বৃহৎ বঙ্গ

[সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.
757.6
091/3

রায় বাহাদুর
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্. (অন

CAL
CEN
LIB
UNIVE

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩৪১

JCU 2959

PRINTED AND PUBLISHED BY SUPERINTENDENT, GOVERNMENT
OF THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Regn. No. 2182.—February, 1930.—A4.

G 15759

উৎসর্গ

মহামহিম পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য
বাহাদুরের শ্রীকরকমলে

মহারাজ,

একদা [illegible] যৌবনে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র পাণ্ডুলিপি হাতে লইয়া [illegible] মহারাজ বীরচন্দ্র [illegible] নামে পুস্তকখানি উপহার করিবার অনুমতি ও [illegible] দর্শন-মানসে আগরতলায় গিয়াছিলাম।

[illegible] এখনও [illegible] নীলা পাহাড়গুলি [illegible] পরনাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের [illegible] দেহে উৎক্ষেপ-পূর্ব্বক পার্ব্বত্য [illegible] পূর্ব্বগগনে বা পশ্চিম-গগনে [illegible] সূর্য্যাস্তের [illegible] সহিত ছটা পরিয়া [illegible] তখন আমার বয়স পঞ্চবিংশতি মাত্র; [illegible] জড়িত সাহিত্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভের [illegible] মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত আছে,—আর মনে আছে, [illegible] বীরচন্দ্র মাণিক্যের দীর্ঘ বীরমূর্ত্তি। তিনি প্রসন্ন [illegible] সে প্রার্থনাই মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তদবধি ত্রিপুরেশ্বর-[illegible] আমি নানাভাবে উপকৃত হইয়া আসিতেছি। মহারাজ [illegible] মাণিক্য ও মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য আমাকে দুঃসময়ে [illegible] যে আনুকূল্য করিয়াছেন, তাহা আর কি লিখিব? আমার প্রিয়বন্ধু [illegible] কর্ণেল মহিমচন্দ্র তাহা জানিতেন।

সেই প্রথম সময় হইতে আজ প্রায় বর্ষ পরাধী পরে আমি শ্রীশ্রী
করকমলে আমার বঙ্গভাষা-সমাহিত "বৃহৎ বঙ্গ" উৎসর্গ করিতে উপস্থিত
হইয়াছি। তরুণ বয়সেই শ্রীশ্রীযুত মহারাজের প্রতিভা ও মহানুভবতার পং
সর্ব্বত্র ঘিরিত হইয়াছে। মহারাজ এই দীনের কুটিরে পদার্পণ করিয়া তাহাকে
প্রতিষ্ঠা আপ্যায়ন ও আনুকূল্য করিয়াছেন এবং এই পুস্তক উৎসর্গ করিবার
অনুমতি দিয়াছেন। আমার প্রথম গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং (সম্ভবতঃ
এই শেষ গ্রন্থ "বৃহৎ বঙ্গ" ত্রিপুরেশ্বরদ্বয়ের নামের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া
পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমার সাহিত্যিক জীবনে
সিংহাসনের উৎসাহ ও আনুকূল্যের রশ্মিপাতে বিকশি
করিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি শ্রীশ্রীযুতকে
করিয়া ভারতবর্ষের এই মহা-অর্থসঙ্কটের দিনে প্রজাহিত-সম্বন্ধে নিয়োগ করুন

গুণমুগ্ধ এবং বিশ্বস্ত
বিনোদচন্দ্র সেন

হইয়াছিল। এ দেশের অধিকাংশ ইতিহাসই মুসলমানগণের রচিত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস; তাহাতে জয়-পরাজয়ের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিজয়ী মুসলমানদিগের কীর্ত্তিই সবিশেষ পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে। সামাজিক, নৈতিক, শিল্প ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত—ক্রম-বিকাশের অভাবের ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ সকল সময়েই খুব ঘনিষ্ঠতর হয় না। বহু শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী জাতি যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে—এদেশে তাহার কোন উল্লেখ-যোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। কিন্তু দশজন কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকের সমবেত চেষ্টায় যাহা সম্পাদিত হইবার পরিকল্পনা হইয়াছিল, আমার ন্যায় অল্পজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা একক তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? তথাপি আমি এতদর্থে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছি। এজন্য আমি ১০।১২ বৎসরের চেষ্টায় এবং ৬।৭ হাজার টাকা ব্যয়ে বঙ্গের প্রাচীন শিল্পের অনেক নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি এই শিল্প-সংগ্রহটি যথাযথভাবে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। এত যত্ন ও কষ্টলব্ধ ভালবাসার জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার কথা আমার মনে উদয়ই হইতে পারে নাই। এই মূল্যবান্ সংগ্রহটি আমি ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের করকমলে উপহৃত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে আমি এই সময় আশ্বাস পাইয়াছি যে তিনি এই জিনিষগুলি আগরতলার রাজ-প্রাসাদে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকে যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহার অধিকাংশই আমার স্বীয় চিত্র-শালা হইতে গৃহীত। এই পুস্তকখানি ত্রিপুরেশ্বরের নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া এবং এই পুস্তকের চিত্র ব্লক প্রস্তুতির জন্য তিনি আংশিক ভাবে আর্থিক আনুকূল্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

'বৃহৎ বঙ্গ' নামটি আমার স্বকপোল-কল্পিত বা আধুনিক নহে। ১৯০৩-০৪ সনের আর্কিওলজিকাল রিপোর্টে উদ্ধৃত (২৭৭-২৮৫ পৃঃ) হীরানন্দ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠে আমরা গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে "বৃহদ্বঙ্গান্" কথাটি পাইয়াছি। একসময়ে বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় বলিতে সমস্ত পূর্ব্ব-ভারতকে বুঝাইত। "পঞ্চ গৌড়," "গৌড়ীয় রীতি," "গৌড় ব্রাহ্মণ"—এই সকল শব্দ প্রাচীন কালের গৌড়দেশের প্রসার ও মহিমা-দ্যোতক। দুঃখের বিষয় পঞ্চ গৌড়মণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী—এদেশের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র—উড়িষ্যাসম্বন্ধে আমরা এই পুস্তকে কিছু লিখিতে পারিলাম না। বাঙ্গলার ধর্ম্মমত, বাঙ্গলার কলা-শিল্প ও বাঙ্গলার রাষ্ট্র-ইতিহাসের সঙ্গে উড়িষ্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। গঙ্গাবংশীয় রাজাদের কেহ কেহ "পঞ্চ-গৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন পর্য্যন্তও রাঢ় অঞ্চলের অনেকটা কলিঙ্গ-নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। গঙ্গাবংশীয় রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন, এই মত এখন অনেক ঐতিহাসিকই গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা অক্ষর ও উড়িষ্যার অক্ষরে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না (এই পুস্তকের ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। বঙ্গভাষা ও উড়িষ্যা ভাষার যে পার্থক্য, তাহা একই ভাষার প্রাদেশিক রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সিংহল-বিজয়ী বিজয়-সিংহের সময় হইতে উড়িষ্যাবাসীরা বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সিংহ-

"বৃহৎ বঙ্গ"।

উড়িষ্যা।

বাহুর যাত্রা উড়িষ্যার রাজ-কন্যা ছিলেন। কুলজীগ্রন্থে উভয় দেশীয় লোকের আদান-প্রদানের সম্পর্কের উল্লেখ বহু স্থানে দৃষ্ট হয়—এই আদান-প্রদান তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের সিংহপুর একসময়ে কলিঙ্গের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল (৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের উড়িষ্যার কলা-শিল্প যে বাঙ্গালী-শিল্পের মোহরাঙ্কিত এবং সেই শিল্পের জন্মস্থান যে বাঙ্গলা দেশ, তাহা প্রথম পণ্ডিতগণের অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন (৪০৭-০৮ পৃঃ); উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি কোণারক মন্দির বাঙ্গালী শিল্পেরই মহিমা-দ্যোতক। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—"হিন্দুদিগের চারিটি স্থাপত্য-যুগের সৌন্দর্য্যের সার লইয়া মন্দিরটি সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা **বাঙ্গলা শিল্পের** চরম শোভা প্রকট করিয়া দেখাইতেছে, মুসলমান ঐতিহাসিকগণও অনিচ্ছার সহিত এই মন্দিরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন" ("It concentrates in itself the accumulated beauties of the four architectural centories of the Hindus...it forms the climax of Bengal art and wrung an unwilling tribute even from the Mohamodens"—Hunter's Orissa, Vol. I, p. 191). অনেকের মতে অশোকের সুপ্রসিদ্ধ কলিঙ্গযুদ্ধের শত্রুপক্ষ ছিল—মেদিনীপুরবাসী বাঙ্গালীরা। উত্তরকালে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের [illegible] উড়িষ্যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়তর হইয়াছিল। [illegible]

[illegible] নিজের গরজেই। উড়িষ্যার [illegible] অন্যতমই প্রাচীনকালে বাঙ্গালীদের সমুদ্র-যাত্রার প্রধান বন্দর ছিল। আমরা সময় ও অর্থাভাব-নিবন্ধন এই বৃহৎ বঙ্গে উড়িষ্যার স্থান দিতে পারিলাম না। "বৃহৎ বঙ্গ" নামটি সম্বন্ধে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে "গৌড়" নামে কাহারও আপত্তি হইবার কারণ নাই, কারণ কলিঙ্গ "পঞ্চগৌড়ের" অন্যতম ছিল, এবং পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গঙ্গাবংশের কেহ কেহ "পঞ্চ-গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন। এখন কতকগুলি লোক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত। যাহারা এক সময়ে এক ভাষা ও একই অক্ষর ব্যবহার করিতেন এবং এক রাজার প্রজা ছিলেন—তাঁহাদের মনে যেন ভেদ-বুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ না থাকে—আমার এই প্রার্থনা। ঐক্যবদ্ধ হইলেই আমরা বাঁচিব, নতুবা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে ভারতবর্ষ হিন্দুর শ্মশান-শয্যায় পরিণত হইবে।

আমি নূতন লেখকগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন নাম-শব্দগুলির কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না, ইহা আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। 'হিউন সাঙ্গ', 'আরাঞ্জেব', 'মোগল', 'সিরাজুদ্দৌলা', 'মুর্শিদাবাদ', 'মোক্ষমুলর' প্রভৃতি শব্দের আমি সুচিরাগত প্রাচীন রূপ বহাল রাখিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ বিজ্ঞান-সঙ্গত উচ্চারণের দোহাই দিয়া এই সকল শব্দের নানারূপ উচ্চারণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধেও আবার সকলে একমত নহেন, শুদ্ধ করিবার চেষ্টা ক্রমশঃ দুরূহাতিদুরূহ হইয়া পড়িতেছে।

বানানের উচ্চারণ।

প্রত্যেক ভাষারই একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা genius আছে। ইংরেজেরা গঙ্গাকে 'Ganges,' বঙ্গদেশকে 'Bengal,' ব্রাহ্মণকে 'Brahmin,' কলিকাতাকে 'Calcutta' প্রভৃতি ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তো এই সকল উচ্চারণ শুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হন না,—এমন কি বোম্বাইয়ের বাবুরা যে পবিত্র 'ঠাকুর' শব্দটার অদ্ভুত রকমের বিকৃতি ঘটাইয়া "Tagore" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরেজীতে নাম লিখিতে গেলে তাঁহারা কোনই কথা শুনিবেন না, সেই 'ট্যাগোর' শব্দটি ব্যবহার করিবেনই। গ্রীক ও রোমানেরা সিন্ধুনদকে "ইণ্ডাস্,কোটাস," সিন্ধুকে "Indus" প্রভৃতি ভাবের বিকৃত উচ্চারণ দ্বারা পরিচিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাসগুলিতে তাহাই চলিয়া আসিতেছে। চীনদেশের লোকেরা অনাদিকাল হইতে ভারতীয় নামগুলির যে বিকৃতি-সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের ভাষায় তাহা সেই ভাবেই চলিতেছে। আমার ভাষার ছন্দ রক্ষা করিয়া প্রাচীনেরা যেরূপ উচ্চারণ করিতেন, তাহার যদি পরিবর্তন করিলে সাধারণের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, বিশেষ, কোন ভাষার স্বভাবানুগ ছন্দ হারাইয়া ফেলিলে নাম-শব্দগুলি সেই দেশবাসীর স্মৃতির অনুকূল হয় না। কিন্তু সুধী-সমাজ যদি আমার অবলম্বিত রীতি দোষাবহ মনে করেন, তবে আমি ভবিষ্যতে সাবধান হইব।

বাঙ্গলায় আর্য্য-সভ্যতার ধারা

এই পুস্তকে মগধের সঙ্গে—তথা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে—বাঙ্গলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে—বিশেষ করিয়া মগধে—যে সকল রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় তাহার অনেকগুলি চলিয়া আসিতেছে। আর্য্য-সভ্যতা এবং দেশীয় আচার ও রীতির ধারা-বাহিকত্ব বাঙ্গালীরা যে পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে যে সকল কুমারীর পিতামাতা দারিদ্র্য-নিবন্ধন তাহাদিগকে যোগ্যবরের সঙ্গে বিবাহ দিতে অসমর্থ, তাঁহারা সদ্যোযৌবন-প্রাপ্ত কন্যাদিগকে বিবাহার্থে বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।" ("Strabo tells us that those who are unable from poverty to bestow their daughters in marriage, expose them for sale in market-places in the flower of their age" Robertson's India, p. 65)। সেদিন পর্য্যন্তও বৈষ্ণবেরা রামকেলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষুণীদিগকে বাজারে বিক্রয় করিত,—সাধারণতঃ এইরূপ মেয়েদের এক এক জনের মূল্য ছিল ১৷৷০ (পাঁচ সিকে)। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যাওয়ার পর এই প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ অবশেষ বোধ হয় এখনও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি দাশরথি এই প্রথাকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন :—"মোসাঞ্চীকে পাঁচ সিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাতরক্ষে কুলীন বড় নেড়া।"

কুমারীদিগকে বাজারে বিক্রয়।

খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক পুরুষজাতীয় ধর্ম্ম-মহামাত্রদিগের সঙ্গে স্ত্রীধর্ম্ম-মহামাত্রও নিযুক্ত করিয়া ঘরে ঘরে 'সদ্ধর্ম্ম' প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সেদিন পর্য্যন্তও "মা-গোসাঞী"গণ ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে আনাগোনা করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন, তাঁহার 'দিদিমা' এই "মা-গোসাঞী"-গণের যাতায়াত পছন্দ করিতেন না। এই "মা-গোসাঞী"গণ খুব সম্ভব সেই অশোকের সময়ের "স্ত্রীধর্ম্ম-মহামাত্র"গণের ধারাটি বজায় রাখিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন রীতি, ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্য বৈষ্ণব সমাজই এই দেশে বেশী রক্ষা করিয়াছেন, যেহেতু প্রাচীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলি অধুনা বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গেই বেশী মিশিয়া গিয়াছে। জন-সাধারণের মধ্যেই প্রাচীন ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যায়, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সেই জন-সাধারণকে আত্মসাৎ করিয়াই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্ত্রীধর্ম্ম-মহামাত্র ও মা-গোসাঞী।

পালি সামঞ্ঞ-ফল-সুত্তে পুরণ কস্সপ, মক্খলিপুত্ত গোশাল, অজিত কেশকম্বল, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ জ্ঞাতি-পুত্র, সঞ্জয় বেলট্ঠি প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতের যে সকল মত আমরা উল্লিখিত দেখিতে পাই, সেই সকল মত, কোথাও পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হইয়া, কোথাও

আজীব একাভিজাতী রূপ—অধুনা সহজিয়া সেবাদাস পরিবার।

[redacted]

বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে যে নৈশ মিলন-সমিতি হইত, তাহার উল্লেখ আমরা খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত পালি "কথাবত্থু"নামক পুস্তকে পাই, তাহাই বঙ্গদেশে সহজিয়াদের নৈশ-সভায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা "একাভিজাতী" নামে পরিচিত ছিল এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিব্বত রাজা চাংচুব তাঁহার দূত 'নাগচো'র মুখে দেশের যে অবস্থা দীপঙ্করকে জানাইয়াছিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ এই দলেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহারা নীল আলখাল্লা পরিতেন এবং দেশময় ব্যভিচারের স্রোত বহাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং ইহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগের ভূমিকা এবং ঐ পুস্তকের ৩১৮-৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "চাক্ষ দর্শন" নামক পুস্তকে এদেশের সহজিয়াদের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, আমি তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি (এই পুস্তকের ৭৭৩ পৃঃ)।

শুধু যজ্ঞোপবীত ও হরিদ্রা নহে,—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের চিত্রাঙ্কন-প্রচেষ্টা, যাহা সিঙ্গানপুরে প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গেও বাঙ্গলার কুটির-শিল্পের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। পাহাড়পুরে দেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের যে সকল নিদর্শন আছে,—তাহাতে মনে হয় বাঙ্গলার

কুটির-শিল্প।

কলালক্ষ্মী যেন অতল জলধিতল হইতে তাঁহার প্রথম নিষ্ক্রমণের পদ-চিহ্ন সেখানে রাখিয়া গিয়াছেন। অজন্তার চিত্রগুলি যে বাঙ্গালী চিত্রকরের করস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ গ্রন্থভাগে (৪১৬-৪২ পৃঃ) প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় জগৎ-প্রসিদ্ধ শিল্প-কেন্দ্রগুলির আদর্শ এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গপল্লীতে আর্য্যসভ্যতার শেষ রেণু-কণা আমরা যে পরিমাণে কুড়াইয়া পাইয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তের অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। এদেশের কুটির-শিল্পে আমরা মহেঞ্জোদারো, অজন্তা, অমরাবতী প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রের তীর্থ-রেণু প্রচুরভাবে পাইতেছি। পাতালের গাত্রে, কাষ্ঠে, বস্ত্রে, তুলট কাগজে, ভিজট ও তালপত্রের পুঁথির মলাটে, উপাধানের আচ্ছাদনে, কাঁথা— শিকা— আলপনা— মেঠাই — দেয়াল-চিত্রে, ঘটিতে, বাটিতে, পালঙ্কে, পানের ডিবেতে, দেব-বিগ্রহে, কাঠের রথে, সিংহাসনে, মন্দিরের পোড়া ইটে, মাদুর ও পাটীতে, হস্তিদন্তের ও কাচের চৈতন্য-পত্রে, এমন কি বিছানা বাঁধিবার দড়ি, পুঁতির মালা, নারিকেলের মালায় রচিত নব-মুণ্ড, অস্থের বাঁট, মলে, আসন প্রভৃতি শত শত নিত্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে চারুকলার যে সকল নিদর্শন পাইতেছি, তাহা সুচিরাগত বৌদ্ধ শিল্পের ধারাটি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। গত এক শত বৎসরের মধ্যে এই স্রোত মন্দীভূত হইয়া বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা জন্মাইতেছে। বাঙ্গলার শিল্প-কৃতির [illegible] পাঠকের দৃষ্টি এই পুস্তকের ২৩৫-৪৮, ৪০৬-৪২ পৃষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি ; [illegible] চিত্র-শালা ছিল।

[illegible] ধাকে। এক একটি উপাখ্যানের [illegible] হইয়া সুদীর্ঘ যানচিত্রের মত জড়ান থাকে এবং তাহাতে সেই বিষয়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এরূপ সুসম্বদ্ধভাবে পর পর প্রদর্শিত হয় যে, পটুয়ারা যখন এক একটি দৃশ্য দেখাইয়া তৎসম্পর্কিত পয়ার আবৃত্তি করিয়া যায়, তখন দর্শক ও শ্রোতারা সমস্ত গল্পটি কবিত্বের ভাষায় ও মনোরম চিত্র-সাহায্যে উপভোগ করিবার সুবিধা পান। এই চিত্রপট-প্রদর্শনের রীতিটা বিক্রমপুরে "পট নাচানো" নামে পরিচিত। বঙ্গের কোন কোন স্থানে এই শ্রেণীর পটুয়াদিগকে 'পটিয়ার' বলে। এই রীতিটি খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত। বৌদ্ধগণ এইরূপ চিত্র দ্বারা জাতকের গল্পগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেন—ইহাদিগকে প্রাচীন কালে 'মঞ্জরী' বলিত এবং চিত্রগুলিকে কখনও কখনও 'যমপট' বলা হইত, যেহেতু চিত্রের উপসংহারে ধর্ম্মরাজের সভা ও পাপের দণ্ড প্রদর্শিত হইত। শেষোক্ত প্রথাটা এখন পর্য্যন্তও বিদ্যমান। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকে এইরূপ চিত্র-প্রদর্শনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের অনুকরণে খৃষ্টানেরাও এইরূপ চিত্র দেখাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, রোমে ভাটিকানে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'পেপিরাস' (Papyrus) পত্রে অঙ্কিত এইরূপ কয়েকখানি চিত্র আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রাচীন ধারাটি সেদিন পর্য্যন্তও বাঙ্গালী চিত্রকরেরা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক পট উদ্ধার করিয়াছেন এবং পটিদারেরা যে সকল রীতি গাহিয়া তাহাদের ছবির ব্যাখ্যা করে, তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর চিত্রকরদের সম্বন্ধে পুস্তকের ৪৩৯-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গলাদেশে আদর্শের কোন বিভাগেই অল্প সঙ্কট নহে,—বাঙ্গালীর লক্ষ্য 'ভূমা'।

কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে, বাঙ্গালী যে পথে চলিয়াছে, সেই পথেই তাহার লক্ষ্য 'ভূমা'। এই আদর্শের মধ্যে কোন সীমা-রেখা, সঙ্কোচ বা দ্বিধার ভাব দেখা যায় না; বাহ্যসজ্জা, দাম্পত্য, বা লৌকিক ধর্ম্মসংস্কার দ্বারা এমন কি শুরুচির অনুরোধেও এই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। দাতাকর্ণের গল্পটি খুব প্রাচীন; এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালাতেই বঙ্গের নানা জেলা হইতে সংগৃহীত দাতাকর্ণের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত প্রায় অষ্টশত পুঁথি রক্ষিত আছে। মেদিনীপুর হইতে রংপুর, এবং শ্রীহট্ট হইতে ত্রিবেণী—এই বৃহৎ প্রদেশের সর্ব্বত্রই দাতাকর্ণের পুঁথি পাওয়া যাইতেছে। একসময়ে ঘরে ঘরে প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলেকেই এই পুস্তক পড়িতে হইত, ইহা বাঙ্গালী ছেলের নিত্যপাঠ্য "শিশুবোধক" বইখানির অন্তর্গত ছিল।

দাতাকর্ণ।

অতিথি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিবেন এই সত্য-রক্ষার ব্যপদেশে কর্ণ ও তাঁহার সীমন্তিনী তাঁহাদের একমাত্র পুত্র বৃষকেতুর মস্তক কর্ত্তন করিয়া কাটিয়াছেন এবং শেষে সেই পুত্রের মাংস অতিথির অন্ন রন্ধন করিতেছেন। এই গল্পটির কথা গ্রন্থভাগে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপাখ্যানটি আর্ট হিসাবে একদেশে অসঙ্গত ও নিষ্ঠুর—এমন কি বীভৎস। আর্টের প্রচেষ্টা—ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি এমন কি সাহিত্য-রীতিকেও কতকটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করা। সে হিসাবে গল্পটি ব্যর্থ,—ইহার লক্ষ্য দান ও আতিথ্যের আদর্শ-প্রদর্শন, এই আদর্শ একেবারে ভোলানাথ শিবত্বের প্রায়—সম্পূর্ণ নিরাভরণ, এমন কি ছাই-ভস্ম-মাখা। ইহার বিশেষত্ব এই,—সেই আদর্শ আর সকল কথা অক্লেশে ভিঙ্গাইয়া গিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের রাজ্ঞী শৈব্যা অক্লেশে শ্মশানের চিতা জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের এই আদর্শটি মাতৃকরুণার জন্য পর্য্যন্তও একটু মাত্র অবকাশ রাখে নাই। একটি নিঃশ্বাস বা একফোঁটা অশ্রু পড়িলে সঙ্কল্প বিফল হইবে। পল্লী-গীতিকার (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৭৯-১১৮ পৃঃ) কাঞ্চনমালার গল্পও এই একই সুরে বাঁধা। কাঞ্চন তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীকে স্বীয় চিরশত্রু বধূমালার হস্তে চিরতরে সমর্পণ করিয়া যাইতেছেন; যে মুখ একবার মাত্র দেখিবার জন্য তিনি শত শত জীবনের কষ্ট তুচ্ছ করিতে পারেন, সেই স্বামীকে আর দেখিতে পাইবেন না,—এই মহা-ত্যাগের সময়ে তাঁহারও একবিন্দু অশ্রু বা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িতে পারিবে না,—ইহাই সর্ত্ত, তবেই স্বামী অন্ধচক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহার এই পরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রজাবতীর শূলের উপর প্রাণ দেওয়ার উৎকট পরীক্ষাকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। বিশেষত্ব এই, দাতাকর্ণের গল্পে যাহা

কাঞ্চনমালা।

নাই, সই সাহিত্যিক [illegible] কাব্যগুচ্ছ "কাঞ্চনমালা" [illegible]। এই গল্প ভাগুরে সকোচ হেথায়ে সভাইয়াও কাব্যোচিত [illegible] এ সময় রক্ষা করিয়াছে, এরূপ মহান [illegible] সাহিত্যে [illegible] ধর্ম মঙ্গলের কালু ডোম [illegible] কালু ঘোষ।

আ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাকৃতিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রেম যদি একেবারেই ও ইন্দ্রিয়সম্পর্কশূন্য হয়—তবে তাহাই আদর্শ প্রেম। চণ্ডীদাস এইরূপ প্রেমের প্রসঙ্গেই লিখিয়াছিলেন,—"বন্ধুর ও বাসনা আছয়ে যে জন, কেহ না চিনয়ে তারে প্রেমের আরত্ত এ জন জানয়ে সেই যে চিনিতে পারে।" চৈতন্য-চরিতামৃতকারও এই প্রেমের লক্ষণ প্রসঙ্গে কবিরাজ উপমাচ্ছলে বলিয়াছেন—"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।" শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা ছাড়া চণ্ডীদাসও ইহাই বলিয়াছেন, ইহা মনের সম্বন্ধে কিংবা দেহের সম্বন্ধে "কেবলি লৌকিক কথা।" তৎপরে, সমাজের সমস্ত নিয়মকে পদে পদে ইহা অস্বীকার করিয়াই যেন বলিয়াছেন, তিনি যে কবিতার সূত্রের দ্বারা ইহা প্রমাণ করিবেন তাহাকে কুলটা বলিয়া ঘৃণা করিয়া অন্যেরা তাহাকে চিরদিন দূরে রাখিতে পারেন, এবং তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া মনে করিয়া অন্যেরা তাহাকে চিরদিন অবিশ্বাস করিতে পারেন, তিনিই এই দুই পংক্তির পরম পণ্ডিত বাঙ্গালী সমাজ হইয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে চারুবাবুর সমস্ত পুস্তক পাঠে জানা যায় নাই যে তাঁহার আত্মগৌরব বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার কোনও স্পর্ধা ছিল। এই যে পদকর্তা যাঁহার এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০৩-৩৯ পৃঃ পদকল্পতরু-সম্পাদক স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর "চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য, ১৪৫ সংখ্যা, ১৮৫-২০৭ পৃঃ) এই প্রেমের অলৌকিক ভাস ও অনৈসর্গিক অর্থ [illegible] নিঃসন্দিগ্ধভাবে মাত্র প্রেমের কথাই [illegible] এবং যাহা বলিবার সুর অন্য কোন জাতি দেখাইতে পারিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

বাঙ্গালার এই পদ-সাহিত্যকে [illegible] বলিয়া মনে হয়। এখনও হয়ত এরূপ দুই একটি বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া যাইতে পারে, যিনি বাঙ্গালার বসিয়া বাঙ্গালীর [illegible] কল্পনায় স্বকীয়া-পরকীয়া-দ্বন্দ্বে কাঁদিয়া অধীর হন নাই, যাঁহার [illegible] এই দুর্ভিক্ষের যে [illegible] হয়,—সেই খোল করতাল। সংকীর্তনের সময়ে কাঁদিয়া কুলনারীদের মাতাইয়া তোলেন। "ক মেথি কীর্তনে বাপু কি রস কহসি" বলিয়া যাঁহাকে উপহাস করা হইয়াছিল, তিনি বাঙ্গালা প্রচলিত চৈতন্য-ভাগবতের [illegible] যে এক বাঙ্গালী ভক্তিমতী বঙ্গমঞ্চে নটরূপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সংকীর্তনের [illegible] করিয়াছিলেন (আদি খণ্ড, ৮ম অধ্যায়)। এই পদাবলী সম্বন্ধে যাঁহারা [illegible] অভিজ্ঞতা বাল্য বনবাসের সময়ে [illegible] অভিজ্ঞতা হয়ে পাঠ করিয়াছিলেন যে [illegible] আর বিদ্যাপতি রচিত পুরুষ-নায়িকা-সম্বন্ধ-ঘটিত পদগুলির যে [illegible] ইহাদের সঙ্গে [illegible] এই ভাবে মুখস্থ করিয়া [illegible] ধর্ম্মপ্রচারক এই ভাবপদ্ধতি যে কিরূপ অপূর্ব্বভাবে

* "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে।
মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

প্রকাশিত হইয়াছে তাহা চেতন্য লাভের প্রকাশ পাইয়াছে—সে লাভ আত্মস্থ স্বপ্ন ও স্বর্গের সুধাময়। এখনও খাল বাহিয়া উঠিলে ইহসংসার ও অধ্যাত্মলোকের মধ্যে যে ব্যবচ্ছেদ রেখা বাঙ্গালা তাহা ভুলিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই ভাব প্রবণতা—যাহা বাঙ্গালী জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী করিয়াছে তাহা নীরস ও শুষ্ক জড়বাদীরা নিন্দা করিয়া থাকেন। যুগে যুগে আদর্শ ভিন্ন হয়, এক যুগে যাহা সর্বজন-প্রশংসিত, অন্য যুগে তাহার গুণাগুণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে এমন কি তাহা নিন্দনীয় হয়। সুতরাং আদর্শের বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে যুগেই বাঙ্গালী যে আদর্শের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছে, সে আদর্শ পিছনে এতদূর চলিতে পারিয়াছে যে তাহা অপর জাতির বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঙ্গালী অসাধারণকে লক্ষ্য করিয়াছে। সেই অসাধারণ মহান্ হইতেও মহান এবং অণু হইতেও অণু "মহতোমহিয়ান্ মহাত্মার অপরোক্ষ অনুভব।" বাঙ্গালীর গল্প সাহিত্যের পুনরায় উল্লেখ করিব। গল্পগুলি নিছক কল্পনা ও মিথ্যা হইলেও ইহারা জাতির চরিত্রের নিদর্শন। রাজপুতে "যমপুরী-বলাসে"র পরীক্ষা, —সে পরমসুন্দরী ষোড়শী রমণীর সঙ্গ গ্রহণ করিয়া পরদিন আনাইল ছাগের পক্ষে সে বাহিরে ঘুমাইতে পারে নাই, অনুসন্ধানে জানা গেল, অপোগণ্ড অবস্থায় সেই রমণী কয়েক মাস ছাগদুগ্ধ খাইয়াছিল উৎকৃষ্ট চমৎকৃতিপূর্ণ বহুমূল্য শয্যায় শুইয়া "যমপুরী-বলাসে" অভিযোগ করিল, চুলের জন্য রাত্রে তাহার ঘুম বিঘ্ন ঘটিয়াছে -জানা গেল সপ্তাহের পঞ্চম দিবসে সে মাথার চুল ছিল। রাজার অতিথি শালায় অলসদের পরীক্ষা। রাজা অলসদিগকে ভরণপোষণ করিবেন—এই ঘোষণা করিয়া ছিলেন। শত শত অলস ব্যক্তি আসিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিল। পরীক্ষার দিনে মধ্যরাত্রে রাজা গৃহে আগুন ধরাইয়া দিলেন, আগুন যে লাগিল—পলাইয়া গেল, মাত্র রহিল তিন জন এই তিন জন প্রকৃত অলস ব্যক্তি পক্ষাঘাতে অক্ষিতে পরিণত হইল, তবু নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা মাত্র করিল না। একজন আগুন দেখিয়া বলিয়া উঠিল কত রঙ্গ জানে!' দ্বিতীয় ব্যক্তি আরও অলস, সে বলিল 'কে বা আঁখি মেলে!' চোখ চাওয়াও তাহার নিকট শ্রম-সাধ্য; তৃতীয় ব্যক্তি বাক্যব্যয় করিতেও প্রস্তুত নহে—সে অতি সংক্ষেপে বলিল 'ফি সো' (ফিরিয়া শোও)। এই সকল তুচ্ছ গল্পের দ্বারা বুঝা যায়, বুদ্ধি ও অনুভূতিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অতি প্রখর করিবার যে তপস্যা, তাহাতে বাঙ্গালী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই সকল আজগুবী গল্পের বহুল প্রচার দ্বারা মনে হয়, বাঙ্গালী সর্বদা একটা অসম্ভব আদর্শ চোখের সামনে রাখিয়াছে। বাঙ্গালা যাহা করিবে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িবে। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জাতীয় চরিত্র বুঝাইবার জন্য তাঁহার একখানি পুস্তকে এইরূপ দুই একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'কৃপণ' নামক প্রাচীন যুগের একটি গল্পে শুধু দুইটি পয়সা বাঁচাইবার জন্য একজন কৃপণ ধনী কি অসাধ্য সাধন করিয়াছিল, তাহা লিখিত আছে। অবশেষে সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সে চিতায় যাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল যখন চিতায়

অগ্নি-সংযোগ করা হয়, তখনও সে নিজেকে বাঁচাইবার কোন উদ্যোগই করে নাই। এই অবস্থায় ভগবান্ সদয় হইয়া ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া তাহাকে চিতা হইতে উঠাইয়া বলিলেন—"আমি তোমার অনন্যভক্তি একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি যাহা চাও আমি তাহাই তোমাকে দিব, তুমি বল কি বর চাও।" কৃপণ বলিল, "এই বর দাও, যেন আমাকে এই দুইটি পয়সা না দিতে হয়।" হরেন্দ্রনাথ বসু নামক এক নবীন লেখক তাঁহার "মুন্সিল আসান" নামক একখানি পুস্তকে এই সুপাঠ্য গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা কি চায়, তাহার কি সাধনা, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়—সে সূক্ষ্ম কাজ করিবে, তাহা একেবারে অসম্ভব, সে সূক্ষ্ম চিন্তা করিবে তাহা একেবারে অসম্ভব। বিলাতের আর্ট বাঙ্গালী তাঁতির নিকট মসলিন্ তৈরি করিবার কৌশল শিখিতে চাহিয়াছিল বাঙ্গালা সে বিদ্যা গোপন করিল না, তাহাকে শিখাইয়া দিল। কিন্তু নানারূপ কসরত করিয়া বিলাতী তাঁতি হতাশ হইয়া বলিল, "আমরা এরূপ সূক্ষ্ম সুতো তৈরি করিতে পারিব না, আমাদের আঙ্গুল মোটা।" মোট কথা বাঙ্গালী যাহা করে তাহা শুধু দৈহিক শ্রম নহে, তাহা আধ্যাত্মিক তপস্যা। অপোগণ্ড কোন ব্যক্তি তাহা পারিবে না। এই একশত বৎসরের মধ্যে আমাদের সেই তপস্যা টুটিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর প্রেম তপস্যা যে কিরূপ, তাহা গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখা যায়।*

এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর দেহশ্রী সম্বন্ধে লর্ডলাট মিণ্টো বলিয়াছিলেন, —এরূপ লাবণ্যপূর্ণ সুগঠিত মুখশ্রী ও দেহ-সৌষ্ঠব তিনি জগতের অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখেন নাই। "I never saw so handsome a race, these (the Bengalis) are tall masculine athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are of the most classical European models with great variety at the same time"—Lord Minto's letter to the Hon'ble A. M Elliot, Sep 20, 1907 ওদালটার হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন, "ইঁহাদের দেহশ্রী কি আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন? আমি আপনাদিগকে ৬টি বাঙ্গালার সহিত পরিচিত করিয়া দিব, —ইঁহারা আমার সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছেন, ইঁহারা মল্লিকের চূড়ার মত আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন, ইঁহাদের মূর্ত্তি যেমনই দীর্ঘ তেমনই সুগঠিত। ইঁহারা আমার

বাঙ্গালীর দেহশ্রী।

* "কনক গাড়ু, কনক সম পরশল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল পন্থ, চলইতি ধনি কাঁপি।
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি দূরতর পন্থ, গমন ধনি সাধয়ে, মন্দিরে যামিনী জাগি।
কত-যুগ সহন দুখি চলু ভামিনী বিহরিত পরানক আশে।
যদি কছন-পদ কোমল-বরজক পিছই ১৩৭-ভয় সাসে।
গুরুজন-বচনে বধির সম মানই, আন কহই কহ আন।
পরিজন-বচনে মধির সম হাসই, গোবিন্দ দাস পরমাণ।"

খনি মূর্ত্তি দেখিয়া আমোদের সহিত একটু হাসিয়া থাকেন ("Is their physique so inferior? I will introduce to you two Bengalis who have come with me to England. They tower above me and their are as well-proportioned as tall, they smile on my small stature") একশত বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালার চেহারা লোকের শঙ্কা উৎপন্ন করিত, তাহা মিস বেলনস্ আঙ্কিত ছবিগুলি ও ৮৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মল্লবীরের চিত্রটি দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে বেলনসের আঁকা ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া চরকের মূলটির প্রতি লক্ষ্য করুন, সেই সকল মূর্ত্তির কবাট বক্ষ ও পুষ্টান্বিত দেহ লাবণ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখন কলেজের ছাত্রদের মূর্ত্তি একেবারে চতুষ্পী হইয়া গেলেও পাড়া গাঁয়ে কৃষক ও অপরাপর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালীর সেই অতীত যুগের পুরুষোচিত দেহ-সৌষ্ঠব মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে

বাঙ্গালার বীরত্ব যে এক কালে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা বাহিরের ইতিহাসে মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয় আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি— আমাদের অতীত গৌরবের কথা আমরা কিছুই লিখিয়া যাই নাই, কিন্তু তথাপি পরকীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে সে গৌরবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একদা এই প্রাচ্য ও গঙ্গা-বাহু দেশের বিক্রান্ত যোদ্ধাদের ভয়ে অগ্রসরী আলেক্‌জেণ্ডারের সৈন্যেরা পঞ্জাবে গিয়া পলাইয়া গিয়াছিল,—আলেক্‌জেণ্ডার সাশ্রুনেত্রে মিনতি করিয়াও তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই

বাঙ্গালীর বীরত্ব।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি ভার্জিল তাঁহার Georgics (III, 27) কাব্যে বাঙ্গালাদের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "গুণ্ডি-মন্দিরের দ্বার-দেশে হস্তিদন্ত ও স্বর্ণের অক্ষরে আমরা এই গঙ্গারিডিদের * যুদ্ধের কথা ও বিজয়ী কুইরিনিয়াসের সৈন্যের সমর-কৌশল চিত্রিত করিয়া রাখিব" (On the doors will I represent in gold and ivory the battle of the Ganga-ride and the arms of our victorious Quirinius) দ্বাদশ শতাব্দীতে কলহণকবি কাশ্মীরের ইতিহাসে কতিপয় বাঙ্গালী সৈন্যের রাজভক্তির অতুলনীয়

* ভার্জিল গ্রন্থোক্ত উল্লিখিত 'গঙ্গারিডি' শব্দটির আসুরক অর্থাৎ গঙ্গার এই দোয়াব প্রদেশকেই বুঝাইতেছে। কেহ কেহ 'গঙ্গারিডি' শব্দ গঙ্গা-বাহী শব্দের রূপান্তর বলে করেন। এই শব্দের সঙ্গে একটি নদী ও তৎতীরবর্ত্তী গ্রামের নামের বিশেষ ঐক্য দেখা যায় উহা 'গাড়ুর' বা 'গাড়ুই' গাড়ুর নদী যমুনা জেলার অন্তর্গত ইহাদের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। এই নদী নিয়া বেহুলা কবীর সহিত হাসিয়া নিয়াছিলেন। "গরম গঙ্গার জলাই বীর আমার চুল, ভাতিখন সখা গেল গাড়ুর কুল" (নিরঞ্জন রুশ্ম) এই নদীর তীর উলনিবিষ্ট করোজিয়া ঠাকুরেরা গাড়ুলী নামে পরিচিত। এখন বাকলার দ্বাবিংশেষের নামে গঙ্গা ভাটিয়া বাড়ুরী, মুখটি। সংস্কৃত উপাধ্যায় শব্দের যোগে চট্টোপাধ্যায় 'বন্দ্যোপাধ্যায়' 'মুখোপাধ্যায়' প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছে। এগুলি যে গ্রামের নাম তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও 'পাই' শব্দ যার নামের শেষে উহার পুষ্টি হইতেছে। খৃষ্টিয়ানের সময়েও (ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতাব্দী) নামের এই সংস্কৃতাত্মক পরিবর্ত্তন হয় নাই, কবি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগকে 'মুখুটি' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কি ভাবে তাহারা পরিত্রাস-কেশরের মস্তিষ্কের পার্শ্বে প্রাণ দিয়াছিল, তাহা উচ্ছ্বসিত কবিতার ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন (২২৬ পৃঃ)। কলহণ লিখিয়াছেন, "এই দৃষ্টিয়ের বাঙ্গালী সৈন্য সোদল যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিল, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও বুঝি তাহা পারিতেন না।" অথচ কবি এই বাঙ্গালী বীরদের ঘোর শত্রু ছিলেন। রঘুবংশে লিখিত আছে, "বঙ্গীয় নৃপতিগণ রণতরীতে আরোহণপূর্ব্বক" রঘুর দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধ এরূপ ঘোরতর হইয়াছিল যে, বুদ্ধ জয় করিয়া রঘু "গঙ্গাস্রোতান্তর্গত নলপুরে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন।" রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ। যে সমুদ্রগুপ্ত আসমুদ্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও বঙ্গদেশ জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তিনিও এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়া সাগর সঙ্গমে একটি স্মারক জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। কাবো, তাম শাসনে এবং অন্যান্য গ্রন্থসূত্রে আমরা বঙ্গের বিজয়ী রণতরীর উল্লেখ পাই। মহীপাল বঙ্গীয় সিংহলী সৈন্য লইয়াই তাঁহার অপ্রাতিহত সমরাভিযান সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

একশত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী রণক্ষেত্রে দুর্জ্জয় ছিল। ইণ্ডিয়ান আরজালের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশপ হিবার লিখিয়াছিলেন "যে দৃষ্টিয়র সৈন্য লইয়া লর্ড ক্লাইভ এরূপ আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিল।" "That ill e army with which Clive ad such wonders was raised chiefly from Bengal" ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ঐতিহাসিক মলটন লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালীরা যত রণক্ষেত্রে দেখাইয়াছে, তাহারা সাহসিকতায় য়ুরোপীয় সৈন্যদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।"—"The Bengalis have on many occasions shewn themselves in no way inferior to European troops in personal courage" ওয়ালটার হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন, "আমাদের ভারতীয় যুদ্ধগুলির ইতিহাসের আদিপর্ব্বে বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ আমাদের সৈন্যশ্রেণীর বহু দল সংগঠন করিয়াছিল এবং যুদ্ধে সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।" "At an early period of our military history in India they (the Bengalis) almost entirely formed several of our battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers" ইহার পরে বোধ হয় বলা অনাবশ্যক হইবে না যে, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর বাহুবল ও জগৎ শেঠ-প্রমুখ বাঙ্গালীদের অকুণ্ঠ অর্থ সাহায্য ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিল। এখনও পুলিস ডিপার্টমেণ্টে শত শত বাঙ্গালী কোন কোন সময়ে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের ঘোর দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করিয়া—এমন কি বহু সময়ে প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহকারিতা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের ছোটলাট ও বড়লাটগণ বারংবার উচ্চ প্রশংসার সহিত তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেদিনও (২৬ শে নভেম্বর, ১৯৩৪) বড়লাট নয়া-দিল্লীতে ইন্সপেক্টর জেনারেলদের সম্মেলনে বলিয়াছেন,—"আমি এই সুযোগে বাঙ্গলা ও কলিকাতা পুলিসের বিশেষ সুখ্যাতি করিতেছি। আশা করি এ সম্বন্ধে আপনারা সকলেই আমার সহিত একমত হইবেন। যদিও আপনাদের সকলকেই বিপজ্জনক অবস্থা নিবারণ করিতে হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গলার ন্যায় অপর কোনও

প্রদেশে পুলিস-বাহিনীকে দুর্দান্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শত্রুর সহিত এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে হয় নাই। আমি এবং আমার গবর্নমেণ্ট উপলব্ধি করিয়াছি যে সম্প্রতি অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বঙ্গেলা পুলিসের আবহাওয়ার রাজনীতিক, কর্তব্যপরায়ণতা এবং বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ক্রমাগত চাপ পালন করিবার ফল"—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৩৪।

বাঙ্গালীরা যুদ্ধকালে দুর্দান্ত হইলেও স্বভাবতঃই তাহারা অসামরিক বাঙ্গালার রাজবাজড়াগণই বিদেহো হইয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃতিগত দুর্বলতা নাই।

বাঙ্গালার রাজত্বকাল।

খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালার রাজত্বকাল (৭৩০-১১৭৫ খৃঃ) তাহার প্রত্যক্ষ সেনাপতি রাধানাথ আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালীরা নিজেদের কথা নিজেরা লিখিয়া যান নাই, তখন বিদেশীদের প্রদত্ত অতি সামান্য বিবরণ এবং কাহা-কথার প্রমাণই আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে লক্ষ্মা চুরনী রাজার জন্য যাহা করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা রাজনীতিক উচ্চতর নিপুণ জগতের ইতিহাসে তুলাধনা, পুত্রের আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও যিনি তাহাদিগকে ঘুম হইতে ডাকিয়া দিয়া থাকার জন্য রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সেই আহ্বানে থাকা-সুখার মৃত্যু হইলে এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ না করিয়া স্বামীকে তাঁহার নিশ্চেষ্টতার জন্য গঞ্জনা করিয়া তাঁহাকেও সেই অসম সমরে প্রেরণ করিয়াছেন। বহু ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই একই কথা ভাষান্তরিত হইয়াছে, সুতরাং এই ইতিহাস-মূলক কাব্যে এই ঘটনাগুলি নিছক গল্প বলিয়া মনে হয় না। আর এগুলি যদি শুধু গল্পই হয়, তথাপি রাজনীতিক আদর্শটা যে বাঙ্গালীর কত বড় ছিল তাহা গল্পগুলি পাঠে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

বাঙ্গালীর সামুদ্রিক অভিযানসম্বন্ধে দেশময় শত শত রূপ কথা ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এক সময়ে ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি জাতির বিচার দ্বারা লোকের মতে অভিজাত্য নির্ণীত হইত না। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র দুইই পদ-প্রতিষ্ঠায় প্রায় সমকক্ষ ছিলেন, গুপ্ত ও পাল-রাজত্ব বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগ, তখন বণিকেরাই প্রধান ছিলেন। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর কাব্যের নায়ক ছিলেন। ইঁহাদের সময়ে ব্রাহ্মণ-প্রভাব খুব বেশী ছিল না, বণিকেরা ব্রাহ্মণের টোলে কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি সর্বশাস্ত্র পাঠ করিতেন। ধনপতি সদাগর এক ব্রাহ্মণকে শুভদিন ধার্য করিতে আদেশ করেন, কিন্তু পুরোহিত-কথিত শুভদিনটি তাঁহার মনের মত হয় নাই, এজন্য ক্রুদ্ধ সদাগর "নফরে আদেশ করি মারে তাকে ধাক্কা," অবশ্য পাল-রাজত্বের শেষদিকে ব্রাহ্মণ-প্রভাব বৃদ্ধি পায়,—উহা গুপ্তোত্তর, বৈদ্যদের প্রভৃতির যুগ। এই বণিকদের সমুদ্রযাত্রা কেন নিষিদ্ধ হইল এবং সমাজে তাঁহারা কেন হীনতা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। নৈতিক অবনতি না হইলে কোন ব্যক্তি বা জাতির অধঃপতন হয় না

এই অবনতির সূচনা আমরা কাব্য ও রূপকথায় পাইতেছি, তাহা ইতিহাসগ্রাহ্য না হইলেও খাঁটি সামাজিক চিত্র। ধনপতির স্ত্রী খুল্লনাকে লইয়া বণিক-সমাজে যে ঠাট্টা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়—সেই সমাজের আদর্শ অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। মুরারি শীলের যে চিত্র কবিকঙ্কণ দিয়াছেন—তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টের। রূপকথায় বণিকদের প্রত্যাবর্তনসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে

"কোনও বেনে ভরাডুবি দিতে ভরাডুবি বন্দির করে
কোনও বেনে কাঁকড়ের ঘর বেড়ে সন্ধার পরে।
কোনও বনে খাওয়া' পাতে কই দিতে ভাবয়া ফের
ওরে হরামজাদিকা, সাতমাসিকা কার লে কোন্ বিকায়"

ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, ২৯৯ পৃ.

বাঙ্গালার যাত্রা, ধাত্রা, সুরঙ্গ প্রভৃতি ভারতীয় ইন্দপুঞ্জে অভিযানসম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা গবেষণা দ্বারা সুসংবদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গলা অক্ষর বাঙ্গলা শিল্পাদর্শ, বাঙ্গালীর মত নাম এবং জাভায় উপাত্ত ঐ সকল দ্বীপে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাস বাঙ্গলা ছাঁদে বাঙ্গলা গৃহ নির্ম্মাণ-পদ্ধতি—অবিকল এদেশের ন্যায় -দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। জাপানী কাকাসু ওকাকুরা তাঁহার সুবিখ্যাত "Ideals of the East" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "Down to the days of the Mahammedan conquest our people went by the ancient highways of the sea the intrepid mariners of the Bengal coast forming their colonies in Ceylon, Java and Sumatra bringing Cathay (China) and India in mutual intercourse" (মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গীয় নাবিকগণ বিশাল সমুদ্র পথে যাত্রা করিয়া সিংহল যাভা, সুমিত্রা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্ব্বক চীন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যে সকল কারণে এদেশে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকের ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মান্ধিক অত্যাচারের ফলে কৃষ্ণ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহার পূর্ব্বে দৃঢ় আক্রমণের সৃষ্টি করে, হিন্দুরাও সেইরূপ অত্যাচারে বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী সেই যুগযুগের সময় হইতে নির্ভীকচিত্তে ত্যাগের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছে ২য় খণ্ড বৌদ্ধ তীর্থঙ্করের মধ্যে ২২ জনই বৃহৎ বঙ্গের সমেৎশেখরে) পার্শ্বনাথ পাহাড়ে সিদ্ধ লাভ করিয়াছেন ও তাঁহাদের সমাধি সেইখানেই এখনও বিদ্যমান (১০৪ পৃঃ)। ইঁহারা সকলেই রাজপুত্র ছিলেন এবং ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। আমরা ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছি কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও বাঙ্গালীরা যে অপূর্ব্ব ত্যাগ মহিমা দেখাইয়াছেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে সাতারের হরিশ্চন্দ্র রাজা বৃদ্ধ বয়সে রাজত্বের ভার

বাঙ্গালীর ত্যাগ।

যুবরাজ মহেন্দ্রের উপর সমর্পণ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন (২৭১ পৃ.)। রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথা সর্বত্র বিবৃত (২৭৪ পৃঃ)। বৈষ্ণব অধ্যায় বঙ্গের ত্যাগী মহাজনদের কাহিনীতে পূর্ণ। সপ্তগ্রামের ধনকুবের ও রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস রাজ্যস্তখারামের অপ্রণ (৭২১ পৃঃ)। তিনি শুধু সন্ন্যাসী ছিলেন না, অতি অল্প বয়সে রাজৈশ্বর্য ও "স্ত্রী অপ্সরা সম" ত্যাগ করিয়া যে কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অতি উচ্চ আদর্শ। সনাতন ও রূপ—দুই সহোদর বেতনভোগী রাজা এবং তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব—রাজ-সেবার পরিত্যাগপূর্বক কঠোর ব্রহ্মচর্যের পথ কাহা, দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা তিন কবার ধনকুবের হইতেন এবং চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে তাঁহারা জঙ্গলের কোন একটি বৃক্ষের নীচে শুইতে পাছে সেই স্থানটির প্রতি আসক্তি জন্মে, এই ভয়ে নিত্য নূতন বনবৃক্ষের নীচে শুইতেন ("একেক বৃক্ষের নীচে একেক রাত্রি শয়ন" ৭১৭ পৃঃ)। আর একজন রাজ সন্ন্যাসী নরোত্তম দাস—তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত খেতুরির রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন। অতি অল্পবয়সে কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজ্য দিয়া তিনিও রঘুনাথ দাসেরই মত কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন (৭৮৫-৫০ পৃষ্ঠা)। বনবিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর-হাম্বির তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের পদে সমস্ত রাজ্যভার ফেলিয়া দিয়া তাঁহার রাজ্ঞী সুন্দরীদেবীর সহিত ব্রহ্মচর্য ও কঠোর সংযমব্রত পালন করিয়াছিলেন (৭৪৩ পৃ.)। গড়দ্বারের রাজা চাঁদ রায়ও প্রথমতঃ দত্তাত্রেয় করিয়াছেন, তৎপরে গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন (৭৬০ পৃ.)। বৈষ্ণব অধ্যায়ে এইরূপ ধনকুবের ও রাজবাড়ীদের ত্যাগের কথা পদে পদে আছে—সর্বত্র। চৈতন্যের সমসাময়িক, নিত্যানন্দসমকক্ষপ্রায় স্বর্গীয়ক্ত কুলগৌরব ক্রোড়পতি উদ্ধারণ দত্ত এই দলের অন্যতম (৭১১ পৃঃ)। একশত বৎসর পূর্বে পাইক পাড়ার লালাবাবু এইরূপ ত্যাগ দেখাইয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। অতি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বঙ্গদেশ এত জন রাজ-সন্ন্যাসীর পুণ্যজীবন প্রকটিত করিয়া দেখাইয়াছে যে, তাহাতে স্বতঃই মনে হইবে,—এদেশ ত্যাগের দেশ—তপস্যার দেশ।

কথা-সাহিত্যে মৌলিকত্ব ও গুরুদাসের ধারা।

পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালী লেখকেরাও সংস্কৃত হইতে মালমসলা খুঁজাইয়া তাঁহাদের নিজের ছাঁচে ঢালিয়া পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুরুষকাল হইতে বহু শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কোনটিই আক্ষরিক অনুবাদ নহে। তাঁহারা নিজেদের ছন্দে ঢালাই করিয়া তাহা স্বদেশের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। সর্বত্রই তাঁহাদের এই মৌলিকত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটির যুদ্ধাংশগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তন্দ্বারা ভক্তির মূলতত্ত্ব নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, রণক্ষেত্রকে কীর্তনভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে উড়িষ্যার কবিরা বাঙ্গালা কবি কবিচন্দ্রের এই নূতন ছাঁচে-ঢালা লঙ্কাকাণ্ডের অনুকরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর বৈষ্ণব কবিতার মৌলিকতাসম্বন্ধে গ্রন্থভাগে (৯৮৮-৯৫ পৃঃ) অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীরা যে গুপ্তযুগের ধারা বহন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার অজস্র নিদর্শন আমরা বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যে পাইয়াছি, বাঙ্গালার প্রেমের আদর্শ যে গুপ্তযুগের কবি-দিগকেও স্থানে স্থানে ছাপাইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গুপ্তযুগের কবিরা অভূত-পূর্ব্ব প্রতিভা সত্ত্বেও কতকটা অলঙ্কার শাস্ত্রের চাপের স্বীকার করিয়াছেন, রাজ প্রাসাদ বা ঋষির আশ্রম ছাড়া তাঁহারা কদাচিৎ নীচে নামিয়া আসিয়াছেন—কালিদাসের কাব্য ও নাটো অপ্রাকৃত কিন্তু বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যে শ্রেণী ভেদ, পদ বৈষম্য এরূপ কোন বাধা আদৌ নাই। এই কবিদের সাধারণ নর-জন্ম, সেই জন্মের সুকুমার বৃত্তি, সংসাহস, সংযম, ভাষা প্রভৃতি গুণের উপর তাঁহাদের কবিত্ব-সৌধ দাঁড়াইত। কবিরা সমস্ত সাময়িক নিয়ম ও আইন কানুন অগ্রাহ্য করিয়া দুরন্ত সাহসের সহিত স্বভাবের পথে চলিয়াছেন, চন্দ্রালোক বাড়া অথবা বেলের নেকো উহারা অপচন্দ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন নাই, বিবাহিত জীবন তাঁহাদের পথের বেড়া দিয়া আকাশ বাতাস রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই কিন্তু তাঁহাদের রচনা অনুভবে আমরা এইরূপও কবিদের কোন দল প্রকাশ করেন নাই, সেই লেখা অলঙ্কার, স্বাভাবিক ও অবাধ গতি—তাহাতে আদৌ প্রচার নাই এই সকল গল্প আকৃষ্ট হইয়া ডা হেনরি ফ্রান্সেস হলয়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন, সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে এই গল্পের জোড়া নাই, ডা সিসকান লেভি লিখিয়াছেন, ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ-প্রধান আখ্যায়িকার মধ্যে গণ্য করিয়া টুইন এই সকল গল্প পড়িবার সময়ে মনে করিয়াছেন, কোন চিত্র-বসন্তের রাজ্যে বেড়াইতেছেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী রোদেনষ্টাইন বলিয়াছেন, অজন্তা ও অমরাবতীর যে সকল অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছেন, এই সকল গল্পের নায়িকারা যেন সেই রমণীদেরই জীবন্ত লেখমালা। শ্রীযুক্তা ভেগ এই সকল গল্পের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা মন্দরে অলঙ্কারিত স্তব স্তুতির মতই শোনায় তিনি ফরাসী দেশের সর্ব্বপ্রধান লেখক মাদাম দি লাফেয়েত্তি Madame de Lafayette) এবং মেটারলিঙ্কের গল্পের খুঁৎ ধরিয়া কহিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গলা কথা সাহিত্যের নায়িকারা একেবারে নিখুঁৎ এবং এই গল্পগুলির নায়িকারা সেক্সপীয়র ও রেসাইন-এর (Jean Racine) নায়িকাদের মত, বুকের শেষ ঘরে ঘরে পরিচয় করার ধোগ্য, "ইহারা জগতের চিরস্থায়ী গ্রন্থগুলির সঙ্গে এক পংক্তিতে আসনের দাবী করে যুগে যুগে পাঠকগণ এই গল্পগুলির নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবেন" (৩৯৮-৪০৬ পৃঃ)।

বাঙ্গলার স্থাপত্য ও শিল্পসম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিবার নাই, এক মসলিনই বঙ্গের শিল্প কৃতিত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়বার্ত্তা বহন করিতেছে বাঙ্গলা ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলির

শিল্প ও স্থাপত্য

মন্দিরগুলিতে যে সকল শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এক শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রাহক পাঠক হটন লিখিয়াছিলেন — ইহাদের একটি রশ্মি যুরোপে থাকিত, তবে তাহা দেখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে কত যাত্রী ভিড় করিত, কত লেখক বড় বড় পুস্তক লিখিয়া, ইহাদের রচকের নাম, ধাম, আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যয় ও কর্ম্মীদের প্রতিভা সম্বন্ধে বহু ঘোষণা করিতেন, কিন্তু এই অসাধারণ

প্রতিভাশালী শিক্ষিগণ নাম-গোত্র হারাইয়া অগাধ সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অমানুষী কীর্ত্তি অবশেষ রহিয়া অকল্পনীয় করিতেছে (৯১০-১১ পৃঃ)।

বাঙ্গালার মনস্বিতা সর্ব্বজন সম্মত। আমরা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহারা আমাদের যে গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

মনস্বিতা।

মোরলাপুরের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের ন্যায় বঙ্গদেশে তখন অনেক বিদ্বান্ ছিলেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, "ইনি বিদ্যা-গৌরবে আমাদের ডা জনসনের তুল্য।" মার্শমান লিখিয়াছেন—"ইনি আধুনিক যুগের সর্ব্ব-প্রধান পণ্ডিতদের অন্যতম।" প্রতাপাদিত্য চরিত-লেখক রাম বসু সম্বন্ধে কেরি লিখিয়াছেন, "ইহার অপেক্ষা বিদ্যানুরাগী লোক আমার চোখে পড়ে নাই।" রাজা রামমোহন সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ আডাম্‌স্ সাহেব লিখিয়াছেন, "জগতে ইহার তুল্য ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জন্মেন নাই, কখনও জন্মিবেন না।" বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সভার সভাপতি রামমোহনকে অভিনন্দন দিতে যাইয়া বলিয়া ছিলেন, "পৃথিবীর নাবিকগণ দক্ষিণ-মেরুর 'সর্দ্দিস' আখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ সর্ব্ব প্রথম দেখিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, আপনাকে দেখিয়া আমাদের সেইরূপ বিস্ময় হইয়াছে। আজ যদি প্লেটো, সক্রেটিস, মিল্টন কিংবা নিউটন সশরীরে এখানে আবির্ভূত হইতেন, তাঁহাদিগকে আমরা যেরূপ ভক্তির অর্ঘ্য ডালি দিতাম, আপনাকে তাহাই দিয়া এই অভিনন্দন করিতেছি।" সেদিনও গোখলে ভারত-ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়া ছিলেন—"ভারতবর্ষে যে বেদ এবং পি সি রায়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক, রামমিশ্রার গোদের ন্যায় আইনজ্ঞ ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি আর কোথায় পাইব?"—কিন্তু এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিভাশালী লোক বঙ্গের ইতিহাস-সিন্ধুর সিকতাভূমির কয়েকটি বালুকা-কণা মাত্র। পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে শিক্ষিতের লোকগণ বলিয়াছিল, "স্বয়ং বৃহস্পতিও এতটা সম্মান পান নাই, যতটা ইনি পাইলেন"। ৩৩১ পৃঃ। বাঙ্গালার নবাবের সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতার সংক্ষেপে নিদর্শন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পার্ব্বতী চরণতর্কতীর্থ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে একজন ফরাসীস ও একজন ইংরেজ প্রায় দুইবৎসর কাল এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া—ইহা অতীব জটিল ও তাঁহাদের বুদ্ধির দুরধিগম্য মনে করিয়া পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা যেরূপ জ্ঞানে বড়—হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিতে সে তদধিক বড়। তাহার হৃদয়ের কোমলতামিশ্র ধারা বুঝাইতে যাইয়া একখানি চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমরা নিরস্ত হইব,—তাহার সম্বন্ধে প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমরা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিব না। সমস্ত প্রশংসা ও উচ্ছ্বাস চৈতন্যদেবের পাদ-পীঠের নীচে পড়িয়া থাকিবে।

বাঙ্গালী রমণীর অদম্য সাহস ও একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া শত বৎসর পূর্ব্বে হটন সাহেব লিখিয়াছিলেন "তাঁহাদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও প্রাণ-সমর্পণ অনন্ত চিতার শিখাকেও অতিক্রম করিয়া স্বর্গের নিকটতর হইয়াছে" (৯১৭ পৃঃ)।

"তোমাকে কি ভাত, পিঠা বা অন্য কোন নেশা খাদ্যাহারাছে? একটুখানি অহি কণা

গায় লাগিয়া ফোস্কা পড়ে এবং অসহ্য যন্ত্রণা হয়, আর সমস্ত দেহটা পুড়িয়া ছাই হইবে, তখন তোমার আর্ত্তনাদে ও 'হায়' 'হায়' চীৎকারে চক্ষু-কর্ণদলে চাপা পড়িবে—কেহ শুনিতে পাইবে না, তোমার দেহের সঙ্গে তোমার মুখ বন্ধ করিয়া বাঁধা থাকিবে—তোমার পলাইবার পথ থাকিবে না—অবস্থাটা কি ভাল বুঝিতে পারিতেছ?" বঙ্গের লাট হ্যারিংটন সাহেবের সঙ্গে একপক্ষ ব্যাপী একটা অন্তর্জ্জলযন্ত্রণাময় কলহের পর তাঁহাকে সহমরণের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এইভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রমণী পুস্তক মুখে লইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার কাণে এসকল কথা গেলিল কি না গেলিল, তাহা যেন প্রণিধান করাই গেল না। তার পর যখন রমণীর কাণ কাটিয়া লওয়া হইতে লাগিল কিছুতেই পাদ্রীর বক্তৃতা থামে না, তখন তিনি একটি বাক্য আনয়ন করিলেন ও নরকের সেই বাক্যটির মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। এরূপ করে যেন থাকিয়া যান অঙ্গুলী সেই ভাবে পুড়িয়া গলিয়া গেল, আঁগ কাল পর্য্যন্ত অবিকল হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজ বিদ্বেষী ভাবে লাট হ্যারিংটন লিখিয়াছেন, একটা রাজ্ঞীদের পরিবারের জন্য [illegible] পুড়িয়া ছাই হয়, সেই ভাবে সমস্ত আঙ্গুলটি পুড়িয়া গেল। রমণী নির্ব্বাক নিষ্পন্দ ভাবে [illegible] আহুতি দিতে লাগিলেন। আহুতি তাঁহার মুখের ভাবে কোন ব্যত্যয় পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিলাম না। শেষে ভস্ম পড়িয়া রমণীর হাতের আগুন নিবাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালা দেশের একনিষ্ঠ সেবকের যে সকল বিশেষণ এক শত বৎসর পূর্ব্বে দেখা যাইত, অনেক ইংরেজ সাহেব অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

সহমরণ।

সহমরণেচ্ছুতা এক রমণী স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়কে বলিয়াছিলেন, "আপনাকে কেহ বাধিতে পারিবে না, অগ্নির চিতা হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলে আপনার কোন বিঘ্ন করিবে না, এইভাবে আপনি প্রাণ দিতে পারেন?" রমণী তাহাই করিলেন—রামমোহন-প্রণয়ে যেরূপ তিনি স্বামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি তাঁহার চিতা-সঙ্গিনী হইলেন। এই সকল দৃশ্য ইংরেজের চোখের সামনে ছিল, এইজন্য তিনি লিখিয়াছিলেন—ইহাদের প্রেম ও ত্যাগ অন্য চিত্রার শিখাকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গের দ্বারে পৌঁছিয়াছে (১৯১৩-১৪ পৃঃ)

যেমন পাশ্চাত্য জগৎ জেহোবা ঈশ্বরের মুখ সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য ছিলেন, ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। জড় জগতের একটা বাঙ্গালা প্রমত্ত হইয়া ভোগ করে, এবং যখন সময় উপস্থিত হয় তখন অপ্রমত্ত হইয়া পুণ্যের ন্যায় তাহা ত্যাগ করিতে পারে, বাঙ্গালী টিকাধারণ সোলন-মতের ন্যায় দুই বিরুদ্ধ সীমার মধ্যে অতি সহজে চালাইতে পারে—বাঙ্গালা চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। আজ চিত্তরঞ্জন বিলাসী বাবু ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কাল চিত্তরঞ্জন বিরাগী ফকির নিজের বাস-গৃহখানি পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিতেছেন।

আমার কার্য্যের ক্ষেত্র বিস্তৃত—এই বহিখানি লিখিতে বসিয়া আমার বারংবার মনে হইয়াছে—এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও ভারতীয়

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সমূহের তন্ন তন্ন অনুসন্ধান হয় নাই, সুদূর এদেশের এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের শিলালেখ ও তাম্রশাসন প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয় নাই, এখনও শ্যাম, কাম্বোডিয়া, যাভা, বালী, সুমিত্রা এবং অপরাপর ভারতের উপনিবেশের ইতিহাসে যেখায় যেখায় বাঙ্গলার উল্লেখ আছে, এবং সেই সেই দেশের ভাস্কর্য্যে এতদ্দেশীয় শিল্পাদর্শ কি পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা করিয়া তাহার খোঁজ হয় নাই, বাঙ্গলা অক্ষর কোন্ কোন্ দেশে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, এখনও তাহা আমরা সুষ্ঠুভাবে সন্ধান করিয়া দেখি নাই, চীন ও শ্যাম প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান করিতে এখনও বিলম্ব আছে, —এমন কি এদেশের অতি সন্নিকটে নেপাল, তিব্বত, ভূটান বেঙ্গল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাঙ্গালীরা যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আভাসে মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে, এখনও মালদহ ও উড়িষ্যাদেশে বহু টাঁদ, ভগ্ন প্রস্তর, ইষ্টকস্তূপের অবশেষ ও প্রাচীন বহুসংখ্যক স্বৃহৎ দীঘি ঐতিহাসিকের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া আছে। এখনকার দেশ অর্থনৈতিক সমস্যা উত্তীর্ণ হইয়া যদি বাঙ্গালী জাতি জগতে টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহাই হইলে কালক্রমে এদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সম্ভাবনা হইবে আমি ভিন্ন-মতাবলম্বী যে, যে আভাস মাত্র কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাইতেছি। কলিকাতায় বাঙ্গলার প্রত্নকথা অনেকগুলি প্রচলিত আছে, এবং তান্ত্রিক 'তেরক' যে বাঙ্গলা দেশ হইতে কাম্বোডিয়া ও যাভা গমন করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডাঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়ের কাম্বোডিয়া সম্বন্ধীয় পুস্তক দ্রষ্টব্য।*

সম্প্রতি যাভা, সুমিত্রা, বেঙ্গল এবং কম্বোডিয়ার স্থাপত্যে যে বাঙ্গলাদেশের বিশেষ প্রভাব ছিল, এমন কি বাঙ্গালী স্থপতিরাই ঐ দেশগুলির মন্দিরাদির গঠন-প্রণালী তত্তদ্দেশের লোকদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে যাভার প্রম্বনমের নিকটবর্ত্তী চণ্ডীলোন, সংরাগ এবং চণ্ডীসিউ মন্দিরের গঠন ঠিক পাহাড়পুরের সম্প্রতি আবিষ্কৃত মন্দিরের ন্যায়। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও একপ স্থাপত্যরীতি দেখা যায় না। এদিকে যাভার ঐ সকল মন্দির ৮ম-৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পাহাড়পুরের স্থাপত্য এম কি ৪র্থ শতাব্দীর, অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের তে এন দীক্ষিত বলেন যে এতদ্দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রম্বনমের মন্দিরগুলির পূর্ব্বাদর্শ—বাঙ্গালী স্থপতির এই নির্ম্মাণ-পদ্ধতি। (দীক্ষিত মহাশয় লিখিত গবর্নমেণ্ট আর্কিওলজিকাল রিপোর্টে,

* Images of Hevajra have been also recently discovered from Angkor Thom as the writer heard from Mr Finot. This is a Tantric deity of the Buddhists (whether Saiva or Vaishnava is not known) and it could have come to Tibet and Nepal from Bengal during the Pala period.
—Indian Influence on Cambodia, p 261

১২২৮২৭ খৃঃ)। শ্রীযুক্ত এ কে কুমারস্বামী তাঁহার 'Indra and Indonesia' নামক পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্মদেশের পেগু-মন্দির-সমূহের কারুকার্য্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবিগুলি বাঙ্গলা এবং নেপালের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। পৌড্রের পাল-রাজদের আশ্রয়ে নালন্দা ও বিক্রমশিলা-বিহারের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। নালন্দা-বিহারে সমস্ত প্রাচ্য এসিয়ার কেন্দ্র-ভূমি-স্বরূপ ছিল। এই কেন্দ্র হইতে বাঙ্গলার শিল্প ও সভ্যতা দেশে দেশে অভিযানপূর্ব্বক বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

এই ভূমিকার প্রথমে যে কয়েকখানি বঙ্গের ইতিহাস লিখিত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আঞ্চলিক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, ইহাদের অনেকগুলি আমার নিকট আছে। তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিত 'যশোর খুলনার ইতিহাস,' অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিত 'হুগলীর ইতিহাস,' যদুগোপাল রায় কৃত 'ঢাকার ইতিহাস,' যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস,' রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গলার ইতিহাস' কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত 'মানভূম-সংস্কৃতের ইতিহাস,' শুকদেব, বাগেশ্বর এবং অপরাপর বহু লেখক লিখিত 'স্থানীয় বৃত্তান্ত' (কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত), শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'বিষ্ণুপুরের পাঠান ইতিহাস' কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত 'রাজমালা,' কাশীকান্ত চৌধুরী প্রণীত 'শ্রীহট্টের কথা,' হরানন্দন মিশ্র প্রণীত 'পাবনার ইতিহাস' এইচ ব্লকম্যান কৃত 'সাইকোটা রাজ এবং কাশিরাজ' (ইংরেজী), রায় বাহাদুর কালিকাপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত 'কুচবিহারের ইতিহাস' (ইংরেজী), আনন্দচন্দ্র রায় প্রণীত 'বারভূঞা' এবং 'ফরিদপুরের ইতিহাস,' নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত পঞ্চখণ্ডে প্রকাশিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,' 'অসুরগড়ের ইতিহাস' ও 'কামরূপের ইতিহাস' (শেষোক্ত দুই ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিত), দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত 'মণিপুরের ইতিহাস,' বরেন্দ্র অনুসন্ধান সোসাইটী প্রকাশিত 'গৌড়ীয় লেখমালা,' রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস,' সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'ইলা বা বরেন্দ্র,' আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত 'চট্টল ভূমি,' নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'মুর্শিদাবাদের কাহিনী,' হরিনাথ দাস সম্পাদিত ও অনূদিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ,' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'বিষ্ণুপুরের ইতিহাস,' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা প্রণীত 'রাজাবলী' (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮১০ খৃঃ), প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'মহানাদ,' নগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত 'ময়মনসিংহ কাহিনী,' কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত শুকদেবের সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ, রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'সেকাল আর একাল,' হরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'লোহাগড়ের কাহিনী,' অগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'মহেশ্বরপাশা,' বিজয়চন্দ্র নাথ প্রণীত 'নাগসংঘের ইতিহাস,' হেমলতা সরকার প্রণীত স্বর্গীয় হরসুন্দর মিত্র (ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাস), অরুণচন্দ্র সেন এবং বিমলচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'সোনার বাংলা,' কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'বঙ্গের রত্নমালা,' মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত 'চাবী পোদদের ইতিহাস', বিনয়চন্দ্র সেন প্রণীত 'বোঙ্গাতক' (ইংরেজী), বেভারিজ সাহেব কৃত 'খাথরগঞ্জ জেলার

ইতিহাস' প্রভাসচন্দ্র সেন প্রণীত 'বগুড়ার ইতিহাস,' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'বেণের ও ১৭শ শতাব্দীর বাঙ্গলা' (ইংরেজী), রাজকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'ইতিবৃত্ত-বিবরণ' ব্রজসুন্দর সান্যাল প্রণীত বহু বঙ্গীয় গ্রন্থে বাক্তিগণের জীবন চরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ,' চন্দ্রকান্ত বসু সংগৃহীত প্রণীত 'বঙ্গলার বীর,' অমূল্যধন রায় ভট্ট প্রণীত 'ঘাসেড় গোপাল' স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত 'সুবর্ণগ্রামের (সোনার গাঁয়ের) ইতিহাস,' নবীনচন্দ্র ভদ্র প্রণীত 'জাহাঙ্গীরের ইতিহাস,' রাজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'বাঙ্গালার বল,' উপেন্দ্রচন্দ্র কর প্রণীত বিশ্বকর্ম্মা 'ভারতমাতা,' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'বঙ্গদেশে বুদ্ধ ধর্ম্মের চিহ্ন' (ইংরেজী), হলায়ুধ মিশ্র কৃত 'সেক শুভোদয়া,' সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত 'রামচরিত,' রোহিণীকুমার সেন প্রণীত 'বাকলার ইতিহাস,' যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত 'বাখরগঞ্জের ইতিহাস,' গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট প্রণীত 'বল্লালচরিত,' পীরমহম্মদ কৃত 'সমসের গাজীর গান,' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'সিরাজদ্দৌলা,' ওয়াটসন সাহেবের 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস,' 'ইসা খাঁ,' 'শিবোজসাহ,' 'প্রতাপ আদিত্য' প্রভৃতি বহু পুস্তিকা, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'জাতিতত্ত্ব বারিধি,' সতীশচন্দ্র দোসের 'চাকমা জাতি,' ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত 'উত্তর পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাস,' ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস' (ইংরেজী), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমল,' ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও রমাপ্রসাদ চন্দের বঙ্গের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ ও মৌলিক প্রবন্ধ, ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় প্রণীত 'উত্তর-ভারতের রাজাদের বংশাবলী' (ইংরেজী) এবং ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত 'প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস' (ইংরেজী), মহিমমোহন বসু প্রণীত 'সহজিয়া-সাহিত্যের পুস্তক' (ইংরেজী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাখালদাস।

কিন্তু যিনি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে এই যুগে অনেক কিছু করিয়াছেন, তাঁহার কথা আমি এপর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের জন্য চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাস এদেশের ঐতিহাসিকগণের অপরিহার্য্য সঙ্গী হইবার দাবী রাখে; তাহাতে বিজ্ঞানসঙ্গত এত মালমসলা সংগৃহীত হইয়াছে যে বইখানি পড়িলেই বুঝা যায়, অপর্য্যাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ তাঁহার লেখনী-মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—শৃঙ্খলার অভাবে সেগুলি সুসংবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায় নাই। পুস্তক দুই খণ্ড পড়িলেই অনুমিত হইবে, গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক বেশী জানিতেন এবং তিনি যাহা জানিতেন তাহাও সুবিন্যস্ত করিয়া লিখিবার তিনি সময় সুবিধা পান নাই। তাঁহার অনুস্থার' (যেমন মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, বাঙ্গলা ও কলিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা 'বিদ্যুৎ-চমকের ধাক্কা দিয়া অঙ্কিত হইয়াছে,—তাহা আমাদিগকে একটা অপর্য্যাপ্ত ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে, স্থির ও নিশ্চিত আলোকে তাহা ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা দেয় নাই। বিদ্যাপতির কথায়

তাঁহার উক্ত টীকা দৃষ্টান্তে —"ভাল করি পেখন না ভেল, যেন মাত্র সঞ্চে রহিত লক্ষ যুগ" — স্বয়ালোকে বহু সম্ভাবনার আলো দিয়া গিয়াছে। তাঁহার ইংরাজীগুলি জন-সাধারণের পাঠ্য হয় নাই, উহা শুধু ঐতিহাসিকদেরই পাঠ্য।

কবিচন্দ্র মুন্সী।

আর একখানি ঐতিহাসের কথা এখানে লিখিব —ইহা কবিচন্দ্র মুন্সী কৃত কুচবিহারের ইতিহাস। এই পুস্তকখানি ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ফুলস্কেপ কাগজের কোয়ার্টো আকারে ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রথম ভাগটী কতকগুলি গল্পের সমষ্টি হইলেও ৩৫ পৃঃ হইতে ৯৯ পৃঃ পর্য্যন্ত ইহার অনেক বিবরণই বিশ্বাসযোগ্য ও ঐতিহাসিক। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহার একমাত্র হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকটই আছে।

প্রাচীন বঙ্গমহাপুরুষ

উপসংহারে বাঙ্গলার ইতিহাসসম্বন্ধে পাঁচ মহামহোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম অতীব শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করিব। বিংশ শতাব্দে কোনরূপ স্কুল কলেজের শিক্ষা না পাইয়া এই অসাধারণ পুরুষ দেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যাহা করিয়াছেন, তাহাতে মানুষ এই এক জন্মে কতদূর অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা, কিম্বা তাঁহার ঐ বহু সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থগুলি মধ্যে মধ্যে বিক্রয় না করিলে, তাঁহার ঐতিহাসিক অমর কীর্ত্তির প্রচার করিতে পারিতেন না। প্রসিদ্ধ লেখক অমৃতলাল বসু মহাশয় সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন; বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলিব "আমরা নই, নে কথা তার সঙ্গ নই।" আমাদের ইহাই অযোধ্য রাজনীতি।

শরৎকুমার।

ইতিহাস বিভাগে বঙ্গের সুসন্তান শরৎকুমার রায়ের নাম সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। ইনি কোন আড়ম্বর ও প্রতিষ্ঠার লোভ না করিয়া বাঙ্গলার ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় অনেক পাঠকের পড়িয়া তুলিয়াছেন —এবং বহু অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া অনেক ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া অপর লোকের আড়ালে কাজটা চালাইয়াছেন এবং অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের পাণ্ডিত্যের ভাণ অপরকে দিয়া মহাপ্রাণতা দেখাইয়াছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ।

বর্ত্তমান কালে কে. এন. দীক্ষিত, দেবলত্ত ভাণ্ডারকর, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, হেমচন্দ্র রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাকমল ও রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, নলীগোপাল মজুমদার, বিনয়চন্দ্র সেন, রাখালগোবিন্দ বসাক, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বিজনদাস চাটার্জ্জি, বিনয়চন্দ্র মজুমদার, কালিদাস নাগ, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু নবীন ঐতিহাসিক যন্ত্রস্তরের গবেষণায় দ্বারা এদেশের ভাবী ইতিহাসের পথ সুগম করিতেছেন। শিল্পের ইতিহাসে হেভেল ফ্রান্সবিশের প্রচেষ্টা তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহা স্বর্ণমূলো বিকাইবে।

আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লইয়া জীবন কাটাইয়াছি, ইতিহাস-ক্ষেত্রে আমি অপরিচিত।

পূর্ব্বোক্ত ত্রুটি অপেক্ষা বড় বড় পদে পদে আমার ত্রুটি পাইবেন। তাঁহারা দোষগ্রাহী হইলে আমার অনিচ্ছাকৃত ও অজ্ঞতাপ্রসূত অপরাধ সহজেই মার্জ্জনা করিতে পারিবেন

এই পুস্তকের বিষয় ও আমার যোগ্যতা।

এই পুস্তকে সিংহলী ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি (৩৫-৬৭ পৃঃ), কৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছি (১২৮-৫২ পৃঃ), দর্শন, ন্যায় ও স্মৃতির মত জটিল ও একান্ত দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজের অসমর্থতা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। (৩৪৩-৭১ পৃঃ)। বৌদ্ধ বিহার (৩০০-০৬ পৃ.) নবদ্বীপের টোল (৩৬৬-৫২ পৃ.), বাঙ্গলার পণ্ডিত, মগ ব্রহ্ম, দেশের ব্যবসায়, কুসীদজীব, কৈবর্ত্ত জাতি, সোর ও বৈকব ধর্ম্ম (৫৬৮-৮৯ পৃঃ), তন্ত্রশাস্ত্র (৫৭৯ পৃঃ), সহজিয়া, মহাপ্রভুর চরিত্র, শঙ্খ ব্যবসায় (৯২৮ পৃ.), কেশস্থ (৯৯৬ পৃ.), ও বিশেষভাবে নানারূপ আলোচনা (৪৩০, ৬৬৬, ৮৮৮-৯২ পৃ.)। ধর্ম্মঙ্গল, জয়দেব, মহাপ্রভু চৈতন্য ও তাঁহার বহুসংখ্যক পার্ষদগণের জীবনী, এবং নানা প্রসঙ্গিক ইতিবৃত্ত (পরিশিষ্টাংশ) লইয়া আমি চর্চ্চা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি এমন দেবতার বেবেশ নাই, যাহাতে চক্ষুর আঘাত না করিয়াছি এজন্য আমাকে অনেক পুস্তক পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ বা সাহায্য আমি খুব কমই পাইয়াছি আমি যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা অবতারণা করিয়াছি, তাহাতে কিছু নূতন তথ্য পাঠকগণ সম্ভবতঃ পাইবেন এক্ষেত্রের আমার মনোযোগ বা প্রতিভার দাবী নাই, ধৈর্য্য মজুরের পারিশ্রমিকের দাবী। পুস্তকখানি আমি নানারূপ গুরুতর সমস্যা দ্বারা জটিল করি নাই, নানারূপ বিভিন্ন মতের ঘোলাটে পড়িল পাঠকের প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করি নাই, আমার সেরূপ পাণ্ডিত্যও নাই ঐ সব 'দিক' করিবার বা দেখাইবার, তাহার যে মূল্য থাকুক না কেন তাহা আমি বাদ দিই নাই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করা পাঠকের 'পর ভার দিয়াছি, কারণ আমার ইতিহাস গঠনের প্রকৃতির সাহায্য যতটুকুরও কিছু মূল্য আছে,—কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে—তাহা আমি উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছি, তবে ভাবী আবিষ্কারের আলোকপাতে কালে তাহার একটা মূল্য দাঁড়াইতে পারে।

এই পুস্তকের ভাষা হয়ত ঠিক বিজ্ঞানে সঙ্গত, ওজন করা, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ভাষা হয় নাই, আশা বঙ্গের পাঠকের উপর দাঁড়াইয়া, বাঙ্গালা লেখক যদি মাঝে মাঝে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দুই নিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, কিংবা কিছু বিচলিত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন—তবে আশা করি তিনি ঐতিহাসিকগণের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। বিজ্ঞান-সঙ্গত উচ্ছ্বাস হীন মুক্তিদায়ক ভাষা।

বিশেষ এই পুস্তক শুধু ঐতিহাসিকগণের জন্য লিখিত হয় নাই, বঙ্গের জনসাধারণের মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগাইয়া করা আমার অন্যতম লক্ষ্য। নীরস ও শুষ্ক গবেষণায় তাহারা আকৃষ্ট হইবে না—এজন্য যদি রস-সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ভাষায় মাঝে মাঝে কিছু রং ফলাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাতে আমি অপরাধী হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপের লেখকগণ ক্রাইষ্টের জন্ম ও তৎসম্বন্ধে অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে সাধারণতঃ নীরব, নিজেদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের

শুচিতা তাঁহারা রক্ষা করেন, —আমাদের ঐতিহাসিক বিষয়গুলির অধিকাংশ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত জড়িত, সেই বিশ্বাসে হানা লাগে বলিয়া তাঁহাদিগের একটুও বাধে না, এই জন্য আমাদের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক হইয়া বসেন। হুইলার সাহেব যখন লিখিলেন, কোম্পানি নিজেই নিজেকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ইতিহাসখানি বঙ্গদেশের স্কুলে স্কুলে পাঠ্য করিতে কাহারও আপত্তি হইল না। ইহাই বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। আমাদের মূক জনসাধারণের একটা প্রখর অনুভূতি আছে,—এই ভাবের গবেষণা তাহাদের মর্ম্মান্তিক হয়, কিন্তু তুলসীতলা হইতে হাতের নোয়া পর্য্যন্ত হিন্দুত্বটুকু যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন গবেষণার সময়ে হিন্দু লেখককে তাহা একটু মনে রাখিলে ভাল হয়—তাহা না হইলে জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে একসূত্র ছিন্ন হইবে। আমাদের জনসাধারণ একান্ত অবজ্ঞার যোগ্য নহে তাহাদের মধ্যে যে সংস্কৃত ভাষা বঙ্গের নিজস্ব ভাব, ধর্ম্ম ও শিল্প কতটা বজায় রাখিয়াছে, তাহা এই পুস্তকের পাঠক অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন। ইহাদের সম্বন্ধে পণ্ডিত লেখক পাদ্রি লিফ্রয় ইহার ভারতবর্ষ অপার অভিজ্ঞতার বলে জানাইয়াছেন, "হলুচাষা অত্যন্তই কমবার সহিত সুপণ্ডিতজনোচিত দার্শনিক ও নীতিঘটিত আলোচনা করিতে পারে, এই চাষারা একেবারে নিরক্ষর ও দরিদ্র" ("A very competent and independent witness Dr. Lefroy has testified from his long personal experience to the extraordinary aptitude with which the poorest and the most illiterate Hindu peasant will engage in discussion on the deepest philosophical and ethical questions" কার্পেল সাহেব লিখিয়াছেন, "The Indian painters though illiterate in the western sense are the most cultured of their class in the world" (Introduction, xix, Ideals of the Indian Art, E. B. Havell) ভারতবর্ষের পটুয়ারা পাশ্চাত্য মতে মূর্খ কিন্তু জগতের চিত্রকরদের মধ্যে তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা সকলের উপরে। এ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে বাঙ্গলার লেখকবর্গ এদেশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া একটু সহানুভূতির সহিত লিখিলে ভাল হয়। এই পুস্তকের ১৩৭ ও ৮৮ পৃষ্ঠায় সাহেবদের চামারত্ব ও মহাভারতাদি সম্বন্ধে যে মতামত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসার ও অতিরঞ্জক মতামত বৈজ্ঞানিক মতগুলির তাঁহারা যেন প্রশ্রয় না দেন। মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস অনেক বেশী, তাঁহাদের বিষয়সম্বন্ধে কেহ কিছু লিখিতে সাহসী হন না। ইংরেজ রাজত্ব অতি-সম্প্রতি তাঁহাদের ইতিহাস লইয়া কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না। একমাত্র হিন্দু সমাজই এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় গবেষণাশীল লেখকদের যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন।

আমার এই পুস্তক যদি ঐতিহাসিকগণের পক্ষে একখানি পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে ধন্য হইব। তাঁহারা ইহার উপর দাঁড়াইয়া বঙ্গ জননীর যে মহিমান্বিত প্রতিমা গড়িবেন, সেই শুভ-স্বপ্ন আমার সমস্ত শ্রমকে সার্থক করিয়াছে, এই পরিকল্পনা আমার লেখনীকে বলপ্রদ

ও আলোচিত কারণেও আমি বঙ্গলা এর অপেক্ষা পুনরুক্তির স্থান দিই না, বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে আমার যতটুকু নিকট পরিচয় হইয়াছে, যাহাকে সাধারণ পুস্তকপাঠ বলিয়া আমার স্মরণে আসিতে পারিয়াছে, সেই কালের মত এমন সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য আর কোন ভাষা আমার কানে লাগে না। আমার কর্ণে একা কলাপাতার একটু ঝুরঝুরে কম্পন লাগিয়াই বাঙ্গলা সাহিত্যের সমস্ত ঐশ্বর্য ও কারুকার্যের মূল্য আমি কোথাও খাটো করিতে চাই না। আমি বঙ্গপ্রেমিক নাই আমি একটু সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ মনে বলিতে পারি আমি দুরোপরোগা নহি আমি ক্রমশঃ রক্ষণশীল সমালোচনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছি,—তবে সেই অভিযোগের আমি প্রতিবাদ করিব না, আমি ইহাই আমার একমাত্র সম্বল আমার মাতৃভাষার উপরে আমার ভক্তির বাড়াবাড়ি ও আমার অপেক্ষা আমার কাছে বড় কিছুই নাই।

কেন বৃটিশ অধিকারের ইতিহাস লেখা হইল না

এই পুস্তকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত লিখিয়া হঠাৎ শেষ করিলাম, পারাশষ্ট-খণ্ডে প্রাদেশিক রাজ্যশাসনের ইতিহাস লেখা হইয়াছে। পলাশির যুদ্ধের পরের ঘটনাগুলি দোষগুণে নানা জটিলতাযুক্ত হইয়া আছে এই সময়ে তাহার যথাযথ বিবরণ দিতে পারিলাম না এখন এই কেস একটা বৈজ্ঞানিকের মহা বিচারাধীনে আছে। একদিকে আছেন, এদেশের লোক বাস্তবপক্ষ। এ কেসের বেঞ্চের পক্ষে এই দুইয়ের প্রমাণ সমান কিন্তু জজ হইতেছি কয়েক বর্ষ কাল বেঞ্চ বসিয়া সেরেস্তাদার ঐ ইতিহাসের পক্ষে সওয়াল সমাধা অবলম্বন করিয়া, এই বিস্তৃত ও জটিলতর দৃশ্য সম্বন্ধে কথা বলা নিরাপদ নহে। আশা করি, অচিরে এই ঐতিহাসিক মকদ্দমাটি রুজু হইলে তখন বৃটিশ আমলে আমাদের কত দিক্ দিয়া কত অধঃপতন হইয়াছে, এবং কতটা সম্পদ কোন্ দিকে বাড়িয়াছে, এবং কোন্ দিকে কমিয়াছে - তাহার একটা হিসাব নিকাশ করার সময় হইবে। তখন যদি আমার সামর্থ্য থাকে ও আয়ুতে কুলায়, তবে "বৃটিশ-অধিকারে বাঙ্গলা" নামক এই পুস্তকের পরবর্ত্তী খণ্ড প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল ইংরেজের আমাদের একটা জিনিষ দিয়াছেন যাহা অমূল্য—তাহা চোখের দৃষ্টি কে ছিল অন্ধ, কে ছিল সাপুড়ে এমন কি কে ছিল শিকারী ও প্রণালদ সিং— কে ছিল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও কে ছিল সাত্যকাম, কে ঘাড় ছিল নালন্দা ও বিক্রমশিলা —এক কথায় এই বিরাট ভারতবর্ষের কত ছাপ্পান্ন দিয়েও আমাদের কাছে বঙ্গদেশও অন্ধকারময় ছিল ইংরেজের কাছে চক্ষুদান পাইয়া আমরা আজ জাগিয়া উঠিয়াছি। এই চক্ষুদান অপেক্ষা বড় দান কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। তাঁহারা আমাদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছেন —এ বিষয়ে কোন মতান্তর হইতে পারে না।

সতী সরকার

বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এদেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা সম্প্রদায়ের ভিন্ন-ধর্ম্মের পক্ষপাতসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। আমার ছাত্র শ্রী এনামুল হক, এম. এ., পি এচ ডি. মহাশয়কে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করায় এই পুস্তকের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভ লিখিতে

অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি তদনুসারে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া আমায় দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, পোর্তুগীজ বৈষ্ণবধর্মী মুসলমান শুধু সম্প্রদায়ের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী।

অবশ্য তুর্কী বিজয়ের বহু পূর্ব হইতে ৺ হজ-যাত্রী লোকেরা বাণিজ্য অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশে আনাগোনা করিতেন কিন্তু এই অধিকারে ইঁহারা এদেশে ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ডাঃ হক ও দিনাজপুরের বঙ্গশ্যাটক কয়েকজন মুসলমান সাধুর উল্লেখ করিয়াছেন—

১। সুলতান বায়েজিদ বিস্তামী—ইনি ১৩৪৩ খৃঃ নবম পরিক্রমাতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে মোহরেলের গ্রামের একটি টিলার উপর তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন আছে। ইনি ৮৭৪ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন।

২। শাহ সুলতান রুমি—ইনি কনষ্টান্টিনোপলের লোক। ১৩৪৩ খৃঃ কথিত আছে ইনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে এক কোচ রাজাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। সেইখানেই অন্তর্গত মদনপুরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে, এবং তথায় তাঁহার সমাধি আছে।

৩। শাহ সুলতান বলখী—ইনি মধ্য-এশিয়ার বলখের রাজা ছিলেন, সেখে সাধু হন। বগুড়া জেলায় মহাস্থানের পরশুরাম রাজা ও তদীয় কন্যা শিলাদেবীকে ইনি যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তথায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বিদ্বান ছিলেন।

৪। শাহ জালালউদ্দিন তবরিজি—ইঁহার সম্বন্ধে এই পুস্তকের ৫০১১৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাণ্ডুয়ায় ইঁহার সমাধি আছে।

ইঁহাদের দ্বারা মুসলমান ধর্ম বঙ্গে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হক্ সাহেব লিখিয়াছেন, "নানা কারণে তাঁহারা স্থায়ী ভাবে বঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।"

ইঁহাদের পরে যাঁহারা আসেন, (তখন বঙ্গ বিজয় শেষ হইয়াছে) তাঁহারাই ধর্ম-প্রচারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ১। সিরাজুদ্দীন উসমানী (১৩৫৭ খৃঃ গৌড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ২। নুরকুতুব-ই আলম (১৪১৫ খৃঃ), গণেশের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা প্রদান করেন। ৩। সফীউদ্দীন শাহ পাণ্ডুয়ার পাণ্ডুরাজাকে পরাস্ত করিয়া সেই দেশে ধর্মপ্রচার করেন (১৪৯১ খৃঃ)। ৪। শাহ ইসমাইল গাজী উত্তর বঙ্গে মুসলমান ধর্মের প্রচারক ছিলেন (১৫১৪ খৃঃ)। ৫। **সাহজালাল** মুজর রুম ইয়েমেন খ্রীষ্টীয় ১৩৪৬ খৃঃ অব্দে দেহরক্ষা করেন এবং তাঁহার শিষ্য মুজফিন চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

কিন্তু এই বিদেশী প্রচারকেরা দেশের হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই। পরবর্তী যুগে বঙ্গদেশী মুসলমান সাধুরাই—হয়ত হিন্দুধর্মের কোমল কিন্তুটার উপর জোর দিয়া তাঁহাদের

মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রেমের ক্ষেত্রে সুফী-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালী হৃদয়ের অনুকূল স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়া ছিলেন। হক্ সাহেবের মতে বাঙ্গলার রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সাহিত্যে সুফী সাহিত্যের রস-ধারা প্রবাহিত হওয়ায় উহাতে চিন্তাশীলতার একটা উচ্চাঙ্গ অবাধ গতি দিয়াছে। সহজিয়া নেতাদের মধ্যে অনেক

সহজ-সাধন-প্রণালী ও বঙ্গসাহিত্যে সহজিয়ার প্রভাব।

যাঁরা মুসলমান ছিলেন, তাঁরা অনেকে ৮৯২-৯৪ পৃষ্ঠায় তালোচনা করিয়াছি এই শ্রেণীর মধ্যে যে স্বাধীন চিন্তা দেখা যায়, তাহা ইস্লামিক শিক্ষার ফল বলিয়া লেখক দাবী করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে সুফীদের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহারা পুরুষ হইয়াও রমণোচিত অলঙ্কার পরেন এবং স্ত্রীভাবে ভগবানকে ভজন করেন। ইহাদের অনুকরণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে সখীভাবের সাধনা প্রবেশ করিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের নাম "মদনা-মোহনা" সুফী। প্রবন্ধ-লেখক এই ভাবে অন্যান্য বিষয়েও সুফী-সাহিত্যের সহিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং তথায় সুফী প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

সখীভাবে সাধনা এখনও বাঙ্গলাদেশের অনেক বৈষ্ণবের কাম্য থাকেন। বৃন্দাবনের নৌলক বাবাজী এবং নবদ্বীপের লালতা সখী এখনও স্বর্ণালঙ্কার ও রেশমী শাড়ী পরিয়া সাধনা করেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে **এই সাধনা-ভাবের স্বাভাবিকতা, হজরত মহম্মদের পূর্ব্ব পুরুষোচিত বিশ্বাসের অনুকূল নহে।** এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলী প্রমাণ করিয়াছেন ও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে সুফীরা মুসলমান হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্মমতের অধিকাংশই বেদান্ত দ্বারা গঠিত। পূর্ব্বভাগে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি যে সহজিয়াদের ধর্ম্মমত, যাঁহাদের বিচিত্র স্বাধীন চিন্তাধারা বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। তিব্বত-রাজ লামা হুকের সময়ে নাল আনথাম্-পরিচিত এক অতি বৌদ্ধাত্মক-বেদান্ত মত আদর অবাধ মিলন এবং ব্যভিচারী চিন্তা অতি উগ্রভাবে প্রচার করিতেছিলেন। হজরত মহম্মদের বহু পূর্ব্ব হইতে তামিল ভাষা বৈষ্ণব ধর্ম্ম মন্দিরের অনুচ্চারণের বর্ণনা পূর্ণ করিয়া গীত রচনা করিয়া ছিলেন (৩৭৮ পৃঃ)। এই শৈব ও বৌদ্ধগণই মুসলমান শিক্ষা গ্রহণ করিলেও প্রাচীন মতগুলি ছাড়িতে পারেন নাই। বাঙ্গলার এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং হিন্দুগণ উভয় সম্প্রদায়ই তাহাদের প্রাচীন দীক্ষায় প্রভাবান্বিত ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সার্ব্বভৌমিক স্বাধীনতা তাহারা ইস্লাম হইতে পায় নাই, পেয় নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই তাহা পাইয়াছিল। ইস্লামের সামাজিক সাম্য ও উদারতা সহজিয়া ও বাউলদের ধর্ম্মভাবকে কতকটা প্রভাবান্বিত না করিয়াছিল, তাহা নহে, কারণ নূতন ধর্ম্ম অবশ্য কতক পরিমাণে শ্রোতাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু এদেশের জনসাধারণ কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই দেখিতে সুচিরাগত বৌদ্ধ-সংস্কার ও বিশ্বাসই বিশেষ ভাবে সমাশ্রয় করিয়াছিল।

বাংলার বারোবছরী' শব্দটি লইয়া অনেক পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু

এটি যে একটি খাঁটি পূর্ববঙ্গের শব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধের এক নাম 'বঙ্গ', 'বঙ্গাসন', 'বঙ্গ-বুদ্ধ' ইত্যাদি প্রকৃতি এক সুপরিচিত এই বঙ্গ শব্দ হইতে বঙ্গ, বঙ্গের "বঙ্গর পড়ো পেল" ইত্যাদির পর, এবং বঙ্গ শব্দ হইতে গয়ার "বাঙ্গাসন", ঢাকার সুবাদপুর পরগণার "বাঙ্গাসন" প্রভৃতি স্থানের বহু পৌরাণিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গ, বঙ্গর, বঙ্গর।

পূর্ববঙ্গের মাঝির সঙ্গে নৌকা বাহিবার সময়ে "বঙ্গর" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে উহারা 'বঙ্গর' 'বঙ্গর' যোগ করে। সেই বঙ্গের শব্দের লোপ হইয়াছে। মুসলমানি হওয়ার পর সেই ব্রাহ্মণ বন্ধুকে তুলিয়া গেল, কিন্তু 'বঙ্গর' যে আকাশের দেবতা তাহা তুলিল না। মসজিদে পীর লাগাইয়া তাহারা মুসলমান-সমাজে একটা স্থান করিয়া লইয়াছে। হয়ত 'পীর বঙ্গ' বলিয়া কেহ ছিলেন কিন্তু এমনও হইতে পারে যে মুসলমানেরা বঙ্গদেশে 'পীর' নাম দিয়া তাহাদের একটা পুরাতন অস্পষ্ট ধারণার সূচনা করিয়াছে, 'কিন্তু পীর বঙ্গ' 'বঙ্গর' শব্দের সম্বন্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরের 'বঙ্গাল' গ্রাম এখন "বঙ্গালেশ্বর" নাম ধারণ করিয়াছে, কিন্তু চিরকালে ইহার নাম ছিল 'বঙ্গর গোপাল'—এখনও চাষা ও নিরক্ষর লোকেরা ইহাকে "বঙ্গর গোপাল" বলিয়াই জানে। 'বর বঙ্গর' অর্থ 'বড় বর'। ঐ শব্দে 'বৃহৎ বুদ্ধ-মন্দির' বুঝায়।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সাহেবের রাজা রাজেন্দ্রের যে অশ্বপৃষ্ঠ মূর্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় ঈশা খাঁ তাঁহার রাজ্যে বহু চন্দনকাষ্ঠ রোপণ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ী সাভারের নিকট, কিন্তু সাভারের আশে পাশে নিকটবর্তী কোন স্থানে চন্দন বৃক্ষ নাই। সাভারে পরিত্যক্ত পুরাতন ইষ্টক সংগ্রহকালে মিঃ মজুমদার সম্প্রতি আমাকে জানাইয়াছেন যে সেই অঞ্চলে এখনও অনেক চন্দন বৃক্ষ জঙ্গলে জঙ্গলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া মহেন্দ্রের সেই কবির স্মৃতি-গৌরব এখনও বহন করিয়া আসিতেছে।

চন্দন বৃক্ষের চন্দনকাষ্ঠ।

এদেশে রাজাদের যে পুরাতন কোন সম্পদই কখনও স্থায়ী হয় নাই একথা শুনাইবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকিত, এরূপ প্রবাদ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্পর্কে রামায়ণের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে, পত্যেক রাজারই কীর্তিকলা হইয়া গল্প করিবার লোকী পাওয়া, যায় পাল প্রভৃতি রাজবংশের শেষ হইয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত রামপালের কীর্তিনাশা গ্রামের জমিদার বাড়ী পুরাতনত্বের সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হইয়া আসিতেছে। মুসলমান পাওয়া যায়—আমিও ইহার একটি নির্দিষ্ট সময় কীর্তিকলা শুনিবার যখন যে গ্রামে কোন জমিদার এক বিরাট সমৃদ্ধি মুখে পরিচয় দিত, সে রাজের সঙ্গে কতকগুলা অলীক গল্প লাগিয়া ছিল তাহাদের এক সঙ্গে দৃঢ় হইয়াছিল। সম্প্রতি ভাওয়ালের সেকেণ্ড কোন রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইয়াছে এই "ভৌমা" নামক একটা অপদার্থ ও ক্ষেত্রমাহিষ নামক এক শ্রেণীর কুলটা স্ত্রীলোককে কেন্দ্র করিয়া এই কাহিনীগুলিকে কতকটা ভুলাইত।

কলঙ্ক

আনন্দবাজার ৭ই আশ্বিন, ১৩৪১ অনেক সময়ে রমণীরাই এই রূপকথাগুলি ভাল করিয়া বলিতে পারিতেন, কোন কোন স্থানে তাঁহাদের নাম ছিল "আলোপিনী" এই রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য লোকেদের উৎসাহে তাঁহাদের অন্তঃপুরে আলোপিনীরা যে রূপকথা শুনাইত, তাহার পরিচয়, কথার গাঁথুনি, এবং আদর্শ অতি নিখুঁতের হইত, মালঞ্চমালা প্রভৃতি গল্প এই অপূর্ব্ব কথা-শিল্পের রচনা আমরা এই শ্রেণীর লোকদিগকে হারাইয়াছি।

আমি প্রুফ দেখিতে পটু নহি, এজন্য এই পুস্তকে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৩য় ছত্রে নীলগোপাল মজুমদার মহাশয়কে ঋষি না করিয়া ঋষিকল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু রাখাল আশা করি ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন ৫৩৯ পৃষ্ঠার ১৮ ছত্রে শ্রীযুক্ত বিনয় চৌধুরী মহাশয়কে [illegible] লিখিয়াছি, কিন্তু আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ৫১৭ পৃষ্ঠার ২৮ এবং [illegible] ছত্রে চতুরঙ্গ হাতি [illegible] স্থলে হাতিঘোড় ছাপা হইয়াছে, ইহার অর্থ [illegible] ৪৮৮ পৃষ্ঠার ২৮ ছত্রে "যাত্রা" স্থলে "পুত্র" হইবে ৫৩২ পৃষ্ঠার ১০ ছত্রে tunnel শব্দ স্থলে canal ছাপা হইয়াছে এবং ৪৮৮ পৃষ্ঠার ৮ ছত্রে "মছলান্দি" স্থলে "মহলন্দি আলি" লেখা হইয়াছে, ইসাখাঁর কামানের উপর যে প্রস্তরলিপি "মছলান্দি" শব্দ পাওয়া যাইতেছে ৩০৬ পৃষ্ঠার ৩১ ছত্রে "নরপাল" স্থলে "নরপাল" এবং ৮০৮ পৃষ্ঠার ১৫ ছত্রে "নলিনা" শব্দ "নালিয়" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে ১০০৯ পৃ. ৭ ছত্রে "মহাবলের কুকুর" স্থলে ভুলক্রমে "সমুদ্রের কুকুর" ছাপা হইয়া গিয়াছে ১৮৩ পৃষ্ঠার ২৭শ ছত্রে "বল্লালের পুত্র" স্থলে "বল্লালের প্রপৌত্র" হইবে।

৪৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় আমি "বায়স্কোপে" বৃত্তা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে কিছু ভুল হইয়াছে। আমি শ্রীযুক্ত শুকদেব রায় মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রায় ছয় মাস পরে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, অথচ তাহাতে উদ্ধৃত করার চিহ্ন ব্যবহার করিতে মনে হইবে যেন উহা রায় মহাশয়েরই উক্তি, কিন্তু তাহা নহে, স্মৃতির ভ্রমবশতঃ তাহা যথাযথ হয় নাই প্রথমতঃ যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহা বিশুদ্ধ ব্যবসায়িক মেলার উপলক্ষে নহে, সিউড়ী হইতে ১২ মাইল দূরে রাঢ় অঞ্চলের লাভজনক চিকিৎসালয়ের ধর্ম-উদ্যোগ উপলক্ষে প্রদর্শনী হইয়াছিল ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫ম ছত্রে "মুসলমান" শব্দ স্থলে "বাঙালি" হইবে। এইরূপ আরও কিছু কিছু ভুল আছে, মোট কথা যাহা ঠিক রায় মহাশয়ের মুখের কথা নহে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা পরে লিখিত হইয়াছে এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বলা দরকার, ইহার মধ্যে বাঙ্গালার পাঠ্যত্ব ধরাইবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এই স্বার্থত্যাগ ও প্রচেষ্টা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালাদেশের কর্তৃপক্ষ 'বায়স্কোপে' নত্ত আজ ভারতের সকলে এমন কি য়ুরোপীয় অনেক মহামান্য ব্যক্তির মধ্যেও আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে কেহ কেহ এই বায়স্কোপে

পূর্ব্বের উল্লেখ পূর্ব্বেই জানিতেন, কিন্তু এই পুস্তক যে এদেশে এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যমান তাহা দত্ত মহাশয়ই আবিষ্কার করিয়াছেন, কাব্যিকতা ও জাতিগত, বঙ্গের ছেলের মুখস্থ, চাষা সম্বন্ধেও উহারই চেষ্টার ফলে লোকে জানিতে পারিয়াছে। শিক্ষিত লোকেরা ইহার কাদতেছেন জারি গানের কথা অনেকে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সুস্থায় সুন্দর কবিতা এত মহাশয়েরই আবিষ্কার কবিয়াছেন। দত্ত মহাশয় এই প্রবন্ধে কাহিন ও ছাউলতা বিশ্লেষণ করিয়া উহার সহজ সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

বারমাস ও আরাধনার পূজা।

ইহাছাড়া বিভিন্ন বঙ্গের নিজস্ব চিত্রশিল্প যেমন পুতুল পটের ছবি, চালাচিত্র, সরার উপর পাঁচুচিত্র, কাঠের উপর নানারূপ কারুকার্য্য, হাঁড়ি ও পাত্রের গায়ে পত্রলতা সংযুক্ত করিয়া যে চিত্রসৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ে দত্ত মহাশয় এই সকল বিষয়ে গবেষণার দ্বারা এবং নানাস্থানে বক্তৃতার দ্বারা বিশেষভাবে বঙ্গের যে শিল্পীগণ বিলাতী শিল্পের অনুকরণ ও অনুসরণ বিমুক্ত করিয়া দেশীয় ভাবে পরিচালিত করিয়াছেন।

এখনও বঙ্গের যে সুপ্রাচীন সূত্র ধরে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ইহা যে আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা আমরা দত্ত মহাশয়ের বঙ্গের পূর্ব্বের মন্বন্তরের কাজ সমাপ্ত ভাবে এখনও চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি। দত্ত মহাশয় এখনও বাঁকুড়ায় কতকটা পটুয়াদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব অনুধাবন, এবার সত্যেন্দ্র মল্লিক হাবড়া, বাগেরহাট ও কাঁথির সেই শিল্পের ধারা অনুসরণ করিতেছেন। এই আবিষ্কারগুলির ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ফরিদপুরে সতীশ কারিগর ও বাসাইলের ও চাষা প্রাচীন চিত্রকরদের যারা বজায় রাখিয়াছেন সতীশচন্দ্রের বয়স ৬০ বৎসর। কালীঘাটের যে কোন কোন পটুয়ার কৃতিত্বও সামান্য নহে কুমারটুলার শিল্পীই এখন ঐ পটের নাম গ্রহণ করিয়াছেন সকলে বিভিন্ন প্রদেশের বহুলোক কিছুদিন পূর্ব্বে কুমারটুলার মূর্তির কারখানা ফ্রান্সদেশের রাজা মুগ্ধ হইয়া যাহাকে নমুনা করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন ফরিদপুরের নলিয়া-বাসী গোপাচরণ পাল প্রাচীন মতের অনুরোধে যে চিত্রমূর্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অনেকগুলির সহিতকে তুলনা করিয়া দেখা যাইতেছে। শিল্পীদের মধ্যে বারভূমের গোপেশ্বর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চড়ক গাজনের বা দশ অবতার পুতো বিশেষের দক্ষ। মল্ল ও [illegible] পুতো শ্রেষ্ঠ ফরিদপুর জেলার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহার পুতোর এক একটি ভঙ্গী দশ অবতারের নিপুণ অভিনয় ছাড়া প্রত্যেকটির এমন রূপ বিচ্ছুরিত করে যে, তাহাতে বেশ উজ্জ্বল হইতে সমস্ত ভাগবত লীলা উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হয়। আমাদের [illegible] কত নাম করিব, যে দিন

বিলাতের লাটীন শিল্প রক্ষা ও প্রচার।

পাঠান্তর মনে মনে এই লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চিত্রশিল্পগণ এই আলপনা হইতে চিত্রশিল্পের প্রেরণা পাইয়াছেন। একটি দুইটি নাম দিয়া কি করিব? লক্ষ নামের তালিকা দিলেও উহা সম্পূর্ণ হইবার নহে। ফরিদপুরের বগলা দেবী, নগেন্দ্রবালা দেবী প্রভৃতি অশীতিপর বৃদ্ধারা এখনও যদি পিঠালি বা চালের গুঁড়া লইয়া বসেন, তবে তাঁহাদের অবর্ণালাক্রমে অঙ্কিত আলপনার কাছে শিল্পচর্চাগণও হার মানিয়া যান। খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামের 'কমলার ঘাট' আলিপনা অতুলনীয়। বৃদ্ধা চন্দ্রা ফরিদপুরের মন্না দেবী কালী ও নির্মলা দেবী, সুবাসিনী, মেনকা দেবী প্রভৃতি তরুণীরা প্রাচীন ধারাটি প্রশংসনীয় সাফল্যের সহিত অভ্যাস করিতেছেন। সম্প্রতি ঐ জিলে আমরা অয়নমিস্ত্রীর প্রসিদ্ধ আবি ঝুমুর, মনোহরের চালি ও ব্রত-চিত্রকারদের নাম সংগ্রহ করিতে পারি। এখনও খুলনা, ফরিদপুর ও যশোরে দুই একজন এমন রমণী আছেন কাঁথা সেলাই কার্যে যাঁহাদের কৃতিত্ব অসাধারণ। এই সকল শিল্প বাঙ্গলা দেশে অতীব্য হইলেও, খুব সম্ভব অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলা হইতেও প্রাচীনতর। কোন্ অতীত যুগের তমিস্রায় ইহাদের উৎস নিহিত, তাহা কোন্ পুরাতত্ত্ববিদ্ নির্ণয় করিবেন? তবে তাঁহাকে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার যুগে গতিবিধি করিতে হইবে, রামায়ণ মহাভারতের সময়ের বহু পূর্বেই বঙ্গদেশের শিল্পের অপোগণ্ড ঘুচিয়া গিয়াছিল—এইগুলিই আমাদের বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় স্বদেশী মেজাজের নিচিত্র কর্ম বিভাগের মধ্যে ইহাদের কথা কেহই একবার স্মরণ করেন না। এই শিল্পগুলি নিঃস্বার্থভাবে—বিনয় সাধনা ও নিষ্ঠাসহকারে মধ্যে শত সহস্র বৎসর যাবৎ তাঁহাদের নিজস্ব জিনিস রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বিধুকের কাঁথ যেরূপ শুক্তির মধ্যে মুক্তা রক্ষা করে এবং তদ্রূপ প্রাণ দেয়—বঙ্গদেশের শিল্পীরা চিরকাল সেইরূপে তাঁহাদের নিজস্ব বিদ্যা রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু আর বুঝি তাহারা পারে না, দলের লোকের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া এইবার দেশী শিল্প মরিতে বসিয়াছে।

বাঙ্গলার চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি ২২৮-৪০, ৪০৬-৫২, ৫৫৭-৫৮, ৮৮৭-৯২ পৃঃ। হিন্দু রাজত্বকালে শিল্পী যে প্রভূত পুরস্কার ও উৎসাহ পাইত, গত সাত শত বৎসর যাবৎ সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মোগল ও রাজপুত শিল্পের মার্জিত ও পরিণত রূপ সে কোথায় পাইবে? কালীঘাটের চিত্রের মূল্য ছিল দুই পয়সা। আরাঙ্গজেবের নিষেধাজ্ঞা বিধিতে শিল্পীর শিল্পভবন হইতে প্রস্থান করিয়া রাজপুতনায় আশ্রয় লইয়াছিল, সেখানে ঐ শিল্প পরিচ্ছন্নতা ও কালো-কানুনের দিকটা কতকটা হারাইয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু দুই দিকের প্রভাবে পড়িয়া উহা একটা মিশ্র রকমের সামগ্রীতে দাঁড়াইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানসিংহ এই জয়পুরী আদর্শ বাঙ্গলায় চালাইয়াছিলেন, তদবধি বাঙ্গালী শিল্পী বাঙ্গলার বড় মানুষদের ফরমাইস মত জয়পুর শিল্পের অনুকরণ করিয়াছে, তাহাতে সোণারূপার প্রাচুর্য্য, দরবারী কায়দা-কানুন ও পোষাকের আড়ম্বর বেশী।

বাঙ্গলার বাটি চিত্রের বিশেষত্ব

কিন্তু এতদ্বারা কিন্তু [illegible] কারণে এরূপে [illegible] ছিল। [illegible] "[illegible]

অন্নদামঙ্গল [illegible] [illegible] [illegible]

তাহাও নমুনা মাত্রের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু মূলের এই অংশ ছবিগুলি যথাযথভাবে উঠে নাই।

বাঙ্গালা চিত্রকরের মনে ছবি আঁকিবার শক্তি অসাধারণ, পটুয়ার তুলি এই বিষয়ে এত পটু যে তাহার গড়া মূর্তি ও ছবি যেন কথা কহে। কালীঘাট চিত্রাবলীতে স্ত্রীলোক ছবিটি লক্ষ্য করুন। [illegible] বহুগুলি ভঙ্গীতে পটুয়া রমণীমূর্তি আঁকিয়াছে, তাহার সবগুলিই সুস্পষ্ট, কোন ভঙ্গীর বৈষম্যদোষে ছবিগুলি দুর্বোধ্য হয় নাই।

অয়পুরী চিত্রের সঙ্গে বাঙ্গালা পটুয়ার আকৃতি সাদৃশ্যে ইহা পরিষ্কার বাঙ্গালা পটুয়া অনেক সময়ে বড় বড় মুখের মধ্যে ছোট ছোট চোখ আঁকিয়াছে। [illegible] বৎসর পূর্বের লিখিত একখানি ভাগবতের পাতায় [illegible] মণ্ডলের বাড়ীতে আছে, উহার প্রত্যেক পাতে বিশেষ করে একটি ছবি আঁকা আছে। চিত্রগুলি সমস্ত এক আচার্য্য চিত্রকরের অঙ্কিত এবং অনেকগুলি মাটি [illegible] ছবি কোথাও রেখা বাহুল্য বা ধারণা সাদৃশ্যে [illegible], কোথাও কুত্রিম নিপুণতার পরিচয় রাখা হয়নি বরং অনেক স্থলে অনভ্যস্ত হাতে আঁকা ছবির মত ইহাদের [illegible] চিত্রগুলি দেখিলে মনে হয় যেন চিত্রকর অন্তরের সমস্ত ভাব ঢালিয়া দিয়াছে। [illegible] চিত্রের সময় হইতে সমস্ত বাহ্য প্রকৃতিকে ভুলিয়া গিয়াছে। [illegible] ও অন্তরালের মধ্য [illegible] বড় বড় চোখ ছোট ছোট [illegible] পশু আঁকিয়াছে, এবং প্রেমের [illegible] [illegible] ও ফুল ছাড়া এক পাখিতে স্থান লইয়াছেন নদী ও সমুদ্র এক করিয়া দিয়াছে। [illegible] ও [illegible] এই সকল লক্ষ্য করিলে চিত্র আর কোন প্রাদেশের [illegible] বলিয়া অনুমান করা যায় না। [illegible] রাধা গোপাল ও গোপীকের গোষ্ঠে [illegible] করিয়া [illegible] মাঠে [illegible] একটি সাধারণ [illegible] [illegible] করিয়া মকরমুখ স্বর্ণমণ্ডিত বাঁশী বাজাইতেছেন [illegible] [illegible], তাহাও আঁকিয়াছেন।

কবি রামপ্রসাদ সেন ও তাহার পত্নীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি হালি সহর বাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু এম এ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। একখানি স্বর্ণ-খচিত সমচ্ছদ চন্দ্রাতপের দুই পার্শ্বে দুইজনের ও দাঁড়াইয়া ছবি দুইটি দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বাস করিবার কথা রহিয়াছে এই ছবি যখন অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্বে রামপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তখন হালিসহর অঞ্চলটা রামপ্রসাদের স্মৃতিময়, যে পটুয়া ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার বাড়ী হালিসহর কুমারপাড়া, এই স্থানটি রাম-প্রসাদের গৃহ ও সাধনভূমি হইতে অধিক দূরে, এক পাড়া বলিলেই হয়। গোপেন্দ্র বাবুর বাড়ীও এক মাইলের মধ্যে এবং তাঁহারই পূর্বপুরুষ ছবি আঁকাইয়াছিলেন সেখানকার লোকের মুখে শুনিয়াছি উক্ত পরিবারের ছবি রামপ্রসাদ ও তাঁহার পত্নীর অনুরূপ। এখন যেমন ফোটোমূর্তি আঁকাইতে যাইয়া অনেক সময়ে পরমহংসে দেবের ছবিও তৎপার্শ্বে আঁকা হয়, রামপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার প্রতিবেশী

পটুয়া যে ছবি আঁকিতে বসিয়া রামপ্রসাদ ও তাঁহার অন্নপূর্ণার ছবি আঁকিবে, তাহাও তেমনই স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের মাতা কালিকাদেবীর স্বপ্ন পাইয়াছিলেন, একথা কবি স্বয়ং বলিয়াছেন। রামপ্রসাদকে তাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছিলেন স্বীকার লেখক অতুলবাবু তাঁহাদের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন "রামপ্রসাদের মাথায় চুল ছিল ডগডগে গোরবর্ণ ছিলেন, গলায় স্ফটিক মিশানে রুদ্রাক্ষ মালা ছিল। সর্বদা হাস্যমুখ।" অতুল মুখোপাধ্যায় কৃত রামপ্রসাদের জীবন, ১৩৫৯ পৃঃ ৮৫। পটুয়া ছিল না বলিয়া কাহারও কাহারও কিন্তু লোকের দাড়ী কখনও থাকে, কখনও থাকে না, অতএব বিষয়ে এই কথার সঙ্গে চিত্রের খুব সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

এইখানে গ্রাম শিল্প পুনরুজ্জীবনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে সকল শিল্প ছিল, তাহাদের বিস্তারের ও উন্নতির কথা হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত নানা কারণে তাহাদের ক্রমে ক্রমে অবনতি, তাহার মূল সূত্রধর, ধাতু ও প্রস্তর শিল্পী ও চিত্রকরের কথা কহিয়া বক্তৃতাকে আরম্ভ, প্রধান প্রধান নগরে উহা সমালোচনার ব্যাপার ছিল। বহু প্রকার বিলাস দ্রব্যের পথ টানা হইল, ঢাকার তাঁতির বাজার ও শাঁখারীবাজার অনুসন্ধানের কথা, তাহাদের যে মূলধন ব্যতিরেকে, তাহাতে শত শত টাকা বাহির হইল। সেবার বড়দিনের ছুটিতে পুরীর রাজা কালনার যশ ডাক্তারিয়ম উপলক্ষে সেই সময়ের মধ্যে ৮ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। নগরের প্রত্যেক নগরীতে বড় বড় যে কোন হয়, বারাণসী, আমৃত, দাশমাহী, মহিষাদল বালেশ্বর, মহেশ পটুয়া বহু বহু গ্রামে যে সকল অপূর্ব কারুকার্যময় অঙ্কিত বস্ত্র কিংবা কাশ্মিরি পরিচ্ছদাদি ব্যবহৃত হয় পটুয়া আছে, তাহাদের পরোক্ষটির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। কলিকাতার মধ্যে এই পূজা পার্বণোপলক্ষে খুব প্রতিযোগিতা চলিত। বহু বহুর পূর্বেও সংবাদ পত্রের, পাঁচকড়ি পটুয়ার পত্রিকা কোন বাড়ীর পূজা ও সমালোচনা কিরূপ হইল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া এই প্রতিযোগিতার ইন্ধন যোগাইত। বড় বড় নগরে কর্তাদের নিয়া যে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত, তাহার অবধি নাই, ছোট ছোট গৃহস্থও এই সময়ে সাধ্যানুসারে ব্যয় করিতেন। এই সকল উৎসবে ব্যয় মাস কামার, কুমার, ছুতার, বিড়ার বাড়ীকর, ফুলওয়ালা, মালা, ঢাকী সানাইবাদক ঢুলী, ফোটাক ও বহু ভিক্ষুক মাঝি, তাঁতী প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর লোকই আনন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করিত। আমরা উৎসবগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছি যাহাই এদেশে কিছুকে অবলম্বন করিয়াছিল, এখন পূজার মন্দির ও দালান পড়িয়া পড়িয়াছে কিন্তু তাহার সংস্কারের কারুরো কোথায়? প্রত্যেক গ্রামেরই উৎসব আছে, পুরাতন উৎসবগুলি যে প্রয়োগে বিবেচিত না হইলে তৎস্থলে নূতন উৎসব প্রবর্তিত হউক বাঙ্গলা দেশে সার্বজনীন দুর্গোৎসবে বিস্তৃতির কিছু কিছু অনুসন্ধান হইয়াছে যথাভিন্ন তবু কোন দেবতা এ দেশকে ছাড়াইতে পারিবে না। যদুনাথ শিবের সঙ্গে মিতাক্ষ অসম পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিয়া দিলে গ্রামবাসিক ভাসিয়া যাইবে শিল্প –

ভক্তি ও প্রেম—এই দুই দেবতার মধ্যে ভক্তি চলিয়াছে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এখন প্রেমের স্থানে পূর্ব্বপুরুষের লড়াই চলিতেছে, এদেশে স্বর্গকারের আর দরকার নাই, রমণীরা অলঙ্কার চাহেন না ভাস্করদের এই দুই দেবতার সমন চলিতেছে, কাহারো কাহারো আশ্রয় করিয়া শিল্প দাঁড়াইতেছে। পূজারীকে অর্থ দিবার জন্য ভক্ত। অবশ্য বলাইয়া দিতেছি যে ধর্ম্ম বাদ দিয়া শিল্পকে কেহ বাঁচাইতে পারিবেন না। ধর্ম্ম শুধু আত্মায় নহে, মন্দিরে তাহার দেহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তবেই শিল্প রক্ষা পাইবে। প্রাণান্ত-মন্দির, স্বর্ণ-মুদ্রা সোনার সিঁড়ি মেসার্টিনি বা ব্রুস পল্লে দেহ তত্ত্ব কেমন করিয়া যাহা ভুলিবে? ৫৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ব্রাহ্মণদের দৈত প্রাচীন কালে সকলে অপছন্দ করিত না। যজ্ঞোপবীত যজ্ঞের সময়ই ধারণ করার বিধি ছিল আজকের বিধবা বালবিধবা যখন হিন্দুর ঘরে নির্যাতন হয়, তখন সেই প্রাচীন রীতিই পরিলক্ষিত হয়, এবং এখন পাশ্চাত্য সেই প্রাচীন রীতি সে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিদ্যমান। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাসের প্রবন্ধে লিখিত আছে "শিক্ষিতকে বালবিধবার বিবাহ দেওয়া হইলে আপনার দৈহিক কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন—'আমরা শুধু পূজা অর্চনার সময়ে উহা ব্যবহার করিয়া থাকি, অন্য সময়ে নহে'" প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩১, বাংলা ৭০ পৃঃ

কৃষ্ণনগর মহাশয় বাঙ্গালার অধিবাসীদের গৃহ নির্ম্মাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান বাঙ্গালী বাঙ্গালার গৃহ নির্ম্মাণ পদ্ধতি ঠিক বাঙ্গালার মত। আর্য্য সমুদ্র পার হইয়া কিরূপে আমাদের গৃহ নির্ম্মাণপদ্ধতি গ্রহণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ঠিক সন্ধানে এখনও আসিতে পারি নাই" সুতরাং তাহা যে তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা-দীক্ষা ও রীতিনীতি লইয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল সে কথা বিশ্বাস মহাশয় জানেন না, অন্ততঃ পালরাজত্বের ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িলে তিনি প্রবন্ধটী রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু এখনও সে ইতিহাস লেখার সময় আসে নাই এখন ইতিহাস-লেখা অসম্ভব বাহুল্যবশতঃ বাঙ্গালার সেই কার্ত্তি-কাহিনীর আভাস দেখাইতেছেন। ভক্টর ষ্টেলা ক্রামরিশ আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "The great major arts of East Indian Art and Architecture within India itself is but one of its aspects The other, equally important, shows the art and architecture of this province as the prime source of Indian influence in further India and Indonesia. The indigenous and original character of Bengal art has become known mainly in its paintings (*pata* and book-covers) and but recently also in its sculpture (Paharpur Seventh Century) Its connection and leading rôle in image-making with the rest of Aryabarta is amply illustrated by the sculptures of the Pal and Sen age at that place It influenced the further East, and Paharpur must be considered as the most convincing monument preserved; unmistakably it proves that the temples of Kumar-

greatness are enthusiastic [illegible] ” ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের মহৎ স্থাপত্য ও শিল্পপ্রসার জাভার চতুঃসীমার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু এই প্রভাব স্থানীয়ভাবে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব ভারতের এই প্রভাব স্থূল পূর্বে— ভারতীয় উপনিবেশের সমাবেশে অধিক পরিমাণে হইয়াছে। বাঙ্গলার শিল্প চিত্র বিস্তার (পটি ও পুঁথির চিত্রের কথা স্বতন্ত্রভাবে) যতই স্থূল মোলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য বেশী দেখা হইয়াছে, ইহাদের স্থাপত্য বিস্তারে পাহাড়পুর, সপ্তম শতাব্দী আরও গুরুর পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাল ও সেন-রাজত্বের মূর্তি নির্মাণের তাদৃশের সঙ্গে সমস্ত অঙ্গোরভের সম্বন্ধ ও বাঙ্গলার শিল্পের পরস্পর বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, পাহাড়পুরের শিল্প ও স্থাপত্যের আদর্শ পুরুষানুক্রমে ইন্দোপুরে অকাট্যভাবে প্রমাণিত [illegible] মন্দির সমূহের মহৎ স্থাপত্য বিস্তারে আর খুঁজিয়া পেলে আমাদিগে পাহাড়পুরের আদর্শ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।]

পাহাড়পুরের প্রাত্নেতিক ও আভ্যন্তর ইতিহাসের সূত্র ধরিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এইবার ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে, পরাজয় মোটেই নিশ্চিত এবং প্রাণঘাতক ছিল না অনেক সময়ে ইহাতে রাজ্যের উত্থানকারী ও ভাগ্য বিধাতা ছিল। প্রজাদের অসন্তোষে হিন্দুর রাজ প্রতাপমাণিক্য (১৪৩৩ খৃঃ, জয়দেবমাণিক [illegible] খৃঃ, অমরমাণিক্য [illegible] খৃঃ, প্রতাপ মাণিক্য ১৬১৭ খৃঃ, জয়মাণিক্য প্রথম ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে এবং পরবর্তী ১৭৮০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনচ্যুত হন পাঠক মনে করিবেন না পরাজিত রাজগণের মধ্যে পূর্বোক্ত ৫ জনই মাত্র স্বীয় বিদ্রোহী প্রজা ও সৈন্যের হাতে পরাজিত হইয়াছিলেন, আমরা বাঙ্গলার এই তালিকা বাড়াইলাম না পাঠক ইতিহাস খুঁজিলে এই তালিকার দলে আরও অনেক রাজা পাইবেন।

প্রজা কর্তৃক রাজ-বিতাড়ন।

প্রজারা কখনও অত্যাচার সহ্য করে নাই। রাজার বংশের না থাকিলে রাজবংশের পরিচয় পাইয়া ইহারা রাজা নির্বাচিত করিয়াছে যে যে স্থানে তাহারা রাজাকে হত্যা করিয়াছে, পরবর্তী রাজাকেও তাহারাই মনোনয়ন করিয়াছে। [illegible] পূর্বোক্ত মুসোমাণিক্যের পরে রাজবংশের কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না, [illegible] রাজ পুত্র দেখা যায়, তাই রাজ [illegible] কাজকে করিয়া রাজা করিয়া সকলে। সেনাপতি মাণিক্যের চরিত্র তখন কাহাকে করিব রাজা না দেখে লক্ষণ। [illegible] রাজা বহুদিন রাজত্ব করার পর [illegible] মৃত্যুর কালে কৈলাসহরে সেনাপতি করেছে অনেক যুদ্ধ সেই মাতমান্ [illegible] এই রাজ্যের হয় দেখ বিদ্যমান। এসব চিন্তিয়া সেনাপতি বিক্রমে। রাজার নাম সেনাপতি বসে সিংহাসনে” এই বাক্যের পালবংশের গোপালের ন্যায়ই নানা যুদ্ধে জয়ের দেখাইয়া স্বয় রাজযোগ্য গুণাবলীর পরিচয়-প্রমাণাদিসহ প্রজাদের কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ইনিই একমাত্র প্রজানির্বাচিত রাজা ছিলেন না [illegible] সময়-প্রকাশিত [illegible] প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের মহারাজ ধর্মপালও এইভাবে প্রজাদের মনোনয়নে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আসামের বৈষ্ণবদের দ্বারা

লক্ষ্মণসিংহ মহারাজ (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে) নিহত হইলে, বৈষ্ণবেরা মোসাহেবের মত যোগেশের পুত্র বলাগণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বলাগণের পিতা পুত্রকে সাংঘাতিক প্রতিহিংসা লোভী হইতে দেন নাই। এই সকল প্রাদেশিক ইতিহাস হইতে ভাল ভাবেই আমাদের জনসাধারণের রাজনৈতিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল এবং তাহারা রাজাদের ইচ্ছামিষ্ট বুঝিয়া রাষ্ট্রব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিল। ইংরেজের জনসাধারণ অবশ্য এ মাপা নহে। তাহারা অন্ধকারের মত এক হাতুড়ে ঘুমায় এবং এক হাতুড়ে জাগে।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের কলহ যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা আমাদের দেশে নূতন হয়, তবে বাঙ্গালার অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় নাই। ইতিহাসে ইহাদিগকে দেখা যায় নবদ্বীপে

শাক্ত ও বৈষ্ণবের কলহ।

ইহাদের বাড়ীতে কোন লোক চন্দন ও সিন্দূরলিপ্ত বিবসনা ও চক্ষুপুষ্পের ফল দেখিয়া বিবাহ করিতে সাহস করে না, এই অপরাধে সেই ব্যক্তি নাকি কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াছিল। নরোত্তম বিলাসে দেখা যায়, শাক্তরা বৈষ্ণব গুরু নরোত্তমের মৃত্যু হরণ করিবার জন্য পঞ্চার পঞ্চার হাতগুলি দিয়া মাটী কাটিতে কাটিতে গিয়াছিল নরোত্তম বিলাস হইয়া। বৈষ্ণবেরা কালীর নাম করিত না এজন্য তাহাদের কালীকে 'মহাদেবী' বলিত। শাক্তপূজার সকলরূপ নাম করিত না, এজন্য তাহা পুষ্পকে "ওড় ফুল" বলিত "কাটা" কথা তাহাদের অভিধানে নিষিদ্ধ, এজন্য তরবারী কোটাকে "বালান" বলিত।

কিন্তু আমাদের শাক্ত বৈষ্ণবের যুদ্ধের কারণ উহা নহে তুচ্ছ পরিমাণ প্রণাম না করাতে অন্ধ বিল্ব নারায়ণের দক্ষিণ হস্ত রাজা নরনারায়ণের আদেশে চুরোরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, এবং এই অপরাধে তাহার দক্ষিণ ও বামপদ বিল্ব বৃক্ষের উপর রাখার আদেশ হইল. উহাতেও যদি তাঁহারা ক্রোধ শান্ত না করেন তবে তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এইরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচারের ফলে নিরস্ত্র বৈষ্ণবেরা ক্ষেপে যাইয়া ৪০ হাজার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা জগন্নাথ ফেলিয়া দিয়া অন্ধ হস্ত হইয়া রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে হত্যা করিয়াছিলেন (১৭৮০ খৃঃ), আসামে বৈষ্ণববাহিনী দুর্জয় হইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।

এই সকল পারলৌকিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বে যখ পার্ব্বত্য অঞ্চলে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া দেশগুলি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। যদিও ত্রিপুরার

পার্ব্বত্য প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম-বিস্তার।

রাজারা গুলাচনের (মৃত্যুর সময়নির্দ্দেশক বলিয়া কথিত সময় হইতে চতুর্দ্দশ দেবতার পোষক, তথাপি ক্রমশ: হিন্দু নামের শক্তি গুণে ও প্রজাদের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর্দ্দশ দেবতার পুরোহিত চন্দ্রাইদের প্রভাব হইতেছে রাজাদের দেশে বাঙ্গাল ব্রাহ্মণদের খাতির খাতা বেশী হইয়াছিল বিজয়মাণিক্য প্রভৃতি ত্রিপুরেশ্বরগণ নিষ্কলঙ্ক অবতরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য স্বর্ণ ও ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেসকল স্বর্ণসঙ্গে অরোশিলা রূপে। উহাদিগকে দিল ব্রাহ্মণ সমাপে॥ উহাদের স্বর্ণ তে ব্রাহ্মণেরা লুটে, বিজয়মাণিক্যকে হৈল হরে ঘাটে॥

• • • সেই পঞ্চদেশ ভূম ব্রাহ্মণকে দিল সেই হতে পঞ্চদেশী গ্রাম নাম হৈল " রাজমালা। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরেশ্বর কল্যাণমাণিক্য তাঁহার পৌত্রের তুলাদান উপলক্ষে বৃন্দাবন মথুরা ও নবদ্বীপ হইতে ৫০০০ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, অনেক লোকের রাজধানীর সকল ২০০ ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপস্থিত থাকায় সেই সভা বাস্তবিকই বাহ্য সমারোহ করিয়াছিল। কৈলাসচন্দ্র প্রণীত (১৬২৫-৫৫ খৃঃ) "রাজকর ও সংস্কৃতে কবিতায় স্তুতি করিয়া ও শ্লোক পড়িয়াছিলেন " কবিত্ব আছে তাহার পরিচয় কিছু কিছু পাইয়া সংস্কৃতে কথা বলিত, অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিক্য (১৬১১-১৫ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখা শুরু করেন, তদবধি খোল ও করতালের কলরবে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য রাজধানী মুখরিত হইয়া আসিতেছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য যে সকল দেবালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেগুলি আজিও ভক্তিভাবে দেবার মহোৎসবের দ্বারা প্রতিবৎসর একটি সময়ে আটদিন করিয়া মুখরিত থাকে। ত্রিপুরার রাজধানীর অধিবাসী সকল শ্রেণীর লোক ইহাতে যোগদান করে।

এই সকল রাজাদের ব্যবহারের জন্য যাহা কিছু কিনিতে হইত তাহার অধিকাংশ ব্যবসায়ী বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেন। আমাদের দেশে কোন কোন ব্যবসায়ী রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ব্যবসায়ে প্রভূত লাভবান হইতেন। ত্রিপুরার রাজবংশের সহিত আত্মীয়তা করিয়া বিক্রমপুরের কোন কোন ব্যবসায়ী পরিবার ধনে মানে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরার রাজা এই আদেশ করিয়াছিলেন।

খাস বাঙ্গলা ও বাঙ্গালার সমুদ্রতীরবর্ত্তী অধিবাসীরা অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং • • • বঙ্গভাষার অনুশীলনকারীদের অবজ্ঞা করিতেন। তাই পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থ রাজসভার আশ্রয়ে রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গলার রাজারা এতকাল জনসাধারণের মনে সংস্কৃতের পড়ুয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজত্বকালে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া সম্ভবপর হইবে অবকাশ পায় নাই। কোচবেহারের রাজা নরনারায়ণ ১৫৫৪-৮৭ খৃঃ অনন্ত কন্দলী নামক প্রসিদ্ধ কবিদ্বারা রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। দোমোহনী অঞ্চলের রাজা রূপচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজ ভবানী কর্ত্তৃক চাণক্যের ভাব-অনুবাদ সঙ্কলিত করাইয়াছিলেন। কথিত আছে এই কার্য্যের জন্য তিনি রাজার নিকট সেই সময়ে যখন টাকার মূল্য অনেক বেশী ছিল প্রতিশ্লোক দশ টাকা হিসাবে দক্ষিণা পাইতেন।

বঙ্গভাষায় প্রতি অনুরাগ। ত্রিপুরার রাজাদের অনেকেই মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া ছিলেন, রাজমালায় তাহার উল্লেখ আছে ধর্ম্মমাণিক্য। ১৪৬৩-১৫১৫ খৃঃ অনেক সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন, তৎপক্ষে বিদ্বান কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল। "ত্রিপুরাধিপতির রাজা কমলার পতি উৎকলেশ্বর পাঠাই এড়াইল মহামতি জ্যোতিষের যত্নে-বঙ্গাক্ষর নিধি আর। পাঞ্চালী

বচহইল রাজা লোকে বুঝিবার ° বহুমাধিক রামকবি ঘরে প্রেমচতুষ্পদ সঙ্গীতবাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এই পুস্তকখানি [illegible] ১১৯৫ খৃ। প্রাচীন কালের কোন ত্রিপুরেশ্বরের আদেশে রচিত বৃহদাকার পুরাতন বঙ্গানুবাদ আমার নিকট ছিল বোধ হয় এই পুস্তক এক সময়ে অগরতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যেহেতু মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য এই পুস্তকে স্বহস্তে অনেক নূতন বিষয় একখানি উপহার দিয়াছিলেন অল্পকাল পূর্বে মহারাজ বীরচন্দ্র পুরা লাভবান্ বিদ্যারত্নকে এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন অতএব ১৭০৮ খৃ অব্দে রাজমাতা চন্দ্রপ্রভার আদেশে নারদীয় পুরাণের আর একখানি অনুবাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই তালিকা বাড়াইবার দরকার নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বিগত ৪০ কি ৫০ বৎসর যাবৎ পার্বত্যিক রাজাদের প্রায় প্রত্যেকে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন সাধারণ পাঠকের পক্ষে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন।*

দেখা যাইতেছে, শুধু ত্রিপুরা ঈশান, আরাকান, কাছাড়, কোচবেহার এই কয়টি ভারতের প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত রাজ্যে সুদূর প্রাচ্য সাম্রাজ্যের বাঙ্গলা ভাষা আদর পাইয়াছিল। সোর চট্টরাজ লেখক কৌতুক কাণ্ড এবং পদ্মাবতীর লেখক সৈয়দ আলোয়াল প্রভৃতি কবিরা আরাকানি রাজকর্মচারীদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বঙ্গভাষায় কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ—ইহঁ কবীন্দ্রের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন ইঁহারা হুসেন সাহা ও তৎপুত্র নসরত সাহার অধিনস্থ সিপাহসালার ছিলেন যখন নসরত সাহা পূর্বোক্ত কবীন্দ্রের পূর্বে অপর কোন পণ্ডিতের দ্বারা একখানি অনুবাদ গ্রন্থ করাইয়াছিলেন "শ্রীযুত পাঁচালি প্রবন্ধ কৈল নসরত খান। রচইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ ১১৬ পৃঃ।, মুসলমান সমাজটির আদেশে গুণরাজ খাঁ ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ শেষ করেন ১৪৭০ খৃ। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগে হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ ছিল না। দুই ভিন্ন ধর্ম কিন্তু মাতৃভাষা এক ছিল, একদিকে রোসাঙ্গ নদী, আরাকান ও নিকটই লঙ্গাক্ষ হুসেন পার্শ্ববর্তী মরুপুর—অপরদিকে ঢাকা ও পদ্মাতীরস্থ পূর্ববঙ্গের পরাক্রমশালী হরীন্দ্র সমস্ত পূর্বদেশ বঙ্গভাষার আদর করিয়াছে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি

* নিম্নলিখিত বিবরণটুকু ঢাকা হইতে প্রকাশিত [illegible] বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯ পৃঃ। "এই অনুবাদ ছাপার পুস্তক ইংরাজিবাদ হইলে, প্রকাশ পত্রে এক সাহেব লিখিয়াছেন যে অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া রক্ষিণা প্রকাশের সাহায্য করে অল্প কাল পরে এই সম্পর্কের ফলে পুস্তক বিক্রয় করিয়া [illegible] বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। শুভঙ্কর পণ্ডিত ১৬৩০।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯ পৃঃ

পূর্ববঙ্গই বঙ্গভাষার গৌরবের আদি জন্মভূমি, মহাপ্রভু নিজে পূর্ববঙ্গবাসী হইয়াও পশ্চিম বঙ্গে যে ভাষাকে ভক্তির ভরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বঙ্গ বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। [illegible] আমার মনে হয়, বৈষ্ণবকবিদের [illegible] সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছিল সেন-রাজাদের সময়ে [illegible] একেবারে [illegible] কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গভাষা দ্বারা কিছু বড়ো [illegible] কিন্তু [illegible] তাহার আধকারে [illegible] পূর্বকার [illegible] বঙ্গভাষা [illegible] এই ভাষা ঐ সকল লেখার কোন কোন স্থানে গোলমালের "সুবিধা" [illegible] ১০৫ পৃ

আমরা [illegible] [illegible] [illegible] সাধুদের [illegible] [illegible] [illegible]

তাহা আঁকিতে হইলে এই চিত্রের ভক্ত অংশ বাদ দিয়া বিশুদ্ধ প্রেমের অংশটুকু আদর্শ করিলে ভাল হয়।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে আনন্দ-তত্ত্বের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আপত্তি করিয়াছেন। মাধ্যমিক মহাযান কর্ত্তারা কয়েক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে উপনিষদের গা ঘেঁসিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা, "নির্ব্বাণ"কে তাঁহারা যে ভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে উহা কতকটা "ভাব-সমাধি"রই মত হইয়া দাঁড়ায়। নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্মে বুদ্ধই কালক্রমে ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিলেন, জাপানের চরিত্রচিত্র মন্দিরে রক্ষিত "সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক" গ্রন্থে বুদ্ধকে স্বয়ম্ভূ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মে ঈশ্বর ও উপাসকের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রথমোদয় সূচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ তন্ত্রে আদি বুদ্ধ আদি প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং বহুসত্ত্ব শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত ভক্তিসাধনার মূলমন্ত্রটি সংবলিত শৈবধর্ম্মের,—তথা তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম্মের গোড়া পত্তন করিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, ধর্ম্মপালের সময়ে (অষ্টম নবম শতাব্দী) "মহাসুখবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, বুদ্ধ যে আনন্দ-স্বরূপ এই মতবাদ তাহা প্রকাশ করে। কালী উইলসন হেবজ্রতন্ত্রের টীকা লিখেন এই 'মহাসুখবাদ' হইতেই বজ্রযান ও কালচক্রযানের মতাদি উদ্ভূত হয়।" (যামিনীকান্ত সেন—'প্রবাসী', শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪১ সন, ৮৬ পৃঃ)

আনন্দহীনের ধর্ম্ম।

বুদ্ধদেবের দুঃখবাদে ক্লান্ত হইয়া, ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কালচক্রযান ও বজ্রযানে যে ভক্তিবাদ সূচিত, শৈবধর্ম্মে ও বৈষ্ণবধর্ম্মে তাহার পরিণতি, এজন্য ডা. কার্ণ (Dr. Kern) লিখিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এদেশে ভক্তিবাদের উৎপত্তি।

এইভাবে ভারতীয় বৌদ্ধগণ এক যুগে উপনিষদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও বলিতে হইবে, এই আনন্দ ও সুখবাদ বুদ্ধদেবের আদর্শ হইতে অনেকটা উল্টা পথ ধরিয়াছিল।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মে তপস্যার জন্য অতিরিক্ত শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে (১১৬ পৃঃ)। এ সম্বন্ধে মহাভারতের নির্দ্দেশ বহুপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, "অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা, কেবল শরীর-শোষণ করিলেই তপস্যা হয় না" (মহাভারত, শান্তি, ৭৯ অঃ)।

আমরা এই পুস্তকের ৭১, ৮৮ এবং ৮৯ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি বঙ্গদেশ হইতে এক সময় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে ও দক্ষিণাপথে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ পালরাজগণ তাঁহাদের রাজত্বের আদি ভাগটা বড়ই গোঁড়া ছিলেন, ইহাদের উৎপীড়নেই গৌড়ী ব্রাহ্মণেরা দেশ ত্যাগ হইয়া সমস্ত পূর্ব্বভারতকে হিন্দু গণ্ডীর বহির্ভূত বলিয়া শাসন প্রচার করিয়াছিলেন। নেপালে যে সকল তাম্রপট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নবম-দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের বিদেশে বিস্তৃত অধিবাসের প্রমাণ

পৃষ্ঠীভূত হইয়াছে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার Vol XXI, p. 260) প্রকাশিত কোলাগাছঃ [মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ রেলওয়ের গুন্টাখালির ছগলি (Hoogly)-অঞ্চলের] অনুশাসনে দৃষ্ট হয়, রাষ্ট্রকূটরাজ খোটিগ ৮৮১ শকে (৯৫৭ খৃঃ অব্দে) গুণাধব নামক গৌড়াগত ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণকে "বারেন্দ্র শ্রোতকারিণা" বিশেষণ দ্বারা বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জানা যাইতেছে ইনি "বিবান্ গোড়ভূভামণিশ্চ" এবং ইঁহার জন্মস্থান 'তাড়া' (Tada) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এরূপ আরও ভাম্র-পট পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে এদেশের ব্রাহ্মণগণের ভিন্ন দেশে উপনিবেশ সূচিত হইয়াছে এই ভাবে বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে পুরবর্তীরাজার যজ্ঞের জন্য ভিন্ন দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করার দরকার হইয়াছিল তাড়া ও গৌড় ব্রাহ্মণদের বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনের সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত প্রবাদ আছে (Indian Antiquary, Vol IX, P II (এই পত্রিকার (Vol XII, P. 215-51 রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাঙ্গলী প্লেট দৃষ্ট হয়, উক্ত রাজ কেশব দীক্ষিত নামক এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে লোহাগ্রাম নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রের কাল ৮৫৫ শকাব্দ (৯৩৩ খৃঃ)। কেশব দীক্ষিতের পিতার বাড়ী ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণে অকাট্য ভাবে এই কথা সমর্থিত হইয়াছে যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা পালরাজাদের সময়ে দেশ-ত্যাগী হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধাদি দেশের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন

গুজরাটে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অন্য একটা দিক্ দিয়াও আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমাদের অনুমান হয় যে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা আদিকালে বাঙ্গালী ছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ, ডি আর ভাণ্ডারকার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গলার বহুসংখ্যক লোক গুজরাট ব্রাহ্মণের বংশধর। ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোয়ার্টার্লির (১৯১০ খৃঃ এক সংখ্যায় ভাণ্ডারকরমহাশয়ের তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত নাগর ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে ছিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, "We made an attempt to prove by means of epigraphic and other evidences that Nagar Brahmins existed in Bengal as far back as the 5th century". অধ্যাপক ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়েরীতে (১৯১১, ৪১-৭২ পৃষ্ঠা প্রমাণ করিয়াছেন যে, নাগর ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলার নানা জাতির সঙ্গে খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্টেও (1911, Vol I, Part I, Chap XII, Para 513, ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠা) এই উক্তি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। নাগর শ্রেণীর চাষারা 'কৃষ্ণ উরা' ও 'শ্বেত উরা' এই দুই নামে প্রসিদ্ধ (ইহারা সাধারণতঃ কানাই এবং পলসা এই দুই নামে কথিত হইয়া থাকে)। আশ্চর্য্যের বিষয়, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণের মধ্যেও কৃষ্ণ উরা ও শ্বেত উরা এই দুই শ্রেণী আছে। এই ভাবের নানা প্রমাণ Indian Culture, Vol I, No 4 সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধ-লেখকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাট হইতে

বাঙ্গলা দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বিপরীত, বাঙ্গলা হইতেই নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাটে গিয়াছিলেন।

আমরা ৭১ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ গুজরাটে গিয়াছিলেন। এই নাগর ব্রাহ্মণেরাও সম্ভবতঃ সেই দলের শুঙ্গ ও গুপ্ত রাজগণের সময় নাগর ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলায় ছিলেন খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দী পর্য্যন্ত। তারপর তাঁহারা বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ দেশত্যাগী হইয়া গুজরাট এবং অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। তখন বঙ্গদেশ অস্তিনপ্রস্থ দেশে পরিণত হয়। তখন যে সকল নাগর ব্রাহ্মণ স্বদেশে ছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধাচারী হইয়া পতিত হন। এজন্য তাঁহারা নানা শ্রেণীতে মিশিয়া গিয়া কোথাও কায়স্থ কোথাও সংচাষা প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হন। বিশ্বকোষে দৃষ্ট হয়, একমাত্র মালদহে ১৪,৩৪৯ জন নাগর শ্রেণীর লোক আছে বৃহৎ বঙ্গে এই নাগরদের সংখ্যা অনেক বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহাদের এক শ্রেণীর নাম "ওটনাগর" গুজরাটেও "ওটনাগর" নামক এক শ্রেণীর নাগর ব্রাহ্মণ আছেন হিন্দু রাজত্বকালে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গলা দেশে সংরাজিত ছিলেন, তাঁহারা পরে এত অধোগতি পাইলেন কিরূপে? এই সকল কারণে মনে হয় বাঙ্গলা হইতে গুজরাটে যাইয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা গৌড়রাজ্যের একটা বড় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এদিকে পাল অধিকারে তাঁহারা অনাচারী ও পতিত হইয়া বাঙ্গলা দেশে নিম্নতর জাতির সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

নাগর ব্রাহ্মণগণের আদি বাস বাঙ্গলা বলিয়াই মনে হয় এই অনুমান যদি সঙ্গতিসম্পন্ন নাও হয়, তথাপি পালদের সময় যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার বিস্তর অকাট্য প্রমাণ নানা প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে।

Indian Museumএর আর্কিওলজিকাল শাখার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কে এন দীক্ষিত মহাশয় তাঁহার অধুনাতন রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত অংশটি এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন বাকপতি মুঞ্জের নবগাঁয় তাম্রপত্র বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল, ইহা নবম-দশম শতাব্দীর

"এই তাম্রশাসনগুলির প্রধান গুরুত্ব এই যে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেই কালে ব্রাহ্মণগণ মালবে আসিয়া পরমার রাজকুমার হইতে ভূমি দান পাইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত ইহাতে পাওয়া যাইতেছে কতকগুলি স্থলে দেখা যায়, দূর বাঙ্গলা প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণ মালবে উপনিবিষ্ট হইয়া এইরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন এতদ্দ্বারা মনে হয়, এই যুগে বাঙ্গলা দেশ বেদ-বিদ্যার একটা কেন্দ্র ছিল দেখা যায়, দক্ষিণ-রাঢ়ানিবাসী বিশ্বরূপ নামক গ্রামবাসী সোমক নামক এক ব্রাহ্মণ ৭৮টি অংশের মধ্যে একাই ৫টি অংশ দান পাইয়াছিলেন। আর একজন ব্রাহ্মণ কোলঞ্চবাসী ছিলেন, এই কোলঞ্চ এবং কোলঞ্চ,—দান-প্রাপক কয়েক জন ব্রাহ্মণের আদি-ভূমি, ইহারা আসাম, উত্তর-বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। আমি অনুমান করি, কোলঞ্চ— উত্তর-বঙ্গের বগুড়া জেলার তরাসে অভিহিত গ্রাম। সাবর্ণিগোত্র নামে আর একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস,

এই সাবর্ণ অথবা সাবর্ণিকা কর্তৃক পরিচালিত বলিয়াই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রপাল নামক আসামের এক রাজার এক প্রশস্তিতে এই সাবর্ণ গোত্রের উল্লেখ আছে। এই স্থানটি আলমিরের অপভ্রংশ। ইন্দ্রপালের প্রশস্তিতে এই স্থানের নাম বাইদ্যগ্রামের উল্লেখ পাই হয়। একটি তাম্রশাসন সম্প্রতি বাইদ্যগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হওয়াতে এই স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধাই নাই, বগুড়া জেলার উত্তর পশ্চিমে বাইদ্যগ্রাম এখনও বর্ত্তমান। বগুড়ার দক্ষিণাংশের অনেকটা স্থান যে সাবর্ণ বা সাবর্ণিকা তক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তাম্রশাসনের সাবর্ণ্যরিকা এবং 'মিত্তাল পাড়ক' বর্ত্তমান 'মিত্রা' পরগণার নামের অন্তর্গত এবং 'মিত্তাল' বা 'মিত্তাল পাড়া' বলিয়া মনে হয়। উহা পাইলে বগুড়া জেলায়। মালদহ হইতে প্রাপ্ত তাম্রলিপি বাঙ্গলা ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই সামবেদী, ছান্দোগ্য শাখাভুক্ত বাঙ্গলা দেশেই সামবেদী সম্প্রদায় বেশী, সুতরাং উপরি উক্ত সম্প্রদায় সকলের বাসস্থানের ইঙ্গিত বিশেষ করিয়া পাওয়া যাইতেছে।*

এই পুস্তকখানি প্রথমে মাক্‌মিলান কোম্পানী প্রকাশ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল, বিলাত হইতে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে সে চুক্তি রদ হয়া গেল। বর্ত্তমান হাইস চান্সেলর ইযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমায় বাধিত করিয়াছেন। এই ব্যাপারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত

* 'The most important information to be derived from these plates is regarding the migration of Brahmins from various parts of the country to Malva where they were recipients of donations at the hands of Paramara princes. In several instances the donees seem to have migrated all the way from Bengal which appears as a country with Brahmins studying different Vedas even to-day. Thus we find a Brahmin named Dohaka having migrated from Vanga (Vangadesa forming within the Southern Radha country also) covered as many as five stages. Another person is said to have migrated from Kalamba which is the form of Kolumba or Kadamba occurs as the name of place of Brahmins who received grants in Assam North Bihar and Orissa. I propose to identify this with Kalamba in Bogra District of North Bengal. Another locality mentioned in these plates is Vatasaka which is surely a exact name or one corresponding to Bogra district in Bengal. An inscription of Indra Deva, a king of Assam refers to a Varattha Bhukti and speaks only the name as Bhavana and mentions the presence of a place called Vangarama-vasti. The identity of the latter can now be completely established by the find of a copper plate of the Gupta period at Vangarama which is in the North west corner of the Bogra District in which it is mentioned as Vangagrama. There can be no doubt that the Varatta or the Varattha here included the northern part of Bogra District. In the present case the two names in the tract are Dardurika and Mitrapattaka which it is proposed to identify with Dadi in Pandit in Thana of the Bogra District and Mitra or Mitrapura both of which are in the Bogra District. A large majority of the Brahmins mentioned in these places from Benga not referred to are stated to have belonged to the Chhandoga sakha of the Sama Veda which is significant in view of the preponderance of the adherents of this Veda among the Brahmins of Benga.'

যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও প্রেস কর্ম্মিগণের সকলে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপার বন্দোবস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে হইয়াছে কিন্তু ছবি সংগ্রহ এবং ব্লক প্রস্তুত করিবার বিপুল ব্যয়ের অধিকাংশ আমাকে বহন করিতে হইয়াছে পুস্তক সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আমি নিম্নলিখিত মহোদয়গণের সহায়তা পাইয়াছি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রকুমার মৈত্র, আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বরনারায়ণ রায়, মজঃফরপুর স্কুলের পূর্ব্বতন শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কালিদাস পক্ষধর, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস পালের কথা, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে প্রেসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দাস অনুগ্রহ করিয়া মুদ্রণকার্য্য পরিদর্শন করিয়া দিয়াছেন আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্ট আমাকে তাঁহাদের কতকগুলি ছবি ছাপাইবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। সেই সকল ছবি আমি পুনঃ চিত্রিত করিয়া লইয়াছি ইহাদের সম্বন্ধের মানিক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের আর্কিওলজিকাল শাখা অর্থাভাবে আমার বিস্তৃত চিত্রশালার শুধু লিপি প্রচুর পরিমাণে দিতে পারি নাই ব্লকগুলি সন্তোষজনক হইলেও বাঁধা হওয়ায় সেগুলি অনেক সময় মনের মত হয় নাই। ফরিদপুর হইতে ৬৫ শত বৎসরের প্রাচীন মাতৃমূর্ত্তিটি অতীব সুন্দর, কিন্তু ব্লকটি একেবারেই তেমন হয় নাই মেদিনীপুর হইতে ক্ষিতিনাথবাবু আমায় যে মাদুরখানি দিয়াছেন, তাহা বি. এন. আর পাঁশকুড়া ষ্টেশনের চার মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত রঘুনাথবাড়ীর অনেক কারিগর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দুঃখের বিষয়, এই মাদুরের কারিগুলি যেরূপ ভাবে সূক্ষ্ম কাশ সূত্রের মত তৈরী করিয়া নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে, তাহা ব্লকটিতে আদৌ উঠে নাই। আমার সংগৃহীত কাঁথাগুলির মধ্যে মাত্র ১৯খানির কিছু কিছু নমুনা দিয়াছি। যাঁহারা শিল্প সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কেদারনাথের স্বযোগ্য পুত্র পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও আমি মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছি, তথাপি কবি জসীমুদ্দিন কাঁথা-সংগ্রহে আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বরিশালী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর নিকট আমি নানা বিষয়ে ঋণী আমার শিল্প-সংগ্রহ শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ মাণিক বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে এই ভূমিকার প্রথমাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে এই বিস্তৃত ইতিহাস ও তৎসংক্রান্ত চিত্রাদি সম্বন্ধে আমি যাঁহাদের সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না তজ্জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ত্রিপুরা ষ্টেট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য কয়েকখানি ব্লক পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য উহাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি

অনুক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায় ১-৮৯ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—আনুগঙ্গপ্রদেশ ১-৫ পৃঃ।

গঙ্গার মহিমা ও তাহার কারণ—২ পৃঃ, আনুগঙ্গ প্রদেশে আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠা ৪ পৃঃ, দূরে অবস্থিত হিন্দুদিগকে ঘন ঘন গঙ্গাতীরে আহ্বান—৪ পৃঃ, অপরাপর নদ নদীর সঙ্গে গঙ্গার পার্থক্য—৪-৫ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ—৫-১১ পৃঃ।

প্রাচ্য ভারতে আর্য্য-নিবাস ৫ পৃঃ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিদ্বেষে পূর্ব্বভারত নিগৃহীত—৬ পৃঃ, প্রাচীন ইতিহাস বিলোপের কারণ ৭ পৃঃ, বুদ্ধমূর্ত্তিকে হিন্দু দেবতারূপে পূজা—৯ পৃঃ, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রতি অত্যাচার—৯ পৃঃ, সদ্ভাবের মিলন—১০-১১ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, - প্রাচ্যভারতের গৌরব ১১-২২ পৃঃ।

বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অনিশ্চয়তা—১২ পৃঃ, প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাদশ বঙ্গ—১২-১৫ পৃঃ, বৃহৎ বঙ্গের সীমা—১৫-১৬ পৃঃ, বাঙ্গলা ভাষার প্রসার—১৭-১৯ পৃঃ, শিক্ষা-দীক্ষার সীমা ১৯ পৃঃ, একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলের কতগুলি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—১৯ পৃঃ, জগতের ইতিহাসে বাঙ্গলার স্থান—২০-২২ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বাধ্যায় ২২-৩০ পৃঃ।

অঙ্গ গৌরব কর্ণ—২৩-২৪ পৃঃ, মগধ গৌরব জরাসন্ধ—২৪-২৫ পৃঃ, জরাসন্ধের পরাক্রম—২৫ ২৬ পৃঃ, অস্তি ও প্রাপ্তি—২৬ পৃঃ, বঙ্গগৌরব পৌণ্ড্র বাসুদেব—২৮ পৃঃ, কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ও মৃত্যু ২৯ পৃঃ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (আসামের) অধিপতি নরক—২৯ পৃঃ, বৃহৎ বঙ্গের অপরাপর রাজগণ—৩০ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা সম্বন্ধে এদেশের দাবী ৩১-৩৯ পৃঃ।

"নিতাইলেক্ পাক" ৩১ পৃঃ, প্রবালের মূল্য ৩২ পৃঃ, চেদি কোথায় ? —৩২-৩৪ পৃঃ, চাষা-নাগরী—৩৪ পৃঃ, ভীমের পূর্ব্বমুখী যাত্রা—৩৫ পৃঃ, গণ্ডক ও পুলিন্দ—৩৫ পৃঃ, নিরক্ষরে প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ রক্ষা—৩৫ পৃঃ, ত্রিপুর দেশে ক্ষত্র —৩৬-৩৭ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণ-বিদ্বেষ ৪০-৪৬ পৃঃ।

শৈব প্রভাব—৪০-৪১ পৃঃ, জয়াদেবের কাব্যোক্তি -৪১-৪২ পৃঃ, তাঁহার অপূর্ব্ব সংযম -৪২ পৃঃ, সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ ও তাহার উত্তর—৪৩ পৃঃ, ক্ষাত্র শক্তির বিলোপ—৪৩-৪৫ পৃঃ, বৈষ্ণব প্রভাব —৪৫-৪৬ পৃঃ উপরোক্তগুলি মিছক গল্প নহে -৪৬ পৃঃ, বারংবার ধর্ম্ম মতের পরিবর্ত্তন ৪৬ পৃঃ

সপ্তম পরিচ্ছেদ, নব ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম—৪৭-৫৪ পৃঃ

ব্রাহ্মণের শেষের মহাভারতের প্রমাণ ৪৭ পৃঃ, ব্রাহ্মণ 'অগ্রাদেব' ও 'একমাত্র উপাস্য' ৪৭ পৃঃ ব্রাহ্মণেরা কেবলমাত্র উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাকে দেবতা করিতে পারেন -৪৮ পৃঃ, আত্মাত্যাগের বিচার -৪৯ পৃঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে বুদ্ধ চক্ষে, স্পর্শ দেখা নিষিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধে অপবাদ ৪৯-৫২ পৃঃ, সর্ব্বপ্রধান বিদ্রোহী চৈতন্য—৫২ পৃঃ, তাঁহার প্রতি আক্রোশ ৫২-৫৩ পৃঃ

অষ্টম পরিচ্ছেদ, বিজয় কর্ত্তৃক লঙ্কা অধিকার ৫৪-৮৯ পৃঃ।

সিংহবাহুর রাজধানী সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান ৫৫-৫৮ পৃঃ, নগরবাসী ও মহিলাবৃন্দ ৫৯-৬১ পৃঃ নিম্নশ্রেণীর ভিক্ষোপজীবিনী ৬১ পৃঃ লঙ্কা সমৃদ্ধ ৬২-৬৪ পৃঃ, অশ্বপৃষ্ঠে সিংহল বিজয়ের চিত্রাবলী, ঘোড়া বাঙ্গাল ৬৪-৬৫ পৃঃ (মহাবংশের বঙ্গাধারে বিজয়ের সিংহলে আগমন ৬৫-৬৫ পৃঃ), রাজকুমারীর সিংহলদ্বারে সিংহের সহিত মিলন যাত্রা ও রাজধানী সহ সিংহবাহুর পলায়ন বঙ্গের উপকণ্ঠে সিংহবাহু কর্ত্তৃক সিংহবধ —বঙ্গ ছাড়িয়া রাঢ়ে রাজধানী স্থাপন সিংহল চরিত্র -লঙ্কায় আগমন ৬৫-৭৫ পৃঃ, (মহাবংশের সপ্তমাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহল সঙ্গম ৭৬-৮২ পৃঃ), বিজয়ের যক্ষ-রাক্ষ অধিকার যক্ষ শমাচ্ছন্নী যক্ষ বিজয় পুরুষ পুরুষ নাগদ্বীপ যক্ষীর মৃত্যু ও পুরুষদ্বার কথা ৭৬-৮৩ পৃঃ, (মহাবংশের অষ্টমাধ্যায়ে পাণ্ডুবাসুদেবের রাজ্যাভিষেক—৮২ পৃঃ), বিজয় কর্ত্তৃক পাণ্ডুরাজকন্যার আনয়ন—পাণ্ডুবাসুদেবের ৮২ পৃঃ, (সিংহল কথার উপসংহার ৮৩-৮৯ পৃঃ), সিংহল বিজয় বাঙ্গলার অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা—৮৩-৮৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৯০-১১৮ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, ঐতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব ৯০-১১৮ পৃঃ।

জাতকের গল্পকথা—তুলসীর মহৎ আত্মবিস্মৃতি "এই তিনটি মূলকল্প জাতের কি কোনও উপকার করিতে পারি না" -মহেন্দ্র সেন ও সঙ্ঘ শঙ্খ—পাণ-হত্যাকারী ও প্রাণ রক্ষা করণে দাবা খেলা—পুরুষদ্বার পুরী দর্শন দ্বিতীয়বার দর্শন—তৃতীয়বারে সাধু দর্শন -সাধু বিজয়—বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি সঙ্ঘ -সারিপুত্রের অভিমান--বুদ্ধের উপদেশ—সামঞ্জস্যবিধান ৯০-১০৫ পৃঃ—ভিক্ষাইনা কর্ম্মোদ্যোগে বুদ্ধের উদ্যম —১১৭ পৃঃ মার্কো পোলো (১১৭-১৮ পৃঃ)।

তৃতীয় অধ্যায় ১১৯-৩২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—আর্য্য ও অনার্য্য সংমিশ্রণ—১১৯-২৫ পৃঃ।

যবন, হেফ্ত, শক প্রভৃতি জাতির আর্য্য-সমাজে প্রবেশ—পণিজাতি—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও জন-বন্ধ—রক্তশুদ্ধি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, রামায়ণ, সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতিবাদ—১২৫-২৮ পৃঃ।

ভিক্ষুধর্ম্মের প্রতি পিতামাতার আতঙ্ক—ভিক্ষুধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদ গার্হস্থ্য আদর্শ—রামায়ণী নীতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, -জৈনধর্ম্ম ১২৮-৩৬ পৃঃ।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের পার্থক্য—২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ—১৩০-৩৪ পৃঃ, জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্য—১৩৫ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—ভারতেতিহাসের ধারাবাহিকত্ব—১৩৬-৪০ পৃঃ।

মহাভারতের সময় নির্ণয় এবং যবনের আধিপত্য—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অদ্ভুত অনুমান যন্ত্র—বংশলতা—মহাভারতের সময়—১৪০ পৃ,

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, —নন্দবংশ, আলেকজাণ্ডারের অভিযান -১৪১-৪৭ পৃঃ।

মহাপদ্ম নন্দ দ্বিতীয় ভার্গব—সর্ব্ব ক্ষত্রকুলের প্রতিহিংসা—চাণক্যের অপমান ও প্রতিহিংসা—বংশাবলী ও সময় নির্দ্দেশ -১৪১ পৃ,—চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবল—মেগাস্থিনিসের বিজ্ঞান-সঙ্গত গণনা—আলেকজাণ্ডার ও চন্দ্রগুপ্তের উপাখ্যান—১৪৭ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য—১৪৮-৫২ পৃঃ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র -১৪৮ পৃ, মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য ১৪৮-৪৯ পৃঃ, রাজসিংহাসনের সঙ্গে চাণক্যের সম্বন্ধ—১৫০ পৃ, চন্দ্রগুপ্তের অবসান (৩২২-২৯৮ খৃঃ পূ.)—১৫১ পৃঃ, প্রায়োপবেশনে মৃত্যু—১৫১ পৃঃ।

চতুর্থ অধ্যায় ১৫৩-৭৩ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, বিন্দুসার ও অশোক ১৫৩-৫৫ পৃঃ

বিন্দুসার (২৯৮-২৭৩ খৃঃ পূঃ) -অশোক (২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ) -১৫৩ পৃঃ, দিব্যাবদানের ও মহাবংশের বংশলতায় অনৈক্য -১৫৪ পৃ,, অনৈক্যের কারণ—১৫৫ পৃঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—অশোক সম্বন্ধে অপবাদ ১৫৫-৫৮ পৃঃ।

ভ্রাতৃহত্যা—১৫৫ পৃঃ, পাঁচশত অমাত্যের শিরশ্ছেদ—১৫৬ পৃঃ, পুরনারীদিগকে দাহ —১৫৬ পৃ,, নরক—চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোক—১৫৬ পৃঃ, উপগুপ্ত—১৫৭ পৃঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, অশোক নীতি—১৫৮-৬৪ পৃঃ।

মহাভারত-প্রসঙ্গ—১৫৮ পৃঃ, প্রামাণিকতা—১৫৮-৬০ পৃঃ, মহাভারতাদির নীতি এবং অশোক-নীতি—১৬০ পৃঃ, রাজনীতি ধর্মনীতি নহে—১৬১ পৃঃ, রামায়ণী নীতি ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—১৬১ পৃঃ, হিন্দু রাষ্ট্র নীতি—১৬২ পৃঃ, গ্রীক-নীতি—১৬২-৬৩ পৃঃ। হিন্দু রাষ্ট্র-নীতি উদার হইলেও দোষমুক্ত—১৬৩ পৃঃ, চাণক্য নীতি—বাণভট্টের নিন্দা—১৬৩-৬৪ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, অশোক অনুশাসন—১৬৫-৭৩ পৃঃ।

"সর্বত্র-ভজ্যতে-খণ্ডিত-পশু-ন্যায়ঃ"—১৬৫-৬৬ পৃঃ, পরধর্মনিন্দা নিষিদ্ধ—১৬৭ পৃঃ, মৃগয়ার পরিবর্তে লোকহিতার্থে অভিযান—১৬৮ পৃঃ, দণ্ডিতের প্রতি দয়া—১৬৯ পৃঃ, রাজ-গৃহ বিচারের জন্য সভা-সমিতি—১৬৯ পৃঃ, শিলালেখ ও স্তম্ভগুলির স্থান-নির্দেশ—১৭০-৭১ পৃঃ, মহেন্দ্র—১৭১ পৃঃ, অশোকের ধর্ম—১৭২ পৃঃ, বিখ্যাত ত্রয়োদশ অনুশাসনে অশোকের অনুতাপ—১৭৩ পৃঃ।

পঞ্চম অধ্যায় ১৭৪-৯২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—মৌর্য্য, সুঙ্গ ও কাণ্ব বংশ—১৭৪-৭৬ পৃঃ।

মগধের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী—মগধের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ—১৭৫-৭৬ পৃঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, - গ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব—১৭৬-৮৩ পৃঃ।

গ্রীক-প্রভাব—১৭৮ পৃঃ, অশোক ও চন্দ্রগুপ্ত হিন্দুরক্ষিতা—১৮০ পৃঃ, অশোকের বংশ-ধরগণ—১৮১ পৃঃ, মৌর্য্য রাজত্ব [৩১৫ ১৮৪ খৃঃ পূঃ, ১৮২-৮৩ পৃঃ]।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ—১৮৩-৮৫ পৃঃ।

ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের বিলোপ—পশুবধযুক্ত হোম নিষেধ, ব্যবহার ও মতের সাম্য—১৮৪ পৃঃ, অশোকের বংশধরগণের অক্ষমতা—১৮৫ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ক্ষাত্র-শক্তির পুনরভ্যুদয়—১৮৫-৮৭ পৃঃ।

ক্ষাত্র শক্তির বিলয়—১৮৬ পৃঃ, অগ্নিকুল—১৮৬-৮৭ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—সুঙ্গ বংশ—১৮৭-৯২ পৃঃ।

সুঙ্গবংশ [১৮৫-৭৩ খৃঃ পূঃ]—১৮৮ পৃঃ, পুষ্যমিত্রের বৌদ্ধদলন—১৮৮ পৃঃ, সুঙ্গ বংশীয় শেষ রাজার অপমৃত্যু—১৯০ পৃঃ, কাণ্ব ও অন্ধ্রবংশ—১৯০ পৃঃ, ইক্ষ্বাকুবংশ—১৯১ পৃঃ, শিশুনাগবংশ—১৯১ পৃঃ, মৌর্য্যবংশ—১৯১ পৃঃ, সুঙ্গবংশ—১৯১ পৃঃ, অন্ধ্রবংশ—১৯১ পৃঃ, রঘুবংশ—১৯১ পৃঃ, সৌরবংশ—১৯২ পৃঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯৩ ২০১ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, —শৈব ধর্ম্মের বিবর্ত্তন, শিব বনাম বুদ্ধ —১৯৩-৯৮ পৃঃ।

ধ্বংসের আনন্দ—১৯৩ পৃঃ, রুদ্র তাণ্ডব—১৯৩-৯৪ পৃঃ, ডাকার পাগল —১৯৪ পৃঃ, অনাসক্ত-স্রষ্টা—১৯৪ পৃঃ, শিব ও বুদ্ধ—১৯৫ পৃঃ, বুদ্ধ এখন শিবের ঘরই, অনেকাংশে কল্পনাজড়িত ১৯৫ ৯৬ পৃঃ, সাদৃশ্য—১৯৬ পৃঃ, বৌদ্ধ ও শিবের আদর্শ-সাম্য,—১৯৭-৯৮ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—শৈব ধর্ম্মের অভিনব দান—১৯৮-২০১ পৃঃ।

তিনটি গুণ—১৯৮ পৃঃ, অনন্দ—১৯৮ পৃঃ, শৈবধর্ম্ম বঙ্গের বৈষ্ণব যুগের অগ্রদূত—১৯৯-২০১ পৃঃ।

সপ্তম অধ্যায় ২০২ ২৬ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, অন্ধ্র ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্ম্ম-প্রতিযোগিতা ২০২-০৬ পৃঃ।

পূর্ব্ববর্ত্তী বংশের রাজগণ ২০২ ০৬ পৃঃ, অন্ধ্রপ্রাধান্য ৩৩ খৃঃ পূঃ ২২৫ খৃঃ ২০২ পৃঃ, শকগণের অভ্যুদয়—২০৩ পৃঃ, ক'পক, ভাবয় প্রভৃতি—২০৩ পৃঃ, ভারতায় ধর্ম্ম ও উপাধি-গ্রহণ—২০৪ পৃঃ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ২০৫ পৃঃ, ব্রাহ্মণ কে? তিন যুগে তিন রূপ ব্যাখ্যা —২০৫ পৃঃ, পূর্ব্ব ভারতে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য ২০৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—গুপ্তগণের অভ্যুদয়—২০৬ ১৭ পৃঃ।

চন্দ্র বর্ম্মা ৪র্থ শতাব্দী —২০৬ পৃঃ, লিচ্ছবি ও গুপ্তবংশ ২০৭ পৃঃ, শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত—২০৭ পৃঃ, 'মহারাজাধিরাজ' 'পরমভট্টারক' চন্দ্রগুপ্ত—২০৮ পৃঃ, তৎপুত্র রাজর্ষি বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ২০৮ পৃঃ, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কিনা?—২০৯ পৃঃ, বহুদিন সিংহাসনে ত্যাগ ও দানের মাহাত্ম্য—২০৯ পৃঃ, ব্রাহ্মণকে দানের পুণ্য—২১০ পৃঃ, বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রম—২১১ পৃঃ, এদেশে গুপ্তবংশের স্মৃতি বিলুপ্ত—২১১ পৃঃ, সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কথা—২১১ পৃঃ, রুদ্র —বর্ম্মা—পরাভূত—২১২ পৃঃ, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের আয়তন—২১৩ পৃঃ, বীণাবাদক সমুদ্রগুপ্ত—২১৪ পৃঃ, স্কন্দগুপ্তের বিপদ—২১৫ পৃঃ, হূনদিগের আক্রমণ—২১৬ পৃঃ, গুপ্তরাজবংশের তালিকা—২১৬-১৭ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পরবর্ত্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ ২১৭-২৩ পৃঃ।

লিচ্ছবিগণের উত্তরাধিকারী—২১৭ পৃঃ, 'আদিত্য' উপাধি—২১৮ পৃঃ, গুপ্তদিগের প্রাধান্য উপাধি—২১৮ পৃঃ, শশাঙ্কগুপ্ত—২১৯ পৃঃ, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা ২১৯ পৃঃ, শশাঙ্ককৃত বৌদ্ধদলন ও অনুতাপ—২২০ পৃঃ, ছোট ছোট গুপ্ত রাজা—২২১ পৃঃ, যশোবর্ম্মা—২২১ পৃঃ, আদিত্যসেন—২২১ পৃঃ, খড়্গবংশ—২২১ পৃঃ, খড়্গমুদ্রা—২২৩ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, রাজতরঙ্গিণী কথিত দুইটি আখ্যান ২২৩-২৬ পৃঃ।

জয়াপীড়ের সহিত ও গৌড় আ ক্র.. ২২৩ পৃ., জয়াপীড় ও কমলা—২২৪ পৃঃ, সিংহবর্ম—২২৪ পৃঃ মাণবকস্থ 'জয়ন্তী' নাম কো ২২৫ পৃঃ, কল্যাণীদেবীর সহিত বিবাহ ২২৫ পৃঃ, কাশ্মীরের লালিত দত্তা ও গোড়েশ্বর ২২৫ পৃ., দেবকল্পী কুল্য দলের অভিযান—২২৬ পৃঃ, পরিহাসকেশব'গ্রামে 'হয়গ্রীব'বিগ্রহের ধ্বংস ২২৬ পৃঃ

অষ্টম অধ্যায় ২২৭-৮৭ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, মৌর্য ও গুপ্ত-যুগে শিল্পসাহিত্য ২২৭-৪০ পৃঃ।

যুগে যুগে বৃহত্তর বাঙ্গলার গৌরব—২২৭ পৃ আদিম যুগের চিত্রালেখ্য ২২৮ পৃঃ, শিশুনেপুরের গুহা'চিত্র ২২৮-২৯ পৃ., শিশুনেপুর মহেঞ্জোদারো, বিক্রমখোলা ও মহাভারতাদির বর্ণিত চিত্র, মোর্য চিত্র ২২৯ পৃঃ আর্য সমাজে শিল্পের স্থান—২৩০ পৃঃ, আদিম শিল্পীরা কোথায় গেল ২৩০ পৃ., অশোক-রোলিংএর মূর্তি ২৩১ পৃঃ, গ্রীকশিল্পের প্রভাব ২৩২ পৃ., ভারতীয় বৃদ্ধমূর্তির বৈশিষ্ট্য ২৩২ পৃঃ, বাঙ্গলা দেশ মথুরের শিল্প-শালা ২৩৩ পৃ., বাঙ্গালার ও মহাভারতীয় প্রভাব—২৩৬ পৃঃ, গঠন প্রণালী সম্বন্ধে নিয়ম ২৩৫ পৃ., কুষাণ ২৩৬ পৃঃ, ভারতীয় শিল্পের স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্য—২৩৭ পৃঃ, মনুষ্য মূর্তি গড়িতে হইবে না, কোন মূর্তি গড়িতে হইবে ২৩৮ পৃঃ, বাঙ্গলার ঘর-কন্নার চিত্র ২৩৮ পৃঃ, মৌর্যযুগের পূর্ববর্তী শিল্প ২৪০ পৃঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, মহেঞ্জোদারো চীনপাল টকগণের মত—২৪০ ৪৩ পৃঃ।

৫০০০ খৃ পূ, ভারতীয় শিল্প ২৪০ পৃ., মাতৃদেবী ২৪২ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বাহিরের সঙ্গে আদান প্রদান, অজন্তা গুহা—২৪৩-৪৭ পৃঃ।

বিদেশের সহিত সম্বন্ধ—২৪৩ পৃ. গ্রীকদিগের নিকট ঋণ ২৪৪ পৃঃ, গ্রীকদিগের উপরে প্রভাব—২৪৪ পৃঃ, অজন্তার চিত্র-সম্পদ—২৪৫ পৃ।

নবম অধ্যায় ২৪৮-৭২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, পাল-সাম্রাজ্য, মৎস্য ন্যায় ২৪৮ ৪৯ পৃঃ।

লামা তারানাথের বর্ণনা—২৪৮ পৃঃ, রাজেন্দ্রচোল আক্রমণ ২৪৯ পৃঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, গোপাল ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ—২৪৯-৫২ পৃঃ।

নরপতিবিষ্ণু ২৪৯ পৃঃ, বপ্যট—২৪৯ পৃঃ, গোপাল (৭৪০-৭৪ খৃ., পালগণের জাতি সম্বন্ধে মতভেদ ২৫১ ৫০ পৃঃ, সমাজ সংস্কার—২৫০ পৃ. দেহরক্ষী ২৫১ পৃঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ধর্মপাল—২৫৩-৫৫ পৃঃ।

ধর্মপাল (৭৮৫-৮২০ খৃঃ, ভি স্মিথের মতে ৭৭০-৮১০ খৃঃ)—২৫৩ পৃঃ, ধর্মপালের

সামন্ত রাজগণ ২৫৩ পৃঃ, ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয় ২৫৩ পৃঃ, রাজপুরুষগণের উপাধি ২৫৪ পৃঃ, মালঞ্চলেখা—২৫৫ পৃঃ, রাজ্যের সীমা—২৫৫ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দেবপাল—২৫৮-৫৮ পৃঃ।

দেবপাল (৮২০-৫৮ খৃঃ, ভি স্মিথ ৮০০-৪৮ খৃঃ) ২৫৬ পৃঃ, বীর অথচ শান্তিপ্রিয়—২৫৬ পৃঃ, দর্ভপাণি ২৫৭ পৃঃ জাভার দূত ২৫৮ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ২৫৮-৬১ পৃঃ।

বিগ্রহপাল (৮৫৮-৯০ খৃঃ) ২৫৮ পৃঃ, নারায়ণপাল (৮৯০-৯১৫ খৃঃ) ২৫৯ পৃঃ, অধিকার-সংকোচ ২৫৯ পৃঃ, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯১৫-৭৮ খৃঃ)—২৫৯-৬১ পৃঃ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পরবর্ত্তী পালরাজগণ ২৬১-৭২ পৃঃ।

মহীপাল (৯৭৮-১০৩০ খৃঃ) ২৬১ পৃঃ, মহীপাল ও লীলা ২৬২ পৃঃ, নয়পাল (১০৩০-১০৪৫ খৃঃ) ২৬৩ পৃঃ কর্ণদেবের পরাজয় ২৬৩ পৃঃ, বৈদ্যজাতির উন্নতি—২৬৩ পৃঃ, বিগ্রহপাল (তৃতীয় (১০৪৫ খৃঃ) ২৬৪ পৃঃ, দ্বিতীয় মহীপাল ও সুরপাল—২৬৪ পৃঃ, কৈবর্ত্তপতি দিব্বোক—২৬৪ পৃঃ, রামপাল ২৬৪ পৃঃ, শিক্ষারত্নোদ্ধার ব্রত ২৬৫ পৃঃ, সান্ধ্যভাষা—২৬৬-৬৮ পৃঃ, রামপালের চরিত্র ২৬৮ পৃঃ তাঁহার গুণাবলী ২৬৮-৬৯ পৃঃ, রামপালের দিগ্বিজয় ২৬৯ পৃঃ, মদনপালের মৃদুদণ্ড ২৬৯-৭০ পৃঃ, ভয়োক্তি—২৭০ পৃঃ, পরবর্ত্তী পালরাজগণ—২৭০ পৃঃ, তাম্রশাসন কুমারপালের প্রশংসা ২৭০ পৃঃ, বৈদ্যদেবকৃত আসামজয়—২৭০ পৃঃ, মদনপাল—২৭১ পৃঃ, তৃতীয় গোপাল ও ইন্দ্রদ্যুম্নপাল ২৭১ পৃঃ, তারানাথের তালিকা—২৭১ পৃঃ।

দশম অধ্যায় ২৭৩-৩০৪ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—পাল রাজত্বের নানা কথা, অপরাপর রাজবংশ ২৭৩-৮৭ পৃঃ।

বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ—২৭৩ পৃঃ, গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস ২৭৪ পৃঃ, রাজেন্দ্র চোল (১০২৫ খৃঃ)—২৭৫ পৃঃ, ত্রিপুরা নাথ-যোগীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র—২৭৬ পৃঃ, চন্দ্ররাজগণ—২৭৭ পৃঃ, মহেন্দ্রের শিলালেখ ২৭৭-৮৪ পৃঃ জয়সেন বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জিকা, শ্যামবংশ ২৮৫ পৃঃ, বর্ম্মবংশ ২৮৫ পৃঃ মিত্রবংশ ২৮৬ পৃঃ, সাউসেন ২৮৬ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—এদেশে ইতিহাসের উপকরণ—২৮৭-৯১ পৃঃ

ইতিহাস কেন লুপ্ত হইল? ২৮৮ পৃঃ ক্ষেমেন্দ্র, ইন্দ্রব্রহ্ম, ভট্টগটী, রাজমালা—২৮৮-৮৯ পৃঃ, জয়নাথ মুন্সী ২৮৯ পৃঃ, পল্লীগাথা প্রভৃতি—২৮৯-৯১ পৃঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—বিদ্যা ও বিদ্বানের গৌরব—২৯১-৩০০ পৃঃ।

কৌটিল্য, দণ্ডপাণি ও ঠক্কুর মিশ্রের প্রশস্তি—২৯২-৯৩ পৃঃ ব্রাহ্মণদের প্রভাব—২৯২ পৃঃ, বিদ্যা-যুগ—২৯২ পৃঃ, গোড়ীয় রীতি—২৯৪ পৃঃ, বৈদ্যদেবের প্রশস্তিক উপমা—২৯৫ পৃঃ, অমরদেব—২৯৯ পৃঃ, পণ্ডিতী বাঙ্গলা—২৯৭ পৃঃ গুপ্তযুগের সামাজিক পরিবর্তন—২৯৮ পৃঃ, বৌদ্ধ কুল প্রদীপ—২৯৯ পৃঃ, ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ—২৯৯-৩০০ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বৌদ্ধ-বিদ্যার—৩০০-৩০৪ পৃঃ।

নালন্দা—১০ কোটী স্বর্ণ-মুদ্রার ব্যয়ে নির্ম্মিত—৩০০ পৃঃ, ক্রমিক ইতিহাস—৩০১ পৃঃ, শ্রীবিষ্ণু-কৃত ১০৮টী মন্দির—৩০১ পৃঃ, ভিক্ষুসঙ্ঘের সময়কার নালন্দার অধ্যাপকগণ—৩০২ পৃঃ, ইৎসিং—৩০২ পৃঃ, স্থাপত্য ও চারুশিল্প—৩০২ পৃঃ, ধর্ম্মগঞ্জ—৩০৩ পৃঃ, বিক্রমশিলা—৩০৪ পৃঃ, 'বাজ্রাসন' বিশ্ববিদ্যালয়, দীপঙ্করের সময়ে আচার্য্যগণ—৩০৪ পৃঃ।

একাদশ অধ্যায় ৩০৫-৩৩৯ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার প্রভাব—৩০৫ পৃঃ।

দীপঙ্কর—৩০৫ পৃঃ, বিদেশ ভ্রমণ—৩০৬ পৃঃ তিব্বতরাজ লাঃ লামা ইয়েসি—৩০৭ পৃঃ, "আমি স্বর্ণ বা প্রস্তরের কাঙ্গাল নই" ৩০৭ পৃঃ, লাঃ লামা ইয়েসি ও গারোগাসের প্রজ্ঞা—৩০৮ পৃঃ, তিব্বতরাজার মৃত্যু—৩০৯ পৃঃ, চাংচুবের প্রচেষ্টা—৩০৯ পৃঃ, গায়ৎসনর পরামর্শ—৩১০ পৃঃ, দীপঙ্করের মৃত্যু—৩১০-১১ পৃঃ, তিব্বত যাত্রায় সম্মতি—৩১১ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তিব্বত-যাত্রা ও তথায় মহৎ কর্ম্মপদ্ধতি—৩১১-১৭ পৃঃ।

আচার্য্য রত্নাকরের অনুমতি—৩১২-১৩ পৃঃ, দীপঙ্করের অভাবে ভারতবর্ষ—৩১৩ পৃঃ, নেপালরাজ কৃত সম্বর্দ্ধনা—৩১৩ পৃঃ, নেপালে পদ্মপ্রভ—৩১৩ পৃঃ, দীপঙ্করের অভিনন্দন—৩১৪ পৃঃ, 'ভারতবর্ষ দেবস্থান' ৩১৪ পৃঃ, 'একেশ্বর নীলকান্তমণির খনি'—৩১৪ পৃঃ, ১০৪০ খৃষ্টাব্দে—৩১৫ পৃঃ, সংবর্দ্ধনার জন্য নির্ম্মিত নূতন বাদ্য-যন্ত্র—৩১৫ পৃঃ, শেষ—৩১৬-১৭ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সুদূর উত্তর-পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রচার—৩১৭-১৯ পৃঃ।

মঙ্গ—৩১৭ পৃঃ, শাম্বরক্ষিত—৩১৭ পৃঃ, পদ্মনাভ—৩১৮ পৃঃ, কমলশীল—৩১৮ পৃঃ, তিব্বতে বাঙ্গালী প্রচারক—৩১৮-১৯ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ—৩১৯-৩২৯ পৃঃ।

সঙ্ঘে স্থালোকদের প্রবেশাধিকার—৩১৯-২১ পৃঃ, প্রকাশিনায়ী—৩২১ পৃঃ, বাঙ্গলার সহজপন্থী—৩২২ পৃঃ, তান্ত্রিক বৌদ্ধচক্র—৩২২ পৃঃ, বোধিধর্ম্ম—৩২২ পৃঃ, বোধিধর্ম্ম ও লোহুর মঠ—৩২২ পৃঃ, মেরুনেচী—৩২৪ পৃঃ, বিবাহ প্রথা-প্রবর্ত্তন—৩২৫ পৃঃ,

নেড়ানেড়ীর কলহ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নহে ৩২৫ পৃঃ, বাউল ও সহজিয়া মতে স্পষ্ট বোধধর্ম্মের প্রভাব ৩২৬ পৃ., চৈতন্য 'পূর্ণ মূর্ত্তি' ৩২৭ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ব্রাহ্মণের টোল ৩২৯-৩৪ পৃঃ।

ঘারপণ্ডিত—৩৩০ পৃঃ, বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির পরিণতি—৩৩১-৩৪ পৃঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ৩৩৫-৪০৭ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, পালরাজত্বে ধর্ম্মশাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য—৩৩৫-৪০ পৃঃ।

নাগার্জ্জুন ও ঘিনাভার ৩৩৬-৩৭ পৃঃ, চন্দ্রগোমিন, শান্তরক্ষিত (৭০৫ ৭৬৫ খৃঃ)—৩৩৮ পৃঃ, জ্ঞানশ্রী ৩৩৯ পৃঃ, রত্নাকর শান্তি—৩৩৯ পৃঃ, ইতিহাস উদ্ধারে উদাসীনতা—৩৩৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানের গৌরব—৩৪০-৪৪ পৃঃ।

বিদ্বানদিগকে দান ও উৎসাহ ৩৪২-৪৩ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, নবদ্বীপের টোল—৩৪৪-৫৩ পৃঃ।

নবদ্বীপে টোলের উৎপত্তি ও বিকাশ—৩৪৬ পৃঃ, টোলের শিক্ষাপদ্ধতি—৩৪৬ পৃঃ, বাহু হস্তের দানের মর্য্যাদা—৩৫১ পৃঃ, নবদ্বীপে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানের ছাত্রসমাগম ৩৫৭ পৃঃ, জীবন যাত্রার সাদাসিধা ৩৫৮ পৃঃ নবদ্বীপ-টোলের গ্রন্থকারগণ—৩৫৯ পৃঃ, অধ্যাপকগণ—৩৫০ পৃঃ, জাগদীশ ৩৫০ পৃঃ, ভূবোপের ভাবশাস্ত্র, বৌদ্ধন্যায় ও নব্যন্যায়—৩৫১-৫৩ পৃঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য—৩৫৩-৭৬ পৃঃ

নব্যন্যায়—পূর্ব্ববর্ত্তিগণ—৩৫৩ পৃঃ, নব্যন্যায়ের উদ্দেশ্য—৩৫৪ পৃঃ, দৃষ্টান্ত ৩৫৫ পৃঃ, নব্যন্যায় পড়িবার যোগ্যতা—৩৫৬ পৃঃ 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' ৩৫৭ পৃঃ, গঙ্গেশ শিরোমণি—৩৫৯ পৃঃ, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি সর্ব্বসম্মত কথা ৩৫৯ পৃঃ, প্রবাদ—৩৫৯ পৃঃ, রঘুনাথ শিরোমণি—৩৬০ পৃঃ, গুরু বাসুদেব কে?—৩৬০ পৃঃ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম চৈতন্যের শিক্ষক নহেন—৩৬১ পৃঃ, রঘুনাথের বাল্যজীবন, 'খ' আগে না হইয়া 'ক' আগে হইল কেন? ৩৬১ পৃঃ, চৈতন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের গল্প—৩৬২ পৃঃ, কাণা শিরোমণি—৩৬৩ পৃঃ, পূর্ব্বপক্ষ ও রঘুনাথের জবাব ৩৬৪ পৃঃ, "হ'রের গোয়াল"—৩৬৪ পৃঃ, শবণের দুর্ঘটবৃত্তি—৩৬৭ পৃঃ স্মৃতিশাস্ত্র ৩৬৭ পৃঃ, স্বষ্টিধর ৩৬৮ পৃঃ স্মৃতির নকী ৩৬৯ পৃঃ, আর্য্যাসপ্তশতী—৩৬৯ পৃঃ, হরিভক্তিবিলাস ৩৭১ পৃঃ, কুল্লুক ভট্ট ৩৭১ পৃঃ জ্যোতিষ—৩৭১ পৃঃ, চিকিৎসা শাস্ত্র, মাধবকর ও চক্রপাণি দত্ত—৩৭২ পৃঃ জ্যামশাস্ত্র—৩৭২ পৃঃ, অভিধান—৩৭২ পৃঃ, ভাস্করাচার্য্যের কবিত্ব—৩৭৩ পৃঃ, বিদ্যাপতি—৩৭৩ পৃঃ, রূপনারায়ণ—৩৭৩ পৃঃ, আচোর্য্য ও সরস্বতী উপাধি-লাভ—৩৭৪ পৃঃ, জীবগোস্বামীর নিকট পরাজয়—৩৭৫ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ্য তেজস্বিতা ও চরিতবল—৩৭৬-৮১ পৃঃ।

কুমার ভট্ট ও মাধবা—৩৭৬ পৃঃ গোবিন্দমাণিক্য ৩৭৮-৭৯ পৃঃ কবি কৃত্তিবাস—৩৭৯ পৃঃ, গর্গ ৩৮০ পৃঃ, বুদ্ধা রামাই ৩৮০-৮১ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, গুপ্ত-পাল যুগের জের—কথা-সাহিত্য—৩৮১-৪০৬ পৃঃ।

নব রাহ্মণ ৩৮১ পৃঃ, সেনরাজগণ নব ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক ৩৮২ পৃঃ, পূর্ব্ব যমুনা সিংহ সেনরাজগণের অধিকার বহির্ভূত—৩৮২ পৃঃ, সুসংগোপুর ৩৮৩ পৃঃ, দশকোশিয়া—৩৮৩ পৃঃ, মঙ্গলবাড়ী ৩৮৪ পৃঃ, কন্দর্পেশ্বরের যুগ ৩৮৪ পৃঃ, গল্পগুলির উদ্ভাবের শিক্ষা—৩৮৪ পৃঃ, রাজসাহী গল্প সাহিত্যের প্রতিবাদ—৩৮৫ পৃঃ কাহারা কি নিষেধ করিলেন ও কি দিলেন ? ৩৮৬ পৃঃ আলালপন্থী ৩৮৬ পৃঃ, হরেকৃষ্ণ রায় ৩৮৭ পৃঃ, গীতিকথা, মালকমালা ৩৮৭ পৃঃ ভাঁড়ুকথা—৩৮৮ পৃঃ, ভগদিদ্ধি ৩৮৮ পৃঃ, বিপক্ষে কথোপকথন ৩৮৯ পৃঃ সমস্যা প্রেম ৩৮৯ পৃঃ, ভাবের কাঙ্গাল, ঈশ্বরের কঙ্কাল নহে ৩৯০ পৃঃ, 'পাটরাণী' ও 'ঠাকুরঝি'—৩৯১ পৃঃ, গল্পের বাঁধুনি ৩৯১ পৃঃ গল্পে লোকযুগের প্রমাণ—৩৯২ পৃঃ, কাকমেলা ৩৯২ পৃঃ অপূর্ব্ব ভাগ ৩৯৪ পৃঃ, পল্লী-গীতিকায় শৈবযুগের প্রভাব ৩৯৫ পৃঃ, এই নায়িকারা কালিদাসোক্ত কবি বর্ণিত নায়িকাদের পর্য্যায়ে ৩৯৬ পৃঃ, মহুয়া—৩৯৯ পৃঃ, চন্দ্রাবতী—৩৯৯ পৃঃ, পুরুষরূপ ৩৯৭ পৃঃ হিন্দুরা এসকল গান গায় না ৩৯৭ পৃঃ, বাঙ্গালার কবি এক ধাপ উপরে—৩৯৭ পৃঃ 'সতীত্ব' ধর্ম্ম উপেক্ষিত ৩৯৮ পৃঃ, মহুয়া ৩৯৯ পৃঃ বিদেশী সমালোচকদের মত ৪০০ পৃঃ, গীতিকথা ও পল্লী গীতিকা—৪০২ পৃঃ, ভাসার কথা ৪০৩ পৃঃ, গীতি কথা, পল্লী গীতিকা ও রূপকথা ৪০৪ পৃঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ, গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের—৪০৬-৫২ পৃঃ।

কাঙ্গা ঘাটের শিল্পের উপর বাঙ্গলার শিল্প প্রভাব, মৃত্তিকার শিল্প বাঙ্গলার গাথা—৪০৬-০৯ পৃঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাঙ্গালীর উপনিবেশ—৪১০ পৃঃ, বঙ্গের পল্লী ও সহর সিঙ্গাপুর—৪১১ পৃঃ মহেন্দ্রোদরো—৪১২-১৩ পৃঃ অজন্তা—বাঙ্গালার পটুয়া—৪১৬ পৃঃ, স্ত্রীলোকদের শিল্প সাধনা—৪২১ পৃঃ, কড়পুটে কলস, বাঙ্গলাদেশে তৎপ্রভাব—৪২১ পৃঃ, কালীঘাটের পটুয়া—৪২২ পৃঃ, কাজলরেখার 'চক্ষু পটুয়া' ৪২৫ পৃঃ, মেঠাই—৪২৬ পৃঃ, বিবাহ বাসর—৪২৬ পৃঃ, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা ও নৃত্যে পটুত্ব—৪২৭ পৃঃ পুরুষ ও স্ত্রী সংসার রথের দুইখানি চাকা—৪২৮ পৃঃ, চট্টগ্রামের মুসলমানগণ—৪২৯ পৃঃ, বাঙ্গালী মেয়েদের হাতের কাথা—৪৩০ পৃঃ, আলপনা ৪৩২ পৃঃ, ৭০০ বৎসরের প্রাচীন মন্দিরের কয়েকখানি ইট—৪৩৩ পৃঃ, শিকারের ছবি—৪৩৩ পৃঃ, অপরূপ ছবি—৪৩৪ পৃঃ, শিল্পের সাধনা—৪৩৫ পৃঃ, একটি উমামহেশ্বরের মূর্ত্তি—৪৩৫ পৃঃ প্রশান্ত বুদ্ধ—৪৩৬ পৃঃ, প্রসন্ন শিব—৪৩৬ পৃঃ, এদেশের শিল্প অনার্য্য-সম্ভব—৪৩৭ পৃঃ, ভরতদেশের প্রভাব—৪৩৭ পৃঃ, বুদ্ধ, শিব ও বাসুদেব মূর্ত্তি—৪৩৮ পৃঃ, পটদার শ্রেণী—৪৩৮-৪০ পৃঃ, খেজুরাহ ও রাজগড়

-৪৪১ পৃঃ, মন্বন্তরের কাব্যপটভূমি—৪৪১ পৃঃ, গোপীসজ্ঞা, বহুমন্থন যান—৪৪২ পৃঃ, প্রাচীন অলঙ্কারের নমুনা—৪৪১ পৃঃ, চিত্রশিল্প—৪৪৪ ৪৫ পৃঃ, চৈতন্য সঙ্কীর্তনের ছবি—৪৪৬ পৃঃ, কাশীঘাটের ছবি -৪৪৭ পৃঃ, মেয়েদের বিচিত্র ভঙ্গী—৪৪৯ পৃঃ, অর্ণাবর্তের চিত্রকরদের কৃতিত্ব—৪৫২ পৃঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ,—বাঙ্গলার নৃত্যকলা—৪৫২-৫৭ পৃঃ।

রায়বেঁশে—৪৫২-৫৭ পৃঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ৯০৮—১৩৩৩পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—সেন রাজত্ব—৪৫৮ ৭২ পৃঃ।

দুর্গাচরণ সান্যালের সামাজিক ইতিহাস—৪৬০ পৃঃ, আদিশূর -৪৬২ পৃঃ, কোন জাতির স্বীয় দাবী সর্ব্বদা বিশ্বাসযোগ্য নহে -৪৬৩ পৃঃ, নিম্নশ্রেণীতে বিবাহ—৪৬৫ পৃঃ, সামন্ত সেন—৪৬৫ ৬৬ পৃঃ, হেমন্ত সেন—৪৬৬-৬৭ পৃঃ, পঞ্চগৌড়েশ্বর ও নবলক্ষ সৈন্য—৪৬৭ পৃঃ, মনসামঙ্গল—৪৬৭ পৃঃ, বাঙ্গলার রাগ ও তালিকাল স্বর—৪৬৮ পৃঃ, গোপীচাঁদের গান—৪৬৮ পৃঃ, বহু বাঙ্গলা কুল হইয়া গেল—৪৬৯ পৃঃ, সমুদ্রযাত্রা—৪৭০ পৃঃ, সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ-বিধির কারণ—৪৭১-৭২ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—গৌরীদান ও বালাবিবাহ—৪৭২-৭৬ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের সময়নিরূপণ—৪৭৬-৭৮ পৃঃ।

মুসলমান ইতিহাসের প্রবাদ—৪৭৬ পৃঃ, রাখালবাবুর মত—৪৭৭ পৃঃ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া বঙ্গে আর কোন জাতি নাই—৪৭৮ পৃঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, —কৌলীন্য -৪৭৯-৫০৪ পৃঃ।

তাম্রশাসনে কৌলীন্যের উল্লেখ নাই কেন?—৪৭৯ পৃঃ, আচার—৪৮১ পৃঃ, বৈশ্য-শক্তির বিলোপ—৪৮৩ পৃঃ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া বঙ্গে আর জাতি নাই—৪৮৪ পৃঃ, বল্লাল সেনের সঙ্গে সুবর্ণবণিক্‌দের বিরোধ—৪৮৫ পৃঃ, শিঙ্গিশিও-রক্ত ও তাহার উপসংহার—৪৮৫ পৃঃ, কুলদন আচার্য্য ও মণিদত্ত —৪৮৭ পৃঃ, সুবর্ণবণিক্‌দের দণ্ড—৪৮৭-৮৮ পৃঃ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির প্রতি অনুগ্রহ—৪৮৮ পৃঃ, বল্লাল চরিত্র—৪৮৯ পৃঃ, ধোয়ী কবি -৪৯১ পৃঃ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য—৪৯১ পৃঃ, শরণ—৪৯১ পৃঃ, জয়দেব ও পদ্মাবতী কর্ত্তৃক বুড়ন মিশ্রের পরাজয় —৪৯৪ পৃঃ, উপাদানগুলির সারাংশ -৪৯৫ পৃঃ, জয়দেবের পদে সংস্কৃত প্রাকৃতের অনুযায়ী—৪৯৬ পৃঃ, রুচির কথা—৪৯৮ পৃঃ ভক্তি ও ভোগ -৪৯৯ পৃঃ, গীতগোবিন্দের টীকা -৫০০ ০১ পৃঃ, 'দেহি পদপল্লবমুদারং'—৫০২ পৃঃ, গীতগোবিন্দের অনুবাদ—৫০৩ পৃঃ, লক্ষ্মণ সেনের সভার পণ্ডিতগণ—৫০৩ পৃঃ, হলায়ুধ, পুরুষোত্তম প্রভৃতি ৫০৪ পৃঃ, বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলা—৫০৪ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া নৈতিক অধঃপতন ৫০৪-১২ পৃঃ।

বীভৎস ছবি—৫০৫ পৃঃ, মহী পাদলাবিক—৫০৫ পৃঃ, মাধবীর কাহিনী—৫০৬ পৃঃ, গোবর্দ্ধন আচার্য্যের ভেরুণ্ডিতা—৫০৭-০৮ পৃঃ, ব্রাহ্মী বাহুড়ার নীচতা—৫০৯-১২ পৃঃ।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ, সাহ জালালুদ্দিন তব্রেজ ও সেক শুভোদয়া— ৫১৩-২৩ পৃঃ।

শুভোদয়া—৫১৩-২০ পৃঃ, লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে দেখা—৫১৩ পৃঃ, বিষ-ভক্ষণ—৫১৪ পৃঃ, নানারূপ কেরামৎ—৫১৪ পৃঃ প্রতিমা-সৃষ্টির বাড়াবাড়ি—৫১৯ পৃঃ, পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ হয় নাই—৫১৯ পৃঃ, সোমনাথের মন্দির—৫২০ পৃঃ, জাতি-ভেদের অবিচার—৫২২ পৃঃ, বঙ্গদেশের বিলাস-কলা—৫২৩ পৃঃ বাঙ্গালীর শিল্পকলার বিনাশ—৫২৩ পৃঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ,—মুসলমান-বিজয় ৫২৪-৫৩ পৃঃ।

অনঙ্গপালের পরাজয়—৫২৫ পৃঃ, ইখ্‌তিয়ার খিলজি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়—৫২৬ পৃঃ, বিহারের "দুর্গ"বিজয়—৫২৭ পৃঃ, বাঙ্গালী যুদ্ধে যোগ দেয় নাই কেন?—৫২৮ পৃঃ, জন-সাধারণের সঙ্গে সেন রাজাদের বিচ্ছেদ—৫৩০ পৃঃ, পল্লী-কবিরা নীরব—৫৩০-৩১ পৃঃ, বাঙ্গালী কুলে দেশময় অশান্তি—৫৩২ পৃঃ, ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের কঠোরতা—৫৩২ পৃঃ, বাঙ্গালের শেষ জীবন ৫৩৩ পৃঃ লক্ষ্মণ সেন তুর্কিদের আগমনের আভাস পাইয়া কি করিলেন?—৫৩৪ পৃঃ, কুলীনদিগকে নিজের দলে টানিয়া আনা—৫৩৬ পৃঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—৫৩৬ পৃঃ, কুল-শাস্ত্রের প্রামাণিকতা, স্বীয় সিংহাসন সুদৃঢ় করা—৫৩৮ পৃঃ, আমির যামুদের সুরাপান—৫৩৮-৩৯ পৃঃ, 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'—৫৪০ পৃঃ, প্রধান নাগরিকগণ ও ধন-সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা—৫৪০ পৃঃ, ম: ইঃ বক্তিয়ার লক্ষ্মণাবতী ছাড়িয়া নবদ্বীপ আক্রমণ করিলেন কেন?—৫৪১ পৃঃ, বুদ্ধিবার ভুল ৫৪১ পৃঃ, অশ্বিযান ব্যর্থ ৫৪২ পৃঃ, লক্ষ্মণ সেন গেলেন কোথায়?—৫৪৩ পৃঃ, সম্ভবতঃ বঙ্গেরে—৫৪৩ পৃঃ, এ সম্বন্ধে প্রমাণ—৫৪৩ পৃঃ, খেয়াভোগ, পিঠেভোগ, দেবভোগ, মৌভোগ প্রভৃতি নাম—৫৪৪ পৃঃ, জয়সেন বিদ্যাসকৃত কুলজি—৫৪৭-৪৮ পৃঃ, বৈদ্য বল্লালের সৃষ্টি—৫৫১ পৃঃ, দুই বল্লাল কখনই নহে—৫৫১ পৃঃ, গ্রন্থোক্ত বিবরণ বিশ্বাস-যোগ্য কিনা? প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু লেখকের উক্তিই এক বল্লাল—৫৫৩ পৃঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ৫৫৪-৬০৯ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—হিন্দু রাজত্বের নানা কথা—৫৫৪-৫৬ পৃঃ।

শিরাদি অত্যাচারে ধ্বংস-প্রাপ্ত—৫৫৪ পৃঃ, হিন্দুর কঠোর পরীক্ষা—৫৫৬ পৃঃ, হিন্দু বাহু সম্পদের প্রত্যাশী নহে—৫৫৬ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, -পরবর্ত্তী শিল্প ও স্থাপত্য -৫৫৭-৬৮ পৃঃ।

মাতৃমূর্ত্তি ৫৫৭ পৃঃ, বাঙ্গলা সহর ৫৫৮ পৃঃ, খড়ের ঘর—৫৫৮ পৃঃ, বাঙ্গলাঘর, ছয়ওয়ার জানে মিঞার ঘর—৫৫৯-৬৪ পৃঃ, ঘরের দেওয়ালে চিত্র—৫৬৪ পৃঃ, টিকিবাড়ী—জগটুঙ্গী—৫৬৫ পৃঃ, সাঁতেরের কাঁতল পাটী- ৫৬৫ পৃঃ, অন্যান্য শিল্প দ্রব্য—৫৬৭ পৃঃ, আমিষ ও নিরামিষ রান্না—৫৬৭ পৃঃ, ভাস্কর্য্য—৫৬৭ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, —বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা—৫৬৮-৭৬ পৃঃ।

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ভাবের মধ্যবর্ত্তী শৈব ভাব ৫৬৯ পৃঃ গুপ্তচরগণ—৫৭০ পৃঃ, চাষার হাতে শিব ঠাকুর ৫৭২ পৃঃ, কৃষকবেশ শিব ৫৭৩ পৃঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—সৌর ধর্ম্ম —বাঙ্গলার ধর্ম্মের উপর তামিল প্রভাব ৫৭৬-৭৯ পৃঃ।

শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের উপর তামিল প্রভাব -৫৭৮ পৃঃ, অম্বর স্বামী ও মানিক ভাসহরা—৫৭৮ পৃঃ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—বাঙ্গলার তন্ত্রশাস্ত্র—৫৭৯-৮৯ পৃঃ।

তান্ত্রিক সিদ্ধি সম্বন্ধে উপসংহার—৫৮০ পৃঃ, বৈষ্ণব ও শাক্ত তন্ত্র ৫৮২ পৃঃ, কুলার্ণবতন্ত্র—৫৮২ পৃঃ, গোরক্ষ-বিজয়- ৫৮৪ পৃঃ, আচার—৫৮৬ পৃঃ বৈদিক ও বীরাচার ৫৮৬ পৃঃ, অলৌকিক ক্ষমতা—৫৮৬ পৃঃ শৈবশক্তি ও অভ্রশক্তি ৫৮৭ পৃঃ, সুরাপান ৫৮৭ পৃঃ, দিব্যাচারী ৫৮৮ পৃঃ, বীরাচারী—৫৮৮ পৃঃ, অধোগতি—৫৮৮ পৃঃ, ষট্চক্র-ভেদ—৫৮৮ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, —আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতত্ত্ব—৫৮৯-৬০৯ পৃঃ।

পৈতা—৫৮৯ পৃঃ, বর-মনোনয়ন—৫৯০ পৃঃ, কুকুর—৫৯০ পৃঃ, কাপড়পরার রীতি ও পাগড়ী—৫৯০ পৃঃ, খোঁপা বাঁধা—৫৯২ পৃঃ, বৈদ্যশাস্ত্র ও বৈদ্যগণ—৫৯২ পৃঃ, 'বোমথা'—৫৯২ পৃঃ, বাঙ্গলার কৌলীন্য ও বিদেশীয়দের মতামত—৫৯৬ পৃঃ, কোলাঞ্জের উজ্জ্বল দিক্—৫৯৭ পৃঃ, বহু-বিবাহ—৫৯৯ পৃঃ, সার হর্ব্ব বাইউডের মত—৫৯৯ পৃঃ, বার্ণাড শ-র মত—৬০০ পৃঃ, সোপেন হেয়ারের মত—৬০১ পৃঃ, প্রকৃত শুণীরাই কুলীন হইয়াছিলেন—৬০৩ পৃঃ, এ দেশের প্রকৃতি ভ্রূণাস্ত ও স্বাধীন—৬০৪ পৃঃ, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী-বিভাগ ও উদারতা—৬০৫ পৃঃ, শূর, সেন ও চন্দ্রবংশের সম্বন্ধ বিচার—৬০৯ পৃঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ৬১০ ৭৮২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, —পাঠান রাজত্ব ৬১০-৬১৭ পৃঃ।

মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিজির শেষ জীবন—৬১০-১১ পৃঃ, মহম্মদ শিরান (১২০৫-১২০৮ খৃঃ)—৬১১ পৃঃ, আলিমর্দ্দন, সুলতান আলাউদ্দিন (১২০৮-১২১১ খৃঃ)—৬১২ পৃঃ,

গিয়াসউদ্দিন ইউজ্বক (১২১১-১২২৬ খৃঃ)—৬১২ পৃঃ, নসিরুদ্দিন মহমুদ (১২২৬-২৮ খৃঃ) —৬১৩ পৃঃ, হাসামুদ্দিন, ইখতিয়ারুদ্দিন, আলাউদ্দিন আলি, সৈফউদ্দিন (১২২৮-৩৩ খৃঃ) —৬১৩ পৃঃ, তোগান খাঁ (১২৩৩-৪৪ খৃঃ)—৬১৩ পৃঃ, তোগান খাঁ ও তমুর খাঁ (১২৪৪-৪৬ খৃঃ)—৬১৪ পৃঃ, মুলুক মুজবেক (১২৪৬-৪৮ খৃঃ)—৬১৪ পৃঃ, জালালুদ্দিন (১২৪৮—একবৎসর), আর্সলন খাঁ (১২৪৮, ১২৬০ ৬১ খৃঃ), ৬১৫ পৃঃ, তাতার খাঁ (১২৬১ ৬৬ খৃঃ) —৬১৫ পৃঃ, তোগ্রেল খাঁ (১২৭৮-৮২ খৃঃ)—৬১৬ পৃঃ, নসিরুদ্দিন বগড়া খাঁ (১২৮২-৯১ খৃঃ)—৬১৬ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, নসিরুদ্দিন ও পরবর্ত্তী পাঠান রাজগণ -৬১৭-৪৮ পৃঃ।

নসিরুদ্দিন ও কায়কোবাদ—৬১৭-১৮ পৃঃ পিতাপুত্রের মিলন (১২৮৮ খৃঃ)—৬১৮ পৃঃ, ফিরোজ সাহ ও তাঁহার পুত্রগণ (১২৮৯ ১৩০৭ খৃঃ) -৬১৯ পৃঃ, বহরম খাঁ ও কুদর খাঁ (১৩০১-০৬ খৃঃ)—৬১৯ পৃঃ, আলাউদ্দিন ও ফকরুদ্দিন (১৩০৮-৪৩ খৃঃ)—৬১৯ পৃঃ, ইখতিয়ারুদ্দিন গাজিসাহ (১৩৪৯-৫২ খৃঃ)—৬২০ পৃঃ সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহ (১৩৫৩-৫৮ খৃঃ)—১ম সেকেন্দর সাহ (১৩৫৮-৮৯ খৃঃ)—৬২০ পৃঃ, গয়েসুদ্দিন আজিম সাহ (১৩৮৯-৯৩ খৃঃ)—৬২১ পৃঃ, গয়েসুদ্দিনের রাজপরিচয়—৬২১ পৃঃ, সাইপ্রাস, গোপাল ও তুলিপ—৬২২ পৃঃ প্রসিদ্ধ কবি হাফেজ—৬২২ পৃঃ, সৈফউদ্দিন হামজা (১৩৯৮-১৪০৩ খৃঃ)—৬২২ পৃঃ, ২য় সামসুদ্দিন (১৪০৩ ০৯ খৃঃ)—৬২২ পৃঃ, রাজা গণেশ (১৪০৯-১৪ খৃঃ)—গণেশ কোন্ জাতি?—৬২৩ পৃঃ, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সমস্যা—৬২৪ পৃঃ, ভাতুড়িয়ার জমিদার বংশ—ভাদুড়ি বংশ—৬২৪ পৃঃ, নবকিশোরী ও আসমানতারা—৬২৫ পৃঃ, যদু কেন মুসলমান হইলেন?—৬২৬ পৃঃ, যদু কর্ত্তৃক অত্যাচার—৬২৭ পৃঃ, আহম্মদ সাহ—৬২৭ পৃঃ, সাহস্তকের পত্র—৬২৭ পৃঃ দাস নাসিরের ৮ দিনের রাজত্ব, নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ (১৪৪২-৫৯ খৃঃ) ৬২৮ পৃঃ, বরবক সাহ (১৪৫৯-৭৪ খৃঃ) ৬২৯ পৃঃ, ইউসফ সাহ ১৪৭৪-৮২ পৃঃ, জালালুদ্দিন ফতে সাহ (১৪৮২-৮৬ খৃঃ), সুলতান সাহাজাদার আটমাস রাজত্ব -৬২৯ পৃঃ, ফিরোজ সাহ (১৪৮৬-৮৯ খৃঃ)—৬৩০ পৃঃ, মহম্মদ সাহ (১৪৮৯-৯০ খৃঃ)—৬৩১ পৃঃ, মুজাফর সাহ (১৪৯০-৯৩ খৃঃ)—৬৩১ পৃঃ, হুসেন সাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ)—৬৩১ ৩৩ পৃঃ, নাসির উদ্দিন নসরত সাহ (১৫১৯-৩২ খৃঃ)—৬৩৩ পৃঃ, আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ ৩ মাস মাত্র), গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহ (১৫৩২-৩৮ খৃঃ) ৬৩৪ পৃঃ, শেরসাহ কর্ত্তৃক হুমায়ুনের পরাজয়, শের সাহ (১৫৩২ ৪৩ খৃঃ)—৬৩৫ পৃঃ, বাল্য ও কৈশোর—৬৩৫ পৃঃ, বিহার বহুদর্শিতা ৬৩৬ পৃঃ, খড়্গধারা কাটিয়া মাংসভক্ষণ—৬৩৬ পৃঃ, বেহার অধিকার—৬৩৭ পৃঃ, সোসি মোস্লিকি ৬৩৭ পৃঃ, রোটাস দুর্গ অধিকার—৬৩৭ পৃঃ, সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে ও পরে—৬৩৮ পৃঃ, খিজির খাঁ—৬৩৮ পৃঃ, মহম্মদ সাহ (১৫৪২-৪৪ খৃঃ)—৬৩৯ পৃঃ, বাহাদুর সাহ (১৫৪৪-৬০ খৃঃ) ৬৩৯ পৃঃ, জালাল সাহ (১৫৬০-৬৩ খৃঃ)—৬৪০ পৃঃ, গিয়াসুদ্দিন (১৫৬৩ খৃঃ),

কালাপাহাড়—৬৪০ পৃঃ, দুলারী বিবির প্রেম—৬৪০ পৃঃ, বিবাহ ও হিন্দু বিদ্বেষ—৬৪১ পৃঃ, প্রতিশোধ—৬৪১ পৃঃ, কাশী ধ্বংস, অনুশোচনা, নিরুদ্দেশ ৬৪২ পৃঃ, জালালের পুত্র এবং তাঁহার হন্তা গিয়াসুদ্দিন (১৫৬৩ খৃঃ)—৬৪৫ পৃঃ, তাজ খাঁ করররাণী (১৫৬৩-৬৪ খৃঃ) ৬৪৫ পৃঃ, সোলেমান করররাণী (১৫৬৪-৭২ খৃঃ)—৬৪৫ পৃঃ, দাউদ সাহ ১৫৭২-৭৬ খৃঃ) ৬৪৫-৪৬ পৃঃ, প্রণয়সন্ধি—৬৪৬ পৃঃ, অস্বীকার ভেঙ্গিয়া পলায়ন—৬৪৬ পৃঃ, মনিরাম খাঁর দরবারে দাউদ—৬৪৭ পৃঃ, পুনরায় সন্ধি-লঙ্ঘন—৬৪৮ পৃঃ, দাউদের মৃত্যু—৬৪৮ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—পাঠান রাজত্ব সম্বন্ধে নানা কথা—৬৪৯-৭৪ পৃঃ।

পাঠান সম্রাটগণের অপমৃত্যু—৬৪৯-৫০ পৃঃ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল—৬৫০-৫১ পৃঃ, দিল্লী-বিদ্রোহী দুর্দান্ত "বঙ্গ-রাজ"—৬৫১ পৃঃ, হিন্দুর সহিত বঙ্গ সম্বন্ধ—৬৫২ পৃঃ, কুলমতী বেগম—৬৫৩ পৃঃ, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি—৬৫৫ পৃঃ, বঙ্গ ভাষার আদর—৬৫৬ পৃঃ, পাঠান রাজত্ব কালে হিন্দুদের বাণিজ্য ও অর্থাগম—৬৫৭ পৃঃ, শিল্পীরা অনাদৃত—৬৫৯ পৃঃ, পাঠান রাজারা শিল্প-চর্চার তাদৃশ সুযোগ পান নাই—৬৫৯ পৃঃ, মসজিদ রচনায় হিন্দু শিল্পী—৬৬০ পৃঃ, খামখেয়ালী সম্রাটগণের অত্যাচার—৬৬২ পৃঃ, রাজদরবারে ও বিলাসের কক্ষে বিদেশী ভাবের প্রভাব—৬৬৫ পৃঃ, পল্লী স্বীয় ভাব বজায় রাখিয়াছে—৬৬৬ পৃঃ, মন্দির-গাত্রে চারু শিল্প—৬৬৬-৬৭ পৃঃ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব—৬৬৭ পৃঃ, মেয়েদের নৃত্যগীত—৬৬৮ পৃঃ, মেয়েদের হাতের কাজ—৫৬৯ পৃঃ, দুঃখান্ত দৃশ্য উদ্ঘাটন করিতে নাই—৬৭০ পৃঃ, কাজীদের অত্যাচার—৬৭১ পৃঃ, চণ্ডীদাসের মৃত্যু ৬৭২ পৃঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ৬৭৪-৯৬ পৃঃ।

পুরুষপুরাণ ও ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি—৬৭৫ পৃঃ, মুসলমানগণের সঙ্গে মিলনের ফলে প্রশ্ন—৬৭৬ পৃঃ, সেনরাজত্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিদ্যাকে স্বীয় শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করা—৬৭৭ পৃঃ, জনসাধারণের আগরণের দুইটি কারণ—৬৭৭ পৃঃ, মাধবেন্দ্র পুরী ৬৭৭ পৃঃ, রামানুজ (১০৭০ খৃঃ)—৬৭৭ পৃঃ, সনক সম্প্রদায়—নিম্বাচার্য্য—৬৭৮ পৃঃ, রুদ্র সম্প্রদায়—বিষ্ণুস্বামী, বল্লভাচার্য্য ও চৈতন্য ৬৭৮ পৃঃ, মধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুভাক্—মাধ্বাচার্য্য ১১৯৭ খৃঃ।—৬৭৯ পৃঃ, চৈতন্য ভাগবতাদি পুস্তকে চৈতন্যকে কৃষ্ণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা—৬৮১ পৃঃ, চৈতন্যের বিনয়—৬৮২ পৃঃ, "মহাভাব"—৬৮২ পৃঃ, রূপদর্শন—৬৮৩ পৃঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ৬৮৫ পৃঃ, ভাবপঞ্চক—৬৮৬ পৃঃ, শান্ত, দাস্য, সখ্য ভাব—৬৮৬ পৃঃ, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য—৬৮৭-৮৯ পৃঃ, দুঃখে কান্না ও আনন্দ—৬৮৯ পৃঃ, পারিবারিক সম্বন্ধ—৬৯০ পৃঃ, নীতিশাস্ত্র—৬৯০ পৃঃ, গানে গানে চৈতন্যের ইতিহাস রচনা—৬৯০ পৃঃ, কীর্ত্তনের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধ—৬৯১ পৃঃ, মহাজন গান—৬৯১ পৃঃ, পার্থিব মোড়কে আঁটা স্বর্গের চিঠি—গৌর চন্দ্রিকা—৬৯২-৯৫ পৃঃ, সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হওয়া—৬৯৪ পৃঃ, প্রেমের সাগর-সঙ্গম—৬৯৫-৯৬ পৃঃ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, —গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ—৬৯৭-৭৩৯ পৃঃ।

চৈতন্যের পূর্বে দেশের অবস্থা—৬৯৭ পৃঃ, বংশাবলী—৬৯৭ পৃঃ, জগন্নাথ মিশ্র—৬৯৮ পৃঃ বিশ্বরূপ ও নিমাই ৬৯৯ পৃঃ উপনয়ন ৬৯৯ পৃঃ, অধ্যয়ন, বিবাহ ও পত্নী-বিয়োগ—৭০০-০১ পৃঃ, নিমাই ও ঈশ্বর পুরী—৭০২ পৃঃ, পাদপদ্ম, পূর্বরাগ ৭০৩ পৃঃ, ঈশ্বর পুরী সম্বন্ধে শচীদেবীর ভয় ৭০৫ পৃঃ, গৃহ ত্যাগ ৭০৬ পৃঃ, ভট্টাচার্য্যের দল ও গোরাই কাজির আদেশ ৭০৬ পৃঃ, মহানগর্তন ৭০৭ পৃঃ, কাজীর প্রীতি—৭০৭ পৃঃ, নিত্যাইয়ের আবির্ভাব ৭০৭ পৃঃ, মাধবেন্দ্র পুরী ৭০৮-০৯ পৃঃ, 'যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি' ৭০৯ পৃঃ, অদ্বৈতাচার্য্য—৭১০ পৃঃ, নরহরি সরকার ৭১১ পৃঃ, শ্রীবাস—৭১২ পৃঃ, "হরিদাস" ৭১৪ পৃঃ, লোকনাথ গোস্বামী—৭১৬ পৃঃ, সনাতন ও রূপ—৭১৭-২১ পৃঃ, রঘুনাথ দাস—৭২২-২৪ পৃঃ, রামানন্দ রায়—৭২৫-২৬ পৃঃ, শিবানন্দ সেন, পরমানন্দ সেন, মুরারি গুপ্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রঘুনন্দন—৭২৬ পৃঃ, আগমবাগীশ ৭২৭ পৃঃ, শাক্তদ্বেষের যুগে ভাবের লীলা ৭২৭-২৮ পৃঃ, জগাই ও মাধাই ৭২৯ পৃঃ, চৈতন্যের সন্ন্যাস—৭৩১ পৃঃ, 'আপনিই সেই আমি দাস' ৭৩৫ পৃঃ, পূর্ব ত্যাগের সঙ্কল্প ৭৩৬ পৃঃ, চৈতন্যের প্রভাব—৭৩৮-৩৯ পৃঃ, কালের উপরে জয়—৭৩৯ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ—৭৩৯-৪৭ পৃঃ।

তিরোধান সম্বন্ধে নানা মত ৭৩৯ পৃঃ, চৈতন্যের তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজের অবস্থা ৭৪১ পৃঃ, অদ্ভুতাচার্য্য পরে ৭৪২ পৃঃ, তিনটি কেন্দ্র ৭৪২-৪৪ পৃঃ, রূপনারায়ণ ৭৪৫ পৃঃ, রূপ-সনাতনের শৈল্প ৭৪৬ পৃঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭৪৭-৬৯ পৃঃ।

শ্রীনিবাস ৭৪৭ পৃঃ, নরোত্তম দত্ত—৭৪৮-৫০ পৃঃ, শ্যামানন্দ—৭৫০ পৃঃ, রাজ-দরবার খেতরি ৭৫২-৫৪ পৃঃ, রাণীদের অনুতাপ ৭৫৫ পৃঃ, ধর্মের বিরুদ্ধে হার-উদ্ঘাটন—৭৫৭-৫৯ পৃঃ কায়স্থ গুরুর ব্রাহ্মণ শিষ্য ৭৫৯ পৃঃ, চাঁদরায়ের পীড়া—৭৬০ পৃঃ তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান ও পরাজয়—৭৬৪ পৃঃ, মহাপ্রভুর ধর্মের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা—৭৬৮ পৃঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ, গুরুবাদ ও পরকীয়া—৭৬৯-৮২ পৃঃ।

গুরুবাদ—৭৬৯ পৃঃ দেহতত্ত্ব—৭৭০ পৃঃ, পরকীয়া—৭৭২ পৃঃ, কিশোরী-ভজনের মেলা ৭৭৩ পৃঃ, সহজিয়াদের আদর্শ-প্রেম ৭৭৫-৭৬ পৃঃ, রস-সার—৭৭৬ পৃঃ, সহজিয়া আদর্শ—৭৭৭ পৃঃ, সাধু দুর্গাপ্রসাদ—৭৭৭-৭৮ পৃঃ, প্রাচ্য উপস্থা—৭৭৮-৮০ পৃঃ, সহজিয়া সাহিত্য—৭৮২ পৃঃ।

ষোড়শ অধ্যায় ৭৮৩-৯০৮ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—পাঠান বিদ্রোহ—৭৮৩-৮৫ পৃঃ।

কতলু খাঁ ও ওসমান—৭৮৪ পৃঃ, আবদুল রজ্জাকের মুক্তি—৭৮৪ পৃঃ, ওসমানের অপূর্ব্ব সাহস ও মৃত্যু (১৩১২ খৃঃ)—৭৮৫ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ ৭৮৬-৮০৮ পৃঃ।

পাঠান ও মোগল রাজত্ব—৭৮৬ পৃঃ, ১৫৮২ খৃঃ—৭৮৮ পৃঃ, জঙ্গলবাড়ী (১৫৮৫ খৃঃ) —৭৮৮ পৃঃ, প্রতাপাদিত্য—৭৮৯-৯০ পৃঃ, বসন্ত রায়ের হত্যা—৭৯০ পৃঃ, প্রতাপ সম্বন্ধে নানা কথা—৭৯১-৯৫ পৃঃ, ঘটক-কারিকা—৭৯৫ পৃঃ, কেদার রায় ও চাঁদ রায় ৭৯৭ পৃঃ, কেদার রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ—৭৯৮ পৃঃ, কাঁইমুড়া—৮০০ পৃঃ, ভূষণার মুকুন্দরাম রায় ও চন্দ্রদ্বীপের লক্ষণ মাণিক্য—৮০০ পৃঃ, বঙ্গদেশ মোগলদের বিরুদ্ধে কেন হইল ?—৮০১-০৩ পৃঃ, ফিরোজ খাঁর প্রতিজ্ঞা—৮০৩-০৮ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পর্ত্তুগীজ দস্যু, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি—৮০৮-২০ পৃঃ।

আকবরের নীতি—৮০৮-০৯ পৃঃ, আকবর ও অশোক—৮১০ পৃঃ, পর্ত্তুগীজ জলদস্যু "হার্মাদ" —৮১১-১৩ পৃঃ, কুচবিহার রাজ্য—৮১৩-১৮ পৃঃ, মুণ্ডমালা ও তুলক কাটা—৮১৮ পৃঃ, ত্রিপুরা ও আসাম—৮২০ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, —মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তৃগণ—৮২০-৪২ পৃঃ।

আকবরের নীতি ৮২০ পৃঃ, নুরজাহানের জন্মকথা—৮২৩ পৃঃ, শের আফগানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ৮২৫-২৬ পৃঃ, জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ কাবুলী (১৬০৭ খৃঃ) ৮২৬ পৃঃ, পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ ৮২৭ পৃঃ, সুজা বাদসাহ—৮২৮-৩৫ পৃঃ, মীরজুমলা—৮৩৫ পৃঃ, সায়েস্তা খাঁ—৮৩৬ পৃঃ, ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ—৮৩৯ পৃঃ, সায়েস্তা খাঁ (দ্বিতীয় বার)—৮৩৯ পৃঃ নওয়াব ইব্রাহিম খাঁ—৮৩৭ ৩৮ পৃঃ, সুলতান আজিম ওস্মান—৮৩৮-৪০ পৃঃ, মুর্শিদকুলি খাঁ—৮৪১-৪২ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, রাজা সীতারাম রায়—৮৪২-৫০ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পরবর্ত্তী বাদসাহগণ—৮৫০-৮০ পৃঃ।

পরবর্ত্তী বাদসাহগণ—৮৫০-৫২ পৃঃ, সুজাউদ্দিন খাঁ—৮৫২-৫৩ পৃঃ, সরফরাজ খাঁ—৮৫৩-৫৪ পৃঃ, আলিবর্দ্দি খাঁ—৮৫৪-৬২ পৃঃ, মুস্তাফা খাঁর লাহরী—৮৫৮-৫৯ পৃঃ, বর্গীদের সঙ্গে শেষ সন্ধি—৮৫৯ পৃঃ, সিরাজউদ্দৌলা—৮৬০ পৃঃ, ঘসেটীবেগম—৮৬৩ পৃঃ, ইংরেজ সংসর্গ—৮৬৬ পৃঃ, ষড়যন্ত্র—৮৭০ পৃঃ, সিরাজের দোষ—৮৭৩ পৃঃ, মুস্তাফা খাঁ ও আলিবর্দ্দি—৮৭৩ পৃঃ, সমর ব্যবহার—৮৭৪ পৃঃ, সৎসঙ্গ—৮৭৫ পৃঃ, পলাশীর যুদ্ধ—৮৭৬ পৃঃ, পরিজন-বর্জ্জিত নবাব—৮৭৬ পৃঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ, শিক্ষা-দীক্ষার কথা—৮৮১-৯৫৮ পৃঃ।

পাঠানাধিকারে বাঙ্গালী —৮৮১-৮২ পৃ., বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য ও দিল্লীর বিদ্রোহ—৮৮২ পৃঃ, হিন্দু-শিল্প —৮৮২-৮৩ পৃঃ, বারদুয়ারী মসজিদ—৮৮৩-৮৫ পৃঃ, শের সাহের সমাধি —৮৮৫ পৃ., পৃথিবীময় হিন্দু কারিগর উপনিবেষ্ট হইয়াছিল—৮৮৬ পৃঃ, আরাজের কৃত শিল্প ও সঙ্গীতের অনুসাহ—৮৮৭ পৃঃ, বাঙ্গালা মোগল কলমের পক্ষপাতী কেন হয় নাই ?—৮৮৭-৮৯ পৃঃ, রাজপুত শিল্প—৮৮৯ পৃ., কাঙ্গরা কলম—৮৯০-৯২ পৃঃ, সর্ব্ববর্ণের সমন্বয় চেষ্টা ও সহজিয়া—৮৯২ -৯৬ পৃঃ, বলরাম হাড়ী—৮৯৩ পৃঃ, বাবা আউল—৮৯৩-৯৫ পৃঃ, সন্ধ্যাভাষা —৮৯৫ পৃ., বাঙ্গালার তথা-কথিত নিম্নশ্রেণী—৮৯৫-৯৬ পৃঃ, গণিত —৮৯৬-৯০৫ পৃঃ, সঙ্কলিতাঙ্কের তত্ত্বাদি জ্ঞান—৯০৫ পৃঃ, উচ্চ-শিক্ষা—৯০৬ পৃঃ, সঙ্গীতচর্চ্চা—ওস্তাদিয়ানা —৯০৮ পৃঃ মনোহর সাই—৯০৮-১০ পৃঃ, স্ত্রীশিক্ষা—৯১০-১৩ পৃঃ, চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী ও দুঃখিনী দেবী—৯১৩ -১৫ পৃঃ ৪টী বিদ্যালঙ্কার —৯১৫ পৃঃ, গ্রাম্যসুন্দরী, গঙ্গামণি ও পাগোল ধর্ম্ম—৯১৫ পৃঃ, নষ্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও ইংরেজ লেখকদের অভিমত—৯১৬-১৪ পৃঃ প্রাচীন কালের দেবতা—৯১৪-১৫ পৃঃ, ডাক ও খনার বচন—৯১৫-১৮ পৃ., নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে বিদেশীর অভিমত —৯১৮-২০ পৃঃ, বণিকগণের কথা —৯২০-২৪ পৃঃ, জাহাজ নির্ম্মাণ—৯২৪-২৭ পৃঃ, শঙ্খের কারবার—৯২৮-৩১ পৃঃ, বস্ত্র-বয়ন শিল্প—মসলিন—৯৩১ পৃঃ, একটী বড় এলাচের খোলে ৪০টি লৈঙ্গা —৯৩২ পৃঃ, বিলেষ মত, ৬০ হাত কাপড় হাতে রাখিলে টের পাওয়া যায় না, ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু অঙ্গাবরণী, ১৭ হাত মসলিনের ওজন ৪ তোলা—৯৩৩ পৃঃ, মসলিন নামের উৎপত্তি ও প্রকার ভেদ—৯৩৬ পৃ., ঢাকা মসলিনের চাহিদা —৯৩৭ পৃঃ, কারবারীদের কষ্ট, মসলিনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, বিলাতের শিল্পীদের অনধিগম্য—৯৩৯ পৃঃ, চরকা ও তুলন কাঠি —৯৪০ পৃঃ, রেশম—৯৪০-৪৬ পৃ., বাঙ্গালার পাল্কিতা—৯৪৬ পৃঃ, বেশ-বিন্যাস —৯৪৯ পৃঃ, দৃষ্টান্ত, রামরাম বসু রামমোহন রায়, গঙ্গাধর কবিরাজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রভৃতি—৯৪৭ ৫৪ পৃঃ মোগলাধিকারে বাঙ্গালী ৯৫৪-৫৮ পৃঃ।

সপ্তদশ অধ্যায় ৯৫৯-১০১২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ, বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ—আদিযুগ—৯৫৯-৭৫ পৃঃ।

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ —৯৫৯ পৃঃ, ভাষার তিন যুগ, ব্রজবুলি এ দেশ প্রচলিত প্রাকৃতের নিদর্শন কি না ?—৯৬০ পৃঃ, ব্রজবুলি—৯৬১ পৃঃ, বৌদ্ধ দোহা ও গান —৯৬২ পৃঃ সঙ্কলনের নাম প্রাকৃত—৯৬৩ পৃ., বেণ্ঠ ধারা— ৯৬৪ পৃঃ, প্রাক্‌সংস্কৃত যুগের বঙ্গ-সাহিত্য -গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র—৯৬৬ পৃঃ, ধর্ম্মপূজার পুঁথি, গীতিকথা, রূপকথা ও পল্লীসাহিত্য—৯৬৭-৬৯ পৃঃ, প্রবচন—৯৬৯ পৃঃ, মঙ্গলকাব্য—৯৭০ পৃঃ, শিবায়ন—৯৭১ পৃঃ, কৃষ্ণ-যাত্রালী, চণ্ডীমঙ্গল—৯৭২ পৃঃ, বৈষ্ণবদিগের শাক্ত বিদ্বেষ—৯৭৩ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য ৯৭৫-৮৮ পৃঃ।

সংস্কৃত-প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য—৯৭৫ পৃঃ, ব্রাহ্মণ-প্রভাবে আদর্শের রূপান্তর—৯৭৬ পৃঃ, তুর্কী নবাবদের দ্বারা বঙ্গভাষার উৎসাহ প্রদান—৯৭৭ পৃঃ, সঞ্জয় কবীন্দ্র এবং মহাভারতের অপরাপর অনুবাদকগণ ৯৭৮-৭৯ পৃঃ, রামায়ণ, কৃত্তিবাস—৯৭৯ পৃঃ, যুদ্ধের অবতার রামানন্দ ঘোষ ও অপরাপর রামায়ণের অনুবাদকগণ—৯৮০ পৃঃ, ভাগবত ও অপরাপর পুরাণ—৯৮১ পৃঃ, শ্রীকৃষ্ণবিজয়—৯৮২ পৃঃ অনুবাদ সাহিত্যের স্থায়ী ফল—৯৮২ পৃঃ, মনসাদেবীর গান—৯৮৩ পৃঃ, মনসামঙ্গলের কবিগণ—৯৮৩ পৃঃ, চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ—৯৮৪ পৃঃ ধর্মমঙ্গল—৯৮৬-৮৮ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, চৈতন্য যুগ—৯৮৮-১০০২ পৃঃ।

চণ্ডীদাসের কবিতা—৯৮৮-৯১ পৃঃ, বিদ্যাপতি—৯৯২-৯৩ পৃঃ, অপরাপর বৈষ্ণব পদ কর্ত্তা—৯৯৩-৯৭ পৃঃ, মাথুর গান—৯৯৭-৯৯ পৃঃ, প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায়—৯৯-১০০২ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যের অবস্থা—১০০২-১২ পৃঃ।

ভারতচন্দ্র—১০০৩ পৃঃ, রামপ্রসাদ—১০০৪ পৃঃ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী—১০০৬ পৃঃ, কবিওয়ালা—১০০৬ পৃঃ, ঈশ্বর গুপ্ত—১০০৭ পৃঃ, আগমনী গান—১০০৮ পৃঃ গোপাল উড়ে—১০০৯ পৃঃ দাশরথি রায়, রামনিধি গুপ্ত—১০১০-১২ পৃঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায় (পরিশিষ্ট) ১০১৩-১১৫০ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস—ত্রিপুরা রাজ্য—১০১৩-২৩ পৃঃ।

পার্থিব ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা—১০১৩ পৃঃ, রাজ-মালা—১০১৪ পৃঃ, ত্রিপুর—১০১৭ পৃঃ, ধ্বজ, চক্র ও ত্রিশূল চিহ্ন—১০১৮ পৃঃ, হেরম্বাধিপতির কন্যার সহিত বিবাহ—১০১৮ পৃঃ, ক্ষিতি রাজা, বিশাল গড় বৈকুণ্ঠপুর—১০১৯ পৃঃ, কাশীরত্ন বা ছেংথোম্ফা, মহারাজ্ঞী ত্রিপুরা-সুন্দরী—১০১৯-২০ পৃঃ রত্নফার মাতার পুত্র বিরহ, পল্লীগাথা, গৌড়েশ্বর এবং রত্নফা, গণিকাকে সম্রাটের প্রণাম, অমির খাঁর গড়ে যুদ্ধ ১০২১-২৩ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—ধর্ম্মমাণিক্য ১০২৩-৩০ পৃঃ।

প্রতাপ মাণিক্য, ধন্য মাণিক্য, সেনাপতিদিগকে হত্যা—১০২৩ পৃঃ, খরলাখাত দখল—১০২৫ পৃঃ, সেনাপতি চয়চাগ—১০২৫ পৃঃ, সৈন্যগণের মধ্যে জাতিভেদ বিলোপ, "কাঠি ছোঁয়া"—১০২৫ পৃঃ, খানাংছি দুর্গ অধিকার, নিগবর কুকীদের বশ্যতা স্বীকার—১০২৬ পৃঃ, হুসেন সাহের সঙ্গে বিরোধ—১০২৭ পৃঃ, গৌড়-ধ্বজের অপমান—১০২৭ পৃঃ,

পুরাণ ও আরাকান বিজয়, বিষ্ণুর ১০ম অবতার উৎপত্তি প্রসঙ্গ—১০২৭ পৃঃ, অদ্ভুত উপায়ে রোগ ভাল করা বাধ, হুসেন খাঁ ও করাপার পরাজয়, মনুষ্যবলি নিষেধ, ৬ই মন সোণার ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি—১০২৮ পৃঃ, উৎকল খণ্ড পাঠান্তর, প্রেত চতুর্দ্দশী, পল্লীগাথা, স্থপতির বৃত্তান্ত, দেব মাণিক্য ১০২৯ পৃঃ, ছত্রাচার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ—১০৩০ পৃঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—১০৩০-৬৯ পৃঃ।

বিজয় মাণিক্য মাণিক্য, শ্রীহট্ট ও তদ্বংশীয় আত্মগুপ্ত বংশীয়, মহারাজ খাকে বাঙ্গালা ১০৩১ বিজয় মাণিক্যের দিগ্বিজয় ১০৩২ পৃঃ, অনন্ত মাণিক্য ও উদয় মাণিক্য, ত্রিপুরা হইতে সেনাদল—১০৩৩ পৃঃ, ইন্দ্রমাণিক্য ও জয়মাণিক্য—১০৩৩ পৃঃ, অমরমাণিক্য, অমর ধাঁড়, ভুলুয়া জয়, শ্রীহট্টের রাজা গড়ে খাঁ বন্দী, ইসা খাঁ মছলন্দ বাঙ্গালা জয়—১০৩৬ পৃঃ, ভুঁইয়ে বড় না বাজাই বড়, মগদেশ বিজয়—১০৩৯ পৃঃ, মহারাজা দশরথ দেবেন্দ্রের বিজয়, জয়দমাণিক্যের অদ্ভুত সাহস ও আত্মহত্যা, রাজধর মাণিক্য ১০৫৪ পৃঃ, বলোদয়মাণিক্য, কল্যাণমাণিক্য, গোবিন্দমাণিক্য, মধো মাণিক্য ১০৫৭ পৃঃ পুনরায় গোবিন্দমাণিক্য, রামমাণিক্য—বিচারে দয়া, রত্নমাণিক্য, ব্রজেন্দ্রমাণিক্য, পুনরায় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য—১০৫৭ পৃঃ, ধর্ম্মমাণিক্য (দ্বিতীয়), কৃষ্ণমাণিক্য, মহারাজাদের বঙ্গানুবাদ—১০৬৮ পৃঃ, পুনরায় জয়মাণিক্য—১০৬৮ পৃঃ, বিজয়মাণিক্য ও চন্দ্রমাণিক্য—১০৬৯ পৃঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, লক্ষ্মণমাণিক্য—কৃষ্ণমাণিক্য—১০৭০-৫০ পৃঃ।

"আমি দুঃখের কথা তুমি অধিকারী," লক্ষ্মণমাণিক্য—১০৭১ পৃঃ, কৃষ্ণমাণিক্য, কৃষ্ণমালা ১০৭১ পৃঃ, বঙ্গভাষায় উৎসাহদান, গণতন্ত্র, প্রজাদের ক্ষমতা—১০৭৪ পৃঃ, সামান্য ব্যবহার ১০৭৪ পৃঃ, কালাজ্বরের উপাধি, ত্রিপুরার শিল্প ১০৭৭ পৃঃ, হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাস-লেখক ১০৭৮ পৃঃ, বসন্ত রোগ—১০৭৯ পৃঃ, রাজমণ্ডল—১০৮০ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, প্রাগজ্যোতিষপুর—১০৮০-৫২ পৃঃ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ ১০৮০ পৃঃ, বাণলিঙ্গ—১০৮১ পৃঃ, কামাখ্যা তীর্থ ছিন্ন বিদ্যা ১০৮২ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ঐতিহাসিক যুগের আদিকাল—১০৮৩-৯৫ পৃঃ।

ভাস্কর বর্ম্মা—১০৮৩ পৃঃ, হর্ষের বর্ম্মা, বনমাল, রত্নপাল—১০৮৪ পৃঃ, ইন্দ্রপাল, ধর্ম্মপাল, সীমা—১০৮৫ পৃঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ,—পাঠান আক্রমণ ও ক্রমশঃ অধিকার-সঙ্কোচ—১০৯৫-৬৮ পৃঃ।

কামতা দখল—১০৯৩ পৃঃ, অসমরাজগণ—সুকাফা, সুতিফা, সুদিনফা, সুখাংফা—১০৯৭ পৃঃ, সুপাংফা, সুতুফা, টাবাওখামটি, সুলাংফা, সুজাংফা হইতে সুহেনফা, সুশিংফা,

মুহম্মদ—পাঠানদের পরাভব—১০৫৮ পৃঃ, গুজেনফা, সুখাপফা—১০৫৯ পৃঃ, প্রতাপসিংহ নরিয়া রাজা, জয়রঙ্গ—১০৬০ পৃঃ, চক্রধ্বজ, উদয়াদিত্য হইতে পাঁচ জন নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণ—১০৬১ পৃঃ, গদাধর সিংহ, রুদ্র সিংহ—১০৬২ পৃঃ, শিব সিংহ, লক্ষ্মী সিংহ, বৈষ্ণব বিদ্রোহ—১০৬৩ পৃঃ, গৌরীনাথ হইতে পুরন্দর সিংহ ও ৪ জন নৃপতি ১০৬৫ পৃঃ, শিল্প ও স্থাপত্য— ১০৬৮ পৃঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ, কোচবিহার—১০৬১ ৭৬ পৃঃ।

ব্রহ্মপাল হইতে ভবচন্দ্র—১০৬৯ পৃঃ, শিববংশ, চন্দন সিংহ, বিশ্বসিংহ —১০৭০ পৃঃ, চিলারায়, নরনারায়ণ —১০৭১ পৃঃ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও বীরনারায়ণ—১০৭২ পৃঃ, রাজার অকৃত কার্য্য ও মৃত্যু, প্রাণনারায়ণ—১০৭৩ পৃঃ, মোদনারায়ণ, বাসুদেব নরনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ—১০৭৬ পৃঃ, রূপনারায়ণ, উপেন্দ্র ও দেবেন্দ্রনারায়ণ ১০৭৭ পৃঃ

নবম পরিচ্ছেদ, কাছাড় (হেরম্ব)—১০৭৬-৮০ পৃঃ।

মহাভারতের বীরগণের সহিত সম্বন্ধ—১০৭৭ পৃঃ, রাজাবলী ১০৭৮ পৃঃ।

দশম পরিচ্ছেদ—শ্রীহট্ট—১০৮০-৯৬ পৃঃ।

শ্রীহট্টের নাম—১০৮১ পৃঃ, শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস ১০৮২ পৃঃ, প্রাচীন ইতিহাস ১০৮৪ পৃঃ, কেশবের রাজশাসন ১০৮৫ পৃঃ, গৌড়গোবিন্দ কে ?—১০৮৬ পৃঃ, মুসলমান-বিজয়—১০৮৮ পৃঃ, শ্রীহট্টের স্বাধীনতালোপ ১০৮৯ পৃঃ, সাহজালালের বংশ, শ্রীহট্টের নবাবগণ—১০৯০ পৃঃ, আমিল, নবাব হবেরুল্লা ১০৯১ পৃঃ, ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড় —১০৯২ পৃঃ, নবাব রাধাবল্লভ—১০৯৩ পৃঃ, লাউড়—১০৯৪ পৃঃ, শিল্প ১০৯৫ পৃঃ, কামান—১০৯৬ পৃঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ, মণিপুর ১০৯৬-৯৯ পৃঃ।

মিতাই রাজবংশ ১০৯৬ পৃঃ, নরসিংহ, নবীন সিংহ—১০৯৭-৯৮ পৃঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, মেদিনীপুর ১০৯৯-১১০৭ পৃঃ।

রাজা পরশুরাম শ্রীচন্দন পাল—১১০৪ পৃঃ, নারায়ণবল্লভ শ্রীচন্দন পাল, দেবীবল্লভ শ্রীচন্দন পাল, শ্যামবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সুলতান, রাজা মধুসূদনবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সুলতান ও রাজা পরশিংহ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সুলতান —১১০৫ পৃঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ,—বন-বিষ্ণুপুর,—১১০৮-১৮ পৃঃ।

আদিমল্ল—১১০৯ পৃঃ আদিমল্লের অভিষেক—১১১০ পৃঃ, মল্লেশ্বর, শ্যামরায়, জোড় বাঙ্গলা, লালজী, মদনমোহন—১১১৭ পৃঃ, মদনগোপাল, মদনমোহন, রাধাশ্যাম, রাধামাধব—১১১৮ পৃঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ভুলুয়া বা নোয়াখালী ১১১৯-২৩ পৃঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, সুন্দরবন ১১২৫-৩২ পৃঃ।

পূর্ব্ব ভাগ— ১১১ পৃঃ, কালিদাস দত্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ১১২৬ পৃঃ, পৌরাণিক গ্রন্থে সুন্দরবন, ঐতিহাসিক যুগে সুন্দরবন —১১২৭ পৃঃ, পাল রাজত্বকাল — ১১২৮ পৃঃ, সেন রাজত্বকাল — ১১২৯ পৃঃ, মুসলমান রাজত্বকাল—১১৩০ পৃঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ —অন্যান্য রাজা ও জমিদারগণ —১১৩২ ৪০ পৃঃ।

মুরসিদাবাদ—১১৩২ পৃঃ, কৃষ্ণনগর, ভাওয়াল—১১৩৩ পৃঃ, বরনাগড়, পুঁটিয়া— ১১৩৪ পৃঃ, নাটোর, কাশীমবাজার—১১৩৫ পৃঃ, দীঘাপাতিয়া, দিনাজপুর ঢাকা ১১৩৬ পৃঃ, অপরাপর কথা—১১৩৭-৪০ পৃঃ।

বৃহৎ বঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আনুগঙ্গ প্রদেশ

"বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ো নহি দূরতরঃ।
অমৃতপতদ্বরণারীভিঃ পরিবৃতঃ করিবরকোটিশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ॥"

সিন্ধুনদের গতী ত্যাগ করিয়া আর্যগণ আর্যাবর্তের সর্বত্র শরদাতীত কালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে মূলতঃ সিন্ধুনদেরই মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। উত্তরকালে সম্ভবতঃ সমুদ্র দেখিয়া তাঁহারা উহা সিন্ধুনদের মতনই বিশাল কোন নদ মনে করিয়াছিলেন—তাই সমুদ্রের অপর নাম সিন্ধু। এই সিন্ধু নদ হইতেই হিন্দু, হিন্দু, হিন্দুস্থান প্রভৃতি নাম হইয়াছে।

মথুরার উপর গঙ্গাবতী পুতনা যোগার ঈশ্বরপুরে প্রায় দুশ্বছর হইতে পূজা হয়। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

রামায়ণে আমরা গঙ্গার যে প্রথম বর্ণনা পাই, তাহা যেন একটা নূতন বিস্ময় ও আনন্দের ভাব প্রকাশ করিতেছে। গঙ্গার জলরাশি কোথাও বায়ুবেগে চূর্ণ হইয়া শুভ্রফেনীর রেখার ন্যায় তুলিয়া উঠিয়াছে, কোথাও জল আবর্ত-শোভিত, কোথাও যেন বীণার ন্যায় তরঙ্গের সুর-লহরী, কখনও জলের গম্ভীর নিঃস্বনে দিক্ প্রতিধ্বনিত, কোথাও নিষ্ফলবালুকাময় তটভূমি শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রতিভাত, কোথাও তটলগ্ন শব্দে চতুর্দিক্ কম্পিত, কখনও জলের অট্টহাস্য-শব্দে সিকতাভূমি কলহাস্যা,—কোথাও বা মালার ন্যায় তীরস্থ বৃক্ষদ্বারা সমলঙ্কৃতা, কখনও শুভ্রফেনরাশি যেন স্মিতবদনার হাসির ন্যায় মনোহর (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৫০ অঃ, ১৩-২৫ শ্লোক)। রামায়ণে গঙ্গার এবম্বিধ বর্ণনা নব-সাক্ষাৎ ও নব-আবিষ্কারের আনন্দ সূচনা করিতেছে।

যতই আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে যাইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতীয় নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিশে হারা আর্য্য-পথিক কোথায় যাইয়া পড়িবেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইলেন। মূল আর্য্যসমাজের সঙ্গে যোগ যাহাতে ছিন্ন না হয়, প্রত্যেক আর্য্যের বাসস্থান যাহাতে একপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সমাজের আহ্বানে সকলেই সাড়া দিতে পারেন,—সীতাকে অন্বেষণ করিতে যাইয়া সুগ্রীবকে যেরূপ সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র আঁকিতে হইয়াছিল,—আর্য্যসমাজের কোন পথ ভ্রান্ত পরিবারকে যাহাতে তেমনই উৎকট ভাবে সন্ধান করিতে না হয়, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সমাজ ব্যস্ত ও চেষ্টিত হইলেন।

গঙ্গায় কহিয়া ও তাহার কারণ।

রামায়ণে গাঙ্গেয় প্রদেশের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হয়, আর্য্যগণ সেই ভূখণ্ডটির উপনিবেশের পক্ষে প্রস্তুত হনে করিয়াছিলেন। রামায়ণের বর্ণনায় গঙ্গা শিব জটা-ভ্রষ্টা নহেন, তিনি সাগর-মহিষী। "পতন্তী জটা ভ্রষ্টা গঙ্গা সাগরমহিষী।" (অযোধ্যাকাণ্ড)

রামায়ণের পূর্ব্ব হইতে আর্য্যগণ গাঙ্গেয় ভূখণ্ডকে বসবাসের জন্য মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে এই সম্বন্ধে যাহারা নানা পুরাণে কীর্ত্তিত হইল। সিন্ধু, যমুনা, সোনাবরী প্রভৃতি শত শত নদ-নদী এই প্রদেশ অলঙ্কৃত করিতেছে কিন্তু স্বয়ং শিব যে গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়াছেন, সেই গঙ্গার পাবনী শক্তি বর্ণনা করিতে যাইয়া পুরাণকারেরা কতই না উপকথার সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা গঙ্গাতীরবাসী তাঁহাদের জন্য অক্ষয় স্বর্গ পরিকল্পিত হইয়াছে। শত শত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গার জল অমূল্য সম্পদের ন্যায় ভারে ভারে বাহিত হইয়া লইয়া যাওয়া হইত। সোমনাথ শিবের প্রতিদিন সেই সদ্যঃ সংগৃহীত গঙ্গাজলে অভিষেক হইতেন। একদল শত সহস্র লোক গুজরাট হইতে সারি দিয়া গঙ্গার উপকূল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিত, এক এক কলসী জল শত শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া হাতে হাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে মন্দিরে আনীত হইত। ভারতের দূরদূরান্তরে কেহ কেহ দীঘি খনন করাইয়া গঙ্গাজলে উহা পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিতেন। তখনকার দিনে, যখন যাতায়াত বহু বিঘ্ন সঙ্কুল ও বিপজ্জনক ছিল তখন এইরূপ কার্য্য যে কত কষ্ট সাধ্য ও ব্যয়জনক ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। গঙ্গাতীরে মরিবার ইচ্ছা হিন্দুর স্বাভাবিক, উহা অপরিহার্য্য সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। কত আসন্ন মৃত্যু ধনবান্ হিন্দু বহুদূর হইতে গঙ্গাতীরে আনীত হইতেন। রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম, শীতের প্রকোপ ও প্রচণ্ড ঝড় সহ্য করিয়া চিরদিন আরামে পালিত ধনী ব্যক্তি মুমূর্ষুকালে অম্লানচিত্তে দিনের পর দিন গঙ্গাতীরে অতি অসুবিধাজনক স্থানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন।*

* এই সংস্কার হিন্দুর মনে কতটা বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। গোর ইংরাজী সভ্যতার পক্ষপাতী ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী ঢাকা-নবগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মাননীয় পার্ব্বতীচরণ রায় বৃদ্ধবয়সে

হিন্দুর গঙ্গাভক্তির উদাহরণ সকলেই জানেন। ইহার বহু উদাহরণ সকলেই দিতে পারেন কিন্তু যাহারা এই সংস্কারটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি মূলত, ধর্মমূলক ছিল? আমার মনে হয়, এই গঙ্গাতটকে পাণ্ডী, তাপী, মাহী ও নর্মদার অনন্তশরণ পরিকল্পনা পূর্বক মৃত্তিকার আর্যসমাজের উপনিবেশ একটা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া জাতীয় ঐক্য দৃঢ়বদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এই সংস্কারের জন্য গঙ্গার দুই তীর আর্যনিবাসে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গাতীরে বাস পরম প্রাপ্তির বিষয়, এই বিশ্বাসে ধর্মানুরাগী হিন্দু পুণ্য অর্জন করিবার আশায় গঙ্গাতীরে বাসের জন্য একটা লোলুপ হইয়া পড়িয়াছিলেন এক টুকরা অস্থি যে গঙ্গার জল স্পর্শ করিলে মৃতের আর নরক ভোগ অসম্ভব হয়, এমন নদীকে কে উপেক্ষা করিবে? এমন কি পাঠান সম্রাট খাঁ পর্যন্ত সংস্কৃতে গঙ্গাস্তব লিখিয়া গিয়াছেন।* পাদটীকায় উল্লিখিত বিধর্মী পার্শ্বজী রাজ লক্ষ্ণৌতে বাস করিয়া এক ফোঁটা গঙ্গার জলের জন্য মৃত্যুকালে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন; স্বয়ং আলিবর্দি খাঁ মৃত্যুকালে কিরীটেশ্বরীর পাদস্পৃষ্ট গঙ্গাজল পান করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই বহু-ব্যাপক সংস্কারের ফলে আর্যসমাজের বাসস্থান একটি নদীতে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল গঙ্গার দুই তীর ভরিয়া মূল আর্যসমাজের একটা প্রধান

শেষের সন্তানের পরে জীবনের শেষ রাত্রি বিশ্রাম করেন এর ফলে তিনি বিশ্রাম হইয়া বিশ্রামে এক নেম বিরাম করেন কিন্তু এই সময় অবশ্য ও অসম্ভব হইয়া তাহার চিন্তাধারা ঐক্য সমাপ্ত হইয়া উঠে। তিনি ই রাজীর "From Hindu unity to Hindu unity" বিশ্বাসটি এই ও নব পুনরুদ্ধার) নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন যে সময় তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন তিনি তাহার বিশ্লেষিকা পত্নীকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, মৃত্যুকালে তাঁহার মুখে একবিন্দু গঙ্গাজল পান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা না করিলে তাঁর মৃত্যু প্রকৃত হইবে না এই কথা শুনে হইয়া হোম মহাশয়ের আত্মীয়গণের নিকট এক শিশি গঙ্গাজল পাঠাইবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়া যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার আত্মীয় স্বজনের কাছে দুষ্প্রাপ্য বোধ নিকট ছিল। আমি যেগুলি পড়িয়াছি তাহাতে 'Poor dear craves for a drop of Ganges water —"আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এক ফোঁটা গঙ্গার জলের জন্য কাতর হইয়া পড়িয়াছেন" প্রভৃতি ভাবের কথা ছিল। এমন সাহেবী ভাবাপন্ন আচরণহীন কবির মনের ঐরূপ সংস্কার কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? আমি যেখানে থাকি কোন কোন সময় দেখিয়াছি, সমাজ ত্যাগ করিয়া লোকেরা দক্ষিণেশ্বর হইতে গঙ্গা জল কলসে করিয়া লইয়া যাইতেছে গঙ্গাপূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য

* স্বয়ং খাঁ-ই গঙ্গাস্তব হইতে নিম্ন চারিটি ছত্র উদ্ধৃত করিলেন

"প্রভূবিষ্ণুনিকেতে তারয়ে, পুণ্যবন্ত।
স তরতি শিবপুরোপান্তর কিংবা মরণম।
যদি চ পতি বিরোধা তারয়ে, পাপিনং মাম।
তদপি তব তরঙ্গ উদ্ধরন্তু মহত্ত্ব।"

শাখার সন্ধান পাইতে কোনও কষ্টই হয় না। অতএব এক সময়ে যে বারিবহুল বন সিংহ, ব্যাঘ্র ও অপরাপর হিংস্র পশুসঙ্কুল ছিল, যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অতি দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত পুরাণের উপন্যাস কথঞ্চিৎ মানিয়া লইলে, সগরের অসংখ্য বংশধর যে রাজ্য স্থাপন করিতে যাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন সেই কিরাত, মেচ, কুকি, হাজং, চাকমা প্রভৃতি জাতি-অধ্যুষিত অরণ্য প্রদেশে কে ভরসা করিয়া আসিত? গঙ্গা শুধু তাঁহার স্বীয় উপকূল নহে, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত বিজন স্থানে আর্য্যসমাজকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। এই জন্য কালীঘাটের মহাগঙ্গার কর্দ্দম-জলে অবগাহন করিবার জন্য নিত্য শত শত লোকের ভিড় হয়,—অথচ একদিনে যে সকল নদী গঙ্গার প্রধান শাখা ছিল, ব্রাহ্মণগণ বোধাদিকালে দুর্দ্দিন মনে করিয়া যাহাদের মহিমা লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গের সেইরূপ বড় বড় নদীর এখন আর নামও নাই।

আদুরক্ষ প্রদেশে আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠা।

যাহাদের পক্ষে নানা কারণে গঙ্গাতীরে বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল, সামাজিকগণ তাঁহাদিগকেও যন যন গঙ্গাতীরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পঞ্জিকা হাতে লইলেই দেখিবেন, কোন কোন্ যোগে গঙ্গাস্নান গৃহস্থের পক্ষে অবশ্যপালনীয়, সেই সেই যোগে এবং তদুপলক্ষে গঙ্গাতীরে যে ভিড় হয় উহা সামলাইবার জন্য পুলিসের অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক গঙ্গাস্পর্শ করিয়া থাকেন।

যুরে আসিয়া ভক্তদিগকে যন যন গঙ্গাতীরে আনিবার ব্যবস্থা।

গঙ্গাতীরস্থ আর্য্যসমাজকে ঐক্যের অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল গঙ্গা। শতমুখে সমুদ্রে পড়িয়াছেন, আমাদের বঙ্গদেশ শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমস্ত পূর্ব্বভারত গঙ্গার আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে। এই গঙ্গার উপকূলে শত শত মঠ উত্থিত হইয়া একদিনে ভারতীয় সভ্যতার দিক্‌প্রদর্শন করিয়াছিল। গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিশাল জনপদ—মঠ, মন্দির অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদে সমলঙ্কৃত হইয়া এবং কৃষকের হলচালনের পক্ষে উৎকৃষ্ট উর্ব্বর ভূমি বহন করিয়া লক্ষ্মীর পদাঙ্ক-লাঞ্ছিত হইয়াছে। যেখানে গঙ্গা স্বয়ং পৌঁছিতে পারেন নাই, প্রাচীন কালের এক রাজর্ষি ভগীরথের তপস্যার দ্বারা প্রশস্ত খাদ খনন করিয়া বহু-যোজন-ব্যাপক সেই মহাপ্রদেশে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক মহাজনের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের প্রবচন-সম্রাট্ ঠাক বলিয়াছেন, "মরমি যদি মরগে ভগীর খাদে" (যদি মরিতেই বাসনা হয়, তবে ভগীরথের খাদে মরাই শ্রেয়ঃ)।

সিন্ধু ও সরস্বতীর যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে পুরাণে লিখিত গঙ্গা-স্তোত্রের একটা ভেদ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৫ সূক্ত, ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ ও ৬২ সূক্ত, সপ্তম মণ্ডলের ৩৬ ও ৯৫ সূক্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, ঋগ্বেদের ঋষিরা সিন্ধু ও সরস্বতী সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্র লিখিয়াছেন, তাহা উচ্ছ্বসিত কবিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশালতোয় জলরাশির অপরূপ রূপ, মধুগন্ধপ্রদ তরুলতাসমলঙ্কৃতা তটভূমি ও নানা

অপরাপর নদ নদীর সঙ্গে গঙ্গার পার্থক্য।

শাখাসেবিত তরঙ্গভঙ্গ দর্শনে বৈদিক কবি বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন। বাল্মীকিকৃত গঙ্গাবর্ণনা রামায়ণ অযোধ্যা কতকটা সেইরূপ বটে, কিন্তু পুরাণের প্রশংসা বহুবিধ, তাহাতে গঙ্গাতীরে বাস হিন্দু স্মৃতির অনুশাসনের অন্তর্গত হইয়াছে। সেই সকল শ্লোক কবিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া সাময়িক বিধিতে পরিণত হইয়াছে—তাহাদের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট।

আমাদের বাঙ্গলাদেশ যে মহাপ্রাকৃতিক শক্তির পুণ্য-প্রভাবে ধনধান্যশালী, শ্রীসম্পন্ন ও সভ্যতার লীলানিকেতন হইয়াছিল—সেই সুরতরঙ্গিনীকে ভগীরথের পুণ্যকৌশল যেদিন শাখা-প্রশাখা-সমৃদ্ধ করিয়া এ দেশে বহমান করিয়াছিল, সেইদিন একসঙ্গে এদেশে আর্য্যসভ্যতা এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। গঙ্গার এক স্তোত্রে ভক্তিমান্ কবি লিখিয়াছেন যে, হে মাতঃ গঙ্গে! তোমা হইতে দূরে অবস্থিত কোন রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া অপেক্ষা তোমার জলের ক্ষুদ্রতম মৎস্য বা কচ্ছপ হওয়াও আমি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ

"অশোক যাহার কীর্ত্তি হাইল
সাগর হ'তে জলধি শেষ
তুই কিনা যাগো তাদের জননী,
তুই কিনা যাগো তাদের দেশ" —দ্বিজেন্দ্রলাল।

প্রাচ্য ভারতে আর্য্য-নিবাস।

বৈদিক ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বভারত অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যনিবাসে পরিণত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণকে বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, চন্দ্রবংশীয় অমূর্ত্ত নামক এক নরপতি ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণে দৃষ্ট হয়, বিদেঘমাধব নামক কোন রাজা মিথিলায় আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, "পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি দেশীয় মহাত্মাগণ শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম বিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।" হরিবংশে লিখিত আছে, পুণ্ড্র পঞ্চপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ—ইহারা ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। সাগর-সঙ্গমের নিকট 'কপিলাশ্রম' অতি প্রাচীন আর্য্যতীর্থ। সাগর-সঙ্গমের এই কপিলাশ্রমে এখনও বৎসর বৎসর সাগরে স্নান উপলক্ষে অসংখ্য জনতা হইয়া থাকে। ভগীরথ এইখানে

গঙ্গার নবশাখা খনন করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন, কপিল, ভগীরথ ও গঙ্গার বিগ্রহ এখনও তথায় পূজিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতা পূজক চম্পাইমান সেই হইতে তথায় রহিয়া বঙ্গের দূরতর সীমায় আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থও অতি প্রাচীন। শ্রীহট্ট প্রভৃতি সকলে বহু প্রাচীন তীর্থ আছে, সেগুলি পুরাণোক্ত কাল হইতে বিদ্যমান। আমরা পরে তাহা আলোচনা করিব (পরিশিষ্টে শ্রীহট্টের ইতিহাসাংশ দ্রষ্টব্য)।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বাঞ্চলে আর্য্যসভ্যতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের বিষয় নহে। তাংপরে ব্রহ্মের ক্ষত্রিয় ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আসিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের ভাব শিক্ষা দেন, তিনি এই সকল দেশে জৈনধর্ম্ম বিশেষ করিয়া প্রচার করেন। মগধাধিপতি শ্রেণিক, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নরক, ভগদত্ত, পৌণ্ড্র বাসুদেব প্রভৃতি পূর্ব্বভারতের রাজারা কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন, ত্রিপুরাধিপতি ত্রিপুর নিজেকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বঙ্গায় পূর্ব্বভারতে আসিয়া গিয়াছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা এই দেশকে তাঁহাদের গণ্ডীর বহির্ভূত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত পূর্ব্বভারতকে কলঙ্কলাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ মগধ এমন কি সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বৃহৎ জনপদকে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"যাঁহারা তীর্থযাত্রার উপলক্ষ ভিন্ন এই সকল দেশে গমন করিবেন তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বদেশে পুনরায় অধিকার লাভ করিতে হইবে"

"অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

এই শ্লোকটির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই সুবৃহৎ নিন্দিত জনপদে আর্য্যগণ-পূজিত অনেক তীর্থ বহুপক্ষ হইতেই বিদ্যমান ছিল। যে কালে যে সকল স্থানে ঋষিরা তীর্থস্থান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে উহারা নিন্দিত রাজ্যে পরিগণিত হইল কেন? আদিযুগে এ রাজ্য আর্য্যগণের অধ্যুষিত হইয়া পরে তাঁহাদের এক বৃহৎ শাখা দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল কেন? ইহার উত্তর এই,—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রাবল্য বশিষ্ঠ হিন্দুর চক্ষে এ দেশকে দূষিত করিয়াছিল। তীর্থঙ্করচূড়ামণি পার্শ্বনাথ পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি প্রদেশে চাতুর্য্যাম ধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক কৃষ্ণদ্বেষের শিক্ষা দিয়া যজ্ঞ ও কর্ম্মকাণ্ডময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই শুদ্ধ হিন্দুদিগের দ্বারা এই দেশ নিন্দিত হইয়াছিল। এই নিন্দাবিধি পূর্ব্বভারতে আর্য্য উপনিবেশের আধুনিকত্ব প্রমাণিত করে না, আর্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখার দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করে মাত্র। যে মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ ভারতের ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, তাহাদিগকে অনার্য্য বলিয়া ঘোষণা করা ঘোর অসুরার ফল।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বিদ্বেষ পূর্ব্বভারত বিদ্যুষ্টা।

গৌড় নামটা অতি প্রাচীন। পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বরগণ "পঞ্চগৌড়েশ্বর" অথবা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর এই গৌরবান্বিত উপাধি ধারণ করিতেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের একটা প্রাচীন রীতির প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ।

রামায়ণ ও মহাভারতকে আমরা বর্ত্তমান যুগের নিক্ষেপ অনুসারে ঠিক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পুরাণগুলি সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তথাপি এই সকল কাব্য-পুরাণে যে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাদের কাব্যাংশ ও দর্শনতত্ত্ব, ভক্তি ব্যাখ্যা ও উপকথা ছাড়িয়া দিলেও ইহারা যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের এক একটি নিদর্শনস্বরূপ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উপকথা-বহুল ঐতিহাসিক উপকরণ পাশ্চাত্য দেশে অগ্রাহ্য হয় নাই। সে দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় এত তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপিও পাওয়া যায় নাই। মূলকথা এই উপকরণগুলি হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিতে হইলে সুস্থ বিচারবুদ্ধির আশ্রয় লইতে হইবে। তাম্রশাসন যে বিশ্বস্ততার প্রতীক, তাহাও আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারি না। তাহাতেও তোমাদের-আমাদের অভিরুচি ও সত্যের অপলাপ আছে। সর্ব্বত্রই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হয়।

প্রাচীন ইতিহাস বিলোপের কারণ।

যখন আমরা মহাভারত ও হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে নরক, চিত্রক, বৃহৎ, জরাসন্ধ, জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব প্রভৃতি বর্ত্তমান আর্য্যাবর্ত্তকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে দেখিতে পাই, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতযুদ্ধের প্রাক্কালে পূর্ব্বভারত অনেক পরিমাণে নব-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বিরুদ্ধতা উত্তরকালে বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধান্যের যুগে পূর্ব্বভারতকে কয়েক শতাব্দী কাল নবযুগের হিন্দুদিগের নিকট বর্জ্জনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের গুরুই আমরা এই দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলাম। কৃষ্ণের প্রবল সহায়তায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল সেই পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ-জৈনদ্বেষিতার উন্মত্ত অন্যায় এদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিল। বৌদ্ধবিদ্বেষের নাম শুনিলে হিন্দুগণ কাণে আঙুল দিতেন, এই পাপ নাম উচ্চারণ করিতে নাই—ইহারা এই শিক্ষা পাইয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ্গ-বর্ণিত সমতটের রাজধানী কামতা নগরে কর্ণসুবর্ণ, আধুনিক সময়ে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কামতা যেখানে সমবায়াম ছিল বর্ত্তমানে উহার নাম "বিহারমণ্ডল" — উহা বড় কামতা গ্রামের কিছু উত্তরে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন "পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ কখনও দোরের বেলায় সেই গ্রামের নাম লয় না, পূবের গ্রাম কি পশ্চিমের গ্রাম ইত্যাদি বলিয়া হুঙ্কার হইলে ইহার উল্লেখ করিয়া থাকে" (প্রতিভা, তৃতীয়বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১২৫ পৃষ্ঠা)। সম্প্রতি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম এ, পি-এচ ডি মহাশয় "ছয়বেশে দেবদেবী" নামক তাঁহার একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের

সর্ব্বত্রআরাধ্য হিন্দুদেবতার অনেকগুলিই বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ দেবদেবীগণ হিন্দুর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বেমালুম নিজস্ব করিয়া বৌদ্ধত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, এমন কি তারা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাদিগকে আমরা যেভাবে পূজা করিয়া থাকি, তাহা বৌদ্ধ তন্ত্রের অনুগত। তিনি দেখাইয়াছেন, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা প্রভৃতি সাতটি দেবতা তারার রূপান্তর, এবং তারা দেবীর উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে, ইহার মাথায় "অক্ষোভ্য," পাঁচটি মুদ্রা ও 'একজটা' নাম সমস্তই বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত, পরবর্ত্তী হিন্দু তান্ত্রিকগণ "অক্ষোভ্য" অর্থে শিব এবং 'একজটা'ও হিন্দু দেবতার বিকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অক্ষোভ্য প্রকৃতপক্ষে ধ্যানী বুদ্ধ, একজটা বৌদ্ধ দেবতা, এবং মুদ্রাগুলিও বৌদ্ধ তন্ত্রানুসৃত। হিন্দু তন্ত্রের যেগুলিতে অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটিই সপ্তম শতাব্দী হইতে অধিক প্রাচীন নহে, এবং বৌদ্ধ তন্ত্রে এই সকল সম্বন্ধেও যেরূপ দৃষ্ট হয় তাহা হিন্দু তন্ত্র ব্যাখ্যায় তাহা নাই, তাহা কোনরূপ গোঁজামিল দেয়। সরস্বতী অবশ্য বৈদিক দেবতা, কিন্তু বঙ্গদেশে ইঁহাকে শুম্ভনিশুম্ভকালী বলিয়া পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। বিনয়বাবু বলেন, "সরস্বতী বৈদিক দেবতা, পুরাণেও ইঁহার পূজা আছে এবং পুরাণগুলি প্রায়ই তান্ত্রিক যুগের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সে সকল কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যখন তন্ত্রকালীর সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ হইয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে আমরা যে সরস্বতীর পূজা করিতেছি তিনি বৌদ্ধ তারার একটি রূপভেদ" (হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনা-লেখমালা, ১৮-২৮ পৃঃ)। কালিদাস শিবের বিবাহকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে কালীদেবীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তখনও তিনি হিন্দু দেবমণ্ডলীতে বিধিমতরূপে প্রতিষ্ঠিত হন নাই।

এই ভাবে নষ্ট হয় হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু নষ্ট করিয়া ছাড়েন নাই, তাঁহারা তদুপরি বৌদ্ধ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যের উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়া উহা সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব করিয়াছেন। হিন্দুর পরবর্ত্তী ন্যায়দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই লুণ্ঠনের পরিচয় আছে—কোথাও ঋণ স্বীকার নাই। এইভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। বঙ্গের পশ্চিমোত্তর উপান্তে প্রিয়দর্শী অশোক প্রভৃতি যত বড় বড় রাজা জন্মিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের নিকট তাঁহারা নামে মাত্রও পরিচিত ছিলেন না। বঙ্গগৌরবের মহামণি বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের নাম পর্য্যন্ত বিক্রমপুরবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর ও সুবর্ণ বিহারের নামই বা কে শুনিয়াছিল? কেবল আমরা যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের নাম লইয়া গর্ব্ব করিতে শিখিয়াছিলাম কেবল ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। বাড়ীর কাছে কলিঙ্গের যে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ সৈন্য হত্যা করিয়া রাজা অশোক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রূপ মহাযুদ্ধের কথাও আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু কবে কোন্ যুগে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা তাঁহার উদরস্থ হইয়া কর্ণরন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়াছিল এবং রামের শক্তিশেল উপলক্ষে মারুতি কবে কোন্

দিক দিয়া গন্ধমাদন শৈল কাঁধে করিয়া লঙ্কাক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল, অতীতকালের সেইরূপ উপকথা আমরা পরাক্রান্ত ছক্কে পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ কেবল ভীম কৈবর্তের আঙ্গালকে আমরা দ্বিতীয় পালুবের কীর্তি পরিকল্পনা করিয়া ভক্তিতে গদ্গদ হইয়াছি এবং ঢাকা জেলার সাভারের বৌদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষকে পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের বাড়ী মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া হৃৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী পাহাড়ে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লোকে শুদ্ধ নিষ্ঠুরের অস্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। হৈন ও বৌদ্ধ দেবতার বিগ্রহ বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু তাঁহারা যে বৌদ্ধ বা হৈন ধর্ম্মের অন্যতম তাহা কে কবে মনে করিয়াছিল? কোন কোন স্থানে জিনেশ্বর তীর্থঙ্কর শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। এক স্থানে দেখিয়াছি বোধিতরুর নিম্নে উপবিষ্ট বুদ্ধ বিগ্রহের নাম পাণ্ডারা দিয়াছে 'জটাশঙ্কর,'—বুদ্ধের শিরের উষ্ণীষ বোধিতরুর পত্রপুঞ্জ জটাস্বরূপ পরিভাষিত হইয়াছে। বুদ্ধমূর্ত্তিকে সিন্দুর মণ্ডিত করিয়া গ্রাম্য পুরোহিতেরা তাঁহা সংস্কারে অক্ষম করিয়া মাতৃপূজার যাহা চরিতার্থ করিয়াছেন, এরূপ সংবাদও আমরা জানি। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন, "ত্রিপুরার বড় কামতা গ্রামে বিহার মণ্ডলে বৌদ্ধ অমিতাভমূর্ত্তি কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে" (প্রতিভা, ৫ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৪ পৃঃ)। অনেক স্থলে অশোক গুপ্ত 'ভীমের গদা' নামে অভিহিত

হিন্দুর ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নাই, যাঁহারা এই সকল প্রমাণ দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণেরা এতই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই সকল পাপ কথা যেন কেহ না শুনে এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেরা ইহা করিয়া তাঁহাদের কীর্তি লোপ করিয়া দিয়াছিলেন। সত্য বটে বুদ্ধ নির্ব্বাণের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে জয়দেব কয়েকটি ছত্রে বুদ্ধের বন্দনা করিয়াছেন। আরও দুই এক স্থলে হিন্দুরা এইরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, অগাধ অপ্রমেয় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে পরবর্ত্তী কালের সেই সকল পংক্তি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কি ভীষণ অত্যাচারের সহিত ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ও হৈনধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা শঙ্কর-বিজয় নামক পুস্তকের নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়

"দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসাধ্যান্ রাজন্যখ্যাননেকবিধা প্রসঙ্গভেদৈ-র্নির্জ্জিতা তেষাং শিরাংসি শস্ত্রবৃষ্টিভিস্তিত্বা বহূন উদ্ধরণের নিক্ষিপ্য কতিপয়ৈশ্চ শাস্ত্রকৃত্য চৈব দুষ্টমতধ্বংসমাচরন নির্ভয়ো বর্ত্ততে" জৈনদের প্রতি আরও যে সকল অমানুষী অত্যাচার হইয়াছিল তাহা পরে লিখিব (জৈন শব্দটি ভুল)।

বৌদ্ধধর্ম্মের নেতারাই শুধু এই ভাবে নিপীড়িত হন নাই, শূন্যপুরাণে দেখা যায় অতি নিরক্ষরের বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিল "বেদ-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল এবং তাহারা সদ্ধর্ম্মের যথাসর্ব্বস্ব

কাড়িয়া লইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। তাহাদের কাতর প্রার্থনায় ধর্ম্মের (বুদ্ধের আসন টলিল, তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধর্ম্ম যবনরূপী হইয়া মাথায় টুপি পরিয়া কামান হাতে লইলেন দেবতাগণ ইহার পরিয়া ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন রক্ষা মহম্মদ হইলেন, বিষ্ণু পয়গম্বর এবং আদম শিব হইলেন " এই অবতারের তালিকা খুব দীর্ঘ, তাহাতে গণেশকে গাজি, কার্ত্তিককে কাজি, ঋষিদিগকে ফকির এবং ইন্দ্রকে আমরা মোল্লা-রূপে দেখিতে পাই। চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি দেবতারা পদাতিক হইয়া সামরিক বাজনা বাজাইতে লাগিলেন। শূন্যপুরাণে "নিরঞ্জনের রুষা" নামক পরিচ্ছেদে এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে

মালদহ জেলার কোন স্থানে হয়ত মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণের উৎপীড়নে উত্তেজিত হইয়া উৎপীড়িত সম্প্রদায়গুলি এই ব্যাপারে দৈব প্রতিশোধের পরিকল্পনা করিয়াছিল।

সত্যপীর প্রসঙ্গ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে 'বুদ্ধদেবের অবতার' বলিয়া নিজকে প্রচার করিয়া বর্দ্ধমানবাসী রামানন্দ ঘোষ নামক একব্যক্তি একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ অতি তীব্র ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুরা বৌদ্ধ ও ডোম পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি লোপ করাইয়া তাহাদের হস্ত হইতে দেবমন্দিরের পূজার অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন ডোমাচার্য্যদিগের নাম বৌদ্ধসাহিত্যে পরিচিত। যে সকল বৌদ্ধ পুরোহিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিয়া অতি হেয় জিনিষ ভক্ষণ করিতেন তাঁহারাই সম্ভবতঃ 'মেথর' শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন। শব্দটি 'মহত্তর' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয় হিন্দু স্মৃতির বিধানে চণ্ডালেরা মেথরদের বর্ত্তমান কার্য্যে নিযুক্ত ছিল কিন্তু কালে যখন চণ্ডালেরা হিন্দুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর গণ্ডীভুক্ত হইয়া পড়িল তখন বিজিত শত্রুগণের মধ্যে যাহারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির ঘৃণিত হেয় জিনিষ ঘাটাঘাটি করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, তাঁহারাই চণ্ডালের কাজের ভার লইতে বাধ্য হইলেন। ইহারাই ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ে বিজিত বৌদ্ধদিগের প্রতি যেরূপ কঠোর নিষ্পেষণ চলিয়াছিল, তাহাতে বৈদ্যেরা যদি সেই সকল চিকিৎসার ভার উদ্ঘাটন না করিতেন, তবে সেই শ্রেণীর সকলেই মুসলমান হইয়া যাইত। কেবল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি নহে, জৈনদিগের প্রতিও ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষ প্রজ্বলিত ছিল, 'হস্তিনা পীড়্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্' এই একটি কথায় সেই বিদ্বেষ বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে দাক্ষিণাত্যে শৈবেরা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মস্তক ছেদন করিয়া কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের মতের ধ্বংস করিয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে লিখিত হইবে

যাহা হউক বিদ্বেষ ও উৎপীড়নাদি সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনের সারাংশ ব্রাহ্মণেরা নিজেদের শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া লেহে এই দুই ধর্ম্মকে বন্ধন করিয়াছিলেন। এ দেশের বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের কত তাহার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় বহন করে।

বৌদ্ধ-ইতিহাস ব্রাহ্মণেরা বেজায় ও ঘোর শত্রুতা করিয়া লুপ্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের

রাজে যে কোন কালে পূর্বোক্ত দুই প্রধান ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একজন আশ্রয় লাভ হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র বাকাতে না থাকে তাঁহারা উহা পরিষ্কার করিয়াছেন এজন্য আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পথে দুর্ভেদ্য আঁধার

শুধু হিন্দুরা নহেন, মুসলমানেরাও বৌদ্ধ গ্রন্থ ও শাস্ত্রের বিলোপসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। মগধের রাজধানী ওদন্তপুরে তুরস্কগণ মহাবিহারের বহু পূর্বে বহু বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রমণের প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন এবং তথাকার সুবিস্তৃত পাঠাগার জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন বৌদ্ধগণ নেপাল, চট্টগ্রাম, আরাকানে প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশে পলায়ন করিয়া তাঁহাদের জীবন ও জীবনাধিক প্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলি কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে ব্রাহ্মণ্য ক্রোধে তাঁহারা স্বদেশোদ্দেশ্যে নির্বাসিত হইয়াছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলি জনসাধারণের ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, যে জনপদে এক কোটীর অধিক বৌদ্ধ এবং ১১,০০০ ভিক্ষু বাস করিত সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ ৩০ বৎসরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই ইৎ-সিঙ্গের অরণ্যাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার পদ্ধতাবলম্বীদের নাম ও মতসমূহ বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে, শুধু নৈয়ায়িকেরা বৌদ্ধমত-খণ্ডনোদ্দেশে তাহাদের গ্রন্থাদির কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সে সকল ন্যায়ের গ্রন্থ এখন আদৌ পঠিত হয় যে পূর্বভারত বৌদ্ধধর্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল, তথায় বৌদ্ধধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল তাহাও সুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গণের চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে" (History of Buddhism in Bengal, ১ পৃঃ)।

বৌদ্ধ বিপ্লবের পর বাঙ্গলা যখন নব প্রাণে, জাগিয়া উঠিল, তখন ভুলিয়া গেল যে একদিন এই দেশের সীমান্তে নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিহার ছিল, দীপঙ্করের প্রতিভা দেশ বিদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিল, এদেশ হইতে বাঙ্গালী বীরেরা যাইয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন এবং এদেশের ধীমান ও বিত্তপাল অন্ধ এসিয়ার চিত্রগুরু হইয়া শিল্পজগতে এক অভূতপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য ভারতের গৌরব

"প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।" —রবীন্দ্রনাথ।

"বসিত রাজেন্দ্র যথা স্বর্ণ সিংহাসনে,
ঝঙ্কারে নূপুর তথা বিকট নিঃস্বনে

নৃপ গৌড়, সমতট, কর্ণাটের চিহ্ন,
কোথা হরিকেল কোথা করণ সুবর্ণ।
পথে পথে রাজধানী—ফুলের বাগান,
এতো নহে বঙ্গ—এযে বঙ্গের শ্মশান।"

বাঙ্গলাদেশের সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন প্রাচীনকালে কতবার যে এ দেশের রাষ্ট্রীয় সীমার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। পুরাকালে চীন, ব্রহ্ম, কলিঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, আরাকান, ত্রিপুরা প্রভৃতি নানাদল এই ভূভাগের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া এ দেশের দেহের কলেবরকে যুগে যুগে বহুধা-বিভক্ত ও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে।

বঙ্গদেশের বারংবার অবিচ্ছেদ

এক সময়ে যেমন গৌড়-কামরূপ বৃহদ্বিহে বিক্রমপুরসীমার কনোজ সারস্বত গৌড়, মিথিলা ও উৎকল—এক কথায় গোটা আর্য্যাবর্ত্তটাকে বুঝাইত, সেইরূপ আবার বঙ্গদেশ বলিতে "হাসল বঙ্গ" অর্থাৎ বার আনা বিভক্ত বাঙ্গলা,—পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম সীমা হইতে চট্টলবন্দরের সীমা, উত্তরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও দক্ষিণে তমলুক ও সুন্দরবন,—এই সমস্ত অঞ্চলটাই এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত পালদের প্রাধান্যের সময়েই "গৌড়গৌড়" কথাটার সৃষ্টি। তখন সমস্ত বাঙ্গলা যাহাতে গৌড়েশ্বরের শাসনাধীনে থাকিত, এবং এদেশের রাজারা "গৌড়েশ্বরের" উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তিত্বের দাবী করিতেন,—এই সময়েরও বহুপূর্ব্বে এদেশের সংস্কৃত ভাষায় "গৌড়ীয় রীতি" প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল

প্রাচীন ইতিহাসের যুগ

ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগে ভরতখণ্ড আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বা রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন পৌণ্ড্র বাসুদেব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নরক ও চেদির শিশুপাল ইহার সামন্ত রাজা ছিলেন এক সময়ে পৌণ্ড্র বাসুদেব অনেকটা ভরতখণ্ডের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন নরক, মুর ও ভগদত্তের সময় এই সেনাটা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হইয়াছিল ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গলাদেশের অনেকটা তমলুকের অন্তর্গত ছিল, সম্ভবতঃ অশোক যে মহাসমরে কলিঙ্গদিগকে জয় করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে মেদিনীপুর জেলার কর্ণসুবর্ণবাসী বাঙ্গালীরাই কলিঙ্গ সৈন্যের অগ্রণী হইয়াছিল "মেদিনীপুর" লইয়া—পরিশিষ্ট।

বাঙ্গলা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে অনেকস্থলে 'বারবঙ্গ' বা বারভূঞার উল্লেখ দৃষ্ট হয়

বারবঙ্গ।

রাজচক্রবর্ত্তীদের অভিষেককালে বারজন মাণ্ডলিকগণের উপস্থিতি অপরিহার্য্য ছিল, অভিষেকসংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ইহাদের কতকগুলি কৃত্য ছিল ইহারা রাজার সিংহাসনারোহণের সময়ে তাঁহার মাথায় জলধারা বর্ষণ করিয়া অভিষেক করিতেন ইহারা প্রায়ই রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন, রাজার নিকটেই ইহাদের আসন থাকিত। উত্তরকালে এই বারজন মণ্ডলস্বামী, 'বারভূঞা'

নামে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে রাজা লখাইয়ের বর্ণনায় প্রায়ই "বারভূঞা বসি আছে যুকে দিয়া তাল" এইভাবে রাজার পরাক্রান্ত পার্শ্বচরদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যে সামন্তচক্র গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই 'বাদশ মাণ্ডলিক' অবশ্যই সেই বীরদিগের অগ্রণী ছিলেন।

পাঠানশক্তির বিলোপকালে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বারভূঞার প্রতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বারটি ভূঞা রাজা বাঙ্গলার বারটি শার্দূলের মত গর্জনশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভুলুয়ার ভূঞা রাজা চন্দ্রনারায়ণ সুর নিখিল পূর্ব-দেশাধিপতি ত্রিপুরেন্দ্র উদয়মাণিক্যকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'ত্রিপুরারাজ্য আমার, পূর্ববঙ্গী রাজা বিজয়মাণিক্য আমার প্রজা ছিলেন' (রাজমালা—অমরমাণিক্য খণ্ড)। অমরমাণিক্য ইহার বিরুদ্ধে স্বয়ং এক বিপুল বাহিনীর সহিত যাত্রা করিয়া অনেক করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, এই যুদ্ধের ফলে পরবর্তী দুই বার দুর্গা রাজ বলরাম সুর বিপক্ষেকে অমর দীঘি খনন কালে ১,০০০ কুলি পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সুবিখ্যাত দীঘি তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় খাত হইয়াছিল (১২৭৮ ৮১ পৃঃ)। এবং বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত ভূঞা রাজারাই এতদুপলক্ষে ত্রিপুরেশ্বরের আনুগত্য করিয়াছিলেন। ভজলবাড়ীর ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুরের কেদার রায়ের নামও আমরা এই সামন্তরাজগণের তালিকাভুক্ত দেখিতে পাই। তবু ঈশা খাঁ এর কন্যাকে সিং কোন সাহায্য করেন নাই। কুমার রাজধর ও ঈশা খাঁ ত্রিপুরার এক বিপুল বাহিনীর নেতা হইয়া শ্রীহট্টে গমনপূর্বক কদাকার নবাব ফতে সিংএর গর্ব খর্ব করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। রাজমালায় দৃষ্ট হয় ত্রিপুরারাজ বিজয়মাণিক্য ষোড়শ শতাব্দীতে নিজরাজ্যে অভিষেক করিয়া সমস্ত পূর্ববঙ্গে স্বীয় রাজচক্রবর্তীত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজমালায় পুনঃ পুনঃ এই "বাদশ বঙ্গের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মোগলেরা সামন্তরাজার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহারা সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় মুষ্টির ভিতর রাখিয়া তাঁহাদের অধীন রাজাদিগকে মাত্র একটা ঠাঁ কা সম্মান দিতেন। কিন্তু বঙ্গের বাদশ লক্ষ্মণ এই অবস্থা সুখের মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে মোগলদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অনেকেই প্রাণ দিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভজলবাড়ীর ঈশা খাঁ, ভুলুয়ার মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র শত্রাজিৎ—মোগলদের বিদ্রোহী ছিলেন। তবে পাঠান ও মোগলে অনেক তফাৎ—পাঠানেরা অবনতি স্বীকার করিলে শত্রুকে স্বীয় রাজ্যের অর্ধাংশ দিতেন—মোগলেরা ফাঁকা সম্মান দিয়া আসল ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেন। মোগল সম্রাটের ফৌজদারদের সম্বন্ধে সিয়ার মুতক্ষরিণে লিখিত আছে, "ফৌজদারদের প্রধান কর্তব্য ছিল, জমিদারদের শক্তি খর্ব করা, তাঁহারা যেন যুদ্ধাস্ত্রাদি সংগ্রহ না করেন, বন্দুক ও বারুদ প্রভৃতি যেন তাঁহারা জমা না রাখেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পুরাতন দুর্গগুলি সংস্কার না করেন কিংবা নূতন কোন দুর্গ নির্মাণ না করেন। কিন্তু যদি কোন ফৌজদারের মনোযোগের ত্রুটির সুবিধা পাইয়া জমিদার এই ভাবের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া ক্ষমতাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন,

তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিদায় করিয়া যুদ্ধোপকরণসমেত সম্রাট সরকারে সমর্পণ করিতে হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র অবাধ্যতা করিলে তাহাকে তাঁহার রাজ্যস্থান হইতে দূরে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে ইহাতে যদি তিনি কড়াক্ষরের কোন লঙ্ঘন প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহার ভূমাদি ভূমিসাৎ করিয়া, তাঁহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিতে হইবে যে জমিদার যেন একটা নগণ্য প্রজার অবস্থা প্রাপ্ত হন " কিন্তু মোগলদিগের কঠোর শাসনসত্ত্বেও বাঙ্গলার ভূস্বামীগুলির ক্ষমতা কোন কালেই একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই আকবরের সময়ে ভূরসটের রাণা প্রতাপসিংহের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, ইনি "রায়বাঘিনী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন (বঙ্গবীরাঙ্গনা, বিজয়রত্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ১৪০-৫১ পৃ ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়েও মেদিনীপুরের চকলিয়ার জমিদার জীবন ঘাট তাঁহার পাইক সৈন্য দ্বারা সার্জেণ্ট বাসকোর্থ প্রভৃতি ইংরেজ সেনাপতির অসংখ্য সিপাহী হত্যা করিয়া কিছু তাঁহাদের শিবির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ডবলিউ কে ফারমিঙ্গার লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালা পাইকেরা পশ্চিমা সিপাই হইতে সৈন্য হিসাবে উৎকৃষ্ট' (W. K. Firminger's Bengal District Records, Vol I, p.). নলডাঙ্গার রাজাদের পূর্ব্ব-পুরুষ রণবীর দুর্জয় পাঠানদিগের হাত হইতে এই রাজ্যটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন রাজসাহীর জমিদারের রাজ্য তাজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, চাকলা রাজসাহী এই অধিকারের অন্তর্গত ছিল এবং উহার রাজস্ব ছিল ২১ লক্ষ টাকা বর্দ্ধমানের রাজারা খুব পরাক্রমশালী ছিলেন, ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে ইঁহারা কত কোম্পানীর অনেক উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঈশাখাঁ লস্করকাঠে মোসাখাঁর চৌধুরীরা কিরূপ দুর্দ্ধান্ত ছিলেন, এবং একটি বেগম স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া কিরূপ অসমর কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লী কিম্বদন্তীতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে পূর্ব্বপল্লীপত্রিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পাঠানেরা সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, তাঁহারা সমস্ত দেশটার খুঁটিনাটি খবর রাখিয়া প্রত্যেক দেশের উপর বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া শাসনদণ্ড করিতে চাহিতেন না। তাঁহারা এদেশে বাস করিয়া কতকটা এদেশের লোকের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন হিন্দু জমিদারেরা এবার বুঝিয়াছিলেন যে, মোগলেরা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিয়াছেন এজন্য তাঁহারা জীবনপণে বাধা দিয়াছিলেন এই কৃষ্ণা রাজাদের অনেকেরই সমস্ত বঙ্গদেশের অধিকারের উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি অনেকেই সেই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন প্রতাপে কেহ তাঁহাকে হাঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, এবং "জয়ে যত নৃপতি রায়ন্ত" হইতেন। এদিকে উত্তরে ত্রিপুরার ধন্যমাণিক্য এবং দক্ষিণে বনবিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর মুসলমানদের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া বঙ্গদেশে অধিকার বাড়াইতে চেষ্টিত ছিলেন। ঈশা খাঁর বংশধর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ যে মোগল সম্রাটের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বশেষ পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় একটি পল্লীকিম্বদন্তীর বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে (পূর্ব্বপল্লীপত্রিকা, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ৪৩৪-৭৮ পৃঃ)

এই পুরুষসিংহদের অনেকেই আকবরের সেনাপতিদিগকে যেরূপ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে কিন্তু ইহারা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই. ঈশা খাঁ দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, অপরাপর ভূঞাগণ মোগলবাহিনীকর্তৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এই বারজন মণ্ডলাধিপতি যদি একত্র হইয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, তবে মনে হয় বঙ্গদেশ কখনই মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে পারিত না কোন কলহের উপগ্রহ বঙ্গের বারভূঁইবিপ্লবের সময়ে ভেদনীতির বীজ বপন করিয়া অখণ্ড বঙ্গদেশকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছিল তাহা জানি না,—দেখা যাইতেছে বাঙ্গালী তখনও একজাতি হইয়া গড়িয়া উঠে নাই,—এখনও বোধ হয় তাহা হয় নাই আমাদের কবিরা সাতকোটি লোককে বৃথাই "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" বলিয়া আহ্বান করিতেছেন, উহা শুধু একটা কবিত্বের উচ্ছ্বাস মাত্র।

এই বারজন মাণ্ডলিক বা বারভূঁা নিয়োগ শুধু বাঙ্গলার রীতি নহে, সমস্ত আর্য্যজগতে রাজচক্রবর্ত্তীদের বারজন সামন্তরাজা নিয়োগের রীতি পরিদৃষ্ট হয় প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় রাজপুতানার রাজাদের মধ্যে বারজন সামন্ত নায়ক নিযুক্ত করিবার প্রথা আছে সেদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা বারজন মণ্ডলাধিপ নিযুক্ত করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতেন বঙ্গের এই বারজন মণ্ডলাধিপের অনেকেই হিন্দু ছিলেন। ঈশা খাঁ মুসলমান হইলেও তিনি হিন্দুর পুত্র ছিলেন।

এই গঙ্গার সিকস্তাভূমির উপর প্রভুত্ব লইয়া যুগে যুগে হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের, হিন্দুর সহিত হিন্দুর, পাঠানের সহিত পাঠানের, মোগলের সহিত মোগলের এবং হিন্দু পাঠান ও মোগলের কতই না যুদ্ধ হইয়াছে এইজন্য এদেশের বাহির সীমা নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেদিনও উড়িষ্যা ও বিহার বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

সুতরাং প্রকৃতি ইহার যে সীমা টানিয়া দিয়াছেন, মূলতঃ আমরা তাহাই অবলম্বন করিব। ইহার উত্তরে আকাশস্পর্শী হিমাদ্রি-পৃষ্ঠ, দক্ষিণে তমালক-প্রান্তসমাশ্রিত বিশাল বারিধিবক্ষ, পূর্ব্বে আরাকানের নিবিড় অরণ্য, পশ্চিমে মগধের সীমান্তে ছোটনাগপুরের কান্তারভূমি—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিপুল সমতলক্ষেত্র—চিরসবুজ, নিত্য-নূতন শ্রী, শস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার,—কুন্দ, অপরাজিতা, সন্ধ্যামালতী, নবমল্লিকা ও পদ্মের রাজ্য—"পদ্মোৎপলকহ্লারাকুলা" শত দীঘিকার পুণ্য তীর্থ—বুদ্ধ, চৈতন্য, পার্শ্বনাথ, নীলম্বর, রামকৃষ্ণ, শঙ্করদেব প্রভৃতি নরদেবতার পদরজঃপূত এবং বিজয়, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল, রামপাল, মহীপাল প্রভৃতি সিংহবিক্রম নৃপতিদের কীর্ত্তিভূমি—ধনপতি, চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বিশ্ববণিক্-সম্প্রদায়ের বাণিজ্যকেন্দ্র—তুরাশ্ব, হীরামন্, বিত্তপাল, বসন্তপাল, শিবপাল প্রভৃতি কীর্ত্তিমান্ শিল্পীদের নিকেতন—চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কালীঘাট প্রভৃতি ভারত-বিশ্রুত তীর্থভূমি—জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নবাস্ত্রার ও মসলিনের জন্মভূমি,—এই মহাদেশই আমাদের বৃহৎ বঙ্গ. আমরা কলিঙ্গ ও মিথিলার

বৃহৎ বঙ্গের সীমা।

ইতিহাস এই মহাদেশের অন্তর্গত করিতে পারিলাম না ইহা আমাদের অক্ষমতা ও স্থানাভাবের জন্য। বস্তুতঃ পূর্ব্বভারতে শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ও ভাষা প্রায় একইরূপ এই সমগ্র দেশটার ইতিহাস এক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ইহা এতই একভাবাপন্ন যে ইহাদের মধ্যে কৃত্রিম গণ্ডীর রেখা টানিলে তাহা কতকটা কৃত্রিম হইবে

পদ্মার জাহ্নবী পাড়ের মত, এ দেশের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের কোনই নিশ্চয়তা নাই হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে মগধ, রাজগৃহ, কজঙ্গল, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ (রাঙ্গামাটি), সোনারগাঁ, সাতগাঁ, বিক্রমপুর, গৌড়, ঢাকা (সোনারগাঁ, বাঙ্গলা), পাটিকারা, কমলাঙ্গ বিজয়নগর, সিংহপুর, সাভার, মহাস্থান প্রভৃতি নানাস্থান এই দেশের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্ররূপে যুগে যুগে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিয়াছে মুসলমানদের সময়েও কতবার এই কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, রহমৎ খাওয়া, পাণ্ডুয়া ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল প্রভৃতি কতই না স্থানে স্বাধীনতাপ্রিয় রাজারা রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতের ভাষা অনেকটা এক রকমের ছিল। মণিপুর, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কাছাড় ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশের রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষা সমাদৃত ছিল তাদের রাজকীয় দলিলপত্র ও তাম্রপট্টে বাঙ্গলা ভাষাই ব্যবহৃত হইত রাজাদের বংশোদ্ভব প্রজারা বাঙ্গলা ভাষাতেই গাহিত। সেনরাজাদের সময়ে সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু যে সকল স্থান সেনদের সীমা-বহির্ভূত ছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংস্কৃতের প্রভাব স্বীকৃত হইলেও বাঙ্গলা ভাষা অনাদৃত ছিল না। বাঙ্গলা ভাষাকে রাজমালাং "সুভাষা" বলা হইয়াছে, এই উপাধি যার কবির ভাষার সহিত লিখিত ভাষার পার্থক্য সূচিত হইয়াছে নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ত্রিপুরা জেলার কামতা গ্রাম এক সময়ে খড়্গবংশের রাজধানী ছিল। উক্ত বংশের রাজারা সমতটে রাজত্ব করিতেন। খড়্গবংশের রাজাদের সঙ্গে আরাকান রাজাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল, সমতটের রাজপুত্র এক সময়ে আরাকান শাসন করিতেন, তাহাও নলিনী ভট্টশালী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৌদ্ধ-প্রাধান্য-যুগে পূর্ব্ব-ভারতের রাজাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল আরাকানের রাজসভায় সেদিন পর্য্যন্তও "বঙ্গভাষা আদৃত ছিল এবং আরাকানবাসীরা বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিতেন" এ সম্বন্ধে চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আমাকে (১৯৩৩, ৪ঠা জানুয়ারীর) চিঠিতে জানাইয়াছেন –

"অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি দৌলত কাজির একখানা ছেঁড়া পুঁথি পাইয়াছি। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে আরাকানের রাজসভায় বঙ্গ ভাষার চর্চ্চা হইত। আরাকানের যে চন্দ্রসুধর্ম্ম রাজা সুলতান সুজাকে আশ্রয় দিয়া সমূলে ডুবাইয়াছিলেন, আলওয়াল তাঁহার রাজসভায় তখন উপস্থিত ছিলেন। আলওয়ালের সেকেন্দরনামায় উল্লেখ আছে –

এই মতে সুখে সোয়াইনু বহুকাল।
বৃদ্ধ বয়সে অবশেষে ঘটিল জঞ্জাল॥

যাহ মুঞা সঙ্গে বহি আইনু সৈন্যশক্তি।
হস্তবুদ্ধি পাত্র সব দিল হস্তমতি॥
আপনার জোর হস্তে পাই অবসাদ।
এক পাণী আমারেও দিল বিদ্যাবাদ॥
কারাগারে সৈন্য আমি না পাই বিচার।
বন্ত'ইতি বসতি হইল ছারখার॥

এই চন্দ্রসুধর্ম নরপতির বহুপূর্ব্বেও আরাকানের রাজসভায় বঙ্গভাষার চর্চ্চা হইত।

চন্দ্রসুধর্ম্মের পিতার নাম—থেডো
থেডোর পিতা—নরপতিজি
নরপতিজির পিতা—মাংছোনি
মাংছোনির পিতা—শ্রীসুধর্ম্ম।

এই শ্রীসুধর্ম্ম আরাকানের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন তিনি ১৬২২-১৬৩৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীসুধর্ম্ম অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন তিনি "মেঙ-তুয়ার বর্ণনা" রচনা পরিত্যক্ত হইয়া রাজসভায় আসিতেন পূর্ব্ববর্ণিত কবি দৌলতকাজি শ্রীসুধর্ম্মের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।" যে রাজসভায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলওয়াল তাঁহার "পদ্মাবৎ" কাব্য ও দৌলতকাজি "লোর চন্দ্রাণির" মত বিশুদ্ধ সংস্কৃতানুগ বাঙ্গলা কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী সময়ের কুসংস্কারের রাজসভায় সমই বাঙ্গলা ভাষার উৎসাহ ও আশ্রয়দাতা ছিল বলিয়া মনে হয় বৌদ্ধযুগে বাঙ্গলা ভাষা বর্ত্তমান বঙ্গদেশের গণ্ডী ছাপাইয়া পূর্ব্বদিকে গিরিকান্তার সমাকীর্ণ আরাকানের সীমা অবধি প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করিতে পারা যায়।

এই দেশে শুধু ঘন ঘন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন হয় নাই, উহার ভাষাও মূলতঃ অন্তর্মুখী এবং একলক্ষণাক্রান্ত—তথাপি সেই ভাষার উপর প্রাদেশিকতের ছাপ মারিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশকে জুদা করা হইয়াছে। ত্রিপুরা, মণিপুর, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি প্রদেশে বহুকাল বাঙ্গলার দলিলপত্র এমন কি তাম্রশাসন পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উড়িষ্যা সাহিত্যের ভাষার সহিত

বাঙ্গলাভাষার প্রসার।

* In the north-east the Bengal alphabet was adopted in Assam where not only in the Inscription of Vaidyadeva, but also in other inscriptions Bengali characters have been exclusively used In the Nesa plates of Vaidyadeva of the Saka year 1107 (1189 A D) we find archaisms which strike us the backwards of orientation In the East, the Bengali script was also being used in Sylhet where similar archaisms are to be met with

বর্তমান বাঙ্গলা ভাষার যে সাদৃশ্য তাহা ত্রিপুরা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশের কথিত ভাষার সহিত আধুনিক কালের লিখিত বাঙ্গলার অপেক্ষা কম নহে। গঙ্গা-বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল সম্প্রতি,

একশত বৎসরও হয় নাই, আসামী ভাষাকে বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, তৎপূর্বে বাঙ্গলাই আসামের রাজ দরবার ও বিদ্যালয়গুলিতে পঠিত ছিল কয়েকজন মিশনারী আসামের নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ও তদুপযোগী অক্ষর , ইত্যাদি কাট্ট 'ব'—ব। তৈরী করিয়াছিলেন—তারপর যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, আসামের ভদ্রসাহিত্য অবশ্য তাহা বাঙ্গলা তাহাতে ওরূপ নিম্নশ্রেণীর ভাষা চলিবে না, তখন তাঁহার সেই নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষা ছাপাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন—তাঁহাদের সময় ও গাইডগুরুর কল্যাণে আসামের কথিত ভাষার পরিবর্তন হইয়া গেল প্রাদেশিক অধ্যয়ন সৃষ্টি করা সহজ, পৃথিবীতে যত জাতি বিরোধ এই ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে যখন ভাষার এই পরিবর্তন হয়,—তখন তাহাদের সরকার ইংরেজ স্কুল ইনস্পেকটর ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন তিনি দেখাইয়াছিলেন—স্কটলণ্ড, আয়রলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কোন ভাষায় এরকম পার্থক্য ও বৈষম্য বিদ্যমান, তথাপি বিশাল ইংরেজী সাহিত্য সেই প্রাদেশিকত্বগুলি উপেক্ষা করিয়া একভাষাপন্ন হইয়াছে এমন কি ওয়েলসের ভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মূলাগত কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি সে দেশেও ইংরেজী প্রচলিত হইয়াছে। এখনও যদি রাজশাহের কথিত রাম ও ঢাকার কথিত ভাষার উপর প্রাদেশিকত্বের ছোপ দেওয়া যায়, তবে সাহিত্যে দুইটি ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে, একই, অথচ দেশের পাঁচ মাইল দূরে দূরে যদি ভাষার স্পষ্ট বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তাহা প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন ভাষার চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়, এবং একই দেশের লোকের পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ হারাইয়া ভাষাক্ষেত্রে অনায়াসে একটা বাবেলের মত প্রস্তুত করিতে পারে।

এই ভারতবর্ষে এক সময়ে গান্ধার হইতে ব্রহ্মদেশ এবং হিমালয় হইতে রামেশ্বর — এমন কি সিংহল, জাভা, বালি ও সুমিত্রা পর্যন্ত বৃহৎ জনপদে একই সংস্কৃত ভাষার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, এজন্য সংস্কৃত ভাষা এরূপ অপূর্ব বৈভবশালিনী হইয়াছে। এখন যদি উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে পৃথগ্ভাবে এক ভাষা স্বীকৃত হয় তবে তাহা—'বাঙ্গল ভাষা'

in the ... centuries of Jayadeva and Lakshmana. In the south the Bengali script was used throughout Orissa. We find the proto-Bengali script in the Ananta Vasudeva temple inscription of Bhima Bhoi deva at Bhubaneswar and the modern Bengali alphabet in the case of the Ganga Kings Narasingha Deva II and Narasingha Deva IV. The modern curvilinear type script is a modified variety of the Bengali after the 14th century A.D., like the modern Assamese. — R. D. Banerjee, Origin of the Bengali Script, pp. 54.

সুতরাং বলা যাইতেছে এক সময়ে এই বিশাল প্রদেশ শুধু বাঙ্গলা ভাষা-ভাষী, বাঙ্গলা অক্ষরও প্রচলিত ছিল। প্রাদেশিক বিভাগের ফলে বাঙ্গলা ভাষার অধিকার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে।

'উৎকল ভারা' অথবা 'আসামী ভাষা' যে কোন নামেই পরিচিত হউক—জাতীয় জীবনে উহা একটা অবিসংবাদিত লাভের বিষয় হইবে, কিন্তু একসময়ে যাহা সহজ ছিল, এখন আর তাহা তেমন সহজ নহে কাটা কিনিয়াকে জোড়া দেওয়া সহজ ও সম্ভবপর নহে

যাহা হউক আমরা প্রাচীন কালের কথা বলিতে যাইয়া সমস্ত পূর্ব্বভারতকেই লক্ষ্য করিব দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার বঙ্গবন্দনায় অঙ্গের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি অকারণ করেন নাই এক সময়ে মগধই সমস্ত পূর্ব্বভারতের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বঙ্গদেশের শিক্ষাদীক্ষার মূল প্রস্রবণ এই গঙ্গার আদি-উৎস হরিদ্বার-স্বরূপ মগধ-কেন্দ্রগুলে বিরাজিত ছিল, মগধের উচ্চশিক্ষা মগধের শিল্পকলা সমস্তই উত্তরকালে পূর্ব্বদিকে আসর করিয়া গৌড় পরিচয় লাভ করিয়াছিল, মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করা চলে না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে মগধকে বাদ দেন নাই

শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র

যদি ভারতীয় মানচিত্রের পূর্ব্বসীমানার কতকটা অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে উত্তর সীমান্তে দার্জ্জিলিং কার্শিয়ং প্রভৃতির নিকটে নেপাল উপত্যকায় গোরক্ষপুরের অতি সন্নিধ্যে কপিলাবস্তু ও বুদ্ধজীবনের সাক্ষ্য পাই, তারপর সমুদ্রে দেখিতে বর্ত্তমান মানভূমজেলায় অবতরণ করুন, আরও দক্ষিণে নবদ্বীপ এবং তার পশ্চিমোত্তরে রঙ্গপুর, বিক্রমপুর ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর চিহ্নিত করুন, একটু পশ্চিমে ভাগলপুর এবং মগধ এই যে ক্ষুদ্র একটা সীমানা দেওয়া হইল, সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্রে তাহা অতি নগণ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় সীমানা ইহা নহে কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমির সীমা টানিলে এই বিভাগ মানিয়া লইতে হইবে এই সকল স্থান সমুদ্রের অন্তর্বর্ত্তী আকৃতিতে বা পরিমাণে পৃথিবীর মানচিত্রে এই বিভাগ নগণ্য হইলেও ইহা অঙ্ক হিসাবে নগণ্য নহে। এই বিভাগে আমরা গৃহকে পাইয়াছি, তাহার অর্থ মানবজাতির একচতুর্থাংশের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্রাট এই বিভাগের লোক। যিনি জগতের রক্তস্রোতের বিরোহরণ সেই অশোক এই বিভাগের নিবাসী এই বিভাগে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, জগদ্দল, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি জগতের আদর্শ শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিকে পাইয়াছি। এই বিভাগে ধীমান্ ও বিমলাক্ষ চিত্রকলার সম্রাট, তাঁহারা যে রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নেপাল ও তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীন-জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এই বিভাগে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মিক

একটি হর পড়ানোর কথা দিয়া সমস্ত পূর্ব্বভারত অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন

* দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রসিদ্ধ বঙ্গবন্দনা গানে যে ধারা আমার আমার মত খানিকে মুক্ত অশোক, বিজয় প্রভৃতি সকলকে বঙ্গবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন সে সময় বিহার উড়িষ্যা বঙ্গের একাংশ ছিল। কবি কালিদাস রায় লিখিয়াছেন "এই গানে পি এল রায় বঙ্গ আমার" লিখিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু পুনর্মুদ্রণ কালে বঙ্গ উড়িষ্যা দিয়া 'ভারত' করিয়াছেন।

মহাযান-বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপাস্যদেবতা বুদ্ধের পাঁচই তাঁহার স্থান। বিক্রমপুরের শান্তরক্ষিত ও দীপঙ্কর একসময়ে সমস্ত বৌদ্ধ জগতের শিক্ষাকেন্দ্রের গুরু ছিলেন সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্গ তাঁহার পাদস্পর্শে বহুকাল রাঢ়, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্ত দেশে তাঁহার চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বহু বুদ্ধ মূর্ত্তি সমাধিলাভ করেন, এই মানভূম জেলায় আরও অনেক তীর্থঙ্করের সমাধিস্থান রহিয়াছে — হরপুর অঞ্চলে এবং ত্রিপুর দেশে বঙ্গাধিপ রাজা গোবিন্দচন্দ্র মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ন্যায় দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার কাহিনী আসাম হইতে পাঞ্জাব এবং কলিঙ্গ হইতে বোম্বে প্রেসিডেন্সী পর্য্যন্ত সকল স্থানে এখনও গীত হইয়া থাকে বোম্বাই প্রদেশে এখনও গোপীচাঁদের সন্ন্যাস রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং সেদিনও সুবিখ্যাত রাজ-চিত্রকর রবিবর্ম্মা বঙ্গের বীর গোপীচাঁদের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।

মগধের সুবিখ্যাত সম্রাটগণের কথা ছাড়িয়া দিলাম গুপ্ত, পাল ও সেন সম্রাটগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অবকাশ এখানে নাই কিন্তু উত্তরকালে সাঙ্গোপাঙ্গ-সহকারে মূর্ত্তিমান হরিনাম-স্বরূপ যিনি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে আসিয়াছিলেন—তিনি এই দেশের ইতিহাসে একা তিনি প্রেম ভক্তি-সমন্বয়ের পুরোহিত। এদেশের গঙ্গা যে উত্তরতা ও শ্যামলশ্রী দান করিয়াছেন মহাপুরুষ বঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাহার সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দিয়া গিয়াছেন অতি ক্ষুদ্র ভাট-পাড়ের বঙ্গীয় গুরুদের নাম এখানে করিলাম না, তাঁহারাও প্রত্যেকে এক একটি বিকুপাল রূপ। আসামের শঙ্কর, বঙ্গদেশের রঘু, রঘুনাথ, নরোত্তম, শ্রীনিবাস, অদ্বৈত নিত্যানন্দ, শ্যামানন্দ বৈষ্ণব-জগতের গুরুদলের প্রথম পংক্তিতে আসীন।

এখানে আমরা ভারত-মানচিত্রের পূর্ব্বাংশের যে সীমা প্রদান করিলাম, তাহাতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জগতের আর কোথাও কি এরূপ একটি ক্ষুদ্র ভূমির মধ্যে এত বেশী মহাজনগণের আবির্ভাব হইয়াছে? বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী বাঙ্গলার স্থান

বাঙ্গলার গোলাকার ভূমি, এই সীমা-নির্দ্দিষ্টভূমি তেমনিই ধর্ম্মবীর ও সাধকগণের লীলাক্ষেত্র এই পুণ্যদেবতা পবিত্র হইতেও পবিত্র। বাঙ্গলাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাক্ত—হিন্দুধর্ম্মের এই কয়েকটি ধারা প্রশাখার প্রধান কেন্দ্রভূমি। উত্তরকালে ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম এইদেশে প্রবেশ করিয়াছে এই শক্তিশালী দেশকে গ্রাস করিবার উপযোগী প্রতিভা কোন বিদেশীর নাই কিন্তু যে কেহ এই দেশে আসিয়াছেন, তিনি যাহা কিছু ভাল আনিয়াছেন, এ দেশ-লক্ষ্মী তাহা রাজেশ্বরীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিনয় করিয়া দিয়াছেন। বিদেশীরা ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের প্রদান নৈতিক ও অধ্যাত্ম সম্পদ বাঙ্গালীরা গ্রাস করিয়াছেন। যে মহাক্ষেত্রে এতগুলি শক্তির সংঘর্ষ হইয়াছে, সে দেশ,—সে সমাজ এখো পুকুরের মত আবর্জ্জনা-পূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা সে দেশের পক্ষে স্বাভাবিক এ দেশের লোক নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে শিখিয়াছে বিভিন্নশক্তির

সংঘর্ষে আসিয়া ইহারা সংস্কার-জয়ী হইয়াছেন তাহাদের উদারতা ও শিক্ষার প্রসার যে কত বড়, তাহা আমরা ক্রম ক্রমে দেখাইয়া যাইব যখনই বিদেশীয়গণ তাঁহাদের দুর্জয় শক্তির বলে রাষ্ট্র প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বন্যার মত এদেশে আসিয়াছেন, তখনই হয়ত কিছুকালের জন্য আত্মরক্ষার্থে আমাদের সমাজ তাঁহাদের প্রধান সম্পর্ককে অতিরিক্ত মাত্রায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন কচ্ছপ যেরূপ মাংস-লুব্ধ হিংস্রজন্তু হইতে নিজের কোমল দেহ রক্ষা করিবার জন্য বাহিরে একটা কঠিন আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে, হিন্দুসমাজ সেই ভাবে সময়ে সময়ে একটা অতিরিক্ত গোঁড়ামির গণ্ডী স্থাপন করিয়া পররাজ্যাধিকার-লোলুপ জাতিগুলি হইতে নিজকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রভাব সাময়িক বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম সেইরূপ একটা আত্মরক্ষার আবরণে বেষ্টিত, কিন্তু ইহার ভিতরে ভিতরে এখনও যে চিন্তার প্রসারতা ও মানসিক স্বাধীনতা আছে অন্য দেশের সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে তাহা দেখাইব। এখন পুনরায় মুসলমান রাষ্ট্রশক্তি ও নবাগতাদের সংস্পর্শে সেই কঠিন আবরণ খসিয়া পড়িতেছে আশা করি অচিরাৎ আমরা বাঙ্গালী জাতির স্বরূপ আবিষ্কার করিবার সুবিধা পাইব

পুরাকালে আর্য্যাবর্তের পূর্ব্বখণ্ড নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের গৌরব, নাম ও সীমার কিছুই ঠিক ছিল না, বঙ্গ-বিভক্ত এই দেশের যে রাজা যখন প্রবল হইয়া উঠিতেন, তাঁহার রাজ্যের গণ্ডী কিছুকালের জন্য তখন বাড়িয়া যাইত আমরা এই অধ্যায়েই দেখিয়াছি এক কালে গৌড় দেশের নামে সারস্বত কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বিদ্যোত্তর প্রদেশ পরিচিত হইত, গৌড়ের নামে প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত নামাঙ্কিত ছিল গৌড়ের শ্রেষ্ঠ রাজারা 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করিয়া সার্ব্বভৌম সম্রাটের সম্মানের দাবী করিতেন। এককালে সপ্তদ্বীপ বিভক্ত ব্রিটনের প্রধান রাজা যেরূপ "ব্রিটেনাধিপ" উপাধি গ্রহণ করিতেন, 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধিও সেইরূপ গৌড়দেশের মহিমব্যঞ্জক ছিল এই পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধি কালে গৌড়ের রাজন্যবর্গের কৌলিক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল, এমন কি যখন গৌড়রাজ্যের সীমা একান্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তখনও প্রাচীন সংস্কারবশতঃ গৌড়রাজকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি দ্বারাই সম্মান করা হইত রাজা গণেশকে কৃত্তিবাস 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়গুপ্ত বিজয়গুপ্ত গৌড়াধিপ হুসেন সাহারও ঐ নামেই পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গৌড়ের আরও ছোট ছোট নৃপতিকে তোষামদ-জীবিগণ ঐ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি এখনও পুরীর রাজার এক উপাধি 'পঞ্চ-গৌড়েশ্বর' সিংহপুরের রাজারা ইহা বিকৃত করিয়া "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন কোচবেহারের প্রাচীন ইতিহাসে তথাকার রাজাদিগেরও এই উপাধি দৃষ্ট হয়। (জয়চন্দ্র মুন্সীর 'রাজাবলী' দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু এই গৌরবময় উপাধিটি সর্ব্বদাই কবি বা রাজ-সেবিগণের অভিতন্ত্র ছিল না 'সাক্ষার হ'তে জলধি শেষ' পর্য্যন্ত রাজা—আমাদের এই গৌড়দেশ—বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তে

G 15759

প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। যুগ যুগ ধরিয়া মনোজ্ঞ পরবর্তী লোকেদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে পৌঁছায়। এত সময়ে এই গোত্রের নামেমাত্র পরিবর্তন হইয়াছিল সত্য কিন্তু উহা যে এ দেশের প্রাচীন গোত্রের ও কৌমের স্মারক তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে দেশের সীমানা যুগে যুগে অসংখ্যবার পরিবর্তিত হইয়াছে, আমার ভৌগলিক সীমা লইয়া এরূপ অধ্যায় লিখিতে আমরা স্বভাবতই দ্বিধাবোধ করিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগের পূর্বাধ্যায়

"অঙ্গানাঞ্চ বিনিষ্পত্তে মহাত্মনঃ স পার্থিবঃ
ন তস্যামো বয়ং তত্র বিস্তরস্তস্য তত্ত্বতঃ॥"

—মহাভারত, সভা—১৪ ; ৩৫।

এই সময়ে আর্যাবর্তের পূর্বভাগ অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি নাম ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বৃহৎ ভূভাগ পরস্পরের অতি সন্নিহিত হেতু এবং যুগে যুগে একচ্ছত্র সম্রাটের শাসনাধীন থাকায় সকল দিক দীক্ষা ও সভ্যতায় ঐকাত্ম্য করিয়াছিল। ইহার বিভাগ-প্রবল-স্রোতা নদীর চরের মত ক্ষণভঙ্গুর পরিবর্তনশীল। তাহার উপর আমরা জোর দিব না। এই রাজ্যের সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থানগুলির প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দিব। লোকেতিহাসের কাঠামো বর্ণনা করিতে গেলে বোধ হয় এই পন্থাই সমীচীন।

বৈদিক সাহিত্যে এই দেশের নাম অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল নামোল্লেখ এবং ভৌগলিকগণের তদ্বিষয় আলোচনা দ্বারা এদেশের অস্তিত্ব কোন্ যুগে হইয়াছিল তাহা লইয়া সন্দেহ করিব না। সে বিদ্যা আমার নাই এবং আমি প্রত্নতাত্ত্বিক নহি।

মহাভারতের সময় হইতেই আমরা আর্যাবর্তের পূর্বাংশের বিশেষরূপ উল্লেখ পাই। সেই উল্লেখই আমাদের আলোচনার ভিত্তিভূমি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্বে আমরা এই ভূভাগের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কীর্তি অবগত হই। মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, অঙ্গরাজ কর্ণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি নরক ও ভগদত্ত এবং বঙ্গাধিপ চিত্রসেন ও সমুদ্রসেন।

কর্ণ অঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়া পূর্বভারতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ-বীর্যের লীলাক্ষেত্র ছিল হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কুরুক্ষেত্র

অঙ্গ-গৌরব কর্ণ।

মহাভারতের এক বৃহৎ অংশ তাঁহার গুণগরিমায় পূর্ণ সেই কীর্তিকথা লইয়া পূর্বাঞ্চলের লোকেরা গৌরব করিবার কিছুই নাই, কিন্তু আমাদের দেশে তাঁহার পরিচয় অন্যরূপ তিনি পরশুরামের শিষ্য অতএব বীর, দুর্যোধনের প্রিয়সখা ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁহার প্রধান অবলম্বন, এ সকল কথা লইয়া আমরা গৌরব করিব না মহাভারতে অতি সংক্ষেপে তাঁহার আর একটি গুণের উল্লেখ আছে -

"তিনি প্রার্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন তিনি যাচকদিগকে কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণের জন্য জীবন দানেও উদ্যত হইতেন।" — কর্ণপর্ব, ৯৪ অঃ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ

গৌরবকুলের বর্ষীয়ান স্বরূপ মহারথ ভীষ্ম তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে বলিয়াছেন "মদ্রদেশসমুদ্রের অদ্যই লয় হইল, শিক্ষাবিক্রমসকল দর্শকহীন ও প্রভাবিত হইল, মহারথসকল সংক্ষুব্ধ ও শঙ্কাযুক্ত হইল, বুদ্ধগণ চিরকাল যাবৎ অনুশোচিত হইবেন। অমল সলিল উদ্গারিত হইতে লাগিল এবং বসুন্ধরা আর্তনাদ করিয়া কম্পিত হইল" (কর্ণপর্ব, ৯৫ অঃ) আমাদের এই অঞ্চলে কর্ণ এতাদৃশ পুরুষসিংহরূপে বিশেষভাবে পরিচিত নহেন আমরা তাঁহাকে উপাধি দিয়াছি 'দাতাকর্ণ' এই উপাধি যে তাঁহার যোগ্য, তাহা মহাভারতের পূর্বোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি দ্বারা প্রমাণ হইবে 'দাতাকর্ণ' নামক পুস্তকে যে একটি উপন্যাস বর্ণিত হইয়াছে সেই অনেক কাহিনীতে কর্ণের জন্ম যে কত উচ্চ, তাঁহার মনঃশক্তি যে অপরিসীম সেই কথা অতিরঞ্জনের ভাষায় কথিত হইয়াছে, যেমন আমরা অসীম শক্তি দেখিয়া কোন মহাবীরের শত হস্ত, শত চক্ষু কল্পনা করিয়া তাঁহার কর্মশ্রান্ততা ও অদৃষ্টি সাধারণকে চমক দিয়া দেখাইয়া আসিয়াছি -রাবণ, কার্তবীর্যার্জুন, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি রাক্ষসের সম্বন্ধে ঐভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছি —কর্ণ সম্বন্ধে উপন্যাসটিও তদ্রূপ একটি রূপকমাত্র কিন্তু এদেশে তাঁহার দানশীলতার কথা এমন পর্যন্তও প্রবাদবাক্যের ন্যায় সুপরিচিত হইয়া আছে। বোধ হয় ইন্দ্রপ্রস্থ বা কুরুক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী স্থানে তাঁহার 'দাতাকর্ণ' নাম কেহ জানেনা।

* প্রাচীন অঙ্গ দুয়ের সহ রাজপুর প্রদেশ। প্রাচীন কালে রাজধানী ২ টি শব্দের বিকৃত ছিল, অঙ্গ তাহার অন্যতম (অঙ্গুত্তর, বিনয়সূত্র, ঔপপাতিকসূত্র)। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা এই রাজ্যের নাম বহু স্থলে পাওয়া যায়। এখনও চাঁপা নাম দেখা কলা প্রভৃতি নাম অঙ্গ দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গৌরবের রাজা এবং পরবর্তী কালে কর্ণ এই রাজ্যের ভোগে রাজা ছিলেন বার্ডউড সাহেবের মতে ভদ্রিয়াবাস ও বীরভূম জেলা প্রাচীন অঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল এই কাহারও কাহারও মতে চাঁপারণ পাওয়ানাও অঙ্গের অংশ। সদ্য প্রথম অধ্যায়-সংক্রান্ত অঙ্গের উল্লেখ দুই হয় (পঞ্চম ভাগ, ১৯ অধ্যায়)। নকশাল দের রাজত্বকাল সৌজন্যিক অভিধান দ্রষ্টব্য (১৮৮ পৃ.)।

কিন্তু এদেশে এই নাম চিরপরিচিত স্ত্রীলোকেরাও কথায় কথায় উপমা দেওয়ার সময় ঐ পরিচয়ের পথাদ্বারা ব্যবহার করে 'দাতাকর্ণ' পুস্তকখানি লইয়া এদেশের বহু কবি কবিতা লিখিয়াছেন বোধ হয় এই বিষয় লইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন কবিরা যত কবিতা লিখিয়াছেন অন্য কোন বিষয়ে এত অধিক কবিতা লিখিত হয় নাই আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায়ই ভিন্ন ভিন্ন কবিরচিত ৩০ ৩৫ খানি 'দাতাকর্ণের' পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় বালকগণের নিত্যপাঠ্য শিশু বোধক এবং অন্যান্য পুস্তকে দাতাকর্ণের উপাখ্যান একটি অপরিহার্য্য বিষয় ছিল শুধু যে বাঙ্গালীর কত্ত দিয়া তাঁহার দোষত্রুটী ও অন্যান্য অসাধারণ গুণের জন্য নহে, শুধু দানশীলতার জন্য, তাহা এই প্রসঙ্গে সকলেই বুঝিতে পারিবেন তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া যখন কি ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত পুত্রকেও নিজহাতে হত্যা করিয়া দানের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন এই কথাটি বাঙ্গালী কবি পুনঃ পুনঃ তাঁহার পাঠক গণকে গলাধঃকরণ করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন দুর্য্যোধনকে বাঙ্গালার কবিরা তিনি সহোদর দিগের বিরুদ্ধে অন্যায়াচরণকারক বলিয়াই প্রায় দিয়া বাহাদুরের মহিমা দেখাইয়াছেন কুরুক্ষেত্রের কর্ণকে হাজারবার্ষীর এক ভাবে দেখিয়াছেন অন্য বঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে আর এক ভাবে বুঝিয়াছেন পালরাজগণের কাহারও কাহারও তাম্রশাসনে কর্ণের দান শীলতার কথার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে দেশ, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও এদেশের লোকেরা মনুষ্যের ঔদার্য্য মহানুভবতা ও ত্যাগধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছে কর্ণের প্রসঙ্গে এদেশের সেই বলিষ্ঠতার কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক বাঙ্গলার তাম্রশাসনগুলিতে আমরা পুনঃ পুনঃ কর্ণের এই দানশীলতার উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতে কর্ণের এই গুণটির অতি সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ আছে ভাগবতের [প্রথম শিক্ষা, অন্যের বোঝা এবং বীরদের অন্যান্য কথা] অন্তর্গত 'দাতাকর্ণ' তাম্রশাসনে মদনপালের পুত্র গোবিন্দপাল কর্ণের মত দাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে "স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতা গুণে 'চন্দ্রকেশ কর্ণের' সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে কর্ণ সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ বঙ্গলার আরও দুই একখানি তাম্রশাসনে আমরা পাইয়াছি বাঙ্গলার কোন তাম্রশাসনেই কর্ণের বীরত্বের উল্লেখ নাই সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত কর্ণকে যে ভাবে দেখিয়াছে বাঙ্গলাদেশ সেভাবে দেখে নাই। এদেশ ক্ষমতার পূজক নহে, হৃদয়ের মহান্ ভাবের পূজক, এই জন্যই এদেশের কৃষ্ণ পঞ্চজন্যধারী নহেন—তাঁহার একমাত্র অবোধ কণ্ঠ একটা শাঁখের বাঁশী

মধ্য গৌরব ভারত

প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বৃহৎ বঙ্গের প্রধান পুরুষ ভরাসক মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে এই অদ্বিতীয় বীরের কাহিনী বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে

একদা নারদ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "পাণ্ডু স্বর্গবাসী, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বলিবেন এই যজ্ঞ পূর্ণ করিতে পারিলে আমার স্বর্গবাস স্থায়ী হইবে।"

সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ রাজসূয় সর্ব্বপ্রধান সম্রাট্ না হইলে এই যজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। নারদ বলিলেন, 'তুমি রাজাধিরাজ, ভ্রাতৃগণের সহায়তায় তুমি কৃতকার্য্য হইবে।' যুধিষ্ঠির ভাবিত হইয়া পড়িলেন তিনি ভ্রাতৃগণকে ডাকাইলেন, তাঁহারা কেহ গাণ্ডীব, কেহ গদা, কেহ অপরাপর অস্ত্রের গৌরব করিয়া এই কার্য্যে তখনই হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী ও সভাসদেরা একবাক্যে বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই যজ্ঞ একান্ত সহজ ব্যাপার।' তাঁহারা অনতিবিলম্বে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিতে রাজাকে ধরিয়া বসিলেন। রাজা দ্বৈপায়ন ব্যাস ও ধৌম্য প্রভৃতি ঋষিবর্গের মত লইলেন, তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি এ কার্য্যের যোগ্যপাত্র।'

এই সকল অনুকূল মত পাইয়াও ধীর-বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দ্বিধা ঘুচিল না; তিনি যদুপতি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, 'যদিও আমার ভ্রাতৃবৃন্দ-প্রমুখ সমস্ত আত্মীয়, মন্ত্রিগণ এবং শ্রেষ্ঠ ঋষিরা এই কার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন, তথাপি আমি কৃষ্ণের মতানুসারেই পরিচালিত হইব।' সারথি ইন্দ্রসেনকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকা হইতে দ্বারকানাথ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "এত শীঘ্র এই কথার মীমাংসা চলে না" তৎসময়ের ক্ষত্রিয়গণের একটা ইতিহাস তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, কংসবধের পর

জরাসন্ধের পরাক্রম।

এখন বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্, সে তোমাদের এই কার্য্যে প্রতিবাদী হইয়া তোমাদের সমস্ত উদ্যম পণ্ড করিয়া দিবে। তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিলে তোমাদের এ কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত নহে যাহারা তোমাদের ও যদুকুলের আত্মীয়, তাঁহারাও ভয়ে জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছেন। শুধু তোমাদের পৃথা ও দেবভাজন মাতুল পুরুমিত্র জরাসন্ধের অনুগামী হন নাই, কিন্তু তোমাদের পিতৃসখা যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত, যদুকুলের পরম আত্মীয় ভীষ্মক ইহারা সকলেই তাঁহার বাধ্য। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি ভীষ্মক জরাসন্ধের ভয়ে আত্মীয়তা সত্ত্বেও আমাদিগের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হন নাই হংস ও ডিম্ভক এই দুই মহাপরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের অনুচর চেদি অধিপতি শিশুপাল যুদ্ধকালে জরাসন্ধের সেনাপতি হন। মহাপরাক্রান্ত, বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি পৌণ্ড্র বাসুদেব ইহার অন্যতম সখা। যে সকল রাজা জরাসন্ধের প্রতিকূলতা করিয়াছেন তাঁহারা স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিয়া বনাচারী হইয়াছেন, নতুবা অন্যত্র বাস করিতেছেন। উত্তরদেশবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। ইহার ভয়ে শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুহৃদ, সকৃট, কুলত্থ, কুন্তি, শাল্বনবংশীয় রাজগণ, দক্ষিণ-পাঞ্চালের রাজারা, এবং কোশলবাসী নৃপতিগণ পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন, মৎস্য প্রভৃতি বেশীয় রাজগণ অতিশয় ভীত হইয়া উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। শিবের বলিদানে বলি যোগাইবার জন্য এই চৌষট্টি সমাট্ ৮৬জন

রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন আর ১৪জন নৃপতি হইলেই একশত সংখ্যা পূর্ণ হইবে, তখন ইনি যজ্ঞ করিয়া ইহাদিগকে বলি দিবেন

তদবধি জরাসন্ধ বহুবার মথুরা অবরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার অমিত পরাক্রম এবং অসংখ্য সৈন্যবলের নিকট কৃষ্ণবল দাঁড়াইতে পারে নাই অবশেষে ভীত ও আর্ত হইয়া আমরা প্রিয় জন্মভূমি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম গিরিরাজি সংরক্ষিত রৈবতকের নিকট রাজধানী পরিবর্তিত করিয়া কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্তে বাস করিতেছি। এই দুষ্কর গুরু কিছুতেই তোমাদের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে দিবেন না।

"আমি আমরা শত্রুসংশোষক মহাপ্রভাবা ত্রিশত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। (মহাভারত, সভা, ১৩ অঃ) সুতরাং জরাসন্ধ থাকিতে কিছুতেই তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারিবে না রাজসূয় যজ্ঞ একেবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" (সভা, ১৪ অঃ)।

কৃষ্ণের এই কথায় জরাসন্ধের প্রতাপের কতকটা আভাস পাওয়া গেল, হরিবংশে জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা আক্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—তাহা আরও বিস্তৃত। পুরাণকার যেন ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গের ছবি-সংযুক্ত একখানি বিশাল পট জরাসন্ধকে রাজরাজেশ্বর মহাসম্রাটস্বরূপ আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, এই একখানি চিত্র দিয়া হরিবংশ পুরাণের অনেকাংশ পূর্ণ করা হইয়াছে।

জরাসন্ধের দুই দুহিতা অস্তি ও প্রাপ্তিকে কংস বিবাহ করিয়াছিলেন, কংসের মৃত্যুর পর ইহারা জরাসন্ধকে তাঁহাদের স্বামিহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করেন।

অস্তি ও প্রাপ্তি।

জামাতৃবধের শোকে প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া জরাসন্ধ মথুরাপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন, একবার নহে—সপ্তদশবার প্রথমবারের আক্রমণকালে ভারতবিশ্রুত প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের রাজা সম্রাট জরাসন্ধের অনুচরী হইয়াছিলেন হরিবংশ ৩৫জন রাজার নাম বলিয়া "অন্যান্য" শব্দদ্বারা অধিকতর সংখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন এই ৩৫জনের মধ্যে আমরা গান্ধার ও কাম্বোজ হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্যন্ত এবং হিমাচলের উপত্যকা হইতে দক্ষিণাত্যের কোন কোন দেশের নাম পাইয়াছি। এই মহতী চমূর মধ্যে পৌণ্ড্রবাজ বাসুদেব, অঙ্গ-বঙ্গ দুই দেশের অধিপতি, চেদিরাজ শিশুপাল, কাশী, মগধ, গান্ধার প্রভৃতি দেশের রাজার উল্লেখ আছে। আশ্চর্যের বিষয় যাঁহারা মথুরা অবরোধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দ্রুপদ রাজা ও সত্যভামার স্বয়ংবরের নামও পাইতেছি। যদুবংশের দ্বারা সুরক্ষিত মথুরার চারিটি দ্বার জরাসন্ধ অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন রাজগণের মধ্যে পশ্চিমদ্বার রোধ করিয়া ১০জন রাজচক্রবর্তী, উত্তরদ্বারে ১৯জন এবং পূর্বদ্বারে ১৩জন পরাক্রান্ত রাজা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, স্বয়ং জরাসন্ধ, শিশুপাল ও তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ কয়েকজন মহাযোদ্ধার সঙ্গে দক্ষিণদ্বার অবরোধ করিয়াছিলেন।

যদুবংশের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা।

এই মহাসৈন্য ও রাজাধিরাজগণ পরিবৃত সম্রাট জরাসন্ধ যে তখন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান রাজা ছিলেন, তাহা মহাভারতাদি পুরাণে পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়। যে রাজধানীতে উত্তরকালে অশোক প্রভৃতি মৌর্যবংশীয় রাজগণ আসীন ছিলেন, তৎপূর্বে নন্দবংশ, এবং মৌর্যবংশের রাজত্বের অবসানে শুঙ্গবংশ ও গুপ্তসম্রাটেরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই রাজধানীর সর্বপ্রথম গৌরব জরাসন্ধের শিরে মুকুটরূপে শোভন করিয়াছিলেন এবং সেই গৌরব শিখা জরাসন্ধের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়াছিল। জরাসন্ধের সভাকালে শত শত ক্ষুদ্র রাজন্যের একত্র দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছিলেন, মনে হইতেছে মথুরার আকাশে শত শত বলাকাদল কি উড়িতেছে! এই মহাসৈন্য হইতে কৃষ্ণ সাগরের ন্যায় একটা গম্ভীর কলরব উত্থিত হইয়াছিল। হরিবংশকার বলিতেছেন এই সময় ভঙ্গীহেলনপূর্বক এক সমুচ্চ মঞ্চ হইতে জরাসন্ধ বলিলেন "চুপ"। তখন হিমাদ্রিকূলা স্থির কোন যোগিবরের ন্যায় জরাসন্ধকে দেখা যাইতেছিল। তাঁহার সেই আদেশবাণী ইঙ্গিতে সঞ্চারিত হওয়ামাত্র মহাসৈন্যসমুদ্র সকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিল, উত্তাল মহাসাগর যেন প্রশান্ত মহাসাগরে পরিণত হইল, রাজন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি সম্রাটের যোগ্য গম্ভীর কথায় আলাপী এক বক্তৃতা করিলেন।

এক সময়ে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতাপে জরাসন্ধের এই বিপুল সৈন্য প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল তখন ক্ষত্রিয়পতিতে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "হে ক্ষত্রিয়গণ তোমরা পলায়নোদ্যত হইয়াছ কেন? তোমাদিগকে ধিক্! বেশ, তোমরা যুদ্ধ করিও না, এইখানে দাঁড়াইয়া থাক, আমি স্বয়ং এই দুইটি রাখালকে (কৃষ্ণ-বলরাম) একাই বধ করিব তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখ।"

এই কথায় লজ্জিত হইয়া পলায়নপর সৈন্য ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

প্রবল ষোড়শকাল স্থায়ী যুদ্ধের পরও যদুকুল পরাস্ত হইল না, বহু সৈন্য ক্ষয় হইল, কিন্তু জরাসন্ধকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এদিকে তাঁহার প্রিয় কন্যা অস্তি এবং প্রাপ্তির বিলাপ ও উত্তেজনায় তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার যদুকুল ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প অটল হইয়া রহিল, তিনি পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

যদুকুল বিশেষরূপে বুঝিলেন, পরিণামে তাঁহারা জরাসন্ধের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। তাঁহার জনবল এবং অধীন নৃপতিবর্গ অনেক বেশী, বালির বাঁধ দিয়া এই মহাস্রোত তাঁহারা কতদিন ঠেকাইয়া রাখিবেন? তাঁহারা পরামর্শ করিয়া পিতৃতম জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্বক দূরদূরান্তরে বাস করিয়া নিরাপদে থাকাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। যদিও সমস্ত ধন-সম্পত্তি লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইল না, তথাপি কতক কতক মূল্যবান্ সামগ্রী লইয়া তাঁহারা পশ্চিমদিকে পলায়নপর হইলেন এবং তথায় রৈবতক পর্বত-বেষ্টিত রমণীয় কুশস্থলীতে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "তথায় একশ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহার গণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারিবে।"

অসংখ্য ভীরাজ্ঞুদের সাহায্যে ছলনা করিয়া কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কপট ব্রাহ্মণবেশে যাইয়া জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে মগধের সৈন্য কতকদিনের জন্য নিরস্ত্র হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিতে লিখিয়াছেন—"হিন্দুরাজত্বকালে অধিকাংশ সময়েই আধিপত্য মগধাধিপতির ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও মগধাধিপতি উত্তরভারতের সম্রাট্। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয়পক্ষের মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল, দেখা যায়। একা জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা ছিল বলিয়া উল্লিখিত।"

এই সকল সৈন্য-সংখ্যা ও প্রতাপের বর্ণনার কতকটা অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই আছে, তথাপি মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের কিছু পূর্বে জরাসন্ধ পূর্ব গগনের মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড ছিলেন। তাঁহার মত বলশালী ও প্রবল নৃপতি তখন ভারতবর্ষে অন্য কেহ ছিলেন না।

কিন্তু এই পরাক্রান্ত জরাসন্ধ নহেন, তখন আরও অনেকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সমস্ত আর্যাবর্তে স্থাপিত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে জরাসন্ধের পরেই পৌণ্ড্র বাসুদেবের নাম করিতে পারি। সেই সময়ের পৌণ্ড্র দেশ বঙ্গদেশের অনেকাংশে জুড়িয়াছিল, চীনক পরিব্রাজকগণ ও প্রাচীন ইতিবৃত্তকারেরা অনেকেই এই পৌণ্ড্র দেশের গৌরব কীর্তন করিয়াছেন। সমস্ত পুরাকালে ইহার দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে মহানন্দা, উত্তরে কৌশিকী ও করতোয়া নদী ছিল, উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পাবনা জেলার পূর্বাংশ বাদে এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ এই পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন পৌণ্ড্রের অনেকাংশ এখন পাবনা ও বরেন্দ্রভূমির মধ্যে পড়িয়াছে। সম্প্রতি দীক্ষিত সাহেব মহাস্থান হইতে যে মৌর্য লিপি-সংযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পাইয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে অশোকের সময় মহাস্থানেই পৌণ্ড্র দেশের রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনতিপূর্বে এই ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন বাসুদেব। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্র বাসুদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই দুরাত্মা মহাবল ও পরাক্রান্ত, আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মোহবশতঃ আমার শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করে, এই রাজা জগতে

* পৌণ্ড্র দেশ—মহাভারতোক্ত পৌণ্ড্র বাসুদেবের সময় হইতে এই দেশ বঙ্গদেশের একটা বিশাল ও সুবিস্তৃত অংশ ছিল। এর রাজধানী পৌণ্ড্র হইতে কুড়ি মাইল উত্তরপূর্বে ও বগুড়া হইতে ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। অনেকের মতে রাজসাহী দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মালদহ বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরাকালে মহানন্দা এবং করতোয়ার তীর পর্যন্ত পাকুড়ার সাম্রাজ্য বেষ্টন করিয়া পড়িয়া যাইত। কাহারও মতে দিনাজপুর বগুড়া ও রঙ্গপুর এই রাজ্যের প্রধান অংশ ছিল। একালে পৌণ্ড্র দেশ বলিতে সমস্ত উত্তরবঙ্গ বুঝায়।

বাসুদেব নামে বিখ্যাত এবং বঙ্গ, পৌণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি" (সভা, ১৩ অঃ)। হরিবংশের ভবিষ্যপর্ব্বের ৯৩ অধ্যায়ে পৌণ্ড্র বাসুদেবের দ্বারকা আক্রমণ সম্বন্ধে বিস্তৃত এক বর্ণনা আছে। নরককে কৃষ্ণ হত্যা করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বাসুদেবের প্রতিহিংসা বৃত্তি জাগিয়া উঠে। তিনি তাঁহার অধীন রাজগণকে আহ্বান করিয়া বলেন "এই গোপনন্দন কৃষ্ণ কোন্ সাহসে আমার নাম গ্রহণ করিয়াছে? জগতে একমাত্র আমিই 'পুরুষোত্তম বাসুদেব', এই উপাধি এবং চিহ্ন সে কেন গ্রহণ করিয়াছে? হে রাজগণ, আমার সুদর্শন অতি তীক্ষ্ণ, আমার সহস্রার মহাদেব চক্র, আমারই শার্ঙ্গ নামক মহাধনু ও কৌমুদিকী নামক বৃহৎ গদা—আমিই গদাধর—এই উপাধি গ্রহণের আর কাহারও অধিকার নাই। হে রাজগণ! যদি তোমরা আমাকে 'শঙ্খচক্র গদাধর' না বল, তবে তোমাদের প্রত্যেকের শতবার বধ ও বহু ধন্ত দণ্ড করিব"

কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ও মৃত্যু।

এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী পৌণ্ড্র বাসুদেব অক্ষৌহিণী রথ এবং বহু সহস্র গজারোহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ হইতে দ্বারকা অবরোধ করিবার জন্য একলব্য প্রভৃতি পরাক্রান্ত সামন্ত রাজাদিগকে সঙ্গে করিয়া অভিযান করিলেন, অবরোধকারীদের শত শত দীপশলাকার আলোকে সমস্ত দ্বারকাপুরী উজ্জ্বল হইয়াছিল। এই ভীষণ যুদ্ধে বহুসংখ্যক যদুবীর নিহত হইয়াছিলেন। সাত্যকির সঙ্গে অভিমান যুদ্ধে যখন পৌণ্ড্র রাজ একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন কৃষ্ণ আসিয়া চক্র দ্বারা যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিলেন কিন্তু তিনি পৌণ্ড্রকের অসাধারণ বীরত্বে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহার কি আশ্চর্য্য বীর্য্য, কি দুঃসহ তেজ!"

ইহার পর আমরা নরকবধের উল্লেখ করিব, হরিবংশে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি নরকের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ইনি ভূমিপুত্র,—কৃষ্ণের ঔরসে বিশ্বাস করিতেন না। নানারূপ উপপত্তি হইতে নিছক সত্যটুকু গ্রহণ করা বড়ই কঠিন, তবে একথা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, দেব-মাতা অদিতির দুইটি বহুমূল্য কুণ্ডল ইনি বলপূর্ব্বক লইয়া আসেন। প্রধানতঃ এই কারণেই ইন্দ্রাদি দেবতার প্রার্থনায় কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরক রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। নরক রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। নিশুম্ভ, পঞ্চজন, মুর ও হয়গ্রীব নামক সেনাপতিরা ইহার অসংখ্য সৈন্যের পরিচালনা করিতেন। এই প্রভাবশালী মিত্র-ব্যূহের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া নরক সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে অপরাজেয় এবং শেষ কীর্ত্তিমান্ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি যখন কৃষ্ণের আহ্বানে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন, তখন হরিবংশকার লিখিয়াছেন, স্বর্ণচক্র-সংলগ্ন শত শত মণিখচিত পতাকা-বেষ্টিত ইহার স্বর্ণময় রথ লোক চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছিল,—এই রথ অষ্ট লোহচক্রসংযুক্ত এবং বহুমূল্য হীরকখচিত যূপে আবদ্ধ বহু অশ্বধারা

নরকাসুর (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরক)। "মধুসূদনকর্ত্তৃকনিধনের পূর্ব্বে—ভরতের।

UNIVERSITY LIBRARY CALCUTTA CENTRAL

বাহিত হইত। রথটি লোহজালে রক্ষিত ছিল, পুরাণকার লিখিয়াছেন এই ওজঃ রথে সমাসীন রাজচক্রবর্তী নরককে সাক্ষাৎযমের মতো দেখা যাইতেছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণিত হইবে, এইজন্য তাহাকে সাক্ষাৎযমের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণ অতি কঠোর যত্নের পর তীক্ষ্ণ ভল্লফলকে নিশুম্ভের মস্তক ছিন্ন করিলেন— ক্রমে মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তিনি বাণদ্বারা চমূরীবের বক্ষ ভেদ করিলেন। শঙ্খফলকে মুরকে সংহার করিয়া এবং কঠোর যুদ্ধে পঞ্চজনের নিধন সাধনপূর্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ করিয়া তাঁহার বৈজয়ন্তী আকাশে উড়াইয়া দিলেন। ইহার পর স্বয়ং নরকের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ হরিবংশে এই যুদ্ধের উপাখ্যানের একটি কথা আছে কৌতূহলী পাঠক নিজে তাহা পাঠ করিবেন আমাদের এই পূর্বদেশের রাজারা যে কিরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, এই সকল বর্ণনাতে তাহার আভাস পাওয়া যায় নরকের মৃত্যুর পর তাহার শোকাকুলা জননী ভূমি বিলাপ করিতে করিতে অদিতির সেই কুণ্ডল দুইটি লইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন— হে কৃষ্ণ! তোমার লীলা কে বুঝিবে? বালক যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে তোমার খেলাও সেইরূপ তুমি যাহাকে দিয়াছিলে তাহাকে তুমি আবার নিজহস্তে হত্যা করিলে। যাহা হউক এই কুণ্ডল দুইটির জন্য তুমি নরককে হত্যা করিয়াছ, এই দুইটি কুণ্ডল গ্রহণ কর এবং নরকের সন্তানদিগকে রক্ষা করিও। আমাদের বঙ্গদেশে 'মধুসূদন নরক বিনাশন' পংক্তিতে মুর ও নরকের উল্লেখ আছে

মহাভারতে দুই স্থানে আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্বে হইতে পরাক্রান্ত রাজগণকর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের নরক, মুর প্রভৃতি দানব বাঙ্গলার রাজা ছিলেন ও সমুদ্রসেন বঙ্গের অতি প্রবল রাজা ছিলেন, ইঁহারা ভীমের দিগ্বিজয়ের সময় তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন ইহা ছাড়া বর্তমান হুগলী জেলার রাজা (কৌশিকী কক্ষপতি), তাম্রলিপ্তির রাজা, মাহিষকের (মোদা গিরির) রাজা, গুহ বা রাঢ়দেশের রাজা প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন অংশের রাজগণও ভীমকে সহজে পথ ছাড়িয়া দেন নাই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের উল্লেখ মহাভারতের অনেকাংশেই পাওয়া যায় এই সমস্ত রাজার প্রায় সকলেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাম্রলিপ্তির রাজা সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন

বৃহৎ বঙ্গের অন্যান্য রাজগণ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় আমাদের বৃহৎ বঙ্গ পরাক্রান্ত রাজগণের নিবাসস্থল এবং শ্রেষ্ঠ আর্যভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল অবশ্য বঙ্গদেশের পূর্ব-সীমান্তের রাজগণের প্রসঙ্গে যবন কিরাত, চীন ও বর্বর সৈন্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত আর্যাবর্তময় বৈবাহিক আত্মীয়তা ছিল তাহা প্রমাণিত হইতে পারে আমরা দেখাইয়াছি, এই বৃহৎ বঙ্গের কেহ কেহ সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুর সম্বন্ধে এদেশের দাবী

"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।"

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্মার্থ মুক্তং বচনং প্রমাণং।
যত্র প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তত্র কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং॥"

মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র প্রভৃতি স্থান বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত, তাহাদের ভৌগলিক সংস্থান সম্বন্ধে মতভেদ নাই, কিন্তু এই রাজ্যগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি স্থান আছে—যাহাদের ভৌগলিক সীমানা সম্বন্ধে মতভেদ আছে

মণিপুর—বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমান্তে যে মণিপুরের রাজারা বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেছেন,—তাহার সঠিক সংস্থান এখনও কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই

মহাভারতের প্রমাণ ধরিয়া বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মদেশস্থ মণিপুর অঞ্চলের মণিপুর কিনা—তাহা বিচার করা যাউক। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ২১৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"অর্জ্জুন কলিঙ্গতীর্থ ও ত্রিকলিঙ্গ পুণ্যতীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী অতিক্রম করিয়া চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাম্রলিপ্ত-পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহাসাগর উপকূল-মার্গে মণিপুর গমন করিলেন" সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ নন্দলাল দে মহাশয় তাঁহার Geographical Dictionary of Ancient India নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের যে মানচিত্র দিয়াছেন তাহাতে মহেন্দ্র পর্ব্বত তাম্রলিপ্তির ১০০ শত মাইল দক্ষিণে দেখান হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন উড়িষ্যার উত্তরে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত সমস্ত পর্ব্বত-শ্রেণীকেই মহেন্দ্র পর্ব্বত বলা হইত মহেন্দ্র পর্ব্বত অপরদিকে প্রায় বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তৎকালীন উড়িষ্যা রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, তবে একথা নিশ্চিত যে অর্জ্জুন ক্রমশ: পূর্ব্বদিকে যাইতেছিলেন, "মহেন্দ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া" অর্জ্জুন ক্রমে পূর্ব্বদিকে আসিয়া সাগরে পৌঁছিলেন, এই সাগর বাঙ্গলার সুপ্রাচীন সাগর-তীর্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে পূর্ব্বকালে সমুদ্র অনেকটা উত্তরে ছিল—সুতরাং বাঙ্গলার পূর্ব্বে "মণিপুর"—মহাভারতের মণিপুর হওয়া বিচিত্র নহে। ত্রিপুরার "রাজমালার"

"মিতাইলেক পাক।"

সারাংশ সঙ্কলন করিয়া কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে যে মণিপুর দৃষ্ট হয়, তাহার প্রাচীন নাম "মিতাইলেক পাক্" গত দুই শতাব্দীর মধ্যে শ্রীহট্টের বৈষ্ণব

অধিকারীরা এই দেশকে 'মণিপুর' আখ্যা দিয়াছেন এই সব বিচারসহ কিনা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে আমরা মণিপুরের ঐতিহাসিক পরিশিষ্টে তাহা দেখাইয়াছি

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উড়িষ্যা, এমন কি দ্রাবিড় রাজ্যের 'ম' অক্ষরযুক্ত নগরগুলির তালিকা হাতড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে সেই প্রাচীন 'মণিপুর' নাম দিয়াছেন। লাসেন (Lassen) চিকাকোলের দক্ষিণে "মনদুর কলঙ্গকে" মণিপুর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "প্রাচীন হিন্দুদিগের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থের" লেখক (Weapons of Ancient Hindus, pp 145-145) লাসেনের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং মাদুরার সন্নিহিত "মনপুরা" নামক স্থানকে বভ্রুবাহনের রাজধানী মনে করিয়াছেন। মিঃ রাইস্ (Rice) ইহাকে মহাভারতের "হস্তপুর" বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং অপর একজন লেখক চিঙ্গা হ্রদের তীরস্থ "মানিকপত্তনই" মণিপুর বলিয়া অনুমান করিতেছেন। সুতরাং "মণিপুর" নগরটি দ্রাবিড়দেশের "ম" যুক্ত নগরের নামের তালিকা প্রায় নিঃশেষ করিয়াছে, অথচ কোন মতেই সত্যের বিশেষ সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রবাদের মূল।

এতগুলি মতের মধ্যে বঙ্গদেশের চিরপ্রচলিত প্রবাদটি আমরা ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না। যখন মণিপুর নামক একটা প্রসিদ্ধ নগর এখনও বিদ্যমান এবং উহা পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত, তখাকার রাজারা বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া এখনও দাবী করিতেছেন—তখন বৃহৎ বঙ্গের ইতিহাসে সে কথাটা আমরা ছাড়িয়া দিব কিরূপে? অন্ততঃ প্রবাদটির উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করি

চেদি কোথায়।

চেদি—চেদি সম্বন্ধেও বঙ্গের একটা স্বীয় দাবী আছে। সে দাবী বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি যখন এখনও কোন মতই সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় নাই এবং একই নামে অনেক দেশ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পরিচিত, তখন প্রবাদ গুলির উল্লেখ করিতে দোষ নাই। "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" প্রবাদ সর্ব্বত্র অবিসংবাদিত সত্য না, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকা অসম্ভব নহে, অন্ততঃ সেই জনশ্রুতি অপর কোন বিষয়ের উপর প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোক পাত করিতে পারে। মহাভারতের সময় চেদি এক অতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে শিশুপাল জরাসন্ধের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন, বসুদেবের ভগিনী শিশুপালের মাতা ছিলেন কৃষ্ণ পিতৃস্বসার অনুরোধে শিশুর বহু অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রপ্রস্থে এই অপরাধের মাত্রা চরমে পৌঁছিয়াছিল, তখন কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "আমি যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে চলিয়া গিয়াছিলাম তখন শিশুপাল আমার মধুরাপুরী অরক্ষিত পাইয়া উহা দগ্ধ করে। আমার পিতা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন সে আমাদের যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, বীর যাদুল বিলালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করে, সৌবীর দেশে একাকী শতিপরাধনা বভ্রু পত্নীকে তাঁহার ঘোর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক লইয়া যায়।" রাজসূয় যজ্ঞসভায় শিশুপাল কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ

পণ্ড করিবার মানসে যেরূপভাবে সমবেত রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতের পাঠক সকলেই অবগত আছেন ইনি সেকালে যে একজন রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন এই রাজচক্রবর্ত্তী শিশুপালের চেদি কোথায়? কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতের অপর কয়েকটি দেশ। পূর্ব্বে টোন্স ও পশ্চিমে কালিন্দ্রী এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী, প্রাচীন চেদির অন্তর্গত ছিল এই স্থানটিই যেজন্যই হউক চেদি বলিয়া উল্লিখিত। রাজস্থানের লেখক টড অনুমান করেন, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চান্দেরি প্রাচীন চেদি। কাহারও কাহারও মতে গ্রীকগণ যে চন্দ্রাবতী (সন্ত্রাবতিস) নগরের নাম করিয়াছেন, তাহাই এই চান্দের এবং এই স্থানটি মহাভারতের শিশুপালের রাজধানী ছিল. ইহা ললিতপুরের ১৮ মাইল পশ্চিমে স্থিত এবং বর্ত্তমান চান্দেরির ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবশেষ দৃষ্ট হয়। আইন-আকবরীর মতে এই নগরী সুপ্রাচীন এবং এক সময়ে চন্দেল পরাক্রান্ত রাজাদের রাজধানী ছিল। ডাঃ ফুরার, জেনারেল কানিংহাম এবং বুলারের মতে বুন্দেলখণ্ডটাই প্রাচীন চেদিরাজ্য স্কন্দপুরাণ ও বেবাখণ্ডে 'পাহলমণ্ডল'ক বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম। প্রাচীন চেদি বলা হইয়াছে। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি যে সকল রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই 'পাহলমণ্ডল'—শোন ও নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানসংলগ্ন ভূভাগ ইহার অন্তর্গত মহাভারতের সময় এই প্রদেশের রাজধানীর নাম ছিল শুক্তিমতি, গুপ্তদের সময় চেদি রাজ্যের রাজধানী কালাঞ্জর এবং কলচুরিদের সময় উহা মহিষমতি নগরী নামে পরিচিত ছিল (নন্দলাল দের ভৌগলিক ইতিহাস, ৬৮ পৃঃ)

পূর্ব্বোক্ত মতগুলি যদিও ঠিক একটা জায়গাকে নির্দ্দেশ করে না, তথাপি মনে হয় মোটের উপর মহাভারতের বুন্দেলখণ্ডটাই প্রাচীন চেদিরাজ্য, বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ-প্রচলিত প্রবাদগুলি আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহি না ভারতবর্ষের প্রাচীন ভৌগলিক ইতিহাস এখনও সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠে নাই। এসময়ে প্রবাদগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন. হয়ত তাহার মূল্য নাই বলিয়া এখন মনে হইতেছে, কালে তাহার কোনরূপ মূল্য দাঁড়াইতে পারে

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে (১৮৭৫ খৃঃ, ২৮শে মার্চ্চ) "ভাওয়ালের ইতিহাস" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল. ইহার লেখক ভাওয়াল-জয়দেবপুর স্কুলের পণ্ডিত নবীনচন্দ্র ভদ্র তাঁহার পুস্তকের ২০১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "ভাওয়ালের উত্তর-পশ্চিমাংশে 'দিঘলীর ছিট' নামক বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা ও প্রাচীরের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে এক পরিখাই দৃষ্ট হয়, অধুনা তাহা ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ হওয়াতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়াছে। সুতরাং তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথানুসন্ধান করা দুঃসাধ্য, জনশ্রুতিতে জানা যায় ইহাই

রাজা শিশুপালের রাজধানী ছিল। উক্ত স্থানের মৈলাট গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃহদায়তন প্রাচীন পুষ্পোদ্যানের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহাতে বকুলবৃক্ষ, নাগকেশর ও গুলাচি এবং বৃহৎ বৃহৎ চাম্পক প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৃক্ষসকল দৃষ্ট হয়। জনরব আছে যে উহাই উল্লিখিত রাজার পুষ্পবাটিকা ছিল। লোকে উহাকে "কুল সাজনের গড়" বলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামের উত্তরাংশে শিশুপালের রাজধানী ছিল। চেদি যে কামাখ্যার অন্তর্নিবিষ্ট প্রদেশ তাহারও বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে শিশুপাল রাজার বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, অতএব বাহুল্য বিবেচনায় তদ্বিবরণ বর্ণনায় বিরত রহিলাম।"

"বহুদিন গত হইল, ভাওয়ালের মধীর মাঠের সন্নিধানে কতকগুলি অক্ষরযুক্ত একখণ্ড তাম্রপাত্র পাওয়া গিয়াছিল। তত্রত্য ভূতপূর্ব্ব তমিদার স্বর্গীয় মহাত্মা গোলোকনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয় তাহা আনাইয়া ঐ অক্ষরগুলি পড়াইবার জন্য অনেক যত্ন করাইয়াছিলেন কিন্তু কেহই তাহা চিনিতে না পারিয়া ঢাকার কোন বিজ্ঞ ইংরেজের নিকট পাঠান, তথায়ও কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে পারেন না। অবশেষে তাহা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। কিন্তু সেখানেও কেহ তাহা পাঠ করিতে না পারায় তাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। বোধকরি ঐ অক্ষরগুলি চাষা নাগরী হইবে। এখানে যাহারা চাষা-নাগরী অবগত আছে তাহাদিগকে ঐ তাম্রশাসন প্রদর্শন করা হইয়াছিল না। ভাওয়ালে

চাষা-নাগরী।

এখনও চাষা-নাগরী চলন জাতির মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছে, তাহারা বিলক্ষণ অঙ্কপাতনা ও হিসাবাদি করিয়া থাকে, চাষা নাগরীতে লিখিত কতিপয় পুস্তক তাহাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়" (২৫-২৬ পৃঃ)

পুস্তকখানির প্রারম্ভেই লিখিত আছে—"জনরব আছে যে ভাওয়াল রাজা শিশুপালের রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদি রাজা শিশুপালের রাজধানী—তদনুসারে ভাওয়াল চেদি রাজ্যের অংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন তন্ত্রের লিখনাভাসে কামাখ্যা দেশের দক্ষিণ সীমা বৃদ্ধগঙ্গা (বুড়ীগঙ্গা) ও চেদি দেশ কামাখ্যার অংশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে" (উপক্রমণিকা)। লেখক প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এককালে ভাওয়ালের আয়তন খুব বড় ছিল। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কতুল্লা প্রভৃতি স্থান ভাওয়ালের মধ্যে "এবং লাক্ষা নদীর পূর্ব্বে তুরাক্ নদীর পশ্চিমে বহুপরিমিত ভূমি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল"।

এই শিশুপাল খুব সম্ভব পালবংশের কেহ হইবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভীমসেনের পুত্র ধীমসেনের পৌত্র এবং রণধীরসেনের পুত্র হরিশ্চন্দ্রকেও কিংবদন্তী পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র

* এই তাম্রশাসনখানি এখন পাওয়া যায় না। হয় সম্ভবতঃ, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার উল্লেখ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। ইহার পাঠোদ্ধার হয় নাই তাই রবীন্দ্রনাথ মহাশয় ইহার একটা আনুমানিক পাঠোদ্ধার দিয়াছিলেন, তাহাতে স্থির হয়েছিল যে ইহা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল

স্থির করিয়া দাক্ষিণাত্যের নিকটবর্তী জনপদে অনেক উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিল, ভীম কৈবর্তের জাঙ্গালকেও মধ্যম পাণ্ডবের কীর্ত্তি বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। এই শিশুপালকেও তদ্রূপ মহাভারতোক্ত শিশুপালের সঙ্গে এক করিবার কি-বদ্ধমূল প্রচলিত হইতে পারে। মহাভারতের সময়ে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও নাগকেশর এবং গুলাচি পুষ্প তদ্বর বন্য যে এখনও বর্ত্তমান আছে—তাহা বিশ্বাস করা হয় না। কিন্তু মহাভারতের সেই অংশ আলোচনা করিলে দেখা যায় ভীম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রথমতঃ পাকাল, তৎপরে ক্রমান্বয়ে বিদেহ (মিথিলা) ও গণ্ডক দেশবাসীদিগকে জয় করিয়া দশার্ণ দেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রাজার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয়পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথায় প্রবল পরাক্রান্ত রোচমানকে জয় করিয়া পূর্ব্ব দেশ অধিকার করিলেন। তৎপরে মণিকে যাহারা পুলিন্দদিগকে পরাজিত করিয়া শিশুপালের রাজ্য চেদি দেশে উপস্থিত হইলেন।

ভীম কর্ত্তৃক পূর্ব্বমুখী যাত্রা।

তারা তন্ত্রে লিখিত আছে, পুলিন্দদেশ ত্রিহুতের পূর্ব্বে এবং কামরূপের উত্তরে,—(নন্দলাল দের প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক অভিধান ১৯১ পৃঃ) এবং গণ্ডকী নদী নেপালগিরি হইতে উৎপন্ন (তিব্বত দেশের দক্ষিণ সীমান্তে এবং বিশেষঘাটের সন্নিহিত কোন স্থান হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে (৬০ পৃঃ)।

গণ্ডক নদী সম্বন্ধে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভীম ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া চেদিমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই মত একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

বরঞ্চ মহাভারতের একটি উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় চেদি দেশ বঙ্গের সন্নিহিত ছিল। পৌণ্ড্র বাসুদেবের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, "এই পৌণ্ড্র বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি ও সমস্ত চেদিদেশে সুবিখ্যাত" (সভা, ১৩ অঃ)। এক নামে ভিন্ন ভিন্ন যুগে নানা প্রদেশ বুঝাইত—তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং চেদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম হওয়াও বিচিত্র নহে।

এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের ভার ভাবী প্রাচীনভারতের ইতিহাস লেখকের উপর আমাদের পক্ষে এই প্রচেষ্টা আঁধারে ঢিল ছোড়াছুড়ির মত।

নবীনচন্দ্র ভট্ট মহাশয়ের "ভাওয়ালের ইতিহাসে" প্রসঙ্গক্রমে যে কথাটা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা এত প্রয়োজনীয় মনে করি যে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। এই যে চাষা-নাগরীর কথার এখানে উল্লেখ হইল হয়, এ কথাটা আমার কাছে একেবারে নূতন। তবে কি ব্রাহ্মী লিপি কিম্বা গুপ্ত লিপির অনুশীলন দেশ হইতে এখনও পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই? সমাজের উপরকার স্তরে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারা নানা দেশের সংস্পর্শে আসিয়া যুগে যুগে রীতি, নীতি, ভাব ও ভাষার অনেকরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এমন কি অনেক সময়ে ভিন্নদেশাগত বিজয়ী বীরদের অত্যাচারে কখনও কখনও সমাজের

বিহারের সাঁওতাল ও চাষির উপভাষা রক্ষা।

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা একেবারে বিলুপ্ত হন, নতুবা মেশাসেরা হইয়া আত্মরক্ষা করেন কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণী সেই ঝড়ের উৎপাতে একেবারে নষ্ট হয় না খাল, তমাল তাড়িয়া প্রভৃতন লীলা করেন, কিন্তু তিনি ক্রমশঃকালের একটিও শিখা ভাঙ্গেন না দেশের প্রাচীনতম আচার, নীতি এমন কি শিক্ষা দীক্ষা, কলাবিদ্যা—এ সমস্তই দেশের নিম্নতম স্তরের কুটিরে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে, এদেশে যে তাহা হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পরে দিব এই নিম্নশ্রেণীর লোকেরা জাতীয় প্রাচীন সম্পদের অন্তঃপুরের দ্বারস্বরূপ ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা এই অন্তঃপুরে যতটা রক্ষিত আছে উচ্চশ্রেণীর সমাজে তাহা নাই এই জন্যই কি ডাওয়ালের জঙ্গলে চঞ্চালেরা সেই প্রাচীন লিপি এখনও বজায় রাখিয়াছে? এবং প্রাজ্ঞযানী ভদ্রলোকেরা নাসিকা কুঞ্চন করিয়া সেই লিপির নাম দিয়াছেন "চাষা-নাগরী"? এই নাগরীতে লেখা পুঁথিও কিছু ছিল। যে অক্ষরগুলির অবলম্বিত লিপিকেই কি ব্রাহ্মণেরা "চাষা নাগরী" নাম দিয়া তাহাদের ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন? ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, এই চাষা নাগরীতে জ্ঞানসম্পন্ন লোক ও চাষা নাগরীতে লিখিত পুঁথি ডাওয়ালে চঞ্চালদের মধ্যে ছিল। এই ৫৭ বৎসরে কি তাহা লোপ পাইয়াছে? বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহার খোঁজ করা একান্ত প্রয়োজন, অধিক, এই "চাষা নাগরী"র অর্থ কি "হিন্দুস্থানী লিপি"?—তাহা বলিয়াও মনে হয় না, হিন্দুস্থানীরা বহুকাল যাবৎ বাঙ্গলার নানা স্থানে বাস করিতেছে তাহাদের নাগরীর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে তাহাদের নাগরীর এইরূপ অদ্ভুত নাম কেনই বা হইবে? ব্রাহ্মীলিপির জ্ঞান যদি এদেশে নষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা বৌদ্ধ বিদ্বেষের ফলে হইয়াছে দেব নাগরীর প্রাবল্যের যুগে বৌদ্ধ যুগের লিপি কতাদৃত হইয়াছিল এবং উচ্চশ্রেণীর তাহা সমাজের নিম্নস্তরে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। সেই লিপির "চাষা নাগরী" নাম হওয়াও অসম্ভব নহে।

'ত্রিপুরদেশে দ্রুহ্য

ত্রিপুরদেশ—যযাতিপুত্র দ্রুহ্যু ত্রিপুররাজ্যে আগমন সম্বন্ধেও বহু প্রবাদ এদেশে চলিয়া আসিয়াছে পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত দ্রুহ্যু এক বস্ত্রের রাজ্যে চলিয়া গেলেন মহাভারতের আদি পর্বের ৮১ অধ্যায়ে এই অভিশাপের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে দ্রুহ্যুকে যযাতি বলিলেন "তুমি সেই দেশে যাও, যেখানে অশ্ব, গজ, রথ, পর্ব্বত, ছাগ বা মেষবাহিত কোন যানবাহনের সুবিধা নাই। যেখানে একান্ত নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলেও ভেলার আশ্রয় করিতে হয় বড় নৌকার যাতায়াতের উপায় নাই অথবা সাঁতার কাটিয়া যাইতে হয়।" কিন্তু সেই দেশ কোন দেশ, তাহা মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই বিষ্ণুহরিবংশে (৩০ অঃ, ১৮২০ শ্লোক) উল্লিখিত হইয়াছে—যযাতি সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন এই বিভাগানুসারে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর ভাগ দ্রুহ্যু পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণানুসারে (৪র্থ অংশ, ১০ম অঃ, ১৭-১৮ শ্লোক) উহা পশ্চিম দিক্ পাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে (৯ম স্কন্ধ, ২৩ অ, ১৪।১৭ শ্লোক) তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণগুলির মধ্যে অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য শঙ্করগ্রন্থে সংকলয়িতা রাধাকান্তদেব বাহাদুর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—তাহা শঙ্করগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে "যযাতি যখন সমস্ত কনিষ্ঠ পুত্রকে পৃথক্ রাজচক্রবর্তিত্ব দান করেন তখন দ্রুহ্যকে দক্ষিণ পূর্বপ্রান্ত, তুর্বসুকে দক্ষিণপ্রান্তস্থ ভূখণ্ড, অনুকে উত্তর পূর্বপ্রান্ত, পুরুকে মধ্যদেশ দান করেন। তখন দ্রুহ্যকে পূর্বদিক্ দিয়া পশ্চিমের তুর্বসুকে উত্তরাঞ্চলের অনুকে এবং পুরুকে মধ্যদেশের চক্রবর্তী করেন।"

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্রুহ্য পূর্বদিক্ পাইয়াছিলেন। যাহারা দ্রুহ্য হইতে ত্রিপুররাজবংশাবলীর বংশলতা অঙ্কিত করেন তাঁহারা বলেন—"কোন কোন পুরাণে যে দ্রুহ্যকে পশ্চিমদিকে প্রেরণের কথা পাওয়া যায়, তাহা হয়ত লিপিকরের প্রমাদ বা শ্রোতার ভ্রমবশতঃ ঘটিয়াছিল ইহাই বুঝা যায়।"

আসু ত্রিপুরার যে সকল সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ইতিহাস আছে তাহার কতকগুলি ৪ শত বৎসরের প্রাচীন, ইহাদের লেখকগণ সকলেই একবাক্যে ত্রিপুরেশ্বরগণের পূর্বপুরুষ যযাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজরত্নাকরের ষষ্ঠ সর্গে (৫১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ও রাজমালার প্রথম অধ্যায়েও এই কথা আছে। রাজমালা পুস্তকখানি প্রাচীন, ইহাতে লিখিত আছে যে চন্দ্রেশ্বর ও বালেশ্বর নামক শ্রীমন্ত্রমালিকা রাজার দুই সন্তানপ্রতি ত্রিপুরা ইতিহাস সঙ্কলন করিতে নিযুক্ত হন। চতুর্দশ দেবতার প্রধান পাণ্ডা ধ্রুবেন্দ্র চন্তাই। ইঁহাদিগকে সহায়তা করেন, তাহারা রাজমালিকা, যোগিনীমালিকা, রাজরত্নাকরিণী, হরগৌরীসংবাদ ও লক্ষ্মণমালিকা নামক পুরাতন সংস্কৃত ঐতিহ্যগ্রন্থ আলোচনা করিয়া বিশেষ চন্তাইগণ কথিত ত্রিপুরাহাসের প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনপূর্বক রাজমালা সঙ্কলন করেন। রাজমালা পুস্তকখানি সেই যুগের বাঙ্গলা ভাষার একটা কীর্তিস্তম্ভ। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী হইতেও ইহার বর্ণিত বৃত্তান্ত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু প্রথম কয়েক অধ্যায়ে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ও কল্পনার লীলাখেলা আছে। এই কয়েকটি অধ্যায় সম্বন্ধে অবশ্যই বিদ্য আছে। ত্রিপুরার রাজবংশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস-লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ ওদাকার রাজন্যবর্গের যযাতি হইতে উদ্ভবের দাবী অস্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কামরূপের স্থানরাজাদের বংশধর বলিয়া মনে করেন এবং 'বিশ্বকোষ'কার হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া তাহার পশ্চিম হইতে উপনিবেশ স্থাপনের মতটারই পক্ষপাতী।

এই জটিল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা এখানে না করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে আমি সঙ্কল্প করি নাই। কিন্তু রাজরত্নাকরে ত্রিপুর হইতে বর্তমান পদাশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য পর্যন্ত যে ১৮৫ জন নৃপতির বংশলতা পাওয়া যায়—তাহার অনেকাংশই ঐতিহাসিক বিচারসহ ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুর রাজন্যবর্গের মত এরূপ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে ভারতবর্ষের বর্তমান অন্য কোন বংশকে দেখা যায় না। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। ভারতের ক্ষত্রিয় কুলতিলক চন্দ্র-সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের অভিমানী আর্য্যাবর্তের প্রধান প্রধান রাজগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই দেশান্তর আশ্রিত এবং উত্তরকালে ব্রাহ্মণাদৃতে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উচ্চ

শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং কোন রাজবংশে যদি আর্য্যসমাজের বহির্ভূত কোন সম্প্রদায়ের শোণিত প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা সার্ব্বজনীন রীতির দ্যোতক,—নিন্দার্হ নহে।

এই অধ্যায়টী একটু বড় হইল যে কয়েকটি রাজবংশের কথা লিখিত হইল, তাহা ছাড়া আরও অনেক রাজবংশ বাঙ্গলাদেশে দ্বাপরযুগের ঐতিহাসিক মঞ্চের অভিনেতৃস্বরূপ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন নানারূপ লৌকিক প্রমাণের মিশ্রসত্যের একথাটা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে মহাভারতীয় যুগের বাঙ্গলাদেশ, বিদ্যা-গৌরবে, বল-প্রতিষ্ঠায় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটি অতি শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল যুগে যুগে সমস্ত আর্য্যাবর্তের এমন কি তৎকালপরিচিত ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম রাজশক্তি দিল্লী ও মগধ ইহাদের একতমের রাজধানীর আধিপত্য স্বীকার করিয়াছে। আমরা বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন পুঁথির কোন কোনটিতে দেখিয়াছি 'সকল ইন্দ্রপ্রস্থের' দোহাই দেওয়া হইয়াছে। তৎসঙ্গে বাঙ্গলা চিরদিন দিল্লীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আসিয়াছে ঐরূপ দোহাই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পরিচায়ক।

ইংরেজীর বিশ্রুত ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় দাবী করিতেছেন, শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থান এককালে মহাভারতের ভগদত্তের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বগুড়ার ইতিহাস-লেখক প্রত্নতত্ত্বিদ্ সেন বলেন যে উক্ত জেলার মহাস্থানগড় নামক স্থানটি সুপ্রসিদ্ধ পৌণ্ড্র বাসুদেবের রাজধানী ছিল। দিনাজপুরের ইতিহাসে ঐ দেশের কোন কোন অংশকে কৃষ্ণের সৈন্য অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাণরাজ ঊষার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের লীলাভূমি বলিয়া বর্ণিত আছে মেদিনীপুরের ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলটা ভীমকৃত বক রাক্ষসবধের লীলাস্থল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এইভাবে বঙ্গদেশের কোন কোন অংশ বিরাটের গোগৃহ এবং কীচক-বসতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে সত্য সত্যই মহাভারতের সময়ে হুগলীর নিকট সপ্তগ্রাম নামক এক বিরাট রাজ বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু যতগুলি কিংবদন্তী স্থানীয় লেখকগণ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দ্বিধাশূন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রমাণাভাবে তাহার অনেকগুলিই অশ্রদ্ধেয় ১৮৭১ খৃঃ প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়কৃত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, সুবর্ণগ্রামের (জেলা ঢাকা) সন্নিহিত লাঙ্গলবন্ধে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব আগমন করিয়াছিলেন (২০ পৃঃ) সুবর্ণগ্রাম নাম সম্বন্ধে এই লেখক বলেন—"জনশ্রুতি যে অতি প্রাচীন কালে আকাশ হইতে এই বিস্তৃত ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল, তদবধি ইহা সুবর্ণগ্রাম নামে আখ্যাত হয় সুবর্ণ বা সুবর্ণবৎ কোনও পদার্থের বর্ষণ অসম্ভব কথা নহে ৮১০ খৃঃ অব্দে ইউরোপের অন্তর্গত হাঙ্গেরী দেশে রক্ত ও অন্যান্য সময়ে পশুভক্ষণের বস্তু এবং ১১৭৪ শকের ১৪ চৈত্রে চীনদেশে বালুকাবৃষ্টি হইয়াছিল ১৮৮৭ খৃঃ ১১ই আগষ্টে বোম্বাই সহরে প্লাটিনাম্ বৃষ্টি হইয়াছিল" (২ পৃঃ

জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু নিছিমার গল্পগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার এইরূপ পাণ্ডিত্যের প্রচেষ্টা দেখিলে মনে হয় আমাদের লেখকেরা

অনেক সময়ে বৃথা পাণ্ডিত্যের দেখাইতে যাইয়া ইতিহাসকে তাহারদের এলাকার পর্যন্ত লইয়া আসেন, তখন তাঁহাদের অবলম্বিত প্রবীণ অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য্য কৌতুক ও কৃপার উদ্রেক করে।

আমার নিকট বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় রাশি রাশি প্রাদেশিক ইতিহাস চড়ান রহিয়াছে। এই সকল ইতিহাসের কতকটা মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ সম্বন্ধে তাঁহাদের উল্লিখিত অনেক তথ্যই মূল্যবান, অনর্গলিত লিপিবদ্ধ কথা অশ্রদ্ধেয় নহে, কিন্তু এই সকল প্রাদেশিক বিবরণীর অধিকাংশে ইহারা যখন পৌরাণিক যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অধিকাংশ স্থলেই ইহারা পাণ্ডুপুরুষের লইয়া যুক্তি-তর্কের আড়ম্বর করিয়া বৃথা ধস্তাধস্তি করিয়াছেন। তারশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির প্রমাণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী না জানার ফলে অনেক সময়ে তাঁহাদের শ্রমগুলি উপহাসাস্পদ হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে একটি কথা এই যে মনুসংহিতার প্রচারকগণ সমস্ত দেশটা মহাভারতের ছাঁচে ঢালিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দুর পুরাণ ছাড়া এ দেশে আর কোন বিষয়ক ঘটনার অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। এইভাবে বিগত সহস্র বৎসর পূর্বের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইসাব্দীয়ন্কালে ব্রাহ্মণগণ যেখানে যেখানে বৌদ্ধ যুগের নিদর্শন ছিল—তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। চন্দ্র-সূর্য্যবংশের গৌরব লোকচক্ষে তাঁহারা খুব অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে যে কোন রাজা আছেন, তাঁহাদের আদি পুরুষকে মহাভারতের কোন দেব-বিদগ্ধ বীরের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া, বংশলতা টানিয়া আনিয়াছেন। বঙ্গদেশের সকল রাজার সম্বন্ধেই ঐরূপ ঘটিয়াছে। শুধু এদেশে নহে, রাজপুতনা প্রভৃতি দেশেও সূর্য্যবংশের গোঁজামিল একইভাবে হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম দিকটা সূর্য্যবংশের ও পূর্ব্ব দিকটা চন্দ্রবংশের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং রাজাদিগের আদিপুরুষের কথাটা একেবারে ইতিহাস হইতে বাদ দিলেও মন্দ হয় না। যতই কেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হউক না কেন, ঐতিহাসিকগণ এই সকল বংশ-লতার মূলপাতটা খুব সুচক্ষে দেখিবেন না। বালি দ্বীপের হিন্দুগণ তাঁহাদের দেশে অযোধ্যা, মথুরা, ইন্দ্রপথ প্রভৃতি সমস্ত স্থানই দেখাইয়া থাকেন। এ দেশের ইতিহাসকেও ব্রাহ্মণগণ মহাভারতোক্ত তীর্থে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ ইতিহাস মুছিয়া ফেলিয়া ছিলেন। যাহা হউক এই অধ্যায়ে যে সকল কথা লিখিত হইল তাহা হইতে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, মহাভারতের যুগে আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ সার্ব্বভৌম নৃপতিদের নিবাসভূমি ছিল। শিশুপালকে বাদ দিলেও জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, নরক, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজারা আর্য্যাবর্তের যে কোন নৃপতি হইতে শৌর্য্য, বীর্য্য ও ক্ষমতায় ন্যূন ছিলেন না, ইহারা এই দেশের প্রাচীন যুগের গৌরব।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিদ্বেষ

নানাদেশের প্রভাবে মতের স্বাধীনতা

কেশবেন কৃতং কর্ম জরাসন্ধবধে তথা
ভীমসেনাজিনাভ্যাঞ্চ কৃষ্ণং সাক্ষিণমব্রবীৎ।
অস্মাকমেষ প্রবিষ্টেন ছদ্মনা ব্রহ্মবাদিনা॥
দৃষ্টঃ প্রত্যয়ঃ কৃষ্ণেন জরাসন্ধস্য তৃপ্যতেঃ॥

—মহাভারত, সভা, ৪১ অঃ, ২১৩।

পুরাকালে পূর্বভারতের রাজারা অধিকাংশই শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা যজ্ঞ-বিদ্বেষী এবং কিরাত, মেচ, কুকি চাকমা, হাজং, খস প্রভৃতি জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, শিব অনুচরগণের বিকৃত দেহ ও অদ্ভুত মুখ কল্পনা করিবার কারণ ইহাও হইতে পারে। প্রাচীন শৈব ধর্ম এ দেশে প্রচলিত ছিল। শিবের সঙ্গে এ দেশের রাজারা নানাভাবে আত্মীয়তা কল্পনা করিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন। এই দেশে একসময়ে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল। ত্রিপুরারাজের ত্রিলোচন এবং কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ শিবের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। হরিবংশে লিখিত আছে মহারাজ বাণকে শিব এত ভালবাসিতেন যে স্বীয় পুত্র কার্তিকেয় হইতে তাঁহার আদর বেশী রাখিতেন, বাণ-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ—সর্বপ্রকার শিবলিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বাণলিঙ্গ নামে অভিহিত। কোচদের সঙ্গে নানারূপ শিবলীলা উপকথার বিষয়ীভূত হইয়া আছে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী বর্ণিত আছে। শাক্যতা জাতিদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেশামেশি, যজ্ঞ-বিদ্বেষ ও কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা ইত্যাদি কারণে পূর্বদেশের রাজারা ক্ষত্রিয় হইয়াও 'দানব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ, বাণ, ভগদত্ত নরক ও মুর প্রভৃতি রাজারা ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও দানব নামে পরিচিত। ইঁহারা যে আর্য সমাজভুক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক সাহিত্যে লিখিত আছে যে, পূর্বদেশীয় রাজারা অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্যনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম-ভারতীয়, চন্দ্রবংশীয় ও যদুকুলের রাজাদের সঙ্গে ইঁহাদের কুটুম্বিতা ছিল। জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে মহারাজ কংস এবং বাণের কন্যা ঊষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষের জন্য ক্ষত্রিয়পুরুষ হয়ে 'দানব'

শব প্রভাব

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়দেবকৃত কৃষ্ণস্তোত্রে তাঁহাকে "কংসদানবঘাতন" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শৈব রাজাদের অনেকেই যজ্ঞে পশুবলির প্রতিবাদী ছিলেন। নরকের বিরুদ্ধে ইহাই প্রধান অভিযোগ ছিল স্বয়ং শিব শুদ্ধের যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন। সমস্ত বাঙ্গলাদেশ এক সময়ে কৃষ্ণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধবাদী ছিল। দেশ ব্যাপিয়া সেই সময়ে ধোলাইয়ের ধারা উঠিয়াছিল, কৃষ্ণ-সমাশ্রিত ব্রাহ্মণাধর্ম এদেশে সে যুগে সমাদৃত হয় নাই। পরবর্তী কালে যজ্ঞ নিষেধকারী, সাম্য-প্রচারক, করুণাঘনি বুদ্ধদেবকে শিব তাঁহার সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বহুযুগ পরে যখন এ দেশ কৃষ্ণকে স্বীকার করিল, তখন তাঁহাকে শঙ্খচক্রগদা ছাড়িয়া এ দেশের মাটিতে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল বাঙ্গালী তাঁহার হাতে একটি বাঁশী দিয়া তাঁহার আত্মগতা স্বীকার করিল। এ দেশ কখনই ঐশ্বর্যকে গণ্য করে নাই, বল দিয়া এ দেশ কখনই জয় করা যায় নাই; বাঁশীর সুরে—প্রেমের আহ্বানে বাঙ্গালী চিরকাল সাড়া দিয়াছে।

জরাসন্ধের চরিত্রে বৃহৎ বঙ্গের রাজনীতি অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে কৃষ্ণের নীতি ও জরাসন্ধের নীতি দুই ভিন্ন সামগ্রী। ইন্দ্রপ্রস্থের নীতি "যারি অরি পারি যে কৌশলে" কৃষ্ণ ধর্মাবতার সাধুচরিত্র যুধিষ্ঠিরের মুখে মিথ্যাকথা কহাইয়া গুরুবধ করাইয়াছিলেন, রাজনীতি উল্লঙ্ঘন করিবার ইঙ্গিত দিয়া অর্জুন ভীষ্ম কর্তৃক দুর্যোধনের হত্যা ঘটাইয়াছিলেন, ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন; ছদ্মবেশে সিন্ধুরাজপুরে প্রবেশপূর্বক উপবাসী জরাসন্ধের এবং কৌশলে নিরস্ত্রাবস্থার চাতুরী খেলিয়া জরদ্রথের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন।

এগুলি মহাভারতের উপকথা মাত্র। কিন্তু পূর্বভারতের যাহা কিছু কাব্যকথা ও গল্প তাহাদের সকলের মূলে সনাতনধর্মাশ্রিত মহানীতির পরিচয় জাজ্বল্যমান। মহাভারতেও জরাসন্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব

জরাসন্ধের রাজনীতি।

যুগে যুগে রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও রাজধর্মের মূলভাবের পরিবর্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমুদ্র যেমন তাহার নিজতাত্ত্বিক লঙ্ঘন করে না,—মহারাজ জরাসন্ধ তদ্রূপ সেই যুগে আচরিত রাজনীতি উল্লঙ্ঘন করেন নাই। প্রথমতঃ জরাসন্ধ যদুবংশীয়দের প্রবল প্রতাপ সম্বন্ধে সম্যক বিদিত হইয়াও স্বয়ং যুদ্ধকামী বা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির ইচ্ছুক হইয়া বিনাকারণে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই এমন কি যখন কৃষ্ণ জরাসন্ধ জামাতা কংসকে নিধন করেন—তখনও যদুবংশধ্বংস করিতে উদ্যত হন নাই কিন্তু যখন তাঁহার প্রিয় কন্যা অস্তি তাঁহাকে স্বীয় স্বামিহন্তার প্রতিশোধ লইতে ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া করুণ আর্তনাদে রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিয়া তুলিলেন, তখন তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিলেন প্রথম অভিযানে যদুবীরেরা তাঁহার অসামান্য শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল; কিন্তু অস্তি তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেন নাই, ক্রমাগত উত্তেজিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া জরাসন্ধের সামরিক অভিযানগুলির ইতিহাস যোগাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জুন যে ভাবে যাইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন, তাহা নীতিবিগর্হিত তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গুপ্তদ্বার দিয়া মগধ রাজধানীতে গিয়াছিলেন তাঁহারা গুপ্তভাবে জরাসন্ধের বিষবিলক্ত কেরীত্রয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত চৈত্যস্তম্ভ ভঙ্গ করিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন জরাসন্ধ অতি বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগের আতিথ্যসৎকার করিতে উদ্যত হইলেন কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিলেন না. তাই বলিয়া জরাসন্ধ যে তাঁহাদের কার্য্যাবলীর খবর রাখিতেন না, তাহা নহে গুপ্ত চরের মুখে তাঁহাদের প্রবেশ অবধি চৈত্য ও কেরী-ভঙ্গের সমস্ত খবরই তিনি জানিতেন. কিন্তু আতিথ্য-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার জন্য তিনি গৃহাগত স্নাতক ব্রাহ্মণবেশধারিগণের প্রতি কিছুমাত্র প্রতিকূলাচরণ করেন নাই কৃষ্ণ যখন বলিলেন, "আমরা তোমার শত্রু," তখন ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের করায়ত্তে পাইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন সেই অদ্বিতীয় বীরসম্রাট্ বিনীত ও শান্তভাবে বলিলেন, "কই, আমি ত আপনাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না" এরূপ সংযতেন্দ্রিয় বিনয়ান্বিত পুরুষকে শুধু ক্ষাত্রবীর বলিয়া নহে—একজন বস্তুনিষ্ঠ নীতিমান্ পুরুষ বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবগণের সহিত মগধে যাত্রা করেন তখন তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল,—এইভাবে গোপনে জরাসন্ধকে হত্যা করিতে পারিলেও "তাঁহার অন্যান্য স্বপক্ষগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা নিহত হইতে পারেন।"

জরাসন্ধের অপূর্ব্ব সংযম।

কিন্তু যখন কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন—তখন জরাসন্ধ স্বীয় সৈন্যগণ দ্বারা বা তাঁহার বিশ্বস্তা সেনাপতিদিগের দ্বারা তাঁহাদের বধ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন না কৃষ্ণকে তিনি 'দাস' বলিয়া ঘৃণা করিতেন—(মহা, সভা, ৪১ অঃ ১৭শ শ্লোক), তাই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না অর্জ্জুনাপেক্ষা ভীমকেই সমধিক দৈহিক বলসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকেই তাঁহার কথঞ্চিৎ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনোনীত করিলেন। তখন মহারাজ জরাসন্ধ কোন ব্রত পালন করিয়া উপবাসী ও পরিশ্রান্ত ছিলেন, এই অবস্থায় তিনি ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি তৎপুত্র সহদেবকে সেনাধ্যক্ষে অভিষিক্ত করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বৈদ্য নানারূপ প্রলেপ ও ঔষধ লইয়া উপস্থিত রহিলেন, ইহাই তাৎকালিক বৈরথ যুদ্ধের নীতি ছিল জরাসন্ধের আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য সৈন্য তামাসগীরের মত কুতূহলী হইয়া সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত রহিলেন জরাসন্ধ অক্ষরে অক্ষরে ক্ষাত্রনীতি পালন করিয়াছিলেন কত বড় সংযম তাঁহার ছিল যে উপবাসক্লিষ্ট শরীরে—বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সামন্ত-রাজগণ-পরিবৃত থাকিয়াও—সমস্ত সুবিধা তুলিয়া উপেক্ষাপূর্ব্বক স্বীয় প্রাসাদে, স্বজনের মধ্যে নিরাশ্রয় অবস্থায় কূটচক্রী শত্রুগণের যুদ্ধের আহ্বান এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনজন যোদ্ধার মধ্যে তাঁহাকে দৈহিক বলে ও শস্ত্রশস্ত্রাদিতে যোগ্যতম মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকেই স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। এহেন অকুতোভয় ক্ষাত্রনীতির সাক্ষাৎ আদর্শগ্রহণ। বীরবরের উপবাস ও ব্রতশ্রমের কথা জানিয়াও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তদ্দণ্ড সমস্ত সুবিধা দিধাশূন্যভাবে অম্লানচিত্তে গ্রহণ করিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। জরাসন্ধের

চরিত্রে সম্রাটের যোগ্য শ্রেষ্ঠগুণের সঙ্গে সংযমের অপূর্ব মহিমা মিলিয়া গিয়াছিল, তিনি তাঁহার কপটাচারী শত্রুদিগের সঙ্গে কথাবার্তায় শিশুপালের ন্যায় অসংযত ক্রোধ বা অসভ্যতা ব্যবহার করেন নাই। ইহারই সিংহাসন উত্তরকালে মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন

কৃষ্ণ মগধরাজের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, জরাসন্ধ তাহাদের সকলগুলিরই নিরাসন করিয়াছিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগ—যাহা আমরাও প্রতিবাদ করিতে বিধা বোধ করি—তাহা তাঁহার মহাদেব মন্দিরে একশত রাজাকে বলি দেওয়ার সংকল্প।

অভিযোগ ও তাহার উত্তর।

এই নিষ্ঠুর ও বর্বরজনোচিত ব্যবহার সমর্থন করা যায় না। কিন্তু জরাসন্ধ এই অভিযোগের উত্তরে কি বলিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য —"হে কৃষ্ণ! আমি কোন রাজাকেই জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। বিক্রমপ্রকাশপূর্বক লোককে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম" সুতরাং দেখা যাইতেছে এই ৮৯জন রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, তিনি বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করিয়া বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়াছিলেন পূর্বেই বলা হইয়াছে জরাসন্ধ সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্মের প্রতীক ছিলেন। এই ক্ষাত্রনীতিরক্ষাকল্পে তিনি শত্রুদিগকে করায়ত্ত পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি অলৌকিক মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং ত্রয়োদশ দিবস নিরন্তর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ভীমহস্তে নিহত হইয়াছিলেন সেই যুগের রাজনীতির আদর্শ ভিন্নরূপ ছিল, কিন্তু তাহা যাহাই থাকুক না কেন, তিনি তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন বন্দী রাজগণ সম্পর্কে তিনি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "আমি ক্ষাত্রধর্মাবলম্বী, দেবপূজার জন্য রাজগণকে আনিয়াছি, এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিব?" (মহাভারত, সভা, ২২ অঃ।)

আর্যাবর্তের পূর্বাংশের এই সকল রাজগণের প্রায় সকলেই কৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন, এই জন্যই কৃষ্ণ-সমর্থিত নব ব্রাহ্মণসমাজ ইহাদিগকে রাক্ষস ও দানব বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন ইহাদের কেহ কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করিতেন না, নিজেরাই ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন, কেহ বাসুদেব "শঙ্খচক্রগদাধর" বলিয়া নিজেকে অভিহিত করিয়াছিলেন যাহারা তাঁহার শার্ঙ্গ ধনু, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও কৌমোদকী গদার অনুশাসন মানিত না, তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিতেন নরক, মুর, জলসন্ধ, বাণ প্রভৃতি রাজারা চিরকাল কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণকে কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া উত্তরপশ্চিমে যে নূতন হিন্দুসমাজ গঠন করিতেছিলেন—পূর্বদেশের সার্বভৌম রাজারা তাহার ঘোরতর বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন মহাভারত, রামায়ণ এই দুই হিন্দুসমাজের সর্বজনাদৃত গ্রন্থে ধর্মসমন্বয়ের একটা চেষ্টা আছে, কিন্তু যে আকারে আমরা এই দুই পুস্তক পাইতেছি—তাহা সমধিক পরিমাণে কৃষ্ণের মহিমদ্যোতক

ক্ষাত্রশক্তির বিরোধ।

আর্যাবর্তের এই অংশে পরবর্তী কালে ক্ষত্রিয়শক্তি একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল। পুরাণে নন্দবংশ শূদ্রকুলজাত বলিয়া বর্ণিত আছে। এই বংশের স্থাপয়িতার সহিত পুরাণকার পরশুরামের উপমা দিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রকুলান্তক বলিয়া গণনা করিয়াছেন। মৌর্যদের শূদ্রত্বও সর্বজনস্বীকৃত পরশুরামের পর কুরুক্ষেত্রে এবং তৎপরে নন্দদের দ্বারা ক্ষত্রশক্তি বিশেষরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। এই যুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে যজ্ঞাদি বিলুপ্ত হয়। যাহারা যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইত, তাহারা দানব, রাক্ষস প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা যায় মৌর্যদিগকে দানবদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা হইয়াছে *

জৈন ও বৌদ্ধদিগের অধিকারকালে প্রাণিহিংসাত্মক যজ্ঞাদি বহুপরিমাণে লুপ্ত হয়। আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ পূর্ব হইতে নব ব্রাহ্মণ-নেতা কুরুর বিদ্বেষী ছিল। এখানে কুরুবিরোধী দলের চেষ্টায় যজ্ঞাদি বহুকালের জন্য একরূপ নির্বাসিত হইয়াছিল। এখানে নানাদেশীয় লোকের যতটা সমাগম ও মিশ্রণ হইয়াছিল বোধ হয় ভারতের আর কোন দেশে ততটা হয় নাই। বাঙ্গালী বহুপূর্ব হইতে সমুদ্রে যাতায়াত ভালবাসিতেন। সমুদ্র-তীরবর্তী তমলুক এবং পূর্ববঙ্গে অধুনা-বিলুপ্ত কপিলাশ্রম প্রভৃতি স্থান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চম্পা, কম্বোজ, টংকিং, আনাম, জাবা, সুমিত্রা প্রভৃতি দেশের নানা মন্দির-গাত্রের ক্ষোদিত লিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আর্যাবর্তের পূর্বাংশের লোক সমুদ্রে যাতায়াতে অতীব দক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালীরা দুই তিনবার বহুপূর্বে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সমুদ্রপথে চীনদেশে গমনাগমন করিতেন। কথিত আছে, চীনদেশে উপনিবিষ্ট হিন্দুগণ চীনপতির সাহায্যে একদা ২,৮০০ নৌসেনা ও কতকগুলি রণতরী দিয়াছিলেন—ইহা খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা। (বাঙ্গালীর বল, ১ পৃঃ, এবং J. R. A. S., 1890, Article by G Phillip.) দুই তিনবার কিছু পরে বাঙ্গালীরা মাটীবান্-দ্বীপে উপনিবেশ-স্থাপনপূর্বক তথায় 'সঙ্কর্ষ' নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে পূর্বদেশীয় রাজাদের নৌবলের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়

সুতরাং শুধু নিকটবর্তী পাহাড়িয়া জাতিদের সঙ্গে নহে, বাঙ্গালী সনাতনকাল হইতে বিভিন্ন জাতিদের সংস্পর্শে বিশেষভাবে আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাম্রলিপ্তির লোকেরাই আরও দক্ষিণ দেশে যাইয়া তামিলরূপে গণ্য হইয়াছে। তামিল ও তেলেগু জাতির সঙ্গে যে এককালে এদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামের খাসিয়াজাতি, ব্রহ্মদেশের কিরাত ও চীনদেশবাসিগণ এদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে অধুনা যত বড় একটা বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর তোলা হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী প্রতিবাসীদের সঙ্গে আহারাদি চলে না, অথচ কোন কোন জাতি—যথা, সূত্রধর প্রভৃতি,—তাহাদের ব্যবসায়ে অপরিচ্ছন্নতার কিছুই নাই তথাপি সমাজ তাহাদিগকে ঠেকাইয়া

* "কাম্বোজা যৌন্ত্রা যৌধ্যাঃ কালকেরাস্তথাপরে।" চণ্ডী, অম্বা মাহাত্ম্য।

রাখিয়াছে, একজাতীয় লোক হইলে এতটা বিজিগীষা কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। কোন কোন সময়ে রাজ-নিগ্রাহনে অথবা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কালে শ্রেণী-বিশেষ অপদস্থ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ বিদেশাগত ভিন্নজাতির বংশধরগণকে হিন্দুসমাজে নিজেদের নিম্নস্তরে একটু জায়গা দিয়া তাঁহাদিগকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অধিকাংশ স্থলে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, এদেশ ব্রাহ্মণ্য প্রভাব হইতে অনেকাংশে বিমুক্ত হইয়া দূরদেশসমূহের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের ফলে চিন্তাজগতে কতকটা স্বাধীনতা পাইয়াছিল। এ দেশে কোন দিনই পরের অত্যাচার এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের কঠোরতা সহ্য করিতে পারে নাই। গঙ্গা যেরূপ চিরচঞ্চল, পদ্মানদীর তীর যেরূপ সতত ভঙ্গপ্রবণ—এদেশের চিন্তা ও সামাজিক গঠন তেমনই অবিরাম গতিশীল। কৃষ্ণ-বিদ্বেষীদের অত্যাচার নিম্নে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল—কিন্তু সেই ধর্ম দুইটিও বেশীদিন এখানে স্থায়ী হয় নাই, তারপর পুনরায় নব ব্রাহ্মণ্যের ছটা এদেশকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। এদেশের লোকেরা যখন যে ভাবটি ধরিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। পৌণ্ড্র বাসুদেব যে অঙ্গলে কৃষ্ণ-বিদ্বেষের চূড়ান্ত অভিনয় করিয়াছিলেন—তাহার বহুপর পরে কে জানিত সেই দেশের মৃত্তিকায়, সেই গঙ্গার উপকূলে কৃষ্ণ নামের মহিমায় লোকে এমনভাবে মাতিয়া উঠিবে। 'একমাত্র শঙ্খচক্রগদাধর' বলিয়া পৌণ্ড্রক গর্ব করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কে জানিত সেই দেশে কৃষ্ণের কীর্তিকথা এরূপ ভাবে প্রচারিত হইবে?

জৈন প্রভাব

জৈনেরা জীবে দয়ার অভিনয়ের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল সাধু ময়ূরপুচ্ছ লইয়া চলাফেরা করিতেন। পাছে তাঁহাদের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া কোন ক্ষুদ্র কীট নিহত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা সেই ময়ূরপুচ্ছ দিয়া পথ ঝাড়িতে ঝাড়িতে অগ্রসর হইতেন। তাঁহাদের একশ্রেণী প্রতিদিন পিপীলিকাকে নিয়মিত ভাবে শর্করা প্রদান করেন এবং অন্য একদল ঝাড়াঝাড়ি করিয়া এখনও নগ্ন গাত্রে ছারপোকা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দেহের রক্তধারা তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া থাকেন। এক সময়ে স্বয়ং পার্শ্বনাথ এই দেশে বহুবৎসর জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং এদেশে—বিশেষ সুহ্মবন বিক্রমপুর এবং মানভূম অঞ্চলে—বহু লোক এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। বহু রঙ্গ-পল্লী হইতে তীর্থঙ্করের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে—এই ধর্ম তৎকালে কতটা ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। জয়নগর-মজিলপুর-নিবাসী স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারকল্পে নিবেদিতজীবন শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন, তাঁহার নিবাসপল্লী হইতে ১৭ ক্রোশ দূরবর্তী করঞ্জলী গ্রামে সম্প্রতি একটা পুষ্করিণী খননকালে প্রায় ৬ফিট উচ্চ এক বিশাল কাল-পাথরের জৈনদিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত পার্শ্বনাথমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কালিদাসবাবু লিখিয়াছেন, "এরূপ সুন্দর মূর্তি আমি ইতিপূর্বে অন্য কোথাও দেখি নাই।" যথাস্থানে ইহার ছবি দেওয়া

শেল শিবি যে মহাত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই একটা উপগল্প মাত্র, বোদ্ধজাতকে বৃদ্ধ একস্থলে একটা বুভুক্ষু ব্যাঘ্র ও তাহার শাবকদ্বয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজের দেহ দান করিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন—এরূপ একটা উপাখ্যান আছে, ইহাও অবশ্য একটি উপগল্পমাত্র কিন্তু আমাদের দেশে ত্যাগ ও দয়াধর্ম্মের যে কি অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়াছে তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। শিবি উপাখ্যান, দাতাকর্ণ উপাখ্যান প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে যে অতিরঞ্জন আছে, তাহা একটু খুঁজিয়া ফেলিলেই ধরা পড়িবে যে ঐ সকল কবি কল্পনার অত্যাশ্চর্য্য সাহায্যে অধিকাংশ রচিত হইয়াছে। ইহারা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় নিছক কল্পনাপ্রসূত নহে। এখনও বাঙ্গালী বৈষ্ণবের ঘরে মশকের নাম করিতে নাই—'কাটা' কথা তাঁহাদের অভিধানে নাই, মশকারী কোটা বা কাটাকে তাঁহারা 'বালাই' বলেন কীর্ত্তে প্রভৃতি নীতিকথা সেই আদি কাল হইতে এদেশে এমনই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। দয়া প্রীতি, ত্যাগ এই সকল গুণের আদর সম্ভব-অসম্ভব গল্পচ্ছলে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। পুরাণকারগণ, কথক ও কীর্ত্তনীয়াগণ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নানা উপাখ্যান দ্বারা ত্যাগধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন বাঙ্গালীরা এক সময়ে বণিক্ শ্রেষ্ঠ ছিলেন বণিকেরা যেদোক্ত পণিজাতি, ইহারা গরু হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি পাইতেন, কৃষিকার্য্যে দক্ষ ছিলেন। ইহারাই পশুবলির বিরোধী ছিলেন। বেদের সময় হইতেই আর্য্যদের সঙ্গে ইহাদের শত্রুতা চলিয়াছিল। এই নিরীহ পণিজাতি সংখ্যায় প্রবল ছিলেন এবং উত্তরকালে ইহারাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্র সুপ্রসারিত করিয়া যজ্ঞ বিরোধী হইয়াছিলেন।

উপগল্পগুলি নীতিকথা রূপে

নানা দেশের সভ্যতা, নানা ভাব ও নানা ধর্ম্মের প্রবাহ এ দেশে আসিয়া শতস্রোতা গঙ্গার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার সাগরসঙ্গমে মিশিয়া গিয়াছে। এজন্য বাঙ্গালী যাহা আজ ভাবিবে, তাহা ভারতবর্ষের অন্যত্র কাল কি পরশ্ব ভাবিবে। বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বদাই চিন্তার নেতা। তাঁহারা একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার মানুষ নহেন বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণ্য ও জাতিভেদ মাত্র কয়েক শতাব্দীর জন্য তাঁহাদিগকে অচলায়তনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানে যে বিশৃঙ্খলতা, যে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মমূলক অত্যাচার এদেশে প্রবল ঝড়ের মত প্রবাহিত হইতেছিল—যাহাতে বাঙ্গলার কুঁড়েঘরগুলি হয়ত বা উড়িয়া যাইত তাহা হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-শুরুগণ অতি কড়া ও শক্ত নিয়মের দড়ি দিয়া কুটিরগুলি বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গলা যে বাঁধন বেশীদিন মানিয়া চলিবার দেশ নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের আন্দোলনে সেই কুটিরের ভিতে খুব জোরে নাড়া পড়িয়াছিল। অধুনা আর একটা বিপ্লবের সূত্র আসিয়াছে বাঙ্গালী যুগে যুগে কিরূপ চিন্তাশীলতা ও গঠনমূলক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, তাহাই আমরা ঐতিহাসিক অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে দেখাইব

বার বার বঙ্গসমাজের পরিবর্ত্তন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নব ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম

"গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ"

পৌরাণিক যুগের কল্পনার কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া যে সত্যের আলোটুকু আসিয়াছে তাহাতে বৃহৎ বঙ্গের মানচিত্রকে খুব উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছে। অথচ আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ-সমাশ্রিত যে আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতে ব্রাহ্মণকে দেবতা হইতেও উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছিল। এই গৌরব ও পূজার প্রধান পতাকাবাহী ও পুরোহিত ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ব্বকালের অর্থাৎ বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ ছিলেন অন্যরূপ। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-রক্তের উপর তত্টা জোর দেন নাই অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইত এবং প্রধানতঃ বৃত্তিই জাতি-নির্দ্দেশক ছিল যে কোন জাতির লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এমন কি কোন কোন মহর্ষি গণিকাজাত ছিলেন। সত্যকাম ও নারদের মাতার স্থান এই পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের স্থান, মহাভারতের প্রমাণ।

কিন্তু মহাভারতের যুগের পর হইতে ব্রাহ্মণগণ যে ক্ষমতা পাইলেন, তাহা তাঁহাদিগের অপ্রতিদ্বন্দ্বি শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিল। মধ্যদেশের রাজারা, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষের রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন; অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্রাট্‌গণও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে ব্রাহ্মণকে স্বর্গমর্ত্ত্যের সর্ব্বোচ্চস্থানে যে ভাবে আসীন করা হইয়াছে, পূর্ব্ব-ভারতবাসিগণ প্রথমতঃ তাহা স্বীকার করেন নাই। মহাভারতে যজ্ঞাদির যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও ফলশ্রুতি আছে এবং বিশেষ করিয়া অনুশাসন পর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপের যে সকল উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রভাব প্রথমতঃ এদেশ স্বীকার করে নাই। মহাভারতকার লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মণের সেবা করিলে ইহলোকে ও পরলোকে এমন কোন অভীপ্সিত সামগ্রী নাই, যাহা মানুষে না পাইতে পারে। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম জোর দিয়া বলিল 'কাহাকেও কিছু দিবার ক্ষমতা অপরের নাই কর্ম্মই লোকের জন্ম নির্ণয় করে এবং কর্ম্মই সর্ব্বফলপ্রসূ।'

ব্রাহ্মণ "অগ্নিশিখা ও "একমাত্র উপাস্য।"

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ব্রাহ্মণসম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাবাদ আছে তাহার কিছু নমুনা আমরা নিম্নে দিতেছি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 'ফলতঃ ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, আমি ব্রাহ্মণগণের দাস, এই ভূমণ্ডলে স্ত্রীজাতির যেমন পতিই পরমধর্ম্ম পতিই দেবতা ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও পরমগতি (অষ্টম অধ্যায়)। অরণ্যবাসে

অগ্নিশিখা যেরূপ সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে সমুদায় ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন। উহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই ব্রাহ্মণেরা পিতৃ দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য। তাঁহারা দেবতাকে অপদেবতা ও অপদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। মুষ্টিদ্বারা বায়ুগ্রহণ ও হস্তদ্বারা চন্দ্রস্পর্শ ও পৃথিবীধারণ করা যেরূপ, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন" (৩৩ অধ্যায়)। সাতাইশ নক্ষত্রের কোন্ কোন্‌টিতে ব্রাহ্মণকে কি কি খাওয়াইলে বা দিলে স্বর্গলাভ হয়, ৬৯ অধ্যায়ে তাহার একটা দীর্ঘ তালিকা আছে,—যথা কৃত্তিকায় ঘৃত, শালি, রোহিণী নক্ষত্রে মৃগমাংস, ঘৃত, চরু ইত্যাদি; মৃগশিরা নক্ষত্রে সমংস ধেনুদান, আর্দ্রায় তিলমিশ্রিত কেশর, পুনর্ব্বসুতে শিষ্টক ও অন্ন, পুষ্যায় সুবর্ণদান, অশ্লেষায় রজত ও তণ্ডুলদান, মঘায় তিলসংযুক্ত সলাবু ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে দাতাদিগকে নানারূপ লোভ দেখান হইয়াছে, যথা—"চিত্রা নক্ষত্রে ঘৃত ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদের সঙ্গে নন্দনকাননে বিহার করিতে পারা যায়।" এই অগণিত দানদ্রব্যের মধ্যে রাজকীয় বিলাস সামগ্রীর অভাব নাই, যথা—ছাতী, রথ, কম্বল, শ্বেতবস্ত্রযুগল, মেষমাংস এবং অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। যে যে বিখ্যাত পুরুষেরা ব্রাহ্মণদিগের এবম্বিধ দান করিয়া স্বর্গের সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াছেন, ৭৭ অধ্যায়ে তাঁহাদের নামের এক দীর্ঘ তালিকা আছে; আমরা সহিষ্ণু পাঠকবর্গের ঘাড়ে সেই মুষল চাপাইব না, এমন কি স্বীয় পরিণীতা জায়াকেও ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কোন রাজা প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-প্রতাপের আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব—"ব্রাহ্মণদিগের শাপ-প্রভাবেই নাগরের জল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে, উহাদের কোপানল বহুকালেও এখনও প্রশমিত হয় নাই। উহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ, প্রমাণের প্রমাণ। উহাদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেই পূজার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্খ হউন—তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা বিধেয়। অগ্নি সংস্কৃতই হউন বা অসংস্কৃতই হউন, তাঁহার দেবত্ব কিছুতেই লুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হন না, প্রত্যুত যজ্ঞগৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ অদিগ্ধ সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জানিয়া সম্মাদর করিবে" (১৯১ অধ্যায়)। "ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্‌সমূহ ব্রাহ্মণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন" (৩৪ অধ্যায়)।

ব্রাহ্মণেরা দেবতাকে অপদেবতা ও অপদেবতাকে দেবতা করিতে পারেন।

পরশুরামের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বড় কি ক্ষত্রিয় বড় সমাজে একবার এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। পালি "অম্বট্ঠসুত্ত" নামক পুস্তকে দেখা যায় বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়দিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বেই একবিংশবার যুদ্ধ করিয়া পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনও পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার পর মহানন্দ প্রভৃতি যারা ক্রমান্বয়ে নিষ্ঠুর হইয়া অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অনেকে কিরূপ দীনভাবে ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে।

ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কড়াকড়ি ভারতে বদ্ধমূল হইতে লাগিল এই ব্রাহ্মণ-শিক্ষালীক্ষার ভিত্তিভূমি মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের দশম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে "হীন জাতিকে উপদেশ দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে" "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু মুকুন্দাধিত শূদ্রের অন্ন কখনই ভোজন করিবেন না" (১০৯ অধ্যায়)। বৈশ্যের অন্ন সম্বন্ধেও কতকগুলি নিষেধ বিধি আছে এ দিকে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসক অম্বষ্ঠীরা, পুরাধ্যক্ষ, দেবল ও বৈদ্যক উপাধিধারীকেও শূদ্রের পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। যাহারা বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন—তাঁহাদের অন্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে পণ্ডিতগণের মতে মনুস্মৃতি খৃষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজা পুষ্যমিত্রের সময়ে লিখিয়া লেখা হইয়াছিল, তখন তাহাতে উহার বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল পুষ্যমিত্র মৌর্য্যরাজের সেনাপতি ছিলেন, শেষে স্বপ্রভুকে হত্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন আশ্চর্য্যের কথা— নিম্ন বিবাগের স্থলে ব্রাহ্মণ যে পার্থিব ভোগ বিলাসের ভোগী পাত্র, তাহা এই মানব-স্মৃতির নানা সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ সেনাপতি হইতে পারেন, রাজা হইতে পারেন, ইত্যাদি ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে এ লোলুপ মনু স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ রাজার কার্য্য সমর্থন করিতেছে, "সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ, সর্ব্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্র বিদর্হতি" মনু, ১০০)। সমস্ত পৃথিবীর অধিকার স্বতঃ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, এ ভাবের কথাও মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের অপরাধের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণের জন্য অতিরিক্ত করিয়া দেন শূদ্রের উপর শাস্তির ব্যবস্থা এই সময়ে কঠোরতম হইয়া দাঁড়ায় এতদ্ব্যতীত স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণ রাজাদের স্বত্বাধিকার বাড়াইবার প্রবল চেষ্টা ও মোট লাভের প্রতি লোভ বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে যে সকল অনুশাসন শাস্ত্রীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও সূত্র মহাভারতেই পাই—"পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমা গতি অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও দেবতাকেও অবলোকন করেন না তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের জল লাভ করিয়া থাকেন" (১৩৬ অধ্যায়)। এই উক্তির সঙ্গে নারদপঞ্চরাত্র-সংবাদের নানারূপ অদ্ভুত কথা মিলাইয়া পড়িলে স্ত্রীলোকদিগের উপর শাস্ত্রীয় কঠোর বিধির কারণ উপলব্ধ হইতে পারে, সম্ভবতঃ সন্ন্যাসের প্রতি

স্ত্রীলোকের মুখ চন্দ্র ও দেখা নিষিদ্ধ তাহাদের সম্বন্ধে অপবাদ।

অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য বেহুলার সাজাইবার প্রধান আকর্ষণ—স্ত্রীজাতির উপর চোর বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য এই সকল কূট অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐই একখানি বৌদ্ধজাতকে যে সকল কুমারজনক উপকরণ পাওয়া যায়—তাহা নিশ্চয়ই স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের চক্ষেও স্বাভাবিক রকম স্থির করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল "তুমিয়া সব কাউয়া তোকর ঘর পর বাহিনী পোষে" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক উক্তিও সেই প্রাচীন উদ্দেশ্যমূলক স্ত্রীকে গৃহদাসী করিবার উদ্দেশ্যে গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন পুরিণীকে এইভাবে নিন্দিত করা হইয়াছে

মহাভারতে এই যে বাঙ্গালার কৈবর্তের কথা আছে তাহা প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর হিন্দু জনসাধারণের মনে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে বেশ অন্তত ও অচলা রাজভক্তির লীলাভূমিত্ব পরিবেশ করিয়াছে কৈবর্তরা সমস্ত জাতির জন্য দীক্ষার দ্বার খুলিয়া দিলেন—যজ্ঞস্থানে সোম পরিবেশন করিলেন, তাহারও দ্বিসহস্র বৎসর পরে চৈতন্য "চণ্ডালোচ্ছিষ্ট বিপ্রেরে, হরিভক্তিপরায়ণ সাহসে এই মহাবাণী প্রচার করিলেন কিন্তু বৌদ্ধ যুগ হইতে এই সকল মহাপুরুষদের সময় পর্যন্ত সমাজের অধিকাংশ লোকের দাবী কখনও অস্বীকৃত হইলেও তাহাদের জন্য একটা সঙ্কীর্ণ আসন সর্বদাই নির্দিষ্ট ছিল অধুনা ব্রাহ্মণরা সেটুকুও অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু সাকল্যের প্রতি কি অমোঘ বিশ্বাস—কি অচলা ভক্তি হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া আছে এখনও জনসাধারণের মনে সে বিশ্বাস কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে স্ত্রীলোক কাহাকেও মন্ত্র দেখিতে পারিবে না, মহাভারতীয় এই নীতির মূল কতদূর অভিনব হইয়াছে যখন রামমণির জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, তিনি স্বামীর মোকদ্দমা হেরিয়া লক্ষ্যে একরাত্র পোষ্টা টানিয়া দিয়া গুরু হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন ইহা গল্প গুজব নহে, সত্যকার ঘটনা রামমণি স্বয়ং লিখিয়াছেন। (রামমণির জীবনী দ্রষ্টব্য) অবশ্য গাড়ু দেখিয়া লক্ষ্য পাওয়ার উদাহরণ এখনও আমরা পাই নাই। প্রচলিত "অক্ষণাপ্রসঙ্গ" কথাটাতে তাহার ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি কবিতাটির এবং অনুরোধের যে কতকটা পেরেশে হইয়াছে তাহাতে মনে হয়,—সমস্ত শঙ্কাকুল ভাবীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নৈতিক হিন্দু জনসাধারণ সকল পাতারা কলহই পরম ধর্ম মনে করিয়া থাকেন মহাভারতকার বলিয়াছেন, "শূদ্রান্ন নিত্য ও নিমিত্ত ব্যতিরেক অন্ন ভোজনীয়নহে" অনুশাসন, ১৩৮ অধ্যায়,

উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্মকে নিরস্ত করিয়া যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃ উদ্যোগন করিয়াছিল, তাহা এই সকল উপদেশ মূলমন্ত্রের ন্যায় বিশেষ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল সেই নবগঠিত সমাজের এই সূত্রগুলি ছিল ভিত্তিস্বরূপ

বৌদ্ধ ধর্মের মূল সূত্রগুলি ভিক্ষুসঙ্ঘে পূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল, বাহ্যিক অনুষ্ঠান অনেক স্থলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল মহাভারত ব্রাহ্মণদিগের মাতাপ্রাণ অহিংসাযোক্তি ও যজ্ঞের সমর্থন করিয়াও 'জীবহত্যা' নীতির কথা ভুলিয়া যান নাই মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে দেখিতে পাই, "মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়তম বলিয়া

জ্ঞান করা উচিত। যখন সিন্ধিকাম জ্ঞানীদিগের চতুর্থাংশ বিদ্যমান তখন মাংসাশী ব্যাধগণ কর্ত্তৃক নিপাতিত অল্প জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে কাকস বলা যাইতে পারে। যাহারা মাংসাহারে বিরত, তাহাদের তুল্য অরণ্যে, চর্ম্ম বা চত্বরে বা উদ্যান-শস্য বাকি বা সর্প প্রভৃতি হিংসকজন্তু হইতে কোন ভয়ের কারণ থাকে না। এবম্বিধ ব্যক্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূত-শরণ্য বিশ্বাসজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। যদি কেহই মাংসভোজী না হয়, তবে পশুহত্যা একবারে তিরোহিত হইতে পারে। খাটকেরা কেবল মাংসভোজীর জন্য জীবহত্যা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অপর কর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারীর তুল্যফল ভোগ করিতে হয়, যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার জন্য ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি মাংস ভোজনে স্বয়ং বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও যমযাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হয় সন্দেহ নাই" (অনুশাসন পর্ব্ব, ১১৫ অধ্যায়)

শ্লোকোক্ত বিধান পাঠ করিয়া আমাদের দেশের বিধবাদিগের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তাঁহারা নিজেদের স্বজনবর্গকে উৎকৃষ্ট মাছের মুড়া বা পেটি খাওয়াইবার জন্য কত অনুনয়-বিনয় করেন, তাহা সকলেই জানেন। নিজেরা যে সুখে বঞ্চিত, আপনার জনকে সেই সুখভোগ করিতে দেখিলেও তাঁহাদের পরোক্ষভাবে কতকটা তৃপ্তি ঘটিতে পারে। কিন্তু মহাভারতের বিধিতে এই মাংসাহার বিরতা মহিলাদিগের জন্যও নরকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, মহাভারতে জীবের প্রতি দয়ার যে মত প্রচারিত হইয়াছে—তীর্থঙ্করগণ, স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং মহাবীর প্রিয়দর্শী অশোক তদপেক্ষা নূতন কথা কিছু বলেন নাই। আর্য্যদের অধিকার-বিস্তৃতির সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের জীবন অত্যন্তাধী কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা যাগযোগ জনপদে পরিণত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, হিংস্র জন্তুদিগকে নিঃশেষ করিবার দরকার ঘটিয়াছিল। মূলতঃ এই অভিপ্রায়ে আর্য্যগণ যজ্ঞবিধি পালন করিতেন, তাহাতে অসংখ্য পশুবলি দেওয়া হইত। অবশ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন বিশাল স্থানে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে কাষ্ঠের জলীয় নিশ্বাসজাত বাষ্পরাশি আকাশে পরিব্যাপ্ত হইলে পর্জ্জন্যদেবের কৃপালাভ করা সম্ভবপর হয়, এজন্য অনাবৃষ্টি দূর করিবার উদ্দেশ্যেও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু পশুহত্যা নিবারণ ও ভূতদয় জন্তুল পরিত্রাণপূর্ব্বক তাহা লোকবাসে পরিণত করাই অনেক যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই পশুহিংসার নিষ্ঠুরতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বৈদিক যুগে এতদ্দেশ অরণ্যবহুল ছিল, এজন্য যজ্ঞাগ্নি এ দেশে ঘন ঘন প্রজ্বলিত হইত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দেখা যায়, বীর ও পৌরুষ-গাথের একটা সাম্য হইয়া যায়। যে সকল দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক অধিকাংশে অনার্য্য ছিলেন, তাঁহারা এই যজ্ঞগুলি খুব সুচক্ষে দেখিতেন না। অনার্য্যগণ প্রায়ই যজ্ঞ বিঘ্ন ঘটাইতেন। তাঁহাদিগকে

রাক্ষস, দানব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। ইহারাই উত্তরকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সুবৃহৎ জনসাধারণের মনের ভাবের অভিব্যক্তি বৃহত্তর জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। সাধারণ জনমত পূর্ব্বেই এই ধর্ম্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সেইজন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দুই ধর্ম্ম আসামে এতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল। কাঁযে দয়ার সূত্র আমরা মহাভারতাদি গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি, তত্ত্বকালে এই সূত্রগুলির বিশেষ পুষ্টি ও উন্নতি হইয়াছিল। কলিঙ্গবঙ্গ—মিদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি হইতে মাত্র দেড় শত ক্রোশ পশ্চিমে। ঢাকা হইতে কলিকাতা যতদূর প্রায় ততটুকু ব্যবধান। সুতরাং কলিঙ্গবঙ্গকে বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। পুরী, মানভূম, বুদ্ধদেবের মহাপীঠ, ও তীর্থঙ্করদের পাদপীঠ আমাদের বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্বর্ত্তী। যতদূর দেখিয়া এই সমস্ত দেশ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ ছিল। এই জন্যই এ অঞ্চলটা বাঙ্গালার পবিত্রতাকে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন কালেই বাঙ্গালার মর্য্যাদা এ দেশে একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। যখন উহা নিম্নাবস্থায় ছিল, তখন সেন রাজাদের মাতৃকুলের কোন আদি পুরুষ—তিনি স্বয়ংবংশেই হউন বা অন্য কোন বংশেরই হউন—সুদূর পশ্চিম হইতে নব বাঙ্গালীকৃত সাহিত্য বক্তাস্থানে পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণদিগকে এখানে আনিয়া তাঁহাদিগকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশের ধর্ম্মগুরু ও সমাজগুরুরূপে অভিষিক্ত করাইয়াছিলেন। সেই কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া আমরা এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিধান শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। কিন্তু তাঁহাদের অধিকারে যুগে যুগে অনেক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। এই বিদ্রোহীদলের অন্যতমনায়ক ছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। তন্ত্ররত্নাকরে লিখিত আছে, ত্রিপুরাসুর হত হইলে ঋষিকুলগুরু নারদ শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন—ত্রিপুর নিহত হওয়ার পর তাহার সত্ত্বা জগৎ হইতে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল,—না কোন না কোন প্রকারে বিদ্যমান ছিল। গুরুদেব উত্তর করিলেন—ত্রিপুরাসুর হত হইলে তাঁহার রূপ ত্রিধাভাবে জগতে দেখা দিয়াছিল। সেই মহাতেজা অসুরের প্রধান অংশ শঙ্করের চৈতন্যরূপে প্রকট হইল, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহারা সংঘবদ্ধে শিব শক্তির বিরুদ্ধতা করিতে অসমর্থ হইয়া মানুষকে হীনবল করিবার জন্য নারীভাবের উপাসনা শিক্ষা দান করিল। "শিবশক্তিবিনাশায় লোকানাং মোহনেচ্ছবে। ত্রিপুরাখ্য শিবদ্রোহিনামুপাসন সঞ্চয়ন। অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্য শচীগর্ভে বভূব সঃ। তস্যো ভরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ। উপদ্রবায় লোকানাং নারীভাবমপাশ্রিতঃ ৫০ এব ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম যাহা আপৎকালের ধর্ম্মের ন্যায় সময়ের প্রয়োজন বুঝিয়া সমুচিতরূপে নিষেধ, স্ত্রীলোকের প্রতি অবিচার এবং প্রবহমান স্বাভাবিক ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়া রাখিতেছিল ও আহারসংযমের জন্য শত শত নিষেধবিধি দ্বারা সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে কুটিলতা আনয়ন করিয়াছিল—তদ্বিরুদ্ধে

সর্ব্বপ্রধান বিদ্রোহী চৈতন্য, তাঁহার প্রতি আক্রোশ।

বাঙ্গালী জাতি পুনঃ পুনঃ সশস্ত্রবাহু উত্তোলনপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছে। চৈতন্যদেব প্রাচীন সমাজের প্রধান এবং প্রথম বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ আধুনিক সময়ে রামমোহন রায় ঘোষণা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি গান্ধী প্রবর্ত্তিত নীতিতে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিত্তি বোধ হয় একেবারে ধসিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী কোন কালেই স্বাধীনতার ডাক অগ্রাহ্য করে নাই। চিন্তার সঙ্কীর্ণতা, কোন ধর্ম্মমতের অস্বাভাবিক অযুক্ততা তাঁহারা বেশী দিন সহ্য করেন নাই। অত্রাসক, নরক যুগ প্রবর্ত্তিত সময় হইতে বৃহৎ বঙ্গ চির দিন স্বাধীনতার ধ্বজ বহিয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিক যুগে এই পৃষ্ঠপোষণা বিশেষ ভাবে সংঘটিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের শেষে একটি কথা আমাদের বক্তব্য। মহাভারতেই আমরা নব ব্রাহ্মণ্যের গঠনার লক্ষণ সকল দিকে দেখিতেছি,—রাজসূয়কে ধর্ম্ম সম্পর্কের অতীত অতি পবিত্র যজ্ঞিয়ে পরিণত করা, জাতিভেদের আদর্শ স্থানীয় উত্তোলন করা স্ত্রীলোককে কোটায় পুরিয়া রাখা, সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণদিগকে তেত্রিশ কোটী দেবতার উর্দ্ধে স্থান দিয়া তাঁহাদিগকে দ্যুলোক ভূলোকের একাধিপত্য প্রদান করা—এ সমস্তই স্পষ্টাকারে মহাভারতে দেখিতে পাই।

কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে পশুহননপ্রবৃত্তি ও প্রথার সঙ্গে আমরা যাহা যাহা দেখিতে পাই যে মহাভারতে পশুহত্যার বিরুদ্ধে একপ স্পষ্ট ও বিধাশূন্য ভাষায় অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—তাহা এ সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রচারক নব ব্রাহ্মণসঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা কি ভাবে করিবেন? তবে কি মহাভারত যথার্থে পশুবলি নিষেধ করিয়াছেন? তাহা ত কখনই নহে। মহাভারতের মূলনীতি জীবহত্যার বিরোধী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রাজ্যে পশুবলি দিনরাত অনুষ্ঠিত হইত, নরবলিও যথায় বাদ পড়িত না, এমন কি একশত নরেন্দ্র বলি দিয়া যেখানে অত্রাসক শিবের তুষ্টিসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, শবমণ্ডলাগ্নি আদর্শ নৃপতি অশোকও যেখানে পশুহত্যা নিষেধ করিতে প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি পশুবধের অনুজ্ঞা দিয়া মাংসাশিগণের জন্য স্বীয় অন্তঃপুরেও কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন—সেই রাজ্যে মহাভারতকার একেবারে জীবহত্যা নিষেধের হুকুমজারি করিতে কিছু দ্বিধাবোধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মাংসাশিদিগের জন্য মহাভারত কয়েকটি রক্ষাকবচের অনুকরণ করিয়াছিলেন "বৃথা মাংস" কথাটা আমরা মহাভারতেই পাইতেছি। দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া মাংস প্রসাদস্বরূপ খাইলে দোষ নাই। এই যে রক্ষাকবচ রচিয়া দিয়া গেলেন, সেই বলে মানুষের স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তি দেবস্থানগুলিকে পশুরক্তে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। এই রক্ষাকবচের ফলে এখনও কালীঘাটাদি তীর্থস্থান অষ্টমীতিথিতে একটা বিরাট কসাইখানাতে পরিণত হইয়া থাকে। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাসে দেখিতে পাই, রাজারা শত্রুগণকে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে অবাধে বলি দিতেছেন। এইভাবে রাজা যার নিকট-আত্মীয় মগরাজ বা চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট ত্রিপুরার পুরোহিত চন্তাই দ্বিজগণ কর্ত্তৃক বলিস্বরূপ হত হইয়াছিলেন এবং সেদিনও মণিপুরের রাজা জেনারেলের

আলেকজাণ্ডারের ধনলিপ্সা নামক জঘন্য টেলাটা নামক ধক্কা দ্বারা কুইন্টন, স্টাবো, জিমসন এবং কলিন্স এই চারি জন লেখক রাজপুরুষকে দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে বলি দিয়াছিল, এবং পাঞ্জাব ঐ রক্ষাকবচগুলি হাতে পাইয়া এতদূর হিংস্র ও নিষ্ঠুর হইয়া পড়িয়াছিল। রক্ষাকবচগুলি নিরীহভাবে প্রথম দেখা দিলেও উহা পরিণামে বীভৎস অত্যাচারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। মহাভারতে বৃথা-মাংস সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"যে মাংস যত্নপূর্বক ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে দান করা যায়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথা-মাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথা-মাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে" (অনুশাসন, ১১৫ অধ্যায়)। বলা বাহুল্য যে এইরূপ বিধানের পর হিন্দুস্থানে উপলক্ষ বা অনুষ্ঠানের কোন অভাব কেহ বোধ করেন নাই এবং কাহারও মাংস-ভোজনের বিঘ্ন ঘটে নাই। মহাভারতে জীবে দয়া সম্বন্ধে যে প্রকাণ্ড বক্তৃতা দেখা যায়, রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করাতে তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু মহাভারতীয় নীতি লোকমতের নিয়ন্ত্রণ করুক বা না করুক, উহা যে পরবর্তী কালের হৈন ও ভোজনের অনুকূলতা করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার

"একদা তাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

এইবার আমরা ঐতিহাসিক যুগের নিকটে আসিয়া পড়িলাম। পৌরাণিক যুগের পুরাবৃত্তলিপির উপরে পটক্ষেপ হইলে আমরা যে সকল দৃশ্যের সাক্ষাৎকার লাভ করি, তাহার প্রচ্ছদপটে ইতিহাসের অরুণালোক আসিয়া পড়িয়াছে।

যে সময়ে বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ হয় (৪৭৩ খৃঃ পূঃ), তাহারই সন্নিহিত কোন সময়ে বঙ্গাধিপ সিংহবাহুর পুত্র বিজয় লঙ্কা দ্বীপে যাইয়া তাঁহার বহু সুহৃদ ও অনুচর সহ সেই দেশ জয় করিয়া উপনিবিষ্ট হন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই দেশ বিদ্রোহের দেশ,

ইহা শান্তিনিকেতনের আবাসভূমি নহে। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশ জয় করিতে রঘুকে যেরূপ বাধা পাইতে হইয়াছিল অন্য কোথাও তিনি সেরূপ দুর্জয় শত্রুর সম্মুখীন হন নাই। বঙ্গদেশের সঙ্কল্পের পুরুষ যাঁহাকে আমরা পুরুষোত্তমের সিংহাসনে বসাইয়াছি, সেই চৈতন্যদেবও বাঙ্গলার নিষ্ক্রিয় সন্তান ছিলেন না, তিনি বাল্যকালে অতি দুরন্তই ছিলেন।

এই বিদেশের দেশে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে আমরা এক বিদেশী রাজকুমারের দেখা পাই। রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, সে রাজ বঙ্গভূমি। তুমি তোমার সন্তানদের আর শান্তিস্নিগ্ধ করিয়া রাখিও না—তাহাদের পতনীন চঞ্চলতা করিয়া দাও। রাজকুমার বিজয় বঙ্গযাত্রার সেইরূপ এক গৃহত্যাজিত দুরন্ত সন্তান ছিলেন। তিনি পুরুষোত্তমের নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজবিদ্রোহী হইয়া নির্বাসিত হইয়াছিলেন। বিজয়ের অনভিপ্রেত বৌদ্ধধর্ম লঙ্কায় প্রাধান্য করিয়াছিল। পিতৃনাম স্মরণীয় করিবার জন্য সিংহবাহু তনয় লঙ্কার নাম সিংহল রাখিয়াছিলেন, তদবধি সেই নাম চলিয়া আসিতেছে।

এই বিজয় কর্তৃক সিংহল-বিজয় বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। সমস্ত প্রাচীন পালিপুস্তকে বাঙ্গলার সিংহবাহু তনয় বিজয়ের বিজয়গাথা কীর্তিত আছে।

আমরা মহানাম-কৃত মহাবংশ হইতে বিজয় কৃত লঙ্কাজয়ের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই লঙ্কা বিজয় বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি অতীব গুরুতর ও গৌরবাত্মক ঘটনা মহাসমুদ্রেরও পূর্ব পারে, আমাদের এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতেও একটু দূর পড়িয়াছে সুতরাং বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

দীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রভৃতি সিংহলের যাবতীয় প্রাচীন ইতিহাসের মত এক সিংহলের চিরন্তন সংস্কার—লঙ্কাজয়ী বিজয় বাঙ্গালী ছিলেন, এসম্বন্ধে যিনি সমস্ত ঘটনাটি অবগত, তাঁহার মনে কোন দ্বিধার ভাব থাকিতেই পারে না এইজন্য সেই ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিবৃতি আবশ্যক।

বঙ্গের রাজার সুসিমা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন (দীপবংশ)। এই কন্যা যেমন সুন্দরী তেমনি স্বাধীন ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন, রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের জন্য গঞ্জনা সহিতে হইত, সুসিমা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া একদা গোপনে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইহা খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা, সুতরাং সেই সুদূরকালের সমস্ত ইতিহাসের ন্যায় ইহারেও কতকটা অলঙ্কারে মিশ্রিত আছে এইরূপ অলঙ্কার কেন হইল, তাহাও আমি পরে লিখিব।

সিংহলের রাজধানী সিংহ-পুর ও রাজবংশাবলির সংস্থান

যখন রাজকন্যা রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন একদল বণিক্ রথ হইতে নগরে যাইতেছিলেন, কুমারী তাঁহাদের সঙ্গ ধরিলেন পথে হাড়হেলে এক সিংহ তাঁহাদিগকে তাড়া করিল, (সম্ভবতঃ সিংহলাধিবাসী কোন বন্য অসভ্যজনপতি অর্থলুব্ধ হইয়া বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল) বণিকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলেন কিন্তু

রাজকুমারী কামাতুরা হইয়া তাহাকে ভজনা করিলেন। সিংহের ঔরসে সুমিত্রার ৭টি সন্তান জন্মিল। বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, ইহারা সকলেই পরমসুন্দর ছিলেন। পুত্রের নাম সিংহবাহু এবং কন্যার নাম সিংহলী। যোড়শবর্ষ সিংহের সঙ্গে বাস করিয়া (তীলবংশ অনুসারে, মহাবংশ অনুসারে ষোলবর্ষ) রাজকুমারীর স্বামীর প্রতি অরুচি হইল, তিনি তাঁহার পুত্রকন্যা লইয়া উল্কাসে পিতৃরাজ্য বঙ্গের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সিংহ সেইদিনই পলায়নপর স্বীপুত্রকন্যার সন্ধানে রথ রওনা হইয়া বঙ্গের উপান্তে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল।

এখানে সিংহবাহু তাঁহার পিতাকে বধ করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে বঙ্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। (সেইসময় তাঁহার অপুত্রক মাতামহ বঙ্গেশ্বরের অল্প দিন পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার মাতা সুমিত্র বঙ্গেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং সিংহবাহু তাঁহার মাতামহের রাজ্য মাতার স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়া সেখানে অর্থাৎ বঙ্গ হইতে মগধের পথে বাঢ় দেশে যে আর্যদের পল্লি স্থাপিত হইয়াছিল, সেইখানে "সিংহপুর" নামক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।*

এই রাঢ় দেশের নামান্তর লাঢ়, লাট, রাঢ় প্রভৃতি। একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে এই দেশকে "লাড" বলা হইয়াছে। মানভাঙ্গ ইহাকে "রাঢ়" এবং মহাবংশকার "লাঢ়" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"সিংহপুর" রাঢ়ের অতি প্রাচীন রাজধানী। সৈন ভরিবংশে পূর্ব-রাঢ়ের ৬টি প্রধান নগর উল্লিখিত আছে, একটি গৌড়, অপরটি সিংহপুর। বঙ্গীয় কুলজীগ্রন্থের অনেক-গুলিতেই এই সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বল্লালসেন-কৃত কথায় ২৭টি কুলস্থানের মধ্যে সিংহপুর অন্যতম "সিংহপুরো মহেশপুরো হেমনাদস্তথাপিচ বাসার্থং প্রদত্তস্তেষাং বল্লালেন মহাত্মনা" নাচল্লাটের কুলকারিকা। এই স্থানটি কাঁথি মহকুমা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে এবং কাঁটোয়া হইতে ১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে, অক্ষরেখার ২৩° ৫৩' উত্তরে এবং দ্রাঘিমারেখার ৮৮°৭' পূর্বে অবস্থিত।

ঐতিহাসিকগণ জানেন রাঢ় দেশের যে স্থানে সিংহপুর অবস্থিত, পূর্বকালে উক্ত দেশের সেই অংশ (দক্ষিণাংশ) কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। মহাবংশে উক্ত আছে সিংহবাহুর মাতামহ বঙ্গের রাজা কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ কলিঙ্গের সীমা তখন বঙ্গদেশের একপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছিল এবং উভয়রাজ্য পাশাপাশি ছিল। একসময়ে তমলুক কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং কলিঙ্গরাজ এত পরাক্রান্ত ছিলেন যে অশোক এক লক্ষ সৈন্য ধ্বংস এবং বহু লক্ষ সৈন্য আহত করিয়া বহু কষ্টে কলিঙ্গ জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

* Sinhapur—Sinhapur in the district of Hooghly in Bengal. It was founded by Sinha bahu the father of Vijay who conquered and colonised Lanka. It is situated in Rādha, the Land of the Buddhists and Lair of the Jains. The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India by Nundalal De, M.A., B.L. Published by Luzac & Co. London, p. 196.

রাজার কোন্ কলঙ্ক যুক্তের মত এরূপ শুকতর হইয়া সেই পুরাতন যুগে বিরল। যতটা জানা যায় তাহাতে মনে হয় তাম্রলিপ্তি [illegible], কলিঙ্গের মুখপাত্র স্বরূপ ছিল এবং অন্যান্যের সঙ্গে যে যুক্ত হয় তাহাতে তাম্রলিপ্তির লোকেরাই সেই যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন পরিশিষ্ট 'মেদিনীপুর দুইবা'। মেদিনীপুর জেলাটী তাম্রকের অন্তর্গত ছিল, সেদিন পর্য্যন্তও (১৭০৭ খৃষ্টাব্দে) বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বর্ধড়ি পরগণা, হুগলীর অন্তর্গত কতকগুলি পরগণা এবং তিজলি জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। যোগেশচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড। ইবনবসার খাস্তা হরণস্থ তথাযোহনের দেশাবলী বিবৃতি' নামক যে সংস্কৃত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হয় এক সময়ে বেতাল মড়িয়া, মঙ্গলঘাট পটাশপুর পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীতে যে সামন্তচক্র রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যূন তিনজন রাজা কলিঙ্গরাজ ছিলেন—দণ্ডভুক্তি, অবাবমণ্ডল ও কোটাটবি। এই সকল ও অন্যান্যের প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হয় যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যে রাষ্ট্রিক বিভাগ দৃষ্ট হয় তাহা গোড়ে গোড়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—বিশেষ গাঙ্গ বংশের অধিকারে এক সময়ে কলিঙ্গ রাজের দু'কগাছ ছিল। সিংহবাহু যখন সিংহপুর স্থাপন করেন, তখন তিনি মাতামহের রাজ্য কলিঙ্গে সিংহপুরে একটী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার অনতিপরে সিংহপুর কলিঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছিল এবং এককালে এই সিংহপুরের রাজারাই সমস্ত কলিঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া শিলালিপিতে ঘোষণা করিতেন *। এক সময়ে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা একই গুপ্তরাজ্য ছিল, তাহা সত্যকার কথা, কিন্তু তাই বলিয়া উড়িষ্যার লোককে বাঙ্গালী বলা যায় না, কিন্তু লাট সাহেবকে বঙ্গেশ্বরই বলা হইত। সেইরূপ প্রাচীনকালে সিংহপুর কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলেও অধিবাসিগণ বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তখনই উড়িষ্যা বলা যাইতে পারে না। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরবাসী বাঙ্গালী গুণসিংহ অনন্তবর্ম্মা সমস্ত উড়িষ্যা জয় করিয়া গঙ্গাবংশের স্থাপন করেন। প্রায় ৫০০ বৎসর কাল অনন্তবর্ম্মার বংশধরগণ কলিঙ্গের রাজসিংহাসন পরিচালন করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া এদেশের সঙ্গে কলিঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। রাঢ়দেশের এক প্রধান অংশ যে এককালে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে এমন কি "রাঢ়" নামেই ইহা কতকটা প্রমাণিত "ঢ" অক্ষরটী উড়িষ্যার নিজস্ব, এই অক্ষরটী বাঙ্গলা দেশে সব জেলাই দৃষ্ট হয়। বিজয়ের সিংহপুর এখন সিঙ্গুর বা সিঙ্গুরগড়, সিংহপুরগড় নামে অভিহিত।

আচার্য্যবিদ্যার্ণবের নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ও তাঁর অধ্যাপক ডাঃ, সহিদুল্লা সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সিঙ্গুরই যে প্রাচীন সিংহপুর তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বঙ্গ হইতে বঙ্গের

* 'Kalinga however appears to have been the general name of the upper Gangetic Doab which were different at different periods as Nandapura, Rajapura, Bhubaneswar, Kataka or, Jajnagar Simhapur and Mukhalingam' G Thompson N De p 55

যাইতে হইলে রাঢ়দেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় এবং মহাবংশের বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাঢ়দেশের যে অংশে রাজকুমারী সিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং যেখানে উত্তরকালে সিংহবাহু তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন, সেই বঙ্গদেশের প্রান্তসীমায় ছিল বণিকদের সঙ্গে কুমারী সুসিমা নগরে যাইবার পথে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে পাঁছিলেন এবং সিংহও তাঁহার রাঢ়দেশের নিবাসস্থানে স্বীয় পুত্র কন্যা এবং পত্নীকে না পাইয়া অমনই ছুটিয়া আসিয়া বঙ্গদেশে অত্যাচার করিতে লাগিল,—এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, রাঢ়দেশের সেই স্থানটি এবং বঙ্গদেশের প্রান্তসীমা অতি নিকটবর্তী ছিল। বঙ্গ ও মগধ এই দুই রাজ্যের মধ্যে রাঢ় ছিল এবং দক্ষিণ রাঢ়েই সিংহপুর। আমরা পরে বিজয়সিংহের বংশের সমালোচনা করিব এইস্থলে সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান-সম্বন্ধে এতগুলি কথা লিখিলাম।

বিজয় সিংহ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া একদা জাহাজের বহুদূর পর্যন্ত নিক্ষাশিত হইলেন। যে কথা লিখিতে আছে তাহা সিংহবাহু বিজয়কে এই ভাবের কথা দিয়াছিলেন —"এই বালককে (বিজয়কে) এ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দাও—ইহার সমস্ত দাস, দাসী, মন্ত্রী সচিব ও তাহাদের পুত্রগণ কেহ যেন আর এ দেশে না থাকে। জাহাজে তুলিয়া ভাসাইতে ইহারা যেখানে ইচ্ছা যাউক, আর যে ইহারা স্বদেশের মুখ দেখিতে না পায়।" মহাবংশের বিবরণের যতটুকু অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে বলা হইবে, রাজা সাতশত বিজয় ও তাহার সাতশত সহচরের অঙ্গমস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মহাবংশে এই মস্তক মুণ্ডনের উল্লেখ নাই। মহাবংশ পরবর্তী গ্রন্থ, মনে হয় ইহার লেখক একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পরিচ্ছদ পরিবর্তিত হইয়া শিশুগুলী যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাহা ঝটিকা তাড়িত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সেই জাহাজের আরোহিগণ "নগ্নদ্বীপে" উপনিবিষ্ট হইল। ("The ship in which the children had embarked was violently driven to an island named Naggadipa"—Dīpavaṃsa) ক্রমশঃ ঝটিকা তাড়িত হইয়া স্ত্রীলোকের জাহাজও বিজয়ের জাহাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুদূর এক দ্বীপে আশ্রয় লইল — তাহার নাম মহিলা রাষ্ট্র, মহাবংশ অনুসারে 'মহিলা দ্বীপ'

দ্বীপবংশে লিখিত হইয়াছে—ঝটিকা তাড়িত হইয়া সপরিকর বিজয়ের জাহাজ অতি দুরবস্থাগ্রস্ত হইল—তাহার বহুলাংশ বিকল হইল, এবং পথ হারাইয়া কোনক্রমে তাঁহারা সুপ্পর বন্দরে উপস্থিত হইলেন। মহাবংশ ও দ্বীপবংশের বর্ণনা এ বিষয়ে একরূপ। এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব নগ্নদ্বীপ এবং মহিলারাষ্ট্র বা মহিলাদ্বীপ কোথায়। সুপ্পর বন্দর হইতে ইহার অভ্যন্তরে যাইয়া তিনমাস বাস করিয়াছিলেন (দ্বীপবংশ), এখানে অধিবাসিগণ ইঁহাদিগকে বিস্তর জলতরঙ্গ ও নৌকা দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা মদ খাইয়া তথাকার স্ত্রীলোকদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার ও হঠকারিতা করিয়া সর্ব্বসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা একত্র হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন "এই চারাধম-দিগকে (রাক্ষসদের) হত্যা করা হউক" (দ্বীপবংশ)। মহাবংশে লিখিয়াছেন বিজয়ের নিজ

সহচরেরাও অবাধ হইয়া নানারূপ অত্যাচার করাতে বিজয় সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনে হয় এই কথায় একটা ইঙ্গিত আছে যে বিজয়ের সঙ্গে তাহার বিদ্রোহী অনুচরবর্গের মনোমালিন্য ঘটাতে একজন সেইখানে রহিয়া গিয়াছিল, এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি কথা পরে লিখিব।

বিজয় এখানেও আবার ভীষণ ঝটিকার মুখে পড়িলেন। সেই ঝড়ে জাহাজ বিপর্যস্ত হইয়া দক্ষিণমুখে যাইতে যাইতে লঙ্কায় উপস্থিত হইল।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন সেতুবন্ধসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে তাম্রা নামক যে দ্বীপ দৃষ্ট হয় (সিংহলের উত্তরে) উহাই নাগদ্বীপ। এইরূপ অনুমান করিবার হেতু এই যে, সিংহলের উত্তরে ভারতসমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূলে সেই সময়ে নাগদ্বীপ নামে একটি দ্বীপ ছিল, তথায় বুদ্ধদেব একবার গিয়াছিলেন বলিয়া মহাবংশে উল্লিখিত আছে। সুতরাং এখন নাগদ্বীপ পাওয়া যায় না, অথচ সিংহলের উত্তরে 'তাম্রা' নামক দ্বীপ পাওয়া যাইতেছে—বুদ্ধদেব-সংশ্লিষ্ট ঐ দ্বীপেরই পূর্ব্ব নাম নাগদ্বীপ বা নাগদ্বীপ থাকা সম্ভব।

কিন্তু আমার মনে হয় মহাবংশ ও দীপবংশোক্ত নাগদ্বীপ পুরাতন পূর্ব্ব উপকূলের "নেগাপত্তম" এই বন্দর তাঞ্জোরের নিকটবর্ত্তী। ইহা অতি প্রাচীন স্থান, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান ছিল। তাহাতে বহুপূর্ব্বে এই বন্দর বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিক James Burgess সাহেব তাঁহার History of Indian Architecture, ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃ: ১৯১৩ পুস্তকে লিখিয়াছেন—"কাবেরীর উত্তরস্থ নাগপত্তম তাঞ্জোরের সমুদ্রবন্দর বলিয়া কেন্দ্র ছিল। এই বন্দর মাদ্রাস হইতে ১৭০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান তীর্থ; ১০০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের প্রথম ভূমিতে কিলাধাম অথবা কথা প্রদেশের। সম্ভবতঃ দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের অংশ বা গ্রামের অধীশ্বর রাজা চড়াসন বর্ম্মা (চুলামণি) কর্তৃক এখানে একটি বৌদ্ধমঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পরে কুলতুঙ্গ চোল ১০৭০ খৃষ্টাব্দে এখানে অন্ততঃ দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার একটি অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও পেগু দেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীরা নেগাপত্তমে যাতায়াত করিতেন।" বার্জেস্ সাহেব তথাকার আর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উচ্চতা ছিল ৭০ ফিট্। এই মন্দির নেগাপত্তম্ হইতে মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বেসরী সাহেব উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। বৌদ্ধ রাজগণ যেখানে মঠ মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেন তাহা প্রায়ই বুদ্ধের অস্থির কিংবা সুপ্রাচীন ভগ্নস্তূপ কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সমাধির উপর স্থাপিত হইত। এই ভাবে নালন্দা বিহার ও তথাকার মঠ মাল্লরাদি বুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ কোন শিষ্যের সমাধি উপলক্ষ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নেগাপত্তমে যে সকল কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ আদিবুদ্ধের কোন শিষ্যের সমাধির স্থারক, নতুবা রাজারা সেখানে এতগুলি মন্দির ও স্তূপ রচনা করিবেন কেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেও পেগু প্রভৃতি সুদূর দেশ হইতে এখানে

নাগদ্বীপ ও নাগপত্তম।

যাত্রীর সমাগম হইবে কেন? এই সকল কারণে নেগাপত্তম্ যে অতি প্রাচীন স্থান, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করিয়াছেন, পশ্চিম উপকূলের মালদ্বীপই বৌদ্ধ গ্রন্থোক্ত "মহিলাদ্বীপ"। এখানেও আমার মনে হয় পশ্চিম উপকূলের মহি বন্দরই এই মহিলা দ্বীপ, ইহা মহিদ্বীপ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল (ভূবেত্তান্তের অধিবাসীর ভৌগোলিক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই মহিদ্বীপ বন্দর প্রসিদ্ধ স্থান,—ইহা এককালে সমস্ত ভারতের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল।

কিন্তু এই উভয়মতের যেটিই গৃহীত হউক না কেন, মূল সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। যেহেতু আদম ও নেগাপত্তম উভয়ই ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে এবং মালদ্বীপ ও মহিদ্বীপ সেইরূপ পশ্চিম উপকূলে। বিজয় সিংহপুর ছাড়িয়া পূর্ব্ব সমুদ্র তরঙ্গে ভাসিয়া দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব উপকূল একদল রহিয়া গেলেন পশ্চিম উপকূলের বিপদে পড়িয়া আর একদল পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় ও তাঁহার ভাগ্যান্বেষী সহচরেরা সুরক্ষিত (আধুনিক সেলেঙ্গর থানা কেলার অন্তর্গত বোধাইএর নিকটে) তটীয় ভূভাগে নামিয়া (আধুনিক বাগাচ্) উপস্থিত হইলেন তথা হইতে মানবক এবং দৈব উভয় শক্তিদ্বারা বিপদমুক্ত হইয়া অনাহার ও নানা যাতনা সহ্য করিয়া সিংহলে পৌঁছিলেন।

এই সহজ সরল সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিবার কোনই কারণ নাই। বস্তুতঃ, অটো ফ্রাঙ্কি (Otto Franke), বার্নেল (Burnell) প্রভৃতি বহুবিদ্ জগদ্বরেণ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ ও সিংহলবাসীরা ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সিংহলের প্রসিদ্ধ বন্দরাদি, বিক্রম, সিংহল, বিজয় বন্দরাননন এবং কলিকাতা বঙ্গ সাহিত্যের সিংহলীভাষার অধ্যাপক শরৎচন্দ্র আমাকে জানাইয়াছেন যে, "সিংহলী বেদ্দাগণের চিরাগত বিশ্বাস যে তাঁহারা বাঙ্গালী, বহু শত শতাব্দী পরেও সিংহলীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের চেহারার যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহা অতি আশ্চর্য্য, মিথিলা, আসাম ও বিহার-বাসীদের সঙ্গেও আমাদের তত্রটা সাদৃশ্য নাই। সিংহলী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার অতি

* We have the following story that I was told by a Ceylon friend [illegible] found [illegible] ancestors here [illegible] century by [illegible] traditions [illegible] history and by [illegible] Vijaya came to Lanka from Bengal and [illegible] from [illegible] generations. The [illegible] formerly [illegible] Mahavamsa, Dipavamsa and other works and [illegible] supported by the [illegible] resemblance between the features and appearance of the Bengalis and the inhabitants of Ceylon, as seen by the great similarity between the Bengali and Ceylonese dialects. The Ceylonese women wear [illegible] but the Bengali ladies [illegible] that year when some Sinhalese women came to Calcutta. I had at first mistaken them for Bengali women. Recently [illegible] Sinhalese women were passing by the streets of Calcutta, who the people would mistake them for the town people. I have heard the Bengalis say that the Sinhalese people speak Bengali exactly like Bengalis whereas the [illegible] Bihari or [illegible] people who [illegible] could hear what they [illegible] cannot speak Bengali except with a [illegible] foreign accent. [illegible] Principal, Sanskrit College and Professor of [illegible] Calcutta University

নিকট সম্বন্ধ তাহা পরে লিখিব বস্তুতঃ বাঙ্গালা বেলাতের সিদ্ধার্থ, বেলাসের শ্রীধানন্দ প্রভৃতি যতজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেকের চেহারা অধিকাংশ বাঙ্গালীর মত আমরা কয়েক স্থলে দেখিয়াছি, বাঙ্গালীরা কেমন কেমন সিংহলীর সহিত বাঙ্গালায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া শেষে বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশবাসী, —বাঙ্গালা বুঝেন না গত ১৯২৪ এপ্রিল তারিখে ১৯২৩ নয়া দিল্লীতে সিংহল গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সেনিমুদলয় এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালী বিজয় যে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯২৪, ১৭ই এপ্রিলের লিবার্টি দ্রষ্টব্য ,

সুপারক ও ভরুকচ্ছ -এই দুইটি স্থান দক্ষিণ গুজরাটের সন্নিহিত গুজরাটের দক্ষিণাংশকে গ্রীকগণ লাট বা লারিকা নামে অভিহিত করিয়াছেন এই জন্য কয়েকজন পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, সিংহবাহু বাঙ্গালী হইলেও পূর্ব্ব বঙ্গের কিন্তু তিনি গুজরাটের দক্ষিণে প্রাচীন লাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন

নানাকারণে বাঙ্গালাদেশের প্রতি বাহিরের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে বিদেশী বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন, আজকের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন অযৌক্তিক ও অদ্ভুত একটা মত প্রচার করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে আমাদের মেগাস্থিনিসের এই কয়েকটি কথা মনে পড়া স্বাভাবিক—"যিনি আমার মনরঞ্জন করেন তিনি কিছুই ফল করেন না। তিনি যাহা লইয়া যান, তাহা আজ আমার, কাল অপরের কিন্তু যিনি আমার দুর্নাম করেন, তিনি এমন একটি জিনিস হরণ করেন, যাহাতে তাঁহার কোনই লাভ হয় না, অথচ আমি প্রকৃতই দরিদ্র হইয়া পড়ি" ; তবেও বঙ্গের ইতিহাসে বিজয়ের সিংহল অভিযানের মতই বাঙ্গালীর একটি বড় দুর্নামের বিষয়

বঙ্গের রাজকুমারী চলিয়াছেন, বঙ্গ হইতে মগধে—মগধই রাঢ় দেশ, সেই দেশেই তৎপুত্র সিংহবাহু রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন এই বঙ্গদেশ সমতট) এখনও আছে, তন্নিকটবর্ত্তী রাঢ় দেশ এবং তাহা উত্তীর্ণ হইয়া মগধে এখনও যাইতে হয় ইহা ছাড়া ভারতবিখ্যাত সুপ্রাচীন সিংহপুর বঙ্গের উপকণ্ঠে রাঢ় দেশে এখনও বিদ্যমান * সুতরাং এই বিবরণে ভৌগোলিক জটিলতা কিছুমাত্র নাই , যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, গুজরাটের দক্ষিণাংশ এককালে লাট বা লারিকা নামে উক্ত হইত—তবেও কি বলিতে হইবে বঙ্গ হইতে মগধে যাইতে গুজরাটের সেই লাট দেশ পথে পড়ে? বঙ্গের সীমান্ত ছাড়িয়াই

* Its Sanskrit part of Burdwan which is now in the west of Bengal proper Tamluk Midnapur and the districts of Hugli and Burdwan A portion of the Lata of Mural Subah was included in its northern boundary It was the capital country of Vijaya who ruled over Ceylon with seven hundred followers (Rhys Davids Buddhist India p 71 Ray Taranath's Chap 21 Mahavamsa, chapter 6 p 1 It is the Lala of the Buddhists and Lada of the Jains It is to be stated here that Rad is a corruption of Radha and an abbreviation of Gangaridai—the east side of Megasthenes — Beglar's Archæological Dictionary, pp 64-65

রাঢ় দেশ যশোরের পথে রাজকুমারী সেই স্থানে উপনীত হইলেন। এ অবস্থায় গুজরাটের কথা উঠিতে কি কারণ থাকিতে পারে? সিংহ রাজের সীমা ছাড়িয়াই বঙ্গে আসিয়া অতিথি উপস্থিত হইল—এখানে গুজরাটের কথা কি করিয়া উঠিতে পারে? তারপরে বিজয় সিংহপুর ছাড়িয়া দক্ষিণ মুখে চলিলেন, পথে নাগদ্বীপ—পূর্ব্ব উপকূলে, দ্বিতীয় মহিলাদ্বীপ—পশ্চিম উপকূলে সর্ব্বশেষে শুর্পারিকা বন্দরে সমুদ্রযাত্রার পর পর জ্যোগালিক নির্দ্দেশ এই ভাবে পাওয়া গেল অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্ব উপকূল হইতে রওনা হইয়া পশ্চিম উপকূলের দিকে চলিয়াছিলেন কিন্তু যদি গুজরাট হইতে বিজয় রওনা হইতেন তবে উল্টা রাস্তার ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে গমন করিতে হইত,—প্রথমই সুরাষ্ট্রক বন্দরের নাম থাকিত কিন্তু বোদ্ধগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে, বহু পর্য্যটন এবং ছই বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সন্ধীদিগকে ফেলিয়া আসিয়া সর্ব্বশেষে তিনি সুরাষ্ট্রকে গেছিয়াছিলেন

এদিকে যে সময়ে লাক্ষ গুজরাটের নাম লাট থাকিলেও সেখানে সিংহপুর কোথায়? সেই কালে সিংহপুর রাজধানী বা তৎসংক্রান্ত কোন সংস্কারের চিহ্নমাত্র নাই পশ্চিমোপকূলে এক সিংহপুর আছে—এই সিংহপুর (Sadi Range) বম্বে হইতে ১৩০০ মাইল দূরে তক্ষশিলার নিকট ও বিতস্তা নদীর তীরবর্ত্তী এখানে বঙ্গের রাজকুমারী অবশ্য হাঁটিয়া আসিতে পারেন নাই এই সুরাষ্ট্রক বন্দরও পূর্ব্বোক্ত সিংহপুর হইতে ৯০০ মাইল দূরে অবস্থিত, সেখান হইতেও সিংহবাহু সুরাষ্ট্রকে আসেন নাই প্রতিবাদীরাও এই সিংহপুর বিজয়ের জন্মভূমি বলিতে সাহসী হন নাই তাঁহারা গুজরাটের মানচিত্র তাকড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন কাথিয়াবারে যে সিহোর নামক স্থান আছে, তাহাই হয়ত সিংহপুর। কিন্তু বঙ্গ দেশ হইতে বিজয়কে এতটা ঘুরে লইয়া যাইবার হেতু কি? বঙ্গ দেশের উপকূলে রাঢ় দেশ, তমলুক বহু প্রাচীন সিংহপুর এবং ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে নাগদ্বীপ, পশ্চিম উপকূলে মহিলাদ্বীপ, সুরাষ্ট্রক পর পর সমস্তই আছে এই সাজানো বাগান ছাড়িয়া ফেলিয়া নিতান্ত অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক মত প্রচারের কারণ কি? কবির গানটি মনে পড়ে,—"ওঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে, ঠাঁদার পথে গুঁজতে গলি"

প্রতিবাদীদের একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ই কে রাপসন তাঁহার সম্পাদিত অক্সফোর্ড Early History of India পুস্তকে এরূপ অসম্ভব কথা লিখিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, তিনি মনের কথা সরল সহজ ভাবে না লিখিয়া অতিশয় দ্বিধার সহিত যাহা লিখিয়াছেন তাহা অসঙ্গত ও শব্দার্থের বিরোধী তিনি লিখিয়াছেন, The Mahavamsa seems to locate Lala in Magadh "মহাবংশের লেখা পড়িলে মনে হয় যেন লাল দেশ মগধের অন্তর্গত।" তাই যদি হবে, তবে তিনি বিজয়কে গুজরাটের লাট দেশবাসী মনে করেন কেন? মহাবংশে যাহা বলা হইয়াছে দীপবংশ এবং কুলক্রমেও তাহাই আছে, সিংহলের

মহাবংশে অতি পরিষ্কার ভাবে লিখিত আছে যে বঙ্গ হইতে মগধে যাইতে পথে রাঢ় দেশ রাপসন কেন লিখিলেন ইহাতে সন্দেহ হয় রাঢ় বঙ্গ মগধের মধ্যে পড়ে বাঙ্গলা ভাষায় যে অতি প্রাচীন রাঢ় নামের নিদর্শনও আছে তাহা কি তিনি জানেন না বাঙ্গলার নাম করিতে তাঁহার কষ্টের কারণ কি

সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থের ঐ একই সুর। তবে তিনি কোন্ প্রমাণবলে বিজয়কে গুজরাটবাসী বলিতে চান? এই সকল প্রাচীন পুস্তকের সরল অর্থ তিনি বুঝিবার লিখিয়াছেন, "লাট দেশের সিংহপুর সম্ভবতঃ কাথিওয়ারের সিংহোর।" বিজয়ই সর্ব্বপ্রথমসভ্যরূপে সিংহলে সর্ব্বপ্রথম আর্য্যোপনিবেশ স্থাপন করেন। যদি তিনি সত্যই কাথিওয়ারের অধিবাসী হইবেন, তবে কি করিয়া র‍্যাপসন আবার লিখিলেন—"The first stream of emigration to Ceylon came from Orissa and perhaps from Southern Bengal." তাঁহার মতে কাথিওয়ার হইতে প্রথম অভিযান গেল, অথচ পুনরায় দক্ষিণ বঙ্গ দেশ হইতে বিজয় গিয়াছিলেন—এরূপ পরস্পর বিরোধী একটা ইঙ্গিত তিনি কি করিয়া দিলেন? ইহার মত একান্ত ভিত্তি যুক্ত, এবং "শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি" গোছের।

বিজয় যে বাঙ্গালী তাহার আর একটা অকাট্য প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের পর আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

সিংহলের রাজা নিঃশঙ্ক মল্লের শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইনি বিজয় বংশে উদ্ভূত। Epigraphia Zeylanica র দ্বিতীয় খণ্ডে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রাজা সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসর বিজয় সিংহলে পদার্পণ করেন সেই সময় হইতে ১৭০০ বৎসর পরে নিঃশঙ্ক মল্ল ভূমিষ্ঠ হন, তাহা হইলে ইঁহার জন্ম তারিখ হইল ১২১৭ খৃঃ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হুগলী জেলার অধিকাংশ এক সময়ে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং রাঢ় দেশের কতকাংশ পর্য্যন্ত কলিঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে এক সময়ে সিংহপুর অতি প্রবল ও প্রবল পরাক্রান্ত নগর ছিল। গৌড় দেশের ছোট ছোট রাজারা যেরূপ "গজপতেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিতেন, মেদিনীপুর ও সিংহপুরের রাজারাও সেইরূপ "কলিঙ্গেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিতেন, সিংহপুরের অভ্যুদয় সময়ে ইঁহারা কলিঙ্গের রাজগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তমলুকের রাজা ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত উড়িষ্যা জয় করিয়া গঙ্গাবংশকে তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন—ইহার নাম অনন্তবর্ম্মা, ইনি বাঙ্গালী ও ক্ষত্রিয়, সম্ভবতঃ ইঁহারা সিংহপুরের রাজবংশের জ্ঞাতি ছিলেন। প্রায় ৫০০ বৎসর কাল কলিঙ্গদেশ রাঢ়ীয়গণের শাসনাধীন ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে সিংহপুর রাজ্য হীনশক্তি হইলেও "উত্তরে হারকানদ", পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়নদ এবং পশ্চিমে মন্দারাচলনদ এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন প্রায় ২০০ বর্গমাইল ব্যাপক ভূভাগে পরিণত হইয়াছিল। সিংহপুরের তিন মাইল উত্তর পশ্চিমে জয়পান বা জয়পন গ্রাম। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই এই দুই গ্রামের মধ্যে অক্ষয়ন জয়পানের ১৫৭০ শকাব্দা বৎসর বৎসর রাজস্ব দিতে হইত সুতরাং ইঁহাদের রাজ্যের আয়তন সেই সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করিলেও একটা প্রকাণ্ড ভূভাগ ছিল। (নগেন্দ্রনাথ বসুর জাতীয় ইতিহাস—রাঢ়ীয় কাণ্ড, ১৩৭ পৃঃ)।

সিংহলের রাজারা চিরকালই সিংহপুরের বলিয়া গর্ব্ব করিতেন এবং তাঁহারা একদা কলিঙ্গেশ্বর "উপাধি" ধারণ করিয়া সমস্ত সিংহল দেশটা কলিঙ্গেশ্বর সিংহপুরপতির অধীন বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এখন আমরা নিঃশঙ্ক মল্লের লিপি হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিতেছি —

"When one thousand seven hundred years had elapsed since this King (Vijaya), protected by the Gods in accordance with the behest of the Buddha, arrived in the island of Lanka, and destroying the yakkas made it an abode for mankind there was born the great king Sri Sangabo Kalinga Parakrama Bahu Viraj Nissanka Malla Apratima Malla in Sinhapura on the confines of Kalinga in Jambudwa, the birthplace of the Jinas, Bodhisattas and Universal monarchs, (he was born) of the womb of the great queen Parvati (wife of King Jayapa who was like unto a pearl ornament to the royal line of the Okkaka dynasty). He grew up in the midst of royal splendour and being invited by the great kings of the island Lanka, his own or kinsman, to rule over the island of Lanka which was his by the right of hereditary succession of kings, he landed in great state in Lanka. Having (thereafter) the royal dignities of governor and subduing and being proficient in all arts of sciences he in due order of regal succession received the sacred unction and wearing the crown assumed supreme sovereignty —" Epigraphia Zeylanica," Vol II

এই লিপির সাক্ষ্যে এই যে রাজা সিংহপুরের বিজয়ের বহুপূর্বে। এই স্থানের রাজারা "কলিঙ্গেশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন এবং ইহা কলিঙ্গেরই অন্তর্গত ছিল। ইনি বিজয়ের সিংহল পৌঁছিবার ১১০০ বৎসর পরে সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশোদ্ভব কোন সিংহলরাজ তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না পাইয়া তাঁহাদের মূলস্থান সিংহলের এক জাতিকে আনাইয়া রাজটি তাঁহাকে প্রদান করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহপুরের রাজবংশের বাহু সিংহলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

ইহাতে এই যে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল, তাহা সর্ব্বসম্মত। সিংহপুর অতি প্রাচীন ও প্রধান নগর এবং কলিঙ্গভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন দ্বিধা নাই। এমন অবস্থায় এই লিপির প্রমাণ অকাট্য।†

এখন বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে সিংহলী ভাষার যে নিকট সম্বন্ধ তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মহম্মদ শহিদুল্লা সাহেব এম্ এ, ডি, লিট্ আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, "I have tried to show in an article that the Singhalese language has the greatest affinity with the language of the Eastern inscriptions of Asoka and must have been derived from the ancient language of Magadha. According to the description of

† Ibid.

[illegible] এই [illegible] পণ্ডিতের [illegible] হইয়াছিলেন [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]

the Mahavamsa Lala or modern Gujarat was situated between Vanga and Magadha. So I am not sure that the Radha which has been called Ladha in the Jain books and Lala in the Malai inscriptions of Rajendra Chola."

["আমি একটি প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সিংহলী ভাষার সঙ্গে অশোকের পূর্বপ্রাকৃতের সিংহলী রূপের যতদূর ভাষার দিক হইতে সম্ভব হয়। ঐ ভাষা নিশ্চয়ই রাঢ় দেশের প্রাচীন ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মহাবংশের বর্ণনানুসারে বিজয়ের মাতৃভূমি মগধ ও বঙ্গের মধ্যবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল সুতরাং উহা তৈলপুত্তকে এবং রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে যে দেশের নাম 'লাড়' বলা হইয়াছে সেই দেশ অর্থাৎ 'রাঢ়' ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না।" সহিত্য সাহেব যে প্রবন্ধের কথা বলিয়াছেন আমি তাহা দেখি নাই।

* শব্দসাদৃশ্য

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
বাতাস, বাত	বাতাহ	পিঠ, পিঠা	পিটি
ভিজা। পূর্ববঙ্গে তিত	সিত, তিত	স্তন	থন
মরা	মর	উরু	উর
ফেনা, ফেন	পেন	হাড়, হাড়ি	এটে
মাটি	মাটি	দাঁত	দাত
লোম	লোম	শিব, শিব	সিব
মাকড়সা	মাকুলুবা	পুস্তক, পোথা, পোত	পোত
ডিম্ব বা ডিম, ডিম	* ডিম্ব	জল	জল
আম্র আম	আম্বা	সুপ	সুপ
আটা	আটা	পুত্র। পুত্রক।	পুত্র, পুত্রক
সাপ	সর্প	পেঁপে	পেপল
রাঢ় রাঢ়ু রাঢ়ুর)	রাঢ়	কদল	কেল

* দুষ্ট হইবে। পূর্ববঙ্গে অনুনাসিক ও দুষ্ট ও স্থলে ঁ হয়। সংস্কৃত দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ বাঙ্গলা ও সিংহলীতে দন্ত্য ন হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে ঁ স্থানে ং হয়। সিংহলী অং ঠিক বাঙ্গলা অংএর মত নহে। উহা বরং বাঙ্গলার ঁ-এর কাছাকাছি যেন দাঁড়ায়। সে হউক এই শব্দগুলির উচ্চারণ অনুযায়ী, কয়েকটা ঠাহরেছি মাত্রের নহে। এ সব আমি উচ্চারণের দিক হইতে দুই রকমের ছাপ ব্যবহার করিলাম।

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
কাণ	কা্	দেব	দেউ, দেব
ছিদ্র	সিদুর	ধর্ম	ধা্হম্
মুখ	মুহুন	হাওয়া	ওয়া
হাত	আ্ত	লোহা	লোহ
বাত	বাত	উত্তর	উত্তুর
গাছ	গাস	দক্ষিণ, দখিণ	দকুন
বিবাদ	বাদ	সাত	হা্ত
প্রহার	পহার	আট	আ্ট
নদী পার	পার	বাঘুর	প্যাহুরা
সাগর, সাগুর	সাগুর	সুখ	সুক
বিষ	বিস	দুঃখ	দুক
গ্রাম	গাম	জাল	জাল
তৈল, তেল	তেল	চাল	চাল, হাল
উকুন	উকুনা	তিন	তুন
স্নান করা, নাওয়া	নানওয়া	ভাত	ভাত, বা্ত
নিদ্রা যাওয়া, নিদ যাওয়া	নিদনওয়া	সর	সর
বাঁধ	বান	কাঁস	পাস
উত্তম	উত্তুম	মোট বা ছোট	হোদা
চোর, চোরা	চোক্ক	সমুদ্র	সমুদুর
লাঙ্গল, নাঙ্গল	নাঙ্গল	পৌষ	পোষন
বাস্ত	বস	চৈত্র	চৈত্ত
খিড়াল	কলালা	মানুষ	মিনিহা
ইন্দুর	উন্দুর	(পূর্ব্ববঙ্গে "মানু" ও পশ্চিমবঙ্গে "মিনসে")	
মাছি মশা	মাসা	পুত্র, পুত	পুতা
কুকুর	কুকুরু	মাথা	মাথা
হাঁস	হানসয়া	লো (তরু)	লে
যবনা	যবিনা	কোথায়	কোহান, কোহেন
আক (ইক্ষু)	উক	গৃহ	গে
কাল	কা্লু	চন্দ্র, চাঁদ	হান্দ, হান্দ
নীল	নীল	যা	যাও
চিনি	সিনি (উচ্চারণ 'ছিনি')	হাড়ি	হা্ট্টি

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
ব্রাহ্মণ	কাবুনা, বাবুনা	কাশি	কাস, কায়
নাদা	লাডা	পিঠা	পিট
চাতাল	ছান্দাল	লবণ, নুন	লুন
আদি	আম্মা	কন্যা	কদিনা
মুটকি	মুট	আলিঙ্গন বা চাউল	হাল
পাতিল (Pudding)	প্রাক্তিলি	বদনা	উত্তনা
নাও (নৌকা)	ডাও	কম্বল	কম্বলিয়

সিংহলী শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ও পর্তুগীজ হইতে গৃহীত কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা শব্দ, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কথিত শব্দের সঙ্গে সিংহলী শব্দের খুব মিল দেখা যায় এরূপ তালিকা সুদীর্ঘ করা যায়। অবশ্য জগতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে পরস্পরের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে, সুতরাং অপর কোন প্রাদেশিক ভাষায় এইরূপ শব্দ-সাদৃশ্য খুঁজিয়া কতক পরিমাণে বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সঙ্গে সিংহলীর সম্বন্ধ অত্যধিক অপর কোন ভাষার সঙ্গেই সিংহলের ভাষার এতটা সাদৃশ্য নাই যত শব্দ আরও আছে, যদ্দ্বারা এই সাদৃশ্য প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু শুধু শব্দ-সাদৃশ্য-দ্বারা এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার নিকট সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা প্রতিপন্ন হয় না বিভক্তি-চিহ্ন এবং বাক্য-বিন্যাসের রীতিই এই সম্বন্ধ নিশ্চয়তার সহিত সূচনা করে এক্ষেত্রে ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ একটু সন্ধান করিলে সিংহলীর সঙ্গে বাঙ্গলার পরম ঐক্য প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। আমি স্বয়ং সিংহলী জানি না, দুই-এক জন প্রতিবেশী সিংহলীর মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি

সিংহলী "মে" শব্দ "উচ্চ" এবং "নি" দ্বারা বুঝায়—আমাদের বাঙ্গলার "ও জানে" এবং সিংহলীতে "উ জানে না" প্রায় একরূপ "তাহার" শব্দের সিংহলী প্রতিশব্দ "উহাগে" পূর্ব্ববঙ্গে এই শব্দ = "ওহাগো" এবং "উহাগো" তাহারা = সিংহলীতে "ওন" "ওনে" "ওহন" —পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ লোকেরা এই স্থলে "উনি", "ওনারা", "ওনে" বলিয়া থাকে "আপনার" শব্দ সিংহলীতে "আয়গে" পূর্ব্ববঙ্গে "আমাগো", "আপনাকে" সিংহলীতে "আপেন"। স্ত্রীলিঙ্গে সিংহলী -lie শব্দ = "এ", আশ্চর্য্যের বিষয়, ফরিদপুরে এখনও ছোট ছোট মেয়েদের "এ" বলিয়া সম্বোধন করা হয় "তোমার"—সিংহলীতে "তোগে", পূর্ব্ববঙ্গে "তোগো" যথা "তোগোর সাথে কথা বলিব না, ইত্যাদি)

ক্রিয়াবিশেষণেও এই সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট "কোথায়" সিংহলীতে "কোহে" —পূর্ব্ববঙ্গে "কোহানে", সেখানে = সিংহলী "এহে"—পূর্ব্ববঙ্গে "ওহানে", "আমি" শব্দটি সিংহলীতে "মান্না"—পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুথিতে "আম্মি" এবং "আম্ম"

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথিতে অনেক শব্দের যে রূপ পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে সিংহলীর নৈকট্য অধিকতর লক্ষ্য হয়। পুরাতন পুথির পুস্তক শব্দে "পাত" ও "পোত" এই দুই রূপই পাওয়া যায়। সিংহলীতে পুস্তক = "পোথ" ও "পোত"।

পুষ্করণীর প্রাচীন পুঁথি মাত্রেই "ণ" স্থলে "ন" পাওয়া যায়। সিংহলে "ষাণ্ড" শব্দই এখনও প্রচলিত। ব্রাহ্মণ শব্দ সিংহলেও পাওয়া যায়। "বামুন" ও "বাদুন" রূপে প্রচলিত সিংহলীতে ঐ শব্দ "বাদুনা"। সিংহলী "পুকুর" বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল, যথা "অমৃত সমান গিরিসুতা যার বলে পরে পুতা"। বাঙ্গলায় সাঁওতালদের মধ্যে "কাট" বলিতে আমাদের ঢাকা জেলার কোন কোন স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গ বুঝাইত, সেখানটীকে লোকে "কোটবাড়ী" বলে। পুষ্করবাসী যে প্রাচীনকালে এই অর্থে "কোট" বা "কোটবাড়ী" ব্যবহার করিত। সিংহলে ঘরকে "কটু" বলে। বাঙ্গলার "ঘাট" শব্দ সুপরিচিত। ঐ শব্দ ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া সেখানে সিংহলে ব্যবহৃত হয়। পুষ্করবাসী নদীতটকে "ঘাট" বলে সিংহলেও তাহাই। বাঙ্গলা "ঘোড়া" শব্দ প্রাকৃতের পুরাই মুখ হইতে "ঘোটা" শব্দ ব্যবহৃত হয়। পুষ্করবাসী এই শব্দ "ঘোড়া" সিংহলীতে উহা "ঘোড়া"। "ঘোড়" শব্দ প্রাচীন বাঙ্গলায় "ঘোড়" "ঘোর" এই দুই রূপেই পাওয়া যায়। সিংহলীতে উহা "ঘ" "ঘোড়" শব্দ সিংহলীতে "ঘোরা"। —পুষ্করবাসী "ঘোড়" "ঘোড়" শব্দ সিংহলীতে "ঘোর" প্রাচীন বাঙ্গলাতে "ঘর" "কালিদাস" সিংহলীতে "কলি"। পুষ্করবাসীদিগের মুখ হইতে "ঘ"কার "হ"কারে পরিণত হইয়া থাকে। "ঘর" শব্দ সিংহলীতে "হিঙ্গ", সম্ভবতঃ এই শব্দ দ্বারাই বাঙ্গলার "হিজলটুলী", "হিজল ডোবা" প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। "ঘুন" শব্দ পুষ্করবাসীর পুথিতে "হুন" রূপে অনেক স্থলেই দেখিয়াছি। সিংহলীতে "ঘুন" শব্দ "হুন" রূপেই প্রচলিত আছে। সিংহলীতে মুখ শব্দ "মুহুন", প্রাচীন বাঙ্গলাতে "মুহ", "মুহে" সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। "ঘুন্দর" শব্দ সিংহলীতে "হুন্দর"। প্রাচীন বাঙ্গলা পুথিতেও ঠিক ঐরূপ পাওয়া গিয়াছে। "হুন্দর" শব্দ সিংহলীতে "হুন্দুর"। এখনও বাঙ্গলাতে "হুন্দুরে ছাওয়াল" ঐ রূপই ব্যবহৃত আছে। "রাহু", "গ্রাস" রক্তবর্ণ প্রাচীন বাঙ্গলায় অনেক পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও "কার সঙ্গে ঝগড় করি চক্ষু হৈল রাঙ্গ"। সিংহলী "রঙ্গ"—বাঙ্গলা প্রাচীন পুথিতে ঠিক এই রূপই পাওয়া যায়।

"ধর" শব্দ সিংহলীতে "হরম"। প্রাচীন বাঙ্গলা পুথিতে "ধামরাই", "ধামারল" (ঢাকা জেলা) প্রভৃতি নামে ঐ হরম শব্দের সহিত নৈকট্য সূচিত হইতেছে। বাঙ্গলার পারিবারিক উপাধিগুলির কোন কোনটি সিংহলে লক্ষ্য হয়। যেমন—সেন, বাস, সিংহ, বর্দ্ধন ইত্যাদি। ছন্দের প্রকৃতিগত রূপ সিংহলী ও বাঙ্গলায় প্রায় একরূপ। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান করি নাই যেটুকু জানিয়াছি, তাহাতে এই সাদৃশ্য অতি আশ্চর্য্য। "আমি সিংহলী জানি না" এ কথাটী সিংহলীতে "মম সিংহল দানে না"। "না", আমি জানি না = সিং মম না দানিমি (বাং) সে বয় ও বায়=(সিং) সে যায়। সে দেখে, ও দেখে, (সিং)

ওহ দাসি (বাং মরা ও স্নান করে না মাত্র (সিং) লহু নানওয়া (বাং সে বা ও আসর করে=(সিং ওহ আজরে করনওয়া বাং সে হয় বা ও যায়—(সিং, ওহ যাইহৈ (বাং) সে গেল=(সিং) ওহ গলা, (বাং উহারে পুস্তক আমি নেই নাই পূর্ববঙ্গের বাঙ্গলায়—ওহারে পুথি আমি নেই নাই)= সিং ওহুগে পোতা মন ম গাছেমি বাং) (Imperative) যাও= সিং, যাহ (উচ্চারণের একটু সামান্য তফাৎ আছে (বাং) খাও=(সিং) খাও khawa): (বাং) ছাত খাও= (সিং) বাত্ খাও khawa (বাং উহাকে বা ওকে মার= সিং ওহ মারু (marwa) পূর্ববঙ্গের পল্লীর ভাষার সঙ্গেই সিংহলীর বেশী মিল

মহিলা সাহেব বিষ্ণুর কি হলন্ত সম্বন্ধে আমাকে যে একটি কুদ্র নোট দিয়াছেন (বিদেশী এবং বাঙ্গালী বহু পণ্ডিতই এই নোটের অনেকাংশই স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

"The voyage of Vijay was in the older Vanga country—Nagga Dwip, Magadha Dwip, Suppārakka, Bharukaccha, corresponding to Bengal Jaffna Malabar, Sopara, Broach' The order of the places shows that the voyage must have been started from the eastern coast, not the *western coast* Vijay must have left some of his followers at Bharukaccha Those became settled there and gave the name of the older country to their new home which was afterwards corrupted to Lata, evidently the same word as Lala

Sinhapur is said to have been situated between Vanga and Magadha in Lāla-rattha (*SAI* Lata Rashtra) In the Jain Prakrit books it is called Lāḍha In the Prabodha Chandrodaya it is called Rāḍha Mahajanaka Rāj Simhapura or Singapura has been mentioned in some inscriptions. There it is said to be in Kalinga The Varma kings of Bengal claimed to have come from Singapura King Nissankamalla (about 1200 A D) of Ceylon came from a dynasty of Kalinga kings who were reigning at Singapura Long of the same family from which descended Vijay—the first King of Ceylon So Sinhapur must have been in South Radha which afterwards became merged in the Kalinga kingdom. Mr Nandalal Dey identifies this Sinhapur with Singur in the district of Hooghly'

"বিজয়ের সমুদ্র অভিযান এইভাবে হইয়াছিল বঙ্গদেশ—নাগদ্বীপ, মহিলাদ্বীপ, সুপারক ভরুকচ্ছ বর্তমান বাঙ্গলা—জাফ্না, মালদ্বীপ, সোপরা, ব্রোচ্ এই অভিযান হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিজয় পূর্ব উপকূল হইতে রওনা হইয়াছিলেন। পশ্চিম উপকূল হইতে তাঁহার যাত্রারম্ভ হইতেই পারে না বিজয় সম্ভবতঃ তাঁহার কতকগুলি অনুচরকে ভরুকচ্ছে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহারা যে স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইস্থানটি তাঁহাদের

জন্মভূমির নামানুসারে অভিহিত করিয়াছিলেন সেই নাম কালে কালে পরিবর্তিত হইয়া "লাড়" নামে পরিচিত হইয়াছিল এই লাড় এবং আমাদের রাঢ়" বা "লাঢ়" নিশ্চয়ই একশব্দ।

সিংহপুর বঙ্গ মগধের মধ্যবর্তী লাঢ় রাষ্ট্র সংস্কৃত লাঢ়বন্ধু নামক স্থানে অবস্থিত। জৈনদিগের পাকৃত গ্রন্থসমূহে এই দেশ "লাঢ়," বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে "রাঢ" এবং যবনরাজ কর্তৃক "রাল" নামে উক্ত হইয়াছে কতকগুলি প্রাচীন লিপিতে সিংহপুর বা সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল লিপিতে এই স্থান কলিঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত আছে বঙ্গ দেশের যশোবংশীয় রাজারা এই সিংহলের অধিবাসী বলিয়া দাবী করিয়াছেন সিংহলরাজ-বংশে বিজয়মল্ল অনুমান ১২০ খৃঃ সিংহপুরের রাজবংশে উদ্ভূত এবং তিনি সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু বিজয়ের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। সিংহপুর দক্ষিণ রাঢ়ে অবস্থিত ঐ নগর বিধ্বস্তের পরে কলিঙ্গ-সামন্ত কর্তৃক হইয়া গিয়াছিল মিঃ নন্দলাল দে এই সিংহপুরকে গঞ্জাম জেলার বর্তমান সিঙ্গুর বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন "

নগেন্দ্রনাথ বসু, অধুনাতন বিশ্বকোষ রায়বাহাদুর বঙ্গে পোদাধ্যক্ষ প্রভৃতি বাঙ্গালার পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই একটি কথা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয় নাই। বাঙ্গালী গুজরাটে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক উক্ত দেশের কোনরূপ "রাঢ়" নাম দিয়াছিলেন সহিত্যা সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সম্ভবপর হইতে পারে যদিও তিনি এই মতের প্রথম প্রচারক বাঙ্গালী কর্তৃক গুজরাটে উপনিবেশ-স্থাপনের একটা প্রাচীন সংস্কার এ দেশে ছিল তাহা আমরা অবগত আছি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে কালকেতুর গুজরাটে রাজ্য স্থাপনের একটা গল্প আছে এই গল্পটি অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের চৌর্য্য ধরা পড়িলে কোতোয়াল বীরসিংহের কন্যা বিদ্যার গল্পের ন্যায় নহে পূর্ব্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর-লেখকগণ যথা কবিকঙ্কণ ও রামপ্রসাদ এই গল্পের কোন-নির্দ্দেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিয়াছেন কিন্তু কবিকঙ্কণ যেমন গুজরাটে উপনিবেশের কথা লিখিয়াছেন সেরূপ তাঁহার এবং তৎপরবর্ত্তী অপরাপর চণ্ডীকাব্য-লেখকগণও সেই গুজরাটেরই উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং প্রাচীন কাল হইতে এই সংস্কার এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে গুজরাট বঙ্গদেশের কাছে নহে অথচ প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীর গুজরাটে উপনিবেশ-সম্বন্ধে একটা গল্পকথা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকাংশ মিথ্যা ও অবিশ্বাস্য হইলেও মূলে কোন একটা ঐতিহাসিক ঘটনার অস্তিত্ব ছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় মিঃ জে এন দাসগুপ্ত "মিরাট আহমদি" নামক একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে শুধু কবিকঙ্কণ নহেন উক্ত পুস্তকের মুসলমান লেখকও একটা অনুরূপ গল্প বলিয়াছেন। দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন "The connection between the Hindu poet (Kavikankan) and the Mohammedan historian (author of Mirat Ahmadi) would suggest that a traditional account of the foundation

of Gujrat was long prevalent in Hindustan." Bengal in the Sixteenth Century, p. 170.) এই তর্কটাই উপর এবং ইহাদের মধ্যে হাত এইটুকু সত্য যে হিন্দুস্থানের সর্বত্র একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে বিজয়রা গুজরাটের কতকাংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অনেককালের জন্য তাহার রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গুজরাট অঞ্চলে উপনিবেশ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কৃতবিদ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ দত্ত, এম. এ., বি. এল. মহাশয় স্মৃতি আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন

"১৯১৩ সালে আমি গুজরাটের অন্তর্গত কাম্বিদারে নয় মাসিতোছলাম এবং ১৯২০ সালে আমি মহাপ্রভুর ৪ শিষ্যকে কিছু কালের জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম কাম্বিদারে গুজরাটি নামক স্থান আছে এগুলি মুসলমান সঙ্গে ছিলাম ইহারা ব্রাহ্মণ এবং 'দাঁড়া গৌড় ব্রাহ্মণ' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন ইহারা বলেন যে, বহু কাল পূর্বে এলাহাবাদের নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে ইহারা এখানে আসিয়াছেন এই গুজরাটবাসী ব্রাহ্মণেরা 'গৌড় ব্রাহ্মণ' বলে যখন এলাহাবাদের নিকট কোন স্থান ইহাদের আদিম বাস তখন আমি গৌড় বলিতে বাঙ্গলার গৌড়ের অধিবাসী বাঙ্গালী অনুমান করিলাম মিরাট সহর হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে বাগপোতা নামক স্থানে আমি স্বামী সোমতীর্থ মহোদয়ের আশ্রমে বাস করিতেছিলাম তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা "তাগা ব্রাহ্মণ" এবং তাঁহাদের প্রাচীন কুলজীগ্রন্থ অনুসারে তাঁহারা 'গৌড় বাঙ্গলা" হইতে আসিয়া এতদঞ্চলে বাস করিতেছেন এইরূপ 'গৌড় ব্রাহ্মণ' আগ্রা অযোধ্যের উত্তর-পশ্চিমে আরও অনেক স্থানে আছেন আমার মনে হয় প্রাচীনকালে বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ ঐ সকল অঞ্চলে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন মিরাট ও তাহার নিকটবর্তী বুলন্দসহরাদি জেলাতে প্রায় চার লক্ষ "গৌড় ব্রাহ্মণ" বাস করেন, ইহারা নিজেই যখন গৌড় বাঙ্গলা হইতে আসিয়াছেন বলেন, তখন তাঁহারা যে বাঙ্গালী সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই "

বাঙ্গালীর সঙ্গে সিংহলের সংস্রব বহু পূর্ব হইতে এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে শুধু ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর নহে, বাঙ্গলার যে কোন বণিক্ বাণিজ্যে যাইবেন—তাঁহাকে সফর করিতে সিংহলে যাইতেই হইবে। বঙ্গীয় বহু প্রাচীন কাব্যে এ দেশের বণিক্দের সিংহলে যাতায়াতের কথা উল্লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা বাঙ্গলার সঙ্গে সিংহলের একটা ব্যাপক সম্পর্ক প্রতিপন্ন হয় এবং সিংহলে বাঙ্গালীর যে একটা স্থায়ী রকমের আড্ডা ছিল—এই সকল কাহিনী তাহার অপরোক্ষ ইঙ্গিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় বস্তুতঃ বাঙ্গালী জাবা, বালী, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া, শ্যাম, জাপান ও চীন প্রভৃতি বহু স্থানে সেই ইতিহাস-পূর্বযুগে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়ের এই কীর্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অজন্তার বিখ্যাত চিত্রাবলির মধ্যে সিংহল দেশে বিজয়ের অভিযান-

শীর্ষক চিত্রটি সর্ব্বচিত্রের মধ্যে অধিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছে। এই চিত্রাবলির বহুমূল্য মুক্তামালার মধ্যে বিজয়কৃত সিংহলবিজয় মহামণিস্বরূপ। অজন্তার চিত্রাবলির ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ আমি নিম্নে দিতেছি। ইহা লেডি হ্যারিঙ্গটনের "অজন্তা প্রসাবলি" পুস্তকে উদ্ধৃত কুমারী ফোরথ্রু এম লাবড্যাণ্টের মন্তব্য হইতে সঙ্কলিত হইল —"এই চিত্রাবলির মধ্যে যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে সেই চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে। যদিও এই ছবিটি চক্ষুকে বিশ্ব লেডি হ্যারিঙ্গটনের ঠিক মনের মত পাইতেছি তখন ই, তথাপি এই পর্য্যায়ের চিত্রগুলির মধ্যে ইহাই সুন্দরতম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল চিত্রের উপরিভাগ মাঝে মাঝে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হয়ত ইহা কোনরূপে কক্ষ এমনভাবে কাটিয়া ফেলিয়া থাকিবে, অথবা অন্য কারণেও ইহা হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু ইহার বর্ণের উজ্জ্বলতা অনেক পরিমাণে এখনও বিদ্যমান। চরিত্রগুলি বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কোথাও লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এক একটি পর্য্যায়ের ছবি যে একটি মালার ন্যায় বোধ হয়। অপূর্ব্বাকৃতি হস্তীগুলির বৃহৎ দেহগুলির মধ্যে দিয়া যুদ্ধের অভিযান, সৈন্যসমূহের বর্ণাফলক-সহ যুদ্ধোদ্যত আকারে উদ্দীপনা তীব্রতাব্যঞ্জক সমরক্ষেত্রে ভীতিসঞ্চারক হৈ হৈ শব্দের আবির্ভাব, পলায়নপর শত্রুকুলের চারু গঠন, গায়ক বাদকদের সঙ্গে রাজার আগমন—এই সমস্ত ছোট ছোট সুন্দর চিত্র-সমন্বিত যে মহৎ দৃশ্য অবতারিত হইয়াছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। অজন্তা গুহার চিত্রাবলির শিল্পাদর্শ নিখুঁত কলাকৌশলপূর্ণ বিষয়সিদ্ধ, কিন্তু এই চিত্রখানি অপরাপর সমস্ত চিত্রকে হার মানাইয়াছে।"

মহাবংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহলে আগমন *

বঙ্গদেশের রাজধানীতে বহুকাল এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কলিঙ্গরাজের দুহিতাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাহার একটি কন্যা হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিলেন, এই কন্যার সঙ্গে পশুজাতির মিলন হইবে। কন্যাটি অতি সুন্দর ও স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন—রাজা ও রাণী ইহার ব্যবহারে লজ্জিত হইতেন। সিংহলে ইহার নাম "সুসিমা" বলিয়া লিখিত আছে।)

* উইলহেলম গাইগার, পি-এচ্ ডি এবং মাতার হরিদাস মৌলিক, পি-এচ্ ডি কৃত ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

কুমারী একাকী রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, তিনি স্বাধীন জীবনের সুখ-ভোগের জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। একদল পথিক মগধের পথে যাইতেছিল, কুমারী তাহাদের সঙ্গ লইলেন। 'লাল' দেশের জঙ্গল-পথে তাঁহারা এক সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। যে যে-দিকে পারে পলাইয়া গেল, কিন্তু রাজকুমারী যে পথ দিয়া সিংহ যাইতেছিল, সেই পথে চলিলেন।

রাজকুমারীর নিভীকতা।

সিংহ যখন স্বীয় আহার্য্য ভোজনার্থে স্বস্থানে যাইতেছিল, তখন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল সিংহ সেই রমণীর মোহে পড়িয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া কুমারীর নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাহার হৃৎকম্প তখন ঘুচিয়া পড়িল সিংহকে দেখিয়া কুমারীর সৈবজ্ঞের কথা মনে উদিত হইল এবং তিনি নির্ভয়ে তাহার গাত্রে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন তাঁহার কোমল স্পর্শে সিংহ গাত্রতরঙ্গে আকৃষ্ট হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া স্বীয় গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইল, সেখানে রাজকুমারীর সঙ্গে পশুরাজের মিলন ঘটিল। এই মিলনের ফলে রাজকুমারীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এই দুইটি যমজ সন্তান জন্মলাভ করিল।

সিংহের সহিত মিলন

ছেলেটির হাত ও পা কতকটা সিংহের মত হইয়াছিল, এই জন্য তাহার মাতা তাহার নাম সিংহবাহু রাখিলেন কুমারীর নাম হইল সিংহশিবলী ছেলের বয়স যখন ষোল হইল, তখন সে নিজের মনের একটা সন্দেহ-সম্বন্ধে তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার সঙ্গে আমাদের পিতার চেহারার একটা বৈষম্য কেন?" তখন রাজকুমারী সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন তাহা শুনিয়া পুত্র বলিল,—"চল, আমরা এ স্থান হইতে দেশে ফিরিয়া যাই" মাতা বলিলেন, "তোমার পিতা একটা পাথর দিয়া এই গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যান।" তখন পুত্র সেই বৃহৎ পাথরটা কাঁধে করিয়া লইয়া ৬০০ মাইল পথ এক দিনে যাতায়াত করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মাতা ও ভগিনী সহ সিংহবাহুর পলায়ন

ইহার পরে একদিন সিংহ শিকারের জন্য চলিয়া গেল সিংহবাহু এক স্কন্ধে তাঁহার মাতা ও অপর স্কন্ধে তাঁহার ভগিনীকে লইয়া খুব হাঁটিয়া চলিলেন। তাঁহারা কাপড়ের অভাবে গাছের পাতা ও লতা পরিধান করিয়াছিলেন। এই ভাবে তাঁহারা একটি পল্লীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই সময়ে সেই স্থানে বঙ্গাধিপের এক ভাগিনেয় তাঁহার অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন। এই সেনাপতির নাম অজয় তিনি বঙ্গের প্রান্তভাগের শাসন-কর্ত্তৃত্ব করিতেন। যে সময় রাজকন্যা তদীয় পুত্র ও দুহিতার সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, ঠিক সেই সময়ে তথাকার শাসনকর্ত্তা দৈবক্রমে তথায় একটি বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া কার্য্যকর্ত্তৃগণের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" রাজকন্যা বলিলেন, "আমরা বনবাসী।" শাসনকর্ত্তা তাঁহার লোকদিগকে

বলিয়া তাঁহাদিগকে বস্ত্রদান করিলেন। তাঁহার সেই বস্ত্র পরিধানমাত্র তাহা বহুমূল্য পরিচ্ছদে পরিণত হইল।

বঙ্গের উপসংহার।

শাসনকর্তা অসুর তাঁহাদিগকে বৃক্ষপত্রে আহারদান করিলেন, কিন্তু সেই বৃক্ষপত্র তাঁহাদের প্রভাবে স্বর্ণনির্মিত ভোজনপাত্রে পরিণত হইয়া গেল। বিস্মিত হইয়া শাসনকর্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা কে?" তখন রাজকন্যা তাঁহাকে স্বীয় বংশ ও কুলের কথা বলিলেন। তখন শাসনকর্তা তাঁহার মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিলেন।

এ দিকে শিকার হইতে ফিরিয়া সিংহ তাহার পরিবারবর্গকে না দেখিতে পাইয়া—বিশেষতঃ পুত্রদিগকে না দেখিতে পাইয়া—অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া পড়িল। সে আহার ও পানীয় ত্যাগ করিল এবং তাহাদিগের উদ্দেশে বঙ্গদেশের উপান্তবর্তী পল্লীসমূহ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তৎপল্লীর অধিবাসীরা তাহার ভয়ে বাটীঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সেই প্রান্তভাগের লোকেরা রাজার নিকট আসিয়া নালিশ করিল, "মহারাজ! একটা সিংহের উপদ্রবে আমরা কেহই বাস করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

সিংহের অত্যাচার।

রাজা এমন কোন লোক পাইলেন না যে, এই বিপদ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। তখন রাজা রাজার দ্বারে সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি তোড়া রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন—"যে কোনও ব্যক্তি সিংহকে বধ করিয়া আনিবে, এই তোড়া তাহারই হইবে।" তারপরে রাজা সেই তোড়ার মুদ্রাসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে দ্বিসহস্র ও শেষে ত্রিসহস্র স্বর্ণমুদ্রার পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সিংহবাহু দুই বার এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা দুই বারই তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু তিন বারের বার সিংহবাহু নিজের পিতাকে নিধন করিয়া ত্রিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

সিংহবাহুকে রাজপুত্রের রাজসভায় উপস্থিত করাইল। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি যদি এই সিংহকে বধ করিতে পার তবে রাজসিংহাসন তোমারই হইবে।"

সিংহবাহু সিংহের গর্ত্তের মুখে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে পুত্রকে পুনরাগত দেখিয়া অতি স্নেহবশতঃ সিংহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সিংহবাহু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর ছুঁড়িলেন, তীর সিংহের ঠিক মস্তকের উপরে পতিত হইল, কিন্তু বাণের এমনই প্রভাব যে সেই তীর সিংহের কোন ক্ষতি করিল না। সিংহের কপালে ঠেকিয়া তাহা ফিরিয়া আসিয়া সিংহবাহুর পায়মূলে পড়িল। তিন বার এইভাবে সিংহবাহুর বাণ ব্যর্থ হইয়া গেল, কিন্তু চতুর্থ বারে সিংহের ক্রোধ হইল। ক্রোধ হওয়া মাত্র চতুর্থ বারের নিক্ষিপ্ত শর তাহার শরীর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

সিংহবাহু কর্তৃক সিংহবধ।

সিংহবাহু কেশরযুক্ত সিংহমস্তকটি লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই সময়ের সাত দিন পূর্ব্বে বঙ্গাধিপের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। রাজার কোন পুত্র ছিল না। মন্ত্রীরা

সিংহবাহুর বিক্রমের নিদর্শন পাইয়াছিলেন তাঁহারা জানিয়াছিলেন সিংহবাহু মৃত্তরাজার দৌহিত্র এবং তাঁহারা মাতাকেও চিনিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সিংহবাহুকে অভিনন্দনপূর্বক বলিলেন, "আপনিই আমাদের রাজা হউন" সিংহবাহু রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন কিন্তু উহা তাঁহার মনঃপূত হইল না মাতার স্থানে অর্পণ করিয়া সিংহশিবলীকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই নগরীর নাম হইল "সিংহপুর" এই নগরীর চতুষ্পার্শ্ব ৪০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া তিনি বহু পল্লী স্থাপন করিলেন। "লালদেশে"—সেই রাজধানীতে সিংহবাহু রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সিংহশিবলীকে রাজ্যেশ্বরূপ গ্রহণ করিলেন। বিবাহের পরে রাজ্ঞী ১৬ বার প্রসব করিলেন। প্রত্যেক বারেই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল তাঁহাদের প্রথমপুত্রের নাম বিজয় এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুমিত্র সুমিত্র রাখা হইল যথাসময়ে রাজা বিজয়কে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সর্বসমেত রাজার ৩২টি পুত্র হইয়াছিল।

সিংহবাহুর যমজ ভ্রাতৃত্ব এবং তাহার রাজ্য স্থাপন

বিজয় অতি দুর্দান্তচিত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সঙ্গীরাও তাঁহারই মত ছিলেন। ইহারা রাজ্যে অসহনীয় অত্যাচার করিতে লাগিলেন, প্রজাগণ ক্ষুব্ধ হইয়া রাজাকে তাঁহাদের সমস্ত ব্যবহারের কথা জানাইল রাজা মন্ত্রীদিগকে তিরস্কার করিলেন এবং পুত্রের তীব্র নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবরাজ রাজার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। একবার এক বার দুই বার এবং তিন বারের রাজার কথায় যুবরাজের চরিত্রের কোন উন্নতি হইল না তখন প্রজাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ আপনি পুত্রকে বধ করুন।" বিজয় ও তাঁহার শত শত সঙ্গীর মস্তকের শ্মশ্রুভাগ মুণ্ডন করাইয়া রাজা তাঁহাদিগকে নির্বাসন দিলেন। তাঁহাদিগের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাসহ তাহাতে উঠাইয়া দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সমুদ্রপথের যাত্রী করাইলেন। স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পেটিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আগমনপূর্বক তথায় বসবাস করিতে লাগিল, যেস্থানে বালকগণ উপনিবিষ্ট হইল, তাহার নাম হইল অরবীপ মহিলাগণ যেখানে বসিলেন তাহার নাম হইল মহিলাদ্বীপ কিন্তু বিজয় যে বন্দরে গেলেন, তাহার নাম সুপ্পারক কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্গীদের দৌরাত্ম্যে বিপন্ন হইয়া পুনরায় তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন। বীরদের বিজয় অবশেষে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। তথায় তাম্রপর্ণী নামক স্থানে তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যে দিন ভগবান তথাগত যমজ সন্তানের ন্যায় পরিনির্বাণ দুইটি শালতরুর অবকাশস্থলে নির্বাণপ্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন সেই দিনই বিজয় লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন। এইখানে মহাবংশ নামক গ্রন্থের বিজয়ের আগমন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল এই মহাবংশ ধার্মিক ব্যক্তিগণের চিত্তপ্রসাদন, স্থৈর্য ও আনন্দের জন্য সঙ্কলিত হইল।

বিজয়চরিত্র

লঙ্কায় আগমন

মহাবংশের সপ্তমাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহল-বিজয়

যখন জগতের অনন্যশরণ তথাগত ভূলোকের উদ্ধার সাধন করিয়া চিরমঙ্গলময় শান্তির শেষধামে আরোহণপূর্বক নির্বাণ-লাভে শান্তিত ছিলেন, তখন সেই মহাজ্ঞানী বাক্যকোবিদগণের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব সমস্ত দেবতাগণের সমক্ষে সন্নিকটে দণ্ডায়মান দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'সিংহবাহু তনয় বিজয় সাত শত সঙ্গিসহ 'লাল-দেশ' হইতে লঙ্কায় আসিতেছে। হে দেবরাজ লঙ্কাদ্বীপ আমার ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হইবে, অতএব আপনি সাবধানতার সহিত বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে লঙ্কায় রক্ষা করিবেন।' যখন দেবরাজ তথাগতের এই কথা শ্রবণ করিলেন, তখনই তিনি তাঁহার সম্মানার্থ নীলোৎপল বর্ণদেবের বিকুর্বণ। উপর লঙ্কারক্ষার ভার ও অভিভাবকত্ব প্রদান করিলেন। শক্র হইতে এই ভার প্রাপ্তি মাত্র সেই দেবতা লঙ্কায় উপনীত হইয়া কোন সুমনলাল সাধুর ছদ্মবেশে তথায় এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। বিজয়ের সঙ্গিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! এই দ্বীপের নাম কি?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "এখানে কোন মানুষ নাই কিন্তু তোমাদের কোন বিপদ্ ঘটিবে না।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার কমণ্ডলু হইতে তাহাদের গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন, তৎপরে তাহাদের হস্তে রক্ষি-বন্ধনপূর্বক আকাশপথে অন্তর্ধান হইয়া গেলেন।

তখন তথায় কুবেরীর বেশে এক যক্ষী উপস্থিত হইল। এই যক্ষী ছিল 'কুবরা' নাম্নী যক্ষীর সহচরী। বিজয়ের এক অনুচর কুবেরীর পশ্চাতে ধাবিত হইল, কিন্তু বিজয় তাহাকে মানা করিয়াছিলেন। সে ভাবিল, নিশ্চয়ই এখানে কোন পল্লী আছে, নতুবা কুবের থাকিত না। সেই কুবেরী বেশিনী যক্ষীর অধিকারিণী কুবরা নাম্নী যক্ষী অনতিদূরে এক বৃক্ষের নীচে বসিয়া সম্রাজ্ঞিনীর ন্যায় চরকা-দ্বারা সূতা কাটিতেছিল। বিজয়ের অনুচর সম্রাজ্ঞিনীকে একটা বাপীতীরে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া সেই পুষ্করের জলে স্নান করিয়া জলপান করিল, তৎপরে কতকগুলি পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া লইল এবং পদ্মপত্রে কিছু জল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। যক্ষী তখন তাহাকে বলিল "যেখানে আছ ঠিক সেইখানেই থাক, এখন তুমি আমার করতলগত হইয়াছ।" এই কথা উচ্চারণ করামাত্র সেই লোকটি সেখানে যক্ষীর মত হইয়া রহিল, তাহার নড়িবার শক্তি লুপ্ত হইল। কিন্তু তাহার হাতে যে রাখী বাঁধা ছিল তাহার গুণে সেই যক্ষী তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারিল না। যদিও যক্ষী তাহার রাখীটা খুলিয়া ফেলিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, লোকটি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না। তখন যক্ষী তাহাকে আক্রমণ করিল এবং জোর করিয়া একটা গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যক্ষী বিজয়ের সাত শত অনুচরের সকলকেই সেই গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

সাত শত অনুচরের একটিকেও ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া বিজয় ভীত হইলেন। তিনি পঞ্চাস্ত্রে (খড়্গ, ধনু, যুদ্ধকুঠার, বর্শা এবং বর্ম) সজ্জিত হইয়া সেই পুকুরের তীরে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি কোন অনুচরের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, শুধু সেই অতি সুন্দর বাপীতটে সন্ন্যাসিনীবেশী সেই স্ত্রীলোককে দেখিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন "নিশ্চয়ই আমার অনুচরেরা এই রমণীর প্রভাবে বশীভূত হইয়াছে।" তখন তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলেন, "মহাশয়া আপনি কি আমার লোকগুলিকে দেখিয়াছেন?" যক্ষী বলিল, "যুবরাজ! আপনি সেই সকল লোকজন লিয়া কি করিবেন? আপনি পুকুরে স্নান করিয়া জলপান-পূর্ব্বক শান্ত হউন।"

বিজয় কর্তৃক যক্ষীর অধিকার।

এই কথায় বিজয়ের মনে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেল,—"এই রমণী নিশ্চয়ই যক্ষী, সে আমার পূর্ব্বপুরুষ-সম্বন্ধে সবই জানে।" তখন তাড়াতাড়ি তিনি ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া স্বীয় নাম ঘোষণাপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার বস্ত্র দ্বারা যক্ষীর কণ্ঠ বাঁধিয়া বামহস্তে তাহার কেশরাশি আকর্ষণপূর্ব্বক অন্যহস্তে নিষ্কাষিত কৃপাণ উদ্যত করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "রাক্ষসি! তুমি আমার সাত শত লোক ফিরাইয়া দাও, নতুবা আমি তোমাকে বধ করিব।" তখন ভীতা হইয়া যক্ষী অনুনয়পূর্ব্বক রাজকুমারের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিল এবং বলিল, "আমার জীবন দান করুন, প্রতিদানে আমি আপনাকে একটি সাম্রাজ্য দান করিব এবং স্ত্রীজনোচিত যে ব্যবহার আপনি ইচ্ছা করিবেন এবং যে সেবা আপনি চাহিবেন, তাহা সমস্তই দিব।"

যক্ষী পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই ভয়ে বিজয় তাহাকে দিয়া শপথ করাইয়া লইলেন এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি আদেশ করিলেন, "আমার অনুচরদিগকে এখনই লইয়া আইস" তখনই যক্ষী তাহাদিগকে তথায় লইয়া আসিল। ইহার পর রাজকুমার বলিলেন, "আমার লোকজন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে।" তখনই যক্ষী প্রচুর চাউল, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং অপরাপর বহু সামগ্রী তাঁহাকে আনিয়া দিল। যে সকল বণিকেরা জাহাজে তথায় আসিয়াছিল এবং যাহাদিগকে যক্ষগণ খাইয়া ফেলিয়াছিল, এ সকল জিনিষপত্র ও খাদ্যদ্রব্য তাহাদেরই ছিল। সেই সমস্ত দ্রব্য-দ্বারা বিজয়ের লোকজনেরা অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল, তৎপরে তাহারা একত্র বসিয়া আহার করিল।

বিজয় স্বয়ং সেই খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ যক্ষীকে দিয়াছিলেন, সে তাহা আহার করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল। ষোড়শ-বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী রমণীর বেশে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিজয়ের নিকট উপস্থিত হইল। একটি বৃহৎ তরুচ্ছায়ায় যক্ষী অতি চমৎকার শয্যা রচনা করিল। একটি শিবিরের দ্বারা সেই স্থানটি উৎকৃষ্টরূপে আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল এবং তাহার উর্দ্ধে একটি তন্ত্রাতপ বিরাজিত ছিল। এই সকল আয়োজন দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রাজকুমার সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং যক্ষীকে সেই শয্যায়

যক্ষীকে শয্যা-রচিয়ত্রী করা

স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে বহু সুখলাভের আশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরেরা শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিল।

রাত্রে রাজকুমার নানারূপ বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে শায়িতা যক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সমস্ত গোলমাল কিসের?" যক্ষী মনে মনে চিন্তা করিল, "এখন ইনিই আমার প্রভু, আমি ইহাকেই এই রাত্রি পান করিব। যক্ষগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। যদি তাহা না করিতে পারি তবে আমাকভুক ইহারা এইখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিয়া তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।"

যক্ষী বিজয়কে বলিল, "এইখানে যক্ষদের একটি রাজধানী আছে, তাহার নাম সিরিসাবস্থ। যক্ষ-রাজার নাম কালসেন। মহাধিপ যক্ষপতির কন্যাকে এখানে আনা

বুদ্ধা যক্ষীর সাহায্যে বিজয় কর্তৃক কালসেন নামক যক্ষরাজের পরাভব

(অজন্তা চিত্র হইতে গৃহীত

হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার মাতাও আসিয়াছেন। এই কন্যার বিবাহোপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে। বহু যক্ষ এখানে সমাগত হইয়াছে, এই কলরব তাহাদের।

যদি তুমি আজই ইহাদিগকে বধ কর, তবে পারিবে, কিন্তু ইহার পরে আর তাহা সম্ভবপর হইবে না।"

বিজয় বলিলেন, "আমি ইহাদিগের সঙ্গে কিরূপে পারিব? ইহারা তো অদৃশ্য হইয়া থাকে?" যক্ষী বলিল, "সে যাহাই হউক, তুমি ভীত হইও না আমি যেখানে সেখানে চীৎকার করিব, তুমি সেইখানে সেইখানে লক্ষ্য-সন্ধান করিবে। আমার হুহুঙ্কারে তোমার অস্ত্র তাহাদের শরীরে পতিত হইবে।" এই কথা শ্রবণমাত্র বিজয় যক্ষীর উপদেশানুসারে যক্ষদিগকে সংহার করিলেন এইভাবে অগ্রসর হইয়া তিনি যক্ষরাজের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে অপর একজনকেও সেইরূপ পরিচ্ছদ দিলেন।

যক্ষ বিনাশ

কতকদিন সেইখানে বাস করিয়া বিজয় তাম্রপর্ণি নগরে গমন করিলেন, এইখানে এক রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই যক্ষীকে লইয়া স্বীয় মন্ত্রিবর্গসহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

যখন বিজয়ের সঙ্গীরা লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া শ্রান্তক্লান্ত দেহে মাটীর উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই দেশের লাল মাটীর গুণে তাঁহাদের করতল তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইজন্য তাঁহারা সেই স্থানের নাম "তাম্রপর্ণি" রাখিয়াছিলেন। এদিকে বিজয়ের পিতা সিংহবাহু সিংহবধ করার জন্য "সিংহল" নাম পাইয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার সহচর ও আত্মীয়গণ ঐ নামে পরিচিত হইতেন, এই সম্বন্ধহেতু বিজয়ের লোকজনেরাও "সিংহল" নামে অভিহিত হইতেন।

লঙ্কা দ্বীপে বিজয়ের প্রাসাদ-দৃশ্য।
(অজন্তা-চিত্র হইতে গৃহীত

বিজয়ের মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নূতন নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন কদম্ব নদীর তীরে অনুরুদ্ধ নামক বিজয়ের এক অমাত্য "অনুরুদ্ধ" গ্রাম (অনুরুদ্ধ গ্রাম) স্থাপন করেন। ঐ গ্রামের উত্তরে গান্ডীরা নদীর তীরে পুরোহিত উপতিষ্য "উপতিষ্য" গ্রাম (উপতিষ্য গ্রাম) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়ের আর তিন জন অমাত্য উচ্চলি, উরুবিল্ব এবং বিজিত নামক তিন গ্রাম স্থাপন করেন

নূতন নূতন নগর-স্থাপন।

এই দেশে অধিকার স্থাপিত হইলে সকলে বিজয়ের নিকট প্রার্থনা করিল, "আপনি আমাদের রাজপদে অভিষিক্ত হউন।" কিন্তু তাহাদের বারংবার প্রার্থনাসত্ত্বেও বিজয় বলিলেন, "যদি উচ্চকুলের কোন রমণী রাজ্ঞী হইয়া আমার সঙ্গে একত্র অভিষিক্ত না হন, তবে সহধর্ম্মিণী-হীন অবস্থায় কিছুতেই আমার অভিষেক হইতে পারে না।" কিন্তু তাঁহার অমাত্যবর্গের দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল, যে করিয়া হউক বিজয়কে রাজাভিষিক্ত করিতেই হইবে। অবশ্য কাজটা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা দমিবার পাত্র নহেন, সুতরাং নিরাশ হইলেন না। তাঁহারা বহুসংখ্যক বহুমূল্য মণিমুক্তা ও অপরাপর সামগ্রীসহ দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য রাজার নিকট তাঁহার কন্যার সহিত বিজয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন; তাঁহারা নিজেদের এবং অপরাপর ব্যক্তিগণের জন্যও সেইরূপ যোগ্যা কন্যার সন্ধানে দূতদিগকে অবহিত করিয়া দিলেন। যখন দূতেরা জাহাজে চড়িয়া মাদুরায় উপস্থিত হইল, তখন তাহারা মাদুরার রাজাকে সেই সকল উপহার ও পত্র প্রদান করিল।

বিজয়ের অভিষেক।
(অজন্তা-চিত্র হইতে গৃহীত)

দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য রাজ

মাদুরার রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্বীয় কন্যাকে লঙ্কায় প্রেরণ করা স্থির করিলেন। বিজয়ের মন্ত্রীদের জন্যও তিনি আরও এক শত কন্যা প্রেরণ করা সঙ্কল্প করিয়া নগরে ঢোল দিয়া ঘোষণা করিলেন "যাহারা তাঁহাদের কুমারী কন্যাদিগকে লঙ্কায় পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কন্যাদিগকে দুই প্রস্থ পরিচ্ছদসহ রাজদ্বারে উপস্থিত করাইবেন, তাহা হইলেই আমি তাহাদিগকে গ্রহণ করিব।"

এইভাবে তিনি বহুসংখ্যক কুমারী সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে ক্ষতিপূরণার্থে ধন দান করিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় কুমারীকে নানারূপ অলঙ্কার ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী এবং পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিলেন। তিনি পদমর্য্যাদা-অনুসারে অন্যান্য কুমারীদিগকে উপযুক্ত বেশভূষা দিয়া সজ্জিত করাইলেন। বহু অশ্ব, গজ এবং শকট-সমাবেশে রাজযোগ্য মিছিল চলিল, তৎসঙ্গে অষ্টাদশ শিল্পীর এক সহস্র

পরিবারবর্গ লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল। রাজদূত রাজার পত্রসহ মহারাজ বিজয়ের জন্য এই সকল উপঢৌকন ও কুমারীদিগকে লইয়া যাত্রা করিল। এই বিপুল জনতা লঙ্কার মহাতীর্থ (মহাতিত্থ) নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের উপস্থিতির স্মারক স্বরূপ উত্তরকালে এই স্থানটির নাম 'মহাতীর্থ' হইয়াছিল।

সেই যক্ষীর গর্ভে বিজয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছিল। যখন বিজয় শুনিলেন, রাজকুমারী সিংহলে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন যক্ষীকে বলিলেন, "প্রিয়তমে, এই বেলা তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর। তুমি তোমার পুত্রকন্যাকে আমার নিকট রাখিয়া যাইতে পার। মানুষেরা তোমাদের মত যক্ষীদিগকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া যক্ষী তাহার স্বগণ যক্ষদিগের ভয়ে অত্যন্ত আতঙ্কিত হইল। বিজয় বলিলেন, "বিলম্ব করিও না, আমি তোমাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া নৈবেদ্য দান করিব।" যখন পুনঃ পুনঃ সকাতর-ভাবে প্রার্থনা করিয়াও যক্ষী নিষ্ফল হইল, তখন সে তাহার দুইটি সন্তান লইয়া তথা হইতে লঙ্কায় চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মনে সর্বদা আশঙ্কা হইতেছিল যে তাহার কোন বিপদ ঘটিবে।

যক্ষীর মৃত্যু ও তাহার পুত্রকন্যার কথা।

লঙ্কা নগরীতে পৌঁছিয়া সে তাহার সন্তান দুইটিকে পুরীর দ্বারে রাখিয়া স্বয়ং একাকী নগরীতে প্রবেশ করিল। লঙ্কাবাসী যক্ষেরা তাহাকে চিনিতে পারিল এবং আশঙ্কা করিল যে সে বিজয়ের গুপ্তচর, তাহারা এই বিষয়ে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে এক দুর্দান্ত যক্ষ একটি মুষ্টির আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিল। কিন্তু যক্ষীর এক মাতুল যক্ষপুরী হইতে নির্গত হইয়া পথে সেই বালক-বালিকাকে দেখিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? কাহার সন্তান?" এবং যখন শুনিল যে তাহারা কুবেরের পুত্রকন্যা, তখন বলিল "তোমাদের মাতাকে যক্ষগণ হত্যা করিয়াছে, তোমাদিগকে দেখিতে পাইলেও তাহারা মারিয়া ফেলিবে, সুতরাং অশোকে অতি দ্রুত পলাইয়া যাও।" তাহারা যথাসাধ্য দ্রুত গমন করিয়া পুষ্পকূটে উপস্থিত হইল। বালকটি বড় ও কন্যাটি ছোট ছিল। বালক বয়স্থ হইয়া নিজ ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহাদের বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইল, তখন তাহারা রাজার আদেশ লইয়া মলয় পর্বতে বাস করিল। ইহাদিগেরই বংশধরেরা "পুলিন্দ" নামে খ্যাত হইয়াছে।

পাণ্ডু রাজার দূতেরা বিজয়কে রাজকন্যাসহ সেই সকল বহুমূল্য রত্নাদি ও কুমারীগণ অর্পণ করিল। বিজয় এই সকল দূতের যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিয়া সম্মানিত করিলেন এবং কুমারীদের সহিত পদমর্যাদানুসারে স্বীয় মন্ত্রী এবং সেনাপতিদের বিবাহ দিলেন। মন্ত্রীরা এইবার তাঁহাকে রীতি-অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া একটি মহৎ উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। বিজয় রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পাণ্ডুরাজ-কন্যাকে সমারোহের সহিত বিবাহ করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্ঞীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি এই উপলক্ষে তাঁহার মন্ত্রীদিগকে অনেক ধন দান করিয়াছিলেন এবং তদবধি বৎসর বৎসর তিনি তাঁহার শ্বশুর পাণ্ডুরাজকে এক একটি মুক্তা উপহার পাঠাইতেন. এই মুক্তার মূল্য ছিল ছয় লক্ষ মুদ্রা।

অতীতের দুষ্কৃত স্মরণ পরিহারপূর্ব্বক এই নৃপতি সমস্ত সম্ভার অধিপতি হইয়া অতিশয় ন্যায়পরতার সহিত রাজশাসন করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্ব শান্তিপূর্ণ ও সুখময় হইয়াছিল। 'চম্পপানি' নগরে তিনি এইভাবে আটত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিজয়ের রাজ্যাভিষেক নামক মহাবংশের সপ্তম অধ্যায় এইখানে পরিসমাপ্ত হইল। এই পুস্তক সুধীজনের চিত্তপ্রসাদন, স্থৈর্য্য ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দদানের জন্য সঙ্কলিত হইল।

মহাবংশের অষ্টমাধ্যায়ে পাণ্ডুবাসুদেবের রাজ্যাভিষেক

রাজাধিরাজ বিজয় জীবনের শেষ বৎসর চিন্তা করিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার কোন পুত্র নাই। এই মহারাজ্য বহুকষ্টে আমি গঠন করিয়াছি এবং ইহা স্বর্গলোকাবাসে পরিণত হইয়াছে কিন্তু এই সুগঠিত বিশাল রাজ্য আমার মৃত্যুর পর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে সুতরাং আমার ভ্রাতা সুমিত্রকে আনাইয়া তাঁহাকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।" তিনি মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে রাজার নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই পত্র প্রেরণের কয়েকদিন পরেই বিজয় রাজার মৃত্যু হইল।

বিজয় কর্তৃক ভ্রাতাকে আহ্বান।

তাঁহার মৃত্যুর পর উপদিষ্য গ্রামে থাকিয়া মন্ত্রীরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাজার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া এই সময়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিজয়ের মৃত্যুর এবং নূতন রাজার আগমন পর্য্যন্ত প্রায় এক বৎসর কাল লঙ্কাদ্বীপ রাজশূন্য অবস্থায় ছিল।

সিংহবাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র রাজা হইয়াছিলেন, মদ্রদেশের রাজকন্যার গর্ভে তাঁহার তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল লঙ্কা হইতে দূতগণ আসিয়া রাজাকে বিজয়ের পত্রখানি দান করিল। সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া রাজা তাঁহার তিন পুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "বৎসগণ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমাদের মধ্যে একজনকে শুনলঙ্ক লঙ্কানগরে যাইতে হইবে ইহা আমার ভ্রাতার রাজ্য, তিনি লোকান্তরিত হইলে এখন যে যাইবে, সেই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে।"

রাজার সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার পাণ্ডুবাসুদেব যাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার পথে কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই—এ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়া, পিতার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক ৩০ জন মন্ত্রিপুত্র-সহ ধর্ম্মপালকের ছদ্মবেশে তিনি জাহাজে রওনা হইলেন।

পাণ্ডুবাসুদেব।

সিংহলী কথার উপসংহার

আমরা মহাবংশের আর অধিক অনুবাদ দিব না। বিজয়ের লঙ্কায় অভিযান এবং তথায় নব রাজ্যস্থাপন বাঙ্গলার ইতিহাসের অতি স্মরণীয় ঘটনা এবং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বড় গৌরবের বিষয়। প্রত্যেক বাঙ্গালারই এই বিষয়টি স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিবার বিষয় এইজন্য ইহা মূল পালি হইতে সংক্ষেপে অনূদিত হইল। অধুনা বাঙ্গালীরা বিজয়ের গৌরবের কাহিনী কিছুই জানে না, আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। বাঙ্গালীর অসামান্য গৌরবের কথা আমরা বিদেশীয়দের বিবরণ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি হইতে কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা যে এসিয়ার দূর দূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে বসবাস করিয়া অপূর্ব কর্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত অপরেরা প্রসঙ্গক্রমে দিয়া গিয়াছেন। আমরা আমাদের কথা কিছুই বলি নাই। দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের কৃপায় আমরা সিংহল-বিজয়ের বৃত্তান্তটি পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাচীন সভ্যতা ও জয়শ্রীর এই মূর্তিমের রত্নালঙ্কার আমাদের নিকট বহুমূল্য।

এই কাহিনীটি নানারূপ উপকথায় বিজড়িত। মহাসেন ধাতুসেনের আদেশে দীপবংশ বিস্তারিত করিয়া লেখা হয়। কিছু ভিন্সেন্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে বিস্তারিতরূপে পুনর্লিখিত দীপবংশই মহাবংশ নামে পরিচিত। ধাতুসেন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—মহাবংশ ঐ সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিজয়ের মৃত্যু ৪৪৩ খৃঃ পূর্বে ঘটিয়াছিল এবং পাণ্ডুবাসুদেব ৪৪৩ খৃঃ পূর্বে রাজা হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক রিচ্ ডেভিড্‌স লিখিয়াছেন "যে সময়ে মহাবংশ ও দীপবংশ লিখিত হইয়াছে, তাহার বহুপরে রচিত ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির সঙ্গে মহাবংশ ও দীপবংশের কাহিনী তুলনা করিলে শেষোক্ত আখ্যায়িকাগুলি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হইবে।" তিনি আরো বলিয়াছেন, "এই সমস্ত কাহিনী ঠিক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারা গেলেও ইহারা তাহাদের সময়ের লৌকিক সংস্কারের যথাযথ চিত্র দিয়াছে, সেই চিত্র হইতে আমরা প্রাচীনতর কালের ঘটনার অনেকগুলি ইঙ্গিত পাইতে পারি।" আমরা এই আখ্যায়িকার ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দীপবংশে, মহাবংশে, কুলবংশ প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন সিংহলী গ্রন্থে এই ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে কোন মতান্তর নাই।

সিংহল-বিজয় বাঙ্গলার অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিজয় কর্তৃক সিংহল-বিজয় বঙ্গদেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ কালের একটি অতি শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় ঘটনা। বিজয়ের বংশধর রাজারা তাঁহাদের মাতৃভূমি পূর্বভারত কখনই বিস্মৃত হন নাই। ভারতের পূর্বাঞ্চল হইতে, এমন কি বঙ্গদেশ হইতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহু উপনিবেশ বাঙ্কি যবদ্বীপ, মাটাবান কাম্বোডিয়া, শ্যাম সুমিত্রা, জাপান

চীন প্রভৃতি দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সকল অঞ্চলে যে কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় করিবার উপযুক্ত। প্রাচীনতম শ্যামদেশ ও কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে বঙ্গ ও তাহার নিকট বহু কীর্তি বিদ্যমান। সুমিত্রা ও বালীদ্বীপে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের ছাঁচ অনেকটা পাল রাজাদের সময়ের অক্ষরের মত। বালী ও যবদ্বীপের শুধু লিপি নহে, অনেক প্রস্তর ও ধাতু-মূর্তিতে বাঙ্গালী ভাস্করের হস্ত-চিহ্ন অতি স্পষ্ট। অধুনা চট্টগ্রামের দেবাং পাহাড়ের নিকটে ভূমির ভিতর হইতে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বহু ধাতব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে আমরা সেই মূর্তিগুলির একখানির এবং বালী-জাবা দ্বীপের কয়েকখানি বুদ্ধ বিগ্রহের ফটো দিলাম। আমার নিকট আরও দুইখানি ছিল, একখানি আমি মজিলপুরের কালিদাস দত্ত মহাশয়কে দিয়াছি। পাঠক দেখিবেন, বাঙ্গালী কৃত বিগ্রহ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মূর্তিগুলি শুধু যে এক আদর্শে নির্মিত তাহা নহে, তাহাদের সাদৃশ্য এত অধিক যে, মনে হয় তাহারা একই ভাস্করের দ্বারা নির্মিত। পাল রাজাদের সঙ্গে যে ভারতীয় ঐ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি সিংহল বিজয়কেই আমরা বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া মনে করি।

একসময়ে 'বাহু' শব্দযুক্ত নাম প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট্য ছিল। চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুর বাড়ী পৌণ্ড্রবর্ধনে বঙ্গে ধর্মপালের সমসাময়িক আসামের রাজা ছিলেন বীরবাহু। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, 'কৃত্তিবাসী' রামায়ণে বীরবাহুর উল্লেখ আছে, সংস্কৃত রামায়ণে নাই। উহা বাঙ্গালী কল্পনার সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়।

সিংহবাহুর জন্মকথা একটা গল্প মাত্র, গল্পটা রোম-নগর-স্থাপয়িতা রমুলাসের গল্পের মত। সমুদ্রতীরে রমুলাস ও তাঁহার ভ্রাতা রিমাসকে এক ব্যাঘ্রী দুগ্ধ পান করাইয়া পালন করিয়াছিল। সিংহবাহুর সম্বন্ধে উপকথাটার জোড় আরও অনেক বেশী। ইহাতে দৃষ্ট হয় সিংহবাহুকে একটা সিংহ জন্মদান করিয়াছিল। বঙ্গদেশে পশুরাজের সঙ্গে সেদিনও মণিপুরের রাজমুদ্রা অঙ্কিত পাওয়া যাইত। সিংহ এদেশে চিরকালই পরাক্রমের সাধন, গৌড়েশ্বর রামপালের দ্বিতীয় পুত্র কুমারপালের সেনাপতি বৈদ্যদেব একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরাজিত রাজাদের মুকুটের সোনা দিয়া এক বৃহৎ সিংহ গড়াইয়া ছিলেন এবং তাহা তাঁহার প্রাসাদের তোরণের উর্ধ্বে স্থাপন করাইয়াছিলেন। ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কোন কোন প্রাচীন রাজসিংহাসন ষোড়শ সিংহ-দ্বারা ধৃত। সিংহলাধিপ একটি মোমনির্মিত সিংহ বঙ্গেশ্বরকে পাঠাইয়াছিলেন তাহা দেখিতে ঠিক জীবন্ত সিংহের মত হইয়াছিল, ঐ সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল। পিঞ্জরের দ্বার না খুলিয়া কেহ পশুরাজকে বাহির করিতে পারেন কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য সিংহবাহুর বংশধর সিংহটা মগধে মহানন্দের সভায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একটা উত্তপ্ত লৌহশলাকা পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করাইলে সিংহ গলিয়া বাহির হইয়া আসিল। মগধবাসীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। সিংহ-সম্বন্ধে এইরূপ নানা

ঐতিহাসিক কথা ও উপকথা বাঙ্গলা দেশময় প্রচলিত আছে। এদেশে যে ঘরদ্বার কোন সিংহমূর্ত্তি নাই সে ঘরদ্বার যদি গৃহের পুরোভাগে প্রবেশ পথে থাকে, তবে তাহাকেও 'সিংহদ্বার' বলে এবং রাজা সিংহমূক্ত আসনে বসিলেও তাহা সিংহাসন নামে অভিহিত হয়। সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মল্লবীরের শেষ পরীক্ষা ছিল সিংহের সহিত লড়াই করা। উদাহরণ-স্বরূপ একশত বৎসরের প্রাচীন একখানি চিত্রপটের প্রতিলিপি এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহা কালীঘাটের এক পটুয়া আঁকিয়াছিল, একশত

সিংহের সহিত মল্লবীরের যুদ্ধ
(১০০ বৎসরের প্রাচীন কালীঘাটের চিত্র)

বৎসরের প্রাচীন হইলেও চিত্রের আদর্শটি বড় প্রাচীন। পটুয়ারা পুরুষানুক্রমে একই

আসলে চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকে. বাঙ্গালা মল্লবীর সিংহকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে মল্লের মৃত্যুমাত্রও আয়াস দৃষ্ট হয় না, অথচ আলিঙ্গনটি এত নিবিড় যে সিংহের মুখের হাঁ আর বিস্তৃত হইতে পড়িয়াছে প্রায় ২৫০ বৎসরের পুরাতন, চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বারুয়ালীর যোড়শদের একটা বিরাট্ রঙে সিংহের সঙ্গে এক মল্লবীরের লড়াইয়ের ছবি কাষ্ঠে লিখিত হইয়াছিল সিংহটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু মল্লবীরের মুণ্ড এখনও ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে সে মূর্ত্তি বীরের মূর্ত্তি বটে আমাদের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেবমাহাত্ম্য 'সিংহময়' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না 'সিংহবাহিনী'-মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীর পূজিত দেবতা।

সিংহের প্রবাস নানাকারণে এদেশে সম্ভবপর হইয়াছে এই সিংহ-সম্পর্কিত উপকথার মধ্যে সত্যাংশ এই যে পুরুষদের সাহায্যে রাঢ়দেশে কোন অনার্য্য দস্যুরাজপত্নি বঙ্গদেশাগত বণিকদলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক বঙ্গের উপকূলে বহুকাল আটকাইয়া রাখিয়াছিল এবং পরিশেষে অনৈক্য হওয়াতে রাজকুমারী সন্তানদ্বয়সহ পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন। এই দলপতির 'সিংহ' উপাধি হওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন ব্যাপারকে পরিশেষে একটা গল্পের আকার দিয়া সিংহবাহুর বিবরণ রচিত হইয়াছিল কিন্তু উপকথাটি যেরূপ হউক না কেন, তাহার ভিতরকার যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটি আছে, তাহা অস্বীকার্য্য, সত্য সন্ধান করিবার সময় আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এই আখ্যানটি পড়িলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে বঙ্গ ও মগধের মধ্যে রাঢ় নামক প্রদেশের একাংশে সিংহপুর রাজধানী সিংহবাহু কর্ত্তৃক পুঃ পুঃ সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আমার পরিচিত যে সকল সিংহলী বন্ধু আছেন বা এককালে ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকখানি আলোক-চিত্র এইখানে প্রদত্ত হইল সিংহলী বৌদ্ধদের সকলেরই বাঙ্গালীর চেহারা ইহা দৃষ্টে মাত্রই প্রতীয়মান হইবে। বিজয় ও তৎসহগামীদের বহু পরবর্ত্তী বংশধরদের চেহারার সঙ্গে প্রায় তিন হাজার বৎসর পরেও যে বাঙ্গালীদের এরূপ অধিকল সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় বটে তাহার এক কারণ এই যে, বঙ্গদেশের লোকেরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কতকটা স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী কালে দাক্ষিণাত্যের তামিলজাতীয় বহু লোক সিংহলে বাস করিয়া সিংহলী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু বৌদ্ধগণ তাঁহাদের সহিত ততটা মিশেন নাই দ্বিতীয়তঃ শুধু বিজয় ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ নহেন সেই সময় হইতে বাঙ্গালীর এই উপনিবেশে পরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন যুগের শত শত বাঙ্গালী যাইয়া তথায় বসবাস করিয়াছিলেন। সেন রাজাদেরও অনেক পরে এই অভিযান থামিয়াছে। সিংহলে এরূপ পরিবার আছেন যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ৭৮ পুরুষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে তথায় গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে এখনও যে 'পালওয়ার' নৌকা দৃষ্ট হয়, সিংহলেও সেইরূপ নৌকা প্রচলিত আছে ছবি দেখুন বাঙ্গালীর বহু প্রাচীন পুস্তকে সিংহলে বাত্রাবাতের বিবরণ আছে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, সত্যপীরের কথা,

[illegible] পৃঃ, ২০শ চিত্র।

বিষয়াবলম্বন—৮১ পৃঃ, ২০শ চিত্র

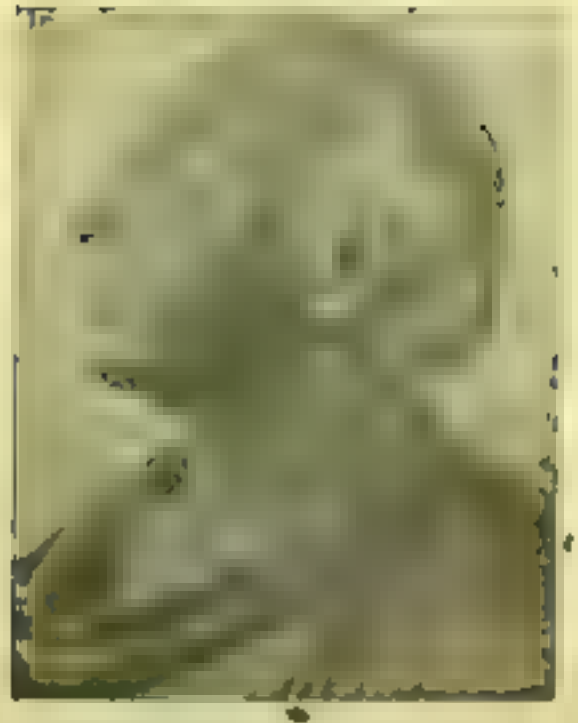

বঙ্গপাল, বৃদ্ধ বয়সে—৮৩ পৃঃ, ২০শ চিত্র।

নেবজির রণী সিংহ—৮১ পৃঃ, ২০শ চিত্র।

[illegible] [illegible] ৮২ পৃ., ১০ পঙ্‌ক্তি।

[illegible] [illegible] [illegible] ৮৩ পৃ., ২০শ পঙ্‌ক্তি।

পাতালপুরী দৌড়—৯৬ পৃঃ, ৩য় ছত্র।

এমন কি শনির পাঁচালী প্রভৃতি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র-বৃহৎ কাব্যে যেখানেই কোন বণিকের সমুদ্রে যাওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইখানেই সিংহলে যাওয়াটা তাঁহার অপরিহার্য্য কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্বারা সিংহলের সঙ্গে বঙ্গের ব্যাপক সম্বন্ধ অনুমিত হইতেছে।*

আর্য্যাবর্ত্ত এখন বৌদ্ধযুগের শত শত কীর্ত্তির শ্মশান। সেই নালন্দা-বিহার, অশোকের রাজপ্রাসাদ, স্তূপ ও বিক্রমশিলা—এ সমস্তের ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে। কথিত ৮৪ হাজার অনুশাসনের অতি সামান্য কয়েকখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধযুগের আদি ইতিহাস সিংহলে অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে।

সমুদ্রের অতলতলে জলজন্তুর ভক্ষণ হইতে যেরূপ স্বীয় অপার সম্পত্তির একটি সামান্য অংশ উদ্ধার করিতে পারিলেও তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে—সিংহলের মহাবংশ, দীপবংশ ও চূলবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদিগের নিকট তেমনই মূল্যবান্ ও যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবার সামগ্রী। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস এই সকল গ্রন্থে রক্ষা আছে, ভারতের আর কোথাও তাহা নাই। এইজন্যই সিংহল-বিজয় ভারতের ঐতিহাসিক একটি বিশেষ গৌরবময় ঘটনা। এই সিংহলের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্বন্ধের সংস্রবমূলক কাহিনী বঙ্গসাহিত্যের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে একথা আমরা এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। উপসংহারে আমরা সিংহল-কলোম্বো-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরমের লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে নিম্নের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, এই প্রবন্ধ গত জুন মাসের ১৯২৩ "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে —

"The Singalese who form the vast majority of the Ceylonese are descendants of Vijaya the Bengali Prince, and hence in language specially the Singalese has close affinity with the Bengali. Fifty per cent of words

* যাঁহারা বঙ্গের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পড়িয়াছেন তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন দীপবংশ মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীনতম পুস্তকে যে বঙ্গ ও বঙ্গরাজ কথা আছে তাহা সঙ্গীন কল্পনা। এই যুক্তিটা পাশ্চাত্য ধরণধারণ বাদ, ইহা টিকিবার যোগ্য নহে।

আবার কেহ কেহ বলেন, সিংহবাহু মাতার নাম সুপ্রাদেবী,—গুজরাটের সুপ্রারিক বন্দরের নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। যদি কোন লোকের নাম বিদেশ যাত্রার যাত্রীর খবর পাওয়া যায়, তবে বঙ্গদেশে গয়াধাম, আগ্রা-প্রয়াগ প্রভৃতি নিত্য কুকারণ মথুরা দ্বারকা নবদ্বীপ প্রভৃতি শত শত দেশ-বাচক নামধারী লোককে উক্তরূপ দেশবাসী বলিতে হয়। "সুপ্রাদেবী" নাম হইতে কি "সুপ্রিয়ার" নামকরণ হইতে পারে?

কিন্তু আসল কথা, সিংহবাহুর মাতার নাম সুপ্রভা তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই নামটি দীপবংশে পাওয়া যায়। দীপবংশই সিংহলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস—ইহাই প্রমাণ। আমরা মহানামকৃত মহাবংশের অনুবাদ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে শুধু "বঙ্গরাজকন্যা" এই ভাবের উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম নাই। এই অনুবাদ একান্ত ভাবে মূলানুগত বলিয়া গ্রন্থকার দাবী করিয়াছেন।

যদি দীপবংশে ও মহাবংশের মত পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থে সিংহবাহুর মাতার অন্যরূপ নাম থাকে, তবে দীপবংশকে অগ্রাহ্য করিয়া সে নাম কেনই বা গ্রাহ্য হইবে। বিজয়ের সিংহল অধিকার-সম্বন্ধে দীপবংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। সুতরাং বলিয়াছি দীপবংশ ও মহাবংশ এই সিংহলের আদিগ্রন্থদ্বয়

of classical Singalese are identical with those of Bengali. So though Ceylonese as a whole is a "Crown Colony" of greater India, Singalese Ceylon is an important part of greater Bengal. Both the Singalese and the Bengali belong to the same stock of North Indian Aryans and so have many things in common with them. Comparative Philology of Bengali and Singalese will reveal great treasures of linguistic wealth of greater Bengal. In my paper "Bengal and Ceylon" read before the greater Bengal Section of Prabasi Banga Sahitya Sammilani, held last December in Allahabad under the esteemed presidentship of Dr Kali Das Nag, I emphasised the urgent need of founding a Greater Bengal Society or *Brihattara Banga Samiti* in Calcutta early to carry an organised activity and research on this neglected but vitally important subject of Bengal's national history, that modern Bengal will be richer in every way by the services of such a society is open to no doubt. In South Kanara there are people called Gouda Brahmins who claim that they are immigrants from Bengal. Their language called Kaukani, only a colloquial tongue with no written script, is a South Indian edition of Bengali and nothing else. From this, Gujrat, Java and especially from Singalese Ceylon many things of Greater Bengal can be unearthed' (pp 204-06).

ইহার তাৎপর্য এই,—বর্তমান সিংহলীগণ বঙ্গের রাজকুমার বিজয় ও তাঁহার সহচরদের বংশধর, এই জন্যই সিংহলী ও বাঙ্গলার একটা সাদৃশ্য, প্রাচীন সিংহলীর অর্ধেক শব্দ বঙ্গভাষার শব্দ। সুতরাং যদিও সিংহলদ্বীপকে বৃহত্তর ভারতের উপনিবেশগুলির "মুকুট" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তথাপি সিংহলবাসিগণ বিশেষভাবে বৃহত্তর বঙ্গদেশবাসীদেরই স্বগণ। সিংহলী ও বাঙ্গালী এই দুই জাতিই উত্তরাপথের আর্যবংশ-সম্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে এই জন্যই নানাবিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহলীভাষা এবং বঙ্গভাষার তুলনামূলক তত্ত্ব সন্ধান করিলে বৃহত্তর বাঙ্গলাভাষার এক অপূর্ব ভাণ্ডারের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গত ডিসেম্বর মাসে, বৃহৎ বঙ্গের প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যিকগণের সম্মিলনে আমি "বাঙ্গলা দেশ ও সিংহল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। মনীষী ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতি ছিলেন। আমি সেই প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া ইহাই বলিয়াছিলাম যে অবিলম্বে "বৃহত্তর বঙ্গ সমিতি" নামক একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বৃহৎবঙ্গের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশের পক্ষে অতি মূল্যবান্ সন্ধান প্রদান করিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধতর করিবে। আধুনিক বঙ্গদেশ যে এবংবিধ অনুষ্ঠান-দ্বারা প্রচুরভাবে উপকৃত হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দক্ষিণ কানারার গৌড়া নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা দাবী করেন যে তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের কথিত ভাষার নাম 'কঙ্কণী'। এই ভাষার কোন লিখিত পুস্তক নাই, কিন্তু অণুমাত্র সন্দেহও নাই যে, এই ভাষা বাঙ্গলা ভাষারই একটি দাক্ষিণাত্য সংস্করণ

ছাড়া আর কিছুই নহে এই সমস্ত হইতে এবং গুজরাট, জাভা, বিশেষ করিয়া সিংহলী ইতিহাস হইতে, বৃহৎ বঙ্গের অনেক মূল্যবান্ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে

আমরা গুজরাটে ও মহাভারতে বঙ্গীয় উপনিবেশের কথা বলিয়াছি এইবার শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরমের প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালীর প্রাচীন বিস্তৃত উপনিবেশ-চেষ্টার আরও কিছু সমর্থন পাওয়া গেল। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপমালা, চীন, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি বহুস্থানে পুরাতীত কালের চিহ্নগুলি এখন বঙ্গের ইতিহাস-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে লুকায়িত আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ইতিহাস শিখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বহুধা স্বীকার করিয়া দলে দলে ছাত্রগণ ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, সেখানে তাঁহারা এ দেশের পুরাতত্ত্ব শিক্ষার পর কখনও কখনও জার্ম্মেনী ও প্যারীতে যাইয়া পাঠ সাঙ্গ করিয়া উপাধি লইয়া আসেন ভারতের পুরাতত্ত্বের খনি খাঁটীর কাছে তাহার সন্ধান লওয়াও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়-সাধ্য। কিন্তু তাহাই খোঁজ করিতে আমরা দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই এবং আমাদের বিলাতের গুরুগণ যতটুকু দিয়াছেন—তাহার বেশ অগ্রসর হইতে তত পারি, যেহেতু পাছে তাঁহাদের সঙ্গে মতান্তর হয় এবং চিত্তপ্রসাদ না ঘটে। পরাধীন ভারতসন্তানের অধিবাসীদের লইয়া নিয়তি কতকগুলি বিদ্রূপ ও রহস্যের খেলা খেলিতেছেন, তাহার জন্য দুঃখ করিলে কি হইবে?

বিজয়ের মৃত্যুর পর পাণ্ডুবাসদেব সিংহলের রাজা হন। ইহার পর তৎপুত্র অভয় এবং অভয়ের মৃত্যুর পর তাহার ভাগিনেয় পাণ্ডুকাভয় ৭০ বৎসর সিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডুকাভয়ের পুত্র মুতাশিব ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন, মুতাশিবের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তিষ্য সিংহলের রাজা হন তাঁহার রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩০৯ অব্দে অশোকের পুত্র, বিদিশার (বর্ত্তমান ভিল্‌সার নিকটবর্ত্তী বেশ নগরীর) দেবী নামিকা মহিষীর গর্ভজাত মহেন্দ্র এবং তাঁহার কন্যা সঙ্ঘমিত্র ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচারার্থ সিংহলে আগমন করেন। ছিউনসাঙ্গ ইঁহাদিগকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সিংহলীদের ইতিবৃত্ত অনুসারে ইঁহারা অশোকের পুত্র কন্যা।

মহারাজ তিষ্য যুবরাজ মহেন্দ্রের কাষায় বস্ত্র-পরিহিত প্রতিভাপূর্ণ দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে স্বতঃই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে এরূপ বেশধারী কতজন আছেন?" মহেন্দ্র বলিলেন, "সৈন্যিক বসনে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন ও সমুজ্জ্বল, তথায় বুদ্ধশিষ্যের সংখ্যা অগণিত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব

[বুদ্ধদেব—৫৬৩-৪৮৩ খৃঃ পূঃ]

"উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার।"

দ্বিজেন্দ্রলাল।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর—জয় জগদীশ হরে।"

—জয়দেব।

এই যুগে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে, ব্রাহ্মণশাসিত ভারতবর্ষে বৃহৎ বাহুনা এক নূতন আদর্শ লইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিউয়েন্‌সাঙ্গ এবং তাঁহার সময়কার চীনা লেখকগণের মতে বুদ্ধদেবের জন্মকাল ৮৫০ খৃঃ পূঃ। কপিলাবস্তুর * অনতিদূরে লুম্বিনী বনে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মায়াদেবীর পুত্র †। কথিত আছে, তাঁহার পূর্ণগর্ভা জননী স্বীয় পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে লুম্বিনী বনে ‡; তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। সেই বনে হয়ত তাঁহার উদরে

* কপিলাবস্তু শাক্যরাজ্যের রাজধানী ছিল। শাক্যরাজ্য বর্তমান বস্তি ও গোরক্ষপুর জেলার উত্তর কোশল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

† রাজা শুদ্ধোদন কপিলাবস্তুর অধিপতি অঞ্জনের মহাদেবী ও শাক্যরাজ দণ্ডপাণির ভগিনী মায়াদেবী দুই কন্যা বিবাহ করেন। মহারাণী মা মায়াদেবী বুদ্ধের জননী কিন্তু কৌতুকীই মানুষের বালক বুদ্ধের পালয়িত্রী, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইনি "মহাপ্রজাবতী" নামে উল্লিখিত।

‡ লুম্বিনী বৌদ্ধদিগের বেথেলহাম। রাজা অশোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গুরু উপগুপ্তকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, এই স্থানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" উপগুপ্ত-উল্লিখিত ঠিক এই কথাগুলি অশোক মহাপ্রতিষ্ঠ প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। অক্ষরগুলি একটুও ম্লান হয় নাই, এখনও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট আছে।

অস্বীকার করিয়া পুনর্কে বহির্গত করা হইয়াছিল। লৌকিক সংস্কার—গৌতমবুদ্ধ জননীর কুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপুরুষের প্রায়ই অস্বাভাবিকত্ব প্রবাদটি এই প্রাচীন সংস্কারের প্রতিপোষক হইতে পারে,—নতুবা ইহা অস্বীকারের ইঙ্গিত-সূচক। জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মাতৃহারা হইলেন। তাঁহার জন্ম হইতে সকল যৌবনাবধি জীবনকাহিনী অনেক উপন্যাসসঙ্কুল। শাক্যরাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শাক্যসিংহ বলিয়া খ্যাত, তাঁহার অপর নাম গৌতম।

পৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধের চরিতকথা কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, তৎপূর্ব্বে ললিতবিস্তরে সেই আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছিল। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কবি এডুইন আরনল্ড 'এসিয়ার আলোক' নামক কাব্য লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের জন্মকাহিনী-সংবলিত বৌদ্ধজাতকগুলি নানারূপ অতিরঞ্জন ও গল্পের সাজসজ্জা লইয়া ভক্ত পাঠকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে। যদিও এই সকল জন্মকথার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই তথাপি বুদ্ধজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী তৎকাল-প্রচলিত ভারতীয় নানা প্রবাদ এই জাতক-কাহিনীগুলিতে স্থান লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত জাতকগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে।

"পঞ্চ ন্যূ শতপঞ্চ জাতা" (৫৫০) জাতকে বুদ্ধদেবের ঐ সংখ্যক জন্মের বৃত্তান্ত আছে, ইহা ছাড়া আরও অনেক জন্মের কথা নানা উপাখ্যানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধ মনুষ্যরূপে, অথবা পক্ষী, কুক্কুর, মৃগ, বানর, মর্কট, ইন্দুর প্রভৃতি যেরূপেই যেখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেইরূপেই কোন না কোন মহৎ গুণের আদর্শ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধগণ যে সকল গুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, জাতকের উপলক্ষে মনুষ্য ও জীবজন্তুরূপে বুদ্ধ সেই সকল গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যদিও অনেকগুলি উপাখ্যানেই ত্যাগধর্ম্মকে খুব বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, তথাপি সাহস, ধৈর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি গুণও কোমলতর গুণরাশির আড়ালে পড়ে নাই। গৌতম কাঠবিড়াল জন্মে বিন্দু বিন্দু জল তুলিয়া সমস্ত সমুদ্র শোষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন,—এই জন্মে তিনি "বীর্য্যপারমিতা" সম্পন্ন করেন। এইভাবে সিংহ জন্মে "সত্যপারমিতা" এবং বেদাব্রহ্মজাতকে "শীলপারমিতা" এবং মর্কট জন্মে "প্রজ্ঞাপারমিতা" সম্পাদন করেন। কিন্তু ত্যাগমূলক কাহিনীগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা এখানে একটি জাতকের বৃত্তান্তের উল্লেখ করিব, আরনল্ড এই গল্পটি তাঁহার কাব্যে মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

* কথিত আছে যুগে যুগে জগতে অসংখ্য বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ বুদ্ধ চতুর্দ্দশের নাম গৌতম (খৃঃ পূঃ ২১০১), কনকমুনি (খৃঃ পূঃ ২১৭৯), কাশ্যপ (খৃঃ পূঃ ২১৫৪) এবং শাক্যসিংহ ৪৮০ খৃঃ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধগণের এই বুদ্ধ-প্রশস্তি মহাপুরুষ যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা "মহাভদ্রকল্প" নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন এক জন্মে বুদ্ধদেব একজন তপস্বী ছিলেন। সেই সময়ে একদা ভীষণ অনাবৃষ্টি ও রৌদ্রের তেজে সমস্ত দেশ শুকাইয়া গিয়াছিল। অগ্নিসদৃশ রৌদ্রের উত্তাপে ও আহার্য্যের অভাবে সমস্ত জীবজন্তু মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। তপস্বী তাঁহার গন্তব্য আশ্রমে যাইবার পথে এক বৃহৎ কঙ্কাল জীবকঙ্কালে ও শব-দেহে পূর্ণ দেখিতে পাইলেন। একটি খালের ধারে এক করুণ দৃশ্য বিশেষভাবে তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। বহুদিবসের উপবাসক্লিষ্টা একটী ব্যাঘ্রী অনাহারে অস্থির অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার দুইটি শাবক তাহার স্তনে মুখ সংলগ্ন করিয়াছিল, কিন্তু স্তনে বিন্দুমাত্র দুগ্ধ ছিল না। তাহারা বৃথা সেই মৃত্যুর মাতৃবক্ষ হইতে সুধা আহরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। খড়ের ঘরের বাঁশের বেড়ার উপর জোরে হাওয়া বহিলে উহা যেরূপ কাঁপিয়া উঠে, ব্যাঘ্রীর প্রবল আক্ষেপে নিঃশ্বাসে তাহার বাসযষ্টি, স্বল্পমাংসে আবৃত অস্থিপঞ্জর সেইরূপই কাঁপিতেছিল। আর কিছুকালের মধ্যে এই তিনটি প্রাণীর জীবনান্ত ঘটিবে। তপস্বীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন, "আমি কি এই তিনটি জীবের কোনই উপকার করিতে পারি না?" তিনি সম্মুখে ও দূরে চাহিয়া দেখিলেন—মাটি রৌদ্রের তাপে তাম্রবর্ণ, তাহাতে তৃণ কি ঘাসের চিহ্ন নাই। খালে একবিন্দু জল নাই, উহা একেবারে শুষ্ক। তখন তপস্বী স্বীয় সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি মাথার পাগড়ী, গায়ের উত্তরীয় ও পায়ের উপানৎ দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং একটুকরা নেংটি মাত্র রাখিয়া নগ্নদেহে ব্যাঘ্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন "খাও, এই দেখ, তোমার খাদ্য সম্মুখে।" সেই আহ্বানে মুমূর্ষু ব্যাঘ্রীর অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু উন্মুক্ত হইল, হিংস্র বুভুক্ষু মাংসাশীর নখদন্তরক্ষা অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় ঝলিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রী এক লম্ফে সন্ন্যাসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহার শোণিত পান করিতে লাগিল। সেই হিংস্র উল্লাস লীলার সঙ্গে যখন তপস্বীর প্রাণবায়ু শেষ হইল, তখন দেখা গেল—তাঁহার চক্ষে ত্যাগ-জনিত একফোঁটা পুলকাশ্রু।

তপস্বীর মহৎ আত্মোৎসর্গ।

আমি কি এই তিনটি বুভুক্ষু জীবের কোনই উপকার করতে পারি না?

মহেন্দ্রসেনোপাখ্যানে দুঃখের আর একটি জলন্তবৃত্তান্ত আছে। কাশীরাজ মহেন্দ্রসেন খুব উদারচিত্ত ও সজ্জন ছিলেন। তাঁহার শত্রু—সামন্ত রাজারা—রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে। বনবাসী রাজা নির্ব্বিকারচিত্তে সমস্ত দুঃখ বরণ করিয়া লইলেন। একদা জীবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! রাজা মহেন্দ্রসেনের নিকট আমি যাইব, কোন্ দিকে তাঁহার রাজধানী?" মহেন্দ্রসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নিকট আপনার কি দরকার?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শুনিয়াছি তাঁহার মত দাতা জগতে নাই। আমি অর্থকামী অর্থের আশায় তাঁহার নিকট যাইতেছি।" রাজা তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান অবস্থা জানাইলেন। জীবশর্ম্মা অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বলিলেন, "আমার অদৃষ্ট এইরূপই, নতুবা আপনার ন্যায় মহাত্মার এই অবস্থা কেন হইবে?" তিনি বিমনা হইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রসেন

মহেন্দ্রসেন ও জীবশর্ম্মা।

সেই সকল বিলাপ শুনিয়া বড়ই দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন, কিছুকাল চিন্তা করিয়া তিনি জীবশর্মাকে বলিলেন, "আপনি এক কাজ করুন, এই তরলতাগুলি দিয়া আমার হাত বাঁধুন, তারপর এখন যিনি আমার স্থলে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া গিয়া বলুন, 'মহারাজ! আমি আপনার শত্রুকে ধরিয়া আনিয়াছি আমাকে পুরস্কৃত করুন।' এই কথা শুনিয়া তিনি প্রীত হইয়া আপনাকে প্রচুর অর্থ দিবেন এবং আমাকে বধ করিবেন।" ব্রাহ্মণ এরূপ মহামনা রাজার হত্যার ব্যবস্থা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অত্যন্ত অর্থ-লালসার অবশেষে তাহাই করিতে সম্মত হইলেন।

পূর্ব্ব এক জন্মে বুদ্ধদেব ছিলেন কাশীরাজ মহেন্দ্রসেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কত জন্মের সুকৃতি ও ত্যাগস্বীকারের ফলে যে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন—এই সকল জাতক-কাহিনীতে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বুদ্ধ বিশ্বের যাবতীয় জীবজন্তুর জীবন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া তিনি অর্জন করিয়া বুদ্ধত্বের যোগ্য হইয়াছিলেন,—জাতক পরিকল্পনা সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা-প্রসূত। ইতর জীব ও মানবের মধ্যে যে বিভিন্নতার রেখা য়ুরোপীয়েরা টানিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহা কোন কালেই স্বীকার করেন নাই।

আর্য্যাবর্ত্তে অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা যুদ্ধবীর, ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরগণের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত ছিল,—হিন্দু ও জৈনেরা তাঁহাদের পুরাণে এবং বৌদ্ধগণ তাঁহাদের জাতকে নিজ নিজ উপাস্যদেবতা ও দেবকল্প ব্যক্তিকে কেন্দ্র-স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সেই সকল তাঁহাদের স্বকীয় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ খাতে চালাইয়াছেন

মহাভারত ও হিন্দু পুরাণাদিতে যে সকল কথা আছে, বৌদ্ধজাতক ও জৈনপুরাণে অনেক স্থলেই তাহা রূপান্তরিত হইয়া স্থানলাভ করিয়াছে বস্তুতঃ প্রত্যেক শ্রেণীই তাঁহাদের উপাস্যদেবতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন উপকথাগুলিকে স্বীয় লাভের অন্তর্গত করিয়াছেন। সুপ্রাচীন ইতিহাস ও উপকথার ভাণ্ডার সেই সকল দেবতার জন্য জন্মান্তরীণ লীলার যোগান দিয়াছে এইভাবে শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বরাহপুরাণ, দেবীপুরাণ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্বজাতকগুলি বৌদ্ধদিগের সেইরূপ পুরাণ ভিন্ন আর কি?

গৌতমের জন্মের পর মহর্ষি কালদেবল (অসিত) রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই শিশুর শরীরে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যদি ইনি সংসারে থাকেন, তবে জগদ্বিজয়ী সম্রাট্ হইবেন, যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বনবাসী হন, তবে এমন ধর্ম্মপ্রচার করিবেন যাহা সমস্ত জগদ্বাসী গ্রহণ করিবে কালদেবল শিশু-গৌতমের শরীরে ৩২টি মহাপুরুষের লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে হনুমান্ অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীর নিকট রামচন্দ্রের শরীরের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, উহাদের সঙ্গে ললিতবিস্তরের এই সকল লক্ষণের অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়।

পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া যশস্বী হইবেন, ইহা সচরাচর কেহ চান না, জনকজননী ইচ্ছা করেন, যেন পুত্র রাজচক্রবর্তী হন কিন্তু অল্পবয়স হইতেই দেখা গেল গৌতম ভাবুকের মত বসিয়া চিন্তা করেন এবং তিনি কতকটা একাকী এক সময়ে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র দেবদত্ত একটি কপোতের প্রতি শরক্ষেপ করেন, প্রাণের ভয়ে পক্ষীটা সিদ্ধার্থের ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। গৌতম তাহার বক্ষ হইতে শর তুলিয়া ফেলিয়া যত্নপূর্বক তাহার ক্ষতস্থানে ঔষধের প্রলেপ দিয়া প্রাণরক্ষা করেন তাঁহার ভ্রাতা সেই কপোতটি স্বয়ং শিকার করিয়াছেন বলিয়া তাহা লইয়া যাইতে চান, গৌতম তাহা দেন না শুদ্ধোদনের কাছে বিচারার্থ এই শিশুদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন "গৌতম, তুমি ইহাকে কপোতটি দাও না কেন?" উহা ইহারই প্রাপ্য, যেহেতু উহা সে শিকার করিয়াছে" পক্ষান্তর গৌতম বলিলেন "যে প্রাণ হরণ করিতে চাহে সে ইহা পাইবার যোগ্য কিম্বা যে জীবন দান করিয়াছে, তাহারই এই জীবের উপর অধিকার আপনি বিচার করুন।"

প্রাণহরণ করিতে চাহে সে নয় প্রাণ দান করে যে তাহারই জীবের উপর অধিকার বেশী

এই ভাবের কার্যকলাপ ও উক্তি-দ্বারা সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও সন্ন্যাসীর প্রতি করুণার ভাব লক্ষ্য করিয়া গৌতম যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া উত্তরকালে বনবাসী হইবেন, শুদ্ধোদনের মনে এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল।

অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন, রাজা লোকের অগোচরে এক রাজকীয় প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া বুদ্ধদেবকে তথায় রাখিলেন। সেখানে অতি সুকুমার-বয়স্ক, সুদর্শন বালকবালিকা ও কিশোরকিশোরীরা তাঁহার সম্মুখে থাকিত কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে লইয়া যাওয়া হইত সেখানে প্রাসাদসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে নানা বর্ণের ফুল ফুটিত, কিন্তু ঝরিয়া পড়িবার পূর্বেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইত একটি শুষ্কপ্রায় ফুল বা পাতা তথায় থাকিতে পাইত না। প্রাসাদের কোন স্থানে আবর্জনা বা বিসদৃশ দ্রব্য রাখিবার হুকুম ছিল না সুতরাং নিরবধি গান, বাদ্য, ফুলের মালা ফুলমালা, রত্নময় দীপাবলী, দুগ্ধফেননিভশয্যা এবং প্রিয়দর্শন তরুণতরুণী ছাড়া বালক গৌতমের চক্ষে আর কিছুই পড়িত না পৃথিবীতে যে, রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং নানাবিধ কষ্ট আছে রাজকুমার তাহা কিছুতেই জানিতে পাইতেন না মাঝে মাঝে রাজা স্বয়ং নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পুত্রকে দর্শন দিতেন এদিকে ধূপধুনা, অগুরু ও চন্দনাদির গন্ধে প্রাসাদ আমোদিত থাকিত এবং গৃহ সমীর সদ্যঃপ্রস্ফুটিত ফুলগন্ধে মাতোয়ারা হইয়া যখন কুমারের অঙ্গ স্পর্শ করিত, তখন তিনি ভাবিতেন, আমার পিতার রাজ্য কি সুন্দর! পৃথিবী কি সুখের! এই সংসারের কোলাহল হইতে সুদূরে অবস্থিত প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পূর্বে যে পৃথিবী তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই শৈশব-স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া গেল এবং তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগৎটা একটা নন্দনকাননে পরিণত হইল।

সমস্ত জগৎ একটি নন্দনকানন

একদিন বালক রাজপুত্র তাঁহার পিতার নিকট কপিলাবস্তু রাজধানীটা দেখিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। শুদ্ধোদন আদেশ করিলেন যেন সেদিন রাজধানীতে অশোভন কিছু না থাকে, রুগ্ন, জরাতুর, কুষ্ঠ, মৃত, শুষ্ক ও মলিন কিছু যেন কুমারের চক্ষে না পড়ে। সমস্ত রাস্তা-ঘাট চন্দন-জলে ধৌত হইয়া কুসুমাকীর্ণ করা হইল। কুমার গৌতমকে লইয়া সারথি ছন্দক* রাজপথে রথারোহণে চলিলেন। তাঁহার পিতৃরাজ্যের শোভাসম্পদ দেখিয়া গৌতম মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ এক বৃদ্ধ রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িল। সেই পলিতকেশ, খলিতদন্ত লোলচর্ম, কুব্জদেহ বৃদ্ধকে দেখিয়া গৌতম শিহরিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি! একি? একি মানুষ?" সারথির উত্তরে তিনি বুঝিলেন, বাঁচিয়া থাকিলে সকলকেই এক সময় এইরূপ বৃদ্ধ হইতে হইবে, তাঁহার পিতা শুদ্ধোদনেরও এইরূপ অবস্থা হইবে এবং স্বয়ং তিনিও এই দশা প্রাপ্ত হইবেন। আর এক দণ্ডও তিনি রাজপথে থাকিতে চাহিলেন না,—"তবে কি আমাদের সকলের দশাই এইরূপ হইবে?" এই ভাবনার শেষ নাই, রাজকুমার বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত হইলেন। এতদিন যে সত্য তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঢাকা ছিল—সেই সত্য উলঙ্গ ও বীভৎসরূপে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

প্রথমবার পুরীভ্রমণ।

একদিন যাহা ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বিতীয় দিন তাহা সোধরাইতে পারে, এই ভাবিয়া শুদ্ধোদন গৌতমকে আবার স্বীয় রাজধানী দেখাইলেন। এবার অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইল,—অপ্রিয়-দর্শন কিছু যেন কুমারের চক্ষে না পড়ে। কিন্তু মৃত্যুর আগমন অলক্ষ্য। কখন কে কি অবস্থায় মরিবে তাহা কে বলিতে পারে? সেদিন রাজপথে একটি লোক মৃত হইল এবং তাহাকে দাহ করিবার জন্য শোকার্ত আত্মীয়েরা লইয়া চলিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল—"একি আর উঠিবে না, কথা কহিবে না, ইহার পিতামাতারা কি চিরদিনের জন্য ইহাকে হারাইলেন? একপ হওয়া কি শুধু ইহারই অদৃষ্টলিপি, না আরও কেহ কেহ এইভাবে চলিয়া যাইয়া থাকে?" উত্তরে শুনিলেন, "সকল জীবেরই এই নিয়তি সুনিশ্চিত,—কুমার স্বয়ং, তাঁহার পিতা এবং আত্মীয়গণ এবং জীব মাত্রেরই এই শেষ পরিণতি। সেদিন নয়, ১০০ কোর ১২০ বৎসর মানুষের পরমায়ু, ইহার পূর্বেই অধিকাংশ লোককে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, আত্মীয়গণের স্নেহ জনিত আর্তনাদ প্রভৃতি কিছুতেই এই অনিবার্য নিয়তির গতি রোধ করা যায় না।" চিন্তাকুল গৌতম

দ্বিতীয় বার ভ্রমণ।

* বঙ্গদেশ বা পালী প্রাচীন সাহিত্যে যে সারথি শব্দ দুই হয়— তাহারা কেহ যেন সাধারণ 'কোচওয়ান' মনে না করেন। পূর্বকালে সারথি সমস্ত রাজার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। রাম-বনবাসোপলক্ষে রামায়ণে যে বাল্মীকির হয় অযোধ্যা কাণ্ডের সেই বর্ণনা পড়িলে দেখা যাইবে সুমন্ত্র রাজাকে শুধু পরামর্শ দিতেন না, রাজনীতির আদেশ অমান্য করা, এমন কি হত্যা করার সাহসও তাঁহার ছিল। মহাভারতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইয়াছিলেন।

সেদিনও বিষণ্ণমুখে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতা যে সত্য তাঁহার চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই ধ্রুব সত্য আবার তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

কি জানি, প্রথম ও দ্বিতীয় বার যে সকল উপায় ব্যর্থ হইয়াছে, তৃতীয় বারে তাহা সফল হইতে পারে। কুমারের মনোভাব বুঝিয়া এবার ভাল হইবে, এই আশায় যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধোদন আবার তাঁহার পুরী ও রাজপথ সাজাইতে আদেশ করিলেন। এবার কুমার সৈরিকবস্ত্রাবৃত কমণ্ডলুহস্তে এক সাধুর দর্শন পাইলেন। সারথির প্রশ্নের উত্তরে সারথি বলিলেন, "সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া ইনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন।" সে তখন বুঝিলেন, ইহাই মানুষের প্রকৃত পথ। জরা, রোগ, শোক ও মৃত্যুর অধীন মানুষ কেন এই সংসারে আসক্ত হইয়া থাকিবে? এই পথই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

তৃতীয় বার সাধুদর্শন

শুদ্ধোদনের চেষ্টা থামিল না। কুমার অল্পকালের মধ্যে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে, তিনি বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি চতুঃষষ্টি ভারতীয় লিপি শিখিয়াছিলেন এবং ধনুর্বিদ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজয় করিয়া দণ্ডপাণি রাজার কন্যা অনুপমা সুন্দরী গোপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। ইনিই

বুদ্ধ মূর্তি বরুল। বিক্রম শৈলীর প্রাচীন চিত্র হইতে।

শেষে পিতার প্রকৃত সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক "রাহুল" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

জীবের দুঃখ গৌতমের মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিল এই কষ্ট কি নিবারণ করা যায় না? সংসারের এই গ্লানি কি করিয়া তিরোহিত করা যায়? ইহাই তাঁহার ভাবনার মুখ্য বিষয় হইল তিনি একদিন রাজপ্রাসাদ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ২৯ বর্ষ বয়সে ছন্নককে লইয়া কপিলাবস্তু ত্যাগ করিলেন। কপিলাবস্তু ছাড়িয়া গৌতম ছন্নক-সহ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন কিছুপথ অতিক্রম করিয়া ইহারা "অনুমিন" বা অনোমা" নামক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন সেখানে তিনি অশ্বের গতি বন্ধ করিলেন সেই স্থানটির নাম "মনিয়া" *। অনুমানিক বেলার অবসান। এইখান হইতে তিনি ঘোড়ার পিঠেই নদী অতিক্রম করিয়া ছন্নককে ঘোড়ার সহিত বিদায় দিলেন। ছন্নক কাঁদিয়া তাঁহাকে কাপিলবস্তুপ্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন গৌতম উত্তরে বলিলেন,—

"বজ্রাশনি-পরশু-শক্তি-শরাধরাণাং।
বিদ্বেষ্টুরোধপরিখাসু চ তীক্ষ্ণকোষ্ণম্।
আদীপ্তশল্যলিখরাঃ প্রসহেয়মুগ্রা
নৈবা জহুঃ পুনরনেন গৃহাভিলাষম্।"

অর্থাৎ বজ্র, কুঠার, শর প্রভৃতি বিদ্বেষীদের ন্যায় প্রজ্বলিত লোহ, আগ্নেয়গিরিশেখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হউক, তাহাতেও আমার গৃহাশ্রমে অভিলাষ করাইতে পারিবে না, তীব্র বিরাগের বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে জীবের দুঃখ নিবারণ করা যাইতে পারে -ইহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় করিয়া রাজপুত্র মনিয়া নগর অতিক্রম করিলেন। প্রাচীন মনিয়া উক্ত নামের বর্ত্তমান নগর হইতে এক মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল পরিত্যক্ত নগর এখন এক বিরাট ভগ্নাবশেষস্তূপে পরিণত এখন লোকে উহাকে "ভমেখর গিরি" বলে এইখানে "ভমেখর" নামক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গৌতমের যাত্রা-পথের যে সকল প্রাচীন বৃত্তান্ত আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত স্থলগুলির স্থান-নির্দ্দেশ এখনও খুব ঠিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

১ ছন্নক নিবর্ত্তন স্থল—অনোমা নদীর পূর্ব্বতীরে গৌতম পৌঁছিয়া যেখানে ঘোড়াসহ ছন্নককে বিদায় দিয়াছিলেন, সেখানে এই স্থল বিরাজমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, "চন্দরিয়" (বর্ত্তমান চন্দরক) নামক পল্লীতে এই স্থল ছিল অপরেরা বলেন, সে স্থানটি বর্ত্তমানে "ছন্দবাড়ী" গ্রাম, ফিউনসাঙ ও ফাহিয়েন তথায় একটি চৈত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, এখনও উহা বর্ত্তমান আছে।

* মনিয়ার বর্ত্তমান নাম মোনিয়া (Monia)। ইহা কপিলবস্তু হইতে ৩৪ মাইল এবং রামগ্রাম হইতে ৯ মাইল দূরে। অনোমা নদী হইতে রামগ্রাম ফিউনসাঙ-বর্ণিত ক্রোশানুসারে ১০০মি, অর্থাৎ ১৫½ মাইল।

২। ছকক নিক্ষেপ স্তূপের কিছু পূর্ব্বদিকে আর একটি ক্ষুদ্র স্তূপের উল্লেখ পাওয়া যায়, এইস্থানে গোতম শাক্যর বহুমূল্য কাষায়বস্ত্র কি এক কারণে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই স্তূপের নাম "কাষায় স্তূপ"—লোকে এখন "ভগ্না" নামক একটা পল্লী দেখাইয়া সেই স্তূপের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

৩ কাষায় স্তূপের অল্প দূরে আর একটি স্তূপের উল্লেখ পাওয়া যায় উহার নাম "চুন্দস্তূপ"। এইখানে স্বর্ণকারপুত্রক চন্দ শূকরের মাংস চূড়ান্তরূপে করিয়া ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চুন্দস নামক একটি গ্রামে উক্ত স্তূপ অবস্থিত ছিল। চুন্দের নাম "ছন্দ" হওয়াই উচিত—পুরাণে চাঁদ হইতে বুধ অবস্থিত।

নালাগিরি আক্রমণ করিয়া দেবদত্তের বৈশালী নগরে উপস্থিত হইলেন কাশী হইতে ১৪১ যোজন পূর্ব্বে এই নগরে যে বেনারেস বা নাগারের মতে বৈশালী বিশাল। পাটনার উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে কোন সন্ন্যাসীর নিকট তিনি কিছুকাল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। তথা হইতে মগধে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব শৈলে তিনি ধ্যানমগ্না প্রকৃতির অঙ্গ সেবা করেন। তখন বিম্বসার মগধের রাজা। মগধ হইতে নানাস্থান ঘুরিয়া তিনি শ্রাবস্তীতে বর্ত্তমান যন্ত্র তাঁহার উপস্থিত হইলেন এবং গুরুর উপদেশ আরম্ভ করিলেন, তাঁহার সঙ্কল্প বড় কঠিন, "মাংসের সাধন কিম্বা শরীর পতন"। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং। ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং। নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে"। আমার এই আসনে শুকাইয়া যাক্, অস্থি, মাংস, ত্বক্ লীন হইয়া যাক্ তথাপি যে জ্ঞানে কল্পের দুঃখের প্রশমন হয় তাহা না পাইয়া পরে এই আসন হইতে বিচ্যুত হইব না। পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য একি অসামান্য সাধন পণ। এই কথার অন্ধতার ঋষির তুলনা জগতে কোথায়?

গোতমের এই সময়ের অবস্থানের স্থানের প্রতিমূর্ত্তি অনেকস্থানে প্রস্তরে গঠিত হইয়াছে, সেই সকল মূর্ত্তির আকার এই—কেবল কঙ্কালখানি অস্থি। তাঁহার চক্ষু কিসে দূর করিবেন অন্তঃস্থ ধ্যাননিমগ্না অনাহার দীর্ঘবাহু-উপেক্ষা এবং অস্থিসার দেহ। বহুবৎসর এইভাবে চলিয়া গেল, একদিন তিনি অনাহারে ক্লিষ্ট দেহে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হিন্দুশাস্ত্রে যতি ধর্ম্মের কঠোরতার যত নিয়ম আছে, সাধনী হইয়া তিনি তাহার সমস্ত প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না।

একদিন বটবৃক্ষের নীচে উপবাস-ক্লান্ত মুখে রাজপুত্র তপস্যা করিতেছেন রাত্রি ঘনাইয়া আসিল তখন বহু কষ্ট সাধনের পর তাঁহার মন সন্দেহে বিক্ষিপ্ত হইল অমনই দেখিলেন, ভীষণ বাঘ ও সর্প, সৈন্য ও দানব রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে

মার-বিজয়

ভীষণ ঘটিকা প্রবাহিত হইতেছে, ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তমাত্র। এ জীবনের কোন প্রয়োজন নাই, যখন লক্ষ্য মিলিল না তখন বাঁচিয়া ফল কি? এই নির্বেদ উপস্থিত হওয়া মাত্র মন হইতে ভয়ের ভাব তিরোহিত হইল প্রশান্ত নির্ভীক চক্ষে সেই সকল বিভীষিকাকে তিনি উপেক্ষা

করিলেন রজনীর দ্বিতীয় যামে দেখিতে পাইলেন পরমসুন্দরী ষোড়শী যুবতীরা নৃত্যগীতের বিলম্বিত তালে, মূর্ছনা-পারম্পর্যে ও তাঁহার সহযোগ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে মুহূর্তের জন্য গৌতমের চক্ষু মুগ্ধ হইল, পরক্ষণেই দীর্ঘ উপস্থাপনাতে বিবেকবাণী তিনি শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন "আমি সুখের জন্য জন্ম নাই তোমরা অন্যত্র যাও, দুঃখীদের বোঝা আমি মাথায় লইব ইহাই আমার ব্রত" রজনীর তৃতীয় যামে তিনি দেখিলেন, দেবাদিদেব ইন্দ্র স্বয়ং যেন তাঁহাকে জগতের আধিপত্য দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার এক হস্তে রাজদণ্ড এবং অপর হস্তে অন্যান্য দেবতাদের জন্য চন্দন ও মাল্য, গৌতম সেই রাজদণ্ড, মালা বা রাজটীকা গ্রহণ করিলেন না আমি দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়াছি, এ সকল ক্ষয়ক্ষ ও প্রতিষ্ঠার আমি প্রয়াসী নহি এক সময়ে অচিরেই তাঁহাকে মগধ বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য দিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু অচিরেই বলিয়াছিলেন, "গৌতম! আমৃত স্থা কিসের তেন কুপার্ব "—ধারা নশ্বর, কল্পতরু তাহা আমি চাই না অবিনশ্বর নিত্য-পদার্থের সন্ধান আমাকে দিন।

কথিত আছে মার তাহার পুত্রকন্যা ও অসংখ্য সৈন্যসামন্ত লইয়া নানারূপ কৌশল অবলম্বনপূর্বক বুদ্ধকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারই পরাভূত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইয়াছিল মারের তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিল পুত্রদের নাম বিলাপ রাগ ও দর্প, এবং কন্যারা রতি প্রীতি ও তৃষ্ণা। ইহারা পরে কেহ বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল মারের সেনাপতির মতো উহাদের সুনেত্র, দীর্ঘবাহু প্রসাদ প্রাতলব্ধ প্রভৃতি প্রধান ছিল প্রলোভন এখানেই থামে না তারপর আর এক দৃশ্য। গৌতম দেখিলেন, পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্ত হইয়াছে, পুরুষোত্তমে তিনি মুহ্যমান, গোপা স্বামি শোকে তোমনে যোগিনী তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত অনাহারে অনিদ্রায় কৃশদেহে সে লাবণ্য নাই এই অপূর্ব পরিবর্তমান তো দেবতার দান,—তুমি দেবতার এই অমূল্য প্রসাদ পদদলিত করিয়া আসিয়াছ কন্যার পার্শ্বে শিশু রাহুল বিমনা হইয়া বসিয়া আছে, "তুমি কি পাষাণ? আমাদিগের এত কষ্টে কি তোমার মমতা হয় না? ফিরে এস, জীবদুঃখের নিবৃত্তি তুমি খুঁজিবে কিরূপে?" এই দৃশ্য গৌতমকে মুহূর্তকাল অভিভূত করিল, কিন্তু উহা মুহূর্তমাত্র, "আমি বহু পথ ধরিয়াছি, আমাকে অবিচল দেখাইতেছে – আমার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত সুখ ও স্নেহের ডুরি দিয়া আমাকে সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইও না।"

এই সকল দৃশ্য গৌতম যাহা দেখিলেন তাহা কাল্পনিক বা স্বপ্নদৃষ্ট নহে। উহাদের কথাবার্তা, হাবভাব রূপ ও ভঙ্গী কাব্য, এতদূর মনে হইল যেন তাহাদের নিঃশ্বাস তাঁহার গায়ে লাগিতেছে তাঁহার চরিতাখ্যানগুলিতে কথিত আছে যে মার বা কামনার দেবতা তাঁহাকে জীত, আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করিয়া মারার রূপে ফেলিবার জন্য এই সকল প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সকল ভয়ে নির্ভয় ও সকল প্রলোভনে অটল ছিলেন।

এই উপাখ্যানটি "মার বিজয়" নামে পরিচিত। পুরুষ নিজের ভবিষ্যৎ পূর্বে মনুষ্যচরিত্রের বল পরীক্ষার জন্য এক সময়ে সমস্ত সাংসারিক প্রলোভন হেন একত্র হইয়া সাধককে পরাভূত করিতে চেষ্টা করে। এই প্রলোভন দমন করিতে না পারিলে সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। কথিত আছে তথাগতদেব অন্যান্য এইভাবে সাংসারিক ভয়, লোভ ও আকর্ষণের সম্মুখীন হইয়া শ্মশানে মৃত দেহের উপর বসিয়া তপস্যা করেন। মার-বিজয়ের পর বুদ্ধের উপাধি হইয়াছিল "অহন অর্হৎ —আর্হন্ত করিতে সমর্থ। শব্দটি এই অর্থ সূচনা করে। অজন্তা গুহার বোধিসত্ত্ব-জীবনের এই অধ্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। আর একটি চিত্রে সোজন যে রাজপথে বুদ্ধ, মৃত ও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তাহা অতি সুচারুরূপে আঁকা হইয়াছে।

মনশ্চেতনা প্রলোভনের সেইসব নিক্ষেপ করিয়া নিরস্ত হইল। কিন্তু সমস্তের এইরূপ প্রভাব আছে এবং আমাদের নিত্যের কার্যকলাপ এই জাতীয় সংস্কারজাত। আমার মনে হয় বিশ্বের শত্রুতাপূর্ণ প্রলোভন দমন এবং বিশেষ কামনার মোহজালিনীর নিকট ক্ষণী কামনের যখন শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন নিম্নে চক্ষু অকস্মাৎ মোহীর বিষাদনের প্রতি পড়িয়া এক মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল—"বিশ্বস্ত কিঞ্চিৎ পরিস্ফুটনের।"

যাহা হউক রজনীর শেষ যামে সৌন্দর্যের ছল সিদ্ধি হইল। কামজয়ী পুরুষের মনের [illegible] হইল। তখন হাসি মেখে সোজন দেখিলেন অন্ধকার [illegible] সরিয়া গিয়াছে—সম্মুখে আলোক সুদীপ্তরূপে তাঁহার চক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই আলোকিত চক্ষে জগতের চারিদিকে তিনি সত্যের স্বরূপকে উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন।

তাঁহার নিকট এই কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করিলাম হইল, প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের কল্পনালে সুখ-দুঃখ পায়—তাহার দুঃখের, কষ্টে কষ্টে কামনা পরিহার করিতে পারিলে জন্মান্তরের পূর্বে চিরতরে দুঃখ মুক্তি লাভ করিতে পারে।

উৎকট কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া নিজেই দেহ ক্ষয় করা উচিত নহে। কামনার বশবর্তী হইয়া কাজ করিতে না নিষ্কাম হইয়া মধ্যপথ অবলম্বনপূর্বক সুকর্ম করিয়া যাইবে।

বুদ্ধ শব্দের অর্থ লক্ষ্যজ্ঞান। তিনি যে তত্ত্বের অধিগম দ্বারা এই উপাধি গ্রহণ করেন, সেই তত্ত্বের পারিভাষিক "প্রতীত্যসমুৎপাদ" অবিদ্যার জন্যই দুঃখমোচনের একমাত্র উপায় এই মতবাদ তিনি উপলব্ধি করিলেন। পৃথিবীর যত দুঃখ তাহা এই অবিদ্যার জ্বালাপালা হইতে জাত। অবিদ্যা-জনিত কুসংস্কার এইরূপ—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরামৃত্যু, শোক, পরিদেব, দৌর্মনস্য, উপায়াসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্যন্তিক দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা। এই কথাগুলি কতকটা কীর্তনে "মোহান্ধ সন্তাপে ক্রোধে" প্রভৃতির মত শোনায়। অবিদ্যা জয়ের আটটি উপায় ভগবান বুদ্ধ নির্দেশ করিয়াছেন—

সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি—এই আটটি উপায়ের নাম আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। গৌতম অবিদ্যার উৎপত্তি ও বিনাশ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বলিতে লাগিলেন "এই দুঃখের গৃহ যে নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাকে আমি খুঁজিয়া ফেলিয়াছি। এখন সেই নির্ম্মাতা আর গৃহ রচনা করিতে পারিবে না।" "অনেক জাতি সংসার অনির্ব্বিসম অনির্ব্বিসম গৃহকারকের গবেষণে দুঃখা জাতি পুনঃপুনঃ॥ গৃহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা, গৃহকূটং বিসংখিতং বিসংখার গতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।"

তাৎপর্য্য এই গৃহ যে নির্ম্মাণ করিয়াছে, জন্মজন্মান্তরে পদে পদে তাহাকে খুঁজিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু এতদিন তাহার সন্ধান পাই নাই। হে গৃহ নির্ম্মাতা এতদিন পরে আজ তোমার সন্ধান পাইয়াছি আর তুমি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার থাম ও ছিদ্র চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। আমার চিত্ত আজ বিকারশূন্য-সংস্কার ও কামনা লয় পাইয়াছে।

অবিদ্যাজাত কামনাই এই দুঃখের ঘর বারংবার রচনা করিয়াছে, চিত্ত কামনা ও সংস্কার-শূন্য হইলে কে আর এই দুঃখের ঘর রচনা করিবে?

বোধগয়ার একটি প্রধান শিক্ষা অহিংসা। শুধু মনুষ্য জগতে নহে, জীবমাত্রের প্রতিই ইহা আচরণীয়। এডুইন আর্ণল্ড বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'নিখিল বস্তুবিশেষের শান্তিস্বরূপ সর্ব্বজনপ্রেমিকপ্রবর' পশুপক্ষি সম্বলিত বন্যপ্রধান নিকা করিয়া তিনি কত শত জন্তুর প্রতি লোকদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দয়ামূলক নীতির ফলে অশোক রাজা কর্ত্তৃক দেশ বিদেশে শত শত পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বোধিলাভ নিজে জীবনের সমস্ত কষ্ট বরণ করিয়া লইবেন এবং জগৎকে দুঃখমুক্ত করিবেন, এই মহানীতি লাভ করিবেন —

"যং কিঞ্চি জগতো দুক্খং ভবং সব্বং যদি পটিচ্চ
বোধিত্বা তমহং সব্বং জগং সুখিতমস্স ॥"

(জগতে যত কিছু দুঃখ-কষ্ট তাহা সমস্তই আমাতে আসুক বোধিসত্ত্বের পূর্ণ ফলে জগৎ দুঃখমুক্ত হইয়া সুখী হউক।) বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী সম্বলিত কত যে গল্প আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটি এইরূপ—একদা ভগবান নামক এক বণিকের গৃহে বুদ্ধ ভিক্ষুবেশে ভিক্ষা করিতে গিয়া ছিলেন। বণিক্ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল— "তুমি সুস্থদেহ, অঙ্গের শক্তিকে কাজ করিতে অনিচ্ছুক কেন? আমি তোমাকে কিছু জমি দিতেছি, তুমি উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে শিখ।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, 'আমি কৃষিকার্য্যেই রত হয়ে আপনাদের কৃষির সহিত আমার কৃষির একটু তফাৎ আছে। মানুষের মনই আমার জমি যত্ন ও উৎসাহ দুটি বলদ, জ্ঞানের ফাল

বিন জ্ঞান হল এবং নিশ্চয়ই আমার হীত এই বীজ হইতে নিক্কাণফল উৎপন্ন হয় " পরে আড়াই হাজার বছরের পরেও এক সাধুর মুখে বুদ্ধদেবোচ্চারিত উপদেশের প্রতিধ্বনি সকল পল্লীতে পল্লীতে শোনা গিয়াছিল "নরের কুমতিরাজ জানি না—এমন মানব জনম হৈল পতিত, আবার কোথা কত যোন "

বুদ্ধদেবের নিক্কাণ কি তৎসম্বন্ধে সর্বশেষ বিচারকগণ বলিয়াছেন যে অবস্থায় সুখও নাই, দুঃখও নাই যাহার কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না, যাহাতে উপত্তি ও নিরোধ কুলাচারে নিষ্পন্ন হয় এবং যাহা একের ও বহুরের ভেদ নিরস্ত হয়—সেই ভাব ভাবনিরুদ্ধ অবস্থাকে নিক্কাণ বলে " এই ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা যায়, তবে নিক্কাণে আমরা দুঃখ জগতের "নেতি" আখ্যা পাইতে পারে ইহ জগতের সমস্ত অসুখের নীচিতে যে কামনার কণ্ঠকারে আমাদের চিত্ত আকর্ষিত সেই 'আনন্দ" যাহা উপনিষদ্ লিখিয়াছিলেন এবং শৈব ও বৈষ্ণবের 'রসের ভরিয়া' যে তাহের ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ গড়িয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মে সেই আনন্দ বা অপর কোন আধ্যাত্মিক বাস্তব সত্যের স্থান কোথায়? প্রাচ্যবাদীরা বলিয়া থাকেন, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এই বৌদ্ধধর্মের মূল উদ্দেশ্য, উহাতে আর কিছু দেখিবার নাই কেহ কেহ এই মতকে 'দুঃখবাদ" নাম দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না কেন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল, তৎপ্রসঙ্গে আমরা আবার আলোচনা করিব।

যাহা হউক সম্যকসম্বুদ্ধত্ব লাভের পর গোতম চক্র প্রবর্তন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন প্রথমে কৌ হইয়া শুদ্ধোদনের সুধাতা • ইঁহাকে যে উদ্দেশ্যে চক্র ঘুরাইতে দিয়াছিলেন, গোতম তাঁহার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সেই চক্র আবার ঘুরাইয়াছিলেন। এই চক্র সম্বন্ধে সুধাতা ভগবান বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন 'সম্যকপ্রভ একশত কৃষ্ণবর্ণ গভীর গর্ভে আমি শকটটি বারংবার পেষণ করিয়াছি তাহাদের চক্র, পতাকাধারী গাড়ী এবং সেই শকটটির চক্রে আবার বারটি গাড়ী তাহাদের সেই বারটি গাড়ীর চক্রে ছয়টি গাড়ী পেষণ করিয়া তাহাদের চক্রের এই চক্র উচ্চই চাকা ও মনের সহকারে প্রস্তুত করিয়াছি দেব আপনি ইহা আহার করিয়া তৃপ্ত হউন।"

বটবৃক্ষমূলে নিক্কাণতত্ত্ব তাঁহার লাভ হইয়াছিল এবং এইভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি সেখান হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন সেই বটবৃক্ষটি "বোধিবৃক্ষ" নামে জগতে পরিচিত হইয়াছিল পরবর্তী কালে মৌর্যবংশের কীর্তিমান্ সম্রাট পুণ্যশ্লোক নামক রাজা এই বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনুরোধের বীজ ধ্বংস হইবার নহে— পুনঃ পুনঃ অত্যাচারীর হাতে লাঞ্ছিত হইলেও কল্পবৃক্ষের মতন এখনও পৃথিবী বিরাজ করিতেছে

• ইনি গয়া কবিরাজের এক কন্যা নামের পত্নী ছিলেন। উরুবিল্বগ্রামের সেনানীর ইঁহাদের বাড়ী ছিল।

গৌতম গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কোণ্ডান্য ও আর চারিটি সঙ্গী লাভ করেন। তাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। মেক্কলদের যে বিরাট শক্তি উত্তরকালে জগতের ½ অংশ গ্রাস করিয়া অপর ½ অংশের নিকটও আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাতে স্বকীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল সঙ্ঘশক্তি। এই পাঁচটি শিষ্যের দ্বারা সেই সঙ্ঘের সূচনা হইয়াছিল।

সঙ্ঘ

বুদ্ধের ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিরাজ করে নাই, উহা প্রধানতঃ নীতিমূলক। হিন্দু-ধর্ম্মের জটিল আধ্যাত্মিকতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই নীতিমূলক ধর্ম্ম সহজেই ভারতবাসীর হৃদয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কেন যে তিনি আধ্যাত্মিক উপদেশ দেন নাই তৎসম্বন্ধে পালি "মজ্ঝিম নিকায়" নামক পুস্তকে একটি গল্প আছে তাহা এইখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

একদা সারিপুত্র গাত্রোত্থান করিয়া বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যটন করিতেছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—গুরুদাস করিয়া আমি কি লাভ করিলাম? যে সকল জটিল সমস্যা আমার মনে সর্ব্বদা একটা বিকার সৃষ্টি করিয়াছে, গৌতম তো তাহার কোনটিরই সমাধান করিলেন না, আমার ঘনদাস ঘুচা হইল আমি আজই তাঁহাকে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইব। বুদ্ধদেব যখন আসিলেন, তখন তাঁহারই পাইলেন সারিপুত্রের মুখে যেন বর্ষাগমের সমস্ত মেঘের ছায়া পড়িয়াছে, তিনি বিস্ময় প্রকাশ বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন সারিপুত্র বলিলেন "আচার্য্য, আপনি আমাকে গৃহ হইতে আনিয়া কি শিক্ষা দিতেছেন? আপনার উপদেশ শুধু অষ্টমার্গ অনুসরণ করা সেগুলি তো কয়েকটি নীতিসূত্র মাত্র, অধ্যাত্ম জগতের কোন তত্ত্ব তো বিন্দুমাত্রও আপনি আমার নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিলেন না। আমার প্রশ্নগুলি এই :—

সারিপুত্রের অভিমান।

সারিপুত্র।

"আত্মা কি? ইহা কোথায় থাকে, ইহার অস্তিত্ব আছে কি নাই? যদি আত্মা থাকে, তবে দেহের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ? এবং দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা কোথায় যায়? ঈশ্বর আছেন কি নাই? যদি থাকেন তবে জীবের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ? দেহ নষ্ট হইলে তাহার অণুপরমাণু কোথায় যায় এবং বিদেহী আত্মা কোথায় কি ভাবে থাকে?"

যদি আপনি এই সকল পদ সম্বন্ধে আমাকে সম্যক্ রূপে অবহিত করিতে পারেন, তবে আমি আপনার কাছে থাকিব, নতুবা বেদ ও যজ্ঞ ফলসহ থাকিয়া বন্ধ-মরণের কোন পার্থক্যই তো আমি দেখিতে পাই না।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি তোমাকে ভ্রাতৃত্ব হইতে এখানে আনি নাই তুমি সংসারের সার ও সত্য পুঁজিতে থাক, খুঁজিতে খুঁজিতে যদি সেই বস্তুর সন্ধান আমার নিকট

বুদ্ধের উপদেশ।

আসে তবে তোমাকে সেই মহাশান্তি লাভের একমাত্র উপায় অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলিব তুমি ব্যস্ত হইলে চলিবে না যদি তুমি আমার উপদেশ সম্পূর্ণ না হয় তবে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পার

'দেখ, তোমা একজনকে কেহ বাণ মারিতে গিয়াছে,—অপর এক ব্যক্তি তাহার হাত হইতে বাণটি ধরিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তখন যদি সে বলে 'আগে বল এই বাণ, উহার পুচ্ছ শালের বা শাকের—কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে, তবে আমি তোমাকে উহা ধরিতে দিব আগে বল, উহা কি কোন বাণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তবে তোমাকে উহা ধরিতে দিব ' তোমার প্রশ্ন কি সেই অজ্ঞানান্ধ অবোধ ব্যক্তির মত নহে ?

তোমার চিত্ত হইতে অজ্ঞান দূর করিবার জন্য আমি তোমাকে আর্য্যধর্ম্মের উপদেশস্বরূপ এই কয়েকটি কথা বলিয়াছি এই সকল পন্থা অনুসরণ করিলে তুমি স্বয়ং সত্য ধর্ম্ম, নির্বাণ ও মুক্তি যাহা তোমার জিজ্ঞাসা করিয়াছ—তাহাদের উত্তর তুমি হাতে হাতে পাইবে সত্যের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তুমি বিনাতর্ক হইয়া সকলই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে কিন্তু এখন আমি যদি ঐ সকল প্রশ্নের এক একটি উত্তর বলিয়া দিই এবং তুমি অন্ধের ন্যায় তাহা আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া লও তখন তোমার যতগুলি সংশয় ছিল তাহা হইতে অপেক্ষা দুগুণ ও পাণ্ডিত্যবলে সেগুলি খণ্ডন করিয়া অন্য মত স্থাপন করিবেন তুমি তখন তাহার উত্তর দিতে পারিবে না এবং তাহাতে যে আঘাত তোমাকে দুঃখ দিয়াছিলেন। কিন্তু যদি তুমি অষ্টাঙ্গ অবলম্বন করিয়া সাধনার পথে আর অগ্রসর হও তবে তোমার কামনা নিবৃত্ত হইয়া যাইবে তখন তুমি তোমার জ্ঞানোজ্জ্বল চক্ষে সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর নিজেই পাইবে তখন তোমাকে সহস্রবার অনুরূপ যুক্তিতর্কও কেহ তোমার বিশ্বাস টলাইতে পারিবে না তুমি হয় ত সেই বেদের সংখ্য দেখ, তবে যদি খুব পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তোমাকে বুঝাইয়া দেন যে সেই কথাই ঠিক, তথাপি তুমি তাঁহার মত কিছুতেই গ্রহণ করিবে না "

বুদ্ধ সমস্ত জগতকে নীতিধর্ম্মের নূতনরূপ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, অধ্যাত্মরাজ্যের জটিল পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন তিনি জগতের সুনীতির পথ অবলম্বন করিয়া লোক সত্য লাভ করিতে পারে নতুবা অধ্যাত্মরাজ্যের কথা কেবল কতকগুলি ও শুষ্কযুক্তির লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়ে ঋষির মত দৃষ্টি হইতে পারিলে অধ্যাত্মরাজ্যের সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়, নতুবা

যাহার তাহার কাছে সেগুলি বলিলে তাহা শুধু পরস্পর বিরোধী মতবাদের জটিল ও সংশয়পূর্ণ সমস্যায় পরিণত হয়। অধ্যাত্মরাজ্য-সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার অষ্টাঙ্গ কুসুমের ন্যায়, তাহাতে নিষ্ঠাসহ করিলে অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রত্যেকে স্বয়ং উদ্ঘাটন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।

বুদ্ধ গৃহাশ্রমকে নিন্দা করেন নাই, কিন্তু ভিক্ষুকে গৃহস্থ হইতে উচ্চতর সম্মান দিয়াছেন। 'সামঞ্ঞফলসুত্ত' পুস্তকখানি পাঠ করিলে এবিষয়ে তাঁহার মতামত অতি সহজভাবে জানা যাইতে পারে। বুদ্ধের তিরোধানের পর তাঁহার এবং তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। শুধু জাতক গ্রন্থগুলি নহে, বহু পুস্তকে তাঁহারই মুখে শোনা-কথার দোহাই দিয়া নানা জনে নানা মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের উক্তি কতটা খাঁটি তাহা বলা যায় না।

পালি "সামঞ্ঞফলসুত্তে" প্রথমাক্ষরসূত্রে। লিখিত আছে, মগধ-রাজকুমারগণের চিকিৎসক জীবকের রাজকুঞ্জ মনোরম আম্রবাটিকায় ভগবান্ বুদ্ধদেব বিংশত-পঞ্চাশদধিক এক সহস্র সংখ্যক শিষ্যপরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন।

একদা মগধাধিপ মহারাজ অজাতশত্রু (অজাতশত্রু) স্বীয় রাজপ্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে নৈশগগনের শোভা উপভোগ করিতেছিলেন। তখন শরৎ কালের প্রসন্ন অম্বরে পূর্ণচন্দ্র শীত্ত্ব রশ্মি বিতরণ করিতেছিল। বিম্বসারের সেই পুত্র দেখিতে দেখিতে রাজা অজাতশত্রু কাব্যকলায় তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন -

"বন্ধুগণ! এই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী কি সুন্দর! কি প্রিয়দর্শন! কি সাধনাসাধিনী! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কি মধুর চিহ্ন!

"আজ এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত যামিনীতে এমন কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহার নিকট গেলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারিব?"

এই প্রশ্নের উত্তরে একজন সচিব বলিলেন "মহারাজ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত লোকপূজ্য প্রবীণ পূরণ কস্সপ (পূরণ কাশ্যপ) মুনির নিকট চলুন, তাঁহার উপদেশে অভীপ্সিত শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।" এই কথা শুনিয়া রাজা নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে আর পাঁচজন সচিব পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রশংসাবাদ করিয়া মক্খলিপুত্র গোসাল (মস্করিপুত্র গোশাল অজিত-কেশকম্বল ককুধ-কচ্চায়ন ককুদ কাত্যায়ন), সঞ্জয়বেলট্ঠি-পুত্র সঞ্জয়-বেলাস্থি-পুত্র), নিগণ্ঠনাথপুত্র (নির্গ্রন্থজ্ঞাতি পুত্র) এই ছয় পণ্ডিতের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাদের কথা শুনিয়া পূর্ব্ববৎ নীরব হইয়া রহিলেন।

এই সময়ে ভিষক্‌প্রবর জীবক মহারাজ অজাতশত্রুর অনতিদূরে বসিয়াছিলেন, অজাত-শত্রু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুহৃৎশ্রেষ্ঠ জীবক, তুমি কিছু বলিলে না যে?"

জীবক বলিলেন, "সন্নিকটেই ভগবান বুদ্ধদেব আমাদের আম্রোদ্যানে বাস করিতেছেন, তিনি জ্ঞান এবং পবিত্রতার আধারস্বরূপ, তিনি মুমুক্ষুদিগের একমাত্র পথপ্রদর্শক। মহারাজ, তাঁহার নিকট চলুন, শান্তি পাইবেন।"

"প্রিয় জীবক, তুমি আমার হস্তীগুলি সুসজ্জিত করিতে বল।" তখন রাজার আদেশে পাঁচশত হস্তিনী সুসজ্জিত হইল, সেই ৫০০ হস্তিনীর উপর প্রবেশপরিচিতা পাঁচশত সুন্দরী আলোকবর্তিকা ধারণ করিয়া নানাভূষণশোভিত বিশালকায় দ্বিরদে সমারূঢ় মহারাজ অজাতশত্রুকে বেষ্টন করিয়া চলিল। রাজা সেই রাত্রিকালে মহাসমারোহের সহিত রাজগৃহ হইতে জীবকের আম্রবাটিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিশাল আয়োজনের নিকটবর্তী হইয়া রাজা সহসা ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন, আশঙ্কায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ভীত ও উত্তেজিতকণ্ঠে জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জীবক, তুমি কি আমাকে ছলনা করিয়া আনিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতেছ? বিশত পঞ্চাশদধিক একসহস্র ব্যক্তি যে স্থানে সমবেত, সেখানে এমন নীরব কিরূপে হইতে পারে? একটি কাশি কিংবা হাঁচির শব্দ পর্যন্ত শুনা যাইতেছে না।"

"মহারাজ, আমি আপনাকে ছলনা করিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে আনি নাই, আমি তদ্রূপ পামর নই। ঐ লতামণ্ডপে দীপ জ্বলিতেছে, ঐ দিকে চলুন।"

রাজা হস্তিপৃষ্ঠে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া, যেখানে হস্তী আর চলে না, সেই স্থানে অবতরণ করিলেন এবং বনমণ্ডপের সন্নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবক, ভগবান বুদ্ধদেব কোথায়?"

"ঐ মধ্যস্থ স্তম্ভের সম্মুখে পূর্বমুখ হইয়া শিষ্য-পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব উপবিষ্ট আছেন।"

তখন রাজা অগ্রসর হইয়া শঙ্কাসহকারে একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রাজা দাঁড়াইয়া একবার সেই নিঃশব্দ বিশাল জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উন্নতগ্রীব, নির্মল হ্রদের ন্যায় শিষ্যমণ্ডলী নীরব ও প্রশান্ত। রাজা উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর! কি প্রশান্ত! আমার প্রাণাধিক কুমার উদায়িভদ্রের (উদায়িভদ্রের) জীবন যেন এইরূপ শান্তিপূর্ণ হয়।"

অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবান্ বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

"মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

"হে দেব! সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে। সারথি, অশ্বরক্ষক, ভারবাহ, নিশানবাহক, সেনাপতি, সৈনিক, পাচক, নাপিত, মালাকর, ধোপক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, জ্যোতিষি, সচিব প্রভৃতি শত শত শ্রেণীর লোক জীবিকা অর্জন করিতেছে। ইহারা স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহজীবনেই স্বকৃত কর্মের পুরস্কার লাভ করিতেছে। তাহারা স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ অর্থে পরিবার পালন করিয়া বন্ধুবান্ধবসহ নানারূপ সুখভোগ করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। সমস্ত অর্থ জনহিতকরি কার্যে ব্যয় করিয়া পরকাল-সম্বন্ধেও তাহারা সুখের পথ স্থির করিয়া রাখিতেছে। পাঁচশত আম্রের কর্মের পুরস্কার ইহজীবনেই লক্ষিত হইতেছে কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি এরূপ দেখাইতে

পারেন কি, সংসার ক্ষণ এই জীবনেই ভোগ করা যায়?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, করিয়াছিলাম।"

"আপনার আপত্তি না থাকিলে, তাঁহাদের নিকট আপনি কি উত্তর পাইয়াছেন, আমাকে বলিতে পারেন?"

'আমি একবার পূরণ কস্সপ (পূরণ কাশ্যপ) মুনির নিকট গিয়াছিলাম, নানারূপ ভদ্রতা এবং সৌজন্যসূচক আলাপের পর আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'যে ব্যক্তি লোক পীড়ন করে, হত্যা বা চৌর্যবৃত্তি করে, তাহার কোন পাপই হয় না। যে অসত্য কথা বলে, পরদার গমন প্রভৃতি সমাজ-গর্হিত কাজ করে তাহার প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি কেহ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা সমস্ত মানবমণ্ডলীর দেহ খণ্ডিত করিয়া এক স্তূপাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত করে তথাপি সে কোন পাপকার্য করিল বলিয়া আমি মনে করি না। যদি কোন ব্যক্তি গঙ্গার দক্ষিণপার্শ্বস্থ সমস্ত জনপদ নিহত করিয়া ফেলে, তথাপি সে কোন দুষ্কর্ম করিল বলিয়া আমার প্রতীত হইবে না। যদি কেহ গঙ্গার উত্তরপার্শ্বের সমস্ত জনপদ বাসিয়া মুক্তহস্তে দান করিতে ও করিতে অগ্রসর হয় এবং প্রতিস্থানে পূজা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় মনে কৃতার্থ হয়, তথাপি সে কোন পুণ্য কর্ম করিল বলিয়া আমি মনে করিব না। পরোপকার, আত্মসংযম সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা কোনরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।' হে দেব, কস্সপ এইভাবে 'সন্ন্যাসাশ্রমের ইহকালের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে কর্মের অসারতা সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কেহ আত্মফল-সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে তদুত্তরে নিষ্ফলের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিলে যেরূপ হয়, এই উত্তর তেমনই হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে আমি তাঁহার এই কথাগুলির নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই করি নাই, এবং যদিও এ উত্তরে আমার কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তি হয় নাই, তথাপি আমি অসন্তোষসূচক কোন কথা বলি নাই, এবং তাঁহার কথা গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীরবে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

"অতঃপর মক্খলিপুত্র মক্খলিপুত্র গোসালের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'জীবগণের পাপপুণ্যের কারণ নাই। ব্যক্তিবিশেষের জীবন যে ভাবে গঠিত হইতেছে, তার উপর তাহার কিছুমাত্র হাত নাই। পুরুষকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ একই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্তী, তাহাদের কিছুমাত্র স্বশক্তি নাই, তাহারা অকূলভাবে ভাগ্যের অধীন হইয়া বিচরণ করিতেছে। তাহারা যে শ্রেণীতে যে অবস্থায়, যেরূপ প্রকৃতি লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই অপরিবর্তনীয় নিয়মানুসারে কাজ করে এবং সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জীবই ৮৪ লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং অসংখ্য উপায় এবং অসংখ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহজগতে বারংবার গমনাগমন করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ভাবিতে পারেন,—আমি এই সকল

পুণ্যানুষ্ঠান-দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিব, মুণ্ড জ্ঞানানুসারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি স্বীয় মানদণ্ডে জীবের সুখদুঃখ পরিমাপ করিয়াছেন, তাহার তিলমাত্রও ব্যতিক্রম হইবার নহে। কর্ম্মফলানুসার গ্রহণ করিয়া তাহা অসন্তাবিতরূপে জীবের ভোগ করিতে হইবে। তীর হইতে গুলি নিক্ষেপ করিলে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সীমা হইতে অধিকতর নিকটে কিংবা দূরে পড়ে না। সেইরূপ জ্ঞানী হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন, কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। কর্ম্মফলানুরূপে বস্তাবাধীন ভাবে কর্ম্মক্ষয় হইলে জীব চরমশান্তি পাইয়া থাকেন।' হে দেব! মঙ্খলিপুত্র গোশাল 'সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে কর্ম্মফলানুসার-দ্বারা কিরূপ পাপক্ষয় হয় তদ্বিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন।

"অজিত-কেশকম্বলকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যাগযজ্ঞের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে, পরকাল বলিয়াও কিছু নাই। কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। প্রাকৃত মানবের পক্ষে তাহা সুদূরপরাহত। মৃত্যুর পর পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহারা মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বা সৎকারাদির দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকারের কথা বলেন, তাঁহারা হয় অজ্ঞ, না হয় মিথ্যাবাদী। মৃত্যুর পর মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেরই অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহাদের কিছুই থাকে না।' হে দেব! এই ভাবে অজিত-কেশকম্বল 'সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে হেয় এবং আত্মার অবসাদ-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

"তৎপর আমি ককুদ কচ্চায়নকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সপ্তপ্রকার দ্রব্য জগৎ নির্ম্মিত, ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা নির্ম্মিত এবং অবিনশ্বর, এগুলি হইতে আর কিছু উৎপন্ন হয় নাই। গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ইহারা অটল। জল, মৃত্তিকা, অগ্নি বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং আত্মা এই সপ্তদ্রব্য, ইহাদিগকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না, ইহারা চিরস্থায়ী। যদি কেহ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা কাহারও জীবন নষ্ট করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সপ্ত-দ্রব্যের অভ্যন্তর দিয়া অসি চালনা করিয়াছে মাত্র।' এইভাবে ককুদ-কচ্চায়ন 'সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রত্যক্ষ পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন।

"তৎপরে আমি নিগ্রন্থ জ্ঞাতি-পুত্রকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'নিগ্রন্থগণ চারি প্রকার সংবর দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করেন, তাঁহারা সাধারণভাবে জল পান করেন না। জীবহননাশঙ্কায়, এবং সর্ব্বদা পাপ হইতে বিরত থাকেন।' 'সন্ন্যাসাশ্রমের ফল কি?' ইহার উত্তরে নিগ্রন্থ জ্ঞাতি-পুত্র আমাকে চারি প্রকার সংবর সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

"তৎপরে আমি সঞ্জয়বেলট্ঠিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন 'যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর পরকাল আছে কিনা, আমি কি উত্তর দিব মনে ভাবিতেছ? পরকাল আছে কিংবা পরকাল নাই এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না।' এই ভাবে "পাপপুণ্যের ফলাফল এবং সত্যরক্ষণশীল ব্যক্তির পরকালের পুরস্কার কি?" প্রভৃতি প্রশ্ন-সম্বন্ধেও আমি সেই

একই উত্তর দিব।' সঞ্জয়বেলট্ঠি 'সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি কিংবা পূর্বোক্ত অপরাপর পণ্ডিতগণের প্রতি আমি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করি নাই। তাঁহাদের বাক্য গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য না করিয়া আমি নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়াছি।

"এইক্ষণ ভগবন্! আমি আপনাকে সেই প্রশ্নই করিতেছি। এই সংসারে সন্ন্যাস অবলম্বন দ্বারা কি পুরস্কার লাভ হইতে পারে, সংসারাশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসরণ করিয়া যেরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্ন্যাসসম্বন্ধে তদ্রূপ কোন প্রত্যক্ষ ফলের বিষয় আমাকে বলিতে পারেন কি?"

"মহারাজ, আমি তাহা বলিতে পারিব, কিন্তু তৎপূর্বে আপনাকে একটি প্রশ্ন করিব। মহারাজ, আপনার দাসগণ প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাণান্ত-পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়া থাকে। তাহারা পরিশ্রম স্বীকার করে কিন্তু আপনি সমস্ত সুখ-সম্ভোগ করেন। ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে, অপরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষুর বৃত্তি অবলম্বন করে, ক্রমে যদি তাহার সন্ন্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং আপনি শুনিতে পান যে আপনার ভৃত্যদলের মধ্যে একজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্জনে সামান্য আহারে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিতেছে তখন আপনি কি তাহাকে পুনরায় দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিবেন?"

"কখনই না, বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সম্মান দেখাইব, তাহার সেবাশুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিব।"

"এরূপ হইলে, মহারাজ, আপনাকে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সন্ন্যাসধর্মের কিছু ফল ইহজীবনেই লাভ করা যাইতে পারে।"

"হাঁ, ভগবন্, তাহা স্বীকার্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষয়ে আপনি আমাকে বলিতে পারেন কি?"

তখন বুদ্ধদেব স্বাধীনজীবী গৃহস্থ যদি সম্পত্তি ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সেও নির্জনে ইন্দ্রিয়সংযমাদি ব্রতিযোগ্য আচরণের জন্য লোকপূজিত হয়, প্রমাণ করিলেন রাজা এবারও সন্ন্যাসাশ্রমের কতক ফল ইহলোকেই লব্ধ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, —"অন্য কোন উৎকৃষ্টতর ফলের বিষয়ে আমাকে বলুন।"

"সেরূপ ফল অনেক আছে, বলিতেছি, মনোযোগপূর্বক শুনুন। যদি পৃথিবীতে এরূপ কোন প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন-লাভ হয়, যিনি বিগতস্পৃহ, কামনাশূন্য এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, লোকমোহাদি যাঁহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় করিয়া রাখে নাই, যিনি নিজ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত উদ্বেগশূন্য, যিনি পরমরম্য পরমপ্রিয় সত্যের অনুসন্ধান করিয়া তদ্লাভে চিরপ্রসন্ন হইয়াছেন,—এইরূপ সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্র অন্ধ গৃহস্থগণের মায়াপাশ কাটিয়া যাইবে। এই বিপদ ও বিঘ্ন-সঙ্কুল

সাংসারিক জীবন তখন তাহার ভাল লাগিবে না। পৃঙ্খলিত পক্ষী যেরূপ উড্ডীয়মান পক্ষিকুলকে তাহার স্বীয় স্বাধীন শক্তির কথা স্মরণ করে, মুক্ত পুরুষের দর্শন লাভ করিয়া বিড়ম্বিত গৃহস্থ সেইরূপ মুমূর্ষু হইবে। এক উচ্চতর উৎকৃষ্ট জীবনের চিত্র তাহার চক্ষে পড়িবে। সে তখন ভিক্ষু হইয়া পরিব্রাজক করিবে। ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিলে নির্জনে তাহার আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মিবে, সে প্রতিপদে সতর্ক হইবে, যে কামনা বিপদসঙ্কুল, যাহা সচনায় লোভের উদ্রেক করিয়া পরিণামে কষ্টের পারম্পর্য্যের উপস্থিত করে, সেইরূপ বাসনার অনুসরণে তাহার স্বাভাবিক ভীতি উৎপন্ন হইবে সে শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে প্রাতকালে, মধ্যাহ্ন আত্মসংযমের উদ্দেশ্য স্মরণ করিবে। এইভাবে ভিক্ষু মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে শিক্ষা করে, শেষে কামনা আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, ভোগের ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে নিবৃত্ত হইয়া যায় সংসারাশ্রমে তাহার এই নিবৃত্তি শিক্ষার পক্ষে বহু অন্তরায় আছে।

"মহারাজ, যেমন কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অতি কষ্ট পাইতেছিল, তাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল এবং চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, সে যদি পুনরায় স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, তবে পূর্ব্বাবস্থা ও পরের অবস্থা স্মরণ করিয়া সে কত সুখী হয়।

"মহারাজ, যেরূপ কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি দুঃখময় অবস্থায় এক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকে, কিন্তু মুক্তি পাইলে সে পূর্ব্বাবস্থা ও পরের অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রফুল্ল হয়।

"মহারাজ, যেমন কোন ক্রীতদাস পরের আদেশ পালনে নিযুক্ত থাকে, তাহার স্বচ্ছন্দ গতিবিধির শক্তি থাকে না, সহসা যদি সে মুক্তি পায় তবে সে কত সুখী হয়।

"মহারাজ, মনে করুন কোন সম্পত্তিশালী মরুভূমির পথ পড়িয়া অনাহারে ও তৃষ্ণায় বিষম আশঙ্কা করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি যদি সহসা এক মনপ্রাণজুড়ানিনী পল্লীর উপান্তে উপস্থিত হন, তাহা হইলে কত সুখী হন।

"সেইরূপ ভিক্ষু ক্রমে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া যখন কামনা হইতে মুক্তিলাভ করেন, তখন সেই রোগমুক্ত, কারামুক্ত, মরুভূমি উত্তীর্ণ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার আনন্দ লাভ হয়, তাঁহার প্রফুল্লতা হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে উৎপন্ন হয়, বাহিরের অবস্থাচক্রে তাহার হ্রাস বা উপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না যেরূপ কোন নদী, স্বর্গ হইতে দুইধারা পড়ুক বা না পড়ুক, দুইকূল স্পর্শ করিয়া পরিপূর্ণ প্রবাহে চলিয়া যায়, তদ্রূপ তিনিও সমভাবে চলিয়া যান

"হে মহারাজ সন্ন্যাসাশ্রমে এই সকল ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে কিন্তু ইহা ছাড়া আরও ফল আছে।

"আত্মসংযমের ফলে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায় যেরূপ এক পদ্মপুকুরে অনেকগুলি পদ্ম বিকাশ পাইয়াছে, জলধারা তাহাদের প্রত্যেকটি পুষ্ট করিয়াছে, শীতলজলস্পর্শে তাহারা নির্ম্মল এবং নবীনভাব ধারণ করিয়াছে, রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ পদ্মের যেটিরই একটি অংশ নাই যাহা সৌরভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যেরূপ আলোকস্তম্ভ শ্বেতবর্ণ পরিষ্কৃত বস্ত্রে পরিবৃত হইয়া কেহ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার শরীরের

এমন কোন স্থান নাই, যাহাতে সেই শ্রেষ্ঠ পরিধেয়ের সংস্পর্শ নাই, সন্ন্যাসাশ্রমে নিষ্কলঙ্ক জীবন লাভ করিয়াও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পবিত্রতা লব্ধ হওয়া যায়।

"যখন চিত্ত এইরূপে প্রশান্তভাব ধারণ করে তখন পাপ উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তখন দেহসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় এ দেহ অগ্নিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল যাহার সঙ্গে জুতার যে সম্পর্ক, তরবারির সঙ্গে কোষের যে সম্পর্ক, দেহের সঙ্গে আত্মারও সেইরূপ সম্পর্ক তখন দেহ হইতে আত্মাকে ইচ্ছানুসারে বিচ্যুত করিতে পারা যায়, ইন্দ্রিয়সংযমশীল মুক্ত সন্ন্যাসীর এই জ্ঞান হয়, যে কোন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তিনি তাহা পরিগ্রহ করিতে পারেন, তিনি কঠিন ভূমি ভেদ করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন জলের উপর ছুটিয়া যাইতে পারেন এক হইয়া বহু রূপ গ্রহণ করিতে পারেন তিনি ইচ্ছানুসারে দৃশ্য বা অদৃশ্য হইতে পারেন, বিহঙ্গের ন্যায় শূন্যমার্গে উড্ডীন হইতে পারেন কুম্ভকার যেমন ইচ্ছানুসারে যে কোন রূপ ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে, স্বর্ণকার কিম্বা বস্ত্রিদল ব্যবসায়ী যেরূপ যে কোন মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে, সেইরূপ সন্ন্যাসী যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন

"ইহা ছাড়াও সন্ন্যাসের আরও ফল আছে চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইলে তাহার জন্মান্তরের অবস্থা স্মৃতিতে উদিত হয় পূর্ব্ববর্ত্তী বহুজীবনের বিবরণ তাহার মনে জাগরিত হয়; অমুক স্থানে আমি অমুক নামে পরিচিত ছিলাম অমুক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম আমি অমুক পরিবারভুক্ত ছিলাম আমার আয়ুর পরিমাণ এইরূপ ছিল, সেই স্থান হইতে আমি অমুক স্থানে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলাম, তথায় আমি এই কার্য্য করিয়াছিলাম, তারপর আবার আমার অমুক স্থানে জন্ম হয় ইত্যাদি। এই ভাবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়।

"মহারাজ, যেরূপ কোন ব্যক্তি এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে সে গ্রাম হইতে পুনরায় গ্রামান্তরে যাইয়া শেষে নিজগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন অন্ধ-কাহ্নি দূর হইলে, প্রশান্ত অন্তঃকরণে যেরূপ তাহার মনে হয়, আমি অমুক স্থানে গিয়াছিলাম, তথা হইতে অমুক স্থানে যাইয়া এই কার্য্য করিয়াছি, অমুক স্থানে উপবেশন করিয়াছি অমুক স্থানে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াছি, এবং শেষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছি, সন্ন্যাসাশ্রমের এই প্রত্যক্ষফল আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ছাড়াও উৎকৃষ্ট এবং উত্তমতর আরও ফল লব্ধ হইয়া থাকে

"মুক্ত সন্ন্যাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ হয়, তিনি বন্ধ ও জীবের স্বরূপ দর্শন করেন কোন্ ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিতেছে এবং তাহার কি প্রকার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতে হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারেন যেরূপ, মহারাজ! প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া কেহ নিম্নে জনস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায় লোকগণ কে কি ভাবে কাজ করিতেছে, কে আসিতেছে, কে কোন পথে যাইতেছে ইত্যাদি, মুক্ত সন্ন্যাসী কামনার পরিণতি সেইরূপ সুস্পষ্টই দেখিতে পান, কোন্ কামনার পরিণাম বিষময়, কোন্ পথ কণ্টকময়, কোন্ কার্য্যদ্বারা উদ্বেগ ও অনর্থ সৃষ্ট হয় কোন্ কার্য্যদ্বারা উহা নিবারিত হয়,

তিনি উহা জানিয়া কামাসব, ভবাসব এবং অবিদ্যাসব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হন তাঁহার বর্তমান কামনা, ভবিষ্যৎ কল্পনা এবং অজ্ঞানকল্পিত মোহ এই ত্রিবিধ কষ্টের কারণ একেবারে দূর হইয়া যায় উন্নত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চির প্রশান্তিতে সুস্থির হন যেরূপ, মহারাজ, কেহ পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ জনস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে সেই নিম্নস্থ জনের ভিতর যে সকল লোক, প্রস্তর এবং গহ্বর রহিয়াছে তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন বাসনাতাড়িত জীবনের কষ্টগুলিও মুক্ত সন্ন্যাসী সেইরূপ দেখিতে পান এই জ্ঞানই সন্ন্যাস-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ এই জ্ঞানের তুল্য উৎকৃষ্ট ফল মনুষ্য জীবনে আর কিছু লক্ষ হইতে পারে না।"

ভগবান্ বুদ্ধ এই ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অজাতশত্রু বলিলেন "হে পরমারাধ্য দেব, পতিত লোককে পুনঃ ধর্মে উত্থিত করিয়া দিলে, অথবা যাহা লুক্কায়িত ছিল তাহা সম্মুখে ধরিলে অথবা ঘোর তিমিরাবৃত স্থানে আলোক ধরিলে অথবা পথহারা বিপন্ন পথিককে পথ দেখাইয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ ভগবন্ আপনি নানা কৌশল এবং বিচিত্র উপমাদ্বারা আমাকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন এখন হে দেব, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আপনজনের যেন গণ্য করা হয় ভগবন, আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন, আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকিব। আমি মহাপাপী মলিনচিত্ত দুর্জন এবং ঘোর অজ্ঞানান্ধকার আমি রাজ্যলাভের জন্য আমার পরম পূজনীয় সাক্ষাৎ ধর্মের অবতারস্বরূপ পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি তিনি পরম ধর্মিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ নৃপতি এবং অতি উদার চরিত্র দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন আমার ন্যায় নরাধমকে আশ্রয়দান করুন যেন ভবিষ্যতে আর আমি পাপ না করিতে পারি।"

"মহারাজ তুমি পাপাসক্ত হইয়া এরূপ কার্য করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি যখন ইহা পাপ বলিয়া মনে করিতেছ এবং সকলসমক্ষে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি কারণ যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া জানিয়াছে সে ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না।"

সেই রমণীয় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশীথে রাজা হৃদয়ের বাধা ঘুচাইবার জন্য ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট গিয়াছিলেন। অজাতশত্রু সোদরবধ গ্রহণের পর কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠ-ধর্মপরায়ণ নৃপতি হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন শাক্য নিশীথের পূর্ণচন্দ্র অনুতপ্ত প্রাণে পিপাসা জাগাইয়া তাঁহা এইভাবে পুণ্যপথে প্রবর্তিত করিয়াছিল।*

এই 'সামঞ্ঞফলসুত্তে' বুদ্ধদেবের সময়কার নানা দার্শনিক মতের অতি সংক্ষেপে একটা বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় সেই সময়ে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান অতি জটিল

* মজ্ঝিমের এই অংশটী সন ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা তাঁহার বুদ্ধচর্যা নামক পুস্তকে ২৩৪-২৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

চিন্তার আবর্তে পড়িয়া কতকটা নিরুপায় হইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল বুদ্ধদেব কামনা তাহার প্রগতি ও তাহার শেষ পরিণতি ঠিক একটা অঙ্কুরের উদ্ভব ক্রমবিকাশ ও ধ্বংসের মত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া তাঁহার ধর্মমত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই যুক্তিতর্কের প্রাবল্যের দিনে তিনি অনির্দিষ্টের সন্ধানে লোককে প্রবর্তিত করিতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রায় প্রত্যক্ষ ফলের মত নির্বাণতত্ত্বকে সহজভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পূরণ-কাশ্যপ ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পুণ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন মক্খলিপুত্ত গোশাল অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং অজিত কাত্যায়ন কতকগুলি নিত্য বস্তুর তালিকা দিয়া মানুষের কিছু করণীয় আছে ইহা স্বীকার করেন নাই। এই সকল মতের কোনটিতেই সমাজ-রক্ষার ব্যবস্থা নাই ইহারা অবাধ চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের ফল মাত্র, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক নৈতিক এবং পৌরোহিত্যের সমস্ত কর্মকাণ্ড এই মতবাদীরা ছুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন অথচ কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা ইহাদের কোনটিরই মধ্যে ছিল না।

বুদ্ধ আধ্যাত্মিক কোন নূতন চিন্তার বাহাদুরি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই তিনি দুঃখবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখাইয়া সমস্ত বিশ্বকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জগতের সকলেই দুঃখী, সকলেই হিতাকাঙ্ক্ষী সুতরাং জগতের সর্বস্থান হইতেই তাঁহার আহ্বানের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল এইভাবে বৌদ্ধধর্ম সার্বজনীন ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। যে সকল সমস্যার উপর সমস্ত জগতের শান্তি নির্ভর করে, তিনি সেই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া যে রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অচিরকাল মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

বুদ্ধের সময় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল মত প্রচলিত ছিল তাহার সকলগুলিই কালক্রমে বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। বিদ্যোদয়-ত্রয়োদশীতে বৌদ্ধমত বলিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় অজাতশত্রু-কথিত ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতের সমস্তগুলিই শেষযুগে বৌদ্ধগণের কোন না কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে বৌদ্ধমত এই ভাবের বলিয়া লিখিত হইয়াছে —

"অভিলষিত দ্রব্যভোজনই স্বর্গ, নিজ পত্নীতে ও পরদারে যথেচ্ছ বিহার করিবে" (স্বদার-পরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা "প্রত্যক্ষাত্মক মানং ন সকলফলস্য দেহভিন্নোঽস্তি কশ্চিন্মিথ্যাভূতে সমস্তেঽপ্যনুভবতি জনঃ সর্বমেতদ্বিমোহাৎ।" "কা স্বর্গে পরিবেদনা যদি পুনঃ পিণ্ডোরণত্যাদ্ভবঃ। কুস্তাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততময়ী তদ্বংকুলালাদিতঃ॥" অর্থাৎ দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি সমস্ত কর্মের ফলভোগী কোন আত্মাদি নাই। এই মিথ্যা-ভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে। যখন মাতা পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুম্ভকারাদি কর্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির গুরু ভাবনা কি আছে? অর্থাৎ সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহাতো চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছ, এজন্য পৃথক্ সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শুধু পূরণ-কাশ্যপের মত নহে, মস্করিপুত্র গোশাল, অজিত কেশকম্বল, নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র এবং সঞ্জয় বেলট্ঠের মত ইহাদের কোন মতই ভারতবর্ষে হারাইয়া যায় নাই; বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর বাউল ও সহজিয়া গুরুদের মধ্যে যে সকল মত প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও বিকৃত বৌদ্ধমত আমরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইব, বুদ্ধের সময়ের প্রচলিত যে ছয়টি চিন্তাধারা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলি বৌদ্ধদিগের সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল সুতরাং তৎকালের কোন মতই এদেশ হইতে চলিয়া যায় নাই সমাজের অন্তস্তলস্তরে সেই সকল মত সহজিয়াদিগের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। অনুমাতন বৈদান্ত ধর্মাবলম্বীদের নিকটবর্তে যেরূপ বৌদ্ধমত প্রচ্ছন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয়, বুদ্ধের সময়কার ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতও তদ্রূপ কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত হইয়াছিল, সহজিয়াদের বিস্তৃত সাহিত্য পাঠ করিলে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। বঙ্গদেশের এই সকল মত এখনও যেরূপ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তদ্রূপ উহা আছে কি না তাহা আমরা জানি না বুদ্ধের নীতিমূলক ধর্মের সঙ্গে এই সকল মতের গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান গুরু কটিল আধ্যাত্মিক চিন্তার দিকে একেবারেই যান নাই, কিন্তু এই সকল মতে ব্যাপকভাবে স্বাধীন চিন্তার খেলা দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরিশিষ্টে সহজিয়া প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

অজাতশত্রু যে তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে যে প্রবাদ ও উপাখ্যান বৌদ্ধজগতে প্রচলিত আছে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, যথা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, —এই সকল প্রবাদ বিশ্বাস করেন নাই আমরা এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম যে গৃহস্থের আশ্রম অপেক্ষা ভাল, তৎসম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত অপ্রত্যয় করিবার কোন কারণ নাই সেই মতবাদটি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে। এখনও এদেশের লোকের বিশ্বাস যে মুক্তিকামী কোন লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার সাত পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার পায় সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'সন্ন্যাসাশ্রম ভাল না গৃহস্থাশ্রম ভাল?' পরমহংসদেব ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে একটা প্রবচন দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন "খোলার মধ্যে খৈ যখন তৈরী হয়, তখন কতকগুলি খৈ আগুনের উত্তাপে বাহিরে আসিয়া পড়ে। কতকগুলি খোলার ভিতরেই থাকিয়া যায় যেগুলি বাহিরে আসিয়া পড়ে সেগুলি যেরূপ ধবধবে সাদা হয়, কড়ার ভিতরের খৈ তেমনটি থাকে না সেগুলি একটু লালচে হয়"

বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করেন তিনি ধর্মার্থে অতিরিক্ত কঠোরতা এবং দৈহিক শুষ্কতা—এই উভয় পন্থা পরিহারপূর্বক 'মধ্যপথ' অবলম্বন করিয়াছিলেন বৌদ্ধগয়া জগতে নৈতিক জীবনের প্রতি সর্বপ্রথম তিনিই একটা জোর দিয়াছিলেন। এই নৈতিক তত্ত্বের অমৃতফল অশোক রাজার সময় ফলিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

প্রথম পঞ্চ শিষ্যের পর ৬০ জন নূতন শিষ্যকে বুদ্ধদেব দীক্ষা প্রদান করিলেন। বর্ষাকালটি তিনি কয়েক বৎসর "মৃগদাব" নামক স্থানে বাস করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন এই

মৃগদাবের বর্তমান নাম সারনাথ। এখানে অশোকরাজা (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) ১২৮ ফিট উচ্চ একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মৃগদাব-সংলগ্ন জনপদের পূর্বনাম ছিল, "ঋষিপতনমৃগদাব" (ঋষিপত্তনমৃগদাব)। শঙ্করাচার্যকালে এই স্থানে হিন্দুরা সারঙ্গ-নাথের মন্দির স্থাপন করেন এবং তদবধি ইহার নাম সারঙ্গনাথ বা সারনাথ হইয়াছে। বুদ্ধদেবের শিষ্যসংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিল। অনোমা নদীর তীরে আনন্দ, দেবদত্ত অনিরুদ্ধ, ভদ্দোদন, অমৃতোদন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত হন ইহাদের অধিকাংশই কপিলবস্তুর রাজবংশজাত। কপিলবস্তুতে ফিরিয়া আসিয়া বুদ্ধ কয়েক দিন তথায় ছিলেন। এখানে রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার বাসের জন্য নগ্রোধ মঠ স্থাপন করেন, এই মঠ রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই মঠের ভগ্নাবশেষ শিবপুরের উত্তরে বরগদিয়া নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। বোধ হয় বরগদিয়া গদিয়া ও ন্যগ্রোধ একই সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন এখানে বুদ্ধপুত্র রাহুল তাঁহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া নিজের মতের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ঋষিপত্তনে তিনি শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ ও কৌণ্ডন্যকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন

বুদ্ধদেব বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে উপদেশ দিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে নরলীলা শেষ করিয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করেন ৪৮৩ খৃঃ পূঃ)। বৈশালীর নিকট বেলুব নামক স্থানে আসিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, মৃত্যু সন্নিহিত। এই স্থানে তিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দের সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন। রাজগৃহ হইতে গণ্ডকী নদীতীরে কুশীনগরে পৌঁছিয়া পাবা নামক স্থানে তিনি শিষ্য সহ চুন্দ নামক এক কর্মকারের আতিথ্য স্বীকার করেন তৎপ্রদত্ত শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া বুদ্ধ নিদারুণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন তথায় একটা যমক শালবৃক্ষ তলে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়।

বুদ্ধের সখা এবং শিষ্য শিষ্যদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, বিম্বিসার হইতে বুদ্ধ পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন।

যখন বুদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বুদ্ধত্বলাভপূর্বক রাজগৃহে ফিরিয়া আসেন—তখন বিম্বিসার তাঁহাকে আদরে অভিনন্দিত করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন —

"আজিস্যপূর্বং বিপুলং কুলং তে।
নবং বয়ো দীপ্তমিদং বপুশ্চ।
গাত্রং হি তে লোহিত-চন্দনার্হং
কষায়-সংবেষ্টনমেতৎ।
কথাদিদং তে মতিবক্রদেশে
ভৈক্ষাক এষাভিরতা ন বাচ্যা।
হন্তঃ প্রজা-পালন-যোগ্য এষ
ভোক্তুং ন চার্হং পরদত্তমন্নম্।"

আপনার সুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলের বিপুল কুল, নূতন বয়স, দীপ্তিমান দেহ, আপনার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিল কেন? রক্তচন্দনে শোভা পাইবার যোগ্য অঙ্গ কি কষায় বস্ত্রের উপযুক্ত? আপনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কেন? আপনার বিশাল ভূজ প্রজাগণের আশ্রয়-স্বরূপ হইবে, ইহা কি পরদত্ত অন্ন গ্রহণের যোগ্য?

এই প্রশ্নগুলি পড়িয়া রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের তৃতীয় সর্গে লক্ষ্মণের প্রতি হনুমানের উক্তি মনে পড়ে :—

আয়তাংশ্চ সুবৃত্তাংশ্চ বাহবঃ পরিঘোপমাঃ।
সর্বভূষণভূষার্হাঃ কিমর্থং ন বিভূষিতাঃ। ইত্যাদি

[আপনার পরিঘতুল্য] দুইবাহু আয়ত ও বৃত্তাকৃতি সুগোল), এই বাহু সমস্ত ভূষণ-ধারণের যোগ্য, অথচ আপনি ভূষণহীন কেন?]

কথিত আছে বুদ্ধদেব ত্রিশজন রাজাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন কাশ্যপ, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, অনিরুদ্ধ পূর্ণ, কাত্যায়ন, উপালি ও রাহুল—ইহারাই তাঁহার সর্বপ্রধানকার শিষ্য বুদ্ধের মাতামহের নাম অঞ্জন ছিল এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে বুদ্ধমাতা মায়াদেবীকে 'অঞ্জনা' বলা হইয়াছে।

মৌদ্গল্যায়ন।

বুদ্ধ ২৯ বৎসর বয়সে (৫৯৯ খৃঃ পূঃ) সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ছয় বৎসর তপস্যা সাধনের পর (৫৮৮ খৃঃ পূঃ) গয়াতে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি গয়ায় এক মাস একুশ দিন অবস্থান করেন, তৎপরে কাশীতে আগমনপূর্বক ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হন

বুদ্ধ যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা নূতন বলা যায় না হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র খুঁজিলে তাঁহার সকল মতের আদির সন্ধান মিলিবে। কামনা ত্যাগ, ইন্দ্রিয়ের প্রশমন, জন্মান্তর বাদ, অহিংসা, দুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত কথাই আমরা হিন্দু দর্শন ও মহাভারতাদি পুরাণে প্রাপ্ত হই। অতিশয় দুষ্কর তপস্যা এবং বিলাস উভয়ই পরিত্যাগপূর্বক মধ্যপথ অবলম্বনীয়,—এই নীতি বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন—এই মধ্যপথ মহাভারতও নির্দেশ করিয়াছেন। এরিষ্টটল গ্রীকদিগের মধ্যে এই মাধ্যমিক পন্থার উপদেশ দিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যে সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব ভিক্ষুদের যে আশ্রম ছিল তাহা পারিবারিক জীবনেরই অনুরূপ, শিশু কয়েক বৎসর মাত্র গুরুর আশ্রমে থাকিতে পারিতেন বুদ্ধের নির্দিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার সহজ উপায়—উহাতে সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্,—প্রজ্ঞাস্কন্ধ, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—সমাধিস্কন্ধ এবং সম্যক্ কর্ম্মান্ত ও সম্যক্ আজীব—শীলস্কন্ধের অন্তর্গত। এই অষ্ট মার্গ ছাড়া দশটি নিষেধ-বিধির উল্লেখ করা যাইতে পারে —

১ প্রাণাতিপাত—প্রাণহত্যা হইতে বিরতি
২। অদিন্নাদান—অন্যের ধন বা চুরি।
৩। কামেসুমিচ্ছাচার—মিথ্যা কামাচার।
৪। মুসাবাদ—মিথ্যা কথা বলা।
৫। পিসুনবাদ—ভেদ বাক্য।
৬। ফরুসবাদ—কর্কশ কথা বলা
৭। সম্পপ্পলাপ—নিরর্থক কথা বলা।
৮। অভিজ্ঝা—পরদ্রব্যে লোভ।
৯। ব্যাপাদ—মানসিক হিংসা।
১০। মিচ্ছাদিট্ঠি—বিপরীত জ্ঞান।

একথা সকলেই অবগত আছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা য়ুরোপে প্রবেশ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, আলিসুপের খৃষ্টীয় 'চার্চ্চ' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল জন নামক এক ধর্ম্মযাজক (John the Monk) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বুদ্ধের কাহিনী "বারলাম এবং যোসেফের" কথা বলিয়া য়ুরোপে প্রচলিত করেন। এই পরিবর্ত্তিত নামে খৃষ্টানেরা বুদ্ধকে তাঁহাদের একজন ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করেন। মহাকবি ডান্টে তাঁহার প্রসিদ্ধ "ডিভাইনা কমেডিয়া"তে বুদ্ধদেবের সম্পর্কে এইরূপভাবে সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন —"on uom nasce alla riva dell' Iuds, e quivi nechi ragiom de christo, nechi, leggn, nechi scriva e tuth suoi Voleried attribuoni Sono, quanto ragione umana vede Senza peccato in Vita o in Sermoni" (Paradiso, XIX 70-75) ইহার মর্ম্মার্থ এই—"তিনি সিন্ধুর উপকূলে জন্মিয়াছিলেন, যে দেশে কেহ কখনও খৃষ্টের কথা বলে না, তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না—তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্য এবং কাজ—মানবীয় যুক্তি অনুসারে শুদ্ধ। কাহাকেও তিনি বাক্যে ও কার্য্যে বাধা দেন নাই।"

ডাঃ কে ই নিউম্যান বুদ্ধের উল্লেখ-সূচক ডান্টের এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মারকো পোলো (Marco Polo) বুদ্ধ সম্বন্ধে এয়োদশ শতাব্দীতে (১২৯৮-১২৯৯ খৃঃ) লিখিয়াছেন "এই সাগোমনি (শাক্যমুনি) ভারতীয় লোকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, এবং প্রথম সাধু। ইনি একজন ধনশালী এবং পরাক্রান্ত রাজার পুত্র ছিলেন, কিন্তু জগতের মহত্ত্বলাভে সমস্ত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করেন।" তারপর বুদ্ধদেব কিরূপে তাঁহার পিতা কর্তৃক এক মনোরম নিভৃত গৃহে জগতের দৃষ্টির অন্তরালে সুরক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সহসা রাজপথে বাহির হইয়া এক স্খলিত দন্ত, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে ও একটি মৃত ব্যক্তির শব দেখিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, মার্কো পোলো তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি উপসংহারে লিখিয়াছেন, "যদি ইনি শুধু খৃষ্টধর্মের দীক্ষাটি পাইতেন, তবে ইনি জগতের একজন সর্বপ্রধান সাধু হইতে পারিতেন।" মার্কো পোলো ব্রাহ্মণদিগের নিরামিষ ভোজন ও বৈরাগ্যের নানা দৃষ্টান্ত দিয়া উলঙ্গ জৈন-সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ইহারা উলঙ্গ থাকেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে উত্তরে বলিয়া থাকেন—"আমরা জগতে কিছুই লইয়া আসি নাই—জগতের কোন জিনিষের উপর আমাদের দাবী নাই।"

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হুন দল, পাঠান ও মোগল, এক দেহে হ'ল লীন।"

—রবীন্দ্রনাথ

আর্য্য ও অনার্য্য সংমিশ্রণ

বেদের সময় হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই দেশে আর্য্য ও অনার্য্যের অবাধভাবে মিলন হইয়াছে। সেই সময় হইতেই একদল যজ্ঞের পক্ষে, অপর দল যজ্ঞের বিপক্ষে আর্য্যগণের মধ্যেও যজ্ঞবিরোধী ও ইন্দ্রের বিদ্রোহী লোকের অপ্রতুল ছিল না। যাহারা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন ও সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক অনার্য্য রাজা ছিলেন, তাঁহারা আর্য্যদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে আর্য্যগণের একদল ইন্দ্রের বিপক্ষ হইয়া অনার্য্য কোন কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। বেদের সময় হইতে আর্য্য-অনার্য্য মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই খিচুড়ীর মধ্যে ডাল-চাল বাছিয়া লওয়া সম্ভবপর নহে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ—চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় দেবশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধির মুখোস পরিয়া তাঁহাদের স্বরূপ বদলাইতে পারিবেন না। তাঁহাদের রক্তের রাসায়নিক পরীক্ষা হইলে কতরকম উপাদানই যে তাহাতে পাওয়া যাইবে তাহার অবধি করা যায় না।

ইন্দ্রের পক্ষ বিপক্ষ

মহারাষ্ট্র ভাষায় একটি প্রবাদ আছে নদী ঠৈ পাহ নয়ে মুচ্ছ অশি ঋষিচে পুত্রং নয়ে কুচ্ছ") "নদী এবং ঋষির আদি খুঁজিতে নাই।" ব্যাস ধীবর কন্যার সন্তান, পরাশরের মাতা ছিলেন চণ্ডাল কন্যা,—মহাভারত বনপর্ব্ব। বশিষ্ঠ বেশ্যাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (ভাণ্ডারকার —ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী, জানুয়ারী ১৯১১) এবং ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬০ এবং ৪৪ সূক্তের রচকদ্বয় ক্ষত্রিয় ছিলেন নাভানেদিষ্ট নামক বৈশ্যের দুই পুত্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন, হরিবংশ। ভারতবাসীদের মধ্যে শুধু আর্য্যে ও অনার্য্যে এবং আর্য্যদের নানা-শ্রেণীর মধ্যে প্রতিলোম এবং অনুলোম বিবাহ দ্বারা যে মিশ্রণ হইয়াছিল,—ইহাই শেষ নহে, যবন, হেফ্ত প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক যে আর্য্য সমাজে প্রচুর সংখ্যায় মিশিয়া গিয়াছিল

তাহা ত আর ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরির এক প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১৯১১, জানুয়ারী সংখ্যা)। বৌদ্ধধর্মের আমলে মধ্যএশীয় লোক এতদ্দেশে আসিয়া নাম পরিবর্তনপূর্ব্বক বৌদ্ধসমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ যবনরাজ মিনেণ্ডার নাগসেন কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর ভারতবর্ষে এতটা জন-প্রিয় হইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের সাতটি সমৃদ্ধ নগরী তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় চিতাভস্মের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, এই প্রবাদটি মুটার্ক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন *। শকরাজরা বিদেশাগত, তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম এবং কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিপুল ভারতীয় জনসমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। বহু যবন গ্রীক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানের কথা নানা স্থানের প্রস্তর-লিপিতে পাওয়া যাইতেছে—গ্রীক দেশেরেরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ বিষ্ণু-মন্দির অথবা গরুড়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। শকরাজ ক্ষহরাতের ব্রাহ্মণদিগকে তিন হাজার গাভী দিয়াছিলেন এবং প্রভাসে আটজন ব্রাহ্মণের বিবাহ দেওয়াইয়া সে কথা তাম্রলিপিতে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতেন। যাদুবংশীয় নাহক এক শক ক্ষত্রপ আয়ুর্ব্বেদ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এই শক রাজগণের আদিপুরুষেরা বিজাতীয় ছিলেন, তাঁহাদের নামেই তাহার পরিচয়, যথা 'স্পেলি-রিসেস' 'আজেস্' 'মোয়েস্'। তাঁহারা পশ্চিম হইতে শাসনকর্ত্তা পাঠাইয়া এক কালে তক্ষশিলা, কাবুলের মালব এবং সাক্ষিণাত্যা পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। তাঁহাদের রাজারা হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 'স্পেলোহোরস,' স্পেলোগেডামস' প্রভৃতি রাজারা "ধার্ম্মিকা" উপাধি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মুদ্রার একদিক চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এই সকল রাজাদের কেহ কেহ হিন্দু হইয়া স্বকীয় মুদ্রা হিন্দু-লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। আভীরগণ এক সময় আর্য্যসমাজ-বহির্ভূত ও হিন্দুদের অন্য ছিলেন, তাঁহারা শেষে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু নামে পরিচিত হইয়া বিশাল হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এখন সিন্ধুনদীর তীর হইতে ব্রহ্মদেশ এবং পাকিণাত্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। আভীর-লেখমালায় ১৮০ পৃঃ, এই বিষয় উল্লিখিত আছে।

যবন, শক ও পল্লব প্রভৃতি জাতির এদেশে আগমন প্রসঙ্গে।

অনার্য্য দাসগণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের এক স্তোত্রে লিখিত আছে—"আমাদিগের চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণত্বগ্জাতি আছে,—তাহারা যজ্ঞ করে না, তাহারা কিছু মানে না—তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন রকমের। হে ইন্দ্র! তুমি ইহাদিগকে বিনাশ কর।" কথিত আছে ইন্দ্র দাসরাজ সম্বরের এক শত সংখ্যক প্রস্তর-নির্ম্মিত নগরী ধ্বংস করেন। এই নামক

* এইরূপ সপ্ত নগরীর দাবী সম্বন্ধে হোমরের একটি শ্লোক আছে

"Seven wealthy cities claim for Homer dead,
Through which the living Homer begged his bread

এক অনার্য্যরাজা ইন্দ্রের অন্যতম সুহৃৎ ছিলেন। অপর এক দাস-রাজা—নমুচি—ইন্দ্রের সঙ্গে বহু বিরোধ করিয়াছিলেন। আর্য্যবংশীয় অগ্নি এবং চিত্ররথ যজ্ঞ করিতেন না, তাঁহারা ইন্দ্রকে মানিতেন না, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করেন। বস্তুতঃ সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে, পুরাকালে যুদ্ধ-বিগ্রহগুলি আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধ নহে,—ইন্দ্রপক্ষীয় যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের সঙ্গে ইন্দ্রের বিপক্ষ যজ্ঞ-বিরোধীদের যুদ্ধ—উভয় দলেই আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন।

বেদোক্ত পণিজাতি ফিনিশিয়ান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বিরোধী ও যজ্ঞের অনিষ্টকারী ছিলেন। ইন্দ্র সরমাকে পাঠাইয়া তাঁহার বলবীর্য্যের বর্ণনা ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পণিদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"আমরা ইন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিব না, আমরাও যুদ্ধ করিতে জানি।"

পণিজাতি।

এই পণিরা অতি বিপুল ভাবে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহারা মাংসাশী ছিলেন না, গরু-সেবা এবং গোজাতির রক্ষা করিয়া গোদুগ্ধ হইতে মাখন, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি উৎপন্ন করিতেন। ফিনিশিয়ান স্বর্গীয় এ. সি. সেন মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইন্দ্র পণিদিগের নিকট পাঁচ প্রকার পণ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন—ছানা, মাখন, ঘি, দধি ও ক্ষীর। তথাপি ইন্দ্র কতবার যে ইহাদের নিকট হইতে গরু অপহরণ করিয়া হত্যা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। যজ্ঞে অসংখ্য জীবহত্যা হইত এবং যজ্ঞকারিগণ প্রচুর পরিমাণে মদ্য (সোমরস) পানপূর্ব্বক উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন,—পণিরা এই সমস্ত আচারের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞক্রিয়ায় ঋত্বিগদিগের প্রাপ্যের মাত্রা বেশ ছিল। তাঁহারা ঐ উপলক্ষে ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা করিয়া বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইতেন, বশিষ্ঠ কোন এক যজ্ঞ উপলক্ষে ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা করিয়া কুশমণ্ড হইতে চারি হাজার গাভী, একখানি সুন্দর বাড়ী এবং একটি উজ্জ্বল স্বর্ণকলসী পাইয়াছিলেন, সুতরাং ঋষি ও তদংশীয়েরা যে যজ্ঞের বিশেষরূপ পক্ষপাতী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই সকল যজ্ঞ ও উৎসবে সর্ব্বদা পশুহত্যা হইত। ঋগ্বেদে লিখিত আছে, বৃত্রবধ করিয়া ইন্দ্র যে বিপুল উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তিন শত মহিষ মারিয়াছিলেন। সেকালে ভারতবর্ষ সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদ-সংকুল ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সুতরাং এই জঙ্গল পরিষ্কার করা ও পশুহত্যাপূর্ব্বক জন নিবাসের প্রসার বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া যদি কোন স্থানে সুবৃহৎ বৃক্ষসমূহ দাহ করা হয়, তবে উদ্ভূত জলীয় ধূমে আকাশে মেঘোৎপত্তি হইতে পারে,—এজন্য অনাবৃষ্টি নিবারণও রাজারা মেঘ-কামনায় সময়ে সময়ে যজ্ঞ করিতেন।

আর্য্যগণের নির্ম্মম পশুহত্যা ও যজ্ঞের বীভৎসতা তৎবিরোধী পশুপালক পণি ও অপরাপর জাতীয় লোকেরা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত ও বিমর্ষ হইতেন। এই পশুহত্যার

বিরোধী দল জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ সংখ্যায় প্রবল হইয়া ক্রমে নিবাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। মহাভারতের সময় জনমত অনেকটা পশুহত্যার বিরোধী হইয়াছিল।

মহাভারতকার পশুহত্যার বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিয়াছেন আমরা তাহা পূর্বের এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মহাভারত মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবান্বিত। জীবহত্যার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়া ব্যাস জনমতের প্রবলতা স্বীকার করিয়াছেন মাত্র, অথচ জীবহত্যার পক্ষে এতগুলি রক্ষা-কবচের বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাহাতে পশুহিংসার নিবৃত্তি হয় নাই। বঙ্গদেশের সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, উহাকে টানিলে সেরূপ মাথাটা চলিয়া আসিতে বাধ্য, সেইরূপ বাঙ্গলার কথা প্রসঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের উল্লেখ মাঝে মাঝে অপরিহার্য।

ব্রাহ্মণ্য ও জনমত।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা পাইতেছি যে অতিকাল হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জনমতের মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কোনও সময় গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা বৈদিক আচার ও যাগযজ্ঞ চালাইতেছেন, কখনও বা বৌদ্ধ, জৈন বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের আচারে অহিংসা মূলক জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুগের বহু আচার-বিচার এবং কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের করতলগত ক্ষমতার লীলা একদিকে, অপর দিকে প্রাচীন যাগযজ্ঞের ধূমের কটু গন্ধ দূর করিয়া মুক্ত আকাশের আলো ও বায়ু আনিবার পালা—এই দুই প্রবাহ ভারতের সর্বত্র যুগে যুগে কর্মমুখরিত করিয়াছে।

আমরা আরও দেখাইয়াছি বাঙ্গলার ভিন্ন—রক্তের বিমিশ্রণ—কতটা, অসার সেই পুরাকাল হইতে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়ীয় নিগ্রো-আল্পো ও অন্যান্য—ভারতীয় সমাজ গঠন করিয়াছে।

রক্তধারা।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা যাইতে পারে—কিন্তু রক্তের বিশুদ্ধত্ব একটা অলীক স্বপ্ন মাত্র। যাঁহারা যাঁহাদের মধ্যে যত বেশী, তাঁহারা তাহা তত বেশী। সুকুমার প্রাচ্যবিদ্ মহামহোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার তাবৎ ইতিহাসের বিরাট গ্রন্থে বঙ্গীয় কুলীন সমাজের যে বীভৎস চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেও ঘৃণা হয়। মুসলমান সম্রাটগণ বহুস্থানে বেগমকে অবরোধে আটকাইয়া—নিজেদের ছোট ছোট শিশুর অঙ্গ বিকৃতি ঘটাইয়া খোজাবাহিনী সৃষ্টিপূর্বক এবং সঙ্গিন পাহারার ব্যবস্থা করিয়া, স্বভাবের গতি রোধ করিতে পারেন নাই। আর দুর্বৃত্তায়ন পল্লীতে স্বামী হইতে সমাজ বিচ্ছিন্ন শতশত ধর্মপত্নী শুধু পরের বশ শুনিয়া নিরস্ত থাকিবেন, এ প্রত্যাশাই বা কে করিতে পারে? বাঙ্গলার এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন মেলের পঙ্‌ক্তিদুষ্ক কুলীনদিগের কুল কলঙ্ক-লাঞ্ছিত, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মণপ্রভাব সম্প্রতি যত বেশীই হউক না কেন, একদিন এমন ছিল যে, উত্তর-পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদিগকে ধিক্কার করিতেন, এমনকি তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি রক্ষা করিতে নারাজ। অথচ উত্তর-পশ্চিমের ব্রাহ্মণদিগের নিজেদের কলঙ্কের সীমা নাই। অধ্যাত্মভাগে

ভাণ্ডারকরের যে পরস্কর বিবাহ উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও স্পষ্ট দেখা যায় তখনকার ব্রাহ্মণেরাও মিশ্রজাতি। এই মিশ্রজাতি আমাদের প্রদেশের ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ আমরা চক্ষে দেখেন, তাহাতে দুঃখ নাইবে, প্রদেশের ব্রাহ্মণ অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুর সঙ্গে এক সময়ে এরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা শক্ত হইয়াছিল, এজন্য কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল এখন যে ১২ ১২ লক্ষ ব্রাহ্মণ বঙ্গে দম্ভসহকারে শিখা উত্তোলন করিয়া আছেন তাঁহারা কি পাঁচটি মাত্র ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন? ইহা অসম্ভব. এই বাঙ্গলা দেশেই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহারা অবাধে মিশিয়া গিয়াছেন মাথার খুলি পরীক্ষা করিয়া টিবেটো-বর্ম্মণ, দ্রাবিড়, তামিলী প্রভৃতি কত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যে এই দেশের নানা শ্রেণীরই সম্পর্ক অবধারিত হইবে তাহা বলা যায় না অম্বট্ঠসুত্তে পালি অম্বট্ঠসুত্ত) বুদ্ধদেবের মুখে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, এক সময়ে ক্ষত্রিয় জাতিই সমাজে প্রধান ছিলেন ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদা সমাজে হীনতর ছিল পরশুরামের সময় ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্বই ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিতেন এইজন্য "নবলং ক্ষত্রিয়ন্তু, ব্রাহ্মণেয় বলং বলং" এই গুজবাণী ঘোষণা করিয়া পরশুরাম প্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ঐতরেয়গুলির কুলজাত পাঠ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নানারূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে সুতরাং শুধু বেদ, উপনিষদ, শিখা, উপবীত ও উপাধি দেখাইয়া আপনাদিগকে "কুলেষ" বলিয়া প্রচার করা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তর্পণ করা বিড়ম্বনা মাত্র আমরা তাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত করিয়া অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, পবিত্র দেব মন্দিরে—যেখানে ভগবান্ সর্ব্বজনের শিক্ষা, সর্ব্বজনের মাতা সর্ব্বজনের পিতামহ। পিতাহং সর্ব্বজগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। একমাত্র আরাধ্য,—সেই পিতৃনাথ ও পিতামহদেবের অন্ন যাইবার প্রবেশদ্বারে যাঁড়া পাহারা বসাইয়া ব্রাহ্মণ-বিশ্বামিত্রের সন্তানগণকে তাঁহার উপাস্য মন্দিরের দ্বারে ঠেকাইয়া রাখিয়াছি—তাহাদিগের প্রতি এই আচরণ ইতিহাস সমর্থন করে না এই আচারের অনুরোধে আমরা অখণ্ড হেলেনিক জাতি খণ্ড খণ্ড করিয়া সমস্ত জাতিকে নির্ব্বীর্য্য ও বলহীন করিয়া ফেলিয়াছি বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক নিম্ন জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট আর্য্যলক্ষণাক্রান্ত নরনারীর অভাব নাই অথচ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকদিগের মধ্যে অতি দুর্লক্ষণ অনার্য্যমুখও আমরা দেখিতে পাই—উপবীত, তিলক, কণ্ঠী বা অন্য কোন ছাপে সেই অনার্য্যতা ঢাকা পড়ে না

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার "নেপালের বৌদ্ধ সাহিত্য" নামক সন্দর্ভে একটি সুপ্রাচীন গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, আদিকালে ত্রিশঙ্কুর নামক এক চণ্ডাল উত্তর-ভারতে শার্দ্দিলকর্ণ নামক তাহার পুত্রসহ বাস করিত। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিফলে ইহারা বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিল। ত্রিশঙ্কুর একটি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের স্পর্দ্ধায় ক্রোধান্বিত হইলে চণ্ডাল তাঁহাকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিল —

"সোণাতে আর ছাইতে খুব একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণে আর অপর জাতির লোকের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য ত নাই। কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন জন্মে, ব্রাহ্মণ তেমন কোনও কাণ্ড হইতে ত জন্মে না, আকাশ হইতে পড়ে না, ভূঁই ফুঁড়িয়া উঠে না। ঠিক চণ্ডালের মতই ব্রাহ্মণও মায়ের পেট হইতে পড়ে যখন মরে তখন অন্য জাতির মত তাহার শবও অশুচি হয়, এ বিষয়ে কোন ভেদ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণেরা মাংস খাওয়ার লোভে অম্লানবদনে নিষ্ঠুর যজ্ঞ করে তাহারা বলে—ছাগল ইত্যাদি পশুকে মন্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া যজ্ঞে বধ করিলে স্বর্গে যায়। যদি স্বর্গে যাওয়ার পথ ইহাই হয়, তবে তাহাদের বাপ মা ভগিনীদিগকে কেন সেই উত্তম পথেই স্বর্গে পাঠাইয়া দেয় না? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ সকল নামে মাত্র, এগুলিতে কোনও বিশেষ ভেদ বুঝায় না, সমস্ত মানুষেরই পা, উরু, নখ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গগুলি ঠিকই এক রকম, কোনও কিছুতে এতটুকুও ভেদ নাই। সেজন্য চারিটা আলাদা আলাদা শ্রেণী থাকিতে পারে না। ছেলেরা পথে খেলিতে খেলিতে খানিকটা ধূলা জড় করিয়া উহাকে ভাগ ভাগ করিয়া রাখিয়া বলে এই রহিল জল, এই দুধ, এই দই, এই মাংস, এই ঘি ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া ধূলিরাশি এই সকল জিনিষের কোনও একটাও হয় না তেমনি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কতকগুলি নাম মাত্র, উহারা বিভিন্ন জিনিষ নয়। জন্তুদের মধ্যে—গরু, ঘোড়া ইত্যাদির মধ্যে আকৃতির ভেদ আছে সেই জন্য গরু একটা জাতি, ঘোড়া আর একটা জাতি এবং আর আর জন্তু আর এক এক জাতি। তেমনি আম জাম, খেজুর ইত্যাদিও বিভিন্ন জাতের। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে কোনও আকারের পার্থক্য না থাকায় উহারা ভিন্ন জাতের হইতে পারে না বলা হয় যে, ব্রাহ্মণেরা দেবতা হয়, ক্ষত্রিয়েরা হয় যক্ষ, বৈশ্যেরা হয় নাগ ও শূদ্রেরা হয় অসুর। যদি তাই হইত, যদি শ্রুতির এই কথা সত্য হইত যে ব্রাহ্মণ হইতেই ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য হইতেই বৈশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য বিশেষ কোনও চিহ্ন থাকিত। চারিটা বর্ণের সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম করে স্বর্গলাভ করিতে পারে, জাতি-বিশেষের কোনই বাধা সে বিষয়ে নাই সেই জন্য জাতিগত কোনও বিশেষ ভেদও নিশ্চয়ই নাই। মানুষের মধ্যে যাহারা জমি চষে, বীজ বোনে, শস্য জন্মায় তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলে। যাহারা বিবাহ না করিয়া বনে গিয়া ঘাস-পাতার ঘর বানাইয়া যাগে দিন কাটায় তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাহারা গ্রামে থাকে ও মন্ত্র শিক্ষা দেয়, তাহাদিগকে অধ্যাপক বলে যাহারা লাভের আশায় এটা-সেটা কাজ করে তাহাদিগকে শূদ্র বলে। যাহারা রথ বা হাতী চালনার কাজ লয় তাহাদিগকে মাহুতী বলে। যাহারা চাষ করে তাহাদের নাম চাষা যাহারা বাণিজ্য করে তাহাদের নাম বণিক্ যাহারা গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লয় তাহাদিগকে পরিব্রাজক বলে যাহারা সৎ আচরণ-দ্বারা প্রজা রঞ্জন করে তাহাদিগকে বলে রাজা ইহাদের কোনটাতেই জন্মগত বিশেষত্ব নাই।" ইং হরিজন, ৩০ সংখ্যা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লিখিত এই বিষয়টি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হরিজন পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যা ১৩৪০ সনের ২৯শে ভাদ্রের

বঙ্গবাসী তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন আমি সেই অনুবাদ অবলম্বনে ইহা এখানে লিখিলাম।

বৌদ্ধযুগের আদি সময়ে এবং তৎপূর্ব্বের হিন্দু সমাজে জাতি-ভেদ অনেক পরিমাণে শিথিল ছিল, নতুবা চণ্ডালের পক্ষে ব্রাহ্মণের নিকট এবম্বিধ প্রস্তাব করা কখনই সম্ভবপর হইত না জাতি-ভেদের এরূপ কড়াকড়ি ও শক্ত আইন-কানুন বঙ্গদেশে বিগত ৫।৬ শতাব্দীর মধ্যে হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের সেই সকল গোঁড়ামি সত্ত্বেও তান্ত্রিকগণ ও সহজিয়ারা জাতি-ভেদের বন্ধন শিথিল করিয়া সেই সমাজের খিড়কির দরজা অনেকটা মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সর্ব্বজাতির মিলন ঘটিতে পারিত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামায়ণ, সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতিবাদ

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অহিংসনীতির জয় ঘোষণা করিয়াছে জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া পশি বা বণিক্-সম্প্রদায়, এই অহিংসনীতিকে সংরক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল বুদ্ধ গার্হস্থ্য আশ্রমকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমকে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে আর্য্য-সমাজ বিশেষ ঠাঁই পাইয়াছিলেন। ঋষির আশ্রম অন্যরূপ ছিল, সেখানে বেদবেদান্তের চর্চ্চা হইত, কিন্তু দারাপুত্র ও শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত ঋষির ধর্ম্ম—সংসারের ধর্ম্ম ছিল, তাহাতে গো-সেবা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থের সমস্ত কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে নানাভাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল পালি সামণ্ণ ফলসুত্ত-পুস্তকে তাহাদের কথা আছে। ষড়্দর্শনকারেরা এইরূপ সম্প্রদায়গুলির কোন-কোনটির মতের পরিচালনা করিয়াছিলেন

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শিক্ষা-যাত্রার আতঙ্ক।

রাজপুত্র মহাবীর ও রাজপুত্র বুদ্ধ ভিক্ষু হইয়া দুই মহৎ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। দলে দলে উচ্চকুলের যুবকেরা গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন ভিক্ষু-ধর্ম্মের উপর জনসাধারণের একটা ভীতির ভাব সঞ্চারিত হইল। কন্দর্প-সমান রূপ, অটুট নবযৌবন উজ্জ্বল প্রতিভাশালী রাজকুল-সম্ভূত তরুণেরা এমন কি তরুণীগণও রাজপ্রাসাদ ও রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বোদ্ধসঙ্ঘে নাম লিখাইতে লাগিলেন আসমুদ্র-হিমাচলবাসী ভারতীয় শিক্ষাযাত্রার প্রমাদ গণিলেন। এই সার্ব্বজনীন আতঙ্ক ও ত্রাসের ভাব আমরা

আমাদের শিক্ষকালের প্রসঙ্গ করিয়াছি আমাদের ম ও দিদিমারা আমাদিগকে পাড়াহীন কালড় পরিতে ও কুশাসনে বসিতে দিতেন না ইহা সেই বহুযুগ পূর্বের সার্বজনীন সন্ন্যাসেচ্ছার হইতে উৎপন্ন আচার

হিন্দু সমাজ ভিক্ষুধর্মের দ্বা সৃষ্টি হইয়াছে—একখানি গ্রন্থের বলে সেই গ্রন্থের তুল্য প্রিয় গ্রন্থ হিন্দুর আর একখানিও নাই টীকা রামায়ণ। গ্রন্থখানি এই সত্য প্রচার করিল যে, ধর্ম মোক্ষ, ইহকাল, পরকাল এই সমস্ত লক্ষ্যের সন্ধানই নিজ পরিবারের গণ্ডীতেই পাইবে পারিবারিক জীবনই সর্বাঙ্গ সাধুর শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য এই পারিবারিক জীবন তুমি নিজে গঠন কর নাই উহা ভগবানের দান, তুমি যত কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না তোমার পারিবারিক দায়িত্ব অপরিহার্য।

ভিক্ষুধর্মের বিরুদ্ধবাদ।

তুমি কি পিতৃমাতৃ সেবা কর—তাঁহাদের আজ্ঞা পালন কর তবে তোমার মোক্ষলাভ হইবে তুচ্ছ সাক্ষাৎ ভগবানের প্রত্যক্ষ পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া বনে যাইবে কে কি লিখিবে?

গাইস্থ্য আশ্রম

তুলসীতরু সমন্বিত মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া সেওড়াগাছের সেবা করিতে বনে যাইব কেন? একমাত্র পিতৃসত্য পালন করার জন্য রাম ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ এবং তাঁহার ছত্রধারী হইলেও মোক্ষলাভ হইতে পারে কেহ তাহার সঙ্গে যদি কখনের অপেক্ষা রয়, তবে কনিষ্ঠ তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইলেই মানব জীবন চরিতার্থ হইবে। লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে আদর্শভ্রাতৃত্বের মহত্ত্বের দেখাইয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃভক্তির তুলনায় তিনি সমুদ্র জলে ডুবাইয়া দিয়া ছোট হইয়া রামের ছত্রধারী হইয়াছিলেন ভরত রাজ্যে থাকিয়াও ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শ দেখাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন সীতা পাতিব্রত্যের মূর্তিমতী প্রতিমা, কৌশল্যা বা সত্যের প্রতীক। পরিবার বলিতে শুধু ইহারাই নহেন, দাসদাসীরাও পরিবারের জন। হনুমান্ ভক্তভক্তিকে অতি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ সখ্যভাবের আদর্শ কিরূপ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন

রামায়ণ বলিতেছেন পরিবারের গণ্ডীই ধর্মের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র এই পারিবারিক ধর্মের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে, ভিক্ষুধর্মের কঠোর পথ পরিহার করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন

রামায়ণ কী?

উপভোগ করিবার জন্য পারিবারিক ধর্ম পরিকল্পিত হয় নাই মুণ্ডিতশির হইয়া উপবাস ও ব্রহ্মচারি পালনপূর্বক ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হওয়া অপেক্ষা গৃহের জীবন্ত দেবতাদের সেবা উৎকৃষ্ট, ইহাই রামায়ণের প্রতিপাদ্য এই পারিবারিক ক্ষেত্র তপস্যারই ক্ষেত্র, ইহা অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও অবিমিশ্র সুখভোগের পথ নহে। কোন্ জটিল সন্ন্যাসী পিতৃভক্তিতে তরুণ রামসন্ন্যাসীর মত দুষ্কর ব্রত পালন করিয়াছে? জটাবল্কলধারী, কঠিন, পাংশু-বিবর্ণ, পাদুকার উপর ছত্রধারী, রাজর্ষি ভরত ভ্রাতৃভক্তির যে আদর্শ দেখাইয়াছেন—সেই অতুল ব্রহ্মচর্য ও তপস্যার সমতুল তপস্যা কোন্ ভিক্ষু কবে দেখাইয়াছে? কে লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃস্নেহে আহার-নিদ্রা বিসর্জন দিয়া সংযমের

পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছে বা সীতার ন্যায় আজীবন পতিব্রতার ব্রত পালন করিয়া অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে? কে কবে নিজীবনের মত সাংসারিক সকলের সংহার প্রত্যক্ষ করিয়াও সন্ন্যাসাশ্রম হয় নাই? এই সকল চরিত্রের প্রত্যেকটি একটি বিশাল পটের ন্যায় ইহারা বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুর জীবন্ত প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদ তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যের লৌহশলাকা-দ্বারা লিখিত হয় নাই, সুন্দর চিত্রপটক্ষেত্রে অনুরাগের সুরঞ্জিত-অক্ষরে লিখিত হইয়াছে এই সব বিচার, তর্ক, নীতি-জ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রভৃতি উৎকট উপাদানজাত নহে ইহা গঙ্গাতরঙ্গের মত সহজ স্নেহমমতার সুবিমল বিন্দুকের উৎস হইতে স্বভাবসঙ্গীত প্রীতি, ভক্তি ও অনুরাগের কল্পনার বিন্দু চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া লীলাচঞ্চল গতিতে ছুটিয়াছে। জীবন মরুভূমিতে ইহা অমৃতের সন্ধান দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যেরূপ নেংড়া আমের বীজটি যেখানে পুঁতিবে, সেইখান হইতেই ইহা তাহার অপূর্ব্ব সুরভি ও অতুল রসাস্বাদের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিবে—সেইরূপ ভগবান যেখানে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন—তোমার মনুষ্যত্বসিদ্ধির পথও সেইখানে গড়িয়া দিয়াছেন—তুমি বাহিরের আঁকাবাঁকা অনিশ্চিত পথ খুঁজিতে বনে যাইবে কেন?

বৌদ্ধধর্ম্মের পর এই রামায়ণী নীতি ভারতের সমস্ত বিরুদ্ধভাব প্রোজ্জিত করিয়া ভারতীয় সমাজকে যে অপূর্ব্ব শান্তির আশ্রয় দিয়াছিল, এখনও যে এক পরিবারে বহুসংখ্যক লোক আদরে সোহাগে, সদ্ভাব ও ত্যাগের মহিমায় গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা এই একখানি মহাগ্রন্থের শিক্ষার প্রভাবে কিন্তু বাঙ্গলাদেশে উহার শক্তি হ্রাস হইতেছে, রামায়ণী শিক্ষা বুঝি এদেশ হইতে তিরোহিত হয়। কিন্তু এক সময়ে ইহা অত্যুজ্জ্বল ছিল, তাহা আমরা শৈশবে দেখিয়াছি ঠাঁই নাম শতাব্দীতে আজমীঢ়ের রাজপুত্র সারঙ্গদেবকে—বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তরাগী জানিয়া তদানীন্তন রাজা বিশালদেব নানা উপদেশ দিয়া কুমারকে শেষ করিয়াছিলেন—

"ইহ নষ্টজ্ঞান জ্ঞান শুনিবেক কাণ।
পুরুষোত্তম ভজে কিরীটান॥
পরমোদ্ধ ভজ মোক্ষ পুরাণ।
রামায়ণ শুনহ ভারত নিদান॥"—চারুধারা।

মহাভারত ভারতীয় নানাধর্ম্ম নানামত, যুগধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম এক বিশাল চিত্রপটে আঁকিয়া দেখাইতেছে ইহাতে যেরূপ পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও সামঞ্জস্য আছে, তেমনই উহার বিরোধ ও বিয়োগ দৃষ্ট হয় ইহাতে দান, ধ্যান, তপ, সামাজিক কর্ম্মকাণ্ড সকলই একস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি চরিত্রে সতীধর্ম্মের আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে, অপরদিকে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতাগুলি জ্বলন্ত অক্ষরের সহিত নারদ-পঞ্চচূড়া-সংবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে একদিকে সৌভ্রাত্র, অপরদিকে জ্ঞাতিবিরোধ,—একদিকে

হচাগ্র ভূমির জন্য জীবনপণ যুদ্ধ, অপরদিকে স্বীয় দেহের মাংস কাটিয়া পক্ষীকে প্রদান—এই ভাবের বিকৃত আদর্শ মহাভারতের নানা অঙ্গ কটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র দুর্বলতার চিত্র এত অধিক অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে যাহাতে মনে হয় কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী বিশুদ্ধ ধর্মে মানুষকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই রমণীচরিত্রে ঐরূপ বীভৎসতা দেখান হইয়াছে একথা আমরা একবার উল্লেখ করিয়াছি

মহাভারতে সংসার ও সন্ন্যাস এই দুই আদর্শের প্রতিপোষক কথাই পাওয়া যায় কিন্তু রামায়ণের লক্ষ্য এক, উহাতে কোন জটিলতা নাই, উহা পারিবারিক জীবনের আদর্শমূলক কাব্য একটিমাত্র আদর্শ উহাতে স্পষ্ট হইতে তাহা সূত্র বা অনুশাসনরূপে উপস্থিত করা হয় নাই, কাব্যাকারে পারিবারিক জীবনকে লোভনীয় ও উজ্জ্বল করিয়া দেখান হইয়াছে।

মহাভারত যুগে যুগে ভক্তপরম্পরাক্রিত বিকৃত বক্ষের ন্যায় নানারূপ ধর্মমত দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। উহাকে একখানি আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না পৃথিবী খনন করিলে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিচিত্র মৃত্তিকার উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বিপুল গ্রন্থে সেইরূপ নানা যুগের স্মৃতি ও ধর্মমতের নিদর্শন পাওয়া যায়

রামায়ণী নীতির প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার চক্রবাল অন্তরিক্ষ প্রভার দীপ্তি দেখাইয়া বিলীন হইতেছে, ইহা সত্য সত্যই পরিতাপের বিষয় অথবা ইহা সভ্যতার অপর কোন উন্নততর পথার রহস্য—কোন নব আদর্শের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে—তাহা কে জানিবে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জৈন ধর্ম্ম

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ-শিষ্য শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব ও মহাবীর উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বৃহৎ বঙ্গে—মগধ ও পাটনায়। জৈন ইতিহাস-অনুসারে মহাবীর বহুকাল রাঢ়দেশে স্বকীয় ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবি-রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যৌবন কালেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং ৪০ বৎসর বয়সে বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মিথিলার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার মাতৃকুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল এবং

মহাবীর (৫৪০ খৃ. পূ. —৪৭৭ খৃ. পূ.)

এই সূত্রে তিনি বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজসভায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ৪২৭ খৃঃ পূর্বে তাঁহার নির্বাণ ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কিন্তু ঐ সময় স্বীকার করিয়া লইলে অজাতশত্রুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ও যাবতীয় প্রস্তর-লিপির কথিত বৃত্তান্তের সহিত তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য করিতে কতকটা কষ্ট-কল্পনা করিয়া করিতে হয়। এজন্য অধ্যাপক জেকবি ৪৭৭ খৃঃ পূঃ বীর-নির্বাণের সময় ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা হইলে ৫৪৯ খৃঃ পূঃ তাঁহার জন্মকাল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধ ৫৬৩ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪৮৩ খৃঃ পূঃ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার নির্বাণ লাভ হয়। জৈন ধর্ম-প্রবর্তক মহাবীর তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে জেকবি, হিয়েট্ স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের কথিত তারিখ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

বুদ্ধের মত ও মহাবীরের প্রচারিত মতের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়েই জীবহত্যার বিরোধী ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতিবাদী ছিলেন। উভয়েই হিন্দুর বর্ণাশ্রম কতকাংশে মানিয়া লইয়াছিলেন এবং হিন্দু দেবতা স্বীকার করিতেন। এইজন্য কেহ কেহ জৈন ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের শাখা-স্বরূপ অনুমান করিতেন কিন্তু এখনকার গবেষণায় উভয় ধর্মের পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে এবং জৈন ধর্ম যে বুদ্ধের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল তাহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পার্থক্য

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম একই সময়ের উপর দাঁড়াইয়া একই সূত্র প্রচার করিয়াছে। মহাবীরও বুদ্ধের ন্যায় নিজে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যতি-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, জৈন ধর্ম সংযম ও কঠোরতার বেষ্টনকে বড় ছাড়ে নাই। তথাপি বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচার হইল কেন? কি কারণে তাহা জগতের এক-তৃতীয় অংশে গ্রাস করিয়া এখনও প্রচারকার্যে সচেষ্ট এবং জৈন ধর্ম ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকিয়া শুধু নিজের আচার-ব্যবহার নিয়েই ব্যস্ত রহিয়াছে?

ঐতিহাসিকেরা বলেন জৈন ধর্ম, হিন্দু ধর্মের কোন দর্শনের উপর বেশী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ভারতের সঙ্গে অধিকতর অন্তরঙ্গ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ও বিদেশীর প্রবেশ-পথ কতকটা অন্তরায়পূর্ণ করিয়াছে। জৈনেরা বিশ্বাস করেন প্রত্যেক তরুলতারও আত্মা আছে। তাঁহারা জীবের দুঃখ কষ্টের প্রতি এত মমতাশীল ও সদয়, যে একটি গাছের পত্রপল্লব ছিঁড়িতেও কুণ্ঠবোধ করেন, পাছে তাহাদের আত্মা কষ্ট পায়। তাঁহাদের একদল ধিরে ময়ূরপুচ্ছ লইয়া রাজপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সরাইয়া পথ পর্যটন করেন, পাছে কোন জীব পদপীড়নে বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিজের শরীরের রক্তদ্বারা মশক ও ছারপোকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ধর্মের অঙ্গীভূত মনে করেন এবং শ্বেতাম্বরকেরও কোন কোন জৈনধর্মাবলম্বী নিত্য শকরা প্রদান করিয়া "হাঁপরে দয়া" সূত্রের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সাধারণতঃ কাব্য-নাটকে ইহারা 'নিগ্রন্থ' নামে পরিচিত।

এইভাবের দয়ার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা আতিশয্য আছে, যাহাতে হিন্দুস্থানের গণ্ডী পার হইয়া এই ধর্ম দেশান্তরে গৃহীত হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া বৌদ্ধদের সঙ্ঘ

একটা বস্তু বড় অস্ত্র, এই অস্ত্র-দ্বারা বৌদ্ধগণ জগজ্জয় করিয়াছিলেন, এই সঙ্ঘের উন্মুক্ত তোরণে দেশান্তর হইতে সমাগত লোকেরা আসিয়া ভগবান্ বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লইতে পারিয়াছিলেন বিশ্বের সঙ্গে এই ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার দরুন বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ-দ্বার অবারিত হইয়াছিল, জৈন ধর্ম নানারূপ কঠোরতা ও বিধি-ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুস্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের আগন্তুকগণকে তাঁহাদের পঙ্‌ক্তিতে আনিতে পারে নাই। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দুস্থান হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইয়া দেশ-দেশান্তরে অভিযান করিতেছিল, তখন জৈন ধর্ম যেন জন্মস্থানকে অধিকতর জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের বুকোসত হইয়াছিল।

সামঞ্ঞ ফল সুত্তে অজাতশত্রু-কর্তৃক-বুদ্ধ-দর্শন-বৃত্তান্তে দেখা যায় যে বুদ্ধদেবের সময়েই উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক নানারূপ মতবাদের দরুন ধর্মনীতি অতি জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। অজাতশত্রু তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ অনেক সাধু সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার ও গবেষণামূলক চিন্তার আড়ম্বর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই; বুদ্ধদেবের উপদেশে তিনি শান্তি পাইয়াছিলেন। সেই সকল কথা পূর্বের এক অধ্যায়ে আমরা লিখিয়াছি। অজাতশত্রুর সময়েই নিগ্রন্থ জ্ঞাত-পুত্রের কথা আমরা পাইয়াছি, ইনি একজন জৈন তীর্থঙ্কর। বস্তুতঃ বুদ্ধের পূর্বেই জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। জৈনগণ কহিয়া থাকেন, ঋষভদেবই তাঁহাদের প্রথম তীর্থঙ্কর। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, ইনি রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া নগ্ন সন্ন্যাসিরূপে বনে যাইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ঋষভদেব কোশলরাজ নাভী ও রাজ্ঞী মরুদেবীর পুত্র তৎকালে প্রচলিত রীতি-অনুসারে তিনি স্বীয় যমজ ভগিনী সুমঙ্গলাকে বিবাহ করেন ঋষভদেবকে কেহ কেহ 'আদিনাথ' নামে অভিহিত করেন।

প্রথম তীর্থঙ্কর হইতে পার্শ্বনাথ ২৩শ স্থানীয় এবং মহাবীর ২৪শ তীর্থঙ্কর। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রে এই সম্প্রদায় নানা নামে পরিচিত। ইঁহারা সংসারের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এজন্য "নিগ্রন্থ", ইঁহারা ইন্দ্রিয়বিজয়ী এজন্য "অরিহন্ত" (অর্হৎ), ইঁহারা পৃথিবীর সমস্ত লোভ ও আকর্ষণ জয়পূর্বক জয় করিয়াছেন এজন্য ইঁহারা "জিন" (জয়ী)। ইঁহাদের সন্ন্যাসীরা 'শ্রাবক' ও সন্ন্যাসিনীরা "শ্রাবিকা" নামে অভিহিত। জৈনগণ দাবী করেন বৌদ্ধধর্ম জৈন ধর্মের শাখা-মাত্র ("It is very likely that future researches will throw a flood of light on the theory that Buddhism is rather a branch of Jainism"—An Epitome of Jainism by Puran Chand Nahar & S Ghosh—Introduction, p. 3)। বস্তুতঃ জৈন ধর্মের ধর্মমতের সহিত বৌদ্ধমতের একটি স্থানে বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়, উভয় ধর্মই নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের ধর্ম-শাস্ত্র ও স্তোত্র এরূপ বিপুল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ যে সাধারণ জীবনের আলোচনায়ও তাহার কিনারা করা যাইতে পারে না জৈনেরা অর্থশালী ও প্রভাবশালী সম্প্রদায় তাঁহারা একসময়ে মঠ-মন্দিরাদির জন্য যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী ভারতীয়

প্রাচীন কীর্ত্তিশালার একটি বিশেষ অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে। অথচ দুঃখের বিষয় তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাসের উদ্ধার-কল্পে তাঁহারা বিশেষ কিছুই করেন নাই।

মথুরার স্তূপ জৈনকীর্ত্তির প্রায় দুই সহস্র বৎসরের সাক্ষ্য দিতেছে। কেহ কেহ বলেন, বেদে জৈনদের যে উল্লেখ আছে তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে জৈনমত বেদের সমকালিক কিংবা তদপেক্ষাও প্রাচীন।

যাহা হউক ২৩শ সংখ্যক তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও তৎপরবর্ত্তী মহাবীরের সময় হইতেই জৈন ধর্ম্ম এদেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ ভিন্ন জৈন ধর্ম্মাবলম্বী অন্য কোন দেশে আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু এদেশে—রাজপুতনা, গুজরাট, পঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে—ইঁহারা সংখ্যায় প্রবল। ইঁহাদের অর্থসম্পদ ও বাণিজ্যে কৃতিত্ব ভারতবর্ষে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত।

এই বাঙ্গলা দেশে ইঁহাদের প্রভাব খুবই বেশী ছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় জৈন ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইয়াছিল, তথাপি সেদিন পর্য্যন্তও জগৎ শেঠ প্রভৃতিরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ছিলেন। খাস বাঙ্গালীদের মধ্যে জৈন ধর্ম্ম আজই আছে। যখন ভক্তির বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল, সেই সঙ্গে এদেশবাসীরা নিরীশ্বরবাদের কলঙ্ক এখান হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিলেন। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, হাতীর পায়ের নীচে নিষ্পেষিত হইলেও জৈন মন্দিরে প্রবেশ করিবে না—এরূপ নিষেধ-বিধি জনসাধারণের মধ্যে এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্তিকা নিম্নে এ দেশের নানা স্থানে এত অধিক পরিমাণে তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে যে এক সময়ে এই ধর্ম্মের প্রভাব যে খুব বেশী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যে সকল মন্দিরে ভগবানের স্থলে মানুষকে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে - এবং তাঁহাদের গুরু আরতি হলে না, ভোগ প্রস্তুত হয় না, শ্রেষ্ঠ-ভক্তির আতিশয্যের দিনে হিন্দুগণ সেই সকল মন্দির অস্পৃশ্য মনে করিতেছিলেন। কিন্তু যেরূপ জৈন তীর্থঙ্করদিগের বহু প্রাচীন মূর্ত্তি-দ্বারা একদিকে এই ধর্ম্মের প্রভাব প্রমাণিত হয়, তেমনই অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণঘটিত কূট তর্কে আমাদের নব্যন্যায় যে এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়ের চিন্তাশৈলতা-দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাও সহজেই অনুমেয়। অনুমানকে হিন্দুগণ বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষবাদের শ্রেষ্ঠত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এদেশের মহাস্থানে এক সময়ে জৈন ধর্ম্মনেতা ভদ্রবাহু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি অশোকের পিতামহ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। এক সময় মগধ, অঙ্গ ও কৌশল রাজ্যে জৈন ধর্ম্ম প্রবল হইয়া তাহা রাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশে ধারাবাহিক ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হওয়াতে, আমরা যাহা এখন দেখিতে পাই না, তাহা কোন কালেই ছিল না, বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং যাহা আছে—তাহা সৃষ্টিকাল হইতেই বিদ্যমান, এরূপ সংস্কার পোষণ করি।

এদেশে এককালে জৈনধর্ম্মের প্রাধান্যের প্রধান প্রমাণ এই যে নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্করদের এই অঞ্চলটি এক সময়ে প্রধান ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল। পার্শ্বনাথ পাহাড় (সমেৎ শেখর) এখনও জৈনদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

পার্শ্বনাথ খৃঃ পূঃ ৮৭৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন খৃঃ পূঃ ৭৭৭ অব্দে বঙ্গদেশের তরাঞ্চে অন্তিহিক পাহাড়ে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। পরবর্তী তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বৈশালী নগরের নিকট কুণ্ড গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় বৈশালীর রাজা চেতকের ভগিনী ত্রিশলাদেবী ইঁহার মাতা চেতক রাজার কন্যা চেল্লনা বিম্বিসার রাজার রাজ্ঞী সুতরাং ঐ সকল রাজাদের দরবারে এক সময় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর মহাবীর ৩১ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের ১২ বৎসর পরে ইনি জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ৪২ বৎসর বয়সে জ্ঞানযুক্ত হইয়া ৭২ বৎসরে তিরোহিত হন, পোবাপুরী পাহাড়ে তাঁহার লীলাবসান হয়। ঐ স্থান বর্ত্তমান বেহারের অতি নিকটবর্ত্তী, তাঁহার তিরোধান খৃ. পূঃ ৪৭৭ অব্দে ঘটিয়াছিল।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে দ্বাদশবৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল এই সময়ে মগধের জৈন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ, ভদ্রবাহু তাঁহার শিষ্য দলকে লইয়া কর্ণাটে গমন করেন। তথায় তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, বিদেশে অবস্থানকালে তৎস্থলে অভিষিক্ত মগধের জৈন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্থূলভদ্র পূর্ব্বাগতদিগের জন্য ধর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন। জৈন ভিক্ষুমাত্রই সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকিবেন এই ছিল নিয়ম, কিন্তু স্থূলভদ্রের দল শ্বেতাম্বর পরিধানের পক্ষপাতী হইলেন ভদ্রবাহু দ্বাদশবৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া নব-প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুমোদন করেন নাই তাঁহার মত ছিল, নিগ্রন্থগণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কার-বর্জ্জিত হইবেন। যাহারা পার্থিব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জৈনদের সনাতন উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে বিসংবাদ করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি ও তাঁহার দল শান্তিরক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। দুই দলের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া তর্কযুদ্ধ চলিল, অবশেষে ৭৮ খৃঃ অব্দে ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন দিগম্বরেরা বলেন দেহ এবং দেহের সংস্কার যে রক্ষা করিবে সে আবার নিগ্রন্থ হইবে কেমন করিয়া? শ্বেতাম্বরীরা লোকসমাজে চলাফেরার সময়ে শ্বেতবস্ত্র পরিয়া থাকিতে হইবার পক্ষপাতী হইলেন।

কিন্তু কি বৈষ্ণবধর্ম্ম, কি সহজিয়াধর্ম্ম, কি চাণক্যধর্ম্ম বাঙ্গালীরা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আদর্শের অসম্পূর্ণতা তাঁহারা অনুমোদন করেন নাই। পার্থিবতার অনুরোধ বা সমাজবিধি তাঁহাকে ভূমা হইতে একটুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সুতরাং কপটব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হস্তে খড়্গ দিয়া কাল ভোম নিজ গ্রীবা বাড়াইয়া দিলেন, কয়জন সাহিত্য রাজা প্রভাপাদিত্য তাঁহার রাজ্যকে পণ্যস্থান করিয়া ফেলিলেন, কয় একফোটা চোখের জল না ফেলিয়া স্বীয় পুত্র বৃষকেতুর মস্তক নিজে ছেদন করিলেন, এই সকল প্রবাদ ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন হইলেও বঙ্গের চিরাবাবার যে উচ্চাঙ্গ প্রদর্শন করে—তদ্দ্বারা বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয় যে এ জাতি তাঁহাদের চিন্তা বা কর্ম্মে কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নহে, যাহা কিছু বাঙ্গালী করিবে তাহার চূড়ান্ত অভিনয় না করিয়া ছাড়িবে না। লৌকিক সংস্কার ত্যাগ করিয়া যিনি নিগ্রন্থ হইবেন—তাঁহার আবার

বস্ত্রের উপর শ্বেত অথবা নগ্ন হওয়ার ভীতি কেন? বাঙ্গালী ভদ্রবাহু দিগম্বরের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। এইরূপ দিগম্বর সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি বাঙ্গালী চিত্রকরেরা অনেক আঁকিয়াছেন। সহজিয়ারা প্রচার করিলেন, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলেও তাহার প্রতি ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, "প্রণয় করিয়া ভাজয়ে যে সাধন অঙ্গ পায় না সে" (চণ্ডীদাস)। পরের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা—স্বকীয় হইতে শ্রেষ্ঠ—এই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শমূলক সতীত্বের ধারণা নিভীকভাবে বৈষ্ণব-কবি গাহিলেন—

"যমুনিনী বল গিয়া নগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্কসাগরে।"

এইরূপ সমাজবিধি, শাস্ত্রবিধির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সাধারণের অনধিগম্য ভাবের রাজ্যে শেষ পর্য্যন্ত ডঙ্কা বাজাইয়া স্বীয় মত প্রচার করার দৃষ্টান্ত বোধ হয় বাঙ্গালীর মত অন্য কোন জাতি খুব কমই দেখাইয়াছে।

সুতরাং লোকসমাজে চলিতেও নিগ্রন্থদিগকে উলঙ্গ হইয়া চলিতে হইবে,—আকণ্ঠকে একটুকুমাত্র বস্ত্র করিতে দেওয়া হইবে না, এই মতে বাঙ্গালী ভদ্রবাহু ও তাঁহার দল দৃঢ় হইয়া রহিলেন। এদিকে পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্করগণের সঙ্গে বাঙ্গালার দীর্ঘকাল-ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের ফলে জৈন ধর্ম্ম যে এই দেশে কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। বঙ্গদেশের সঙ্গে জৈন ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব হইয়াছিল—সে ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

ভদ্রবাহুপ্রমুখ দিগম্বরের দল মেয়েদিগের জন্য তাঁহাদের আশ্রমে একটুমাত্র স্থান রাখিলেন না। সকলেই অবগত আছেন ১৯শ তীর্থঙ্কর (তীর্থঙ্করী ?), মল্লীকুমারী চিরকুমারী ছিলেন, কিন্তু দিগম্বর জৈনেরা তাঁহার স্ত্রীত্ব স্বীকার করিলেন না তাঁহারা তাঁহাকে পুরুষরূপে পরিকল্পনা করিয়া তীর্থঙ্কর-তালিকার অন্তর্গত করিয়া লইলেন এবং তিনি "মল্লীনাথ" হইলেন।

নিম্নে আমরা ২৪জন তীর্থঙ্করের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতেছি

১ আদিনাথ (ঋষভ দেব)। ২ অজিতনাথ রাজা জিতশত্রু ও রাজ্ঞী বিজয়ার পুত্র। ইনি বঙ্গদেশের পার্শ্বনাথ পাহাড়ে সমেৎ শেখর তিরোধান করেন তাঁহার বর্ণ ছিল স্বর্ণের ন্যায় এবং তাঁহার চিহ্ন। লাঞ্ছন) ছিল হস্তী ৩ সম্ভবনাথ রাজা জিতারি এবং রাজ্ঞী সেনার পুত্র। স্বর্ণবর্ণ, অশ্বলাঞ্ছন ৪। অভিনন্দন—রাজা সম্বর ও রাজ্ঞী সিদ্ধার্থার পুত্র। বঙ্গদেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান,—স্বর্ণবর্ণ, কপিলাঞ্ছন। ৫। সুমতিনাথ —রাজা মেঘ এবং রাজ্ঞী মঙ্গলার পুত্র স্বর্ণবর্ণ, (ক্রৌঞ্চ লাঞ্ছন)। ৬ পদ্মপ্রভ— রাজা শ্রীধর ও রাজ্ঞী সুষিদার পুত্র. বঙ্গদেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। রক্তবর্ণ,

পদ্মলাঞ্ছন। ৭। সুপার্শ্বনাথ রাজা প্রতিষ্ঠ ও রাজ্ঞী পৃথ্বীর পুত্র, সমেৎ শেখরে তিরোধান সমুজ্জ্বর্ণ, স্বস্তিকলাঞ্ছন। ৮ চন্দ্রপ্রভ—পিতা রাজা মহাসেন, মাতা রাজ্ঞী লক্ষ্মণা এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান শ্বেতবর্ণ, চন্দ্রলাঞ্ছন ৯ সুবুদ্ধিনাথ—রাজা সুগ্রীব এবং রাজ্ঞী রমার পুত্র এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। শ্বেতবর্ণ, মকরলাঞ্ছন ১০ শীতলনাথ—রাজা দৃঢ়রথ ও সুনন্দার পুত্র এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান স্বর্ণবর্ণ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন ১১। শ্রেয়াংসনাথ—রাজা বিষ্ণু এবং রাজ্ঞী বিষ্ণার পুত্র। বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান ইহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় এবং গণ্ডার-লাঞ্ছন ১২ বসুপূজ্য—বাসুপূজ্য রাজা এবং রাজ্ঞী জয়ার পুত্র—চাম্পাপুরের জন্ম ও নির্ব্বাণ রক্তবর্ণ ও মহিষলাঞ্ছন ১৩ বিমলনাথ—রাজা কৃতবর্ম্মা ও রাজ্ঞী শ্যামার পুত্র—বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে নির্ব্বাণ। স্বর্ণবর্ণ, বরাহলাঞ্ছন। ১৪। অনন্তনাথ—রাজা সিংহসেন ও রাজ্ঞী সুযশার পুত্র বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, শোনলাঞ্ছন। ১৫ ধর্ম্মনাথ—রাজা ভানু এবং রাজ্ঞী সুব্রতার পুত্র। বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান স্বর্ণবর্ণ, বজ্রলাঞ্ছন। ১৬ শান্তিনাথ—রাজা বিশ্বসেন এবং রাজ্ঞী অচিরার পুত্র। সমেৎ শেখরে নির্ব্বাণ শিরীষবর্ণ মৃগলাঞ্ছন ১৭ কুন্থনাথ—রাজা সুর ও রাজ্ঞী শ্রীর পুত্র—সমেৎ শেখরে তিরোধান, ছাগলাঞ্ছন। ১৮। অরনাথ পিতা রাজা সুদর্শন ও মাতা রাজ্ঞী দেবী। সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ—স্বর্ণবর্ণ, নন্দ্যাবর্ত্ত। ১৯ মল্লীনাথ—রাজা কুম্ভ ও রাজ্ঞী প্রভাবতীর কন্যা—সমেৎ শেখরে তিরোধান নীলবর্ণ, কুম্ভলাঞ্ছন ২০ মুনি সুব্রত রাজা সুমিত্র এবং রাজ্ঞী পদ্মাবতীর পুত্র সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। কৃষ্ণবর্ণ, কূর্ম্মলাঞ্ছন ২১। নেমিনাথ—রাজা বিজয় এবং রাজ্ঞী বিপ্রার পুত্র। শিঙ্গলবর্ণ, নীলোৎপল লাঞ্ছন সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ ২২ নেমিনাথ ২য়।—হরিবংশোক্ত রাজা সমুদ্র-বিজয় এবং রাজ্ঞী শিবার পুত্র। কৃষ্ণবর্ণ, শঙ্খলাঞ্ছন। ইহার পিতা সমুদ্র-বিজয়, কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভ্রাতা ছিলেন। ২৩ পার্শ্বনাথ—রাজা অশ্বসেন ও রাজ্ঞী বামাদেবীর পুত্র—জন্ম ৮৭৭ খৃঃ পূঃ ৭৭৭ খৃঃ পূর্ব্বে সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। ইনি ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীরের প্রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সমেৎ শেখরে তিরোধান। নীলবর্ণ, সর্পলাঞ্ছন। ২৪। মহাবীর (বর্দ্ধমান)—রাজা সিদ্ধার্থ ও রাজ্ঞী ত্রিশলার পুত্র, পাবাপুরীতে নির্ব্বাণ (৪২৭ খৃঃ পূঃ) শিঙ্গলবর্ণ, সিংহলাঞ্ছন।

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—২১ জন তীর্থঙ্কর বাঙ্গলাতে ইহাদের সকলেই বৃহৎ বঙ্গের সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ করেন, সুতরাং বাঙ্গলাদেশ যে জৈন ধর্ম্মের একটি প্রধান লীলাক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তীর্থঙ্করেরা সকলেই রাজকুলোদ্ভূত, এবং ৬ইজন বাঙ্গলাতে সকলেই ইক্ষাকু-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মিঃ পূরণ চাঁদ নাহার তাঁহার Epitome of Jainism পুস্তকে (৬৮৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন "পার্শ্বনাথ পাহাড় বঙ্গদেশের হাজারীবাগ জেলায় অবস্থিত, ইহা জৈনদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ, ২৪জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জনই এই স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদিগের অসংখ্য মঠমন্দির আছে তীর্থঙ্করদিগের পদাঙ্কের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু পার্শ্বনাথের মন্দিরে পার্শ্বনাথের একটী প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।"

আদিনাথের একটি মূর্ত্তি ভাগলপুর ডিবিসনের অন্তর্গত কুলটী থানার অধীন পাণ্ডেশ্বরী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি একটু আভ নীল রঙ্গের বালি পাথরের উপর ক্ষোদিত পঞ্চপুষ্প, সুন্দরবনে আবিষ্কৃত জৈন মূর্ত্তি প্রবন্ধ ১৩৩৯ আষাঢ়, ১৩৪ পৃঃ)। মহাবীর (বর্দ্ধমান স্বামী) ৫২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন জৈন দিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ আয়ারঙ্গ সূত্র লিখিত আছে তিনি ৩০ বৎসর কাল বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন

পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি।

পার্শ্বনাথের এই প্রস্তর-মূর্ত্তিটি সুন্দরবনের অন্তর্গত কাঁটাবেনিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে সুন্দরবনের ২৪ নং লাটে এইরূপ আর একখানি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে উদীয়মান ঐতিহাসিক ভাগলপুর হাইকোর্টের অধীন জয়নগর মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের গবেষণা-মূলক ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্য অতি বিরাট, এ পর্য্যন্ত তাহাদের বিশেষ সন্ধান হয় নাই। ইহাদের মহাগ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে—বহু সংখ্যক প্রাকৃতে এবং অবশিষ্টগুলি প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত ইহাদের ব্যবহৃত প্রাকৃত অতি জটিল সুতরাং এক সময়ে এ দেশে যে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, ইহারা তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গালী ভদ্রবাহু ইহাদের শেষ মনীষী ও মুখ্য লেখকগণের অন্যতম ইহার রচিত কল্পসূত্র দশাশ্রুতি স্কন্ধ নামক বিরাট পুস্তকের পত্রাঙ্ক প্রমাণ সম্বন্ধে ৮ম অধ্যায় জৈনদিগের প্রধান পর্ব্ব চাতুর্মাস্য উৎসবের সময় ইহা জৈনমন্দিরে ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্তের সময় নিখিল জৈন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ছিলেন জৈন (প্রাকৃতে লিখিত) পদ্মচরিত অষ্টম চরিতাম) একখানি প্রাচীনতম প্রাকৃত কাব্য। জৈনদিগের আখ্যায়িকা গ্রন্থও বিস্তর, ন্যায়, দর্শন সম্বন্ধে ইহারা এক সময়ে ভারতীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রণী ছিলেন। তীর্থঙ্কর ও প্রধান জৈন সাধুদের জীবনচরিতও বহু বিদ্যমান প্রফেসর হারতাল (Hertal) বলেন, ইহাদের কল্পনাত্মক

রচনা—শুধু ভারতীয় সাহিত্য নহে—সমগ্র মনুষ্য-জাতির সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে ("With respect to its narrative part, it holds a prominent position not only in Indian Literature but in the Literature of mankind")

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতেতিহাসের ধারাবাহিকত্ব

কুরুপাণ্ডব, পরবর্ত্তী শিশুনাগ ও নন্দবংশ

মহাভারতের সময়নির্ণয় এবং মতভেদের আলোচনা।

কুরুপাণ্ডবেরই হউক বা কুরুপাঞ্চালেরই হউক, কিংবা ভিন্সেণ্ট স্মিথ, হপ্‌কিন্‌স্ সাহেবের মতানুসারে পাণ্ডুবংশ কোন কুটিল জাতির সহিত আর্য্যসমাজের এক মুখ্য নায়কই হউক, কুরুক্ষেত্রনামক স্থানে যে একটা মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন মতান্তর নাই। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থেরও কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। সাজাহানের দিল্লী ও হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী যমুনা-তীরের কতকটা স্থান প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের একাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নিগমবোধঘাট এবং তাহার উত্তরস্থিত নিগমপ্রবোধের সন্নিহিত নীলছত্রী-মন্দির ইন্দ্রপ্রস্থের সীমানার মধ্যে ছিল অনেকের ইহাই ধারণা। বুদ্ধদেব, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দের পাকড়া জাতীয় লোক ছিলেন বলিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করিয়াছেন। এরূপ মত আমরা আরও অনেক শুনিয়াছি,—শিবঠাকুর অনার্য্য দেবতা, সীতা অর্থে লাঙ্গলের ফাল, গ্রামের নাম-এর অর্থ কাফ্রিদাসত্ব আর্য্যগণের কৃষিবিদ্যার চর্চ্চা প্রভৃতি মত আমরা ওয়েবার সাহেবের কল্যাণে শুনিতেছি। মানুষের কঙ্কাল ও রক্তের উপাদান কি সেই সম্বন্ধের বিস্তার অনুশীলন করা আমাদের কাজ নহে। বহুযুগ হইতে সন্ধ্যাকালে শিব-মন্দিরে ঘোল ও আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে তাহা আরও বহুযুগ বাজিবে। বহুযুগ যাবৎ মুমূর্ষু বাঙ্গি পিপাসার্ত্তের ন্যায় গ্রাম নামামৃত শ্রবণ করিবার উৎসুক হইয়া আসিয়াছে ও আরও বহুযুগ সেইরূপ উৎসুক থাকিবে এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা আমাদের আদর্শ আছেন ও থাকিবেন। আমরা ইতিহাসের কঙ্কাল লইয়া টানাহেঁচড়া করিব না এবং এই সকল জীবন্ত দেবতা ভাঙ্গিয়া কাটির পুতুল গড়িব না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়-সম্বন্ধে প্রচলিত মত, উহা ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন—পাণ্ডবদের নাম পাণ্ডু শব্দ হইতে হইয়াছে এই শব্দের অর্থ

ale বা yellow (পীত)। সুতরাং পাণ্ডবেরা নেপালী বা ভুটিয়া লেপের লোক দ্বিতীয়তঃ, পাণ্ডবদের মধ্যে অনার্য আচার প্রচলিত ছিল—যথা, এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা সুতরাং তাঁহারা পাহাড়িয়া কোন অসভ্য সম্প্রদায়-ভুক্ত

এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে আমাদিগের আচার-ব্যবহার চিরদিনই একরূপ ছিল না আর্যদিগের ক্রমবিকশিত সামাজিক ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যুগে যুগে নানা প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। উৎকোচ মূল্যের স্ত্রীকে যখন অপর এক ব্যক্তি লইয়া যান তখন সেই স্ত্রীর প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রোষপদ চক্ষে সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, - তখন তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন "বৎস। তত্ত্বাই প্রথা, যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে, সে তাহাকে পাইবে, ইহাতে বাধা দেওয়ার শক্তি সমাজ আমাকে দেন নাই" দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তাঁহার 'সামাজিক ইতিহাসে' লিখিয়াছেন পুরাকালে আর্যসমাজে যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিত, তাহাকে সেই পুরুষের অনুগামিনী হইতে হইত। নতুবা সেই স্ত্রীর সমাজে নিন্দা হইত এবং লোকে তাহাকে "ককলা" বলিয়া ঘৃণা করিত। দশরথ-ভাতকে দৃষ্ট হয়, সীতা রামের সহোদরা ছিলেন এবং শেষে তাঁহার পত্নী হন। একদা আর্যসমাজের কোন কোন শাখায় সহোদর সহোদরার বিবাহের প্রথা বিদ্যমান ছিল দ্রৌপদীর বিবাহের সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদ রাজার নিকট এক রমণীর বহুপতি হইবার কতকগুলি প্রাচীন নজীর উপস্থিত করিয়াছিলেন, যথা "অঙ্গুলা জটিলা নারী গৌতম বশগা একস্থা সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেন এবং বাক্ষী নারী মুনিকন্যা প্রচেতাঃ নামক দশভ্রাতার সহধর্মিণী হইয়াছিলেন" (মহাভারত আদিপর্ব ১৯৬ অঃ।) শুধু পাণ্ডবদের কন্যাস্বয়ম্বরটিই আধুনিক আদর্শ অনুসারে বিসদৃশ নহে দ্রুতরাষ্ট্র ও বিদুরের জন্মকথাটাও খুব রুচিসঙ্গত নহে ইহাছাড়া নারদস্মৃতি ও সহকারের জন্ম কথা বাসস্মৃতির উৎপত্তি ইত্যাদি বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে, ব্যাস, বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কুমারী-পুত্র হইয়াও সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হইয়াছিলেন। মণিপুরের যুদ্ধরাজা এই সর্তে তাঁহার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুনের হস্তে দিয়াছিলেন যে দৌহিত্র তাঁহাদের সিংহাসনের অধিকারী, সুতরাং অর্জুনের পুত্র হইলে সে মণিপুরেই থাকিবে, তাহার উপর অর্জুনের কোন দাবী থাকিবে না।

বিরাট আর্যসমাজে যৌনসম্পর্ক ও আহারাদি-সম্বন্ধে অসম্ভব রকমের শিথিলতা বিদ্যমান ছিল। যুগে যুগে আর্যসমাজ নানারূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বর্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে এক সময়ে আর্যগণ এত বেশী গরু খাইতেন যে, অতিথি আসিলেই একটি গরু মারিতে হইত, এইজন্য অতিথির এক নাম "গোঘ্ন" রাম বনবাস-কালে বরাহ বলিয়া শূকরের মাংস সীতাকে খাইতে দিয়াছিলেন প্রাচীন যুগ হইতে আর্যগণ কোন একটা বিশেষ আচারের খুঁটি ধরিয়া বসিয়া থাকেন নাই এখন যে সকল আচার ও রীতিনীতি লুপ্ত হইয়াছে, তাহা চীনাম্যান বা ভুটিয়াদের মধ্যে পাইলে আমাদের আর্যবংশীয় পূজ্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দলের মধ্যে লইয়া ফেলিব, ইহা কি খুব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে?

স্মিথ সাহেব আরও লিখিয়াছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা একটা জাতি বিরোধ লইয়া হইতেই পারে না একটা সামান্য পারিবারিক কলহ কি ভারতীয় সমবেত রাজশক্তির উপস্থিতি ও যুদ্ধবিগ্রহাদির কারণ হইতে পারে? কথিত আছে পূর্ব্বদেশের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা পৃথিবী এতটা পথ পর্য্যটন করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন যদোয়া লড়াই হইলে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল। এই পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে পারিবারিক ব্যাপারগুলি কিছুই নহে, যুদ্ধাদি হইতে হইলে একটা জাতীয়তা-সম্পর্কিত কারণ থাকা চাই তাঁহারা জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝেন ভারতবর্ষে তাহা কোন কালেই ছিল না। ভারতীয় সভ্যতার মূল কেন্দ্র পারিবারিক জীবন ও জাতিত্বের বন্ধন তাঁহারা সার্ব্বভৌম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত দেশে অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই রাজপরিবারের যুদ্ধবিগ্রহে যে সমস্ত মিত্র ও সামন্তরাজ যোগ দিবেন, উহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এখন হইতে দুই তিন হাজার বৎসর পরে, যখন বর্ত্তমান ইতিহাসের অনেক কথাই লোকে ভুলিয়া যাইবে, তখন যদি কেহ বলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ ও ঈষ্টইণ্ডিয়া প্রভৃতি কয়েকজন সভাসদ্ মুরশিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শত শত যোজন দূরে অবস্থিত সাগর, শৈল ও দ্বীপের অধিবাসিগণ কেন ইংরেজ জাতি যোগ দিবেন বিশেষ তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন? তবে সেই প্রবাদটির অনুরূপ প্রবাদ হইবে পাখী শব্দ দেখিয়া জাতি নির্ণয় করিতে হইলে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মহী ফক্স সাহেবকে তর্কবাচক ঈষ বিশেষের শ্রেণীভুক্ত করিতে হয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, পূর্ব্বভারতে ব্রাহ্মণবিরোধী যে সকল জাতি প্রবল হইতে ছিলেন যথা, লিচ্ছবি, শিশুনাগ বংশীয় এবং মগধ ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেশের রাজগণ, তাঁহারা কখনই আর্য্য ছিলেন না, তাঁহারা ক্ষত্রিয়, শূদ্র এবং ক্রীতদাসীদেরই জ্ঞাতি ও অনার্য্য ছিলেন,—এই জন্যই তাঁহারা ব্রাহ্মণদের বেদবিধি গ্রহণ করেন নাই অবশ্য বুদ্ধদেবের নাক চেপ্টা ছিল কিনা তৎসম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজনীয় এই সকল মতের সঙ্গে ত্রেতাযুগের রামায়ণের টীকা অর্থাৎ সীতা অর্থ লাঙ্গলের ফাল এবং লঙ্কাকাণ্ডটা লঙ্কিপাড়ার ক্রীতদাসী দেওয়ার চেষ্টা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মত জুড়িয়া দেওয়া উচিত হইলার দশরথের মৃত্যুর যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও কি আমরা বিজ্ঞান-সম্মত বলিব? একাকী রাত্রে এক ঘরে দশরথ রাজাকে পাইয়া শোকসন্তপ্তা কৌশল্যা পুত্র-নির্ব্বাসনের প্রতিশোধার্থ স্বামীকে গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন, নতুবা এত বড় রাজাটা মরিলেন, তাঁহার কোন কাগজ-পত্র হইল না ও তাঁহার জন্য কোন চিকিৎসক ডাকা হইল না, ইহাও কি হইতে পারে?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কল্পনা অদ্ভুত রস

আমরা এসকল বৈজ্ঞানিক মতের আলোচনা করিব না পাণ্ডবেরা চীনদেশের লোক হউন বা বুদ্ধদেব নাক চেপ্টা ছুটিয়া হউন, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না রামায়ণ-মহাভারতোক্ত নায়ক ও নায়িকাগণের সঙ্গে আমাদের শুধু একটা বাহ্য ইতিহাসের সম্পর্ক বিদ্যমান নহে, তাঁহারা এ দেশে শুধু নরনারায়ণ অথবা ঐতিহাসিক কৌতূহলের চরিতার্থক

পুরাকালের কর্ণধার নহেন বুদ্ধদেব যদি কুটীর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই কি তাঁহার প্রতি জগতের শ্রদ্ধা লুপ্ত হইবে? চাণক্য মাতার সন্তান পরাশর ও গণিকার সন্তান সত্যকাম, তাহাতে কি হইয়াছে? আর যদি বল ইহারা কবি-কল্পনা মাত্র, ইহাদের অস্তিত্বই ছিল না, তথাপি আমরা দুঃখিত হইব না যে মস্তিষ্ক সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের মানব দেহ দিয়াছেন, তেমনি কোন দৈবশক্তির ইন্দ্রজালে পড়িয়া এই সকল কাল্পনিকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতবাসীর হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া তাঁহারা অধিষ্ঠিত আছেন—তাঁহাদিগকে লোক-চক্ষু হইতে কে অপসারিত করিবে? খৃষ্ট অযোনি-সম্ভব, কুমারী মেরীর পুত্র, এই সকল কল্পনাও পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক অবাধে সহ্য করিয়া আসিতেছেন খৃষ্টের প্রতি তজ্জন্য তাঁহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই।

বংশলতা

কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ হইতে যে বংশলতা পুরাণাদিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা পার্জিটার সাহেব মূলতঃ গ্রাহ্য করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা তাহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পুরাণোক্ত রাজবংশাবলীর সঙ্গে শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রায় প্রাপ্ত রাজগণের নামের আশ্চর্য্যরূপ মিল রহিয়াছে তখন স্বয়ং ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনেকটা ঘাড় চুলকাইয়া বলিতেছেন, এই পুরাণের বংশাবলী একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। "The Puranic genealogies of kings in probable times seem to be of doubtful value but those of the historical period of Kaliyuga from about 600 B.C. are records of high importance and extremely helpful in reconstructing the early political history of India" (Oxford History of India, 1921, p. 34) ইহার তাৎপর্য্য এই যে কলিযুগের ইতিহাস পূর্ব্ব অধ্যায়ের, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর পূর্ব্বের যে বংশলতা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাহা কতকটা সন্দেহজনক—কিন্তু ৬০০ খৃঃ পূঃ হইতে যে বংশলতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ভারতের প্রাচীন কালের ইতিহাস গঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য এই ঐতিহাসিক যুগটা তাঁহারা বুদ্ধদেবের জন্ম ও আলেকজাণ্ডারের অভিযানের সময় হইতে গণনা করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ইতিহাসের কোন আলোরেখা বিদেশ হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ভারতবর্ষের স্থানীয় ইতিহাস-লেখকগণের উক্তি তাঁহারা সম্যক্‌রূপে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসরের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারাই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বংশলতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং আলেকজাণ্ডার আসিবার পর হইতে যে ভারতীয় ইতিহাসের প্রকৃত যোগ্য যুগ আরম্ভ হইবে—ইহা তাঁহারা আন্দাজেও জানিতেন না। আমরা পার্জিটারের সহিত একমত হইয়া বলিতে পারি যে, পুরাণোক্ত রাজবংশলতা মূলতঃ গ্রাহ্য, কিন্তু নানা কারণে কতকটা বিকৃত হইয়াছে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের বংশাবলী ও ইতিহাস রক্ষা করিতেন। তাঁহারা শুধু ইতিহাস স্বতন্ত্র ভাবে লিখাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, শিলালিপি, তাম্রলিপি, এবং ধাতব পত্রে স্বীয়

কীর্ত্তি ও পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া ইতিহাস রক্ষা করিবার সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরা ইতিহাস-বিরোধী হইয়াছিল, শুধু শ্রাবক ব্রাহ্মণেরা অর্থলোভে রাজকীয় অনুশাসনের শ্লোক রচনা করিতেন সত্য,—কিন্তু মূলতঃ পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণগণ সত্যশক্তির বিরোধী ও নিবৃত্তি-ধর্ম্মাশ্রয়ী ছিলেন পার্থিব ঐশ্বর্য্য—গৌরব ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে নাই বোধ যুগে প্রতাপান্বিত রাজাদের অনেক ইতিহাস ছিল এবং পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ সমুত্থানে তাহাদের অধিকাংশ ধ্বংস পাইয়াছে অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পুরাকালে আদত পুরাণগুলি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত ছিল। নব ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের দিনে তাহারা সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সম্প্রতি মহাভারতের একখানি সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন তিনি মনে করেন যে কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এখন (১৯৩১ খৃষ্টাব্দে) ৫০৩২ এবং এই সময়ই মহাযুদ্ধের সময়। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রমাণ দিয়াছেন এখন ১৯৩৩ খৃঃ অব্দ, সুতরাং তাঁহার মতে ১৮৩০ + ১৯৩৩ = ৩৭৬৩ বৎসর পূর্ব্বে মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল বঙ্কিমবাবু বিষ্ণুপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় বলিয়া স্বীকার করেন।* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে "যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্" বঙ্কিমবাবু এই মত গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন "নন্দের পূর্ব্বনাম নব মহাপদ্ম, বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে—মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান নন্দান্ কে টিল্যো ব্রাহ্মণ, সমুদ্ধরিষ্যতি তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি, কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি" ইহার অর্থ, মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশত বর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন কৌটিল্যনামক ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়দিগকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন, কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

---

* উইলসন ও কোলব্রুক সাহেবের অনুমান অনুসারে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, উইল ফোর্ড সাহেবের মতে ১৪১০ খৃঃ পূঃ বুকানন্‌এর মত খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, প্রাট সাহেবের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন "ইউরোপিয়দের সঙ্গে আমাদের কোন আত্মীয়তার সম্বন্ধ নাই।" (কৃষ্ণচরিত্র, ৯পৃঃ) সম্প্রতি ভারত-যুদ্ধের কাল লইয়া অধ্যাপক রেবতীমোহন চৌধুরী, মোক্ষদাচরণ রায় এবং প্রবোধচন্দ্র সেন অনেক গবেষণা করিয়াছেন। সেজন্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের যুক্তি জ্যোতির্দ্বিদ গণনার কি ভাবে টিপ্পণ দাঁড় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এই সকল মতের বেশীর ভাগের ঐক্য না থাকিলেও বঙ্কিমবাবুর কথায় বলা যাইতে পারে মহাভারতের কাল-নির্ণয়ে যে সকল মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে "কোন মীমাংসা হয়ে নাই।" এই সকল মতের বিশদ আলোচনা করা এখানে আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নন্দবংশ, আলেকজাণ্ডারের অভিযান

যুধিষ্ঠির এবং মহাপদ্ম-নন্দের মধ্যে মোটামুটি হিসাব করিলে প্রায় ১০১৫ বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু এই সময় যে ভারতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা বিষম সংঘর্ষ চলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপদ্ম নন্দকে ক্ষত্রিয়ধ্বংসকারী পরশুরামের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতীয় রাজন্য বা ক্ষত্রকুল প্রায় নির্মূল হইয়াও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। পুনরায় সেই শক্তি দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, এবং হীন কুলজাত নন্দবংশ ক্ষত্রিয়-দিগকে পুনরায় নিরস্ত্র করিয়াছিলেন ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকত্ব কোন কালেই নষ্ট হয় নাই।

ফার্কিস সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, মহাভারতে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বেদের সূক্তের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। মহাভারতেই অহিংসনীতির সৃষ্টি এবং নানা আধ্যাত্মিক মতের বিকাশ পরিদৃষ্ট হয় পরবর্ত্তী কালে বহুধর্ম্ম মত ও আধ্যাত্মিক সূত্র প্রচার করিয়া জনসাধারণ আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতের আভাস মহাভারতেই পাওয়া যাইবে এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

বেদে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, মহাভারত ও বৌদ্ধ জৈন শাস্ত্রে এবং পুরাণাদিতে সেই সূত্রাকার তত্ত্বগুলি পল্লবিত ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত বৃহৎ বিটপীর ন্যায় ভারতে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল এই সভ্যতার কোন কালেই ক্রম-ভঙ্গ হয় নাই, কতকগুলি রাজার নাম ও কর্ম্মের তালিকা আমরা নিশ্চয়ই হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু ভারতীয় নিবৃত্তি মূলক সভ্যতা কোন কালেই নষ্ট হয় নাই। দেশলক্ষ্মীর কনক কিরীটের একটি অংশেরও জ্যোতি ম্লান হয় নাই।

পরবর্ত্তী ধর্ম্মমতগুলিকে গ্রাস করিয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দুই মহাশক্তি—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে বিরাজিত হইয়াছিল, আমাদের এই বঙ্গদেশে উক্ত দুই কল্পতরুজাত অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব

কিন্তু বঙ্গদেশের চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে গেলে রাজ-নৈতিক ইতিবৃত্তের কতকটা আভাস দেওয়া প্রয়োজনীয়।

মহাপদ্ম-নন্দ-সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত হইয়াছে (১২শ স্কন্ধ। "মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম অতি প্রবল রাজা হইবেন, তিনি শূদ্র মাতার গর্ভজাত তাহা হইতে উৎপন্ন রাজারা শূদ্র এবং ম্লেচ্ছপ্রায়। মহাপদ্ম সমস্ত দেশ নিঃক্ষত্রিয় করিয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন।

মহাপদ্ম নন্দ দ্বিতীয় ভার্গব।

সুমাল্য এবং তাঁহার অপরাপর পুত্রগণ একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। কিন্তু একজন

ব্রাহ্মণ নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই বংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তকে সেই ব্রাহ্মণ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন।"

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, "শিশুনাগ বংশীয় রাজগণের শেষ রাজা মহানন্দী। ইহারা সর্ব্বসমেত ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করিবেন। মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম শূদ্র মাতার গর্ভজাত। তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিবেন এবং তৎকুলজাত রাজগণ শূদ্র বংশীয় বলিয়া গণ্য হইবেন। মহাপদ্ম সমস্ত পৃথিবী একচ্ছত্রের অধীন করিবেন। সুমল্য নামে তাঁহার পুত্র এবং অপরাপর পুত্রগণ একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ নয়জন নন্দের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌর্য্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

এ সম্বন্ধে সোমদত্ত-প্রণীত 'বৃহৎকথা'য় অনেক উপাখ্যান আছে। তন্মধ্যে নন্দ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি কোন কারণে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সকাতলের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তাঁহাকে তাঁহার পুত্রগণ সমেত একটা কূপে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে অল্প একটু ডাল ও জলের ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্য ছিল, কিন্তু সেই খাদ্য ও পানীয়-দ্বারা এক জনের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিত। মন্ত্রী কহিলেন, "যে প্রতিহিংসা লইতে পারিবে সেই বাঁচুক।" পুত্রেরা একবাক্যে বলিল "আপনিই এ বিষয় যোগ্যতম, সুতরাং আপনিই এই আহারে কোনমতে জীবনরক্ষা করুন।" সকাতলের চোখের সম্মুখে একে একে সব কয়টি পুত্র অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহার পরে মন্ত্রী কোন ক্রমে উদ্ধার পাইয়া কূপ হইতে উঠিয়া আসিলেন। তিনি প্রতিহিংসার দিবে অগ্রসর হইয়া একদা কোন প্রান্তর-ভূমিতে ঘুরিতেছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, একটি হীন পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্রাহ্মণ প্রান্তরটা খুঁড়িতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তাঁহার পায় কুশ-বিদ্ধ হওয়াতে ক্ষত হইয়াছে এইজন্য তিনি প্রান্তরের সমস্ত কুশচ্ছেদ করিতে অনুমতি করিয়াছেন। মন্ত্রী বুঝিলেন, প্রতিহিংসা কিরূপে লইতে হয় তাহা এ ব্যক্তি জানেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন ইতিহাসবিশ্রুত চাণক্য। সকাতল ইঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে নীচই নন্দের রাজভবনে প্রচুর সমারোহের সহিত এক শ্রাদ্ধ হইবে, তিনি যদি পুরোহিতের কাজ করেন, তবে অনেক অর্থলাভ হইতে পারিবে। তিনি স্বয়ং তাঁহাকে পুরোহিত-স্বরূপ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহার উপদেশমত নির্দ্দিষ্ট দিনে চাণক্য শ্রাদ্ধসভায় পুরোহিতের আসনে বসিলেন। মহাপদ্ম নন্দ এই অপরিচিত ব্রাহ্মণের দুষ্টচাদশনে তাঁহার টিকি ধরাইয়া সেই আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং তৎস্থলে রাজপুরোহিত সুবন্ধুকে নিযুক্ত করিলেন। মুক্তশিখ চাণক্য আর শিখা বন্ধন করিলেন না, সেইখানেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সাত দিনের মধ্যে যদি তিনি নন্দের বধ সাধন করিতে না পারেন, তবে তিনি আর জীবনে

মন্ত্রী সকাতলের প্রতিহিংসা।

চাণক্যের অপমান ও প্রতিহিংসা।

শিখা বন্ধন করিবেন না। ইহার পর অভিচার-প্রক্রিয়া-দ্বারা তিনি নন্দের হত্যা সাধন করেন এবং তাঁহার পুত্র হিরণ্যগুপ্তকেও বধ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাচীন পুরাণগুলির মত অনুসরণ করিলে নিম্নলিখিতরূপ বংশাবলীও তাহাদের সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণেরও মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ১৪৩০ খৃঃ পূঃ। শিশুনাগবংশীয় ১০ জন রাজার সময় ৩৬২ বৎসর। ইহাদের মধ্যে শেষ দুইজন নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দ ৮৩ বৎসর, মহানন্দ ও তাঁহার ৮ পুত্র, এই ৯ জনের রাজত্বকাল ১০০ বৎসর। কোন কোন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক নিম্নলিখিত ভাবের বংশাবলী ও সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

শিশুনাগ	ইনি প্রথমতঃ কাশীর রাজা ছিলেন	৬৮০ খৃঃ পূঃ
কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্ম্ম, ক্ষেমজিত	ইহারা রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন	২৮২ খৃঃ পূঃ
বিম্বিসার	... ...	৫৫৫ খৃঃ পূঃ
অজাতশত্রু	... ...	৫৫৫ খৃঃ পূঃ
দর্শক	... ...	৫২৭ খৃঃ পূঃ
উদাসীন		৫০০ খৃঃ পূঃ
নন্দিবর্দ্ধন		৪৭০ খৃঃ পূঃ
নবম নন্দবংশীয় রাজা	মহাপদ্ম এবং তাঁহার ৮ পুত্র	৩৯২ খৃঃ পূঃ
চন্দ্রগুপ্ত	... ...	৩২২-২৯৮ খৃঃ পূঃ

৩৯২ খৃঃ পূঃ শিশুনাগের সময় ধরিলে দেখা যায় যুধিষ্ঠিরাব্দ অর্থাৎ ১৪৩০ খৃঃ পূঃ হইতে উহার কালদান মাত্র ১৪৩০ — ৯৯২ = ৭৮৮ বৎসর।*

* খৌলবংশ ও মহাপদ্ম নের ৮ পুত্রের সমকালীন বিম্বিসার হইতে বংশাবলী এইরূপ :—

		রাজত্বকাল
১।	বিম্বিসার	খৃঃ পূঃ ৫৫৫—৪৯৩
২।	অজাতশত্রু	খৃঃ পূঃ ৪৯৩—৪৬৩
৩।	উদয়ভদ্র	খৃঃ পূঃ ৪৬৩—৪৪৩
৪।	অনিরুদ্ধ, মুণ্ড	খৃঃ পূঃ ৪৪৩—৪০৩
৫।	নাগদাসক	খৃঃ পূঃ ৪০৩—৩৮৩
৬।	শুশুনাগ	খৃঃ পূঃ ৩৮৩—৩৬৩
৭।	কালাশোক	খৃঃ পূঃ ৩৬৩—৩৩৩
৮।	কালাশোকের দশ পুত্র	খৃঃ পূঃ ৩৩৩—৩১৩
৯।	নয় জন নন্দ	খৃঃ পূঃ ৩১৩—৩২২

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পোরস্ পুরু নামক রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া মাসিডনীয় বীর বিস্মিত হইয়াছিলেন যদিও কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব দুর্ঘটনায় পঞ্জাবাধিপতি পরাজিত হন, তথাপি "গ্রীকগণ স্বীকার করিয়াছেন যুদ্ধবিদ্যায় আর কোন এসিয়াটিক জাতি হিন্দুদের সমকক্ষ ছিলেন না।" পুরু দৈর্ঘ্যে ৭½ ফিট ছিলেন।

আলেকজাণ্ডার, প্রাচীন মুদ্রা হইতে।

আলেকজাণ্ডার

যাহা হউক পুরুর সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব বিজয়ের পরে পূর্ব্বাঞ্চলে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার সৈন্যেরা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পাটলীপুত্রের নন্দবংশীয় রাজার সৈন্যসংখ্যা ও পরাক্রমের যে কাহিনী তিনি পুরু ও ফিগিয়স হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও আরও পূর্ব্বে অভিযান করিবার তাঁহার দুর্দ্দমনীয় বাসনা নিরস্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছিল। মাসিডনিয়ার মহাবীর, যাঁহার ইঙ্গিতে বিপুল গ্রীক সৈন্য উত্থিত বসিত, তাহারা একেবারে ফিরিয়া বসিল, এমন কি তিনি সাশ্রুনেত্রে তাঁহাদের নিকট কাকুতি-মিনতি করিলেও তাহাদিগের মনের গতি ফিরাইতে পারিলেন না। গ্রীকগণ শুনিলেন যে প্রাচ্যের রাজা গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সাজসজ্জা করিয়া আছেন। তাঁহার ২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, দুই লক্ষ পদাতিক, তিন হাজার হস্তী ও দুই হাজার যুদ্ধরথ সেই স্থানে প্রস্তুত হইয়া আছে। মেগাস্থিনিস আলেকজাণ্ডারকে বলিলেন যে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার শিবিরে চার লক্ষ সশস্ত্র সৈনিক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। গ্রীক দূত পাটলীপুত্র নগর-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"এই নগর দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল এবং ইহা দুই মাইল প্রশস্ত। সমস্ত নগরটি প্রাকার-বেষ্টিত। এই প্রাকারে ৫৭০টি গম্বুজ আছে এবং ইহার তোরণের সংখ্যা ৬৪টি

চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবল।

১১।	চন্দ্রগুপ্ত		খৃঃ পূঃ ৩২১—২৯৭
১২।	বিন্দুসার	...	খৃঃ পূঃ ২৯৭—২৭৩
১৩।	অশোক	...	খৃঃ পূঃ ২৭৩—২২১

আলেকজাণ্ডারের জীবনীলেখক প্লুটার্ক বলেন—"গঙ্গারিডির রাজাদের ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দুইলক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধরথ এবং ৬০০০ হস্তী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ছয়লক্ষ সৈন্য লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে সাময়িক অভিযান করিয়া এই বিশাল দেশ জয় করিয়াছিলেন।" এরিয়ান লিখিয়াছেন—"এই সকল বিবরণের কথা শুনিয়া আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদের মধ্যে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে তাহারা একবাক্যে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে অসম্মতি জানাইল, তাহারা এবিষয়ে এরূপ দৃঢ়তার সহিত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল যে আলেকজাণ্ডারের বীর সৈন্যগণের উপর সম্যক্ আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও এইবার তাঁহাকে তাহাদের মতানুসারে পারস্যদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।"

পুরু ও আলেকজাণ্ডার (প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

পুরু হস্তী পৃষ্ঠে-যুদ্ধ দিয়াছে। আলেকজেণ্ডার অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতেছেন; হস্তি-পৃষ্ঠে দুই ব্যক্তি, তন্মধ্যে যাঁহার মাথায় মুকুট তিনিই পুরু

আলেকজাণ্ডারের অভিযান সম্বন্ধে এরিয়ান, জষ্টিন্ মেগাস্থিনিস প্রভৃতি লেখকগণের বর্ণিতকাহিনীর সামঞ্জস্য নাই, উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই পাঠক তাহার কিছু কিছু নমুনা পাইবেন কিন্তু হইলে কি হয়? পশ্চিম হইতে যে আলো আসে তাহাই বৈজ্ঞানিক।

মেগাস্থিনিসের বিজ্ঞান-সঙ্গত বর্ণনা।

ভারতবর্ষের নাকি কোন ইতিহাসই ছিল না, আলেকজাণ্ডারের আগমন হইতেই সেই ইতিহাস ধরা পড়িয়াছে। ঐ সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে মেগাস্থিনিসই প্রধান। আমরা কথায় কথায় তাঁহার দোহাই দিয়া অতি দুরূহ ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাই। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথাই বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুই একটির নিদর্শন দিতেছি "ভারতবর্ষে এরূপ একশ্রেণীর লোক আছে যাহাদের কান এত লম্বা যে দুটি কান দিয়া তাহারা সর্ব্বশরীর জড়াইতে পারে।" "আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের মুখ নাই, নাক নাই,—কেবল একটি করিয়া চক্ষু আছে। তাহাদের পদতল বিঘত লম্বা এবং পদাঙ্গুলী সকল উল্টাদিকে ফিরান। আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি মাত্র। সেখানে কতকগুলি অরণ্যবাসী লোক আছে যাহাদের মাথার নীচের দিকটা শক্ত ও পুরু এবং উপর দিকে খুব সূক্ষ্ম ও পাতলা। ভারতবর্ষের পিপীলিকাগুলি

• মাথার উপরের শিখাটাকে হয়ত ঐকতান মাথার একটা অঙ্গ মনে করিয়া থাকিবেন, কি জানি।

আট পরিচ্ছেদ

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য

আমরা পূর্বে যাহাকিছু লিখিয়া থাকি না কেন, এ কথা কখনই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গ্রীকদিগের আগমন এবং অশোক প্রভৃতি রাজন্যবর্গের শিলালেখ-আবিষ্কার আমাদিগের ইতিহাসে এক নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন যুগের যে কাহিনী দেশময় নানাশাস্ত্রে লিখিবদ্ধ হইয়াছে তাহার মূল্যও উপেক্ষণীয় নহে।

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। চন্দ্রগুপ্ত মুরা নামক এক শূদ্রকন্যার কোন রাজা হইতে উদ্ভূত, এজন্য এই বংশকে মৌর্যবংশ বলা হইয়া থাকে। ডিওডোরাস্ সিকুলাস নামক আলেকজাণ্ডার-অভিযানের কাহিনীর জনৈক লেখক বলেন—নন্দের মুরা নাম্নী এক মহিষী ছিলেন। একটি সুদর্শন নাপিতের প্রেমে তিনি মুগ্ধ হন এবং চন্দ্রগুপ্ত সেই নরসুন্দরের ঔরসজাত পুত্র। আলেকজাণ্ডারের অভিযান প্রসঙ্গে জষ্টিন্ বলেন, "চন্দ্রগুপ্ত অতি নীচবংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি একদা আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্পষ্টাপূর্ণ বাক্যে আলেকজাণ্ডার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত কোনরূপে পলাইয়া সে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান।"

চাণক্যের অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম ছিল চণক, এজন্য তিনি চাণক্য নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজনীতি অতি কুটিল ছিল, এজন্য তিনি কৌটিল্য নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। মহাবংশের বর্ণনানুসারে তিনি খর্বাকৃতি ও কদাকার ছিলেন। তাঁহারই কৌটিল্য শাস্ত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তক তদানীন্তন কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের একখানি দর্পণ স্বরূপ। চাণক্যের এই অসাধারণ কীর্তিস্তম্ভ তৎকালীন ভারতের উপর যে উজ্জ্বল আলো প্রক্ষেপ করিতেছে তাহা একরূপ অমূল্য। ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে উহা অন্ধের পক্ষে চক্ষুর মত। এই কৌটিল্য শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিলাতে ও এতদ্দেশে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাময় পুস্তক বৎসর বৎসর লিখিত হইতেছে। শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় এই মহাগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিশাখদত্ত লিখিত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে চাণক্যের চরিত্র পরিপুষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। যদিও চাণক্যের বহু শতাব্দী পরে এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে, তথাপি ইহা পড়িলে স্পষ্টই মনে হইবে যে গ্রন্থখানি দূরাগত দেশের সংস্কারের একখানি বিশ্বস্ত অনুলিপি। চাণক্য একসময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির গুরুর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী, প্রবাদ,

মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য।

গল্প ও উপন্যাস আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল তাহার অনেক কথাই হয়ত কাল্পনিক, কিন্তু চাণক্যের চরিত্র-সম্বন্ধে লোকের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল, মুদ্রারাক্ষস তাহার একটি অনুকূল ছবি, বহুদিন পরেও সেই চরিত্রের মুখ্যভাব ও বৈশিষ্ট্য লুপ্ত লোকস্মৃতিতে হারাইয়া যায় নাই। এই হিসাবে মুদ্রারাক্ষসের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সেক্সপীয়র ও ষট যেরূপ কল্পনার মধ্য দিয়া ঐতিহাসিক সত্যের কিরণরেখা আনিয়াছেন, বিশাখদত্তও মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যের ছবির উপর তেমনই আলোপাত করিয়াছেন। কি অদ্ভুত সে ছবি! কত অপূর্ব্ব উপায়ে চাণক্য রাক্ষসের ন্যায় প্রবীণ কূটধার ধী-সম্পন্ন মন্ত্রীর সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল করিয়া দিতেছেন। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে রাক্ষস মন্ত্রী যতগুলি শাণিত ছুরিকা প্রক্ষেপ করিয়াছেন, চাণক্যের অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল সেই অস্ত্রগুলির অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া দিয়া তদ্দ্বারা রাক্ষসকেই ঘা দিয়াছেন। যতগুলি অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও বন্ধুর দ্বারা রাক্ষস পরিবেষ্টিত ছিলেন, ও যাঁহাদিগকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তিনি গুপ্তচরস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার মন্ত্রের ভার তাঁহাদের নিকট অকপটে উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন, শেষকালে দেখা গেল—তাঁহারা রাক্ষসের কেহ নহেন, চাণক্যেরই গুপ্তচর। শেষ যুদ্ধে তিনি চাণক্যের ষড়যন্ত্রের জালে এমনইভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, হতাশাপূর্ণ বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "অরে শত্রু আমার হৃদয়ের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।" পরের বুদ্ধির বলে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সমুত্থান হইয়াছিল, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রাজ্য-সন্ন্যাসী। তাঁহার মত গুণীর গুণ বুঝিতে সমর্থ দ্বিতীয় লোক ছিল না—অথচ গুণী হউন, নির্গুণ হউন, তাঁহার আশ্রিত নৃপতির উন্নতির পক্ষে যে ব্যক্তি বাধা দিয়াছে, তাঁহার হস্তে তাহার উদ্ধার বা নিষ্কৃতি ছিল না। কি ঘোর অভিসন্ধি বিফল করিয়া তিনি অভয়ঙ্করকে হত্যা করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের একটি কেশেরও হানি হইল না। পুষ্পপুরের উৎসব উপলক্ষে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কি অদ্ভুত বিধাতৃ-দ্বন্দ্বের অভিনয় করিলেন। এই নাটকে চাণক্যের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কোন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রগুরুর এরূপ জীবন্ত চিত্র জগতের সাহিত্যে আর একখানিও নাই। উইলসন্ সাহেব মুদ্রারাক্ষসের ইংরেজী অনুবাদের উপসংহারে বলিয়াছেন, "The plot of the Drama singularly conforms to one of the unities, and the occurrences are all subservient to one action—the execution of Raksha This is never lost sight of from first to last, without being made unduly prominent It may be difficult in the whole range of dramatic literature to find a more successful illustration of the rule * * * The succession of incidents is active and interesting, although women form no part of the Dramatis Personæ, except in the episodical introduction of Chandan Das's wife, a peculiarity that would be scarcely possible in the dramatic literature of Europe (p 351).—ইহার মর্ম্মার্থ এই যে "মুদ্রারাক্ষসে নাটকের মূল ঘটনার প্রতি সর্ব্বত্র লক্ষ্য আছে, অথচ সেই লক্ষ্যের উপর নাটককার কখনই অসঙ্গতভাবে জোর দেন নাই,

ঘটনার মূল কেন্দ্র রাক্ষস মন্ত্রীকে চন্দ্রগুপ্তের দিকে টানিয়া আনা গ্রন্থকার সেই লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত হন নাই, এই লক্ষ্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন নাটকের সমস্ত ঘটনার একাদশ কেন্দ্রগতি. জগতের নাটকীয় সাহিত্যে বিরল নাটকে একবারমাত্র কার্যোপলক্ষে চন্দনদাসের স্ত্রী উঁকি মারিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর কোন স্ত্রীচরিত্র নাই অথচ পরপর ঘটনার সন্নিবেশ হেতু নাটকখানি সর্বক্ষণ সক্রিয় ও কৌতূহল-উদ্দীপক এই বৈশিষ্ট্য ইংরোপের কোন নাটকে সম্ভবপর নহে।" (২৫৪ পৃঃ)

বঙ্গদেশের সঙ্গে চাণক্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কিছুদিন পূর্বেও চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করিয়া পাঠশালার ছেলেরা লেখাপড়া শুরু করিত পণ্ডিতদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে এমন সাধারণ গৃহস্থ, এমন কি একটু উচ্চ শ্রেণীর চাষী নাই যে চাণক্যের দুই একটি শ্লোক আবৃত্তি না করিতে পারে গিরিব্রজ ও পাটলীর সভ্যতার খুব বড় ঢেউ আমাদের দেশে আসিয়াছিল—পাটলিপুত্রের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৈভবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী বাঙ্গালীরা চাণক্য শুধু চন্দ্রগুপ্তের নহেন, তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজসভায়ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। যে সকল শ্লোক বাঙ্গলাদেশে চাণক্যের রচিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়

বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে চাণক্যের সম্বন্ধ

অশ্বঘোষ যেখানে একত্রিত সমবেত হইয়াছিলেন এবং সমস্ত আর্যাবর্ত, এমন কি দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ বিজয় করিয়াছিলেন—সেইখানে উত্তরকালে মহানন্দ-পদ্ম এরূপ এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার বৈভব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া তৎকালে পাশ্চাত্ত্য জগতের সর্বপ্রধান জাতি গ্রীকেরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন পূর্বেই বলা হইয়াছে নন্দকে পুরাণকারের ভার্গবের সঙ্গে উপমা দিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (২৯৮ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত), আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সেনাপতিরা এ্যান্টিগোনাস ও সেলিউকস তাঁহার এসিয়া মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যের অধিকার লাভের জন্য পরস্পর শত্রুতাসাধনে নিযুক্ত হন। সেলিউকস প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া ৩১৬ খৃঃ অব্দে বাবিলন অধিকার করেন এবং অল্পকালের মধ্যে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এসিয়ার পশ্চিম ও মধ্যাংশ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল এবং ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেলিউকস নিকেটর অতঃপর ভারত বিজয়ের উদ্দেশ্যে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়াই চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন সেলিউকস মৌর্যসম্রাটের হস্তে ভারতের অন্তর্ভুক্ত পারোপনিসদই (কাবুল), এরিয়া (হেরাট) ও এ্যারাকোসিয়া (কান্দাহার, প্রভৃতি রাজ্য অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। এরূপ উক্ত আছে, সেলিউকস নাকি তাঁহার এক কন্যা চন্দ্রগুপ্তকে উপঢৌকনস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। গ্রীক সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামক

এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়াছেন এবং সমসাময়িক ভারত-সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন চন্দ্রগুপ্তের ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৯,০০০, হস্তী, ৬০০,০০০ পদাতিক ও বহু যুদ্ধরথ ছিল গ্রীকদূত পাটলীপুত্র নগর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এই নগর ৯০ মাইল এবং ইহা দুই মাইল প্রস্থ। সমস্ত নগরটি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত এই প্রাকারে ৫৭০টি গগণ আছে এবং ইহার তোরণের সংখ্যা ৬৪টি" বিন্সেণ্ট স্মিথের মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের সীমা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

আফগানিস্থানের পেরোপামিসাস পর্ব্বত হইতে ভারতের যুক্ত প্রদেশ (আগ্রা, অযোধ্যা, বিহার, কাথিওয়ার, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ)। স্মিথ বলেন, আফগানিস্থান এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশ জয় করিয়াছিলেন তিনি মহাভূতের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের বশবর্তী হইয়া বলেন যে ভবত মহ পুর পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল নন্দবংশের অভ্যুদয়ের সমস্ত ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান যে তাঁহার অধীনস্থ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্ত ৩২২ খৃঃ পূঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ২৯৮ খৃঃ পূঃ স্বর্গারোহণ করেন তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন

স্মিথের ভারতের ইতিহাস, পৃ. ১৬৮ ঃ পৃ।

চন্দ্রগুপ্ত উত্তরকালে জৈনধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার জৈন গুরু ছিলেন, ভদ্রবাহু ভদ্রবাহুর বাড়ী ছিল বঙ্গদেশের অন্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে একসময়ে দৈবজ্ঞের গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, উত্তর-ভারতে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইবে। এই গণনার অব্যবহিতকাল মধ্যেই উক্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার প্রজাদের বাসের জন্য উর্ব্বর স্থান খুঁজিয়া বহু জৈন শ্রমণসহ মহীশূর পর্য্যন্ত গিয়া ছিলেন তাঁহার গুরু ভদ্রবাহু এইসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হন তাঁহার প্রজাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি মহীশূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন, কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার নিজের জন্য জীবনধারণে বেশী অসুবিধা হইতে লাগিল, এবং ২৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি মহীশূর উপত্যকায় প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের নীচে ছিল আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেলিউকসের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল এবং তিনি গ্রীকদের কাপিশা বাক্‌ট্রিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ, সেলিউকস্ তাঁহার কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন মুদ্রারাক্ষসে প্রায়ই যবন সৈন্যদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সংশ্রবের কথা উল্লিখিত আছে। ভারতের এই যুগে গ্রীক ও হিন্দু—জাতের এই শ্রেষ্ঠ সভ্যজাতির বিশেষরূপ মিলন হইয়াছিল। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বদা শস্ত্রবেষ্টিত হইয়া একটি দিনের বেশী রাজ-প্রাসাদের কোন এক প্রকোষ্ঠে রজনী যাপন করেন নাই।

প্রায়োপবেশনে মৃত্যু।

ভারতীয় রাজগণের এই ভাবের অপূর্ব্ব জীবনের দৃষ্টান্ত অন্যত্র কোথায় পাইব? আজ যিনি বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্, কাল তিনি যোদ্ধৃবেশ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী চন্দ্রগুপ্ত জীবের

দুঃখে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার জগৎবিশ্রুত বংশধর অশোক শুধু তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার অসাম্প্রদায়িক-লোকহিতৈষণা, প্রজাবাৎসল্য ও অহিংসাবৃত্তির বীজও তাঁহার শোণিতেই ছিল। সেই গুণগ্রামের জীবন্ত নিদর্শন, প্রস্তর-স্তম্ভে ও শিলা-পাত্রে এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিন্দুসার ও অশোক

"অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গাঙ্গার অবধি জলধি-শেষ,
তুই কিনা যাগো তাদের জননী, তুই কিনা যাগো তাদের দেশ!"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের উপাধি ছিল "অমিত্রঘাত।" তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশ বিজয় করিয়াছিলেন। লামা তারানাথ বলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপক ছিল, ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রীকরাজ এ্যান্টিওকাসের সোটারের সঙ্গে বিন্দুসারের বাণীবিনিময়সূচক পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল, গ্রীকদূত ডেমিওকাস তাঁহার সভায় আসিয়াছিলেন। ইজিপ্টরাজ টলেমির দূত এই সময়ে পাটলীপুত্র রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিন্দুসার ২৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজা হইয়া ২৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিন্দুসার ২৯৮-২৭৩ খৃঃ পূঃ

সোমবংশতিলক দেবতাদিগের প্রিয় মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকবর্দ্ধন ২৭৩ হইতে ২৩২ পর্য্যন্ত ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কীর্ত্তিকথা বাল্মীকি তাঁহার অমর কাব্যে লিখিয়াছেন, পাণ্ডবদের গাথা ব্যাস মহাভারতে কীর্ত্তন করিয়াছেন, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে সাক্ষাৎ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের জীবন-আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু বিবিধ অবদানে অশোকবর্দ্ধনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইলেও তাহারা তাঁহাকে অমর করিতে পারে নাই, তিনি নিজের ধর্ম্মকথা পাথরে উৎকীর্ণ করিয়া যে দেবত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি নিজেকে নিজে অমর করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী কোন দৈববরে অমর হন নাই, তিনি স্বকীয় কর্ম্ম-প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

অশোক ২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ

দীপবংশ ও মহাবংশে মগধের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রাজগণের বংশলতা এই পুস্তকের ১৪৩৪৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। অশোক সমেত এই বংশের ২০ জন রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। দিব্যাবদানের তালিকার সঙ্গে এই তালিকার গরমিল আছে দিব্যাবদানের তালিকা এইরূপ—১। বিম্বিসার ২। অজাতশত্রু ৩ উদায়িভদ্র ৪ মুণ্ড ৫। কাকবর্ণী

ভিন্ন ভিন্ন বংশতালিকা।

অশোক।

৬। সহলী ৭ তুলকুচি ৮। মহাজগুল ৯ প্রসেনজিৎ ১০। নন্দ ১১। বিম্বিসার ১২। অশোক ১৩। কুনাল ১৪। সম্প্রতি ১৫। বৃহস্পতি ১৬। বৃষসেন ১৭। পুষ্যধর্ম্ম ১৮। পুষ্যমিত্র।

বিষ্ণুপুরাণের তালিকা এইরূপ—শিশুনাগ বংশে ১ শিশুনাগ ২। কাকবর্ণ ৩। ক্ষেমধর্ম্ম ৪। ক্ষেত্রজ্ঞেন ৫ বিম্বিসার ৬ অজাতশত্রু ৭। দর্শক (হর্ষক) ৮। নন্দীবর্দ্ধন ৯। মহানন্দী ১০-১৮। তাঁহার ভ্রাতা মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁহার আট পুত্র ১৯। (মৌর্য্য) চন্দ্রগুপ্ত ২০। বিম্বুসার ২১ অশোক ২২ সুযশ ২৩। দশরথ।

জৈন স্থবিরাবলী চরিত্রে ইহা ছাড়া শ্রেণিক, কুনিক, উদায়ী এই তিন রাজার নাম উল্লিখিত আছে।

এই কয়েকটি বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে যে অনৈক্য দৃষ্ট হয় তাহা নিম্নলিখিত কারণগুলির ফল হইতে পারে। এক রাজা কখনও ভিন্ন ভিন্ন নামে

অভিহিত হইতেন, কেহ বা তাঁহার প্রচলিত নাম আর কেহ বা তাঁহার উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন (যেমন—সেলিম ও জাহাঙ্গীর)। দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বা রাজার ভ্রাতার নাম ও বংশাবলী দিয়াছেন। রাজকুমারেরা প্রায় সকলেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন এবং রাজবংশের মর্যাদারক্ষার্থে রাজা বলিয়াই গণ্য হইতেন। তৃতীয়তঃ, পুরাণকারদের হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে নাম সম্বন্ধে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অপরাপর কথা পাঠক না বুঝিতে পারিলেও অনুমান করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি ও স্থানের নাম সম্বন্ধে লেখা না পড়িতে পারিলে পাঠকগণের ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং পুঁথিলেখকদের এই সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ, যাঁহারা যে রাজবংশের সঙ্গে বিশিষ্টরূপে ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ তাঁহারা সেই বংশের তালিকা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ এবং দিব্যাবদানের বংশাবলী অনেকটা একরূপ,—কিন্তু যাঁহারা সেই বংশের সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা অনেক সময় কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ করিয়াছেন।

আবিষ্কার কারণ।

কিন্তু তথাপি এই সকল বংশাবলী সুদূর অতীত কাল হইতে এতটা যে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। যুধিষ্ঠিরের সময়ের সঙ্গে এই বংশাবলী রক্ষিত সময়ের খুব বেশী ব্যবধান নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের রাজগণের একটা ধারাবাহিক বংশলতা আমরা পাইতেছি। কতকটা ভুল থাকা অনিবার্য্য, জগতে কোন্ জাতিরই বা অতিসুদূরের সময়ের এরূপ ইতিহাস আছে? যে সময় হইতে পুরাণ লেখা বন্ধ হইয়া গেল, ভাগ্যক্রমে সেই সময় হইতে আমরা মুদ্রা, তাম্রশাসন ও শিলালেখ প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। এখনও ভারতীয় ইতিহাস লিখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বিদেশীয়দের সাহিত্যে আমরা আরও অনেক উপাদান পাইব বলিয়া আশা করি। এদেশেরও উপাদানও যথেষ্টরূপে সংগৃহীত হইতে আরও দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার দরকার হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশোক সম্বন্ধে অপবাদ

অশোক মগধরাজ বিন্দুসারের পুত্র, তিনি শুভদ্রাঙ্গী নাম্নী পরমা সুন্দরী এক ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অশোক দেখিতে কুৎসিত ছিলেন, এজন্য রাজা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। রাজার প্রিয় পুত্র ছিলেন সুসীম। অশোক তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়া পথে সংগৃহীত সৈন্য

ভ্রাতৃহত্যা।

সামন্ত লইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন। বিন্দুসারের ঐ সময় মৃত্যু হইয়াছিল—অশোক রাজধানীর তোরণ বন্ধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে কৌশলক্রমে সুসীমকে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার হত্যাসাধন করেন। রাধাগুপ্ত নামক এক মন্ত্রী অশোককে বিশেষ সহায়তা করেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলি হইতে এই কথাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহলের মহাবংশে বিস্তারিতভাবে অশোকের জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থানুসারে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বৎসর কাল মগধ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অশোক তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে নানা কৌশলে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুবরাজ "সুমন" ও তাঁহার ৯৯ জন ভ্রাতাকে হত্যা করেন। কেবলমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

সুমনের পত্নী পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন—স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, নিগ্রোধ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। চণ্ডালেরা তাঁহাকে পালন করে। কিন্তু অল্পবয়সেই বালকুমার বোদ্ধসমবলম্বীদের কৃপা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে শৈরিক-পরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল এই বালকই অশোকের চিত্তে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দেয়।

পাঁচ শত অমাত্যের শিরশ্ছেদ।

অশোক-অবদানে তাঁহার ভ্রাতৃহত্যার কোন উল্লেখ নাই কিন্তু তাঁহার অতিশয় নৃশংসতার অনেক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে; কথিত আছে—একদা মন্ত্রিসভা তাঁহার কোন মতের প্রতিবাদ করিয়াছিল, এজন্য তিনি স্বহস্তে পাঁচ শত অমাত্যের শিরশ্ছেদ করেন। তাঁহার অন্তঃপুরের মহিলারা একদা জনৈক ভাস্কর্য্যকারের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ব্বক একটা পত্রপুষ্প অশোক বৃক্ষ অঙ্গভঙ্গী সহকারে দেখাইয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাহা জানিতে পারিয়া পুরমহিলাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করেন। তাঁহার এই ভীষণ কার্য্য দর্শন করিয়া অনেক মন্ত্রী তাঁহাকে স্বহস্তে এই সকল নৃশংস কার্য্য করিতে নিষেধ পূর্ব্বক একটা জল্লাদ রাখিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি 'চণ্ডগিরিক' নামক তন্তুবায়কুলে জাত এক জল্লাদ নিযুক্ত করেন। বাহিরে কারুকার্য্যময় একটা অতি সুদর্শন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তিনি চণ্ডগিরিকের দ্বারা লোকহত্যা করিতেন। সেই গৃহ দর্শনার্থিগণ লুব্ধ হইয়া তথায় প্রবেশ করিলে তখনই চণ্ডগিরিকের হস্তে তাহাদের নিধন সম্পাদিত হইত। এই বধাগৃহের নাম ছিল 'নরক'।

পুরমহিলাদিগকে দাহ।

নরক

এইরূপ শত কলঙ্ক অশোক চরিত্রে আরোপ করা হইয়াছে। ভারতীয় আখ্যান-গুলিতেই এইরূপ কাহিনীর প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, তিনি এই অতি নৃশংস চণ্ডনীতি অনুসরণ করার জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল "চণ্ডাশোক।" চণ্ডাশোক শেষ সময়ে "ধর্ম্মাশোক" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

চণ্ডাশোক—ধর্ম্মাশোক

উপরি উক্ত যে সকল কলঙ্কের কথা তাঁহার নামে আছে, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকিতে পারে। এতগুলি বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত আখ্যান একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা পরে দেখাইব, তাঁহার প্রতি ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের কারণ ছিল, তাঁহারা কতকগুলির সৃষ্টি করিয়া

থাকিবেন। বৌদ্ধগণও তাঁহাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য কতকগুলি আখ্যান রচনা করিতে পারেন। তাঁহাদের ধর্ম্মবলে কত বড় পাষণ্ড যে কত বড় সাধুতে পরিণত হইতে পারে তাহাই হয়ত প্রদর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও তাঁহার প্রিয় মন্ত্রীদিগকে প্রথমতঃ হত্যা করিয়াছিলেন, সেই কাহিনীগুলি অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া এইরূপ আখ্যায়িকার আকার ধারণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু যেরূপ রাশি রাশি কুকর্ম্ম তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, তাহার সিকিভাগও যদি সত্য হইত, তবে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী কি কখনও অনুতপ্ত হইতেন না? কলিঙ্গক্ষেত্রের সামরিক অভিযানে রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধে কতকগুলি লোক হত্যা করিয়াছিলেন—তজ্জন্য তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী অনুতাপ পাথর পাত্রের উপরে অক্ষয় অক্ষরে ব্যক্ত রহিয়াছে, আর নিজের আত্মীয় স্বজনদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া কি তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুতপ্ত হইলেন না? এদিকে এইরূপ পরস্পরবিরোধী যুক্তি তর্ক সত্ত্বেও আমরা একথা বলিতে পারি না যে তিনি নিষ্কলঙ্ক। যুধিষ্ঠিরও মিথ্যাচার করিয়াছিলেন, ধর্ম্মাশোকও প্রথম-জীবনে হয়ত রাজ্যলোলুপ হইয়া কতকগুলি হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মগধের রাজা অজাতশত্রুর নামেও পিতৃবধের কলঙ্ক আছে। ধর্ম্ম যে মানুষজীবনে কি অদ্ভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, তাহার উদাহরণ এদেশের ইতিহাসে অনেক আছে। রত্না রত্নাকর প্রথমে চণ্ডাশোকের মতই নৃশংস ছিলেন। তিনিই না শেষে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির মৃত্যু দেখিয়া করুণাবিগলিতহৃদয়ে অপূর্ব্ব ছন্দে কাব্যকথার জন্ম দিয়াছিলেন? প্রাচীন উপাখ্যান বাদ দিলেও আমাদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বনবিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, গৌড়ধারাধিপ চাঁদরায়, নবদ্বীপের রাজকুমারদ্বয়, জগাই-মাধাই, রত্না নাতোকি, জীবলণ্ঠ কেন্দ্রা যাবমুখী রত্না কেনারাম প্রভৃতি বহুলোকের জীবন এই মহাসত্য প্রমাণ করে। অন্ধকার রজনীর অবসানে যেরূপ তপনের উজ্জ্বল আলো ফুটিয়া উঠিয়া জাগতিক দৃশ্য উজ্জ্বল করে, নৈষ্কর্ম্মপায় প্রাক্তনের শুভ ফলে হঠাৎ কোন কোন ব্যক্তির জীবনে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়—যখন কলঙ্কিত জীবন নিষ্কলঙ্ক হইয়া অমল-ধবল রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের চক্ষে স্বর্গীয় সুষমা প্রকাশ করে।

উপগুপ্ত।

অশোকের বহু ধর্ম্মগুরু ছিলেন। তন্মধ্যে উপগুপ্তের নামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি চম্পা (অঙ্গের রাজধানী), নগরের প্রধান বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন,[১] কিন্তু সুদূরান্তরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তৎসম্বন্ধে বহু প্রবাদ ও উপাখ্যান মথুরা, কাশ্মীর, এমন কি মঙ্গলিয়ায়ও প্রচলিত আছে। বৌদ্ধগ্রন্থে নানাবিধ আখ্যায়িকা দ্বারা তাঁহার জীবনের ত্যাগ ও ধর্ম্মবিশ্বাস দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে একটিকে কতকটা রূপান্তরিত করিয়া রবিবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত' কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে অশোকের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধদেবের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, অশোকের মত দাতা কেহ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দান অর্ঘ নহে—তিনি স্বীয় প্রিয়তম সুদর্শন তরুণ পুত্র মহেন্দ্র। মতান্তরে কনিষ্ঠ

ভ্রাতা) ও অষ্টাদশবর্ষীয়া রূপসী কন্যা (মতান্তরে কনিষ্ঠা ভগিনী) সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধসঙ্ঘে ভিক্ষুসম্প্রদায়কে দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিক্ষুধর্ম গ্রহণপূর্বক সিংহলে যাইয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্ঘমিত্রা আসল নাম নহে, সঙ্ঘে প্রবেশ করার পর তিনি এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অশোক-নীতি

এখন আমরা অশোকের অনুশাসনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কথিত আছে, অশোক ৮৪০০০ অনুশাসন বা ধর্মরাজিকা স্থাপন করেন।

উপনিষদের পরের যুগে ভারতবর্ষে যে নানা প্রকার মত প্রচলিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যে সকল মতের সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহা বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী যুগের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ পণ্ডঞ্জলের বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ জনসমাজের মধ্যে যে ঘোর আন্দোলন করিয়া বৈদিকধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল—তাহার প্রমাণ রামায়ণে পর্যাপ্ত দেখিতে পাই। অযোধ্যাকাণ্ডে শতভম সর্গে ৩৮-৩৯ শ্লোকে বেদবিরোধী শুষ্ক তর্কাশ্রিত অবিশ্বাসী রাক্ষসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে দৃষ্ট হয় নানারূপ কপালক ও উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল তখন খুবই সুবিধাজ করিয়াছিল। মহাভারতখানি ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে সত্যবতীর মৎস্যগন্ধা সন্তানের সহিত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে তিনি গ্রহগণের গতির কথা উল্লেখ করিয়া কালনির্ণয়ের এরূপ একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন যে মহাভারতের আধুনিক টীকাকার সেই সূত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, ভীষ্ম, দুর্যোধন প্রভৃতির কাহার কি বয়স ছিল—তাহার একটা ঠিকুজি করিয়া ফেলিয়াছেন। যে সকল প্রমাণ বলে মহাভারতের ভারতকৌমুদী নামক টীকা-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না। জ্যোতিষিক গণনা বলে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অর্জুনের ৭০ এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস বয়স ছিল।*

মহাভারতের প্রামাণিকতা।

* বোম্বাই নির্ণয়সাগর হইতে মুদ্রিত মহাভারতের ১৩০ অধ্যায়ে যে কয়েকটি শ্লোক দৃষ্ট হয়, তদনুসারে যুধিষ্ঠির ২৩ বৎসর, ভীম ১৫ বৎসর, অর্জুন ৯ বৎসর এবং নকুল ও সহদেব ১৩ বৎসর বয়সে হস্তিনাপুরে আসেন, সেখানে দ্রৌপদীর সহিত ১৩ বৎসর থাকেন। তারপর ৯ বৎসর বনবাস ও ১ বৎসর অজ্ঞাতবাস। এই ২২ বৎসর রাজ্য থাকার পর একচক্রা

মহাভারতের প্রতিপর্বশেষে কতটি অধ্যায় এবং শ্লোকে তাহা শেষ হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

১।	আদিপর্ব,	২২৭	অধ্যায়	এবং	৮৪৮৪	শ্লোকে	সম্পূর্ণ
২।	সভাপর্ব—	৭৮	টি	অধ্যায়	এবং	২৫১১	টি শ্লোক
৩।	বনপর্ব—	২৬৯	,,	,,	,,	১১৬৬৪	,, ,,
৪।	বিরাটপর্ব—	৬৭	,,	,,	,,	২০৫০	,, ,,
৫।	উদ্যোগপর্ব—	১৮৭	,,	,,	,,	৬৯৮	,, ,,
৬।	ভীষ্মপর্ব—	১১৭	,,	,,	,,	৫৮৮৪	,, ,,
৭।	দ্রোণপর্ব—	১৭০	,,	,,	,,	৮৯০৯	,, ,,
৮।	কর্ণপর্ব—	৬৯	,,	,,	,,	৪৯৬৪	,, ,,
৯।	শৈল্যপর্ব—	৫৯	,,	,,	,,	৩২২০	,, ,,
১০।	সৌপ্তিকপর্ব—	১৮	,,	,,	,,	৮৭০	,, ,,
১১।	স্ত্রীপর্ব—	২৭	,,	,,	,,	৭৭৫	,, ,,
১২।	শান্তিপর্ব—	৩৩৯	,,	,,	,,	১৪৭০৭	,, ,,
১৩।	অনুশাসনপর্ব—	১৬৬	,,	,,	,,	৮০৪৩	,, ,,
১৪।	অশ্বমেধপর্ব—	১৩০	,,	,,	,,	৩৩২০	,, ,,
১৫।	আশ্রমিকপর্ব—	৩২	,,	,,	,,	১১১১	,, ,,
১৬।	মৌসলপর্ব—	৮	,,	,,	,,	৩২০	,, ,,
১৭।	মহাপ্রস্থানিকপর্ব—	৩	,,	,,	,,	১২০	,, ,,
১৮।	স্বর্গারোহণপর্ব—	৫	,,	,,	,,	৩২৩	

শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ পুস্তকে সমস্ত বিষয় এক পরিষ্কারভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, সঙ্কলয়িতা পাঠকচিত্ত হইতে যথাসম্ভব দ্বিধার ভাব দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল এবং দুর্যোধনের সৈন্য সংখ্যা ছিল একাদশ অক্ষৌহিণী। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—একটি হাতী, একখানি রথ, পাঁচটি পদাতিক এবং তিনটি ঘোড়া—ইহাতে একটি পংক্তি হয় তিন পংক্তিতে এক সেনামুখ, এবং তিন সেনামুখে এক গুল্ম হয়। তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী এবং তিন বাহিনীতে এক পৃতনা হয়, তিন পৃতনায় এক চমূ তিন চমূতে এক অনীকিনী এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অক্ষৌহিণীতে রথের সংখ্যা করিয়াছেন ২১৮৭০, হস্তীর সংখ্যাও তাহাই। "হে পণ্ডিতগণ এক অক্ষৌহিণীতে পদাতিক সংখ্যা এক লক্ষ

গ্রামে এক বৎসর বাস করেন, হস্তিনাপুরে ফিরিয়া দুর্যোধনাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া পাঁচ বৎসর বাস করেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর পাশা খেলায় হারিয়া ১৩ বৎসর নির্বাসিত হইয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া যুধিষ্ঠির ১০৮ বৎসর ৮ মাস বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

নয় হাজার তিন শত পঞ্চাশ জানিবেন" (আদিপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯-২১ শ্লোক)। এই হিসাব অনুসারে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫৬০৯০০, কৌরব পক্ষে ২৪০৫৭০০। প্রধান অস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম দশ দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য পাঁচ দিন, কর্ণ দুই দিন, শল্য অর্ধ দিবস, ইহার পরে গদাযুদ্ধ হয় (আদি, ২য় অধ্যায়, ৩০-৩১ শ্লোক)। হর্কিন্স্ সাহেব দেখাইয়াছেন, মহাভারতের মধ্যে অসংখ্য লেখা বেদের অনুবৃত্তি মাত্র। যদিও মহাভারতে বিস্তর স্থানে কল্পনার লীলাখেলা দৃষ্ট হয়, আদি ইতিহাস-পূর্বযুগের চিরাগত কাহিনীগুলি বাদ দেওয়াও মহাভারতকারের পক্ষে সমীচীন হইত না। বহুমূলাগত সংস্কারের অস্তিত্ব— এমন কি একটা ঐতিহাসিক মূলাও আছে কিন্তু যিনি পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্যের এতটা পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনকালে কোন্ ঋষির মুখে সেই তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন কাল ও সৈন্যসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যিনি অতি মুক্তভাবে গণনা ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে চাহেন নাই, তিনি যে প্রধান নায়ক নায়িকাদের সম্বন্ধে অবাধ কল্পনা চালাইবেন, তাহার মনে হয় না। কুরুক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার কথা আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত কোটী কোটী লোকের হৃদয় হইতে একেবারে উড়িয়া যাইবে এবং মহাভারতোক্ত কতকগুলি কল্পনামাত্র এত বড় দেশের আশামর সাধারণ সত্য বলিয়া শুনিবে, এ কথা ত বিশ্বাস করা যায় না ওয়েবার ও ভিন্সেণ্ট স্মিথের পাণ্ডবগণের ব্যাখ্যার কোন প্রমাণ কি এ দেশে আছে? বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী দলের ত অসংখ্য শাস্ত্র আছে, কোন শাস্ত্রে কি ভীষ্মার্জুন ও বুদ্ধদেব কখনও ভূটিয়া বা মোঙ্গলিয়ান বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন? সাতসমুদ্রের ওপার হইতে পণ্ডিতেরা ব্যাসদেবের টীকি এমন কড়াভাবে ধরিলে আমরা সহ্য করিতে পারিব না। যদি প্রাচীনতম শাস্ত্রের কোন কোনটিতে পাণ্ডবদের নাম না থাকে তবে সেই অনুল্লেখই কি পাণ্ডবদের যুদ্ধের বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ?

মহাভারতের ঐতিহাসিক মূল্য এবং অন্যান্য মূল্য

মহাভারতে বৈদিক কাল হইতে আগত সমস্ত ধর্মমতের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে। অশোকের অনুশাসন আলোচনা করিতে হইলে কোন্ কোন্ কথায় তিনি পূর্ববর্তী যুগের রাজাদের আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই বিচার্য। আমরা এক যুগকে 'আঁধার যুগ' বলিয়া এবং অপরকে 'আলোকের যুগ' নাম না দিয়া আসি অথবা চোখ বুজিয়া পথে চলিব না ভারতের চিন্তাশীলতার যে ধারাবাহিকত্ব আছে তাহা আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, এই ধারাবাহিকত্ব একটা সত্যকার বড় কথা, এ প্রচেষ্টা আমরা ইতিহাসের ছেঁকাপাতা জোড়া দেওয়ার মত মনে করি না।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শততম অধ্যায়ে ভরতকে রাজনীতি-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষে রামচন্দ্র তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন আবার মহাভারতের সভাপর্বে নারদ যুধিষ্ঠিরকে করিয়াছিলেন। এই দুই প্রসঙ্গ প্রায় এক, এমন কি কোন কোন

স্থানে রামকথিত রাজনীতি নারদের উপদেশের সঙ্গে প্রায় ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যাইতেছে ইহা ছাড়া রাজনীতি সম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে শুক্রনীতিসার, কামন্দকীয় নীতিসার, গৌতমসংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা, হারীতসংহিতা, অত্রিসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি বহু গ্রন্থে রাজনীতির আলোচনা রহিয়াছে—মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা তাহাদের মধ্যে বেশী প্রচারিত। এই সকল সংহিতাগ্রন্থ ছাড়া কালিকপুরাণ, দেবীভাগবত, অগ্নিপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি পুস্তকে নীতিসার আলোচিত হইয়াছে কয়েকবৎসর হইল কৌটিল্যশাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে এই গ্রন্থ রাজনীতি-সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে।

রাজনীতি ধর্মনীতি নহে।

এইসকল রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রায় একপ্রকার। রাজনীতি সর্ব্বদেশেই ধর্মনীতির পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার দাবী করিতে পারে না। রাজার শাসন প্রণালীর মূলেই রহিয়াছে সাম দান, ভেদ, দণ্ড। শত্রুদের ছিদ্রান্বেষণ, স্বীয় প্রবল প্রভাবের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু প্রতাপ লক্ষ্য করিলে রাজার ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা অবলম্বন, গুপ্তচরগণের দ্বারা সংবাদ-সংগ্রহ—এসমস্তই রাজনীতির অঙ্গীভূত। রামায়ণে লিখিত আছে, শুধু যুবরাজ, প্রধান মন্ত্রী ও রাজপুরোহিত ব্যতীত অপর সকল রাজকর্ম্মচারীর

রাজার গুপ্তচর ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।

প্রত্যেকের পাছে তিন তিনটি করিয়া গুপ্তচর থাকিবে, তাহারা সর্ব্বদা তাহাদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবে। এই গুপ্তচরেরা প্রধান সেনাপতি, অস্ত্রাগারাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী, বেতনাধ্যক্ষ, বেতনপ্রদানকারী, প্রধান বিচারপতি নগরাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমা-পালক দুর্গাধ্যক্ষ, ব্যবহারজীব প্রভৃতি সকলেরই পাছে পাছে থাকিয়া অজ্ঞাতসারে সংবাদ সংগ্রহ করিবে, প্রজাদের গতি-বিধি ও কথাবার্ত্তার সংবাদ দেওয়ার জন্যও গুপ্তচরেরা গণিকাদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত আনাগোনা করিত—ইহাও কোন কোন নীতিসংহিতায় দৃষ্ট হয় কৌটিল্য এই শাস্ত্রের অন্যতম গুরু, ইনি গুপ্তচরদের যে কার্য্যতালিকা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় রাজ্যের কেহই এই শ্রেণীর লোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কৌটিল্যের শাস্ত্রে যে উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতির অনুদৃষ্টি পাওয়া যায় জগতে ঐ শ্রেণীর সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই তথাপি তিনি যখন লিখিয়াছেন "যিনিই ক্ষমতাপন্ন, বৃদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য," "যিনি উত্তরোত্তর স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বকার সন্ধির নিয়ম পালন করা চলে না," "যে রাজা সন্ধির নিয়ম পালন করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহার প্রতিপক্ষকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে কারণ উভয়পক্ষ যদি তুল্যরূপ ক্ষমতাশালী হন, তবেই প্রকৃত শান্তি হইতে পারে। দুইটি লৌহখণ্ড তুল্যরূপ উত্তপ্ত না হইলে তাহাদের প্রকৃত মিলন ঘটিতে পারে না," ইহাই রাজনীতি। রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে ব্যবহারিক জীবনে এই নীতি পালনীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল চাণক্যনীতি পাঠ করিয়া অশোকের অনুশাসন পড়িলে মনে হইবে যেন আবদ্ধ গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুক্তাকাশের নীচে দাঁড়াইয়াছি। রাজ্যপালন ও রক্ষার জন্য কঠোরতা অপরিহার্য্য, তাহা হিন্দু রাষ্ট্রনীতিতে আছে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দুদের রাজনীতির আদর্শের মত উচ্চনীতি জগতের আর কোন জাতির ছিল না। এই সকল নীতি ক্ষত্রিয়গণ যথাসাধ্য পালন করিয়া চলিতেন।

হিন্দু রাষ্ট্রনীতি।

"যে ব্যক্তি তোমারই আমি' এই কথা বলে, পাশুপতে কৃতাঞ্জলি, যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়মান, সুপ্ত, ধ্বনমত্ত পূজাদিত, নিরস্ত্র বর্মহীন রথ পরিত্যাগপূর্বক ধূলাহত এরূপ লোক অবধ্য" (মনু ৭ম অধ্যায়)। উক্তরূপ ব্যক্তিকে যে হত্যা করে সে ব্রহ্ম হত্যাকারী বলিয়া কথিত হয়। মহাভারতে লিখিত আছে "দুর্বল লোক ভয়বশতঃ উপস্থিত হইলে শত্রু আসিয়া শরণাগত হইলে কিংবা কোন লোক যুদ্ধে বিমুখ হইলে তাঁহাদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিতে হইবে" (সভা ৫ম অঃ, ৫৬ শ্লোক)। ইলিয়ড কাব্যে লিখিত আছে শত্রুপক্ষের কোন বিজিত রাজকুমার ইউলিসিসের পাদমূলে নিপতিত হইয়া প্রাণের ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাজ্ঞানী ইউলিসিস তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। উক্ত কার্য্যসম্বন্ধে সে দেশের সুধী সমাজ সিদ্ধান্ত করিলেন যে জ্ঞানী শিরোমণি ইউলিসিস সে পর্য্যন্ত যতগুলি কার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার এই কার্য্যটিই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হেয়।

গ্রীক নীতি।

যখন বিদেশীয়দের সঙ্গে সম্বন্ধ উপস্থিত হইল, তখনই হিন্দুদিগের বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। যেহেতু যে ক্ষাত্রনীতি ভারতীয় রাজাদের মধ্যে অবলম্বিত ছিল, সেই নীতির যথোপযুক্ত পরিচয় তাহারা দেখান নাই। ভারতবর্ষের পরাজয়ের ইহাও অন্যতম কারণ। তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যশাসন এ সমস্তের মধ্যেই একটা মন্থরতা ছিল। একটা উদাহরণের উল্লেখ করিব। তাইমুরলেন ভারতের পশ্চিমাংশের কোন কোন স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার সৈন্য সিন্ধুর সেই সকল দেশের অধিকার রাখিতে পারেন নাই। কন্নর নামে এক হিন্দু রাজা স্বাধীন হইলেন এবং সিন্ধুরা তাঁহাকে সাতবার আক্রমণ করিয়াও পরাজয় করিতে পারেন নাই, প্রত্যেক বারই সিন্ধুরা পরাস্ত হইয়াছিলেন। শেষবার কন্নরের হাতে পরাজিত হইয়া তিনি বন্দী হন। হিন্দু রাজা শত্রুপক্ষ শত্রুকে মুক্তিদান করিলেন, কেবল একটি মাত্র সর্ত্ত রহিল, যেন তাতার-রাজ আর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ না করেন এবং রাজত্বের দাবী উত্থাপন না করেন।

সিন্ধুরা নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় তাঁহার উপরক্ষত্র শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবার ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে ফিরিল, কন্নর বন্দী হইলেন। সিন্ধুরা বন্দীর চক্ষু দুটি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিলেন। ক্ষাত্রনীতি অনুসারে কন্নর শরণাগত শত্রুকে পুত্রবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্দীর শত্রু তাঁহার হৃদয়হীনতা ও পশুভাব দেখাইতে ছাড়িল না। কিন্তু কন্নর এই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ দিলেন। সিন্ধুরার বিশ্বাস ছিল তাঁহার মত লক্ষ্যভেদ করিতে পারে এরূপ লোক জগতে নাই; একদা তিনি শুনিলেন, অন্ধ হইলেও কন্নররাজ কোন স্থানে শব্দ মাত্র শুনিলে তাহা না দেখিয়া শব্দভেদী বাণ দ্বারা লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন। সিন্ধুরা বন্দীকে সম্মুখে আনিয়া এই গুণের পরীক্ষা

দিতে বলিলেন। কঙ্কর বলিলেন, "আমি আপনার দ্বারা পরাস্ত হইয়াছি—আপনি আমার বিজয়ী, অন্য কাহারও মুখোচ্চারিত বাণী আমি শুনিব না, আপনারই আমাকে আদেশ করিতে হইবে।" মিত্রচা লক্ষ্যস্থান স্থির করিয়া কঙ্করকে আদেশপূর্বক যাই সরিয়া পড়িলেন, তৎপূর্বেই কঙ্কর-চক্ষুর্নিক্ষিপ্ত বাণ তাহার বক্ষ ভেদ করিল। এই ভাবে ১৪৫১ খৃঃ অব্দে মিত্রচা মৃত্যুমুখে পতিত হন (মোগল ইতিহাস, ঐ এস্ কারটনপ্রণীত, প্রথম সংস্করণ, লণ্ডন ১৭৩৯, বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৯—৩১ পৃঃ)। এই পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হিন্দুরা আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বেচ্ছায় অপর কাহারও রাজ্য আক্রমণ করিতে যায় না।

এই ক্ষাত্রনীতি যে কিরূপ দৃঢ়ভাবে রাজগণ পালন করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহারাজ জরাসন্ধের বধ-সাধনার্থে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জুন ছদ্মবেশে গিরিব্রজপুরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ গুপ্তচরের মুখে জানিয়াছিলেন যে ইহারা গুপ্তদ্বার দিয়া তাঁহার চৈত্য ও চৈত্য ভঙ্গ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যে জরাসন্ধের পরাক্রম এরূপ ছিল যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈন্যের সঙ্গে যদি আমাদের যদুকুল অবিশ্রান্ত তিন শত বৎসর যুদ্ধ করে, তথাপি তাহার কিছু মাত্র ক্ষয় করিতে পারিবে না,—ভারতের তৎকালীন সেই অদ্বিতীয় সম্রাট তাঁহার শত্রুদের পরিচয় পাইয়াও ক্ষাত্রনীতি লঙ্ঘন করিলেন না, তিনি এই তিন অতিথি যুদ্ধকামী হইলে তন্মধ্যে ভীমকেই বিশেষ বলবান্ মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যেহেতু মল্লযুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে শারীরিক বলেরই অধিক দরকার। কৃষ্ণকে তিনি মনে মনে 'দাস' বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এজন্য উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জুনকে তিনি ধর্মকার্যে রতী হইয়া উপবাসী হইয়াছিলেন, সেই উপবাসক্লান্ত দেহেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বৃহৎ চমূ উপস্থিত ছিল, কিন্তু ক্ষাত্রনীতি পালন করিয়া সংগ্রামে তিনি মৃত্যু করিয়াছিলেন। প্রলয়পয়োধি যেরূপ বেলা অতিক্রম করেন না, ক্ষাত্রধর্মনীতি সেইরূপ সীমা উল্লঙ্ঘন করেন নাই, আমরা এই কথা ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয়াছি। এই ক্ষাত্র নীতি পালন করিয়া যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইলেন। যেহেতু দ্যূত-কার্য্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অনুমোদন করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না। যাঁহারা যমের মত ভীষণ, ইন্দ্র ও প্রলয়ের মত দুর্দ্ধর্ষ—সেই ভীমার্জুন মেষপালকের মত যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনবাসী হইলেন, রাজনীতি ও রাজ-পরিবারে পালিত চিরাগত নীতির সংস্কার তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

হিন্দু রাজনীতি উচ্চাঙ্গের ধর্মনীতি হইলেও ইহা কোনকালে

হিন্দু রাজনীতি উচ্চাঙ্গের ধর্মনীতি আছে, কিন্তু তথাপি রাজনীতি কোনকালেই একেবারে শুভ্র চন্দ্রকিরণবৎ হইতে পারে না। সেখানে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে হইবে, শত্রুর পরাজয় ইচ্ছা করিতে হইবে ও প্রজাবিপ্লবকে দমন করিয়া রাখিতে হইবে, সেখানে যোগি-ঋষির ধর্ম চলে না।

চাণক্য-শাস্ত্রে ধূর্ত্ততাকে সদ্‌গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বাহুবল হইতে ছল-কৌশল ভাল, কারণ যিনি কৌশল ও কূটনীতিতে অভিজ্ঞ, তিনি আপনার হইতে শ্রেষ্ঠ বিক্রমশালী ছুর্জ্জয় প্রতিপক্ষকেও অনায়াসে জয় করিতে পারেন (অর্থশাস্ত্র, ১ম অধ্যায়, ১ পৃঃ)। এখানে চাণক্য তাঁহার নিজ জীবনের একান্তের সফলতার ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র। তিনি বন্দীর মুখ হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য অষ্টাদশ প্রকার অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অনায়াসে লিখিয়া গিয়াছেন—"প্রত্যহ একটি একটি করিয়া নূতন যন্ত্রণা দেওয়া যাইতে পারে এবং দরকার হইলে এক সময়ে এক বন্দীর উপর সর্ব্বপ্রকার পীড়ন প্রয়োগ করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে।" আমাদের সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রই তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুশাসনগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়া থাকে। কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েও বন্দীর স্বীকারোক্তির জন্য তাহার উপর পীড়ন চলিত। অর্থশাস্ত্রের নীতিগুলির কত অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতির পুনরাবৃত্তি, এবং কতগুলি মৌলিক, তাহা বলা যায় না।

এই অর্থশাস্ত্র যে সকলেরই অনুমোদিত ছিল, তাহা নহে। বিশ্বজয়ী সম্রাটের পক্ষে কতকগুলি অপরিহার্য্য আইন প্রচলিত করিতে হয়, কিন্তু তাহা সকলের মনঃপূত বা অনুমোদিত হইবার কথা নহে। শীরবের বড় বাদশাহ অর্থশাস্ত্রের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—"কৌটিল্যের নির্দ্দয় ও নিদারুণ রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কে অনুমোদন করিবে? তাহাতে রাজাদের এরূপ মন্ত্রী রাখিতে হইবে যাঁহারা প্রতারণা-শাস্ত্র ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শী যাহাতে তুচ্ছ অর্থলাভের জন্য অর্থমন্ত্রীর পরে প্রাণের অর্ঘ্য ঢালিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উন্নতিকল্পে সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের ধ্বংসে নিশ্চিন্ত এবং যাহাতে সহোদরগণ এবং যাহারা স্বাভাবিক স্নেহ-প্রেমে মানুষের সঙ্গে আবদ্ধ, তাহারাই ধর্ম্মভূমির উপযুক্ত বলি-স্বরূপ।"

কৌটিল্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু স্মৃতিকারের মতামত আলোচনা করিয়া তাঁহার গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন "পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা প্রাচীন নরপতিগণের রাজ্যশাসনে সহায়তা করিবার জন্য যে বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া পরিশিষ্ট-স্বরূপ এই অর্থশাস্ত্র লিখিত হইল" (১৩শ খণ্ড ১ম অধ্যায়)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অশোক-অনুশাসন

কিন্তু অশোকের নীতি এক অভিনব সামগ্রী। সমস্ত জগতে, এমন কি হিন্দুশাস্ত্রেও তাহার তুলনা নাই। তিনি সমস্ত নীতিশাস্ত্রের উর্দ্ধে উঠিয়া খুব একটা উচ্চ স্থান হইতে জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন। কি ভাবে রাজা শাসন করিতে হইবে, রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাই আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু কিরূপে রাজা শাসন করিতে হয়, অশোক তাহাই বলিয়াছেন। জগৎ তাঁহার চক্ষে একটা সাম্রাজ্য ছিল না—উহা ছিল একটি বৃহৎ পরিবার—তিনি উহা রক্ষা করিয়া কিরূপে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে একবারও ভাবেন নাই। কোন বৃহৎ পরিবারের শিরস্থানীয় ব্যক্তি কিরূপে সেই পরিবারভুক্ত সকলের মঙ্গল হইবে সর্ব্বদা তাহাই চিন্তা করেন, অশোকও স্বীয় রাজ্য-সম্বন্ধে সেইরূপই করিতেন। এই পরিবার কেবল মনুষ্য সম্প্রদায় লইয়া নহে, সমস্ত জীবই যেন সেই পরিবারভুক্ত ছিল। একটিমাত্র শিলালেখে দণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে। কোশাম্বী অনুশাসনে বলা হইয়াছে "ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দলে যে কেহ সঙ্ঘে ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনি শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন, এবং ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দলে মিশিতে পারিবেন না।" এই দণ্ডের অভিপ্রায় যে ব্যক্তি ভিক্ষুধর্ম্মের অযোগ্য, তাহার বৈরিক বাস পরা বিড়ম্বনামাত্র। ইহাকে 'দণ্ড' বলা ঠিক নহে, সঙ্ঘের মধ্যে শৃঙ্খলরক্ষার জন্য উহা একটি উপায়মাত্র কিন্তু তাঁহার এত বড় রাজ্যে কি লোক দণ্ড পাইত না? অবশ্যই পাইত, কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে পুনঃ পুনঃ সেই দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করাইবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা প্রজাপালক দেবমূর্ত্তিতেই দেখিতে পাই—শাসন-কর্ত্তৃরূপে নহে।

"সর্ব্ব প্রাণ হিংসা পরিহার"

নির্ব্বিঘ্নভাবে পশুবলির কাজ চলিতেছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞে দেশ পরিপ্লাবিত ছিল রাজা সমস্ত দেশ হইতে এই প্রথা উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেকালে তাহা অসাধ্যসাধন ছিল, একালেও কি তাহা নহে? তথাপি অপরিহার্য্য কিছু কিছু রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখিয়া অশোক পশুহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন জগতের এক ভগবৎকল্প ব্যক্তি এই পশু বধ দেখিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন, সমস্ত হৃদয়ে জীবহত্যার প্রতি লোকের ঘৃণা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই পুরাযুগে একমাত্র অশোকের চক্ষে যেমনই জীবকষ্টে সহানুভূতিজাত এক ফোঁটা করুণার অশ্রু পড়িয়াছিল, তাঁহার প্রায় সমস্ত শিলালিপিতে পশুহত্যা-নিবারণের প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। "পূর্ব্বে রাজ-রন্ধনশালায় রাজার ব্যঞ্জনের জন্য শতসহস্র প্রাণিহত্যা করা হইত—এখন তিনটি

মাত্র প্রাণী হত্যা করা হয়—পশ্চাৎ আর তিনটি প্রাণিও হত্যা করিতে দেওয়া হইবে না।" চতুর্দশ গিরিলিপি।। অইম শিলালিপিতে মৃগয়া-নিবারণের ইঙ্গিত আছে পঞ্চম স্তম্ভ-লিপিতে কয়েকটি রক্ষাকবচের উল্লেখ আছে কিন্তু সকলগুলিতে দুই হইবে, অশোকের জীবনের অন্যতম মহাব্রত ছিল—মৌন পশুজাতির কষ্টমোচন। এদেশে মাংসের প্রাচুর্য্য সর্ব্বজনবিদিত, মাংসপ্রিয় জনসাধারণকে মাংসাহার হইতে সেকালে নিবৃত্ত করা একান্ত অসম্ভব ছিল, তথাপি তিনি ধীরে ধীরে তাহাদিগকে নিবৃত্তির পথে আসিতে কতই না চেষ্টা করিয়াছেন "আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে, কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও প্রতিপদ এবং বৎসরের উপোসথ দিবসে মৎস্য বধ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না" পঞ্চম স্তম্ভলিপি।)

বৃষদিগকে যে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধেও তিনি ধীরে ধীরে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন ইক্ত লিপিতে বলা হইয়াছে—"পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিবসে প্রত্যেক চাতুর্ম্মাসিক পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিবসে এবং চাতুর্ম্মাস্যের শুক্লপক্ষে বৃষকে লৌহশলাকাদ্বারা কোনরূপ চিহ্নিত করিতে পারিবে না।" চতুর্দ্দশ গিরিলিপিতে অশোক 'সমাজ' সম্বন্ধে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন ঐ 'সমাজ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক লিখিয়াছেন—পশুদিগের মধ্যে নিষ্ঠুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিয়া পূজাকালে কোন বৃহৎ আঙ্গিনায় তাহাদের মারাত্মক ক্রীড়া দেখান হইত, এইরূপ উৎসবই সমাজ' শব্দের অভিপ্রেত। দুষ্টলোকের আচার ও মঙ্গলানুষ্ঠানের যে যে অংশে পশুহত্যার প্রথা ছিল, তিনি তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন। (নবম গিরিলিপি) তৎকৃত পশুচিকিৎসালয়ের উল্লেখ এই শিলালিপিগুলিতেই আছে।

তিনি পথে পথে যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, এবং কূপ খনন করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য তিনি সপ্তম স্তম্ভলিপিতে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন—পথে পথে বটবৃক্ষ সকল রোপণ করাইয়াছি উহারা পশু ও মনুষ্যগণকে ছায়া দান করুক। আম্রবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছি এবং অষ্টক্রোশ ব্যবধানে কূপ খনন করাইয়াছি এবং সেই সেই স্থানে জলদানের ব্যবস্থা করাইয়াছি। মনুষ্য ও পশুগণের উপকারের জন্য অনেক আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছি।" সপ্তম স্তম্ভলিপি)

তিনি শুধু তাঁহার নিজের প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন নাই,—হৃদয়ের শুদ্ধ বাৎসল্যভাব ও সহানুভূতি সীমাতে সন্তুষ্ট হয় না, কলিঙ্গ অনুশাসনে তিনি বলিয়াছেন "সকল মনুষ্যই আমার পুত্রতুল্য। আমার পুত্রেরা ঐহিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গল ও সুখের অধিকারী হউক, ইহা আমি যেরূপ ইচ্ছা করি তেমনই প্রার্থনা করি সকল মনুষ্যই সেইরূপ হউক।"

মনুষ্য ও পশু-চিকিৎসালয় তিনি শুধু স্বীয় রাজ্যের নানাস্থানে স্থাপন করেন নাই, ম্যাসিডোনিয়া এবং এ্যান্টিগোনেসের রাজ্য পর্য্যন্ত সুদূর পশ্চিম এবং দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত এই জাতের দাতব্য চিকিৎসালয় তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন "যে যে স্থানে

মনুষ্য ও পশুগণের উপকারক ঔষধ এবং ফলমূল নাই, সেই সেই স্থানে ঐ সকল সংগৃহীত ও রোপিত হইয়াছে।" (দ্বিতীয় গিরিলিপি।

তাঁহার ধর্মপ্রচারকগণকে তিনি তৎকালপরিজ্ঞাত জগতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়াছিলেন, টলেমি, মিশর (২৮১—২৪৬ খৃঃ পূঃ), ম্যাসিডনিয়ারাজ আন্টিগোনাস্ (২৭৭—২৩৯ খৃঃ পূঃ), সাইরিনীর মগাস (২৮৮—খৃঃ পূঃ মৃত্যু), এপিরসের রাজা আলেক্সন্দ্রস (২৭২—২৫৮ খৃঃ পূঃ—ইহাদের রাজ্যে তিনি মনুষ্য ও পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম কি তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—প্রধান ধর্ম্ম অহিংসা ও জীবে দয়া, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও দান দ্বারা সন্তুষ্ট করা, উপকার বৃত্তি ইত্যাদি। তাঁহার ধর্ম্মে আধ্যাত্মিকতা কিছুই ছিল না—তাঁহার প্রধান ভিত্তি সুনীতি, তিনি অতিরিক্তমাত্রায় স্বীয় ধর্ম্ম আস্থাবান্ ও কোন হেতুতেই পরধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন "অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষ হইতেই আমি সর্ব্বলোকের হিত ও সুখের জন্য এইরূপ ধর্ম্মলিপি লিখাইতেছি। তাহারা যাহাতে পূর্ব্বপাপ-আচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। এইরূপে আমি প্রজাগণের হিত ও সুখ দেখিয়া থাকি। আরও জ্ঞাতিদিগকে, প্রত্যাসন্নদিগকে এবং দূরবর্ত্তীদিগকে কি কি উপায়ে সুখী করিতে পারা যায়, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি। এইরূপ সর্ব্বভাবের ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি আমার লক্ষ্য থাকে। সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীকেই আমি বিবিধ প্রকারে পূজা ও সম্মান করিয়া থাকি, তথাপি আমার মতে স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগই শ্রেয়।" (সপ্তম স্তম্ভলিপি।) "আমার ধর্ম্মমহামাত্রগণ কি গৃহস্থ, কি উদাসীন সকলের জন্য এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা সঙ্ঘের কার্য্যেও নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ ও আজীবকগণের জন্যও আমি এইরূপ করিয়াছি। নির্গ্রন্থদিগের (জৈন সম্প্রদায়) জন্যও এইরূপ করিয়াছি। ইঁহারা তাঁহাদিগের জন্যও ব্যাপৃত আছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্যও এইরূপ করিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যেও ব্যাপৃত আছেন।"

একদিকে পারস্যের উপান্তভাগ, অপরদিকে বঙ্গ, বিহার ও আসাম, একদিকে গান্ধার ও হিমালয়ের উত্তর হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য, এই বিশাল রাজ্যের তিনি একচ্ছত্র অধীশ্বর, তাঁহার এতগুলি অনুশাসনের কোনটিতে এত বড় সাম্রাজ্য কি করিয়া রাখিতে হইবে কিংবা হস্তান্তরের বিধিব্যবস্থা কি প্রকারে হইবে এসম্বন্ধে একটি কথাও নাই। তাঁহার শিলালিপি পাঠ করিলে মনে হয় যে সুবিশাল এক পরিবারের পিতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি দিনরাত্র সমস্ত সন্তান পালনের চিন্তায় বিভোর হইয়াছেন স্নেহ, প্রীতি ও দয়াদ্বারা কি ভাবে তাহাদের জীবনের উন্নতি করিবেন, তিনি এই চিন্তায় ব্যস্ত। মনে হয় যেন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য একটি বিরাট চিকিৎসাশালা—তাহার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারিক্ সকলের আধিব্যাধি দূর করিতে ওষধি তৃণ গুল্ম খুঁজিতেছেন,—মনে হয় যেন কোন বিশাল মরুভূর পথের অধ্যক্ষ-স্বরূপ, তিনি প্রতি মাইল ব্যবধানে কূপ ও শীতল বিটপী ছায়ার

কিরূপে ব্যবস্থা করিবেন—তজ্জন্য চিন্তায় নিদ্রিত, আত্মরক্ষা, দুর্গসংস্কার, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যের কথা নাই। যেন ভারতবর্ষে হঠাৎ এক বিরাট উৎসবক্ষেত্র, মহাযাত্রা—কর্ণধারগণে সুখানুপুঙ্খরূপে কাহার কি দরকার তাহার সন্ধান নিতেছেন—যেন সমস্ত ভারতবাসী হঠাৎ এক মহোৎসবে চলিতেছে। পশুবলি নাই, নৈবেদ্যের ঘটা নাই, অনুষ্ঠানাদির বাহুল্য বা আড়ম্বর নাই। দুঃখীর দুঃখ বুঝিতে, আর্তের মর্মে সান্ত্বনা দিতে পৃথিবীর সমস্ত জীবের আতঙ্ক নিবারণ করিতে, দানসত্র খুলিয়া সর্বলোকের অভাব মোচন করিতে, পরস্পরের প্রতি করুণা শিখাইতে, মহাপুরোহিত সেই মন্দির হইতে অবিরত ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহার ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, কৌটিল্য, প্রচলিত রাজনীতি কোথায় আর অশোক রাজার রাজনীতি কোথায়? উভয় নীতির মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান। জগতের আর কোন্ দেশে এরূপ রাজা জন্মিয়াছেন তাহাও জানি না।

অশোক নিরবচ্ছিন্ন জগতের হিতার্থে উদ্যোগী ছিলেন, "সর্ব্ব লোক হিতের জন্য সতত জাগ্রত ও উদ্যোগী থাকা চাই। তাহাদের ইষ্টচিন্তা ছাড়া আমার কর্তব্য নাই, আমি জগতের কাছে যেন ঋণী হইতে পারি" (৬ষ্ঠ অনুশাসন)। পূর্বে রাজগণ মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন, তৎস্থলে অশোক ধর্মযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নব পবিত্র উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিলেন, "ব্রাহ্মণ, সাধু ও সন্ন্যাসিগণের সন্দর্শন, তাঁহাদিগকে দান করা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে স্বর্শন, পল্লীর লোকদিগের সঙ্গে মেলামেশা ও তাহাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করা, গ্রামে গ্রামে ধর্ম আচরিত হইতেছে কি না তাহার সন্ধান লওয়া আমার চক্ষুর এইগুলি মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্বে যে মৃগয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা হইতে এইরূপ নবল আনন্দদায়ক ও উৎকৃষ্ট।" (৪র্থ অনুশাসন)। তিনি প্রতিষ্ঠা চাহিতেন না—তাঁহার লক্ষ্য ছিল বহু উচ্চে স্বর্গের দিকে, সুতরাং লৌকিক যশের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যশ বা কীর্তির বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না" (নবম অনুশাসন।) তিনি যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে পূর্বেই লিখিয়াছি তাহা কঠিন অধ্যাত্ম বাদ নহে, সরল ও অবিসম্বাদিত সার্বজনীন সত্য। "ক্রীতদাস ও সাধারণ ভৃত্যদিগের প্রতি সদাশয়তা, গুরুজনের পূজা, প্রাণীদিগের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্যকে সাধুকার্য এবং এইরূপ অন্যান্য কার্যকে ধর্ম বলিয়া করে।" (নবম গিরিলিপি।) বাক্য-সংযমের উপর অশোক খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন—"সকল ধর্ম সম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু তাহার মূলে বাক্য-সংযম। কিরূপে? স্বধর্মের সম্মান ও পরধর্মের নিন্দা সামান্য বিষয়েও যেন আসে না হয়। কোন কোন কারণে পরধর্মীদিগের পূজা কর্তব্য, উহাদ্বারা স্বধর্মীদিগের উন্নতি ও পরধর্মীদিগের উপকার হয়। এরূপ না করিলে স্বধর্মীদিগের ক্ষতি হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্মীদিগের

মৃগয়ার পরিবর্তে ধর্ম-যাত্রার আরম্ভ।

গৌরব বর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স-সম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায় সাধুজনক। ভাল। কিরূপে? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক, এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক" (দ্বাদশ অনুশাসন।) আমরা যে আধুনিক কালে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আন্দোলন করিতে চেষ্টিত, কত শত শতাব্দী পূর্ব্বে অশোক তাহার বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন।

যাহারা অপরাধ করিয়া কারাগারে যায়, তাহাদের জন্য এই রাজশাসন কত দয়া। নিজের সন্তান যদি ঐরূপ শাস্তি পায়, তবে মানুষের মনে যেরূপ কষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপ ব্যথা ধর্ম্ম-মহামাত্রদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে গিরিলিপিতে বলিয়াছেন "দণ্ডিত ব্যক্তির অনেকগুলি সন্তান আছে কি না, দুঃখে তাহারা আয়হারা হইয়াছে কি না, অথবা সে বৃদ্ধ কি না, এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মমহামাত্রগণ অন্যায় অবরোধ ও অন্যায় দৈহিক দণ্ডের প্রতিবিধানে ও বন্ধনমুক্তির জন্য ব্যাপৃত থাকেন।" "দণ্ডিত ব্যক্তির স্বজনেরা কষ্ট পাইতেছে কি না এবং দণ্ডিত ব্যক্তির বহুসন্তান আছে কি না এবং সে বৃদ্ধ কি না"—এসকল কি বিচারকগণ কোথাও দেখিয়া থাকেন? অশোক আগে শুদ্ধ বিচারক ছিলেন না। পিতামাতা সন্তানকে দণ্ড দিয়া গোপনে আর এক চক্ষে চাহিয়া দেখেন, তাহার ব্যথা হইতেছে কি না—উহা সেই ব্যথাপিতার দণ্ড। "নগরের শাসনকর্ত্তারা সর্ব্বদা দেখিবেন যেন নগরবাসীগণের অকারণ অবরোধ ও দৈহিক দণ্ডভোগ না ঘটে" (দ্বৌলীর অতিরিক্ত অনুশাসন।) মোটকথা তাঁহার অনুশাসনগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি সাম্রাজ্যের সম্রাট্ নহেন, শাসনকর্ত্তা নহেন,—পালনকর্ত্তা। তাঁহার উক্তিগুলি সিংহাসন হইতে উচ্চারিত বলিয়া মনে হয় না, বেদী হইতেই উচ্চারিত বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ এগুলি শাসন বা অনুশাসন নহে—পালন-নীতি। উহাদের মধ্যে শাসনের নামগন্ধ নাই।

দণ্ডিতের প্রতি দয়া।

যাহার যে প্রয়োজনে রাজদরবারে আসার দরকার তাহার জন্য প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত রাত্র অবারিত দ্বার। "সুতরাং আমি নিয়ম করিয়াছি সকল সময়ে—আমি ভোজনেই ব্যাপৃত থাকি বা অন্তঃপুরে, শিরুচ্ছেদে, শৌচগৃহে, যানে বা প্রমোদ-উদ্যানেই থাকি, সর্ব্বত্রই আমার বার্ত্তাবহগণ আছে, তাহারা আমাকে প্রজাগণের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবে" (ষষ্ঠ গিরিলিপি।) যদি কোন জরুরী কার্য্য সম্বন্ধে মৌখিক আদেশ লইয়া দূতদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয় "বা কোন বিশেষ জনসমাজে কোন বিবাদ বা প্রবঞ্চনা উপস্থিত হয় তাহা হইলে যেখানেই হউক বা যে সময়েই হউক, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাইবে, আমি এইরূপ আদেশ করিতেছি কারণ রাজকার্য্য বা পরিশ্রম করিয়া কর্ত্তব্য পর্য্যাপ্ত হইয়াছে ইহা মনে করিয়া কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না" (ষষ্ঠ গিরিলিপি।) তিনি যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা রাজকীয় আইনের ধারার মতন নহে। দূতদের লইয়া মসলা তৈয়ার করাইয়া শেষে তিনি প্রচার করেন নাই। উহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। উহা পরকে বলিয়া দিয়া সেখান যাইতে

রাজপুর দূতদিগের সর্ব্বদা মুক্ত।

পারে না। তিনি আদেশ প্রচার করিয়া ভাবিয়াছেন হয়ত রাজকর্মচারীরা তাঁহার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না—হয়ত মহামাত্রকে তিনি প্রজাহিতের উপযোগী ছিলেন। বহু কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিনি সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন—তাঁহার উপদেশগুলি যথাযথরূপে পালিত হইতেছে কি না তাহারা তাহা বুঝাইতে পারিতেছেন কি না? প্রজারা তাহা বুঝিতেছে কি না? কলিঙ্গ জৌগড় অনুশাসনে তিনি বলিতেছেন "আপনারা হয়ত সমাকরূপে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। হয়ত কেহ কেহ আংশিক বুঝিয়াছেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বুঝেন নাই প্রতি-তিথি দিবসে এই লিপি শ্রবণ করাইবেন, অন্ততঃ এক ব্যক্তিকেও শ্রবণ করাইবেন" এরূপ কথা অপরকে দিয়া লিখান যাইতে পারে না অশোকলিপির প্রত্যেকটি আদেশ প্রত্যেকটি উপদেশ তাঁহার নিজের উহা এরূপ সোহার্দ্যের ভাবধারা, এরূপ প্রবল স্নেহ, দয়া ও মমতার ছাপমারা উহার মধ্যে রাজার ব্যক্তিগত শুভেচ্ছার এত প্রবল প্রেরণা দৃষ্ট হয় যে উহার একটি শব্দ, একটি বর্ণও পরের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তৎসাময়িক পাশাপাশি নৃপতিদের শিলালেখ দুই করুন, সেগুলিতে উৎকট রাজকীয় গৌরবের ঘোষণা, আদেশের পক্ষুর পাঠকবৃন্দকে জানিয়া দিবে তাহাদের সঙ্গে অশোক-শিলালেখমালার কোন তুলনাই হইতে পারে না অশোকলিপিতে আমরা রাজার রাজবেশ দেখিতে পাই না, বিশ্বের মঙ্গলকামী সন্তের সাধুর বেশ পাই। প্রস্তরলিপিগুলির মধ্য হইতে বক্তব্যদের সাধু যেন জীব জগতের কাণায় দাঁড়াইয়া তাঁহার অনুশাসন প্রচার করিতেছেন সেই অনুশাসনগুলি এত জীবন্ত তাহাতে জগতের প্রতিকরে এত দয়া, এত বাৎসল্য, এত চিন্তিকা যে তাহাতে এখনও প্রাণে সাড়া দিয়া উঠে, আমরা বর্ত্তমান কালের সমস্ত কোলাহল বিস্মৃত হইয়া সেই সর্ব্বকালোপযোগী বাণী শুনিয়া চরিতার্থ হই। উহা যে ২০০০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইতে ইতিহাসের আর পাঁচটি এক নিবিড় যুগ হইতে আসিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাই, মনে হয় যেন কোন সাধুর পাশে বসিয়া এখনই বসিয়া সেই জগৎ-মঙ্গল সর্ব্বজন হিতকর পরমার্থ জীবনের উপদেশ শুনিতেছি

শিলালেখ ও প্রস্তরলেখ অশোকের শিলালেখগুলি নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে—

যাইতে পারে।

১৪টি প্রধান গিরিলেখ তন্মধ্যে ১০টি এই ছয়স্থানে পাওয়া গিয়াছে

১ সাহাবাজ গড়ী কপরদিগিরি পেশোয়ারে
২ সাহাজাবপুরের হেজারা নবভিভিসনে কলসী গ্রামে
৩। ধৌলী জেলায় মকরায়।
৪। কাথিওয়ারে গিরনার পাহাড়ে
৫ ভুবনেশ্বরের নিকট ধৌলিতে।
৬। গঞ্জাম জেলায় (বাস্তাক) জৌগড়ে

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সোপারকের প্রাচীন স্থানের অনুশাসনে বহু শিলালেখের কতকাংশ পাওয়া যায়।

সাতটি প্রধান স্তম্ভলেখ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পাওয়া গিয়াছে —

১। সোপারক স্থান হইতে ফিরোজশাহ কর্তৃক আনীত স্তম্ভ দিল্লীতে স্থাপিত
২ ফিরোজশাহ কর্তৃক মীরাট হইতে আনীত, দিল্লীতে স্থাপিত;
৩। কোশাম্বি স্তম্ভ—অধুনা এলাহাবাদ-দুর্গের নিকটে স্থিত;
৪। চম্পারণ জেলায় অরেরাজ শিবের মন্দির পার্শ্বে লৌরিয়া গ্রামের স্তম্ভ
৫ চম্পারণ জেলায় মতিহা গ্রামে নন্দনগড় স্তম্ভ
৬। ঐ জেলায় বি এন্ ডব্লু আর—গোপুরা ষ্টেশনে রামপুর শিলার,
৭। সপ্তম স্তম্ভ দিল্লীতে।

ছোট ছোট শিলালেখ সর্বশুদ্ধ তিনটি, নিজামের অধিকারে একটি, বিহারে একটি, জব্বলপুরে একটি, রাজপুতনায় একটি।

অশোকের গুরু উপগুপ্ত সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে কোন কোন লেখকের মতে মহেন্দ্র অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ভারতীয় সমস্ত গ্রন্থে এবং সিংহলের এক কাহিনীতে মহেন্দ্রকে এইরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সিংহলের মহাবংশে তিনি অশোকের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মহেন্দ্র সমস্ত সিংহল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন, এই হিসাবে তিনি বিজয়ের মতই সিংহল জয় করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। সমস্ত সিংহল দেশ মহেন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নে পূর্ণ অশোকাবদানে মহেন্দ্রের অলৌকিক বৈভব, জ্ঞান-গরিমা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র সুদৃঢ়তা সম্বন্ধে অনেক গল্প উল্লিখিত আছে। অশোকের বহু নিষ্ঠাচরণ ও কঠোরব্রত দ্বারা তিনি অর্হত্বলাভে সক্ষম করিয়াছেন এ দেশে মহেন্দ্রের চলিত নাম ছিল বিগতশোক। মহেন্দ্রের পৌণ্ড্রবর্ধনে তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন বাঁকীপুরে ভিক্ষুন পাহাড়ীতে ছোটলোকেরা এখনও মহেন্দ্রের ভিক্ষুমূর্তি মাটীতে গড়িয়া বৎসর বৎসর পূজা করিয়া থাকে তাহাদের মহেন্দ্র 'ভিক্ষুনা কুঁয়ার' ভিক্ষু-কুমার। নামে পরিচিত।*

অশোকের পুত্র কুনাল সম্বন্ধেও অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। বিমাতা তিষ্যরক্ষিতা কুনালের রূপে মুগ্ধা হন কিন্তু যখন এই গর্হিত প্রস্তাব কুনাল ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়া অশোকের প্রিয় পুত্রটিকে তক্ষশিলার

* Even now at Bhimpahari in Bankipur a crude earthen image of the Bauddha Kuar (the monkish one Mahendra) is annually erected and worshipped by the rude people Such things indicate that the traditions are not altogether baseless

Piyadasi Inscriptions by Hemchandra Basu Introduction pp vi & vii

প্রেরণ করেন রাজার শিলমোহরটি রাণী কৌশলে হস্তগত করিয়া কুনালকে রাজাদেশ জাল করিয়া একটা চিঠি লিখেন, তাহাতে আদেশ ছিল, যেন তিনি চিঠি প্রাপ্তি মাত্র তাহার দুইটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলেন কুনাল এই অদ্ভুত আদেশ কোন ষড়যন্ত্রের ফল বলিয়া অনুমান করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা উপদেশ দিলেন যে তিনি রাজাকে একবার চিঠি লিখিয়া আদেশের সত্যতা নিরূপণ করুন কুনাল সে উপদেশ না লইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া অন্ধ হইলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি তাঁহার পত্নী কাঞ্চনমালার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পাটলীপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন, বহুকষ্টে রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কুনাল বীণা বাজাইতে লাগিলেন। চিরাভ্যস্ত কর্ণের পরম তৃপ্তিদায়ক সেই অমৃতকল্পা ঝঙ্কারধ্বনিতে অশোক বংশীবাদককে নিজের সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের মুখে তাঁহার দুরদৃষ্টের কথা শুনিয়া অশোকের চিত্ত করুণা ও দুঃখে ভরিয়া গেল তিনি সদ্যুদ্ধের সমুচিত দণ্ডের বিধান করিলেন বৌদ্ধ-সাহিত্যে এই গল্পটি পাওয়া যায় অশোক তাঁহার প্রেমলীলা কন্যা চারুমতির সঙ্গে পুণ্ড্র বনে তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন পুণ্ড্র বনের নাম ছিল কুক্কুটিনি বন তথায় তিনি বুদ্ধের জন্মের স্মারক স্তম্ভে একটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন

এইরূপ বহু উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে,—সেগুলি লিখিবার এখানে স্থানাভাব সিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার পূর্ব্বক তাহা শুদ্ধভাবে প্রচারিত করিবার জন্য অশোক প্রথমবারের 'মহতী সভা' আহ্বান করিয়াছিলেন কথিত আছে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক ১০ কোটী স্বর্ণ দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ কোটী ৬০ লক্ষ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন। অশোক তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, মন্ত্রীরা কুনালপুত্র সম্প্রতিকে বলিলেন এরূপ অজস্র দান করিলে রাজকোষে আর কপর্দ্দকও থাকিবে না। সম্প্রতি আর অধিক বিতরণ নিষেধ করিয়া দিলেন তখন অশোক কোষাগারে কিছু না পাইয়া তাঁহার নিজের বহুমূল্য সমস্ত আসবাব বিতরণ করিয়া ফেলিয়া নিজে মৃন্ময় পাত্রে আহার করিতে লাগিলেন। একদিন অশোক কুক্কুটারামের ভিক্ষু সঙ্ঘকে একটি মাত্র আমলকী দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন ইহাই তাঁহার শেষ দান। তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন রাধাগুপ্ত একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাম্রাজ্যের অধিপতি কে?" রাধাগুপ্ত বলিলেন "আপনিই এই বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট।" অশোক তখন বলিলেন -"এই সাগর-মেখলা হীরামুক্তামণি পূর্ণা বহু প্রভা ও শ্রীর সঙ্কুলা বসুমতী আমি সঙ্ঘকে দান করিলাম আমি ইহার চাই না, ইহার পর চাই না। আমি সকল পৃথিবীর সম্রাট্ হইতে চাই না, কারণ এই সকল বাহ্য ঐশ্বর্য্য সলিলস্রোতের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য। সাধুদিগের একমাত্র কাম্য আত্মসংযমই আমি একমাত্র প্রার্থনা করি" তখনই এক দান-পত্র লিখাইয়া অশোক তাহা মোহরাঙ্কিত করিয়া দিলেন। কথিত আছে অশোকের মৃত্যুর পর তদংশোদ্ভব সম্প্রতি মগধসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

অশোকের দান।

বিষাদ ও প্রায়শ্চিত্ত অনুশাসনে অশোকের অনুতাপ

অশোকের অনুশাসনগুলির মধ্যে কলিঙ্গলিপিই ত্রয়োদশ অনুশাসন নানা কারণে সর্বাধিক ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। কলিঙ্গ যুদ্ধে একলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র লোক বন্দী হয়, একলক্ষ লোক নিহত হয়, এবং তদপেক্ষা অনেকগুণ লোক আহত হয়।

এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড প্রিয়দর্শীর মনে যে কষ্ট, অনুতাপ ও সন্তাপ তীব্র উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা যেন শৈল কঠিন পাহাড়ের আবরণ হইতে চীৎকার করিয়া আর্তনাদ করিতেছে। এই মর্মন্তুদ সুরটি দ্বিসহস্র বৎসরের উচ্চকালের পরেও যেন একটি শিশুর করুণ কান্নার ন্যায় আমাদের কানে আসিয়া বাজিতেছে। এই শৈললেখের মর্মান্তিক ভাব-প্রবণতা দেখিয়া অনেকে অনেক রকম অনুমান করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ঘোর নিষ্ঠুরতায় তাঁহার চিত্ত এরূপ দ্রবীভূত হইয়াছিল যে তিনি তৎপরেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর তিনি কোন যুদ্ধই করেন নাই, আবার কেহ অনুমান করিয়াছেন চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের পর এক কলিঙ্গ ছাড়া তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য আর বাড়ান নাই -যেহেতু তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশাল যোগাসাধনা চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারই এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই সকল মতের সমস্তই সম্পূর্ণ ঠিক না হইলেও ইহাদের অনেকগুলিই যে আংশিক ভাবে সত্য তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। বস্তুতঃ কলিঙ্গ যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি প্রাণে বড় দাগা পাইয়াছিলেন। কলিঙ্গ অনুশাসনের শিলালিপিতে সূচ ফুটাইলে তাহা হইতে যেন রক্ত বাহির হয়, তাহা এত জীবন্ত। "কলিঙ্গ বিষয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুশোচনা হইয়াছে" কেন হইয়াছে? তাহা তিনি বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন। "সেই দেশে যত সম্প্রদায় সাধু আছেন যাঁহারা ধর্ম মানিয়া চলেন, যাঁহাদের জীবন নিষ্কলঙ্ক, তাঁহাদের আত্মীয়গণ এই যুদ্ধে মারা পড়িয়াছেন। আমি সাধুহৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি, যত লোক হতাহত হইয়াছে—তাঁহাদের শত সহস্রের একাংশও দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুতাপের কারণ।" "ভ্রাতাভগ্নী পুত্র পৌত্রগণ কোন দেশহিতৈষী রাজনীতি মনে না করেন। তাঁহারা কোন প্রশ্ন নিজ স্বার্থেই যথার্থ হিতকর মনে করেন।" অনেক কারণে মনে হয়—কলিঙ্গের অন্তর্গত মেদিনীপুরের লোকেরাই অশোকের সঙ্গে এই প্রাণান্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশিষ্টে 'মেদিনীপুর' শব্দ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৌর্য, শুঙ্গ ও কাণ্বংশ

"দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধপতাকা—
উড়িছে দেশ বিদেশে ও
তিব্বত, চীনে, ব্রহ্ম আতারে—
ভারত স্বাধীন বেদিন ও।"

আমার পুনঃ পুনঃ একটা কথা মনে হইতেছে। বাঙ্গলার কথা লিখিতে গিয়া, তাহা "বৃহদ্বঙ্গ" অথবা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, অশোক এমন কি বুদ্ধদেবের কথাগুলি আমি এত বেশী করিয়া লিখিতে যাইতেছি কেন? এজন্য হয়ত কেহ কেহ আমার কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন।

সুতরাং এই কথাটা আমাকে একটু বিশদ করিয়াই বলিতে হইবে। আমার সরল আন্তরিক বিশ্বাস যে এই পুণ্যভারতের সভ্যতার বিশেষ করিয়া মগধের শিক্ষা দীক্ষার

মগধের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী

আমরা বাঙ্গালীরাই উত্তরাধিকারী হইয়াছি, অন্ততঃ আমরা তাহা যতটা পাইয়াছি, আমাদের প্রতিবেশিগণের মধ্যে কেহই, এমন কি খাস্ বিহারবাসীরাও, ততটা পান নাই মগধের দীপ নিবু নিবু হইলে তাহা গৌড়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এই দীপ একই দেশলাই কাঠির গৌড়ের দীপ যখন নির্ব্বাণোন্মুখ, তখন তাহার পরবর্ত্তী শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল নবদ্বীপে. সেই দীপই এখন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে জ্বলিতেছে। ইহা প্রমাণযোগ্য যে মাগধী ত্যাগধর্ম্ম, মাগধী উচ্চশিক্ষা, মগধের শৌর্য্য বীর্য্য—এ সমস্তই বাঙ্গালীরা যেমন করিয়া পাইয়াছে, অন্য কেহ তেমন করিয়া পায় নাই মগধ মুসলমান কর্ত্তৃক ধ্বংস হইলে তাহার পুণ্য আরও পূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছিল।

একসময়ে মগধেশ্বরগণ সমস্ত ভারতবর্ষের অধিতীয় সম্রাট্ ছিলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহাদের পদানত ছিল মগধের রাজক্ষত্র ভঙ্গ হইলে গুপ্তদের অবনতির পর গৌড় সম্রাট হইয়া উঠিয়াছিল গৌড়রাজধানী বড় প্রাচীন, এবং মগধের অবনতির পর গৌড়ই সেই দেশের বিনষ্ট গৌরবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত গৌড়ের মহিমায় মহিমান্বিত ছিল,

মগধের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ।

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চরাজ্য লইয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য পালগণ অধিকার করিয়াছিলেন—তাহার নাম ছিল পঞ্চগৌড়। এ সম্বন্ধে সকল কথা আমরা ১৯ পৃষ্ঠায় বিশেষ ভাবে একবার উল্লেখ করিয়াছি।

এককালে গৌড়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রীতি "গৌড়ীয় রীতি" নামে পরিচিত হইয়াছিল। ধর্মাচার্য্য প্রভৃতি লেখকগণ তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ময়ূরভট্ট, রূপরাম, ধনরাম, মাণিক গাঙ্গুলী প্রভৃতি সমস্ত ধর্মমঙ্গল লেখকগণই যেখানে সেখানে গৌড়েশ্বর-গণের 'নবসঙ্গ সৈন্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। মগধের প্রতাপের শেষ শিখা যে কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াও গৌড় প্রাসাদকে দীপ্ত করিয়াছিল—তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। শুঙ্গবংশের পর মহানন্দ, তৎপর চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি রাজন্যবর্গ—তৎপর গুপ্তরাজগণ এবং সর্ব্বশেষে পাল ও সেন রাজারা সেই একই দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া—পরবর্ত্তী রাজ্যের প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও—পূর্ব্বভারতের গৌরবের ধারাবাহিকত্ব বজায় রাখিয়াছেন।

নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদন্তপুর, জগদ্দল, সুবর্ণ, বাক্তাসন প্রভৃতি বিহারের শিক্ষালীক্ষায় বাঙ্গালীদের যথেষ্ট সাহচর্য্য, দান এবং প্রভাব ছিল এবং যখন এই সকল বিদ্যালয় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল—তখন পূর্ব্বভারতে ভারতী অনেকের জন্য মিথিলা কেন্দ্র পরিক্রম করিয়া নবদ্বীপে সিংহাসন স্থাপন করিলেন। আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব বেহারের বিহার-সমূহের সংস্কার বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের মহাশিক্ষা ত্যাগ, বৌদ্ধ রাজগণের ভিক্ষুবেশ এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মঠ বৃহত্তর বাঙ্গলাদেশেই বিশেষ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছিল এবং সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলি সহজিয়া তান্ত্রিকদের মধ্যে কখনও উন্নত, কখনও পরিবর্দ্ধিত, কখনও বা বিকৃত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের পর চৈতন্য, অশোক, ধর্ম্মেন্দ্র, উপগুপ্ত প্রভৃতির পর বাঙ্গলার গোপীচন্দ্র রাজা, রূপসনাতন, নরোত্তম, রঘুনাথ এমন কি সেদিনকার লালাবাবু পর্য্যন্ত বাঙ্গলার রাজবিগণ ভিক্ষাভাণ্ড হাতে করিয়া আদি ভিক্ষুকের অনুসরণ করিয়াছেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, শান্ত রক্ষিত, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি ভারতবন্দিত পণ্ডিতগণ—সেই মগধের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির প্রজ্ঞা ও সংস্কার যুগোপযোগী ভাবে বিকীর্ণ করিয়াছেন। একালেও পরমহংসদেব, রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ব্বভারতের জ্ঞান-প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দেখাইব যে বাঙ্গালীরাই মাগধী গৌরবের উত্তরাধিকারী এবং সেই মগধের শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির সংস্কার বঙ্গদেশ যতটা রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে, আর কেহ তাহা পারে নাই। আমাদের এই পুস্তক রাজনৈতিক ইতিহাস নহে। রাজনৈতিক একটা চালচিত্র না থাকিলে বিষয়গুলির যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া প্রদর্শন করা কঠিন

হয়, এজন্য আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ বাদ দিতে পারিব না। কিন্তু বৃহৎ বঙ্গের শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস এখনও ঘনীভূত তিমিরাবৃত ঘন সন্নিবিষ্ট অন্ধকারের নিবিড়তা ভেদ করিয়া স্পষ্ট আলোকে সেই ঐতিহাসিক পট উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আমাদের চিন্তাশীলতা, শিক্ষাদীক্ষা, কলাবিদ্যা ইত্যাদির নানাবিধ ইতিকথার একটা ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইব। রাজনৈতিক ইতিহাসে যথেচ্ছাচার শাসনকর্তারা রাষ্ট্রের সুবিধানুসারে রাজ্য-বিভাগ করিয়া থাকেন। একবার বঙ্গদেশের এক পরগনা অন্য কলিঙ্গের কুক্ষিগত হইয়াছে। কখনও বা ভাগলপুর জেলা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি প্রদেশ কখনে বঙ্গাধিকারভুক্ত কখনে বহির্ভূক্ত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। সেই ভাঙ্গাগড়ার বিরাম নাই। এখন পর্য্যন্তও সেই রাজবিপ্লবের সীমারেখা নূতন নূতন করিয়া টানা হইতেছে। এই নিষ্ঠুরকর পরিবর্ত্তনের যাদুমন্ত্রের মত অক্ষরগুলি রাষ্ট্রের সীমানা লইয়া আমার এই ইতিবৃত্ত নহে। আমরা যাহা চাহিতেছি, আমাদের চিন্তা, শিক্ষা, বিশেষতঃ মনের সম্পদ এ সকল কোথায় কি ভাবে পাইয়াছি, সেই ভাবধারার শোকাপাত ও ক্রমপুষ্টি প্রদর্শন করিতে হইলে আমরা রাজ্যকে বাদ দিতে পারি না। তাহা করিলে আমাদের আলোচ্যের বিশেষত্ব বিনষ্ট হইবে। এই জন্যই রাজ্যকে লইয়া আমরা এতটা নাড়াচাড়া করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব

মৌর্য্য অধিকার কালে দেশের অবস্থা কেমন উন্নত ছিল তাহা বিদেশী পর্য্যটকগণ বিস্ময়ের সহিত লিখিয়া রাখিয়াছেন। মহাভারতে ময়দানবকৃত যুধিষ্ঠিরের রাজসভা এবং রামায়ণে লঙ্কাপুরীর বর্ণনায় যে সুন্দর চিত্রপট আছে, তাহা হইতে অনুমান করা সহজ যে মৌর্য্যাধিকারের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতের বাহ্য সমৃদ্ধি উন্নতির চরম শেখরে পৌঁছাইয়াছিল। গ্রীক দূত বলিয়াছেন "চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ সুসা এবং একবটনের রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সমৃদ্ধ।" তাঁহারা লিখিয়াছেন, অশোকের কীর্ত্তি দেখিলে সেগুলি মনুষ্যকৃত বলিয়া মনে হয় না। কোন অমানুষী শিল্পী এই সকল বিরাট কীর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে।

অশোক স্থাপিত পশু চিকিৎসালয়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সেদিন পর্যন্তও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইত। হ্যামিল্টন সাহেব লিখিয়াছেন "আহমদাবাদ, সুরাট এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বহুস্থানে যে সকল পশু চিকিৎসালয় আছে, তাহা সম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়গুলির আদর্শ এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সুরাটের প্রতিষ্ঠানটির নিম্নলিখিত বর্ণনা অষ্টাদশ শতাব্দীর। অনেকটা পাটলিপুত্রের পশুশালার রীতির পরিচয় দিতেছে "সুরাটের বণিকদের চিকিৎসালয়টিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কোন রিপোর্ট আমাদের হাতে নাই। পশুশালাটি প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া। ইহা চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। পশুদিগের জন্য এই বৃহৎ স্থানটিতে ছোট ছোট বহু প্রকোষ্ঠ আছে। কোনও জীবজন্তু পীড়িত হইলে এখানে অত্যন্ত সতর্ক ও স্নিগ্ধ যত্ন পাইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্বে এই চিকিৎসাগারটি বৃদ্ধ ও অনাথ পশুদের শান্তির আশ্রয় স্বরূপ হয়।

"যখন কোন জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তত্ত্বাধ্যক্ষ তাহাকে এই চিকিৎসালয়ে লইয়া আসে। সেই পশুর অধিকারীর কি জাতি, সে কি শ্রেণীর লোক ইত্যাদি কোন বিষয়েই প্রশ্ন করা হয় না। কেবল মাত্র পশুটি কোথায় গৃহীত হয়। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে এই চিকিৎসালয়ে অনেকগুলি ঘোড়া, গাধা, ষাঁড়, ছাগ, মেষ, বানর, কাক, কুক্কুট, পায়রা এবং অন্যান্য নানা প্রকারের পাখী ছিল। সেখানে একটা কচ্ছপ ছিল, সেটা নাকি সেখানে ৭৪ বৎসর যাবৎ বসবাস করিতেছিল। ইহার মধ্যে রক্তলোভী জীবদিগের সম্পর্কিত বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য-জনক ছিল। সেখানে ছারপোকা, ইঁদুর ছুঁচো এবং অপরাপর অনেক হিংস্র ক্ষুদ্র জীব যথাযোগ্য খাদ্য প্রাপ্ত হইত।" (হ্যামিল্টনের হিন্দুস্থান-কাহিনী, ১৮২০ খৃঃ, ৭১৮ পৃঃ।)

এই ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ খুঁজিলে দেখা যাইবে যাহা কিছু অতি আধুনিক পাশ্চাত্যেতিহাসিক যুগে ঘটিয়াছে তাহারও কিছু না কিছু নিদর্শন কোন না কোন স্থলে আছে।

হিন্দুরা গ্রীকদিগের সংসর্গে আসাতে গ্রীকদিগের কিছু না কিছু প্রভাব তাঁহাদের শিল্পের উপর অবশ্যই আসিয়া পড়িয়াছিল, বাহ্যদৃষ্টির নিকেই সেই প্রভাব একটু বেশী দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন ভারতীয় শিল্পের উপর হেলেনার প্রভাব অতি সামান্য,—যাহা আছে তাহাও বাহ্য মাত্র। গ্রীক সভ্যতা কখনই হিন্দুর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। অবশ্য একদল উগ্রপন্থী পাশ্চাত্য পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা কেবলই গ্রীক ও রোমের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। একদল ধর্মযাজক সেদিনও বলিতেন যে ভগবান্ হিব্রুভাষায় কথা বলিতেন, যেহেতু বাইবেল হিব্রুভাষায় লিখিত এবং তজ্জন্যই জগতের যত ভাষা তাহা হিব্রু হইতে উৎপন্ন। সেইরূপ, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সমস্তই হেলেনার দান—এরূপ মতবাদী পণ্ডিতও এখন আছেন। কিন্তু ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উগ্রপন্থীদের বল ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। গান্ধার অঞ্চলের বুদ্ধমূর্তিগুলি দেখিলে হিন্দু শিল্পের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব কতটা হইয়াছিল

তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু এই প্রভাব সিন্ধুনদের পশ্চিমে কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও ঐ নদের পূর্ব্বে তাহা কণিকা প্রমাণ, এবং যদি কিছু থাকিয়া থাকে তাহা একান্ত বাহ্য অপর দিকে, ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক কারিগরগণ যে হিন্দু শিল্পকলার আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা সেই দেশের কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তিতে স্পষ্ট প্রতিভাত যে আধ্যাত্মিকতা গ্রীক কলায় নাই, ব্যাক্‌ট্রিয়ার বুদ্ধমূর্ত্তিতে কোথাও কোথাও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে।

ভারতীয় সভ্যতার উপর হেলেনীয় প্রভাব কতকগুলি সাহেব নানাদিক্ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন রামায়ণ ইলিয়াডের নকল ভারতে স্থপতিবিদ্যা ছিল না, ব্যাক্‌ট্রিয়া হইতে গ্রীকেরা হিন্দুদিগকে তাহা শিখাইয়াছেন, মূর্ত্তি অঙ্কন বা গঠন ভারতে গ্রীকেরাই আমাদিগকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন, ইত্যাদি।

গ্রীক প্রভাব।

গ্রীকদিগের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের পরে কিছু কিছু সম্পর্ক আমাদের দেশে হইয়াছিল আমাদের পুরাণকারেরা রূপকচ্ছলে যে সকল গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে মৌর্য্যযুগের গ্রীকদিগের সঙ্গে ভারতীয় সংঘর্ষের একটু আভাস আছে বলিয়াই মনে হয়। পুষ্যমিত্র মৌর্য্যদিগকে অধিকারচ্যুত করেন এবং তিনি ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহার সময়ে হিন্দুধর্ম্মের একটা সমুত্থান হইয়াছিল—তখন অশোক প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দকে ব্রাহ্মণেরা হীন প্রতিপন্ন করিতে সর্ব্বাই চেষ্টিত হইয়াছিলেন চণ্ডীতে দেবীযুদ্ধে দেখা যায় যে অসুরদের দলে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে "মৌর্য্যের" প্রবল ছিল। এই মৌর্য্যগণকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী দৈত্য-দলভুক্ত করিয়াছেন ভারতীয় হিন্দুশক্তি কোন বৈদেশিক আক্রমণে আত্মরক্ষার্থ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একত্র দাঁড়াইয়াছিল—চণ্ডী-কথিত অলৌকিক ঘটনার মধ্যে এইরূপ কোন সত্য নিহিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এ কথা পূর্ব্বেই (১৪৭ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে। কালিদাস প্রভৃতি কবির লেখায় গ্রীক রমণীরা যে রাজাকে বেষ্টিত করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে বীরবেশে পরীর-রক্ষীর কাজ করিতেন, তাহার উল্লেখ আছে। মুদ্রারাক্ষসেও সেইরূপ বর্ণনা আছে। আলেকজাণ্ডারের সময়ে বিদেশী গণিকারা হিন্দু রাজার সঙ্গে সঙ্গে রণক্ষেত্রে থাকিতেন কিন্তু এই সকল উপাখ্যান ও বর্ণনার মধ্যে যদি কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব থাকে, তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুরাজগণ গ্রীকদিগের বাহু সাহচর্য্য পাইয়াছিলেন ও যোগ্যতা অনুসারে স্বীয় স্বীয় বিচিত্র কর্ম্মবিভাগে তাঁহাদিগকে কিছু স্থান দান করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগকে তাঁহারা সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মুদ্রারাক্ষসাদি নাটকে পাওয়া যায়।

কিন্তু অশোক যে বহু ধর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর-পুত্র গ্রীস্, পারস্য ও অন্যান্য প্রদেশে পাঠাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বহু মনুষ্য- ও পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন ও তৎসঙ্গে ঔষধার্থ প্রয়োজনীয় তরু-গুল্ম রোপন করাইয়া চিকিৎসা-জগতে ও ধর্ম্মরাজ্যে একটা মহাহিতকর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম প্রধান শাখা—বৌদ্ধধর্ম্মকে

ভারতের সীমা অতিক্রম করাইয়া পূর্ব ও পাশ্চাত্য জগতে বহুলোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সাহেবরা নীরব। গ্রীকদের কেহ কেহ সকড়ধারণ স্তম্ভ নির্মাণ পূর্বক বিষ্ণুকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যবন ধর্মরক্ষিত, যবন হরিদাসের মত তাঁহার পূর্ব সম্প্রদায়ের নাম-গোত্র হারাইয়া নব দীক্ষার প্রচার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আচার্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গুজরাটের ধর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—মহারক্ষিতকে অশোক ধর্মপ্রচারার্থে গ্রীসদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য বহু গ্রীককে নব ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল বহু প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা গ্রীকদিগের উপর হিন্দুপ্রভাব সম্বন্ধে তো কোন আলোচনা করিতেই স্বীকৃত নহেন। বৌদ্ধ-আচার ও নীতি, প্রথম খ্রিস্টকার খৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকার বাস্তু করিয়াছিল। ভারতবাসীদের মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও প্রাতঃকালে উঠিয়া শিব-স্তবন করার রীতি ছিল। এ সকল অনেক কথা তাঁহারাই প্রাসঙ্গিক ভাবে লিখিয়াছেন। তথাপি ভারতের নিকট যে গ্রীক বা রোমানগণ কোনরূপ ঋণী একথা তাঁহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সজ্ঞানে স্বীকার করিতে যেন কুণ্ঠিত।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচারের জন্য অশোক রাজা পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভারতবর্ষ হইতে প্রবীণ বৈদ্যদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং সকল লোকদিগকে 'গুবিক' বা 'গুবিকপুত্ত' বলিত; চলিত কথায় ইহাদিগকে 'গেরা' বা 'গেরা পুত' বলিয়া থাকে। সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থে প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ গেরা বা গেরা-পুত নামে অভিহিত। এখন পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা বিদ্যার নাম "গেরাপিউটিক্স"। এত বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি জানেন না যে এই সব "গেরাপুত" হইতে উদ্ভূত? কিন্তু সে কথা জানিয়াও তাঁহারা স্বীকার করিবেন না, কেহ স্বীকার করিলে যে সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে হিন্দু বিদ্যার-চিহ্ন-লাঞ্ছিত করিতে হয়। ওয়েবষ্টারের অভিধানে "গেরাপিউটিক্স" অর্থে 'লিখিত হইয়াছে "'গেরাপিউটি' শব্দ হইতে ঐ নাম উদ্ভূত। এই নামের কতকগুলি সন্ন্যাসী পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে বাস করিতেন, পণ্ডিতপ্রবর ফিলো এই বিবরণ লিখিয়াছেন—একথা এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করেন।" * তাঁহারা কেন বিশ্বাস করিতে চাহেন না? আমাদিগের নিকট এই অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট। অশোকের দ্বিতীয় অনুশাসনে "দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী" রাজা তাঁহার রাজ্যে এবং তদুপান্তে চোড়, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, তাম্রপর্ণী, আন্তিয়োক নামক যবন রাজার রাজ্যে দুই প্রকার চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, "পশু-চিকিৎসালয় এবং মনুষ্য-চিকিৎসালয়।" ত্রয়োদশ অনুশাসনে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে অশোক পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত পরিচিত স্থানে ধর্মশাস্ত্র অবস্থিত করাইবার জন্য এবং ধর্মচক্র প্রবর্তিত করাইতে যাইয়া যবনরাজ এন্টিয়োকাস, এবং এন্টিয়োকাসের রাজ্য ছাড়াইয়া টোলেমি, এন্টিগোনাস, মগস এবং

* "A native sect in Syria is said to have anciently dwelt near Alexandria. They are described in a work attributed to Philo, the genuineness and credibility of which are now much disputed. [Webster's Dictionary

আলেকজান্ডারের রাজ্যেও ধর্মতত্ত্ব পণ্ডিতগণ পাঠাইয়াছিলেন ভারতবর্ষের কোন স্থানই অবশ্য বাদ ছিল না, চোড়, পাণ্ড্য এবং সিংহল পর্য্যন্ত সকলে ধর্ম্মচক্রের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল।* এই পণ্ডিতগণের নাম যে 'থেরা এবং 'থেরাপুত্র ছিল তাহা বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ সকলেই জানেন। এবং এখনও ব্রহ্মদেশ খুঁজিলে আসলে কে চুলাক্রান্ত পাঠক থেরাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিতে পারেন।

য়ুরোপে আজকাল পালিভাষাবিৎ পণ্ডিতের অভাব নাই। তাঁহারা অশোকলিপি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং থেরা ও থেরাপুত্র বলিতে কাহাদিগকে বুঝায় তাহাও ভাল করিয়া জানেন 'থেরাপাটিক্স অব যে থেরাপুত্রদের-সম্বন্ধীয়' তাঁহারা অবগত আছেন ও অভিধানে লিখিয়াছেন, ইহারা পুরুষেরই সন্ন্যাসী, আলেকজান্দ্রিয়ার রাজার পর্য্যন্ত যে এই সকল থেরা ও থেরাপুত্রদের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, হিস্লপ্ট প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ সমস্ত লিখিয়া এবং ওয়েবেষ্টার তাঁহার অভিধানে এ কথা স্বীকার করিয়াও লিখিয়াছেন, 'যে দেকথা এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে চান না।' এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে কেন চান না? ইহা কি প্রতীচ্যের পণ্ডিত অভিমানের ফল নহে? এদিকে তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতীয় ভূবিদ্যার ও সামাজিক ঘটনার ছবি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবার লোভের কাছে প্রলোভ ঠিক আবিষ্কার করিতে কত না ব্যস্ত।

অশোকের বহু পত্নী ছিলেন তন্মধ্যে সম্ভবতঃ তুরুবকী ও অসন্ধিমিত্রা প্রধানা ছিলেন। অসন্ধিমিত্রার মৃত্যুর পর তিনি 'পদ্মবতিকা' নাম্নী এক পরমা সুন্দরী ললনাকে বিবাহ করেন।

অশোক ও রাজ্ঞী তিষ্যরক্ষা

এই মহিষী ও কুণালদর্শিত সকল অধ্যায়িকার প্রতি আমি ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি কথিত আছে একদা অশোকের উদরে ভয়ানক বেদনা হয় সেই সময়ে কোন রাখাল বালকেরও ঐরূপ রোগ হইয়াছিল। রাজ্ঞী গোপনে রাখাল বালককে হত্যা করিয়া তাহার উপর পরীক্ষা করেন, তাহাতে দুই হয় উহাতে বহু কীটাণু জন্মিয়াছে রাজা তাহাদের উপর অনেক প্রকার রস প্রয়োগ করেন, তাহাতে সেগুলি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু শিয়ালের রস দেওয়া মাত্র কীটাণুগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। চিকিৎসকের অসাধ্য অশোকের রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন রাজ্ঞী তাঁহাকে শিয়ালের রস খাওয়াইয়া সুস্থ করেন। তদবধি এই সুন্দরী মহিষী রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন কুণালের সঙ্গে রামচন্দ্রের ও বিশ্বরক্ষিতার সঙ্গে কৈকেয়ীর তুলনা চলিতে পারে

অশোকের কুরুবকীগর্ভজাত তীবর নামক প্রিয়পুত্র হইয়াছিল সম্ভবতঃ রাজকুমার অন্ধ হইয়াছিলেন। অশোকের আর এক পুত্র জলুক কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

* The Missionaries of the Emperor Teacher (Asoka) and his successors carried the doctrine of Gautama from the Indus and the Ganges to the snows of the Himalayas, the deserts of Central Asia and to Lanka of Asoka's Edicts and Early History of India by V. Smith, p. 143 (1924).

অশোকের পৌত্র দশরথ সম্ভবতঃ জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন তিনি ২৩১ খৃঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন দুইখানি পুরাণের মতে তিনি আটবৎসর কাল রাজত্ব করেন। কুনালের পুত্র সম্প্রতি সম্পদি, কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কথিত আছে ইনি অশোকের জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার হাত হইতে রাজ শক্তি কাড়িয়া লইয়া অশোকের অবাধ স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন

অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত অনেকদিন পূর্বেই সেনাপতি সেলিউকাসের (নিকেতার বিজয়ী নামে প্রসিদ্ধ হাত হইতে সিন্ধুদেশ উদ্ধার করেন, এইভাবে পৌরস (Porus), অস্সি ও অভিসার রাজাদের রাজ্য তিনি পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং সেলিউকাসকে পরাজয় করার ফলে তিনি তাঁহার আরও কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এই প্রকারে বেলুচিস্থান, খিলাট, মকেরন প্রভৃতি দেশ চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলিউকাসের দূত অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রাধান্য সুদৃঢ় হইয়াছিল, এবং গ্রীকগণ নিরস্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন সেলিউকাস, ইজিপ্টের রাজা টোলেমির দাতার হাতে ৭৮ বৎসর বয়সে নিহত হন ইজিপ্ট রাজদূত দাইওনিসিয়াস চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজসভায় কতকদিন বাস করিয়াছিলেন।

বিন্দুসার তাঁহার পিতার রাজ্য হয়ত বা কতকটা বাড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু এবিষয়ে খাঁটি প্রমাণ নাই অশোক তাঁহার রাজত্বের নবমবর্ষে কলিঙ্গ জয় করেন এই জয়ের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কলিঙ্গ বিজয়ের ফলে মহানদী ও কাবেরীর মধ্যবর্ত্তী এবং সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয় দক্ষিণে মহীশূর সুবর্ণগিরি পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় সুতরাং অশোকের রাজ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং মধ্যভাগে (পশ্চিমোত্তরে কাশ্মীর ও পূর্ব্বে নেপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে মহীশূর, দক্ষিণপশ্চিমে কাথিওয়ার এবং পূর্ব্বে অনুগাঙ্গ প্রদেশ এ সমস্তই তাঁহার অধিকারের অন্তর্গত ছিল কাশ্মীরের প্রধান নগর ছিল প্রবরপুর (শ্রীনগর), এবং নেপালের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল মুক্তপত্তন ও ললিত পত্তন।*

মেগেস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের শাসনপ্রণালীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অশোকের সময়েও কতকাংশে সেইরূপই ছিল বলিয়া মনে হয় এই সুবৃহৎ রাজ্য কতকগুলি প্রাদেশিক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, তোষলী, সুবর্ণগিরি এবং আরো কয়েকটি স্থান প্রাদেশিক প্রধান নগর ছিল, স্বয়ং যুবরাজ অশোক এক সময়ে তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

মেগেস্থিনিসের সময়ে মগধের সৈন্যবল, ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্বারোহী ৯ হাজার হস্তী এবং বহুসহস্র রথবিশিষ্ট ছিল কোন স্থানে রাজকীয় শিবির থাকিলে তথায়

* প্রিয়দর্শী-প্রকাণ্ড (রামাবতার শর্ম্মা সম্পাদিত—ভূমিকা, ২৪ পৃঃ)

রাজার সঙ্গে ৪,০০,০০০ সৈন্য থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সুবিখ্যাত সুদর্শন হ্রদ খনন করা হইয়াছিল। বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত এই কার্য্য-সম্পাদনের ভার পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে (অশোকের রাজত্বকালে) যবনরাজ তুষাস্প এই হ্রদের মেরামতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সময়াবধি গ্রীক ও পারস্যবাসীদের সঙ্গে মৌর্য্যবংশের ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়, মুদ্রারাক্ষস নাটকের যদি কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তবে স্বীকার করিতে হইবে গ্রীক সৈন্যেরা বহু পরিমাণে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদল-ভুক্ত ছিল। উত্তরকালে যবন ধর্ম্মরক্ষিতকে অশোক গুজরাটে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যবন ধর্ম্মরক্ষিতের মূল নাম কি ছিল তাহা জানা যায় নাই। বৈষ্ণব হরিদাসের মুসলমানী নাম যেরূপ অজ্ঞাত, ধর্ম্মরক্ষিতের পূর্ব্বনামও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। কিন্তু তিনি ভারতীয় বেশে দীক্ষিত হইয়া নবধর্ম্মে এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে অশোক তাঁহাকে প্রাদেশিক আচার্য্যের পদ দিয়াছিলেন। সাঁচির স্তূপে দেখা যায় অশোক ধর্ম্মপ্রচারার্থ গ্রীস দেশে আচার্য্য মহারক্ষিতকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি মহারাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল আচার্য্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের নামও পাওয়া গিয়াছে। অশোক অনুশাসনে তিনি কোন্ কোন্ দিনে কোন্ কোন্ পশু-বিনাশ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন। যে দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যজ্ঞধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন ছিল এবং ঢক্কা প্রভৃতি নানারূপ বাদ্য-যন্ত্রের উচ্চ শব্দে পশুর মৃত্যুকালের মর্ম্মান্তিক চীৎকার শ্রুতির অনায়ত্ত হইয়া যাইত, সেই দেশে এক্কদিনেও অশোক পশুহনন থামাইয়া দিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি কত দিক্ হইতে কতরূপ ওজুহাতে সে পশুহত্যা-নিবৃত্তির নীতি অতি ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে তিনি একরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমন আজীবক, নিগ্রোথ প্রভৃতি তাঁহার সৌজন্য ও মহানুভবতা সেইরূপ স্মরণীয়। তাঁহার রাজ্যের ত্রয়োদশাঙ্কে তিনি খালতিক পাহাড়ের গুহা ও সুরোখ গুহা আজীবকদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, এই দুইটি গুহা বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের বিশ বৎসর পরে সেইরূপ আবার "সুপ্রিয় গুহাটি"ও আজীবকদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ভাবে তিনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসনে তিনি লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পরের ধর্ম্ম নিন্দা করে—সে নিজের ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধা আনয়ন করে।"

অশোকের পরে মৌর্য্যবংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণের নাম শোনা যায় —

১ দশরথ—(২৩২ খৃঃ পূঃ) নাগার্জ্জুনী গিরিগুহা আজীবকদিগকে দান করেন, ইহার পরেই মৌর্য্যবংশের অবনতি আরম্ভ হয়। (বায়ুপুরাণ)

২। সংপ্রত মৌর্য্য (উপাধি 'বহুপালিত')। (বায়ুপুরাণ)

৩ শালিশুক শালিশুক। মৌর্য্য ('দাস-বধূপ' এবং 'দেব ধর্ম্মশ' এই দুই উপাধিতে পরিচিত); ইনি উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ রাজা খারবেল-কর্ত্তৃক পরাস্ত হন।

মৌর্য্য-রাজত্ব ৩৭৫ খৃঃ পূঃ, ভোট ১৪০ বৎসর।

৪। সোমশরমণ মৌর্য্য (দাস শরমণ বা দেবশর্ম্মণ) (বায়ুপুরাণ)

৫। শতধনবান মৌর্য্য। (বায়ুপুরাণ)

৬। বৃহদ্রথ মৌর্য্য (মন্ত্রী পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত)।

অশোক খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দে পরলোকগমন করেন এবং খৃঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে অশোকের ৪৭ বৎসর পরে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়। তাঁহার পরে ছয়জন নৃপতি মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন—তাঁহাদের সমগ্র রাজত্ব কাল ৪৭ বৎসর। ইঁহাদের মধ্যে দশরথ ৮ বৎসর অপরাপর রাজার সময় সমভাবে বিভক্ত করিলে তাঁহারাও প্রত্যেকে প্রায় ৮ বৎসর করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে, এই রাজত্বকাল মোটে ৪৭ বৎসর কোন্ রাজা সাম্রাজ্যের কতটা শাসন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইঁহাদের মোট রাজত্বকাল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য হইতে অশোক পর্য্যন্ত ১১৫ খৃঃ পূঃ অব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ১৪০ বৎসর কাল।

—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ কি? যাহা হঠাৎ এত বিস্তৃতি লাভ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিশালতা লাভ করিয়াছিল—তাহার ধ্বংসের বীজ নিজের মধ্যে লইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়াছিল। অশোকের শাসনতন্ত্র সমস্ত জগতের প্রতি সার্ব্বজনীন উদারতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে সমভাবে শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। যাহারা চরিত্রবলে শ্রদ্ধার দাবী উপস্থিত করিতেন তিনি কখনও তাঁহাদের চিরাগত অর্চ্চিত শ্রদ্ধা অগ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে, যাহা কিছু সনাতন কাল হইতে অধ্যাত্ম ও ধর্ম্মনীতির গুণে পূজা পাইয়া আসিয়াছিল, তাহা হঠকারিতা করিয়া তিনি উড়াইয়া দেন নাই। কাহারও প্রাণে পীড়া দান করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যতটা সতর্কতাই অবলম্বন করুন না কেন, যাহারা বহুযুগের ক্ষমতা ও প্রতাপ ভোগ করিয়া বংশমর্য্যাদা ও রক্তের গৌরবে সুচিরাগত আভিজাত্যে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের সকল দাবী তিনি রক্ষা করিবেন কিরূপে? ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকার ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল, সেই অধিকারের ভাগ অপর কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে ব্রাহ্মণেরা স্বতঃই কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন,

ধর্মের বিচার, ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা ও সত্যাসত্য স্থিরীকৃত হয় কিনা তাহার বিচারার্থ "ধর্ম মহামাত্র" নামক একশ্রেণীর ধর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, তখন সাধারণের উপর তাঁহাদের যে অযৌক্তিক আধিপত্য ছিল তাহা হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণই বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন এই কার্য্যের উপকারিতা ও প্রজাবর্গের চিত্তৈষণা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না

ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের বিনাশ

গির্ণার পর্ব্বতের অনুশাসনে অশোক পশুহিংসক হোমাদি নিষেধ করিয়াছেন। ধর্ম্মযজ্ঞের পশু এক সময়ে হিন্দুসমাজেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা উঠিয়া যায় বহু শতাব্দী পর তিনি এই পশুর পুনরায় সৃষ্টি করিলেন, যেখানে যেখানে তখন ব্রাহ্মণগণের অখণ্ড আধিপত্য ছিল, ধর্ম্মমহামাত্রগণ ধর্মগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ দেবতাস্থানীয় ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অপরাপর মনুষ্যের সমান করিয়া ঘোষণা করিলেন। (সিদ্ধপুর শিলালিপি।)

পশুবধের হোম নিষেধ।

চতুর্থ শুম্বলিপিতে তিনি বলিয়াছেন, ব্যবহার ও দণ্ডদানে যেন পক্ষপাত না করা হয় সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্থলে সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মের দণ্ডমুণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের কর্ত্তা ছিলেন ব্রাহ্মণেরা, তাঁহাদিগের সেই স্থান আর একচেটিয়া রহিল না, ধর্ম্মমহামাত্রগণ ও রাজুকগণ সেই সেই বিভাগে কর্ত্তা হইলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যতই পণ্ডিত কাণা কাইতেন না কেন, তাঁহার প্রতি শারীরিক দণ্ড নিষিদ্ধ ছিল, সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করাইবার কোন উপায় ছিল না। যদিই বা তাঁহারা সেচ্ছায় উপস্থিত হইতেন তাঁহাদিগের উক্তি মাত্র লিখিয়া লওয়া হইত। তাঁহাদিগকে কিছুতেই জেরা করা যাইত না। "দণ্ডের মধ্যে তাঁহাদের প্রধান দণ্ড ছিল শিখা-কর্ত্তন" "ব্যবহার-সমতা বা দণ্ড-সমতা" এই দুই কথার দ্বারা অশোক ব্রাহ্মণ-সূত্রে কোন পার্থক্য রাখিলেন না। এই সকল কারণে বিশেষ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে গুরুতর বাধা পাইয়া ব্রাহ্মণেরা যে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, অশোক কখনই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন না। চতুর্থ, ত্রয়োদশ এবং সপ্তম শুম্বলিপিতে তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যথাযোগ্য সম্মানের বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন বৈদিদিগের আজীবকগণের স্মৃতির বহু শিলালিপিতে জ্ঞাপিত হইয়াছে।

ব্যবহার ও দণ্ডের সাম্য।

কিন্তু বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত স্থান ও গৌরব মানুষ সহজে হারাইতে চায় না মহাভারতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি গৌরব থাকে, যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা এখন সেই ব্যাস-বাক্যের বিরুদ্ধতা সহ্য করিতে পারিলেন না সুতরাং অশোকের উদারতা এবং সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাব অবলম্বনে ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়াছিলেন পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক মৌর্য্যসাম্রাজ্য-ধ্বংসের মূল কারণ ব্রাহ্মণদের চিরসঞ্চিত ক্রোধ এবং প্রতিশোধেচ্ছা।

কেহ কেহ বলেন যে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষে এই পতন ঘটিয়াছিল। অবশ্য এই কারণও যথেষ্ট ছিল। অশোক স্বীয় ও বংশের ভিত্তির উপর যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন পরবর্তী মৌর্যরাজগণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। আত্মীয়ের পর দ্বিতীয় আত্মীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেইজন্যই মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বস্তাবশিষ্ট হইয়া গেল।

অশোকের বংশধরগণের অক্ষমতা

অশোকের বংশধরগণ সকলেই হীনবীর্য ও দুর্বল ছিলেন। অক্ষমের দাতীর অক্ষমই ব্যবহার করিতে পারিতেন। অশোকের পরে, এই বিশাল সাম্রাজ্য যে সকল মহাগুণে দৃঢ় ভিত্তি হইয়া একত্র সম্বদ্ধ হইয়াছিল, সেই গুণরাশির অভাবে ইহার ভিত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য। তথাপি আমরা বলিব, বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়ের পাত্র হিন্দু জনসাধারণের অনুরাগের অভাবই মৌর্যরাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল, সেনাসামন্ত ও সেরূপ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ চক্রান্তেই যে হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্ষাত্রশক্তির পুনরভ্যুদয়

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব অনেক দিন হইতেই ছিল। মূলের সংস্কৃত টেক্সট পুস্তকে এই দ্বন্দ্বসূচক বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এক সময়ে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পালি অম্বট্ঠসুত্ত নামক পুস্তকে বিশেষভাবে দেখিতে পাইতেছি। কার্তবীর্যার্জুনের সময়ে কলহটা খুব ঘনাইয়া আসিয়াছিল। পরশুরাম ক্ষত্রিয়-কুলকে নির্মূল করিয়াছিলেন।

দীর্ঘযুগের পর ক্ষত্রিয় শক্তি পুনরায় বল সঞ্চার করিয়া আর্যাবর্তে খুব শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষত্রিয় নরনারায়ণ কৃষ্ণ এই যুগে ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া হিন্দুধর্মকে নূতন এক আকারে গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টায় ক্ষত্রিয়-সমাজের সর্বসম্মত সমর্থন তিনি পান নাই—যেহেতু তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে কেহ কেহ প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতের পূর্বাঞ্চলটা—মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও চেদী প্রভৃতি রাজ্য—কৃষ্ণদ্বেষীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মগধের জরাসন্ধ পৌণ্ড্রবঙ্গের বাসুদেব, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নরক, মুর ও চেদির শিশুপালকে হত্যা করিয়া কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তদীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্যের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সবও বেশীদিন টিকিল না। কুরুক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষত্রিয়শক্তি ধ্বংস পাইল। দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যে সকল ক্ষত্রিয় বীর জীবিত রহিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যায়। দুইবেই ক্ষত্রিয় পুনরায় হীনবল হইলেন। তখন ভিন্ন সমাজের নিম্নস্তর হইতে উত্তোলন করিতে লাগিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আর কোন বড় ক্ষত্রিয় রাজার কথা অনেকদিন পাওয়া যায় নাই। তথাপি নিম্নস্তরের লোকদের ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেইপদ লাভ করা বড় সহজ কাজ হয় নাই। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শক্তির একটা শৃঙ্খলা ও শাসনপ্রণালী অটুট ছিল—নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা সহজে কাড়িয়া নিতে পারে নাই। আবার ব্রাহ্মণের সঙ্গে পুনরায় এক সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্ব ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে নহে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ে নহে, ক্ষত্রিয়-পুত্রে।

মহানন্দের সকলে একবাক্যে তাঁহার দুষ্কৃতির উপাধি দিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি হীনবংশজাত ছিলেন, এবং পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ বিপুল আহবে ক্ষত্রিয়শক্তি হীনবীর্য হইয়া ধ্বংস পাইল। নবোত্থিত নরপিশাচকে চাণক্য সংহার করিলেন। মগধরাজ্যের অন্যান্য সকলের উপর ব্রাহ্মণগণের অস্বাভাবিক শক্তির মাত্রা বাড়িল না।

ব্রাহ্মণগণ পুনঃ পুনঃ বিপদের মুখে স্বীয় প্রতিভাবলী শক্তি লইয়া, কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, অশোক সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া গ্রীস চরিত্রে ম্যাসিডনিয়া প্রভৃতি নানাদিকে প্রচার বিভাগের পৌরোহিত্যকে কি দুর্দশাগ্রস্তদিগকে সঙ্ঘের পক্ষপাতী করিয়া তুলিতেছেন, দলে দলে গ্রীক সৈন্য আসিয়া বৌদ্ধদিগের আশ্রয় লইতেছে। বেশী দিনের কথা নয়, তাহা ব্রাহ্মণদিগের যথাশ্রুত হইয়া পক্ষপাতী নহে—বর্তমান ব্রাহ্মণের অটুট ক্ষমতা বৌদ্ধেরা স্বীকার করেন না। ক্ষত্রিয়শক্তি যাহা ব্রাহ্মণদের অনুকূল হইয়া আসিয়াছিল—তাহা শূদ্রনরপতিদের দ্বারা একেবারে লুপ্তপ্রায়। শাসনে, শস্ত্র ও সমাজে যত কিছুর বেগে নবগঠিত মহাযান মত সমস্ত ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে উদ্যত। ব্রাহ্মণের এই বিপদের সময়ে ক্ষত্রিয় শক্তি গঠন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। চারিদিকে অন্যান্য সমাজ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া নিষ্ক্রিয় আর্যাবর্তের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অশোক ও মহাক্ষত্রপদের অপ্রমেয় তেজ ও জগদ্ব্যাপক অন্তরজবের প্রভাবে সেই সকল বিদেশীয় শক্তিরা নিস্তব্ধ ছিল। কিন্তু এবার দলে দলে আসিয়া কেহ বা শত্রুভাবে কেহ বা বন্ধুভাবে দেখা দিল। কনিষ্কের এক প্রধান দল বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে অশ্বমেধ অধিপত্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার পর হইতে পর থাকিলেন না। কনিষ্কের প্রবর্তিত অব্দ এখনও আমাদের অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ

ভারতের চক্ষুঃসীমার উপান্তভাগে যে সকল বিদেশীয়েরা আনাগোনা করিতেছিলেন, তাঁহারা ভারতের চক্ষুর্দৃশ্যবংশের খ্যাতির সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। ভারত তখন সমস্ত এশিয়ার মধ্যমণি, এমন কি য়ুরোপের চক্ষুও তাহার দীপ্তিতে ঝলসিয়া গিয়াছিল। জগতের রাজন্যবর্গের কিরীটস্বরূপ চক্ষুর্দৃশ্যবংশের কীর্তিকথা হুন প্রভৃতি জাতিরা বিলক্ষণ

জানিতেন ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের কোন কোন শ্রেণীকে লোক দেখাইয়া আহ্বান করিলেন— আমরা তোমাদিগকে ক্ষত্রিয়পদে স্থাপন করিব, তোমরা চন্দ্রসূর্য্যবংশের বলিয়া মানিয়া লইব এবং সমস্ত ভারতের অধিকার তোমাদিগকে দিব তোমরা আমাদিগের শ্রেষ্ঠ মানিয়া লও। আবু পর্ব্বতের কোন নিগূঢ় গুহায় এই গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতেছিল বর্ব্বর জাতিদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান পূর্ব্বক তথায় একটা যজ্ঞের আয়োজন হইল প্রমর, প্রতিহার, চৌহান এবং সোলাঙ্কী চৌলুক্য এই চারিশাখার নাম হইল অগ্নিকুল ইহারা নবসৃষ্ট ক্ষত্রিয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাই প্রবাদ আবু পর্ব্বত বারপুত্তনার দক্ষিণ দেশে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়কুলের অমিত বিক্রম সমাগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির দুইটি ছত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ অতি উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে মাত্র ৫৩ ৫ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষের গিরিসঙ্কুল উপত্যকা ভূমিতে বহু রাজবংশ এই ভাবে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া সমাজের কুলপঞ্জী ক্ষত্রিয় শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশেও এরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের উদাহরণ অনেক দৃষ্ট হয়, ক্ষত্রিয়ত্বে দীক্ষিত জাতিরা ক্রমে ক্রমে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়কুলের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া পুনরায় নবপরুদ্ধ ক্ষাত্র শক্তিকে ভারতব্যাপী করিয়া তুলিতে ছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের গৌরবের দীপ্তি এখনও লুপ্ত হয় নাই, এই বংশে প্রবেশের দাবী সত্য করিবার জন্য কত রাজা মহারাজা কুবেরের ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিয়াছেন সেই যে ক্ষত্রিয় হইবার দাবী এবং সমাজের পাদপীঠের চেষ্টা যাহা রাজপুতনার দক্ষিণাংশে বিদেশাগত হইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ঢেউ এখনও চলিতেছে। একদিকে যখন পাঞ্চাব্যা সভ্যতা পঞ্চনদযোগে গঙ্গার নিম্নদেশের সুবাসিত সীমন্তদেশ ভঙ্গ করিয়া ডাঙ্গা ও পানী এক করিয়া তুলিতেছে অন্য দিকে এই বঙ্গদেশেই সেই আবু পর্ব্বতের ব্রাত্যশুদ্ধি কত অসুরকে আর্য্যকে ক্ষত্রিয়পদে নিত্য ব্রাহ্মণের ইতরবর্ণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে বাঙ্গলার প্রায় এমন কোন হিন্দু পল্লী নাই, যাহা আবু পর্ব্বতের সেই আগুনকে করিয়া ঘরে ঘরে নব নব অগ্নিকুল উৎপাদন করিতেছে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুঙ্গবংশ

মৌর্য্যবংশের শেষ রাজত্বকাল ১৮০ খৃষ্টপূর্ব্বে ১৩১ বৎসর এই সময়ের মধ্যে অশোকের পর মৌর্য্যবংশের রাজাদের বিশেষ কোন কীর্ত্তিকথা শোনা যায় না অশোকের পৌত্র দশরথ বৌদ্ধদিগের অপেক্ষা জৈনদিগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নাগার্জ্জুন গিরিগুহা এবং তাহার পথ উপত্যকা ভূমি আজীবকগণকে দান করিয়াছিলেন। সালিসুক , সালিসুক মৌর্য্য , বায়ুপুরাণ অনুসারে ইহাদের নাম ইন্দ্রপালিত। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত রাজা খারবেল কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে

শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র অতি সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমর-নীতি-বিশারদ ছিলেন তিনি শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কথিত আছে ইহারা পুরুষপরম্পরা মৌর্যরাজগণের পুরোহিতের কার্য্য করিতেন বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের ক্রম অবনতি ইহারা খুব সুচক্ষে দেখেন নাই রাজপ্রাসাদের বাহিরে ধীরে ধীরে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য ও হৃতগৌরব মৌর্যকুললক্ষ্মীর সিংহাসনের ছবি চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এদিকে গ্রীক বীর—মিনাণ্ডার পঞ্চনদ ভারত জয় করিয়া বিপুলবাহিনী সঙ্গে মগধরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন এই বিদেশী শত্রুর চমকিবার গতি পুষ্যমিত্র নিবারণ করিয়াছিলেন নানা কারণে পুষ্যমিত্রের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ মূল-আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন হিন্দুগণ বৌদ্ধ-প্রভাবে নিমগ্ন ছিলেন এরূপ অবস্থায় বৃহদ্রথের নিষ্প্রভ রক্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লওয়া পুষ্যমিত্রের পক্ষে কোনই কঠিন কার্য্য হইত না কিন্তু চিরদিন সিংহাসনের আশ্রয়ে থাকিত, তাঁহাদের একেবারে সর্ব্বনাশ করিলে লোকচক্ষে তাহা নিন্দনীয় হইত রাজাকে সমস্ত সৈন্য পরিদর্শন করিবার ছলনায় লইয়া আসিয়া কোনও সৈন্যের দ্বারে তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে বসিয়া বসা তিনি তদপেক্ষা সমীচীন নীতি মনে করিয়াছিলেন এই ঘটনা খৃঃ পূঃ ১৮৪ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল

পুষ্যমিত্রের অনুশাসন

কথিত আছে পুষ্যমিত্র অশোকের ৮৪ হাজার সমস্যাত্মিকা ধ্বংস করেন এবং অক্ষয় যশের মূলচ্ছেদ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করিয়া নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহা ব্রাহ্মণ-রাজা কতটা ঠিক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। অশোকের বহুসংখ্যক (৮৪ হাজার ?) শিলালিপি হিমাচল হইতে কুমারিকা, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থান হইতে বাঙ্গলা ও আসাম পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলি শুধু পর্ব্বতে পর্ব্বতে শৈলগাত্রে অঙ্কিত ছিল এমন নহে, তাহার অর্থ লোক বুঝে কি না তাহা লোকে সকলে পড়িয়া স্মরণ রাখে কি না—ইহা পরিদর্শন করিবার ভার ধর্ম্মমহামাত্র ও রাজুকদের উপর ন্যস্ত ছিল সেই অনুশাসনগুলি সংস্কৃত কিংবা শুধু রাজধানীর ভাষায় শুধু ব্রাহ্মী বা কুটিল লিপিতে লিখিত হয় নাই তাহা খোষ্ঠী প্রভৃতি প্রাদেশিকলিপিতে এবং ভারতের নানা প্রাদেশিক অক্ষরে ও ভাষায় লিখিত হইয়াছিল সেই বিশাল অনুশাসন-সাহিত্য সমস্ত জনপদের লোকেরই অধিগম্য ছিল। এই অনুশাসন এরূপই সরল সহজ ও সুখপাঠ্য ছিল যে তাহা সর্ব্বসাধারণের মুখস্থ হইয়া থাকিবার কথা। শুকসারীর ন্যায় ইহারা নিত্যপাঠ্য ছিল

এই উপদেশগুলি ব্রাহ্মণগণ কখনই সুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না, সমস্ত মানুষের সমান অধিকার, বিচারসাম্য, ব্যবহারসাম্য এসকল কথা বাহিরের লোকের কর্ণে কিছুই অদ্ভুত শোনায় না কিন্তু এই ভারতবর্ষে বসিয়া কে তখন বলিতে পারিত যে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের বিচারশালার স্থান এক? এই পশু-হনন-নিষেধ অর্থাৎ যজ্ঞলোপ—যে যজ্ঞ ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, যাহা ব্রাহ্মণকে নানা দান-দক্ষিণায় পুরস্কৃত করিত সেই

যজ্ঞবিধি ও পশু-হনন নিষেধ, এই সকল উপদেশ প্রস্তরগাত্র হইতে সরল পল্লীলোকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত ও অঙ্কিত হইয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ-প্রভাবের ভিত্তি ভারতবর্ষে এই শিলামালার সারিগুলি কিরূপ অটুট থাকিবে? পুষ্যমিত্র এই নাস্তু জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ব্রাহ্মণের মনের জ্বালা নিবারণ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহেবদের মত মৌলিকতা দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, "এখন পুষ্যমিত্র ও তদ্বংশীয় অনেকেরই মিত্র উপাধি দৃষ্ট হয় এবং "মিত্র" শব্দের অর্থ "সূর্য", তাহার মনে হয় এই বংশ মূলে সূর্য উপাসক পারসিক ছিলেন। এরূপ অকিঞ্চিৎকর ভিত্তির উপর এতাদৃশ বিরাট ঐতিহাসিক মত স্থাপন করিতে হিন্দুগণ্ড সাহসী হন নাই। তিনি বিষয়টাকে একেবারে উড়াইয়া না দিয়া বলিয়াছেন, "আমি এ কথা মানিতে চাই না।" পুষ্যমিত্র সামবেদীয় গোড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মকে দুহাতে আঁকড়াইয়া মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি বাহুবল পর্য্যন্ত তাঁহার নিষ্ঠুর বৌদ্ধ পীড়ন নীতি চালাইয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে দৃষ্ট হয়। ইহাতেই সম্ভবে পুষ্যমিত্র পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করেন। পুষ্যমিত্র অতি আড়ম্বরের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। পতঞ্জলিপ্রণীত মহাভাষ্য একেবারে লিখিত হইয়াছিল, অশোকের পর পুষ্যমিত্র পুনরায় সেই গ্রন্থকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। রাজকুমার অগ্নিমিত্র বিদর্ভরাজকে জয় করিয়া সেই উপলক্ষে মাধবসেন নৃপতির দোহিত্রদ্বয়কে তাঁহার পিতাকে পরাইবার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই মগধ হইতে অশ্ব রক্ষার্থি সৈন্যগণের নানাস্থানে পলায়নের আরম্ভ হয়। "Many Mooas who escaped the sword are said to have fled into territories of other lords" (Smith's History of India, p. 174).

পুষ্যমিত্র	রাজত্বকাল	১৮৪ খৃঃ পূঃ
অগ্নিমিত্র	,,	১৫২ ,,
বসুজ্যেষ্ঠ	,,	১৪১ ,,
বসুমিত্র	,,	১৩১ ,,
অন্ধক	,,	১২৮ ,,
পুলিন্দক	,,	১২২ ,,
ঘোষবসু	,,	১১৯ ,,
ভাগবত	,,	১১০ ,,
দেবভূতি	,,	৯৮ ৭৩ খৃঃ পূঃ

(পার্জিটার—কলিযুগের রাজবংশ, পৃঃ ৩০—৭০

একুনে যোগ করিলে মিত্রবংশের রাজত্বকাল ঠিক ১০২ বৎসরই হয় না, যদিও ১১২ বৎসরই এই বংশের রাজত্বকাল নির্দিষ্ট আছে। সামান্য ১০ বৎসরের তফাৎ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এক রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীর অভিষেক ঠিক তার পরের দিনই হয় না, শুভদিন ও অপরাপর কারণের প্রতীক্ষায় বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। অভিষেক হইতে অনেক সময়ে ৪ মাস দেরী হইয়া যায়। সুতরাং ঠিক অভিষেক হইতে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত সময় ধরিলে ঐ ১০২ বৎসরই ঠিক হইতে পারে।

নানা কারণে যখন হইতে সুঙ্গ বংশের রাজত্ব লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন হইতেই ঐ বংশের ধ্বংসের সূচনা হয়। ব্রাহ্মণ কবি বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে সুঙ্গবংশীয় শেষ রাজার সময়ে যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে এই বংশের অবনতির কারণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বাণভট্ট বলেন, পুষ্যমিত্র নামক এক ব্যক্তি সুঙ্গবংশীয় শেষ রাজার সেনাপতি ছিলেন। তিনি যখন তাঁহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন তখন মিত্রদেব নামক একব্যক্তি তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। "পাতাল হইতে পদ্ম যেমন উঠিয়া পড়ে, সেইরূপ মিত্রদেবের তরবারির আঘাতে সুঙ্গরাজের মস্তক ভূমি ভেদ করিয়া পড়িয়াছিল।" হর্ষচরিত, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। সুঙ্গবংশের শেষ রাজা দেবভূতি বা দেবভূমি লম্পট ছিলেন এবং রাজকার্য্যের ভার তিনি অমাত্যের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে অন্তঃপুরে বাস করিতেন।

পুষ্যমিত্রের শেষ রাজা দেবভূতি,

খৃঃ পূঃ ১৮ অব্দে পুষ্যমিত্র সেনাপতি পদ হইতে দেবভূতিকে হত্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। অনুমান ৬৪ খৃঃ পূঃ অব্দে দেবভূতিকে হত্যা করিয়া সেইরূপে তাঁহার রাজ্যলাভী বাসুদেব কাণ্বায়ণ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। বাসুদেব ও তাঁহার বংশধরগণ মোট ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। সুঙ্গবংশে ১১২ বৎসর ও কাণ্ববংশে ৪৫ বৎসর, মোট ১৭ বৎসর রাজত্ব করিবার নির্দ্দেশ ছিল। খৃঃ পূঃ ১৮ অব্দে মগধে ব্রাহ্মণ-রাজত্বের অবসান হয়। কিন্তু কালের এই হিসাব ঠিক রাখিলেও ভিন্‌সেন্ট স্মিথ ব্রাহ্মণরাজত্বের অবসানের তারিখ ৩৮ কি ২৮ খৃঃ অব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া হইল অনুমান করিতে পারিলাম না। কণ্বিত আছে কাণ্ববংশের শেষ রাজাকে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজ সিমুক নিহত করেন। সিমুক ২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজত্ব করেন, এ বংশের রাজারা মগধ বিজয় করিলেও পুষ্যমিত্রের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক কমই ছিল।

সম্ভবতঃ অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে শাসন শিথিলতা দৃষ্ট হইতেছিল তাহার ফলে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন সামন্তরাজ ঠিক স্বাধীন না হইলেও আপনাদিগের অধীনতার পাশ অনেকটা ছেদন করিয়াছিলেন। অন্ধ্রভৃত্যেরা সেইরূপ কোন সামন্ত-রাজবংশের ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অন্ধ্র ভৃত্যদের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল বলিয়া আমরা তাঁহাদের কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। কিন্তু বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে আকারে আমরা দেখিতে পাই, তাহা দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রূপান্তর। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের তামিল কবিদের শিবস্তোত্রের সঙ্গে বাঙ্গলার অনেক বৈষ্ণব এমন কি শাক্ত কবিদের স্তোত্রেরও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আমরা

কাণ্ব ও অন্ধ্রভৃত্য।

পরে তাহা কতকটা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিব। বাসুদেবের পূর্ব্বেও অন্ধ্র ভৃত্যগণই উত্তরপূর্ব্ব ভারতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এবং বাঙ্গলার নানাজাতির সঙ্গে তাহাদের মিশ্রণ অন্ধ্ররাজগণের সময়েই ঘোর হইয়া থাকিবে।

পুরাণকারেরা শিশুনাগ, বৃহদ্রথ অন্ধ্র, মৌর্য্য এবং শাতবাহনের যে তালিকা দিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে দিলাম। বায়ুপুরাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও অগ্নিপুরাণ হইতেই আমাদের তালিকা মূলতঃ সঙ্কলিত হইয়াছে ভবিষ্যপুরাণ হইতে অপরাপর পুরাণোক্ত রাজগণের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল—পার্জিটার সাহেব এই মতাবলম্বী।

ইক্ষ্বাকুবংশ—১। বৃহদ্বল ২। বৃহৎক্ষণ ৩। উরুক্ষয় ৪। বৎসবৃদ্ধ ৫। প্রতিব্যোম ৬। দিবাকর ৭। সহদেব ৮। বৃহদশ্ব ৯। ভানুরথ ১০। প্রতীতাশ্ব ১১। সুপ্রতীক ১২। মরুদেব ১৩। সুনক্ষত্র ১৪। কিন্নরাশ্ব ১৫। অন্তরীক্ষ ১৬। সুপর্ণ ১৭। অমিত্রজিৎ ১৮। বৃহদ্রাজ ১৯। ধর্ম্মিন ২০। কৃতঞ্জয় ২১। রণঞ্জয় ২২। সঞ্জয় ২৩। শাক্য ২৪। শুদ্ধোদন ২৫। সিদ্ধার্থ ২৬। রাহুল ২৭। প্রসেনজিৎ ২৮। ক্ষুদ্রক ২৯। কুলক ৩০। সুরথ।

শিশুনাগবংশ—১। শিশুনাগ ২। কাকবর্ণ ৩। ক্ষেমধর্ম্ম ৪। ক্ষেত্রজ্ঞ ৫। বিধিসার ৬। অজাতশত্রু ৭। দর্ভক ৮। উদয়ন ৯। নন্দীবর্দ্ধন ১০। মহানন্দী ১১। মহাপদ্মনন্দী ১২। ধনানন্দ।

মহাপদ্মনন্দী ক্ষত্রিয়রাজগণের সংহারকারী, ইহার ৮ পুত্র একাদিক্রমে ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং কৌটিল্যের চক্রান্তে নিহত হন।

মৌর্য্যবংশ—১। মৌর্য্য ২। বিন্দুসার ৩। অশোক ৪। সুযশা ৫। দশরথ ৬। সঙ্গত ৭। শালিশুক ৮। সোমশর্ম্মা ৯। শতধনুস্বান ১০। বৃহদ্রথ (পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত)।

সুঙ্গবংশ—১। পুষ্যমিত্র ২। অগ্নিমিত্র ৩। বসুজ্যেষ্ঠ ৪। বসুমিত্র ৫। অন্ধ্রক ৬। পুলিন্দক ৭। ঘোষ ৮। বজ্রমিত্র ৯। ভাগবত ১০। দেবভূতি। ১০ জন শুঙ্গ।

অন্ধ্রবংশ—১। সিন্ধুক ২। কৃষ্ণ (কৃষ্ণা) ৩। শ্রীশান্তকর্ণী ৪। পূর্ণোৎসঙ্গ ৫। শকস্বামী ৬। সাতকর্ণী ৭। লম্বোদর ৮। আপীলক ৯। মেঘস্বাতি ১০। অরিষ্ট ১১। হাল ১২। মণ্ডলক ১৩। পুরীন্দ্রসেন ১৪। সুন্দর সাতকর্ণী ১৫। চকোর সাতকর্ণী ১৬। শিবস্বাতি ১৭। গৌতমপুত্র ১৮। পুলোমা ১৯। সাতকর্ণী ২০। শিবশ্রীসোম ২১। শিবস্কন্দ ২২। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী ২৩। বিজয় ২৪। চন্দ্রশ্রী সাতকর্ণী ২৫। পুলোমাবি

ইক্ষ্বাকুবংশ—১। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ ২। অতিথি ৩। নিষধ ৪। নল ৫। নভঃ ৬। পুণ্ডরীক ৭। ক্ষেমধন্বা ৮। দেবানীক ৯। অহীনক ১০। রুরু ১১। উপ্রুত ১২। রাজসাহ ১৩। মিত্রসহ ১৪। সুদর্শন ১৫। অগ্নিবর্ণ ১৬। শীঘ্র ১৭। মরু ১৮। প্রসুশ্রুক ১৯। অম্বরীষ ২০। নহুষ ২১। যযাতি ২২। নাভাগ ২৩। অজ ২৪। দশরথ ২৫। রাম।

অগ্নিবর্ণ,—ইনি অতিরিক্ত ঔদ্ধত্যসহকারে রাজ্যশাসন করিতেন এবং আহ্নিক, সান্ধিক ও নাগরিক এই বিবিধ নারী দ্বারা রমণীবিলাস সুখ করিতেন ইনি বহু বৎসর রাজ্যভোগান্তে প্রাণত্যাগ করেন। (কালিদাসের রঘুবংশ হইতে গৃহীত)।

পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি — অন্তর্বেদীর (এবং ঐ ভুক্তিপুর) পরিচিত ২। অগ্রহার ৩ শাসনকর্তা ঐ অধিকরণ ৫ নগর ইহার সময়ে ইহাকে পরাজয় করিয়া ইনি কৌশাম্বি নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ৬ ইক্ষা ৭। বিংশতম ৮। পুরোহিত ৯। বৈশ্যবৃত্ত ১০। যুদ্ধ ১১। পুরুষ ১২। পাঠান্তর ১৩। প্রজার ১৪। ভোগহীন ১৫। নগরের ১৬। ক্ষয় ১৭। ত্রিপঞ্চাশৎধিক ১৮। চতুস্ত্রিংশ ১৯। কাশ্যপের ২০। সহস্রাধিক ২১। ঈক্ষণ ২২। বহির্দ্বার ২৩। ইতস্ততঃ ২৪। বিংশতিতম ২৫। ক্ষেমক।

পার্জিটার সাহেব অনুমান করেন পুরাণগুলি পূর্বে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় বংশাবলী গাথাকারে লিখিত ছিল গুপ্তদের রাজত্বের পূর্বভাগে এই গাথা সংস্কৃত শ্লোকে লেখা হয়। ইহার পক্ষে তিনি ভাষাগত যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা অকাট্য বলিয়াই মনে হয়। গুপ্তরাজত্বের প্রথম ভাগে লিখিত পুরাণগুলিতে কতকটা ইঙ্গিত আছে—তখন তাঁহাদের রাজ্য আধুনিক প্রদেশে প্রয়াগ, সাকেত এবং মগধ লইয়া সীমাবদ্ধ ছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুরাণসঙ্কলনের অধিকাংশ শেষ হয়, গুপ্তগণ তখন অপর কয়েক জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যের অন্যতম ছিলেন এবং পুরাণে ইঁহারা সকলে ব্যবসায়ী, ধর্মহীন, অনাচারী ও ধান্যমেয়ালী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এই মন্তব্য পড়িয়া আমাদের আলবিরুনীর কথা স্মৃতিতে উদিত হওয়া স্বাভাবিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈব ধর্ম্মের বিবর্ত্তন, শিব বনাম বুদ্ধ।

"অদৃষ্টসংহৃষ্টবিবাহবাহ-
হপাশিবাধারমনুত্তরঙ্গম।
অন্তশ্চরাণাং জগতাং নিরোধা-
দিবাত্মনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥"—কালিদাস।

বোধ হয় বেদ পুরাণ ও কাব্যে মহাদেব যে ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন, অন্য কোনও দেবতা সে প্রকার রূপবৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দেন নাই।

বেদে তিনি বিনাশের দেবতা। তাঁহার উপর পুরাণ, উপপুরাণ ও কাব্য ক্রমে রং ফলাইয়া তাঁহাকে অতি উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার নর্ত্তন—আনন্দের আতিশয্য,—সেই আনন্দ তাঁহার বিষাণ-বাদনে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ত্রিশূলাঘাতে ও জগদ্ধংসকর তাণ্ডবে পরিব্যক্ত। নিষ্প্রভ গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক সেই আনন্দে নির্ব্বাপিত হয়। দিগ্বলয়গণ রুদ্ধ হইতে পবিত্রীর ধোঁয়া ফেলিয়া দিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সেই তাণ্ডব নর্ত্তনে যোগ দেয়। নর্ত্তন কালে শিবের জ্রুভঙ্গে জগতের বিলয় হয়। তথাপি জগৎ তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হয়।

আনন্দের আনন্দ, রুদ্রতাণ্ডব।

প্রদীপের চারিদিকে পতঙ্গের মত জগতের এই প্রগতি। মৃত্যু ও ধ্বংসে নিশ্চয়, তথাপি জগতের এই প্রগতি। আনন্দ স্বরূপের এই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবের চিরানুচর বিষমগুলী,—মৃত্যুই ইহার নিয়তি। তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নর্ত্তনে যোগ দিয়া শুধু মৃত্যুর জন্যই অগ্রসর হয়। এই মৃত্যুর অন্তর্নিহিত আনন্দানুভূতি রূপকারী পতঙ্গের মৃত্যু অনিবার্য্য, উহা তাহার ভালবাসার সহ-মরণ।

এই তাণ্ডব—এই বিশ্বধ্বংস এবং কৃষ্ণের রাসলীলা উভয়ই এক সামগ্রী। রাসে জীবের সমস্ত কামনা, লজ্জা, ভয়, ঐশ্বর্য্য, আত্মপরজ্ঞান নষ্ট হইয়া এক আনন্দময়ের খেলার সাহচর্য্য প্রতীক্ষা করে। তাণ্ডব পুরাতন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূর করিয়া নূতন বিশ্বরচনার সূচনা করে।

প্রজ্বলিত দীপশিখায় পতঙ্গগুলি মরে কেন? স্বেচ্ছায় ও অনিবার্য্য আকর্ষণে। মরে কেন?—জীবকে জিজ্ঞাসা কর। শিবতাণ্ডবে জগৎ নষ্ট হয় কেন?—জগৎকে জিজ্ঞাসা কর। যে এই জ্বালা বুকে লইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে সেই ইহার মর্ম্ম জানে। এই অমর-প্রেমের আকর্ষণ অন্যের অবোধগম্য।

শিবের তাণ্ডবনৃত্য ও জগতের ধ্বংস—পুরাণকারের কল্পনার এক অদ্ভুত সৃষ্টি

নিতাই সাহকালে জগৎ ধ্বংস পাইতেছে, নিতাই বিশ্বের তন্ত্রায় জীবের অস্তিত্ব ডুবিয়া যাইতেছে আবার অরুণালোকে কুসুম কুঁড়ির বিকাশের সঙ্গে জীবনের আগ্রহ স্পন্দন উপলব্ধ হইতেছে। বিশ্বদেবতার অন্ধে চোখ মেলিয়া জাগরণ, এবং তাঁহারই তাণ্ডব বা আনন্দলীলার ঘুম-পাড়ানিয়া গানের সঙ্গে চক্ষু বুজিয়া সুনিদ্রা—বিশ্ব এই ভাবে নিত্য জাগিতেছে, নিত্য মরিতেছে। নিত্য না মরিলে নিত্যকার জগৎ পুরাতন হইয়া যাইত। মৃত্যুই জীবনকে নিত্য সৃষ্টি দিতেছে।

যিনি বিনাশের দেবতা তাঁহাকে লইয়া পুরাণকারেরা কত রূপেরই না পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঢাকায় একটি পাগল ছিল—সে একটা খড়ি লইয়া অতি ব্যস্ততার সহিত বাড়ীর প্রাচীরে মনুষ্যের মূর্ত্তি, বৃক্ষ, পল্লব, ফুল ও ঘর-দরজা আঁকিয়া যাইত একটানে যে ছবি সে আঁকিত তাহা অতি নিখুঁত সুন্দর ও সুশ্রী হইত। সেই ছবি আঁকিয়া সে মুহূর্ত্তকাল ছবিটা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিত, তারপরে বলিত "বাঃ", সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা মুছিয়া ফেলিয়া অপর একটা প্রাচীরে সেইরূপ আঁকিতে মনোযোগ দিত। সারাদিন সেই আঁকার বিরাম ছিল না—সারাদিন এই মুছিয়া ফেলারও বিরাম ছিল না।

ঢাকার পাগল।

ধ্বংসের দেবতাটি কি তেমনই পাগল নয়? এই পাগলামির একটা আকর্ষণ আছে,—উহা আকারহীনের আকর্ষণ। কিছুতেই যাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সকলেই উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়। মানুষের উপর কাহারও উপর না থাকিলেও নিজের সৃষ্টির উপর এবং নিজের জনের উপর মমতা থাকা স্বাভাবিক। যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে সে বিষবৃক্ষটিকে কর্ত্তন করে না। কিন্তু এ কি দেবতা? এত সুন্দর তাঁহার এই বিশ্ব। সোণার ভাণ্ডারের দু'হাতে মুক্ত-পরিবেশন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হাত গুটাইয়া ফেলা এবং সমস্ত ধ্বংস করাই ইহার নিত্য-লীলা। এই সদ্যঃপ্রসূতির শস্য, উহার গিরিনদী, ধনধান্যময়ী শস্যবিনী প্রকৃতি দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, মনে হয় আবার দেখি। কিন্তু শিল্পী নিজে তাহার শিল্প একবারটি না দেখিয়া অমনি তাহা ধ্বংস করেন। এই যে প্রকৃতির শত শত বন্ধনের মধ্যে পরম দেবতা একটি মুক্তির স্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহা অন্য কোন জাতি এমন ভাবে কল্পনা করিতে পারেন নাই। এরূপ পাগল দেবতা, উন্মত্ত ভোলানাথ, আর কোন ধর্ম্মের শাস্ত্রে নাই। যাঁহার বুকের ভাণ্ডারী, তাঁহার শ্মশানে শয্যা,—হীরা, মণি পারিজাত-পুষ্পের বিজয়মাল্য পরিয়া দেবতারা যাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়েন, তিনি নিজে হাড়মালা পরিয়া, ভস্ম ভূষণ করিয়া জটাজূট মুক্ত করিয়া চিতায় বসিয়া আছেন। দেবতাদের অন্নের

অনাসক্ত প্রভু।

সুবাসে অঙ্গসৌষ্ঠব আমোদিত হইতেছে, আর শিবের জটাবদ্ধ কেশপাশ হইতে "ফণী ফণ" গর্জ্জন করিতেছে। কে চায় পারিজাত? কে চায় উচ্চৈঃশ্রবা? কে চায় ঐরাবত? কে চায় অমৃত? বুড়ো ষাঁড়ের উপর চাপিয়া ভিক্ষুরাজ চলিতেছেন—'ডমু' 'ডমু' ডমরু বাজিতেছে। বস্তুতঃ এই হিমাদ্রিসীমান্ত আনুগঙ্গপ্রদেশ শিবেরই প্রকৃত রাজ্য বলিয়া মনে হয়। সৌম্য, শান্ত, ভূষাগ্রযুক্ত রজতশেখর হিমাদ্রি শিবেরই লীলাভূমি সেই চারুচন্দ্রনিভ মুখের উর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রের সুচারু দীপ্তি—তাঁহার তৃতীয় চক্ষু।

শিব ও বুদ্ধ।

ভারতের ধর্ম্মপন্থী বড় গুছানো মেয়ে। এখানে যিনি যাহা কিছু ভাল লইয়া আসেন তিনি তাঁহার একটা ভাগ নৈবেদ্যস্বরূপ তুলিয়া রাখেন। বুদ্ধরাজপুত্র তরুণ বয়সে জীবন্মৃত দেখিয়া সন্ন্যাসী, জীবের দুঃখ দেখিয়া জগতের দুঃখের ভার তিনি নিজের উপর লইয়াছিলেন। আর শিব রাজপুত্র নহেন, রাজ-রাজেশ্বর,—কৈলাসের স্বর্ণময়পুরী তাঁহার রাজধানী, তাঁহার কোষাগারের অধ্যক্ষ স্বয়ং যক্ষাধিপতি কুবের। বুদ্ধ—সন্ন্যাসী, শিব ভিখারী—চিতা শয্যা। জীবের ব্যথায় ব্যথিত বুদ্ধ পরম দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য সঙ্কল্পিত। এদিকে যখন দেবগণ নিদারুণ মন্থনজাত সামুদ্রিক হলাহলে বিশ্ববিলুপ্ত হয় দেখিয়া শিবের শরণাপন্ন হইলেন, তখন তিনি সহাস্যবদনে সমস্ত বিষ স্বীয় কণ্ঠস্থ করিয়া জগৎ উদ্ধার করিলেন। যিনি সমুদ্র-মন্থনজাত রত্নরাজি, অমৃত, কৌস্তুভ এই সকল বহুমূল্য দ্রব্যের কিছুই চান নাই,—তিনি ব্যথিত জগতের বুকের দৈন্য উদ্ধার করিয়া আসিলেন, পুরস্কার কণ্ঠের বিষ। এই বিষই তাঁহার অমৃত। পারিজাত দিয়া কি করিবেন! বিষের ফুল কাণে পরিলেন, সেই বিষাক্ত ধুতুরার পুষ্প, তাঁহার হৃদয়ের বিহ্বল, সমাহিত, শান্তির ছায়া পাইয়া শুভ্র-জ্যোৎস্নার মত নিষ্পন্দ হইয়া কাণে দুলিল। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে, এমন কে আছে। বিষধর সর্পেরা, তাঁহার জটাজুট আশ্রয় করিয়া লইল, গর্জ্জনশীলা গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গের ক্রীড়া অবিরাম সেই জটাজুটে চলিতে লাগিল। এই ভীষণ পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মত শিব সমাধিমগ্ন। এই সমাধির সঙ্গে কাহার সমাধির তুলনা? শিব-সমাধি ভাঙ্গিতে যাইয়া কামদেব ভস্মাবশেষ হইয়া গেলেন।

তরুণ বুদ্ধ, বুড়ো শিবের কাছে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিবেন, শিব একটা কল্পনামাত্র, বুদ্ধ জীবন্ত ঐতিহাসিক মূর্ত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যে শিব ও বুদ্ধের মধ্যে কে যে কতটা কল্পনার সামগ্রী ইহার বিচার আরম্ভ করিলে তাহা সহজে শেষ হইবে না। কার্ণ্ (Kern) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন না, নেপাল-উপত্যকার কোন জননায়কের পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতার গর্ভসময়ে সমস্ত দেবতারা অদৃশ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অযোনিসম্ভব, মাতার কুক্ষি ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ললিতবিস্তারে এ সম্বন্ধে বহুবিধ গল্প আছে। জাতকগুলিতো সমস্তই উপগল্প অথবা ঠাকুরমার ঝুলি, সামাজ্য-ফলসূত্র প্রভৃতি পুস্তকে বুদ্ধের বীর উক্তি বলিয়া যে সকল কথা প্রচলিত আছে—

বুদ্ধ এখন শিবের মতই, অনেকাংশে কল্পনাজড়িত

তাহা ঐতিহাসিকগণ তাঁহার উক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কোন জন্মে বুদ্ধ হংস ছিলেন, কোন জন্মে তিনি বানর ছিলেন, কোন জন্মে সাপ পক্ষী ছিলেন, ইত্যাদি জাতক-কথিত বহুবিধ উপাখ্যান সহস্র সহস্র বাহ্যিক মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন বস্তুতঃ বুদ্ধজীবনী-সাহিত্য এক অদ্ভুত ও বিরাট্ কল্পনারাজ্য। শিবের মধ্যেও কি কিছু সত্য নাই? হয়ত কোন আদিযুগের এক বুড়ো সাপুড়ে শিঙা বাজাইয়া সাপের উপর চালিয়া হিমতলের কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া আদিগণের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপর কি অপরূপ এক পারমার্থিক মন্দির নির্মিত হইয়াছে বুদ্ধসম্বন্ধে এত উপকথা প্রচলিত হইয়াছে এবং হিউয়েনসাঙের মত পণ্ডিত বৌদ্ধগণও এই উপকথার এত বাহুল্য সহ্য করিয়াছেন যে হিন্দু দেবদেবীগণের সঙ্গে তাঁহার এখন আর কোন বিশেষ ব্যবধান রাখেন নাই। ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও কাল্পনিক শিব এখন প্রায় এক পঙ্‌ক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কিন্তু বুদ্ধ সে বিশাল চাল-চিত্র কোথায় পাইবেন, যাহা বুড়ো শিবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বর্গমর্ত্যপাতাল শিবের লীলাভূমি, কোন স্থানে সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া অনাদি লিঙ্গ উঠিয়াছে, কোথাও ধূর্জটির জটায় গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ-কম্পিত বিশাল জলপ্রপাত পড়িয়াছে, সে স্রোত ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, গিরিকন্দর শৈলশৃঙ্গ বিদলিত করিয়া ছুটিবার গতিতে ছুটিয়াছে। শিবের জটার একটি কেশও সেই ভীষণ অঘাত নাড়াইতে পারিতেছে না। শিব তাণ্ডব, যাহাতে বিশ্ববিলয় হয়, তাহার উদ্দামকল্পনা মানুষকে যতটা উদ্বোধিত ও কবিত্বের প্রেরণাদৃপ্ত করিতে পারে, বুদ্ধ তাহা কোথায় পাইবেন? শিবের সমাধিতে যুগ যুগ অতীত হইয়া যায়, দেবতারা সেই সমাধিমূর্তির অনতিদূরে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। বুদ্ধের নির্বাণ কি ইহার কাছে লাগে? শিব বিশ্বের বিষ দূর করিবার জন্য স্বয়ং বিষভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ মার বুদ্ধকে ছলনা করিতে আসিয়া পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৈলাস-শিখরে কাম ভস্মীভূত। যাহা কিছু বুদ্ধের গরিমা তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া শিবে আরোপিত। কিন্তু শিবের আনন্দ বুদ্ধ কোথায় পাইবেন? শিবের আনন্দের পর পার নাই, তাঁহার কণ্ঠের বিষাক্ত মৃত্যুর সুপ্ত আনন্দ-নির্ঝর ক্ষত হাস্তে সতত উদ্বেল, তাঁহার কণ্ঠে হাড়মালা, অঙ্গে চিতার বিভূতি, দেহবেষ্টী ভীষণ উরগ ও ব্যাঘ্রচর্ম, এ সমস্তের মধ্যে ভীষণত্ব বা ঘৃণার কিছুই নাই মস্তকোষ্ঠের অর্ধচন্দ্রের ধ্রুব জ্যোতিতে, আনন্দময়ের ঈষৎ-কুঞ্চিতাধরের মৃদুহাস্তে তাহারা নূতন গৌরব লাভ করিয়া আনন্দসূচক হইয়াছে। এই জগতের ব্যথার পরমব্যথী নীলকণ্ঠ শিব—এই মহাভিক্ষু, রত্নকাঞ্চনবিলাসত্যাগী মহাযোগী—সমস্ত ঘৃণার শোষক মহানিঘ্ন, আভিজাত্য ও দেবগৌরব-বিসর্জনকারী মহা অপাঙ্‌ক্তেয়, এই শিবম্, বিষাণ-ডমরু-শূল-বাঘাম্বর, মহাভয়ের মধ্যে চির অভয়—মৃত্যুর মধ্যে অমর—এই শিব,—হিন্দুর অধ্যাত্মরাজ্যের কর্তা—ঠাকুরের ঠাকুর।

বুদ্ধ ভিক্ষু—শিব ভিক্ষু, বুদ্ধ উপদেষ্টা—কৈলাসশিখরে সমাসীন শিবও উপদেষ্টা। বুদ্ধ

যারজয়ী—শিব কামভস্মকারী, বুদ্ধ নির্ব্বাণালোক প্রাপ্ত যোগী—শিব নির্ব্বাণকল্প সমাধিমগ্ন, বুদ্ধ জগতের দুঃখে দুঃখী—শিব জগৎ-উদ্ধারের জন্য কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়াছেন। তরুণ বুদ্ধ—বনাম যুগযুগান্তের বৃদ্ধ শিব। পুরাণকারেরা শিবকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিলেন আর তাঁহার সংহারমূর্ত্তি নাই, বেদের রুদ্রদেব আনন্দস্বরূপ যোগিরাজ হইলেন—তাঁহার তাণ্ডব হইল আনন্দনর্ত্তন—প্রেম-পাগলের প্রমত্ত আনন্দোৎসব।

বুদ্ধ ঐতিহাসিক চিত্র, আর শিব পুরাণের কল্পনা। পুরাণকারেরা চিরদিনই অধ্যাত্ম জীবনের উপর বেশী জোর দিয়াছেন, বাস্তব জীবনের ইতিহাসকে তাঁহারা কতটা গ্রাহ্য করেন নাই। শিবের মোড়ার যে কোন বাস্তব সত্তা নাই, তাহা কেহ বলিতে পারেন না এখনও হিমালয়ের কোন উপত্যকায় ভয়ঙ্কর বাঘাইয়া সাপ গায়ে জড়াইয়া বৃষভাসনে তুষার-কুন্দ-কান্তি কোন কোন জাতি চলাফেরা করিয়া থাকে, তাহাদের কোন সুদূর আদি পুরুষ বিষাণ-বাদনে দিক্ প্রকম্পিত করিয়া আর্য্যদের মণ্ডলীর মধ্যে হয়ত কোন কালে একটা বিশিষ্ট আসন লইয়াছিলেন,—সুতরাং মূলে কিছু বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক সত্তা ছিল,—তাহার উপর যুগ যুগ ধরিয়া পুরাণকারেরা রং ফলাইয়া এরূপ এক রজত-গিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংস বাঘচর্ম্ম পরিহিত নিখিল তত্ত্ব রূপ প্রসন্ন পদ্মাসীন মহাযোগের মূর্ত্তি আঁকিয়া ফেলিলেন যে, বুদ্ধ তাহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধ শেষকালটার জাতকের গল্পে নানাজন্মে নানারূপ জীবজন্তুর অবয়বে পরিকল্পিত হইয়া অবশেষে যে আকার গ্রহণ করিলেন, তাহাতে বুদ্ধদেবের বাস্তবতা ও শিবের কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে বেশী তারতম্য রহিল না। ললিতবিস্তরে বুদ্ধাবির্ভাব অবহিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতারা গর্ভবতী মায়াদেবীর চতুঃপার্শ্বে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ অযোনিসম্ভব, তিনি মাতৃকুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হন, এমন কি পালি অপদান-গ্রন্থে ও সংস্কৃতললিতগ্রন্থে বুদ্ধের মুখে যে সকল কথা আরোপ করা হইয়াছে, হিউয়েনসাঙ্গ তাঁহার অণিমা-লঘিমা শক্তির যে সকল গল্প লিখিয়া গিয়াছেন—মহাবস্তুঅবদানে বুদ্ধের লঙ্কায় গমনসম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক আখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা প্রায় সকল বৌদ্ধ বিশ্বাস করেন। এই সকল গল্পে আস্থাবান্ লোকদের সঙ্গে শিবোপাসকদের পার্থক্য কোথায়? জাতকগল্প ও পুরাণ-আখ্যানগুলিতে প্রভেদ কি? বুদ্ধ যে সকল নিয়ম ও উপদেশ দিয়াছেন, নানা পুরাণে নানা তন্ত্রে শিবোপদেশ তদপেক্ষা গুরুত্বে ন্যূন কিসে? সুতরাং জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধ-সাহিত্য ও হিন্দুর তন্ত্র-পুরাণ প্রায় এক পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐতিহাসিক বুদ্ধের উপর ক্রমাগত রং ফেরান হইতে লাগিল এবং বৈদিক শিবও ঠিক একস্থানে দৃঢ়ীভাবে স্থির থাকিলেন না।

বৌদ্ধ ও শিবের আদর্শ সাম্য।

ভারতবাসীর চক্ষে বুদ্ধ ও শিব প্রায় এক শ্রেণীর দেবতা হইয়া পড়িলেন। হীনযানীরা সরিয়া পড়িলেন, কিন্তু মহাযানীরা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া বুদ্ধকে তাঁহার স্বদেশে আরও কতকদিন টিকিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি আকাশের নিম্নস্তরে মিলিয়া যায় এবং পূর্ব্বাকাশ সিন্দূরে রাঙ্গাইয়া দিনদেবতা শত

রশ্মির শর-নিকরে সমস্ত কুহেলিকা দূর করিয়া জগতে আবির্ভূত হন, বুদ্ধ সেই ভাবেই অস্ত গেলেন এবং শিব সেই ভাবেই বুদ্ধের সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিঃশেষে আহরণ করিয়া তাঁহাকে হঠাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র যেরূপ পরশুরামের ভাগবত তেজ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ যেরূপ শিশুপালের বৈষ্ণবীশক্তি লুপ্ত করিয়া সুদর্শন-চক্র-দ্বারা তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিলেন, শৈবধর্ম সেই ভাবে বুদ্ধের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে আয়ত্ত করিয়া বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষে একেবারে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিল।

পুরাণকারেরা বুদ্ধের সমস্ত বিভূতি শিবে প্রয়োগ করিয়া দেবাদিদেবের মূর্তি উজ্জ্বল করিলেন, সুতরাং এই নবপ্রতিষ্ঠিত শিবমূর্তির নিকট বুদ্ধদেবের মূর্তি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

কিন্তু বুদ্ধ ভারতবর্ষকে যে দান দিয়াছিলেন, শিব কি শুধুই তাহা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন? বুদ্ধ দিয়াছিলেন—ভিক্ষুর ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, কামনার বিলোপ এবং নির্বাণ জীবমঙ্গলের জন্য। আমরা দেখিতে পাইলাম, শিব এ সমস্ত গুণই আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধমূর্তি ম্লান করিয়া ফেলিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় পরিচ্ছেদ

শৈব ধর্মের অভিনব দান

কিন্তু শিব এই সকল গুণ ছাড়া আরও তিনটি বিষয়ে বুদ্ধকে ডিঙ্গাইয়া গেলেন। তাঁহার নূতন তিন গুণের—প্রথমটি আনন্দ, দ্বিতীয়টি গার্হস্থ্যাশ্রম ও তৃতীয়টি ব্রহ্মজ্ঞান

বৌদ্ধধর্ম আনন্দ হীনের ধর্ম—জগতের অত্যন্ত দুঃখাভিঘাতে অভিভূত মানবের পরিত্রাণ কিনা হল।

আকাঙ্ক্ষা, কামনার বিলোপ যে নির্বাণ, তাহাতে প্রশান্তি আছে কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই এই আনন্দ হীনতার জন্য উত্তর কালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অপর নাম নাস্তিকতা হইয়াছিল।

শৈব সমাধি আনন্দ-সাগরে ডুব দেওয়া, ইহাতে দুঃখের হাত হইতে পলায়নের ইচ্ছা নাই, কল্পনিধির পূর্ণত্ব যেরূপ সমুদ্রকে আকৃষ্ট ও স্ফীত করে, ব্রহ্মানন্দ সেইরূপ আত্মাকে আকর্ষণ

আনন্দ

করিয়া তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে ইহা আত্মোদ্ধার আনন্দ, ইহা সংসারকে জ্বালাযন্ত্রণার কারাগার মনে করিয়া সংসার-কারাগার ভাঙ্গিবার ইচ্ছা প্রসূত নহে; ইহা আধ্যাত্মিক জগতের অনাগত বসন্তের আহ্বান

বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ সংসারাশ্রমকে হীন মনে করিয়াছেন। "সামঞ্ঞফলসুত্তে" বুদ্ধদেবের এ সম্বন্ধে অজাতশত্রুর প্রতি উপদেশ অতি সুস্পষ্ট, সন্ন্যাসীর স্থান গৃহাশ্রম হইতে উচ্চ। ঋষি গৃহী হইতে বড়,—গৃহী যত বড় অনাসক্তই হউন না কেন। বুদ্ধ তাঁহার সঙ্ঘে স্ত্রীলোকের

স্থান প্রথমতঃ রাখেন নাই, শেষে বহু অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে অষ্টভিক্ষুরা বৃদ্ধা মহাপ্রজাপতীর জন্য দ্বার খুলিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। শৈবধর্ম্ম গৃহকে পুণ্যনিকেতন করিয়া দেখাইল—গৃহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। অন্নপূর্ণা গৃহিণী ও গৃহস্থ শিব আদর্শ দম্পতী। সে দাম্পত্য কত বড় তাহা পুরাণকারেরা নানাভাবে দেখাইয়াছেন। শিবের ন্যায় স্বামী পাইবার জন্য গৌরীকে বহু তপস্যা করিতে হইয়াছিল, তপস্বিনী, সুচির-সাধনাক্লান্তা, তরুণী গৌরী দাম্পত্যের আদর্শ স্ত্রীমূর্ত্তি গৌরী স্বামিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ দাম্পত্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন শিব মৃত গৌরীদেহ স্কন্ধে করিয়া মহাপ্রলয়ে নৃত্য করিয়াছিলেন, এদিকে কৈলাসে শিবদুর্গার সংসার—আদর্শ পারিবারিক জীবন প্রতিবিম্বিত ভিক্ষুকের অন্নথালায় অন্নপূর্ণা,—শিবের ষাঁড়, দুর্গার বাঘ সিংহ, কার্ত্তিকের ময়ূর, গণেশের ইন্দুর ও লক্ষ্মীর পেচক এবং কৃত্রা নন্দী-ভৃঙ্গী ও পুরুকুলাগণকে পরিবেশন করেন সিদ্ধি ও ভাঙ্গ বাটিতে বাটিতে হিমরাজের করুণার হাতে কড়া পড়িয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রসন্ন প্রেম-পবিত্র মুখশ্রীর ছবি ও মাতৃমূর্ত্তি নিরুপম আনন্দের আধার। এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে গৃহিণীমুখে সেই অন্নপূর্ণার দুঃখসহনক্ষমা অপূর্ব্ব সেবা ও ত্যাগের কথা শোনা যাইতেছে এদিকে শিবের শত প্রেম সত্ত্বেও তিনি ত্যাগী-উদাসীন—যে মুহূর্ত্তে গৃহাশ্রম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তে আবার চিত্তাগ্নির বিরাগ তাঁহাকে সমভাবেই আকর্ষণ করিতেছে। একদিকে গৌরীর কোমল বাহুলতা কণ্ঠ বেষ্টিয়া ধরিয়াছে, অন্যদিকে বিষধর সর্প তাঁহার অপর স্কন্ধে ফোঁস ফোঁস করিতেছে এই অনাসক্তির মধ্যে আসক্তি, বিরাগের মধ্যে রাগ—ভাব সমাধির পার্শ্বে অগাধ দাম্পত্য-প্রেম—এই ত্যাগের মহিমমণ্ডিত গৃহীর চিত্র—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শুষ্ক আনন্দহীন নীরসত্ব কঠোরতর করিয়া লোকচক্ষে উপস্থিত করিল এবং এই ধর্ম্মের প্রতি সকলকে বিমুখ করিল বুদ্ধদেব তাহা চেষ্টা করেন নাই, পুরাণকারের নবসৃষ্ট শিব এখানে তাহা মুক্ত কণ্ঠে পরিবেশন করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে আস্তিকতা নাই। বুদ্ধদেবকে ছাপাইয়া ভক্তের পূজার ধূপ ধোঁয়া আর উপরে উঠিল না। সেই বুদ্ধদেবও বলিলেন, কেহ কিছু করিতে পারিবে না, তোমার নিজের উপকার নিজেকেই করিতে হইবে। কর্ম্মফল অপরিহার্য্য, অবশ্যম্ভাবী ও অমোঘ পূজা কর কর্ম্মের—মন্দিরে ঘণ্টা বাজাইলে তোমার পাপতাপ ঘুচিবে না।

শিব-সমাধি আনন্দলোকের পূর্ণ ইঙ্গিত, তাহা শুধু কামনা-জয় নহে, কামনা-ক্ষয়ের পরে কোন অনাস্বাদিত সুখের স্পষ্ট আভাস তাহাতে আছে আত্মার মধ্যে যে পরমাত্মা তাহার স্বরূপদর্শন, "মনো নবদ্বারনিবিষ্টবৃত্তি আত্মানমাত্মস্থমলোকয়ন্তম্" এই শিবকে আমরা পাইলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে শৈবধর্ম্ম বুদ্ধের এক একখানি করিয়া সমস্ত ভূষণ হরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের দত্ত ঐশ্বর্য্য হইতে আরও কিছু বেশী অধ্যাত্মসম্পদ এদেশকে দিয়াছিল—যাহাতে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরিবর্ত্তে "হর হর" রবে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

এদিকে অতিশয় সূক্ষ্ম-চিন্তা ও বিচারবৃত্তির ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম লোকের নিকট ক্রমশঃ

নাস্তিকের ধর্মরূপে পরিচিত হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর-রচনাবলীতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত যথাযথ রূপেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে (ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১০২) আমরা তাহা দেখাইয়াছি। সেইদিকে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে যে উষর মরুভূমির সৃষ্টি করিয়াছিল, পুরাণকারেরা তাহাতে রসের অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিলেন ভারতবর্ষকে সেই যুগে কেহ ঘোর কাঁদিয়া এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্মে পরিবর্তিত করে নাই, পরন্তু আকর্ষণী বলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম নিবৃত্তি মূলক। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবারণ ইহার মূল উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য লইয়াই কপিলবস্তুর রাজকুমার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অরণ্যচারী হইয়াছিলেন। সংসার যতদিন থাকিবে, ততদিন মানুষের দুঃখ অপরিহার্য। কাম-ক্রোধাদি রিপুর শিকড় পর্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া মানুষকে অনড়, অটল ও নিষ্কম্প একটি পাষাণ-প্রতিমার মত করিয়া গড়িতে হইবে। যাহা কিছু জীবনের উপভোগ্য তাহা সমস্ত কাটিয়া দেওয়া হইল। বৌদ্ধধর্ম কঠোর চিকিৎসকের মত জ্বরোগীর ঘরে হানা দিয়া তাহাকে সকলবিধরে নিরন্ন করিয়াছিল, কিন্তু এই ধর্ম দিয়া গেল কি? নির্বাণক্লেশ মহাশূন্য, যাহাতে মানুষের যথাসর্বস্ব লুপ্ত হইয়া একটা শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে একটি মাত্র নৈতিক দান এই ধর্মের অঙ্গীভূত ছিল, তাহা দয়া, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি। একটি অপূর্ব মত, একটি অপার্থিব কুসুমের মত এই দয়াবৃত্তি সঙ্ঘধর্মের শ্রী উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু নির্বাণ-প্রাপ্তির পর সে দয়াও বিলুপ্ত হইয়া যায় সুতরাং লৌকিক বিশ্বাসে যে অল্পে সে নাস্তিক বাদের অপর নাম হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

উন্নত নৈতিক জীবন, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই কি মানুষের সম্যক্ পরিতৃপ্তি দিতে পারে? প্রকৃতিতে চারিদিকেও 'নেতি-নেতি'র এত সুন্দর হইয়া গাছের ডগায় ফুলটি ফুটিল, কিন্তু দুদিনের দেখা-সোনার পরই সমস্ত চুকিয়া গেল, প্রকৃতি 'নেতি-নেতি' বলিয়া তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন, আকাশে উজ্জ্বল তারাটি ফুটিল, রাত্রি অবসানে প্রকৃতি আকাশ হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, অপোগণ্ড শিশুর মুখে স্বর্গের হাসি চিতায় ঢালি দিলেন। প্রকৃতি কত বীর্য, কত প্রতিভা, কত ক্ষমতা, কত হেলেন, কত নারদ, কত অভিমন্যু, কত তিলোত্তমা, কত অর্জুন ও আলেকজাণ্ডার মানব জগতে অপূর্ব রং দিয়া আঁকিয়া 'নেতি-নেতি' বলিয়া মিলিতে দিলেন না। মহাশূন্যের ক্রোড়ে এই 'নেতি-নেতি' রব চিরকাল ধ্বনিত হইতেছে বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি কি এই শূন্যবাদ—যাহা আছে তাহা অনিত্য সুতরাং অসৎ সেই হেয়?

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে আর একটি সামগ্রী আছে তাহাও তো উপেক্ষণীয় নহে। আনন্দ বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, এই আনন্দ মরণকে অবিনশ্বর করিয়াছে, শূন্যকে অবিশ্রান্ত অঙ্কপাত দ্বারা নিরর্থক করিতেছে। নিত্য রাত্রে চোখ বুজিলেই জগৎ লুপ্ত হইয়া যায়—অন্ধকারের গর্ভে মহা শূন্য কিন্তু আবার প্রত্যূষে জাগিলেই দেখি, কিছুই তো যায় নাই। যাহা গিয়াছে ভাবিয়াছিলাম, তাহা স্মৃতির সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষায় চক্ষুর কাছে নিজের সত্তা

প্রমাণ করিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে। আনন্দ এই নিত্যচঞ্চল ধ্বংসশীল জগতের চিরস্থায়ী মেরুদণ্ড, চঞ্চলের সঙ্গে—অনিত্যের সঙ্গে নিত্য বস্তুর সেতুবন্ধন। বৌদ্ধধর্মে এই আনন্দ নাই কান্না ও হাহাকার আছে—হয়ত নির্বাণ বারিপ্রক্ষেপে তাহা সাময়িক ভাবে নির্বাপিত করা যায়, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের জন্য যেরূপ অন্তর্জলের দরকার—শুধু দুর্বাদলী চিরবাহিনী তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু মানব-মন যে পরম-পরিতৃপ্তি চায়—চঞ্চল ছোট ছোট তৃপ্তি যে স্থায়ী মহাতৃপ্তিকে ইঙ্গিত করে, সেকথা বৌদ্ধধর্মে বলে না। নির্বাণ ও সমাধিতে এই প্রভেদ। যদি নির্বাণে মুক্তিলাভ হয়, তবে পূর্বেই বলিয়াছি নিত্য সমাধি আনন্দসাগরে ডুব দেওয়া।

শৈবাদর্শের শৈবধর্ম বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থে অগ্রহত গৌরীর সঙ্গে শিবের যে সকল প্রেমলীলা আমরা বাঙ্গালার ভাস্কর্যের পাথরে বর্ণিত দেখিতে পাই এবং সেই যুগের শিব ও গৌরীর পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ প্রস্তর নির্মিত যুগলরূপ দেখিতে পাইতেছি, তাহা রাধাকৃষ্ণের লীলার আদি সূত্রের সূচনা করে। বুদ্ধদেব যেরূপ বেদের কর্মদেবতাকে সেবা, শান্ত সমাধির গভীর দিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে চরগৌরীর প্রেম সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলার প্রথম অধ্যায় অবধারিত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব শিবকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া স্বীয় সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় লইলেন। শিবও তরুণ কৃষ্ণকে তাঁর প্রেমের বিস্তৃত প্রদান করিয়া এদেশ হইতে বিদায় লইলেন। শিবের গার্হস্থ্যধর্ম, স্বপত্নীকে ধর্ম উপদেশ দেওয়ার যাহা উপাদানগুলি পাওয়া যায় তাহার পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ-পূর্বক প্রেমের মহান এ দেশকে ভাসাইয়াছিলেন। এই মহান আদি সূচনা শৈবধর্মে।

এই ভাবে বৈষ্ণব কল্পদেবতা পরবর্তী বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের গুণগুলি গ্রহণপূর্বক জ্ঞানীর আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন,—শিব ক্রমশঃ জ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়া প্রেমের পথে অগ্রসর হইলেন—এবং যখন হরগৌরীর যুগলমূর্তিতে এই প্রেম কতকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন রাধাকৃষ্ণ বঙ্গের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রেমের পরিপূর্ণ শক্তি প্রদর্শন করিলেন। দুঃখের বিষয় হরগৌরীর যে অপূর্ব প্রস্তর নির্মিত যুগলমূর্তি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় পাওয়া যায়, পতিব্রতা-বিদ্বেষীদের দ্বারা প্রস্তরশিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে বঙ্গদেশের সেই নিকষিত হেমতুল্য সমাক্ পরিণত প্রেমের স্থায়ী প্রতিচ্ছবি প্রস্তরে অঙ্কিত বা গঠিত দেখিতে পাই না। শিবে সেই প্রেম-পরিণতি না পাইলেও আমরা অতুলনীয় বৈষ্ণব পদে তাহা পাইয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সাম্রাজ্য

"সোঽইমাঞ্চতুরুদধিমাস্বাদিতোদয়কাননাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্॥
যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্॥
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥
—অথবঃ সদৃশো তনুবাপিতবোঽপি সন্।
তদগুণৈঃ কর্ণমাপত্তা চাপলায় প্রণোদিতঃ॥"

—রঘুবংশ।

অন্ধ্র ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্ম্ম-প্রতিযোগিতা

অন্ধ্র নৃপতিরা যতকাল আর্য্যাবর্ত্তে প্রবল ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহারা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী তেলিঙ্গনা প্রদেশের লোক ছিলেন এবং তেলেগু ভাষায় কথা বলিতেন। সৌতকর্ণপুত্র জ্ঞানশ্রী ইহাদের সর্ব্বপ্রধান রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকাল ১৭৬ খৃঃ—১৯৬ খৃঃ। ২২৫ খৃঃ অব্দের পর ইহাদের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনেক স্থানে "তেলেঙ্গা" সৈন্যের উল্লেখ আছে মুতাক্ষরিণে দৃষ্ট হয় সৈন্যমাত্রই বঙ্গদেশে "তেলেঙ্গা" নামে অভিহিত হইত, তেলিঙ্গনা সৈন্যের এক কালে ব্যাপক-প্রভাবের ইহা প্রমাণ। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অন্ধ্র প্রদেশের শৈবধর্ম্মের দ্বারা বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সুতরাং বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষায় এই তেলেগু জাতীদের একটা অবদান ও অন্তরঙ্গতা আছে—তাহা পরে আমরা দেখাইব।

অন্ধ্রপ্রাধান্য, ৩৩ খৃঃ পূঃ—২২৫ খৃঃ।

সুঙ্গবংশের ক্ষমতা-বিলোপের এবং গুপ্ত অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলের ইতিহাস কতকটা তমসাচ্ছন্ন। এই সময়টার মধ্যে পশ্চিমদিকে বক্ত্রিয়ার গ্রীক শাসনকর্ত্তারা খুব শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন; মৌর্য্যবংশের শেষ দিকটায় ইহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আরও ক্ষমতাশালী হইয়া পঞ্চনদ পর্য্যন্ত দখল করেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের শেষে পাঞ্জাব ও কাবুলের অধিপতি সুভাগসেনা পরাজিত হইয়া বহু উপঢৌকন ও রাজস্ব প্রদান করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ রাজা ডেমিট্রিয়স এত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তিনি "ভারতবর্ষের অধিপতি" নামেও পরিচিত ছিলেন। ক্রমে চীনদেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে 'য়ুই চি' নামক এক বৃহৎ সম্প্রদায় পশ্চিমদিকে অবতরণ করিয়া বক্ত্রিয়া দখল করেন। তাঁহাদের রাজা কাডফিসেস্ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়া অগ্রসর হন। দ্বিতীয় কাডফিসেস্ এত প্রবল হন যে তিনি চীনদেশ অধিকার করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি চীন সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিয়া পাঠাইয়া শেষে বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

শকবংশের অভ্যুদয়

দ্বিতীয় কাডফিসেসের পর শকরাজ কণিষ্ক প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করেন (৭৮ খৃঃ)। কণিষ্কের পর তৎপুত্র হুবিষ্ক, তাঁহার পর বাসুদেব সম্পূর্ণ হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় শকবংশের উপাধি পরিত্যাগ করেন।

কণিষ্ক, হুবিষ্ক প্রভৃতি

কণিষ্ক
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

হুবিষ্ক
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

শারীরিক শক্তিবলে যাঁহারা বাহির হইতে এদেশ দখল করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার সনাতনী-শক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া এ দেশের ধর্ম্ম ও আচার

গ্রহণ করিলেন। হিন্দুর এই বিজয়কথা অষ্টাহ্নিকে ইতিহাসে লিখিত আছে। এই প্রাকারের কোন কোনটির মূলদেশ বুদ্ধ ও হিন্দু লাঞ্ছন বিবর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীকরাজ মিনান্দার পূর্বপঞ্জাব অধিকার করিতে যাইয়া পুষ্যমিত্রের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এন্টিয়ালকিডাসের দূত গ্রীক তক্ষশিলাবাসী হেলিওডোরাস বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিয়া গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় কাডফিসেস্ শৈবধর্মে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার মুদ্রার একদিকে তাঁহার মূর্তি অপরদিকে বৃষভারূঢ় মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত আছে। (অক্সফোর্ড ইতিহাস—ভিন্সেন্ট স্মিথ ১২৮ পৃ) পার্থিয় রাজা গণ্ডফারনেসের মুদ্রাতেও শিবমূর্তি অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় কাডফিসেস এবং কণিষ্ক উভয়ের মুদ্রায় শিবের চতুর্ভুজ, ত্রিশূল এই দুই মূর্তিই পাওয়া যাইতেছে। কাশ্মীরের কোন কোন মুদ্রার একপার্শ্বে বৃষমূর্তিও দৃষ্ট হয়।

ইতিহাসের যারতীয় ধর্ম ও উপাসনা

কিন্তু কণিষ্ক শিবভক্ত হইলেও বৌদ্ধসঙ্ঘেরই গোড়া ছিলেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে বৌদ্ধধর্ম—বিশ্বের সার্বজনিক মহাযানে কোন কালেই শিবকে বাদ দেয় নাই। কণিষ্কের পৌত্র বাসুদেব নিজের শক উপাধি পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইভাবে দুই শতকের মধ্যে বিদেশী গ্রীক, পার্থিয়, কুষাণ ও শক ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবে বৌদ্ধধর্মের দেশ-বিদেশে সকল প্রচারের ফলে ইহা ভারতীয় স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই। এদিকে "চীনাংশুক" বুদ্ধের মতগুলি বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাতে তাঁহাদের মধ্যে বিকৃতি লক্ষণে অস্বাভাবিক উপস্থিত হইয়াছিল। অশোকের পর কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করিয়া তাহা আরও উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি পুনরায় বৌদ্ধসঙ্ঘ আহ্বান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত হইয়া ইহা যে আকার ধারণ করিল, তাহাতে ইহা অনেক পরিমাণে হিন্দুমত গ্রহণ করিল। এই নবগঠিত উদারপন্থী বৌদ্ধধর্মের নাম হইল মহাযান। এখন চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ সকলেই মহাযান পন্থী। যাহাকে হীনযান নামক নিন্দিত উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। কিন্তু এই দুই নাম সম্প্রতি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং একদেশদর্শীরা হীনত্ব ও মহত্ত্বের যে সূচনা করিয়া নাম সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা সর্বসম্মত নহে।

বৌদ্ধধর্মের নবসংস্কার হইলেও উহা স্বাভাবিক টানে শক্তি ভারতবর্ষে করিয়া আসিতে লাগিল। রামায়ণের আকর্ষণ ভারতবাসীর পক্ষে অনিবার্য হইয়া উঠিল। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত অপেক্ষা রামায়ণ-কাব্য ভারতবাসীর মন বেশি আকর্ষণ করিল। মহাভারত কৃষ্ণকে কেন্দ্রবর্তী করিয়া নব রূপান্তরের সাধনা প্রদান করিল। এই মহাগ্রন্থের বিরাট আদর্শ, আখ্যান গৌরব, আদিধর্মের বৈষ্ণবধর্ম নূতন ভাবে উদ্বোধন করিল। বহুদিন যাগযজ্ঞের ধূমধাম ও মূলকাণ্ড পশুহননকলুষিত উল্লাস অশ্বমেধাদি যজ্ঞের দিগ্বিজয়ী উৎসাহ এদেশে নিরস্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র এই যজ্ঞাগ্নি নূতন করিয়া প্রজ্বলিত করিলেন। বৌদ্ধ

দিগের ত্যাগ অপেক্ষা কায়ক্লেশ পুনরায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বৌদ্ধ সাম্যপ্রচারে ব্রাহ্মণগণ বর্জ্জিত বলিয়া বর্জ্জিত হন নাই, এমন কি ধর্ম্মগুরুর আসনও তাঁহাদের উপযুক্ত পরিচায়ক ছিল। অশোকের সময়েই কিংবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে পুরাতনকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছিল, তাঁহার অনুশাসনেই তিনি তাহা জানাইয়াছেন। "লোকের এখন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও মাতাপিতৃগণের প্রতি বাক্যসংযম।" সত্যের গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে পারিবারিক বন্ধন এই শিক্ষার নিকার নিকার বিধিল হইয়া পড়িয়াছিল। সত্যকে উচ্চতর স্থান দেওয়াতে পারিবারিক সম্বন্ধের গুরুত্ব কমিয়া গেল। অশোক একদিকে সত্যের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার ঘোষণা করিয়াছেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ উচ্চতর ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, অশোক তাঁহাদের কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের এই গৌরব স্বীকার করিয়াও তিনি তাঁহাদিগকে কোন বিশিষ্ট পদ দেন নাই। চরিত্রভূষিত লোকেরই তিনি আদর করিয়াছেন ও জাতি নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকেই রাজসভার উচ্চতম পদ প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণদিগের পুনরুত্থান

ব্রাহ্মণ কে? মহাভারতকার অনেকবার এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নহুষ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, "যদি শূদ্রে সত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ লক্ষিত হয় তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" ২। যুধিষ্ঠির যক্ষরূপী ধর্ম্মের অনুরোধে বলিয়াছিলেন যেখানে প্রবৃত্তি, জন্ম ও মরণ মনিষ্যজাতির সাধারণ ধর্ম্ম এই নিমিত্ত সকল পুরুষেরা জাতিবিচারে বিদ্ধ হইয়া নানাবিধ অপকর্ম্মোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের একরূপ সম্বন্ধবশতঃ ব্রাহ্মণাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু শুকনাসিকা তাহার মধ্যে "তোমরা যাগযজ্ঞে তাহারাই ব্রাহ্মণ" এই আগু প্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করেন (বনপর্ব্ব ১৭৯ অ. ৩)। কিন্তু অনুশাসনপর্ব্বে দেখা যায়, "ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই গুণনির্ব্বিচারে তিনি পূজা পাইবেন" এই বিধান আছে। সময়ে মহাভারত পাঠ কারণে দৃষ্ট হইবে, এই গ্রন্থে ভারতীয় অতি পুরাকালের সমাজ নৈতিক আভাস থাকিলেও ইহা সঙ্কলিত হওয়ার সময়ে ব্রাহ্মণকেই সর্ব্বপ্রধান স্থানে, এমন কি সর্ব্বোপরিস্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা আছে। এই ব্রাহ্মণ-গৌরবের ধ্বজা ধারণ করিয়া আছেন স্বয়ং ভগবান শাস্ত্রিত শঙ্খ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ঠিক মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণ তখনও যে সমাজে পরবর্ত্তী যুগের মত প্রতিষ্ঠিত হন নাই, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, সভাপর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারটার উপর কোন জোর দেওয়া হয় নাই। অতিথির ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা এবং বামন, অন্ধ, পঙ্গুদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহারদানের কথা আছে সেখানে ব্রাহ্মণ-ভোজনের উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণ-ভোজনই সকল ধর্ম্ম ও সামাজিক কাজের সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ কে? তিন যুগে তিনরূপ ব্যাখ্যা।

ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে করিয়া যে হিন্দুধর্ম্ম নূতন ভাবে দাঁড়াইল তাহার অগ্রদূত শ্রীকৃষ্ণ

কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল মহাভারতের ধর্ম গ্রহণ করে নাই, মগধে সুঙ্গবংশের সঙ্গে কৃষ্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য কতকটা নির্বাসিত হইয়া গেল। এ দিকে হর্ষবর্ধন কনোজে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মকে উজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মগধ ও গৌড়ে প্রাচীন শৈব ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। জরাসন্ধ, নরক, মুর, শিশুপাল প্রভৃতির রাজ্যে কৃষ্ণ বহুকাল নিগৃহীত রহিলেন।

আমরা দেখাইয়াছি, বৌদ্ধ ধর্মকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়া শৈব পণ্ডিতরা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম যে আকারে গৌড়ে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ আসীন বিষ্ণু, যাহার একদিকে লক্ষ্মী, অপর দিকে সরস্বতী, পূজিত হইতেন। মহাভারতের কৃষ্ণিণী, প্রদ্যুম্ন বহুপত্নীক নৈষ্কর্ম্যনন্দন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কেন্দ্রবর্তী নবব্রাহ্মণগোত্র পুরোহিত-কৃত রাজচক্রবর্তী কৃষ্ণ এই পূজার উদ্দিষ্ট ছিলেন না, ব্রাহ্মণই পরমপূজ্য ছিলেন। হিন্দু ধর্মের নব আবরণে এক দিকে বৈষ্ণব ধর্ম অপরদিকে শৈব ধর্ম উভয়েই নবশ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের পার্শ্বে শৈব ধর্ম বহুকাল একত্র প্রচলিত ছিল। গৌড়ের প্রাচীন সমস্ত তীর্থই শৈব।

পূর্বাঞ্চলে শৈব ধর্মের প্রাধান্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুপ্তগণের অভ্যুদয়

কুষাণ ও সুঙ্গ বংশের পর চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস কুহেলিকাময় ও তমিস্রাচ্ছন্ন। গুপ্তরাজত্বের কিছু পূর্বে মকরাক্ষ পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মার কথা বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে কোদিত লিপি হইতে জানা যায়। ইনি যদি মেহেরৌলি স্তম্ভলিপির চন্দ্র হইতে অভিন্ন না হন, তাহা হইলে চন্দ্রবর্মা বঙ্গে এক মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সুদূর পশ্চিম হইতে তিনি বঙ্গদেশ পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন।*

চন্দ্রবর্মা, চতুর্থ শতাব্দী।

* শ্রীযুক্ত কে পি জয়সোয়াল বিহার ও উড়িষ্যা-রিসার্চ সোসাইটির মাসিক সংখ্যক পত্রিকায় (১৯৩০) প্রমাণ করিয়াছেন যে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদে কুষাণ ও ভরশিবদের অবসান ও গুপ্তযুগের আরম্ভ—এই সময়টাকে ভারতীয় ইতিহাসের "অন্ধকার-যুগ" আখ্যা দিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। জয়সোয়াল সাহেব বলেন, গুপ্তদিগের অভ্যুদয় পূর্বে আর্যাবর্তে বাকাটক ও ভারশিব এই দুই প্রবল রাজবংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা যে শুধু আর্যাবর্তের প্রধান রাজশক্তি ছিলেন, তাহা নহে,—গুপ্তদিগের পূর্বে ইঁহারাই ভারতবর্ষের

এই অন্ধকারযুগে ক্ষীণ আলোকরশ্মির মত কোন এক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নামক এক রাজা সুবিখ্যাত লিচ্ছবি বংশের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া সমস্ত গৌড়রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম ঘটোৎকচ এবং পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত ইঁহারা সম্ভবতঃ সামান্য সামন্তরাজরূপে মগধাধিপের অধীনে থাকিয়া ক্রমে বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন বুদ্ধদেবের সময়ে লিচ্ছবিদের কথা পাওয়া যায়, তারপরে ৭০০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের গৌরবমহিমার বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না কিন্তু গুপ্তদের মুদ্রায় যে ভাবে লিচ্ছবিদের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় গুপ্তযুগের অব্যবহিতপূর্ব্বে লিচ্ছবিরাই মগধ অধিকার করিয়াছিলেন

লিচ্ছবি ও গুপ্তবংশ।

শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নাই শিলালিপিতে তাঁহাদের উপাধি 'মহারাজ' দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্ব মগধের কোন অল্পপরিমাণ ভূভাগে সীমাবদ্ধ থাকারই সম্ভাবনা। ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তই গুপ্তবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ সময় হইতেই গুপ্তরাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। বৈশালীর লিচ্ছবিবংশ এই সময়ে খুব পরাক্রান্ত

শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও রাজ্ঞী কুমার দেবী
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

হইয়া উঠিয়াছিল, ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময়েও লিচ্ছবিদের কথা পাওয়া যায়। সেই বংশের কুমারদেবীকে বিবাহ পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ তাঁহাদের সাহায্যে মগধ দখল

অদ্বিতীয় সম্রাট্ রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাকাটক বংশাবতংস প্রথম প্রবর সেন ব্রাহ্মণ-কুল-সম্ভূত ছিলেন এবং তিনি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের বহুদূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ ও চারিটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রবর সেনের পৌত্র রুদ্র সেনের (প্রথম রুদ্র সেন) হস্ত হইতে সমুদ্রগুপ্ত

করিয়া তাঁহার অধিকার প্রয়াগ ও অযোধ্যাপর্যন্ত বিস্তৃত করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত "মহারাজ" উপাধিতে পরিচিত, কিন্তু প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিদিগের "মহারাজাধিরাজ" "পরমভট্টারক" প্রভৃতি রাজচক্রবর্তীর উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ' 'পরমভট্টারক চন্দ্রগুপ্ত

মহারাজ পাদানুসরের উল্লেখ বড় দেখা যায় না, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মহিষী লিচ্ছবিবংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং তদীয় বংশের অপরাপর সকল রাজস্ব লিপিলিপিতেই তাঁহার পত্নী কুমারদেবী ও লিচ্ছবিবংশের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, এই লিচ্ছবিবংশের সঙ্গে আত্মীয়তাই ইঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার পক্ষে প্রধান সহায় হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের অধিকার খুব বিস্তৃত ছিল না, এজন্য লিপিলেখে সমুদ্রগুপ্তের বিজয়কাহিনী কীর্তনোপলক্ষে "তিনি নিকটের, একমাত্র বাহুবলে অসংখ্য এবং প্রবল শত্রুপক্ষসমূহ পরাজয় করিয়াছিলেন," এরূপ ভাবের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গুপ্তবংশের অধিষ্ঠাতৃ প্রতিষ্ঠা—সাহসে সাধারণসাধ্য বিজয়, অমিতপরাক্রম, খড়্গ ও বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্ত, কবিশ্রেষ্ঠ, সাহিত্যিকোমণি, ভাগ্যলক্ষ্মীর ললাম বিজয়মালা, অশ্বমেধ যজ্ঞে সুপ্রতিষ্ঠিত কীর্তিকীর্তি, মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব প্রায় অষ্টশতাব্দীব্যাপক ছিল। কঠোর যুদ্ধবিগ্রহের পর তাঁহার বিশাল রাজ্যের প্রতি ধূলি দেবীর কৃপামধুর হাস্য বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। সেই ধূলিমুষ্টায় তাঁহার পালিত প্রদেশগুলি শিহরিয়া ও কম্পিতমস্তিষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শান্তিপূর্ণ বিজয়যাত্রার অধীশ্বর হইয়া প্রজা-চিত্তরঞ্জন যত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

লিপিলিপিতে তাঁহাকে পরমভাগবত 'রাজর্ষি' এবং আশ্রিতবৎসল প্রজারঞ্জক বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্ত সূর্যের রশ্মির ন্যায় প্রখর ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন স্নিগ্ধ, শরদিন্দুসুন্দর চন্দ্রলেখার মত, লিপিলেখের বিশ্লেষণে একের প্রখর তেজ ও অপরের মধুর চরিত্রেরই যেন আভাস দিতেছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল "বিক্রমাদিত্য" উজ্জয়িনীর কোন বিক্রমাদিত্য কোনকালে ছিলেন কিনা জানা যায়। গুপ্তরাজগণও মালবদেশ বিজয় করিয়া উজ্জয়িনীতে অন্য এক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে যে সব শত শত উপাখ্যান প্রচলিত আছে, অন্ততঃ তাহার উপকরণের অনেকাংশ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি হইতে সংগৃহীত।

অনেকে মনে করেন কালিদাস এই বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন এ সম্বন্ধে খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন করিবে কে? কালিদাস যদি কোন রাজসভার

আগাবর্তের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন— সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভের লিপি লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। বাকাটক রাজপরিবারের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। মহারাজ হইবার, উক্ত বংশের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রাজর্ষি বংশীয়েরা গয়াতীর্থে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অলবেরুনি সাহেব অনুমান করেন, সেই গয়াস্তম্ভের ফল এখনও কাশীর "লাটভৈরব" নাম নামে পরিচিত।

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে মগধরাজের সঙ্গেই তাঁহার ঐ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় লৌকিক সংস্কার, তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল মগধের রাজা হইলেও চন্দ্রগুপ্তের অন্যতম রাজধানী উজ্জয়িনীতে ছিল লৌকিক সংস্কার, কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন কালিদাস যে গুপ্তযুগের কবি তাহা তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী আলোচনা করিলে অস্বীকার করা যায় না। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে যদিও নায়িকা উত্তর কোশলাধিপতি অজকে বরমাল্য দান করিয়াছেন, তথাপি মগধের প্রাধান্য সেই রাজমণ্ডলীর মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছিল মগধপতিই রাজন্যবর্গের পুরোভাগে ছিলেন। কালিদাসের "ভাসমুদ্বীক্ষতকুলা" প্রভৃতি পদ পড়িয়া কেহ কেহ মনে করেন কবি রূপক প্রয়োগে গুপ্ত বংশের সম্রাটের নবলব্ধ সমুদ্রগুপ্তের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্ম উপলক্ষে কবি 'কুমারসম্ভব' রচনা করিয়াছিলেন এই সকল যুক্তি বৈজ্ঞানিক হিসাবে সোষ্ঠবযুক্ত না হইলেও একটা অনুমানকে সমর্থন করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয়া আত্মেকক্ষে কালিদাস রাজকন্যা প্রভাবতীর বিবাহ উপলক্ষে 'সেতুবন্ধ' কাব্য রচনা করেন এই কাব্যের টীকাকার রামদাস এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, বাকাটক মহারাজ প্রবরসেনের বংশে জাত রুদ্রসেনের সঙ্গে প্রভাবতীর বিবাহ হয় এবং এই বংশের গৌরব 'সেতুবন্ধ' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময়ে বৌদ্ধ মতের প্রাধান্য হ্রাস পাইলেও বৌদ্ধ ভাবগুলির ছাপ জাতীয় জীবনে তখনও খুব স্পষ্ট ছিল। বৌদ্ধমতের সর্ব্বপ্রধান গুণ ত্যাগ কবি রবীন্দ্র অনাধপিণ্ডদের মুখে বলিতেছেন "সর্ব্ব বস্তু ক'রে ত্যাগ ধর্ম্ম সার",—মেঘ—"নিজেকে লাঘব করে তবেই গৌরব" এই গুণ বৌদ্ধ যুগের আদর্শ গুণ ছিল। বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বৎসর পরে সর্ব্বস্বত্যাগী কল্পতরু হইতেন, তখন ভিক্ষুদেরই ভগবান্ বুদ্ধের রাজত্যাগের মহিমার অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিতেন উত্তরকালে হিউয়েনসাঙ্গ হর্ষবর্দ্ধনকে এই ভিক্ষুর ধর্ম্ম পালন করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। কালিদাস মহারাজ দিলীপকে দিয়া এই অনুষ্ঠান করাইতেছেন—বলা বাহুল্য বাল্মীকির রামায়ণে, অথবা অন্য কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য বা পুরাণে, দিলীপের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা নাই। রঘুবংশ মহাকাব্যে বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে যতগুলি কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই ঐতিহ্যমূলক।* তাঁহার পঞ্চম পুত্তলিকা বিক্রমাদিত্যের

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন?

কালিদাসকৃত রঘুবংশ মহাকাব্যে ত্যাগ ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য।

* বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও সিংহাসনে উজ্জয়িনী ও বিক্রমাদিত্যের কথা পূর্ব। লৌকিক-সংস্কার কালিদাস ইহাদের কথিতা, এই সকল গল্প বৌদ্ধ জাতকের ন্যায় অথবা ইহাদের প্রাক্কালপ্রভাবের আছে কালিদাস এই গল্পগুলি রচনা না করিয়া থাকিলেও কতকগুলি প্রাচীন কাহিনী নূতন করিয়া সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন।

অসীম ত্যাগমূলক দান-শক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে দিয়েছেন, যে কেহ উপযাচক হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে তিনি সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহা পূরণ করিতে উদ্যত হইতেন। দ্বিতীয় পুত্তলিকা রাজার সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলিলেন, যাহাতে বিক্রমাদিত্য কোন হোম সম্পাদন করিতে নিজের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্তলিকা রাজার অমূল্য চারিটি ফল, যাহার চতুর্থাংশ লাভ হয়—কোন এক ব্রাহ্মণকে অকাতরে দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থ পুত্তলিকা বলিতেছেন, রাজা একবার কোন যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কি করিয়া তাঁহার পুণ্যসঞ্চার হইল তাহাই ইহার সহজ চমৎকার বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণ ছলনা করিয়া জানাইল যে, সে যজ্ঞাগ্নিকে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অঙ্গের আভরণ চুরি করিয়াছে, অতএব সেই ব্রাহ্মণকে তখনই ধরিয়া লইয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। রাজা তাঁহাকে কত কাঞ্চন রত্ন নানা উপহার দান করিলেন। পঞ্চম পুত্তলিকার উপাখ্যান এই যে, রাজা এক বালকের প্রার্থনায় তাঁহার ভাণ্ডার হইতে সমুদ্রের দক্ষিণ মণিকা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। প্রতি উপাখ্যানের প্রত্যেকটিতে এইরূপ দান ও ত্যাগের কথা আছে। এই বিষয়ে বৌদ্ধ জাতকগুলির সঙ্গে বর্ণিত উপাখ্যানের একটি আদর্শের খুব ঘনিষ্ঠ ঐক্য আছে। নাগার্জ্জুন নাটিকেও এইরূপ আত্মদানের কাহিনী আছে—উহা খাস বৌদ্ধ গ্রন্থ।

সিংহ শিকারী চন্দ্রগুপ্ত হয়, বিক্রমাদিত্য
(আইন মসা হইতে গৃহীত)

কালিদাসের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, এইখানে জাতক গ্রন্থগুলির সঙ্গে বত্রিশ-সিংহাসনের একটু প্রভেদ আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকথায় যে দান ও ত্যাগের মহিমা দৃষ্ট হয় তাহার কোন গণ্ডী নাই সেই ত্যাগ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় সমস্ত বিশ্বজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বত্রিশ-সিংহাসনের কাহিনীগুলিতে যদিও অপরাপর লোকের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কথা আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে অসীম পুণ্যসঞ্চয় হয়, যাহে যাহে কবি তাহা সবিশেষ লিখা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। ১১শ পুত্তলিকার কাহিনীটিতে আত্মস্থ ব্রাহ্মণের জন্য ত্যাগ স্বীকারের অশেষ পুণ্য বর্ণিত আছে।

ব্রাহ্মণকে দানের পুণ্য।

বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে এই সমস্ত উপাখ্যানের মধ্যে শৌর্য্য, বীর্য্য, বীরত্ব প্রভৃতি কথা একরূপ নাই বলিলেই হয়। উহার সকলগুলি ত্যাগ ও দানের মহিমায় উজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিবার আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গদেশে কালিদাসের বর্ণিত গুণ ও কাব্যের

আদর্শ এক সময়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী এক যুগে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে।

বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত ও বঙ্গদেশ

বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রম।

কালিদাসের বর্ণনা যাহাই থাকুক না কেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সেনা, বীর্য্য ও ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। তাঁহাদের বিবরণে জানা যায়, তাঁহার সামন্ত রাজারা বিদ্রোহ করিতেছিল ও শত্রুরাজ মাথা তুলিতে সাহস করে নাই। তাহার মৃত্যুর তিন সিংহের সহিত লড়াই করিতেছেন। এইরূপ বৃদ্ধি দেখিতে পাই বঙ্গদেশে গুপ্তরাজত্বসম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা সংশয় নাই, তবে যদি কালিদাসের বিক্রমাদিত্য সত্যই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হন তবে শুধু বঙ্গ বিজয়ের কাহিনী নহে—বেতাল পঞ্চবিংশতি রচিত উপাখ্যানমালায় তাঁহার কীর্ত্তির এবং তাঁহার অনুরাগে সিদ্ধিলাভসম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প আমরা বঙ্গীয় পল্লীসমূহে শুনিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এক সময়ে এত দেশ গুপ্তসম্রাটদের বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও এবং সমগ্র বঙ্গদেশের গত কিংবদন্তী হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তদের স্মৃতি এদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এমন কি সমুদ্রগুপ্তের নামও আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

এদেশে গুপ্তের শেষ স্মৃতি বিলুপ্ত

আলবেরুনী লিখিয়াছেন, সাধারণ লোকের বিশ্বাস গুপ্তরাজগণ যেমনই প্রবল ও শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, তেমনই দুষ্ট ছিলেন। একচ্ছত্র রাজা হইতে হইলে কতকটা কঠোরতা অবলম্বন না করিলে চলে না। বহু রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া বৈজয়ন্তী পতাকা উড়াইতে হয়। বহু শাসন বারবিক্রম রাজাকে হত্যা

সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কথা

করিয়া তাহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইতে হয়। রাজচক্রবর্তীদের পক্ষে কুলমর্যাদার্থে নহে।

হয়। গুপ্তরাজগণের প্রভাবের ও ক্ষমতার দুর্দিনকাল হইতে বিরাম পাইত না, তাহাদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইত। "প্রবল ও দুষ্ট" (powerful and wicked) উপাধি নিশ্চয় লোকেরা তাঁহাদিগকে যদি দিয়া থাকে তবে তাহার কারণ সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, নাগসেন, চন্দ্রবর্মা, গঙ্গাপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দন, বলবর্মা প্রভৃতি যে আর্যাবর্তরাজ রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন (violently extirpated) তাম্রশাসনে আমরা তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

সমুদ্রগুপ্ত কোশল দেশের মহেন্দ্ররাজ, মহাকান্তারাধিপ ব্যাঘ্ররাজ, কৌরলাধিপ মন্ত্ররাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্ররাজ, পালক্কের হস্তিবর্মা, এরণ্ডপল্লাধিপ দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবমুক্ত দেশের নীলরাজ, বেঙ্গীদেশাধিপ হস্তিবর্মা, পালক্ক দেশের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, কুস্থলপুরের ধনঞ্জয় এবং সমতটাধিপের অপর অপর রাজগণকে মহাসমরে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন, তৎপর বন্ধুত্বস্বীকারের পর নিজগুণে মুক্ত করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত ইহা ছাড়া সমতট, দবাক, ঢাকা, কামরূপ, নেপাল, কারতৃপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত আর্যাবর্তের সীমান্ত দেশের গুপ্তসম্রাটের বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলেন। মালবীয়-গণ, অর্জুনায়নেয়গণ, যৌধেয়গণ মদ্রকগণ, আভীর শকাদুন, সনকানিকা, কাক, খরপরিকা ও অন্যান্য দেশের লোকের এবং তাহা ছাড়া দৈবপুত্র, সাহি, সাহানুসাহি, শক, মুরুণ্ড এবং সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীরা তাঁহাকে রাজচক্রবর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে তাঁহাকে বাৎসরিক রাজস্ব দান করিতেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য কুসুমপুরের দরবারে উপস্থিত হইতেন। অপরেরা তাঁহাকে তাঁহাদের কন্যা ও ঐশ্বর্য সমস্ত প্রদানপূর্বক বিচিত্র গরুড়ধ্বজাঙ্ক ভদ্রদেশীয় সুন্দর তুরঙ্গ প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণপূর্বক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। অন্যান্য উপাধির সহিত তাঁহাকে এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে বারংবার কৃতান্তের পরশু এবং 'অন্তক' বলা হইয়াছে। ইহাদের এলাহাবাদ লিপিতে লিখিত হইয়াছে "তিনি পৃথিবীর যাবতীয় রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার শাসনাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহার শত্রু-রাজগণ নিজদেশে স্বপ্নের অবস্থাতে তাঁহাকে স্মরণ করিলে কম্পিত কলেবর হইতেন। তিনি সর্বরাজোচ্ছেদকার ছিলেন।" ইহার মধ্যে কতকটা বেশীমাত্রায় রংফলান হইলেও তাঁহার চক্রান্ত প্রতাপে দেশময় যে ভয়ের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায় এবং আলবরুনীর কথার কতকটা প্রতিপোষকতা দৃষ্ট হয়। এতগুলি রাজাকে যিনি দিগ্বিজয় যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যসংখ্যা প্রথম দিকে যে খুব বেশী ছিল, এমন নহে, কারণ তিনি একাকী নিজ ভুজবলমাত্র আশ্রয় করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন,—এলাহাবাদে এ কথার বারংবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার বাহুবল

তাঁহার একমাত্র বান্ধব ছিল (whose only ally was the strength of his arms). তাঁহার অঙ্গ শত যুদ্ধের শত কুঠার, শূল, শেল, বাণ ও শরক্ষত চিহ্নে বহন করিত। শিলালিপির কবি লিখিয়াছিলেন—"এই চিহ্নগুলিই তাঁহার পুরুষত্বের শ্রেষ্ঠ-শোভনতা ছিল। তিনি এক জনের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া অপরকে প্রদান করিয়া নিজ বংশের রাজবংশে স্থাপন করিয়াছিলেন। বন্ধুতা স্বীকার করিলে তাঁহার রাগ হইত না। "ভক্তি অবনতি যার তাহে মৃদু অন্তর।" সুতরাং তিনি ভারতের প্রাচীন আভিজাত্য রক্ষা এবং নব আভিজাত্যের পত্তন করিয়াছিলেন। এই ভাবে দেশময় শত্রুর সৃষ্টি করিয়া তিনি সমস্ত শত্রুজয় করিয়া অধিনায়ক হইয়াছিলেন।

গুপ্তযুগের পূর্বে এই বিশাল ভারতবর্ষ যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল তাহা পূর্বের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত ভারতবর্ষ চিরকালই মহৎ ক্ষেত্র। কোন বড় রাজবংশ একযুগে অখণ্ড ভারতকে অখণ্ড শ্রী প্রদান করেন এবং সেই বংশের প্রভাবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অখণ্ড রাজশ্রী শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ ভাঙ্গাগড়া এদেশে বহুবার হইয়াছে। কত বড় শক্তি থাকিলে একজন বীর এই অসাধ্যসাধন করিতে পারেন তাহা অনুমেয়। তৈমুরলঙ্গ, আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি বীরেরা দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আশ্চর্য্য বীর-প্রতিভা ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া তাহার জগৎকে চমক লাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোন মহাদেশের শক্তিপুঞ্জ জব করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য বশ্যতার নিগড়ে আবদ্ধ করা কঠিনতর কাজ। সমুদ্রগুপ্ত এই কঠিনতর কাজ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের আয়তন।

সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব পূর্বে বঙ্গদেশ ও কামরূপ, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পঞ্জাব ও মালব এমন কি পেশোয়ার এবং দক্ষিণে সিংহল প্রভৃতি দ্বীপমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি ও পূর্ব্বদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বকালে উহা শাসনের চাপ দিয়া বিজিত রাজ্যগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবার রীতি ছিল না, "ভক্তি অবনতি পাইলেই দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ তাহা গ্রহণ করিতেন এবং বিজিত রাজা তাঁহার আশ্রয় লাভ করিতেন।" শিলালিপিতে যে সকল প্রদেশের নাম পাওয়া যাইতেছে—ইহাদের সকলেই তাঁহার একচ্ছত্র রাজ-গৌরব স্বীকার করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা তিনি তাঁহার অখণ্ড প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেওয়ার জন্য যে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার একদিকে অশ্বমেধের ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। আমরা মনে করিতে পারি এই যজ্ঞে সিংহলের মেঘবাহন, পঞ্চ নৃপতিরা (মৈত্রপুরাঃ) এবং পেশোয়ারের সাহী ও সাহানুসাহী কুষাণরাজগণ কনকপাটক কুসুমপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চীনদেশীয় ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, সিংহলের রাজা মেঘবাহন সমুদ্রগুপ্তকে বহু উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং শিলালিপিতে যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ

নাই। পাটলিপুত্রের রাজবংশ যুগ যুগ ধরিয়া এই মহাদেশে রাজচক্রবর্ত্তীর পদে আসীন ছিলেন। জরাসন্ধের সময় হইতে গিরিব্রজের নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী সমগ্রদেশের সেরা দেশ ছিল। অন্ন সময়ের জন্য এই দেশের গতি পরিম্লান হইলেও কোন নব রাজবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুপ্রাচীন রাজগৌরব ফিরিয়া আসিত।

সমুদ্রগুপ্ত শুধু বিজয়ী সম্রাট্‌রূপে আমাদিগের শ্রদ্ধার দাবী করেন নাই, তাঁহার মুক্ত হস্ত দান পাণ্ডিত্যগর্ব্বে যাহারা, কবিত্ব ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কৃতিত্বের বহু উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দানশীল হৃদয় এবং বাহুর অপেক্ষাও বেশী ছিল। শিলালিপির কবি লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার মনস্বী প্রতিভায় স্বয়ম্ভুক কাব্যপথকে পরিচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রে অধিকার নারদ, তুম্বুরু এবং অন্যান্য কলাবিৎকে ছাপাইয়া গিয়াছিল তিনি বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর অবলম্বনস্বরূপ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া "কবিরাজ" রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত শত্রু যুদ্ধনায়ক সম্রাট্ ছিলেন। যত্র তত্রপায় তাঁহার খড়্গাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন, অপর অনেক নৃপতির গর্ব্ব তিনি খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং সত্য সত্য রাজগণ তাঁহাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সকল নৃপতির ছিন্ন, ধূলিলিপ্ত ও রক্তাক্ত শির নিশ্চয়ই তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইত এখন তাঁহারা কোথায়? সেই কয়জন কি লিচ্ছবিদের কেহ? যাঁহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিগঠনের সময় তাঁহার যোগদান নিরোধিলেন? সেই অটবীরাজ মহারাজ ও অচ্যুতই বা কোথায় —তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে নিহত হইয়াছিলেন, তথাপি গুপ্ত সম্রাটের নিকট "ভক্তি অবনতি" দেখান নাই? সমুদ্রগুপ্তের পুরুষকারের গৌরব সাম্রাজ্য জয় স্বীকার করিয়াছিল, এখন আমাদের কাছে তাহার মূল্য কি? কিন্তু তিনি যে রণকলাকুশলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনি যে সুরের মোহিনীতে মুগ্ধ হইতেন, তাঁহার সেই বীণাবাদনরত মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে বড় মধুর লাগিয়াছে, তাহা তাঁহার মুদ্রায় অঙ্কিত হইয়া আছে অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ও খড়্গহস্ত সমুদ্রগুপ্ত হইতে বীণা-হস্ত সমুদ্রগুপ্তই আমাদের পক্ষে বেশী স্পষ্ট করে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসর তিনি বহু যুদ্ধ করিয়া এই মহাদেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন।

বীণাবাদক সমুদ্রগুপ্ত।

বীণাবাদক—সমুদ্রগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

তাঁহার পতাকা গরুড়চিহ্নাঙ্কিত হইলেও তিনি বৌদ্ধদিগের উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, সুবিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু তাঁহার অন্যতম সুহৃৎ ছিলেন গুপ্তবংশ হিন্দুধর্ম্মের

পুনরুত্থানের মেঘ হইলেও ইহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধবিদ্বেষের কোন পরিচয় নাই। ইঁহাদের বংশধরদের অনেকেই অবশ্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা বৌদ্ধ মন্দিরে আলোর ব্যবস্থা ও ভিক্ষুদের আশ্রয়ের সংস্থান করিয়া যে সকল শিলালেখ উৎকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে গুপ্তরাজগণের কীর্তি ও যশ ঘোষিত হইয়াছে। বস্তুত, শুঙ্গবংশের পতনের পর আর্যাবর্তে বৌদ্ধদিগের প্রতি প্রথম সুদাস ভাব হ্রাস পাইয়াছিল।

কুমারগুপ্ত (১ম)
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কুমারগুপ্ত (২য়)
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কিন্তু কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের সময়ে গুপ্ত রাজ্যে নানারূপ বিপদ্ দেখা দিয়াছিল। পশ্চিম হইতে ইরানবাসী পুষ্যমিত্রগণ ও মধ্য এশিয়া হইতে হূনেরা তাঁহার বিশাল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। মহাবীর স্কন্দগুপ্ত এইসকল বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুরা প্রথমতঃ তাঁহার রাজ্য কতকটা দখল করিয়া লইয়াছিল, সৈন্যের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কত অনিদ্রারাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল—তাহার ইয়ত্তা নাই। শিলালেখে বর্ণিত আছে, তিনি সৈন্যের রাজ্য হারাইয়া একদা সমস্তরাত্রি শুধু মৃত্তিকাকে শয্যা করিয়া ইতস্ততঃ শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অসীম ধৈর্য্য, বীরত্ব ও সাহস-বলে স্বীয় রাজ্য পুনরায়

স্কন্দগুপ্তের বিপদ।

স্কন্দগুপ্ত ও তাঁহার রাজ্ঞী মধ্যে গরুড়ধ্বজ
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

অধিকার করিয়া যেদিন তিনি ইরানদেশীয় নৃপতির মস্তক পাঁচার পাদপীঠে পরিণত করিয়াছিলেন সেইদিন কনস্তন্তী সম্রাট তাঁহার মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সেই বিজয়বার্ত্তা তাঁহাকে স্বয়ং জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কাহিনী আছে, "কৃষ্ণ যেরূপ কংসকে বধ করিয়া মাতা দেবকীর নিকট সেই বার্ত্তা বহন করিয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্ত সেইভাবে জননীকে রিপু-সংহার জ্ঞাপন করিলে মাতার আনন্দাশ্রু তাঁহার মস্তক আর্দ্র করিয়াছিল।"

স্কন্দগুপ্ত পর্ণদত্তকে যে কারণে তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতেন, এজন্য তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি কখনোকে অবহেলা করেন নাই। সর্ব্বদা কর্ম্মশীল মধুর চরিত্রগুণে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের পর আরও কয়েকজন, গুপ্ত রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্কন্দগুপ্তই মহা গুপ্তবংশের শেষ বীর চক্রবর্ত্তী। তাঁহার পরে এই বংশের পতনের ইতিহাস। শিখ সাহেব লিখিয়াছেন "আরঙ্গজেবকে যেরূপ মোগলবংশের শেষ রাজা বলা যাইতে পারে, স্কন্দগুপ্তও সেইরূপ গুপ্তবংশের শেষ রাজা।" তৎপরে কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত গুপ্তরাজবংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু লোকক শৌভাক্ত তাঁহারা 'মহারাজাধিরাজ' ও 'পরমভট্টারক' উপাধি শেষ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন।

হুনদিগের আক্রমণ।

স্কন্দগুপ্তের বাহু বাহু অপসারিত হইলে হুণেরা পুনরায় প্রবল পরাক্রমে গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার ধ্বংস সাধন করিলেন। তুনরাজ তোরমান্ এই আক্রমণের নেতা হইলেও তৎপুত্র মিহিরগুলই পরিশেষে এই ধ্বংসকার্য্যে শেষ আহুতি প্রদান করেন। ইহার পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত গুপ্ত বংশধরগণ রাজবিভূতি অঙ্গে ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে হইতে মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীর উপাধিধারণপূর্ব্বক সিংহাসন উপবেশন করিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের তেজ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত।

আমরা নিম্নে গুপ্ত সম্রাটদের একটী তালিকা দিতেছি :—

গুপ্তরাজবংশের তালিকা

১। শ্রীগুপ্ত।

২। ঘটোৎকচগুপ্ত।

৩। চন্দ্রগুপ্ত (২য়) রাণী কুমার দেবী। ইঁহার সময়ের কাল হইতে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয় ৩১৯—২০ খৃঃ)।

৪। সমুদ্রগুপ্ত—রাণী দত্ত দেবী ; রাজ্য ৩৩৯ খৃঃ।

৫। শ্রীগুপ্ত (২য়), উপাধি বিক্রমাদিত্য— রাণী ধ্রুব বা ধ্রুবস্বামিনী দেবী। ইঁহার রাজত্বে চিহ্নিত যে সকল উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তারিখ যথাক্রমে ৩৭৯ খৃঃ (৬২ গুপ্ত), ৩৮৫ খৃঃ (৬৬ গুপ্ত), ৩৯২ খৃঃ (৭৩ গুপ্ত)। যেরূপ ৪১৩ খৃঃ ৪১৫ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে প্রধান কর্ম্মচারী পৃথিবী সেন।

৬। কুমারগুপ্ত (১ম) রাণী অনন্ত দেবী, উপাধি—মহেন্দ্রাদিত্য, তাঁর রাজত্বে চিহ্নিত লিপি, ৪১৫ খৃঃ (৯৬ গুপ্ত), ৪১৭ (৯৮ গুপ্ত), ৪২৮ খৃঃ, ৪৩৪ খৃঃ।

৭। পুরগুপ্ত—রাণী শ্রীবৎসা দেবী ও প্রকাশদিত্য। (প্রথম কুমারগুপ্তের দুই পুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বুধগুপ্ত ও কনিষ্ঠ পুরগুপ্ত।)

৮। নরসিংহগুপ্ত—রাণী মহালক্ষ্মী দেবী। উ—বালাদিত্য।

৯। কুমারগুপ্ত (দ্বিতীয়) ৪৭৩ খৃঃ।

১০। তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

১১। চন্দ্রগুপ্ত (খ); উ—ভানুগুপ্তাদিত্য।

১২। বিষ্ণুগুপ্ত, উ—চন্দ্রাদিত্য।

১৩। ভানুগুপ্ত, উ—প্রকাশধর্ম্মা।

এই তালিকার শেষের দিকে আর একজন প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাট হইলে বড় ভাল হয়। ইনি গুপ্তবংশীয় হইলেও ইঁহার কোন শিলালিপি বা মুদ্রা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইনি বুধগুপ্ত। স্বাধীন মগধ রাজ্যের শেষ রাজা বিষ্ণুগুপ্ত হইতে আমরা মাত্র ৫টি নাম পাইয়াছি। এই ৫ জন রাজা ১৫০ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৪৮৫ খৃঃ অব্দে ১৩৪ বৎসর ইঁহার পূর্ব্বে পাটলিপুত্রে গুপ্তবংশীয় রাজগণ ও তাঁহাদের সামন্ত রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের অধিকার ৪৮৫ খৃঃ হইতে ৫১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বুধগুপ্তের পর আর একজন গুপ্ত রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। ইনি ভানুগুপ্ত। ইঁহার অধিকার ৫১৫ খৃঃ হইতে ৫৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে মালব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ের অব্যবহিত পরেই মালব রাজ যশোধর্ম্মদেবের বল বিক্রম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই তালিকাটি রাখালবাবুর ইতিহাস হইতে তুলিয়া দিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ

খ্রিষ্ট সাহেব অনুমান করেন লিচ্ছবিরাজগণ গুপ্তসাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন। শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচগুপ্ত, এমন কি প্রথম চন্দ্রগুপ্তও তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত লিচ্ছবি-সম্রাট্গণের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। যে অব্দ "গুপ্তাব্দ" নামে পরিচিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে লিচ্ছবি-সংবৎ, কারণ গুপ্তগণ সেই অব্দ গ্রহণ করেন এবং পরে উহাই গুপ্তাব্দ নামে চলিয়া যায়। লিচ্ছবি-রাজকুমারীর পাণি-

লিচ্ছবিগণের উত্তরাধিকারী

গ্রহণের পর চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরিয়া যায়, এদিকে যেমনি গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল—সিন্ধুবিজয়ও তন্মধ্যে নেপাল উপত্যকায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদ্র যমুনায় ফরিতে লাগিলেন। গুপ্তরাজবংশের সঙ্গে কোন রক্তসম্বন্ধ ও বৈবাহিক আত্মীয়তা সূত্র বিদ্যমান থাকায় এত বড় একচ্ছত্র সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নেপাল উপত্যকার অধিকারভুক্ত করেন নাই।

৪৮০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হওয়ার পর মালবদেশ গুপ্তসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হয়, পরবর্ত্তী ক্রমাগত শতবর্ষ ব্যাপিয়া গুপ্তরাজগণ বিধ্বস্ত হইয়া পড়েন। শেষোক্তকে

'আদিত্য' উপাধি।

ইতিহাসে এক নামে কতক সময়ের জন্য গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহাদের তুলনায় আমরা পূরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত, ভানুগুপ্ত (উপাধি প্রকাশ্যগুলো, পরবর্ত্তী অনেক নৃপতির নাম কাব্যে পাই) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে এই বংশের রাজগণের অনেকেরই "আদিত্য" উপাধি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে কুমারগুপ্তের উপাধি ছিল "মহেন্দ্রাদিত্য," নরসিংহগুপ্ত "বালাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৩য় চন্দ্রগুপ্ত "বজ্রাদিত্য" নামে পরিচিত ছিলেন ইহা ভিন্ন স্কন্দগুপ্ত বোধ হয় শত্রু বিজয় করিয়া বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কুমারগুপ্তের পর দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরেরা এক সময়ে পাটলিপুত্রের রাজা হইয়াছিলেন এই শাখার কুমারগুপ্ত (৩য়) ঈশানবর্ম্মা নামক কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গৌড়ের অধিকার হইতে বিচ্যুত হন।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে তাঁহাদের ইতিহাসের অন্ধকারযুগ বলা যাইতে পারে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর তাঁহাদের পরম্ভ উপাধির সম্মান রক্ষা করিয়া অমাত্যগণ কোন কোন প্রদেশে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আপনাদিগকে "মহারাজাধিকরণ" বা "কুমারামাত্যাধিকরণ" ইত্যাদি নামে পরিচিত করিতেন ইঁহারা যাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা "দেওয়ান" উপাধিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি রাজা হইয়াও দেওয়ান উপাধি ত্যাগ করেন নাই উড়িষ্যার রাজিমাচক্রের রাজারা স্বাধীন নবাব ছিলেন, অথচ তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের "দেওয়ান"

গুপ্তদিগের প্রদত্ত উপাধি।

উপাধি চিরকাল বজায় রাখিয়াছিলেন মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়ারা হায়দ্রাবাদের নিজাম এই সকল উপাধি পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের দান। উপাধিদাতার বংশধরেরা স্বাধীন হইয়াও তাহা ছাড়েন নাই গুপ্তরাজগণের প্রদত্ত উপাধি তাঁহাদের অমাত্যগণের বংশধরেরা সেইরূপ অনেকদিন বজায় রাখিয়াছিলেন গুপ্তদের নাম শাখা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি হইয়া কতকাল বংশক্রমে বজায় রাখিয়াছিলেন

শশাঙ্কগুপ্ত।

এই নানা শাখায় বিভক্ত গুপ্তরাজগণের বংশধরগণের কে কাহার সন্তান তাহা অনেক সময়ে নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক এই সকল বংশধরের মধ্যে যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শশাঙ্ক গুপ্তরাজগণের বংশধর। ইনি প্রথমতঃ কর্ণসুবর্ণের রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন, তখন ইহার প্রচারিত মুদ্রায় ইনি "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমহাসামন্ত "শশাঙ্কদেবের" এই নামে নিজ পরিচয় দিতেন। কালে মগধ, গৌড়, রাঢ় ও সমস্ত বঙ্গদেশ ইহার অধিকৃত হয়। ইহার উপাধি ছিল, "নরেন্দ্রাদিত্য"। সম্ভবতঃ ইহার পিতা বা পিতৃব্যের নাম মহাসেনগুপ্ত। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্তের বংশধর বলিয়া মনে হয়। মালবরাজ দেবগুপ্তও গুপ্তবংশ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং দেবগুপ্তের সহিত কান্যকুব্জাধিপতির বিরুদ্ধে শশাঙ্ক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

"গৌড়কৃতক" শশাঙ্কগুপ্ত
(মুদ্রা হইতে গৃহীত)

রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা—৬০৬ খৃঃ অঃ।

এই সময়ে স্থাণ্বীশ্বরে রাজ্য করিতেছিলেন, কবির লেখনী মসীময় করিয়া শশাঙ্ক এইভাবে তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কালক্রমে এই বিবাদ ঘোর হইয়া যায়, শশাঙ্ক তাহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দেবগুপ্ত পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ যুদ্ধের অবসান হইলেও শশাঙ্কের মনে রাজ্যবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সেদিনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। রাজ্যবর্দ্ধন অতি সাধুচরিত্র ছিলেন। সেজন্য তাঁহার গুণ ও কীর্ত্তির কথা সুপ্রচারিত ছিল। কথিত আছে শশাঙ্ক তাঁহার অমাত্যবর্গকে প্রথমেই বলিতেন, "যাবৎ রাজ্যের পার্শ্বদেশে কোন সাধুচরিত্র রাজা বিদ্যমান থাকা অকল্যাণকর।" এ কথার অর্থ ইহাই মনে হয় যে, কোন কারণে যদি প্রজারা রাজার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাহারা স্বভাবতঃই সেই সাধু রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্রোহী হইতে পারে। দেবগুপ্তের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া হউক, বা পূর্ব্বোক্ত বিদ্বেষবশতঃই হউক, শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিবার অভিসন্ধি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যবর্দ্ধনকে গৌড়দেশে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন এবং অতিশয় আদর ও স্নেহমধুর ব্যবহার তাঁহার মনের সমস্ত সন্দেহ অপনোদন করিয়া (৬০৬ খৃঃ অঃ) স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় গোপনে হত্যা করিলেন। এই ঘটনা হর্ষচরিত এবং হিউয়েনসঙ্গের বিবরণে লিখিত

আছে, রক্তাক্ত ঐতিহাসিকগণ শশাঙ্কের সমস্ত দোষ ঢাকিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন বলিয়া এক সেনাপতি এই নিদারুণ সংবাদ দেওয়ার সময়ে শশাঙ্ককে "গৌড়দুষ্টক" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই কুৎসিত ব্যবহারের সংবাদ শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যে পর্য্যন্ত এই গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে আমি ইহার ফল না করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আহার বিষয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার করিব না।" কথিত আছে কনৌজ পুনরাধিকার করিয়া রাজশ্রীর বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

শশাঙ্ক গোড়া শৈব এবং বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ লিখিয়াছেন—তিনি বোধিতরুর মূল উচ্ছেদ করিয়া পাটলিপুত্র ও কুশীনগরে বহু বৌদ্ধকীর্ত্তি ধ্বংস করেন।

শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ও ধর্ম্মনাশ

পাটলিপুত্রে তিনি বুদ্ধ চরণচিহ্ন লাঞ্ছিত প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা না পারিয়া উহা গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কুশীনগর হইতে তিনি বোধিদ্রুম পর্য্যন্ত দূর করিয়া দিয়া গয়ার বোধিবৃক্ষের সম্মুখে এবং আশপাশসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং বোধিবৃক্ষের নিকটবর্ত্তী আম্রবনের মূলমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া তৎস্থানে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আদেশ দেন, কিন্তু ঐ কাজে যাহারা নিযুক্ত হয় তাহারা সাহস না করিয়া একটা প্রাচীর তুলিয়া উহা চক্ষুর আড়াল করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে যে শশাঙ্ক এইসকল ভগ্নস্থান ধ্বংস করিয়া পারণে আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কণ্ঠরোধ করা হইয়াছিল এবং মাংস পচিয়া গিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করার পর কিছুকালের জন্য শশাঙ্ক কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বল্প অর্থে শুধু কামরূপ ছাড়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন জ্যেষ্ঠভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য নিশ্চেষ্ট করিবার আশায় গৌড়ে অভিযান করেন। কামরূপের ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই অভিযানের সহায়তা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ কতকটা সহায়তা পাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, শশাঙ্কের যে সকল স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কতকগুলি খাঁটি এবং কতকগুলিতে অন্য ধাতুর বেশী পরিমাণে খাদ আছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে যাইয়া গৌড়ের রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, তজ্জন্য শশাঙ্ক এরূপ অপকৃষ্ট মুদ্রা চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ ব্যবহারে নিঃস্বতাপন্ন রাজ্যের পূরণ করিবার জন্য খাদযুক্ত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের রীতি কয়েক রাজ্যে ঘটিয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের মুদ্রাতেও এইরূপ খাদ দেখা যায়, তাহাও একই কারণে ঘটিয়াছিল।

এমনিরূপ অশান্তি ও রোগের প্রকোপ সহ্য করিয়া শশাঙ্ক ছয়বৎসরব্যাপী যুদ্ধের

শেষভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। * সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বরের পরাজয় এবং মৃত্যুঘটিত ক্রোধবশতঃ পুলকেশী হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া তাঁহাকে শেষে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন ব্রাহ্মণগণের চক্রান্তে তাঁহার জনৈক অমাত্যকর্ত্তৃক নিহত হন

এই অন্ধকার যুগে মাঝে মাঝে গৌড়ের যে কাহিনী পাওয়া যায় তন্মধ্যে শশাঙ্কের কীর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম তিনি হঠাৎ কোন গুপ্ত রাজবংশের মত উদিত হইয়া কয়েক বৎসরের জন্য তাঁহার চমৎকার বীরত্ব রাষ্ট্রনীতি ও প্রতিভার আলো দেখাইয়া গৌড়াকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস ও পালরাজবংশের অভ্যুদয়ের মধ্যে গৌড়মণ্ডলে আরও দুএকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। শশাঙ্কের পূর্ব্বে ৫৩১ খৃঃ অব্দে পরবর্ত্তী গুপ্তবংশের ভানুগুপ্ত গৌড়দেশ শাসন করিয়াছিলেন তৎপরে কতক সময়ের জন্য মালবরাজ যশোধর্ম্মা এই দেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন গৌড়দেশের স্বাধীনতার এইভাবে পুনঃ পুনঃ বিলোপ ঘটিতেছিল হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর গুপ্তবংশোদ্ভূত মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক আদিত্যসেন ৬৭১ খৃঃ অব্দে মগধে পুনরায় স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সম্ভবতঃ গৌড়দেশপর্য্যন্ত তিনি স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। আদিত্যসেনের রাজধানী নাম ছিল "কোলাদেবী"। গৌড়দেশ কতকদিনের জন্য কৈলবংশের কোন রাজার অধীন ছিল।

এই সময়ে বঙ্গের আর একটি পরাক্রান্ত রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায় হিউয়েন্সাঙ্গ এবং ইৎসিং উভয়েই লিখিয়াছেন—তাঁহাদের অবস্থিতিকালে সমতটে খড়্গবংশের দুর্দ্ধর্ষ রাজা রাজসিংহ দৃঢ় ভাবে শাসনদণ্ড চালাইতেছিলেন খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ এবং তৎপুত্র দেবখড়্গ এই কয়েকটি নাম আমরা পাইতেছি সাঙ্কেতিক

* সম্প্রতি "বোধিসত্ত্ব দেশিকাবদানক" নামে বহুটী মলকত নামক একখানি বহু পাণ্ডুলিপি কে পি. জয়সোয়াল মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুস্তকে রাজাদের নাম ইতিহাস দেওয়া আছে পণ্ডিতেরা মনে করেন, ইহাতে যে প্রকারান্ত নাম দেখা আছে, তাহাতে ইতিহাস বুঝা যাইবে। প্রকারান্ত রাজা হর্ষবর্দ্ধনকে এবং সোমাখ্য শশাঙ্কে বুঝাইতেছে। এই অনুমান ঠিক হইলে শশাঙ্ক সম্বন্ধে পুস্তকখানি হইতে জানা যায়, তিনি দুইবার ছিলেন এবং কাশী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার অব্যবহিত পরে, উদয়ন নামক এক রাজা অল্প সময়ের জন্য গৌড় রাজত্ব করেন।

'প্রকারান্ত' হর্ষ অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধন

"পরাক্রান্তাখ্য সোমাখ্যো দ্বাদশাব্দান্যুবাচ সঃ।
ততো নিহত সোমাখ্যে স্বদেশেষ্বপি সংস্থিতে।
বিবর্দ্ধমান প্রকারান্তো দেশং হৃত্বা বসুন্ধরাং।
দ্বাদশৈব প্রকারান্তঃ সংবৎসরানপি স "

মঞ্জুশ্রী মূলকল্প কাহার কাহারো মতে খ্রীষ্ট সপ্তমশতাব্দীতে কাহারও মতে অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়

রাজাদের সম্বন্ধে যেরূপ স্তোকবাণী লিখিত হয়, সমসাময়িক কবি ইঁহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ স্তোকবাণী বলিয়াছেন, যথা "সংখ্যাতীতপরাক্রমঃ" "শত্রুক্ষয়ীকৃতপরাক্রমঃ" "অনেকগজতুরগমণিমুক্তাপরিপূর্ণ-কোষাগারঃ" ইত্যাদি। সমতট প্রদেশ সম্ভবতঃ পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন খাদ, উত্তর গারো ও অন্যান্য পাহাড়, পূর্বে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট, দক্ষিণে সমুদ্র—এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। বস্তুতঃ এমন পুরাবৃত্ত বলা যায় যে কোন্‌টি বুঝায় তাহার প্রায় সমস্তটাই এই সমতটের অন্তর্গত ছিল। খড়্গবংশের রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বিদ্বান্‌দিগকে সম্মান করিতেন, ইঁহারা প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারের উৎসাহবর্দ্ধক ও সহায়কারী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় নানা প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল কর্ম্মান্তনগর। আধুনিক কামতা বা বড়কামতা, কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে। ঐতিহাসিক সতীশ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নহেন। খড়্গবংশের পৌত্র দেবখড়্গ শ্রীহট্টের সমসাময়িক। এই কর্ম্মান্ত বা কামতানগরে যে স্থানে বিহার ছিল তাহা এখনও 'বিহারহওল' নামে পরিচিত, উহা বড়কামতা গ্রামের কিছু উত্তরে। ভট্টশালী মহাশয় বলেন, খড়্গবংশের রাজাদের রাজ্য ত্রিপুরা নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর এমন কি ঢাকা জেলার কোন কোন অংশ জুড়িয়া ছিল, ইহাই প্রাচীন সমতট। এই রাজারা বৌদ্ধ পরমেশ্বর ছিলেন, দেবখড়্গের পুত্র রাজভট্ট, একজন গৌড়া বৌদ্ধ ছিলেন, হিউয়েনসাঙ্গের সময়ে কর্ম্মান্ত নগরের পরিধি ৫ মাইল ব্যাপক ছিল। রাজধানীর অন্তর্দ্বারে তিনটী সঙ্ঘারাম ও অসংখ্য দেবমন্দির ছিল। হিউয়েনসাঙ্গের সময়ে এই নগরে ১০০০ বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করিতেন, কিন্তু ৫০ বৎসর পরে ইৎসিংএর সময়ে (৬৭১ খৃঃ ৬৮৮ খৃঃ) এই সংখ্যা কমিয়া ৩০০ এ পরিণত হইয়াছিল।

রাজভট্ট সমস্ত বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেন। এই নগরে বহু ধনিক নিরাশ্রয় বাস করিতেন, এবং ইহাতে একটি অশোকস্তম্ভ ছিল বলিয়া হিউয়েনসাঙ্গ লিখিয়াছেন। ভট্টশালী মহাশয় তথায় একটী স্তম্ভ দেখিতে আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা যেরূপ পাওয়া যায়, তাহাতে উহা চীন পরিব্রাজকের সেই প্রাচীন অশোকস্তম্ভ বলিয়াই মনে হয়।

যে কারণেই হউক এই খড়্গবংশীয় রাজাদের সঙ্গে আরাকানের রাজাদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজভট্টের পরে কোন সময়ে কর্ম্মান্ত রাজ্য লহচন্দ্রের অধীন হইয়াছিল। লহচন্দ্র বা লহয়চন্দ্র নাম সম্ভবতঃ আরাকানরাজ ডুলটোচন্দ্রেরই বাঙ্গলা রূপান্তর। ত্রৈলোক্যদমনে শ্রীমল্লহরিচন্দ্রবিজয়প্রাসাদের ষষ্ঠদশ বৎসরে শ্রীকুসুমদেবপুত্র ভাকদেবের উল্লেখ আছে। ইঁহার উপাধি 'কর্ম্মান্তপতি' দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয় তখন আর কর্ম্মান্তের রাজারা রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন না—তাঁহারা "মণ্ডলনৃপতি" হইয়া গিয়াছিলেন। লহচন্দ্র (ডুলটোচন্দ্র) ৯৫১ খৃষ্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আরাকানরাজদের সঙ্গে কর্ম্মান্তরাজগণের, কখন ও জিত কিংবা বৈবাহিক

আত্মীয়তা সূত্রে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়। আলাউদ্দিনের নদীশাসন আজিও লুপ্ত, খড়্গাসংঘেরও তাহাই। বঙ্গদেশের চতুর্দিকস্থ কৃত্রিম পাটিকারা নামে পরিচিত এক্সরেণের ইতিহাস 'মহাসংঘোরাং' গ্রন্থে এই 'পাটিকারার' কথা উল্লিখিত আছে। স্থাননামতত্ত্বের দিক হইতে দেখা যায় যে মাণিকচন্দ্র রাজা এই পাটিকারে রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর পাটিকারে কোন রাজকুমার পেগুর রাজা কিংমিয়াদর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহজাত পুত্র অলংসিথু পাটিকারায় এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কথিত আছে অলংসিথু শ্বশুরকে দেখিবার জন্য প্রায়ই পাটিকারায় আসিতেন। অলংসিথু ১০৮৪ খৃঃ—১১৬০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন (নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ, প্রতিভা ২য় সংখ্যা, ১২৪ পৃঃ)।

এই বড়কামতা গ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী স্থানগুলি খুঁড়িলে প্রাচীন বহু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ভট্টশালী মহাশয় তাহার একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়াছেন। তথাকার এক্সরেণ রাজবংশের নগর, কিংবা সম্ভারামের বিষ্ণুর বিপুল কোলাহল, নিত্যরুদ্রদিগের কঠোর মন্ত্রধ্বনি—পূর্বকালের রাজধানীর সেই স্থানে রাজ্যের প্রতাপ ও সমৃদ্ধি এখন একটি স্বপ্নে পরিণত। কবির সেই উক্তি মনে পড়ে, —"এই যদি শেষ, সব হয় শেষ, স্বপন স্বপন প্রভাতে ও। তবুমন কাঁদায়ে, দুঃখ শত সহিয়ে, ভুলিতে লোকে কি আসে ও।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজতরঙ্গিণী কথিত দুইটি আখ্যান

গৌড়ের এই অন্ধকার-যুগে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক রশ্মি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইল। এখানে আমরা কল্হণকৃত রাজতরঙ্গিণীর (কাশ্মীরের ইতিহাস) দুই একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। এই সকল বিবরণের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি, কিন্তু বর্ণিত ঘটনাগুলি যে কতকাংশে সত্য তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন, পালদিগের অব্যবহিত পূর্বে জয়ন্ত নামক এক রাজা গৌড়াধিপতি ছিলেন, —অধ্যাপক ব্যানার্জি মনে করেন ইনিই রাজতরঙ্গিণীর "গোড়েশ্বর জয়ন্ত", এই কথাটুকুর অবতারণা করিয়া আমরা রাজতরঙ্গিণীর কাহিনীটি নিম্নে দিতেছি

তখন কাশ্মীরাধিপতি ছিলেন জয়াপীড় ইনি মহারাজ দণ্ডিবর্ম্মিদেবের পৌত্র। তরুণ জয়াপীড় মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি একাকী কোন শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবেন তৎপূর্ব্বে তিনি কোন রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইবেন না এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি একদা চন্দ্রোদয়ে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন সেই সুন্দর কান্তিমত্তর লবঙ্গ ও আম্বুরক্ষা-পরিচ্ছদ-মধুর অলঙ্কারের শোভা ছাড়িয়া একবারে বর্ম্মের ভার-চমৎকার নিষেবিত, গজনীর সম্পূক্ত-সমীরচুম্বিত বনদেশের নানাস্থানের বাহির সংসর্গে আসিলেন প্রথমতঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইয়া তৎপরে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হইলেন গৌড়ের রাজা তখন কয়স্থ গৌড়ে এক বিশাল চক্রাকারখচিত কাশ্মিকাতলের মন্দির ছিল সেখানে প্রাত নিশীথে অপূর্ব্ব সুন্দরী নর্ত্তকীর অঙ্গের নানাবিধ লোলায়িত ভঙ্গী দেখাইয়া নৃত্যকৌশলে মুগ্ধ করিত নর্ত্তকীর শ্রেষ্ঠ ছিলেন কমলা। সভার কুতূহলের মধ্যে যেরূপ চঞ্চলতা—সেই কাশ্মিকাতলের মধ্যেও সঙ্গীতের আসরে কমলার স্থিতি ও নর্ত্তন ছিল তেমনই। এদিকে চন্দ্রোদয় হইলেও কাশ্মীরের তরুণ রাজার রূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল কাশ্মীর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যের অনুরাগী ও জয়াপীড় ছিলেন কাশ্মীরের সাধের মানুষ সুতরাং নবাগত যুবকের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িতে লাগিল কিন্তু বিশেষ করিয়া কাহার চোখে পড়িলেন কমলা। শুধু কুমারের মুগ্ধ রূপ নহে, তাঁহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া কমলা বুঝিলেন, ইনি কোন দেশের রাজা হইবেন কতকগুলি লক্ষণের একটী এই যে সেকালে রাজাদের সঙ্গে সর্ব্বদা ছত্রধারিণী থাকিত, মণিখচিত সুবর্ণদণ্ড-হস্তে তাহারা রাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিত। রাজা ইচ্ছানুসারে পুরের দিকে হস্ত বাড়াইয়া ছাতা গ্রহণ করিতেন রাজনটী লক্ষ্য করিল, তরুণ যুবক অভ্যাসবশতঃ পুনঃ পুনঃ স্বীয় পৃষ্ঠের দিকে হস্ত প্রসারিত করিতেছেন। মেঘ কুরাইয়া গেলেও যখন তেমন অভ্যাসবশতঃ কেবলই করে, রাজা হইতে প্রবাসে একাকী আসিয়াও জয়াপীড় সেইরূপ এই হাত বাড়াইবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। নটী বুঝিলেন, ইনি রাজা না হইয়া যান না।

জয়াপীড়ের সঙ্কল্প ও গৌড়ে আগমন।

রমণীর নানারূপ ছলাকলায় আত্মবিস্মৃতা, কুলশীলহারা নর্ত্তকীর পক্ষে জয়াপীড়কে কৌশলে ভুলাইয়া স্বগৃহে লইয়া আসা বিশেষ শক্ত কাজ হয় নাই। কিন্তু যখন নর্ত্তকী নানা অনুনয় বিনয় করিয়া তরুণ নৃপতিকে প্রেম নিবেদন করিলেন, তখন তিনি সঙ্কল্পের বিষয় তাঁহাকে বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন।

জয়াপীড় ও কমলা।

এই সময়ে একটা বড় রকমের সিংহ গৌড়ের এক জঙ্গলে ঢুকিয়া বড়ই উৎপাত করিতেছিল। রাজা সেই সিংহের মস্তকের জন্য উচ্চ পুরস্কার ঘোষণা করিলেন কিন্তু কোন শিকারী সিংহকে বধ করিতে সমর্থ হইল না এই কথা শুনিয়া বহু লোকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া একাকী অস্ত্রহস্তে জয়াপীড় সিংহ খুঁজিতে নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন, খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি সিংহের

সিংহবধ।

দর্শন পাইলেন এবং খড়্গের এক আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু মুমূর্ষু সিংহ জয়াপীড়ের দক্ষিণ বাহু কামড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

গৌড়েশ্বরের আদেশে সেই সিংহের মস্তক তাঁহার নিকট আনীত হইল, কিন্তু শিকারীর দর্শন নাই। সঙ্কল্প পূর্ণ হওয়ায় আনন্দে তিনি রাজধানীর এক প্রান্তে একাকী বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। তরুণ শিকারীর বাহু কামড়াইবার সময়ে তাঁহার মণিময় সলহ সিংহের দংষ্ট্রাবদ্ধ হইয়াছিল। সেই বলয় খোলা হইলে রাজা দেখিলেন, তাহাতে "জয়াপীড়" নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। জয়াবেলা নামক ললিতাদিত্যের পৌত্র, তরুণ বয়সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, একদা কোথাও অবিদিত ছিল না। গৌড়েশ্বর জয়ন্ত শিকারীকে আনিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত করিলেন। জয়াপীড়কে রাজসকাশে উপস্থিত করা হইল। তিনি সাদরে তাঁহার গুণবতী ও রূপবতী কন্যা কল্যাণদেবীকে জয়াপীড়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়া তাঁহাকে নানা উপঢৌকন প্রদান করেন। কলহণ লিখিয়াছেন জয়ন্তের পাঁচটি প্রবল শত্রুকে পরাজয় করিয়া জয়াপীড় তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

মণিবলয়ে "জয়াপীড়" নাম কোদিত।

কল্যাণদেবীর সহিত বিবাহ।

জয়ন্তকে কায়স্থ ও প্রথাতনামা আধিকারিকের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিবার জন্য যে কয়েকখানি ভ্রান্ত কুলজী সম্প্রতি প্রণীত হইয়াছে তাহার অসারতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষভাবে তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে (১ম খণ্ড ১৯১ পৃঃ ১৩০০) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জয়াপীড়ের বিবরণ রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

গৌড়েশ্বর জয়ন্তের গুণবতী কন্যা কল্যাণদেবীকে যে কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় বিবাহ করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু তাহা সত্যটা যেন রূপকথার রাজকুমারের কাহিনীর মত শোনায়। তাহার কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা এবং অতিরঞ্জন তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

কলহণের দ্বিতীয় উপাখ্যানটি জয়াপীড়ের শিক্ষাগুরু ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় সম্বন্ধীয়। তাহাতে বাঙ্গলার গৌরবের অনেক পরিচয় আছে।

ললিতাদিত্যের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের বহুদিন কলহ চলিতেছিল। তিনি সন্ধি করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহাকে কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। গৌড়েশ্বর স্বভাবতঃই শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন কিন্তু ললিতাদিত্য তাঁহার গৃহদেবতা পরিহাস-কেশবকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার সম্মানিত অতিথিকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তাঁহার কোন বিঘ্ন ঘটে তবে তক্ষণই পরিহাস-কেশব' দায়ী হইবেন। গৃহদেবতাকে লইয়া এরূপ স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির পর গৌড়েশ্বর অবশ্য নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু কাশ্মীর-রাজ এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ত্রিগামী নামক স্থানে গুপ্তহন্তারক নিযুক্ত করিয়া রাজ-অতিথিকে নিধন করেন।

কাশ্মীরের ললিতাদিত্য ও গৌড়েশ্বর।

এই সংবাদ পাইয়া রাজার দেহরক্ষীর একটি ক্ষুদ্র দল গৌড়দেশ হইতে প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীরাভিমুখে রওনা হইল। কলহণ লিখিয়াছেন (৪র্থ অধ্যায়),

দেহরক্ষী পুত্রবলের অভিযান।

"গৌড়রাজের পরিচারকেরা তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বীয় প্রাণ স্বীয় প্রভুর জন্য বিসর্জন দিয়াছিল। (৩২৪ শ্লোক)

"তাঁহারা কাশ্মীরের তীর্থ সকল দেখার মনিব দেখিবার ছলনা করিয়া এক জোট করিয়া পরিহাস-কেশবের মন্দিরে প্রবেশ করিল এই পরিহাস-কেশবই তো তাঁহাদের প্রভুর জীবনের জন্য জামিন হইয়াছিলেন। (৩২৫ শ্লোক)

"পুরোহিতেরা দেখিলেন, গৌড়ীয় সৈন্যগণ পরিহাস-কেশবের মন্দিরে ঢুকিতেছে; রাজা তখন কাশ্মীরে ছিলেন না. তাঁহারা মন্দিরের সদর দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন (৩২৬ শ্লোক,

"গৌড়ীয়গণ সেখানে মহামারী উপস্থিত করিয়া পরিহাস-কেশব নাম 'রামস্বামী' নামক বিষ্ণুর অপর এক রজতময় বিগ্রহ আক্রমণ করিল তাহারা সেই মূর্তি পীঠ হইতে উৎপাটিত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল (৩২৭ শ্লোক।

'পরিহাস-কেশব' নামে 'রামস্বামী' বিগ্রহের আগমন।

"এদিকে শ্রীনগরের সৈন্যগণ আসিয়া যখন সেই দুষ্টমেয় গৌড়ীয়গণকে বধ করিতেছিল, তখনও তাহারা স্বীয় মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া সেই দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহার রেণু চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতেছিল (৩২৮ শ্লোক

"গৌড়ীয়গণের কবলের রক্ত-রঞ্জিত হইয়া যখন ভূমিতে পড়িতেছিল তখন তাহারা পঞ্চতপাগণ অধিক শক্তিমান দৈত্যিকাকৃত পুষ্পবর্ষণের মত দেখাইতেছিল (৩২৯ শ্লোক)

"তাহাদের বক্ষঃস্থল তাহাদের অসাধারণ প্রভুভক্তিকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইল এবং ধরিত্রীকে অসামান্য সম্পদশালী করিল। (৩৩০ শ্লোক

"তড়িৎপাত বজ্রদ্বারা নিবারিত হয়, অতি মূল্যবান্ মকরত মণি (Emerald) দ্বারা অহিবিষ দোষ নষ্ট হয় পত্যেক মণির কোন না কোন আশ্চর্য্য ব্যবহারিক মূল্য আছে কিন্তু এই বীরগণের বীরত্বের তুলনায় অপর সমস্ত মণি নিষ্ফল (৩৩১ শ্লোক)

"তাহারা তাহাদের প্রভুর জন্য কত সহজে প্রাণ বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল সেই মৃত প্রভুর জন্য তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছিল। (৩৩২ শ্লোক)

"সেই দিন গৌড়ীয়গণ যাহা করিয়াছিল, তাহা সহস্রকল্পান্তেও বৃথা করিতে পারিতেন না (৩৩৩ শ্লোক)

"রামস্বামীর বিগ্রহ এই গৌড়ীয় সন্তানগণ ভগ্ন করাতে রাজার অতি সাধের নিখাত 'পরিহাস-কেশব' বিগ্রহ রক্ষা পাইয়াছিল। (৩৩৪ শ্লোক)

"এখন পর্যন্ত রামস্বামীর মন্দির বিগ্রহশূন্য থাকিয়া গৌড়ীয়গণের জগদ্ব্যাপী বীরত্ব-যশের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।" (৩৩৫ শ্লোক)।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৌর্য্য ও গুপ্ত-রাজত্বে শিল্পসাহিত্য

"ন খলু ন খলো বোদ্ধিসত্ত্বেতি সর্ব্বং ন চানবং" —কালিদাস।

আমরা যুধিষ্ঠিরের যুগ, মৌর্য্যযুগ এবং গুপ্তদের যুগ—ভারতের এই তিন প্রধান যুগের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি এই তিন যুগই গৌড়দেশের উজ্জ্বল কীর্ত্তিচিহ্নিত। রঘুবংশে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে বাঙ্গালীরা তাঁহাকে তাঁহাদের রণহস্তীর সাহায্যে বাধা দিয়াছিল, এবং সে যুদ্ধ এত ভীষণ হইয়াছিল যে বিজয়ী রঘু জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া স্বীয় গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশ অবশ্য ইতিহাস নহে, কিন্তু গুপ্ত যুগে যে বঙ্গবীরগণ সুদূরবিস্তৃত বিদেশ পরাজয়ী ছিলেন এই সংবাদ কালিদাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠিরের যুগে অঙ্গরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, সুহ্ম, বঙ্গক, সমুদ্রসেন ইঁহারা কুরুপক্ষের এবং কুরুদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইঁহাদের রাজ্যের সীমা যুগে যুগে বাহুল্য বিস্তারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইঁহারা সকলেই বৃহত্তর বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। মৌর্য্য যুগের পূর্ব্বে বঙ্গের এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন। সেই বিজয়কাহিনী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, সেই ঘটনার বহু শতাব্দী পরেও অজন্তার চিত্রকরের তুলি সিংহলবিজয় তাঁহার সমস্ত প্রতিভা দিয়া আঁকিয়াছিল। অজন্তার অতুলনীয় চিত্রগুলির শীর্ষস্থানে বিজয়ের অভিযান গুপ্তযুগের শেষভাগে 'গৌড়-বঙ্গ' শব্দাক্ষ প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছিলেন।

মৌর্য্যযুগ হইতে বঙ্গের অতি নিকটবর্ত্তী মগধই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল যাঁহারা মগধ-জয়ী, তাঁহারাই ভারতজয়ী আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উল্লেখ এখানে করিব না। যিনি যখন মগধ জয় করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছেন, তিনিই একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সমগ্র ভারতের উপর রাজদণ্ডের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষের আয়তন অতি বৃহৎ ছিল একদিকে পারস্য, অপর-দিকে বাহ্লীকাটী, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সিংহল। এই বিরাট ভূভাগ সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরোক্ষে মগধের শাসন মানিয়া চলিত জরাসন্ধ হইতে অন্ধ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত মগধের রাজগণ ভারতীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের পূর্ব্বভাগে বিরাজ করিতেছিলেন ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে কালিদাস সমস্ত নৃপতির পুরোভাগে মগধেশ্বরের স্থান দিয়া লিখিয়াছেন, ভূমণ্ডলে

যুগে যুগে বঙ্গের রাজ্যের গৌরব।

মহল মহল নরনারী আকারের বস্তুগুলি কেবল এই মহাদেশ দ্বারাই একচেটিয়া বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, যেহেতু এখানে এরূপ সমাবেশ হইলেও কেবল চক্ষুদ্বারাই দৃশ্যমান হইয়া থাকে। "কিন্তু এখন, এই সংস্কৃতিকে, এতদিন যাহাকে [illegible] কিন্তু এখন যাহাকে ভাবা হইত একটি পুরাতনকে মুখ ফিরাইয়া এই প্রাচীন [illegible] পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে চাহিতেছেন [illegible] কিন্তু যাহারা সেই অবস্থায় আরও কিছুদূর পূর্বে গুহাবাসের কিছু আগের 'বিজ্ঞানটি' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, ভারতের কোন স্থানের প্রাগৈতিহাসিক শিলাচিত্র হইতে ইহাদের জন্ম এবং সুদূর [illegible] সম্বন্ধে অধিকতর তথ্য অনুসন্ধানের সন্ধানগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। [illegible] কোন কোন লেখক পাথরের [illegible] চিত্রাঙ্কন [illegible] এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (Indian Antiquary, [illegible], [illegible]) কিন্তু কেহ কেহ এগুলিকে অর্বাচীন বিজ্ঞানপুর [illegible] বিষয়ের কৌতূহলকেও ঐ পর্যায়ে ফেলিয়াছেন (এই প্রবন্ধটির আলোচনার বিষয়ী, ১৯১৫, দ্রষ্টব্য)।

আদিম মানবের শিল্পজ্ঞান, মানবজাতির শিল্পবিকাশের ক্রমবিকাশ।

কোনো চিত্রশিল্পী বা এক আর বেলজিয়ান যে এতদিন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এই চিত্রগুলির সঙ্গে অধুনাতন কালের আবিষ্কৃত ফরাসী দেশের ও ইউরোপ দেশের পাষাণ [illegible] চিত্রগুলির খুব সাদৃশ্য আছে এবং এ সাদৃশ্যই এক সুন্দর বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞানপুর বি এল বেলভালের এই গুহা হইতে ৩ মাইল দূরে। এই স্থানের পাষাণের গায়ে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া, এল এল বি মহাশয় ইংরেজীতে 'Pre-Historic Rock Paintings of Singanpur' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার সেই 'চিত্রগুলির একটির ছবি' [illegible] তাহার মধ্যে একটি অতিকায় বানরের মনুষ্যের ছবির সহিত সাদৃশ্য। উহার চতুষ্পার্শ্বের গঠন, সুবিস্তৃত বক্ষ, দীর্ঘবাহু এবং অতি ক্ষুদ্র মস্তক এবং উহার পুচ্ছ দেখিয়া যে মনুষ্যের আকার দেখা তাহাকে পণ্ডিতদের কেহ কেহ পশুরূপে বলিয়া মনে করেন। মিঃ পারসি ব্রাউন তাঁহার Indian Painting নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "The rock paintings at Singanpur may be of very remote antiquity."* (বিজ্ঞানপুরের এই শিলাচিত্রগুলি

* These [illegible] depict [illegible] human beings and animals and are accompanied by what appear to be hieroglyphics. Although many of these drawings are not wanting in merit enough of them have been identified to show that this primitive artist had a natural gift for artistic expression as proved by the facile manners in which he interpreted his ideas by means of these effective [illegible] to [illegible] forms.

* মহেঞ্জোদারোর বৃষ, আর হাজার বছরের পুরোনো, (১৪০-৪০ পৃঃ)।

* পাহাড়পুরের একটী পুরাতন মূর্তি (পাহাড়পুর-সংক্রান্ত সমস্ত চিত্রের ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

* পাহাড়পুরের তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত ও খোদাইয়ের ১৫ পাওয়া গিয়েছে এই চিত্রে "বসন্তাভিনয়" প্রদর্শন।

মহেঞ্জোদারোর ৪৫ হাজার বছর আগেকার এক বৃদ্ধ বিশ্বাস বীরভূম জেলার একটী আদিম মূর্তি এইরূপ দেখিয়াছি, এর পরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে ইহার তুলনা করা যায়।

* কলিকাতা মিউজিয়ামের একজনার পুরুষিকের আরাধনার নবম-দশম শতাব্দীতে নির্মিত একটি ধূসরবর্ণ প্রস্তরফলকের বিবরণের মধ্যে হইতে গৃহীত।

২২৮ (খ) বঙ্গীয় চিত্রাবলী কাগজ, তালপাতার পুঁথির মলাটের উপর অঙ্কিত,

জয়পুরের প্রতাপ, মন্দরালের পট

সিংহ—পটুয়ার আঁকা, ২৪শ পরগণা, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ।

সংকীর্তন—পটুয়ার কর্তৃক তুষ্ট সাদার আঁকা, (কাঁথিপুর) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ।

সুদূর প্রাচীন যুগের বলিয়া মনে হয়। এই চিত্রগুলির মধ্যে মৎস্যনারী (mermaid) এবং নানাবিধ পশুর প্রতিমূর্তি আছে। তখনও চরক মহাশয় ছবিগুলিকে পোর্ট বানাইতে শিখে নাই। শিকার দ্বারাই সম্ভবতঃ তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিত। এই শিকারের ছবিগুলি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত ইহাদিগকে 'শিকারী যুগের' মনুষ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন।

এই ছবিগুলি পাহাড়ের সিন্দুর ও গৈরিক প্রস্তরের গুড়া দ্বারা অঙ্কিত। বিভিন্ন দেশের প্রাচীন চিত্রাবলীর সঙ্গে ইহাদের নিকট-সাদৃশ্য লইয়া অমরবাবু খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন—এই ছবিগুলির সঙ্গে য়ুরোপের নানাস্থানে প্রাপ্ত এবং আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন চিত্রিতগুহার আকৃতি মূর্তি তুলনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ ইহাদিগকে বিশ হাজার বৎসর পূর্বের বলিয়া অনুমান করেন।

সিঙ্গানপুরের ছবিগুলি বিশ হাজার বা পনের হাজার বৎসর পূর্বের কিনা পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন। এই সকল তারিখ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা আমার পুস্তকের বিষয়ভূত নহে, তথাপি নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে এগুলি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ছবি ও প্রতিমূর্তির যুগের বহু পূর্ববর্তী। এই যুগের নিকট বেদের যুগকেও মানবজাতির শৈশবকাল বলা যাইতে পারে। এইখানে সিঙ্গানপুরের কয়েকখানি ছবির প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

সম্প্রতি সম্বলপুর জেলায় বিক্রমখোলার কতকগুলি চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাও পর্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ। বিক্রমখোলার অভ্যন্তরে ঊষাকুটি নামক স্থানে ঐরূপ কতকগুলি জ্যামিতিক চিত্র ও প্রাণীর ছবি সুগম পাহাড় গাত্রে পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমখোলা বি এন আর পথে বেলপাহাড় ষ্টেশন হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত। লিপিগুলি ৩১ × ৬ ফিট স্থান ব্যাপিয়া আছে। অক্ষরসংখ্যা প্রায় ৩৫০। ঊষাকুটির অক্ষর ও চিত্রসংখ্যা ২০২টি হইবে। মহেঞ্জোদারোর চিত্রাক্ষরের সঙ্গে এই সকল অক্ষরের সাদৃশ্য আছে এবং ইহাদের কোন কোন অক্ষর ব্রাহ্মী লিপির ন্যায়। কিন্তু এখনও ইহাদের পাঠোদ্ধার হয় নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, ইহাদের সময় আনুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বের, মহেঞ্জোদারো ও অশোক-লিপির মধ্যবর্তী কোন সময়ে এই অক্ষরগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

এই সিঙ্গানপুরের চিত্রগুলি দুই হাজার বৎসর পূর্বের অনুমান করিয়া লইলে ভারতীয় চিত্র ইতিহাসের সময় নির্দেশপূর্বক আমরা নিম্নলিখিত ভাবে একটা ধারাবাহিকতা দেখাইতে পারি।

(১) সিঙ্গানপুরের চিত্র ২০,০০০ বৎসর পূর্বের
(২) মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার চিত্র ৬,০০০-৭,০০০ বৎসর পূর্বের।
(৩) বিক্রমখোলার চিত্রাক্ষর—৫,০০০ বৎসর পূর্বের
(৪) মহাভারতাদি পুরাণ-বর্ণিত চিত্র —৩,৫০০ বৎসর পূর্বের
(৫) মৌর্যচিত্র ২,৫০০ বৎসর পূর্বের

এই সকল চিত্রে এমন কতকগুলি বিষয় দৃষ্ট হয় যাহাতে অকাট্যরূপে প্রমাণ হয় যে বঙ্গদেশের চিত্রবিদ্যা কোন কোন স্থলে উহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। এতৎ-সংলগ্ন চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন। বাঙ্গালা পল্লীতে লক্ষ্মীপূজার ঠিক এইরূপ ছবি আঁকিয়া মেয়েরা পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতীয় চিত্র তাহার ধারাবাহিকত্ব হারায় নাই। কিন্তু এই সকল চিত্র বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল কাহারা? সে সকল চিত্রকরের বংশ কি লোপ পাইয়াছে?

আমরা যখন করি—আর্য্যগণ কোন চিত্র সংস্কার লইয়া এতদ্দেশে আসেন নাই, ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের নিকটেই এই সংস্কার তাহারা পাইয়াছিলেন। বাবিলন, ঐজিপ্ট, ক্রীট্ এবং সুমেরিয়ান শিল্পের সঙ্গে এই ভারতীয় আদিমের শিল্পের যেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার যে সেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় রাহ্মী লিপির কতকটা মিল দেখা যায়, কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন; এবং অমরাবতীর পুস্তকের সিজানপুরের এবং চিত্রকে কেহ কেহ ঐজিপ্টের মত "চিত্রাক্ষর" বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও বিক্রমখোলার চিত্র রাহ্মী লিপির আদিপুরুষ হওয়া অসম্ভব নহে।

আর্য্যগণ সঙ্গীতকে যেরূপ সম্মানের স্থান দিয়াছেন, চিত্রকলাকে সেরূপ দেন নাই। সামগানে কবিরা প্রমত্ত হইতেন, নাটক, তখন প্রায় সঙ্গীতের শুরুগণ আসরেপূজিত দেবী ভারতীর হস্ত বীণা-রঞ্জিত

আর্য্যসমাজে শিল্পীর স্থান।

চিত্র এবং স্থপতিবিদ্যের দেবতা বিশ্বকর্ম্মাকে আর্য্যগণ যদিও তাঁহাদের দেবমণ্ডলীতে কতকটা স্থান দিয়াছেন, তথাপি কোন উচ্চবর্ণের লোকেরা ঐ দেবতার পূজা করেন না। স্বর্গবাসী দেবতারা কোন শিল্পকর্ম্ম করাইতে হইলেই বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন, তিনি তাঁহাদের কর্ম্মচারীর মত। "বিশ্বকর্ম্মা" ঠাকুর প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর শিল্পীদেরই দেবতা এবং তাহারাই এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা মনে হয় অনার্য্য জাতিদের নিকট হইতেই আর্য্যগণ এই শিল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লঙ্কার প্রধান শিল্পী "বিশ্বকর্ম্মা" রাক্ষসজাতীয় ছিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয় যজ্ঞের সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ময়দানব। এই ময়দানব প্রাচীন ব্যাবিলনের ময় (Maya) জাতীয় কিনা তাহা বিবেচ্য। মেক্সিকোর শিল্পী "হুনাক্ষ", যিনি গুলশন হ্রদের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনিও সম্ভবতঃ অনার্য্য-বংশোদ্ভূত, তাঁহার নাম আর্য্যজাতীয় বলিয়া মনে হয় না।

আদিম শিল্পীরা কোথায় গেল?

ঐতিহাসিক-যুগে চন্দ্রগুপ্তজাতীয় সূর্য্য স্থপতি কাশ্মীরে যে সকল অদ্ভুত স্থাপত্যের দ্বারা বিতস্তা নদীর গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিণীকার কল্হণ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, এখনও এ দেশে স্থাপত্য ও চিত্রের কারুকার্য্য সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই করিয়া থাকে। যাহারা তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই শিল্পীরাও হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়—ভোগট, তাতট প্রভৃতি পাল রাজাদের নিযুক্ত শিল্পী নিশ্চয়ই উচ্চকুলজাত ছিল না। এমন কি

মোগলদের সময়েও আইন-আকবরিতে আবুল ফজল যে কয়েকজন হি স্রেষ্ঠ শিল্পীর নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই নিম্নশ্রেণীর, বিখ্যাত দস্তুস্ত এবং কেশু তাহারজাতীয় য়ুরোপে চিত্রকরেরা যে সম্মান ও অর্থ প্রাপ্ত হন, ভারতীয় শিল্পকারগণ অনেক বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য করিয়াও তদপেক্ষা অতি অকিঞ্চিৎকর পরিমাণ অর্থ পাইয়া থাকে। ভুবনবিজয়ী "মমর্সেস" যাহারা প্রস্তুত করিত, তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাই বা কি ছিল? অর্থ সম্পদই বা কি ছিল?

হাতীর দাতের উপর যে সকল চিত্রকর ষোড়শ বাদসাহদের স্বরচিত্রন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে তাহারা এবং জয়পুরের অপূর্ব্ব প্রস্তর-শিল্পীরা অতিসামান্য উপার্জ্জনে তুষ্ট।

ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদা মঙ্গলে লিখিয়াছেন—ব্যাস বিশ্বকর্ম্মাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রকগণ অন্নাভাবে না খাইয়া মরিবে।

এই সকল প্রমাণবলে আমার মনে হয়—ভারতীয় শিল্প অনার্য্যদের দান, অথচ বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন (৩য় শতাব্দী)—কলাবিদ্যার মধ্যে চিত্রবিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিম শিল্পিগণ কোথায় গেলেন? তাঁহারা কি জাতীয় ছিলেন?—এই জটিল প্রশ্নের সহজে সমাধান হয় না, ভারতবর্ষে যাঁহারা একবার আসিয়াছেন, কি হুন, কি শক, কি পাঠান কি মোগল, কি কলাভ্রর, কি ম্যাসেডনিয়া কাহাকেও ত এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে দেখি নাই। য়ুরোপবাসীরা যেখানে যান তাঁহারা তদ্দেশবাসী অধঃসম্ভানিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ছাড়েন যথা—আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ান। কিন্তু সকল দেশের লোকই, কি জেতা বা কি জিত ভারতের ক্রোড়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগে আশ্রয় পাইয়াছেন আমার মনে হয়—ভারতের আদিম নিবাসিগণ আর্য্যসমাজের নিম্নস্তরে স্থান লাভ করিয়াছিল এবং এখনও তাহাদের সন্তানগণ 'কারিগর' শ্রেণী নাম ধরিয়া নিম্নজাতিদের অন্তর্গত হইয়া আছে দীর্ঘকাল আর্য্যসমাজের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাহারা তাহাদের চেহারার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, তথাপি আমার মনে হয় অশোক-রেলিংএ যে বহুসংখ্যক চাপটা নাক, এশেষাসী হইতে কতকটা ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত ও মুখনিঃসৃত লোক দৃষ্ট হয়, উহাই সেই আদিম শিল্পীদের মূর্ত্তি। শিল্পীরা মনুষ্যমূর্ত্তি আঁকিতে যাইয়া সকলেই তাহাদের নিজেদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়াছে। এতৎসংলগ্ন চিত্র দেখুন।

অশোক-রেলিংএর মূর্ত্তি।

মৌর্য্য রাজগণের কীর্ত্তি দেখিয়া গ্রীস রাজদূত বিস্মিত হইয়াছিলেন। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পারস্য রাজধানীর ঐশ্বর্য্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মৌর্য্য-যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উপর গ্রীক প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। পাঞ্জাবের দিকে যেখানে গ্রীক ক্ষত্রপেরা (Satraps) আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিলেন, সেখানে অবশ্য গ্রীক-প্রভাবের অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহার পশ্চিমে যদি গ্রীক-প্রভাব কিছু থাকিয়াও থাকে—তাহা শুধু চালচিত্রে। ভারতীয় শিল্প কখনই গ্রীক শিল্পের দ্বারা অভিভূত হয় নাই। রাজচক্রবর্ত্তী যেরূপ তাঁহার সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তের প্রজা হইতেও রাজস্ব আদায় করিয়া

গ্রাহ্যভাণ্ডারে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, ভারতীয় শিল্প সেইভাবে বিদেশী শিল্প হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল তাহাতে ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ভঙ্গী, শ্রী কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই ভারতীয় শিল্প অধ্যাত্মবাদী হইয়াও

গ্রীকশিল্পের প্রভাব।

জড়জগৎকে তুচ্ছ করে নাই, ইহাতে অধ্যাত্ম সৌন্দর্যের সঙ্গে জড়জগতের সৌন্দর্য মিশিয়া গিয়াছে, গ্রীক শিল্প বাহিরের অবয়বের প্রতি যত লক্ষ্য রাখিয়াছে, ভারতীয় শিল্প ভিতরের ভাবটিকে সম্পূর্ণতা দান করাই তাহাদের তুলির চরম সার্থকতা, কিন্তু ভারতীয় শিল্প ভূতলে দাঁড়াইয়া স্বর্গ ছুঁইতে চাহিয়াছে তাহাদের শিল্পপ্রতিভা বিদ্যুতের মত পূর্বাচল হইতে পশ্চিম হয় নাই, তাহা অস্তাচলগামীর মত। গ্রীক-প্রভাবান্বিত বুদ্ধ এবং মথুরার বুদ্ধ নিশ্চিত বুদ্ধ—এই ভাবের পার্থক্য দেখাইবার জন্য আমরা কয়েকখানি ছবি পৃথক পৃথক ভাবে দিলাম।

এ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখা ভারতীয় বুদ্ধ ধ্যানের মূর্তি বোধকরি এখন জগতের দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, জাভা, কাম্বোডিয়া, শ্যাম,

ভারতীয় বুদ্ধমূর্তির বৈশিষ্ট্য।

বালি প্রভৃতি সকল স্থানেই বুদ্ধমূর্তি আছে মাদ্রাজিদের কয়েকখানি বুদ্ধমূর্তি খাঁটি বুদ্ধের আদর্শ প্রতিফলিত ইঁহাদের নির্মাণপ্রণালী ও রৌতিটা অনুসরণের অনায়ত্ত কিন্তু এখানে আমি উহাদের শিল্পসৌষ্ঠবের প্রসঙ্গ তুলিব না ইঁহারা যাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া প্রাচ্যভাবে ভাবিত হইয়া এই দেশে মূর্তি গড়িয়াছিলেন তাহাদের কাহার মধ্যে কোন্ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় বেঙ্গুনের বুদ্ধের ক্ষুদ্র চক্ষু ও স্ফীত গণ্ড, চীন বুদ্ধের মোঙ্গলিয়ান মুখভাব, জাপানী বুদ্ধের, দীর্ঘ হস্ত ও জ্যামেট্রির উজ্জ্বল ত্রিভঙ্গভঙ্গি, শ্যাম দেশের আকর্ণবিস্তৃত বঙ্কিম ওষ্ঠের বিকৃত বুদ্ধের বিকৃত মূর্তি—কুদর্শন, সৌন্দর্যসৌষ্ঠব-বিরহিত প্রস্তরাকৃতি—কলিকাতার মিউজিয়ামের বিশাল বৌদ্ধ গ্যালারিতে এইরূপ শত শত বিচিত্র প্রকারের বুদ্ধমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় খেজুরাহ, আবু ও সিংহলের মর্মর-শিল্পেরও কয়েকখানি বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি অতীব সুন্দর, যাহা পরাগের চূড়ান্ত সৌন্দর্য তাহাতে আছে।

কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, এই যে বিরাট বুদ্ধ মূর্তির বৃত আমরা চিত্রশালায় দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকটিতে সেই বৈশিষ্ট্যের ছাপটি আছে সুন্দর অসুন্দর, শুশ্রী বিশ্রী, শ্যাম—বেঙ্গুন—আলাকান, অতীত সমস্ত প্রাচ্য জগতের বুদ্ধমূর্তিই ভাব প্রধান। ইহাদের সকলের উপরই অন্তর্নিহিত একটা ধ্যানের ছায়া আছে, প্রত্যেক বুদ্ধকে দেখিয়াই যেন প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয় প্রত্যেকের দেহ যেন চিন্মন্ত এবং ঈশ্বরের প্রতীক হইয়াও অপরূপ ইহাদের মুখে কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, আনন্দ—নিরানন্দ, প্রভৃতি সাংসারিক ভাবের লহরলেশ নাই, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের স্থির নিষ্পলক ভাব, প্রশান্ত ওষ্ঠপুট, তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস বিক্ষুব্ধতার সম্পূর্ণ অভাব,—এক কথায় 'নির্ব্বাণ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বুদ্ধবিগ্রহের প্রত্যেকটিতে তাহা আছে। এমন কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে নিষ্পলতা এবং একটা অপার্থিব নিস্তেজতা—মুখে সম্পূর্ণ বিকারবৈচিত্র্য বিরহিত, যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সেই নির্ব্বাণ-তত্ত্ব বুঝাইতেছে।

ভূমিস্পর্শমুদ্রা, বজ্রাসন প্রভৃতি সমস্তই যেন সেই নির্বাণের ইঙ্গিত করিতেছে। যেরূপ কোন অঙ্কন চিত্রকর মোড়া আঁকিতে যাইয়া বাঘ হইলেও যেমন তেমন করিয়া তাহার বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইয়া দিতে পারে, বুদ্ধবিগ্রহনির্ম্মাতাও সেইরূপ হাজার অঙ্গবিন্যাসেও সে যে নির্ব্বাণতত্ত্বটি বুঝাইতে চাহে, তাহা মানুষ সম্পর্কিত কোন দেহভঙ্গি বুঝিতে কষ্ট হয় না।

এইবার খাজুরাহোর পঞ্চাশাধিক মন্দির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাহাদের মাথুনের প্রতিকৃতি বিশেষভাবে পুষ্ট, বাহু অবয়বের পরিপূর্ণ লক্ষ্য অভিব্যক্তিময়, মানুষের লক্ষণ তাহাতে বেশী। শিল্পী যে মানুষ আঁকিতেছে, অপরূপ কিছু আঁকিবার চেষ্টা হয় নাই, তাহা তাহার বাঁকানো বা ভূমির প্রত্যেক রেখাপাতে ধরা পড়িতেছে। এক প্রস্তরাধার কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তিই নির্ব্বাণের গৌরব রক্ষা করিবে ও বাহিরে থাকিয়া ধারার অন্তরালের বস্তু ও বুঝিবে।

বাহিরের সমালোচক ইহাদের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় হয়ত এই সব আদর্শকেই বেশী প্রশংসা করিবেন, কারণ উহা ঠিক মানুষের অনুরূপ, কিন্তু মাগধশিল্পী ঠিক এই মানুষিক তত্ত্বটি বুঝাইতে চান নাই। স্থূল অবয়বকে অপেক্ষা করিয়া বাহিরের মানুষ কোন ধারণা পুঁজিয়া পাইবে। এ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, অতি দক্ষ শিল্পিগণের হাত হয় নাই এমন নহে কিন্তু অনুরূপ প্রাচীনতার কাজে যাহা সম্পূর্ণতার যে অভাব পরিলক্ষিত হইল, নিকৃষ্ট শিল্পিগণের হাতে হয়ত তাহা নাই। একটি সংসারের দায়ভাগ, অপরটি ধানভানার, এখন দুইটি চিত্র লক্ষ্য করুন। মাগধের মুখ গঠন, স্থির, নিশ্চিন্ত, প্রশান্ত—নির্বাণতত্ত্বের সম্পূর্ণ সার্থক ছাপ। তাহার ওষ্ঠাধরে, অবনমিত অক্ষিপুটে, এমন কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা নিবিড় শান্তির ছায়া—নির্বাণতত্ত্বের সার্থক ব্যাখ্যাস্বরূপ। অপরদিকে খাঁটি প্রত্নসম্বন্ধীয় বুদ্ধের কতকগুলিতে যেন কান ছিদ্র করিবার উপযোগী মুখাবয়ব বিরাজমান, কিন্তু তাহা একান্তই বাহ্য। যাহার সমস্ত শরীরে ভাবনার স্পন্দন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হইতেছে,—হার মুখের ভাব কোন কথা বুঝাইবার চেষ্টা ও বাক্‌চাতুর্য্য যেন সাংসারিক ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে।

বাঙ্গলাদেশ মগধের শিক্ষাশালা।

এই যে মগধশিল্প ছিল, এখনও তাহা এ দেশ হইতে তিরোহিত হয় নাই, বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও যেরূপ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় এই দেশই একসময় মগধের শিক্ষাশালা ছিল হয়ত মগধের শিল্পকার্য্যের জন্য বঙ্গদেশই শিল্প সরবরাহ করিয়াছে শুধু ঢাকার মসলিন নহে, সোনারগাঁর কাজ, বিলুপ্ত প্রস্তরশিল্প, কাষ্ঠফলকে, ইষ্টকে, কাপাসে সর্ব্বত্র বাঙ্গলাদেশ হইতে যে অজস্র চারুশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় পূর্ব্বকালের মতো বঙ্গদেশই সর্ব্বপ্রধান শিল্প-কেন্দ্র ছিল এখনও বঙ্গদেশের কুম্ভকারগণ যে সকল দেবদেবী নির্ম্মাণ করে, ইহাদের মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গীতে সেই প্রাচীন ধারা সহজেই ধরা পড়িবে। মগধ যে দীপ জ্বালাইয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—এখনও সেই দীপ ফেরোয় হইয়া এদেশের পল্লীতে পল্লীতে জ্বলিতেছে।

ভারতীয় শিল্পকলাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এত উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে যে তাহা অগ্রাহ্য করা বাতুলতা। এই শিল্পসম্বন্ধে যেসব যে আভাস আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও রামায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণ হইতেও নানা কাব্য ও নাটকায় সুস্পষ্ট-ভাবে বহু উল্লেখ আছে। কালিদাসের বহু পূর্ব্বে ভাস-কবি তাঁহার প্রতিমা নাটকে ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়াই মৃতের চিত্রশালায় দশরথের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গৃহে ইক্ষ্বাকুবংশের মৃত রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি ছিল—সেই মৃত রাজগণের পঙ্‌ক্তিতে নবনির্ম্মিত দশরথের মূর্ত্তি দেখিয়া ভরত ঘটনাটি বুঝিলেন এবং শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রামায়ণে রাবণের আদেশে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষস রামের কর্ত্তিত মস্তক ও ধনু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; "নয়নে মুখবর্ণঞ্চ ভর্তুঃ সৎসদৃশং মুখম্। কেশান্ কেশান্তরেষঞ্চ তথ চূড়ামণিং শুভম্ এতৈঃ সঙ্কৈরভিজ্ঞানৈর্বিভজ্যার্থবিভজ্ঞায় মুহুর্মুহুঃ।" (লঙ্কা, ৩২শ অঃ।) বৈদেহী সেই মায়ামুণ্ডের মুখবর্ণ, চক্ষু, কেশ, মাথার চূড়ামণি এবং সমস্ত লক্ষণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া শোকসন্তপ্তা হইলেন বিদ্যুজ্জিহ্বের এরূপ পারদর্শিতার মর্ম্মও তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন যে, সীতার ন্যায় রামগতপ্রাণা স্ত্রীও তদ্দ্বারা প্রতারিত হইয়া শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে যেরূপ শিল্পসম্ভারের বর্ণনা আছে এবং রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন চিত্রশালার উল্লেখ (সুন্দর, ৩য় সর্গ) দৃষ্ট হয়, তাহাতে, প্রাচীন কালে এদেশের মানুষের মূর্ত্তি কেহ গঠন বা চিত্রণ করিতে পারিত না—এরূপ মত যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি নিতান্ত একটা আবর্জ্জনার স্তূপ মনে করেন, আমরাও কি তাহাই করিব? মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের মহাসমারোহের যে রাজসভার বর্ণনা আছে তাহা ফা হায়েন কথিত চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার সঙ্গে তুলিত হইয়া শেষোক্তের আসন পাইবার যোগ্য, কিন্তু কোন গ্রীক দূত তাহা দেখেন নাই—সুতরাং তাহা অবজ্ঞেয়। ইংরাজীতে যাহাকে ইতিহাস বলে, আমাদের কাব্যপুরাণাদি তাহা না হইতে পারে,—কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা আছে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিল্প প্রভৃতির যে যথাযথ চিত্র দেওয়া আছে তাহা মনগড়া কথা নহে। কবি বা লেখকেরা যাহা দেখিতেন, তাহাই বর্ণনা করিতেন। ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় স্ফটিক-পরিশোভিত একটা স্থানকে জলাশয় মনে করিয়া দুর্য্যোধন জলভ্রমে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ("স কদাচিৎ সভামধ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ। স্ফটিকং স্থলমাসাদ্য জলশঙ্কী সমুত্থিতঃ। বস্ত্রস্যোৎকর্ষণং রাজা কৃতবান্ বুদ্ধিমোহিতঃ।") একটা জায়গায় একটা স্ফটিকের স্তম্ভ বা চিত্র ছিল, তাহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে মনে হইত যেন দুইটি কাচের দরজা খোলা আছে, দুর্য্যোধন ঢুকিতে যাইয়া কঠিন স্ফটিকের ধাক্কা খাইয়া মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলেন। ("দ্বারস্থ পিহিতাকারং স্ফাটিকং প্রেক্ষ্য ভূমিপঃ। প্রবিবেশাহরো বুদ্ধ্যা ব্যামুগ্ধিত ইব স্থিতঃ॥") আবার একটা স্থানে দুইটি স্ফটিকময় বিশাল কবাট মুক্ত ছিল, কিন্তু উর্দ্ধস্থিত মণিজ্যোতিতে এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন দুইটি দরজাই বন্ধ, তখন দুই হাত বাড়াইয়া দুর্য্যোধন তাহা খুলিবার

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রমাণ।

অভিপ্রায়ে তাহাতে বেগে ধাক্কা দিয়া উলুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। ("তাদৃশকাপবং দ্বারং স্ফটিকোৎকটকপাটকম্। বিদদর্শ ন কারাভ্যন্তরিক্ষমাত্রে পপাত হ ") অন্য একস্থানের একটি মুক্ত দ্বার ছিল, তাহাও পূর্ব দ্বারের ন্যায় আবদ্ধ মনে করিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। ("দ্বারন্তু বিততাকারং সমপশ্যৎ পুনশ্চ সঃ তদ্ বৃত্তকেতি মন্বানো দ্বারস্থানাদুপারুহৎ"—সভা, ৩৫ অঃ, ১০-১২ শ্লোক।) অভিমানী দুর্যোধন অহঙ্কারবশতঃ দ্বারপাল কাহারও সাহায্য না লইয়া এইরূপ নানা ভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন।

ভারতীয় স্থপতিরা যে প্রাচীনকালে নানারূপ মণি, স্ফটিক ও কাচসংযোগে গৃহনির্মাণের বিচিত্র কৌশল দেখাইতেন, এই সকল পাঠ করিয়া এতৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। রাজসূয়যজ্ঞের উপলক্ষে কাম্বোজের রাজা যুধিষ্ঠিরকে যোলখানি পশমবস্ত্র ভেট দিয়াছিলেন, মহাভারতে লিখিত আছে তাহা কম্বলশব্দের রূপ ধরুন—তাহাদের কোন কোনটি কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি শ্যামবর্ণ এবং কোনটি অরুণবর্ণ, কৃষ্ণ নানামণিরত্নখচিত শিক্যের ('শিকার') মধ্যস্থিত সুবর্ণময় জলপাত্র যুধিষ্ঠিরকে এই উপলক্ষে উপহার দিয়াছিলেন। এই সকল দ্রব্যের কারুকার্য এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ছিল যে দুর্যোধন শকুনিকে বলিয়াছিলেন, "মাতুল, এই দ্রব্যগুলি দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্যদর্শনে আমার যেন জ্বর হইয়াছিল। ("দৃষ্ট্বা চ মম তৎ সর্বং জ্বরস্তুমিবাভবৎ॥")

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভাকে গ্রীকদূত সকলাপেক্ষা সমৃদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। পারস্যের রাজসভা তৎকালে পরিষ্কৃত ছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সভা তাহাকে পরাজিত করিয়াছে, এরূপ মানুষের হাতের কাজ নহে, কোন দৈব শিল্পি কৃত। গ্রীকদূতের এইরূপ উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই; বাস, বাল্মীকির কথা অগ্রাহ্য, কিন্তু ফা হিয়েন মেগাস্থিনিস্ ও ইৎসিং যত অদ্ভুত কথাই তাঁহারা বলুন না কেন, তাঁহাদের কথা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য খুব উচ্চ দরের ছিল এবং গ্রীক ও পারস্যের শিল্পীদিগকে ছাপাইয়া গিয়াছিল—একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তথাপি গ্রীকদিগের প্রেহরের প্রতি চিরবিশ্বাসীরা এক কথায় সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না।

গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে শিল্পীদের নিয়ত গুরুনীতি।

ভারতবর্ষে দেবদেবী, বহু হস্ত, বহু মুখ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সহকারে নির্মিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা বহু মূর্তিতে দেখিয়া ভালমন্দ সমালোচনা করেন, তাঁহারা হয়ত মনে করিতে পারেন, এই শিল্প বিশৃঙ্খল,—ইহার কোন সূত্র বা নিয়ম নাই, শিল্পী তাঁহার খেয়ালে কার্য করিয়া যান। কিন্তু শুক্রনীতি ও শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তকে কলাশিল্পের নিয়মণের যে সকল সূক্ষ্ম ও কঠোর নিয়ম আছে, তাহাতে শিল্পীর যথেচ্ছাচারের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। এমন কি মনুষ্যমূর্তি ও গজমুণ্ডের সংযোগে যে গণেশ দেবতা নির্মিত হইয়া থাকেন, তাঁহার সম্বন্ধেও অনেক খুঁটিনাটির আইন আছে। যথা—গণেশের মস্তক হাতীর, মনুষ্য-মূর্তি, কর্ণ লম্বা,—

কম্বোদর, ক্ষুদ্র কিন্তু মাংসল হস্ত, মাংসল পদদ্বয়, দীর্ঘ শুঁড়, বামদন্ত দেখা যাইত হইবে না, শুঁড়টি বামদিকে হেলান থাকিবে মূর্তির শির, অস্থিসংযোগ দেখাইতে হইবে না। ইহার পরিমাণ এইরূপ: শুঁড় = ৪½ তাল; মস্তক = ১০ আঙ্গুল, শুঁড়ের শেষদিকে পুষ্কর থাকিবে কর্ণ = (দৈর্ঘ্য) ১০ আঙ্গুল এবং বিস্তৃতিতে ৮ আঙ্গুল দুই কর্ণের অবকাশ স্থানের মাপ = ১ তাল এবং এক আঙ্গুল চক্ষুর উপর দিয়া মস্তকের পরিধি ৩১ আঙ্গুল, চক্ষুর নিম্নভাগ শুঁড়ের উৎপত্তিস্থানে হইতে মস্তকের পরিধি ২১ আঙ্গুল পুষ্কর এবং শুঁড়ের শেষদিকের পরিধি = ১০ আঙ্গুল কর্ণের দৈর্ঘ্য = ৬ আঙ্গুল, উহার পরিধি ১০ আঙ্গুল উদরের পরিধি = ৩ তাল উহার দৈর্ঘ্য ৬ অথবা ৮ আঙ্গুল লাঙ্গ = দৈর্ঘ্যে ৬ আঙ্গুল; উৎপত্তি স্থানের পরিধি এইরূপ নিম্নাংশে = ৬ আঙ্গুল পুষ্করের মধ্য পর্যন্ত থাকিবে। উহার উৎপত্তিস্থলের পরিধি = ১১ আঙ্গুল উহার শেষদিকের পরিধি ১১ আঙ্গুল চামরের উৎপত্তিস্থানের পরিধি শেষদিকটার পরিধি অপেক্ষা এক কিংবা দুই আঙ্গুল বড়। চক্ষু এবং কর্ণে অবকাশ-স্থান = ৪ আঙ্গুল চক্ষুর দুই প্রান্তের বর্তমান কই চক্ষুর তারার অবস্থান এবং চক্ষুর যের উৎপত্তিস্থানের অবস্থান = ক্রমান্বয়ে ১০ ৭ এবং ৬ আঙ্গুল।

এই ভাবে অশ্বমুখ, মহিষমুখ, বরাহমুখ দেবতাদিগের সমস্ত দেহের খুঁটিনাটির পরিমাণ দেওয়া আছে।

পরিমাণসূচক যে সকল শব্দ পারিভাষিক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ — একটি মুষ্টির ½ অংশ এক আঙ্গুল, ৮ মুষ্টি হাতবদ্ধ করিলে যে 'মুড়' হয় তাহাই তাল। তালের দৈর্ঘ্য ১২ আঙ্গুল ৪ তাল = এক হাত ১ তাল = এক কুমার।

মূর্তিগুলির যেরূপ পরিমাণ হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল —

(সাধারণতঃ) বামন ৭ তাল
মানুষ = ৮ তাল
দেবতা = ৯ তাল
রাক্ষস = ১০ তাল
ঋষি = ৭ তাল
কুমার = ৬ তাল
বাল = ৫ তাল

অসাধারণ। নরনারায়ণ = ১০ তাল
চণ্ডী = ১২ তাল
ভৈরব, হিরণ্যকশিপু, ইন্দ্র = ১৬ তাল

৭ তাল-পরিমিত মূর্তির মাপ :—

(১) মুখ = ১২ আঙ্গুল, (২) গ্রীবা = ৩, (৩) হৃদয় = ৯, ৪) উদর = ৯, (৫) শ্রোণি = ১৮ (৬) জানু = ৩, (৭) জঙ্ঘা = ১৮, (৮) গুল্ফদ্বয় = ৩।

৮ তাল-পরিমিত মূর্তির মাপ :—

(১) মুখ ১২ আঙ্গুল, (২) গ্রীবা = ৪, (৩) হৃদয় = ১০, (৪) উদর = ১০, (৫) শ্রোণি = ১০, (৬) শ্রোণিফলক = ১১, (৭) জানু = ৯, (৮) জঙ্ঘা = ২১, (৯) গুল্ফ = ৪।

১০ তালের মাপ ;—

(১) মুখ=১৩ অঙ্গুল (২) গ্রীবা=৪, (৩) স্কন্ধ=১৩, (৪) উরু=১১,
(৫) সক্থি=১৩, (৬) জঙ্ঘা=১১, (৭) জানু=৫ (৮) গুল্ফ=৪,
(৯) মণি=১।

"শিল্পভেদে কাল দৈর্ঘ্যের বিচিত্রতা ঘটে, কারণ শিল্প হইতে সমস্ত অঙ্গের মেজাজ বৃদ্ধি পায় তাহাদের মুখ সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না কাজেই শিল্প হইতে সমস্ত অঙ্গের যে দৈর্ঘ্য, তাহা মুখের ৬½ গুণ কারুর শিল্প হইতে শিল্প পর্য্যন্ত মান মুখের দ্বিগুণ উহা হইতে শেষ পর্য্যন্ত=½ ধর দ্বিগুণ হস্ত মুখের আড়াই গুণ"

"শিল্পের পাঁচ বৎসরের পর হইতে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে যৌবনের সোঠবের সঙ্গে পুষ্ট হয়" (শুক্রনীতি ৪র্থ অং ৪র্থ প ১৪৮, ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

যৌবনের সঙ্গে পুরুষের যে সকল স্থানে মাংসের বিস্তৃতির কথা আছে তাহা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আলঙ্কারিকদের ক্ষেত্রে দুটী বিষয় লক্ষ্য করিলে অভিব্যক্তির রূপবর্ণনার সঙ্গে শুক্রনীতির পরিমাণের ঐক্য হয়। শুক্রাচার্য্য ইহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন।

এই সকল শিল্পসম্বন্ধীয় নিয়ম পড়িলে দেখা যাইবে যে প্রস্তরের শিল্পোপযোগী অতি সূক্ষ্মভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়াছেন যদি স্বাভাবিকই হউক বা উদ্ভট রকমেরই হউক একটা সুনির্দ্দিষ্ট হিসাব আছে, শিল্পীকে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করিলাম মাত্র।

ভারতীয় শিল্পের স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু শুক্রনীতির কয়েকটী কথা, অনুধাবনযোগ্য তাহা ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক এবং সেই কয়েকটি সূত্রের উপরই এদেশের শিল্পের গৌরব প্রতিষ্ঠিত যদিও আচার্য্যগণ শিল্পীর হাত পা আইনকানুন দ্বারা একরূপ বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেই কয়েকটি সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে এই সকল খুঁটী খুঁটি বাঁধন সত্ত্বেও তাঁহারা শিল্পের স্বাধীনতা হরণ করেন নাই। শিল্পীকে তাঁহারা কখনই ক্রীতদাসে পরিণত করেন নাই। যেখানে ভাবের প্রকৃত মহিমা—তাহার অনুসন্ধানকারীকে তাঁহারা স্বাধীনতা করিতে বলিয়াছেন, পরের নির্দ্দেশ অতিক্রম যাওয়া যায়—কিন্তু গৌরবের শীর্ষস্থানে উঠিতে হইলে সাধককে একা যাইতে হইবে, সমস্ত বন্ধনের অতীত রাজ্যে একা একা প্রাণের দেবতার সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। শুক্রাচার্য্য লিখিয়াছেন "সকল মূর্ত্তির চরম উৎকর্ষ ধ্যানযোগের সহায়তা করা, সুতরাং শিল্পীকে ধ্যান-নিরত হইতে হইবে" মূর্ত্তির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে শিল্পীকে ধ্যানমগ্না করিতেই হইবে—ইহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই এমন কি সাক্ষাৎভাবে তখনকার ও তাহা পরীক্ষা করিয়া চলিলেও শিল্পী ভ্রান্তপথ হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। (সকল বিষয়ে ভুলাইবে না। শুক্রনীতি—৪র্থ অং, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১৪৭-১৫১ শ্লোক।

শুক্রনীতি স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মনুষ্যের মূর্ত্তি গড়িতে হইবে না। দেবমূর্ত্তিই গড়িতে হইবে। মনুষ্যমূর্ত্তি যদি সুশ্রী এবং সুগঠিত হয়—তাহাকে ছাড়িয়া বিশ্রী ও কুরূপ দেবমূর্ত্তিগঠনও শ্রেয় (৪র্থ অঃ, ৪র্থ পাঃ, ১৪৮-১৪৭ শ্লোক)।

এই শ্লোক কয়টিতেও ভারতীয় শিল্পের চরম কথা বলা হইয়াছে। এরূপ কথা অন্য কোন দেশে কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ইহা ভারতের নিজস্ব কথা।

যদি শিল্পী মনুষ্যের মূর্ত্তি গড়িতে লাগিয়া যান তবে কোটিশতাব্দীই নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থের প্রলোভনে সুরূপ, কুরূপ ধনী ব্যক্তিদের মেয়াল পূর্ণ করিতেই তাঁহার জীবন চলিয়া যাইবে, তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার প্রাণের দেবতাকে অঙ্কন বা গঠন করিতে বসিয়া যান, সে মূর্ত্তি, যাহাই কল্পনা করুন, চতুর্ভুজ বিষ্ণু বা দেবতাই হউন না কেন তাঁহার ধ্যানে তিনি তন্ময় হইবেন। আরাধ্যদেবতার অনুপাতানুযায়ী তাঁহার সমস্ত কলাশিল্প-শক্তি উদ্বোধিত হইবে, তিনি ধ্যানলোকে পৌঁছিয়া তাঁহার কলার চরম সফলতা লাভ করিবেন।

মনুষ্যমূর্ত্তি গড়িতে হইবে না, দেবমূর্ত্তি গড়িতে হইবে।

স্থাপত্যসম্বন্ধে শুক্রনীতির নিয়মগুলি এমনই পরিপূর্ণ এবং খুঁটিনাটি চিত্তাকর্ষক। বঙ্গদেশে প্রাচীন প্রাসাদাদি খুব বেশী নাই। তলবিন্যাস যেরূপ, মণ্ডপ, শুকনাসিকা, ছাদোর্ধ্ব, চন্দ্রশেখর, মালাবান্, পদ্মিনায়, গ্রহকান্ত, কপোতমালা, পুষ্পহাস, শুকনাস, স্বস্তিক, মহাপদ্ম, পদ্মকুট, বিজয় প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণীর মন্দিরের গঠনপ্রণালী, ক্রোম (ক্রমান্বয় বা স্তরের সংখ্যা, উচ্চতা, কত তল প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ কথা নীতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার খড়ো ঘরের মূর্ত্তি বড় প্রাচীন এবং সেজন্য এসম্বন্ধে স্থানান্তরে লেখা হইবে। আমরা অবগত আছি বাঙ্গলার মন্দির ও গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রাচীন একখানি পুঁথি মেদিনীপুর জায়গায় ছিল। যিনি আমাকে এই পুস্তকের সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি এখনও উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বচনের "পূর্ব্বে চাষ, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে ঘেরে, দক্ষিণে ছেড়ে, বাড়ী করো ছেড়ের ভেড়ে"—পূর্ব্বে ইহার অর্থ পূর্ব্বদিকে জলাশয় পল্লীর কুটীরস্থাপত্যের এই নিয়ম পল্লীবাসী সকলেরই মুখে মুখে শোনা যায়।

বাঙ্গলার চিত্রশিল্প বহু প্রাচীন। হরিবংশের চিত্রলেখা বাঙ্গলার অতি যুগের চিত্রকরী। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজার কন্যা উষা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া—প্রেমে পাগল হন। এই স্বপ্নদৃষ্ট তরুণ সুদর্শন রাজকুমারকে তাহা তিনি কিছুতেই ভুলিতে না পারিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন। তাঁহার সখী চিত্রলেখা তখন ভারতীয় তৎকালপ্রসিদ্ধ বাবতীয় তরুণ রাজকুমারের চিত্র অঙ্কন করিয়া কুমারী উষার নিকটে উপস্থিত করেন, তন্মধ্য হইতে উষা অনায়াসেই অনিরুদ্ধকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। হরিবংশের পূর্ব্বে মনুষ্যমূর্ত্তির অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কনের কথা বোধ হয় আর কেহ বলেন নাই। চিত্রলেখার সময়ে এবং তাহার পূর্ব্ব

বাঙ্গলার চিত্রকলার চিত্র।

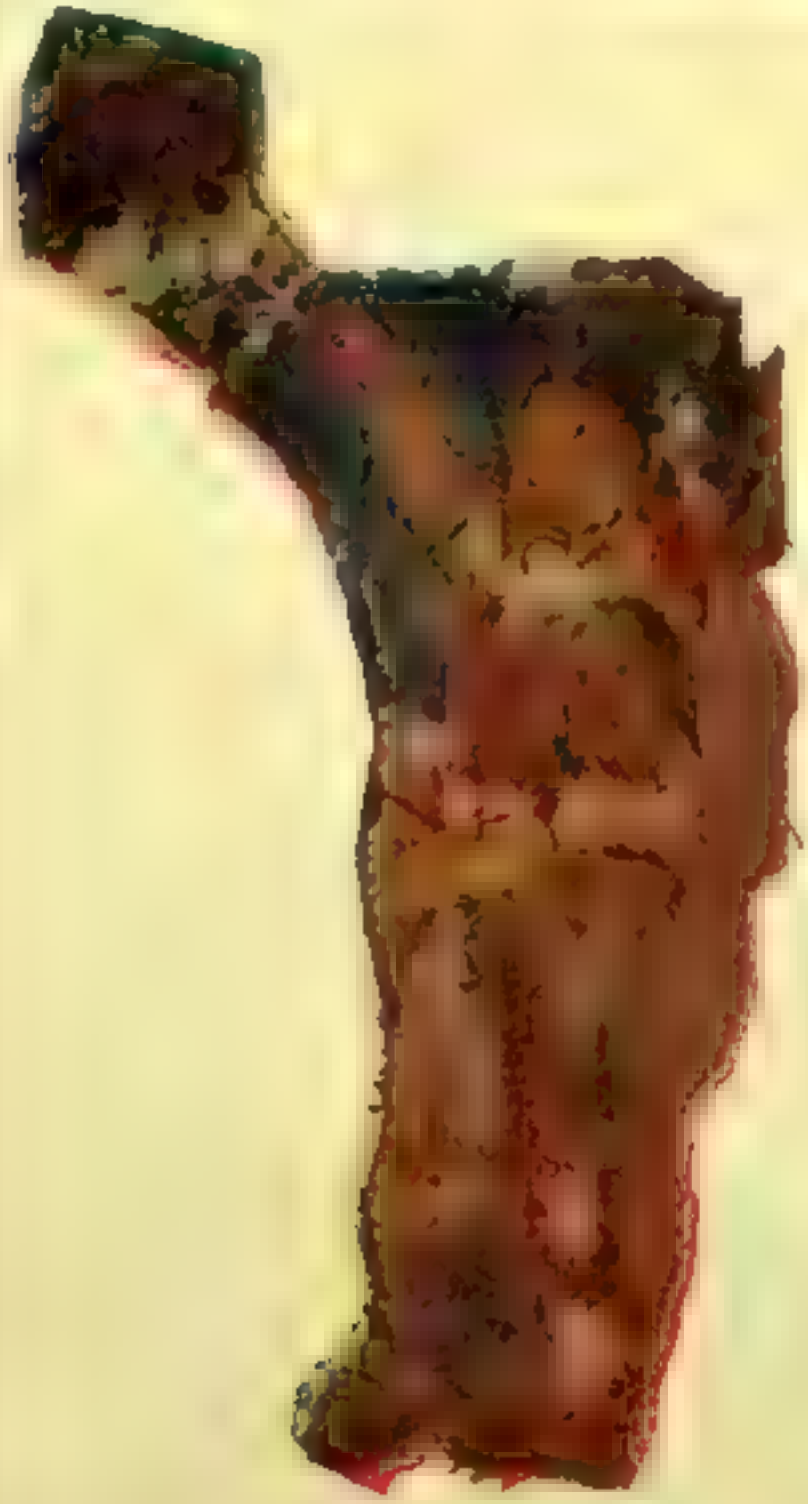

হইতে যে এদেশে চিত্রবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল—এই বিবরণ হইতে তাহা অনুমিত হয়।*

এইরূপ বলবার [illegible] কেন বিদ্বান্ ঘটনাবলীর দেখা হয়া বিবাহ স্থির করিলেন [illegible] পাটনী-কন্যার দৃষ্টি হয় বহু পরে সুন্দরীর চিত্র। [illegible] কবিত্ব আছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমও এই চিত্রদর্শন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সাধারণ পূর্ব্ববাগ বর্ণনায় এই কথা পাওয়া যায়। পূর্ব্বরাগের প্রথমাবস্থার দুইটি চিত্রদর্শন।

"কি ছিত্র বিচিত্র মরি দেখাইল চিত্রেরী প্রাণ ময় কিল সে মূরতি"
"বিনোদ যখন দেখায় চিত্রপট, মোর কলঙ্কিনী সে বড় লম্পট"।

প্রত্যেক মহাকবি পাত্র চিত্রিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে ঐরূপ চিত্রাঙ্কনের দ্বারা নায়কনায়িকার মন আকর্ষণ করার চেষ্টার অনেকের প্রমাণ পাওয়া যায়। তরল বাঙ্ময় সেখানে বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের সেইখানে কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীর চিত্র দেখিয়া শিব তাহার কুমার-লাভ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়াছিলেন—"গাথাসপ্তশতী" নামক প্রাকৃতকাব্যে তাহা দৃষ্ট হয়। "মুকুট রায়" নামক বাঙ্গালার এক ঐতিহাসিক নামে অভিহিত পাশ্চাত্য লেখক দুই হয়, রাধা ও তাহার অন্য পাত্রী খুঁজিতে আসিয়া এক রজকন্যার চিত্রপট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মুকুট রায় সেই ছবির কোনটিই পছন্দ করেন নাই।

চণ্ডীদাসের—

"হাম সে অবলা, সরলা অখলা—ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া বিনোদ দেখাল আনি॥"

প্রভৃতি পদ সকলেই অবগত আছেন।

রাজা ও রাজতুল্য ব্যক্তিদের ছবি যে একসময়ে সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালিদাসের শকুন্তলার রাজা দুষ্মন্তের ছবি অঙ্কন করিবার যে কথা আছে তাহাতে দেখা যায়, এ বিষয়ে তাঁহার পটুতা কত বেশী ছিল। চিত্রে সমবেত ঘটনাবলীর, দূরত্বের পরিচয় রাখা এ সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরচরিতে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ ও পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির চিত্রিত সমুদয় কথা লক্ষ্মণ সীতাকে দেখাইতেছিলেন। সেই অংশটি ভবভূতির পাঠকদের সুপরিচিত। গুপ্ত সম্রাটগণ এমন কি কণিষ্ক প্রভৃতি শক রাজাদের মূর্ত্তি তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত পাওয়া যাইতেছে। মহেঞ্জোদড়োর মূর্ত্তিগুলির আবিষ্কারের পর উগ্রপন্থা গ্রীকভক্তগণ এখন আর বলিবেন না যে হিন্দুরা গ্রীস হইতে মূর্ত্তি গড়িবার

* It is a notable fact that the first Indian painter mentioned by name was a woman Chitralekha was the heroine of an incident in the *Dwarawati Jina*, a work of the Epic age and probably dating from many centuries before the Christian era.

—P. Brown's Indian Paintings, p. 11.

যা গঠন করিবার কৌশলটি নির্ধারণ করিত। কিন্তু ভারতীয় কোন শিল্পাচার্যের কোন কোন পণ্ডিত এই মত প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। কারণ তাহাদের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান কালে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে—তাহাদের চেষ্টা আর বাধা তুলিতে পারিবে না। আমরা এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

যৌগী চক্রগুপ্তের রাজধানীর দুর্বলতা দূর করিবার জন্য যাহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাদের দৌর্ব্বল্য ও সাধারণত, সমস্ত পুরাতত্ত্বের উৎকর্ষের আলোচনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে একটা বাহির হইতে একটা নূতন ভাব আসে নাই। ইহাদের পূর্ব্বে বহু সাধনা হইয়া গেলে তবেই ঐরূপ সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু সেই সাধনা যে আদি প্রত্নতত্ত্বের কোন চিহ্ন আবিষ্কার নাই, সুতরাং এই উৎকর্ষ স্থানীয় ও ভারতবাসী গ্রেকোরার শিল্পের নিকট ঋণী। কিন্তু স্মিথ সাহেব বলেন উত্তর ভারতে উপর্যুপরি মুসলিম আক্রমণে ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহাতে ভারতের রাষ্ট্রিয় দৌর্ব্বল্যের ছাপ দেখে দেশের স্বভাব, ও ভাস্কর্য্যের উপর এমন স্পষ্ট যে উহা বিদেশাগত বলিয়া মনে হয় না। আবিষ্কারের বিলম্বে কোনই নিশ্চয় করিবার নাই বলিয়া ভাবেল্‌ সাহেব শিল্পী মাত্রই মহাপণ্ডিত যাহাতে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রমাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা তাঁহাদের সে ভুল চিরতরে ঘুচাইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেঞ্জোদারো, চীন-পর্য্যটকগণের মত

সম্প্রতি মহেঞ্জোদারোর (একটীর অর্থ, মৃতের স্তূপ ৭২০ বিঘা জমির নিম্নে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে গ্রীকরা হিন্দুদিগকে চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিখাইয়াছে, এই পরিকল্পনা কেমন উড়িয়া যাইবে। এই সকল নিদর্শন বহু যুগ ব্যাপক, ইহার স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চিহ্ন উহাতে আছে। খৃষ্ট জন্মিবার ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বের যে সকল বাড়ী ঘর ও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বা যাইতেছে তাহা শুধু সময় হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, উহা ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের আদিরূপ দেখাইতেছে। এইগুলি ভারতীয় শিল্পের মূলক, এক পরিবার ভুক্ত। ইহাতে যে সকল অক্ষর লেখা হইয়াছে তাহার সহিত সাঁচীস্থিত লিপির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, ইহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এখন ইহা স্পষ্ট বুঝিতে কাহারও বাকী নাই যে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা শুধু কবি কল্পনা বলিয়া মনে হইবে না,—ইজিপ্ট ও ব্যাবিলনের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী বলা চলিবে না। কিন্তু আর্য্যগণ যদিও এই শিল্পের অনেক উন্নতি করিয়াছেন, আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা

করিয়াছি—এই শিল্প আর্য্যদের নহে—ইহা ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার শিল্প অপেক্ষাও শিল্পনিপুণের শিল্প বহু পরবর্তীন, তাহা আদিম মানবের শিল্পে হাতে খড়ি। মহেঞ্জোদারো সিন্ধু দেশের লারকণা পরগণে অবস্থিত এবং হরপ্পা পাঞ্জাবের মন্টগোমারি জেলার অন্তর্গত।

খেজুরাহ, ভুবনেশ্বর, মথুরা এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে হিন্দুদের যে নানারূপ লীলায়িত মূর্ত্তী আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহার আদি খুঁজিতে আমাদের আর হোরনস্য যাইতে হইবে না স্যার জন মার্শেল তিনখানি মস্ত বড় পুস্তকে মহেঞ্জোদারোর প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গলা দেশের কার্লেনা ও তাঁহার পশুর সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর পশুগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে এই স্থানের একটি লোকের আকৃতি পর পৃষ্ঠায় দিতেছি, আমরা বাঁকুড়ার কাছে কোদিত প্রাচীন একটি মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহা অনেকটা এই রকমের।

মার্শেল লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বেই মহেঞ্জোদারোর শিল্পীরা অশ্বত্থ অঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। এখানে ঐ দেশে প্রাপ্ত গুরুর মূর্ত্তির একটি নমুনা দিতেছি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই অনার্য্যলোকেরা ৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বে শিবপূজা করিত এবং শুধু লিঙ্গ নহে, ধ্যানস্থ শিব মূর্ত্তিও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া যাইতেছে শিব কোথা হইতে আসিলেন, কেহ তাহা জানে না দক্ষ তাঁহাকে অপমানকর কথা বলিয়াছিলেন, তিনি দেবগণের গতীর বাহিরে ছিলেন, অনার্য্য নগ্নী চুল্লী তাঁহার সহচর ছিল, এই জাতের পৌরাণিক বর্ণনা আমরা জানিতাম, তাঁহার আদি খুঁজিতে হইত আর্য্যদিগকে অনার্য্য নিষেবিত কোন পার্ব্বত্য দেশে যাইতে হইবে। এবার তাঁহার গোড়ার খবরটা কতকটা পাওয়া গেল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, মোটা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বাঙ্গালীর কতকটা হাত ছিল। মগধ বাঙ্গলার পণ্ডিতেরা। গুপ্তদের সময়কার যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি আছে সেগুলি মগধ শিল্পশালার। তাঁহাদের উন্নত নাসিকা, কবাট বক্ষ এবং বাহুর, সুগঠিত শ্রী বর্দ্ধিষ্ণু আর্য্যমূর্ত্তি ভাস্কর্য্য-মহিমার চরম আদর্শ আশ্চর্য্যের বিষয় সেই আর্য্য বুদ্ধের অনুপম মুখশ্রী বাঙ্গালীরা এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের দেবমূর্ত্তি হইতে ক্রমশঃ সেই দেব মানব, নরনারায়ণের সন্ধি-সূচক আধ্যাত্মিকের মহিমা 'ইহলৌকিক হইতেছে, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও আমাদের দেশের কুম্ভকার ও সূত্রধরগণ বিবাহ নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া গুপ্তযুগের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মুখ অনুকরণ করিত আমরা কয়েকটি নমুনা দেখাইতেছি। ফরিদপুরের নাবিয়া গ্রামের কুমরের হাতের কৃষ্ণমূর্ত্তির মুখ ও বোধিসত্ত্বদের মুখ তুলনা যোগ্য।

এই জাতের আধ্যাত্মিকত্বের চূড়ান্ত গরিমা দেখাইতেছে, কাশীর চিলতাগেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন একখানি বুদ্ধমূর্ত্তি, উহা আদি গুপ্তযুগের, উহাকে পাণ্ডারা "কটাশঙ্কর" নামে অভিহিত করে। এই জটাশঙ্করের মত সুগঠিত, বৃষস্কন্ধ, সিংহকটি, ভাগবত মুখ মহিমা

বিশিষ্ট ধ্যানগৌরবের অভ্যুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি আমার চক্ষে আর পড়ে নাই। ইহা গুপ্তযুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহায়েন গুপ্তযুগের আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। বিনয় পিটকের বিশুদ্ধ পাঠ সংগ্রহের জন্য তিনি ৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ৪১৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নানাস্থান পর্য্যটন করেন। তিনি তিন বৎসর পাটলীপুত্রে ও দুই বৎসর তমলুকে ছিলেন। তাঁহার আর্য্যাবর্ত্ত-ভ্রমণ (৪০১—৪১০ খৃঃ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই সম্পাদিত হইয়াছিল। ফাহায়েন মগধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমাদের মহাভারতের গিরিব্রজপুরের কথা স্মরণ হয়। প্রজারা নিশ্চিন্ত ও সুখী, অপরাধের দণ্ড প্রায়ই অর্থদণ্ডের দ্বারা হইত। শুধু যেখানে কোন লোক দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহী হইয়া থাকিত কিংবা দস্যুতাকে তাহার নিত্যনৈমিত্তিক বৃত্তিতে পরিণত করিত, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হইত, কিন্তু এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা অতি অল্পই হইত। নগরে বড় বড় অন্নসত্র ও পশু চিকিৎসালয় ছিল। তখনও অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইত, ফাহায়েন উহা দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়াছেন, "এগুলি কোন স্বর্গীয় স্থপতির কাজ—এরূপ নির্ম্মাণশক্তি মানুষের হইতে পারে না।" বিচিত্র পোড়া-মণ্ডিত হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ দেখিয়া চীন পর্য্যটক বিস্মিত হইয়াছিলেন। স্মিথসাহেব, লিখিয়াছেন, "সে সময়ের কোন বড় হর্ম্ম্য বা এমারত এখন নাই, এই স্থান বহু পূর্ব্ব হইতে মুসলমানেরা অধিকার করিয়া ক্রমাগত হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন। (অক্সফোর্ড প্রকাশিত হিন্দুভারত, ১১০ পৃঃ, ১৯২১)। ফাহায়েন লিখিয়াছেন সমস্ত দেশে কেহ মদ্য মাংস পিয়াজ বা রশুন খায় না, তাহারা কোন জীবিত প্রাণী হত্যা করে না।" অশোক জীবহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন, অথচ দেশের অবস্থা বিবেচনায় জীবহত্যার জন্য দরজা খুলিয়া না রাখিয়া পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অসাম্রাজ্য জীবপ্রীতির ফল বৌদ্ধাধিকার-বিলোপের পর ফলিয়াছিল। ফাহায়েন সাধারণতঃ যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বমেধ করিয়াছিলেন।

ফাহায়েন।

অশোকের সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ যেখানে বিদেশী পর্য্যটকের বিস্ময় জন্মাইয়া আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহা বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণে কুমরাতার গ্রামে অবস্থিত ছিল। এখনও তাহা কেহ খুঁড়িয়া দেখে নাই।

ফাহায়েনের বর্ণিত গুপ্তরাজ্যের সুশাসন আদর্শ স্থানীয়। উহা স্পষ্ট দেখাইতেছে মৌর্য্য-যুগের কৌটিল্য-প্রবর্ত্তিত গুপ্তচর-প্রথার দৌরাত্ম্য তখন আর ছিল না, তথাপি আলবিরুনী লিখিয়াছেন—গুপ্তগণ খুব ক্ষমতাপন্ন ও দুষ্ট ছিলেন। জনমত তখনই একরূপ হয় না।

এই গুপ্তযুগে কালিদাসের অতুলনীয় শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য বিরচিত হয়। ঋতুসংহার, সর্ব্বসম্ভবিক্রমে তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক কিছু পূর্ব্বের রচনা। ৪৭৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট জন্মগ্রহণ করেন।

বরাহমিহির (৫০৫ খৃঃ—৫৩৭) ও ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খৃঃ) প্রভৃতি এই গুপ্তযুগে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং গুপ্তযুগকে সংস্কৃত সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদির স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। গুপ্ত সম্রাটেরা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হইলেও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না, স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধুর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, একথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

সাহিত্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজন্তাগুহা

গুপ্তযুগে মগধের সঙ্গে ভারতের বাহিরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। ৩৫৭ হইতে ৩৭১ খৃঃ অব্দের মধ্যে বাণিজ্যাদি বিষয় লইয়া অন্ততঃ দশ বার চীন রাজদূতেরা ভারতবর্ষে গমনাগমন করিয়াছিলেন। ফাহিয়েন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু চীন পরিব্রাজক তীর্থ দর্শন ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন এবং আর্য্যাবর্তবাসী বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮৩ খৃঃ অব্দে কুমারজীবের চীনগমন এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানের বৌদ্ধগণের প্রথম প্রচেষ্টা। ৪৩১ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্ম্মা জাবা দ্বীপে যাইয়া তৎদেশবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্মে প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপূর্ব্বে তথায় হিন্দু পরিব্রাজকগণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। অজন্তা চিত্রে আমরা দেখিতে পাই পারস্য রাজদূত সম্রাট্ পুলকেশীর নিকট দূত পাঠাইতেছেন। রোমের রাজার নিকট ২২৬, ২৩১, ৪৬১ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ তিনবার মগধের রাজদরবার হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে।

বিদেশের সহিত সম্বন্ধ।

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, হিন্দু মুদ্রায় দিনারের উল্লেখ দৃষ্টে এই কথা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই দিনার শব্দ হিন্দুরা রোমানগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শব্দটি লাটিন "দিনারিয়স" শব্দের রূপান্তর। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে দিনার শব্দের উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু আমাদের বলিবার উপায় নাই যে রোমানেরা বা গ্রীকগণ হিন্দুদের কোন ঋণ বহন করে, সেই ঋণ তাঁহারা সংগোপন করিতে চেষ্টা করেন। অবশ্য য়ুরোপীয়েরা হেলেনার প্রভাব আমাদের দেবমন্দিরের নৈবেদ্যের মধ্যেও আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি তাঁহাদের "পেরোপুটিক" শব্দ নিশ্চিতরূপে আমাদের পেরাপুত শব্দ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু একথা তাহারা মানিবেন কেন? দিনার শব্দ আমরা মহাভারতে পাইতেছি, ইহার উত্তরে হয়ত তাঁহারা বলিবেন, মহাভারতে ঐ শব্দ

নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই "প্রক্ষিপ্ত" শব্দটা যত কিছু অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অশ্লীল তাহা গোপন করিয়া লওয়া যায়, প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান ব্যাপারে এই শব্দটি পরমগুরু স্থানীয়।

এই যুগে গ্রীকগণ হইতে যে হিন্দুরা জ্যোতির্বিদ্যার কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয়—"সাম্বুদ্রিকা", মনুষ্য পরিচয় বিদ্যা এই বিদ্যা আলিয়াছে এই জন্য ইহা সাম্বুদ্রিকা লৌকিক প্রসঙ্গে যাহা শোনা যায় তাহাতেও ফলিত জ্যোতিষ যে এদেশের নয় তাহার প্রমাণ আছে। বরাহমিহির অনেকগুলি গ্রীক শব্দ তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় এতাবধি পাওয়া যায় নাই। 'পনফর,' 'আপোক্লিম,' 'খেকান,' 'মুদ,' 'ইত্থশা' প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতিষের কয়েকটি শব্দ বাস্তবিক। কিন্তু তাহারাও হিন্দুদের নিকট গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনেক কথা লইয়াছেন, তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীকগণের মধ্যে যেসব ছাত্র কতকটা হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রীক জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের 'ধনিষ্ঠাদি শকাব্দ পরিচিত' নামক জ্যোতিষের গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন —"যবনপুরাদ্রে খেচরাঃ স্বস্বনামযবোধায় গোলমেবাগুস্বর্কি।" রাজগণিতের অনেক কথা গ্রীকেরা আলেকজান্দ্রিয়ার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেকালে হিন্দু পণ্ডিতেরা কত উদার ছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনার এই টীকা হইতে বুঝা যায় —

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈবদিদ্বিজঃ॥"

যেসব গণিত আর্য্য হিন্দুদিগেরই উদ্ভাবিত। যজ্ঞকুণ্ডের আকার লইয়াই এই বিদ্যার প্রথম অনুশীলন হয়। হঠাৎ কোন যাজ্ঞিক খেয়াল হইল যে যজ্ঞকুণ্ডের আয়তন ঠিক থাকিবে কিন্তু উহা বৃত্তাকার না অষ্টকোণ হইবে, সুতরাং যজ্ঞকর্ত্তা ঋত্বিককে চতুষ্কোণ কুণ্ডের সমান করিয়া বৃত্তাকার, অষ্টকোণ বা অন্য কোন প্রকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবার সমস্যা পূরণ করিতে হইল এইভাবে বৃত্ত = চতুষ্কোণ, বা চতুষ্কোণ = অষ্টকোণ, জ্যামিতির এই সকল সূত্র লইয়া ভাবিত হইতে হইয়াছিল। বেদ গণিতের জন্মকথা এই প্রকারের। যে সকল দেশের যজ্ঞের বালাই নাই সে সকল দেশে এই সব সমস্যার উদয় হয় নাই। আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। সাতটি ঋষির নামে সাতটি গ্রহ আছে। ঋষি শব্দ হিন্দুস্থানীরা "ঋখি" এইভাবে উচ্চারণ করে (ষ = খ)। এখন আরব গ্রন্থকারেরা হিন্দু জ্যোতিষ অনুবাদ করার সময় "ঋখি" শব্দ লইয়া ভাবিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা অভিধান খুলিয়া দেখিলেন ঋক্ষ শব্দের অর্থ ভল্লুক। সুতরাং তাহাদের তর্জ্জমায় সপ্তর্ষি সপ্তভল্লুকে পরিণত হইল। এই সপ্ত ভল্লুক হইতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ Seven bears আমদানী করিলেন। আমাদের বক্তব্য এই, ভারতবর্ষ তখন নিজ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া প্রবাহহীন হইয়া পড়ে নাই, তখন তাহার গতিশীলতা অবাধ ছিল; সমস্ত জগতের

গ্রীকদিগের নিকট ঋণ।

গ্রীকদিগের উপরে প্রভাব।

সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ছিল এবং হিন্দুরা জাবন্ত অভ্যাসের ন্যায় চারিদিক্ হইতে যাহা কিছু ভাল তাহা আত্মসাৎ করিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরের উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু নিজকে পরাভূতকরে ভাসাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহাদের অপূর্ব্ব নাটকগুলি সর্ব্বদা অভিনীত হইত। কিন্তু অনেক সময় প্রস্তুত প্রাঙ্গনে পট পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক দৃশ্যাবলী দেখাইবার অবকাশে যে খানিকটা সময়ের জন্য দর্শকদিগকে অবসর দেওয়া হইত, সেই সময়ে কোন অংশ বিশেষ অভিনীত হওয়ার পর আড়াল দেওয়ার উপযোগী ভাল কোন উপায় ছিল না, হয়ত বা সেই অবকাশে গুপ্ত প্রকোষ্ঠে বসিয়া অভিনেতারা বেশাদি বদলাইতেন। উক্ত রূপ কোন কারণ বশত, প্রেক্ষাগৃহের নিকট তাঁহারা "যবনিকা" পাইয়া থাকিবেন। কথাটির মধ্যেই তার স্বাক্ষর আছে। গ্রীক নাটকের আধুনিক সংস্করণ যাত্রায়ও "যবনিকার" কোন স্থান নাই, সুতরাং ইহা দেশজ নয় বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই গুপ্ত যুগে নানাদিকেই ভারতের অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে আর্য্যাবর্ত্ত ছিল সকল দেশের সেরা, এখানে কতই না উত্তম চারুশিল্পের নিদর্শন ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই তবে ঘনিষ্ঠের দুর্গম গিরিগুহায় অজন্তার যে চিত্রগুলি বিদ্যমান, কোন ক্রমে তাহার বিনাশ হয় নাই এই গুহ চিত্রগুলির মধ্যে ১৬ নং এবং ১৭ নং চিত্র অনুলেখ্য,—বিষয়ের সিংহল অভিযান -চিত্রগুলির মধ্যমণি ইহাদের মধ্যে শেষ চিত্রগুলি পঞ্চম শতাব্দীর ভারতীয় চিত্রকলার এইগুলি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। খুব সম্ভব ইহা হইতে যদি শ্রেষ্ঠ কিছু কল্পনা করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই আর্য্যাবর্ত্তে স্থান পাইয়াছে এবং নালন্দা বিহারের শিল্প তাহাদের অন্যতম ছিল। বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তি, নয়নাভী অঙ্গের নানারূপ লাস্য ও মনমোহন ভঙ্গিমা, ফুললতার বিচিত্র সৌষ্ঠব এ সমস্ত অজন্তা চিত্রগুলির উপর এক স্বপ্নকুহক বিস্তার করিয়াছে। চিত্রকরদের সংযম অসাধারণ ছিল তাহারা এক একটি রেখার যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, বহু রেখার জটিলতা উপস্থিত করিয়াও এখনকার চিত্রকর সেই সাধনার পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবেন না। গৃহস্থ রমণী বাহির হইয়াছেন ভিক্ষুক ভিক্ষা দিতে—তাঁহারা ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গেলেন, সেই মানসসরোবরের শ্বেত কমলের মত প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রমণী ও বালক নিশ্চল ভাবে চাহিয়া রহিলেন, কি ভিক্ষা আসিয়াছেন ভুলিয়া গিয়াছেন শিল্পর হাত হইতে ভিক্ষার ঝুলি পড়িয়া গিয়াছে। মা ও ছেলের দৃষ্টির ইঙ্গিতে পাশ্ব অধ্যায় বাক্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে কোন কোন চিত্রসমালোচক বলিয়া থাকেন রেখা দ্বারা দূরত্বের ভাব ফুটান অতি অল্প দিনের আবিষ্কার। অজন্তার চিত্রে পালঙ্ক সমাসীন রাজার পার্শ্ববর্ত্তী পরিচারকদের এরূপ ভাবে আঁকা হইয়াছে, যাহাতে চিত্রকর যে রেখা সম্পাতে দূরত্বের ভাব বিশেষভাবে বুঝাইতে পারিতেন তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে।*

অজন্তার চিত্রসম্পদ।

* কোন কোন চিত্রসমালোচক বলেন অজন্তা এবং বাঘগুহা প্রভৃতি বিহারের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি পূর্ব্ব ও পশ্চিমা-বিভাগের অন্যতম। তাহা প্রাচীন ভারতের চিত্রাঙ্কনের অনুযায়ী নহে। প্রাচীনকালে অনেক স্থলেই প্রাচীর ও ফলকাদি সাজাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে এই রীতি বিদ্যমান আছে।

প্রত্যেক রেখা অঙ্কনে অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে, কোথাও দ্বিধা বা ক্লান্তির প্রমাণ নাই। রংএর খেলার বাহুল্যে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যায় অথচ কোন স্থানে অতিরাগ বা বাহুল্য নাই।

আজন্তা জেলায় ঘেরুয়ার পাথরের উপর গুপ্তযুগের যে শিল্প পরিচয় আছে, তাহাই বোধ হয় প্রস্তর কারুকার্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ধাতুবস্তুতে এই সময়ে খুব উৎকৃষ্ট হইত। দিল্লীতে সমুদ্রগুপ্তের ঢালা পেতলের যে স্তম্ভ আছে তাহা এযুগের শিল্পকুশলতার বিস্ময়। তাহার উপর ঢালাই করা কাজ ঐ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। নালন্দাতে ৮০ ফিট উচ্চ তাম্রের এক বুদ্ধমূর্তি বহু শতাব্দীর নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল এবং সুপ্রতাননাথের প্রায় ৭½ ফিট উচ্চ একটি অতি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি গুপ্তযুগে নির্মিত হইয়াছিল। তাহা এখন বার্মিংহাম্ চিত্রশালায় রক্ষিত। গুপ্তযুগের একটি পাথরের প্রাচীরগুলি কিন্তোট সিংহ তাঁহার প্রাচীন হিন্দুযুগের

[illegible] মেয়েরা এখনও পূজার সময়ে আলপনা চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন, বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষুদের হাতের কাজ এই শ্রেণীর। যদিও অজন্তার চিত্রাঙ্কনের [illegible] হইয়াছে, তথাপি প্রাচীন চিত্রের রীতি হিসাবে ঐ সকল চিত্র আদর্শ চিত্র বটে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর কঠোর সংযম ও ধর্মবোধের সরলতা ঐ সকল চিত্রকে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু চিত্র বলিতে প্রাচীনেরা যাহা বুঝিতেন তাহার অনেকটাই বাহুল্য ও বাহ্যিকতা লইয়া। তাহাদের পীতাম্বিত মাধুরী, প্রেমাবেশের লাস্য ও লীলা। বৌদ্ধভিক্ষুর হাতে তাহা আশা করা যায় না। বৌদ্ধভিক্ষু অনাসক্ত [illegible] কাহিনী তাহার [illegible] নরনারীর প্রণয়লীলার [illegible] চিত্রকরকে [illegible] প্রেরণা দিয়া থাকে, ভিক্ষু সেই প্রেরণা [illegible] পাইবেন। নরনারীর বিলাস বাসনে যে রূপের সন্ধান মেলে, চিত্রকৌশলে চিত্রিত ভিক্ষু তাহা আনেন না। সুতরাং তাঁহার চিত্র সম্ভোগের অনাবশ্যক [illegible] তাহাতে লৌকিক প্রেমের বাসনা নাই।

[illegible] বলেন "[illegible] [illegible] [illegible] [

ইতিহাসে দিয়াছেন—তাহাতে ফুললতা ও মনুষ্যমূর্তির নানা বিচিত্র ভঙ্গী কল্পিত হইয়াছে, এই গুপ্তযুগের যাহা কিছু সাহিত্য বিজ্ঞান ও চিত্র সম্পদ্ তাহা বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। আমরা আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন সভ্যতার যতটা উত্তরাধিকারী, অন্য কোন প্রদেশবাসী ততটা হয় নাই। মৌর্য্য ও গুপ্তযুগের সভ্যতা ও উচ্চচিন্তার ধারা সমস্তই বাঙ্গলায় কি পরিমাণে আসিয়াছে তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইব। যাহা কিছু মগধে ছিল তাহা গৌড়ে আসিয়াছে, গৌড়ের ধ্বংসের পর তাহা বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—যেমন করিয়া কোন বিস্ময়বস্তু ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহা হইতে রত্ন ও মুক্তা নিকটবর্ত্তী স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। গুপ্তদের সময় হইতেই মগধ গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" নামক প্রাচীন পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই গুপ্তরাজাদের মগধ সম্পদ্ "গৌড় মাগধ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। গৌড়তন্ত্রের একটি অঙ্গ ছিল মগধ। পরবর্ত্তী গুপ্ত রাজারা বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গৌড়রাষ্ট্র স্বাধীন ভাবে পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন।

মুখ ও মিশ্রিত মনুষ্য দেখাতে একজন, কিন্তু চিত্রবিৎ এই দুয়ের প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া বিশ্লিষ্টক মিশ্রিত এবং মৃতকে মৃত বলিয়া বুঝাইবেন। একটি পদের পরে বিশ্লিষ্টের বেশ আর প্রহার পরে মৃত বুঝাইয়া বিশিষ্টরা বুঝাইবেন ("মৃতশ্চ ভেদমাত্রেণ মৃত ইত্যবগচ্ছতি মিশ্রোপবিষ্টাদপি যঃ কারাদি স চিত্রবিৎ।"), মিশ্রিতের চিত্র "সমান ইব" প্রভৃতিরূপ হইবে। নায়ক-নায়িকার চিত্রকেই অনেকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। এই কলাদর্শনের চিত্র আমাদের হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। বহুপরে কথন ও একজন পাশ্চাত্যের বেহুয়াহ ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যেসকল নায়ক নায়িকার চিত্র দেখিয়াছেন তাহা আলিঙ্গনের উপরোক্তির বিলুপ্ত চিত্রবীথির কথা মনে জাগাইয়া দেয়। এই রীতি ভারত পারস্যে বিস্তৃতের আর প্রতিফলন করিয়া দেখাইয়াছিল। তখন বাৎস্যায়ন যুগের (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) সেই রস-সেবা একান্ত দুর্লভ ও দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। বাৎস্যায়ন চিত্রশিল্পকে কলাশিল্পগুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন ("যথা প্রধানঃ প্রথমো নরাণাং তথা কলাসাবিহ চিত্রকর্ম প্রধানঃ। যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশস্তথা কলানামিহ চিত্রকরঃ।")।

যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রদেশ হইতে দূরীভূত হইল এবং হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ ক্রমশ পরিমাণে পুনরায় গ্রহণ করা হইল, তখন প্রাচীন যুগলের চিত্রগুলি আর তেমন রস ও সাধনা-রেখা-সমৃদ্ধ হইতে পারিল না। কতকগুলি উমা-মহেশ্বরের মূর্ত্তিতে যে চেষ্টা আরব হইয়াছিল, কিন্তু অধিক সময় রসাভিসারের সঙ্গে এই ভাবটি সম্যক্ ঐক্যসূত্র হইয়াছিল, বিদেশীদের আক্রমণে এদেশের রাজধর্ম্ম ও চিত্রবিদ্যা বিনষ্ট হওয়াতে সেই নায়ক নায়িকার প্রেমলীলা আর কলাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারিল না (১৩৩৯ বাং চৈত্র মাসের প্রবাসীতে গুরুদাস বাবু মহাশয়ের ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। চিত্রকলা সম্বন্ধে বাৎস্যায়নের নিম্নলিখিত শ্লোক অনুধাবন —

"যেষাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তয়ন্তি চ নিত্যদা।
স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বাপি বর্ণাঢ্যাস্তেষাং চিত্রং ন রঞ্জয়েৎ।"

['আচার্য্যগণ যেসব প্রশংসা করেন, রমণীগণ অলঙ্কারের পক্ষপাতিনী, ইহার যাহারা বর্ণের চাকচক্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়।' বাৎস্যায়নের মতে চিত্রবিদ্যার ছয়টি অঙ্গ—রূপভেদ, প্রমাণ (গঠন ও আকৃতির পরিমাণ শুদ্ধি), ভাব, লাবণ্য, যোজনা, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ।]

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালসাম্রাজ্য, মৎস্যন্যায়

"গোপীপাল, ভোপীপাল, মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

—চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য।

বৃহত্তর বাঙ্গলা ছাড়িয়া এবার আমরা খাস বাঙ্গলা মুলুকে আসিয়া পড়িব। পাল ও সেন-যুগ খাস বাঙ্গলার। মৌর্য ও গুপ্তযুগের যাহা কিছু নিজস্ব তাহা শেষের দুইযুগে বাঙ্গলার নিজস্ব হইল।

অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে আর্য্যাবর্ত্ত কোন প্রধান সম্রাট্ বা একচ্ছত্র নরপতির রাজদণ্ডের আশ্রয় হয় নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিপুল মোগল সাম্রাজ্যের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত তখন শতধা বিভক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল

বঙ্গদেশের অবস্থা কোন সমালোচক তখন মৎস্যন্যায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বড় মৎস্য যেরূপ ছোট মৎস্যকে গিলিয়া খায়, বঙ্গদেশে সেইরূপ ছোট ছোট জমিদারগণ ছোট ছোট রাজার গ্রাসে যাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র অরাজকতা, নিপীড়িত প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে কোন বলবান্ ভুজ প্রসারিত হয় নাই, তাহারা চক্ষে "কাঞ্চনবৃক্ষ" দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িল। [সংস্কৃত কবিদের কাঞ্চনবৃক্ষ বঙ্গের প্রাদেশিক নাম "সরষেফুল"]

তারানাথের বর্ণনা:

বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ এই সময়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্যদেশের আর পাঁচটি প্রদেশের বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক বৈশ্য পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে আপন আপন প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না।"

তারানাথ আরও লিখিয়াছেন "গৌড়দেশে এক নৃপতি ছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্নী পরবর্ত্তী নির্ব্বাচিত রাজাকে গোপনে নিধন করিতেন। এইভাবে তিনি বহু রাজার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন।" কথাটা উপন্যাসের মত শোনায় তবে ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, বিধবা রাণীর সহিত মন্ত্রিবর্গের ষড়যন্ত্র ছিল। তাঁহারা কোন স্থায়ী রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া

স্বীয় স্বীয় প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যিনিই সিংহাসনের দাবী করিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা বাধা দিতেন না। কিন্তু গোপনে রাণী তাঁহাকে রাত্রিকালে বধ করিতেন। সুতরাং রাজা হওয়া একটা বিভীষিকায় দাঁড়াইয়াছিল। যাঁহারা রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, উপর্য্যুপরি তাঁহাদের কয়েকজন এইভাবে নিহত হওয়ার পর অনেকদিন রাজা হইবার জন্য কেহ আর অগ্রসর হন নাই। এই সময় "বাক" নামক এক জননায়ক কতকদিনের জন্য রাজা হইয়াছিলেন, আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে—ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রাজলক্ষ্মী কাহার ভুজ অবলম্বন করিবেন? রাজকুলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবার তিনি বিশিষ্ট এবং যোগ্য ভুজাশ্রয় করিতে উদ্যত হইলেন, সম্মিলিত প্রজারা অরাজকতা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য প্রজারা তাঁহারই ললাটে রাজচিহ্নলাঞ্ছন লিখিয়া দিল এবং কণ্ঠে বিজয়মালা দোলাইয়া দিল। এই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি গোপাল।

রাজলক্ষ্মীর রাজকুলত্যাগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোপাল ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ

গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণুকে "অবনীপাল কুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বংশধরের বীজপুরুষ" বলা হইয়াছে। পাল-বংশীয় নৃপতিগণের তিনি বীজপুরুষ ছিলেন, তিনি "সর্ব্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ" ছিলেন বেদ, বেদান্ত, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যায় যিনি কৃতী হইতেন, তাঁহাকেই "সর্ব্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ" বলা হইত। দয়িতবিষ্ণু সুধী সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের আদি নিবাস ছিল—উত্তরবঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি।

দয়িতবিষ্ণু।

এই পণ্ডিত-বরের পুত্র "বপ্যট" ছিলেন যোদ্ধা। সেই ঘোর অরাজকতাপূর্ণ চৌরদস্যু-অধ্যুষিত বঙ্গদেশে তখন পণ্ডিতের পুত্রকেও শাস্ত্র ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিতে হইয়াছিল। তাম্রলেখে তাঁহার বপ্যট অরাতিনিধনকারী ও কর্ম্মকুশল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—"তাঁহার বিপুল কীর্ত্তিকলাপ সমাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিল।" এতদ্বারা অনুমিত হয় 'বপ্যট' সৈন্যের শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যবসায় ছাড়িয়া

বপ্যট।

বীরত্ব দ্বারা কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি নানাস্থানে "জয়স্তম্ভ" ও "দুর্গ" প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ধরাতলে সেই কীর্তি ও বীরত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন " সুতরাং বপ্যট হইতেই এই বংশ বিক্রমশালী ও প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

গোপাল বপ্যটের পুত্র অনুমান ৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। লামা তারানাথের মতে গোপাল ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব ৭৮৫ খৃঃ অব্দে শেষ হয় ভিন্সেন্ট স্মিথ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। রাখালদাসবাবুর মতে গোপাল ৭৫০-৭৯০ অব্দের কোন সময়ে রাজা হইয়া ৮১৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। রাজা হইবার পূর্বেই শাসনভার অনেকটা তাঁহার হাতে ছিল, এইজন্য তারানাথ তাঁহার ৪৫ বৎসরের রাজত্বের কথা বলিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের মাৎস্য অরাজকতার সময় বহু দস্যু ও অত্যাচারীর গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, প্রজাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, এবং যেখানে প্রবলের অত্যাচার ও দুর্বলের ক্রন্দন হইত, সেই স্থানেই অভয় শঙ্খ উচ্চারণ করিয়া দাঁড়াইতেন গৌড়মণ্ডলে তাঁহার সমকক্ষ বীর আর কেহ ছিলেন না, নতুবা তিনি একজন সামান্য ভূস্বামীর পুত্র, এবং এক পণ্ডিতের পৌত্র ছিলেন, সেই সর্ববিক্ষত্রকুলজাত (চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি বংশের কেহ নহেন) একজনকে গৌড়বাসী সকলে মিলিয়া রাজপদে বরণ করিলেন কেন? তাম্রলিপিতে লিখিত হইয়াছে, "প্রকৃতিপুঞ্জ ইঁহাকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইনি এরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন যে, দ্বিগুণ-প্রসারিত পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নাই তাঁহার যশের স্থায়ী সহচরীর সঙ্গে তুলিত হইতে পারিত " উত্তরকালে যখন ইঁহার বংশ গৌড়ে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন স্তাবক পণ্ডিতেরা এই বংশের সঙ্গে সূর্যবংশের একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

গোপালের ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে উপসংহার।

বৈদ্যদেবের সময় সাময়িক সন্ধ্যাকরনন্দী যখন রামপালকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিতে যাইয়া এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন বৈদ্যদেব যেটুকু বাকী ছিল তাহাই বা পূরণ না করিবেন কেন? তাঁহার প্রশস্তিতে রামচন্দ্রের ন্যায় পালরাজকেও সূর্যবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী জনশ্রুতি এই যে ধর্মপাল সমুদ্রকুলজাত। একথা ধর্মমঙ্গল কাব্য-গুলিতে পাওয়া যায় এবং সন্ধ্যাকর নন্দীও ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাখালদাস-বাবু বলেন যে যখন এই দুই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে পাশু বিভিন্ন যুগের প্রমাণ মিলিয়া যাইতেছে, তখন ধর্মপাল সমুদ্রকুলজাত একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই ;— ইহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। পালরাজের আদিপুরুষ যে বঙ্গোপসাগর বা ভারত-মহাসাগরের ঔরসজাত পুত্র, তাহা তাম্রপট শৈল-লেখ কিংবা যে কোন "বিশ্বাসযোগ্য" স্থানে লিখিত থাকিলেও উন্মত্ত ভিন্ন কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এই অজ্ঞাতকুলশীল পালবংশ প্রাচীন কোন যুগে সমুদ্র পাড়ি দিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই জনশ্রুতিটি সেই ইতিহাসের একটা সুদূরগত বিকৃত প্রতিধ্বনি। রাখালদাসবাবু সমুদ্রের

ঐরসে পালবংশের আদিপুরুষ জন্মিয়াছেন, এই মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণাটি উপন্যাসাশ্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। (বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম ভাগ ১৩৩০, ১৬৭-১৬৮ পৃঃ।)

বাঙ্গলা দেশকে অত্যাচার হইতে বিমুক্ত করিতে গোপালকে যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে হইয়াছিল, তিব্বতবাসী তারানাথ তাহা লিখিয়াছেন। "After seven years Gopal who had been elected king managed to free himself and obtained the kingdom" (Cunningham's Survey Report, Vol XV, p 148) নারায়ণপালের তাম্রশাসনেও গোপাল কর্ত্তৃক কামাচারপরের দৌরাত্ম্য নিবারণের কথা উল্লিখিত আছে। মনে হয় গৌড়দেশে শাসন শৃঙ্খলা আনয়ন করাই গোপালের প্রধান প্রচেষ্টার বিষয় হইয়াছিল, তিনি গৌড়দেশে সমাক্ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল নানা যুদ্ধ বিগ্রহে পারদর্শিতা দেখাইয়া তিনি রাজরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গৌড়রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার পর তাঁহার আর বেশী কিছু করিবার ছিল না, কথিত আছে, তিনি রাজা হইবার পূর্ব্বেও ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রজাদের অনুরাগ ও মৈত্রী লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে তিনি জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞান প্রচারিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টিত ছিলেন। পূর্ব্বের উল্লিখিত তাম্রলিপিতে উল্লিখিত আছে তিনি অচিরে রাজা মধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—"শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং"

দেবপালের তাম্রলিপিতে গোপালকে বিনয়ীদের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় বলা হইয়াছে, সমুদ্রান্ত গৌড়দেশ জয়ের পর "আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই" ইহা মনে করিয়া তিনি তাঁহার মদমত্ত হাতীগুলিকে রণ-যূথ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। উক্ত লিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি রণ-হস্তীগুলিকে পুনরায় বনে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ চক্ষে বনে যাইয়া তাহাদের স্বগণদের সঙ্গে পুনরায় মিশিতে পারিয়াছিল। দেবপালের তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি, গোপালদেব সমাজ সংস্কার করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইহারা স্বধর্ম্ম বিচ্যুত হইয়াছিলেন। গৌড়ের পরবর্ত্তী রাজারা যুগে যুগে যে সমাজ-সংস্কার করিয়াছেন, গোপালই তাহাদেরই অন্যতম আদি পথ-প্রদর্শক।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা মনে হয় যে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা "গোপাল" যদিও মহাবীর এবং যুদ্ধনীতি-বিশারদ ছিলেন, তাঁহার সেই অসাধারণ বীরবিক্রম তিনি সংযত করিতে পারিতেন। তিনি দুরাকাঙ্ক্ষী দুর্দ্দান্ত বীর ছিলেন না, তাঁহার অপেক্ষা অবাধ ছিল না যেখানে দরকার, সেইখানেই তাঁহার অসি কোষমুক্ত হইত এবং প্রয়োজন-শেষে তিনি তাহা কোষবদ্ধ করিতে জানিতেন। তিনি বিনয়ীদিগের আদর্শ ছিলেন এবং জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এই সকল গুণ পিতামহ ধর্ম্মবিষ্ণুর পৌত্রের যোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মবিষ্ণুর চরিত্র যাহাদ্বারা তিনি প্রজারঞ্জন এবং প্রজাদের নির্ব্বাচনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ ক্ষমতার অধীন থাকিতে চায়,

কিন্তু তাহারা মধ্যাহ্ন ভাস্করের তেজকে ভয় করে। গোপালের চরিত্রে এই বিনয়-মাধুরী ছিল বলিয়াই তিনি সর্ব্বজন প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি রণ-হস্তীগুলিকে পর্য্যন্ত যুদ্ধান্তে তাহাদের অরণ্য-জীবনের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বজীবে তাঁহার দয়া ছিল,—এই সামান্য কথায় তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে জীবে দয়ার নীতি শিক্ষা দেয়, এই ব্যাপারে আমরা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

দেদ্দদেবী।

ঘটাট বা দরিত্রবিষ্ণুর পত্নীদের উল্লেখ নাই। গোপালের ভগিনী যদিও ইন্দ্রের শচী, অগ্নির স্বাহা, শিবের সন্ধ্যাদি, কুবেরের ভদ্রা ও বিষ্ণুর লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন, তথাপি তিনি কোন্ কালের মেয়ে তাহার উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী প্রায় সকল পাল রাজারই মাতৃকুল কোন না কোন রাজবংশ-জাত, তাম্র-শাসনে তাহা সগৌরবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু গোপাল-পত্নী দেদ্দদেবী মহাগুণবতী হইয়াও বোধ হয় মধ্যবিত্ত লোকের মেয়ে ছিলেন, এ জন্য তাঁহার বংশকথা অনুল্লিখিত রহিয়াছে। গোপাল স্বয়ং মধ্যবিত্ত গৃহস্থকুল হইতে প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বেই সমান ঘরে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বিজয়ী বীর ছিলেন কিন্তু দিগ্বিজয়ীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি পররাজ্য বিজয় করিয়া একচ্ছত্র মহীপাল হওয়ার বাসনা করিতেন না। দৌষ্মন্তদের শান্তি আনয়ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সেই শান্তির আবির্ভাবের পর তিনি তাঁহার অসি কোষ মুক্ত করেন নাই, এমন কি তাঁহার শত যুদ্ধের সহচর রণ হস্তীগুলিকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। গোপাল ৭৪০ খৃঃ অব্দে ওদন্তপুরের বিহার স্থাপন করেন।

৺ অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এখনও বরেন্দ্র ভূমির এক নগণ্য পল্লীতে শ্রীশ্রীগোপালদেবের সমাধি বিদ্যমান আছে। এক জীর্ণ কুটীরে দরিদ্র কৃষক কাহিনীরা সেই সমাধির মৃত্তিকে সন্ধ্যাকালে তৈলের ক্ষুদ্র আলো দেখায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে, বাঙ্গালীরা তাঁহাদের দেশের প্রধান গৌরব বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের দরিদ্রেরা সেই রাজাকে ভুলে নাই,—যিনি মহাবিপদের দিনে বাঙ্গালী জাতিকে মৎস্যন্যায়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মপাল

গোপাল ছিলেন পূর্ণচন্দ্র—গৌড়মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন—তাঁহার উদয়াস্ত মহিমান্বিত, উজ্জ্বল অথচ শান্ত। কিন্তু তাঁহার পুত্র ধর্মপাল ছিলেন মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড—তেজ, বিক্রম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি গৌড়মণ্ডলে একচ্ছত্র রাজত্ব লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার সিংহাসন ছিল বহুতুলা দৃঢ়—তাঁহার বিজয়লক্ষ্মী ছিলেন বক্ষাসনে স্থিত, অবিচলিত।

ধর্মপাল ৭৮৫ খৃ: ৮২০ খৃ: অব্দ। (ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে ৮০০ ৮১০ খৃ:)।

তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন গৌড়ের চতুর্দিক্ ঘাপদসঙ্কুল অরণ্যের ন্যায়—কে কাহার রাজ্য কাড়িয়া লইবে, তাহারই চেষ্টা চলিতেছিল। দশদিক্ দুর্দান্ত শত্রু-সৈন্য-পরিব্যাপ্ত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর অমাত্যগণ স্বাধীন হইয়া সকলেই একচ্ছত্র সিংহাসনের দাবী করিতেছিলেন। নর্মদার উত্তরকূলে মালবরাজ, (ভোজদেবাধিপ), উজ্জয়িনীরাজ (অবন্তীর রাজা), মধ্যভারত ও পাঞ্চাবাসী কুরু ও যদুকুল, ভারতের পশ্চিম সীমানার যবন গ্রীকগণের শেষবংশধরেরা, কাম্বোজের (গান্ধার) ও ভারতের উত্তরপূর্বপ্রান্তবাসী কীর ও মদ্ররাজ্য (বর্তমান কাঙ্গরা বা জালামুখী) এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ (বঙ্গ) প্রভৃতি প্রদেশের নৃপতিবৃন্দকে ধর্মপালের নিকট মাথা নোয়াইতে হইয়াছিল। তাম্রশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষায়—"এই সকল নৃপতিরা 'সাধু' 'সাধু' উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।" তিনি কান্যকুব্জের ইন্দ্ররাজকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে এই রাজ্য প্রদান করেন। চক্রায়ুধের অভিষেক কালে ধর্মপালের সমস্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত ছিলেন এবং বৃদ্ধ পাঞ্চালগণ চক্রায়ুধের মস্তকে স্বর্ণকলস হইতে অভিষেকের জলধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের সামন্ত রাজগণ।

চক্রায়ুধ।

ধর্মপালের দিগ্বিজয় অভিযানের কথা তাম্রলেখের কবি অতিশয় আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ভট্টাচার্য গৌড়ীয় রীতি নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের যে রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, এই সকল প্রশস্তি হইতে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। উমাপতিধর-কৃত বিজয় সেনের প্রশস্তি সেইরূপ রচনার আর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ধর্মপালের দিগ্বিজয় কাহিনী অলঙ্কারের বাহুল্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আছে—তাঁহার অসংখ্য সৈন্যের পদভরে পর্বতশিখর নোয়াইয়া পড়িয়াছিল, তদীয় বৃহৎ চমূর অগ্রগামী "নাসীর" নামক সৈন্যদের বিক্রান্ত গতিতে যাত্রাভার অভিযান স্মরণ করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রদেব স্বীয় চক্ষু ভয়ে নিমিলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রণ-হস্তীগুলির নাম ছিল "ঘণ্টাপথ"; সংস্কৃত অভিধানে এ শব্দের অর্থ দেওয়া আছে "হস্তীর বিরাট্ ব্যূহ"।

ধর্মপালের দিগ্বিজয়।

ধর্মপালের এই রণ-হস্তীর বিরাট্ যূথ যখন কোন বৃহৎ নদী পার হইত, তখন মনে হইত সেই নদীর সিকতাস্তরণ বহুদূর পর্যন্ত সরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ হস্তীগুলি নদীর প্রসারিত তটভূমির মত মনে হইত এবং তাহাদের ঘন সন্নিবেশে চতুর্দিক্ শ্যামায়মান হইয়া লোকের মনে অকাল বর্ষাগমের বিভ্রম জন্মাইত। তাহার অসংখ্য রণতরী সেতুবন্ধস্থিত সমুদ্র-নিমজ্জিত পর্ব্বতমালার সমুন্নত-শেখর বলিয়া মনে হইত এবং ধর্মপাল যখন ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন মনে হইত চতুঃসাগর বেষ্টিত ভূমণ্ডলে বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রাজধানীতে উত্তর দেশের রাজারা, তাঁহার সখ্যকামনা করিয়া আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক অসংখ্য অর্ঘ পাঠাইতেন। তাহাদের যুযোজিত ধ্বনিতে রাজধানী মুখরিত হইয়া থাকিত।

এই সকল বর্ণনায় আমরা প্রবল প্রতাপান্বিত একচ্ছত্র সম্রাটের একটি উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাই। ধর্মপাল গুপ্তসাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যের অনেকটা যে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার গুণগাথা সর্ব্বত্র গীত হইত, আমরা তৎসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। গোপালের সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিক্রম দিয়া তুলনা চলে। উভয়েই সংযত বীরত্ব, শান্তিপ্রিয়তা ও ত্যাগ প্রায় কিন্তু ধর্মপাল ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের ন্যায়, তাঁহার ক্রোধ ছিল বাড়বাগ্নির মত, একবার একরূপ। জ্বলিয়া উঠিলে তাহা সহজে নিবিতে চাহিত না। ইঁহার দরবারে যে সকল প্রধান ব্যক্তি ও রাজকর্মচারী ছিলেন, খালিমপুরের তাম্রশাসনে তাঁহাদের একটা তালিকা দেখা যায়—সে সকল উপাধির অনেকগুলি আমাদের কাছে এখন দুর্ব্বোধ্য হইয়া গিয়াছে—যথা রাজ-রাজন্যক অনীশ রাজা ?, রাজপুত্র, রাজামাত্য সেনাপতি, বিষয়পতি, দৌঃসাধসাধনিক, দণ্ডপাশিক চৌরোদ্ধারণিক, দণ্ডশক্তি, দণ্ডপাশিক, দূতক্ষেপণকাগমিক, অভিতুরমাণ, হস্ত্যশ্বাধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেষাধ্যক্ষ, নাকাধ্যক্ষ,* ওরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, তদায়ুক্তক, বিনিযুক্তক, চাট, ভাট—প্রভৃতি, জোঙ্কারবৃ, মহামহত্তর, দশগ্রামিক, করণ, ক্ষেত্রকর, বলাধ্যক্ষ, বলাক ইত্যাদি।

রাজপুরুষের উপাধি

এই তালিকা হইতেই বুঝা যায় যে প্রবল একচ্ছত্র সম্রাটের, তাহা আমাদের বাঙ্গলাদেশ কৃষিপ্রধান, গরু, ছাগ, বৃষ প্রভৃতি জন্তু কৃষির সহায় গোধন রাজ্যের একটা প্রধান সম্পত্তি ছিল। সেই বেদের সময় হইতে গরু চুরি করা রাজদের একটা নিত্য কার্য্য ছিল। স্বয়ং ইন্দ্র পণিদের গরু হরণ করিতেন। বিরাট রাজার গো-গৃহ লইয়া কত বড় যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সুতরাং গবাধ্যক্ষ-ছাগাধ্যক্ষের পদ বহু প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। তাম্রশাসনটি ভূমিদান সম্পর্কীয়, সুতরাং ইহাতে রাজ্যের ভূমিসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদেরই মাত্র উল্লেখ করা

* 'নাকাধ্যক্ষ' অর্থ আকাশ-বিভাগের অধ্যক্ষ। এই পদটির অর্থ কি তাহা বোঝা যায় না। কালিদাসের রঘুবংশে দেখিতে পাই দুন্দুভিরা সকলেই স্বচ্ছন্দে আকাশপথে বিচরণ করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে (প্রথম অধ্যায়)। অবশ্য অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও আকাশগামী দেবতার উল্লেখ অনেকেই দুই হয়। সিন্ধু দেশেও আকাশগামী রথের বর্ণনা আছে। আকাশে যাতায়াতের সড়কই কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা এ সমস্তই উপলব্ধ।

হইয়াছে। রাজ্যের বিপুল নৌ-বাহিনীর এবং বাণিজ্যতরীর অধ্যক্ষ বা রাজকর্ম্মচারীদের উল্লেখ এখানে নাই। ভারতবর্ষে যুগে যুগে গ্রীক, তুরাণ, হূণ প্রভৃতি যে সকল জাতি বিজয়ী হইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের ভাষার কতকগুলি পদের উপাধি ধরবাদে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, এই জন্য এই সকল উপাধির ভাষা কতকটা জটিল ও দুর্ব্বোধ।

খালিমপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে মহারাজ ধর্ম্মপালের ত্রিভুবনপাল নামক এক পুত্র ছিলেন। তিনিই জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন এবং যে মহাদেবী অভিষিক্তা হইয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহার অকালে পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ত্রিভুবনপাল নাম যখন রাজকীয় দলিলপত্রে কখনও দেখা যায়, তখন ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া একই ব্যক্তির দেবপাল নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মপাল ৬২ বৎসর রাজত্ব করেন। রাধালদাস-বাবুর মতে তাঁহার রাজত্বকাল ৩৫ বৎসর।

ধর্ম্মপাল তাঁহার অধীনস্থ বিপুলবাহিনীকে নানা তীর্থ দর্শন করাইয়া তাহাদের পরলোকের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ের সহায় হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিকে কেদার-তীর্থে তর্পণাদি করিবার সুযোগ দিয়া প্রয়াগে এবং তৎপর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোকর্ণ তীর্থে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন কথিত আছে রাবণ রাজা এই গোকর্ণ তীর্থে তর্পণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কারণ।

তাম্রশাসনের কবি লিখিয়াছেন, মহারাজ পৃথু, মহারাজ রামচন্দ্র এবং পুণ্যশ্লোক নল রাজা এখন স্বর্গগত, তাঁহারা আর দর্শনীয় নহেন। কিন্তু ইহাদের সমস্ত গুণ লইয়া মহারাজ ধর্ম্মপাল দেব বিদ্যমান তাঁহাকে দেখিলেই সেই সকল মহাপুরুষের দেখিবার ফল হইত।

ধর্ম্মপালের রাজত্ব যে সর্ব্বত্রই বিজয়ের ইতিহাস তাহা নহে। এতাদৃশ পরাক্রান্ত নৃপতিকেও দুই একস্থলে অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি মরুভূমির দ্বিতীয় নাগভট্টের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই শত্রুকর্ত্তৃক বারংবার বিপর্য্যস্ত হইয়া ধর্ম্মপাল তাঁহার আশ্রিত কনোজাধিপতি চক্রায়ুধকে লইয়া রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট বিনীত ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

জয়পরাজয় বীরদিগের জীবনে উভয়ই ঘটিয়া থাকে কিন্তু ধর্ম্মপাল যে উত্তর ভারতের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে যে তাঁহার প্রতাপ স্বীকৃত হইত, তাহার প্রমাণ আছে।

তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্ম্মপালের রাজ্য বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তরে দিল্লী এবং জলন্ধর (পঞ্জাব) পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ধর্ম্মপাল প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটরাজবংশীয় জেন্দ্রের পৌত্র এবং কল্যাণের পুত্র পরবলের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন পরবলের অপর নাম গোবিন্দ। প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা বিহার ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক তন্ত্রীয় বৌদ্ধদের প্রথম ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবপাল

ধর্মপালের জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিভুবনপাল সম্ভবতঃ অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। দেবপালের মাতা রান্নাদেবী "মুঙ্গিয়ত্রী কীর্তি" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ অনেক মঠমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। জিম্মেন্ট স্মিথ বলেন, দেবপালের সেনাপতি লবসেন বা লাউসেন কলিঙ্গ ও আসাম জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে লাউসেন ধর্মপালের তালিকা রক্ষাধক্ষীর পুত্র এবং উক্ত রাজার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি শুধু কলিঙ্গ ও আসাম নহে, "অঙ্গের ঢেকুরের" অধিপতি ইছাই ঘোষকে বধ করিয়া উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে "ঈশ্বর ঘোষের" যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই ঈশ্বর ঘোষ এবং ধর্মমঙ্গলোক্ত ইছাই ঘোষ অভিন্ন—এই মতও কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন।

দেবপাল—৮২০-৪৮ খৃঃ (স্মিথের মত, ৮০০-১৮ খৃঃ)।

তাম্রলিপিতে লিখিত হইয়াছে, দেবপালের মুখে সর্ব্বদা হাসির শ্রী বিরাজ করিত; ইহার চিত্ত নির্ম্মল ছিল তাহাতে কুটিলতার লেশ ছিল না এবং ইনি সংযত-বাক্, সংযত-ব্যবহার ও মধুর চরিত্র দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য ইহার দেহ পবিত্র ছিল এবং পিতামহের ন্যায় ইনি শাস্ত্রিকামী ছিলেন। পিতামহ যেরূপ যুদ্ধান্তে বন্দী হস্তীগুলিকে অরণ্যজীবনে ছাড়িয়া দিতেন, ইনিও সেইরূপ দিগ্বিজয়ান্তে হস্তীগুলিকে তাহাদের নিবাসভূমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে মুক্তি দিতেন। দেবপাল রণশ্রান্ত অশ্বগুলিকে তাহাদের জন্মভূমি কাম্বোজের অরণ্যে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেখানে তাহারা তাহাদের আরণ্যসহচর অশ্বগণের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিত।

বীর অথচ শান্তিপ্রিয়

তাম্রশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষায় স্তাবক কবি লিখিয়াছেন, সত্যযুগে বলি, ত্রেতাযুগে জামদগ্ন্য, দ্বাপরে কর্ণ এবং কলিতে বিক্রমাদিত্য দাতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন, কিন্তু তারপর লোকে দানের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছিল, দেবপাল সেই দানশীলতা গুণ পুনরায় মর্ত্যে প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

তাম্রলিপির কবিরা অনেক অতিশয়োক্তি করিয়াছেন, কোন কোন স্থানে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, কিন্তু বেশী স্থানেই সত্যগোপন করিয়াছেন। নিজের আশ্রয়দাতা নৃপতির দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদের পরাজয় কথা প্রায়ই উল্লেখ করেন নাই। তথাপি এই তাম্রলেখমালা ভাল করিয়া পাঠ করিলে এক এক নৃপতির চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বুঝিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে কবিগণ যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ধর্মপাল ছিলেন পরাক্রমশালী যোদ্ধা, কিন্তু দেবপালের বীরত্ব অপেক্ষা সাধুতাই চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল,

উপরের লেখাগুলি পাঠ করিলে তাহাই বোঝা যাইবে। পরবর্তী তাম্রশাসনগুলি পড়িলে আমরা দেবপাল-সম্বন্ধে আরও কতকগুলি তথ্য জানিতে পারি। ধর্মপাল এত বড় বোঝা হইয়া যে সকল কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, দেবপাল তাহা সমাপ্ত করেন, তিনি দ্রাবিড়েশ্বর ও পিতৃশত্রু গুর্জ্জরনাথকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। দেবপালের মাতা রাষ্ট্রকূটাধিপতি অমোঘবর্ষের ভগিনী ছিলেন। দেবপাল মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কাম্বোজগণ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গৌড়দেশ আক্রমণের জন্য চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু দেবপাল কর্তৃক পরাজিত হন। তিনি গুর্জ্জরের রামভদ্রদেবকে জয় করিয়া সেই দেশের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং উৎকলের রাজাকে রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনে দেবপালকর্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধিকার এবং হূণবিজয়ের কথাও উল্লিখিত আছে।

এই সকল বৃত্তান্তের দ্বারা মনে হয় ধর্মপাল মরিয়া তাঁহার বিশাল রাজ্য একরূপ নিষ্কণ্টক করিয়াই স্বর্গীয় হইয়াছিলেন, তথাপি চারিদিকে বিজয়োন্মুখ স্বাধীন নৃপতিরা গৌড়মণ্ডলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। দেবপালকে ধীর, স্থির ও সৌম্য প্রকৃতির লোক বুঝিয়া ইঁহারা যথা কাম্বোজরাজ—কিন্তু পুণ্যশীলা রাজ্ঞী রন্নাদেবীর আধিপত্যে তাঁহার প্রিয়পুত্র দেবপাল সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধগুলি তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা অমিতবীর জয়পাল কর্তৃকই বেশীর ভাগ নির্ব্বাহিত হইত। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (দেবপালের) অনুজ্ঞাক্রমে বলবান্ জয়পাল দিগ্বিজয়ার্থ চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াই উৎকলের রাজা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া বীর রাজধানী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা (সম্ভবতঃ ভগদত্তবংশীয় পালদের প্রপৌত্র জয়পাল বীরবাহু) জয়পালের বশীভূত হইয়া অধীনতাস্বীকারচ্ছল মালা মস্তকে পরিয়া চিরকাল শান্তিতে অবস্থান করিয়াছিলেন।" "জয়পাল ইন্দ্রের কানন উপেন্দ্রের ন্যায় অগ্রজ দেবপাল দেবকে ধরিত্রীর শাসনসুখের অধিকারী করিয়াছিলেন।" সুতরাং দেখা যাইতেছে অর্জ্জুনতুল্য সহোদরের বীরত্বেই দেবপাল তাঁহার রাজ্যের পরিচালন করিয়া রাজশ্রীকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন। দেবপালের এই সৌভাগ্যের ফল আরও দুইজনের সাহায্যে অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইহারা তাঁহার মন্ত্রিবর, প্রথমতঃ দর্ভপাণি। তাম্রলেখে বর্ণিত হইয়াছে—"ইহার নীতিকৌশলে দেবপাল বিন্ধ্য হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" দর্ভপাণির পৌত্র কেদার মিশ্রও দেবপালের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাম্রশাসন ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই মন্ত্রিবরের বুদ্ধির বলের উপাসনা করিয়া গৌড়েশ্বর দেবপাল দেব উৎকল কুল উৎখাত করিয়া হূণগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এবং দ্রাবিড় গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন।"

শান্তস্বভাব, স্থির, ধীর, ধর্ম্মানুরাগী দেবপাল দৈবানুগ্রহে অর্জ্জুনতুল্য ভ্রাতা জয়পাল এবং

বৃহস্পতিতুল্য মন্ত্রী ধর্মপাল ও কেদার মিশ্রকে লাভ করিয়া সর্বত্র বিজয়যুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের পরিসর বড় কম ছিল না। অহুশাসনে লিখিত আছে—"একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ; একদিকে লক্ষ্মীর নিকেতন রত্নাকরসমুদ্র, অপরদিকে বরুণালয়—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল দেবপাল নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছেন।" দেবপাল সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র নৃপতি না হইলেও তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় রাজন্যগণের পুরোভাগে ছিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্বক্রমে একজন শ্রেষ্ঠ নৃপাল ছিলেন, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

ইহার রাজত্বকালে বঙ্গাধীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব পাটলিপুত্রে দূত পাঠাইয়া ইহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন মহারাজ দেবপাল বঙ্গাধিপতির নামে রাজগিরের অন্তঃপাতী নন্দীসেনাক ও মণিমাধবকগ্রাম, নাগিক গ্রাম, চণ্ডগ্রাম এবং গয়া জেলার পালামর-গ্রাম—এই পাঁচখানি গ্রাম নালন্দা বিহারে দান করেন। এই গ্রামগুলির উপস্বত্ব দ্বারা (১) নালন্দা বিহারের বুদ্ধসেবা, (২) ভিক্ষুসঙ্ঘের বলি, চরু, চীবর, পিণ্ড, শয়ন, আসন, ঔষধ, সত্র, ও গন্ধপাদ লিখন, (৩) বিহার ভগ্ন হইলে তাহার সংস্কার—এই চতুর্বিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গাধীপের বালপুত্রদেব শ্রীবীরনামক রাজার বংশসম্ভূত। বলা বাহুল্য এই পঞ্চগ্রাম বালপুত্রদেব সেই সেই গ্রামের মালিকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলেন। দেবপালের রাজত্বের আটত্রিশ বৎসরের কার্তিক মাসের একবিংশ দিনে, অনুমান ৮৩৮ খৃ: অব্দের নবেম্বর মাসে, এই দানপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

বিগ্রহপাল ধর্মপালের পৌত্র এবং দেবপালের ভ্রাতৃবিক্রান্তকীর্তি শক্তিমান্ কনিষ্ঠ সহোদর জয়পালের পুত্র। কাহারও কাহারও মতে বিগ্রহপাল ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র।

বিগ্রহপাল ত্রৈহৈ রাজকুলবৃদ্ধনামধেয়া লজ্জা নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইঁহার অন্য নাম ছিল সুরপাল। ইঁহার সময়ে গুর্জরাধিপতি ভোজরাজ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহার হাতে বিগ্রহপাল পরাজিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, প্রণত সমস্ত সামন্ত নৃপতির মুকুটমণি তাঁহার পাদপীঠ উজ্জ্বল করিয়াছিল এবং তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে

বিগ্রহপাল ৮৫৮-৯১০ খৃ:

প্রাপ্ত সিংহাসন নিজের যোগ্যতা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাম্রলিপির "ন্যায়ার্জিত" শব্দের অর্থ সকলেই "উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত" করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার সিংহাসনের দাবীর প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কেহ ছিলেন, ন্যায়ার্জিত কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটাই আছে। গুর্জ্জরপতির আক্রমণে শুধু তিনি নহেন তাঁহার পুত্র নারায়ণপালও কতকটা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিগ্রহপাল ৮৫৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অল্পকাল পরেই পুত্র নারায়ণপালের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনের সপ্তদশ শ্লোকে এই বানপ্রস্থ অবলম্বনের আভাস আছে।

নারায়ণপাল—৮৫৮-৯১৫ খৃঃ।

নারায়ণদেব—বিগ্রহপাল ও লজ্জাদেবীর পুত্র। তিনি সম্ভবতঃ ৮৫৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব খুব নিরাপদে নির্ব্বাহিত হয় নাই, রাজত্বের প্রথম দিকটায় গৌড়ের পরম শত্রু গুর্জ্জরপতি ভোজদেব মগধ আক্রমণ করেন। ভোজদেবের এই অভিযান সুপরিকল্পিত এবং সুদক্ষ ও সামন্ত-নৃপতিগণের সমবেত চেষ্টায় সফল হইয়াছিল, নারায়ণপালের পিতা বিগ্রহপাল এই সমবেত শত্রুগণকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, ভোজরাজের প্রধান সহায়স্বরূপ মোখরীপুরের (প্রাচীন যাত্তবাপুর) রাজা কক্ক ও কলচুরি বংশের রাজা গুণাম্ভোধিদেব সামন্ত নৃপতিস্বরূপ এই অভিযানে মিলিত হইয়াছিলেন এবং মুঙ্গেরে নারায়ণপালের সঙ্গে গুর্জ্জরাধিপ ও তাঁহার সামন্ত নৃপতিগণের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে নারায়ণদেব পরাজিত হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষপরে গুর্জ্জরের সৌভাগ্যে পালসাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মুঙ্গের বিপন্ন ও মগধ, গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল এবং পালরাজা গৌড়বঙ্গের আবেষ্টনীর মধ্যে পরিমান রহিবার রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন।

অধিকার সংকোচ।

কিন্তু নারায়ণপাল দেব উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধিকার হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইলেও ইহার দীর্ঘ রাজত্ব মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। ইহার সময়ে উচ্চশিক্ষা, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে দেশের খুব উন্নতি হইয়াছিল। আমরা এই অধ্যায়ের শেষে পালরাজত্বকালে দেশের অবস্থার কতকটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। শান্তিপ্রিয়, দানবীর, প্রিয়ভাষী, আদর্শচরিত্র, নারায়ণপাল উচ্চশিক্ষা ও চারুশিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা সুখে বাস করিত, কবি তাঁহার শুভ্র যশোরাশি শিবের হাসির সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন।

নারায়ণপালের একমাত্র পুত্র রাজ্যপাল আনুমানিক ৯১৫ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তাম্রলেখে এই রাজার কৃত কুলাচল সদৃশ উচ্চ দেবালয় এবং অগাধ-সমুদ্রতুল্য বিশাল দীর্ঘিকার উল্লেখ আছে। মরেন্দ্রভূমিতে বহু উচ্চ দেবালয়ের ভগ্নস্তূপ এবং অধুনা-লুপ্তপ্রায় দীর্ঘিকা নানাস্থানে

দৃষ্ট হয়। ইহার কোন্‌টি কোন্ রাজার কীর্তি, তাহা এখনও ভাল করিয়া জানা যায় নাই।

রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ৯৩৫ ৯৮ খৃঃ।

পালরাজগণের সময়ে সাধারণতঃ দেশে শান্তি ছিল এবং তাঁহারা সকলেই শিক্ষা, শিল্প ও সাধারণের হিতকর নানা অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। রাজপাল রাষ্ট্রকূটপতি জগতুঙ্গদেবের (কাহারও কাহারও মতে তুঙ্গ বম্মবলোকের) কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদের পুত্র দ্বিতীয় গোপালদেব।

উত্তর ভারতে তখন কান্যকুব্জ এবং রাষ্ট্রকূট এই দুই পরাক্রান্ত রাজার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। কান্যকুব্জের অধিকার মগধ ও বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কনোজাধিপতি মহীপালকে যখন বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিলেন, তখন গৌড়াধিপ দ্বিতীয় গোপালদেব এই সুবিধায় মগধ পুনরায় দখল করিলেন। কিন্তু গোপালদেবের অদৃষ্টে অব্যাহত শান্তি ছিল না। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে বুন্দেলখণ্ডের রাজা চন্দেলবংশীয় যশোবর্মা গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহাভারত ছত্রপুরে এই চন্দেলবংশের রাজাদেরও যে সকল কীর্তি বিদ্যমান—তাহা এখনও অটুট অবস্থায় আছে, এই কীর্তিগুলি অত্যন্ত বিস্ময়কর। প্রকৃতির স্বপ্নকুহক-রচিত এরূপ অপূর্ব স্থাপত্যমহিমা ভারতের আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পাহাড়ের উপরস্থিত রাজগড় আরবা উপন্যাসের দৈত্যপুরী বা অতিমানুষলোকের রাজধানী বলিয়া ভ্রম হয়। খজুরাহো গ্রামে আবিষ্কৃত যশোবর্মার তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় ৯৫৪ খৃঃ অব্দে উক্ত রাজা গৌড়, কাশ্মীর, কোশল, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু ও গুর্জর-রাজগণকে পরাভূত করিয়া সমস্ত আর্যাবর্ত স্বাধিকারে আনিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গোপালদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। গোপালদেবের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। তাঁহার সময়ে গৌড়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রে বিদেশীয়গণের বড়ই উৎপাত চলিতেছিল। তাম্রশাসনের কবি বিগ্রহপালের প্রশংসা করিতে যাইয়া তাঁহার কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারেন নাই। যে সময়ে সমস্ত দেশ অসির ঝনৎকারে মুখরিত, তখন হয়ত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কোন নিরাপদ্ পল্লী ভূমিয়া তথায় তূলিহস্তে চিত্রপট আঁকিতেছিলেন, তাঁহার অতুল্য বিশালকায় হস্তিগণ বনমধ্যে মাতিয়া কোন চলন্তা নদীর প্রসারিত সিকতা ভূমির ন্যায় দৃষ্ট হয় নাই—তাহারা হিমালয়ের হিমশীতল কোন উপত্যকার চন্দনবনে যথেচ্ছ বিহার করিতেছিল। এই সময়ে যশোবর্মার পুত্র ধঙ্গদেব কনোজ হইতে বিপুল বাহিনী লইয়া গৌড়েশ্বরের পল্লীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য কি তাম্রশাসনকার মহীপালের মাতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্ঞীর নাম বা বংশসম্বন্ধে একটি কথাও লিখেন নাই? অপরদিকে কাম্বোজিয়ারা আসিয়া অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়াছিল, এই জন্যই কি মনঃক্ষোভে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল চিত্র করিবার জন্য রং ও তূলি

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।
(প্রাচীন মূর্তি হইতে)

লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া সংসার-জ্বালা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন? যশোবর্ম্মার পুত্র বজ্রদেবের দিগ্বিজয়-প্রবৃত্তিটা যেমন খুবই প্রবল ছিল, তেমনই তাঁহার পরাজিত রাজাদের অন্তরমহলের প্রতি একটা নিদারুণ বলবতী ছিল। তাম্রশাসনের কবি তাঁহার এই রোগটারও বেশ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়া গৌড় অবরোধিকার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন —"সমরজয়ী রাজা গৌড়ের কারাগারে বন্দিনী রমণীরা সজলনেত্রে এই ভাবে কথাবার্তা বলিতেছিলেন—"আপনি কে? অঙ্গেশ্বরের রাজ্ঞী, আপনি কে? রাঢ়রাজপত্নী, আপনি কে? অন্তরাজ পত্নী।" এই ঘটনা ১০০২ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী পালরাজগণ

কাম্বোজিয়াগণ ছিলেন বিদেশী, কুলজীগ্রন্থে মনুপকানন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—"এই অস্পৃশ্যজাতি নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে চায়। এই এক বিষম রোগ যে জাতি রাজা হইবে, সেই নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করে।" মনুপকানন জানিতেন না যে আবুপর্ব্বতে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবার জন্য যে সময়ে যজ্ঞ হইয়াছিল তদবধি ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বজাতির মধ্যে এই প্রচেষ্টা চলিতেছিল।

কাম্বোজিরাজা কে? ফরাসী পণ্ডিত ফুসের মতে তিব্বত দেশের নামান্তর কম্বোজ দেশ—নেপালে এই প্রবাদ প্রচলিত। রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন "কাম্বোজরাজ গৌড়পতি" তিব্বত বা অন্য কোন পাহাড়িয়া দেশ হইতে আসিয়া বরেন্দ্র জ

মহীপাল—৯৯৮-১০৩০ খৃঃ (ফ্লিটের মতে)।

করিয়া "গৌড়পতি" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ৯৭৩ খৃঃ অব্দে ইহাদের এক বংশধর কর্ত্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগনগরে ইহাদের কীর্ত্তিচিহ্ন পাওয়া যায়। কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিরা এই কম্বোজরাজগণের পদপ্রার্থীভুক্ত। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যে "অনধিকারী"জাতি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন—ইহারা সেই জাতি।

মহীপালের রাজত্বকালে উত্তর-পূর্ব্ব ভারত নানা নৃপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। কনোজাধিপতি রাজ্যপাল চন্দেররাজগণের সহায়তায় হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বাদুর গজনীর সহায়তা-প্রাপ্তির জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। মহীপালের পরে নয়পালের সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ঘোর সমরানলে দগ্ধ হইতেছিল। একদিকে চেদীরাজ কর্ণ অপূর্ব্ব বীরত্বলে সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের ভাষায় "কর্ণদেবের বিক্রমদর্শনে পাণ্ড্যরাজ চতুরতা ত্যাগ করিয়াছিলেন,

কেরলরাজের পর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল, কুঙ্গরাজ সংপথে আসিয়াছিলেন, মঙ্গরাজ ও কলিঙ্গরাজ ভয়কম্পিতকলেবরে লুকাইয়া ছিলেন, কীরগ্রাম শিকারবদ্ধ পাখীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন, হপরাজের হয় অন্তর্হিত হইয়াছিল।" এই জগদ্বিজয়ী বীর চন্দ্রবংশের রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মাকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানগণ এই সময়ে অমিতবিক্রমে বন্যার ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তের উপর আসিয়া পড়িলেন। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরাজাদের অনেকে একত্র হইয়া মুসলমানের অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু কণৌজরাজগণের হস্ত হইতে বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করিয়া মহীপাল স্বদেশে নানা লোকহিতকর ব্যাপারে আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যে প্রত্যন্তশক্তি হিন্দুসাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা বাধা দিবার জন্য মহীপাল কোন চেষ্টাই করেন নাই। বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত মহীপাল দীঘি এখনও সেই নিশ্চিন্ত জনপ্রিয় রাজার প্রবান কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এত বড় দীঘি আর বাঙ্গলায় নাই। এই দীঘি রঙ্গপুরের অতি সন্নিহিত। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় চরিত্রের নানাগুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে পল্লীগাথা এখনও উত্তরবঙ্গে গীত হইয়া থাকে। "ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত" এই প্রবাদবাক্য বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কি ছিল তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।"

মহীপালের মৃত্যুর ৪।৫ শত বৎসরেও যে গীত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পুণ্যশ্লোক গীত হইত এবং এখন কিছিদ্‌ন সন্তরবৎসর পরেও যাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, সেই গানের বিষয়ীভূত রাজচরিত্র যে কতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি ক্ষুদ্র মহীপালের গানে আমরা জানিতে পারিয়াছি, লীলা নাম্নী এক ধনাঢ্য বণিক্‌কন্যাকে মহীপাল ভালবাসিতেন তাহাকে পাওয়ার জন্য তিনি কত ছলপূর্ণ বাক্য খুজিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে উষ্ণ প্রদেশে গমনাগমন করিয়াছেন; একদিন তিনি শুনিলেন, তাঁহার নবনির্ম্মিত দীঘিতে স্নান করিবার জন্য সেই সুন্দরী কন্যা আপনা হইতে আসিয়া জলে সাঁতার কাটিতেছে। মহীপাল নিজে জলে নামিয়া লীলার জটিল ও দীর্ঘ কৈশোরের যত ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত চুলের মুঠা ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। ইতঃপূর্ব্বেই মহীপালের সম্বন্ধে লীলার একটা কলঙ্ককথা প্রচলিত ছিল, এই জন্য লীলার পিতামাতা তাহাকে মহীপালদীঘিতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কন্যা সে কথা না মানিয়া দীঘির জলে নামিয়াছিল, ইহা দ্বারা মনে হয় রাজশিকারী যে পাখিটিকে শিকার করিয়াছিলেন, সে পাখী ধরা দিতেই তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। এই সকল গল্পকথার ঐতিহাসিক মূল্য কি তাহা জানি না তবে পল্লীগাথা অনেক সময়েই সত্যের একটু ইঙ্গিতকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর কল্পনার সৌধ

মহীপাল ও লীলা।

নির্ম্মাণ করে। এই প্রাচীন গাথাটিতে যে সত্যের সেরূপ একটু ইঙ্গিত না আছে তাহাই বা কে বলিবে?

মহীপাল দেব সম্ভবতঃ ১০৩০ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন তিনি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারানাথের মতে মহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। সুলতান মহম্মদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, যখন স্থানীশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, সোমনাথ প্রভৃতি নগর ও দুর্গ একের পর একটি করিয়া বিজয়ী বিদেশীর করতলগত হইতেছিল, তখন মহীপাল নিশ্চিন্তমনে বারাণসী নগরীকে নানা কীর্ত্তিতে মণ্ডিত করিতেছিলেন।

নয়পাল—১০৩০-১০৫৫ খৃঃ।

মহীপালের পুত্র নয়পালের সময়েই বঙ্গদেশের নানাস্থানে শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। উত্তর-ভারতে যে ঝড় বহিতেছিল, সেটের তাহার গতি উপলব্ধ হয় নাই। নয়পাল নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে বসিতে পারেন নাই। যে কর্ণদেব অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত করতলিত করিয়া চেদীরাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন, যিনি প্রথমবার চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার হস্তে পরাজিত হন। চন্দেল্লরাজের প্রধান সেনাপতি গোপালের শৌর্য্য ও বীরত্বগুণে এই জয় সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু কর্ণদেবের দ্বিতীয় বারের পরাজয় ঘটিয়াছিল মগধে।

কর্ণদেবের পরাজয়।

নয়পাল তাঁহাকে পরাভূত করেন। কর্ণদেব গয়াতীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। সেইখানে সসৈন্যাধিপতি নয়পালের সঙ্গে তাঁহার যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে কর্ণ মগধ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়ের আশা না দেখিয়া স্বীয় মুখ্যমন্ত্রী কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস করিয়া কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করেন। নয়পালের সৈন্যদল বিজয়ী হইয়া কর্ণদেবের সৈন্যসামন্তদিগকে অবাধে হত্যা করিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গের মুকুটমণি শ্রীমান্ অতীশ দীপঙ্কর গয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় কর্ণদেব ও নয়পালের মধ্যে উভয় পক্ষের একটি সম্মানজনক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। শত্রুতা এইভাবে সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হইলে নয়পালের পুত্র কুমারপালের সঙ্গে চেদীরাজ যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

৺ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "নয়পাল দেবের রাজত্বকালে বৈদ্য-জাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল, বৈদ্যগুরুকর্ত্তা চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ নয়পাল দেবের

বৈদ্যজাতির উন্নতি

ভিষগাচার্য্য ছিলেন। জনার্দ্দন মন্দিরের প্রশস্তি রাজবৈদ্য সহদেব কর্ত্তৃক এবং গয়াধর মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্য বজ্রপাণি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই কোবিদ লিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যা ও রচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।"

১০৫৫ খৃঃ অব্দে নয়পালদেবের পুত্র বিগ্রহপাল তৃতীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার শ্বশুর ভারতবর্ষের তৎকালীন নৃপতিগণের প্রধান—চেদীশ্বর কর্ণদেব, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিগ্রহপাল বহু রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। পাটনা

জেলায় কোষরাজগ্রামে বীরদেব-নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই সকল মূর্ত্তির অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বিগ্রহপালের সময়ে বর্ম্মবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা বাঙ্গলাদেশের অনেকটা আত্মসাৎ করেন। এই রাজগণের মধ্যে বিগ্রহপালের সমসাময়িক বজ্রবর্ম্মা ও জাতবর্ম্মা। জাতবর্ম্মা বিগ্রহপালের জামাতা, তিনি কর্ণদেবের দ্বিতীয় কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। জাতবর্ম্মা হরিকেল (চট্টগ্রাম) অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ও পরে দিব্য নামক কৈবর্ত্ত সেনাপতিকে পরাভূত করিয়া অঙ্গদেশ (পাটনা) অধিকার করেন।

বিগ্রহপাল তৃতীয় ১০৫৫ খৃঃ—দ্বিতীয় মহীপাল ও সুরপাল।

কিন্তু বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষদিকে আর এক দুর্দ্দম শত্রু কৈবর্ত্তকুলসম্ভূত। পালশক্তির বিনাশ প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ বঙ্গদেশে রাজ্যস্থাপন করেন। ইঁহারা সেনাপতি দিব্বোক নাম এই মাত্র করা হইল—ইনি অঙ্গ ছাড়িয়া বরেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং তথাকার অধিবাসিগণকে পালরাজাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। দিব্য অনেক স্থলে দিব্বোক নামে পরিচিত তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষের দিকে কৈবর্ত্তগণ উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া দিব্বোকের শাসন স্বীকার করিয়া লয়।

কৈবর্ত্তনায়ক দিব্বোক।

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজ্যের অধিকার লইয়া তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে কলহ বাধাইয়া আসে। দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। বিগ্রহপালের তৃতীয় পুত্র রামপাল কৃতী ও জনপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং যদি তিনি রাজ্যের প্রতি লোভ করেন এই আশঙ্কায় মহীপাল শুধু রামপালকে নহে, অপর ভ্রাতা সুরপালকেও শৃঙ্খলিত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। এমন কি তিনি রামপালকে বধ করিবারও প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহী কৈবর্ত্তদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া নিহত হন। ইহার পরে কতক সময়ের জন্য সুরপাল রাজা হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন সুরপালকে হত্যা করিয়া রামপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইহা একটি অনুমান মাত্র। সুরপালের রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী ছিল না, এবং তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না—সুতরাং তিনি হয়ত রামপালকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, এই "হয়ত" দ্বারা পুণ্যশ্লোক ভ্রাতা রামপালের ঘাড়ে এত বড় একটা অভিযোগ চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে।

রামপাল।

যাহা হউক রামপাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পাল-সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বিদ্রোহী কৈবর্ত্তেরা উত্তরবঙ্গের সমস্তটা দখল করিয়া লইয়াছিল। দিব্বোকের পরে তদীয় ভ্রাতা রুদোক গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। রামপালের সময়ে রুদোকের পুত্র ভীম কৈবর্ত্তদের অধিনায়ক হইয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, রামপাল তখন পদ্মা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কিন্তু কিরূপে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন, ইহাই ছিল রামপালের দিবসের চিন্তা ও

রাত্রের স্বপ্ন। রামপালের মাতুল "বিদ্যা ধানিকা" নামক দুর্জ্জয় হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় মথনদেব তাঁহার সহায় হইলেন রামপাল জনপ্রিয় ছিলেন, পূর্ব্বগগনের সমুজ্জ্বল সূর্য্য, পালবংশাবতংস রাজ্যহারা রামপালের জন্য সমস্ত গৌড়মণ্ডল মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ করিতেছিল।

[লিপিমালাস্তোত্রের]

এই দেশে এখনও কৈবর্ত্তের সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর, তাঁহারাই সম্ভবতঃ একসময়ে দেশের মুখপাত্র ছিলেন বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গে সমুদ্র ও বড় নদীতে ইহারা দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। ইহাদের শত্রুতে অমাত্যবল ছিল, কিন্তু "দৃষ্টিগত বলং তত্র"। রামপাল সংগঠনের শক্তি ও রাষ্ট্রনীতির উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সামান্য একটি ভূস্বামীর অবস্থায় পরিণত একটি মেটে প্রদীপের সলতের মত শোচনীয় পালবংশের এই দুঃস্থ হতভাগ্য বংশধর কিরূপে কৈবর্ত্তদলের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন,—শতধাবিচ্ছিন্ন এই গৌড়মণ্ডলীকে কিরূপে ঐক্যের সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন তাহা সন্ধ্যাকর নন্দী বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ ভীম কৈবর্ত্তের পরাক্রম ও তাঁহার নিন্দ শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া রামপাল নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে সমস্ত সামন্ত নৃপতিদের গৃহে গৃহে যাইয়া দেখা করিতে লাগিলেন, পাকাচা দেশের দলপতিদিগের সাহায্য পাইবার জন্যও চেষ্টিত হইলেন এবং দিবারাত্র স্বীয় তরুণপুত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যেন মনশ্চক্ষুর নিরাশা ভেদ করিয়া একটু একটু করিয়া আলোর সঞ্চার হইতে লাগিল তিনি বুঝিলেন, দেশের লোকের হৃদয়ের অনুরাগ তাঁহার প্রতি স্থির রহিয়াছে।

যখন দেশবাসিগণের ভালবাসা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে অসমা উৎসাহ ও বাহুতে বল আসিল। তিনি অস্ত্রাগারী, গজাগারী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রাণপণে লাগিয়া গেলেন। তখনও পালরাজগণের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয় নাই। সেই পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত অর্থ তিনি জলের মত বিলাইয়া দিতে লাগিলেন।

কৈবর্ত্তবিদ্রোহের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম সেনাপতি হইলেন রামপালের মাতুলপুত্র রাষ্ট্রকূটবংশীয় শিবরাজদেব। তিনি প্রচণ্ডবেগে ভীমাধিকৃত দেশগুলি আক্রমণ করিলেন—এই আক্রমণের ফলে দেশ জুড়িয়া আতঙ্ক হইবার কথা ছিল,—কিন্তু রাজার অনুজ্ঞাক্রমে শিবরাজদেব যথাসম্ভব সংযম ও সাধুতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অভিযান চালাইতে লাগিলেন। তিনি হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকের বিপুলবাহিনী লইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বত্র দেবত্র ও ব্রহ্মত্র জমি এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। বরেন্দ্রভূমি শিবরাজের বিক্রম ও সংযম এই উভয় গুণেই তাঁহার বশীভূত হইয়া গেল। ভীমের নিযুক্ত সেনাপতিগণ ক্রমশঃ হটিয়া যাইতে লাগিল যেখানে প্রজামণ্ডলী অনুকূল, সেখানে অভিযান অনেক পরিমাণে নিরাপদ্। অল্পসময়ের মধ্যেই শিবরাজ রাজসভায় সংবাদ দিলেন—"বরেন্দ্রভূমি অধিকৃত হইয়াছে।"

কিন্তু সহসা এই বিরাট্ অভিযানের বেগ সামলাইতে না পারিয়া কৈবর্ত্তরাজ একটু

বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও পুনরায় তাঁহার বিপুল বলক্ষয় করা কষ্টসাধ্য হইল না। এবার উভয় পক্ষের জীবনমরণ পণ। কৈবর্তনেতা তাঁহার অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ হইতে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। হিমাদ্রিতুল্য এই বিরাট্ বাহ ভেদ করিতে পারিলে তবে জয়ের আশা,—যে বরেন্দ্র-দেশ তাঁহার পূর্বপুরুষদের পুণ্য জন্মভূমি ও তাঁহাদের শত শত কীর্তিকীর্তিতে সমুজ্জ্বল, যাহা পদস্খলনের ন্যায় রামপাল শিবরাত্রের কল্যাণে কিছুকালের জন্য পাইলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা দেখিতে দেখিতে অল্পকালের পুনরধিকৃত হইয়া গিয়াছিল—তবেই তাহা সত্য সত্য অধিকার করিতে পারিবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন। এই সমস্যার কণ্টকাকীর্ণ মুহূর্তে তিনি সমস্ত সামন্ত-নৃপতি লইয়া এক গোষ্ঠচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন—সেই চক্রে নিম্নলিখিত নরপতিগণ যোগদান করিয়াছিলেন —

১ মগধ ও পীঠাধিপতি ভীমযশা ইনি কান্তকুব্জাধিপতি দেবরক্ষিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন প্রথমতঃ ইনি রামপালের বিরুদ্ধে ছিলেন, একসময়ে মদনদেব (রামপালের মাতুল ভীমযশাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার মিত্রতা আবার করিয়া লইয়াছিলেন এবং স্বীয় কন্যা শঙ্করদেবীকে ইহার সঙ্গে বিবাহ দিয়া সেই সখ্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কৈবর্ত-বিরুদ্ধে অভিযানার্থ একত্র সামন্তমণ্ডলীর মধ্যে ইনিই সম্ভবতঃ প্রধান ছিলেন, যেহেতু ইহারই নাম সন্ধ্যাকর নন্দী সর্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে "মন্দা" উপাধি দিয়াছেন। পীঠ—বর্তমান গয়া-জেলার প্রাচীন নাম।

২। কোটাটবীপতি বীরগুণ। কোটাটবী উড়িষ্যার বিশাল অরণ্যানীবেষ্টিত গড়জাত প্রদেশ। আইন আকবরীতে এই দেশকে কটক সরকারের অন্তর্গত "কোট দেশ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে সন্ধ্যাকর নন্দী বীরগুণকে "নানাবন্ধ-কৃত্রিম-কোটাটবী-ষষ্ঠী-দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। দণ্ডভুক্তির রাজা অরসিংহ। ইনি উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল, রামচরিতে কর্ণকেশরীকে পরাজয় করার জন্য যে বহুপল্লবিত দ্ব্যর্থসমাসযুক্ত উপাধিদ্বারা ইঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে সেই শ্লেষযুক্ত বিশেষণটী ষোড় ছত্র পরিমিত দীর্ঘ।

৪। বালবলভীর অধীশ্বর বিক্রমরাজ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বালবলভী বর্তমান বাগড়ীর প্রাচীন নাম। সন্ধ্যাকর নন্দী এই দেশের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে এই দেশ নদীবহুল ছিল বলিয়া মনে হয়।

৫। সুবর্ণবীথীর অপার মান্দারের অধিপতি সঙ্কটসূদ। রামচরিতে ইঁহাকে "অপার-মান্দার-মধুসূদন-সমস্তাটবিক-সামন্তচূড়ামণি" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে অপার-মান্দার দুর্গেশনন্দিনীর "গড়মান্দারণ"।

৬ কুঞ্জরঘটার অধীশ্বর ভূপাল। ইনি পালবংশের কোন বংশধর হইবেন। কুঞ্জরঘটার এখনও স্থাননির্ণয় হয় নাই।

৭। কৈলকম্পের অধিপতি রুদ্রশিখর। এই স্থানটির বর্তমান নাম 'ভেলভূপি', উহা মানভূম জেলায় অবস্থিত।

৮। উচ্ছালের অধিপতি মহাসাল সিংহ।

৯ ঢেকরীর রাজা প্রতাপসিংহ। ঢেকরী উত্তর-রাঢ়ে অবস্থিত। ইহাই ইছাই ঘোষের "অজের ঢেকুরী", এখানে এখনও ইছাই-ঘোষের প্রায়রূপার মন্দির অতি জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান।

১০। কহ্লর-মণ্ডলের নরসিংহার্জুন।

১১। শঙ্কটগ্রামের চণ্ডার্জুন।

১২। নিস্ত্রাবলের নিজবরাহ নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে এই বিজয়রাজই বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন নামের সাদৃশ্যজনিত অনুমান ভিন্ন এই মতের সমর্থক অন্য কোন প্রমাণ নাই।

১৩ কৌশাম্বীর ঘোষবর্ধন। কুশম্বী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। এখানে নসরৎ সাহের একটি মসজিদ আছে ঘোষবর্ধন সম্ভবতঃ লিপি-প্রমাদ, নামটি গোবর্ধন, কেহ কেহ মনে করেন ইনি ভোজবর্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত গোবর্ধন।

১৪। পদ্মবর্মার সোম।

গৌড়াভিষানার্থ এই চতুর্দশ নৃপতিমণ্ডল-নির্মিত চক্র,বাঙ্গলার ইতিহাসে জাতীয় ঐক্যের একটি বিরল নিদর্শন কৈবর্তপতি ভীম এই দেশেরই লোক, তাঁহার বিরুদ্ধে এত বড় একটা চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন যাঁহারা,—তাঁহাদের বংশধরেরা লক্ষ্মণসেনের বিপদের সময়ে, জাতীয় মহাবিপদের দিনে কোথায় ছিলেন? এই চতুর্দশ নরপতি একত্র হইয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডল যেন এক ব্যক্তি এইরূপ ভাবে ভীমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, এরূপ ঐক্য গৌড়দেশে বড় দেখা যায় নাই এই অপূর্ব ঐক্যের একটি কারণ আমার মনে হইতেছে, কৈবর্ত-রাজা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত জাতির উপর শাসনদণ্ড চালাইবেন—ইহা জাত্যাভিমানের দুর্গন্ধরূপ গৌড়দেশে কাহারও সহ্য হইয়াছিল। এই সাধন-চক্র বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় অধিকাংশ স্থান লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতেই নব ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের হাওয়া পুণ্য ভারতে পৌঁছিয়া কৈবর্তানিকাণ্ডটা জাতীয় সম্মানজ্ঞানকে অভিঘাত করিয়াছিল পালেরা যে জাতীয়ই হউন, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া লোকের শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, পালেরা বৌদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেন

যাহা হউক, তথাপি রামপাল যে এত বড় একটা কাণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় এই সাধন-চক্র লইয়া রামপালদেব প্রবল নৌবাহিনীর সহিত অগ্রসর হইয়া নৌ-সেতু নির্মাণ পূর্বক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণপশ্চিমে কোন স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈবর্তরাজ "মহি কিংবা বারি" সম্বল করিয়া রণক্ষেত্রে 'মহিয়া' হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় কৈবর্তরাজ ভীম রামপালের সেনাপতি বিষ্ণুপালের হস্তে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজার এই বিপদের সংবাদ শুনিয়াও কৈবর্তসেনা একেবারে আশা ত্যাগ করে নাই, তাহারা

আবার একত্র হইয়া হরি নামক সেনানায়কের নেতৃত্বে রামপালের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এবার চাহা কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) জাতির গৌরব পশ্চিমে বিলম্বোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় অস্তস্থায়ী হইয়াছিল। হরিও রামপালের পুত্র রাজপালের হস্তে বন্দী হইলেন। কৈবর্ত্তপতি ভীম তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি সহিত একই শৃঙ্খলে বলভূতার দ্বারা নিহত হইলেন। কৈবর্ত্তেরা তিন পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকার গৌড়মণ্ডলের বহুদূরব্যাপক হইয়াছিল। তাম্রশাসনে তাঁহাদের রাজগণ "কৈবর্ত্তবিদ্রোহ" নামের কলঙ্ক ললাটে ধারণ করিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহীপালের নিষ্ঠুরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই যে এই বিদ্রোহিদলের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভীমরাজকে নিহত করিয়া রামপাল তাঁহার রাজধানী ভমর-নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্ত্তরাজগণের প্রতি এতটা বিদ্বিষ্ট ছিলেন যে তাঁহাদের রাজধানীকে তিনি 'উপপুর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদি ভীম জয়ী হইতেন, তবে রামপালের কার্য্যটাই "বিদ্রোহ" নামে অভিহিত হইত, জয়ের গৌরব ও পরাজয়ের কলঙ্ক বাস্তু ইতিহাসে চিরপরিচিত। কৈবর্ত্তগণের ক্ষোভের কারণ নাই। কৈবর্ত্তরাজ ভীমের খুল্লপিতামহ দিব্বোক দ্বিতীয় মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া বিদ্রোহাগ্নে যে স্বল্প ইন্ধন সংযোজিত করিয়াছিলেন তাহা এখনও রামচরী নেতার এক কীর্ত্তির উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গের যত্রতত্রে যে বিশাল মৃৎপ্রাকারের অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়, এবং যাহা "ভীমের পাঙ্গাল" নামে প্রসিদ্ধ তাহা ভীম কৈবর্ত্ত রামপালের সামন্তচক্রের গতিরোধ করিতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রামপাল ধনাঢ্য ও মহাপ্রভব ব্যক্তি ছিলেন। ভীমকে বন্দী করিয়া তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে সমোচিত মর্য্যাদা ও আতিথ্য দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু যুদ্ধান্তে কৈবর্ত্ত সেনা পরাজয় স্বীকার করিয়াও সেনাপতি হরির নেতৃত্বে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ করাতে তিনি ভীম ও তদীয় সেনাপতির বধাজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সামন্ত রাজারা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ইহাদের জীবিত থাকা তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে নিরাপদ নহে।

রামপালের চরিত্র।

কৈবর্ত্তযুদ্ধে ভীমরাজা কলিঙ্গ অধিপতির সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই রাজার নাম কণ, "উৎকলেশ-কাকেশরী"। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কেশরীবংশের রাজা ছিলেন। রামপালের সামন্তচক্রের অন্যতম প্রধান বীর রণস্তম্ভের অধিপতি জয়সিংহ উৎকলে অভিযান করিয়া এই রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষের কবি সন্ধ্যাকর, যিনি কৈবর্ত্তদিগের প্রতি অতি-বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং ভীমকে রাবণের সঙ্গে উপমা দিয়া তাঁহার রাজধানীকে উপপুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তিনিও ভীমের চরিত্রের কতকগুলি গুণের উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। ভীম স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের আদর জানিতেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন এবং মুক্তহস্তে দান করিতেন। এই সকল

ভীমের গুণাবলী

গুণ বুঝাইতে তিনি নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি ব্যবহার করিয়াছেন—"লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের আবাস" তাঁহাকে পাইয়া "বিশ্ব অভিনব সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। এই বৈবর্ত রাজারা শুধু শারীরিক বলে দেশ অধিকার করেন নাই, ইহারা লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন।

রামপালের বিজিগীষু

ভীমকে জয় করিয়া রামপাল তাঁহার পূর্বপুরুষদের রাজভূমি বরেন্দ্রমণ্ডলের অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছিলেন ক্রমে সমস্ত গৌড়মণ্ডল তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল এবং পালবংশের ভাগ্যলক্ষ্মী পুনরায় এই বংশের প্রতি কতকটা সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। রামপাল সমস্ত মিথিলা দেশ ও বর্তমান বেহার জেলার উত্তরাংশ চম্পারণ এবং দারবঙ্গ জেলায় অধিকার করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তিনি কামরূপও জয় করিয়াছিলেন। যেহেতু আমরা দেখিতে পাই তাঁহার পুত্র কুমারপাল কামরূপের সিংহাসনে তাঁহার এক মিত্ররাজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সেক-শুভোদয়া পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, এই গল্পটি আমাদের কাছে একেবারে অলীক বলিয়া মনে হয় না, তবে "কলামুদ-কৌমুদী" সেক শুভোদয়ায় অনেক গল্প ও উপন্যাস আছে, এজন্য খুব জোর করিয়া এই গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ একটি গল্প সৃষ্টি করিবার কোন কারণ নাই রামপাল যে নিজে পারিবারিক শোকে নদীর জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। মাতুল মথনদেবের মৃত্যুতে তিনি এরূপ শোক পাইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী এইরূপ কথা লিখিয়াছেন

মকপালের মৃত্যুদণ্ড।

সেক-শুভোদয়ায় লিখিত আছে যে রামপালের পুত্র কোন ব্রাহ্মণ-বালককে বধ করেন। সেই রমণী রাজদরবারে অভিযোগ করে। রামপাল স্বীয় তরুণ বয়স্ক পুত্রকে শূলে দেওয়ার হুকুম প্রদান করেন এই ঘটনাটি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় আরও একটু বিস্তারিত করিয়া তৎসম্বন্ধে রাজসাহী অঞ্চলে প্রচলিত জনপ্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, রামপালদেবের যে পুত্র এইরূপ দুষ্কার্যের করেন তাঁহার নাম মকপাল ধর্মিষ্ঠা-রমণী আলুলায়িত কুন্তলে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া রামপালের সম্মুখে সমস্ত ঘটনা বলিয়া তাঁহার কলঙ্কিত জীবনের আর কোন মূল্য নাই – এইরূপ জানাইয়া বিষ পান করিয়া সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনায় রামপাল ভুলিয়া গেলেন যে তিনি মকপালের পিতা ভুলিয়া গেলেন যে কুমারের বিবাহিতা স্ত্রী ও স্নেহ-তুরা জননীর পক্ষে রাজকুমারের প্রতি উচিত দণ্ড দিলে তাহা অসহ্য হইবে তিনি তাঁহাকে শূলে দেওয়ার হুকুম দান করিলেন তাঁহার মাতা সাক্রনেত্রে পুত্রের জীবনভিক্ষা করিলেন, কিন্তু ন্যায়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা কিছুতেই তাঁহার কর্তব্যবিচ্যুত হইলেন না। কুমার মকপালকে শূলে দেওয়া হইল এবং সেই শোকে রাজমহিষী ও রাজবধূ আত্মহত্যা করিলেন রামপাল স্বয়ং এই শোক সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও নদীগর্ভে তাঁহারজীবন বিসর্জন করিলেন। সেক-শুভোদয়া-কার লিখিয়াছেন, রামপালের এই কার্যের ন্যায়নিষ্ঠার

সমস্ত প্রজা এরূপ কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান্ হইয়াছিল, যে অদ্যাবধি রাজ্যের লোকেরা পুণ্যশ্লোক নৃপতির এই বিস্ময়কর ত্যাগের কথা গান করিয়া থাকে। "অদ্যাপি তেষাং যশো গীয়তে লোকৈঃ, রামপালো রাজা একমেব পুত্রং অপরাধিনমপরাধিনং বা ভূমেন যোজয়ামাস"—শেক শুভোদয়া তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথও লিখিয়াছেন যে, রামপালের মকপাল নামে এক পুত্র ছিল। এই গল্পের বিশ্লেষণ করিতে গেলে হয়ত অনেক ঐতিহাসিক সূত্র বাহির হইতে পারে, কিন্তু মোট ঘটনাটি অসত্য বলিয়া মনে হয় না। এত বড় একটা ঘটনা লইয়া যে পল্লীগীতি রচনা হইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না।

রামপাল গৌড়রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রমাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। রমাবতী আবুলফজলের আইন আকবরীতে রমৌতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই 'রমৌতি' বা "রমতি" নগরের নাম প্রাচীন বাঙ্গলা রূপমঞ্জরীগুলিতে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রমাবতী-নগরী পদ্মা ও করতোয়ার মধ্যে অবস্থিত ছিল। রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের তাম্রশাসনেও রমাবতী নগরী রাজধানীরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। রামপাল এই নগরে "জগদ্দল মহাবিহারের" প্রতিষ্ঠা করেন।

রমৌতি

রামপালের মৃত্যুর পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপালের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং দ্বিতীয় পুত্র কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে ইঁহার যে সকল গুণের উল্লেখ আছে তাহা পড়িলে মনে হয় কোন দুরূহ মহাকাব্য পাঠ করিতেছি। ইনি সমুদ্রের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে উপমিত হইয়াছেন, কি কি বিষয়ে উপমিত হইয়াছেন, তাহার তালিকা দিলে এই পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা পূর্ণ হইবে। প্রশস্তিকার এইভাবে উপমার ঝুড়ি সাজাইয়া শেষে ছন্দে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না, হইল না,"—একটি বিষয়ের অভাবে সমুদ্রের সহিত কুমারপালের তুলনা চলে না—সুতরাং তাঁহাকে সমুদ্রের সহিত উপমা দেওয়া উচিত নহে। সমুদ্র রাঘবের সেতুর দ্বারা লঙ্ঘিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কুমারপালকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, অর্থাৎ তিনি কোন শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হন নাই। একথা ঠিক কিনা তাহা বিচার্য্য। রামপালের পর পালরাজগণের ঘর পড়ল, তখন কি তিনি নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভ করিয়া সুখ শান্তিতে ছিলেন? এই সকল তাম্রপটের পাণ্ডিত্য আমাদিগকে "গে ড্যাম-রীতি" কি পদার্থ তাহা বারংবার স্মরণ করাইয়া দেয়।

পরবর্ত্তী পালরাজগণের সহিত কুমারপালের প্রভেদ।

একথা ঠিক যে যখন কামরূপের রাজা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কুমারপাল তাঁহার অন্যতম সুহৃৎ ও অমাত্য বৈদ্যদেবকে বিদ্রোহ-নিবারণের জন্য প্রেরণ করেন। বৈদ্যদেব আমত বিক্রমে কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং কুমারপাল এই সংবাদে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া বৈদ্যদেবকে কামরূপের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের সময়েও কুমারপাল সেনানায়ক হইয়া স্বীয় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

বৈদ্যদেবকৃত আদান-প্রদান।

কুমারপালের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মদনপাল রামপালের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, ইনি রাজ্ঞী মদনদেবীর গর্ভজাত মদনপালের রাজধানীর নাম ছিল "চিত্রমতিকা"। ইনি ব্যাসদেবের সমগ্র মহাভারতের পাঠ শুনিয়াছিলেন এবং পাঠক বটেশ্বর স্বামী শর্ম্মাকে একটি গ্রাম পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করেন। মদনপাল রাজা হইবার আটবৎসর পরে এই দান সম্পাদিত হইয়াছিল। মদনপাল সম্ভবতঃ এই সময়েই সেনবংশের আদিরাজগণের কাহারও দ্বারা মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তিনি কান্যকুব্জের রাজার সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় গোপাল, নামে মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই পালবংশের রাজত্বের উপর শেষ যবনিকাপাত হয়। যে বংশ প্রায় পাঁচ শত বৎসর রাজা করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের রাজত্বকালে বাঙ্গলা দেশ সৌর্য্য, বীর্য্য, শিল্প-কলা, স্থাপত্য, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই অমরকীর্ত্তি ও সম্পদ লাভ করিয়াছিল, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই বংশের শেষ দীপ নিবিয়া গেল। তৃতীয় গোপালের পর পালবংশের বংশধর আর দুই এক জনের নাম জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। তিব্বতীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন—"এই বংশের গোবিন্দপাল নামক এক রাজা ১১৫৫ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন পালেরা বঙ্গের গৌরব অশেষরূপে বাড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন কান্যকুব্জাধিপতিকে পরাভূত করিয়া স্বীয় সামন্তকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, অপর এক জন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজবংশ উচ্ছেদ করিয়া স্বীয় আশ্রিত বন্ধুকে তথাকার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন যাঁহারা ইচ্ছিতে এই ভাবে নূতন রাজবংশ সৃষ্টি করিতে পারিতেন তাঁহাদের প্রতাপ যে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র স্বীকৃত ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহারাই বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর (উদন্তপুর) এবং জগদ্দল বিহারের স্থাপয়িতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন

মুসলমানবিজয়ের সময়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন পাল নামক এই বংশের এক রাজা মগধের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন মুক্তের হেলায় ইন্দ্রদ্যুম্নের কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রার অস্তিত্ব এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে। পণ্ডিত তারানাথ পাল রাজগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাম্রশাসন ও শিলালিপি-লিখিত রাজগণের মিল নাই কিন্তু তারানাথ এবং বৃন্দাবন দাস যে সকল পালরাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন তাম্র বা প্রস্তরলিপি না পাওয়া গেলেও তাঁহাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। হয়ত কোন রাজা তাম্রশাসন প্রচার করেন নাই, বহুসংখ্যক শিলালিপি যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, অনেকই লুপ্ত হইয়াছে, অল্পমাত্র আছে এই বিশাল পালবংশের শাখাপ্রশাখার ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নৃপতি ছিলেন, একথা সত্য যে জনপ্রবাদের প্রমাণ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা একবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। তারানাথের তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

১। গোপাল—৭৬০—৭৮২ খৃঃ
২ দেবপাল—৭৮৩ ৮৫৩ খৃঃ
৩। বিগ্রহপাল—৮৫৩—৮৬৮ খৃঃ
৪। ধর্ম্মপাল—৮৬৮—৮২৯ খৃঃ
৫। মধুরক্ষিত—৮২৯—৮৩৭ খৃঃ
৬। রাণপাল—৮৩৭—৮৪৭ খৃঃ
৭ মহীপাল—৮৪৭—৮৯৯ খৃঃ
৮ মহাপাল—৮৯৯ ৯৩০ খৃঃ
৯। সামুপাল—৯৪০ ৯৫২ খৃঃ
১০। প্রেষ্ঠপাল—৯৫২—৯৫৫ খৃঃ
১১। নয়ক—৯৫৫—৯৮৩ খৃঃ
১২। ভায়াপাল—৯৮৩—১০১৫ খৃঃ
১৩। জয়পাল—১০১৫ ১০৫০ খৃঃ
১৪। ভাতপাল—১০৫০—১০৬৩ খৃঃ
১৫ ত্রিভুপাল ১০৬৩—১০৭৮ খৃঃ
১৬। মাহিপাল—১০৭৮—১০৯২ খৃঃ
১৭ রামপাল ১০৯২ ১১৩৮ খৃঃ
১৮ কুমারপাল—১১৩৮ ১১৩৯ খৃঃ

কোন কোন স্থানে রাজগণের একাধিক নাম ছিল। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে একরূপ নামে চিনিত, কিন্তু রাজশাসন ও রাজকীয় কালে তাহাদের নাম অন্যবিধ হইত। আবার কোথাও রাজার অনেক পুত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজা শাসন করিতেন, তাম্রশাসনে শুধু এক শাখার বংশাবলী উল্লিখিত হইত, অন্যান্য শাখার কোন উল্লেখ দেখা যাইত না। এই সকল নানা কারণে বংশাবলীর এই রূপ অনৈক্য ঘটিয়া থাকিবে। পালবংশের মূলশাখার বহু উপশাখা ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত ও প্রজাপক্ষ সর্দ্দার ও লোক সৌজন্যবশতঃ রাজা নামে পরিচিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই রাজগণকেও তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকিবে। সোড়শ শতাব্দীতে তুলাদন সাহোক্ত ভোগীপাল ও ভোগীপাল সম্বন্ধে পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা ছিল লেখক মহীপালের সঙ্গে ইহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তারানাথের ভুলগুলি স্পষ্ট। ইহা ছাড়া ঢাকা জেলার তাওয়ালের জঙ্গলে যে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ শিলিপালের বাড়ী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং জনসাধারণ যাহাকে মহাভারতোক্ত চেদিরাজের প্রাসাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে, তিনিও খুব সম্ভব পালবংশের কেহ হইবেন। অনেক স্থলেই সামান্য সামান্য ভূখণ্ডের অধিপতি রাজপুত্রেরাও রাজতালিকায় উপযুক্ত স্থান পাইয়াছেন। কথিত আছে, পালবংশে ৫২জন রাজা ছিলেন

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালরাজত্বের নানাকথা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ

"এ পয়ঃ পারে, কত কত নাতায় ভাতিল কত শত রাজা ও
আসিল গ্যাপিল, ভাঙ্গিল রাজ্য, বাঁচি রয় কত পরিপাটী ও ॥
কত শত দুর্জ্জয় দুর্গম দুর্গে, বেড়িল তব তটদেশ ও
নগরে প্রান্তরে, ঘেরিল সেনে চির-যুগ-সম্ভোগ আশে ও ॥
উপহসি সর্ব্বে মানব-গর্ব্বে, কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুরে, কতিপয় দূরে রাখিল কীর্ত্তি বিকলাকৃতি ও ॥
ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে, গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছি যে সব উজ্জ্বল লেখা, সে গত-যৌবন-রেখা ও ॥"

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

পাল রাজাদের অধিকারকালে বঙ্গদেশ যে সকল প্রাদেশিক ও বিদেশী ক্ষুদ্র ও বড় রাজাদের সংস্রবে আসিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব।

বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ।

১। বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ণচন্দ্র আধুনিক রোটাস্-নগরের রাজা ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা সুবর্ণচন্দ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের রাজা হন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থলের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র তৎপরে সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ মাণিকচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিলে ইনি পৈতৃক অধিকারসূত্রে বিক্রমপুরের কতকাংশের মালিক হইয়া গৌড়ের এক বিস্তৃত জমিদারী খিরাজ স্বরূপ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি মিহিরকুলের (ত্রিপুরা) রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতীর পাণিগ্রহণ করিয়া ত্রিপুরদেশের এক বিস্তৃত অংশের অধিকারী হন। তাঁহার রাজধানী ছিল পটিকায়,—আধুনিক পাটিকারাতে। এখনও তথায় মাণিকচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৪ ইঞ্চি পরিমিত একখানি উমামহেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, উহা এখন আমার নিকট আছে। মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী পরমসুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। কথিত আছে রাজা প্রৌঢ় বয়সে কএকজন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে একজন সুন্দরী ও তরুণী ছিলেন। সেই নব বিবাহিতা ষোড়শীর রূপে মুগ্ধ হইয়া

তিনি ময়নামতীকে তাড়াইয়া দেন, যেহেতু পত্নীর সঙ্গে এই নূতন স্ত্রীর সর্ব্বদা ঝগড়া হইত। ময়নামতী অতি অল্প বয়সে ভারতবিখ্যাতকীর্ত্তি মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিষ্যা হন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন কথিত আছে ১২ বৎসর বয়সে রাজকুমারের বিষ্ঠা ছিল এবং যদি দ্বাদশ বর্ষ তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দেশত্যাগী হন, তবেই এই বিঘ্ন কাটিয়া যাইতে পারে—দৈবজ্ঞগণ গণিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। রাজার মৃত্যুর পর রাজ্ঞী ছিলেন দেশের শাসনকর্ত্রী কিন্তু যখন কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখনই রাজ্ঞীর আদেশে তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিতে হয় এই উপলক্ষে একদল লোক ময়নামতীর বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা প্রচার করেন তিনি এবং হাড়িসিদ্ধা উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে সমস্ত রাজ্য উপভোগ করিবার ইচ্ছায় নাকি রাণী তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক একমাত্র পুত্রকে দ্বাদশবৎসরের জন্য বনে পাঠাইয়াছিলেন। গোপীচন্দ্রের স্ত্রী অদুনা তৎস্বরে রাণীর এই অপবাদ ঘোষণা করিয়া পতিকে বিরক্তিভোগে ইচ্ছা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—পল্লীগুস্তিকায় এই সকল কথা দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল।

এখন ঐতিহাসিকগণের অনেকে এই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপির বঙ্গাধিপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার অল্পবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণে দেশময় যে শোকের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা লইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বোম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত দেশগুলিই পল্লীগীতি রচনা করিয়াছিল ত্রিপুরা কোলা ও উড়িষ্যায় এখনও "বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র" গানের ছড়া প্রাচীন লোকদের মুখে শোনা যায় গোপীচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র নামের কথাও, চরিত মল্লিক কৃত পল্লীগাথায় তাহা উল্লিখিত আছে। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অনেকটা জুড়িয়া রাজত্বশাসন করিতেন, ত্রিপুরমণ্ডলের পার্ব্বত্যপ্রদেশের এক বিস্তৃত অংশ তিনি তাঁহার মাতামহ হইতে প্রাপ্ত হন। গৌড়ের কতকাংশ তিনি বিজয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিতান্ত নগণ্য রাজা ছিলেন না। গোরক্ষনাথের শিষ্য হওয়ার ফলে তাঁহার এই ত্যাগ শিক্ষাসভ্যতাপালনকারী নামের নিষ্কাসনের মতই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, যেহেতু গোরক্ষশিষ্য নাথ-সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই পল্লীগাথা সর্ব্বত্র গান করিয়া বেড়াইতেন সেদিন পর্য্যন্তও বোম্বাই সহরে "বঙ্গাধিপ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" অভিনয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত, এবং রাজা রবিবর্ম্মা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের একটি চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঘরে ঘরে বঙ্গাধিপের এই ত্যাগের মূর্ত্তি আদৃত হইয়াছে

গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস।

গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাসের হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা-পদুনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিদায়কালে অদুনার বিলাপ করুণরসের নিঝরস্বরূপ। তদপেক্ষাও করুণরসাত্মক দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ অন্তে স্বামি স্ত্রীর মিলনের দৃশ্য। দ্বাদশ বৎসর পর গোবিন্দচন্দ্র গৃহে ফিরিতেছেন; ১২ বৎসরে সন্ন্যাস অবলম্বন, ১৩ বৎসরে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন। তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি ধূলিধূসর, শিরোরুহ দীর্ঘ জটাজুট, অনশনে অস্থিচর্ম্মসার;

তিনি প্রিয়দর্শন ও অপরূপশ্রীসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার সেই রূপ—সেই সৌন্দর্য্য আর নাই। তিনি রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে প্রহরীরা বাধা দিল, কিন্তু সন্ন্যাসীর উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইল না। রাজ্ঞী মদনা রাজহাস্তদ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন,—রাজহস্তী স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিয়া হাটু পাড়িয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া পড়িল, তাহার দুইচক্ষু হইতে অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রাজ্ঞী ভীমদর্শন রাজকীয় শিকারী কুকুর লেলিয়া দিলেন, ঘোর চীৎকার ও আস্ফালন করিয়া কুকুর যাইয়া সন্ন্যাসীর মুখ দেখা মাত্র তাঁহার পদলেহন করিতে লাগিল। তখন অশ্রুসিক্ত মুখে রাজ্ঞী বলিলেন, "বনের পশুরাও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" এই সকল কাব্যকথা পল্লীকথাকে সরস করিয়াছে, ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি জানি না।

এগুলি হয়ত সত্যই কাব্য কথা, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ ঐতিহাসিক সত্য, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রাজেন্দ্রচোলের সঙ্গে ইঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, পরীগাধায় তাহার উল্লেখ আছে। রঙ্গপুর অঞ্চল হইতে নীলকামরি সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে মাতৃকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—উড়িষ্যার দক্ষিণ দিক্ হইতে এক রাজা বঙ্গে আসিয়া ইঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া তাঁহার কন্যা গোবিন্দচন্দ্রকে সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করেন। এই দক্ষিণ-উড়িষ্যা হইতে আগত রাজাই সম্ভবতঃ রাজেন্দ্রচোল। তিরুমলয় শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে—গোবিন্দচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হাতীর পীঠে চড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলেন, এই রাজা যে পরাস্ত হইয়াছিলেন কিংবা আদৌ কোন যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। যাহা হউক অতি অল্প দূর অগ্রসর হওয়ার পরেই রাজেন্দ্রচোলকে সন্ধি করিতে হইয়াছিল। সুতরাং দুই দিক্ হইতেই এই ঘটনাটি দুইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজাদের স্তাবক কবিদের কথার কতকটা বাদ দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। রাখালদাসবাবু লিখিয়াছেন, "শ্রীচন্দ্রের বংশধরগণ পরে পালরাজগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন পরবর্ত্তী রাজা রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক।" রাখালদাসবাবু তাম্রশাসন ও শিলালিপির কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতেন, তদ্ভিন্নে যদি সুদীর্ঘকালের কোন জন-প্রবাদ বা গাথা থাকে, তাহার উল্লেখ করাটাও ঐতিহাসিক অঙ্গহানি বলিয়া মনে করিতেন। ইহাও এক প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্র। চোলরাজ রাজেন্দ্রের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে লিখিত আছে—"তিনি কর্ণাটদেশ, চর্ম্মপাদুকা এবং বলয়বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার অনুচর বলসম্পন্ন হস্তিসমূহ এবং বন্যোপম রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলাদেশে যেখানে কটুবৃক্ষও কখনও বিরাজ নাই সেখানে গঙ্গাপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন।"

রাজেন্দ্রচোল ১০২৫ খৃঃ।

ত্রিপুরার ইতিহাসে আমরা কোন কোন স্থানে দুই পক্ষের স্তাবক-কবিকৃত ঘটনার দুইরূপ বিবরণ পাইয়াছি। শ্রীকরণ নন্দী কৃত ছুটি খাঁর বিস্তৃত কাহিনী ও রাজমালার ধন্য মাণিক্যের রাজত্বের বিবরণ দ্রষ্টব্য। রাজেন্দ্রচোলের অপর নাম ছিল "পরকেশরী বর্ম্মা" এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত শিলালিপি তাঁহার রাজত্বের প্রয়োদশ অব্দে (১০২৫ খৃঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ময়নামতীর গানে ও গোরক্ষবিজয়ে যে সকল প্রসিদ্ধ নাথ-যোগীদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের অনেকেই ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে ১৩২৮ বাং সনের পৌষমাসের 'ইতিহাস ও আলোচনা' পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম এ মহাশয় যে গবেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন —

ত্রিপুরা নাথ-যোগীদের অন্যতম প্রধানকেন্দ্র

(১) শালবান্ রাজার পুত্র "গাভুর সিদ্ধাই" ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়বাসী ছিলেন। কুমিল্লা হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে 'শালবানপুর' গ্রাম ও তথায় "শালবানের দীঘি" এখনও বিদ্যমান। ঐ গ্রামে শালবানের প্রাচীন-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই বাসভবন শালবান্ ও হাড়িপা সিদ্ধার বাড়ী বলিয়া জনশ্রুত আছে। যে চৌরঙ্গী এখন জগদ্বিখ্যাত, তাহা যাঁহার নাম স্মরণ করিতেছে, সেই নাথ যোগী চৌরঙ্গীও এই শালবানপুরে বাস করিতেন, তাহা একখানি প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। "বঙ্গ-যোগী" নামক পুঁথিতে ৮৪ সিদ্ধার অন্যতম প্রধান সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ যে শালবান্ নগরে যাতায়াত করিতেন, তাহা লিখিত আছে, "যেন মতে চৌরঙ্গী গেল শালবান নগরে।" গাভুর সিদ্ধা যে শালবানের পুত্র তাহা গোরক্ষবিজয়েই পাওয়া যায়, "তথাপিহ হই আমি সালবানের বেটা" (২১ পৃষ্ঠা)।

(২) ময়নামতীর সম্বন্ধে ত্রিপুরার পর্ব্বতে নানা প্রবাদ আছে—একটি পাহাড়ের নামই "ময়নামতীর পাহাড়", ময়নামতীর গৃহে একটি সুড়ঙ্গ আছে, জনশ্রুতি ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধা অদৃশ্য হইয়া যান, ঐ সুড়ঙ্গের পার্শ্বে ত্রিপুরেশ্বরের একটি সুরম্য "বাঙ্গালা" আছে। সম্প্রতি সুড়ঙ্গটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) মীননাথ যে "কদলীর দেশে" ("উত্তরে যিনাই") উত্তর দিকে গিয়াছিলেন, মীনচেতনে ও গোরক্ষবিজয়ে সেই স্থান সম্বন্ধে 'সিদ্ধাই' শব্দটি দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার উত্তরে শ্রীহট্টের নিকট 'সিদ্ধাই' গ্রাম এখনও আছে এবং তথায় যোগিগুরুর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে; গোরক্ষবিজয়ে এই প্রসঙ্গে যে 'মেখলী কাঁথার' উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা মণিপুরীরা এখনও প্রস্তুত করিয়া থাকে।

আমি মাণিক্যচন্দ্র রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উমা-মহেশ্বরের প্রস্তরমূর্ত্তির কথা লিখিয়াছি। এই মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে দিয়াছেন, আমার মনে হয় বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র যে উমা-মহেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, তাহার আদি-ইতিহাস নাথযোগীদের সঙ্গে জড়িত।

শীতলবাবুর সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষের একটী প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায় নাম বজ্রাবলম্বীদিগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল—ত্রিপুরা জেলা ও শ্রীহট্টের উপান্ত দেশ।

চন্দ্র রাজাদের যে বংশলতা পাওয়া যাইতেছে, তাহা এইরূপ —

চন্দ্রবাজগণ

পূর্ণচন্দ্র—ইনি বহু তাম্রস্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং অনেক দেববিগ্রহের পাদপীঠে ইহার নাম উৎকীর্ণ ছিল

সুবর্ণচন্দ্র—সম্ভবতঃ নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার ইহার দ্বারা স্থাপিত।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র—ইনি চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন এবং ত্রিবেণের (পূর্ণবঙ্গ) বিজয়ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন।

শ্রীচন্দ্র

শ্রীচন্দ্রের দুইখানি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একখানি অসম্পূর্ণ। কেহ কেহ অনুমান করেন—বংশাবলী উৎকীর্ণ হওয়ার পর কোন ঘটনাবশতঃ হয়ত তাম্রশাসন তদবস্থায় রহিয়া গিয়াছে, বাকীটুকু পূর্ণ করিবার সুবিধা হয় নাই। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, রাজকার্য্যে বংশাবলীর অংশ অনেক তাম্রপত্রেই উৎকীর্ণ হইয়া প্রস্তুত থাকিত, কাহাকেও দানপত্র দেওয়ার সময়ে বাকী অংশ উৎকীর্ণ হইত, এই তাম্রলেখটি ঐরূপ একখানি। তাম্রলিপির অক্ষর দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমের বলিয়া অনুমিত হয়।

ঢাকা জেলার সাভার হইতে যে শিলালিপির প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহার পাঠ 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা অপর এক রাজবংশের নাম ও বিবরণ পাইতেছি। ঢাকার আট মাইল উত্তরে সাভার গ্রামে একটা বড় জঙ্গলে ধলেশ্বরী নদীর তীরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জঙ্গল হইতে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি এবং নানারূপ কারুকার্য্যসম্বলিত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি পাওয়া গিয়াছে। সাভারের একটা মঠের নিম্নে যে শিলালিপি ক্ষোদিত ছিল তাহার মূল সংস্কৃত, ঢাকা রিভিউ, ১৯২০-২১ সনের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহার প্রতিলিপি পাদটীকায় দেওয়া হইল। পরপৃষ্ঠায় অনুবাদটি মুদ্রিত হইল। *

* নব পুরাণ

যে কাশো বীরেন্দ্র মন্ত্রিতাল্পি কলৌদনশ্চ
বীমলো বীরেন্দ্রমুকুটাং ভীমাদেবাং সেনাং।
সোদরো বৈরিশল্য পেতরাজিরাজঃ সংবাং
আবাসিয়াদ্বিবন বসিতে ভাসলীবে প্রবেশে। (১)।
কলাবতী কৃতাদুত প্রতিষ্ঠঃ
হরেন্দ্র পাত্র স চ ভাসলীনঃ।

"নব সুগতায়

(১) গুপ্তরাজ চন্দ্রবংশপ্রভাত, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা ভীমসেন, যিনি অটুট ধৈর্য্য ও সংযমের প্রতীক ছিলেন, তাঁহার পুত্র ধীমন্ত সেন দশবল (বুদ্ধ) দেবের উপাসক ছিলেন, এজন্য ভ্রাতৃবর্গের সহিত ইহার মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও অরণ্যপূর্ণ ডাবলীন দেশে উপনীত হন।

মহেন্দ্রের শিলালেখ।

"এই ধীমন্ত সেন তাঁহার অধীন যোদ্ধৃবর্গ ও সেনাপতিদের সাহায্যে গঙ্গার দক্ষিণ দিকে বংশবাটী (অধুনা বংশাই) ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ডাবলীন প্রদেশে তুঙ্গত্ব কিরাতদিগকে জয় করিয়া সেই দেশ অধিকার করেন।

"ধীমন্ত সেনের পুত্র রণধীর সেন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বিক্রমী মহাবীর ছিলেন, তিনি হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়া সদার নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

ধীমতসেনঃ মহাসত্ত্বশার্দ্দূলঃ
রাজর্ষিঃ স্যা প্রকাশঃ কিরাতাঃ। (২)।
ধীমতপুত্রো রণধীরসেনঃ
সংগ্রামজেতা ইব কার্ত্তিকেয়ঃ।
হিমালয়ান্তাং প্রশাস্যক্ষিতিত্রং
সদারনাম্যাবসথং প্রবীরঃ। (৩)।
হরিস্তস্যো মহারাজ রণধীরস্য পুত্রকঃ
যশেন ইব কর্ত্তান্তা যশাঃ কৃৎস্নোবাকঃ। (৪)।
নৃপেশ্বরাণাম্যার্জ্জব হরিস্তস্য ইবাভবৎ।
প্রশস্তিলোকাস সর্ব্বাম্ যং আহুঃ ইব বাদবঃ। (৫)।
যমুনাত্রাসিনী তীরে পৌত্রাভবৎ নিবেশিতে
বিষয়ে চ স রাজর্ষি বর্ত্তার্থং পার্থিবীতে। (৬)
ভিন্নকজুলে প্রবলিন; পশ্চাৎ:
মহাঙ্গনঃ কিঞ্চিৎ পুরঃচক্র;।
ছায়ধিপা কণ্টক-পরিপিলা
সুবালিকা ইব যমলার্জ্জি ভোগ ঃ (৭)।

হরিস্তস্তস্য পুত্রেণ মহেন্দ্রেণ মহীভৃতা। কৃতঃ কলশং যে মহেন্দ্র
প্রশস্য হরতঃ দেব ভূতিঃ পালনী যস্য কর্ত্তীস্য শিলালেখন হিমকুটাবস্থপ্রভূম ।

শকাব্দা—(অস্পষ্ট) ।

• মিঃ ষ্টেপলটন ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই প্রশস্তির যে প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন আমি তাহাই প্রকাশ করিলাম। ইহাতে অনেক ভুল ও পাঠোদ্ধারের গোলযোগ আছে।

"রণধীর সেনের পুত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের ন্যায়ই ধর্ম্মাত্মা ও কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন।

"তিনি ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া প্রজাদিগকে শাসন করিতেন এবং সূর্য্যবংশে-প্রদীপ হরিশ্চন্দ্রের মতই প্রতাপশালী ছিলেন।

"স্বভাবতঃ চন্দ্র কলঙ্ক বহন করে কিন্তু ইনি ভিষক্‌কুলের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র। এই রাজর্ষি যমুনার (যমলক্রীড়িনী ?) তটে নির্জ্জন বৌদ্ধমূর্ত্তিশোভিত মঠ-মন্দিরে বাস করিতেন।

"হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রাজর্ষি মহেন্দ্র,—তিনি এই কণ্টকাকীর্ণ পার্ব্বত্য জঙ্গল চন্দনতরু নিষেবিত করিয়াছিলেন,—তিনি এই মঠ ঈনাব্ধাদ্রিহিত শকে শিবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন

"ভিষক্ মাধবের পুত্র কবীন্দ্র শিবদাস স্বমঠকে প্রণামপূর্ব্বক এই শ্লোকমালা রচনা করিলেন। শকাব্দা (অস্পষ্ট)।"

এখন "ঈনাব্ধাদ্রি"র অর্থ —ঈন = ১২, অব্ধ = ৪, অদ্রি = ৭, = ১২৪৭ শক ("সপ্ত কুলাচল" = ১০৭৪ খৃঃ অব্দ সর্ব্বত্রই যে অঙ্ক বাম দিক্ হইতে পড়িতে হইবে, এমন নহে অঙ্কের সোজাসুজি পাঠ আমরা অনেক স্থানে পাইয়াছি, যথা ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে "শনে রন্ধ্র চৌত্রিশা" (রন্ধ্র ১১ + ৩৪ = ১১৩৪ বাং সন), খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গলে —"ভুবনশকে বায়ুমাসে শরের বাহন, খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন" (১৪ ভুবন ৪৯ বায়ু = ১৪৪৯ শক, শরের বাহন মাস ধনু অর্থাৎ পৌষ মাস।, জয়নারায়ণকৃত কাশীখণ্ডে "মিত্র শতচৌদ্দ শক" = ১৪১৪ শক, গোপালভট্ট-প্রণীত বল্লাল-চরিতে "অঙ্কবামস্য মানে বসুভির্বাহনধিকশাকেষু" = ১০১৩ শক, আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিতে "শাকে চতুর্দ্দশশতে মনুস্বরদনমুতে" (মনুবাদস্ত = ৩২) = ১৪৩২ শক, ঐ পুস্তকের অন্যত্র "সপ্তবেদেষ্ট বিংশযুতে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ স্বাপ্তিঃ সাদ্ধং মহাভাগং উৎপপাত: দিবং প্রতি" = ১০২৮ শক। বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই যে মীন অর্থ সর্ব্বদা এক হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। জ্যোতিষিক গণনায় মীন অর্থ ১২। আমরা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি বলিলেন, "মীন অর্থ কখনই 'এক' বলিয়া ধরা হয় না, সর্ব্বদাই উহার অর্থ ১২।" যাঁহারা মীন অর্থ এক ধরিয়া এবং অঙ্কের বামা গতি স্বীকার করিয়া এই শ্লোকের অর্থ ৭৯১ অর্থাৎ ৮৭৯ খৃঃ অব্দ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,* তাঁহাদের এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে ঐ প্রশস্তি নবম শতাব্দীর হইলে উহার আবিষ্কারক বৃদ্ধ পণ্ডিত ৺অমৃতানন্দ গুপ্ত কখনই উহার পাঠ উদ্ধার করিতে পারিতেন না।

ইহা নিশ্চিত যে বৌদ্ধপ্রভাব তখনও বেশ ছিল বল্লাল সেন উদীয়মান ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন; ভীমসেনের পুত্রগণের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কলহ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। প্রশস্তিতে হরিশ্চন্দ্র ও মহেন্দ্র উভয়েই রাজর্ষিপদবাচ্য

* ফ্লীটের সাহেব এবং বলিয়াছেন ভট্টশালী।

হইয়াছেন. এমন অবস্থায় ইঁহাদের ৫ পুরুষ বিক্রমরূপ সেনের পুত্র ভীমসেনের সময় হইতে গণনা করিলে যে কোনরূপ বাতিক্রম লক্ষিত হইবে না, তাহা পরে লিখিব।

শোনা যায় সাভারের নিকটবর্তী মাহিষ্য ও কৈবর্তজাতীয় লোকেরা কেহ কেহ হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কথা নাই, ইহা হইলেও হইতে পারে যেহেতু সমাজ বহির্ভূত উচ্চকুলসম্ভূত এই বংশ অবশেষে নিম্নতর জাতিদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

যাঁহারা বলেন, একটি প্রাচীন প্রস্তরলেখ বহুপূর্বে কতকাংশে রূপান্তরিত করিয়া এই অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহাদের কোন যুক্তিই বিচারসহ নহে. ভিষক্ শিবদাস সেনকে কেনই বা মোসাবিদা করিবার চেষ্টা হইবে? আবিষ্কৃত বৌদ্ধরাজাকে লম্বা করিতে কোন উচ্চশ্রেণীয় হিন্দুর কেনোদিন প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না যাঁহাদের কাছে এই শিলালিপির প্রতিভাস ছিল, তাঁহারা ইহা তাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন বাকিন ও ষ্টেপলটন্ সাহেব দৈবক্রমে ইহার সন্ধান পাইয়া বহুকালের চেষ্টায় যাহা ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন অমৃতানন্দ কবিরাজ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই পাঁচালি লিখিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ লেখার পাঠোদ্ধার তিনি সহজে পারিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বয়ং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হইলেও শিলালিপিতে যেরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত দেখা যায় ভারতের নানাস্থানের শিলালিপিতে সেরূপ সংস্কৃতের অনেক দৃষ্টান্ত আছে হরিশ্চন্দ্র রাজাকে বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, তিনি শেষ বয়সে নাকি বৌদ্ধ মঠে মন্দিরে বাস করিতেন। বিজয় সেনের সম্বন্ধেও ঐরূপ বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের কথা জানিতে পারা গিয়াছে। পার্থক্য এই যে বিজয় সেন হোম-যাগ-পরিপূত গঙ্গার উপকূলে কুটির আশ্রমে পুণ্যধ্যান করিতেন, হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ মতে তাঁহার মধ্যে বজ্রাসনের দীক্ষা নাই তিনি হিন্দুর আশ্রমে ও মঠে বিচরণ করিতেন।

হাইকোর্টের এডভোকেট এবং ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনের খানদান পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন, বি এল, ইঁহাদের মহাকুল সম্ভূত দুর্জ্জয়দাস কৃত বৈদ্যকুল পঞ্জী প্রকাশ করিতেছেন, এই পঞ্জীর কথা ষোড়শ শতাব্দীতে ভরতমল্লিক তাঁহার চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা নামক দুই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজকুমার সেন উহার একখানি ছিন্ন জীর্ণ কপি পাইয়াছিলেন, সেই কীটদষ্ট বহু প্রাচীন পুঁথিখানি কোন্ গ্রামের কোন একটি মল্লিক পরিবারের অনেক বিধবার নিকট ছিল, উহা এখনও আছে কি না জানি না বিধবা রক্ষীরা প্রায় সতর্ক ভাবে পুঁথিখানি রক্ষা করিতেন, কাহাকেও ছাড়িয়া দিতেন না। দুর্জ্জয় দাস বিক্রমরূপ সেনের পৌত্র কার্ত্তিক সেনের সমসাময়িক ছিলেন।

কার্ত্তিক সেনের পিতা ঈশ সেন দুর্জ্জয় দাসের অব্যবহিত পরেই মল্লদেশবাসী শক্তি গোত্রীয় জয়সেন বিশ্বাস তাঁহার "সম্বন্ধ-কুল চন্দ্রিকা" রচনা করেন। দুর্জ্জয় দাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বহু বৈদ্য-পঞ্জিকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের কোনটিই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ক্ষুদ্র ৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপক কুল-গ্রন্থখানি এবং জয়সেন বিশ্বাসের "সম্বন্ধ-

কুল-চন্দ্রিকা" এই দুই পুস্তকই এখন বৈদ্য-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কুল-গ্রন্থ। শেষোক্ত পুস্তক ১২২৭ শকে (১৩০৫ খৃঃ) রচিত হয়। অম্বষ্ঠ-কুল-চন্দ্রিকা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, মহারাজ ভীম সেন ১১৫৮ হইতে ১১৮৬ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২৩৬-১২৭৪ খৃঃ)। তিনি বল্লালের পৌত্র। গ্রন্থকর্ত্তা জয়সেনের কন্যা কমলা দেবীকে ভীম সেনের পুত্র কার্ত্তিক সেন বিবাহ করেন। সুতরাং সেনরাজের সম্বন্ধে তাঁহার ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকিবার কথা।

আমরা স্থানান্তরে "অম্বষ্ঠ-কুল-চন্দ্রিকা" হইতে আর অনেক কথা উদ্ধৃত করিব। কুলশাস্ত্র নানা প্রতারকের হাতে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইয়াছে। দুর্জ্জয় দাস ও জয় সেন বিশ্বাস যে দুইখানি কুল-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, খুব প্রাচীন পুঁথি না পাওয়া পর্য্যন্ত,—উক্ত পুস্তক দ্বয়ের সকল অংশ আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। এই দুইখানি পুস্তকই গীতাচার্য্য মহাশয় শীঘ্র প্রকাশ করিবেন, তখন সুধীগণ ইহাদের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবেন, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত হই নাই।

কুলজী অনুসারে, মহারাজ ভীম সেন ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে আমরা সাভারের শিলালিপিতে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র মহেন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণের তারিখ ১২৭৫ খৃষ্টাব্দ পাইলাম। মহেন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এদিকে ভীমসেনের জন্মতারিখ পাওয়া যায় নাই,—তাহা হয়ত শতাব্দীর কোন সময়ে হইতে পারে। ভীম হইতে মহেন্দ্র পঞ্চম পুরুষ, সুতরাং বল্লাল প্রপৌত্র ভীমসেন এবং সাভারের লিপি-কথিত ভীমদেব একব্যক্তি হইতে পারেন। বল্লালের তারিখ সম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে। গোপাল ভট্ট রচিত বল্লালচরিতে "রাজবল্লভ" বলিয়া যে ভীমসেন উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনিও এই ব্যক্তি কি না বলা যায় না। তাহাতে দ্বিধার কারণ এই উহা বিশ্বাস করিতে হইলে ভীমসেনের বয়ঃক্রম অপরিমিতরূপ বেশী হইয়া পড়ে।

এই সকল তারিখ সম্বন্ধে হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ অনেক সময়েই অবিশ্বাস্য। যখন তারিখটি গ্রন্থকার অঙ্কের অক্ষরে প্রদান করেন, তখন অনেক সময়েই নকলকারীর ভ্রমে তাহা অন্যরূপ হইয়া যায়, সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও সেই সকল শব্দের প্রায়ই নানারূপ অর্থ করা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া মোটামুটি আমরা জয়সেন বিশ্বাসোক্ত ভীমসেন এবং সাভারের লিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি।

ষ্টেপলটন সাহেব ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় সেন রাজগণের সঙ্গে সাভারের রাজ পরিবারের সংস্রব অনুমান করিয়া প্রথমতঃ লিপিটি কতকটা দ্বিধার সহিত খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—তারপর সে মতের পরিবর্ত্তন করিলেন। শিলালিপির প্রামাণ্য তাঁহারা স্বীকার করিতে এখন কুণ্ঠিত। এতৎ সম্বন্ধে আমার সুদীর্ঘ পত্রের জবাব দিতে না পারিয়া সেই চিঠির মাত্র কিয়দংশ চাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন, অপরাংশ কেন প্রকাশ করিলেন না, তাঁহারাই জানেন। যদি বাঙ্গলা এ বিষয়ে ষ্টেপলটন সাহেব

নলিনীবাবুর ধারাই সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাদের দুই মত না ধরিয়া তাহা এক জনের মত বলিলেও অন্যায় হইবে না। ষ্টেপলটন সাহেব কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত আমাকে প্রথমে লিখিয়াছিলেন—" It has all the characteristics of a genuine inscription "—[এই শিলালিপি সর্ব্ব বিষয়ে খাঁটি বলিয়াই মনে হয়।] এই শিলালিপি সম্বন্ধে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ষ্টেপলটন সাহেবের যাবতীয় আরও কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, -

"When we were coming away from Savar last June (1920), Babu Harendra Nath Ghosh handed over to me the *khāta* full of litigation notes in which Sj Ambikacharan Chaudhuri had taken down in pencil the *slokas* dictated by the late Amritananda Kaviraj I found that the whole composition was the copy of an inscription on a Math dedicated by Mahendra, son of Harish. Harendra Babu had only utilised a part of the composition, the rest of which was also of unusual interest.

Mr Rankin thereupon undertook to find the original of these *slokas* and through the aid of Mr J N Roy, I C S, and Mr A C Sen, I C S, at last succeeded in getting into touch with Babu Pratap Ch Gupta, the grandson of Amritananda Kaviraj. Pratap Babu ransacked the papers of his grandfather and after much search succeeded in finding the required *slokas* written in violet ink in the Kaviraj's own hand on a piece of paper only 4" × 8" in size and handed it over to Mr Rankin On one side of the paper is seen a transcript in which many slips had occurred and on the reverse the transcript is copied correctly.

I shall give below an exact copy of the *slokas* and a translation, these *slokas* as already noted appear on a close reading to be the transcript of an inscription attached to an ancient Math, dedicated by Mahendra the inscription however is extremely interesting It takes note of the fact that Harishchandra was a Buddhist It gives the correct boundary of Bhowal or Bhabalna and furnishes us with the important information that it was reclaimed by Dhananta from the occupation of the powerful Kirata This supports the statement of the Yoginitantra that Pragjyotish at one time extended up to the confluence of the Lakeya and the Brahmaputra. The Ganges is said to be flowing below Bhowal and thus this statement furnishes proof of the current tradition that the Ganges used to flow in olden times through the Dhaleswari channel or even further north along the course of the present Buriganga."

ইহার ভাবার্থ—"আমরা গত জুন (১৯২০) মাসে সাভার হইতে ফিরিবার পথে বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার হাতে একখানি খাতা দিলেন। এই খাতায় মোকদ্দমা সম্বন্ধে অনেক কথা ছিল। সেই খাতাখানির মধ্যে অম্বিকাচরণ চৌধুরীর হাতে পেন্সিলে লেখা এই শ্লোকগুলি

ছিল, স্বর্গীয় কবিরাজ অমৃতানন্দ তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং চৌধুরী মহাশয় তাহা টুকিয়া লইয়াছিলেন। আমি বুঝিলাম ইহা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র কর্তৃক নির্ম্মিত একটি মন্দিরের গাত্র সংলগ্ন শিলালিপির নকল। হরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ইহার কতকাংশ মাত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম ইহার বাকী অংশও খুব লক্ষ্যকারী।

শ্রীযুক্ত রাকিন সাহেব কবিরাজের স্বহস্ত-লিখিত আসল লিপিটি উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর শ্রীযুক্ত জে এন রায় এবং এ সি সেন সিভিলিয়ান দ্বয়ের সাহায্যে স্বর্গীয় অমৃতানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের পৌত্র প্রতাপচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হইয়া সন্ধান লইলেন। প্রতাপবাবু তাঁহার পিতামহের সমস্ত কাগজপত্রের বিশেষরূপে খোঁজ করিয়া শেষে সেই শ্লোকযুক্ত আসল কাগজটি পাইয়া রাকিন সাহেবকে প্রদান করেন। ছোট ৪″×৮ ইঞ্চি কাগজে স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের নিজ হাতে বেগুনী কালীতে উহা লিখিত। কাগজখানির এক দিকে নকলটি অনেক ভ্রমপূর্ণ, কিন্তু অপর দিকে উহা নির্ভুল করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি নিম্নে সেই শ্লোকগুলি অনুবাদসহ প্রদান করিতেছি।

এই শিলালিপি অতীব প্রয়োজনীয় তত্ত্বপূর্ণ। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। ইহাতে ভাওয়াল অথবা ভাবলীনের একটা ঠিক সীমানা দেওয়া হইয়াছে। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে ঐ স্থান কেদারভের হস্ত হইতে দীনজ সেন বলে আনিয়াছিলেন। এই লিপি দৃঢ়ভাবে যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সীমা সমর্থন করিতেছে। প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্য এক সময়ে লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের সংগমস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাতে দেখা যায় এক সময় গঙ্গা ভাওয়ালের প্রান্তভাগ দিয়া বহিয়া যাইত। লৌকিক সংস্কার, এক সময়ে ধলেশ্বরী এমন কি আরও উত্তরে বুড়িগঙ্গার খাত দিয়া গঙ্গা বহতা ছিল, সুতরাং সেই সংস্কার এই লিপি সপ্রমাণ করিতেছে।"

যদি কুলজীটিকে বিশ্বাস্য বলিয়া ধরা যায়, তবে আমরা শিলালিপির মহারাজ ভীম সেন এবং জয় সেন বিশ্বাসোক্ত মহারাজ বল্লালের পুত্র ভীম সেনকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। বিশ্বাস মহাশয়ের ঐতিহাসিক নানা কথা সম্বন্ধে প্রচুর তর্ক ও আন্দোলন হইবে, কিন্তু তিনি সেন বংশের যে তালিকাটি দিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্য কিনা বিবেচ্য। আমরা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ইতিহাস দেওয়ার সময় সেই তালিকাটির কথা পুনরায় আলোচনা করিব। এই বহু ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ কুলজীখানিতে যে প্রক্ষেপকারীর হস্ত স্পর্শ করে নাই—তাহা বলিতে পারি না। এদেশে যাঁহারা জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা খুব পণ্ডিত হইলেও নিজের সামাজিক গৌরবের কথা একবারে ভুলিতে পারেন না। এমন কি নিতান্ত অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও যখো যখো এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া থাকেন।

হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অঞ্জনা ও পদ্মনাকে গোপীচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া ময়নামতীর গানে উল্লেখ আছে। ইহা কতদূর ঠিক বলা যায় না।

আমরা এই লিপিলিপির পুঁথিলিপিখানি নিম্নলিখিত কারণে প্রামাণ্য মনে করি।

১। ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে মহাদেবের সন্ধাবন্ধ—তখন তিনি রাজসি। ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে (মহারাজ ভীম সেনের মৃত্যুর সময় হইতে ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমরা চারিজন রাজার নাম পাইতেছি—ধীমন্ত, প্রেমবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মহাদেব। এক শতাব্দীতে ৭ জন রাজার গণনা প্রচলিত নিয়মানুসারে সঙ্গত।

২। সাঙ্কারের লিপি ও জয় সেন বিদ্যাসের কুলজী দুই বিভিন্ন এবং পরস্পরের অজ্ঞাত স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং উভয় স্থানেই ভীম সেন "মহারাজ" বলিয়া উল্লিখিত। কুলজী হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি ইনি বল্লাল সেনের মহারাজ বিজয় সেনের পুত্র।

৩। জয় সেন বিদ্যাস কার্ত্তিক সেনকে স্বীয় কন্যা দান করিয়াছিলেন, সুতরাং এই দুইটি বংশলতা নিভুল বলা যাইতে পারে বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত নাম পরস্পর ঘরে যাহা সমর্থিত হইতেছে তবে প্রক্ষেপকারী কেহ কিছু করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না

আমরা লিপি হইতে অমৃতানন্দ কবিরাজ মহাশয় স্বহস্তে প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমৃতানন্দ কবিরাজ সে সময় পুরুষের সন্ধানাপেক্ষা বড় কবিরাজ ছিলেন, রাজা ও রাজন্য বর্গগণ তাঁহারই দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন তাঁহাদের নৌকা অনেক সময় কবিরাজ মহাশয়ের ঘাটে বাঁধা থাকিত. ইনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার সততা ও বিনয় সকলের অনুরাগ বিশেষ পরিচিত ছিল। অমৃতানন্দের পুত্র রাঘবানন্দ পিতা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি পুরাতন "ভারতী" পত্রিকার এক জন নিয়মিত লেখক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পিতা-পুত্র উভয়েই পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এবং রাঘবানন্দ প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় পটু হইয়াও তাঁহারা এই দলিলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এই লিপিলি সম্বন্ধে ইহারা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই উহা হারাইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক যত্নের চেষ্টা না করিলে উহা পাওয়া যাইত না।

মূল শ্লোকের কবির উচ্চারণের নহে, এবং কবিরাজ মহাশয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লিপির জ্ঞান করিয়া পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে শ্লোকগুলি অনায়াসে নব ছন্দযুক্ত করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, সেই ভাবেই নকল করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাদের অনেক ত্রুটি দৃষ্ট হয়।

ভট্টশালী মহাশয় সমস্ত সূচক পদটির বিকৃত অর্থ করিয়া উহা অষ্টম কি নবম শতাব্দীর বলিয়া লিখিয়াছেন। আমরা প্রমাণ করিয়াছি—লিপিটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগের। প্রায় এই সময়ে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও কালবাচক সংস্কৃত পদ "বামাগতি" নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে এবং আরও বহুস্থলে যে সেই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ আমরা দিয়াছি। বিশেষ "বামাগতি" দ্বারা ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গেলে উহার কোন অর্থই হয় না। আর একটি কথা এই যে এই লিপি যদি অষ্টম কি নবম শতাব্দীর

হইত, তবে কৈবর্ত্তরাজ মহাশয় পাঠান সেকেন্দর পাণ্ডির সম্বন্ধে তাহাতে মন্তব্যটুকু করিয়া পাঠাইবার কথা বলিতে পারিতেন না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ প্রভাব যথেষ্ট ছিল। বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ এতদঞ্চলেই বৌদ্ধগণের একটা নবজাগরণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান ফেরার বাদ নন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি এই শতাব্দীতে আপনাকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও মুসলমান নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন সংগঠিত করিয়াছিলেন। তাহা আমরা এই পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে যে কয়টি রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত রাজবংশগুলির নাম পাওয়া যায়। ১। চন্দ্রবংশ, ২। বর্ম্মবংশ, ৩। সেনবংশ, ৪। দেববংশ, ৫। খড়্গবংশ, ৬। কম্বোজবংশ, ৭। শূরবংশ, ৮। পালবংশ, ৯। কৈবর্ত্তবংশ, ১০। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশ, ১১। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশ, ১২। বৈদ্যবংশ, ১৩। কায়স্থবংশ, ১৪। নমঃশূদ্রবংশ, ১৫। কৈবর্ত্তবংশ, ১৬। সদ্গোপবংশ, ১৭। তিলিবংশ, ১৮। তাম্বুলিবংশ, ১৯। গন্ধবণিকবংশ, ২০। শঙ্খবণিকবংশ, ২১। সুবর্ণবণিকবংশ, ২২। তন্তুবায়বংশ, ২৩। কুম্ভকারবংশ, ২৪। কর্ম্মকারবংশ, ২৫। সূত্রধরবংশ, ২৬। নাপিতবংশ, ২৭। গোপবংশ, ২৮। মালাকারবংশ, ২৯। তৈলিকবংশ, ৩০। তাম্রকারবংশ, ৩১। শাঁখারিবংশ, ৩২। কাঁসারিবংশ, ৩৩। স্বর্ণকারবংশ, ৩৪। রজকবংশ, ৩৫। ধোবাবংশ, ৩৬। ধীবরবংশ, ৩৭। বারুইবংশ, ৩৮। কাওরাবংশ, ৩৯। হাড়িবংশ, ৪০। ডোমবংশ, ৪১। চণ্ডালবংশ, ৪২। বাগ্দীবংশ, ৪৩। বাইতিবংশ, ৪৪। পোদবংশ, ৪৫। মুচিবংশ, ৪৬। মেথরবংশ, ৪৭। কলুবংশ, ৪৮। শুঁড়িবংশ, ৪৯। জেলেবংশ, ৫০। মালোবংশ, ৫১। বেদেবংশ, ৫২। বাজীকরবংশ, ৫৩। ভাটবংশ, ৫৪। ঘটকবংশ, ৫৫। বাউরীবংশ, ৫৬। ভূমিজবংশ, ৫৭। কোচবংশ, ৫৮। মেচবংশ, ৫৯। হাজংবংশ, ৬০। গারোবংশ, ৬১। খাসিয়াবংশ, ৬২। ত্রিপুরবংশ, ৬৩। কুকিবংশ, ৬৪। লুসাইবংশ, ৬৫। চাকমাবংশ, ৬৬। মগবংশ, ৬৭। কুকিবংশ, ৬৮। লুসাইবংশ, ৬৯। চাকমাবংশ, ৭০। মগবংশ, ৭১। কুকিবংশ, ৭২। লুসাইবংশ, ৭৩। চাকমাবংশ, ৭৪। মগবংশ, ৭৫। কুকিবংশ, ৭৬। লুসাইবংশ, ৭৭। চাকমাবংশ, ৭৮। মগবংশ, ৭৯। কুকিবংশ, ৮০। লুসাইবংশ, ৮১। চাকমাবংশ, ৮২। মগবংশ,

উল্লিখিত রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ পূর্ব্বভারতে বিদ্যমান। বিজয়ের বংশধরেরা বেদজ্ঞ হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে জাতিত্বের কথা লোপ করিয়া মহাভারতের সঙ্কর্ষণ নামক সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ইহারা গৌরবযুক্ত হইয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ এই রাজবংশে আরও দুইটী নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম জ্যোতির্ব্বর্ম্মা ও হরিবর্ম্মা। সম্প্রতি শ্যামলবর্ম্মাকে বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে লইয়া কুলাচার্য্যেরা যে সকল জাল বংশতালিকা তৈয়ার করিয়াছেন এবং যাহাদের কথা নব্যভারত বসু মহাশয়ের মত প্রবীণ ব্যক্তিও প্রতারিত হইয়াছেন তাহার কেন কৌতুকাবহ বিবরণী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে পাল রাজত্বের শেষ সময়ে বিহার অঞ্চলের বর্ম্মবংশীয় রাজারা সম্ভবতঃ শূরবংশের চন্দ্র রাজাদের অধিকার বিলুপ্ত করিয়া রাঢ়, বঙ্গ ও বিহার অঞ্চলে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে শূরবংশ হয়ত বর্ম্ম বংশকে পরাভূত করিয়া সেনদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই জটিল এবং যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ বিপদসঙ্কুল অন্ধকারময় যুগে সেনরাজগণ স্বীয় শক্তি সমস্ত বঙ্গ ও বিহারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তথাকার একচ্ছত্র রাজত্ব লাভপূর্ব্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন।

শঙ্করাচার্য্য মিহিরগুলের সঙ্গে কোন সময়ে বঙ্গ দেশের তন্ত্রজ্ঞ বা একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল। তাহা অবশ্য পাল রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। আমাদের ইহা একটি অনুমান মাত্র। অনুমানের হেতু এই যে ত্রিপুরার একটা বৃহৎপরগণার নাম মেহেরকুল। ঐ পরগণা ভারতবিশ্রুত মহাবীর মেহের-গুলের নামাঙ্কিত কি না, ইহা একটা জটিল সমস্যা।

মিহিরকুল।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত মল্লভূমের অধিপতি কর্ণসেনের লাউসেন বা লবসেন নামক যে পুত্র ছিল, তাঁহার সাতাশো গৌড়েশ্বর, কলিঙ্গ, বর্দ্ধমান, ভাওপাগা, কামরূপ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি মূলতঃ এই লবসেনের কাহিনী লইয়া। ইনি তেলুয়ার ইচাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং হরিপালের কঙ্কা কালেডার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভপূর্ব্বক উক্ত রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। বঙ্গলা পঞ্জিকায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কলিকালের রাজচক্রবর্ত্তীদের মধ্যে লাউসেনের নাম উল্লিখিত হইত। লাউসেন বা লবসেন গৌড়েশ্বরের জ্ঞালীপুত্র ছিলেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে এই গৌড়েশ্বর পাল বংশীয় দেবপালদেব।

লাউসেন।

আমি কতকগুলি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে এখনও সে সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যার ভালরূপ সমাধান হয় নাই।

১। গোরক্ষনাথ ও গোবিন্দচন্দ্রের সময়।

২। ভর্তৃহরি ও গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্রের) সম্বন্ধ এবং তাঁহাদের কাল।

৩। এই গোবিন্দচন্দ্র এবং রাজেন্দ্র চোলের সমরের গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি কি না?

৪। সাম্রাজ্যের হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অঙ্গনা ও পত্তনার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হইয়া থাকিলে উভয় রাজার কালের সঙ্গতি প্রমাণ করা যায় কি না?

৫। জাতিগত প্রশ্ন দ্বারা বিচলিত না হইয়া প্রশস্তভাবে বিচার করিলে সাতারের শিলালিপি খাঁটি বলিয়াই বোধ হয়, তবে বল্লালচরিতোক্ত অথবা "সম্বন্ধ-কুল-চন্দ্রিকা"র ভীমসেন এবং শিলালিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি না তৎসম্বন্ধে আমার কতকটা সন্দেহ আছে।

এই সকল জটিল প্রশ্নের কেহ চূড়ান্ত উত্তর দিতে পারিবেন না তবে কালে হয়ত দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়া সমস্যার সমাধান-পথ সুগম করিয়া দিতে পারে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এদেশে ইতিহাসের উপকরণ

ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই, ভারতের লোকেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না, ইত্যাদি কথা সকলের মুখেই শোনা যায়। মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ তন্ত্র পাঠ করিলে আমরা অতি পূর্ব্বকাল হইতে কতকগুলি রাজ বংশের ধারাবাহিক বংশাবলী জানিতে পারি। এই সকল বংশাবলী যে সমস্তই ভ্রমপূর্ণ তাহা বলা যায় না, ইদানীং তাম্রশাসন ও শিলালিপির প্রমাণে অবধারিত হইয়াছে যে এত পূর্ব্বকালের লেখার মধ্যে মধ্যে সত্যের অপলাপ হইয়া থাকিলেও সেগুলি মোটের উপর নির্ভরযোগ্য। পার্জিটার সাহেব পুরাণোক্ত বংশাবলীর আংশিক বিশ্বস্ততার পক্ষপাতী।

প্রত্যেক রাজাদেরই বংশাবলী ও পূর্ব্বপুরুষদের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য অভিজ্ঞ লোক থাকিত। বিবাহ-সভায় ও যজ্ঞস্থলে ইহারা উৎসবকারী রাজার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের গুণগ্রাম বর্ণনা করিতেন কালিদাসকৃত রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। তাম্রশাসন ও প্রস্তরলেখ সহজে নষ্ট হয় না এবং এগুলি দানগ্রহীতাদের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষরূপ জড়িত, এজন্য এ সকল নানারূপ বিপ্লব সত্ত্বেও কতক কতক রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু কাগজ বা ভূর্জ্জপত্রাদিতে লেখা ইতিহাস কচিৎ রক্ষিত হইয়াছে যদি একবংশই ক্রমাগতঃ রাজত্ব করিতেন, তবে সেই বংশের ইতিহাস রক্ষিত হইত। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক বিপ্লব এত ঘন ঘন হইয়াছে যে এক বংশের কথা অপর বংশের লোকদের রক্ষা করিবার কোনই স্বার্থ থাকিত না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার হইলে সকলেই এদেশে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকে, কারণ ধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়েরই সামগ্রী। কিন্তু নূতন বংশের রাজারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের (অনেক সময়েই যাঁহারা শত্রুপক্ষীয়) ইতিহাস রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন—এমন কি বিদ্বেষী হইতেন। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ

কখনই কেহ হয় নাই। কেহই এতদিনকে ঠিক অনুভব করেন নাই সুতরাং তাহার সাক্ষ্য

ইতিহাস কেন গুপ্ত হইল?

যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হইতে ধারাবাহিকভাবে রাখিতে যত্ন করেন নাই। বঙ্গের গত সাত আট বৎসরের মধ্যে ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে বলিয়া জানা নাই। লোক বা জাতি বিশেষের ইতিহাস যাহা লোকের কখনই মনে আসিতেছে চাহে না। এতদিনের কথা পুরাবৃত্তকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন এবং অনেক স্থানে তাহা পাঠ করিয়া শুনান হইতেছে। মানুষের কীর্ত্তি কলাপগুলি, যাহা লইয়া অনেক লোক বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে এই ছয় লোকদের বিষয়ে সুতরাং যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়াছে তাহা এই কয়েক বৎসরের অবহেলায় প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ত্রৈলোক্য ব্রাহ্মণের বংশ সম্বন্ধে যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রায় আছে। রামপাল সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তি প্রচলিত ছিল, সেগুলি ও আজও নিরক্ষর লোকের মুখে মুখে ইতিহাস আছে। যে নাই। সন্ধ্যাকরের 'রামচরিত' ছিল পৌণ্ড্রদেশে। কিন্তু তাহার পুস্তকখানি দেশান্তরে থাকায় বিশেষ সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপালের ঘটনাগুলি আর সন্ধ্যাকর সম্বন্ধে জানা ছিল, কারণ তাহার 'সন্ধ্যা প্রজাপতি নন্দী' রামপালের অনুমোদনক্রমে করেন। পুস্তকখানি তাহারই লিখিত হইয়াছিল রামপাল ও রামপুরের নাম এই উভয়ের সম্বন্ধেই পুস্তকটি লোকের অর্থ করা যাইতে পারে। কবির উপাধি ছিল 'কলিকাল বাল্মীকি'। সন্ধ্যাকর নন্দী ১৫ সর্গে সম্পূর্ণ করেন। ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে অভিষিক্ত হয়, যে পুস্তকখানি ৩৫ বৎসর পরে লিখিত হইয়াছিল। এই বাঙ্গলার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোক পাওয়া যায়। যে কয়েক খানা রামায়ণ ও রামপালচরিতকে একত্র করিয়াছে, তাহাতে রামপালের নাম থাকায় তাহারা যে কিছু সেই সময়ের পুরাতন ঘটনা আছেন তাহার পক্ষে একটা টিকা-টিপ্পনী আবশ্যক। এই জন্য অনেকে মনে করেন সন্ধ্যাকর নন্দী প্রথম পুস্তকে টিকা ঘটনাই লিখিয়াছিলেন। যে কয়েকটি টিকা পাওয়া যায়, তাহা ভুলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। রামচরিত পুঁথি একাধিক পুস্তকের কেবল লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামপালের রাজত্বকালে সকলেই পালেশ্বরের প্রজার কীর্ত্তিগাথাতে রামচরিতের অবতারণা হইয়াছে। নতুন রামচরিত কে পড়িতে আমরা এই রামচরিত হইতেও জানিতে পারি যে পাল ও সেন রাজাদের অনেকের সম্বন্ধেই ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে লিখিত হয় নাই। এরূপ কতকগুলি পুস্তকের নাম করিয়াছেন, যথা—

১। ক্ষেমেন্দ্রের পদ্মিত ইতিহাস। ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরবাসী ছিলেন এবং তিনি পুরাকাল হইতে রামপাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাজার বিবরণ দিয়াছেন।

২। গুপ্ত বংশীয় একজন কবি পাটলিপুত্রের রাজাদের প্রথম চার জনের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পুস্তকের নাম "বুদ্ধপুরাণ"।

৩) গুরুপরম্পরা ইতিহাস। ইহাকার ব্রহ্মদেশক্রান্ত "ইউটি" পণ্ডিত ইহাদিগকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ইতিহাসের লেখক ছিলেন এই পুস্তক তাঁহারই সংগ্রহ করিয়াছেন।

ত্রিপুরাজ্যের একখানি ইতিহাস আছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধন্যমাণিক্য ও ধর্ম্মমাণিক্য নামক দুই পণ্ডিত ইহা বাঙ্গালায় লিখিতে আরম্ভ করেন, সেগুলি ত্রিপুরদেশীয় ছিল

ত্রিপুরার 'রাজমালা'।

এতদ্ভিন্ন যে সকল পণ্ডিত ইহাদের রাজমালা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজমালাকার', 'গোবিন্দমাণিক্য' কৃষ্ণমালায় নিবন্ধকার' এবং লক্ষ্মণমালিকা' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি পুস্তকখানি খুব সম্ভব লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে, পুস্তক

আমার নিকট একখানি হস্তলিখিত কোচবিহারের ইতিহাস আছে। ইহা মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে প্রধান মন্ত্রী কালীচরণ কায়স্থের আদেশে মুন্সী রঘুনাথ দোষ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন এই পুস্তকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত পাঠকখানি ছাপা হয় নাই, ইহাতে কোচবিহারের যে সকল পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের মালমসলা আছে, তাহা অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। পুস্তক লিখিবার সময়ে যদি কালীচরণ লেখক রঘুনাথকে প্রাচীন কতকগুলি ইতিহাসের কথা বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে জানা যায়, পূর্ব্বকালের রাজাদের

রঘুনাথ মুন্সীর কুচবিহারের ইতিহাস

আসামের 'অহম' জাতিদের যে ইতিহাস আছে তাহা বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশ্বাসযোগ্য যে, আসামের ইতিহাস-লেখক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণে কাল্পনিক কাহিনী বা উপকথা নাই, উহা বেশ ধারাবাহিক ও যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং আমাদের দেশে ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট ছিল অধিকন্তু যাহা ছিল, তাহার এখনও যাহা আছে তাহা নিতান্ত সামান্য নহে।

উপকরণগুলির নিম্নোক্ত ভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যাইতে পারে

প্রথমতঃ—মুদ্রা। বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া ইতিহাসের কাজে লাগান হইতেছে। সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক উপকরণ।

দ্বিতীয়তঃ—রাজাদের ইতিহাস। তৎসম্বন্ধে এখনই আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ—শিলালিপি ও তাম্রশাসন।

চতুর্থতঃ—সাময়িক নানা গ্রন্থে রাজবংশসমূহের এবং বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এবং বিদেশীয় পর্য্যটকগণের এদেশভ্রমণের এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষ লেখকগণকর্ত্তৃক কোন কোন ঘটনার বিবরণ। প্রাচীন মন্তব্যাদি

পঞ্চমতঃ—পল্লীগাথা

এই শ্লোকোক্ত উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

১ কোন কোন গুপ্তরাজার সম্বন্ধে পল্লীগাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস পুরুরবার সম্বন্ধে বৃহৎ জনপদব্যাপী পল্লীগাথার উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ পুরুরবা ও উর্বশীর সম্বন্ধে পল্লীগাথা রচনার সংস্কার বহুকাল চন্দ্রবংশ রাজগণ বিদ্যমান ছিল (রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ২৮ শ্লোক)।

পল্লীগাথা।

২ ময়নামতীর সম্বন্ধে আজও মনে উদ্ভিদিত আছে যে তাঁহার সম্বন্ধে প্রজারা গান বাঁধিয়া সর্বত্র গাহিয়া বেড়াইত, সেই সকল গান অতীব রাখাল বালকেরা গাহিয়া প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিত। দিবসের কর্মাবসানে বধূরা তাহাদের বিপণীতে সেই গান গাহিতে ভালবাসিত, এমন কি অন্তঃপুরচারিণীরাও সেই সকল গান গাহিতেন এবং তাঁহাদের পোষা পাখীকে তাহা আবৃত্তি করিতে শিখাইতেন (৮ম শতাব্দী—খালিমপুর তাম্রশাসন।) মহীপালের বাণগড় তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে মহারাজ রাজপালের কীর্তিকথা জনসাধারণ মুখে মুখে গাহিয়া বেড়াইত (১০ম শতাব্দী)। বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য ভাগবতে (১৫৫৫ খৃঃ) লিখিয়াছেন যে গোপীচাঁদ, ভোপীচাঁদ ও মহীপাল (১০ম শতাব্দী) সম্বন্ধে পল্লীগাথা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্বে বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত ছিল, এবং তাহাই বঙ্গবাসীর একটা প্রধান আনন্দ উৎসবের বিষয় ছিল। ফেক গুভোদয়া নামক পুস্তকে দুই হয়—রামপাল (১১শ শতাব্দী) তাঁহার পুত্রকে কোন বণিক সীমান্তদেশকে ধর্মের অপরাধে শূলে দিয়াছিলেন, তাঁহার এই অপূর্ব ন্যায়পরতা-সম্বন্ধে পল্লীগাথা বাঙ্গলার সর্বত্র লক্ষ্মণসেনের সময়েও (১২শ শতাব্দী) বিদ্যমান ছিল। ত্রিপুরার মহারাজ ধন্যমাণিক্য (১৬শ শতাব্দী) সম্বন্ধে এইরূপ পল্লীগাথার উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায়। তাঁহার রাজ্ঞী কমলাদেবী ও পরবর্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্বন্ধেও এইরূপ গীত প্রচলিত ছিল। রাজারা ত্রিপুরা হইতে উৎকৃষ্ট গায়ক ও নর্তক আনিয়া সেই সকল গান কি ভাবে নাচিয়া গাহিতে হয়, তাহা ত্রিপুরবাসী দ্বারকে শিখাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ ও তৎপরবর্তী কয়েকজন পরাক্রান্ত ভোগীদের সম্বন্ধে পল্লীগাথা পূর্ববঙ্গ গীতিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এরূপ অনেক উদাহরণের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের এই সকল মন্তব্য পাঠ করিলে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক রাজার সম্বন্ধেই নিরক্ষর প্রজা-মণ্ডলীরাও গাথা রচনা করিয়া গান করিত। যাহারা অত্যাচারী ও দুর্দান্ত শাসনকর্তা ছিল, তাহারা প্রজাদের রচিত পল্লীগীতির কলঙ্কিত হইত। মাণিকচন্দ্রের গানে "লখা-লখা দাড়ী" বাঙ্গাল মন্ত্রীর অত্যাচারের কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তিনি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা কবির কৃপায় অনেকেই অবগত আছেন। কবি দয়া করিয়া তাঁহার কলঙ্কিত নামটি প্রকাশ করিয়া তাহা অমর করিয়া রাখেন নাই। কিন্তু কবিকঙ্কণ সেলিমাবাদ পরগনার শাসনকর্তা মামুদ সরিফের শত কুকীর্তির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘৃণার পাত্র করিয়া রাখিয়াছেন। কেমানন্দ উক্ত পরগনার পরবর্তী শাসনকর্তা বারা খাঁ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে কত ভালবাসিত তাহার আভাস

পাওয়া যায়। সমুদ্রের গাঙ্গি নামক এক দস্যুসর্দার প্রবল হইয়া কিছুকালের জন্য ত্রিপুরা-রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। পদ্যকবি দীর মহাশয় তৎসম্বন্ধে একটি বিস্তারিত পুঁথি লিখিয়াছেন। উহা সমসাময়িক রচনা ও মূল্যবান্ ঐতিহাসিক উপকরণপূর্ণ। স্থানান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সেকালের কোন লেখাই বৈজ্ঞানিকের মানদণ্ডে নিখুঁত বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। তাম্রশাসন ও শিলালিপিতেও ভ্রান্তির অভিত্বের অভাব নাই। আমরা বলিতে চাই না যে, পদ্যগাথাগুলি নির্দোষ এবং খাঁটি সত্য, উহাদের মধ্যে নানারূপ ত্রুটি, সত্যের অপলাপ, অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক অনৈসর্গিক, অতিরঞ্জন বাগাড়ম্বর এ সমস্তই আছে, কিন্তু তথাপি এই পদ্যগাথাগুলি রাজার ইতিহাসের নিতান্ত নগণ্য উপকরণ নহে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই নানাতত্ত্বপূর্ণ, কবিত্বময়, জাতীয় গৌরবস্বরূপ পদ্যগ্রন্থের সংরক্ষণার্থ সরকার বাহাদুর ও বিশ্ববিদ্যালয় যে সামান্য কিছু টাকা দিতেন তাহা সম্প্রতি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি বৎসর বৎসর ধ্বংস পাইতেছে, নষ্টই নষ্ট হইয়া যাইবে। অনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার তরঙ্গ উঠিয়াছে, কত দিক্ দিয়া কত ভাবের সংরক্ষণ হইতেছে। কিন্তু দেশের ইতিহাসসম্বন্ধে তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা বিস্ময়কর। ঘরে আগুন লাগিলে এক বালতি জল অনিবার্য। এতদও লোক কি দেশে নাই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যা ও বিদ্বানের গৌরব

যোদ্ধা সম্রাট্ অশোকের অনুশাসনে দেখা যায় তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি দেশে শ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছিল। দেশবাসীরা প্রকৃত জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ ত্যাগী পুরুষদিগকে সম্মান দেখাইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহাদের মনে যাহাতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করেন, তজ্জন্য রাজা উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অন্যদিকে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রের একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করিতে দেন নাই। ব্রাহ্মণ বলিতে তিনি শুধু ব্রাহ্মণবংশজাত ব্যক্তিদিগকে বুঝিতেন না, তিনি সর্ব্বজাতিনির্বিশেষে 'সমাজসাধ্য' প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য কুল ও শ্রেণী গণ্য না করিয়া সর্ব্বজাতি হইতে নির্ব্বাচন পূর্ব্বক 'ধর্ম্মমহামাত্রগণ' নিযুক্ত করিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে, কৌটিল্য লিখিয়াছিলেন—বিদ্বানের সঙ্গে রাজার তুলনাই হইতে পারে না। রাজা যে দেশে রাজত্ব করেন সেই দেশের ক্ষুদ্রাংশেই তাঁহার নাম ও প্রতিষ্ঠা কিন্তু

বিদ্যানের পূজা পৃথিবীময়ী। কেরলা বিদ্যানের আদ্য সম্মানের কথা অনেকস্থলে বলিয়াছেন, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও বঙ্গদেশে পণ্ডিত তদীয় নীতিজ্ঞালার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধার কথা নাই।

এই বিচার পদ্ধতি যে শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিত তাহার ফলে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের মধ্যে অমনটি পরিস্থিতি অন্য হইল। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে দেখা যায়, পণ্ডিত-মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া রাজা বিশেষরূপ গৌরবান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গুপ্ত রাজাদের কবিরা লেখ একটি বিশেষ গুণের মধ্যে পরিগণিত হইত। সমুদ্রগুপ্ত নিজে কবিতা লিখিতে যে অধিক লাভ করিয়াছিলেন, বীণা বাজাইবার দক্ষতা দেখাইয়া তাহা হইতে কম যশ উপার্জন করেন নাই। অশোকের সময়ে প্রাদেশিক অক্ষর ও প্রাদেশিক ভাষায় অনুশাসন লিখিত হইয়াছে, গুপ্তদের সময়ে অনুশাসনই প্রধান সংস্কৃত ও সাধুভাষায় লিখিত। তখন শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানের দিকে সর্বসাধারণের লক্ষ্য হইয়াছে। একদিকে যেমন কবি ও নাট্যকারেরা যশ অর্জন করিতেছেন, অন্যদিকে জ্যোতিষিদের মত জ্যোতিষিদেরও আদর হইয়াছে, যেন বর্তমানের আইনজীবীর মত তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদের মধ্যেও নূতন আলোচনা চলিয়াছে। বহু যবন শক ও শকস্থানীয় বিদেশিরা যাঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত কালিদাস প্রভৃতি বিদেশীয়ের এই দেশে বাস করিয়া এই দেশের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশীয়ের নাম হইতে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, পূজা অর্চন করিয়াছেন, কেহ বা গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া তাহা দেখে দেখে উৎসব করিয়াছেন।

শালের আদরের সময়ে এই দেশ জ্ঞান ও ধর্মকর্মে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তখন বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর ও নালন্দার মত বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্র সমূহ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ধর্মপালদেবের রাজত্বে বঙ্গের সোমপুর মহাবিহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন। বিক্রমপুরের শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পূর্ণাকারের উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল আলোকিত করিয়া অক্ষয়যশের পূজা লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যাযুগ।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের সম্মান করিয়া পালরাজাদের সময়ে যেরূপ সম্মান ও আদর পাইয়াছেন, তাহাতে ইহাদের রাজত্বকাল আমরা 'বিদ্যাযুগ' নামে অভিহিত করিতে পারি। চন্দ্রবংশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে রাজা ধনই সম্মান করিতেন। রাজা কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত কবিদের কোন রাজার সভায় ছিলেন না, রাজারা যদি তাঁহাদের চরণপদ্মের প্রসাদী হইতেন—তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইত না। এমন কি মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের নিকট রণ গরুড় পক্ষীর মত করজোড়ে থাকিতেন, মুদ্রারাক্ষসে যে দম্ভ অতি পরিষ্কার ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতেও আশ্চর্য হইবার মত কিছু নাই। একমাত্র যাঁহার মন্ত্রণাবলে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া নিজের সিংহাসন ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় প্রতাপশালী করিতে পারিয়াছিলেন সেই চাণক্যের অবজ্ঞাসূচক "বৃষল" সম্বোধনেও

কৌটিল্য, কালিদাস ও কেরলা মিশ্রের প্রতিপত্তি।

ছিনি চরিতার্থ হইতেন এ ব্যাপারেও আশ্চর্য হইবার বিষয় নাই দরিদ্রের পক্ষে স্বপ্নে পাওয়া রাজ্যের মতনই তাঁহার সামাজোলাভ আশার ও সোভাগ্যসূচক করিয়াছিল। কিন্তু পালরাজগণ মহাবিদ্যোৎসাহী যে সকল কি ছিলেন তাহাদের মনে হয় তৎকালে সর্বসাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে, রাজা অপেক্ষা বিদ্বানই শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং নৃপতিরাও অকুণ্ঠিত চিত্তে এই প্রণতি ও শ্রদ্ধা পণ্ডিতদিগকে দিতেন। পাকড় অনুলিপিতে দেবপাল সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সামন্ত নৃপতিগণের বিলাসকায় হস্তিসমূহের পদদলিত সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া দেবপালকে লোকলোচনের দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখিত এবং পরাজিত ও মিত্র রাজাদের অসংখ্য সৈন্যগণের যাতায়াতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সহজ ছিল না, এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত একচ্ছত্র সম্রাট দেবপাল তথায় মন্ত্রী দর্ভপাণির উপদেশ অনুসারে জন্য অবসর খুঁজিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে প্রস্তাবনা করিতেন। মন্ত্রী মহাশয় রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা সর্বাগ্রে সোৎসাহবেগে মহার্ঘ সিংহাসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া পরে যেন সঙ্কুচিত ভাবে তদীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। মন্ত্রিবর মন্ত্রী হইলেও তাঁহার কলাচার্য ছিলেন কলাচার্যের এতটা সম্মান কোন রাজা দিয়াছেন? বঙ্গেশ্বর রাজার মন্ত্রী বর্মী সম্বন্ধে মন্তব্যে বলিতেন, "পৃথিবীপতি ইন্দ্রকে দশদিকের একটী মাত্র দিকের অধিপতি করিয়াছিলেন সেই একটি দিকের অধিপতি তাঁহাকে প্রীতি সন্তুষ্ট করিতেন—পৃথিবীপতি তাহা করিতে পারিতেন না কিন্তু আমি বঙ্গেশ্বর রাজাকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।" এই ভাবের অহঙ্কারশূন্য কথা সেই মন্ত্রীর সম্বন্ধেরা ধর্মপাল ও তাঁহার বংশধরদের কর্মচারী হইয়াও তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ করিতেন। সুরপালের মন্ত্রী কেদার মিশ্র গৌড় দ্বিজ ছিলেন। পালসাম্রাজ্যের অনেকেই বঙ্গজ ছিলেন, তাঁহাদের বঙ্গজাতি মাত্র না করাই কথা, কিন্তু গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে কেদার মিশ্র যখন স্বীয় গৃহ যজ্ঞ করিতেন তখন সুরপাল স্বয়ং মন্ত্রীর উৎসবে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া জলদুন্দুভিকে সজোর বারি মস্তকে লইতেন

বিক্রমশিলা বিহারের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিক্রমশীল রাজার উপরই ছিল নালন্দা বিহার পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিচালিত হইত, বিক্রমশিল বিহারের ভার শুধু রাজার উপর ন্যস্ত ছিল রাজা স্বয়ং তথায় উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন কিন্তু চীনপরিব্রাজক শীলভদ্রের সহিত লিখিয়াছেন যে যখন রাজা স্বয়ং সেই বিহারে প্রবেশ করিতেন তখন কোন ছাত্র বা অধ্যাপক তাঁহাকে দেখিতে দাঁড়াইতেন না কিংবা অন্য কোন ভাবে সম্মান দেখাইতেন না। বিক্রমশিলা বৌদ্ধবিহার ছিল এখানেও বিদ্বান ও বিদ্যার সম্মান এতটা বেশী ছিল। এই উপলক্ষে আমাদের সকলেরই মনে পড়িবার কথা

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।"

এই বিদ্যার যুগে বিদ্বানদিগের প্রতি লোকের যে কতটা অনুরাগ ছিল এবং রাজারাজড়ারা পর্যন্ত বিদ্বানের পদে কতটা শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত এই যে, তিব্বতের

এক রাজা বিক্রমশিলা বিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্করকে তিব্বতে আনিবার জন্য কয়েকবার বহু চেষ্টা করিয়া শেষে সেই চেষ্টায় নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছিলেন। আমরা দীপঙ্করের প্রসঙ্গে সেই ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করিব।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে এই লেখকেরা সংস্কৃত যে রীতিতে রচনা করিতেন তাহা 'গৌড়ীয় রীতি' নামে পরিচিত পাইয়াছিল। বৈদর্ভী রীতি ও গৌড়ীয় রীতির তুলনা করিয়া দণ্ডাচার্য বলিয়াছেন যে গৌড়ীয় রীতি কঠোর ও জটিল এবং বৈদর্ভী রীতি প্রসন্ন ও সরল। সেই গৌড়রীতির উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"হলধরেতরভুজমুক্তফণীকৃতে বলভিদঃ। তিনি বৈদর্ভী রীতির উদাহরণস্বরূপ আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন কথা "মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা।"

গৌড়ীয় রীতি, তাহার ক্রম বর্ধনশীল জটিলতা।

নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর প্রভৃতি এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় বিহার বিদ্যমান থাকার ফলে তাহাদের আশ্রয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। চীন, জাপান, তিব্বত ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষার জন্য এই কেন্দ্রে আসায় স্থানীয় ছাত্রেরা আসিয়া এতগুলি পণ্ডিতের সমাগমে এবং নানাবিধ জটিল বিষয়ের আলোচনার ফলে পুরাকালের ছাত্রেরা কতকটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়া পড়িত। পণ্ডিতের সহজ ভাষায় কথা কহিবেন কেন? তাঁহারা কোন কালেই তাহা করেন নাই। এখনও পণ্ডিতেরা তাঁহার মধ্যে যাহারা কথ্যভাষায় কথা কহিতে পারেন তাঁহারা লেখায় পারেন না। অতীতের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা না করিলে তাঁহাদের কালোপযোগী সাধারণের বোধগম্যের পক্ষে একটু কঠিন হয়। গৌড়ীয় সংস্কৃত যদি এই সময়ে একটু জটিল হইয়া থাকে, তবে উহার কারণ এই। বঙ্গভাষায় অভিধেয় যে বিষয় হউক, তাহা তাম্রশাসনের ও শিলালিপির ভাষা আলোচনা করিলেই বুঝা যায়।

"চক্রুকে কুলুকোদ্ভূতকীর্তিসভর ... পাদপদ্মার্চিতঃ কুলুতসমঃ সোমঃ গতঃ পরং। বঙ্গানাং বিষয়ঃ শিব কুলগৃহং যস্তৎপ্রতিষ্ঠাপিতঃ তদ্বংশেষু সুরোহমুধেরপি জলধারোপমা লক্ষিতঃ।" এই অংশটি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ১৮ সংখ্যক শ্লোক। ইহা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। ইহার একদিক সংস্কৃতাত্মক, অপরদিক বৈদ্যদেবের অর্থদ্যোতক। এই তাম্রশাসনের একস্থলে রামপালকে রামচন্দ্রের সঙ্গে এবং ভীম কৈবর্তকে রাবণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যের কথা তাম্রশাসনের লেখক অবশ্যই জানিতেন বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ ছন্দের জটিলতা, অর্থের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং বিচিত্র আলঙ্কারিক গুণসমন্বিত কবিতা দ্বারা লেখার চেষ্টায় পাল রাজত্বের সময় সংস্কৃত ভাষা প্রায়শঃ কাব্যময় কতকটা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছিল। দণ্ডাচার্য বহুপূর্বে গৌড়ীয় রীতির এই কালোপযোগিতার কথাই বলিয়াছিলেন। পালরাজগণের তাম্রশাসনের প্রায় সমস্তগুলিই এইরূপ ভাষা লইয়া নানারূপ পণ্ডিত ভঙ্গীতে খেলা করিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া

যায়। একস্থানে বৈজয়ন্তের সৈন্য সহকারে অভিযান ও বৃদ্ধ একটা হাতীর সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। উপমা দুটি এই—হাতীর শুঁড় অঙ্কুরোদ্গত ধূলিপটল বালুকাপূর্ণ বজ্রমুষ্টির মত দেখাইত, সেই ও কাশবনাস্থ ধূলিপটলে সূর্য্যদেবের অশ্বগণের গতিরোধ হইত, সুতরাং ইহা দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া সেই অবিচ্ছিন্ন ধূলিরাশি হইতে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করিতেন, এদিকে আবার দুইটি হস্তই চক্ষু রক্ষায় ব্যাপৃত থাকায় ইহা আর কোন কাজই করিতে পারিতেন না, তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্যগুলি অসম্পাদিত পড়িয়া রহিত কেবলচক্ষু মুদিত হয় না, তাহা অলক। সুতরাং সমরাঙ্গণে দেবতাগণের কণ্ঠস্বরের নিন্দা করিতে পারিতেন, কেন ইহারা চক্ষু বুজিতে পারেন না? ইহা তাঁহাদের কপটফল, যদি চক্ষু বুজিতে পারিতেন তবে দুটি হস্তকে বেশভূষার নিযুক্ত রাখিতে হইত না ইহার পরের শ্লোকে উপমা অন্য ভাবের অবতারণা করিয়া এই যজ্ঞের ঋত্বিক, বিশ্বজিৎ হোমাগ্নির ঋত্বিক, এবং সমস্তলোকের নিধন এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। (রঘুবংশ ১৪ ও ১৫ শ্লোক।) এইরূপ যত উপাদেয় উপমা হইতে পারে রাজাদিগের যে প্রাচুর্য্য ছিল, পুরাণ ও মহাকাব্যেতেও তাহা কতক পরিমাণে লক্ষ্য ছিল। বৃহৎকথা, দশকুমারচরিত প্রভৃতি নাটকেও কতক পরিমাণে পাওয়া যায়। কালিদাসের সময় হইতে অলঙ্কারের দিকে কবিদের ঝোঁক পড়ে। কালিদাসের উপমা ও তাহা চমৎকার, কিন্তু মাঝে মাঝে উপমাগুলি একটু কষ্টকল্পিত ও লম্বা একটু টানিয়া বুঝিবার সময় পাণ্ডিত্যের প্রভাব সংস্কৃত পণ্ডিতেরা পাঠক বর্গে করিয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতগণ তাহাকে গুরুকল্পিত কখনও বা যাঁরা নিঃস্বদের ন্যায় মধুর কবির তাহার উপর অসাধারণ অধিকার দেখাইয়া ছেন তাহা সত্ত্বেও কালিদাসের ভাষায় যতটা পাণ্ডিত্য ছিল, ভবভূতির ভাষায় তাহা পাওয়া যায় না। তবে ভবভূতি নিজের ভাবপ্রবণতায় আসিয়া হইলে লিখিয়াছেন, তাঁহার করুণরস উচ্ছলিত হইয়া ভাগীরথীর ন্যায় শব্দরাশির দুটির পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য্যকে যেন ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। উহার পর সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারে পণ্ডিতগণ আসর জমকালো করিয়া বসিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা তাঁহাদের উদ্দিষ্ট নহে, ভাষার বাহাদুরি দেখানই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল। মগধের রাজসভায় বঙ্গের পণ্ডিতগণ বৈদেশী লোককে কতকটা অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। শ্রীহর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি বইএর পণ্ডিতদের দুরূহত্ব ও অলঙ্কার-নিপুণতার একত্রের দেখানো হইয়াছে। কাদম্বরী ও শ্রীহর্ষচরিতের সংস্কৃত গদ্যলেখকের এরূপ পূর্ণতমপুষ্টি দুই হয়, যাহাতে লেখকগণ শব্দ দ্বারা যে কিরূপ অসাধারণ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই সকল শব্দ একত্র করিয়া যে শব্দস্তূপ বা সন্ধির দুর্গ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা ভেদ করা সকলের সাধ্য নহে। এদিকে নালন্দা প্রভৃতি বিহারে যে বৌদ্ধ ন্যায়দর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহার ছাঁচ বসাইয়া হিন্দু নাস্তিক ও নৈয়ায়িকগণ যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষাত্মক কূট তর্কের মঠ গড়িয়াছিলেন—তাহা জগতের বিস্ময় অথচ দুর্ভ চিন্তাশীলতার স্বরূপ ধারণ করিয়া পরাধীন বাঙ্গলায় অপূর্ব্ব কীর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধিক উপমা

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বাঙ্গালার সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতের জটিল প্রকৃতি হইতে ধীরে ধীরে গ্রাম্যতা কেমন করিয়া আসিল। উহা পণ্ডিত সমাজের প্রাণহীন ভাষায় সন্ধিস্থলের কথা প্রকটিত করিতেছে। কতকগুলি জটিল ও কৃত্রিমতার বন্ধনীর মধ্যে পণ্ডিতগণ ভাষা অনেকটা জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি হারাইয়া ফেলিতেছে, অলঙ্কারের গুরুভারে লঘু হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের কাছে এই জটিলতা ও ভারও লাগে না। কি সমাজ, কি রাষ্ট্রনীতি, কি সাহিত্য—কোন স্থানেই গতিশীলতার প্রতিষ্ঠা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখিতে চাহে নাই। যাহা জীবন্ত গতিশীল ও প্রাণবন্ত তাহার সঙ্গে সকলেই সম্পর্ক রাখিতে চাহে। মাতৃভাষা যেরূপ সাধারণ গ্রাম্য মানুষকে নিত্যসঙ্গে পরিপুষ্ট করিয়া অবিচল করে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ঐশ্বর্য্যময় মায়ের অলঙ্কার দেখিয়া যেমন প্রাণভরা প্রীতিতে সেইরূপ দরদ, বিস্ময়, অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে নিজেদের নাড়ীটা কাটিয়া ফেলে গৃহের আঙ্গিনায় আসে—যাহার সহিত রক্ত কাঠ প্রাণ জড়িত। জয়দেব সেইরূপ সংস্কৃত ভাষার কবি কবিতা কামিনী প্রাণের অনুরাগে হইয়াছিলেন, তাহাতে ব্যঞ্জনা সাধারণ সমস্যার কথা আছে কিন্তু তাহাতে ভাবি পরম একমাত্র নাই যাহা কিছু আছে তাহার সাধারণ কয়েকটা ছন্দের ঝঙ্কার, অথচ তিনি সংস্কৃতের লোভনীয় মুক্তিটা নষ্ট তাহাকে পরিপূর্ণরূপে ঢালিয়া করার এত চালাইয়াছেন, তাঁহার "চল সখি কুঞ্জং" "অলসল সঙ্গল কুসুম সমূহ" "মধুরিপু অলিত বিলাপে" "কোকিল-কূজিত কুঞ্জ" "লবঙ্গ লতা পরিশীলনকে মলয় সমীরে" প্রভৃতি পদ সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সাথে সঙ্গে—তখন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন কিন্তু মনে হয় এই উপলক্ষে বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের ঘরে আসা ছেয়ে না হইয়া থাকে, এই জন্য তাঁহারা একটা হেয় রচনার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি হয় সাধারণের হাল ধরিলেন না, তাহাতেই উমাপতি ধরাক "মিলা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার কোমল শ্রুতির ভাষায় একমাত্র কোমল কান্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন বলিয়া দম্ভ—এই সুধা বর্ষিয়াছেন। কবিশেখর রাজকুমার ঐশ্বর্য্য ছড়িয়া দিয়াই সান্ত্বনা ছিলেন, হয়তো তাই তাহা সেইভাবে কয়েকজন সাজিয়া সম্পদ বিলাইয়া দিয়া নিজে হইলেন। বাঙ্গালাদেশেও এইরূপ বাহ্য মনন ছাড়িবার মুহূর্তের অভাব নাই বাঙ্গলা ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসার একটা বাঙ্গালার মতো আছে অগতে আর কোন ভাষার হয় আছে কিনা জানি না জয়দেব সংস্কৃতের জটিল পাশ ছাড়িয়া দিয়া ভাষাকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গীত-গোবিন্দ গ্রন্থখানি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অমর স্থানে রচিত হইয়াছে।

জয়দেবের বাঙ্গলার আদর প্রাপ্তিরহস্য।

এই বিদ্যার যুগের যে প্রবল পাণ্ডিত্য তাহা এখনও বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ের গ্রামন পণ্ডিতদের কাহার ভাষার মধ্যে প্রভূত বিস্তার করিয়া আছে। যৌগা, গুপ্ত বেং পালদিগের রাজত্বের কোন শিক্ষা বা কথাই বাঙ্গালার বাস করে নাই আজও দেখিবে, এই সকল যুগের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আমরাই হইয়াছি, আমাদের আর কোন অতীত সেই যুগের

বাঙ্গলার পাণ্ডিত্যের বিস্তারের প্রকার

গুণরাশির অন্ততঃ দাবী করিতে পারেন না, ইহাই আমরা পাই—যেহেতু মগধবাসীরা ধীরে ধীরে পার্বত্যপ্রদেশের আশ্রয় ছাড়িয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে হটিয়া গেছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

"Indian Pandits in the Land of Snow" নামক পুস্তকে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'The close resemblance which the modern Bengali bears to the Magadhi, and the comparison of the customs of the ancient Magadhi people with those of the modern Bengalis show that the latter have descended from the former ... It may be inferred that we are the descendants of the very people who constituted the central empire of Magadha though we have thus far, in the course of two thousand years and a half, moved to Bengal, replacing the original Bengalis who moved further East and South to Burmah and Siam" (p. 21)

| "বাঙ্গালা ভাষা ও মগধের সহিই সম্বন্ধ,—পাটনা মগধবাসীদের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালাদের আচারব্যবহার ঠিক প্রভেদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি—মাগধদের বংশধর। ইহা সিদ্ধ করা যাইতে পারে যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাই আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মগধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহারা এই দীর্ঘ কালের মধ্যে বঙ্গ দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে, হটাইয়া ও ধ্বংস বিতাড়িত করিয়া এই দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন।"

অধিকাংশ এমন কি শৈশবাবধি পাণ্ডিত্যের সমস্ত অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও পূর্ব্ব সীমান্তের শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বাঙ্গাল পণ্ডিতগণ আজও তাঁহাদের অন্তঃপুরে কথিত ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের অতি

পণ্ডিতী বাঙ্গালা।

গুরুগম্ভীর শব্দ সকলও ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাদের চলিত কথা অনেকাংশে প্রাকৃত। সেই জন্যই কোথাও "ও" স্থলে "উ" (যথা "চোর" চুর, সোল স্থলে সুল, সাত স্থলে হুত, কোথাও বা উ স্থলে ও। যথা তুফান স্থলে তোফান), উ স্থলে ঠ। (যথা ছোট স্থলে ছোঠ), ও স্থলে উ (যথা ঢোলের স্থলে ঢুল), ন স্থলে ল, যথা নাড়া স্থলে লাড়া, ণ স্থলে ন (যথা আগুন স্থলে আগুল) ইত্যাদি নানারূপ প্রয়োগ দ্বারা দেখা যায় যে প্রাকৃত ভাষার গতির স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদের কথিত ভাষার একটা স্বাধীন রকমের বিভিন্নতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সেই সকল প্রাকৃত ভাষার আনুগত্য স্বীকার করিয়াও এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের বিচিত্রমূর্ত্তি গতি সত্ত্বেও সেই পণ্ডিতী যুগের জয়পতাকা উড়াইয়া রাখিয়াছেন। কথিত ভাষায় শব্দের প্রাকৃতরূপ তাঁহারা শতবার স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সেবভাষার কতকগুলি চিহ্ন ভাষা হইতে মুছিয়া ফেলিতে স্বীকৃত হন নাই কোন কোন স্থানে উচ্চারণদোষে তাঁহাদের সংস্কৃত দোষাবহ এমন কি উপহাসোস্পদ হয়—তথাপি সেই সকল শব্দ তাঁহারা ছাড়িবেন না 'ভাত' কে 'অন্ন' বলিবেন, 'জুতো'কে 'পাদুকা', 'কাঠ'কে 'কাষ্ঠ', 'কাঁটাল'কে 'কণ্টক', 'ঘাম'কে 'ঘর্ম্ম', 'চামড়া'কে 'চর্ম্ম', 'ঘি'কে 'ঘৃত' 'খাওয়া'কে 'ভক্ষণ', 'দেখা'কে 'দর্শন' 'বামুন'কে 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি সাধুভাষা তাঁহারা নিরক্ষর কথোপকথনের ভাষায়ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোন কোন স্থলে রাঢ়ের লেখকেরা পূর্ব্বাঞ্চলের লোককে এরূপ ঠাট্টা করিয়া থাকেন বিদ্রূপকারীরা একটা শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে "পূর্ব্বাঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে কখনই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে না, কারণ তাঁহারা 'শতায়ু হও' এই বলিতে যাইয়া 'হতায়ু হও' এই আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলেন।" আপনারা যদি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের "প্রবোধচন্দ্রিকা" এবং শত বৎসর পূর্ব্বের আর কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন সেই পাদ্রীসাহেবের 'পণ্ডিতী যুগ' যাহা গৌড়ীয় রীতি-অনুগ বলিয়া কটাক্ষপূর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কি ভীষণ প্রভাব একসময়ে আমাদের সাহিত্যসাহিত্যের উপর পড়িয়াছিল। ইহার বহু উদাহরণ আপনারা আমার "Bengali Prose Style" নামক পুস্তকে পাইবেন। প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে একটি মাত্র উদাহরণ দেখাইতেছি—"অনভিব্যক্ত বর্ণমাত্র মাত্র বাক্য পরানাম্নী ভাষা যেমন অভিনব কুমারদের ভাষা তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পরসি নামক ভাষা ছিতা যেমন প্রাপ্তমৎকিঞ্চিদ্বাক্য বালকবাণী।"

আর্য্যাবর্ত্তের আর কোন সাহিত্যিক ভাষার উপর গৌড়ীয় রীতির এরূপ প্রভাব দেখা যায় না। যাঁহারা ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরগণ গোড়দেশেরই পণ্ডিত এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকোর্ত্তে যে তাঁহারা অমনোযোগী ছিলেন না, তাহা এই সকল উদাহরণের দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে।

সেদিন আমাদের নটরাজ শিশিরকুমার প্রফুল্ল নামক নাটকে একটি স্ত্রী-চরিত্রের মুখে যে ভাষার আড়ম্বর দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক কলোপযুক্ত নহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও যে গৌড়ীয় রীতির প্রভাব পড়িয়াছিল তাহার সমাপ্ত অশিক্ষিত লোকের সাধুভাষা-ব্যবহারের চেষ্টায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। সেগুলি আর ভাষার অলঙ্কার বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে, তাহা বরঞ্চ ভাষার রোগ বলিয়া ধরা যায়। সেদিনও এক চাষা আমাকে বলিতেছিল, "বাবু, এবার আমাদের ক্ষেতে অনন্ত ধান হইয়াছে।" আর একজন তাহার জামাতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবে বাহ প্রসারণপূর্ব্বক বলিয়াছিল, "দেখুন, আমার উপর সে চটিতে পারে, কিন্তু আমার কন্যাকে সে মারিবে কেন? তাহার উপর একটা অনুরাগ কি ভাল?"

পাল্লাধিকারে বঙ্গীয় সমাজে এক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যদিও অশোকের সময় হইতে প্রকৃত গুণবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি গৌড়ীয় হিন্দুর দল এই সম্মানে প্রীত ছিলেন না। সপ্তম বংশের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য অতিমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। অশোক ধর্ম্মমহামাত্রদের পদের সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণগণের কোপের ভাজন হইয়াছিলেন, যজ্ঞে পশুহননবিধি রহিত করিয়াও বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষপাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ সকল কথা ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় আমরা কতকটা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্য-ধ্বজা উত্থাপিত করিয়া বৌদ্ধদিগের প্রতি ভীষণ

গুরুতর সামাজিক পরিবর্ত্তন।

প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্রাহ্মণদের বলবৃদ্ধি হইতেছিল, অন্ধ্ররাজগণও ব্রাহ্মণধর্মের পুনঃসমুত্থানের পরিপোষক হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এদিকে বৃহৎবঙ্গে পালরাজাদের সময়ে বৌদ্ধ-হাওয়া পুনরায় দেশে প্রবাহিত

বৌদ্ধ পুনঃপ্রদীপ

হইতেছিল। তিব্বতের রাজা লামা ইয়েসি, ব্রাহ্মণাধর্মের নেতা গারোয়ালের রাজার হস্তে উৎপীড়িত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এদিকে পালরাজাদের সময়ে নালন্দ, ওদন্তপুর, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বহু বৌদ্ধবিহার—জ্ঞান ও বিদ্যার প্রখর রশ্মি বিতরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিব।

পালরাজগণ, বিশেষ করিয়া শেষের দিকের পালবংশের কতিপয় রাজা, প্রকৃত যোগ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকিলেও তাঁহারা বৌদ্ধধর্মেরই পরিপোষক ছিলেন, আর্যাবর্তের ও দক্ষিণাপথের গোঁড়া ব্রাহ্মণের দল এদেশকে অপবিত্র মনে করিয়া ত্যাগ করিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—এখানে জনসাধারণ অতি পূর্বকাল হইতেই ব্রাহ্মণ-বিরোধী ছিল এবং এদেশ বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল, সুতরাং যদিও কপিল মুনির আশ্রম এবং প্রাচীন শৈবধর্মসংক্রান্ত অনেক তীর্থ এখানে বিরাজ করিত—তথাপি পালাধিকারে নব্যোত্থিত ব্রাহ্মণগণ এই দেশকে ব্রাহ্মণদিগের বাসের অযোগ্য মনে করিয়া এদেশের সঙ্গে সমস্ত হিন্দু-সমাজের সম্বন্ধ ত্যাগ করাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা যেরূপ পুণ্ড্রবর্ধনের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধপ্রাধান্য দেখিয়া পদ্মা ও বুড়িগঙ্গাকে গঙ্গার শাখা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত এবং ভগীরথ-খাত খালের গৌরব বাড়াইয়া ঐ দুইটি বৃহৎ নদীর জাতি মারিয়াছেন, তেমনই করিয়া পালাধিকারে ভারতের নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজ বঙ্গ ও অপরাপর বৌদ্ধাধিকৃত স্থানসমূহ তাঁহাদের গণ্ডী হইতে বর্জন করিলেন। ফলে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ বর্জিত হইল তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই সকল দেশে আসিলে হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—এই বিধি প্রচারিত হইল। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ এবং ভারতের বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রের বর্জন দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্যলক্ষ্মী একরূপ বিতাড়িত হইলেন।

সামাজিক এই গুরুতর পরিবর্তনের ফলে এই দেশ ব্রাহ্মণ-বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা এই পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি যে এদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দু কেন্দ্রে আশ্রয় লইয়া জাতিরক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা

ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গলাদেশ ত্যাগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, এম এ., পি. আর. এস মহাশয় তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন. ৮৮ পৃষ্ঠায় সিংহল-প্রবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরমের একটি প্রবন্ধের কতকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—ঐ প্রবন্ধটি কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে অতি স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে—দক্ষিণাপথের কানেড়ার লক্ষ লক্ষ কন্নড় ভাষাভাষী ব্রাহ্মণ বাঙ্গলাদেশ হইতে তথায় গিয়াছেন বলিয়া যাঁহা পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের

ভাষার সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার অতুল নৈকট্য। এক্ষেত্রে এখনও তাদৃশ অনুসন্ধান চলে নাই, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—পালাধিকারে গৌড়দেশের ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে গমন পূর্ব্বক স্বতঃ স্থানে অধিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং এই জন্য—

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥"

—প্রভৃতি শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই জন্য পূর্ব্বাগতগণের পুত্রপৌত্রকে কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া নব ব্রাহ্মণসঙ্ঘের প্রবেশে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ-বিহার

পাল-রাজত্বকালের সময়ে জাতীয় উচ্চ শিক্ষা গৌরবের তুঙ্গশিখরে উঠিয়াছিল। কোথায় গেল সেই নালন্দা,* ওদন্তপুর (বা উদণ্ডপুর), বিক্রমশীলা, জগদ্দল ও সুবর্ণ বিহার? এই যুগ বাঙ্গলা ইতিহাসের স্বর্ণযুগ,—ইহা স্থপতি ও ভাস্কর্য্যের স্বর্ণযুগ—ইহা বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার স্বর্ণযুগ—এই যুগের গৌরবস্মৃতি বাঙ্গালাদেশকে চিরকাল উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

নালন্দা ১০ কোটি স্বর্ণমুদ্রায় ক্রীত আম্রকানন

বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া নালন্দা-বিহার গৌড়মণ্ডলের—তথা এসিয়ার—সর্ব্বপ্রধান বিদ্যাকেন্দ্র-রূপে বিরাজ করিতেছিল। বিহারে রাজগিরির ৭ মাইল উত্তরে ঘড়গাঁও বলিয়া যে পল্লী বিদ্যমান, তাহাই এক সময়ে নালন্দা-বিহারের গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। কথিত আছে পাঁচশত বণিক্ ১০ কোটী স্বর্ণমুদ্রা-মূল্যে বুদ্ধদেবের জন্য এক বিশাল আম্রকানন ক্রয় করেন। সেই আম্র-কাননে উত্তরকালে নালন্দা বিহারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পালি সাহিত্যে মাঝে মাঝে 'নালো' গ্রামের উল্লেখ থাকিলেও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহা একটি অখ্যাত পল্লীমাত্র ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিংহলাধিপ মহানাম এইখানে একটি বড়রকমের বিহার-নির্ম্মাণের অনুমতি পাইয়াছিলেন, ৩৩০-৩৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আম্রবনে এই বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। জৈন ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, ৫০০ খৃঃ পূর্ব্বে এইস্থানে রাজা বিম্বিসারের

* নালন্দা-বিহারের সমকালবর্ত্তী আরও কয়েকটী বৌদ্ধবিহার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ভাগলপুরের পাথরঘাটায় অবস্থিত বিক্রমপুর বিহার, ওদন্তপুরী বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে ১০০ শত বিহারে ছয় হাজার ছিক্ষু থাকিত, এতদ্ভিন্ন সুবিখ্যাত তক্ষশিলা বিদ্যাকেন্দ্রের কথা সর্ব্বত্র সুবিদিত।

রাজত্বকালে কোন সৈন্য সন্ন্যাসী একটি আশ্রম স্থাপন করেন নালন্দা-বিহার তাহারই বিকাশ। লামা তারানাথের মতে অশোকই এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু আরও বুদ্ধের কিছু কিছু সারিপুত্রই নালন্দায় জন্মগ্রহণ করাতে এইস্থান বৌদ্ধতীর্থস্বরূপ হইয়াছিল, খৃ: দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে নাগার্জুন এবং আর্যদেব এই পীঠে স্থাপত্য বিহারের অধ্যক্ষরূপে হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অব্দারম্ভে এক মনোজ্ঞ বুদ্ধ মন্দির পর্যন্ত অশোকের সময়ে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষ এখানে ১০০টি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৪০০ খৃ: অব্দের সন্নিহিত কোন সময়ে বিখ্যাত চীন পর্যটক ফা-হিয়েন এই বিহার পরিদর্শন করেন—তিনি পীঠটিকে "কালেন্দ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্রের সমাধিমঠ তিনি এইখানে দেখিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গের উত্তরাঞ্চল খড়্গবংশের রাজকুমার শীলভদ্র যখন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন সেই সময়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউনসাঙ্গ এই বিহারে ১৫ মাস অবস্থান করেন সেই বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতবরের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ্গের পর পাঠান নরপতি এইস্থানে পাঁচটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন এই পাঁচটির নাম ছিল ভক্রাশিলা, হরিশুল্ক তপালতগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বজ্র। উত্তরকালে ক্রমান্বয়ে বহু রাজার মুক্তহস্ত দানশীলতা, আন্তরিক অনুরাগ ও প্রচার, এবং স্থপতি ও চারুশিল্পিবিদগণের প্রচেষ্টায় নালন্দা-বিহার এরূপ একটা কীর্তি হইয়া দাঁড়াইল যে, ৬৩৭ খৃ: অব্দে হিউনসাঙ্গ যখন ইহা প্রথম দর্শন করেন তখন ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই বিহারে বহু সহস্র সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত ছিল। তাঁহারা শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, তাঁহারা বিনয়ের সূত্রগুলি সযত্নে অতি কঠোরভাবে পালন করিয়া সমাজে আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, কিরূপে রাত্রদিন চলিয়া যাইত অনেক সময়ে তাঁহাদের তাহা খেয়াল থাকিত না। নালন্দা-বিহারের নাম এরূপ সম্মানের ছিল যে, কোনস্থানে প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় পণ্ডিতগণ নালন্দা বিহারে পাঠ করিয়াছেন, মাঝে মাঝে স্বার্থের জন্য এরূপ মিথ্যা পরিচয়ও দিতেন। যাঁহারা এই বিহারে পাঠ করিতে আসিতেন তাঁহারা অধিকাংশই দ্বারপণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া না দিতে পারিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন না। যাঁহারা আধুনিক ও প্রাচীন শাস্ত্রে উপযুক্তরূপ ব্যুৎপন্ন না থাকিতেন, নালন্দা-বিহার তাঁহাদিগকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিতেন না। প্রত্যেক ১০ জন আবেদনকারীর মধ্যে দুই তিনজন মাত্র গৃহীত হইতেন, বাকী প্রার্থীরা ফিরিয়া যাইতেন। হিউনসাঙ্গ যখন নালন্দার ছিলেন তখন যে সকল পণ্ডিতচূড়ামণি সেই বিহার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই কয়েকটি নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য—শীলভদ্র, জ্ঞানচন্দ্র, জিনমিত্র, স্থিরমতি, গুণমতি, চন্দ্রপাল এবং ধর্মপাল।

ক্রমিক ইতিহাস।

হিউনসাঙ্গের সময়কার নালন্দার অধ্যাপকগণ।

অপর একজন চীনপর্য্যটক দীর্ঘকাল এই বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন (৬১৩-৬৮৪ খৃঃ) তাঁহার নাম ইৎচিং, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন (৬১৩ খৃঃ) নালন্দা-বিহারে আটটি বৃহৎ পাঠাগার এবং তাহা ছাড়া ৩০০ প্রকোষ্ঠ ছিল। এই সকল প্রকোষ্ঠে ১০০০এর অধিক শ্রমণ বাস করিতেন। রাজগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ২০০ সমৃদ্ধ গ্রাম দিয়াছিলেন। ৪৫০ খৃঃ হইতে নালন্দা-বিহারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, সুপ্রসিদ্ধ গুপ্ত রাজা মিহিরকুলের সমকালবর্ত্তী (৫১৫ খৃঃ রাজত্ব আরম্ভ) বালাদিত্য এখানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আরও তিনজন রাজা তাম্র বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহাদের মধ্যে শক্রাদিত্য ৪৫০ খৃঃ অব্দে আদি বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু খণ্ডিত্রোত্রে যে সকল শিলালিপি ছিল তাহা হইতে জানা যায় পাল রাজারাই ইহার সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, এই রাজাদের অনেকগুলি রাজধানী ছিল যথা মগধ, বিক্রমপুর, পোণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি। গোপাল, ধর্ম্মপাল, বলাদিত্য নরপাল রামপাল এবং গোবিন্দপাল এই বিশাল বিহারকে অর্থ ও মুক্তহস্ত দানের দ্বারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

নালন্দা বিহার ৩০০ ফুট প্রশস্ত উচ্চভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার সম্মুখে বড়পাঁচের পুষ্পশোভিত হ্রদগুলির নীলজলে কুমুদ কহ্লার পুরভি বিতরণ করিত, নালন্দার প্রধান বিহারটির আয়তন ছিল ১৬০০×৪০০ ফুট। চতুষ্পার্শ্বে আর ৬টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বিহার, সহচরীরা যেরূপ রাজকুমারীকে বেষ্টন করিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রধান বিহারকে বেষ্টিত করিয়াছিল বালাদিত্য রাজার মঠ নালন্দার সর্ব্বোচ্চ দর্শনীয় বস্তু ছিল। ইহার চূড়া ৩০০ ফুট উচ্চে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল এই সুবিশাল এবং উচ্চ মঠের চতুর্দ্দিকে ঠিক বিকল ১০৮টি মঠ পদ্মের ১০৮টি দলের মত দেখাইত ইহার বক্ষস্তম্ভগুলির উর্দ্ধে প্রদর্শিত অদ্ভুত রাক্ষস-মুখ কারুকার্য্য, বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত অলিন্দ, আরক্ত চুনীর ন্যায় কমকান্ত প্রস্তর এবং নানারূপ কারুখচিত উজ্জ্বল রেলিংগুলির প্রশংসা চিত্তনাম্বের মুখে যেন ধরে না। আজ অজন্তা, ইলোরা ও হস্তিগুহার যে বিচিত্র ছবি দেখিয়া জগতের কারুশিল্পিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছেন, এবং যাহা বিধাতার ক্রোধ ও ভিন্নধর্ম্মীদের অত্যাচার হইতে বনজঙ্গলের একান্ত নিভৃতে থাকিয়া কথঞ্চিৎ ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত তথা সমস্ত এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধকেন্দ্র, বিশ্ববিজয়ী সম্রাটদের মুক্তহস্ত দানশীলতায় পুষ্ট নালন্দা-বিহারের চিত্র ও স্থাপত্যের নিদর্শন যে সেগুলি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল তাহা কি আমাদের ভাবা স্বাভাবিক নহে? আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ভগবান্ বুদ্ধলীলার সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহার নিরুপম শিল্পকলার সহস্র সহস্র কুসুম ও কোরকচিহ্ন বনেজঙ্গলে সৃষ্টি করিয়া দিবসান্তে নির্দ্দয় হস্তে ধ্বংস করিয়া ফেলেন, এই ভাবেই আর্য্যাবর্ত্তে শিল্পীর শিল্প, স্থপতির স্থাপত্য ধ্বংস পাইয়াছে, তাহার জন্য দোষী করিব কাহাকে?

ইৎচিং।

ইলোরা ও অজন্তা।

শ্রবণ এবং অধ্যাপকদের গৃহ সাধারণতঃ তৌতল ছিল নবতল গৃহও দুই একটি ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের সংযোগ এরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে যে, ডাক্তার স্মিথ বলিয়াছেন "আধুনিক জগতের কোন ইঞ্জিনিয়ার-নির্ম্মিত গৃহই এই নালন্দার নির্ম্মাণ-কৌশলের পাশে দাঁড়াইতে পারে না ইটের সঙ্গে ইট এমনই সুচারুভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে, তাহাতে জোড়ার কোন চিহ্নই নাই। কানিংহাম এবং গ্রাভলি এই নালন্দার স্থপতি ও শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিয়াছেন—"জগতের কোন এক স্থানে এরূপ আশ্চর্য্য কলা ও স্থপতিশিল্পের এতগুলি নিদর্শন আমি দেখি নাই।" কানিংহামের মত পণ্ডিতের এই উক্তির মূল্য খুবই বেশী। অথচ তাঁহারা সামান্য কিছু উপকরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন হায় নালন্দা! বহুপূর্ব্বে হিউনসাঙ্গ বলিয়াছিলেন, "The monasteries of India are counted by myriads, but this is the most remarkable for grandeur and beauty" "ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র বিহার আছে, কিন্তু শোভা সমৃদ্ধি ও উচ্চতায় নালন্দা-বিহারের তুলনা নাই" নালন্দা বিহার যেখানটায় ছিল, সে রাজ্যের নাম ছিল মগধ এই ধর্ম্মগঞ্জের তিনটি বিখ্যাত অলিন্দ ছিল রত্নসাগর, রত্নোদধী এবং রত্নরঞ্জক। রত্নোদধী নবতল গৃহ ছিল। এই পুস্তকাগারে প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র, সমাজ গুহ্য ও বহুবিধ তন্ত্রও তান্ত্রিক গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। তুরস্ক অভিযানে এই রত্নোদধী ধ্বংস পায় ও ইহার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার এক প্রান্ত আগুনে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ৭৪০ খৃঃ অব্দে আমরা নালন্দার শেষ খ্যাতি শুনিতে পাই—তখন কমলশীল এই বিহারের তন্ত্রের উপাসক ছিলেন বালাদিত্য-নির্ম্মিত তিনশত ফুট উচ্চ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত বিহারের উত্তরদিকে বুদ্ধের আশী ফুট উচ্চ একটি তাম্রমূর্ত্তি ছিল। মহারাজ অশোকের বংশধর রাজা পূর্ণবর্দ্ধন ৩০০ খৃষ্টাব্দে মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ইৎচিঙের পর চেহং (Tchehoa) নামক আর একজন চীন ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়াছিলেন। ৬৪০ খৃঃ অব্দে আনিয়েপো মোক্ষো (আজবর্ম্মা) ও ওচ-হে (Hoe Li) নামক দুইজন কোরিয়াবাসী ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত হইতে ধনবি ও অপর ছয়জন প্রধান ব্যক্তি নালন্দায় আসিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে কি ই (Ki ...) নামক চীন ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়াছিলেন ইহাদের কথা ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসে স্থান পায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য বিদ্যা, ধর্ম্ম ও শিল্পের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রের সম্বন্ধেও দেশের ইতিহাসলক্ষ্মী অতল বিস্মৃতি-সমুদ্রের তলে বসিয়া কোন ভাবী সুদক্ষ ডুবুরীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। হিউনসাঙ্গ নালন্দাবাসী ভিক্ষুদের আহার্য্যসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কৌতূকাবহ তালিকা দিয়াছেন :—

প্রচুর পরিমাণে জম্বীরফল, সুপারি, কর্পূর, মসলের সুগন্ধ তণ্ডুল ও অন্যান্য দ্রব্য ইহারা পাইতেন। হিউনসাঙ্গের জন্য ব্যবস্থা ছিল—প্রত্যহ ২২০টি জম্বীরফল, ২০টি আম, ২০টি খেজুর, আড়াইতোলা কর্পূর, কিছু মাখন, এক পোয়া তণ্ডুল, মাসে তিন 'রাশি'

তৈল। নালন্দার ভিক্ষুগণ ঘোড়ায় চড়িতে পাইতেন না। কাঠের যানে বসিয়া বাহকদ্বারা নীত হইতেন।

যদি তথাকথিত অর্থ বাস্তবিকপক্ষে হইয়া থাকে, তিব্বতরাজ ঘোড়ে ২২০টি বাস্তাপিলেবু দিয়া কি করিতেন, তাহা ভাবিবার বিষয়—বোধ হয় সরবৎ প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন, কিন্তু তথাকথিত অর্থে বোধ হয় 'কালোজাম'।

বিক্রমশিলা— ৮১০ খৃ

নালন্দা বিহার তখনও ধ্বংস হয় নাই। শেষের দিকে (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর গোড়ায়) দুই বিহারেরই প্রতিষ্ঠা ঘোরে চলিতেছিল। বিক্রমশিলা বিহার ৮১০ খৃঃ অব্দে বঙ্গাধিপ মহারাজ ধর্মপাল কর্তৃক স্থাপিত হয়, যদিও রাজচক্রবর্তীদের মানে নালন্দা বিহার পুষ্ট হইয়াছিল—তথাপি নালন্দা সর্ব্বতোভাবে গণতান্ত্রিক ছিল। এখানে ছোট বড় কেহ ছিল না। যিনি পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ হইতেন তিনিই ইহার পরিচালনার ভার লইতেন। রাজাদের কোন ইচ্ছা বা অনুমতি এক্ষেত্রে চলিত না। কিন্তু বিক্রমশিলা ছিল ঠিক রাজকীয় প্রতিষ্ঠান। রাজাই ইহার কর্তা ছিলেন, এবং বিহারের সমস্ত পরিচালনার ভার তাঁহারই উপর ছিল এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইহাকে লোকে "রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়" বলিয়া জানিত। রাজা স্বয়ং পণ্ডিতদিগকে উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন তথাপি বিক্রমশীল রাজদত্ত বিনয়ের বিষয়ের সহিত বলিয়াছেন—রাজা সভাগৃহে উপস্থিত হইলে ছোট বড় কোন ভ্রমণই তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য দাঁড়াইতেন না। শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ ভেদের ইহারা প্রতিকূলস্থল ছিলেন। "বিষ্ণুক নৃপতক" শ্লোক শুধু কথার কথা ছিল না জীবনেও তাহা প্রতিফলিত হইত। জানের

"রাজকীয়" বিশ্ববিদ্যালয়

দীপঙ্করের সময়ে অধ্যাপক

দীপঙ্করের সময় বিক্রমশিলার নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ শীর্ষস্থানীয় ছিলেন,—দীপঙ্করের গুরু আচার্য্য জিতারি, আচার্য্য রত্নাকর আচার্য্য জ্ঞানশ্রীমিত্র ও আচার্য্য রত্নকীর্তি।

বিক্রমশিলা যে পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ও সাধুর নামে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, যিনি বৌদ্ধজগতে বুদ্ধদেবের পরেই সম্মানিত যিনি বাঙ্গালাদেশের নবম শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক অগ্রদূতস্বরূপ, যাঁহাকে আমরা অবিমৃষ্টতা ও মূর্খতার জন্য এতকাল ভুলিয়াছিলাম—সেই আমাদের সকল দীপঙ্করকে আজ আমরা আমাদের বলিয়া জানিতে পারিয়াছি—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা আমাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়ার ফলে। এজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিব। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দীপঙ্করের জীবনী সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার প্রভাব, দীপঙ্করের প্রাথমিক জীবন

"সুরাপান অত্যাচার, ব্যভিচার তন্ত্র মধ্যে যত রত হ্যাপিল
যক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি, জীব সব পূজিতে লাগিল॥"
"রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলা, কারু প্রাণ না মারিলা, মন শুদ্ধি করিলা সভার॥"
"আজানুলম্বিত বাহু যুগল, কনক পুতলী দেহা।
অরুণ অম্বর শোভিত কলেবর, উপমা দেয়ব কাহা॥"

—গৌরপদতরঙ্গিণী, ১৪, ৪২, ১১৬ পৃঃ।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃঃ অব্দে ঢাকাজেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি তাঁহার বাড়ীর পশ্চিমে 'বজ্রাসন' বিহারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বজ্রযোগিনীর পশ্চিমে—ঐ জেলায় নাড়া ও সুরাপুর নামে দুইটি গ্রাম আছে, এই দুই পল্লীর সন্ধিস্থলে একটি বড় রকমের বিহার ছিল তাহা এখন উচ্চ ঢিপিতে পরিণত। এই ঢিপিগুলির নাম 'বাজ্রাসনের ভিটা।' কয়েক বৎসর অতীত হইল একজন সেটেলমেণ্ট অফিসার উদ্যোগী হইয়া এই ভিটাগুলির একটিকে খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বিস্তৃত বিহারের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। এই বাজ্রাসন বিহার দীপঙ্করের স্বীয় পল্লীর অতি সন্নিহিত সম্ভবতঃ এখানে তিনি কতক দিনের জন্য পাঠ করিয়া ছিলেন। গয়ার বিখ্যাত বজ্রাসন বিহারেও যে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার কতকটা নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। দীপঙ্কর কল্যাণশ্রী নামক কোন রাজার ছেলে ছিলেন এবং

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

তাঁহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। বাল্যকালে তাঁহার মাতা তাঁহার 'চন্দ্রগর্ভ' নাম দিয়াছিলেন। এই সময়ে অধ্যাপক আচার্য্য জিতারির বিদ্যার যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল—দীপঙ্করের প্রথম উচ্চশিক্ষার ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। জিতারির সাহায্যে ইনি বিজ্ঞানের পাঁচটি শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দীপঙ্কর ত্রিপিটক, হীনযানশ্রাবকের চারিশাখা, মাধ্যমিক এবং যোগাচার্য্য দর্শন ও তন্ত্রের চারিটি শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তীর্থিকদের শাস্ত্র এবং অপরাপর বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দীপঙ্কর তৎকাল প্রসিদ্ধ এক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত করেন। এই সময় সাংসারিক সুখ উপভোগের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল এবং তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথেই রহিয়া যাইবেন এই সঙ্কল্প করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র চর্চ্চা, ধ্যান ধারণা এই ত্রিশিক্ষা ও সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ধার প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুলগুপ্তের নিকট যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাহুলগুপ্ত তাঁহার শিষ্যকে বৌদ্ধশাস্ত্রের গুপ্ত আধ্যাত্মিক বিদ্যায় দীক্ষিত করেন এবং তাঁহাকে "গুহ্যজ্ঞানবজ্র" উপাধি প্রদান করেন। ১৯ বৎসর বয়সে ওদন্তপুর বিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য্য শীলরক্ষিত তাঁহাকে "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার বয়স যখন ৩১ তখন আচার্য্য ধর্ম্মরক্ষিত কর্ত্তৃক তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুদের শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং ভিক্ষুগণের যে সকল প্রতিজ্ঞা লইতে হয়—তাহা গ্রহণ করেন। ইহার পরে মগধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের নিকট তিনি কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন এবং শূন্য হইতে জগতের উদ্ভব স্বীকার করিয়া এই সূত্র (শূন্যবাদ) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি অবগত হইলেন যে সুবর্ণবিহারের অধ্যক্ষ চন্দ্রকীর্ত্তি বৌদ্ধ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি তাঁহার শিষ্য হইবার মানসে সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা করেন, কেহ কেহ বলেন পেগুর নাম সুবর্ণদ্বীপ। কিন্তু অপর অনেকের মত যাবাদ্বীপেরই অপর নাম সুবর্ণদ্বীপ, আমাদের মতে দীপঙ্কর যাবাদ্বীপেই গিয়াছিলেন, নতুবা পেগু হইতে আসিতে হইলে সিংহলে যাইবেন কিরূপে? তাঁহার সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা বহুমাসে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এজন্য তাঁহাকে বহুকষ্ট সহিতে হইয়াছিল। যাবাদ্বীপে তিনি দ্বাদশ বৎসর থাকিয়া সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র করায়ত্ত করিয়াছিলেন। মগধে ফিরিয়া আসার পর তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভা সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাৎকালিক মগধের প্রধান পণ্ডিত শান্তি, নরপাদ, কুশলী, অবধূতি, ডোম্বি প্রভৃতি বহুলোক তাঁহার সমকক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

বিদেশ-ভ্রমণ।

এই সময় তিনি তীর্থিকদিগের মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে তিনবার পরাভূত করেন অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মনেতাদেরও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাঁহার তুল্য পণ্ডিত তখন ছিল না এই বিশ্বাস সর্ব্বসাধারণের মনে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। পালবংশের প্রসিদ্ধ রাজা নয়পাল তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনাইয়াছিলেন। এই সময় বিক্রমশীলা কর্ণরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। নয়পালের সঙ্গে কর্ণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয় পক্ষেরই সামরিক ভাবে অপরাধের ঘটিয়াছিল। দীপঙ্কর মধ্যে পড়িয়া

উই রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে সোহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। (১৬১ পৃঃ)

এই সময়ে তিব্বতের রাজা ছিলেন মাঃ লামা ইয়েসি চোড্। ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তিব্বতের প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ ইনি সাতজন বালককে মনোনীত করেন। ইঁহাদের কাহারও বয়স দশের উর্দ্ধে ছিল না। যাহাতে ছোটকাল হইতে ইঁহারা সংসারে আবদ্ধ না হইয়া নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারেন, এই জন্য রাজা এই সকল বালককে তাঁহাদের পিতামাতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া শাস্ত্রে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সাত বালক যখন বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চ্চায় অনেকটা অগ্রসর হইয়া বয়স্থ হইয়াছিলেন, তখন রাজা আবার ইঁহাদের প্রত্যেকটির অধীনে ৬ইজন করিয়া বালক সেই সকলকে করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রমণদিগের এই তরুণ ক্ষুদ্রদল ক্রমে সর্ব্বসমেত ২১টি হইয়াছিল। রাজা সঙ্কল্প করিলেন শুধু ইহাতে হইবে না, ভারতবর্ষ হইতে প্রধান কোন বৌদ্ধপণ্ডিত আনাইয়া তিনি নানারূপ ভ্রম-দূষিত তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মকে সংশোধিত করিবেন। এতদর্থে ইনি এই ২১টি শ্রমণকে কাশ্মীর ও মগধ প্রভৃতি রাজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। ১২জন বিখ্যাত পণ্ডিত তিব্বতে যাইতে স্বীকৃত হন, কিন্তু রাস্তাঘাট এতই দুর্গম ও বিপদ্সঙ্কুল ছিল যে পথেই ২১জন তিব্বতীয় শ্রমণের মধ্যে পীড়া ও সর্পাঘাতে ১০জন মৃত্যুমুখে পতিত হন। উক্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ সহ ৬ইজন অবশিষ্ট শ্রমণ তিব্বতে ফিরিয়া আসেন। এই ছইজনের নাম "শিলেন্দ্র জ্ঞান গো" এবং "লেগস্ পতি সিরাব"। রাজার আদেশমত ইঁহারা মগধাদি দেশেও আসিয়াছিলেন। ইঁহারা গৃহে ফিরিয়া রাজাকে বলিলেন—"ভারতবর্ষে বিক্রমশিলার প্রধান অধ্যক্ষ দীপঙ্করের মত পণ্ডিত আর নাই, কিন্তু আমরা তাঁহাকে তিব্বতে আসিতে বলিতে সাহস পাইলাম না।" যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তিব্বতীয় শ্রমণেরা তাঁহাদের কাছে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু দীপঙ্করের গুণগ্রামের কথা রাজা যতই শুনিতে লাগিলেন ততই তাঁহাকে তিব্বতে আনিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইল। অবশেষে তিনি একজন সুদক্ষ লেখক "গায়ংসেন-গ্রুসেনগি" (Gyatsen-Grosen-ge) কে একশত অনুচর ও অনেক স্বর্ণসহ বিক্রমশিলায় পাঠাইয়া দিলেন। সেনগি দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করিয়া গুরুভার একখণ্ড স্বর্ণ ও তিব্বত-রাজার পত্র তাঁহার হাতে দিলেন এবং সেখানে গেলে তিনি সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইবেন, এই সকল কথা বলিয়া অতি বিনীত ভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া দীপঙ্কর বলিলেন "আমার নাওয়ার দুইটি কারণ দর্শাইলেন, আমাকে এই স্বর্ণ আরও প্রচুর স্বর্ণ দিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে গেলে আমি পূজা প্রতিষ্ঠা পাইব। মহাশয় আপনার রাজাকে বলিলেন আমি স্বর্ণ বা তিব্বতের প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহি। এই স্বর্ণ আপনি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবেন।" এই বলিয়া দীপঙ্কর তিব্বত দূতকে সেই স্বর্ণখণ্ড ফিরাইয়া দিলেন। সেনগি এই সকল কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার কৌষেয় বস্ত্রের এক প্রান্ত দিয়া চক্ষু

তিব্বতরাজ মাঃ লামা ইয়েসি।

আমি স্বর্ণ ও প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহি।

মুছিতে লাগিলেন। তিনি সংক্ষেপ কথায় তাঁহার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলেন আচার্যদেবের জন্য সেনগি হিমালয়ের সুদূর উপত্যকা হইতে কত কষ্ট, কত বিপদ্, কত ঝামেলা বহন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে কেহবা দারুণ ঠাণ্ডাতিসহে, কেহবা অসুরোগে, কেহবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এখন যদি ফিরিয়া যান তবে তাঁহাদের রাজার ক্রোধ ও দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। এই সকল কথা শুনিয়া দীপঙ্করের মন আর্দ্র হইল, তিনি অনেক মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প হইতে তিনি বিচলিত হইলেন না। তিব্বতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

নাঃ লাবা ইয়েশি ও গারো-লোকের রাজা।

রাজা লাঃ লাবা তথাপি আশা ছাড়িলেন না। তিনি তিব্বতের লোকদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সার কথা প্রচার করিবেন। যে করিয়া হউক, দীপঙ্করকে আনিতে হইবে—নতুবা অন্ততঃ বিক্রমশিলার যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন—তাঁহাকে আনিতে হইবে। এই ধর্মপ্রচার ও লোকহিতকর কার্যের জন্য অর্থের দরকার, সুতরাং স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য রাজা নেপালের উপত্যকায় স্বয়ং মাত্র ১০০ পরিকর সহ উপস্থিত হইলেন। সেখানে গারোলোকের (গারোবাসের) রাজার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল উক্ত রাজা বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং যখন শুনিলেন যে তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান পাণ্ডা ধর্ম-বিস্তার করা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার বহু সৈন্যসামন্ত সহজেই তাঁহাকে বন্দী করিলেন। প্রথমতঃ প্রস্তাব করা হইল, রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে রাজার চেহারা যত বড় তত বড় একটা মূর্তি গঠন করিতে যতটা খাঁটি সোনার দরকার তাহাই তাঁহাকে দিতে হইবে তিব্বতের যুবরাজ 'চাংচুব' প্রথমতঃ শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন ঐরূপ অভিযানের ফলে গারোলোকের নিষ্ঠুর রাজা তাঁহার বৃদ্ধ পিতৃব্যের উপর অত্যাচার করিতে পারেন। সুতরাং সোনা সংগ্রহ করিয়া রাজার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একটা মানুষের মতন মূর্তি গড়িতে যে সোনার দরকার তাহা মানুষটির ওজন হইতে ঢের বেশী। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া বলিল এই সোনা দিয়া মানুষের মাত্র মুখখানি গড়া যাইতে পারে। সমস্ত মূর্তি গড়িতে আরও সোনার দরকার হইবে। রাজকুমার তাঁহার পিতৃব্য বন্দী রাজার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার মুক্তি দিলেও আমি বেশী দিন বাঁচিব না, সুতরাং এতগুলি সোনা এই নিষ্ঠুর বিধর্মীকে দেওয়ার কোন দরকারই নাই। এই টাকা দিয়া তোমরা প্রজাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার কর এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে আমাদের দেশে আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। সোনা সংগ্রহের আর চেষ্টা করিও না। তোমরা উক্ত মহাপুরুষের নিকট এই মর্মে চিঠি পাঠাও—তিব্বতরাজ স্বীয় রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং আপনাকে আনিবার চেষ্টার জন্য বিধর্মী শত্রু রাজ কর্তৃক বন্দী হইয়া কারাগারে আছেন, তাঁহার এই প্রার্থনা, যেন তিনি (দীপঙ্কর) রাজাকে দুঃখের দিনে আশ্বাস করেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহার

আশীর্ব্বাদে তাঁহার জন্মজন্মান্তরে তিনি ধর্ম্মপথে দৃঢ় থাকিবেন এবং সেই পথ বিঘ্নবিহীন-কুসুমাকীর্ণ হইবে। তিনি পণ্ডিতবরের শ্রীমুখ-দর্শনের আশায় এখনও জীবিত আছেন।" সান্ত্বনোচ্ছলে যুবরাজ পিতৃব্যের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তথাপি তাঁহার মুক্তির আশা ছাড়িলেন না, সেনা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শত্রু শঙ্খা ক্রুদ্ধ হইয়া তিব্বতের রাজার উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে একটা ভীষণ কইলাসক কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এত কষ্ট বৃদ্ধ রাজা সহ্য করিতে পারিলেন না। শেষদণ্ডে পার্শ্বস্থ দপঙ্করের নাম স্মরণ করিয়া তিনি কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তিব্বত রাজার মৃত্যু।

বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রাতুষ্পুত্র 'চাংচুব' রাজা হইলেন। কিন্তু তিনি শাসন পরিচালনা করিলেও ধর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া রহিলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুতে প্রভাত লোকে তিনি এক সভা আহ্বান করিয়া বিনয়ধর (পুলথিম সিঙ্গাল্পো) নামক পণ্ডিতকে পুনরায় দীপঙ্করকে আনিতে প্রেরণ করিলেন। ইহার বয়স ২৭ বৎসর মাত্র হইলেও ইনি কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন রাজা বলিলেন, "আমাদের দেশে ধর্ম্মের ঘোর অবনতি হইয়াছে ভিক্ষুরা বিসংঘাম করিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে একদল নীলবস্ত্রের আলখাল্লা পরিধা তান্ত্রিক বাজিকার শিক্ষা দিতেছে পূর্ব্বে মহারাজ ভারতবর্ষ হইতে যে তের জন পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই, বরঞ্চ দিন দিন ধর্ম্মের অধোগতি হইতেছে। তুমি দীপঙ্করকে যে করিয়া হউক লইয়া আইস, তুমি ভারতবর্ষে ছিলে, সংস্কৃত জান এবং সে দেশের সকল কার্য্যের অভ্যস্ত হইয়াছ যদি দীপঙ্কর নিতান্তই না আসেন, তবে তাঁহার পরেই যিনি প্রধান তাঁহাকে আনিতে চেষ্টা করিবে" বিনয়ধর প্রথমতঃ যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তিনি নিজনে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও বিনয়ধর্ম্ম আচরণ করিবেন—ইহাই তাঁহার বাঞ্ছা ছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে দীপঙ্করকে আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া জীবনের কামাবস্তু লাভের পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করা উচিত হইবে না, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা প্রথমতঃ যাহা অনুরোধের মত বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন, এবার তাহা রাজাদেশ বলিয়া স্থির ধরিলেন অগত্যা বিনয়ধরকে সেই আদেশ পালন করিতেই হইল রাজা তাঁহার সঙ্গে ১০০ অনুচর দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিনয়ধর মাত্র পাঁচটী সঙ্গী লইলেন। রাজা তাঁহাকে মোট ৩৫ আউন্স স্বর্ণ দান করিলেন। ইহার মধ্যে ১৬ আউন্সের একখণ্ড স্বর্ণ দীপঙ্করকে উপঢৌকনস্বরূপ দেওয়া হইবে, ৭ আউন্স বিনয়ধরের পারিশ্রমিক, ৭ আউন্স তাঁহার যাতায়াতের ব্যয় এবং ৫ আউন্স একটি দোভাষীর জন্য। তিনি সেই ভাষা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

একবার ডাকাতের হাতে পড়িয়া আর একবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিরুপায়ভূমিতে সঙ্কল্প করে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া নানা কৃচ্ছ্র ও বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক বিনয়ধর বিক্রমশিলায় উপস্থিত হইলেন সৌভাগ্যক্রমে তখন সেই বিহারে বিনয়ধরের শিক্ষক তিব্বতদেশীয় গায়ব-

সন অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার যে অতীশ দীপঙ্করকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, একথা যেন প্রকাশ না করেন। অতীশ বিক্রমশিলা বিহারের সর্ব্বোচ্চ চূড়াস্বরূপ, তাঁহাকে চিনাইয়া এখান হইতে আপনারা লইয়া যাইবেন, এই উদ্দেশ্যের কথা শুনিলে এখানকার লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। আপনারা উদ্দেশ্য গোপন করিয়া আর আটশ সোনা দক্ষিণা দিয়া মহাস্থবির রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হউন এবং এখানকার ছাত্রশ্রেণীতে ভর্ত্তি হউন। তারপর লেখাপড়ায় আগ্রহ, ব্যবহারের সৌজন্য এবং অনুরাগ দ্বারা যদি মহাস্থবিরকে খুসী করিতে পারেন তবে অতীশ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করিয়া স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপনের সুবিধা পাইতে পারেন।

গায়ংসমর পরামর্শ।

তুলশিমু নাগচো-বাসী ছিলেন বলিয়া অনেক সময়ে নাগ চো উপাধিতেই অভিহিত হইয়াছেন। নাগ-চো গায়ংসেনের সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া সেই ভাবে বিহারে ভর্ত্তি হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বৌদ্ধশাস্ত্র অনেকটা জানাশুনা ছিল, সুতরাং তথায় প্রবেশ লাভ করিতে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই।

তারপর দিন বিক্রমশিলা বিহারে ৮০০০ ভিক্ষুর এক বিরাট সঙ্ঘ আমন্ত্রিত হইয়াছিল। নাগ-চো গায়ংসেনের সঙ্গে সেই সঙ্ঘের এক কোণে উপবেশন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহাদের কোন্‌টি অতীশ? গায়ংসেন বলিলেন, "তাঁহার দেহলক্ষণ দিব্যদর্শন ঋষিমূর্ত্তি দেখিলে আপনা আপনিই চিনিতে পারিবেন।" সেই সঙ্ঘে প্রথমে আসিলেন 'আচার্য্য স্থবির বিদ্যাকোকিল', ইঁহার কাছে অতীশ কতকদিন পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর আর একজন আচার্য্য আসিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি সোম্য ও গম্ভীর, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইঁহার মত পণ্ডিত বিরল ছিল না। ইঁহার নাম নরপাল, ইনিও একসময়ে অতীশের গুরু ছিলেন। নরপালের পর এক সুলক্ষণসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তি আসিয়া একটি উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিলেন। ইনি বিক্রমশিলার রাজা, কিন্তু ইঁহাকে দেখিয়া ভোটবঙ্গ কোন পণ্ডিত বা অধ্যাপক উঠিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। সেই সময়ে আর একজন অতি গম্ভীরপ্রকৃতি, স্থবির পণ্ডিত আসিলেন, তাঁহার নাম বাগীশ্বর। ইনি কোন্ দেশের লোক, কেহ বলিতে পারিল না—লোকে বলিত, ইঁহার জ্ঞানের অবধি নাই।

সভামঞ্চের সমস্ত আসন পূর্ণ হইয়া গেল, কেবল একজনের স্থান তখনও পূর্ণ হইতে বাকী। তখন এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আগমনে সমস্ত সভাস্থলে একটা শ্রদ্ধামিশ্র আনন্দের গুঞ্জন শোনা যাইতে লাগিল। তিনি আসিলেন, তিনি সেই সমাগত বরেণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বরেণ্য, তাঁহার আনন্দময় মুখ দর্শন করিয়া কাহারও দৃষ্টি ক্লান্ত হয় না। তাঁহার মূর্ত্তির উজ্জ্বল-দীপ্তি এবং মুখমণ্ডলের বিনম্রলাবণ্যে দর্শকগণের চক্ষু মুগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার কোমরে কতকগুলি চাবি ঝুলিতেছিল, কারণ তথাকার সমস্ত বিহারের প্রবেশ তাঁহারই অনুমতি-সাপেক্ষ ছিল। এমনই তাঁহার স্থির রূপ এবং আকর্ষণী শক্তি যে ভারতবাসী নেপালী, তিব্বতবাসিগণ সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, তিনি তাঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

দীপঙ্করের দৃষ্টি।

একজন। বোধ হয় স্বর্গ হইতে দেবগণও তাঁহাকে আত্মীয় বলিতে পারিলে ধন্য হইতেন। তাঁহার মুখে প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে এমন একটা স্নেহের মাধুর্য্য খেলিতেছিল যে তদ্দ্বারা দর্শকমণ্ডলীর প্রত্যেকেই যেন বাত্সল্যে অভিভূত হইল। ইনিই তৎকালিক জগতের পণ্ডিতদের শিরস্থানীয় শ্রীমান্ আচার্য্য মহাপ্রভু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যাঁহার দর্শনকামনায় তিব্বতরাজ বন্দী হইয়াও ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার লোচনায় মুক্তাকে সুখের মৃত্যু মনে করিয়াছিলেন।

ইহার পর বিনয়ধর দীপঙ্করকে দুই একবার দেখিয়াছিলেন, প্রত্যেকবারই তাঁহার হৃদয় ভক্তিবিনম্র হইয়া তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়িতে চাহিয়াছে। কিন্তু মগধের বহু বিহার যাঁহার তত্ত্বাবধানে চলিতেছিল, —পাণ্ডিত্যে, চরিত্রবলে এবং ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার প্রার্থনা করিতে তাঁহার সাহস কুলাইতেছিল না। বহুদিনান্তে একদা বিনয়ধর গাত্রোত্থানের সহিত দীপঙ্করকে নিবেদন করিলেন। তিনি বিনীতভাবে পণ্ডিতবরকে বলিলেন —তিব্বতের উপর রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব চলিয়া যাইতেছিল। মৃত রাজা লাঃ লাখা এবং তাঁহার পিতা খোঙ্খরকে সমুদ্ধত করিতে কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। এই তান্ত্রিকেরা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে প্রভু অতীশের জন্য সমস্ত দেশবাসী বারিবিন্দুপানী চাতকের ন্যায় উদ্গ্রীব হইয়া আছেন—তাঁহারা তাঁহার জন্য কতই না করিয়াছেন দীপঙ্করের মন এবার করুণাপূর্ণ হইল, তিনি বলিলেন, "জানি হে জানি, তোমার দেশের লোকেরা আমার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছে। আমার জন্য তোমাদের অনেক লোকক্ষয় হইয়াছে এবং আমারই যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতে করিতে তোমাদের দেশপ্রতিম স্বর্গীয় রাজা বিনষ্টীর কারাগারে প্রাণ দিয়াছেন। আমার মন কি পাষাণে নির্ম্মিত? তোমাদের দুঃখ আমার বুকে শেলের মত বিঁধিয়া আছে। কিন্তু আমার হাতে এখন বিস্তর কাজ আছে তাহা সমাপ্ত করিতে একটি বৎসর সময় লাগিবে। এই সময়টি যদি তোমরা অপেক্ষা করিতে পার, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব যাইতে পারি কিনা।" তিব্বতবাসীরা বলিল, "এক বৎসর কেন যত কাল বলিবেন, আপনার শ্রীমুখের অনুকূল আদেশের আশা করিয়া আমরা প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।"

তিব্বত যাওয়ার সম্মতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিব্বত-যাত্রা ও তথায় মহৎ কর্ম্মপ্রতিষ্ঠা

নানারূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। দীপঙ্কর তাঁহার গুরুবর বজ্রাকরের নিকট বিদায় চাহিতে গেলেন। তিনি বলিলেন, "এই তিব্বতীয় আয়ুষ্মদ্বয়ের সঙ্গে আমি তীর্থ-দর্শনে যাইব, আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি প্রার্থনা করি যে আমার প্রত্যাবর্ত্তন

পাঠাইয়া আপনার স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে।" রত্নাকর বলিলেন, "দীপঙ্কর, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।" বিক্রমশিলার এক ভিক্ষু বলিলেন, "এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের চক্ষু-স্বরূপ, ইহার অভাবে এই দেশ অন্ধকার হইবে।" মহাস্থবির রত্নাকর বলিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি, নাগ-চো এবং গম্বৎসন তোমাকে তিব্বতে লইয়া যাইবেন তিব্বতের রাজার আদেশে নাগ-চো এখানে আসিয়াছেন। আর একবার তিব্বতের রাজা তোমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা দেই নাই, এখনও আমি তোমার পথে সমূহ বিপদ্ উপস্থিত করিতে পারি। রাজাকে জানাইলে তোমার তো যাওয়া হইবেই না, অধিক এই তিব্বতের আমুস্থদ্বয়ের জীবন সংশয় হইবে। কিন্তু আমি তাহা করিব না যেহেতু অতীশ স্বয়ং তিব্বতবাসীদের হিতার্থে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমি তাহার শুভ উদ্দেশ্যে বাধা দিব না। বিশেষ এই আমুস্থদ্বয়কে আমি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছি, গুরু হইয়া ইহাদের বিপদ্‌ঘটন করা আমার কর্তব্য নহে, কিন্তু আমি মাত্র তিনটি বৎসরের জন্য ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

আত্মীয় রত্নাকরের অনুমতি।

তিব্বতরাজের প্রেরিত ১৬ আউন্স সোনা দীপঙ্কর চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহার এক অংশ তিনি বিক্রমশিলার অধ্যাপকদিগকে দিলেন, দ্বিতীয় অংশ স্থবির রত্নাকরের হাতে দিলেন, বিক্রমশিলা বিহারের স্থবিরদিগের ব্যবহারের জন্য, তৃতীয় অংশ তিনি বঙ্গাসন বিহারের মহার্থ পাঠাইলেন, চতুর্থ অংশ ব্রহ্মলাভের জন্য উপদেশ দিলেন, ব্রাহ্মা যেন তাহা তথাকার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের হিতার্থে ব্যয় করেন

ইহার পর অতীশ নানা মঠ ও মন্দিরের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুদের নিকট এই যাত্রার শুভাশুভ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে যদি জানিতে পারে তিব্বতরাজ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে দেশময় একটা উত্তেজনা উপস্থিত হইবে—এই আশঙ্কায় নাগ চো সমস্ত জিনিষপত্র ১০টি ভারবাহী অশ্বপৃষ্ঠে রাত্রারাতি পূর্বেই পাঠাইয়া দিলেন বঙ্গাসন পার্বত্য স্থান দর্শন করিয়া দীপঙ্কর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রত্নাকর স্থবির বলিলেন, "নির্বিঘ্নে সময়ান্তে আপনারা ফিরিয়া আসিবেন।" নাগ-চো এই সুবিধা পাইয়া বলিলেন, "আমি এখন শ্রীজ্ঞানের অধীন, তাঁহার আদেশ পালন করিব। তিনি আসিতে চাহিলে আসিব।" মহাস্থবির দুঃখের সহিত বলিলেন, "আমিই বা কি করিয়া তোমাদিগকে অতীশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলিব? বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের নিকট কি হিত তাহা প্রার্থনা করিয়া লও যদি অতীশ আসিতে চান ভাল, নতুবা সেখানে থাকিয়া যেন জীবমাত্র সকলের উপকার করিয়া জীবন যাপন করেন—আমি এই ইচ্ছা বহন করিব।" নাগ-চোর দিকে চাহিয়া অতিবৃদ্ধ রত্নাকরাচার্য্য বলিলেন, "আয়ুষ্মন্, অতীশ বিহনে ভারতবর্ষ কাণা হইবে। বহু বিহার ও প্রতিষ্ঠানের চাবি ইঁহার হস্তে, ইঁহাকে ছাড়া অনেক বৌদ্ধবিহারের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে ভারতে বিপদের দিন আসিতেছে—চারিদিক্ হইতে সেই বিপদের ছায়া দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে। তুরস্কেরা ভারতবিজয়ের জন্য অভিযান করিতেছে।

আমার মন নানা আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, অতীশ যেন জগতের মঙ্গলের জন্য তথায় কাজ করেন।"

বৃদ্ধ রত্নাকরের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল। অতীশ তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি বৎসর ভরিয়া সম্পাদন করিলেন। তাঁহার গুরুতর কার্য্যের ভার তিনি সুবিখ্যাত স্থবির-দিগের উপর ন্যস্ত করিলেন। প্রত্যেক স্থানেই তাঁহাকে নানারূপ বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল নাগচো, গায়েরসেন, দুঃখগড়, ভূমিলঙ্ক ও ঈশাচন্দ্র প্রভৃতি ভিক্ষু সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গে তিনি উত্তরে বিক্রমশিলার পথে রওনা হইলেন। বিক্রমশিলার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ এই দলকে বিশেষভাবে অভিনন্দন করিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এই ভাবে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—কেহ বলিলেন, "অতীশ চলিয়া গেলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের সূর্য্য অস্তমিত হইবে, ইহাকে কিছুতেই যাইতে দেওয়া হইবে না, আসুন, সেই চেষ্টা করি।" আবার কেহ বলিলেন, "বিক্রমশিলার সঙ্ঘ যখন ইহার গমন রোধ করিতে পারে নাই, তখন আমরা কি করিব?" সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "অতীশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন অনিবার্য্য হইবে।"

বিক্রমশিলার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের অভিমত।

পথে কোন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া অতীশ তিব্বতের দিকে রওনা হইলেন, তাঁহার সঙ্গে এই সমস্ত লোক ছিলেন—গায়েরসেন ও তাঁহার দুই ভৃত্য, নাগচো ও তাঁহার চারিটি ভৃত্য, ইহা ছাড়া অতীশের সঙ্গে ২০ জন অনুচর।

অতীশ তান্ত্রিক আচার ও ক্ষমতা-লাভের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার মন্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক বহু শক্তি আয়ত্ত ছিল। সেই শক্তির বলে তিনি পথে অনেক দস্যু ও শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি পথে অনেক বিহার হইতে সংবর্দ্ধনা পাইয়াছিলেন নেপালের রাজা অনন্ত কীর্ত্তি তাঁহাকে বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শ্রীজ্ঞান নেপালের মহারাজকে একটি হস্তী উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, এই হস্তিটি বন্ধের সহিত পালন করিবেন, ইহাকে যুদ্ধের কিংবা অস্ত্রশস্ত্র বহন করিবার জন্য যেন ব্যবহার করা না হয় দেববিগ্রহ, দেবমন্দিরের সামগ্রী, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি বহন করিবার জন্য ইহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন। এই হস্তীর নাম দৃষ্টোদধী।" নেপালের রাজা এই উপহার গ্রহণ করিয়া শ্রীজ্ঞানের প্রতি সম্মান দেখাইয়া সেই স্থানে "ধান-বিহার" নামক একটি বিশাল বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র পদ্মপ্রভকে শ্রীজ্ঞানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পদ্মপ্রভ শ্রীজ্ঞান কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কতকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন দীক্ষাগ্রহণের পর যুবরাজের নাম হইয়াছিল 'দেবেন্দ্র'।

নেপালের রাজার সংবর্দ্ধনা।

যুবরাজ পদ্মপ্রভ।

এবার শ্রীজ্ঞান তিব্বতের সীমানায় পদার্পণ করা মাত্র রাজার প্রেরিত ৪ জন সেনাপতি (দু'ই ওয়াংপো, দু'ই লোডই, দু'ই সেরাব এবং দু'ই শ্রীজিন) আসিয়া তাঁহাকে

প্রণাম করিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ১৬ জন বর্শাধারী সৈন্য ছিল। তাহা ছাড়া কয়েক জন লোক পতাকা বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি সাটিন বস্ত্রনির্মিত রাজ ছত্র ছিল। এই দলের সঙ্গে বাঁশী, ঢাক, ঢোল ও সানাই প্রভৃতি যন্ত্র-বাদকের দল ছিল। চারি জন সেনাপতি এই দলের সঙ্গে "ও মণিপদ্মে" গান করিতে করিতে মন্দিরের পূজনীয় অতিথিকে সংবর্দ্ধনা করিল। সম্রাটের প্রতিনিধি নরিচোসল্লা এই স্থানে আসিয়া শ্রীজ্ঞানকে পাঁচ আউন্স সোনা এবং রক্তমুখাঙ্কিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত চায়ের পাত্র উপহার দিলেন। পথে না চোর পড়িতে শ্রীজ্ঞান কিছু দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় রওনা হইলেন। চারিজন সেনাপতি সহ ৩০০ লোক সমভিব্যাহারে শ্রীজ্ঞান চলিলেন। সেনাপতিরা যে অভিনন্দন শ্রীজ্ঞানকে দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা গান করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। সেনাপতিদের প্রধান শ্রীজ্ঞানকে নিম্নলিখিত ভাবে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন—"হে মহাভাগ! আপনি ভারতবর্ষ হইতে আমাদের এই দেশে আসাতে আমরা ধন্য হইয়াছি। আপনাকে আমরা কোন মূর্তিমান্ দেবতার ন্যায় মনে করিতেছি। আপনি আমাদের চক্ষে চিন্তামণি ও কল্পতরুর ন্যায়। ভারতবর্ষ আমাদের চক্ষে দেখেনি, ধর্মের ন্যায় নিষ্কেতন। কিন্তু আমাদের এ দেশেও কতকগুলি সুবিধা আছে, যাহা ভারতে নাই। এদেশে গ্রীষ্মের অত্যধিক প্রকোপ নাই। হিমরেখার উপত্যকায় প্রচুর ফলদায়ী নিঝর ও নৈসর্গিক উৎসের অভাব নাই। শীতকালে এদেশে শৈত্য কিছুতেই সহন করা যায় না। হিমালয়ের নিকটবর্তী উপত্যকা প্রদেশে এমন অনেক স্থান আছে যাহা শুধু সেই উষ্ণ—শীতকালে ঐ সকল স্থান অত্যন্ত আরামপ্রদ বসন্তকাল এদেশের লোকের খাদ্যের অসদ্ভাব হয় না। এখানে পাঁচবার ফসল হয়। শরৎকালে যেন ছুটিয়া চলিয়াছে ও নবপল্লবের এমনই শোভা হয় যে মনে হয় যেন সমস্ত দেশটি একটি মণিময় খনি। এখানে রাজা ও প্রজা সকলেই ধর্মানুরক্ত, তাঁহারা সেই গভীর অনুরাগযুক্ত হইয়া প্রভুদের চিত্তরঞ্জিত হইয়া রাজ্যে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছেন। এখানে কোন কলহ বিবাদ নাই। এখন মহাভাগের আগমনে এদেশ পুণ্যময় হইয়া উঠিল।" এই স্থানে তিব্বত রাজপ্রতিনিধি উপরোক্ত "তা" গান করিলেন (১০৪০ খৃঃ)। ইহাই বোধ হয় বাঙ্গালার প্রথম "চা" খাওয়া।

"সেটি বাঙ্গালা মনির খনি"

চা পানের অভিনন্দন।

'ভারতের গোরব।

সেনাপতিরা এখন মিছিল করিয়া তাঁহাকে খোলিন বিহারে লইয়া চলিল। পথে তাঁহারা "লোকা, লোকা, লোকা লোকা" ইত্যাদি গান গাহিতে গাহিতে আকাশে বাতাসে তাহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস ছড়াইয়া চলিল। শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে রাজা ভূমিসন্ধ, পণ্ডিত পলাহ্বজন, পণ্ডিত বর্ণাচন্দ্র, লোচাবা গুণদং প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা চলিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মহারাজ ভূমিসন্ধ—সমস্ত পশ্চিম ভারতের রাজা ছিলেন তিনি পূর্বে জন্ম করিবার উপযুক্ত বলশালী ছিলেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যও অসাধারণ ছিল। কিন্তু ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ মঠের অধিবাসী হইয়াছিলেন।

এই বিশিষ্ট পুরুষদের সঙ্গে মহাপুরুষ শ্রীজ্ঞান রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহু পণ্ডিত, বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট পুরুষমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীজ্ঞানের মূর্ত্তিই বিশেষ দর্শনীয় হইয়াছিল, রাজহংসের মত উন্নতগ্রীব একটি সুদৃশ্য ঘোটকের উপর তিনি আরূঢ় ছিলেন তাঁহার বয়স তখন ৬০ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য, দেহকান্তি, ব্যবহারের ভদ্রতা ও সৌজন্য তাঁহাকে দেবযোগ্য সম্মানের পাত্র করিয়াছিল।

১০৪০ খৃষ্টাব্দে।

তাঁহার মধুর ওষ্ঠাধরে নিরবধি মিষ্ট হাস্যের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছিল এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বদা সংস্কৃত মধুর শ্লোকাবলী উচ্চারিত হইতেছিল। তাঁহার কথাগুলি সুস্পষ্ট, চিত্তাকর্ষক এবং শ্রুতিসুখাবহ ছিল, তিনি প্রায়ই বলিতেন "অতি ভাল" "অতি মঙ্গল," অভ্যাসের মুখে এই অতি ও ভাল শব্দ তিব্বতের লেখক লিখিয়া তিনি যে বাঙ্গালা ছিলেন তাহা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। তাঁহাকে এই সময় কি চমৎকারই না দেখাইতেছিল! তাঁহার কথা ও কণ্ঠস্বর কতই না মিষ্ট বোধ হইতেছিল।

রাজধানীর নিকটে আসিলে প্রধান মন্ত্রী ন'হই ওয়ানচাঙ্গ যুক্তকরে "হে প্রভু আমরা ধন্য হইলাম" বলিতে বলিতে তাঁহাকে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক ৪০ হস্তবিশিষ্ট এক বিশাল অবলোকিতেশ্বরের ছবি উপহার দিলেন, ইহা বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে স্বর্ণসূত্রে অতি আশ্চর্য্য কারুশিল্পের সহিত গ্রথিত হইয়াছিল।

নেপালরাজ বহু জন লোক সঙ্গে দিয়াছিলেন, তথাকার যুবরাজ দেবেন্দ্র বিশেষ গুরুর সাহচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এই ভাবে শ্রীজ্ঞান রাজধানী তিব্বতে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা বলিতে লাগিলেন, "ইনি কিরূপ লোক। এরূপ সম্মান এপর্য্যন্ত কাহাকেও দেখান হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ ইহাকে আনিবার চেষ্টায় প্রাণপণে করিলেন। কত অর্থ ও কত লোকক্ষয়ই না ইহার জন্য হইয়াছে। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা।" ধনিন বিহারের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ইনি নেপাল যাওয়ামাত্র ওখানকার রাজা, রাজ্ঞী, যুবরাজ এবং সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি নানারূপ গীতবাদ্যের মিছিল করিয়া ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই ইহার তুল্য সংবর্দ্ধনা স্বয়ং বুদ্ধদেবও কোথাও পান নাই।"

এইবার তিব্বতের রাজার সঙ্গে মিলন। ইহার সংবর্দ্ধনার জন্য রাজ্যদেশে একটি বিশেষরকম বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার নাম হইয়াছিল "রাগডন," ইহা নানারূপ কারুখচিত শিল্পনির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব যন্ত্র, ইহার আকৃতি ও সুর উভয়ই অদ্ভুত ছিল। রাজা প্রহরিগণকে আদেশ করিলেন "শ্রীজ্ঞানই রাজ্যের কর্ত্তা ও প্রভু, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ যেন কেহ লঙ্ঘন না করে।" এই ঘটনার বহু শতাব্দী পরে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে এইভাবে তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিয়াছিলেন।

সংবর্দ্ধনার জন্য নির্ম্মিত নূতন বাদ্যযন্ত্র।

শ্রীজ্ঞানের বিশেষ চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম হইতে তান্ত্রিক বাভিচার দূর হইয়া উহা নির্মল হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি সমস্ত এসিয়ার লোকের শ্রদ্ধা এরূপ হইয়াছিল যে, তাঁহার নাম শুনিলে রাজচক্রবর্ত্তীদের মস্তক অবনত হইত। বুদ্ধদেবের পর বৌদ্ধজগতে দীপঙ্করের ন্যায় আর কোন লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বহু পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং সেই সকল পুস্তকই তিব্বতে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। তাহার কয়েকখানির নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) বোধিপথ-প্রদীপ। (২) চর্য্যাসংগ্রহ প্রদীপ। (৩) সত্যদ্বয়াবতার (৪) মধ্যমোপদেশ। (৫) সংসারোত্তর। (৬) অবয়সিদ্ধি। (৭) বোধিসত্ত্ব-মালাবলি (৮) বোধিসত্ত্ব কর্ত্তব্যধর্ম্ম গাথাবতার (৯) সঙ্গতিপরীক্ষা (১০) মহাযান পথসাধন বর্ণসংগ্রহ। (১১) মহাযান পথসাধনাসংগ্রহ। (১২) দ্বাদশার্থ সমুচ্চয়োপদেশ। (১৩) দশকুশল-কর্ম্মোপদেশ (১৪) সপ্তকবিধি (১৫) গুরু কর্ম্ম বিভঙ্গ (১৬) চিত্তোৎপাদসঙ্গতি (১৭) বিধিক্রম (১৮) সমাধিসম্ভার পরিবর্ত্ত। (১৯) লোকোত্তর-সপ্তকবিধি (২০) গুরুক্রিয়া-ক্রম (২১) শিক্ষা সমুচ্চয় অভিসাময়। (২২) বিমলরত্নলেখন, শেষোক্ত পুস্তকখানি নয়পালের নিকট দীপঙ্করের একখানি চিঠি।

নিরবচ্ছিন্ন পরোপকার ও জগতের ইষ্টসাধনে তৎপর মহাভাগ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মপরতায় সমস্ত বৌদ্ধজগৎ উজ্জ্বল করিয়া ৭৩ বর্ষ বয়সে লাসা নগরের সন্নিহিত [illegible] স্থানে পরলোকে গমন করেন। ইহার সাতবৎসর পরে গৌড়দেশ ভূমিকম্পের অধীন হইয়াছিল। দীপঙ্কর বিক্রমপুরের শেষ অধ্যায়ের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপুরুষ এবং বাঙ্গালী জাতির চরমগৌরব। শ্রীজ্ঞানের নাম বৌদ্ধজগতের পুরোভাগে। আমরা তাহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম। অধ্যাপক রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের পুস্তক হইতে এই জীবনীর অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

তিব্বতে দীপঙ্করের জীবনচরিত অনেক আছে। আমরা কেহই তাঁহার সন্ধান করি নাই। শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় এই কথা অধিকার করিয়াছেন, তৎপরেও আমাদের এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক লামা গাইসন গুপ কাজি মহাশয়ের নিকট প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীপঙ্করের জীবনীর একখানি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি আমি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সাহায্যে সেই পুস্তকের খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আশা ছিল অবসর হইলে তাঁহারই সাহায্যে পুস্তকখানির অনুবাদ করিব কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। বহিখানি যে কোথায় গেল, তাহাও জানি না! তিব্বতে সন্ধান করিলে এরূপ আরও পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ব্রমটন লিখিত (১৭৫৪ খৃঃ) দীপঙ্করের জীবনচরিতে অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরা অতিসংক্ষেপে তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিলাম। এই একজন পূর্ব্বঙ্গের বাঙ্গালী ছিলেন যিনি তাৎকালিক জগতে অদ্বিতীয় যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা তাঁহার

রাজার সহিত অনুগত পরিকরের মত তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেন। নেপালের পূর্ব্বোক্ত তৎকর্ত্তৃক ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেন। ভিক্ষুত্রাত তাঁহাকে স্বদেশে আনিবার চেষ্টায় ছলের মত অর্থ ব্যয় করিলেন। সেই চেষ্টায় তাঁহার বহু অর্থ ও লোক ক্ষয় হইল এবং এই জন্য তিনি শত্রুকর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি দীপঙ্করের নিকট ঐহিকোদ্ধারণীর বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। মরণোন্মুখ (মুমূর্ষু) রাজা ধর্ম্মপাল দীপঙ্করের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক নানা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। তিব্বতের নরপালের সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বদা পত্রব্যবহার চলিত। শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় বিস্তারিত ভাবে তৎসম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহার জীবনকালে দীপঙ্কর সমস্ত এসিয়ার সম্রাটগণের পূজনীয়, অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, এবং এখনও বিদেশে বৌদ্ধ রাজ্যে তাঁহার পবিত্র নাম সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারিত হয়। চীন দেশের অধিবাসিগণ সমুদ্রপারে দীপঙ্করের নাম শুনিলেই সিংহাসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালী কর্তৃক সুদূর উত্তর পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রচার

এমন একজন বাঙ্গালী-সম্বন্ধে বাঙ্গলার ইতিহাস নীরব। আমাদের চৌদ্দ পুরুষের নাম না জানিলে আমরা পণ্ডিত-সমাজে হেয় হইয়া পড়ি, অথচ আমাদের

যশ।

গৌরবকিরীটের মণিমণি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। শুধু দীপঙ্কর নহেন, বহু বাঙ্গালী বৃহত্তর ভারত এবং সমুদ্রপার হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য এসিয়ার সর্ব্বত্র স্থানের ভাগ্যবিধাতৃরূপে সমাদৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা একরূপ কিছুই জানি না। অথচ একের এক বিরোধী মধ্য নিষ্কাশিত হইয়া চীন দেশে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম যজ্ঞ। সাত শত অনুচর সঙ্গে তিনি চীনের এক প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহার পূর্ব্বেই বোদ্ধ ধর্ম্ম চীনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু যজ্ঞের দ্বারা এই প্রচেষ্টার বিশেষ উন্নতি হয়। তদবধি ভারতের নানা স্থান হইতে, বিশেষ আমাদের বঙ্গ হইতে, শত শত পণ্ডিত চীন, জাপান প্রভৃতি স্থলে অভিযান করেন এবং তথাকার বহু ভাগ্যের নব ভাগ্য লোককে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

শাস্ত্ররক্ষিত।

বলা বাহুল্য ইহাদের মধ্যে বহু লোক বাঙ্গালী ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়বাসী শান্তরক্ষিত তিব্বতরাজ খিসরুঙ্গ দিউত্সান কর্তৃক বহু মানের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গ হইতে তিব্বতে গমন করেন

এই আশ্চর্যজনক নায়কা বিহারের প্রধান আচার্য ছিলেন, সুতরাং ইনিও নগ্না ছিলেন না। ইনি তিব্বতের বজ্রযানকে পরিবর্তিত করিয়া বৌদ্ধধর্মকে রাজকীয় ধর্মে পরিণত করেন।

পদ্মসম্ভব। তারানাথের কথা সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত। তিব্বতবাসীরা ইঁহাকে আচার্য বোধিসত্ত্ব উপরি ভাগে ইঁহার মূর্তি সযত্নে দেখাইয়া থাকেন। ইঁহার সঙ্গে পণ্ডিত পদ্মসম্ভব নামক একজন প্রধান আচার্য তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইঁহারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান করিয়া তাহা অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধধর্মের অনেক নূতন প্রণালী হইয়াছিল। চীনদেশীয় কতকগুলি পণ্ডিত ইঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য তিব্বতে আগমন করেন। বহু তর্কবিতর্ক হয় এবং ইঁহাদের আলোচনা বর্ষাধিক চলিয়াছিল। অবশেষে গৌড়ীয় প্রধান আচার্য কমলশীল। ইঁহার নাম ইতঃপূর্বেই সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তিব্বতে আসিয়া চীনক বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ রলচান বাঙ্গলা হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় প্রায় ৭০ জন পণ্ডিতের নাম দিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্যের নাম দিতেছি, শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব (উড্ডিয়ানবাসী), দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, শাক্যশ্রী, বিমলমিত্র, জিনমিত্র, সুবর্ণমিত্র, সুগতশ্রী, জ্ঞানপাল, সংঘরক্ষিত, বিরোচন, বন্ধুঘোষ প্রভৃতি।

তিব্বতে বাঙ্গালী প্রাধান্য।

ভারত ইতিহাসের এই পৃষ্ঠা আমাদের নিকট একেবারে আঁধার হইয়া আছে, অথচ এই পৃষ্ঠাই আমাদের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ যাবাদ্বীপে যাইয়া তথায় শ্রাবক-সম্প্রদায়ের যে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের ধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বাঙ্গালী চীন ও জাপানে যাইয়া ধর্ম, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাপানের ছাউটঙ্গ মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ আজ পর্যন্ত লিখিবার সময় যে অক্ষর ব্যবহার করেন তাহা জাপানী চিত্রাক্ষর নহে, তাহা পাল ও সেন-রাজগণের সময়কার প্রাচীন বঙ্গাক্ষর। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বিদ্যাভূষণ ভারতীয় বহু চীন ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ তন্ত্র ও বৌদ্ধ ধারণী সম্বন্ধীয়। ইঁহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী পণ্ডিতদের লেখা। চীন, জাপান, তিব্বত ও নেপালে এই সকল কীর্তি রক্ষিত হইয়াছে, আর কতদিন পরে এই সকল পুস্তক হাতড়াইয়া পাওয়া যাইবে না। এই পালরাজগণের রাজত্ব বাঙ্গালীর পক্ষে অতুলনীয় যুগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও সিংহলে গমনের ভাষা শিক্ষা করিয়া বহু কয়েক বৎসর চেষ্টা করেন, তবে বঙ্গের এই যুগের ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের হৌয়াচে-রোগ কোন্ আমাদিগকেও পাইয়াছে। আমাদের দেশ এক হাজার বা বারশত বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ

ও জৈন ধর্ম্মের প্রভাবমত আছে ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ ও উদাসীন। বিলাতে না যাইয়া যদি এশিয়ার নানাস্থান হইতে আমরা পুরাতত্ত্ব সঙ্কলন করি তবে বাঙ্গালার অতীত গৌরবের অনেক কথা অবিষ্কৃত হইতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেকগুলি শাখা প্রশাখার উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। নবম শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বতরাজ ঠি খুন ৎসাংকে ডাকাইয়া ম যে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তিনি তাঁহার কাছে কয়েক শ্রেণীর বৌদ্ধ দের উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নীল অ লম্বোদরা একদলের কথা বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে জানান যে, ইঁহারা ধর্ম্মের নামে দুর্নীতি প্রচার করিতেছে, ইঁহাদের একজন যে সকল মত সমর্থন করিতেন, তাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়।

প্রথমতঃ বুদ্ধদেব সঙ্ঘে ভিক্ষুণীদলকে কোন স্থান দিতে না, এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিমাতা ও মাসী মহাপ্রজাবতী ও আরও মহাপ্রজাবতী যিনি বুদ্ধকে মাতার অভাবে নিজে লালনপালন করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্ত্তী অবলম্বন করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু বুদ্ধের অটল সঙ্কল্প টলিল না, তিনি কোন স্ত্রীলোকের জন্য সঙ্ঘের দ্বার উন্মুক্ত করিবেন না। বিরক্তচিত্তে মহাপ্রজাবতী ফিরিয়া গেলেন, বুদ্ধ মনে ব্যথা পাইলেন, কিন্তু তিনি বিমাতার জন্য তাঁহার নীতির আদর্শ শিথিল করিলেন না। তারপর তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ মহাপ্রজাবতীর পক্ষ লইয়া তাঁহাকে ছাড়িবার অনুরোধ করিলেন—কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। কিন্তু যখন তৃতীয়বার আনন্দ সেই প্রার্থনা উপস্থিত করিলেন, তখন বুদ্ধদেব বিরক্তচিত্তে বাক্যক্ত হইলেন, যেহেতু উপর্য্যুপরি বিফলকামা হইয়া অতিবৃদ্ধা মহাপ্রজাবতী নিদারুণ মনস্তাপ পাইতেছিলেন, বুদ্ধ তাঁহার অনুরোধ আর এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু আনন্দকে বলিলেন, "দেখ আনন্দ, যদি আমাদের সঙ্ঘ ১০০০ বৎসর টিকিয়া থাকিত, সঙ্ঘে স্ত্রীলোক প্রবেশ করাইবার অনুমতি দেওয়াতে উহা মাত্র ৫০০ বৎসর টিকিবে, শ্বেতাম্বিকা (একরূপ শ্বেতবর্ণ কীট) যেরূপ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে শস্য নষ্ট হইয়া যায়, সঙ্ঘে স্ত্রীলোক প্রবেশ করাতে সদ্ধর্ম্মের পক্ষে তেমনই অনিষ্ট হইবে।" সঙ্ঘে স্ত্রীলোক-প্রবেশ

সঙ্ঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার।

এখনও এদেশে আচারের কড়ম হইয়া আছে। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এতৎসম্বন্ধে আমাদের নিকট একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি পরমহংসদেবকে তাঁহাদের ব্রাহ্মমন্দির ও উপাসনাপদ্ধতি দেখাইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সমাজগৃহে লইয়া আসেন। বেদী হইতে অল্প, বক্তৃতা করিতেছিলেন এবং উহাকে মাইলারো বলাবাহুল্য ছিলেন। পরমহংসদেব ভক্তদের চাহিয়া ঈশারা করিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁরা কে?" শিবনাথ শাস্ত্রী বলিলেন "ইঁহারা বক্তৃতা, উপাসনায় যোগ দিতে আসিয়াছেন।" পরমহংসদেব হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "করেছেন কি? গাছে পুঁতিয়াই ছাগল লাগাইয়াছেন, —এখন টিকবে না"—এই কথা বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যাহার প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি পূর্ব হইতেই স্নেহ করিতেন। তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাহার প্রতি প্রতিকূল ইহা আমাদিগকে বুঝিয়া সাবধান হইতে হইবে। বুদ্ধদেব অনিচ্ছাসত্ত্বে স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া দিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্বন্ধে যতটা পারেন ততটা কঠিন নিয়ম প্রণয়ন করিলেন। যথা —

(১) যো এন ভিক্ষু অসম্বন্ধা ভিক্ষুনিয়ো ওবদেয্য পাচিত্তিয়ং। (সঙ্ঘের অনুমতি না লইয়া যদি কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হইবেন) (ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ভিক্ষুণী উপদেশবর্গ ২১)।

২। সমুগ্গতাপি যে ভিক্ষু অনুগতে সূর্যাস্তে ভিক্ষুনিয়ো ওবদেয্য পাচিত্তিয়ং (সঙ্ঘের অনুমতি পাইলেও যে ভিক্ষু সূর্যাস্তের পর ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিবেন তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য) (ঐ, উপদেশবর্গ ২২)।

৩ যো এন ভিক্ষু ভিক্ষুনিয়া সদ্ধিং সংবিধায় একদ্ধানমগ্গং পটিপজ্জেয্য অন্তমসো গামন্তরম্পি অন্তরেমগ্গা, পাচিত্তিয়ং। (যদি উপযুক্ত সময়ে ছাড়া অন্য সময়ে কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সহিত দীর্ঘপথ বা গ্রামান্তরে গমন করেন, তবে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হইবেন) (উপদেশবর্গ ২৩)।

(৪) যো এন ভিক্ষু ভিক্ষুনিয়া সদ্ধিং সংবিধায় একং নাবং অভিরুহেয্য উদ্ধগামিনিং বা অধোগামিনিং বা তিরিয়ন্তরণায়, পাচিত্তিয়ং। (যদি কোন ভিক্ষু সঙ্কেত করিয়া কোন ভিক্ষুণীর সহিত নৌকায় আড়াআড়িভাবে পার না হইয়া ভাটি বা উজানগামী কোন নৌকায় আরোহণ করেন তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হইবেন) (উপদেশবর্গ ২৪)।

(৫) যো এন ভিক্ষু ভিক্ষুনিয়া সদ্ধিং একো একায় রহো নিসজ্জং কপ্পেয্য পাচিত্তিয়ং। (যদি কোন ভিক্ষু একাকী কোন একক ভিক্ষুণীর সহিত জনহীন স্থলে উপবেশন করেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হইবেন) (উপদেশবর্গ ৩০)।

এইরূপ বহু উপদেশ আছে। কোন ভিক্ষু বিজ্ঞ ব্যক্তির অবিদ্যমানে ভিক্ষুণীকে ৫৬টি বাক্যের অধিক ধর্ম ও উপদেশ দিতে পারিবেন না (সুত্তবিভঙ্গবর্গ ৭)। কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীর জন্য বস্ত্র সেলাই, কিংবা ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুর জন্য উক্তরূপ কাজ করিতে পারিবেন না (উপদেশবর্গ ২৯)। এইরূপ অনেক উপদেশ সঙ্ঘসংস্থিতির ভিত্তি গঠন করিয়াছে

যদিও বুদ্ধদেব যৌনসম্বন্ধের দুর্বলতা অবগত হইয়া সঙ্ঘের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কঠোর অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

যদিও সঙ্ঘের প্রথম যুগে আদর্শচরিত্র, পূজনীয়া ভিক্ষুণীগণ বৌদ্ধ সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তথাপি সেই লোকোত্তর মহানুভবের দুরদৃষ্টি ও আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহা অচিরেই বুঝা যাইতে লাগিল। কতক বৎসর অতিবাহিত না হইতেই সঙ্ঘের জীবনে কলঙ্কের রেখাপাত হইল। দেখা গেল, ভিক্ষুণীরা কমণ্ডলুর মধ্যে জল লইয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই ভিক্ষুণী গর্ভিণী হইতেছেন (ভিক্ষুণী প্রা, সুত্ত বিভঙ্গ, পারা ১০২) বঙ্ককুটি, বঙ্ককুটি)তে চিত্র পত্রপাঠ করিতেছেন (চুল্ল ১০, ২৭, ৩)। ভিক্ষুণী লোহিতচন্দন বহুমূল্য পত্রপাঠ সহায়তা করিয়া স্বকীয় ভিক্ষাপাত্রে ঐ রঙ্গ বহন করিতেছেন (ঐ ১০, ১১)। কোন গর্ভিণী প্রাবরণ লইয়া সঙ্ঘে ঢুকিয়া প্রসব করিতেছেন, যেখানে সেখানে ধূর্তেরা অরণ্যে ও অন্ধকারে যে স্থানে সাধারণতঃ কেহ স্নান করে না ভিক্ষুণীগণকে দূষিত করিতেছে (ভিক্ষুণী প্রা, পাচি ২০, ২১ ঐ সুত্তবিভঙ্গ)। কোথাও বা নানারূপ অলঙ্কার ধারণ করিতেছেন, গন্ধবর্ণক ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন (ঐ, পাচি, ৮৮-৯১)। আবার কোনও স্থানে ভিক্ষু খাইতে বসিলে নিজে পাখার বাতাস দিয়া পরিচর্যা করিতেছেন, অথবা গৃহস্থের বাড়ীতে পাকের সময়ে যাইয়া "অমুক ভিক্ষুর জন্য অমুক জিনিষ পাক কর"— এইরূপ বিশেষ কোন ভিক্ষুর জন্য পাক করাইতেছেন, (ঐ পাচি ১৩-২০), কোথাও তাঁহারা অঙ্গরাগ করিতেছেন, তিলক রচনা করিতেছেন, দর্পণে মুখ দেখিতেছেন, পান-গৃহ ও পণ্যব্যবহার স্থাপন করিতেছেন, দোকান বসাইতেছেন, মহাজনী কারবার করিতেছেন (চুল্ল ১০, ১০-৪)। ভিক্ষুপাত্র মোক্ষ, মূল ও অনুবাদ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১০-৫১ পৃ.)। ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধবে প্রবাজিকা কামন্দিকী, অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতার চরিত্রে এই ভিক্ষুণীদের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত চিত্রশালার এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য।

খৃষ্ট জন্মিবার তিন শত বৎসর পূর্বে এরূপ একদল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দেখা দিল যাহারা নিজদিগকে একাভিপ্রায়ী (একাভিপ্রায়) বলিয়া পরিচয় দিল। তাহারা বুদ্ধদেবের আইন কানুনের বিরুদ্ধে তাহাদের একটা স্বাধীনতার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল এবং বলিল যদি ধর্মের লক্ষ্য (অভিপ্রায়) এক হয় তবে মতানৈক্য মিলনে কোন দোষ হইতে পারে না। বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্র হইয়া আলোচনা করিলে তাহা পূর্ণাঙ্গ ও হিতকর হয়, তখন যৌনবিজ্ঞানও আলোচিত হইবে, সুতরাং অজ্ঞ সাধারণ এই সকল সভায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। তাহারা (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী) গোপনে রাত্রিকালে একত্র হইয়া আলোচনা করিত এবং এই শ্রেণীর বৌদ্ধগণের নাম হইয়াছিল "একাভিপ্রায়ীর দল" বলা বাহুল্য প্রথমতঃ এই দল অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং সঙ্ঘের অধিকাংশ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত ও উপহাস করিত।

একাভিপ্রায়ী।

এখনও যে শত শত সহজিয়ার দলভুক্ত স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া বঙ্গের বহু পল্লীতে গোপনে ভজনসাধন করিয়া থাকে, তাহারা কি সেই "একাভিয়ারী" দলের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের শিখা জ্বালাইয়া রাখে নাই। অবশ্য সেই একাভিয়ারীর দলও এখন শতধারায় বিভক্ত। সহজিয়াগণের আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য ঠিক একরূপ নহে, দুই হাজার বৎসরে অনেক ভাব ও পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এই ঘোষপাড়া প্রমুখ বঙ্গীয় পল্লীর গোপন নিশীথ-সভা সেই প্রাচীন বীজ হইতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই তত্ত্বের এই কথা।

বাঙ্গলার সহজপন্থী।

তিব্বতরাজ চাংচুব নাগচোকে যে নীল পোষাকপরা দলের কথা বলিয়াছিলেন, যাহারা ঘোর দুর্নীতি ও ব্যভিচার প্রচার করিয়া দেশকে অধঃপাতে দিতেছে বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা কি ইন্দ্রিয়ের পথে ইন্দ্রিয়ের চরম সংযম প্রচারক বর্ত্তমান সহজিয়াদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মতের প্রতিধ্বনি নহে?

তিব্বতে তান্ত্রিকতার বাড়াবাড়ি চলিতেছিল, রাজা তজ্জন্য আক্ষেপ করিয়াছিলেন এদিকে তিব্বতীর দল ক্রমাগত সিংহল ও ভারতবর্ষ হইতে হিমালয়ের এই মনোরম উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া তিব্বতের সঙ্ঘারামগুলিতে স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছিলেন। এই তন্ত্রসিদ্ধা রমণীদের মধ্যে কাহারও কাহারও অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। ইঁহারা তিব্বত-রাজার পূর্ব্বে মন্ত্রীর কৃপাভিক্ষা ও আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে কোন তন্ত্রসিদ্ধা রমণী মন্ত্রীর আদেশ তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। এখনও কাশী প্রভৃতি স্থানে যে সকল তান্ত্রিক অনুষ্ঠাননিরতা ভৈরবী দৃষ্ট হয়, এই সকল রমণী তাহাদের পূর্ব্বগামী। তিব্বতের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাদের তাৎকালিক কার্য্যকলাপ অনেকটা জানা যায়। চৈতন্যদেবের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে দাক্ষিণাত্যে এইরূপ এক ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিব্বতরাজ চাংচুব যে সকল তান্ত্রিক ব্যভিচারের কথা বলিয়াছিলেন তাহা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের "ভৈরবীচক্র" সম্পর্কিত। এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বৌদ্ধতন্ত্রের অনুকরণে হিন্দুরা এইরূপ চক্র করিতেন। বাঙ্গলার অনেক পাড়াগাঁয়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র হইয়া চক্রে বসিতেন। ইঁহারা সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পুরুষ ও নারীগণ চক্রে বসিয়া নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র অতলে ডুবাইয়া যথেচ্ছাচার করিতেন। বৌদ্ধতন্ত্রের সমস্ত কথা হিন্দুতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে কিন্তু হিন্দুরা ভ্রমেও বৌদ্ধগণের উল্লেখ করেন নাই, সেকথা পরে লিখিব। এসমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ ও সাহিত্য তাঁহাদের ভাল করিয়া জানা দরকার বৌদ্ধধর্ম্মের বাহিরের খোলসটা আমরা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রাণটা আমাদের সমাজ ও সাহিত্যকে এমন জড়াইয়া ধরিয়া আছে যে, তাহা এখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান অসম্ভব। বৌদ্ধ সমাজের প্রত্যেকটি অঙ্গ হিন্দুসমাজের উপর তাহার ছায়াপাত করিয়া রহিয়াছে।

তান্ত্রিক ভৈরবীচক্র।

ভারতবর্ষ হইতে বোধিধর্ম নামক জনৈক পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া এক নব মত স্থাপন করেন। বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির নানারূপ বিগ্রহ ও দেবমূর্তিতে পূর্ণ, কিন্তু বোধিধর্ম ঐ সকল মূর্তিতে বিশ্বাস করিতেন না। ইঁহার মঠে একখানি মাত্র বুদ্ধের মূর্তি ছিল—কোন দেবতাবিগ্রহ তিনি রাখিতে দিতেন না তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে লোহু নামক এক ভিক্ষু এই মত প্রচার করিয়াছিলেন, "ধর্ম মানুষের স্বভাব, উহা শূন্যতার অপর নাম। ধর্মগ্রন্থ কোন শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই সেই অলিখিত গ্রন্থ মানুষের পরিবর্তনশীল স্বভাবের অনুবর্তী হইয়া নিরন্তর ক্রমবিবর্তনের পথে চলিতেছে। প্রকৃত ধর্ম মানুষের ভিতরকার জিনিস, উহা বাহিরের কিছু নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তত্ত্ব না বুঝিয়া যে সে পুস্তক হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। যে আইন ও নিয়ম বিশেষ কার্যকরী, তাহা পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। জলের অবিরাম প্রবাহ, বাতাসের সুর,—সেই মহাশাস্ত্রের বাণী, তাহা শুনিলেই ধর্মের স্বরূপ বুঝিবে, মিছামিছি কতকগুলি পুঁথি হইতে শ্লোক ও প্রার্থনা আবৃত্তি কর কেন?" তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি দেববিগ্রহ পূজা করেন না কেন? তাঁহার উত্তর—"পিতল বা কাঁসার বুদ্ধ আগুনে গলিয়া যায়, কাঠের বুদ্ধ আগুনে দগ্ধ হয়, মাটির বুদ্ধ জলে পড়িলে মিলিয়া যায়, যাহা নিজেকে পরিত্রাণ করিতে পারে না, তাহা আমাকে পরিত্রাণ করিবে কিরূপে? মূর্তিকার প্রত্যেক রেণুই বুদ্ধক্ষেত্র, বুদ্ধের অমোঘ নিয়মে শাসিত। চারিদিকে বিশ্ব সেই মহা মুক্তিকারের বিধান ঘোষণা করিতেছে। তবে আর বুদ্ধ-বিগ্রহের কথা কেন? ঐ যে আকাশচুম্বী পর্বত, ঐ দূরগামিনী নদী—এই অদ্ভুত জগৎ, এসমস্ত কি তাঁহার বিগ্রহ নয়? কেন তুলি, ছাঁচ ও রং লইয়া বৃথা প্রয়াস পাইতেছ?" তিনি ধূপ-ধুনা জ্বালান না কেন?—এই প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে বলিতেন, "অজ্ঞ লোকেরা জানেন না যে ধূপ ধুনা নিজের ভিতরেই আছে। প্রকৃত ধূপ-ধুনা কি?—আত্মসংযম, জ্ঞান, ধৈর্য, দয়া, বিদ্যাশুদ্ধতা, ভক্তি এবং অভিজ্ঞতা। পুণ্যবানরূপ পবিত্র সাধুগণই খাঁটি সুগন্ধ, তাহা সমস্ত আকাশ ছাইয়া আছে, সেই পুণ্যবানের পরম সুগন্ধ ক্রমেই উর্ধ্বে উঠিতেছে। কিন্তু মানুষের হাতের প্রস্তুত সুগন্ধ, কাঠের ধোঁয়া—কখনই স্বর্গে পৌঁছিতে পারে না বাতাস, মেঘ এবং শিশিরকণাই প্রকৃত ধূপ ধুনা, উহারা স্বর্গ হইতে বংশের সমস্ত গুণ ভরিয়া বর্ষিত হইতেছে।" তিনি পঞ্চ প্রদীপালি জ্বালাইয়া আরতি করেন না কেন, এই প্রশ্ন করায় বলিতেন, "এই জগৎ একটা বিরাট্ প্রদীপশলাকা, জলরাশি ইহার তৈল, আকাশ ইহার ছায়ার আবর্ত, চন্দ্রসূর্যরূপ দীপ হইতে আলো জ্বলিয়া সমস্ত জগৎকে উজ্জ্বল করে যদি মানুষের প্রকৃতি উজ্জ্বল হয়, তবে তাহার কাছে স্বর্গ আঁধার থাকিবে না, নিজের মধ্যে আলো থাকিলে স্বর্গ ও পৃথিবী আপনা আপনি সাধকের কাছে আলোকিত হইবে। এই আলো লাভ করিলে মানুষ দেখিবে বিধাতার বিধান অনন্ত, তাহার প্রত্যেকটি স্পষ্টভাবে তখন চক্ষে পড়িবে।"

বোধিধর্ম ও লোহুর মত।

(শরচ্চন্দ্র দাসের Indian Pundits in the Land of Snow, ৪৪ পৃঃ।)

বৌদ্ধধর্মের এই শাখাই চীনদেশের পূর্বভাগে প্রবল. কথিত আছে লোকের সমস্ত উপদেশ সম্রাট য়িংচাণ্ডী দিলায় উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ১৫১৮ খৃ. ।।

এই মতবাদেরা বাঙ্গলার বাউল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে সহজিয়া ও বাউলের দল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মের পতাকার নীচে আশ্রয় পাইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম এই দেশ হইতে তাড়িত হওয়ার পর মহাপণ্ডিতেরা চীন, তিব্বত, নেপাল ও চট্টগ্রামের পথে আশ্রয় লইলেন বঙ্গদেশের দ্বার ইহাদের বিরুদ্ধে একেবারে অর্গলবদ্ধ হইয়া রহিল। তান্ত্রিক ব্যভিচারদুষ্ট নিম্ন শ্রেণীর সহজিয়া, বাউল, আউল প্রভৃতি শ্রেণীকে নব সংস্কারবদ্ধে দীক্ষিত সমাজের লোকেরা ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সে ঘৃণার সীমা-পরিসীমা ছিল না। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হিন্দুর সম্মুখে আসিলে দিয়া চলিয়া গেলে তাহাদের ছায়া-সংস্পর্শ অসহ্য হইত। এই ঘৃণার ফলে পূর্ববঙ্গের শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ পাইয়াছিল এই ঘৃণার ফলে বোধ হয় বহু গ্রন্থ লুকাইয়া ফেলিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা অপর কোন ধর্মে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ়ে যাহারা রাজা তৈল ও বৌদ্ধদলের পতি ঘোর অত্যাচার চলিয়াছিল। নবদ্বীপের নূতন ন্যায় ও দর্শন বৌদ্ধ ন্যায় ও দর্শনের ভাব ও পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহাদের জন্ম স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন লোপ বিলুপ্ত করিল। "বাক্যাসন" নাম পর্যন্ত একান্ত ঘৃণ্য হইল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি সেখানে তান্ত্রিক বীভৎসতায় আচ্ছন্ন হইল। ঢাকা জেলার প্রয়াগপুর গ্রামের কাছে যে বিশাল বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয় এবং যেখানে বাক্যাসন-বিহার সংস্থাপিত ছিল সেই স্থানে পূর্বে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বাস করিতেন, যাহারা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এখন স্বয়াপুরে বাস করিতেছেন তাঁহাদিগকে পূর্বে 'বাক্যাসনের চক্রবর্তী' ও 'বাক্যাসনের দাস' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইত কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ এই বাক্যাসনের নামের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন না, কেহ তাঁহাদিগকে ঐ নামে অভিহিত করিলে তাহারা চটিয়া লাল হইতেন। এদেশে যাঁহারা এক সময়ে বৌদ্ধ-সংস্রবে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা সে প্রাচীন কলঙ্কের দাগ একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টিত ছিলেন বৌদ্ধধর্ম এদেশে এতই ঘৃণিত হইয়াছিল যে বুদ্ধমূর্তিগুলি পর্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর নাম দিয়া পরিচিত করা হইত। এই ছয় শতাব্দীর মধ্যে বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি, প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি যে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পূজিত হইত সেই সকলের নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে উহাদের নাম করা মহাপাপ, এজন্য এখন ৫৬ শতাব্দী পূর্বে যে সকল বিগ্রহ এত সমারোহে পূজা পাইতেন, তাঁহাদের কোনটি আবিষ্কৃত হইলে কেহ তাঁহাদের নামগোত্র বলিতে পারে না, তজ্জন্য আমাদের বৌদ্ধধর্ম খুঁজিতে হয় এমন দিনে ষোড়শ শতাব্দীর মহাভাগে বাউল ও সেড়াদেহীরা ব্রাহ্মণাধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া রামকেলীতে রূপসনাতনের নিকট এবং খড়দহে বীরভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। খড়দহে ১,২০০ সেড়া এবং ১,৩০০ সেড়া খড়দহের রূপালাভ করিয়া যে

আনন্দোৎসব করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি সেখান পর্য্যন্ত জাগ্রত ছিল। ৩৫৮৮ বৎসর বৎসর নেপালেরাজের বেল বাজত ১১২৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাভাবে এই ঐতিহাসিক মেলাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই মেলার স্থানটি দেখিয়া ভাগ্যবান্ বিদেশী তাহাকে "বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধিক্ষেত্র" নাম দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নেপালের অধিবাসী বৌদ্ধ ধর্ম্মের গণ্ডীতে আশ্রয় দিয়া পরম অনুকম্পা দেখাইলেন কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ বর্ত্তমানের সেই যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইলেন। নেপালেরা বিবাহ করিতে পারিত না— কয়েক সঙ্ঘে বিবাহ প্রথা ছিল না সুতরাং তাহাদের ঔরস সন্তানেরা সমাজে অজ্ঞাত হেয় হইয়া থাকিত। বৈদ্যবংশের উদ্ভব হইয়া তাহারা বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ও গৃহস্থ সেবার সেবায় সাজিয়া সমাজের চক্ষে অনেকটা উন্নত হইল। সেই আদিম কালিচারের রেশ এখনও একেবারে শেষ হয় নাই, কিন্তু ইহার বিবাহপদ্ধতি যতই কেন অনেক উন্নত হউক না ভিক্ষুবংশতি কোন আত্মীয় গৃহীর নিকট আর আদানপ্রদানের বস্তুগুলি ভিক্ষুদের জন্য হাতছাড়া। যে যে সেখানে ও হাতে ১০ মূল্যে বিক্রয় করে না। নবধর্ম্ম হইতে এ নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে রামকেলীতে কিছু কিছু আছে শুনিয়াছি। এই সকল রীতির সঙ্গে কাহারো কেহ কেহ বৌদ্ধসম্প্রদায়কে মিশ্র করেন, কিন্তু নেপালের প্রাচীন সম্প্রদায়ের ও পাকৃত বৌদ্ধদের লোক, বৈদ্যদের হইতে কে অনেক উচ্চে করিয়াছেন, সে চালের কলঙ্কের ছাপছারা বৈদ্যদের সমাজকে লাঞ্ছিত করা উচিত নহে।

বিবাহপ্রথা প্রচলন।

নেপালেরা কলঙ্ক বৈদ্য সম্প্রদায়ের নহে

বৌদ্ধধর্ম্মের যে শাখা পূর্ব্বাঞ্চলে উৎপন্নহইয়াছিল, তাহা চাউলনাত, পাপপুণ্য প্রভৃতির উপর ততটা জোর দিত না। তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মকে আধ্যাত্মিক পথ্য লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন এবং নিজের দেহই মন্দির ও সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা শূন্যবাদ স্বীকার করিতেন এবং সেইটিই সর্ব্বোপরি মূল মনে করিয়া যাগ অনুষ্ঠান পরিহার করিয়াছিলেন। এই নরদেহই তাঁহাদের শূন্য মন্দির ছিল, এবং দেহতত্ত্ব অবধারণ করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বোধ চীনদেশে এই মত খুব জোরের সহিত চালাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই দেহতত্ত্বমূলক শূন্যবাদ সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নানক রচিত "গগন মে থাল রবিচন্দ দীপক জলে" —"যুগ যুগান্তর সকল বনরাই ফুলন্ত ফুলন্তি। কায়েমে আরতি হোত হব খণ্ডন তেরি, আরতি অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।" এবং রবীন্দ্রনাথের "গগনের থালে, রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতির। ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে কুলন্ত জোতিরে। কেমন আরতি করে ভব খণ্ডন তব আরতি অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী" প্রভৃতি গান লোমহর্ষ পূর্ব্বোদ্ধৃত কথার পদানুবাদের মত শোনায়। বঙ্গদেশের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই মতের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়, ইহারা নরদেহ ছাড়া আর কোন বস্তুকে সাধনার অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করেন না। এমন কি নাথ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লেখক গোরক্ষ-বিজয় নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই মতের অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। গোরক্ষ মুজ

বাজাইয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সেই মৃদঙ্গের বোল ছিল "কাহাসাহ"

বাউল ও সহজিয়া মতে স্পষ্ট বৌদ্ধধর্মের প্রভাব।

"কাহাসাহ" বাঙ্গালী সহজিয়াদের একদলের নেতা ছিলেন বলরাম, ইনি হাড়ী জাতীয় ছিলেন একদল ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক গঙ্গায় অঞ্জলি অঞ্জলি জল লইয়া তর্পণ করিতেছিলেন। বলরাম সেই নদীর আর একস্থানে দাঁড়াইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল নদীতটের দিকে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। ইহার অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মণেরা অঞ্জলিতে জল লইয়া সেই জল পুনরায় নদীতে নিক্ষেপ করিলে যদি তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ পাইতে পারেন, তবে আমি এই জল নদীতীরে ফেলিয়া দিলে আমার শস্যক্ষেত্রে তাহা নিশ্চয়ই পৌঁছিবে; যেহেতু সেই সকল ক্ষেত্র নিশ্চয়ই তত দূরে অবস্থিত নহে—ব্রাহ্মণদের পিতৃপুরুষগণ এখান হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম কত বাহ্য আচার ও অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ এই বাঙ্গালী সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল ঢাকার ৺পার্বতীচরণ কবিরাজ মহাশয় পণ্ডিত "চাক-চরণ" নামক উপন্যাসে এই বৈষ্ণব, আউল, বাউল ও সহজিয়াদের যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিতান্ত ও খাঁটি ঐতিহাসিক ছবি। তিনি ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহারা পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান অগ্রাহ্য করে এবং মনে করে তদ্দ্বারা লোক কুপথে পরিচালিত হয় মাত্র ইহাদের বিশ্বাস বেদ ও ধর্মশাস্ত্র সাংসারিক লোকেরা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রচনা করিয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণ এবং জাতিভেদ মান্য করে না এবং স্ত্রীলোকেরা তাহাদের ধর্মের প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করে না, তাহারা বিবাহ-পূজা, আরাধ্য, শ্রাদ্ধ ও দুর্গোৎসব, পাপপুণ্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এ সমস্তই বৃথা মনে করে। তাহারা শুধু নিজের ভিতরে যে আত্মজ্ঞান আছে তাহারই চরম সাধনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া এমন এক স্থানে পৌঁছাইতে চায় যাহাতে কামনা পূর্ণ হইয়া এক স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে পারে। তাহাদের নৈশ সঙ্ঘসম্মিলন এবং স্ত্রীপুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য ইহাই।" ("In the contemplative school of Sahji Dharma, the distinction between vice and virtue is lost According to this school worship of gods and goddesses, etc, is intended for the ignorant The Dharma being only a matter of the heart, offerings and recitations are really unnecessary The true Dharma is not outside of man's self But the deluded are ignorant of this and they therefore chant books of prayers A brazen Buddha melts, a wooden Buddha burns when exposed to the fire, an earthen Buddha cannot save itself from water It cannot save itself, how can it save me? Why then carve or mould an image of him? What is the true incense?—The true doctrine of Sunnyata is the true incense, etc"—S. C. Das's Indian Pundits in the Land of Snow) এই সহজিয়া ও বাউলের মত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিধ্বনির ন্যায় শোনায়। একদিন এক বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। এই ব্যক্তি চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম

করিয়া আমাদের দরজায় ভিক্ষার জন্য দাঁড়াইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাবাজি, তোমার আখড়া কোথায়?' সে একটা জায়গার নাম করিল। আমি তখন প্রাচীন চৈতন্য বিগ্রহ বাঙ্গলার কোথায় কোথায় আছে, তাহার সন্ধান লইতেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবাজি, তোমাদের আখড়ায় চৈতন্য-বিগ্রহ আছেন?' বাবাজি ধাতে ঈষৎ কটির বলিল, "সেকি কথা, চৈতন্যের কি বিগ্রহ আছে? তিনি যে শূন্যমূর্ত্তি।" তখন বুঝিলাম এই দেশের বাউলেরা বিগ্রহের নিকট মাথা নোয়ায় না, "তিনি যে শূন্যমূর্ত্তি" এই উক্তিটি মহাযানী বৌদ্ধদের "ধ্যানেন শূন্যমূর্ত্তিং" এর ঠিক অনুবাদের মত শুনাইল।

চৈতন্যশূন্যমূর্ত্তি।

যখন কোন নূতন ধর্ম্মের রথ জাতি বা সমাজের রাজপথ দিয়া চলিয়া যায়, তখন প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহার পথ ছাড়িয়া দেয় এবং অনেক সময় আগন্তুকের নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু নূতন প্রবল ধর্ম্ম তাহাদিগকে দীক্ষা দান করিলেও তাহাদের সাধনার খুঁটিনাটি তত্ত্বগুলি নব-দীক্ষিতকে শিখাইবার অবসর পায় না। রাজত্ব আদায় করিয়া রাজরথ চলিয়া যায়। বাহিরের দুই একটি সূত্র স্বীকার করিলেই তাহারা নব দীক্ষিতকে আপনার করিয়া লয়। আজার মুসলমানেরা এখনও ষষ্ঠী করিয়া লক্ষ্মীপূজা করে, পারস্যের সুফি-সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক জিনিষ ছাড়ে নাই, বরঞ্চ সেইগুলিই তাহাদের ধর্ম্ম অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গলার অবদলিত দুঃস্থ বৌদ্ধগণ বৈষ্ণবের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইল, কিন্তু তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের কতটুকু লইল? চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম মাত্র সম্বল দিয়া বীরভদ্রী দল তাহাদিগের তিলকে বৈষ্ণবের ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা যে সাধনা এ পর্য্যন্ত করিতেছিল, সেই দেহতত্ত্ব ও শূন্য-ধ্যান এখন পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে কত কত দল আছে তাহাদের কাহারও নাম বলরামী, কাহারও নাম ধাবা আউলা, ধুসী বিশ্বাসী, পাগলা কানাইয়া, হুজরতী, গোবরাই, পাগলনাথি, পাকুফকিরী, এরূপ কত নাম করিব? শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাদের কোন খবর রাখেন না। কিন্তু এই সকল দলের ধর্ম্মবিশ্বাস খোঁজ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যহু আরাধনা ও তপস্যা করিয়া শেষদিকের মহাযানী বৌদ্ধগণ যে সকল তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহারা তাহা রক্ষা করিয়াছে। আপনারা পাগলা কানাইয়ের গান, লালশশীর গান, যুবসঙ্গী গান প্রভৃতি পড়িয়া দেখিবেন, কত উচ্চাঙ্গের কথা তাহাতে আছে। অনেক সময়ে তাহা সন্ধ্যাভাষায় লিখিত। সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যায় না, কিন্তু নিবিড় অরণ্যের পথে জটিল শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া যেরূপ অজ্ঞাত পুষ্পের সুরভি আসে ও অভিনব নব-পুষ্পের অরুণ রাগরঞ্জিত মুখশ্রী দেখা যায়, এই সকল বাউল ও ফকিরদের গানে সেইরূপ বিগত ভারতীয় তপস্যা-মহিমার কিছু কিছু আভাস আছে। আমরা তাহা ভুলিয়াছি, কিন্তু নিম্ন স্তরের লোকেরা এই সম্পদ্ ছাড়ে নাই। রবীন্দ্রবাবু বাউলের গান হইতে তাঁহার কবিত্বের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই বাউলদের দেহতত্ত্ব বিষয়ক শত শত গান এখন লুপ্ত হইবার পথে। তাহারা বৈষ্ণবদিগের দান নহে, তাহারা সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী ভারতীয়

নিবিড় দর্শন-স্পৃহা ও মনোবিজ্ঞান হইতে সাধনার প্রেরণা করে আমরা হারানো দৃষ্টি চক্ষু ফিরিয়া পাইব যাহার দ্বারে বাঙালের ভিন্নিস দেহিদারে সাক্ষ্য হইবে ?

বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে—বিশেষ করিয়া মুসলমানের মধ্যে যে সকল অপূর্ব গান এখনও লোকমুখের ন্যায় তাহাদের ঐতিহ্যে ও অনাদরে শুষ্ক হইতেছে, তাহা পাঠকদের কাহারও অপরিজ্ঞাত বলিয়া হইবে না। ইহা বাঙ্গালাদেশের সম্পত্তি আছে অন্যত্রের অন্য কোথাও এরূপ নাই—যেহেতু সেগুলির স্বরূপ বাঙ্গালীরাই প্রথম অনুভব করিয়াছিল। তাহাদের স্বাধীন বুদ্ধি, অনবদ্য সৌন্দর্য্য এবং সর্ব্বসংস্কারের ঊর্দ্ধে স্থিত আত্মার যে রূপায়ণ হইয়াছে তাহা সাধারণ প্রতিভার অনুকূল নহে, যেহেতু বাঙ্গালাদেশ প্রকৃতপক্ষে মানব-মহিমার উদ্ভাবয়িত্রী। এ সম্বন্ধে আমরা শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি।*

বাঙ্গালা মহাকাব্য সম্বন্ধে যত কিছু পুঁথি আছে তাহা বোদ্ধ-দর্শনের পরাবলম্বী। অমৃত-রসাস্বাদী লেখক এগুলির মধ্যে কোথাও ভাবলোকের অস্তিত্ব রাখিয়া যান নাই। কেহ বলেন বুদ্ধদেব যখন দেবতাদের গুরু হইয়াছেন, তখন বোধিসত্ত্বের নামোল্লেখ ইহাতে নাই কেন ? বোধিসত্ত্বের নামোল্লেখ করিলে যে সেগুলি অস্পৃশ্য হইত। বর্তমান কালের হিন্দুধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনেক স্থলে বৌদ্ধদের অনুসরণ করিবার ফলেই এক দেবতার অবলম্বিত পথে সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধত্বের দোষ সংক্রান্ত নাই। বৌদ্ধ-কবিরা অনার্য্যদিগের হিন্দুর নিকট হিন্দুকুলকমল সদৃশ রামচন্দ্রের নামের মত অত্যন্ত আদরণীয় হইয়াছেন। বিশেষ তাহাদের সঙ্কল্পগুলির বৌদ্ধত্বকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইত। এই সেদিনের কথা যদি বৌদ্ধ ডমরুধরের নাম কবিত তবে তাহাদিগকে দূরে রাখা হইত। তাহারা সত্যাশ্রয়ী নিরাকুল পথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাদের সমস্ত সুরের স্বপ্নলোকে এক মহাজনের —এই কথা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এরূপ কুয়াশায় কবিরাজ, রূপ সনাতন মাধবাচার্য্য প্রভৃতি কেতুল্য ব্যক্তিকেও তাহাদের মতের ঐক্যে টেনিয়া নিজেদের সাধন সমাজে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ঐতিহাসিকভাবে যে সাধন মহাপুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। আমি একাভিজ্ঞায়ীদের কথা বলিয়াছি কথাবত্থু (কথাবত্থু) নামক পালি পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে ইহাদের উল্লেখ আছে এই পুস্তক খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে লিখিত হইয়া ছিল। সুতরাং একাভিজ্ঞায়ী দল তাহার পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল 'একাভিজ্ঞায়ী' অর্থ 'সহজযানপন্থী'। কথাবত্থুতে লিখিত আছে—কোন কোন সম্প্রদায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করিতেন, তখন কোন অনুরাগ

* "I come now to consider what the modern Bengali bears to the Magadhi and a comparison of the customs of the ancient Magadhi people with those of the modern Bengali will show that the latter are drawn from the former. Evidence is not wanting for satisfactorily proving that our ancestors were the people who carried on diplomatic and commercial transactions with the foreign nations at whose Megasthenes, Arrian and Strabo have left records." P 31.

বশতঃ নহে—পরস্পরের মত ও অভিপ্রায়ের ও আদর্শের একত্বহেতু—এবং তাঁহারা সেই সঙ্ঘারামে মিলিত হইয়া ধর্মচর্চা করিতে ইচ্ছুক হইতেন, এমন কি জন্মজন্মান্তরেও তাঁহারা এই মিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে অনুগণ, বৈতালিক ও উত্তর-পাঠকগণই এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অনুগণ এই স্ত্রীপুরুষের পরস্পর-সাহচর্য্য ধর্ম্মজীবনের এতটা প্রয়োজনীয় মনে করিতেন যে তাঁহারা প্রচার করিতেন, দেবপ্রতিম ও অত্যাশ্চর্য্য-ক্ষমতাসম্পন্ন ঋষিরাও অশ্বের রূপ ধারণ করিয়া যোন আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করেন।

কেন যে সহজিয়াগণ রূপ, সনাতন, মীরাবাই, এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভুকেও এইভাবে যোন প্রেমের বশবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—তাহার অর্থ এখানে পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন অর্হৎ, বৌদ্ধভিক্ষু ও মহাপুরুষদের নাম তাঁহারা বৈষ্ণব হওয়ার পরে আর করিতে পারেন নাই, এজন্য বৈষ্ণব মহাজনের টীকি ধরিয়া টানিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়, এই সহজ প্রেম তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুসারে এত নির্ম্মল, ত্যাগপূর্ণ ও সংযমাত্মক যে যাঁহারা তাহাদের মতের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত, তাঁহারা এই যোন মিলন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গৌরবে মণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এই আদর্শ ব্যভিচারীদের হস্তে এরূপ দুর্গতি পাইয়াছিল এবং লৌকিক সংস্কারে ইহা এত ঘৃণ্য মনে হইয়াছে যে সহজিয়ারা তাঁহাদের মত অতি গোপনে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ব্রাহ্মণের টোল

নালন্দা বিহারের অবনতি এবং গৃহদাহে ধ্বংস পাইবার পরেও বিক্রমশিলা-বিহার অনেকদিন পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ মহিমায় বিরাজ করিতেছিল। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—নালন্দায় একজন দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষার্থীকে এই দ্বারপণ্ডিতের নিকট পরীক্ষা দিয়া তথায় প্রবেশাধিকার পাইতে হইত প্রতি দশটির মধ্যে আটটিকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। এই পরীক্ষা কঠিন ছিল। উচ্চশিক্ষার অনেকটা অগ্রসর না হইলে কেহ নালন্দা-বিহারের ছাত্র হইবার দাবী করিতে পারিতেন না। বিক্রমশিলা-বিহারে ছয়টি দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। গৌড়ের সনক রাজার

সময়ে (১৫৫ ১৮৩ খৃ:) নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ এই বিহারের দ্বারপণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন,—

পূর্ব্বদ্বারে—আচার্য্য রত্নাকর শান্তি

পশ্চিমদ্বারে—বাগেশ্বর কীর্ত্তি

উত্তরদ্বারে—নরপাল

দক্ষিণদ্বারে—প্রজ্ঞাকরমতি

প্রথম কেন্দ্রীয় দ্বারে—রত্নবজ্র

দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় দ্বারে—জ্ঞানশ্রীমিত্র

এই ছয়জনের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন বাঙ্গালী ছিলেন। আমি এই অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা পাইতেছি যে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্যস্থানবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীর মধ্যেই ভারতীয় পরবর্ত্তী সভ্যতা ও উচ্চ শিক্ষার সম্ভার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যাইতেছে। মগধ সুদীর্ঘকাল সমস্ত ভারতবর্ষের প্রধান শিক্ষা ও ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল -সুতরাং তাহার প্রভাব যে এদেশে বেশী ছড়াইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ পালরাজত্বের প্রায় সমস্ত গৌরবই বিশেষভাবে বাঙ্গালীর নিজস্ব, খৃষ্ট দশম শতাব্দীতে বরেন্দ্র দেশের অধিপতি সনাতনের পুত্র তিব্বতে বিক্রমশিলা বিহারে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর, সুবর্ণবিহারের অধঃপতন হইল—বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির দীপ নিবিল, বেশ, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সেই সঙ্ঘারামগুলির গৌরবের স্মৃতি বহু পরেও রক্ষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ মঠমন্দিরের চূড়া খসিয়া পড়িল, তাহাদের বিরাট্ গৃহগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইল না কিন্তু এখনও বাঙ্গলার বহুস্থানে মাটী খুঁড়িলে তাহাদের ভিত্তি বাহির হইবে। রামাই পণ্ডিত কৃত শূন্যপুরাণ একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তক। উহা কত প্রাচীন তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে বর্ত্তমান কালে উহা যে আকারে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে উহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতকের লেখা বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ইহার মাঝে মাঝে প্রাচীনতর গৃন্থের নমুনাও আছে, বিশেষতঃ ইহার গদ্যাংশগুলিতে. এই শূন্যপুরাণ ধর্ম্মপূজকদের পুস্তক। বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বকালে 'ধর্ম্ম' নামে পরিচিত ছিল শূন্য-পুরাণকে অধঃপতিত বৌদ্ধদিগেরই একখানি পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করা যায় ইহাতে লেখা আছে, "সিংহলে শ্রীধর্ম্মদেবের বহুত সম্মান" "কনক সৈল পুরুর কনক বিহার" "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে"—এই সকল উক্তিতে ধর্ম্মঠাকুর যে স্বয়ং বুদ্ধদেব তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। সিংহলে বৌদ্ধগণের প্রধান আড্ডা, নদীয়ার নিকট সুবর্ণবিহারই বোধ হয় দ্বিতীয় অংশের লঙ্কা এবং তৃতীয় কথাটি জয়দেবের সুবিখ্যাত "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতি-জাতম্" ছত্রের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। "বিহার" শব্দটিও বৌদ্ধবিহার অর্থে বহুদিন বাঙ্গলায় প্রচলিত হয় নাই। রামোদরের নিকটবর্ত্তী বরুকা নদীর ধারে ও বর্দ্ধমানে চল্লাই নগরীর নিকটস্থ হাকন্দ নামক স্থানে কোন বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান থাকা সম্বন্ধে এই পুস্তকে কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি ঠিক নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত

বিহারসম্বন্ধে লৌকিক স্মৃতির শেষ চিহ্ন কিনা বলা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধবিহারগুলির স্মৃতির দীপ যে তখনও বঙ্গদেশের নিম্নস্তরের লোকেরা একেবারে নিবাইয়া ফেলে নাই, তাহা সেই সকল উল্লেখ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পাটনি প্রাসাদের দুই একখানি পাথর বা কারুখচিত থামের ভগ্নাংশ দেখিলে যেরূপ আমরা পূর্ব্বযুগে কোন রাজচক্রবর্ত্তীর আবাসস্থানের কথা স্মরণ করি, এই সকল উল্লেখ দ্বারাও সেইরূপ আমাদের স্মৃতিপথে নালন্দা ও বিক্রমশিলার কথাই মনে পড়ে। তাকন্ বিহারের উত্তরদ্বারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন নীলাই। তাঁহার ৮০০ পণ্ডিত বা শিষ্য ছিল। দক্ষিণদ্বারের দ্বারপণ্ডিত স্বয়ং গন্থকর্ত্তা রামাই পণ্ডিত। তাঁহার গণ্ডিসংখ্যা ১,৬০০। পশ্চিমদ্বারের দ্বারপণ্ডিত পণ্ডিত ধেচাই, গণ্ডিসংখ্যা ৪০০ এবং পূর্ব্বদ্বারের দ্বারপণ্ডিত কলোই, গণ্ডিসংখ্যা ১,২০০ (৮৪৮৮ পুঃ শূন্যপুরাণ, ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ)। বস্তুতঃ এই শূন্যপুরাণোক্ত ধর্ম্ম-ঠাকুরের কাহিনীর মধ্যে যে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক কথা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় লুক্কায়িত আছে, তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বিস্তারিতভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান কীর্ত্তি ইহাদের সঙ্ঘারাম। এই সঙ্ঘারামগুলিতে সঙ্ঘস্থবিরের আবাসগৃহ সংগৃহীত থাকিত। ইহাদের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবার জন্য রাজারাজড়ারা প্রভূতসম্পত্তি করিয়া বহু সম্পত্তি দান করিতেন। ইহাদের আড়ম্বরের অবধি ছিল না। কারুখচিত বিশাল মঠমন্দিরের শোভায় ইহারা সম্রাটগণের বিশাল প্রাসাদগুলিকে ছাড়াইয়া যাইত। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সম্পত্তি বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতিষের সাহায্যে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। নালন্দা ও বিক্রমশিলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরে কামরূপের বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলো নিবিয়া গেলেও জ্ঞান ও শাস্ত্রালোচনার পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায় নাই। হিন্দুধর্ম্ম ইহাদের বল ও সমস্ত শক্তি নিজস্ব করিয়া লইয়া জাগিয়া উঠিল। যখন ইখন খল্জিয়ার খিলজি শুনিতে পাইলেন, পাটনা একটা বড় রাজার রাজধানী ও তাহাদের একটা অজেয় মহাপ্রতাপশালী দুর্গ আছে, বিক্রমশিলার বিহারকে মুসলমানেরা দুর্গ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। চারিদিকে নিরীহ হিন্দু ও বৌদ্ধগণকে হত্যা করিতে করিতে বিজয়ী দল যখন বিক্রমশিলার উচ্চচূড় অট্টালিকা ও শত সহস্র শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকের কণ্ঠধ্বনি শূন্যবিস্তৃত বিহার দেখিলেন, তখন ইহাদের ধারণা হইল, এই দুর্গ জয় করিতে পারিলেই হিন্দুস্থানে মুসলমান-অভিযানের প্রধান বিঘ্ন দূর হইবে। মুণ্ডিতমস্তক, কাষায়বস্ত্রপরিহিত ভিক্ষুগণকে ইহারা সেনাপতি মনে করিয়া অসি চালাইতে লাগিলেন। নিরস্ত্রে বিনাবাধায় মুণ্ডের পর মুণ্ড কর্ত্তিত হইয়া এই দুর্গ সেনাশূন্যস্থান হইয়া পড়িল। যে বিপুল সম্পত্তি বহুযুগ ধরিয়া সঙ্ঘারামে সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছিল তাহা লুণ্ঠন করিয়া বক্তিয়ার মনে করিলেন, মগধের দুর্গ হইতে তিনি রাজভাণ্ডার লাভ করিয়াছেন। মানুষ খুনী হইলে যে তাহার হিসাবে কতটা ভুল হইতে পারে তাহা এই হত্যাকাণ্ড হইতে অনায়াসে বুঝা যায়। অস্ত্রশস্ত্র নাই, জগদ্গুরুগণ এ পর্য্যন্ত সর্ব্বলোকের পূজা পাইয়া আসিয়াছিলেন,

তাঁহাদের পবিত্র আশ্রম যে কেহ হানা দিবে, ইহার বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও তাঁহাদের ছিল না। একজন রক্ষী বা সশস্ত্র পাহারাওয়ালাও এতবড় অট্টালিকার মধ্যে ছিল না। বক্তিয়ারের মাথায় তখন খুন চড়িয়া গিয়াছে। শত শত ভিক্ষুর মধ্যে যখন একজনও বাকী নাই, বিপুল ভাণ্ডার যখন সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়াছে, তখন হঠাৎ শত শত সহস্র সহস্র পুঁথি তাঁহার চক্ষে পড়িল "এগুলি কি?" কে বলিবে? সেগুলি যাঁহাদের প্রাণের বস্তু ছিল, তাঁহারা ত মৃত্যুর রক্তশয্যায় চিরনিদ্রিত। বক্তিয়ার বলিলেন, "বাহির হইতে হিন্দুলোক কাহাকেও ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা কর 'এগুলি কি'?" তাঁহার অধীন সেনারা এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বিদ্রূপোল্লাসে বলিল, "হুজুর, সহরে আর একটি হিন্দুও যে বাঁচিয়া নাই - কাহাকে ডাকিয়া আনিব?" তখন তিনি সেই যুগ-সঞ্চিত ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের খনি বিশাল পুস্তকশালা পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। দেখিতে দেখিতে কত কবি, কত দার্শনিক, কত নৈয়ায়িক, কত স্মার্ত্ত ও চিত্রকরের জীবনব্যাপী আরাধনার ফল হইতে মানবজাতি বঞ্চিত হইল। বিক্রমশিলার মঠে মঠে, মন্দিরের গাত্রে বড় বড় ভিক্ষু ও আচার্য্যগণের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, সেগুলি মুসলমানের মধ্যে ঘুষে পর্য্যবসিত হইল। এই ঘটনা ১১৯৮ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। বক্তিয়ার খিলজি পাটনার কেল্লা ফতে করিয়া গৌরে চাড়া দিয়া আসামিদের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

হিন্দুসমাজে বৌদ্ধগণের সঙ্ঘের মত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। হিন্দুশক্তি কোনকালেই কেন্দ্রীভূত হইয়া জাতীয় ঐক্য উজ্জ্বল করিয়া দেখায় নাই। বৌদ্ধগণ শুধু কয়েকজন ভিক্ষুর হস্তে সঙ্ঘারামের চাবি দিয়া জনসাধারণকে উচ্চশিক্ষা হইতে কতকটা দূরে রাখিয়াছিলেন। এই মুসলমান কৃত বিপ্লবের সময়ে যখন প্রধান ভিক্ষু ও আচার্য্যগণ দুর্গম তিব্বতের গিরিগুহায় অথবা নেপাল উপত্যকায় পলায়ন করিলেন, কিংবা মুসলমান আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, যখন সঙ্ঘারামের বিপুল পাঠাগার নষ্ট হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ জন-সাধারণের আলম্ব-স্বরূপ যোগ্য ব্যক্তি কেহ রহিল না। তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন লোক ছিল না, এবং তাহাদের কাছে শস্ত্রশাস্ত্র বা কোন পুস্তক রহিল না। এইজন্য কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় তাহারা অতলে ডুবিয়া গেল। তাহারা হয় ব্রাহ্মণদের পদধূলি লইয়া হিন্দুসমাজের কোন একটা নীচ স্থানে অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়া কৃতার্থ হইল, নতুবা মুসলমান সমাজে মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা এই দুর্দ্দিনে তাহাদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার আভাস শূন্যপুরাণের "নিরঞ্জনের উষ্মা" শীর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যায়। হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রামে এই অত্যাচারের চূড়ান্ত হইয়াছিল। "লক্ষিণা মাগিতে যাএ, যায় ঘর, তার, ঘরে নাই পায়, সাপ (শাপ) দিয়া পোড়ায় ভুবন।" ব্রাহ্মণেরা বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিল, কিন্তু তাহারা যড়ই দুর্জ্জন তাহাদের শক্তি খুব বেশী দশ বিশ জন একত্র হইয়া তাহারা সদ্ধর্ম্মকে বিনাশ করিতে লাগিল।

এই দুর্দ্দিনে যে মুসলমানেরা তাহাদের মন্দির, ভিক্ষু ও আচার্য্যদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল—তাহাদের প্রধান তীর্থস্বরূপ সঙ্ঘারামগুলিকে ধ্বংস করিয়াছিল, তাহাদিগকেই

তাহারা 'যত্র' বলিয়া গণ্য করিল, কারণ মুসলমানেরা এইবার ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ব্রাহ্মণরা এবার শুরু হইল এই আনন্দে হজরত মহম্মদকে তাহারা শঙ্করাচার্যের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিল,

"যবনেকে দেবতাগণ সঙ্গে হৈয়া একমন অলক্ষিতে পশিল ইস্লাম
লঙ্কা হৈল মহাক্ষয়, বিষ্ণু হইল পরাজয়, আনন্দ হইল রাবণ
প্রবেশ হইল যাজি কার্ত্তিক হৈল কাজি, কন্দর্প হইল যত ঘোম
ছেজিয়া আপন ভেক [illegible], নারদ হৈলা পেক, পুরন্দর হইল মোল্লা
চন্দ্রসূর্য্য আদিদেব, পলাইক হৈয়ে সব, সঙ্গে মিলি বাড়ায় বান্ধনা
আপনি চণ্ডিকাদেবা ভেক হৈলা ছাড়ি [illegible] হাবা—হাবা—হাবা দেব

পদ্মাবতী হৈল বিবি নূর।

যতেক দেবতাগণে, হয়া সঙ্গে একমনে প্রবেশ করিল আচম্বিত
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়ুয়া কিড়ুয়া বাদ্য বাজে, লাগাড় লাগাড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়, ধার্ম্মিক পণ্ডিত যত এই বড় বিষম গণ্ডগোল
এতকালে ধিক্কার, কারু নাই সংহার, ই বড় হইল অবিচার

এই অবিচার সহ্য করিতে না পারিয়া বঙ্গদেশের বৌদ্ধগণ অনেক স্থানে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সামাজিক সাম্য ও অক্ষুণ্ণ সুবিচার লাভ করিয়া—ব্রাহ্মণের দুষ্টসাহায্য অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল। পূর্ব্বেই বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল সেখানে মুসলমানের সংখ্যা অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গেল। আজ যে ভারতবর্ষে ৭ কোটি লোক মুসলমান, তাহা কি পশ্চিমাগত মুসলমান-সৈন্যের ফল, না ব্রাহ্মণের হিংসাদ্বেষ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য অত্যাচারের ফল? হে হিন্দু, তুমি যে ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের মস্তক নিজে কাটিয়া এখন হতজ্ঞানে ভাত ও ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছ—তুমি তো "স্বর্গের সন্ধানে" ঘুরিয়া মরিতেছ। একটু দয়া ও কৃপার দৃষ্টিতে যেখানে স্বর্গসুখ ফলিত, সেখানে নিষ্ঠুরতার দ্বারা নরক তুমি ঊর্দ্ধের দেশকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছ। আর কত দিন দেবতার তুমি স্বর্গপ্রাপ্তির বিরুদ্ধে বদ্ধ রাখিবে?

১১৫০ সালে লিখিত বর্দ্ধমান জেলার কাটুল গ্রামের ৭০ বৎসর বয়স্ক পণ্ডিত পাঁচুগোপাল পণ্ডিতের গৃহে রক্ষিত, গ্রামাই পণ্ডিতের স্বলিখিত একখানি পুঁথিতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—বঙ্গকায় যে ধর্ম্মঠাকুরের বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা পাটনার বিহারগুলির মতই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ছিল। সিংহল রাজের বিহারের সঙ্গে বঙ্গকায় এই "দেহারা" তুলিত হইয়াছে—তাহার অট্টালিকের শুভ্র, 'চূড়ার প্রাচীর', বহু কারুকার্য্য এবং 'বিশ্বকর্ম্মার নিজের হাতের কারুকার্য্য' ভারতবর্ষের বড় বড় সকলকেই স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহাতেও দ্বারপণ্ডিত এবং তাঁহাদের গতিবেগের কথা আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অন্ধ বৌদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম্মঠাকুরের চেলারা মুসলমানদিগের সঙ্গে যে তখনই মিলিয়া যাইবার উপক্রম

করিতেছিল, তাহা এই সকল বর্ণনায় স্পষ্ট দেখা যায়। ধর্ম্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা এইরূপ "তোমা বি সাহেব গোসাই, তোমা বি জবরদস্ত তোমা বি যবন গোসাই, তোমারি চারিবেদ, তোমা বি পীর পয়গম্বর তোমা বি চৈতন্য", ইত্যাদি সেবায় বলে কহে—মিলে ফরমান, অন্য হিন্দোলজি পশ্চাতে এসলমান। "ভক্ত মনা পরে রোজে খেলাই উড়মান বিরক্ষা", উঠে বৈসে নমাজ করে তক কাজি" যেখানে আমরা "ঘ" বা "ন" মিলাম সেখানে মূলে 'ছ' আছে, যথা 'সাহেব' স্থানে 'ছাহেব' "রোজে" স্থানে 'রোজে' এগুলি ঠিক যবনই পণ্ডিতের লেখা হইতে পারে না, কিন্তু বঙ্গলা রচনার মাঝে মাঝে এইরূপ হিন্দী ও উর্দ্দুর মিশ্রণ এই গ্রন্থের একটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। এই অংশটিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের এত কথা আছে এবং ধর্ম্মঠাকুরের পূজার সঙ্গে মোস্তফা মদিনা লইয়ার একপ পরিচয় দেখা যায়—যে আমার মনে হয় যে নব সম্প্রদায় এক সময় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন, এবং খুব সম্ভব ইঁহাদের অনেকে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। আমরা বঙ্গে পালরাজাদের সময় হইতে বৌদ্ধদের ক্রম পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে দিতে চেষ্টা করিলাম।

মুসলমানগণ বিজয়ের পর হিন্দু সমাজে জ্ঞানের চর্চ্চা থামে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুরা ধর্ম্মের কোন মঠ বা মন্দিরে তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। ব্রাহ্মণের উচ্চশিক্ষা কতকটা ঘরোয়া। প্রত্যেক পণ্ডিতের বাড়ীই যেন টোলটি সমস্ত গ্রামের মত। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সমস্ত অধীত বিদ্যা নিজ নিজ ছাত্রের নকল করা পুঁথিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতেন। একটি বড় সঙ্গলাম নষ্ট হইলে যেরূপ বৌদ্ধ জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, হিন্দুদের শাস্ত্রের তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থশালা নাই। এক এক ঘরে প্রত্যেক পণ্ডিত বংশের বাড়ীতে বহু পুস্তক রক্ষিত থাকে। হয়ত ৭৮ পুরুষ ধরিয়া সেই সকল পুঁথি ও টীকা একই বাড়ীতে একই পরিবারের লোক কর্ত্তৃক লিখিত হইত। পরবর্ত্তী বংশধর পিতৃপিতামহের সঞ্চয়গুলি নিজ বাড়ীতে পান, তাহা ছাড়া বর্ত্তমান সময়ের ভাল বহি তিনি নিজে নকল করিয়া লয়েন। এই বড় টোলের পণ্ডিতেরা নিজেই পুস্তক খাটিয়া প্রণয়ন করেন এবং ছাত্রদের দ্বারা তাহাই নকল করাইয়া লন। প্রত্যেক টোলেই একটি ছাত্রাগার বিদ্যমান। নালন্দা ও বিক্রমশিলার অভাবে সমস্ত বৌদ্ধ জ্ঞানের চক্ষু ধাঁধিয়া হইয়া গেল। কিন্তু মুসলমানদের অত্যাচার, হুতাশন, অগ্নিদাহ, বন্যা, কীটের ও শিশুর দৌরাত্ম্য কিছুতেই বাঙ্গলার পণ্ডিতদের পুস্তকাগার ধ্বংস করিতে পারে নাই, এখনও লক্ষ লক্ষ, সহস্র সহস্র গ্রন্থরাজি বাঙ্গলার গৃহে গৃহে বিরাজমান। রাজার টোলের মত জ্ঞানলাভ ও প্রচারের এরূপ গণতান্ত্রিক পন্থা অন্য কোন দেশে এত বহুল পরিমাণে আছে কি না জানি না। পাশ্চাত্য সভ্যতা এই দরিদ্র দেশের উপযোগী উচ্চশিক্ষার সহজ পন্থা ছাড়িয়া দিয়া বড় বড় রাজপ্রাসাদে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে—ফলে উচ্চশিক্ষা এদেশে আর নাই, আছে জাঁকজমক ও বাহ্যাড়ম্বর।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালরাজত্বে ধর্ম্মশাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য

জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্র

"ষড়পদ্যঃ ক পন্থা মযূরাপ্সরী।"—কপলোম্বামী।

পালরাজত্বে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দর্শন ও ন্যায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। জৈনগণও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকজন গ্রন্থকারের নাম করা যাইতেছে। ইঁহাদের প্রভাব বঙ্গদেশে বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে।

মগধের সন্নিহিত গোবরা নামক পল্লীতে বসুভূতি নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল পৃথ্বী দেবী। ইঁহাদের পুত্র ইন্দ্রভূতি (উপাধি গৌতম) জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিষ্য ছিলেন, ইনিই জৈনশাস্ত্রসংগ্রহের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পরিচালক ছিলেন। ইনি ৬০৭ খৃঃ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে ৫১৫ খৃঃ পূর্ব্বে পরলোকগমন করেন। সুতরাং এই মগধবাসী জৈন পণ্ডিত পালরাজত্বের বহুপূর্ব্বে জৈনশাস্ত্রগুলির ভিত্তি গড়িয়া যান। এই সময়ে ন্যায়শাস্ত্র অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লিখিত হইত। ইন্দ্রভূতির পরে বহু জৈন নৈয়ায়িক ন্যায়ের আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিক্রমাদিত্যের গুরু সিদ্ধসেন দিবাকর সর্ব্বপ্রথম ন্যায়শাস্ত্রকে প্রাধান্য প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম ক্ষপণক ও জৈন সিদ্ধসেন একই ব্যক্তি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কথিত আছে এই জৈন সন্ন্যাসীর একটা ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, ইঁহার দৃষ্টিমাত্র শিবলিঙ্গ ফাটিয়া যাইত। বাঙ্গালার অভিরাম স্বামীরও ঐরূপ একটা ক্ষমতা হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ইঁহাদের বহুপরে মগধবাসী দিগম্বরসম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্যানন্দ "আপ্তমীমাংসাবৃত্তি" অথবা অষ্টসাহস্রী নামক ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। ইঁহার অপর নাম পাত্রকেশরী স্বামী। ইনি সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, অদ্বৈত, মীমাংসক, সুগত, তথাগত, জিষ্ণান, ধর্ম্মকীর্ত্তি, প্রজ্ঞাকর, শবর স্বামী, ভর্তৃহরি প্রভৃতি বহু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারদের মতামত লইয়া বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টসাহস্রীতে সর্ব্বমত

খণ্ডন করিয়া তিনি নিজের মত স্থাপন করিয়াছিলেন। জিনসেন তাঁহার আদি পুরাণে (৮৩৮ খৃঃ বিদ্যানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। গুজরাট, কাশ্মীর ও উজ্জয়িনীতেই বহু জৈন নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করেন, অপর অনেকের নাম পাওয়া যাইতেছে, যাঁহাদের বাসস্থানের নির্ণয় হয় নাই। পুরাকাল হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দী পর্যন্ত অনেক জৈনন্যায়ের গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। নবীন্যায় ও তৎপূর্বে মিথিলায় হিন্দুদের নবীন ন্যায়শাস্ত্রের আবির্ভাবে তাহাদের প্রচেষ্টা বাধা হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গদেশে জৈনপ্রভাবের এত নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় এক সময়ে জৈনশাস্ত্র এতদ্দেশে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে অধীত হইত। বৌদ্ধপ্রভাবের মত জৈনপ্রভাবও কিরূপে ক্রমশঃ কলিঙ্গবঙ্গ এদেশ হইতে তিরোহিত হইল, তাহার কারণ ছাড়াইয়া পাওয়া যায় না।

কেন যে হিন্দুরা ঘোর জৈনবিদ্বেষী হইয়া এদেশে "চন্দ্রার্কৌ যদ্যুপলভেতাং তথাপি ন গচ্ছেৎ জৈনম্ নগরম্" পর্যন্ত প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের একটা জটিল সমস্যা অথচ বঙ্গদেশের যেখানে সেখানে তীর্থঙ্করের বিশাল প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়া এদেশে যে পূর্বে জৈনধর্ম প্রবল ছিল তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করিতেছে।

পালিতে বৌদ্ধদিগের যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "মিলিন্দপঞ্হো" বিশেষ বিখ্যাত। ইহা ১০০ খৃঃ অব্দের সন্নিহিত কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি চীনদেশে "নাগসেন-সূত্র" নামে অভিহিত। ইহাতে গ্রীক রাজা মিনান্ডারের সহিত ভিক্ষু নাগসেনের তর্ক-বিতর্ক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকে ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীক নৃপতি সম্বন্ধে লিখিত আছে

নাগসেন (প্রাচীন শিল্পকলার চিত্র হইতে)

ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞান স্মৃতির বহু বিভাগে পারদর্শী ছিলেন। সাংখ্য, যোগ বৈশেষিক দর্শন, গণিত, সঙ্গীতশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ যাদুবিদ্যা ও তন্ত্র এই সমস্ত বিদ্যায় তাঁহার দৃষ্টির সর্বজনস্বীকৃত ছিল। তাঁহার সঙ্গে তর্কে কেহ সমকক্ষতা করিতে পারিতেন না। তিনি সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈহিক বলও অসাধারণ ছিল। তাঁহার মত সাহসী ও কার্যতৎপর ব্যক্তি

সমস্ত ভারতবর্ষে তখন কেহ ছিল না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও সৈন্যসংখ্যার অবধি ছিল না। তিনি নাস্তিক, বিদ্যাসম্পন্ন, তর্কপরায়ণ ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। নাগসেনেন্দ্র সহিত তাঁহার তর্কের প্রথমটা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল :—

মিলিন্দ
(প্রাচীর মূর্ত্তি হইতে)

"রাজা—মহোদয়! আপনি কি আমার সঙ্গে পুনর্ব্বার আলোচনা করিবেন?

নাগসেন—যদি মহারাজ পণ্ডিতের মত আলোচনা করেন, তবে করিব। কিন্তু যদি রাজকীয়ভাবে আলোচনা করিতে চান, তবে আমি সম্মত নহি।

রাজা—পণ্ডিতেরা কি ভাবে আলোচনা করেন?

নাগসেন যখন পণ্ডিতেরা তর্ক করেন, তখন তাঁহারা কোন কোন বিষয় ছাড়িয়া দিয়া নূতন বিষয় আরম্ভ করেন। যদি কোন বিষয় ভুল প্রমাণিত হয় তখনই তাহা সংশোধন করেন এবং সে বিষয়ে আর তর্ক চালান না। তাঁহারা পরস্পর ভুল স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতগুলির গুণাগুণের তারতম্য লইয়া বিচার হয়, কিন্তু তাহাতে কেহ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। মহারাজ, পণ্ডিতদিগের আলোচনা এই ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

রাজা—রাজকীয়ভাবে আলোচনার কথা যে বলিলেন, তাহা কিরূপে হইয়া থাকে?

নাগসেন—মহারাজ, যদি কোন রাজা তর্কে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি যাহা বলেন তাহার প্রতিবাদ হইলে তিনি চটিয়া যান এবং প্রতিবাদীকে দণ্ড দিতে উদ্যত করেন। মহারাজ, আলোচনার রাজকীয় ভাব এইরূপ।

রাজা—ভাল, আপনি পণ্ডিতের মতই তর্ক করিতে আরম্ভ করুন, ভুলিয়া যান যে আমি রাজা। পূজনীয় মহাশয়! আপনি তর্কের সময়ে কোন দ্বিধা বোধ করিবেন না। মনে করিবেন, যেন গুরুর সঙ্গে অথবা কোন অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে কিংবা শিষ্যের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন, এমন কি, মনে করিবেন যেন আপনার ভৃত্যের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন।"

ভারতীয় শাস্ত্র ভারতের বাহিরেও যে কিরূপ আগ্রহ ও কিরূপ ভক্তির সহিত অধীত হইতেছিল, এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

রাজা কনিষ্কের সময় হইতে বৌদ্ধগণের মধ্যে দুই দল দেখা দিল :-

মহাযান ভারত হইতে মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইল এবং হীনযান সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে বিস্তৃতি লাভ করিল। হীনযান ঠিক বুদ্ধদেবের কথা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না, ইহাই তাঁহাদের মত। ধর্ম্মপদ গ্রন্থ—যাহাতে বুদ্ধদেবের স্বীয় শ্রীমুখের বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং অপরাপর বহু পালিগ্রন্থ যাহাতে বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁহার উক্তি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই মাত্র তাঁহাদের গ্রাহ্য। মহাযান সম্প্রদায়ের

লোকেরা বলেন, সত্য কখনও বুদ্ধের মতের বিরোধী হইতে পারে না, আমরা যেখানে যে সত্য পাইব তাহাই গ্রহণ করিব।

বঙ্গদেশের বৌদ্ধ-নৈয়ায়িকদের মধ্যে চন্দ্রগোমিনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি রাজসাহী জেলার বারেন্দ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সেই সাহিত্য, ব্যাকরণ ন্যায় ও কলাশাস্ত্রে

চন্দ্রগোমিন।

কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত "সমাধিসুখণ বিন্দু-প্রকাশিকা" নামক পুস্তক রচয়িতা অশোক-আচার্য্য কর্তৃক তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বরেন্দ্র-রাজকন্যা তারার সঙ্গে ইহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু ঐ কন্যার নাম ও তাঁহার উপাস্য দেবতার নাম এক হওয়াতে তিনি বিবাহে সম্মত হন নাই, এই জন্য বরেন্দ্রাধিপতি তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন। ইনি নির্ব্বাসিত হইয়া বরিশালের একটি দ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। এই দ্বীপ এখন তাঁহার নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ হইতে ইনি সিংহলে গমন করেন। ইনি পাণিনির পাতঞ্জলসম্মত অগ্রাহ্য করিয়া ব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই সময়ে ইনি নালন্দা বিহারে আসিয়া আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির সৌহার্দ্য লাভ করেন। ইনি আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার ন্যায়সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান পুস্তকের নাম "ন্যায়ালোকবিধি।"

শান্তরক্ষিতের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইনিও বাঙ্গালী ছিলেন। ৭৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। নালন্দার অধ্যাপকগণের মধ্যে ইহার মান ও প্রতিষ্ঠা খুব বেশী ছিল। তিব্বতরাজ খ্রীসোন দিউত্তানের আহ্বানে ইনি তিব্বতে

শান্তরক্ষিত, ৭৫৫-৭৮৫ খৃঃ

যাইয়া তের বৎসর ছিলেন। ওদন্তপুর বিহারের আদর্শে রাজা ইহার পরামর্শানুসারে সমযে সমইএ-বিহার ৭৪৯ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিব্বতে ইহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া আছে। ইহার প্রধান গ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহকারিকা' একত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত; যথা—(১) স্বভাবপরীক্ষা, (২) ইন্দ্রিয়পরীক্ষা, (৩) উৎপত্তিপরীক্ষা, (৪) কালস্বভাবাকাশপরীক্ষা, (৫) শব্দব্রহ্মপরীক্ষা, (৬) পুরুষপরীক্ষা, (৭) মীমাংসাকল্পিত আত্মপরীক্ষা, (৮) কপিলপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা, (৯) নিগণ্ঠপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা, (১০) উপনিষদ্‌পরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা, (১১) বাৎসীপুত্র-কল্পিত আত্মপরীক্ষা, (১২) কর্ম্মফলসম্বন্ধপরীক্ষা, (১৩) সমবায়পদার্থপরীক্ষা, (১৪) গুণ-পদার্থপরীক্ষা, (১৫) কর্ম্মপদার্থপরীক্ষা, (১৬) সামান্যপদার্থপরীক্ষা, (১৭) প্রমাণান্তরপরীক্ষা, (১৮) আপ্তপরীক্ষা, (১৯) প্রকৃতিপরীক্ষা, (২০) অনেন্দ্রিয়াতীতার্থদর্শি পুরুষপরীক্ষা ইত্যাদি। এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে তিনি হিন্দু ও জৈনশাস্ত্র এবং উপনিষদ্ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের মত আলোচনা ও খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধ মত (আত্মা নাই) প্রমাণ করিয়াছিলেন।

কমলশীলও একজন বাঙ্গালী ছিলেন, ইনি শান্তরক্ষিতের শিষ্য। কতক সময়ের জন্য ইনি নালন্দার তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইনিও তিব্বতরাজের আহ্বানে তথায় গিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীন পণ্ডিত মহাযানী হোসাং পদ্মসম্ভব ও শান্তরক্ষিতের মত খণ্ডন

করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কমলশীল তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় গুরুর গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রজ্ঞাকরগুপ্তও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশের সনক রাজার সময়ে (৯৮৩ খৃঃ) বিক্রমশিলার পূর্ব্বদ্বারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার ন্যায়সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে "প্রমাণ-বার্ত্তিকালঙ্কার" ও "মহাবলন্তনিশ্চয়" প্রসিদ্ধ

প্রসিদ্ধ জিতারি (দীপঙ্করের গুরু, পাল-রাজার অধীন সামন্ত-রাজ সনাতনের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইনি বাঙ্গালী ও বরেন্দ্রবাসী ছিলেন। ন্যায়সম্বন্ধে ইঁহার অনেক গ্রন্থ সুপরিচিত, তন্মধ্যে "হেতুবাদোপদেশ," "ধর্ম্মধর্ম্মি-বিনিশ্চয়" প্রভৃতি প্রধান।

জ্ঞানশ্রী (৯৮৩ খৃঃ) গৌড়বাসী হইলেও দীর্ঘকাল কাশ্মীরে বাস করেন। ইনি প্রথমতঃ শাবক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে গিয়া জ্ঞানশ্রী বিক্রমশিলার দ্বারপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে—দীপঙ্কর তাঁহার প্রথম জীবনে ইঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। অপরাপর নানা গ্রন্থের মধ্যে ইঁহার "প্রমাণ-বিনিশ্চয়টীকা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইনি শ্রাবকের মত ছাড়িয়া শেষে মহাযান-সম্প্রদায় আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইঁহার "কার্য্যকারণ-ভাবসিদ্ধি" গ্রন্থখানিও বিশেষ প্রশংসিত।

জ্ঞানশ্রী।

রত্নাকর শান্তি (৯৮৩ খৃঃ) ওদন্তপুরের শাবক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ৯৮৩ খৃঃ অব্দে বিক্রমশিলার দ্বারপণ্ডিতগণের তালিকায় ইঁহার নাম আছে, ইনি জিতারি ও বরকীর্ত্তি প্রভৃতি আচার্য্যগণের শিষ্য ছিলেন। ইনি তীর্থকরদের প্রতিবাদ নিরাশ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। অনেকদিন ইনি সিংহলে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রধান পুস্তকের নাম "বিজ্ঞানমাত্রসিদ্ধি"।

রত্নাকর শান্তি।

যে সকল নৈয়ায়িকের নাম দেওয়া হইল, তাহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন, শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের গ্রন্থগুলিতে বাঙ্গালী পণ্ডিত যাঁহারা চীন-জাপানে গিয়াছিলেন তাঁহাদের উল্লেখ আছে, ভারতবর্ষের শত শত নৈয়ায়িক পণ্ডিতের নাম ও গ্রন্থাবলী পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ পণ্ডিতের অনেক পুস্তকই ভারতবর্ষে নাই চীন, জাপান, তিব্বত, শ্যাম ও নেপাল হইতে তাহারা আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রায়শঃ মূল সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। চীন বা তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদ হইতে আমরা তাহাদের বিষয় জানিতে পারি। এই সমস্ত বৌদ্ধ ন্যায় পাঠ করিলে আমরা আমাদের দেশের অধিতীয় অন্যতম গৌরব ন্যায়শাস্ত্রের অঙ্কুর ও বিকাশের দুর্গম পথা আবিষ্কার করিতে পারি। হায়! ভারতীয় পণ্ডিতগণ! তোমাদের ধর্ম্ম-কলহ কি নিদারুণ! তোমাদের অমূল্যনীয় কীর্ত্তিগুলি স্বদেশবাসীরা উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু অপর জাতিরা তাহাই অতি যত্নে কুড়াইয়া রাখিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। তোমরা নিজেরা এখন নিঃস্ব। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একদল দৃঢ়সঙ্কল্প যুবকের চীন, জাপান, শ্যাম, সিংহল, তিব্বত, নেপাল, বার্মা ও জাভায়

ইতিহাস উদ্ধারে উদাসীনতা।

যাওয়া দরকার। সেগুলির যাহা অবশিষ্ট আছে, হয়ত এখনও তাহার কতক কতক বহু তপস্যার দ্বারা কুড়াইয়া আনিতে পারা যায়। কিন্তু এই দুর্গম পন্থায় পথিক কে হইবেন? এখানে উপাধি, স্বর্ণপদক ও উচ্চপদের আশা নাই। পুরাকালে কৌদেহবাস বোদ্ধ ভিক্ষুরা যেরূপভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেশ বিদেশে গিয়াছিলেন, বিলাতে এক প্রাচীন যুগে এরেস্‌মাস প্রভৃতি জ্ঞানিবৃন্দ যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্বদেশের কল্যাণকামী, পার্থিব যশ অর্থ প্রভৃতির প্রতি উদাসীন কতিপয় দেশ-সেবকের প্রয়োজন। বিলাতে যাইয়া নরম্যান-বিজয় ও ক্রমওয়েলের শাসন, এমন কি ক্রুসেডের বৃত্তান্ত পড়িয়া গবেষণার জন্য ছাত্রগণ উন্মুখ হইয়া ছুটিতেছেন, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও পদগৌরব আছে এখানে কিছুই নাই কিছু না লইয়া, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া জীবন বিনাশনে সমর্পণপূর্ব্বক যাহারা খাটিবেন, সেইরূপ খাটিবার কয়েকটি লোক চাই ইলোরা, অজন্তা, হস্তিগুম্ফ, খেড়ুরাহ, ন্যায় বরোবদর, প্রথমতঃ হইতে নিরবধি আমাদের দেবলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ আসিতেছে, আমরা বধির হইয়া আছি—তাই মাতৃ-আজ্ঞা শুনিতে পাইতেছি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানের গৌরব

গৌর্দ্ধিগের সময় হইতে বিদ্যা ও জ্ঞানের আদর আমরা বৃহৎ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র দেখিতে পাই সেই সময় হইতে সুযোগ্য রাজ্যের কার্য্য বী ও রাজার পূজ্য হইয়াছিলেন। সে সময়ের কত গল্প, যাহা প্রদর্শনের জন্য "বৃষল" উপাধিতে যেন কৃতার্থ হইয়া চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতেন। এই বিদ্যা ও জ্ঞানের আদর করিয়া কৌটিল্য তাঁহার সমস্ত ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি রাজনৈতিক নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন সত্ত্বেও মূলতঃ রাক্ষস মন্ত্রীর সৌহার্দ্দ্য ও সহকারিতা-প্রার্থী ছিলেন। গুণীর আদর দেখাইবার জন্য পালরাজগণের মধ্যে একজন মহিষারোহিত সম্রাট অমলধবল মহার্ঘ আসনে স্বীয় মন্ত্রীকে বসাইয়া সশঙ্কচিত্তে সম্ভ্রমের সহিত স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, এবং অপর এক রাজা, যাঁহার চতুর্দ্দশ শক্তিবলে চারিদিকের নৃপতিরা গরুড় পক্ষীর ন্যায় তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন, তিনি স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রিবরের কুটিরের এক কোণে পরামর্শের জন্য অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ দিতেও সাহসী হইতেন না। প্রকৃত একজন গুণীর আদর দেখাইবার জন্য ভিক্ষাজীবী অসংখ্য স্বর্ণ ব্যয় করিয়া স্বীয় রাজসভার প্রধান ব্যক্তিদিগকে কত কত দূরদেশে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই বাঙ্গালী পণ্ডিতের

দর্শনকামী হইয়া দেবে নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রিয় সভাসদেরও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, এবং নেপালের রাজা ও তাঁহার রাজ্ঞী মহাসমারোহে সেই পণ্ডিতকে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহাদের একমাত্র পুত্র যুবরাজকে তাঁহার পাদে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। প্রকৃত গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও জ্ঞানের আদর এই দেশে বোদ্ধযুগের পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। শুধু ইতিহাসে নহে, এই গুরুগণের যে চিত্র আমরা কাব্য-নাটকাদিতে পাই—তাহা সর্ব্বোতোভাবে সেই অপূর্ব্ব সমাদরের যোগ্য। চন্দ্রগুপ্তের চরকর্ম্মা সেনিয়া শ্রীকদূত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। পারস্যের রাজার রাজপ্রাসাদ কারুকার্য্য ও ঐশ্বর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ এবং তাঁহার সভার সৌন্দর্য্য ও শোভা পারস্যরাজের রাজধানীর গৌরবকে ম্লান করিয়াছিল। সেই রাজাধিরাজ প্রসিদ্ধ নন্দবংশের উচ্ছেদকারী মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যে মন্ত্রীর আশ্রয়ের ছত্রাধরূপ ছিলেন সেই মন্ত্রীর গৃহের কথা আপনারা মুদ্রারাক্ষস নাটকে পাঠ করুন। সোমরসিপ্ত কুশ-খড়োপরে, অতি সামান্য আসবাবযুক্ত পর্ণকুটিরে বাস করিয়া চাণক্য আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত রাজনীতির কাণ্ডারী হইয়াছিলেন, তাঁহার বিলাসের ভোগের ইচ্ছা ছিল না। বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ, ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক ব্যাপার তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে সম্পাদিত হইত, তিনি অমাত্যরাক্ষস, কুটিলবুদ্ধি বিকৃতপ্রকৃতি রাক্ষসের আশ্রয়, যখন রাক্ষস মন্ত্রীর পরাভব হইল, তখন তিনি তাহাকে স্বীয় পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজে ব্রাহ্মণোচিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। আমরা একখানি নাটক মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক এই সকল ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই নাই। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের এই যে আদর্শ তাহা কেবল পরবর্ত্তী কালের সমস্ত তাম্রশাসন ও শৈললেখাদিই প্রমাণিত হইতেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার খুটিনাটির প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে মনোযোগ দেওয়ার কারণ নাই। কিন্তু কি কাব্য, কি নাটক, কি তাম্রশাসন ও শিলালেখ এ সমস্তের মধ্যে, যদি আমরা একটা আদর্শই দেখিতে পাই, তবে তাহাই জাতীয় ইতিহাসের মূল কথা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

পরবর্ত্তী সেন-রাজত্ব কালে এমন কি মুসলমানাধিকারেও আমাদের এই আদর্শ উজ্জ্বল ছিল, জ্ঞানের পথে আমাদের মস্তক কাহারও নিকট হেঁট করিতে হয় নাই। আমরা 'জগদ্গুরু' উপাধি লইয়া সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করিতাম। আমাদের সেই মহিমান্বিত পদের বিচ্যুতি যেদিন ঘটিয়াছে সেই দিন হিমালয় বিন্ধ্যপর্ব্বতের মত নতশির এবং ত্রিস্রোতঃপাবনী গঙ্গা একটা খালে পরিণত হইয়াছে।

মগধের লোকেরা ক্রমাগত পূর্ব্বমুখী হইয়া বাঙ্গলায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, আজ বিহারে মগধের যতটা চিহ্ন আছে বাঙ্গলাদেশে তাহা তদপেক্ষা অনেক বেশী। বিহার খুঁড়িয়া নালন্দা, ওদন্তপুর ও বিক্রমশিলার প্রস্তরখণ্ড, দেবমূর্ত্তি ও শিলালেখ বাহির হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণের কৃতিরই মূল মাগধী প্রতিভার অপ্রমান হইয়াছিল। নানাভাবে বিকৃত চূর্ণাবচূর্ণ মাগধী সভ্যতা, বিকৃতলক্ষ্মির সত্যদেহের ন্যায় বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলাদেশ হইল সেই তীর্থ, যে তীর্থে মাগধী মহাদেবীর মস্তিষ্কটি

পড়িয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বেহার হইতে বহু সৈন্য-সামন্ত ও আত্মীয়-সহচরপরিবৃত হইয়া রাজা শশাঙ্ক বাঙ্গালাদেশে আসিয়া মুর্শিদাবাদের নিকট কাণসোনায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বতের মাগধদের আসিয়া তথায় বিপুল সৈন্য ও বহু আত্মীয়-স্বজনসহ রাঢ়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মগধের লোকেরা উপর্যুপরি শত্রুর আক্রমণে, অবশেষে মুসলমানের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কতক ত্রিকলঙ্গ ও নেপাল প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন; কতক চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ইহা ছাড়া রাঢ়ে ও বঙ্গে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত তথায় হিন্দু রাজত্ব ছিল) বহুসংখ্যক মগধবাসী আশ্রয় লইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও যশোধনে বৌদ্ধগণের বিপুল প্রভাব ছিল। ঐ শতাব্দীতে সহস্র সহস্র শিষ্যের সহিত রামানন্দ ঘোষ তারকমন্ত্রে পুনরায় বৌদ্ধ সাম্রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তখন পুরীর মন্দির মুসলমানগণকর্ত্তৃক বলভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবেরা তাহা দখল করিয়াছিলেন। রামানন্দ নিজকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া পুরীর মন্দির উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি পরিষ্কারভাবে প্রচার করেন যে, পুরীর মন্দির বৌদ্ধগণের নিজস্ব, ইহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। তিনি একখানি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে তিনি এই রাজ্য হইতে মুসলমান-দিগকে দূর করিয়া বৈষ্ণবগণের হস্ত হইতে পুরী কাড়িয়া লইয়া পুরীর মন্দিরাধিপতি বুদ্ধ-বিগ্রহকে একচ্ছত্র রাজা করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি পুস্তক লিখিয়াছিলেন যে, যখন এদেশে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তিনি পুরীর মন্দিরের পাদপীঠে বসিয়া স্বকৃত রামায়ণখানি পাঠ করিবেন। বুদ্ধদেবের সপ্তদশ শতাব্দীর এই অদ্ভুত অবতারের বিষয় যে রামায়ণে লিখিত আছে সেই পুস্তকখানির নাম রাধালীলা। ইহার সম্বন্ধে অপরাপর কথা পরে লিখিব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে সে নারায়ণদেব মগধ হইতে আসিয়া মৈমনসিংহে উপনিবিষ্ট হন। সম্ভবতঃ মনসামঙ্গলের উপাখ্যান-ভাগ তিনি বেহার অঞ্চল হইতে আনিয়াছিলেন। চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা বেহারী রাজকন্যা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণদেব যে মগধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হুগলীর অন্তর্গত মগধ গ্রাম, কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। এই ভাবে শক্তিসোদ্ভব মাগধী-মহিমা বাঙ্গলায় আসিয়া আশ্রয় লইল, তাহার ফলাফল পরে লিপিবদ্ধ হইবে।

এই দেশে বিদ্যার যে সম্মান হইয়াছিল,—তাহা মগধের ইতিহাসকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণ পণ্ডিতদিগকে যেরূপ অজস্র দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। পালরাজগণের পরেও এই দানের স্রোত নিরুদ্ধ হয় নাই। শত শত তাম্রশাসন এবং অন্যান্য দলিলপত্র নষ্ট হইয়াছে কিন্তু সেই মহানুভব রাজাদের দানশীলতার পুণ্যে যে কয়েকখানি আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতেই এই দানের পরিমাণ কতকটা বুঝা যাইবে। দৃষ্টান্তস্থলে তাম্রশাসনের সাংসারোদ্ভবীয় উপকরণ হইতে বিজয় সেনের দান, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় পীতবাস গুপ্তশর্ম্মাকে ঈশ্বরদেবের দান, বিক্রমপুরবাসী রামদাস দেবশর্ম্মাকে

ভোজবর্ম্মদেবের দান, বাৎস্যগোত্রীয় হলায়ুধ দেবশর্ম্মাকে বিশ্বরূপ সেনের দান, উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্ম্মাকে লক্ষ্মণ সেনের দান প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র দানের উল্লেখ করিলাম। এই দানের পরিমাণ যে কত বেশী ছিল, তাহা দেখাইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব তৎকালে যে কোন উপলক্ষ হইলেই রাজারা পণ্ডিত-বিদায় করিয়া উৎসাহ দিতেন এখনকার রাজারা যেমন বিলাত যাইয়া সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন, গৃহে আসিয়া দেখেন রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনায় বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে, মালীর অভাবে তাহা কাটা হয় নাই—রাজপ্রাসাদে তাঁহার শুইবার ঘরের ছাদে ফুটা হইয়াছে, মিস্ত্রীর অভাবে তাহা মেরামত হয় নাই কারণ রাজার কোট আনিতে আর মহারাজ বাহাদুরের বিলাত যাওয়ার খরচে খরচ হইয়া গিয়াছে,—তখনকার দিনে তেমনি চারিদিকে যোগ্য সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ পণ্ডিতদিগকে যুক্তহস্তে দান করা রাজাদের একটা খেয়াল ছিল। একটা উপলক্ষ বা অছিলাও পাইলেই হয়। আমরা তাম্রশাসনে বালরাম নামক একজন রাজার উল্লেখ পাই। তাঁহার কোটের উপরে নূতন গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে মাত্র। এই নব শ্মশ্রুোদ্গমের উপলক্ষে উৎসব করিয়া তিনি ১১ খানি গ্রামের সব ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং ইহা ছাড়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে আরও ৪১ লক্ষ টাকা নিদান দিয়াছিলেন। আসামের অনেক রাজাও যুক্ত হস্তে বিদ্বান্গণকে এইভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহা তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃ বিদ্যার অনুশীলন ও উৎসাহ দেওয়া তখন একটা সমারোহ-ব্যাপার ছিল। ধনাঢ্য লোকেরা মাতাপিতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান কেন্দ্রের পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। কাশী, কাঞ্চী, কাশ্মীর, দ্রাবিড়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অযোধ্যা ও মিথিলা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ আসিতেন। নৈয়ায়িকে নৈয়ায়িকে, দার্শনিকে দার্শনিকে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত বিচার চলিত। তেমন এক বিচারসভা আমি শৈশবে দেখিয়াছি। যাবতীয় স্থানীয় পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া বিচার করিতেন। তাহাতে প্রত্যেক বিদ্যাই অনুশীলনপুষ্ট হইত এবং নূতন তথ্য, নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইত। এইরূপভাবে মিলন বৎসরে একবার, দুইবার নহে, বহুবার হইত বিদ্বান্ পণ্ডিতদিগের বিদ্যা সর্ব্বোচ্চ হইত। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অধীত বিদ্যার অনুশীলনপূর্ব্বক যে মৌলিকত্ব দেখাইতেন উৎসাহ পাইতেন, তাহাতে জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইত। এখনকার দিনেও এইরূপ Conference হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে শুধু বিদ্যানুরাগী, পার্থিব সমস্ত গৌরবের প্রতি উদাসীন, জ্ঞানসম্বল পণ্ডিতগণ একত্র হন না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের সময়ে লার্ড ওয়েলেসলি সিভিলিয়ানদের মধ্যে প্রাদেশিক ভাষার কৃতিত্ব পরীক্ষার জন্য এইরূপ বিচারপদ্ধতি চালাইতে চাহিয়াছিলেন, ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে রামমোহন রায় ও মেকলে প্রমুখ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিরা প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে হতাদর করিয়া বাধা উপস্থিত করাতে সেইরূপ বিচারপদ্ধতির মূলে

মুঠারাঘাত করা হইয়াছে। বাঙ্গালার নবজাগরণের সূত্র ধরিয়া করা পাশ্চাত্য জগতের কতকটা অসম্ভব, কারণ শুধু বিদ্যার জন্য বিদ্যাচর্চায় তাঁহারা এখন আর একটা মূল্য দিতে প্রস্তুত হন না।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রাম অন্যগ্রামের হইতে বিচ্ছিন্ন। প্রত্যেক গ্রামেই তাঁতী, কাঁসারী, ধোলা ধোপা নাপিত, গায়ক, গোয়ালা, কামার, কুমার, পুরোহিত বিদ্যমান, তাহা ছাড়া তথায় দেবমন্দির আছে, হাট বাজার বসে, সুতরাং প্রতিগ্রামের লোকেরা জগৎ হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরে আশ্রিত থাকিত। কিন্তু বৎসরে কয়েকবার 'গুপ্ত যোগ' হইয়া থাকে তীর্থযাত্রায় আছে -সেই সকল উপলক্ষে ভারতীয় পল্লীবাসীদের একটা সাম্মেলনীন মিলন হইত। এই মিলন উপলক্ষে পল্লীবাসীরা আর কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিতে পারিত না। চিন্তাধারার একটা প্রেরণা সর্বত্র প্রবাহিত হইয়া আসিয়া পল্লী সভ্যতার বৃদ্ধি করিত। বাহিরের বায়ু আসিয়া পল্লীর নিরুদ্ধ বায়ুকে নূতন প্রাণশক্তি প্রদান করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপের টোল

এইভাবে আমাদের সোণার বাঙ্গলা ভারতী দেবীর সাধনা করিত। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি নষ্ট হওয়ার পরে বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া টোল বসিয়া গেল, যাহা এক ছিল তাহা বহু হইল। এখন আর ওদন্তপুর, বিক্রমশিলা, পুষ্পগিরিবিহার, সমস্ত বিদ্যার ভাণ্ডারী হইয়া অধ্যক্ষতা করিতে দাঁড়াইল না। সমস্ত বিদ্যামন্দিরের চাবি একজনের কাছে রহিল না। লিখিত আছে শীলভদ্রের কোমরে অনেকগুলি চাবি সর্বদাই ঝুলান থাকিত। তিনি বহু সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষ হওয়ার দরুন সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের চাবি তাঁহার কাছে থাকিত। কিন্তু সঙ্ঘারামগুলি নষ্ট হওয়ার পর কে আর তিন শত ছুট উচ্চ মঠ নির্মাণ করিবে, কে বিশালায়তন বিহার নির্মাণ করিবে, কে আর রাজচক্রবর্তীদের ন্যায় তাঁহাদের মুক্তহস্ত দানে বিদ্যাশালায় রাজভাণ্ডার স্থাপিত করিবে? আমাদের সেই সৌরবের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! কিন্তু ভারতী দেবী নিজ হস্তে টাঁচার করে সাঁঝের বাতি জ্বালাইয়া দিতেন, কপালে স্বীয় কৃপাচিহ্নের তিলক আঁকিয়া দিতেন, তাঁহাদিগের সৌরব নষ্ট করিবে কে? সেই রাজপ্রাসাদগুলির ভগ্নস্তূপে সামান্য কুটির হইল -ক্ষতি কি? হতে কুটিরে বসিয়াই এক সময়ে বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাস মহাভারত লিখিয়াছিলেন—তদপেক্ষা কত বৃহৎ বিদ্যামন্দিরে বাস করিয়া আমরা কি এ পরীক্ষার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছি। নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণি,

জগদীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নব্যন্যায়কে যে চূড়ান্ত মহিমা প্রদান করিলেন, তাহাতে ইহস্কৃতি, সিদ্ধসেন-দিবাকর ও চন্দ্রগোমিন প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতের কীর্তি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সুতরাং বিদ্যার গতি মুসলমানাধিকারেও বিন্দুমাত্র থামে নাই। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্তও বঙ্গদেশের এই গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। উহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গে নদীয়ার টোল ভারতবিশ্রুত হইল। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ঐ সকল টোল জগদ্বিখ্যাত বিদ্যাপীঠের সঙ্ঘারামগুলির সঙ্গে তুলনা করা বাতুলতা, অবশ্য পরাধীন ভারতবর্ষে তখন রাজচক্রবর্ত্তীদের দান ও সমারোহ আমরা কি করিয়া আশা করিতে পারি? সে ধর্ম্মপাল, বালাদিত্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গের মুক্তহস্তের স্থানে লিখিত শত শত ব্রহ্মত্রের নবদ্বীপে আশা করা বৃথা কিন্তু বাহিরের আসবাবপত্র সমাপ্ত হইলেও ভিতরের তো কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ও ন্যায়ের পর আক্রমণ থামিয়া যায় নাই; ইহাদের পরিণতি বাঙ্গলার নবন্যায়ে দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা নূতন একটা কি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, বলা নিষ্প্রয়োজন, যদিও নবদ্বীপের টোলগুলির উত্থানপতন-প্রসঙ্গ পরবর্ত্তী ইতিহাসের অন্তর্গত, তথাপি পাল-যুগের বিদ্যার কথা করিতে যাইয়া ধারাবাহিকভাবে বিষয়টীর সূত্র টানিয়া আনিলে নবদ্বীপের কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিহারের সঙ্ঘারামগুলির পরে মিথিলা ও নবদ্বীপ। তখন বাঙ্গালী স্বাধীনতা হারাইয়া বসিয়াছে নালন্দায় ১০,০০০ ছাত্র পড়িত, বিক্রমশিলায় কোন একটা সঙ্ঘে ৮,০০০ ভিক্ষু দার্শনিক মতের আলোচনা করিতেন নালন্দায় ৮০০০ ভিক্ষু নির্ব্বাণ পাইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে "লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া পড়িত"—ইহা কৃষ্ণদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন। এই লক্ষ লক্ষ মানে কি? সেকালের ভাষায় এই সকল ব্যবহারিক অতিরঞ্জন ছিল অবশ্য বৃন্দাবন দাস "বহুসঙ্খ্যক" কথাটা ঐ ভাবে বুঝাইয়াছিলেন তখন রঘুনাথ শিরোমণি জীবিত ছিলেন, অপরাপর বিশ্রুতকীর্ত্তি নৈয়ায়িকেরাও আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তখনকার দিনের সকল কথা জানি না, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিছু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে এই নবদ্বীপে পূর্ব্বে হরিহোড় নামক এক ব্যক্তি খুব ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফরমান্ দিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ রাজার সময়ে নবদ্বীপের টোল খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যার গৌরব তখন বহুপূর্ব্ব হইতেই ছিল, নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার তাহার প্রমাণ। ভবানন্দের পর গোপাল রায় রাজা হন, তাঁহার পুত্রের নাম রাঘব রায়। ইঁহাদের সময়েও নবদ্বীপে টোলের সম্মান ও শ্রী অব্যাহত ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী কাল হইতে তখনকার টোলগুলির দীপ্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে রাঘব রায়ের পুত্র কৃষ্ণ রায় অনুমান ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের অনুযায়ী সংখ্যার "কলিকাতা ম্যাগাজিন" (Calcutta Monthly) নামক একখানি ইংরেজ-সম্পাদিত পত্রিকায় নবদ্বীপ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল, "নবদ্বীপের টোলগুলির গৌরব সর্ব্ববিদিসম্মত এই টোলগুলির মধ্যে তিনটি ছিল

সর্ব্বপ্রধান, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ও গোপালপাড়ার টোল। ইহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যথাযোগ্য সম্পত্তির ব্যবস্থা আছে। যখন এই নিজস্ব সম্পত্তির আয় হইতে পণ্ডিত ও ছাত্রদের ব্যয়নির্ব্বাহ করা কঠিন হয়, তখন কৃষ্ণনগরের মহারাজ মুক্তহস্তে দান করিয়া সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পণ্ডিতের জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা আছে এবং তাহার দ্বারা তাঁহারা যতগুলি ছাত্র রাখেন তাহাদের প্রত্যেকের জন্য একটী অতিরিক্ত মাসোহারা পাইয়া থাকেন। এই বৃত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যে সমস্ত ব্যয় সুনির্ব্বাহ হয়। এখন ১১১ টোল, এক নবদ্বীপের টোলেই প্রায় ১,১০০ ছাত্র এবং ১০০ জন অধ্যাপক আছেন। কিন্তু এই টোলগুলির অবস্থা পড়ন্ত দশায়। রাজা কৃষ্ণের সময়ে অবস্থা ইহাপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।"

এই লেখক জানাইতেছেন যে রাজা কৃষ্ণের সময়ে ১৬৮০ খৃঃ ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪০০০ এবং অধ্যাপক ছিলেন ৬৪ জন। অধ্যাপকের সংখ্যা এত বেশী থাকাতে মনে হয়, পাশের যত বিদ্যালয় এই সকল টোলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"কলিকাতা ম্যাগাজিন" হইতে এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"যাহা দুরদেশ হইতে নবদ্বীপে ছাত্র সমাগম হয় এই অধ্যয়নক ছাত্রগুলী অধিকাংশই প্রৌঢ়বয়স্ক। কারণ তাঁহারা বহুকাল অন্যত্র দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়দর্শন পাঠ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। এতদূর পড়িয়া শুনিয়া আসিয়া নবদ্বীপে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে তাঁহাদের বিশেষ বৎসরের দরকার হয়। যাঁহারা সাহিত্যের জন্য এখানে আসেন, তাঁহাদের পক্ষেতেই টোলের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ও বাজার দাম হইতে ব্যয় চালাইবার মত খরচ পাইয়া থাকেন।

টোলের শিক্ষা পদ্ধতি

"ইহারা যে সকল গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। এইজন্য সংস্কৃত ভাষার অভিধানও কণ্ঠস্থ করিবার রীতি হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা যেন এটি মনে না করা হয় যে তাঁহাদের বিদ্যা কেবল মুখস্থ করার আবৃত্তিতেই শেষ হয়। তাঁহারা সমস্যা মৌলিক গ্রন্থ এবং টিকা লিখিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের বিশেষ বুদ্ধি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।"

কি কি পুস্তক পড়ান হয় তাহা এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করিয়া সমাচারকার লিখিয়াছেন "বেলা ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ অধ্যয়নকার্য্য করা হয়। শিক্ষার প্রণালী এইরূপ দুইজন অধ্যাপক দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোন একটা মত লইয়া তর্ক করিয়া থাকেন। ছাত্রগণ তাহা শুনিবার অধিকার পাইয়া থাকে। যদি অধ্যাপকদের আলোচনা ও তর্ক দুরূহ বা কঠিন বোধ হয়, তবে তাহারা তাঁহাদিগকে সমস্যা প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি বুঝিবার অধিকার পায়, অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে এইভাবে প্রশ্ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টায় সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা ছাত্রদিগের সম্বন্ধে অতিশয় সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া অধ্যাপনা করেন। যদি কোন অধ্যাপক চটিয়া যান তবে তাঁহার খুব নিন্দা হয়। এমন কি ছাত্র যতবড় মেধাবী ও বুদ্ধিমান

হউক না কেন, যদি কচিৎ কোন অধ্যাপকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে কিংবা তিনি কোন অপভাষা ব্যবহার করেন, তবে সেসময় তাঁহার নিন্দা প্রচারিত হয় এবং তিনি অসম্মানিত হন।" (যখন ছাত্রের বয়স ৪০ বা তদূর্ধ্ব, তখন তাঁহার সহিত অভদ্রোচিত ব্যবহার অধ্যাপকগণের পক্ষে যে দূষণীয় হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?) "নবদ্বীপের রাজারা পণ্ডিতগণের এই জাতের বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক শুনিবার জন্য প্রায়ই টোলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। যাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখান কিংবা আলোচনায় বিজয়ী হইয়া স্বীয় গুণপনার পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে যাহারা যোগ্যভাবে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। কোন বিশেষ উপলক্ষে সর্বসাধারণের সমক্ষে এইরূপ তর্ক ও আলোচনায় বিজয়ী পণ্ডিতেরা রাজার নিকট বিশেষ উৎসাহ ও পুরস্কার পাইয়া থাকেন। এককালে এই পুরস্কার প্রকৃতই মূল্যবান্ ছিল। রাজা কৃষ্ণের সময়ে প্রধান পণ্ডিতগণ ঘটিতরা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা পাইতেন। এখনকার রাজাদের তত্রূপ দান করা সাধ্য নহে; হয়ত একটা পিতলের ঘড়া, গরদের জোড় প্রভৃতি সামান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু রাজার নিকট হইতে এই দান পাইয়া অধ্যাপকেরা যে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন, তাহার মূল, খুব বেশী। কোন রাজকরদাতা যদি বহুমূল্য খিলাৎ দান করেন, তাহাও এই সামান্য দানের কাছে একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভারতীয় পণ্ডিতগণের চিরাভ্যস্ত অর্থের প্রতি উপেক্ষা ও ত্যাগের ইহা একটি প্রধান নিদর্শন। পাণ্ডিত্যের জন্য যে সামান্য মূল্য ইঁহারা পান তাহা তাঁহাদের কাছে অসামান্য মনে হয়।"

রাজদত্ত দানের মর্যাদা।

কিন্তু নবদ্বীপের টোলগুলি ক্রমশঃ শ্রীহীন হইল। রাজা কৃষ্ণের পূর্বে ইহাদের যে অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। রাজা কৃষ্ণের সময়ে (১৬৮০ খৃঃ) ৪,০০০ চারি কাজার ছাত্র ও ৩০০ (তিন শত) অধ্যাপক ছিল, ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইল ১,১০০ এবং অধ্যাপকের সংখ্যা হইল ৪০০, ১৮২৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক উইলসন নবদ্বীপের টোলের ছাত্রসংখ্যা পাঁচ শত হইতে ছয় শতের মত দেখিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক সংখ্যাও অনুপাতে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৮৬৭ সালে ই বি কাউএল ছাত্রসংখ্যা ১৫০ ও অধ্যাপক সংখ্যা খুব কম দেখিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কাউএল সাহেব নবদ্বীপের টোলগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৮৬৭ সনের ১৯শে জানুয়ারীর রিপোর্টের সারাংশ সঙ্কলন করিতেছি—"পূর্বকালে গ্রীস দেশে যেরূপ লেখাপড়ার উচ্চাঙ্গ অনুশীলন হইত এবং যাহার বিবরণ আমরা মাঝে মাঝে প্লেটোর 'বাগ্বিতণ্ডায়' (Controversies) পাই, আন্তর্গের বিষয় নবদ্বীপে আমরা সেই প্রাচীন সময়ের একটা ধারা যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাইলাম। বিদ্যাদান করিয়া অর্থগ্রহণ করা ইহারা পাপ মনে করেন; পণ্ডিতেরা শুধু বিনাবেতনে ছাত্রদিগকে পড়াইয়া ক্ষান্ত থাকেন না, পরন্তু তাহাদের খাওয়াপরা ও বাসস্থান যোগাইয়া থাকেন। ইহারা বড়লোকদের সাম্বাৎসরিক ধর্মকার্যে বিদায় এবং নানারূপ ব্যাপারে দক্ষিণা লাভ করিয়া এই সমস্ত খরচ নির্বাহ করেন।

নবদ্বীপে ভারতবর্ষের সকলপ্রদেশের ছাত্রসমাগম

নবদ্বীপে প্রধানতঃ স্মৃতি ও ন্যায় পড়ানো হইয়া থাকে। এই বিষয়ে নবদ্বীপের খ্যাতি ভারত-ব্যাপী। বিশেষতঃ ন্যায় পড়িবার জন্য এখানে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া থাকে। আমি আমার অবস্থিতিকালে প্রৌঢ়বয়স, এমন কি যাহাদের চুল প্রচুর পরিমাণে পাকিয়া গিয়াছে, এমন সকল পণ্ডিতকে লাহোর, পুনা, তাঞ্জোর দেশ, এমন কি মিথিলা ও নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতেও আসিতে দেখিয়াছি। স্মৃতির টোলে সাধারণতঃ ৮ বৎসর পড়িতে হয়। ন্যায়ের টোলে ১০ বৎসরের নীচে কিছুতেই হয় না। টোলগুলি মাসে ১০ দিন করিয়া বন্ধ থাকে, এইভাবে প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পৌর্ণমাসী, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের দুই তিথিতেই টোল বন্ধ থাকে। ইহা ছাড়া সরস্বতী পূজার দুই সপ্তাহ এবং অন্যান্য পর্ব্ব উপলক্ষেও ছাত্রগণ ছুটি পায়। ন্যায়ের টোলে ছেলেরা আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ছুটী ভোগ করে, স্মৃতির টোলে ফাল্গুন হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত। লাহোর হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত বহুদেশ হইতে ছাত্রগণ নবদ্বীপে আসিয়া থাকে। নবদ্বীপের উপাধি পাইলে ভারতীয় সমস্ত বিদ্যাকেন্দ্রে সেই পণ্ডিত সম্মানিত হন, তিন বৎসরের কয়েকমাস টোলগুলি বন্ধ থাকে, বাকী কয়েক মাস ছাত্রগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকেন।"

"পণ্ডিত ও ছাত্রগণ কেমন সরলভাবে জীবনযাপন করেন তাহা স্পার্টানদের কষ্টসহিষ্ণুতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" কাউএল সাহেব আরও লিখিয়াছেন, "বংশপরম্পরা পণ্ডিতগণ বিদ্যার্জ্জনের যে কষ্ট ও তপস্যা স্বীকার করিয়া এই নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, তাহা তাঁহাদের বিস্ময় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। প্রত্যেক ছাত্র একটি খড়ো ঘরের সামান্য অংশে বাস করে। তাহার সম্বল একটি লোটা ও মাদুর, অধিকাংশ ছাত্রেরই ইহা ছাড়া অন্য কোন আসবাবই নাই, তাহারা নিজেদের পাঠ্য পুস্তক নিজেরা নকল করিয়া লয়। টোলগুলি চতুষ্কোণ একটা জায়গার উপর অবস্থিত। অধ্যাপকেরা ছাত্রদের সঙ্গে থাকেন না, তিনি আসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পড়াইয়া যান। এই চতুষ্কোণ জায়গার একদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত ঘর আছে। ইহা অনেকস্থলেই একটা খড়ো ঘর, তিন ফুট উচ্চ ইহার মেজে। একটা দিকে ঝড়বৃষ্টি হইতে রক্ষিত হওয়ার কতকটা ব্যবস্থা আছে, অপর দিকগুলি খোলা।"

জীবনযাত্রার সাদা।

কাউএল সাহেব লিখিয়াছেন, একটিমাত্র টোল কতকটা সচরাচরের, "পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র শুকাদকারের এই টোলটি লক্ষ্ণৌ নিবাসী এক ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩০ গজ চতুষ্কোণ জমির উপর স্থাপিত, ইহাতে ১০টি পাকা ঘর আছে, ঘরগুলি সাধারণতঃ ৯ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রশস্ত—ইহা ছাত্রদের বাসের জন্য। প্রত্যেকটি ঘরের একটি জানালা ও একটি দরজা আছে। কোণের দিকের ঘরগুলি একটু বড়। ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাটী হইতে পাঁচ ফুট উচ্চ মেজের উপর নির্ম্মিত, এই গৃহটি দুইভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ১০ ফুট দীর্ঘ, ভিতরে ১০ ফুট প্রশস্ত।"

বাহ্য শোভা হিসাবে নবদ্বীপের এই টোলগুলিকে যে কোন সভ্যাগারের সঙ্গে তুলনা

করিলে ব্যাকুলতা হইবে। পূর্বকালে ঋষিরা আশ্রমবাসী ছিলেন, বৌদ্ধযুগে জ্ঞানী ও ভিক্ষু রাজপ্রাসাদবাসী এবং একালে জ্ঞানী চূড়ো পণ্ডিত কুটিরবাসী ব্রাহ্মণ কিন্তু যেখানে যেভাবে থাকুন না কেন, এই জ্ঞানিগণ ভারতের বিদ্যা ক্রমোন্নতির পথে চালাইয়া লইয়াছেন। দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ অথবা সুনির্মিত প্রস্তরের রাজপথ, যে দিক্ দিয়া ভারতী দেবীর রথ চলিয়াছে, তাহার অগ্রগতি থামে নাই, লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে নাই। নদীয়ার স্মৃতিকার বিপুল শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনা করিয়া যে মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাই এখন পর্যন্ত আমাদের সামাজিক জীবনের কাণ্ডারী। রঘুনন্দনের মধ্যাহ্নে সমস্ত যুক্তিশাস্ত্র ছিল। তিনি সময়োপযোগী যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, হয়ত তাহা এখন আর চলিবে না। সময়ের প্রয়োজন মানিয়া সেই বিপুলগ্রন্থ অচলায়তনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এক যুগে তাহার প্রয়োজন ছিল, এবং সেই সময়ের উহা যুগনির্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রে ঢাকার মসলিনের মত যে সূক্ষ্ম বুনট ফুটিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের চিরকালের বিস্ময়কীর্তি। এখন লোকে মনে করিতে পারেন এত সূক্ষ্ম চিন্তাশ্লেষণার প্রয়োজন কি? সে স্বতন্ত্র কথা। মানুষের চিন্তাশ্লেষণা শাণিত করিবার প্রয়োজন নাই যাঁহারা বলেন, এরূপ লোকদিগকে আমরা বলিতে পারি—মানুষ মারিবার অস্ত্রশস্ত্র বা এষ্টা শাণিত করিবার কি প্রয়োজন? কেবল অন্ন অধিকার বাড়াইবার যাঁহাদের প্রচেষ্টা এবং তদর্থে যাঁহারা বিজ্ঞানের তিন ভাগকে নিয়োজিত করিয়াছেন—তাঁহাদের মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলিবে না।

নবদ্বীপ টোলের গ্রন্থ কারণ

এই নবদ্বীপে বসিয়া যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম সূত্রে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকখানির আমরা নাম দিতেছি —

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
১। রঘুনাথ শিরোমণি	তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি
২। মথুরানাথ	তত্ত্বালোকরহস্য
৩। কৃষ্ণকান্ত	তত্ত্বদীপালী
৪। কণাদ তর্কবাগীশ	তত্ত্বটীকা
৫। ভবানন্দ	তত্ত্বালোকসারমঞ্জরী
৬। মহেশ ঠাকুর	তত্ত্বালোকদর্পণ
৭ মধুসূদন ঠাকুর	তত্ত্বালোক কণ্টকোদ্ধার
৮। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি	তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিব্যাখ্যা
৯। জগদীশ	তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটিপ্পনী
১১ গদাধর	তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটীকা
১০। ভবানন্দ	তত্ত্বচিন্তামণিমঞ্জরী
১২। মহাদেব পণ্ডিত	তত্ত্বভবানন্দী ব্যাখ্যা

	গ্রন্থকার			গ্রন্থ
১৩।	কালীশঙ্কর	...	...	তত্ত্বকালীশঙ্করীপত্রিকা
১৪।	চন্দ্রনারায়ণ	...	...	তত্ত্বশাক্তিপত্রিকা
১৫।	চন্দ্রনারায়ণ	...	...	তত্ত্বরৌদ্রীপত্রিকা

ইহা ছাড়া আরও বহু নৈয়ায়িক গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। নব্যন্যায়কে অনেকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যেহেতু অতি সূক্ষ্ম বিষয়কে আরও করা হইয়াছে "অন্ধের আধার ক্ষিতি", এই প্রবাদ প্রতিবাদীরা প্রমাণস্বরূপ করিতে চান। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নব্যন্যায়কে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ইউরোপীয় ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র দাঁড়াইতে পারে না, যেহেতু ইহা অতি বড় গ্রন্থ এবং ইহার প্রণালী এত জটিল এবং ভারগ্রস্ত, এবং তাহা এত দুরূহ যে ইহা বুঝা খুব শক্ত এবং জড়ভরতে ইহার উপকারিতা কিছুই নাই। যাঁহারা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ন্যায় বলেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে স্বীকার করেন যে তাঁহাদের বুদ্ধির পক্ষে অনুপযোগী।

কিন্তু যে বিদ্যার জন্য ৪ শত বৎসর বাঙ্গালী ভারতবর্ষের নেতা হইয়াছিলেন, নবদ্বীপ ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার্থীর তীর্থে পরিণত হইয়াছিল, যে ক্ষেত্রে বাঙ্গালী গর্ব করিয়াছিলেন গুরুর পর এবং অন্যান্য দেশবাসীরা শিষ্যের ন্যায় হইয়া তাঁহার পাদপীঠে বসিয়াছিলেন এবং যে বিদ্যার কৃতিত্বের জন্য বাঙ্গালাদেশের ঘরে ঘরে পণ্ডিতগণ ন্যায়পঞ্চানন, তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, ন্যায়বাগীশ, তর্কচঞ্চু, তর্কতীর্থ, ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়া চিন্তাপ্রসূতার এক অতীব দুর্গম ও জটিলপথে অন্যকে হাতে ধরিয়া দেখাইয়া ছিলেন সেই বিদ্যাকে বাঙ্গালীর এরূপ ফুঁকি মারিয়া এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে নদীয়ার টোলে যে সকল অধ্যাপক পড়াইতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কাউএল সাহেব সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। আমি তাহা হইতে এখানে কিছু সঙ্কলিত করিতেছি :—

অধ্যাপকদ্বয়।

"প্রায়ই নবদ্বীপের টোলগুলির শ্রেষ্ঠ বিষয় ছিল মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চিন্তামণি অবলম্বনে অধিকাংশ ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু চিন্তামণিকে আশ্রয়মাত্র করিয়া নবদ্বীপের কাণা শিরোমণি এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে চিন্তামণি কোথায় পড়িয়া রহিল ঠিকানা নাই, কাণা শিরোমণি মিথিলার গৌরবকে কাণা করিয়াছিলেন। তাঁহার দীধিতি নব্যন্যায়ের পত্তন করিয়াছে। চিন্তামণি চারিটি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু দীধিতিকার দুইটি মাত্র অধ্যায় লইয়া টীকা লিখিয়াছেন। রঘুনাথ চিন্তামণির নূতন টীকা করিয়াছিলেন, এবং দীধিতিকে তিনি নূতন ব্যাখ্যা দিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথের পরে ন্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়াছিলেন জগদীশ তর্কালঙ্কার তিনি এরূপ অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইয়াছেন যে অনেক সময়ে লোকে ন্যায়শাস্ত্রের অন্য নাম দিয়াছিল—

জগদীশ

'জাগদীশী' বেদান্ত পড়াইবার অধ্যাপক ছিলেন তখন শঙ্কর বাচীশ এবং গদাধর ভট্টাচার্য্য। স্মৃতিশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক ছিলেন রঘুনাথ বিদ্যাবাগীশ। ইঁহারা প্রত্যেকেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন এবং ইঁহাদের নাম শুনিলে সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিতসমাজ মাথা হেঁট করিতেন।" আমরা নবদ্বীপের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আশুতোষ কোন সুপণ্ডিত লোক স্থির করিয়া তাঁহারই হাতে এক একটি বিভাগের ভার ছাড়িয়া দিতেন। সর্ব্বশ্রী সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নব্যন্যায়ের তাদৃশ অধিকার না থাকাতে এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং চিন্তায় অভ্যস্ত জ্ঞান লাভ করিতে না পারায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার স্থান দিতে সাহসী হন নাই। এজন্য বাঙ্গলার সংস্কৃত বিভাগে বাঙ্গালীর অপূর্ণ কীর্ত্তি সংরক্ষিত হয়োছে। এই বিসদৃশ ঘটনা এক বাঙ্গলায়ই হইতে পারে, অন্য কোন দেশ এভাবে নিজস্ব নিধন করিয়া দেয় নাই।

নবদ্বীপের প্রাধান্য।

বৌদ্ধতন্ত্র হইতে যে কালী, তারা এমন কি সরস্বতীর পূজা বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমরা এই পুস্তকের ৮ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। যদিও সরস্বতী বৈদিক দেবতা তথাপি বাঙ্গালায় এই দেবীর পূজায় ইঁহাকে তন্ত্রোক্ত কালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং ইঁহাকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত শক্তি মূর্ত্তির অন্তর্গত করা হইয়াছে।

শুধু দেবপূজায় নহে বঙ্গদেশে শিক্ষাদীক্ষা-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান আছে। বাঙ্গলার নব্যন্যায়ে বৌদ্ধ ন্যায়দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। গৌতমপ্রমুখ ন্যায়দর্শনের প্রবর্ত্তকগণ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই স্বীকার করেন। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনায় শুষ্ক যুক্তির কতকটা স্থান আছে সত্য, কিন্তু তাহা তত্ত্ব নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে ইহাই যুক্তি দিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" সুবালোপনিষৎ কেবল তর্কযুক্তির নিন্দা করিয়াছেন। তর্ক বেদমূলক না হইলে হিন্দুদর্শন কেবল তর্কের নিন্দা করিয়াছেন। মহাভারতে কোন তার্কিক শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এরূপ লিখিত আছে, (শান্তিপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়।) মনুর প্রমাণও তর্ক অবলম্বন করিয়া যে ব্রাহ্মণ শ্রুতি স্মৃতি অগ্রাহ্য করেন, তিনি ব্রাহ্মণসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। (মনু ২।১১।)

বৌদ্ধেরা শ্রুতি-স্মৃতি স্বীকার করেন না সুতরাং তর্কবুদ্ধিই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। খ্রিষ্টিকে অনেক স্থলেই "তং কিস্স হেতু"—ইহার কারণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা দৃষ্ট হয়। স্বয়ং বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, "পণ্ডিতেরা যেরূপ সোণাকে আগুনে পোড়াইয়া নিকষ পাথরে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার কথাগুলিকেও সেইরূপ পরীক্ষা করিয়া লইও, কেবল আমার গৌরবরক্ষার জন্য গ্রহণ করিও না।" (তত্ত্ব সংগ্রহ, ৩২৮৮।) বৌদ্ধদিগের মতে আদ্যা বলিয়া কোন পূজ্য পদার্থ নাই। এইখানে হিন্দুদর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ ভাবের বিশেষ পার্থক্য, তাঁহাদের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও স্বয়ংবেদ্য, অপর জ্ঞাতার অপেক্ষা করে না। শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণের কেহ কেহ বলেন, প্রমাণ

নাই, প্রমেয় নাই, প্রমিতি নাই,' কেহ বলেন "অনাদিবাসনা বশতঃ জ্ঞান নানা আকারের হইয়া থাকে।" গৌতম তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ন্যায়শাস্ত্রে কেবলমাত্র প্রমাণ পদার্থকেই অবলম্বন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বাঙ্গলা নব্যন্যায়ে বৌদ্ধ ন্যায়দর্শনের মত এই প্রমাণকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিবাদের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাপ্তিবাদ গৌতমের ন্যায়দর্শনে নাই, অথচ বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তি-বাদের কথা অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন (ন্যায়বিন্দু ১।১২ ১।১২৭-২৮ ১৩৫-১৩৬)। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাঙ্গলার নব্যন্যায় বৌদ্ধন্যায়কে আশ্রয় করিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য যে কি ভাবে তর্ক করিতে হইবে তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাঁহারা তর্কের বিশুদ্ধতা লইয়া কুতর্কের কূটতা দেখাইয়াছেন, কোন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার লক্ষ্য তাঁহাদের নাই। এ সম্বন্ধে আমরা পরে পুনরায় লিখিব। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বলেন, 'আমাদের নিজের কোন পক্ষ নাই। বিপক্ষের স্বীকৃত প্রমাণাদির দ্বারা তাহাদের পক্ষের দোষ প্রদর্শন করাই আমাদের অভিপ্রেত।" দিঙ্‌নাগ বলেন, অনুমান—অনুপ্রেয়—ব্যবহারসম্বন্ধী সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে এই 'ধর্মধর্মি'সম্বন্ধ করিত। ইহার বস্তুতঃ থাকার কোন আবশ্যকতা নাই।"

যাঁহারা মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু ধর্মের প্রকৃতি অবগত নহেন। হিন্দুরা নূতন কোন ধর্মের সংস্পর্শে আসিলে সেই ধর্মের যেটা কিছু ভাল ও গ্রাহ্য তাহা গ্রহণ করিয়া আবর্জনাগুলি নিষ্কাশন করেন। যখন এই ভাবে সেই ধর্মের বল একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন পরধর্ম প্রাপ্ত তত্ত্বের দ্বারা স্বীয় ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া খ্রিষ্টের মত প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধর্মকে বিলয় করিয়া দেন, এইজন্য যুগে যুগে হিন্দুধর্ম নব কলেবর ধারণ করিয়া এই দেশে টিকিয়া আছে। যদু-প্রয়োগ দ্বারা ইহা হইতেছে। আশ্চর্যজনক প্রাচীন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ কতকটা গৌতমের পথেই চলিয়াছিলেন, দিঙ্‌নাগই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর বেশী জোর দিয়া অনেক স্থলে গৌতমের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দিঙ্‌নাগ ন্যায়শাস্ত্রের যুগপ্রবর্তক। পরবর্তী ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ মূলতঃ দিঙ্‌নাগকে অনুসরণ করিয়াছেন। আত্মার পৃথক্ সত্তা অস্বীকার করায় সকল বৌদ্ধ ন্যায় সাধারণের চক্ষে নাস্তিকবাদ নামে পরিচিত হইয়াছিল। শান্তি রক্ষিতের মতানুযায়ী শুধু তত্ত্বমূলক বৌদ্ধ ন্যায়ই বাঙ্গলার নব্য-ন্যায়ের কতকটা পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। শুভগুপ্ত, শান্তরক্ষিত প্রভৃতি কতিপয় সেই বৌদ্ধ নৈয়ায়িক বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত অপোহসিদ্ধি, ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, অন্যাপোহ নিরাকরণ, সামান্য দূষণদিক-প্রসাধিতা, অন্যাপোহ সমর্থন, এই ছয়খানি বৌদ্ধ ন্যায়-প্রকরণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। এশিয়াটিক সোসাইটীর ১০৭৪৬ সংখ্যক পুঁথি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর যে ভিত্তি পড়িয়া গিয়াছিল, হিন্দুর নব্যন্যায় সেই

ভিন্তি কতকটা আশ্রয় করিয়া স্বীয় বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা তুলনা করিয়া দেখার বিষয়। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ন্যায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গটি মূলতঃ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, পি আর এস, লিখিত 'বৌদ্ধন্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য

বাঙ্গলার গৌরব নব্যন্যায়। বাঙ্গালীর হৃদয়ের কোমলতা ও উচ্ছ্বাস আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখিতে পাই। এই জাতি ভাবের স্রোতে যেমনের মত আপনহারা হইয়া মজে—সে জাতি সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতাতেও এতটা কৃতকার্য্য, যে জগতে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একথা কোনরূপ অত্যুক্তি নহে।

বঙ্গবাসীর।

তর্ক-বিতর্ক হিন্দু চিরকাল অবলম্বন, উপনিষদের "বাক্যোবাক্য" ইহার প্রমাণ। ইতিহাসপূর্ব্ব সেই দূর যুগে হিন্দু দার্শনিকগণ তর্ক বিতর্কদ্বারা কোন সত্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তর্কের দুইটি প্রধান অঙ্গ। বিপক্ষস্থানে তর্ক বিতর্ক কিরূপে করিতে হইবে এবং কি প্রণালীতে সভাপতির কাছে যাইতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত আছে। এই প্রণালী নৈতিক হিসাবে খুব বিশুদ্ধ বা দোষশূন্য নহে। সভা বিজয়ার্থীর যে ভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতে হইবে, তাহাকে 'ফাঁকি' আখ্যায় অভিহিত করা যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তিগণ

চরক বলিয়াছেন, "প্রতিহন্যা মহতা সূত্রপাতেন", ইহার অর্থ যেখানে দেখিবে বিপক্ষীয় পণ্ডিত খুব বিদ্বান্ নহেন, তথায় "মহতা সূত্রপাতেন" অর্থাৎ আড়ম্বরময় বড় বড় শব্দ ও সূত্র আওড়াইয়া তাহাকে ভড়কাইয়া দিতে হইবে। যেখানে প্রতিপক্ষ বড় পণ্ডিত সেখানে পাণ্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করিও না, অন্য উপায়ে সভাস্থলে তাহার মন আকৃষ্ট করিয়া সে যাহাতে শক্তির খেই হারাইয়া ফেলে তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। চরক এইরূপ বহু উপদেশ দিয়াছেন, এগুলি ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়া শত্রুকে পরাজয় করার উপযোগী। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পালি "কথাবত্থু" গ্রন্থে এইরূপ তর্ক রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে গৌতম (অক্ষপাদ) ন্যায়দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে বাৎস্যায়ন (পক্ষিলস্বামী) গৌতমের পদে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করেন। চার্ব্বাক বহুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, যখন জগৎ মিথ্যা—তখন অনুমানাদি দ্বারা কোন ফল সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ তাহা একান্ত অনিশ্চিত, ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না—তাহা

অনুমানাদি দ্বারা আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা বৃথা। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগ অনুমানাদির বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করেন। সপ্তম শতাব্দীতে উদ্যোতকর বাৎস্যায়নকে সমর্থন করিয়া ও দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করিয়া তাঁহার বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। নবম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র সেই বার্ত্তিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া দিঙ্‌নাগের কথাবলম্বী ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকের মত খণ্ডন করেন। দশম শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি ও তাৎপর্য্য টীকাপরিশুদ্ধি দ্বারা পুনরায় বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, যখন মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের দ্বারদেশে ছিদ্র করিয়া বিলুপ্ত হইবার করিতেছিল, এবং কথঞ্চিৎ সাহায্যদিন ছোরির সহ জীবনমরণ সমস্যার সমাধান করিতেছিলেন, তখন 'তনক তনয়াকচাতলভূমা' মিথিলায় বসিয়া গঙ্গেশ শিরোমণি নিশ্চিন্তমনে তাঁহার তত্ত্ব চিন্তামণি রচনা করিতেছিলেন। তিনি গৌতমের ন্যায়দর্শন হইতে মাত্র চারটি বিষয় লইয়া বিচার করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ চিন্তামণি, অনুমান চিন্তামণি, উপমান চিন্তামণি ও শব্দ-চিন্তামণি। ইহার বিচার আর একখানি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল, এই পুস্তকের নাম "আকর"। আকর এখন লুপ্ত। বৌদ্ধগণ তখন নিরস্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং গঙ্গেশ প্রধানতঃ মীমাংসকগণেরই প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীহর্ষ নামক এক ব্যক্তি মীমাংসকগণকে সমর্থন করিয়া নৈয়ায়িক বিশেষ বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ সন্দর্ভ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, 'আকরে'র লেখক ও গঙ্গেশ শিরোমণি শ্রীহর্ষের প্রতিবাদ করেন।

এখন নব্যন্যায় বলিতে যাহা বুঝায় তাহার আদিগ্রন্থ চিন্তামণি। এই নব্যন্যায় কোন ফল লাভের উপায় প্রদর্শন করে না। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় ইহা ফলপ্রদ নহে। এই নব্যন্যায়কে কোন পাশ্চাত্য ভাষায় ইহা কোন বিশেষ শিক্ষা দান বা মস্তিষ্ক গঠন করে না, ইহা কেবল ছুরিকার ধার দেওয়া। নব্যন্যায় পাঠের ফল—যদি ইহাকে ফল বলা যায়—অধ্যয়নকারীর বুদ্ধি ক্রমশঃ মার্জ্জিত ও ধারাল করা। এই পুস্তকগুলি পাঠের পর দেখিতে পাইবেন, যে সকল মত বা কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া চিরকাল গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কোনকালে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, তাহা একান্ত কঠিন ও দুরূহ। ইহা সুগম করিতে চেষ্টা করিলে নব নব প্রশ্নের সৃষ্টি হইয়া পথকে পুনঃ পুনঃ দুর্গম করিয়া ফেলা হয়; পথিকের পথ এক্ষেত্রে অন্তরস্থ। এই অন্তরস্থ পথ পর্য্যটন করিয়া যাহা যখন ফিরিয়া আসিবেন তখন তাঁহার হস্ত রিক্ত, তিনি কিছুই দেওয়ার জন্য লইয়া আসিতেছেন একথা তিনি বলিতে পারিবেন না। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে তিনি প্রখর করিয়া আনিয়াছেন, শুধু এইটুকু তিনি বলিতে পারিবেন, যেখানটা একদিন কণ্টকের মত স্বচ্ছ মনে হইয়াছিল তাহা একেবারেই স্বচ্ছ নহে বরং তাহা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর আরো ময়লা কাটিয়া পরিষ্কার করিবার যোগ্য বলিয়া মনে হইবে। এই নব্যন্যায় কাহাকে শিক্ষা,—সত্য নিরূপণের জন্য অবাধ অনন্ত পথে চলা-ফেরা শিক্ষা।

নব্যন্যায়ের উদ্দেশ্য।

গঙ্গেশ শিরোমণি যে সূত্র একটিমাত্র ছত্রে করিয়াছেন, তাহার বিবৃতি রঘুনাথ এক সহস্র কি তদধিক ছত্রে করিয়াছেন। হয়ত, তাঁহার সূত্রের মধ্যে যে এত সূক্ষ্ম কথার অবকাশ ছিল, তাহা স্বয়ং গঙ্গেশ শিরোমণিও জানিতেন না। পরিভাষা না জানিলে এই সকল সূত্রের অর্থ করা বা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব।

চার্বাক অনুমানকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্যাবহারিক কারণে অনুমানের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহার উপাধি যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। রঘুনাথ তাঁহার দীধিতিতে কি করিয়াছেন তাহা এই একটি উদাহরণ দিয়া সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব, হয়ত এ চেষ্টা একান্তই বাতুলতা বলিয়া গণ্য হইবে। ধরুন "ঘটাভাব" কথাটায় বুঝা গেল, ঘটের অভাব। কিন্তু যে স্থান, বাক্তি বা অপর কিছু সম্বন্ধে এই কথাটা বলা হইল, তাহার হয়ত আরও দশ রকমের অভাব ছিল। সে স্থান বা সেই লোকের অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব এইরূপ শত রকমের অভাব ছিল। সে সকল না বুঝাইয়া শুধু নির্বচ্ছিন্ন ঘটের অভাবটি কি করিয়া বলিয়া বুঝান যায়? "ঘটাভাব বলিতে সহজ লোকে বুঝিতে পারে যে তাহার আর কোন অভাবই নাই, কেবলই ঘট নামক জিনিষটার অভাব। কিন্তু তাহাতো নহে, কি কথা বলিলে বুঝা যাইবে যে অন্য সমস্ত অভাবের কথা না বুঝাইয়া ঘটের অভাবকে শুধু বুঝাইবে। প্রথমতঃ ঘটাভাব কথাটা স্ফুট হইল না, সুতরাং আরও স্ফুট করিবার জন্য দ্বিতীয় সূত্রের স্থাপন হইল, তাহা—ঘট-নিরূপিত অভাব। তাহাতেও সন্দেহ রহিয়া গেল, তখন তৃতীয় ব্যাখ্যায় কথাটি দাঁড়াইল 'ঘটান্যপ্রতিযোগিতাকঃ অভাবঃ।'

চতুর্থ ব্যাখ্যায় কথাটি আরও পরিষ্কার করিবার চেষ্টা হইল, "ঘটত্বেতর নিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-নিরূপিতঃ যোঽভাবঃ" এইভাবে ক্রমশঃ টীকায় সূত্রটিকে স্পষ্ট করা হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, পারিভাষিক শব্দ উত্তমরূপে না জানা থাকিলে এই সূত্রগুলি বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। ধরুন ঘটের যদি গোলাকৃতি থাকে কিংবা যদি তাহা চোকোণ কি অষ্টকোণ হয়, উহার বর্ণ যদি রক্ত বা পীত হয়, উহার মধ্যে যদি কোন বস্তু বা আচ্ছাদন থাকে তবে এই সমস্ত উপাদান বাদ্যিরেকে শুধু ঘটের অভাব বুঝাইতে হইলে সংজ্ঞাটি কি হইবে? রঘুনাথের টীকায় এ যে জিনিষটা জলের মত সহজ বলিয়া প্রথম মনে হইতে ছিল, তাহা ক্রমশঃ জালের মত জটিল হইয়া পড়ে। কি করিয়া অতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় যে কথাটি বলা অভিপ্রেত, শুধু তাহাই বুঝাইতে পারা যায়—ব্যবহারে সেই কথাটি লিখিতে পারা যায়। অনুবীক্ষণ দিয়া জল দেখিলে যেরূপ আপাততঃ শূন্যবৎ পরিদৃশ্যমান জলে শত শত কীট দৃষ্ট হয় এবং তাহা অপেয় বলিয়া মনে হয়, সেই অনুবীক্ষণ যদি ক্রমশঃ সূক্ষ্মদর্শী হইয়া থাকে, তবে প্রথম যন্ত্রটি দ্বারা যে সকল কীট আবিষ্কৃত হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, দীধিতি সেইরূপ সংজ্ঞা বা শব্দের শুদ্ধি ও উপযোগিতা পরীক্ষার যন্ত্রবিশেষ। ইহা বিষয়ের জ্ঞান বাড়াইয়া দেয় না, ইহা

কেবল কথাগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উচ্চারিত করিতে কিছু দম লাগে। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে সুজাতা ভগবান বুদ্ধের জন্য যে চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার নির্মাণ-প্রণালী এইরূপ—একশত গাভীর দুধ একত্র করিয়া পঞ্চাশটি গাভী পুষ্ট করা—এই পঞ্চাশটির দুগ্ধ আবার পঁচিশটি গাভী এবং তাহাদের দুগ্ধ বাকী পাঁচটি গাভী, এবং তাহাদের দুধে যে দুইটি গাভী পুষ্ট হয়, সেই দুইটির দুধে চরু প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই চরু বহু শাস্ত্রীয় বাক্যযুক্তমন্ত্র ক্রমান্বয়ে দুগ্ধের সারাংশ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ধনাঢ্যবিলাসী সন্তুষ্ট পুরুষ একটি নাচে একটি চুল দেখিতে পাইলে তাঁহার ঘুম হয় না, রমণীবিলাসীর শয্যা অল্প অপেক্ষাকৃত শৈথিল্যদোষযুক্ত কয়েক মাস ছাড়িয়া থাকিলেন, এই হেতু তিনি পূর্ণ যোড়শ বর্ষবিলাসী হইলেও বহুবিলাসী পুরুষ অপেক্ষা ছাগদুগ্ধ পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সকল গল্প যখন দেশের লোকের মুখে মুখে ফিরিত, তখন সাহেব ঢাকা মসলিনের সূক্ষ্মতা বৈজ্ঞানিক করিবার যে সকল যুক্তি বিস্তৃত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাও এই সকল উপকথার মত কেবল একজনের একবার শুনিবার সামগ্রী। বুদ্ধির অভাবে এখন এই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাহেবের এরূপ অসারকে অনায়াসে বলা চলে বাঙ্গালী বুদ্ধিমান বলে, তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ দেখা যায় না। স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুমহাশয় একবার মহাত্মাদের সংকট পীড়িত হইয়াছিলেন, তখন একজন আত্মীয় ও একটি ইংরেজ ডাক্তার তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। কেহ কয়েক মাস কেহ বা এক বৎসর কাল ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সবশেষে একজন দেশীয় ডাক্তারের ব্যবস্থা দেওয়া হইলে আমরা শুনিয়াছি, তখন তাঁহাকে "অমুকের স্বল্প অম্ল" এই মাত্র প্রচার করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিল, ব্যবহারিক জীবনে এত সূক্ষ্ম তর্ক ও বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। বিদ্যুতের একতারে চড় খাইয়া অপর গাল ফিরাইয়া দেওয়ার নীতিরই বা ব্যবহারিক জীবনে কি প্রয়োজন আছে? মাধ্যাকর্ষণ, কেন্দ্রমুখ ও কেন্দ্র বহির্মুখ গতির তত্ত্ব জানিয়াই বা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়?

ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার প্রণালী।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গলার যে ন্যায়শাস্ত্র নবদ্বীপে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বুদ্ধিকে শাণিত করিবার পন্থা। কিন্তু ন্যায়ের উদ্দেশ্য পূর্বে অন্যরূপ ছিল। চিন্তামণিতে লিখিত আছে "অথ অপবর্গস্য তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"—যে ব্যক্তি দুঃখের আত্যন্তিক ভাবে নিবারণ করিতে চায়—সেই ব্যক্তি এই ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার যোগ্য। তিনি যেরূপ প্রমাণকার, এবং সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন তিনিই ন্যায়শাস্ত্রপাঠের যথা অধিকারী। অক্ষপাদ ঋষিগণ বলিয়াছেন "মিথ্যাজ্ঞানাধিকারোত্তর প্রবর্তনে কর্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মজ্ঞানে সা ন তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী ভবতি।" সুতরাং রঘুনাথের কিন্তু পূর্বেও ন্যায়শাস্ত্রের পঞ্চাবলম্বীরা মোক্ষ কামনা করিতেন। কিন্তু বাঙ্গলার মহাকবির গৌণাধিকারীর অধোগতি—এসম্বন্ধে নবদ্বীপের প্রেমিক শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র ঘোষ বলেন, "এই শাস্ত্রের যিনি গৌণাধিকারী হইবেন তাঁহাকে আর লোকান্তরে পথে মোক্ষকামী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইতে হইবে না। পরন্তু তিনি পুরাণাদিপ্রবর্তিত পথে "মোক্ষার্থী" হইয়া তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী,

অথবা ছাত্রবিদ্যাত্মমাত্র হইয়া, অথবা কেবল বুদ্ধিপরিমার্জনা কামনা করিয়া এই শাস্ত্রানুশীলনে বদ্ধপরিকর হইলেই তাঁহার এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারিবে। তাঁহার পক্ষে যে সব গুণগ্রাম একান্ত আবশ্যক তাহা—মন, বুদ্ধি, বিনয় সত্যানুরাগ সংযম, গুরুভক্তি ও নিষ্ঠা ইত্যাদি। যে সব গুণগ্রাম ছাত্রের এই শাস্ত্রানুশীলনে অন্তরায়, তাহা—ছলকপটতা, নানা বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্যাদানে ভিন্ন পাত্রে শব্দবিদ্যাদানের সম্বন্ধে অসাবধানতা কোন মতেই—আসক্তি (৮৭ পৃঃ)।" সুতরাং "মোক্ষার্থে" ভগবদ্ভক্তি কর্তব্য বলিয়া সর্বশেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে ধরা করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহা পূর্বসংস্কারের প্রতি দোষদৃষ্টি দেখাইবার জন্য মাত্র, নতুবা কোন ধর্ম পরোপকারবৃত্তি কিংবা লাভের আশা ত্যাগ করিতে বলে না। এই অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মনে করেন। ও রঘুনাথ "তর্কবাগীশের" "ব্যাপ্তিপঞ্চকের" সামান্য কয়েক ছত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া গিরীশ বিদ্যারত্নের ৬৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন, অথচ "ব্যাপ্তিপঞ্চক" যা ছাত্রের লোকের পক্ষে যেরূপ দুরূহ প্রায় তা ছাত্র করা যায়।

"পর্বতো বহ্নিমান" এই জ্ঞান সম্বন্ধে নৈয়ায়িকেরা আলোচনা করিয়া "ব্যাপ্তি" বুঝাইয়াছেন। ধূমের সহিত বহ্নির একটা সাহচর্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, রন্ধনশালা, চুল্লী বা যেখানে ধূম ও অগ্নি দেখিয়া যেখানে ধূম সেইখানেই বহ্নি আছে, এরূপ একটা অনুমান হয়। অগ্নির সহিত ধূমের এই যে সম্বন্ধ তাহাকে সম্বন্ধের নাম "ব্যাপ্তি"।

"পর্বতে বহ্নিমান"

সুতরাং যেখানে কোন ব্যক্তি ধূম ও বহ্নি দেখিয়াছে তাহা ছাড়া যদি অন্য কোন স্থানেও—যথা পর্বতেও—সে ধূম দেখে, তবে সে মনে মনে চিন্তা করিবে যে বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম তাহাতো এই পর্বতেও আছে, এই জ্ঞানে বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম দেখিয়া তাহার মনে যে আলোচনা হইবে—তাহার নাম "পরামর্শ"।

"পরামর্শের" পর 'পর্বতে বহ্নি আছে' "পর্বতো বহ্নিমান্"—তাহার এই ধারণা হইবে, ইহার নাম "অনুমিতি"।

সুতরাং যখন কোন "অনুমিতি" হয় তখন এই কয়েকটি প্রক্রিয়া মনোমধ্যে হইয়া থাকে :—

"কেন পর্বতটি বহ্নিমান?" এই প্রশ্নের উত্তরে সহজেই পূর্বদৃষ্ট কারণসম্বন্ধে চিন্তা উপস্থিত হইবে, যেহেতু ধূম আছে, বহ্নিও সেখানে থাকিবে—ইহাই "হেতুবাক্য।"

প্রথমতঃ পর্বতটি বহ্নিমান্, এই যে একটি বাক্য হইল—ইহার নাম "প্রতিজ্ঞাবাক্য"

দ্বিতীয় স্তরে কেন পর্বতটি বহ্নিমান, এই প্রশ্ন হইলেই ধূমের সহিত ইহার সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি স্মরণ করা হয়—এই অনুমিতির লিঙ্গ অর্থাৎ হেতুবাক্যকে "হেতুবাক্য" বলা হয়।

তৎপরে প্রশ্ন, ধূম আছে বলিলেই বহ্নি থাকিবে কেন? তখন যেখানে যেখানে ধূম, সেইখানে সেইখানেই বহ্নি, এই জ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়,—যেমন রান্নাঘর, "যো যো ধূমবান্, স স বহ্নিমান্, যথা মহানসম্।" এই হইল "উদাহরণবাক্য।" ন্যায়-মতেও ইহাই তৃতীয়বার চতুর্থ প্রশ্ন, বুঝিলাম, যেখানে ধূম থাকে সেইখানেই বহ্নি

থাকে, কিন্তু এখানে কি? এই প্রশ্নটি কিছুই নহে তবে কথাটা খুব পরিষ্কার করিবার জন্য বলিতে হয় "অয়মপি ঘটঃ" বলিলেই যেমন বক্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়—পদটিও সেইরূপ বাক্যসাহচর্য্যযুক্ত হইয়াছে। ইহার নাম "উপনয়বাক্য"। কথাটা একেবারে পরিষ্কার করিবার জন্য একটা 'সুতরাং' বাক্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। ধূম পর্ব্বতে আছে 'সুতরাং' পদের তাৎপর্য্য। ইহা "নিগমনবাক্য।" তাহা হইলে ন্যায়াবয়বের এই পঞ্চাঙ্গে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। রাজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"এখন এই পদার্থান্বয়ধি-প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপ্তির স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদের উক্ত 'ন্যায়ের' মধ্যে চতুর্থ ন্যায়াবয়ব 'উদাহরণ'বাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই উদাহরণবাক্যের মধ্যে 'যাহা ধূমবান্ তাহা বহ্নিযুক্ত,' ইহাই হইল ব্যাপ্তি'। এই 'ব্যাপ্তির' স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য উদাহরণবাক্যের মধ্যে রন্ধন-শালারূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত এবং ব্যাপ্তিসূত্রের সহচার-দর্শনটি বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের বিদিত হয় সুতরাং তদ্দর্শনের ব্যাপ্তিটিও উভয়বাদিসম্মত হয়। এই 'ব্যাপ্তির' সাহায্যেই 'এই পর্ব্বতটিও তদ্রূপ'—এই উপনয়রূপ চতুর্থ ন্যায়াবয়বটি রচিত হইয়া থাকে এবং এই অবয়বটি স্বার্থানুমানে কতক পরামর্শের' আকার-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবশ্য এস্থলে ব্যাপ্তিটিও উদাহরণটি উভয়বাদিসম্মত হওয়ায় পরামর্শঘটিত ঐ উপনয় বাক্যটিও উভয়বাদিসম্মত হয় এবং উপনয় বাক্যটি উভয়বাদি-সম্মত হওয়ায় নিগমনটিও সুতরাং উভয়বাদিসম্মত হয় আর তজ্জন্য বক্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতা পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি করিতে বাধ্য হয়।" ২১ পৃঃ

কিন্তু ন্যায়াবয়বের সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র মত নহে। বৌদ্ধমতে ন্যায়াবয়ব মাত্র দুইটি—'উদাহরণ' ও 'উপনয়', মীমাংসকমতে তিনটি—'প্রতিজ্ঞা,' 'হেতু' ও 'উদাহরণ'। জৈনমতে 'প্রতিজ্ঞা', 'হেতু' ও 'উদাহরণ'। মহর্ষি বাৎস্যায়নের মতে দশটি—জিজ্ঞাসা, সংশয় শক্য-প্রাপ্তি প্রয়োজন, সংশয়ব্যুদাস, প্রাতিজ্ঞ হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন।

এই ইতিহাসে ন্যায়ের তত্ত্ববাখ্যা করিবার অবকাশ নাই। ন্যায়াগমে মাকড়শার যাওড়ার মত একটির পর একটি করিয়া এরূপ জাল প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা একেবারেই অনধিগম্য। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় ন্যায়াগম সম্বন্ধে ইংরেজীতে যে কয় পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই শাস্ত্রের মর্ম্মকথা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। রাজেন্দ্রবাবুর পুস্তকের মত তাহাও বাহিরের লোকের পক্ষে দুর্ব্বোধ। আমরা এ সম্বন্ধে অনধিকারী, সুতরাং তাঁহার পুস্তকখানি হইতে একটা উদাহরণ দিয়া ইহার জটিলতা প্রমাণপূর্ব্বক ন্যায়াগমের ইতিহাসাংশের পুনশ্চ অবতারণা করিব।

"পুস্তকের জ্ঞান" (The place with a book) বাক্যে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথমতঃ পুস্তকসম্বন্ধে "প্রকারতাবচ্ছেদক" দ্বিতীয় "সমবায়", তৃতীয় "সাংসর্গিক", চতুর্থ "অবচ্ছেদক", পঞ্চম "প্রকারতাবচ্ছেদকতাশ্রয়াবিধেয়তা"—ইহার প্রত্যেকটি বুঝাইতে অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

যে 'তত্ত্বচিন্তামণি' ন্যায়শাস্ত্রে চিন্তাশীলতার একটি নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে সেই অপরাজেয় গ্রন্থের লেখকের নাম গঙ্গেশ শিরোমণি। কেহ কেহ তাঁহাকে গঙ্গেশ্বর শিরোমণি নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহার জন্মস্থান বাঙ্গলাদেশ বলিয়া কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন বিশ্বকোষে গঙ্গেশের বাড়ী বাঙ্গলাদেশ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ মতাবলম্বী প্রবন্ধে আরও অনেকে আছেন কিন্তু আমাদের মনে হয় মিথিলাই তাঁহার জন্মস্থান। মিথিলাবাসীরা দারভাঙ্গার নিকটবর্ত্তী "রোসড়া" পোষ্ট আফিসের অধীন "করিয়ন" নামক গ্রাম গঙ্গেশের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এ বিষয়টি লইয়া এখনও কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

গঙ্গেশ যেখানেই জন্মিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিষয় নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

গঙ্গেশ শিরোমণি।

তৎসম্বন্ধে কয়েকটি সঙ্গত কথা।

১ম—তিনি অল্পবয়সে পিতৃহারা হইয়া মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

২য়—তাঁহার মাতুল একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন

৩য়—গঙ্গেশের কর্ম্মজীবন মিথিলাতেই অতিবাহিত হয়, তথায় তাঁহার টোল ছিল।

৪র্থ—'ন্যায়-লীলাবতী'র "প্রকাশ" নামক টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান গঙ্গেশের পুত্র ছিলেন। ইনি উক্ত টীকার প্রারম্ভ বাক্যে লিখিয়াছেন

"ন্যায়ালোকপ্রকাশায় সংসারোপারসূরয়ে।
গঙ্গেশায় গুরবে পিতেঽত্যন্তভক্তয়ে নমঃ॥"

ইনি "গঙ্গেশ" নাম না লিখিয়া সর্ব্বত্রই "গঙ্গেশ" নাম লিখিয়াছেন, "ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়-তনূজ-মহোপাধ্যায় শ্রীবর্দ্ধমান বিরচিতে ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশে ... চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ, শুভমস্তু ম সং ৩৫৪ আশ্বিন।"

৫ম—গঙ্গেশের পৌত্র, বর্দ্ধমানের পুত্র, রত্নপতি 'চিন্তামণির' "প্রভা" নামক টীকা প্রণয়ন করেন।

৬ষ্ঠ—গঙ্গেশ হইতে পঞ্চমস্থানীয় পক্ষধর ১২২৮ খৃঃ অব্দে একখানি পুস্তক নকল করেন এবং সপ্তমস্থানীয় রুচিদত্ত ১২৭০ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন দশমস্থানীয় শঙ্কর মিশ্র ১৪১২ খৃঃ অব্দে তদীয় কোন কোন গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন।

তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ

রাজেন্দ্রবাবু অনেক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গঙ্গেশ ১১৫০ খৃঃ অব্দের পরবর্ত্তী, সেই সকল প্রমাণ আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন কথিত আছে, তিনি প্রথম যৌবনে একটি মূর্খ ছিলেন, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে দৈবকৃপা লাভ করিয়া শেষে সেই পণ্ডিত হইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। "চিন্তামণিব্যবিলোচনেন। সিদ্ধান্তশিক্ষাগুরুঃ গঙ্গেশস্তনুভূতে মিথেন রচনা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিম্", এই "দিব্যাবিলোচনেন" কথাটির দ্বারা দৈবানুকম্পা সূচিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে

করিয়াছেন। চিন্তামণির মত এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সেই যুগে আর রচিত হয় নাই। ইহার বহু টীকা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য একদিকে ভারতের নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ মিথিলায় সমবেত হইত। চিন্তামণি পাণ্ডিত্যের খনিস্বরূপ। উহাতে প্রাচীন ন্যায়ের কত যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা ও আলোচনা করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বৈশেষিক, বৈয়াকরণিক তার্কিক শিরোমণি, গৌতম নৈয়ায়িক সিংহনাদ। আনন্দ তর্কী ও অমরচন্দ্র তর্কী-কৃত্যকু, হরিদাস মিশ্র, শঙ্কর, মথুরানাথ তর্কবাগীশের পঙ্‌ক্তি নৈয়ায়িকদের মতের আলোচনা এই পুস্তকখানিতে আছে। গ্রন্থের শেষে

"নত্বিং নাম কোঽয়ং ? কিমর্থমি কোঽয়ম্ ? যদি বাপি কোঽয়ং মম নতি তত্ত্বম্।
অপি চ সোঽয়ং নাম কুতোঽয়ম্, ভবতি ভবত্তাপ সমাপ্ত কোঽয়ম্॥"

এই শ্লোকটি যে কাহারও কোন গ্রন্থ, তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, সেইজন্য জন-প্রবাদে এর কোনটি উদ্ধৃতির শেষও আলোচনা করা হইয়াছে।

রঘুনাথ শিরোমণি

রঘুনাথ [illegible] কারণে গদাধর গোবিন্দ চক্রবর্তী ইঁহার [illegible] মাতার নাম সর্বজয়া। রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর রঘুপতি রাজা সুবর্ণময় নামের একটি সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এই বিবাহ [illegible] অনুমোদিত ছিল না। [illegible] হইয়া শ্রীহট্ট হইতে পুরুষ নিঃস্ব অবস্থায় ফিরিয়া পুত্র রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাসুদেব নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেকে বলেন এই বাসুদেবই সুবিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌম। নানা কারণে আমরা এই মত সম্পূর্ণ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারি নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যে, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য সম্বন্ধে সকল পুঁথি চরিতাখ্যানে কোথাও রঘুনাথ শিরোমণির নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাসুদেব সার্বভৌম-সম্পর্কে নানা কাহিনী বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার কোনটিতে প্রাসঙ্গিক ভাবে রঘুনাথের সঙ্গে সার্বভৌমের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। রঘুনাথ শিরোমণি সাময়িক নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষভাবে স্থান লইলেও বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারে নীরব এতদ্দ্বারা সহজেই মনে হয় তিনি বৈষ্ণব ছিলেন কিংবা বাসুদেব সার্বভৌমের কেহ ছিলেন না।

যে বাসুদেব মিথিলা হইতে 'চিন্তামণি'গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া মিথিলার ভারতী মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, সে বাসুদেব বৈষ্ণব ইতিহাসের বাসুদেব সার্বভৌম নহেন। কথিত আছে বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু ছিলেন, এ

কথাটিও সর্ব্বত্র মহা বেদান্তবিদের নিকটেই পড়িয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে কোথাও এমন নাই যে চৈতন্যদেব শৈশবে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতই একমাত্র প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহাতে বাসুদেব-চৈতন্যমিলনের যে আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে, তার বলে এরূপ জনশ্রুতির প্রতিবাদ অবিলম্বে গ্রহণ করা যায়। বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রথম চৈতন্যদেবকে দিনিতে পারেন নাই, তারপর যখন শুনিলেন, ইনি অপরাপর বিদ্বেষের পত্র ও নবদ্বীপের চক্রবর্ত্তী সেখিত—তখন পরিচয় পাইয়া তিনি চিনিতে পারিলেন। তবে এই সময়ে তাঁহাদের কোন একজন, অথবা উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে কেহ একবারও বলেন নাই যে ইহারা বাসুদেবের ছাত্রপূর্ব্ব ছাত্র। এদিকে অন্যান্য পণ্ডিত কয়েকজন লেখক চৈতন্যদেবের শিক্ষক কে কে ছিলেন, তাহা পরবর্ত্তে কালে উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপে তিনি তিনজন শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুদাস পণ্ডিত, গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী ও গঙ্গাদাস পণ্ডিত। ইহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নাম নাই।

চৈতন্যদেবের শিক্ষক নহেন।

সুতরাং চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি দুজনেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট পড়িয়াছিলেন, একথা আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করিনা। রঘুনাথ অবশ্য বাসুদেবের ছাত্র, কিন্তু সে বাসুদেব বৈষ্ণবদের বাসুদেব সার্ব্বভৌম নহেন।

কথিত আছে বাসুদেবের পণ্ডিতত্বের খ্যাতি শুনিয়া রঘুনাথ তাঁহার নিকট পড়িতে আসেন। কিন্তু বাসুদেব বালক রঘুনাথের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা পরিচয় পাইয়া তাহার আত্মাভিমানে আঘাত করিবার জন্য পড়াইতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যখন পণ্ডিত মহাশয় শিশুকে ক, খ, গ, ঘ পড়াইতে সুরু করেন, সেই দিনই বালক তাঁহাকে প্রশ্ন করে, 'ক' আগে না হইয়া 'খ' আগে হইল কেন? পক্ষমবর্ষীয় বালক এইভাবে ক্রমাগত তাঁহাকে এরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল যে বাসুদেব বুঝিলেন এই বালক কালে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হইবেন। একদা বালককে এক বিদুষী স্ত্রীলোকের জন্য আসন আনিতে বলিলে তাহার মাতা রাগ করিতেছিলেন, তিনি বলেন "আসন কিসে নিবি?" বালক হাতের তেলোতে কয়েকটী ফুল রাখিয়া বলিল, "এইবার গাছের মাটীর উপর আসন হবে।" একদিন বাসুদেব বালক রঘুনাথকে পূজার জন্য কিছু ফুল চয়ন করিয়া আনিতে বলিলেন। রঘুনাথ ছাত্র করিয়া ফুল আনিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "ছাতে করিয়া কি ফুল আনিতে হয়? ইহাতে কি পূজা হয়?" রঘুনাথ উপরকার ফুলগুলি পণ্ডিত মহাশয়কে তাহার সম্মুখে ধুইয়া লইতে বলিল, যেহেতু নীচের ফুলগুলি তাহার স্পর্শদোষদুষ্ট কিন্তু উপরকার ফুলগুলি ঐ ফুলের উপরই ছিল—সেগুলির পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয় উপরকার ফুলগুলি গ্রহণ করিলে রঘুনাথ নীচের ফুলগুলি

রঘুনাথের বাল্যকীর্ত্তি 'খ' আগে না হইয়া 'ক' আগে হইল কেন?

হাত হইতে ফেলিয়া দিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতেন।

কথিত আছে নবদ্বীপে রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সহিত ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের লিখিত একখানি ন্যায়ের পুথি দেখিয়া একান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইব এই উচ্চাশা মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তোমার লিপিকুশলতা ও ন্যায়ে অধিকার দেখিয়া আমার সে আশা নির্মূল হইল।" "একপ অসার নিয়ার চঞ্চল আমার কোন প্রয়োজন হইবে না", এই বলিয়া চৈতন্যদেব সেই পুথি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া রঘুনাথকে আশ্বস্ত করিলেন, "তুমি অনায়াসে ন্যায়ের চর্চা কর, আমি তোমার পথে কাঁটা দিব না।" আর একদিন রঘুনাথ কোন দুরূহ ন্যায়ের প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিতেছিলেন, চৈতন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত 'নাস্তিত্বাদ' ক' চড়া করেছ?" রঘুনাথ সেই প্রশ্নটি বলিলে চৈতন্য তৎক্ষণাৎ তাহার ঠিক উত্তরটি বলিয়া দিলেন। এবার তিনি কয়দিন চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তাহার সমাধান করিতে চৈতন্য মুহূর্তকাল সময় লইলেন না। রঘুনাথ এবারও বিস্মিত হইলেন।

চৈতন্যদেবের সঙ্গে রঘুনাথের গল্প

এই গল্পগুলির কোনটিই কোন ভিত্তি আছে কিনা আমার মনে হয় না। রঘুনাথ নবদ্বীপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে চৈতন্যের দেখা থাকিলে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপুর, বাসুদেব ঘোষ, লোচন দাস, গোবিন্দ কর্মকার প্রভৃতি সমকালের কেহ না কেহ এই ঘটনার অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। এমন কি মুরারি গুপ্তের মত চৈতন্যবিরোধী গ্রন্থকার অথবা কবিকর্ণপুরের মত ঈষদ্ভ্রুকার অবশ্য সে কথা অন্যত্র, তাঁহারা সকলেই ঘটনাটি জানিতেন—কিন্তু কেহই এ বিষয়ে কিছু লেখেন নাই। একমাত্র ঈশান নাগর তাঁহার অদ্বৈতপ্রকাশে চৈতন্যের ন্যায়ের পুঁথি ও তাঁহার এক নৈয়ায়িক সহাধ্যায়ের ঘটনাটি বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সহাধ্যায়ীর নাম পর্যন্ত তিনি করেন নাই। রঘুনাথ শিরোমণি এই সহাধ্যায়ী হইলে ঈশান নাগর নিশ্চয়ই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। ঈশানের জীবন প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপক ছিল, এবং এই সুদীর্ঘকালের অধিকাংশটা তিনি নবদ্বীপে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সহিত একই পল্লীতে যে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত বাস করিতেন, চৈতন্যের সহাধ্যায়ী সেই রঘুনাথ হইলে ঈশান অবশ্যই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন।

সুতরাং গল্পগুলি আমাদের কাছে একান্তই অসার বলিয়া বোধ হয়। শিশির ঘোষ মহাশয় ঈশান নাগরের গ্রন্থে "জনৈক ন্যায়ের পড়ুয়া" এই পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রঘুনাথ সাব্যস্ত করিয়া তদীয় 'অমিয় নিমাই চরিতে' কথাটি লিখিয়াছিলেন,—তদবধি জনশ্রুতিটি প্রবল হইয়াছে।

কিন্তু রঘুনাথ যে কাণা অর্থাৎ একচক্ষুর্হীন ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। কাণা শিরোমণি 'কাণা শিরোমণি' বলিতে রঘুনাথকেই বুঝায় এবং এই কাণার নামে কতকগুলি পদ্য আমরা বৈশবে শুনিয়াছি, সেই কবিতাগুলি রঘুনাথকেই উদ্দিষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে।

নবদ্বীপে পাঠ সমাপ্ত করিয়া রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের কাছে পড়িতে উৎসুক হইয়া মিথিলায় গমন করেন। সেখানে নাকি পক্ষধরের এক ছাত্র তাঁহাকে উপহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —

"কে, ত্বমেককলোচনঃ ?" "আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্ধঃ পিঙ্গলকঃ, সর্পে কো ভবানেককলোচনঃ॥"

রঘুনাথের উত্তর, —

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
গুরুং যে লাঘবে, শাস্ত্রে ত্বাদৃশ একলোচন.

কথিত আছে পক্ষধর মিশ্রের টোলে গুরুশুশ্রূষকদের জন্য সাতখানি ছিল। একাদশশ্রেণীর ছাত্রগণ মঞ্চের সর্ব্বনিম্ন স্থানে বসিতে করিতেন ক্রমে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতর আসন নিয়োজিত ছিল। সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে পক্ষধর স্বয়ং বসিয়াই ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন এবং গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। নূতন কোন ছাত্র আসিলে তাঁহাকে মঞ্চের সর্ব্বনিম্ন স্থানে প্রবেশ করিয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হইত।

রঘুনাথ রীতি অনুসারে সর্ব্বনিম্ন স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই নবদ্বীপে পাঠ সমাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং মিথিলার প্রধান ছাত্র বেশী বাক্য ব্যয় না করিয়া তাঁহাকে অত্যুচ্চতর স্থানে বসাইয়া দিলেন। এইরূপভাবে ক্রমে উচ্চ সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি একেবারে পক্ষধরের সঙ্গে সমারূঢ় হইলেন। অনতিবিলম্বে একবারে প্রধিষ্ঠণণ্য অধ্যাপকের নিকটে পড়িবার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া ছাত্রমণ্ডলী বিস্মিত এবং ঈর্ষাতুর হইল। তাহারা সুযোগ পাইলেই নানারূপ বিদ্রূপ ও শ্লেষোক্তি করিত।

রঘুনাথের সঙ্গে আর দুইজন ছাত্র এক সময়েই মিথিলায় পাঠ সমাপনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, রঘুনাথ তিনজনেরই পরিচয় এক শ্লোকে দিয়াছিলেন —

"কৃষ্ণঃ পক্ষধরো দ্বীপে নবদ্বীপে নিবাসিনঃ,
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত শিরোমণ্যভিধাঃ ত্রয়ঃ॥

পক্ষধরের সঙ্গে শিরোমণির শ্লোক-যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট কবিতা আছে, উদ্ভট-গুরু পূর্ণচন্দ্র যে তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি, বলা শক্ত।

কাঁসাড় আছে পক্ষধর মিশ্র একবার স্বীয় মত খণ্ডন করিতে রুদ্ধ হইয়া নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :—

বক্ষোরুকণ্ঠনয়নে করপল্লবাগ্রে স্পৃষ্টিং
সাম্বমদর্শয়ত যঃ সকলাদ্রিবন্দ্যঃ

কাশীতে ছাঁড়বার পরে পক্ষধর, তাঁহার উত্তরে বলিলেন,

রঘুনাথের জবাব

"যে কৃষ্ণং কমলাকুচাম্বুজযুগং যস্য ধ্যানং শ্রিতে ধ্যাতং।
তমেবাধ্যাপকং বন্দে জগদ্গুরুং নাম-ধারিণঃ॥"

কিন্তু বয়সের কালে রঘুনাথ তর্কশিরোমণি পক্ষধরের চেলে পড়াইতেছিলেন। গুরু-শিষ্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন হয়, ইহাদের মধ্যেও তেমনি একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেক লোকের ধারণা যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নব্যন্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহার একটি মাত্র কারণ বলা হইবে ভগবান্ রঘুনাথকে মনে মনে গুরুর পদে বরণ করিয়াছিলেন, এবং এই সূত্রেই তাঁহাকে শিষ্য করিয়াছিলেন।

প্রবাদ এই যে, পক্ষধর মিশ্র রঘুনাথের মস্তক প্রসূত গ্রন্থ পাঠ করিয়াই পরিচয় পরীক্ষা করিতে বসিলেন। তখনই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। এ সম্বন্ধে নানা উপকথা আছে, এমন কি রঘুনাথ নাকি এক সময়ে গুরু-পত্নীর ইচ্ছাও পোষণ করিয়াছিলেন।

যে প্রকারই হউক, ইহার পর রঘুনাথের সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহার লেখা নিমন্ত্রণ ছিল, সেহেতু তাহা কাহারও পক্ষে কোন বিশেষ ছাত্র নকল করা সম্ভবপর হইত না। যে কারণেই হউক রঘুনাথ যেদিন নবদ্বীপে তাঁহার চতুষ্পাঠীর টোল খুলিলেন, সেই দিন হইতে মিথিলার কথা অস্তমিত হইল, নবদ্বীপের চেলে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মদ্র ও তামিল দেশের ছাত্রেরা পড়িতে আসিতে লাগিল। তাঁর চেলে যারা ছিলেন—সেই টোলগুলি অল্পদিনের মধ্যে শত শত ছাত্রের গুঞ্জনে একপ কোলাহলময় হইয়া উঠিল এবং তাহাদের পরিভাষা-দুর্বোধ্য সকলকে এমনভাবে নকলের হইতে আসিল যে লোকে সেই টোলের নাম দিল "ছ'শ'র গোয়াল।"

রঘুনাথের জীবনের অনেক কথাই উদ্ভট কবিতায় আছে, তাহার কতটা লেখকদের কল্পনাপ্রসূত এবং কতটা ইতিহাসের স্থান পাইবার যোগ্য তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কথিত আছে, নবদ্বীপে ফিরিয়া আসার পর, তাঁহার পূর্ব গুরু বাসুদেব তাঁহাকে একটি কবিতাদ্বারা প্রশ্ন করিলেন :—

"অস্তি দিবসস্তবৈষাঃ পক্ষিনীসঙ্গমি ক্ষম
ধৃত নমু নিশাকরঃ কৈরবিণাং রহস্যম্।
কথয় কথয় ক্ষুদ্র! পক্ষভাবেন তাবৎ
কিমধিকসুখমেষাঞ্চক্রবাকস্য বা তত্র বেত্তি॥"

মাতৃকিনী পদ্মিনীর মধ্যে কণ্টাইয়া মাতৃকিনী কুমুদিনী মন্দের অতিবাহিত করিয়া আসিলে, হে অলি তুমি ঠিক বল দেখি কোথায় বেশী সুখী হইয়াছিলে? এস্থলে বাসুদেব নিজেকে দিয়া এবং পদ্মধরকে নায়ক কল্পনা করিয়া কোন্ নায়ক বেশী সুখী হইয়াছেন, এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। রঘুনাথের শ্লোক —

"যঃ পীনস্তনমণ্ডলে তরুণয়া গাঢ়ং পরাশ্লেষিতঃ
যামুদ্দাম রতপ্রসাদমদিরা সম্মীলিতাক্ষ্যা চ সঃ।
কিঞ্চেকস্তদপরস্তয়া কমলয়া নো বেত্তি কুপ্যন্নসি,
দ্বঃ কান্তাধরপল্লবস্য মধুমা আস্বাদ্য কুত্রাপি স.॥"

এতদ্ব্যতীত রঘুনাথের পদ্মধরের প্রশ্নই পদ্মপাদ্য হইয়াছে। ত্রয়োদশ চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে বাংলা এই যৌনভাব পূর্ণ শ্লোকের সমাদর, কিন্তু এমন কি ব্রজবুলির মধ্যেও কোথাও রূপকচ্ছলে কোথাও সম্ভোগ ভঙ্গীতে এমন শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছে। এই যৌনভাব জয়দেবের কবিতায় ও উৎপ্রেক্ষা এবং বক্রোক্তি সহকারে কিন্তু যথেষ্ট সংযম ও ভদ্রতার আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত এই সকল কাব্যের বিষয় কিছু শুদ্ধ বা মন্দ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

রঘুনাথ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—সংস্কৃতসূত্রবৃত্তি, পদার্থ-খণ্ডন, আত্মতত্ত্ব-বিবেকটীকা, ন্যায়াগমোদ্ধার, ন্যায়বিজয়, অখণ্ডার্থবাদ, মৃৎপিণ্ডবাদ, লীলাবতী-টীকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-টীকা, গুণকিরণাবলী-প্রকাশ-দীধিতি, ন্যায়লীলাবতী-বিবৃতি, মুক্তিবাদ-বিচার, বাদিচূড়ামণি-বিবেক। এ সকল পুস্তকের অনেকগুলিই এখন পাওয়া যায় না। রঘুনাথের রামভদ্র নামক এক পুত্রের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি।

বৈদিক-সংবাদিনীর মত গ্রহণ করিয়া অচ্যুতরায় বলেন, রঘুনাথ ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহাকে চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ণ প্রমাণ করিবার চেষ্টা এই সময়-নির্দ্ধারণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে কি না বলা যায় না। • রঘুনাথের ছাত্র সুবিখ্যাত

• এই প্রবন্ধ লেখার পর লেখক রঘুনাথের বাসস্থান নবদ্বীপ এই মত সমর্থন করিয়া কয়েকটি লেখক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। বৃহত্তরে আমরা শ্রীহট্টের রঘুনাথ শিরোমণির 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত (৩য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহের প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মহাপ্রভু রঘুনাথের সমসাময়িক বা সতীর্থ এই মত প্রমাণাভাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সমস্ত মহাপ্রভু বা বাসুদেবের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন নাই, কেবল প্রামাণিক সাহিত্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, মহাপ্রভুর সঙ্গে নৈয়ায়িক রঘুনাথের কোন সম্বন্ধ কোথাও দৃষ্ট হয় না। নবদ্বীপে কয়েকজন রঘুনাথ ছিলেন, রঘুনাথ শিরোমণি ইঁহাদের কাহার ছাত্র, তাহাও প্রমাণিত হয় নাই, এই অবস্থায় প্রতিবাদ-প্রবন্ধগুলির যুক্তিগুলি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, সুতরাং আমাদের লেখা পরিবর্তনের মুহূর্ত এখনও উপস্থিত হয় নাই।

মথুরানাথের (নবদ্বীপবাসী শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র) যতগুলি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে—তাহাদের কোনটির লিখন কালই ১৫৫০ খৃঃ অব্দের পরবর্তী নহে। মথুরানাথ রঘুনাথের বৃদ্ধ বয়সের ছাত্র, এবং এই ১৫৫০ খৃঃ অব্দের কিছুদিন পূর্বের সময় নহে। সুতরাং অচ্যুতবাবু রঘুনাথের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা প্রায় ঠিক বলিয়া ধরা যায়। অপর কোন নিশ্চয় প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা অনুমান করেন যে তাঁহারা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। নবদ্বীপের অপরাপর নৈয়ায়িকের নামও আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি

মুসলমান অধিকার যেরূপ ফলফুল ফলিয়া লোকচক্ষুর আলোচনার বিলীন হয়, বাঙ্গালাদেশে কত যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহার ইতিহাসের অজ্ঞাতসারে ধরাধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কে তাহার ঠিক করে? এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে ঘরে কত যে সংস্কৃত পুঁথি পূর্ব্বপুরুষের হাতের কীর্ত্তি, অগ্নি, জলপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস পাইতেছে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় কোন পণ্ডিতের অকৃতীবংশধরগণ তাঁহার নিকটবর্ত্তী মুদীখানার বিক্রয়ের নিমিত্ত পিতৃধন হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, কোথাও বা অজ্ঞাতের দায়ে কোন বাবুসাহেব পরলোক গমনের বিলম্বের মেথরওয়ালার নিকট কিছু নগদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটি এই সমস্ত পুঁথির সংগ্রহের একাংশও পান নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বে কত কতকটা আমরা করিয়া ছিল,—এমন অপরাধে ও পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের যত্ন ও সংগ্রহের অভাবে কত কতকটা তথ্য বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছে। কত পুঁথি যে ধ্বংস পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহা নির্ণয় হয় নাই, এখনও কত যে আছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। এই সকল পুঁথির মধ্যে অপরিচিত পুস্তক যথেষ্ট আছে; উদ্ধৃ, আরবী ও পার্শী পুঁথিগুলির দুর্ঘটনা হইতেছে। কত লক্ষ টাকা বৎসর বৎসর আমাদের বড় বাদসাহেরা বাজে খরচ করিতেছেন, একটি লক্ষ টাকা এতদর্থে ব্যয়িত হইলে এখনও বঙ্গদেশের অনেক গৌরবের জিনিষ, অনেক হারানো রত্নের উদ্ধার হইতে পারে

গুপ্ত ও পাল রাজাদের সময়কার অনেক তাম্রপট্টই বাঙ্গালা পণ্ডিতের লেখা। সেন-রাজার কালের তাম্র বড় আড়ম্বরপূর্ণ গৌড়ীয় রীতিতে রচিত। ত্রিলোচনবৃদ্ধি বামন জয়াদিত্য রচিত কাশিকাবৃত্তির "ন্যাস" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মধ্যে ত্রিলোচনবৃদ্ধি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই টীকার হস্তলিখিত পুঁথির অধিকাংশই বঙ্গদেশে—বিশেষতঃ, রাজসাহী জেলাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 'ন্যাসের' টীকাকারগণের প্রায় সমস্তই বঙ্গদেশবাসী। ত্রিলোচনবৃদ্ধিকে সাঙ্গবার বৈয়াকরণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে

একাদশ শতাব্দীতে রক্ষিত মৈত্রেয় "ধাতুপ্রদীপ" নামক পাণিনির ধাতুপাঠের টীকা প্রণয়ন করেন। 'মৈত্রেয়' উণাদি বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কাহারও লেখা যায় না রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি 'ধাতু-প্রদীপ' প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের প্রসিদ্ধ সভাকবি শরণদেব পাণিনির ব্যাকরণ অবলম্বন পূর্ব্বক "দুর্ঘটবৃত্তি" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন এবং এই সময়েই বাঙ্গলার

শরণের দুর্ঘটবৃত্তি।

অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম ভাষাবৃত্তি নামক টীকা রচনা করেন; এই পুস্তকে বৈদিক ভাষার আলোচনা নাই, ইহা পাঠ করিলে কাশিকা ও ভাগবৃত্তির সিদ্ধান্তগুলি অতি সরলরূপে বুঝিতে পারা যায়। পুরুষোত্তম স্বয়ং বলিয়াছেন "কাশিকা ভাগবৃত্তেশ্চ চেৎ সিদ্ধান্তং বোদ্ধুমস্তি ধীঃ। তদা বিচিন্ত্যতাং ভাষাবৃত্তিরিয়ং মম"। পুরুষোত্তম বৌদ্ধ ছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেনের আদেশে, 'ভাষাবৃত্তি' রচনা করেন। তাঁহার "একাক্ষরকোষ", "ত্রিকাণ্ডশেষ" ও 'হারাবলী' নামে আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে। বল্লাল সেনের সমকালিক (দ্বাদশ শতাব্দী) বারেন্দ্র

শ্রুতিধর

শ্রেণীর কুলজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ভট্ট বাঙ্গলার একটা জেলায় বিলিয়াবা পরগণে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি পরাশরের সমগোত্রীয় ছিলেন তাঁহার রচিত "চারলতা" (অলৌচাধিকার) নামক স্মার্ত্তগ্রন্থ "বিদ্বজ্জিকা ইণ্ডিয়া"য় ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রঘুনন্দন ইহার শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য রঘুনন্দনের সমকালিক ছিলেন, মেদিনীপুর জেলায় ইহার জন্ম হয় এবং ইনি অধ্যাপনা করেন এবং ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক ছিলেন। ইহার রচিত বর্ষকৃত্য কৌমুদী, শ্রাদ্ধক্রিয়া কৌমুদী" "প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কৌমুদী" প্রভৃতি চারিখানি স্মৃতিগ্রন্থ যথাক্রমে ১৮৮৯, ১৮৮৯, ১৮৯৯ এবং ১৮৯৫ সনে বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনন্দন এবং ইনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন সম্ভবতঃ, একত্র ইহার পুস্তক হইতে কোন শ্লোক তিনি নিজের স্বরূপ উদ্ধৃত করেন নাই। এই চারিখানি পুস্তকের প্রথমটিতে বারমাসিক ধর্ম্ম ক্রিয়ার কথা আছে, দ্বিতীয়টি দান সম্বন্ধে, তৃতীয়টিতে শ্রাদ্ধের কথা এবং চতুর্থটিতে অশৌচ ও মলমাস সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা আছে। গোবিন্দানন্দের পিতার নাম ছিল গণপতি ভট্ট ইনি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। ইনি জাতিতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন এবং ইহার রচিত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকা সুলপাণির রচিত। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু বঙ্গদেশের স্মৃতিকারদের রাজা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। ইনি হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং নবদ্বীপবাসী। চৈতন্য অবতারের সময়ে ইনি স্মার্ত্ত রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত জ্যোতিষতত্ত্ব ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার প্রসিদ্ধ "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে"র মধ্যে "উদ্বাহতত্ত্ব", "দায়ভাগতত্ত্ব" "প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব" এবং "একাদশীতত্ত্ব"ই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত দুইখানি পুস্তক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত এবং বাঙ্গলা ও আসামে ব্রিটিশ আদালতে গ্রাহ্য হইয়াছে। উদ্বাহতত্ত্ব বিবাহসংক্রান্ত স্মৃতিগ্রন্থ ইহাতে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত বিবাহে খুব ধাঁতাধাঁতী নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার অপেক্ষা রঘুনন্দনের এই নিয়ম অত্যধিক কঠোর এবং তাহাতেই এদেশে বিবাহ-

সমস্যা এত জটিল হইয়াছে। স্মৃতিতত্ত্বাবলীর [illegible] প্রাদেশিক স্মৃতি অপেক্ষা রঘুনন্দনের "সামুদায়িক স্মৃতি [illegible] বঙ্গের [illegible] করে নাই। শুদ্ধি এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে রঘুনন্দন পুলস্ত্য [illegible] [illegible] মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছেন। "একাদশীতত্ত্বে" রঘুনন্দন বিধবার নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে প্রচলিত হইয়াছে।

[illegible] রাজসভার [illegible] পণ্ডিতের [illegible] [illegible] [illegible]

একজন শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদবাসী কুলুক ভট্ট 'সংক্ষিপ্তসারে'র টীকা রচনা করেন, এই টীকার নাম 'রসবতী', ইহা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র একদা প্রচলিত ছিল "সুপদ্ম" ব্যাকরণ প্রণেতা পদ্মনাভ দত্ত পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

মুগ্ধবোধ

ষোড়শ শতাব্দীতে রূপগোস্বামী "হরিনামামৃত" নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণ নামে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হইয়াছে। বৈষ্ণবসমাজে এই ব্যাকরণখানি বিশেষ আদৃত। তদনন্তর "উজ্জ্বল নীলমণি" অলঙ্কার গ্রন্থ সম্বন্ধে সর্ব্বজনপ্রিয় গ্রন্থ সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং ইহার টীকাকার রামচরণ চক্রবর্ত্তী উভয়েই বাঙ্গালী ছিলেন।

কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" সম্বন্ধে আমরা বহু পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। গৌড়ের রাজসভার কবি , নবম শতাব্দী , কবিবর পণ্ডিতের "রাঘব পাণ্ডবীয় কাব্যে" একখানি বহুঅর্থবোধক, প্রাচীন কাব্য ইহার প্রত্যেক শ্লোকের বামপক্ষে ও দক্ষিণপক্ষে অর্থ করা যায়। রামচরিতের ন্যায় ইহার শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থবোধক গোবর্দ্ধন আচার্য্যের "আর্য্যাসপ্তশতী"—লক্ষ্মণসেনের সময়কার একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য সম্বন্ধে আমরা এই পুস্তকের অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। (শব্দসূচী দ্রষ্টব্য), কবি লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

আর্য্যাসপ্তশতী।

"কলকলা, কবিত্বং বয়ঃ, সকলং কুলবধূভ্যঃ
যেনকুলস্থিতিরুচ্চৈরেকো রাজা স লক্ষ্মণসেনঃ"

ধোয়ীকবির "পবনদূতে"র কবির প্রেমাস্পদ লক্ষ্মণসেনের কোন্ পাড়ায় কুবলয়া নাম্নী বধূ যে বিরহ যাপন করিয়াছিলেন তাহাই এই কাব্যের বর্ণনীয়। প্রসঙ্গক্রমে বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের যে সকল ভৌগোলিক বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও অতীব উপাদেয়। জয়দেব ইহাকে "কবি ক্ষ্মাপতি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইহার সম্বন্ধেও আমরা পূর্ব্বভাগে অনেক আলোচনা করিয়াছি (শব্দসূচী দ্রষ্টব্য)।

কেন্দুবিল্ব নিবাসী জগদ্বিখ্যাত কবিকুলশিরোমণি জয়দেবের বিস্তারিত প্রসঙ্গ এই পুস্তকের অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে (শব্দসূচী দ্রষ্টব্য)

"প্রসন্নরাঘব" রচয়িতা জয়দেব বাঙ্গালা কবি কিন্তু ইনি 'গীতগোবিন্দ' প্রণেতা জয়দেব নহেন, রচনার প্রণালী দেখিয়া উভয়কেই এক সময়ের কবি বলিয়া মনে হয় কেহ কেহ দুইজনকে অভিন্ন মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 'প্রসন্নরাঘব' প্রণেতা স্বয়ং লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম মহাদেব এবং মাতার নাম সুমিত্রা। কিন্তু 'গীত-গোবিন্দ'কার তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 'প্রসন্নরাঘব'কারের "চন্দ্রালোক" নামে একখানি অলঙ্কারের গ্রন্থও আছে

ধোয়ী কবির সমসময়ে কিংবা তাঁহার কিছু পরে বঙ্গদেশের কয়েকজন বৈষ্ণব কবি "পদাঙ্কদূত," "উদ্ধবদূত," "বাসনদূত" প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ

পরিকর মুরারিকৃত "চৈতন্যচরিত কাব্য" এবং কবি কর্ণপুর রচিত "চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য", কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত 'গোবিন্দ লীলামৃত', নরহরি সরকারের "ভক্তিরত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত নরহরি বিশারদ কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নাটক গৌড়ীয় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তিনি বোধহয় কাশী আসিয়া উহা রচনা করিয়াছিলেন। ঘটকারিকে 'বিদ্যার কারণে' তাহার "বেদান্তাব্জ অর্ক" (৭৩২ খৃঃ) বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে [illegible] কবি কর্ণপুর) একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের নাম আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইঁহার সর্বপ্রধান গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রের নাটক। এই নাটকখানির অত্যন্ত প্রশংসা [illegible] মহাশয় করিয়াছেন, [illegible] নামক পুস্তকের ভূমিকা লেখক। [illegible] কর্ণপুরের জীবনে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' রচিত হয়। ইহার সম্বন্ধে আমরা একখানি পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। [illegible] কৃষ্ণদাস [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদৃত [illegible]।

কবি গোস্বামী* বিশ্বনাথের ও [illegible] "চমৎকার চন্দ্রিকা" দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক। প্রথমোক্ত কবি [illegible] এই দুইখানি নাটকের আর একখানি নাটকে সংযুক্ত করিয়া যে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইহার [illegible] মধুরের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব [illegible] বিষয় করা স্বতন্ত্রভাবে দুইখানি নাটক লিখিতে [illegible] আমরা [illegible] (মাধুরলীলা) আর প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] বৈষ্ণব সমাজে [illegible] নাম [illegible], বঙ্গদেশে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন—তন্মধ্যে কয়েকখানির নাম এখানে করিতেছি।—

১ বিদগ্ধমুখমণ্ডন, ২ [illegible] স্তোত্র, ৩। [illegible], ৪ [illegible] ও [illegible], ৫ [illegible], ৬। [illegible], ৭ [illegible], ৮। [illegible], ৯। [illegible], ১০ [illegible], ১১। নামাষ্টক। এইরূপ ২৯খানি পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত। ইহাদের কতকগুলি আকারে খুব ছোট। ভক্তিরত্নাকরে বহু [illegible] পণ্ডিত বহু পুস্তকের নাম উল্লিখিত আছে।

[illegible] বহু বাঙ্গালা সংস্কৃত সংস্কৃতে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। "সাহিত্যরত্ন গীতি," বঙ্গীয় [illegible] [illegible] সম্ভবতঃ [illegible] [illegible] তাঁহার বঙ্গবিশ্রুত

* রূপ গোস্বামী "ভাবকেলী-কৌমুদী", "পদ্যাবলী" "লঘুভাগবতামৃত", "হংসদূত", "উদ্ধবসন্দেশ", "মথুরালীলা", "গণোদ্দেশদীপিকা," "নাটক-চন্দ্রিকা", "লঘুতা-তাণ্ডবা", "স্তোত্রক-বিংশাবলী" প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রাদ্ধবিবেক, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক প্রভৃতি স্মার্তগ্রন্থও সঙ্কলন করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নব ব্রাহ্মণের অভ্যুদয়ের ফলে এই সময়ে বৌদ্ধদের পরিত্যক্ত সমস্ত সংস্কারের উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছিল। ইহার ফলে সমাজের মধ্যে কেহ কেহ নূতন নূতন সামাজিক জীবনে আচার শুদ্ধিমূলক অনেক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মূলতঃ এই ভাবের নিবন্ধকারদের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে অগ্রণী ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দন ইহার অসমাপ্ত শম ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" প্রচার করেন। এই গ্রন্থসমূহ বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের পথ প্রদর্শক এবং ইহারই অনুশাসনে আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিচালিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব সমাজে হরি ভক্তি বিলাসের অনুশাসন অভ্রান্ত। এই গ্রন্থ রচনা করেন রূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠতাত সনাতন। তিনি চৈতন্য দেবের উপদেশ পাইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহার অধ্যায় ভাগ হইতে বিষয় সূচি ও সমস্ত খুঁটিনাটি কথা চৈতন্যদেব সনাতনকে কহিয়া দিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের 'সনাতন শিক্ষা' নামক অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এবং চৈতন্যদেব সনাতনকে যে সব বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন সে সব বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সনাতন রাজার হইয়াও হুসেন সাহের মন্ত্রী স্বরূপ তিনি কত কালের জন্য মুসলমানদের আচার ব্যবহার ও মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে সমাজে নিন্দিত হইতে হইয়াছিল, এমন কি কাহারও কাহারও মতে রামকেলী গ্রামে রূপগোস্বামী কৃত "রূপসাগর" নামক প্রকাণ্ড দীঘির জল হিন্দুদের ব্যবহার্য্য ছিল। সনাতন অতি বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার মহাগ্রন্থ 'হরিভক্তি বিলাস' রচনার পর তিনি চৈতন্যদেবকে বলিলেন "এখনগৌড় হিন্দুসমাজ আমাদের এতটা বিরুদ্ধ যে আমার নাম থাকিলে—এই স্মৃতিগ্রন্থের অনুশাসন কেহ মানিবে না" তদনুসারে তিনি গোপাল ভট্টের নামে পুস্তক খানি প্রচারিত করেন। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী এ কথা প্রচারিত করেন। জীব গোস্বামী সম্বন্ধে সমস্ত কথা এই পুস্তকের অন্যত্র লিখিত হইয়াছে (পরবর্ত্তী দ্রষ্টব্য)। তাঁহার 'ষট সন্দর্ভ' চিন্তাশীলতা, পাণ্ডিত্য ও ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীব গোস্বামী প্রণীত ক্রমসন্দর্ভ, সর্ব্বসংবাদিনী ও গোপালচম্পু গ্রন্থও বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে রাঘবানন্দ কর্ত্তৃক কুল্লুক ভট্ট। মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকা পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

হরিভক্তিবিলাস।

জ্যোতিষের সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত বহু পাটীন পুঁথি আমরা বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে দেখিয়াছি। এখনও তাহাদের সন্ধান লওয়া হয় নাই। 'জ্যোতির্বিজ্ঞানকলানিধি' পত্রিকা কয়েকখানি পুস্তকের সঙ্গে জ্যোতিষ আলোচনাকারে পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

জ্যোতিষ।

এদেশে আয়ুর্ব্বেদের এত পুস্তক রচিত হইয়াছে যে তাহাদের সংখ্যা নাই। প্রত্যেক পল্লীতেই পুঁথি খুঁজিতে গেলে সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেক গুলিই 'পাতড়ার' আকারে লিখিত হইয়াছে। কতকগুলিতে বহু মুষ্টিযোগের উল্লেখ আছে।

বঙ্গদেশে মাধবকরের নিদান ও চক্রপাণি দত্তের বৈদ্যকশাস্ত্র তুলনায় "চক্রদত্ত" গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ। ইহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে।

ডাকরোগের মাধব কর ও চক্রপাণি দত্ত

মাধব করের নিদানের টীকাকার বিজয়রক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী বাগ্‌ভট শ্রীয় নামানুসারে আয়ুর্বেদশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। বহুসংখ্যক এই সকল স্থানের পণ্ডিত শিরোমণি গঙ্গাধর কবিরাজের তুলনায় [illegible] বিস্তৃত ভাবে এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

ডাকরোগ

চুরাদি ধাতুপাঠে অনেক কথা এবং একখানি ধাতুপাঠ ও মাধবনিদানের কয়েকখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে [illegible] সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক ভরতমল্লিক। টীকা করেন তাহা ক্ষেত্রবর্ত্মী নামে প্রসিদ্ধ। ভরতের [illegible] "ভরতপ্রকাশিকা"ও একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের [illegible] ভরতমল্লিক ইহার পূর্বপুরুষ ছাত্রের নাম "ভাষা-পরিচ্ছেদ" প্রণয়ন করেন। বিশ্বনাথ নব্যনৈয়ায়িক ছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্র গ্রন্থকারগণের মধ্যে বাসুদেবের নাম [illegible] ইনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের [illegible] অন্য কোন কোন গ্রন্থের সঙ্কেতেও তাঁহা লইয়া এখনও মাঝে মাঝে তর্ক হইয়া থাকে। ইহার রচিত পুস্তকের নাম সঙ্কেতের 'লঙ্কার'।

[illegible] পণ্ডিত বঙ্গবাসীর [illegible] কুলিক দ্বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইহার গ্রন্থের টীকার নাম 'গাদাধরী'।

এই নিবন্ধের লেখকদিগের অনেক কথা আমি ১৩১৬ সনের পৌষ মাসে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুমহাশয়ের সম্পাদিত হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সংস্কৃতের গ্রন্থাগার এখনও গুপ্তকীর্ত্তি চিরন্তন বঙ্গদেশের পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ নাদুকা ও বিক্রমশীলা বিরাজ করিতেছে, কোন্ অধ্যবসায়শীল বাঙ্গালী বিদ্বান্ এই বিরাট্ সাহিত্যশালার দীপশলাকা হস্তে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালার এই গৌরবরাশির লোক সমুখে আনিয়া দেখাইবেন। বহু গ্রন্থ ক্ষয়ে হইয়া যাইতেছে। যাহা কিছু কালের উদরস্থের মত এখনও পড়িয়া আছে তাহা কে উদ্ধার করিবে?

আধুনিক কালে রঘুনাথ দেবের শব্দকল্পদ্রুম ও তারানাথের বাচস্পত্যাভিধান এবং বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাকার বিরাট্ কলেবর ও বিপুল উদ্যমের দ্বারা প্রমাণ করিতেছে যে বাঙ্গালী পণ্ডিতের এখনও ঐশ্বর্য্যশক্তি বা বিদ্যার প্রতি বিমুখতা জন্মে নাই। কিঞ্চিৎ উৎসাহ ও আশ্রয় পাইলে পুনরায় কল্পতরুর উদ্ভব হইতে পারে কিন্তু "অনাশ্রয়া ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতা।"

সংস্কৃত।

গুপ্ত ও পাল রাজাদের যে সকল তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ বাঙ্গালা পণ্ডিত লিখিত। এই সকল তাম্রপটের কতকগুলি এরূপ কবিত্বপূর্ণ সুললিত

ভাষায় লিখিত যে একখানি শ্রেষ্ঠ কবিদের এক পর্য্যায়ে স্থান পাইবার যো। আমরা ত্রিপুরা আসাম ও বিহারের ইতিহাস আলোচনা কালে কয়েকখানি প্রাদেশিক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি।

চারিজন কবি

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা পণ্ডিতেরা দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইতেন। তাঁহা পণ্ডিতের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িত। অকবর বাদশাহের সময়ে কোন কাশ্মীরী সমস্ত ভারতবর্ষ বিজয় করিয়া [illegible] খৃ. অব্দে নবদ্বীপে আসিয়া হৈতন্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। সদ্যঃ-উদ্ভাসক-গুরু [illegible] এই মহা পণ্ডিতকে হারাইয়া দিয়া 'বাণীসিংহ' উপাধি লাভ করেন। সে কালে এই সকল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের হস্তীর পৃষ্ঠে সমারোহ করিয়া দেশ বিদেশে বিজয়ডঙ্কাকে ডঙ্কাকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন। সংপুত্রকে পুত্রবা নিষাদী মণ্ডন মিশ্র এই ভাবে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গ দেশে আর একজন পণ্ডিতের কথা এখানে উল্লেখ করিব। তিনি দিগ্বিজয় করিয়া অনেক যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ী।

সেই সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কামরূপের রাজধানী ছিল 'এগারসিন্দুর'। এই নগর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ছিল। এগারসিন্দুর, মিরজাফরপুর, হরিসভা, কুটীশ্বর ও হোসেনপুর পাশাপাশি লাগা ছিল। এই স্থান বণিক ও বিদ্যা আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এগারসিন্দুরের অতি নিকটে দিগ্বিজয়ী নামক পল্লী বুলনদিগের একটা কেন্দ্র ছিল। তথায় লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী নামক সঙ্গীতাচার্য্য এক পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল কমলাদেবী।

গুপচন্দ্র নামক ইঁহাদের এক পুত্র জন্মে। এই বালক বাল্যকালে এরূপ দুষ্ট ছিল যে তাহার অত্যাচারে পাড়াপ্রতিবাসীরা বিপন্নগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মীনাথ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও ইহাকে জ্ঞানের পথে আনিতে পারিলেন না। দুষ্ট বালক মেধাবী ছিল বলিয়াই একেবারে পাগল করিতে না। একদিন পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া কমলাদেবীকে আদেশ করিলেন "অদ্য যখন দুরন্ত ভাত খাইতে আসিবে, তখন তাহাকে ছাই দিবে।" পতিব্রতা ব্রাহ্মণী পতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিবার সময় থালের এক কোণে এক টুকরা ছোট কলা রাখিয়া দিলেন। কিন্তু দুষ্ট হইলেও বালক খুব মেধাবী ছিল, তাহার দৃষ্টি সেই পোড়া কাঠ টুকরার উপর পড়িল, সে আন্দাজে উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সেই পদার্থটা কি এবং কোন্ উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে তাহা তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল। কমলাদেবী "কিছু নয়, ভুলে থালায় পড়িয়া গিয়াছে" প্রভৃতি যে সকল বাধা দিলেন তাহা বালক বিশ্বাস করিল না। সে একটা খারাপ কথা লিখা তাহার মাতাকে সত্য বলিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে মাতা লজ্জিতভাবে সত্য কথা বলিয়া, কেন সে পিতার উপদেশ

গুপচন্দ্র।

আহ্বান করিয়া এত কষ্ট হইতেছে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সে চরিত্র সংশোধন করে তজ্জন্য মিষ্ট মধুর উপদেশ দিলেন।

রূপচন্দ্র সে সকল উপদেশ শুনিলেন কি না শুনিলেন বোঝা গেল না। তিনি অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া সেই যে ধ্যানে ডুবিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান হয় না। তিনি কোথায় কি করিতেছিলেন তাহা কেহ জানিত না। তিনি কোথায় ছিলেন তাহাও কেহ জানিত না। তিনি কোথায় ছিলেন তাহাও কেহ জানিত না।

আচার্য্য ও সরখেল উপাধিলাভ

তিনি কোথায় ছিলেন তাহাও কেহ জানিত না।

আধ্যাত্মিক বিনয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রূপচন্দ্রের হস্তে তাঁহার খুল্লতাতগণের পরাজয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্তে অতীব ক্রোধের উদ্রেক হইল। তিনি ইহার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন ক্রমাগত তর্কের পর রূপচন্দ্রের অদ্বৈতবাদ ভাসিয়া গেল। জীব-গোস্বামী দ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিলেন। সপ্তমদিনে জীবগোস্বামী জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের উপর ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। রূপচন্দ্র এবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া জীবের শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তোষিণী টীকার সাহায্যে ভাগবত পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি লঘু ও বৃহৎ ভাগবতামৃত পাঠ করিলেন। তৎপর বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি পুস্তক তিন লক্ষের আলোকে পাঠ করিয়া কৃতবিদ্য হইলেন। এবার স্পর্দ্ধিত পণ্ডিতের সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি এই সমস্ত বিচার ও তর্কযুদ্ধ অসার মনে করিতে লাগিলেন। রূপচন্দ্রের উপাধি এবার হইল "রূপ নারায়ণ," আমরা স্থানান্তরে ইহার কথা পুনরায় উত্থাপন করিব।* এই যে দিগ্বিজয়ী মহাবীরদের মত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের দেশ বিদেশে ঘুরে জয়পত্র সংগ্রহ করিতেন ইহা মধ্যযুগের বিশেষত্ব; সম্ভবতঃ ইহা আলেকজেণ্ডারের ন্যায়, এমন কি বোধ হয় এই বর্ণিত পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। সভাস্থলে কুটতর্ক দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে 'কাবু' করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে চরক নানা উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ বিতর্ক হইতেই বোধ হয় ন্যায়শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এই ন্যায়শাস্ত্র পূর্ব্বে একদিন পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচলিত ছিল, সম্ভবতঃ পালদের সময়েই উহা প্রসার লাভ করিয়াছিল। রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই অবাক্যাক্ষ ও মুখরক্ষাদির অসারতা প্রকাশ করিবার পরে পণ্ডিতগণের 'যুদ্ধং দেহি' রব থামিয়া গেল, মহাপ্রভু নামাপরাধে "শুষ্কমুখি মুখ ব্যাদন করিতে জানি না" ইত্যাদি বলিয়া অদ্বৈতবাদে যে বিনয় দেখাইলেন, সেই বিনয় শেষে পণ্ডিতগণের চরিত্রের ভূষণ হইল, তারপর শাস্ত্র ও অন্যান্য কি উপলক্ষে সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে তর্ক ও আলোচনা হইত, তাহা বিদ্যার গৌরব ও উন্নতি-সাধনের জন্য—তাহার মূলে মধ্যযুগের প্রতিষ্ঠার মোহ ছিল না। এই মধ্যোল্লিখার ফলে পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের চেষ্টা বঙ্গদেশে কখনও বিলিন হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও মেদিনীপুরবাসী মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার অসীম শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া কেরী, মার্সমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়া কেহ তাঁহাকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের অন্যতম, কেহবা তাঁহাকে জনসনের ন্যায় অগাধ বিদ্যার অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে আধুনিক সময়েও রামমোহন, বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালীগণ দেশবিদেশে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী এখনও জগতের সুধী সমাজে প্রথম শ্রেণীতেই আসন স্থাপন করিয়া আছেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ জগতের সর্ব্বত্র পূজা পাইতেছেন এবং

জীবগোস্বামীর নিকট পরাজয়।

* বিস্তারিত বিবরণ প্রেম-বিলাসে দ্রষ্টব্য।

রামকৃষ্ণ যে সিংহাসনে আজও তাঁহার ভাই বসিয়া বসিতে পারে এমন লোক জগতে দুর্লভ। যে সকল গুণী ও পণ্ডিতের নাম করিলাম তাঁহারা প্রকৃত বিদ্যোৎসাহীদের তুলনায় মুষ্টিমেয়। প্রকৃত পক্ষে কত যে অসাধারণ গুণী ও জ্ঞানী এদেশে উচ্চতম চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহাদের নাম স্মরণীয় করিয়া রাখেন নাই। কোনও অজ্ঞাত মহামণির ন্যায় তাঁহারা বিস্মৃতির খনিতে লুক্কায়িত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা তেজস্বিতা ও চরিত্রবল

এই সকল জ্ঞানশূন্য সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও তেজস্বিতা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। অষ্টলক্ষ্মণসেন তাঁহার সভাস্থিতে কাঁপিতেন, সেই চাণক্য গোষ্ঠীভুক্ত একটা খদ্যোতের বাস করিতেন। তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের গৃহের চূড় অভ্রংলেহী দর্পে ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্বপক্ষি লিপের মহিমা প্রচার করিত, কিন্তু সেই বিষশূন্য পণ্ডিতের খড়ের চালের উপর সঞ্চরণশীল অলাবুলতা কুটীরের দরিদ্রতা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত। এই বিষয় নিস্পৃহতা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের বিশেষত্ব। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় মাধবী নাম্নী বণিক্-বধূ আসিয়া নালিশ করিলেন 'রাজস্যালক কুমার বসু তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে" উমাপতি ধর প্রভৃতি বিচারকগণের নিকট এই অভিযোগ। স্বয়ং লক্ষ্মণসেন সেই অভিযোগ শুনিলেন। এই সময় আলুলায়িতকুন্তলে রাজমহিষী স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইলেন এবং তীব্রস্বরে বলিলেন -"এখানে এমন কোন্ মন্ত্রী আছেন যিনি এই অভিযোগের বিচার করিবেন? একটা নির্লজ্জা দুষ্টা স্ত্রীলোকের অভিযোগে আমার ভ্রাতাকে দণ্ড দিবে এমন কাহার সাধ্য?' রাজ্ঞীর স্ফুরিত অধর ও রক্তচক্ষু দর্শনে মন্ত্রীরা নির্ব্বাক্, ভয়ে সভাসদগণের মুখ শুকাইয়া গেল। স্বয়ং লক্ষ্মণসেনও ভয়ে মৌনাবলম্বন করিলেন। ঘটিকার পূর্ব্বক্ষণে নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ভয়বিহ্বলা অত্যাচারিতা মাধবীর কণ্ঠে অভিযোগের বাণী স্তব্ধ হইয়া গেল

কুমার বসু ও মাধবী

সেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আচার্য্য গোবর্দ্ধন। ইনিও চাণক্যের মতই বিষয়-নিঃস্পৃহ, অথচ লক্ষ্মণ-সাম্রাজ্যের পরিচালক, অদ্ভুতদর্শন কাষায় পরিধানে কৌপীন, হস্তে কমণ্ডলু। তিনি রাজ্ঞীর ধৃষ্টতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, খড়্গহস্তে করিয়া রাজ্ঞীকে মারিতে অগ্রসর হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন শকি আশ্চর্য্য এই স্ত্রীলোকের, বিচারগৃহের অবমাননা করিতে আসিয়াছে। আমি

গোবর্দ্ধনাচার্য্য

দেখিতেছি লক্ষ্মণসেন, তোমার রাজত্ব শেষ হইয়া আসিতেছে। তুমি সেই সিংহাসনে বসিয়াছ যে সিংহাসনে বসিয়া রাজা রামপাল একদা পরস্ত্রী-হরণাপরাধে তাঁহার পুত্রকে শূলে দিয়াছিলেন। এখনও লোকে তাঁহার ন্যায়বিচারের প্রশংসা করিয়া থাকে। তুমি এই সিংহাসনের অযোগ্য।"

বৃদ্ধের চক্ষু সজল হইল, তিনি মৃগ কমণ্ডলু লইয়া সেই সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উদ্যত হইলেন, লক্ষ্মণসেন সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্বক গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পা ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং স্বয়ং খড়্গ হস্তে কুমারদত্তকে কাটিতে উদ্যত হইলেন।

এই উপাখ্যানটি "শেক শুভোদয়া" নামক পুস্তকে লিখিত আছে। ভিন্ন সূত্রে হুগলীর সান্যাল মহাশয় এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন।" তিনি উপরন্তু লিখিয়াছেন "রামপালের এই পুত্রের নাম মকরপাল।" নাহা তারানাথ রামপালের মকরপাল নামক এক পুত্রের কথা লিখিয়াছেন আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে রামপাল তাঁহার মাতুল মথন মহন। দেবের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া নদীজলে প্রাণত্যাগ করেন সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন পুত্রকে শূলে দিয়া সেই শোকে রামপাল নদীতে ডুবিয়া মরেন। কোন্ কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কতটা তাহা ভবিষ্যতে নির্ণীত হইবে, কিন্তু গোবর্দ্ধনের মত তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে বঙ্গদেশে কোন কালেই অভাব হয় নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃত্তিবাস কবি গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বরচিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের মুখে বিচিত্র ছন্দোময়ী কবিতাগুলি রস ও ভাবপ্রাচুর্য্যে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পাত্রমিত্রগণ কৃত্তিবাসকে ইঙ্গিতে জানাইলেন "তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে—কারণ স্বয়ং গৌড়েশ্বর তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন।"

কবি কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস সগর্ব্বে বলিলেন—"আমার কল্পনা রাজসভায় দেখাইতে আসিয়াছি। আমি কাহারও কাছে কিছুমাত্র যাচ্ঞা করি না।" "কারো কিছু নাহি লই সৌরব মাত্র সার" গৌড়েশ্বর চমৎকৃত হইয়া গেলেন। কাহার এতটা স্পর্দ্ধা যে মুখের উপরে তাঁহার দান গ্রহণ করিতে এভাবে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ্য গৌরবের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন এবং কেদারগাঁএর ঘরে কবির মস্তকে চন্দনের ছড়া দিয়া তাঁহাকে বাল্মীকির রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ দিলেন। কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহার আত্মবিবরণে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন।

সভায় ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল যখন তিনি রাজ-পথে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও কণ্ঠদেশে রাজপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ পুষ্পমাল্য তিনি বিপুল রাজ-উপঢৌকন ও অশ্বাদি অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞানের মর্য্যাদা রাখিয়াছেন, এজন্য নগরবাসীরা সমস্বরে "ফুলিয়া পণ্ডিতকে" ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

আমরা ক্রমাগত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও ভ্রমণকারীদের নিন্দা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া

আসিয়াছি পঞ্চদশ শতাব্দীর আর একজন ব্রাহ্মণের কথা বলিব ময়মনসিংহ জেলার বিপ্রপুর আধুনিক বিপ্রবর্গ গ্রামে পর্ণনামে এক পণ্ডিত ছিলেন, ইনি শ্রীচৈতন্যের সমকালবর্ত্তী। সেই গ্রামের গুণরাজ নামক এক ব্রাহ্মণের একটি পুত্র হয়, যখন শিশুটি অতি অল্পোদর তখন তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তখন লোকের নানারূপ কুসংস্কার ছিল। পিতৃমাতৃহীন শিশু বাড়ীর আঙ্গিনায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। 'অপয়া' ভাবিয়া তাহাকে কেহ গ্রহণ করে নাই অষ্টদিবস সেই জ্ঞানহীন শিশু হাত পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছিল—না খাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল—কেহ তাহাকে কোলে তুলিয়া লয় নাই। যে জন্মিয়া মা বাপ খাইয়াছে, তাহাকে কে বাড়ীতে স্থান দিবে? মুরারি নামক চণ্ডাল এই সকল মেয়েলি শাস্ত্র জানিত না। সে ছিল সকলের ঘৃণ্য, সুতরাং দুঃখাতের জন্য তাহার মমতা হারায় নাই—সে আসিয়া শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইল তাহার সন্তান ছিল না, সুতরাং উৎপন্নী কৌশল্যা সন্তান পাইল এবং পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুও সেই গৃহে পিতামাতার যত্ন পাইল পাঁচ বৎসর সেই শিশু চণ্ডাল পিতা ও চণ্ডাল মাতার ঘরে বর্দ্ধিত হইল, শিশুর নাম কৌশল্যা রক্ষ রাখিয়াছিল। এই পাঁচ বৎসর পরে আবার বিপদ হইল, বসন্তরোগে মুরারি প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার পত্নীও শোকে ছটফট করিয়া কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক বালক পিতামাতার শ্মশানে উপস্থ হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। এবার তাহার 'অপয়া' নাম আরও জাহির হইয়া গিয়াছে, কোন চণ্ডালও আর তাহাকে কৃপা করিল না। চণ্ডালদের পুষ্ট বালকের ব্রাহ্মণও কেহ স্বীকার করিল না। একূলে ও ওকূলে তাহার কেহও ছিল না, সুতরাং অত্যাচারিত ও কুসংস্কার বালকটিকে একেবারে নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব করিয়া ফেলিল বালক কাঁদিতে কাঁদিতে শ্মশানের উপর ঘুমাইয়া পড়িল এবং পুনরায় জাগিয়া কাঁদিতে লাগিল। চিতা-ভস্ম ও চোখের জল একত্র হওয়াতে সেই সুন্দর শিশুটির মুখখানি ভস্মলিপ্ত বালক শিবের মুখের মত দেখা যাইতেছিল।

পর্ণ ছিলেন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত, সমস্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলে তখন তাঁহার মত চিন্তাশীল ও বিদ্বান্ কেহ ছিলেন না, তিনি ব্রাহ্মণ-সমাজের অবিসংবাদিত নেতা ও শাস্তার পাত্র ছিলেন। বৃদ্ধ ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করিয়া সেই শ্মশানের নিকট দিয়া নামাবলী গায়ে যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার কর্ণে বালকের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল এবং তিনি ধূলিলুণ্ঠিত বালককে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার নামাবলী দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের ধূলিকালি মুছিয়া পরমস্নেহে তাহাকে কোলে লইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন, তাঁহার সাধ্বী পত্নী সাবিত্রীদেবীর পুত্র ছিল না, লীলা নামক একটি মাত্র কন্যা ছিল সাবিত্রী দেবীর স্নেহে রক্ষ ব্রাহ্মণগৃহে লালিত পালিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্যাপারটা বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতেছিলেন না। কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণাবতার তেজস্বী পর্ণের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাঁহাদের সাহসে কুলাইল না।

গর্গের পরবর্তী নায়ক একটা গাভী ছিল, তাহা তপোবনের নিকটবর্তী গোচারণের মাঠে সেই গাভী চরাইত, প্রাতে ও বৈকালে বালকের সঙ্গে খেলা করিত এবং বাঁশী বাজাইত। তাহার বাঁশী যখন বাজিত তখন সমস্ত পল্লীর লোক তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইত ক্রমে তাহার বয়স ১০ হইল, গর্গ দেখিলেন বড় অসাধারণ মেধাবী। তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহাকে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখাইলেন, মুখে মুখে কণ্ঠস্থ করিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সমস্ত শ্লোক শিখিয়া ফেলিল, কবের প্রতিভা সকলেই স্বীকার করিল সে ইহার মধ্যে "মলয়ার বারমাসী" নামক যে বাঙ্গলা কাব্য রচনা করিল, তাহাতে তাহার নিজের জীবন ও গর্গের দুঃখের সুরটি এমনই করুণভাবে বাজিয়া উঠিল যে সমস্ত ময়মনসিংহ জেলার লোক ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচিতকাব্যটি মুখস্থ করিয়া ফেলিল আরও দুই এক বৎসর গেল, কবি "সত্যপীরের গান" নামক আর একখানি কাব্য রচনা করিল, ইহাই বাঙ্গলা ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর, কিন্তু বিদ্যাসুন্দর বলিতে বাঙ্গালীর মনে যে ভাবটির উদয় হয় ইহাতে তাহার কিছুই নাই ইহাতে কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু কুরুচি প্রকাশ পায় নাই সমস্ত জেলায় "কবিকঙ্ক" এখন প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এই সময়ে গর্গ তাঁহার গৃহে এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথায় উপনীত হইলেন, গর্গ প্রস্তাব করিলেন "কবিকে সমাজে নেওয়া হউক," – একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তনে লোক যেরূপ বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়ে, এই প্রস্তাবে সভাগৃহে সেইরূপ একটা ভীতি ও বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল

'মনু' প্রভৃতি গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—"যে ছেলে পাঁচবৎসর চণ্ডালের ভাত খাইয়া চণ্ডালের সংসর্গে মানুষ হইয়াছে, সেই দুর্ভাগ্য বালকের কি ব্রাহ্মণত্বের কোন দাবী আছে? তাহা হইলে যে মুসলমান হইয়া গোমাংস ভক্ষণপূর্ব্বক অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছে তাহাকেও তো আপনারা জাতে তুলতে পারেন" সমস্ত সভায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধ মত গর্গ সেখানে দাঁড়াইয়া বালকের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। সে যখন অবোধ শিশু তখন সে চণ্ডালের খাইয়াছে, সে ইচ্ছাকৃত কোন পাপ করে নাই তিনি তাঁহাদিগের মহত্ত্ব ও সহানুভূতির দাবী করিলেন, তাঁহাদের করুণা প্রার্থনা করিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। কিন্তু সেই নির্ম্মম কুসংস্কারের অভেদ্য ব্যূহ ভাঙ্গিতে অসমর্থ হইয়া তিনি স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া ক্রমাগত ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা কেহই তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না তাঁহাদের শিখার বন্ধনী খুলিয়া গেল, তাঁহারা মুক্তকচ্ছ হইলেন, সারাদিন বাদপ্রতিবাদ চলিতে লাগিল, কিন্তু শিকারহ জীবের ন্যায় এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের জালের শতগ্রন্থি ছেদ করিয়া নিজে যে মত স্থির করিলেন প্রাতঃকালের মত তাঁহার সেই অগাধ পণ্ডিত্যের মুখে তূলের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

কেহ কেহ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ স্বকীয় যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষে মত দিলেন কিন্তু অসাক্ষাতে পুনরায় কটলা চলিল ষড়যন্ত্রের ফলে সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি এই সময় পাগলের মত যে সকল ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং

সন্ন্যাসী কি স্বয়ং নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যাকুলভাবে তিন রাত্র তিন দিন মন্দিরদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া যে ভাবে দেবতার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত কাহিনী পড়িলে মনে হয়, ইনি সেই সত্যযুগের ঋষি; এদিকে কত নানা ভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়া অনাহারে শুষ্কমুখে একটা কাঠের ঘরের মেজেতে পড়িয়াছিলেন। তন্দ্রার আবেশে তিনি দেখিলেন তাঁহার দরজা বন্ধ মধ্যে নিষ্কম্প হইয়াছেন, যমদূতেরা তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছে এমন এক রক্তাম্বর পুরুষবর তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন "চল আমার সঙ্গে"। সেই মহাপুরুষ শ্রীরাম। কত প্রহার হইবার পূর্বেই সেই পূত স্পর্শ করিয়া নবদ্বীপে চৈতন্যদেবকে দেখিতে ছুটিয়া চলিলেন। পথে মোকাদুমি ঘটনাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা একটি গল্পের কথা নহে, কবির জীবনী চারিজন কবি লিখিয়াছেন এবং যদি কখন তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের পক্ষপাতে অতি সরলভাবে স্বীয় জীবনের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেকালে যত ব্রাহ্মণ সেকালে অনেক ছিলেন, এতদ্ব্যতীত মুসলমানসংস্পর্শযুক্ত ব্রাহ্মণগণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়া কুলীন হইতে পারিতেন না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র মহারাজ শিবচন্দ্র তাঁহার রাজ্যের সঙ্গে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। স্নানের সময় বহুমূল্যালঙ্কারভূষিতা রাজকীয় শিবির হইতে রাজা নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীতে অবতরণ করেন—সেই পুষ্করিণীর অপর ঘাটে জনৈক অতি সাধারণবেশ পরিহিতা সদ্যস্নাতা ব্রাহ্মণ মহিলা স্নান করিতেছিলেন, তাঁহার গায়ে লাল সুতা ছাড়া অঙ্গে কোন আভরণ ছিল না। এই রমণীর অঙ্গ সঞ্চালনে কয়েক বিন্দু জল বিক্ষিপ্ত হইয়া রাজার দেহ স্পর্শ করাতে রাজা কুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কে?" উত্তরে সেই মহিলা বলিলেন, "নবদ্বীপ অঞ্চলের যিনি সর্বপ্রধান ব্যক্তি আমি তাঁহার ধর্মপত্নী"। রাজা মনে করিলেন রমণীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এবং নিজেকে অত্যন্ত অপমানিতা মনে করিয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন। এই রাজ্যে মহারাজ শিবচন্দ্রের উপরে কে প্রধান ব্যক্তি থাকিতে পারেন? রাজা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন ইনি রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের পত্নী। তিনি রাজাকে বলিলেন "এক হিসাবে রমণীর কথা সত্যই বটে কারণ রামনাথের ন্যায় বঙ্গদেশে প্রতিভূ নৈয়ায়িক আর দ্বিতীয় নাই।" রাজার অভিমান আরও জ্বলিয়া উঠিল তিনি রাজাকে বলিলেন—"এই পণ্ডিতকে তোমার বেতন-ভোগী সভাপণ্ডিত নিযুক্ত কর, তবেই ঐ স্পর্ধালোকটার দেমাক কমিয়া আসিবে।" রাজা বলিলেন, রামনাথ কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিবেন না তথাপি রাজার একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে রামনাথের কুটিরে যাইতে হইল, একথা সেকথার পরে, রাজা বলিলেন, "আপনার কোন অনুপলব্ধি আছে?" অভাব কথাটা শোভন নহে, এই জন্য অনুপলব্ধি কথা দ্বারা তিনি প্রশ্নটির অবতারণা করিলেন তর্কসিদ্ধান্ত মনে করিলেন রাজা ন্যায়ের অনুপপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন—এবং সেই ভাবে উত্তর দিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া রাজাকে বলিতে হইল, তিনি ন্যায়-ঘটিত প্রশ্ন করেন নাই, তাঁহার সাংসারিক কোন অভাব আছে কি না—তাহাই জানিতে চাহিয়াছেন। রামনাথ বলিলেন, "এই দেখুন তিন্তিড়ী বৃক্ষ, ইহার পাতার ঝোল

এবং যে সামান্য জমি আছে তাহার উৎপন্ন ধানেই আমাদের অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইয়া যায়—এই সংসারের আর কি অভাব থাকিতে পারে?" সন্তানপ্রিয় হওয়ার কথাটাও রাজা ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করিয়া যে ভাবে তাহা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে রাজাধিরাজ শিবচন্দ্রের উক্ত শিব গৌরী বিহার-বিলুপ্ত বিলাসলালসমুক্ত ব্রাহ্মণ তপস্বীর নিকট একেবারে হেঁট হইয়া গিয়াছিল।

বাহুল্য ভয়ে আর এরূপ দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। সন্ধ্যারামগুলি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাউক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণ দেশ হইতে বিতাড়িত হউন। কিন্তু যে উচ্চ চিন্তা ও স্বাধীন ক্ষেত্র মৌর্যাধিকার হইতে পাল, সেন এবং মুসলমান রাজত্বে এমন কি নিতান্ত আধুনিক সময় পর্য্যন্ত শ্রেণী নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীজাতি দেখাইয়া আসিয়াছেন, তাহা একই কারণ হইতে উৎপন্ন সে নেড়ো ধর্ম্মের বীজ নষ্ট হয় নাই বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা ইতিহাস আছে তাহাতে দয়া, ক্ষেম, ত্যাগ, জ্ঞান, প্রভৃতি গুণের আদর্শ অনেক পাওয়া যায় তাহা শুধু ব্রাহ্মণ সমাজে আবদ্ধ নহে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি সেই গুণগরিমার উত্তরাধিকারী। বাহিরের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে সিংহাসন পতাকা সমস্ত, সিংহাসন বৃটিশের কালে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু এখনও সেই আধ্যাত্মিক গৌরবটি অক্ষুণ্ণ আমরা মাগধ গৌড় বাঙ্গালীর জ্ঞান যতটা আয়ত্ত করিয়াছি অন্য কোন দেশ তাহা পারে নাই পূর্ব্বযুগের সঙ্গে আধুনিক কালের সেই সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই এখন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য

আট পরিচ্ছেদ

গুপ্তপাল যুগের জের কথাসাহিত্য

এইবার আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের এক বিভাগে গুপ্ত ও পাল-যুগের সুস্পষ্ট ছাপ দেখাইতে চেষ্টা করিব। সেনেদের সঙ্গে নব ব্রাহ্মণ্য বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছে—ইহার সঙ্গে মূলতঃ আমাদের সম্বন্ধ খুব বেশী নহে। ইহাতে শুধু ব্রাহ্মণকে বাড়াইবার চেষ্টা। ব্রাহ্মণসেবা সেবাবৃত্তির চরম, তৃণের আদি খাইয়া বিষ্ণু তৃণের পদ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন—ইহাই সকল সেবার সেরা সেবা। ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দিলে তাহার ফল অনন্তপুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিবে ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অক্ষয়পুণ্য। ব্রাহ্মণকে রাগাইলে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার শাপের সোঁয়ায় উড়িয়া বিলীন হইয়া যাইবে, ইত্যাদি এসকল কথা বাসের মহাভারতেও আছে অষ্টবর্ষে গৌরীদান, স্বয়ংবরপ্রথা তুলাই, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, কোন্ তিথিতে কলা, মূলা, বার্ত্তাকু, অলাবু

নব-ব্রাহ্মণ্য।

খাইতে হইবে, মাথে মূলা খাইলে বক্তবধের পাপ – ইত্যাদি বিধি বিধান লইয়া নব ব্রাহ্মণ্য কনোজ হইতে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইল। সেনরাজত্বের অধ্যায়ে আমরা এই সকল বিধি-ব্যবস্থার কারণ ও দেশের উপর তাহার ফল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে নব ব্রাহ্মণের প্রভাব খুব বেশী। এখানে তাহার উল্লেখের স্থান নাই। সেন রাজগণের প্রভাব যেখানে যেখানে গিয়াছে, সেখানে সেখানে নব-ব্রাহ্মণ্য তাহার ইস্পাত-কঠোর নিয়মাবলী লইয়া এক একটা অভ্রভেদনের সৃষ্টি করিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সমস্ত ইতিহাস মুছিয়া ফেলিয়া এই নব-ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণকে নূতন ভাবে গড়িয়াছে। তাহার হস্তে শিবের ত্রিশূল বিষ্ণুর চক্র বিশ্বকর্ম্মার পরশু, ব্রহ্মার অক্ষমালা—এ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া তাহাকে দুর্ভেদ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই শাসনের নিগড় বাঙ্গালী জাতি বেশ দিন সহ্য করে নাই। বাঙ্গালীর বিধাতা চির-বিদ্রোহীর ললাটের তিলক তাহার কপালে লিখিয়া দিয়াছেন। তাহার সনাতন নির্দ্দম বিদ্রোহ স্বাধীনতা তাহার প্রকৃতিগত নহে। এই ব্রাহ্মণ্য তাহার এক বিদেশী সন্তানের হাতে শীঘ্রই লাঞ্ছিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব এবং তদীয় পরিকরেরা যেখাইয়াছিলেন ব্রাহ্মণগণের নিগড় যত শক্ত তাহা ভাঙ্গিতে বাঙ্গালীর শক্তি তদপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু সে সকল কথা পরে লিখিব।

সেনরাজগণ যে যে স্থানে সেন রাজগণ গিয়াছিলেন, সেখানে সেখানে নব ব্রাহ্মণের সৃষ্টিকার্য্যে যাইয়া সামাজিক বিধি ব্যবস্থা এবং অবস্থার উলট পালট করিয়াছেন। যেখানে সেখানে যেখিব বাল বিবাহ প্রচলিত নহে, স্বয়ংবর বা 'ইচ্ছাবর' প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নাই, বহুবিবাহ কৌলীন্য অস্বীকৃত, জাতিভেদ খুব কঠোর ভাবে সমাজকে বাঁধিয়া ফেলে নাই সেখানে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়-উপাধি ব্রাহ্মণে নাই, চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেষ্ঠ এবং সোম, বসু, গুহ, মিত্রের প্রভাব নাই, ক যত্রের মধ্যে কায়স্থই প্রধান কুলীন, যেখানে যেখিব অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ-প্রথা সকলজাতির মধ্যে বিদ্যমান, সেই সেই স্থানে বুঝিব নব-ব্রাহ্মণ্য প্রবেশপথ পায় নাই। বঙ্গের সীমান্তে কতকগুলি স্থান আছে যেখানে সেনরাজগণ অধিকার বিস্তারের সুবিধা করিতে পারেন নাই। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্টের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বিশেষ ভাবে এখানে ময়মনসিংহ জেলার কথাই বলিব। এই জেলার মধ্যে ইহার পূর্ব্বাংশের প্রতিই আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিব।

সেনরাজগণ নব-ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক।

একসময়ে সমস্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান গুপ্তাধিকারের অন্তর্গত ছিল। সেই সময়ে গুপ্তপ্রভাব এই স্থানে খুব বেশী হইয়াছিল। তাহার ফলে পার্ব্বত্য জাতিগণের মধ্যে অনেকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং রাজবংশীয়, কোচ, হাজং, চাকমা প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা আর্য্য সমাজের অন্তর্গত হইয়াছিল। গুপ্তবংশের পতনের পর পাল-রাজত্বের সময় ময়মনসিংহ জেলা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের অধীন হয়, উক্ত রাজ্য পালগণের চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু পাল-রাজত্বের শেষভাগে ঐ স্বীকার শুধু নামে মাত্র পর্য্যবসিত হয় এবং সেনরাজগণের সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর

একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উত্তরকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজারা অত্যন্ত হীনবল ও শ্রীহীন হইয়া পড়েন এবং ময়মনসিংহ তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। বিশেষ পূর্বময়মনসিংহে উক্ত পার্ব্বত্যদলের নেতাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় শক্তি অব্যাহত রাখিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেন রাজগণ এই সকল নেতাদের বশ্যতা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, শুধু যদি বঙ্গের এক দূর সীমান্তে ক্ষুদ্র একটা রাজ্য তাঁহাদের গণ্ডীর বহির্ভূত থাকিত, তবে বিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্তু অসুবিধা এই দাঁড়াইল যে যাঁহারা সেনদের বিদ্রোহী ছিলেন সেইরূপ আড্ডা ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা ময়মনসিংহের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় ষড়যন্ত্র করিবার সুবিধা পাইতেন। সেনরাজগণ কয়েকবার এই রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শরৎকালে সম্রাট্ সৈন্য অনায়াসে এই ক্ষুদ্র দলপতিদের সৈন্য জয় করিয়া সেনরাজাঙ্কিত পতাকা উড়াইয়া জয়-পত্র প্রেরিত করিত। যথাসময়ে সেই পত্রকে উদ্ধোলন করিয়া কে কোথায় ফেলিয়া দিত, তাহার ঠিকানা নাই। তখন কংস, দনু, ভৈরব প্রভৃতি বিশাল-স্রোতা নদ-নদী প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে বিচরণ করিত। পথ ঘাট দুরধিগম্য হইত সেই দুর্গমপথ বিচরণে অভ্যস্ত কাছাড়ের মত পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ গুপ্ত পথ দিয়া আসিয়া সম্রাট্ সৈন্য ধ্বংস করিয়া ফেলিত এবং অন্ধকূপের এমন নিস্তব্ধ অন্ধে লুকাইয়া নিরাপদ্ হইত যে কাহার সাধ্য তাহাদিগকে সেখানে অনুসরণ করিতে পারে? কয়েকবার এইভাবে বহু অর্থ ও লোকক্ষয় সহ করিয়া সেনরাজগণ ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ জয়ের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাসে এই সকল কথা বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। সেনরাজগণ এতদ্দেশ আধিকারভুক্ত করিতে পারেন নাই, তাহার ফল এই হইল যে বহুকাল পর্য্যন্ত নব ব্রাহ্মণ এদেশে প্রচলিত হইতে পারে নাই, সেই সকল পার্ব্বত্য ও অপরাপর স্বাধীন শাসকগণের হাত হইতে এই স্থানগুলি সোজাসুজি মুসলমানগণের হস্তগত হয়। এই প্রদেশ যবনাক্রান্ত সেনরাজগণ এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই। পূর্ব্বে দুর্গাপুর অঞ্চলটা কোচবংশীয় 'সারো' নামক রাজার অধীন ছিল। ইহার রাজ্য এক সময়ে বহু বিস্তৃত ছিল। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সোমেশ্বর সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ-সেনাপতি পশ্চিম হইতে আসিয়া এই পাহাড়-বেষ্টিত দুর্গাপুরটি অধিকার করেন। সুতরাং সেনরাজগণের সঙ্গে এই রাজ্যের কোন সংস্রব হয় নাই। দুর্গাপুর

সেরপুর বা বগুড়া অঞ্চলের শেষ রাজা ছিলেন রাজবংশী দিলীপ সামন্ত। ইঁহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকের প্রস্তর গড়ের এখনও কিছু কিছু চিহ্ন আছে—উহা এখন 'গড়জরিপা' নামে পরিচিত। 'জরিপা' শব্দ 'দিলীপ' শব্দের অপভ্রংশ। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে হিসোজ সাহার সেনাপতি মজলিস হুমায়ুন দিলীপ-সামন্তকে নিহত করিয়া এই রাজ্য অধিকার করেন। সুতরাং এখানেও নব-ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব কিছুমাত্র হইতে পারে নাই। এইভাবে অঙ্গবঙ্গী রাজ্যটিও কোচ রাজা বগুড়া

হইতে মুসলমানগণের অধিকৃত হয়। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে দুই ভাই রাম ও লক্ষ্মণ হাজরা রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ হাজরা ছিলেন বড়, তিনিই রাজা ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইশাখাঁ মসনদ আলি ঐ সনে দ্বিপ্রহর রাত্রে অতর্কিতভাবে লক্ষ্মণ হাজরার রাজধানী আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ হাজরা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদবধি জঙ্গলবাড়ীতে ইশাখাঁর বংশধর 'দেওয়ানগণ' সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইভাবে যমলপুর, বোকাইনগর প্রভৃতি স্থান রাজবংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের হস্ত হইতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমানগণ অধিকার করেন। বৌদ্ধাধিকার হইতে এদেশে বহু কাহিনী ও উপকথা প্রচলিত ছিল, তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'ত্যাগ'। গুপ্ত ও পাল অধিকারেও এই আদর্শ শিথিল হয় নাই। জীবে দয়া ও ত্যাগের মহিমা এই সকল গল্প সাহিত্যের মর্মস্থ ছিল। জাতক উপাখ্যানের আদর্শ এই ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। নাগানন্দ নাটকে (৭ম শতাব্দী) এই ত্যাগে অদ্ভুত কল্পনা সংমিশ্রিত হওয়াতে রাজপুত্র নাগানন্দের চরিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য যুগের সর্বপ্রধান কথা ছাড়া ও প্রেম। কিন্তু বৌদ্ধযুগে ত্যাগ ও দয়া প্রধান বস্তু ছিল, কাজেই তখন প্রেম ছিল ভক্তির বিশেষ কোন আভাস তৎকালের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধগণ কঠোরপন্থী ছিলেন, সুতরাং ত্যাগমিশ্রিত কথাই তখন বঙ্গের প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সে ছিল এদেশের এক অন্ধকারময় যুগ। তখন লোকের চরিত্র মহৎ ও নির্মল ছিল, কোন সুন্দরীকে পাইতে হইলে মহৎ ত্যাগ ও পুরুষকার দিয়া তাহার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইত। "None but the brave deserves the fair" কথাটার সে যুগে পুরুষকারের সার্থকতা ছিল। রমণীদিগকে অশেষ সহিষ্ণুতা ও একনিষ্ঠ তপস্যা দ্বারা মনোমীত পতির উপযুক্ত হইতে হইত। তখন বিজয়ী পুরুষেরা ডাঙ্গা খুঁড়িয়া চীন, জাপান প্রভৃতি এশিয়ার সর্বদেশে যাতায়াত করিতেন। পুরুষগণের বীর্যবত্তার ক্ষেত্র অবাধ ছিল।

এই সময়কার উপকথাগুলিতে সেই বিক্রম, পুরুষকার, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত আমরা কল্পসাহিত্যে আস্বাদ করিতে পাইয়াছি। আমাদের আশ্চর্যের বিষয় এই যে পুরুষযুগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু চিত্তহারী ও অপূর্ব তাহার অনেক সামগ্রী আমরা নিম্নশ্রেণীর নিকট হইতে পাইতেছি। যে সকল অদ্ভুতকর্মা শিল্পী অজন্তার চিত্র আঁকিয়াছিলেন এবং ইলোরা ও খজুরাহের অপূর্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা এখন জগতের বিস্ময় ও হিন্দুগৌরবের মুকুটমণি, সেই সকল শিল্পী কাহারা ছিলেন? তাঁহারা খুব সম্ভব নিম্নশ্রেণীর লোক, কারণ তাঁহাদের এই ব্যবসায় সমাজের দুই ধাপ নিম্নে অবস্থিত ব্যক্তিদের বৃত্তি—বৈশ্যবৃত্তি। সেইরূপ এই সকল উপকথার মধ্যে যে ত্যাগ ও অপরাপর গুণের আদর্শ আছে তাহা বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু শাস্ত্রের সার কথা হইলেও এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট হইতেই আমরা পাইতেছি। কিভাবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই সকল অদ্ভুত তত্ত্ব শিখিয়াছিল এবং যাহা

জঙ্গলবাড়ী

কল্পসাহিত্যের উপাদান

গল্পগুলির উপাদানের কথা

কিছু আধ্যাত্মিক জগতের অতি উচ্চ ও উচ্চাঙ্গের সমস্যা, তাহা কবিজনোচিত সারল্যের সহিত এমন সহজ করিয়া কি কৌশলে কে তাহাদিগকে বুঝাইতে শিখাইল, এই কূট প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাইব? কিন্তু এই সকল উপাখ্যান রাজকন্যারা শুনিতেন, সর্ব্বসাধারণে শুনিত, রাজারা রাজসভায় বসিয়া শুনিতেন, অন্তঃপুরচারিণীরা অবরোধে বসিয়া শুনিতেন সুতরাং কথা-আবৃত্তিকারিণী নাপিতানী বা অন্য কোন নিম্নশ্রেণীর লোক হইলেও সেই কথার মূল্য তো আমরা কমাইতে পারি না। সাধারণ লোকেরা এই যে উচ্চাঙ্গের কথা-কৌশল, চরিত্র-বর্ণন ও মনস্তাত্ত্বিক অনবদ্য প্রেমকাহিনী বলিতে শিখিয়াছিল, তাহাতে দুই হইবে উন্নত আর্য্যসভ্যতা এদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে কতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল।*

ব্রাহ্মণগণ গল্প-সাহিত্যের প্রতিবাদী।

নব ব্রাহ্মণ্য এই সকল গল্পের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, ইহাতে প্রেমের যে স্বাধীন হাওয়া আছে, তাহা ব্রাহ্মণেরা সহ্য করিতে পারিলেন না। ইহাতে বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষসঙ্গ আছে, তাহা তো একেবারে গোঁড়া সমাজের অসহ্য। কোন কোন সময়ে অভিভাবকের মত লঙ্ঘন করিয়া নায়িকা নিজের মনোমিলনের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন এবং প্রেমের একনিষ্ঠ তপস্যা বজায় রাখিয়াছেন, ব্রাহ্মণের ইহা চক্ষুঃশূল হইল। প্রত্যেক নায়িকাই বয়স্থা। গৌরীদানের ফল ইহার একটি গল্পও স্বীকার করে নাই। এইরূপ নানা কারণে ব্রাহ্মণেরা গল্পগুলির প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু গল্পগুলি যে বিমলানন্দ দান করিয়া সমাজকে নিত্য-পুষ্ট ও পুলকিত রাখিয়াছিল, তাহার স্থান পূরণ করিবে কে? ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের অধিকৃত সমস্ত দেশ হইতে কথা-সাহিত্যের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। কথা যে সকল লোকের উপজীবিকা ছিল, তাহারা ইহা ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিল। কেবল দূরদেশে, যেখানে ব্রহ্মব্রাহ্মণ্য ভাল করিয়া প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই, সেইখানে সেইসকল গুণী ব্যক্তিরা এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবসায় কোন রকমে বজায় রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিষেধবাক্যে বঙ্গে শত শত মুখে কোকিল ও পাপিয়ার কণ্ঠ হঠাৎ রোধ হইয়া গেল। কেবল কোন দূর পল্লীর নিভৃত কোণে বসিয়া সাঁঝের প্রদীপ

* এই সকল পল্লীগাথার যথার্থ প্রশংসা বিদেশ হইতে আসিতেছে। সুবিখ্যাত ফরাসী চিত্রকরী মাদমোয়াজেল ভেরণ লিখিয়াছেন, "In reading these ballads one is reminded of other eternal classical masterpieces. They deserve to be on the same shelf as these, among the books that never grow old and in which each generation discovers new reasons to love them. How much I wish that circumstances might allow me to translate them and publish them in France. ইংরেজী লেখক "মাথা-খারাপ" কবিকে তাঁহাদের Quest and Infant প্রভৃতি উপন্যাসের La Princesse de Clèves লেখিকা Madame de Lafayette হইতে বড় মনে করিয়াছেন। তিনি "মাদল বধূর" চিত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কবি এই কয়েক ছত্রে বৃদ্ধার পরের যে ছবি আঁকিয়াছেন, মেটারলিঙ্ক তাঁহার অনেক নাটকায় সেইরূপ ছবি আঁকিতে যাইয়া বিফল হইয়াছেন—" This ballad has in a few lines expressed much more and what a picture !" এই ভাবের প্রশংসা বিদেশের সাহিত্য অনেক স্থলে সমালোচক করিয়াছেন।

আসাইয়া এখনও দুই একজন গুরুকেশী বৃদ্ধা নিশ্চিন্ত মনে নিজের স্নেহের দুলালদিগের কৌতূহল পূরণ করিবার জন্য পুরাগত বংশীরবের মত সেই রাজকন্যা ও রাজপুত্রের প্রেমকাহিনী—জীবনক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রাণান্ত পরীক্ষা ও চরম তপস্যার কথা শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু আর কেতদিন চলিবে না। তাঁহাদের সংখ্যা যে হারে হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে আর দশবৎসর-মধ্যে তাঁহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া অন্তর্হিত হইবেন।

ব্রাহ্মণেরা কি বিষয় করিলেন ও কি বিষয়ে।

ব্রাহ্মণেরা এই অধিবাহিত নরনারীর প্রেমকাহিনী সমর্থন করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা একহাতে গ্রহণ আর একহাতে দান করিলেন। তাঁহারা নদীর এপার ভাঙ্গিয়া ওপার গড়িলেন। তাঁহারা এই সকল লৌকিক প্রেমমূলক উপকথা ও স্বাধীন নায়ক-নায়িকার কাহিনী অগ্রাহ্য করিয়া দেবলীলার কথা বলিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টিত হইলেন। লোকশিক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই তাঁহারা নিজেদের হাতে রাখিলেন। যাহারা গল্প শুনাইয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিত, তাহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল, কিন্তু এবার কথক ঠাকুর গলায় শ্বেত শুভ্র পৈতা দোলাইয়া মাথা ও কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরিয়া বেদীর উপর চাপিয়া বসিলেন। তাঁহারা মহাভারতের কথা, রামায়ণের কথা, ভাগবতের কথা, ধ্রুব প্রহ্লাদের উপাখ্যান, হরিরাজ রাজার একাদশী প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প শুনাইতে লাগিলেন। সেই যে রাজপুত্র, সদাগরের পুত্র ও নায়িকার কথা তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল, কিন্তু সুখের বিষয় আমরা প্রাচীন যুগের, সেই লুপ্তপ্রায় উপাখ্যানের অনেকগুলি উদ্ধার করিয়াছি। হিন্দুযুগের সঙ্গে এই গুপ্ত ও বৌদ্ধ যুগের আদর্শের তুলনা মূলক সমালোচনার উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে—বৌদ্ধ-যুগের সেই সকল রূপমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চন রেখা, কাঞ্চনমালার উপাখ্যানই ভাল কিংবা পৌরাণিক যুগের ধ্রুব প্রহ্লাদের গল্পই ভাল তাহা লইয়া বিতর্ক করা অনাবশ্যক। তবে হিন্দু নবব্রাহ্মণ্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কিরূপ গল্প রচনা করিত, এই অধ্যায়ে তাহার আভাস দিয়া পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে ভক্তিমূলক দেবলীলা ও দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনীগুলি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

'আলাপিনী'।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি গল্প করার প্রথা বর্ব্বর জাতির মধ্যেও আছে—ইহা কোন যুগ-বিশেষের নিজস্ব নহে। প্রায় পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি লিখিয়াছিলেন যখন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মাতুলালয়ে ভরত বিষণ্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন রাজসভার নিযুক্ত কথাব্যবসায়ীরা কথা শুনাইয়া তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা পাইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে মাগধী ও নাগিকরমণীগণই প্রধানতঃ অন্তরমহলে কথা বলিত তাঁহাদের নাম ছিল "আলাপিনী"। মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর (১৫৭৫ খৃঃ) পুস্তকে আমরা কথাব্যবসায়ীদের এই উপাধি পাইয়াছি। তিনি সীতার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "উপকথা সীতারে শুনায় 'আলাপিনী'।" এই আলাপিনীগণ রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্দরে মহিলাদিগের গায়ে বসনভূষণ পরাইবার সর্ব্ববিধ কৌশল অবগত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃতে সেই কৌশলের যে বর্ণনা আছে,

তাহাতে বুঝা যায় বেশ্যাদের কলা-শাস্ত্রে কতটা অধিকার ছিল। আঁতুড়ঘরে—বিশেষতঃ ষষ্ঠীর দিন ইহারা বড় ঘরের মেয়েদিগকে গল্প শুনাইয়া নির্জ্জনতার শ্রান্তি ও অবসাদ দূর করিত। বাহিরে গল্প বলিতে সুদক্ষ ব্যক্তিরা গানের সঙ্গে মিশাইয়া নানারূপ গল্প বলিত। ইহা তাহাদের পেশা ছিল। রাজসভায় কথা বলিবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকিত। সেদিনও আলিবর্দ্দির রোজ গল্পকারকের সঙ্গে দিবসের কতকটা সময় কাটাইতেন এবং মীরন মরিবার রাত্রিতেও এক আলাপিনীর সঙ্গে বসিয়া গল্প শুনিতেছিলেন, মুতাক্ষরিনে একথা লিখিত আছে। এরূপ জনৈক কথাব্যবসায়ী আমার জানা ছিল, তাঁহার নাম ছিল ভারতচন্দ্র রায়, ইনি ঢাকা জেলায় সাভার গ্রামবাসী ছিলেন। ত্রিপুরার রাজসভায় তিনি গল্প শুনাইতেন, রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি রাজপরিবারগণ রাজসভায় নিযুক্ত গল্পকারকের কাছে সেই সকল উপাখ্যান শুনিতেন। এই কাজে ভারতচন্দ্র রায় মহাশয়ের মাসিক বেতন ছিল ৬০৲ টাকা।

ভারতচন্দ্র রায়।

গল্পগুলি বলিবার এই ধারা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছিল—যাহার শেষ রাজসভার কথাব্যবসায়ী ভারত রায় ছিলেন—তাঁহার পর হইতে বঙ্গদেশের এই ধারা লোপ পাইয়া গিয়াছে, ভারত রায়ের মুখে আমি গল্প শুনিয়াছি, তাহা করুণ, অদ্ভুত, হাস্য প্রভৃতি রসের উৎসস্বরূপ ছিল।

এই যে কথা বলিবার ধারা এতকাল ধরিয়া এদেশে চলিয়াছিল, তাহাতে গল্প বলিবার কৌশল এতদ্দেশে পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছিল। এইভাবের গল্পগুলি কিরূপ উচ্চাঙ্গের তাহা দেখাইবার জন্য বৌদ্ধযুগের একটি গল্পের কথা আমি এখানে বলিব।

১। গীতিকথা, মালঞ্চমালার গল্প।

ইহা মালঞ্চমালার কাহিনী। খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইহা বিরচিত হইয়াছিল বহুকাল হইতে উহা কথিত হইয়া আসাতে উহার ভাষার অবশ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয় উহা এক ৮০ বৎসরের বৃদ্ধার মুখে শুনিয়া তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন, পাছে তাঁহার নিজের কোন পরিবর্ত্তন অলক্ষিতে আসিয়া পড়ে, এই জন্য তিনি দ্রুত লিপিতে সাবধানতার সহিত গল্পটি টুকিয়া লইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা তাঁহার পিতামহীর নিকট গল্পটি শিখিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স ছিল ৯০। এই ভাবে যুগে যুগে গল্পটি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আলাপিনী পূর্ব্বপ্রচলিত-কাহিনী অতি অদ্ভুতভাবে অনুকরণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। গল্প বলিবার সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তিনী রমণী যেখানে হাসিতেন, কাঁদিতেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেন, হাতের যে ভঙ্গী করিতেন, তিনি তাহার সমস্ত মুদ্রাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই আলাপিনী বলিয়াছেন, তিনি যাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তিনিও সেইভাবেই তাঁহার নিকট এই বর্ণনা-কৌশল শিখিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার ভাষার খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাণিজ্যকেন্দ্রের ভাষাগুলিই সাধারণতঃ বেশী পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বাহিরের সর্ব্বপ্রকারের প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া বঙ্গের অজ পাড়াগাঁগুলির ভাষা বিশেষরূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। দক্ষিণাবাবুর ঠাকুরমার ঝুলি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন

মালঞ্চমালার গল্পের ভাষা ছুৎমার্গ বলিয়া অবশ্য সরকার প্রমুখ সমালোচকবর্গ এই গল্প এখনকার দিনে অচল, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া পরবর্তী সংস্করণগুলির ভাষা দক্ষিণারঞ্জন অনেকটা পরিবর্তিত করিয়াছেন।

এই গল্পে প্রাচীনযুগের যে সকল নিদর্শন আছে, তাহাই ইহার নব ব্রাহ্মণ্যযুগের পুরুষ ইহার অকাট্য প্রমাণ ইহার প্রতি অধ্যায়ে তান্ত্রিকতার প্রভাব স্পষ্ট, মালঞ্চমালা মৃত স্বামীর সহিত শ্মশানে পুড়িতেছেন, তাঁহার ছিন্ন হস্ত ও নাসিকা হইতে অজস্র রক্ত ছুটিতেছে—পিশাচগণ লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া সেই রক্তধারা চাটিয়া খাইতেছে। ঘিয়ানো রাত্রি, ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি, পিশাচেরা তাঁহার স্বামীর শবটি চাহিয়া উৎপাত করিতেছে কিন্তু সাধ্বীর অটল সংকল্প দেখিয়া তাহারা নিরস্ত হইয়া গেল তার পর আসিল জলকুম্ভীর ও বাঘ, তাহাদিগকেও তিনি স্বামীর শব দিলেন না, বরং তাড়াইয়া বরিষ রাখিলেন। প্রলোভনের দেবতা পরম সুন্দরী রমণীমূর্তি ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া তুষিত শবটি ফেলিয়া দিতে পরামর্শ দিল রজনীর অন্ধকারের শেষ হয় না, তাহাও যেন মালঞ্চের বিরুদ্ধে কিন্তু মালঞ্চ হাসিতে বলিলেন 'আমি তোমার নক্ষত্রগুলিকে আগুনে পরিণত করিব' ভয়ে নিশাচরী প্রস্থান করিল তাঁহার অলৌকিক তপস্যার মধ্যেও শিশুসুলভ মায়া পাইল তিনি তাঁহার সমস্ত প্রাণের মধ্যেও কি তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন, এই আকাঙ্ক্ষার বলে তাঁহার অন্ধ চক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন স্বামীকে সেবা করিবার জন্য তাঁহার উৎকট তপস্যারনিত যে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল তাহার ফলে তিনি হাত ফিরিয়া পাইলেন শুধু এই কয়েকটি স্থানে নহে, সমস্ত গল্পটি জুড়িয়া তান্ত্রিক তপস্যা ও তাহার কিরূপ সিদ্ধিলাভ করা যায় তাহার বর্ণনা আছে। এই গল্পটি পড়িবার সময়ে বিক্রমাদিত্যের ভাল-বেতাল সিদ্ধির কথা মনে পড়ে কিন্তু ইহা আরব্য উপন্যাসের অথবা কথাসরিৎসাগরের অলৌকিক গল্পের মত আদৌ নহে। ইহার তান্ত্রিকতা ও অলৌকিকত্বের মধ্যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্বোধনের কথা অন্তর্নিহিত, এইজন্য এই অলৌকিক কাহিনী কোন মোটিভ অনুসরণ করিয়া মনে করাইয়া দেয় মালঞ্চ অপোগণ্ড শিশুর মত, সেই অপোগণ্ড শিশুকে তিনি মাতৃস্নেহে পালন করিলেন। বাৎসল্যের এরূপ একখানি নিখুঁত ছবি বোধ হয় যশোদা মাতার আঙিনা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। মালঞ্চ যখন যাহা করিয়াছে, তাহা সমস্তই হৃদয়ের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি সমাকৃতাবে প্রয়োগ করিয়া এই অদ্ভুত অলৌকিক গল্পের মধ্যে সকলা কর্মের মাহাত্ম্য ও তপস্যার গৌরব পরিস্ফুট হয়, এজন্য রাজপ্রাসাদে, শ্মশানে, বাসন্তকুল অরণ্যে, মালিনীর গৃহে মালঞ্চ কর্ম ও তপস্যা গৌরবে সকলের দেবীর পর্যায়ে আসীন, কোথাওও মানুষী নহেন যখন রাজা তাঁহার তিন দিনের শিশু পুত্রের সহিত মালঞ্চের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন কোটালের কন্যা মালঞ্চ বুঝিল, তাহার পিতার সামাজিক হীনত্বের জন্য রাজবধূর উচিত মর্যাদা সে সেই রাজপুরে পাইবে না এজন্য সে রাজার কাছে তিনটি সর্ত চাহিল এক একটির

তান্ত্রিকতা।

অলৌকিকত্ব।

পর রাজা তাহাকে উৎকট শাস্তি দিতে লাগিলেন তাহার কর্ণ, নাসিকা, এবং হাত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন কিন্তু এক এক শাস্তি দান করিয়া সে পরবর্তী সত্যগুলি বলিতে সাহস হারাইল না পূর্বাপেক্ষা উৎকটতর শাস্তি বরণ করিয়া লইয়া সে তাহার সত্য বলিতে থাকিল। মোট কথা ছেলেটা মালক অকিঞ্চিৎকর মনে করত মালকমালার গল্প শেষ করিলে মনে হইবে, সে বিদেহী, ইন্দ্রিয়াতীত, কর্তব্যের জীবন্ত প্রতীক,—একটি নারীমূর্তি অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি যখন রাজার গুহায় সে স্নেহ ও যত্ন পাইয়া সুখী, তখন তাহার স্বামী পাঁচ বৎসরে পা দিয়াছে। এ সময়ে তো লেখা পড়া শিখাইতে হয় সে যে রাজ্যের রাজা হইবে, মালকের উপর উহার ভার ন্যস্ত সম্মুখে যে বিপদই থাকুক না কেন, যে দিন স্বামী পাঁচবৎসরে পা দিল সেইদিন সমস্ত স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিরাপদে শান্তির আশ্রয় ছাড়িয়া সে তাহার জীবনব্রত অকূলে ভাসাইল মুনকধা তাহার নিকট বিপদ অকিঞ্চিৎকর, দৈহিক সুখ অকিঞ্চিৎকর। তাহার জীবন একটা তপস্যার প্রদীপ। যেদিন রাজকুমার চন্দ্রমালক লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত, সে ঘোর রাত্রে রাজদের সাহায্যে কারাগারে প্রবেশ করিল লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিবার উৎকট চেষ্টায় শিকলের প্রতিঘাতের বন্ধন তাহার আঁটি করিয়া হাত ভাঙ্গিয়া গেল, নিশাশেষে শৃঙ্খলভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রক্তস্রোতে মুখ ভাসিতেছে, মালক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল রাজকুমার তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নিজে মুক্তি পাইলেন এই অমানুষী দৈবশক্তি কর্ণ ও তপস্যাজাত কমনীয়কান্তি রাজা তাহার শ্বশুর, মালককে ডাকিনী মনে করিতেন, একস্থ যে পথে সে যাইত, তাহা কাঁটায় বিরিয়া রাখিতেন। পুকুরে পাহারা রাখিতেন যে মালক জল না খাইতে পারে। প্রতি পদক্ষেপে শ্বশুরের নির্মম অত্যাচার ও দানবলীলা দেখিয়া মালক বলিতেন "তবু আমার শ্বশুর আছেন, আমাকে কষ্ট দিবে এমনও ত আর কেহ নাই।" চন্দ্রমালকের জন্য মালক না করিয়াছিল এমন কৃচ্ছ্র নাই। তাহার যত্ন, স্নেহ, অধ্যাত্মজগতের ছায়া জগতের কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা হয় না। সেই স্বামী রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। অশ্বরাজ ঘোড়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আরোহীকে তৎপৃষ্ঠে না দেখিয়া মালকের প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু সে যখন শুনিল, কুমার এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছে—তখন বলিল "আমার স্বামী এখন সুখী হইয়াছেন, আমার মত সৌভাগ্যবতী কে? এখনতো আমার জীবনের আর দরকার নাই, যে পুকুরের জলে আমি বিবাহের প্রথম প্রস্তাব শুনিয়াছিলাম, কলহংস তখন সেই সরোবরের নীলজলে বিচরণ করিতেছিল, প্রভাতের সূর্য্য পুকুরের পদ্মকুড়িগুলি ফুটাইয়া দিয়াছিল, সেই আমার পিতামহাদের বাড়ীর পুকুর—তাহার সুশীতল জলই এখন আমার প্রকৃত দুঃখ নিবৃত্তির স্থান, তাহাতে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া আমি মরিব।"

নিরাপদ রক্ষাকবচ।

সরোবরের স্নেহ।

স্বামীর সঙ্গে রাজকন্যা রহিয়া আছেন, মালক একবার স্বামীকে দেখিবে পা টিপিয়া

গভীর রাত্রে বাসর-গৃহে প্রবেশ করিল দেখিল চন্দ্রা নিদ্রিত, তখন পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সে যে গানটি গাহিয়াছিল তাহা ভাগবতীলতার চরম। মানুষের মুখে তেমন কথা ফোটে না, তাহা স্বর্গীয় দেবতার বাণী, নন্দনের দেব-পুষ্প—

"সুখে থাইকো—সুখে থাইকো রে রাজপুত্র, সুখে থাইকো রে রাজকন্যা
যদি সতীর মুখের কথা সুপ্রভাতে ফলে—রে।
বাসরের পদীপ যেন সাত পুকুরে নেভালে। রাজছত্র যেন চৌদ্দপুরুষের
মাথায় থাকে—রে।
জল, থল, বন, বৃক্ষ, যেন সজাগ হয়া থাইকো রে—রাজমন্দিরের চূড়া
যেন অমর হয়া থাইকো রে চন্দ্র সূর্য্য যেন রে সমভাগে হাসে
আমার শ্বশুরের ঘর, আমার সোয়ামীর পীড়ি, অক্ষয় করা রাইখো বিধাতা।
রাজকন্যার আগত যেন হাতে পাতে করে—রে হে ধাতা,
তুমি আমারে দেও এই বর চৌদ্দভরা পূর্ণ কর আমার শ্বশুরের সংসার
ওরে আমি তল মাটি হয়া থাকিমো রে, আমি ভুঞ্জিমো কত সুখ
ওরে আমি পদ্ম পক্ষ হয়া থাকিমো রে। আমি ভুঞ্জিমো রে কতই সুখ।"

তাহার শ্বশুর যেখানে প্রথম দিন তাহাকে আদর করিয়া রাজপ্রাসাদে আসিতে অনুরোধ করিলেন, সেখানকার ধূলি মাথায় লইয়া বালক বলিল "আজ এইখানে সর্ব্বপ্রথম তোমার মুখের আদর পাইলাম। এইখান আমার নিকট পুণ্য তীর্থ। এ স্থানের কাছে আমি রাজপ্রাসাদ নগণ্য মনে করি।"

আদর কাহাকে, ঈহাদের কাহাকে বলে।

বালকচরিত্রে আত্মার স্বরূপ দৃষ্ট হয়। তিনি দেহকে যেমন অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়াছেন, রাজপ্রাসাদও তাঁহার কাছে তেমনি অকিঞ্চিৎকর ইনি ছিলেন ভাবজগতের মানুষ, ধনিমাণিক্য অপেক্ষা মুখের কথাতে বেশী মূল্য দিতেন। এই জন্য শ্বশুরের পদরজঃ-পূত তাঁহার আদরের বাণীর প্রথম ক্ষেত্রকে তিনি তীর্থ মনে করিয়াছিলেন।

তিনি আমন্ত্রণমাত্র রাজপ্রাসাদে আসিলেন না। যাহারা তাঁহার পরম শত্রু ছিল, তিনি অপূর্ব্ব তপস্যাদ্বারা তাঁহাদের জীবন দান করিলেন, যাহারা তাঁহাকে কোনও দিন দুটি স্নেহের কথা বলিয়াছিল বা কোনরূপ উপকার করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে লইয়া রাজপ্রাসাদে আসিলেন তিনি এমন সুখ চান নাই, যাহার অংশ তিনি অপরকে দিতে পারিবেন না। কাহাকেও দুঃখী রাখিয়া তিনি নিজে সুখী হইতে চান না। ইহা নিচক বৌদ্ধ আদর্শ।

তখন রাজপ্রাসাদে বিপুল পুষ্পভোরণ উঠিয়া গিয়াছে, নহবৎ প্রভাতী রাগিণীতে

গৃহলক্ষ্মী দেবী-প্রতিমা মালকমালার আগমনী গাহিতেছে, নক্ষত্রমিত্র সকলের বিপক্ষদল লইয়া বিপুল সমারোহপূর্বক মালকমালা স্বামিগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সখী আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল, তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তিনি নিজের ভোগের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া রাজকন্যা কাকীকে পাটমহিষীস্বরূপ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন, তাহাকে স্বামীর পার্শ্বে বসাইলেন, নিজে ভোগনিঃস্পৃহ আনন্দময়ীর ন্যায় সেই রাজসংসারে কর্ত্রী হইলেন। প্রজারা কাকীকে 'পাটরাণী' বলিয়া জানিল, কিন্তু মালকমালার নাম দিল "ঠাকুরাণী"। তাহারা বুঝিয়াছিল একজন যাদুরী, আর একজন দেবী।

অবোধনা।

'পাটরাণী' ও 'ঠাকুরাণী'।

যাহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া কথা শিখিয়াছে, বিশেষতঃ যাহাদের শ্রোতা ছিল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলারা, তাহারা গল্পকে নানা শিল্পকলায় সাজাইতে পারিত। তাহারা অলঙ্কারশাস্ত্র না পড়িয়াও এমনই সকল কায়দা কানুন জানিত, যাহাতে বর্ণনা নিখুঁত হইত।

এই মালকমালা গল্পের বাঁধুনিটি চমৎকার। প্রথমতঃ আতুড়ঘরে রাজকুমারের মৃত্যু, এইখানেই গল্পটি শেষ হইতে পারিত, কিন্তু মালকের মত দেবীর হাতে তাহার জীবন, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে, সুতরাং গল্প থামিল না। এইভাবে স্বাভাবিক ক্রমে গল্প আবার চলিল। কাকীর সঙ্গে বিবাহের পর গল্পের আখ্যান ফুরাইয়া গেল, এইখানে গল্প পুনরায় শেষ করা যাইতে পারিত, কিন্তু বিবাহ করা মাত্র সেই রাজ্যের নিয়মানুসারে রাজকুমার বন্দী হইলেন, তখন তাহার মুক্তি দেওয়ার দরকার হইল, গল্পের গতি থামিল না। মুক্তি পাওয়ার পরে চক্রমাণিক আনন্দাসবের মালকমালাকে রাজপ্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দিলেন। এইখানে গল্পের স্বাভাবিক ভাবে ইতি হইতে পারিত, কিন্তু মালকের মত তপস্বিনীর শক্তিসিদ্ধি না দেখাইলে গল্প পঙ্গু হইয়া পড়িত, সুতরাং নৈতিক প্রয়োজনে আরও খানিক দূরে যাইতে হইল। এই নায়িকাকে যদি প্রথম শ্বশুর গ্রহণ করিতেন, তবে তাহা যোগ্য হইত না। গল্পকার এমন এক শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন যখন রাজা প্রজা একত্র হইয়া মালকমালাকে সংবর্ধনা করিয়া লইবেন। আকাশ হইতে দেবতারা যে মালকের কর্মগুলি দেখিতেছিলেন, কর্মফল হাতে করিয়া তাঁহাকে দেওয়ার জন্য, তাঁহারা শুধু একটা যোগ্য মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বন্দীরা মুক্ত হইল, মৃতেরা জীবন পাইল, বহুদিন যাহারা কষ্ট দিয়াছিলেন এমন সকল বন্ধু শত্রুরা মিত্র হইয়া দাঁড়াইল। যখন এই ভাবে সুবাতাস বহিল, তখন গৃহলক্ষ্মী পরিপূর্ণ মহিমায় গৃহে ফিরিলেন। কোটালের কন্যা রাজঅনুগ্রহে প্রাসাদে একটুখানি জায়গা পাইয়া কৃতার্থ হইল না, তাহার কর্ম দ্বারা, মহাতপস্যা দ্বারা অর্জিত বিপুল সংবর্ধনা পাইয়া গৃহে ফিরিল।

গল্পের বাঁধুনি।

এই গল্প যে বৌদ্ধযুগের তাহার প্রমাণ কি? প্রথম প্রমাণ ইহার মূলমন্ত্র ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্ম। পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের যে অধ্যায় সুরু হইবে তাহাতে কর্ম কিছুই নহে,

একমাত্র প্রেমই লক্ষ্য হইল, কর্ম-গৌরব একেবারে লুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ্য যুগে বিপদে পড়িলে লোকে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা পাইত না, কেবল মা, মা বলিয়া চণ্ডী, মনসা দেবী বা অপর কোন দেবতার নাম জপ করিত। সেই যুগের স্মৃতিকারেরা বলিলেন, একবার হরি নাম করিলে যত পাপ নষ্ট হয়, তত পাপ মানুষ সারাজীবনে করিতে পারে না। একবার মাত্র গঙ্গায় অবগাহন, একবার মাত্র তুলসীতলায় দীপ জ্বালা, আরতির সময়ে শঙ্খে ফুঁ দেওয়া কিংবা একটিমাত্র বিল্বদল শিবের পায়ে দেওয়া—তাহা হইলেই যতই বিপুল অর্জিত হউক না কেন—সমস্ত দূর হইবে। যাঁহারা বন্দী হইতেন বা মশানে নীত হইতেন, তাঁহারা বসিয়া বসিয়া চণ্ডীর 'চৌতিশা' জপ করিতেন, মালঞ্চের মত সারারাত্রি লৌহের শিকল কাটিতে যাইয়া দাঁতগুলি হারাইতেন না। মালঞ্চের অস্ত্রশিক্ষার পূর্ণ কৃতিত্বের যুগে বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, যেমন কাজ করিবে তেমন ফল পাইবে, কর্মফল নষ্ট করিতে পারেন, এমন কোন দেবতা নাই। মালঞ্চ নানা বিপদে পড়িয়া একটিবার কোন দেবতার নাম করেন নাই।

মধ্যে বৌদ্ধযুগের প্রমাণ

দ্বিতীয় প্রমাণ—এই গল্পে ব্রাহ্মণের কোন উচ্চস্থান নাই, তাঁহাকে দান করা, ভক্তি করা ইত্যাদির ফল বর্ণিত হয় নাই।

তৃতীয় প্রমাণ—ইহার পরিপূর্ণ তান্ত্রিকতা, এই তান্ত্রিকতা ব্রাহ্মণ-আসিত নয় হিন্দুধর্মে বিশেষ আদৃত হয় নাই। বিশেষ ব্রাহ্মণ প্রভাবযুক্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তান্ত্রিকতার কোন আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না।

চতুর্থ প্রমাণ—কথক ঠাকুর বেদীতে বসিয়া, কীর্তনীয়ারা খোলের আওয়াজে নাচিয়া গাহিয়া, পুরাণব্যাখ্যাকারীরা ফুলমালা গলায় ঝোলাইয়া, পুরোহিতেরা শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার মধ্যে মালঞ্চমালার চরিত্রে যে সকল গুণ-গৌরব দৃষ্ট হয়,—তাহার কোনটি প্রশংসিত নহে। উপবাস করিয়া থাকিবার পুণ্য, ভক্তিতে রোমাঞ্চ হইয়া আঙ্গিনায় লুটাইয়া পড়া, হরি বলিতে চক্ষে জল বহা, ইত্যাদি ব্রাহ্মণ কথিত কোন পুণ্যই মালঞ্চ অর্জন করেন নাই। বরঞ্চ তিনি এতকাল জঙ্গলে কাটাইলেন, কতকাল অজ্ঞাতকুলশীল মাঝির বাড়ী ছিলেন—এজন্য তাহার কোনই কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। কোন কঠোর পরীক্ষা দিতে হইল না, ইহা হইতে অনেক পরিমাণে কম অপরাধী বেহুলা মৃত স্বামীকে লইয়া জলে ভাসিয়া ছয়মাস কোথায় ছিল—কেহ জানিত না, তজ্জন্য জাতিগণ চাঁদ সদাগরের সন্তান দোরাত্ম্যের আপত্তি উত্থাপনপূর্বক বেহুলার হাতে ভাত খাইবে না—সঙ্কল্প করিয়া বলিদ্বারকে বিদায় করিয়া তুলিয়াছিল, এবং খুল্লনা কয়েকদিন অপত্নী কর্তৃক দিনের বেলায় ছাগ রাখিতে নিযুক্ত হওয়ার পরম ধনপতিকে তাহার জ্ঞাতিরা যেরূপ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সামাজিক দৌরাত্ম্যের এইরূপ দৃষ্টান্ত হিন্দু সাহিত্যে আরও ঢের পাওয়া যায়।

পঞ্চম প্রমাণ—ভাষা। মালঞ্চমালা একটি পাঁচালী—ইহার অধিকাংশ গদ্য, এবং মাঝে মাঝে পদ্য। বহু শতাব্দীর আবৃত্তির ফলে গদ্যাংশের ভাষা অবশ্যই পরিবর্তিত

হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চাংশের ভাষা তত শুদ্ধ পরিবর্তিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পঞ্চাংশের ভাষা অতীব দুর্বোধ। তাহা বোধ হয় মূল রচনার অনেকটা অনুবর্তী, সেই ভাষা বহু প্রাচীন।

মালঞ্চমালা একটি উৎকৃষ্ট রীতিকথা। বৌদ্ধদিগের কথাসাহিত্য যেরূপ ছিল তাহার আদর্শ এই মালঞ্চমালা। এই প্রসঙ্গে আমরা মন্তব্যগুলি সমস্ত খুলিয়া বলিব তখন এত বিস্তারিত ভাবে ইহার আলোচনা করিলাম। এই শ্রেণীর রীতিকথা আরও কতগুলি আমরা পাইয়াছি, সেগুলি ভারি সুন্দর এবং বৌদ্ধযুগের চিত্র বহন করে। তাহাদের মধ্যে মনুচরিত্র, স্বামিমনোরঞ্জন প্রভৃতি আধুনিক স্মৃতি নিষিদ্ধ অনেক বিষয় আছে। কাঞ্চনমালার গল্পের সঙ্গে মালঞ্চমালার গল্পের কিছু কিছু ঐক্য আছে এবং তাহাতেও তাহার আদর্শ উচ্চ। আমি যখন আমার "Folk Tales of Bengal" পুস্তকের ভূমিকায় বাঙ্গলার রীতি-কথাগুলি এই জাতীয় কথা সাহিত্যের মধ্যে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় লিখিয়াছিলাম, তখন লর্ড রোনাল্ডসের পাইভেট সেক্রেটারী পণ্ডিতপ্রবর গুরুদে সাহেব ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন "প্রথম যখন দীনেশবাবুর উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশংসা পাঠ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম, অতিরিক্ত স্বদেশ প্রীতির ফলে তাঁহার বিচার শক্তি নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু নিজে মালঞ্চমালার সুন্দর কাহিনীর অনুবাদ পড়ার পর দেখিলাম দীনেশবাবুর কথা সবই সত্য।" মালঞ্চমালার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"হিন্দু নারীর আদর্শ যে কত মহান্ ও উচ্চ হইতে পারে, তাহা মালঞ্চমালায় যেরূপ পাইয়াছি, আর কোথায়ও তেমন পাই নাই।" *

কাঞ্চনমালা ও মালঞ্চমালার ন্যায় শিশু স্বামী লইয়া বনজঙ্গলে কত কষ্ট পাইয়াছেন, কত কষ্টে—কতপ্রাণান্ত চেষ্টায় তাহাকে মানুষ করিয়াছেন কিন্তু সহসা এক রাজা দস্যুর মত কুটিরে আসিয়া তাহার ছোট কৌস্তুভ মণির মত অমূল্য স্বামি-শিশুটিকে চুরি করিয়া লইয়া গেল। কালে সেই রাজার কন্যার সঙ্গে তরুণ বয়সে তাহার বিবাহ হইল। কাঞ্চন স্বামী হারাইয়া মহিষারূঢ়া দাসী হইল। তারপর সেই রাজকন্যার দাসী হইয়া সেই গৃহে আশ্রয় লইল। কিন্তু রাজকন্যা রত্নমালা স্বামীকে কাঞ্চনের অনুরাগী দেখিয়া ষড়যন্ত্রপূর্বক কাঞ্চনকে নির্বাসিত করিলেন। কিন্তু স্বামীর মন ফিরিয়া পাইলেন না। তরুণ যুবরাজ কাঞ্চনের বিরহে রাজ্য ত্যাগ করিল—তাহাকে খুঁজিয়া বনে জঙ্গলে বেড়াইল, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষুদুইটি অন্ধ হইল। কাঞ্চনের

কাঞ্চনমালা।

* "When I read the author's enthusiastic appreciation of Bengal Folk Tales, the thought crossed my mind that possibly his patriotism has affected his judgment But after I had read the translation of the beautiful story of Manancha-mala, I went back to the first lecture and I know that what he said was true

I have never read anything which led me to such an understanding of the sublimity of the conception of the ideal Hindu wife as I have obtained from the story of Manancha-mala."

সঙ্গে এই অবস্থায় তাহার দেখা হইল। এক সন্ন্যাসী কাঞ্চনের সহায় ছিলেন—তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঞ্চন প্রার্থনা করিল, "আপনি আমার স্বামীর চক্ষু দান করুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি যাহা বলিব, তাহা করিতে পারিবে?" কাঞ্চন বলিল, "স্বামীর চক্ষুর জন্য যাহা বলিবেন তাহাই করিব। আমার সমস্ত ঐশ্বর্য, যাহা আপনি আমাকে দিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া দিয়া আমি আবার বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইব, এই রাজধানীতে আমার কাজ নাই, পাতার কুটিরে থাকিব।" সন্ন্যাসী মাথা নাড়িলেন, কাঞ্চন বলিল, "তবে কি দিব? আমার চক্ষু দুইটি নিন, এখনই তাহা উপড়াইয়া আপনার পদতলে দিতেছি, আপনি আমার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিন।" এবারও সন্ন্যাসী ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। "তবে কি করিব? যাহা বলিবেন,—উঁহার চক্ষু লাভের জন্য আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।" সন্ন্যাসী তাহার হাতে একটি ফল দিয়া বলিলেন, "এই পর্বতের গহ্বরে রত্নমালা আছেন, তুমি এই ফলটি তাঁহার হাতে দাও, এবং সেই সঙ্গে তোমার স্বামীকে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দিয়া এস। ইহার পর জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, এই শেষ দেখা। কিন্তু যদি স্বামীকে সপত্নীর হাতে দিতে গিয়া তোমার একবিন্দু অশ্রু বা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে তবে সমস্ত পণ্ড হইবে, তোমার স্বামী আর চক্ষু ফিরিয়া পাইবেন না।"

অপূর্ব ত্যাগ

যে সপত্নী চুড়ান্ত কষ্ট দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া নির্মমভাবে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই সপত্নী পাইবে তাঁহার প্রাণাধিক স্বামীকে, যাহাকে তিনি একবার চক্ষু দিয়াছিলেন, কত কষ্টে, দিন-যামিনী কত কৃচ্ছ্র করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, যাঁহার হাসি দেখিলে তিনি স্বর্গ চান না, যাঁহার সঙ্গ পাইলে তিনি আহারনিদ্রা ভুলিয়া যান, যে স্বামী তাঁহার জীবনের একমাত্র তপস্যা, একমাত্র কাম্য—সেই স্বামীকে সপত্নীকে দিতে হইবে? এই দেখুন কাঞ্চনমালা ফল হাতে চলিতেছেন—স্বামীর ইষ্টমাত্র কামনা করিয়া তাঁহার নিজ সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে কাঞ্চন চলিতেছেন, তাঁহার জন্য ভেদ করিয়া যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিতে চাহিতেছে তাহা তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত ত্যাগের রাজ্যে ঢুকিয়া সংবরণ করিতেছেন, যে অশ্রুবিন্দু চোখের কোণে পড়ত, তাহা স্বামীর শুভ কামনার তপস্যার হোমানলে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

তিনি সেই ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের মতই সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার সাম্রাজ্য পার্থিবজ্ঞ, অযোধ্যার সাম্রাজ্য অপেক্ষা অনেক বড়, এবং তাঁহার পরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইতে অনেক কঠোর। স্বামীকে দান করিয়া সর্বহারা রমণী বনপথে চলিতেছেন, সেই মুখখানি ফিরিয়া দেখিবার তাঁহার অধিকার নাই। এই দৃশ্যের উপর পটক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের অধিবাসী এক দেবতার ছবি কবি দর্শকের চক্ষে অমর তুলিকায় আঁকিয়া রাখিলেন।

এই গাথাটির মধ্যেও তান্ত্রিকশক্তির অনেক নিদর্শন আছে। গীতিকথাগুলি সমস্তই ত্যাগের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং তদ্দ্বারা বৌদ্ধযুগের গুণ ও কর্মগুলি

খুব বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ঐতিকথাগুলিই গল্পকথার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ। গল্পীকথার অনেক রূপভেদ আছে, যথা—ঐতিকথা, রূপকথা, গল্পঐতিহ্য। গল্পীগীতিকার যে সকল গল্প প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐতিহ্যতা দেখিতে পাই না, কঠোর কর্ম ও উৎকট পরীক্ষা সকলই আছে, কিন্তু ত্যাগ অপেক্ষা তাহাতে প্রেমের মহিমাই বেশী উজ্জ্বল হইয়াছে। ক্রমশঃ এই কথা-সাহিত্য হইতে ত্যাগ চলিয়া গেল এবং প্রেমই সর্বাপেক্ষা বড় আসনে পরিণত হইল।

পল্লী গীতিতে প্রেমের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। আদর্শের এই রূপান্তর হওয়ার কারণ কি? বৌদ্ধ-যুগান্তে গুপ্ত-যুগে শিবই উপাস্য দেবতা হইলেন। ভিক্ষুর আসন ও ত্যাগ ধীরে ধীরে গৃহ হইল। মহাভিক্ষু বুদ্ধ গৃহস্থালীকে সন্ন্যাস অপেক্ষা নিম্নে স্থান দিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ঐহলৌকের সাহচর্য ত্যাগটাকেই বড় ধর্ম মনে করিতেন, কিন্তু শৈব ধর্ম গৃহস্থালীর উপর জোর দিল, যৌন প্রেম তাহাদিগকে ভুলাইল। ক্রমশঃ ক্রমশঃ গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে প্রেমকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন—সেই দিকে লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কালিদাসের শিব এদিকে "মহাযোগী" নিরাভরণবিকল্প প্রদীপের মত, এই শিবের কণ্ঠাকে যখন ভস্মীভূত হইল, কিন্তু তাহার ফুলশরটি স্বর্গ হইতে পাওয়া অমোঘ অস্ত্র;—যে দেবতপস্যার ইন্দ্রের বজ্র, তেমনই এক দেবতপস্যার ফুলশরের সৃষ্টি সেই ফুলশর শিবের বুকে পড়িয়াছিল। অমোঘ লক্ষ্যভেদ শর ব্যর্থ হয় নাই। শিব বিমোহা গৌরীকে বিবাহ করিলেন। এমন কি এই ফুলশর যখন শিবের বুকে পড়িয়াছিল, তখনও "শিবস্য কিঞ্চিৎসমাধিভেদঃ" মুক্তির জন্য তাঁহার ধৈর্য বিচলিত হইয়াছিল। এই শৈব ধর্মের সঙ্গে বহু দিনের শুষ্কতাপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ-জীবনে যৌন-প্রেম প্রবেশ করিল। ভিক্ষুর মুখরাগী কঠোর সংযমে দেশ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পল্লীগীতিকাগুলি এই শৈব ধর্মের চিহ্নাঙ্কিত যুগের বার্তা বহন করিতেছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইব যে প্রাচীন মাগধ চিত্র-শিল্পের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গলায় চলিয়া আসিয়াছিল। অজন্তার চিত্রের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মুকুলবাবু কালীঘাটের পট-অঙ্কনের ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সেইরূপ গুপ্তযুগের কাব্যের সঙ্গেও এই বঙ্গীয় পল্লীগীতিকার ঐক্য আমরা দেখিতে পাইতেছি। চিত্রের মত কাব্যেরও একটা ধারা চলিয়া আসিয়াছে, কোন স্থানে বিশাল স্রোত সমাজ খাদে পরিণত হইয়া অতি মৃদু ও প্রথাগতিতে চলিতেছে, কোথাও বা সেই ধারা মূল প্রস্রবণের বেগ অতিক্রম করিয়া বিরাট্টতর শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমার বিশ্বাস এই পল্লীগীতিকাগুলি অনেক বিষয়ে গুপ্তরাজ্যের আদর্শকে ছাপাইয়া অধিকতর শক্তির পরিচয় দিতেছে।

পল্লীগীতিকার নায়িকারা শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকা প্রভৃতি নাটকের নায়িকার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এক পরিবারের লক্ষণ বহন করে। ইহাদের ছাঁচ নব-প্রাক্তন্যের ছাঁচে আদৌ ঢালা নহে। তাহাদের ছাঁচ স্বতন্ত্র,—শকুন্তলা,

পল্লীগীতিকায় গুপ্ত-যুগের প্রভাব

মালবিকা, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকের নায়িকার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এক পরিবারের লক্ষণাক্রান্ত। শকুন্তলা, মালবিকা ও উর্ব্বশীর সঙ্গে মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি নায়িকার পূর্ব্বরাগ তুলিত হইতে পারে। চন্দ্রাবতী যৌবনের মত স্বীয় মনোনীত স্বামী পাইবার জন্য শিবের আরাধনা করিতেছেন। তিনি জয়চন্দ্রকে ভালবাসেন, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মেয়ে প্রেমের কথা কাহাকে জানাইবেন? নির্জ্জনে ফুল তুলিতে যাইয়া প্রাণের কথা যেন নিজেরই কাণে কাণে বলিতেছেন :—

পল্লীনায়িকার মালিকারা কালিদাস-বর্ণিত নায়িকাদের সমান।

"তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া।
তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়া॥
বাড়ীর আগে ফুটিয়াছে বালতী বকুল।
অঞ্জলি ভরিয়া তুলব তোমার মালার ফুল॥
বাড়ীর আগে ফুটিয়াছে রক্তজবা সাতি।
তোমারে করিব পূজা পায়ে আশা করি॥
বাড়ীর আগে ফুটিয়াছে মল্লিকা মালতী
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন পতি॥"

এই নিরাবিল প্রেমমুগ্ধা কুমারীর চিত্র কালিদাসের তপোনিরতা গৌরীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সমস্ত শকুন্তলার মত নায়িকারা নবযৌবনে কোন নায়ক দর্শনে প্রেমের প্রথম উন্মেষ অনুভব করিতেছেন। মহুয়া আড়ালিয়া গ্রামে মান্দার গাছের মোটা-গুঁড়ি-যুক্ত কদলী তরুর আড়ালে ঝাড়-জঙ্গলে ঘেরা এঁধোপুকুর পাড়ে কদম গাছের নীচে সুরূপ পুরুষ এক যুবককে দেখিতে পাইলেন। এই যুবকের নাম চাঁদ-বিনোদ, ইহাকে দেখা মাত্র "ভিন দেশের পুরুষ দেখি চাঁদের মতন। লাজরক্ত হৈল কন্যার প্রথম যৌবন।" শকুন্তলা যেরূপ কণ্বাশ্রম কাঁটায় আটকাইয়াছে জানিয়া একটু অবকাশ পাইয়া দুষ্মন্তকে ফিরিয়া দেখিতে লইলেন, মহুয়াও কলসী ভরিবার ছলে কুম্ভের জল-প্রবেশের শব্দদ্বারা চাঁদবিনোদকে জাগাইয়া তুলিলেন। উভয়ের সসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা চলিল—তারপর সেই একনিষ্ঠ প্রেমব্রত কত দুঃখ ও বিপদের মধ্যেই না উদ্‌যাপিত হইল। চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র দুইজনে তরুণ বয়সে বাগানে ফুল কুড়াইতে যাইয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। জয়চন্দ্র ফুলগাছের ডাল নোয়াইয়া ধরিতেন, চন্দ্রাবতী সেই ডাল হইতে তাহার সাজি ভর্ত্তি করিতেন, ইহার মধ্যে না কোন এক সময়ে প্রেমের দেবতা পরস্পরের কটাক্ষ উপলক্ষ করিয়া দুজনের দুঁহিলেন। কমলা চুম্বিত রাজপুত্রকে পাতার আধারে জল দিতে যাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চোখ ফিরাইতে পারিল না, তথাপি সে যে সংযম অবলম্বন করিয়াছিল, রাজপুত্রের অনুনয়-বিনয়ে তাহা ভাঙ্গে নাই। কবি লিখিয়াছেন, ফুলটি

মুটিবার পূর্বে কলকলির কাছে ভ্রমর বারবার আসিয়া গুন গুন্ করে কিন্তু কলি সহজে ফুটে না, হৃদয়ের সমস্ত মধু লইয়া সে মুখ বুজিয়া থাকে, কমলার কাছে রোজ রোজ কুমার সেই ভাবে আসিয়া বার্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। মদিনা তুলালকে দিয়া উড়ন্ত বুলবুলা ধরাইত, দুইজনে আমের চারা পুঁতিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিত, শৈশবে দুইজনে একদণ্ড ছাড়াছাড়ি থাকিতে পারিত না, এইভাবে কোন মুহূর্তে অনঙ্গ তাঁহার শরাসনে তুলিয়া দুইজনের প্রাণ লইয়া খেলিতে লাগিলেন। সমস্ত গাথিকাগুলিতে গুপ্ত-

পূর্বরাগ

যুগের নায়িকাদের মত প্রেমের লুকোচুরি খেলা—পূর্বরাগের অভিনয়। নব ব্রাহ্মণ্য কাঁটা দিয়া এই ভালবাসার পথরোধ করিল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি মেলা সেনরাজগণের গতিরোধ করাতে সেই ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব তথায় ঢুকিতে পারে নাই, কিন্তু এখন ঢুকিয়াছে, হিন্দুরা আর প্রায় এ গাথাগুলি গায় না মুসলমান

হিন্দুরা এসকল গান গায় না

সমাজে সেরূপ কঠোর বিধিনিষেধের বালাই নাই তাহারাই এগুলি গাহিয়া থাকে ইদানীং মোল্লারা আদেশ জারি করিয়াছেন, এসকল গান আর গাওয়া হইবে না।

তথাপি সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কাব্যের সেই প্রাচীন ধারাটি আমরা বঙ্গের সমাজের কতকগুলি স্থান হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছি।

কিন্তু এই নায়িকারা যদি কালিদাস প্রভৃতি কবির নায়িকাদের সহিত এক পংক্তিতে স্থান পান তবুও আমাদের খুব প্রীতি বা গর্ববোধ করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বাঙ্গালী নকল

শুধু ধারা এক নহে, বাঙ্গালীর গড়ি এক ধাপ উপরে।

করিয়া কাহু হয় না, বিশ্বে তাহার কিছু দেওয়ার আছে, সে যেখান হইতেই তাহা নিক না কেন, তাহার মধ্যে নিজের একটা সুস্পষ্ট ছাপ দিয়া জগতে ছাড়িয়া দেয়। এ ছাপ বাঙ্গালীর রাজকীয় মুদ্রার ছাপ। আমরা গুপ্ত যুগের সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে যে সকল নায়ক-নায়িকা পাইতেছি, তাঁহাদের সকলেরই অন্তর্বেশ। কালিদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহার সমস্ত কাব্যে রাজসভার সৌরভ ও পরিচ্ছন্নতা আছে। তাঁহার নায়িকা মালবিকার অন্তঃপুরে দাসীর ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও রাজকুমারী, তাঁহার প্রতি বাক্যে প্রতি কথায় রাজান্তঃপুরচারিণীর সম্ভ্রম প্রকট করে। তাঁহার শকুন্তলা বল্কলবাসসত্ত্বেও রাজার ন্যায়। তাঁহার মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা, বাক্‌সংযম দৃষ্ট হয়—তাহাতে রাজা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বনলতা উদ্যানলতা হইতে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসাদি কবির সৃষ্ট ঋষির আশ্রম ও রাজসভা লইয়া। সমাজের নিম্নস্তরে তাঁহারা যাইতে চাহেন নাই।

কালিদাসের কাব্য ও নাটকে প্রচুর সৌন্দর্য আছে, প্রচুর কলা আছে—সেগুলি যেন মালীর হাতের পুষ্পবন, প্রত্যেক কথায় সংযম আছে, কোথাও বাহুল্য নাই। কবি শিল্পীর মতন কাটিয়া ছাঁটিয়া তাঁহার চিত্রগুলি উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কাব্যেই রাজসভার মর্যাদা আছে, দুষ্মন্ত, অগ্নিমিত্র, পুরূরবা তাঁহার নায়ক। তিনি রসের যে পসরা সাজাইয়া উপস্থিত করেন—তাহা রাজভোগ।

কালিদাস সৌন্দর্য্যের উপাসক, সংযতবাক্ ও সঙ্কুচিত মনঃপটু। কিন্তু এরূপ ছত্রবেশ, এরূপ সংযম আমাদের পল্লীকবিতার কাছে দুই হয় পঙ্‌ক্তিগুলিতে যে উদার লীলা আছে, যে অবাধ স্বাধীনতা, চরম স্থান পাইবার যোগ্য দৃঢ় গতি আছে—তাহা কালিদাসে নাই। বাঙ্গালী কবিকে আপাততঃ মনে হইবে অসংযমসাহসী। কোথায় সমাজ, কোথায় রুচি, কোথায় শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যের সে সকল কিছুই মানে না সে প্রকৃত জহুরী, সে কেবল সত্য ও শিবকে দেখিয়াছে—তাহা আস্তাকুড়ে পাইলেও সে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে সে কাহারও ধার ধারে না—মনু, রাজব্যবস্থা, পুরাণ, স্মৃতি এসকল কিছুই সে জানে না, সে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ে নাই, সে কাহারও আইন মানিয়া চলে না। কিন্তু প্রকৃত সুন্দর কি সে তাহা চিনিয়াছে, সত্যকে সে শিশুর মত নির্ম্মল চক্ষে দেখিয়াছে। আমরা যাহাকে অসতী বলি, সে তাহার পুঁথির পাতায় পাতায় তাহার ছবি আঁকিয়াছে, কিন্তু সে নিঃসঙ্কোচভাবে অসতীকে সতীসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছে। ভোম রমণী তাহার স্বামীকে ছাড়িয়া গ্রাম্য যুবের সঙ্গে অনায়াসে চলিয়া গেল, রাজকুমারী তাহার স্বামীকে বলিয়া কহিয়া অনুমতি লইয়া স্বীয় বন্ধুর সঙ্গে চলিয়া গেল। রাজাও নিজের স্বামীকে ত্যাগ করিয়া নদীর তীরে তাঁহার বন্ধু বিনোদের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিল। এমন সকল কথা কবি লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি সমাজের সকলের কাছেই নাকাল খাইবার যোগ্য সেরূপ ছবি আঁকিতে মেটারলিঙ্ক ভয় পাইয়াছেন, সাধারণের হিত কামনা সঙ্কল্পের একটা মামুলী অর্থও যেখানে খোঁজে, ফরাসী কবি ইহা নানাকৈফিয়তে বুঝাইলেন কিন্তু যাহা বলিলেন সবাই তাহা আঁকিতে বসিয়া ভয় পাইলেন, সমাজের কঠিন অস্থিচর্ম্মে কঙ্কালক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া আনিলেন রবীন্দ্রবাবু বিনোদিনীকেও এইভাবে বাঁচাইয়া আনিলেন। সতীত্বকে পদাঘাত করিতে পা উঠাইবারও সাহসে কুলাইল না। কিন্তু পল্লীকবির সাহস দেখুন, তাহার বক্তৃতা করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই। সে আদৌ প্রচারক নহে, সে বুঝিয়াছে প্রেম জিনিষটা খাঁটি সোনা, তাহার কাছে পুরোহিতের মন্ত্র, সামাজিক আদর্শ এবং লোকনিন্দা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে সেই প্রেমের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়াছে ও দিয়াছে। এজন্য তাহার অসতী পরপুরুষকে ভালবাসিয়া এমন সকল কার্য্য করিয়াছে, এমন নির্ভীক ভাবে তাহাদের নায়কদিগের অনুধাবন করিয়াছে যে তাহারা সাধ্বী সাবিত্রী হইতেও চিত্র হিসাবে উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। ধাঁধাবধূর পালা, শ্যামরায়ের পালা, এবং ধোপার পাট এই তিনটি খাঁটকা পড়িয়া দেখুন, পল্লীকবির সৃষ্ট নায়িকারা, পর-উপপত্নী নায়িকারা, দুষ্টা নায়িকারা—স্বর্গের পবিত্রতা গায়ে মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গোঁড়া সমাজের অতিবড় পাণ্ডারা ইহাদিগকে দোষ দিবার সুবিধা ও অবসর পাইবেন না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কবি সমাজের পক্ষ বা সংস্কারকের পক্ষ—এই দুই পক্ষের কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। তিনি স্বয়ং পদ্মটি দেখিয়াছেন ও তাহাই আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার নীচে যে পঙ্ক আছে, তাহা তিনি ঘাঁটিতে বসিয়া যান নাই, তিনি দীপশিখাটি দেখিয়াছেন ও তাহাই দেখাইয়াছেন, তাহার নীচে যে ছায়া আছে সে

সতীত্ব ধর্ম্ম উপেক্ষিত।

দিকে তিনি দৃষ্টি করেন নাই। তিনি সামাজিক জটিল সমস্যা, স্ত্রীপুরুষের অধিকার নরপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতি, ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা লোকহিত শ্রেয়, এই সকল বড় বড় প্রশ্ন লইয়া তাহাদের মতের পোষকতার জন্য গ্রন্থের স্বরূপ কাব্যের নায়ক নায়িকা সৃষ্টি করেন নাই। সেই প্রচেষ্টা করিতে যাইয়া বড় বড় লেখকেরা পথভ্রষ্ট হইয়া যান, মুখ পল্লীকবি সে সকল জটিল বস্তু পরিহার-পূর্বক অকুতোভয়ে সত্যের সহজ পথে চলিয়া গিয়াছেন। যখন ডোমের স্ত্রী শ্যামরায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল তখন সে বুঝিল তাহার জীবনমরণ শ্যামরায়ের হাতে, যখন রাজকুমারী আঁধারবুধুর বাঁশী শুনিল তখন সমস্ত জগতের কোলাহল তাহার কাণে পৌঁছিল না, জগতে সে আর সেই বাঁশীর সুর শুধু রহিল। এই ভাবে সত্য ও সুন্দরকে তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া রূপক কবি যে ছবি আঁকিয়াছেন—তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। এই সকল পল্লীগীতিকা পড়িলে পাঠক একটা অজানিত রাজ্যের হাওয়া পাইবেন, ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজের কড়াকড় অবরোধের দূষিত বায়ু হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেই হাওয়া নির্মল ও স্বচ্ছন্দগতি এবং যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে নূতন জীবন দান করে। পাঠক স্বচ্ছন্দে শকুন্তলাদি নাটকের মত একটা স্বাভাবিক তৃপ্তি ও আনন্দ রস এই গীতিকায় পাইবেন। সুতরাং গুপ্ত ও পাল-যুগের বার্তা এগুলি বহিয়া আনিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নব ব্রাহ্মণ্য যুগের ভাষা ও ভাব হইতে ইহা এত পৃথক্ যে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না কিন্তু সেই গুপ্ত ও পাল-যুগের কাব্যকলা যেখানে ছিল, এ গীতিকাগুলি আর সেখানে দাঁড়াইয়া নাই। এই গতিশীল ধারা পূর্ব্ববর্তী যুগের খাদে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নাই। ইহা সেই যুগের পর আরও অনেক স্তরের মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ববর্তী যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। এই সকল গীতিকার প্রেম—সাধারণ কাব্যের উপাদানে নির্ম্মিত নহে। এই গীতিকার প্রেমের স্বরূপ,—তপস্যা, ইহার পশ্চাতে দুঃখকে বরণ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করিবার সঙ্কল্প, এগুলিকে প্রেমের গীতি বলিলে ঠিক হয় না—এগুলি প্রেমতীর্থের তর্পণ অধিকাংশ নায়িকাই প্রেমযজ্ঞের হোতা, পৃথিবী ইহাদের নিকট যজ্ঞবেদী, স্বীয় জীবন বলি দিয়া ইহারা সেই যজ্ঞবেদীতে হোমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, ইহারা সহস্র ঝঞ্ঝা, বিপদ্, টিট্‌কারী, কলঙ্ক কিছুতেই সেই হোমাগ্নি নিবিতে দেয় নাই ইহারা প্রাচীন কালের আহিতাগ্নি।

অধিকাংশ নায়িকাই প্রেমের তপস্যা করিতে গিয়া শুধু একদিক্ জীবনপণ ভালবাসা মাত্র দেখায় নাই, প্রতিপদে ইহারা অদ্ভুত উদ্ভাবিনী শক্তি দেখাইয়াছে। মহুয়া স্বীয় মৃতপ্রায় প্রণয়ীকে কাঁধে করিয়া পর্ব্বতাপথে দ্রুতপদে ছুটিতেছে যেন সতীদেহ কাঁধে করিয়া স্বয়ং চলিয়াছেন। মহুয়াকে যখন তাহার ধর্ম্মপত্নী তাহার নায়কের রাজধানী হইতে পলাইয়া

মহুয়া।

যাইতে বলিলেন, তখন সে অস্বীকার করিল না যেহেতু সে জানিয়াছিল, তাহার নায়কের প্রেম বড় মানুষের প্রেম, চোখের খেয়াল মাত্র, দুই দিনে এ প্রেম ছুটিয়া যাইবে, তখন প্রণয়ী আহা খোয়াইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া বিপদে পড়িবে, স্বয়ং প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া আজীবন বিরহ-সন্তাপ অঙ্গীকার করিয়াও

সে ধর্ম্মপিতার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অগ্নিশিখা যেরূপ নিজেকে দগ্ধ করিতে করিতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, সেইরূপ প্রেমে আত্মহারা বহু দুঃখ বিপদের উদ্ধগতিযাত্রা বরণ করিয়া চলিল। কিন্তু সে যে দিন বুঝিল তাহার প্রণয়ীর প্রেম প্রকৃত ও খাঁটী, শুধু একটা চোখের নেশা বা খেয়াল নহে, সেদিন তাহার মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহা স্বর্গীয় সুষমা-মাখা। তখন সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সে ঘোড়ায় চড়িয়া পিতৃস্নেহ তুচ্ছ করিয়া প্রণয়ীর সঙ্গে পর্ব্বতের পথে চলিল। যখন বণিক তাহাকে লুব্ধ করিবার জন্য শত শত প্রলোভন দেখাইল, তখন সে কপট প্রেমের আভিনয় করিয়া হুকুকের বিষ দিয়া সেই স্বামীর হন্তারিগণকে বধ করিল এবং কৃপাণ দিয়া তাহাদের জাহাজ বিদীর্ণ করিয়া জলে ডুবাইল। কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন এক প্রবল ঘূর্ণীবায়ু চলিয়া গেল। সে মুখে প্রেমের কথা বলে নাই, কিন্তু শেষের দিনে পিতাকে বলিল, "তুমি যে সুজনকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, তাহা হইবে না। কোথায় সুজন এবং কোথায় আমার স্বামী। তুমি আমার চক্ষু লইয়া দেখ।" "সোণার ভরুর বঁধু একবার দেখ", "সুজনের সঙ্গে আমার স্বামীর যে প্রভেদ, জোনাকীর সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের সেই প্রভেদ।" এই বলিয়া সে ছুরিকা নিজের বুকে বিঁধাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। পূর্ব্বাঙ্গের নায়িকার কথা আমরা পাইয়াছি, তাঁহারা স্বভাবের পথে চলিয়াছেন, স্বভাবের বশীভূত হইয়া ভালবাসিয়াছেন, মিলনে হাসিয়াছেন, বিরহে কাঁদিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পল্লীসাহিত্যিকার নায়িকাদের অধিকাংশই জটিল অবস্থার মধ্যে স্বীয় অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তি দেখাইয়া খুব অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের প্রায় কেহই "স্রোতের শেওলা" নন। ইহাদের সঞ্জীবনী শক্তি, সমস্ত জটিলতাকে প্রতিভাবলে দূর করিয়া নিজের উপযুক্ত উজ্জ্বল করিবার শক্তি অত্যদ্ভুত। ইহাদের মধ্যে প্রেমের নানা লীলা, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুভেদে বিরহ ও মিলনের বিচিত্র চিত্র প্রকৃত যাদু-মোহিনী মায়া। ইহারা নদীর মত স্বচ্ছতোয়া নির্ম্মল ও সুন্দর, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কিছু—গঙ্গার মত পবিত্র এবং ঐরাবতমর্দ্দন যোগা শক্তিশালিনী। এই যে প্রশংসা আমি করিলাম তাহার প্রতিধ্বনি সুদূর সমুদ্রের পার হইতে আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত হগমান বলিয়াছেন, "নায়িকাগুলি সেক্সপীয়র ও রেইনীর স্ত্রীচরিত্রের মত ইউরোপের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। আমি এবং ম্যাডাময়সিলা এভিলাইন রোঁলা (রোমা রোঁলার ভগিনী) পল্লীসাহিত্যিকাগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিতে চাই। প্রায় বিশবৎসর যাবৎ আমি ভারতবর্ষের সাহিত্য পড়িয়া আসিতেছি, কিন্তু হঠাৎ যে এমন অপূর্ব্ব জিনিষ পাইব, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।" তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, মেটারলিঙ্ক ও ফরাসীর সর্ব্বপ্রধান লেখক বা নায়ক নায়িকা অপেক্ষা বাঙ্গলা পল্লীকীর্ত্তির নায়ক-নায়িকারা শ্রেষ্ঠ, ইহাদের সৌন্দর্য্য সর্ব্বকালস্থায়ী, বরং যুগে যুগে সমালোচকগণ ইহাদের নূতন নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবেন, একথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। ডাঃ টেলা ক্রামরিশ 'মহুয়া' সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আজ তিনদিন যাবৎ মহুয়া হোসেন ও নসের চাঁদের চিত্র আমার মাথায় ঘুরিতেছে। সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে আমি

বিদেশী সমালোচকদের মত।

এরূপ সুন্দর একটি গল্প পড়ি নাই।" ডাঃ লিলতান পেক্কি লিখিয়াছেন, "পড়িয়া মনে হইল, এই গল্পের লেখক যেন আমি ভাবস্বরূপের রসস্বরূপ উপলব্ধি করিতেছি। এই কাহিনীর নদের চাঁদ ও মহুয়ার প্রেম চিরন্তন আলেখ্যের মত আমাকে আকৃষ্ট করিতেছে।" সুপরিচিত চিত্রশিল্পী লোনেনস্টাইন বলিয়াছেন, এই নায়িকাগুলি অজন্তাগুহার অপূর্ব নারীচিত্রগুলির যেন জীবন্ত সংস্করণ। ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গী ও রূপের মনোহারিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।" এসেক্সবিদ্যার লেখক প্রবর এ্যালেন বলিয়াছেন —"গল্পিকাগুলি পড়িয়া মনে হইল বঙ্গদেশ এখনও তাহার যৌবন হারায় নাই।" শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টার ওটেন সাহেব বলিয়াছেন, "যদি বাঙ্গালী এই গল্পিকাগুলির আদর করে, তবেই বুঝিব তাহারা উন্নতির পথে যাইবার শক্তি হারায় নাই। সহরের ধোঁয়ার মধ্যে বাস করিয়া এবং নিরানন্দের শব্দটের ঘর্ঘর ধ্বনি শুনিয়া কান ঝালাপালা হওয়ার পর হঠাৎ যদি কেহ পল্লী-নদীর ধারে সৌন্দর্য দেখে, তাহাতে যেমন তাহার একটা নির্মল আনন্দ হয় এক রাশ কৃত্রিম সাহিত্য পাঠ করার পর এই গল্পগুলি পড়িলে তেমনই একটা নবজীবনের সৃষ্টি পাওয়া যায়।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শুধু অনুবাদ পড়িয়া এইরূপ এত বড় উচ্চাঙ্গের প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছেন, তন্মধ্যে সমাজে কয়েকটি ছবি কত সুন্দর উঠিত হইল। কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা স্বয়ম্বরা, সাগরিকা, মালবিকা প্রভৃতি সমস্ত নায়িকাই যৌবনে বিবাহ করিয়াছেন। ইহারা নিজে স্বামী মনোনয়ন করিয়াছেন, এমন কি যৌবনাগম কথাটাই মিথ্যা। এসম্বন্ধে পল্লীকবিরা কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিদেরই অনুবর্তী। গৌরীকে হরগলের বরমাল্য দেখিয়া নিজের গলা দিয়া বলিলেন, তুমি স্বামী মনোনয়ন করিয়া আন।" সত্যবানকে তিনি মনোনীত করিলেন, কিন্তু দুরন্ত সত্যবানকে অল্পায়ু জানিয়া ঘিরে রোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাবিত্রী বলিলেন, "আমি ইহাকে মনোনীত করিয়াছি। ইনি অল্পায়ু হউন, দীর্ঘায়ু হউন, এখন আর সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না, আমি মনে মনেও বিচারিণী হইতে পারিব না।" গৌরীকে কালিদাস প্রাপ্তবয়স্কা করাইয়া বিবাহ দিয়াছেন, সরিৎসীমা পল্লবিনী লতার ন্যায় স্তনভিন্নবয়সা গৌরীর অঙ্গ তখন যৌবনলাবণ্যে চলচল করিতেছিল। পল্লীগীতিকার নায়িকারাও এই পৌরাণিক চরিত্রদের পদাঙ্কেই বিরাজ করিবেন। আশ্চর্যের বিষয় পল্লী রমণীরা স্বামী মনোনয়ন করার একটা বিশেষ গৌরব মনে করিতেন। এক পল্লীকবি লিখিয়াছেন—যাবার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখ ও সৌভাগ্য,—সে যাহাকে মনোনয়ন করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে পারা।

স্বয়ংবর কথাটা এক সময়ে এদেশে খুবই প্রচলিত ছিল, লৌকিক ভাষায় পল্লীবাসীরা তাহা 'ইচ্ছাবর' শব্দ দিয়া বুঝাইত। ব্রাহ্মণ-প্রভাবান্বিত নায়িকাদের সঙ্গে এই পল্লীগাথার নায়িকাদের কোন সাদৃশ্য নাই।

এই কাব্যকথাগুলি সেন-রাজগণের পূর্ববর্তী সাহিত্যের ধারা, যদিও অপেক্ষাকৃত

আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সেই ধারা চলিয়া আসিয়াছে। মাগধ শিক্ষার উত্তরাধিকারী যে আমরা হইয়াছি তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরচারিণীদের রূপে আমাদের গৃহদেবতারা রূপসী হইয়াছেন। আমরা যে মাঘমাসে সরস্বতীর পূজা করি, তাহা শুভচরিত্রা চন্দ্রাবতীর মত মহিলাদের পদে আমাদের ভক্তির অর্ঘ্য। দশভুজার মত বহুরা নানাভাবে কর্ম্মকুশলা—সেই বহুরার মত মহিলারা আমাদিগকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়া থাকেন। এজন্য দুর্গাপূজা আমাদের সার্থক। মনুষ্যের মত গৃহলক্ষ্মী যাঁহার দেখিয়াছেন, তাঁহারা কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন আমরা এত ঘটা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করি। এই নায়িকারা এখনও আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজিতা। ইঁহারাই আমাদের মাতা, ভগিনী, সখী ও পত্নী, এই জন্য বাঙ্গলা দেশ পুরাতন হইয়াও পুরাতন হয় নাই, আমাদের গৃহে দেবনিষ্ঠালা এখনও শূন্য হয় নাই, আশীর্ব্বাদের দূর্ব্বা এখনও সজীব আছে, ভাইফোঁটার বিজয়মালা এখনও বাসি হয় নাই।

ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের যে বাঁধনে এই পালাসাহিত্যকে আবদ্ধ করিয়াছে। গীতিকথায় সিদ্ধ তান্ত্রিকগণের অদ্ভুত কার্য্য, ভাষা, অতিকৃত, দয়া, নিষ্ঠা, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই দেখা। কিন্তু পরবর্ত্তী পালাসাহিত্যে প্রেম ক্রমশঃ স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। জ্ঞান ও ত্যাগমূলক কর্ম্ম যে পরিমাণে দেখা সেই পরিমাণে এই পালা-সাহিত্যে ভোগ সুখের দেখা সর্ব্বত্র এবং প্রাচীন। গীতিকথাগুলিই এই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, যদি পালাগীতিকা-গুলিতে কোন অলৌকিক ঘটন নাই। তাহা প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত, তাহাতে কল্পমহিমা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই, কিন্তু এই সাহিত্যে এক পা এক পা করিয়া প্রেমই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং শেষে মনের অপরাপর সমস্ত গুণ প্রেমের আড়ালে পড়িয়াছে। গীতিকথায়ও প্রেম আছে কিন্তু তাহার সঙ্গে মনের অপরাপর মহাগুণও প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মগৌরব এবং ত্যাগে উজ্জ্বল হইয়া দেহী বিদেহী হইয়াছেন এবং সুখদুঃখের অতীত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কাজলরেখা ও মালঞ্চমালা হৃদয়ের উচ্চভাবে সমৃদ্ধ হইয়া দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু পালাগীতিকায় মীনকেতনের ধ্বজ এবং নিশান পতাকা সকলের উর্দ্ধে উঠিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপনের ইঙ্গিত করিতেছে।

গীতিকথা ও পালাগীতিকা।

গীতিকথাগুলি সুপ্রাচীন কিন্তু পালাগীতিগুলি তাদৃশ প্রাচীন নহে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বের গীতিকথা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত গীতিকথাই অধিক। ইহাদের রচনা যে যুগেরই হউক না কেন, ইহাদের পূর্ণ মহিমাই এই সাহিত্যিক ধারার প্রাচীনত্ব সূচনা করিতেছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার স্থাপত্য ও কারুকার্য্যের বর্ণনা পড়িয়া অনুমান হয় যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও তাহা একটা পরিণতি, আরম্ভ নহে, হঠাৎ একদিনে কেহ সেরূপ শিল্পমহিমার চরমে পৌঁছিতে পারে না, তাহা যুগযুগের শিল্পচর্চ্চার প্রমাণ। এই গীতিকথাগুলিও সেইরূপ ইহাদের নিজের অন্তর্বর্ত্তী প্রমাণ দ্বারা এই ধারার

প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে। এই পল্লীসাহিত্য ব্রাহ্মণ-প্রভাবযুক্ত সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত ও প্রাচীন এবং কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, রত্নাবলী, এমন কি মৃচ্ছকটিক যুগের আদর্শের অনেকটা অন্তবর্তী।

ভাষার কথা

ইহাদের রচনার ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে কিন্তু অন্ত পাড়াগাঁয়ের ভাষার শত শত বৎসরেও খুব বেশী পরিবর্তন হয় না। যেখানে রেলওয়ে বা হাইস্কুল কারণে ভিন্নদেশীয় জনসমাগম হয় না, সেখানে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার প্রভাব প্রাদেশিক ভাষার উপর পড়ে নাই,—বঙ্গের উপকণ্ঠস্থিত সেই সকল দুর্গম অরণ্য-প্রদেশের পল্লীগুলিতে ভাষা অনেকটা অপরিবর্তিত অবস্থায়ই আছে। সেখানে নব নব রুচির আক্রমণে বেশভূষার বেশ পরিবর্তন হয় নাই, সেখানে প্রবীণারাই যেরূপ সাড়ী পরিতেন যে কায়দায় চুল বাঁধিতেন, নাকনী, -ফুলও যেরূপভাবে বেশভূষা করিয়া থাকেন। ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। আজ যদি পাল-রাজত্বের কোন লোক উপস্থিত হয়, তবে কি আমরা তাহার কথা কিছুই বুঝিব না? আমার মনে হয় একটু আয়াস করিলেই পল্লীবাসীরা সেকালের অনেকটা বুঝিতে পারিবে। কেহ যেন ভাষার দ্বারা ভাবের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যে যুগে মধুসূদন 'মেঘোদ্ভব নক্ষেপি' 'হরমুদ-গাত' প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধানিগুণ এমন সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা কোন কালে কর্ণগত বাঙ্গলায় কেহ শোনে নাই, সেই যুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'হুতুম পেঁচার নক্সা' লিখিয়া অমর হইয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশের ভাষা ও পরবর্তী অংশের ভাষা দুই ভিন্ন যুগের ভাষা। সুতরাং ভাষার প্রাচীনত্ব এবং যুগনির্দেশ করা একটু কঠিন কাজ। আমি মালঞ্চমালার গল্প হইতে একটী উদাহরণ দিব। "পতি হাসে মালঞ্চ হাসেন, পতি কাঁদে, মালঞ্চ কাঁদেন, পতি কথা কয় মালঞ্চ কথা কন, পতি হাসে পা নাড়ে, মালঞ্চ আদরে খেলা দেন। চোখের জল ঢালিয়া মালঞ্চ পতিকে নাওয়ান, মাথার চুল দিয়া পতিকে মুছান, মুখের বাতাস দিয়া পতিকে শুকান, আঁচল খানা দিয়া ঝেড়িয়া পতিকে বুকের মধ্যে করিয়া বসিয়া থাকেন। চলিতে চলিতে সেই নিলক্ষের চড়ায় শিশু স্বামীর মুখে রৌদ্র লাগে, আঁচল দিয়া ঢাকিয়া নেন, দুই মাথায় পড়ে, বুক দিয়া আগলিয়া নেন, ধূলাবালি উড়িয়া আসে, চুল ছড়াইয়া পাখা করেন" এই কথাগুলি এত সরল ও গ্রাম্য যে বহু শতাব্দীতেও এরূপ ভাষার খুব বেশী পরিবর্তন হয় না।

প্রথম সংস্করণের ভাষা অনেকটা দক্ষিণারঞ্জন পরিবর্তিত করিয়া এই সংস্করণ করিয়াছেন, ইহা আধুনিক ভাষা, কিন্তু কথাগুলি এত সহজ ও সংক্ষিপ্ত যে পুরাকালের পল্লীর ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালীর গৃহের কথাগুলির একটা তফাত দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, তাহা সত্ত্বেও ইহাতে বঙ্গপল্লীর সুপ্রাচীন সুরটি আছে, অপোগণ্ড শিশুর গায়ে দুধের গন্ধের মত তাহাতে ভুল হইবার অবকাশ নাই। এই সুর ব্রাহ্মণসূত্রের বাঙ্গলা ভাষার কথা বলিবার ভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সকল গল্প বলিবার বেহাই ব্রাহ্মণঠাকুর দখল করিয়া বসিয়াছেন, রচনা করিতে লাগিলেন, "ঘোর রজনী, নিবিড় গাঢ় তমস্বিনী—শান্তা নলিনী" ইত্যাদি।

পল্লীমায়ের মুখটি ব্রাহ্মণগণ বলসাইয়া দিয়াছেন সত্য, তবুও উহা মায়ের ডাকের মত মধুমাখা শুনি, সেই খানেই উহার মিষ্টত্ব আমাদের কানে লাগে—আমরা মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াই, অন্তর মোহ আমাদের ডাকের মত অমন জিনিষকে ফুলাইয়া রাখিয়াছে।

পল্লীসাহিত্যের কতকটি নিদর্শনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে সেই ধারা কথাঞ্চিৎ হইয়াছে। কবিতার পূর্ব্ব যুগের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে নূতন যুগের একটা পরম ঐক্য আছে, ইহাই বুঝাইতে চাহিয়া এখানে এ সম্বন্ধে এইটা বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। কাহিনী ধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথাপি তাহার পরিণামে নাই, কিংবা নূতন পথে চলিবার শক্তি হারায় নাই, বরং স্থানে স্থানে নূতনতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বেশ কিছু পরে আমি পল্লীসাহিত্য সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

আমরা পাই কথা-সাহিত্যের দুইটি প্রকারভেদ দেখিয়াছি, ১ম গীতিকথা, ইহাতে অধিকাংশই পদ্য, মধ্যে মধ্যে ইহাতে কবিতা আছে, কবিতাগুলির ভাষা প্রায়ে কতকটা পাচন যুগের অনুরূপ। এই গীতিকথাগুলিতে গীতিরসের প্রভাব খুব বেশী।

রূপকথাগুলি অলৌকিক ঘটনা, এবং সিদ্ধ ভাগ্যকগণের অদ্ভুত কার্য্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাদের সঙ্গে তুলনার জন্য কতক ১০ম, ১১শ শতাব্দীর ভূটিয়া, পূর্ব্বোত্তর সময়ের অলৌকিক বর্ণনার অনেক সাদৃশ্য আছে। আমরা "Folk Literature of Bengal" নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, পুষ্পমালা, মধুমালা, কাজলরেখা প্রভৃতি দেখানে এই শ্রেণীর।

দ্বিতীয় শ্রেণী পল্লীসাহিত্যিকা। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার অধিকাংশ কথাকাব্য এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর আদর্শ খুব প্রাচীন যুগেরও হইলেও যে সমস্ত কাব্য আমরা পাইয়াছি, তাহার কোনটিই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। প্রেমের জন্য তপস্যাই পল্লীসাহিত্যের আবহাওয়া—ইহাতে আধিভৌতিক দৃষ্টান্ত 'বরল'—দুই একটিতে আভাস মাত্র পাওয়া যায়, বোধ হয় তাহা এই সকল কাব্যের মূল কথা নহে। ইহাদের মূল সুর প্রেমের বীণায় বাজিয়াছে। গল্পাংশগুলির অধিকাংশই শুধু পাড়ু লেখা। ইহাতে অঘটন-ঘটন পটীয়সী কল্পনার লীলা নাই, লেখকগণের মধ্যে অলৌকিক কিছু নাই বলিলেই চলে, পার্থিব নিত্যদৃষ্ট পথে চলিয়া ইহারা আমাদিগকে প্রেমের কথা শুনাইতেছে। মলুয়া, মহুয়া, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা প্রভৃতি গীতকাব্য এই পল্লীসাহিত্যের অন্তর্গত।

তৃতীয় শ্রেণীর কথার নাম রূপকথা। ইহা কথাসরিৎসাগরোক্ত গল্পগুলির মত। ইহাতে ছেলেদের কৌতূহল পূরণ করিবার মত উপাদান যথেষ্ট আছে। ইহা যে কতকাল হইতে এদেশে প্রচলিত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রাজা ও রাজকন্যার কথা, রাজপুত্রের সঙ্গে সদাগর পুত্রের সখ্য, রাজকন্যাকে দস্যু বা রাক্ষসগণ কর্তৃক পাষাণ-গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা এবং বহু অলৌকিক বাঁধন দেখাইয়া রাজপুত্রের তাহাকে উদ্ধার করা, কথার কাঠি ও সোনার কাঠি, নড়া কলা, সিংহদ্বার বিংহদ্বার ইত্যাদি নানা বিষয় এই রূপকথাগুলির আখ্যানবস্তু। এই সকল গল্পের অধিকাংশের জন্মভূমি বাঙ্গলাদেশ। ইহারা সম্ভবতঃ বাঙ্গলাদেশ হইতে বাহির

যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় য়ুরোপীয় প্রাচীন কথা-সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে "বিশ্বস্ত জনের গল্পটি" "ফকিরচাঁদ ও রূপমালা" নামক অতি প্রাচীন বাঙ্গলা গল্পের ঠিক অনুবর্ত্তী, সোনা, রূপ ও মরনামন্ত্রের সম্বন্ধে অনুপম ও অনুসন্ধানকারীর যে ব্যাপার আখিরুটাদের গানে বর্ণিত আছে, তাহা কাডিলহেন ওইনবাচের গল্পের সঙ্গে মিলিয়া যায়। গন্ধর্বদের দেবরের গল্প ঠিক বাঙ্গলা রামায়ণের কুশলোচনের গল্পের মত বাঙ্গলার প্রাচীন অলিখিত গল্পভাণ্ডার হইতেই কৃত্তিবাস উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বসন্তমঙ্গলে ইলা চোরের কথা এবং বঙ্গীয় রামায়ণের মহীরাবণের নিকট সীতা প্রত্যেকটি প্রয়োগের ব্যাপার এবং "বোক বাছের" গল্প একরূপ, এরূপ একটি দুইটি নয়, গ্রীমভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীন বহু গল্পের আশ্চর্য্য নিকট সম্বন্ধ। হাত অপরাধে অন্ধ বাঙ্গলের সময় এই সকল গল্প আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কাশিরাজ্য নিয়াছিল এম এন বেরট স্বামী মহাশয় তামিল দেশের যে সকল গল্প প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এখনও বাঙ্গলার পল্লীতে প্রচলিত। আমরা যে কয়েকটি রূপকথা সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্যে দুই তিনটি বেরট স্বামী মহাশয়ের প্রকাশিত উপাখ্যানের সঙ্গে মূলতঃ একরূপ, বাঙ্গলার রূপকথার একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাদের অনেকগুলির মধ্যে পাখীকে জ্ঞানিলোক বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দিগিয়াদের বর্ণিত উপাখ্যানগুলির প্রধান চরিত্র ইহারা ভবিষ্যদ্বক্তা এবং নায়কনায়িকার বিপদের পূর্ব্বাভাস দিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইবার উপদেশ দিয়া থাকে বাঙ্গলার শত শত রূপকথায় ইহাদের বিচিত্র পরিচয় আছে আমাদের প্রকাশিত কাঞ্চনরেখার কাহিনীতেও সর্ব্বত্র রূপকথার ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা দেখান হইয়াছে। বিলাতের "ফেইরিটেল" গুলির গল্প যাহা লালবিহারীবাবু ও দক্ষিণারঞ্জনবাবু দুই ভিন্ন নামে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহা পূর্ব্বকাল হইতে গৃহীত হইয়াছে,—তাহাতে এই বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার কথা এমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে উহা যে বাঙ্গলাদেশ হইতেই প্রথম যাত্রা করিয়া বিলাতী শিশুসম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আমরা Folk Literature of Bengal পুস্তকে বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাখ্যান ও গ্রীম্ সংগৃহীত বিলাতী কথা-সাহিত্যের আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছি, তাহা পড়িয়া 'The Story of the Simpguards, Rampel Nalin Kia প্রভৃতি গল্প যে খাঁটি বাঙ্গলাদেশের তাহা সহজেই পাঠকের মনে হইবে। য়ুরোপীয় গ্রাম্য সাহিত্যের বিচারকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয় সংগৃহীত গল্পের অনেকগুলিই ভারতবর্ষ হইতে নেওয়া, কিন্তু গল্পগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রাচীনতম কথাগুলির যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়—তাহাতে এই দেশকেই সেই সাহিত্যের গুরুর আসনে বসাইতে হয়। 'Folk Literature of Bengal' পুস্তকে আমি সেই সকল গল্পের বিস্তার আলোচনা করিয়াছি স্বর্গীয় লালবিহারী দে এই সকল উপকথার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রবিশঙ্করবাবু প্রমুখ অনেকে বাঙ্গলার রূপকথা প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশেই রূপকথারই দেশ, এদেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও খুঁজিলে শত শত প্রাচীন রূপকথা আবিষ্কার করা যাইতে পারে বঙ্গদেশের

এইরূপ মূল্যবান্ উপকরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে, সেদিকে দৃকপাত না করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষায় ডক্টরেট উপাধি লাভের জন্য ছাত্রগুলিকে বিলাত পাঠাইতেছেন, তাহাদের অধিকাংশই দেশের প্রতি অনুরাগ দূরের কথা, একটা বিরাগ ও বিতৃষ্ণার ভাব লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। এই ছাত্রদিগকে যদি বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে পাঠাইতেন, তবে তাঁহারা অনেকটা শিখিতে পারিতেন, অন্ততঃ তাঁহাদের পাছে যে খরচ হয় তাহার অনেকটা কমিয়া যাইত, এবং তাঁহারা অর্দ্ধদগ্ধ বা অকালকুষ্মাণ্ড না আনিয়া সত্যকার কিছু হাতে লইয়া ফিরিতে পারিতেন।

এই উপাখ্যানগুলি সমুদ্র যাত্রা নিষেধ সত্ত্বেও কেমন করিয়া কোন সময়ে এদেশ হইতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া বিলাতে গেল, তৎসম্বন্ধেও আমি আলোচনা করিয়াছি। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইহা ঘটিয়াছিল এরূপ অনুমান হয়। সৌদাগরেরও বহুপূর্ব্বে ভারতবাসীরা গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। অশোকের সময়ে এই পরিচয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়—কিন্তু গুপ্তদের সময়েই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবের বিনিময় ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান বেশ হইয়াছিল। ইসপের গল্পের অনেকগুলি যে ভারতবর্ষের দান এবং পঞ্চতন্ত্র উপন্যাসের মূল ভিত্তি যে ভারতীয় কথাবিদ্যাগণ গড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন যে পরবর্ত্তী কালে ক্রুসেডের সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীরা লড়াই করার উপলক্ষে এক জায়গায় কয়েকদিনের জন্য জড় হইয়াছিলেন—তখন হয়ত ভাবের আদান প্রদান অনেক পরিমাণে ঘটিয়া থাকিবে। গুজরাট হইতে ১০ সহস্র বণিকবাহক পারস্য দেশে গিয়াছিল, তাহারা সমস্ত য়ুরোপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং তাহাদের বংশধরেরা এখন য়ুরোপে 'জিপসি' নামে পরিচিত। ইহারা যে ভারতবাসী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা এদেশের কতকগুলি গল্প যে তথায় চালাইয়াছিল তাহা খুবই সম্ভবপর। মুসলিম বাঙ্গলাদেশ হইতে একসময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। সেই সকল জাহাজের মাঝিরা হয়ত বঙ্গের গল্পগুলি সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়াছিল। এইরূপ নানাস্থানে আমাদের এসোহিত্য ভূপর্য্যটন করিয়া থাকিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের ভেদ

হিন্দুর স্বাধীন যুগের কথা অতঃপর। এই পুস্তকে আমরা বাঙ্গলাদেশের শিল্পসম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করিয়াছি। সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে আমাদের কয়েকটি অনুমান আমরা এখানে সংক্ষেপে পুনরায় লিপিবদ্ধ করিব। আমরা লিখিয়াছি, গুপ্ত ও

পালদের সময়ে হয়ত বাঙ্গলা দেশই মগধের চিত্রকর ও ভাস্কর জোগাইত, এবং এই দেশই বিস্তৃত মাগধ সাম্রাজ্যের চিত্রশালাস্বরূপ ছিল

খেস্থরাহ, উড়িষ্যা, বিহার, সিংহল, জাবা, কাম্বোডিয়া, শ্যাম ও বালী প্রভৃতি শিল্প ক্ষেত্রের জগদ্বিখ্যাত প্রস্তর ও ধাতব শিল্পের সঙ্গে বঙ্গীয় শিল্পের যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহাতে তাহারা অনেক পরিমাণে যে একসঙ্কলাক্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের আদর্শ অনেকাংশে এক, এবং পরিভাষা দিয়া বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়—ইহারা 'এক কলমের' ,—এই কলম বাঙ্গলার 'কলম' বলিয়াই মনে হয়।

প্রথমতঃ শিল্পীদের মধ্যে বঙ্গীয় ধীমান ও বজ্রপাল (শিল্পীপুত্র) উত্তরবঙ্গের লোক—তাঁহাদের প্রতিভা চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বত প্রভৃতি রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় ও তদুত্তরে—এক বিশাল রাজ্য শিল্পোন্নতের এক নব যুগ আনয়ন করিয়াছিল (অষ্টম-নবম শতাব্দী)। প্রসিদ্ধ শিল্প সমালোচক ডা. হেলা ক্রামরিশ্ রূপম পত্রিকায় (নং ৪০, ১০৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন The art of Bihar and Bengal exercised a lasting influence on that of Nepal, Burma, Ceylon and Java—(বাঙ্গলা ও বিহারের শিল্প নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও জাভার শিল্পের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল)।

বালী দ্বীপের মূর্তিগুলি ঠিক বাঙ্গলাদেশের মূর্তির ন্যায় তথাকার কতকগুলি ধাতব বুদ্ধমূর্তি অবিকল চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে প্রাপ্ত ধাতব বুদ্ধমূর্তির ন্যায়। (নবম ও দশম শতাব্দী, পরবর্ত্তী চিত্র দ্রষ্টব্য) বালী দ্বীপের শিলালিপির অক্ষর অনেকাংশে সেই যুগের বাঙ্গলা অক্ষরের ন্যায়। পাল রাজাদের সঙ্গে সুদূর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাজন্যবর্গের ঘনিষ্ঠতা ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ পাল রাজাদের শিল্পীরা সেই সকল স্থানে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়া শিল্পের প্রেরণা দিয়াছিলেন। নালন্দার তাম্রপটে দেখা যায় সম্রাট্ দেবপালের সভায় সুমিত্রার রাজার নিকট হইতে রাজদূত আসিয়াছিল বুদ্ধচরণরেণু-পূত প্রাচ্য ভারতে যবদ্বীপ দেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা আনাগোনা করিতেন, সুতরাং প্রবল-প্রতাপান্বিত, ঐশ্বর্য্যের তুঙ্গশৃঙ্গে আসীন পাল-রাজাদের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য যে সেই সকল দেশকে প্রভাবান্বিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীযুক্ত জে সি ফ্রেঞ্চ, সি. আই ই তাঁহার "Art of the Pal Empire" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "It seems extremely probable, though the point has not yet been definitely established, that the Hindu Art of Java is to be derived from Bengal" (p. 43)—"খুবই সম্ভব, যদিও এখন পর্য্যন্ত বিষয়টী নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই যে, জাভার হিন্দু শিল্প বাঙ্গলাদেশ হইতে উদ্ভূত।"

উড়িষ্যা—উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশের অধিকারকালে (ষষ্ঠ হইতে ষোড়শ শতাব্দী *), বাঙ্গলার

* Oxford History of India by Vincent Smith, p. 199

প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে চারুকলাক্ষেত্রে ময়ূরভঞ্জ বাঙ্গলা ও কলিঙ্গের সন্ধিস্থলে, ইহা কলিঙ্গের সন্নিকটবর্তী এবং বাঙ্গলাদেশের উপান্তভাগে, বাঙ্গলাদেশের শিল্পকলার মধ্যে যে অধিকতর বিস্তৃতি এবং প্রস্তরগাত্রে ধাতব শিল্পের ন্যায় সূক্ষ্ম কারুকার্য, বিশেষ অলঙ্কারাদিতে এবং মূর্তিগুলিতে কোমল ভাবের ব্যঞ্জনা, তাহা ময়ূরভঞ্জের শিল্পেও বাঙ্গলাদেশ হইতে পাইয়াছে, এরূপ অনুমান সহজেই হয়—"Artistically Mayurbhanja lies between Bengal and Kalinga (as understood here) It is the northernmost of the Orissan States and borders on Bengal A greater precision and almost metallic sharpness in details such as jewelry and more emotional physiognomical expression bring it near to the former"—Stella Kramrisch, Indian Sculpture, p. 112 ময়ূরভঞ্জের বিভিন্ন নামক স্থানে যে সকল স্থাপত্য নিদর্শনাদি ও দেবদেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাল-প্রভাবের বাঙ্গালীর বাঙালার প্রভাব স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে। মিঃ ক্র্যামরিস, বাঙ্গালী ভাস্কর্যকে বলিয়াছেন—"অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গলা ও বিহারের কাল পাথরের মূর্তিগুলির কার্য সমাহিত সুকোমল ভাব-গভীরতা এবং গাম্ভীর্য সকলের চক্ষে খুব বেশী করিয়া বাজিবে"—"Executed in black stone the dignified yet sensuous serenity of these eastern images stands in telling contrast to the work of the west" p. 112) এবং উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—"So it comes about that traces of the Pala and Sena School of Art of Bihar and Bengal are noticeable in the subsequent images of Utkala" (p. 113) সুতরাং দেখা যাইতেছে পাল ও সেনদের বাঙ্গলা বিহারের শিল্পকলা দ্বারা উৎকলের শিল্প উদ্ভবকালে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

মিঃ ডে ফি ফ্রেঞ্চ The Art of the Pal Empire of Bengal, (বাঙ্গলার পাল সাম্রাজ্যের কলা শিল্প) পুস্তকে ৩২ খানি ছবি দিয়াছেন, ইহার সমস্ত কয়েকখানি বিহারের চাহাও সেদিন পর্যন্ত বাঙ্গলারই একটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু মূর্তিগুলির অধিকাংশই খাস বাঙ্গলাদেশের মিঃ ডে'ফ বাঙ্গলার মহাস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "মহাস্থানের একটা সমুচ্চ ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া পাল-সাম্রাজ্যের স্থাপত্য শিল্পকলার নিদর্শন আছে, চারিদিকে বিলুপ্ত-অবশেষ ভগ্নস্তূপ বহু মাইল ব্যাপী উচ্চভূমি পালদিগের কীর্তিচিহ্ন বহন করিতেছে। ইহাদিগের জন্য বৎসর বৎসর যে ব্যয় হয়, তাহার শতাংশের একাংশও যদি এই স্থানে খননের জন্য ব্যয় হইত, তবে কতই না আশ্চর্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত!" ৪ পৃঃ।

ডে'ফ সাহেবের পুস্তকে ৩২ খানি ছবি বঙ্গদেশের শিল্পকলার নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিতেছে। বঙ্গ ও গৌড়ের প্রাধান্য-যুগে বৃহৎ বঙ্গই শিল্পের লীলাস্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই যুগের মূর্তিগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখমণ্ডলের অপার্থিব কোমলতা ও ওষ্ঠসম্পুটের হাসিরেখা—এবং ভক্তিপ্রেমের প্রেরণা—অপেক্ষাকৃত শিল্পের স্বর্গীয় ভাব স্মরণ করাইয়া দেয়।

উহ খেড়ুরাহ, ভুবনেশ্বর, খিচিং, বালা ও সিংহলের মূর্তিতে একই ভাবে বিদ্যমান কিন্তু খাস বাঙ্গলায় ঐ সকল কোমল অথচ সংযত,—ভাবপ্রবণ অথচ গম্ভীর,—লীলায়িত অথচ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ মূর্তির উৎকর্ষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব কাশ্মীরের চারুশিল্পের সঙ্গে খাস বাঙ্গলা শিল্পের সম্বন্ধ নিকটতম,—ইহার কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিয়াছেন —"When the writer, Mr French, was in the Punjab Hill States recently he came across a curious and unexpected echo of the Pal dynasty There is a strong and continuous tradition that the ruling families in certain States are descended from the 'Rajas of Gour in Bengal These States are Suket, Keontal, Kashtwar and Mandi In the ancient Rajput States tradition has immense force and accuracy Of Kashtwar it is related that 'Kahan Pal'—the founder of the State—with a small band of followers arrived in the hills in order to conquer a kingdom for himself. He is said to have come from Gour, the ancient capital of Bengal and to have been a cadet of the ruling family of that place." (The Art of Pál Empire, p. 19)

মর্ম্মার্থ —[ফ্রেঞ্চ সাহেব সম্প্রতি পঞ্জাব পাহাড়িয়া রাজ্যগুলিতে পর্য্যটনকালে পালবংশসম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্যজনক অদ্ভুত কথা শুনিতে পান সেখানে একটি বদ্ধমূল ও দীর্ঘব্যাপী সংস্কার এই যে পঞ্জাবের কয়েকটি রাজ্যের রাজবংশ বাঙ্গলার গৌড় রাজবংশের শাখা। সুকেত, কেয়োথল, কাইথোর এবং মণ্ডি—এই কয়েকটি স্থানের রাজারা গৌড় রাজবংশ বলিয়া লোকের চিরাগত বিশ্বাস। প্রাচীন রাজপুত-রাজ্যগুলিতে এইরূপ কিংবদন্তী ও সংস্কারের মূল্য সর্ব্বাধিক, এবং তাহা বিশ্বাসযোগ্য। উক্তরূপ প্রচলিত প্রবাদ এই যে, কাইথোরের রাজবংশের আদিপুরুষ "কাহনপাল" একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া গৌড়দেশ হইতে আসিয়া উক্ত দেশ জয় করেন এবং বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।]

এ সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি প্রমাণ আছে, এই পুস্তকে সেগুলির সম্বন্ধে আমরা তাহারও উল্লেখ করিব। এবিষয়ে এখন নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালীরাই পঞ্জাবে যাইয়া বহু রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন সেসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট গেজেটিয়ারের উক্তি, সরলা দেবী চৌধুরাণীর প্রবন্ধ, রাখালদাসবাবুর মত এবং ফ্রেঞ্চ সাহেবের উক্তি মিলিয়া যাইতেছে কাঙ্গড়া উপত্যকায় যে বাঙ্গলার শিল্প প্রবেশ লাভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই এখনও বাঙ্গালীর কীর্ত্তি অনাবিষ্কৃত,—মধ্যভারতে গৌড় ব্রাহ্মণদের ও দক্ষিণ-ভারতে কঙ্কণ ভাষাভাষী বাঙ্গালীদের বিশাল উপনিবেশ, গুজরাটে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী—মাটীবান ও সিংহল-বিজয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন ভূলক্ষুকে পরিণত বাঙ্গালী জাতি যে এক সময়ে দূরদূরান্তরে যাইয়া রাজ্য জয় করিত তাহা কালে

দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা ও কলাশাস্ত্রের নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব লইয়া এক সময়ে এশিয়ার সর্বত্র যাতায়াত করিত—তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে।

এখনও বাঙ্গলার কৃষ্টিবিস্তারের অজস্র নিদর্শন ও মৌলিকতার প্রমাণ ছড়াইয়া রহিয়াছে এরূপ অধিক পরিচয়ের বিষয়ীভূত আমাদের আর কোথাও আছে বলিয়া আমরা জানি না এজন্যই আমরা একেবারে মাগধ ও গৌড়-সাম্রাজ্যের চিত্রশালা আখ্যা দান করিয়াছি শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—অজন্তার অনেক চিত্রকরই বাঙ্গালী ছিলেন শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও অপরাপর লেখকেরা অনুমান করিয়াছেন—'জাভার বরোবুদর মন্দিরে যে সকল অপূর্ব শিল্পনিদর্শন আছে তাহা বাঙ্গালী ও কলিঙ্গবাসীদের কীর্তি। কলিঙ্গদেশের শিল্পকলা যে বাঙ্গালীর আমল দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা আমরা লিখিয়াছি

নানা কারণে আমরা সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বিধিবদ্ধ করিয়া গত ৫৬ শত বৎসর যাবৎ বীর পদক্ষেপের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কূপমণ্ডুক সাজিয়াছি কিন্তু প্রাচীনকালে সমুদ্রোপকূলবর্তী তমলুক ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বন্দর ছিল এই স্থান হইতে বাঙ্গালী জগতের নানাস্থানে যাইয়া উপনিবেশ করিত। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী বঙ্গের সভ্যতা ও জাহাজের স্বর্ণযুগ কিছু পরে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, বৈদেশিকেরা কিছুকাল পূর্ব হইতেই বঙ্গের পার্শ্বনাথ পাহাড় (মধুবনেশ্বর) তাঁহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীতে বঙ্গের দুই পুত্র—তুলাল ছেলে বিজয়ের সিংহলে অভিযান। অমলা দিবাকরণ মহাশয় লিখিয়াছেন—একজন বাঙ্গালী বীর খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে আনাম রাজ্য গমন করেন তাঁহার নাম লাকলঙ (Laklong) ইঁহার মাতৃকুল নাগবংশীয় ছিলেন। আনাম দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ইনি তত্রত্য রাজাকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন তথায় 'উকি' নামক এক রমণীকে বিবাহ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন আনাম দেশের নাম তিনি বনলঙ্গ রাখেন. তদাকার রাজবংশীয়েরা বন্ বা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল ইহারা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত আনামে রাজত্ব করিয়াছিলেন সুপণ্ডিত জেরিনি ও অপরাপর পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি বঙ্গদেশ হইতে আনামে গিয়াছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, নাগপূজক কয়েকটি জাতি বাঙ্গলা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকম্ দেশে যায় ইহাদের মধ্যে মরণ, চের, ও পাঙ্গলা উল্লেখযোগ্য। চেরগণ উত্তর-পশ্চিম পাঙ্গলা হইতে দক্ষিণ ভারতে যায়। সেখানে যাইয়া তাহারা চেররাজ্য স্থাপন করে পাঙ্গলা যে বাঙ্গলা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে (রাখালবাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ.)। "বাঙ্গলার বর্তমান অধিবাসিগণের সহিত দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি অধিবাসিগণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ইহার প্রমাণ প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্যে পাওয়া যায়" বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)।

বাঙ্গালীর দিগ্বিজয় দেশে উপনিবেশ।

"সিংহলের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বিজয়সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ... বিজয়সিংহ নাম অনার্য্য নহে, সুতরাং তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই বঙ্গ হইতে সিংহলের অধিবাসিগণ আর্য্যজাতির আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন" (ঐ, ২৪ পৃষ্ঠা)।

ইহা ছাড়া মাটীবানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আমরা এই পুস্তকে গুজরাটে বাঙ্গালী "ভাগা ব্রাহ্মণে"র বিস্তৃত উপনিবেশ এবং বাঙ্গলার অপরাপর জাতির তথায় বসবাস-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি (৭০-৭১ পৃঃ)। সিংহল প্রবাসী শ্রীযুক্ত অগস্ত্যবম প্রমাণ করিয়াছেন, দক্ষিণ কানাড়ায় গৌড় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী এবং তাঁহাদের ভাষা (কঙ্কণীভাষা) বাঙ্গলা ভাষারই কথিত রূপ ভিন্ন কিছুই নহে, (৮৮ পৃঃ)।

জাভা, বালি, কাম্বোডিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস খুঁজিলে বাঙ্গালীর অসংখ্য কীর্ত্তি চিরকাল আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আমরা নিজেদের কথা নিজেরা লিখিয়া রাখি নাই এদেশে এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যে, পার্থিব গৌরবকে আমাদের ব্রাহ্মণগণ অতীব উপেক্ষার সহিত দেখিতেন ইহাদের চেষ্টায় এদেশের ইতিহাস লোপ পাইয়াছে গত পাঁচশত বৎসর দেবলীলা ও ধর্ম্মকথা বলা করাই আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। যোগীদিগের দেখাদেখি গৃহস্থগণ তাঁহাদের মৃতের নিজেদের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করিতেন, কিন্তু তৎপরে পুনরায় দেবমূর্ত্তি অথবা ধর্ম্মচিহ্নই মৃতের অঙ্কিত হইতে লাগিল এই সমস্ত কারণে এশিয়ার নানা দেশে যে সকল ঐতিহাসিক উপকরণ উপেক্ষিত হইয়া আছে তাহার আবিষ্কার হইলে বঙ্গের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইবে

গুপ্ত ও পালরাজগণের সময়ে বাঙ্গালী জগতের সমস্ত দেশে যাতায়াত করিত বাঙ্গালীর যে রণতরীর কথা মহাভারতে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, তাহা এক সময়ে জগজ্জয়ী হইয়াছিল বঙ্গের পল্লীবাসীরা সেই যুগের বাঙ্গালীর অশ্বত্থ সাহস, জীবনোৎসর্গ, তপস্যা, নানা দেশে পর্য্যটন, অপূর্ব্ব দার্ঢ্যসিকতা, বীর্য্য ও "মনের সাধন কিংবা শরীরপতন"—তপঃসিদ্ধির এই সাধনার সম্বন্ধে নানা উপকথা, রূপকথায় কল্পনার অফুরন্ত নিধি বহুবিধ প্রবাদ ও গল্প রচনা করিয়াছিল, তাহারই ছিটাফোঁটা আমরা পূর্ব্বকথিত পল্লীসাহিত্যিকায় পাইয়াছি

হিন্দুর স্বাধীন যুগের কথা অনুবন্ধ বাঙ্গলাদেশে যে রাজত্বের শেষ হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গের পল্লীর জনগণকে কেহ পরাভূত করিতে পারে নাই যে শিক্ষাদীক্ষা এককালে এদেশকে "সকল দেশের সেরা" করিয়াছিল, এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেই শিক্ষার ঐতিহ্যিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই গুপ্ত ও পালবংশের কথার সঙ্গে আমাদের দেশের এখনকার কথা অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে আমরা সেই যুগকে বাদ দিলে নিজের স্বরূপ আবিষ্কার করিতে পারিব না। বঙ্গের নগর যুগে যুগে বিকটভাবে পরিবর্ত্তিতরূপে দেখাইয়াছে,—ধুতি ছাড়িয়া একযুগে বাঙ্গালী পাইজামা ও আলখাল্লা পরিয়াছে,

বঙ্গের পল্লী ও নগর।

মাতৃভাষা ছাড়িয়া পারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী পড়িয়াছে, হাত ছাড়িয়া কাঁটা চামচের সাহায্যে ভাত-তরকারী খাইয়াছে, চন্দন ও অগুরু ফেলিয়া আতর এবং শেষে এসেন্সের শিশি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে, কাজল ছাড়িয়া সুর্মা, অলক্তক ছাড়িয়া মেন্দী ধরিয়াছে, টীকি কাটিয়া সোলোলা পরিয়াছে এবং খড়ম ছাড়িয়া লপ্টুনের জুতা পরিয়াছে, আবার ইংরেজীর আমলে সে পাগড়ী আর নগরবাসীর মাথায় নাই, তৎস্থানে সোলার টুপি শোভা পাইতেছে, গলার পৈতা ও কণ্ঠীর জায়গায় নেকটাই, খড়ম ও জুতার জায়গায় বুট, প্রণাম ও কুর্নিশের জায়গায় টুপিখোলা, করজোড়ের জায়গায় করমর্দন—পারসীর জায়গায় ইংরেজী বুলী—যুগে যুগে বহুকর্ণার ন্যায় এদেশের নাগরিকগণ এই ভাবে বেশ পরিবর্তন করিতেছে।

কিন্তু সহর ও নগরে যেরূপ পরিচ্ছদের ইজাদ ও ছাটি, উল্টা-পাল্টা ও পরিবর্তন, বঙ্গের পল্লীতে তাহা নাই। বঙ্গের পল্লী সেকালেও ছিল আম্র, জাম, কাঁঠাল তরুর ছায়াশীতল, সেখানকার কুঁড়ে ঘরে গোময়লেপ্য, ঝাঁট পরিচ্ছন্ন অঙ্গিনা, সন্ধ্যা পড়িলে তাহাতে একটী ছোট পাঁচমিশালী ধানের খুঁটে তুলসীর পাশে দেওয়া হইত, কারণ সেখানে বাঙ্গলার কর্তৃদেবে সোনার ফসল অর্পিয়া যজ্ঞ করা হইত। সেকালে পল্লীর বঙ্গেশ্বর মন্দির কারুকার্য মণ্ডিত ছিল, সেখানে দেবতারা নিত্যপূজা পাইতেন, গ্রামের পাইবার জন্য ডুলে বুড়ো ঘড় হইত, সেখানে অতিথি ফিরিত না, কেহের চরকা ছাড়িত না, তাহাদের সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য দিয়া যে সম্বেল তৈরী করিত, তাহাতে ফুল ও ফলের সমস্ত লোভা প্রদর্শিত হইত, তাহাদের সেলাই এক একখানি কাঁথা পারসের কার্পেটের মত হইত। তাহাদের আলপনা ও পিটী চিত্র দর্শিল লোকে মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিত। তাহাদের শিকা, পানের বাটা, পুথির লাটি দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইত। পল্লীর ছুতরের কাঠের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম কার্য করিত, তাহাতে কারুশিল্পের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত। পটীর চিত্রকর যে সকল ছবি আঁকিত এবং পল্লীর মিস্ত্রি লোক ইটের উপর যে সকল ফুল লতা ও নরনারীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিত এবং পুঁথির মলাটে যে ছবি আঁকিত তাহার বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য দেখিয়া এখনও লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে, পল্লীর জাতুটকরের হাতে মিছরির খেলনা, নারিকেলের সন্দেশের মঠ, গুড়, জলযন্ত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ছবির মত সাজানো থাকিত, সেই নারিকেলের খোল দিয়া এরূপ ময়ূর গঠিত হইত, যাহার ডানা পাখা ও লেজে ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ খেলা করিত। মৌনী, গুপ্ত ও পালরাজত্বকে স্মরণ করাইয়া দিবার মত শিল্প-সম্ভার গ্রামবাসীরা আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহা হিন্দুর সভ্যতার বিচিত্র আদর্শ ও ধারা বজায় রাখিয়াছিল। তাঁহারাই জগদ্গুরু কীর্ত্তনগানের স্রষ্টা, গ্রামের গৌরব পণ্ডিতগণ সর্ব্বশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিয়া জগদ্গুরু উপাধি লাভ করিতেন এবং নটের নর্ত্তন এরূপ চিত্তাকর্ষক পটুতা প্রদর্শন করিত যে শুকসনক ভরত মহাশয়ের মত পণ্ডিত ও সমালোচক সেই নর্ত্তনের তালে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। তিনি সমস্ত খুঁটিনাটি নুত্যা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন এবং বলিয়া থাকেন যে বঙ্গের পল্লীর ঝুমুর, বাউল, জারি, সারিগান নৃত্যের যেরূপ বিজ্ঞানসম্মত রঙ্গভঙ্গী ও সৌষ্ঠব তাহাতে ইহাদের এই নৃত্য জগতে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য,

এবং ইহা সেই প্রাচীন শিবতাণ্ডব ও মহাভারতীয় যুগের বৃহত্তলার ধারা-ধারা বজায় রাখিয়াছে।

বড় বড় স্থাপত্য ও অপরাপর কলাশিল্পে ভারতের স্থান পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল। এ সকল শিল্প রাজানুগ্রহে শ্রীসম্পন্ন হয়। যুধিষ্ঠিরের যে রাজসভা ময়দানব নির্ম্মাণ করিয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর যে ঐশ্বর্য্য, কারুকার্য্য ও স্থপতিবিদ্যার পরিচয় পাইয়া গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস উহা পারস্যের বিখ্যাতম রাজধানীর সৌন্দর্য্যকেও হীন মনে করিয়াছিলেন, অশোকের যে বিশাল রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া স্থপতিবিদ্যাবিশারদেরা সেই পুরাকালে এরূপ শিল্পকুশলতা কিরূপে হইল সেই সমস্যা পূরণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, নালন্দার গুপ্ত মন্দিরাদির যে কারুকার্য্য দেখিয়া কানিংহামের মত লোক সমালোচক বলিয়াছেন জগতে তিনি সেরূপ স্থাপত্য ও চারুশিল্পের এরূপ দ্বিতীয় নিদর্শন কোথাও দেখেন নাই, মথুরার সমৃদ্ধি ও স্বর্ণযৌবনের অসংখ্য দেবমূর্ত্তির যে আঙ্গসংগঠনপ্রণালী ও শিল্প-কৃতিত্ব দেখিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ছাড়া ইলোরা অজন্তার অপূর্ব্ব স্থাপত্য ও চিত্রশালা—দূর যবদ্বীপে সিকোট বরোবদর মন্দির বহু দৌরাত্ম্য, ধ্বংস ও ক্ষয়ের পরও এই যে ভারতীয় কলাশিল্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাবশেষ ও নমুনা ও উৎসবকে নিদর্শনের মতামত পাওয়া যাইতেছে সেই অদ্ভুত শিল্প ও স্থাপত্য পরাধীন ভারতবর্ষে অসম্ভব গুণীর পুরস্কার, স্থাপত্যের অসাধারণ ব্যয় ও দুরূহত্ব উৎসাহ, যে সকল না হইলে এক্ষেত্রে তদ্রূপ অপূর্ব্ব সফলতা অসম্ভব হয় রাজপ্রসাদভিন্ন তাহা শিল্পী কোথায় পাইবে? রাজরাজেশ্বরগণ শিল্পীকে বলিতেন যতটা জল হয় তাহা কর যেখান হইতে যে উপকরণের দরকার সংগ্রহ কর—রাজকোষের তোমার জন্য মুক্ত হইল সেই অকাতর ও অকুণ্ঠ দানশীলতায় শিল্পীর হাতে বিশ্বকর্ম্মার ক্ষমতা আবির্ভূত হইত ইতিহাসে পাইতেছি, এদেশের কোন শিল্পী শক্তি থাকিতেও মন্দির-নির্ম্মাণকালে তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে নাই এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। রাজকোষ রাজ-পারিষদিকের মতই অবাধ ছিল। কোথায় গেল কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যনাথের সেই প্রাসাদ, যে প্রাসাদের উর্দ্ধে জীবন্ত সিংহের ন্যায় এক স্বর্ণসিংহমূর্ত্তি এমনই ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যাহা দেখিয়া মনে হইত দেবীর বাহন সত্যসত্যই স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিতেছে, যে বিরাট সিংহ পালরাজগণের বহু-শত্রুরাজার মাথায় স্বর্ণমুকুট ভাঙ্গিয়া পড়া হইয়াছিল। পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি—সিদ্ধানপুর প্রভৃতি গুহাচিত্র ও হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারের পর এই সিদ্ধান্ত স্থির নির্ণীত হইয়া গিয়াছে যে ভারতের আদিম অধিবাসীরা স্থাপত্য ও চারুশিল্পে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মা পশুপক্ষী এবং নরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে একথাটা প্রমাণিত হয় যে আর্য্যগণ কোন শিল্পসংস্কার ভারতে আনেন নাই। তাঁহারা এদেশের আদিম সভ্যতা হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজন্তা গুহা, খেজুরাহ প্রভৃতি স্থানে আমরা রমণী মূর্ত্তির যে সকল লালায়িত ভঙ্গী পাই, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, তাহা সেই আদিম

শিল্পকলার বিকাশ। আর্যগণ এইজন্য বোধ হয় বাহ্য ঐশ্বর্যের যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা দানব রাক্ষস প্রভৃতির নিকট। এই ভাবের একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন অযোধ্যাপুরীর যে বর্ণনা, তদপেক্ষা লঙ্কার বর্ণনা শতগুণ সমৃদ্ধিসূচক।

যুধিষ্ঠিরের রাজসভা ময়দানব রচনা করিয়াছিলেন। আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে আর্যগণ যে স্থাপত্য ও চারুশিল্পের অনেকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্যগণ এই শিল্পকলায় আধ্যাত্মিকত্ব দিয়াছেন, এরূপ কথাও আর বলা চলে না। মহেঞ্জোদারোতে শিবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই শিব যে প্রথমতঃ আর্যগণের দেবতা ছিলেন না তাহার প্রমাণ অনেক শাস্ত্রেই আছে। ভক্ত তাঁহাকে কন্যা দান করিলেও তিনি দেবতার পংক্তিতে স্থান পান নাই। কেহ কেহ বলিতেন যখন আর্যগণ শিবকে স্বীকার করিয়া লইলেন তখন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক গৌরব প্রদান করিয়া সর্বদেবতা করিয়া তুলিলেন। ভারতীয় আর্যগণ এই আধ্যাত্মিকতার ছাঁচে তাঁহাদের সমস্ত সভ্যতাকে মণ্ডিত করিয়াছেন। বাহিরের অবয়ব গঠনাদিতে তাঁহারা আদিম অধিবাসীদের সহায়তা পাইয়াছেন, কিন্তু যে ভাবস্তরে তাঁহারা সমস্ত মূর্তি গড়িয়াছেন বুদ্ধদেবের মুখে অপূর্ব শান্তি ফুটাইয়াছেন, শিবের মুখে প্রশান্তি ও কিরাতের মুখে প্রেমের ভাবনা দিয়াছেন ভগবতীর সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি অনুভব করিয়াছেন, এমন কি পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা এ সমস্তই একটা মহৎ ভাবানুগ করিয়াছেন তাই যেমন সাহিত্যে, যেমন দর্শনে, তেমনই চারুশিল্পে আর্যগণের বিশেষত্ব। কিন্তু এ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। মহেঞ্জোদারো ও পাহাড়পুরের আধ্যাত্মিক সৌরভমণ্ডিত মূর্তি পাওয়া যাইতেছে। আর্য ও অন্যান্য সভ্যতা-সম্বন্ধে এখন নানা দিক্ দিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভক্তি ও প্রেম তামিলদিগের ধন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন। আর্যগণ শিল্প ও স্থাপত্য কতটা উৎকর্ষ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা অনাগত যুগ করিবে। মহেঞ্জোদারোর যেমন দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, তামিল-সভ্যতা হইতে হিন্দুরা আধ্যাত্মিক গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলা দেশে যে সকল স্থাপত্য ও শিল্পের চিহ্ন ছিল, তাহার অনেকগুলিই মুসলমানের সৌধাদ্যে ধ্বংস পাইয়াছে। সম্প্রতি পাহাড়পুর হইতে যে সকল ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহাতে গুপ্তযুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এমন কি মৌর্যযুগের একখানি তাম্রপট্টও নাকি অধ্যাপক লাণ্ডারকার মহাশয় তথায় দেখিয়াছেন। পাহাড়পুর রাজসাহী জেলায়, শিয়ালদহ হইতে রওনা হইলে সান্তাহারের পর দুইটি ষ্টেশন ছাড়িয়া জামালগঞ্জ ষ্টেশনে নামিলে পশ্চিমদিকে তিন মাইল দূরে পাহাড়পুর পাওয়া যাইবে। Report of Archæological Survey in 1925-26 পুস্তকে পাহাড়পুরের ভূ-খননের বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই স্তূপে গুপ্তযুগের ১৬খানি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি বালগোপালের যমলার্জুন ভাঙ্গিবার চিত্র। ঐ দুটি বৃহৎবৃক্ষ শিশুকৃষ্ণ বলীলাক্রমে ভাঙ্গিতেছেন—এখানে তিনি লীলাময়—কোন ভক্ত কার্য সম্পাদনের ভাব

মুখেচোখে ফোটে নাই সমুদ্রের পরপর ভাঙিবার মত ক্লান্তের সহজ, সুন্দর যৌবন ভাব,—বাঙ্গালী চিত্রকরের বৈশিষ্ট্য এখানে, দেবতার কাছে পাতা-পর্ণাত ভাঙার দ্বারা, লীলা-কমল লইয়া খেলা করার ও চাহাই, বালগোপালের লাবণ্য এই চিত্রকর বাঙ্গালার ভাবী মাধুর্য রসের পরিণতির পূর্বসন্ধান দিতেছে পাহাড়পুরের রাধাকৃষ্ণের ছবি সমুদ্রগুপ্তের প্রথমভাগের, তাহার মধ্যেও অপূর্ব কমনীয়তা আছে। এই লাবণ্যপূর্ণ কমনীয়তা বাঙ্গলা-কলমে বাঙ্গালীর নিজস্ব, যেখানে যেখানে বাঙ্গালী গিয়াছে—সিংহল, আসাম, কাম্বোডিয়া, জাভা, বালী, শ্যাম—সর্বত্রই এই কমনীয়তা তাঁহারা লইয়া গিয়াছে মেয়েদের ও নায়কের নানারূপ নয়নলোভন ভঙ্গী পাহাড়পুরের মন্দিরে ফুটিয়াছে—উত্তরকালে খেজুরাহ ও ভুবনেশ্বরের অপূর্ব নয়নাভিরাম সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে পট্ট ও মৃণ্ময় অসংখ্য সন্ন্যাসিমূর্তি এবং বানর, সিংহ প্রভৃতি—বেশ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে চতুষ্কোণ পোড়া ইটের (terra-cotta) উপর খোদাইকৃত মূর্তি—বাঙ্গলার এই মন্দির-শিল্পের চারুশিল্পের বিশেষত্ব, পরবর্তীকালে উহা খুব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল ভিন্ন ভিন্ন যুগের চিত্রপদ্ধতি এই বিস্ময়কর বিহারের গাত্রে পট্ট হয় নানারূপ পুষ্পের মধ্যে 'পদ্মেরই প্রতিপত্তি অধিক' উহা বৌদ্ধদের পদ্ম-প্রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় অলঙ্করণের পদ্মই ফুলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। এই বিহারের নিম্নস্তরে অনেক ছিদ্রযুক্তদেহীর মাটি আছে উত্তরের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বড়, ৭৭ ফুট লম্বা, ৭৩ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া এই স্তূপ-খননে দীনাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় (বর্তমান রাজশাহীর মতই মুক্ত-হস্তে ব্যয় করিয়াছেন, বঙ্গদেশে এরূপ আরও বহু স্তূপ আছে কে তাহা খনন করিবে? সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন স্তূপ দৃষ্ট হয়, অভিশপ্তগ্রস্ত যশের ইতিহাস-লক্ষ্মী সেই সকল স্তূপের অন্তরালে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে? পাহাড়পুরের প্রাপ্তমূর্তিগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও গোপালকের রাখালদের দৃশ্য প্রমাণ করিতেছে যে রাঢ়কাব্য এদেশে বহু প্রাচীন কালের আবাল্য। দীক্ষিত মহাশয় মহাস্থান গড় হইতে আর একখানি লিপিযুক্ত প্রস্তর পাইয়াছেন। তাহা মৌর্যযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত।

বঙ্গদেশে প্রস্তরশিল্পের

এই সমুদ্র-সিকতা ভূমি গাত্রের উপযোগীর পাথরের গৃহ ও বিগ্রহ প্রস্তুত করা সহজ নহে বহুদূর হইতে বহু ব্যয়ে প্রস্তর আনিতে হয়। সুতরাং যখন বহু কষ্ট ও ব্যয়ে নির্মিত বিগ্রহ ও মন্দির অত্যাচারীরা ভাঙিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন প্রস্তরের ব্যবসায়টি একেবারে ধ্বংস পাইল। প্রস্তর-দ্বারা গৃহ কি মন্দির গঠন করিতে এদেশে অনেক সময় লাগিত, রাতারাতি কিছু হইবার উপায় ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িত এবং কালাপাহাড়ের দল তাহা ভাঙিবার উদ্দেশে অভিযান করিত। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে, যথা বাঁকুড়া জেলায় ইঁটড়াসল্লা গ্রামে (৺ ধর্মদাস হাজরার বাড়ীতে) এরূপ দেখা যায় যে মন্দির সম্পূর্ণ না করিয়াই মুসলমান-অভিযান হেতু শিল্পীরা অর্ধসমাপ্ত কাজ ফেলিয়া পলাইয়া

[illegible] [illegible] [illegible] [

ধারণী ও সাধু জগদ্গুরু কবন্ধ মহাপুরুষ সমাধিস্থানের ভবন পরিচয়ের প্রকাশের অধিকার বিশেষজ্ঞের মন্তব্য।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্ট এবং পরিচয়ের প্রসঙ্গে যদি কোনো মহাপুরুষের অনুপ্রেরণা থাকে

ঘটে নাই, একটা কল্পকার ফুলগুলির মধ্যে বামনরূপে কোন পুরুষ, অট্টালিকা রমণীরূপে কিংবা ক্ষুদ্রপদ বৃহৎমস্তিষ্ক উদ্ভট মনুষ্যরূপে চিত্রগুলি এমনই ভাবে সাজানো আছে যে সেগুলি যেন শিল্পরাজ্যের অঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে। অধুনা ইয়োরোপে এই সকল কল্পকার নানারূপ অনুকরণ হইতেছে। বাঙ্গালী চিত্রকরেরাও যে পরীগ্রামে এইভাবে জীব উদ্ভিদের মিলন ঘটাইয়া তাহাদের কল্পকার কারুকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন তাহার নিদর্শন আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি, সংখ্যা চিত্রহিসাবে সেগুলি অজন্তার সমকক্ষ নহে। বাঙ্গলাদেশে ষাঁড়ের লড়াইয়ের চিত্র অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে অজন্তায় তাহা দুর্লভ নহে। তুলনায় বাঙ্গলার চিত্র নিকৃষ্ট নহে। চাতুর্য লড়াই, অজন্তা ও বাঙ্গলা চিত্রে, উভয়েই পাওয়া গিয়াছে।

অজন্তায় বিহঙ্গের অভিধানে কি অপারোহী কি পদাতিক কি অশ্ববাহক কাহারও মস্তকে উষ্ণীষ অথবা পাগড়ীর বালাই নাই উহারা ঠিক বাঙ্গালী। অজন্তাগুহার ছবির চিত্রগুলি সাধারণভাবে অনেকটা বাঙ্গলাদেশের দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রের মত মনে হয়। হরপ্রসাদের নিকট রাজগৃহে আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই অজন্তার ১৮ নং চিত্রে, পুরুষের ধুতি ও স্ত্রীলোকের শাড়ী ঠিক বাঙ্গালীর মত।

আমাদের দেশে শিল্প ও সাহিত্যে যাদৃচ্ছিক পরিবর্তনের প্রতীক। উহাকে আবরণ দেওয়া হইত না। এমন কি দেবতাদেরও স্তন-বর্ণনা অনেক সময়ে কাব্য ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। কালিদাসের 'স্তনদ্বিতয়বলনা সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রে গৌরীর ও লক্ষ্মীর স্তন-বর্ণনা সুলভ সরস্বতীবন্দনায় 'কম কম দেবি চরাচরসারে, কুচযুগলোলিত মুক্তাহারে' প্রভৃতি কথা উক্ত দেবী পূজা উপলক্ষে শিশুশিল্পকেও আবৃত্তি করিতে হয় বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পে স্ত্রীলোকদিগের স্তন আবৃত করা হইত না, এই আজ বিদেশীদিগের বিশেষভাবে মোগলদের আমদানি। রাজমহিষী ও বেশ্যাদের সম্পূর্ণ অবয়ব বহুমূল্য মেলাস দিয়া ঢাকা হইত এমন কি আরঙ্গজেবের কন্যার দেহ সাতপ্রস্থ মসলিনে আবৃত থাকা সত্ত্বেও মোগল বাদশাহ শায়েস্তাখাঁনা বলিয়া তাঁহার কন্যাকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। রাজপুত-কলাশিল্প মোগল কায়দা অবলম্বন করিয়াছিল, যেহেতু সেখানকার রাজারা সর্ব্বদাই মোগল দরবারের সংস্পর্শে আসিতেন অজন্তা-গুহার রাণীদের পরণে পাতলা কাপড়ের অভাব নাই, অথচ বহুমূল্য মণিমুক্তায় তাহা উজ্জ্বল। মানুষদেহের সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রকাশ,—বাংলাদেশের মহাতীর্থের উপর কোন যবনিকার উৎপাত নাই। বাঙ্গলার পল্লীশিল্পে স্তন সর্ব্বদাই নগ্ন থাকিত সিংহল, বালীদ্বীপেও রমণীমূর্ত্তির এই বৈশিষ্ট্য।

অদ্ভুত ও উদ্ভট ভঙ্গিমার ছবি—অজন্তায় অসংখ্য এইরূপ ছবি আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রপটে দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষ জাতকের ছবিটি অজন্তাগুহার পরিহাস-রসিকতার একটি কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত। একটি বানর কোন মহিষের পিঠে চাপিয়া বসিয়া ঐ জন্তুটার চক্ষু দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তামাসা করিতেছে, বানর ও মহিষের ভাবভঙ্গী অদ্ভুত, এইরূপ আর একটা ছবিতে একটি ভল্লুক একটা মানুষকে আলিঙ্গন করিতেছে,—

মেয়ে কিরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করিত, তাহা ঠিক করা কঠিন। তাঁহার একটি চিত্রে এক রমণী হরিণী দোহন করিতেছেন, মেয়েটির গা হইতে যেন রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। তাহার দুইটি চক্ষু [illegible] মেয়েটার হাতে অতি কিঙ্করের ছবি অজন্তার চিত্রাবলীর মধ্যে কোথায় স্থান পাইবার যোগ্য। মেয়েটির ছবি বিলাতীয় শুদ্ধ বাঙ্গলার স্বাধীন চিত্রশিল্পের অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই কথা।

একদিন সিংহলের ঠিক বাঙ্গলার চিত্রের সিংহের মত বাঙ্গালী চিত্রকর ও কুমারেরা এখনও ঠিক সেই আদর্শ ধরিয়া রহিয়াছে। উহাতে সিংহের কেশর স্পষ্ট নহে মুখের আকৃতি ও [illegible] ধরনের ঘন কয়েকটা ঘোড়ার মত। [illegible] খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের সান্ধ্যকালীন [illegible] সিংহ ঠিক এইরূপ ছিল। সংস্কৃতিজ্ঞ পণ্ডিত বঙ্গসাহিত্য পরিষদের [illegible] ছাপা প্রাচীন মূর্তিতত্ত্ববিদ্যার যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহার সিংহও ঠিক এইরূপ। কলিকাতার অনেক পুরাতন পটে আমরা ঐরূপ সিংহ দেখিয়াছি। সুতরাং অজন্তার চিত্রকরদের এই পদ্ধতি তাহার মধ্যযুগ অধুনা পর্যন্ত বাঙ্গলায় চলিয়া আসিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে সিংহল দেশে [illegible] তাহা বাঙ্গলাদেশে চিত্রকর ও কুমারদের মনে [illegible] প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন টাঙ্গে দেখা নূতন একটি মূর্তিতে সিংহ আমরা দেখিয়াছি। ইহা ফরিদপুর জেলার নলিয়া গ্রামের কুমারেরা প্রস্তুত করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সিংহলের বিখ্যাত সিংহটি দেখানো হইয়াছে। সিংহগুলির সম্মুখ পদ দুটা যেন ঘোড়ার ইহার উপর নির্ভর করিয়া দুই শত বৎসরের প্রাচীন [illegible] কোন পটে আমরা প্রায় দুইটি হরিণের প্রতিকৃতি ও অজন্তার দুইটি ধাবমান হরিণের ছবির সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছি। পাঠক পরস্পরের সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অজন্তার ও মাগধী শিল্পের ধারা বঙ্গদেশে এখনও চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল প্রাচীন শিল্পকলার এত বেশী নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে যে বাঙ্গলাই আর্যাবর্তের প্রাচীন শিল্পের জন্মভূমি বলিয়া মনে করিতে আমাদের মনে কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধাভাব হয় না। [illegible] বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী রমণীরাই বিশেষভাবে চিত্রকলার অধিকারিণী ছিলেন। আমাদের চক্ষুকে ইয়োরোপের শিল্পের উজ্জ্বল মরীচিকার মত এদেশে প্লাবন উপস্থিত করিয়া আমাদের সেবভোগ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। উচিতমত বিচার করিতে গেলে যে সকল প্রাচীন ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা বাঙ্গলার শিল্পের চরম আদর্শ। পূর্বোক্ত চিত্রগুলির কয়েকটি তুলনায় সমালোচনার জন্য এখানে দেওয়া যাইতেছে।

মধ্যযুগে এমন কি মুসলমানদের সময়েও চিত্রবিদ্যা বাঙ্গালীর নিজস্ব ছিল। পল্লীবালিকারা লক্ষ্মীসরস্বতী ছিলেন। নক্সীর কোঁটা খুলিয়া ইঁহারা ঘরবাড়ী সাজাইতে বসিতেন, ইঁহারা রন্ধন-শালার শিল্পকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। কতটা পবিত্রতা ও সম্ভ্রমের সহিত বাঙ্গালীর মেয়েরা এইসকল শিল্পকার্য্য ও ব্রতা প্রস্তুত করিতেন তাহা কাঞ্চনরেখা নামক পল্লীগীতিকা পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বরপত্তালা হইতে আরম্ভ করিয়া নামাকরণ আলপনা, দেওয়ালের চিত্র, কাঁথা, বইটে বালিসের খোলাপ, নূতন আত্মীয়দের বাড়ীতে

প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে কেহ কহ অনুমান করেন ... বৎসর পূর্বের, ২২৮-২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নিম্নাবপুর পাহাড়পুর খাতে নিম্নভূমে অঙ্কিত চিত্র .

এই চিত্রখানি ৩০০০ বৎসরের পূর্বের প্রাচীন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবার পরে হইতে গৃহীত।

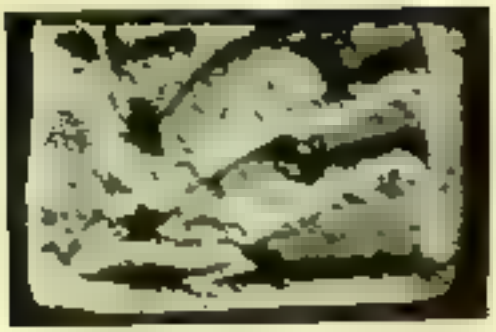

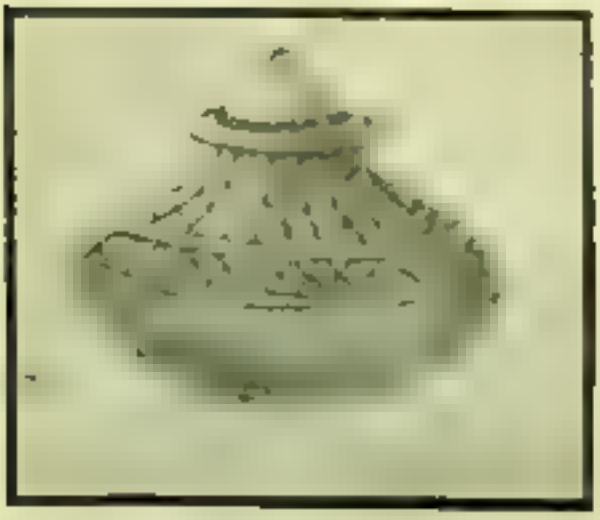

বিজয়পুরের গাঙুর চিত্র, এরকম আকারের কুমারের এইরকম হাঁড়ি-সরা কাজল থাকে

বিজয়পুরের ঐ গাঙুর চিত্র। এখনকার দিনের মানুষ যা কি কতকটা এইরকম ছিল, ২২৯ পৃঃ

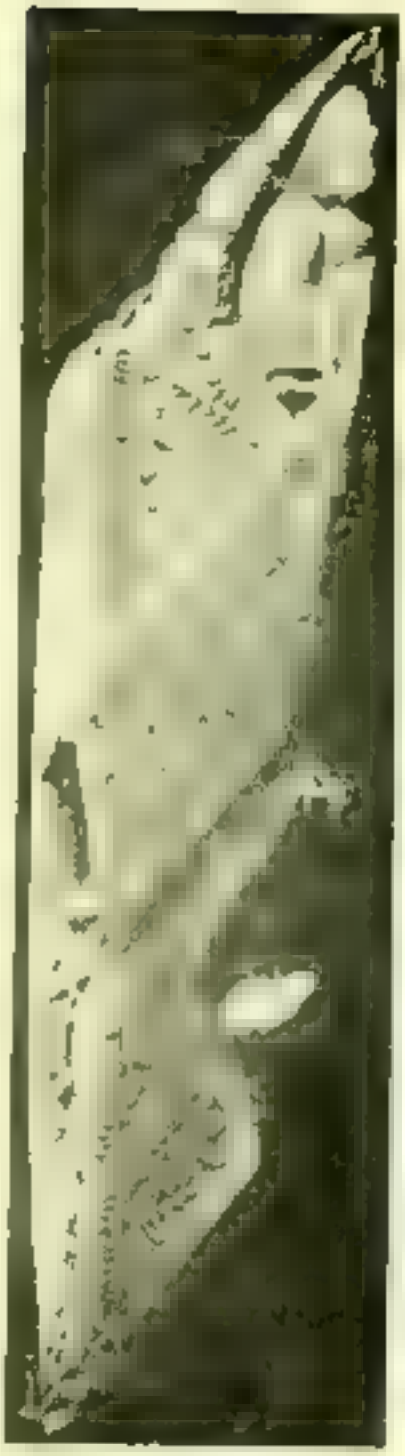

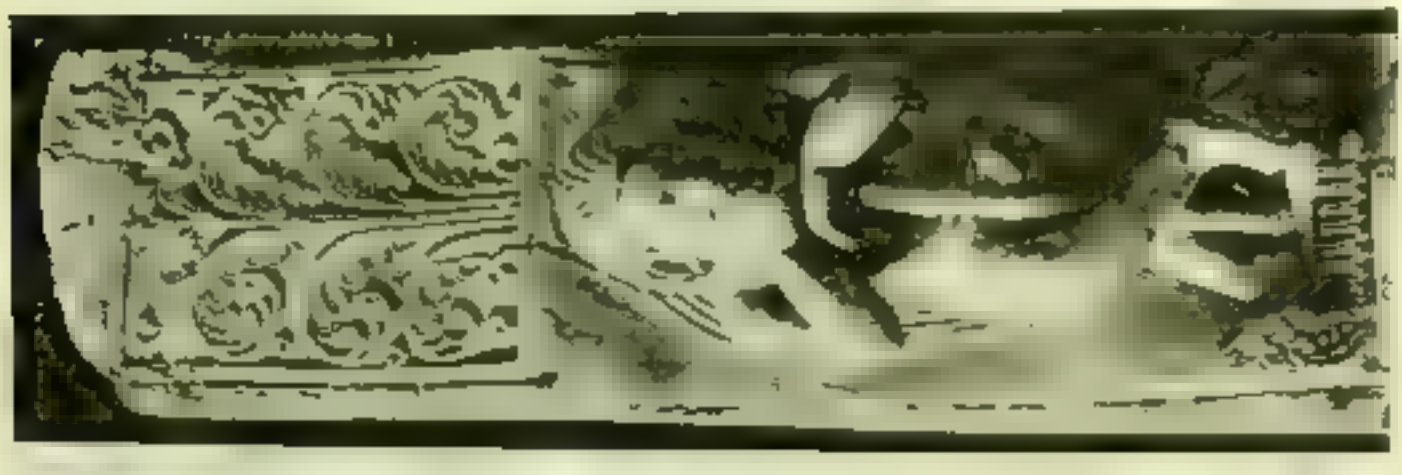

চাকা, কাঠ-শিল্পমেলে কৃষ্ণলীলা, সপ্তদশ শতাব্দী।

পাঠ্যবইয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক ভাণ্ডারে নতুন করে সূত্রের আবার নিশ্চয় কালের জন্য নতুন কলাপাতা করে বাঁধিয়া রক্ষা করা হইত, তাহাতে অনেকগুলি বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত হইত। এমনিরূপ কারুকার্যযুক্ত কিছু ও লেখা-ছোটদের বাঁধাইবার দাঁড় বিশেষ করিয়া কলাপের মুখ চন্দনরেখার কারুকার্য, বাম্পের পাশ অলঙ্কার, চিত্রিত পিঠে ও কাগজের আসল পাশা খেলার উপযোগী চিত্রিত কাগজ, ছেলেদের পুতুল এবং কত শত প্রকারের মেয়েরা তাঁহাদের কারুকার্য দেখাইতেন সেই কথার সংক্ষেপে আলোচনা এখন পিছাই সো, তাহাদের যে এত নানারূপ নকল বা অনুকরণ বিদ্যা করেছে তার ও ছেড়ে চিকিৎসা প্রাচীন মোলকতা ও বাঙ্গলার কিছুই কি সম্ভার তাহা পাশে, বাহা দিয়াছে যুরোপের এই বিষয়ে প্রকৃত কথা করছে প্রাচীন কোন বাঙ্গলা পুস্তকে আমরা পরিষ্কার ভাবে 'চীরার বসনে জিরা', হত, অবশ্যই অনুপ্রাসের বাহাদুরী কিন্তু সময়ে সময়ে হই, সত্যই উপন্যাসের মত বিস্ময়কর হয় পাখের উপর কত ক্ষুদ্র না ছিন্ন চিত্র হইত। একটি পাখের উপর দশ অবতারের ছবি দেওয়া হইল চিত্র দেখুন এমনি চতুর্দশ শতাব্দীর একটি কারুশিল্পের উল্লেখ করিব, তাহা প্রাচীন সাহিত্যের অন্যত্র সম্ভবতঃ হইলেও বাঙ্গলার প্রত্নতত্ত্বিদের সন্ধান পায় নাই এই কারুকলার মূলে খেলার সাহায্যের কোন সম্বন্ধ ছিল। মানসিংহের সময়ে এক রত্নাপাতি তাহার প্রাচীন দেহকে ও সম্পাত্ত এক ব্যাখ্যানে দান করিয়া যায় এই কারুকলা মানসিংহের সময় হইতে প্রায় দুইশত বৎসরের অনেক পুরাতন মনে করি। কাহের উপরে যেরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য অঙ্কিত হইত তাহা একপ্রস্তরাঙ্কিত কারুকার্যের কথা, সেই প্রাচীন দাঁতের কাহের কারুকার্যের কতকটা নমুনা দেওয়া হইল পাশের চতুর্দশ শতাব্দীর কাহনিকটির একটি ক্ষুদ্র অংশ হইতে চিত্র এবং তাহার প্রায় সাত শতাব্দী পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে, আর একটি কাহকার্যময় ক্ষুদ্র আধার বসানো হয়, তাহার কাজ প্রাচীনতরটির মত তত সূক্ষ্ম নহে অনেক সময়ে ক্ষুদ্র কাহের সাহায্যে এদেশের মানুষ পরস্পর হইত। মানুষের সম্মুখে কতই কারুকার্যময় পাতাপাখিদের সম্মুখের একখানি কারুকার্যের কাহনের অনেক বিবরণ, তাহার অনেক সংগৃহীত আছে, উহা খুলনা জেলার আবদুল হামেদ কাছে পাওয়া গিয়াছিল সেই সব কারুশিল্পের কয়েকটির নমুনা দিয়েছি আর একটি কথা এই যে এইসকল শিল্প যত প্রাচীন হতই উৎকৃষ্ট। মুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে কারিগরের অবনতি পরিলক্ষিত ক্ষুদ্রস্থানে কারুকার্য করিতে হইলে অত্যন্ত মুখ হইয়া পড়িত কোন কোন স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, সেখানে মানুষের পাতুটি পাখীর পায়ের মত করিয়া কিম্বা সেখানে সম্পাদিত করিয়া স্থান সংকুলান করিতে হইত এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নানারূপ অনুকরণ পরিকল্পিত হইয়াছে কারিগরের চুড়ান্ত খোলা বাঙ্গলার গ্রামগুলিতে প্রকাশিত হইত বাঙ্গলার নানা স্থানে, যথা ২৪ পরগণা, বাগেরহাট, যাদেশ, আবদুলাপুরী এক জেলার বেনিয়াড়াড়ি ও নামরাই প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীন রথ এখনও আছে, তাহাদের শিল্প ও কারুকার্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অধিকাংশই ত্রিতল বাড়ীর ছাদ কিংবা ক্ষুদ্র, বৃহৎ কাহের

রথ বাঙ্গলার বহু প্রাচীন পল্লীতে দৃষ্ট হয়। বেতালায় একখানি কারুকার্য্যখচিত ৭০০ বৎসরের প্রাচীন পিতলের রথ আছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে পদ্ম একটি পবিত্র সামগ্রী—বৌদ্ধশিল্পেও পদ্মের প্রধান স্থান। বৌদ্ধমন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে' বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'পদ্ম' একটি আসনের নাম। 'পদ্ম' 'হেমপদ্ম' প্রভৃতি উপাধির সহিত সকলেই পরিচিত। অজন্তাগুহার বিচিত্র ফুলপদ্মের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য, যদিও নানারূপ ফুলের ছবি অজন্তা-চিত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে পদ্মই সর্ব্বাপেক্ষা বহুল পদ্মের বিচিত্র অবস্থার ছবিতে অজন্তা পরিপূর্ণ, কোনটি একেবারে কুঁড়ি, কোনটি আধফোটা, কোনটি সম্পূর্ণ বিকশিত,—এই পদ্ম কখনও পত্রহীন পূর্ণ শতদল কখনও পত্রে আধঢাকা কুঁড়ি এইভাবে নানা অবস্থার এক পদ্মই অজন্তা-চিত্রের প্রধান সম্বল। বোধ হয় অজন্তার ফুল শতকরা কুড়িটি, পদ্ম শতকরা ৮০টি। বাঙ্গলার চিত্রেও পদ্মের স্থান আছে, কিন্তু অজন্তার সঙ্গে তাহার একটা প্রভেদ আছে। অজন্তার মত পদ্ম বাঙ্গলার কাঁথা ও চিত্রিত পাঁড়িতে আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু অনেকস্থলেই বাঙ্গলা ছবির পদ্ম ভিন্ন প্রকারের, তাহা ঠিক পদ্মের নকল নহে, তাহা 'মানসপদ্ম' নামে অভিহিত করা যায়। পদ্মটির ভাব গ্রহণ করিয়া তাহা চিত্রকর অবলীলাক্রমে ইচ্ছানুসারে রূপান্তরিত করিয়াছেন, যে পদ্মটি সরসীতে জন্মে—সেই পদ্মটি চিত্রকরের মনে নবভাবে জন্মলাভ করিয়াছে স্বাভাবিক পদ্ম একরূপ বই দুইরূপ হয় না, কিন্তু এই 'মানসপদ্ম' সংখ্যাতীত। পদ্মের শুধু ভাবটি লইয়া চিত্রকর কল্পনার মুক্তহস্তে তুলির খেলা দেখাইয়াছেন। অজন্তার ফুলপদ্মের মূলধন অল্প, কারণ তাহা মূলের অধিকতর অনুগ কিন্তু বাঙ্গালী চিত্রকরের অফুরন্ত কল্পনায় একই জিনিষ অসংখ্য আকারে দেখা দিয়াছে, কি আলপনায় কি মন্দিরের ইটকে, কি প্রস্তরে, কাষ্ঠফলকে, পুঁথির মলাটে, পিতল বা তাম্রপটে, কি কাথায়—চিত্র-সম্ভারের অবধি নাই। তুলির লীলায়িত রেখাপাতে কতপ্রকারের নক্সা ও ঝকা যে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই, প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলে চিত্রকর অল্প সময়েই নিঃস্ব হইয়া পড়িতেন, কারণ প্রকৃতির সৃষ্টি বিশেষ বিশেষ স্থানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক দ্রব্যের সকলগুলিই তুলির যোগ্য নহে, কিন্তু যেখানে মানস হরিণীর উৎস, সেখানে বিষয়বস্তুর অবধি থাকিতে পারে না, নিত্য নবজাত শিশুর ন্যায় কল্পনাসৃষ্ট ফুললতার সংখ্যা অগণিত, ভঙ্গী অগণিত এবং রূপ অগণিত। বাঙ্গলার এই ছবিগুলির যে ভাণ্ডার আছে তাহা অজন্তাকে এই স্থানে হার মানাইয়াছে। অন্যান্য দেশে এক একটি বিশেষ শিল্প-শ্রেণী আছে। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙ্গলার শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকল জাতির রমণীই কাঁথা সেলাই, আলপনা দেওয়া, পাঁড়ি চিত্র, দেওয়ালে ছবি আঁকা প্রভৃতি বহু শিল্পকার্য্য জানিতেন। এখনও আসামের রেশমের উপর যে সকল সুন্দর ফুললতার কাজ দেখা যায় তথাকার রমণীরা তাহা প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক কুমারীকেই বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার হাতের কাজ দেখাইয়া বরপণে নির্দ্ধারিত হইতে হয় বাঙ্গালী রমণীরা শিল্পশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লইয়াই যেন ভূমিষ্ঠ হইতেন তাঁহাদের কাজের যে অসৌষ্ঠবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাতে

এখনকার দিনে যে কোন জাতির বাহুল্য দোষবর্জিত হইতে পারেন বস্তুতঃ এই শিল্প কথা এদেশে এরূপ বিশ্লেষণে সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল যে আমাদের বাঙ্গলাদেশকে যে "ঘগনের চিত্রশালা" বলা হইয়াছে, তাহা অত্যুক্তি নহে, বাঙ্গলার ঘাটি শিল্প তাহার সঙ্গে মহেঞ্জোদারো যেন কি সিন্ধুনদপুত্রের চাইতে কুপ দূরের দিন অবশ্য, ব্রহ্মদেশী বালীদ্বীপ ও সিংহলের শিল্পের সঙ্গে আছে, তাহাই আমাদের দেশের অন্যান্য প্রাচীন শিল্পের বাঙ্গলার চিত্রশিল্পের সঙ্গে কাজটা চিত্রশিল্পের একটা মিল দেখা যায় যে আমরা উহা শিল্পের

খাজুরাহোর শিল্পকলা

অন্তর মনে করি। আমরা এই পুস্তকের স্থানান্তরে একখানি কাজটার চিত্রসম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাপণ্ডিত ঘত উদ্ধৃত করিয়াছি, বস্তুতঃ বাঙ্গলার প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে গুপ্ত যুগের চিত্রের সোসাদৃশ্য সুস্পষ্ট, তাহা নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ সমালোচকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কালীঘাটের পটুয়া ও কাজটার চিত্রকর দিগের একটা জায়গায় অদ্ভুত ঐক্য দেখা যায় উভয় স্থানের চিত্রকরেরাই তাহাদের চিত্রে নানারূপ সরু ও মোটা, সরল, বক্রাদ্ধ ও কৌণিক টান রেখা টানিয়া চিত্রগুলিকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়াছেন অনেক সময়েই ঐ রেখাগুলি বাস্তবিক নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ঐ সকল রেখাপাতে চিত্রসৌন্দর্য যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে দুইটি স্থলে আমরা ক লীঘাটের শিব ও পটুয়ার চিত্রের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের বাঙ্গলা কাজটা ও কালীঘাটের কলম এক।

১৮২৪ খৃঃ অব্দে মানসিংহ বাঙ্গলার শাসনকর্তা হইয়া এদেশে আসেন তিনি কয়েক বৎসর বাঙ্গলাদেশে এদেশে ছিলেন এই সময়ে রাজপুত বিশেষতঃ জয়পুরী শিল্প এদেশে প্রবেশ করে কিন্তু এই শিল্প একান্তপক্ষে উড়িষ্যা শিল্প—উহা এদেশের মাটিতে কিছু বসাইয়া বাঙ্গলার জিনিস হইয়া দাঁড়ায় নাই। পুথির মলাটে এবং বাঙ্গলার কাঠমানুষের ঘরে অনেক সময়েই এই শিল্প অনুকৃত হইয়াছে যাহারা পটুয়া পোপা নিয়েই স্থানীয় কারিগরের কথা, সমস্ত পটুয়ার পোষাক-পরিচ্ছদে আকৃতি গঠনের ভঙ্গি ইত্যাদি রাজপুত চিত্রে বাঙ্গালী পটুয়ার সাদৃশ্য দূর রেখা পড়ে নাই, বাঙ্গালীর চুল কাটিবার ধরন করে, তাহার মত চুলোচোখ ও প্রাণের আভিজাত্য ভারতের অন্য কোন দেশ দেখাইতে পারে নাই কৃষ্ণ রাধার পায়ে ধরিয়া সজলচোখে সাধিতেছেন—বাকামনের অগোচর প্রেম এখানে প্রেমের দুলাল, তিনি এত সহজভাবে, এত দৈন্যের সহিত বাঙ্গালী প্রেমিককে ধরা দিয়াছেন। বাঙ্গালা শিব অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারীর ভাবে অন্ন উদ্ধার দেখে এত ভিক্ষা করিতেছেন আর অন্নপূর্ণা কুম্ভের বাণী অন্নচিন্তা, তাঁহার বেশভূষা রাজকীয় রাধিকা কাজীর বেশে শ্রীকৃষ্ণের বাম্যদিকে দাঁড়াইয়া : অলঙ্কারের আসবাব লইয়া জমকালরূপে দেখা দিতেছেন শিব পঞ্চমুখে ঐশ্বর্য দেখাইতেছেন এ সকল জাঁকজমক সত্ত্বেও বাঙ্গালী হৃদয়ের কাছে রাজপুত চিত্র প্রাণহীন। দিল্লীর নবাবী কায়দা ও পুথী চিত্রগুলিকে পাইয়া বসিয়াছে। মানসিংহ উহাদের দেশ হইতে বড়মানুষী চালের চিত্রাদর্শ আনিয়াছিলেন, মৎসঙ্কলিত বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে প্রদত্ত চিত্রেরই আদর্শ দুই হইবে

বারেন্দ্র, বিষ্ণুপুর এবং [illegible] সহরগুলির কোন কোন স্থানে হাজারের পাথেরের মূর্তী দেখা যায়। বাঙ্গালী শিল্পের [illegible] যে কত শত শত উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিগুলি বাঙ্গালী মেয়েদের যে কত কালীঘাটের পট দেখাইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রাণে যে কত আবেগ ভরা তাহা ঐ সকল ছবিতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। কোথায় হাতের ছাঁদ বলিয়া দিতেছে কোথায় আঙ্গুল বেঁকান হইয়াছে, কোথায় বা অঙ্গুলীর [illegible] ও মুখের ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। এইরূপে যে শুধু বাঙ্গালী কলাকুশলীরা [illegible] কলাকুশলীরা [illegible] দক্ষ টীকা [illegible] প্রতিভাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। এখানে কিন্তু কারিগরের প্রশ্ন একেবারে নাই, যে শিল্পীর দুটি পয়সা রোজগার করিয়া কলকব্জা জীবন নির্ব্বাহ করে, কিন্তু তাহার [illegible] সে কলাশিল্পীর প্রাণে তাহার অন্তরে থাকিয়া যে কোন সুরটী আছে তাহা সে জানে না বা কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই।

বাঙ্গালার ছিন্নকন্থার পাখী বাঙ্গালী কুলবধূরা যাহা যে কলাকৌশল [illegible] করিতে সুরু করিয়াছেন সুদীর্ঘকাল তাহা শেষ করিতে পারেন নাই সেই অসমাপ্ত কাজ লইয়াই তাঁহার কথা বলিয়া দিতেছেন। [illegible] তাহা শেষ করিতে পারেন নাই তাঁহার কথা [illegible] কোন [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] কাজের চেষ্টায় কারিগরি [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible]

ব্যঞ্জন রাঁধিতেন, তাহা পকাশ রূপ অমৃত। উপকরণ অতি সামান্য, কারণ বাঙ্গলার কুলক্ষ্মী অতি গরীব। সামান্য শাকসব্জী ও ডাল যে কিরূপ অমৃতের মতন হইত এবং কতরূপ বিচিত্র হইত, শৈশব কালে আমরা তাহা স্বাদ পাইয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিব না। এই রান্নায় লোমেধ, অশ্বমেধ, ছাগমেধ এমন কি কুকুট বা মেষমজ্জও হইত না এবং তজ্জন্য একটা কসাইখানার আমদানি ও সমারোহ হইবার প্রয়োজন ছিল না। এই রান্না প্রেম-তপস্বিনীর প্রেম যজ্ঞ, ইহার অতি সামান্য উপকরণ বাঙ্গালীর দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে সহজ ও অনুকূল খেঁটাইয়ের যে কত ছাঁচ ঘরে ঘরে ছিল তাহা ষাড়করের মনের জায় কে কি বলিয়া উড়াইয়া দিবে। সন্দেশের কয়েকখানি প্রাচীন ছাঁচের নমুনা আমরা এখানে দিতেছি,—এগুলি খুব ভাল নমুনা নহে, প্রাচীন পল্লীতে ঘুরিলে ইহা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট ছাঁচ পাওয়া যাইতে পারে।

বিবাহবাসরে মেয়েদেরই রাজ্য, এখানে মেয়েরা কর্ত্রী, বর কনের কড়ি বা পাশাখেলার জন্য শিল্পখচিত কাগজ কি বস্ত্র, বরকনের বিবাহের আসন, সাঁজিচিত্র, প্রভৃতি সকলই মেয়েরা করিতেন। কনের চুল বাঁধিতে যাইয়া তাঁহারা নিত্য নূতন কায়দা আবিষ্কার করিতেন। কনের কপালে অগুরু চন্দন দিয়া অতি সূক্ষ্ম কচ্ছপের দ্বারা কত চারুশিল্পের অবতারণা করিতেন—কনের মুখখানির উর্দ্ধে সেই শিল্পের বর্ণ ঝলমল করিয়া তাহার লাবণ্য অশেষরূপে বাড়াইয়া দিত। কনের বাড়ীতে পানের খিলি দেওয়ার জন্য নবীন কদলীপত্রের মোড়ক এরূপ শিল্পমণ্ডিত করিতেন যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। শিকা, সেপটোরক বাঁধিবার কড়ি প্রভৃতি গৃহস্থালীর সর্ব্ববিষয়ে এমন কি হাঁড়ীর গায়ে কতরূপ চিত্রাঙ্কন হইত তাহা বর্ণনা করা যায় না। বীরকূর্চ, বাঁকুড়া প্রভৃতি দেশে গৃহের দেওয়াল নানারূপ চিত্র বিচিত্র রঙের দ্বারা মণ্ডিত করা হয়, মেছারেও এই প্রথা আছে। ইহা অবশ্যই দেওয়াল সাজাইবার কথা মনেই স্মরণ করাইয়া দেয়। গৃহের দেওয়াল তাঁহারা দেবীপ্রতিমার চালীর মত নানা চিত্রে সাজাইয়া প্রত্যেকটি গৃহ যেন এক একখানি চিত্রশালার পরিণত করিতেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই শিল্পচর্চ্চা কোন শ্রেণীবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। সে কালের প্রত্যেক কুলবধূ শিল্পী ছিলেন। বাঙ্গলার প্রত্যেক উৎসবে এই শিল্পীরা অভিনাকত্ব করিতেন, এই শিল্পীদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া যশস্বিনী হইতেন।

বাঙ্গলার পল্লী—দরিদ্র পল্লী, এইভাবে ভরপুর প্রেমের ঐশ্বর্য্যে শিল্পসমৃদ্ধ ছিল, এই জন্য বাঙ্গলার প্রত্যেক গৃহস্থের মন এত সরস ও প্রেমপূর্ণ ছিল।—এখন যদি আমরা আমাদের মাতৃজাতির এই অতুলনীয় তপস্যাকে দাসীবৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করি, তবে এই বলিতে হয় যে আমরা আমাদের মাতাদের অকৃতি অযোগ্য সন্তান।

"কাঠুরিয়া এক মাণিক পেল, পাথর বলি ফেলে দিল,
অভিমানে কাঁদছে মাণিক, বরাজনে টের না পেল।"

কালীঘাটের পটুয়াদের যে সকল ছবি এখানে দেওয়া হইল তাহার এক এক খানি এক বা দুই পয়সায় বাজারে পাওয়া যাইত, তুলির একটিমাত্র টানে মূর্তিগুলি যেন সজীব হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিত। কোন মডেলের দরকার হইত না, অথচ চিত্রকর তাঁহার চিত্রে যে কথা বুঝাইতে চাহিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ চিত্র-ভাষার জ্ঞান ছিল, যে ভঙ্গী, যে ভাব তাঁহারা আঁকিয়া দেখাইবেন, তাহার সন্ধান তাঁহাদের অব্যর্থ তুলির মুখে পাওয়া যাইত সুস্পষ্ট হইত। হয়ত বা কোথাও কোথাও টেক্‌নিক্ অথবা শিল্পের শুষ্কনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ত্রুটি হইত সে কালে অন্ততঃ সেরূপ তুল বিরল ছিল না। কালীঘাটের পটুয়া যে চিত্র কাপড়ে সঙ্গে, মেয়েদের কত ভঙ্গী যে তাহারা আঁকিতে পারিত তাহার ইয়ত্তা নাই, প্রত্যেকটি ভঙ্গী লালিত্য ও কবিত্বময়। এই সকল চিত্র বাজারে এক পয়সা দুই পয়সায় বিক্রীত হইত, অথচ এরূপ কিছুই ছিল না। গৃহস্থ ঘরের ছবিতে দামী সোণার রং ব্যবহার করিত না, কিন্তু সরু ও মোটা তুলির রেখার যা টানগুলি এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক হইত যে আজকাল মডেল সামনে রাখিয়া খুব অনুসন্ধিৎসু চিত্রকরেও এরূপ শাড়ী আঁকিতে পারেন না। কোন কোন চিত্রকর শাড়ী আঁকিতে যাইয়া একটা কাপড়ের তুল আঁকিয়া বসেন। ছবির মূল্য এত অল্প ছিল যে বাজারে এমন কাহার ছিল না যাহার বাড়ীতে এই সকল ছবি বিরাজ না করিত। সে সময়ের লোকের দেশসম্বন্ধে আন্তরিকতা ও সম্যক্ জ্ঞান ছিল। এখনকার চিত্রকর ছবিখানি আঁকিয়া ৫০০ হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত তাহার দাম দিবেন, এদেশে কয়জন এরূপ চিত্রবিলাসের অধিকারী? সাধেকী চিত্রকরদের হিসাব ছিল, তাহারা হাজারটি বড় মানুষ হইতে চাহিত না নিজেরা অতি সামান্য অর্থে তুষ্ট থাকিয়া কলালক্ষ্মীর দান সমস্ত জাতিকে বিতরণ করিত। এখনকার শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই অন্যরূপ, অথচ দেশের লোকের অন্নসংস্থানের কড়ি নাই। যেখানে ষাট ঘরের টোলে গুরুর গরুর গাধানী করিয়া ছাত্র ষড়্‌দর্শন পড়িত, সেইখানে বিমানস্পর্শী তুঙ্গ প্রাসাদ উঠিয়াছে, ছাত্রদের অভিভাবকগণ পুস্তকতালিকা ও তজ্জন্য দেনা মুড়া যাইতেছেন। এরূপ বিসদৃশতা বেশী দিন থাকিবার নহে। আমরা সেদিনের মধ্যে যে সকল অপূর্ব্ব বৃহদ্মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে চট্টগ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ছোট ছোট বাহুর বৃহদ্মূর্ত্তির এমন একটা সাদৃশ্য আছে যাহা সকলেরই চক্ষে পড়িবে। এই গোবরমাটীর উপর ছবির কথা যাহা অজিতবাবু অজন্তার উপলক্ষে লিখিয়াছেন তাহা শুধু চুণা পলিস্তারার চারুচিত্রে নহে, অন্ততঃ বীরভূম জেলার বহু পল্লীতে ঘরের দেওয়ালে গোবরমাটীর উপর মেয়েরা এখনও সেইরূপ বহু ছবি আঁকিয়া থাকেন। একটি পল্লীর কথা তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ শুকসন্দর বসু মহাশয় বলিয়াছেন যে, তাহাতে প্রায় সমস্ত ঘরগুলির দেওয়ালেই এরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে। সেই পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন চিত্রশালায় প্রবেশ করা হইল। হয় দেওয়াল এমনই বাহারদার সেই প্রসিদ্ধ চিত্রকরীদের আছে যাহা দেখিলে হরিবংশে উল্লিখিত বাণরাজ-পুরীর চিত্রলেখাকেই মনে পড়ে। চিত্রলেখারা আমাদের লোক ছিলেন।

প্রাচীন যুগে বাঙ্গালীর তুলি ও বাটালী যে কতদূর ছিল তাহা এই সকল প্রমাণে

বুঝিতে পারা যায়। তাহারা কাগজে, আয়নায়, কাঠে, দাঁতের সামগ্রীতে, পুঁথির মলাটে, কাপড়ে, পাথরে, হাতীর দাঁতে ও মাটীতে সর্ব্বত্র কিছুদিন পূর্ব্বে যে সকল চিত্র অঙ্কিত বা উৎকীর্ণ করিত তাহা দেখিলে বোঝা যায় যে এদেশ চারু শিল্পেরই স্বরাজ্য।

আমরা বহু প্রাচীন পল্লীসাহিত্যে বাঙ্গালী মেয়েদের চিত্রশিল্পে দক্ষতার কথা পাইতেছি। কাজল রেখা একটি অতি প্রাচীন লোককথা, ইহাতে নায়িকা যে চিত্রশিল্পবিশারদ ছিলেন, তাহা দেখানো হইয়াছে তিনি শুধু ফুলপল্লব ও লতাপাতি তুলিতে ফুটাইতে দক্ষ ছিলেন না, মানুষের প্রতিকৃতি ঠিক স্বভাবের অনুযায়ী করিয়া আঁকিতে পারিতেন। রাজার নিযুক্ত চিত্রকরী ছিল, তাহারা বড় ঘরে বিবাহের ঘটকালী করিত এবং তাহারা বিবাহের যোগ্য পাত্রপাত্রীর ছবি লইয়া দেশ বিদেশে যাতায়াত করিত। চিত্র যদি মনোনীত হইত, তবেই বিবাহের প্রস্তাব অনেকটা অগ্রসর হইত।

কাজল রেখার চিত্রপটুতা।

রঙ্গপুর বাড়ীর তরুণ কেরাণী ফিরোজ ও এইরূপ এক চিত্রকরীর কাছে সখিনার ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজার অন্তঃপুরচারিণী চিত্রলেখার নাম পাইতেছি। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোন চিত্রকর বা চিত্রকরীর উল্লেখ নাই। সুতরাং পুরাণের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে আমাদের দেশই এই চিত্রবিদ্যার একরূপ আদি-ভূমি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ আমরা রাধিকার সখীদের চিত্রবিদ্যার কুশিলবের কথা উল্লিখিত দেখিতেছি।

এগুলি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নহে, কিন্তু এখনও যে বাঙ্গলার পল্লীর মেয়েরা নানারূপ চিত্রাঙ্কনপটুতা দেখাইয়া থাকেন, তাহাতো আমরা চোখের উপরই দেখিতেছি। এদিকে যখন প্রাচীন সাহিত্যেও ইহার প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাই, তখন দেশে যে চিত্রকর ও চিত্রকরীর বাহুল্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

যাদবী সুকুমার-শিল্প যেখানে যেখানে খুব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে সেই সেইখানেই বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত শিল্পকলার সঙ্গে যে তাহার যোগ আছে—তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। উৎসাহ, অর্থ, বড়লোকের পৃষ্ঠপোষকতা এ সকলের অভাব হইলেও বাঙ্গলার শিল্প একেবারে মরিয়া যায় নাই। তাহা প্রাসাদ ছাড়িয়া কুটীরবাসী হইয়াছে। কিন্তু কৈলাসের স্বর্ণপুরী ছাড়িয়া চিতাভস্মের উপর আসীন শিব যেরূপ তাঁহার মহিমা হারান না, সেইরূপ এই অভাব ও রাজনৈতিক বিপ্লবে উৎপীড়িত দেশেও শিল্প নিজের গৌরব সেদিন পর্য্যন্তও বজায় রাখিয়াছিল। আমরা প্রবাসী রামচন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্যহীন, অরণ্যচারী এবং অপহৃত হইয়াছি। কিন্তু রাম সীতার সঙ্গে থাকিতেন, ও প্রায়ই বলিতেন, "তোমার সঙ্গে থাকিয়া অযোধ্যার অভাব আর আমাকে কষ্ট দেয় না।" আমাদের অন্তঃপুরিকাদের ভালবাসা নিঃস্ব অবস্থায়ও আমাদের পরম শান্তি ও গৌরবের বিষয় ছিল। তাঁহারাই আমাদের শিল্পের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহা কিছু অভাব অভিযোগ তাহা স্নেহ দিয়া অতিমাত্রায় পূরণ করিতেন সামান্য শাক, তরকারী ও ব্যঞ্জনকে নানা কৌশলে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অমৃত আস্বাদ দিতেন। সন্দেশ প্রভৃতি তৈরী করিতে যাইয়া এরূপ শিল্পনৈপুণ্য

দেখাইয়াছিলেন যে তাহা শুষ্ক ও সুগন্ধি ফুলকলের শোভা ধারণ করিত, বাঙ্গালী মেয়েদের হাতের শত শত ঢাঁচ আছে তাহা মাটী দিয়া গড়া, তাহার কারুকার্য্য দেখিবার যোগ্য, তাহা যেন আঙ্গুলের স্পর্শে অপূর্ব্ব [illegible] একটি নারিকেলের খোল লইয়া কত শিল্পনৈপুণ্য যে তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের মহিলাদের নির্ম্মিত নারিকেলের মেঠাই না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না। স্বামী, পুত্র, কন্যা যাহা খাইবেন তাহা গড়িতে যাইয়া প্রাণ ঢালা মমতার রসান দিয়া রাত্রিদিন ভুলিয়া তাঁহারা কতনৈপুণ্য দেখাইতেন। বঙ্গের পঞ্চাশ বাঞ্জন এখন কথার কথা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু উহাতে তাঁহাদের স্নেহমধুর মনের সমস্ত সুকুমার বৃত্তির লীলা প্রকাশিত হইত। রান্নাঘর ছিল তাঁহাদের শিল্পশালা, আলপনা-শোভিত আঙ্গিনা ছিল তাঁহাদের চিত্রশালা, নানারূপ কারুখচিত সামান্য খড়ির শিকা, মাটীর হাঁড়ীর রঞ্জিত চিত্রিত শোভা—এ সকলের সহিত তাঁহার ছিল তাঁহাদের চিত্রশালা। সামান্য খাড়ী ও ছেঁড়া কাপড়ের উপর কত চিত্র-বিচিত্র কারু-কার্য্য দেখাইয়া তাঁহারা যে কাঁথা ও বালিশের খোল, পানের বটুয়া তৈরী করিতেন তাহাতে তাঁহাদের শয্যাগৃহ ছিল চিত্রশালা। এই হাঁকা ও সেলাই করার কতকগুলি নিয়ম ছিল, ভিন্ন ভিন্ন রূপ আঁকিবার প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল।

যে আসনে পিতৃতুল্য গুরুর বিরাজ করিবে, কত যত্নে সে আসন চিত্রিত হইত তাহা তাঁহাদের সাধকতা ও কৃতিত্বের বড় রকমের নিদর্শন ছিল। পাঁড়ি-চিত্র বাঙ্গালী মেয়ের আর একটা বড় বিদ্যা। আমরা এরূপ পাঁড়ি-চিত্র দেখিয়াছি যাহার অঙ্কন বিস্ময়কর। এই সকল পাঁড়িতে, মেঠাইয়ের ছাঁচে, কাঁথার ও বহির মলাটে, বটুয়ার ও শিকায়, ঠাকুরের সিংহাসনের কাঠে, সর্ব্বত্র অজন্তার চিত্রশিল্প ও ইলোরা ও কুবলেশ্বরের কারুকার্য্য কারবার ঝিক মারিয়া যায়, মনে হয় একটা বড় জিনিস ছোট হইয়া গেলেও তাহার মূল প্রাণ হারায় না। মানুষ সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া তন্ময়তার সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়া যাহা করে—তাহার মধ্যে আর যাহাই হউক না কেন প্রাণের অভাব হয় না। মেয়েদের শিল্পে এই যে প্রাণের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা দেখিতে পাই—তাহাই বাঙ্গলার কুটীর-শিল্পের বিশেষত্ব। একখানি ভাল পুরাতন কাঁথা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, উহাতে যে ধৈর্য্য অবলম্বিত হইয়াছে তাহা অমানুষিক। এখনকার দিনে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া তেমন পরিশ্রম করিলেও কেহ ওরূপ জিনিস তৈরী করিতে পারিবে না। ভালবাসা-প্রসূত সে শিল্পতন্ময়তা এদেশ হইতে কি চিরতরে বিদায় লইয়াছে? আমাদের এখন খাওয়ার আনন্দ চলিয়া গিয়াছে, সে অবিচ্ছিন্নতন্ময়তাময় রাত্রির আনন্দ চলিয়া গিয়াছে। রন্ধনশালা, শয্যাগৃহ, বিশ্রামকক্ষ যেন শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করিতেছে। তথাপি কপালে একটি সিন্দুরের টিপ ও বিবাহের একখানি চিত্রিত পাঁড়ি দেখিলে এক অতীত যুগের স্বপ্নকথা মনে পড়ে।

পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রায় তুল্যরূপ শিক্ষিত ছিল। সেখানে পুরুষের শিক্ষা ও বিদ্যার

চর্চার উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে যে স্ত্রীলোকের শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল, ইহা বলা ভুল বৈদিক আত্রেয়ী, অরুন্ধতী, গার্গী প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত স্ত্রীলোকের নাম সর্বজনবিদিত রামায়ণে সৌতমী প্রভৃতি কঠোরব্রতা যোগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় মনে মনে অনেক বিতর্কের পর হনুমান্ সীতার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন। মহাভারতে এইরূপ উচ্চশিক্ষিত ও সাধনোন্নত অনেক স্ত্রীলোকের কথা পাইতেছি রাজান্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা নানারূপ শিক্ষা পাইতেন। অর্জুন বৃহন্নলা সাজিয়া বিরাটরাজপ্রাসাদে রাজকুমারীদিগকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' নামক নাটকের নায়িকা "নৃত্যগীতে অনুরক্তি" একটা অপরিহার্য্য গুণ ছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রমণীদের চিত্রাঙ্কন, চিত্রকলা ও উহাদের বিদ্যাশিক্ষার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় বেহুলা এমন সুন্দর নাচিতে গাহিতে জানিতেন যে তাহার নামই হইয়াছিল "বেহুলা নাচুনী" প্রাচীন অনেক গীতিকথায় আমাদের রাজকুমারীরা স্বর্গে যাইয়া নৃত্যগীতে কৃতিত্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক দেবতাদিগের নিকট বরলাভ করিয়াছেন, এরূপ হইয়া থাকে সংস্কৃত মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিতা ছিলেন—তিনি সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। অপর নাটকগুলির নায়িকাদের অনেককেই প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিতে দেখা যায় হিন্দু রাজত্বকালে পুরুষ ও প্রাপ্তবয়স্ক রমণীরা এক গুরুর পাঠশালায় একত্র পড়িতেন গীতিকথাগুলির অনেকটিতেই এইরূপ অধ্যয়ন উপলক্ষে প্রেমের অভিনয়ের সূত্রপাত বর্ণিত আছে 'মলুয়া' 'মহুয়া' প্রভৃতি গীতিকায় এইরূপ নায়ক নায়িকার কথা দুই ছত্র একটি গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বহু কাহিনীতে এইরূপ ব্যাপারের উল্লেখে ইহা একটা ব্যাপক রীতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। গল্পের চিত্রের ঐতিহাসিকত্ব আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি কবির কল্পনায় অনেক নায়ক-নায়িকা ও ঘটনার সৃষ্টি হইয়া কথাসাহিত্য বিরচিত হইতে থাকে, কিন্তু উহাতে আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অনেক সময়েই সমাজের দর্পণস্বরূপ। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক মহিলা-কবির নাম পাইতেছি, অনেক ঐতিহাসিক মহিলার বিদ্যাবুদ্ধির কথা জানিতেছি। ময়নামতী শিশুকালে পাঠশালায় পড়িতেন এবং গোরক্ষনাথের শিষ্যা হইয়া যোগশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, চাঁদবিনোদের পালা ও কেনারাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের প্রেমিকা রামীর অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনন্দময়ী দেবী একজন সুপণ্ডিতা মহিলা ছিলেন। তিনি বেদ হইতে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনেক বৃত্তান্ত ও যজ্ঞসূত্রের আকার প্রভৃতি তাঁহার পিতাকে জানাইয়াছিলেন। হরিলীলা কাব্যে তাঁহার যে পদগুলি আছে তাহা তাঁহার সংস্কৃতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি প্রমাণ করে।

এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা এককালে এদেশে জ্ঞান ও সাধনার শীর্ষদেশে পৌঁছিয়াছিলেন। থেরী গাথা পুস্তকে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির কিছু কিছু নমুনা আছে। বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা যে পাণ্ডিত্যের বলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তর্কে আহ্বান করিয়াছিলেন,

তাহা কল্পনামূলক হইলেও পূর্ব্বকালের একটা ঐতিহাসিক সংস্কারের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। এই সংস্কার বহু প্রাচীন কালের, মণ্ডনমিশ্রের ও শঙ্করের শাস্ত্রালোচনার ক্ষেত্রে মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতী মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে পণ্ডিতা রমণীর অভাব ছিল না। জাহ্নবী দেবী, সিখি মাইতীর ভগিনী মাধবী প্রভৃতি অনেকের নাম করা যাইতে পারে। এক কালে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর মেয়েরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন। ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয় ভার্য্যা খুল্লনা চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। কবি এ সমস্ত বিষয় এমন অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন যে সত্য সত্যই খুল্লনা নামক কোন স্ত্রীলোক বণিক্‌কুলে না থাকিলেও উহা সেই যুগে বহু অজ্ঞাতনামা শিক্ষিতা রমণীর বিদ্যমানতার প্রমাণ। আমরা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে আবার এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

পরবর্ত্তী সময়ে লেখাপড়া না শিখিলেও কথকতা ও কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা দেশে শিক্ষার এতটা প্রচার হইয়াছিল যে এ দেশের নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা পর্য্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি পৌরাণিক সমস্ত উপাখ্যান অবগত ছিল। যাদু রমণী পুরুষ চণ্ডীকে যে সমস্ত শাস্ত্রের কথা শুনাইয়া দিয়াছিল তাহার ঐতিহাসিকত্ব কিছুই নাই কিন্তু নিম্নতম শ্রেণীর স্ত্রীলোকের আক্ষরিক জ্ঞান না থাকিলেও তাহারা যে সেই সকল শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার বিদিত ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এখনও হয়ত নিম্নতম শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে সেইরূপ জ্ঞান আছে। কবিওয়ালাদের মধ্যে অনেক নিম্নশ্রেণীর সঙ্গীত রচয়িতা যন্ত্রেশ্বরী প্রভৃতির নাম বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞমাত্রই অবগত আছেন। আমরা স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার উদাহরণ পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে দিব।

পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক ও পুরুষের বিদ্যাবুদ্ধি সাধারণতঃ একরূপ ছিল। পণ্ডিতের ঘরে পণ্ডিতা গৃহলক্ষ্মীর অভাব ছিল না। সাধারণ গৃহস্থ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মূল সংস্কৃত না পড়িতে পারিলেও কথক ঠাকুরের কৃপায় তাহাদের উপাখ্যান-ভাগ জানিতেন। তাঁহাদের রমণীদেরও সে বিদ্যা ছিল। পুরুষেরা জমিজমার হিসাব রাখিতেন, শস্যক্ষেত্র পরিদর্শন করিতেন, রমণীরা সেই শস্য গোলায় তুলিয়া রাখিয়া তাঁহাদের হিসাব রাখিতেন। পুরুষেরা বাহিরের সকল কর্ম্ম করিতেন, মেয়েরা গৃহের মধ্যে সকল কাজ করিতেন, পরন্তু অসাধারণরূপ শিল্পবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। এক চাকায় রথ চলে না। ঘরে বাহিরে পুরুষ ও স্ত্রী এই দ্বিচক্রবাহিত সংসার-রথ বিনা আড়ম্বরে চলিয়া যাইত। এখন যদি পুরুষেরা বিশ্বের সমস্ত সংবাদ রাখেন এবং স্ত্রীলোক কূপমণ্ডূকের ন্যায় স্বীয় অন্তঃপুরের বাহিরের কিছু না দেখেন, তবে অশান্তি হইবেই। স্ত্রীলোক এখন ঘরের কাজ কিছুই করিবেন না পণ করিয়া উপন্যাস-হস্তে শুইয়া পড়িয়া আছেন, অথচ বৎসর বৎসর সন্তানের আবির্ভাব হওয়াতে অর্থসমস্যা ক্রমেই জটিল ও কঠিনভাব পরিগ্রহ করিতেছে। এদিকে সংসারের ভার কাঁধে করিয়া পুরুষ পলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছেন, আবার চারিদিকের হাওয়া বাঙ্গলার কুটীরেও আসিয়া ঢুকিয়াছে। স্ত্রীলোক আর অবগুণ্ঠনবতী

পুরুষ ও স্ত্রীলোক সংসার-রথের দুইখানি চাকা।

হইয়া অবরোধের পাখী হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিতে চাহেন না। অষ্ট শতাব্দী পূর্ব্বেও বঙ্গ-পল্লীতে অবরোধ বলিয়া কিছু ছিল না। সহরে একান্ত অনাবশ্যক ও অপরিচ্ছিন্ন পাড়াপড়শীর মধ্যে বাস করিয়া যে অবরোধ একরূপ অপরিহার্য্য হইয়াছে, তাহাতে নগরবাসিনীরা স্বপৃহের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরকার ঘরে যাওয়া ও কাদাপানকে নীচ নাবা ছিন্ন অন্যস্থানে যা স্বাধীনতার কোনই সুযোগ পান না। এই সকল অসামঞ্জস্যের ফলে যৌনসমস্যা আমাদের দেশে বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোক এখন আর পুরুষের অবিচার অত্যাচার সহ্য করিবেন না, তাঁহারা এখন অসহিষ্ণু ও মরিয়া হইয়া উঠিতেছেন। ঘরে ঘরে কেরোসিনের বিভীষিকা দেখা দিতেছে। তাহার উপর অপদেবতাবিরহীত হাত ধরে কাশিলে তাঁহারা গৃহ-ঘরে অপেক্ষা করিয়া পড়িতেছেন। ত্রিসংসারে আর তাঁহাদের স্থান নাই। কিছুদিন পূর্ব্বেও গোড়া ব্রাহ্মণ সমাজ ধরিয়া রমণীর প্রতি যে উপেক্ষা দেখাইতেন, এখন আর তাহা নাই। ঘরে ঘরে স্ত্রীবিদ্রোহ, তাহার ধোঁয়া বঙ্গে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ বিবাহ করিতে চাহেন না, রমণীরাও নানারূপে এই গৃহের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছেন। ইহার ফল কি দাঁড়াইবে জানি না, কিন্তু পুরুষ হইয়া যদি স্ত্রীলোকের ভালবাসা না পায় এবং স্ত্রীলোক হইয়া যদি পুরুষের ভালবাসা না পায় তবে তাঁহাদের মত দুর্ভাগ্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।

চট্টগ্রামের মুসলমান।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত আলোয়াল কবির পদ্মাবৎ পড়িলে দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ কিরূপ সংস্কৃতে অভিজ্ঞ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত শ্লোক সহ অদ্ভুত সমাস ও সন্ধি-সঙ্কলিত অতি কঠিন সংস্কৃত গদ্য দ্বারা তিনি যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রায় তিন শত বৎসর যাবৎ মুসলমানেরা এখনও দল বাঁধিয়া শত শত মুসলমান শ্রোতার সম্মুখে গান করিয়া থাকেন। ইহা হইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এরূপ উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতবহুল একখানি কাব্য প্রায়ই ফারসী অক্ষরে লিখিত হয়। বৌদ্ধ নেতারা মগধধ্বংসের পর তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে পালাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের একদল চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হন। এই স্থলে পরিশেষে যখন তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন যে উচ্চাঙ্গের সাধনা ও পাণ্ডিত্য তাঁহাদের ছিল তাহার অনুশীলনের আর কোন সুবিধা রহিল না। কিন্তু যুগ-যুগ অর্জ্জিত সেই বিদ্যার প্রভাব তাঁহাদের খোপিতে ছিল। পূর্ব্ব সংস্কার লুপ্ত হইতে বহুকালের দরকার হয়। চট্টগ্রামের মুসলমানদের সংস্কৃত-কৃতিত্ব এত বেশী ছিল যে তাহা নিম্নশ্রেণীর কৃষক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য পদ্মাবতের এত শ্রোতা সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। পদ্মাবতের রচনার নমুনা এইরূপ :—

"বসন্তে নাগর-বর নাগরী বিলাসে,
করকালা দুই ইন্দু, প্রবে যেন সুধা বিন্দু
মৃদুমন্দ অধরে গবিক মধু হাসে,

প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল ক্রম
ভ্রমত মধু ব্রত কুঞ্জে কত রাসে,
মলয় সমীর, সুশীতল সুরভিত,
বিলোলিত গতি অতি প্রভাবে।"

ভূতত্ত্ব প্রাকৃত ও সংস্কৃতবিদ্যার আচার্যস্বরূপ কাব্যখানি বাঙ্গালী মুসলমান কৃষকেরা এই তিন শত বৎসর যাবৎ মনে রাখিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা যে কিরূপ শান্তিপূর্ণ ও ব্যাপক ছিল, তাহা ইহা দ্বারা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

কাঁথার যেসকল অপূর্ব নমুনা আমরা দেখিয়াছি তাহা ফটোগ্রাফ্ করিয়া রাখিবার সুবিধা হয় নাই। এখানে অতি সাধারণ কয়েকখানি কাঁথার অংশগুলির কয়েকটি প্রতিলিপি দিতেছি। এই কাঁথাগুলি ১০০ শত বৎসর যাবৎ অতি দরিদ্র মেয়েদের হাতেই সাধারণতঃ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। যে সকল পাড়ী পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া যাইত, তাহা ফেলিয়া না দিয়া নিরক্ষরা এবং সময়ে সময়ে বিশেষ মর্মান্তিক অবস্থার গৃহলক্ষ্মীরা তাহা দ্বারা এই কাঁথাগুলি সেলাই করিতেন। ইহা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা কায়ক্লেশে জীবিকা চালাইতেন। অফুরন্ত কখনও স্নেহ ও ভালবাসাই ইহার একমাত্র প্রেরণা দিয়াছে, স্বামী ও পুত্রকে দিবার জন্য রমণীরা নিজহাতে পরিশ্রম করিয়া কাঁথা সেলাই করিতেন। সেই পুরাতন শাড়ী ও ছেঁড়া শাড়ীর পাড়ের নানা রঙ্গের সূতা এবং ছুঁচ ইহাই মাত্র ছিল উপাদান।

বাঙ্গালী মেয়েদের হাতের কাঁথা।

ইহাতে একটি পয়সাও ব্যয় হইত না, অথচ যে শিল্পকৌশল ও সহিষ্ণু পরিশ্রমে এক একখানি তৈরী হইত তাহা প্রেমে ছাড়া অন্য কোন দেশে কোন রমণী কোন কালে এরূপ তুচ্ছ উপকরণ নিয়া সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

প্রথমতঃ সমস্ত কাঁথাখানির উপর খুব ঘোরের সেলাই দেওয়া হইত, ইহা সাদা সূতায় হইত। ইহাতে জমির উপর কোমল একটা সাদা রঙ্গের যেন ঢেউ খেলিয়া যাইত। একখানি তিন হাত লম্বা দুই হাত প্রশস্ত জমির উপর ঐরূপ সরল সোজা রেখার বুনানি দেওয়ায় যে কত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার দরকার তাহা অনুমান করা যাইতে পারে; দুঃখের বিষয় সাদা জমির উপর সেই সরল সাদা সুন্দর বুনানি ফটোগ্রাফে বা ছবিতে ধরা পড়ে না, সুতরাং আমাদের প্রদত্ত চিত্রগুলিতে তাহা ঠিক পাওয়া যাইবে না। এই বুনানি দ্বারা জমির যে শুধু শোভা বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, এত ঘন বুনানি দেওয়াতে পুরাতন শাড়ীতে প্রস্তুত জমি খুব শক্ত হইত, তাহা ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিত না। এইভাবে জমি প্রস্তুত হইলে তাহার উপর কত যে পদ্ম, কত যে ধানের শীষ, কত যে কা বেরং ফুল ও সূতার পল্লব রচিত হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্যের বিষয় আমি ন্যূনপক্ষে ৫হইশত কাঁথা দেখিয়াছি, ইহার একখানি ঠিক অপরখানির মত নহে। এই বিচিত্র লতাপল্লব ও ফুলসজ্জা অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করে, কারণ ইহাদের আদর্শ প্রায় সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেক

এই ছবি এবং ইহার পরপৃষ্ঠার ছবি ১৮ খানি কাশ্মীর রাজ্যের ৪ জন বিভিন্ন চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন কাশ্মীর শিল্পের একখানি সুন্দর নমুনা। যেহেতু সুখ পাখী এখানে এবং এই কাপড়খানি মন্দিরে ব্যবহৃত হইত। ইহাদের সর্বশেষটি আনুমানিক ১৫০ বৎসরের। এখানি রাধা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। অপরগুলি ১০০ হইতে ৫০০ বৎসর পূর্বের। প্রায় সমস্ত কাপড়ই পুরাতন হইয়াছে। একখানির ১১টি টুকরা হইতে, অপরখানির ৮টি হইতে অংশ বিশেষ চয়িত হইয়াছে।

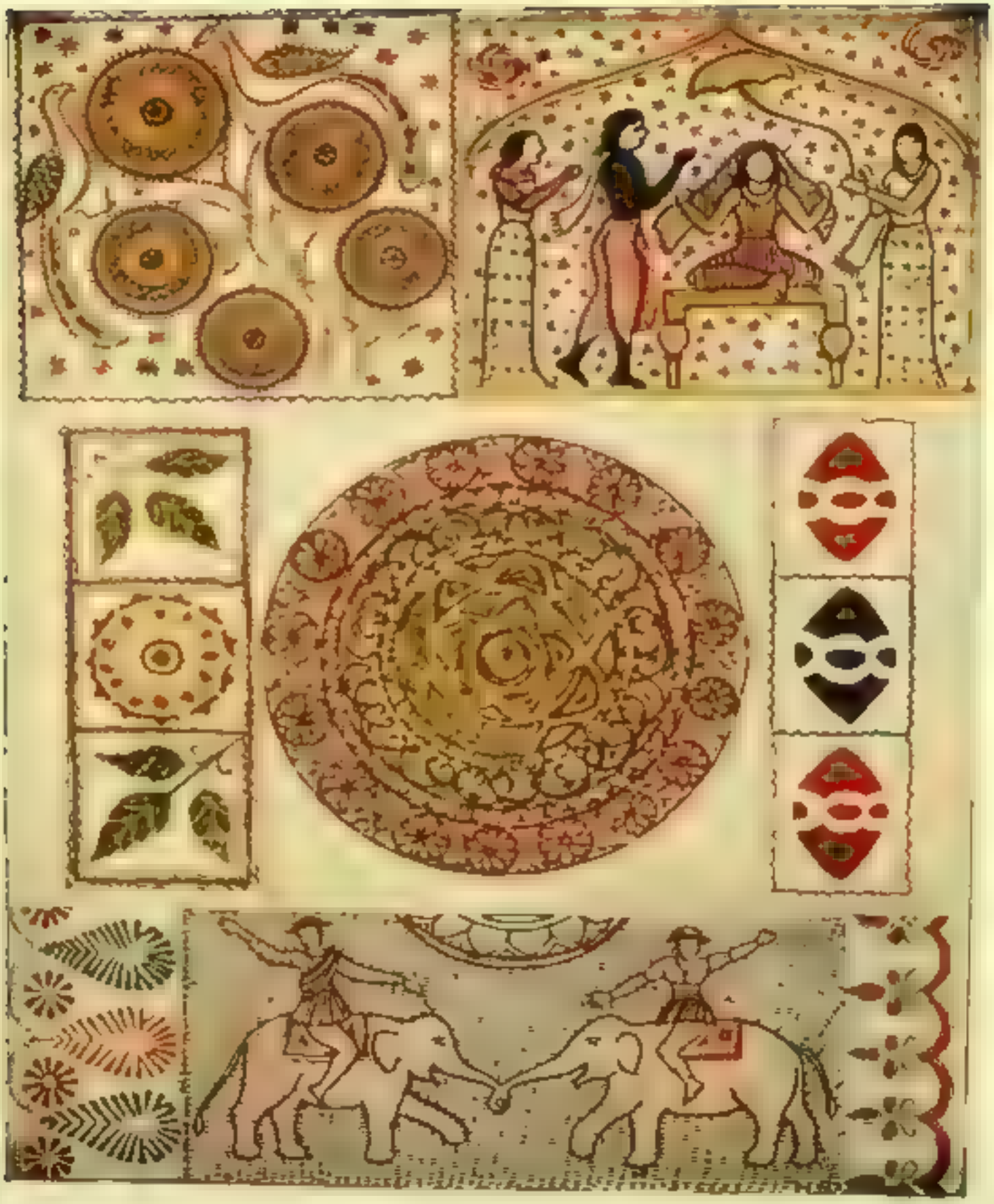

রমণী যেন সংকল্প করিয়া বসিতেন যে অপরের কাথা তিনি নকল করিবেন না এবং তাঁহার কাঁথাখানি অপরের কাজ হইতে ভাল করিতে হইবে। এই সকল চারু শিল্পকলাজাত কাজ প্রত্যেকটি মৌলিক হইতেন, কাঁথা সেলাইএর কতকগুলি নিয়ম ছিল, আমাদের পিতামহীরা তাহা জানিতেন স্বামী ও পুত্রকন্যার প্রতি ভালবাসার সেই শিল্প নৈপুণ্য কোমলতর ও সুন্দরতর হইয়া ফুটিয়া উঠে, হয় ত পরদেশ-প্রবাসী পুত্রের মুখখানি স্মরণ করিয়া তাহার ব্যবহারার্থে যে জিনিষটা তৈরী করিতেছেন তাহার উপর সমস্ত হৃদয়ের প্রাণঢালা যত্ন শিল্পীর হস্তে স্নেহজনিত-নিপুণতা প্রদান করে। স্নেহের দ্বারা যে কাজটি হয় তাহার মধুরতা ও লাবণ্য এই কাঁথাগুলি স্পর্শমাত্র অনুভব করা যায় উহা মনের তৈরী নহে, মনের তৈরী, ছাঁচে ঢালা কৌশলের একঘেয়ে বাঁধুনির মধ্যে উহার জন্ম হয় নাই, শত সহস্রের মধ্যে একসঙ্গে পরিবেশনের জন্য নির্মাণের ফলে উহা তৈরী হয় নাই, কাঁথাগুলি হাতে করিলেই মনে হইবে উহা বাৎসল্য বা সাম্পত্য-সুরভিমাখা। কেবল ফুললতা নহে, রাজা, প্রজা, রথ, হস্তী, অশ্ব, পৌরাণিক উপাখ্যান—এ সকলই কোন কোন কাঁথায় সুতায় বিরচিত হইয়াছে ইহার সর্বাপেক্ষা বড় মনোহারিত্ব ইহার বিচিত্র বর্ণসম্পদ্, ছবিগুলি বিলাতী চিত্রাদর্শ-বিনাশে যেখানে ভুল করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে, ভারতীয় চিত্রাদর্শে হয় ত তাহাই উহার গুণ। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিয়া একখানি কাঁথা খুলিয়া ধরিলে মনে হইবে বাঙ্গলার মনোরম কোন পল্লী-দৃশ্যের একখানি ছবি চোখের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। রংগুলি এরূপভাবে সুবিন্যস্ত হইয়াছে যাহাতে শিরকৌশলের চূড়ান্ত করা বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের শাল, বেনারসের শাড়ী ও পারস্যের গালিচা যেন ছাপাইয়া গিয়াছে এই পল্লীবাসিনীদের বিচিত্র বর্ণসুষমা বাঙ্গলার কাঁথা, কোবিদ ইষ্টক প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পসৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্যই এই যে যাহাকে আমরা লতা, ফুল ও তরু প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকি—সেই জাতীয় কাজের মধ্যে তদ্রূপ নকলবাজি আদৌ নাই—পদ্ম ঠিক পুকুরের পদ্ম নহে, ফুল ও লতা স্বভাবের ফুল ও লতা নহে—বাঙ্গালী শিল্পী নকলনবীস্ আদৌ নহে—সে সুরু হইতে স্বতন্ত্র

এখানে প্রদত্ত দুইখানি রঙীন ছবি ১২খানি কাঁথা হইতে গৃহীত প্রথমটিতে এগার খানি ও দ্বিতীয়টিতে আটখানি কাঁথার নিদর্শন আছে এই সকল কাঁথার কোন কোন খানি দৈর্ঘ্যে আট ফুট ও প্রস্থে চার ফুট, সুতরাং অতি বৃহৎ। আমার চিত্রশালায় প্রায় ৫০ খানি কাঁথা সংগৃহীত আছে, ইহার সকল গুলিই উৎকৃষ্ট নহে, এবং আমার কাছে যে সকল উৎকৃষ্ট কাঁথা আছে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট কাঁথা এখনও বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিদ্যমান আছে। আমি একখানি কাঁথায় "শিব-তাণ্ডবের" ছবি দেখিয়াছি, অপর একখানিতে নানারূপ নায়ক-নায়িকার সমাগমসহ ফুললতার নিপুণ কার্য্য আছে, তাহাদের নিদর্শন দেওয়ার সুবিধা পাইলাম না—কিন্তু অন্ততঃ এই দুইখানি কাঁথা যে বাঙ্গালী রমণীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সীবন-কার্য্য-দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ১২খানি কাঁথার নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে—তাহাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপতি চৌধুরী, এম. এ

আমাকে আঁকিয়া দিয়াছেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে কতদিন পরিশ্রম করিয়া যথাসম্ভব নিখুঁত প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তথাপি মূল কাঁথাগুলির যে চল চল অঙ্গের লাবণী এবং অন্তর্নিহিত মর্মলক্ষ্য তাহা চলন রেখায় সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। এই কাঁথাগুলি ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। ইহাদের মধ্যে একখানি ১০০ বৎসরের পুরাতন, বাকি গুলি ৮০ হইতে ৯০ বৎসর পূর্বের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কাপড়ের জিনিষ বেশী দিন টিকে না, সুতরাং কাঁথা সেলাই যে কত কালের প্রাচীন তাহার নির্ণয়ের উপায় নাই। এই কার্য যে অতি ধীরতার সহিত করিতে হইত, তাহা প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক "কানা কড়া লুলা পড়া" হইতেই প্রমাণিত হয়।

বঙ্গ ছিল বাঙ্গালী যখন সে বাজারের মেঠাই খাইত না, যখন সে শিল্পনিপুণার পরা কাঁথা যে অন্যের জন্য দোকানে দোকানে ঘুরিত না। একখানি কাঁথা সেলাই করিতে সাধারণতঃ ছয় মাস লাগিত, কিন্তু আমরা এমন সকল অপূর্ব কাঁথার কথা শুনিয়াছি যাহা শিল্পময়ী আজীবন করিয়া গিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সমস্ত জীবনে শেষ করিতে পারেন নাই, পরপারের ডাকে তাহার সমাপ্ত রাকা উপহারিত হইয়াছে। সেই অমূল্য কারুশিল্পী যাহা এখন আর হইবার নহে তাহার মূল্য এক টাকা বা দুই টাকা ছিল, এখন আর পাওয়া যায় না আপনার এ চালানী চকচকে সিকের, আসল হিসাবে, আজ খেলো জিনিষের প্রতে,কটির জন্য আমরা যে দর দিতেছি তাহাতে দশখানি কাঁথা পাওয়া যাইত। আমরা পরাজিত জাতি, কিন্তু বাস্তু পরাজয়কে আমি তত দুর্ভাগ্য বলে করি না, বিলাতী সভ্যতার সোনোকাঁদায় পড়িয়া আমরা যে আমাদের সেই আদর্শগুলি হারাইয়া ফেলিয়া কাচকেলো কাঞ্চন প্রধান করিতেছি ও কাঞ্চনমূল্যে কাচ ঘরে আনিতেছি,—এই যে আমার পরাজয় ইহাই আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় পরাজয়। আমাদের চোখে কে যেন দৃষ্টি হরণ মন্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে যে, আমাদের প্রকৃত সম্পদকে আর আমরা সম্পদ বলিয়া চিনিতে পারি না। পাশ্চাত্য প্রবেশদ্বার যাহা খুলিয়া গিয়াছে আমরা তাহা বন্ধ করি নাই। ধর্মের শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, স্বাস্থ্য এ সমস্তেরই আমরা এখনও প্রকৃত উত্তরাধিকারী এ কথায় অবিশ্বাসের কোন হেতু থাকিবে না। এই স্থানে কাঁথার সঙ্গে আপনারও কিছু কিছু নক্সা দিতেছি।

গৌড় এক সময়ে প্রাসাদশিল্পের চূড়ান্তস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। পোড়া ঘরের মত যে সকল ইষ্টকালয় এখনও মাঝে মাঝে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার আদি স্থান গৌড়। বাবেল সাহেব বলিয়াছেন বাঙ্গলা দেশ হইতে এই ভাবের মন্দিরাদি নির্মাণ পৃথিবীর [illegible] সর্বত্র অনুকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী কারুকার্যের পরা কাঁথা পোড়া ইটের উপর দেখাইত। এখনও যখন অত্যাচার ও প্রকৃতির নানারূপ বিরোধে দেশের কারুকার্য খচিত অট্টালিকাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে ও অযত্নের স্রোত ও বন্যার সেই সৌধমালার অনেকগুলিরই অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখনও দূর পল্লীর দৈবক্রমে রক্ষিত দুই একটি মন্দিরের ইষ্টকের কারুকার্য চক্ষু মোহিত করে। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত সংগ্রামসিংহের ফরিদপুর অঞ্চলের (খানা চেলমারি একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি কোন দৈব দুর্ঘটনার ফলে

প্রাচীন আসবাবের ছাঁচ

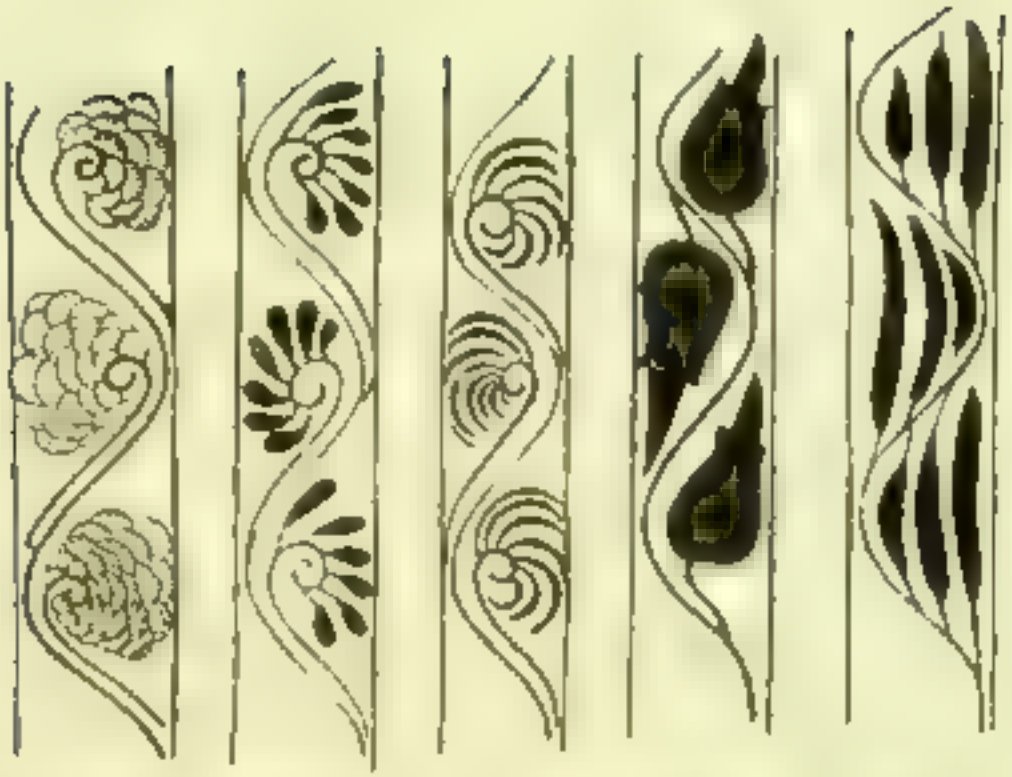

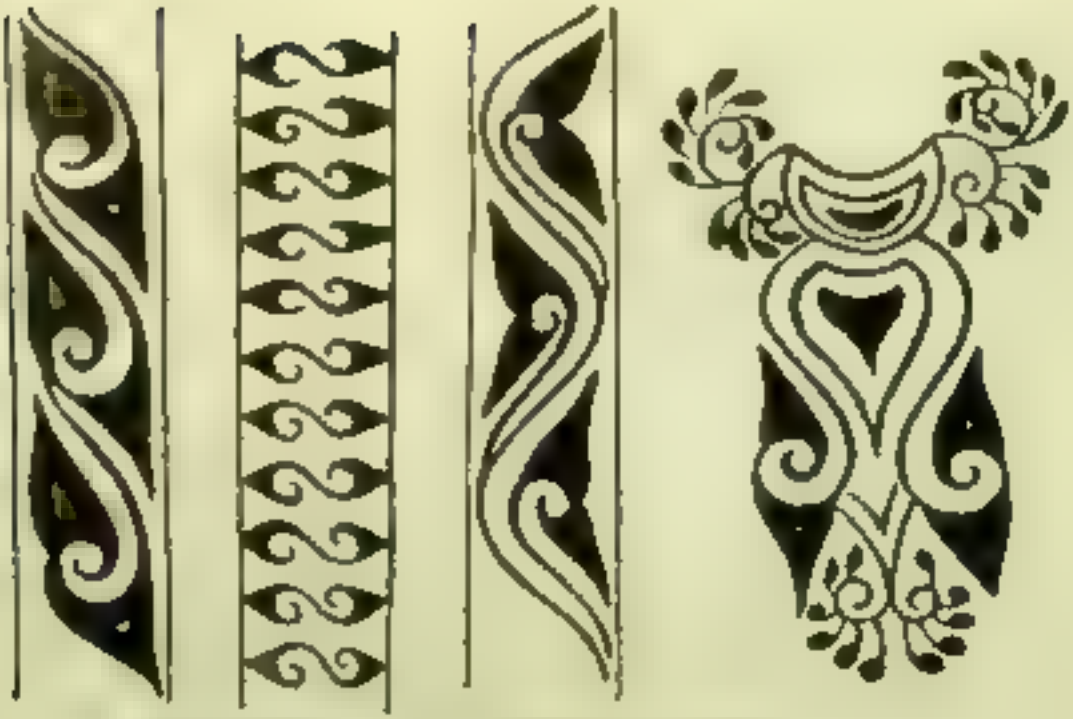

[illegible]। পোড় ইটের [illegible] কাজ।

[illegible]

[illegible]

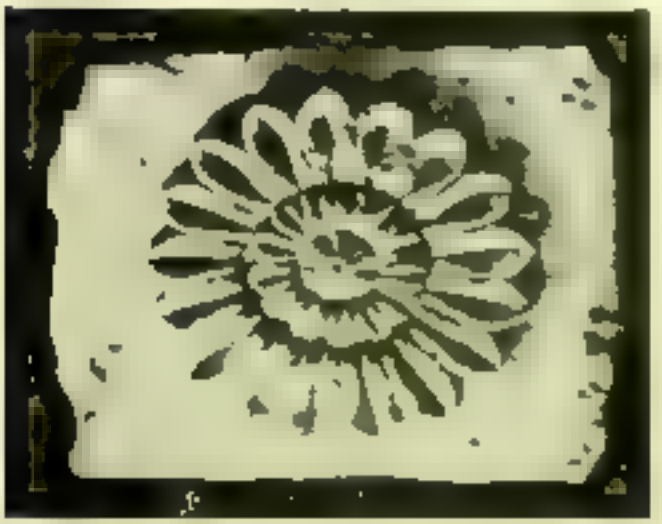

[illegible]

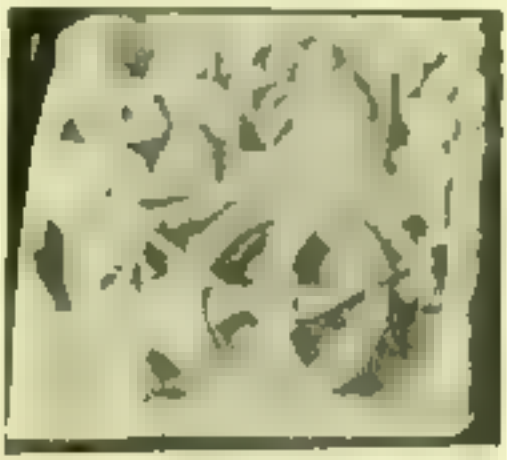

[illegible]

[illegible]

[illegible]

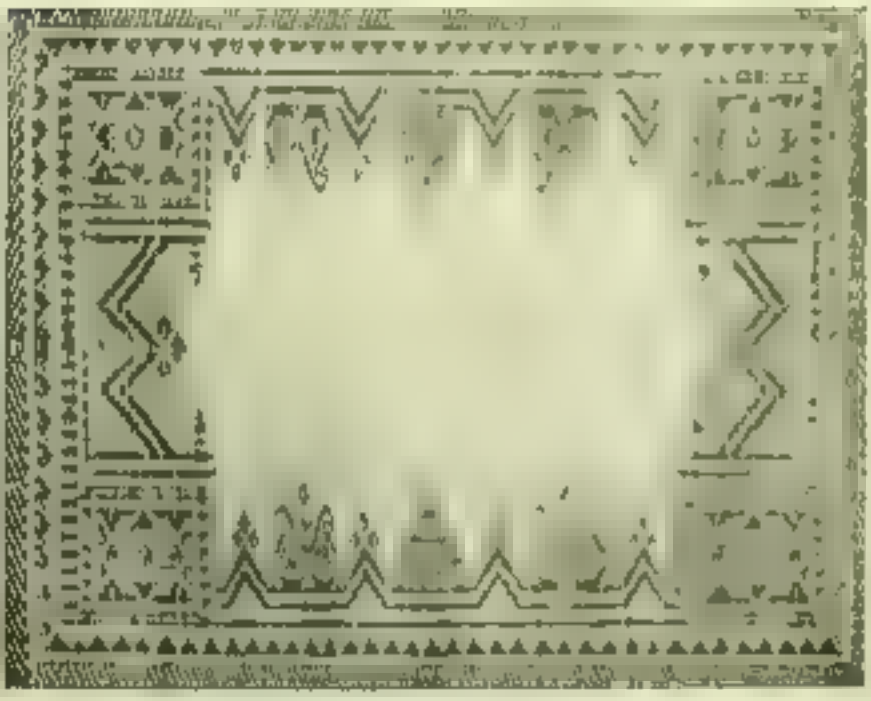

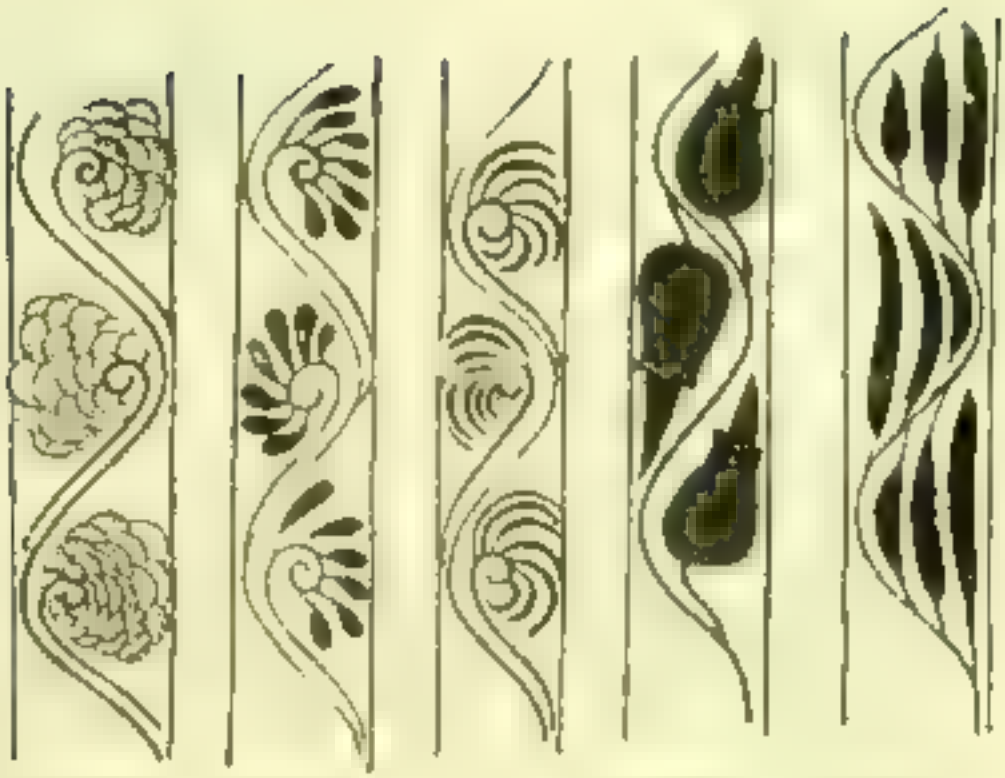

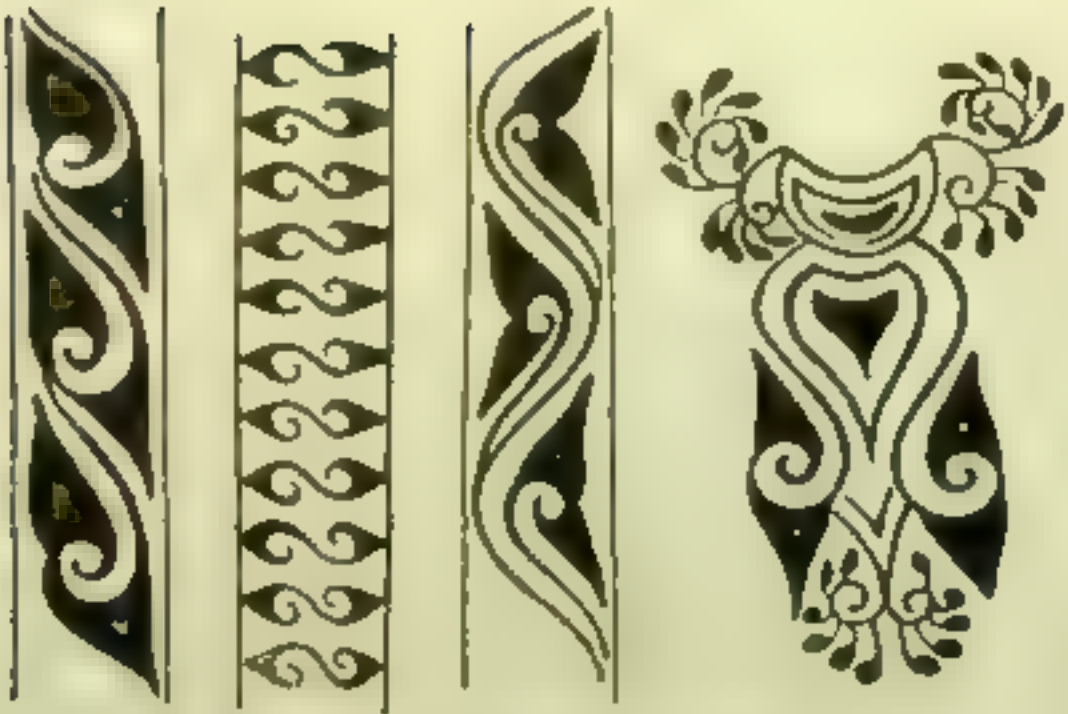

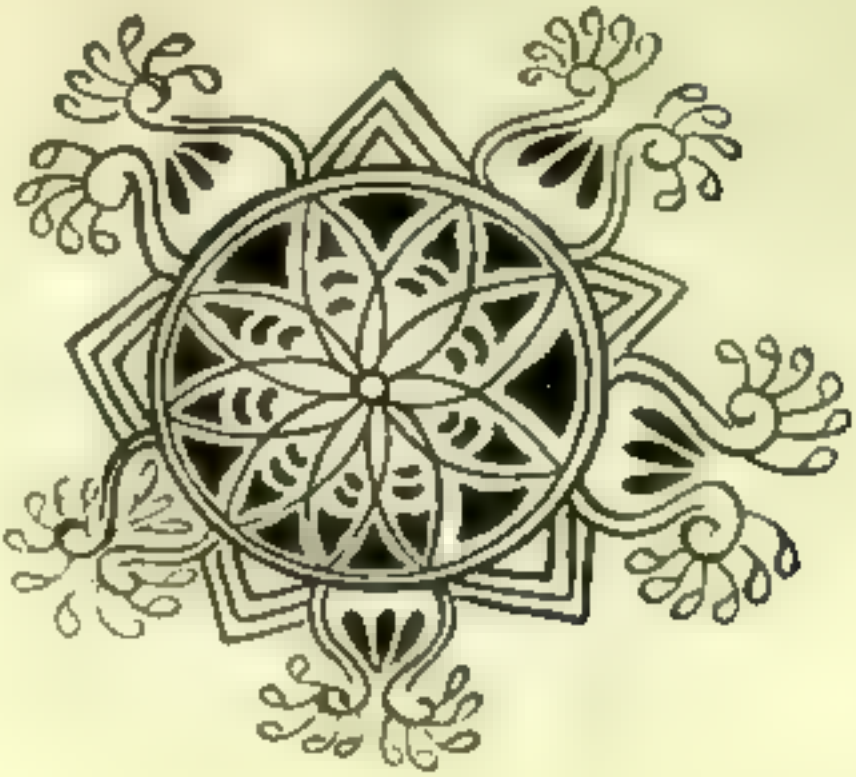

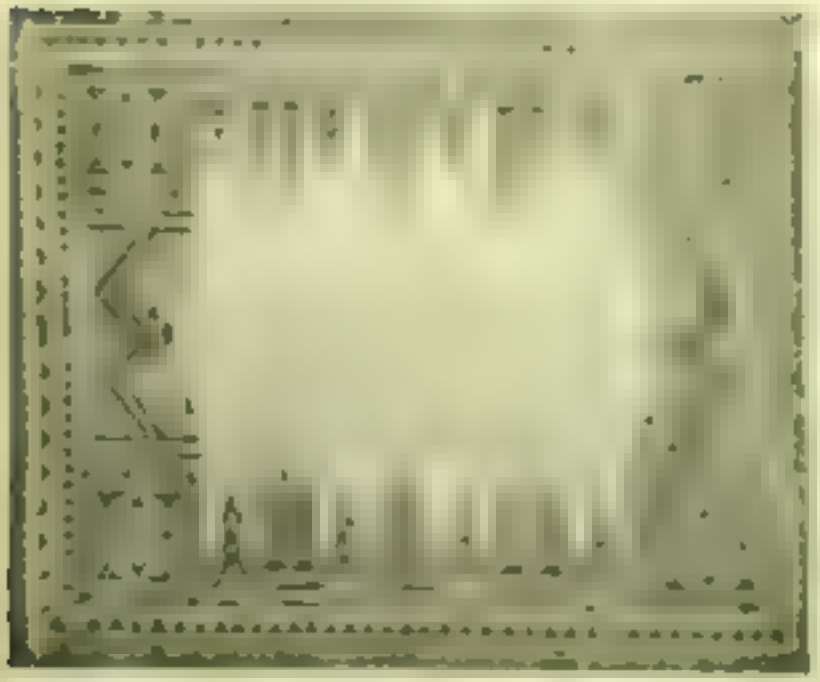

দেববিগ্রহ স্থাপনের অযোধ্যা বলে হইয়া পরিত্যক্ত হয়—গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত Market Manual (১৮৯৯ খৃঃ অব্দের সংস্করণ ২২৬ পৃঃ) লিখিত আছে—উহা বৈদ্যরাজের সংগ্রামসিংহ কর্তৃক আনুমানিক ছইশত বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। কিন্তু এ কথাটা ভুল। সংগ্রামসিংহ ছিলেন তিনি বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া বৈদ্য-সমাজের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে চেষ্টা করেন। বহু বৈদ্য পরিবারের পুত্রকন্যা তিনি জোর করিয়া আপনার পরিবারে বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। বৈদ্য সমাজে এজন্য এতাদৃশ একটা ঘৃণা ও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের এই ভাবে আত্মীয়তা তাঁহারা সমাজ বহির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাদের বংশধরেরা "ভগ্ন বৈদ্য" নামে পরিচিত। সংগ্রামসিংহের কন্যা বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া ১৬শিংহের কাশীর কবিনাথ সেই সময়ার দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "সংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণপরায়ণ" কবিনাথের তাঁহার বৈদ্যকুলপঞ্জীতে ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে লিখিয়া ছিলেন

সংগ্রামসাহ আমাদের কবিনাথ, কবিকণ্ঠহারের সমসাময়িক সুতরাং সাড়ে ৩-সাত শত বৎসর পূর্বের লোক তাঁহার নির্মিত পূর্বোক্ত মন্দিরের পার্শ্বে একটি ভগ্ন মন্দিরের অবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা বহু প্রাচীন স্বাভাবিক ক্রমে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া লুপ্ত হইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই ভগ্নাবশেষ হইতে কয়েকখানি ইট আমি সংগ্রহ করিয়াছি। সংগ্রামসাহের মন্দির তিনশত বৎসর পূর্বের তাহা এরূপ আলুই আছে, মসিও তাহাতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে কিন্তু তৎপার্শ্ববর্তী মন্দির সংগ্রামসাহের সময় হইতে অন্ন ৩,৪ শত বৎসর পূর্বের। সুতরাং তাহা এখন হইতে প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বের অর্থাৎ যখন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর তখন পূর্বঙ্গে হিন্দুরাজত্ব ছিল। হিন্দুরাজত্ব ধ্বংস পাওয়ার ফলে আমাদের দেশের শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত হয়। যেখানে কোন সুন্দর বিগ্রহ বা আর কোন মূর্তি গঠিত হওয়ার কথা হইত, সেইখানেই কালাপাহাড়েরা হস্তক্ষেপে উপস্থিত হইত। সুতরাং কে আর অকারণ অর্থব্যয় ও কষ্ট করিয়া শিল্পদেবীর জন্য মন্দির নির্মাণে। কারিগরদের হাত বন্ধ হইয়া গেল। পাথরের মূর্তি গড়ার যে বিরাট কারবার বঙ্গদেশে ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল।

১০০ বৎসরের প্রাচীন মন্দিরের কয়েকখানি ইট।

এতৎসংলগ্ন চিত্রগুলির মধ্যে প্রথম ছবি একটি অশ্বারোহী শিকারীর। শিকারীর মুখ দেখা নাই—কেবল দেহের ও মুখের আভাস রেখাঙ্কন আছে, ঘোড়াটা অনেকটা অস্পষ্ট অবস্থায় আছে। এই ঘোড়া যে কোন বিশেষ বংশের অঙ্কিত বা কোনটির ঘোড়ার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। কনারক, অজন্তা ভুবনেশ্বর বা অন্য কোন স্থানে এই ঘোড়া হইতে উৎকৃষ্ট ঘোড়া দৃষ্ট হয় না, ইহার গতি, সমস্ত অঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গী এবং দুর্দমনীয় বেগ—তাহার কি অদ্ভুত শিল্প-কৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন। অশ্বারোহীর সমস্ত শরীর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে কেবল রেখার ইঙ্গিত আছে, সেই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সেই ইঙ্গিতে তাহার অসামান্য কিপ্রকারিতা ও তেজোব্যঞ্জক কর্মক্ষেপ যেন রেখাটির

শিকারের ছবি।

মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্শাটি যেভাবে দেখান হইয়াছে তাহাতে যেন ভাস্কর মূহূর্তে সম্পূর্ণরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঘোড়াটি কি বেগে হরিণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। হরিণের মুখ ঘোড়াটা কামড়াইয়া ধরিয়াছে, নীচে শিকারী কুকুর, তাহার প্রায় সমস্ত দেহটাই ছাড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটা আবছায়ার রেখাচিত্র আছে। সেই রেখাচিত্রে ব্লাড হাউণ্ড জাতীয় ক্ষিপ্রগতি কুকুরের ভাব অতি স্পষ্ট হইয়াছে। শিল্পীর কি অদ্ভুত ক্ষমতা! সে শুধু রেখা দিয়া সমস্ত চিত্র নিখুঁতরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সমস্ত চিত্রটির মধ্যে একটি অদ্ভুত শক্তিমত্তা ও শিকারের উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। ঘোড়াটা হরিণটার ঘাড় [illegible] করিয়া ধরিয়াছে। অশ্বারোহী তাহার হাতের অস্ত্র-বল্লম বর্শা, অতি দক্ষ হস্তধারণকারী কুকুর দুইজনার চরম অবস্থার নীত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটার দুরন্তপনা যেরূপ একটা নিখুঁতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বিস্ময় মুগ্ধ হইতে না দেখিলে শুধু ছবি দেখিয়া ইহার গুণাগুণ বুঝা যাইবে না।

পোড়া ইটে রামায়ণের ছবি, হরিণের ছবি প্রভৃতি কতকগুলি ছবির কথা বলা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তথাপি ইহাতে রেখাঙ্কনের আলস্য বা অক্ষমতার ছাপ্পাছুপ্পা প্রমাণ দৃষ্ট হয়। পোড়া ইটের ২০০ বৎসরের পুরাতন কারুকার্য্য দেখিয়া অস্পষ্ট হইলেও রেখাঙ্কনে অদ্ভুত দক্ষতা অতি অল্পই আবিষ্কার করিয়াছি। উহা হিন্দু আমলের কথা। আমি এই খোদাই ইটের (terracotta) পরবর্ত্তী সময়ের কতকগুলি ছবি এই সঙ্গে দিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন কালে শিল্পের এই দিক ক্রমশঃ অবনতি-প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি ছবি শিক্ষাবোধকের, তাহার হাতে পাঠশালার পুরুষগুরু এবং একটি মেয়েশালকের একটি ছবিতে, রাজা ও রাণী আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রথে বসিয়াছেন রথটির অনেকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একখানিক ঘোড়ার একখানি পায়ের অনেকটা ভাঙ্গা আছে, রথটি প্রাচীন হিন্দু আমলের। অপর ছবি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সংগ্রামমাঠের মল্লিকের, ১০০ বৎসর পূর্ব্বের গোপীরা পশরা মাথায় মথুরার হাটে যাইতেছেন পশ্চাতে লাঠি হাতে বড়াই, বৃদ্ধার হাতের লাঠি, তাহার কুব্জতা ও বাঁকটাখানি রাখিবার ভঙ্গী লক্ষ্য করুন। আর একখানে ছবিও ঐরূপ গোপীদের পশরা মাথায় মথুরা যাত্রার ছাব। শেষের দুইখানি ছবির প্রথমটিতে কলমগাছের নীচে দুইটী গাভী এবং অপরখানিতে শুরু যজমানদের কপালে তিলক আঁকিয়া দিতেছে।

আমার কাছে যে নমুনাগুলি আছে, তাহা হইতে আমি এই কয়েকটি ছবি দিলাম। পাঠক প্রথম চারিখানি ছবিতে তুলনাবিহীন বাঙ্গলা শিল্পীর হস্তচিহ্ন দেখিবেন। প্রধানতঃ বঙ্গের এই শিল্পীরাই ভারতবর্ষ, জাভা, প্রম্বনম, শ্যাম প্রভৃতি স্থানের শৈব ভাস্কর্য্য গরিমার আংশাদার ছিলেন। এখনও বাঙ্গলায় শত শত মন্দিরে এই শৈব ভাস্কর নিদর্শন আছে, অনেক স্থলে ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে, বাঙ্গালী যে বাঙ্গলা রাজধানীর নিদর্শন বজায় রাখিয়াছে ইহাই আমাদের বিশেষ করিয়া বলিবার বিষয়। শিকারের ছবি, দুটি হরিণের ছবি এবং মেয়েশালকের ছবি দেখিয়া সহজেই মনে হইবে যে গাভারা

* অনুরাগহীন বাক্য হা, প্রতিধ্বনি ও সাধনা— [illegible] অনুভূতির প্রকৃতি ও ই ৩১৬ পৃঃ ২৭ ছত্র

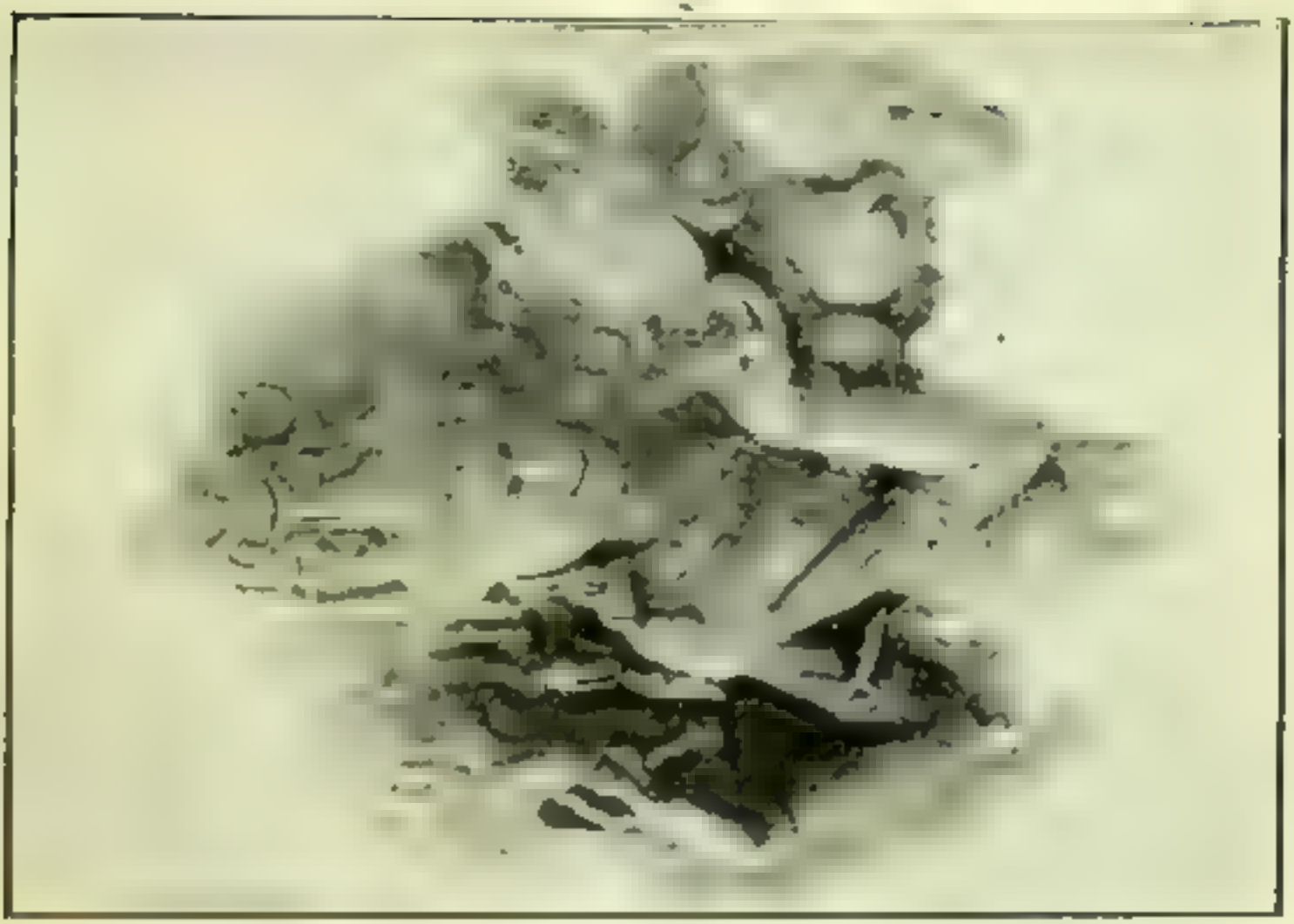

হরগৌরী (শাশ্বত মূর্তি) বাদামি, গুপ্তপ্রভাব আছে।
(৯ম-১০ম শতাব্দী)।

হরপার্বতী কর্নাটের পট্টডকল্লি মন্দিরের বাদামি গুহার ভাস্কর্য, শিবের ত্রাণ শিশুর আছে।

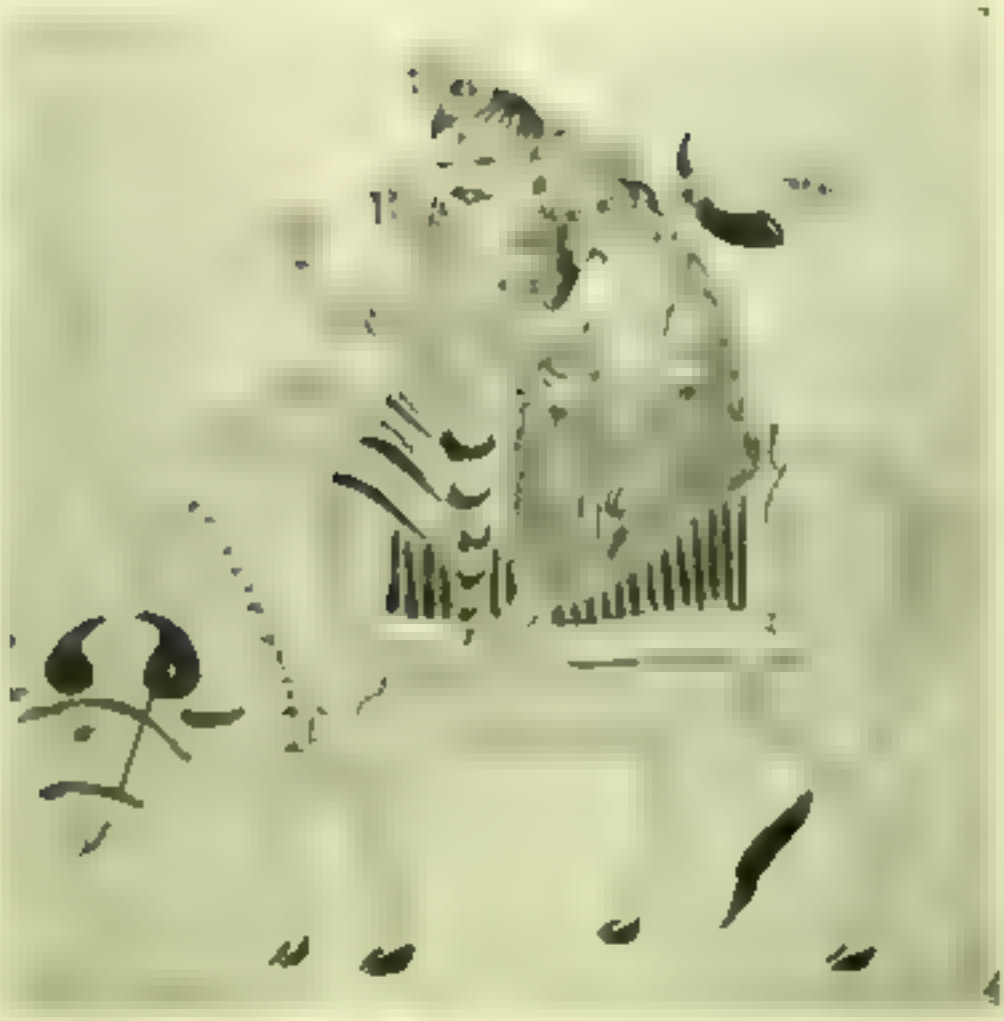

[illegible]

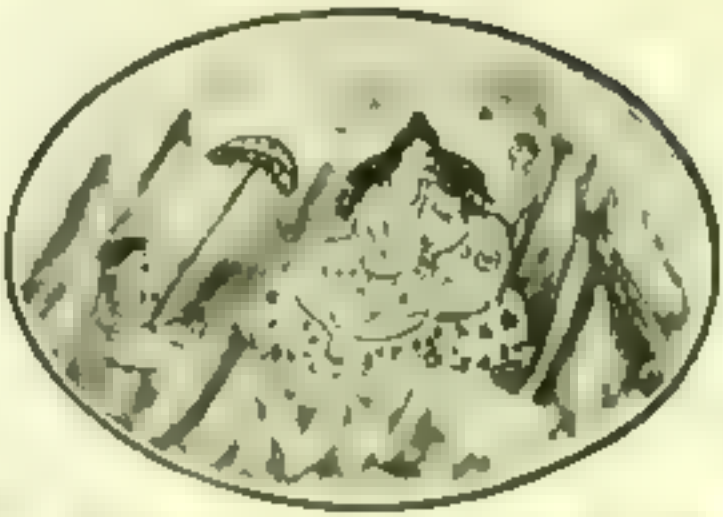

মহাদেব—ভাস্কর্যের পূর্ণ অবয়ব, ১০শ শতাব্দীর প্রথম

অথবা শুধু চিত্রিত করিয়াছিলেন এই ছবি তাঁহাদেরই অথবা সেই দেশের শিল্পীদের বংশধরগণের হাতের।

প্রস্তরমূর্তি অধিকাংশের কালাপাহাড়েরা ভাঙিয়া ফেলিয়াছে পুকুরের তলায় এইরূপ অনেক ভগ্ন বিগ্রহ পাওয়া যায়, মাটী খুঁড়িলেই মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে ভগ্নমূর্তির পরিকল্পনার মধ্যে উহাদের ভাব পাওয়া যায়, তাহাদের মুখের প্রসন্ন গাম্ভীর্য্য, অবয়বের নিখুঁতগঠন সৌষ্ঠব বা বয়ঃক্রমোচিত কোমলতা দেখামাত্রই ভাবুকের তপস্যার কথা মনে করাইয়া দেয়। এই দেশের এক জায়গার কথা শুনিয়াছি, যেখানে কারুশিল্পী শুভ্র শিলাফলক খোদিয়া নিমগ্ন হইয়াছে খোদাই করে। ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই চাকটির অভিষেকার্থ জলধারা দিবার জন্য উহা পূজা করিয়া তদুপরি ভাণ্ড রাখিবার ব্যবস্থা করে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় পরিবারের সমস্ত লোক ভূমিষ্ঠ প্রণত হইয়া সেই চাকটিকে প্রণাম করে। এইরূপে অভিষেকের জল বহু ও পূজা পাইতে পাইতে চাকা বড় হইয়া উঠে। তারপর বহু বৎসর পরে যখন নিমগ্নাকৃতি মূর্তি নির্ম্মাণের শোভা হয়, তখন তাহাকে আবার খোদাই আনিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া পূজা করাইয়া লয়, ইহার পর সেই কাজ যারা কত শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে কারুশিল্পী দেবমূর্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সে নিজেই মূর্তি গড়ে সত্য, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সে স্মরণে রাখে যে সে যাঁহাকে গড়িতেছে, যাঁহার আকার দিতে চাহিতেছে, তিনি অবাঙ্মনসগোচর এই পূজার ভাবের প্রেরণা পাইয়া শিল্পী যারা গড়ে তাহার তুলনা কোথায় মিলিবে? দেবতার যে ধ্যানের ভাব, সে শাস্ত্র পড়িয়া কোন্ শিল্পী কোথায় দিতে পারিয়াছে? ইহাই ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশের শিল্পের বৈশিষ্ট্য। দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা আমরা যে ভাবে করিতে জানি তাহা মন্ত্রের গুণও নহে নিজের চৈতন্য দিয়া আমরা অচেতন জড় কাঠ পাথরকে চৈতন্য দান করি অপোগণ্ড শিশু মন্দ বোঝা হেসে হাসিয়া উঠে, কেন হাসে তাহা কেহ জানে না, সে নিজে তো নিশ্চয়ই, তাহার জ্ঞান নাই, ভাষা নাই, সে সেই নিরর্থক হাসির অর্থ বুঝিবে কিরূপে? সেই নিষ্কলুষ মুখিকাপুত্র হাসি সাংসারিক কোনকিছুর হাসি নহে—তাহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আনন্দরাজ্যের আধ্যাত্মিক জগতের হাসি। আমি কোন কোন মূর্তিতে সেইরূপ হাসি দেখিয়াছি—যে শিল্পী সেই হাসি পাথরের উপর ফুটাইতে পারিয়াছেন—তিনি শত শত বৎসরের ভারতীয় তপস্যার সংস্কারবশতঃ শক্তি লাভ করিয়া উহা পাথরে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন। তখন শতাব্দীর একখানি ভাঙ্গা উমামহেশ্বরের মূর্তির ছবি দেওয়া হইল, উহা কালাপাহাড়ী কোদালে একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। উমার মুখখানি তো পাথর বা বন্দুকের আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে কটিদেশ হইতে অবশিষ্ট অংশ নাই ভাগ্যের এই বাহিরা নিষ্ঠুর বজ্রের হাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে উমার চিবুক যেখানে ছিল সেইখানে শিবের হাত রহিয়াছে, সেই আঙুল কয়েকটি দিয়া যেন বিশ্বের সমস্ত কোমলতা, সমস্ত স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছে, যদি মূর্তিদ্বয়ের আর কিছু না থাকিত শুধু শিবের এই কয়েকটি মমতায় গড়া, স্নেহপ্রতীক

শিল্পীর সাধনা

একটি উমামহেশ্বরের মূর্তি

আসল থাকিত তবেই বোধ হয় ভারতের কার্যের অনেকটা সফলতা হইত। সেই আসল কয়েকটি আছে, আর আছে অহর্নিশই শিবমুখের একটু হাসি ও স্নেহমাখা দৃষ্টি—সেই হাসিটুকু ও সেই দৃষ্টি স্বর্গীয়—তাহা একেবারেই এই জগতের নহে। ফটোগ্রাফ দিয়া এই পুস্তকখানিতে যাহা ছাপা হইয়াছে তাহাতে কিরূপে বুঝাইব—তখাপি এইখানে তাহা দিলাম এই আশা বুকে আমার শেষের মন্দিরের দেয়ালে আঁকা আছে।

অজন্তার গ্যালেরি বহু মন্দিরের ও সমাধিস্থ দুই শত বাঙ্ময় চৈতন্যসংকীর্তনের ন্যায় অনেক ছবি আছে। তাহার মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট ছবি এই পুস্তকের মুখপত্রে দেওয়া হইয়াছে। এই ছবিতে ১২ টি মুখ আছে ইহাদের একজনের সঙ্গে অন্যের মিল নাই, প্রত্যেকের মুখ চোখ ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র ভাবের। আমার মনে হয় এই সকল ছবি সেই সকল মানুষের অনেকটা ধরিয়া প্রতিচ্ছবি। তাহাদের পঞ্চাশৎ যে সকল চিত্র ছিল, চিত্রকর সেগুলি সামনে রাখিয়া কিংবা তাহাদের মুখের সাদৃশ্য আহরণ করিয়া এই বিরাট ছবির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আমার নিজের চিত্রশালায় যে সকল ছবি ও মূর্তি আছে তাহা হইতেই অনেকগুলি প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়াছি বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলায় ইহাদের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট অনেক ছবি এখনও আছে।

উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের প্রথম শুকের মুখের ভাব এবং তাহার নাসা, চক্ষু, ললাট ও আগাগোড়া মুখের লক্ষণাক্রান্ত। আমরা জানি, হিমালয়ের অত্যুচ্চ প্রকৃতি স্থানের অনেক মানুষের এই ভাব দেখা যায়। বোদ্ধাবতারকালে এইরূপ মুখেতে হাসি ফুটে নাই, তাহাতে ধ্যানমগ্নতা খেলিয়া যাইতেছে। কালিদাসের কুমারসম্ভব হর শিব ও চিত্রের বুদ্ধদেবের তুলনা খুব কম। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, বিরাট কোন সাধনা যার স্তব্ধ হয়, তবে তাহার যে ভাব তাহাই কালিদাসের শিবে এবং সমস্ত বুদ্ধমূর্তিতে। একটিমাত্র দণ্ডায়মান স্থির হইয়া দাঁড়াইলে যেরূপ দেখায় ইহা সেইরূপ। মানুষ মুখ ফিরাইলে যেখানে নাই সেইখানে অনন্ত চিদাকাশের ন্যায় নীলাম্বরাটি, তাহা সমুদ্রের মত বিরাট নহে বটে বটে বন্ধুর মত ক্ষুদ্র, তথাপি তাহার স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের যে মহিমা তাহা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রেরই ন্যায়। আকাশের প্রভেদে কিছু আসে যায় না—উভয়েই একনিষ্ঠ তপস্যার প্রতীক। কালিদাস আর একটি উপমা দিয়াছেন—মেঘ আকাশে দাঁড়াইয়া আছে বর্ষণের পূর্বে, তখনও উহা সেইরূপই সাদাটের একখানি চিত্র। কালিদাসের শিব মুখের ভাব উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তপস্বী শিব ও তপস্বিনী গৌরীর একখানি ছবি দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে লাস্যলীলার লেশমাত্র নাই। মুখেচোখে অটুট তপস্যার ভাব, নবম শতাব্দীর পর কঠোর সংযমীর অমর প্রশান্ত ভাব ধীরে ধীরে ছুটিয়া যাইতেছে। দশম শতাব্দীর শিবের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। শিব এবার জ্ঞানের

প্রথম শিব

সীমানা ছাড়িয়া প্রেমে পা দিয়াছেন তাঁহার চক্ষে ধ্যানের ভাব হইতে প্রসন্নতা দেখা দিয়াছে। অধরে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিতেছে, তাঁহার চিত্তের ধ্যানস্থ ভাবের মধ্যে যেন প্রেমের রোমাঞ্চ আস্তে আস্তে দেখা যাইতেছে। গৌরীর মুখের

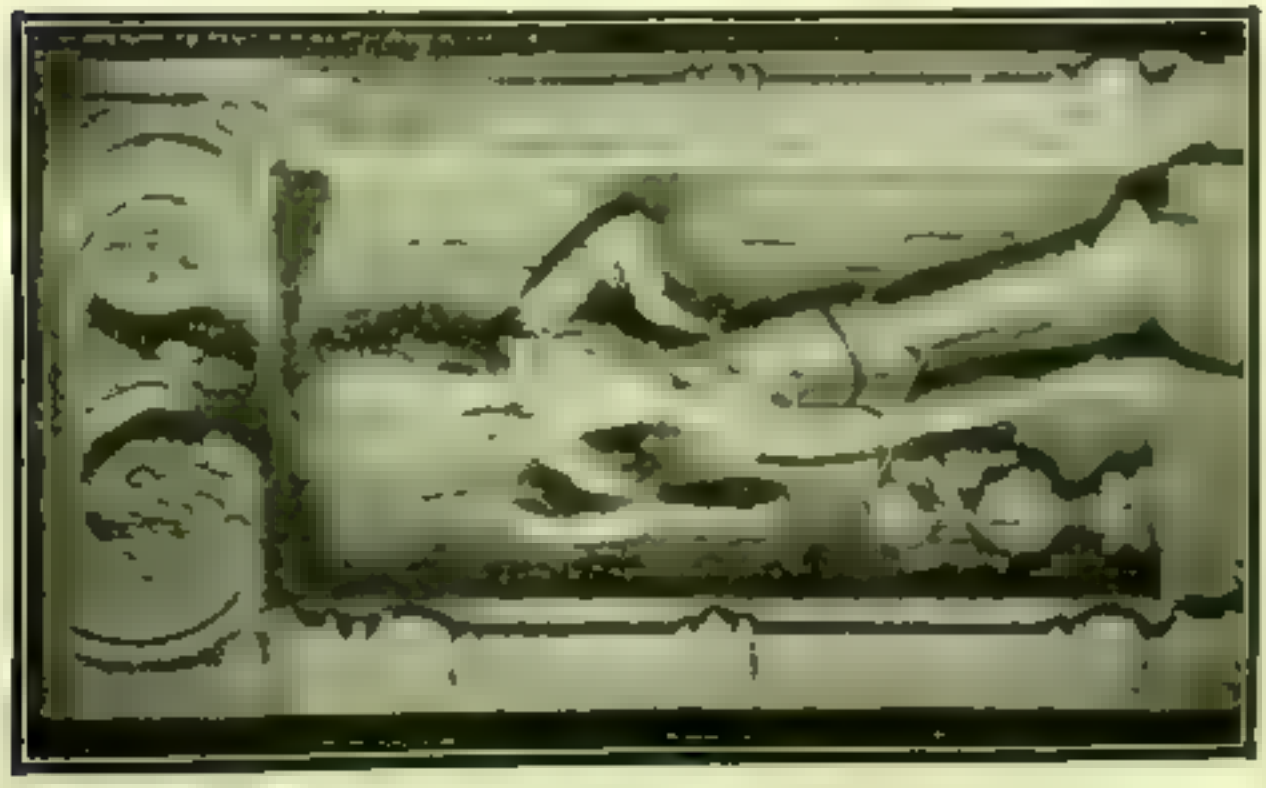

বৌদ্ধ-জাতক—ভাতের ভাতের, বস্ত্র ও তিব্বতের সন্নিহিত প্রান্ত—১৩শ শতাব্দী

• "পাল-যুগ", ৺ওয়াল্টার স্পিংহাম,
১১শ পরিচ্ছেদ।

[illegible] পৃষ্ঠা—১৭৩ পৃষ্ঠাতে কাতার হিয়ৎ আলি কলিকাতা ট্রেজারীতে সোনাকটিকে জমা করেন, তখন এই মূর্তিটি কতদিন বংশের প্রাচীন ছিল। ডাঃ জন ডাব ডালিনের আনুকূল্যে ফটোগ্রাফ গৃহীত। ২২৩ পৃঃ এবং মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৩—১৭ ছত্র, ঐরূপ।

• বেহারের তাম্রশাসন [illegible]—১১৮৮ খৃঃ।
(বৌদ্ধমূর্তির নামে মানুষ।)

ক খ

(নরেন্দ্রবন্ধুর চিত্রকর, পুণ্যশ্লোক সেন কর্তৃক প্রাচীন চিত্রের অনুকরণে অঙ্কিত)।

দিকে চাহিয়া তিনি সমাধির আনন্দ ভুলিয়া যাইতেছেন। এইরূপের কয়েকখানি ছবিতে পর পর স্থানের সীমা লাঘব দিয়া ধারণোত্তী প্রেক্ষণীকে ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন। এরূপ ছবি বা মূর্তির বিকাশ খাস বাঙ্গলার। প্রাচীন শিল্পী চরম সম্ভারের পূর্ব-পশ্চিমের শিল্পকে কতকটা প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব ভারত-শিল্প লক্ষ্মীর হৃদয় ছুঁইতে পারে নাই। ভারতীয় কলালক্ষ্মী সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসিয়া পাশ্চাত্য শিল্পীর নিকট হইতে কিছু রসদ আদায় করিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু আত্মসাৎকরণের পূর্বে প্রত্যেক যে শিল্প প্রচলিত ছিল, পরবর্তী কালে তাহারই ক্রমবিকাশ হইয়াছিল; বাঙ্গালীরা সেই শিল্পে স্বীয় প্রেমের মহিমা প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রস্তরীভূত অজন্তাস্বরূপ আদিম ভারতীয় শিল্পের নবভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অশোকের যবনাগত হেলিওএর মূর্তির মুখ সেই আদিম শিল্পীদের মুখের ছবি বলিয়া মনে হয়। চিত্রের মুখগুলির নাক একটু খাদা। সমস্ত মুখখানিতে আর্য্য আদর্শের নাসিকা নাই। মুখের ভাব একটু চেপটা। অশোকের সময় তুষাদ্ধ নামক স্থপতির দ্বারা সুদর্শন হ্রদের বিশাল সেতুপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল, তুষাদ্ধ নামটি অনার্য্য নামের মত শোনায়। কাশ্মীরে সূর্য্য নামক স্থপতি অদ্ভুত উপায়ে বিতস্তা নদীর গতি উল্টাইয়া দিয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিণীতে সেই বৃত্তান্ত কলহণ লিখিয়াছেন; সূর্য্য চণ্ডালবংশীয় ছিলেন।

অশোক হেলিওএর মুখগুলির বরহুতের যক্ষের মুখের সহিত এদেশের আর কোন স্থানে দেখা যায় না। এই আদিম অধিবাসীদের মুখের ভাব ছাড়া আর এক প্রকার ছাঁচ আমরা পাইতেছি। তাহা স্পষ্টই উত্তরদেশসম্ভূত। নেপাল, চীন ও ব্রহ্মের ছাঁচ আমরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের দেশের চিত্রকর ও স্থপতি-বিশারদেরা তিব্বত, নেপাল, চীন ও জাপানে যে বঙ্গদেশের শিল্পের যে রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই তত্তদেশের শিল্পাকাশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল—একথা ইতিহাসজ্ঞ লোকেরা সকলেই অবগত আছেন। তথাপি উত্তর দেশের শিল্পীদের কারুকার্য্যে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। তাহারা ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করিলেও মুখের ভাব ও ছন্দে নিজেদের রীতি বজায় রাখিয়াছিল। আমাদের দেবদেবীর মূর্তিতে তাহাদের এই প্রভাবের চিহ্ন পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়, কোন স্থানে আমাদের দেবদেবীর মুখ মঙ্গোলিয়ানদের মত, তাঁহাদের গণ্ডের অস্থি মঙ্গোলিয়ানদের ন্যায় সমুন্নত, কিন্তু প্রভাবটা চক্ষুর উপরই বেশী দৃষ্ট হয়, চক্ষু বঙ্কিম বা অর্দ্ধচন্দ্রের মত নহে, তাহা ঈষৎ তির্য্যক্‌ভাবে স্থাপিত দুইটি শরের মত। আমাদের দেশের কুমারেরা কোন কোন স্থানে দুর্গাপ্রতিমার এই মঙ্গোলিয়ানদের মত অঙ্কিত করিয়া উহা দেবচক্ষুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করে। চীন ও তিব্বত প্রভৃতি দেশের তান্ত্রিক শক্তিপূজা আমরা ঐ সকল উত্তরের দেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং তজ্জন্যই দেবচক্ষুর এই বৈশিষ্ট্য এখন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। উড়িষ্যার পুরিতে নামক স্থানে (ভুবনেশ্বরের নিকট) যে প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সেই প্রস্তরমূর্তিগুলির ভাস্কর্য্য অতি সুন্দর, কিন্তু তথাপি দেবীমূর্তির চক্ষু মঙ্গোলিয়ানদের চক্ষুর

এদেশের শিল্প অনার্য্যপ্রসূত।

উত্তরদেশের প্রভাব।

মত খিচিং নামটিও উত্তর দেশের কোন নামের মত শোনায় সম্ভবতঃ তথায় মঙ্গোলিয়ান কোন জাতির একসময়ে বেশী প্রভাব ছিল।

আমরা বঙ্গদেশের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে মাগধ আদর্শই আমাদের নিজস্ব, এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দ্বারা স্থলবিশেষে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইলেও সেই আদর্শকেই আমরা বজায় রাখিয়াছি। মগধ বৃহত্তর বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, এই জন্য এই শিল্পকলাকে আমরা "মাগধী" আখ্যা দিয়েছি কিন্তু আমার মনে হয় বাঙ্গলা দেশ হইতে শিল্পীরা মগধে যাইয়া কাজ করিত সীমান্ত ও বিতপাল যাস রাজমাহীর লোক, বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত প্রস্তরমূর্তিগুলির আদর্শ বিহারীদের মত হইলেও খাস বাঙ্গলাদেশের মূর্তি বিহারের মূর্তি হইতে সুন্দর হইত খাস বাঙ্গলার প্রথম শ্রেণীর একখানি ও উৎকৃষ্ট বিহারী একখানি মূর্তি পাশাপাশি রাখিলে, এই কথা প্রমাণিত হইবে। বাগেরহাটের বৃহন্মূর্তির মুখ যেরূপ প্রসন্ন দেবভাব-দ্যোতিতে পূর্ণ—বিহারী মূর্তি সর্ববিষয়ে একরূপ হইলেও তাহার কোনটিতেই সেরূপ ভাবটা ফোটে নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বিহারে প্রাপ্ত বহু মূর্তি খাস বাঙ্গলার ভাস্করগণকর্তৃক নির্ম্মিত, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে একদেশে শিব জ্ঞানচক্ষুর সীমানা হইতে পা বাড়াইয়া ধীরে ধীরে প্রেমের কুঞ্জবনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন বুদ্ধ ও শিব এই দুই মূর্তিই অষ্টম-নবম শতাব্দীর জনসাধারণের সঙ্কল্পের উপাস্য দেবতা ছিলেন তাম্রশাসনের শিবস্তবনায় তাঁহার যে সকল বর্ণনা পাই সময়ে সময়ে তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যকে পরব করাইয়া দেয় গৌরীর সঙ্গে শিবের নানারূপ লীলার ইঙ্গিত সেই সকল শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়

বুদ্ধ, শিব ও বিষ্ণু (পাহাড়পুর)

এদিকে উমা-মহেশ্বরের যুগল প্রস্তরমূর্ত্তিরও সেই লীলার ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় বাসুদেবের পূজা খুব প্রাচীন হইলেও বঙ্গদেশে শেষ পালরাজগণ বিশেষ সেনবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালেই এই দেবতার পূজা খুব বেশী পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল বাসুদেব মূর্ত্তিতে সেই জ্ঞানপ্রতিম প্রশান্তভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে—তাহাতে প্রেমের উন্মাদনা নাই,—"চল চল অঙ্গের লাবণি" নাই, যাহা পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণবেরা প্রেমময়ের পরিকল্পনায় দেখাইয়াছেন, কিন্তু সুকোমল ভাবের সূত্রপাত আছে নিখাবরের হাসি এবার সুস্পষ্ট, পদ্মপলাশনেত্রের চাহনীতে চন্দ্রালোকে বারিবিন্দুর মত ভাবের ঢেউ উছলিত হয় সেই লাবণ্য—অপার্থিব ইন্দ্রিয়াতীত লাবণ্য দেখা দিয়াছে। কোন কোন বুদ্ধ ও বাসুদেবমূর্ত্তি আমরা এক জায়গায় রাখিয়া তাহাদের পার্থক্য ও সাদৃশ্য বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে পারি।

বুদ্ধ নিস্পৃহ, তাঁহার নেত্র ধ্যানস্তিমিত, ওষ্ঠাধর প্রশান্ত, দেহ নির্ব্বিকার, মুখচোখ অবয়ব কামনা রাজ্যের উর্দ্ধে। বাসুদেবের অঙ্গ কামনা মাখা—কিন্তু সে কামনা রক্তমাংসের নহে, তাহা আধ্যাত্মিক, সেই চিরন্তন সুষমাময় চক্ষু, ওষ্ঠ, চাউনি ও হাসি দ্বারা মন হরণ করে এই

পৃথির মলাটের ছবি

কাঠের [illegible]ট ফুল লতার কাজ

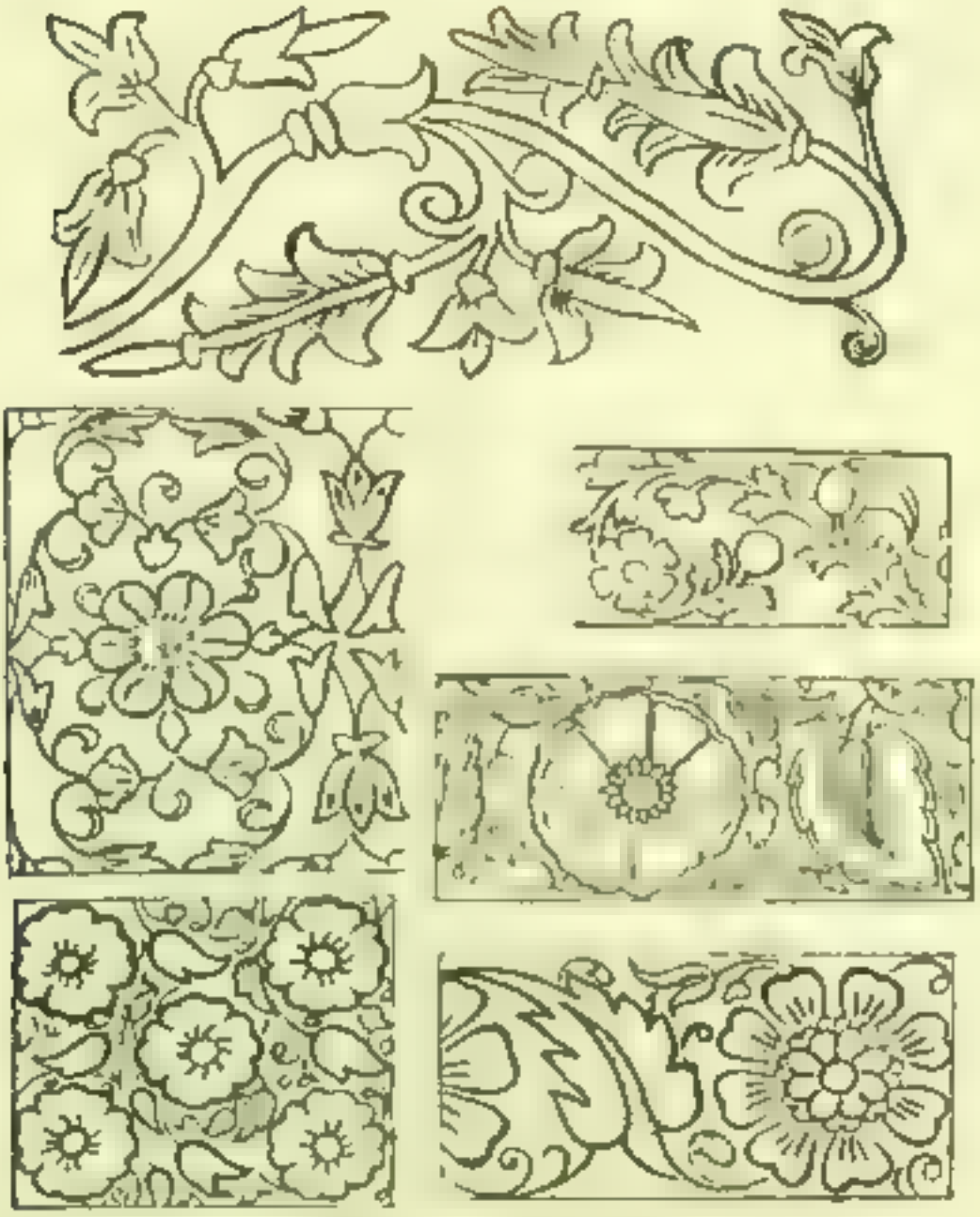

২০০ হইতে ৩০০ শব্দের মধ্যে বিষয় বর্ণনা করিতে হইবে।

১৯-খি স্তম্ভের যুদ্ধ, খৃষ্টোত্তর উনবিংশ শতাব্দী।

পটিদারদের ('মহরদের' [illegible]র, মূল চিত্রগুলি রক্ষিত

৪৩৯ (ক)

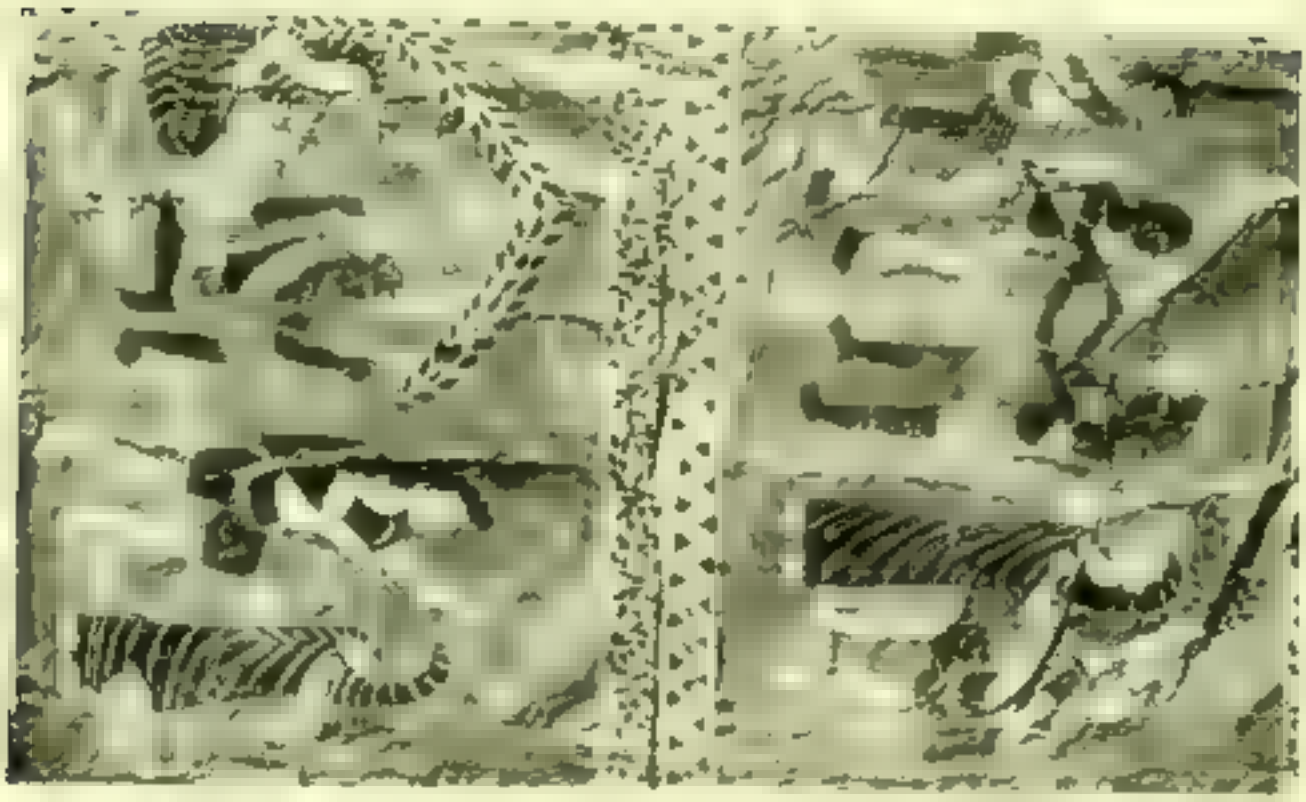

যুদ্ধিষ্ঠির ও নকুল।

ভরত মিলন।

পটিদার এই ছবি দুটি [illegible] বছরের পুরোনো বলছে।

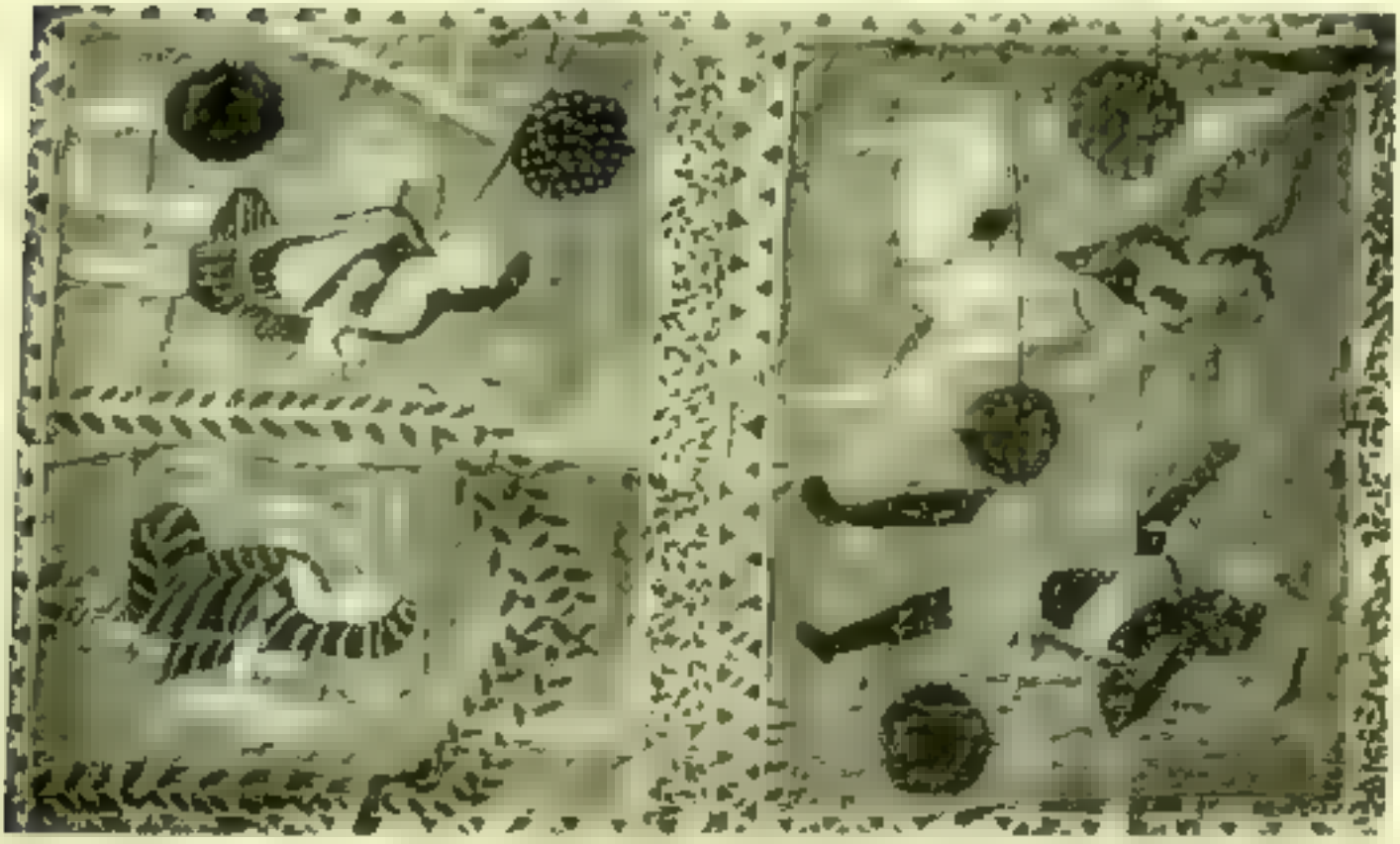

সীতা কর্তৃক বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন।

রাম কর্তৃক হরিণরূপী মারীচ বধ।

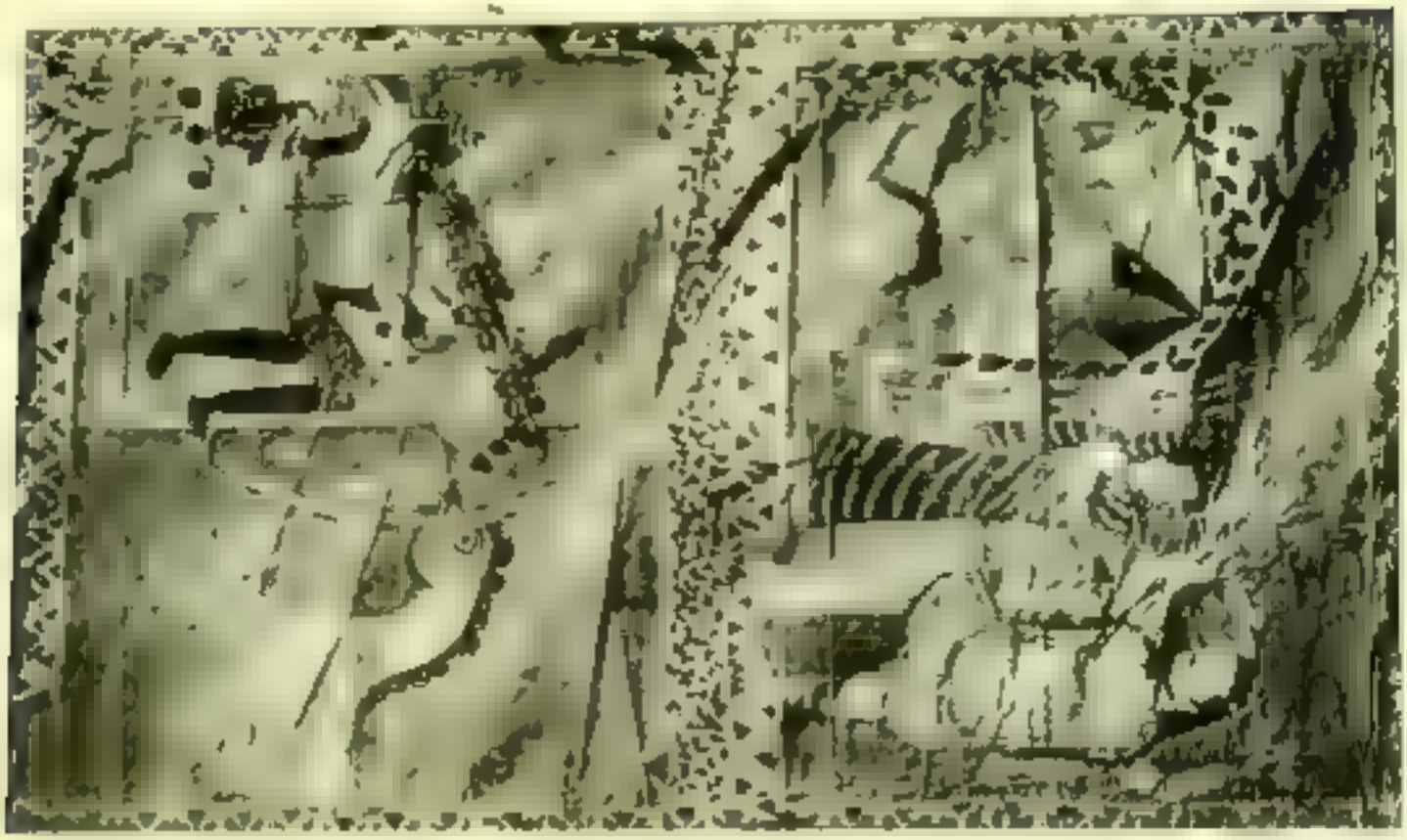

চাটু ও বগলেন। মহাদেবের বেশে লক্ষ্মণ নীতার খুঁটিয়ে।

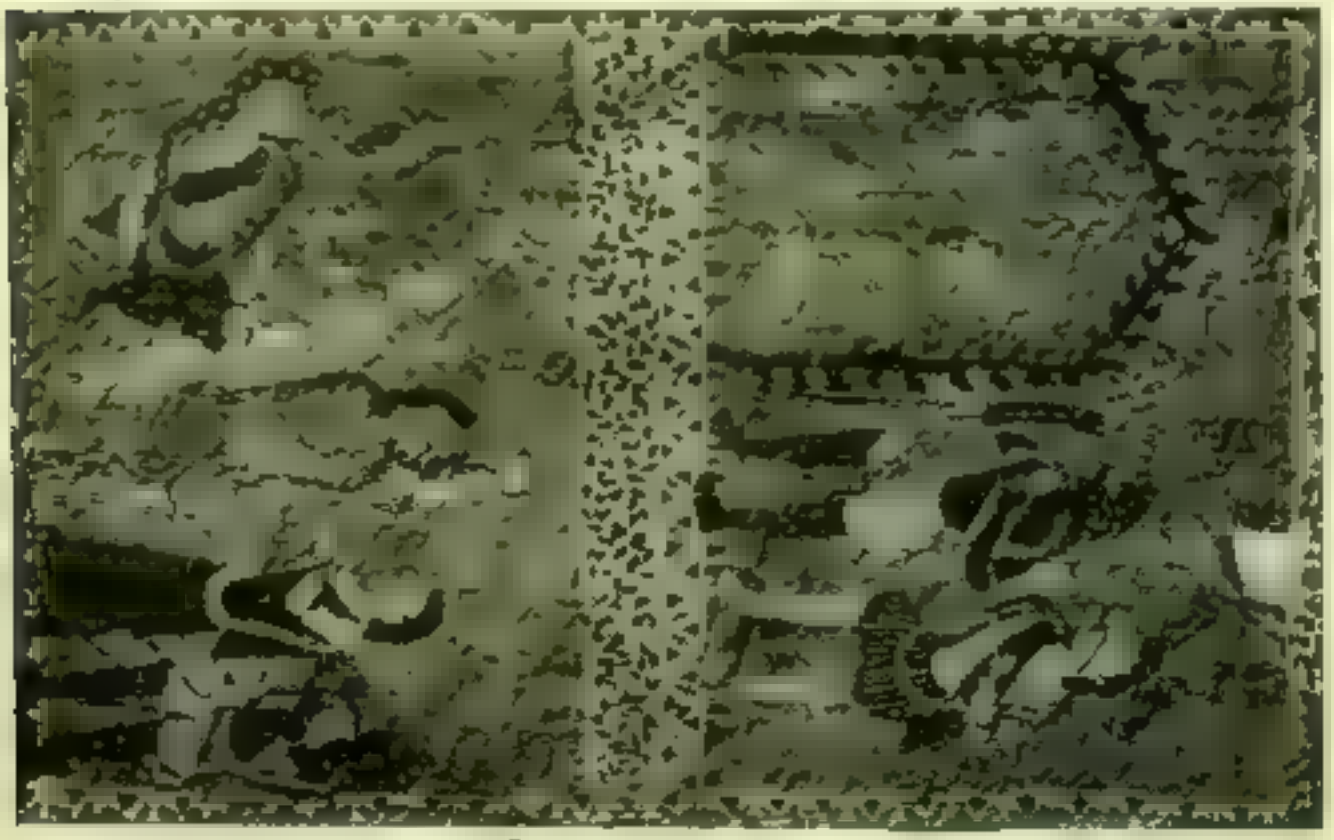

রাম ও লক্ষ্মণের পত্র-কুটিরে প্রবেশ।

দুই মূর্তি নদীর এপার ও ওপারে একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে প্রেম মানবী শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞানের সহিত শেষ, ভরত বা ভক্তি ও প্রেমের দুয়ারের দিকে কুঁচিৎ উঁকি মারিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশ এখন হইতে নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিল—সে পথ প্রেমের। এ বিষয়টি পরে আলোচ্য। খুব প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিতে বৌদ্ধ প্রশান্তির ভাব সুস্পষ্ট নবম শতাব্দীর একখানি ভাঙ্গা বিষ্ণুমূর্তি আমার নিকট আছে, তাহার বৃহদ্বক্ষ, কপাটবক্ষ ও সোমা অবয়ব এবং শান্তক্ষ স্থির মুখভঙ্গী বুদ্ধমূর্তিরই মত, পরবর্তী সময়ে এই প্রশান্ত সাগরে যে ভাবের ঢেউ খেলিয়াছে তাহার সম্পর্ক অভাব

বুদ্ধ ও বাসুদেবের মধ্যবর্তী মূর্তি শিবের তিনি অর্দ্ধমুক্ত মহাযোগী, অর্দ্ধনিমগ্ন অর্দ্ধজাগ্রত, নিত্যদ্বন্দ্ব দুই যুগের মধ্যবর্তী তাঁহার বাসুদেব জ্ঞানের দিকটা ছাড়িয়া প্রেমে পৌঁছিয়াছেন মাত্র, তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু তাঁহার একটি হস্তে অনুরাগপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে বুদ্ধের অর্দ্ধনিমীলিত নাসাগ্র মুদ্রার বিচিত্র ভঙ্গীতে ফুলের কুঁড়ির মত সুন্দর দেখায় তাঁহার বসিবার ভঙ্গী, ললিতাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাসূচক। বাসুদেবের ও সকল আসনের বালাই কিছুই নাই বাসুদেবের পূজা পরিশেষে সোজাসুজি কৃষ্ণ-পূজায় পরিণত হইল - তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় প্রচেষ্টার সর্ব্বশেষ সার্থকতা—জগতে তাহার উদাহরণ বিরল তাহা পরে আলোচনা করিব

আমরা বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাৎ পাই যাহাদের ব্যবসা ছিল ছবি দেখাইয়া লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা। ইহাদিগের উপাধি ছিল "মস্করী" যাহার সহিত সাদৃশ্য চিত্রাঙ্কিত কোন বস্তু অথবা "পরিব্রাজক" অর্থে কবিকঙ্কণ 'মস্করী'শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, (চণ্ডীকাব্যের প্রথমাংশ)

পটুয়াবাদেরী

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় যাজকগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধগণের এই রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা [illegible] ফলক পাতে এইরূপ ছবি আঁকিয়া জড়াইয়া রাখিতেন। ভেটিকানে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর এইরূপ ছবি রক্ষিত আছে জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাতে কখনও কখনও লোকদিগকে আমোদ দেওয়ার জন্য প্রচুর রঙ্গরসের ব্যবস্থা থাকিত। সুতরাং মস্করীরা যে সকল কথা বলিয়া সৌকর্য্য ও ধর্ম্মকথিগকে হাসাইত তাহা তাহাদের নামে পরিচিত হইয়াছিল এখনও লোকে 'ঠাট্টা-মস্করী" কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে আমরা মস্করীদের পরিচয় পাই। মঙ্কালীপুত্র গোসালীর নিকট যে জীবিকা অর্জ্জনের এই বৃত্তি ছিল মুদ্রারাক্ষস নাটকে এইরূপ পট দেখাইয়া সাধারণের নিকট হইতে অর্থগ্রহণের ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে এই চিত্র ব্যবসায়ীরা পাপীদিগের শাস্তি আঁকিয়া যমরাজের দূতগণের মূর্ত্তি দেখাইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গলার পটব্যবসায়ীরা ধর্ম্মবিষয়ক নানা উপাখ্যানের চিত্র দেখাইয়া উপসংহারে যমরাজের সেই পাপীদের শাস্তি দেওয়ার দৃশ্যটা প্রদর্শন করেন। যে কোন পৌরাণিক চিত্রের শেষভাগে যমের দণ্ড-গৃহ দেখান হয়। ইহা সেই সুচিরাগত প্রাচীন রীতি। মুদ্রারাক্ষসে দৃষ্ট হয় এইরূপ চিত্রগুলির সাধারণ নাম

"যম পট" বুদ্ধদেবের সময়ের পূর্ব্ব হইতে এই "পটীদার"গণ পটে অঙ্কিত ছবি দেখাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন "সংযুক্তনিকায়, খন্ধ সংযুক্ত" প্রভৃতিতে "কথন চিত্তং—চতুরং চিত্তং চিত্তেনেব চিত্তন্তং" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। বুদ্ধঘোষের অর্থকথিনী ৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন। ইহাতে এই ভাবের চলন্ত চিত্রের বিবরণ দেওয়া আছে সপ্তম শতাব্দীতে "সারত্থপ্রকাশিনী" নামক সংযুক্ত-নিকায়ের ভাষ্যে ধর্ম্মপালের সাক্ষ্যবলে। লিখিত আছে—"যথা ব্রাহ্মণা পাসন্তিকা হোন্তি, পটকোটিয়কা নাম তে বানরকারা সুপতি ছন্নপতিবসেন সম্পত্তি-বিপত্তিযো দেখাপেত্বা তদা তদা কথং কথা ইদং পটিলভন্তি, ইদং কত্বা ইদমিধ লভন্তি তং চিত্তং পহেত্বা বিচরন্তি"। এই 'যথা' শব্দ কখনও 'যমো' রূপ ধারণ করিয়াছে জৈন শাস্ত্রে ইহাদের নাম "যমো" কোন্ পাপে নরকে কি শাস্তি তাহা ছবিদ্বারা ইহারা দেখাইতেন সেই ইতিহাস পূর্ব্ব যুগ হইতে বর্ত্তমান পটুয়াদেরা সর্ব্বত্র "যম-পট" দেখাইয়া থাকে। তাহাতে যে কোন বিষয়েরই ছবি থাকুক না কেন, শেষের দিকে পাপীর শাস্তির ছবি থাকে। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারবৃদ্ধির সঙ্গে এই পট দেখাইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপাখ্যানগুলির প্রচলন অত্যধিক হইয়াছিল, বৌদ্ধগণ সুদূর-প্রান্তের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যাতায়াত করিতেন। যেখানে পরস্পরের মধ্যে ভাষাদ্বারা কোন কথা বুঝাইবার সুবিধা বেশী নাই, সেখানে ছবি এই প্রচার-কার্য্যের প্রধান সহায় ছবি যে ভাষার কথা কহে তাহা সার্ব্বজনীন বুদ্ধদেবের জন্মকথা (জাতক) লইয়া ছবি অঙ্কিত হইত, অনেক সময়ে সেইগুলি দেখাইয়া হস্তাদির ইঙ্গিতেই বিদেশী শ্রোতার মনে কাহিনীগুলির একটা মোটামুটি ভাব বুঝাইয়া দেওয়া হইত। কাগজ কিংবা মনের উপর এই সকল চিত্র লিখিত হইত। সম্ভবতঃ কাপড়ের উপর ছবি আঁকার পদ্ধতিই পোড়ার দিকে বেশী ছিল, 'পট' শব্দ (পট) দ্বারাই ইহা অনুমিত হয়। জাতকের উপাখ্যানগুলি পাথরের গা খুঁড়িয়া উৎকীর্ণ করা হইত, দেওয়ালে আঁকা হইত এবং মফস্বলীয়া কাগজে বা কাপড়ের উপর তাহা আঁকিয়া সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত। অজন্তার গোবরমাটির উপর সাদা রং মাখিয়া তাহার উপর যে সকল অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল কোন কোন স্থানে তাহা এখনও পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল আছে শত শত বৎসরের প্রাকৃতিক দৌরাত্ম্য তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে নাই কত বর্ষার জলকড় গ্রীষ্মের অগ্নিময় তাপ, হেমন্তের শিশির সেই পর্ব্বতগুলির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই গিরিগুহাগুলি যেন ছায়া কলালক্ষ্মীর এই বিচিত্র দান বক্ষে আগলাইয়া রাখিয়াছে। ইহা একবার বলা হইয়াছে, বীরভূম জেলায় এখনও মেয়েরা গোবরের মাটির উপর প্রথমতঃ সাদা রং ফলাইয়া প্রতি গৃহের দেওয়ালে দেওয়ালে নানারূপ পল্লব, দেবলীলা ও নরলীলা, লক্ষ্মীর পদাঙ্ক, বাস্তুদেবী প্রভৃতি কত কি আঁকিয়া থাকেন এই সকল কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সকল ছবির যে প্রতিলিপি তুলিয়াছেন, তাহা দেখিলে প্রতিপদে অজন্তাকে মনে পড়ে। অজন্তার বিশ্ব-বিজয়ী চিত্রশিল্পের সমকক্ষতা করিবে এই দরিদ্র কুটীরবাসিনীরা সেরূপ শিক্ষাদীক্ষা কিরূপে পাইবেন? তথাপি এই ছবিগুলি যে অজন্তার অক্ষয় ভাণ্ডারেরই কুলশাখা, সেই প্রাচীন সংস্কারজাত একই খনির উৎপন্ন রত্ন, তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। অতএব যে শিল্প বাঙ্গলাদেশ এখন পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছে, সেই শিল্পীদের অনেকেই খুব সম্ভব বাঙ্গালী ছিলেন তাহার প্রমাণও পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যে কল্পনাই হউক খেজুরাহের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে বঙ্গের তথা বাঙ্গলার ভাস্কর্য্যের আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলার শিল্পীরা কি সেই দেশে গিয়াছিলেন? খেজুরাহের সন্নিকটবর্ত্তী রাজগড়ের পর্ব্বতাভ্যন্তরে লুক্কায়িত বিশাল রাজপ্রাসাদ দেখিয়াছিলাম, তাহা কি বিরাট্ কল্পনাপ্রসূত। মনে হইয়াছিল, আলাদীনের প্রদীপ-বলের ফলে কোন দৈত্য আসিয়া অদ্ভুত রাজগড়-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা অটুট সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যে বিদ্যমান। সেই রাজগড়ের প্রাসাদে ঢুকিতেই আশাতীতরূপে প্রকাণ্ড দুর্গপ্রতিমার একটা চালচিত্রের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নানাবর্ণে চিত্রিত বিলান দৃষ্ট হয়। হঠাৎ পাহাড়িয়া দৃশ্য চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং নরশিল্পীর অদ্ভুত কারুকার্য্য চক্ষে পড়িয়া বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই রাজগড়ের তোরণের চালচিত্র দেখিয়া আমার বীরভূমের দেওয়ালে আঁকা মেয়েদের হাতের নানা চিত্র মনে পড়িয়াছিল। এই চিত্রশিল্প যে এক পরিবারের সম্পত্তিস্বরূপ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

খেজুরাহ ও রাজগড়

মঙ্করীদের সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিয়া এই বিষয় শেষ করিব। বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে এই মঙ্করীরা এখনও আছে। এখনও পট দেখাইয়া তাহারা উপজীবিকা অর্জ্জন করে। তাহাদের ছবিগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, বাঙ্গলার পল্লীকলাবিদ্যা-বৈশিষ্ট্য এই সকল পটে বর্ত্তিয়াছে। এই সকল পটের বিশেষ গুণ এই যে, একটা বৃহদ্বিষয়কে ইহারা এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করিতে পারে যাহাতে মূলগল্পের কোন হানি হয় না এবং যে সকল দৃশ্য করুণ বা অপর কোন বিশেষ রসব্যঞ্জক, সেই সকল বিষয়ে জোর দিয়া কাহিনীর কবিত্ব ও কৌতূহল চিত্রকর বেশ করিয়া জমাইয়া তোলে। যেগুলি নিতান্ত সম্ভাংশ, যাহা ছাটিয়া না ফেলিলে কোন বড় কাব্যকথার সঙ্কলন একটুকু সংকীর্ণস্থলে হওয়া অসম্ভব, চিত্রকর তাহার স্বতঃসিদ্ধ কলাপ্রতিভার বলে তাহা অবিকার করিয়া তদীয় চিত্রে মৌলিকতা ও সৌষ্ঠব উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে রাখিয়া থাকে। আমরা পল্লীভাষা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এই পল্লীচিত্রগুলির সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। গল্পটি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করিয়া পর পর চিত্রাবলী দিয়া সমস্ত আখ্যানবস্তুটি তাহারা জীবন্ত করিয়া তোলে। এই চিত্রগুলি দেখাইবার সময়ে প্রত্যেকটী চিত্রসম্বন্ধে চিত্রকর পাঁচ ছয়টি ছত্রের কবিতা গান করিয়া থাকে. এই গানে বিষয়টি উজ্জ্বল ও দর্শকের কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হয়। বাঙ্গলাদেশে এই মঙ্করীদের নাম 'পটুয়া' কোথায়ও বা 'পটীদার'। বিক্রমপুর অঞ্চলে এইরূপ পট দেখানো ব্যাপারটাকে "পট নাচানো" বলে। পূর্ব্ববঙ্গ, হাঁচি, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও সেই মঙ্করীদের ব্যবসা চলিতেছে। ইহারা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ছিল, এজন্য অনেক স্থলেই ইহারা মুসলমান হইয়া অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছে। কিন্তু তাহারা এই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক বৃত্তি আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না। বঙ্গের অতীতের কথা এখন দুর্ব্বহ। পটীদারগণ অনেকটা

মঙ্করীদের কার্য্য পটুয়া।

হিন্দুভাবাপন্ন, তাহাদের অধিকাংশের হিন্দু নাম। তাহাদের ছবির বিষয় অধিকাংশই পৌরাণিক। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র দত্ত মহাশয় এই পটুয়া বা পটীয়াদিগের কৃতিত্ব ও গুণপণা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বদেশহিতৈষার উজ্জ্বাসে রঞ্জিত। তিনি সাধনেত্রে সুন্দর কণ্ঠে চিত্রকরদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে করুণরসে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এখন ইহাদের সংখ্যা এত দ্রুতভাবে হ্রাস পাইতেছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় সহস্রবৎসর হইতে বঙ্গদেশ যে ধারাটী বজায় রাখিয়া আসিয়াছে তাহা সহানুভূতিহীন উষরক্ষেত্রে আজ বুঝি শুকাইয়া যাইতে চলিল। আমরা সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি, দেশের কারুশিল্প কাচমূল্যে বিকাইতেছে। চিত্রে কয়েকখানি পটের অংশের প্রতিলিপি দেওয়া গেল।

বাঙ্গলাদেশ নদীমাতৃক। এখানে রাস্তার কীর্ত্তি বেশী দিন থাকে না, বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গের নদীর ভাঙ্গনীতে বহুযুগের অনেক বাড়ীঘরের মুক্তকেশ আজ শিবচিহ্ন, কিংবদন্তী পর্য্যন্ত, বটেশ্বরী, কৈবর্ত্তের পাশটে টুঁটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশের প্রধান গুণ এই যে, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প, সুপারী জাতীয় এ সমস্ত বিষয় এখানে জনসাধারণ আয়ত্ত করিয়া লয়। ইহাকে আলোকের সঙ্গে মেশা তমসার বিরোধ পাইয়াছে, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিগণের কীর্ত্তি এখন কোথায়? কিন্তু সেগুলি নষ্ট হইলেও এই দেশে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্মের বীজ ছড়ান আছে। এই দল এতাসকানের মত একটী পাদপের অঙ্কুর করে না, জাপানের চন্দ্রহাসের মত দেশে একটিমাত্র সমুন্নত দৈবদুরূহের মর্ম্মে দলিত নহে। এক কীর্ত্তিমানের ও দেশে এদেশ সর্ব্বস্বতাহা হয় না। অবহেলা ও বিরুদ্ধবিধির পীড়নে এদেশের বিদ্যার স্রোত যায় নাই। যাহা কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বিরাজমান ছিল, তাহা কেন্দ্রহীন হইয়া সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিল। প্রত্যেক পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলপনার উপর হইয়া বিস্তার লাভ করিল। সাম্রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ কীর্ত্তি মূর্ত্তিমান্ হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত ধানের ও বিচিত্রশাল কলাবধূর গৃহে সাধের ধান ভানাইয়া রাখিল।

সেই কক্ষের শেষেষু রাজকন্যা ঊষার সখী চিত্রলেখার সময় হইতে চিরে কৃতিত্ব বাঙ্গালী রমণীর একটী বিশেষ গুণ। যদুনন্দন দাস খৃষ্টীয় সপ্তদশশতাব্দী [illegible]

ভাঁহার গোবিন্দলীলামৃত পুস্তকে রাধিকার সখীরা ভাঁহার যে অঙ্গসজ্জা করিয়াছেন তাহার একটি বিস্তারিত বিবরণী দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের কথা উপলক্ষ বল, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতীক বল, প্রেমের কবিত্ব বল—ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক কি কিছুই নাই? গোপীরা রাধিকাকে যেভাবে অভিসারের জন্য সাজাইতে বসিয়াছেন, সেইভাবে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেও কোন ধনীর দুহিতা বা রাজদুহিতাকে তাঁহার সহচরীরা বাসরের জন্য সাজাইতে বসিত। তখন এদেশের স্বাধীনতা চলিয়া গিয়াছে, মন্দিরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য ও বিগ্রহের অলঙ্কার-গৌরব নির্ম্মাণের এখন আর উৎসাহ কোথায়? নির্ম্মম অত্যাচারীর অসির ভয়ে ভারতের লৌহ লেখে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। তথাপি সেই সময়েও

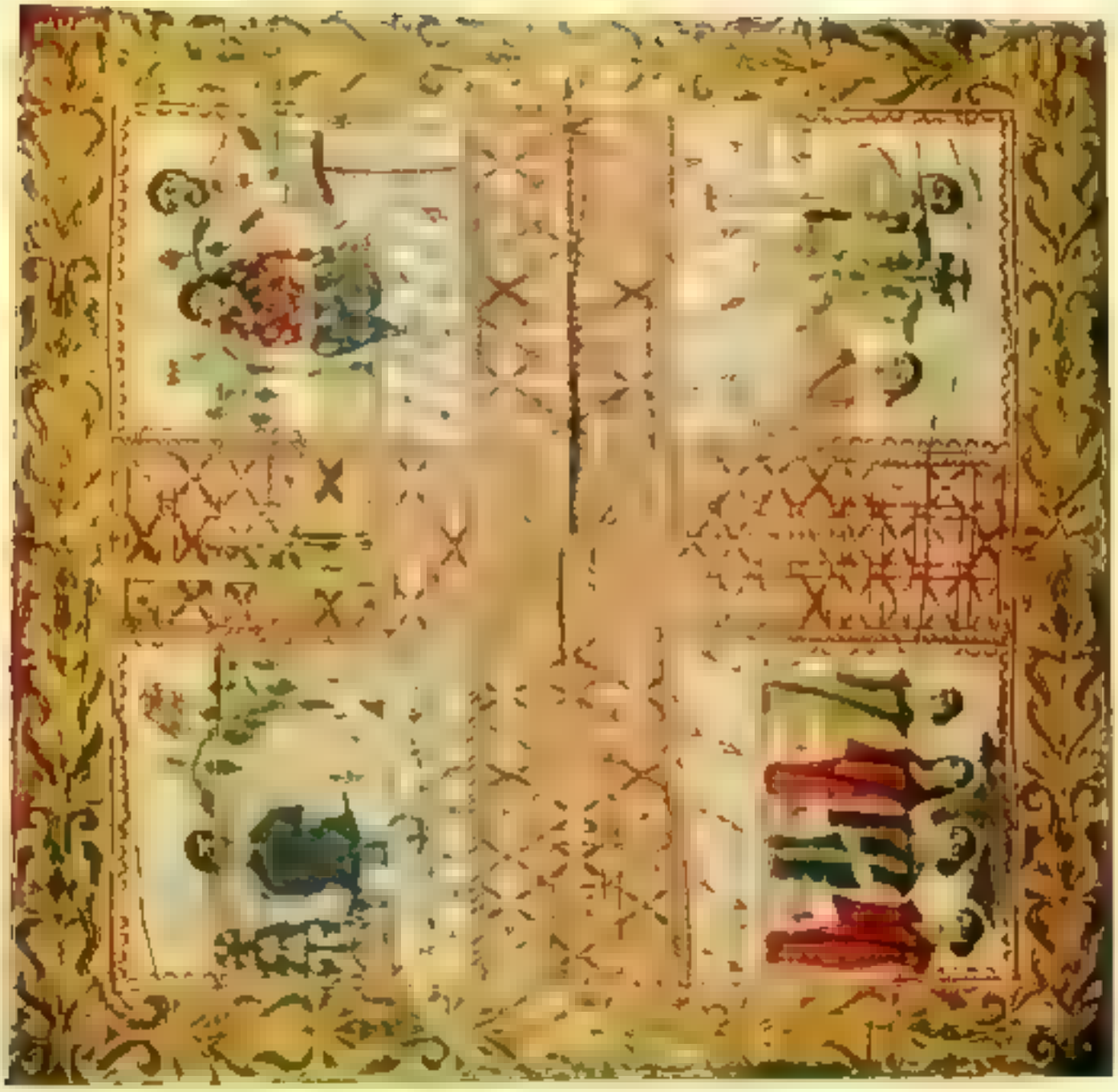

রাধিকার অভিসার-সজ্জার যে বর্ণনা কবি দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী রমণীর চারুশিল্পে স্বতঃসিদ্ধ দক্ষতা তখনও পূর্ব্ববৎ বজায় ছিল

"কবিতা সোনার চিরুনী দিয়া রাধার কেশ বিনাইয়া সেই আলকেশরাশি ধূপধূনার ধোঁয়া দিয়া শুকাইয়া লইল তৎপর কেশরাশি সুকুঞ্চিত করিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট সুগন্ধ তৈল মাখাইল শ্রীমতীর কুন্তল স্বভাবতঃই মৃদুসুগন্ধপূর্ণ, অগুরুর গন্ধে তাহার সুরভি বাড়িয়া গেল। দুটি বেণী সুচারুরূপে গাঁথিয়া ক্ষুদ্র একটি বকুলফুলের মালা যেন আর একটা বেণীতে পরিণত করা হইল. এই তিন বেণীর সমাহারে সৌন্দর্য্যের তীর্থস্বরূপ ত্রিবেণী রচিত হইল। এই তিন বেণী একত্র করিয়া প্রথমতঃ পট্টডোর (রেশমী ফিতা, দিয়া গাঁথিয়া তাহা পুনরায় সোনার সূক্ষ্ম তার দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল।"

"প্রথমতঃ ভিতরকার রক্তবর্ণ বস্ত্র (সায়ার মতন কোন কাপড়) পরিয়া তাহার উপর রাধা ভ্রমরের মত নীলাভ মেঘদুয়ুর শাড়ী পরিলেন" রাধা বৃন্দাবনবাসিনী, তাই কবি এখানে মুক্তা ও মণিখচিত স্বর্ণসূত্র দিয়া একটী কোচা তৈরীর কথা লিখিয়াছেন "চন্দন, কর্পূর এবং কাশ্মীরের অগুরু দিয়া সখীরা একটা সুগন্ধ তৈরী করিল" ইহা হিয়ানী বো জাতীয় হইবে), "এই সুগন্ধ সখীরা রাধার অঙ্গে মাখাইয়া দিল"

ইহার পর কবি যে সকল অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অমরা বা অমরাবতীর উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের অঙ্গ-ভূষণ মিলাইয়া দেখুন। বুঝিবেন, সপ্তদশ শতাব্দীর কবির সঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রাচীন মহিলাদের বেশভূষার কতদূর পরিচয় ছিল, অলঙ্কারগুলি অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও কলাশিল্পের পরিচায়ক, তাহা কতকগুলি মণিমাণিক্যের শ্রীহীন কারুজ্ঞানশূন্য সমাহার নহে। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত গহনার উল্লেখ আছে, কিন্তু কবি শিল্পজ্ঞতা দেখাইতে একটা বাঁকা মাথা হইতে নামান নাই, গহনাগুলি হাল্কা ও মূল্যবান্, সুন্দরকে নবশ্রী প্রদান করে কোথাও শ্রীহীন করে না. বাঙ্গালী যে প্রাচীন শিল্পজ্ঞান বহু শতাব্দীর দৌরাত্ম্য ও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও অটুট রাখিয়াছিল, ইহা তাহাই প্রমাণ করিতেছে মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর কাব্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত সংস্কৃত "গোবিন্দ-লীলামৃত" কাব্যের একখানি সুললিত পদ্যানুবাদ।

প্রাচীন অলঙ্কারের নমুনা।

অতি প্রাচীন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রায় সমস্ত গহনাই এখনও বঙ্গের পল্লী-মহিলারা পরিয়া থাকেন। মুসলমান মেয়েদের মধ্যেই সেই প্রাচীন গহনার প্রচলন খুব বেশী। বৈষ্ণবগণের উৎকৃষ্টতর কলাজ্ঞান ও রুচির প্রভাবে হিন্দুরা প্রাচীন গহনাগুলির কোনটি পরিহার কোনটি বা পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের অঙ্গরে চালাইয়াছেন. কিন্তু হিন্দুর নিম্নশ্রেণী হইতেই এদেশে অধিকাংশ মুসলমান হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন গহনা ও বেশভূষা এখন পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালীর গলায় যে হার দেখা যায় উহার নাম হাঁসুলি, উহা বঙ্গের মুসলমান পাড়াতেই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়. গৌরীর কালের চেড়িও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান মেয়েদের অনেকেই পরিয়া থাকেন দেবীর হাতের অলঙ্কার মুসলমান মেয়েদের কাঁকন এখনও পল্লীতে পাওয়া যায়। আমরা

বাস্তুদেবের ও সৌরীর গহনাগুলি কতক কতক এবং অন্যান্য মুসলমান মেয়েদের পরিচিত রূপার ভূষণের কয়েকটি চিত্র এখানে দিয়েছি।

বাস্তুদেবের কটিবন্ধ ও সৌরীর নীবিবন্ধ বঙ্গদেশ হইতে এখনও উঠিয়া যায় নাই। এখনও নিম্নস্তর মফঃস্বলে বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে রূপার "গোটের" প্রচলন আছে, উহাই কটিবন্ধ উহা পুরুষেরাও কোমরে পরিয়া থাকে বছরাক বা বাঁকমল পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে এদেশে হিন্দু মেয়েদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, এখনও মুসলমান পাড়ায় তাহা আছে সে আমলের বেসর, হিন্দুস্ত্রীর বিবাহে যাহা নাসিকার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিত, তাহা এখনও হিন্দু মেয়েরা (বিশেষ নিম্নশ্রেণীর) ব্যবহার করিয়া থাকেন। বেসর এখন লম্বা হইয়া নোলকে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু চিত্রকলার কথা বলা হয় নাই অজন্তার চিত্র ও বাঙ্গালীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের চিত্র যে এক পরিবারের লক্ষণাক্রান্ত তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই চিত্রবিদ্যা এদেশে যে কতদূরে কতদিন ধরিয়া প্রচলিত ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না বাঙ্গালী যে কাজ করিতে বসিয়াছে তাহাই একটা কলাবিদ্যার সাহায্যে সুন্দর করিয়া লইয়াছে ইহার অধিকাংশ নিদর্শনই স্ত্রীজাতির হাতের কাজ। শিকা, বাঁধা, আসন, আলপনা, চাঙ্গড়ি, দোয়াল, কুলা, ডালি, নারিকেল মেঠাই, আমসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই বাঙ্গালী মেয়েদের এই স্বতঃসিদ্ধ পটুত্ব দেখা যায়। আমরা এক রাজ ইঁদু নারিকেলের মেঠাইএর রথ ও ফুলের গাছ দেখিয়াছি, প্রায় ছয়টা ইঁদু চিনির মেঠাই দেখিয়াছি। উহা এখনও বঙ্গের কোন কোন পল্লীতে উৎসববিশেষে পাওয়া যায় কবিপুর জেলার নালিয়া গ্রামে এখনও দুই একঘর কামারের স্ত্রীলোক মৃৎপাত্রে মেয়াই প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল মেঠাইএর কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ঠিক এসময়ে উহাদের ফটোগ্রাফ্ দিতে পারিলাম না। লক্ষ্মীর সরা ও লিখন-চিত্রণে মেয়েরা নীয় প্রতিভা দেখাইতেন, শাঁখের পুতুল ও শাঁখের উপর নানারূপ কারুকার্য্যও এখানে উল্লেখযোগ্য।

সূতি দিয়া বুনিয়া ও লাটি কতরূপ চিত্র বিচিত্র করা হইত। এখন পশ্চিম দেশের কাপড়ের হাওয়া বহিয়া আমাদের এই পল্লীর প্রাণস্বরূপ কলাবিদ্যাকে নির্ম্মূল করিয়া একান্ত শ্রীহীন ও উলঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে। যে হাত একদিন নব নব উদ্ভাবনী শক্তির বলে শত শত সুন্দর ছাঁচ তৈরী করিয়া আত্মীয়স্বজন, বিদেশী ও অতিথিসকলকে সন্দেশাদি নানারূপ মিষ্টান্নের বিচিত্ররূপে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিয়াছে, আমাদের সেই কোমল করকিশলয় প্রাচীন কারুকার্য্যগুলির প্রতি এখন অতীব উপেক্ষাশীল ও উদাসীন।

চিত্রশিল্প।

ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত আমাদের চিত্রবিদ্যার ধারা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিয়াছিল বাঙ্গলাদেশের চিত্রনৈপুণ্য অজন্তার পথেই চলিয়াছিল। বরেন্দ্রভূমির ধীমান্ ও বিত্তপালের ন্যায় বহু চিত্রকর ও স্থপতি ছিলেন যাঁহাদের নাম আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাঁহাদের হাতের কাজের সমস্ত সন্ধান পাইলেও সেই রূপসৃষ্টির মধ্যে অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে।

আমাদের প্রত্নতত্ত্বাগারের নমুনা এখনও যথেষ্ট কাছে পরাধীনতার যুগেও আমাদের শিল্পরাণী তাঁহার নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই।

একখানি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন ছবি হইতে নমুনা দেওয়া হইল, ইহার তারিখ পাওয়া গিয়াছে, এই ধারার দুই শতবর্ষীয় ছবির সঙ্গে যে কাগজ ছিল তাহার তারিখ ১০৯৫ বাং সন পুব সম্ভব ঐ কাগজগুলি ও ছবিখানি এক সময়ের ছবিখানি বড় ছিল—তাহার প্রায় সব অংশটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে টুকু আছে তাহা দেখিয়া মনে হয় উহা রাজপুত ঘরানার শেষটা অনুকরণ এবং নকলটা অত্যন্ত ইহারও তারিখটা যদি মালিকের বংশাবলীর হিসাব ধরিয়া পাওয়া যায়, তাহাতে প্রায় তিনশত বৎসরের কাছাকাছি আশ্চর্যের বিষয় ছবিটা দীর্ঘকাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রং এর উজ্জ্বলতা ও সোণার চাকচিক্য কমে নাই।

তারপর আমরা পুথির মলাটের উপর আলো ফেলাই করিয়া যে সকল ছবি ১০০ হইতে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছিল—তাহার কিছু কিছু নমুনা দিয়েছি এই সকল নানাবর্ণের বিচিত্রভাবে চিত্রিত কাঠের মলাট আমার নিকট অনেকগুলি আছে, উহার কয়েকখানির প্রতিলিপি বহুসংখ্যক "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়" গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে এই ছবিগুলিতে রাজপুত চিত্রকলার কতকটা প্রভাব আছে, কিন্তু বিষয়বস্তু ও ভাবচিত্র হইতে সুরু করিয়া নয়নাবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন প্রভৃতি অনেকটাই খাঁটি বাঙ্গলার বর্ণবিন্যাস ও মেয়েদের হাবভাবে রাজপুত চিত্রকলা কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পশুচিত্র অঙ্কনে রাজপুত কলা-শিল্পের স্থান খুব উচ্চ, কিন্তু বাঙ্গলার পশু-জগতের কতকটা নিজস্বভাব আছে, বাঙ্গালীর সিংহ—কল্পনারাজ্যের সিংহ, তাহা কতকটা Lion-এর মত। ইহার মুখ ও গ্রীবা-ভঙ্গী কতকটা ঘোটকের প্রায়।

বাঙ্গলার চিত্রকর পশুগুলির যে ভঙ্গী দেখান, তাহাতে অসামান্য গতিশীলতা দুই এক পোড়াইটের (Terracotta) উপর প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে এবং হরিণগুলির গতিভঙ্গী দেখান হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে আমার History of Bengali Language and Literature এর ২২০ পৃষ্ঠায় হরিণের আর একটা ছবি দেওয়া হইয়াছে, এইগুলি দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা চিত্র-হিসাবে সম্পূর্ণ নিখুঁৎ হউক না হউক, তাহাতে কি আসে যায়, কিন্তু তাহাদের চলিবার ভাটাকে যে চিত্রকর মূর্ত্ত করিয়া দেখাইতে পারেন এই কৃতিত্ব বাঙ্গালী চিত্রকরের অসাধারণ। দুই শত তের বৎসর পূর্ব্বের একটি কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ পাল্কীদিগের চিত্রসম্বলিত একখানি কাষ্ঠফলক আমার নিকট আছে, কাঠ জাল্কিয়া চুকিয়া গিয়াছে কিন্তু তথাপি যেন তাহা পাল্কীদিগের গতি সামলাইতে পারিতেছে না। ক্রেগ সাহেব এই ছবিখানির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বহু চেষ্টা করিয়া ও ছবিখানির ফটোগ্রাফ তুলিতে পারেন নাই।

কাগজের উপর চিত্রের অনেক নমুনা আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ৩৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ১০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই সমস্তই মানব চিত্রশিল্পের ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে

চৈতন্য-সংকীর্ত্তনের মূর্ত্তিগুলির চোখে মুখে যে ভাব-প্রবণতা (emotion) দেখান

হইয়াছে—তাহা বাঙালীই পারেন, অন্যের পক্ষে উহা অনধিগম্য। নৌকার যাত্রীর চক্ষু হইতে কয়ে কলিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার সে জ্ঞান নাই, তিনি চৈতন্যের দিক চাহিয়া আছেন। মাঝি হাতে কেপনী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার যে যাত্রী সন্ন্যাসি নিম্নস্থ স্থানে বসিয়াছে তাহা ভুলিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক সূর্যাকে প্রণাম করিবার জন্য সন্তবতঃ হাত তুলিয়াছিল, কিন্তু সে চৈতন্যের দিকে চাহিয়া তাঁহাকেই প্রণাম করিতেছে। কলসী জলে ভাসিয়া বধূ একি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছে। গাভীগুলি উর্দ্ধমুখ হইয়া চৈতন্যের কণ্ঠধ্বনি পান করিতেছে। এটি হইতেছে ছবিগুলির সাধারণ ভাব, কিন্তু এই ভাবটিকে প্রকাশ দেওয়ার জন্য চিত্রকর আরো নানা স্থানে গাভীগুলির মুখ একটি আবার এদিক ওদিক চাহিয়া আছে। রমণীগণের দুই একজন গল্প করিতেছেন—তাঁহাদের দৃষ্টি চৈতন্যের প্রতি নাই, হয়ত তাঁহার সম্বন্ধেই গল্প হইতেছে। ইহাতে কোন বাড়াবাড়ি নাই, শিল্পের এই সংযম ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চিত্রকর ছবিটিকে তাঁহার চতুর্দ্দিক কলাকৌশল দ্বারা একঘেয়েমের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় শত শত লোকের একমাত্র লক্ষ্য চৈতন্যের মুখ। কিন্তু চিত্রকরের বাহাদুরি অবস্থিত। সন্ন্যাসীর আজানুলম্বিত দুই বাহু সুপ্রসারিত, তিনি দীর্ঘদেহ। পশ্চাৎ অংশের কতকটা দীর্ঘদেহ, তাঁহার বামের মুখ শ্রীবাসের, তাঁহার এক হাত এদিকে প্রসৃত, অন্য হাত অদৃশ্য ও—ইহাও কতকটা দীর্ঘদেহ চিত্রকর এই ছবি চিত্রে যেন পুরুষসম্প্রদায়ের পথ অবলম্বন করিয়া দেহকে গড়িয়াছেন। দুইটি মাত্র কতকটা অন্য ধরণের, এই দীর্ঘায়িত জনসমূহের মধ্যে থাকিয়াও যেন উহার একটু বাহিরে। ইহাদের মধ্যে পুরুষোচিত দেহ সংস্থানের ভাব বেশী, স্বাভাবিকত্ব অল্প।

কিন্তু চৈতন্যের সমস্ত মূর্ত্তি যেন একটি লীলাময় সঙ্গীত। তাঁহার দুই হস্তের ভঙ্গী লক্ষ্য করুন। তাঁহার বুকের উপর দিয়া যেন একটা গানের ঝড় বহিয়া যাইতেছে তিনি যেন একটা সুর রাগিণী। এই চিত্রপটখানিতে প্রায় ১২০টি ছবি আছে। উহার কোন এক মুখের সঙ্গে অপর কোন একটির সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেকটির চেহারা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র রকমের। বৈষ্ণব সাহিত্যের আমার কাছে অনেক ছবি আছে, তাহা আলোচনা করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, মূর্ত্তিগুলি তাৎকালিক বিশিষ্ট ভক্তগণের মূর্ত্তির অনেকটা অনুরূপ। উহাদের প্রত্যেকের পরিচয়ের জন্য আমি চেষ্টিত আছি। চৈতন্যের সময় হইতে তাঁহার ও তাঁহার ভক্তগণের ছবি অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার উপরই বাঙ্গালার ছবি আঁকিতে যাইয়া এই চিত্রকর সেই প্রাচীন সংস্কারের পথ অবলম্বন করাতে সাদৃশ্য সংরক্ষিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের চিত্রকরগণ সেই প্রাচীন সংস্কার হারাইয়া ভক্তের মূর্ত্তি গড়িতে যাইয়া অনেক সময়ে যত্নপুষ্ট পৌঁসাই গড়িয়াছেন।

এই চিত্রখানি সেই ঐতিহাসিক কীর্ত্তন অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, যে কীর্ত্তনে নগর পথে চৈতন্য কাজির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সায়ংকালে সমস্ত নবদ্বীপবাসীর বুকে অপূর্ব্ব উন্মাদনার ঢেউ তুলিয়া রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন।

অধিকাংশে ছবির আকার [illegible] পর্যন্ত। এই স্থানে [illegible] ছবির নমুনা দেওয়া হইল। প্রথম দল পটুয়া ছবি [illegible] ব্যবহার করে। ইহারা [illegible] পরমায়ু [illegible]। পৌরাণিক কথা ও সমসাময়িক ঘটনা উভয় লইয়াই পটুয়ারা ছবি আঁকিত। [illegible] পটুয়ারা আমাদের [illegible] ছিল। [illegible] সহায়ক লইয়া একদলের কাজ যে উপভোগ্য হইয়া উঠিত তাহাতে সন্দেহ [illegible] ছবি আঁকিতে [illegible] পটুয়ারা [illegible] ছবি আমদানি করিয়াছে। [illegible] দেশের পটুয়াদের সহিত [illegible] কোন ছবি আঁকিত।

[illegible] ছবির আকৃতিটি বড় বড় [illegible] ছবি [illegible]। এই সকল ছবির রেখা বিন্যাস নরম ও সরল, [illegible] কোন ঘরের বা আকৃতি সম্পূর্ণ না থাকায় [illegible] ছবি [illegible]। ইহাতে মনের ভাব যেমন স্পষ্ট হইত, তেমনই রেখাঙ্কনের [illegible] সময়ও [illegible]। [illegible] এই [illegible] পুঁথির [illegible] এই [illegible]। এই [illegible] কারণের [illegible] বর্তমান [illegible]। এই [illegible] কখনও [illegible] ছিল না, ইহাদের [illegible] হয়। [illegible] ইহাদের [illegible] [illegible] করা হইত। [illegible] এই [illegible] [illegible] ইহাদের আর্থিক [illegible]। [illegible] এখন [illegible] [illegible]। ইহাদের অধিকাংশই সাহেবের, পাঁচসিকে-ওয়ালা আর্টি কলেজের [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

এইরূপ চিত্র বঙ্গদেশে আরও দুই একখানি আছে। বৈদ্যবাটীর নিকটবর্তী বাজলায় অনেক চিত্র আছে, যাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালী ধারার প্রথা যে অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহা টের পাওয়া যায়। মহোৎসবোপলক্ষে স্ত্রীলোকদের নানা ভঙ্গী দুই হয় এত প্রাচীনকালের ভারতীয় শিল্পকারের মেয়ী অবয়বের লাবণ্যময় গতিভঙ্গিমা লক্ষ্য করিবার যে চক্ষু ফুটিয়াছিল ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। আমরা যেড়াগাছ মন্দিরে এরূপ বহু দৃশ্যমূলক পাইয়াছি, মন্দিরের এক একটা অপেক্ষাকৃত অবকাশ স্থানের সব সব উদ্ভাবিত চারুকলার সোপান দিয়া পূরণ করিবার জন্য এই সকল অপূর্ব নরনারী চিত্রের পরিকল্পনা হইয়াছিল। ধানুকের ছলী, ধাঙ্গড়েরা, বসিবার কথা কহিবার, চামর ঢুলাইবার, মন্দিরা বাজাইবার, ফুল ও যাগ ছড়াইবার, নৈবেদ্য লইয়া পথে চলিবার, ব্যজনীসঞ্চালনের ও নিয়তের কষ্ট প্রকাশ করিবার, বৃক্ষের আড়ালে যাইয়া ভাল নিমজ্জিত হইয়া নিজেকে লুকাইবার, বৃক্ষে আরোহণের ছলে নিজের দেহের নগ্নত ঢাকিবার মান করিয়া বসিয়া থাকিবার এইরূপ শত শত ভঙ্গীতে শুরুরা যাইতে যে কত মেয়ে সুন্দরী হইয়া উঠেন তাহা যেড়াগাছ, ঝুমুরের প্রভৃতি নানা স্থানের মন্দিরে দেখা যায়। অজন্তার অমরাবতীর চিত্রও অনুরূপ।

বাজলায় এইভাবের চিত্র অনেক আছে লোপ পাইতে বসিয়াছে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, এমন যারা বহু চিত্র আমাদের প্রাচীন কলাকুশলীর নিকেতনায় পাওয়া যাইতে পারে। এই ছবিগুলি যে খুব সুন্দর তাহা বলিব না, যেহেতু ইহাদের অপেক্ষা অনেকগুলি সুন্দর ছবি কাঠের উপরে আঁকা আমি নিজেই দেখিয়াছি এগুলি সমস্তই আমার বাড়ীর চিত্রশালায় রক্ষিত এজন্য ফটোগ্রাফ দেওয়ার সুবিধা পাইয়াছি। তিনশত বৎসরের প্রাচীন সংগ্রামসিংহের সময়ের একটি কাঠের পুতুলের ছবি আমরা এখানে দিলাম

পাক্ত ছবি এদেশে অনেক ছিল এখনও চেষ্টা করিলে কতকগুলি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে আমি অনেকগুলি দেবীমূর্তির ছবি কাঠে উৎকীর্ণ অবস্থায় পাইয়াছি সেগুলি ৪০০ বৎসরের কিছুর অধিককালের প্রাচীন, তাহা হইতে দুই একটি চিত্রের প্রতিলিপি এখানে দিতেছি। এইসকল ছবিতে দেবীর শক্তিমত্তা চিত্রকারক কিরূপ সাহসিকতার সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার আভাস পাওয়া যায়

কালীঘাটের ছবি।

বাঙ্গলার চিত্রকর যখনই নিজের অতি সাহসকে আনিয়া দর্শন করেন, তিনি একেবারে দুঃসাহসের মধ্যে ঘর ঢুকিয়া পড়েন এইজন্য তিনি হাসিকান্নার যেরূপ তাঁহার দুই ব্যক্তিগুলির সঙ্গে যোগ দিতে পারেন তেমনই তিনি পরিহাস রসিকতার ভগ্নাংশ ১৮০০-১৫০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী চিত্রকর সামাজিক বিষয়ের ছবি আঁকিতেন, তাহাতে এই পরিহাস রস থাকিত কিন্তু চিত্রকরেরা প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোক, এই সকলের ছবিগুলি খুব দরের হইত না, তথাপি এগুলি বাঙ্গলার পল্লীর অশিক্ষিত শতশত নরনারীর উপভোগ্য ছিল এবং এই চিত্রগুলি সমাজের

চারুকলকল নৈতিক নেত্রোপলব্ধির সহায়তা করিত একখানি পত্র যেরূপ কথা কহে একখানি ছবিও সেরূপ কথা বলিতে পারে লেখকের সঙ্গে যেরূপ অক্ষরের পরিচয়, চিত্রকরের সঙ্গে যদি সেরূপ পরিচয় হয়, তবে সেখানে সঙ্কেত চিহ্ন অনায়াসে একটা ভাব চাঁদের অক্ষরের মত ফুটাইয়া তুলিতে পারেন ঐ পটখানির চারিটি ছবিতে দুই হস্ত স্থাপন করা হইয়াছে নাই কাহার মাথাই নাই, গলায় হার নাই পায়ে মল নাই সেগুলি কোথায় গেল? যে নিজ বেশভূষায় কাহার ও কৌতূহল জন্মে সেই বেশা মাহাকে ইহাদের কিছুই নাই, পুনশ্চ সাজগোজ করিয়া এই আকাঙ্ক্ষায় পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে সঙ্কেত দ্বারা দুই সামান্য গহনা অঙ্কিত করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, কিন্তু যে আমার পাশপথের পথিক হইবে, তাহা সহ কাহার ও পরিচয় নাই এতগুলি নগ্ন হাত দুটি দিয়া স্বামীর গা জড়াইয়া ধরিয়াছিল এই ছবির প্রধান গুণ কারুকার্যে নহে, ছবিখানিতে একটা ঘর সামান্য, কিন্তু ঘর দিয়া যে কথা বলা হইয়াছে তাহা ও সেই চিত্রকরের শক্তি চিত্রকরের ছিল।

কালীঘাটের অঙ্কন পটি বাঙ্গালার চিত্রশিল্প নহে মুসলমান ভাবে পাঠান আমল কতকটা এদেশীয় হইয়াছে কিন্তু চিত্রকরদের মধ্যে কাহারও কাহারও অসামান্য ক্ষমতা ছিল ইহাদিগের মধ্যে কালীঘাটের পটুয়াদের চাষাদের ছবি আঁকিত। একটা কাগজ সেই খসড়া কাগজে রাখা হইত চক্ষের সেই খসড়া অনুযায়ী ছবি আঁকিত, এবং তিন চারজন একত্র হইয়া রঙের কাজে লাগিয়া যাইত। চাষা সাজটি মাথায় কিছু কিছু কম গোলা থাকিত, এবং একটি মেয়ে একটি মাত্র রঙ, সেই ছবিখানিতে দিয়া যাইত খসড়ার অনুযায়ী শত শত ছবি আঁকিয়া যাইত কেহ সাদা, কেহ লাল, কেহ নীল এইভাবে যার যার নির্দিষ্ট যে ছবিখানিতে দিয়া যাইত এইভাবে চার পাঁচটি মেয়ে একসঙ্গে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে তিনশত ছবির সমস্ত রঙের কাজ শেষ করিয়া ফেলিত কোন কোন সময়ে মেয়েরাও খসড়া আঁকিতে সুরু করিত বাজারে যে মাসে পুতুল বিক্রয় হয় তাহার এইভাবে ছয় জন মেয়ে এক এক বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া যাকে, সেজন্য কিশলয়ে এই ছবি এবং পুতুল প্রস্তুত হইতেছে আসিয়া বাগবাজারে কুমারটুলিতে এখনও এই পদ্ধতিতে রাত্রের কাজ হয়।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের কালীঘাটের চিত্রে বিলাতী অনুকরণ স্পষ্ট তাহার শিল্পরীতি দোষাবহ ও টেকনিক অসম্পূর্ণ কিন্তু মাঝে মাঝে কটুটার চিত্রের ভাষা নিজস্ব স্বাভাবিক ও বাঙ্গালার প্রতিভার আহরণ করিয়া ফেলিত

যাহারা ছবির খসড়া তৈরী করিত, তাহাদের ক্ষমতা অদ্ভুত তাহাদের বহু-পুরুষাগত চিত্রবিদ্যার সংস্কার মজ্জার মধ্যে নিহিত ছিল কোন নৈসর্গিক উৎস হইতে অবিরত রসধারার ন্যায় সেই পূর্বসংস্কার হইতে তাহাদের এমন অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি জন্মিত যে তাহাদিগকে কোন মডেলের সাহায্য লইতে হইত না। কোন কুকুর, বিড়াল, নর, নারী, বৃক্ষ

মাতৃমূর্তি, এখানে মাতৃ ভাবের [illegible]

[illegible] মাতৃ[illegible] এক হস্তে [illegible]

মাতৃমূর্তি আলেকজেন্দ্রিয়ার [illegible] ইহাতে মাতৃভাব বেশ ফুটিয়াছে

মাতৃমূর্তি [illegible] (৩৪১ পৃঃ)।

মাতৃমূর্তি—কালীঘাট

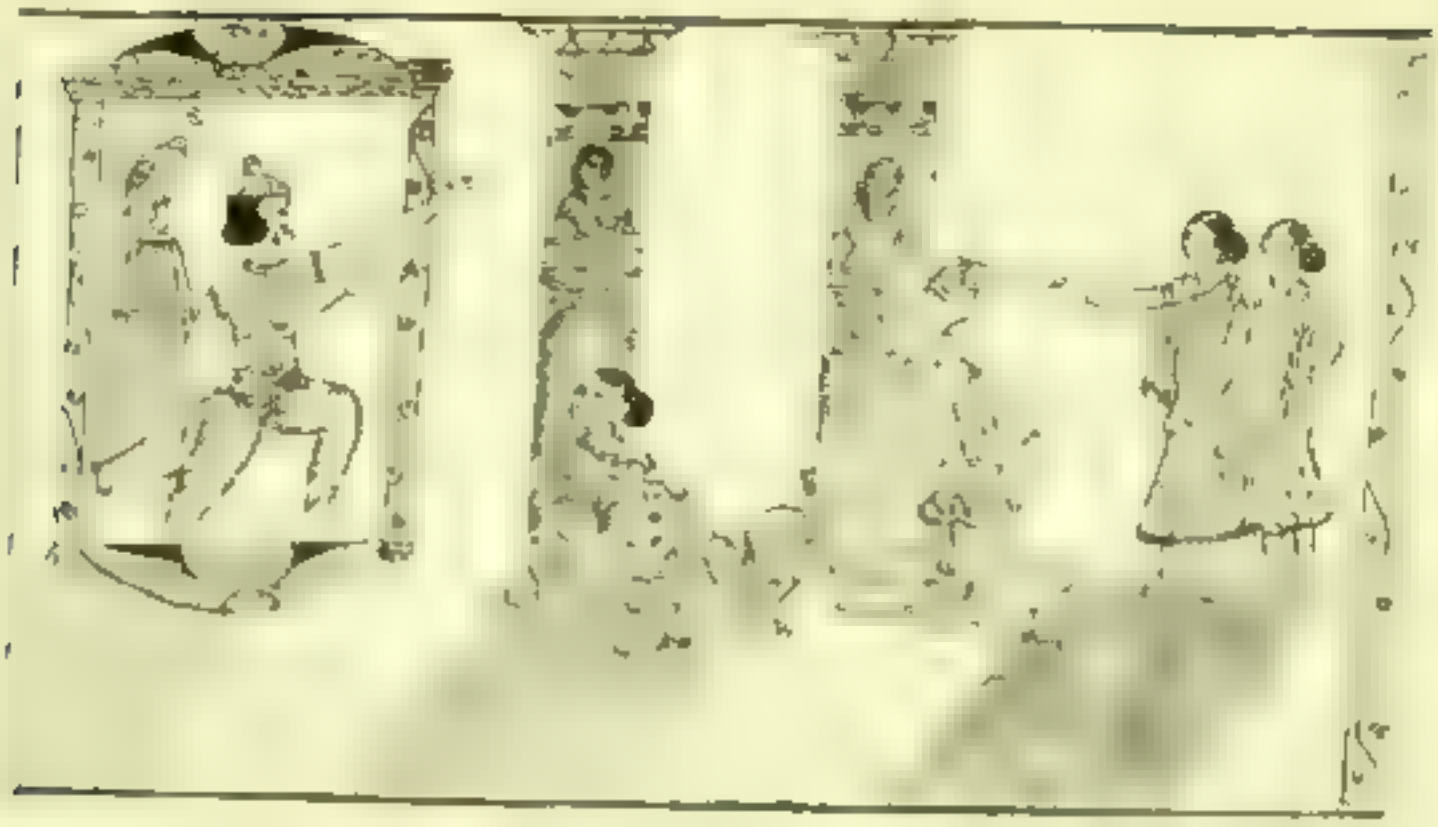

বীণা বাদিকা

কালিঘাটের পটুয়াদের ছবি

আদর্শ ছবি

নায়ক ও নায়িকা

বাঁক ও বাঁশি

বিদেশী প্রভাবে প্রাচীন ছবির পরিবর্তে কালীঘাট অঙ্কন।

মানুষ ধরিয়া তাহার নকল করে নাই কেবল একটি কারণে তাহারা ছবি টানিয়া তাহারা চায় ও উঁচুদরের মনুষ্যত্ব এবং ইহাই কারণে তাহারা এই কথাটা আর আওড়ায় ছবিগুলি দেখিলে মনে হয় যে সময়টুকুর মধ্যে তাহারা এক একখানি ছবি আঁকিয়া ফেলিতে পারিত ছবি আঁকিবার জন্য তাহারা কালি ব্রাশ লইয়া বসিয়াছে বটে কিন্তু সেই কালিটুকু একবিন্দু তাহারা অপব্যয় করে না যাহাতে পাখী মাত্র হইয়া থাকে বড় জোর সাদা কাগজের

একটু কি কোণে কালির একটি ফোঁটা পড়িয়া কাগজের সাদা যে বড় বড় অংশ থাকে যেখানে বসিবার সাহসকরে চুপ হইয়াথাকে, অমনই মুখ ফেরায় সেখানে মাছিটির মাছিটিরও আসিতে ভয় হয়, কিন্তু কোথায় হয় যেন না লইয়া অমনীলোকটি আঁকিয়া যাইতে আরাম পেয়ে নাই

ছবিগুলি ঠিক এমনকার বৈজ্ঞানিক আলোকে তাহারা ছবিগুলিতে বাহির করা হয় ও শক্ত নহে, তাহারা মানুষটি কাল মুখে সাদা না, কিন্তু চিত্রের তাহা সেই সুর আঁকা কোন কোন ছবি ও আঁকিত মানুষের কতদিন রাখে? কাজকাজের সাহস নকল করিতে যে, যে তাহারা ও এক একটি বর্ণাশুদ্ধি থাকে তবেই কি কালিদাস যদি হয় যাইবেন? কালিদাসের মহান কবি হওয়াই শক্ত এবং মস্ত বড় ভাষা বর্ণাশুদ্ধির জন্য কাজ করিবার মাত্র সে আমলে ভারতবর্ষে টেক্‌নিকের উপর কেহ কোন গুরুত্ব দিতেন না কারণ এ শিল্পকলার প্রাণ—ছন্দ ও সুরকে প্রতিফলিত করা সেখানে অজন্তার গুহায় একটি মহাকাব্যের মডেল নিয়েছে এই ছবিখানি ই কোন সুসময়ে প্রাচীনত্ব কি কারণে কোন কলমের ধার ধারে না ইহা বাঙ্গলার ছিল পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত হয়, শুধু কালির টানে মুহূর্তমাত্র হয়ত কি কর ইহার সঙ্গে করিয়াছিল কিন্তু ইহার পশ্চাতে কারণ রেখায় চিত্রের কি কথন আসল মানুষ উঁকিঝুঁকি ছবি ঠিক ফুলের মতন হয় আর একটি কলমের অসার ও অকিঞ্চিৎকর মনুষ্য তাহারা প্রকাশ করিবেন, তাহার সেই মহাসত্যের প্রতি কখনও না করিয়া তাহাদের যখন ও সুরকে দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়া কালির টানে একি অদ্ভুত মন্ত্রের একি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল রহিয়াছে! কতগুলি রেখা চিত্রকর আপন মনে আঁকিয়া গিয়াছেন তাহার কতকগুলি একেবারে অর্থশূন্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সমস্ত চিত্রখানির তাহারা কি পূর্ণতাই না দিয়াছে! মানুষ ও দেবতার রেখার তফাত তাহা এই ছবিখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই দেবতা যে মানুষ নহেন, কোন ঊর্দ্ধলোকবাসী, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে এই জাতের অনেকগুলি পাঠান ছবি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা প্রায়ই একজন সাহেবের মতের পাঠান কিন্তু ছবি সাহেবের

তাবিয়া দিয়া ছবির বয়ঃক্রম নির্ণয় করা উচিত নহে, ইহা শত শত বৎসর পূর্বেকার হিন্দুর ধারণা লইয়াই পুরুষানুক্রমে এ ধারণা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে শিবমূর্তিটি "ভক্তভক্তিরি সন্তাবং" "নিবাত-নিষ্কম্পদীপ প্রকাশং" "চাঞ্চল্যাবস্থাং" প্রভৃতি ধ্যানের সাথ মিলাইয়া লইয়া গেলে সেই শেষ-উপাদানে রচিত হইয়াছে

এই চিত্রগুলির যেন পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য করুন, উহাদের উত্তীয়ের ভঙ্গী, সেই চেহারা মাড়ীর এলোমেলো ভাব সমস্ত অবয়বের লালাচঞ্চল ধরিয়া ও তরঙ্গায়িত অঞ্চল যেমন খুলিয়া হইয়া উড়িয়াছে ইহাদিগের সমস্ত গুলিকেই আলোচনা করিবার স্থান নাই নমুনা যাহা দিলাম তাহা ঠিক ছবিগুলির অনুরূপ হইল না এই আশঙ্কা

আমরা পরম্পরাগত ও ঐতিহ্যকথা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এখানে তাহাই ফিরিয়া উল্লেখ করিব —এই শিল্পশৈলীর ভাব ও চিত্রকরণের আশ্চর্য সংযম ও ধৈর্য পূর্ব-যুগের কবিদেরও এসম্বন্ধে একটু বলন আছে, কালিদাসও তাহা হইতে বাদ যাইবেন না, প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলির তো কথাই নাই, সর্বত্র শৈলতার অভাব কবিগণ তাঁহাদের মনোক্ষেত্রের রথ নির্বিঘ্নে যেখানে সেখানে চালাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এই রুচি উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, রামপ্রসাদের ভাব সাধকও সেই অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না কবিকঙ্কণ আদিরসে ডুবিয়া যান নাই, তথাপি বহু কারণে শৈলতা অতিক্রম করিয়াছেন বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ পরম আদরসের পাকেই আসিয়াছে। পদাবলীর প্রায় সবগুলিই প্রেমসম্পর্কিত, নায়ক নায়িকার বহু অবস্থা কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, এক একস্থানে তাঁহাদের বর্ণনা অশ্লীলের সমীপবর্তী হইয়াছে, মনে হইয়াছে "এই যে! ছেলেদের কাছে আর পড়া চলিবে না," কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যাইবে কবি আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে লেখনীর গতি ফিরাইয়া লইয়াছেন। এই উপমের সম্বন্ধে একটা যত্নসিদ্ধ শুচিতার ছাওয়া ধরিয়া যাইতেছে। ছবিগুলি সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা যাইতে পারে।

এখানে দুইটি চিত্র দেওয়া যাইতেছে প্রথমটি শিব-অন্নপূর্ণার এখানে শিবের কটি হইতে বাঘছাল খসিয়া পড়িতেছে। এই শিব চৈতন্যপূর্বযুগ, শিবের চৈত্র তীর্থের প্রভৃতি ভারতীয় সাধুসন্তের ভাব লইয়া গড়া যোগিসনের তেজ দেবাদিদেবের এই ছবি। লৌকিক সংস্কারে শিব ভোলানাথ। তিনি ভাবের রাজ্যে থাকেন, ভাবের উচ্ছ্বাস একটু হইলে তাঁহার কটি হইতে বাঘছাল খসিয়া পড়ে, ভোলানাথের এইরূপ ভুল পদে পদে। বিবাহের আসরে পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া একবার তিনি এইভাবে নগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সেনকারাণী লজ্জায় পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং এয়োগণ প্রণাম নিবারণ করিয়াছিলেন এই প্রাচীন চিত্রপটের শিবের মূর্তি সেই ভোলানাথের। ইহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কিছুই নাই বাঙ্গালীরা ঠাকুর-দেবতাদিগকে নিজ অবয়বের মত করিয়া লইয়া থাকেন তাঁহারা কখনই বৈষ্ণব ঐশ্বর্যের পক্ষপাতী নহেন, মাধুর্যরসই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে। তাঁহারা এখানে বুড়ো শিবকে লইয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়াছেন ঠাকুরদাদাকে লইয়া নাতি যেরূপ ঠাট্টাবিদ্রূপের একটু অবকাশ পাইলে ছাড়ে না, এই ব্যঙ্গরসও সেইরূপ। এখানে শৈলতার কথা

একেবারে অতিক্রম করে না। এই ছবির সঙ্গে গ্রীকশিল্পের কোন কোন উলঙ্গ বীরপুরুষের ছবি তুলনা করা যাইতে পারে। তথাপি উলঙ্গতা আদৌ কুরুচির পরিচায়ক নহে, কিন্তু গ্রীকশিল্পীর পুরুষগঠিত মানুষের দেহসৌষ্ঠব দেখানই উদ্দেশ্য, এ হিসাবে সেই মূর্তির বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। ইহার স্নায়ু ও মাংসপেশীর এবং গঠনের টেক্নিক অনেকটা নিখুঁত। কিন্তু শিশুর নগ্নতা আদৌ দৈহিক কোন ভাব নির্দেশ করে না। উহা বাহ্য জগতের প্রতি পরম উপেক্ষাসূচক। এই নগ্নতা যোগিজনোচিত স্বপ্রধানতা ও সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচায়ক। গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের পার্থক্য, এখানে এক জাতির লক্ষ্য বাহ্য জগতের প্রতি, অপরের লক্ষ্য অন্তর্জগতে।

দ্বিতীয় চিত্রখানি মানুষী। ইহা হিন্দু জগতের ভক্তি ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ, যাহা শিল্পকে শুদ্ধ দিয়েছেন। এখনকার চিত্রকরেরা অতি সহজ পাত্রীর আচরণ হইতে নানারূপ বিশ্রী ইঙ্গিত সুস্পষ্ট করিয়া স্তনযুগল বেশ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া থাকেন, তাহা অশ্লীল। সেই সকল 'সুরুচিপূর্ণ' সমালোচক হয়ত এই মাতৃমূর্তিসম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিবেন তাহা করুণা করিতেও আমাদের ঘৃণা হয়। অজন্তার দেয়ালে মাতৃমূর্তি কতকটা এই ভাবের আছে, দুইখানি বিদেশী চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইতেছি। বাঙ্গালার চিত্রে মাতা ও শিশুর প্রকৃতিতে যে অন্তর্দৃষ্টি আছে, অপর দুই ছবিতে তাহা নাই, সেই দুই মূর্তিতে মাতা শিশুকে যে ভাবে ধরিয়াছেন সে ভাবে একখানা বই বা অন্য কোন সামগ্রীকেও ধরিতে পারিতেন। আলেকজেন্দ্রিয়ার আইসিস্ এবং রোমান মূর্তিতে মাতার মুখে সম্পূর্ণ ভাবের অভাব এবং ছেলের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাব, ইহাদের কাহারও মুখে-চোখে কোন ভাবই ফুটিয়া উঠে নাই। চীনদেশের কুয়ান ইন্‌সির (Kuan Yin মূর্তি বোধ করি প্রকট করিতেছে—ইহাতে মাতৃত্বের কিছুই নাই। (এই চি. বি. ত্রয়োদশের Art Old India দ্রষ্টব্য এবং ৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের সান্নিধ্যে বাঙ্গালীর চিত্র কত বেশী মূল্যের তাহা সহজেই অনুমেয়, শিশুর ও মাতার ভাব—একেবারে বুকে দেবমন্দিরে স্থাপনের যোগ্য করিয়াছে। মাতার মুখের সহিত মুখাবয়ব এবং বালকের নিশ্চিন্তভাবে মাতৃস্তন্যধারণের মধ্যে বাৎসল্যের গূঢ় সৌন্দর্য প্রকটিত। দুঃখের বিষয় কাহিনিদিক এই অপূর্ব মাতৃপ্রতিমার ছবিটি ভাল হয় নাই।

দূরাগত বংশীর যেরূপ মধুর, অজস্র, অফুরাবতী প্রকৃতির সমস্ত মানব শিশুর এই যে প্রতিধ্বনি বাঙ্গলার কুটিরে আমরা পাইতেছি তাহাও তেমনই মধুর, বাঙ্গালী মাতৃস্নেহের সংস্কার বজায় রাখিয়াছে, ইহাই তাহার বাহাদুরী, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা কলঙ্কিত সর্বত্রই সেই প্রতিধ্বনিটি পাওয়া যায়। প্রাচীন চিত্রবিদ্যার ভগ্নাবশেষ হইতে বাঙ্গলার পল্লীর নানাস্থানে এখনও কুড়াইয়া পাওয়া যায়, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।

কালীঘাটের পটুয়াদের চিত্রের বিলাতী সিল্কি কিরূপ দেখাযা হইয়াছে তাহা কতকগুলি চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। এই চিত্রকরদের মধ্যে একটি রমণী সেতার বাজাইতেছেন, দ্বিতীয় চিত্রে একটি মেয়ে চুল আঁচড়াইতেছেন। আমাদের প্রেস হইতে এই বাঙ্গালীর ছবিগুলি ছাপাইয়া লইবার সময় আধুনিক শিল্পবিশারদেরা তাহাতে কি চমৎকার করিয়াছেন

তাহা কয়েকটি চিত্রে দেখা যাইবে কি সকল, অঙ্গুলিচিহ্ন, নিশ্চিহ্ন, বলয়ধ্বনি তুলিতে মূল ছবিখানি আঁকা হইয়াছে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় কিন্তু জাপান প্রেস হইতে ইহার যে চলচ্চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিল্প বুঝাইবার কতকগুলি ভুল আঁক কাকড়ায় ও সতরঞ্চের ঘর পাথরেইনী দিয়া আসল ছবিখানির শঙ্কিত ভঙ্গীর অবমাননা করা হইয়াছে এই রঙীন ছবির চলচ্চিত্র আদৌ মূল চিত্রের সহিত সামঞ্জস্য হয় নাই।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আর্যাবর্তের নানাস্থানে এমন সকল চিত্রকর ছিলেন, তাঁহাদের অঙ্কনশক্তি বর্ণনাতীতের সত্তা এবং বিস্ময় উৎপাদন করিত আরাঙ্গীবের প্রাসাদের প্রেম বিষয়ক চিত্রসমূহ এই মন্তব্যটি লিখিয়াছেন. "জাহাঙ্গীরের সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে ও ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে এরূপ সকল চিত্রকর ছিলেন যাহারা য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে নকল করিতে পারিতেন যাহাতে কোনটি আসল কোনটি নকল তাহা নির্ণয় করা সাধারণ বিচারকের সাধ্য হইত না।" এতদ্ভিন্ন বিষয় লইয়া যে সকল মৌলিক চিত্র আঁকিত হইত তাহা তাঁহাদের অনধিগম্য ছিল, এজন্য সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেন নাই।

এই অধ্যায় বড় হইয়া গেল সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অনেক থাকিলেও সেগুলি লইয়া আর আলোচনা করিবার অবকাশ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার নৃত্যকলা

বাৎস্যায়ন [illegible] প্রভৃতি নানাবিধ হিন্দু নৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শিবতাণ্ডবই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই শিবতাণ্ডবের অনেকগুলি সুর প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। তাহাতে শিবের এক পা উঁচু ও হাতগুলির দ্বারা তাল রক্ষার ভঙ্গী যে ভাবে দেখান হইয়াছে, দাক্ষিণাত্য হইতে উদয়শঙ্কর তাহা শিখিয়া আসিয়া বিলাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এই সকল নৃত্যের অনেকগুলিই বাঙ্গালার পল্লীতে কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ইহার উৎসাহ দিয়া দেশের মহা উপকার

করিয়াছেন। তাঁহার মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট না হইলে অন্ধকারের মধ্যেই এই প্রাচীন নৃত্যধারা বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :

"বীরভূমে কার্যোপলক্ষে যেদিন উপস্থিত আমি সেদিন ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'এখানে স্থানীয় আমোদপ্রমোদ কিছু আছে কি না?' তাঁহারা বলিলেন, 'আমোদপ্রমোদের আর কি ছার থাকিবে তবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মেলার স্থানে মুসলমান 'বাইবেশে' নাচিয়া থাকে, তাহা ভদ্রলোকের দেখিবার যোগ্য নহে।'

"আমি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিলাম, মেলার কর্তৃপক্ষীয়েরা যেন কতকটা অবজ্ঞার সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। উৎসব আরম্ভ হইল। দর্শকগণের মধ্যে কয়েকজন উচ্চ রাজকর্মচারী সাহেব ছিলেন। তাহা ছাড়া সবজজ, ডেপুটি, মুন্সেফ, শিক্ষক, জমিদার ও সাধারণ ভদ্রলোকের একটা জনতা হইয়াছিল। উৎসব তালিকায় অনেক রকম আমোদপ্রমোদের বিষয় ছিল, তন্মধ্যে 'বাইবেশে' নৃত্য অন্যতম। আমি হঠাৎ দেখিলাম দূর হইতে ৫।৬ জন লোক অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের হাতে বর্শা নাই, কিন্তু তাহারা হস্তের ভঙ্গীতে বর্শাফেলের অভিনয় করিতেছে। কোন স্থানে শত্রুপক্ষের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ, খড়্গের যুদ্ধ, বর্শা চর্মদ্বারা প্রহার-নিবারণের চেষ্টা—এ সমস্তই যুদ্ধ হস্তের ভাবভঙ্গীতে সুন্দর অভিনয় করিয়া দেখাইতেছে। শুধু হস্তপদের ভঙ্গী নহে, তাহাদের মুখভঙ্গী অদ্ভুত, কোথাও মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার বিকৃতরূপ কোথাও বা সিংহবিক্রমে আক্রমণকালে ভীষণ মুখবিকৃতি এ সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রোচিত নৃত্যের অঙ্গীভূত। দূর হইতে দেখিলাম যেন বৈশাখী ঝড় বা আষাঢ়ের মেঘের মত তাহারা রঙ্গভূমে আসিতেছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ করিলাম সেই বাঙ্গালী বীরগণকে, যাহারা কাম্বোজে গিয়াছিল লক্ষিতাভিষেকের অবিশ্বাস্য পরিহাস-কেলিবের রাজার ভাগ্নিতে, যাহারা পেগু রাজপুত্রের সঙ্গে শুক্লাকে পরাভূত করিতে যবদ্বীপে গিয়াছিল, যাহারা বালি, প্রবনম ও জাভা বীরবিক্রমে অধিকার করিবার জন্য পুরাকালে বঙ্গদেশ হইতে রওনা হইয়াছিল, যাহারা রাজকুমার বিজয়ের অনুচরী হইয়া অষ্টিকাতাড়িত জাহাজ হইতে যুদ্ধ-নিশানের সঙ্কেতে সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া সেই দেশ বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিল, এই বাইবেশের দল যে সেই বাঙ্গালী সৈন্যের পুরোগামী নৃত্যশীল বোদ্ধৃদের বংশধর, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র রহিল না। কি বিরাট তাহাদের লম্ফঝম্ফ, বাহুস্ফোট, খড়্গচর্ম ব্যবহারের অদ্ভুত ভঙ্গী, কি অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী বীরবিক্রম, এ সকল এযুগের কথা নহে। আমার চক্ষে বাঙ্গালার গৌরবের, বীরত্বের লেখনিখা অতীত যুগের যবনিকা উত্তোলিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

"আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত ও চক্ষু বিস্ফারিত হইল। কিছুকাল আমি আড়ষ্ট আবিষ্ট হইয়া সেই বিক্রান্ত নটকদের ভদ্রভঙ্গ আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার পার্শ্ববর্তী এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিঃ ভট্ট আপনার কি হইয়াছে? কোন অসুখ হইয়াছে নাকি?' আমি যেন জাগ্রত হইলাম, বলিলাম, 'দেখুছেন না কি প্রলয় ঝড় বহিয়া যাইতেছে?'

"আমি চিরকালই লুচ্চা প্রকৃতির। দেশবে কীর্তনীয়াদের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছি, তারপর যুরোপের বহুস্থানে লুচ্চা দল কৃষ্টি করিয়াছি, এবং সেই সকল লুচ্চোৎসবে যোগদান করিয়া নাচিয়াছি। কিন্তু এই 'রাইবেশে'দের নর্তনের যে ছন্দ, অঙ্গভঙ্গীর যে বিজ্ঞানসম্মত তালমান-জ্ঞান, যে অপূর্ব গতিশীলতা, এক কথায় নৃত্যের যে চরম সফলতা, তাহা আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। আমি ভাবিলাম হয়ত পরুত 'শিবতাণ্ডব' বীরভূম জেলার লোকেরা এই নৃত্যসম্ভার কোথায় পাইল তাহা ভাবিয়া বিভ্রান্তি হইলাম।

"মনে হইল পরশুরাম বীরভূমের মত কোন রাজ্যে আসিয়াছিলেন, হয়ত বা এইখানেই বিরাটের রাজপুরী ছিল এবং উত্তরা হইতে নৃত্য শিখিয়া এখানেই অর্জুন বৃহন্নলাবেশে রাজকুমারীদিগকে নৃত্য শিখাইয়াছিলেন সেই কৌশলটা তখনও এদেশে চলিয়া আসিয়াছে, বীরভূমের বীরেরা এই বীরনর্তন করিতে করিতে বঙ্গের বিজয়ী সৈন্যের পুরোভাগে হইত আমার মন দেশপ্রীতিতে ভরিয়া গেল।

"রাইবেশে পুরুষসম্প্রদায় হারাইয়া বসিয়াছে। তাহারা জানে না কত বড় বীরত্বের সম্প্রদায়ের তাহারা উত্তরাধিকারী। তাহার 'নরকে রাইবেশে' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবকালে যখন ঘেরের নর্তনে দেশ মাতিয়া গেল, তখন রাইবেশে' হইল রাইবেশে', তখন যাঁহারা ছিলেন নৃত্যের গুরু এমন কি গোস্বামিগণের শিক্ষার প্রভাবে এই বীরধর্মের পোষ্টাগণের বংশধরেরা নর্তনকালে মাথে মাথে ঘোমটা দিয়া ঘেরের অভিনয় করিত অথচ তাহাদের সমস্ত নর্তনটি যুদ্ধক্ষেত্রে মরণ-পণ বীরত্বের অভিনয়।"

ধর্মমঙ্গল চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে "রাইবেশে"গণের উল্লেখ আছে। বাঙ্গলার বাঁশের লাঠির কথা কে না জানে? বাঙ্গলার লাঠিয়াল এই বাঁশের লাঠির দ্বারা শত্রুর শির বিচূর্ণ করিত, এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে তাহা বন্দুকের গুলি ঠেকাইতে বলিয়াও শুনিয়াছি। রাইবাঁশ খুব বড় গোছের বাঁশের লাঠি ছিল। এই শব্দ হইতে মুক্তা-পদ্ধতির নাম হইয়াছে বলে হয়

রাইবাঁশের দল ছাড়া বাঙ্গলার পল্লীতে আরও অনেক রূপ নর্তন প্রচলিত ছিল, যথা, দশ অবতার নৃত্য, বাউলের নৃত্য, ঝাঁপ নৃত্য ইত্যাদি। এগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, গুরুসদয় দত্ত বলেন "এই সকল নৃত্যে অশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভাবের কোনই পরিচয় নাই। দরিদ্র, কৃষিজীবী-সাধ এই বীরহীন দলের অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা যে শিক্ষার সংস্কারের উত্তরাধিকারী তাহা আজ উচ্চ স্তরের," আমাদের দেশে আর্থিক অবস্থা শুধপলার ঘাগরাওয়ালী নহে। হয়ত যমুনার তীরে বসিয়া যে সকল ভাবের ভাবময়ন ও মস্তিষ্কমন্থন রচনা করিয়াছিল—তাহাদের পরণে নেংটি ও মাথায় একটা অতি নিকৃষ্ট কাপড় পাগড়ীর মত করিয়া জড়ান ছিল।

বৈষ্ণব-নর্তনে নৃত্যকলা এদেশে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এদেশে নাচিবার কৌশল যে অদ্ভুতরূপে আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাঁচা সরার উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠাগ্র

স্পর্শ করিয়া নর্তকীরা নাচিতে পারিতেন, মনে হইত যেন তাঁহারা শূন্যের উপর নাচিতেছেন। কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন:—

"না হবে তুমুল ধ্বনি না নড়িবে চীর, দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর
বিষম সংকট তালে বাজাইব বাঁশী, ধনু আকর্ষে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥
হারিলে তোমার হব বেশর কাঁচুলী, জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী

রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি এমন করিয়া নাচিবে যেন —

"না নড়িবে পদ যুগ, নূপুরের কড়াই, না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল, না নড়িবে নাসার মণি নয়নের পল ॥"

এগুলি নিছক কল্পনা বলিয়া মনে হয় না অতি দ্রুত গতিতে হৈয়ের ভাব আনয়ন করে, ইহা তাহারই ইঙ্গিত। কাঁচা সরার উপর নৃত্যের কথা আমরা অনেক বাঙ্গলা গল্পকথায় শুনিয়াছি, সরা ভাঙ্গিলে নর্তকীরা দণ্ড পাইত এই কৌশল এখনও ভারতবর্ষে বিলুপ্ত হয় নাই কয়েক বৎসর হইল ভারতের একজন মহারাজা ফ্রেঞ্চ নৃত্যকৌশল বড়লাটকে দেখাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ষ্টেট্‌সম্যানের সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, নর্তকীরা "moved on swords-[illegible] water without breaking them in order to show the lightness of foot." এই সকল মূল বিদ্যা উদ্ধার করিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা নৃত্য শিখিতে বিলাতে যাইয়া থাকি—আমরা যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে এই কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি শত শত শতাব্দী যাবৎ আর্য্যাবর্ত্ত যে উচ্চ সভ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিলেও আমাদের পল্লীগ্রামগুলি তাহা হারায় নাই বিলাতী সভ্যতা ভদ্রলোকদিগকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে, স্যার অতুল চন্দ্রই বলিতেন "আমরা নিঃস্ব হইয়া গিয়াছি" কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বাঙ্গলার পল্লীলক্ষ্মী কুড়াইয়া আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন কবে আমরা বাস্তব হইব, আমাদের উত্তরাধিকারের উচিত মূল্য বুঝিতে পারিব তখন তিনি আমাদের সম্পত্তি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, সাম্প্রদায়িক তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাঙ্গলাদেশের শিক্ষাভিমানী বিলাতী ছন্দে স্বদেশীর বক্তৃতা দিতে পারেন, "বঙ্গ আমার, জননী আমার" এমন কি 'বন্দে মাতরম্' প্রভৃতি গান উদাত্ত সুরে গাহিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গদেশ যে প্রকৃতই সকল দেশের সেরা' এই কথাটা না বুঝিলে বিলাতী স্বদেশ-প্রেমের গানের নকল আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত সাড়া পাইবে না বাঙ্গলাদেশ বুঝিতে হইলে আমাদের পল্লীগুলি খুঁজিয়া তন্নতন্ন করিতে হইবে। কারণ এদেশের সভ্যতার কেন্দ্র নগর নহে, পল্লী আমরা অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি—বাঙ্গলাদেশই ছিল সমগ্র ভারতের কলা-শিল্প ও চিত্রশালা।

বাঙ্গলা দেশের ঢাকাই মসলিন শিল্পজগতের অদ্ভুত কীর্ত্তি। বাঙ্গলা দেশের ও উড়িষ্যার সূক্ষ্ম সোনাকপার কাজ অতি অপূর্ব্ব। যদিও প্রত্নতত্ত্বিদ এদেশে একরূপ নূপ হইয়াছে,

তথাপি বাঙ্গলার কুটকারগণ এখনও মুর্শিদাবাদে ভারতে অদ্বিতীয়। যদিও নালন্দা বিহারের মত কারুকার্য্যমণ্ডিত স্থাপত্যের নিদর্শন বাঙ্গলা হইতে লোপ পাইয়াছে তথাপি সেদিন পর্য্যন্তও বাঙ্গলার স্থাপত্যশিল্পের সংস্কার বাঙ্গালী অপূর্ব্বভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, ছুতরদের জাত নিবাস ঘরের বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে দিব পাঠক বুঝিবেন, এই শিল্প বাঙ্গলার প্রাচীন আদর্শ কিরূপ উৎকৃষ্টভাবে প্রদর্শন করিতেছে বাঙ্গালীর মৃৎকলা, বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব কলার চারু শিল্প শিকা, দড়ি, নারিকেলের ছাস ও খোল দ্বারা আশ্চর্য্য শিল্পকলার নানা সামগ্রী প্রস্তুত করার পদ্ধতি, অজন্তা গুহার আদর্শে দেয়ালে চিত্রাঙ্কন, মন্দির, কাঁসর ও নারিকেলের মেঠাই, আসনাদ প্রভৃতির মধ্যে বিচিত্র চারুকলা-প্রকটন, কাঠের রথে ও সিংহাসনের মধ্যে সূক্ষ্মতম কোষাদ বিচিত্র ফুল লতা ও মূ অঙ্কন,—এইরূপ কত শত কারুকার্য্যে ১০০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী সিদ্ধহস্ত ছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা ইহার পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যশোরের নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে এইরূপ শিল্প নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যাইবে কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যে কত উৎসে ও কত প্রবাহে কলা-লক্ষ্মী তাঁহার অজস্র দান অকাতরে কতের মত ছড়াইয়া দিয়াছেন—তাহা অনুধাবন করিলে স্বতঃই মনে হইবে যাদব গৌরবের অবশেষই এই এক দুইশত বৎসরের উৎসই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং এখনও যে সে কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষ নাই শত শত ভগ্ন নিদর্শন দ্বারা তাহার প্রমাণ রহিয়াছে রাজধানীই কলালক্ষ্মীর স্থায়ী নিকেতন এই বঙ্গভূমি। তিনি তাঁহার আদরের উপযোগী শক্তি দ্বারা তাঁহার সপত্নী লক্ষ্মীর অভিশাপ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন তিনি বিক্ত হস্তে যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা লক্ষ্মীর অনুপম দ্বারা পরাস্ত হয় নাই। পারস্যের কারপেটকে হার মানাইয়াছে বাঙ্গলার কাঁথা, তাহাতে এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই, বড় বড় শিল্পী এখানে রাজানুগ্রহে পুষ্ট হয় নাই, পটুয়ারা এক কড়িমূল্যের কাগজে যে রেখাঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে পাত কুটিরে বাঙ্গলার চিত্রসম্পদ অধিগম্য হইয়াছে। সেই সকল কাঁথা বুদ্ধ উপোষাথসমন্বিত উমা মহেশ্বর অবলোকিতেশ্বর ও বাসুদেবের মূর্ত্তি গড়িবার পাথর এখন সুদুর্লভ, বহিঃশত্রুর আঘাতে ভারতের বাটালী হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু শিল্পী একটি সূতা ব্যয় না করিয়া নদীর তীরের মৃত্তিকা লইয়া আসিয়া এখনও কত শত দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন এবং সেই দেবমূর্ত্তি ঘরের ঘরে জাগ্রত রহিয়াছেন বড় বড় কারুকার্য্যের অর্থে উৎসাহিত হইয়া এখানে আর কালোযাতা করিতে আসর জমাই, বসেন না কিন্তু অতি গরীব নিম্নশ্রেণীর লোকের যে শক্তি গৃহ-প্রাঙ্গণে অপূর্ব্ব মনোহরসাজী রচনা করে, তাহাতে সমস্ত রাগ রাগিণী, গঙ্গার শত ধারার মত প্রদেশের সুরসাগরের পুণ্য তীর্থে আসিয়া মিলিয়াছে,—এখন আর শান্তিনিকেতনের ন্যায় বাঙ্গালী পণ্ডিত বিশাল নালন্দা-বিহারের অট্টালিকায় বসিয়া শিক্ষাদান করেন না অথবা শ্রীশঙ্করের ন্যায় অদ্ভুত প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিক্রমশিলার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমস্ত গ্রন্থিবাকে জ্যোতিষ্মানপূর্ব্বক আলোকিত করেন না, কিন্তু সেদিন পর্য্যন্তও তীন ঘরে বসিয়া বাঙ্গালী ছাদের পণ্ডিত ও মুচিকার পাতের যে সকল টিনী রচনা

"Oshadhi", thus the Sen Kings are evidently compared to successful physicians who by administering medicinal aresperc cure a patient attacked by poisonous beasts. Here the poison is power" (History of Bengal, p. 57) ['ওষধি' শব্দ লইয়া কবি ঘর্থবাচক একটু খেলা খেলিয়াছেন। স্পষ্টতঃই সেনরাজগণ উৎকট কাবরাজদের সঙ্গে তুলিত হইয়াছেন, ইহারা অব্যর্থ ঔষধপ্রয়োগদ্বারা দোর্দণ্ডিগের বিষদোষ খণ্ডাইতে পারিতেন এরূপ শক্তির সেজন্যই বিষয়রূপ কল্পিত হইয়াছে।] পুনরায় আমরা কেশব সেনের ইংলণ্ডস্থ ভক্তমণ্ডলীর এই বিদ্বেষবুদ্ধির ইঙ্গিত পাই। বল্লাল সেন তাঁহার শত্রুদিগের দণ্ডদান তাঁহার ভেষজ। এতাদৃশ খড়্গের ন্যায় আরোগ্য করিতেন।" খড়্গকে লতার সঙ্গে উপমা দিয়া কবির মনকে অন্যরূপ বলা হয় কতকটা অদ্ভুত। আমাদের মনে হয়, ইহা সেনরাজদের তাচ্ছিল্যসূচক একটা ইঙ্গিত বাক্য।

ঐতিহাসিক আমরা অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সহিত পূর্বোক্ত কথাগুলি লিখিলাম। কিন্তু এই কথাটা যখন একটা ঐতিহাসিক সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছে তখন আমি ইহা নিশ্চিতরূপে জানি তাহা না বলিয়া প্রস্তাবটির শেষ কাটিয়া যাওয়া কাপুরুষতা মনে করি।

সেকালে বিবাহের এত ঘাঁটাঘাঁটি ছিল না। সমাজে অনুলোম প্রতিলোম সকলপ্রকার বিবাহই প্রচলিত ছিল। বাল্লালসেনের কায়স্থকন্যার গর্ভে যে দুই পুত্র হয় তাঁহার মধ্যে লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র এবং তিনি উভয়েই পরস্পরের মত এক বাড়ীতেই ছিলেন। "স্বয়ম্বর চলিত না—রাজারা যেখানে সেখানে বিবাহ করিতেন এবং জাতিগুলি এখনকার মত ভেদের ছাঁচে ঢালাইকরা হইত না। রূপকথাগুলিতে রাজপুত্র, রাজকন্যা সদাগরের পুত্র হইবার পুত্র, কোটালের পুত্র—এই ভাবের পরস্পরের পরিচয়েই দেওয়া হয়,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উপর জোর দেওয়া হয় নাই। বিবাহসভায় প্রথম পুরোহিত, রূপকথায় এইরূপ দুই হয় ব্রাহ্মণের ছেলে, ক্ষত্রিয়ের ছেলে কি বৈশ্যের ছেলে একপ কথা পড়াশোনাকরা এ রূপকথায় আসে নাই। তখনও অবশ্য গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ হয় ত এক কোণে বসিয়া এই সকল মিশ্রিতার বিবাহ ও খাদ্যাখাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত রীতি উঁকি মারিয়া দেখিয়া ভ্রূকুটি করিতেছিলেন কিন্তু পরবর্তী যুগে তাঁহারা দিন পাইয়া বসিলেন। মহাভারতের নানা স্তরে নানারূপ সামাজিক ব্যবস্থার কথা আছে। এক যুগ ছিল যখন বৈবাহিক কাড়াকাড়ায়, জাতির কথা আসে উঠিত না। ক্ষত্রিয় ভীম রাক্ষসকন্যা হিড়িম্বাকে ও ক্ষত্রিয় অর্জুন নাগকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র ঘটোৎকচ এ বংশদ্বয়ের সঙ্গে অভিন্নত্বের সামাজিক কোন পার্থক্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না।

বিশিষ্টের বিবাহ

সামন্ত সেন রাঢ় দেশে অধিপতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এদিকে পূর্ববঙ্গের রাজা লক্ষ্মণ হইতে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ পরাস্ত রাজা বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, সামন্ত সেন বহু যুদ্ধে বীর শোভা পাইয়া প্রদর্শন করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। কবির ভাষায় "তিনি কাটি ছেলের অন্তরধী সমাকে

সামন্ত সেন।

পুনরায় উদয়াচলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি কর্ণাটলক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দস্যুগণকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন," শুধু যে তিনি প্রবলপ্রতাপান্বিত ছিলেন এমন নহে, "তিনি সত্যনিষ্ঠ, অকপট এবং করুণার আধার ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের ধবলকীর্ত্তিরঙ্গে আকাশতল বিধৌত হইয়াছিল। এই সকল পুণ্যে সেনবংশ নিষ্কলঙ্ক মহতের রাজার শক্তি বিলোপ করিয়া সমগ্র বাঢ় দেশের রাজচক্রবর্ত্তির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইঁহাদের সময়েই বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম শ্রীবৃদ্ধি উদ্ভাসিত করিয়াছিল। সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হেমন্ত সেনের উপর রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং সুপ্রসন্ন গঙ্গাতীরে জাহ্নবী তরঙ্গগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন হেমন্তের সুযশঃ শুভ্রিমার সেই সকল পুণ্যফলই তাঁহার শেষ বয়সে আশ্রয়স্থল হইয়াছিল।"

সেনবংশ বিদেশাগত [illegible] ইঁহাদের অল্পকালের মধ্যে এতটা প্রভাব-প্রতিপত্তি হওয়ার কারণ ব্রাহ্মণদের সহায়তালাভ। সামন্ত সেনের বংশধর বল্লাল সেন যে সামাজিক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণকে একের সর্ব্বেসর্ব্বা, ইহকাল ও পরকালের কাণ্ডারী এবং সমাজের একমাত্র গুরু ও নেতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সূর্যবংশ ইহার পূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এই সূর্যবংশের সহিত বৈবাহিক আদানপ্রদান দ্বারাও বঙ্গদেশে সেন-রাজাদের ক্ষমতা তথা ব্রাহ্মণ-প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এই দুই বংশের মিলন সোণায় সোহাগা-মিলনের ন্যায় শুভ ফল প্রসব করিয়াছিল উভয় বংশই ব্রাহ্মণদিগের পক্ষপাতী হেমন্ত সেনের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, যে তিনি বহু যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়াছিলেন, হেমন্তের সময়ে বঙ্গাধিপের রাজধানী নবদ্বীপ কখনও কুলক্ষণাক্রান্ত হইতে হয় নাই এই বংশের সকল রাজাই বিদ্যা ও বিদ্বানের সম্মান করিতেন ইঁহারা ধনবান ও শক্তিশালী ছিলেন পরাক্রমের সহিত এই সমস্ত মহাগুণের সমবায়বশতঃ শেষ সময়ের যবন পাঠানদিগের অরাজকতার সময়ে তাঁহারা রাজ্যরক্ষার অনুরাগ ও সহায়তা অর্জ্জন করিয়া চলেন।

হেমন্ত সেনের পত্নীর নাম যশোদেবী ইঁহাদের পুত্র বিজয় সেনই সেনবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা—কুলপ্রদীপ। বিজয় সেন—অপুত্রক খুল্লতাত রাজা দুর্লভ বিদ্যাধরীর পাণি-গ্রহণ করিয়া প্রায় সমগ্র পূর্ব্বঙ্গ স্বাধিকারে আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া ইঁহার অধিকারের সীমানা খুব হ্রাস করিয়াছিলেন তিনি কামরূপের রাজা ইন্দ্রপালকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তৎপর ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে মিথিলার চন্দ্রদেবকে পরাজিত করেন। পশ্চিম প্রদেশগুলি জয় করিবার জন্য তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামক নৃপতিরা ইঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন * অনুমান হয়, উড়িষ্যার পশ্চিমাংশেও তিনি কতকটা কৃতকার্য্য হইয়া থাকিবেন, নতুবা তাম্রশাসনে এই কথিয়ানের উল্লেখ থাকিত না। সেন রাজগণ অবশ্য ভারতের

* কিলহর্ণ সাহেবের মতে এই বীরের পূর্ণ নাম ঈশ্বরঘোষ। ইনি কামরূপাধিপতি নরকের বংশধর, ঈশ্বরঘোষ পুত্রের নাম রামপাল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে রাঘব অবশ্য রাঢ়া ক্ষেত্রপালের পৌত্র

সার্বভৌম রাজা হইতে পারেন নাই। মৌর্যবংশের অশোক একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী ছিলেন তারপর গুপ্তবংশের সমুদ্রগুপ্ত সেই গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। পালরাজারা আর্যাবর্ত বিজয়ী হইয়াছিলেন দক্ষিণাপথের কোন কোন অংশে সাময়িকভাবে প্রভাব বিস্তার করিলেও তাঁহারা "পঞ্চগৌড়েশ্বর" (Lord of the five Indias) উপাধি দ্বারাই পরিচিত হইতেন। সারস্বত, পাঞ্চাল, কান্যকুব্জ, গৌড় মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চদেশ পঞ্চগৌড় নামে প্রসিদ্ধ, এই নাম গৌড়দেশেরই সাম্রাজ্যিক, এই গৌড়দেশ হইতেই "গৌড়ীয় রীতি" নামক রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। বস্তুত, গৌড়দেশ তখন "সকল দেশের সেরা" ছিল, প্রাচীন ধর্মমঙ্গল কাব্যে অনেক স্থলেই গৌড়েশ্বরদের "নবলক্ষ সৈন্যের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যে সকল রাজাদের সম্বন্ধে এই সৈন্যসংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা অবিশ্বাস্য হইলেও প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ পালবংশের গৌরবের সময়ে যে কোন এক বা একাধিক রাজা তাঁহাদের বল-অভিযানের নবলক্ষ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিতেন, তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই। "নবলক্ষ" কথাটা বাঙ্গলাদেশে প্রবাদবাক্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল, বাঙ্গলা বৈষ্ণবপদে সঙ্গীত বৃন্দাবনে "নবলক্ষ ধেনুর" উল্লেখ পাই। একথা গৌড়াধিপের এই বিরাট্‌সংখ্যক সৈন্য ছিল একথাই এই প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সেই রূপ আবার এই "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধিটা, একদিকে পালরাজগণ সিংহাসনে বসিয়া এই গৌরবান্বিত উপাধি গ্রহণ করিতেন, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে কবিগণ যে কোন আশ্রয়দাতা কর্মচারী বা রাজাকে এই উপাধি দিয়াছেন। এই প্রাচীন সংস্কার বাঙ্গলার হৃদয়ভূমিতে ছিল, একথাই ইহা এত প্রসার লাভ করিয়া তোষামোদজীবী কবিগণের স্তাবকতার অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইত।

পঞ্চগৌড়েশ্বর ও নবলক্ষ সৈন্য

বাঙ্গলাদেশের এই বিরাট্ প্রভাব পরিপোষক আরও কিছু প্রমাণ আছে। গৌড় যখন ভারতবর্ষের রাজকীয় মহাশক্তির অন্যতম কেন্দ্র ছিল, তখন গৌড়ের আমোদপ্রমোদ ভারতের সর্বত্র অনুকৃত হইত। মনসাদেবী সম্বন্ধে এপর্যন্ত যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে হরিদত্তই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি। ইহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এজন্য ইঁহাকে সাধারণতঃ "কানা হরিদত্ত" বলিয়া ডাকা হইত। অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে "কানা হরিদত্ত" খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব হইতে মনসাদেবীর গান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। এই বাঙ্গলাদেশের নায়ক নায়িকার কাহিনী শুধু বঙ্গদেশে নহে, একদিকে প্রায় সমস্ত আর্যাবর্তে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মনসাদেবী সম্বন্ধীয় কাব্যের একটি প্রাচীন সংস্করণ "পরিবর্ধিত ও সংশোধিত" হইয়া পণ্ডিত বিষ্ণুপ্রসাদ মিশ্র সারস্বত কর্তৃক কাশীর কয়েতল প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটি সংস্করণ এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সদস্য বাবু ভগবতীসহায়, এম. এ., বি. এল এবং বাবু বৈকুণ্ঠনারায়ণ সিংহ, এম এ মহাশয়দ্বয়ের

মনসামঙ্গল

নিকট শুনিয়াছি যে পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] বাঙ্গলাদেশের এই মেহলার কাহিনী গান করিয়া আহারের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তের অধিবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। আমি যে ছিন্দী সংস্করণটি পাইয়াছি তাহাতে চন্দনসরের বণিকরাজ চাঁদ সদাগর, তাহার রাজ্ঞী ও সাহ মনসারের কাহিনী ঠিক বাঙ্গলা ঐ বিষয়গুলির ন্যায় বর্ণিত আছে। এই কারণেই বাঙ্গলাদেশ হইতে যাইবার পূর্ব্বে তাহার প্রথম কার্য্য ঐ পুস্তকে আছে অনেক গানের পূর্ব্বে "বাঙ্গাল রাগে" অথবা "ভাটিয়াল রাগে" গান করিতে হইবে, এরূপ নির্দ্দেশ আছে। এই "ভাটিয়াল রাগ" পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর লোকের একমাত্র অবলম্বন বিশাল নদনদী বাহিয়া যখন বাঙ্গালী মাঝি সদাগরী নৌকায় নৃপতি পদে বসিয়া বৈঠা ফেলন করে, তখন তাহার কণ্ঠে ভাটিয়াল সুর নিরবিচ্ছিন্ন একটা উদাস হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মনে হয় যেন সেই সুরটি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত, অন্য আকাশের ও নিম্নের বায়ুমণ্ডলেরই নিজস্ব সুর।

বাঙ্গলার রাগ ও ভাটিয়াল সুর

এই মনসাদেবী সম্বন্ধে বাঙ্গলাদেশে বহু কথা রচিত হইয়াছে। আমি অন্যত্র এক শূদ্র কবির কাহিনী দিয়াছি। তাহা ছাড়া ও যে কালেও কত মনসামঙ্গল' যন্ত্রের নিকট নিকেতনে বসিয়া কত কবিতা লিখিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পরবর্ত্তী কালে নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত বংশীদাস ও ইহাদের অনেক অনেক, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ' প্রভৃতি কবিরা 'মনসামঙ্গল' রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, ছিন্দী সাহিত্যে তাহার কিছুই নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিন্দী সংস্করণগুলির সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীনতম মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবনের লেখার সঙ্গে আমার সাদৃশ্য পাইতেছি। মনসাদেবীর 'সর্পকন্যা' নামক অন্য যে দুটি ছিন্দী পুস্তক ও কানী হরিদত্তের রচনার সঙ্গে মিলিয়া যায়।

এখানে বলিলে শুধু এই হইতে পারে যে, পালরাজত্বের সময়ে যখন বাঙ্গলার মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যে ও পৌঁছে প্রচারিত হয়, তখন আমাদের গৌড়দেশ ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার প্রধান কেন্দ্র। তখন সেই গান সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, কিন্তু মোগলের সময়ে বাঙ্গলাদেশের গণ্ডীর মধ্যে গোড়ীয় প্রভাব সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, তখন আর কোন যোগাযোগ রহিল না, তাহার বাঙ্গালীরা এই কাব্যকে যে উজ্জ্বল শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্যে প্রসঙ্গ আর অবহিত হয় নাই। সেই কানী হরিদত্তের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনসামঙ্গল-লেখক বাঙ্গলাদেশে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সেই ক্ষীণ সুরটি আজিকার দিনেও কাশী, এলাহাবাদ, ভাগলপুর এবং তাহা হইতেও সুদূর পশ্চিম হইতে আমরা আবিষ্কার করিতেছি, পরবর্ত্তী বাঙ্গলা কাব্যের কত কাব্যময় স্বরলহরী আজ তথায় পৌঁছিতে পারে নাই।

শুধু মনসামঙ্গল নহে, রাজা গোপীচন্দ্রের গান গৌড় কেন্দ্র হইতে এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণদাস প্রণীত ছিন্দী "গোপীচন্দ্র কা গানে" বাঙ্গলার রাজা গোপীচন্দ্র, তাঁহার মাতা মদনামতী (ছিন্দীতে মদনাবতী হইয়া গিয়াছে) ভোলেরা, হাড়িরা প্রভৃতির প্রসঙ্গ বাঙ্গলা পাঠিকার মতই বর্ণিত

গোপীচন্দের গান।

হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিলুপ্ত গোপীচন্দ্রের গানের দুইশত বৎসরের একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহার কতকাংশ আমার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (প্রথম খণ্ড ৮৮-৯৯ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের গানের প্রসার সমস্ত উত্তরবঙ্গব্যাপী। স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গাদাসরায় লাহিড়ী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য পাবনা হইতে এই গোপীচন্দ্রের গানের কতকগুলি হিন্দী ও উর্দু ভাষায় লিখিত কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে এই বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্রের গানের প্রচার খুব বেশী। কয়েক বৎসর পূর্বেও তথায় বাঙ্গল দেশের রাজা গোপীচন্দ্র ও মাতা অঞ্জনার জন্মবৃত্তান্তের সম্বন্ধে লইয়া নাটক রচিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে রাজা রবিবর্মা সন্ন্যাসের পরিচ্ছদে গোপীচন্দ্রের একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাহার নাম 'গোপীচন্দ্র কা সন্ন্যাস'। এই চিত্রে গোপীচন্দ্রের পত্নী অঞ্জনা ও পদ্মনাথ মূর্তি তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। এখনও সেই ছবি কলিকাতার বাজারে পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ দ্বারা দেখা যায় বাঙ্গলাদেশের এই সকল কথাকথা দাক্ষিণাত্যেও কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এই দুইটি গান ছাড়া বাঙ্গলার মাটির ঘর, ধান, কাঁটালতরুর ছায়ায় বসিয়া কত রূপকথার সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা তুলালদের কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কণ্ঠ পাইয়া সমস্ত যুরোপে গৃহীত হইয়াছিল। লালবিহারী দে ও রূপকথার বাঙ্গলার সেই অপূর্ব রূপকথাগুলির সামান্য কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠকেরা গ্রিম ভ্রাতাদের সংগ্রহের সহিত মিলাইয়া ও তৎসম্বন্ধে জর্মন ও স্কান্ডিনেভিয়ান পণ্ডিতদের মন্তব্য আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গলার মাটি প্রকৃতই এই রূপকথার জননী, এই খনি হইতেই জগতের সমস্ত উপকথা সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। মৌর্য গুপ্ত ও পালবংশের রাজত্বকালে মগধ ও গৌড় হইতে ঢাকার মসলিনের মত কারুকার্যভাণ্ডার বিদেশে রপ্তানী হইত এখন আমরা পাট, মসলা, রুসি, চাউল ও গম পাঠাইতেছি।

সেন রাজাদের সময় হইতে বৃহৎ বাঙ্গলা ক্ষুদ্র বাঙ্গলায় পরিণত হইল। বিদেশের সঙ্গে আদান প্রদান একরূপ তিরোহিত হইল। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া আমরা কূপমণ্ডূকে পরিণত হইলাম। ইহার জন্য আমরা সেন রাজাদিগকে অভিযুক্ত করিতে পারি না দেখেছু যখন হইতে তাঁহারা সময়োপযোগী ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঘরোয়া বিবাদ, বাঙ্গলার সীমা পার হওয়ার কথায় আতঙ্ক, এবং জগৎটাকে বন্ধ দিয়া একটা অপবাদে হইয়া গৃহস্থের আস্ফালনের হেয় লিপ্সা জাতীয় দুর্গতির কারণ হইয়াছিল। যে মৃত্যুমন্ত্র গাইয়া সমুদ্র উপকূলের আশায় আমরা জড়তা অবলম্বন করিয়াছিলাম সেই আপাততঃ শান্তিসুখের বাস পরিণামে দুর্গতির কণ্টকায় পরিণত হইয়া নিজের দেশে আমাদিগকে কাঙ্গাল ও পরমুখাপেক্ষী করিবে তাহা কে জানিত?

বৃহৎ বাঙ্গলা ক্ষুদ্র হইয়া গেল

সেনদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব ব্যাপ্ত হইল, তাহাতে এই দেশবাসীরা এক নূতনত্বে

দীক্ষিত হইল। ভক্তরকাল প্রভুদর্শন যে বৃত্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেনেরা তাহা দেশে গৃহীত হইবার পথ সুগম করিয়াছিলেন।

সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইল। দেশে জাহাজ তত বিরাট হইত যে সাধারণতঃ একখানি জাহাজে ৭০০ যাত্রী যাতায়াত করিত, এ ধারণা বহুস্থলে সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। ধনের বিজয়সিংহ ৭০০ লোক লইয়া সমুদ্রপথে লঙ্কায় গিয়াছিলেন জনক জাতকে বৃদ্ধ জনোচ নগর হইতে ৭০০ বণিকের সঙ্গে এক জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। নবরত্ন সৌদাগর হাস সমুদ্রপথে জাহাজে ৭০০ যাত্রী-বহনের কথাটাও সকলেরই জানা ছিল। সমুদ্রবণিক জাতকে বর্ণিত আছে একটি গ্রামের সমস্ত লোক সওদাগরী করিত। তাহারা জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে জাহাজখানি দিতে পারিতেছিল না, সুতরাং একখানি জাহাজে সেই বহুসংখ্যক সওদাগর পলাইয়া গিয়াছিল। সুবর্ণক-জাতকে পুরাতত্ত্ববিদের সমুদ্রযাত্রা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, তাঁহারা যে জাহাজে বাণিজ্যের বিপুল ক্রয়সম্ভার লইয়া বাণিজ্য করিবার জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন, সেই জাহাজে তাঁহাদের তিনশত সহযাত্রী ছিল। বারাণসীর ধনী এবং পাকের বঙ্গোপসাগরের একখানি জাহাজে পাঁচশত সাত্রী মাল লইয়া গিয়াছিলেন এরূপ বিরল বিবরণেরও দুষ্প্রাপ্যতা নাই। লঙ্কাবিজয়ী বঙ্গের বীর বিজয় যে জাহাজে সিংহলে গিয়াছিলেন তাহাতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও হাতী ছিল অনুমানেও তাহা অসঙ্গত হইবে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের Indian Shipping পুস্তকে পাঠক এইরূপ নানাজাতীয় জাহাজে ৬,৫৫৮ লোকের সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ নানাবিধ তত্ত্ব অবগত হইবেন। মহাভারতে বঙ্গীয় রণতরীর সৌষ্ঠবের উল্লেখ আছে। চীন গ্রন্থে বর্ণিত একটি সিংহলীপতে সৌম্যদর্শনদিগকে 'সমুদ্রা-প্রধান' বলা হইয়াছে। এদেশে বড় কৈবর্ত্তের বাস, ইহার জলযুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শিতা দেখাইত। শঙ্খ জাতকে একখানি জাহাজের উল্লেখ আছে তাহা দৈর্ঘ্যে ৮০০ হাত, প্রস্থে ২০০ হাত এবং ২০ [illegible] জল জাহাজ বহুত বলিয়া লিখিত আছে। বাঙ্গলার

সমুদ্রযাত্রা।

অনেক প্রাচীন পুঁথিতে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু সমুদ্র যাত্রা-নিষেধের বহু পরে সেগুলি লিখিত হওয়া বশতঃ সেই সকল বর্ণনা অনেকটা অতিরঞ্জিত ও বিকৃত হইয়াছে। চাঁদ সদাগরের জাহাজগুলির যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে সেগুলি অনেক সিন্ধুবক্ষে ভাসমান হিমাদ্রির মতন ছিল বলিয়া মনে হয়। এক জাহাজে লোক ধরে কত, তাহাতে বিকিকিনি সবই হইত, এসকলের অতিরঞ্জিত বর্ণন বিজয় গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কবি দিয়াছেন। বংশীদাসের বর্ণনাগুলি অনেকটা যথাযথ, তাঁহার সময়ে (ষোড়শ শতাব্দীতে) তখনও সমুদ্রযাত্রা-নিষেধবিধি পূর্ণফলে ফলবান্ হইয়া উঠে নাই। জাহাজ নির্ম্মাণের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অনেক প্রয়োজনীয় তত্ত্বসম্বলিত। পাঁচালিকথাগুলিতে সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহাতে এক বণিক্ বলিতেছে, "সমুদ্রই

আমার বাড়ীঘর " অপর এক বণিকবধূ বলিতেছেন "আমাদের পারিবারিক রীতি এই যে বিবাহাদি আমাদের সমুদ্রে জাহাজের উপরই নির্ব্বাহিত হয় " সমুদ্রযাত্রা লক্ষ্মণসেনের সময়েও যথারীতি চলিতেছিল। শেখ শুভোদয়া পুস্তকে বর্ণিত আছে প্রাহাকর নামক এক বণিক্ তাহার বিপুল বাণিজ্যসম্ভার লইয়া বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল এই সময়ে তমলুক ও চট্টগ্রামের বন্দর অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও চট্টগ্রামের হালিসহর, পতেঙ্গ, ডাবল, মরিচা প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন কালের জাহাজের অনুরূপ জাহাজ নির্ম্মিত হইয়া থাকে

যে দেশের বণিকেরা সমুদ্রকেই তাঁহাদের গৃহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে দেশবাসীর তুল্য জগতে নৌকুশলতার আর কোন জাতি ছিল না,—যে দেশের বণিকেরা সমুদ্রেই তাঁহাদের বিবাহ এবং অন্যান্য আমোদকর শুভ ঘটনা সম্পাদন করিতেন, যে দেশে বণিকরাই রাজার তুল্য সম্মান পাইতেন, বিদেশে গেলে যাহাদের দুর্গা রাজদ্বারের মত বাজিয়া উঠিলে কোন রক্ষী সেই দেশে আসিয়াছেন এই আশঙ্কা করিত, যে দেশের শ্রেষ্ঠ বণিকগণ রাজার ন্যায় ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন ব্যবহার করিতেন (মনসামঙ্গল কাব্যগুলি দ্রষ্টব্য) সে দেশে সমুদ্রযাত্রা কেন নিষিদ্ধ হইল? একথা একবার আলোচিত হইয়াছে। আমরা পুনরায় সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ করিয়া যাইতেছি—

সমুদ্রযাত্রা-নিষেধবিধির কারণ।

১ম, এই দেশ নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর বণিকেরা অপর দেশে তেমন সম্মান পাইতেন না, প্রবাসে তাঁহাদের উপর অত্যাচার অবিচার হইলে তাহার প্রতিকার হইত না

২য় ভিন্ন দেশের সমাজের অনুকরণে প্রবাসে হিন্দু এরূপ সমস্ত আচার-ব্যবহার শিখিয়া আসিতেন, যাহাতে আমাদের শান্ত হিন্দু সমাজ উৎপীড়িত হইত, অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকাতে সমাজের উপর সেই সকল উৎপাত কেহ নিবারণ করিতে পারিত না।

৩য়, এই পরাধীন দেশ হইতে একবার লোক চলিয়া গেলে এখানে তাহারা অনেক সময়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিত না, কোন স্বাধীন দেশে উপনিবিষ্ট হইত, এইভাবে আমাদের লোকসংখ্যা ক্ষয় পাইত।

৪র্থ, অনেক স্থলে হিন্দুর ছেলে পরাধীন দেশে ভিন্ন ধর্ম্মীর মেয়ে বিবাহ করিয়া ফেলিত ইহা আমাদের সমাজের পক্ষে একটা বিভীষিকার দাঁড়াইয়াছিল

৫ম, প্রবাসে হিন্দুশক্তির কোন কেন্দ্র না থাকাতে তথায় তাঁহাদের খোঁজখবর লওয়ার কোন সুযোগই ছিল না।

আমরা মহাভারতেও সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে নিষেধবিধির ইঙ্গিত পাই তাহা হয়ত কোন একটা বিশেষ প্রদেশের সাময়িক কোন অসুবিধার জন্য ঘটিয়াছিল, কিন্তু উহা কোন দেশব্যাপী নীতি বা ব্যবস্থার সূচক নহে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়

সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য ঘাঁটিয়া হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার কথা আছে, বৌদ্ধ জাতকগুলি সেই উপাখ্যানময়। এই বাঙ্গলাদেশ যে এক সময়ে সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা রূপকথা, নীতিকথা এবং প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য সমূহের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজত্ব পর্য্যন্ত এই

নিষেধবিধি কোন শাস্ত্রের কোন এক বা দুই পাতায় পাওয়া থাকিলেও তাহার প্রচার ছিল না। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মানুষের মোট বিপদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আছে, এবং সেই বিপৎকালে সহায়তা করিবার জন্য চণ্ডীর নিকট প্রার্থনা আছে। মোট ৩২ চল্লিশটি প্রধান বিপদের মধ্যে "বিধর্মিতা ও মানের ক্ষিপ্র আঘাতে মৃত্যু" এই দুইটি আছে সুতরাং সমুদ্রের বিপদ যে প্রধান, ঘটিত তাহা বলিতে পারা যায়। বাস্তবিকপক্ষে মেয়েরা বহু কষ্টসাধ্য মেয়েদের একটি প্রধান প্রার্থনার কথা আছে। সুখের বিষয় তাই এ শিক্ষাকে সমুদ্রের বাটিক হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপায় নেওয়ার কিছু চেষ্টা করা

শিক্ষা পরিচ্ছেদ

গৌরীদান ও বালবিবাহ

গৌরীদান ও বালবিবাহ নামে যে কুপ্রথা বাঙ্গালার পরিচয়। অবশ্য ব্রাহ্মণেরা এক ঘরে ঠেক বন্ধ করিয়া শাস্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়া কথা দিতে পারিতেন ও পারেন, সুতরাং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকে তাঁহাদের মতের সমর্থনকল্পে দাঁড় করাইতে বিশেষ কোন কষ্ট করিতে হয় না। এ দিকে সংস্কৃত সাহিত্য এত বিরাট ও এই মহাদেশের অসংখ্য ছোট ছোট লোকে সামাজিক কারণবশতঃ এত বিভিন্ন রীতির প্রচলন হইয়াছিল যে যুগে যুগে শাস্ত্রগ্রন্থে নানা মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সংস্কৃত সাহিত্যরূপ বিরাট বনভূমি হইতে যে কোন মত সাহিত্যিক ডুব দিয়া হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারেন, সেসম্বন্ধে সকলেরই শাস্ত্রের সমর্থনের বিশেষ মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

গৌরীদান প্রথাটা স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী। প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে বিবাহের ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম তবে কেন আমাদিগের ৭৮ বৎসরের খুকীদের বিবাহের জন্য পণ্ডিতদের এতটা ঘোঁক? আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—গৌরাঙ্গিক

গৌরীদান।

মত বাস্তবুমতী তাঁহারা সকলেই বয় বয়ং মনোনীত করিতেন, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি হিন্দুর আদর্শ কন্যারা স্বীয় স্বীয় বর নিজেরাই মনোনয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি মেয়ে স্বয়ং প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া নিজের বরস্বরূপ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কাজেই মেয়ের যে বিয়ে দিতেন তাহার পর গৌরীদানের কোন অর্থ থাকে না।

যখন হিন্দুগণ জগতের দূর সুদূরান্তরে যাইয়া অসহায় হইয়া সাবধানভাবে স্বীয় পরিবার রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন অতি অল্প বয়সেই স্বামীর হস্তে তাহাকে সমর্পণ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ঘরের কাছে কুমারী অসহায়ক অবস্থায় ঘুরিতেছিল। তাহার প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী পাইলেই বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইত। অল্পবয়স্কা, যুবা ও প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা রমণীর যে সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরাধীনতাকালে কত স্থানে পাওয়া যায়, অলঙ্কৃতা রমণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্বামীকে করুণ নিবেদন জানাইয়া পাশবিক বলের অধীন হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছে। খুব অল্প বয়সে কোন স্বামীর বাহুর আশ্রয়ে কন্যাকে দিয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত হইতেন। হিন্দুর বাহিরে যাইয়া ব্যবসাবাণিজ্য করার সুবিধা চলিয়া গেল, তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। গৃহে বাস করিয়া জীবন কাটানই মূল উদ্দেশ্য হইল, তখন গৃহে শান্তিরক্ষা করাই হইল তাঁহাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। এই গার্হস্থ্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ কেন্দ্র একান্নবর্তী পরিবার। বৌদ্ধজগতে রুগ্ন ও জীবজন্তুর জন্য বিশাল চিকিৎসালয় ছিল, তাহাতে সর্বজীব সহানুভূতি ও আশ্রয় পাইত। পাঁচিতের ও আইনের তখন কোন ভয়ের কারণ ছিল না। গার্হস্থ্য ধর্ম তখন মানুষকে পাশে শিকল দিয়া গৃহে অবরুদ্ধ রাখিত না। হিন্দু স্বাধীনতার যুগে হিন্দু সন্তানেরা অবাধে জগতের সর্বত্র যাতায়াত করিত। কিন্তু এদেশ হইতে যখন সেই সকল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গেল, তখন সেই অভাব পূরণ করিতে গৃহ তাহার নিজ হস্ত বিস্তার করিল। বিশাল সংসারগুলির অঙ্গের যেরূপ গ্রামে গ্রামে টোল স্থাপিত হইয়া ব্যাপকভাবে পূর্ণ করিল, বিশাল চিকিৎসালয় সমূহের অভাব প্রত্যেক গৃহ সেইরূপ পূর্ণ করিল। গৃহ, সেবাশ্রম চিকিৎসালয় প্রভৃতি সমস্তের ভার গ্রহণ করিল। এইরূপ গৃহের প্রধান অবলম্বন হইল একান্নভুক্ত পরিবার। হিন্দু সভ্যতা গৃহকে কেন্দ্র করিয়া এক নবশ্রী ফুটাইয়া তুলিল। হিন্দুর ধর্মের বিরুদ্ধে যাইয়া ধর্ম যে ঘোষণা করিল। রামায়ণী নীতি গৃহে গৃহে গাহিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। অনুসারে ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা ইহাদের স্নেহসম্বন্ধ শুধু সুধাপূর্ণ ও আনন্দময় হইল না, উহা আধ্যাত্মিক মোক্ষ ও শ্রেষ্ঠ কর্মা বন্ধন সন্ধান দিল ইহাতে শিখাইল—পিতামাতার কথা পালন করিলে, তাহার হুকানুবর্তী হইলে, পাতিব্রত্য সাধনা করিলে যে স্বর্গে পৌঁছান যায়—ভিক্ষুর আশ্রমে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন স্বর্গের সন্ধান নাই। এমন কি শাস্ত্র এবং মৈত্রীও এই গার্হস্থ্যাশ্রমের একটি প্রধান অঙ্গীভূত হইল, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিলে এই একান্নভুক্ত পরিবারে বিঘ্ন হওয়ার সম্ভব ছিল। ভিন্ন পরিবারের রুচি ও শিক্ষা লইয়া প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী তাহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া তদাকার নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে তেমন সোহার্দ্য বোধ করিতে পারেন না। প্রত্যেক বাড়ীই দশজনের ঘর, তাহাদের সকলেই এক প্রকৃতির লোক নহেন, প্রাপ্তবয়স্কা রমণী স্বাভাবিক নিয়মে স্বামীর সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু স্বামীর গৃহের অপরাপর লোকের সঙ্গে তাঁহার অনেক সময়ে বনিবনাও না হওয়ারই বেশী সম্ভব। এজন্য গৌরীদানের ব্যবস্থা হইল। ছোট মেয়েটী শ্বশুরালয়ে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের স্নেহবন্ধনে

ধরা দিতেন। শিশুর চিত্তে যে সকল ভাব অঙ্কিত হয়, তাহা কোন কালেই মুছিয়া যায় না, এবং মোহের ন্যায় শক্তিশালী বন্ধন আর কিছুই নাই। ছোট বধূটি যখন এইভাবে বড় হইতেন, তখন নূতন পরিবারে তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া যাইতেন। তিনি দেবরদিগকে নিজের ভাইয়ের মত, ননদকে পিতামাতার মত দেখিতেন। দাসদাসীরা তাঁহার একান্ত স্বজন হইয়া যাইত। একান্নবর্তী পরিবার সর্বপ্রধান অবলম্বন বধূ। এই বধূর সঙ্গে যদি পারিবারিক সামঞ্জস্য না হয়, তবে একান্নবর্তী পরিবারকে আর কোন শক্তি বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তাহা তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া যায়। শতাধিক লোক এক পরিবারে পরম সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কোন গৃহস্থ বঙ্গের শত শত অংশের মত বড় সম্মিলিত হইয়া কিরূপে চলিতে পারে, তাহা আমাদের পূর্বকালের পাইয়া প্রদর্শন করিয়াছে। এখনকার পরস্পর বিরোধী স্বার্থের বিদ্রোহানলের শিখায় প্রথমিত গৃহ দেখিয়া সে গার্হস্থ্য যাহা আমরা দেখিয়াছি—তাহার মাধুর্য অনুভব করা অসম্ভব। হেতুগুণে এই অঘটন সংঘটিত হইয়াছিল। শাস্ত্রকারা লোকের মনে বিবাহের সঙ্গেই একটা ধর্ম সম্বন্ধের কুহকিত চিত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীনকালে, এমন কি আমাদের সময়েও প্রাপ্তবয়স্কা না হইয়া কোন রমণী তাহার স্বামিসঙ্গ পাইতেন না। অকালদাম্পত্যের বিরুদ্ধে এত বিঘ্ন, নিষেধ ও টিটকারি, সমাজের প্রত্যেকস্তরে থাকত যে ছোট বউটির সঙ্গে তাহার স্বামী কথা বলিলে তাহাও একটা মস্ত বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। তখু স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব থাকিলেই এদেশের রমণীরা আদর্শগৃহিণী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না। সেহগুণে তাঁহাকে দেবরকে লক্ষ্মণের মত, ননদকে কৌশল্যার মত, দাসকে হনুমানের মত করিতে পারিলে তবে তিনি গৃহলক্ষ্মীর স্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা লাভ করিতেন। এখন সেই সৌম্য পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে মোহের শঙ্খ, আদুরে মেয়ে, বিপদের সহায়তা ভাসিয়া গিয়াছে। বড় বড় হাসপাতাল হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রায় চাষাও তাহার স্ত্রীপুত্রকে সেই সকল চিকিৎসালয়ে রাখিতে সম্মত হইবে না। একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গার্হস্থ্যের প্রধান সুখ ভাসিয়া গিয়াছে। গোরাবান একসময়ে সামাজিক শুভের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছিল।

পদ্মিনী স্ত্রীর অপরাপর গুণের মধ্যে নৃত্যগীতে অনুরাগ একটি প্রধান ছিল,—"নৃত্যগীতানুরক্তা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা"। আমাদের দেশে শত শত রূপকথায় নায়িকাদের স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রসভায় নৃত্যগীত ও অভিনয় করার কাহিনী আছে। বেহুলা নৃত্যে এতটা দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে তাহার নাম ছিল "বেহুলা নাচুনী"। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধিকার মনোরঞ্জন নৃত্যের উল্লেখ আছে। রাজকুমারীরা এক সময়ে নৃত্যগীত ও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, বুদ্ধবয়স পর্যন্ত বহুস্থলে পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রতকথায় মেয়েদের নৃত্যগীতের বহুস্থানে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং প্রত্যেক ব্রতেই মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেন। এখনও পূর্ববঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে বিবাহে মেয়েদের নৃত্যপ্রথা প্রচলিত

আছে, ব্রতকথার "এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী দি বছরান্তে একবার তাকে নাচবো না তো কি?" এবং

"ষোল ষোল বত্তির হাতে ষোল সরা দিয়া।
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাড়ুয়া হইয়া।"

(অবনীন্দ্রনাথ—বাঙলার ব্রত, ৫১ পৃঃ)

প্রচলিত মেয়েলী ছড়া ঘরে ঘরে পরিচিত মুসলমানদের সময় হইতে এই রীতি উঠিয়া যায়, বঙ্গদেশের পত শত কোকিলকণ্ঠ ও খঞ্জন-গতি হারাইয়া যায়। যদি একথা কেহ শুনিতে পাইত, যে কোন রমণী লাভ করিতে পারিতেন তবে কি রক্ষা ছিল? ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমান নবাবদের নিযুক্ত এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাহাদের উপাধি ছিল "সিন্দুকী"। হিন্দুর ঘরের রূপবতী ও গুণবতী রমণীদের ঠিকানা নবাব সরকারে জানাইয়া দেওয়াই তাহাদের কাজ ছিল। এই সংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁহারা বিস্তর ভাতা পাইতেন। পূর্ণবঙ্গ-পরিচিতির ভূমিকায় এই সিন্দুকীদের সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

মোট কথা কনৌজের ব্রাহ্মণেরা যে সকল বন্ধন দিয়া সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিলেন, তাহা আপৎকালের জন্য বিধান, তাহা সহজকালের জন্য নহে। ঘর ভরিলে যেমন ভাত বন্ধ হয়, পাত্রে না হইলে পক্ষিরাজ ঘোড়াকেও চৌঘাইতে দেওয়া হয় না, এইরূপ আপৎকালে সমাজকে যে সকল বিধানে রক্ষা করা হইয়াছিল তাহা এখন শৃঙ্খল হইয়া আসিতেছে। সেই সময়ে আমরা উপস্থিত থাকিলে হয়ত আমরাও এই বিধানই করিতাম। হিন্দুধর্মের নেতৃগণ পর্বত ছিলেন তাঁহারা যে আমাদের পক্ষকে আকাশ-বাতাসের স্বাধীন গতিবিধি হইতে বঞ্চিত করিয়া অচলায়তন করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছিল, সমস্ত প্রথা, রাষ্ট্রনীতি ও মূল-বিধেরও আইন-কানুনের পশ্চাতে থাকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। ইতিহাস বাদ দিয়া বিচার করিলে অবিচার করা হয়, দোষের গন্ধে যে ফলটি একবারে এত সুন্দর থাকে, তাহাও পঁচিয়া গেলে ফেলিয়া দিতে হয়। রোগ সারিলে ভাত বন্ধ করিয়া রাখা বাতুলতা। এদেশে যখন প্রয়োজনানুসারে যে নিয়ম হইয়াছে তাহাই মেয়েলী শাস্ত্র ও কুলিবাকোর সোহাই দিয়া সনাতন কালের সামগ্রী করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহারা এ সকল বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ইহাদিগকে অভিযুক্ত করিবার কোনই কারণ নাই যাহারা প্রয়োজনাতীতরূপে প্রস্তর দিয়া বাসী বা পচা জিনিষ ঘরে রাখিতেছেন, তাঁহাদিগকেই আমরা দোষী বলিব। সমস্ত জাতি যখন যে অভাব উপলব্ধি করে, শাস্ত্রকারেরা তাহাই বিচার করিয়া বিধিবদ্ধ করেন, নতুবা লোকে তাহা মানিবে কেন?

সেনসংশের অভিজাতগণের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ মুসলমানাধিকারে নব হিন্দুধর্মের এই বিধানগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেনেরা রাহ্মণগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিন্তু যখন তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন তখন সকল বিষয়ে কড়াকড়ি করার ততটা প্রয়োজন

হয় নাই—সকল সামাজিক ঘটনার পশ্চাতে রাজবল ছিল। কিন্তু যখন পরবর্ত্তী সময়ে স্মার্ত্তগণই সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, তখন 'নিষেধ-বিধিগুলি প্রবল হইল। নিষ্ঠাশক্তিহীন, অনাচারে আচারক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ গৃহস্থের দোর আগলাইয়া 'এটা করিতে নাই,' 'ওটা করিতে নাই' এইভাবে সকলকার বাধা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অন্য যুগে পড়িলে যেমন উচ্চ স্বরে কথা বলা যায় না, দোর অনাচারকতার দিনে তেমন মেয়েরা যদি একটু উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেন, তাহাও দোষাবহ হইত। ব্রাহ্মণের নবসিংহ বাহুস্ফার অনেকটাই আলংকারের বর্ম্ম। এই সকল বিধিব্যবস্থার ফলাফল আমরা বৈষ্ণব অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের সময়-নিরূপণ

বল্লালের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায়। পাঙ্গাসাই স্টেশন হইতে পাঁচক্রোশ দক্ষিণে রামপাল গ্রামে ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সংগমস্থলের একটু পূর্ব্বে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর ঐ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ঐ মন্দিরের সম্মুখেই 'বল্লালসেনকৃত পুষ্করিণী' ছিল। মন্দিরদ্বারে যে শিলালেখ সংলগ্ন ছিল তাহা একখানি প্রস্তর ফলক। তাহা পূর্ব্বোল্লেখিত ভূমাপতির নামক কবির রচনা। বরেন্দ্রের শিল্পগোষ্ঠী চূড়ামণি বাল্ক সুলপাণি কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই প্রশস্তিতে বিজয়সেন কর্ত্তৃক গৌড়েশ্বরের পরাজয়ের উল্লেখ আছে।

এখন পর্য্যন্ত সেন রাজগণের সিংহাসনে আরোহণ ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঠিক সময় নির্দ্ধারিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আমরা এই সকল তারিখের সূক্ষ্ম বর্ত্তানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে কলহ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ইহাদের মোটামুটি রাজত্বকাল সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা সকল ঐতিহাসিকেরই আছে। ১৩১০ খৃষ্টাব্দের এ দিক সে দিক হইলে যে কি ঐতিহাসিক ত্রুটি বা বিলম্বে ঘটিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। এইরূপ সূক্ষ্ম কালনির্ণয় করিতে যাইয়া লেখকগণ বুদ্ধিবৃত্তির একটা ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। বল্লাল সেন রচিত দান-সাগরের নানা পাঠে প্রাপ্ত অন্তত: তিনখানি পুস্তকে উহার রচনা-কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা ১০৯০ শক (১১৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দ) তাই এক খানি পুঁথিতে তারিখ দেওয়া হয় নাই। এজন্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "সমস্ত পুঁথিগুলিতে যখন ঐ শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন ঐগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।" ইহা বড়ই আশ্চর্য্য অনুমান। "অদ্ভুত-সাগর" এক বৎসর পরে

বাঙ্গালার ইতিহাসের নূতন মসলা

রচিত হইয়াছিল। ১১৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে বল্লালসেন পরলোকগমন করিয়া থাকিবেন। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে লক্ষ্মণসেনের জন্ম ১১৭৯ খৃ. ও মৃত্যু ১২৭২ খৃষ্টাব্দে। যাঁহারা হাতের লেখার পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন বহুসংখ্যক পুঁথির মধ্যে দুই একখানিতে মাত্র সন তারিখ থাকে। তিনটি ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত তিনখানি পুঁথিতে যখন একই তারিখ পাওয়া যায় তখনই এই তারিখের প্রামাণিকতার যথেষ্ট কারণ। গৌড়-বিজয়ের মাত্র ৩৪ বৎসর পরে ইতিহাস প্রণেতা মিনহাজ এই বিজয়কাহিনী শুনিয়া তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, তিনি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির অধীন মহম্মদ-ই-শেরাণ নামক এক যোদ্ধা, যিনি এই অভিযানের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহার এবং সেই সময়কার অপর একজন সৈনিকের মুখে কাহিনী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ সৈনিক ৩৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা যে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা যায় না। যে রাজাকে তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন, তিনি গ্রন্থ বড় লোক ছিলেন যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন, তাঁহার নাম সম্বন্ধে সমসাময়িকদের ভুল হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। 'লখ্‌মণ' নামটাকে হিন্দুস্থানীরা "লছমনিয়া"রূপে উচ্চারণ করিতে পারে, সুতরাং এই লছমনিয়া যে আমাদের লক্ষ্মণসেন তাহা বলা অযৌক্তিক নহে। দ্বিতীয়তঃ, তারিখটি সম্বন্ধেও মোটামুটি ভাবে সমসাময়িকদের নিশ্চয়ই কোন ভুল করেন নাই। বল বিজয়ের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ যে গণনাক্রমে কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রভেদ মাত্র দুই কি তিন বৎসর। সমসাময়িকগণ বলিয়াছিলেন ৫৯৯ হিজরায় ১২০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ নদীয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। "নোদিয়া" রাজধানী থাকা সম্বন্ধেও একটা ভুল হওয়া অসম্ভব। অবশ্য অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে অতিরঞ্জন, মিথ্যাপবাদ, বলকের গল্প, জনশ্রুতিজাত ভুল ধারণা এগুলি মিনহাজের প্রদত্ত কাহিনীতে থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তিনটি বিষয় কখনই ভুল করেন নাই,—স্থানের নাম রাজার নাম ও ঘটনার সময়। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে যদি ১১৭০ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেন পরলোক-গমন করিয়া থাকেন, তবে ১২০০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলমানগণকর্তৃক পরাজিত হইবেন কিরূপে? সান সাগর ও অযুক্ত সাগরের তারিখ দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা পাথরে উৎকীর্ণ হয় নাই বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ ঐ তারিখ মানিয়া লইলেই সময় সম্বন্ধে সমস্ত অসামঞ্জস্য ও দুরূহ প্রশ্নের সহজে সমাধান হয়।

রাখালবাবুর মত

বল্লাল যদি ১১৬৮-৬৯ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন তখন লক্ষ্মণসেনের ৪৯ বৎসর হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে, বরং তাহাই বেশী সম্ভব, যেহেতু বল্লালের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণসেন যে একটা দল পাকাইয়া তাহার নেতা হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে প্রবল জনশ্রুতি আছে। পিতাপুত্রের মধ্যে যত শ্লোকের বিনিময় হইয়াছিল তাহাও বৃদ্ধ লোকেরা কহিয়া থাকেন ও সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি পুস্তকে সেই শ্লোকগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। এ দিকে কৌলিন্য লইয়া বিবাদের কথাও এদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও গাইয়া জীবনে উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য হইয়াছিল তাহা বল্লাল

গুরু গোপালভট্ট প্রণীত বল্লাল-চরিতে এবং রাজমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে লক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মণসেন বল্লালের জীবদ্দশাতেই প্রেতাত্মা দেখিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। সুতরাং সিংহাসনে আরোহণকালে যদি তাঁহার বয়স ৪৯ হয় তবে ১১০০ খৃষ্টাব্দে বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হয়। এদিকে বল্লালসেনের রাজত্বে ৩২ বৎসর পাওয়া গিয়াছে, রাজ্যপাপ্তির সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১০ ধরিয়া লইলে তাঁহার জীবনও ৬০ ৬৩ বৎসর হয়। এই ভাবে নানা ভিত্তির উপর দাঁড়াইলে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সেন-রাজগণের রাজত্বকালের একটা মোটামুটি হিসাবে উপনীত হইতে পারি। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "নবদ্বীপ যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।" শিলালিপির বা তাম্রশাসনের প্রমাণ ছাড়া অন্যবিধ প্রমাণ যদি 'বিজ্ঞানসঙ্গত' না হয়—তবে অবশ্যই একথার একটা মূল্য দেওয়া যায়। কিন্তু সকলেই জানেন নবদ্বীপে এখনও একটা প্রকাণ্ড দীঘির অবশেষ রহিয়াছে, যাহার নাম বল্লালদীঘি ও তাহার পার্শ্বে বিশাল দুর্গ বিদ্যমান, তাহা এখনও বল্লাল রাজার বাড়ী বলিয়া লোকে দেখাইয়া থাকে। ১৫১০ খৃঃ অব্দে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত ঐ বল্লালদীঘিতে স্নান করিয়াছেন, একথা গোবিন্দ দাস চাক্ষুষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার এক শতাব্দীর মধ্যেই যে বল্লাল রাজ-বাড়ী তিরোহিত হইয়াছিল তাহা কহিলা গিয়াছেন *। আমাদের এই পুস্তক আলোচনার খুঁটিনাটি বিচার করিবার স্থান নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যের উপর ভবিষ্যদ্বংশের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের একখানিমাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মাতা বিলাসদেবী পুণ্যস্থলোপলক্ষে যেসকল ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি দান করেন, তাহার দক্ষিণাস্বরূপ গ্রামস্থ ৪ বাসুদেব নামক আমলেদী এক ব্রাহ্মণকে হাটমণ্ডলের অন্তর্গত ৭ ডাকা জিলার বাঘিয়াটি (?) গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। হাটমণ্ডলের বাঘিয়াটি ঢাকা জেলায় বলিয়াটি বলিতে হইলে উক্ত মণ্ডলের পরিধি অত্যধিক বাড়াইতে হয়। ইহাই তাম্র-শাসনের বিষয় এবং ইহা বল্লাল-রাজত্বের একাদশাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল।

বল্লাল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সাহাল মহাশয়ের মতে তিনি ১০৬৩ হইতে ১১১৯ খৃ.। অন্ধ্রগ্রহণ করেন। বল্লালসেন সম্বন্ধে অনেক কথা ঘটক কারিকা এবং বল্লাল-চরিত নামক সংস্কৃত কাব্যে লিখিত আছে। সন তারিখ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী লোকেরা অনেক গোলযোগ করিয়াছে। কিন্তু এই ঘটককারিকাগুলি সেই সময়ের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারে প্রচলিত বিশ্বাস ও জনশ্রুতির উপর স্থিত। তাহার অধিকাংশেরই মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া বিশ্বাস হয়।

---

* "প্রভাত এল সাঁঝ হল তাহার নিবড়।
কত কত বলে লোকে বল্লাল সাঁকর।
বল্লাল রাজার বাড়ী লঙ্কার নিকাট।
আসিবেক প্রমাণ আছয়ে তার বট।" —ত্রৈলোক্যনাথের কড়চা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৌলিন্য

প্রথমতঃ বল্লালসেন কর্তৃক স্থাপিত কৌলিন্য-সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কৌলিন্য যে বল্লালকৃত তাহাতে সন্দেহ করেন কিন্তু আমাদের মতে এই বিষয়টিতে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই। তিনি বলেন তাঁহার তাম্রশাসনে উহার উল্লেখ নাই। তাঁহার দুই একখানি তাম্রশাসনে পাওয়া গিয়াছে, তাম্রশাসনে কোন রাজার সম্বন্ধে যাবতীয় কথা উল্লেখ থাকিবার কথা নয়। দীপঙ্করের কথা পাল-রাজগণের তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে নাই, তজ্জন্য কি সেই বিখ্যাত ব্যক্তির অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে হইবে? মুসলমানদের ইতিহাসে চাঁদ সাহার সময়ে যে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় এবং টাঁক সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী 'সনাতন' ও প্রধান কর্মচারী 'রূপ' যে সেই সময়ে মুসলমান রাজসভা হইতে পলায়ন করিয়া হিন্দু বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এমন কি চৈতন্য প্রভু রূপ ও সনাতনের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে হইবে? তাম্রশাসন ও শিলালেখগুলি মলত. রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। উহাতে প্রধানত. রাজাদের যুদ্ধজয়ের কথাই বর্ণিত হইত, সামাজিক কোন কথা, ধর্মের উদার মতবাদ প্রভৃতি বিষয় তাম্রশাসনে পাওয়া যাইবার কথা নহে। বিশেষ বল্লাল-প্রবর্তিত কৌলিন্য বল্লালের বহু পরবর্তী কালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বল্লালের সময়ে এই কৌলিন্যের যাঁহারা লক্ষ্য ছিলেন তাঁহারা উহা জানিতেন না,—এবম্বিধ বিষয় তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র একটি ক্ষীণ জলধারার ন্যায় এই কৌলিন্য অবলম্বনে বিপুলস্রোত নদীর ন্যায় সমাজব্যাপী হইয়াছিল—ইহার উল্লেখ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত একখানি মাত্র তাম্রশাসনে নাই দেখিয়া তাহার সত্যতায় সন্দিহান হওয়া উচিত নহে। সামাজিক বিষয়ের কোন উল্লেখই তো আমরা বঙ্গদেশের তাম্রশাসনগুলিতে পাইতেছি না। কনৌজ হইতে যে ব্রাহ্মণগণ আনীত হইয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপসেন প্রভৃতি কাহারও তাম্রশাসনে নাই, কৌলিন্য প্রথা-সম্বন্ধেও কোন কথা সেই সকল তাম্রশাসনে নাই। কিন্তু বিদেশাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ এখনও আছেন এবং কৌলিন্যপ্রথার বিলোপের অবস্থায় বঙ্গীয় পল্লী সমূহে এখনও বিদ্যমান। যদি বল্লালসেন এই প্রথা প্রবর্তিত না করিয়া থাকেন, তবে এই অদ্ভুত কৌলিন্যপ্রথার উদ্ভাবক অন্য কেহ অবশ্যই থাকিত, অন্ততঃ জনশ্রুতিতেও তাহার নাম পাওয়া যাইত। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে, সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন শত শত কুলীন গ্রন্থে এই কথাটি পাওয়া যায় কৌলিন্যপ্রথা বল্লালসেন-প্রবর্তিত। যাঁহারা এই কৌলিন্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই বংশধরগণ এই কথা পুরুষানুক্রমে জানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের কুলজী-পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। বাসস্বদ্যের পুস্তকে কিংবা জ্যোতিষের গ্রন্থে বল্লালসেন কেনই-বা

তাম্রশাসনে কৌলিন্যের উল্লেখ নাই কেন

সমাজসংস্কারের মত অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিবেন ? সুতরাং মান সাগর ও অমৃত সাগরে কৌণ্ডিন্যের অনুরোধে উহা অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে যাঁহারা নবগুণ "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্, নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্" বিশিষ্ট ছিলেন তাঁহারা কুলীন এবং যাঁহারা অষ্ট, ছটি গুণযুক্ত তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়ের পর্য্যায়ে পড়িয়া গেলেন।

বল্লালসেনের অবসানের সময়ে দেশ অচারভ্রষ্ট হইয়াছিল। এই বর্ণ সমস্ত জগতের নিকট নিমন্ত্রণ-চিঠি দিয়া সকলদেশের লোককে ভারতীয় হোরলে সম্পদশালী করিয়াছিল। "তাতার হইতে অর্দ্ধি-সীমাবিস্তারী সকলস্থানের অধিবাসীরা—চীন, চন, আফগান, পাঠান, মোগল প্রভৃতি সকলেই সম্পত্তির জন্য এবং নালন্দা প্রভৃতি বিহারে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য ভারতের অতিথি হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী প্রসারতা লাভ করিয়াছিল এই মহাজন-সঙ্গমে হিন্দুর আচার ব্যবহার ভাসিয়া গেল—আর্য্য-অনার্য্যের রক্ত মিশিয়া গেল নূতন হিন্দুধর্ম্ম এই আবর্জ্জনিশ্রের সমাধান করিতে পারিল না। ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদ সমাজে কঠোর করিলেন। কোন কোন সাধারণের মধ্যে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব হইয়া ব্রাহ্মণের শরণ লইলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধানটা স্পষ্ট রেখার মত টানিয়া দিলেন,—ব্রাহ্মণেরই একমাত্র বিশুদ্ধ জাতি, অপর সমস্ত শূদ্র বঙ্গদেশে যাজক ব্রাহ্মণের ও তাঁর মধ্যে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের জাতিত্ব দাবী অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কলিতে শুধু দুই বর্ণ চতুর্থ বর্ণ নাই, পঞ্চম শুধু বিশ্বাস সূত্র মাত্র, বাস্তবিকের স্রোত বৌদ্ধদিগের প্রবল সময়ে এদেশে অবাধে বহিয়া যাইতেছিল কেহ চীনদিগের মত নানারূপ জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করিত এবং বৌদ্ধসঙ্গকে বৌদ্ধতন্ত্রসকল ও সহজিয়া-সম্প্রদায় নানারূপ বীভৎস আচারের প্রশ্রয় দিতেন, ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করিয়া সেনরাজগণের সাহায্যে যে আদর্শের স্থাপন করিলেন তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য পাইল 'আচার' ইহাই কৌলিন্যের নবগুণের সর্ব্বাগ্রে স্থান লাভ করিয়াছে। এই সূত্রে আচারের প্রাধান্য হওয়ার পর সমাজে ইহার এতই বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটা অদ্ভুত উপহাসাস্পদ আকারে দাঁড়াইয়াছে আস্তাখানের বিচার লইয়া ইহার শাসন অত্যাচারীর শাসনের মত হইয়া উঠিয়াছে। আচারপূত' কথাটা সঙ্কীর্ণ নিষ্ঠাসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশেষ অর্থজ্ঞাপক হইয়াছে যবে যবে যেদিন ব্রাহ্মণেরা যাগ যজ্ঞ একত্র হইয়া চক্র-গঠনপূর্ব্বক শ্মশানের শবের মাংস ও মদ্যাদি খাইত, সেই সময়ে আচার সত্যসত্যই একটা বস্তুতে পরিণত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল নব্য হিন্দু স্মৃতিকারেরা ইহার একটা শাসন দিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান কালে ইহা হিন্দুসমাজের প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হইয়াছে। আমি যদি খৃষ্টানের প্রার্থনাগারে যাইয়া তাহাদের মত উপাসনা করি, যদি মুসলমানের সহিত একত্র বসিয়া নমাজ পড়ি, তবুও হিন্দুসমাজ আমার টিকিতে হাত দিবে না, কিন্তু যদি আমি বিছানার উপর থালা রাখিয়া

অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করা কিংবা নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করি শুনে সেই মুহূর্তে আমি সমাজচ্যুত হইব। অবশ্য আজকাল হিন্দুধর্মের এই সকল রীতিনীতি একটু বেশ শিথিল হইয়াছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই আচার স্বেচ্ছাচারী রাজার মত হিন্দুসমাজকে শাসন করিয়া আসিয়াছিল। যদি কাপড়ে একটা ভাত লাগিয়া থাকিত, তবে বাড়ীর মেয়েরা সমস্ত ধর্ম নষ্ট হইয়া গেল ইহাই মনে করিতেন। এখনও পাড়াগাঁয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে এমন দুইএকজন আছেন, যাঁহারা দিনরাত্র আচারের অদ্ভুত অভিনয় করিয়াও সোয়াস্তি পাইতেছেন না। ক্রমাগত কথায় কথায় স্নান করিতেছেন, তথাপি দেহের শুদ্ধতা সম্পূর্ণ হইল না ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। একটি স্ত্রীলোককে জানি তিনি কোন ডোম বা চাঁড়ালের পা যে সকল স্থানে পড়িয়াছে, পাছে তাহা মাড়াইতে হয় এই ভয়ে গঙ্গাস্নানের পর বকের মত অদ্ভুত ভঙ্গীতে পা বাড়াইয়া কত আশঙ্কার সঙ্কিত পথে হাঁটিয়া যান। অপর একজনকে জানি তিনি অন্য কোন গৃহ হইতে কোন শিশুটিকা তাঁহার রন্ধনশালায় আসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি স্পর্শ করিয়া ধর্ম নষ্ট করে কিনা, ঘরের দ্বারে বসিয়া তাহাই পাহারা দিতে থাকেন, তাঁহাদের গুরুতর কোন দোষেও তাঁহারা ততটা ক্ষুব্ধ বা আতঙ্কিত হন না যতটা অন্নব্যঞ্জনাদি স্পর্শ করিলে উত্তেজিত হইয়া থাকেন। চরিত্রে নহে, আধ্যাত্মিক শক্তি বা নীতিতে নহে, কলিতে ধর্ম অন্নগত হইল। সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর মধ্যে সর্বাগ্রেই আচারের স্থান দিয়া ব্রাহ্মণেরা কতকগুলি উপস্থিত অশুভ হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই আচারই এখন হিন্দুর গৃহে নিশ্চয় মহামারীর মত উৎপীড়ন করিতেছে।

কিন্তু নব-ব্রাহ্মণ্য এই 'আচার' নামক বিষয়টির সৃষ্টি করে নাই, ইহা প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আর্যসমাজে নানা আকারে বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক ধর্ম এদেশে আচারকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। যুগে যুগে আচারের রূপের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূলে যুক্তি থাকুক আর না থাকুক, ইহা আর্যধর্ম ও তাহার বিভিন্ন শাখার ভিত্ত গড়িয়া দিয়াছে।

প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমে আচারের দৌরাত্ম্য না থাকিলেও উহার শাসন প্রবল ছিল বেদ শিক্ষার্থীকে আচার পালন করিতে হইত। গুরু স্বয়ং আচার-পূত হইয়া আচরণ করিয়া শিক্ষার্থীকে আচার শিখাইতেন এবং আচার হইতেই 'আচার্য' শব্দ উদ্ভূত। যিনি আচার রক্ষা করিতেন না, তিনি ব্যভিচারী।

আচার।

কতকগুলি আচার সনাতন নীতির অঙ্গীভূত,—যথা "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম। নানৃতং চ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ" কতকগুলি স্বাস্থ্যসম্বন্ধে, যথা "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যমনস্তং নৈব নাম্ভসি ন মধ্যাং নভসো গতম" (মনু) কোন সময়েই সূর্য দেখিবে না, একথাটা সোজাসুজি বলিলে লোকে মানিবে না, অথচ কৌশলে তাহাই বলা হইয়াছে। সূর্যের দিকে চাহিলে চোখ খারাপ হয়, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কতকগুলি আচার মেয়েলী ব্যবহারজাত—নবব্রাহ্মণ্য সেইগুলির উপরই বেশী জোর দিল। কতকগুলি সূত্র প্রাচীন সূত্রকারেরা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের

[illegible] কিছুতেই চুরা হয় না পুরুষের সর্ব্বসমক্ষে করিতে হইবে কাপড়পাড় পা ঘুচিবে না, কাহাকেও চক্ষুদান দেখাইতে হইলে চক্ষুদান নাম করিতে হইবে না— যজমান বলিবে (বৌধায়ন ২— ১ ১১ । কাহাকে শ্রীমান বলিতে হইবে শূদ্রোদিগকে শ্রীমান বলিতে হইবে ক্ষত্রিয়কে বলবান, বৈশ্যকে ধনসমৃদ্ধ ও শূদ্রকে আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিবে (আপস্তম্ব, ১—১৪—১২ । এই আচারগুলি একেবারে নিরর্থক, নবব্রাহ্মণ সহেতুক বা অহেতুক আচারগুলি সম্বন্ধে শুধু অনুশাসন প্রচার করিল না, বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল, "উদিতে ভগবান্ ভাস্করে যঃ ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে কল্মষম্ স পিবতি কৃমিং কফং শুক্রং শোণিতং তদ্দিনম্।" ইহার মোদ্দা উদ্দেশ্য একটা পাওয়া যায় খুব জোরে উঠিবে—যেন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া রুচি হইতে পারা যায়—কিন্তু এরূপ 'শাপিত' বলিয়া গালাগালি কেন? "বিবৎ বা ক্লেদো দুষ্ট ন নমেদ যো নরাধমঃ স যাতি নরকং ঘোরং মহারৌরবসংজ্ঞিতে " যে ব্যক্তি মল মূত্রে মল ধায় সে বক্তবধের তুল্য পাপ করে যেমনই কবি এবং ব্রাহ্মণদের আচারসম্বন্ধে নানারূপ অনুশাসন আছে, কিন্তু সভ্য কিংবা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের দোহাই দিয়া যেমনকরে যবন হিন্দুসমাজকে নরকের "অরৌরবে" বাঁধিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।

আপস্তম্বের দুই প্রধান শত্রু শৈব ও বৌদ্ধদের অহেতুক আচারের অস্তিত্ব বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় বৌদ্ধদের বিনয়পিটক এই আচারের একটি পেটিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না দন্তকাষ্ঠ কতটা লম্বা হইবে, উপাধ্যায়ের পিছি কত বড় হইবে, গ্রামে কোন্ ভাবে যাইবে, তখন যে কি করিয়া বসিতে হইবে খাওয়ার রীতি কি, ছুঁচ রাখিবার জায়গাটি কিরূপ হইবে এমন্‌কি চলনা ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থভাগে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিতে আছে বিনয় ব্যতীত কোনও কাজে যাইবে, চল চল বা সুরু সুরু শব্দ করিয়া ভোজন করিবে না, প্রাতিমোক্ষ ৪১ ৪২), এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুশাসন বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক আছে ঋষিদের সূত্রিতেও অনুরূপ বাঁধা আছে বৌদ্ধদের অনুশাসনের একটা সার্থকতা এই মনে করা যায় যে সঙ্ঘে দীক্ষিতেরা বাস করিতেন তাঁহাদের রীতিনীতির একটা ঐক্য থাকার দরকার কিন্তু নবব্রাহ্মণের আচার কত যে উদ্ভট আকারে পল্লীজীবনে দেখা দিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিব কি কাঁদিব তাহা বলা যায় না এটা খাইতে নাই, ওটা করিতে নাই এরূপ শত শত নিষেধবিধি লইয়া পল্লীবাসিনীরা তাঁহাদের আত্মীয় ও সন্ততিবর্গকে বিভীষিকা দেখাইয়া থাকেন। এখন হিন্দুদের ধর্ম্ম যতটুকু থাকুক আর না থাকুক, অন্ধ ও মলিন আচার উহা রহিয়া এই সমাজে বেহদ্দ পরিচালনা করিতেছে সর্ব্বদর্শী মহাত্মা সেনহার্টের ন্যায় অশোক একবার মেয়েলী আচারের বিরুদ্ধে মৃদুভাবে একটু কটাক্ষ করিয়াছিলেন (শিলালেখ ৯) "শিশুর জননীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নিরর্থক মঙ্গলাচরণ করেন -- উহার ফল অল্প " তিনি যদি বঙ্গদেশে নববাহ্মণ্যপ্রভাবে কত যে নিষেধ-বিধি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা জানিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাহা রাজবিধি দ্বারা বারণ করিয়া দিতেন। কোনখানে যাত্রার পূর্ব্বে কাকের নানা ভঙ্গীতে ডাকের

গুপ্তাগুপ্ত ফলের কতকটা তালিকা আমি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" (৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৮৭) দিয়াছি।

আচারের পথই বিনয় যখন জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল তখন বিনয় চরিত্রের স্বরূপস্বরূপ হইয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধ সেতুবন্ধের বিলোপ বা পলায়নের পর অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাহাদের বহু পুরু-গৌরবের স্মৃতি একটু ছায়াতে রাখিয়া গেল তথা প্রাক্ত ভিক্ষুগণ লোকেরা এই স্পর্দ্ধা সহিল হইয়া উঠিল। যাহারা নব-ব্রাহ্মণের শাসন না মানিয়া বিদ্রোহ করিত, সেই সকল ঔপনিবেশিক লোকদিগের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজ দ্বার রুদ্ধ করিল কথিত আছে—নবাগত কায়স্থের মধ্যে বসু এবং বৈদ্যদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর গুপ্ত ঔপনিবেশিক ব্যবহারের জন্য অপর সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াও কৌলিন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত শ্রেণীর নাম এখন "অগুপ্ত" হইয়াছে। মহারাজ বল্লালসেন বৈদ্যসমাজের মধ্যে বিবাহের অবাধ হওয়ার দরুন কুল ভাঙিয়াছিলেন। (ভরতমল্লিক: চন্দ্রপ্রভা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,) বস্তুতঃ কৌলিন্য সেই সকল লোককে দেওয়া হইয়াছিল, যাহারা ব্রাহ্মণশাসন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই নূতন সমাজে যোলক পরিচালনার শক্তি অপেক্ষা যাহারা শান্তশিষ্ট হইয়া সমাজের বশীভূত হইয়া থাকিতে সাহস ছিলেন, তাঁহারাই আদৃত হইয়াছিলেন সেন-বোধ নব ব্রাহ্মণসমাজকে পূজা করিয়া লইলেন এবং হিন্দুরাজত্বের অবসানে বাঙ্গালীরাই সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন।

বৈদ্যশক্তির বিলোপ

এই নব ব্রাহ্মণ দলকে উপেক্ষা করিতে শিখাইলেন, শক্তিকে ও প্রতাপকে তুচ্ছ করিয়া অনাদর করিলেন, সমুদ্যাত্র নিষেধ করিয়া মনোযোগের পথ রুদ্ধ করিলেন যে বৈদ্যশক্তি গুপ্ত ও পালদের সময়ে ভারতে এক বিপদ্য করিয়াছিল—নব-ব্রাহ্মণ তাহাদিগের অধিকাংশকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিলেন। তাহাদের পৃথিবীব্যাপী গতিবিধি থামিয়া গেল, বুকরের আদর ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল, বণিক্ 'বেণে' নামে সমাজের তুচ্ছ পাত্র হইল, এক সময়ে যাহাদের আসন রাজাসনের তুল্য ছিল, রাজপুত্র ও মহারাজের পুত্রের পদবী একরূপ ছিল সেই ধনকুবের বণিকুলের বংশধরগণ 'বেণে' হইয়া সমাজের এক কোণে কথঞ্চিৎ স্থান করিয়া লইয়া কোনরূপে জীবিত রহিলেন, নব ব্রাহ্মণ বৈদ্যশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিল বল্লালচরিতে বর্ণিত হইয়াছে, বল্লালসেন যখন বল্লালসেন সেতুর উপর ক্রোধবশতঃ সমস্ত সুবর্ণবণিক জাতিকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে রাজাকে উপদেশ দিলেন, সুবর্ণবণিকদিগের উপার্জ্জিত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে অনাচরণীয় জাতির শ্রেণীভুক্তে স্থাননির্দ্দেশপূর্ব্বক একেবারে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে। ধনের শক্তি বড় প্রবল শক্তি, এতকাল বৈদ্যের এই শক্তির বলে রাজা অতি প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এইবার নব কতিপয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের হস্তে ধনকুবেরগণ পরাস্ত হইলেন।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া কোন জাতি নাই এই ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণের কবিত

দিগের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিলেন। সমাজিক প্রতিষ্ঠার উপর একটা বৃহৎসিত গালি বর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ পার্থিব প্রতিপত্তিকে হস্তান্তর করিলেন। এই ভাবে কর্মফলশক্তি ও বৈদ্যপ্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নব ব্রাহ্মণ্য তাঁহার অপ্রতিহত বৈজয়ন্তী সমস্ত বঙ্গদেশের উপর সগৌরবে উড্ডীন করিলেন। নব ব্রাহ্মণ এই সকল শিক্ষা নানারূপ অলৌকিক উপাখ্যান ও পৌরাণিক গল্পের মধ্য দিয়া দেশে প্রচার করিলেন। তাঁহাদের এই প্রচারকার্য্য কত যে উপায়ে সম্পাদিত হইয়া অমোঘ ও বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল, ব্রাহ্মণকে তিথিভেদে দানের ফল, ব্রাহ্মণের ঘরপানের ফল, তাঁহাদের আড়ম্বরের অত্যয় ধ্বংসকারী ফল কথক ঠাকুর, কাস্তুনীয়া, পটুয়ারা, পল্লীর চিত্রকরেরা, বক্তৃতায়, গানে গল্পে, চিত্রে ঘোষণা করিয়া এই ধারণা দেশে এমন বদ্ধমূল করিয়া ফেলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি এদেশের জনসাধারণের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র এই দুই জাতি সম্বন্ধে বাঙ্গালার কবি জাতি বার

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে হয়ত মনে হইতে পারে এই যে ব্রাহ্মণের রাজা প্রজাবাসীর পক্ষে শুধুই অহিতকর হইয়াছিল কিন্তু তাহা নহে, উহা শুধু সমাজের বিশেষ এক সময়ের কতকগুলি অন্ধ স্রোতকে রাখিবার জন্য সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় প্রভাব সমাজের উপর অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজা ছিলেন না, লোক তাহাদের কথা মানিবে কেন? সুতরাং শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা এরূপ এক সিংহাসনের সৃষ্টি করিলেন তাহা কৃপাণের চেয়েও রাজ সিংহাসন অপেক্ষা প্রবলতর হইল। এইভাবে হিন্দুজাতিকে ব্রাহ্মণগণ সমাক্ সংহত করিয়া তাঁহাদের নিরঙ্কুশতন্ত্র মহাবেগে সমাজ চালাইবার সুবিধা করিয়া লইলেন। বিশেষ রাজার রাজত্বকালে এক শ্রেণীর লোক কতকটা ক্ষমতাশালী হইয়া দেশ শাসন করিতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যেরূপ সমাজব্যাপী প্রভাব দেখাইয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অন্যত্র সুলভ নহে। এই নব ব্রাহ্মণের অনুমিতির একটা মস্ত বড় গুণ ছিল তাহার বাস্তবে অনুরিত হইয়া ফলতরুতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে বলিব।

বল্লালচরিতে বল্লালসেনের সহিত শুভঙ্করবিদূষকের একটা সংবাদ ও মনোমালিন্যের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা ইহাতে আর কিছু বিশ্বাস দিয়াছেন, তিনি কোন বহি হইতে কি পাইয়াছেন তাহা লিখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকে অমূলক বৃত্তান্ত দেওয়া হয় নাই, বরঞ্চ "সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতিপদ্ধতিসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা সম্পূর্ণ সত্য।" স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থকার সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকার কেবলমাত্র সংগ্রাহক নহেন তিনি যথাস্থানে নূতন অনুসন্ধান ও চিন্তার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।" সান্যাল মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "অষ্টাদশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া নানাবিষয়ক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত ইংরেজী ও বাঙ্গলা ইতিহাসে পুরাতন জমিদারদিগের সনদ, বংশাবলীক্রমিক কিংবদন্তী, শেক শুভোদয়া, বল্লালচরিত, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র, ভট্টকবিতা এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নির্ণয়পূর্ব্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি।"

যদি তিনি কোন্ পুস্তক বা কুলশাস্ত্র হইতে কি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পাদটীকায় উল্লেখ করিতেন তবে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আধুনিক বড় বড় বাঙ্গলা ঐতিহাসিক গ্রন্থে ঐরূপ প্রকাশিত অপ্রকাশিত পুস্তকের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কতকগুলি বোধ হয় এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং ঐ সকল উল্লেখ যে সর্ব্বদাই লেখকের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করে তাহা নহে, বরঞ্চ সময়ে সময়ে লেখা অনর্থের মূল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

বল্লালসেনের সঙ্গে তর্ক বণিকের বিরোধ।

সাধারণ মহাশয়ের ইতিহাস লিখিবার শক্তি এরূপ অসাধারণ যে বঙ্গদেশের কোন ইতিহাস এরূপ প্রত্যক্ষবৎ কখন হয় কৌতূহলপ্রদ ও জীবন্ত হয় নাই। সমস্যাগুলি সকলেরই আছে কিন্তু তুগাচরণ বাবুর ইতিহাস যে মোটামুটি সামাজিক ইতিহাসের বলিবার উপকরণ বহন করে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

এখন বল্লালসেন এবং সুবর্ণবণিকের কথা বলিব। বল্লালসেন যেরূপ প্রতাপশালী ছিলেন, তেমনই ছিলেন অমিতব্যয়ী। তাঁহার রাজ্যের আয় ছিল এককোটী বিংশ লক্ষ। সে সময়ে এ পরিমাণ মুদ্রার প্রকৃত মূল্য অনেক বেশী। এই লক্ষস্থ থাকা সত্ত্বেও অপরিমিত ব্যয়শীলতার জন্য তাঁহার কোন সময়েই অভাব মিটিত না। তাঁহার এই অযাচিত অতিরিক্ত ব্যয়জনিত দারিদ্র্য 'বল্লাল দারিদ্র্য' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল। মগধের বল্লভানন্দ শেঠ ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত ধন-কুবের। বল্লাল তাঁহার নিকট প্রায়ই ঋণ গ্রহণ করিতেন। একবার তিনি কোটীকোটী স্বর্ণমুদ্রা চাহিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু মগধের পাল রাজা ছিলেন বল্লভানন্দের জামাতা এবং এই রাজা বল্লালের পরম শত্রু ছিলেন। যে কারণেই হউক বল্লভানন্দ বল্লালের দূতকে কতকগুলি অশ্লীল ও অশিষ্ট উক্তি বলিয়া অপমানে প্রকারান্তরে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "রাজা ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া অর্থক্ষয় করিতেছেন, ইহা রাজার উচিত কার্য্য নহে। এবম্বিধ যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করা আমি অন্যায় মনে করি। প্রজার হিতকর কার্য্যেই রাজাদের করা কর্ত্তব্য। তবে যদি তিনি বঙ্গভাগে কতকটা ভূমি আবদ্ধ রাখিয়া ঋণ চান তবে আমি দিতে পারি।" এই অশ্লীল উক্তিতে রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কি উপায়ে প্রতিশোধ লইবেন, তাহা সহসা নিরূপণ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে রাজা এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন। বলদেব প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি শিবৃলিপ্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি বিক্রমপুর

শিবৃলিপ্ত যজ্ঞ ও তাহার উপসংহার।

যাইয়া সুহৃদ্ সুষেণ এবং কুমার চন্দ্র প্রদ্যুম্ন ও অন্য পূর্বকালের সহিত যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।" চন্দ্রপ্রভাবে বিক্রমপুর হইতে বঙ্গালের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সুষেণ বিক্রমপুর ধরমেন, বকসেন, বপ্পাসেন কুমার চন্দ্র প্রদ্যুম্ন সকলে যজ্ঞোৎসবে যোগদান করিবার জন্য বৈদেহে পদার্পণ করিলেন। যাত্রার পূর্ব সম্ভবত: জ্ঞাতি ভীমসেন এই বিশাল দান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা নিশ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দানাচার্য্য দ্বিতীয় বৃহস্পতিতুল্য বলা হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক ছিলেন লক্ষ্মণসেন এবং ভীমসেন এই দুই কার্য্যে রাজ্যের প্রায় সমস্ত লোকই নিযুক্ত হইয়াছিল। বল্লালচরিতকার আনন্দভট্ট লিখিয়াছেন যে অহত, অনাহূত ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ শত সহস্র নিদেশ হইতে রাজধানীতে সমাগত হইলেন, এই সময়ে সমাগত রাজ্ঞ ও মহামাত্যগণকল একত্র হইয়া মহারাজ প্রদানের পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

সভায় একটা সাময়িক গোলমাল উপস্থিত হইল। সুষেণ বংশের জন্য যে স্থানে আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছিল, সেখানে তাঁহারা বসিতে পারেন নাই। তাঁহারা সেইখানেই ক্রমে কাষেণ্য আসিয়া চড়িয়া বসিতেছেন দেখিয়া, মনে করিলেন এবং রাজপ্রাসাদ হইতে কেহ বাহিরে চলিয়া গেলেন। কেহ বা আসন ত্যাগ করিতে না করিতে আসন বাড়াইলেন এমন সময়ে ভীমসেন তথায় উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বিক্রমপুরকে স্থান ছাড়িতে অনুরোধ করিয়া অসম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"মহারাজ শুনুন, বড়ই ছোট ছোট হইয়াছি তখন আমরা কেমন করিয়া বসিতে পারি। আমরা বলিত, প্রাচ্য, শাকদ্বীপী ভোজ মহাশয় সুষেণেরই সমকক্ষ কুলীন ভোজ মহাশয়। তাঁহাদের সুষেণের সন্নিকটে কোন স্থানে আসন দেওয়া হইয়াছিল এজন্য তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে তাঁহাদের বাদানুবাদ হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহাদের প্রতি শব্দবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াও কিছুতেই থাকিলেন না, অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

"নৃপতি বল্লাল" ভীমসেন এই ব্যাপারটা রাজার কর্ণে একটু উল্লেখিত ভাষায় বলা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভবাদৃশ বহুজনের প্রার্থনায় এই বলিকুলের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জামাতা মগধাধিপতি এই অহঙ্কারে তাহার স্পর্দ্ধা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। বরং সে মস্তকে কেন পদার্পণ করিত।" এই কথা শুনিয়া বল্লালের সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পমান হইল এবং নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং "পদাঘাত মস্তকাং ভব কিমেতৎ ইতিকোজ্জ্বল" এবং চারিকোজ্জ্বল মুহূর্ত্ত মস্তক হইতে পড়িয়া গেল। আনন্দভট্ট এই ব্যাপারের সবিস্তার বর্ণন দিয়াছেন, তাহা হইতে আমি সংক্ষেপে ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম।

সান্ধ্য মহাশয় আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে দেখা যায় যে বৈদিক ব্রাহ্মণের উপর শ্রদ্ধাবশত: রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে এই সময়ে এক সুবিধা পাইলেন। রাজা এক কুলীনকন্যা নামক এক বাহ্মণ ১ বড় রাগ করিতেন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে অন্তঃপুরে একটি গ্রামের তাঁহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুলীন পত্নীর

হস্তে এক বণিককে দিলেন, তিনি উপাসনার [illegible] দ্বিতীয় সুবর্ণখণ্ড মণিদত্ত নামক এক সুবর্ণবণিকের নিকট [illegible] কিছু সময় সংকল্পপূর্বক অপেক্ষা করিলেন পরদিন কুন্দন ঘরে আসি[illegible] সমস্ত কথা শুনিলেন এবং সেই মেকির পুতুলটি ফুল করিবার জন্য মণিদত্তের দোকানে উপস্থিত হইলেন মণিদত্ত লোভে পড়িয়া সেই মেকি রাখা ফেরত দিবার কথা অস্বীকার করিলেন। কুন্দন নরপালকে সংবাদ দিলেন,—এদিকে মণিদত্ত স্বর্ণ দেখাইয়া একটা টেপু তৈরী করিয়াছিলেন স্বর্ণখণ্ড তখন ১০৮ তোলা ছিল এই টেপের ওজনও তাহাই, এজন্য নরপালের মনে সন্দেহ হইল কুন্দন আচার্য্য যেমন করিয়া বলিলেন, তাঁহারই সোনার খণ্ড দিয়া মণিদত্ত ঐ টেপ তৈরী করিয়াছিল। মণিদত্ত ছিলেন বল্লালানন্দ সেঠের জামাতা বল্লাল নিজে এই মোকদ্দমার বিচারের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি সুবর্ণবণিকদিগকে শাস্তি দিবার একটি একটি মস্ত বড় সুযোগ মনে করিলেন তিনি বল্লালানন্দকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই টেপুতে অন্য কোনরূপ ধাতু মিশান আছে কি না জামাতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া বল্লালানন্দ বলিলেন 'টেপু খাঁটি সোনায় নির্ম্মিত' বল্লাল অন্যান্য সুবর্ণবণিকদিগকে টেপু পরীক্ষা করিতে দিলেন। দলপতি বল্লালানন্দের পক্ষপাতে তাঁহারা সকলেই মিথ্যাকথা বলিলেন। স্বর্ণনির্ম্মিত খেলনায় অবশ্য কিছু খাদ থাকিবে কিন্তু সুবর্ণবণিকেরা একবাক্যে বলিলেন—টেপুতে কোন খাদ নাই বল্লাল শঙ্খবণিক ও গন্ধবণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা বলিলেন—"এ বিষয়ে আমরা নিতান্ত মূর্খ, প্রকাশ করিতে পারিব না, যেহেতু বিষয়টিতে আমরা অনধিকারী—আপনি স্বর্ণকারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বল্লালানন্দ ছিলেন ধনকুবের তাঁহার ঘরে ষোলকোটী স্বর্ণমুদ্রা মজুত ছিল। তিনি উৎকোচ দিয়া স্বর্ণকারদিগকে আপনার দিকে টানিয়া আনিলেন, তাঁহার একবাক্যে মিথ্যা কথা বলিয়া উহারই সমর্থন করিলেন, কিন্তু বল্লালের সন্দেহ ঘুচিল না। তাঁহার গুপ্তচরেরা বল্লালানন্দের চক্রান্তের কথা আভাসে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত দিল। তিনি কাশী হইতে একদল স্বর্ণকার আনাইলেন বল্লালানন্দ তাঁহাদিগকে ধরিতে ছুঁইতে না পারে, এই জন্য তিনি তাহাদিগকে নাকে বেষ্টিত করিয়া বন্ধের মত লইয়া আসিলেন, তাঁহারা বিশেষ করিয়া টেপু পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে ঐ টেপুর সোনায় কিছু অংশমাত্র ও অন্যধাতু মিশ্রিত খাদ বিদ্যমান। কাশীর স্বর্ণকারদিগের পরীক্ষা করার পর আর কাহারও সন্দেহ রহিল না যে মিশ্রিত ধাতুতে স্বর্ণ দেবু প্রস্তুত হইয়াছিল—এই টেপু তাহা ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা হইয়াছে। রাজা এইবার বিচারাসনে সিংহবিক্রমে বসিলেন এবং ব্রাহ্মণদের পরামর্শ অনুসারে এই আদেশ দিলেন, "যেহেতু সমস্ত সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারের অধিকারে রাজসভায় মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছে তাহারা অদ্য হইতে পতিত হইল" তিনি কুন্দন আচার্য্যকে সোনার টেপু ও কষ্টিপুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন এবং সুবর্ণবণিকদের উপবীত কাড়িয়া লইয়া শুধু তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া ছাড়িলেন না, তাহাদের সমস্ত

কুন্দন আচার্য্য ও মণিদত্ত।

সুবর্ণবণিকদিগের দণ্ড

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই ধনকুবেরের সমস্ত সম্পত্তি খাসদখল করিবার পর বল্লালের স্বচ্ছলতা হইল। শিল্প তাহাদিগকে এইভাবে নিঃস্ব করিয়া বণিক্ (বকইপের) দক্ষিণাংশে নির্বাসিত করিলেন।

মধ্যযুগের পঞ্চর বল্লালসেন এই ব্যাপারটায় একটুও দমিয়া পড়িলেন না। বাঙ্গলার পশ্চিম হইতে কুশীর দল বলে এদেশে আসিয়া চুক্তার কাজ করিত। গৌড় দাস ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বল্লালচরিতে লিখিত আছে, বল্লালের নিপীড়নে সুবর্ণবণিকেরা সপরিবারে দেশবিদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। "অযোধ্যায়াং প্রযযুঃ কেচিৎ কেচিদ্মলদমিরিস্তথা। চম্পায়াংশ্চ পরে লাক্ষ তাম্রলিপ্তাংশ্চ কেচন। অপরে পুরং কেচিৎ কেচিন্নানাগড়ং যযুঃ।" কিন্তু বল্লালের সেনাদের এবং বল্লালসেনের চক্রান্তে দাস-ব্যবসায়ীরা গৌড়ের পথ রুদ্ধ করিল এবং দাসদের মূল্য দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বাড়াইয়া দিল। ফলে এদেশে দুষ্প্রাপ্যভাবে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মহাকষ্ট উপস্থিত হইল।

ব্রাহ্মণদিগের মতে পরামর্শ করিয়া বল্লাল কৈবর্তদের প্রধান মহেশকে মহামাণ্ডলিকের পদ দান করিয়া কৈবর্তদিগকে সেবার অধিকার দিলেন। দিব্যোক ও ভীমের বিদ্রোহিতায় ভয় পালরাজগণ তাহাদিগের জন্য অনাচরণীয় করিয়া সমাজে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। বল্লাল তাহাদিগকে সেবার অধিকার দেওয়াতে তাহারা কৃতার্থ হইল। বল্লাল সোনার বেণেদের প্রতি অত্যাচার করিয়া জনসাধারণের শ্রীতিলাভের জন্য মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার প্রভৃতি জাতি লইয়া 'নবশাখ' (হিন্দু সমাজের নূতন শাখা) সৃষ্টি করিলেন। আসমুদ্রাচল ইহারা স্থান পাইয়া বল্লালের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিল। বল্লালচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

কৈবর্ত প্রকৃতি জাতির পতি অনুগ্রহ।

বল্লালচরিত ও মাণ্যান-বর্ণিত উপাখ্যানের মধ্যে অতিরঞ্জন, প্রলাপের মিশ্রণ ও সত্যের সংযোগ অবশ্যই আছে। তথাপি মোটামুটি ঘটনাগুলি বিচার-সহ ও প্রামাণিক বলিয়াই মনে হয়।

দ্বিতীয় উপাখ্যান পদ্মিনী-সংক্রান্ত। বল্লালচরিত ও বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস এই উভয় পুস্তকেই এই কাহিনীটি দৃষ্ট হয়। পদ্মিনী হাড়ীর কন্যা—পরমাসুন্দরী, বল্লাল ইহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। হাড়ীর কন্যাকে রাজপ্রাসাদে আনিয়া বল্লাল তাহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় বশংবদ করিয়া রাখেন। লক্ষ্মণসেনের মাতা তাহা কাহারও কাছে শুনিয়াছিলেন। সেই পট্টমহিষীর স্বাভাবিক ভাবেই রাজার এরূপ ব্যবহার দুঃসহ হইবার কথা। ঘটনাটি লইয়া পিতাপুত্রে বিরোধ ঘটে। বল্লাল পট্টমহিষীর গর্ভজাত সন্তান পদ্মিনীকে দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পদ্মিনীর রান্না করা ভাত বৈদ্যজাতির মধ্যে সম্ভ্রান্তব্যক্তি মাত্রকেই খাইতে আরম্ভ করেন। খুব ভারী সোণার খিড়ি ও সোণার পান-ভোজনের আসবাব পুরস্কার দিয়া তিনি বৈদ্যগণকে প্রলুব্ধ করেন। এই কথা পূর্বে (পৃঃ ৪৬৪) একবার উল্লেখ করিয়াছি। যাঁহারা প্রলুব্ধ হইয়া রাজদাঁসে পা দিয়াছিলেন

তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও স্বর্ণপ্রাম উপাধির বাক্স বহন করিয়া সমাজে অবজ্ঞাত হইয়া আছেন।

পশ্চিমের ব্যাপারটা লইয়া খুব বাড়াবাড়ি চলিয়াছিল এমন কি রাজগুরু 'ভীম গুপ্তা' স্বরাজ্য ফালিয়া ত্যাগ করিয়া দূরে বাস করিতে লাগিলেন। অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রাজদরবার হইতে দূরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু বল্লালের প্রকৃতি উদার ছিল সহজেই তাহাকে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হন নাই এক সময়ে লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধে সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু বল্লাল তাঁহাকে মার্জনা করিয়াছিলেন কথিত আছে লক্ষ্মণসেনের পুত্র মধুসেন গৃহত্যাগকালে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে এঁকিয়াছিলেন তাঁহার গলদশ্রু নেত্র তাঁহার মনের আনন্দ বুঝাইয়াছিল, মুখে তাঁহার ভাষা ফোটে নাই বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে

বল্লালচরিত্র।

পরলোকগত মহাপ্রভু কুম যে কয়েকটি ছত্রে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য, "তিনি একদিকে নিকট আত্মীয়ের ছেলে, যজ্ঞস্থলে পরম ধার্মিক ও দাতা, সভামধ্যে পণ্ডিত, যুদ্ধস্থলে মহাবীর, শত্রুদমনে চতুর ও প্রবঞ্চক এবং উপপত্নীর আগারে সম্পূর্ণ মাতাল ছিলেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'নৃপেষু বল্লালঃ প্রেতঃ' বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতেন।"

লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার অনেক শ্লোকের বিনিময় হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। আমরা সেই সকল শ্লোকের কতকগুলি দেখিয়াছি। সেগুলি পিতাপুত্রের রচিত অথবা ইহাদের কলহঘটিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া কোন চতুর ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন তাহা বলা যায় না শেষোক্ত অনুমানই বেশী সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় তবে উভয়েই যে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। • কেহ কেহ বলেন বল্লাল রচিত 'দান-সাগর'

• সত্যং বাম তবাস্পদে সরলঃ স্বাভাবিকী বক্রতা
কিং ব্রূমঃ তটিনীপতে তবাপি ঔচ্চঃ স্পর্শেন বন্ধ্যাশয়ে।
কিং তাতঃ পরমং তব স্তুতিপদং যং জীবনং জীবিতা
ত্বং তস্যাঃসখেষু সজ্জনি পরং কস্যাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ (লক্ষ্মণসেন)

হে জল তুমি স্বভাবতঃই অতি নীচগ তোমার পক্ষে তাহা স্বাভাবিক, তোমার পবিত্রতার কথাই বা আর কি বলিব? তোমার সংস্পর্শে লোকে শুচি ও পবিত্র হয়, সুতরাং তুমি নিজে কত পবিত্র, তাহা বুঝিতেই পার।

আর তোমার ইহা অপেক্ষা প্রশংসার কথাই বা কি বা হতে পারে, যে তুমি সমস্ত জীবের জীবনস্বরূপ। অতএব হে পবিত্র পাপনাশিনি, যদি তুমি এই পাপে পতন কর, তবে কাহার সাধ্য তাহাকে নিরোধ করিবে?

তাপো বাপসরস্বতী ন চ কৃশা যৌবং ন পূর্ণা তবো-
র্যচ্ছয়ামকরি কথকথং কা বাম কেলীকথা?
পূর্বোৎকণ্ঠিতকেন হন্ত কথিতং শ্রুত্বা ন বা পণ্ডিতৌ
প্রায়েণ মধুসূদকাবিতি মহাগ্রাম-কোলাহলঃ। (বল্লালসেন)

ও অদ্ভুতসাগর' নামক যে দুইটি বৃহৎ গ্রন্থ আছে তাহার অধিকাংশ বল্লালের মন্ত্রীপণ্ডিত অনিরুদ্ধ ভট্ট রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে মহাশয় লিখিয়াছেন—পদ্মিনী প্রকৃত পক্ষে হাড়ীর মেয়ে ছিল না বল্লালনিকটে সম্মান বৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতার নিমিত্ত বরণকন্যা। পদ্মিনী হাড়ী বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্বক রাজার ও তাঁহার আত্মীয়গণের ভ্রান্তি নষ্ট করিয়াছিলেন বল্লালসেনের সভাপণ্ডিতগণের ছিলেন হরি ঘোষ এবং দৈবজ্ঞগণের কর্তা ছিলেন মহেশ্বর, এখনও মহেশপুর গ্রাম ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। বল্লালের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল।

যদিও কিংবদন্তি ছিল এবং বাস্তবে দেখা যায়, সেন রাজারা বৌদ্ধ অবলম্বন করিয়া বল্লালসেনের পুত্র ও লক্ষ্মণসেনের পিতৃসিংহাসনে আরোহণের সময় ১১৬৯ খৃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা নানা কারণে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ১১৭০ হইতে ১২০৩ খৃ. পর্যন্ত যথেষ্ট মনে করিয়াছি লক্ষ্মণসেন সৌন্দর্যকারে মহারাজ রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কালজ জয় করেন, যাহার ফলস্বরূপে এই বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যাহার মূর্তি বীরত্বব্যঞ্জক ছিল যাহার বাহুবলস্পর্ধা ছিল এবং যাহা শিল্পসৌন্দর্য ছিল তিনি বৈদ্যদেব গঙ্গা সৈকতে পরলোক গমন করিয়াছেন যদিও কামরূপ তাঁর ও অন্যান্য সেনা সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল তথাপি তাঁহার সময়ে বিদেশীয়ের দোষ নাই এই সব হইতে নিশ্চিত হইতেছে

প্রাচীনগণের ধারণা কেবলমাত্র কলে না বিধাতা এখনও তাহার পরিচয়ের ঢালে ধরা হয় নাই সাধারণ নিয়মের এখনও বিধারিত হয় নাই এমন কি অনেক ঘটনা হয় নাই। এখনও কলে আসিয়া চন্দ্র কলঙ্কশূন্য হয় নাই অন্ধকারের কথা এখন কাহার আর তাহার সম্বন্ধে করা পদ্মিনীকে সম্বন্ধ করে নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে অনেকগুলি মহা সত্যের লোপ হইয়া গিয়াছে।

পরীবাদস্তবো কবিতি বিরহো নাপি মরণং
অকলঙ্কাশ্চন্দ্রো ন হরতি তমিস্রাণি জগতঃ।
ত্রিলোকীবিখ্যাতি প্রকটিতচরিত্রাস্তনুভৃতঃ
যশোধন্যাঃ কেষাং ন হি কথয়তি কক্ষাং কবিগণঃ (লক্ষ্মণসেন

লোকাপবাদে মরণ না করের মহিমা এই হয় তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক। চন্দ্র রাখিতে থাকিলে তাহা অন্ধকারনাশের অপেক্ষা কম অন্ধকার নহে কারণ কিন্তু তথাপি কলঙ্ক রাখিতে না পারিলে চন্দ্রের সে জ্যোৎস্না মহীয়ান হয়।

গুণাধিক্য চন্দ্রের যে কলঙ্কলক্ষ্য তাহা কি তাহার নিজের দোষ না বিধাতার দোষ? সেই জন্য কি চন্দ্র অত্রির পুত্র এই নাম ধারণ করিয়াছেন, না বিষ্ণুর স্থান পান নাই, অথবা পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট করিতে কি অসমর্থ হইয়াছেন কিংবা কলঙ্কের ঢাল হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন

সেখান তিনি যথাসময়ে সেই অর্থ নিবার করিয়াছিলেন। কামরূপ অভিযানে তাঁহার বীরত্ব বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি কামরূপেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া কামরূপের পরাস্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়স্তম্ভ অসংখ্য সমরমণ্ডলে এবং পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীতে যজ্ঞযূপের সহিত প্রোথিত হইয়াছিল। এইভাবে বিজয়ী লক্ষ্মণসেন সমস্ত আর্যাবর্তের রণকৌশলনিপুণ প্রবল রাজা বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

তিনি স্বয়ং সুকবি ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার রাজসভা কলকণ্ঠ কবিগণের প্রতিপত্তিতে মুখরিত ছিল। এই কবিদের মধ্যে "ধোয়ী" অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহাকে রাজসভাসদ্ কবি বলা যায় না, কারণ তাঁহার কাব্য পবনদূতে দৃষ্ট হয়, তিনি লক্ষ্মণসেনের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। স্বতন্ত্রতা স্বচ্ছন্দ প্রকৃতি নাম মূল্যবান রাজযোগ্য উপহার দিয়া লক্ষ্মণসেন ধোয়ী কবিকে অভ্যর্থিত করিয়াছিলেন "পবনদূতে" লক্ষ্মণসেনের বিরহে কোন যক্ষজন পবনকে দোত্যে নিযুক্ত করিয়া যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই অবশ্য করাই যায়। লক্ষ্মণসেনের সমকালবর্তী বিশ্বরূপের ধোয়ী নামক এক প্রসিদ্ধ কবির উল্লেখ অন্যত্র কুলজী গ্রন্থে পাই। তিনি শ্রুতিধর বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ এখন হাওড়ার শিবপুরে চলিতেছে। এক শতাব্দী তিন পুরুষ হিসাবে ধরিলে ধোয়ী সাড়ে ন বংশের পূর্বে আবির্ভূত ছিলেন, সুতরাং ধোয়ীকে লক্ষ্মণসেনের সমকালবর্তী বলিয়া মনে হয়। এই ধোয়ী বৈদ্যদের অম্বিক শাক্তপুরুষ, শক্তি গোত্রে ছয়টি শাক্তপুরুষ ছিলেন। কিন্তু ধোয়ী বিদ্যা, প্রতিভা ও ঐশ্বর্যে এত বড় হইয়া উঠেন যে শক্তি গোত্রের ছয় যাহার যে ছয়জন শাক্তপুরুষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি তাঁহাদিগের সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিলেন; শক্তি গোত্রে আর ছয়জন শাক্তপুরুষ থাকা সত্ত্বেও এক ধোয়ীকে শক্তি গোত্রের একমাত্র শাক্তপুরুষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। চন্দ্রপ্রভায় লিখিত আছে, "পুণ্ডরীক সেনার ও গুহোচ্চলনি ধৃষি সেনঃ বহুল বাজী সচ শক্তি বংশেহনবদ্য বিদ্যাকুল সম্পদাঢ্যঃ", তিনি শক্তি বংশে অনবদ্য বিদ্যা কুল ও সম্পদশালী হওয়াতে "বাজী শক্তি গোত্রেষু সর্বেষাং পরাঃ স্মৃতঃ," অন্য ছয়টি বাজী থাকিলেও সমস্ত শক্তিকুলের তিনি একমাত্র বাজী বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। পবনদূতের অবতরণিকায় কবি নিজের সম্বন্ধে যে সকল গর্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে এই দুই ধোয়ী একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কবি জয়দেব ধোয়ীকে "ক্ষাপতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও যেন মনে হয় যে তিনি রাজকুল সম্পন্ন ছিলেন এইরূপ ইঙ্গিত আছে। ক্ষাপতির অর্থ ভুবনপতি, কবিভুবনপতির অর্থ কবিরাজ। তথাপি ঐ 'ক্ষাপতি' শব্দে যেন একটা পক্ষান্তর ইঙ্গিত দিয়া জয়দেব ধোয়ী যে ভুবন পতি বা রাজতুল্য ছিলেন, তাহাও বুঝাইয়াছেন। বৈদ্যকুলগ্রন্থে ধোয়ীর পিতার নাম পুণ্ডরীক ও পিতামহের নাম শ্রীধরসেন। দুঃখের বিষয় পবনদূতের প্রসিদ্ধ কবির আত্মবিবরণ বা জয়দেবের টীকায় ধোয়ীর পিতা পিতামহের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সেক শুভোদয়াতে আর এক ধোয়ী কবির উল্লেখ আছে। ইনি জাতিতে তাঁতি ছিলেন এবং অতি দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার বৈদ্যাবস্থ

এবং বংশের ইনিই ছিলেন প্রথমদিকে একমাত্র অধস্তন পুরুষ যিনি কবি হওয়ার স্পর্ধা দেখিয়ে ব্রাহ্মণের ঈর্ষাকে জাগ্রত করতে পেরেছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের আর একজন সভাকবি ছিলেন, উমাপতি ধর যিনি বিজয়সেনের প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। তাঁহার বাক্য-পল্লবের সেই ভগ্নাংশ নিদর্শনের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে ক্রমবর্ধমান ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছে, তাহা সেই প্রশস্তি পাঠ করিলে সকলেই প্রমাণিত হয়। বল্লালচরিতে যে একজন সময়মোচক একজন উমাপতি ধরের উল্লেখ রহিয়াছে "উমাপতিধরো বাণী জয়ন্তশ্চ পরাশরঃ। সর্বে বাচস্পতি-প্রখ্যা, " বৈদ্যকুলের যে সকল কীর্তিপুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলেই বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক। সেই সময়েই ইঁহারা গৌড়সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত সমস্ত শ্লোক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতসভাপণ্ডিত একজন মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের সময়ে উমাপতি ধর বল্লালের কুলমর্যাদা পাইয়া ধরবংশে বাঁহারা বাস করিতেছিলেন তাঁহারা ছিলেন শুধুমাত্র। লক্ষ্মণসেনের সময়ে একজন বিখ্যাত বাক্তি ছিলেন। ইহা ছাড়া ইতিহাসে আর একটি নামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে যাহাতে তাঁহাকে লক্ষ্মণসেনের রাজকবিদের অন্যতম বলিয়া মনে হয়। তিনি "রাজবল্লভ" ছিলেন। তিনি কি লক্ষ্মণসেনের শিশু কবিপুত্রদের একজন নন? উমাপতি ধর শুধু কবি ছিলেন না, তিনি রাজসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। সেক শুভোদয়াতে লিখিত হইয়াছে যে মধ্বা নাম্নী কোন রসিক মহিলার কবিত্বশক্তির প্রতিপক্ষে রাজপুরুষ কৃষ্ণ ধরের তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল। মাধবী সেইজন্য রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কুমারদত্তের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করে। উমাপতি ধর মধুর আড়ম্বর দেখাইয়া মাধবীকে অভিযোগ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাহাকে বিপন্ন দেখিয়া রাজী বল্লভা স্বয়ং রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজার হাত ক্রুদ্ধ কটাক্ষে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার কে করিবে, জানতে চাই যে সভাসদরাজ, এই উমাপতি ধর আজ পালিছে, এই ব্যক্তি মাধবীকে আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে" তখন উমাপতি ধরের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। সে মুখে উত্তর জুটিল না, বিজয়সেনের প্রশস্তি লেখক উমাপতি ধর লক্ষ্মণসেনের সময়ে অনেক বয়সে প্রাচীন হইয়াছিলেন। তিনি রাজসভায় আসা করিতেন, সেক শুভোদয়াতে উল্লিখিত আছে যিনি বাসা কৃষ্ণস্তরুক সভা-স্থায়ী লক্ষ্মণসেনের টীকায় পাইতেছি —"উমাপতিধর নাম্না লক্ষ্মণসেন-গৌড়েন্দ্র-সচীবঃ।" *

কবি সোবন্ধুনাচার্য "আর্যাসপ্তশতী" নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহার পদলালিত্য

* সেক শুভোদয়া ও সিদ্ধিসাগরী কৃষ্ণমিশ্রের গদ্য নাটী প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকা। উহা পুস্তকেই উমাপতি ধর লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। চন্দ্রপ্রভায় উমাপতি ধরও লক্ষ্মণসেনের সময়ামায়িক সিদ্ধিই বাক্তি এবং 'রাজবল্লভ' বলিয়া উল্লিখিত, সুতরাং ইঁহারা অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

সুবিদিত লক্ষ্মণসেনের সময়ে ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেক শুভোদয়া গ্রন্থে গোবর্দ্ধনের সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সেবকল চরিত্রবান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যখন রাজ্ঞী বল্লভা দেবী তাঁহার ভ্রাতৃ কুমারদত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার দরুন সকলের সমক্ষে মাধবীকে অতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রী উমাপতি ধরকে দুর্দ্ধাকা বলিয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন, তখন রাজার সেই ক্রোধ-প্রদীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া স্বয়ং পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব বাধা দেন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময়ে কৌপীনসার অধিকৃত আচার্য্য গোবর্দ্ধন খড়্গহস্তে রাজ্ঞীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, তারপর লক্ষ্মণসেন সিংহাসনের রোগা করেন, এই বলিয়া "শ্রীমতাং রাজ্যং অচিরাদ্বৈব ভবিষ্যতি" এই অভিসম্পাত করিতে করিতে রক্তকমণ্ডলুহস্তে রাজসভা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনাটি সেক শুভোদয়াতে যেরূপ আছে, সেইভাবে সংক্ষেপে আমরা পরে লিখিব সেক শুভোদয়ায় গোবর্দ্ধনকে 'আচার্য্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, জয়দেবও ইঁহাকে আচার্য্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু জয়দেব সকল কবিরই কোন না কোন দোষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন আচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি আদিরস-বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গোবর্দ্ধনাচার্য্য।

পরন্তু কবি সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন "ইনি কত ছন্দে কাব্য লিখিতে জানেন কিন্তু ইঁহার ভাষা অতি দুরূহ।" এই বিদ্রূপাত্মকের মধ্যে জয়দেব কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইনি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বিশাল সংস্কৃত-সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসনের দাবী করিতেছেন ইহার বাড়ী ছিল বীরভূম জেলার কেন্দুলী (কেন্দুবিল্ব) গ্রামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে বৎসর বৎসর মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিনে একটি মেলা বসিয়া থাকে। "দশাবতারস্তোত্র" জয়দেবের শেষ কাব্য; এই কাব্যের "মৃত্তিকা পীতাম্বর" নামক ছন্দ বা শেষ অধ্যায়ে কবি তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ঐ স্থানে আরও লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁহার পরাশরাদি কয়েকজন প্রিয় বন্ধুর কণ্ঠে বনকুসুমমালিকার ন্যায় এই কীর্ত্তিকাব্যখানি উপহার করিলেন। এই কাব্যে আমরা আরও আভাসে জানিতে পারি যে পদ্মাবতী নাম্নী এক রমণী যখন নৃত্য করিতেন তখন তাঁহার গতির তালে রাখিতে কবি সুদক্ষ ছিলেন পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীগীতগোবিন্দে জয়দেবের স্ত্রী রোহিণীর নামও উল্লিখিত হইয়াছে বনমালী কর্ত্তৃক জয়দেব-চরিত, নারায়ণকৃত ভক্তমালা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় পদ্মাবতী জগন্নাথ মন্দিরের সেবাদাসী ছিলেন। সেবাদাসীরা নৃত্যগীতে দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখেন, শ্রীগীতগোবিন্দেও পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্ত্তী পদে এই কথাটির প্রতি ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। সেক শুভোদয়ার ঐতিহাসিক প্রভাব বড় বেশী, সুতরাং তাহাতে অনেক আলোচ্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। এই পুস্তকে জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্বন্ধে লিখিত আছে—একদা রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁহার

সভায় বিখ্যাত নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা, শশিকলা এবং বড় বড় পণ্ডিতের সহিত সঙ্গীতালাপে আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন, এই সময়ে রাজদরবারে বৃদ্ধ মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, "আমি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। আমি ভূভারতে যাইয়া রাজা কলিলেশ্বরের সভা জয় করিয়া জয়পত্র পাইয়াছি এখন আপনার সভায় যদি এমন কেহ থাকেন যে তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে ডাকুন।" রাজার নিকটে তখন সেক জালালুদ্দিন তরেক উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বৃদ্ধ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ আপনি কোন্ বিদ্যাবিশেষে পারদর্শী?" বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি পঞ্চমস্বর রাগই বিশেষ করিয়া অভ্যাস করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি পঞ্চমস্বর রাগে গান গাহিতে লাগিলেন সেই গানের স্বরসঙ্গে সমুখবর্তী শিঙ্গলক কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার নলোদ্ভূত পত্র পল্লব করিয়া পড়িল সভাস্থ লোক বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এমন তো কখনই দেখি নাই, কখনও শুনি নাই বটে আপনি ব্রাহ্মণ।" তখন রাজা সটচন্দ্রায়ক তরেক ব্রাহ্মণকে মিশ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। বাদ্যবিদ্যা বন্ধ হইতে লাগিল এই সময়ে কমলের মিশ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্মাবতী সেকমুখে এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন তিনি সভার সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি আমার স্বামিসহ যেখানে বিদ্যমান, সেখানে এক কার্য্য সিদ্ধ আছে সেই জয়পত্র পাইতে? আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, ইনি আমাদের সঙ্গে শাস্ত্রে অথবা সঙ্গীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়ী হইতে ইচ্ছা করেন কি না? আমি অথবা আমার স্বামী এই দুইয়ের মধ্যে যাহার সঙ্গে ইহার ইচ্ছা, ইনি সংকল্পকতা করুন।" সেক জালালুদ্দিন বলিলেন "মাতঃ! আপনার স্বামী কল্য তাঁহার সঙ্গে পরে হইবে, এখন আপনি আপনার সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিন।" পদ্মাবতী গাহিবার ইচ্ছা করিলেন সেই গানের সুরলহরী যখন গঙ্গাবক্ষে খেলিতে লাগিল, তখন সমস্ত নৌকা সেই স্থানে আপনা হইতে আসিয়া জড় হইল শ্রোতৃমণ্ডলী ব্রাহ্মণীকে পূজা প্রদান করিয়া বলিল "মরি ইনি, ইহার সঙ্গীতে কাননস্থিত নৌকা সকল হইয়াছে, মরাগাছে পাতা হইয়াছে ইনিই জয়ী হইয়াছেন, এরূপ কখনও শুনি নাই, দেখিও নাই।" তরেক বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনাদের মধ্যে কে জয়ী হইয়াছেন— আমার সঙ্গে শাস্ত্রের বিচার দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন।" বৃদ্ধ মিশ্র বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহি না, যেহেতু এদেশে রমণীরা বহুগুণশালিনী, পুরুষদের গুণ নাই।" এই কথা শুনিয়া পদ্মাবতী তাঁহার স্বামীকে পাঠাইয়া রাজসভায় জয়দেবকে আনাইলেন। জয়দেব আসিয়া বলিলেন, "আমার রাজদর্শন হইয়াছে, আমাকে আহ্বান করা হইয়াছে কেন?" জালালুদ্দিন বলিলেন, "ইহারই গুণের পরিচয় ইহারা দিয়াছেন, এখন আপনার গুণপনা আমরা দেখিতে চাই।" জয়দেব উত্তরে কহিলেন, "ইহার সঙ্গীতে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে কিন্তু বসন্তকালে গাছের পাতা আপনা আপনিই ঝরিয়া পড়ে, ইহাতে বাহাদুরী কি?" জালালুদ্দিন বলিলেন, "তখন মিশ্রমহাশয় বসন্তকালে

জয়দেব ও পদ্মাবতীকর্তৃক বৃদ্ধ মিশ্রের পরাজয়।

পাতা ঝরিয়া পড়ে সত্য, কিন্তু একদিনে সকল পাতা পড়ে না, প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া পড়িয়া থাকে।"

জয়দেব বলিলেন "যে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে, আপনি তাহাতে পত্রোদ্গম করুন" বুচন বলিলেন, "ইহা আমি পারিব না" জয়দেব কহিলেন, "তবে এইটি স্থির করুন যিনি গাছে নূতন পাতা জন্মাইতে পারিবেন, তিনিই জয়ী।" বুচন মিশ্র এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সেক জালালুদ্দিন উভয়ের প্রস্তাব ও সম্মতি শুনিয়া অনুমোদন করিলেন। তখন জয়দেব বসন্তরাগে গান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কদম্ব নবপত্রপল্লবে গাছটি ভরিয়া গেল। ইহাতে চারিদিকে জয় জয় শব্দ উত্থিত হইলে বুচন মিশ্র রাজার নিকট হইতে যে সকল উপঢৌকন পাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই জয়দেবকে দিতে উদ্যত হইলেন। রাজা সেক জালালুদ্দিনের কথায় ব্রাহ্মণকে সেই সকল অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং আরও কিছু দ্রব্য আনিয়া বুচন মিশ্রকে প্রদানপূর্বক তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

অনেকটা সাল মিশানো উপকথাটির মধ্যে এই সত্যটুকু পাওয়া যায় যে, জয়দেব ও পদ্মাবতী উভয়েই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, এবং বুচন মিশ্র নামক সঙ্গীতজ্ঞের নিকটে প্রকাশ্য রাজসভায় ইঁহারা পরাস্ত হইয়াছিলেন। জয়দেব সম্বন্ধে আরও অনেক গল্পকথা পাওয়া যায়। একবার তাঁহার হস্তপদচ্ছেদনপূর্বক সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছিল এবং সৈন্যরা সেই ছিন্ন অঙ্গগুলি ফেলিয়া দিয়াছিল। তিনি গীতগোবিন্দে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই কথা কয়েকটি লিখিতে স্বভাবতই বিলম্ব করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার অলোচক্ষে রূপ ধরিয়া তাঁহারই ছদ্মবেশে গৃহে আসিয়া নিজহস্তে ঐ শ্লোকাংশ লিখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে একদা তাঁহার মৃত্যুর একটা মিথ্যা সংবাদ রাষ্ট্র হয়, তাহা শুনিয়া পদ্মাবতী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি, বিশেষতঃ কবিজগতে। জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প কথিত হইয়া থাকে। এ সকল আজগুবি কথার বুদ্বুদগুলি ছেঁকিয়া তাঁহার সত্যকার স্বীকৃতি উদ্ধার করা বড় কঠিন।

উপকথার সাহায্য।

জয়দেব সম্বন্ধেও ইহাই হইয়াছে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে কবি বীরভূমের প্রিয় ছায়াশীতল কেঁদুলী গ্রামে বাসপূর্বক অজয় নদীর জলস্পৃষ্ট সমীরে পুলকিত হইয়া 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরীশীলনকোমল' প্রভৃতি স্মরণীয় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পদ্মাবতী মৃত্যুপর্যন্ত কৃতবিদ্য ছিলেন এবং ইঁহারা উভয়ে রাজা লক্ষ্মণসেনের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কবি লক্ষ্মণসেনের ন্যায় এত বড় রাজার আশ্রয় পাইয়াও কাব্যে তাঁহার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার প্রিয় পদ্মাবতী প্রভৃতি সখীদিগের নামে পুস্তকের উৎসর্গ পত্র লিখিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জয়দেবের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। উমাপতি ধর ও শরণ পর্যন্তও বঙ্গীয় কবিরা গৌড়ীয় রীতি অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের তাণ্ডব দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু

জয়দেব সেই পন্থা ত্যাগ করিয়া কাব্যে সুশ্রাব্য সরল মধুর ললিত পদবিন্যাস করিয়াছেন। এই কাব্যের ছন্দের সঙ্গে গানের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে জয়দেবের সময় হইতে সংস্কৃত যে কাব্যের ছন্দ গানের উপযোগী ছিল এই ছন্দ গাহার গান কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিত তাহারা ইহার ছন্দ ঠিক রাখিতে পারিত না। এই কারণে ইহার ছন্দ ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহার ছন্দ ঠিক করা বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

জয়দেবের পরে সংস্কৃত প্রাকৃতের অনুকরণ।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। বাঙ্গালা দেশের ঠিক কোন সময়ে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে ইহা যে বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি তাহা নিঃসন্দেহ। বাঙ্গালা দেশের ঠিক কোন সময়ে অশিক্ষিত গায়কেরা পালা করিয়া কৃষ্ণযাত্রার গান করে তাহা নির্ণয় করা যায় না। মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাস্তার লোকেরাও গাইয়া থাকে। গীতগোবিন্দের ছন্দ ঠিক সংস্কৃতের অনুবর্ত্তী নহে, বরঞ্চ প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সৌন্দর্য্যপ্রিয় বিদগ্ধ রসজ্ঞ ব্যক্তির বিলাস-কৌশল ঐতিহাসিক মহাকাব্যে দৃষ্ট হয় না। তাহার হৃদয়ের কতকগুলি বিচিত্র ভাবের স্ফূর্ত্তি আসিলে পথিক যেরূপ উদাসীন হইয়া পড়ে এই কাব্য পাঠকে পণ্ডিতে পারকের মনে সেইরূপই একটা বিরক্তি উপস্থিত হয়। সকলগুলিই সুন্দর ও সুন্দর, কিন্তু তাহার অধিকাংশই কোন বিশেষের অধীন নহে, কবির মন যখন যে ভাবটি আঁকিয়াছে, তাহাই তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই কাব্যে প্রাকৃত শব্দের প্রয়োগ এত বেশী যে অনেকে মনে করেন বঙ্গদেশের আকাশে বাতাসে যে সকল গান প্রাকৃত ভাষায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, যে সকল প্রাকৃত পদাবলীর আদরে কবি বাস করিতেছিলেন, সেই সকল গানের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া তিনি তাহাদের রূপান্তর সাধনপূর্ব্বক গীতগোবিন্দে স্থান দিয়াছেন। এই গুণেই ইহার ছন্দের রীতি ও অভিধান এতটা প্রাকৃত ভাবাপন্ন এবং এ জন্যই ইহার ভাষায় প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য এবং বুঝি বা এই জন্যই এই কাব্য জনসাধারণের মন এতটা ছুঁইতে পারিয়াছিল। 'গৌড়ীয় রীতি' উমাপতি ধরের রচনায় চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। জয়দেব পরিক্রিয়ার আদি প্রবর্ত্তক।

Pischel প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে কোন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় প্রথমতঃ এই সকল পদ রচিত হইয়াছিল, জয়দেব পরে তাহাদিগকে সংস্কৃতের রূপ দিয়া বিকৃতরূপে সেবা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমার সুশীলকুমার দে মহাশয় বলেন, পদাবলীতে প্রযুক্ত ভাষার রচনার পদ্ধতি সংস্কৃত কাব্যের অনুরূপ নহে, বরং এই ছন্দ ও সরল গেয় পদগুলি লৌকিক গানের পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি অতি অল্প চেষ্টায় অনেক পদকে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতে এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রাকৃতপিঙ্গলে উদাহৃত গাথাকুলক প্রভৃতি যে সকল মাত্রাচ্ছন্দ ইহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কবিতার আদর্শে, সংস্কৃতের নহে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে বাঙ্গলার প্রাচীন ছন্দগুলি জয়দেবের ছন্দোমূল, একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, জয়দেবের ছন্দ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতার নানা ছন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কবি দেশীয় রীতির অনুগামী হইয়াছিলেন বলিয়াই দেশীয় ভাষার উপর তাঁহার এতটা প্রভাব। সুশীলবাবু দেখাইয়াছেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার অনেক কবিতায় 'কবিরাজরাজ' জয়দেবের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার 'যদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী'র ধ্বনির অনুকরণ আমরা 'একদা যদি মন্দ ধ্বনি কিঞ্চিতে নব ভুবনে' শুনিতে পাই।

জয়দেব যে নূতন রীতি সংস্কৃত সাহিত্যে আনয়ন করেন তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক কবি জয়দেবের অনুকরণে কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। সকলেই যে রাধাকৃষ্ণ বিষয় লইয়া লিখিয়াছেন, তাহা নহে, অনেকে শিব ও পার্ব্বতীসম্বন্ধেও এইরূপ কাব্য প্রণয়ন করেন। এইরূপ কয়েকটি কাব্যের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইব।

১। মৈথিল কবিশেখরাচার্য্য রচিত সম্ভবতঃ কাব্য "গীত-গিরীশ"।
২। পঞ্চপতিরাজ পুরুষোত্তমদেব কৃত "গীত-গৌরীপতি"।
৩। হরিশঙ্কর-কৃত "গীত-বাসব"।
৪। শ্রীহরি আচার্য্য কৃত "গীতকৌস্তুভ"।
৫। চন্দ্রকৃষ্ণ কৃত "গীতগোপাল"। ইনি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।
৬। তাম্রলিপ্ত কবিচক্রবর্ত্তী কৃত "শৈবকাব্য গীত-গৌরীশ"।
৭। ত্রিকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত "গীতশঙ্করীয়ম্"
৮। গীত-গৌরীপতি কাব্য (ইহা ১৮২০ সালে প্রবন্ধমালা নামক সংস্কৃত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়)।
৯। কল্যাণ-প্রণীত "গীত-সদাশিব"।
১০। রামভট্ট-প্রণীত "গীত-গিরীশ"।
১১। ভূধরপুর প্রভাকর-প্রণীত "গীত-বাসব"।
১২। তিরুমল-কৃত "গীত-গৌরী"।
১৩। জয়দেব (২য়)-কৃত "রামকৃষ্ণ গোবিন্দ"

কেবল যে সংস্কৃতেই গীতগোবিন্দের অনুকরণে ৎঃপ্রাপ্ত কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, বঙ্গেতর প্রাদেশিক ভাষায় কোন না কোনটিতেও গীতগোবিন্দের প্রভাব লক্ষিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে নন্দদাস নামক একজন কবি "পঞ্চাধ্যায়ী" নামে জয়দেবের অনুকরণে একটি কাব্য লেখেন [মাসিক পত্রিকা "পঞ্চপুষ্প," ১৩২৪ সনের কার্ত্তিক সংখ্যা পৃঃ ৯৫৩-৯৫৭।]

জয়দেবের কাব্যে স্বর্গ হইতে দেবতারা নামিয়া আসিয়া মৃত্তিকার কুটির ছুঁইয়াছিল। এই কাব্যের ধ্বনি আমরা চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড় বলে পাই, চণ্ডীকাব্যে খুল্লনার বনবাসকালীন বিরহে,—বিদ্যাপতির পদে ও বহু বৈষ্ণব কবিগণের গানে পাই সেই ধ্বনি রঘুনন্দন কৃত রামরসায়নে ও আলোয়ালের পদ্মাবতে পাই, কিন্তু ভারতচন্দ্রেই যেন উহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাই। সুতরাং বাদশ

আমরা জয়দেবের প্রভা।

শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ছয়শত বৎসর কাল জয়দেবের অপ্রতিহত প্রভাবকাল। মাণিক্যচন্দ্র, গুপ্তচন্দ্র, পাল, পাহাড়িয়া, মোগল ইহাদের রাজত্বেও প্রভাবকাল এত দীর্ঘ নহে। এখনও জয়দেবের রাজ্যেই আমরা বাস করিতেছি, তাঁহার মন্ত্রিত প্রবন্ধ-লহরীর পরিশীলনমধুর সমুজ্জ্বল স্পর্শ পুলকিত "বঙ্গ-কুঞ্জের" পক্ষ আমরা, যদিও ভারতচন্দ্রের পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কবি আর ইহার বড় একটা অনুকরণ করিতেছেন না, তথাপি তিনি যে হাওয়া বহাইয়া দিয়াছেন তাহা এখনও অল্প স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে পুলকিত করিতেছে। সেদিনও কবিওয়ালা রাম বসু "তব নই আমি যুবতী, কেন আমাকে এনে রতিপতি" গানটিতে জয়দেবের একটি চরণ তুলিয়া এমন সুললিত করিয়া গাহিয়াছেন যে, কে বলিবে বঙ্গের কবির এখনও তাহার পরাভবে চক্ষে জল আসিতে পারে।

স্থানাভাব অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তি কবিসম্বন্ধে কথার অবতারণা আমরা এখানে করিব না। ইহা নিশ্চিত যে চৈতন্যদেবের সাক্ষাদ্ভাবে জয়দেবের গান অহর্নিশ করিতেন। এখনও ভারতের সমস্ত স্থানে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে জয়দেবের মধুনিষ্যন্দিনী পদাবলী সমাদৃত হইয়া থাকে, এখনও কীর্ত্তন গানের বৈষ্ণব কবির পদ গান করিবার সময়ে গুরু, রাত্র হইয়া যোড় হাত পরিধানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া গানের গুরু জয়দেবকে বন্দনাপূর্ব্বক কীর্ত্তন আরম্ভ করে। শ্রোতৃবর্গও এই সকল গান গাহিবার সময় একটা বিশুদ্ধ ভাবের ও ভক্তির স্রোত আসে। "যদেন পরিচীয়তে"—গানের ফলেই তাহার পরিচয়। যাহার গানে দেবতা স্বয়ং আসরে উপস্থিত হন, তাহার কাব্যে "গোবিন্দ নাই" ইহা আছে—এই সকল মতবা বালকোচিত। শ্রীগোবিন্দের কোন বিদগ্ধ সমালোচক দীনতার প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহার সম্মান নষ্ট করেন নাই। যদিও সাহচর্য্যের জন্য বাঙ্গালার প্রধান বাক্তিরা বাঙ্গালার নিকট ঋণী আছেন তাহা মানে না। বস্তুতঃ শ্রীজয়দেবের সংস্কৃত ভাষাকে বাঙ্গালা করার জন্য সাহিত্যে আমরা যে কৃতি স্থাপন করিয়াছেন তাহার তুলনা সুলভ নহে। লাটিন্ ভাষা, যাহা সর্ব্বত্র সমাদৃত, তাহার আদর আর ঘুরোপে নাই। শিক্ষা ঘরের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে কচিৎ তাই একটি লাটিন শ্লোক আবৃত্তি হয় এই মাত্র। কিন্তু জয়দেবের সংস্কৃত এখনও সজীব। লোকের মুখে মুখে, গানের আসরে, মন্দিরে, শুভসমাগমে উৎসবোপলক্ষে, সাধুর কণ্ঠে সতীর মুখে, নটকণ্ঠে শ্রীতে জয়দেবের রাজত্ব এখনও ভারতের সর্ব্বজনস্বীকৃত।

ক্রটির কথা।

ঃ, ং প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ বর্জ্জিতকল্প। এই সকল বর্ণ ইংরেজী ভাষায় খুব বেশী। এই বর্ণগুলি-দ্বারা কবির ভাব হয় সত্য, কিন্তু ইহাদের অনুস্বারক গৌরব কোমলতা নহে—বরঞ্চ কঠোরতা। কিন্তু ল, ন, য প্রভৃতি বর্ণ বড় কমল। জয়দেবের অধিকাংশ পদে এই বর্ণত্রয়ের আধিক্য—যথা—"অমল কমল-দল-লোচন ভবমোচন" "ত্রিভুবন-ভবন নিধান" "অলিকুল সঙ্কুল-কুসুম সমূহ নিরাকুল বকুল কলাপে," "মধুসূদন বদন সরোজং," "কোকিল কলরব কূজিত," "চরণ-কমলগলদলক্তকসিক্ত-ইব বিভাতি," "নয়ননলিনমিব বিগলিতনালং," "বসতি বিপিন বিতানে তামপি ললিতলবঙ্গ লতাপরিশীলন কোমল মলয় সমীরে," "চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং নীলনিচোলং," "মধুর-মধু যামিনী," "রমসি

মম চরণং, স্মরসি মম ভাবনং, হরসি ধন ভয়ভঞ্জনহেতুং, "মধুমুদিত মধুপকুল কলিতরবে—" এইরূপ পদ অসংখ্য। বাঙ্গলাভাষা এখন পর্য্যন্ত এই সকল কোমল কান্ত পদাবলীর মোহিনী এড়াইতে পারে নাই। জয়দেব সমস্ত পদই সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এই সন্ধি বাণভট্টের সন্ধি নহে, ইহা ফুলের গাঁথি—এই কাব্য সংস্কৃতের মধ্যে এক কথা কহিয়া বঙ্গ ভাষার অনাগত মহিমার পথ অনুলিসঙ্কেত করিতেছে। কাব্য হিসাবে পড়িতে গেলেও জয়দেবের মধুরাক্ষরা কবিতা কর্ণের চরিতার্থতা করে, কিন্তু গায়কের কণ্ঠে জয়দেবের ভাষাবিষ্ট সুর কোকিলকণ্ঠ, বীণা বা সপ্তম্বর বিহঙ্গের মধুর নিস্বনের ন্যায় স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়। জয়দেব স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, ভক্তের নিকট তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে—ইতিহাস এই কথা প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু তিনি ভক্তকে তাঁহার আসরে ঢুকিতে দিয়া জনসাধারণের বিরুদ্ধ দ্বার অর্গলবদ্ধ করেন নাই। এই জন্য তিনি লিখিয়াছেন যাহারা তাঁহাদের মন সরস করিতে চান তাঁহারা আমার কাব্য পড়ুন, এবং তাঁহারা বিলাস কলায় কুতূহলী তাঁহারাও এই কাব্য পড়ুন। কথাটা মানুষের একসঙ্গে একরূপ নহে তাহাতে স্বর্গের দ্বার প্রতিফলিত হয় এবং পার্থিব ভোগের ইন্দ্রজাল তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভাবের ক্ষেত্র—এই দ্বৈতযোগিনী। জয়দেবের কবিত্বসম্বন্ধে সুললিতভাবে লিখিয়াছেন, "জয়দেব পরবর্ত্তী ভক্তিকাব্য অনুসরণ করেন নাই কিন্তু পরবর্ত্তী ভক্তিকাব্য তাঁহার কাব্যগ্রন্থকে শাস্ত্ররূপে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে।" "কবি কল্পনার লালিত্যের সহিত গুরুর শিল্পের সংযম, যথার্থে পদলালিত্যের সাপেক্ষ সার্থকতা, সমধুর আলেখ্যলেখনে দক্ষতা, ধ্বনিবৈচিত্র্য, ছন্দঃস্বাচ্ছন্দ্য, পদযোজনা ও শব্দমাধুর্য্য তাঁহার কাব্যকে একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। জয়দেবের কাব্যকলাপে বৈচিত্র্যলালসার সৃষ্টি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও সামর্থ্যের স্বেচ্ছাচারিতা বা প্রাগল্ভ্য নাই। শিল্পনৈপুণ্যের সুষমা থাকিলেও অনর্থক আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা নাই, ইহার কান্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দগতি পাঠকের মনকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। শব্দসম্পদে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধশালী। প্রতিভাবান কবিগণ যে অদ্ভুত শব্দ-বিন্যাসনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা কেবল সংস্কৃতের মত ভাষায় সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কৃতের শব্দমাত্রেপরম্পরার যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তাহার সহজ ও সুনিশ্চিত প্রয়োগে এতাদৃশ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কবি দুর্লভ।" (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৯—৫৮২-৫৮৩ পৃষ্ঠা।)

ভক্তি ও ভোগ।

আমরা জয়দেবের প্রসঙ্গ একটু বিস্তারিত করিলাম কারণ আমার এই ইতিহাস শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। আমার নিকট মগধের মৌর্য্য অশোক যেমন, তদপেক্ষা বড় নবদ্বীপের চৈতন্য, সিংহলবিজয়ী বঙ্গের বিজয় আমার নিকট যেরূপ, অক্ষএশিয়া-বিজয়ী গুপ্তবংশের চেন্দ্রগুপ্ত বা তদধিক বড়। যে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব একজন সভাকবি ছিলেন আমার পক্ষে সেই লক্ষ্মণসেনের সিংহাসন অপেক্ষাও বড় সিংহাসনের অধিষ্ঠাতা—সেই নিভৃত কেন্দুলি গ্রামের জয়দেবের

জয়দেবের ভারতব্যাপী খ্যাতি প্রতিষ্ঠালাভের প্রমাণ এই যে, গীতগোবিন্দ প্রণীত হইবার অল্পকাল পরে বিভিন্নদেশী ভক্তবৃন্দ প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ রাস এই কাব্যের সম্পূর্ণ নামক টীকা প্রণয়ন করেন পরবর্তী কালে আরও অনেকে ইহার টীকা রচনা করেন। তন্মধ্যে শঙ্করের গাম্ভীর্যের টীকাই প্রসিদ্ধ। পৃথ্বিরাজের সভাসদ চাঁদকবি 'চৌহান রাসো' নামক কাব্যে জয়দেবের উল্লেখ করিয়াছেন (জয়দেব অর্থাৎ কবি কবিসম্রাট কিন্তু কেবল কবি গোবিন্দ নামে)। পৃথ্বিরাজ মৃত্যুমুখে তাঁহার ১১৯৩ খৃঃ অব্দে শাহবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক নিহত হন সুতরাং জয়দেবের কাব্য তৎপূর্বেই রচিত হইয়াছিল রাজপুতানার অন্তর্গত মিবারের অধিপতি রাণা কুম্ভ ১৪১৯ খৃঃ ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। গীতগোবিন্দের যে "রসিকপ্রিয়া" নামক টীকা প্রণয়ন করেন তাহাই বোধ হয় অদ্যাবধি টীকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত আছে যখন তিনি কেলবে মণ্ডলকোটে মালবী নগরের অধিপতি মহারাজ বিক্রমকেশরীর সভায় গীতগোবিন্দ নিত্য গীত হইত। জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে গেলে এই বিক্রমকেশরীর আদেশে ধনপতি সদাগর বিক্রমশিলা স্থাপন করিয়াছিলেন। বিক্রমকেশরীর ভগ্নপ্রাসাদ ও অপরাপর চিহ্ন এখনও মালবাদেশে বিদ্যমান রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে কৈলাসে শ্রীহর্ষদেবের ক্রমসরোবরে নৌবিহারের সময়ে গীতগোবিন্দ গীত হইত উৎকলে এইরূপ প্রবাদ আছে যে তথাকার কোন রাজা নিজহস্তে স্বয়ং একখানি গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানা হয় নাই। কথিত আছে পরম বৈষ্ণব কর্ণাটের গায়কগণ শ্রীক্ষেত্রের অন্তর্গতিথিতে গীতগোবিন্দ গান করিতেন সেনেরা কর্ণাটব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ছিলেন। এইজন্য বোধ হয় কর্ণাট গায়কগণের প্রতিপত্তি রাজসভায় বেশী হইয়াছিল এবং তাঁহারা গীতগোবিন্দ গানের রীতিতে বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন।

গীতগোবিন্দের টীকা।

প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত Aufrechtএর (Catalogus Catalogorum) "গীতগোবিন্দে"র অনেকগুলি টীকার উল্লেখ আছে। যে সকল টীকাকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই অ-বাঙ্গালী ইহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েকজন টীকাকার ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইল :—

	টীকাকার	টীকার নাম
১।	চৈতন্য দাস	বালবোধিনী
২।	"	রচনমালিকা
৩।	উমাপতাচার্য্য	ভাববিভাবিনী
৪	কমলাকর	পদ্মমালা
৫	রাণাকুম্ভ	রসিকপ্রিয়া
৬।	মৈথিল কৃষ্ণ দত্ত	গঙ্গা
৭।	কৃষ্ণদাস	

	টীকাকার	টীকার নাম
৮	গোপাল	অর্থরত্নাবলী
৯।	নারায়ণ ভট্ট	পদচন্দ্রিকা
১০।	নারায়ণদাস	সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী
১১।	পীতাম্বর	
১২।	ভগবদ্দাস	রসকল্পকল্লোলিনী
১৩		ভাবাচার্য্য
১৪।		বালক
১৫	রামভদ্র	মাধুরী
১৬।	রামরুদ্র	
১৭।	পণ্ডিত রূপদেব	মানস গোবিন্দ
১৮।	লক্ষ্মণভট্ট	
১৯।	লক্ষ্মণসূরি	শক্তি-রঞ্জিনী
২০।	বনমালী ভট্ট	
২১	বিট্ঠলনাথিক	
২২	বিশ্বেশ্বর ভট্ট	শক্তি-বৃদ্ধিনী
২৩।	শঙ্কর মিশ্র	রসমঞ্জরী
২৪	শার্ঙ্গিনাথ	
২৫।	শেষ রত্নাকর	সাহিত্যরত্নাকর
২৬।	শ্রীকান্ত মিশ্র	পদভাবার্থচন্দ্রিকা
২৭।	শ্রীধর	
২৮	সদন্তধারণ	শ্রীগুপ্তগোবিন্দ-তিলকোত্তম
২৯।	অনূপ সিংহ	অনূপোদয়
৩০।	চিদানন্দ ভিক্ষু	
৩১।	জগদ্ধর	সারদীপিকা
৩২।	ধৃতিকর	
৩৩।	ভগবদ্দাস	
৩৪।	অর্জ্জুনদাসের পুত্র বাসুদেব বাচস্পতি	পদার্থবিদ্যাসুন্দরী
৩৫।	তিরুমলরাজ	শক্তিসারতরঙ্গিনী
৩৬	রামভদ্রের পুত্র রামকৃষ্ণ	শ্রীগুপ্তগোবিন্দপ্রবোধ
৩৭	কুমারখান কৃষ্ণ	
৩৮।	কোন্তভভট্টের ভ্রাতা লক্ষ্মণ	লক্ষ্মণভট্টিবিলাসিনী

"দেহি পদপল্লবমুদারম্" পদটির কথা একবারে উল্লিখিত হইয়াছে কথাগুলি জয়দেবের লেখনীর মুখে আসিয়াছিল কিন্তু তাহা লিখতে জয়দেব ভরসা পান নাই।

দেহি পদপল্লবমুদারম্

ত্রিলোকপতি ভগবান্ কৃষ্ণ গোপনারীর মন ধারণ করিবেন, ইহা লিখিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্নান করিতে গেলেন, ইতোমধ্যে কৃষ্ণ জয়দেবের বেশে উপস্থিত হইয়া পদ্মাবতীর কাছে লেখনী চাহিয়া লইয়া স্বয়ং "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্নানের পর গৃহে আসিয়া জয়দেব এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন।

এই প্রবাদটি একটি তুচ্ছ কথা নহে। ইহা বঙ্গীয় ধর্ম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের একটা মস্তবড় ইঙ্গিত। বাঙ্গালী তাহার দেবতাকে নিজের অন্তরের অন্তরতমদেশে আনিয়া সমারোহের অর্ঘ্য পালন করেন দেবতাকে যাহারা মানুষের প্রাণ দিয়া গড়িয়া জীবন্ত করিয়া তোলেন বঙ্গের বেদীতে এইভাবে দেববিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় বাঙ্গালী তাহার দেবতাকে বড় করিয়া দূর হইতে দেখিয়া হাতে করে পূজার ফুল নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া পালান না। বঙ্গের মাতার নিকট দেবতা শিশু, তাঁহার পূজে বঙ্গ-জননীর কোমল চড়ের দাগ এবং তাহার হাতে বঙ্গ-জননীর নাড়ু খাইবার চিহ্ন বঙ্গের সখা দেবতার কাঁধে চড়েন, ফলটি খাইতে যখন দেখেন উহা সুস্বাদু তখন সেই সঙ্গেই ফলটি দেবতার মুখে তুলিয়া দেন, আর বঙ্গের প্রণয়িনী মান করিয়া বসিলে দেবতা পায়ে কাশড় ধরিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া সাধিতে থাকেন। "কি ছার চকোরে দেব হত সম নহে" চণ্ডীদাস লিখিয়াছিলেন ইহার অর্থ সমানে সমানে না হইলে প্রেম হয় না এই জন্য বাঙ্গালী দেবতাকে হৃদয়ের এত কাছে লইয়া আসেন যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে বাঁধিয়া রাখা যায়। বাঙ্গালী তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবে না, কুশতৃণমূলে বসাইয়া বন্যফুলের মালা গলায় দিয়া নয়নজলে অভিষিক্ত না করিলে সে দেবতা যে পাথর বা মাটীর বিগ্রহ হইয়া থাকিবে বাঙ্গলার ঠাকুর বাঙ্গালার জ্যেষ্ঠ ছাত্রের প্রণাম চান না তাহার হৃদয়ের উপর ঠাকুরের যুদ্ধ দাবী। এমন সকল বাড়ী আমি দেখিয়াছি যেখানে পরম বৈষ্ণব গৃহ-কর্তার মৃত্যু হইলে সেই গৃহের দেবতাকে কাছা পরিয়া সন্তানের মত পিণ্ড দিতে হয়, যেহেতু মৃত গৃহ-স্বামীর উপাস্য ছিলেন বাল-গোপাল

কিন্তু জয়দেবের পূর্বে এ দেশে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যযুক্ত মূর্তি ছিল গোপী তাঁহাকে মনপ্রাণে ভালবাসিয়াও তাঁহাকে পদতলে বসাইতে সাহসী হইত না। জয়দেবই সর্বপ্রথম দেবতাকে ভক্তের পা ধরিয়া সাধিতে নিযুক্ত করিলেন পাছে এই কথা পড়িয়া কেহ পাতে বিষ কাটে, এই ভয়ে ছদ্মবেশী কৃষ্ণকর্তৃক পাদপূরণের প্রয়াসটির সৃষ্টি ইহার পরে চৈতন্যদেব আসিয়া যখন বুঝাইলেন, ঠাকুর প্রতিক্ষণ আমার সেবা করিতেছেন, তিনি প্রাণপ্রিয়, তিনি আমাকে দূরে রাখেন নাই, তাঁহার সঙ্গে মান কত চলে, যদি ভালবাসা সেই মানের ভিত্তি হয়, তাঁহার গালে চড় দেওয়া চলে, যদি আমার হস্তস্খলন তাঁহার অভিপ্রেতসারে অতিরিক্ত হয়, ছোটকথা যে শিশুগুলিকে আমরা প্রতিদিন গাল দিতেছি মারিতেছি, যে প্রণয়িনীর পদ ধরিয়া সাধিতেছি, এরা সমস্তই সেই শ্রেষ্ঠ লীলাময়ের রাজ্যের

অন্তরঙ্গের স্নেহলীলা এই সংসারের অঙ্গিনায় প্রত্যেক মাতার পশ্চাতে সেই অনন্ত স্নেহশীল যশোদা আছেন, প্রত্যেক শিশুর পশ্চাতে সেই স্নেহের দুলাল বালগোপাল হাসিতেছেন। এবং যখন চৈতন্যদেব মানুষের মধ্যে দেবতা ও দেবতার মধ্যে মানুষ এই ভাব স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন কৃষ্ণের পা বর বাপান্তরের রহস্য বৈষ্ণবেরা ভাল করিয়া বুঝিল। পরবর্তী কবি বলরাম দাস যখন গাহিলেন "নিশি যাহু চাঁদবদনী ধূলায় অঙ্গে দিয়া পা" তখন আর কোন পরাদৃষ্টান্তের সৃষ্টি করিয়া স্নেহলীলা বুঝাইবার প্রয়োজন হইল না। মানুষ তাহার সমস্ত লীলার মধ্যে স্নেহলীলা পরিত্যাগ করিল এবং তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। জয়দেব এইভাবে রাধাকৃষ্ণ-লীলার এক নূতন যুগ প্রবর্তন করিলেন,—যাহা ভারতবর্ষের অন্যত্র তখনও অনাবৃত ছিল।

স্যার উইলিয়ম জোন্স ও এডুইন আরনল্ড ইংরেজী ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন। ল্যাসেন এই কবিকে লাটিন এবং কর্কাট জার্মানে অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া পারসী ও আরবী ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ হইয়াছিল। বঙ্গভাষায়

গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা অনেকবার অনূদিত হইয়াছিল। গিরিধরের অনুবাদ অপেক্ষা রসময়ের অনুবাদই বিশেষ উৎকৃষ্ট। রসময় সংস্কৃত শ্লোকের মাধুর্য্য বাঙ্গলায় আনিয়াছেন। হিন্দী ভাষাতেও গীতগোবিন্দের অনেকগুলি অনুবাদ হইয়াছে। রসময় ও গিরিধর ছাড়া প্রাচীন কবিদের মধ্যে জয়দেবের অনুবাদক যদুনন্দন দাস প্রভৃতি আরও অনেক কবি পাইয়াছি *

শুধু কবি লইয়াই লক্ষ্মণসেনের রাজসভা উজ্জ্বল হয় নাই। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধ "সেক শুভোদয়া" নামক এক

লক্ষ্মণসেনের সভার পণ্ডিত গণ।

গ্রন্থেরও কেহ কেহ এই পুস্তকের কর্তা সংস্কৃত এবং কেহ বা উহার অলৌকিক ঘটনা-বিবৃতি দেখিয়া উহা হলায়ুধের লিখিত নহে এরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা লিখিয়াছি, নকলকারীর অত্যাচারে পুস্তকখানির সংস্কৃত বিকৃত হইয়াছে। ফকিরের কেরামতিতে এখনও প্রবীণ ও নিম্ন ব্যক্তিরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং তদ্দ্বারা পুস্তকখানি জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। লক্ষ্মণসেন সেক জ্ঞানাসুদ্দিন তবেজের অত্যন্ত অনুরাগী ও বশীভূত ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী যে ফকিরের জীবনী লিখিবেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? হলায়ুধ আত্মপরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন তিনি যখন কুমারবয়স্ক তখন লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন, যৌবনে তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ প্রদান

* আমরা কবিদিগের কৃতিবাসিকী লইয়া অনেক ঠাট্টা করিয়া থাকি। অনেক টাকাও এইজন্যে ব্যয় হইয়া থাকে কিন্তু জয়দেবের এই প্রাচীন অনুবাদগুলি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সাহিত্য পরিষদের একটী বৃহৎ ন্যায়ে এই প্রাচীন কবিদের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া আমরা কবির প্রতি সম্মান দেখাইতে পারি।

করেন এবং বাঙ্কিকো দর্শাধিকার বা প্রধান বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছিলেন।* সেক শুভোদয়ার দেখা যায় রাজার কোন কোন মন্ত্রী ব্রাহ্মণ্যধর্ম ফাঁকতের বিশেষ বিরুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু হলায়ুধ তাহার একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন।

হলায়ুধ পুরুষোত্তম সঙ্কটি

"ব্রাহ্মণসর্বস্ব" "সেক শুভোদয়া" ব্যতীত হলায়ুধের "মৎস্যসূক্ত" নামক অপর একখানি পুস্তক আছে। এই সময়ে পুরুষোত্তমের "ভাষাবৃত্তি" ও "ত্রিকাণ্ড কোষ" গ্রন্থ এবং পদ্মপতি ও ঈশানের পদ্ধতিসমূহ রচিত হইয়াছিল। এই সকল কবি এবং পণ্ডিত ছাড়া শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্তগণও লক্ষ্মণসেনের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভা বিদগ্ধগণের আনন্দস্বরূপ ছিল, তাঁহার সভায় কলাবিদ্যার উৎসাহ দেওয়া হইত। রাজদরবারের নর্তকীদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলা ছিলেন রূপেগুণে সর্বত্র প্রশংসিত। রাজা যেখানে যাইতেন সেখানে এই দুইজন গায়িকাকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। সেক শুভোদয়াতে কথিত আছে বিদ্যুৎপ্রভা একদিন "স্বরাহ" রাগে গান করিয়াছিল, সেই গান যে যেখানে থাকিয়া শুনিয়াছিল, সে-ই চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু গানের মোহিনী শক্তি সকলাপেক্ষা বিস্তার করিয়াছিল এক বণিক-বধূর উপর। সেই বণিক্ বধূ কূপ হইতে জল তুলিতেছিল, সম্মুখে তাহার এক শিশুপুত্র দাঁড়াইয়াছিল, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সেই রমণী কলসীর গলায় রজ্জু না বাঁধিয়া শিশুপুত্রটিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া জলে ডুবাইয়াছিল।

বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়া নৈতিক অধঃপতন

লক্ষ্মণসেনের সময়ে ভারতবর্ষটা বাসনের নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। নৈতিক অধঃপতন না হইলে তাহার অন্য গতি হয় না। তন্ত্র কেবলমাত্র বামাচার চলিতেছিল, সর্বত্র বৌদ্ধ বামাচারে কলুষিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব তাঁহার মাসীমাতা মহা-প্রজাবতীকে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার সময়ে আনন্দের নিকট যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা ফলিতে আরম্ভ করিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর সম্পর্ক ভয়ানক হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা পঞ্চমকারের বীভৎস অভিনয় করিতে লাগিলেন।

* "তথা বাল্মিকি-ব্যাসপ্রভৃতয়ঃ যেষাং কবিত্বোদ্ভবকারোৎসিক্ত-মহারত্নসমূহঃ তথা অত্র লোকে, তথা গৌড়দেশেষ্বপি সাম্প্রতিকাঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপ্রভৃতিসর্বাধিকারাঃ সন্তি।

বৈষ্ণবধর্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া নানারূপ অসঙ্গত কাহিনী রচিত হইল জয়দেবের শ্রীগোবিন্দের কবিত্ব উপাদেয়, কিন্তু রুচি কোথায়? দেবমন্দির-গাত্রে যে সকল যৌন-বিষয়ে মূর্তি অঙ্কিত হইতে সুরু হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় কামশাস্ত্রের সমস্ত বচনগুলির দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা পরিকল্পিত হইয়াছিল। যে সকল তীর্থে বালবিধবা, নিষ্ঠ যুবক, শিক্ষা-দাতার সহিত পুত্র, পুরোহিতের সহিত তরুণী শিষ্যা, শাশুড়ীর সহিত পুত্রবধূ, দেবর ও ভাসুরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি গৃহস্থ পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, সেই তীর্থের গাত্রে এই সকল মূর্তি যে সকল শিল্পী উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন কে? অধ্যাত্মবাদী লোকেরা এই প্রশ্নের নানাভাবে উত্তর দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন এই সকল স্ত্রীপুরুষের মূর্তির নানারূপ নগ্নভঙ্গী দেখিতে পাই, তখন তীর্থগামিনী তরুণীর লজ্জাকুণ্ঠ চক্ষু ও বৃদ্ধ গুরুজনের মুখবিকৃতি, তরুণ যুবকের দ্রুত পলায়ন-চেষ্টা, এসকলও তো সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই। চারুর প্রসাদের কাছে শাস্ত্র-বাক্য কোথায় ভাসিয়া যায় এবং বিবেক সেই পবিত্র স্থলে এই সকল বীভৎসতার কোনরূপই অনুমোদন করে না। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গের বহু মন্দির-গাত্রে এইরূপ বীভৎস চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহা স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জেলায় বেহের কান্দীবাড়ীর নিকট হইতে এক বৃহৎ কারুফলকে আমরা নগ্ন নরনারীর এইরূপ চিত্র পাইয়াছি। উহা তথাকার দাস-রাজাদের যুগে নির্ম্মিত হইল। দাস রাজা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কলিকাতার অতি নিকটে আন্দুলমৌড়ীর প্রসিদ্ধ কুণ্ড বাবুদের বহু প্রাচীন অধুনা অব্যবহার্য্য একখানি রথে এইরূপ চিত্র ছিল। খেজুরাহ মন্দিরেও ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার ফটোগ্রাফ আমার নিকট আছে। বেহেরের এই শ্লীলতাবিগর্হিত নরনারীর বীভৎসমূলক কারুফলকখানি আমার নিকট আছে। পুরী ও খেজুরাহ মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি এই একই পর্য্যায়ের। যোড়শের প্রাতঃকথাসূচক এই যৌন-লীলার চিত্র ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরে অঙ্কিত হয় নাই।

যে কঠোর আদর্শ ভিক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া বুদ্ধদেব রক্তমাংসজাত বাসনাকে নির্ম্মূল করিয়া মানুষকে নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই আদর্শ দ্বাদশ শতাব্দীতে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইল। যে কঠোর সংযম জাতীয় জীবনের সাধনার সামগ্রী হইয়াছিল, যুগব্যাপী উৎকট তপস্যা-জনিত অবসাদে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন মানব আত্মা সে সাধনায় বিমুখ হইয়া বসিল। যৌন সম্বন্ধ যতটা মধুর হইবার হইল। দেশের সাহিত্যে, দেশের শিল্পে, দেশের সমাজে সর্ব্বত্র যৌন সম্বন্ধের বাধাবিঘ্ন একেবারে দূরীভূত হইল, কামদেবের অপ্রতিহত রাজত্ব আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ মন্ত্রীরা প্রকাশ্যভাবে নর্ত্তকীদের সঙ্গে ব্যভিচারের মূল্য লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন (সেক শুভোদয়া, ষোড়শ পরিচ্ছেদ) "অস্মিন্ রাজ্যে মন্ত্রী পারদারিকঃ" ইত্যাদি কথা এই উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে। পদ্মাবতী রাজসভার নৃত্যগীতে যোগ দিতেন, সম্ভবতঃ জয়দেব বাদ্যযন্ত্র লইয়া তালরক্ষা করিতেন। গৃহস্থপরিবার রাজদরবারে নর্ত্তকী

মন্ত্রী পারদারিক।

সেখাইত কিন্তু ইহারা ছিল গঙ্গাধরের পুত্রবধূ সে বাড়িচার প্রাপ্ত অর্থ আনিয়া শ্বশুরের হাতে দিত, উপার্জন অল্প হইলে তাহা লইয়া লোকলোক ঘটিত কলিঙ্গরাজনাথের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের কুমার লীলা তামশাসনে সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছে এই সকল প্রসঙ্গ লইয়া "ধোয়ী কবি" পবনদূত লিখিয়া রাজকীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন লক্ষ্মণসেনের প্রালেয়কর্তৃক কুমারদত্তের গৃহস্থ বধূকে হরণের অনেক কথা পূর্বেই তাম্র শাসনে উল্লিখিত হইয়াছে। সেক শুভোদয়াতে ঘটনাটি এইভাবে বিবৃত হইয়াছে একদা মাধবী নাম্নী এক বণিক্ বধূ গঙ্গাস্নান করিয়া তাহার কটীলম্বিত বিপুল কুন্তলগুচ্ছ পৃষ্ঠে শুকাইতেছিল, এই সময়ে রাজী বল্লভার ধাত্রী লক্ষ্মণসেনের দুলক কুমারদত্ত রাজার প্রধান ঘোড়াটির চালিত গঙ্গাতে জলপানার্থ আসিল এবং সেই রূপবতী বণিক্ বধূকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল কুমারদত্ত মাধবীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া বলিল, "তোমার গায়ে যে সকল অলঙ্কার আছে তাহা হইতে অনেক বেশী অলঙ্কার আমি দিব, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের একটা সময় নির্দ্ধারণ কর, তুমি যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে কি না দিতে পারি" মাধবী এই সকল কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিল না মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তখন কুমারদত্ত বলিল, "উত্তর দিতেছ না কেন? আমি যদি তোমাকে এখন ধরিয়া লইয়া যাই তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে?" মাধবী বলিল, "তুমি কামান্ধ হইয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ তুমি কে এবং আমি কে তাহা ভাবিয়া দেখ। তুমি রাজপুত্র, তুমি এইরূপ দূষিত কাজ করিলে লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে আর যে সকল ভয় দেখাইতেছ তাহারই বা মূল্য কি? মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে পরস্ত্রী হরণ করে এমন শক্তি কাহার? "কস্য শক্তিরিয়ত্তে বিজয়-রাজ্যে পরস্ত্রীং ধর্ষয়িতুং শক্নোতি?"। কুমারদত্ত পুনরায় নানারূপ প্রলোভন ও ভয় দেখাইতে লাগিল অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হইল এই সময়ে পুরবাসিনীরা অনেকে গঙ্গাস্নানের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। কুমারদত্ত চলিয়া গেল এবং মাধবী তাহার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গৃহে গমন করিল

মাধবীর কাহিনী

কুমারদত্ত গৃহে যাইয়া স্থির থাকিতে পারিল না একজন নাপিতানীকে মাধবীর নিকট পাঠাইয়া দিল। সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া মাধবীকে অনেক লোভ দেখাইয়া বলিল, "তোমার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া কুমারদত্ত মৃতবৎ—আধার গৃহে অপেক্ষা করিয়া আছে, তোমার মুখের অনুকূল কথা পাইলে সে প্রাণ পাইবে" নাপিতানীকে মাধবী অনেক তর্জ্জন করিতে লাগিল। সেদিন প্রস্থান করিয়া সে বিরত হইল না, পুনরায় যাতায়াত করিতে লাগিল— তখন মাধবী তাহাকে সম্মার্জ্জনী লইয়া তাড়া করিল

কুমারদত্তের নিকট নাপিতানী এ সকল কথা বলিল না, সমস্ত অপমান হজম করিয়া হাসিমুখে সে রাজ-কুমারকে মিথ্যা কথা বলিল, "আমি যেখানে যাই, সেখানে কি কোন কাজ বাকী থাকে? সুসংবাদ আছে। মাধবী বলিয়া দিয়াছে কুমারদত্ত আমার শ্বশুর ও স্বামীকে কিছু বেশী মূল্য দিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিন এবং যখন তাঁহারা অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত করিবেন তখন যেন বলেন যে ঐ গহনায় অষ্টপল সোনা কম হইয়াছে। এই অভিযোগের

পর কানাঘুষা হইতে তখন যেন কুমারদত্ত আমার শ্বশুর ও স্বামীকে বাঁধিয়া রাজদ্বারে লইয়া যান তাহা হইলে আমাদের মিলনের সুবিধা হইবে।" এই মিথ্যা কথায় প্রীত হইয়া কুমারদত্ত মাধবীর শ্বশুর ও স্বামীকে সকল প্রস্তুত করিতে বলিয়া গেল, কিন্তু এই ব্যাপারে মাধবী কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া দোষীর প্রতিবাদ করিল না সে অবশ্য তাহার স্বামী বা শাশুড়ীকে কুমারদত্তের কথাগুলি জানায় নাই। অতিরিক্ত টাকার লোভে তাহার স্বামী ও শ্বশুর তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিল না অলঙ্কার লইবার সময়ে কুমারদত্ত তাহার প্রদত্ত অষ্টপল সোণা কম হইয়াছে বলিয়া একটা গোলযোগ উপস্থিত করিল, এবং বিচারের জন্য বণিকদ্বয়কে রাজদ্বারে লইয়া যাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন নাপিতানী বলিল, "এখন সকলই ঠিক হইয়াছে, মাধবী বলিয়াছে, তাহার শাশুড়ী চক্ষে দেখে না, আপনি যে সময়ে ইচ্ছা তাহার গৃহে যাইতে পারেন।" কুমারদত্ত এ পক্ষ-বদর কথায় প্রতারিত হইয়া মাধবীর গৃহে উপস্থিত হইল মাধবী পলাইবার উপক্রম করিলে সে তাহার সাড়ীর আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল এবং সেখানে তখন একটা ধস্তাধস্তি হইল মাধবীর চীৎকারে পাড়াপড়শীরা তথায় উপস্থিত হইল এবং কুমারদত্ত পলাইয়া গেল। লোকজন-পরিবৃত হইয়া মাধবী সভার নিকট উপস্থিত হইল। মন্ত্রী উমাপতিধর বলিলেন, "আমি যথোচিত চেষ্টা করিব, কিন্তু এই কুমারদত্ত রাজার শ্যালক, রাজা স্বয়ং তার ভার না লইলে আমার দ্বারা এই অভিযোগের বিচার হইবে না, রাজা স্বয়ং বিচার করিবেন তবে কিছু শাস্তি অবশ্যই হইবে। তুমি দরবারে যাও আমি তথায় লোক পাঠাইতেছি।" মাধবী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিল। যখন মাধবী কুমারদত্তের কথা বলিল, তখন সভাসদেরা স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিল, শুধু একে অন্যের মুখের দিকে চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না লোকজন-আচার্য্য রাজসভার বিচারক তিনি সন্ন্যাসী, কৃষ্ণকম্বলাসনে বসিয়াছিলেন। তিনি মাধবীকে নিকটে আহ্বান করিয়া সকল কথা তাহার মুখে শুনিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষী বসন্তা দাসীর সহিত রাজসভার দ্বার আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই উমাপতিধর ঘোর পাপিষ্ঠ এই বাক্যের প্রেরণায় অভিযোগটি হইয়াছে এ সমস্তই ইহার ষড়যন্ত্রের ফল—হে সভাসদ্‌গণ! আপনারা বিচার করুন।" রাজ্ঞী এই কথা বলিলে সমস্ত সভা চুপ হইয়া গেল রাজা স্বয়ং মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, রাজ্ঞী মাধবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় পরপুরুষরক্ত বিচারটী তুই কোন্ সাহসে আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছিস্? ইহার জন্য তোকে অনুতাপ করিতে হইবে। আমি তোকে এমন শাস্তি দিব, যাহাতে তুই ভবিষ্যতে কাহারও মন্ত্রণায় এরূপ কাজ করিতে সাহসী হইতে পারিবি না।" মাধবী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যাইয়া রাজ্ঞীর পাদমূলে নিপতিত হইল এবং সকাতরে বলিল, "মহাশয়ে মা, আমায় ক্ষমা করুন। এই গৌড়রাজ্যের সম্রাট্ সমর-বিজয়ী মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন, আপনি তাঁহার পত্নী, আমায় ক্ষমা করুন। এই রাজ্যে চিরকাল সুবিচার হইয়া আসিয়াছে, কেহ এখানে বলপ্রয়োগ করিতে পারে নাই এখন বুঝিতেছি, বল যাহার, এই পৃথিবী

লক্ষ্মণসেন আচার্য্যের নৈতিকতা

তাহার আপনার কুলে এবং পিতৃকুলে এরূপ ব্যবহার ছিল না যে, একজনের পত্নীকে অপরে গ্রহণ করে। যা, আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে আমি আপনার ভ্রাতাকেই ডাকিয়া আনি।"

"তথাস্তু আজ্ঞাপয় আজ্ঞাপয় তবৈব ভ্রাতরং ত্বরায়।") মাধবী এই কথা বলিলে রাজা তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া লাথি মারিলেন। তবে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। গোবর্ধনাচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া কংসসেনকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যেরূপ ধার্ম্মিক তাহা বুঝিলাম। মহারাজার এই রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হইবে।" এই বলিয়া একটা খনিত্র লইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন, "রাজার পত্নী—এই গৌরবে তুমি বন্ধের মাথায় পদাঘাত করিতেছ। তোমার ভাই ইহাকে বধ করিতে গিয়াছিল, তুমি ইহাকে প্রহার করিতেছ। এই রাজ্য শীঘ্রই নষ্ট হইবে। আমি শুনিয়াছি এই পুরুষ পালরাজ রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে রামপাল রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র এক স্ত্রীলোককে বধ করিয়াছিল, এই অপরাধে রামপাল তাহাকে শূলে দিয়াছিলেন। এখনও রামপালের এই বিচারের প্রশংসা গ্রামবাসীকে শোনা যায়। সকলে বলে, রাজা রামপাল তাঁহার পুত্র অপরাধী বা নিরপরাধ হউন, তাঁহাকে শূলে দিয়াছিলেন।"

এই বলিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণ খনিত্র লইয়া গলদ্ঘর্ম্মে গোবর্ধনাচার্য্য চালিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। সভাসদ্‌গণ একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। তখন রাজা স্বয়ং সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া গোবর্ধনাচার্য্যের পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এই সময়ে সেক জ্ঞানাঞ্জন এবং অপর কয়েকজন সভাসদ্ কুমারদত্তের নিন্দা করিতে লাগিলেন। রাজা খড়্গহস্তে কুমারদত্তকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মাধবী অগ্রসর হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ, ক্ষমা করুন, ইনি আমার কর ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার প্রাণ যায় নাই, জাতিও যায় নাই। আমার প্রতি যে ব্যবহারই করিয়া থাকুন, ইহাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার দুর্দ্দৈব অথবা জন্মান্তরে কৃত দোষেই ইনি এই সব করিয়াছেন। এখন এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটার শান্তি হউক।" মাধবী এই কথা বলাতে সভাস্থ সকলেই তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

এই কাহিনীটি আমি এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে পাল-রাজাদের এক পুরুষের কথা আছে। পালরাজগণের এমন অনেকের নাম আমরা পাইতেছি বা পাইয়াছি, যাঁহারা তাম্রশাসনে বা শৈললেখে উল্লিখিত হন নাই। কোন রাজার পাঁচটি ছেলে থাকিলে কখনও কখনও তাঁহাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন, সম্ভবতঃ সম্রাটের সঙ্গ পাইয়া অপরাপর সন্তানকে সামন্তরাজার পদবী দিয়া থাকেন লোকসংস্কৃতিতে অবশ্য ক্ষুদ্রতর রাজা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এই হিসাবে যে কয়েকজন রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশসংখ্যক রাজবংশসম্ভূত ব্যক্তিরা 'রাজা' বলিয়া সাধারণো পরিচিত হইতেন। এ পুরুষের ব্যাখ্যা এইরূপ হইতে পারে। তারানাথ পালরাজাদের অনেকের নাম করিয়াছেন যাঁহারা তাম্রশাসনে বা শৈললেখে উল্লিখিত

হন নাই। আমরা "এই পুকুরটি" ঠিক আক্ষরিকভাবে সমর্থন করি না, কিন্তু উহা যে লোকপ্রবাদমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামপালের পুত্রকে খুনে দেওয়ার কথা শুধু সেক শুভোদয়াতে নহে সন্ধ্যাকর মহাশয়ও বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন -কুলজীগ্রন্থ এবং মহাবংশের জনশ্রুতি অবলম্বনে তিনি তাঁহার ইতিহাস লিখিয়াছেন পুত্রকে খুনে দেওয়ার প্রসঙ্গ লইয়া গ্রাম্যগীতি রচিত হইয়াছিল, তাহারও ইঙ্গিত আমরা সেক শুভোদয়াতে পাইতেছি। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে কথার খুঁটিনাটি লইয়া আপত্তি থাকিতে পারে কিন্তু মোটামুটি হিসাবে ঘটনাটি অস্বীকার করা যায় না, ইহা পূর্বেই আমরা লিখিয়াছি

এই কাহিনীতে লোকনাচার্যের সমাজ সংযুক্ত ব্রাহ্মণাতের আদর্শের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সৎসাহস, এই জড় শক্তির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং ন্যায় বিচারের মূর্ত আদর্শ তখন বাঙ্গলার সম্মুখে ছিল বলিয়াই আধা-বৌদ্ধ জগতে পূজা পাইয়া আসিয়াছে যদের বর্তমান নানা কৌতুক ও আনন্দের তলে যাহারা দর্শকদিগকে উত্তেজিত করিতেছে -আমাদের নাট্যশালাসমূহ কি এই সকল জীবন্ত ঐতিহাসিক আদর্শ চরিত্রকে পুরোভাগে আনিয়া দেখাইতে পারে না?

লক্ষ্মণসেনের সভার যে চিত্র আমরা সেক শুভোদয়াতে দেখিতে পাই তাহা জ্ঞানগরিমা, পাণ্ডিত্য ও শিল্প কলায় শোভান্বিত হইলেও বঙ্গের জাতীয় চরিত্রে যে ঘুণ ধরিয়াছিল, এবং নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতিহেতু যে উহা অধঃপাতের নিম্নস্তরে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এই সময়ের প্রায় সাতশত বৎসর পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে আবার একবার এই দেশে নৈতিক অধোগতি হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় খণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্ঞী মাধবী যে কিরূপ অত্যাচারিণী ছিলেন তাহার উদাহরণ আর একটি দিব। কালান্তরে কোন স্থানে একটি ভূপ্রোথিত কলসীর মধ্যে বহু হীরক রত্নালঙ্কার প্রাপ্ত হন তাহার মধ্যে একটি অতি মূল্যবান্ মণি ছিল, তাহা তিনি লক্ষ্মণসেনকে প্রদান করেন। সেই কলসীতে মণিটি ছাড়া কতকগুলি মহামূল্য কঙ্কণ ছিল রাজসভার নটকীয়কে গীতি-কুশলতার জন্য তিনি তাহার দুইটি করিয়া চারিটি প্রদান করেন রাজা, হলায়ুধ মিশ্র, আচার্য গোবর্দ্ধন, জয়দেব পদ্মাবতী ইহাদের প্রত্যেককে তিনি কঙ্কণ প্রদান করেন। রামাকে যদি ছাড়া আরও দুইটি সম্প্রদায়ের কঙ্কণ দেওয়া হইয়াছিল। বণিক্ বধূ মাধবী তাঁহার অতি স্নেহপাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাকেও কঙ্কণদ্বয় দিয়াছিলেন। সেই কঙ্কণ হাতে দিয়া মাধবী স্বামিসহ স্নানার্থে যাইতেছিল। বাজনার রাণীরা যাইয়া বলিল, "মা রাণী সেই বণিক্-বধূ মাধবী এমন সুন্দর ও মহামূল্যের কঙ্কণ পরিয়াছে, যাহাতে তাহার হাত দুইখানি সূর্যকিরণের মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে।" রাজ্ঞী আজ্ঞা করিলেন, "মাধবী ও তাহার স্বামীকে আমার নিকট লইয়া আইস।" রাণীদিগকে মাধবী বলিল, "কোথা যাইয়া বল, স্নানান্তে আমরা রাজ্ঞীর নিকট

রাজ্ঞী কঙ্কণ পরিয়া।

যাইব।" তাহারা যাইয়া বলিল, "বণিক্-বধূ ও তাহার স্বামী তোমার আজ্ঞা মানিল না, তাহারা আসিল না।" রাজা স্বয়ং তাহাদের নিকট সভাতীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পাপীয়সী বণিক্‌বধূ! আমার আজ্ঞা অমান্য করিলি কেন এই কঙ্কণ কোথায় পাইয়াছিস?" মাধবী বলিল, "মা, শুনুন, আমি সাধুর কন্যা, সাধুর পুত্রবধূ এবং সাধুর ভগ্নী, আমার ঘরে নানা প্রকারের রত্ন আছে।" রাজা বলিলেন "তোমাদের ভাণ্ডারে এমন কঙ্কণ নাই" মাধবী উত্তর করিল, "মহারাজ! এ বিষয়ে তাহা হইলে আমার মত সৌভাগ্য আপনার হয় নাই" এই কথা শুনিয়া রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কি পাপীয়সী! এত বড় কথা! আমার ভাগ্য নাই? আমা অপেক্ষা তোর বেশী ভাগ্য!" রাণী স্বয়ং মাধবীর হাত হইতে জোর করিয়া কঙ্কণ দুইটি খুলিয়া লইলেন এবং চণ্ডালদিগকে আদেশ করিয়া বলপূর্বক তাহার স্বামীর কর্ণ হইতে কুণ্ডল দুইটি খুলিয়া লইয়া উহাকে দূর করিয়া দিলেন। তখন মাধবী স্বামীর সহিত সেক জালালের নিকট যাইয়া কাঁদিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল এদিকে মাধবীর কঙ্কণ রাজা নিজে পরিলেন এবং তাহার স্বামীর কুণ্ডল নিজ পুত্রকে পরাইলেন তৎপরে হলায়ুধ মিশ্র ও পদ্মাবতীকে লইয়া সেক জালালের আশ্রমে গেলেন। রাজাও ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপনীত হইলেন সেই স্থানে মাধবীর সঙ্গে তাঁহার আবার কলহ হইতে লাগিল রাজা কিছু না বলিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন জালালুদ্দিন কোন কথা বলিলেন না এদিকে মাধবী রাজাকে খুব শাসাইতে লাগিল মাধবী বলিল, "রাজা, আপনি নিজেকে খুব মহৎ মনে করেন, সেক জালাল এই কঙ্কণ আমাকে দিয়াছেন, আপনি জোরপূর্বক তাহা লইয়া গিয়া নিজে পরিয়াছেন, ইহাতে আপনার লজ্জা হয় না? যদি নিজের ইষ্ট চান, তবে আমার কঙ্কণ আমাকে দিন, পরের জিনিষ পরিতে আপনার লজ্জা হয় না?" তবুও কেহ কিছু বলিলেন না রাজা রাজ্ঞীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন, "তুমি কেন যে ইতরলোকের মত ব্যবহার করিতেছ, বল দেখি? যাহারা সেক তাহাদের কঙ্কণ ও কুণ্ডল কেন নিয়াছ? ইহাদের কঙ্কণ ও কুণ্ডল ফিরাইয়া দাও।" রাণী সক্রোধে বলিলেন, "এই সেক আপনাকে কি দিয়াছেন? ইনি মধুকর বেশের দুইটি মহামূল্য মণি ও কুণ্ডল দিয়াছেন, আপনাকে কি দিয়াছেন? আপনার মুখে ও আমার মুখে ছাই দিয়াছেন।" মাধবী রাজপত্নীকে বলিল, "কলহকারিণি রাজ্ঞি, আপনার মহত্ত্ব আমার খুব জানা আছে, পূর্ব্বে একবার যখন পা ধরিয়াছিলাম, তখন আমাকে লাথি মারিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলি নাই কাহনকারীর বংশের আর বেশী কি মহত্ত্ব থাকিবে?"

এই কলহ আর বেশীক্ষণ চলিল না সেক জালাল মনে পড়িয়া মিটাইয়া দিলেন। বিক্রমসেন (শত্রুদের শিক্ষাগুরু) রাজ্যহারা হইয়াও বৈদ্যকুলিপাকে পড়িয়া কিছুকাল কাহনকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সাগরাল মহাশয় সেই গল্প বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, মাধবী হাসিয়া যাইয়া এখানে সেই কথাটার ইঙ্গিত করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় সেক শুভোদয়াতেও সেই কথার আভাস আছে।

এই যে দৃশ্য রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা কি বীভৎস! যৎস্য-জীবীদের মহিলারাও হাটবাজারে এরূপ কলহ করে না। ইহার মধ্যে যদি সত্যের কোন লেশমাত্রও থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে সেন রাজার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল এবং রাজ্ঞী সর্বদা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া হীনতা প্রদর্শন করিতেন। তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনের স্ত্রীর নাম আমরা কেহ পাইতেছি, এখানে কিন্তু রাজ্ঞীর নাম বল্লভা। কিন্তু এক ব্যক্তির একাধিক নাম থাকিতে পারে এবং রাজাদের পক্ষে একাধিক ভার্যা থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে। লক্ষ্মণসেনের সময় হইতেই রাজপ্রাসাদ একদিকে পণ্ডিতমণ্ডলের কোলাহলে, অপরদিকে নর্তকীদের ও গণিকাদের নূপুরধ্বনি ও গীতিবাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠিত। কেশব সেন মুহূর্তিমান্ পাষণ্ডী ছিলেন কিন্তু "কুরঙ্গনয়না লক্ষ্মণসেনের নীবিবন্ধ বিমোচনে ব্যস্ত থাকিতেন" (বাঙ্গালীর বল, ১৪০ পৃঃ)। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় দেখা যায়—লক্ষ্মণসেনের যত পত্নী ছিল তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি আদর করিয়া 'উত্তমা' কাহাকেও 'স্বাধীনভর্তৃকা' বা 'অভিসারিকা,' কাহাকেও 'উৎকণ্ঠিতা' বা 'বিপ্রলব্ধা' অথবা 'কলহান্তরিতা' কিংবা 'বাসকসজ্জা' নাম দিয়া সেই নামোচিত বেশভূষা পরাইয়া আমোদপ্রমোদ করিতেন *। এই সব কাহিনী একদিকে রাজগৃহে সংস্কৃতের প্রভাব কত বেশী হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে, অপরদিকে রাজার বিলাস-বৃত্তির পরিচয় দেয়।

বল্লভা ও বসুদেবী নামী যে লক্ষ্মণসেনের দুই প্রধানা মহিষী ছিলেন তাহার উল্লেখ আমরা হেলায়ুধ-সম্পাদিত মৌড়-পাণ্ডুবা নামক পুস্তকে পাইতেছি। এই পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে সেক শুভোদয়ার কথা যে বিশ্বাস উৎপাদনে কোন বিশেষ কারণ নাই।

যে দেশের আদর্শ স্বামী শিব সতীর মৃত্যুর পর তাঁহার শব স্কন্ধে করিয়া কত দূর কাঁদাইয়া দিয়াছিলেন, এবং অন্নপূর্ণার যে নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন নিমতলের পশ্চিমে তাহা মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে এবং যে দেশে এই আদর্শ দেবতার ইঙ্গিতে কাম ভস্ম হইয়াছিল এবং যেখানকার লোকেরা "স্ত্রিয়ং ন পশ্যন্তি নয়ং নপোংক্ষেত" প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে চিরাভ্যস্ত, যে দেশের আদর্শ রাজা রাম সীতা ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতেন না, "ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুভ্যামপি পশ্যতি," সেই দেশে মন্দির-গাত্রে নগ্ন ও বীভৎস চিত্র ও ভাস্কর্যের এই কাম-বিলাস—জাতীয় জীবনের মূলতান্ আদর্শের যে বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই ইঙ্গিত করিতেছে। পৌরাণিক কাহিনীতে ঐতিহাসিকত্বের অভাব হইতে পারে, কিন্তু তাহা জাতীয় আদর্শের নির্দেশক। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক নবদ্বীপ আক্রমণের পূর্বে বঙ্গদেশ যে নৈতিক অধোগতির প্রান্তে হইয়াছিল—তাহার চিত্র নানাদিক্ দিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতেছে। মন্ত্রী উমাপতিধরের সঙ্গে রাজসভার পঙ্কর্ণ নামক এক নটের রহস্য ও

* বিদ্যাপতির পুরুষ-পরীক্ষার অনুবাদ (হরপ্রসাদ রায় কৃত, ইংরাজীর ছায়া, ১৮১৪ খৃঃ)

পরিহাসের কথা কবি বিস্মৃত হইয়া পুরুষ-পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার বিকৃত রুচি সভা সমাজে সহজ বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। একদা সন্ধ্যায় নায়ক এক নট লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত হইল, তাহার কপালের চন্দনের বিশ্লিষ্ট কস্তুরী অন্তঃপুরের মত দেখিয়া উমাপতি ধর হাস্য করিয়া বলিলেন "কি হে পঞ্চবাণ! তুমি যে মাথায় বিন্দু দিয়া 'নটঃ' ক্লীব সাজিয়াছ?" নট উত্তর করিল, "আপনি তো উমাপতিধর, বুধ, আমার রূপে আর একটি চন্দনের বিন্দু আছে, সুতরাং আমি নটঃ মহাদেব এবং আপনার পিঠে চড়িতে পারি।" একথা বলা বাহুল্য যে একটি সামান্য নটের এই প্রকার বিদ্রূপে রাজসচিব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। রাজ-সভার পরিহাস-রসিকতা এইরূপ বীভৎস হইত ইহা তাৎকালিক বিগর্হিত রুচির পরিচায়ক।

রাজীর প্রভাব রাজার উপর সামগ্রিক ভাবে কত প্রবল হইত তাহার আর একটি উদাহরণ আমরা এই পুরুষ-পরীক্ষাতেই পাইতেছি। কথিত আছে এক সময়ে রত্নপ্রভা নাম্নী রাজীর প্রভাব রাজার উপর অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেন কাশীরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন রত্নপ্রভা বলিলেন "তোমার বিরহে আমি দেওয়ালী রাত্রি (সুখ রাত্রি) কিরূপে যাপন করিব?" লক্ষ্মণসেন প্রতিশ্রুত হইলেন, তিনি যে করিয়া হউক দেওয়ালী রাত্রিতে গৌড়ে ফিরিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, রাজী বলিলেন, "যদি তুমি প্রতিজ্ঞা পালন না কর তবে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব।" লক্ষ্মণসেনের বিপুল নৌবাহিনী কাশীরাজের নগরী অবরোধ করিল, যখন তিনি রণরঙ্গে মত্ত, এই সময়ে যে দেওয়ালী রাত্রি সমাগত, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নগরবাসীরা দীপালীর উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। তখন উৎকণ্ঠিত হইয়া রাজা মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায়?" তাঁহারা বলিলেন, "প্রভূত অর্থ দ্বারা সকলই সম্ভব আপনি নৌবাহকদিগকে বিশেষরূপ পুরস্কারের ভরসা দিয়া অদ্য রাত্রেই গৌড়ে পৌঁছিবার ব্যবস্থা করুন রাজশক্তির অসাধ্য কি?" পুরুষ পরীক্ষাকার লিখিয়াছেন, তরুণ এক সহস্র নৌবাহককে প্রচুর অর্থে পরিতুষ্ট করিয়া মনোরথ গতি নৌকায় আরোহণপূর্বক সেই রাত্রেই লক্ষ্মণসেন গৌড়ে পৌঁছিয়া রাজী রত্নপ্রভার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন-সম্বন্ধে এরূপ আর একটি আখ্যান আমরা ইত.পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিষ্ণু-রাজত্বের শেষকালে যে অন্তঃপুরিকাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল, নানা উপাখ্যানে ইহাই প্রমাণিত হয়। অবশ্য কাশীরাজের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধ ও জয়লাভ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহা তাম্রশাসনে উক্ত আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শাহ জালালুদ্দিন তবরেজ ও সেক শুভোদয়া

প্রসিদ্ধ জালালুদ্দিন তবরেজ—খোজা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি (মৃত্যু, ১২৩৬ খৃঃ), বাহাউদ্দিন জাক্রিয়া মুলতানী (মৃত্যু, ১২৬৯ খৃঃ) এবং খোজা মুহাম্মদ্দিন আজমিরী (১১৪২ - ১২৩৬ খৃঃ) প্রভৃতি বিখ্যাতনাম সাধুগণের সমসাময়িক এবং বন্ধু ছিলেন। জালালুদ্দিন ১২২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

জালালুদ্দিন তবরেজের আত্মজীবনী সেক শুভোদয়াতে পাওয়া যায়—তাহার অল্প ও অংশের ন্যায় আজগুবি গল্পপূর্ণ। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার মাতা অগ্নিউপাসিকা, আমার পিতার নাম কাফুর এবং মাতার নাম গবীর। আমরা অতি দরিদ্র ছিলাম, কিন্তু পরে আমার ভাগ্য ফিরিয়া যায়।" হমজান নামক এক সাধুর সঙ্গে জালালুদ্দিনের সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার কথা অনুসারে তরুণবয়স্ক জালালের প্রেমপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু জালাল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, ইহার পরে অনেক উপগল্প বর্ণিত হইয়াছে। বহুদিন জালাল দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। সমুদ্রের এক ঘাটে তাঁহার সহিত একটি বড় সাধুর দেখা হয়। তিনি জালালকে বলেন, 'তোমার এখনও সদ্‌গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সময় হয় নাই। তুমি একবার পূর্বদেশে ঘুরিয়া এস। সেখানে লক্ষ্মণ সেন নামক এক মহারাজ আছেন। সেখানে যে মুসলমান যায়, তাহাকেই তিনি হত্যা করেন। তাঁহাকে জয় করিতে পারেন, এমন কেহ নাই। তুমি হিন্দী কথা বলিতে পার সেই স্থানে এবং অস্ত্রাঘাতে বহুকাল পর্যন্ত নিরাপদ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হইবে।' (সেক শুভোদয়া, নবম পরিচ্ছেদ)।

লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে সেকের সাক্ষাৎকার ও সেই প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক কথা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা গঙ্গাতীরে ছিলেন, সকলে কৃষ্ণবস্ত্র-পরিহিত দীর্ঘ মূর্তি জালালকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জালাল রাজাকে উচিত মত সম্বর্ধনা না করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনি কে? আমি পৃথিবীপতি, আমার সমুচিত সম্মান আপনি করেন নাই কেন?" এই সময়ে একটা ছিল একটি গণ্ডি মাছ লইয়া গঙ্গার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। সেক বলিলেন, "আপনি পৃথিবীপতি এই অভিমান করিতেছেন, ঐ চিলটিকে বলুন যে গণ্ডি মাছটি সে যেন ছাড়িয়া দেয়। আপনার আদেশ পালিত হইলে আমি বুঝিব আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর।" রাজা বলিলেন, "পক্ষিজাতি জ্ঞানশূন্য, উহারা আমার কথা শুনিবে কেন? যদি আপনার সাধ্য থাকে, তবে আপনিই বলিয়া দেখুন না কেন, আপনার কথা শোনে কি না?" সেক উর্ধ্বদিকে চাহিয়া আদেশ করা মাত্র চিল মাছটি ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। রাজা ভয় পাইয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং সেকের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। সেক বলিলেন, "আমি কাহারও প্রতি বিরক্ত বা রুষ্ট হই না। কিন্তু বাজ-পক্ষে বসিয়া চঞ্চুকে গালি দিতে থাকে, কিন্তু চঞ্চু তাহাকে অভিশাপ দেন না।"

লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে দেখা।

রাজা বলিলেন "এই ভগ্নপ্রায় বনজঙ্গলাকীর্ণ বাসভবন আপনি আমার প্রাসাদে আসুন, এই স্থান বাস করিবার উপযুক্ত নহে।" সেক বলিলেন, "আমি আপনার নগরীতে প্রবেশ করিব না। আমি আসিবার সময় পথে যতদূর দেখিয়াছি এই পুরী অচিরাৎ নষ্ট হইবে। আমি এই খানেই অদ্য রাত্রি বাস করিব।"

রাজমন্ত্রী উদ্যানপতিকে কহিলেন "যাহাতে আমাদের কক্ষ পরিচ্ছন্ন পরিষ্কৃত, এ ব্যক্তি যবন না হইয়া যায় না। ইহাকে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের যবন দেখা যাইতেছে। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই যবন। যাহা হউক বিষ খাওয়াইয়া ইহাকে মারিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

রাজার অনুরোধে সেক সম্মত হইলেন না। তখন মন্ত্রী সেইখানেই সেকের খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। সেক বলিলেন, "আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইলে এখানে রন্ধন করিতে হইবে।" মন্ত্রী তাহাই করিলেন এবং রাজমহিষীর সঙ্গে রাজন্ শূন্যবিষ রাখিয়া রাখিলেন। যবনের পরিবেশন করিতে কোন ভিন্ন রাজা হইল না। অবশেষে এক রক্ষক পুত্র একটি পুরাণ ও একটি কপর্দক পাইয়া এই কার্য্যে সম্মত হইল।

বিষভক্ষণ।

সেক ভোজনান্তে কতকগুলি চৈতুল খাইলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, দরিদ্রদের ঘরে বৎসরেও বুদ্ধির দাঁত গজায় না। এই ভাল ভাল জিনিষ খাইয়া সেক মুখশুদ্ধির জন্য কতকগুলি চৈতুল খাইতেছেন। এদিকে কণ্ঠবাহিত নানারূপ মসলাযুক্ত প্রপঞ্চি পান লইয়া মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে।" রাজা ফকিরকে বলিলেন, "আপনি চৈতুল খাইলেন কেন?" সেক মন্ত্রিকর্তৃক বিষ প্রয়োগের কথা বলিলেন। মন্ত্রী ক্রোধ করিয়া বলিলেন "মিথ্যা কথা, ভোজন-শেষে একটু তিক্ত খাইতে হয়, নতুবা অসুখ হয়। সেই তিক্ত দেওয়াতে সেক বিষ মনে করিয়াছেন।" সেক বলিলেন, "হয়ত বা তাহাই হইবে।" কিন্তু রাজার ছিদ্র বুঝিতে পারিয়া মন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, "মন্ত্রী তুমি অতি পাপমতি, এমন কখনও শুনি নাই বা দেখি নাই যে অভ্যাগতকে কেহ খাইবার জন্য ডাকিয়া আনিয়া বিষ দিয়াছে। যদি ইনি ইচ্ছা করেন, তোমার ঘোর অনিষ্ট করিতে পারেন। তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে?"

রাজা আবার বলিলেন, "এখানে, বড় বাঘের ভয়, চলুন রাজপ্রাসাদে যাই।" কিন্তু সেক গেলেন না। রাজা মন্ত্রীসহিত চলিয়া গেলেন। সেই রক্ষক পুত্র ও সেক তথায় রহিলেন। রাত্রিকালে দুইটা বাঘ আসিয়া সেককে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। পর দিন সেই রক্ষক পুত্রের মাতা আকাশ-ভেদী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কারণ জনশ্রুতিতে শোনা গেল যে, সেই সেক ও রক্ষক পুত্রকে রাত্রে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। মন্ত্রী রাজাকেও এই কথা জানাইলেন। রাজা যাইয়া দেখিলেন, সেই জঙ্গলে উভয়েই বেশ সুস্থ দেহে আছেন, রাজা মন্ত্রীকে বিদায় জনবার সৃষ্টি করার জন্য ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা দেখিলেন—সেকের সমস্ত কাপড় ভেজা। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেক বলিলেন—গভীর রাত্রে ইঁহার এক শিষ্য—প্রত্যেক নায়ক বলিয়া—সমুদ্রে বহু

ধনঞ্জয়কে সঙ্গে জাহাজ লইয়া যাইতেছিলেন। অল্পের নীচে একটা প্রকাণ্ড ত্রিশূল ও কাষ্ঠের সংঘাতে জাহাজের তলদেশে ছিদ্র হইয়া যায়, এবং সঙ্গের সব বণিক সাগরজলে ডুবিয়া অতি আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে। অল্পদূরবর্ত্তী স্থানে সেক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া সমুদ্রের নিম্নদেশ হইতে জাহাজখানি উত্তোলন করেন। এই জন্য তাঁহার কাপড় সিক্ত হইয়াছে। রাজা কালড়খানি নিংড়াইয়া ফোঁটা কত জল অধিকে সিক্ত করাইয়া দেখিতে পাইলেন এবং তখন সেকের কথায় তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। সেক নামাজ পড়িতে বসিলেন—তাহা শুনিতে গগনমণ্ডল পূর্ণ হইল। তাঁর মুখ হইতে শুনিয়া কেহ বলিল "বেদ মন্ত্রন করিতেছে," কেহ বলিল, "মহাযক্ষ তাঁহারা পড়িতেছে" কেহ বলিল, "সভার ঠাঁই তাড়িয়া পড়িল।"

এই সকল অলৌকিক ঘটনার দ্বারা দিয়া সেক শুভোদয় আমাদিগকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার এবং তৎসময়ের সাম্প্রদায়িক অবস্থার যে সকল তত্ত্ব জানাইয়াছেন, তাহার অনেকগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই সম্বন্ধে বিলাতে আমাদের সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা কাটিয়া ছাঁটিয়া দিয়া ইংরাজেরা ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন। স্পেনের ঐতিহাসিকগণ তাঁর দেশের মেঘের নানা আজগুবি গল্পের মধ্যে সত্যের আলো খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। আমাদের দেশে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও ঐতিহাসিকগণ নানা আজগুবি গল্পে তাঁহাদের পুস্তক পূর্ণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে, চৈতন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, চৈতন্যের মুখে হরিনাম শুনিয়া যাবনেরা পর্য্যন্ত হরিনাম করিতেছে। এই ঘটনার সময় যিনি চৈতন্যের নিকট উপস্থিত ছিলেন, সেই যবনের দোহাই দিয়ে ইহা, স্বকর্ণে শুনিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের মত্ত হাতের কথা চাক্ষুষ ঘটনার ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ বিলাতের সেই সকল মহাজনের অলৌকিক গল্পকথা, এবং আমাদের দেশের মুরারিগুপ্তের কড়চা, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া ইতিহাস লেখা অসম্ভব, ইংলণ্ডের রাজা কাণ্ডাট সমুদ্রকে আদেশ করিয়াছিলেন তাঁহার গতি থামাইতে এইরূপ অসম্ভব কথাও ইংরাজের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। বাইবেল তো আজগুবি কথার খনি, তাহা বাদ দিলে খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস লেখা যায় না। এদিকে তাম্রশাসন এবং শিলালিপিতেও অনেক অতিরঞ্জিত, একপক্ষসমর্থিত, একদেশদর্শী, নৃপের সম্বন্ধে অলীক বৃত্তান্ত-বহুল বর্ণনা আছে, তাহার সকল কথা মানিয়া লওয়া চলে না। ইহাদের সকলগুলিই দলিল ও উপকরণ—একান্তভাবে ইহাদের কোন একটির উপর নির্ভর করিয়া অন্যগুলিকে একবারে ফুঁড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঐতিহাসিকের উচিত হইবে না। এই হিসাবে সেক শুভোদয়কেও আমরা লক্ষ্মণসেনের সময়ের ইতিহাসের একটি উপকরণ-স্বরূপ ব্যবহার করিব। ইহাতে যে সকল তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিচারসহ কি না—তাহাও আলোচনা-যোগ্য। ইহাতে "চতুর্দ্দিংশোত্তরে শাকে সপ্তত্রৈক-শতাধিকে" (১১২৭শক ১২০২ খৃঃ) তুরস্ক সৈন্য বিহার ও পাটনায় প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে এবং "শাকে যুগাব্ধিরন্ধ্রে গতে কলাং গতে ভাস্করে" ১০৬৬ খৃঃ, রামপালের

মৃত্যুর কথা লিখিত আছে। সেক শুভোদয়ার যে হস্তলিখিত পুঁথি উমেশ বটব্যাল মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা জগন্নাথ রায়ের পাঠের জন্য রামভদ্র শর্মা নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সনটি দেওয়া হয় নাই অধ্যক্ষ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন রায়ের লেখাটা বরং ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী— কোন ক্রমেই পরবর্ত্তী নহে এই পুস্তকে লিখিত আছে সাহ জালাল তরেঙ্গ বিক্রম সংবৎ ১১৯৯ [illegible] খৃঃ। কারেক মাসে এতদ্দেশে আগমন করেন এবং বিক্রম সংবৎ ১২৭৩ [illegible] খৃঃ চৈত্রে দেখে ফিরিয়া যান ইহাতে বড় পরেস্তী হসেন সাহ সম্রাটের নাম পাওয়া যায়, সুতরাং পুস্তকের যে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই এই পুস্তকে বিক্রমকেশরী রাজার উল্লেখ আছে এবং এক জায়গায় স্পষ্টই ভুল করিয়া বিক্রমকেশরীকে বিক্রমাদিত্য বলিয়া লেখা হইয়াছে এই রাজা আকাশপথে পাইয়াছিলেন এইরূপ সুই হয়, পালী একখানা বাইবেল বিক্রমকেশরীর একখানি দুর্লভ্য পত্র প্রাপ্তির কথা আছে মনে হয় বিক্রমকেশরী রংপুরের কিছু পূর্ব্বে বর্ত্তমানের মঙ্গলকোটের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বও পরে এক সময়ের মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। বিক্রমকেশরী জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—এ কথা আমরা স্থানান্তরে লিখিয়াছি। মঙ্গলকোট অঞ্চলের লোকের সংস্কার কালিদাস নামক এক পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে সম্মান করিতেন। একখানি ফারসী পুস্তকে লিখিত আছে, দিল্লী হইতে আগত কোন পীরের চমৎকারে বিক্রমকেশরীর রাজা ধ্বংস পাইয়াছিল। বিক্রমকেশরী মঙ্গলকোটের রাজা ছিলেন, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও তাহা উল্লিখিত আছে। বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে বিক্রমকেশরীর কোন সম্বন্ধ থাকায় জনশ্রুতি কালিদাস সম্বন্ধে যে সকল গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে নহে। তাহার ভুল অবশ্য থাকিলেও সেক শুভোদয়া অতি সরল ও প্রতিমধুর সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে। ইহার মাঝে মাঝে যে সকল শ্লোক আছে, তাহাদের দুই একটি বেশ কবিত্বপূর্ণ, কলাসূত্রের লেখনীর অযোগ্য নহে। যথা—

"নিজ লেখনি সম্ভেন্ন হরার তুরাজ সাবদ:
ন হি সাহতে জোগাং চক্রুস্তালবেন্দনি ॥"

এই শ্লোক দেখিয়া "[illegible]" প্রভৃতি পদ মনে করাইয়া দেয়।

সেন রাজাদের সময় নব হাঙ্গলা প্রবেশের ফলে বাঙ্গলার কোন কোন বিষয়ে যে মহৎ ক্ষতি হইয়াছিল, সে ক্ষতি শুধু মুসলমান বিজয়ের পর পূরণ করিয়া দেয় নাই অধিকন্তু বঙ্গীয় সমস্ত লোককে হীনবীর্য্য ও অধঃপতিত করিয়াছিল—তাহা জাতিভেদকে লোহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া ইহাদের পূর্ব্বেও জাতিভেদ ছিল এবং রাহ্মণ-গুরু ছিল, কিন্তু তথাকথিত হীনবল সম্বন্ধে ছোঁয়াচে রোগের সৃষ্টি এই সেন রাজাদের সময় হইতে শুদ্ধ ও পালরাজদের

ছোঁয়াচে রোগ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না 'স্ত্রীবস্ত্র হুতুলাদ্দলি'-চণ্ডালোঢ়লি বিজ শ্রেয়ঃ ভবিতক্তিপরাহতঃ' এ সকল শ্লোক সেন রাজাদের বহু পূর্বে রচিত বল্লিচণ্ডাল-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন—এ সকল তো অতি প্রাচীন যুগের কথা। পালরাজারা ও তৎসময়ের পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা বিবাহ বিষয়ে কোনো গণ্ডীরেখা করিতেন না। সেই সকল রাজাদের সময়ের তীর্থগুলিতে জাতিভেদ ছিল না, সমাজেও ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত জাতিভেদ ছিল না। নবরাজন্যা একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দ্বার রুদ্ধ করিল ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিপুল বেগে জনসাধারণের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্কন্দপুরাণ ও অপরাপর পুস্তকে আমরা পাইয়াছি এই অত্যাচার এত অধিক হইয়াছিল যে, যখন মুসলমানগণ আসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিরস্ত্র করিলেন, তখন নিপীড়িত জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ত্রাণকর্তা ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। যখন ব্রাহ্মণগণ গৃহে গৃহে ছোঁয়াচে আনিয়া বৈদিক ধর্মের অভিনয় করিতেছিলেন তখন এই ধর্মের বেশে ছোঁয়াচে রোগ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল দেব মন্দিরের আরতিশিখা ও যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়া বহুদূর যায়—তাহার ত্রিসীমানায় নিম্নশ্রেণীর লোক যাইতে পারিত না। তাহাদের ভাষা আমাদের কথিত ভাষা অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত হইল নিম্নশ্রেণীর সংস্কৃত পড়িবার অধিকার তিরোহিত হইল এবং যাহার কথা যদি কেহ শ্লেচ্ছভাষায় শুনিত, তবে তাহার শ্রবণে গলিত সীসক ঢালিয়া দান হইবে—এই ব্যবস্থা দেখান হইল ফলে এই দাঁড়াইল, শ্রবণের কণ্ডক কণ্ডক মেথর মহত্তর হইল, কণ্ডক ডোম হইল, কারণ ইহারা তান্ত্রিক ছিলেন এবং ঘৃণিত জিনিষ পানাহার করিতেন

বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সময় ডোমাচেযোগণের প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়; এখনও শীতলাদেবী, ধর্মঠাকুর ও কালীমন্দিরের ডোমপূজারী বঙ্গের নানাস্থানে বিদ্যমান আছে ডোমেরা শুধু তান্ত্রিক ধর্মে অগ্রণী ছিলেন, এমন নহে, তাঁহারা রাজাদের অধীন যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে নেতৃত্ব করিতেন। বাঙ্গলার অনেক প্রাচীন পুঁথিতে ডোম সৈন্যের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। "আগডোম, বাগডোম, ঘোড়ায় ডোম সাজে" প্রভৃতি ছেলে-ভুলানো ছড়াতেও তাহার একটু প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয় হিন্দু সমাজ স্থিতিশীল নহে—জাতীয় উঠাপড়ার দৃষ্টান্ত এই আপাত দৃষ্টিতে অন্যত্রবৎ সমাজেও অনেক আছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সামাজিক শ্রেণীগুলিকে ইস্পাতের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিল ক্রমশঃ এই বন্ধন দৃঢ় হইল। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় দৃষ্ট হয়, বল্লালসেনের সময় শ্রীবৎসসেনের পুত্র দত্তখাঁ হাড়ীঘোষের কন্যাকে বিবাহ করাতে তাঁহার কৌলিক কতকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল কিন্তু তিনি জাতিচ্যুত হন নাই।

এই হাড়ীঘোষ এক হয় কায়স্থ না হয় সদ্গোপ ছিলেন বঙ্গজ পৌণ্ড্রের সেন-ভূমির রাজা বিজয় সেনের যত পুত্রের মধ্যে কয়েকটি বৈদ্য এবং অবশিষ্ট কয়েকজন কায়স্থ পর্য্যায়ে ভুক্ত হইয়াছিল, বৈদ্য জাতীয় মহাকুলীন কায়স্থ বংশের শোভাকর নাগের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এইরূপ বিবাহ তখন অনেক হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থকারের সময়

সামাজিক অনুশাসন আরো একটু কড়া হইয়াছে। কবিকঙ্কণের (১৩৭৯ খৃঃ) দণ্ডপাণির কুল নষ্ট হওয়ার সম্বন্ধে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কুলগ্রন্থ-লেখকের সুরে সুর মিলাইয়া লিখেন নাই, "দণ্ডপাণিঃ হাড়ীঘোষস্য কন্যাং পরিণীতবান্" ইহাতে নিষ্কৃতির অবসর রহিল, কিন্তু লিখিয়াছেন "দণ্ডপাণিঃ পিতুঃ শাপাৎ সাধ্যভাবম উপাগতঃ" অর্থাৎ তিনি ডোম-কন্যা বিবাহের কথা লিখিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। চন্দ্রপ্রভাব ডমরু মল্লিক বৈদ্য ও রাজনে বৈবাহিক সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন এবম্বিধ আঠারটি বিবাহের উল্লেখ আছে সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্রমশঃ জাতীয় সীমারেখা দৃঢ় ও কঠিন হইয়া প্রাচীরের মত উঠিতে হইয়াছে এবং এক এক শ্রেণীকে 'একঘরে' করিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ যথেষ্ট ছিল—ক্রমে স্বল্পেটের মধ্যেও সকল সম্বন্ধ হইতে ঠাঁইরা শেষে এখন একস্থানে দাঁড়াইয়াছে যেখানে বিবাহ একটা মস্ত বড় সমস্যা ও দায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

জনসাধারণ নিরুপায়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিল, নিজ প্রভাব সমস্ত স্থাবরা হইতে বঞ্চিত হইল। রাজাবরে বিড়াল কুকুর যাতায়াত করিলে কিছুই হয় না, কিন্তু ক্ষুধা-কথিত অন্ত্যজ জাতির হাওয়া সেই বন্ধন-মন্দিরের গায়ে লাগিলে তাবৎ হাঁড়কুড়ি জলে বিসর্জ্জন দেওয়ার ব্যবস্থা যাহারা পালরাজগণের প্রশংসা গাহিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিত তাহাদের মুখে অকস্মাৎ প্রশংসা শুনিয়া রাজগণের মুখ লজ্জাবনত ও অবনত হইত,—সেন-রাজাদের সময়ে সেই জনসাধারণের উৎসব আসর ভাঙ্গিয়া গেল এই রাজপ্রভাব সম্বন্ধে শুধু পাল রাজাদের সময়কার নহে। প্রাচীন কাব্যাদিতে দুই হয় ইতিহাস পূর্ব্ব যুগেও প্রজারা এই ভাবে রাজাদের প্রশংসা গীত রচনা করিয়া গান করিত সেন রাজাদের সম্বন্ধে একটি পালা গানও রচিত হয় নাই এমন যে মুসলমান-বিজয়রূপ অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব হইয়া গেল, তৎসম্বন্ধে একটি গান রচিত হইয়াছিল বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। কি ভাবে যে মুসলমানেরা এত বড় রাজ্যটা দখল করিলেন, তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ নাই, একটিও উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে নাই মোটকথা মূক জনসাধারণ তখন সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনেকে ইসলামধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নূতন শক্তির আশ্রয় লইয়া অপমানকর ব্রাহ্মণ্য-শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল, অপরেরা পতনশীল হইয়াও কথঞ্চিৎ স্বীয় ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু যাহারা দাসের ন্যায় সেই বন্ধনকে অতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল,—অনধিকারীরা নূতন কোন স্থানে কিছু অধিকার পাইলেই সেই আলগা বাঁধটি টুটিয়া যাইত মন্দির হইতে বিতাড়িত জনসাধারণ মসজিদে প্রবেশাধিকার পাইল, হিন্দুসমাজের অতি কঠোর বৈষম্য হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা ইসলামের উদার ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট হইল, মোটকথা নবব্রাহ্মণ্য মতবাদের অপমান করিয়া মিলনের স্থলে বিচ্ছেদ ঘটাইল এক জাতিকে দুই টুকরা করিয়া নিজেদের বল নষ্ট করিল বৃহত্তর বল বলবীর্য্য-শক্তি শিক্ষা হারাইয়া বাতরোগগ্রস্তের ন্যায় নিশ্চল হইল, ক্ষুদ্রদল শিক্ষার অভিমান ও পবিত্রতার জ্ঞান করিয়াও নিজের পরমায়ুকাল বজায় রাখিতে পারিল না। এখন হিন্দুজাতি যে মরণ-সমস্যার সম্মুখীন—তাহা এই নবব্রাহ্মণ্যের আত্মদ্রোহী, আত্মহত্যাকারী নীতির ফল

এখনও যে সকল গোঁড়ার দল এই পশুবলির দেবীতির সমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদের গৃহ যখন লন্ডন কর্তৃক আক্রান্ত হইবে, তখন মহেন্দ্র, বাবলী প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা আর লগুড় লইয়া লন্ডনদের পশ্চাৎ ধাবিত হইবে না। বৎসর বৎসর হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের অনুপাতে যেরূপ কমিয়া যাইতেছে তাহাতে তাহাদের পুঁথি, টিকি ও রমণীগণের পবিত্রতা কোথায় থাকিবে - তাহা তাঁহাদের একবার চিন্তা করা উচিত।

মুসলমান কর্তৃক ভারতবিজয়ে আমাদের লাভ ও ক্ষতির একটা হিসাব করিলে ফলাফল কি দাঁড়ায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়।

আমাদের কলাবিদ্‌ অনেকেই মুসলমানদের ঘোর করিয়াছেন তাঁহারা অন্ধ্র, অযোধ্যা, কোশলকে তাঁহাদের ভুবনবিজয়ী শিল্পপ্রতিভা দেখাইয়াছিলেন--তাঁহাদের দ্বারা আমরা পুঁথি পাইতে পারি বটে, কিন্তু কলালক্ষ্মীর বৈজয়ন্তী-প্রতিমা যে মুসলমানেরা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি যবে হয় বৌদ্ধাধিকারের পরে সমস্ত এসিয়া মাতিয়া প্রতিমা গড়ার বড় বাড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিত্য নূতন ধ্যানে পাওয়া বিগ্রহ, বহু হস্ত-কল্পনা, বিশ্বরূপ, কূর্ম বরাহ, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সর্ব অবয়বে ভগবানের পূজার এতটা বেশী প্রচলন হইয়াছিল যে মনে হয় যেমন মৎস্য না থাকিলে পুকুরের জলে সাঁতার কাটার আনন্দটুকু পর্যন্ত থাকিত না, সেইরূপ মূর্তিপূজার এই অবাধ প্রচেষ্টা না থাকিলে আমাদের রাজাগৃহ, ন্যায়াগৃহ, এ সমস্তই মন্দিরে পরিণত না করিলে দেবতাদের স্থান সংকুলান করা অসম্ভব হইত। সত্য বটে তখনও সাধক অনেক ছিলেন যাঁহারা বাহিরের অবয়বকে অতিক্রম করিয়া নিরবয়বের ধ্যানধারণা করিতেন, সমাধি বিগ্রহ পাবক চিত্রের মত মাত্র থাকিতেন এমন কি ভারতবর্ষের সাধারণ লোকেরা পর্যন্ত প্রতি বিগ্রহের পশ্চাতে পরমাত্মাকে দেখিতে শিখিয়াছিল এবং দেবমন্দির যে পরমাত্মার আবাসগৃহ নহে, স্থাপিত বিগ্রহ যে তাঁহাকে ধারণা করিবার একটা চিত্র বা রূপক মাত্র ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল।

তথাপি অনেকস্থলে, বিশেষ করিয়া আরবদেশে, অন্যান্য বিগ্রহের পরিকল্পনা মানুষের মনকে বাহ্যবস্তু ও কুসংস্কারযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল দেবপূজা অনেক সময়ই বাহ্যচারে পরিণত হইয়াছিল, এবং পুরোহিতেরা অন্তর্লোক সম্বন্ধে এত বেশী উদাসীন হইয়াছিলেন যে দেববিগ্রহের মন্দিরে বৈদিক যজ্ঞ হইতে আগত নানারূপ জটিল পদ্ধতির বাহ্য ভেদ করিয়া সাধারণ লোকের দৃষ্টি সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। এই ভাবে মানুষের মন কিছু ও বন্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেবগৃহে দেবতারা এত অতিরিক্ত সংখ্যায় জড় হইয়াছিলেন যে তথায় তাঁহাদের জায়গা কুলাইত না। অতিশয় ভিড়ে মানুষ যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুটুকু হারা হইয়া কোন মুক্ত ময়দানের হাওয়া খোঁজে, ভক্ত ও সাধকের হৃদয়ও তেমনই স্বভাবের মুক্তাঙ্গনে দাঁড়াইয়া একবার তাঁহার স্রষ্টার সঙ্গে মুখোমুখি হইতে চাহিতেছিল।

প্রতিমাপূজার বাড়াবাড়ি।

পৌরোহিত্য ও মুসলমান বিজয়ের ফল বাবলী

ভারতে যে অসহিষ্ণুতা ছিল না তাহা নহে। প্রভু যে যে স্থানে দেবতারা ভাঙিয়া গেলেন কেহ তাঁহাদিগকে আর গড়িতে পারিল না। ভারতবর্ষে দেবমূর্তি হয় হইল সত্য, কিন্তু ভক্ত ও সাধক পুনরায় দেবতা গড়িলেন। মূর্তিপূজার মধ্যে যে অমূর্ত পূজার উপাদান আছে, সেই কথা ভারতবর্ষ জানিত, অন্য কেহ তাহা জানিত না। যেটুকু আবর্জনা ঢুকিয়াছিল মুসলমান তাহা আসিয়া দূর করিয়া দিলেন। শিব পূজা, দুর্গা পূজা কৃষ্ণ পূজা কালী পূজা—হিন্দুদের সকলই রহিল। পাথরের যে রূপ চালিয়া গেল, লোহে সেই রূপ ঢালিয়া উঠিল, তুলট ও বাটালীর গতিশক্তি থামিল, কিন্তু লেখনীর গতি থামিল না, কাঁসি দিয়া বেচা কিনা যাহা হইত, অস্ত্র দিয়া তাহা অধিকতর সফলতার সহিত বেচা হইতে লাগিল। বৈষ্ণবপদে রাধিকার অভিসারের যে মূর্তি দেখিতে পাই, রাধার পুষ্করাগ মণি ও কৃষ্ণের যে ছবি দেখিতে পাই, রামপ্রসাদের কালীমূর্তি-খানায় যে রূপ চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা আলোচনা করিলে কে বলিবে মুসলমান মূর্তিপূজার শিকড় এদেশ হইতে উপাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন?

ভক্তের মনস্কাম পূরণ হেতু ভক্তগণ, পুরোহিতের কুসংস্কারপূর্ণ এক ছুতেজ ধর্ম-শাসনপ্রণালী সত্ত্বেও হিন্দু স্বকাল উন্নত হইয়াছিলেন যে চক্ষু মানুষ কাণাইয়া ফেলিয়াছিল, তিনি সেই চক্ষে দুই দান করিয়া মানুষকে ভগবানের নিকট মুখোমুখি করিয়া দিতে পারিতেন। ভারতবর্ষের যে তিনি কতক পরিমাণে তাহা করেন নাই, ইহা বলা যায় না। সোমনাথের মন্দির গঙ্গা হইতে ১০০ ফরসঙ্গ (৪০ ক্রোশ) দূরবর্তী ছিল। শিখাশালকার মত সারি সারি লোক সেই মন্দির হইতে গঙ্গা পর্যন্ত দাঁড়াইত, কত সহস্র লোক সে চাহিত এই ব্যবধানটা পারণা করিয়া একটা অনুমান করা যায়। প্রত্যেক লোকের হাতে হাতে কলসী কলসী জল চলিয়া আসিত, তাহারা পাঁচ হাজার উক্ত লিঙ্গরূপী মহাদেবকে প্রত্যহ অভিষিক্ত করা হইত। ইহার মন্দিরে ১,০০০ পুরোহিত সর্বদা নিযুক্ত থাকিতেন এবং আগন্তুক যাত্রীদিগকে দক্ষকার্যে সহায়তা করিতেন, যাত্রীদিগের মস্তক মুণ্ডনের জন্য এবং দাড়ি-গোঁপ কামাইবার জন্য ৩০০ নাপিত নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের কর এক মুহূর্ত অবসর পাইত না। মন্দিরের দ্বারে ৩০০টি নর্তক-নর্তকী গান ও নৃত্য করিত। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য মন্দির হইতে বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কতটা আধ্যাত্মিকতা ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তির খেলা সোমনাথের আঙ্গিনায় যতটা হইত তাহা অপেক্ষা যে বাহ্যাড়ম্বর অনেকটা বেশী হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভ্যাটিকানে যেমন ক্যাথলিকগণের মধ্যে নানারূপ বীভৎস ঘটনা ঘটিত এবং পোপ সেখানে ভগবানের স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন। এই জগদ্ব্যাপী কুসংস্কার এবং জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ সরীসৃপ প্রভৃতি বহুরূপী মূর্তির পূজায় মানবাত্মা ক্লিষ্ট হইয়াছিল। তখন উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল যে, এক বস্তুই সত্য নাই, এস আমরা সকলে বলি ভগবান্ একটি মাত্র, তিনি মহান্। একথা মুসলের মুখে শুনিয়া

সোমনাথের মন্দির।

গরেশের ঘুম ভাঙ্গিল, সেখানে ধর্মের কাঁচিকাঁচি হইল। ধর্মের ধর্ম যাহা ইসলাম প্রভৃতি বহুদেশে এখন লক্ষ্যবাচিহীকৃত—তাহা প্রকৃত বুদ্ধ ধর্ম নহে—তাহাতে মহম্মদের প্রেরণা সুস্পষ্ট।

এদেশে ইসলামের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ একটু পরে আসিয়া কবীর নানক প্রভৃতি সাধুদিগকে প্রেরণা দিয়াছিল, তাহাতে বৃথা অনুষ্ঠানগুলির উপর লোক বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। সাধু বলিলেন, "পাথর পূজনে হরি মিলে ত মুই পূজে পাহাড়।" রামপ্রসাদ বলিলেন, "যিনি সমস্ত জগতকে খাওয়াইতেছেন, তাঁহার জন্য যে যাদুল, তুমি বৃথা বুট ভিজানা ও আলো চালের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেছে সমস্ত জগত যে আমার মায়ের প্রকাশে রে অযোগ, সেই মায়ের মূর্ত্তি মাটী দিয়া গড়িতেছে কেন?" নানক বলিলেন,—"আমার প্রভুর মন্দির কেমন,—অনন্ত আকাশ, চন্দ্রসূর্য সেখানে দিবসে ও সন্ধ্যায় আরতির দীপ জ্বালিয়া যাহে সেখানে মলয়ানিল ধূপের গন্ধ বিস্তার করে এই ক্ষুদ্র মন্দির ভুলিয়া যাও।" যিশু বলিলেন, "নিত্য স্নান করিলেই যদি তাঁহাকে পাওয়া যাইত, তবে জলজন্তুরাই তাঁহার স্বর্গ হইত।" মুসলমান যদি মোল্লার মত নিয়া এই সকল কথা কহাইতেন, তবে বুঝিতাম ইহা প্রচার মাত্র, কিন্তু হিন্দু সাধুর মুখে যখন এই উপদেশগুলি শুনি তখন বুঝিতে পারি হিন্দু সাধুরা সমাজ না পড়িয়াও মহম্মদকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বাহির মুসলমানধর্ম্মের প্রভাবে এই সকল ভাব এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল হিন্দুদের অন্তরাত্মার যে স্তরতলে এই সকল সত্য তৎপূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা নহে তখনকার পদাবলী তামিলদেশের অনেক স্থানে এই সকল কথার আভাস পাওয়া যায়, আলবারিক ধর্ম্মকে তামিল কবি অন্নর স্বামী খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"বেদ পাঠ করিয়া কি লাভ? শাস্ত্র বচন শিখাইয়া কি হইবে? যে একমাত্র শিবের শরণ লইবে মুক্তি তাহারই জন্য জঙ্গলে ও নগরে তীর্থ খুঁজিয়া ঘুরিয়া কি পাইবে? কেন নানারূপ পাষণ্ডিত্ব ও দৈহিক কৃচ্ছসাধন করিয়া জীবনটাকে দুঃসহ করিয়া তুলিতেছ? আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া এবং মাংসাদি ছাড়িয়া দিয়া কোথায় সত্যের সন্ধান পাইবে? তিনি একমাত্র অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ প্রভুর শরণ লও, মুক্তি তাঁহারই। কেন উপবাস করিয়া কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আত্মাকে কাঁদাইতেছ, কেনই বা পর্ব্বতগহ্বরে যাইয়া বা দূর এবং নিকটবর্ত্তী নদী জলে অবগাহন করিয়া তপস্যা করিতেছ? যিনি একমাত্র ভগবানকে প্রার্থনা করেন মুক্তি তাঁহারই।" (History of the Tamil Saivite Saints, by Kanakasabhai Pillai, pp. 7)

হজরত মহম্মদের শিষ্যেরা হিন্দু অধ্যাত্মসম্পদকে খুব জোরে নাড়া দিতে পারেন নাই যে রামপ্রসাদ মূর্ত্তিপূজার প্রতি তাচ্ছল্য প্রদর্শন করিয়াছেন তিনি সেই মূর্ত্তির পায়ে বসিয়া তপস্যা করিতেন এবং সেই মূর্ত্তি কাঁধে করিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়ার কালে নদীর স্রোতে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।* মুসলমান হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিলেন, কিন্তু মূর্ত্তিপূজা

মহম্মদ যা পড়িয়াও মহম্মদকে গ্রহণ।

* অক্ষয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত রামপ্রসাদের জীবনী, ১৮৮ পৃ।

থামাইতে পারিলেন না। অত্যাচারীর মুগুরাঘাতে শিরদাঁড়ার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল, এই পর্য্যন্ত। ভগবান্ মঙ্গলস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ—তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য্যস্বরূপ। সেই রূপের আকাঙ্ক্ষা তিনিই মানবচিত্তে জাগাইয়াছেন, তিনিই সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করেন। সুতরাং ভগবানের রূপকল্পনা স্বাভাবিক। আমরা জ্ঞানস্বরূপ, দয়াস্বরূপ—এই সকল কথার দ্বারা নিগুণের গুণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকি। ঐ সকল কথা—কর্ণের পক্ষে ইঙ্গিতের কাজ করে। বিগ্রহও সেইরূপ আমাদের চক্ষুকে অরূপের রূপের ইঙ্গিত দেয়। সেই সকল বাক্যে মনের অগোচর ব্রহ্মকে সাধকের কাছে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে বুঝাইয়া থাকে। যে সময় ইঙ্গিতগুলি উদ্দিষ্ট দেবতাকে না বুঝাইয়া নিজেরা প্রবল হইয়া দেবতাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইযুগে ওজস্বত মন্ত্রদের অনুদয় হইয়াছিল। সেযুগে ভগবান্‌কে ভুলিয়া জনসাধারণ খড়কুটো ও ইটপাটের লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি আসিয়াছিলেন সেই উপকরণগুলির যথোচিত মূল্য দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে।

ব্রাহ্মণের অধিকার।

হিন্দুর যেখানে প্রভু ও দুর্ব্বলতা এবং মুসলমানের যেখানে প্রবল শক্তি, সেইখানে তাহাদের আক্রমণ অনেকটা সফল হইবে। হিন্দুর ব্রাহ্মণে যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় এবং অকৃতজ্ঞতার চূড়ার দৃষ্টান্ত। হিন্দু রাজাদের জন্য নিম্নশ্রেণীর শত সহস্রলোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে। তাহাতেই তাঁহাদের সিংহাসন রক্ষা পাইয়াছে। পল্লীগ্রামে তাহারাই কৃষ্ণলোকের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, ব্রাহ্মণগণ তাহাদেরই প্রসাদে ব্রাহ্মণীদিগকে লইয়া সুখে থাকিতে পারিবারিক জীবন কাটাইবার সুবিধা পাইয়াছেন, অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের জন্য প্রাণ দিয়াছে। ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক তাহারাই রক্ষা করিয়াছে—এই ব্রাহ্মণ সেবা-পরিচর্য্যা ও ভক্তিগ্রহণের সম্মান রক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তাহারা কি পাইয়াছে? সেই দেবমন্দিরে তাহাদের উঁকি মারিবার ক্ষমতা নাই, সেই ব্রাহ্মণের পা ছুঁইয়া ধূলি গ্রহণের অধিকার তাহাদের নাই, সেই ভক্ত-গৃহস্থের গায়ে একটু জল দেওয়ার অধিকার তাহাদের নাই।—এই সকল অন্যায় ও দুর্ব্বিষহ ও ঘৃণার রাজ্যে মুসলমান নিষ্ঠুর ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব লইয়া আসিলেন। পতিত যৌদ্ধগণকে তো হিন্দুরা কোল টানিয়া এমন এক জায়গায় লইয়া আসিয়াছিলেন যেখানে তাহারা শূদ্র অধম হইয়া জীবন যাপন করিতেছিল—যে স্থানে তাহারা থাকিত, সে স্থান হিন্দুগৃহস্থের অস্পৃশ্য, তাহাদের ছায়া মাড়াইলে স্নানের ব্যবস্থা। ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া মুসলমান বলিলেন, "আমাদের রাজা-প্রজা নাই, বামুন-চণ্ডাল নাই, আমরা এক পংক্তিতে বসিয়া খাই। দুনিয়ার এক মালিক। আমরা তাঁহারই সন্তান সকলে ভাই।" এই কথা এদেশের নিম্নশ্রেণীর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে অমৃত প্রলেপের কাজ করিল। আজ যদি হিন্দুর প্রাণে বিন্দুমাত্র ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকিত, কৃতজ্ঞতার লেশ থাকিত, তবে কি পূর্ব্ববঙ্গে শত সহস্র লোক মুসলমান হইয়া এদেশের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নকে এত জটিল করিয়া ফেলিতে পারিত? উত্তরবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশী ছিল, সেইখানেই ইসলাম কৃতকার্য্য হইল। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, "আমি এবং যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদের মধ্যে জাতি

বলিয়া কিছু নাই—আমরা সকলে একজাতি" ঠৈ ভা এই কথার মহত্বের বিজয়ী কণ্ঠস্বরের প্রভাব ও প্রতিধ্বনি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

এই সকল নৈতিক শক্তি লইয়া বিশ্বাসের খড়্গহস্তে মুসলমান আসিয়াছিল। সেই খড়্গ আমাদের পরাস্ত হইয়াছে লৌহ বা ইস্পাতের খড়্গ নহে যখন তাহারা দেবমন্দির ভাঙিয়া বিশ্বনাথপ্রাসাদের উচ্চ চূড়া অতিক্রম করিয়া বজ্রের মত খরবেগে আমাদের চক্র-চূড়া-বংশের ধ্বজস্তম্ভগুলিকে প্রাবিত করিয়া ক্রমশঃ পূর্বমুখে আসিতেছিল, তখন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পণ্ডিতেরা বৃথা করিতেছিলেন, এবং হরদেব তাল রাখিয়া গীতগোবিন্দের ললিত পদে মন্দির চালিতেছিলেন, লক্ষ্মণ-সেনের মন্ত্রী—বিদ্যাৎপ্রভা ও অমিকলা নারী নর্তকীদ্বয়ের সঙ্গে রাত্রি কাটাইয়া তাহাদের প্রাপ্য লইয়া প্রাকৃত ব্যক্তির মত রাজসভায় ঝগড়া করিতেছিলেন তাঁহার প্রিয় কবি কলিঙ্গরাজনাথের মুখে তৎবিরহ বিলাপ শুনাইতেছিলেন, রাজধানীর বহু দেবমন্দির গায়ে শিলিগণ নানাছন্দে গৌর বিগ্রহের বীভৎস বহু প্রকটিত করিয়া কলা চাতুর্য দেখাইতেছিলেন

যখন বঙ্গদেশের বিলাসকলা।

মুসলমানগণ না আসিলে চৈ বংশের সংস্কার-কল্পিত প্রেরণার ফলস্বরূপ আমরা ভরত করিব, নানক প্রভৃতি সাধুদিগকে পাইতাম না, এমন কি হয়ত বা চৈতন্যদেবকেও পাইতাম না বঙ্গসাহিত্য চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে অসাধারণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাহাও হয়ত সম্ভবিক পরিমাণে মুসলমান নবাব বাদশাগণের উৎসাহে হইয়াছিল।

মুসলমানগণ আসাতে আমাদের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইতেছে, স্বাস্থ্য-কেউল ভাঙিয়া পড়িয়াছে, হয়ত লক্ষের বক্ষের রৌদ্রজ্বলিত অপহৃত হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের রাজলক্ষ্মীর মুকুটের প্রধান মণিগুলি অপহরণ করিয়াছেন এবং অনেক সময়ে অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু তথাপি তাঁহাদের আগমন যে মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে ঘটিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই

কেবল ক্ষোভ হয় সেই সমস্ত ও কারুকার্যময় বিগ্রহ ও দেবমন্দিরের জন্য, যাহাতে চারুশিল্প তাহার শেষ কথা কহিয়াছিল,—যাহা কঠোর পাষাণে ক্ষোদিত হইয়াও কোমল লাবণ্যের লীলাভূমি ছিল, যাহাতে বাঙ্গালীর অসামান্য সূক্ষ্ম কারু-শিল্প ভক্তি ও প্রেমের বচনে বর্ণা দিয়া দেবমন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই ভক্তি-প্রেম মিশ্র কলা-শিল্পের চরম গৌরব কত যে কালাপাহাড়ী গৌরাঙ্গে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহা আর পাওয়া যাইবে না, সেই যুগের সঙ্গে সে শিল্প, সে প্রেম অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই অতুলনীয় নরশিল্প-বৈভবের জন্য এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আপনা আপনি নয়ন প্রান্তে আসিয়া দাঁড়ায়।

বাঙ্গালীর শিল্পকলার বিলাপ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুসলমান-বিজয়

যত পূর্বে যখন আলেকজেণ্ডার ভারতবর্ষ করে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন মগধের সাম্রাজ্য পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যান। তাঁহার সৈন্যেরা মগধসৈন্যের সৈন্যসংখ্যা ও বীরত্ব প্রভৃতির যে সংবাদ পাইয়াছিল তাহাতে তাহারা আর এক পাও অগ্রসর হইবে না এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বসিল। আলেকজেণ্ডারকে যোদ্ধৃবর্গের অভিপ্রায় সহিত ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যে তাঁহার সৈন্যদিগকে সাধিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা স্বচক্ষে চাহিয়াছিল তাহার প্রায় তাঁহার চক্ষুঃশূলস্বরূপ ছিল তাহারা এবার তাঁহার আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করিল না। অশোকের ধর্মলিপিকা বঙ্গদেশের অনেকগুলি ছিল — ফিউয়েনসাঙ্গ লিখিয়াছেন কিন্তু তাহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ জয় করিয়া সমুদ্রের তীরে তাঁহার জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। পালনরপতিগণ বঙ্গদেশেরই লোক ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষকে বঙ্গদেশের লোকেরা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিপুল সাম্রাজ্যের মধ্যে বঙ্গদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বিক্রমের অভাব।

কিন্তু সেনেরা আসিয়াছিলেন রাঢ়দেশ হইতে। তাঁহারা কর্ণাটের রাজবংশ সম্ভূত সামন্তসেন পালরাজত্বের শেষভাগে বঙ্গের অরাজকতার সময় সৈন্যবাহিনী দেখাইয়া অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন একটু একটু করিয়া সেই অধিকার বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়সেনই এদেশের উপর প্রকৃত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মিথিলার রাজসভা সম্বন্ধে বিজয়সেনের আত্মশ্লাঘা শুনিতে পাওয়া যায়। সেখানে দশম-শতাব্দী 'সসং' এখন পর্যন্ত চলিতেছে। মিথিলার রাজকবিকে "নব জয়দেব" উপাধিতে অভিনন্দিত করা হইত। বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন ইঁহারা খাস বাঙ্গলা দেশটাই প্রথম করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, পশ্চিমে মিথিলা ও পূর্বে আসাম, ইহাই ইঁহাদের কাজের পরিধি ছিল। লক্ষ্মণসেন কাশী ও প্রয়াগ অবধি বিজয়ী হইয়া অভিযান করিয়াছিলেন। এই রাজ্য লইয়াই ইঁহারা সার্বভৌম রাজযোগ্য পরমভট্টারক প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনরাজাদের মন্ত্রী পূর্বে বা পশ্চিমে বঙ্গের সীমানা ছাড়িয়া বেশদূর প্রসারিত হয় নাই। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে বাঙ্গলার যে যোগ পালরাজত্বের সময় পর্যন্তও ছিল, সে যোগ সেনাধিকারে একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। কনৌজ, অযোধ্যা, শ্রাবস্তী — প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর দেশের রাজারা যখন মুসলমানদিগকে ঠেকাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, পশ্চিমের সাম্রাজ্য কাশীর, কনৌজ দিল্লী ও মরুরাজ যে ঘোরঘটা তুলিয়া উঠিতেছিল সে আগুন বাঙ্গলায় আসে নাই। লক্ষ্মণসেন একবার জয়চন্দের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্ব শেষে হইতে বিহুকুল এবং কাশীর হইতে মুসলমান

মুসলমানদের সহজ ও বিজয় আগমন।

পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জয়পাল সুপ্রসিদ্ধ ভীমপালের পুত্র ছিলেন এবং দুই লক্ষ সৈন্য সহ সবক্তগিনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ইনি হারিয়া যাইবার অবমাননাজনক সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। সবক্তগিনের পুত্র সুলতান মহম্মদ পুনরায় এই জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। জয়পালের ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ৩০ হাজার পদাতিক ও ১ শত রণহস্তী ছিল। এবারও মুসলমানেরা জয়ী হয়। তখন হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোন রাজা একাধিকবার শত্রু কর্তৃক পরাস্ত হইতেন তবে তাঁহার সিংহাসনের উপর দাবী থাকিত না। দ্বিতীয়বার যুদ্ধে হারিয়া জয়পাল প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ সমর্পণ করেন।

ইহার পর সুলতান মহম্মদ মুলতানের রাজা "বাজীরাও"কে আক্রমণ করেন (১০০৪-০৫ খৃঃ)। দাউদ খাঁ নামক যৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এক রাজা বাজীরাওকে সহায়তা করেন কিন্তু এ যুদ্ধে বাজীরাও পরাস্ত হইলেন এবং দাউদ খাঁ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করায় এবং বাৎসর বৎসর ২০ হাজার 'দিনার' সুলতানকে দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

জয়পালের পুত্র অনঙ্গপাল সুলতান মহম্মদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে নিজের এই মহাবিপদের সময় একত্র হইয়া মহম্মদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে আহ্বান করিয়া চিঠি লিখিলেন। অনঙ্গপালের রাজত্বের নীচে সন্নিবিষ্ট রাজন্যবৃন্দ ভারতবর্ষের মহাশত্রুকে বাধা দিবার জন্য দৃঢ়পণ হইয়া দাঁড়াইলেন। কোকাহার নামক হিন্দুসম্প্রদায় তাঁহার সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিল। তাহারা এরূপ দৃঢ়পণ ছিল যে, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সুলতান মহম্মদের ৩০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিহত করিল। এই কোকাহারদের পরাক্রম দেখিয়া সুলতানের মনে বিষম ত্রাস জন্মিল। তিনি সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত করিয়া পালাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন, এমন সময় অনঙ্গপালের হস্তী সমস্ত হইয়া রাজাকে লইয়া ছুটিয়া চলিল এবং রাজা কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রাজচক্রবর্ত্তীর বিশাল ধবল ছত্র না দেখিয়া হিন্দু সৈন্য মনে করিল, রাজা নিহত হইয়াছেন, তখন তাহারা রণক্ষেত্র হইতে পালাইতে লাগিল, এবং সুলতান মহম্মদ এই অভাবনীয় সুযোগ লাভ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পলায়নপর ৮,০০০ হিন্দু সৈন্য নিহত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বীর বৈজয়ন্তী উড়াইলেন। ইহার পরে ১০২৪ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ সোমনাথ জয় করেন। তৎকালে ভারতবর্ষে এত বড় দেবালয় আর ছিল না। এই দেবতার উদ্দেশে নিরোজিত ভাণ্ডার ও বৃত্তি কাহিনীর উপাখ্যানের মত মনে হয়। শিবের চতুর্দ্দিকে যে সকল মণিময় স্বর্ণাধার ঝুলিত সেগুলির দ্বারা দেবগৃহ অন্ধকার রাত্রিতেও আলোকিত হইত। শিবের সান্নিধ্যে একটা স্বর্ণশৃঙ্খল ছিল তাহাতে অসংখ্য স্বর্ণঘণ্টা বাঁধা ছিল, স্পর্শমাত্র তাহারা বাজিয়া উঠিয়া প্রহরে প্রহরে নিত্য পুরোহিতদের ঘুম ভাঙ্গাইত। এই স্বর্ণশৃঙ্খলটির ওজন ছিল দুই মন। সোমনাথের ভাণ্ডার

হইতে সুলতান ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পরে, লইয়াছিলেন। কথিত আছে, অযোধ্যার রাজার কণ্ঠে যে বড় বড় মুক্তা ছিল তাহাদের মূল্য ছিল ২,০০,০০ দীনার। তাঁহার অন্তঃপুর বাসিনী রমণীদের কণ্ঠে ইহার বিভিন্ন পরিমিত মূল্যের মণিমুক্তা ছিল। সুলতান ভারতবর্ষ হইতে যে অর্থ লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বদেশের কোষাগারে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু বিজয়গর্বী মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই। দিল্লীর পৃথ্বীরাজের হস্তে প্রথমবার সুলতান মহম্মদ পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহার দ্বিতীয় বারের আক্রমণে ১১৯২ খৃঃ পৃথ্বীরাজ নিহত হন।

এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া মুসলমান ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন। এ সময় বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেন কি করিতেছিলেন? হয়ত তিনি ভাবিতেছিলেন, মুসলমানেরা আর এই পূর্ব্বে অগ্রসর হইবে না। সেনেরা বঙ্গ ও তৎসংলগ্ন প্রদেশগুলি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয়ের স্বপ্ন কোন কালেই দেখেন নাই, আকাঙ্ক্ষাকরাও বখ্তিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয়। এই দেশ তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল ইহাই তাঁহারা বড় লাভ মনে করিয়াছিলেন। শাসনের সঙ্গে আধ্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের যে যোগ ছিল, সেনদের সময় তাহা একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল মিথিলায় লক্ষ্মণ-সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের এই পরিচয়ই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কাল লইয়া যে বিসংবাদ চলিতেছে, তাহার সমাধান এইভাবে হইতে পারে। ইহাতে আমার মৌলিকত্বের দাবী কিছুমাত্র নাই। আমার পূর্ব্বে অনেকে এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ১১৮৮ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়, সেই সময় বঙ্গাল মিথিলা জয় করিয়া নবজাত শিশুর জন্ম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণাব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহার ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে মহম্মদ বখ্তিয়ার কর্তৃক বিতাড়িত হওয়া সম্ভবপর হয়। ১৯১০ বৎসরের সময়ের ব্যবধানের বিচার লইয়া বৃথা পাণ্ডিত্য দেখাইয়া লাভ নাই এবং তদ্রূপ গবেষণার পাণ্ডিত্য আমার আছে নাই।

এখন মহম্মদ বখ্তিয়ার কর্তৃক নদীয়া বিজয় আমাদের আলোচ্য। অনেক দেশভক্ত ঐতিহাসিক এই ব্যাপারটাকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। কেহ কেহ বলেন, নদীয়ায় লক্ষ্মণসেনের রাজধানীই ছিল না, কেহ বলেন, মিনহাজ বর্ণিত নদীয়া এই নবদ্বীপ নহে, কেহ বলেন, যে লক্ষ্মণসেন স্বীয় ভুজবলে কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন, কাশীর রাজাকে পরাজিত করিয়া বারাণসী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যিনি কামরূপের রাজার গর্ব্ব-খর্ব্বকারী, সেই "অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি, বিদ্বদ্ বিদ্যা বিচার বাচস্পতি, সেনকুল-কমল-বিকাশ ভাস্কর, সোমবংশ-প্রদীপ, প্রতিপন্ন-কর্ণ-সত্যব্রত গাঙ্গেয়, শরণাগত বজ্রপঞ্জর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন" কি সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে ভোজনার্থ আনীত স্বর্ণথালী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্তঃপুরের মহিলাদিগকে মুসলমানদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া গুপ্তদ্বার-যোগে পলায়ন

করিয়াছিলেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাঁহারা মিনহাজের কথিত বৃত্তান্তটা একেবারেই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

কিন্তু একথা নিশ্চিত যে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল এবং এই বিজয় সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা—নবদ্বীপ অধিকার—লক্ষ্মণ সেনের ৩৫ বৎসর পরে মিনহাজ এই বিবরণটি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি স্বকর্ণে বোদ্ধার মুখে ঘটনাটি আদ্যন্ত শুনিয়াছিলেন। এই দুই যোদ্ধাই মহম্মদ বক্তিয়ারের অভিযানের সঙ্গী ছিল। মিনহাজের কথিত বিবরণ তৎসাময়িক লোকের মুখে শুনা ইহা যেসকীর্তির অনুপ্রাণনায় একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কি প্রকারে? বিজয়ী যোদ্ধাদের পক্ষে স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্য বাড়াইয়া বলা এবং অপর-পক্ষকে হীন করিবার চেষ্টা করাটা স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত ঘটনাটির কল্পনার সৃষ্টি, একথা বলা ঠিক নহে।

লক্ষ্মণসেন সেই সময়ে ভারতবর্ষের এক স্বাধীন রাজা ছিলেন তাঁহার সভার গীত-গোবিন্দ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যৌবনে তিনি বহু যুদ্ধ জয়ী এবং কাশ্য বীর বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনটাই মুসলমান অভিযানের সমকালবর্ত্তী তিনি নিশ্চয়ই মুসলমানদিগের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আগমন বৃত্তান্তের সাধ্যমতার সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন দৈবদেবে শুনিয়াছিলেন, বিহারের, কলোজের প্রভৃতি মহাবীরগণের পরাজয়ের কাহিনী তাঁহাদের দৃঢ়বদ্ধ সঙ্ঘ এবং শত্রুদমনার্থ ঐক্য সমস্তই দৈবদোষে পণ্ড হইয়া গেল, সোমনাথের গগনচুম্বী শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল, উদন্তপুর-বিহার পর্য্যন্ত বিজয়ী মুসলমানেরা আসিলেন, তাঁহাদের পথ রক্তরঞ্জিত হইল মহম্মদ বক্তিয়ার যেমনই দুঃসাহসিক ছিলেন, তেমনই দ্রুত ও নিপুণ ছিলেন বিহারে তিনি এরূপ নির্ব্বিচারে হিন্দুদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন যে, সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যে তাঁহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি জানিবার চেষ্টা করিয়া শুনিলেন নগরে একটিও হিন্দু নাই। একটা বিরাট সম্প্রদায়কে তাঁহারা দলবদ্ধ বলিয়া নষ্ট করিয়া আক্রমণ করিলেন। মুণ্ডিত-মস্তক নিরীহ বৌদ্ধভিক্ষুগণকে শত্রু সেনাপতি মনে করিয়া অসহায় অবস্থায় ও অলক্ষিতে তাঁহাদের জীবন নষ্ট করিলেন, তখন পর্য্য স্বপ্নেও বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি শত শত একান্ত নিরীহ, অবাধনন্দিত মানবগণের প্রাণ নষ্ট করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু আসিয়া ঠেকিল বিহারের বিরাট পাঠাগারের প্রচীরের নিম্নে তখন বা তিনি প্রথমতঃ সেগুলি অস্ত্রশস্ত্র মনে করিয়া থাকিবেন সেই পাঠাগারের অমূল্য রত্নরাশি, জ্ঞানিগণের জীবনব্যাপী তপস্যাসম্ভূত সুধীমণ্ডলীর প্রাণাধিক প্রিয় পাঠাগার নষ্ট করিয়া তিনি মহাগর্ব্ব বিজয়ীর গর্ব্ব অনুভব করিলেন। তখন দশ হাজার সৈন্য গভীর জঙ্গলে লুক্কায়িত রাখিয়া তিনি মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সঙ্গে বণিক্‌বেশে নদীয়ায় প্রবেশ করিয়া আপনাকে অশ্ব ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিলেন।

বিহারের 'দুর্গ' বিজয়।

এই আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী বিরাট যুদ্ধে বাঙ্গালী যোগ দেয় নাই কেন? (১) দাক্ষিণাত্যের কোন রাজা এই সময় আর্য্যাবর্ত্তের রাজাদিগকে সাহায্য করিতে আসেন নাই, বাঙ্গলা

দেশের হয়ত সেইরূপ কোন কারণে আপনা নিজেকে দূরে রাখিয়াছিলেন হয়ত বা এরা

বাঙালী যুদ্ধে যোগ দেয় নাই কেন।

মনে করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী বিজয়ী পাশ্চাত্য অভিযানের সময় অনেক [illegible] বাঙ্গলাদেশ পর্যন্ত আসে নাই, তেমনি ধরিয়া নিয়াছে এবারও তাহাই হইবে। [illegible] শুঙ্গ ও পালযুগের সময়ে আর্যাবর্তের সর্বপ্রধান রাজ্য কনৌজ ছিল বলিয়া সেনযুগের সময়ে সেই হিসাবে আর্যাবর্তের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হয় নাই। এই কারণে সাময়িকভাবে গৌড়কর্তৃক পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি মধ্যে মধ্যে বিজিত হইলেও আর্যাবর্তের সঙ্গে বাঙ্গলার যোগ বা অন্তরঙ্গতা কোন দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল না। এ সেনেরা খাস বাঙ্গলার লোক ছিলেন না, তিন পুরুষে তাঁহারা বাঙ্গলা দেশকে কতকটা আপনার করিয়া লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহারা তাদৃশ সহযোগ পাপ্ত হন নাই। এ কৌলীন্য, সামাজিক বিপ্লব বৌদ্ধবিদ্বেষ প্রভৃতি কারণে খাস বাঙ্গলাদেশ সেনেদের রাজত্ব সম্বন্ধে লোক উৎসাহিত হয় নাই। স্বীয় সন্তানসন্ততিগণের লিখিত জ্ঞানশাসন প্রমাণকতাপূর্ণ হইতে পারে কিন্তু তাহা কি ব্যাপকভাবে লোকপ্রীতির সূচনা করিতেছে? কেহকেহ এরূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়াছিলেন যে তাহারা মুসলমানদের পূর্বকৃত শত অত্যাচার ভুলিয়া বিদেশিগণকর্তৃক বাঙ্গলা জয় করিলেন এবং মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় ভগবানের দানস্বরূপ মনে করিয়াছিল। পুরাপুরাণের "নিজেদের উষা" নামক অধ্যায়ে দেখা যায়— তাহারা মুসলমানদিগকে ভগবানের ও নানা দেবদেবীর অবতার মনে করিয়া তাহাদের কর্তৃক ব্রাহ্মণদলনে নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিল। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের (পশ্চিমা ঠাকুর) অত্যাচার ও পাশাই, পঞ্চবর্ষী সমাজের সেই বাঙ্গিদের ক্ষমতা লোপ, দেশের আপামর সাধারণের ভীতিকর হয় নাই। বল্লালসেনের উপহাস্যী কাড়ী আড়াই পত্নিনীকে সমাজে চালাইবার চেষ্টা ও বঙ্গসমাজের সর্বত্র একটা হোরাহুরি ধুমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বল্লাল কৌলীন্য স্বীকৃত হয় নাই। এতদ্বারা বুঝা যায় বাঙ্গলায় একটা অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিহাসে কোথাও এরূপ নাই যে সেনরাজত্ব ধ্বংসের প্রাক্কালে মুসলমানদিগের সঙ্গে বাঙ্গালী জনতার কোনরূপ সংঘর্ষ হইয়াছে। পরন্তু দেখা যায় যে বঙ্গবিজয়ের পরে বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, নব ব্রাহ্মণদিগের ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে।

এই সময়ে সেনরাজগণের দ্বারা একটা দেশব্যাপী সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করা খুব সময়-সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। (৬) লক্ষ্মণসেন অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে বয়সে লোকে জীবন হইতে মরণের দৃশ্যই বেশী দেখে, যখন শারীরিক শক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির প্রতি প্রবৃত্তি থাকা কতকটা অস্বাভাবিক,— সেই সময় বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তখন যদি লক্ষ্মণসেন তাদৃশ উৎসর্গপরতা না দেখাইয়া থাকেন, তাহা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। (৭) ইতিপূর্বে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক পালরাজার সম্বন্ধেই গ্রাম্যগীতি রচনা হইয়াছিল। রাজাদের সম্বন্ধে কোন করুণ কাহিনী মুখে ফিরত, ইহার কোন ঘটনাই গ্রাম্য

করিয়া বাদ দেন নাই। রাজ্যপাল, গোপীপাল, ভোটপাল, রামপাল, মহীপাল, বর্দ্ধপাল প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক পালরাজার সম্বন্ধেই প্রায় গীতির কথা তাম্রশাসনে ও গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে।* এই সকল গানের কিছু কিছু আমরা এখনও পাইতেছি। কিন্তু সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন—ইহাদের সম্বন্ধীয় কোন পল্লীগীতির উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায় না। অথচ ইহাদের অনেকেরই তাম্রশাসন ও গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এখনও লোকে "ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত" প্রবাদ-বাক্যটি বলিয়া থাকে। চৈতন্যপ্রভুর জন্মিবার সময়েও লোকে দিবারাত্র পালরাজাদের গান গাহিত। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন-দাস লিখিয়াছেন, "গোপীচাঁদ, ভোটপাল, মহীপাল গীত, ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত" (চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য)। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল,—লক্ষ্মণসেন অতি বৃদ্ধ বয়সে মুসলমানকর্ত্তৃক তাড়িত হইলেন, সমস্ত দেশটা হিন্দুরাজার হাত হইতে মুসলমান রাজার হাতে যাইয়া পড়িল—কত মর্ম্মবিদারক ঘটনার সঙ্গে লক্ষ্মণের নাম বিজড়িত। এ দুঃখ, এ করুণ কাহিনী গাহিবার জন্য কি একটি পল্লীগায়কও দাঁড়াইল না? এখন কথা হইতে পারে যে, সে সকল গীত নষ্ট হইয়াছে,—কিংবা এখন যাহা পাওয়া যায় নাই, পরে হয়ত তাহা পাওয়া যাইতে পারে. কিন্তু যাহা পাওয়া যায় নাই, তৎসম্বন্ধে অনুমান আমাদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বেশী হানি করিতে পারে না। গীত ত পাওয়া যায় নাই, তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখও পাওয়া যায় নাই। এদিকে এখনও ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান ইত্যাদি গাহিয়া উত্তর বঙ্গের চাষারা আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিতেছে, দশম শতাব্দীর মহীপালের গান এখনও প্রচলিত, অথচ লক্ষ্মণসেন কি বল্লালসেন সম্বন্ধে একটি গানও শুনিতে পাই না। বৃন্দাবনদাস ষোড়শ শতাব্দীতে

* রাজাদের সম্বন্ধে এইরূপ গ্রাম্য-গীত রচনার প্রথা বহু প্রাচীন। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রাজা রঘু এইরূপ গান দ্বারা অজিত ধন হইতেই বরতন্তু [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] কথোপোহার্য্য [illegible]" ঘাদশপুর তাম্রশাসনের [illegible]। [illegible] শতাব্দী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে — "গোপে, গৌড় রাজচৈতন্যকুল প্রাগ্রসরকর্ত্তে [illegible], ক্রীড়ন্তি [illegible] [illegible]। [illegible] বেশ্মনি পল্লবেদ-সঙ্গীতকলালী-মনোহরস্য [illegible] [illegible]" বাদপাড় তাম্রশাসন দ্বারা, পাল সম্বন্ধীয় গ্রাম্যগীতের উল্লেখ পাই হয় (১৯শ শ্লোক)। তৃতীয় বপ্যঘটপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধেও তাম্রশাসনে এরূপ উল্লেখ আছে ("কীর্ত্তিঃ প্রগীতা [illegible]")। তেঘরি-তাম্রশাসনে চন্দ্র বংশীয় রাজা সম্বন্ধীয় ঐ বংশের পল্লীগীতির কথা আছে—তাই উদ্ধৃত হইয়াছে। লিখিত আছে চৈতন্যপ্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এই সমস্ত গান সর্ব্বসাধারণের অতি প্রিয় ছিল। সেক শুভোদয়াতে রামপালের প্রশংসাসূচক পল্লীগীতির উল্লেখ পাই হয়। ১৯শ শতাব্দীতে ইংরেজী ঈষর ঘোষের ত্রিপুরাভিধানে ও কিংবা ধনপতি সম্বন্ধে এইরূপ গীতির উল্লেখ আছে। ১৪৭৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত রাজা গণেশের ত্রিপুরারাজ বিজয়-কথা, রাণী কমলা ও পরবর্ত্তী রাজা 'অমরমাণিক্য' সম্বন্ধে সাধারণের উপভোগ্য গীতকথা কথা পাই হয়। হাজ-সাহেব লিখিত আছে, এই সকল গান মুখে ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত হইবার জন্য [illegible] হইতে [illegible] ত্রিপুরাধিপতি [illegible] [illegible]। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৌলবী গুলাম মকবুল ও বাবু ত্রিপুরারাজধানী সম্বন্ধে গীতির গান প্রকাশিত করিয়াছেন। [illegible] "Folk Literature of Bengal" নামক পুস্তকে এই গীত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে (১৩৩-১৩৫ পৃঃ)।

বৌদ্ধপালরাজগণের নাম করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধীয় দেশব্যাপী গানের উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ সেই সকল রাজার বহুপরবর্তী হিন্দুরাজাদের গীতের উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ শেষ হিন্দুরাজগণের স্মৃতি অতি করুণ ঘটনা বিজড়িত জাতীয় ঘোর দুর্দশার কথা। তাঁহাদের সম্বন্ধীয় গান থাকিলে অবশ্যই তিনি উল্লেখ করিতেন।

এই সকল কারণে মনে হয়, নব ব্রাহ্মণগণের উৎপীড়নে বৌদ্ধ সাম্যবাদের অবসানে জনসাধারণ নিতান্ত হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহারা সেই কষ্টে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ওদ্রাবহ পরধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহারাই ছিল গায়ক, উহার কালে তাহারাই ঈশাখাঁ মেওয়াস ফিরোজ খাঁ মেওয়াস, জাহাঙ্গীর মেওয়াস, মেওয়াস সেকেন্দর প্রভৃতি মুসলমান বীরদের সম্বন্ধে বহু পাঁচালী রচনা করিয়াছিল। সদুক্তিকর্ণামৃত ও লোক-প্রবাদে কম্বলাম্বরের অনেক সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়, রাজা পণ্ডিতমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া নব হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতেন, কোন্ বিষয়ে ব্রাহ্মণকে কি দান করিলে কি ফল হয় এই সকল বিচার চলিত, তিনি ছিলেন পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা-পণ্ডিত, পণ্ডিতগণ ছিলেন তাঁহার স্বপক্ষ।

জনসাধারণের সঙ্গে শেষ রাজাদের সম্বন্ধ।

জনসাধারণের সঙ্গে পালরাজগণের যে যোগ ছিল সেনদের সঙ্গে তাহাদের আর সে যোগ রহে নাই। জনসাধারণ পালদের সময় নূতন নূতন গাথা রচনা করিত, রূপকথা, কীর্তিকথা প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইত এবং রাজারা তাহা শুনিতেন। সময় সময় যখন কোন রাজার প্রশংসা সেই সকল গানে অতিমাত্রায় বর্ণিত হইয়া পড়িত, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইত এবং তিনি অধোমুখ হইতেন। খালিমপুর তাম্রশাসন, কিন্তু সেনদের সময় কি সাধ্য যে জনসাধারণ বাঙ্গলা গান লইয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করে? সিন্ধুরাজলেখা, অম্বিলেখা বড় বড় রাগ রাগিণীতে গান করিত এবং পদ্মাবতী ও জয়দেব গীতগোবিন্দ গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন। ইহার বহু পরে যখন বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতাদির ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল, তখন ভট্টাচার্যের দল রাগিয়া গিয়া অভিশাপ দিলেন, ধর্মরাজ যে বাঙ্গলায় শুনিবে সে ঘোর নরকে যাইবে।

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

এইভাবে জনসাধারণ ও রাজসিংহাসনের মধ্যে একটা দুরূহ ব্রাহ্মণ্য-গর্বের প্রাচীর উঠিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্যের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, জাতিভেদ শৈল-কঠিন গণ্ডীতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে আবদ্ধ করিয়া এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীকে দূরে স্থাপিত করিল। এই ক্ষেত্র সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপযোগী নহে, এই ক্ষেত্রে জাতীয় সঙ্গীত জন্মায় না। বঙ্গ-বিজয়ে জনসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষোভের উৎপত্তি করে নাই। মুসলমান শাসনে বঙ্গীয় জনসাধারণ বরঞ্চ কতকটা

পল্লীকবিতা নীরব।

উঠে হইয়াছিল। শুধু নব ব্রাহ্মণগুলী তাঁহাদের অনুগৃহীত বলবল সঙ্গে এবং কৌলীন্য-প্রাপ্ত ভদ্র-সমাজের একটা বল রাজকীয় প্রসাদ লাভ করিয়া রাজাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য বঙ্গ-বিজয় এত সহজে হইয়াছিল। দৃঢ়-সঙ্কল্পিত জাতীয় বাধা অতিক্রম করিয়া পরদেশাগত শত্রু কখনই এক রাজ্য দখল করিয়া দীর্ঘকাল স্বীয় শাসন বজায় রাখিতে পারে না। ইংরেজদিগকে আমরা যেরূপ বাঙ্গলা দেশ হাতে তুলিয়া দিয়াছিলাম, মুসলমান-দিগকেও তাহাই করিয়াছিলাম কিনা, এ সম্বন্ধে সেই আঁধার যুগের সমগ্র ইতিহাস আমরা জানি না। কিন্তু নিম্নশ্রেণী-দলনকারী ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে জনসাধারণ যেরূপ আতঙ্কিত হইয়াছিল, মুসলমানাধিকারে যে তাহা হয় নাই তাহার আভাস নানা দিক্ হইতে পাওয়া যাইতেছে।

ডোম-কন্যা পদ্মিনীকে ঘরে আনিয়া বল্লালসেন তাহাকে রাজমহিষীর সম্মান প্রদান করিতে চেষ্টা পান। আমরা পুনঃ পুনঃ কুলগ্রন্থে "বল্লালস্তারযোনেন" এই কুল ব্যক্তিদলের উল্লেখ পাইতেছি। এই ডোম-কন্যার হাতে রাজা বড় বড় কুলীন বৈদ্যদিগকে খাওয়াইয়া-ছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ আমরা পাইয়াছি এবং পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্ণপীঠের উল্লেখ কুলজী-গ্রন্থের সর্বত্র আছে। ভরত মল্লিকের রত্নপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা, কবি ভরতের গণিত কুলপঞ্জী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নানা স্থানে এই স্বর্ণপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও স্বর্ণপীঠের বংশধরগণ বাঙ্গলার বিদ্যমান আছেন, যদিও তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, কিন্তু তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের নাম, ধাম, গাঁই, গোত্র এরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে যিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনিই তাহাদিগের সন্ধান অনায়াসে পাইবেন। ইহারা যে গুরুতর এবং গুরুতর সোনার পীঁড়ির উপর বসিয়া ডোম-মেয়ের রাঁধা ভাত খাইয়াছিলেন, তাহাই ভোজন-দক্ষিণা স্বরূপ পাইয়া এই উপাধিটি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজঘাড়ীর এই সোনযোগে বাঙ্গলার আবহাওয়াটা দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল। বল্লাল-চরিতে পদ্মিনীর প্রতি লক্ষ্মণ সেনের যে অত্যাচারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বঙ্গের বহু উপকথায় বিমাতার এরূপ চক্রান্তের কথা পাওয়া যায়, সেইরূপ কোন গল্প লক্ষ্মণ সেনের উপর প্রয়োগ করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। প্রাচীন ইতিহাসে কুপাল ও রাণী তিষ্যরক্ষিতার সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। কিন্তু পাটরাণী বল্লালের ব্যবহারে যে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বল্লাল সেনের সঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের এই উপলক্ষে কলহ এবং সংকৃত শ্লোকে পিতা-পুত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর সন্নিবেশকল্পনাসূত্রে উদ্ভূত হইয়াছে। ঘটককারিকাও এ বিষয়ে নীরব নহে। শালযোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ-নির্ণয়ে" মুলোপকাননের কারিকা হইতে যে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও পদ্মিনীকে লইয়া লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে তাঁহার পিতার কলহ বর্ণিত হইয়াছে।

এদিকে বল্লালী কৌলীন্য দোষের একটা গুরুতর আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাঁহাদিগকে বল্লাল কুল দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সেই কুল গ্রহণ

করিলেন না, "কায়েত্ত কায়ত্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ। বল্লালের কুল না লইল তিন জন।"

বল্লালী কুলে দেশের অশান্তি।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যে যাঁহারা সমাজে তাঁহাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হারাইলেন, তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম ছিল না। বস্তুতঃ বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে প্রধান কুলীন ছিলেন। বৈদ্যরাজ চক্রপাণি সেন বংশের বল্ল ও কুলীন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। বল্লালের শক্তির বহির্ভূত ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের বল্লই এখনও তদাকার কায়স্থগণের প্রধান। সেই সকল স্থানে চক্রবর্তিগণই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত। বল্লালের নব পর্য্যায়ে বহু প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত বংশেরা কোন স্থান পাইলেন না, তাঁহারা নীরবে ক্ষোভে অলিতে পুড়িতে লাগিলেন কেহ কেহ বল্লালের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া সেন-রাজের সীমার বহির্ভূত স্থানে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, পূর্ব্ব ময়মনসিংহে অনন্ত বল্ল, উত্তর রাঢ়ীয় ব্যাস সিংহ ও কৃষ্ণনন্দী বল্লালের নিকট অপমানিত হইয়া বল্লালের সীমানা হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন।*

যাঁহাদিগকে বল্লাল কুল দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে নানা কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যাঁহারা কুলজ্ঞ হইলেন তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা রহিল না, যাঁহারা কুল পাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার শ্রেণী বিভাগ লইয়া বিরক্ত হইলেন। ইহা ছাড়া কোমকক্ষাকে রাজান্তঃপুরের শীতস্থানে গাঢ় করাইবার চেষ্টা কাহারও মনঃপূত হইবার কথা নহে। এমন কি স্বয়ং রাজগুরু জীবকালেই রাজসভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। বাঙ্গালী কৌলীন্য দেশময় একটা অসন্তোষের বিস্তার করিয়াছিল, ঈদৃশ ঘটনাটি লইয়া রাজশাসনে গোলযোগ করার মত তখন কিছুই ছিল না।

ব্রাহ্মণ অনুশাসনের ঘটোৎকচ।

উচ্চ তিন শ্রেণীর নিম্নে যে সকল জাতি, তাহারা ব্রাহ্মণ্য উপপ্লবে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের একটা প্রধান ভাগ ছিল বৌদ্ধ। বৌদ্ধ নেতৃবর্গ বঙ্গদেশ হইতে দূর সীমান্ত প্রদেশগুলিতে আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় বৌদ্ধ-জনসাধারণ এই ব্রাহ্মণ্য আন্দোলনের জলধিতে টলমল করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ জাতি-ভেদের বন্ধনী কসিয়া আঁটিতে লাগিলেন, বল্লালের হাঁড়ি পালগ্রামের মত সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারা উহাকে ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের হাঁড়ি ছুঁইতে পারা দরিদ্রের পক্ষে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করা অপেক্ষাও অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে আচার জিনিষটা নব-কৌলীন্যে একবারে মাথা ডিঙাইয়া উপরে বসিল। যিনি "খপাক" খান, তিনি পুণ্যাত্মা। এক জাতির মধ্যেও ছোঁয়াচে রোগ এক কঠোরভাবে

* "চন্দ্রদ্বীপপুরাবিনাকশর্মণঃ। বল্লালসেন, বসু সত্তমাঃ। শ্রীকণ্ঠনন্দন তনুজা ছিলেন। ঈশানদাস বিজয়া ৫ বসবঃ" ১১০৩ শ. অব্দে লিখিত একটী প্রাচীন হাতে লেখা পাই, অনন্ত বসু কোলের ছেলে পালাইয়া যাইয়া শিলোকাল (ময়মনসিংহ) মহকুমার অধীন কাঙ্গল গ্রামে বাস স্থাপন করেন (কেদার মজুমদার কৃত ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৬৫ পৃঃ)।

নির্বিচারে সকল লোককে আক্রমণ করিল যে, সহরে সমস্ত এক বাড়ীতেই সারি সারি উনুন বসিয়া গেল। উনুনগুলি হোমকুণ্ডের মতই পবিত্র হইল। জনসাধারণের মধ্যে শত সহস্র লোক "অনাচরণীয়" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের গায়ে একটু জল ফেলার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী 'নেড়ানেড়ী' নাম লইয়া ভদ্রপল্লী হইতে বহু দূরে কোনরূপে একটু স্থান লাভ করিল, কিন্তু বিষাক্ত শবের ন্যায় তাহাদের স্পর্শ হিন্দুসমাজে পরিত্যাজ্য হইল। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ জনসাধারণের নিকট হইতে অত্যাচার করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের মৃতাদি অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি এই দুর্দ্দিনে বৌদ্ধগণ। সন্ধর্ষীরা কিরূপ বিপন্ন হইয়া মুসলমান কর্ত্তৃক দেশাধিকার একটা মস্ত বড় সৌভাগ্য মনে করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল।

বল্লালের শেষ জীবন।

এদিকে বল্লাল সেন ঘোর ও দুরূহ-বলিকদের জাতি নষ্ট করিলেন এবং স্বকীয় রাজাগ্রহণকে বলবৎ করিয়া কৈবর্ত্ত, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ইত্যাকার প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উপর বসাইয়া দিলেন (বল্লালচরিত, ১০৯ পৃষ্ঠা)। বল্লাল সেনের শেষ জীবন সুখের হয় নাই। পদ্মিনী সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া তাঁহার পত্নী মহারাজ্ঞী রামদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ সেন প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহিতা করিতে একবার উদ্যত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে পদ্মিনী তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাঁহার শরীর চিরকাল সুগঠিত ও সুন্দর ছিল, কিন্তু এবার সেই শরীরে মারাত্মক পীড়া দেখা দেল। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কানুসাটে আসিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন (সাম্বাল)। এই সকল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তিনি গৃহে নিজে অশান্তি টানিয়া আনিয়াছিলেন, নতুবা তিনি মুক্তহস্ত, উদারচরিত্র, তেজস্বী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন. বটুক দাসের পুত্র শ্রীধর দাস কৃত সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁহার ও লক্ষ্মণ সেনের সংস্কৃত শ্লোকে যে কাব্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতা দৃষ্ট হয় সেই সমস্ত কবিতা যদি পিতা-পুত্রের রচিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে সংস্কৃত শাস্ত্র ইঁহারা গৌণিক ভাবে অধ্যয়ন করেন নাই, ইঁহারা উভয়েই সেই শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরে বল্লালের বিদ্যাবত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এমনও হইতে পারে যে সেই দুই-খানি পুস্তক তিনি নিজে রচনা করেন নাই, তাঁহার গুরু অনুরুদ্ধ ভট্ট পুস্তক প্রণয়নে তাঁহাকে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মূল বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন এবং গ্রন্থরচনার আদ্যন্ত প্রেরণাটা রাজার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া তিনি শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না, কোন যোদ্ধা ব্যক্তি তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে ফিরাইতেন না, তাঁহার অবারিত দানে রাজকোষ প্রায় সর্ব্বদাই শূন্য হইয়া পড়িত এদেশে এখনও যে "বল্লালী দারিদ্র্য" বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে তিনি এরূপ অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন যে, তাঁহার অভাব কোন কালেই মিটিত না।

আর্য্যাবর্ত্তে সমুদ্রগুপ্ত ও ধর্ম্মপালের পরে বল্লালের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং শক্তিমত্তা অতি অল্প রাজারই ছিল। কন্যাটে যখন উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার দেহে যমের নিশ্বাস আসিয়া পড়িতেছিল। এই গৃহহারা দারাপুত্র-স্নেহহারা মুমূর্ষু হতভাগ্য রাজা যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া সভায় অনুতাপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। তদবধি এই প্রায়শ্চিত্তের কলঙ্ক তাঁহার পীড়া দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল।

লক্ষ্মণসেনকে রাজা মৃত্যুকালে একবার দেখিতে চাহিলেন। পদ্মিনী রাজার সঙ্গে নাই শুনিয়া, লক্ষ্মণ কিন্তু জগদানন্দে গৌড়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুসেনকে (মাধব সেন) পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ জুড়াইলাম, এখন বিষবৃক্ষ হইতে যে এরূপ অমৃত ফল হইবে, তাহা কে জানিত?" বিষবৃক্ষ দ্বারা লক্ষ্মণসেনকে রূপক হইতেছে। এই বিষয়ে তাঁহার রচিত যে কয়েকটি কবিতা আছে, তাহা বড়ই সুন্দর। এই সকল কথা আমরা সাহিত্য মহাশয়ের "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু যদি বল্লাল-চরিতের কথাই সত্য হয় এবং সত্য সত্যই রাজা অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন তবে ইতিহাসের অনেক কথাই ফিরিয়া লিখিতে হইবে।

বল্লালের সময় সংস্কৃতের অনুশীলন এত অধিক হইয়াছিল যে পুরমহিলারা পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী বামিঘিরহে কাতর হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে :—

"পতত্যবিরতং বারি মুত্যন্তি শিখিনো মুদা
অয়ং কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখসাগরং করিষ্যতি।"

কথিত আছে নির্ব্বাসিত লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী-লিখিত এই দুইটি পংক্তি কোন ক্রমে বল্লাল দেখিতে পাইয়া পুত্রকে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিবার আদেশপূর্ব্বক নিম্নলিখিত শ্লোক চতুষ্টয় প্রেরণ করিয়াছিলেন—

"সমস্তা দশমঙ্গলাগতিনা সন্তাপিতা নিষ্ঠুরে
দুর্য্যোদশবং দ্বিতীয়মতিময়েকাদশেজন্মনী।
সা বহ্নি নৃপকন্যকত্ব কবিতা জনস্তমীবর্দ্ধিতা।
প্রাপ্তোত্তাইমবেদনাং প্রথম যে তূর্ণং তৃতীয়ো ভব॥"

[শ্লোকের অর্থ —যে বুধ (দ্বিতীয়) বং বলী (পুত্র, [মকর (১০ম) সমাগমে কর্কট ও মীনবং (৯ম ও ১২শ) মকরকেতন (কন্দর্প) সমাগমে কুরিকুল (১১শ, তনী (বধূ) প্রপীড়িতা এবং সেই জ্বালা(৭ম) বা তুলনা-রহিত অর্থাৎ অতুলনীয় জনস্পর্শা কন্যা (ষষ্ঠ, সিংহ (৫ম, তুল্য রাজকুমারের পক্ষী হইয়া বৃশ্চিক (৮ম)-বং যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, যে যেমবং (১ম) বিনীত পুত্র, শীঘ্র আসিয়া উহাকে মিথুন (৩য়, অর্থাৎ মিলিত হও। (যশোর-খুলনার ইতিহাস, সতীশ মিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১।)]

যিনি অদ্ভুত সাগর সিঞ্চিয়াছিলেন, জ্যোতিষের ইঙ্গিত দ্বারা পুত্রবধূর অবস্থা বর্ণনা করা তাঁহারই যোগ্য বটে। এইরূপ একটা বিষয় প্রকাশ করিয়া লিখিবার যোগ্য নহে, ইঙ্গিতে ব্যক্ত করাই সমীচীন।

লক্ষ্মণসেনের মত অভিজ্ঞ, বীরত্বগর্বিত, সুপণ্ডিত প্রবীণবয়স্ক রাজা কি জানিতেন না যে যবনদেশ আসিয়া মুসলমান উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের দুর্দমনীয় ধর্ম শক্তি কেহ রোধ করিতে পারেন নাই, অচিরে তাঁহার রাজ্যও গ্রাস পাইবে? ইহাতো তাঁহার রাজসভার জ্যোতিষীরাই গণিয়া বলিয়াছিলেন। জ্যোতিষিগণ যঃ ইঃ বক্তিয়ার খিলজির বিকটাকৃতি, তাঁহার ক্ষিপ্র অতিক্রমকারী সুদীর্ঘ অদ্ভুতদর্শন তুরঙ্গমের কথা পর্যন্ত গণিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কাশী অধিকার করেন "তবকৎ-ই-নাসিরী" নামক ইতিহাসে লিখিত আছে যে তৎকালে আর্য্যাবর্তের রাজগণের মধ্যে কাশীরাজের নাম শীর্ষস্থানে ছিল। তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য নৃপতির তুলনায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্য মালবদেশ হইতে চীনের সীমান্ত, এবং সমুদ্র হইতে লাহোরের নিকটবর্তী ১০ দিনের পথ দূরে স্থিত) প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাতাশদিন ঘোরী কাশীপতিকে আক্রমণ করিয়া তথাকার প্রজাবর্গকে যেরূপ নিরুপদ্রবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লক্ষীভূত হইয়া আছে। রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়া অসংখ্য শবের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সোণাদীধা দাঁত দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারা গিয়াছিল। ১,৪০০ উটের পৃষ্ঠে চাপাইয়া ঘোরী কাশীর লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য লইয়া গিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন কি এই ঘটনা ও বিচারের সংবাদ বাংলার কথা জানিতেন না? তিনি এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন যে পূর্ব্বোক্ত প্রবল পরাক্রান্ত কাশীরাজকেও তিনি পরাস্ত করিয়া সমর্থে গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ছোট কথা ফুকিয়া যে ঝড়ের মত আসিতেছে, কখন আসে, কখন আসে -এজন্য গৌড়-বাসীরা প্রস্তুত ছিল এবং লক্ষ্মণসেন সমস্ত জ্যোতিষ গ্রন্থের পাতা ঘাটিয়া কোন্ দিন কখন তাঁহারা আসিবেন, তাহার দিন, ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। এমন কি কোন্ ব্যক্তি আসিবে, লোক পাঠাইয়া তাহার আকৃতি প্রকৃতির খোঁজ লইতেছিলেন ও জ্যোতিষের বচনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেছিলেন।

লক্ষ্মণসেন আত্মরক্ষার্থ তিনি কি কি উপায় অবলম্বন করিতে ছিলেন? প্রথমতঃ তিনি যদিও বল্লালী কৌলীন্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিলেন যে দেশের মধ্যে যাঁহারা পাণ্ডিত্যে, চরিত্রবলে, অভিজাত্যে, বহুদেশ-পর্য্যটনজনিত দূরদর্শিতায় ও মনস্বিতাবলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বল্লালসেন তাঁহাদিগকেই কুল দিয়াছিলেন এই কুলীনেরা তাঁহার পিতার সিংহাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ ও অনুরক্ত। এদিকে নিম্নশ্রেণী এবং দেশের অনেক ধনী মানী লোক তাঁহার শত্রু। নব ব্রাহ্মণ

লক্ষ্মণসেন মুসলমান আক্রমণের আভাস পাইয়া কি করিলেন?

তখনও দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা দেশের মধ্যে স্বীয় অধিকার অল্পস্বল্প-ভাবে স্থাপিত করিবার জন্য যে সকল অত্যাচার অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহা জনসাধারণ কখনই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নাই। এই অবস্থায় তিনি বুঝিলেন, যাঁহারা তাঁহার সিংহাসনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও হিতৈষী, তাঁহাদিগকে এই দুঃসময়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা একেবারেই বিজ্ঞের কাজ হইবে না। বল্লালের বিধান অনুসারে প্রত্যেক ৩৬ বৎসরের পর কৌলীন্য নবভাবে প্রদত্ত হওয়ার কথা ছিল। কুলীনেরা ইতিমধ্যে রাজবলে সমাজে কতকটা আসন জুড়িয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাদের স্থলে নূতন লোক বসাইলে নিশ্চয়ই কুলীনদের সেরূপ প্রতিপত্তি সহজে হইবে না, এবং যাঁহাদের কুল যাইবে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন লক্ষ্মণ-সেনের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে যখন বল্লালী কুলের নব সংস্কার হওয়ার কথা, তখন তিনি কুলীন-দিগের কুলের পরিবর্তন করিলেন না, ব্রাহ্মণের পুত্র যেরূপ ব্রাহ্মণ হয়, কুলীনের পুত্রও তেমনই কুলীন হইলেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কুলীনগণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাদের সমাজিক মর্য্যাদা পরিরক্ষিত দেখিয়া একান্ত কৃতজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা সেই বিপদের দিনে রাজার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন।

কুলীনদিগকে বিশেষ বলে টানিয়া আনা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

লক্ষ্মণসেন যদি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজত্বের পঞ্চদশ অঙ্কে অর্থাৎ ১২১৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনদের কুল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে নূতন বাহিনি আরম্ভ হইলে কাহার কুল থাকিবে, কাহার কুল যাইবে, এইরূপ একটা আতঙ্ক কুলীনসমাজে দেখা গিয়াছিল। ঘোষ-অনুসন্ধিৎসুগণ খুব মনোযোগের সঙ্গে কুলীনদিগের অযোগ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কুলীনগণ পদ্মাপারের ইষারতের মালিকদের ন্যায় তাহাদের কৌলীন্য-সৌধে কখন ভাঙ্গন লাগিবে, এই ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পদ প্রতিষ্ঠা কোন স্থায়ী ভিত্তির উপর না থাকাতে তাঁহাদের কুলগৌরব লইয়া বড়াই করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু যাই তাঁহাদের কুল চিরস্থায়ী হইল, অমনই তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হইলেন। এদেশের ব্রাহ্মণেরা (শাক্তশতী নহে, সাকল্যত) তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে পারিলে ধন্য হইতেন। "পশ্চিমা ঠাকুরেরা" যাঁহাদের গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদেরই রাজ্য ঘোর কাটিয়া গেল। সুতরাং তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তা করিবার জন্য সমস্ত সমাজে একটা বিষম আগ্রহ দেখা দিল। ক্রমে এরূপ দাঁড়াইল যে একজন কুলীন যদি ৮০।৯০ বৎসর বয়স্ক হইত, তাহার সঙ্গে সাত-আট বৎসরের মেয়ের বিয়ে দিতে পারিলেও পিতামাতা কৃতার্থ হইতেন কুলীনের ঘর ক্রমশঃ বাজারে বাড়িয়া চলিল। এক এক জন কুলীন ৩৪ শত বিবাহ করিয়াছেন, এই সব সাধারণ ঘটনায় দাঁড়াইল। কুরু, সুজ, শঙ্ক, খঞ্জ, মুমূর্ষু এরূপ কুলীন পাইলেও পিতামাতা কৃতার্থ হইয়া তাঁহার ত্রিশততম স্ত্রীরত্ন স্বীয় অপোগণ্ড কন্যাকে দান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সামাজিক প্রতিপত্তি

বড় লোভনীয় জিনিষ, পশ্চিমা ব্রাহ্মণেরা এ দেশের ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য করিতেন না। তাঁহারা যখন ইহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন সেই স্বীকার-পত্র তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ মানপত্র হইয়া দাঁড়াইল। এখন যেমন এম এ পাশ বর পাইলে কন্যার পিতার মুখ প্রফুল্ল হয়, সে কালে সেই নব ব্রাহ্মণের অভিভাব কালে কুলীন পাত্র পাইলে লোকে তদপেক্ষাও গর্ব্ব অনুভব করিত। নবব্রাহ্মণ্য স্ত্রীলোকের নৈতিক জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি একটুও জোর দেওয়া নাই। কুমারীরাও এরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল যে অনেক সময় কুলীন বর পাইলে তাহার সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও গৌরব ও আনন্দ বোধ করিত। এখনকার শিক্ষা ও তখনকার শিক্ষায় যে প্রভেদ, সুতরাং সে সময়কার মেয়েদের রুচি যেভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছিল, এখন তাহার ধারণা করা সহজ নহে। ভিক্ষুকের চূড়ামণি শিবঠাকুর, অতি বৃদ্ধ শিবঠাকুর ও অইষবরীয়া গৌরী—ইহারা হইলেন দাম্পত্যের আদর্শ। শিব ভাঙ্গখোর, গাঁজাখোর, শ্মশানে মশানে ফেরেন, ইঁহাকে পাইবার জন্য কুমারী গৌরীর তপস্যা। কুলীনের মেয়েরা এই তপস্যাই বরণ করিয়া লইয়াছিল "সোনার প্রতিমা লোহী আমার ভাঙ্গেতে ভাঙ্গড় জামাতা তোমার" ইত্যাদি আগমনী গানের একটি ঐতিহাসিক অর্থ আছে।

কনৌজের ব্রাহ্মণেরা সমাজের শূন্যস্থানে আরোহণ করিয়া এদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহাদিগের পাতিত্য দূর করিয়া গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা ধন্য হইলেন। কৌলীন্য স্থাপী হওয়া অবধি কুলশাস্ত্র লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। সুতরাং বলা যাইতে পারে ১১৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কুলশাস্ত্র যাহা ঐতিহাসিক সাহায্য ছিল না, স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরে তাহা ছাড়া দেওয়া হইয়াছিল। আদিশূরই হউন, বা পূর্ব্ব বঙ্গের যে কোন রাজাই হউন, তিনি যদি "বেদবানাঙ্ক" শাকে ১৪৮ শক ৭৩২ খৃষ্টাব্দ) সর্ব্ব প্রথম কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকেন, তবে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে ৭৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৮৩ খৃষ্টাব্দ এই ৪৫২ বৎসরের কুলশাস্ত্রের প্রধান অবলম্বন ছিল স্মৃতি। সুতরাং ইহাতে সত্যের অনেক অপলাপ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কৌলীন্য স্থাপী হওয়ার পরে যাঁহারা কুলীনদের বংশাবলীর মধ্যে কোনই দোষ হয় নাই, যেহেতু ধন, মান, প্রতিষ্ঠা, বল, বিদ্যা এ সমস্ত ছাপাইয়া উঠিয়াছিল কুল। প্রতি বিবাহ উপলক্ষেই কুলজী আবৃত্তি করা হইত, এত শত শত লোক ঘটকের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিল, কোন ক্ষুদ্রতম বিষয়েও কোন খোঁজ রাখিলে বিবাহ-সভায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইত। কুলজীশাস্ত্রের অনেক গলদ থাকিতে পারে কিন্তু যাঁহারা কুলীনদের বংশাবলীতে কোন দোষ নাই। গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে, বেদিনীপুর হইতে বিক্রমপুর পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে পরবর্ত্তী কুলীনদের যে বংশাবলী পাওয়া যায় তাহা নির্খুঁত, কারণ বংশের মর্য্যাদা এদেশে অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই সম্মানের ইতিহাসটুকু তাঁহারা নিজেরা রাখিয়াছিলেন। কুলীন-সমাজবহির্ভূত বংশাবলীতে অনেক দোষ পাওয়া যাইতে পারে।

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকত্ব।

এই ভাবে ও দেশের যাতা দোষ-দুষ্ট সাবর্ণ ব্রাহ্মণদিগের উদ্ধারের পর বঙ্গের নব-সৃষ্ট ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপিত হইল। যদি লক্ষ্মণসেন

কৌলীন্য স্থাপন না করিতেন, তবে এই ঐক্যের পরিবর্তে বিষম অনৈক্য উপস্থিত হইত। প্রথমতঃ রাজা কৌলীন্যের নির্ব্বাচন সুরু করিয়া দিয়াছিলেন। "এই নির্ব্বাচনে বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাদুড়ী বংশীয় কুলীনেরা পতিত হইয়া শ্রোত্রীয় হইলেন, রাঢ়ীদের মধ্যে কতকগুলি কুলীন পতিত হইয়া বংশজ নামে পরিচিত হইলেন এই উপলক্ষে ক্রমশঃ তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, গালাগালি অবশেষে মারধরি পর্য্যন্ত হইল যাঁহার আশা ভঙ্গ হইল তিনি রাজাকে ও নির্ব্বাচক পণ্ডিতগণকে শাপ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন" (সামাজিক ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩০ পৃঃ)। লক্ষ্মণসেন কৌলীন্য বংশানুক্রমিক করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত উচ্চশ্রেণীর সমাজকে হস্তগত করিলেন। ইহারাই তাঁহার আপদ্ কালের সহায় হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসেন এইবার কুলীনকুল পরিবৃত হইয়া নিজেকে কতকটা শক্তিমান মনে করিলেন। একশ্রেণীর লোক যাঁহারা জ্ঞানে মানে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা তাঁহার নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় চেষ্টা হইল নিজ সিংহাসনটিকে দৃঢ় করা। তিনি বুঝিলেন, পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার প্রধান স্থান নহে। সুরবংশ পূর্ব্ববঙ্গ যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পূর্ব্ববঙ্গ লাভ করিয়া সেনেরা সেই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ভরদ্বর নদ-নদীর দেশ, সেখানে পদ্মা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র, কাশ, বড়, কানাই, বংশাই প্রভৃতি বিশাল-স্রোত নদ-নদীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি যেন জালের মত ভাসিয়া বেড়ায়। মুসলমানগণ স্থলযুদ্ধে অসাধারণ শক্তিশালী, কিন্তু নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে কতকটা অসুবিধাজনক ছিল স্থলযুদ্ধে হিন্দু তুরস্ক দেশের অভিমানুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে কিরূপে? নৃশংসতায়, অমানুষে ও হত্যাকার্য্যে তাহাদের শক্তি অতিমানুষিক ছিল হিন্দুদের অনেকেই মাংস খাইতেন না, তাঁহারা সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা দিগ্বিজয়ী। জীবনক্ষেত্র তাঁহাদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের অপর নাম ছিল। তাঁহারা কিরূপ সুরাসক্ত ছিলেন, "আইন-ই-আকবরী" নামক পুস্তকে তাহার একটা উদাহরণ আছে। "আমির মামুদ একটা প্রকাণ্ড জমকালো শিবিরে বহু সহস্র লোক লইয়া আমোদ করিতেছিলেন। বিরাট্ রকমের একটা ভোজের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, আমীর, সুহৃদ ও সম্ভ্রান্তগণ ভোজনান্তে চলিয়া গেলেন। আমির আপনার রক্ষককে বলিলেন, "তুমি কি বল, এখন একটু মদ খাইলে হয় না?" রক্ষক বলিলেন, "এমন দিন আর কোথায় পাওয়া যাইবে। আপনারা আজ ষোল বেহারাকে আনেন রাজকুমারের অভিষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা ভোজনান্তে চলিয়া গিয়াছেন। বিশেষ আজিকার এতবড় একটা ভোজের পর একটু মদ খাওয়া তো দরকারই।" আমির বলিলেন, "বেশ! বেশ! আমরা দেশে আসিয়াছি, এই ফিরোজা বাগানই খুব উপযুক্ত স্থান, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া এখনই সুরু করা যাক।" শিবির হইতে তৎক্ষণাৎ প্রচুর মদ বাগানে আনীত হইল। ৫০ পাত্র মদ একটি ছোট শিবিরে সাজাইয়া রাখা হইল। এই পাত্রগুলি হইতে একটি একটি করিয়া সকলের

পাঁচ সিংহাসন সুরক্ষিত করা।

আমির মামুদের সুরাপান

নিকট মদ লইয়া আসা হইল আমির বলিলেন, "সকলকেই সমানভাবে দেওয়া হউক সকলেই যেন সুবিচার পায়।" প্রত্যেক পাত্রে মদ ঢালিয়া মদ ঢালা হইল। কাফেরের একটু সন্দেহ হইল, দৃষ্টিকে বাঁচাইয়া ও বালকের সঙ্গে অদল-বদল করিলেন এবং আমিরটি বেশ জব্দ হইল। বুদ্ধ তাহার পাঁচ পাত্র নিঃশেষ করিলেন যখন বষ্ঠ পাত্র খান, তখন তাঁহার মাথাটা খারাপ হইল এবং সপ্তম পাত্র খাইতে খাইতে একবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং অষ্টম পাত্রে মুখ ডুবাইয়া কাত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থা তাকেরেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয্যাশায়িত করিল। দ্বিতীয়দিবস মুসলমান পাঁচ পাত্র খাইতে খাইতে মাথা হেঁট করিলেন। ইহা কাফের স্থানে স্থানে বলা হইল। যখন সপ্তম মদ পাত্র নিঃশেষ করিলেন সিংহাসনচ্যুত হইলেন। একজনকে পাঠাইলাম শত্রু কি করিতেছে দেখা হইল। বলা হইল, তিনি পাত্র নিঃশেষ করিয়া টলিতে টলিতে মসজিদে গিয়া সেজদায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন, নাসিক বালক ও বিজেতা মদ অবশিষ্ট পান করিতে লাগিল। কেবল মাত্র ঠিক রহিলেন হযরত খালেদ ও আমার বন্ধুবর। তাহারা পাত্র নিঃশেষ করিয়া বন্ধুকে চলে। তাহাতে হজরত খালেদ পুলকিত আমরকে বলিলেন "এতদিনে ইনি ঐশ্বর্যশালী রোমায়ক আমাদের হাতে দিলেন, তবে যে নিজের মুক্তিকল্পে ও হজরতের প্রতি শ্রদ্ধা সমস্তই হারাইয়া বসিলেন।" আমির হাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বিদায়ের অনুমতি দিলেন। বন্ধুবর অতীব শঙ্কা আনাইয়া বিদায় হইলেন। ইহার পরও আমির মদ খাইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। তিনি যে দিন সকলকের আনন্দিত পাত্রের একটি পূর্ণপাত্র মদ খাইলেন তার পর উঠিয়া একটু নড়া চড়া করিবার আসন আনিতে আদেশ করিলেন। ইতিমধ্যে অল্প কথা আমির মদ ও মাংস করিলেন উভয় আস্বাদন করিলেন এবং কেমন ভাবে কথা বলা ও ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া কেহ সন্দেহ করিতে পারিল না যে, তিনি এক পাত্র মদও খাইয়াছেন। আমি এই সমস্ত ঘটনাটি সচক্ষে দেখিয়া লিখিলাম। (Ibn-ul-Asir, Abdul Fazal Baihaki, Mukaddam Mohammad Nazim, In Arabic Text Book, pp. 8-10)

এই ছিল পাঠান নায়কের যে চরিত্র, তাহাদের কাছে দুই দলদনিয়া কি করিবেন? যিনি এক বৈঠকে ১০০ মন মদ খাইয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারেন তেমন লোকের পক্ষে জয়ী হওয়া অসম্ভব নহে? সমুদ্রগুপ্তের পরেই এই মদিরা-পানের গল্পটি দাঁড়াইতে পারে, অথচ এক ঐতিহাসিক ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। সিকেন্দরের লিখিত কথা আমরা নির্দ্বিচারে ইতিহাসের কোথায় স্থান দেই, কেবল আমাদের পাঠের কথা উঠিলেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার আরম্ভ হয়।

যাহা হউক ১০০ মন মদ খাওয়ার গল্পে বাহারা কিছা বিশ্বাস করিলেও এই তুরস্কের মত লোকসকল যাঁহার শত্রু, তাঁহার মাথার উপর যে কিরূপ অস্ত্র তুলিতেছিল, তিনি কি একদণ্ডও তাহা ভুলিতে পারিয়াছিলেন? যে দিন রাজপুতরা একে একে বড় চেহা করিয়া

দুঃখিত অভিমানে বাধা দিতে পারিলেন না। তখনই প্রস্তুত প্রবল পরাক্রান্ত রাজা যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন যে দিনই লক্ষ্মণসেন বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুর ভরের আশা নাই যে দিন হিন্দুর সমবেত শক্তি সোমনাথ মন্দির রক্ষা করিতে পারিল না, পাণ্ডবের রক্তে যজ্ঞিয় অগ্নিসিক্ত হইল সে দিনই লক্ষ্মণসেন বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দুর ভরের আশা নাই একমাত্র আশা ছিল হয়ত মুসলিম সৈন্য আর পূর্ব্বে অগ্রসর হইবে না কিন্তু কয়ের অধিপতি তাঁহার প্রবল সৈন্য সহ নিযুক্ত হইলেন মগধের গোবিন্দপালের রাজ্য নষ্ট হইল, বিক্রমপুরে উচ্চতর মিহার গ্রাম প্রাপ্ত হইল কল দাড়ির পার্শ্বে, জ্যোতিষ-বেত্তারা বলাইল—যে যে স্থল হস্ত শুধু কাজ আরম্ভ করে নাই, প্রায় পাঠের যোগাযোগ সম্পূর্ণ করে নাই, সেই দুই আকার বা ফাঁকি বর্ণ বিষয় ও পরে তাহাদিগের হস্তে যে কুফল ফলিবে তাহা মনিষা গেল তখনই কি লক্ষ্মণসেন নিশ্চিন্ত ?

"হয় মাগধে বিহার বর"

এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া সভাসদের সঙ্গে বিক্রমপুরে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা কি করিবেন ? তাহারা লক্ষ্মণসেনকে বলিল, বিক্রমপুরে যে সময়ে কাহার রাজধানী ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না কিন্তু লক্ষ্মণসেন ইহার পূর্ব্বে, পরবর্ত্তী ও বাঙ্গালার পশ্চিম বঙ্গ ও পাণ্ডবমণ্ডল কে তাঁহাদের অধিকারের সম্পূর্ণ সহ পূর্ব্বাঞ্চলে পরাজয় দিয়াছিলেন সেখানে তাঁহার ছয় পুত্র ভাগ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন পূর্ব্বঙ্গে খুব কম ক্ষত্রিয় ছিল কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন মিনহাজ লিখিয়াছিলেন তখন এক কুমারের আক্রমণ সহ্য হইল তখন "লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালার রাজা, সেনা ও বড়লোকের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু লক্ষ্মণসেন যুদ্ধ করিলেন না" কুবি লিখিয়াছেন "লক্ষ্মণসেন আক্রমণকারী কোন সৈন্য পাইলেন না কিন্তু তাঁহার নগরের প্রধান প্রধান লোক সাহায্যে যাহা না করে ঈশ্বর তাহাকে তখনই তাহার উচ্চ-পূর্ণ উপকূল পাঠাইয়া দিলেন

কিন্তু যেটি ইতিহাসকার ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না তিনি পূর্ব্বঙ্গে তাঁহার সমস্ত সৈন্য ক্রমে সমস্তগুলি তবে ব্রহ্মপুত্রকে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নগর পরিত্যাগ করিলেন এই সময় তাঁহার মৃত্যু বিষয়ক দেখাইতে লোকদের কাহারও ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু এখন তাঁহার পক্ষের বল, মুসলমান সৈন্য যে সব সময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না এরূপ সাহস তাঁহারা দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মিনহাজ লিখিয়াছেন, 'লক্ষ্মণসেন মরিবার সময় যে বাক্যদান অনেক অর্থ পুরস্কার করিয়াছিলেন' তাহারা সেখানে ছিলেন, বাক্যদানের সেখানে অবশ্যই ছিল কিন্তু পুরস্কারটা সম্ভবতঃ খুব বড় রকমের কিছু হইতে পারে নাই। অন্যান্য সম্পত্তি পূর্ব্বেই অনেকটা বিলি হইয়াছিল রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহার প্রকৃত রকম ইতিহাসকার উল্লেখ ও তালিকা থাকে বলিয়া অন্যের হাতে সেখানে কিছুই নাই মনসমাজের লোক যায় বেশী কিছু পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না

হয়ত একটা বিষয়ে রাজার বুদ্ধিবার একটু ভুল হইয়াছিল। রাজা হয়ত ভাবিয়াছিলেন, নবদ্বীপ রাজধানী মূল রাজধানী নহে, সেখানে সপ্তাহে বলিয়া লোকের গতিবিধি ছিল, সেখানে বল্লালসেন একটা রাজ প্রাসাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে সেখানে থাকার জন্য, কতকটা দার্জিলিং বা সিমলা শৈলের মত; প্রকৃত রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ছাড়িয়া যে বৃদ্ধ রাজাকে তীর্থস্থানে যাইয়া মুসলমানেরা তাড়া করিবেন ইহা হয়ত তিনি ভাবেন নাই কুল-কারিকা হইতে জানা যায়, নবদ্বীপকে তীর্থ মনে করিয়া বল্লালসেন তথায় বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। "মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল নবদ্বীপ ভক্ত, নগরেতে করে যে বাসস্থান" (সতীশ মিত্রের যশোর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪।

বুদ্ধিবার ভুল।

মঃ বক্তিয়ার লক্ষ্মণাবতী ছাড়িয়া নদীয়া আক্রমণ করিলেন কেন?

মঃ বক্তিয়ার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ছাড়িয়া নদীয়া আক্রমণ করিলেন কেন? সহজ কথা হইল, যখন রাজা রাজধানীতে থাকেন না তখনই শত্রুপক্ষের সেই স্থান আক্রমণ করার সুবিধা হয় অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপের একটা ফাঁকা সহর—উহা সোমনাথতীর্থ নহে, ঐ স্থানটা মঃ বক্তিয়ার আক্রমণ করিলেন কেন? মিনহাজ লিখিয়াছেন—বিদ্যা, বুদ্ধি আত্মাভিমান ও প্রবীণ বয়স হেতু লক্ষ্মণসেন ভারতীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। তিনি ভারতীয় ধর্ম্ম জগতে আচার্য্য ('খলিফা') ছিলেন। ফিরেস্টা স্থির লিখিয়াছেন—"পূর্ব্ব বঙ্গের অধিপতি সেই সময় ছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেন, মুসলমান ঐতিহাসিক ব্রহ্মক্রমে লিখিয়াছেন, তাঁহার রাজত্ব ৮০ বৎসর ব্যাপক ছিল [ইহা মুসলমান লেখকের ভুল নহে, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহা দেখাইয়াছি] তাঁহার কথা সময়ে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত হইয়াছিল, তাহা ফলিয়া গিয়াছিল, কারণ তিনি সর্ব্ব বিষয়ে অনুকূলনীয় গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার পারিষদিক সম্মান তৎকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের অপেক্ষা বেশী ছিল এবং তাঁহার বংশীয় রাজারা পুরুষানুক্রমে "খলিফা" অর্থাৎ সমস্ত দেশের ধর্ম্মগুরু বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, তিনি কাহারও প্রতি কখনও অবিচার করেন নাই, এবং তাঁহার যথার্থতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

বক্তিয়ার নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন যে লক্ষ্মণাবতীর সমস্ত সম্পত্তি পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। সেই রাজধানী দখল করা বিশেষ লাভের বিষয় নহে, অথচ একটা সঙ্গিন যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার অনতিবৃহৎ সৈন্যদের ধ্বংস হইবার কতকটা আশঙ্কা ছিল। এদিকে নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গ একেবারে অনধিগম্য, পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষিপ্র-হস্ত নৌবাহকদলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যুদ্ধ করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে। সুতরাং তিনি একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার করিলেন। লক্ষ্মণসেনের মত খ্যাতি-সম্পন্ন প্রবীণ রাজাকে যদি তিনি বশবর্ত্তী করিয়া লইয়া কুতুবউদ্দিনকে উপঢৌকন দিতে পারেন তবে তাঁহার প্রশংসা খুব বেশী রকমের হইবে এদিকে পূর্ব্ববঙ্গের রাজারা তিন ভাই পিতার বিপদ্ দেখিলে স্বতঃই মাথা হেঁট করিয়া তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে আগ্রহান্বিত হইবেন।

নিজের যে দশ হাজার সৈন্য ছিল, তাহা জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি অত্যধিক দ্রুততার সহিত নবদ্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন, পাছে তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া যান, এই ভয়ে তাঁহার এরূপ দ্রুত ও গুপ্ত অভিযান। কেহ কেহ শুনিয়াছে যে, দশ সহস্র সৈন্য হাতে থাকিতে কোন সেনানায়ক মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ঘোটক-ব্যবসায়ীর পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শত্রুতা করিবার জন্য কোন নগরে প্রবেশ করিয়াছেন? এই অভিযানের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা নহে, ইহার মতলব চোর্গা এবং ছদ্মবেশ। মিনহাজ লিখিয়াছেন তিনি সমস্ত রাস্তাটা অতি নিরীহভাবে আসিয়াছিলেন, কাহারও উপর কোন অত্যাচার করেন নাই বরং নিজেকে জনৈক ঘোটক-ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।' কথকথায় যেরূপ শুনিয়াছি, কোন রাজবাড়ীকে অপহরণ করিবার জন্য দস্যুরা গুপ্ত পথে প্রবেশ করে—লক্ষ্মণসেনকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য এটি সেইরূপ একটা ফন্দি মাত্র। ইহার উদ্দেশ্য নূতন নহে, তাহা হইলে প্রথমই তাঁহার দলবল লইয়া আক্রমণ করিতেন। ইহা দ্বারা লক্ষ্মণসেনকে সপরীরে ধরিয়া একেবারে নিজের সহরে লইবার চেষ্টা। তাহা না হইলে এরূপ একটা অস্বাভাবিক ঘটনার কোন অর্থই হইতে পারে না। অস্বাভাবিক ঘটনা বলিয়াই রাজা নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে ছিলেন। তিনি চীৎকার করিতেন এবং দস্যালোচনা করিতেন। স্থানটি একটা দূর দূর সংরক্ষিত মহানগরী ছিল না এখানে যঃ বক্তিয়ার আসিবেন কেন? মিনহাজ নিজে সামসুদ্দিন ও তাঁহার সহচরের মুখে সকল কথা শুনিয়া লিখিয়াছিলেন রাজার অমাত্য, বন্ধু, পরিবার যে সমস্ত সম্পত্তিসহ ঘুরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যঃ বক্তিয়ারের অবিদিত ছিল না আহারাদি করিবার সময় অতর্কিত ভাবে একটা "আল্লাহো আকবর" বা কোন রণধ্বনি পর্য্যন্ত উচ্চারণ না-করিয়া একেবারে ভোজনশালার দরজায় আঘাত,—ইহারা কেমন ঘোটক-ব্যবসায়ী। ইহারা চোর, আসিয়াছিলেন সপরীরে রাজাকে চুরি করিতে এ অবস্থায় পৃথিবীর সমস্ত লোক যাহা করে, লক্ষ্মণসেন তাহাই করিয়াছিলেন, ঘরে আগুন লাগিলে কি দস্যু ঢুকিলে লোকে ঘর ছাড়িয়া আত্মরক্ষা করে, এখানে যুদ্ধের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। লক্ষ্মণসেন গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে প্রত্যেক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংযুক্ত খাল কাটা থাকিত তাহার সঙ্গে বড় নদীর যোগ থাকিত। নিতান্ত বিপদের সময় সেই খাল (Canal) দিয়া রাজারা পরিবারসহ বাহির হইয়া পড়িতেন। সম্ভবতঃ মহারাজ্ঞী সঙ্গে ছিলেন—তিনিও রাজার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কেবল অন্তঃপুরচারিণী দাসীরা ছিল—যঃ বক্তিয়ার তাহাদিগকে বন্দী করিলেন।

অভিযান বর্ণ।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যঃ বক্তিয়ারের অভিযান এক্ষেত্রে বিফল হইল। তিনি লক্ষ্মণসেনকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার পুত্রদ্বয়কে দিয়া বঙ্গবিজয়ের একটা খৎ লিখাইয়া লইতে পারিলেন না। তিনি সম্রাট্ কুতুবউদ্দিনের দরবারে এমন একটা বর্ণনা দাখিল করিলেন যাহাতে মনে হইল লক্ষ্মণসেন নিতান্ত কাপুরুষ, কর্ম্মব্যস্তার অবতার পুরুষসিংহ যঃ বক্তিয়ার তাঁহাকে এমন ভাবে পরাজিত করিয়াছেন যে উক্ত রাজা তাঁহার ভয়ে সমর-ক্ষেত্র হইতে

হরিসিংহ (১৬৬-৬৮)।

ফয়জী (৫৯ পৃঃ)।

শেরশাহ (১৫৪ পৃঃ)

নুরজাহান (৮২৩ পৃঃ)।

জাহাঙ্গীর (৮২৪-২৩ পৃঃ)।

শাজাহান (৮২১ পৃঃ)।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১০০৪ পৃঃ)।

রাজীব (৯৭৩ পৃঃ)।

রাজা রাজনারায়ণ ঘোষাল। ফুকেলাগের রাজা, ফার্সীখণ্ডের অনুবাদের প্রবর্ত্তক ও বিবিধ গ্রন্থকর্ত্তা। ১৭১৪ শক।

রামপ্রসাদ সেন, এঁর ছাত্র ও পরবর্ত্তী কবি সম্বন্ধে ২০০ পৃঃ) ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (১০০৪ পৃঃ)

রামপ্রসাদের পুত্র গোপাল সেন।

কথাসেউ যেমনই পলাইয়া গিয়াছেন। ধরবারে নদীয়া-বিজয় একটা মস্ত বড় কাণ্ড বলিয়া ঘোষিত হইল। ইতিপূর্ব্বে এই পুরুষসিংহ একটা মস্তকবিহীন দেহ দুর্গ মনে করিয়া মুণ্ডিত-শীর্ষ নিরীহ বৌদ্ধ আচার্য্যগণকে সেনাপতি রূপে তাঁহাদিগের শির কর্ত্তন করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন উদ্ধৃতপুরের কাণ্ডটা নবদ্বীপ-বিজয়ের এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য।

লক্ষ্মণসেন গেলেন কোথায়?

নদীয়া ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণসেন কোথায় গেলেন?—নবদ্বীপ ছাড়িয়া বৃদ্ধ রাজা কোথায় যাইবেন, তাহা সম্ভবতঃ পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবদ্বীপে মাত্র তিনি ছিলেন,—তাঁহার পরিবারবর্গ, সামন্ত ও প্রধান ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের ধন-সম্পদ সমেত নিরিবিলে পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া মুসলমান-অভিযানের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য। সে বয়সে আর তাঁহার রাজত্ব করিতে প্রবৃত্তি থাকিবার কথা নহে মাধব সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন—তাঁহাদের তিন জনেরই কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সোণার গাঁ ইঁহাদের প্রধান রাজধানী ছিল। তাম্রশাসনে দেখা যায়, ইঁহাদের এখানেও মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল ঃ বক্তিয়ারের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়াও ইঁহাদের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যাইতে হইয়াছে বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে তাঁহাকে "গর্গঋষিবংশের প্রলয়কাল রুদ্র" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ যশোরে।

সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেন সেনহাটী নামক যশোর খুলনার একটা জায়গায় শেষ জীবন কাটাইয়া ছিলেন। কবিরাজ নামক জনৈক পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, লক্ষ্মণসেন সেনহাটী নামক পল্লী স্থাপন করেন, কবিরাজ প্রতাপাদিত্যের সমকালবর্ত্তী (যশোর-খুলনার ইতিহাস ও বিশ্বকোষ ১ম সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। সেখহাটী সেনহাটীর নিকটবর্ত্তী, সেখানে বহু শাঁখারির বাস ছিল পূর্ব্বে সেখহাটীর নাম সম্ভবতঃ শাখহাট ছিল (যশোর-খুলনার ইতিহাস)। ঐ স্থানের নিকটে জগন্নাথ নামক গ্রাম আছে। মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন পলাইয়া জগন্নাথে গিয়াছেন। একটা নোক্তার গোল হইলে এ শব্দটি শাখনাট পড়িতে হয়। জগন্নাথই হউক বা শাখনাটই হউক, ইহারই কোন স্থানে লক্ষ্মণসেন বাস করিয়া থাকিবেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজা ঢাকা নগরীর নিকট কোন স্থানে বাকী জীবন কাটাইয়া ছিলেন। আমরা যে কারণে সেখহাটীর পক্ষপাতী হইয়াছি, তাহা লিখিতেছি —পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সেনহাটী গ্রাম লক্ষ্মণসেনের স্থাপিত। ঐ গ্রামটি রাজা তাঁহার জামাতা হরিসেনকে দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন বহু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শেষ বয়সে তিনি যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। সেখহাটীতে যে ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহাকে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি কালী ভূমিসে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ভাস্কর্য্যের চরম মূর্ত্তিটি পাঁচ ফুট

এ সম্বন্ধে প্রমাণ।

উক্ত এবং এত সুন্দর যে যশোর-খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশবাবু লিখিয়াছেন এরূপ মনোহারী মূর্তি তিনি দেখেন নাই। এই মূর্তি হইতে অনেক ছোট একটি তারা মূর্তি ঢাকায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবিকল ইহার অনুরূপ। উভয়ের মাথা এত বেশী যে মনে হয় উহা এক কারিকরের হাতের কাজ। "এই সমস্ত দেখিলে কেহ না বলিয়া পারেন না যে এই দুইটি মূর্তি একই সময়ে সম্ভবতঃ একই কারিকর দ্বারা প্রস্তুত।" যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃ. ২৩। ঢাকার মূর্তিটির নীচে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের তৃতীয়াঙ্কে নির্ম্মিত' লেখা আছে। সেখহাটীর মূর্তিও ঐ সময়েরই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তাহা এত বড় এবং গঠনাদিতে হাতের এতটা সূক্ষ্ম কাজ করিয়াছেন যে উহা খুব বড় কোন লোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ঐ পল্লীর নিকট খুব বড় কৃষ্ণ পাথরের অতি সুন্দর গণেশ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া নানা কারুকার্য্যখচিত বিশাল তোরণের ভগ্নাংশও সেই স্থান হইতে উদ্ধার হইয়াছে। "এই স্থানে যে সকল দেববিগ্রহ বা দেবালয়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও অনেকটা সেন-রাজাদের সময় নির্দ্দেশ করে। সেখহাটী গ্রামের কাষারপাড়ার চকচক নামক পুষ্করিণীতে একটি বড় গণেশ মূর্তি পাওয়া যায়। উহার নিকটে কাজলপাড়ার পুকুরে একটি বাসুদেব ও একটি গণেশ মূর্তি পাওয়া যায়।" "চকচক পুকুরের নিকট একটি স্থানকে মঠবাড়ী বলে এখানে অনেক ইষ্টক স্তূপ আছে। গ্রামের মধ্যে কয়েক স্থানে প্রাচীর পরিখার আভাস বর্ত্তমান আছে"। পৃঃ ২২৭।। ঐ খাত এত বড় যে পরবর্ত্তীকালে সম্ভবতঃ উহার এক দিকে একটা খালে পরিণত করা হইয়াছিল। সেখহাটী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও অনেক বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, বিশাল তোরণ ও পরিখাই কি ঐ স্থানটিকে কোন রাজধানীর ভূতপূর্ব্ব আবাস-স্থান বলিয়া ইঙ্গিত করে না?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্থান লক্ষ্মণসেন প্রতিষ্ঠিত সেনহাটী গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী, অদূরে লক্ষ্মণসেনের বাজার। সাধারণতঃ উহাই "সেনের বাজার" নামে পরিচিত। কিন্তু বৃদ্ধেরা কহিয়া থাকেন তাঁহারা পূর্ব্বে উহার নাম লক্ষ্মণসেনের বাজার শুনিয়াছেন। সেনহাটী হইতে "সিলক্ষর" অর্থাৎ কারীশাল বেশী দূরে নহে। সমস্ত স্থানটি যে বহু দেবালয়ে পূর্ণ ছিল, তাহা পল্লীগুলির নাম হইতেই বুঝা যায়—'দেবভোগ', 'শিবভোগ', 'ধেরাভোগ', 'মোড়োগ' প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি দেবত্র সম্পত্তি ছিল, তাহাদের নামেই পরিচয়। যশোহরের প্রান্তবর্ত্তী গ্রামগুলি ছাড়িয়া আমরা করিমপুর জেলার কাঁসারে "লক্ষ্মণকাটী" গ্রাম পাই, তথায় এক বিরাট বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত হাইকোর্টের উকীল রজবাবু বলিয়াছেন যে যশোহর-খুলনায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্রহ্মত্র সম্পত্তি লক্ষ্মণসেনের দেওয়া, সেই দলিলের কোন কোনটি তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন। উক্ত প্রমাণাবলিদ্বারা এই কথাটা দৃঢ় হইল যে লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে এই স্থানটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং সম্ভবতঃ তথায় তাঁহার একটি রাজধানী ছিল।

দেবভোগ, শিবভোগ, ধেরাভোগ, মোড়োগ প্রভৃতি

সাধনাটা বা জয়রাগ যে নামই পল্লবটির হউক না কেন, এই স্থানে আসিয়া শেষকালে তিনি বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তীর্থবাসী হইবার জন্য বৃন্দাবন বা কাশীতে যাইয়া থাকে। কিন্তু পুরী-তীর্থ যাত্রীদের আনাগোনার সহর, তথায় কেহ বাস করিতে চায় না। লক্ষ্মণসেন যে এই খানেই গিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহার এতদপেক্ষাও প্রবলতর প্রমাণ আছে। আমিই পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, লক্ষ্মণসেন কুলীনদিগকে একান্ত বশীভূত করিয়াছিলেন। কুলীনেরা সেন-রাজগণের সঙ্গে বাস করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের এই রাজভক্ত আভিজাত্য রাজাকে আশ্রয় করিয়াই পুষ্টি লাভ করিত। যশোর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের কুলীন-কেন্দ্র কেন হইল, আমি সতীশ মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"প্রতাপাদিত্য ইহাদিগকে আনাইয়াছিলেন।" আমি বলিলাম, "অন্যূন সাত শত বৎসর পূর্ব্বে অনেক কুলীন এখানে বাস করিয়াছিলেন। আমরা ছিনু সেন বংশীয়। ছিনু হইতে আমরা ২২ পুরুষ চলিতেছি।"

ছিনু খুলনার অন্তর্গত পয়গ্রামে বাস করিতেন। এইরূপ ভাবে, পঞ্জিকাতে তিন পুরুষ গণনা করিলে দেখা যাইবে, বহু কুলীন এদেশে লক্ষ্মণসেনের জীবনের শেষের দিকে আসিয়া বাস করিয়াছেন। রাজা এখানে আসিয়া স্থায়িরূপে বাস না করিলে কুলীনেরা কখনই রাঢ় ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া বাস করিতেন না। বৃদ্ধ বয়সে রাজত্বের ভার যোগ্য পুত্রদিগকে প্রদান পূর্ব্বক তিনি বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে শুধু দেব-সেবার বিধিব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মজীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি "অরিরাজ" বা ধর্ম্মগুরু নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কীর্ত্তি দেখিলে মনে হয় তিনি শেষ জীবনের দিনগুলি আচার্য্যের মতই বঙ্গের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। কুলীন সমাজের সকলেই সুপণ্ডিত ও কৃতবিদ্য ছিলেন, ইহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিয়া তিনি শেষের কয়েকটা দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যশোর-খুলনা এবং বরিশালের প্রান্তপর্য্যন্ত একটি মস্ত বড় দেশ লক্ষ্মণসেনের এত চিহ্ন বহন করিতেছে যে এস্থানে তিনি বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে দুর্গ, সেনা-নিবাস বা বিজয়-স্তম্ভের কোন নিদর্শন নাই,—আছে কেবল দেবমন্দির, দেববিগ্রহ, দেবত্রভূমি ও দেবায়তন। এখানকার লোকেরা বীরত্ব বা সৌর্য্য-বীর্য্য দেখাইয়া সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন, তেমন জনশ্রুতি বা প্রবাদ নাই। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের বংশধরেরা আজও লক্ষ্মণসেনের দেওয়া দলিল দেখাইয়া নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছেন। যে সময়ে লক্ষ্মণসেন মিথিলা, কাশী ও প্রয়াগ জয় করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গদেশ-বিজয় অভিযান উপলক্ষে তথাকার রমণীগণের সঙ্গে বিহার করিতেন, এই নিবাসভূমি তাঁহার সেই উদ্দাম যৌবনের কোন স্মৃতিই বহন করে না। সেনহাটীর অতি নিকটে সুবিখ্যাত বিজয়-চণ্ডীতলা। প্রবাদ যে উহা বিজয় সেনের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী। যশোর-খুলনার ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে বিজয় সেন কোনও সময় তাঁহার সামরিক অভিযানের পথে এই চণ্ডী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। লক্ষ্মণসেন যখন গৌড় দেশের অধিকার ছাড়িয়া স্বজন ও কুলীনবর্গকে লইয়া এতদ্দেশে আসেন, তখন তাঁহার বিশ্ব-বিজয়কীর্ত্তি শিলাময় বিজয় সেনের প্রতিষ্ঠিত

গৃহদেবতা ফেলিয়া আসিতে পারেন নাই। বিজয়চণ্ডী সেন-বংশের কুলদেবতা, এখন তথায় বিগ্রহ নাই। অদ্যি প্রাচীন বিটপিতলে লোকেরা বহুমান সহকারে তাঁহার পূজা দিয়া থাকে। সেনবংশের কুলদেবতা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে সঙ্গে যশোরে আসিয়াছিলেন, ইহাও রাজার শেষ জীবনের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যদি আমার বক্তব্যগুলি পুনরায় সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে হয়, তবে বলিব নদীয়া ছাড়িয়া লক্ষ্মণসেনের যশোরে আসিয়া বাস করার অনুমানের পক্ষে এই কয়টী কারণ :—

১। শত্রুর হাতে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া কোন রাজার রাজত্ব করা রীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং বৃদ্ধ রাজা সোণার গাঁয়ের রাজধানীতে আসেন নাই।

২। সেনহাটী গ্রাম লক্ষ্মণসেনের স্থাপিত। এই গ্রামের অনতিদূরে "সেনের বাজার"কে প্রাচীনেরা 'লক্ষ্মণসেনের বাজার' বলিতেন।

৩। 'লাখনাট ও জাগনাট' একটা লোকার ভুলে ভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে। লোকে লাখনাট নাম জানে না, সুতরাং "জাগনাট" বা "জগন্নাথ" পাঠ সহজে মনে হয়। লাখহাটি, লাখনাটি প্রভৃতি নাম সম্বন্ধে সতীশ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৪। এই স্থানে বিপুল গড়খাই, ভগ্ন প্রাসাদের চিহ্ন বর্তমান এবং বড় বড় প্রস্তরের দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন কোন্‌টি যে লক্ষ্মণসেনের সময় গঠিত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঢাকায় প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে নির্ম্মিত তারামূর্ত্তি যশোহরে ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তির একটা সদৃশ যে সতীশবাবু মনে করিয়াছেন উহারা একই হাতের রচনা।

৫। যিনি কুলীনদের কৌলীন্য স্থাপী করিয়া তাঁহাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন,—তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই এতগুলি কুলীন যশোরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের তথায় যাইয়া বাস করার অন্য কোন কারণই নাই। ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল কুলীনের অধিকাংশ তথায় গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের দেওয়া ব্রহ্মত্র জমির দলিল সেখানে ব্রাহ্মণের ঘরে ব্রজবাবু দেখিয়াছেন।

৬। লক্ষ্মণসেনের স্থাপিত 'সেনহাটি', 'লক্ষ্মণসেনের বাজার', প্রকাণ্ড গড়খাই ছাড়া অদূরে সিদ্ধলক্ষ গ্রাম (হাতী পাল), প্রভৃতি দ্বারা সূচিত হয় যে তথায় রাজপাট ছিল এবং তাহা লক্ষ্মণসেনের নামের সহিত জড়িত।

৭। এই রাজপাট, রাষ্ট্রীয় শাসন সংক্রান্ত রাজধানী নহে,—উহা রাজর্ষির তপোবন-কল্প 'রাজপাট'। ইহার চারিদিকে যে সকল গ্রাম তাহাদের নামেই বুঝা যায় যে তথায় বহু দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; নামগুলি খেয়াভোগ, মৌভোগ, পিঠাভোগ, দেবভোগ প্রভৃতি। যশোহরের উপান্তে লক্ষ্মণকাটী গ্রামে যে বৃহৎ বাসুদেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রায় ছয় ফিট উচ্চ। কোন রাজচক্রবর্ত্তী ভিন্ন এত বড় মূর্ত্তি কেহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, এবং সেই মূর্ত্তি সেন-যুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন।

৮। সেনহাটীতে সেন-বংশের কুলদেবতা বিজয়চণ্ডী-তলায় এখনও লোকে পূজা দিয়া থাকে।

(এই মহিলা আমাকে স্বহস্তলেখানী [illegible] করিয়া [illegible] ছবিখানি দেখিতেন, তাহারই সমক্ষে করিয়া লইবার জন্য [illegible] ছবিখানি [illegible] ১৮৩২ খৃঃ অব্দের এই মার্চ্চ এই ছবিখানি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ফলিয়া [illegible] ডাঃ জনসন সাহেবের অনুরোধে সেই প্রাচীন চিত্রপুস্তকখানি হইতে প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার সুবিধা পাইয়াছি।)

মৃত্যুর পরের ছবি।

চতুর্থ দিবসের ছবি।

কর্ণের (রবি রায়) পায়ে ক্ষতে সুরাভিষেক— সাথে পরিচারিকা দর্শনা।

সেনরাজারা আরো কিছিৎ উচ্চ শতাব্দীকাল পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়েশ্বরগণের সার্ব্বভৌমত্বের যে কিছু অবশেষ ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়া যায়।*

* আমরা ইতিপূর্ব্বে জয়সেন বিরচিত "সংবেদ-কুল-চন্দ্রিকা" নামক কুলজী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। এই পুঁথিতে যে সকল ঐতিহাসিক উপাদান আছে, তাহা সত্য হইলে বঙ্গের ইতিহাসের আঁধার পথটী অনেকদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে এবং আমাদের বিদ্যমান অনেকটী উল্টা পাল্টা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন (হাইকোর্টের এডভোকেট) মহাশয় যদি এই পুঁথিখানি প্রকাশ করিবেন, তখন পুস্তক—বর্ণিত ঐতিহাসিক কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বিচার হইবে, এখন তৎসম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। এই কুলজীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত বেশী যে, আমরা শিরোভাগে মহাশয়কে এই পুস্তকের কোন প্রাচীন প্রতিলিপি সংগ্রহপূর্ব্বক অথবা অন্য কোনরূপ প্রবল প্রমাণ উপস্থিত করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদিগকে নিঃসন্দিগ্ধ করিতে সাধ্য করিতে পারি। এখানে বলা আবশ্যক যে আমরা পুস্তকখানি সমগ্রভাবে দেখিবার সুযোগ পাই নাই। বিরচ সংবেদ-কুল-চন্দ্রিকার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল —

" কর্ণাটি-রাজ-মর্দ্দিত-সেবধ পশ্চিমাবধৌ।
সাবজ্ঞয় জয়ৌঘো যো নদ্যা হেমন্তকূলতঃ।
এষ বারেন্দ্র-ক্ষৌণীশো বঙ্গান বিংশার্দ্ধ-ভূপতিঃ।
পুত্রো বিজয়সেনস্য যেষাং কুলোদ্ভবঃ।
আদিশূরকুলাবন্দ্যপিহিসেবস্য ভক্তকঃ।
খাবয়ামাস যঃ সেবী বিলাসী স্বর্গকৌতুকম্।

(১০৫০ শক, ১১২৮ খৃঃ) ধরাপবেদমুদে শাকে মহাসাধ্যঃ স ভূপতি.
হৈমন্তশাবতংসোঽকূপকৌত্তা খুগোত্তবঃ।
যেষীকা ঈহাভ-লক্ষ্মীঃ সাকভূপাল-সেবা।
চাতুরন্তস্য মহিষী সবস্তকুলমণ্ডিকা।
মহাসত্তমঃ শ্রীমল্লসেনো বৈদ্যযোগিনঃ।
কায়স্থল-লৌহ-মন্থযাম্ জিগায় তরসা কলী।
বিক্রান্তকোলীত্যোত্তা স ত্রয়াণ্ড ধর্ম্মপতিঃ।
ধার্ম্মিকো বর্ণশাস্ত্রে চ ত্রয়ধিপ ব্রহ্মকক্ষঃ।
স ধন্যান্ ধনদম্ দ্রষ্টান্ দাতারীন মানদম্ সদা।
যাচকাঃ তোষয়ন্ যোগান্ সর্ব্বলোকবরপ্রদঃ।
বিজিত্য শত্রুন্ পতিত্বান্ পালয়ন্ সাধুন্ কৃতৈঃ।
ঈশাণ্ড ভূমিদানাদ্যৈঃ স ধরন্ মহাশয়ঃ।
সংকুলাচারবিন্যস্তান্ দুষ্টষণ্ডভাগিনঃ।
শিষ্টান্ত সন্মুখীন্ কুর্ব্বন্ কুলাচারকরোৎ সদৎ।
পিতেব পালয়ন্ প্রজাঃ পক্ষপিণ্ডিতবৎসলঃ।
স ভোক্তে বৈদ্যবং রাজ্যং সপ্তত্রিংশৎসমাঃ সুখম্।

আবদ্ধাপুরে ৮৮৮ হিজরায় নির্ম্মিত বল্লালসেনের শ্বশুর রাজা আরবের সমাধি দৃষ্ট হয়। তথায় একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। বল্লালদীঘির নিকট অনেকটা জায়গা জুড়িয়া রাজ-প্রাসাদের চিহ্ন আছে। তাহার অনেকটা জমি পোড়া মাটী, খুঁড়িলেই পোড়া কয়লা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে দেশব্যাপী প্রবাদ এই যে কোন এক ফকির বল্লালের রাজধানী হইতে কতকটা ব্যবধানে গোবধ করিয়াছিল, সেই গোমাংস একটা চিলে ঠোটে করিয়া লইয়া আসিয়া রাজপ্রাসাদে ফেলিয়া যায়। রাজা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, তাঁহার

শ্রীবল্লালসেনের রচিত পুত্রকাপ্তঃ।
বর্ণপালস্তথাচাক বসুদেবোগ্রনন্দবঃ
অগ্রণো ভাববেতৃ পুরুষেব দিবঃ বরৌ।
কেশবো বিষ্ণুপদ্ম রাজাভাবৌ বভূবতুঃ।
পুরীরাজা রামপাল বিশ্বরূপোবুভোঽশৎ।
কেশবঃ পশ্চিমে ভাগে গৌড়াখোবভূবরাজিপঃ।
স রাজপেশবরাজীং ক্রমিষ্ণুঃ পিতৃবাবত
ভাবেন কর্ণঃ গৌড়োশ্চ ভীমঃ পরমবর্ম্মিক
ভগবান্ত, পতপ ভবভূ ঘরসাভূৎ।
যো গৌড়রাজ্যঃ লোভেন ববধার সমার্পিত।
রামপালঃ গতা ভূপঃ ভগবান্তুভেন গ ।
বিশিষ্য পাণ্ডুরাজ্যে চ পাণ্ডবমণ্ডলোৎ।
এবং কথায় ভগবান্ত'ভকাবমরেছপত।
ববধারকরঃ গৌড়রাজ্য গোচার্য্য বর্ণা ধরম।
{ ১১৫৪ পৃঃ, ১২০২ পৃঃ, বেদপাকেপুরুপ্রাপ্তে বিদ্যাপীববধারপূ ।
উৎপিত্তিপ্রথম গৌড়ে দৃষ্টঃ বাবধাপাদমম।
বিষ্ণুপদ্ম ভবেদ্ বাপিকারিবভূবীরম।
রক্ষম বাহুবলাবাঁ প্রজাঃ রাজাবর্দ্দিপদম
ত্রিচত্বারিংশদাদি পাদরক্ষিকাঃ প্রজাঃ।
স প্রজাম বিবঃ রাজা পুত্রাভ্যাং রাজ্যমর্পিপম।
পুত্রো তস্ত বরাপুরো ভীমসুন্দরসেবকৌ।
কুর্ণাটের পৃথরাজ্যং গৌড়ঞ্জিত্বাপ্তুকৌ।
ভবর্ণগ্রামবরম্ কবিষ্ঠঃ সুন্দরভারা।
তঃ সুন্দরপুরঃ নাম বমাম যোজনত্রপঃ।
রামপালেকরোম রাজা ভীমভাগুত্রিংশাধকম
অবপুরো বঙ্গশাস্ত্রো যো রাজতে সেনবার্দ্ধিকঃ।
কার্ত্তিকেরসবাবো যো রূপেণ চ বলেন চ।
ভীমসেনে স রাজাপা কমলা ভ ভুবনত্রয়।
বসুধুবিক্রমশক্তি রাজসেনস্ত কর্ত্তবায়।
সেনেন্দ্র রচিতা পুণ্যা সংক্ষেপকুলপদ্ধিকা।"

রাজার মধ্যে এক ফকির পোষ্যতা করিয়াছে। কোথায় হইতে রাজা সেই ফকিরের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার চরম শাসন করিয়া ছাড়িয়া দেন। ফকির যাহা আসিয়া বাহাদুর নায়ক এক মুসলমান সেনাপতির নিকট যাইয়া সাশ্রুনেত্রে বল্লালের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করে। যাহা আসিয়া বহু সৈন্য লইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। মুসলমানেরা বল্লালের রাজধানীর অনতিদূরে শিবির স্থাপন করেন। বল্লাল-চরিতে মুসলমান সেনাপতির আক্রমণের কারণ অন্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রাজা শঙ্কিত হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন রাজ-সিমন্তিনীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীদের মধ্যে লিলাদেবী, পদ্মাক্ষী, সুরলা, হেমমালিকা সোমদেবী, এবং চণ্ডেশ্বরী তাঁহাকে সাশ্রুনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! রাজ্যে মহাশত্রু উপস্থিত, দৈবাৎ যদি পরাজয় ঘটে তবে আমরা কি করিব তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিন।" রাজা প্রতি মহিষীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া স্বয়ং সাশ্রুনেত্রে তাঁহাদের নয়নবারি মুছাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "এখন পুত্রে আগুন জ্বালিয়া রাখ, আমি এই দুষ্টি পাষণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে

[illegible] ১১৭০ খৃঃ অব্দে [illegible]। এবার ৮ বছরের রাজত্বকাল এবং অপরাপর বিষয় বলিয়া আছে তাহা আমরা বাদ দিয়াছি)। বল্লাল সেন পাল রাজ কন্যা রামলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেন জয়ন্তল, গৌড় এবং কলিঙ্গাদি জয় করিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি ধর্মবিদ্, ধার্মিক, বর্ণাশ্রমরক্ষক এবং দানশীলতায় বিভূষিত ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ৫৫ বৎসর। লক্ষ্মণ সেনের তিনটি পুত্র—বিশ্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ কবি বিশ্বরূপের পৃষ্ঠপোষক। অন্যতম মাধব পুরীতে অবস্থিতি করেন। বিশ্বরূপ ও কেশব রাজা হইয়া অধিকার করেন। বিশ্বরূপ পুরী জিতিয়া, রামপাল প্রভৃতি প্রদেশ) প্রভৃতি করেন এবং কেশব পশ্চিম ভাগে গৌড় দেশের রাজা হন। কেশব তাঁহার পিতৃনামানুসারে "লক্ষ্মণের" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি (কেশব, দামোদর লক্ষ্মণের) নামে কবির ছাত্র, পরাক্রমে ভীমের ন্যায় এবং পরম ধার্মিক ছিলেন। ইঁহার অন্যান্য গুণপক্তি বিদ্যমান হইয়া লোকবর্গের গৌড়রাজ্য যবনকে সমর্পণ করেন। অসুরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কেশব (লক্ষ্মণের রাজপাল নিয়োজিলেন, এই সুযোগে পাঁপাই যবনী রাত্রিকালে দুর্গদ্বার যবনকে উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে গৌড় রাজ্য যবনাধিকৃত হয় ১১৯৩ খৃঃ (১২০৫ খৃঃ) খিলিজি রাজা অধিকার করিলে মুসলমান শাসনে প্রজারা নিপীড়িত হয়। বিশ্বরূপ বল্লালের স্বাধীন থাকিয়া অনুষ্ঠিত প্রভাবে বীর বাহুবল দ্বারা প্রজা রক্ষা ও পালন করিয়াছিলেন। তিনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ভীমসেন ও সুন্দরসেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহারা শত্রুবিনাশকে সেচ্ছিত প্রভাবে পরাজয় করিয়াছিলেন। ভীমসেন রামপালে ও সুন্দর সেন সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। সুন্দর সেন পীর নামানুসারে সুবর্ণগ্রামের নাম সুন্দরপুর রাখিয়াছিলেন। রামপালে ভীমসেন ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপুত্র কার্তিকসেন রাজা ও পরাক্রমে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের মতই ছিলেন। ইনি মহাবিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত গোষ্ঠীর অগ্রসেন বিদ্যাসের কথা কমলা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই অগ্রসেন বিদ্যাসই "সংযোগ-কুল-চন্দ্রিকা" প্রণয়ন করেন।

কেন্দ্রে লইয়া যাইতেছি, যুদ্ধে আমার পরাজয় হইলে এই পায়রাগুলি ছুটি পাইয়া বিজয়ী সৈন্য তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই আকাশ-পথে রাজপ্রাসাদে আসিয়া পড়িবে। তখন মুসলমানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমরা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিও।" অতি কঠোর যুদ্ধ হইল। বাঘাতুর ও বাবা আদম বল্লালের হাতে, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিজয়োল্লাসে বল্লাল পায়রা দুইটিকে সুরক্ষিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পায়রা ছাড়া পাইয়া রাজ-প্রাসাদে উড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইলে রাণীরা রাজ-মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এ দিকে রাজা যখন দেখিলেন পিঞ্জর শূন্য, পায়রা নাই, তখন ঘোর আশঙ্কায় উন্মত্তবৎ হইয়া তিনি অশ্বারোহণে অতি দ্রুত রাজধানীতে উপস্থিত হন। তখন বল্লিদেব তাঁহার রাজোদ্যানের শ্রেষ্ঠ লতার কুসুমগুলিকে গ্রাস করিয়াছেন। সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে রাজা নিজে আশ্রয় লইয়া নিজের শোক জ্বালা নিবারণ করিলেন। বল্লাল ও তাঁহার মহিষীরা একত্র সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিলেন

এই প্রবাদ এত ব্যাপক ও বহুকালাগত যে ইহা অবিশ্বাস করা যায় না বিক্রমপুরবাসী সকলেই ইহা জানেন। এখনও তাঁহারা "পোড়াবল্লাল বাড়ী" দেখাইয়া থাকেন। বল্লাল-চরিতেও আনন্দ ভট্ট এই করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন বাবা আদম বা বাঘাতুরের

এই কুলজী-গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি (১) বল্লাল সেন নীচ-কুল-জাতা রমণীর পাণিগ্রহণ করা বশতঃ তৎসম্পর্কযুক্ত বহু লোককে সমাজ মধ্যে পতিত করেন। (২) কেশব সেনের অপর নাম দানুজমর্দ্দন—ইনিই লক্ষ্মণ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। (৩) ইঁহার মন্ত্রী পশুপতি রাজার অনুপস্থিতিকালে লোভবশতঃ দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া গৌড় রাজ্য মুসলমানদিগকে অর্পণ করেন। (৪) এই ঘটনা লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল, তখন কেশব (দানুজমর্দ্দন) কবির বিক্রমপুরের সঙ্গে সম্ভবতঃ মুসলমান আক্রমণ-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য রাজধানী গিয়াছিলেন। বল্লাল সেন এই কুলজী অনুসারে ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে মরণ করেন, লক্ষ্মণ সেন তাহার পর ৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কেশব (দানুজ) গৌড়ে রাজা হন, তাঁহার রাজত্বের ১০ম বৎসরে ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা গৌড় বিজয় করেন। এদিকে বিশ্বরূপ ৩৩ বৎসর রামপালে রাজত্ব করেন, সুতরাং তিনি ১২২৭ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের রাজপদে আসীন ছিলেন। তৎপরে ৩৮ বৎসর ভীম সেনের রাজত্ব কাল, অর্থাৎ ১২৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত। তৎপরে কার্ত্তিক সেনের রাজত্ব সময়ে 'সম্বন্ধ-নির্ণয়-চন্দ্রিকা' রচিত হয়।

যে পর্য্যন্ত এই পুস্তকের ঐতিহাসিকত্ব সর্ব্বত্রভাবে কিম্বা আংশিকভাবে প্রতিপন্ন না হইবে, সে পর্য্যন্ত শুধু অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা ছাড়া আমরা এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য বলবতী রাখিলাম। বহুকাল কালে কুলজী পুস্তক সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ মনে উপস্থিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কোন পরিচিত কুলজী পুস্তকের মধ্যে মূল লেখা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, আগাগোড়া কাল্পনিক লেখা,—এরূপ পুঁথির সংখ্যা বিরল। অবশ্য বিশ্বাসের কুহকীগ্রন্থ ছাড়া বা হইলেও এই পুঁথি অনেক স্থলেই খাঁটি বলিয়া বঙ্গীয়বাবু মানাইয়াছেন।

আর একটী কথা, লক্ষ্মণ সেনের লিখিত দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশবের অপর নাম দানুজের ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাসুদেব দানুজমর্দ্দন নামে পরিচিত,—সেই সাদৃশ্যের প্রাবাল্য হেতু একপ নামের নামকরণ অস্বাভাবিক নহে।

সমাধি, বল্লালসাগর ও বল্লালের বাড়ী এ সমস্তই পাশাপাশি, এবং রাজার বাড়ীর মাটী খুঁড়িলেই একটা নাতিক্ষুদ্র জায়গার সর্ব্বত্র সোড়া কয়লা দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইহা ছাড়া সেন-রাজগণের পরবর্ত্তী রাজাদের বংশাবলী সম্বন্ধে যে একটা ছড়া প্রচলিত আছে, তাহাতে এই সোড়া রাজার উল্লেখ আছে।* এই সোড়া রাজা কে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না মনে হয় বল্লালের কোন বংশধরের কথা তাঁহার উপর আরোপ করা হইয়া থাকিবে বল্লাল চরিতে লিখিত আছে, রাজা যখন এইভাবে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তখন তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন দূর দেশে ছিলেন, সুতরাং দ্বিতীয় বল্লালের অস্তিত্ব এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

বৈদ্য বল্লালের সৃষ্টি।

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, এই বল্লাল যে শাস্ত্র-স্থাপয়িতা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বংশাবতংস বল্লাল সেন নহেন। ইনি বৈদ্য বল্লাল সেন নামক অপর এক রাজা, তিনি ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং গোপাল ভট্ট দ্বারা তাঁহার চরিত-কথা লিখাইয়াছেন। আনন্দ ভট্টের বল্লাল-চরিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি কৌলীন্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের নাম লক্ষ্মণসেন। সেন-কুল-কমল-ভাস্কর বল্লালসেন সম্বন্ধে যতগুলি কথা প্রচলিত আছে বল্লাল-চরিত-বর্ণিত বল্লালে তো তাহার অনেক কথাই আরোপ করা হইয়াছে। বৈদ্য বল্লালেরও কি তবে লক্ষ্মণসেন নামক পুত্র ছিলেন?

এই সকল লোকেরা বল্লালসেনকে ক্ষত্রিয় (অথবা কায়স্থ) প্রতিপন্ন করিতে যে কতরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা লিখিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এতদর্থে কতকগুলি ফরমাইস মতন তৈরী কুলজী গ্রন্থের অসারত্ব ও প্রবঞ্চনা এরূপ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে শুধু এই বিষয়টি নহে, বর্ত্তমান কালের আবিষ্কৃত কুলজীশাস্ত্রের অনেকগুলির উপর কোন রূপ আস্থা করা যায় না। স্বর্গীয় হুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তাঁহার সামাজিক ইতিহাস ও উমেশ বিদ্যারত্ন মহাশয় তদীয় গ্রন্থ সমূহে এ বিষয় বিশদ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। জাতিগত এই সকল কুতর্ক লইয়া বঙ্গের ইতিহাসের একটি যুগের সমস্যাকে বিদ্যার ধূলিপাকে ফেলিবার আমরা এখানে কোন প্রয়োজন দেখি না।

দুই বল্লাল কখনই নহে।

বল্লাল-রাজ-শিক্ষক গোপাল ভট্টের যে শ্লোকটির বলে 'বৈদ্য বল্লাল'কে দাঁড় করান হইয়াছে তাহা এই :—

"বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ।
স্বরাজ্ঞ্যা কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্
গোপালভট্টনাম্না চ তদ্রাজশিক্ষকেণ চ
অক্ষরাভ্রময়ে বহ্নিবাণৈরধিকশাকেষু।"

* সোণার গাঁয়ের ইতিহাস দ্রষ্টব্য

এখানে স্পষ্টাক্ষরে বল্লালকে 'বৈদ্য' বলা হইয়াছে। যদি দ্বিতীয় বল্লাল ধরা করান যায়, তবে প্রথম বল্লালকে বৈদ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করিতে হয় না। কিন্তু এই শ্লোকটির যে অর্থ বিজয়চন্দ্র নাগ এবং অপরাপর লেখকগণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন ক্রমেই উহা সিদ্ধ হয় না। ইহাদের মতে শূন্য ০, বসু ৮ এবং বাণ ৫, সুতরাং ৮+৫ ১৩ অঙ্কের বামা গতি; এই নিয়মে ১৯৫ পৃষ্ঠে ১০০ চাপাইয়া ১৩০০ শক করা হইয়াছে ১৩০০ শক = ১৩৭৮ খৃঃ—এই হিসাবে এই বল্লাল সেনবংশীয় কৌলীন্য-স্থাপয়িতা বল্লাল হইতে অন্যূন ২০০ বৎসরের পরবর্ত্তী। সুতরাং দুই বল্লাল এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।

এই গণনাটি ভুল, অঙ্কানাং (৩২তমাৎ পূর্ত্ত) ১০০, তৎপরে বসু আট, সুতরাং ১০০৮+৫ বাণ = ১৩ হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৯৩৩ খৃঃ এই ভুল আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, "উপরি লিখিত বাক্যটির অর্থ ১০০৮+৫ =১০১৩ হইতে পারে, কিন্তু ১৩০০ করিলে সঙ্গত হয় না।" ১০১৩ শক = ১০৯১ খৃষ্টাব্দ। এই সময় সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বল্লালকেই নির্দ্দেশ করিতেছে, সুতরাং দুইটি বল্লাল ধরা করাইবার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত লেখকেরা ৮+৫ =১৩ যোগ দিয়া উহা ১০০ সঙ্গে পরে করিয়াছেন। এক স্থানেই সুবিধা অনুসারে যোগ ও পূরণের কাজ চলিতেছে, ইহা অযুক্ত গণনা। সঙ্গতি রক্ষার জন্য যদি সকলগুলিকেই যোগ দিতে হয়, তবে ১০০+৮+৫ হইবে, এবং তাঁহাদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যদি অঙ্কের বামাগতি স্বীকার করিতে হয় তবে সনটা হয় ১৩১৩। কিন্তু শ্লোকটির অর্থ যে ১০১৩ তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

গোপাল ভট্টের শ্লোকটি আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিতের আর একটি অনুরূপ শ্লোককে সমর্থন করে। সেই শ্লোকটি বিচার করিলে অর্থ উহার সহজ হইয়া পড়ে "সহস্রেষ্টা-বিংশতে শকাব্দে পৃথিবীপতি। স্বীয়ং মাসং মহাভাগ উপপাদ্য দিবং গতঃ॥" অষ্টবিংশ যুক্ত সহস্র শকে পৃথিবীপতি মতিমীরণের সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এখানে যদি অঙ্কের বামাগতি ধরা যায় তাহা হইলে ২৮০১৮ শকে অর্থাৎ ২৮১০৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের মৃত্যু হয়, ইহাই বলিতে হইবে, উহা উপহাসাস্পদ। মোট কথা বল্লাল-চরিতে অঙ্কের বামাগতির উল্লেখ নাই। এ সম্বন্ধে তাহা হইলে তিনটি বচন পাওয়া যায় এবং তিনটিই সোজা সুজি ভাবে অর্থ করিতে হইবে "অঙ্ক রাজন্য মানে বসুভিবাণৈরাদিকে শাকেস্" অর্থ ১০১৩ শক = ১০৯১ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় শ্লোক অষ্টবিংশ যুত সহস্র অর্থ = ১০২৮ শক = ১১০৬ খৃঃ এবং তৃতীয় একটি সময়-নির্দ্দেশক শ্লোক আছে, তাহা নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমৎ বুদ্ধি বন্ত খাঁয়ের জন্মতিথিতে "শাকে চতুর্দ্দশশতে মনুভরদনযুতে" ১৪০০ + মনুভরদন = ৩২ ১৪৩২ শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে দ্রাবিড় শ্রীমৎ অনন্ত ভট্টের বংশোদ্ভব মহামহোপাধ্যায় আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল-চরিত উক্ত রাজাকে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উৎসর্গ করা হইয়াছিল। গোপালভট্টের বল্লালচরিত অবলম্বনে ১৪৩১ শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে)

আনন্দভট্ট কর্তৃক এই বল্লাল-চরিত পুনরায় লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুইখানি পুস্তকে বল্লাল সম্বন্ধে তিনটি স্থানে সময় নির্দেশ আছে এবং তিনটিই সোজাসুজি ভাবে অর্থ করিতে হইবে। অঙ্কের বামগতি গণনা -ইহার কোনটিতে সঙ্গতি হয় না। বল্লালসেন সম্বন্ধে কাল নির্দেশক তিনটি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। তাহার একটি ১০৯১ খৃষ্টাব্দ এবং অপরটি ১১০৬ খৃষ্টাব্দ। ইহার একটি গোপালভট্টকে আজ্ঞাদানের সময় এবং অপরটি বল্লালের মৃত্যুর সময়; ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য নাই তবে এই সময় নির্দেশ ঠিক কি না, তাহা বলিতে পারি না এই পুস্তক বর্ণিত অনেক গল্প আছে তাহা যেরূপ জনশ্রুতি হইতে গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বল্লালের সময় সম্বন্ধে শ্লোকও হয়ত তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা ঠিক যে অন্যান্য বিষয়ে এই দুই পুস্তকেই নানারূপ উপদল থাকিতে পারে, কিন্তু দুই বল্লালের কথা কখনই বলা হয় নাই, এক বল্লালের কথাই উভয়েই লিখিয়াছেন।

প্রত্যেক বিষয়ে বিশ্বাস যোগ্য কি না এখ হইতে পারে, কিন্তু লেখকের ইহাই এক মত

যে বুদ্ধিমন্ত খানের কথা পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি হুসেন সাহের পূর্ব-প্রভু। ইহাকে চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ "গৌড়-অধিকারী" উপাধি দিয়াছেন হুসেন সাহের পক্ষে ইনিই সেনাপতির করিয়াছিলেন। সে ঘটনা বাঙ্গলার অনেক ইতিহাসেই বর্ণিত আছে বুদ্ধিমন্ত খান ফুরানদে প্রাণত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছিলেন; চৈতন্য প্রভু ইহার জীবন রক্ষা করেন

অঙ্কের বামগতি প্রচলিত থাকিলেও বহু প্রাচীন পুস্তকে মাঝে মাঝে ইহার ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। আমরা ২৭৯ পৃষ্ঠায় তাহার অনেকগুলি প্রমাণ দিয়াছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুরাজত্বের নানা কথা

"বহুপত্তে কৃতং কর্ম্ম যদুবাপুরী"

মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর রাজ্য অস্তমিত হইল। যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া হিন্দুরাজগণ মনে করিয়াছিলেন, কালের গুহায় তাঁহারা অমর লাভ করিয়া গেলেন, অত্যাচারের কুহকে তাহা বিলীন করিয়া ফেলিল। দাক্ষিণাত্যের অতি বিস্তৃত কোন অঞ্চল আত্মগোপন করিয়া কোন ক্রমে তাহার অতুল বিদ্যাসম্পদ্ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। হর্ষ-বর্দ্ধনের, এবং পালের প্রথমে হিন্দু শিল্পের বৈজয়ন্তী এখনও উড়িতেছে। কিন্তু যাহা আর্য্যাবর্ত্ত, যে স্থান আর্য্য সভ্যতা ও আর্য্যশিল্পের জন্মভূমি, তাহা হইতে নিশ্চিহ্ন পাঠান ও মোগল এরূপ নৃশংস ভাবে সমস্ত অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে যে তাহার কিছু নাই বলিলেই হয়। মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে যে মথুরা, মগধ ও আসামের অরণ্যমধ্যে গৃহলক্ষ্মী স্বর্ণনির্ম্মিত অমূল্য মণি-মাণিক্য খচিত দেব-বিগ্রহ সন্ধ্যার শঙ্খ প্রদীপের আলোকে ঝলমল করিত, যাঁহাদের মন্দিরে শত শত বাগান উজাড় করিয়া পুষ্পরাশি সঞ্চিত হইত, ধূপ অগুরু কর্পূরের গন্ধে সুবাসিত আঙ্গিনায় ভক্তের অশ্রুর পবিত্র প্রস্রবণ ছুটিত, কোথায় সেই শতমন্দিরী মন্দির ও অপূর্ব্ব দেব বিগ্রহ। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময় গিরিনগরে যে বিপুল পাষাণ প্রাচীরে নির্ম্মিত হইয়া "সুদর্শন" নামে পরিচিত হইয়াছিল, অশোক তুষাস্ফ নামক স্থপতি দ্বারা যাহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ১৫০ খৃষ্টাব্দে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম যাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন এবং ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা পর্ণদত্তের পুত্র চক্রপালিত যাহার আমূল সংস্কার করিয়াছিলেন, সেই যুগযুগান্তী রাজন্যবর্গের চেষ্টায় নির্ম্মিত সুপ্রতিষ্ঠিত চাকচিক্যে সমৃদ্ধ 'সুদর্শন হ্রদের' শত শত দীর্ঘ দুই শত হস্ত প্রশস্ত উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর কোথায় গেল। কোথায় গেল নালন্দা বিহারের সে অপূর্ব্ব অতুলনীয় কারুকার্য্য, যাহা দেখিয়া সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন্সাঙ্গ বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বিহার অগণ্য, কিন্তু শোভা সমৃদ্ধি ও উচ্চতায় এই বিহারের কাছে আর কোনটি দাঁড়ায় না," কোথায় গেল তথাকার তাম্র নির্ম্মিত ৮০ ফুট উচ্চ বিশাল বুদ্ধ মূর্ত্তি, যাহা ৬০০ খৃঃ অব্দে অশোকের বংশধর পূর্ণবর্ম্মা নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া তাঁহার রাজকোষ শূন্য করিয়াছিলেন? কুমার পালের রাজত্ব কালে একাদশ শতাব্দীতে তদীয় সেনানায়ক বিশ্বরূপ-কীর্ত্তি

শিল্পাদি অনাদরে ধ্বংস প্রাপ্ত।

বৈদ্যদের অন্যথা রাজন্যবর্গকে মুগ্ধ করিতে ইতস্তত স্বাদুকূট সংগত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক বিশাল স্বর্ণসিংহ মূর্তি নির্মাণ করান। তাহার নানা চারুকলা-সুশোভিত, নিখিল জনগণের দর্শনীয় প্রাসাদের চূড়া অপরে স্থাপন করিয়াছিলেন। [illegible] কালে সেখানে সেই স্বর্ণসিংহ ও সেই রাজপ্রাসাদ? তবকাৎ ই নাসিরিতে যে, ইবন বাক্তিয়ার তাহার অভিযানের প্রসঙ্গে কামরূপের এক মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছে তাহাতে দুই বিঘত উচ্চ স্বর্ণের মন্দির বিগ্রহের কথা আছে, কোথায় গেল সেই বিগ্রহ স্বর্ণ দণ্ড। মহারাজ রাজপালদেব যে সকল দীঘি খনন করিয়াছিলেন তাহা "সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ ছিল এবং তাহার "জলরাশির তরঙ্গ সমূহ উচ্চ ছিল" সে সকল কোথায় গিয়াছে। [illegible] সকল বিশাল স্তম্ভ ছিল, তাহার কিছু কিছু ভগ্ন টুকরা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। কোথায় গেল হিমাদ্রি সদৃশ বিশাল প্রাচীন মন্দিরের মাঝে মাঝে উচ্চ চূড়া সমূহ যাহা স্বর্ণ কলসী স্থাপিত করিয়াছিলেন প্রস্তর-লিপির কবি সেই কলসীর সোনা কাহারা লইয়া গিয়াছে? অভিজ্ঞতা আমায় বলিয়াছিলেন বিধাতাও বুঝি তেমনটি পারত করিতে পারেন না? যাহা যুগ-যুগ ব্যাপী শিল্পের বংশ পরম্পরা চলিয়া কত কাল পর কারা আসিয়া তাঁহাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া যে কীর্তিতে নিজের চরম সৌন্দর্য প্রকাশ করেন যাহা চিরকাল জগতে অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে, নির্মাতাদের এই একটুকু বিশ্বাস না থাকিলে এত উদ্যম তাহা সিদ্ধ হইতে পারিত না, সেই সমস্ত কীর্তি কাহারা ধ্বংস করিতে কে করিতে পারে? কোন সংসারের তাতে একখানা ঘর তুলার সূত্রে কাহার দাম্পত্যের মাঙ্গল পাবে প্রেমের স্বপ্ন—অপূর্ব তাজমহল দম্পতির মধ্যে যে ধ্যানে কবিরা তোলতে পারে, তাহাতে তাহার বর্ণময়তাই প্রকাশ পায়, শিল্প হইতে সরিয়া গিয়াছে। [illegible] কত শত তাজমহল আগ্রানগরে মিশিয়াছে একটিমাত্র আছে। কালের হাত হইতে হয়ত ইহারা যুগ-যুগ পরিমিত সময় নিজেকে রক্ষা করিতে পারে কিন্তু সংসারের হাতের কুঠার বড় সাংঘাতিক হিন্দুর বুকে সেইরূপ কুঠারাঘাত কতবার পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই সুতরাং যদি একখানও কতকটা উচ্চাসের ভগ্ন অংশও পড়ে তবে তাহা কদাপি সেই যে মহঃ ইবন বক্তিয়ার এ দেশে আসিলেন, তখন এদেশে মুসলমান রাজত্বের আর একটি সম্ভাবনা করার আশা কি আছে, যাঁহার নামের নামের ভয়ান্ত পরাক্রান্ত সৈন্যের চরণাঘাতোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইত, যাঁহার রাজধানীস্থ সমস্ত ভদ্র জীবের উপাসনাগৃহ সমবেত হইয়া রাজাধিরাজের উপাসনা করিতেন, যাঁহাকে উলিয়া নৃপতিগণ অসংখ্য হয় বাহিনী উপঢৌকন দিয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেন, যাঁহার ফরমান নামক প্রস্তরফলক জলদকালের ন্যায় দিগ্ দিগন্তে গম্ভীরমান করিয়া ঘোষিত এবং ভারতের পশ্চিমে [illegible] প্রশস্ত নৌকটক সেতুবন্ধ নির্মিত হৈরম্বিধর গজের ন্যায় প্রতিভাত হইত, যাঁহার বিশ্বজয় উদ্যমে বিয়াদি পশ্চিমে কেদারতীর্থ, দক্ষিণে সেতুবন্ধের সন্নিহিত পর্যন্ত [illegible] এক কথায় "বারাণসী কিরণাঙ্কিত পূর্বসমুদ্র হইতে অস্তাচলাবলম্বী ক্লান্ত রবির রক্তরাগরঞ্জিত পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত" বিস্তৃত ছিল

তাম্রশাসনগুলির উক্তি স্বপ্নের মত মনে হয়। সেগুলি পড়িলে আমরা যে তাহাদেরই একজাতি হিন্দু, মনে হইবে। আবুলফজলের মত কে কিনের জন্য সাম্রাজ্য লাভ করি। সেদিনও লক্ষ্মণসেনের সময় "কস্য শক্তিবিক্ষয়ে বিজয়রাজ্যে পদ্ধতিং ধরিতুং শক্নোতি"। কার সাধ্য যে লক্ষ্মণসেনের বিজয়রাজ্যে পদ্ধতি ধরণ করিতে সাহস করে। প্রবাদ বাক্যের মত ছিল। তাহার শক্তিক্ষয়ে হিন্দুর শাসন যবন ইবন বক্তিয়ারের আগমনের দিন হইতে ফুরাইয়া গিয়াছে।

হিন্দুর কঠোর পরীক্ষা।

কিন্তু হিন্দু বহুদিন যাবৎ জড়জগৎকে অস্বীকার করিয়াছে। অর্থ সম্পদ্ কিছু নহে, ইহা বলিয়া আসিয়াছে "অর্থং অনর্থং ভাবয় নিত্যং"। এবার সত্যিকারি পরীক্ষার দিন আসিল, ধনসম্পদ্ কিছু নহে তাহা সেগুলি অপরে লইয়া যাউক। সমস্ত ঐশ্বর্য্য লুই করিয়া কেহতা পরীক্ষা করিতে আসিলেন—সত্যই অর্থ অনর্থ কিনা তাহাতে সত্যই সুখ লেশ নাই কিনা? এই পরীক্ষায় হিন্দুরা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

হিন্দু ধর্ম সম্পদের প্রত্যাশী নহে।

জড় সভ্যতার সমস্ত আড়ম্বর ধ্বংস করিয়া ভগবান্ হিন্দুকে আধ্যাত্ম-সম্পদের উপযুক্ত করিলেন। মন্দির ভাঙ্গিয়া গল তের বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, কিন্তু ভগবান্ সাধককে ছাড়িলেন না, ভক্ত তাহার আরও অন্তরঙ্গ হইল। শত শত মঠমন্দিরে যে ভক্তির খেলা না হইয়াছে, চৈতন্যদেব বিজয়ন্তম্ভ তদপেক্ষা অধিকতর প্রেম ভক্তি দেখাইলেন, আজ পর্য্যন্ত সে খেলার বিরাম নাই। চাঁদপুরের একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া সে দিনও এক মুসলমান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যে তপস্যা করিতেছিলেন, তাহার কাহিনী প্রসাদ সহজ করিয়া এক মহাপণ্ডিত যুবক সুদূর পাশ্চাত্যদেশে বিশ্বজয়ী হইয়া আসিয়াছেন। মন্দির গিয়াছে ভগবান্ আমাদিগকে ছাড়েন নাই। আলেকা, বিক্রমপুরী, উদয়পুর অত্যাচারীরা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গিয়াছে কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে টোল বসিয়া গল তাহাতে কত শিক্ষিত স্মার্ত রঘুনন্দন স্মার্ত ভবিষ্যৎ কৃষ্ণলীলা প্রণেতা সনাতন, কুলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার রাজসভার জগন্নাথ বাণী, শবর, গোবর্দ্ধন ও উমাপতিগণ আর উৎসাহ পাইলেন না কিন্তু কবিকঙ্কণচণ্ডীকার চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করিয়া দেখাইলেন যে এদেশের কবিত্ব-সম্পদ্ তেমনি, উহা স্বাভাবিক উহা বসোরার গোলাপের ন্যায় কাহারও তপস্যা ও একবিন্দুও নষ্ট হয় নাই, তাহার পুষ্টিসাধনের জন্য কোন রাজার উৎসাহের প্রয়োজন নাই। এই পরাধীন নিষ্পীড়িত জাতি হইতে বিশ্বজয়ী রবীন্দ্রনাথ উদ্ভূত হইয়া দেখাইলেন, আমরা জড় শক্তির প্রত্যাশা করি না—আধ্যাত্মিক সম্পদে আমরা চিরকাল বড়, আমাদের সে তপস্যা ফুরায় নাই।

দ্বি তীয় পরিচ্ছেদ

পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য

শিল্প ও ভাস্কর্য্য কতকটা ব্যয়সাধ্য, রাজ অনুগ্রহ ও প্রভূত অর্থ সাহায্য সম্পদের প্রতীক্ষা করে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীও বিনা সাহায্যে তাজমহল গড়িতে পারেন না বারোবোদর মন্দির অথবা অজন্তা, ইলোরা, ভুবনেশ্বর—এ সমস্তের পশ্চাতেই রাজ-শক্তির সহায়তা ছাই আমরা এখন ভিখারীর জাতি, আমাদের শিল্প-সাধনা অবলম্বন করিবার উপায় কি? এই জন্যই কি শিল্পকে আমাদের শাস্ত্রকারেরা অপেক্ষাকৃত হীন স্থান দিয়াছেন? কিন্তু শিল্প ও ভাস্কর্য্যের উন্নতির পথ অত্যাচারে অনেকটা রুদ্ধ হইয়া গেলেও উহার মূল উৎস শুকাইয়া যায় নাই গ্রামে গ্রামে সেই শিল্পের অনুশীলন কিছু দিন পূর্ব্বেও হইতেছিল সে প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি গৃহশিল্পে বাঙ্গালী মুসলমানাধিকারের কাল পর্য্যন্তও স্বীয় প্রতিভা দেখাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিত্রপটে যে ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বহুদিনের সংস্কারের ফল,—বহু তপস্যা-জাত এই পুস্তকে একটি মাতৃমূর্ত্তির ছবি দিয়াছি তাহা যথাযথরূপ ছবিতে ফোটে নাই পৃথিবীর অন্য কোন দেশের শিল্পী বাঙ্গালার মত মাতৃমূর্ত্তির প্রতি গৌরবের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না যে দেশে শিশু পুত্রোক্ত মাতৃমূর্ত্তি ও কবিতায় রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীত বিদ্যমান, যে দেশের শিল্প ও কাব্যলক্ষ্মী ভাষা ও অলঙ্কারের নিগড় পরিয়াও যে বেশী স্বাধীনতন্ত্র হইয়াছেন—এমন মনে হয় না, বর্ত্তমান শিল্পীরা স্তন আঁকিতে ভয় পান, অথচ রমণীর স্তন আভাসে দেখাইয়া কুরুচির ইঙ্গিত করেন। য্যাণ্ডলার অতুল চিত্রকরও শিশু যিশুকে আঁকিতে যাইয়া মাতার স্তন দেখাইতে সাহসী হন নাই তাঁহার শিল্পিকল্পী প্রতিভা ও বহুদূরের সংস্কারাধীন হইয়া এই ক্ষেত্রে কতকটা বাধা পাইয়াছে কিন্তু যে শিল্পী স্তন আঁকিতে ভয় পান, তিনি মাতৃমূর্ত্তি আঁকিবেন কিরূপে? বড় জোর তিনি ধাত্রীমূর্ত্তি আঁকিতে পারেন

মাতৃমূর্ত্তি।

পূর্ব্বে যে মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে শিশু এক হাত ধরিয়া স্তন্যপান করিতেছে আর এক হাত দিয়া অপর স্তনটি খুঁটিতেছে। এই ছবিতে মাতৃমূর্ত্তি সম্পূর্ণ হইয়াছে শিশুকে স্তন্য দেওয়ার সময় যে প্রশান্ত গরিমায় মাতৃমূর্ত্তি উজ্জ্বল হয় তাহাও ইহাতে দেখান হইয়াছে। এমন কি কাপড়ের ভিতর শাড়ী খানির কুঞ্চন ও মাতার বসিবার ভঙ্গী এক অপূর্ব্ব ভাব ঘোতনা করিতেছে।

এখন যাঁহারা শিল্প চর্চ্চা করিতেছেন তাহারা বিলাতী রুচির আবহে ঘুঘু বনিয়া গিয়াছেন। মাতৃস্তন দেখাইবার সাহস তাঁহাদের লুপ্ত হইয়াছে তাঁহারা দেবাদিদেব মহাদেবের অধিকারে বাস করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি আঁকিতে ভয় পাইতেছেন বাঙ্গালী কবি ও চিত্রকরের স্বাধীনতা ৩ সাহস ১০০ বৎসর পূর্ব্বেও লুপ্ত হয় নাই কবি অবাধে যাঁহারা বধূর সঙ্গে বিবাহিত রাজকুমারীর অতি বিশুদ্ধ প্রেম বর্ণনা করিতে ভয় পান নাই এবং শিল্পের

যতদূর অনুমান করা যায় চিত্রকরের মনে ঢাকার কোন ছবি উদ্ভাসিত হয় নাই। বাঙ্গলা দেশ ও ইংরেজ-আধিপত্যের সিংহল ভারত অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত ও চারুকলা অনাবৃত্তা রক্ষা করিয়াই নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাদের বাক্স সমস্ত লইয়া ও পাড়ি জমিয়া তার গঙ্গাধারার ন্যায় বহিয়া গিয়াছে। এখনও বাস্তব চিত্রকর অট্টালিকা প্রাসাদের চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে করে না। সম্ভবতঃ অতীতের চিত্রাঙ্কন যে কি ছিল সেখানেই তাহা সহজ কল্পনায় আসে না। পাকাস্ত্রা কাচ পায়ের পাড়ালী সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়ক কাজেরই কল্প আমরা বুঝি না। ছিল খুব, সাধারণ ছবি, আর ভিতরে যাহা পাই পরে সকল তাহাই বাক্সে করিয়াছে।

কাজেই আমরা এ কথা পূর্ণ বাঙ্গলা একটি বড় রকমের সহর ছিল। ইহা সপ্তগ্রাম হইতে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন ভূগোলবিদ অনুমান করেন বর্তমান ঢাকা নগরই সেই প্রাচীন বাঙ্গলা সহর এবং বর্তমানেই সেই প্রাচীন গঙ্গা, কুড়িগ্রামের সমীপবর্তী ৫০০ বৎসর পূর্বে বুড়িগঙ্গার নাম "বড় গঙ্গা" ছিল। পর্তুগীজ কাগজে উহাকে একেবারে ঢাকা নদী হইয়াছে "বাঙ্গলা বাজার" সেই আজি নামের স্থান অনুসন্ধান করিতেছে। এই বাঙ্গলা সহরের সম্বন্ধে যুরোপের অনেকগুলি বর্ণনা সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। এর মধ্যে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে "মনসরাট" সাহেবের বর্ণনা সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ। ইহা পুরাতন কালের "মনসরাট" নামে পরিচিত ছিল। এই বাঙ্গলা সহর হইতে সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম ১৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল, এই বাঙ্গলা সহরের নাম হইতে সমস্ত প্রদেশের নাম বাঙ্গলা হইয়াছে।

যখন নদীর প্রবাহের এই পরিবর্তন হয় নাই, তখন সপ্তগ্রামের স্থানীয় বিস্তৃতি অনেক বেশী ছিল। পূর্বকালে মহাজনেরা ভাগীরথী, যমুনাপুর ঢাকা পূর্বের অঞ্চলে এই সমস্ত বড় বড় কারবার করিতেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক সাহেব কুল এখন সকল নাম এই ছাড়া ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ও এখনকার দিনে তাহার কোন্টা ধরিয়া কত বড় পূর্বকালের সাহেবের অনেক স্থানে পুরা শিল্পকলা সংযুক্ত পাড়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যখন পর্তুগীজের নায়ক চাঁদ বিনোদ এ বিষয়ে একজন উপযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যে ঘর বড়ুয়ার কথা এই গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যগুলির কোন কোনটিতে সাধু বণিক স্ত্রী অমলার "ঔষধাগার" নামক ঘরের উল্লেখ পাই। ইহার ঐশ্বর্য ও সাজসজ্জার আলব ও সোণার পুতুলি প্রভৃতির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যখন বাঙ্গলা বাণিজ্যের সেরা সাধক বাণিজ্য ছিল, তখন ঐ সকল বড়ো ঘরের পাড়ে অতুল অর্থ বায় হইত। কবির বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও উহা সাময়িক শিল্প সমৃদ্ধির কতকটা আভাস দিতেছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব বাঙ্গ ফরিদপুর জেলায় মধুমতী নদীর উপর স্থানে খনন ও ইট দিয়া বাঁধা ঘাট আছে। পূর্বাঙ্গ ছত্রভোগ ঘাট দিয়াছে বাঁধানো ঘাট আছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে কোন কোন স্থানে দুই একটি ভগ্নাবশেষ ঘর আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এই নিম্ন শ্রেণী

সারওয়ারজানি মিয়ার দর

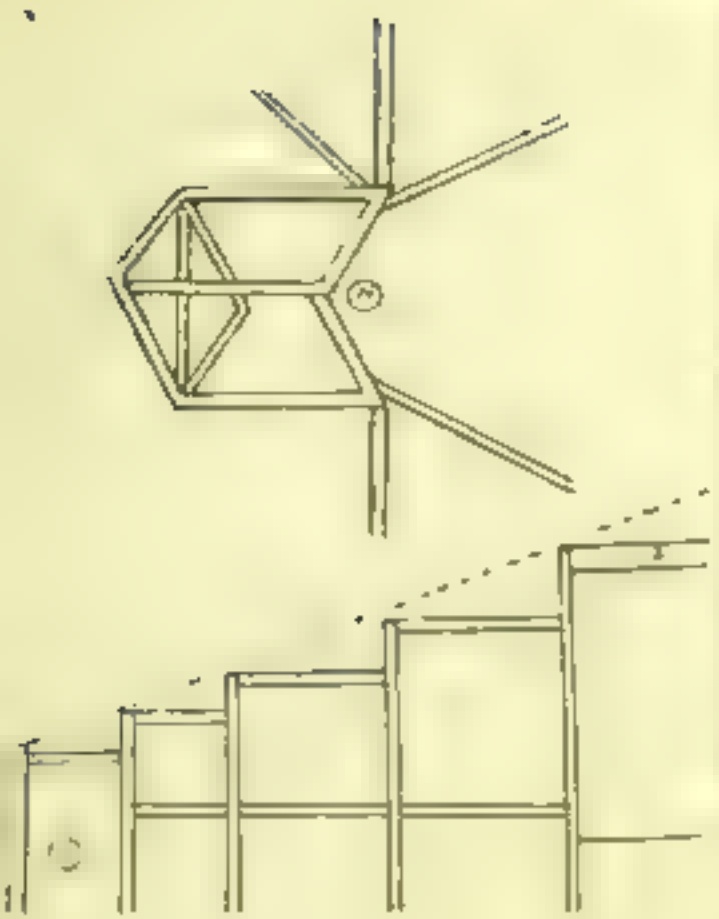

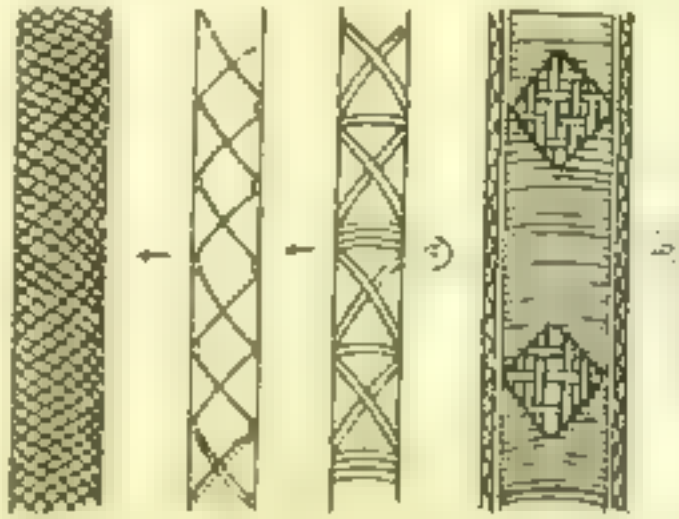

(১)। প্রত্যেকটি 'থামের' মোটায় একরূপ চিত্রিত করা। 'থামে'গুলি বিভিন্নরকম ভাবে চিত্রিত। ইহা ছাড়া 'ছাউনি', 'কলসী' ও 'লম্ব' ইত্যাদী পাঁচ শীলরঙ্গে চিত্রিত। (২) ও (৩)। সাধারণ 'ফুরসী—ফুরসী মেঝের বীধন, মাঝে পরস্পর। মোড় 'ফুরসী'র পাশে দুইটি চিত্রিত শলাকা। মেঝের বীধনে সাধারণ (৪)। পাশের প্রত্যেকটি থাম একরূপ।

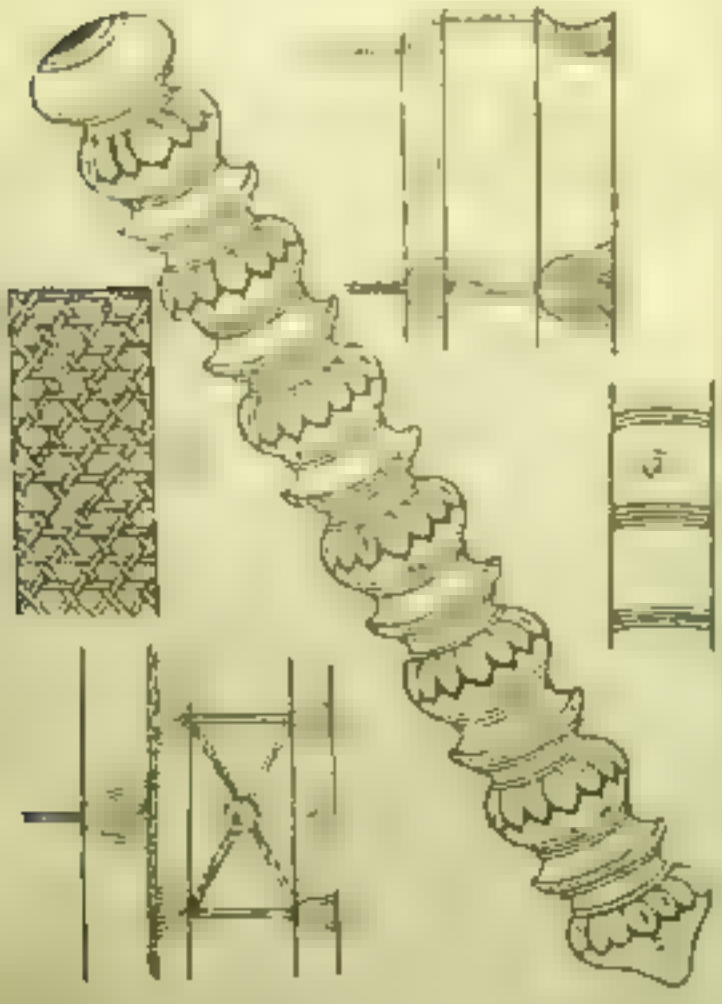

সারওয়ারজান মিঞার ঘর

(ক) শীতল পাটির উপর কাঠের কুল। সাতেরের বিখ্যাত বহু কুল পাটির উপর ভিত্তিত অঙ্কিত পুষ্প [illegible] শীতল পাটির উপর এরকম কুল তৈরী করাকে "খাঁদাখাদি মারা" বলে।

(খ) [illegible]

(গ) শীতল পাটির উপর কাঠের কুল।

হইতে চলিয়া গেল। এখন পাকাবাড়ী—অন্ততঃ টিনের ঘর লোকের আদরণীয় হইয়াছে খড়ো ঘরের জন্য কে আর এত শ্রম—এত অর্থব্যয় করিবে? আর এখন সে শিল্পের উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ যে সকল গুণ ও দোষের ভূষণ ছিল, যাহা মিগাস্থিনিস, হিউনসাঙ্গ, ফাহায়েন প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকেরা মুক্তমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, সেই সস্তাবাদিত্ব, সারলা ও ধর্মভীরুতা বাঙ্গলা দেশ হইতে তিরোহিত হইবার মধ্যে আসিয়াছে। ৮১০ কাহন টাকা খরচ করিয়া অতীব সৌধা ও সর্বাঙ্গসুন্দর যে গৃহ নির্ম্মিত হইবে, তাহাতে হয়ত পরদিন তাহার প্রতিবেশী বন্ধু, অন্য কোন কারণে না থাকুক, শুধু হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আগুন ধরাইয়া দিবে। সুতরাং এখন আর সেই প্রাচীন শিল্পের উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নাই। ছারওয়ার জান মিঞার বাড়ীর কতকটা দৃশ্য নিম্নলিখিত বিবরণে পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা ঘর।

পরখানি চারি চালা বিশিষ্ট, এ দেশে ইহাকে "চার" ঘর বলে। পূর্ব্ববঙ্গে একরূপ ছন জন্মে তাহাকে "উলু ছন" বলে। এই উলু ছনের উল্লেখ পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় অনেক স্থলে পাওয়া যায়। সাধারণ ছন হইতে এই উলু ছন দীর্ঘ সূক্ষ্ম ও অনেক কাল স্থায়ী। এই উলু ছনকে খুব কায়দা করিয়া "কুলিছন" তৈয়ার করিতে হয়। মুটির মধ্যে উলু ছন এক এক আটি ধরিয়া ধরিয়া তাহা ছাটিতে হয়। কান একটি খড় বস্তু যা ছাট না হয় এইভাবে বাছাই হয় এবং সমান করিয়া কাটিতে হয়। তৎপরে এই "কুলি" ছনের এক এক আটি বিস্তৃত করিয়া সজ্জান হয়। চালের উপর ছন খুব পুরু করিয়া প্রত্যেকটি স্তর নির্ম্মিত হয়, প্রত্যেক স্তর ইঞ্চি পরিমাণ ছনের স্তরের পর 'ছাটন'। বাঁশের চটা উহা খুব সরু করিয়া গোলাকৃতি করে তাহাকেই বলে "ছাটনী কাঠি"। এইরূপ স্তরে স্তরে "কুলিছন" চালের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া উপরের দিক পরিষ্কার করিয়া ছাটিয়া ফেলা হয়। উপরের দিকটা ঐ ছনই মোড় দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমন করিয়া রাখে যে তাহা দেখিতে খুব সুন্দর হয়। এই চালের নীচের দিকটাই অতি সরু—কারুকার্য্যময় পাটী থাকে। এই পাটীকে পূর্ব্ববঙ্গে "শীতলপাটী" বলে। ইহার দাম খুব বেশী কখনও কখনও এক খানার দাম ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইত। শীতল পাটীকে আটকাইবার জন্য "ছাটন" (সুস্থভাবে চাঁচা বাঁশের চটা) ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক চার আঙ্গুল পরে পরে "ছাটন" থাকে "ছাটন" গুলির সঙ্গে "কুরসো" (ছাটন হইতে বড় অর্দ্ধ গোলাকৃতি চাঁচা বাঁশ বক্র এবং আড় ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই কুরসোর সহিত দড়ি ('তাইত') দিয়া চালের উপরকার ছাটন আবদ্ধ থাকে। এই সমস্ত বাঁধনে "কুলি ছন" খুব শক্ত ভাবে আঁটা থাকে। "কুরসোর"

ছয়চালা আর বিচারী ঘর।

সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন পাকা বাঁশের নারিকেল গোলাকৃতি "কয়ো" আড়াআড়িভাবে বাঁধা হয় ইহাতে চাল এত শক্ত হয় যে কেহ চালের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিলেও তাহা হেলে না। কয়োকে আটকাইবার জন্য বাঁশের "চটা" সর্ব্বনিম্নে আবদ্ধ হয়, এই প্রশস্ত চটাকে "মুখচোত" বলে। চালের একেবারে সম্মুখের সাজানো দিকটাকে "মুখ পাত" বলে। এখন ঘরের মধ্যে গিয়া ঊর্দ্ধে তাকাইলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা বর্ণনাতীত, যে সকল বাঁশ ও ছাঁটনের কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্তই

নানা বর্ণে রঞ্জিত ও তাহার প্রত্যেকটিতে অসীম ধৈর্য্যের পরিচায়ক শিল্পকার্য্য আছে। বিচিত্র বর্ণের ফুল ও লতাতে উপরকার দৃশ্য অতি মনোরম হয়। নানা কারুকার্য্য-খচিত খুঁটির সঙ্গে কাঠের "ডাক" দিয়া চাল আঁটা হয়। এই ডাকগুলির কোনটি নরাকৃতি, কোনটি হাতীর শুঁড়ের মত, কোনটিতে পরী বা অন্য কোন স্ত্রীমূর্ত্তির মূর্ত্তি গড়া থাকে। যেখানে যেখানে বাঁশের "গোদা" সেইখানে সেইখানে বিচিত্রবর্ণ পক্ষীপক্ষী ও ফুলপাতার কারিগরী। প্রথমে বেত অতি সূক্ষ্মভাবে চাঁচিয়া তাহাতে নানা কারুকার্য্য করিয়া লতাপাতা বা ফুলের আকারে গঁড়োগুলি গাঁথা হয়। কিন্তু কখনও উহা তাকাইলে মাঝে মাঝে পাতলা পাটা ও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত চৌকা এবং ঠেকাগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্ত্তিতে এমন আড়ম্বরময় দেখায় যে চক্ষু সেই চাকচক্যে ভুলিয়া যায়। খাম্বা অর্থাৎ বাঁশের খুঁটিতে যে বাঁশ লম্বা এবং যাহার সঙ্গে চাল আঁটা থাকে তাহাকে পাড় বলে। আবার ঘরের ভিতরে চালাকে শক্ত এবং উঁচু করিয়া রাখিবার জন্য ডাকের যে লম্বা বাঁশ দিয়া চলা বাঁধা থাকে সেই বাঁশকে উঁচা বলে। যে বাঁশের বিস্তৃত চটের দ্বারা বাঁধা থাকে তাহাকে কলা আইন বলে। এই শিল্প-শোভা প্রতিপদে অকস্মাৎ ছাত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ছয়ঘরির জমিদার খাড়া হন, শ্রী: মধুখালি, গ্রাম বলমাবলিয়া, জেলা ফরিদপুর। এই ঘরখানি প্রথমে গুপ্তাল বাজলোচন ঘরখানি প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়া শেষে ভয় পাইয়া জমিদারের নিকট অস্বীকার করে। কিন্তু তাহার এক আত্মীয় সাগরের মহিম নমঃশূদ্র এই ঘর অতি প্রশংসা ও আদরের সহিত সমাধা করে। উহা প্রস্তুত করিতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ১২,০০০ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে এই ঘরে একটিমাত্র আলো জ্বালাইলে সমস্ত ঘরখানি "মিনাদার" এবং "কাচে" প্রতিবিম্বিত হইয়া আলোকিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে "মিনাদার" একেবারেই নাই, অন্য কিছু আছে যে হারামী দিনে একটিমাত্র কয়ো প্রস্তুত করিতে পারিলে সেই চাকুরী পাইয়াছে; এবং মহিম নাকি প্রত্যেকটি জিনিষেরই পরীক্ষা করিবার জন্য জিনিষগুলির উপর দিয়া একগাড়ি বেলুন সুতা টানিয়া লইয়া যাইত, যদি সুতাটি ছিঁড়িয়া যাইত তবে বুঝা যাইত যে জিনিষ ভালরূপে মসৃণ হয় নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই চিত্র বিচিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্পীর তপস্যার ফলস্বরূপ ঘরখানি দেখিলেই অজন্তার কারিগরদিগের কথা মনে পড়িবে। সে সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তীরা আর নাই, সুতরাং পাথরের সে বিরাট স্বপ্ন গড়িবার পরিকল্পনা কে করিবে? কিন্তু তথাকার কারিগরের বংশধরেরা যে সেই অপূর্ব্ব শিল্প তাহাদের কাল করিল উপকরণ লইয়া এইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও তপস্যার আঘো সাজাইয়াছে, তাহাতে কে সন্দেহ করিবে? বস্তু সেই শিল্পিকুল, তাহারা নাম যশ অর্থ চাহে নাই কিন্তু বহু কষ্ট সহিয়া ও অভাব উপেক্ষা করিয়া যুগযুগান্তের তপস্যার ফল লইয়া আসিয়া আমাদিগকে দিয়েছে। যদি তাহারা অর্থ কি প্রতিষ্ঠা চাহিত, তবে এ তপস্যার ফল দেশের দুর্দ্দিনে আমরা পাইতাম না। শিল্প ছিল তাহাদের জীবনকৃত্য, অনাহারে, অর্দ্ধনগ্নদেহে এই আকিঞ্চনটুকু সেই জোমানন আগলিয়া রাখিয়াছে। আমরা মূঢ়, উপাস্য ঈশ্বরকে চিনিয়া ইহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছি কমলাক্ষী সুখ সিরাইব একটু অশ্রু মুছিয়াছেন।

যিনি নিজ চক্ষে এই ঘরখানি না দেখিবেন, তিনি এই দোতার একটা ধারণা করিতে পারিবেন না। প্রতি অবকাশস্থল প্রত্যেক কণা ছাউনি ও ঝুরণি এমন সযত্নে সহকারে নিয়মিত এবং প্রত্যেক জিনিসের ব্যবধান এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত যে মনে হয় যে কারিগর প্রতি সূক্ষ্ম কার্যের জন্য গজকাঠি হাতে করিয়া কাজ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের এই শিল্পশিক্ষা বংশানুক্রমে একরূপ বিশুদ্ধভাবে হইয়া আসিতেছে, যে কাজ গজকাঠি বা মানদণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে সমস্ত জিনিস কারিগরের অভ্রান্তজ্ঞানে সম্পাদিত হইয়াছে। চালটা পূর্বে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল এখন অবশ্য উহা আর পৃথক নাই। এই পৃথক চালের নীচে দাঁড়াইয়া নানারূপ গ্রাম্য কাজের সঙ্কল্প ছুটিয়া যায়। চালের মধ্যে মধ্যে সুদর্শন আমের চিত্রিত ছবির কারিগরি সঙ্কল্প। একখানা ঘরের ;—৪ খানি চালা, চাল হইতে "মুখপাত" পর্যন্ত এক একটি "ঘরো" ৬০ ইঞ্চি ঘরের দৈর্ঘ্য ৩৫ ফিট—এক একটি "আঠন" ৩৫ ফিট ঘরখানি প্রস্থে ১০ ফিট আড়াই ১৪ ফিট। এক একটি চালে ১০টি 'ঘরো,' ৫৪টি 'আঠন,' ১৮৫টি 'মুখপাত' ৪০টি 'ছাউনি' ১৭০টি "সলা", ১৪টি 'পট্,' ৭টি "মুখপাত", ৫টি 'আড়' ৪০টি ডাক', ১০টি খুঁটি, বারান্দায় ৮টি খুটি। 'ভিতরে ৪২০টি "তীর" উপরি ভাগে একটি "ঢালা"।

ছবওয়ার স্থানে মিঞা এখন জীবিত নাই। তিনি অতি বৃদ্ধবয়সে মারা গিয়াছেন, তাঁহার পুত্রের বয়সই প্রায় পঞ্চাশ। এই ঘরখানি প্রায় ৮০ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইল নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হইয়াছে ১৮ সন, উহার ব্যয় পড়িয়াছিল ১,০০০, এক হাজার টাকা। সকলেই, এই ঘরখানির উৎকর্ষের মূল, এর জিনিসের লাক্ষণ্য আছে অল্প ছিল। সহ সময়কার একখানি ঘর ঘরে যে বার হাজার টাকা ব্যয় হইতে পারে তাহা অসম্ভব মনে হইবে, কিন্তু ঘরখানির ভিতর দাঁড়াইলে মনে হইবে যে এখন যদি উহা কেহ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন তবে উহা অপেক্ষা অনেক গুণ খরচ করিয়াও কারিগরের অভাবে তিনি সফলকাম হইবেন না। কথিত আছে কোন বড় লোকের মেয়েকে ছবওয়ার কোন বিবাহ করেন তখন শ্বশুরালয়ে বড় পাকা বাড়ীতে বাস করিয়া স্বামিগৃহের খড়ো ঘরের কথা শুনিয়া একটা ক্ষুদ্র ইচ্ছুক তার জানাইলেন। মিঞা মনে বড় লাগা পাইয়া তাঁহার জন্য এমন একখানি খড়ো ঘর তৈরী করাইলেন, যাহা এখনও বহুদূর হইতে লোকে দেখিতে আসে, অথচ ছবওয়ার জানের শ্বশুরের প্রাসাদোপম গৃহের শেষ ইষ্টকখানাও এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, খড়ো ঘরের মাহাত্ম্য লোকে এখনও মুগ্ধ হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প দেবারাধনা বা রমণীর প্রেমের প্রেরণা পাইয়া চরমোৎকর্ষ বিকাশ পাইয়াছে *

* এই ঘর বাসি কয়েক দিন হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ২০শে আষাঢ়ের ১৩৩১ বাং) আনন্দবাজার এই নিদারুণ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। "১০,০০০ টাকা মূল্যের খড়ের ঘর—অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য বহুলাংশে ভস্মীভূত। (নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র), বালিয়াডাঙ্গি, হয়, জুলাই। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বৃহদা থানার অধীন বহুমালদিয়া নিবাসী জমিদার সরোজান মিঞা সাহেবের খড়ের ঘর খানি বহুলাংশে একবারে ভস্মীভূত হইয়াছে।

চালের খুব শুষ্ক ও শক্ত গাঁদনির সকল স্থানের ভিতরের দিকটায় বহু বৎসরও এক ফোঁটা জল প্রবেশ করিতে পারিত না। এই জন্য চালের ভিতরভাগ নানারূপ সজ্জিত করা হইত। অনেক সময়ে মধ্যের থাকা এবং সময়ে সময়ে মাদুরাজা পার্শ্বের পালক দিয়া ছাওয়া হইত। "মাদুরা পালক পাখা দিতে সাজুলে বানায়ে" —মনুসা, পূর্ব্বঙ্গ গীতিকা, ২য় ভাগ ১ম খণ্ড, ৬২ পৃ উহাদের ঘরগুলি ও সকল বাঁশ ও বেত দিয়া নির্ম্মাণ করা হইত, তাহা সাধারণ বেত ও বাঁশ অপেক্ষা অনেক ভাল। কারণ তাহা গৃহস্থেরা আলাদা রকমের চাষ তৈয়ারী করিয়া যত্নের সহিত উৎপাদন করিত। সময়ে সময়ে একটি সুরু বেত ২০ হাত লম্বা হইত। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোন না কোন পল্লীতে সেরূপ বেত জন্মান হয়। খাঁটি বাঙ্গালা ঘরের সকল কাজই বাঁশ, বেত ও খড় দিয়া সম্পাদিত হইত। সুতা দিয়া বুনন করা বা জালে নানারূপ ফুল, লতা ও জীবজন্তু প্রস্তুত করা হয়, শুধু সুরু বেত দিয়া সেরূপ কারুকার্য্য হইত, সেই বেত চাঁছিয়া প্রায় সুতার মত সরু করা হইত। যাহার দ্বারা নানারূপ জীবজন্তুর মুখ ও অবয়ব নির্ম্মিত হইত। কুমারা মাটি বাঙ্গালা গৃহস্থ খুব কমই কাঠ প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করিতেন। যত কম জিনিষে সম্ভব তাহাতেই তখন তাঁহাদের অমূল্য কারুকার্য্য চলিত। পুরাণ কালের তখন পুরাণ আমলের সুতা বাহির করিয়া যেরূপ কারিগরী জালের মতন করা হৈত। সেই সমস্ত সামান্য উপকরণ হইতে বাঙ্গালার পল্লীর সুগঠন অপূর্ব্ব কারুখচিত খড়ো ঘর তৈয়ারী হইত। একালে যন্ত্রকৌশল এইরূপ হয়। অনেকেই প্রস্তুত করিতেন। দুরন্ত শাকা বাড়ী নির্ম্মাণ নিরাপদ ছিল না। অথচ যে সকল শিল্পী অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম কারুকার্য্য খচিত করি গড়িতেন ও চালের বাঙ্গালীরা সেই শৈল্পিক শিল্প-কৌশলের সমাদরই করিতে শিখে প্রস্তুত হন নাই। রাজার ঐশ্বর্য্য ও মন্দির এবং কৃষ্ণপ্রস্তরের আদরের উহারা কোথায় পাইবেন? সুতরাং বেত ও বাঁশের সামান্য উপকরণ লইয়া তাঁহারা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন; এদেশ দেবী ভারতীর নিজ স্থান, তাই প্রকাণ্ড সিংহদরজার পশ্চাতে খাড়া ঘরের টোল বসিয়া গেল—ভারতীর আসন টলিল না। যে সকল শিল্প তাঁহাদের অসাধারণ শিল্প মাহাত্ম্য জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাঙ্গালীরা মহামূল্য উপকরণের অভাবে ছেঁড়া কাপড় ছুঁচ সুতা শিঙ্গালো, বাঁশ, বেত ও খড় লইয়া বসিয়া গেলেন। এই স্থান শিল্পের 'জন্মস্থান' যত বার সেই শিল্প নষ্ট করিবে, ততবার তাহা 'ভস্মরূপ ধরিয়া আবার জাগাইবে।

বাঙ্গলা দেশে যে এইরূপ ঘর অনেক ছিল তাহার প্রমাণ শুধু পল্লী গীতিকায় নহে—

এই ঘর বাবি ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহার শিল্প নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যের কথা তখনকার সংবাদপত্রের স্তম্ভ অলঙ্কৃত করিত। দূর দেশান্তর হইতে বহু লোক এই ঘর বাবি দেখিতে আসিত। ঘরখানির কারুকার্য্য-খচিত-পাড় বেতের সংখ্যা ছিল ৩২০০০ টাকা অথবা ১০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারিব না।

আইন ই আকবরিতেও আছে আবুল ফাজল লিখিয়াছেন "বাঙ্গালীদের ঘরগুলি প্রধানতঃ বাঁশ দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকে ইহাদের কতকগুলির ৫০০০ টাকা কিংবা ইহোধিক অর্থ ব্যয়িত হয়—এই ঘরগুলি খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়" ("Their (of the Bengalees) houses are chiefly made of bamboos some of which will cost five thousand rupees and upwards and are of a very long duration" Ain-i-Akbary, Pt. I, Soobha of Bengal, p 303) একখানি ঘর প্রস্তুত করিতে ৫০০০৲ এবং তদোধিক টাকা সেই সময়ে ব্যয় হইত এখনকার দিনে ঐ টাকার মূল্য অনেক অধিক

"চণ্ডীমঙ্গল" নামক পাঁচালীকার মহাকবির বাড়ী ও তাহার গুলির যে বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, আমিয়াছিলাম উহা নিছক কল্পনা, কিন্তু এখন মনে হইতেছে ঐ বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণ কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়

ছত্রভোগে কান মিত্রের বাড়ীর মত সাবেকী ধরণের ঘর এখনও বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান হইয়া পড়িয়া আছে দৃষ্টান্তস্থলে আমরা বীরভূমের অন্তর্গত "সাঁমাই" গ্রামের একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীর ঘরের উল্লেখ করিতে পারি গ্রামখানি সেলমপুর হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত ঘরের মধ্যে নানা কারুকার্য্য তাহা বেতের বাঁধনে মযূর ফুল ও মনোরম মূর্ত্তি তুলিয়া সজ্জিত হইয়াছে কাঠের আড়ার মধ্যে নানারূপ মূর্ত্তি খোদাই করা ঐ ঘরখানি ১০০ বৎসর পূর্ব্ব তৈয়ারী হইয়াছিল সিঙ্গুর হুগলী জেলায় কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে ঐরূপ একখানি ঘর ছিল তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান খুলনা জেলার অন্তর্গত ঘোষালি গ্রামের নিকট কোন পল্লীতে প্রতাপাদিত্যের সময়কার কাঠের একখানি ঘর ছিল তাহাতে কারুনির্ম্মিত নানা দেবদেবী ও মানুষ এবং পশু-পক্ষীর মূর্ত্তি খুব সুন্দর খুঁটি ও প্রাচীরের শোভাবর্দ্ধন করিত, তাহার কিছু কিছু উপাদান আমার কাছে আছে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রের গ্রামে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ ভাদুরী, এম. এ ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের বাড়ীতে সাবেকরার কান মিত্রের ঘরের মত এখনও একখানি প্রাচীন ঘর বিদ্যমান যিনি আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন, তিনি বলিলেন—"এই ঘরখানির শিল্প- কার্য্য অদ্ভুত,—বেতের বাঁধনে ও কাঠের কাজে মনুষ্য ও পশুপক্ষীর মুখ অতি উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে বর্ণবৈচিত্র্যে, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসম্ভারে, ও অঙ্কিত নানারূপ মনোহর চাকচিক্যে প্রাচীন ঘরখানি এখনও দর্শনীয় হইয়া আছে এই একখানি বড়ো ঘর নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে তাহাতে অনায়াসে একখানি দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারিত *

* এই ঘরখানি সম্প্রতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বাঁকুড়া জজের আদালতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় মহাশয়কে এই ঘরের একখানি ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি না, তদ্বিষয়ে সন্ধান লইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি ২২শে জুন (১৯০৫) আমাকে লিখিয়াছেন "আমি গত ২০শে জুন তা. হাজার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, আমি আসিতে পারিলাম, সেই শিল্প-সৌন্দর্য্যশালী প্রাচীন ঘরখানি গত ভূমিকম্পে একবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে (have fed to the ground)" এই অল্প সময়ের মধ্যে উহার সবগুলির অনেকটি নষ্ট হইয়া গেল! বঙ্গের শিল্পশ্রী কি নিতান্ত অবলম্বন পাইয়া এই দুরবস্থা হইতে ত্রাণ করিয়া আনেন?

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "আমার জীবন" পুস্তকের [illegible] পৃষ্ঠা ৬০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত এইরূপ কতকগুলি ঘরের উল্লেখ আছে। "[illegible] "এ ভাব কি" দীঘির পাড়ে [illegible] দুইটি মাত্র ঘর। এই গৃহগুলি দেখিয়া ঐতিহাসিক ৺৺ অঙ্কে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন "প্রত্যেক ঘরের স্বতন্ত্র আকৃতি পৃথক্ পৃথক্ ঘরের পশ্চাৎ কি বিশ্ব চাল নানারূপ ঢেউ ও চক্রে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র কারু। এ অঞ্চলে কি কোন অঞ্চলে এখন কবিত্বপূর্ণ বাঙ্গালীর ঘর কত কমিয়া গিয়াছে। সকল কুটীর যে এমন সুন্দর হইতে পারে, এ ধারণাও কাহারও ছিল না। এ অঞ্চল এই সকল ঘর লইয়া ঘর-দুয়ার পড়িয়া গেল। বহুদূর হইতে লোক দলে দলে এই সকল গৃহ দেখিতে আসিতে লাগিল।"

এই সকল সুন্দরপূর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি বোধহয় কোন শিল্পের হইয়া রহে নাই। ইহাদের অপূর্ব্ব শিল্পের কেহ নাই এই [illegible] সুতরাং যে দুইজনের হাত হইতে ইহারা হয়ত সাধারণ পরায়ণ সাহায্য কোনরূপে ইহাদের নিকটে [illegible] তাহাদের কাহারও মনে পড়িল না। [illegible] হইয়াছে, [illegible] কারুকার্য্য [illegible] কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য [illegible] ঢেউ কল ধ্বংস পাইয়াছে। সেই ছাদ এই সকল ঘরের অপূর্ব্ব কারু [illegible] কারিগরী [illegible] হইয়াছে। [illegible], [illegible] তাহাদের কোনও একটা পথ একবারে নিরুদ্ধ হয় নাই।

আমরা ডাক্তার [illegible] পুনরুদ্ধারকল্পে [illegible] [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি তিনি এই বিষয়ে অবহিত হউন। এই এই ইষ্টকালয়ের সঙ্গে বাঙ্গলার স্থাপত্য সম্বন্ধ নহে,—বাঙ্গলা দেশের [illegible] এই সকল ঘরের সম্বন্ধে ঐতিহ্য ছিল, এখনও যখন উহাদের নিদর্শন একবারে লুপ্ত হয় নাই এবং [illegible] কারণে আজ বৃদ্ধ গৃহনির্ম্মাণশিল্পী কারিগর দুই একজন কোন সন্ধান কোন স্থানে এখনও মিলিতে পারে, তখন কি এই স্থাপত্যকে উদ্ধার করা পুনরুদ্ধারের করা আমাদের উচিত নহে?

এই সকল বিষয়ের আমার কোন যোগ্যতাই নিজ নাই। তাহারা লুকাইয়া মাত্রেতে মিলিয়াছে। আমরা কলিকাতায় ও [illegible] স্থাপত্যের অনুরোধে [illegible] পাস করিয়া 'ডাক্তার' উপাধির চক্ষু বিলাত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতেছি। কিন্তু লক্ষ্য যে বাড়ীর এত কাছে, তাহার কোন সন্ধানই লই নাই।

ঘরের বেলোয়ারি চিত্র।

বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে, যেখানে পাহাড়ের মাটী শক্ত, সেখানে মাটীর সুন্দর সুন্দর ঘর এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। গৃহলক্ষ্মীরা সেই সকল ঘরের দেওয়ালে যে সকল চিত্র আঁকিয়া থাকেন তাহার শোভায় মুগ্ধ হইয়া [illegible] একজন চতুর চিত্রকর কেরলের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই চিত্রের ফটোগ্রাফ লইয়া তাহা রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনি একখানি গ্রাম সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছেন, "সেই গ্রামের পুরুষেরা সেতার, প্রত্যেক ধাম, সরকা, কানালা,

মেয়েদের হাতের তৈরি সূচিশিল্প, কাপড়গুলির চারদিকে নানারূপ কারু ও কুলুঙ্গি প্রভৃতি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কাপড়ের উপর ফুলবুটি কিংবা প্রাকৃতিক বা সামাজিক দৃশ্য অঙ্কিত গ্রামখানিতে ঢুকিয়া মনে হইল, যেন কোন চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছি। গ্রামখানির চিত্রগুলির মধ্যে যে রং এর খেলা দেখা যায় তাহাতে চোখ জুড়াইয়া যায়, মাটির ঘরের এরূপ কলনাবলা এবং সমস্ত পল্লীর এরূপ অপরূপ সাজসজ্জা আর কোথাও দেখা যায় না। "চিত্রগুলি আদৌ উচ্চ শিল্পপর্যায়ভুক্ত হউক কিম্বা নাই হউক, ইহাদের প্রধান গুণ, ইহার পশ্চাতে এরূপ ভাবে বা সত্য রহিয়াছে যাহাতে সমস্তটা বিশ্বয় জন্মে। গ্রামখানি বাঙ্গলা দেশের ক্ষুদ্র একটি অজন্তা বলিয়া মনে হয়।

চিত্রিবাড়ী গ্রামটি।

ইহা ছাড়া "টাঙ্গাইল" বা "তলটুঙ্গি" নামক এরূপ গ্রামের কোন কোন ধনী গৃহস্থ বা পুকুরের মধ্যে বড়লোকের পাকা কাটা কিম্বা কাঁচের গৃহস্থের খুঁটি পুঁতিয়া খাটাঘর নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা নানারূপ কলাকারে মণ্ডিত হইয়া জলের উপর কলসমূহের মত উঁচু হইয়া থাকে। চারিদিকে কুমুদ ও পদ্মফুল ফুটিয়া, তাহার মধ্যে সুবাসিত বায়ু গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের ভিতর পুলকিত করিয়া দীর্ঘকালের জন্য তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখে। পাকা তলটুঙ্গি ঘর আমরাও দেখিয়াছি এখনও কোন কোন ধনীর পাকা ঘরের ছাদ বা চূড়া নানা রকম বাহারের সহিত নির্মিত হইতে দেখা।

মাইজপাড়ার পাটের শীতল পাটি।

গৃহস্থের ঘরের আসবাব প্রায় সমস্তই তাঁহারা নিজের অথবা মেয়েদের হাতের তৈরি। বড় মানুষের বাড়ীতে পাটি পালঙ্কের উপর যাহা ছড়ান থাকে নানারূপ মূর্তি ও ফুলপাতা উৎকীর্ণ করিত। এখানে বলা উচিত যে সেকালের এই সকল ছবির মাথা মোড়ার পুর অথবা সেকালের পাটার্নে থাকিত না। মেয়েরা পানের বাটা ও কলসাদি বা হাঁড়ি বসাইবার জন্য নানা শিল্পোক্তীর্ণ শিকা তৈরি করিতেন, সেখানে ছবি আঁকিতেন। পাখার উপর, পাখের উপর নানারূপ কারিগরী প্রদর্শিত হইত। প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মী কলালক্ষ্মীর ন্যায় নিপুণভাবে বাঁশের উপর, মাটীর ভাণ্ডের উপর নানারূপ বিচিত্র কারুকার্য করিতেন। গৃহের সমস্ত কাজ করিয়াও তাঁহাদের মনে যে আনন্দ ও ভালবাসা ছিল তাহার নানা ভাবে অভিব্যক্তি হইত। মিছরি ও চিনির মঠ, পুতুল প্রভৃতির কথা আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, এখনও গ্রামদেশে তাহা প্রস্তুত হয়, কিন্তু পূর্বে যাহা হইত তাহার তুলনায় এগুলি অতি নগণ্য। পূর্বে যে মিছরির মঠ হইত, তাহা দশ হাত উঁচু, এখনও ফরিদপুর নালিয়া গ্রামে কালাচাঁদ কুণ্ড নামক এক ব্যক্তি ঐরূপ মঠ তৈরি করিতে পারে, অত বড় মিছরির মঠ নানারূপ সুন্দর কারুকার্যখচিত, দেশান্তরে লইয়া যাওয়া কঠিন এজন্য আমি ৭৮ হাত উঁচু একখানি আনাইয়াছিলাম। ভয়ানক বৃষ্টির ছাট লাগিয়া কারুকার্য কতকটা গলিয়া গিয়াছিল এবং সেই উহা সম্পূর্ণরূপ গলিয়া গেলে আমরা প্রায় ২৫ জন লোক উহা মুড়ি দিয়া মাথাইয়া সদ্ব্যবহার করি। মঠের চারিদিকে ময়ূর ও পক্ষী প্রভৃতি উৎকীর্ণ থাকে। মঠ ছাড়া এরূপ বাঘ, ভালুক, হাতী,

ঘোড়া, মযরও মিঞার বা চিনি দিয়া প্রস্তুত হইত এখনও পূর্ব্বোক্ত বস্তু পাইলে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে ফরিদপুর জেলায় সাটির নামক গ্রামে এরূপ মাদুর ও পাটী নির্ম্মিত হইত যাহার কারুকার্য্য অতুলনীয় শ্রীহট্টে সেই পাটী কখনও কখনও হাতীর দাঁত দিয়া তৈয়ার হইত তাহা ফোলবার পর পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি সেই পাটীতে অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য সহকারে বুনন হইত একখানি পাটীর মূল্য সেই আমলেও ৫০০৲, এমন কি হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইত এখন সেই কারিগরের বংশে আর কেহ এই কাজ জানে কিনা জানি না এই শীতলপাটী রেশম ছুটি দিয়া একটি মসলিন আর একটি শীতল পাটী আমরা মসলিন প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি কারু আমরা উহার মূল্য ও উপযোগিতা বুঝিতে পারি নাই শীতল পাটী আর বাঙ্গালার 'একবার না পারা' বলিয়া এই কথা বলিয়া থাকি দুঃখের বিষয় আমরা এরূপ 'বলতে' একালের 'চাঁড়কে অস্বাভাবিক কষ্ট করিয়াছি রেশমের অবস্থাও সেইরূপ একদিকে অল্প নহে ভাহা না হইলে এদেশ এত দিনে শূন্যপ্রধান হইয়া যাইত আমরা ময়মনসিংহ জেলায় একখানি পাটীর মূল্যলাভ করিয়াছি উহার মূল্য ১৫০ টাকা এখনকার দিনে কে এরূপ পাটী ক্রয় করিতে পারেন ভুললতা চাঁছিয়া প্রায় সূতার মত সূক্ষ্ম করা হইয়াছে ঐ অবস্থায় ও সৌন্দর্য্য এই পাটীতে দেখা যায় তাহার বহু পূর্ব্বে এমনকার দিনে 'বরণ' শ্রীহট্টের শীতল পাটীতে নানা কারুকার্য্য থাকিত ও নানা রঙের সূতা ব্যবহৃত হইত কোন কোন ক্ষেত্রে নারিকেল ছোবড়ার মুষ্টি, সিন্দুরের বিন্দু থাকিত "বিয়ে" বস্তু যাহা বধূবরণের বিশেষ করিয়া বস্তু 'ছল' ছাড়া বিলাতী ডিজাইন এখন ক্রমশঃ বরণ হইয়া পড়িতেছে চট্টগ্রামের মেয়েরা কলার নূতন পাতাকে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা কতকটা শক্ত করিয়া লন, তাহার উপর কোন নানারূপ ছবি উৎকীর্ণ করিয়া সেই চিত্রলাঞ্ছিত কদলীপত্র দিয়া মুড়ায় বিবাহের পর নূতন আত্মীয়দের বাড়ীতে পান পাঠাইয়া থাকেন, ঐরূপ কদলীপত্র একটা দেখিবার জিনিষ বটে শ্রীহট্ট এবং অপরাপর স্থানে মেয়েদের কপালে সিন্দুরের বা দিয়া চিত্রিত করেন অতি অল্প পরিশ্রম করিলে কপালে যেরূপ সূক্ষ্ম কারিগরী প্রদর্শিত হয় তাহা অতি আশ্চর্য্য বাঙ্গলার নানাস্থানে শিবের মাথা শুধু ফুল লতা পাতার নহে রাধাকৃষ্ণ ও অপর দেবদেবীর মূর্ত্তি খুদিয়া নির্ম্মিত হয় তাহাও বিশেষভাবে প্রশংসনীয় সুতরাং দেখা যায় পূর্ব্বযুগের মেয়েদের প্রত্যেকে এক একটি কলাবিদ্ ছিলেন মেয়েলী শিল্প বাঙ্গলা দেশে এককালে যতটা বিকাশ লাভ করিয়াছিল অন্য কোন দেশে এত দিন ধরিয়া তাহা বিকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না বাঙ্গলার "শিকে" যাহাতে কোটা কাড় হাঁড়ি, জলপাত্র ও পানের বাটা প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখা হয় তাহার মধ্যে নারীহস্তের কমনীয় শিল্প যে কত প্রাচীন রীতির পরিচায়ক তাহা বলিতে পারি না মহাভারতে কলসের উহার উল্লেখ করিয়াছেন (এই পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠা ১১ ছত্র দ্রষ্টব্য)। নারিকেলের মালা দিয়া প্রাচীনকালে নরমুণ্ড প্রস্তুত হইত, সেই যুগে নারিকেলের গাছের উপাদান ছাড়া আর কিছু ব্যবহৃত হইত না মাথার দাড়ি, গোঁপ চুল নারিকেলের ছোবড়ায় তৈরী হইত উহা একটা দেখিবার জিনিষ ছিল

আমার এই পুস্তকে আমি কিন্তুর আমল গৃহস্থের বাড়ীঘরের কথা লিখিলাম পাকা বাড়ীর স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী পুস্তক পাওয়া যাইবে আমি আমাদের দেশের

অজ্ঞাত শিল্পিবর্গ

মন্দিরের কয়েকখানি প্রতিচিত্র দিব উহাতে অতি পুরাকাল হইতে বাঙ্গালা স্থাপত্যের বিশেষত্ব কতকটা দৃষ্ট হইবে দোচালা ঘরের মত মন্দির বাঙ্গালীর সৃষ্টি এই দেশ হইতে তাহা ভারতের সর্বত্র অনুকৃত হইয়াছে

বাঙ্গালী গৃহিণীর হাতে রান্নার যে উন্নতি হইয়াছিল তাহাও অতীব প্রশংসনীয় রন্ধনবিদ্যায় ইঁহাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৃতিত্ব ছিল আমরা সন্দেশের কথা বলিয়াছি। এই

আমিষ ও নিরামিষ রান্না।

সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের স্নেহ, প্রেম ও রুচির অনুনিহিত প্রভাব টের পাওয়া যায় প্রত্যেকটি খাদ্যের মধ্যে তাঁহাদের অসামান্য ধৈর্য্য ও কৌশল দৃষ্ট হয় প্রেম স্নেহ পবিত্রতা স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণায় তাঁহারা এরূপ চারুকলা করিতে পারিতেন এক একখানি ভাল কাঁসা দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

আমিষ রান্না হইতে নিরামিষ রান্নাতেই ইঁহারা বেশী কৃতিত্ব দেখাইতেন নিম্নে কতকগুলি আমিষ ও নিরামিষ রান্নার উল্লেখ সম্বলিত রন্ধনপ্রণালী পাঠকদের অবগতি নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিলাম পাঠক এই অংশগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন এই সকল রান্নার অধিকাংশই অতি অল্পমূল্যের উপকরণ দ্বারা সম্পাদিত হইত, অথচ তাহা এত সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ছিল যে এখনকার রেস্তোরাঁগুলির সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য সম্ভার তাহাদের তুলনায় হীনবীর্য্য স্বাস্থ্য ও সুরুচির একেবারেই উপযোগী নহে এই সকল রান্না রন্ধনকর্ম্ম কলাবিদ্যার অন্তর্গত ছিল গৃহলক্ষ্মীদের ভালবাসার গুণে তাঁহাদের করস্পর্শ হইতে ইহাদের উদ্ভব আমরা অধুনা নানা কল বিলাতী খাদ্যের অনুকরণের কসরৎ করিতে যাইয়া এই মুখরোচক, স্বাস্থ্যকর ও পবিত্রতাপূর্ণ বিদ্যাটি হারাইতে বসিয়াছি রন্ধনপ্রণালী-পরিচয়ের ৪ ১১৭, ১১৮ ১২১ ২২২ ২৪৫ ৩৩৩, ৪৭৯ এবং ৫০৭, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের সহরগুলির অধিবাসীদের সাহেবদের দেখাদেখি আমরা যেস্তোরাঁ খুলিতেছি তাহাদের একটিও মধ্যেও বেশী বাজার কিছুই পাওয়া যায় না, আমাদের রুচি এমনই বিকৃত হইয়াছে যে এই দেশে এত নোনতা, বোম্বাই, ফজলি আম এবং ভাল ভাল ফল থাকা সত্ত্বেও সেই সকল রেস্তোরাতে তাহার একটিও থাকিবার উপায় নাই যেহেতু সাহেবদের দেশে ঐসকল ফল নাই উহাদের রেস্তোরাঁতে তাঁহারা কোন ফল রাখেন না এমন কি কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর বড় বড় রেস্তোরাতে একখানি ভীমনাগের সন্দেশ বা একটি ডাব পর্য্যন্ত রাখিবার ব্যবস্থা নাই

পারস্যাক্রান্ত অবধি ভারতীয় শিল্পীমণ্ডলী বুদ্ধদেবের প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তিই অঙ্কন করিয়াছিল,

ভাস্কর্য্য।

বড়বোদরের অপূর্ব্ব বৃহন্মূর্ত্তি, যাহাকে হ্যাভেল সাহেব পৃথিবীর সপ্তশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের গৌরব দিয়াছেন, এবং কালীতে ত্রিলোকেশ্বর-মন্দিরে রক্ষিত জটাশঙ্কর-মূর্ত্তি বঙ্গ দেশের রাজসাহী জেলার পাল্লা ভাঙ্গোরের অধীন

বাঙ্গালিপুরে প্রাপ্ত অধুনা সংরক্ষিত সমাধির চিত্রফলকে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তি, ত্রিপুরার চাঁদপুরে প্রাপ্ত স্বর্ণনির্মিত চতুর্মূর্তি কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের ১৫ নং, ৩৪৯ নং ব্রোঞ্জ নির্মিত দেবপাল দেবের রাজত্বকালের একটি বুদ্ধমূর্তি, ঐ রাজার রাজত্বকালে নির্মিত নালন্দায় প্রাপ্ত ধাতব ক্ষুদ্র কুবেরমূর্তি এবং নালন্দার বুদ্ধমূর্তি নালন্দা প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে রক্ষিত প্রস্তরনির্মিত তারামূর্তি, সারনাথ যাদুঘরের উত্তরে গয়া জেলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি অনিরুদ্ধ পুরের প্রসিদ্ধ বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতিতে পাল প্রভাব ও পালের মূর্তিতে বোদ্ধের মাতামাখিত আদর্শ অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা হয়েছে। এই অপূর্ব ভাবধারার অনেকগুলি মূল্যবান চিত্রপঞ্জিত গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই প্রাচীন পুঁথি, পুঁথির পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্রগুলি অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চিত্রগুলির অধিকাংশই আজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেক চিত্রের মূল রঙ ও চিত্রগুলিকে অনাদরের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। আবার কোন কোন চিত্রের অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি আজ হতে চিত্রগুলির অনুকরণ সম্ভব। এই পুঁথি পুঁথির পৃষ্ঠায় অঙ্কিত। ইহার দুখানি পাতার চারি কোণে চারটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। সমস্ত দেহে ভাবের সুকুমারত্ব ও অনেকটা কঠোরতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মাঝখানে যে স্থানে স্বভাবতই মনে হয়েছে ইষ্ট দেবতার স্থান—অবলুপ্ত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা

কিন্তু বাঙ্গালার বীর নীরব সাধনার অধিকক্ষণ কাটল না। বৌদ্ধমূর্তির মূল লক্ষ্য ধ্যানী বুদ্ধ কাল্পনিক এই আদর্শের মধ্যে কিছু কঠোরতা মিশ্রিত হইয়াছে, এই শান্ত সমাধির আদর্শ অনুসরণ করিয়া তন্ত্রের কাছে। ইহাতে শক্তির সম্বোচ্চ ভাব আছে এবং মাঝে মাঝে আনন্দ ও কঠোরতা হয়ে পড়িয়াছে। আমি পালাবাদে শিল্পটি চিত্র দিলাম, একটি সমাধিপ্রাপ্ত ধ্যানিমগ্ন দেহ অত্যন্ত সুন্দরের সঙ্গে একটি রেখামাত্র নাই তাহা স্থির, ধীর, গম্ভীর নিশ্চল—দ্বিতীয়টিতে একটু আনন্দের ছায়া পড়িয়াছে তৃতীয়টিতে কঠোরতার ভাব শেষ রাত্রের কুলের কুঁড়ির মত অস্ফুট।

কিন্তু একাদশ শতাব্দী হইতে যৌনভাব সম্বন্ধে প্রবেশ করিল, এতদিন বৌদ্ধজগতে যৌনভাব অস্বাভাবিক হইয়াছিল, বোধিসত্ত্বের আদর্শের মধ্যে পুরুষ কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক সমাধিশান্তি অপরিহার্য। এই ভাবপ্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াসিদ্ধিমূলক স্থির সমাধির আদর্শ কতকটা টলিল, যোগীর মুখমণ্ডলে আবার সেই স্থির প্রসন্নের চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইলেন সমাজ

হইতে বিচ্ছিন্ন ধ্যানমহিমার মধ্যে যেন লোকের আনাগোনা দেখা ছিল সেখানে চক্রপল্লব ছিল না, সেখানে সমুদ্র হ্রদের ধেয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম মানুষকে একা একা ধ্যান পর হইয়া সমাধিপ্রান্তের পথ দেখাইয়াছিল মানুষ সেখানে আত্মস্থ, আত্মগরিমায় পূর্ণ, নিঃসঙ্গ—একা মনুষ্যসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধের একমাত্র সম্বন্ধ ছিল করুণার. প্রীতির বন্ধন, স্নেহ ভালবাসা বৌদ্ধধর্ম প্রথম যুগে অস্বীকার করিয়াছিল শৈবধর্মও প্রথম যুগে "সোঽহম্" এর যে সুর তুলিয়াছিল তাহার আত্মমহিমায় পূর্ণ, বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ শিব "অর্দ্ধনারীশ্বর" হইলেন একা তিনি অপূর্ণ, যুগলের পূর্ণতা একক লব্ধ হয় না। নরনারীর দৈনন্দিন—আধ্যাত্মিক জগতটা বুকের মধ্যে টানিয়া আনা. অপরাপর দেশে আধ্যাত্মিকতা একটা আদর্শকে ঘিরিয়াছে —স্বর্গের পথ অনধিগম্য আদর্শের সঙ্গে এই ব্যবধান বাঙ্গালী রাখিতে চাহে না সুতরাং যখন শ্রী স্বীকৃত হইলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে পুত্র, কন্যা জায়া, জননী সকলেরই সঙ্গে পুনরায় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল ভিক্ষুর চক্ষে এ সকল আত্মস্থ জনকে কিন্তুতকিমাকার ছিল, সে এই সম্বন্ধগুলি যথাসাধ্য এড়াইয়া আত্মস্থ হইতে চেষ্টা পাইত কিন্তু এবার শিবের বৃহৎ পরিবার অধ্যাত্ম-জগতে আসন গাড়িয়া বসিল কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী লইয়া চতুশ্চক্র গঠিত হইল তাহাতে নন্দী, ভৃঙ্গী, গণেশ কিংবা ময়ূর ও মূষিক পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই শিব এই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা, কিন্তু তাঁহার অনাসক্ত উদাস ভাবে ভিক্ষুর কামনা-জয় তাঁহাকে এখনও ছাড়ে নাই, তিনি এক মুহূর্ত্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে বসিয়া আহার বিহার করেন ভাঙ্গড়ীর সহিত মাতামাতি বিবাহ করেন পর মুহূর্ত্তে তিনি জটাজুট পরিয়া গায়ে চিতার ভস্ম মাখিয়া কোথায় চলিয়া যান কে জানে? ভিক্ষুর ভাব ও পরবর্ত্তী গার্হস্থ্য বৈষ্ণব ভাব ইহাদের সমন্বয়ের শিবের আসন একদিকে যেমন তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর অপর দিকে তেমনই তিনি যোগীশ্বর একদিকে সোণার আড়া কঙ্কণ কটিসূত্র কর্ণে মণিকুণ্ডল দুলিতেছে বেণীবদ্ধ কেশের লহরী স্বর্ণসূত্র ও চন্দ্রকলায় সজ্জিত, গলে মণি লহরীতে বুকের হার দুলিতেছে, শিরের একার্দ্ধ মণিখচিত মুকুট, অপরার্দ্ধে পরম বাঘছাল অঙ্গ ভস্মমাখা, কণ্ঠে নর-কপালের মালা, কর্ণে বিকট ধুতুর পুষ্প, শিরে জটাজুট বিরিয়া সর্প ফোঁস ফোঁস করিতেছে এবং ডমরুর গম্ভীর গর্জ্জন জটার লহরে লহরে শোনা যাইতেছে এই অর্দ্ধাংশ অর্দ্ধ তাপস মূর্ত্তির নাম অর্দ্ধনারীশ্বর অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ নারী, গার্হস্থ্য প্রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে তাপ্তিক তাপসের অঙ্গে মিলিয়া রহিয়াছে, শিব বুকের মত জগতের ঊর্দ্ধে নহেন, তিনি জগতের কাছে ধরা দিয়াছেন অথচ ধরা দেন নাই—ইহাই বঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল প্রতীক পরে সেনদের রাজত্বকালে ভাস্করের বাটালি ও চিত্রকরের তুলি—নরচিত্তের ভালবাসা গড়িতে ও আঁকিতে সুরু করিয়াছিল আমাদের পক্ষে শিব-গৌরীর প্রস্তরমূর্ত্তির ভগ্নাংশের লক্ষ্য করুন, শিবের চক্ষু ও করাঙ্গুলীতে কত স্নেহ ও মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে বৌদ্ধ চিত্র, ভাস্কর্য্য ও জীবনে এই ভাবটি ছিল না সুতরাং ভাস্কর ও চিত্রকর এই নূতন ভাবের

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ভাবের মধ্যবর্ত্তী শৈবভাব।

অনুপ্রাণনায় তাঁহাদের সাজসরঞ্জাম তদনুযায়ী করিয়া তৈরি করিতেছিল এমন সময়ে মূর্তি-ধ্বংসকারী দল দেখা দিলেন, চিত্রকরের তুলি ও ভাস্করের বাটালি হস্তচ্যুত হইল সুতরাং বোদ্ধ ধর্মের ভাব সেরূপ চিত্রে, শিলা বা ধাতব বিগ্রহে এক অনাবৃত অনিন্দ্যসুন্দর লক্ষ্যকে দৃঢ়তর তপস্যা দ্বারা করতলগত করিয়াছিল, প্রেমের অক্ষয় ও অমর আত্মার অনাত্মতত্ত্ব তেমন করিয়া চিত্রপটে বা ভাস্কর্যে ফুটিতে পারে নাই অত্যাচারীদের প্রলয়কর চেষ্টায় ছায়াময় বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইল লক্ষ্মণসেনের পরে ভাস্করের অতুলনীয় বিপণির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল গত সাত শত বৎসরে একখানিও উৎকৃষ্ট শিলামূর্তি এদেশে গড়া হয় নাই ইতিহাসকারেরা বলেন, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ভাস্কর নবীন ষোড়শ শতাব্দীতে পাথরের কেবল তৈরি করিতেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই লিঙ্গমূর্তি, যাহা অত্যাচারীরা ভাঙিবে না সে সকল তুচ্ছ চিত্র যদি তাহাদের স্বর্গবিস্মৃতির কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই তবে তাহাদের একখানিও কি আর স্বর্গকার গড়িতে উৎসাহ পাইত না অত্যাচার অনেক সময়ে দুই ভাবে চলিয়াছে — একদিকে যে মানুষ কাহার ধনপ্রাণ লুটিয়া লইতেছে আর একদিকে যে সুন্দরকে সৃষ্টি করিতেছে তাহার সংবাদ দিবার জন্য "সিদ্ধুকা" নামক গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল এবং অনেকে যে কারণে দণ্ডিত হইতেছেন বা আছেন তাহারও খবর তাহাদের জন্য গুপ্তচর সর্বত্র আলোচনা করিত এ অবস্থায় সেখানকার বিদ্যার আর কে চর্চা করিবে? বড় জোর অতি ক্ষুদ্রাকার দুই ধাতুর মূর্তি গড়িতে দুই এক জন শিল্পী চেষ্টা পাইত কৃষ্ণের মাটির মূর্তি গড়িয়া অনেকে পূজা করিত কিন্তু তাহা তিন দিন পরে নদীতে ডুবাইত কিন্তু ইহার উপর কি কাব্য, কিছু সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের কারুকার্য প্রচলন করিতে উৎসাহ পাইত? কিন্তু অন্ধকূপ অত্যাচার তপস্যা সেই তপস্যায় ক্ষমাবতার বুদ্ধদেবের অনুরাগ, অহিংসা অমলাবতার শিল্পের বিষয় হইল কোনকালে কয়ে ভয়ে মূর্তি গড়িয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্বক তাহা কাল বিসর্জন দিতে পারিলে মন রক্ষা হইত এইখানে কি শিল্পের কার্যের প্রতি ইহার কোন অনুরাগ বা শ্রদ্ধা হইতে পারে? বাঙ্গলার বৌদ্ধপাল ও হিন্দুসেনের বংশধরগণ তুলি ও বাটালি ফেলিয়া লাঙ্গল ধরিল

কিন্তু শৈব ধর্মের প্রভাবে যে মন লীলা প্রকটিত হইয়াছে তাহা চারুশাসনের ছায়ায় থাকা হইয়াছে তাহার ভাষা এই ভাবের, "গৌরীর স্তনযুগ্মের প্রতি শিবের তৃতীয় নেত্রের আলো পড়াতে ব্রীড়ান্বিতা গৌরী অবগুণ্ঠন টানিয়া সমস্ত আবরণ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন, তদ্দর্শনে যে শিব মন্দ মন্দ হাসিয়া পত্নীর এই সলজ্জ ভাব উপভোগ করিতেছেন সেই শিব আমাদের কল্যাণ করুন" শিবলীলা এখানে দেবী কৃষ্ণলীলার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। শৈব সাহিত্য হইতে আমরা দেখাইব যে গঙ্গাকে যেমন ভগীরথ শিবের জটার উৎকলন হইতে ভূতলে আনিয়াছিলেন, এই শৈব ধর্মও সেইরূপ বোদ্ধ সমাধির সমুচ্চ রাজ্য হইতে সৈকত-প্রেমকে বঙ্গদেশে লইয়া আসিয়াছিল একদিকে চারুশাসনে চতুর্গোপীর নানা ভঙ্গীতে নানা লীলাঙ্কিত কামকলা, অপর দিকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর লীলা-বিলাস একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে যুগল মূর্তির বিশেষত্ব হইল বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে (একাদশ শতাব্দী) "বক্ষোঽংশুকাহরণ

সাম্বপঞ্চাশিকায়োদ্ভিন্নালাক্ষাকৃষ্টকেতকীকুসুমপ্রসাধনঃ," ভট্টমেঘের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে "গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা অবতীর্ণোঽয়ম্," (১৩৫-১৩৬ খৃঃ)। ১১৬৩ খৃঃ অব্দে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে "দর্ভৈঃ প্রান্তরবেদি নন্দনবনস্পর্দ্ধিনঃ কল্পয়ন্নিলো বাড়ি ব্যস্তকরঃ প্রশান্তি কুতুকেনালেখ্য কোতুহলী" তাংকালিক রাজা ভীম ও মাতুলানী সহ বরেন্দ্রীর রাজা ঈশ্বরপালের রাজসভায় বন্দনার শ্লোক উচ্চারণের পরে খড়্গের আঘাতে আসামের রাজা ঈশ্বরপালের শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া ক্রীড়ার জন্য উপলক্ষে তাঁহার স্ত্রী। "শিব, তোমার সর্বস্ব অপহরণ করিতে পারি, শশিকলা প্রভৃতি আমি ছিনিয়াছি কিন্তু সমস্তই আমি ফিরাইয়া দিলাম কেবল গঙ্গা আমার তব মাথায় চিরকাল হইয়া থাকিবে।" এ সমস্তই যৌন লীলার অতিরঞ্জিত মূল সূচনা করিতেছে শেষোক্ত পদের রহস্যটি খেলায় পরাস্ত শিবমূর্তিকে অতি উপাদেয় ও রুচিকর করিয়া পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের বাজি রাখিয়া খেলার মূলের আভাস ঘোষণা করিতেছে—"জিনিলে তোমারে লব মোহন মুরলী, হারিলে তোমারে দিব বেশর কাঁচুলী।"

শেষ সমাসের ভাস্কর্য বৌদ্ধ মূর্তির সহিত ও যৌনতত্ত্বে পাওয়া যায় না দেহের অঙ্গের তলায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং প্রস্তরের সাধনা ভঙ্গ করিয়া সুরু হয় নাই সুতরাং পূর্ণ মূর্তির তাপালঙ্ক উদ্ধার এবং বিশদভাবে দেখাপড়া লাক্ষণা মূর্তির দিয়ে নাই এই অভাব পূরণ করিয়াছে অলঙ্কারবাহুল্য মস্তক ভাবের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে শিল্পী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারিগরী লইয়া ব্যস্ত হইতে পারিতেন না অলঙ্কারের বাহুল্য ইহার পরে পরে যারা লাক্ষণা মূর্তির দিয়ে শিল্প কারিগরী লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন তথাপি ক্রমশঃ যে গাঢ়ইয়া প্রেমের বিশেষ ভাবটির ভাষা সমাজে প্রবেশ করিয়াছে তাহা তরঙ্গোদ্বী এবং বাসুদেবের মূর্তির পরিকল্পনায় ধরিতে পারা যায় পূর্ব মূর্তির একখানি বাসুদেবের মূর্তি ও লক্ষ্মণসেনের সময়কার বাসুদেব দুইটির চিত্র এখানে দেওয়া হইতেছে, প্রথমটিতে বৌদ্ধ শান্তির মধ্যে আনন্দের রেখাপাত মাত্র, এখানি মূর্তির অষ্টম শতাব্দীর, দ্বিতীয়খানি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের, ইহাতে অলঙ্কারবাহুল্য সর্বাগ্রে চোখে পড়ে প্রথমখানি একটা উচ্চ রাজ্যের সংবাদ দিতেছে, কিন্তু দ্বিতীয়খানি মাধুর্যের কমনীয়তা ও সৌকুমার্য মাখা "ইহার অরুণ নয়নে তেমন চাহনী" এবং ওষ্ঠের মাধুর্য ও অনুপম হাসি লাস্যতা ও যৌন ভাবের পরিচয় দিতেছে। যদি এই শিল্প আর একটু অগ্রসর হইতে পারিত, তবে বোধ হয় এই অলঙ্কার-বাহুল্য থাকিত না, গৌড়ের অনাগত প্রেমের আদর্শ চিত্রকর তুলিতে আঁকিতে পারিতেন চণ্ডীদাসের মত নিরাভরণ, প্রেম-সর্বস্ব, অগদ্‌বিস্মৃত অনুরাগ তাহা হইলে যেরূপ সাহিত্যে সেইরূপ শিল্পেও হয়ত আমরা পাইতাম কিন্তু শিল্পজগতে বুদ্ধ বড় হইয়া রহিলেন, কৃষ্ণ ততটা ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিলেন না।

কিন্তু তাই বলিয়া যে লক্ষ্মণসেনের সময়ে চিত্রের মহিমান্বিত আদর্শ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল তাহা নহে সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধগয়ার মূর্তির প্রশংসা করিতে যাইয়া সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় সত্যের মত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন —

"এ মূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন, এরূপ অতুলনীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পাষাণময়ী দেবী মূর্ত্তি ভারতের কুত্রাপি আছে কিনা সন্দেহ স্থল। শিল্পী এ মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে যে অপূর্ব্ব করুণা ফুটাইয়া ভিক্ষুকদের চক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সত্যই হৃদয়গ্রাহী। পূজা করিবার সময় দেবীর মূর্ত্তির বদন মণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে একটী স্বর্ণীয় জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া থাকে ইহা সকলে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। চিত্রপটে বর্ণবিন্যাস দ্বারা ইহা প্রদর্শিত করা হয়, পাষাণের উপর অয়স্কান্ত পাষাণের সংযোগে সে ভাব অভিব্যক্ত করা অতীব দুরূহ কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিল্পী সাধকের মত সে কার্য্যেও সিদ্ধ হইয়াছেন।" (ঢাকার পুরাতত্ত্ব ইতিহাস প্রথম ভাগ ১১৮ পৃ.)।

মাতিরা যখন বৌদ্ধ যুগের সমস্ত নিদর্শনকে চির অন্ধকারের গর্ভে চিরতরে নিমগ্ন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা প্রদর্শন করিতেছিল, তখন ঈশানচন্দ্র নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া এই অমূল্য রত্নটী রক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশান নামক এক কুকুরের সাহায্যে তাঁহার কুটীরস্থিত বিশাল শিলা খণ্ড নিম্নে ফেলিয়া দিয়া ইহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিবার জন্য দুর্বৃত্তেরা যে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। ঈশান যখন কুকুর সহ কুটীরের বাহিরে আসিয়াছিলেন তখন মাতিরা ও তাহার অনুচরবর্গ ঈশানের কুটীর ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশান মাতিরার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন।

ঈশানের হাতে শিবমূর্ত্তি।

ঈশানের হাতে যে শিবমূর্ত্তি দেখা যায় তাহা ঈশানের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছিল। ঈশানের পূর্ব্বপুরুষগণ কোথা হইতে এই শিবমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। ঈশানের নিকট হইতে এই শিবমূর্ত্তিটী লইয়া ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। ঈশানের নিকট হইতে এই শিবমূর্ত্তিটী লইয়া ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এই শিবমন্দিরগুলির পাষাণফলকগুলি প্রায় পঞ্চদশশতাব্দীর সমকালবর্ত্তী। তখনও বঙ্গের গ্রাম্য কলাবিদ্যার অধঃপতন হয় নাই। শিল্পের দুই কৃষি-সম্বন্ধে যে সকল মতের নাম পাওয়া যাইতেছে তাহার অনেকগুলিই এখনকার চাষাদের আবাদের। সে সকল ইক্ষুচক্রসমূহ বাকচক্রবর্ত্তী নদী চাষাদের পরিচালিত সিমাহাসের জন্য শস্য শত কুরক উৎপন্ন করিতে হয় তাহার প্রস্তুত করিবার যন্ত্র গুলোপাল লাঙ্গল ঘাটের এবং বাঙ্গলার পল্লীতে যখন কৃষকগণ ধান্যের মাপন করিতেছে তখন তাহার তুলনা করিত। শিবমন্দিরে কতকগুলি নামের নাম আছে যাহার অর্থ বুঝাইতে পারে এমন লোক এখন বিরল। হরিণাক্ষর ছাগীপাতর হরেণুকি ছাগীক্ষর চৌকি চতুরশুঁড়া ক্ষোম কাপ্ত কেলেকৌমা, স্বাদিয়া, কার্পিকা কনকচ্ছা কর্পটকুল কালোকরঙ্গী কার্পিসী কটকী কুসুমমালী, কনক-চূড় তুলরাজ চূর্ণিচোগ পরদেশ ধূসর কৃষ্ণমালী কুমারযোগ কুমারপূর্ণিমা, কল্পীলতা, কনকলতা, কাঞ্চনগরিমা, খেজুরপুষী বাহুরমালী ক্ষেম সন্তাজন গয়াবলী, গয়াযোগ, গৌড়ী কাঞ্চন, গন্ধমালতী গুলাবুষী গুলাকর চামরঢালী চন্দনমালী ছত্রমালী, জটামালী, জগন্নাথযোগ জামাইলাড়ু তলাসঙ্গী তৈলকলাযোগ ত্রিশূলমালী থলাইযোগ, থুক্কা, নিমুই, নন্দনমালী নৃপলাঞ্ছন বাহাদুরযোগ, পাহাড়ের পিপীলিকা, পিতলাগরী, পাকমালী, পাকইবুমালী পাতুরঙ্গী, পাকচূড়, বৃদ্ধামাত্রা বায়মালী বন্ধী, বজ্রাঘাতে বামগড়, বজ্রঘ, লক্ষ্মীবিলাস লাউমালী লক্ষ্মী কাঞ্চন স্বর্ণমীযোগ, ভোজনা, ভুবন-উজ্জ্বল সীতামালী, শঙ্করমালী শঙ্করজটা, এই সকল বাক্য শিব ও তাঁহার ক্ষেত্রে ভীমের মাহাত্ম্য জ্ঞাপাইয়াছিলেন।

কিন্তু এই সকল নামেই শেষ নহে। কবি লিখিয়াছেন "কত নাম কব তার কহিতে কিছিং"। বাঙ্গলা ভূমি অন্নপূর্ণা বলিয়া আমরা গান করিয়াছি। কিন্তু কত শত শেষ বহু তপস্যা-লব্ধ ধান্যের প্রকারভেদ আমরা হারাইয়াছি। কৃষকেরা ক্ষেত্র এখনও কি কি ফসল উৎপন্ন করে যাহা লিখিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার এবং যাহা বিলোপের পথে তাহা রক্ষা করা সম্বন্ধে আমরা কিছু ভাবিনা, কিছুই করি না। শুধু ধান্য নহে বিভিন্ন ঋতুতে নানারূপ সুস্বাদু ফলের চাষ গ্রামের কৃষকেরা আনীত হইয়া বঙ্গীয় বাগানের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ "চিকন কাঁঠাল" কলা নিশ্চয়ই কোন দূর দেশ হইতে বাঙ্গলায় আনীত হইয়াছে, সমর দেশ হইতে সুপ্রসিদ্ধ "সবরী" কলার আবির্ভাব, এক সময়ে কার্পের রাজধানী অঞ্চলের হইতে মূল ফল বঙ্গদেশে আমদানী হইয়াছে। "চালা কলা ও চালা মূল" আমরা এইভাবে পাইয়াছি, "সাত রাই চম্পা" প্রভৃতি বাঙ্গলা ছড়ার উপরও চম্পক নগর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিক্রমপুরের "মোহন ভোগ" কলাও সেন কি পাল রাজারা আমাদের কোন দূর দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। আবার ইহা হইতে খুব সুপরিচিত যুগে "জবা" ফুল আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কবির প্রাচীন সংস্কৃত কবা মূলের নাম এই শোকাকে "জবাকুসুমসঙ্কাশং" প্রভৃতি শ্লোকের উৎপত্তি। জবার প্রায় একরূপ লাল ফুল এ দেশে ছিল, তাহাকে 'ওড় ফুল' বলিত, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে ওড় ফুলের উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিতে পাই।

কৃষক বেশে শিব ঠাকুর একেবারে পাড়াগাঁয়ের চাষাদের কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গ হইলেন। বাঙ্গালী যেরূপ তাঁহার দেবতাকে আপনার করিয়া লইতে পারে, এরূপ আর কোন জাতি পারে না। বস্তুতঃ এই সকল দেবলীলার মধ্যে কেবল ভক্তেরা দেখিবেন কিন্তু দেবতার সুখ দুঃখের অংশীদার হইয়া তাঁহার প্রতি অন্তরঙ্গ ভক্তের উপায় এক মাত্র এই যে, তাঁহাকে আমার মত করিয়া লওয়া। কিন্তু তাই বলিয়া কি শিবের গূঢ় মহিমা চাষাদের অজ্ঞাত? তাহাদের গানের অবকাশে মাঝে মাঝে এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যায় যে তাহারা দেবাদিদেব মহাদেবের আধ্যাত্মিক ভাব ও শৈব তত্ত্বের তত্ত্বকথা সম্যক্ অবগত ছিল। এক চাষা-কবিকৃত আগমনী গানে মেনকা রাণী শিবঠাকুরকে খুব জামাই করিয়া রাখিতে চাহিতেছেন "আমার শিবের অনেক দোষ কিন্তু একটা বিল্বপত্র দিলেই সে পরম সুখী তাহাকে কৈলাসে রাখিলে বংসরান্তে এই উমা-বিরহ আমাকে সহ্য করিতে হইবে না।" এই গান লিখিয়া কবি উপসংহারে বলিতেছেন "রাণী, তুমি পাগল, কুবেরের ঐশ্বর্য্য দিয়া যিনি যত্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ভোলানাথ দিগম্বর, দেবাদিদেব অনাসক্ত যোগী শ্মশানের চিতা ও ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য যাহার চক্ষে এক, যাঁহার নিকট চন্দন ও ভস্মের পার্থক্য নাই সেই শিবকে তুমি "বশ জামাই" করিয়া রাখিতে চাহিতেছ, তুমি পাগল।" আশ্চর্য্যের বিষয় শিবের এই মহা অনাসক্ত রূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াও চাষা-কবি তাঁহাকে একজন চাষার মতই আঁকিয়াছে এবং তাঁহার

কৃষকবেশী শিব।

[illegible]

কিন্তু দরিদ্রের ঘরে মেয়েটি দিয়া তাঁহার মনে সর্ব্বদা ক্লেশের কষ্ট বিঁধিয়া থাকে একদিন গদ্গদ কণ্ঠে স্বামীকে তিনি বলিতেছেন—"তুমি যে ভিখিরাজ, কাছে আমার সত্য কথা, সে কথা শেলসম আছে আমার হৃদয়ে গাঁথা। আমার জয়ার নাকি ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, তবে অতি ক্ষুধার্ত্তিক সোণার কার্ত্তিক ধূলায় পড়ে লুটায়।" এত সাধের উমার ছেলেরা না খাইয়া থাকে, এই দুঃখ মেনকা কিরূপে সহ্য করিবেন? এই জন্য তিনি শিবকে ঘর জামাই করিতে চাহিতেছিলেন "আমি জামাতা সহিতে, আনিব চুহিতে, গিরিপুরে করব শিবস্থাপনা। ঘর জামাই করি বাখব কৃত্তিবাস গিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস। করগোরীরূপ দেখব বারমাস, বরসন্ন্যাসে আনতে যেতে হবে না।" শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মের এই যে চিত্র তাহা লক্ষ্মণসেনের পরবর্ত্তী কালের বঙ্গ সমাজের চিত্র যদিও বহুকাল পরে কবিরা এই করুণ সুরে গাহিয়াছেন কোলিন্য প্রথায় দেশের সমাজ কুলীন হইলেন রাঘা,—তিনি অন্ধ, খঞ্জ, অশীতিপর অনশন ক্লিষ্ট বৃদ্ধ। উহাতে শুধু কৌলিন্য গর্ব্বে সমাজের মেয়েদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতেন। ধনকুবেরগণ এমন কি রাজগণ যদি ভাল বড় কুলীন পাইতেন তবে শত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার গলায় কন্যাটি ঝুলাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না কিন্তু সমাজ যাহাকে বড় করে, অন্তর্যামী সকল সময় তাহা অনুমোদন করেন না এবং সমাজের অশেষ প্রশংসিত কুলীনগণ অনেক অবরোধগৃহে অবলা মেয়েদের শত শত কান্নার লেশমাত্র হ্রাস হয় না এই সকল চিত্র বাঙ্গালী মনের অন্তঃপুরের বাঙ্গালী হৃদয়ের চিত্র আমরা কৃষিরাপায়ে শিব ঠাকুরকে চাষাদের দেবতারূপে দেখিয়াছি, এখানে তিনি কুলীন সমাজের একজন এই দুই খানি ছবিই বাস্তব আমাদের গৃহ বাঙ্গলার বাঙ্গালীর জননীর হৃদয়ের আবেদন এজন্য উহা হৃদয়কে এরূপ করুণ ভাবে ছুঁইত কৃষক ও কুলীন ব্রাহ্মণ— এই দুই ছাঁচে গঠিত হইয়া শিব এ দেশবাসীর হৃদয় বলে করিয়াছেন কিন্তু পল্লী গীতে দেবাদিদেবের কোথাও গৌরবচ্যুতি হয় নাই

এখানে শিব ঠাকুর সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বোধহয় জীবজগতের প্রতি অশেষ করুণাপরবশ হইয়া শাক্য ও মনুষ্যসমাজের মধ্যে পীড়িত ও আর্ত্তের জন্য অনেক চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন তাঁহার উচ্চ আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুর ধর্ম্ম সংসারের উর্দ্ধে তাহাতে অনুরাগ ও স্নেহের অবকাশ নাই শৈব ধর্ম্ম আসিয়া মানুষের হৃদয়ের কোমল ভাবগুলির উপর জোর দিল বৌদ্ধ ধর্ম্মে কঠোরজ্ঞান ছিল, কথায় কথায় নিচার ছিল কিন্তু শৈব ধর্ম্ম অনুরাগের রাগে রাঙ্গিয়া উঠিল ধর্ম্মের মন্দিরে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা এ সকলেরই স্থান ছিল বামাগণ এই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিল, কিন্তু শৈব ধর্ম্ম সেই বীজ অঙ্কুরিত ও অধ্যাত্মমহিমমণ্ডিত করিয়া দেখাইল ভিক্ষুর ধর্ম্ম সংসারকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, শৈবধর্ম্ম মানুষের দৃষ্টি উর্দ্ধ দিক্ হইতে ফিরাইয়া মাটীর দিকে ন্যস্ত করিল শৈব বলিলেন—গৃহধর্ম্মিণী না হইলে ধর্ম্মকর্ম্মা হয় না, শিব কৈলাস পর্ব্বতে বসিয়া গৌরীকে আগম নিগমের তত্ত্ব শুনাইতেছেন, এদিকে সামাজিকগণ ও চাষারা শিবপ্রসঙ্গে গাইস্থ্যের খুঁটিনাটির উপরও অনুরাগের রং ফলাইয়া শিবকে আপনার

স্থগন করিয়া লইল। তিনি আর বুদ্ধের মত খানী হইয়া বসিয়া থাকেন না। তখনও ভারতের আকাশ হইতে বৌদ্ধ সমাধির শেষ রেখা বিলীন হয় নাই, এই জন্য শিব-সমাধির কতকটা স্থানে পূর্ব্ব ধর্ম্মের অনুযায়ী রহিয়া গেল কিন্তু জনসাধারণ শিবকে একেবারে তাঁহাদের স্বগন ও পরিবারভুক্ত করিয়া রাখিল। বাঙ্গালী কখনও তাহার দেবতার জন্য বাড়ীর বাহিরে মন্দির নির্ম্মাণ করেন না, তাঁহার গৃহদেবতা যেমন পুত্র কন্যা, স্ত্রী, মাতা—তেমনই বা ততোধিক একজন। তথাপি চারা চিত্রকর মাঝে মাঝে তাঁহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন কে বলিবে ধ্যান-গৌরবে তিনি বুদ্ধ অপেক্ষা ন্যূন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৌরধর্ম্ম—বাঙ্গলার ধর্ম্মের উপর তামিল প্রভাব

এই যে সংসারের প্রতি ওদাসীন্যের চূড়ান্ত কাটিয়া বঙ্গাকাশে অনুরাগের অরুণালোক দেখা দিল তাহা শুধু শৈব ধর্ম্ম নয়, তৎকালপ্রচলিত বঙ্গের সৌর ধর্ম্মের শিকড়কলাপেও খাটিয়া গেল। যতগুলি পাচালী ব্রতকথা আছে তাহাতে সূর্য্যের অর্চ্চনার এবং ছোট ছোট মেয়েদের সমুদ্রযাত্রী পিতা ও ভাইদের কুশলের নিরাপদ ভ্রমণের জন্য সূর্য্যের স্তব আছে। আগমনী গানের ন্যায় পাচালী সূর্য্যের ছড়া আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি খুঁটীয় ষোড়শ একাদশ শতাব্দীর। গৌরী যেমন শিবের স্ত্রী তেমনি আর একটি গৌরীকেও সূর্য্যের পত্নীস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। এই বালবধূটীকে লইয়া সূর্য্যঠাকুর নৌকাযোগে শ্বশুরে যাইতেছেন—অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী তাহাকে স্বামিগৃহে ছাড়িয়া দিতে পিতামাতার কত কষ্ট। ছয়টি অতি আদুরী পড়সীরা আসন্ন গৌরীবিরহে রহিয়া রহিয়া কাঁদিতেছেন খেলার সাথি হাতে লইয়া গৌরীও তাই কাঁদিয়া আকুল। অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী অসীম বিপদের সব কথা না বুঝিয়াও যাহার অঙ্ক হইতে তাহাকে যে কাড়িয়া লওয়া হইবে সেই আশঙ্কায় শুষ্ক মুখে মাকে বলিতেছে "মা, তুমি আমাকে এদের হাতে দিও না।" মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন "সভার মধ্যে নিয়াছি টাকা, কেমনে রাখুব তোরে।"

গৌরী নৌকায় চলিতেছেন সুদূরাগত বাদ্যের মাঝে কান্নার সুর তাহার কানে প্রবেশ করায় তাহার আকুলি-ব্যাকুলি হইতেছে সে অতি ব্যগ্র ভাবে মাঝিকে বলিতেছে, "ধীরে ধীরে বাহরে মাঝি ভাই মায়ের কান্দন শুনি।" সেই কান্না বিষাদমাখা, কইলাগেক হইলেও স্নেহমধুর, বাদ্যপ্রকাশে মন্দীভূত সেই কান্নার যেটুকু শুনিবার জন্য গৌরীর কত ব্যগ্রতা।

আরশার মে কা ঝর চলিয়া গিয়াছে অকূল পড়িয়া সৌরী ঠাকুরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—"সূর্য্যঠাকুর আমি তোমার সঙ্গে যাইব আমাকে কে কাপড় কিনিয়া দিবে?" সূর্য্য ঠাকুর বলিতেছেন—"তোমার জন্য নগরে নগরে তোমার জন্য পাড়ী তৈরি করার জন্য কাঁচি বসাইব।" "তাহার চেয়ে আমি যাব, সূর্য্যঠাকুর কে আমাকে খোঁপা দিবে?" "কেন। আমি তোমার চুলের মত লইয়া খোঁপা গড়িবার জন্য নগরে নগরে খোঁপারী বসাইব।" "আমার কে কেশ-সিন্দুর দিবে কে আমার ছোট কাপড় দিবে?" পরম স্নেহে বালিকা-বধূকে বক্ষে রাখিয়া সূর্য্য বলিতেছেন—"আমি সিন্দুর কিনিবার জন্য নগরে নগরে বেনিয়া তৈরির জন্য বহু তেলী এবং ধানের জন্য বহু কাল চাষা বসাইব।"

ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু শান্ত হইল না তাহার মনের সন্দেহটুকু ঠিক বোঝা যেখানে, সেখানটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল এবার কিছু জল সামলাইতে পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আমি সূর্য্য ঠাকুর। কিন্তু আমি তাহাকে মা বলিয়া ডাকিব?" শিশুচরিত্রের একমাত্র সম্বল ও সম্বল মা' ডাক যখন এই বলিয়া গোরী কাঁদিয়া উঠিল তখন সূর্য্যঠাকুর দীর্ঘ দেহের উত্তরীয় দিয়া কন্যা স্নেহে নববধূটীর চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—"কেন। আমার যে মা আছে মা বাঙ্গলার ঘরে।" (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম ভাগ, ১৭১ পৃঃ।)

অপরাপর দেশে সাধারণের মধ্যে দেবচরিত্র লইয়া নানা উপন্যাস আছে অন্যান্য দেশের ঠাকুর দেবী, প্রেত কিংবা এমন কোন বস্তুকে দেখিলে আত্মারাম' শুকাইয়া যায় কিন্তু বাঙ্গালী তার সাধারণ ভাবকে না বুঝিয়াছে তাহাকে পূজা দিতে চায় না মনের সঙ্গে মর্ম্ম না মিলিলে সে অধ্যাত্মসমাজের কোন ঊর্দ্ধতন প্রতিনিধি কিংবা কোন বিশাল রাক্ষস রূপ একটা খাড়া করিয়া তুষ্ট হয় না তাহার একটা কারণ, সই দেবতাদের কথা বলিতে বলিতে তাহারই ঘরের স্নেহের পুতুলগুলিকে মনে পড়ে এই স্নেহপুতুলদের লইয়া খেলা করিতে করিতে তাহারা উচ্চ অধ্যাত্মরাজ্যের সন্ধান পায় বালক যেরূপ শিক্ষকমহাশয়ের উপদেশ লইয়া খেলিতে খেলিতে সত্যকার গণিত খেলার মধ্যে সে তেমনি অধ্যাত্ম উচ্চ তত্ত্বের সন্ধান পায় বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গড়িয়া ধর্ম্মকে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে কি ভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে বর্ণনা করিব এখানে বৌদ্ধ যুগাবসানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ ঘুচিয়া শুকোমল ভাববাশি বাঙ্গালীর হৃদয়ে কি ভাবে উপ্ত হইয়াছিল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি কার্ন (Kern) বলিয়াছেন—এই যে অনুরাগ ও ভক্তির বীজ তাহা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ যুগে বোধগয়াই অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন।

শৈব ধর্ম্ম কি ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বাঙ্গলা করিতেছে, তাহা আর দুই একটি উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইব কর্ণাট প্রদেশে এক সময়ে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল আমরা দেখাইয়াছি (১৯০-৯১ পৃষ্ঠা) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অকুলগ মরণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন আগামবাক্তি তাঁহাদের বাসস্থান প্রায় তিন শত বৎসরব্যাপক ছিল

খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তামিল দেশে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের বিলোপ হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে মাদুরার রাজা জৈনধর্ম্মাবলম্বী হইয়া রাজ্যমধ্যে তাঁহার ধর্ম্মের অত্যন্ত চর্চ্চা করেন। তিনি প্রসিদ্ধ শৈব সন্ন্যাসী সম্বন্দরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া জৈন নেতৃবৃন্দকে রাজসভায় তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। দীর্ঘকালব্যাপী তর্কের ফলে জৈনগণ পরাজিত হয় এবং মাদুরার অধিপতি পুনরায় শৈব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে আট হাজার গোড়া জৈন শূলিতে বধ করা হয়। শৈব সন্ন্যাসী সম্বন্দরের অনেক শিবস্তোত্র আছে, তাহার অনেকগুলির দ্বারা যে বঙ্গীয় শাক্ত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা অনুমিত হয়। অপর স্বামীও সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর লোক, তাঁহার রচিত শৈব সঙ্গীতগুলিও যেন বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সঙ্গীতের পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করিয়া দেয় বলিয়া মনে হয়। একটি শৈব স্তোত্র এইরূপ "হে শিব তুমি আমার কল্পতরু আমার চক্ষের তারা, তুমি আমার অমূল্য রত্ন, তুমি আমার গৃহ আমার জীবন ও আনন্দ তুমি" (Hymns of the Tamil Saivite Saints, p. 40, by F. Kingsbury) এই পদগুলি যেন চণ্ডীদাসের "কানু সে আমার, জাতি কুল মান এ দুটি নয়নের তারা" এবং বিদ্যাপতির "কাহ্নক হৃদয়মনি মোরঙ্গ পুন, নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল, হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার, দেহক সরবস গেহক সার, পাণীক পাখ, মীনক পানি জীবক জীবন হাম তুয়া ঐসনি" প্রভৃতি পদের পূর্ব্বাভাসের মত শোনায়। বাঙ্গলার সঙ্গীতমধ্যস্থিত "যে জন গোবাস ভরে সে জন আমার পাণ" পদটির কতকটা ইঙ্গিত অপর স্বামীর এই স্তোত্রটিতে আছে—"যে শিবকে ভালবাসে সে যদি দুষ্ট হয় পতিত অথবা গোহত্যাকারী হয়, তাহাকেও আমি বুক ভরিয়া দেখিব সে আমার চক্ষু দেবতা" আর একটি স্তোত্র "যখন এ দেহ ত্যাগ করিব তখন আমার স্মরণ কে থাকিবে? হে কর্ণযুগল, তোমরা তাঁহার নামকীর্ত্তন শোন" (৪৫ পৃঃ) বিদ্যাপতির "প্রথমে হঁ হামনাম কক গান, শুনইতে নিকসই কঠিন পরাণ" সঙ্গে মিলাইয়া পড়ুন। অপর স্বামীর "কতকটা জীবন শৈশবে অতিবাহিত হইয়াছে, কতকটা জীবন লাম্পট্যের লীলায় বিগত, আমারে মনে কতটুকু স্থান রাখিয়াছি প্রভু তোমার জন্য" (৬৭ পৃঃ) ঠিক বিদ্যাপতির—"আধ জনম হাম, নিঁদে গোঙায়লুঁ, জরা শিশু কতদিন গেলি। নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতিনু, তোহে ভজবি কোন বেলি" গানটির অনুরূপ। এই তামিল-কবিগণের শৈব সঙ্গীতের ভাব-প্রবণতা আমাদের বাঙ্গলা বৈষ্ণবদিগের কতকটা অনুগ। অপর স্বামীর এই গানটি পড়ুন—"সেই হতভাগা নগর যেখানে ভগবানের মন্দির নাই, যেখানে শ্বেত ভস্ম কোন লোকের কপালে দীপ্তি পায় না যেখানে স্তোত্র পাঠ বা দেবগুণ কীর্ত্তিত হয় না, যেখানে কেহ মৃৎকারপূর্ব্বক শঙ্খ নিনাদিত করে না যেখানে আঙ্গিনার চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হইয়া দেবধ্বজ প্রোথিত হয় না, যেখানে ভোজনের পূর্ব্বে কেহ সপুষ্প নৈবেদ্য দেবোদ্দেশে নিবেদিত করিয়া দেয় না, সে স্থানটাকে আমি নগর

শৈব সন্ন্যাসী ও শাক্ত ধর্ম্মের উপর তামিল-প্রভাব।

অপর স্বামী ও তাঁহার স্তোত্রাবলী।

বলি না—উহা ভীষণ অবধূত " আন্দিক ভাস্করায় । খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী , পদ যথা "তুমি কি আমার অনাহত গাছের মধুচক্র" ১২। পৃঃ , ইহা একই ভাবের দ্যোতক

তামিল শৈব সঙ্গীত শুধু বৈষ্ণব পদের পাক্‌প্রতি নহে, তাহাতে বঙ্গদেশের শাক্ত সঙ্গীতেরও পূর্ব্বাভাস আছে যথা আন্দিক ভাস্করায় পদে "জয় হউক তোমার প্রভু, আমি স্বর্ণাভ সলিলে ডুবিয়া মরিলাম, আমি তোমাকে দেখ দিব না " এই ছত্রটি রামপ্রসাদের সুপ্রসিদ্ধ পদের প্রথম চরণ "দেখ কাক নয় গো মা। আমি স্বর্ণাভ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা" প্রভৃতির অনুরূপ অন্তর স্বামীর পদ—"কেন গঙ্গার অবগাহন করিবার জন্য যাইতেছ ? কেন কাবেরী বা কন্যাকুমারীতীর্থে ঘুরিতেছ তুমি কি জান না রে অবোধ, যে যার উঁহাকে সর্ব্বস্থান হইতে ডাকিতে পারে এক মাত্র সেই মোক্ষের অধিকারী ?" এবং রামপ্রসাদের গানে "কি কাজরে মন গিয়া কাশী, মায়ের পদতলে পড়ে আছে কত কাশী-কাঞ্চী বারাণসী" কি ঠিক একরূপ নহে ?

খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে কিংবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে তামিলদেশীয় শৈব ধর্ম্মের সাধুর মধ্যে যে ভক্তি ও প্রেমের বীজ পাওয়া যায় তাহাই কোন্ সময় উড়িয়া আসিয়া বঙ্গদেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এরূপ কল্পতরুতে পরিণত করিয়াছে, কে বলিবে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার তন্ত্রশাস্ত্র

হিন্দু তন্ত্র পূর্ব্বে কি বৌদ্ধ তন্ত্র পূর্ব্বে, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুর প্রবাদ, বশিষ্ঠ চীনদেশ হইতে তন্ত্রশাস্ত্র লিখিয়া আনেন বৌদ্ধযুগে যে এই তন্ত্র-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধ ইন্দ্রিয়বিজয় ও কামনা-বিলোপকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছিলেন একদল সাধক মনে করিলেন, মনুষ্য সমাজ হইতে দূরে যাইয়া তপশ্চরণ করিলে হৃদয়ের শক্তির পরীক্ষা হয় না। কামনার বস্তুকে সম্মুখে রাখিয়া ইন্দ্রিয়বিজয় করিতে পারিলে প্রকৃত ইন্দ্রিয়বিজয়ী হইতে পারা যায় এই ভাবে পঞ্চ মকারের উৎপত্তি। কিন্তু ইহা কেউটে সাপ লইয়া খেলা চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "যিনি মাকড়সার জাল দিয়া হিমাদ্রিকে আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, কিংবা সাপের মুখে ভেককে নৃত্য করাইয়া তাহাকে অক্ষত দেহে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তিনিই এই পরীক্ষায় জয়ী হইতে পারেন, সুতরাং এ পঞ্চ মকারের পরীক্ষাক্ষমী সাধু খুব অল্প ছিলেন,

অধিকাংশই রমণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভক্ত ও কণ্ঠীধারী হইল। এই ভাবে তাহাকে দূর করিয়া একেবারে নিরুপদ্রব হইবার জন্য কোন কোন তান্ত্রিক তাহার উপর মারণ উচাটনের মধ্যে অভিচারক্রিয়ার আশ্রয় করিতেন। কখন কখন তান্ত্রিকগণ অকৃতকার্য হইলেন। কিন্তু ও হইলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক পুস্তকগুলি ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহারা লোলুপ হইলেন। অনিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি লাভের জন্য যাঁহারা দীর্ঘ সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা পরীক্ষায় একেবারে বিফল হইয়া বা ভয়ে কুল কামিনীর কলঙ্কিত ব্যভিচারবহুল রচনা করিয়া লিখিলেন "পীড়া পীড়া পুনঃ পীড়া পুনঃ, সর্বত্র হইতে ভয় ও পুনঃ পীড়া পুনরুক্তি নহে বিস্তৃতে" কিংবা "স্বল্পবুদ্ধিপরাণাং যজ্ঞঃ ব্যর্থতয়ে সদা" হইবার পর এমন সকল শ্লোক আছে যাহা অত্যন্ত ঘৃণাজনক। বেদান্তীদের এই সকল বাঁধরা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহারা দেশে ঘৃণা সমাজের চক্ষে একান্ত হেয় ও ঘৃণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এক সময়ে এই তান্ত্রিক বাঁধরদের শ্লোক অত্যন্ত আদরের চক্ষে দেখিত। তাই ধর্মসংস্কারের জন্য কিন্তুতের রাজারা লাখের শ্রীক্ষেত্রে তাদের লইয়া যাইবার জন্য একটা আয়োজনও করিয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর হইতে আজ পর্যন্ত তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি ও মন্ত্রের সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র অনেক বাঁধরদ লোকবিশ্বাসিত কার্যে অনুষ্ঠিত হইত। কাজেই প্রতিকূল ও দুষ্ট প্রকার যাগযজ্ঞ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহা দুষ্ট প্রভাব একেবারে সমস্ত প্রেমভাবকে অধিকার করিয়া মুসলমান পাশবৃত্তি আচরণ করিয়াছিল। দুষ্ট পুরোহিতগণের আদেশে পর্বতের পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন কার্য সাধন করিতে পারিতেন, নারীকে 'ছিন্ন' বলিলে তাহার পরাজয় ঘটিত এবং তাঁহারা মৃত্যুভয় বহুদূরে পরস্পর হইতে দূরবর্তী অন্য পর্বতশৃঙ্গগুলিকে মন্ত্র পড়িয়া ভেঙ্গে দিতে পারিতেন। কোন যমকে রাণী মন্ত্রণাদাতা অনুচরের কার্যের কারণ পরস্পরায় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে ঐ সকল কথা হইতে

রাজা 'ছিন্ন' নহে উপায়।

উপলব্ধি হইতে পারে। যমকদের তাড়াইয়া এমন কি দেবতাদের লইয়া গেলেন, যমকের কাল ফুরাইল, রাণী মন্ত্রিমণ্ডলকে ক্রুদ্ধ করিয়া তাহাকে অনুচরের কার্যে সাহায্য করিতে সাহায্য হইয়া চলে গিয়াছিলেন, রাণী পার্শ্বচরদের হইতে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন যমদূত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, যমদূতেরা রাজাকে হত্যা করিলেন। এই ছাড়া পরস্পরের নানা প্রকার রূপান্তর চলিতে লাগিল। যমদূত ঘোর পাপে হইয়া পলাইতেছিল, রাণী রাজ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সর্বশেষে ঘোরা যম বৈষ্ণব সাজিয়া ভেকধারীদের মধ্যে যাইয়া বসিলেন, রাণী মোহাচ্ছন্ন হইয়া সেই ছদ্মবেশী বৈষ্ণবের টিকির উপর বসিয়া মস্তকে চল কুটাইয়া লইলেন। সহজিয়াদের পরিচয় এই ছাড়া আর পুস্তক মার্গবিনিকন নামক গ্রন্থের চতুর্থ ভাগে টীকাকার ৺ শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় এই উপাখ্যানটি আছে "গুইনিপাদের পলায়নের সংবাদ কার্ণিড়াদেবের নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহাকে অনুসরণ করিলেন। গুইনিপাদ অবগোস হইয়া ত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইলে, কার্ণিড়াদেবের সাক্ষাৎ হইয়া তৎপশ্চাদ্বর্তী হইল। গুইনিপাদ

মৎস্য হইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে শুক্ল পক্ষনিকোটি হইয়া মৎস্যের পিছু পিছু চলিল শুইনিবাচ পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেলেন কার্ত্তিকেয়ের বাঘ হইয়া অনুসরণ করিল উপায়ান্তর না দেখিয়া শুইনিবাচ একটা গোলার নিকট যাইয়া যবের স্তূপের মধ্যে একটি যবের দানা হইয়া মিশিয়া গেলেন কিন্তু কার্ত্তিকেয়ের একটা কুক্ষ কুকুটী সাজিয়া যবের প্রত্যেকটি দানা খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিল " দুর্গা হইতে পুত্রগণ কর্তৃক হেমপেরিডিস্ উদ্যানের তিনটি স্বর্ণের আপেল হরণের মূলে নিহিত আছে এই দেশের রাজার তিন কন্যা ছিল, তাহারা তন্ত্রমন্ত্র জানিত তাহারা মদুবলে ভেড়া হইয়া বজ্রকলধারী তিন রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল " কিন্তু রাজকুমারেরা রূপ পরিবর্তন করিয়া সাধকরূপ ধারণ করিয়া সাগরে ডুবিয়া গেলেন (কেল্টিক মিথ এত নিকেতন চালস স্কাবর্ণ ৯৯ পৃ. আমাদের পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় রাজকুমারকে হরিণ করিয়া রাখা, বলক্ষয়ে কোন বাজার চক্ষে মন্ত্রপূত ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহার সৈন্য সামন্তকে একেবারে অন্ধ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি অনেক উপাখ্যান বর্ণিত আছে, ধর্ম্মমঙ্গল কালকেতুকে ইন্দ্র চক্রের অক্ষৌহিণীকে নিহত করিয়া ফেলা, কুঁড়ুবাসী ব্যাধরূপে মহাদেবের কর্তৃক বাণ-সৈন্যকে চতুশ্চেতন করা প্রভৃতি তান্ত্রিক প্রভাবের কাহিনী পাওয়া যায়।

কিন্তু এগুলি যে নিছক বৌদ্ধতন্ত্রের ফলশ্রুতি তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? কামরূপ-কামাখ্যার বহু প্রাচীন দেবীর মন্দিরে তন্ত্রের গুপ্ত সাধনের শিক্ষা দেওয়া হইত,—তথাকার মেয়েরা পুরুষের চুলে মন্ত্রপূত ক্ষুদ্র কিছু ফেলিয়া দিলে পুরুষ ভেড়া হইয়া যাইত এই প্রবাদ এদেশে বহুদিন এতটা প্রচলিত ছিল যে আমাদের পটুয়ারা তাহা লইয়া ছবি আঁকিত এখানে প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন কালীঘাটের একখানি ছবি প্রদত্ত করিলাম

হিন্দুতন্ত্রেও এই সকল গুপ্ত তান্ত্রিক সাধনা ছিল এখনও কালীধামে ভৈরবীচক্র বসিয়া থাকে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে একপ রূপান্তরগ্রহণের উদাহরণ বিরল নহে যেমন তিন্টা কন্যা সমস্যার অন্তর্নিহিত ধারণ করিয়া থাকেন এবং বিবস্ত্রানের অশ্বরূপে তাহাকে অনুসরণ, সিংহ রাজার উপাখ্যানে ইন্দ্র ও যমের যথাক্রমে শ্যেন ও কপোতরূপ-ধারণ, ধর্ম্মগুপ্তকন্যা সোমপ্রভার কথা (কথাসরিৎসাগর ১৭ তরঙ্গ) প্রসঙ্গে অশ্বমেধ ও গুরুচক্রের ভিন্নরূপ ধারণ, প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে

কথিত আছে স্বয়ং বল্লালসেন অন্যতম বৈদিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়াও তান্ত্রিক আচার গ্রহণ করিয়া পদ্মিনীকে তিনি তান্ত্রিকমতে গ্রহণ করিয়াছিলেন

হিন্দুমতে তন্ত্রশাস্ত্র আগমের অন্তর্গত তন্ত্রে—শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত—এই তিন শ্রেণীই বেদের দোহাই দিয়া থাকেন বস্তুতঃ তন্ত্র হিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম্মকার্য্যে এত নিগূঢ়-ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে উহার আদি খুঁজিতে যোড়শশ সন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না মন্ত্রশক্তি, বহু যন্ত্র মুদ্রা ন্যাস ভূতশুদ্ধি, কুণ্ডলীযোগ, আত্মরক্ষা চর্য্যা প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রীয় ব্যাপারসমূহের অনেকেরই অন্ততঃ নামেমাত্র পরিচয় আছে। বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্র এক সময়ে প্রবল ছিল, তন্মধ্যে বৈষ্ণব তন্ত্রে অনেকটা ঝোঁক ভাব চুকিয়াছে ও

তাহা সকলিয়াদের মধ্যেই নিবদ্ধ পরিলক্ষিত হইল। শাক্ত মতের প্রধান গ্রন্থ কুলার্ণবতন্ত্র। শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের মধ্যে বেশী বিভিন্নতা নাই। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির শিবের দিকটা শৈব তান্ত্রিকের উপাস্য ও অর্দ্ধাংশ দিকটা শাক্ত তান্ত্রিকেরা পূজা করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় শাক্ত তান্ত্রিকেরা ৬৪ তন্ত্রকে উহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। কুলার্ণবতন্ত্র ও আনন্দ লহরীতে এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত সৌন্দর্য্যলহরী নামক তান্ত্রিক গ্রন্থ বঙ্গীয় শাক্ত তান্ত্রিকদের অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

শৈবত্ব ও শাক্ত তন্ত্র।

বৈষ্ণব আগমের প্রধান কথা পঞ্চরাত্র এবং যামাচার। শাক্ত ও শৈব তন্ত্র উভয়েই পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব স্বীকার করেন। এই সকল তন্ত্রের বিভিন্নতা কতকটা বাহ্য এবং শুধু নামগত। বৈষ্ণব আগম পঞ্চতন্ত্রে সন্ধ্যা, অভিষেক ও সংস্কার বলিতে যাহা বুঝায় শাক্ত তন্ত্রে 'চূড়াকরণ' মহাকালী এবং কঙ্কণ বলিতে অনেকটা তাহাই বুঝায়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "ভদ্র বিবেশী জিনিষ, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়া কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র চালাইয়া উহা বেদসম্মত ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" কিন্তু উডরফ সাহেব বলেন, "এ কথার উত্তর আমি এখন দিব না। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে তান্ত্রিকেরা বহু শতাব্দী হইতে তাহাদের মন্ত্রের ভিত্তি বেদ এই মত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। উহাদের যেসমস্তই প্রধান অস্ত্র ছিল, যাহার বেদ অস্বীকার করিয়া নানারূপ যোক্তিকতা দেখাইয়াছেন।" (শক্তি ও শাক্ত, ৭ পৃঃ।)

এই তান্ত্রিক ব্যাপারে এত সকল দুর্ব্বোধ্য বস্তু আছে যাহা লইয়া আমরা এখন আলোচনা করা একান্ত নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তান্ত্রিকদের মধ্যে কেহ কেহ বামাচারী, যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, আচারে বিচারে ইহারা অতিশয় ঘৃণ্য কাজ করিয়া থাকেন। দীক্ষিত না হইলে এই সকল কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। আমাদের সে শিক্ষা নাই। কুলার্ণবসংহিতায় শিব কতকগুলি ভয়ঙ্কর কাজের উপদেশ দিয়াছেন। বাঘুড় এবং ছুচোর মাংস দিয়া চণ্ডালরমণীর ব্যভিচারজাত বস্তু, শবের উত্তরীয় এবং অশ্বত্থের জঘন্য উপকরণ দিয়া সেই সকল বীভৎস কাণ্ড করিতে হয়। এই সকল প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে বলিয়া তিনি গৌরীকে বলিতেছেন, "এই তত্ত্ব কাহাকেও বলিবার নহে, প্রত্যুত গোপ্য। ইহা একান্তরূপে গোপন রাখিও।" "এই ঘৃণাব্যঞ্জক শাস্ত্র গোপন থাকাই ভাল। এক সময়ে কামরূপের কামাখ্যা দেবীর পোকাই দিয়া কত যে বীভৎস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইত, তাহা বলিবার নহে। বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে এই বীভৎসতা ভয়ানক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, লোকে কাপালিক বা তান্ত্রিক যোগীর নাম শুনিলে ভয় পাইত। বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলায় এরূপ এক যোগীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এই তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি সেদিন পর্য্যন্তও হইয়াছে। আমার জ্ঞানগোচরে আমাদের পরিবার ইহার ভুক্তভোগী হইয়াছিলেন। সেই ঘটনাটি আমার জন্মিবার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, যাঁহারা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদেরই মুখে আমি শুনিয়াছি। আমার পিতামহের

কুলার্ণবতন্ত্র

সহোদর স্বর্গীয় রামনাথ সেন মহাশয় পুলিসের দারোগা ছিলেন তিনি এই সকল তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিতেন একদা মধ্যরাত্রে কালীর নদীর পার্শ্ব খাশি ভূমে শব

রামনাথ সেনের গল্প।

কিংবা মঙ্গলবারে মৃত চণ্ডালের শবের উপর বসিয়া ইনি মন্ত্র জপ করিতেছিলেন হঠাৎ কে তাঁহার গালে এরূপ ভয়ানক চপেটাঘাত করিল যে তাঁহার কাপ্তেন মলী কাঙ্ক্ষিত মুখ ফিরিয়া গেল তাঁহার সঙ্গী ছিলেন মুখ্রাম-সুরাপুরবাসী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পিতা তিনিও ভূতে অন্য স্থানে আসনে বসিয়া তদ্রূপ তপস্যা করিতেছিলেন রামনাথের গো গো শব্দ শুনিবার ব্যাপারটা হয়। বাটীতে লইয়া আসার পর তিন দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন, কথা কহিবার বা পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না, শুধু গো গো শব্দ করিতেন, এবং অজ্ঞান হইয়া ছিলেন তাঁহার মুখে আমার ঠাকুরদাদার মুখে শুনিয়াছি, এবং গ্রামের সকলেই ইহা জানেন তাঁহাদের বিশ্বাস ভূতে তাঁহাকে মারিয়াছে কিন্তু তিনি পুলিসের দারোগা ছিলেন কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক দ্বারা এই হত্যাকাণ্ডটা করাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে আমি স্বচক্ষে ব্রহ্মতালুবিহিত দীর্ঘ জটাজুট সম্পন্ন, গম্ভীর ও সৌম্যদর্শন এক সাধুকে আমার পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত একটা কঙ্কালের খুঁটিনাটি খাইতে দেখিয়াছি এবং আমার পরিচিত একটি ব্রহ্ম যুবক অতি ঘৃণিত কিনিষ খাইতেন, তাহাও জানি এই সমস্ত বীভৎস কাণ্ড এখনও বঙ্গদেশে চলিতেছে, যদিও সাধারণে অনেক কমিয়া আসিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত এই তন্ত্রশাস্ত্র, এমন কি বৈদিক শাস্ত্রও ইহার ভিত্তি হইতে পারে কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম যেমন হিমাদ্রিপ্রস্রবণাকার ব্রহ্মকমণ্ডলু কামরূপ ও কুমারিকা সীমাবেষ্টিত একটা জনপদে আবদ্ধ এই তান্ত্রিক ধর্ম্মদ্বারা গূঢ় আধ্যাত্ম শক্তিলাভের চেষ্টার তাহা তদ্রূপ সীমাবদ্ধ নহে মুসলমান ফকিরেরা নানারূপ করামত দেখাইয়া থাকেন খৃষ্টানদিগকে তাঁহারা বীভৎস আচরণ দান করিতে পারেন, কারণ বিশেষ বিশেষ দেশের ক্রিয়াপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন পীরগণের কেরামত সকলেই জানেন শেক শুভোদয়ার জালালুদ্দিন পীরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে খৃষ্টানগণের মধ্যে "ব্রিদ্রেন অফ দি ফ্রি স্পিরিট" (Bretheren of the Free Spirit) দলের আচারকলাপ অনেকটা তান্ত্রিকদের মত। শাক্ত ও শক্তি, ৪ পৃঃ ,, সুতরাং ভারতের প্রধান চারিটি ধর্ম্ম,—হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান, ইহাদের মধ্যে কোন না কোনরূপে তান্ত্রিক আচার এখনও অনুষ্ঠিত হয় তন্ত্র নামটি হয়ত অনেক শ্রেণীর নাই। কিন্তু পার্থিব নিয়মাবলী হইতে স্বতন্ত্র অন্যানুনীতিচালিত একটা গূঢ় জগৎ আছে, যাহাতে প্রবেশ করিতে পারিলে অতি শুভ অলৌকিক শক্তি লাভ হয়—এই বিশ্বাস এবং সেই সকল পদ্ধতির অনুষ্ঠানকারী লোক জগতে সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় ইহাদের রাজ্য হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি শ্রেণীর অনুমিত স্থান অপেক্ষা অনেক ব্যাপক, আমরা যে বিষয়ের কিছুই জানি না, সে বিষয়ে এতগুলি কথা বায় করিবার ইচ্ছা দেখাইলাম, তজ্জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি বস্তুতঃ ইউরোপ আদি কতিপয় সাহেবকে এই তন্ত্রশাস্ত্রের একটা অনুবাদ দেখিয়া, এই শাস্ত্রের প্রতি একটা বিশেষ কৌতূহলের ভাব

আসিয়াছে আশা করি এই বিষয়ের পুস্তক আলোচনা বগুড়া ও চাঁদচিকার নিবাসভূমি মাকড়সার জালবেষ্টিত হইয়াছে এবং ঐখানে পাঠকগণ হইতে নিবারণকে আনয়ন করিয়া কেহ ইহার তত্ত্বগুলি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন

তবেই প্রচলিত লেখাপড়ার ছাড়া এক সময়ে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল আশ্চর্যের বিষয় এই সকল বাঙ্গলা দেশের চাষাদের অধিকৃত ছিল না গোরক্ষবিজয় নামক প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে ১২শ শতাব্দীতে লিখিত, বর্তমান আকার চতুর্দশ শতাব্দীর গোরক্ষনাথ যে ৩৬টি প্রশ্ন মীন নাথকে করিয়াছিলেন এক সময়ে বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীয় ও মুসলমান কৃষকেরা পর্যন্ত তাহা জানিত যেহেতু এতকাল যাবৎ চাষারাই ঐ পুস্তক নকল করিয়া রক্ষা করিয়াছে, চাষারাই ছিল ইহার পাঠক, এবং তাহারাই ছিল ইহার শ্রোতা প্রশ্নগুলি এইরূপ —

কায়া কোথা হতে পাইলা কায়াতে উদয়।
প্রথমে করিবা গুরু কায়া-পরিচয়॥
দ্বিতীয়ে কহিবা গুরু এ তত্ত্ব কারণ
অরূপা কাহাকে বলি রূপে কোন জন॥
.. নবরে—পবন অন্তরে কোন লক্ষে।
সত্তার আহার আছে বায়ু কিবা ভক্ষে॥
গগনে নিদান বুঝি কেহ নাহি রয়।
দীপ নিবাইলে জ্যোতি কোথা গিয়া রয়॥
..একারণে কহি হেন শব্দের অবস্থা।
শব্দ উঠিলে জ্ঞান চলি যায় কোথা॥
..ত্রয়োদশে কহি হেন পরম কারণ।
নিদ্রা কাহাকে বলি চেষ্টায় কোন জন॥" ইত্যাদি।

সহদেব চক্রবর্তীর শব্দমঙ্গলে ১২শ শতাব্দ এবং অপরাপর অনেকগুলি বাঙ্গলা পুস্তকে প্রহেলিকার মত কতকগুলি কথা আছে যথা

"গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুস্তকার ছত্রে সিদ্ধ উপজিল পঙ্কজ লাগিয়া যায়॥
গুরুহে বুঝহ আপন মনে।
শুক্ল কাষ্ঠ ছিল, পবন মুরুলিল, পাষাণ বিঁধিল ঘুনে
শিলা নোড়াতে কোকল বসিল সরিষা পরাধার করে॥
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক চাসিয়া মরে।
এ বড় বচন অদ্ভুত অকাট্য বান্ধিয়া প্রসব করিল,
ছেলে মরে পারবার দুখ।

আনেক গভীর নেত্রে হেরিনু বারেক, দেখিল কুণ্ডলী
ঘুমায় কুণ্ডলিনী পর্বতে ত্রিকোণ কুহরে শিবলিঙ্গের চারি
আগে ঝোরে তীব্র সলিল ঝরিল, মাঝে মাঝে উঠিল ধূপ
সবিস্ময় ভক্তদের হৃদয়ে নাই, ঘুমায় ঘুমায়ে ...

এইগুলি প্রচলিত কৌলতন্ত্রসম্বন্ধে ইঙ্গিত। এরকমের একশোর চেয়ে বেশি ইঙ্গিত রয়েছে, এবং আমরা ইহার বেশিদূর অগ্রসর হইব না। কিন্তু অনায়াসেই যে কতটি বাপকরূপের প্রচারিত হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সহস্রসম্বন্ধে একরকম ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে-কালের যা-কুলেরা সকলেই ঘুরিতেছে, সেই সকলের একটি আধুনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া একটি মধুর টীকা রচনা করিয়াছেন অতি শুদ্ধ পণ্ডিত এবং তান্ত্রিক কলিযুগে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অতীব মধু অনুসরণ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি এখনও একালের জন্য তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বাস্তব। পূর্বোক্ত অন্নময় পর্যন্ত কোষ আমাদের পর পর আত্মসাক্ষাৎকার। অন্নময় কোষের ছয়টি অঙ্গ-আবরণ যা অর্থাৎকোষ মধ্যে তাহা সত্য এবং মাংস মজ্জাস্থি এবং আর চর্ম ও অস্থির বিভিন্নকার কোষের অংশ বিশেষের টীকা তুলি পাঠাই, স্থানাভাবে এখানে তাহা দিতে পারিলাম না, কেবলমাত্র—মুখ, বাহু, পদ এবং ছায়ের।

অন্নময় কোষের পর প্রাণময় কোষ যাহা প্রাণশক্তিসম্বন্ধীয় ইহাদের বলা হইয়াছে ও বিশুদ্ধ চক্র। প্রাণময় কোষের অধিষ্ঠাতা প্রাণময় দেবতা, ইহাদের পঞ্চ বায়ু প্রধান—প্রাণ অপান, ব্যান, উদান এবং সমান। কুণ্ডলিনী শক্তি ইহাদের মধ্যবর্তিনী।

ইহার পরে মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। ইহাদের প্রক্রিয়া অন্তঃকরণ এক হয় চারি প্রকারে, বুদ্ধি মানস অহঙ্কার এবং চিত্ত। নিদ্রাকালে ইহাদের কার্য স্থগিত হয় স্বপ্নের অবস্থায় ইহাকে "তৈজস" নামে অভিহিত করা হয়। ইহার পর সুষুপ্তির অবস্থা অর্থাৎ স্বপ্নহীন নিদ্রা, এই অবস্থায় মনের কার্য অপসারিত হয়, এবং কেবলমাত্র তমসাবিকৃত বুদ্ধি সজাগ থাকিয়া জীবের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। এই অবস্থায় উপাধি তিরোধান, বিরাট এবং অব্যক্ত। এই সুষুপ্তি অবস্থাতে জীবের আনন্দ থাকে, এইজন্য জীব তখনও পরমাত্মার সহিত এক হইতে পারে না। সুষুপ্তির ঊর্ধ্বে তুরীয় এবং তুরীয় অবস্থার পরে যাহা হয় তাহা নিরুপাধি তখন জীব শিবের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

জীবশরীরের সাড়ে তিন কোটী নাড়ী পরিকল্পিত হইয়াছে ইহাদের নাম নাড়ী। নাড়ীগুলির মধ্যে ১৪টি প্রধান এবং এই ১৪টির মধ্যে শিরদেশ ও মস্তক সম্পর্কে। মস্তক মূলাধার হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। জীবশরীরে ছয়টি চক্র আছে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা। সহস্রাদি সহস্রার শূন্য সপ্তমতল পদ্ম।

এই তন্ত্রানুষ্ঠানে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। গুরুর স্থান পিতামাতা হইতেও উচ্চ। সৎ গুরু প্রথমতঃ শিষ্যকে ভালমতন পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা দিবেন

তারপর অন্য প্রকারে অভিচারের ব্যবস্থা আছে। সিদ্ধির জন্য সাধনার পথ অবলম্বন করিতে হয়। তান্ত্রিক পুরশ্চর্যাদি স্বতন্ত্র প্রকারের কুলার্ণবতন্ত্র নানা প্রকারে আচারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বেদ আচার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তারপর ক্রমান্বয়ে শৈবাচার, অঘোরাচার সিদ্ধান্তাচার বামাচার দক্ষিণাচার সৌম্যাচার, বৈষ্ণবাচার ও কৌলাচার। কৌলাচার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষ অসীম শক্তি, তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাকে পঞ্চতত্ত্বাত্মক মনুষ্য এবং মদ্য দ্বারা পূজা করিতে হয়। যোগিনীতন্ত্রের বিধানানুসারে মদ্য ১৮ প্রকারের তন্মধ্যে সাধারণতঃ ৫টি প্রচলিত দেখা।

আচার।

বৈদিক মন্ত্রের তিন বার জপ করিতে হয় শূদ্রের এই অধিকার নাই কিন্তু তান্ত্রিক মন্ত্রে সব জাতির তুল্য অধিকার। আসনশুদ্ধি পূজা পদ্ধতি, জল সংস্কার, পুনশ্চরণ ভূতশুদ্ধি ন্যাস পঞ্চতত্ত্ব। পঞ্চ প্রকার প্রকৃষ্ট বিধির অনুষ্ঠান তন্ত্রশাস্ত্রে আছে বৈদিক অনুষ্ঠানে স্বকীয় মত খুব কেহের সহিত প্রচারের চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে একমাত্র সত্যসন্ধিতাই ধর্ম্ম-কার্য্যের সম্বল। অনুষ্ঠানক্রম—ধ্যান স্তব কবচ, মেধা, প্রেক্ষণ, শুদ্ধাভাস সঙ্কল্প অর্ঘ্যস্থাপন এবং কিরাতিনীমন্ত্র—এ সমস্তেরই নিজের প্রী সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে। শাস্ত্রকারের অনেক কটূক্তির কথা আছে, কিন্তু তাহা অধিকারীর জন্য।

বৈদিক ও তান্ত্রিক।

বঙ্গদেশের মহিলাদের মধ্যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহা বীভৎস, শুধু প্রসঙ্গ আমরা অতি সংক্ষেপে তৈরবী অধ্যায়ে উল্লেখ করিব।

তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা ক্ষমতা লাভ করিতে চান, তাঁহারা মন্ত্র ও তদ্দ্বারা "মন্ত্রসঞ্জীবিনী", আত্মাকর্ষণ "আকর্ষণী", মৃতদাকৃতিধারণ, "কায়সিদ্ধা" কৃত্রিমরূপধারণ "রূপিণী"। যে শক্তি প্রভাবে বশ করা যায়।, "বশীকরণী"। যে বিদ্যা দ্বারা মন হরণ করা যায়, "চিত্তরাক্ষোবধায়িনী" (যে বিদ্যা দ্বারা দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন পরিণত করা যায়, অক্ষর ও অমর চক্ষুঃ, "অদর্শনকারিণী" যে শক্তি দ্বারা নিজের শরীর অদৃশ্য করা যায়। "বন্ধনী", যাহার দ্বারা অপর ব্যক্তিকে বন্ধন করা যায়, "মারণী" যাহার দ্বারা বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।, "অনলস্তম্ভনী"। যাহার দ্বারা অগ্নির ক্রিয়া বন্ধ করা যায় "জলস্তম্ভিনী" যাহার জলের শক্তি রোধ করা যায়, "বশকারিণী" যাহা দ্বারা পরকে বশ করা যায় বশীকরণ প্রভৃতি মহাবিদ্যা লাভ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এই সকল শক্তি সাধকেরা অনেকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি নবদ্বীপের আগমবাগীশ। পঞ্চদশ শতাব্দী এবং পুরশ্চরণের সর্ব্বসিদ্ধা মেহেরের এ মিতরার অন্ধ কালা এই সকল সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকদের মধ্যে অন্যতম। এ সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। এখনও বাঙ্গালীর মধ্যে তন্ত্রযোনি আছেন, একপ শুনিতে পাই বাঙ্গালীদের এই সকল ক্ষমতা লাভের চেষ্টা নাই। তন্ত্রের এত পুস্তক রচিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠানের একপ অসংখ্য সিদ্ধি ব্যবস্থা আছে, এই তন্ত্রধর্ম্ম একদা এত লোককে আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহার জন্য মানুষ এত কৃচ্ছ্র সহ্য করিয়াছে যে, অতিপ্রাকৃত, ভয়াবহ ও গূঢ় হইলেও

এই বিস্তারক মূল হইতে নামকরণ করা যাউক যেমন নির্দিষ্ট কোন ফলক দেখিলে তাহা ঘুরে ফেলিয়া চলিয়া যায়,—আমাদের "হতা অনেকগুণা এবং অসাধ" এই অভিযোগ দিয়া সেইরূপ এই মহাশাস্ত্রটীকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না বোধ হয় তন্ত্রশাস্ত্রের মত এরূপ জটিল কোন বিদ্যা নাই ইহার অধিকাংশই অনুষ্ঠানের ভিত্তির উপর স্থাপিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য কত ক্লেশ করিয়াছেন সকলই কি বৃথা? আনুষ্ঠানিক পুরোহিতেরা তন্ত্রশাস্ত্রের কতটা সত্য কতটা মিথ্যা, তাহা

দেবশক্তি ও অসুরশক্তি।

নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কষ্টসাধ্য সাধনের দ্বারা ইহাকে একটা দুর্নাম দ্বারা নিন্দিত করিয়া একেবারে এতবড় শাস্ত্রটীকে অতলে ডুবাইয়া দেওয়া কি উচিত? অধ্যাত্মশক্তি জড়ের সঙ্গাপেক্ষা বড় শক্তি, জড়শক্তিদ্বারা তাহা আয়ত্ত হয় নাই অধ্যাত্মরাজ্য আঁধার ও দুর্জ্ঞেয়, ইহার পথ জটিল এবং জড়জগতের নিয়মাধীন নহে। আমাদের দেশের লোকেরা অধ্যাত্মরাজ্যের কথা নিয়ত পরোক্ষে দৃষ্টিতে ভীত হন নাই এখনকার পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা যেরূপ জড় জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান লইতেছেন, এমন কি যন্ত্রশাস্ত্রের লোকদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, সেইরূপে অভিযান করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতেছেন এদেশের লোকেরা তেমনই প্রবল অধ্যবসায়বলে অধ্যাত্মরাজ্য অধিগম্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এই পথে কোন কষ্ট, কোন তপস্যা, কোন উৎকট কার্য্য তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহাদের যে বিপুল পরিশ্রমের ডালি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাসটাও কি আমাদের জানা উচিত নহে?

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের অনেকেই বামমার্গে বৈদিক ত্যাগ করিয়াছিলেন এই পতিত ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কাছারীতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় সামাজিকতা লইয়াছিলেন দিগ্‌পতিনিবাসী "আনন্দভট্ট" নামক বাঙ্গলার সংগৃহীত গ্রন্থে এই কার্য্যের আভাস আছে (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় সংখ্যা ৩৩ পৃষ্ঠা)। এই সময়ে তান্ত্রিকতার এত অধিক প্রচলন হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত বেদবিহিত কর্ম্ম নিষ্ফল মনে করিতেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কলিযুগে তন্ত্র ত্যাগ করিয়া বৈদিক আচার সমর্থন করেন, তিনি "কুমতো ব্রাহ্মণাঙ্গার কুলং ধনিত দুষ্কৃতঃ" পঞ্চমকারের সাধনার উপর এতটা জোর দেওয়া হইয়াছিল যে সাধিকগণই ব্রাহ্মণত্বের মুখ্যলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও

সুরাপান

কোলকী সুরাপানই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। "কেবলামমৃতং হ্যেতৎ কৌলিকৈ সুরা সুরাম্ভ ভোগমাত্রেণ বহ্নিদীপ্তো ভবেন্নরঃ, পাপমাচরেৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বতঃ সাধুস্তন্ত্রেষু সংশিক্ষিতঃ।" (মাতৃকাভেদতন্ত্র ৩য় পটল। পিচ্ছিলা তন্ত্রের প্রথম পটলে তান্ত্রিকদের পক্ষে যে সকল উপদেশ দেওয়া আছে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি পুনরা বোধ করি। তান্ত্রিকের অনুশাসন লোক ভুলিয়া ভোগে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন, এবং "ভোগাই মোক্ষ" এই সূত্র প্রচার করিতে লাগিলেন "ভোগেন

[illegible] [illegible] [illegible] [

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতত্ত্ব

ব্রহ্মদেশের পূর্ব প্রান্তে সংঘটক যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহা এখন অনুমান করাও দুঃসাধ্য। ব্রহ্মদেশ সমস্ত সমাজ দুঃখের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। নৈতিক সমাজের অনেক পূর্বেই পৈশাচিক সমাজ কুলটা কন্যা ব্রহ্মদেশের পক্ষে অসাধারণ ছিল না। পুরুষদের পুং-, পুনঃ সঙ্গ অথবা অপরাপর দস্তুরে সময়ে পৈতা ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। এমন কি পৈতা না থাকিলে উপনয়ন হয় না এই সকল কারণে ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রাধান্য হইয়াছে। সত্যসত্যই ব্রহ্মদেশে দুঃখের বিষয় যে অনভিজ্ঞতাবশতঃ একটা ভ্রম আসিয়া পড়িয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা পৈতা পরার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। পৈতার নাম যজ্ঞসূত্র যজ্ঞের সময়েই উহা পরিধান বিধি এই জন্যই উহার ঐ নাম হইয়াছে। পুত্র উপনয়নের সময়ে পুত্র হস্তে ধারণ করিতে হয়। তাই এ পৈতা অনেক সময়েই গলায় থাকে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর গলায় দুই ছড়া, গোপীচন্দের সন্ন্যাসোপযোগী শুভ সময় নির্ণয় করিবার জন্য পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিলে তখন তিনি তাঁহার যে পৈতাটী পরিয়া ছিলেন। উহার কোনটিই তাঁহার ধারায় ছিল না— চারি ধুই মতক ধুই পরিধান করিয়া। তাঁহার পৈতা ছিল গলায় ঝুলান। [illegible] পড়িয়া আছে ৫৮ পৃ ব্রহ্মদেশের প্রজার বাঙ্গালার অনেক ব্রাহ্মণের পৈতা ঝুলিতেছিল। কুলতাত্ত্বিকগণ একটিতে এক ব্রহ্মদেশকে লিখিয়াছে "পৈতা ছাড়া পৈতা এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে" ব্রাহ্মণদের ইতিহাস। সুতরাং ব্রহ্মদেশীয়দের অত্যাচারে সঙ্গে সঙ্গে অনেকে যে পৈতা নূতন করিয়া গলায় ঝুলাইয়াছিলেন তাহা অসম্ভব হইতেছে। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দেখা যায়, মুসলমানেরা বাড়ীঘর লুটিয়া নিয়াছিল সেই সকল ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া লইয়াছিল। তাঁহাদের গলায় পৈতা ছিল। "বান্ধিয়া কান্ধল বহু পৈতা হার করি" সুতরাং পৈতাগাছটা ব্রহ্মদেশে যে ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। মুসলমান ইতিহাসে বহু পরিচয় যে পৈতাসম্বন্ধে খুব ঝোঁকাঝোঁকি নিশ্চয় ছিল না। তাহার এক ভাগে লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায় চৈতন্য যখন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের জন্য যাইতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার মুক্তিচিহ্নস্বরূপ নিজের গলার পৈতাটি খুলিয়া

পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে দিয়া যান। সমস্ত হইয়া লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পরকালে তাঁহার স্বামীর পাদুকা ও ধৈতা সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। উদ্দেশ্যে অন্তরের তুলার সঙ্গে স্বামীর পাদুকা স্পষ্ট করিবার জন্য ব্রাহ্মণের ধৈতার ব্যবস্থাটা অপরিহার্য্য করিয়াছিলেন।

অপরাপর বহুবিধ আচার প্রথা পদ্ধতি ছিল যাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে গোপীচন্দ্রপ্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্তপ্রায় হইল, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় দেখা যায় নব ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের ফলেই অনেক গুলিতে কুমারীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিতেন এবং তাঁহারা বর মনোনয়নের ক্ষমতাও অনেক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন, সেকথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। স্বয়ম্বরকালে বর যে কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন কোন কোন সময়ে সে কন্যার ভগিনীকেও দানে পাইতেন। গোপীচন্দ্র অনুনাকে বিবাহ করিবার সময়ে দুরকন্যাকে দানে পাইয়াছিলেন ময়নামতীর গানে উল্লিখিত আছে বরযাত্রে কোন কোন দেশে বাসরে দুই তিন দিবস বা সপ্তাহকালের জন্য রাজা কন্যাকে ও জামাতাকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইতেন। গোপীচন্দ্রের বারশ বৎসর কালব্যাপী সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে তাঁহার গর্ভবতী হইয়া দুরকন্যাই অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন, শুধু অদুনা ও পদুনা স্বামীসঙ্গে বনে গিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে কুকুর অতি অস্পৃশ্য পশুর পর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালের বাঙ্গালার কুকুর অতি প্রিয় পালিত জন্তু ছিল। গোপীচন্দ্র যখন ফিরিয়া আসিলেন তাঁহার আদরের কুকুরটি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদতলে লোটাইয়া পড়িল, তাঁহার পার্শ্বে এ দুটি ভিন্নজাতীয় কুকুর ছিল। যুধিষ্ঠির একটি কুকুরকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভাবের সময়ে চণ্ডীকাব্যে পালিত কুকুরের ছবি আঁকিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। বরযাত্রে যাইবার সময় যাত্রী পক্ষ এবং যাত্রে শুভ প্রত্যাবর্ত্তন পথে পাখীর ডাক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু অন্যান্য পাখীর কলকাকলির মধ্যে কুকুরের ডাকের একটা বিশেষত্ব ছিল। ঐ সময়ে ঐ কুকুর বিশেষভাবে ডাকিয়া উঠিত। বরযাত্রে যাইবার সময় কুকুর ডাকিলে বরের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। বরযাত্রে যাইবার সময় কুকুর ডাকিলে বরের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। বরযাত্রে যাইবার সময় কুকুর ডাকিলে বরের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

বর মনোনয়ন।

কন্যাদান ও বেদবিবাহ।

কুকুর।

কাপড় পরার রীতি ও পাদুকা।

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সিংহলযাত্রার সময়ে ঐ ভাবে কাপড় পরিত। হিন্দুস্থানীরা এখনও ঐ ভাবে কাপড় পরিয়া থাকে। বাঙ্গালা প্রাচীন পুস্তকেও ঐ ভাবে সজ্জার কাপড় পরিবার কথা আছে। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দৃষ্ট হয় সিংহলরাজ চাঁদ সদাগরের নিকট পত্রবাহ পাইয়া তাঁহা বাঙ্গালী ভাবে পরিতে লিখিয়াছিলেন "একখানি কাছিয়া শিরে, আর একখানি আবাদ বান্ধে, আর একখানি দিল কক্ষেতে"। পূর্ব্ববঙ্গের লোক ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মালকোচা-মারা আটান মত কাপড় পরিত। এই কালে বোধ হয় পাগড়ী পরাটা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য ছিল। এ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে অনেক ইঙ্গিত আছে। গোপীচন্দ্রের

প্রাচীন গানে পাই হয়,—গান্ধীগুরুর মাতার মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া যাত্রা [illegible] তাঁহাকে বলিতেছেন, "কার জন্য পাগড়ী রাখছ মাথার উপরে"—তখন পাগড়ী পরার রীতিটা বেশ প্রচলিত ছিল, অন্ত অন্ত প্রমাণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন ষষ্ঠ সংস্করণ) পশ্চিম দেশীয় হিন্দুরা মস্তকেই পাগড়ী পরিতেন বোদ্ধগণ মূর্তিমস্তক ছিলেন এ জন্যই তাঁহারা উষ্ণীষকারে হিন্দুগণকর্তৃক "নেড়া" নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন বোদ্ধগণের অনেকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উক্ত নামে বঙ্গে মুসলমানগণও পরিচিত হইয়া থাকেন মূর্তিতমস্তক বোদ্ধগণের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুরা পাগড়ী পরাটা একরূপ বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন, আজমীরের সুবাদার থাকা কালে জেনাক তাঁহার পিতা বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র "বুদ্ধধর্ম্ম লয়ে [illegible] ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে বোদ্ধগণ পাগড়ী মাথায় দিতেন না জেনাক হিন্দু বৌদ্ধ হইলে তাঁহাকে পাগড়ী ত্যাগ করিতে হইত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যতগুলি প্রাচীন চিত্রপটগুলিতে সংকীর্ত্তনের যে দৃশ্য দেখান হইয়াছে, তাহার কোন কোনটিতে প্রায় সকল লোকেরই মাথায় পাগড়ী উহাদের অনেকের পাগড়ীই মাদ্রাজী ধরণের এই দলের লোকের মধ্যে যে অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই (চিত্র দ্রষ্টব্য) বাঙ্গালী মহিলা যে পাগড়ী পরিতেন তাহা সম্প্রতি কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিয়াছে। একখানি বস্ত্র কটিদেশের সকল দিক্ এরূপ সুন্দর ভাবে আচ্ছাদন করা অতি চারু শিল্পকলার পরিচায়ক ইহার মূলতত্ত্বের মধ্যে শিল্পের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে কিন্তু বাঙ্গালীর ধুতির শুকুঞ্চিত কুঞ্চমস্তবকাকৃতি কোঁচা এবং পাড়ীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী অনুপম পরিধানভঙ্গিতে একটা মনোরম কৌশল সুপ্রচুর [illegible] একটি ইংরেজ মহিলা বলিতেন "বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারী কাপড় পরিবার সম্বন্ধে একটি মৌলিক কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন, সেই ভাবে ধুতি ও পাড়ী পরা বিজলীরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না অথচ পাল্ট বা ট্রাউজার কতকটা বাঙ্গালীর পোষাক মত, সহজেই সমস্ত কাজ করিয়া দেয়, যিনি পরিয়াছেন, তিনি পা দুটি ঢুকাইয়া দিলেই তাহার কাজ শেষ হয়" বাঙ্গালার কোঁচা ও পাড়ী পরায় যে কত মনোজ্ঞ ভঙ্গী ছিল তাহা প্রস্তুত চিত্রগুলিতে কিছু কিছু বুঝা যাইতে পারে যদুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃত বর্ণিকার বাসসজ্জার যে বর্ণনা আছে তাহা কলাজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে যে সকল বাঙ্গালীরা উত্তর পশ্চিম হইতে আসিয়া বাঙ্গলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা প্রথম প্রথম উৎসব ও দরবারের সময়ে তাঁহাদের দেশের প্রাচীন পরিচ্ছদ পরিয়া রীতি রক্ষা করিতেন, কিন্তু শেষে এই বাঙ্গলার আবহাওয়ার গুণে এদেশী পরিধানই অধিকতর উপযোগী মনে করিয়া প্রাচীন রীতি ত্যাগ করিয়াছিলেন (ক্ষিতীশ-বংশাবলী দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বে বাঙ্গালী সুকুঞ্চিত কবিয়া দীর্ঘ চুল রক্ষা করিতেন, প্রাচীন সাহিত্যে এই দীর্ঘ চুলের উল্লেখ অনেক স্থলেই আছে। [illegible] বাঁধিবার যে কত কৌশল এ দেশের মেয়েরা জানিতেন

[illegible] [illegible] [illegible] [

দক্ষ হইত না। ইংরেজ রাজত্বে রোগদর্শন না পাওয়ায় কবিরাজদিগের অনেক গ্রন্থ এখন তৈয়ারী হয় না। লক্ষ্মণসেনের সভায় থাকিয়া এবং উৎসাহে বঙ্গদেশীয় বৈদ্যেরা চিকিৎসা-বিদ্যায় পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ক্রমক্রমে রাজকীয় সাহায্যের অভাবে অর্থাভাবে, উৎসাহ সাম্যগীর অভাবে বৈদ্যচিকিৎসার গুণ বিস্তর হ্রাস পাইয়াছে সত্য, তথাপি আয়ুর্বেদিকচিকিৎসা-বিদ্যায় অদ্য কেহ অন্যান্য ব্রাহ্মণের তুল্য হইতে পারেন নাই। নাড়ীজ্ঞানে বাঙ্গালী চিকিৎসকের তুল্য অন্য কোন জাতীয় চিকিৎসকের নাই। (গোপালন সান্যাল কৃত সামাজিক ইতিহাসে, পৃঃ ৬৮-৬৯। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখিয়াছেন—"নয়পাল দেবের (১০২৫-১০৪৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে বৈদ্য গুর্জ্জর পর্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। বৈদ্য গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ নয়পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জজ্জটের ধন্বন্তরি টীকার প্রথমাংশ রাজবৈদ্য সহদেব কর্তৃক এবং পরাংশ ধন্বন্তরির প্রথমাংশ বৈদ্য বঙ্গসেনকর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষোদিত লিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু বর্ণ সম্বলিত বর্ণবিন্যাসের বিস্তার ও রচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নয়পাল দেবের রাজত্বকালে বিক্রমশীলবাসী শ্রীজ্ঞান নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বত রাজের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন।" বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ২৩৩ পৃঃ। এই বিষয়টি আমরা ২৬৩ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করিয়াছি সেখানে 'নয়পাল' শব্দটি মুদ্রাক্রমে "নরপাল"রূপে লিখিত হইয়াছে।

এক সময়ে বৈদ্যদিগের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। বৃদ্ধ-সমুচর ক্রোড়পতি ধন্বন্তরি, বিশ্ববিখ্যাত 'চরক' প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও বল্লালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মদন পালের প্রধান সেনাপতি "সূদেন", বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি "সংগ্রামদক্ষ হস্ত-বৈদ্যবিপক্ষ", বালিনিছি গ্রামনিবাসী "পাল্ল রাজ", গৌড়েশ্বর (সম্ভবতঃ বল্লাল সেন) হইতে "গজ তুরঙ্গ কনক ছত্র" প্রভৃতি উপঢৌকন প্রাপ্ত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বাগ্মী, চিকিৎসাপটু বিনায়ক সেন হুসেন শাহ নিকট "কণ্ঠাভরণ পদবী" প্রাপ্ত "ধন্বন্তরি খাঁ" প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বৈদ্যের নাম আমরা পাইতেছি। মহামহোপাধ্যায় সপ্তর্ষিচন্দ্র, বিশ্ববাচস্পতি প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্যের নাম প্রাচীনকুলশাস্ত্রে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণে যে ইহারা ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা সমকক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই *

* বৈদ্যগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপন ও অধ্যয়ন এই দুই কার্য্যেই তাঁহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদত্ত উপাধিগুলি তাঁহারা এত অধিক পরিমাণে লাভ করিতেন যে তাঁহাদের কুলগ্রন্থের যে কোন পৃষ্ঠা খুঁজিলেই ঐরূপ উপাধির বহর দৃষ্ট হইবে। প্রসিদ্ধ বচন আছে—"প্রধানঃ সর্ব্ব-বৈদ্যানাং বৈদ্যানাং ব্যাসবো যথা। পরাশর ইবাজ্ঞেষু ঋষীণাম্বিব নারদঃ"—চন্দ্রপ্রভা। বংশবৃত্তের কুলজীর একটি পৃষ্ঠার প্রমাণ দেখাইব। সপ্তম শতাব্দীর অবসানে এই কুলে গুণাকর নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র রামেশ্বর, উপাধি ;—'কবিরাজ', রামেশ্বরের পুত্র নরহরি, উপাধি 'কবীন্দ্র' নরহরির দুই পুত্র, ১ম রামনাথ, উপাধি 'সার্ব্বভৌম', ২য় পুত্র যাদবনাথ, উপাধি 'কবিশেখর'। রামনাথের ১ম পুত্র কালীনাথ, উপাধি 'কবিকঙ্কণ', তাহার পুত্র কমলানাথ, উপাধি 'কবিচিন্তামণি', কবিই ; মধুরানাথ, উপাধি "কবিকণ্ঠপুত"। পূর্ব্বোক্ত কালীনাথ কবিকঙ্ক-

হিন্দুরাজত্বের সময়ে বৈদ্যের প্রভাব অটুট ছিল। উহারা রাজাদের অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত ছিলেন এই জন্য অনেকে ঈর্ষান্বিতও হইয়া উঠিতেন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে বৈদ্যরা কতকটা ম্লানপ্রভ হইয়া পড়িলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রাজত্বের সময়ে অনেক সম্ভ্রান্তবংশের সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়, নারোত্তমের প্রিয় সখা রামচন্দ্র কবিরাজ পণ্ডিত ও কবি গঙ্গাদাস সেন ইহাদের মধ্যে অন্যতম কবি রায়শেখর, যাঁহার সম্বন্ধে কল্পিত প্রবাদটি শুনিতে পাওয়া যায়—"পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি, মর্ত্ত্যে গায়কের কর্ত্তা ধন্যে রায়শেখর কবিঃ" এবং শিক্ষা চিকিৎসা সেন চৈতন্যের প্রিয় সখা মুরারি গুপ্ত এবং শিবানন্দ সেন ও পরমানন্দ কবি-কর্ণপুর দুইজন আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্রের সভার রাজবৈদ্য শুখদেব মিশ্রাণী গোবিন্দরাম ও আধুনিক গঙ্গাধর কবিরাজ প্রভৃতি শত শত বৈদ্য মহাকবি অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি গত তিন চারি শত বৎসর যাবৎ সমাজে বৈদ্যের সেরূপ প্রতিষ্ঠা আর নাই। হিন্দুরাজত্বের অবসানের সঙ্গে উহারা প্রধান অবলম্বন রাজশক্তির সহায়তা হারাইলেন উচ্চ সমাজে ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠিলেন। বৈদ্যবিদ্বেষিগণ এরূপ সুযোগ পাইয়া উহাদের অভিমুখমান হইলেন। বঙ্গীয় কবিগণ মাঝে মাঝে বৈদ্যজাতির উপর শ্লেষ বর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণগণের পরই বৈদ্যের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াও ছাড়ার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে বঙ্গদেশের একটি সার্ব্বজনীন শ্রেণীর খরচায় নিজের পরিহাস-রসের পরিচয় দেওয়ার বাহাদুরী লইয়াছেন একটি উৎকৃষ্ট পল্লীগীতিকায় এক মুসলমান কবিও বৈদ্যজাতি কুলিত্ব দেখাইয়াছেন ছটটী কাব্যেরই সেই সেই স্থান পাদটীকায় দেওয়া গেল *

ভূষণের ১ম পুত্র গোপীকান্ত, উপাধি 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ', কবিষ্ঠ পুত্র রমাকান্ত, উপাধি 'কবিরাজশেখর', কবিরাজ-শেখরের ১ম পুত্র রামানন্দ, উপাধি 'কবিভূষণ', দ্বিতীয় পুত্র কমলেশ, উপাধি 'কবীন্দ্রভূষণ' রামেশ্বর কবিভূষণের পুত্র রামেশ্বরের উপাধি 'কবীন্দ্রচূড়ামণি,' রমাকান্ত কবিরাজশেখরের ভ্রাতা রত্নলোচনের দুই পুত্র, প্রথম নরেন্দ্র, উপাধি 'কবীন্দ্ররত্ন', দ্বিতীয় রাজবল্লভ, উপাধি 'কবিশেখর'। এই কাব্যের আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে আমরা রামরামের উপাধি 'কবীন্দ্রবর্য' কৃষ্ণজীবনের উপাধি 'কবিরাজমণি', রামচন্দ্রের উপাধি 'বিদ্যারত্নমণি', রামকান্তের উপাধি 'কবিকর্ণধনি', রামরামের উপাধি 'কবিকুলমণি', রামহরির 'কবিমণি', অম্বিকারামের 'ভারতীভূষণ', হরিচরণের 'কবিরঞ্জ', রত্নরামের 'রত্নধর', মনোহরের 'কবীন্দ্র', ভবানন্দের 'কবিকর্ণকুহর', রতিকান্তের 'কণ্ঠাভরণ', গৌরীকান্তের 'কাব্যভারতী', রামকান্তের 'কণ্ঠহার' উপাধি দেখিতে পাই। ষোড়শ শতাব্দীর পরে একটা উপাধি বৈদ্যগণ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন—তাহা কোন জাতির পক্ষে সে উপাধি অনাবশ্যক ছিল, উহা 'কবিরাজ'। বেত কুলজীগ্রন্থের মাত্র একটি পুঁথিতে এই উপাধির বহর দেখিয়া বহুদর্শী ব্যক্তিমাত্রই মনে করিবেন এজাতির মধ্যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোক অতি অল্পই ছিলেন। এখনও উহাদের মধ্যে 'সেন' ও 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি বিশিষ্ট পরিবার বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে বিদ্যমান।

* "বৈদ্যজাতির তত্ত্ব, শুন সেন রায় কহ, কত আদি বাস কুলধাম। চিকিৎসায় কারে বল, কেহ প্রধানের বল, মাতা তত্ত্ব করহে বিশেষ। উষা প্রভাতকালে, ইষ্ট পোঁটা করি ভালে, বসন ভূষিত করি দিবে। পরিধান উত্তম ধুতি, ভক্তিভাবে করি পুঁথি, শুভক্ষণে করিবে লক্ষণ ক্রিয়া। আর যেবি অন্যান্য লোক, পলাইত কার যোগ, বামা

যেখানে কবিরা বৈদ্য জাতিকে লইয়া হাস্য করিয়াছেন সেখানে চিত্রকারেরাই বা ছাড়িবেন কেন? সমুদয় ভূয়োদর্শনে অঙ্কিত কয়েকখানি ছবিতে বৈদ্যের যে মূর্তি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ব্যঙ্গ-চিত্রের পর্যায়ভুক্ত।

মুকুন্দরাম ও পল্লীগীতিকার বৈদ্যবিদ্রূপ পড়িলে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক সেক্সপিয়রের ছত্রটি মনে পড়ে—"Physicians cure diseases as boat-men bring wind by whistling" (মাঝিরা যেরূপ শিস্ দেয় এবং মনে ভাবে সেই শিসের জোরে বাতাস আসিবে, বৈদ্যগণও সেইরূপ ঔষধের জোরে পীড়া সারাইবার দাবী করেন।)

অযোধ্যার ভূতপূর্ব ইনস্পেক্টর জন্, মি. নেসফিল্ড, এম্ এ (অধুনা প্রলাত "কাই সিষ্টেম" (উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যা বিভাগের) নামক পুস্তকের (১৮৮৫) ৪৮ পৃষ্ঠায় ১০১ অনুচ্ছেদে বৈদ্য জাতির ক্রমে ক্রমে লোপ পাওয়া সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "উত্তর পশ্চিমের বৈদ্যমণ্ডলের অধিকাংশ সেই দেশে মুসলমান চিকিৎসকদের সমধিক প্রতিপত্তি দেখিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন এখনকার লোকসমূহ সম্ভবতঃ সেই সকল বৈদ্যের বংশধর। এ জন্য উক্ত প্রদেশে বৈদ্য নামক কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব নাই।" এ কথা কখনও গ্রাহ্য হয়ে। অন্যান্য দেশে এমন কি বঙ্গ দেশের একান্ত নিকটবর্তী আসামেও বৈদ্যগণ ভিন্নশ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। আসামে তাঁহারা "বেজ বরুয়া" বেজ বরুয়া অর্থ যে বৈদ্য তাহা সকলেই জানেন। একমাত্র বঙ্গদেশেই সামাজিক নিগ্রহবশতঃই তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া আছেন তথাপি বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্রবলে, কর্মকুশলতায়

ছলে মাপয়ে বিষম। ... কপূর পলল করি, হয় বিষহরি পারি, কপূরের করহ সন্ধান। রোগী প্রবিষয়ে বলে, কপূর আনিতে চল, সেই সঙ্গে বধহ পরাণ" (কালকেতুর চণ্ডী)।

"পাছর তিন হাটি যায় যায় সে তাড়াতাড়ি। বিমকড়ি যে মন্ত্র পাইল তার বাড়ী। ঢাক ঢাকিয়া যায় কবিরাজ মাশয়। আমার মা সে প্রথম গর্ভ, তোমার ঘরে হয়। বিমকড়ি কবিরাজ সঙ্গে বুড়ি চাপর লইল। চাপরের বুড়ির মাথা খাওয়াই যাইছা দেল। ছাতে মৈল বাদ লাড়ি, কাছে মৈল ছাড়ি। তুলসী-তলায় সন্ধ্যে দেকাইল তার মাথি। কিছইদ নরীল খা ব ভাল ভাল তার খাও। খাটী খুটী, মাথা মোছা, ঘাটী ঘাটী খাও। কুরকুরিয়া চাল কবিরাজ ভাতরাইয়া খায়। খাস্থ লম্বা কথু আলিত উটা ছোট খায়। মায়ের বাড়ী যাইয়া মৈলে বৈদ্য বিমকড়ি ছেলার মা যে ভাল হবে যাইতে দিব বড়ি। আইলক দিব ছেলের ছাল, আর দিমের পাতার ঝোল। কাইলকা দিব ঘরে কইয়া সন্ধ্যে দিকাইয়া ভাল। পন্থ দিবা লাল বড়িটা কাল্লী দিবা ভুইলা। তথা দিবা নীল বড়িটা কুথায় পাবি তুইলা। ছেলেমাবি দিবা মায় এই ন খায় বড়ি। আরাম হইবে তোমার ন থাকবে না অবজাবি। চন্দন ধানের ছাত দিলাইত পরীর চৌদ্দ ভুল। ধলা বস্তি ন শুকাইলে দিও চৌদ্দুলের অথল। কবিরাজের কথা শুইনা মায় দিল বড়ি। বিষয় চলার সময় হয়, যে ভাল বিমকড়ি। এক কুলা চাউল দিল, চাইল এক ডালা। খাছের খান ভুলে দিল বাজন ঘরিত ভরা। ভালমি দিল লবণ দিল, লটা ভইরা দেল। বিয়াদ দেখে কবিরাজ ন খাছ ভালাই ভালাই খেতে খাল। সন্ধ্যাবেলা বায়ের মা যে চক্ষু মেইলা চাইল। ন অন্ধ ঘর বাসুরে খুইয়া সখো ভইয়া দেল গ" পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ২৯৮-৩০ পৃঃ।

ও উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্তে তাঁহারা শূদ্র স্থান অধিকার করিয়া স্বকীয় আধিপত্য বজায় রাখিয়াছেন।

কান্যকুব্জ হইতে যে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাদের কাল সম্বন্ধেই এই। তাঁহারা যখন আসিয়াছিলেন তখনই তাঁহারা সেই সুদূর অতীত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, তখনকার ইতিহাস কেহ লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সাময়িক ইতিহাস লিখিবার ধারাও তখন প্রচলিত ছিল না। বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলীন্য প্রাপ্ত হইবার পর সম্ভবতঃ ইহারা কুলজী গ্রন্থ-প্রণয়নে নিযুক্ত হন। আদিশূর কিংবা অপর যে কোন রাজার ইঁহাদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন করুন না কেন, সেই রাজা হইতে বল্লাল সেন পর্য্যন্ত ১৫ পুরুষে ৫ শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে। এই অন্তর্বর্ত্তী সময়টার ইতিহাস শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া কুলজী গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এজন্য ঘটীয় ব্রাহ্মণগণের কুলজীর আদি পত্তনটা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শান্ডিল্য গোত্রোদ্ভব উপাধ্যায় যে কয়েক পুরুষের নাম প্রদান করুন ও 'সিদ্ধলক্ষণবর্ত্তী' এই কয়েকটি নামই লোকে স্মরণ রাখে। বল্লাল-সেনের পূর্ব্বের কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত নাম ঠিক আছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নাম ও সেই সকল ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশ শুধু স্মৃতির ভোড়াতালি। তাহার দ্বারা সত্য বিষয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা ও উপন্যাস আলাদা ও বাঁধাবার মত লিখিয়া আছে যখন কৌলীন্য শুধু এক পুরুষের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছিল তখনও কৌলীন্যমর্য্যাদার মূল্য খুব বেশী ছিল না। সমাজ তখন কৌলীন্যের বিরুদ্ধবাদী বহু লোক ছিল বলিয়াই সমাজই কৌলীন্য দ্বারা সমাজ একেবারে উল্টা পাল্টা হইয়া গিয়াছিল এবং বহু লোকের স্বার্থহানি কুলভঙ্গে ও সামাজিক পদের অবনতি ঘটিয়াছিল।

কিন্তু পরে যখন কৌলীন্যের পূর্ণ বিচার আরম্ভ হইল, তখন পঞ্চদশ কুলীনগণের মধ্যে বিষম ক্ষোভ দেখা দিল। সম্ভবতঃ ঘটকেরা লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের পঞ্চদশবর্ষে শ্রোত্রিয়দিগের বিশুদ্ধত্ব নির্ণয় করিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা দানের সময় হইল। রাজা নিজ সভাসদগণ লইয়া নির্ণয় করিলেন। তখনকার কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। দুই চারি বিষয়ের পরীক্ষা দ্বারাও প্রকৃত বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ ঠিক হয় না, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীলতার পরিমাণনির্দ্ধারণকল্পে কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের কৃত নির্ণয় যে খুব নির্দ্দোষ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। এই নির্ণয় হইতে কাহারও উন্নতি হয় নাই। বরং কাহার কোন্ পুরুষ অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহারই আলোচনা হইয়াছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কয়েকঘরমাত্রই ছাড়া বাকী কুলীনেরা পতিত হইয়া সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি কুলীন পতিত হইয়া 'কাপ' নামে খ্যাত হইলেন। বারেন্দ্র মধ্যে কাপত্ব নাই। একবার নির্ণয়কালে ইহাদের মর্য্যাদা পুনঃস্থাপনের কথা হইল, অমনি যাহারা কাপত্ব উন্নতিলাভে অযোগ্য নির্ণীত হইলেন, তাঁহারা ঘোর গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। এই উপলক্ষে অনেকস্থলে শ্রোত্রিয়ে রাজা লক্ষ্মণসেনকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন

বাঙ্গলার কৌলীন্য ও শ্রোত্রিয়ত্বের ইতিহাস

এবং অভিসম্পাত পর্যন্ত করিলেন। লক্ষ্মণসেন বিবেচনা করিলেন যে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত থাকিলে এইরূপ ঘোরতর প্রতারক নির্ব্বাচন উপলক্ষ হইবে। অতএব তিনি নির্ব্বাচনপ্রথা উঠাইয়া দিয়া নিয়ম করিলেন যে, এই অবধি কৌলীন্যমর্য্যাদা বংশানুক্রমিক হইবে এবং পুত্রকন্যার বিবাহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্য্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারিবে, পুনরায় আর নির্ব্বাচন করিয়া মর্য্যাদা প্রদান করা হইবে না।" (১৪ পৃ.) বল্লাল এই কৌলীন্যপ্রতিষ্ঠা দ্বারা সমাজে গুণীর পূজা ও আদরের যে দরজাখানা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এইবার তাহা নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তখন দেশের আচার্য্য গুরুগণ, মুসলমানগণ করে আসিবে, লোকের প্রাণ সংহার করিবে সকল দৃষ্ট করিবে—এই আশঙ্কায় সমস্ত বঙ্গদেশ আতঙ্কিত হইয়াছিল। এই ভীতিদিন সমাজের সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষিকার কুলিয়া যাইবার আশ্রয় লইল। কুলীনগণ তাঁহাদের মর্য্যাদা বংশানুক্রমিক হইল দেখিয়া যাইবার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইলেন। দেশের ভূমিগণও রাজার সহায়তা করিলেন, সুতরাং ইহাও নির্ব্বাচনপ্রথা উঠিয়া গেল। তথাপি এই অনুশাসন আপাতদৃষ্টে তৎকালোচিত সুবন্দোবস্ত বলিতে হইবে।

আভিজাত্য যদিও কুলীনত্বের উপর স্থাপিত, তথাপি ইহাতে যে মনুষ্যকে একেবারে কোনরূপ উন্নতই করে না, তাহা বলা যায় না। অনেক সময়ে ইহা আত্মসম্মানবোধ প্রবল করে, মানুষকে হীন প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করে। পরিব্রাজকপ্রবর প্রকৃতপক্ষে অকৃত্রিম ঘোরতর অদ্বৈতের কথাই তিনি একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথায় এক অতীতিপর বৃদ্ধ বহু কষ্টে এক দূর পল্লী হইতে আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন "প্রভু, আমি আপনার দর্শনকামনায় বাঁচিয়া আছি, আমার জীবনের প্রধান আশা আজ পূর্ণ হইল, আমার শারীরিক অসুস্থতায় ভক্ত বড়ভক্ত যাইতে পারি নাই কিন্তু অদ্বৈতের বংশের বড়ভক্তবাসী কাহাকেও না দেখিয়া যেন আমার মৃত্যু না হয়, বরাবর এই কতক বৎসর যাবৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি আজ আমার সেই কামনা সিদ্ধ হইল।" এই বলিয়া সেই ভক্তাগ্রণী, কতক্ষণের বৃদ্ধ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল তাঁহার পা ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, "আমি বিস্মিত হইলাম, আমার মত পাপী, তাপী, দুর্জ্জন ব্যক্তির শরীরে যে মহাপুরুষের রক্তধারা বহিতেছে, তিনি কত বড় ছিলেন ভাবিয়া আমি প্রকাশ্য মত হইলাম। তাঁহার বংশে জন্মিয়া যদি পাপ করি, তবে আমার মত পাপী আর নাই। সেই ঘটনা হইতে যখনই কোন অন্যায় করিতে যাই তখনই মনে হয় এদেশে শত শত লোক আছেন যাঁহারা আমার দর্শনের দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করিতে লালায়িত, আমার পক্ষে কি অন্যায় করা শোভা পায়।"

এই বহুনিন্দিত কৌলীন্যের জন্য যে কত শত লোক কত ত্যাগ কত দুঃখ বহন করিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে নিজের কুলীনত্বের অভিমানে বংশানুক্রমে শোচনীয় দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়া অপরিমিত-অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের লোভ সংবরণ করিয়াছেন,

তাঁহারা একটু নামিয়া বিবাহাদি করিলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব লুপ্ত হইত না, পরন্তু দাদার আমোদ পরিবর্ত্তন হইত, কিন্তু সেই একটু কলঙ্কের ভয় যাহাতে বংশে না পড়ে তজ্জন্য তাঁহারা রাজপ্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া অনাহারে অত্যাচারে মরা পর্যন্ত কাটাইয়া দিয়াছেন। সম্রাটের সহিত নায়ক করিয়া সেনাপতি বলপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে নিজেকে বৈদ্যসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Ancient Monuments of Bengal" নামক পুস্তকে তিনি ২০০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। এই মতে ভুল, সম্রাট সহ বৈদ্যকুলপঞ্জিকা প্রণেতা কবিকণ্ঠহারের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। তিনি এই বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৯৭ বৎসর পূর্ব্বে রচনা করেন। সম্রাটসহ বলপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে কুলীন বৈদ্যসমাজে বিবাহ দিয়াছিলেন। সম্বন্ধী গোত্রের মহাকুলীন বংশ হেন হইতে সপ্তগ্রাম পর্য্যন্তের ইন্দ্রনাথ সেনের সহিত জোর করিয়া সম্রাটসহ তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই মনোদুঃখে ইন্দ্রনাথ বিবাগী হইয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, আর বাড়ীতে ফিরেন নাই। কণ্ঠহার লিখিয়াছেন "সম্রাটসহ কন্যাপাণিগ্রহণপণ্ডিতঃ ইন্দ্রনাথো নিজকুলাচারদুরন্তমনস্তাপাৎ..." এক অকুলীন বৈদ্য সেনহাটীতে কুলকার্য্য করিতে বাড়ী হইতে এক করিয়া আসিয়া শ্বশুর বহুকাল আটকা করিয়াছিলেন। বহু ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনেও কেহ তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করিতে স্বীকৃত হন নাই। তথাপি তিনি চেষ্টা ছাড়েন নাই। কথিত আছে, তিনি ত্রিবেণীর কূলে প্রথম আসিয়া যে অশ্বত্থ বৃক্ষের চারা পুঁতিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে বড় হইলে যখন ছায়াপ্রদায়ী বিশাল হইতে পরিণত হইয়াছিল, তার ৩৪ পুরুষ পরে তদাকার একঘর বৈদ্য তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কুলীন মকরন্দ ঘোষের বংশীয় কপনারায়ণ নিজ বাসভূমি যশোহর ছাড়িয়া মালিকাপাড়া ঢাকা, আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র জগন্নাথ ও বাণীনাথের মধ্যে কে কাহার সঙ্গে 'কর' উপাধিক জমিদার মহাশয় দুই কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হন নাই। তখন জমিদারের আদেশে দুই ভ্রাতা পদ্মাগর্ভস্থ দ্বীপে নীত হইলেন। তাঁহাদিগকে বলা হইল, যদি তাঁহারা জমিদারের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন, তাঁহাদিগকে পদ্মায় ডুবাইয়া মারিয়া ফেলা হইবে। এই সঙ্কটে বাণীনাথের সহর অটল রহিল। তিনি কিছুতেই কুল ভাঙ্গাইয়া করের কন্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। বল্লাল বীর পদ্মাগর্ভে বীরের মতই প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন—তথাপি অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। জগন্নাথ অনেক অর্থসম্পত্তি পাইয়া জমিদারের এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এই ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঘটিয়াছিল (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ৪৬৮-৬৯ পৃঃ)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কৌলীন্য কতক পরিমাণে হীনপ্রভ হইলেও নিজের ঘরে নামিয়া বিবাহ করিলে জাতিচ্যুত হইতে হয় না। তথাপি কুলীনেরা যেরূপ প্রলোভন এবং ভয়প্রদর্শন এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া কৌলীন্য রক্ষার্থে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতে

আভিজাত্যাভিমানে অন্ধসম্মানলাভে ইহাদের মধ্যে খুবই বিকার দাঁড়াইয়াছিল যে কৌলীন্য লোককে একটা ভ্রান্ত ধারণার প্রশ্রয় করিত তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কতকগুলি নৈতিক গুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে? ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিষ্কর্ম কুলীনগণ যে স্বীয় কুল নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য কত ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র স্বীকার করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে।

কুলীনের প্রধান কলঙ্ক বহুবিবাহ এই বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিস্তৃত হইয়াছে ইহার গতটা বাড়াবাড়ি এই কুলীন সমাজে হইয়াছিল সে ভাব কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না

বহু-বিবাহ।

অর্থাভিলাষে বৃদ্ধের হস্তে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে দান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা কুলীন সমাজেই বেশী দেখা যাইত কিন্তু বালক স্বামীরা একশত দুইশত এমন কি চারিশত বিবাহ করিয়াছেন এরূপও শুনা যায় কাহার কাহার মেয়ে কে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা অনেক সময়েই মনে থাকিত না এজন্য কুলীন স্বামীরা একটা গাঁট সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন সেই কন্যা দেখিয়া ১০ বৎসর পরে অনেক সময় শ্বশুরালয়েও অনেক বেশী সময় পাবে—শ্বশুরবাড়ী বসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতেন তজ্জন্যও শ্বশুর মহাশয়কে অনেক টাকা দিতে হইত কোন কোন সময়ে জামাতা মহাশয়ের অর্থাগাম হবে শ্বশুর মহাশয় মিটাইতে না পারিলে সেই চির বিরহদুঃখিনী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করিয়াই স্বামী তারাবোগি করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন কুলীন সমাজে এই সকল ব্যভিচার প্রচলিত ছিল আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দুদের কৌলীন্য প্রথা সুপ্রসিদ্ধ বাকউড সাহেব এবং ফুলন-বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বার্নার্ড শ সাহেব সমর্থন করিয়া টাইমস পত্রিকায় অনেক চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন হিউলি সাহেবের People of India ভারতের অধিবাসিগণ নামক পুস্তকের ৮ম উপক্রমণিকায় তাহা মুদ্রিত হইয়াছে টাইমস পত্রিকায় ১৯০৭ খৃঃ অব্দে সার জর্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন—"আমরা জানি হিন্দুর কালীন্য অবিচারের একটা রহস্য-পূর্ণ দৃষ্টান্ত কিন্তু হিন্দুদের কাছে ইহা একটি স্বর্গীয় ব্যাপার যে পর্য্যন্ত তাহারা ইহা বিবেক-সম্মত ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া গণ্য করে, সে পর্য্যন্ত ইহাতে তাহাদের নৈতিক অবনতির

সার জর্জ বার্ডউডের মত।

কোন আশঙ্কাই নাই - কুলীনেরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক—এই কুলীন শব্দ একটা সম্মানজনক উপাধি, ইংরাজীতে সম্মানিত (Honourable) অথবা মহাসম্মানিত (Right Honourable) বলিতে যাহা বুঝায় কুলীন শব্দে তাহাই বুঝায় এই কুলীনদের চেহারা প্রায়ই সুশ্রী, ইহার কারণ বহু বিবাহের ফলে মানুষ অনেক সময় তত্তটা ইন্দ্রিয়াসক্ত হয় না, একজন ব্যক্তিদের মধ্যে যতটা দেখা যায়, কুলীনদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী না জানিলেও সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ইহারা সকলেই শুদ্ধাচার এবং প্রাচীন হিন্দু চরিত্রের আদর্শ রক্ষা করেন এবং সর্ব্বদাই সঙ্গী হিসাবে ইহারা অতি প্রিয় এবং আনন্দদায়ক"

টাইমস্ পত্রিকায় বার্নার্ড শ লিখিয়াছিলেন—"ইংরেজী শিক্ষামাত্রা তাঁহাদের সামাজিক যত সুবিধা আছে তাহার মধ্যে স্বীয় দুহিতাদিগকে অবাধভাবে ছাড়িয়া দিয়া স্বীয়

শ্রেণীর যুবকদিগের [illegible] উদ্দেশ্য এই যে কাহারও সহিত [illegible] এই প্রকারে কথার বিবাহ হইয়া যায় তবেই মঙ্গল [illegible] কিন্তু অনেক বর বয়স পর্যন্ত কুমারী পরিবার থাকে তাহাদের মাতৃত্বের [illegible] হওয়াতে [illegible] ও চরিত্রবলের সম্ভাবনার [illegible] হয় [illegible] কোন মেয়ে স্বামী লাভ করিল কিনা অনেক সময়েই [illegible] একথা অনেকে [illegible] তাহার সম্বন্ধে এই শিক্ষা যে সন্তান হওয়াটা মানব জীবনের পরম [illegible] মেয়েরা সন্তান পোষণটাকে গার্হস্থ্যকর্মের কিছু মনে করেন না তাঁহারা স্বামীকে লইয়াই গৌরব করেন সুতরাং সন্তানহীনা রমণী স্বামীহীনা সন্তানবতী মাত্রাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন

"সেই তরুণী বিলাসসুখের কথা স্মরণ হইলে বাঙ্গালী বিধবা তুলা অবস্থায় পড়িয়া কি করেন? তিনি যদিও একজন ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মিয়াছেন [illegible] ব্রাহ্মণ চরিত্রগুণে শিক্ষা দীক্ষায় সমাজে আদর্শ [illegible] সেই বলিয়া [illegible] উপাদানের মেল ফলে তাঁহার কন্যা উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রসূতি হন।

"হয়ত অনেক ইংরেজ এই ব্যাপারটাকে 'ভণ্ডামি' 'মিথ্যাচার' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া নিন্দা করেন কথাটা কি সত্যই একটা কুসংস্কার? আমার ত মনে হয় ইহা অসঙ্গত নহে, নিষ্ঠুরও নহে এই প্রথা রক্ষা করায় কোন আশঙ্কা নাই পরন্তু ইহাতে ইহা উন্নতির পথে প্রবর্তিত করিতে সহায়তা করে সার জন উডরফ পত্রিকায় স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে অনেক সময়েই কুলীনের মুখ ও চেহারা খুব সুন্দর ও সুগঠিত সার জন অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, আমাদের সামাজিক রীতির ফলস্বরূপ যে সকল সন্তান হয় তাহাদের চেহারা সুন্দর ও সুগঠিত হয় না ইহা কি মনে করিতে হইবে যে এইরূপ ভাবে কাজ আকর্ষিত এবং হৈমবতীন বরঞ্চ ইহা কি অধিকতর সম্ভব নয় যে সমাজের প্রচলিত প্রথা [illegible] তাহাতে ইহার বেশী কিছু প্রত্যাশা করা যায় না যেখানে লোকে দৃঢ় সঙ্কল্পের উপর ভাবে মানুষের শারীরিক গঠনের উন্নতি করে তাহা কি ইংরেজ জাতি বিলক্ষণ মনে করিয়া তাঁহাদের কুসংস্কারগুলির উপর বেশী জোর দিবেন? এখন সমস্যা সমস্যাটি এই যে আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি লোককে শারীরিক পূর্ণতা দেওয়ার উপায় কি? উৎকৃষ্ট মানুষ সৃষ্টি করিবার পক্ষে বর্তমান বীতি কার্যকরী হয় নাই, এখন কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাতীয় প্রত্যেক নবনারীকে পুষ্ট সুগঠিত দেহের অধিকারী করা যাইতে পারে? অপর দেশে, যেখানে আমাদের কুসংস্কারগুলি নাই, সেখানে যদি লোকেরা অন্যরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে তবে সতীত্ব, পবিত্রতা, উচিত্য ইত্যাদি নানারূপ গুরুতর ধরিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করা কি আমাদের উচিত? একজন ব্রাহ্মণ যিনি এক শত বিবাহ করিয়া এক শত সন্তান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে কি চরিত্রহীন স্পষ্ট বলিতে হইবে? ত্রিশবৎসর বয়স্ক একটি অবিবাহিত লোকের এক শত ছেলে থাকিতে পারে,

পাল, সেন ও চন্দ্রবংশের সম্বন্ধ-বিচার।

আমরা জয় সেন বিশ্বাসের কুলজীতে লিখিত পূর্ব ও সেন বংশ সংক্রান্ত আর দুই একটি কথা বলিয়া হিন্দু-রাজত্বের উপসংহার করিব। উক্ত কুলজীতে পূর্ব বংশধরদের ইতিহাস এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের পূর্বপুরুষ শালবানে প্রথম গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হন। শালবানের বংশে ১। প্রতাপ চন্দ্র ২। [illegible] ৩ লক্ষ্মীনারায়ণ, ইনিই প্রথমে পূর্ব উপাধি ধারণ করিয়া অরিপূর নামে পরিচিত হন। ইনি বেদ-বিজয়-পূর্বক পঞ্চ সার্দ্ধিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, "ইহারা জন্ম শতুচন্দ্রাহ্নিকে থাকে" (৮১৩) এবং সিংহাসনে আরোহণের সময় "বেদস্তুতি পাঠে" (৮৬৯) ইহার চারিজন প্রধান মন্ত্রীর নাম, সুমতি গুপ্ত, বুধ সেন, কবি দাস ও শাকুধর। ৪ দশরথের পুত্রের নাম ৫ বিমল, উপাধি ক্ষত্রিয় প্রধান মন্ত্রী ঋষি চন্দ্রশেখর, বুধ সেনের পুত্র। ইনি ১৪টি ভাষা জানিতেন। বিমলের পুত্র ৫। কুমার সেন, উপাধি ক্ষিতি পূর, ইহার প্রধান মন্ত্রী বিশ্বনাথ ১৮টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কুমার [illegible] পুত্র ৬ মুকুন্দ সেন বা ধরা পূর। মুকুন্দের দুই পুত্র ৭ বলরাম উপাধি [illegible] পুত্র ৮। গোবিন্দ—উপাধি বঙ্গেশ্বর পূর। এই দুই ভাই "চোলেন পরাজিতে [illegible] চোলেশ্বর পরাজিতে পুনঃ রাজ্যাধিক বলে।" এখানে [illegible] রেখ করা হইয়াছে। এই প্রদ্যুম্ন [illegible] পূর, বঙ্গেশ্বর বিখ্যাত প্রত্ন [illegible]। "বঙ্গেশ দৃষ্টভেদাখ্য প্রদ্যুম্নেশ্বর মান্দরং" - খুব সম্ভব এই মন্দিরের [illegible] নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন বিজয় সেন স্বীয় নামের সহিত ইহা জড়িত করিয়াছেন। [illegible] রাজের প্রশস্তিতে বিজয় সেনই উহার স্থাপয়িতা বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছেন। প্রদ্যুম্ন বা অরিপূরের পুত্র ৯ গদাধর—উপাধি অরিপূর, ইনি "কৈবর্ত্ত রাজ দিবোক [illegible] বিতাড়িত" সুতরাং কতক দিন পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্য কৈবর্ত্তদের অধীন থাকে। হতাশ্বাস—পূর্ববঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, এবং তাহা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হইয়া দুইজন শাসন কর্ত্তার অধীন হয়, ইহাদের নাম জাত বর্ম্মা ও ত্রৈলোক্যচন্দ্র। এই দুই শাসনকর্ত্তা প্রথমতঃ কৈবর্ত্তদের ভয়ে বিগ্রহ পালের অধীন হইয়া "সামন্ত রাজা" বলিয়া পরিচিত হন, তৎপরে স্বাধীন হইয়া বৃহৎ রাজ্যের স্বাধীন ভূপতিরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য পাল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ১০ অরিপূরের পুত্র, চক্রধর—উপাধি নরপূর, ইনি অপারমন্দারের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ গিরিধরের কন্যা বিলাসদেবীকে বিজয় সেন বিবাহ করেন।

জয় সেন বিশ্বাসের কুলজী হইতে পূর্বেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, এবারও তাহার একটি অংশের সারোদ্ধার করিলাম। এই পুস্তকের ঐতিহ্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন মন্তব্য প্রকাশের এখনও সময় হয় নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

'Uneasy rests the head that wears the Crown

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠান-রাজত্ব

নদীয়া জয় করিয়া মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার যে সকল স্থানে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইদিলপুর অভিমুখে প্রেরিত সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন মহম্মদ ইবন বক্তিয়ারের সহচর ... সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। ইবন ... গৌড়ের এদিক্ সেদিক্ লুণ্ঠন করিয়া ... মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসী ... করেন এবং তাহাকে আটক ... সকল সৈন্য লইয়া তিব্বত জয়ের জন্য রওনা হন। পথে ... এই নদীর কূল ধরিয়া চলিলে ... পাশ। এই সরু রাস্তাটি ... হইয়া চলিলেন ... কষ্ট পাইয়াছিলেন, ক্রমাগত ১৬ দিন ... একটি স্থান ... ৫০,০০০ তুরুষ সৈন্য বিশ্রাম করে, তথায় বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন এবং তাঁহারা বলেন যে অনেক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুদেব কোচ বিদ্রোহের একটা কারণ ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা আধুনিক বিশ্বকর্ম্মপুর কোচবিহার জেলার মেক মহাদেবের ঘাঁটি মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার ভয় পাইয়া অগ্রসর হইলেন না—ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন খাদ্যের ভয়ানক কষ্ট হইল। শত্রুরা সমস্ত ক্ষেত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল সৈন্যগণ ঘোড়া মারিয়া সেই মাংস খাইতে লাগিল। ইবন বক্তিয়ার কয়েকজন ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার রক্ষকগণ ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শত্রুরা বেগতিক দেখিয়া সেই বিশাল খাদের নিম্নস্থ সেতুর দুইটি থাম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে তিনি নিকটবর্ত্তী এক দেবমন্দির আক্রমণ করেন সেখানে দুই তিন হাজার ধন অর্থনির্ম্মিত দেবপ্রতিমা ছিল শত্রুদেহীত হইল তিনি ঐ মন্দিরে বন্দীর মত হইয়া রহিলেন, বহুকষ্টে তাঁহার সৈন্যগণ প্রাচীরের একদিক ভাঙ্গিয়া একটি ফাঁক করিয়া পড়িল। তীরভূমি হইতে শত্রুরা তখন তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিতে লাগিল মুসলমান বীর বহুকষ্টে অতি অল্পসংখ্যক পরিকর লইয়া রক্ষা পাইলেন এবং আলি মেচের সাহায্যে

মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিজির শেষজীবন।

দেবকোটে উপস্থিত হইলেন। ইলদ তিনি পরাজিত হইয়া পড়েন এবং ১২০৫ খৃষ্টাব্দে

মৃত্যু ১২০৫ খৃঃ। প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন মহঃ ইঃ বখ্তিয়ারের অধীন কোনো কোনো স্থানের শাসনকর্তা অলিমর্দন খিলজি সুবিধা পাইয়া বোগদাদাধিপতি সুলতানকে নিজের করেন। মহম্মদকে সৈন্যক্ষয়ের জন্য তাঁহার প্রতি তাঁহার দলের লোকের আর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি নিঃসহায় ও বান্ধবহীন অবস্থায় দুর্গান্তর চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্বের দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়া আলেয়ার আলোর মত যে স্বল্পস্থায়ী যশঃপ্রভা তাঁহাকে গৌরব দান করিয়াছিল তাহার বিনিময়ে তিনি কি লাভ করিলেন? পার্শ্বস্থ প্রদেশে অশেষ বিড়ম্বনা, পরাজয়জনিত লাঞ্ছনা, স্বজনবিচ্ছেদ ও অকালমৃত্যু। মহঃ ই বখ্তিয়ার দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ মুসলমানাধিকৃত হয় নাই। এমন কি নদীয়াকে বিজয় করা কঠিন হইয়াছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ কেশবসেন লক্ষ্মণের পুত্র রাজা শাসন করিতেছিলেন এবং মুসলমানদের হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতে না পারিয়া পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া সেনবংশ এবং আরও এক শতাব্দী ঐ স্থানে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তবে কোন সময়ে সেন রাজার হাত হইতে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ মুসলমানেরা অধিকার করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

মহঃ ইঃ বখ্তিয়ার খিলজির মৃত্যুর পর মহম্মদ শিরান নামক তাঁহার একজন সেনানায়ক তাঁহার স্থানে নিজেকে প্রচার করেন। ইনি বখ্তিয়ারের ন্যায় দুর্দান্ত ছিলেন না। ইনি একেই অশ্বারোহণপূর্বক লক্ষ্মণাবতীর নিকট কোন স্থানে একটি হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরেরা সেই সময়ে ইঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে ইঁহার বাসভবন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল।

মহম্মদ শিরান ১২০৫-১২০৮ খৃঃ। প্রভুর মৃত্যুর পর সৈন্যগণ ও সেনানায়কেরা একত্র হইয়া মহম্মদ শিরানকে রাজপদে প্রবৃত্ত করেন। রাজা হইয়া তিনি প্রথমেই পাণ্ডুয়ার কারাগৃহে অলিমর্দনকে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারারক্ষকের দুই কিয়া অলিমর্দন পলাইয়া মুক্তিলাভপূর্বক দিল্লী যাইয়া কুতুবুদ্দিনের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কুতুবুদ্দিন এই সময়ে সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি গঠিতবার প্রয়াসী হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্তা কারমাক তোমরকে পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ বিগ্রহের ভার প্রদান করেন। গঙ্গোত্রীর শাসনকর্তা সম্রাট্-সৈন্যদের সহযোগিতা করিয়া দেবকোটের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। অপর অপর সেনানায়কেরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করিয়া কারমাক তোমরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া কুচবিহারের দিকে পলায়নপর হন। ইঁহাদের মধ্যে আলিমর্দন উপস্থিত হয় মহম্মদ শিরান এই কলহের ফলে নিহত হন। মহম্মদ শিরান ১২০৪ হইতে ১২০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কুতুবুদ্দিন দিল্লীশ্বর ছিলেন ১২০৫-১২১০ খৃঃ। কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

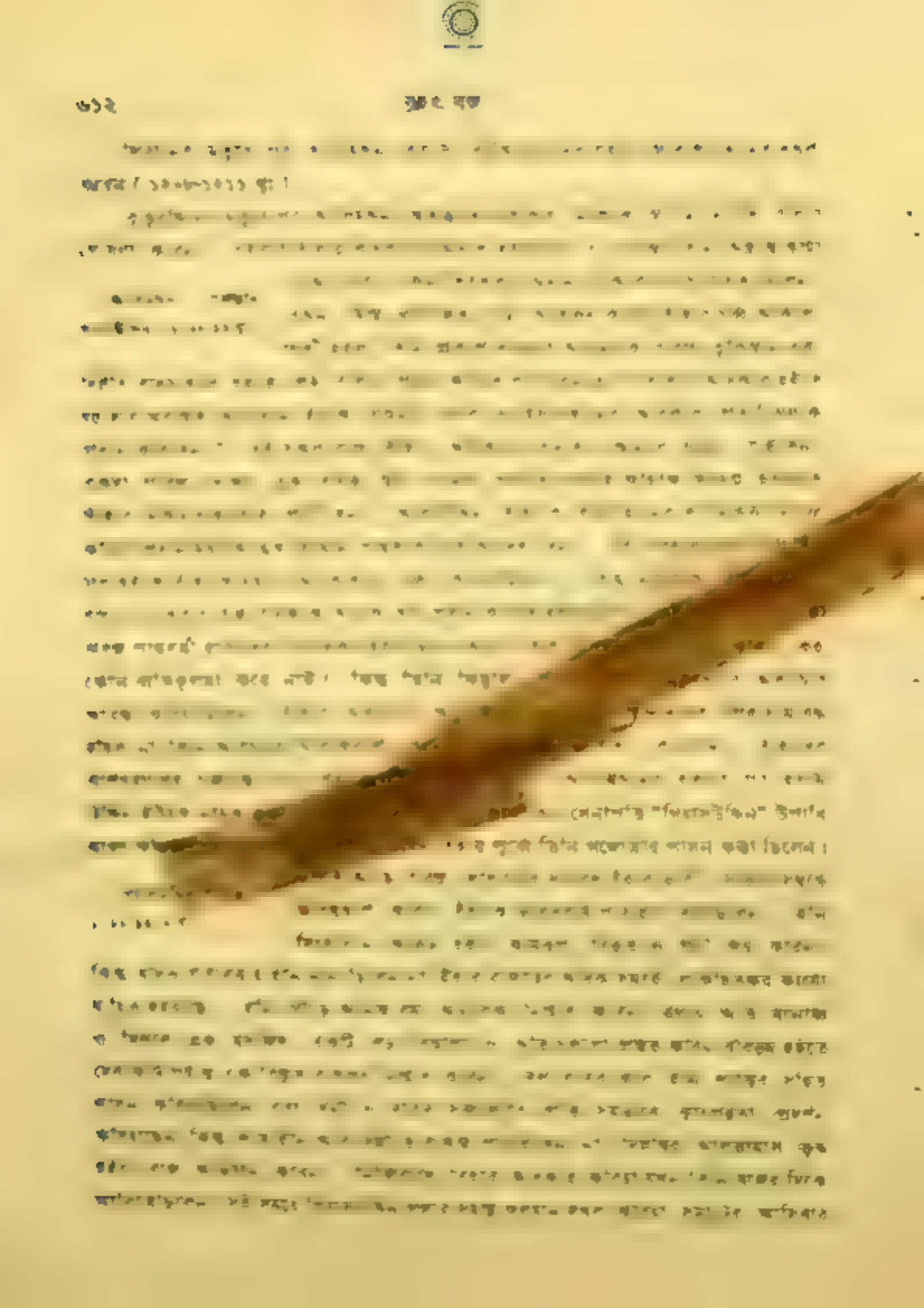

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ মৃত্যু হয়

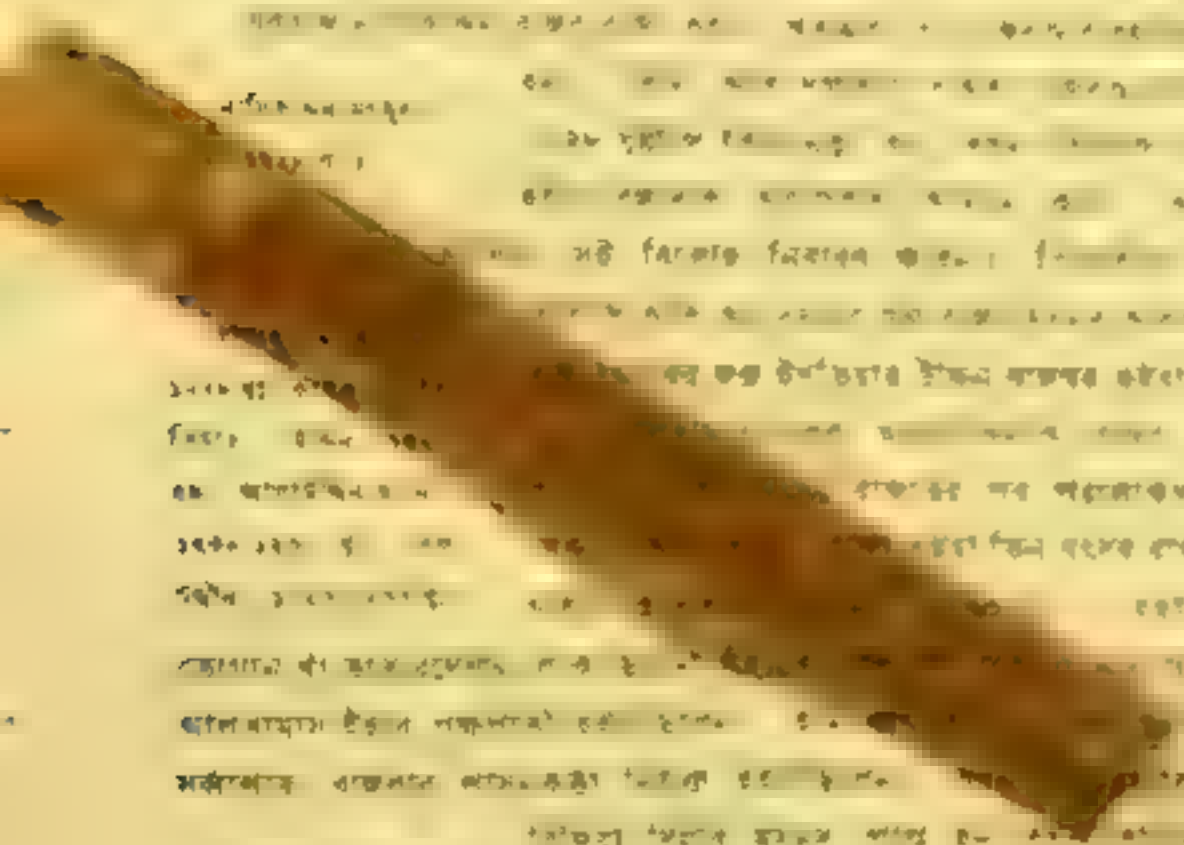

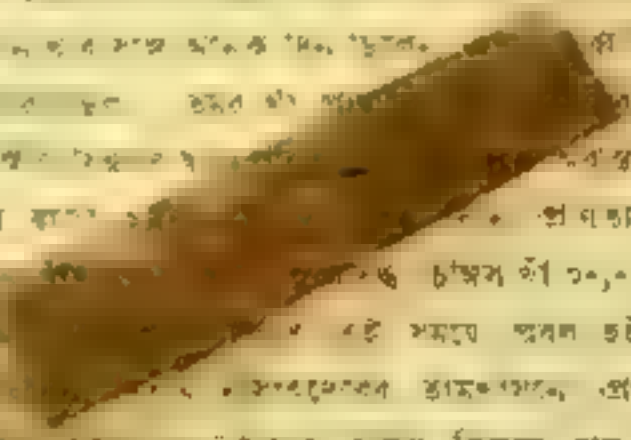

এলাহাবাদ দুর্গ
ইকবাল নামা ১৬৫৭
১২৯৯ খৃ.

মুঘল দুর্গের মূল
ইকবাল ১২৯৯ ২৩০ খৃ.

বাদশাহ এবং সম্রাট মুগীসউদ্দিন উপাধিধারণপূর্বক নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরে তিনি অযোধ্যা জয়ের অভিলাষ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কামরূপ পতি পরাস্ত হইলে ইনি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। তৎপরে কামরূপের রাজা মুগীসউদ্দিনের অধীনতা স্বীকারপূর্বক তাঁহাকে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, পরন্তু বঙ্গেশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রা নিজরাজ্যে চালাইতেও স্বীকৃত হন। কিন্তু বিজয়ী মুগীসউদ্দিন এই সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হিন্দুর পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা তিনি অনেক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করিতে সুবিধা পাইলেন, একটি মাত্র দুর্গ হইতে অন্য দুর্গে সংবাদ প্রেরণ করিতে তাঁহার সৈন্যগণ সমর্থ হইল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না। কখনও পরাজিত হইয়া এই পর্য্যন্ত বলিতেন যে, পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আসিব। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা মধুর হইলেও তাঁহার সৈন্যগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইত না। [১২৫৮ খৃঃ।]

[illegible] আসলন সহসা এক বিপুল বাহিনী লইয়া [illegible] আক্রমণ করেন, জালালুদ্দিন নিহত হন (১২৫৮ খৃঃ)

[illegible] ১২৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু [illegible] এই সময়ের মধ্যে ইউজ্জিন বলখন নামক আর একজন বঙ্গেশ্বরের নাম [illegible]

[illegible] ১২৫৯ খৃঃ

[illegible] ছাড়া ৬৩টি হস্তী এবং বহু অর্থ প্রাপ্তস্বরূপ পাইয়াছিলেন। মুগীসউদ্দিন তাঁহার রাজত্বের সূচনায় এই প্রচুর ধনরাশি পাইয়া তাহা দ্বারা একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। মাধবের খাঁ ১২৫৯ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন।

তাতার খাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত হুগলী বিশ্বস্ত ও পরে অনুচর তাহাদের বঙ্গের অধিকার প্রদান করেন। তাহারা বিদ্রোহাচরণ না করিয়া ইচ্ছামত আক্রমণ করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নিজকে স্বাধীন ঘোষণা করেন, মাধব করেন এবং ইহাও প্রচার করেন

* বাখরবাদ তাহার ঐতিহাসিক ঘটনা [illegible] এই দুই ব্যক্তির মধ্যে এক বোধে ১২৫৯ খৃঃ হইতে ১২৭৮ খৃঃ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের রাজত্বের কাল উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সম্রাট বেলিনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের এই অকৃতজ্ঞতা ও দুর্ব্যবহারে, একান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি পীড়িত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ না রটে এই জন্য নিজ রাজধানীতে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিতে লাগিলেন এবং ভোগেলকে চিঠি লিখিলেন। ভোগেল মহীসুদ্দিন প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিয়া স্বাধীন নৃপতি হইয়াছেন, তিনি সে চিঠি উপেক্ষা করিলেন। সম্রাট শাহজাদার বিরুদ্ধে দুইবার দুইজন সেনাপতি পাঠাইলেন কিন্তু দুবারই মহীসুদ্দিন তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। সম্রাট স্বয়ং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে কতকটা সময় পাইয়া কতকটা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিপুল বাহিনী লইয়া মুঙ্গেরের অভিমুখে চলিলেন। সম্রাট চলিয়া গেলে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন, এই আশঙ্কা ছিল। সম্রাট গোড়ে ফিরোজ্‌খাঁকে নায়ক সেনাপতিকে বঙ্গের রাজধানীর রক্ষার ভার দিয়া মহীসুদ্দিনকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ভোগেল বিনা যুদ্ধে সম্রাটকে পথ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন না। যে দিকে যাইবেন সেই দিকেই তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। তিনি বহু চেষ্টার পর গুপ্তচরদিগের মুখে সংবাদ পাইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। [illegible] আড়িয়াদহে স্বর্ণগ্রামের সন্নিকট হয়, তাহার অনেক সাহায্য করিয়াছিল। [illegible] তাহাদের তন্ত্রী ও যন্ত্রসঙ্গীত শুনিয়া [illegible] প্রসাদপুরের মহিলা ও শিল্পকলার বিশেষজ্ঞ [illegible] নাম। সম্রাটের সৈন্যগণ [illegible] সকলেই নিহত হইল। [illegible] মহীসুদ্দিন বন্দী হইলেন। [illegible] ১২৮০ খৃঃ

মাসিকফিন বাদশাহী ১২৮২-৯০ খৃঃ

সম্রাট অত্যন্ত বিচলিত হইয়া [illegible] বৃদ্ধ ভোগেলকে ডাকাইয়া [illegible] তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকাইয়া [illegible] কোতোয়াল নিযুক্ত করিয়াছি যদিও মহম্মদের পুত্র খসরুই এই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তথাপি সে আমার অজ্ঞাতসারে এত বড় রাজ্যের ভার সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। আপাতত বঙ্গের শাসনের ভার অপর কাহারও উপর দিয়া তুমি কতক দিন এইখানেই থাক। আমি বেশীদিন বাঁচিব না। তুমি একটা ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিও।"

কিন্তু সম্রাট একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিলেন। মাসিকফিনের আর দিল্লীতে থাকিতে ভাল লাগিল না। রাজ্যের ভার গ্রহণ করিবে এই মনে স্থির করিয়া মৃগয়ার ছল করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পুত্রের এই ব্যবহারে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মহম্মদের পুত্র খসরুকে আনাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী পদে নির্দ্দিষ্ট করিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকে গমন করিলেন (১২৮৬ খৃঃ)।

খসরু আইনতঃ উত্তরাধিকারী হইলেও শাহীর অমাত্যেরা তাঁহার দাবী উপেক্ষা করিয়া বঙ্গেশ্বর নসিরুদ্দিনের অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এই বালক কুমন্ত্রীদের হাতে পড়িয়া বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন মালিকমুদ্দিন নামক মন্ত্রীই সর্বেসর্বা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা মন্ত্রীর কুপরামর্শে অতি নিষ্ঠুরভাবে খসরু ও কয়েকজন মন্ত্রীকে হত্যা করেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান রাজগণ

পুত্র সম্রাট হওয়াতে নসিরুদ্দিন আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন নবীন সম্রাটের চরিত্রে অধঃপতন হইয়েছে, তখন তিনি তাহাকে অনেক সদুপদেশ ও মিষ্ট ভর্ৎসনা দিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন তিনি দুই মন্ত্রী মালিকুদ্দিনকে বিদায় করিয়া দিতে পুত্রকে অনুরোধ করিলেন ,সুদিন সম্রাট কিলখারী নামক স্থানে এক নবনির্ম্মিত সিলাগারে আমোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন তিনি পিতার চিঠি উপেক্ষা করিলেন। বঙ্গেশ্বর এক বিপুলবাহিনী লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিয়া রাজশাসনের আমূল সংস্কার করিতে ইচ্ছুক হইলেন এদিকে পুত্র কায়কোবাদও পিতৃভর্ৎসনায় বিরক্ত হইয়া এবং মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে সৈন্যসামন্ত লইয়া বাঙ্গলার দিকে অভিযান করিলেন ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পিতা ও পুত্রের সৈন্যেরা অযোধ্যার নিকটে প্রায় মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গেশ্বর স্বীয় শিবির সরযূ নদীর তীরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের শিবির ছিল গোগরা নদীর তীরে। এই দুইটি স্থানই বিহারে আরন জেলার অন্তর্গত।

নসিরুদ্দিন ও কায়কোবাদ।

নসিরুদ্দিন দেখিলেন তিনি সম্রাটের বিশাল সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া উঠিতে পারিবেন না তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু অভিমানান্ধ পুত্র মন্ত্রীর প্রবঞ্চনায় সেই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন তিন দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল চতুর্থ দিন নসিরুদ্দিন নিজ হস্তে সম্রাটকে এইভাবে একখানি চিঠি লিখিলেন, "পরমাধিকেষু তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিবার একান্ত ইচ্ছা। জেকবের মৃত্যুকালে পুত্র ,জোসেফকে দেখিবার জন্য তাঁহার যেরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল ,তাহাকে দেখার সাধ আমার তদপেক্ষা কম নহে আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধটি পালন কর ইহার পর আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিব না এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিব না।"

এই পত্র পড়িয়া কায়কোবাদ নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি লোকজন না লইয়া একাকী তখনই তাঁহার পিতৃসকাশে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী তাঁহার স্নেহের আধিক্য কমাইয়া দিলেন এবং বুঝাইলেন, তিনি সমস্ত হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্ঞী বা সম্রাট্। তাঁহার পক্ষে নিরস্ত্র এক বাজার কাছে ছুটিয়া যাওয়া কেন তিনি পিতা—এ-ভাবে যাইয়া প্রথমে সাক্ষাৎ করা তাঁহার পক্ষে শোভনীয় ব্যাপার হইবে না।

শেষে এই স্থির হইল যে দুই পক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থলে কোন স্থানে বঙ্গেশ্বর সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্‌কে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। জ্যোতিষীরা শুভ দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া দিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হইল। সম্রাট্ বহু আড়ম্বরের সঙ্গে সৈন্যসামন্তের ঘটা করিয়া নেতৃত্বানীয়দের সহিত হইয়া শিবির ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পিতা সসম্মানে পার হইয়া পুত্রের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সিংহাসন গৃহ দেখিতে পাইলেন তখন একবার কুর্নিস করিয়া অভিবাদন করিলেন আরো একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয়বার কুর্নিস ও অভিবাদন করিলেন এবং যখন একেবারে সিংহাসনের সামনে আসিয়া পড়িলেন, তখন তৃতীয়বার কুর্নিস করিতে উদ্যত হইলেন। পিতার এই দীনতা ও হীনতা দেখিয়া পুত্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিলেন। এই ক্ষণ বিলম্বের পরে পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ সেখানে বসিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। পিতাকে সিংহাসনে বসিতে বাধ্য করিলেন এবং নিজে অতি সম্ভ্রমের সহিত সিংহাসনের নিম্নে একটি স্থানে উপবেশন করিলেন। এই ঘটনায় রাজার কিঙ্করোক্তরী সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। কয়েক দিন পর্যন্ত সুখ আনন্দোৎসব চলিল। বাদ্য ও আতসের ঘটায় আকাশ প্রদীপ্ত হইল এবং রাজার সঙ্গে সমান প্রধান আমীরগণ দেখা সাক্ষাৎ করিয়া মহাপুরুষ সময় কাটাইলেন।

সিংহাসন চিত্রন ১২৮৮ খৃঃ।

ইহার পর উভয় পক্ষের সন্ধি হওয়ার কোন বাধাই রহিল না। নসিরুদ্দিন বঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির স্বাধীন নৃপতি হইলেন, কিন্তু দিল্লীর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এই সর্ত্ত হইল। ১২৮৮ খৃঃ এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিদায়ের সময় নসিরুদ্দিন পুত্রকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে অধিনস্থে নিযুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। পরস্পর আলিঙ্গনাদির পর অতি স্নেহের সহিত বিদায়ের উপক্রম হইল। পিতাপুত্র পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই ঘটনার পর নসিরুদ্দিন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বন্ধুদিগকে বলিতেন—হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী ও তাঁহার পুত্র উভয়কেই তিনি শীঘ্র হারাইবেন। তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল, কারণ এক বৎসর পরে ১২৮৯ খৃঃ কায়কোবাদ খিলিজিবংশীয় এক আমীর কর্তৃক গোপনে নিহত হইলেন।

ফিরোজশাহী খিলিজি ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হইয়া নসিরুদ্দিনকে বঙ্গের মসনদে বহাল

রাখিলেন। তৎপরে আলাউদ্দিনের সমর্থক কতকদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্রাটের খামখেয়ালির ভাবশেষে তিনি আকৃষ্ট হন। তিনি স্বেচ্ছায় রাজের মসনদ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র লক্ষ্ণাবতীর অঞ্চল নিজ অধিকারে রাখেন। আলাউদ্দিন পুরস্কারের জন্য বাহাদুর খাঁকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, সোণারগাঁয়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। মোবারক শাহ সম্রাট হইলে (১৩১৭ খৃঃ) বাহাদুর বিদ্রোহী হন। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঘোরলক শাহাদুরকে দমন করিয়া পুনরায় নসিরুদ্দিনকে বঙ্গের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন লেখকের মতে দ্বিতীয় বার নসিরুদ্দিন রাজত্ব করেন নাই তখন রাজা ছিলেন রুকনুদ্দিন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নসিরুদ্দিনের পরে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শাসনকেন্দ্র লক্ষ্ণাবতী ও সুবর্ণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালাদেশ নসিরুদ্দিনের পর এই কয়েকজন নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন রুকনুদ্দিন কৈকাউস খাঁ (১২৯৯-১৩০২ খৃঃ), শমসুদ্দিন ফিরোজ খাঁ (১৩০২-১৩২২ খৃঃ) নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম খাঁ (১৩১৪-১৩২৪ খৃঃ) ইঁহা লক্ষ্ণাবতীস্থ শমসুদ্দিন ফিরোজ খাঁর সমকালেই রাজত্ব করিতেছিলেন), গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর খাঁ (১৩১৫-১৩৩৭ খৃঃ) শেষোক্ত দুইজন নবাব ফিরোজ খাঁর পুত্র। গিয়াসুদ্দিনের প্রকৃত নিজামুদ্দিন রূপে পাওয়া যায় "প্রভু নিজামুদ্দিন সুলতান" ফিরোজ খাঁর রাজত্বকালে ভিক্ষুর প্রাচীন একটি পাষাণ ফলক কতকটা রূপান্তরিত করিয়া, সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁ গাজী ও সদরুদ্দিনের সমাধিস্থলে সংরক্ষিত নির্দ্দিষ্ট করেন (১২২৮ খৃঃ) এই জাফর খাঁর সুপরিচিত গাজীপীর অনেকেই জানেন এই পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর বহরমখাঁন সোণারগাঁয়ের এবং রুকন খাঁ লক্ষ্ণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই ভাবে বঙ্গের শাসন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিল্লীশ্বর উভয়ের ক্ষমতা খর্ব্ব করেন। বহরম খাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে রুকনুদ্দিন নামক তাঁহার এক দেহরক্ষী সেকেন্দর বাদসাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সোণারগাঁয়ের গদী দখল করিয়া স্বাধীন নৃপতির ছত্রদণ্ড ধারণ করিলেন। এদিকে আলাউদ্দিন আলিমসাহ লক্ষ্ণাবতীর শাসনকর্তা ছিলেন, ফকরুদ্দিন ও আলাউদ্দিন উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। আলাউদ্দিন ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ফকরউদ্দিনকে নিহত করেন এবং তিনিও ইহার এক বৎসর পাঁচ মাস পরে নিজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইলিয়াস খাজে কর্ত্তৃক নিহত হন।

বহরম খাঁ ও রুকনুদ্দিন—১৩৩১-১৩৩৮ খৃঃ।

ইলিয়াস খাজে ১০ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার উপাধি ছিল 'শামসুদ্দিন'—ইনি রাজত্বের প্রথমে জাজনগর আক্রমণ করিয়া বিস্তর অর্থ ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া আসেন। দিল্লীশ্বরের কাশী-সমীপবর্ত্তী কোন এক স্থান অধিকার করাতে সম্রাট ফিরোজসাহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন।

আলাউদ্দিন ও ফকরুদ্দিন—১৩৩৮-১৩৪৩ খৃঃ।

সামসুদ্দিনের পুত্র শাহজাদা ও তিনি স্বয়ং একডালা দুর্গে সৈন্য-সামন্ত লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে সামসুদ্দিনের পুত্র বন্দী হন, কিন্তু সম্রাট কিছুতেই বঙ্গেশ্বরের একডালা দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। অনেক লেখালেখির পর সামসুদ্দিন সম্রাটকে কিছু অর্থ ও সামান্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন, তাঁহার পুত্র মুক্তি পাইয়াছিলেন ইহার পরে ফিরোজশাহ বঙ্গেশ্বরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন সামসুদ্দিন ১৮ বৎসর ৪ মাস রাজা শাসন করিয়া ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ইলিয়াস হোসেন শাহিদার ১৩৯৯-১৪১০ খৃঃ পর্যন্ত সুলতানাত রাজত্ব করিয়াছিলেন সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪৩-১৩৫৮ খৃঃ

সামসুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীতে একটা বড় রকমের ভেট পাঠাইলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ এই সূত্রে বাঙ্গলা দেশটা সরকারের অধীন করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি মন্ত্রীমুখে বলিয়া সেকেন্দর সাহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি তাঁহার ভেট পাইয়া খুসী হইয়াছেন কিন্তু বাঙ্গলা দেশটা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত এই কথাটা স্বীকার করিলে তিনি খুসী হইয়া সন্ধি করিতে পারেন। বঙ্গের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে স্বীকৃত হইলেন, সঙ্গে অবশ্য পাঁচটি হাতী ও মূল্যবান উপহার পাঠাইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

১ম সেকেন্দর শাহ —১৩৫৮-১৩৯৯ খৃঃ।

সৈন্যের উপস্থিতি দেখিয়া সেকেন্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তথায় তাঁহাকে পরাস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া সম্রাট ৫৮টি হাতী ও কতক উপহার আর যৎসামান্য কিছু কর দিতে সম্মত করাইয়া সেকেন্দারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার রাজত্বের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন, শেষকালে তাঁহার দুই স্ত্রীকে লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রথমার গর্ভে ১৭টি সন্তান জন্মে। দ্বিতীয়ার মাত্র একটি পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রের নাম গয়েসউদ্দিন ইনি সর্বজনপ্রিয় ও পিতার আদরের ছিলেন। একদা প্রথমা রাজ্ঞী রাজাকে অনেক শপথ করাইয়া একটি গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা তাঁহাকে বলিতে চাহিলেন, রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়া সেই কথা তাঁহাকে জানাইতে আদেশ করিলেন। আশ্বাস পাইয়া রাজ্ঞী তাঁহার নিকট জ্যেষ্ঠপুত্র গয়েসউদ্দিন সম্বন্ধে কতকগুলি কথা ব্যক্ত করিলেন—গয়েসউদ্দিন তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য দখল করিতে উদ্যত ইত্যাদি। রাজা বলিলেন "তুমি তোমার সপত্নীর একটি মাত্র পুত্র, তাহাও তোমার সহ্য হইতেছে না—তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।"

গয়েসউদ্দিন ভাবে প্রকারে বিমাতার ষড়যন্ত্র টের পাইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে এ অবস্থায় থাকা আর নিরাপদ নহে মনে করিয়া সোণারগাঁয়ে যাইয়া বিদ্রোহী হইলেন। সেকেন্দর তাঁহার বিরুদ্ধে রওনা হইলেন, যুদ্ধকালে গয়েসউদ্দিন তাঁহার সৈন্যদিগকে রাজার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সেকেন্দর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। গয়েসউদ্দিন শিবির চলমানপূর্বক বারংবার ক্ষমা

চাহিলেন, সেকেন্দর আর দুই এক কথায় তাঁহার শুভ ইচ্ছা জানাইয়া ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন (১৩৫৭ খৃঃ)। কিন্তু ইহাই প্রকৃত এই তারিখ গ্রাহ্য নহে। কারণ সেকেন্দর সাহের ১৩৮৯ খৃঃ অব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা করিয়া গয়েসউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার প্রথম কাজ হইল, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইদের প্রত্যেকের চক্ষু দুটি উপড়াইয়া ফেলিয়া সকলকে বিমাতাকে উপহার দেওয়া। তিনি আত্মরক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুরতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এই তাঁহার গুরুতর কিন্তু সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ইহার পর তিনি সকলের ভ্রাতৃপরায়ণ সহিত রাজত্ব করিয়াছেন একদিন তাঁহার একটি শব অভ্যাগমের সকলই হইয়া একজন বিধবার পুত্রকে আহত করে বিধবা কাজীর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, কাজী সিরাজুদ্দিন সম্রাটের উপর সমন জারি করিতে বিধা বোধ করিয়া শেষে হাসেমকে স্মরণ করিয়া দ্বারা কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন যে ব্যক্তির উপর সমন জারি করার ভার ছিল সে ভয় পাইয়া অসমর্থ হইয়াছে উপায়ান্তর না পাইয়া সে মতলব বাহির করিল। বন্ধু লইয়া কে এই বাক্য করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সম্রাট সেই লোকটাকে সম্মুখে আনিয়া এরূপ অদ্ভুত কার্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কাজীর আদেশের কথা বলিয়া কহিল ভয় পাইয়া সে মহারাজের সকাশে উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই, তজ্জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। রাজা একটা ক্ষুদ্র তরবারি কটিবাসে গোপন করিয়া আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন—বাদসাহকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। সেই বিধবার ছেলেটি তিনি আহত করিয়াছেন কি না প্রশ্ন করিলেন, এবং যখন রাজার অপরাধ প্রমাণিত হইল তখন সেই স্থালোকটির ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য রাজাকে বহু অর্থদণ্ড করিলেন। রাজা সেই টাকা দিলেন। তখনই কাজী তাঁহার আসন হইতে নামিয়া আসিয়া রাজাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা বলিলেন, "ভাগ্যে আপনি সুবিচার করিয়াছিলেন, নতুবা অসিদ্ধারা আমি আপনার শির কর্তন করিয়া ফেলিতাম।" কাজী বলিলেন "আপনি আদালতে যদি আমার অবাধ্য হইতেন, তবে এই বেত্র দ্বারা আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতাম।" স্বীয় রাজ্যে ধর্মভীরু সৎসাহসযুক্ত এমন সুবিচারক আছেন, এজন্য রাজা সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন এবং কাজীকে পুরস্কৃত করিলেন।

গয়েসউদ্দিন আজিমসাহ (১৩৯৩ খৃঃ)।

গয়েসউদ্দিনের রাজত্ব।

এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাজার মনে হইয়াছিল, তিনি আর বাঁচিবেন না, সুতরাং একটা উইল করিয়াছিলেন তন্মধ্যে লিখিত ছিল যে তাঁহার প্রিয়তমা তিনটি অন্তঃপুর চারিণী—'সাইপ্রাস', 'গোলাপ' এবং 'বুলবুল'—মৃত্যুর পর তাঁহার শব ঘুইবার অধিকার

* বিদ্যাপতি যে সিরাজুদ্দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পূর্ববর্তী বাদসাহ কিংবা এই গয়েসউদ্দিন সংশয়ের অবকাশ আছে।

পাইবেন। তাঁহাদের প্রতি রাজার এই অনুকম্পাপ্রদর্শনে তাঁহার অপরাপর উপপত্নীরা নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও হিংসাভিভূত হইয়া এই তিনটি মহিলাকে "ঘোষাল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সাধারণের শব ধৌত করার ব্যবসায় যে হতভাগ্যদের লোকেরা করে তাহাদের উপাধি "ঘোষালী" বলা সাব্যস্ত হইয়াছিল। সেই রমণীত্রয় বিদ্রূপের কথা রাজাকে জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখিয়া তাহার জোড়া মিলাইতে পারিলেন না। যে ছত্রটি লিখিলেন তাহার অর্থ এই "হে সুরা পারস্যবাসিনি, তোমরা সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপের প্রশংসা গান কর।" এই কবিতা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার চিঠিতে উক্ত কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথা বলিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কথিত আছে রাজার কবিতার প্রথম ছত্র না দেখিয়াই হাফেজ দ্বিতীয় ছত্রটি লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই "এই সুসংবাদ তিনটি পরমাসুন্দরী ও প্রিয়তমা "ঘোষালী"দিগকে জ্ঞাপন করা হউক।" গয়েসউদ্দিনের পত্রের উত্তরে কবিবর যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিওয়ান নামক কাব্যগ্রন্থে অনুনিবিষ্ট আছে তাহার প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে "আমার বন্ধু" এই শব্দটি আছে। কবিতাটির শেষ ছত্রের মর্মার্থ এই "রে হাফেজ! সুলতান গয়েসউদ্দিনকে দেখিবার জন্য তোমার যে তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে তাহা লুকাইবার কারণ কি? তুমি যে যাইতে পারিতেছ না তাহার কারণ তুমি অনেক দূরে আছ—এ কথা সুলতানের নিকট ব্যক্ত কর।"

'সাইপ্রাস', 'গোলাপ' ও 'তুলিপ'।

প্রসিদ্ধ কবি হাফেজ।

হাফেজ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এতটা জোর দিতে সাহস পাইতেছেন না, ইহাই না আসার কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক হিসাবে কতকটা উদাসীন ছিলেন।

ছয় বৎসর কয়েক মাস একতার সহিত রাজত্ব করিয়া গয়েসউদ্দিন ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

পরবর্তী রাজা সৈফউদ্দিন গয়েসউদ্দিনের পুত্র। তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। নির্ব্বিবাদে দশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪০৮ খৃ. তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার রাজত্বের বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায় নাই।

সৈফউদ্দিন হাম্জা শাহ—১৩৭৩-১৪০৯ খৃঃ।

সৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র 'দ্বিতীয় সামসুদ্দিন' নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর রাজা শাসন করিয়া তিনি ভাদুড়িয়ার রাজা গণেশ কর্ত্তৃক নিহত হন।

২য় সামসুদ্দিন—১৪০৯-১৪১১ খৃঃ

রাজা গণেশ কে?—তাহা লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদেশের অধিকাংশ রাজাকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি

তাঁহার কায়স্থদিগের ইতিহাসের নামই দিয়াছেন "রাজন্যকাণ্ড"। তাম্রশাসনাদিতে প্রমাণাভাব হইলেও তাঁহার মতের পোষক কুলজী-গ্রন্থের অভাব হইতেছে না এই কুলজীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, অনেকের বিশ্বাস নগেন্দ্রবাবু এই সকল কুলজী-লেখকদের দ্বারা বারংবার প্রতারিত হইয়াছেন এ বিষয়ে রাখালবাবু এত প্রমাণ দিয়াছেন যে নগেন্দ্র বাবুর উত্তর মুখে যোগাইতেছে না রাখালবাবু লিখিয়াছেন "বসুজ মহাশয় সন্দেহ জনক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দুই বার সেন-রাজবংশকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই জন্য প্রতিবারেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে ১৮২৬ পৃঃ অক্ষয় বসুজ মহাশয় চন্দ্রবংশের ঘটককারিকা অনুসারে চন্দ্রবংশের রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা মনোজ মাধবকে লক্ষ্মণসেনের পৌত্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু বসুজমর্দনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হইয়াছিল যে চন্দ্রবংশের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণসেনের পৌত্র হইতে পারেন না। ইহার পরে বসুজমর্দন ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা প্রকাশিত হইলে সেনবংশের সহিত কায়স্থসমাজের নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রয়োজন হইল। তদনুসারে ঘটুভট্টের সেববংশ নামক কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে" (বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪, ১৬৮ পৃঃ)। এক একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পর পূর্ববর্তী সম্বোজাত কুলগ্রন্থ সূতিকাগৃহ হইতে শবাগার হইতে না হইলে সেটির সংশোধক ও পরিপূরক হিসাবে অপর একটি কুলগ্রন্থ পাওয়া যায় এই নিত্য নব আবিষ্কারের বলে নগেন্দ্রবাবু যে সকল মত দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা রাখালবাবু তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় ভাগ, ১৬৮ ১৮৯ পৃষ্ঠায় ও শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সামাজিক ইতিহাসের অনেক স্থলে বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও এই ব্যাপারে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, রাখালবাবু অতি গম্ভীর বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত মহিমার মধ্যে একটু চাপা রহস্যের ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন নিখিলনাথ রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কায়স্থ লেখকদের অভাব নাই, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা ঐতিহাসিক শাস্ত্রে অনেক বেশী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং ইতিহাসক্ষেত্রে অপূর্ব্ব উদ্যমশীলতা ও অদ্ভুতপূর্ব্ব বিদ্যার পরিচয় দিয়াও পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ কুলজীশাস্ত্রকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া এবং ঘটকদিগের কথায় নির্ব্বিচারে প্রত্যয় স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিকগণের শ্রদ্ধা কি তিনি কতকটা হারাইয়া ফেলেন নাই? কায়স্থ সমাজ অতি বিরাট্ যদি কোন জাতি সর্ব্ব বিষয়ে বংশের প্রাধান্যের দাবী করিতে পারেন—তবে কায়স্থ জাতি যতটা পারেন, ততটা আর কোন জাতি পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সোণার উপর রং চড়াইবার প্রয়োজন কি? যাহা স্বভাবতঃই বড়, তাহাকে অধিকতর বড় করিবার চেষ্টা বাতুলতা নহে কি? তাঁহার এই সকল গবেষণার ফলে বঙ্গের বহুমূল্য কুলজীগ্রন্থ সম্পদের উপর লোকের কতকটা অনাস্থা জন্মিয়াছে। অথচ খাঁটি কুলজীগ্রন্থগুলি

বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৩২৪, ১৬৮-১৮৯ পৃঃ।

বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ১৩২৪, ১৬৮

[illegible] উপকরণ [illegible] অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

[illegible] কবির [illegible]

[illegible] ভাষাতত্ত্বের অবদান [illegible]

[illegible] • [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

চৈতন্য, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্কিত [illegible]
[illegible] ছবি কলিকাতার [illegible] মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীর

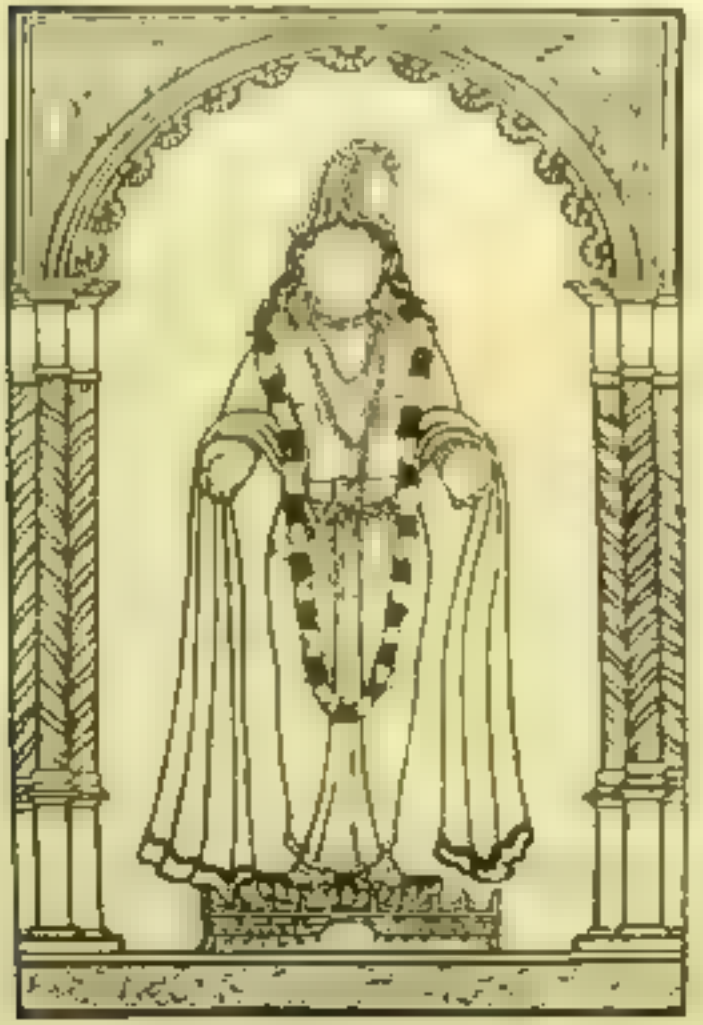

মহাপ্রভু, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ [illegible] চিত্র। ইহা [illegible] মূর্তির অনুরূপ হয় নাই। কথিত আছে ঐ সকল মূর্ত্তি চৈতন্য প্রভুর সময়ের।

[illegible] গ্রামের ২৩শ [illegible] বাস আকবর সেরেস্তা [illegible] ছবি, ডুপ্লীক্স হাজরা কর্তৃক ১৩১৪ সাঃ আঁকা আছে।
চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাস

প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের প্রতি অকথিত অত্যাচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেখ বদর উল ইসলাম রাজাকে অভিবাদন না করাতে তিনি তাহাকে বধ দিয়াছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া ঘৃণায় লিপ্ত ছিল, এজন্য তিনি তাঁহাদের মুণ্ডচ্ছেদ দিয়াছিলেন এইগুলি বিশেষ কোন অত্যাচার বলিয়া মনে হয় না। যদি তিনি সত্যসত্যই ঐরূপ নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পরের অস্বাভাবিক ক্ষিপ্ত হইয়া কেন যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কলহ হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় এদিকে বহু যখন মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তখন রাজা গণেশ সুবর্ণদণ্ডের ব্যবস্থা করাইয়া তাহার প্রতিশোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসরের অনুসন্ধানের পরে হঠাৎ একটু উষার আলোর মত হিন্দুরাজা গণেশের উদয় যে বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেই ভাদুড়ী বংশ কি তাহাকে কখনও ভুলিতে পারে? তাহারা এখন নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু গণেশের কীর্ত্তিকথা তাঁহাদের কুল-কারিকায় এরূপ বিশুদ্ধভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে বহিরের লোকেরাও তাহা ভুলিতে পারিবে না। নগেন্দ্রনাথ মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের এই গণেশের অধ্যায়টি পাঠ করুন, তাহা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও এত বিস্তৃত যে এই সকল কথা যে মূলতঃ সত্যমূলক তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যদি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইত, তবে তাঁহার ইতিহাসসম্বন্ধে সেই পরিবারে সোণার কি টাকার চরিতকথা না থাকিলেও শত শত প্রবাদ থাকিত। সেরূপ একটি প্রবাদেরও অস্তিত্ব আমরা জানি না। তবে সেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে ঐরূপ প্রবাদসম্বলিত পুস্তক আজ ছাপাইতে গেলে একটা বিষয়ের বিষয় হইবে না। গণেশ নারায়ণের স্ত্রী মহারাজ্ঞী রিপুরা দেবী এবং পুত্র স্ত্রী নবকিশোরীর কাহিনী করুণ রসের উৎস, সেই বিয়োগান্ত দুঃখের উপর ভাদুড়ীবংশের চোখের জল এখনও শুকায় নাই। ইহা বাবেন্দ্র কায়স্থকুলে প্রবিষ্ট, সহর সাহত নবকিশোরীর এবং নবকিশোরীর গঙ্গে আগমনীতারার চিঠিপত্রগুলি নগেন্দ্রনাথ মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই চিঠিগুলি সে কালের রহস্যের মোড়কে ঘাঁটো তপ্ত অশ্রু কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত দিনের চিঠিপত্র এগুলি উপকথার মত শুনায়। কিন্তু এই ভাবে চিঠিপত্র রক্ষা করিবার প্রথা ও ধারা আমরা বাঙ্গলার ইতিহাসে আরও কয়েকবার পাইয়াছি। কাশীবিলাসের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত উক্ত রাজার মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে লিখিত। সকলেই জানেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ঐতিহাসিক ও ভাষাবিৎ পণ্ডিত কেরি সাহেবের অনুযোগনে উহা লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল অনেকে বলিয়া থাকেন ঐ পুস্তক ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে লইয়া সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে তন কোম্পানির কতকগুলি চিঠিপত্র জমা আছে—তাহাও এই ধরণের। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবগোস্বামীর সঙ্গে কবি গোবিন্দদাসের সংস্কৃত চিঠিপত্রগুলি নরহরিবিরচিত ভক্তি রত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে এই ভক্তি রত্নাকর বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং

নবকিশোরী ও আগমনতারা।

গোবিন্দদাস ও অন্য গোস্বামী এই পুস্তক রচনার পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন এই সকল চিঠিপত্রের ভাষা হয়ত কিছু রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে কিন্তু ইহাদের মূল ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণ এই ভাবের চিঠিপত্র অনেক রক্ষা করিয়াছেন। এদেশের বাদসাহ আইনেদ খাঁর (১৪০৯ খৃঃ) যখন জোয়ানপুরের রাজা ইব্রাহিমকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভয়ে ভীত হইয়া তাইমুরের পুত্র শাহরুকের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হন, তখন তাতার সম্রাট্ জোয়ানপুরের বাদশাহকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা ইয়াট সাহেবের ইতিহাসে (১৯১০, কলিকাতা সংস্করণ, ১১০ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে। সাম্রাল মহাশয় লিখিয়াছেন নবকিশোরী বাদসাহকে (২৬) যে কোটা পাঠাইলেন তন্মধ্যে একটি বৃক্ষপত্রে লিখিত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্লোক অবশ্য বাঙ্গলায় এবং সাম্রাল মহাশয় তাহার সবগুলি দিতে পারেন নাই। তাহারা চিহ্ন দিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন "মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি অপ্রাপ্য" নবকিশোরীর পুত্র অতুলনারায়ণ যদু পীতাম্বর মাতা ও স্ত্রীর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চিত্ত অতিশয় ক্ষুব্ধ ছিল। তিনি নিজে গোপনে সিংহাসন অধিকার করিলেন, কিন্তু এই সময়ে একটাকিয়ার জমিদারির আর তিনগুণ বাড়িয়া গেল, এই সকল ঘটনা ভাদুড়ীবংশের চিরস্মরণীয়। সুতরাং মূলতঃ বাদসাহ দিয়া এই সকল কাহিনীর যে অনেক কথাই সত্যমূলক তাহা আমরা বলিতে পারি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাম্রশাসন ও মুদ্রায় যাহা নাই, তাহা যে ইতিহাস নহে, এবং বিজ্ঞানসঙ্গত বলিতে যে শুধু মুদ্রা ও তাম্রশাসন বুঝায় এই অদ্ভুত কথা আমরা আধুনিক কয়েক জন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের মুখেই প্রথম শুনিয়াছি।

একটাকিয়া বংশের পতাপ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের মশালের আলো। চলনবিলের স্বচ্ছ তোয়রাশি মুকুরের মত সম্মুখে রাখিয়া যে গম্ভীর গড়খাই বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ এক সময়ে শত্রুর অনধিগম্য ছিল, যে একটাকিয়া বংশের গৌরবের জন্য হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া লড়াই করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে রাজকুলের জন্য পাঠান সেনাপতি কামরুদ্দীন খাঁ প্রাণপাত করিয়া সেই সুচিরাগত রাজভক্তির সাক্ষ্য উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিলেন যেখানে ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণে উৎসবের শত শত দীপ জ্বলিয়া উঠিত, যেখানে সাজনগর পুঁথি ফেলিয়া একটু হইলেই তরবারি হস্তে সমরাঙ্গনে নামিতেন, সেই বঙ্গের শেষ গৌরবরবি একটাকিয়া আজ কোন্ অস্তাচলে মিলাইয়া গিয়াছে।

যদুনাথকে কেহ কেহ বলেন, তিনি গৌড়ের এক মুসলমানী উপপত্নীর গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। কেহ আবার বলেন, তিনি কুতুব উল আলম নামক কোন মুসলমান সাধুর চর্ব্বিত পান খাওয়াতে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আম্মানতারা নামক কোন মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গৌড়ের কোন পাঠান ওমরাহের সম্পত্তি হরণ করেন নাই, পরন্তু অনেক মুসলমান বিদ্বান্ ও সাধু ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি দান করিতেন, এতৎ সত্ত্বেও কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারী মুসলমানের

যদু কেন মুসলমান হইলেন?

প্রবর্তনায় বিখ্যাত সাধু সুর কুতুব উল আলম বিহারের অধিপতি ইব্রাহিম সাহকে গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। গণেশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া এই শমনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, কিন্তু নিজে মুসলমান না হইয়া বহুকে ঐ ধর্মে দীক্ষিত হইতে অনুমতি দেন। তৎসম্বন্ধে প্রচলিত নানারূপ উপাখ্যান পড়িয়া মনে হয় অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজা গণেশ খুব শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। চারিদিকে গোঁড়া পাঠান বাদশাহ এবং আমীর ওমরাহ, হিন্দুবিদ্বেষী ইহারা বিদ্রোহী ও কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ইহাদের সকলের দৃষ্টিস্থানে গণেশ রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বক্ষণ শঙ্কিত ছিলেন। তাঁহার মাথার উপর চিরদিন শাণিত খড়্গ ঝুলিতেছিল। রাজনীতি-কৌশল, পরাক্রম, পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতি নানা গুণ বর্তিত হইয়া তিনি তাঁহার রাজত্বের আপৎ কালটা কোনরূপে কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

কথিত আছে রাজা যদু বা চেঙ্গময় 'জালালুদ্দিন' উপাধি ধারণ করিয়া হিন্দুদের প্রতি অমানুষী অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে স্বর্ণধেনুসহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই কার্যের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে তিনি গোমাংস খাওয়াইয়া বলপূর্বক মুসলমান করিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন সুবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেবকে সোণারগাঁ হইতে আনিয়া তাঁহারই নির্দেশ মত সমস্ত রাজকার্য করিতেন। তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বহু শিল্পকলা-বিদ্‌ই মসজিদাদি নির্মাণ করিয়া প্রাচীন গৌড় নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্ব মসজিদ, অদ্‌দিনালা, দিঘী প্রভৃতি "জালালী কীর্তি" বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ বর্ষকাল নির্বিবাদে রাজত্ব করার পর তিনি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ স্বীয় রাজ্ঞীর প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া ইনিই কবি চণ্ডীদাসকে তপ্ত পুরে বসিয়া বেত্রাঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু ষ্টেপলটন সাহেব অনুমান করেন, উক্ত কবির হত্যাকারী সম্ভবতঃ ইনি নহেন, পরবর্তী যদুশের।

যদু কর্তৃক অত্যাচার।

জালালুদ্দিন—১৪১৫-১৪৩১ খৃঃ।

জালালুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহম্মদ সাহ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইহার রাজত্ব কালে জৌনপুরের বাদসাহ ইব্রাহিম বঙ্গদেশে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহাদের আক্রমণে আহম্মদ সাহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাইমুরলেনের পুত্র সাহরুকের নিকট নিজ রাজ্যের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি পাঠান। সাহরুক সুলতান ইব্রাহিমকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা ষ্টুয়ার্ট তাঁহার ইতিহাসে আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা সেই সময়ে সম্রাটদের প্রতিহিংসার ইচ্ছা কেরূপ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা রোমাঞ্চকর। সেই চিঠির মর্ম এই—"এই জগতের রাজ-চক্রবর্তীর আদেশ পাওয়া মাত্র এক দিনের মধ্যে আপনি বঙ্গদেশের যত লোক বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া

আহম্মদ সাহ—১৪৩১-১৪৬২ খৃঃ।

সাহরুকের পত্র

দিবেন এবং তাহিরের নিম্নবর্তি চিঠি দ্বারা প্রমাণ করিবেন যে আপনি আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। যদি কিন্তিপ্রে বিলম্ব করেন, তবে প্রথমতঃ আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র কামুরের শাসনকর্ত্তাকে, তৎপর খোটান, তিব্বত ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তাদিগকে আপনাকে শাস্তি দিতে পাঠাইব। ইহারা গেলে যদি আপনার মাথা না যায়, তবে ক্রমান্বয়ে আমার সেনাপতি বিদ্রোহ দমন, তৎপরে আমার প্রিয় পুত্র সাহসুজিন মহম্মদকে খোরাসান প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যের সৈন্য সহকারে প্রেরণ করিব।" এই ভাবে তাঁহার আর আর পুত্রগণ এবং তাঁহার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যস্থিত বিবিধ সেনানিবাসগুলির নাম নাম সৈন্য পাঠাইবেন তাহার একটা বড় রকমের তালিকা দেওয়া আছে। উপসংহারে লিখিত আছে—"আমার প্রিয় পুত্র অমুক বেগ সুবাদারকে তুর্কিস্থানের সমস্ত সৈন্য সহকারে পাঠাইব। তাহার উপর আদেশ থাকিবে যে আপনার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করেন, অথবা তাহা এমন জায়গায় ঝুলাইয়া রাখে যেখান হইতে কাকগুলি মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে পারে।"

এই ভীতি প্রদর্শনের ফল সুলতান ইব্রাহিম, তাতারখানের পুত্রের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং আহম্মদ সাহও নিষ্কলঙ্কভাবে অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইহার কোনও সময়ে দনুজমর্দ্দনের ও মহেন্দ্রের বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস ছিল "দনুজমর্দ্দন" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন মুসলমান বিজয়ী হিন্দু রাজাদের ঐরূপ উপাধি আমরা আরও দুই এক স্থানে পাইয়াছি। কিন্তু সন তারিখের গোলযোগ না মিটিলে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি আবিষ্কৃত কতকগুলি নূতন তথ্য কোনই আলো ফেলিতে পারে না। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের সম্বন্ধে আমরা ঐ সকল তাম্রশাসনের বংশাবলী একবারে অগ্রাহ্য করি। প্রথম বর্ম্মা সম্বন্ধেও ঐরূপ বংশাবলী উল্লিখিত করা হইয়াছিল। বংশাবলীর প্রমাণ ঠিক ঐতিহাসিক না হইলেও তাহাকে আমরা ইতিহাসের অন্যতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু জাল বংশাবলী ও মেকী টাকা চালাইতে পেলেই তাহা চলে না। রাখালবাবু এই সকল পক্ষপ্রমাণ জাল বংশাবলীর উপর সন্দেহের দোষারোপ নিক্ষেপ করিয়াছেন। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব কে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উভয়ের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, দনুজমর্দ্দন ১০৪০ শকে (১১১৮ খৃঃ) এবং মহেন্দ্রদেব ১০৩৯ হইতে ১০৫২ শকে (১১১৭-১১২২ খৃঃ) বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেছিলেন।

আহম্মদের পুত্র ছিল না। নসির নামক এক দাস প্রবল হইয়া সিংহাসন দখল করেন, কিন্তু তিনি ৮ দিন রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ওমরাগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দিন ভেলহরে এক তরুণ বয়স্ক বংশধর নসির সাহকে রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইনি অপ্রতিহতপ্রভাবে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন। ইনি গৌড়ে এক বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

ফার্গুসনের ৮ দিনের রাজত্ব। বর্ণিয়ারের মতের সার—১৪৫২-১৪৫৭ খৃঃ।

নসির সাহের পুত্র বয়স্ক সাহ রাজা হইয়া আফ্রিকার আবিসিনিয়াবাসী নিগ্রোদিগকে তাঁহার সৈন্যভুক্ত করেন, ৮ হাজার নিগ্রো অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার অনুগমন করিত, তাঁহার দেখাদেখি গুজরাট ও কাম্বিলাতের রাজারাও এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিশ্বাস ও সাহস দেখিয়া নিজদের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা লিখিয়াছেন "যুরোপীয়দের হাতে পড়িলে যাহারা কখন যত্ন ব্যবহার পাইত না এই দেশের রাজারা তাহাদিগকে অশ্বারোহ ও লিপি পরদর্শন করাতে তাহাদের কেহ কেহ বড় সেনাপতি, এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও হইতে পারিয়াছিলেন।

বরবক সাহ — ৪৪৪-৪৭৯ পৃঃ।

নসির সাহের পুত্র ইউসফ সাহ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি সুপণ্ডিত ও ন্যায়পর রাজপুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গরীব ও ধনী ইহাঁদের মধ্যে বিচার কালে কোন তারতম্য করিতেন না পক্ষপাত দোষে ইনি কাজিদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেন। ইহার রাজত্বকালে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচয়িতা ইনি পাণ্ডুয়ার অনেকগুলি পুরা ও বাসুদেবের মন্দির মসজিদে পরিণত করেন। "বাইশ গজা" নামক গৌড়ের বিশাল মসজিদটি তখ্ত পর্যায়ভুক্তের উপাদানে নির্মিত

ইউসফ সাহের সন্তান হয় নাই। আমির ও মন্ত্রীরা রাজকুলজাত একটি বোবা যুবককে রাজপদে মনোনীত করেন। ইনি "সফর সাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি নবীন বয়সেই পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন নিগ্রো ও খোজারা রাজপরিবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছে দেখিয়া ইনি খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুতর দোষ প্রচলিত ছিল, তজ্জন্য বাদসাহ তাহাদের কতকগুলি বড় লোককে কঠিন শাস্তি দেন এবং অপর ব্যক্তিদিগকে সাধারণ চুরি অথবা গুরুতর শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিলেন। খোজাগণের অন্তঃপুরে গতিবিধির কোন বাধা ছিল না এই সুবিধা পাইয়া তাহারা ইহাকে রাত্রিকালে শয়নাগারে হত্যা করে ফতে সাহ ১৪৮০ খৃঃ অব্দে নিহত হন ইহার রাজত্বের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা হৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৮৫ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী

ফতেহ সাহ — ১৪৮২-১৪৮৬ খৃঃ।

অন্তঃপুর হইতে রাজা প্রাতে বাহিরে আসিবেন সেবকবৃন্দ অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় দেখা গেল, বারেক নামক খোজা রাজ পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন তখন প্রধান মন্ত্রী পান-জাহান এবং প্রধান সেনাপতি খোজা মালক আফগান রাজধানী হইতে দূরে ছিলেন এবং অপরাপর সেনাপতিদিগকে ঘুস দিয়া বশীভূত করা হইয়াছিল—সুতরাং বারেক খোজা "সুলতান সাহারজাদা" উপাধি লইয়া অনায়াসে সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি খোজা ও নিগ্রোশ্রেণীর কর্মচারীদিগকে উচ্চপদ দিতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন সম্ভ্রান্ত লোকেরা সুবিধা পাইলেই তাঁহার প্রতিকূলতা করিবেন তিনি রাজ্যময় খোজা গুপ্তচর নিযুক্ত করেন। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কে কি করিতেছে বা করিতেছে, তাহার বিবরণী

সুলতান সাহারজাদা — আট মাস রাজত্ব।

রাজাকে শুনাইত প্রথমতঃ প্রধান মন্ত্রী খাঁন জাহান ও প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক আণ্ডিলকে তিনি খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সিংহাসনের উপর চিরকাল বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন, এই শপথ গ্রহণ করাতে কতকটা দ্বিধার সহিত তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে বহাল রাখিলেন। ইঁহারা বাহিরে পক্ষপুটের ভাণ করিলেও ভিতরে ভিতরে রাজাকে হত্যা করিবার সুবিধা খুঁজিতেছিলেন, অত্যন্ত চতুরতার সহিত উদ্দেশ্য গোপন রাখাতে রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রতি আস্থাবান্ হইলেন। অন্তঃপুর-রাজপুরক্ষীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া আণ্ডিল এক রাত্রে সম্রাটকে আক্রমণ করেন। তখন তিনি খোজার স্বভাবানুযায়ী স্ত্রীজনোচিত বস্ত্রাদি পরিয়া মদ খাইয়া সিংহাসনের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। আণ্ডিল তাঁহাকে সিংহাসনস্থিত দেখিয়া মারিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন কারণ তিনি সিংহাসনের প্রতি আক্রমণে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন এই শপথ লইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাজা অপর্য্যাপ্ত মদিরা-পানে অসাড় হৌক করের মেঝেতে পড়িয়া যান, তখন আণ্ডিল তাঁহাকে খড়্গাঘাত করেন। রাজদেহের গায়ে অস্ত্রের ভোর ছিল সেই খড়্গাঘাত খাইয়াও তিনি আণ্ডিলকে ধরিয়া ফেলিয়া হাতাহাতি করিতে লাগিলেন। আর দুই একটি লোকের সাহায্যে আণ্ডিল রাজাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মরিয়াছেন মনে করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। ইতিমধ্যে অন্তঃপুরের রক্ষী প্রধান খোজা তাতারচি বাগ ঘরে আসিলে আহত রাজা তাহাকে বিশ্বাসী মনে করিয়া আণ্ডিলের কথা বলিলেন এবং কি কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ দিলেন। খোজা যাইয়া আণ্ডিলকে জানাইলেন রাজা মরেন নাই। তখন আণ্ডিল রাজগৃহে আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। সাহাজাদা মাত্র ৮ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর অমাত্যেরা ঠিক করিলেন স্বর্গীয় রাজা ফতেশাহের দুই বৎসর বয়স্ক শিশু কুমারকে রাজা করিবেন। তাঁহারা বিধবা রাণীকে যাইয়া এই কথা বলিলেন, এবং বলিলেন, শিশুর রক্ষকই অভিভাবকস্বরূপ রাজ্য শাসন করিবেন। এখন রাজ্ঞী কাহাকে ঐ পদে মনোনীত করিবেন? রাজ্ঞী এই আপৎসঙ্কুল রাজপদে শিশুটিকে অভিষিক্ত করিতে মনে মনে ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি শপথ করিয়াছেন যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে পারিবে তাহাকে তিনি রাজসিংহাসনের যোগ্য মনে করিবেন। এই অবস্থায় শিশু আর রাজা হইলেন না খোজা মালেক আণ্ডিল ফিরোজশাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন তিনি ইহার পূর্ব্বেই যোগ্যতা ও সৎসাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছেন রাজা হইয়া তিনি জনপ্রিয় নানা অনুষ্ঠান-দ্বারা সুনাম অর্জ্জন করিলেন। কথিত আছে তিনি একদা একলক্ষ টাকা গরীবদিগকে দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, টাকাগুলি একত্র করিলে কত বড় একটা বৃহৎ স্তূপ হয় ইহা দেখাইয়া রাজাকে এরূপ অপরিমিত দান সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রীরা টাকাগুলি জড় করিয়া রাজার যাইবার পথে রাখিয়া দিয়াছিলেন, রাজা ঐ টাকাগুলি দেখিয়া "এসব কি?" জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন এত অধিক অর্থ তাঁহার

ফিরোজ শাহ ১৩৫১-১৩৮৮ খৃঃ।

আগ্রায় বিতরিত হইবার কথা একজন মন্ত্রী স্মরণ করাইয়া দিলেন। রাজা বলিলেন "এক অন্ধ!" ইহার দ্বিগুণ দেওয়া হউক। ফিরোজ সাহের নির্মিত মসজিদ, দীঘি ও রমণীয় এক কক্ষের ভগ্নাবশেষ এখনও গৌড়ে দৃষ্ট হয়। ১৩৮৮ খৃ: অব্দে ফিরোজ স্বর্গারোহণ করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নামে মাত্র রাজা হইলেন। হোসেন খাঁ নামে এক 'আবিসেনীয়' দাস মন্ত্রী হইয়া সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিলেন। ইঁহার ব্যবহার সকলেরই বিরক্তিকর হইল

মহম্মদ সাহ—১৩৮৮-১৩৯০ খৃ:

আবিসেনীবাসী সিদ্ধিবদর নামক এক ব্যক্তি হোসেন খাঁকে গোপনে বধ করিয়া তৎপরে মহম্মদ সাহকে নিধন করিলেন কেহ কেহ বলেন মহম্মদ সাহ ফিরোজ সাহের পুত্র নহেন; তিনি কুতে সাহের শিশু পুত্র, (যাঁহাকে মন্ত্রীরা রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন), মহম্মদ সাহের রাজত্বকাল এক বৎসর মাত্র।

সিদ্ধিবদর 'মুজাফর সাহ' উপাধি লইয়া রাজা হন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন তিনি সহরের অনেক প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করেন, রাজা আমীর কিংবা জমিদার তাঁহার হাতে কাহারও নিস্তার ছিল না তিনি নিজ হস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন। এই ভাবে তিনি স্বয়ং যে সকল লোকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ঐতিহাসিকগণ-প্রদত্ত তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে তাহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। অবশেষে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন বিদ্রোহী হইয়া গৌড় অবরোধ করেন। রাজা ৫,০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী হাবিসী সৈন্য এবং বাঙ্গালী ও পাঠান ১৫,০০০ সৈন্যসহ বহুকাল দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বাহির হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করেন। ২৫,০০০ লোক যুদ্ধে নিহত হয়, স্বয়ং মুজাফর সাহ নিহতদিগের একজন। কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন মুজাফর সাহের পদাতিক সৈন্য নায়ককে উৎকোচ-দ্বারা হাত করিয়া লইয়া ১১ জন গুপ্তঘাতকসহ রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

মুজাফর সাহ—১৩৯০-১৩৯৩ খৃ:।

পরবর্তী বাদশাহ হুসেন সাহ বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে চৈতন্য দেব বঙ্গদেশ প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে হইবে।

আলাউদ্দিন হুসেন সাহ ১৪৯৩-১৫১৯ খৃ:।

হুসেন সাহ জীবনের প্রথম সময়টা সুবুদ্ধি রায় নামক গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারীর ভৃত্য ছিলেন। একদা পুষ্করিণী খনন করিতে যাইয়া কার্য্যে শিথিলতার জন্য সুবুদ্ধি রায় তাঁহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহার পৃষ্ঠে সেই বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেক দিন ছিল।

হুসেন সাহ প্রথমতঃ দুঃস্থ অবস্থায় থাকিলেও তিনি সৈয়দবংশজাত ছিলেন চাঁদপুরের কাজি এই সংবাদ প্রথম জানিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ মোচন করিলেন

এখন যেমন হজরত মহম্মদের বংশধর 'সৈয়দ' বাঙ্গলায় অনেক দেখা যায়, তখন তাহা নাই। এজন্য এদেশে সেই সময়ে একজন সৈয়দের আবির্ভাব মুসলমান সমাজে খুব বড় কথা ছিল। কাজি সৈয়দ হুসেনকে রাজদরবারে প্রবেশ করাইয়া দিলেন শুধু তাহাই নহে, তাহার নিজ কন্যাকে এই যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়া জামাতা করিলেন। ক্রমে সৈয়দ হুসেন তাঁহার যোগ্যতার দেখাইয়া গৌড়ে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং মুজাফর সাহকে হত্যা করিয়া বাঙ্গলার রাজ্য হরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার বংশমর্যাদা এবং রাজোচিত গাম্ভীর্যে মুগ্ধ হইয়া আমীরগণ এক বাক্যে তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ব্ব নৃপতিকে হত্যা করার পর তিনি স্বজাতি অনুচরদের সাহায্য দৃঢ় করিতে মনোযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত লালসায় লুণ্ঠন করিবার অপরাধে যে দণ্ড প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বয়ং সৈন্যদের ৫০ ৬০০ লোককে হত্যা করিয়া লুণ্ঠিত সমস্ত বহুমূল্য সামগ্রী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন।

হুসেন সাহ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খুব আদর করিতেন, পাণ্ডিত্যকে বৃত্তি দিতেন এবং বহু বিদ্যালয় টোলসমূহ ও অট্টালিকা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আসাম, কামরূপ, ও হিমালয়ের উপত্যকা পর্য্যন্ত স্থানে বিজয় সৈন্যসহ অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল পার্ব্বত্য দেশবাসীকে চির জয় করা তথা হইতে মনে মনে অনেক পুরুষ করিলেও অন্তর্দেশগুলি তাঁহার অধিকারভুক্ত করিতে পারেন নাই বরঞ্চ তাহারা তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া বারম্বার ও তাড়িত করিয়া দিয়াছে। হিমালয়ের পাদদেশ উপত্যকায় তুহিন দেশ হইতে হুসেন সাহের পুত্র অনেক লাঞ্ছনা পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি পণ্ডিত ও সাধু-ব্যক্তিদিগকে এতদূর সম্মান করিতেন যে সুপ্রসিদ্ধ সাধু কুতব উল আলমের সমাধি দেখিবার জন্য তাঁহার জন্মভূমিতে পদব্রজে গমন করিয়া পাণ্ডুয়ায় গিয়াছিলেন।

হুসেন সাহ হাবসী ও অন্যান্যদের ক্ষমতা একেবারে খর্ব্ব করেন। তাঁহারা বাঙ্গলাদেশে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু ইহারা পরে স্বেচ্ছাচারিতা করিতেন। হুসেন সাহের দৃষ্টান্তে আসামের অপরাপর স্থানের রাজারা ইহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন। ইহারা পার্বত্যে "শিংহ" নামে লক্ষিত হয়। আবার পরম পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সৈয়দ হুসেনের দরবারে জৌনপুরের বাদশাহ সাহ হোসেন বেলোলোদি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন। গৌড়েশ্বর এই সম্মানিত অতিথিকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করিয়া তাঁহাকে রাজোচিত বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত সাহ হোসেন সৈয়দ হুসেনের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গৌড়েশ্বর একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন সুরক্ষিত অবস্থায় গৌড়ে আছে।

রাজা হইবার পরে তাঁহার রাজ্ঞী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারিলেন কে ইহা করিয়াছে। সুবুদ্ধি রায় মোটের উপর হুসেনকে পিতৃস্নেহে পালন করিয়াছিলেন, কৃত্যকে দুই এক ঘা বেত্র মারা তখন একটা বহির্বোর মধ্যে গণ্য ছিল না। হুসেন সাহ

সুবুদ্ধি রায়কে খুবই ভালবাসিতেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্ররোচিত করেন, রাজা অনেক বুঝাইলেও হুসেন কিছুতেই সুবুদ্ধি রায়কে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না হুসেন শাহ অগত্যা তাঁহার মুখে গোমাংস দিয়া তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিলেন। পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা চাহিয়া সুবুদ্ধি রায় জানিতে পারিলেন যে তাঁহার হুতাশনে প্রাণত্যাগ করা উচিত। সুবুদ্ধি রায় সম্বন্ধে আমরা শেষে লিখিব। এই বিষয়টি চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে এবং ঘটনাটি ঐ পুস্তক রচনার বেশী পরবর্তী নহে, এজন্য উহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে তরুণ বয়সে এক হিন্দু ভূম্যধিকারীর দত্তা ছিলেন একথা অনেক ঐতিহাসিকই লিখিয়াছেন।

পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন তখন হুসেন শাহ অতর্কিতভাবে যাইয়া উড়িষ্যার অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন করেন, প্রতাপ রুদ্র ঘাটীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড়বিজয়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব বহু লোকক্ষয় ও দেশের দুঃখ বৃদ্ধি হইবে, এই কথা বলিয়া উক্ত সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন—প্রতাপ রুদ্রের যশ গৌরকলাটের ন্যায় শুভ্র ছিল, এবং প্রসিদ্ধ পাঠান রাজগণ তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ভয় পাইতেন। ইহাই সাধের মুসলমান লেখকের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন হুসেন শাহ পুরীর রাজাকে জয় করিয়া তাঁহাকে সামন্ত রাজার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান প্রসূত এই বিবরণ অলীক।

সিকন্দর সেকেন্দর হৈমনপুর দখল করিয়া বঙ্গবিজয়ার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তৎপুত্র দানিয়ালকে বহু উপঢৌকনসহ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। সেকেন্দর শাহ প্রীত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সংকটে হুসেন শাহ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকৃত হন। তাঁহার সহিত ত্রিপুরারাজের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল এবং তিনি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাবিজয়ার্থে পরাগল খাঁ নামক সেনাপতিকে ও তৎপুত্র ছুটি খাঁকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি মমারক গাজী ত্রিপুরেশ্বর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উমাপুরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। ত্রিপুরাপ্রসঙ্গে সে সকল কথা পুনরায় উল্লেখ করা হইবে। ১৫২০ খৃঃ অব্দে (কাহারও কাহারও মতে ১৫১৯ খৃঃ), হুসেন শাহের মৃত্যু হয়। গৌড়ে তাঁহার সুচারু কারুকার্যখচিত সমাধি-মন্দির সিংহদ্বারের দুই দিকে চিরিয়া সে বটবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে, তাহার জটিল, ঘন ও দীর্ঘ শিকড়গুলি মহাদেবের জটাকলাপের মত দেখায়।

নাসির উদ্দীন নসরত শাহ—১৫১৯-১৫৩২ খৃঃ

হুসেন শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত শাহ পাঠান রাজাদের নীতির অনুবর্তী হইয়া তাঁহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই,—বরঞ্চ তাঁহার ১৭ ভাইয়ের প্রত্যেককে রাজোচিত মর্যাদা ও উচ্চ শাসনকার্যভার দিয়াছিলেন। নসরত শাহের সময়ে দিল্লীতে অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, সুলতান ইব্রাহিম লোডীকে পরাস্ত করিয়া বাবর ১৫২৬ খৃঃ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা মহমুদ পলাইয়া নসরত শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইব্রাহিম লোদির এক কন্যাকে মহমুদ সাহ লইয়া গিয়াছিলেন। নসরত শাহ এই কন্যাকে জাঁকজমকের সহিত বিবাহ করেন এবং মহমুদকে রাজোচিত বৃত্তি দিয়া

গৌড়ে থাকিতে সুবিধা করিয়া দেন। বাবর দেখিলেন, বঙ্গদেশকে নসরত শাহ পরাধিত আফগান আমির ও সেনাপতিদের একটা আড্ডা পরিণত করিয়াছেন, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। নসরত শাহ তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনাদি দিয়া নিরস্ত ও বশীভূত করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়, তখন মহম্মদ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগলদের হস্ত হইতে জৌনপুর রাজ্য বলপূর্বক হরণ করেন। সৈন্য বংশোদ্ভূত হইলেও নসরত শাহের শরীরে ও অস্থি নির্মিত ছিল। কোন লোককে তিনি গুরুতর শাস্তি প্রদানের জন্য মনোনীত করিতেন, একদিন যখন তিনি পাণ্ডুয়ার সমাধি-মন্দিরে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন সেই সময় তাঁহাকে স্বাধীন পাঠান হত্যা করে (১৫৩২ ১৫৩৩ খৃঃ)। এই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ভিন্নধর্মাবলম্বী, কারণ ঐ বৎসর চৈতন্য দেবের লীলাবসান হইয়াছিল।

নসরত শাহের হত্যার পর মাহুর পুত্র ফিরোজ সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। নসরত শাহের ভ্রাতা মহমুদ শাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য হাজিপুরের শাসনকর্তা সকলের অসন্তোষ ভাজন হইয়া শের খাঁর সঙ্গে মিলিত হন। শের শাহ উত্তরকালে হিন্দুস্থানের অধিপতি হইয়া ছিলেন এখন তাঁহারই সৌভাগ্যলক্ষ্মী একান্ত প্রসন্ন হইলেন। এদিকে বেহারাধিপতি হতভাগ্য জেলাল শের শাহের উপর বিরক্ত হইয়া মহম্মদের সহিত মিলিত হয়। শের শাহ বিহারের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন জেলাল এই দুর্গ অবরোধ করেন। এখানে পাঠান ও পাঠানদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। জেলালের অধীনে গৌড়ীয়দের শের শাহের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া পরাস্ত হইল (১৫৩৫ খৃঃ)। শের শাহ চুনার অধিকার করিয়া সমস্ত বিহার দেশ দখল করিয়া লইলেন এবং গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড়েশ্বর মহম্মদ বিপদে পড়িয়া হুমায়ুনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তখন বঙ্গদেশ শের শাহের হস্তগত।

চুনার দুর্গ দখল করিয়া হুমায়ুন বঙ্গদেশটী শের শাহের হাত হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান হইলেন কিন্তু তাঁহার গতি ও কার্য্যশক্তি অতি মন্থর ছিল সুবিধাগুলি হারাইয়া তিনি বঙ্গে উপস্থিত হইলেন। শের শাহ গৌড়ের দুর্গ লুটিয়া নিজের বাসস্থান গৌড়ে অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। মোগল সৈন্য বাঙ্গলার আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। তিনমাস কালের মধ্যে কোন যুদ্ধবিগ্রহাদি হইল না হুমায়ুনের মোগল-সৈন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। শের শাহ একটা সন্ধির উদ্যোগ করিলেন, হুমায়ুন এই সুযোগ হারানের দান মনে করিয়া খুসী হইলেন। মোগল-সৈন্যদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না শের সাহের শুষ্ক মরুবেশ খিলিজের বর্ম্ম ও চেহারা সঙ্কিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। চুনারুন শের সাহকে বঙ্গ ও বিহারের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার

> ফিরোজ শাহের ভ্রাতা ধাঁ শাহির মাত্র পিতাপুত্রের মহম্মদ শাহ ১৫৩২ খৃঃ।

করিয়া রহিলেন। হুমায়ুনের সৈন্যেরা শেষে সাহস হারাইয়া ফেলিল এবং সম্রাটের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। এই সময়ে শের খাঁ কৌশলে শের সাহ কর্তৃক হুমায়ুনের পরাজয়, ১৫৩৯ খৃঃ

কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ও সম্রাটের অনুমতি লইয়া বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাঙ্গালার সুলতান মোহম্মদ নিজের অপদার্থতার জন্য শের খাঁর হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। শের খাঁ বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় অধিকার করিয়া সুলতানের শিবির আক্রমণ করিলেন। মোহম্মদ শাহ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। শের খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে

দরবারে পেশ করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার পিতার সমোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়া যাহাতে জীবনযাপন করিতে পারেন তদুচিত ব্যবস্থা দিবার আদেশ হউক। উত্তরে সম্রাট বলিলেন, শের ভাল লোক নহেন, যেহেতু তিনি পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই শেরের পিতৃরাজ্য ফিরিয়া পাইবার এবং শের সৈন্যের বিচারের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচারাধিকারের অধিকার লইয়া শেরের সঙ্গে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতার কলহ চলিতে লাগিল। এসম্বন্ধে বাবরের অধিপতি সুলতান মহম্মদের মধ্যস্থতায় কোন ফলোদয় হয় নাই। সুলতান মহম্মদ বিরক্ত হইয়া সারি নামক এক সেনাপতিকে সৈন্যসহ যাইয়া শেরের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া সোলেমানকে দিতে আদেশ করিলেন। শের সারিকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। এই ঘটনার পর শের সাহ কুড়া ও মাণিকপুরের শাসনকর্তা সুবিজ্ঞ বরলাসের নিকট বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্যলাভে সমর্থ হইলেন। বরলাস নইলে যোগল বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে তিনি সুলতান মহম্মদকে পরাস্ত করিলেন এবং আগ্রা যাইয়া সম্রাটের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। বাবর শেরের বশ্যতাসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও তাঁহার অকপটতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন। কথিত আছে তিনি একদিন ওদরাজের সঙ্গে শেরকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একটা গরু রাংসখণ্ড শেরের পাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের রোশনচৌকি আদেশ অনুসারে তাঁহাকে একখানি মাত্র চামচ দেওয়া হইয়াছিল, ছুরি দেওয়া হয় নাই। মাংসখণ্ড শের আদৌ করিতে অসমর্থ হইয়া ভৃত্যদিগের নিকট একখানি ছুরি চাহিলেন, কিন্তু সম্রাটের গুপ্ত আদেশে তাহারা ছুরি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শের বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া তাহা দিয়া অনায়াসে মাংস কাটিয়া খাইতে লাগিলেন। সম্রাট আমির অলিজা নামক এক ব্যক্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"এই শের খাঁ আফগান কুল ধ্বংস করিবার মত লোক নহেন। ইনি কালে মহালোক হইবেন।"

কিন্তু শের খাঁ বুঝিলেন, সম্রাট-দরবারে থাকা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ্ নহে। তিনি জৌনপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হওয়াতে তিনি তরুণ সাজাদার জেলালের অভিভাবক স্বরূপ সেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। জেলাল বড় হইয়া শেরকে আর পূর্বের মত শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না, এক সময় তিনি শের সাহের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এখন শেরের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ক্ষমতায় আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার হত্যা পর্যন্ত কল্পনা করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল, জেলাল পলাইয়া গৌড়ে যাইয়া সুলতান মাহুর নিকট শেরকে শিকরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

জেলালের পলায়নের পর শের সমস্ত বিহার দখল করিয়া ফেলিলেন, এই সময় চুনারের শাসনকর্তা তাজি খাঁ পরাক্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী লোদি বেগিকি পরমা সুন্দরী

বিতীয় বারবিলা

বরলাসের নিকট হইতে শের সাহের সাহায্য লাভ

বরলাসের নিকট হইতে শের সাহের সাহায্য লাভ

ও গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। ইহার কোন সন্তানাদি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সপত্নীগণের অনেক পুত্র ছিল। তাহারা বিমাতার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একদা তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রাঘাত করে, আঘাত গুরুতর হয় নাই, কিন্তু তাঁহার চীৎকারে তাজি উপস্থিত হইয়া পুত্রদের কার্য্য ধরিয়া ফেলিলেন। পুত্রেরা এই অবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। মোগি মোল্লাক এই বিষয়ে শের সাহের আত্মার রক্ষা করিলেন, শের তুনারে আসিয়া সেই তরুণ ছেলেদিগকে নিরস্ত্র করিলেন। তাহারা সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শাসন কার্য্যের অযোগ্য ছিল। সুতরাং সমস্ত জমতাই শের সাহের হস্তগত হইল। মোগি মোল্লাক শের সাহকে বিবাহ করিয়া যেটুকু বাকী ছিল তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিহারের রাজ্য তুনারও শের সাহের অধিকার ভুক্ত হইয়া গেল।

বিহার অধিকার।

মোগি মোল্লাক।

এদিকে গৌড়েশ্বর মহম্মদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সসৈন্যে বিজয়ে হুমায়ুন আসিতে ছিলেন। হুমায়ুন তুনার অধিকার ছাড়িয়া দিতে শের সাহকে আদেশ করিলেন কিন্তু শের কাকুতি মিনতি করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন সন্ধিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু হুমায়ুন পুরস্কার ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর শের সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিলেন।

শের এখন শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রোটাস দুর্গের অধিপতি রাজা মকিসের সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি ছিল এই দুর্গ অধিকার করা, কিন্তু বাহিরে তিনি সৌহার্দ্য দেখাইয়া রাজা মকিসকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা সেই সকল মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। শের সাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া কপট ভাষা বলিয়া পাঠাইলেন "মোগল সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে, এমত অবস্থায় তাঁহার ধনরাশি ও পরিবারের মহিলাদিগকে রক্ষার উপায় কি? সুতরাং যদি তিনি সদয় হইয়া তাঁহার মহিলাবর্গকে ও ধনগুলি রোটাস দুর্গে স্থান দেন তবে শের নিশ্চিন্ত হইয়া মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তবে তাঁহার পরিবারবর্গ ও ধনরাশি মোগলের হাতে পড়ার অপেক্ষা রোটাস রাজের হাতে তাহা দেওয়া সহস্র গুণে শের মনে করেন, যেহেতু রাজা অতি উদার ও মোগলেরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক।" তাঁক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা বাহিরের লোভে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তিনি শের সাহের ভাতার সহজে করায়ত্ত করিবার সুবিধা পাইয়া অতি ভক্ত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শের সাহ কতকগুলি চৌদলায় কতিপয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী কয়েকটি সৈন্য এবং অপর কতকগুলি চৌদলায় বহু অস্ত্রধারী সৈন্য—এই ভাবে রাহতাসের সম্মুখে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া সিন্দুক গুলিতে বহু সস্তা দরি করিয়া সেগুলিও চৌদলায় চড়াইয়া দিয়া রাহতাসের সঙ্গে পাঠাইলেন। রাহতাসের প্রথম দুই একটি চৌদলা খুলিয়া বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ও শেরের বস্তাটি খুব শক্ত ধাতব পদার্থ শক্তরূপে আবদ্ধ দেখিয়া আর কোন সন্দেহ করিল না। রোটাস রাজা যখন চৌদলা ছাড়া দিয়া এই আগন্তুক সাধিবর্গ মহিলা ও ধন ভাণ্ডার দেখিতে ছিলেন,

রোটাস দুর্গ অধিকার।

তখন তাঁহার কতগুলি সৈন্য হত আহত হইয়াছিল, কিন্তু যখন বন্দুকগুলি নামানো হইল তখন ঠিক চারশো জোলার কাল বাহির করিয়া সোলার সৈনিকগুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল একবারে মাইল খানেক লম্বা খড় পোরা দোমটা খুলিয়া গালিচা খড়ের মতো বাহির হইয়া পড়িল। তখন সেই সকল সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন রোটাস রাজ পলাইতে পথ পাইলেন না। বন্য সাধু কোহর সৈন্যগণের হস্তে ধনুর্ব্বাণ রাজা নিহত হইলেন।

সোলার নগরের মত এরূপ অভেদ্য দুর্গ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় এই নগর নির্ম্মিত, ইহার বেষ্টন প্রায় দুই মাইল। বাহির হইতে এক সরু পথ বাহিয়া এই দুর্গের প্রথম দুয়ারে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ তিনটি একটির বহু উচ্চে আর একটি এই ভাবে স্থিত। প্রত্যেক তোরণ অনেকগুলি কামান ও বড় বড় প্রস্তর খণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত। সর্ব্বোচ্চে যে চতুষ্কোণ সমতলক্ষেত্র তাহা মাইলের অধিক স্থান ব্যাপক—তন্মধ্যে নগর ও দুর্গের আভ্যন্তরীণ সকল স্থানই সুনিশ্চিত জলধারা। এক দিকে দুর্গপ্রাচীর উচ্চতায় সকল প্রাচীরের উপরে। অপর দিকেও অপর একটি নদ—যাহা ৫ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের নিম্নদেশ বেষ্টন করিয়া পশ্চিমের দিকে প্রবাহিত হইয়া উপত্যকা ভূমিতে মিলিত হইয়াছে। এই দুর্গ এরূপ দৃঢ় ও সুরক্ষিত যে উহাতে কোন ব্যক্তির প্রবেশ অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

এই একটি নগরের জন্যই স্যার পল্লর ও ৬০ জন সৈন্য রাখিয়া শের সাহ কর্ণেল কে চমাদের সঙ্গে কোন কার্য্য করিয়া যে লক্ষ করিয়াছিলেন তাহা একটা খেলনার ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল। সুরক্ষিত স্থানে সকলে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

সকল দিক হইতে নিরাশ হইয়া শের সাহের চতুর পাঠানসর্দ্দার কপটতার এবং যে ছলনা ও প্রতারণা তাহাকে অবলম্বন করিতে হইল। ইহার কথার কোন মূল্য ছিল না। তাঁহার সাধু ভাব দেখিয়া চতুর রাজপুত কিছুতেই কিছু বলিল না। তাঁহার কোরাণ স্পর্শ করিয়া শুলি কাহাকে ছোঁয়া অপেক্ষা গুরুতর কিছু ছিল না। তথাপি তিনি তখনকে নিজে পশ্চাৎ তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানে অধিকার করার পথ পরিষ্কার করিতে ক্ষমা, ও ধর্ম্মশীলতা দেখাইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। শের সাহের ন্যায় পরাক্রান্ত ও বিপুল শুভাকাঙ্ক্ষী সার্ব্বভৌম রাজপদ পাইবার পর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

মহম্মদ খাঁ ও খাওয়াস খাঁ

খিজির খাঁ।

শের সাহ সিংহাসন লাভ করিয়া শের সাহ বাঙ্গলার মসনদে খিজির খাঁ নামক শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি পূর্ব্বপূর্ব্ব বাঙ্গলার মসনদ সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি খুব রাজকীয় ভাবে চলাফেরা করিতে লাগিলেন এবং মহম্মদ সাহের আত্মীয় ও ওমরাহগণকে বশীভূত করিলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল যে ইহার অভিসন্ধি ভাল নহে। শের সাহ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হৃদয় ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া বাঙ্গলায় চলিয়া আসিলেন।

খিজির খাঁ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার সমস্ত সম্পত্তি শের সাহ খাস ভুক্ত করিলেন।

খিজির খাঁর হাত হইতে শের সাহ শাসন ভার কাড়িয়া লইয়া বাঙ্গলা দেশকে বারটি মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া ইহাদের সকলের উপর কাজি ফজলুৎ নামক এক বিজ্ঞ, রাজনীতি কুশল ও ধার্মিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। তাহাকে শাসনকর্তার অধিকার দেওয়া থাকে এবং কেহ তাহার উপর মাথা উঁচাইয়া না উঠেন। এই সকল পরিবর্তনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। শের সাহের উপর এতদ্দেশের কোন অধিবাসীর উপদ্রব হয় কি না অথবা কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক কোন উচ্চপদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন কি না ইত্যাদি সম্বন্ধে কাজি সাহেবকে নিশ্চিন্ত সংবাদ পাঠাইতে হইত। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া শের সাহ বাঙ্গলা দেশে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিলেন, তথায় আর পাঁচ বৎসর কোন গোলযোগ হয় নাই। [illegible] অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। তথায় তোমার আসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া

শের সাহ অনেক মন্ত্রণা ও পরামর্শ নিষ্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার সকল পরামর্শের কীর্তি সোণার গাঁ হইতে পাঞ্জাবের সীমান্ত নামক স্থান এক লক্ষ ক্রোশ দীর্ঘ একটি রাস্তা প্রস্তুত করা। এই রাস্তার পাঁচ ক্রোশ অন্তরই পান্থশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং পথিকের সমাদরসাধনের জন্য দুই ধারে বৃক্ষ লাগান হইয়াছিল। তিনি ঘোড়ার ডাক সর্ব্ব প্রথম প্রচলিত করেন এবং রাজ্যের পরিমাণ-নির্ণয় ও রাজস্ব নির্দ্ধারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তোডরমল্ল সেই ভিত্তির উপর তাহার বহু বিস্তৃত কল্পিত কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন।

শের সাহের দ্বিতীয় পুত্র সেলিম সাহ পিতার তাজ অধিরোহণ করিয়া মহম্মদ সুর নামক এক আত্মীয়কে বাঙ্গলার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। সেলিম সাহ মহম্মদ আদিল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মহম্মদ সাহ সুর বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতি বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং জৌনপুর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। মহম্মদ আদিলের ভয়ে হিন্দু সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া বঙ্গেশ্বর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপরা ঘাট নামক স্থানে নিহত হন।

মহম্মদ সাহ সুরের পুত্র খিজির খাঁ বাহাদুর সাহ উপাধি ধারণ করিয়া বঙ্গের অধিপতি হইলেন। কিন্তু ইন সময়ে সম্রাটসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় সময় সাহ বঙ্গ নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গলার গদী দখল করিয়াছিলেন। বাহাদুর তাহাকে নিহত করিয়া অচিরে সম্রাট মহম্মদ আদিলের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিযান করিলেন। যুদ্ধের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সম্রাট এই যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং বাহাদুর বঙ্গদেশ ছাড়া জৌনপুরও স্বাধীকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। বাহাদুর সাহ ১৫৫৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহম্মদ সাহ সুর ১৫৫৫ খৃঃ।

মহাদুর সাহ ১৫৫৯ ১৫৬০ খৃঃ।

যাহাঙ্গীরের সন্তান ছিল না। ইতার মৃত্যু কালে সাহ বাজা হইলেন কিন্তু তিনি তিন বৎসর পরে গোড় পরিত্যাগ করিলে তাঁহার চতুর্থ বর্ষীয় পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন। সিরাজুদ্দিন নামক এক হত্যাকারীর হস্তে এই পুত্র নিহত হইলেন। অতি অল্প সময়ের জন্য হত্যাকারী সিরাজুদ্দিন সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়, তাঁহার সম্বন্ধে যেসময় নানারূপ কিংবদন্তী আছে তিনি তাঁহার সময় বিদ্যমান ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে সেই কিংবদন্তীর কতকগুলির উল্লেখ করিব। দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তাঁহার ইতিহাস এবং রাজমালী [illegible] কিংবদন্তী অবলম্বন কালাপাহাড়ের জীবনচরিত লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

কালাপাহাড়।

তাঁহার দেওয়া অনুসারে কালাপাহাড়ের নাম কলাচাঁদ রায়। তাঁহার বাল্যকালে সকলে তাঁহাকে 'কালু' বলিয়া ডাকিত। রাজসাহীর অন্তর্গত বারেন্দ্রভূমের গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপাধি ভাদুড়ী এবং ইনি জয়ানন্দ রায়ের বংশে জাত "জয়ানন্দ রায় মহাশয়ের কুলবধূ" [illegible]। কালাপাহাড়ের পিতা লক্ষ্মীকান্ত রায় গৌড়েশ্বরের সেরেস্তাদারী বিভাগে উচ্চ কার্য করিতেন, এবং তাঁহার উপাধি ছিল "কানুনগো।" কালাপাহাড়ের মাতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন এবং তিনিও অল্প বয়সে ভক্তিমান ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে মাতামহই তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। শ্রীপুর গ্রামবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

কালাপাহাড় বলিষ্ঠ সুদর্শন এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশের ইতিবৃত্ত অনুসারে তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া অশ্বচালনা ও অস্ত্রশস্ত্রব্যবহার প্রভৃতি ক্ষত্রোচিত গুণের প্রতিকৃতি অর্জন করিয়াছিলেন। তখন নাসের সাহের পুত্র বরবক সাহ গৌড়ের বাদসাহ। কালাপাহাড় তাঁহার বিশিষ্ট সদ্‌গুণদ্বারা শীঘ্রই বাদসাহের দরবারে উচ্চ চাকুরী পাইলেন এবং গৌড়ে বাদসাহের প্রাসাদের অতি নিকটে উচ্চ হিন্দু আমলাদের সহযোগে রাজকর্মচারীদের জন্য নির্দ্দেশিত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় রোজ অতি প্রত্যূষে মহানন্দায় স্নান করিতে যাইতেন। নবাব-কুমার ছলারী বিবি তখন সপ্তদশ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী। তিনি প্রত্যহ প্রাতে এই রূপবান্ যুবককে স্নানান্তে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে দেখিতেন। একদিন তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, এই যুবক ছাড়া আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।' অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ অনুচিত, সহচরীরা এই কথা বলিলে রাজকুমারী উত্তরে বলিলেন 'উহার গলায় পৈতা—উনি ব্রাহ্মণ, উহার পশ্চাৎ ছত্রী বরদার এবং হাতে সোণার কোষা সুতরাং ইনি ধনী'।—ইনি সকালে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে

যান সুতরাং মূর্খ নহেন তারপর ইহার মনভুলানো রূপ,—তাহার সাক্ষী—আমার দুটি চক্ষু, আর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।'

বাদসাহ ও বেগম উভয়েই রাজকুমারীর মনোভাব জানিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, ইনি একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশজাত এই বংশের অনেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান বাদসাহেরা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, তাহা প্রথমভাগে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ রহিল না। বাদসাহ কালাপাহাড়কে ডাকাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য জেদ করিলেন, কালাপাহাড় তেজের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহ কালাপাহাড়কে শূলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। যখন সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, তখন একদিন দুঃস্বপ্নে শঙ্কিত একটি বিপ্লবের ন্যায় দুপারী বিবি রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাতককে আদেশ করিলেন "আগে আমায় হত্যা করিয়া, তারপরে ইহার অঙ্গ স্পর্শ কর।" রাজকুমারীর অসামান্য রূপ এবং অপূর্ব্ব অনুরাগ দেখিয়া কালাপাহাড়ের দোহাই ভাঙ্গিয়া গেল, মুসলমের আঘাতে ধর্ম্মদ্বেষী বিদলিত হইল কালাপাহাড় বিবাহে সম্মত হইলেন কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না. তিনি বহু অনুনয় বিনয় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না জাতিচ্যুত হইয়া এ অবস্থায় কি করিবা, প্রত্যাদেশের জন্য সাত দিন অনাহারে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন আদেশ পাইলেন না, পরন্তু পাত্রাণ অত্যন্ত অপমান করিয়া তাঁহাকে ঈদমন্দির হইতে তাড়াইয়া দিল।

বিবাহ ও হিন্দু-বিদ্বেষ।

ইহার পরে প্রতিশোধের পালা। সে প্রতিশোধ যে কি ভয়ানক তাহা সমস্ত পূর্ব্বভারত হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া বাদসাহের দৈন্যের সাহায্যে তিনি হিন্দুধর্ম্ম জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার পর তাঁহার নাম হইল "মহম্মদ ফর্ম্মুলি, কিন্তু তাঁহার 'কালাপাহাড়' নামই দেশবিশ্রুত এই নাম অবশ্য হিন্দুরা দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কালাচাঁদ রায় হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উদ্ভব. এই নাম হিন্দুর দেবতা ভক্তকারীদের পক্ষে যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাঙ্গালা বলিতে যেরূপ বৈদ্যকেই শুধু বুঝায়, কালাপাহাড় বলিতেও সেইরূপ দেবদ্রোহীকে বুঝায়

প্রতিশোধ।

উড়িষ্যার পাণ্ডাদের হস্ত অপমান তিনি ভুলিতে পারেন নাই সুতরাং প্রথমেই বাদসাহের সৈন্য লইয়া উৎকলবিজয়ার্থ অভিযান করিলেন। কালাপাহাড় উৎকল পণ্ডিতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন কালে তিনি শত শত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবমূর্ত্তিসমূহ অপবিত্র স্থানে ফেলিয়া বহু লোককে অত্যাচার পূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যে অপ্রতপূর্ব্বক কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এখনও ভারতীয় চিত্রশালাগুলিতে ক্ষতবিক্ষত দেব-অঙ্গে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ মন্দির-স্তম্ভে প্রাপ্ত হওয়া যায় গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া কালাপাহাড়

ভাদুড়িয়া, শাঁতোড় ও পূর্ব্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাদুড়িয়ার রাজা কালাপাহাড়ের মাতা ও তাঁহার দুই পাত্নীকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসাতে অগত্যা তিনি তাঁহার অভিযানের মুখ ফিরাইয়া কামরূপ, আসাম, সিলাহপুর, রংপুর ও কোচবেহারের কতকাংশে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন, কথিত আছে তাঁহার নিষ্ঠুরতা দর্শনে অনেক মুসলমানও ব্যথিত হইয়া পলায়নপর হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন

এই সময়ে বেলোল লোদি দিল্লির সিংহাসনে আসীন, তিনি জোয়ানপুরের নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। জোয়ানপুরাধিপতি কালাপাহাড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কালাপাহাড় যুদ্ধে এতদূর দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন যে এই সংবাদ পাইয়া বেলোল লোদি চকিতপূর্ব্বক সৈন্য নায়ক এক রাজনীতি-কুশল কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে কৌশলক্রমে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসেন। বিদ্রোহ দোষের সেনাপতি হইয়া এবার কালাপাহাড় জোয়ানপুরের বাদসাহের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চলিলেন। ২৪ বৎসর যাবৎ দিল্লীশ্বরের সঙ্গে জোয়ানপুরের যুদ্ধ চলিয়াছিল কালাপাহাড় এই যুদ্ধের সমাপ্তি করিয়া উচ্চাবিত করিলেন। জোয়ানপুরাধিপ পরাস্ত ও নিহত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য সম্রাটের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, জোয়ানপুর হইতে আসিবার মুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেবতা ও দেবমন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন। কাশীধামে এক কেদারেশ্বর লিঙ্গ ভিন্ন প্রাচীন দেবতা আর একটিও রহিল না। পাণ্ডারা হাঁহি হাঁহি ডাক ছাড়িল, এবার সেই ডাক মল্লিকের সিংহাসনের নিকট পৌঁছিল।

কাশী ধ্বংস।

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাসিনী ছিলেন। কালাপাহাড়ের দুরাচার সৈন্যেরা তাঁহাকে ধর্ষণ করিল। কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া তিনি কাঁদিয়া সমস্ত কথা বলিয়া তৎসাক্ষাতেই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কালাপাহাড় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং সেই দিন সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করিয়া দিলেন, ফলে কেদারেশ্বর-লিঙ্গ রক্ষা পাইলেন

অনুশোচনা।

সায়াস মহাশয় লিখিয়াছেন, সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় স্বরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাঁহাকে দেখা গেল না। কেহ বলেন, তিনি মনের অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিলেন, কাহারও মতে কাশীর পাণ্ডারা তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় হরণ করিয়া হত্যাপূর্ব্বক শব ঘাটীতে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল, কেহ কেহ বলেন বেলোল লোদি তাঁহার ক্ষমতাবৃদ্ধি দর্শনে গোপনে গুপ্তচর দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার একথাও বলেন যে তিনি বিনাশকারী রুদ্রের অংশে জন্মিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছিলেন,—সার কথা এই যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবসে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ বর্ষ হিন্দুধর্ম্ম-ভাবে ব্রতী ছিলেন। বরাবক সাহের কন্যা দুলারীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল—তাঁহার নাম 'কতেমা'।

নিরুদ্দেশ।

কিন্তু মুসলমান ঐ ইতিহাসকদের বর্ণিত বিবরণের সহিত রাজমাহাত্ম্যে প্রচলিত কিংবদন্তীর কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এই অনৈক্য রাজাদের নাম সম্বন্ধে হওয়া স্বাভাবিক,—ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন জনসাধারণ এক রাজার কথা মাঝে মাঝে অন্য এক রাজার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং দুর্গাচরণ সান্যাল উভয়েই কাল-সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া দুইজন কালাপাহাড় পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় তাঁরা দুই একজনেরই দেখাদেখি এরূপ করিয়াছেন। কালাপাহাড় বাঙ্গলায় একজন মাত্র ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন নাই। সোলেমান খাঁ ও দাউদ খাঁর রাজত্বকালেই কালাপাহাড়ের সমস্ত সাময়িক অভিযান হইয়াছিল। সোলেমান খাঁর রাজত্বকালে (১৫৬৪-৭২ খৃঃ) কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেব ও তাঁহার বিদ্রোহী সামন্তরাজ রঘুরাজ ছোট রায় উভয়কেই পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন ঐ ঘটনা ১৫৬৮ খৃঃ হইয়াছিল (রাখালদাসবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ—১৩২৪ সাল ৩৯৭ পৃঃ)। তখন সোলেমান করররানী বঙ্গের বাদসাহ। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কালাপাহাড় কোচবেহার-রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ চিলারায় (মুকুন্দদেবকে) পরাস্ত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাকশালসিংহকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তখন দাউদ খাঁ বঙ্গের সুলতান। আমরা কালাপাহাড়ের প্রায় সমস্ত সাময়িক বিষয় এই দুই নৃপতির রাজত্ব কালে সংঘটিত হইয়াছিল একপ দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু যদি সবাবক খাঁ কর্ত্তৃক কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন এবং বেলোল সোদির পক্ষ হইয়া সোলেমানপুরের নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে তাঁহার কালের একটা সামঞ্জস্য করা কঠিন হয়। ঐ ঘটনাগুলি সমস্তই ১৫৬৮ হইতে ১৫৭৫—এই সাত বৎসর কাল ব্যাপক। এদিকে বেলোল সোদি সিঙ্গার সিংহাসনে ১৪৭১ খৃঃ হইতে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সবাবক সাহার বঙ্গের রাজত্ব কাল ১৪৫৯-৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত। উড়িষ্যা ও কোচবেহার রাজ ঘটিত ব্যাপার এই দুই বাদসাহের রাজত্বের এক শতা ধিক কাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এদিকে আবার সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে কালাপাহাড় ৭৪ বৎসর বয়সে নিরুদ্দেশ হন, তখন হুলাবী বিবির গর্ভে তাঁহার একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। এই প্রমের উত্তর দুরহ দেখিয়া লেখকগণ দুইজন কালাপাহাড়ের প্রবাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ খুঁজিয়া পান নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা একই কথার পুনরুক্তির মত শোনায়। দুই ভিন্ন স্থানে একই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে যেটুক প্রভেদ থাকিতে পারে এই পার্থক্য পায় সেইরূপ। তিনি লিখিয়াছেন "দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাঁহার পূর্ব্ব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জানা যায় নাই"। (সাময়িক ইতিহাস ১১৩ পৃঃ)। "দ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রথম কালাপাহাড়ের ন্যায় সুন্দরাকৃতি ও বলবান্ পুরুষ ছিলেন। উভয়েই ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং মুসলমান হইয়া মুসলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই

যোগদান হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন"। সামাজিক ইতিহাস, ১১৫ পৃঃ। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালের গোলমাল দূর করিতে অসমর্থ হইয়া লেখকেরা দ্বিতীয় কালাপাহাড় নামক এক কল্পিত কল্পনাপূর্বক সৌজামিল দিয়াছেন। কিন্তু অন্য এক স্থান হইতে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসে এই গোলযোগের সমাধান হইয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের একখানি ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছিল। জেমস ওয়াইজ সাহেব তখন ঢাকার সিভিল সার্জ্জান, তিনি তৎকালের জঙ্গল-বাড়ীর দেওয়ান শোভান রায় খাঁকে এতদর্থে অনুরোধ করেন। দেওয়ান সাহেব মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষের উপর এই কার্য্যের ভার দেন। মুন্সী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সহিত এই কার্য্য আরম্ভ করেন। জঙ্গলবাড়ীর দপ্তরের দলিল, কাগজ-পত্র, স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ এজন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। মুন্সী মহাশয় কালীকুমার চক্রবর্ত্তী নামক জঙ্গলবাড়ী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত এবং ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী ইন্দ্রিস খাঁর বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ২০ বৎসর জঙ্গলবাড়ীতে ছিলেন এবং অনেক বিষয় অপর সকল ব্যক্তি হইতে বেশী জানিতেন। অত্যন্ত আগ্রহাতিশয়ের সহিত এই কার্য্য আরব্ধ হইলেও শোভান রায় দেওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুতে এই কার্য্য কিছু কাল স্থগিত ছিল। কিন্তু নূতন দেওয়ান আজিম রায় খাঁ স্বয়ং এই কার্য্যে মনোযোগী হওয়াতে এই ইতিহাস সঙ্কলনে সমস্ত বিঘ্ন দূর হইল। এদিকে ঢাকা ডিভিসনের কমিসনার লাইস সাহেব এবং প্রধানতমা তখন ভূতপূর্ব্ব রমেশচন্দ্র দত্ত ময়মনসিংহের এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ তাগিদে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইল। এই পুস্তক একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে যে অলীক তাহা বলা যায় না, তবে ইহার অধিকাংশ ভুল নহে। ঈসা খাঁকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখকগণ দেওয়ান বংশের রাজকীয় রক্ত ঘোষণা করিবার জন্য যে ঐতিহাসিক সৌজামিল দিয়াছেন, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণের চক্ষে সহজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দেওয়ানদের বংশ-গৌরব বৃদ্ধির জন্য লেখক যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর সকল বিষয়ে তাঁহারা প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন ও সুস্থ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব বিশ্বাস-যোগ্য। এই ইতিহাসে লিখিত আছে, কালাপাহাড় বাদসাহ জালাল সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষ প্রামাণিক ঐতিহাসিক সংবাদ পাইয়াই একথা লিখিয়াছিলেন, যেহেতু দেওয়ান বংশের গৌরবের সঙ্গে এই কথার কোন সংস্রব নাই।

এখন যদি বাদসাহ জালালের কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন—তবে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সম্বন্ধে সমস্ত গোল চুকিয়া যায়। জালাল সাহের রাজত্ব কাল ১৫৬৯-৭১ খৃ. অব্দ। কালাপাহাড়ের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস যাহা প্রামাণিক ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, তাহা ১৫৭৬ হইতে ১৫৭৫ পর্য্যন্ত। যেসোল সোন্দির নাম সম্বন্ধে ও জনশ্রুতিতে এই

তাঁহার কোন গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণের পর আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কালাপাহাড় মাত্র একজন ছিলেন এবং তাঁহার বিবাহ ১৫৬০ হইতে ১৫৬৩ এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময় হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার ধর্ম্মলীলা সমাধা করিয়া অনুমান ৩৬ বৎসরে নিকেতন হইয়াছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে যদি তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে যদি তিনি নিকেতন হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার বয়স তখন ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে ছিল।

কালাপাহাড়ের পুত্র ও তাঁহার হত্যা সম্বন্ধে ১২১২ খৃ.

কেরানী বা করবানী বংশ শের শাহ ও ইসলাম শের শাহ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অনেক স্থানের শাসন কর্ত্তৃত্ব করিয়া ছিলেন। সম্রাট্ মকসুদ আলিমের আনুগত্য ইহারা করেন নাই। বরাবক শের সাহের উত্তরাধিকারীদের আনুগত্য করিয়া আসিয়াছিলেন।

তাজ খাঁ করবানী—১৫৬৩-৬৪ খৃঃ; সোলেমান করবানী—১৫৬৪-১৫৭২ খৃঃ

গিয়াসুদ্দিনের বঙ্গ দখলের সংবাদ শুনিয়া সোলেমান করবানীর ভ্রাতা তাজ খাঁ করবানী অনায়াসে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইহার পরে এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সোলেমান তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৫৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি গৌড়ের নিকটবর্ত্তী তাণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া সম্রাট্ আকবরকে বহু উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া প্রীত করেন। ইনি ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা বিজয় করেন, ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে কুচবিহার অধিকার করেন, ইনি পুনঃ পুনঃ সম্রাট্ আকবরকে ভেট পাঠাইয়া সখ্য রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব মোটের উপর নির্ব্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ ছিল। সোলেমান করবানী ১৫৭২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তখন কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রায় তাঁহার রাজত্ব ভূমিস্থ থাকিয়া তাঁহার চণ্ডী কাব্য শেষ করিয়াছিলেন।

দাউদ খাঁ—১৫৭২-১৫৭৬ খৃঃ।

সোলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ খাঁ সিংহাসন আরোহণ করেন। (১৫৭২ খৃঃ অব্দে) কিন্তু আফগান ওমরাহগণ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইনি রাজা হইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার রাজ-ভাণ্ডার অপরিমিত, তাঁহার সৈন্য নিবাসে ৪০,০০০ অশ্বারোহী ১,৪০,০০০ পদাতিক সৈন্য, নানা শ্রেণীর ২০০০ কামান, বহুশত যুদ্ধ জাহাজ এবং ৩,৬০০ হস্তী মজুত। তিনি মনে করিলেন, এই প্রবল শক্তির সহায়ে তিনি দুনিয়ার মালিক হইতে পারেন। সুতরাং তিনি শ্বেতচ্ছত্র, রাজদণ্ড, এবং অপরাপর রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের কোন কোন স্থান আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। দাউদ প্রথমতঃ জেমিনিয়া দুর্গ (পাটনার দক্ষিণ পার্শ্বে, গাজীপুরের কিছু উত্তরে অবস্থিত) আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আকবর সেনাপতি মনিয়মকে দাউদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। দাউদের প্রধান মন্ত্রী লোদিকাঁয়ের সঙ্গে মনিয়ম পাটনার

নিকটে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইলেন, কিন্তু এই সময় লোডিখাঁর সঙ্গে মনিয়মের একটা সন্ধি হইয়া যায়। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে বঙ্গেশ্বর সম্রাটকে নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার মোগল বেশমের কাপড় ও মসলিনাদি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনিয়মও বিহার হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, স্থির হইল। আকবর কথা শুনিয়া দাউদ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "লোডিখাঁ তাঁহার মস্তক হেঁট করিয়া দিয়াছেন" এই অভিযোগ করত তাঁহার মৃত্যুদণ্ড করিয়া তদীয় সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। এদিকে আকবরও মনিয়মের সঙ্গে সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক হয় নাই—এই ভাবিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং দশ হাজার সৈন্য সহ তোডরমল্লকে বেহারে মনিয়মের উদ্ধারের কার্য্যভার দিয়া বেহারে প্রেরণ করেন।

প্রথম সন্ধি।

এদিকে দাউদ সন্ধিতে স্বাক্ষর করা নাই এবং লোডিখাঁকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া মনিয়ম পাটনায় অভিযান করিয়া উপস্থিত হন। দাউদের নিযুক্ত হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা ঐতে খাঁ মনিয়মের সৈন্যসংখ্যা ও কৌশলের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিয়া ছিলেন এবং মোগলদিগকে শত্রু নিঃশেষ করিবার মধ্যে আনিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই অবরোধ ও যুদ্ধের ব্যাপার লক্ষ্য করিতে ছিলেন, তিনি মোগল সৈন্যের এই ধ্বংস দেখিয়া বহুসন্তুষ্ট তিনটি জাহাজ পাঠাইয়া দেন। মোগলেরা এই সাহায্য পাইয়া উৎসাহের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গস্বামী পলায়নপর হন। ঐতে খাঁ ও তাঁহার বহু সৈন্যসামন্তের কর্ত্তিত মস্তক এক নৌকা বোঝাই করিয়া সম্রাট আকবর দাউদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানান যে অচিরে তাঁহারও এই অনুচরদের গতি হইবে। কাউদ ভয় পাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া তেরিয়াগড়িতে উপস্থিত হন। এদিকে মোগলেরা হাজিপুরে আফগানদের উপর যে অকথ্যপূর্ব্ব অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার সংবাদ পাইয়া দাউদের সৈন্যেরা তেরিয়াগড়িতে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। সুতরাং তেরিয়াগড়ির দুর্গম গিরিপথে থাকিয়া মোগলদিগকে বাধা দেওয়ার আশা তাঁহার বিফল হইল। তিনি ধনসম্পত্তির সহিত পুনরায় পলায়নপর হইলেন, এদিকে বঙ্গ-প্রবেশের একমাত্র দ্বার তেরিয়াগড়ি অনায়াসে মনিয়ম খাঁর হাতে পড়িল।

তেরিয়াগড়িতে পলায়ন

দাউদ পলাইয়া গড়জঙ্গার পথে চলিলেন। এদিকে খাজা তোডরমল্ল সৈন্য এবং তাণ্ডা অনায়াসে দখল করিয়া পলায়ক দাউদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দাউদ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবার ও রসদাদি লইয়া পলাইতে লাগিলেন। মাঝ পথে দুই এক স্থানে দাউদের সৈন্য কর্ত্তৃক মোগলেরা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অবশেষে দাউদ কটকে গাইয়া "মারি কি মরি" এই সঙ্কল্প করিয়া একেবারে মরিয়া হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন। মনিয়ম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে কতকগুলি ভীষণ কামান গাড়ীতে বহাইয়া আনিয়াছিলেন। দাউদেরও ২০০ অতি দুর্দান্ত বন্য হস্তী সঙ্গে ছিল। দুই পক্ষের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় তুল্য ছিল। এই যুদ্ধে আফগানগণ যেরূপ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল,

মোগলেরা সেরূপ বাধা আর এদেশে কখনও পায় নাই। এই যুদ্ধাবিতে মোগল সেনাপতি গুরুতরভাবে আহত এবং রাজ্যের প্রধান সামন্তগণ হতাহত হইয়াছিলেন। দাউদ যদিও শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিতে পারেন নাই, তথাপি মোগলেরাও বহু ক্ষয়ের পর জয়লাভ করিয়াও কোন উৎসাহ বোধ করিতে পারে নাই। দাউদ কটকে উপস্থিত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দাউদের মনোভাব অসামান্য বিজ্ঞতা ছিল। তিনি যখন এক ধর্মাবলম্বী দুই দলের পরস্পরের এরূপ বিরোধ ও চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে, দাউদ আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাঁহার এবং তাঁহার অনুচরবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য যদি সম্রাট কিছু স্থান ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা তাঁহার চিরানুগত সেবক হইয়া থাকিবেন ইত্যাদি কথা স্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন তখন মনিয়ম খাঁর চক্ষু পরিষ্কার হইল। তিনি বলিলেন, যদি দাউদ স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা বলেন, তবে তিনি সম্রাটের নিকট তাঁহাদের হইয়া বিশেষ অনুরোধ করিবেন।

মনিয়ম খাঁর কৌশলে দাউদ।

কয়েক জন ওমরাহ পরিবৃত হইয়া দাউদ মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মোগলেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সংবর্ধনা করিল। দুই দিকে সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে রাজকীয়ভাবে অভিবাদন করিল এবং শিবিরে উপস্থিত মোগল ওমরাহগণ তাঁহার প্রবেশ মাত্র সকলেই সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া মনিয়ম খাঁর নিকট লইয়া আসিলেন। মনিয়ম স্বয়ং কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দাউদ খাঁ কটিদেশ হইতে তরবারি বাহির করিয়া মনিয়ম খাঁর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই অসি দ্বারা আপনার বহু বন্ধুর শরীরে আমি আঘাত করিয়াছি, ইহা ধারণ করিবার আমি যোগ্য নহি, আজ এখন হইতে যোদ্ধার নাম গ্রহণের আর উপযুক্ত নহি, আপনি এই অস্ত্রটি গ্রহণ করুন।" মনিয়ম খাঁ হস্তে ধরিয়া দাউদকে সম্মানের স্থানে বসাইলেন। দাউদ কোরান এবং অপর সমস্ত পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন—"সম্রাট যদি দয়া করিয়া আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন, তবে আমি চিরদিনের জন্য তাঁহার বিশ্বস্ত সেবক হইয়া থাকিব, তাঁহার কোন শত্রুর সঙ্গে যোগদান করিব না।" এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইল এবং দাউদ সেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। মনিয়ম খাঁ তাঁহাকে একখানি বহুমূল্য তরবারি রাজকীয় উপহার স্বরূপ দিয়া বলিলেন—"আজ আপনি আমাদের অভিবাদিত সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনাকে এই তরবারিখানি উপহার দিতেছি। আশা করি আপনি ইহা সম্রাটের পক্ষে এবং তাঁহার শত্রুগণের বিপক্ষে আস্ফালন করিবেন। আমি আমার মহারাজ সম্রাটের নামে সমস্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকার আপনাকে দিতেছি, আমি অণুমাত্র সন্দেহ করি না, যে আপনি চিরকাল সম্রাটের অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রজা স্বরূপ সাম্রাজ্যের সহায়তা করিবেন।"

মনিয়ম খাঁ তাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া সসৈন্যে গৌড়ের সহিত বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলেন। গৌড় নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বিচিত্র কারুকার্যখচিত দুর্গ, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি

দেখিয়া তিনি এতই আনন্দ লাভ করিলেন যে তিনি তাণ্ডা হইতে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী পরিবর্তন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। শাকের ভিস্তামাটী হইতে বিষাক্ত বায়ু বহির্গত হইয়াই হউক অথবা জল বা আবহাওয়ার দোষেই হউক, তখায় উভয় মুসলমানের মধ্যে এক মহামারী দেখা দিল। সহস্র সহস্র লোক মরিয়া পথে পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া বা দাহ করিবার লোক রহিল না। লোকে সেই মহামারীতে হাহি আহি করিয়া পলাইতে সুরু করিল। স্বয়ং সুলতান খাঁ এই বিসর্পের সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, (১৫৫৪ খৃঃ)।

সুলতান সুলেমান।

সুলতান খাঁর মৃত্যুর পর বাঙ্গলায় আফগানেরা আবার তাহাদের হৃত ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং গৌড়ের তারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা সাহেম খাঁ জেলিয়ারকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া, কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য দাউদ এই বিদ্রোহীর দলে যোগদান করিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হার রায়, যাঁহাকে দাউদ বিক্রমাদিত্য উপাধি দিয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনরায় সম্মুখযুদ্ধে হইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা হাতে পাইয়া দাউদ তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। সম্রাটের সেনাপতি হসেন কুলি খাঁ, উপাধি খাঁ জাহান দাউদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি রাজমহলে আসিয়া দাউদের সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। প্রথম প্রথম দাউদের পরাক্রান্ত দলবল বিজয়ী হইবার ভরসা করিয়াছিল, কিন্তু যখন মোগল সেনাপতির মাহাত্ম্যের কথা পাটনা, হাজিপুর এবং অপরাপর স্থান হইতে অগণ্য সৈন্য আসিতে লাগিল, তখন আফগানদের ভরসার স্থল জোনিয়েদ করবানী (দাউদের ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং অপরাপর প্রধান সেনাপতিরা মোগলদের কামানের বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহাদের অনেকেই রণক্ষেত্রে পাতিত হইলেন। দাউদ যুদ্ধে হইয়া মোগল দরবারে আনীত হইলেন। তৎকৃত কৃতঘ্নতার ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের উত্তরে তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজদ্রোহীর দণ্ড তাঁহাকে দেওয়া হইল, তাঁহার ছিন্নমস্তক একজন বিশেষ দূত সহ আগ্রায় প্রেরিত হইল (১৫৭৬ খৃঃ)। প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে যে পাঠান প্রাধান্য ছিল, দাউদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা এ দেশে বিলুপ্ত হইল।

দাউদের মৃত্যু

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠান রাজত্বসম্বন্ধে নানা কথা

পাঠান সম্রাটগণের অপমৃত্যু।

মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজির সময় হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গে আফগানদের প্রাধান্য ছিল। এই কিঞ্চিদূন চারিশত বৎসর বঙ্গদেশটাকে সুন্দর বনের মধ্যবর্ত্তী ব্যাঘ্র বাস বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—বিশেষ বঙ্গের সিংহাসন। এরূপ মাথার উপর খড়্গ ঝুলান দেখিয়া সিংহাসনে বসার সুখ কেনই বা বঙ্গেশ্বরগণ খুঁজিয়াছিলেন? ইবন বক্তিয়ার হইতে দাউদ পর্য্যন্ত ৪১ জন ভূপতি সিংহাসনে ক্ষণিকের জন্য বসিবার সুখ লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার কামরূপের রাজার হাতে লাঞ্ছিত হইয়া এবং সর্ব্ব সৈন্য ক্ষয় করিয়া যখন গৌড়ের নিকট উপস্থিত তখন তিনি উৎকট রোগশয্যাশায়ী, কিন্তু ভগবান্ মরিবার সময়ও তাঁহাকে শান্তি দিলেন না, প্রিয় সেনাপতি আলিমর্দ্দন তাঁহার পীড়িত অবস্থায় খড়্গাঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেন (১২০৮ খৃ.)। এই ঘটনার মাত্র দুই বৎসর পরে ইবন বক্তিয়ারের প্রিয় মন্ত্রী বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শিরান নিজের দলের একজন লোক কর্ত্তৃক নিহত হন (১২১০ খৃঃ)। এবার বক্তিয়ারের হত্যাকারী আলিমর্দ্দন খিলজির পালা, তিনি দুই বৎসরের একজন ষড়যন্ত্রকারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন ১২১১ খৃঃ। বঙ্গের শাসন পূর্ব করিলেন গিয়াসুদ্দিন, কিন্তু তিনিও কয়েক বৎসর পরে যুদ্ধে নিহত হইলেন (১২২৭ খৃঃ)। এই চারিটি হতভাগ্য নৃপতির পর নাসিরুদ্দিন বাদসাহের কপাল ভাল, তিনি হেকিম ও কবিরাজের চিকিৎসাধীন থাকিয়া মরিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৫ই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা তোগন খাঁ ও তমুর খাঁ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ে ১২৪৯ খৃঃ অব্দের একই দিনে প্রাণত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে বসিয়া তোগন খাঁ বোধ হয় একটি রাত্রিও শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন নাই। সুলতান মগীসুদ্দিন (সপ্তম বাদসাহ) ১২৪৮ খৃঃ কামরূপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, মরিবার সময় তিনি তাঁহার বিজয়ী শত্রুর নিকট প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রের মুখখানি জীবনে শেষবার দেখিতে। পরবর্ত্তী বাদসাহ জালালুদ্দিন কতার শাসনকর্ত্তা আর্সলান খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন একটা অভিসন্ধির ফলে বাহাদুদ্দিন (মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজি হইতে একাদশ) বাদসাহের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। কাইকোবাদকে খিলজি বংশীয় এক আমীর নিহত করেন (১২৮৯ খৃঃ)। তৎপরবর্ত্তী নবাব ফকরুদ্দিনকে তাঁহার গুপ্তচর হত্যা করেন। সেকেন্দর বাদসাহকে তাঁহার পুত্র গয়াসুদ্দিন যুদ্ধে নিহত করেন (১৩৫৮ খৃঃ)। দ্বিতীয় সামসুদ্দিন বাদসাহকে নৃসিংহ ওঝার বুদ্ধিবলে রাজা গণেশ হত্যা করিয়াছিলেন। হতভাগ্য নসিরুদ্দিন (মহম্মদ পৌত্র) মাত্র ৮ দিন রাজত্বকে বসিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, নবমদিনে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করিল। শেষে শাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে খোজা

বাবেক কর্তৃক নিহত হইলেন। সাহাজাদা অন্তঃপুরে আমোদ করিতেছিলেন, তিনি ছিলেন খোজা, শুইবার সময় স্ত্রীলোকোচিত খোজাদের অভ্যস্ত পরিচ্ছদ পরিয়া মদ খাইয়া আমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় হাবিশী মন্ত্রিপ্রবর তাঁহার বুকে অসি বসাইয়া দিল, তাঁহার গায়ে ছিল অস্ত্রের বর্ম, খঞ্জরাঘাত সহ্য করিয়া তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে খুব কতক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত হইয়া যখন মড়ার মতন পড়িয়া ছিলেন, তখন হাবিশী মন্ত্রী তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই সময় বাদসাহের এক খোজা চাকর তথায় উপস্থিত হইল, তিনি মরেন নাই, তাহাকে দেখিয়া যেন পুনর্জীবন পাইয়া তাহার নিকট মন্ত্রীর কাণ্ডটা বলিতে লাগিলেন। বিনাইয়া ভাণ করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে বিশস্ত চাকর বাহিরে একজন ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল, কিন্তু সে লইয়া আসিল সেই হাবিশী মন্ত্রিপ্রবরকে। রাজা তখনও মরেন নাই দেখিয়া মন্ত্রী ও বাদসাহের 'বিশস্ত' খোজা চাকর বাকী কাজটুকু সারিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

অতঃপর ফিরোজসাহ মাত্র একটি বৎসর রাজত্বের পর সিন্ধিবন্ধুর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। সিন্ধিবন্ধুর (মুবারক সাহ) হৈয়দ হুসেনের দ্বারা নিহত হন। হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ তাঁহার পিতার সমাধি-মন্দিরে ভজন করিতে-ছিলেন, ইতিপূর্বে তিনি এক খোজাকে গুরুতর অপরাধের জন্য উচিত দণ্ড দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে দণ্ড আর দিতে হইল না, খোজাই উপাসনা-মন্দিরে তাঁহাকে একা মুদ্রিতনেত্র দেখিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল। (১৫১২ খৃঃ) মৃত বাদসাহের পুত্র ফিরোজ সাহ তিনটি মাস মাত্র রাজত্বভোগ করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার খুল্লতাত মহম্মদ সাহ এই অভিশপ্ত রক্ত-সিংহাসনের লোভে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। মহম্মদ সাহের পরবর্তী বাদসাহ সুপ্রসিদ্ধ সের সাহ রাজত্বের যখন তাঁহার এক মন্ত্রীকে দিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে যাইয়া একটা বোমা ফাটায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাঝে এক রাজা স্বাভাবিক কারণে মরিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী বাদসাহ মহম্মদ সাহ ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। জেলালুদ্দিন বাদসাহের পুত্র অল্পস্থায়ী রাজত্বের পর গায়েসুদ্দিন কর্তৃক নিহত হন। গায়েসুদ্দিনের হত্যাকারক তাজ খাঁ, তাজ খাঁর পুত্র মবরাজ আমিরদিগের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। পরবর্তী রাজা লাউক এই দুর্ভাগা নৃপকুলের শেষ আহুতিস্বরূপ মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে বহু যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়া স্বীয় জীবন সেই সমরানলে প্রদান করেন (১৫৭৬ খৃঃ)।

সুতরাং এই রাজগণের অধিকাংশই সিংহাসন লাভ করিবার প্রাক্কালিকস্বরূপ প্রাণদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে, কেহ বা তিন মাস, কেহ বা এক বৎসর পরেই নিহত হন, এক সম্রাট তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, কেহ বা উপাসনা-মন্দিরে প্রার্থনায় বসিয়া অপরাধী ভৃত্যের হস্তে, কেহ বা রাত্রিকালে শয়নাগারে বিশস্ত মন্ত্রীর

প্রতিক্রিয়ার ফল।

খড়্গাঘাতে, কেহবা স্বীয় স্নেহপর পুত্রভ্রাতৃকর্তৃক যমমন্দিরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এই ভাবে অপঘাতে মরেন নাই, তাঁহারাও নিরাহারে মৃত্যুর ছায়া চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া হীরকখচিত রাজতক্তে বসিয়াছেন। তাতারপতি তাইমুরের মৃত্যুকাহিনী পড়িলে চক্ষু সজল হয়। এই আক্রমণ রাজন্যগণের অনেকেরই ধর্মাধর্ম জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না—কেবল যেমন করিয়া হউক বঙ্গের মসনদে বসিতে পারিলেই হয়। শের শাহ হুমায়ুন বাদশাহের সঙ্গে কোরান ছুঁইয়া শপথ করিলেন, যাহা কিছু পবিত্র সকলের নাম করিয়া শপথ করিলেন, পরক্ষণেই সেই সন্ধি ছেলের হাতের মাটীর পুতুলের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি হুমায়ুনের নিশ্চিন্ত, মিত্রিত শিবির আক্রমণ করিলেন। দাউদ খাঁ মনিয়র খাঁর নিকট যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-সহকারে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে পবিত্রতর শপথ কেহ কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু বঙ্গের তক্তে বসিলে বাদশাহের বুদ্ধি বিকৃত হয়, এই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া তিনি সম্রাটদ্রোহী হইলেন।

অবশ্য রাজপদের মত প্রলোভনীয় কি আছে? কিন্তু মোগল, তুর্ক, পাল ও সেনদের রাজত্বকালেও যুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না, তাঁহারাও স্বপক্ষের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন।

দিল্লীবিদ্রোহী হুমায়ুন 'বঙ্গ-বাঘ।'

কিন্তু এই পাঠানদের মত নৃশংসতা হিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল কার্য প্রতিপন্ন হুলভ্য ছিল—অভিমন্যু বধ, পাণ্ডবদের সুপ্তগণের হত্যা মহাভারতের কলঙ্কস্বরূপ, কিন্তু তাহাতেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের উপাহরণ বড় দেখা যায় না। সত্যরক্ষা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-পালন, রাজভক্তি প্রভৃতি গুণের উদাহরণ স্বরূপ হিন্দুসাহিত্যে যে কত কাহিনী বর্ণিত আছে তাহার অবধি নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নাইসেমের অনুগত মৃত্যু ও সেনাপতি কাণ্ডেরোর সত্যরক্ষার নিজের প্রাণ দিয়াছিল। ধর্মাধিকরণে একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলিলে হরিহর বাইতি বড় পুরস্কার পাইত—সত্য বলিলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, কিন্তু দ্বিধাকম্পিতচিত্তে হরিহর মিথ্যা বলিতে অস্বীকার করিয়াও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া মিথ্যা বলিতে পারিল না। তাহার পল্লীর সরল প্রাণ মিথ্যা বলিতে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, জিহ্বায় তালা ঠেকিয়া গেল। এই সকল কথা উপাখ্যান মাত্র, কিন্তু হিন্দুর সত্যবাদিতাসম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীরা যে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই সকল গল্প পড়িলে মনে হইবে, উপাখ্যানগুলিতে জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এবং উহা সত্য হইতে দূরবর্তী নহে। এই বর্বরীক জাতি রণকুশল সাম্রাজ্যলোভী পাঠানগণের সংস্পর্শে আসিয়া নিতান্ত আতঙ্কিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে পশু-যুদ্ধের রূপক স্থলে হিন্দু রাজা ও প্রমিলাবর্গের এই ভয় বর্ণিত হইয়াছে।

এই যুগের বঙ্গেশ্বরগণের ইতিহাসে দেখা যায় ইহারা স্বাধীনতার জন্য অসাধ্যসাধন-চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেকটি বাদশাহই দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হয়ত পায়ে পড়িয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন—আবার সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইয়াছেন। ইহারা প্রকৃতই বঙ্গের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজব্যাঘ্র (Royal Tiger)। এই ব্যাঘ্রকে দিল্লীশ্বরগণ

কিছুতেই [illegible] হইতে পারেন নাই [illegible] হইতে বঞ্চিত হইয়া হুমায়ুন দিল্লীর তখ্ত্ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সকলেরই পাঠানবাদ্শাহ [illegible] কি ভীষণ তাহার অধ্যবসায় [illegible] হারিয়াছেন, সন্ধিপত্র লঙ্ঘন করিয়াছেন, সন্ধির [illegible] সুবিধা পাইলেই [illegible] কামরূপ রাজধানী লুটে লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সিপাহ্ সেলেমান খাঁ আরকানের নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়া নির্বিঘ্নে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া গেলেন [illegible] ইচ্ছা করিলে একটিবার মাথা নোয়াইলেই তদপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্য স্বাধিকারে অধিকতর হইয়া পরম নিশ্চিন্ত জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিতেন কিন্তু এই পাঠান বীর জীবনে সুখ শান্তি চান নাই পুনঃ পুনঃ হারিয়া গিয়া পুনঃ পুনঃ লড়াই করিয়াছেন প্রায় জীবনব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়াও পরাক্রান্ত হন নাই, শেষে যে সন্ধি হইল তাহাতে সমস্ত উড়িষ্যার সামান্যটা হাতে পাইলেন, হয়ত বা আরকানের বশ্যতা স্বীকার করিলে আরও অধিকার বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সে সকল সুবিধা ও ব্যবস্থা লইয়া তিনি সুখী হন নাই পরিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন এই আফগানদের প্রত্যেকের বুকে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বীজ ছিল, এই বীজ অবাধক, শীতরাজ্যের নরক ও সমর সেন প্রভৃতি হইতে আসিয়াছে বাঙ্গালাদেশের রাজারা চির বিদ্রোহী পাঠান সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলিতে পারি, এতটা আর কখনও নহে—ইলিয়াসের অতুল বিজয়পতাকা, মসনদের সমৃদ্ধি, বৈদ্যনাথের অমরেশী চর্চা এবং সর্ব্বোপরি মুক্তির অধিকারী শিল্পী—বঙ্গের ব্যাপ্তিগাকে স্মরণে আনিতে পারে নাই

বাঙ্গালী চরিত্রের এক দিকে বিরাগ অপরদিকে রাগ বিরাগের যে বিদ্রোহী কিন্তু অনুরাগে সে অকাতরে মৃত্যু বরণ করিয়া লয় বাঙ্গালীর রাজভক্তি অপূর্ব্ব। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম, রংপুরী লক্ষ্মা ও শাকা-শুকা পুত্র-রত্নের যে রাজভক্তির কথা বর্ণনাতীত কালের বর্ণিত আছে তাহার তুলনা নাই লক্ষ্মা তাঁহার দুই পুত্রকে গভীর নিদ্রা হইতে জাগাইয়া রাজার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ যুগেও বাঙ্গালী পুলিশ অনেক সময় স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গলা সহ করিয়াও রাজার জন্য কথায় কথায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে।

হিন্দুর সহিত একত্বন্ধ।

যদিও আমরা ঃ ইঃ বক্তিয়ারের আগমন হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময়টা 'পাঠান যুগ' নামে মূলতঃ পরিচিত করিয়াছি, তথাপি এই যুগের রাজগণের মধ্যে সকলেই আফগান ছিলেন না, কেহবা আরব দেশের, কেহবা খোজা, কেহবা হাবসী, এবং কেহবা হিন্দু ছিলেন। মোটামুটি এই সময়টাকে 'পাঠান প্রাধান্যের যুগ' বলা যাইতে পারে এই সকল রাজাদের পরীরে প্রচুর পরিমাণে হিন্দুরক্ত বর্তমান ছিল সুলতান গয়েসুদ্দিনের বিমাতা, সমসুদ্দিনের নিকা-হের স্ত্রী, কদমবতী বেগম—এক সময়ে সুলতানা দিল্লীতে বাস করিয়াছিলেন—বঙ্গদেশের শাসন-সংস্কার বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। কদমবতী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর

পরগণার সুবিখ্যাত বহুযোগিনী গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা, সমসুদ্দিন সুবর্ণগ্রাম যাইবার পথে নদীর ঘাটে এই অসামান্য রূপসী যোড়শীকে দর্শন করিয়া বলপূর্বক তাহাকে স্বীয় অন্তঃপুরে লইয়া আসেন, সমসুদ্দিনের নিকট তথাকার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও অপরাপর শ্রেণীর বিশুদ্ধ হিন্দুরা উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যের প্রতিবাদ করেন বাদসাহ

ফুলমতী বেগম।

বলিলেন "আচ্ছা বেশ। ফুলমতীকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি ইহার সমান বয়সের কোন সৎব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করুন, নতুবা গণিকা বৃত্তি করিবার জন্য এবং সমাজচ্যুত হইয়া নিরাপদ হইয়া থাকিবার জন্য আমি এমন সুন্দরী মহিলাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব না।" বাদসাহের কথায় কেহ অবশ্য রাজী হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং তাঁহাকে নিকা করিলেন। এই রমণী যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন, তেমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন, তৎসময়ের আফগান দরবারে আসিয়া তিনি বিলাসকলা ও কূটনীতি শিখিয়াছিলেন। সমসুদ্দিনের উপর ফুলমতী বিবির প্রভূত ক্ষমতা ছিল এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পর কংসনারায়, জনা খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গালা দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণকে তিনি নিকা করিবেন সেই লোভ দেখাইয়া ক্রীড়াপুত্তলীর মত ব্যবহার করিয়াছিলেন মুসলমানগণ হিন্দুপ্রভাবের কোন উল্লেখই করেন নাই কিন্তু ফুলমতী বেগম যে কতটা শক্তির সাহায্যে বাদসাহের দরবারে শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা বাংলার ব্রাহ্মণ-কুলজীগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। সাল্লাম মহাশয় লিখিয়াছেন—গায়েসুদ্দিনের মৃত্যুর পর ফুলমতীর পুত্র মইজুদ্দিন গৌড়ের বাদসাহ হন। মধু খাঁ ও ফুলমতী নিতান্ত অলস, বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য মইজুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত শাসনকার্য্য তাঁহারাই সম্পাদন করিতেন কিন্তু মইজুদ্দিন বাদসাহের অস্তিত্ব অন্য কোন সূত্রে এখনও প্রমাণিত হয় নাই তাঁহার সময়ে রাজসাহীর একটাকিয়া ও সাতড়ার রাজারা বাদসাহের অনুগ্রহে খুব প্রবল হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহারা যে ঐ সময়ে প্রকৃত শক্তিশালী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘটককারিকা ও প্রবাদবাক্যের ভিত্তি অনেক সময়ই সত্যমূলক, কিন্তু সময়ে সময়ে উহার লিপি বুদ্ধের ঘাড়ে পড়িয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নানারূপ ভ্রম, প্রমাদ ঘটিয়া থাকিলেও ফুলমতী বিবির অস্তিত্ব ও বাদসাহ-দরবারে তাঁহার প্রভাব কখনই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না, দেশব্যাপী জনরব ও প্রবাদের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই সত্য নিহিত আছে।

ফুলমতীর প্রভাবেই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এই বাদসাহের সময়ে হিন্দুরা যে রাজসভায় অতি প্রধান ছিলেন—তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহার পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখাইব, মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ "সিরুকী" সাজাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দুললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন—তাহাদিগকে নিকা করিয়া বহু সন্তান উৎপন্ন করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের কঙ্কলবাড়ীর জমিদারগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের জমিদারেরা এইরূপে যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে। কোন

এক রাজার কন্যাকে বঙ্গের মুসলমান বাদসাহ বিবাহ করিতে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে যে অনর্থ ঘটিয়াছিল তৎবিবরণ মহমনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডে রূপবতী নামক আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বাধ্য হইয়া নায়িকা রাজা ও বাদসাহের নাম রূপান্তর করিয়া ছাপাইয়াছি। কিন্তু ঘটনাটি সত্য। পূর্ব্ব হইতে দেখা যে আবহাওয়া বহিতেছিল, তখন সাহ সেই দিকে পাল খাটাইয়া বঙ্গের বাদসাহের অন্তঃপুরে হিন্দুপ্রভাবের অনুকূল গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ ও দেশে তখন কুল-গৌরব অত্যধিক ছিল। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এই কুলগৌরবই তাঁহাকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে মহোন্নতির সোপানে আরূঢ় করাইয়াছিল। ইনি নিজের কন্যাদিগকে পাঠানদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে ভাদুড়ীবংশ কুলমর্য্যাদায় অগ্রগণ্য—তাঁহাদেরই একজন সঙ্গের রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুদর্শন এবং গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদা একটাকিয়ার রাজা মদন খাঁ তাঁহার দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেবকে লইয়া হসন সাহের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের সুগঠিত দেহযষ্টি এবং বুদ্ধিতে কুশল দেখিয়া তিনি মদন খাঁর নিকট ইহাদের সহিত তাঁহার দুই কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, "আমি আপনার দুই পুত্রের ধর্ম্ম নষ্ট করিব না, আপনি যদি গ্রহণ করেন আমার কন্যারা হিন্দু হইবে।" তাহা হইবার নহে, তাহা আর কি করিয়া হইবে? মদন খাঁর দুই পুত্র বাদসাহের কন্যা বিবাহ করিয়া অগত্যা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর বাদসাহ মদন খাঁর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বসমেত ১১ জনকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার বাকীর মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াইলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্ত ভিন্নকুলিগণকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া বলাইলেন যে তিনি রাত্রে চোখে দেখেন না, সুতরাং তিনি একটাকিয়ার রাজবংশের ঘটের সলিতাটির মত একাকী সেই পরিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। বাদসাহ রতিকান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধের বেহাই। সে অন্ধ সে হিন্দু থাকুক, যাহার চক্ষু আছে তাহার মুসল-মান হওয়াই উচিত।" সাত্তাল মহাশয় লিখিয়াছেন "ইহার পর অনেক নবাব ও বাদসাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।" ঘটকদের পুস্তক হইতে জানা যায়, "২৯ জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন (১০২ পৃঃ)।" ভবমনসিংহ গীতিকায় কালাপাহাড়ের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা মুসলমানের লেখা, মুসলমান রাজদুহিতা যে কি অদ্ভুত কৌশলে ব্রাহ্মণযুবককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা এই গীতিকায় আছে (পৃঃ ৬৫০-৬৬২)।

ঘটককারিকায় ব্রাহ্মণবংশের আখ্যায়িকায় এইরূপ উল্লেখ কখনই কল্পনাসঙ্গত হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেদের বংশাবলীতে এই কলঙ্কের ছাপ নিজেরা কেন দিতে যাইবেন? পারসীক, যবন (গ্রীক), শক, হূন প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিরা হিন্দুসমাজের উচ্চ গণ্ডীতে স্থান পাইবার জন্য চিরদিন লালায়িত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু

মুসলমানেরা নব জাতিভাত্রের ফলে অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা করিয়াও হিন্দুর ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। এখনও একজন ব্রাহ্মণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে তাঁহারা বিশেষ গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

হিন্দু ও পাঠান প্রভৃতি মুসলমান শ্রেণীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ একটা প্রবাদ-বাক্য নহে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহুল। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাজপুতের রক্ত-সংস্রবের পথ দেখাইয়া দুই জাতিকে মিলনের দিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই. পল্লীগীতিকায় এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

হিন্দু-মুসলমান প্রীতি।

মুসলমান বাদসাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি দেখাইতেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মুসলমান ঐতিহাসিকগণই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একটীর কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গাধিপ ইলাইস খাঁ (সামসুদ্দিন—১৩৫৩ খৃঃ) তখন দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। ফিরোজ পাণ্ডুয়া হইতে একক্রালা দুর্গ অবরোধ করিলেন। সামসুদ্দিন সেই দুর্গে ছিলেন এই একক্রালা দুর্গের সন্নিকটে জবানী নামক এক হিন্দু সাধু ছিলেন, সামসুদ্দিন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত। তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ হইয়াছে, তখন সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া তিনি ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে একাকী বাহির হইয়া সাধুর মৃত দেহের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হন। পথে সম্রাটের শিবির সামসুদ্দিন তাঁহার গুরুদেবের শবের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইয়া সেই ছদ্মবেশেই ফিরোজ শার দরবারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন, তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সম্রাট্ যখন শুনিলেন তাঁহার প্রবল শত্রু, যাঁহাকে ধরিবার জন্য তিনি ২২ দিবস যাবৎ একক্রালা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি ফাঁকি দিয়া তাঁহার মৃত গুরু দর্শন করিয়া, এমন কি তাঁহার শিবিরে ঢুকিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া গেলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তিনি সামসুদ্দিনের দুঃসাহস সতর্কতা এবং অকৃত্রিম গুরুভক্তির প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায় মুসলমান সাধকগণ যে সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি কি করিয়া এই দুই জাতি, মত ও ধর্ম্মের এতটা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, শতাব্দীর পর শতাব্দী পরস্পরের গলে গলে ঠেকাঠেকি করিয়া বাস করিতেছেন। পীর বাতাসীর মুসলমান গায়েন পীর গুরু জিন্দাগাজীর নিকট বর প্রার্থনাপূর্ব্বক "মক্কা মদিনা বন্দুলাম কাশী গয়াধাম" ইত্যাদি বন্দনা-গীতে হিন্দুর তীর্থগুলির প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৬১-৩৮২)। নেত্রকোণা ডাকাইতের গীতিকায় মুসলমান কবি তকের্শ্বর (চট্টগ্রামের) সমস্ত গ্রাম্য দেবতাকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিয়া গীতি আরম্ভ করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি "সীতা শক্তি (সতী) মাকে মানি, রঘুনাথ গোসাই" প্রভৃতি পদ গাহিয়া "ভুলিবার সাধ" পিতামাতার চরণ

বন্দনা করিয়াছেন (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩২৫)। চেঙ্গুরার লড়াই গীতিকায় মুসলমান গায়েন পশ্চিমে মক্কা মূল স্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া 'জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"অদ্বি ঠাকুর জগন্নাথ ভেদ নাই বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। চণ্ডালে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়। এমন শুদ্ধ দেশ ভাত নাহি যায় ভাত লইয়া তারা মুখে মুছে ভাত। ঐ কারণে রহিয়াছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ" (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১০)। শেষের দুইটি ছত্র পড়িয়া পরবর্ত্তী ভারতচন্দ্রের—"চল ভাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাখিছ মহিম হাত, নাচিব আহিব কুতুহলে" প্রভৃতি কবিতার কথা সহজেই মনে হয়। আর একজন মুসলমান পল্লীকবি লিখিয়াছেন—"হিন্দু আর মুসলমান একই পিতের দড়ি—কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি।"

আফগান-প্রাধান্যের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, দুই জাতির মধ্যে আদান-প্রদান হইলে যদিও হিন্দুগণ সমাজ-বহিষ্কৃত হইয়া পড়িতেন, তথাপি তাঁহারা উহাদের স্বাভাবিক দুঃখ ও হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ বিস্মৃত হইতেন না। হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ মহাভারত কাব্যের বাঙ্গলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন, উক্ত বাদসাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন, সঙ্কলয়িতার নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা, শ্রীকরণ নন্দী নামক কবি দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ বা উপাধিধারী বসুবংশীয় মালাধর নামক কবির (কুলীনগ্রামবাসী) দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি "গ্রন্থ গায়েসউদ্দিন সুলতানে"কে গ্রন্থসমর্পক এই পদাংশ উপহার দিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি সুলতানের উৎসাহ পাইয়াছিলেন। এই গায়েসুদ্দিন কবি হাফেজকে সাদর দেশ হইতে বাঙ্গলায় লইয়া আসিতে লালায়িত ছিলেন। মিথিলার রাজসভার শীর্ষস্থানীয় কবি একদিকে গৌড়েশ্বরের আহ্বকৃত্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—"সে যে নসিরা সাহ জানে যারে চাহিল মদন বাণে, চিরজীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভানে।" যশোরাজ খাঁ নামক কবি হুসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সাহ হুসেন জগতভূষণ, জনে যশোরাজ খানে।" সুদূর চট্টগ্রাম হইতে এই সুরে সুর মিলাইয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন সাহকে কলিযুগের কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ উদাহরণ অসংখ্য। আমার এ সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে বাদসাহের পরিবারে 'হিন্দুস্থানের আবহাওয়া' থাকাতে এবং এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বাঙ্গলা ভাষা আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিন্দুরাজত্ব থাকিলে এটি ঘটিতে পারিত না। বিদ্যার অর্থবিমানসমূহ, দেব-ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান্ টুলো পণ্ডিতগণের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুন আমাদের দেশের ভাষা যে কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান-

বঙ্গভাষার আদর।

প্রাধান্যকালে যবনসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্রও অনেক সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইত। দের সাহের কামানের উপর বাঙ্গলা অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজের তাম্রশাসনগুলি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ হইত, সে সময়ে মুসলমানেরাই বাঙ্গলার এই বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গলা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জ্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুর গান ও উৎসবাদি মুসলমান বাদসাহের দরবারে আদরের উৎসব পাইত। এইভাবে কীর্ত্তন পুনিবার সূত্র বশতঃ গৌড়ের কোন সম্রাট্ আমাদের কবিসম্রাট্ চণ্ডীদাসের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন।

রাজরাজড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিরবধি যুদ্ধবিগ্রহাদি উত্থানপতন প্রভৃতি রাজকীয় পতাকার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অবস্থান্তর পল্লীসমাজকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্মণ তাঁহার খড়ো ঘরের মেজের মাদুর পাতিয়া খাগের কলম দিয়া তেরেট ও তালপত্রের উপর বেদবেদাঙ্গের ব্যাখ্যা লিখিয়া যাইতেন, বৈয়াকরণ, তার্কিক, ও নৈয়ায়িক যখন স্বীয় গ্রন্থের আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহারা মুক্তকক্ষ হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন। বিলাস তাঁহাদের মাড়োয়ারি সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের ঘরে, সরস্বতীর চালের উপর অনাবৃষ্টা ঢালিয়া তাঁহাদের একান্ত উপেক্ষিত দারিদ্র্য ও সাংসারিক নিস্পৃহতা জমাট করিত। কোন কোন সময় এক একটা রাজনৈতিক ঝড় বহিয়া যাইত সত্য, কিন্তু তাহার ফল বেশীদিন থাকিত না। দেশের কৃষি শিল্পের উপরও বাদসাহেরা কোনরূপ হাত দিতেন না। পাঠানেরা তরবারি লইয়া এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি তাঁহারা একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা বাদসাহের বা তৎপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনের জন্য সর্ব্বদা বর্ম্মচর্ম্ম আঁটিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যই উদ্যত হইয়া থাকিতেন, ইহারা কৃষির কোন ধার ধারিতেন না। সুতরাং ধনশালী হিন্দুরাই তখন কৃষিপ্রধান বাঙ্গলার একরূপ মালিক ছিলেন, শুধু কৃষি নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে ছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "অধিকাংশ আফগানই তাহাদের জায়গীরগুলি ধনবান্ হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন, গৃহসুখ তাহাদের কপালে বড় থাকিত না, কারণ প্রায়ই তাঁহাদের নেতাদের আহ্বানে তাহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত, বিশেষ ইহাদের বাণিজ্যাদি কার্য্যের প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালা ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯১০ খৃঃ, পৃঃ ১৯০।) এই সকল কারণে বঙ্গদেশে কোন স্বর্ণখনি না থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্য এদেশ "সোণার বাঙ্গলা" উপাধি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের এবং তৎসন্নিহিত সময়ের

পাঠান-রাজত্বকালে হিন্দুর বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্য।

বঙ্গদেশসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "এত সময়ে বাঙ্গলার প্রধান ব্যক্তির খাওয়ার সময়ে স্বর্ণপাত্রের একটা ভয়কালে ঘটা দেখাইতেন ইহ তাহাদের একটী রীতিতে দাঁড়াইয়াছিল। নিম্নস্থ-কালে কাহার এরূপ সোণার সরঞ্জাম নেই তাহ লইয়া একটা গৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত" (১১৪ পৃ.)। এ কথা বলে বলে সত্য বাঙ্গলাদেশ কত ধন ধরিয়া বাণিজ্য ও কৃষিতে জগতে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া এই বিপুল ধনাগম করিয়াছিল তাহার পরিচয় পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার পাঠকেরা পাইবেন এই গীতিকাগুলি ইতিহাসের, শিলালেখ বা মুদ্রার ন্যায় 'ইতিহাস' নামে কথিত হইবার অধিকারী নহে, তথাপি সমাজের যে প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িয়াছে তাহা নিখুঁত এই লোককবিতার ভাণ্ডারে কত অলঙ্কারের উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়া গৃহ ও নৌযানসজ্জায় যে প্রচুর স্বর্ণ ও মুক্তা ব্যবহৃত হইত তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। ধনিকের ও সাধারণের জন্য মৃণ্ময়ী গৃহস্থের গৃহে স্বর্ণের পাত্র ব্যবহৃত হইত ধনিকবধূরা সকলেই সোণার জলের কলসী লইয়া দীঘি, পুষ্করিণী বা নদীর ঘাটে জল আনিতে যাইতেন অট্টালিকাগুলির মাথায় স্বর্ণমণ্ডিত, এবং মণিখচিত জলটুঙ্গি, চৌচালা, আটচালা ঘরে এক ও আধখানা কপাট ও সোণা রূপার কারু প্রযুক্ত হইত।

এ দেশের বাঁশের খড়ুয়ারী ঘর যে ঠিক একখানা সাজানো প্রতিমার ন্যায় হইত, তাহা ফরিদপুর জেলার সম্বন্ধে বিক্রমপুর বাঙ্গালা ঘরখানি-সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনায় সবিস্তারে বলা হইয়াছে সে সময়ের যত ইটকালের প্রকৃত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেই বিপুল কিন্তু সেইরূপ অনেকখানি ঘর কতকটা গোবর মিশ্রান্ন হইয়াও কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখনও টিঁকিয়া আছে। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় দেখা যায় এক ধনিক প্রকৃত এইরূপ ঘরে ইষ্টকনির্ম্মিত কলসী পাইত এবং কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিত, সোণার পাত্রে দিয়া চাল ছাওয়া হইত। মাধবপুর ও মাছরাঙ্গা পক্ষীর পাখা দিয়া অনেক সময় চালের নীচের দিকটা সাজানো হইত "ভেলুয়া" নামক কীর্ত্তিতে ধনিকরাজ মরাইয়ের বর্ণনায় লিখিত আছে— "বড় বড় ঘর, তার আটচালা চৌচালা—আর সোণা দিয়া মুড়াইছে মাথারে। রূপাতে দিয়াছে টুনি, সোণার পাতে দিছে ছানি, টুঙ্গির মাথা রত্ন অলঙ্কার, হাজার কারিগর নাহি সাপর বহিয়া যায়— দেখিলে অতি চমৎকার রে।" ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৪১-৪২ পৃঃ

আমরা মনে করিয়াছিলাম এই বর্ণনার সকলই উপকথা, কিন্তু যখন ফরিদপুরের এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে কতকটা এইরূপ ঘর দেখিতেছি, তখন মনে হয় না যে কবি সত্যের উপর খুব জোরসে তুলি চালাইয়া বা অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু যখন অজস্র গুবাবে পাখপক্ষীর ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের প্রতিস্থলে হস্তিগ্রাসকারী সিংহ, পরস্পরবদ্ধ নরেহস্ত ও বিবিধ ফুল-লতায় একটা পরম ঐক্য দেখাইতেছে এবং যখন আমরাও কলাশিল্প-জাত নানারূপ প্রমাণে ইহা দেখাইয়াছি—। বিশেষতঃ বকুলবাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, অজন্তার কন্দিগণের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন, তখন এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক যে সেই

গুপ্তযুগের অপূর্ব্ব শিল্প ও কৃষ্টিমূলের বংশধরেরা অবস্থার বিপাকে সত্তেও ইহাদের কারুকার্য্যের পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিয়া যান নাই।

এই শিল্পিকুল দেখিতে আদিম অধিবাসীরা তাহার দ্রাবিড় হউক বা অন্যান্য হউক,—যাহাদের বহুসংখ্যক বন্ধু আমাদের সঙ্গে মিলিয়া সমতলের নিম্ন গঙ্গাতীরে স্থান করিয়াছিল যাহারা খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ শতাব্দীতে মহেঞ্জোদরোর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তাহারাই কি ভারতীয় লিপিমালার আদিপ্রবর্ত্তক এবং এই যে মহাসূত্রের "চন্দ্র নাগরী" আমিত তাহার

শিল্পীর কথা।

কি সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর এবং বহুযুগ-পূর্ব্বকার শিল্প সংস্কার বহন করিয়া আসিয়াছে? অনুসন্ধান করা মহা পণ্ডিতগণ যে ভাষা বুঝিবার অক্ষম তাহা বুঝিতে মহাসূত্রের নিকট ধরণা দিবার কেহ কি? (১৩৩৮ পৃ.)

এখানে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা যে কারুশিল্প, স্থপতি, ভাস্কর ও প্রকৃতি শিল্পী, যাহারা দেবমন্দির দেবমূর্ত্তি ইত্যাদি রচনা করে, তাহাদের অনেকের জল হিন্দুসমাজের আচরণীয় নহে, অথচ তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নীচকাজ করে, যথা কাহার নাপিত ইহাদের জল আচরণীয়। এত গুণবত্তা থাকা সত্তেও আদিম অধিবাসিগণ আর্য্যসমাজে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য ধুরন্ধর শিল্পীদিগের পরিচয় রাক্ষস, বানর প্রভৃতি কারণে দেই তব আর্য্যদের সঙ্গে অনার্য্যদের যখন সংঘর্ষ হয়, তখনও সেই সুদূর অতীতকাল এদেশের অধিবাসী অনার্য্যদের বড় বড় প্রস্তরগৃহ ও দুর্গাদি ছিল। পাহাড়ীদের ঘরে সমস্ত কলাবিদ্যার মূলা চিরবিদ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা একদিন চিত্র বিদ্যা আমরা শিল্পশাস্ত্রের গ্রন্থেই পাইয়াছি। সখ করিয়া বড়লোকেরা চিত্র ও স্থাপত্য বিদ্যার অনুশীলন না করিতেন, এমন নহে কিন্তু কলাবিদ্যার মধ্যে এই সকলেরই নিম্ন শিল্পশ্রেণীরই একটেটিয়া ছিল। শুধু চিত্র ও স্থাপত্য নহে—লেখকের বৃত্তিটাও কতক পরিমাণে নিম্নশ্রেণীরই হাতে ছিল, যদিও গণদেবতার উপরে একদাকালে এই বৃত্তি আরোপ করা হইয়াছিল।

পাহাড়ীদের সমাজ শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে উন্নতি করিয়াছে, অধিকার ছিল, তেমনই আফগানগণ নিরবধি রণক্ষেত্রে ও পরদেশ আক্রমণে ব্যস্ত থাকিতেন। ইহা একজন ব্যতীত

পাহাড় রাজারা শিল্পচর্চার তাদৃশ সুযোগ পান নাই।

এই সুযোগ মুসলমান সম্রাটগণ কেহের শিল্প বা স্থাপত্যের বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই। যে সকল মুসলমান পশ্চিম হইতে এদেশে আসিতেন, তাঁহারা স্বীয় ভুজবলে খড়্গহস্তে তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করিতে আসিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আফগান, তাহা ছাড়া, তাতার, মোগল, আরবি প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয় লোকেরাও এদেশে অনেক আসিয়া পড়িয়াছিলেন। শেষ সাত, তুরস্ক এবং অপর দুই এক জন বণিকের ছাড়া ইহাদের মধ্যে কেহই শিল্পচর্চার সুযোগ পান নাই। পঞ্জাবের তুলের কুলা ইহাদের সংস্কৃতির ছায়া বাবরের

* তাম্রচক্রের অন্যান্য কারুশিল্প-কর্ম বিষয়ক ক্রটি অভিপ্রায় এই যে তাঁহার পুরুষ শিল্পকুলের আশ্রয় করিবে।

উপর উলঙ্গ করিত, এই সকল আবৃতাবয়ব স্ত্রীমূর্ত্তির চিত্র ও ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা কখন করিবেন? অথচ সেই যুগে গুপ্তগৃহ, গুপ্তদ্বার অলিন্দপথ অর্থ প্রশস্ত গৃহ ও অন্দর, কোন কোন স্থানে হঠাৎ পর আক্রমণকারে পলাইবার উপায়স্বরূপ সুরঙ্গ (Tunnel) প্রভৃতি রাজ-প্রাসাদের অঙ্গীভূত হইয়াছিল এমন কি হিন্দুরাও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদের মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সেই সময়ের অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরেই পাদদেশের আর অর্দ্ধাংশ, ত্রিপুরার সপ্তরত্ন মন্দিরের চূড়ার অনুরূপ উচ্চ উহাদের শীর্ষদেশ এখন আর দেখিতে পাইবেন না। এই উচ্চ মন্দিরের আসন ও নির্গম পথ একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মহাজন সাহায্য না করিলে সেই রহস্যের সমাধান হয় না এইরূপ মন্দির পাণ্ডাপুরোহিতদের সময়ে মঠ হইয়াছিল গৌড়ের "লুকাচুরি" যেমন ভগ্ন, মুসলমানদের কৃত, উহা এইরূপ একটা রহস্য উহার উচ্চস্তরের স্থাপত্য ভগ্নপুরের সুবিখ্যাত "হাজরদুয়ারী" দুর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এই সকল মন্দির লিখিয়া আমরা যাহাই বলি না কেন এখনও প্রকৃত পক্ষে আমাদের মুসলমান চিত্র ও ভাস্কর্য্যের বড় নিদর্শন এখিয়াটিক সোসাইটি, পাল ও সেন-যুগের কথা বলিতে হইলে আমাদের মুসলমান চিত্রের অবস্থা তুলনায় শ্রীহীন মনে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে

ইহা নিশ্চয় যে পূর্ব্বকালের যেসব কুশলী ও শিল্পবিশারদগণই গৌড়ের রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন বঙ্গের চিরপ্রসিদ্ধ "বাঙ্গলাদেশী ঘর," যাহার কথা

মসজিদ চালার হিন্দু শিল্প।

পূর্ব্বেবঙ্গ গীতিকায় আমরা বহুবার পাইয়াছি, বঙ্গের দোচালা ঘরের মত ছাদবিশিষ্ট বাঙ্গালা ঘর—যাহা বঙ্গীয় মস্তিষ্কপ্রসূত প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল, গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার সমাধিমন্দির কয়টির যাহা আকার তাহারই নমুনা দেখা পাওয়া যায় গৌড়ের সোনা মসজিদ এখনও বাঙ্গালা ঘরের মসজিদ নামটি রক্ষা করিয়াছে ইহা বঙ্গদেশের নিজস্ব স্থাপত্য ইহা ছাড়া ছোটসোণাঁর "বাবার মসজিদ," গৌড়ের "ছোট সাগর মসজিদ" এবং "ঠাকুর দরওজা", তথাকার "জানজান খিজির মসজিদ", সাতগাঁয়ের ইসলাম খাঁর সমাধিস্থান প্রভৃতি মসজিদগুলির উৎকীর্ণ অংশ বিনা চিত্র বঙ্গে নিজস্ব স্থাপত্য-প্রভাব খুব অল্পই দৃষ্ট হয় গৌড়ের "কদম রসুল" বা "কদম মোবারক"টি ঠিক হিন্দু মন্দিরের মতই, উহাকে একটি সমুদ্র রচনা করিয়া উহাকে মুসলিম ছাদ দেওয়া হইয়াছে সোনা বা সোণার মসজিদটি গৌড়ের একখানি বাঙ্গালা ঘরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত গৌড়ের ভাস্কর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ কলিকাতার চিত্রশালায় যে প্রস্তরখণ্ডের কাথাগুলি আছে, রাখালদাসবাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭১ পৃষ্ঠায় স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ফুল-পল্লবের সুচারু কার্য্যও বোধ হয় অমরাবতীর শিল্পীদের সাহায্যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন মঙ্গলকোটের নূতন গাঁয়ের মসজিদটি হিন্দুর প্রাচীন মন্দিরাদির সঙ্কলনমাত্র। ত্রিবেণীর জফর খাঁর সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ এখনও একটা সমস্যার সমাধান, এই মসজিদ একটি হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া রচিত হইয়াছিল। দেব-দেবীর ছিন্ন শরীরাংশের আশুর খুলিলেই বলা যায় এই মসজিদের কোন কোন স্তম্ভে হিন্দু মন্দিরের প্রাচীন অংশ পুনর্নিখাত হয় নাই, যেমনটি ছিল সেই ভাবেই রক্ষিত আছে।

বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙিয়া মুসলমানগণ এইরূপে মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল মসজিদ যে হিন্দু মন্দিরের মালমশলা দিয়াই রচিত হইয়াছিল, পরন্তু সম্ভবতঃ সেইসব যে সকল হিন্দুরাই ঐ সকল প্রাচীন মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ অনেক স্থলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অথবা কোন কোন স্থলে স্বধর্মে থাকিয়াও সেই সকল মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন, মোগলেরা পরেও যে শিল্পপ্রভাব আনিয়াছিলেন, তাহা তখনও বাঙ্গলায় প্রবেশ করে নাই। অবশ্য পরে সেই ভাবনা কিছু কিছু এদেশে ঢুকিয়াছিল, তাহা পরে উল্লেখ করিব। তাহার আগের প্রমাণ রহিয়াছে—জয়রহীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের চিত্র ও স্থাপত্য বিদেশে শুদ্ধ পারস্যের শিল্প ও বিদেশী মসজিদগুলির গঠন কত ও গঠনপ্রণালী সমস্তই মুসলমানগণ গৌড়শিল্পীর নিকট পাইয়াছেন। আর্যা যাহা এই অঙ্গ ও স্থাপত্য হইতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা পারস্য দেশে তাহা হইতে পারে নাই। গৌড়দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা যে সকল রচনা করিয়াছেন, তাহাও এদেশেরই স্থাপত্য হইতে লওয়া। ভারতবর্ষীয় বহু অঙ্গ ও স্থাপত্য বিদ্যার মুসলমানদের বিশিষ্ট সাধনের ফলে স্থির ধারে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের হাত ও মাটীর হিন্দু অন্তরের কুশলতা বিচ্যুত হয় নাই।

পাঠান-প্রাধান্য যুগের মুসলমানী মসজিদ ও গ্রামদেবতার মন্দির এক শ্রেণীর সমান্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এর আগের বাঙ্গালার শেষ সাধারণ এই সমান্তি ইহার হইয়াছিল। এই সমস্ত উচ্চ গম্বুজটি ছাদিয়া দিবার আবশ্যক একটি হিন্দু বাধার অনুকৃতি, তাহার এই যে ইহা বাধার মত বেশ নাম কাটা হইয়া গেছে নাই। গুরু ঘরের সম্ভারে প্রসারিত করিয়া ইহার সৌন্দর্য গ্রন্থের গঠনই একটি সুসমঞ্জস ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে উহা উহার কালে শিল্প স্থাপত্যের সেই সাধারণের আদর্শ ভাবসমূহ পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ দেখাইতেছে। এই মন্দিরের চারিদিকে কৃত্রিম হ্রদের বিস্তৃত জলবাস এক মাইল ব্যাপক, তন্মধ্যে কুদ্র কুদ্র আর কয়েকটি সমাধি মন্দির আছে। সেই বিস্তৃত জলবাসের উপর প্রধান জলধানের মত দূরবর্তী বরাবরের সমাধিমন্দিরের উচ্চ প্রাসাদরাজির অবকাশে এই সুগঠন মন্দিরটি তাহার একক রাজত্বের মহিমা দেখাইতেছে। ইহা দেখিয়া একজন ইংরাজ কবি মুগ্ধ হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন (Asiatic Miscellany) তাহার অনুবাদ আমি নিম্নে দিলাম—

স্বচ্ছ নীর হতে উচ্চ মর্মর-প্রকাশ
সুবিশাল গুম্বুজ ছুঁইছে আকাশ,
উলঙ্গ বেড়া ছুটি সমান-আকার
বিরাজে সৈনিক যেন ধরে আছে বীর
সম্রাট একক, তাঁর অখণ্ড বৈভব
মৃত্যুতেও রাজধানী স্বাতন্ত্র্য-গৌরব।

মুসলমান সওদাগরদের অনেকেই খুব ধনী ছিলেন। বঙ্গদেশের অপেক্ষা দিল্লীর অঞ্চলে সময়ে সময়ে লেনদেনটা খুব প্রবলভাবে চলিত। সম্রাট আলাউদ্দিন চিরদিন খাজনা-আদায়ের ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে কত যে নূতন নূতন আইন-কানুন বাহির হইত তাহা কাহার কল্পনাতেও আসে না। সুলতান তাঁহার রাজধানীর পরিচালন-ব্যাপারের মধ্যে ধনিকদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা অন্যান্যের গৃহে যাতায়াত করিতে পারিতেন না, পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে পারিতেন না। উহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে দেওয়া হইত না। রাজার অনুমতি ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে কোন বিবাহ হইতে পারিত না। তাঁহারা স্বয়ং কোন বিদেশী লোককে স্থান দিতে পারিতেন না। চারিদিকে এত গুপ্তচর ছিল যে তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে ভয় পাইতেন। তাঁহাদের মন্ত্রণা করিবার কোন সুযোগ ছিল না। যদি তাঁহারা কোন হোটেলে বা সরাইতে একত্র হইতেন, সেখানে তাঁহাদের মুখবন্ধনের কারণের অভাব ছিল না, পরস্পরের চক্ষের কথা বলা অসম্ভব ছিল। আড়ালে বিবাদের সম্ভাবনা। যেখানে মুসলমান অমিরদের দলবদ্ধ এইরূপ অবস্থা, সেখানে হিন্দুরা যে কি করিতেছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। "হিন্দুরা ঘোড়ায় চড়িতে পারিত না, তাহাদের ভাল কাপড় পরিতে দেওয়া হইত না—কোন বিলাস-সম্ভোগ করিতে পারিত না। কোন হিন্দু মাথা উঁচু করিয়া বেড়াইতে পারিত না—তাহাদের গৃহে ভাল জিনিস রাখিতে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দেওয়া হইত না।" সুলতান মহম্মদ তোগলকের সম্বন্ধে একজন অনুবাদক এক সময়ে (১৩৪৩ খৃঃ) তিনি আদেশ করিলেন—"তিন দিনের মধ্যে সমস্ত দিল্লীবাসীকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হইবে। অবশ্য অনেকেই সম্রাটের ভয়ে দিল্লী ছাড়িয়া দৌলতাবাদে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু কয়েকজন রহিয়া গেলেন—তাঁহারা লুকাইয়া গৃহ মধ্যে রহিলেন। সম্রাট অতি কায়েশক্লেশে তাঁহাদের সন্ধান লইতে লাগিলেন। সম্রাটের চেষ্টায় একটি পঙ্গু ও একটি অন্ধকে কোথায় পাইয়া কুড়াইয়া আনিল। সম্রাট সেই পঙ্গুটাকে প্রাসাদশিখর হইতে ভূমে নিক্ষেপ করিলে সে মারা গেল এবং অন্ধকে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে টানিয়া আনিল। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ ৬০ দিনের পথ। এই সমস্ত রাস্তাটা অন্ধকে টানিয়া আনার ফলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাস্তায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে পড়িতে চলিল। যখন দৌলতাবাদে এই লোকটার অবশিষ্ট অংশ আনা হইল, তখন হয় গোল তাহার হাত একটি পা সেই নগরে পৌঁছিয়াছে। (ইবন বতুতার সময়ে তাঁহার দিল্লীতে হিন্দুদের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা লোমহর্ষণ।

"তিনি আদেশ করিলেন যে মুসলমান যতগুলি হিন্দু বন্দী করিয়াছে, সেই সকল বন্দীর মস্তকটিকে যে আনিয়া দিবে, সে তাহার পুরস্কার পাইবে। ইসলামের যাঁহারা এই আদেশ পালন করিয়াছিল, তাহারা সমস্ত বন্দীদের নিষ্ঠুর করিল, একদিনে একলক্ষ কাফের নিহত হইয়াছিল। একটি আমির রাজসভায় তাঁহার পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণতা-গুণে সকলের আদৃত ছিলেন, তিনি কখনো

খাজেরালী সম্রাটগণের অত্যাচার।

একটি চড়ুই পাখীও মারেন নাই, সেই সময়টুকু তিনি স্বহস্তে ১৭টি ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন কর্ত্তন করিয়াছিলেন (তাইমুরের আত্মবিবরণী)। এমনোদ্যোগ আকবরের জীবনচরিতে উল্লেখিত আছে যখন মুসলমান রাজকর্মচারী হিন্দু প্রজার নিকট কর আদায় করিতে যাইতেন তখন সেই কাফেরকে ইসলাম গ্রহণ করিতে হইত, কারণ রাজকর্মচারীটি যেন তাহার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিতে পারেন এই ছিল আইন। ইহার উদ্দেশ্য "ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি এবং আশ্রিত কাফেরগণের নম্রতা পরীক্ষা করা"। দিল্লীর বাদশাহগণের যে কতরূপ খামখেয়ালী ছিল তাহার অবধি নাই। একজন (সোকল্পের লোক—১৫৮৮-১৫১৮ খৃঃ) তাঁহার আমির বা অতিথিদিগকে কি কি দ্রব্য খাইতে দিতেন, তাহার ফর্দ্দ লিখিয়া দিতেন, একবার যাহা করিলেন তাহা যেন শাস্ত্রবাক্য হইত—"হুকুম নড়ে, তো হুকুম নড়ে না"। গ্রীষ্মকালে জৌনপুর হইতে এক সম্ভ্রান্ত অতিথি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা অতি ভয়ানক গ্রীষ্ম এবং লোকজন সারাদিন কুলায় ছটফট করিতেছিল। সুলতান সেই অতিথির সমস্ত খাদ্যের ব্যবস্থা ও বরাদ্দ করিয়া দেন, তাঁহার জন্য দুধ জমা সরবৎ মজুত করিলেন। তারপর সেই অতিথি শীতকালে আবার আসিলেন, তখনও দেখিলেন তাঁহার জন্য সেই দুধ জমা সরবতের ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে (তারিকই দাউদি)।

দিল্লীশ্বরগণের এই খামখেয়ালী ও অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা বাঙ্গলায়ও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল বিশেষতঃ পাঠান জাতির স্বভাবতঃই নির্দ্দয় ছিলেন। আমাদের কোন ইতিহাস নাই, সুতরাং সেই সময়ের অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই তবে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে স্থানে স্থানে এই অরাজক দেশের অবস্থার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। যাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া পুস্তক লিখিতেন, তাঁহারাও স্পষ্ট করিয়া এসকল কথা লিখিতে সাহসী হইতেন না। প্রবল শাসনকর্ত্তার ভয় অত্যাচারের কথা সেই দেশের লোকেরা লিখিতে স্বভাবতঃই ভয় পাইয়া থাকে। ভয় পাইবেই বা কেন ভয় বৈষ্ণবগণ আইন করিলেন, কোন নিতান্ত কটকর কথা লিখিতে নাই।

বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের শেষকাল ও মোগলদের আধিপত্যের এই সময়টায় প্রজারা কাজীদের হাতে অত্যন্ত নিপীড়িত হইত। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে কবি চক্রবর্ত্তী যথাযথ চিত্র দিয়াছেন—

"টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটির পুঁতিয়া।
ভাকাত কাড়িয়া লয় গামছা যোড়া দিয়া॥
ভাকাত হৈল রাজা পাতসাই না মানে।
উজীর হইল রাজা কাজীর পাসনে॥
দোহুক পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
ধনেপ্রাণে মরে লোক চক্রবর্ত্তী কয়॥"

কাজীদের মধ্যে মতবিরোধে চকোতিরা দেশ লুটতরাজ করিত, ব্রহ্মণীরায় এবং সেজমন্ত প্রভৃতি লক্ষ্মীদের যে চিত্র পদ্মী কবিকঙ্কণ তাহার ফুটিয়াছে, তাহা পড়িলে প্রাণ আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

পূর্ববঙ্গে ইলিয়াসশাহীর অবসানে ও গণেশবংশের প্রথম অভ্যুদয়ে দেশে এইরূপ অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছিল, বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে তাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে। "যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলায় বাঁধি লয় কালির সাক্ষাৎ। কক্ষতলে যাদা থুইয়া বহু মারে কিল। পালন্ত পয়াণ যেন ছাড়ে পড়ে খিল। পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে বল। চড়চাপড় মারে অস্ত্র মারে গোতা।" —"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিড়ে কারো মুণ্ডু দেয় মুখে।" "বান্ধব সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে থাকয় না দেয় ব্রহ্মণের ভয়।" "খাইয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যায় কাছে। পেয়াদাগণ লাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে।" হুসেন সাহ একটা ভবিষ্যৎ বাণী শুনিলেন যে, "নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ আবার রাজা হইবে।" মন্ত্রীরা বলিলেন—পুরাণে ও শাস্ত্রগ্রন্থে এরূপ কথা লিখিত আছে বটে, 'কলিযুগে নবদ্বীপের যে কেহো বলবান্' ও বহু চালনায় পারদর্শী।" তখন হুসেন সাহ নবদ্বীপ ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন। "পিকল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উজির করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। বিষম পিকল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে" ইত্যাদি। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, মুসলমানেরা বাদসাহের আদেশ পাইয়া নবদ্বীপে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। "কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে। দড়ার লাটে আর লোহপাশে বাঁধে।" অত্যাচারীরা অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিয়া ফেলিল ও তুলসী গাছ মূলশুদ্ধ উপাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। যে ঘরে শঙ্খধ্বনি থাকিত, সে ঘরে যাইয়া উৎপাত সুরু করিত। গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ হইল, দেবালয়গুলি চূর্ণ করিল,—পণ্ডিতগুলিকে ধরিয়া জোর করিয়া মুসলমান করা হইতে লাগিল। বাসুদেব সার্বভৌম পলাইয়া পুরীতে আসিলেন, তথায় রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্বীয় সভায় রত্নসিংহাসনে বসাইয়া সম্মান করিলেন। তাঁহার পিতা বিশারদ কাশীবাসী হইলেন। বাসুদেবের মাতা বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় গৌড়দেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই। হুসেন সাহ বুঝিলেন, এরূপ অবিমৃষ্যকারিতার কোন মূল্য নাই, তখন সেই অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যারণ্য এবং ভট্টাচার্য শিরোমণি ও অন্যান্য মহাজনেরা যাঁহারা নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা নবদ্বীপে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। খানখেয়ালী নবাবগণের ঔদার্য্যও নিষ্ঠুরতার মতই অকারণিক ছিল। হুসেন সাহ যে সকল চিরসুখিকে ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাহা রাজকোষের অর্থদ্বারা পুনরায় সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

যখন বাঙ্গলাদেশ প্রথম পাঠানদিগের অধিকৃত হয়, তখন এই ভাবে অত্যাচার কতক দিন চলিয়াছিল। তারপর রাজাদের মধ্যে যাঁহারা খানখেয়ালী তাঁহারাও মাঝে মাঝে এই অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শের সাহের অবলম্বিত শাসনে কতক দিনের জন্য এই অত্যাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যাচার সুরু

হইয়াছিল। রামগ্রাম কবি মুকুন্দ চিহ্নিদার মামুদ সরিফের যে অত্যাচারের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে গ্রামগুলি উজাড় যাইবার মতো হইয়াছিল। হিন্দু আমলে রাজকর্মচারীরাও যে এরূপ না করিতেন তাহা নহে। রাজা মাণিকচন্দ্রের বাঙ্গালী মন্ত্রী ক্রিয়াকলাপ ও চিহ্নিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার প্রায় এক শ্রেণীর। খিলভূমি আবাদি বলিয়া লিখিত হইল, তাহার উপর রাজস্ব নির্দ্ধিষ্ট হইল। কুফলের, একদিকে বাজারে জিনিষের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাওয়াতে এবং প্রত্যেক টাকার মূল্য ৵১০ আনা হওয়াতে, দুই দিক্ দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। জিনিষের দাম অত্যধিক ৵০ করিয়া গেল। প্রজারা বীজ ধান ও গরু বিক্রয় করিয়া চিহ্নিদারের দাবী মিটাইতে পারিল না। এদিকে গ্রাম হইতে পালাইয়া যাইবার উপায় নাই। পথে পথে কোটালগণ রাস্তা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল এবং প্রত্যেক বিঘা পাঁচ আঠা কর করিয়া হিসাব করা হইতে লাগিল। যাহার দশ বিঘা জমি ছিল তাহার হইয়া গেল সাড়ে সাত বিঘা, বাকী রাজ-সরকারে জমা হইল। মুকুন্দরামের এই চিত্রের সঙ্গে যাদব আচার্য্যের মৈমনসিংহ (পাটি) বাসী বাঙ্গালী মন্ত্রীর অত্যাচারের কাহিনী মিলাইয়া পড়ুন। উভয়ের কার্য্যকলাপের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাইবেন।

রাজত্বারম্ভে ও বিলাসের ফলে বিদেশী ভাষার প্রভাব।

মুসলমানেরা বিলাস-ক্ষেত্রে এবং রাজপ্রাসাদ-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুদের সেই মহাপাত্র, নিশাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের পদবী উড়িয়া দিয়া উজির, নাজির, সেরেস্তার কাজি, ওমরাহ, দরবারিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রভৃতি নানা পারসী ও আরবী সমৃদ্ধ নাম রাজসভায় প্রচলিত হইল। গোড়েশ্বরগণের সভায় সেই অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি, বিবিধবিদ্যা বিচার-বৃহস্পতি, আসাকুল-কবলজাহের, সোর বা সুবাহ্বংশপ্রদীপ, প্রতিপক্ষ-কর্ণ, সত্যপীর সাক্ষের, পরাগলখানবক্ষঃপঞ্জর, পরমেশ্বর-পরমকুটুম্বক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি সংস্কৃতাত্মক কোন উপাধির চিহ্নমাত্র রহিল না। এমারত, ফাঁড়, কেল্লাদারি, তাজুস, আকর প্রভৃতি বিদেশী শব্দ সমাজের উচ্চস্তরের বিলাসীদের ভাষা হইল। সহরে হিন্দুর ভাষা ধীরে ধীরে মুসলমানী ছাঁচ গ্রহণ করিয়া পরাশিকারের প্রভাব সপ্রমাণ করিল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে হিন্দুদের অবাধ রাজত্ব,—সেখানে আবহের মোটে প্রণীলটি হইতে তুলসীতলা, ঘর, দুর্গা, চণ্ডী, বায়ু, আকাশ-ঘেরা কুটিরটি পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই বাঙ্গলা রহিয়া গেল। পাঠান আমলে হিন্দু সহর ছাড়িয়া দিয়া এই পল্লীতে রাজত্ব করিয়াছে। পল্লীতে বসিয়া পণ্ডিতেরা মোটে প্রদীপের সাহায্যে বড় বড় গ্রন্থদর্শনের টীকা করিয়াছেন। পটুয়ারা অজন্তার শেষ চিত্র বজায় রাখিয়াছে, যেয়েরা তাহাদের আলপনা ও কাঁথার মধ্যে যে সকল কথা আঁকিয়াছেন তাহা অজন্তার চিত্রশিল্পের শেষ নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পুঁথিতে শিল্পিগণ বিচিত্র ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন, কাঠের ফলকে গালা দিয়া লাল রংএর জমি তৈরী করিয়া তাঁহারা নিপুণভাবে দেবতাদিগের লৌকাদিক লীলা অঙ্কন করিয়াছেন। ছুতোরেরা তাহাদের কর্ণে অজন্তা, সাঁচি, অমরাবতী ও মগধের সমস্ত শিল্পের শেষ নমুনা

রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে এবং মন্দির নির্মাণকারীরা পোড়া ইটের গায় যে সমস্ত জীবজন্তু, নরনারী ও ফুললতার চিত্র উৎকীর্ণ করিয়াছে, তাহাতে শিল্পলক্ষ্মীর অভয়বাণী শোনা যায়। তিনি যেন বলিতেছেন—"বাঙ্গলার নগর সহর হইয়া গিয়াছে—সেখানে আমার স্থান নাই, কেবল অর্থের ছড়াছড়ি, অর্থে আমাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গলার পল্লীতে এখনও তপস্যা চলিতেছে—আমি সেই তপস্বীদিগকে এখনও ছাড়িতে পারি নাই।" ফুললতার কত্তার যাহাদুরী বাঙ্গলার প্রত্যেক মন্দিরে পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই মোগলাধিকারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের। পাঠান আমলের শেষ দিকে ... বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন পল্লীতে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিগ্রহ বড় বেশী পাওয়া যায় না। বিগ্রহের নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত, শিল্প ভাঙ্গিতে তাহাদের তত্টা উৎসাহ ছিল না। এই জন্য অধিকাংশ মন্দিরেই শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল মন্দিরে দেবলীলা এবং নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র অঙ্কিত থাকিত, কিন্তু ইহাদের বাহার ছিল কত্তায়। প্রত্যেকটি মন্দিরে বিভিন্নরূপ কত্তা এবং মন্দিরেই সূক্ষ্ম ও স্থূল বিবিধ প্রকারের কত্তা। এই কত্তার কত আদর্শ যে বাঙ্গলার মাটীতে ছিল, তাহা বলা যায় না। এই অফুরন্ত কত্তার আদর্শ যেমন আমরা মেয়েদের কাঁথায় পাই তেমনি মন্দিরগাত্রে পাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মন্দির সাজাইবার ভার সমস্ত আকারকে এমন কি ফ্রান্সিসাতেও বাঙ্গালী শিল্পীরা জোগাইত। এই বাঙ্গালী শিল্পীরাই মগদের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের বংশধর মাগধ গৌরব নষ্ট হওয়ার পরে গৌড়ের প্রভুত্বকালে সেই শিল্পীরা বাঙ্গলায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। তিন চারি শত বৎসর হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার শত শত মন্দিরগাত্রে যে কত্তার অপূর্ব্ব মৌলিক শোভার ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বঙ্গোত্তা যেরূপ সোনালের জন্মস্থান—বাঙ্গলাদেশ তেমনই চারুশিল্পকলার জন্মস্থান—এখানেই কলালক্ষ্মীর সিংহাসন ছিল। আমরা মাটী খুঁড়িয়া অশোকস্তম্ভ ও তাহার রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, বাঙ্গলার শিল্পলক্ষ্মীর রাজধানী খুঁজিতে আমাদের মাটী খুঁড়িতে হইবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের পর্ণকুটীরে সেই পর্ণাসনার কঙ্কণমলের স্পর্শ পাইবেন, প্রত্যেক মন্দির তক্ষকের বাটালী ও ক্ষুদ্র যন্ত্রিকার অগ্রে তাঁহার চরণকমলের ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, নতুবা এত শত ফুটিয়া উঠিবে কিরূপে। আমি উৎকৃষ্ট কত্তাগুলির ফটোগ্রাফ পাইলাম না, তাহারা অনেক স্থলেই দূরে অবস্থিত, আমি বৃদ্ধ - সঙ্গতিহীন, চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি পাইবার উপায় করিতে পারিলাম না। আমার প্রিয়তম দেশবাসীদিগের এ বিষয়ে কৌতূহল উদ্দীপন করিয়া আমি বেহালা, বড়িয়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানের কয়েকটি মন্দিরগাত্র হইতে কত্তার নমুনা দিতেছি। য়ুরোপীয় শিল্পকারের মত আমাদের দেশের শিল্পকারেরা নকলনবীস নহেন। ঠিক একটি ফুল দেখিয়া ফুল আঁকা :—অল্প কিছু শিল্পবিদ্যার বর্ণপরিচয় জানিলেই এই নকল কাজটি অতি সহজে শেখা যায়। কিন্তু যে শিল্পী সমস্ত পুষ্পজগৎকে হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে

পল্লী শীর্ষ আর বঙ্গের রাখিয়াছে

মন্দিরগাত্রে চারুশিল্প

পারিয়াছেন, তিনি ভগবানের সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা লাভ করেন, তখন জগতের বিবিধ বর্ণলোভা তাঁহাকে বর আঁকিয়া দেখায়, জগতের যাবতীয় ফুল-লতা তাঁহার নবসৃষ্ট ফুল-লতার মধ্যে অপরূপ মাধুরী ঢালিতে শক্তি দেয়। এই মৌলিক সৌন্দর্যের উপলব্ধি লইয়া ভারতীয় শিল্পী অবাধে আঁকিয়া যান। তিনি যে পদ্ম আঁকেন, তাহা জগতের পদ্ম নহে, তাঁহার আঁকা লতা জগতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা তাঁহার হাতে অবাধ গতি প্রদান করে, বর্ণের বিন্যাস দিয়া কাগজের পোড়া চিত্ত হরণ করে। চরম ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিলে তেমন কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমগ্রভাবে এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিলে মনে হইবে, একি আশ্চর্য্য রসোল্লাস, ইহাতে রঙ্গের বিচিত্র বিন্যাস, রসালঙ্কার কি অপূর্ব্ব ও সৌন্দর্য্যময় মহিমায় না এই অপার্থিব মূল-লতায় প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে। ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয়, শিল্পীর যে সাহসিকতা, তাহার উদাহরণ অন্য কোথাও নাই। এই জন্য বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আঁকে, মূর্ত্তি গঠন করে—এ বলিলে কথাটা ঠিক বোঝা যাইবে না, বলা উচিত বাঙ্গালি ছুতার বা শিল্পকার এই সকল সামান্য উপকরণ দিয়া তাহারা তপস্যা করে। প্রত্যেকটি মন্দিরের কারুকার্য্য, প্রত্যেকটি কাঁথা দেখিলেই তখন এ কথাটাই কিন্তু মনে আসিবে। কারণ এ সকল ঢালাই করা কার্য্য নহে ইহার প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম কাজ, হাতের কাজ।

এই পল্লীসন্নী বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান প্রবাহিনী। এখানে চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন এবং এই পাঠান আমলেই কত ভক্ত, কত তান্ত্রিক, কত নৈয়ায়িক, কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। সত্য বটে মুসলমান বিজয়ের পর আর কোন রাজকবি পবনদূত বা গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তীর মনোরঞ্জন করেন নাই কিন্তু পল্লীকবিদের সুস্বরলহরী তো থামে নাই, সময়ে সময়ে কোন ক্ষুদ্র জমিদারের নিকট "সাত আড়া" ধান মাপিয়া লইয়া পরম তৃপ্তি সহিত কোন কবিচূড়ামণি কৃতার্থ হইয়াছিলেন কিন্তু মোটের মাথায় বাঙ্গলার বিদ্বান্, বাঙ্গলার ভক্ত, বাঙ্গলার শিল্পী এবং বাঙ্গলার ধার্ম্মিক আর রাজানুগ্রহের প্রত্যাশা করে নাই বাঙ্গলার সভ্যতা পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়া গণতন্ত্রতার একটা রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে রাজার কোন স্থান ছিল না,—সমস্ত দেশ পাঠানের অধিকারে থাকিলেও তাহার অধ্যাত্মসাম্রাজ্য বঙ্গীয় রহিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই বাঙ্গলার পল্লীর প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের ইঙ্গিতে সমস্ত সমাজ চলিত ব্রাহ্মণের পর ঐ সময়ে আর এক দল প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—বৈষ্ণব ইহারা নূতন আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়া দেশের একাংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে কুলীনেরা একেবারে দৃঢ়রূপে শাসনপ্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন এক এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের কুলীনদিগকে সমাজে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই সুদৃঢ় হিন্দুত্বের মধ্যে বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না, তবে মাঝে মাঝে সুন্দরী হিন্দু ললনাদিগের যোগ করিবার জন্য "সিন্ধুকী"রা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইত। পল্লীবাসিনী

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

রমণীরা অবরোধ কি জানিতেন না। কিন্তু মুসলমান, মগ, পর্তুগীজ, হার্মাদ প্রভৃতি বিদেশী দস্যুদের ভয়ে মোগল রাজত্বের শেষভাগে এদেশে অবরোধ-প্রথা কতক পরিমাণে প্রবর্তিত হয়। "মৃত্যুপর্যন্তমনুরক্তি" হিন্দুকুলনারীগণের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের পরিচায়ক ছিল—পদ্মিনী-শ্রেণীর রমণীর সকলের মধ্যে এই "মৃত্যুপর্যন্তে অনুরক্তি" উল্লিখিত আছে। এদেশের রাজকুমারীরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা শিখিতেন, বৃহন্নলাই শুধু একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। চিত্রলেখার সময় হইতে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী মেয়েরা চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেন। বিদেশীয়দের অত্যাচারে তাঁহারা এই সকল বিদ্যার অনুশীলন ছাড়িয়া দিলেন। ইহাদের স্বয়ম্বর প্রথা এদেশে এখন লুপ্ত, কিন্তু পালরাজগণের সময়েও কতকটা পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচলিত ছিল। "পুরুষপরীক্ষা"র এই ইহাদের প্রথার অনেক প্রশংসা করিয়া কবি গাহিয়াছেন। পতির মনোরঞ্জনে যে রমণী সদা লাভ করিতে পারেন তাঁহার মত সৌভাগ্য জগতের কাহারও নাই, এই কথা কবি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন।

মেয়েদের দুরবস্থা।

কিন্তু যোড়শ কুমারীর বিবাহ হইবে, তিনি স্বয়ম্বর বরণ করিবেন, কিংবা কোন রমণী সুপণ্ডিতা, নৃত্যকলায় পারদর্শিনী, কিংবা চিত্রবিদ্যায় নিপুণা এই সকল সংবাদ শিশুকালের দুই আকর্ষণ করিত। তাঁহারা বাঘের ন্যায় গুণবতী ও গুণবতী মহিলাদের খোঁজে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সুতরাং বঙ্গদেশ হইতে এই সকল গুণ দেশীসমাজে লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এখনও কোন কোন পল্লীতে পুরাতন রীতির শেষ চিহ্ন আছে। ফরিদপুর অঞ্চলের মেয়েরা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য করিতেন। শ্রীহট্টের কোন কোন পল্লীতে বিশ বৎসর পূর্ব্বেও পাকস্পর্শের পূর্ব্বে নব বধূ-পরিচিতা কন্যা শ্বশ্রূসমক্ষে নৃত্য করিতেন। যাঁহারা এই ভাবে নৃত্য করিতেন তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন।

এখনও ঢাকা ও ময়মনসিংহের মেয়েরা বিবাহ উপলক্ষে গান গাহিয়া থাকেন। বঙ্গের কোন কোন দেশ হইতে এই রীতি লুপ্ত হইয়া থাকিলেও কোথাও কোথাও তাহা এখনও প্রচলিত আছে।

ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও যে সকল রীতি প্রচলিত আছে তাহাতে বাঙ্গালীর গৃহ যে কিরূপ অনাবিল আনন্দনিলয় ছিল তাহার কতকটা ধারণা পাওয়া যায়। কন্যা জন্মিলে মাতা একখানি কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিতেন—শুকুমণির বরের জন্য। সেই একখানি কাঁথা শুকুমণির অবসরে প্রত্যহ সেলাই করিয়া তিনি ৮।১০ বৎসরে সমাধা করিতেন, তখন বর তাহা পাইতেন। এত স্নেহের, এত যত্নের শিল্পসামগ্রী জগতে কোন মহারাজাধিরাজও পান নাই। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে "পীঁড়িচিত্র" আরম্ভ হইত, সেই চিত্রিত পীঁড়ির উপর পাতিবার জন্য নানা কারুকার্য্যখচিত কাগজের ফুললতা অঙ্কিত হইত। তাহার দুই একটা নমুনা আমরা দেখিয়াছি। পানির জল রাখিবার জন্য ঘট ও বরণডালা দুমাস ধরিয়া চিত্রিত হইত। কত হাসি কত গল্প ও আনন্দের মধ্যে মেয়েরা এই সকল চিত্রকলা

সম্পাদন করিতেন, তাহা এখনকার মহিলারা বুঝিবেন না—কারণ এখন বিলাতী চক্ষুরোগে কর্ণকণ্ডূ ও গৃহিণীর আস্থা শুকাইয়া যায়—তবে মেয়ের বিবাহের সময়ের জন্য ছিটাটি বাঁধা পড়িয়াছে যে আঙ্গিনায় বরকর্ত্তার "সাতপাক" অর্থাৎ সপ্তবার প্রদক্ষিণ এবং "মুখচন্দ্রিকা" অর্থাৎ মুখদর্শন হইবে তাহার উপর ৪।৫ জন লোক কন্যা ও বরকে লইয়া ঘুরিতে পারে তদুপযোগী আর একখানি আসন মেয়েরাই চিত্রিত করিতেন এইরূপে বৃদ্ধির হওয়ার সাতদিন পরে 'সাদিনা', একদিন পরে 'হশা' এবং ত্রিশ দিন পরে 'ত্রিশা' প্রভৃতি নানা উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাসন্তানের এবং এতৎ-কর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ মেয়েরা সম্পাদন করিতেন। বাহিরের কোন শিল্পী বা কারিগরের এই অন্তঃপুরের কলাসদনে প্রবেশ নিষেধ। কেবল যখন মেয়েরা নাচিতেন, তখন নিয়তেশীর ঢুলিরা আস্তে আস্তে ঢোল বাজাইয়া নৃত্যের তাল রক্ষা করিত

মেয়েদের হাতের কাজ।

পল্লীর বিগ্রহই পল্লীর প্রকৃত রাজা ছিলেন, তাঁহার ভোগের জন্য রাত্রিদিন খাটিয়া চাষারা অতি সুগন্ধ সরু সোণালিধান, কৃষ্ণভোগ প্রভৃতি চাউল প্রস্তুত করিত যাহার বাড়ীতে যে কলটি জন্মিত, তাহা গৃহস্থ আগে মন্দিরে আনিয়া দিয়া যাইত, কত মালী বাগান হইতে রাশি রাশি ফুল তুলিয়া তাঁহার মাল্য গাঁথিত, কত শিল্পী বিগ্রহের অঙ্গরাগ করিত প্রতি উৎসবে মন্দিরবাটীতে যে ধুমধাম হইত রাজার বাড়ীর উৎসব হইতে তাহা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সূত্রধরগণ সারা বৎসর ভরিয়া দেবতার জন্য রথ তৈরী করিত বঙ্গের পল্লীগুলি এই ভাবে পল্লীবিগ্রহের অধিকারে বাস করিত, তাহারই আঙ্গিনায় কীর্ত্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী নিত্য নূতন আনন্দ পাইত। এমন সুখের রাজ্য, এমন শান্তির রাজ্য কোন রাজা কখনও শাসন করে নাই। সুতরাং বঙ্গপল্লী পাঠান আমলেও বিপুল ধর্ম্মকর্ম্ম ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ বিঘ্ন করে নাই।

তবে মধ্যে মধ্যে অত্যাচারের স্রোত বহিয়া যাইত, তাহার ফল কি দাঁড়াইত তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। যশোহরে পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি বাসুদেব-বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার চারিদিক্ অষ্টধিক্ নবরত্নখচিত—যশোহরের ইতিহাস-লেখক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাকে ইহা জানাইয়াছিলেন। সহজেই অনুমিত হয়, ঐ সকল রত্নের লোভে বিগ্রহের ভক্ত কিংবা পাণ্ডাদের, তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ মন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে বিগ্রহটি লইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, অপর সকলের কথিত কেহ সেই দীঘিতেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন কোন গৃহস্থ মুসলমান নবাবের ছাড়পত্র পাইতেন, সেই চিহ্ন থাকিলে মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইত না। একখণ্ড লৌহের উপর নবাবের পাঞ্জা মাকা থাকিত, এই মন্দির কিরূপ তাহারও ইঙ্গিত থাকিত। আমার নিকট সেইরূপ একটি পাঞ্জা আছে। উহা নারিকেলডাঙ্গার এক ভদ্রলোক আমাকে দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই লৌহখণ্ডটি মিরজাফরের আমলের, উহার একদিকে ত্রিশূলচিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে উহা কোন শিবমন্দিরের গায়ে সংলগ্ন ছিল ইহাতে ইংরাজী আমার তারিখ দেওয়া

আছে, পলাশীর যুদ্ধের পর এই ছাড় ডিক্রী দেওয়া হইয়াছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীমন্দিরের একটি ছাড়পত্র বা চিঠি ছিল।

শ্রীখণ্ড বৃক্ষ উন্মাটন করিতে বাই।

পল্লীবাসীরা সময়ে সময়ে মুসলমান নবাবের ক্রোধে পড়িতেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ইতিহাসে সেই সকল অপ্রিয় কথা লিখেন নাই। যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ গোস্বামিগণের বিধিসম্মত হইত, তাহাতে নিতান্ত দুঃসংবাদ তাঁহারা প্রকাশ করিতেন না। হয়ত বা নবাব বা অপরাপর শাসনকর্তাদের ক্রোধে পড়িবার ভয়ে রাজনৈতিক দুঃসংবাদগুলি তাঁহারা চাপিয়া যাইতেন। কিন্তু হিন্দুমন সহজেই সাংসারিক দুঃখ ও বিপদের বিষয় সাহিত্যে প্রবেশ করা হইতে অনিচ্ছুক ছিল। এজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক লেখার নিয়ম ছিল না, এবং এজন্যই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সমস্ত কীর্তনাদিতে বিরহ, খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি নায়িকার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া 'মুখলসিলন' দিয়া গানের উপসংহার করিতে হইত। যে সকল কষ্ট শুধুই কষ্ট—মর্ম্মান্তিক বেদনার সৃষ্টি করে অথচ যাহার বর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত মনের কোন স্থায়ী উপকার হয় না—সে সকল প্রসঙ্গ [illegible] করিয়া লিখিতেন না। কিন্তু যে দুঃখ আমাদের আত্মার সম্পদ যাহার পাবনী শক্তি মানুষের কলুষ নষ্ট করে এবং হৃদয়ের ভাবগুলি উন্নতির পথে লইয়া যায়, যাহার ফল মহৎ ও চিরস্থায়ী—সেই সকল দুঃখ তাঁহারা বর্ণনা করিতেন, যথা রামের বনবাস সভ্যতাকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে, পাণ্ডবদিগের বনবাস, চৈতন্যসন্ন্যাস, এই সমস্ত মহাদুঃখময় ব্যাপার মহাশিক্ষার বিষয়। কিন্তু ডেসডেমনার শোচনীয় মৃত্যু, জনের নিযুক্ত ঘাতককর্তৃক আরথারের চক্ষু উৎপাটন, হ্যামলেট কর্তৃক নাটকের শেষ অধ্যায়ে হত্যাকাণ্ড—এই সকল দুঃখবর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে, গ্রীক-রীতি-অনুমোদিত পাশ্চাত্য সাহিত্য এই উত্তেজনাটুকু উপভোগ করাইবার জন্য বিয়োগান্ত নাটকের পক্ষপাতী। হিন্দুমন অনাবশ্যকভাবে পাঠকের মনে পীড়া দেওয়ার বিরোধী, কতক এই কারণে—কতক রাজনৈতিক আঘাত বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে দুঃসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অনুমোদিত প্রধান গ্রন্থ—চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবত এই বিধি পালন করিয়াছে, এই জন্য চৈতন্যের তিরোধানের সম্বন্ধে তাঁহারা নীরব। কিন্তু এই গোস্বামিগণের বিধি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে কয়েকজন লেখক প্রতীর ব্যক্তিত্বে স্বেচ্ছাকৃত সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জয়ানন্দ একজন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং যদিও গোঁড়া বৈষ্ণবেরা গোস্বামি-গণের বিধিবহির্ভূত কথা লিপিবদ্ধ করার দরুন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে তেমন আদর করেন না, তথাপি এই পুস্তকে কতকগুলি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য আছে—যাহার জন্য আমরা এ পুস্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী। ইনি চৈতন্যদেবের তিরোধানসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য এবং ইতিহাসসঙ্গত, মন্দুরা লৌকিক প্রবাদ অনুসারে মহাপ্রভুর গোপীনাথ অথবা জগন্নাথবিগ্রহের মধ্যে লীন হইয়া যাওয়ার কথাটা আজকালকার দিনে কতজনে

বিশ্বাস করিবে? জয়ানন্দ লিখিয়াছেন মৃত্যু কাজীর সময়ে একটা ইট তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হয়, এবং তাহার টাড়সে জ্বর হইয়া তিনি নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। পুত্রের এইরূপ আশার পাওয়ার জন্য শচীদেবীর চিরকাল ছিল তিনি কতবার অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন—"তোমরা ইহাকে দেখ, মুক্তাকালে ইহার জ্ঞান থাকে না, কোথায় পড়িয়া চোট লাগিয়া মরিবে তাহার ঠিকানা নাই, আমার কড়িকোলা ধনটি বেচন হইয়া নাচে গায়।" শচীর সেই আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল।

কাজীর অত্যাচার।

যাহা হউক শুধু চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা নহে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আরও কতকগুলি বিস্ময়কর কথা আছে—যাহা বৈষ্ণবসাহিত্যের কথা কোথাও নাই। চৈতন্যমঙ্গল সোম্বাদিগলের বিবেচিত হইলেও এক কালে ইহার প্রচার খুব বেশী ছিল, আমরা এই পুস্তকের অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি পাইয়াছি ও দেখিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

সেই সকল বিস্ময়কর কথার মধ্যে মুসলমান কাজীদের অত্যাচারের কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলী যে সময়কার কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষকালের কথা, যখন রাজনৈতিক অবস্থা কতকটা অরাজকতার দাঁড়াইয়াছিল), জয়ানন্দও সেই সময়কার কথা লিখিয়াছেন, উহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর প্রিয় সখা গদাধর দাস কাজীর সহিত ঝগড়ার ফলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। অপরাপর বৈষ্ণব লেখকেরা একথা চাপিয়া গিয়াছেন কি বিষয় লইয়া এই ভিন্নাকার ঝগড়া হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই কিন্তু কাজীদলের একজন লোক হরিদাসকে কতই লাঞ্ছনা করিয়াছিল, শাইসটি বাজারের প্রত্যেকটি বাজারে তাঁহাকে লইয়া নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়াছিল। শেষবারে ত "যাহার মস্তকে থেকে তুলসীর পাত্র হাতে গলে বাঁধ দড় কাজী সাকাং" নবদ্বীপের লোকাই কাজী কে হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিল, সুতরাং বৈষ্ণবেরা যে অনেক সময়ে কাজীদলের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষ্ণবেরা সে কথা বলেন নাই। সনাতন মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন "আপনি রাজকেলী ছাড়িয়া যাউন, যবন হইলে সাধু এখন পর্যন্ত আপনার প্রতি বিপক্ষতা করেন নাই, উহাকে বিশ্বাস করিবেন না, তখন কি অত্যাচার করিবে বলিবেন তাহার ঠিকানা নাই।" গদাধরকে হয়ত সোমাসোমি ভাব করিয়া খাওয়াইয়া মারিবে, তখন হয়ত মহাপ্রভুর তিরোধান হইয়াছে কে তাঁহাকে বাঁচাইবে? এরূপ অবস্থায় তিনি সুবুদ্ধি রায়কে রক্ষা করিয়াছিলেন গদাধর অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিবেন। শুধু গদাধর নহে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আরও দুইজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখিত আছে, তন্মধ্যে একজন গৌরীদাস পণ্ডিত ইহার নাম গৌরীদাস সরকেল। ইহার ভ্রাতা সূর্যদাসের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন, বাড়ী কালনায়। এই গৌরীদাস চৈতন্যের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন কাটোয়ায় ইহারই স্থাপিত চৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্তি অতি

প্রসিদ্ধ. এই বিগ্রহসম্বন্ধে একটা অলৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এখানে বলিবার দরকার নাই। অনন্দ লিখিয়াছেন "কাজী সনে বাদ করি প্রেমে উনমাদে, সাতদিন গৌরীদাস ছিলা গঙ্গাহুদে", গৌরীদাস পণ্ডিত কি কারণে কোন কাজীর ক্রোধের ভাজন হইয়া গঙ্গার কোন নিভৃত কোণে বৈশাখন ভূতে দুর্যোধনের ন্যায় লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু সেই অরাজকতার সময়ে কাজীদের ক্রোধের খুব গুরুতর কারণ থাকার দরকার ছিল না, অবাধে অত্যাচার চলিয়াছিল, এ সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণী সমভাবে অত্যাচারের সহ করিতেন। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক দেখা যায় এক দিকে কাজী যেরূপ নিরপরাধ চাঁদ বিনোদের উপর যথেচ্ছাচার করিতেছেন, অপর দিকে বিচারের প্রতীক্ষা না করিয়াই কেওয়ান আহাজীর কাজীকে শূলে দেওয়ার আদেশ প্রচার করিতেছেন। এই সকল উক্তি কাল্পনিক হইলেও অনেক সময়ে উহাদের ভিত্তি সত্যঘটনামূলক হইত। গঙ্গাধর দাস এবং গৌরীদাস পণ্ডিত ছাড়া এই অত্যাচারীদের দলে আর এক জনের কথা অনন্দ লিখিয়াছেন, পুরুষোত্তম দাসকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিক ভাবে কবি এই ভাবের কতকগুলি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যুগের অরাজকতা প্রমাণ করিতেছে।

চণ্ডীদাসের মৃত্যু।

নবাবদের খেয়ালের অন্ত ছিল না। চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া কোন্ পৌড়াধিপ নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ তিনি জালালুদ্দিন বা যদুনারায়ণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন হাতী গণেশ যে বাদসাহকে হত্যা করেন সেই দ্বিতীয় সামসুদ্দিনই চণ্ডীদাসের হত্যাকারী। তিনি নিতান্ত অযোগ্য, অত্যাচারী ও বিলাসাসক্ত ছিলেন এবং মাত্র দুইটি বৎসর রাজত্বের পর ১৩৮৪ খৃঃ অব্দে নিহত হন। এই সময়ে বাদসাহের অন্তঃপুর মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিতা বহু হিন্দু বিশেষতঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকন্যা দ্বারা পূর্ণ ছিল। বহু প্রথমা স্ত্রী নবকিশোরী তাঁহার ধর্ম পরিবর্তন করেন নাই। তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন আসমানতারা। কিন্তু তৎকালে কোন বাদসাহেরই এক স্ত্রী ছিল না, তাঁহাদের অনেক বেগম থাকিত। রাধাকৃষ্ণের সঙ্গীত হিন্দু বেগমদেরই বেশী ভাল লাগিবার কথা। বহুর খুব সম্ভব অনেক হিন্দু বেগম ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও চণ্ডীদাসের গুণানুরাগিণী হওয়ার বেশী সম্ভব। অবশ্য সামসুদ্দিনের অন্তঃপুরেও যে সেরূপ হিন্দু বেগম ছিল না—তাহা বলা যায় না। এদিকে এই সকল বাদসাহ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তা নিবন্ধন ইরান, তুরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্বন্ধত্যাগ এবং স্থায়িভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলায় বাস করিবার ফলে তাঁহারা একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলায় পুস্তক রচনা করাইয়া শ্রবণে তাহা শুনিতেন। মুসলমান কবিরাও অনেকে রাধাকৃষ্ণের গান এবং পল্লীগীতিকা বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় চণ্ডীদাসের গুণানুরাগিণী মুসলমান কোন বাঙ্গী হইতে পারেন, কিন্তু অধিক সম্ভব বাঙ্গী কোন হিন্দু-ললনা ছিলেন। হাতীর দ্বারা কোন পণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ নাশ করা এই যুগের ইতিহাসে একটি সচরাচর সংঘটিত ব্যাপার।

যাহা হউক, মুসলমান নবাব ও কাজীদের অত্যাচারে যে অনেক বৈষ্ণব বিশেষভাবে নিপীড়িত হইয়া তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছেন তাহা পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রমাণিত হইবে। যে দেশে রাজতন্ত্র, ক্ষমাপত্র ভিন্ন ভিন্ন লোক অধিকার করিয়াছেন, সে দেশের লোকের ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে, নিরাপদও নহে। প্রশংসা ও অপ্রশংসা উভয়রূপ লেখারই বিপদ ছিল। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সামাজিক ইতিহাসে অনেক লিখিয়াছেন ঘটক-কারিকার বংশাবলী এত পর্যায়পুঙ্খভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে বোধ হয় জগতের অন্য কোন দেশে এরূপ বিশুদ্ধ পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অথচ রাজনৈতিক ইতিহাস কেহ লিখিতে সাহসী হন নাই।

বৌদ্ধ-যুগের অবসানে উচ্চশ্রেণীর অন্নদেখোক লোক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা ব্যবচ্ছেদ-রেখা টানা হইল। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে যে ব্যবধানের অনুশাসন মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রক্ষিপ্ত কিনা—তাহা বিবেচনার যোগ্য। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সুস্থবংশের পৃষ্ঠাবিত্রের সময়ে পাশ্চগুলি কিরিয়া লেখা হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণকে দেবতাদের তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চে আসন দেওয়া হইয়াছিল। এই সময়ে প্রাচীন স্মৃতিকারদিগের উপর অন্যায়ভাবে হাত চালাইয়া ব্রাহ্মণদের গৌরবান্বিত করা হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু তাঁহার 'ঠাকুর-দল লেকচারে' ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের নিষেধ-বিধি-সত্ত্বেও প্রতিলোম-বিবাহের এত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং যাহে মাঝে দুই একটি স্থলে শূদ্রাদের নিন্দা থাকিলেও ভোজনাদি-ব্যাপারে এত শিথিলতার দৃষ্টান্ত আছে যে, মনে হয়, পরবর্তী কালে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি কিরিয়া, কতকাংশ বাদ দিয়া এবং কতক কথা সংযোগ করিয়া, লেখা হইয়াছিল এবং ব্যাসদেবের উপর একালের নীতি বহুল পরিমাণে আরোপ করা হইয়াছিল, ইহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের উপাধি পরিবর্তন করিয়া অপরাপর শ্রেণী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট মহাবংশোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাণের কিছুদিন পূর্বে উপাধি ছিল 'কর'। ধরবংশীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও চট্টগ্রামে আছেন, তাঁহারা উপাধি পরিবর্তন করেন নাই।

নবসৃষ্ট সমাজে শূদ্রশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। আচরণীয় এবং অনাচরণীয়—এই দুই থাক করা হইল। বড় থাক, যথা—নমঃশূদ্র, জেলে-কৈবর্ত, পোদ প্রভৃতি পতিত হইল। দ্বিতীয় থাকে কতকগুলি জাতিকে কৃপা করিয়া আচরণীয় বলিয়া স্বীকার করা হইল—ইহাদের নাম হইল নবশাখ—অর্থাৎ নয় শাখা। কিন্তু শূদ্রমাত্রেরই উচ্চশ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণের সম্পূর্ণ বশ্যতা পাইবার জন্যই জনসাধারণকে এই ভাবে উচ্চ-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে হিন্দুজাতির সুবৃহৎ অংশ—এই জনসাধারণ—অন্ধ ও মূক হইয়া রহিল। ইহাদেরই রক্তমাংস শোষণান্বিত করিয়া এক কালে ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকামাদি

জন্মিয়াছিলেন এই ধর্ম্মের জন্য হীন কুলে। নবদ্বীপে এক সহস্র বৎসর যাবৎ বাঙ্গলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে যদি নিম্নশ্রেণীর ধার উদ্ঘাটিত থাকিত তবে জনসাধারণের মধ্য হইতে কত মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব বাড়াইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ্যস্বতন্ত্রতায় আমাদের জাতীয় সম্পদের উপর কত বড় হানা পড়িয়াছে। লোকসংখ্যাই জাতির প্রধান সম্পত্তি এই সম্পত্তির সুবৃহৎ অংশের প্রতিষ্ঠা আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি মুসলমানের অত্যাচার, কুসংস্কার ও ঐক্যশক্তির নিগড়ের জন্য হোরা যে সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হইয় ভিন্নধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্ষীণকায় হিন্দু জাতিকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছে—ইহার জন্য দায়ী কে? এত প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও ভারতবর্ষে মাত্র চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে, আমাদের শঙ্করদেব পূর্ব্ব প্রভৃতি মহাপুরুষ ইহাদের মধ্যে জন্মিয়াছেন,—এই বৃহৎ জনসংখ্যা আজ ফুলফলে পল্লবিত হওয়া উচিত, নানাদিক দিয়া ইহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়া আমাদের আধুনিক পাণ্ডারা হিন্দু জাতিকে একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন।

চৈতন্য ব্রাহ্মণদের এই ভাবে আমাদের সমাজের ক্ষতি করিয়াছেন সত্য—কিন্তু অপর একদিক হইতে দেখিলে তাঁহারা তাঁহাদের পরবর্ত্তী মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সমাজে বিশেষ সুবিধা দিয়াছেন বিশাল বৃক্ষ সমূহের মধ্যে সোঁদাইর পরবর্ত্তী বাড়িতে যে অপূর্ব্ব উদারতা, সংসাহস নিষ্ঠা ও প্রেম ছিল তাহার ফলে আমরা চৈতন্যকে পাইয়াছি এই অনিষ্টকর গৌড়ামীর অভ্যন্তরে যে সকল বিশালহৃদয় সাধককে জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের পুণ্যকর্ম্ম ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার সাধনা বারবার বঙ্গদেশের অনেক আবর্জ্জনা ভাসিয়া দিয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের মত উপবাস কে করিবে? ব্রাহ্মণের মত ধৈর্য্যরক্ষিত কোন জাতি? ব্রাহ্মণের মত নিঃস্পৃহ কে? ব্রাহ্মণের মত দারিদ্র্য দুঃখ বরণ করিবে কোন জাতি? এই সকল গুণ থাকায় সকলেই তাঁহারা সমাজে শিরোভূষণ হইয়াছিলেন জগতের যখন সকল অঙ্গই অন্ধকারে ডুবিয়াছে, তখন একমাত্র ব্রাহ্মণই নিবৃত্তির হোমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন—ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ব্রাহ্মণ না থাকিলে জড়বাদী জগতে সেই সুরটি নীরব হইয়া যাইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

এইবার আমরা বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস-সম্বন্ধে লিখিব বাঙ্গলাদেশে পাঠান-প্রাধান্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দু-স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী

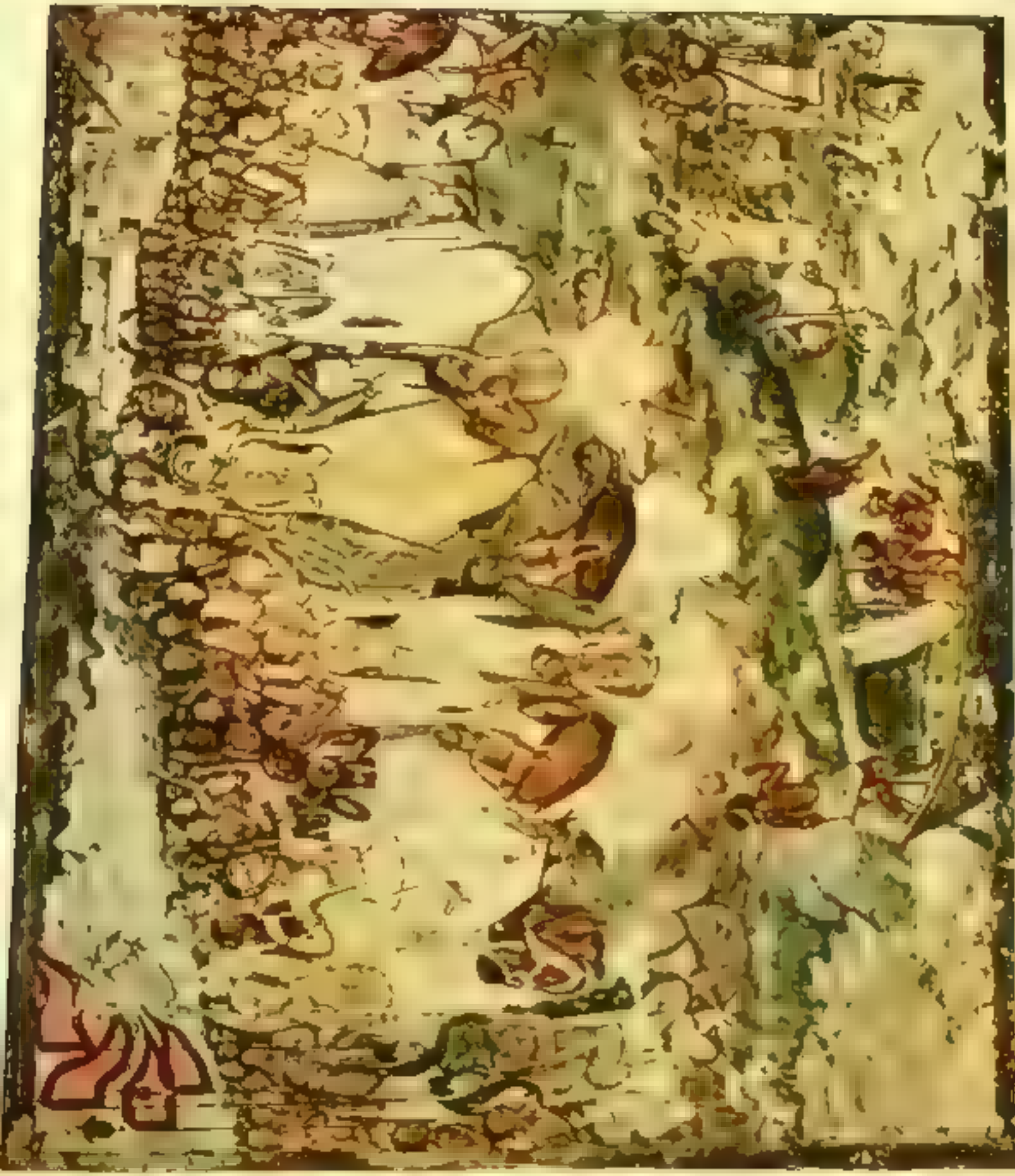

সহজভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে উহা কতকগুলি বীভৎস তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধাধিকারে ধর্ম্ম সঙ্ঘের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পৌরোহিত্যের ভার লওয়ায় নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বিচারগুলি হীন বিলাসের ক্ষেত্র হইয়াছিল। এমন কি বুদ্ধ কে ছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন যেমন হিন্দুরা যেখানেই বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন কিন্তু বেদ কি জনসাধারণে তাহার কিছুই বিদিত নহে—বৈদিক আচার কতিপয় ব্রাহ্মণের পুঁথিগত বিদ্যার অধীন হইয়াছে এবং জনসাধারণ কিছুই না বুঝিয়া না শুনিয়া শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে কতকগুলি দুর্ব্বোধ মন্ত্র আওড়াইয়া যায়, দুর্ব্বাদলের গ্রন্থি তৈরী করিয়া করাঙ্গুলীতে পরে এবং হস্তের নানারূপ ভঙ্গিমা করিয়া কখনও গালে কখনও অঙ্গের অন্যান্য স্থান স্পর্শ করিয়া যোগের কসরৎ করে, বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনই কতকগুলি দুর্ব্বোধ এবং বাহ্য অনুষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছিল পুস্ত-পুরাণ ও ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি জনসাধারণের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের কতকগুলি দুর্ব্বোধ ঢেঁকি, বুদ্ধের সরল নীতিমার্গের বিকৃত পরিণতি

পুস্তপুরাণ ও ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি।

ধর্ম্মজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে নৃতত্ত্ববিদের নিকট এই দুই পুস্তকের একটা স্থান হইতে পারে। কোন বিলুপ্ত পশুর কঙ্কাল হইতে পণ্ডিতগণ মূলবিশেষের জীবতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলেন এই দুই পুস্তকও তদ্রূপ মনুষ্য-সমাজের প্রাচীন আধ্যাত্মিক স্তরের জীর্ণ কঙ্কাল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" কিংবা "সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজের বহুত সন্তান" প্রভৃতি দুই একটি বচন দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে এই পুস্তকগুলির লক্ষ্য ত্রিবরণাধন বৌদ্ধ ধর্ম্ম পাষান-নেতা দ্বারা কাশীরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাঁহার দেহ ও মুখমণ্ডল এরূপভাবে বিকৃত হইয়াছিল যে তাঁহাকে চিনিবার কোনই উপায় ছিল না, শুধু তাঁহার সোণাবাঁধা দাঁত কয়েকটি তাঁহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল, পুস্তপুরাণের বিচারগুলিতেও তেমনই দ্বার-পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে দুই একটি পদমাহাত্ম্য এবং সঙ্কের উদ্ভট বিকৃতি "শঙ্কের" উল্লেখে এই পুরাণকে সাক্ষেতী বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে হইতে পারে, নতুবা বৌদ্ধধর্ম্মের কোন নীতি বা জ্ঞান এই দুইখানি পুস্তকে পাওয়া যায় না এই দুই পুস্তক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে "ধর্ম্মঠাকুর" কল্পনাপন্ন ধর্ম্মঠাকুরের খুব জোরে ঢাক পিটিয়া পূজা দেওয়া হইয়াছে মাত্র আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির যাহা সার কথা তাহা হিন্দু শাস্ত্র সমস্তই আত্মস্থ করিয়া ঐ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল, জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম্ম শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই উভয়ের প্রতীকস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল তাহা 'নাথধর্ম্ম'—তাহা উদ্ভট রকমের সিদ্ধপুরুষ ও নারীদিগের অলৌকিক লীলা ও আজগুবী গল্পপূর্ণ। এই আকারে বঙ্গদেশের নাথধর্ম্মও জনসাধারণের উন্নতির জন্য কিছু দিয়া যায় নাই। শুধু বুদ্ধের সংযমের ভাবটা লোকচক্ষু যোগীর চরিত্রে আভাসে পাওয়া যায় ও ত্যাগের আদর্শটা গীতিকথাগুলির মধ্যে পূর্ণভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই গীতিকথাগুলিই বৌদ্ধযুগের শর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। মালঞ্চমালার মত একটি

গল্পে যে মহানীতি ও স্বর্গীয় ভাব প্রেম-মহিমায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা বহু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাইবার নহে।

কিন্তু ঘোটের উপর ব্যভিচারী বিষ্ণু ও বিষ্ণুপ্রীর এমন কোন গুণই ছিল না, যাহাতে সমাজ আর তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। এদিকে রাজশাসন সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইল, ফলে সংস্কৃতের প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া গেল। বিলাসের দিকে লক্ষ্মণসেন রাজারা যে রুচি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল। মুসলমান সম্রাট ও বাদসাহেরা আসিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারাই সংস্কৃত শাস্ত্র অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, পরবর্তী কালে সেই ভাবে আলিবর্দ্দীর মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে কেরি সাহেব এই যুগের বাঙ্গলায় গদ্য লেখার প্রণালী প্রবর্তন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাদের অক্ষরের বিদ্যে ও ঘুণা চাপিয়া রাখিয়া বাঙ্গলা পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি যে ধর্মঠাকুরের আজিনা বাড়াইলে পাপ হইত, তাঁহার সম্বন্ধে এক মহাকাব্য ব্রাহ্মণ কুলজাত মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়া ফেলিলেন। স্বপ্নে তিনি ধর্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "লাখিব না"—"আজি যায় যদি প্রভু ইহা করি গান।" কিন্তু বাস্তবিক স্বপ্নের প্রত্যাদেশলব্ধই হউক অথবা অর্থলোভেই হউক গাঙ্গুলী মহাশয়কে ডোম ও 'ঘোষী' পূজিত এই কদাকার দেবতার প্রশংসাসূচক কাব্য রচনা করিতে হইয়াছিল।

মুসলমান আগমনে প্রশ্ন উঠিল, এই যে দেবদেবী আমরা পূজা করি, এগুলি কি ভুল? শিব কি ভুল? দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ ইহারা কি ভুল? ব্রাহ্মণ-পুত্র কি ভুল? ডোমের হাতে ভাত খাইলে কি পরকাল নষ্ট হয়? সকলেই কি একখানে বসিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে পারে? ঈশ্বর তো আমাদের নিজের মধ্যেই আছেন তবে আর ডাকিব কাহাকে? (ঐ ভা) 'সোঽহম্' বাদ কি ভুল? সত্যই কি ঈশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে—কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষকে সহায়তা করেন? আমরা পাপপুণ্য দ্বারা কি সত্যই শাস্তি ও পুরস্কার অর্জ্জন করি? পূজার্চ্চার দ্বারা কি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়? সত্যই কি নিজ কর্ম্ম ব্যতীত আমাদের ভবিষ্যতের কর্ত্তা আর কেহ আছেন?

মুসলমানগণের মনে বিপ্লবের ঢেউ এল।

এই সকল প্রশ্ন বেদ-বেদান্তের সময় হইতে এ দেশের পণ্ডিতগণের মাথায় আসিয়াছে। তারপর মহাযান-পন্থী বৌদ্ধগণও এই সকল প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। সহজিয়ারা অল্প-বিস্তর সংযোগে এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতামত আশ্চর্য্য স্বাধীনতা ও মৌলিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড—ভূমিকা)।

কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের মনে এ সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই। সেন-রাজত্ব-কাল হইতে তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুশাসন একান্ত মূঢ়তার সহিত মানিয়া আসিয়াছে; যে যাহা সংস্কৃত অক্ষরে লিখিয়াছে তাহাই বেদ ও ধ্রুববাক্য হইয়া গিয়াছে। মাংস খাইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে। বাসুকীর মাথা নাড়ায় ভূমিকম্প,

দিক্-হস্তীর কাঁধে পৃথিবী, আকাশে চাঁদ সূর্য্য চক্কর কাটিতেছে, এ সকল মহাসত্য সম্বন্ধে তাঁহারা প্রশ্ন করিতে সাহসী হন নাই। এমন কি যে সকল হিন্দু জ্যোতির্বিগণ আকাশে গ্রহনক্ষত্রের সূক্ষ্মতম গতি এবং বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই হিন্দুর বংশধরেরা রাহু রাক্ষস বিষ্ণুচক্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া চাঁদকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পায়, এই সকল কথা পরম ভক্তিসহকারে বিশ্বাস করিতেছিল। য়ুরোপে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইলে সে দেশের প্রত্যেক নরনারী সেই সত্য শিখিয়া ফেলে কিন্তু আমাদের দেশে সেন-রাজত্বের সময় হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সংস্কৃতের মুরুব্বি করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক সত্য সমাজের নিম্নস্তরে যাইতে পারে নাই, তাঁহাদের হুকুমের হাঁড়ির মত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জ্ঞানের ভাণ্ড অন্যের স্পর্শের অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সেন রাজত্বে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বিদ্যাকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা।

কিন্তু এই পাঠান-যুগে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুসমাজে নূতন বিক্ষোভ দেখা দিল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা সজাগ হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকিতে বিধা বোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রচার করিলেন, তাঁহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন, এই অনুবাদকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদ ও শ্রোতাদিগের যথাসাধ্য করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন। "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" এদিকে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার, এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নব ভাবে জাগ্রৎ হইল।

জনসাধারণের জাগরণের দুইটি কারণ।

শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা-জগতে হিন্দুরা সহজ হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে যাঁর মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন এই পাঠান-প্রাধান্যযুগে চিন্তা-জগতে সর্ব্বত্র অভূতপূর্ব্ব স্বাধীনতার খেলা দেখা দিল। এই স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভা যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই, শুষ্ক জ্ঞান-যুগ তখন অবসানপ্রায়, সেই সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার ন্যায় মাধবেন্দ্র পুরীর অভ্যুদয় হইল। তিনি অদ্বৈত প্রভু ও ঈশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রী পর্ব্বতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে।

মাধবেন্দ্র পুরী।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বেই দেশে প্রচারিত ছিল। নারদ, শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব-শিরোমণিগণ ইতিহাসপূর্ব্ব যুগে বিষ্ণু-ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজ (জন্ম ১০১০ খৃঃ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চেঙ্গলপট পক্কনাম পেরামবুদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম

রামানুজ ১০১০ খৃঃ।

কেশব, যাহার নাম কান্তিমতী দেবী। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। একাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ প্রচার ছাড়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের আরো দুইটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, একটি শঙ্করের মায়াবাদ নিরসন এবং দ্বিতীয় শৈব ধর্ম্মকে দলন করা। রামানুজের শিষ্য গোবিন্দ শৈব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইয়া নিম্নলিখিত ভাবের শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—

"হে বিষ্ণু। আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পাপ হইতে ত্রাণ কর, আমি বৈকুণ্ঠনাথকে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়াছিলাম আমি পুণ্ডরীকাক্ষকে ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষকে ভজনা করিয়াছি। আমি পীতাম্বরকে ছাড়িয়া দিগম্বরের পিছনে পিছনে ঘুরিয়াছি আমি স্বর্গীয় তুলসী-কানন ত্যাগ করিয়া ধুস্তুরকীর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিলাম।"

শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই কলহের রেশটা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র ব্যাসদেবের বৈষ্ণবসাধনা ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম-গ্রহণ উপলক্ষে এই দ্বন্দ্বের আভাস দিয়াছেন—"ব্যাস হরিমন্দির-তিলক কপাল হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন আঁকিলেন, গলা হইতে তুলসীমালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রুদ্রাক্ষমালা পরিলেন তুলসীপত্র ফেলিয়া দিয়া বিল্বপত্র লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শালগ্রাম টানিয়া ফেলিয়া দিয়া শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিলেন"। ভারতচন্দ্রের ব্যাসের—শিবনিন্দা, গঙ্গাস্নান এখনও বঙ্গদেশে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আছেন

শ্রীসম্প্রদায় ছাড়া সনক, রুদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবও চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে নানা স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। সনক-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি নিম্বার্কিত্য ইহার নাম ভাস্করাচার্য্য, কথিত আছে সূর্য্যদেব নিম্বগাছের আড়াল হইতে ইহাকে দর্শন দিয়া ইহার প্রায়োপবেশনের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, তদবধি ইহার উপাধি "নিম্বাচার্য্য" হইয়াছিল। এই সনক-সম্প্রদায়ের মতামত-সম্বন্ধে মথুরার ইতিহাসলেখক গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন,—"সনক-সম্প্রদায়ের অনেকে অতি সরল ও সাধুচরিত্র, তাঁহাদের জীবন ও মতামত আলোচনা করিলে ধারণা হয় যে যদিও ইহারা খৃষ্টের দীক্ষা পান নাই, তথাপি তাঁহাদের চরিত্রে সেই দীক্ষার ফল ফলিয়াছে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষের বলে তাঁহারা ঈশ্বরের চক্ষে প্রকৃত খৃষ্টান বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য" (অনুবাদ)। কথিত আছে আরক্ষের সনক সম্প্রদায়ের বহু সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রুদ্র-সম্প্রদায়ের বিষ্ণুস্বামী অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার শিষ্য বল্লভাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন একখানি টীকা করিয়া তাহা পুরীতে চৈতন্যদেবকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই টীকা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রতিকূল হওয়াতে চৈতন্য বিরক্ত হইয়া তাহা শুনিতে চান না, বরং মিষ্ট কথায় এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য্য নাছোড়বান্দা হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনার টীকা স্বামি-পরিত্যাগিনী, সুতরাং

সনক সম্প্রদায়—নিম্বার্কাচার্য্য।

রুদ্রসম্প্রদায়—বিষ্ণুস্বামী বল্লভাচার্য্য ও চৈতন্য

দ্রষ্টা।" চৈতন্যচরিতামৃতে বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কথিত আছে বল্লভাচার্য্য চৈতন্যের পার্ষদ জগদানন্দ, স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতি পণ্ডিতের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য চৈতন্যদেবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আজ আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। মহাশয়, জগতে আপনার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, কারণ আপনার দর্শন পাওয়া মাত্রই অন্তঃকরণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।" চৈতন্যদেব বলিলেন, "মহাশয়, আমার যে সকল প্রশংসা করিলেন, আমি তাহার একান্তই অযোগ্য। যদি আপনার প্রশংসার কণামাত্রেরও উপর আমার কিঞ্চিৎ দাবী থাকে তবে সেই দাবীর কণিকা-প্রসাদ আমি পাইয়াছি অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আর পাইয়াছি এই নিত্যানন্দের নিকট যিনি ষড়্‌দর্শনে ব্যুৎপন্ন এবং যাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে নাই, আমার যদি কিঞ্চিৎ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে তবে ইঁহারই দর্শন ও অতি পবিত্র সংসর্গের ফলে। ইঁহাদের ছাড়া আমি পণ্ডিত গদাধর, স্বরূপের ও জগদানন্দ প্রভৃতি সুধী মহাজনের নিকট অনেক শিখিয়াছি এবং আরও শিখিব এরূপ আশা করি। যদি আপনি শাস্ত্রালোচনা করিতে চান, তবে ইঁহাদের সহিত করুন।" জগদানন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করার ফলে বল্লভাচার্য্যকে তাঁহার অনেক মত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল (চৈঃ চঃ, অন্ত্য খণ্ড, ৭ম অঃ)। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যের দল এখন আগ্রাবধি বিশেষ পুষ্ট। বৃন্দাবনে ইঁহার "গোকুল গোঁসাই" নামে পরিচিত। শঙ্করস্বামি প্রণীত রাধাকৃষ্ণচরিতে ইঁহাদের

বল্লভী সম্প্রদায়ের গুরুভক্তি।

সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তাহার কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা জানি না, তবে ইঁহাদের মধ্যে গুরুভক্তি অত্যন্ত প্রবল। গুরুকে দেখার অধিকার পাইতে হইলে না কি শিষ্যকে ২ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, তাঁহাকে স্পর্শ করার অধিকারের জন্য ২০৲ টাকা, তাঁহার পা ছুঁইতে হইলে ৩৫৲ টাকা, তাঁহার পদাঘাতের মূল্য ১১৲ টাকা, তাঁহার নিকট বেত্রাঘাত পাইবার অধিকারের জন্য ১৩৲ টাকা এবং তাঁহার সঙ্গে একাসনে বসিতে হইলে ৬০৲ টাকা দিতে হয়। শিষ্যেরা এইভাবে গুরু-প্রণামী দেয় কিম্বা এ বিষয়ে অপরিহার্য্য নিয়ম আছে, তাহা জানি না। এই সকল কথা শরৎবাবুর পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, কত দূর সত্য বলিতে পারি না।

কথিত আছে চৈতন্যদেব মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী ইঁহারাই বঙ্গে ভক্তির প্রবাহ প্রথম আনয়ন করেন এবং ইঁহারা মাধ্বী সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু চৈতন্যদেবের মতামত ঠিক মাধ্বী-সম্প্রদায়ের অনুকূল নহে, তাঁহার ধর্ম্ম কতকটা তাঁহারই

মাধ্বাচার্য্য—১১৯১ খৃঃ।

নিজের, এজন্য তিনি বার বার তাঁহার শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ দামোদরের নিকট ছাড়া খাইতেন। অনেকের মতে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমতের সঙ্গে মাধ্বী-মতের ঐক্য নাই, তথাপি বঙ্গের বৈষ্ণব-জগতের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা তাঁহাকে মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। মাধ্বাচার্য্য ১১৯১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি মলবের নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র।

ইহাদের নিবাস দাক্ষিণাত্যে তুলভ পরগনার উদিপী নগরের নিকটবর্তী তাজিকক্ষেত্র নামক গ্রামে। মাধ্বাচার্যের শৈশবে নাম ছিল বাসুদেব, ৯ বৎসর বয়সে ইহাকে অচ্যুতপ্রজ্ঞ নামক এক সন্ন্যাসী শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আনন্দতীর্থ উপাধি দেন। দাক্ষিণাত্যের অনন্তেশ্বর মন্দিরে ইহার প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা হয়। মাধ্বাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের টীকা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছাড়া "পুরাণপ্রজ্ঞা-দর্শন" নামক একখানি পুস্তকে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের উচ্ছেদের মত প্রচার করেন। মাধ্বাচার্য হইতে পঞ্চমস্থানীয় জয়তীর্থ বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। জয়তীর্থ অল্প বয়সে ১২৪৫ খৃঃ অব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার রচিত তত্ত্বপ্রকাশিকা, উপনিষদ্ভাষ্য, ন্যায়সুধা, উপনিষদ্ভাষ্য টীকা, তত্ত্বনির্ণয়-টীকা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক বাঙ্গালাদেশের অধ্যয়নযোগ্য পুস্তকের তালিকায় দৃষ্ট হয়। মাধ্বী সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্যের নাম ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাতে মাধ্বাচার্য হইতে চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকলের নামই আছে। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের মত দার্শনিক চরিতগ্রন্থেও মাধ্বী সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমন কি কেশব ভারতী কিংবা ঈশ্বর পুরী যে ঐ শ্রেণীভুক্ত তাহাও উল্লিখিত হয় নাই।

বৈষ্ণবদিগের এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ভাবের অনুশীলনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। যদিও প্রাচীন সাহিত্যে 'রাগানুগা' ভক্তির উল্লেখ যথেষ্ট পাওয়া যায় তথাপি চৈতন্যের পূর্ব্বে এই ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আর কোথাও ছিল না। বহু যুগ ধরিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যের গণ্ডী এড়াইতে পারে নাই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা—এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। চৈতন্য ভগবানের বিভূতির দিকে লক্ষ্য করেন নাই। উপনিষদের "আনন্দরূপ" ভগবান্‌ই তাঁহার আরাধনীয় ছিলেন, তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে চান নাই, অথচ চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি সমস্ত চরিত-লেখকই তাঁহার জীবনে ঐশ্বর্য্যের লীলা দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। কেহ তাঁহার ষড়ভুজ, কেহ তাঁহার মহাবিষ্ণু, কেহ তাঁহার দামোদর পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার জীবনে ঐশ্বরিক বিভূতি আরোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবত তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রমাণ করিবার জন্য কখনও তাঁহাকে কল্কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে ব্রহ্মরূপী করিয়া তাঁহার মুখে ভীষণ গর্জ্জন করাইয়াছেন, কখনও বা অতি-শৈশবে তাঁহাকে অনন্তশায়ী নারায়ণ পরিকল্পনা করিয়া এক ভীষণ সর্পের উপর শায়িত করিয়াছেন, কেহ কেহ বা তাঁহাকে রামের অবতার প্রমাণ করিবার জন্য লঙ্কা হইতে অমর বিভীষণকে আনাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ও সংবর্দ্ধনাদি করাইয়াছেন, কেহ বা তাঁহার ভক্ত মুরারি গুপ্তকে হনুমানের অবতার বানাইয়া তাঁহার দেহ হইতে একটি দীর্ঘ লাঙ্গুল বাহির করাইয়াছেন। প্রেমের সম্পূর্ণ অটলতাপূর্ণ অনাবিল পবিত্র দেবচরিত্রকে লইয়া ছোট্টো শ্রেণীর চরিতকারগণ বৈষ্ণব-বিভূতির ছাই ভালরূপে মাখাইয়া তাঁহাকে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই বিকৃত রূপ এখনকার দিনে গ্রাহ্য হইবার নহে। শুধু তাঁহাকে মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের অবতার পরিকল্পনা করিয়াই তাঁহারা

কান্ত হন নাই, পূর্ণ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা ভগবানের পার্ষদের হিসাবে নিজেরাও যে সেই ঐশ্বর্য্যের অংশীদার তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য "গৌরগণোদ্দেশ" নামক অসংখ্য পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় তাহার এক রাশ পুস্তিকা বিদ্যমান, তাহাতে চৈতন্যের পার্ষদবর্গের মধ্যে কে কাহার অবতার তাহার একটা পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈত মহাদেবের, হরিদাস ব্রহ্মার, নিত্যানন্দ অনন্তদেবের অবতার তো আছেনই, তাহা ছাড়া কেহ হনুমানের কেহ অঙ্গদের, কেহ রাধিকার সখী বিশাখা, ললিতা, বা মধুমতীর অবতার এইরূপ পরিকল্পিত হইয়াছেন। এই গৌরগণোদ্দেশের এতগুলি পুঁথি পাওয়া যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় প্রত্যেক বৈষ্ণব বালককে ইহা মুখস্থ করিতে হইত। বৈষ্ণব গুরুগণ এইভাবে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের দেবতা বা দেবতাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শিষ্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গুরুতত্ত্বের সার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় এই সকল পুস্তকের কোন একটা পংক্তির সত্যাসত্য সম্বন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তবে সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে যে ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহাতে সমালোচক ভস্ম হইয়া যাইবার পথে দাঁড়ান। যখন গোবিন্দ দাসের কড়চার আমি একটা সংস্করণ প্রকাশ করি তখন এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব গোস্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতের অলৌকিক অংশ গ্রহণ করুন, আমরা তাহা হইলে গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণ্যতা করিতে বিরত হইব"। চৈতন্যের এই সকল চরিত কথা নানা দিক্ দিয়া অতি মূল্যবান। ইহারা চৈতন্যেতিহাসের প্রধান অবলম্বন, বিশ্বাস্য, সাধুতা ও সাহসিকতা শৌর্য্য ও জীবনব্যাপী তপস্যার ফলস্বরূপ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় বৃন্দাবনের রাসলীলার বনের পঙ্কজ রামাল, কিংবা মধুমুর নরক-বিনাশী কালীয়, বক, পূতনা প্রভৃতি কংস প্রেরিত জনবধ্বংসকারী মহাবীর আর কোথায় নবদ্বীপের টোলের আত্মাভিমানী শেষে ভক্তিপ্রেমের অবতার নিরীহ টুলো তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক ইহাদিগকে এক পংক্তিতে আনিয়া এক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৃন্দাবন দাস এতদর্থে না করিয়াছেন এমন কার্য্য নাই। টোলে বসিয়া চৈতন্য শিষ্যদিগকে পড়াইতেছেন ইহার বর্ণনা উপলক্ষে ব্যক্তিকালয়ে কিংবা নৈয়ায়িকগণ কৃষ্ণ ভক্তি দিগকে উপদেশ দিতেছেন—সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিয়াছেন কৃষ্ণ গোপনির নিবেদিত অন্ন খাইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন এখানেও অতিথি ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন শিশু চৈতন্য খাইয়া লুকাইয়া পড়িতেছেন। পাঁচ বৎসরের শিশু চৈতন্য গঙ্গার তীরে ক্রীড়া লীলা, অন্য শিশু মেয়েদের সঙ্গে খেলা ও কলহ করিতেছেন, এখানেও বৃন্দাবন দাস "পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। তেমনই দেখিয়ে তোমার পুত্রের ব্যবহার" লিখিয়া কৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, চৈতন্যের বাল্যকালের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনি মুনির সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। এই সকল চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি চৈতন্য-ভাগবতে দৃষ্ট হয় যে, চৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার তাহা বৃন্দাবন দাস যেমন প্রমাণ করিয়াছেন এমন আর কেহ পারেন নাই এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পরম পরিতোষসহকারে বৃন্দাবনের

চৈতন্য-ভাগবতাদি পুস্তকে চৈতন্যকে কৃষ্ণ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা।

গোস্বামীরা চৈতন্যমঙ্গল নাম কাটিয়া ঐ পুস্তকের চৈতন্য-ভাগবত নাম দিয়াছিলেন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্য ভাগবতের চৈতন্যলীলা একই বস্তু, ইহাই দেখাইবার জন্য এই নাম।

অথচ যে ব্যক্তিকে লইয়া এই কেবলাদ্বৈত পরিকল্পিত হইয়াছিল তিনি দীনের দীন ছিলেন, কেহ তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিলে তিনি বিব্রত হইতেন। পুরীতে পাছে কেহ তাঁহার পাদোদক পান করে এই ভয়ে তিনি একটি বৃক্ষের তলে অতি সঙ্গোপনে স্নানের একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। একবার 'কৃষ্ণভক্ত' স্থানে 'চৈতন্যভক্ত' বলিয়া কোন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহারই নামকীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে তাহা থামাইয়া দিয়াছিলেন। যাজপুর হইতে পুরী প্রত্যাগমনের পর বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া সংবর্ধনা করিতে দিয়াছিলেন, তিনি ও কৃষ্ণিত করিয়া সার্বভৌমকে এজন্য গঞ্জনা করিয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যাইবে।

চৈতন্যের বিনয়।

সুতরাং এখন এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন খুব গোঁড়া বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য-লীলাগুলির ঐতিহাসিকতা আলোচনা করিয়া গ্রহণ ও বর্জননীতি অবলম্বন করিতে হইবে। গোঁসাইদের দুটির অন্ত করিলে চলিবে না। এই ভাবে সত্যের ভিত্তির উপর চৈতন্যচরিত দাঁড় করাইলে তাহার স্বরূপ দেখিবার ও দেখাইবার সুবিধা হইবে। নিজের বাড়ীটি লোকের নিন্দ হইলেও তথাকার আবর্জনা কোন্‌গুলি তাহা দেখাইলে গৃহের মহিমা বাড়িবে বৈ কমিবে না। এখন উহারা চৈতন্যজীবনীর বাহিরে কতকটা অধিষ্ঠান হইয়া আছে। উপযুক্ত ভূমিকায় ঐতিহাসিক কারণ দেখাইয়া সেই আবর্জনা ফিরাইয়া আনিলে তাহা বুঝাইয়া দিলে পুস্তকগুলির মর্ম কমিবে না, বরঞ্চ ইহা সর্বজনগ্রাহ্য হইবে। মধ্যযুগের জগতের সর্বত্রই সাধু পুরুষদের চরিতাখ্যানগুলি এইরূপ অলৌকিক গল্পময়, অথচ তাহারা সর্বত্র সম্মান পাইতেছে, তাহার কারণ এই যে সেই পুস্তকগুলির গুণাগুণ বিচারের নিরপেক্ষতার আলোকে দেখা হইতেছে না। বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাসে উচ্চিষ্ট দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায় মাত্র। ভক্তের নিজ ভক্তি অতি ছাড়া সামগ্রী, কিন্তু ঐতিহাসিকেরও একটা কর্তব্য আছে।

চৈতন্যদেব ভাবতীয় ধর্মের কি উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমাদের বিবেচ্য। বৈষ্ণব ধর্ম প্রধানতঃ ভাবমূলক, চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান লক্ষ্যও তাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উহার নাম দিয়াছেন "মহাভাব", এই মহাভাবই এদেশের বৈষ্ণবধর্মের প্রাণস্বরূপ এবং চৈতন্যদেব 'মহাভাবের' জীবন্ত প্রতীক।

"মহাভাব"।

এই ভাব কি?—মহাভাব তো দূরের কথা—অপর দেশের লোকেরা এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমি চৈতন্যদেবকে বুদ্ধ হইতে কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বলাতে ডাঃ সিল্‌ভান লেভি মহাশয় আমাকে অনুযোগ দিয়াছিলেন (বঙ্গভাষী (Italian) and

[illegible]" পুস্তকের [illegible] বৃদ্ধিকা) ভগবানের অস্তিত্ব পৃষ্ঠান প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও বিশ্বাস করেন। যদি তাঁহার সত্তা স্বীকৃত হয়, তবে তাঁহাকে ভালবাসা যায় এ কথাটা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অনেক দেশের সাধু ও মহাজনেরা ভগবানের প্রত্যাদেশের কথা বিশ্বাস করেন, কারণ জগতের বড় বড় ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনেকগুলিই এই প্রত্যাদেশের উপর স্থাপিত। তাঁহার প্রত্যাদেশ শোনা যায়, তাঁহার রূপদর্শন কেনই বা অসম্ভব হইবে? একবার চৈতন্যদেব তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার রূপদর্শন সম্ভবপর ঋষিরা কখনও কখনও তাঁহাকে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত আকাশে যাত্র দেখিয়া থাকেন, যে মুহূর্ত্তে সেই আকাশে দর্শন লাভ হয় সেই মুহূর্ত্তে মানবীয় জ্ঞানের সার্থকতা শেষ, প্রকাশ ও প্রেমের ভগবদ্দর্শন এক উপগ্রহে অঙ্কিত যে তাহা ঐতিহাসিক যুগের প্রামাণিক কথা বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না কিন্তু জীবনে এই ঘটনাটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এবং ইহার ফল তাঁহার জীবনব্যাপী হইয়াছিল যাহা হইয়া তিনি কিছু দেখিয়াছিলেন, কি দেখিয়াছিলেন তাহা অনেকবার বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই সেই অবধি "অবা মানসগোচরে"র কথা বলিতে যাইয়া তিনি একবার অধরের আর একবার দুঃখন্ পণ্ডিতের কাঁধে ঢলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন—"সকলে তাঁহার রূপ করে বর্ণন। যে দেখিতে পারে যার আঁখি নির্ম্মল।" (গোবিন্দদাসের কড়চা।) তিনি কি দেখিয়াছেন বলিতে পারেন নাই, বলিতে গেলে আনন্দাশ্রুতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন কিন্তু যাহাই দেখুন না কেন, তাহার রূপসম্বন্ধে বিচার কোন কারণ নাই। এই দেখার ফলে তিনি কৃষ্ণকেলী ধুতি ছাড়িলেন, আয়নাকে দিয়া যে দীর্ঘ বক্রার প্রকেশ যত্নপূর্ব্বক ফুলমালায় জড়াইয়া রাখিতেন, সে কেশসজ্জা দূর হইল, পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমিশয্যা লইয়াছিলেন, তাঁহার যে শরীর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী দ্বারা সুবাসিত হইত, তাহা ধূলায় ধূসর হইল। সে কণ্ঠে আর সুরেশ মাধুরী স্থান পাইল না, এমন কি তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক, শালগ্রাম-সেবা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সকলই ছাড়িয়া দিলেন কোন শব্দ শুনিলে 'কে এল, কে এল' বলিয়া উঠে দুইপাঁচ করিতেন, চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা, একবার ঘরে আর একবার বাহিরে যাতায়াত করেন—"পুনঃ পুনঃ গত্যাগতি কর ঘর পথ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলহ একান্ত।" মাথার চুল আলুলায়িত, শ্রথ বসনে শচী দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন, কিন্তু যাওয়ার দিকে আর তাঁহার দৃষ্টি নাই "না করে স্নান খোরা না করে ভোজন, না করে শ্রী অঙ্গে বেশ তৈল উবর্ত্তন।" যিনি জীবন-মরণের সখা, জীবের অনন্তশরণ, যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকা প্রসাদ পাইয়া জগৎ সুন্দর—তাঁহার প্রথম রূপদর্শনে চৈতন্যদেবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল এই ভাব ক্ষণিক নহে—ইহা তাঁহার জীবনব্যাপী ছিল। চণ্ডীদাস চৈতন্য অবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার আগমনী গাহিয়াছিলেন—প্রেম কবিদের চিত্ত মুকুর-স্বরূপ, তাহাতে আনন্দময় সৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হয় এ সকল কি গূঢ় আধ্যাত্মিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে, তাহা কে বলিবে? তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখি না কেন?

রূপদর্শন।

সে কথা পরে হইবে—কিন্তু এই যে তিনি রূপ দেখিয়াছিলেন, সে দেখাটা ত ঠিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ সেই দর্শনের ফলে তাঁহার জীবনের রূপ উল্টাইয়া গিয়াছিল, চণ্ডীদাসের রাধার মত "নিরবধি আছয়ে, রূপ নেহারে, যেমন যোগিনী পারা"—তার তাঁহার হইয়াছিল, তিনিও মেঘের মধ্যে সেই লুকানো রূপ দেখিয়া ধ্যানীর মত নিষ্পলক চক্ষে ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া থাকিতেন, "সকলই যেখানে চাহে সেখপানে, না চলে নয়নের তারা।"

তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আর কেহ দেখে না কেন? আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলির অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে—এ সম্বন্ধে আমি কোন জটিল দার্শনিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। সবাকি শঙ্খকে ফুলবনে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়—সৌন্দর্য্য দেখিবার যে চক্ষু, তাহা মানুষের আছে—তাহা তাহাদের নাই। যাহা আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া পরম তৃপ্তি উপভোগ করি তাহারা সেইগুলি তখনই খাইয়া ফেলে। কুধার তাড়নায় সৌন্দর্যদর্শনাক্ষম চক্ষুর উপর তাহাদের একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে তাহাদের সেই দৃষ্টি ফোটে নাই। আমরাও বহির্বিষয়াসক্তির আসক্তিবশতঃ জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি অনুভব করিবার শক্তি যেমন হারাইয়াছি, কিংবা আমাদের সেই স্বর্গীয় দৃষ্টির এখনও উন্মেষ হয় নাই।

রূপদর্শনের ফল পূর্ণরাগ—জগতে সৌন্দর্য্যের জন্য মানুষ পাগল, এই উন্মত্ততার মত সুখকর আর কিছু নাই, এই রূপদর্শনজাত অনুরাগের ভিত্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য গড়াইয়া। নায়ক-নায়িকার প্রেম সেই কাব্যের উপাদান। প্রত্যেকে যদি অকপটে তাঁহার মনের কথা বলেন তবে অবশ্যই স্বীকার করিবেন—জীবনে প্রথম যে ভালবাসা আস্বাদন করিয়াছিলেন, অনাবিল স্বার্থশূন্য ত্যাগ পূর্ণ হৃদয়ের আবেগে প্রথম যে ভালবাসা হইয়াছিল, তদপেক্ষা বড় সুখ তিনি পান নাই।

যদি উপরন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানুষ এরূপ অপূর্ব্ব সুখের আস্বাদন পায়, তবে যিনি সৌন্দর্য্যের শেখর, আকার একমাত্র কাম্য,—রূপের উৎস, তাঁহাকে দেখা যদি সম্ভবপর হয় তবে মানুষের মনের অবস্থা কি হইতে পারে চৈতন্যের জীবন তাহাই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে। আর কোন সাধু মহাজন জগতে তাহা পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। স্ত্রী, পুত্র, প্রণয়ী, প্রণয়িনীর জন্য কেহ কাঁদিয়া মরে, পাগল হয়, কাকা দেখে, গান গায়, কত কি করে, চৈতন্য ভগবানের জন্য তদপেক্ষা শতগুণ উন্মাদনা দেখাইয়াছেন। ভগবানের প্রেম যে সত্য বস্তু, তাহা কাল্পনিক নহে, তাহা মানুষ লাভ করিতে পারে, তাহা চৈতন্য যেরূপ দেখিয়াছেন অপর কেহ তেমন পারে নাই।

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে কোন মহলোকের বাড়ীতে যাইয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসা কত কঠিন, আর যিনি রাজাধিরাজ তাঁহার দর্শন লাভ কি সহজ? কত যুগের তপস্যা থাকিলে তবে এই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

ভারতবর্ষ এই তপস্যার দ্বারা বিশ্ব-সম্বন্ধের বাণী চলিয়া আসিয়াছিল। যিশুর শিক্ষা মনুষ্যের সঙ্গে সৌভ্রাত্র স্থাপন—"তুমি মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া আইস তাহারও সঙ্গে তোমার ঝগড়া আছে কিনা, যদি থাকে, তবে মিটাইয়া এস, নতুবা তোমার নৈবেদ্য গৃহীত হইবে না। যে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, তাহার নিকট পুনরায় গাল প্রস্তুত হইতে, যে তোমাকে এক ক্রোশ বেগার খাটাইয়াছে, তাহার দুই ক্রোশের বেগার খাটিয়া আইস, যে তোমার জামা লইয়াছে, তাহাকে তোমার কাপড়খানিও দিয়া আইস।" এই ক্ষমাশীল ভ্রাতৃভাব যিশু শিখাইয়াছিলেন, তোমার মনে কলুষলেশ থাকিলে তুমি রাজার দ্বারে ঢুকিতে পারিবে না। তথাগতও বুদ্ধ ভাবে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। শুধু মানুষ নহে একটি সামান্য পশু ও পাখীর জন্য প্রাণ দিয়া ঐ সার্ব্বজনীন প্রেম দেওয়ার শিক্ষা তাঁহারা দিয়াছিলেন। গল্পে কথিত আছে, এক জন্মে বুদ্ধ একটি ছাগীর জীবনরক্ষার জন্য নিজ প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই জাতকটির কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

যখন এইভাবে মানুষের সঙ্গে এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে সৌভ্রাত্র ও মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইল—তখন ভগবৎপ্রেমলাভের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। বহু যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া পুনঃপুনঃ তাহা নির্ব্বাণ করিয়া অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, চৈতন্যদেবই সেই সিদ্ধি

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম।

অপরাপর সাধুদের জীবনে তপস্যা আছে—কিন্তু চৈতন্য সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধি, অতি সহজ, বাল্মীকির কাব্য, চণ্ডীদাসের গান, রবীন্দ্রের সঙ্গীতাবলী যেমন সহজ—ইহা তেমনই সহজ। সমগ্রভাবে একটি বিন্দুও তাহার নাই, বস্তুজগতের সম্যক্ বিকশিত পদ্ম, ইহা সৃষ্টি করিতে যে জাতীয় কত যুগের তপস্যার দরকার হইয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। তিনি খুব কমই উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কঠিন পন্থা দেখান নাই—তাঁহাকে দেখা মাত্র লোকে ভুলিয়াছে। কোন সুন্দরীকে দেখিলে যেরূপ নায়ক ভুলিয়া যায়—তাঁহার মুখে প্রেমের বক্তৃতা না শুনিয়াও সে তাঁহাকে পাগলের মত ভালবাসিয়া ফেলে, চৈতন্যকে লোকেরা তেমনই সহজে ভালবাসিয়াছিল, কারণ তিনি যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপের ছাপ তাঁহার মুখে আঁকা ছিল—তাঁহার সে অপূর্ব্ব রূপ যাহার উদ্দেশে শত শত কবি গানের উৎস বহাইয়াছেন, শত শত বীণাবাদক বীণার সুরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া দিয়াছেন, সেই রূপ তিনি ভাবরূপ-দর্শনের ফলে পাইয়াছিলেন, রাজার মোহরাঙ্কিত সে রূপ-আকর্ষণ কে এড়াইবে? চণ্ডীদাসের রাধিকার মুখে এই তত্ত্বটি একটি ছত্রে লিখিত হইয়াছে—"তোমার গরবে, গরবিনী হাম—রূপসী তোমার রূপে।"

তাঁহার ধর্ম্মের পঞ্চ শাখা—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ছাড়া আর কাহারও শাস্ত্রে নাই, রায় রামানন্দ তাহা চৈতন্যের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

প্রথম শান্তভাব—বুদ্ধদেব যাহার উপর জোর দিয়াছেন, সমস্ত কামনা দূর করিতে

হইবে। এই কামনা নির্ব্বাসিত করা দরকার—তাহা না হইলে অনন্তদুঃখ-নিবৃত্তির উপায় নাই বুদ্ধদেব ছন্দককে বলিয়াছিলেন—"আমাকে অগ্নি-শলাকা-দ্বারা দগ্ধ কর—অতল জলে নিমজ্জিত কর, কিছুতেই আমি দুঃখের সংসারে প্রবেশ করিব না" এই জগতের ত্রিবিধ তাপে যখন মানুষ আর্ত্ত হইয়া 'ত্রাহি, ত্রাহি' রব করিতে থাকে, তখন তাহা হইতে পলাইয়া সে অরণ্য আশ্রয় করে, বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ এইভাবে বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন সুতরাং বুদ্ধ অমৃতের সন্ধানে বনবাসী হন নাই—তিনি দুঃখ হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার উপায়ের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। জপের দ্বারা শান্তভাব পাওয়া যায়। তিনি জপের পথে প্রথম দ্রষ্টা, তিনি বুঝিবেন এ পথ কত কঠিন ভগবানের নামই হউক, রূপই হউক বা বৌদ্ধযুগের মহাযান-সম্প্রদায়ের শূন্যবাদের শূন্য বা মহাশূন্যই হউক, একটা কেন্দ্র মনে আবদ্ধ করিয়া জপ সুরু করিলে দেখা যায় পৃথিবী সাধনার পথের পথিককে কিরূপ শক্ত বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। জপের সময়ে পুনঃ পুনঃ সাংসারিক বিষয়ে মন প্রধাবিত হইবে যাহা প্রথমতঃ অতি সহজ মনে হইয়াছিল, জপের ব্রতী দেখিবেন তাহা কত কঠিন, পদ্মপত্রে জলের মতন মন টলটলায়মান, কিছুতেই তাহাকে কেন্দ্রে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু কয়েক বৎসরের দৃঢ়সঙ্কল্পিত অভ্যাস চেষ্টার ফলে মনকে বশীভূত করা যায়। তখন সংসারের যত বিঘ্নই আসুক না কেন, মনকে তাহাদের উর্দ্ধে লইয়া গিয়া সেই কেন্দ্রটিতে আবদ্ধ করা যাইতে পারে জপে যখন এইভাবে মনে শান্তি আইসে তখন বুঝিতে হইবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে—উহাতে আশঙ্কা বা আবর্জ্জনা নাই তখনকার প্রশ্ন—আমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখন ভগবানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধের বীজ বপন করিতে হইবে।

প্রথম সম্বন্ধ তুমি প্রভু—আমি দাস তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার কর্ত্তব্য এই স্থানে নীতিজ্ঞান সুরু হইল। দাস্যভাবটা নৈতিক রাজ্য। কি ভাল কি মন্দ মনের মধ্যে বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। দাস্যভাবের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ড জড়িত। সর্ব্বদা কর্ম্ম করা—ভগবানের নিয়ম বুঝিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা—ইহাই দাস্যের লক্ষণ। অধুনা য়ুরোপ-প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্ম্ম—এই দাস্য,—নীতিজ্ঞান ইহার ভিত্তি।

কিন্তু কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। নীতিজ্ঞান নীরস ও শুষ্ক। তাহাতে ভগবানের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ নাই। সারাজীবন বিবেক-সম্মতভাবে অহোরাত্র কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মী দেখিলেন, কি পাপ কি পুণ্য তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এক শ্রেণীর জীবের রক্তের উপর অন্য শ্রেণীর আহার চলিতেছে, যাহা কিছু শুভ, আলোর পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ অশুভ আছে। জগতের একদিকে হিতসাধন করিলে, অন্যদিক্ আহত হয়। পাপ-পুণ্যের কথা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তখন

ভক্ত ক্রমে ক্রমে নীতির সীমার উর্দ্ধে লীলার জগৎ পাইয়া রসের সন্ধান পাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমার এই খেলায় আমাকে টানিয়া লও। এই স্থানে সখ্য। সখ্যের মধ্যে শান্তভাব আছে—কারণ প্রথমতঃ মন স্থির করা দরকার—মন স্থির না করিলে ভগবানের প্রত্যাদেশ শোনা যাইবে না। ঘোলা জলে সূর্য্যকিরণ বিম্বিত হয় না। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অনাসক্ত মন প্রস্তুত হইলে তাহাতে কি প্রেয়ঃ কি শ্রেয়ঃ, তাঁহার কি আদেশ তাহা বুঝা যায়। আর সখ্যের মধ্যে শান্ত ত আছেই দাস্যও আছে। সখ্য শান্ত হইতে আর একটু অগ্রসর। জগৎ লীলাময়ের লীলা, আমি তাঁহার সঙ্গী, সহচর ও খেলার সাথী। যাহা কিছু করি সর্ব্বদা তিনি আছেন, আমি তাঁহারই সঙ্গে আছি, আমি তাঁহাকে ছাড়া কিছু জানি না। বিপদে পড়িলে বন্ধু, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দানবের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরি, তিনি আমাকে রক্ষা করেন। এই সখ্যের মধ্যে দাস্যভাব আছে, কৃষ্ণ-সখারা দিনরাত্র তাঁহার সেবা করিতেছে, তাঁহার জন্য ফল কুড়াইতেছে; যে ফলটি মিষ্ট লাগিল তাহা তাঁহার মুখে আনিয়া দিল, তাঁহাকে কাঁধে করিল, তাঁহার কাঁধে চড়িল, এখানে উচ্ছিষ্টজ্ঞান নাই, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ নাই, তথাপি রাখালেরা কৃষ্ণকে বলিতেছে—"যিনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি" এখানে ভক্ত কৃষ্ণের বাহির আঙ্গিনা ছাড়িয়া—দাসের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার গৃহের ভিতরে ক্রীড়াক্ষেত্রে ঢুকিয়াছে। এখানে কর্ত্তব্যজ্ঞান, নৈতিক বিচার নাই, এত ঘণ্টা খাটিতে হইবে, এত ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে হইবে, ঘড়ি ধরিয়া কর্ত্তব্যের সেরূপ কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা নাই। বৃন্দাবনে সখাদের নিত্যলীলা চলিতেছে। সখ্য হইতে ভগবানের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ—আনন্দের সম্বন্ধ।

বাৎসল্য।

জগতে আনন্দ ঘনীভূত হইয়াছে। প্রত্যেক নবজাত জীবের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। নতুবা কালো কুৎসিত ছেলেটা তাহার মায়ের কাছে রূপের ডালি বলিয়া বোধ হইত না। রাত্রি জাগিয়া কাঁপ উঠাইয়া মাতা ছেলের অধরপ্রান্তে হাসিটুকু ফুটিতে দেখেন এবং আনন্দে আত্মহারা হন। প্রত্যেক জননীকে ভগবান্ শিশুরূপে দেখা দেন। নতুবা কুৎসিত ছেলেটার মধ্যে তিনি অনন্তরূপ আবিষ্কার করিবেন কিরূপে? প্রত্যেক মায়ের ধারণা তাঁহার ছেলের মত এমন সুন্দর কেহ হাত-পা নাড়িতে জানে না, এমন সুন্দর আধ-আধ বুলি কেহ বলিতে পারে না এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য কালো ছেলেটার মধ্যে প্রকাশ পায় কিরূপে? বাৎসল্যের মধ্যে শান্তভাব আছে, দাস্য আছে—কারণ মাতার মত অক্লান্ত কর্ম্মী দাসী আর কে আছে? এখানে দাস্য কর্ত্তব্য-জ্ঞানমূলক নহে, এ দাস্য অনুরাগের, এখানে কর্ম্ম কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে সেই অসীম অনন্ত রূপের উৎস ক্ষুদ্র শিশুটিকে অবলম্বন করিয়া মাতৃহৃদয়ে ধরা দিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ, অযাচিত, অজস্র করুণা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ করে। বাৎসল্যে সখ্য আছে, সমানে সমানে না হইলে সখ্য হয় না। মাতা শিশুর সঙ্গে যখন খেলা করেন, তখন শিশুর সঙ্গে শিশু হইয়া যান।

প্রচলিত ভাষায় তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না, এজন্য ছেলে-ভুলানো ছড়ার মত অর্থহীন কাকলীর সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার সঙ্গে কথা বলেন। একদা রোমের সিনেট-সভাপতির নিকট বিদেশী এক রাজদূত আসিয়াছিলেন, ক্রমক্রমে তিনি তাঁহার একটা গোপন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রোমের এত বড় সভাপতি ঘোটক সাজিয়াছেন ও তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার পিঠে চড়িয়া তাঁহাকে চাবুক মারিয়া চালাইতেছে। সভাপতি মাঝে মাঝে হিঁহিঁ রব করিতেছেন বস্তুতঃ বাৎসল্যে শান্ত, দাস্য ও সখ্য আছে তার উপর আরো কিছু আছে। অত উপর করিয়া কি সখ্য অনুভূতি হইতে পারে? কিন্তু রুক্মসখা শ্রীদাম সুদাম তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ঘুমাইলেও স্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করিতেন—শ্রীদাম বলিতেছে—"আমরা মায়ের কোলে ঘুমায়া থাকি স্বপনে তোর চাঁদ মুখখানি দেখি" সুতরাং সখ্য বড় কি বাৎসল্য বড় তাহা লইয়া তর্ক আছে। সখার নিকট যাহা বলা যায়, তাহা মায়ের নিকট বলা যায় না। শিশু একটু বড় হইলেই মাতৃদেহ তাহাকে সম্যক্ রূপে ধরিতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিতে পারে না, পেটের ক্ষুধা হইতে হৃদয়ের ক্ষুধা বড়, মাতা তাহা বুঝিতে পারেন না। এই হিসাবে সখ্য বড় হইতে পারে যেহেতু সখার নিকট মনের সকল কথা ব্যক্ত করা চলে। শ্রীকৃষ্ণের সুবল-সখার নিকট তিনি মনের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেন। সুতরাং সখ্য হইতে যে বাৎসল্য বড় এ কথা শ্রীকৃষ্ণ-সখারা স্বীকার করিতেন না—একদা সুবলকে বলিতেছেন "কি করিব ওরে সুবল, করিব আমি কি? চূড়া বাঁধি পড়া পরি বসে রয়েছি। মায়ে না বলিয়া আমি যাই যে গোঠে, মরিবে আমার মা, পড়িব সঙ্কটে। একদিন নবনীত খেয়ে ছিনু লুকাইয়া। মরিতে গেছিলেন মা, আমায় না দেখিয়া।" উত্তরে সুবল বলিতেছে, "জানি রে তোর মায়ের প্রেম—কত ভালবাসে। সায়াহ্ন নদীর তীরে দেখেছিনু পাছে। যখন আমরা যেদিন পড়েছিনু গায় সেদিন তোর মা নন্দরাণী আছিলা কোথায়?"

যে পুত্র মরিয়া যায়, সন্তান-শোকে বিধুরা মাতা অপর একটিকে ক্রোড়ে পাইয়া তাহাকে ভুলিয়া যান। কিন্তু মাধুর্য, একনিষ্ঠ প্রেম,—ইহা আনন্দের নিত্য অন্বেষণ, কৃষ্ণ কাছে থাকুন বা না থাকুন—রাধার মন সর্বদা কৃষ্ণময় "শতেক আগে দাঁড়াইতে নারি সদা ছলছল আঁখি। পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি," (চণ্ডীদাস) প্রতি পত্রমর্মরে কৃষ্ণ-পদধ্বনি, প্রতি বায়ুহিল্লোলে তাঁহার ঘ্রাণ, রাধিকার আর কোন জ্ঞান নাই। চোখে কৃষ্ণরূপের অঞ্জন, কর্ণে কৃষ্ণকথা বেদ্রব; এই প্রেম রাগানুরাগা ইন্দ্রিয় তখন অন্তর্মুখী, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে তাড়াইয়া অন্যদিকে চালাইতে চাহিলে তাহারা কাণ দেয় না। রাধিকা বলিতেছেন—"যত নিবারিয়ে তায়, নিবার না যায়, আন পথে যাই, তবু কানুপথে ধায়" —মনকে যত নিবারণ করিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি না, আমি অন্য পথে যাইতে চাই, কিন্তু পথ আমার অতর্কিতে কানুর পথেই চলিয়া যায়। "এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম, যার নাম নাহি লব, লয় তার

নাম। এ ছার নাসিকা মুঞি কত কত বন্ধ। তবু তো হারুন নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥ সে কথা না শুনিব করি অনুমান। পরসঙ্গে শুনিয়ে আপনি যায় কাণ॥ ধিক্ রহুঁ আমার ইন্দ্রিয় আদি সব সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥" কখনও কখনও রাধা সেই বিশ্বসুন্দর পরম দেবতার আদরের কথা বলিতে যাইয়া আত্মহারা হইতেছেন — "এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে। অবলা এমন কৈল করিয়াছে কবে॥ পুরুষ পরশমণি নহে কুমার। কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥" তিনি ত স্পর্শমণিতুল্য, তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই সোণা হইয়া যায়—তবে, আমার নিকট কি ধন চান যে আমার পা ধরিয়া বসিয়া থাকেন? "আমি যাই যাই যাই—বলে তিন বোল কত না চুম্বন দেয়, কত দেহি কোল॥" যাইতে চাহিয়াও যাইতে পা উঠে না। চিবুক ধরিয়া "আমি যাই, যাই, যাই" বলিয়া বারংবার সজলচোখে বিদায় গ্রহণ করেন। কত চুম্বন ও নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় লওয়ার পালার পরিসমাপ্তি। কিন্তু এত করিয়াও পালা শেষ হয় না। "পল আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া। বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥ করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে। পুন: দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥" এক পা যাইয়া আবার ফিরিয়া কত কাতরভাবে আমার মুখখানি দেখেন, এবং আমার হাতে নিজ হাত দিয়া বলেন, "আমার শপথ, আবার যেন দেখা পাই।" পুনরায় দর্শনের জন্য কত মিষ্ট কথা বলেন, কত খোসামুদি করেন। এমন স্থানের প্রসঙ্গ যেখানে হয়, সেখানেই তিনি পুলকে আত্মহারা হইয়া যান—"দাঁড়াই যার সখীগণ সঙ্গে,—পুলকে পূরয় তনু শ্যাম পরসঙ্গে।" কৃষ্ণের প্রসঙ্গে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরের সেই আনন্দ ঢাকিতে গেলে "পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার, নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥" সে কথা শুনিলেই চক্ষে পুলকাশ্রু দেখা দেয় যাহা কিছু করি, যত দূরেই যাই না কেন—তাঁহার মুখের হাসিটি মনে জাগে, তখন সর্ব্বআশার অবসান হয়। "যথা তথা যাই আমি—যত দূর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই॥"

আমরা এই রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কথা পুনরায় উত্থাপন করিব বুদ্ধদেব মানুষের সঙ্গে—সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে একমাত্র করুণার সম্বন্ধ রাখিয়া অপর সমস্ত সম্পর্ক বাদ দিয়াছিলেন

দুঃখবাদ ও আনন্দ।

তাঁহার সৃষ্টি স্বতন্ত্র, একক তিনি জীবের সঙ্গে যে পারিবারিক বন্ধন তাহা অস্বীকার করিয়া সমস্ত কামনার উর্দ্ধে আসন লইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মমতের ভিত্তি দুঃখবাদ। কিন্তু মহাপ্রভু মানুষের সমস্তগুলি সম্বন্ধ গরীয়ান্ করিয়া উহা আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধের প্রতীক স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধগুলির দ্বারা আমরা পরিবারে আবদ্ধ—ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে ভগবদারাধনার উপাদান আছে। দারা, পুত্র, পরিবার মিথ্যা নহে—ইহাদের পশ্চাৎ সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন,—যিনি বেদান্তের কথায় বলিতে গেলে "আমাদের পিতা, ধাতা ও পিতামহ।" এই সম্বন্ধগুলিকে তুচ্ছ করিলে—আনন্দস্বরূপের দ্বারে পৌঁছান সম্ভব হয় না।

সুতরাং মহাপ্রভু মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধগুলির উপর ভগবৎপ্রেমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত

পারিবারিক সম্বন্ধ।

করিয়াছেন. তিনি দেখাইয়াছেন দেবাদিদেবের প্রেমের ইঙ্গিত আমরা গৃহে পাইতেছি—বনবাসী তাহা পাইতে পারে না বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গৃহী না হইয়াও গৃহী, কারণ শাশ্বত ভাবনের শিক্ষা দিয়া তিনি তাঁহার উচ্ছিষ্ট দেবতার পূজোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই পঞ্চরস—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা। বৈষ্ণবেরা নীতিশাস্ত্র, জ্ঞান ও কর্ম মানেন না। তাঁহারা বলেন রসই সর্বপ্রধান—যাহার চিত্তে সেই অনুরাগ জন্মিয়াছে তাঁহার

নীতিশাস্ত্র

চিত্তে নীতিকথা স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানে যাঁহার প্রেম জন্মিয়াছে, তিনি নীতিবিগর্হিত কোন কর্ম করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে তাহা অসম্ভব—সুতরাং নীতিকথা নীতেকার কথা। ইহা কি কখনও কেহ মনে করিতে পারে যে চৈতন্যদেব মিথ্যা কথা বলিবেন, পরের অপকার করিবেন? বৈষ্ণবধর্মের উচ্চাঙ্গের রস-শাস্ত্রের নিকট নৈতিক ধারাপাতের বুলি আওড়ান বাতুলতামাত্র।

চৈতন্যদেব ঈশ্বরপ্রেমের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়,—"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" ঈশ্বরের সত্তা, তাঁহার প্রতি অনুরাগ-কল্পনার বস্তু নহে। এই অলৌকিক রস আস্বাদনযোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে—ইহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমে আজ বাঙ্গলা দেশ ভরপুর। বাঙ্গলার দূরদেশান্তরে নগরে ও পল্লীতে ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গের নাম কীর্তিত চাষা লাঙ্গল ফেলিয়া, কামার হাতুড়ী ছাড়িয়া, তাঁতি বস্ত্রবয়ন রাখিয়া সন্ধ্যায় মাদল লইয়া বসে, বাঙ্গলায় এমন পল্লী নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যেখানে গৌরাঙ্গের নাম কীর্তিত হয় না। সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার তিনি মালিক। তিনি খুব বড় পণ্ডিত বা তার্কিক ছিলেন, কিংবা কোন অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, চাষাদের গানে তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি তাঁহার দিগ্বিজয়ী জয় কি ষড়্ভুজদর্শন প্রভৃতির কথা একবারও তাহারা বলে নাই. তাহারা যে নিত্য সন্ধ্যায় তাঁহার জন্য ভক্তিফুলের মালার অর্ঘ্য সাজায়—তাহা সহজ সরল কথার সুরভিমাখা। "আমার গোরা জাতের বিচার মানে নারে—দেখি যদি আর সকলে।" "দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা, তারে যদি যদি মনে করি ধরতে গিয়ে আর পেলাম না। সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, কিরতেছি পাগল হয়ে - মরমে জলছে আগুন আর নিবে না, আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না।" যিনি

যাবে গানে চৈতন্যের ইতিহাস-রচনা

আমাদের অন্তরঙ্গ হইতে অন্তরঙ্গ চিরসুহৃদ, একমাত্র অবলম্বন, তাপের দিনের অবসানে যাঁহার চরণকমল পাইব বলিয়াই জীবন-ধারণ, সেই পরম আত্মীয়, তাপহর প্রিয়বন্ধুর যিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোণার মানুষটির জন্য আতীব্র ব্যাকুলতা বাঙ্গলার শত শত চাষার গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে ইহারা কত ভালবাসে এই দুইটি চরণ, যারা বাঙ্গলার ঘাটে মাঠে শোনা যায় তাহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে—"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেজন

আমার প্রাণ " শত শত গানে এই ভাবটি আছে,—"দেখ এসে এক সোণার মানুষ পণ্ডিতের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছেন " গৌরাঙ্গদেব ভাবীয় গানের যত উপহার পাইয়াছেন, বোধ হয় জগতে আর কেহ তেমন পান নাই ভাঁহার নিজের জীবনটি ছিল একটি গানেরই মত। এই বড় জগতের কোন জটিল কথা তাহাতে ছিল না। দুইটি অশ্রুময় পদ্মচক্ষু, "ঢল ঢল অঙ্গের লাবণী", কৃষ্ণপ্রেমে নির্মদেহ—এই ছিল তাঁহার সম্বল। জনম ভরিয়া এই রূপের কথা বলিয়া বঙ্গীয় জনসাধারণের তৃষ্ণা মিটে নাই। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় যে এক সহস্র গৌরাঙ্গপদ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের অতি নগণ্য অংশ। তাঁহার যে সমস্ত বড় বড় জীবন-চরিত লেখা হইয়াছে—তাহার মধ্যে চৈতন্যকে যত না পাওয়া যায়, এই সকল গানের মধ্যে তাঁহার জীবন্ত রূপ তদধিক পাওয়া যায়—সুরধুনীর তীরে তাঁহার কীর্ত্তনের যে খোল বাজিয়া উঠিয়াছিল, অদ্যাবধি সেই সুরতরঙ্গ এখানে আকাশে-বাতাসে খেলিতেছে। গৌরাঙ্গের বিশিষ্টাদ্বৈত-বৈতবাদ তাহাতে নাই, কিন্তু তিনি পথিককে কোল দিয়াছিলেন, তিনি যে সরলামৃত কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছিলেন -কত ভঙ্গীতে কত ছন্দে কত সুন্দররূপে বাঙ্গলার জনসাধারণ তাহাই পাইয়া আসিতেছে ভাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তন মনোহরসাই, গড়ানহাটি, রেনেটি প্রভৃতি সুরে—তাহের মথিয়া ঢালিয়া বাঙ্গালী-কুটিরের সর্ব্বদুঃখের জ্বালা জুড়াইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন করিয়া কোন সমগ্র জাতি জগতে গুণের পূজা করে নাই। গৌরাঙ্গ প্রকৃতই বাঙ্গালীর চোখের অঞ্জন, কণ্ঠের আভরণ, হস্তের কঙ্কণ, মুখের তাম্বূল, অঙ্গসৌষ্ঠব, গৃহের সার। তিনি ভগবানের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ 'রূপাভিসার' গাহিয়া সেই স্মৃতি এখনও উপভোগ করিতেছে নব-বিবাহিতা বধূ পিত্রালয়ে গেলে যেমন নূতন বউটি ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্বশুরালয় হইতে আগত কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে ভালবাসে সেই প্রাণের মানুষটি যে স্বর্গলোক তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন সেই স্বর্গের স্মৃতি সম্বল করিয়া বাঙ্গালীচিত্ত তেমনি মহাজন-পদাবলী বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহা শুনিতে এত ভালবাসে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কীর্ত্তনকে 'মহাজন' পদাবলী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বাঙ্গালী আর কোন ভাবীয় গানকে এইরূপ সম্মান দেখায় নাই। রামপ্রসাদের বিষয়সঙ্গীত, রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত, ফকির ও বাউলের গান এবং আগমনী গান—ইহারা সত্যসত্যই ধর্ম্মের কথা শুনাইতেছে, কিন্তু ইহার কোনটিই 'মহাজনপদ' নহে। চৈতন্যের পরিকরগণ কিংবা চৈতন্য যাঁহাদের নিকট প্রেমের প্রেরণা পাইয়াছেন এবং চৈতন্যের পরবর্ত্তী একটি নির্দ্দিষ্ট কবির দল, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—তাঁহারাই 'মহাজন', চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত একটি নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব কবির দল—'মহাজন'। রূপজীবীরাও কীর্ত্তন গাহিয়া থাকে, তাহারা রামপ্রসাদের গান,

কীর্ত্তনের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধ।

মহাজনী গান

আগমনী গান, কিংবা শাক্ত-সঙ্গীত, ব্রাহ্ম গান, কবিদের দেহতত্ত্বের গান—এ সমস্তই গাহিয়া থাকে—কিন্তু কীর্তন গাহিতে হইলে তাহাদের ভাব অন্য প্রকার হইয়া যায়, তখন তাহারা বলিবে "মহাশয়, বাসি কাপড়ে, হাত মুখ না ধুইয়া কীর্তন গান করিব কিরূপে?" অথচ এই কীর্তনের মধ্যে ইহলোকের মানবের অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় আছে। তথাপি কীর্তনগানও অপরাপর গান এক পাত্রের নহে। কীর্তনগান চৈতন্যের ছাপ মারা—মোহরাঙ্কিত। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন তাঁহার সঙ্গী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এমন অমৃতময়ী সুরটা কখনও শুনি নাই, শুধু সুরেই যে প্রাণ কাড়িয়া লইল, এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত, এই আশ্চর্য্য সুর কাহার সৃষ্টি?" সঙ্গী বলিলেন, "এই কীর্তন-সুর ঠাকুর চৈতন্যের সৃষ্টি। চৈ ৮ কথা মোট কথা শুরুচি কুরুচির কথা ছাড়িয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে কীর্তনের আসরটি দেখা উচিত। যাঁহার বৈষ্ণব ভক্তির দীক্ষা নাই, যিনি চৈতন্যের জীবনী সুস্থমনে পড়েন নাই তিনি যেন বটতলা-প্রকাশিত পুস্তকগুলি হইতে কীর্তনের পদ না পড়েন। চালি ও কাঠামো বাদ দিয়া অসুর-সিংহ-কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী ও ঊষাহরিকে শুদ্ধ এই সমস্ত আসবাব ছাড়িয়া দিয়া যদি দুর্গা ঠাকরুণকে নামাইয়া আনা যায় তবে দুর্গা প্রতিমার সে ঘটিয়াধিক রূপ আর থাকে কি? সেইরূপ যাঁহারা কীর্তন বুঝিতে চাহিবেন তাঁহারা ভাল কীর্তনিয়ার মুখে আসরে আসিয়া একবার কীর্তন শুনুন দেখিবেন খঞ্জনীর কলুষ কাটিয়া গিয়াছে, বিপ্রলম্ভের উদাস ভাব আর নাই—কলহ কবিতার গান—এ সমস্তই অনাবিল, কলাপবিদ্ধ। যে সম্ভোগ মিলন শুধু পুস্তকে পড়িলে বিদ্যাসুন্দরী চোটকের মতই শুনাইবে—আসরে তাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে একত্র বসিয়া শুনিয়া বুঝিবেন—সম্ভোগ মিলনে ভোগের লেশ নাই যে ভোগ আছে তাহা দেবভোগ অধিকাংশে বৈষ্ণবগণই চৈতন্যের চরিত্র স্মরণ করিয়া লেখা হইয়াছে, তাহা পার্থিব জোড়কে জাঁটা একখানি স্বর্গের চিঠি। কীর্তনীয়া সেই পৃথিবীর জোড়কটি ভাঙ্গিয়া যে সংবাদটি দিবেন, তাহা স্বর্গের এজন্য প্রথমেই "তৎকালোচিত গৌরচন্দ্রিকা" দিয়া গান সুরু হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি যে বিষয়ই লইয়া গান হইবে, তাহার পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের তদ্রূপ অবস্থাসূচক একটি গান গাহিয়া লেওয়া হয়—ইহাই 'গৌরচন্দ্রিকা'। যেমন ধরুন, পূর্ব্বরাগের পদ গাওয়া হইবে, তাহার পূর্ব্বে রাধামোহন ঠাকুরের গৌরাঙ্গলীলার এই পদটি গাওয়া হইল, "আজু হাম কি পেখিনু নবদ্বীপচন্দ্র। করতলে করই বয়ান অবলম্ব পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু পর পথ। ফণে ফণে ফুলবনে চলই একান্ত ছল ছল নয়নে কমল বিলাস: নব নব ভাব করত পরকাশ। পুলক মুকুল বর ভরু সব দেহ। রাধামোহন কহু না পাওল থেহ" (পদকল্পতরু, প্রথম অং, ৬৪ পদ)।

গৌরচন্দ্রিকা।

খুব জোরে মৃদঙ্গ বাজাইয়া খোল-করতালের সুরে, তাণ্ডব নৃত্যে দুর সম্ভাষণের পদগুলিকে যেন আসরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া গায়কেরা এই "গৌরচন্দ্রিকা" (গৌরবিষয়ক গান বা মুখবন্ধ) গাহিল। এই তর্জ্জনিনাদ ও

চীৎকারের মধ্যে বড় একটা পটে চৈতন্যদেবের ভুবনপূজ্য মূর্ত্তিখানি আঁকা হইল—তাহা প্রথম অনুরাগের। তিনি করতলে বদন অবলম্বন করিয়া কি ভাবে বিভোর হইয়া ধ্যান করিতেছেন? হঠাৎ উঠিয়া একবার বাহিরে একবার ঘরে যাতায়াত করিতেছেন কখনও বা ফুলবনের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল ফুলদাম দেখিয়া কাহাকে মনে পড়াতে তাঁহার পদ্মচক্ষু বারংবার সজল হইতেছে এবং কি এক আনন্দে শরীর পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—রাধামোহন তাঁহার এই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল ভাবগুলির তাৎপর্য্য ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। চৈতন্যের এই মূর্ত্তি প্রথমে পটে আঁকা হইল, তাহা শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া—রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের অবতারণা করা হইবে। এইভাবে মহাপ্রভুর লীলার ভিত্তির উপর রাধাকৃষ্ণের লীলা গড়ে করান হইল। চৈতন্যলীলার এই গানের পরেই পূর্ব্বরাগ। প্রথম গানটি হইতে চণ্ডীদাসের "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিল তিল আসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়। সই এমন কেনই না হৈল? পরশ করিয়া কোন্ ঘরে গিয়া কে বা কি দেখে পাইল। সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।" এই গান কীর্ত্তনীয়া "আখর" দিয়া আসরে ঘুরাইয়া যান শ্রোতার মনের তার যাহাতে সর্ব্বোচ্চ গ্রামে আঁটা থাকিতে পারে, সুতলের পর্দ্দে নামিয়া না পড়ে—এই জন্য কীর্ত্তনীয়া 'গৌরচন্দ্রিকা'র সঙ্গে সুর মিশাইয়া ভাবের পবিত্রতা বজায় রাখেন, "কোথা কি দেখা পাইল।" পাইয়া কোন্ দেবতা রাধিকাকে পাইয়াছে তাহার আধ্যাত্মিক সন্ধান অঙ্গুলীসঙ্কেতে প্রদান করেন। আগাগোড়া "আখর" দিয়া গায়ক কীর্ত্তন গানের মহিমা অব্যাহত রাখেন। এমন কি খঞ্জনীর মত ভাবগ্রাহী গান আমি কীর্ত্তনীয়ার মুখে শ্রোতৃগণের সঙ্গে বসিয়া শুনিয়াছি; কীর্ত্তনীয়া এমনই উচ্চগ্রামে শ্রোতার মনকে লইয়া গিয়াছেন যাহাতে কোন দোষের কথা ঘুরে থাকুক, মনোবিদ শুদ্ধ পবিত্রতায় চিত্ত ভরপুর হইয়া গিয়াছে। ভাল গায়ক না হইলে "আখর" দিতে পারে না, অনেকের কীর্ত্তনীয়া "আখর" দিতে চেষ্টা করিলে কীর্ত্তন মাটী হইয়া যায়, আসর ভাঙ্গিয়া যায়। সুকণ্ঠ বা সুগায়ক হইলেই যে কীর্ত্তন জমিবে তাহা নহে, কীর্ত্তনীয়া ভগবৎ রসের রসিক হওয়া চাই, শুধু তাহাই নহে, শ্রোতাদিগেরও আসরে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া বসিতে হইবে কিরূপে যে নিতান্ত পার্থিব বিষয়গুলি স্বর্গের উপাদানে পরিণত করা হয় তাহা কতকটা আন্দাজ। অভিসার গানে রাধিকা গোপনে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতেছেন। জনৈক ঠাকুর রাধিকাকে উপদেশ দিতেছেন—"সুখের মঞ্জীর ত্যজ কর, নীলশাড়ী পর।" যেহেতু পথে নূপুরের শব্দ হইতে পারে,—অন্য রঙ্গের শাড়ী আঁধারেও দেখা যাইতে পারে। যথাসাধ্য গোপন রাখার ব্যবস্থা,—ইহাই ত অভিসারের কথা আলঙ্কারিকেরা ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কবিরা রূপাভিসার বলিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গৌরের যাত্রা, অর্থাৎ তাঁহার সংকীর্ত্তনের অভিযান বুঝিতেন। তাঁহারা রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিতেছেন যিনি রূপেশ্বরের নিকট রূপের সন্ধানে যাইতেছেন, তাঁহার মত রূপ কাহার? তাঁহার পিঠে দোলে

হেমচাঁপা, রঙ্গিয়া পাটের খোপা", "একে সে তরুণ ইন্দু, মলয়জ বিন্দু বিন্দু তদুপরি কস্তুরি তিলক", তাঁহার গতি "অতি সুলাবনী", তিনি সখীর স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন। "কুসুমে বকুলমালা তরুবরে ভ্রমরী" রাজনন্দিনীর দ্রুত হাঁটিবার অভ্যাস নাই, "রাই যাইতে যাইতে পথে, কেলিকুঞ্জবন কতদূরে আছে?" এইভাবে রাধিকা যাইতেছেন—ইনি জয়দেবের অভিসারিকা নহেন, ইনি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক দুখ, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।" ইনি কুল শীল জাতি সমস্ত 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া তাঁহার পদে সমর্পণ করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন "যমুনিনী বন দিয়ে নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণপ্রেম কলঙ্ক-সাগরে" কানে কানে কথা বলিয়া চাপা সুরে নিন্দা প্রচার করিবার দরকার নাই বন দিয়ে নগরে—অর্থাৎ ঢাক বাজাইয়া প্রচার কর আমি নিখিলতত্ত্বরূপের পায়ে শরণ লইয়াছি—আজ আমি নির্ভয়। কবি অনন্তদাস মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন বা অভিসার যাত্রা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি সুন্দরী রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিলেন এবং লিখিলেন "কত বলবলি, বহু রাজধানি, চলইতে সুমধুর বাজে। চৌদিকে রমণী সাজে, ডম্ফ রবাব বাজে," শুধু কঙ্কণের কণু কণু বা কাঁকনের সুমধুর ধ্বনি নহে, উচ্চারণের মধ্যে মধ্যে ঠেপু জাগিয়া উঠিতেছে—ডম্ফ ও রবাবের শব্দ শুনিয়া অভিসারিকাকে দেখিবার জন্য রাজপথে ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ইহা অভিসারের নামে সংকীর্তন। চৈতন্যদেব যে এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা গানের প্রাণ, তাহা কি এখনও বলিতে হইবে? অথচ এই সকল গানের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতগুলি কবিদিগের অপরিস্ফুট কবিত্বের কারিকর হয় নাই; এই পদটিতেই আছে, রাধিকা চলিতেছেন, তাঁহার পায়ের আলতার ছোপ মাটিতে পড়িয়া তাজা রাগ রাখিয়া যাইতেছে, তাঁহার অঙ্গগন্ধে ভ্রমরেরা অন্ধের মত তাঁহার পায়ে পায়ে চলিতেছে এবং যেখানে যেখানে তাঁহার রাঙ্গাচরণচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহাই পদ্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া চুম্বন করিতেছে—"চলইতে চরণে চরণে সঙ্গে চলে মধুকর—মকরন্দ পান কি লোভে। সৌরভে উনমত, বদন চুম্বয়ে কত, যাহা যাহা পদচিহ্ন শোভে"

শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণই এই শিক্ষা, ইহা অতি কঠিন। প্রকৃতির জীবনে অক্লান্ত, চিরস্নেহে পালিত তরুণকে তপস্যার ব্রত করিতে হইবে। রাধিকা বলিতেছেন—"নিজের আঙ্গিনায় কাঁটা পুঁতিয়া—কলসী কলসী জল ঢালিয়া তাহা পিছল করিয়াছি। তদুপরি রাত্রি জাগিয়া আঙ্গুল চাপিয়া যাতায়াত করিয়াছি—যেহেতু "আমার বেতে যে হবে গো, রাই ব'লে বাজিবে বাঁশী, বঁধুর লাগি পিছল পথে" অন্ধকারে বন-জঙ্গলে ঘুরিতে হইবে এজন্য "করযুগ মুদি চলু যামিনী, তিমির পয়ান কি আশে।" তিমিরে প্রয়াণ করিবার আশায় যামিনী হাতের দ্বারা চক্ষু চাপিয়া রাখিয়া যাতায়াত করা শিখিতেছেন। আর পথে পথে হয়ত বিষাক্ত সাপ এজন্য "মণিকঙ্কণপণ, ফণিমুখবন্ধন, শিখরে ক্ষুদ্র ভেক পালে।" মণি-নির্মিত কঙ্কণপণ (পুরস্কার)স্বরূপ দিয়া 'ক্ষুদ্র ভেক' (সাপের ওঝার) নিকট ফণি-

সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

মুখবন্ধন, (সাপের মুখ কি উপায়ে বন্ধ করা যায়) তাহা শিখিয়াছি। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে গুরুজনের মন্ত্রণা শুনিতে হইবে—পরিজনেরা কাণে দিয়া উপদেশ দিবেন—তজ্জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন, "গুরুজন বচন বধির সম যানই আন শুনই কহ আন। পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ " গুরুজনের কথা শুনিলে বধির হওয়ার ভান করেন—এক কথা শুনিয়া আর কথার উত্তর দেন। পরিজনের কথা শুনিলে মুগ্ধার (পাগলের) ন্যায় হাসেন—গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী বলার অভিসারের গোবিন্দদাসের কি বর্ণনা। শব্দের ধ্বনিত ঝঙ্কার ও ভাবের গুরুত্বে তাহাদের তুলনা নাই পঙ্কিল বাট (কর্দ্দমাক্ত পথ), মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাহার উপর দুরন্ত আকাশ বাহিয়া বাদলের ধারা আসিতেছে, হে সুন্দরী, তোমার একখানি নীল শাড়ীর আঁচল দিয়া কি এই দুর্যোগ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? আবার পরক্ষণেই বিদ্যুৎ যেরূপ এক মুহূর্ত্ত চমক দিয়া বস্তাবাসীকে স্বর্গ দেখাইয়া যায়, সেইরূপ একটি মাত্র পূর্ণ সঙ্কেতে কবি আধ্যাত্মিক রাজ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন "কাহুক যানব সুরধুনী পার। সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার?" কি ভাবে এই দুর্যোগে অভিসারে যাইবে, হরি যদি সুরধুনীর অপর পারে—ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে। এই যে সোন্দর্য্য, এই যে দুস্তর অন্তরায়ের কথা এ সমস্তেরই প্রেরণা দিয়াছিলেন চৈতন্যদেব তাঁহার জীবনের অলৌকিক প্রেমের লীলা, অন্তর একটি সুরধুনীর ন্যায়, কিন্তু সে বেদনাশ্রী স্রোত দুস্তর অন্তরায় নৈরাশ্যের করিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার জীবনের কৃষ্ণ চাকা পড়িয়াছিল, তাঁহার দুইটি বিকশিত—শতদল-প্রভ সজল চক্ষুর অন্তরালে, লোকে তাহাই দেখিয়া ভুলিয়াছে। কিন্তু শতদলের নীচে ভুজঙ্গশয্যা-পঙ্কের ভিত, তাহা কে দেখিয়াছে? কত উপবাস, কত অনিদ্রা, কত দূরে ভ্রমণ, কত বিলাপ—সেগুলি তাঁহার জীবনে রসের উৎস ও প্রফুল্লতার হানি করিতে পারে নাই।

প্রেমের সাগর-সঙ্গম।

এই পদাবলী ও কীর্ত্তন-সাহিত্য একটি খরস্রোতা নদীর ন্যায় ছুটিয়াছে। ইহার দুইকূলে কত উপবন, কত লোকালয়, কত মধুর প্রাকৃতিক দৃশ্য,—কিন্তু ইহা যেখানে যাইয়া পড়িয়াছে—সেখানে আর কলরব নাই, তরঙ্গের তান নাই—সে নিস্তব্ধ প্রশান্ত চিরবহতর মহাসমুদ্র। ইহার প্রত্যেক তরঙ্গ সেই আধ্যাত্মিক অভিসারের ইঙ্গিত দিয়া ছুটিয়াছে—ইহাতে যদি কিছু মলিনতা থাকে, তাহা ইহার চির-অমল প্রেমের উৎসের মূলদেশে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার ঠিকানা নাই। বিদ্যাপতির রাধা বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি তোমাকে ভিন্ন আমি মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি না। কত উপমায় কত সুন্দর সুন্দর কথায় এই আত্মসমর্পণের কথা বলিয়া শেষে কবি বলিয়াছেন "মাধব তুহু কেছে কহবি মোয়"—আমি সর্ব্বস্ব দিয়াছি সত্য, কিন্তু কাহাকে দিয়াছি তাহা জানি না। তুমি কেমন তাহা আমাকে বল। সাধনার এই দুস্তর অন্তরায় পর একি প্রশ্ন? ব্রহ্মের স্বরূপ-জিজ্ঞাসা। বিদ্যাপতির ভাব-সম্মেলনের পরে কৃষ্ণ আর দেহী নহেন, তিনি চিন্ময়, রাধিকা তাঁহাকে

মঙ্গলাচরণ করিয়া আসিতেছেন। সেই মঙ্গল-উপচারের সমস্ত মনের বাহিরের উপকরণ তাহাতে কিছুই নাই।

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে,
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে,
বেদী করব হাম আপন অঙ্গনে,
ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে,
আলিপন দেওব মোতিম-হার
মঙ্গল-কলস করব কুচভার।"

যখন তিনি আসিবেন, তখন আমার দেহ দিয়াই সমস্ত মঙ্গল-আচরণ করিব। আমার অঙ্গই বেদী হইবে এবং আমার সুদীর্ঘ কুন্তলের দ্বারা ঝাঁটা তৈরী করিয়া তাহা পরিষ্কার করিব। আমার বক্ষের মণিমালা আলিপনার কার্য্য করিবে এবং আমার পীনবক্ষ মঙ্গল-কলসী স্বরূপ হইবে।

মনুষ্যদেহের ভগবৎদান। ইহাই এই পদের অর্থ সুতরাং চৈতন্যের জীবন-কথাই এই পদাবলীর অর্থ হইয়াছে এবং তাঁহার প্রসাদে সমস্ত বাঙ্গলার জনসাধারণ এই পদাবলীর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার যোগ্য হইয়াছে।

এখন আমরা তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইব। ৮১০ বৎসর হইল গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যেন বঙ্গীয় নিকুঞ্জবনের শত শত কোকিলকণ্ঠ থামিয়া গিয়াছে। তাঁহার গোষ্ঠ ও মাথুর যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তখন ও নীরদকে স্মরণ করাইত; তাঁহার ব্যাখ্যার কাছে ভাগবতের ঈশ্বর স্বামীর ভাষ্য মান হইত। এই অর্দ্ধশিক্ষিত লোকটির ভিতরে দেবী ভারতী যে প্রেরণা দিয়াছিলেন, তাহাতে গৌরীদাসের কণ্ঠে যেন বেণীর বীণাই বাজিতে থাকিত। পৃথিবীতে থাকিয়া তিনি স্বর্গের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, কোন ধর্ম্ম-মন্দির বা বেদী হইতে সেরূপ সংবাদ আমরা শুনি নাই। আজ গৌরীদাস নাই, তাঁহার অপ্রাকৃত আসর-বিজয়ী রসিক নাই, আজ সিবুও পরলোকগত, এখন গলেশ সাঁকের বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু উক্ত কীর্ত্তনীয়াদের কলস্রাবী ভক্তিরসের আসর যদিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি নূতনভাবে ভাবিত, নবরসে রসিক যদুনাথ ও অপর্ণা দেবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য যে আসর বাঁধিতেছেন তাহা কালে দুর্জ্জয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

পদাবলীর অলঙ্কারসম্বন্ধে যাঁহারা বিতর্ক করেন, তাঁহারা গঙ্গায় একগ্লাস গোলা জল দেখিয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বিশ্বপ্লাবিত প্রবাহের শুভ্রতা ও পবিত্রতা অনুমান করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] ২৫০ বৎসরের পাঠ [illegible]
[illegible] পৃঃ।

[illegible], সম্প্রতি শতাব্দীর ২৪শ পরগণার
চিত্র হইতে ৭০২ পৃঃ।

শুভাম্বর—সম্প্রতি শতাব্দীর চিত্রিত চিত্র
হতে (২৪শ পরগণা) ৭০৩ পৃঃ।

উদ্ধৃত অংশ—২৪ শত
বৎসর পূর্বের ও [illegible]
মূর্তি হইতে সংগৃহীত
৭০৩ পৃঃ

ইত্যাদি, ২৪০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র
হইতে ৭০২ পৃঃ।

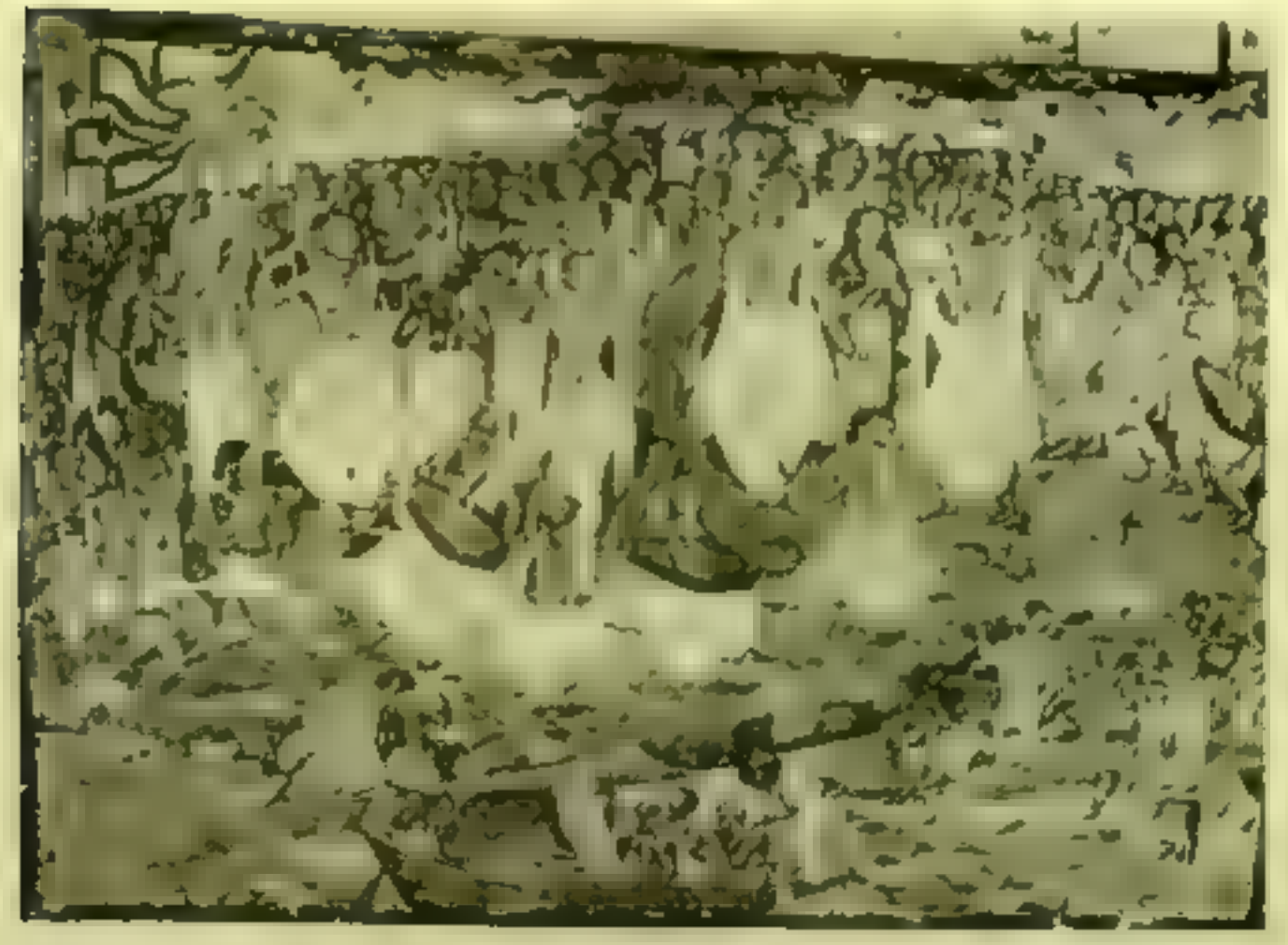

বৈষ্ণব-পদাবলীর। ইহার [illegible] পৃ. [illegible] দেখুন

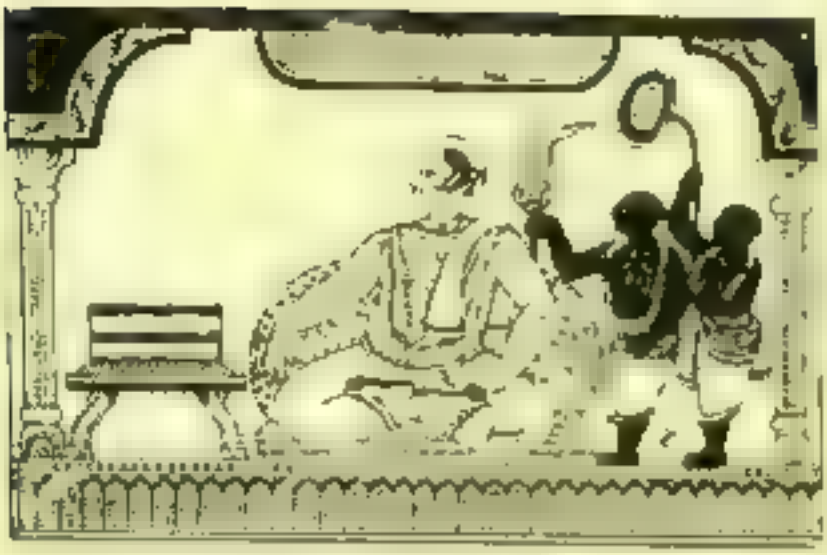

[illegible]

[illegible]

প্রথম আঘাত—নলপুরণ [illegible] চীন চিত্র প্রতিচ্ছবি।

[illegible] ধনধিপুরের রথযাত্রা মন্দির গাত্রে পোড়া ইটের উপর অঙ্কিত চিত্র। (১৭৩ পৃঃ) ৭৪৭-৪৯ পৃঃ।

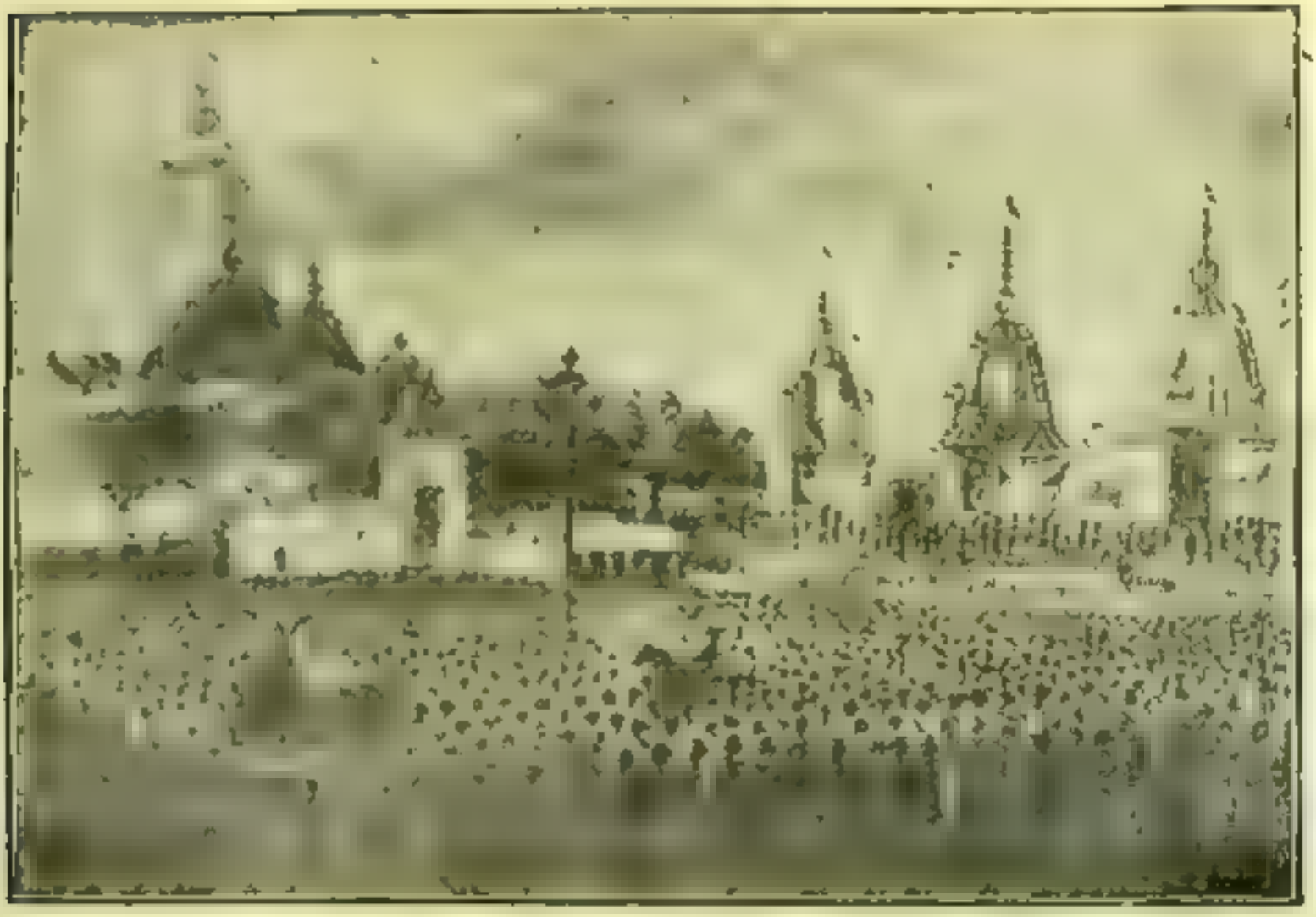

[illegible]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে "নবদ্বীপে পুনরায় ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন," এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে নবদ্বীপের প্রভাব বহু চলনায় সুদক্ষ ছিল এই প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া তিনি নবদ্বীপ ধ্বংস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন নবদ্বীপের অধিবাসীরা সকলে পলায়ন করিয়া মুসলমানেরা নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, কাজী তাঁহাকে স্বস্থ হইতে প্রদান করেন। কাজীর মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তখন রাজকর্ম্মচারীরা সম্পূর্ণ ও সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ছিলেন, আর তাঁহাকে তখন নবদ্বীপের অধিবাসী সমস্ত কার্যকারী ছিল, সিংহাসন পরিবর্ত্তন যেমন প্রাকৃতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের নাম ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়াছিল সেই জন্য বিজয়োন্মাদে হুসেন সাহ তাঁহার সমর পরিচালকগণের অনুরোধে এই অত্যাচার শেষে থামাইয়া দিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, টুলো বামুন পণ্ডিতেরা নিতান্ত নির্বীহ, উহাদিগকে নিপীড়ন করা ভাল নহে চৈতন্যমঙ্গল লিখিত আছে হুসেন সাহ অনুচর হইয়া নবদ্বীপের ভগ্ন দেবালয়গুলির পুনঃসংস্কারের আদেশ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন এই শুভ সংবাদে নবদ্বীপবাসী বহু ব্রাহ্মণ আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যখন দেশের অবস্থা এইরূপ তখন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচার যাজপুর হইতে পলাইয়া শ্রীহট্টে বাস করেন কপিলেন্দ্রদেবের উপাধি ছিল "ভ্রমরবর, মধুকর মিশ্রের পিতার নাম বিশ্বরূপ মিশ্র—ইঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাৎস্যায়নগোত্রীয়

বংশাবলী।

মধুকরের ৩ পুত্র —উপেন্দ্র, বজ্রদানোপ, কংসারিনাথ, কুসুমবাস উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র নাম কমলাকর, উহাদের ৭ পুত্র -কংসারি পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ জগন্নাথ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন।

যখন জগন্নাথ মিশ্র শিশুবয়স্ক, তখন শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ ও ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল জগন্নাথ নবদ্বীপে বিদ্যাসমাপ্তির জন্য অধিবাসিছিলেন, সেইখানেই রহিয়া গেলেন, আর ঢাকা-দক্ষিণেই এই পরিবার বংশপরম্পরায় বাস করিয়াছেন। শ্রীহট্টের আর একটি পল্লীও এইরূপ দাবী উত্থাপন করিয়াছেন—কিন্তু তাহা গায়ে বলিয়া মনে হয় না যাঁহারা শ্রীহট্ট হইতে এই বিপৎকালে নবদ্বীপে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী (অপর একজন বৈদিক) ছিলেন তিনি নবদ্বীপের বেলপুকুরিয়া গ্রামে বাসস্থাপন করেন

জগন্নাথ মিশ্র বল্লাল রাজার বাড়ীর নিকট বাস করিয়াছিলেন—ইহা তখন নবদ্বীপের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল এবং এই স্থানটি সম্ভবতঃ নগরের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল "মেকাপুর," কারণ অনেক মুসলমান এখানে বসে করিয়াছিলেন মহাপ্রভুর জন্মস্থানটিকে মুসলমানী নামে অভিহিত করাতে ভক্তচরিতকারেরা স্বভাবতই ঘৃণাবোধ করিতেন সুতরাং বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি আদি লেখকেরা পল্লীর নাম উল্লেখ না করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান শুধু নবদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী লেখকেরা সম্ভবতঃ জগন্নাথকর রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। "মেকাপুর" শব্দটি হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া উহাকে "মায়াপুর" নাম দিয়াছেন কিন্তু প্রাচীন মুসলমানদের দলিলপত্রে এবং চলিতকথায় মিকাপুর বা মেকাপুর নাম এখনও প্রচলিত দেখা যায় প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব হইতে হিন্দুরা উহাকে মায়াপুর নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন নবদ্বীপে কিন্তু মায়াপুর নাই যেখানে বহু শতাব্দীর পূর্ব হইতে রামচন্দ্রের পূজা হইত এবং রামের রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইত সেখানে বঙ্গদেশের কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি রামচন্দ্রের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন ইহা ঠিক করিয়াছিলেন, যেহেতু ঐ স্থানটি রামের লীলায় একটি প্রাচীন তীর্থ ছিল সেই মন্দির এখন নদীগর্ভে কিন্তু সেই রামচন্দ্রের মন্দির কখনই চৈতন্যজন্মস্থান হইতে পারে না, এবং সে স্থানের নামও মায়াপুর নহে জোর করিয়া কেহ কেহ নিমাই, উহার নাম মায়াপুর দিয়াছেন

জগন্নাথ মিশ্র সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁহার হাতের লেখা একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব এখনও শান্তিপুর ৺ মহামহোপাধ্যায় অচ্যুত চরণের বাড়ীতে আছে, উহা ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের লেখা একটি বর্ণাশুদ্ধি নাই, হাতের অক্ষর মুক্তার হার এই মহাভারতের পুঁথিখানি অতিযত্নে রাখা উচিত। আমি উহা দেখিয়াছি এই পুঁথি লেখার ১৫ বৎসর পরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্রকে উহার পরে পড়াশুনা অর্থাগমের জন্য যজমানচণ্ডী প্রভৃতি দেবপূজার পৌরোহিত্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, "তুমি পণ্ডিত অথচ তোমার চিরদারিদ্র্য।" এই অনুযোগ দেওয়াতে জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ আকাশের পাখীগুলি, উহাদিগকে কে খাইতে দেয়? আমরা সত্যপথে থাকিব, তুচ্ছ অর্থের জন্য অনুচিত আগ্রহ আমার নাই।" (চৈতন্য-ভাগবত)

জগন্নাথ মিশ্রের আটটি মেয়ে হইয়াছিল, তাহারা আঁতুড়ে অথবা অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তৎপরে বিশ্বরূপ নামক পুত্র জন্মে এবং বিশ্বরূপ জন্মিবার ১১ বৎসর পরে একদিন অতিপ্রাতে শকাব্দা (১৪০৭ শকে, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) যখন সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে পূর্ণচন্দ্র সবেমাত্র মুক্ত হইয়া আকাশে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছেন, সেই শুভক্ষণে সমস্ত নবদ্বীপবাসী গঙ্গাস্নানান্তে "হরিবোল" শব্দে আকাশ মুখরিত করিতেছিলেন—ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব মায়াপুরে একটি নিমগাছের নীচে

আঁতুড়ঘরে ভূমিষ্ঠ হইলেন, এ জন্য চৈতন্যকে নিমাই নাম দেওয়া হইয়াছে, পূর্ণচন্দ্র হইতেও তিনি সুন্দর, এজন্য লোকে তাঁহাকে নবদ্বীপচন্দ্র নাম দিতেও ত্রুটি করে নাই, কবি গাহিয়াছেন—"চাঁদে যে কলঙ্ক আছে ছি ছি তবু কি গোরাচাঁদের কাছে!"

বিশ্বরূপ ও নিমাই উভয়েই বড় সুদর্শন ছিলেন বিশেষ নিমাই, যাঁহার রূপের কথা লিখিতে গাইয়া কত লেখক কবি হইয়া গিয়াছেন বিশ্বরূপ যখন বোড়শবর্ষবয়স্ক এবং নিমাই সবে পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি অদ্বৈতের কাছে পড়িতে যাইতেন এবং আহারের সময় হইলে কখনও তাঁহাকে ডাকিয়া আনিত দুইটি ভাই হাত ধরাধরি করিয়া বাড়ী ফিরিতেন নিমাইয়ের মুখখানি কমলফুলের ন্যায়, তাহাতে বিন্দু বিন্দু কালি, কারণ তিনি বিশ্বরূপের দোয়াত ও কলম লইয়া লাটাপাটি করিয়াছেন সেই কালির বিন্দুতে তাঁহার মুখ ভ্রমরবেষ্টিত পাতলের মত চলচল করিত, পায়ে নূপুর বাজিত কত মধুর কথা বলিতে বলিতে দুইটি ভাই শচীদেবীর কাছে আসিতেন বিশ্বরূপের বিবাহ স্থির হইল তখন তাঁহার ১৩ বর্ষ বয়স—কিন্তু বিশ্বরূপ বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন না, অথচ যদি প্রতিবাদ করেন তবে "জননী দুঃখ পাবে বিশ্বাস।" এ দিকে মহাসমারোহে পুরনারীরা শুভ বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন এক প্রভাতে বিশ্বরূপ জ্বালাময় সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সাতারিয়া গঙ্গা পার হইলেন কোথায় গেলেন কে জানে? সে কথা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে—এইটুকু জানা গিয়াছিল যে কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তখন কেশী "অদ্বৈতবংশ পুরী" নাম লইয়া বনবাসী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন শচীদেবীর অভিযোগ "অদ্বৈত আচার্যই তাঁহার পুত্রকে সন্ন্যাস বুদ্ধি দিয়েছিলেন" ইহার পরে যখন নিমাই বড় হইয়া অদ্বৈতের নিকট যাতায়াত করিতেন শচীদেবীর তাহা ভাল লাগিত না, তিনি একদিন বলিয়াছিলেন "কে বলে এই বুড়ার নাম অদ্বৈত. ইনি একটি দ্বৈতা আমার চাঁদের মত ছেলেটীকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কালিকা-প্রসাদের মত এই শিশুটির কাছে আবার কি মন্ত্রণা দিতেছেন, কে জানে?" শচীদেবী অদ্বৈতকে দ্বৈতা নামেই অভিহিত করিতেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর ভগ্নহৃদয় দ্বিশ পঞ্চবর্ষ বয়স্ক নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন কারণ "এই যদি সন্ন্যাসধর্ম্ম একবেক ত্যাগ ছাড়িয়া সংসারসুখ করিবে প্রকাশ। অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাই।"

কিন্তু ছেলেটি বড় মোহময় আরম্ভ করিল তাহার পায় নূপুর পরনে নীল ধুতি মাথায় চুল বেণী করিয়া বাঁধা, তাহাতে সোনার চাঁপা কটীতে কিঙ্কিণী মূর্ত্তি অতি সুন্দর, কিন্তু কাজগুলি আদৌ সেরূপ সুন্দর নহে সন্ধ্যাকালে বালক কোন দেবমন্দিরে ঢুকিয়া শিবের নিকটবর্ত্তী আরতির পঞ্চপ্রদীপ নিভাইয়া আসিত, কখনও কোনও ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে চক্ষু বুজিয়া গীতাখানি সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করিতেছেন নিমাই গীতাটি লইয়া ছুটিয়া পলাইত, কোন ব্রাহ্মণ স্নানার্থে গঙ্গায়

চরকলনা

দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার উত্তরীয় ও কেশপাশ চুর্ণ কুন্তল, কখনও জলে ডুবিয়া কাহারও একটা পা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত, কখনও কোন বালকের কাণে জল প্রবেশ করাইয়া তাহার বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিত, কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার ধাঁচি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বিরহ কাতরা করিত (তখন বালকের বয়স পঞ্চবর্ষমাত্র), অপেক্ষাকৃত কম দুরন্তদের কাহার সহিত গঙ্গার মধ্যের পাকের পিছনে ছোটা কিংবা কোন বালকের উপর চড়িয়া কিল হইয়া নাচা। কেহ কাহারও কলাপাতা ঢাকনা নিমাই গায়ে ক্ষত করিয়া দিয়া দূর পলাইতেছে আর পাছে সেই কলহ চুর্ণ করিতে পলায়ন। এই সকল উৎপাতে নবদ্বীপের লোকমাত্রকে অস্থির করিত। তাহাকে বাহিরের বাঙ্গল সকলেরা জগন্নাথ মিশ্রকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তাহা হইয়া কাহারও ঘরে বড়ের পরে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে পুনরায় টোলে ছুটি করিয়া দিলেন।

নিমাই বিদ্যাবাস, সুদর্শন এবং গঙ্গাদাস—এই তিনজন পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গাদাস খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। যে আগ্রহে তিনি বালকোচিত ছলচাতুরী করিতেন সেই আগ্রহ পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন।

অধ্যয়ন।

তিনি সহাধ্যায়ীদের একজনকে প্রতিপক্ষ করিয়া বিচার করিতেন এবং তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার পুরুষকার মতের পক্ষে বিচার করিতে নিযুক্ত করিতেন, এবং ইহার ফল হইত 'বিদ্যাবেশে' বালক নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের পদ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সহিত বিচারে করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। মুরারি গুপ্তের মত প্রাচীন পণ্ডিতকে 'মুরারি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে একদিন আসিয়া বলিয়াছিলেন, "পড়ু কত সৈন্য তুমি ইহা কর পড়। লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগ দূর কর।" তাঁহার এরূপ বড় ব্যবহারে পণ্ডিতের মনে মনে খুব চটিয়া থাকিতেন, তথাপি তাঁহার রূপ সুদর্শন মূর্তি ও অলৌকিক পাণ্ডিত্যের জন্য কিছু সকলে ক্রুদ্ধ না হইয়া পারিত না। কেহ তাঁহাকে তখনও বিন্দুমাত্র কম হয় নাই অবকাশ পাইলেই যার তার উপর দৌরাত্ম্য করিতেন। শিষ্যদের সকলের আগে লইয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষেপাইতেন, তাহারা সহ্যের চটিয়া যাইত, এবং বলিত "তুমি কত দিনের নদেবাসী হে? তোমার বিদ্যাবাগীশ সকলের অন্তর্ধানেই ত নিমাই এ কথাটি কি ভুলিয়াছ?" শিষ্যকে সেই ভয় করিত যার, তিনি এরূপ মার্জ্জ ভাষা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেন যে তাহা দেখিয়া কেহ কেহ লগুড় লইয়া তাঁহাকে মারিতে যাইত, কেহ বা আদির আদ্যে নালিশ পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইত।

গঙ্গাদাসের মোট লক্ষ বড় সুন্দর ছিল, তিনি গঙ্গার ঘাটে যাইতেন, নিমাই তাঁহাকে দেখিতেন এবং কিছুক্ষণ তাঁহাকে ভক্তি ভরিয়া মেহভরা দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিতেন।

বিবাহ ও অধ্যাপনা।

একদিন নিমাই সন্ধ্যার পরে গঙ্গাদাসকে বিবাহের প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গগত, এবং নিমাই গঙ্গাতীরে মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করিতেছিলেন। বন্ধুর আনন্দের সহিত

প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন নিমাই বলিলেন ঘটকের হাতে শচীদেবীর নিকট পাঠাইলেন, শচীদেবী ছেলে আপত্তি করিলেন "এতটুকু ছেলে লেখাপড়া করিতেছে এখনই বিবাহের কথা কেন?" এই কথা শুনিয়া ঘটক মহাশয় ফিরিয়া যাইতেছিলেন—পরে তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া নিমাই সঙ্গে যাইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ মহাশয় ঘটক মহাশয় এত দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া বলিলেন "ছেলেকে এরূপ কথা ভাল হয় নাই" তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সম্মতি দিলেন সন্তুষ্ট হন তাহাই কর" যে ছা একেন শচীদেবী বুঝিলেন তাঁহার পুত্রই এই ঘটককে নিযুক্ত করিয়াছিল তবে তখনই তিনি বিবাহে সম্মতি দান করিলেন এই বিবাহ বর ও কন্যার পরস্পরের মনোনয়নে দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল যখন নিমাই পুরন্দরকে বিবাহ করিতে চলিলেন তখন তিনি তাঁহার সেজো ও পাদুকা পরিচ্ছদস্বরূপ লক্ষ্মীকে দিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মী আর তিনি দুজনে ছিলেন তিনি স্বয়ং তাঁহার স্বামীর মূর্তি এঁকিয়াছিলেন যখন সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয় তখন সেই ছবি ও পাদুকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধ্বী মৃত্যুর জন্য তুলসী দিয়াছিলেন

এদিকে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত নবদ্বীপের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র সংখ্যা ছিল "অসংখ্য অসংখ্য" ছিল ব্যাকরণের একখানি টীকা করিয়াছিলেন উহা পুরন্দরের টোলসমূহে অধীত হইত, এই টীকার নামও ছিল "নিমাইকৃত টিপ্পনী" ক্রমে তাঁহার অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ হইয়াছিল তিনি পুরন্দর ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিতদিগের হিসাবে বহু অর্থ লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন, গয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে সুখের বহু ধন নিশ্চিত হইয়াছিল সেখানে এই নিরাভিমানী লোকে বৈষ্ণব পরিবার আর সুখে কিন্তু বাস করিতেছিলেন। শচীদেবী নিত্য স্নান পরমান্ন, পিষ্টক, মোহনভোগ করিয়া ভোজন করিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিতেন শচীদেবীর মূর্তি শান্ত ছিল কিন্তু তিনি অতি খর্বাকৃতি ছিলেন "শান্ত মূর্তি শচীদেবী অতি ক্ষুদ্রকায়" (গোবিন্দদাসের করচা)।

এই সময় কেশব কাশ্মীরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর্যাবর্তের বহু স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীকে জয় করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা ভাবিলেন, "এই দুষ্ট ছেলেটা কখনই দুষ্ট লোক বাহিরে তর্ক করিবার উপযুক্ত নহে। প্রবাসের টীকা ধরিয়া টানিতে হবে অন্যথা যদি ইহার উপরই দিগ্বিজয়ীকে বলিয়া দেওয়া যাক" সুতরাং তাঁহারা বলিলেন, গঙ্গাতীরে অতি অল্পবয়স্ক একটি মহাপণ্ডিত আছেন, আপনি তাঁহার সহিত বিচার করুন বৈষ্ণব ভাগবতের সারমর্ম্মে এই বিচারের কথা বর্ণিত আছে গোপকন্যা ভাবিয়া গেলেন সেদিন "নবদ্বীপের মধ্য রক্ষা হইল" এই বলিয়া সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া এক সভা করিলেন এবং নিমাইকে বলিলেন "সার্বভৌম" সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের পুরো নাম হইল "বিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর সার্বভৌম"

নম্র করাই ছিল নিমাইয়ের রীতি ও স্বভাব, যৌবনের প্রারম্ভেও এই ভাব হ্রাস পায় নাই। কেবল বাগ্বাদীর সঙ্গে তিনি একটি বিষয়ে সতর্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন বৈশোরে

পরাস্ত করিয়াই শ্লোকদিগের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতেন "সবে মাত্র পরস্ত্রী প্রতি আছি উদাস স্ত্রী দেখি তাহে হন এক পাশ" ঈশ্বর পুরীর বাড়ী ছিল হালিসহর, তিনি সরল সন্ন্যাসী, ভক্তিপন্থী সুপণ্ডিত, মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিতেন তাঁহাকে দেখিবার নবদ্বীপের লোকের ভিড় হইত নিমাই ঈশ্বর সমীপে পরম পণ্ডিত গদাধরকে চিরকালই ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক ছিল, তিনি ঈশ্বর পুরীর বড় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন অপর কেহ কোন বিষয়ে ত্রুটির নাম করিয়াছে শুনিলে নিমাইয়ের ছিপ্পে হইত ঈশ্বর পুরী কেন গদাধরকে ভালবাসেন, এজন্য নিমাই মাঝে মাঝে তাঁহার আশ্রমে যাইয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন ঈশ্বর পুরী এই সুলক্ষণ বালকটীকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন এবং স্বপ্রণীত ধর্ম্মপুস্তক হইতে শ্লোক তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন কিন্তু একদিন যখন পুরী গোঁসাই শ্লোকের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন নিমাই বলিয়া বসিলেন "এ ধাতু আত্মনেপদী নহে" ঈশ্বর পুরীর ধর্ম্মের আসন ছুড়াইয়া গেল, এ বালককে রাগ আনা তাঁহার কর্ম্ম নহে তিনি বুঝিতে পারিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণের পর যখন নিমাই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, তখনই তাঁহার ভাবান্তর হইল পথে গঙ্গাদাস টোলের পণ্ডিত প্রভৃতি সহচরের সঙ্গে দেখা, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা নকল করিয়া নিমাই হাস্যরসে কথা বলিতে লাগিলেন কিন্তু সহচরেরা সেই রসের সায় দিলেন না, মাতা করিয়া ফেলিলেন নিমাই বুঝিলেন, লক্ষ্মী নাই, যে লক্ষ্মীকে তিনি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি গুরুলোক ও সঙ্গে এবং বৈকুণ্ঠের সঙ্গিনী নবযৌবনের নব অনুরাগ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জাগিয়াছিল সেই লক্ষ্মীর অভাবে তাঁহার যে ভাবান্তর হইল তাহা পরবর্ত্তী জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বলা যায় না এদিকে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য নবদ্বীপের ধনশালী রাজমন্ত্রী পণ্ডিত সনাতন মিশ্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বড় পুরুষ টহা না জানিয়াই বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন বিবাহের দিন নিমাই শুনিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে তিনি বিরক্ত হইলেন, বিবাহ করিলেন না বলিলেন অগত্যা শচী অথচ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু চৈতন্য বুঝিলেন এরূপ করিলে তাঁহার মায়ের মুখখানি ছোট হইয়া যায় সনাতন মিশ্র অনেক আয়োজন করিয়াছেন তাহা নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অনিচ্ছাক্রমে শেষে স্বীকৃত হইলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল ইহার পর নিমাই পিতৃপিণ্ড দান করিতে গয়ায় যাত্রা করিলেন পথে কুমারহট্টে তিনি ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর পুরীকে দেখিতে ছুটিলেন, আজ তাহার চক্ষু ছল ছল আজ ঈশ্বর পুরীকে তাঁহার এত ভাল লাগিল কেন? সাধুকে হঠাৎ চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল, মনে হইল ঈশ্বর পুরীর দেবচরিত্র, তাঁহার মত অন্তরঙ্গ তাহার কেহ নাই। ঈশ্বর পুরী বলিলেন, "তুমি গয়ায় যাও, আমিও সেখানে যাব — তথায় আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।" ঈশ্বর পুরীকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার আজ বড় কষ্ট হইল কুমারহট্টের কতকগুলি ধূলি

তিনি কৌতুকে পুঁটে বন্ধিত করিলেন এবং বলিলেন, "ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান, এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ," উন্মত্তের মত সকলের সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন, এবং কুমারহট্টকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া "প্রভু কহে কুমারহট্টের নমস্কার শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার"

সন্ধ্যা হইলে সে নিমাই আর নাই। সে বক্তৃতা, সে তর্কযুক্তি, সে নিমাই কিছুই নাই। নিমাই 'ঈশ্বর' অর্থাৎ পণ্ডিত নিমাইয়ের জীবনে চাঞ্চল্যপূর্ণ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তিনি কেন কাঁদিতেছেন, কেন সজল চক্ষে উর্দ্ধে তাকাইয়া আছেন, কেন মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন তাঁহার বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই, আহার জন্য বাস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর পিণ্ড দেওয়ার পালা। শ্রীপাদপদ্ম ও অন্যান্য নিমাইর আত্মীয়, পাদপদ্মের চরণ পাহাড় সমান, উচ্চ ফুলরাশি পড়িতেছে। কত বস্ত্র অলঙ্কার, চারিদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কত নরনারী পাগলের মত আবৃত্তি করিতেছে সন্ন্যাসের চূড়ান্ত হয়, তোমরা এই পাদপদ্ম

পাদপদ্ম

দেখ যোগী ঋষি মহাত্মা এই পাদপদ্ম ধ্যান করেন এই পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়াছেন, ইহা যোগেশ্বর শিব ধ্যান করেন, চিন্তাপ্রপন্ন মানুষ—তাহাদের আর শান্তি নাই, এই পাদপদ্ম আশ্রয় কর" নিমাই কি শুনিলেন, কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন তিনিই জানেন, পাদপদ্মের উদ্দেশে তাঁহার পদাঘাতে সে ধারা ছুটিল, তাহার শেষ নাই, বিরাম নাই সেই রক্তপদ্মের মতো তাঁহার মুখখানা অশ্রুগঙ্গার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—পাগলের মতো ছুটিতে ছুটিতে সেই পাদপদ্মের কাছে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া কোনোরকমে বাসায় লইয়া আসিল—তখন ঈশ্বর পুরী অন্তর্হিত হইয়াছেন, নিমাইয়ের জ্ঞান নাই, কেবল অশ্রু, উঠে তাকে ইহা কি দেখেন, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন কোনও প্রকারে তাঁহাকে সহচরেরা বাড়ী ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু পথে পথে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার বাড়ী নাই, আমার বাড়ী বৃন্দাবন তোমরা আমাকে দাও, আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে বৃন্দাবন চলিলাম" কতকটা বলপূর্বকই সঙ্গীরা তাঁহাকে বাড়ীতে আনিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর কাহারও সঙ্গে কথা নাই, চুপটি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন আর কাঁদিতে থাকেন প্রিয় সঙ্গীরা আসিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আমি

পূর্ব্বরাগ।

গয়ায় কি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমায় বলিব," কিন্তু বলিতে যাইয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষু ও গদগদকণ্ঠ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন কি দেখিয়াছেন আর বলা হইল না শচী দেবীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়, প্রতিবেশিনীরা বলিলেন—"পাগল হইয়াছে, এর আর কথা কি? চিকিৎসা করাও" ভিষক্ শিরোমণিদের ব্যবস্থা করিয়া গেল? কোথায় গেল সেই কৃষ্ণকেলী সৌখীন ধুতি, সেই চন্দন, অগুরু গন্ধদ্রব্য, সেই সখের পুষ্পমালা। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইয়া আনিয়া শচীদেবী পুত্রের নিকট বসাইয়া রাখেন। কিন্তু পদুইপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ, দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন"

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে যে ৮ জন ভক্তের সঙ্গে মহাপ্রভু নিত্য কীর্তন করিতেন তাহার মধ্যে শ্রীবাস, রামাই, সুনন্দ, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, গোপীনাথ, সদাশিব ও পুরন্দর পণ্ডিত। ইহাদের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত ও রামাই সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। অন্য ৬ জনের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে কীর্তন হইত বলিয়া তাহার বাড়ীর নাম হইয়াছিল কীর্তনীয়া বাড়ী। শ্রীবাস পণ্ডিত বলিতেন "আমার বাড়ী নিমাই কীর্তন করে, আমি করি ভাগবত পাঠ। আমার কি হইয়াছে? যে বলিল আমি কেমন করে তাহার কথা শুনিব।" অতএব তাহার প্রথমে অসাধু কথা" সকলেই এ সম্বন্ধে একমত হইলেন। এই সময় একটি দাসী দুটি। আসিয়া শ্রীবাসকে বলিল তাহার কর্তা তাহাকে বিদায় দিয়াছেন, আর ঠাকুরাণী যেমন আছে তেমন থাকিবে। শ্রীবাস চুপ করিয়া রহিলেন, দুটি দাসী বলিলেন "ঠাকুরাণী আমরা দুজন একটা উপায় করিব। আমরা কি করিব? নিমাই যে আমাদের সর্ব্বস্ব আমরা সর্ব্বস্ব দাইবার আর।" যখন নিমাই ছিলেন, তখন শ্রীবাসকে এই সব কথাই বলিতেন। শ্রীবাস তাহা মনে মনে বলিলেন। তারপর প্রায় ৫টি বৎসর শ্রীবাস পণ্ডিত চুপচাপ ছিলেন। তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। তিনি দাসীদ্বয়কে বলিলেন, "মা তোমরা কিছু পাবার চেষ্টা করিও না। কেহ, কখন, প্রত্যাশাদের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন আমাদের ভাগ্যে তাহাই একদিন এমনভাবে আসিয়াছেন। এই সকলমূল মূল নিমাই আমাদের পাগল করিয়া ছাড়িয়াছে আমাদের সমস্ত ভোগটা পাগল করিবে।"

এইবার কথা আরম্ভ হইল। একদিন নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে যান। সেখানে তাহাদের বয়স্থ ছাত্রেরা মিলিত হইয়া শুরু হইয়াছিল কাহারও মুক্তি প্রভৃতি কাঁধে করিয়া আনিয়াছে আর কেহ কেহ ঘড়া ভরিয়া গঙ্গা জল আনিয়াছে। লোকে আশ্চর্য্য হইলে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন— "কয় দিন সন্ধ্যা করিলে আমি কিরূপ কৃষ্ণ ভক্তি পাই এই দেখা হইতে আমাকে নিষেধ করিও না।" আরও শ্রীবাস এই ব্যাপারে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তাহার কথা হইল। তিনি বলিলেন "আমার বাড়ীতে কীর্তন হইবে, তুমি আসিও।" নিমাই বলিলেন "আমি আসিব, কিন্তু আমার সঙ্গে যে ছাত্রেরা আছে তাহাদের কি হইবে?" শ্রীবাস বলিলেন "তাহাদিগকে লইয়া আসিও।" নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার ছাত্রেরা তাহার সঙ্গে আসিল। শ্রীবাস পণ্ডিত, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন। এই সঙ্গে ছিলেন মুকুন্দ পণ্ডিত "প্রভুর দয়ার পাত্র নর্ত্তন কুশল।" সাধারণের কি ভাবে কাটিয়া যাইত তাহা ইঁহারা জানিতেন না। এই ৫০০ বৎসর যাবৎ কীর্ত্তনে গোটা বাঙ্গলা দেশটা মাতাইয়া রাখিয়াছে। এমনও ভাব কীর্ত্তন শুনিলে লোক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা সমস্ত ভুলিয়া যায়। আর যিনি কীর্ত্তনানন্দের ঈশ্বর, যাঁহার শ্রীমুখে এই সুর প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল,

পূর্ণিমার আবেগে কলুষ উপরাগের প্রেমে আত্মহারা প্রকৃতির পাগলের সেই মূর্ত্তা—সেই গান যে কি প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? পূর্ণিমার অন্যান্য সেবকের ব্যক্তিরা শশধরকে উপলক্ষ দিয়াছেন, বসন্ত বনের উজ্জ্বল আলো ও মাধবীর সুগন্ধ দিয়া তাহাকে পূজা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু তাহাদের প্রেম লোকচক্ষে এরূপ সুস্পষ্ট করিয়া আর কে দেখাইয়াছেন? সেই যে মুক্ত বাতায়ন উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহার পর এখনও শচীর ঘর বন্ধ হয় নাই, সেই শতবর্ষ উদ্ভাসিত বাতি, যাহা শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রথম আকাশে উঠিয়াছিল—তাহা এখনও আমাদিগের পথ প্রদর্শন করিতেছে যে মায়ে নিমাই কল্পনা সৃষ্টিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই মায়ে তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল "ইনি কি মূর্তিমতী ভক্তি? ইনি কি ভূতলে অবতীর্ণা কমলা না ভাগ্যবতীদিগেরই কাহারও,—গোপীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী?" স্বয়ং গৌরাঙ্গ কলিকাতা কুলকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা সতীর কুলবধূর অঞ্চলে মাখা, ইহাকে এমন সতীত্বের অভিনয় জগতে কেহ কখনও দেখে নাই। সেদিন নবদ্বীপে স্বয়ং কলঙ্কিনী আসিয়া আমাদের মাতৃদেবীর চরণতলে লিখাইয়া দিয়াছিল। প্রাতঃকালে শুনা, ইন্দ্রকুলগুলি বলিল "যেন বাসিত প্রভাত হয়।"

ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া নিমাই আচার্য্যের শিক্ষা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে পড়িয়া থাকিতেন একদিন শচী দেবী নিজের নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, আমাকে ছাড়ে না, আমার বুকটা বড় অস্থির হইয়াছে।" নিমাই বলিলেন, "মা যে কি কথা? তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব কি হইয়াছে বল" তখন শচী দেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইবে বলে বুঝি তাই কেন? মনে হয় যেন তোমার কোন প্রাণের অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তোমার আহার নিদ্রা জ্ঞান নাই, আমাদিগকে ভুলিয়া যাও নিমাই, আমাকে ছুইয়া শপথ কর তুমি সন্ন্যাসী হইবে না, বিশ্বরূপ প্রাণে বড় দাগা দিয়া গিয়াছে, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না" নিমাই মাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া আরম্ভ করিলেন। শচী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার নিকট বড় অপরাধ করিয়াছি, তুমি বল আমাকে ক্ষমা করিবে" নিমাই বলিলেন—"ক করিয়াছ? তুমি মা, ছেলের কাছে মা কি কোন অপরাধ করিতে পারে? এরূপ বলিলে যে মা আমি অপরাধী হই।" শচী দেবী বলিলেন "বিশ্বরূপ নিজহাতে একখানি বই লিখিয়াছিল, সে তাহা আমার কাছে রাখিয়া গিয়া বলিয়াছিল—নিমাই বড় হইলে এই বই পড়িবে। আমি সেই বই ছিঁড়িয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি, যাতে সেই বই পড়িয়া তুমি সন্ন্যাসী হও।" নিমাই বলিলেন "তোমার ঠিক নষ্ট করিয়া ভাল কর নাই, কিন্তু আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া তোমার সঙ্গত নহে আমি যে তোমার একান্ত স্নেহের অনুগত ছেলে এরূপ ক্ষমা চাহিলে আমার অকল্যাণ করা হয়" পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই আমি চৈতন্য ভাগবত এবং অপরাপর প্রামাণ্য পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি

ঈশ্বর পুরী সম্বন্ধে শচী দেবীর ভয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [

পূর্ব্বরাগের আবেশে মধুর ভবিষ্যৎ প্রেমে আত্মহারা প্রেমিক পাঠকের সেই দৃষ্টা—সেই গানে যে কি প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? পূর্ব্বরাগের অন্য যে কোন ব্যক্তিরা মধুমধ্যে উপাসক দিয়াছেন, পরকীয়ার বেদনে আকুল ও নীরব ক্রন্দনে যাহা ভরিয়া পূজা হইয়া আছেন 'বন্ধু ভবিষ্যতের' সে কথাকে এমন সুস্পষ্ট করিয়া আর কে দেখাইয়াছেন? সেই যে মুক্ত বাতায়ন উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকা এখনও শেষ হয় নাই সেই শতবর্ষ উচ্চারিত বাণী, যাহা প্রত্যেকের কানের কাছে প্রথম আকাশে উঠিয়াছিল—তাহা এখনও আমাদিগের পান করিতেছে। যে বাহুতে নিমাই কল্পিত সাজিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই বাহুতে তাঁহাকে দেখিয়া শেষের সাধ জাগিয়াছিল "তুমি কি সন্ন্যাসী যাবে? ঐনি কি তুমলে আমিও তা পড়ুয়েনা করলা না মানলাকরলাগিই করবো, —বাণীর অধিকারী দেবী?" আর যেদিন কাঞ্চন কুঞ্জকে সে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা সাত কাহন কৃষ্ণ লীলার অন্তরে মাখা, রজনীকে এমন সত্যিকার অভিনয় তখন কেহ কখনও দেখে নাই। সেদিন নবদ্বীপের পথে ঘাটে আকাশে বাতাসে আসিয়া আসিয়া মানুষকে ভাবাবেশে বিভোর করিয়া দিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইল কতকগুলি বালক "গয়া বাত্রার প্রভাত হল"

ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে আসিলে নিমাই আত্মাভিমান ছাড়িয়া তাঁহার কাছে পড়িয়া থাকিতেন। একদিন বৃদ্ধা দেবী নিজনে নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই, আমার বড় ভয় হইতেছে আমাকে অভয় দাও, আমার বুকটা বড় অস্থির হইতেছে।" নিমাই বলিলেন, "মা, সে কি কথা? তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব কি হইয়াছে বল।" তখন বৃদ্ধা দেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী যাইবে বলে শুনি কেন? মনে হয় যেন তোমার কোন প্রাণের অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তোমার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকে না, আমাদিগকে ফেলিয়া যাও নিমাই, আমাকে ছুইয়া শপথ কর, তুমি সন্ন্যাসী হইবে না বিশ্বরূপ প্রাণে বড় ব্যথা দিয়া গিয়াছে, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।" নিমাই মাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। বৃদ্ধা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "আমি তোমার নিকট বড় অপরাধ করিয়াছি তুমি বল আমাকে ক্ষমা করিবে" নিমাই বলিলেন "ক্ষমা করিয়াছি, তুমি মা, ছেলের কাছে মা কি কোন অপরাধ করিতে পারে? এরূপ বলিলে যে মা আমি অপরাধী হই" বৃদ্ধা দেবী বলিলেন "বিশ্বরূপ নিজহাতে একখানি বই লিখিয়াছিল, সে তাহা আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিয়াছিল—নিমাই বড় হইলে এই বই পড়িবে আমি সেই বই ছিঁড়িয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি, পাছে সেই বই পড়িয়া তুমি সন্ন্যাসী হও।" নিমাই বলিলেন—"সন্ন্যাসের চিহ্ন নেই কাহার ভাল করে নাই, কিন্তু আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া তোমার সঙ্গত নহে—আমি যে তোমার একান্ত স্নেহের অধীনস্ত ছেলে—এরূপ ক্ষমা চাহিলে আমার অকল্যাণ করা হয়" পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই আদি চৈতন্য ভাগবত এবং অপরাপর প্রামাণ্য পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি

এদিকে টোল বন্ধ হইয়া গেল, হরিকথা কিন্তু নিমাই আর কিছু বলেন না, ব্যাকরণের সূত্র পড়াইতে যাইয়া হরিভক্তির ব্যাখ্যা করেন, ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়া শোনে—কারণ নিমাইয়ের মুখে হরিকথা—সে যে অমৃত হইতেও অমৃত। কিন্তু তাহারা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের। নিমাইয়ের শিক্ষক। কাছে যাইয়া নালিশ করিল, "নিমাই পণ্ডিত আর পড়ান না, কেবল কৃষ্ণকথা বলেন আর কাঁদিতে থাকেন।" গঙ্গাদাস ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ নিমাই, তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী উঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ধার্মিক ও ভক্তিপরায়ণ বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তুমি হরিভক্তি প্রচার কর, ভাল,—কিন্তু ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ করা কি ঠিক?" নিমাই বলিলেন, সেদিন হইতে তিনি পড়াইলেন। নিমাই টোলে গেলেন, খানিকটা মনোযোগের সহিত পড়াইলেন, তখন ছাত্রেরা অন্যমনস্কের গান করিতেছিলেন, গঙ্গাদাসের কিন্তু মধুর স্বরলহরী কাঁপিয়া নাচিয়া আকাশ উদ্ভাসিত—নিমাই সেই গান শুনিয়া পাগল হইয়া গেলেন "আবার গাও"

টোলে হাসি।

"আবার গাও" বলিয়া ভূতলের পানে লুটাইয়া পড়িলেন, দুই চক্ষু অজস্র প্রবাহিত হইল, সেদিন আর পড়ান হইল না। তিনি বুঝিলেন আর পড়াইতে পারিবেন না। তখন পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ভাইসব! তোমরা দেখিতেছ আমি কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না, আমার মন তাঁহার পাদপদ্মে বিকাইয়াছি। কিন্তু যে সর্বক্ষণ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার ফুলকুমুদিনো হাসি হাসিতেছেন, আমি কি করিয়া পড়াইব? আজ হইতে আমি আর পড়াইতে পারিব না, আমার শত শত অপরাধ তোমরা ক্ষমা করিও। আমি জীবনে যদি কোন ভালকাজ করিয়া থাকি সেই পুণ্যের ফল তোমাদিগকে দিলাম, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর" সকলে চক্ষু মুছিয়া আসিল, এইভাবে তিনি পুথিতে ডুবি দিলেন। সকলে টোল হইতে চলিয়া আসিল।

এদিকে নবদ্বীপে ঘরে ঘরে চৈতন্যের জন্য সংকীর্তন করিতে বাহির হন, দলের লোক কম নয়। তাঁহারা যেন প্রেমরাজ্যে ঘরে পাঁচিয়া পড়েন, কক্ষ প্রেম-পঙ্কের ঝরণা তুলিয়া উচ্চরবে নাম সংকীর্তন করিতে করিতে চলেন। নবীনের ভট্টাচার্যদের এই সকল অর্থ, উচ্চস্বরে ভগবানকে ডাকা, ভাল লাগিত না। তাঁহারা কেহ বলিলেন, "আরে ছোকরা ছিল, একেবারে মাটী হইল। ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এখনই বিদ্যা যে একদিন অভ্যাস না করিলে সবগুলি ভুলিয়া যাইতে হয়—নিমাইয়ের কি আর বিদ্যাবুদ্ধি কিছু থাকিবে?" একজন বলিলেন, "আমরাও তো ভাই ভাগবত পড়িতেছি, এরূপ করিলাম হইয়া নয়নকৃষ্ণের কথাতো কোথাও দেখি নাই ভগবানকে চীৎকার করিয়া না ডাকিলে বুঝি তিনি শুনিতে পান না।" অন্য একজন বলিলেন, "আরে তো ঈশ্বর, তাঁহারা ও পরমাত্মার প্রভেদ কি? তবে কে কাহাকে ডাকিবে?" অনেক বলিলেন—"রাত্রে ইহাদের চীৎকারে ঘুম হয় না, রাজার এসকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই সৈন্য পাঠাইয়া নবদ্বীপ উৎসন্ন করিবেন"

ভট্টাচার্যের দল ও নাগরী ভাবিয়া আকুল।

আবার কেহ বলিল, "শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায় ইহারা নিত্যই মধুমঙ্গলী সাধনা করে" (চৈ. ভা.)। ইহারা বাহির নবদ্বীপের যেখানেই কীর্তির কথা শুনিতে পাইত সেখানেই ছুটিয়া যাইত। এইরূপে নবদ্বীপের সকলেই কীর্তির কথা শুনিয়া ও দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাসংকীর্তন।

সেইদিন নবদ্বীপের একটি স্মরণীয় দিন। কীর্তির আবেশ প্রভুর সংবাদ শুনিয়া নিমাই বলিলেন, "আজ আমরা সকলে প্রকাশ্যভাবে সংকীর্তন করিব। এতদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আমাদের কীর্তন আবদ্ধ ছিল, মাঝে মাঝে দুই একটি মাত্র দল রাজপথে কীর্তন করিত। আজ আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা সবে রাজপথে একত্র হইয়া কীর্তন করুন।" যেমন কথা তেমন নিমাইয়ের বিরুদ্ধ দল কত নগণ্য। নিমাই রাজপথে বাহির হইলেন, বিপুলতর মত এই সংবাদ প্রচারিত হইল। শত শত সহস্র সহস্র নরনারী সে রাত্রে রাজপথ ধাইতে হইল, নামাবলী রচিত পতাকায় এবং সুগন্ধ তৈল নিষেচিত সহস্র মশালের আলোকে মনে হইল নবদ্বীপে সে রাত্রে কোন রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা হইবে। খন মৃদঙ্গ উত্থেলিত হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের পরপল্লী, গড়িগাছা প্রভৃতি পাড়াগুলি তাহারা পরিক্রমণ করিয়া কাজির বাড়ীর কাছে আসিলেন। যে যে পথ দিয়া এই সংকীর্তনের দল চলিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ চৈতন্য-ভাগবত, ভক্তি-রত্নাকর ও প্রেম বিলাসে পাওয়া যাইবে। সেদিন কাজি এত বড় বিপুল জনতা প্রত্যাশা করেন নাই বিশেষ জনতা দেখার ভাল অভ্যাস হইয়া থাকে নাই, কিছু কিছু আন্দাজের ভাবও দেখা যাইতেছিল। কতকটা ভয়ে, কতকটা নিমাইয়ের মুখিপনে কাজির অন্তরাত্মা হইল। তিনি দেখিলেন—লোকে লোকারণ্য, তাহারা নিমাইকে কেন্দ্র করিয়া উল্লাসের ঝড় তুলিয়াছে—তাহাদের আনন্দোল্লাসিত বাহু ঘন ঘন শূন্য হইতে কেহারা সাড়া দিতেছেন কুলবধূরা পর্যন্ত বাহির হইয়াছেন। নিষেধ করিবার কেহ নাই, নিষেধ বিধি মানিবার কেহ নাই। মশালের আলোকে সুস্পষ্ট মুখমণ্ডলে, আলোয় সকলেরই অঙ্গ টল টল করিতেছে, এই বৃহৎ জনতা শুধু অগ্নি উদ্গারে কক্ষের পূজা করিতেছে। যে দিকে দিগন্তের শেষ পর্যন্ত সুন্দর কুঞ্চিত-কেশসমন্বিত মস্তক দোলাইয়া কীর্তনের কীর্তনে সোনা ছাপাইয়া চলিতেছেন, শত শত

কাজির ভীতি

মশাল তাঁহার রূপদর্শনেচ্ছু শত শত নরনারীর ভাব সেই দিক্ উজ্জ্বল করিয়া চলিয়াছে কি অপূর্ব রূপ! কাজি মুগ্ধ হইলেন, তিনি গৃহ হইতে নামিয়া আসিয়া নিমাইকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন।

এই সময়ে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে আর একটি সদ্যাগত অতিথি উপস্থিত হইলেন।

নিত্যানন্দের আবির্ভাব।

ইহার নাম **নিত্যানন্দ**, ইনি হাড়াই ওঝার পুত্র—বাড়ী বীরভূম, একচাকা গ্রাম। ইনি নিমাই হইতে নয় বৎসরের বড়, সুতরাং ইনি ১৪৭৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়স হইতেই ইহার কৃষ্ণপ্রেম অভিব্যক্ত ছিল। বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পূতনাবধ, কালীদমন প্রভৃতি কৃষ্ণের নানারূপ লীলার অভিনয় করিয়া বাল্যসঙ্গীদের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্বেই ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ বৎসরকাল ভারতবর্ষের সর্বতীর্থ ঘুরিয়া বেড়ান। কাজির

আছে শ্রীকৃষ্ণকে ইহার সঙ্গে আমাদের পুরাণে সাক্ষ্য [illegible] এই বালকের পরিচয় দেখে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় করিতেছেন [illegible] পুত্রী বাজালা ছিলেন [illegible] ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কেহ কিছু আহার দিলে খাইতেন [illegible] এইরূপ উপবাসী থাকিতেন [illegible] চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, ইনি একদা বৃন্দাবন যাইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দর্শন করিয়া ভক্তি করিয়া বাস করিতেছিলেন। তিন দিন কিছু খাওয়া হয় নাই, তখন তাঁহার কোন কষ্ট হইতেছে না দেখিয়া সকলের মত দুঃখিত হইয়াছিল। সাধারণ কৃষ্ণবর্ণ অতি সুন্দর একটি বালক হাতে একটি ঠোঙ্গা দুধ মাখায় করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল "আমার এই দুধ পান করিয়া তুমি [illegible] অনুরোধ ঐ বলিবার জন্য—

মাধবেন্দ্র পুরী

[illegible] তাহার একটি পাত্রের কাঁথা রাখিয়া দিলেন,—আমি পাঁচক আর আসিয়া লইয়া যাইব।" মাধবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে তোমাকে এই দুধ দিয়া পাঠাইয়াছে?" বালক বলিল "সকলেরই তোমার উপবাসের কথা জানেন, তাঁহারাই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, এখানে যত সাধুসন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের কাছে অনেক ভিক্ষা করেন কেহ ধন, ভাল, গরু, ঘোড়া, কেহ বা অন্যান্য ভিক্ষা করেন, কিন্তু তুমি যাহাদের কাছে কিছুই চাও নাই তাঁহারাই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যিনি কাহারও কাছে কিছু চান না, আমিই তাঁহার খবর রাখিয়া থাকি।" এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল, তাহার পরমসুন্দর মূর্ত্তি উহার হৃদয়ে এক সুন্দর ভাব সঞ্চার করিয়া মন মুগ্ধ করিল।

মাধব সেই দুগ্ধ পান করিলেন তাহা অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু, ঠোঙ্গাটি ধুইয়া মুছিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শয়ন করিলেন। রাত্রের কথা স্মরণে তাঁহার চক্ষু হইতে আবার ধারায় জল পড়িতে লাগিল। শেষরাত্রে তন্দ্রার অবস্থায় ধ্যানের বলে তিনি দেখিতে পাইলেন সেই বালকের বালক তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া, সে অপূর্ব্ব তাঁহার মূর্ত্তি, কিন্তু বড় বিষণ্ণ। সকরুণকণ্ঠে বালক যেন বলিতেছে, "মাধব! আমি বহুদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছি, মৃত্তিকার নীচে নিরালায় আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি আমাকে বাহির করিলে, এই পাষাণের আমি কত যুগ কাটাইয়া দিয়াছি। কোটী জগতে তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, এরূপ কেহ আমাকে ভালবাসে না।" এই বলিয়া ধ্যান নিষ্পন্ন করিয়া বালক অন্তর্হিত হইল। তখন গোবর্দ্ধনের পূর্ব্বে রাজা মালিকের মত পূর্ব্বা কিরণের প্রথম ছটা [illegible] [illegible] মাধবেন্দ্র বৃন্দাবনের পথে ছুটিলেন। বহু লোক কোদাল ও ঝাবরা লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গোবর্দ্ধন পাহাড়ে ছুটিল নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িয়া তাঁহারা এক বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি পাইলেন এই গোপালমূর্ত্তি মাধবাচার্য্য বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করিলেন তিনি বাঙ্গালী পুরোহিত আনিয়া সেই মূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই বালক তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন "মাধব! বহুদিন ভূমিতে থাকিয়া আমার পরিবর্ত্তে ভাল ঘর নাই। উঁচিতলাতে খুব উঁচুই চন্দন আছে, তুমি যদি

তাহা আমার আজ এখন কর, তবে এই আলা জুড়াইবে। মাধব বিচারার অভিপ্রায় বুঝিলেন তখন সাধু ব্রাহ্মণের চাকার বিলাস সখ আর চাহে না বিস্মরাকুল।

'ধর ওহে গোপীনাথ ক্ষীর করিলে চুরি।

মাধবের মাথে কহিতায় এখন বিলক্ষ সম্ভব তাহার জ্ঞান নাই তিনি বলিয়া উঠিলেন ওহো গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেন এই বিগ্রহকে গোপীনাথ দেখিয়া এবং গোপীনাথের ক্ষীরচোরা খ্যাতি প্রসিদ্ধ মাধব ভাবিলেন, "যাঁর এই ক্ষীরের একটু আস্বাদ পাইবার তরে আমি দুরদেশে আইলা গোপীনাথকে এইরূপ সাধনার ধিক্ত করিলাম।" কিন্তু পরক্ষণেই মনে বিলাস উপস্থিত হইল, "ছি, আমার ক্ষীর খাইবার জন্য ঠাকুরের লালসা হইয়াছে।" অনুতপ্ত হইয়া তিনি বাজারের অভিমুখে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া কাল কাটাইবার প্রস্তুত হইলেন।

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। গোপীনাথ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা দেবতাকে ভোগ দেওয়ার পর আরতি সমাপ্ত করিয়া ঘুম হইতে উঠিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার ঘুম ভাঙার পর তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং ক্রতগতিতে মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন—গোপীনাথের পুরা তাঁহার উত্তরীয়ের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বাঁধা আছে। তখন পাণ্ডার ভয় ভঙ্গ হইল পূর্ব। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "গোপীনাথ আমায় বলিতেছেন, 'আজ আমি ভোগ খাই নাই আমা কিন্তু যে স্থানে না সেই মাধব না খাইয়া বাজারে ভিক্ষারী হইয়া বসিয়া আছে তাহার জন্য উঁহাকে কতকটা ক্ষীর রাখিয়াছি, মাধবকে ক্ষীর খাওয়াইবে এস, তবে আমি ভোগ পাইব।'" এই প্রত্যাদেশ শুনিয়া পাণ্ডা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাজারে ছুটিলেন "এমন ভাগ্যবান কে যাহার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিতেছেন তাঁহার চরণের পুণ্য স্পর্শ পাইব? কোন্ সৌভাগ্যবান মাধব?" এই চীৎকারে মাধবের কানে গেল কিন্তু ধরা দিলেন। ইহার মধ্যেই সমস্ত নগরের মত বিপুল জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমস্ত খুলিয়া দেখাইলেন ক্ষীরপ্রসাদ পাইলেন এবং আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন সেই সঙ্গে সমস্ত রেমুনাবাসী লোক নৃত্য করিতে লাগিল তাহারা তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না কিন্তু প্রতিষ্ঠা বৈরাগীর চক্ষে অতি ঘৃণার বিষয়, এই প্রতিষ্ঠার ভয় পাইয়া সন্ধ্যাসী বেলা হইতে উঠার পাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। রাত্র তিনি উৎকলে ছুটিয়া পলাইয়া বহুদূরে চলিয়া গেলেন —এখনও উৎকলের পাণ্ডারা বাজনায় রচিত এই ছইটি চরণ আওড়ায় করিয়া থাকে—"ধন্য ধন্য মহাভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি।" এই চুরির অখ্যাতি ঠিক বিপরীত এখনও রহে নাই এখনও বেলার গোপীনাথ "ক্ষীর চোরা গোপীনাথ" নামে পরিচিত পুরী হইতে চন্দন লইয়া মাধবেন্দ্র সুবাসনে ফিরিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণিগাড়ায় ঈশ্বরপুরীর মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বারের দেখা হইয়াছিল মাধবেন্দ্রের ভক্তি অগাধারণ —আকাশে মেঘোদয় হইলেই তিনি কৃষ্ণকে মত্ত কৃষ্ণিত চাহিয়া থাকিতেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন "মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন মেঘদর্শনমাত্র তিঁহ অচেতন" এই মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত শ্লোকগুলি চৈতন্য আস্বাদনকারে আবৃত্তি করিতেন।

তন্মধ্যে একটি শ্লোক—"অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকসে। হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্"—চৈতন্যের অতি প্রিয় ছিল, তিনি বলিতেন, "এই শ্লোকস্থ প্রথম আলোকাত করিতেছে, ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ বাড়ে, এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলোচনা করিলে ইহার উৎকর্ষ তেমনই উপলব্ধ হয়। [illegible] শ্লোক গুলি" (চৈ চ মধ্য, ৪র্থ প., ...এই শ্লোক পাঠান্তে পড়িয়া শ্রবণ করিবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এবং মূর্ছাভঙ্গের পর মাত্রমাত্র শ্লোকটি শুধু "অয়ি দীন, অয়ি দীন" বলিতে বলিতে আর বলিতে পারেন নাই, পুনরায় মূর্চ্ছাগতা হইয়াছেন। নিত্যানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণের পর মাধবেন্দ্রের উদ্দাম ভক্তিপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, "যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি—তাহার সর্বপ্রধান এই মাধবেন্দ্র-পুরী-মহাস্থান তুমি সর্বতীর্থের সার, তোমার মতো যেরূপ আর কোথাও এরূপ কৃষ্ণভক্তির বিকাশ দেখিতে পাই না। তীর্থগুলি পড়িয়া আছে—সিংহাসন শূন্য, কোথাও ঠাকুরকে বসাইয়া না।" তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন কেহ বলিতেছেন, "তুমি গৌড়ে ফিরিয়া যাও, সেইখানে কৃষ্ণের বহু লীলা দেখিবে।" এই বাণী কোন দৈববাণী অপেক্ষা ন্যূনতে তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে টানিয়া আনিল।

মাধবেন্দ্র পুরীই ভক্তিবাদের প্রবর্তক—ইহার উপাধি ছিল "ভক্তিকল্পতরু"। ইহার স্থাপিত গোপালের অঙ্গে নানারূপ বিলক্ষণভাবে অঙ্কিত। ধর্মান্ধ কোন ব্যক্তি এই বিগ্রহ গোবর্ধনে ভগ্ন করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা ইহাকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছে, এই সংবাদে ইহার অধিকারী পরবর্তী এক মালিক ইহাকে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া পালাইয়া যান, তথা হইতে মাধবেন্দ্র ইহাকে উদ্ধার করিয়া ছত্রভোগ রাজার ব্রাহ্মণকে ইহার সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান সেখানে পুনরায় মুসলমানেরা হানা দেয়, অগত্যা একমাস কাল ইনি বিল্বপুষ্করের গৃহে বাস করেন তৎপরে বহু তীর্থপর্যটনের পর ইনি এখন জগন্নাথে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মাধবেন্দ্র পুরী মহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্বে বা পরে স্বর্গারোহণ করেন, অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন—ইহার শিষ্যগণের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, কেশবভারতী ও ঈশ্বর পুরী প্রধান। এই বৈষ্ণবগুরু দেখে চৈতন্যকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

চৈতন্যের নামের সঙ্গে নিত্যানন্দের ন্যায় আর একজনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ইনি **অদ্বৈত আচার্য**। ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর নগরে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্য হইতে ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন। রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়াল ইহার পূর্বপুরুষ ছিলেন। ইঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা গৌড়ের বাদসাহী যবি নিজে হৈল রাজা—অদ্বৈতপ্রকাশ। লাউরের রাজা কুবের মজুমদার অদ্বৈতের পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন মধ্যে ছিলেন। তৎপ্রকাশ এই কুবের অদ্বৈতের নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা লইয়া "বাল্যলীলাসূত্র" নামক একখানি অদ্বৈতজীবন সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। কথিত আছে অদ্বৈত লোকের নাস্তিকতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত অন্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, সেই প্রার্থনার ফলে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। শান্তিপুরের শাস্ত্রাচার্য নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিতের

নিকট পাঠ সমাপন করিয়া ইনি শান্তিপুরেই উপনিবিষ্ট হন। ইনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে ইহার রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকার নাম ছিল "উপকারিকা।" মুসলমান রাজদরবারে ইহার একান্ত অন্তরঙ্গতা ছিল, ইহার দুই স্ত্রী সীতা ও শ্রী বৈষ্ণব-সমাজে সুবিদিতা। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য একবার শান্তিপুরে ইহার বাড়ীতে যাইয়া "উপকারিকায়," স্বলক্ষিত অবস্থায় স্থীকার করিয়াছিলেন,—যখন তিনি শান্তিপুর ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "তুমি নিজেই যদি এরূপ ব্যাকুল হও, তবে আমার বৃদ্ধ মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?" কথিত আছে একদা জ্ঞানের দিক বেশী ঝোঁক দেওয়াতে ভক্তিবাদীরা পুরীতে চৈতন্যের নিকট ইহার কুৎসা কীর্তন করিয়াছিলেন। চৈতন্য চিঠি লিখিয়া উত্তর আনাইয়া দেখাইলেন—ইনি যে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন শুষ্ক জ্ঞানবাদ গ্রহণ করেন নাই। অদ্বৈতের টোলে বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের নানাস্থান হইতে ছাত্র পড়িতে আসিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে, ইহার প্রেমের ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইহার এক মহারাষ্ট্রীয় শিষ্য ইহাকে ত্যাগ করিয়া যান। "অদ্বৈতাচার্য" ইহার উপাধি,—নাম ছিল—কমলাকর ভট্টাচার্য। শান্তিপুরে অদ্বৈতের বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে ইহার জন্ম এবং প্রেমবিলাসের মতে ১৫৩২ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু। ঈশান নাগরকৃত অদ্বৈত-প্রকাশে ইহার মৃত্যু ১৪৮৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

চৈতন্যের সহচর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ ছাড়া আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা অল্পসংখ্যক কয়েকজনের উল্লেখ করিব—শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, শ্রীবাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস হরিদাস, প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম বাসু ঘোষ, লোকনাথ শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ মাধবানন্দ রায় এবং উদ্ধরণ দত্ত।

নরহরি সরকার। শ্রীখণ্ড গ্রামের পঞ্চায়েতপতি নারায়ণ রাজাদেশের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ইহার আদি নিবাস ছিল মধুগ্রামের নিকটবর্ত্তী বালিন্দু গ্রামে, উত্তরকালে ইহারা শ্রীখণ্ড, কৌটেশ্বর ও অমরাপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের এক প্রধান শাখা শ্রীনাথ, দিগম্বর ও বিষ্ণুদাস কোকনার অনুমান ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের এক বিস্তৃত ভূমির অধিকার পাইয়া ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে বাস করেন। অধ্যাপক ডা. ভূমোনাথ দাস গুপ্ত এই বংশের বংশধর। নরহরির পিতার নাম নারায়ণ, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ সেন সাহার গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নরহরি ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যদেবের গণ্ডীতে যা দিবার পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লিখিয়া কবিযশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার একটি পদ এইরূপ—"আঙ্গিনায় রহিল আমার এই হিয়ার হেম হার। পিয়া যেন গলায় পরে একবার। যোগিণী মহিমা নিজকরে, গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে। এ সব অভিতে তারে কহিও। নরহরি ক'র এই কায়, সে সময়ে কাণে শুনাও কৃষ্ণনাম।" ইহা সহজ কথা অর্থাৎ অন্তিম অবস্থায়

রাধার উক্তি চৈতন্যের প্রতি অনুরাগ হওয়ার পরে, তিনি আর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করেন নাই, সমস্ত পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ে রচনা করিয়াছেন। এই সকল পদে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণরূপে বর্ণন করিয়া সহচরগণকে গোপী ভাবনা করিয়া কীর্তন করিয়াছেন, এই গোপীভাবের লক্ষণ চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস সকলের ভাল লাগে নাই—সে কথা তিনি নরহরির নামে উল্লেখ না করিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। কিন্তু নরহরি আর একটি কাজ করিয়াছেন যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে একটি নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিল—তিনি শাস্ত্রবিধিমতে চৈতন্যপূজার মন্ত্র রচনা করিয়াছেন—সেই বিধি সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। নরহরিদাসের গৌরাঙ্গলীলার বহু পদ আছে। অন্যান্য ভক্তগণ ভক্তি প্রকাশে ইহার গৌরাঙ্গলীলাকীর্তনের প্রায় একশত পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরির বংশধরেরা শ্রীখণ্ডে "নরহরি দাসের" করচা পাঠ করেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদ শেষীর মধ্যে বহু শিষ্য আছে। নরহরি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। চৈতন্য নরহরিকে এত ভালবাসিতেন যে শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে প্রয়াগের মধ্য পর্যন্ত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। "কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। চলনাম তুমি মোর দ্বিতীয় জীবন।" নরহরিকৃত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে।

শ্রীনিবাস চৈতন্য তিরোভাবের সময় ৪০ বৎসরের বড় ছিলেন, ইঁহার মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী শচীর বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, অদ্বৈত এবং শ্রীবাস একত্র হইয়া মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্বক গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের ভ্রাতা তিন জন ছিলেন, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন। শ্রীকণ্ঠ, শ্রীরাম এবং শ্রীপতি। এই ভ্রাতৃত্রয়ের সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণেরা সেলাই কাপড়—অর্থাৎ জামা প্রভৃতি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু সে সময়েও শ্রীবাসের বাড়ীতে একজন মুসলমান দরজি বারমাস নিযুক্ত ছিল। ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত শ্রীবাস গ্রাম্যপ্রকৃতি ছিলেন—কুসঙ্গে মিশিতেন এবং উচ্ছৃঙ্খল হইবার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। সেই বয়সে এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে স্বপ্ন দেখা দিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস, তুমি কি করিতেছ? তোমার আয়ু আর একবৎসর মাত্র আছে।" প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শ্রীবাস দেখিলেন স্বপ্নে যে সেই সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন এবং তিনিও তাঁহাকে সেই সতর্কতাসূচক উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তদবধি শ্রীবাসের সমস্ত আমোদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান হইল। এমন সময়ে তিনি পথে এক টুকরা কাগজ কুড়াইয়া পাইলেন, তাহাতে দুইছত্রে নিম্নোক্ত এই শ্লোকটি লিখিত ছিল—"হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" গ্রন্থে নিমজ্জিত ব্যক্তি তৃণ একটি দেখিতে পাইলেও তাহা আঁকড়াইয়া ধরে, তদ্রূপ ঐ শ্লোকটি সেই স্থানে গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর নাম জপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমশঃ তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক ভক্তির সঞ্চার হইল। তাঁহার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল, যখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া তিনি ভক্তির আবেগে নাম কীর্তন করিতেন, তখন তথায় ভিড় জমিয়া যাইত, দেবানন্দ পণ্ডিতের বাড়ী শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্যাখ্যা হইত, শ্রীবাস ভক্তির উচ্ছ্বাসে চীৎকার

করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। এই অপরাধে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে একদিন সভা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, পণ্ডিত-সমাজে এই উন্মাদ ও ভাবুকতা অনুমোদিত হয় নাই। সেদিন সর্ব্বপ্রথম যখন সেখানে গৃহে যাইয়া তিনি চৈতন্যের ভক্তি দেখিলেন, সেইদিন তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ইহার বহুপূর্ব্বে একদিন তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেইদিন সন্ন্যাসের নিম্নিষ্ট একবৎসরের শেষ দিন, হঠাৎ তিনি মূর্চ্ছিত ও নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সকলে তাঁহাকে বাহিরে লইয়া আসিল, এমন সময়ে কোথা হইতে সেই সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস উঠ, জগতে তোমার আরও অনেক কাজ করিবার আছে। তুমি মন ভঙ্গ পাইলে।"

চৈতন্যের ভক্তি লীলা প্রকাশ হইবার পরেই শ্রীবাসের বিস্তৃত কক্ষ-কুসুমাকীর্ণ আঙ্গিনায় রাত্রিকালে পড়ায় একটি নিম্নিষ্ট ও শুভক্ষণ লইয়া কীর্ত্তন হইত। গঙ্গাবাস পণ্ডিত বাহির দ্বারে পাহারা দিতেন, আর কোন লোক ঢুকিতে পারিতেন না। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আঙ্গিনায় যে লীলা হইত, তাহা অতুলনীয়। সে লীলার কথা এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই। সেই আঙ্গিনা এখন গঙ্গাগর্ভে। কিন্তু অনতিদূরবর্ত্তী একটা স্থানকে "শ্রীবাসের আঙ্গিনা" নাম দিয়া গ্রামবাসীরা এখনও সেই পবিত্র স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছেন। এই আঙ্গিনায় একদিন কীর্ত্তন হইতেছিল, তখন শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মারা যায়। কিন্তু শ্রীবাসের বাড়ীর মেয়েরা হুকরিয়া কাঁদেন নাই। শ্রীবাস তখনও ভক্তদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে গলার স্বরে এবং ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। সংকীর্ত্তনের শেষে মৃত শিশুকে পোড়াইবার জন্য সজ্জিত করা হইল, তখন চৈতন্য এবং তাঁহার সহচরগণ সেই দুর্ঘটনার কথা প্রথম জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন, "পুত্রশোক না জানিল যে আমার প্রেম হেন তব সঙ্গ দুই ভাগ্য কেমনে"। (চৈ. ভা. মধ্য, ২৫ অ.) একদা পুরীতে চৈতন্য সংকীর্ত্তন শ্রীবাস মহাবাহু প্রতাপরুদ্রের দল দেখিয়া চৈতন্যের দিকে যাইতেছিলেন, তাহাতে রাজসখা হরিচন্দন তাঁহাকে হত্যা করাতে তিনি মহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, মহা ক্রুদ্ধ হওয়াতে রাজা তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দিতে বলিয়াছিলেন,—"তুমি রাগ করিও না প্রভুর প্রতি ইহার ঈক্ষণ করিলা প্রসাদ পাইলে আমরা ধন্য হইতাম।"

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইত, তিনি হরিদাস মুসলমান ও জাতিচ্যুত নিত্যানন্দকে দুইবৎসরকাল তাঁহার কাছে স্থান দিয়াছিলেন। এই কারণে ভট্টাচার্য্যগণ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করিতেন। ছলন সাহার দৌহিত্র আসিয়া যাহাতে শ্রীবাসের আঙ্গিনা ও গৃহাদি ধ্বংস করিয়া ফেলে, এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রও তাঁহারা করিয়াছিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার পরিবারবর্গ চৈতন্যপ্রাণ ছিলেন, তাঁহারা ইহাকে কথা ত্যাগ করিতেন না। চৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন, "সপরিবারে করে তারা চৈতন্যের সেবা শ্রীচৈতন্য বিনা নাহি জানে দেবীসেবা।" নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীবাসের কুমারহট্টে এক বিশাল প্রাসাদ ছিল,

তথায় ভগ্ন অট্টালিকা এখনও আছে। চৈতন্যদেব বলিতেন "লক্ষ্মীকেও যদি ভিক্ষাপাত্র হাতে লইতে হয়, তথাপি শ্রীবাসের অঙ্গনের দারিদ্র্য হইবেন না।" যখন চৈতন্য শিশু ছিলেন, তখন শ্রীবাস প্রবীণবয়স্ক, তিনি শিশু চৈতন্যকে পাইয়া একান্ত স্নেহাদর করিতে অবসর পাইতেন, একদিন চৈতন্যের হাত ধরিয়া তিনি সমবয়স্কদের বলিয়াছিলেন, "কোলায় চলেছ উদ্ধতের শিরোমণি।" চৈতন্য অবশ্য কোন অজুহাত করিয়া সকলকে অতিক্রম করিতেছিলেন শ্রীবাস অনুমান ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীবাস নবদ্বীপ সম্পর্কে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর লোকদিগকে মাতাইয়াছিলেন।

হরিদাসকে কত লোক মুসলমানের পুত্র প্রমাণ করিতে চাহিয়া তাঁহার পিতামাতার নাম ধাম সমস্ত কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু মুসলমানের গৃহে পরিত্যক্ত এইরূপ "যবন হরিদাস" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, এই উপাদেয় সিদ্ধান্ত এমন কি প্রাচীন লেখক অনেকেও এই মত পড়ন করিয়াছেন। কারণমে হরিদাস প্রায়শ সমাজে গৃহীত হন, এমন কি বহু দক্ষিণ তাঁহার শিষ্য হন। মহাপ্রভুর নিরোধের পর হিন্দুধর্মী ও ভক্তগণ আবার উহার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, তখন তাঁহারা হিন্দুরা তাঁহাকে মুসলমান বলে পরিচিত করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ এই কারণেই এই গল্পের উৎপত্তি, অন্যথা এই সকল ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আরো অনেক আছে যখনই কোন মুসলমান বা নিম্নজাতি হিন্দু ভক্তসমাজে গৃহীত হয়, উচ্চবর্ণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছেন, তখনই এই সকল গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে। কুলীনগ্রাম বর্দ্ধমানপুর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এইরূপ গল্পের উদাহরণ আছে। সুতরাং হরিদাস এ বিষয়ে একা নহেন। বৈষ্ণব ইতিহাসের অলৌকিক অংশ বাদ দিলে চৈতন্যভাগবতের চূলা বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক আর নাই। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুস্তক খানিও নিত্যানন্দের প্রভুত্ব ও তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশাবলির ফলে বাড়ত হইয়াছিল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুইজন একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বহুদিন একগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় চৈতন্যভাগবতের প্রমাণই সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য। চৈতন্যভাগবত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে কাজি হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, "তুমি বহুকালে মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তোমার পক্ষে কাফেরদের সঙ্গে মেশার মত অপরাধ আর নাই।" তিনি যদি ব্রাহ্মণের পুত্র হইতেন, তাহা হইলে কাজি এবং অন্যান্য মুসলমানের তাঁহার প্রতি এরূপ জাতক্রোধ হইতে পারিত না। চৈতন্যভাগবত কিংবা চৈতন্যচরিতামৃত এই দুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থে হরিদাসের ব্রাহ্মণকুলে জন্মের কথা নাই। হরিদাসের পিতার নাম মনুষ্য কাজি, অথবা অঞ্চলে ইহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল। যশোহর জেলায় বনগ্রামের নিকট বুঢ়ন গ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়। ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে শান্তিপুরে আসিয়া ইনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন এবং অদ্বৈত কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। একজন মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদে গোরাই চাঁদকাজির কর্ণে হয়, এবং ফুলিয়া গ্রামের গোরাই কাজি এবং অন্যান্য বার জন কাজি একত্র হইয়া হরিদাসের বিচার করেন। যদি হরিদাস ত্যাগ না করেন

তবে তাঁহাকে এক একটি করিয়া ২২ বাজারে লইয়া বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এই আদেশ প্রচারিত হয়, ফলস্বরূপ এই শাস্তির ভীষণতা মুসলমানসমাজে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়। এই বেত্রাঘাতের ফলে হরিদাস মৃতপ্রায় হইলে তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ মুসলমানদিগের শিক্ষামত ইঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। যে গুহায় বসিয়া হরিদাস তপস্যা করিতেন, সেইখানে তিনি এক পরমা সুন্দরী গায়িকাকে পাঠাইয়া দেন। হরিদাসের নিকট গায়িকা উপস্থিতা হইয়া প্রণয় প্রার্থনা করে। তিনি উত্তরে বলেন "বেশ, আমি জপ শেষ করিয়া লই, পরে তোমার কথা শুনিব।" সন্ধ্যা হইতে জপ সুরু করিয়া সেই জপ প্রভাতে শেষ হয়। কারণ তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। প্রভাত হওয়ার পরে তিনি গায়িকাকে বলিলেন, "কালে আসিও।" কারণ প্রাতঃকাল হইতে বহু ভক্ত তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া আসেন। গুহার দ্বার রুদ্ধ থাকিলে পরদিন এবং তার পরদিনও সেইরূপ, জপ সাঙ্গ হইতে সারারাত্রি কাটিয়া যায়—গায়িকা কোন সুবিধা পাইল না। তাহার চক্ষে আর একটি জগৎ প্রকাশিত হইল, সেই জগতের দেবোপম হরিদাসের সংযম পূর্ণদের প্রতি অনুরাগে গলদশ্রু চক্ষু এবং সর্বাঙ্গের প্রস্ফুটিত সুন্দর সেই বহুমূল্য নৈতিক সম্পদ একান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। হরিদাসের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইল।

পুরীতে যখনকালে চৈতন্যদেব প্রভৃতি হরিদাসকে দেখিতে তাঁহার নিভৃত আশ্রমে যাইতেন। এই আশ্রমে কতক দিন সনাতন বাস করিয়াছিলেন। সনাতন হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, "এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ধর্মের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা সে পথে চলেন না। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিয়া নিজেরা ধ্যান-ধারণায় প্রমত্ত আছেন, কিন্তু এমন লোকতো তোমার মত দেখিলাম না, যিনি ধর্ম শিক্ষা দেন এবং স্বয়ং ধর্মের পথে অটল, যিনি একাধারে সন্ন্যাসী ও জগতের হিতে রত।" চৈ চ অন্ত্য, ৭ম অ। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, "তোমার চিত্তখানি গঙ্গাধারার ন্যায় পবিত্র, তোমার আত্মা নিয়ত তাহাতে অবগাহন করে। বেদের যে সকল শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান সকলে করিয়া থাকে, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কাজই তদ্রূপ পবিত্র। তোমার নিত্য আচরিত আদর্শ বেদপাঠের পুণ্যময়। জগতে তোমার মত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব?"

হরিদাস একদা চৈতন্যদেবকে বলিলেন "আমার এ কি হইল? আমি নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করিয়া থাকি কিন্তু এখন দেহে ক্লান্তি আসিয়াছে, সংকল্পিত নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" উত্তরে চৈতন্যদেব বলিলেন, "এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, এত নাম জপ করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজে পাবন, নামরূপে তোমার পাবনী শক্তি আর কি বাড়াইবে।" ১৫১০-১১ খৃষ্টাব্দে হরিদাস দেহত্যাগ করেন। তখন চৈতন্যদেব তাঁহার সম্মুখে ছিলেন, তিনি তাঁহার সমস্ত উচ্চ ব্রাহ্মণকুলজাত সহচরবর্গকে মুহুর্মুহু হরিদাসের পাদোদক সেবন করাইলেন এবং তাঁহার সমাধির জন্য নিজ হস্তে প্রথম মাটী খুঁড়িলেন। পুরীতে সেই

সমাধিস্থানটি আছে, যথায় যে বকুলবৃক্ষ-মূলে বসিয়া তিনি ভোজন করিতেন, সেই বৃক্ষটি এখনও আছে, উহার ডাল নাই। মূল তরুর উপর গাছটি দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় ৩৫০ বৎসরের বৃক্ষটী সাধকের চরণে পাদপের শ্রেষ্ঠ উপহার করিয়া আর এমন গাছ আর দেখি নাই।

ইঁহারা বৈষ্ণব সমাজে যে অমর কীর্ত্তি ও পূজা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। এই মুসলমান দুই বৈষ্ণবমহাজনের নাম শুনিলে এখনও বৈষ্ণবেরা ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যান, এবং সেই মুহূর্ত্তের জন্য ইঁহারা সাধু হইয়া যান। মৃত্যুকালে ইঁহাদের বয়স কিছুদিন ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

লোকনাথ গোস্বামী বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব ছিলেন। ইঁহার পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী হালিসহর জেলার তালা-ঝামটপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার জন্মের সন ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইনি গৃহে ছিলেন তখন ইনি চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিতেছিলেন কিন্তু চৈতন্য ইঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দাবনে দীর্ঘ সুপুরোধে ইহাঁর

লোকনাথ গোস্বামী।

সেবা করিয়া ইঁহাকে সুস্থ করিয়াছিলেন। এই সুযোগে পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চৈতন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মুসলমানের জল খাইয়া, দাড়ি ও পাঠানের ন্যায় পোষাক করিয়া ইনি বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। ঘনশ্যামকে বলিয়াছিলেন, "তোমার মুখদর্শনের জন্য তাহার বক্ষঃস্থলের জন্য সুখ আমার এই—তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া দূরে অনেক দূরে পাঠাইলে।" প্রত্যহ বলিতেন, চৈতন্যদেব বলিলেন "লোক ও আমার ভাবিয়া বিরহ সন্তাপের সুখ দেখেন নাই।" যখন লোকনাথ বৃন্দাবনে গমন করেন তখন পথ অতীব সঙ্কটপূর্ণ ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বাদসাহের সৈন্যই দস্যুতা করিত। তাহারা ও লোকনাথ রাজপুতের পথ ধরিয়া পুরিয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে পাকা ঘিয়া প্রস্তুত করিয়া ২০ দিন অন্তর পর তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিতেন। লোকনাথ ঘনশ্যামকে সর্ব্বদাই বাড়ী পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখিতেন, ঘনশ্যাম বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বাড়ী যাইতে সম্মত হন নাই। লোকনাথ ঘনশ্যামকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে গিয়া তিনি তখন হইতে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আর লোকনাথের দেখা হয় নাই, সম্ভবতঃ ঘনশ্যাম বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন কারণ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকনাথের মত নীরব কর্ম্মী এবং নিঃস্পৃহ সাধু বৈষ্ণব ইতিহাসে খুব বেশী নাই। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যচরিতামৃত লেখায় অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন কিন্তু কবিরাজের প্রতিজ্ঞা ছিল যে তিনি তাঁহার পুস্তকে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে পারিবেন না। তিনি স্বভাবতঃ প্রচারের বিরোধী ছিলেন এজন্য কোন কিছু গ্রন্থ করেন নাই। অনেকানে নরোত্তমের সহস্র অনুরোধ, ভৈরব ও মিনতি এড়াইতে না পারিয়া সেই একটি মাত্র শ্লোকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। লোকনাথ দীর্ঘজীবন বৃন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার মূর্ত্তি এখনও বিশেষভাবে পূজিত

এই তিন ভ্রাতা অধ্যয়ন করেন ইহাদের অধ্যাপক অবশ্যই ওড়্যাদের ইহারা ইহাদের শিক্ষক সন্তান ও গুরু। সহিতই সংস্কৃত সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্রের সহিত পরিচয় করেন। সনাতন ছিলেন পরম পণ্ডিত সন্দেহ, সাহিত্য ও অলঙ্কারে তাঁহার যত ব্যুৎপত্তি হোকনা কেন তাহার উপর ছিল। ব্রহ্মের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল এবং তিনিও নানাশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। অনুপমের হাতের লেখা ঠিক মুক্তার মত ছিল। চৈতন্য একবার ইহার সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন "কায়ের আখর যেন মুকুতার পাঁতি"। ইহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেও কতকটা মুসলমান-সংস্রবেই এবং আচার-ব্যবহারে ঠিক মুসলমানের মত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা হিন্দু নাম ত্যাগ করিয়া মুসলমান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ সনাতনের লেখনকার্যের উপরে ন্যস্তপ্রাপ্ত কর্মচারী। সনাতনের উপাধি ছিল "সাকর মল্লিক" এবং রূপ "দবির খাস" নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাদের ছিল অমর ও সন্তোষ। ইহারা অনুপম একটি মাত্র পুত্র ও এক সাধ্বী পত্নী রাখিয়া অকালে লোকান্তরিত হন। যখন খৃষ্টীয় চৈতন্য বৃন্দাবনের পথে গোড়ের নিকটবর্তী রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হন, তখন রূপ ও সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে প্রায়ই তাঁহাদের জীবনে এই অল্পস্থায়ী মিলনে যে মহৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের একটা গুরুতর ঘটনা। চৈতন্য সনাতনের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যখন চলিয়া যান, তখনই সেই দিনই সনাতন ইঁহাকে মনুষ্য-দেহধারী ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন, তখনি তাঁহাকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিতে ত্রুটি করেন নাই। গৌড়ের রামকেলীতে চৈতন্যদর্শনের জন্য লক্ষাধিক লোকের ভিড় হওয়াতে হুসেন সাহ কলহপ্রিয় নাপিত দ্বারা এই খবর পাঠাইয়া দেন। একজন তুরুস্কসম্রাটের সন্ন্যাসীর দর্শনের জন্য এত লোক জমিয়াছে কেন—এই বিষয়ে নিষ্ঠাবান সংসার আসক্তির তার কলহের উদ্রেক ছিল। কলহ ফিরিয়া গেলে হুসেন সাহ তাঁহাকে চৈতন্যসম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, তিনিও উত্তরগুলিতে লিখিত আছে যে, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে চৈতন্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল ইহাই বুঝা যায়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সনাতন চৈতন্যকে বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, তীর্থদর্শনে যাইবেন অথচ সহস্র সহস্র লোক উৎসবানন্দ করিয়া আপনার পিছনে পিছনে ছুটিতেছে মনে হইতেছে যেন কোন রাজাধিরাজ সম্রাটের শোভাযাত্রা যাইতেছেন, ইহা আপনার শোভা নহে। ভিড়াইতে, কারণ সহ আজ যাহাদের সম্রাট সেদিনও উড়িষ্যার কতকগুলি দেবদেবি ও বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। যদিও এখন আপনার উপর তাঁহার ভক্তি জাত কিন্তু ইহার কারণের হৃদয়ে এক মুহূর্তে লাগে না। এই সম্রাটের যদি তিনি খ্রীষ্টের চক্ষে না দেখেন এবং কেহ যদি কুসংস্কারবশে তবে আপনার প্রতি অত্যাচার হইতে পারে—সুতরাং আপনি ফিরিয়া যাউন।" চৈতন্যের সঙ্গে যে লক্ষাধিক লোক চলিয়াছিল, কীর্তনানন্দে যে বিপুল নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—চৈতন্যের সে দিক মোটেই লক্ষ্য ছিল না, অনেক সময়েই তিনি এ বাহ্য অভিব্যক্তি অপরোক্ষ বোধ করিতেন সনাতনের কথায় তাঁহার এদিকে দৃষ্টি পড়িল, তিনি পুরী ফিরিয়া চলিলেন।

যাইবার পূর্ব্বে তিনি সনাতনের "সাকর মল্লিক" নাম ঘুচাইয়া তাঁহার "সনাতন" নাম দিয়া গেলেন এবং "ছবির মল্লিক"কেও "রূপ" নামে পরিচিত করাইলেন। চৈতন্য বলিয়া গেলেন যেন পুরীতে ইহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোড়ে ফিরিয়া সেই রাত্রে রূপ রাজকার্য্য-ব্যপদেশে অন্যত্র শয়ন করিয়াছিলেন। মধ্যরাত্রে তাঁহার পাশে একটা দরজার কড়া শব্দিত হয়। তিনি তাঁহার ভৃত্যকে ডাকাইয়া একটা আলো আনিতে বলেন; কিন্তু ভাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারে মোমবাতি হাতের কাছে না পাইয়া রূপের বহুমূল্য একটা শাল গায়ের উপর আগুন ধরাইয়া ফেলেন। রূপ বলিলেন, "তুমি আমার এত দামের শালটা নষ্ট করিলে?" স্ত্রী বলিলেন, "তোমার ইষ্ট ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বেখানে, সেখানে এই দরবাড়া, বহুমূল্য পোষাক আমার কাছে অতি তুচ্ছ কথা।" রূপ মনে ভাবিলেন "ইহার ঈশ্বর সেবা ও এ সকলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারিতেছি না। আমার প্রভুর সেবার জন্য আমি কি করিয়াছি বা করিতেছি? আমি তো ঘরের দাসী হইয়াই আছি।" চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর তাঁহার জন্মের স্বর্ণকারে যে স্বর্ণের মুদ্রার ছিঁড়ি লিখিত হইয়াছিল, এই তুচ্ছ ঘটনায় তাহার কথা উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার মনে পড়িল। তখন সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিপুল সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ব্রাহ্মণসমাজকে, এক চতুর্থাংশ কুটুম্বিনীদিগকে, অপর দুই অংশের একাংশ পরমেশ্বরকে এবং অপরাংশ সনাতনকে লিখিয়া দিলেন, সঙ্গে একটুকরা কাগজে একটি শ্লোক সনাতনকে লিখিয়া গেলেন তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত; প্রথম চরণটি এইরূপ "হরয়ে ক নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায়।"

রূপ পুরী আসিয়া চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিলেন—রূপ সংস্কৃতে যে দুইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে চৈতন্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। রূপ একই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও মথুরার কাহিনী লিখিতেছিলেন। চৈতন্য ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্য জড়াইতে নিষেধ করিয়া রূপের পরবর্ত্তীত উপাদানে দুইখানি নাটক লিখিতে উপদেশ দিলেন। তাহার ফলে আমরা বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব—মানবীয় সাধক-সাধিকার কোতুহলোদ্দীপ্ত এই দুইখানি নাটক পাইয়াছি। ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্য বিচ্যুত হইবার পর হইতে কৃষ্ণলীলার এক নবভাষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশ তার আর কোথাও সেই রস প্রগাঢ়ভাবে আস্বাদিত হয় নাই।

রূপ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন, তন্মধ্যে দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনে ইনি যে ভাবে জীবনযাপন করেন তাহা সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবন।

সনাতন রূপের চিঠিটুকু লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহারও মন হইতে বিষয়তৃষ্ণা দূর হইয়াছিল। চৈতন্যের দর্শনাবধি তিনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগের ন্যায় কোন সুযোগের সন্ধান লইয়া রাজসভায় প্রতীক্ষা করিতে পারিতেন না। রাজকার্য্যে মন নাই, ক্রমে কয়েক দিন রাজসভায় উপস্থিত হন না। রাজার মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার মত ইনিও পালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার সঙ্গে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সনাতন স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "আপনি হয়ত কোন দেবমন্দির ভাঙিবেন—হিন্দুর ধর্ম্মে হানা দিবেন, এমন কার্য্যের জন্য আমার সহায়তা চাহিবেন না।

আপনার অনেক মুসলমান মন্ত্রী আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও লইয়া যাউন।" হুসেন সাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। এদিকে সনাতনও রাজসভার কাজ প্রায়ই উপেক্ষা করেন, এবং সভায় উপস্থিত হন না। সম্রাট রক্ষীদের পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন সত্যসত্য সনাতনের কোন অসুখ হইয়াছে কি না। তিনি জানাইলেন, সনাতন দিব্য সুস্থ দেহে আছেন। হুসেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে একবার কারাগারে পাঠাইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গৌড় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ৭০০০ টাকা ঘুষ দিয়া সনাতনের আত্মীয়েরা কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলের নিকট হইতে সনাতনের মুক্তিলাভ করাইলেন। বন্ধুরা গঙ্গায় স্নানার্থ মাঝে মাঝে যাইত হইতেন। সেই সুযোগে সনাতন পলাইলেন। তাঁহার জন্য নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। এদিকে মীর হাবুলও খুব সতর্ক অনুসন্ধানের একটা বাহ্যাড়ম্বর করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। ঈশান নামক একটি ভৃত্যের সঙ্গে সনাতন সন্ন্যাসীর বেশে গৌড় ছাড়িয়া পলাইলেন। ঈশান গোপনে ৮টি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়াছিল। গঙ্গা পার হইয়া সনাতন শাহ্র নামক একটি ছোট পাহাড়ের নিকট এক পল্লীতে তাঁহার "হুঁইয়ার" বাড়ীতে আসিয়া গোপন করিলেন। এই হুঁইয়ার অতিরিক্ত আপ্যায়ন ও কাতরতায় সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সঙ্গে কোন অর্থ আছে কিনা। ঈশান সেই ৮টি মোহর তাঁহার হাতে দিল। তিনি উহা হুঁইয়াকে দিলেন। হুঁইয়া অকপটে বলিল "ইহা দিয়া ভালই করিয়াছেন, নতুবা আজ রাত্রেই আমরা আপনাদিগকে হত্যা করিতাম।" সমস্ত শিরোমণি হুঁইয়া ঐ অর্থ হইতে একটি মোহর পথখরচের জন্য সনাতনকে ফিরাইয়া দিল। সনাতন উহা ঈশানকে দিয়া তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। সমস্ত বাঙ্গলা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কৌপীন পরিয়া একক ছুটিয়াছেন। পথে এক মধ্যাহ্নে তিনি কতকগুলি মাটির ভেলা দিয়া শিবের বাসিল ও লক্ষ্মণসেন পঙ্কত করিয়া শুইয়াছিলেন। জলের ঘাটের দুই কোন মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল "সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিন্তু ভোগের অভ্যাস যায় নাই।" সনাতন বুঝিলেন, বহুদিনের অভ্যাস হইতে মুক্ত হওয়া অতি কঠিন। তিনি সেই মাতালকে বকশিস দিয়া চলিলেন। হাজিপুরে একটা ঘাটের গাছের নীচে শীতের রাত্রে তিনি উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্তী একটা বড় বাড়ী সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকণ্ঠ ভাড়া লইয়াছিলেন। হুসেন সাহ তাঁহাকে সমান হইতে গৌড় কিনিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সনাতনের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। যে-সনাতন গৌড় রাজ্যের সমস্ত রাজকার্য তাঁহার নিকট ব্যতীত থাকিতেন, সেই রাজচক্রবর্তীসদৃশ মহামন্ত্রীর কটিতে কৌপীন-বাস

পৌষমাসের শীতে তাঁহার কপালের কাঁপিতেছে নখদের, অথচ মুখখানি প্রেমসরোবরের শতদলের মত আনন্দে টলটল। শ্রীকণ্ঠ তাঁহাকে ফিরাইতে বহু চেষ্টা করিলেন, পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অবশেষে সেই দারুণ শীত নিবারণের জন্য শালদোশালা দিতে চাহিলেন, কিন্তু কুসুম হইতেও মৃদু এবং বজ্র হইতেও কঠোর এই লোকোত্তরগণের চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের এই শেষ কয়েকটি বছর [illegible] স্বীকৃত হইলেন। সনাতন কাশীতে যাইয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দীর্ঘকাল, তবু সকল সন্ন্যাসীরই নিয়ম, দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া লক্ষাটির গায়ে শত শত ফুল ফোটে। চৈতন্য সেইরূপ ভক্তি-সরোবরের সকল পাত্রের ঠাঁয় ফুটিয়া আছেন। সনাতনের লজ্জা বোধ হইল কারণ "ছোট কম্বলের সনে গ্রন্থি ঠাঁই বার বার।" কম্বলখানি এক ভিক্ষুককে দিয়া সনাতন লজ্জার হাত এড়াইলেন। কিন্তু সনাতন চৈতন্যদেবকে বলিলেন "আমার এই দেহ-ধন আপনাকে সমর্পণ করিলাম।" কাশী হইতে রূপের সঙ্গে দেখা করিতে সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন। তথা হইতে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় পুনরায় পুরীর দিকে রওনা হইলেন। পথে ঝাড়িখণ্ডের বন, চোর ডাকাতপুর অঞ্চলের পথে নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ভাবে স্নান করার ফলে সনাতনের সর্বাঙ্গে কণ্ডুয়ার স্থান হইল। গা-ময় ফোড়া। তিনি চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু চৈতন্য তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া টানিয়া আনিয়া বাহুতে করিলেন এবং দুই জন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের গাত্রের রক্তপূঁযে চৈতন্যের অঙ্গ আপ্লুত হইল। সনাতন লজ্জিত হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন আজই যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কারণ তাঁহার দেহটি অপবিত্র হইয়াছে এবং তাঁহার দেহের ব্যাধিগুলি একদিন চৈতন্যের নিজাঙ্গেও সংক্রমিত হইতে পারে। সনাতন যমুনার জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে চৈতন্যের দেহের গ্লানি হইতেছে, এই কথা তাঁহাকে কারণ বলিলেন। চৈতন্য যে সনাতনকে আলিঙ্গন করেন ইহা তথাকথিত ভক্তদের ভাল লাগে না। জগদানন্দ বলিলেন, "অকথ্য মথুরায় যাওয়াই উচিত।"

সেদিন মহাপ্রভু সনাতনকে আবার টানিয়া আনিয়া আলিঙ্গন করাতে সনাতনের দুঃখ ঘুচিয়া গেল। চৈতন্য বলিলেন, "তুমি কেন দেহের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিবে? জন্মজন্মান্তরে পাপসঞ্চয় করিয়াছ? তুমি তো কাজেই আমার দেহ-ধন আমাকে দিয়াছ, এই দেহের উপর তোমার কোন অধিকার নাই।" এই বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করায় চৈতন্যের দেহ রক্তাক্ত হইল। সনাতন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। চৈতন্য বলিলেন "তুমার দেহ মোর, ইহাঁ অন্য নাহি স্থান। তুমার লাগে দেহ মোর, ইহাঁ অন্যে কাঁহা যান।" সনাতনকে মথুরা যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিনি জগদানন্দকে ভর্ৎসনা করিলেন। আর একদিন রাজপথ দিয়া না যাইয়া চৈতন্যের অজ্ঞাতে সনাতন ঈশান নাগরের পথ দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার গায়ে রোদ্রতাপ লাগিয়াছিল। চৈতন্য বলিলেন, "রাজপথ দিয়া আস নাই কেন?" সনাতন বলিলেন, "রাজপথে কেহ আসিতে যাইতে পারে।" চৈতন্য বলিলেন, "তোমার স্পর্শে সেবকাধম পবিত্র হইতে পারেন, তুমাদি দুঃখ ভক্তিদের আপন ভক্তদের প্রতি এরূপ সতর্ক, তোমার ঠেক জগতে অতুল।" সনাতন চৈতন্যের উপদেশ লইয়া "হরিভক্তি বিলাস" নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, ইহা এখন গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র অবলম্বন। ধর্মচ্যুত ব্রাহ্মণের রচিত এই পুস্তক আজ সমাজে স্বীকৃতি পাইত না, অথচ এই পুস্তক সনাতনের ইচ্ছা-ক্রমে

গোপাল ভট্টের নাম চলিয়াছিল কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতের লেখক এবং জীব গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থে এই পুস্তকের রচনাসম্বন্ধে সকল কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন সনাতন বৃন্দাবনের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা রূপ ও সনাতনের চেষ্টায় তখন সে অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধবিধিস্ত, ভক্তমাল গ্রন্থে তাহা উল্লিখিত আছে সম্রাট আকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মহারাজ মানসিংহ সহায়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর যে মন্দির স্থাপন করেন, তৎসম্বন্ধে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, উক্ত রাজা তাঁহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে ঐ মন্দির রচনা করেন। রামদাস কাপুরি নামক বালকের জাহাজ নদীর চড়ায় আটকাইয়া যায়, তিনি সনাতনের বিগ্রহ মদনমোহনের নিকট মানত করেন—জাহাজের উদ্ধার হইলে তিনি একলক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে উক্ত বিগ্রহের মন্দির স্থাপন করিবেন বণিকের প্রতিশ্রুত অর্থে বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এই দুইজন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীর কৃপায় বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার হয় এবং উহা শত সৌন্দর্য্যের বিভূষিত হয় চৈতন্য চরিতামৃত-কার লিখিয়াছেন তাঁহার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না পাছে কোন স্থান বিশেষের প্রতি আসক্তি জন্মে, এইজন্য "একেক বৃক্ষের নীচে" এক রাত্রি শয়ন করিতেন, কৌপীন ও কন্থামাত্র সম্বল ছিল, মুষ্টিভিক্ষা করেই ছিল এবং দিনরাত্রি কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও ভাগবত পঠন করিতেন সনাতনকৃত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে রাজপুতনার অনেক রাজা সনাতনের শিষ্য হইয়াছিলেন সে অঞ্চলে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে ভক্তমালে লিখিত আছে তিনি একটা পরশপাথর পাইয়া তাহা অস্পৃশ্য বলিয়া যমুনার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সম্রাট আকবর যমুনার জলে তাহা মাখাইয়া তাহার খোঁজ করিয়াছিলেন (গ্রাউসের মথুরার ইতিহাস দ্রষ্টব্য) উত্তরকালে রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র **জীব গোস্বামী** বৃন্দাবন বৈষ্ণব সমাজের কর্ণধার হইয়াছিলেন

ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান বন্দরস্বরূপ ছিল অতি প্রাচীন কালেও ইহার খ্যাতি য়ুরোপ পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল রোমানদিগের "গাঙ্গা রিডিয়া" বোধ হয়

সপ্তগ্রাম নাম।

এই সপ্তগ্রাম অঞ্চল, সরস্বতী নদী শুকাইয়া যাওয়াতে এই নগর ধ্বংস পাইয়াছে। পুরাকালে কোনোক্রমে কোন রাজার সাত পুত্রের নামে এই গ্রামের নাম সপ্তগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ গৌড়ের পাঠান রাজার অধীন এক শাসনকর্ত্তা সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন কিন্তু এই বাণিজ্যক্ষেত্রের বিপুল আয় থাকায় সকল শাসনকর্ত্তারা প্রায়ই প্রবল হইয়া গৌড়ের বিদ্রোহী হইতেন এইজন্য বাদশাহ শাসনকর্ত্তা উঠাইয়া দিয়া সপ্তগ্রাম কমিশনরীর মত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামক দুই ভ্রাতাকে ইজারা দিয়াছিলেন দুই ভ্রাতাকে গৌড়ে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত, ইহা ছাড়াও এই সম্পত্তির আয় অতি বিপুল ছিল জাহাজের ঈশদ যে কর স্থাপিত হইত তাহাও একটা বড় রকমের আয়ের পথ হইয়াছিল রাজস্ব ছাড়াও দুই ভ্রাতা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বৎসরে নিজেরা পাইতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বারলক্ষ টাকা একটা সামান্য কথা ছিল না। হিরণ্যের কোন সন্তান ছিল না, গোবর্দ্ধনের পুত্র **রঘুনাথই** এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র

[illegible] [illegible] [illegible] [

করিয়া, চোখে জিজ্ঞাসা লইয়া তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে রঘুনাথের মন উদাস আর্দ্র হইল তাঁহার দৃষ্টি বহিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল কতক্ষণ সময়ে মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু এই যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে—ইহারা রঘুনাথের নিকটে ভগবান ছিল জিজ্ঞাসা ছিল, এমন অনেক ঘোরীর মত ঘুরিয়া চৈতন্যের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছিলেন এই সময় রঘুনাথ পানিহাটী গ্রামে আসিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন বিলাসপ্রিয়ী কৌতুকপ্রিয় পানিহাটীর অধিবাসীদের বাঁধাধরিকের বৈকুণ্ঠের রূপ ধরিয়াছিল রঘুনাথ বুঝিলেন—বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার স্থান নহে ইহাই তাঁহার প্রকৃত নিকেতন নিত্যানন্দ বলিলেন "চাঁদ কারে এবার ধরে খেয়েছি তোকে কৃপা দিনু" সমস্ত সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইলেও আসক্তির রূপ দেখাইতেছিলেন, এই 'মহাচমৎকার' তত্ত্ব তিনি চূড়া উৎসবে পাইয়াছিলেন যাহা হউক রঘুনাথ কৃপাগ্রহণ করিলেন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন, এই উপলক্ষে তাঁহার ধন সার্থক হইয়াছিল চাঁদর সহিত কাঁচা, ছাতা প্রভৃতি বিক্রয়ের সকলেই যথাযোগ্য দক্ষিণা পাইয়াছিলেন,—নিত্যানন্দের জন্য দামী চোলা সাদা এবং একশত টাকা প্রণামীর ব্যবস্থা হইল নিত্যানন্দ ব্যবস্থাপকদের গৃহে ছিলেন, তিনি পাইলেন একশত টাকা প্রণামী ও দুইখানা সোনা ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ লোককে তিনি যে টাকা হইতে যে টাকা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন এই উৎসবের নাম "দণ্ড মহোৎসব" অন্যান্য প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতার সন্নিহিত পানিহাটী গ্রামে এই উৎসব হইয়া থাকে।

এবার গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ পুনরায় গুরুতর সমস্যায় পড়িলেন, তিনি কয়দিন পূর্বে শোভা ছাড়িয়া দিলেন তাঁহার আহার ও নিদ্রা একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া রাজপ্রাসাদে তিনি মক্ষীর মত হইয়া রহিলেন তাঁহার মাতা একদিন রামদাসকে বলিয়াছিলেন "উহাকে একটা মানুষের মত করিয়া বাঁচাইয়া রাখ তবে পলাইতে পারিবে না গোবর্দ্ধন বলিলেন, "ইহারও ঐশ্বর্য্য, শ্রী অপরাজয়, এমন বাঁধনে আমরা বাঁধিব কেমনে?" সতর্ক পাহারার চোখ এড়াইয়া কয়েক বৎসর আচার্য্যকে ফাঁকি দিয়া ১৯ বছর বয়সে রঘুনাথ গৃহ ত্যাগ করিলেন তিনি একেবারে সপ্ত গ্রামে ত্রিশ মাইল হাঁটিয়া রাতে একটা পরিত্যক্ত গরুর আস্তাবলে কাটাইলেন তারপর সকালবেলা হইয়া পানিহাটে আসিলেন পূর্বেই আসিয়া তাঁহার এক ভিন্ন সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তখন তাঁর ঘরের বারান্দাতে চৈতন্য ছিলেন মুকুন্দ দত্ত অনুলিনির্দেশ রঘুনাথকে দেখাইয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন, "ঐ দেখুন, আমাদের বস্তু আসিয়াছে আজ কত কৃশ ও দুর্বল হইয়া গিয়াছে" চৈতন্য মহাপ্রভুর উপর রঘুনাথের নির্ভর ছাড়া ছিল তাঁহার নিজস্ব ও পুরুষকার বলিয়া কিছু ছিল না চৈতন্য ও অন্যান্য লোকজন পাঠাইয়া নিত্যানন্দ তাঁহার নিকট সংবাদ লইয়া গিয়াছিলেন তখনও নিত্যানন্দের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ হয় নাই অবশেষে দুঃখের অন্ধকার পুরীতে আছেন জানিয়া দুরন্ত বালকের হাত ধরিবার জন্য তাঁহারা সমস্ত [illegible]

টাকা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কে যেন পরে বলে এইজন্য তিনি সেই টাকা ফিরাইয়া না দিয়া তাহা হইতে মাসিক ৮০ আনা গ্রহণ করিয়া সেই বাহ্য বৎসরে একদিন বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ছয় বৎসর এইভাবে চলিয়াছে। সেই অর্থ হইতে আর কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণব তারপর একদিন স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভু আর আমাকে নিমন্ত্রণ করা না করেন?' স্বরূপ বলিলেন, "প্রভু বিশ্বাস করে অর্থ গ্রহণ করা পাপ মনে করে।" বৈষ্ণব এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রঘুনাথ যখন কাশীতে তাঁহার অনুসন্ধান করেন। পুরীর মন্দিরের দ্বারে দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া এক একটি তণ্ডুল ভক্ষা স্বরূপ এক এক জনের কাছে প্রার্থনাপূর্বক যে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, তাহাই একবার গ্রহণ করিতেন। অবশেষে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। মন্দিরের দ্বারের যে সমস্ত পড়া পাতাগুলি ফেলিয়া দিত, সেগুলি তাঁরা খাইয়া গেলে— তাহারই এক দুই বারবার পাকের করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তিনি দিনান্তে একবার খাইতেন। প্রায় সর্বদাই উপবাসে থাকিতেন। ঈশ্বরের এবং মহাপ্রভুর ভক্তের প্রতি ভক্তি ও প্রেম প্রগাঢ় হয় বলিয়াই তাঁহার সম্ভব ছিল। এই নিরলস মধুরপ্রকৃতি যুবক কুমার চৈতন্যদেবের কাছে আসিতে লাগিলেন ও প্রিয় হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি স্বরূপ দামোদরকে দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁর চৈতন্যের গীতাখানি উপদেশ শুনিতে চান। চৈতন্য তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মর্কটবৈরাগ্যের বিষয় খবর জানি না। তিনি যদি চান এখানে বিষয় স্বরূপ দামোদরই বিশেষ প্রাজ্ঞ, সেই তোমাকে শিক্ষা দিবেন।—তখাপি এই আমার কথা শুনিতে চাও, 'ফল্গু কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। সুলাভাগ্য সুদর্শন তাহাতে সহিষ্ণুতা অমানিনা মানদান কৃষ্ণনাম সদা করিবে।" ১৯ বৎসর বয়সে রঘুনাথ পুরীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার যখন ৩২ বৎসর বয়স তখন মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। একদিন রঘুনাথ চৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "আর কোন চাতুরের কথা আমাকে বলিতেছেন? আপনি ছাড়া আমার আর ঠাকুর নাই।" ইহার পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া দীর্ঘকাল তথায় যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে। মহাপ্রভুপ্রতিষ্ঠিত রাধার সোনালোর বাধায় একটি কাহিনী তিনি মালা রচিয়াছেন। তাহাতে তিনি তাঁহাদের কৃষ্ণাভিসারে যাত্রার শুরুতেই শ্রীকৃষ্ণাধিকাকে আরোপ করিয়াছেন।— রাধা শ্রীকৃষ্ণামৃত পান করিয়া লাবণ্যামৃতের তিলক পরিয়াছেন। তাঁহার সলজ্জহাস্য নীলাম্বরের কৃষ্ণ অঙ্গ সজ্জা সাধন করিয়াছে, তাঁহার প্রিয়ের উপর একান্ত নির্ভরতা এবং সচকিত দৃষ্টি অন্ধকারস্থলির কাজ করিতেছে তাঁহার একাগ্রতা নীলবস্ত্র অভিসারের পথ দেখাইতেছে।" ইতিহাসিকগণ সাধারণ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের খোসা ও কবিরাজের বাক বিস্তার বাদ দিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক রূপটি গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত "Chaitanya and his Companions" পুস্তক দ্রষ্টব্য। তাঁহার সব পুস্তকগুলিই ভক্তির ব্যাখ্যা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান তিনি দিয়াছিলেন। জন্ম ১৪৯৮ খৃঃ মৃত্যু ৮৬ বৎসরে, ১৫৮৪ খৃঃ

চৈতন্যের পরিকরদের মধ্যে অন্যতম অনুচর ছিলেন রামানন্দ রায়। তিনি উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ইঁহার পিতার নাম ছিল ভবানন্দ রায়। ইহাদের পিতা পুত্র পাঁচ ভাই একসঙ্গে রাজসেবায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব বলা হইত। ইঁহাদের বাড়ি ছিল মধ্য ভারতের বিদ্যানগরে। ইনি "জগন্নাথবল্লভ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের লেখক। যে কয়েকখানি পুস্তকের শ্লোক চৈতন্যদেব নিজমুখে গান করিতেন তন্মধ্যে রায়ের নাটকের শ্লোকও একখানি। গোদাবরীতীরে চৈতন্য ইঁহাকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্বক আনন্দিত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তথাকার ব্রাহ্মণসভ্যগণ বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই ন্যাসিপ্রবর কাহাকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন কেন?" বিদ্যানগরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দের প্রথমদিন যখন কথোপকথন হয়, তাহাতে প্রথমেই বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা লইয়াই হইয়াছিল। চৈতন্যের অনুরোধক্রমে রামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথাগুলি সংক্ষেপে করেন। প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক এই ব্যাখ্যার প্রমাণ। সাধ্যসম্বন্ধে এতদপেক্ষা উন্নত পথ গীতার নবম অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকের পরে ভাগবত হইতে কৃষ্ণার্পণ। তৎপরের অবস্থায় প্রেমে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ৪২শ শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণ ৮ম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোক, তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা বিষ্ণুর ১৭শ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত। তৎপরের অবস্থা ভক্তিসম্বন্ধের শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে প্রদত্ত। এই অবস্থায় গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মতত্ত্বের কথা—প্রথম মন্ত্র পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক। তৎপরে সখ্য ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক, ইহার পর বাৎসল্য ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ৮ম অঃ ৩১শ শ্লোক। তৎপরে মাধুর্য্য। গোবিন্দলীলামৃত, ১০ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক এবং ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৩৩শ অধ্যায় ৩৯শ শ্লোক এবং ভাঃ ৩১শ অঃ, ১৪শ শ্লোক এবং ৭ম অধ্যায়ের ৪৮শ শ্লোক। রামানন্দকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চৈতন্যদেব সকলশাস্ত্র মন্থনপূর্বক অবশেষে স্বয়ং রাধিকার মহাভাব প্রমাণ করিবার জন্য ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৯শ অঃ ৪র্থ শ্লোক এবং ৩০শ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, কোন ব্যক্তি একটী তাম্রখণ্ড স্বর্ণদ্বারা মুড়িয়া লইলে যেরূপ সেটী স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, চৈতন্যের সঙ্গে সংযোগে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে রামানন্দ সেইরূপ "রাগানুগা"র উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ সেদিন চৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রেমময়ীভাব বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি যে কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল"। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল। না সো বচন না হাস রভস ও সঙ্গ সে সব প্রেম কাহিনী কাকু সনে কহব বিছুরল জানি। না খোজল দূতী, না পুন তুয়া আনি দুহুক মিলন মাঝে পাঁচ বাণ অবসাই বিরাগ দুহু এক ভেল দুতী সপুরুষ প্রেম কৈছন বাঢ়।

এই কয়েকটী পরিকর ছাড়া **কর্ম্মকাণ্ড** গোবিন্দদাস যিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে

৬৪বৎসর কাল ভক্তিধর্ম্মের পুঁথিগত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ নবদ্বীপের 'সাঙ্গো' আগাছেন এবং খুব সম্ভব ইনি "শ্রীনাথক" নামে ভক্তকবি চৈতন্যের মাতামহের সঙ্গে একই পুরোহিত ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহার নাম 'নরেশ্বরাচার্য্যে' ভক্তিধর্ম্ম যোগ। ইহার মূল নাম অনিরুদ্ধ ছিল এবং ইনি মূল সঙ্গে অনুভব করিয়া যাঁহা আচার্য্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চৈতন্যের শিরোমণি হইয়াছিলেন।

কাটোয়াতে যখন সন্ন্যাস ও দীক্ষিত **শিবানন্দ সেনকে** যখন পুরীর প্রায় যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার পুত্র বিখ্যাত **পরমানন্দ সেন,** যিনি "কবিকর্ণপুর" নামে বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত এবং যাঁহার রচিত চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য-চরিতামৃত কাব্য চৈতন্যসম্বন্ধে আদি গ্রন্থসমূহের অন্যতম **মুরারিগুপ্ত**—যাঁহার আদি নাম ছিল মুরহরি—এবং ইহার কনিষ্ঠ ও দীক্ষিত এক সময়ে নবদ্বীপের গৌরব ছিল। ইহার পরম চৈতন্যভক্তিপূর্ণ সন্ন্যাসজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে। কবিকর্ণপুর ও মুরারিগুপ্ত উভয়ের সম্বন্ধে এক লিখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকখানি বাঙ্গলা পদ আছে। ইহাদের **পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ**—যাঁর আসল বাড়ী বরাহনগরের আড়ালে নিবিড় জঙ্গলময়। এই সন্ন্যাসের আদি বিদায় গ্রহণ করিলেন। চৈতন্য ইহাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন **বাসুদেব সার্ব্বভৌম** যিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রগণ্য ছিলেন,—পুরীতে যেখন চৈতন্যের নিকট ইহার বিদ্যের পরাজয় হয় সেখন বঙ্গের ও উড়িষ্যার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তখন চৈতন্যের নিকট বিদ্যায় ও ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন যে সার্ব্বভৌম অল্পবয়স্ক চৈতন্যকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি সন্ন্যাসের যোগ্য নও, আমার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুন, তাহলে তুমি তোমার বয়সমত কাজ বুঝিবে"—সেই সার্ব্বভৌম কি বলিলেন এই ভক্তিপথে যুবক অনন্ত আত্মসমর্পণকারিণী চৈতন্যের ভাবোন্মাদনা ও ভক্তিমত্তা দর্শনে পরাস্ত ও বিস্মিত হইয়া শুধু শ্লোকরচনাপূর্ব্বক ইহার স্তবগান করিলেন। প্রকাশ চৈতন্য তাঁহাকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। ইনি শাস্ত্র রামচন্দ্রের বন্ধুকার, অপর এক শাস্ত্র কৃষ্ণচন্দ্রের বাঁশী, এবং অপর চতুর্হস্ত মহাপ্রভুর রূপে ও ভক্তিতে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চৈতন্যের একটা অন্যতম ভক্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার অনুকরণে কবিতা লিখিতে পারিতেন—"দিনে বস্তু পড়ে যদি পুত্র মরি যায়, প্রভুর বিরহ তাহা সহা নাহি যায়" আর **প্রকাশানন্দ সরস্বতী** এই কালেই চৈতন্যের ভক্তদের আক্রমণ উদ্দেশ্যে নাম লিখাইয়াছিলেন ইনি ছিলেন কাশীর কণ্ঠিসন্ন্যাসীদের নেতা প্রথমতঃ চৈতন্যের আর বিদ্রূপ করিয়া ইনি কমই না মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কি থাকিতে পারে—সে এক ভক্তের। চৈতন্য এই সকল গালাগালি শুনিয়া প্রথমবার উত্তর দেন নাই কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার বিচার হইল

এই ভক্তিধর্ম্ম যে মূলের সহিত বিস্তারের কথা তখন একদিকে মুসলমানেরা বিস্তৃত মন্দির ও বিগ্রহাদি ভঙ্গ করিতেছিল, অন্যদিকে পণ্ডিত ভাবের বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বেদবেদান্তের চর্চ্চা করিতেছিলেন —এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি ব্রাহ্মণদিগকে অতি সূক্ষ্মবিচারপরায়ণ পণ্ডিত-গণের যোগ্যতা করিয়া চিন্তাশীলতার এমন উচ্চ স্তর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহাতে সমস্ত

পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নবদ্বীপের টোলের নিকট সম্ভ্রম অর্জন করিয়াছিলেন,—এই সময়ে নবদ্বীপের **বৃহদ্ভূমন্ধন** সম্বন্ধে যখন করিয়া যে স্মার্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশের এখনও কোটি কোটি হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন।—এই সময়ে **ভট্টাচার্যসার্বভৌম** তাঁহার অসাধারণ মনীষাদ্বারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলির গূঢ়মর্ম সকলকে বুঝাইয়া দিয়া হরের পরিচয় সাধারণের সম্মুখে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কাশীধামে সার্বভৌম পণ্ডিতের মহিমা, প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীর বিদ্যাকেন্দ্রের নায়ক এবং মহাপণ্ডিতগণের নেতৃত্বরূপ এবং সার্বভৌমের ভাগিনেয় **অনন্তভট্ট গৌড়ব্রাহ্মণ**—চিন্তাজগতের কর্ণধারস্বরূপ সমস্ত চিন্তাধারার খবর পাইতেছিলেন, এই সময়ে একদিকে নবদ্বীপ অন্যদিকে পুরীধামের খবর সম্ভ্রম বিস্তার যে অনুশীলন হইতেছিল তাহার একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার বিষয় বটে। তখন মিথিলার ছাত্র শিরোমণি এবং নবদ্বীপের বালকেরা অষ্টাদশবর্ষের গূঢ় মর্ম লইয়া আলোচনা করিত—"কালকের ছোঁড়ারা সনে কথা কয়ে" চৈ. ভা আদি।—এই অদ্ভুত শিক্ষা ও চিন্তার অনুশীলনে প্রত্যেকে ছিল কেবল নাচিয়া গাহিয়া, কেবল ঢল ঢল শরদিন্দু প্রভ আননশোভন একখানি সুখের মুখ দেখাইয়া এক লক্ষ লোক সমস্ত ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিলেন, এমন কি আকবর বাদশাহ পর্যন্ত তাঁহার স্তুতিবাচক পদ রচনা করিয়াছেন, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়? মোটকথা চৈতন্য পণ্ডিত শিরোমণি ছিলেন কিন্তু তিনি টোলে বসিয়া আকাশ পাতাল্লা করেন নাই ভগবদ্ভক্ত অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি শাস্ত্র পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রগাঢ়, গভীর ও গ্রন্থ-কীটদিগের বিদ্যা হইতে অনেক বেশী তিনি ভাবে মাতিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান, সহৃদয়তা ও মনস্তত্ত্ব এরূপ ছিল যাহা বড় বড় সমাজ- ও ধর্ম-সংস্কারকগণের ছিল না। সনাতনকে শিক্ষা দিবার সময় যখন তিনি ভক্তিরসামৃত বিলাস লিখাইয়াছিলেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন যে গ্রন্থকার অনুশাসনের জন্য যেন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হয়। যত শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি দিতে বলিয়াছিলেন চৈ. চ. সনাতন শিক্ষা। বস্তুতঃ ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে তিনি পণ্ডিতের শিরোমণি ছিলেন, যিনি যেন জন্মিতে বৃদ্ধিত হইয়াছেন, ভক্তিপথে উন্মত্ত হইয়া ভক্তগণ তাঁহাকে নিরন্তর আলিঙ্গন করিয়া থাকিতেন—"নিরন্তরে আলিঙ্গই ভক্তগণ" এবং যাঁহার চক্ষের জল বিতীর্ণ করিয়াদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিকট যেখানে ইহা হইতে অধিকতর উচ্ছলিয়া পড়িত, তিনি শাস্ত্র-বিচারের সময়ে একটিও হলের কথা বলিতেন না যাহা যেন স্বয়ং বিদ্যাদেবী বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখ সরোবর হইতে অধিকতর প্রমাণ জোগাইত যাঁহারা আজীবন কোন এক বিশেষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া দেখিতেন, ঠিক সেই শাস্ত্র চৈতন্যের অন্য কোন ভক্ত বা পণ্ডিতের ও কখনও সেই শাস্ত্রের মর্ম তিনিই বুঝিয়াছিলেন, আজীবন ঘাটিয়াও তাঁহারা সেই জ্ঞানের সীমায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই তিনি জানিতেন জনসাধারণ শাস্ত্রকে ত্যাগ করিয়া কোন কথা স্থায়ী ভাবে বিশ্বাস করিবে না এজন্য তিনি তাঁহাদের জল চোখের জলে ও

পণ্ডিতের মুখ ধারের লীলা।

মধুর হরিনামে আকৃষ্ট করিলেও তাঁহাকে বলপ্রয়োগ সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন চৈতন্য ভিন্ন অন্য কেহ এই অসাধারণ কার্য সম্পাদন করিতে পারিতেন না তিনি ছিলেন একাধিক ভিন্নভাষার অসাধারণ ভাষাবিদ—তিনি একটি ভাষা জানিতেন অনেকে কিন্তু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রাকৃত ও অবহট্ঠা পড়িয়াছিলেন গৌড়পাদ ভারতী [illegible] সম্বন্ধে ইহার অনেক বেদান্ত গ্রন্থের সঙ্গে মত-বিভেদের উল্লেখ আছে পাণ্ডিত্য সূত্রে কেশব কাশ্মীরী যশস্বী ছিলেন উড়িষ্যায় এই বয়স থাকিয়া তিনি সেই ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন তিনি উড়িয়া ভাষায় সার্বভৌম পণ্ডিত অভ্যর্থনা করিতেন, "জগন্নাথ প্রভু পরিমুণ্ডাই"—পড়ার উড়িয়া পদ তিনি সকলে আবৃত্তি করিতেন, অনেক উড়িয়া কবি তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন তেলেগু ও মালাবারম [illegible] স্থান অনেক কথা বলিতে পারিতেন মারাঠি প্রভাব [illegible] ছিল—মালাবারম, তাঁহার অনুচরেরা চৈতন্যদেবের সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, এসম্বন্ধে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন —"একজন লোক আসে কাহি যাহি করি কি কহিল কথি বুঝিতে না পারি তাঁর ভাষা বুঝি তব প্রভু সমীপে কাহি যাহি বলি তারে দিলেন বুঝায়" তুর্কির সম্বন্ধে এই উল্লেখ আছে—"কখনও আমল তুর্ক বলে লোকে যায় কিছু ও সংস্কৃত বলে তুরুস্কের ভাষায়"—এই ভাষার কথা অন্য লোককাহার অবকাশে গোবিন্দদাস [illegible] নাই, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"এই দেশে তুমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাল জান ভাষা ব্যবহার" উড়িষ্যার সমাজ বিদ্যাপতির মৈথিল পদের উপর বাঙ্গলার পাঠক পাঠিকা [illegible] বিদ্যাপতির পদ যখন খুব মৈথিলী ছিল চৈতন্য নিজেও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ গান করিতেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীত, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ স্বরূপরামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে গায় শোনে পরম আনন্দ॥" চৈ চ। তুলসীদাস তাঁহার চেয়ে ছয় বছরের ছোট ছিলেন তখনকার দিনের আদর্শানুযায়ী সকলেরই বিবাহ হওয়া ছিল সেই হিসাবে অনুমান করা যায় তুলসীদাস ক্রমাগত ছয় বছর থাকিয়া তিনি অনেক কথা জানিয়া লইয়াছিলেন পাঠান বিজলী খাঁর সঙ্গে চৈতন্যের মুসলমান ধর্মসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল, বিজলী খাঁ আরবি ও পারস্য ভাষায় একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের মুসলমান ভক্তদের সঙ্গে যে বিচারের আভাস আছে, তাহাতে মনে হয় পারসী ও আরবী ভাষার মোটামুটি জ্ঞান তাঁহার ছিল।

এখানে দেখা যাইতেছে চৈতন্য আরবী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, উড়িয়া, মৈথিল, তামিল, তেলেগু, মালাবারম, অসমীয়া, এই সকল ভাষা ভালরূপ জানিতেন। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহাদের পারিভাষিক [illegible] যাতায়াত করিতেন আসামী ভাষার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় থাকিবার কথা নানা প্রদেশে হরিনাম ও প্রেমধর্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে এই সকল ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

শুধু সংস্কৃতে নহে, এতদ্ভিন্ন তাহার যুৎপত্তি থাকায় তিনি জনসাধারণকে সর্বত্র উপদেশ দিতে পারিতেন। তিনি আগমবেদ ও দাক্ষিণাত্যের বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তত্ত্বকালে সহজে তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। "আমি মূর্খ সন্ন্যাসী কি বিচার করিব?" এইরূপ পরম দৈন্যোক্তি-দ্বারা বিচার সভা এড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু যখন তিনি 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতেন, হাজার শত সহস্র লোক সেই নামামৃত পান করিবার জন্য আকৃষ্ট হইত, অকস্মাৎ যেন সেখানে পদ্মগন্ধ ছুটিত—শরৎকালের অপরাহ্ণ নবনদী বহিয়া যাইত, চন্দ্র পদ্ম মন মোহাকিত ও চক্ষু সজল হইত, "পশ্চাৎ ভাগেতে দুই লোক ডাকাইত, ধনু শর লইয়া আছে দাঁড়াইয়া। নারীগণ আগুলিয়া মুছিছে ঘাম চলে," এবং "অমৃতের সিন্ধু তৈল সকলি ফুটিয়া হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া।" মহাপ্রভু দেশে যখন এরূপ বৃহৎ সংকীর্তন হয় তাহা যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই এইরূপ। কৃষ্ণের মোহিনী মূর্তি দেখিয়া তাঁহার মাতৃস্বসা অর্থাৎ যেরূপ শত শত দেবতারা অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পড়িতে ছুটিয়াছিলেন, সেরূপ সুন্দরী কোন যোড়শ বর্ষীয়া রমণী রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইলে যেমন শত শত চক্ষু নির্নিমেষে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, চৈতন্যের অলৌকিক দুইটি চক্ষু ও কণ্ঠস্বরের অপার্থিব মাদিনী শক্তি বৃদ্ধ অশীতিপর নরনারী হইতে আরম্ভ করিয়া অবোধ শিশু পর্যন্ত সকলকেই মন সেইভাবে তত্ত্ব সাগরের পাড়ে টানিয়া লইয়া যাইত। এত বিদ্যাবুদ্ধি, এত পাণ্ডিত্য ও এত ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, সেই গুরু চিন্তাপ্রবাহের মূলে পণ্ডিতা না থাকিলে কেহ আদর পাইত না।

নবদ্বীপে জগাই মাধাই এর কীর্তন সম্প্রদায় কেন ভাঙ্গিয়া গেল তাহা আমরা জানি না। শুধু এই মাত্র জানি যে, জগন্নাথ মিশ্র নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে অধিবাস করিয়া ও পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুসেন সাহের সঙ্গে ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল এবং ইনি সম্রাটের নিকট হইতে কিছু খেতাব পাইয়াছিলেন। জগন্নাথের দুই পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দন, সুপরিচিত **জগাই** বা জগন্নাথ রঘুনাথের পুত্র এবং মাধব বা **মাধাই** জনার্দনের পুত্র, এই দুই যুবক নবদ্বীপে অসুর-তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জগাই ও মাধাই।

জগতে এমন কোন পাপ নাই যাহা ইহারা না করিত। দিবারাত্র মদ্যপান করিয়া বিভোর থাকিত—"বাক্য হইয়া মত্ত গোমাংস ভক্ষণ, ডাকা চুরি গৃহদাহ করে অনুক্ষণ" (চৈ. ভা.), চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উপর ইহাদের আক্রোশ ছিল, এই দিনরাত্র হরিরোলের হট্টগোল ইহাদের অসহ্য হইয়াছিল,—ইহারা একদিন দুই জন সাধুকে পথে পাইয়া তাহাদের মস্তের ভাঁড়টা ছুঁড়িয়া মারিল; নিত্যানন্দের কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাপি প্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন—"আমাকে মারিয়াছ দোষ নাই, কিন্তু একবার তোমার শ্রীমুখে হরিনাম কর—আমার বাপার জ্বালা জুড়াইবে।" এই কথার পরেও মাধাই আর একবার তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু চক্র সাধুদ্বয়ের করুণাপূর্ণ ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া জগাইএর নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, সে মাধাইকে বারণ করিল। কি মধুর কণ্ঠ—স্নেহার্দ্র ও মহাশীল। চৈতন্য কেবল বলিলেন,—"মাধাই, তুমি উহাকে না মারিয়া আমাকে মারিলেই

পারিতে।" দুই ভ্রাতা বাড়ী ফিরিয়া গেল, কিন্তু মাতাদের অনুতাপে রাত্রে ঘুম হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে তাহারা চৈতন্যের দরজায় ঘা দিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল "আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।" চৈতন্য বলিলেন, "আমি সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু নিত্যানন্দের অপরাধ তো আমার কাছে নহে তোমরা নিতাইয়ের কাছে যাও।" নিতাই বলিলেন, "কিন্তু যদি নিতায়ের কাছে অপরাধ করে, তবে কি তাহারা ভাল গতি পাবে? আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, পরন্তু আমি যদি জীবনে কোন পুণ্য করিয়া থাকি তবে তাহার ফল যেন তোমরা পাও। ইহাই আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।" নিতাইয়ের চোখে জল ও মুখে হরিনাম এবং সাধুর আশীর্বাদের জন্য প্রসারিত হাত চৈতন্য ও নিত্যানন্দের দুই ভক্তই দস্যুদলের মনে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে ইহারা নিত্যানন্দের নিকট আবার উপস্থিত হইল। মাধাই কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু, তুমিত আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছ কিন্তু তোমার মত সাধুর গায়ে হাত দেওয়ার জন্য নরকের আগুন কিছুতেই কমিতেছে না— কত পাপী লোকের উপর যে আমরা অত্যাচার করিয়াছি তাহার অবধি নাই। অনুতাপের দুঃসহ-জ্বালা যে কিছুতেই কমিতেছে না, তুমি আমার পাপের বোঝা হালকা কর।" নিত্যানন্দ তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "গঙ্গার ঘাটে যেসকল লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছ, গায়ে পড়িয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" মাধাই কাহার উপর অত্যাচার করে নাই। যাহাদের হত্যা করিয়াছে, তাহা কি তাহার মনে আছে? একখানি ভোজাল হাতে সে ঘাটে একটি ঘাট প্রস্তুত করিল এবং যে সকল লোক স্নানার্থ তথায় আসিত, করজোড়ে তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিত। এইভাবে দুঃসহ সেবাবৃত্তি ও সাধুজীবনের দ্বারা তাহারা তাহাদের অসাধু জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে নরহরি তাঁহার ভক্তিরত্নাকর রচনা করেন, তখনও "মাধাইয়ের ঘাট" বিদ্যমান ছিল এই ঘাট কোন লোকবিশেষের স্মৃতিস্তম্ভ নহে,—অপরাধ ভঞ্জন প্রায়শ্চিত্তের চিরস্মরণীয় স্তম্ভ। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি এই ঘাটের সামান্য অংশ তাঁহার বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন। এখন আর উহার কোন চিহ্ন নাই।

এই জগাই-মাধাইয়ের জীবনের পরিবর্তনসম্বন্ধীয় যে কত গান পল্লী-কুসুমের মত বাঙ্গলার তরুচ্ছায়ার শীতল বাতাসে ফুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অবধি নাই। একটিতে জগাই মাধাই যাহা বলিতেছে, তাহার ভাবার্থ এই —যারে, জগাই-মাধাই দুই জনে আজ, গঙ্গাতীরে ঐ মধুর হরিনাম কার শ্রীকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, পূর্ব্বেতো ঐ নাম যমের মত কঠোর লাগিত, আজ নাম শুনিয়া কেন মন ধন চোখের জল পড়িতেছে?

ইহার পর চৈতন্য সন্ন্যাসী হইলেন—জগাচার্য্যের তাঁহাকে প্রহার করিবেন, তব দেখাইয়াছিলেন। চৈতন্য মুকুন্দকে বলিলেন—আমি গৃহী, এইজন্য আমার মুখে ইহারা নাম গ্রহণ করিবেন না। যাঁহারা আমাকে বাধিতে চাহিতেছেন, কাল বাটিয়া সন্ন্যাসী হইয়া

তাঁহাদের পায়ে পড়িয়া হরিনাম দিব—তখন তাঁহারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।

" চণ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী।
নামে মত্ত হইয়া লওয়াইবে সারি সারি॥
বালক বলিবে হরি বালিকা বলিবে।
পাষণ্ড অঘোর-পন্থী নামে মত্ত হবে।
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে
রাজা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি যাবে॥"

চৈতন্যের সন্ন্যাস

চৈতন্যের সন্ন্যাসে দেশময় যে শোক হইয়াছিল, তাহা শত শত গানে বঙ্গের ঘরে ঘরে এখনও কারুণ্য জাগাইয়া রাখে। শচী ১৭ দিন উপবাস করিয়াছিলেন—"যাদব উপাসে আই করিলা ভোজন" চৈ ভা। তাঁহার অনুমতি না লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ অসম্ভব। তিনি যে ভাবে অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহা অতি করুণ। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমার উপর—তোমার এই তরুণ বয়স্কা স্ত্রীর উপর কি তোমার কোন কর্তব্যই নাই? এখানে থাকিয়া কি ভগবান্‌কে ডাকা চলে না? আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করাই কি তোমার ধর্ম? তুমি ধর্মাবতার, তোমার মাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কি ধর্ম করিবে?—আমাকে বুঝাইয়া যাও।" চৈতন্য বলিলেন "মা, তুমি কি জান না কি ভাবে কৌশল্যা রামকে বনে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন সেহার্দ্র অশ্রু বাৎসল্য বিরহ সহ্য করিয়াও তাঁহার পুত্রকে সৈরাগ্যের পথ হইতে নিবৃত্ত করেন নাই তুমিতো সেই দেশেরই রমণী। আমি জগতে হরিনাম বিলাইব, মা, তুমি আমার সাধুপথে বাধা দিও না, এই পরিবারে আবদ্ধ থাকিয়া আমি তাহা পারিব না তোমার ছেলে সকলকে ভগবানের প্রেম দিতে যাইতেছে, তুমি ভারতের পূজ্যা—নারীকুলে জন্মিয়া আমার কোথায় নিবাইও না।" শোকে মৃতপ্রায়া শচী অনুমতি দিয়াছিলেন, কারণ ধর্মের আহ্বানকে তিনি প্রাণ দিয়াও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন নিকুপ্রিয়া যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা ঈশান-নাগর অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিয়াছেন—সে উৎকট তপস্যা চৈতন্যের সহধর্মিণীরই উপযুক্ত নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া গিয়াছিল, ভট্টাচার্যগণ অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন, বাজারে দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ ছিল, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে নাই, চৈতন্য ছাড়া আলাপের অন্য প্রসঙ্গ ছিল না, সে আলাপ অশ্রুময়—চৈতন্যতনু-সদৃশক শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শচী অনিদ্ররজনী ধূলায় পড়িয়া কাটাইয়া দিতেন শ্রীবাস হরিপূজার জন্য ফুল তুলিতে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যাইতেন, কখনও বা 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া গুরুদেবতাকে পূজা করিতে যাইয়া 'চৈতন্যায় নমঃ' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। এখনও নবদ্বীপবাসীরা বাধুর গাহিতে দেন না—বাধুর অর্থ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-

যায়। কিন্তু তাঁহাদের কাছে তাঁরা চৈতন্যের সন্ন্যাসের পরবর্তী। তাঁহারা চৈতন্যের সন্ন্যাসমূর্তি আঁকিবেন না, বা মূর্তিতে গড়িবেন না। সন্ন্যাসের পর তাঁরা কিছু হইয়াছে তাঁহারা এখনও তাহা শুনিতে চান না। তাঁহাদের সম্মুখে সঙ্কীর্তন "নবদ্বীপ লীলাস্মারক গান ও কীর্তন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করার পরের কথা তাঁহারা শুনিতে চান না।

নবদ্বীপ হইতে যাইবার পরে ২৪ বৎসর বয়স্ক চৈতন্য কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৫০৯)। যে সুন্দর চাঁচর কেশ পুষ্পমালা শোভিত হইয়া তাঁহার অপূর্ব রূপের শ্রী বাড়াইয়া তুলিয়াছিল, সেই কেশ মুণ্ডনের উপলক্ষে কাটোয়ার নরনারী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজের নেতা—চৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতি 'সন্ন্যাস করিল নিমাই' গভীর দুঃখের সঙ্গে চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ ও কেশমুণ্ডনের সংবাদে একটা আঘাত পাইয়াছিলেন যে তিনি কতকদিনের জন্য বিপন্ন হইয়াছিলেন—তখন নিমাই বাঙ্গলার একচ্ছত্র ভাবুক তুলিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল "বিশ্বম্ভর মিশ্র, যিঁহা সবার বাড়ী নদীয়া"। এখন সন্ন্যাসগ্রহণের পর যে নাম হইল তাহাও কম মিষ্ট নয়। সন্ন্যাসীর নাম কেশবভারতী দিলেন "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য," কিন্তু বাঙ্গালা জন সাধারণ এ সকল আভিজাত্যিক নামে কিছু ধার ধারে নাই তাহারা তাঁহাকে "গৌরাঙ্গ" "প্রাণের গোরা" "গোরা চাঁদ" "নদের চাঁদ" ইত্যাদি নামে ডাকিতে থাকে।

তিন বৎসর নীলাচলে থাকিয়া চৈতন্য পূর্ব বঙ্গে গেলেন। তখনই তাঁহার জীবনের গতি অন্যরূপ হইল। কিরূপ ভাবোন্মাদক ভাবে তিনি অনুপম গৌড় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম ও তাঁহার সন্ন্যাসীক অনুচরদের প্রেমভক্তিতে গড়িয়া শেষে তাঁহাকে তপনানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সার্বভৌম বাসুদেব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন, অথাধ প্রেমের তরঙ্গ তাঁহার কথা ভুল করিয়া দিয়া ছিল—একটি কথাও বলেন নাই। বাসুদেব বলিলেন, "সার্বভৌম, তোমার প্রতিভার কথা সকলের মুখে শুনি কিন্তু আমার এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী ব্যাখ্যার সময় তুমিতো একটিও কথা বলিলে না কত লোক কত প্রশ্ন করিয়াছে তুমি মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছ। তুমি কি আমার ব্যাখ্যা শোন নাই?" চৈতন্য বলিলেন, "আপনার মত প্রবীণ পণ্ডিতের কাছে আমি কি বলিব,—তবে আমি অন্যরূপ বুঝিয়াছি।" শঙ্কা তো কম নয়। বৃদ্ধ বাসুদেব সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র জগন্নাথ মিশ্রের তরুণ পুত্র তাহা হইতে অন্যরূপ বুঝিয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাসীই যখন চৈতন্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধ বাসুদেব দেখিলেন, পরীক্ষা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভার নিকট দাঁড়ায় না, কুল গিরিনদী যেরূপ বিশাল পাল-তোলা জাহাজকে খরস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়, চৈতন্য সার্বভৌমের যুক্তিতর্ক তেমনি অনায়াসে ভেলিয়া ফেলিলেন এবং ভক্তিবাদ দৃঢ় করিলেন। উপসংহারে চৈতন্য পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ছাড়িয়া ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে হরিনামের মহিমা বর্ণন করিলেন। পরাজয়ের আহত অভিমানে বাসুদেবের হৃদয়ে যে আলা হইয়াছিল,

এবার তাহা ঘুচাইয়া গেল। বৃদ্ধ পণ্ডিত চৈতন্যকে বেষ্টন করিয়া সাক্ষাৎ করিয়া সাক্ষাৎভাবে তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কাশীর প্রকাশানন্দ চৈতন্যের কতই নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন চৈতন্যের অপূর্ব ভক্তিব্যাখ্যা শুনিয়া সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসের মেরা সন্ন্যাসী বাঙ্গালী সাধককে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন তখন কাশীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সার্বভৌমের সুপ্রসিদ্ধ ভগ্নীপতি ভট্টাচার্য গোপীনাথ প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের সভাও একই ফল হইল। সেকালে কিরূপ গুরুগৃহে গোপনীয় নটী-সেবা গুরুর বাহ্যমুখের সংপথে আনিয়াছিলেন তাহা জয়ানন্দের আখ্যানে বর্ণিত আছে, কিন্তু গোবিন্দ কর্মকার তাহার এমন বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন যে তাহা একটি চিত্রপটের ন্যায় মনোহর হইয়াছে।

যাত্রার প্রায় সমাপ্তিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, নরেন্দ্র সরোবর, শিব মন্দির প্রভৃতি তীর্থস্থানের বিভিন্ন দৃশ্যের কি অদ্ভুতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার মুখে চোখে যে অপূর্ব অধ্যাত্ম আলোক ফুটিয়াছিল, যেসকল অশ্রুগদগদ ভক্তের চক্ষে সে স্বর্গীয় প্রেমের কথা লিখিত ছিল তাহাতেই ঐ সকল অলৌকিক ঘটনা সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি উপদেশ আর কতই দিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে এরূপ আর 'স্বর্গীয় বাক্য' কেহ বলে নাই। অধিক উপদেশ বাক্যে, বক্তৃতা প্রভৃতি চিরব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার না করিয়া শুধু নাম-বলে লোকের চিত্ত এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। যে মত ধর্ম ভক্তিরস যুক্ত হইটি বেদ্য লইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে আসিয়াছিল এসে তাঁহার মুখে শুধু চন্দনের ফোঁটা আর হরিনাম জপের মালা দেখিল, তাঁহার নিযুক্ত সন্ন্যাসী ও দণ্ডধারীদিগের বেদান্তের কলের গন্ধে মাতিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা এই প্রেমোন্মাদের ভগবদ্ভক্তির সঙ্কাস দেখিয়া কীর্তনের পথে পথিক হইল। ষাট বৎসরের শাসন দণ্ড নামোচ্চারণ—চৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া শাসন হইয়া গেল। সে তাহার অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত চিরতরে ফেলিয়া দিয়া সেই দিন হইতে চৈতন্যের যে সঙ্গ লইল, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাহা ছাড়ে নাই। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি, উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের পিছনে পিছনে অনুগত সেবকের ন্যায় চলিতেন। যে প্রতাপরুদ্রের কথাটি মুখে বিশাল বঙ্গের মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহাশয় সিংহাসনচ্যুত হইতেন, কবিকর্ণপুর সন্দিগ্ধচিত্ত জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন এই মহাবীর রাজরাজেশ্বর চৈতন্যকে দেখিয়া নবদ্বীপের ন্যায় কোমল হইয়া তাঁহার সামন্তরাজ হইতেন কোন্ গুণে? এই প্রতাপরুদ্র হুসেন সাহের হাত হইতে গৌড়দেশ কাড়িয়া লইবার জন্য একবার সমরোদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইঁহার সাম্রাজ্যের অনেক প্রদেশ জয় করিয়া সার্বভৌম রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। ইহার আদেশে চৈতন্যের যে মূর্তি আঁকা হইয়াছিল তাহার পাদপীঠে সমরাঙ্গণপ্রবৃত্ত কস্তূরীতে রাজার তুরঙ্গের খুরটি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইনিই চৈতন্যের সঙ্কীর্তন শুনিয়া গোপীনাথ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ কোন্ রাগিণী? অর্থবোধ না হইলেও যেমন কোকিল কাকলী, এ যে তেমনই মিষ্টি এমন মধুর রাগিণী ত আমি শুনি নাই, ইহা কে উদ্ভাবন করিয়াছেন?" গোপীনাথ মিশ্র বলিলেন—"ইহা মনোহর-সাই কীর্তন, ইহার স্রষ্টা স্বয়ং চৈতন্যদেব।" প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুষোত্তম দেবের

একমাত্র পুত্র ছিলেন পরমা সুন্দরী পত্নী কাঞ্চিদেবী ঘরের রাজকন্যা ছিলেন প্রতাপরুদ্রের পিতা উহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে রাজার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন রাজা উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "সে সম্বন্ধ ও দুলহের কাছ হতে হাতে আমার কন্যা দিতে পারিব না।" বংশের একজন ভাটমুখে তাহারা সোনার কাঁটা হস্তে পুরীর মন্দির সাফ্ করেন, উহা চিরাচরিত রীতি ছিল রাজা ইহাই লইয়া দম্ভ করিয়া পুরুষোত্তমকে কটুভাষায় বলিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধে কাঞ্চিদেবী আক্রমণ করেন এবং রাজাকে পরাস্ত করিয়া পদ্মিনীকে পুরীতে লইয়া আসেন এবং সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন "এই বন্দী রাজকুমারীকে আমি সকলেরই এক আদরের বস্তু দিব।" মহাদেবী ঈর্ষান্বিত হইয়া একটা ষড়যন্ত্র করিলেন

আদরিণী সেই রাজবালা। এবারও বসন্তের সেই দিন আসিল যেদিন রাজা স্বর্ণ ঝাঁটা হস্তে পুরীর মন্দির পরিষ্কার করিতে গেলেন এই সুযোগে প্রধান মন্ত্রী বন্দী রাজকুমারীকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইঁহাকে কোন কাপুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, আপনিই সেই কাপুরুষ, ইঁহাকে গ্রহণ করুন।" রাজার মন আজ হইয়াছিল, তিনি এই অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, পদ্মিনীকে বিবাহ করিলেন। কৃষ্ণ কবির নায়ক উড়িষ্যা-কবিও এই কাপুরুষজনক ঘটনা লিখিত আছে। আমাদের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় লইয়া একখানি সুন্দর সরল কাব্য লিখিয়াছেন।*

প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুষোত্তম ও রাণী পদ্মিনীর পুত্র। চৈতন্যের তিরোধানের পর প্রতাপরুদ্র মাঝে মাঝে পুরীতে ছিলেন, অন্যান্য সময়ে যুদ্ধপ্রায় ছিলেন। একদা কবিকর্ণপুরকে (পরমানন্দ সেনকে) তিনি বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ রথযাত্রার সময় উপস্থিত, নীলাচলনাথ রথের ছটায় ঝলমল করিতেছেন একদিকে নীল সিন্ধুজলের অযুত সঙ্গম, অন্য দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দ-কোলাহলে পুরী যেন মহাজনে পাইয়া আসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চৈতন্য বিহনে এই উৎসব আমার কর্ণিকারপ্রায়ও আনন্দ হইতেছে না, তুমি তাঁহারই লীলা বর্ণনা করিয়া আমাকে শুনাও।" এই আদেশের ফল—সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

চৈতন্য একবার পূর্ব হইতে পালাইয়াছিলেন পার্থিব স্নেহ মমতার সম্পূর্ণ অন্তরে পড়িলে নিশ্চয় সাধারণের প্রেম ও ভক্তিরই বন্যা পড়ে পুরীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও নদীয়ার মত তাহার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে জগদানন্দ তাঁহার প্রতি মাতার অধিক যত্ন করেন এবং তাঁহার স্নান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি লইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন, নীলাচলের উপবাসের কাঠিন্য আনিয়া তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তিনি না খাইলে তত নিজে উপবাসী থাকেন, না হয় অভিমান করিয়া তিন দিন চৈতন্যের সঙ্গে কথা বলেন না। একদিন হীন চৈতন্যের জন্য একটি কুলীন বালিকা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন তরুণ সন্ন্যাসী অতি

পুরীতাপের সঙ্গী।

* প্রতাপরুদ্র পদ্মিনী লইয়া যে প্রথম মন্দির বাহির একটিম মাত্র করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার ১০শ অধ্যায়ে আছে।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শুধু দেহের পাথরের উপর শুইয়া থাকিতেন, জগদানন্দের ইহা সহ্য হয় নাই সেই জন্যই তিনি চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "জগদানন্দ, বিষয়ের আর আমার আসবাব বাড়াইতে কেন? এখন একটা ঘাট পরিয়া এস এবং আমাকে ভিক্ষা বিষয় ভোগ করাইবার অন্যায় চেষ্টা কর।" আর একদিন এক ভক্ত চৈতন্যকে এক ভাঁড় সুগন্ধ তৈল উপহার দিয়াছিলেন, চৈতন্য বলিলেন, "ইহা বন্ধিবে লইয়া যাও এবং জগন্নাথের আরতির সময়ে জ্বালাইও।" এই কথায় জগদানন্দ হাসিয়া দিয়া সেই তৈলের ভাঁড় ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরিব্রজ্যার নিয়ম পালন করিয়া চৈতন্য দেশদেহে মাসের নিদারুণ ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া শেষরাত্রে স্নান করিতেন। মুকুন্দের ইহা সহ্য হইত না চৈতন্য বলিলেন, "মুকুন্দ, জগদানন্দের মত রাগ করে না, কিন্তু অতি দুঃখিত হইয়া দুঃখ করিয়া থাকে তাহাতে আমার অধিকতর কষ্ট হয়।" এদিকে স্বরূপ দামোদর চৈতন্যকে উপদেশ দিতেছিলেন চৈতন্য শাস্ত্রনিষেধের ধার ধারিতেন না, তাঁহার প্রেমের আবেগে কোন বাধা পালন করিতেন না কিন্তু স্বরূপ-দামোদর "ইহা করা উচিত নহে সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা উচিত নহে" ইত্যাদিরূপ অনুশাসন দ্বারা তাঁহাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন

চৈতন্য দেখিলেন,—ইহারা ইহার জন্য পুনরায় স্নেহ ও শাসনের গৃহের মতন একটা কারাগার সৃষ্টি করিয়াছেন পূর্বে এই স্নেহের বন্ধনী হইতে মুক্ত পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একবার ছুটিয়া পালাইবার মুখে তিনি সনাতনের বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন বিরহের মধ্যে আর এক বিপরীত মিলন সঙ্গে তিনি যে চলিয়াছিলেন, একথা তাঁহার খেয়াল ছিল না। সনাতনের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন পুরীতে ফিরিয়া তথায় আর কিছুকাল থাকিয়া এবার প্রকৃতই পলাতক আসামীর ন্যায় গোপনে দক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে কালাকৃষ্ণ দাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি গোদাবরীর তীর পর্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একমাত্র গোবিন্দ কর্মকার বিরহী মুকুন্দের ন্যায় দীর্ঘপথ তাঁহার অনুসরণ করিয়া ছিলেন এবং এই ভ্রমণের যে বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন তাহা দৃশ্যপটের ন্যায় সুস্পষ্ট। গোবিন্দ কর্মকারের বাড়ী ছিল—বর্দ্ধমান, কাঞ্চন নগর, তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রীবাসদাস এবং মাতার নাম মাধবী, গোবিন্দ তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত ঝগড়া করিয়া চিরদিনের জন্য চৈতন্যের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, উত্তর কালে ইনিই "শ্রীগোবিন্দ" নামে বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এই কড়চা-লেখক সম্বন্ধে সমস্ত কাহিনী মৎসম্পাদিত "গোবিন্দ দাসের কড়চা" দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য ১৫১০ খৃষ্টাব্দের এই বৈশাখ তিনি দক্ষিণযাত্রা—মানস বহির্গত হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগত হন সুতরাং এক বৎসর আট মাস ছাব্বিশ দিনে এই ভ্রমণ শেষ হয় পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্য বাসের অন্তরঙ্গদের সঙ্গে মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে ছয় বৎসর ভ্রমণ করেন তিনি অষ্টাদশ বর্ষ কাল পুরীতে ছিলেন ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন বেলা ৩ টার সময়ে তিনি পুরীর ভক্তিচা গৃহে দেহ রক্ষা করেন।

বৈষ্ণব-সমাজের উপর সমস্ত বাঙ্গলা দেশটার উপর চৈতন্যের যে প্রভাব তাহার তুলনা নাই। নিত্যানন্দ পূর্বেই বলিয়াছি চৈতন্য সঙ্গোপনে এক প্রকারে বসিয়া তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারের উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন নিত্যানন্দের ন্যায় সর্বত্যাগীর প্রেম সমদর্শী, উচ্চনীচ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সমাজে আর স্থান পাইবে না। এই জন্য আচণ্ডালে প্রেম দিবার উপলক্ষে তিনি বৈষ্ণব সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করিবার ভার নিত্যানন্দের উপর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও তাঁহার পুত্র বীরভদ্র অচিরে বাঙ্গলা দেশের যে সেই মধুর অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ১৫০০ সেরা ও তদপেক্ষা বেশী ও ৩০০ সেরা। উচ্চকণ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সমাজ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এইভাবে রামকেলি নামে এক বৃহৎ বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৈষ্ণব বৈরাগী সাজিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গিয়াছিল কিন্তু নিত্যানন্দের প্রভাবে দুর্ধর্ষ হইয়া বৌদ্ধ জনসাধারণ সাধারণ বৈষ্ণব মত অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডীতে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধ আচারে বিধবাদাহ ছিল না। বাঙ্গলার যে সেনবংশীয় রাজারা বৌদ্ধসমাজ তাহাদের নেতৃদলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বহু পুরুষ ধরিয়া বৌদ্ধ সমাজের অনেক নিয়ামক অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের সন্তান-সন্ততি নামে ব্রাহ্মণ হইয়া সঙ্কটের অবস্থায় ছিল—নিত্যানন্দ ইহাদের মধ্যে বিধবাপ্রথা প্রচলন করিয়া সমাজে ইহাদের একটা স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। যেসব বিধবা কখনই ভেকাশ্রয়ের পূর্বে তাহারা কেন কাঁদিত তাহা বলিবে না। এই ভাবে তাহাদের পূর্বজীবনের কলঙ্কিত অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া নিত্যানন্দ তাহারা লোক চক্ষে শুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মধ্য চৈতন্য নিত্যানন্দকে গৃহস্থ করার পরও বৌদ্ধধর্মের দেবতত্ত্ব এখনও চলিয়া আসিতেছে পূর্ব বঙ্গের সাধারণ বাঙ্গালার সন্নিকটে পাশে অইঙ্গল বিদ্যমান আছে। একদিন এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "তুমি চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ পূজা কর কি না?" সে বলিল, "ইহাদের কি বিগ্রহ আছে? চৈতন্য হইলেন 'শূন্য মূর্তি'।" এই উক্তি মহাযান বৌদ্ধদের "আমার শূন্যমূর্তির" ইতিহাস ভাবে কাজ শূন্যবাদের প্রতিধ্বনি করে। নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল "জাহ্নবা" তিনি সুবর্ণ-মল্লিক শিরোমণি—সপ্তগ্রামের ধনকুবের—সপ্তগ্রামেশ্বরী উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়াছিলেন অথচ সুবর্ণবণিক সমাজের দুই কন্যা "বসুধা ও "জাহ্নবী"কে বিবাহ করিয়া নিত্যানন্দ সমস্তরূপ গৃহী সাজিয়াছিলেন। চৈতন্যের আদেশে তিনি অবধূতের ব্রত ভঙ্গ করিয়া সংসারাশ্রমী হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব গোস্বামীদের পূজাদি করিবার ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ইতিপূর্বে যাহাদের দানের দ্বারে পরাশন করাও মহাপাপ মনে করিতেন, বৈষ্ণব গোস্বামীরা তাহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বাড়ীতে ভোজনাদি ও দেবপূজা অবাধে করিতে লাগিলেন। একটি নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল "পতিত-পাবন।" ভক্তি ও প্রেমের বাঙ্গলার বাহ্যচক্রবর্তী চৈতন্য, তিনি ভাবে বিভোর থাকিতেন, কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিতেন—নিত্যানন্দ,

চৈতন্যের অনুজ্ঞাক্রমে বৈষ্ণব সমাজে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে অশেষরূপ সম্মানিক চূড়ান্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাদের প্রচারে নিত্যানন্দের নাম চৈতন্যকেও ছাপ দিয়া গিয়াছে কতকগুলি গানে এই কথা সুব্যক্ত আছে "হাটের রাজা নিত্যানন্দ পাত্র তৈল শ্রীচৈতন্য" প্রভৃতি গানে নিত্যানন্দ রাজা এবং চৈতন্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছেন নিত্যানন্দ এই মহৎ কার্য্য না করিলে আজ পতিত জাতির অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিত। চৈতন্যদেব পুরীতে তাঁহাকে সমাজ সংস্কারসম্বন্ধে কোন পন্থা অবলম্বনের,—তাহা বন্ধ করিয়া এক প্রকোষ্ঠে অতি গোপনভাবে সেই উপদেশ দিতেন

চৈতন্য স্বয়ং ভাবাবেশে বিভোর থাকিলেও বাঙ্গলার নবগঠিত বৈষ্ণব-সমাজকে সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার সমস্ত ভার অবলম্বন করিয়াছিলেন সনাতনকে দিয়া তিনি এই সমাজের জন্য বিধিব্যবস্থা সংকলন করাইয়াছিলেন এই কার্য্যের জন্য সনাতন অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না সনাতন বাঙ্গলার সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ব্যবহার-শাস্ত্র তাঁহার নখাগ্রে ছিল, তিনি হিন্দুদের দর্শন, কাব্য ও পুরাণ উৎকৃষ্টরূপে পড়িয়াছিলেন কিন্তু স্মৃতিই ছিল তাঁহার বিশেষজ্ঞানের পঠিতব্য বিষয় আশ্চর্য্যের বিষয়, নবদ্বীপের তরুণ পাগল দেখতেই ছাড়ে বিভোর থাকিয়াও সংসারের প্রয়োজন এবং স্মৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বসম্বন্ধে সনাতনের মত পণ্ডিতকে কবের পুতুলের ন্যায় পরিচালিত করিয়াছিলেন এসম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতের সনাতন শিক্ষা নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য

একদিকে সমাজ সংস্কার, অন্যদিকে উহা পরিচালিত করিবার বিধি ব্যবস্থা করিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের পত্তন করিয়াছিলেন কে জানিত হরিপ্রেম উন্মাদ এই তরুণ যুবকের এরূপ অসাধারণ সমাজ সংগঠনী শক্তি ও প্রতিভা ছিল?

তাঁহার "গদ্য ভাব" অনুকরণীয়—মনুষ্যের মত অপ্রাকৃত সেই মহাভাবের সৌন্দর্য্যে বৈষ্ণব-পদসাহিত্য ভরপুর , ভগবান তাঁহার আভাস পাইয়া তাঁহার আগমনী গাহিয়াছিলেন, বাসুঘোষ নরহরি তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমলীলায় আত্মহারা হইয়া শত শত পদ রচনা করিয়াছেন হরিনাম করিতে করিতে যখন তিনি কাঁদিতেন, তখন নারদের বীণাধ্বনিবৎ তাঁহার মুকুন্দ-উচ্চারিত হরিলীলা যেন শ্রোতৃবর্গের প্রত্যক্ষ হইত এই মনোরম কণ্ঠস্বরনিঃসৃত নূতন নূতন সুরের মূর্চ্ছনা অপূর্ব্বা উঠিত শুধু মনোহর সাধ্য বেনেটি বা প্রয়াগ-হাটার কীর্ত্তন নহে,—একদিন এমনই করুণ-মধুর কণ্ঠে তিনি সঙ্কল্পনেত্রে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন যে তাহাতে "যাদুর" নামক এক নবরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গেল তাঁহার প্রেমবিহ্বল চোখের মধুরিমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানাভাবে নানা মধুর বার্ত্তা ইঙ্গিতালোকে বহন করিয়া আনিত একদিন তাঁহার চোখে অভিমানের অরুণিমা দেখিতেছিল, অভিমান ও লজ্জাকুণ্ঠিত ক্ষোভ দুইটি অশ্রুতে মুছিয়াছিল, তাঁহার চোখে কি কথা ফুটিতে চাহিয়া যেন ফুটিতে পারিতেছিল না, লেখনীও অভিনব আবেগে দুলিতেছিল রূপগোস্বামী মুকুন্দের এই ভাবাবেশের পাগলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অমনি সেই রস তাঁহাকে কতদূর স্বর্গলোকে লইয়া গেল,

তিনি রাধিকার একটি ছবি উহাতে আরোপ করিয়া সনেৎকলা-কৌমুদী নামক নাটকের মুখবন্ধে "অস্তঃ প্রেমতরঙ্গায়িত মদকলঘনরাধিকাকৃতয়ে" ইত্যাদি শ্লোকটি রচনা করিলেন, তাহাতে সাতটি ভাবের সমাবেশ আছে, অলঙ্কারিকগণ উহাকে "সিলকিঞ্জিৎ" ভাব সংজ্ঞা দিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস এবং রাই উন্মাদিনী প্রভৃতি পুস্তক রাধিকার নামে চৈতন্য লীলা,—বিল্বের রাই উন্মাদিনী গ্রন্থখানি চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ছানিয়া, তাহাদের সারাংশ কাব্যরসাত্মক করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এমন একটি কথা নাই, যাহা চৈতন্য জীবন হইতে সংগৃহীত হয় নাই। অথচ এই গবেষণা অধ্যাত্মতত্ত্ব বা ভক্তি সংবাদ এমনই কৌশলে লিখিত হইয়াছে যে রাধিকার এই রূপ ও চরিত্র -মহা কল্পনার প্রসূতিস্বরূপ হইয়াছে। কে বলিবে এই কাব্যের মর্ম্ম কাহিনী ভাগীরথী—স্বর্গগামিনী মন্দাকিনী নহে? উহা সত্যসত্যই বঙ্গ ধরায় অবতরিয়াছে সত্য কিন্তু উহার উৎপত্তিস্থান স্বর্গে। চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি যদি কেহ স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে চান, তবে গায়কের মুখে 'রাই উন্মাদিনী' গানখানি শুনুন। গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পদে বর্ণিত আছে যে সময়ে সময়ে রাধিকা কৃষ্ণের ক্রোড়ে থাকিয়াও 'কাঁহা কৃষ্ণ' 'কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণের সঙ্গে বিচ্যুত হইতেন না, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বিরহীর মত কাঁদিতেন—রাধাতে আরোপিত এই ভাব সেই লীলার দ্যোতক।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ ও মন্দির মুসলমান অত্যাচারীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তখন মন্দিরাদির গায়ে খচিত কষ্টিপাথরে অঙ্কিত বাসুদেব বিগ্রহের পূজা হইত। এই সকল বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতিরূপ হইলে প্রায় কালো হইত। রাধার কাছে বসিয়া রাধিকার রূপ চিন্তা করিতে—'নিতা নব নব কুসুমসু রাধার চরু নৈবেদ্য ও পুষ্পপত্র রচনা করিতেন, রাধার ভোগ কত যত্নের সহিত রান্না হইত, রাধার আরতির জন্য কত থালী বাগানের ফুল সংগ্রহ করিয়া মালা প্রস্তুত করিত এবং রাধার মন্দির-দ্বার কমলের সমস্ত কলস ঘুরে করিত এবং গঙ্গাস্নান, পট্টবাস-পরিহিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও কৃষ্ণানুরাগিণী রাধার পূজা অর্চ্চনা করিতেন। এই সকল সাময়িক বিগ্রহের অন্তরের পর ভগ্নদেবমন্দির পূর্ণ হইয়া পড়িল। কত পুরোহিত ও পাণ্ডা হতে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীবিগ্রহ রক্ষার বিফল প্রয়াস পাইয়াছিলেন—সেই সকল বিগ্রহ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু ভক্তের মানসপটে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই চন্দনচর্চ্চিত কষ্টিপাথরের কৃষ্ণবর্ণ রূপ তাঁহাদের বুকে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। কালো কিছু দেখিলেই সেই কালো রূপের কথা মনে হইত। বঙ্গের প্রাচীন এবং আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যে কালোরূপের প্রতি অন্ধ উল্লেখ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়; এজন্য রাধিকা কখন পরিধেয় না কালো শাড়ী দেখিয়া চমকিত হইতেন। তিনি সখীকে বলিতেছেন, "কালো কুসুমকরে, পরশ না করি ছলে, এ বড় মনের মনোব্যথা" (চণ্ডীদাস)। এজন্যই তিনি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখিলে নিশ্চল ও স্তব্ধ চক্ষুদুটি সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, "সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা," এজন্যই তিনি মালতী মালা খুলিয়া কালো

চুলের রাশি কপালে লইয়া মুখ চোখে চাকিয়া দিতেন, এবং মধুর-মধুরীর কণ্ঠের উজ্জ্বল নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া উন্মত্ত হইতেন। কালো রঙের বিষয় সমুখ হইতে অপসারিত হওয়ায় সেই বর্ণ আরও প্রিয় এবং ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এজন্যই মাধবেন্দ্র পুরী মেঘদর্শনে অজ্ঞান হইতেন এবং চৈতন্য দেব দাক্ষিণাত্যে চণ্ডপুর গ্রামে এক তমালতরু দেখিয়া তাহাকে সাশ্রুনেত্রে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন—কখনও বা কোনও নদীকে কালিন্দী মনে করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। এক পদকর্তা রাধিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "নিজনে আলিঙ্গয়ে তরুণ তমাল।" এবং বহু বৈষ্ণব কবি রাধার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা—মরণান্তে তমাল-ডালে তাঁহার তনু রাখিয়া রাখিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদারাধনায় এই কৃষ্ণবর্ণটি ক্রমশঃ একটি স্মারক চিহ্নস্বরূপ হইয়া বৈষ্ণব কবিতায় এক অপূর্ব উন্মাদনার অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিল। এই কালো বর্ণ বৈষ্ণবের চক্ষে ধ্যানলোকের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহাকে মন্দির হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, সেই বিষয় স্থান লইলেন ভক্তের চক্ষে ও মনে বিশেষ সঙ্কীর্ণ সমুদ্রের নীলজলরাশি, সুস্নাত তমালতরু, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ও মধুর মধুরীর কণ্ঠের বর্ণে। কবিরা এখনও গান বাঁধিয়া বলেন, "কালো কি হয় না ভালো রে" চৈতন্যের মৃত্যুর পর বৃন্দা এবং জগন্নাথের সঙ্গে আনন্দমিলন অনেক সময়ে এই কৃষ্ণবর্ণকে সমাশ্রয় করিয়া হইত। কৃষ্ণের বর্ণ অবশ্যই কালো, কিন্তু ভারতবর্ষে কালো রঙের উপর এত সন্ত্রাস বাঙ্ময়ীপেক্ষা অন্য আর কোন দেশে দেখা যায় নাই।

কালোর উপরে সন্ত্রাস।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ

১৪৩৩ অব্দে চৈতন্যের তিরোধান হয়। এই তিরোধান কিরূপে হইয়াছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে, এই সূত্রে সমুদ্রের জলে তাঁহার তিরোধান হয়—এই যে সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কোন আস্থা দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথবা গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার দেহ ছিল চিন্ময়, সুতরাং রক্তমাংসের দেহের ধ্বংসের মত তাহার বিলয় হইতে পারে না, এই সংস্কার-বশতঃ প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে "মহাপ্রভু হারাইলায় গোপীনাথের ঘরে" এই ছত্রটি আছে। ইহা গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহার মিশিয়া

তিরোধান-সম্বন্ধে নানা মত।

যাইবার ইচ্ছিত করেন কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের মনে হয় অনেক তীর্থের চৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের যে কাহিনী রহিয়াছে, তাহাই এতৎসম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সঙ্গতিসঙ্গত কথা। এখানকার সমুদ্রে কীর্তনানন্দে চৈতন্য ডুবিয়া যাইবার পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে যেই আসেন, অমনি তাঁহার পূর্বকৃত ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাদের মনে হয় এবং তখন তাঁহার অন্তর্ধানের কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারেন। জগন্নাথ বলেন আষাঢ় মাসের রথযাত্রার সময়ই সেবায়েত [illegible] বলা হইয়াছে সমুদ্রে স্নান করেন কিন্তু লোচনদাস বলেন রথের আটটির তাঁহার বিকাশ হয়। [illegible] অন্তর্ধানের সময়ের কথা বেলা দ্বিতীয় পর পূর্ণিমা বাটীর [illegible] আসে নাই। চৈতন্যের পার্ষদগণ মানুষের কাছে ভক্ত করিয়া ছাড়িলেন কিন্তু আটটা বাজিতে সকলে খুঁজিতে আসিলেন—মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন তাহার [illegible] আর কোন ভুল নাই। বলা [illegible] ঘড়ির আটটা বাজিলে সেই দূরে পাণ্ডারা 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত ঐ পুস্তকের কথা এবং ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অনুমান হয় যেন এটার সময় তাঁহার দেহরক্ষা হইলে মন্দিরের মধ্যেই [illegible] একাকার [illegible] সমাধান [illegible] পরমেশ্বরের অন্তর্ধান লইয়া যে সকল কথা হইয়াছিল [illegible] পুস্তকের [illegible] সেই পুষ্পমালা সেই মন্দিরের ভিতর দিয়া [illegible] হইয়াছিল যেন [illegible] বাঁধা আটটা পর্যন্ত তাঁহার সমাধিকার্য হইত হয়, তাহার পর সেই মন্দিরের দ্বারবন্ধন যথাস্থানে সাধুসেবিত করিয়া সমাধির ভিতর বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। যাঁহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন—তাঁহারা তিরোধানের বেলা ওটায় হইয়াছিল এমন লিখিয়াছেন। কিন্তু আটটা বাজে সংবাদ পাইয়া হয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। সেই মন্দিরের দেবপ্রকোষ্ঠের একটি [illegible] কোণে সোনার প্রস্তর-নির্মিত পদচিহ্ন আছে। ঐ মন্দিরে চৈতন্যের সেই পদচিহ্ন থাকার কোন কারণ নাই জগন্নাথ মন্দির ও [illegible] মন্দির এই দুইটি চৈতন্যের প্রধান লীলাস্থল। পুরীর মন্দিরের সেই পদচিহ্ন কি দুর্ভাগ্য সমাধির নিদর্শন? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা লিখিব না। আমি অনুমান করি লিখিবার কারণ বিগ্রহের অঙ্গে তাঁহার চিহ্ন রহিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের বিশ্বাসে আমি 'না' দিতে ইচ্ছা করি না। পুরীর পাণ্ডাদের মুখে আর একটি কথার প্রমাণ প্রচলিত আছে—তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহে [illegible] চৈতন্যের পাঁচজনীর বেশ হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু দেবদেবীর প্রত্যক্ষতে যাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া ব্যক্ত করিতেন, যাঁহার তিরোধানের পর বাজার ঘোর বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তাঁহারই রাজধানীতে কি এরূপ একটা ঘটনা ঘটিতে পারে? ভক্তমাল রাজপুত' সন্ধান করিলে হয়ত সত্য ঘটনা বাহির হইতে পারে।

চৈতন্যের তিরোধান-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি সকলেই নীরব। যে কয়েকখানি পুস্তকে একটু ইঙ্গিত আছে, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের সর্বজনগৃহীত গ্রন্থ নহে। শুধু লোচনদাস

চৈতন্যের তিরোধানের পর বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা।

...

চৈতন্যের তিরোধানের পর বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজ কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কবিকর্ণপুর তাঁহার মহাকাব্যে ও নাটকে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চরিতামৃতে যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা হইতে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে এই সময়ের বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। চৈতন্যের তিরোধানের পর তাঁহার ভক্তগণ কিছুদিন নীলাচলে থাকিয়া পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে কীর্তন ও নৃত্য করিয়া তাঁহার বিরহ-ব্যথা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মনের দুঃখ দূর হইল না। তাঁহারা নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ ভক্তই বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যের তিরোধানের সংবাদ দিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পূর্বে নিত্যানন্দের তিরোধানের সংবাদ পাইয়াছিলেন—তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ পিতার তিরোধানের সংবাদ পাইয়াছিলেন—তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের

আকাশস্পর্শী মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, সেই সমাজের এবং তাঁহার ভ্রাতৃপ্রতিম ভ্রাতা রূপ সাম্প্রদায়ী চৈতন্যের চিত্রশালায় তুলিয়া তাঁহার সকরুণবন্দিত চরণ ধ্যান করিয়া ধীরে ধীরে মুক্তমুখে পতিত হইলেন। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কাছ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী বন্ধ ছিল। মহাশোকের যতিচ্ছেদ চৈতন্যের অনুচরগণ যেন বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নীরব হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পরে আবার ধীরে ধীরে তাঁহার নবজীবনের আলোকরশ্মিটি বিপুলায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিনজন প্রথম অধ্যায়ের নেতা ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিনজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আবার এমন করিয়া খোল বাজিয়া উঠিল, যেমন করিয়া চৈতন্যের সময়ে বাজিত, আবার সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চরোলে রাগমিশ্রার চীৎকারে ভক্তিধর্ম্ম শুধু বঙ্গ উদ্ভিন্নায় নহে, মথুরা, বৃন্দাবন ও পুরুষোত্তমেও বিস্তৃত হইল। বাঙ্গালী কবিরা বাঙ্গলা-ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় ভাব করিয়া সংস্কৃতগীতির পদ রচনা করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহাদের অপূর্ব্বপদগুলি যেন আর শুধু বাঙ্গালার জন্য নহে—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের জন্য হইবে। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র কবিরাজের পাণ্ডিত্য বৃন্দাবনী রামায়ণ প্রণেতা গোবিন্দদাস প্রকৃত কবিরা বিদ্যাপতির অনুকরণে কবিতা এবং ব্রজবুলি ছন্দে যে রস ঢালিয়া দিলেন, তাহা বৃন্দাবনবাসীরা আদর উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন। বাঙ্গালী কবির পদ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইল। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকরে জীব গোস্বামী ও গোবিন্দদাসের যে সকল সংস্কৃতশ্লোক উদ্ধৃত আছে তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গালী কবিরা ব্রজবুলি ছন্দ অবলম্বন করিয়া কিভাবে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বিজয় করিয়াছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পর পর তিনটি কেন্দ্র হইয়াছিল। প্রথম কেন্দ্র নবদ্বীপে, যেখানে সর্ব্বপ্রথম বাসুদেব ঘোষের ভাই ভ্রাতার হাতে খোল বাজিত এবং মুকুন্দ ও শ্রীবাস মধুর কণ্ঠে হরিনাম গাইতেন আর বক্রেশ্বর তাঁহার স্বর্গীয় নৃত্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। এই কেন্দ্রের মধ্যমণি ছিলেন চৈতন্য।

তিনটি কেন্দ্র।

চৈতন্য পুরীতে গেলে নবদ্বীপ স্তব্ধ হইল। এবার খোল বাজিয়া উঠিল পুরীতে। বর্ষাকালে বাঙ্গালী ভক্তেরা শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে পুরীতে চলিয়া আসিতেন, তখন শ্রীবাসের কণ্ঠের স্বরলহরী ফিরিয়া আসিত, মুকুন্দ আবার গাইতেন,—বক্রেশ্বরের নৃত্যে, নিত্যানন্দ-সমাগমে, স্বরূপ-দামোদর, রামরায় এবং সার্ব্বভৌমের প্রত্যক্ষকরের প্রেমোচ্ছ্বাসে ভক্ত জনসাধারণ নীলাদ্রিনাথের পথ ভুলিয়া বাঙ্গালী ভগবানের কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। মহাপ্রভুর নীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

তৃতীয় কেন্দ্র—বৃন্দাবন। মহাপ্রভুর নীলাবসানের পর বৃন্দাবন কতকদিন শোকে সমাচ্ছন্ন ছিল। এখানে শুধু ভক্তি ও প্রেমের চর্চ্চা হয় নাই অশেষ শৈল্প ব্রহ্মচর্য্যের অশেষ কঠোরতা, ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদিগের অশেষ পাণ্ডিত্য—এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া ইহাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে সনাতনের বৃহদ্ভাগবতামৃত, রূপের ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত

হইয়াছিল। এখানে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ও অশেষ পাণ্ডিত্য ও সাধুতার অমৃতফলস্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত অপূর্ব্ব চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এখানেই নবদ্বীপ চক্রবর্ত্তী তাঁহার অসম্ভার অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। উত্তরকালে জীব গোস্বামী এই বৃন্দাবন কেন্দ্রের নেতা হইয়াছিলেন। এখানে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব ও গোপাল ভট্ট এই ছয়জন গোস্বামী বাস করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে যে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে লিখিত হইত, তাহা এই গোস্বামীদের নিকট প্রেরিত হইত। যে সকল গ্রন্থ ইহারা অনুমোদন করিতেন, তাহাই বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত হইত। যাহাতে ইহাদের সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম থাকিত না তাহা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইতে পারিত না। ইহারা বৈষ্ণব-সমাজের বিধানকর্ত্তা ও নিয়ন্তা ছিলেন, বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিয়া ইহাদের অনুমোদনের জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, গোস্বামীরা ইহা পাঠ করিয়া আদরে আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাব্যাপক ভাগবতের সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ইহার নাম 'চৈতন্যভাগবত' রাখিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী ছিলেন রূপ ও সনাতনের সহোদর অনুপমের পুত্র। জীব অতি সুবালক ছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা চৈতন্যের পার্ষদ—এই সমস্ত কথা বালক যখন তাঁহার মাতা বলিতেন, তখন বালকের পাঠ বন্ধ রাখিয়া অশ্রু পড়িত। অল্পবয়সে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন। কিন্তু ভক্তির আকর্ষণে তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন। এই সংসার তাঁহার নিকট অরণ্যসদৃশ অসার বোধ হইত—পিতৃব্যদের পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্য, কৈশোরসুলভ তাঁহার অতুল রূপ ও সুখস্বচ্ছন্দতা—এসকলের আকর্ষণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। যাহারা চৈতন্যের আকর্ষণ করিতেন তাঁহাকে কে রোধ করিবে? একদিন ষোড়শবর্ষীয় বালক জীব তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, সন্ন্যাসী হয় কেমন করিয়া?" মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাস-সম্বন্ধে পদ্ধতি বলিতে লাগিলেন কারণ—শুধু তাঁহার স্বামী নয় তাঁহার দুই ভাসুরও মৃত্যুর পূর্ব্বে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ মাতা কিরূপে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়, কিরূপে লঙ্গোটী পরিতে হয়, কিরূপে গৈরিক বস্ত্র পরিতে ও দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়—এই সকল কথা বলিলেন। বালক বলিল, "আমার পিতৃব্যেরা অতুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাস লইয়া অঙ্গনের বৃক্ষপত্রে শয়ন করিয়া ও ভগ্নাকার ঘরে বাস করিয়া কিরূপে সুখ পাইতেন?" মাতা বলিলেন, "ধর্ম্মে বিশ্বাস ও চৈতন্যের প্রতি ভালবাসায় তাঁহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না।" পরদিন জীব মস্তকমুণ্ডনে ও গৈরিক পরিধান মাতার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মা, আমায় কি সন্ন্যাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে আমাকে প্রণাম করিবে—আমি একজন সাধু।" সুন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মাতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এমন সুন্দর চাঁচর কেশ মাথায় করিয়া কি কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে?" বালক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, কাল দেখিবে।"

একদিন মস্তক মুণ্ডিত করিয়া সনাতনশিক্ষিত 'কাশার' তাঁর মাতাকে বলিল, "মা, প্রণাম তোমার গর্ভের ঔরসকে ফিরিয়ে নেবার জন্য দাও, আমি ব্রাহ্মণ, আমার পিতা ও পিতৃবংশের যে গতি, আমারও তাহাই। আমি বিষয়ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। যা আমি চলিলাম, তোমার ছেলেটিকে আর দেখতে পাইবে না।" তাঁর চুম্বন লইয়া মাতাকে প্রণাম করিল, বস্তুতঃই মাতা জ্ঞানহারা হইয়া রহিলেন। রূপ সনাতনের পথিপার্শ্বস্থ ফতেয়াবাদে বাস করিতেছিলেন তথা হইতে তাঁর সন্ধান লইয়া প্রথমতঃ নবদ্বীপ আসিলেন। তথা হইতে বাড়ুরি আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালী ভক্তদের পত্র।

শ্রীরূপের আঙ্গিনা চৈতন্যের পদরজে পবিত্র হইয়াছিল বালক সনাতন কাঁদিতে কাঁদিতে সেই আঙ্গিনায় গড়াইয়া পড়িলেন। নবদ্বীপ হইতে কাশী যাইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট তিন বৎসর বেদান্তদর্শনের শিক্ষালাভ করিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া স্বীয় পিতৃব্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভক্তিপথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন। অচিরে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত ভক্তমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল। রূপ ও সনাতনের পরে বৈষ্ণব সমাজে তেমন প্রতিভা আর কাহারও হয় নাই। তাঁহারা যে সব সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন তাহার সাহায্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার হয়। এই পুস্তকগুলির মধ্যে ষট্‌সন্দর্ভই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। গ্রন্থকারের তাহা সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব সমাজের একমাত্র আকর হইয়াছিল। রূপ সনাতন যে সময় বৃন্দাবনে আসেন তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। ব্যাকরণে লিখিয়াছেন 'শ্রীরূপ সনাতনাভ্যাং নমঃ' ইহার অর্থ এই যে রূপ সনাতনকে নমস্কার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য রূপক বসাইয়া কবি এ আদেশ দেন নাই। বৃন্দাবনে সর্ব্বপ্রথম যে মন্দির নির্ম্মিত হয় তাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সমৃদ্ধ রাজপুত উপাসক পরম বীর শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ এই মন্দির। গ্রাউজ সাহেব তাঁহার মথুরার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "এই সময় বৃন্দাবনের সর্ব্বাপেক্ষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈষ্ণব সমাজের নেতা ছিলেন রূপ ও সনাতন। ইহাদের সহিত তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর নাম করাও কর্ত্তব্য। মানসিংহ গোবিন্দজীর যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে এই কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ হয়—"মহারাজ পৃথ্বীরাজের বংশোদ্ভব মহারাজ শ্রীভগবান্ দাসের পুত্র, মহারাজ মানসিংহকর্ত্তৃক এই মন্দির তাঁহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে সম্রাট আকবরের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে নির্ম্মিত হয়। গ্রাউজ সাহেব বলেন, "It is the most impressive religious edifice that the Hindu art has ever produced at least in Upper India. It is not a little strange that of all architects who have described this famous building, not one has noticed its most characteristic feature—the harmonious combination of dome and spire which is still noted as the great crux of modern art, though nearly 300 years ago; the difficulty was solved by the Hindus with characteristic grace and ingenuity." [ভাবার্থ অন্ততঃ আর্য্যাবর্ত্তে এই ধর্ম্মমন্দির

স্থাপত্য হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুরা যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন—এই মন্দির তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যত মুসলমানেরা এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই ইহার একটী অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই। গম্বুজ ও চূড়ার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য এই মন্দিরে যাহা দৃষ্ট হয়—তাহা শুধু সম্পূর্ণ মুসলমান স্থপতিরাই কলাকৌশলের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন সমূহ বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা তাঁহাদের অভ্রান্ত বৈশিষ্ট্য, মনোহারিত্ব ও একান্ত সহকারে এই সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান করিয়াছিলেন। ফার্গুসন এই সকল মন্দিরের বিস্তৃতির বিবরণ দিয়াছেন। এই মন্দির স্থপতিবিদ্যাবিশারদ কলার নাম বুধপতি, পদবীর নাম রায় এবং মাণিকচাঁদ চৌপরের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন ও জীব যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, একটী ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে।

রূপনারায়ণ

একবার কামরূপের রাজধানী গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী ভাটীদিয়া গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নীর নাম কমলা দেবী। ইঁহাদের একমাত্র সুলক্ষণ পুত্র ছিলেন রূপনারায়ণ। অল্পবয়সে তিনি শাস্ত্রালোচনায় অসাধারণ ধী ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। সংশোধনের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদা বৃদ্ধ পাকা পক্ষীকে আবদ্ধ করিলেন, বালককে অঙ্গার খাইতে দিতে। শুকী কমল দর্ভী আনিয়া আবদ্ধ করিতে না পারিয়া তাহার খাঁচার এক পার্শ্বে একটুকরা কলা দুইবার ছাড়িয়া পুনরায় পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু রূপনারায়ণের দৃষ্টি সেই কলাটুকুর দিকেই সঞ্চালিত হইল। মাতার নিকট প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন করিয়া কারণ জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রথম পক্ষপট্টী নামক এক গ্রামের টোলে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তারপর নবদ্বীপে আসিয়া তদানীন্তন টোল সমূহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। তথা হইতে অনুমান ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গ লাভ করেন কিন্তু উদ্ধত যুবক ভক্তির সেই প্রবল বন্যার পাশ কাটাইয়া কাশীতে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র আরও বিশদ করিয়া অধ্যয়ন করেন। সর্ব্বশেষে রূপনারায়ণ ঘোষাল গুরু নবদ্বীপে যাইয়া শাস্ত্রসমিতিপূর্ব্বক "সরস্বতী" উপাধি লাভ করেন।

তরুণী উদ্ধত যুবক এখন পণ্ডিত শিরোমণি হইলেন তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। তিনি অর্ণবপোতে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিলেন "আমি দিগ্বিজয়ী, যদি কোন পণ্ডিতের গৌরব থাকে, তবে সেই গৌরব পরীক্ষা করিবার কৌশলের আমি আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন।" বহু পণ্ডিতকে ধরা করিয়া এক বোঝা জয়পত্র সঙ্গে লইয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, রূপ ও সনাতনের মত পণ্ডিত তখন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দৈন্যের অবতার শ্রীজীব রূপনারায়ণের গর্ব্বিত আক্রমণের উত্তরে বলিলেন, "ভাই, তুমি ভুল শুনিয়াছ, লোকে আমাদের সামান্য গুণ বাড়াইয়া তোমাকে

বলিয়াছে। আমরা হীনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধিপাশ্রয়, তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।" পণ্ডিত পণ্ডিত বলিলেন, "সে হইলে ছাড়িব না তর্কে না পার, আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দাও।" সজ্জনতার আতিশয্যে এবং বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্যের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা উঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন, কারণ বৈষ্ণবের নীতি "অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" এই জয়পত্র হাতে করিয়া রূপ সরস্বতী মনে করিলেন তিনি ভারতের বিদ্যারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্। কিন্তু কে যেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই দুই ভ্রাতার এক পাণ্ডিত্যাভিমানী ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন, তিনিও বড় কম নহেন। রূপসনাতন অমনি যাইয়া জীব গোস্বামীর কুটীরে উপস্থিত। তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়ের স্বাক্ষরিত জয়পত্র দেখিয়া যুবক জীব গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখনই সরস্বতীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন পর্যন্ত বিচারে সমকক্ষতা চলিল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জীবের নিকট রূপসনাতন পরাস্ত হইলেন,—সপ্তম দিনে উপনিষৎ এবং অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীব গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। রূপসনাতনের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নূতন। সপ্তমদিনের ব্যাখ্যায় পাথর গলিয়া জল হইয়া গেল—অহঙ্কার ও দর্প একেবারে গেল। অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া রূপসনাতন রূপগোস্বামীর নিকট যাইয়া তাঁহার অকৃত্রিম খৈন্য ও অনুতাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপর তিনি বঙ্গদেশ ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী শক্তপাড়ার রাজা মুসলমান সভাপণ্ডিত হইলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। সনাতন সঙ্গীত শাস্ত্রে কৃতী ছিলেন হরিদাসের তানেও আলোচনা চলিল।

রূপ-সনাতনের দেশ।

এদিকে জীবকে রূপ গোস্বামী বলিলেন, "তোমার বিচারক্ষমতা প্রতিভা এখনও দূর হয় নাই—তুমি বৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য নও, সম্পূর্ণভাবে অহঙ্কার বিলুপ্ত না হইলে বৃন্দাবনবাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বৃন্দাবনের সীমানার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।" পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জীব বৃন্দাবন ছাড়িয়া যমুনাতীরে এক কুটীরে বাস করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া এক বৎসর কাটাইলেন। একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, "বলতো ভাই, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান গুণ কি?" রূপ বলিলেন "জীবে দয়া।" সনাতন বলিলেন, "তবে তুমি জীবের প্রতি এত নিষ্ঠুর কেন?" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রূপ জীব গোস্বামীকে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর রূপ ও সনাতনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। এ্যাইন সাহেব লিখিয়াছেন, এই দর্শনের ফলে সম্রাট্ এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত হিন্দুরাজাদিগকে বৃন্দাবনে বড় বড় মন্দির-নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। স্বয়ং চৈতন্যের বহু গুণকীর্ত্তন শুনিয়া তিনি চৈতন্যসম্বন্ধে একটা হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের 'গৌরলীলা-তরঙ্গিণী'তে দ্রষ্টব্য। কথিত আছে অদ্বৈত সর্ব্বপ্রথম মদনমোহন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, তিনি উহা মথুরা চৌবে নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, উক্ত চৌবে উহা সনাতনকে দিয়াছিলেন। বাদশাহ কাপুরী নামক একজন কেন্দ্রী নদীতে তাঁহার

বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্যসহ জাহাজ অন্তর্হিত হইয়া যাওয়াতে মদনমোহন বিগ্রহের নিকট মানত করেন, জাহাজ উদ্ধার পাইলে তিনি সেই বৎসরের সমস্ত আয় দিয়া উক্ত বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন। মদনমোহনের বিশাল মন্দির এই মানতের ফলে প্রস্তুত হইয়াছিল। গাউড় সাহেবের ইতিহাস, চৈতন্যচরিতামৃত, নাভাজিকৃত ভক্তমাল ও লক্ষ্মণদাসপ্রণীত ভক্তি-সিন্ধু পুস্তকে এই বিগ্রহ-সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। উত্তরকালে এই বিগ্রহ জয়পুরের রাজা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি উহা তাঁহার প্রার্থনা-কালোচিত রাজা গোপাল সিংহকে প্রদান করেন, তিনি ইঁহার জন্য তথায় একটি নূতন মন্দির তৈরী করিয়া পূজার ভার রামকিশোর গোঁসাই নামক মুর্শিদাবাদের এক ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত করেন। এই ভাবে চৈতন্যের প্রভাবে তাঁহার ভক্তগণকর্ত্তৃক যে নব বৃন্দাবন স্থাপিত হয়, তাহা ক্রমে এরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিয়ন্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের স্থলে আর তিনজন নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ক্ষেত্র অশেষরূপে বাড়াইয়া দেন। ইঁহাদের ভক্তিপূর্ণ জীবন বহু প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, বংশী-শিক্ষা, অনুরাগবল্লী, কর্ণামৃত প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। এই তিনজনের মধ্যে প্রথম নাম শ্রীনিবাস আচার্য্যের।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

কথিত আছে চৈতন্যদেব ইঁহার জন্মবৃত্তান্তসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চাখন্দিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। বর্দ্ধমান যাজিগ্রাম ছিল ইঁহার মাতুলালয়। ইঁহার মূর্ত্তি অতি সুন্দর ছিল, বৈষ্ণব-সমাজে ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া পরিচিত। অদ্বৈত বিদ্যানিবাসের নিকট ইনি শৈশবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কিন্তু ইঁহার পিতা ছিলেন চৈতন্যের অনুরাগী। সেই অনুরাগ পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল। শৈশবে গঙ্গাধর নবদ্বীপে ইঁহাকে লইয়া যাইয়া চৈতন্যলীলার সমস্ত স্থান দেখাইতেন ও সেই মধুরাপতি মধুর লীলাকাহিনী শুনাইতেন। বক্তা ও শ্রোতা—পিতাপুত্র—দুই জনেই কাঁদিয়া আকুল হইতেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইনি নবদ্বীপে শচী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তৎপর পুরীতে গদাধরের নিকট ভাগবত পড়িতে যান। গদাধরের একখানি মাত্র ভাগবতের পুঁথি ছিল, তাহার অক্ষর মহাপ্রভুর অশ্রুতে ভিজিয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে একখানি বিশুদ্ধ পুঁথি আনিলে তিনি পড়াইবেন—

শ্রীনিবাস।

স্বীকার করিলেন। তাহাকে বাড়ীতেই রহিতে দিলেন। কয়েক মাস পরে শ্রীনিবাস ভাগবতের পুঁথি লইয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি শুনিলেন, নরোত্তম বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন। তখন গিরিয়া বাজারে আসিয়া নরোত্তমের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁহার আদেশ বৃন্দাবনে রওনা হন, কিন্তু কুল সমাজের নিকট হইতে কুলপুরোহিত যাজিগ্রাম হইতে পাঁচদিনে রাজমহল আসিয়া তথ হইতে নৌকায় হইয়া পাটনায় আসিলেন কাশীতে যাইয়া চৈতন্যের শিষ্যপ্রকাশানন্দ, বিদ্যাধর, চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তুলসীতলা, যবনের মুসলমান দরবেশের চরিত্রের যত পুঁথির সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, সব সকল করিয়া তাঁহার মনে প্রশ্ন ও সংশয়ের বহু বহিয়া গেল। চৈতন্য পরে তিনি প্রায়ই উপবাস করিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা কেহ কোনো কথা বলিতে সাহস করিতেন না, প্রয়োজন অত্যন্তই হইলে চুপিচুপি বলিতেন যে এই সুকুমার বালককে অথচ সেই ইহাকে প্রায়ই চলিতে অসমর্থ দুর্বল আসিয়া ধরিয়া লইতেন। তাহার অন্তরে ছিলেন সর্বজ্ঞা কথা তাহার ভগবান হইয়া। বৃন্দাবনের পথে শুনিলেন, রূপ ও সনাতন উভয়েই অল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে অন্তর্ধান করিয়াছেন। সমস্ত তাঁহার জন্য বাকে অন্ধকার

'নরোত্তম বালক বহু পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁর গোস্বামী ইহার ভক্তি ও পণ্ডিত্যদর্শনে ইহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক দুই জন প্রসিদ্ধ লোকের সঙ্গে ইহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজসাহী জেলার খেতুরি নামক পরগণার রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র নরোত্তম দত্ত। খেতুরি গোপালপুর হইতে ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং পদ্মার তীরস্থ পোমতলী গ্রামের এক মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। কৃষ্ণানন্দের বহুদিন কোন সন্তান জন্মে নাই নরোত্তম সেই রাজবাড়ীর চোখের মণিস্বরূপ ছিলেন শ্রীনিবাসের ন্যায় নরোত্তমও অতি শিশুকাল। শৈশব হইতেই তাঁহাকেও চৈতন্যপ্রেম পাইয়া বসিয়াছিল একদিন পদ্মার তীরে বালক এই সমুদ্রতুল্য অসীম জলরাশি দেখিতেছিলেন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি দেখিলেন এক গৌরাঙ্গ পুরুষ ঊর্ধ্বলোক হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "নরোত্তম, তুমি তো বিষয়ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই তুমি যে আমার আমার কাছে এস " সেই পরম অন্তরঙ্গের স্বর যেন তিনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া নদীতীরে পড়িয়া গেলেন। রাজবাড়ী হইতে বহু সন্ধানে তাঁহার খোঁজ মিলিল। চিকিৎসকেরা শিরাচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু নরোত্তম বলিলেন, "যদি আমার জন্য ঔষধ সেবা হয় তবে আমি না খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব " কিন্তু রাজা দেখিলেন—যেমন দেখিয়াছিলেন কপিলাবস্তুর শুদ্ধোদন—যেমন দেখিয়াছিলেন মধুরাপুরের গোবর্ধন দাস—ছেলে যে দুবি হয়। চৈতন্যের নাম করিতে সংজ্ঞাবিকলিত সদ্যশিশুর ন্যায় বালকের শ্রীমুখ অশ্রুতে ভাসিয়া যায় গৌড়েশ্বর সম্রাট কৃষ্ণানন্দ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ তাঁহার ইজারাদার ছিলেন তিনি রাজার বিপদ শুনিয়া কবিরাজ পাঠাইলেন, "নরোত্তমকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, আমি তাহার রোগ সারাইয়া দিব " বহু অশ্বারোহী সৈন্য পরিবেষ্টিত করিয়া ষোড়শবর্ষবয়স্ক

নরোত্তমকে গৌড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল কিন্তু তরুণ নরোত্তম সন্ন্যাসের ফাঁদে পা দিলেন না।

ঊষা হইতে সেই রাত্রি যে তিনি মঙ্গল শুনিতেছিলেন তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, রঘুনাথ দাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, রূপ-সনাতনের জীবনে যে বিরাগ দেখা দিয়াছিল সেইরূপ বিরাগের বশবর্তী হইয়া বালক নরোত্তম পালাইয়া গেলেন প্রহরীরা আসিয়া দেখিল পিঞ্জর খালি, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বালক পালাইতেছেন, সংসারকে বিভীষিকা ভাবিয়া—বিলাসকে নরকের বস্তুরূপ মনে করিয়া বিশ্ব-বিতের আহ্বানে সে কি উন্মত্তভাবে ছুটিয়াছেন ক্ষুধা পিপাসা সেরূপ বিলুপ্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়, ছদ্মবেশী ভক্তি তাঁহাকে সেইরূপ ভাসাইয়া লইয়া চলিল কয়েক দিন পরে দুর্গম জঙ্গলের অজ্ঞাত পথ ভাঙ্গিয়া বালক কাশের নিকট হাজরাতে উপস্থিত হইলেন—তখন তাঁহার সুন্দর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে দুই দিনের উপবাসে পদযুগল অবশ হইয়া আসিয়াছে, সমস্ত অঙ্গ দুইটি পদতল কণ্টকবিদ্ধ হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না—আর্তস্বরে মৃদুস্বরে বলিলেন "তুমি আমার জন্য এত সংঘাত তরুণ জীবনে সমস্ত সুখভোগের আশা বিসর্জন দিয়া আসিয়াছ আমি তোমাকে ছাড়িব না উঠ যাও" তাঁহার কথা ভাঙ্গিয়া গেল তখনই কোন কক্ষিত রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে এক বাটী দুগ্ধ দিয়া গেল তিনি উহা পান করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিলেন এবং সুস্থ হইলেন। বৃন্দাবনের নিকট কয়েক জন তীর্থযাত্রী সঙ্গ হইল চৈতন্যের কথা বলিতে গেলে বালকের প্রেমে কণ্ঠরোধ হয়, আনন্দাশ্রুতে গণ্ড প্লাবিত হয় সকলেরও চোখ হইতে জল পড়ে এবং ঘনঘন রোমাঞ্চ হয়—তাহারা ভাবিল "এ দেবশিশু কে?"

বৃন্দাবনে আসিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বহস্ত, নিঃসঙ্গ বালক পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, অন্নাহারে শরীর কৃশ, কিন্তু কোন স্বর্গীয় নৃপতি যদি কারাগার হইতে মুক্তি পান, হাত পায়ের লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলেন তবে তাঁহার সেই মুক্তির আনন্দই যেরূপ সকল জ্বালা জুড়াইয়া দেয়—নরোত্তমেরও সেইরূপ হইল। তাঁহার মুখ অলৌকিক প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল। এই অবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর আশ্রমে গোধূলিতে ঢুকিয়া নিত্য নিত্য তাহার আঙ্গিনা মুক্ত করিয়া ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। সেই অদ্ভুতকর্মা, বিষয়নিস্পৃহ, সম্পূর্ণ অনাসক্ত, অপ্রাতগ্রাহ্য সন্ন্যাসী দেখিলেন, কে যেন তাঁহার আশ্রম ও আঙ্গিনা ঝিটপাট করিয়া রাখিয়াছে একদিন, দুইদিন, তিনদিন তিনি বিস্ময়সহকারে এই অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া এক রাত্রি জাগিয়া রহিলেন—চোরকে ধরিবার জন্য হঠাৎ সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশীথে তিনি দেখিতে পাইলেন, দেবতার মত সুন্দর এক কুমার ঝাঁটা হস্তে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু দুটি পদ্মদলের মত জলে ছলছল করিতেছে, কখনও ঝাঁট দিতেছেন এবং কখনও বা ঝাঁটাটি বুকে রাখিয়া অজস্র চক্ষুজলে গণ্ড প্লাবিত করিতেছেন। লোকনাথ পরম স্নেহভরে শিয়র দিক হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'চোর তুমি কে? আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না" লজ্জিত ও বিস্মিত বালক লজ্জাবতী তরুণীর

স্বামী আর কথা বলিতে পারিলেন না। তখন স্বামী অন্য কাহাকে বলিলেন, "যদি ছাড়িবেন না, তবে আমাকে শিষ্য করুন।" [illegible] মনে অহঙ্কারের উদয় হয় এজন্য কখনও শিষ্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার গুরুর নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি চৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবনে রাধা লইয়া চৈতন্যের শ্রীমুখদর্শনে চিরকাল বঞ্চিত রহিয়া বৃন্দাবনের একক্রোশ উত্তর প্রেমতলায় নিভৃতে ছিলেন, সেই বিরহবিধুর বৃদ্ধ কৃষ্ণ সমাপ্তকাব্য প্রেমের সন্ন্যাসের অটল সঙ্কল্প আজ উল্লাস বিলাস বিটপিশাখা হরণ বনলতাকে আশ্রয় দেয়, ছিন্ন সই ও বৈ নরোত্তমকে রাখা দিয়া তাঁহার নিকট রহিলেন। ক্রমে বালকের শান্ততা, অসীম ভক্তি ও পরগৌরব মুখরাগে বিধিত হইল তাঁর গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহারও সেবার ভার লইলেন।

[illegible] নাম **শ্যামানন্দ**। ইনি নিম্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার রাজকোষের পরগনার ধারেন্দা বাহাদুরপুরবাসী ছিলেন। কিন্তু শ্যামানন্দ, এই পরিচয় দেওয়া বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া উদ্ধারিত হইয়াছিলেন।

শ্যামানন্দের নাম ছিল দুঃখী। অল্পবয়সেই ইহার বিবাগ উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি কালনা গৌরীদাস পণ্ডিতের চৈতন্যনিবাসে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন। এখানকার পূর্বোক্ত চৈতন্যচন্দ্র দত্ত কবিরাজ ইহাকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইহার গুরু নাম ঘুচাইয়া কৃষ্ণদাস নাম দিয়াছিলেন। কালনা হইতে ইনি যাত্রা করিয়া জাহ্নবীর সাথে খড়দহে গমন করেন। "রসিকমঙ্গল" নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত দেওয়া আছে। ইংরেজেরা যাহাকে mystic বলেন, ভারতের সাধু-সম্প্রদায়ের সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা যে সকল ভ্রম বা ভক্তি করেন তাহা সাধারণ লোকেরা চর্মচক্ষে দেখিতে পায় না। নরোত্তম ইহাকে রাধার গোপাল গোপালের রূপ দর্শন করিতেন, শ্রীনিবাসও কৃষ্ণকে দেখিয়া সম্বোধন করা পাপ হইতেন, "কর্ণানন্দ" প্রভৃতি পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে। যিনি বৃন্দাবনে অবস্থায় মৃতকল্প হইয়া পড়িতেন, আত্মীয় ও অনুচরগণ তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করিয়া বিষয় হইতেন। মহাপ্রভুর [illegible] কমই নাই, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে ছিল তাঁহার জীবন। সেই আকাশ কবিহৃদয় স্বপ্নগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির সূত্রের ন্যায় তাহা ধরা ছোঁয়া যাইত না। কাশীধামে অধ্যয়নকালে [illegible] ছয় বৎসর বয়সে এক শিক্ষালয়ের উপরে খৃষ্টের মূর্তি দেখিয়াছিলেন তাঁহার জীবনই এই স্বপ্নাবেশে কাটিয়াছিল। তিনি কতবার যে এই মূর্তি দেখিয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার ঠিকানা নাই। সেন্ট টেরেসা [illegible] খৃঃ খৃষ্টমূর্তি এতবার দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রেমের আবেশে মনে হইয়াছে যে তিনি ও খৃষ্ট এক। ভক্তদের ধারণা সম্বন্ধে "মৃতবৎলোকিত মত্তলীলা, মধুরিপুরহমিত ভদ্রলীলা" বিদ্যাপতির "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই" এবং জগদ্বন্ধুর গোপীদের "অনুক্ষণ কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা নিজেই কৃষ্ণ এই ভাবিতে লাগলেন" প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে এই সকল ক্যাথলিক সাধুদিগের অনুভূতির অনেকটা ঐক্য আছে। আমার ভিন্নের 'মিষ্টিসিজম' পাঠ করিলে পাঠক

এ সম্বন্ধে বহু কথা প্রচলিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ১৩০৭-১৩৬৩ পৃঃ) এবং ভক্তি (পৃ. ৪৩৬-৪৬৯ পৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে কবি ও সাধুদিগের আধ্যাত্মিক অনুভূতি এইরূপ হইয়াছিল। শ্যামানন্দ একদিন বৃন্দাবনে এক মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন আরতি হইয়া গিয়াছে, পাণ্ডারা চলিয়া গিয়াছেন— যেন সময়ে স্বয়ং রাধিকা স্বয়ং আসিয়া কৃষ্ণকে অভিষেক করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, সে কি অপূর্ব ভক্তি! কি আনন্দ কি 'গতি ভক্তি মুক্তিলাভ'। শ্যামানন্দ অচেতন হইয়া দেখিতে লাগিলেন, দেবদুর্লভ বিরাম নাই সমস্ত রাত্রি নিমেষের মত চলিয়া গেল পাখীরা কাকলী করিয়া উঠিল চমকিত হইয়া রাধিকা তাঁহার এক সখীকে স্বর্ণদণ্ড ফেলিয়া গিয়াছেন, সমস্তটাই একটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত কিন্তু স্বর্ণদণ্ডটিতো একটা কঠিন সামগ্রী, তাহা কি করিয়া সেখানে আসিল? সেই দণ্ডটি হাতে করিয়া যখন শ্যামানন্দ সপ্তসঙ্কেতে জীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এই অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াছিলেন অনেক পুস্তকে এই কাহিনীটি লিখিত আছে। নিম্নকুলজাত হইলেও জীব গোস্বামী বিদ্বান বন্ধুর সহিত শ্যামানন্দকে ভক্তিশাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন যুবকের অসাধারণ মেধা ও ধারণাশক্তি দর্শনে জীব গোস্বামী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া গুরু তাঁহার শিষ্যের নিকট হইতে এরূপ সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার শিষ্যের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। নৈষ্ঠী ভক্তি রাগানুগা, স্বকীয়া ও পরকীয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্যামানন্দকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বশেষ উপদেশ ছিল "তুমি তোমার উপদেশ একবার পাকা ভাল করিয়া বুঝিবে, তোমার শ্রোতা অভক্তাদি কিনা, যদি তাহা হয়— তবে তাহাকে কিছুই বলিবে না, তোমার সমধর্ম্মী ও ভিন্নরুচির অনুকূল ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিবে।"

তাঁহার প্রথম নাম ছিল "দুঃখী", দ্বিতীয় নাম "কৃষ্ণদাস", তৃতীয় নাম জীব গোস্বামীর দেওয়া "শ্যামানন্দ", এই নামই উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদে ইনি দুঃখী 'দুখিনী' অথবা "দুঃখী কৃষ্ণদাস" এইরূপ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের একখানি পদ্যানুবাদ রচনা করেন, তাহার এক মাত্র পুথি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।

এই যে তিন ব্যক্তির কথা বলা হইল ইঁহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান পাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ এই তিন ব্যক্তির কীর্ত্তিপ্রভাবে উজ্জ্বল। সুতরাং ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে জনসাধারণের উপর ইঁহাদের যে প্রভাব হইয়াছিল, তাহার তুলনা বঙ্গদেশে বিরল

জীব গোস্বামী কৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাসকে উপাধি দিলেন 'শ্যামানন্দ,' শ্রীনিবাসের উপাধি হইল 'আচার্য্য' এবং নরোত্তমের উপাধি হইল 'ঠাকুর মহাশয়'। বৈষ্ণব-সমাজে আচার্য্য প্রভু বলিতে একমাত্র শ্রীনিবাসকে ও ঠাকুর মহাশয় বলিতে শুধু নরোত্তমকে বুঝাইবে। এই তিন জনেই জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। তিনি

আদেশ করিলেন—"আমাদের এই ভাক্তারগুলি লইয়া তোমরা গোড়দেশে যাও। নতুবা শুধু বই পাঠাইলে কি হইবে ইহা কে বুঝাবে কে?"

শ্রীনিবাস বলিলেন— আমরা একাকী কি করিয়া আমরা গৃহে যাইব আপনাকে ছাড়াই বা কেমন থাকব কিরূপে? আপনার সঙ্গ ছাড়া ক্ষণও সুখকর নহে। ঈশ্বর বিতর করিলেন "সত্য নিজে পাইয়া অপরকে বিতরণ করা ইহাই মুখ্য কর্তব্য আমি তোমাদের গুরু আমি তোমাদিগকে আদেশ করতেছি দ্বিরুক্তি করিও না।"

মহাপ্রভুর গ্রন্থরত্ন লাভ

১২খানি গাড়িতে—তন্মধ্যে সনাতনের হরিভক্তিবিলাস হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু, চৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি গোপালচম্পু, বিদগ্ধমাধব, দানকেলি কৌমুদী প্রভৃতি গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান বহুমূল্য গ্রন্থ ছিল একটি কাঠের বাক্সে মোমজামার আবরণে সুরক্ষিত করিয়া তাহা বড় একটা গরুর গাড়িতে বোঝাই হইল। গাড়িটী বিশালকায় বৃষচালিত শকট ও তৎপরিচালক ১০ জন সশস্ত্র প্রহরীসহ শ্রীনিবাস আচার্য বুধরি রাজের নিকট হইতে অশ্বারোহণে লইয়া গোড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ছোটনাগপুরের বিশাল অরণ্য অতিক্রান্ত। ইং ১৬১০ সালে কবিকর্ণপুর মহাশয় বনদেবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং চৈতন্য একদা ঐ বনে হরিনাম আবেশে মত্ত ও ভক্তাপ্লুতকে কণ্ঠ ভরিয়া প্রিয়সম্বোধনে পূর্ণক ডাকিয়া আনিয়াছিলেন সেই প্রেমের পাগল করার কথা স্মরণ মনে করিয়া তাহার কখনও তাহার পরবশের অশ্রুর আবেগ সেই ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেন, যাহে মহাপ্রভুর আকর্ষণে তাঁহারা আসা হইয়া ইহা ন মক স্থানে একটা সরল পথ দিয়া চলিলেন।

এই সময়ে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন তিনি রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া পরাক্রান্ত রাজাদের অত্যাচার করিতেন। সময়টা ছিল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে পাঠান ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল। মোগলের প্রবল বহিঃশত্রুকে দমন করিতে ব্যস্ত সমস্ত নৃপতিরা কর বৃদ্ধি করিতেন, রাজস্ব দিতেন না, কিন্তু গৌড়ের বাদশাহের মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করার সময়ে গৃহকলহ বাড়াইবার ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না, এইজন্য দেশে একরূপ অরাজকতা চলিতেছিল বাংলাদেশের কতকগুলি স্থানে হইয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেন সমধর্মা কর্তৃপক্ষ মোগলের নিকট তিনি কিছুকালে ১,১৭,০০০ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখনও তিনি ঐরূপ কোন সন্ধি করেন নাই। তাঁহার নিজের একটি প্রধান দুর্গ ছিল এবং তাঁহার অধীন ১২ জন সামন্ত রাজার আরও একটি দুর্গ ছিল তাঁহার কোন রাজস্ব দেওয়ার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুরাসন কুলেখাঁএর রাজত্বের পূর্বপর্যন্ত বনবিষ্ণুপুরের রাজারা একরূপ স্বাধীন ছিলেন

একটা শকটের পিছনে পিছনে তিনজন সন্ন্যাসী এবং ১০ জন সশস্ত্র প্রহরীসহ দেখিয়া বীরহাম্বিরের গুপ্তচরেরা মনে করল –নিশ্চয়ই এই শকটে বহু ধনরত্ন বোঝাই। তারপর যখন সন্ন্যাসিগণের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে ইহার মধ্যে কি আছে? তখন তিনি শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রতি প্রচণ্ড আত্মিকতায় নিশ্চিন্তমনে বলিয়া ফেলিলেন—

"রত্ন",—এই কথাটা মনের ভিতর উঁকি মারিল। চরেরা এখন ঠিক বুঝিল ইহা অধিকারিকা না হইয়া যায় না। বীরহাম্বিরের রাজনন্দন জ্যোতিঃপ্রবর গণনা করিয়া বলিলেন—ঐ শকটের বাক্সে ধনরত্ন আছে। গুপ্তচরেরা শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সঙ্গে বীরহাম্বিরের নিযুক্ত সৈন্যদল। তামর নামক একস্থানে আসিয়া সন্ধ্যা কালপূজা করা হইল এবং সেই গ্রামেই তাহারা শকটটি আক্রমণ করিবে প্রথমতঃ এরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে সুবিধা হইল না। তারপর রঘুনাথপুর হইয়া শকট পারগাছতে পঁহুছিল। পঁহুছিল নামক স্থানের দিকে আসিল, এই গ্রামের দক্ষিণে আলিয়াড়া গ্রামে সন্ধ্যা সময়ে এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাত্রিবাস করিলেন, পরদিন ইহারা গোপালপুর পরগণায় আসিয়া পৌঁছিলেন,—ঐ সময়ে রাত্রিকালে দুইশত সন্ত্রান্ত রাজপুরুষ কবিরাজ ও শকটসহ বৃহৎ কাছারিতে লইয়া চলিয়া গিল।

বীরহাম্বির প্রচুর ধন লাভের আশায় সেই রাত্রে ঘুমান নাই। সেই রাত্রেই রাজ আসিয়া তাঁহার রাজপ্রাসাদে পঁহুছিল। তাঁহার দল পাইয়া এত খুসি হইয়াছিলেন যে রাজ খুলিবার পূর্বেই দস্যুদলকে পাঁচ হাজার ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

তিনি ভাণ্ডারে যাইয়া বাক্স খুলিলেন। কিন্তু একি, প্রথমেই একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। "শত্রুর আখর যেন মুকুতার পাঁতি", মহাপ্রভু বলিতেন। সেই মুক্তাসম অক্ষরগুলি দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, সমস্তই পুস্তক বটে, রত্নের নামগন্ধ নাই। বীরহাম্বির সভায় জ্যোতিষী পণ্ডিতকে বলিলেন, "তোমার গণনা মিথ্যা হইল"। জ্যোতিষী লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। রাজা বলিলেন, "রত্ন নাই কি? যাহাদের নিকট এগুলি রত্নই বটে।" গুপ্তচরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন সাধু—কোন্ পণ্ডিতের আজীবন সাধনার ফল তোমরা লইয়া আসিয়াছ? ইহাদের উপর তো অত্যাচার হয় নাই? তাঁহাদের নিঃশ্বাস আমার রাজপ্রাসাদ দগ্ধ হইয়া যাইবে। গুপ্তচরেরা বলিল "মহারাজের নিষেধ আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, যেখানে বিনা অত্যাচারে কার্য্যসিদ্ধি হয় সেখানে আমরা কোন অত্যাচার করি না, এক্ষেত্রে নিরীহ সাধুদিগের প্রতি কোনই অত্যাচার হয় নাই। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিলেন। রাণী সুলক্ষিণা আসিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

এদিকে তিন সাধু মৃতকের মনে যে শোক হইল—তাহা বর্ণনীয় নহে। সাধু যুগলের আজীবন তপস্যার ফল তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত ছিল সেই পবিত্র মহামূল্যবান্ গ্রন্থ অপহৃত হইল। তাহাদের আর সকল ছিল না বঙ্গদেশ হইতে গ্রন্থগুলি নকল করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রেরিত হইবে—এই ছিল বাসনা। হায় জীবচরিতামৃত প্রভৃতি মহারত্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। নৈরাশ্যে না হইয়া শ্রীনিবাস গ্রামবাসী একজনের নিকট হইতে কাগজ কলম লইয়া তাঁর গুরুদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের তখন বৃদ্ধ বয়স। এই শোকসংবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, সেইখানেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং তখনই বা তাহার অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

অপরদিকে শ্রীনিবাস তাঁহার দুই বন্ধুকে গৌড়মণ্ডলে পাঠাইয়া দিলেন, নরোত্তমের

হাতে শ্যামানন্দকে সঁপিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যাবৎ এই গ্রন্থের সন্ধান করিতে না পারি তাবৎ আমি এখানেই থাকিব এই গ্রন্থগুলির উদ্ধার চেষ্টায় আমার প্রাণ গেলে তাহাও মঙ্গল।" নয়দিন পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের সমীপবর্ত্তী স্থানগুলি ঘুরিয়া শ্রীনিবাস জানিলেন, সে দেশের রাজা স্বয়ং একজন দস্যু সুতরাং অপহৃত পুস্তকগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোন সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। দশমদিনে তিনি কেঞ্জলি নামক গ্রামে পৌঁছিলেন—এই গ্রাম বিষ্ণুপুর হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত এবং যমোদা নদীর তীরবর্ত্তী। সেইখানে কৃষ্ণবল্লভনামক এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়; ব্রাহ্মণ বটু ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুঝিলেন, ইঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ। যুবক তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেখানে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িতে একটু সাহায্য করেন, তবে তিনি চিরকৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইবেন। যুবকের শুধু সিদ্ধ তণ্ডুলান্ন নিয়া একবেলা দুটি ভাত খাইতেন, পরণে ছোট একখানি কটিবাস, শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে পড়াইতে লাগিলেন চুম্বক-পাথর যেরূপ ইস্পাতকে আকর্ষণ করে, শ্রীনিবাসের বিদ্যা ও করুণ মূর্ত্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণবল্লভকে সেইরূপ আকর্ষণ করিল কৃষ্ণবল্লভ রাজসভায় বাসাচার্য্যের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে যাইতেন। হিন্দু রাজগণ সম্ভবতঃ সেনরাজের সময় হইতেই অপরাহ্ণে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মপাল প্রভৃতি রাজারও ঐ ভাবে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন, তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন ধর্ম্মমঙ্গলের এই উক্তি বিশ্বাস্য নহে পরবর্ত্তী হিন্দু রাজারা ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতেন গ্রাম্য কবি পুরাতন সংস্কারগুলির মধ্যে এই সোনালোগ বটাইয়া থাকিবেন

বীরহাম্বির দস্যুপতি হইলেও রাজা হইলেও তাঁহার সভাপণ্ডিত বাসাচার্য্যের নিকট সেই দেশের চিরাগত রীতি অনুসারে অপরাহ্ণে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন চমৎকৃত হইয়া শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাগবত-পাঠ কেমন শুনিলে?" কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন "আমার মন আপনার পাদপদ্মে পড়িয়াছিল, আপনার সঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি।" শ্রীনিবাসকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণবল্লভ সেই শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে তাঁহাকে পরদিন রাজসভায় লইয়া গেলেন প্রথম দিন শ্রীনিবাস নিস্তব্ধ হইয়া সেই ব্যাখ্যা শুনিলেন। দ্বিতীয় দিন আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "আপনি প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন?" ব্যাসাচার্য্য একবার কোন উত্তর করিলেন না, তৃতীয় দিনও শ্রীনিবাস বলিলেন, "আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ শ্রীধরকে ত্যাগ করিয়া নিজের মত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। শ্রীধরের টীকা ছাড়িয়া আপনি রাসপঞ্চাধ্যায় বুঝিতেই পারিতেছেন না" এ কথার উত্তর না দিয়া ব্যাসাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সভাপণ্ডিতকে বলিলেন, "এই ব্রাহ্মণ আপনার ব্যাখ্যায় তুষ্ট নহেন, আপনি কি ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন?" বিরক্তির স্বরে ব্যাসাচার্য্য বলিলেন, "এই নৈয়ায়িকধারী যুবকের আস্পর্দ্ধা দেখুন, আমার ব্যাখ্যায় ভুল ধরিতে পারে এমন পণ্ডিত এদেশে কে আছে?" শ্রীনিবাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আসুন, আপনি ভাগবত

ব্যাখ্যা করুন, দেখি আপনি কত বড় পণ্ডিত।" এই বলিয়া তিনি বেদী ছাড়িয়া উঠিলেন, অকুণ্ঠিতভাবে শ্রীনিবাস তাঁহাতে আসন গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন সে কি কণ্ঠ, সে কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য! তাঁহার হৃদয়ের রাশি অসীম ভক্তিতে যেন উছলিয়া উঠিতেছে সেই ব্যাখ্যা যেন নিবেদনের মত, অঞ্জলি ভরিয়া যেন তাঁহার প্রাণের দেবতাকে উৎসর্গ করিতেছেন যেন সমস্তটা বাঁশি নবীনের অঙ্গস্পর্শে বাজিতেছে রাজা ও অপরাপর শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এমন কি বনবিষ্ণুপুরের রাজার পক্ষে গুরু অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। পর দিন প্রাতে রাজা তাঁর যত কাজ সারিয়া শত শত লোক আনাইয়া শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিতে রাজবাড়ীতে ভিড় করিল বিপুল হরিধ্বনির সঙ্গে শ্রীনিবাস ভাগবতের টীকা খুলিলেন সকলের ব্যাখ্যায় আসর গলিয়া গেল দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুর তুফান বহিয়া গেল। একচক্ষে সকলে দেখিল শ্রীনিবাস মানুষ নহেন, দেবতা রাজা সপ্তাহকাল পর পর ৩ দুইবার করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। রাজবাড়ীর এক বিশেষ প্রকোষ্ঠে তাঁহার স্থান করিয়া দিবার পর রাজা তাঁহার ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু শ্রীনিবাস নিজে ভোজনে বসিয়া এক গ্রাস মাত্র আহার করিলেন সেই সন্ধ্যাকালে রাজা তাঁহাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাহ্মণ আপনি একা কেন আসিয়াছেন? গুরুগৃহে কেন বিপক্ষ পড়ুয়া আপনি যা বাসনা করিয়াছেন, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন সহায়তা হয় তবে অকুণ্ঠিতচিত্তে আমায় বলুন" শ্রীনিবাসের মুখের বাধা উৎসারিত হইল তিনি গদ্‌গদ-কণ্ঠে সকল কথা বলিলেন উপসংহারে বলিলেন, "গ্রন্থরাজিসমূহের এই অমূল্য রত্নভাণ্ডার আমার হাতে ন্যস্ত ছিল, এগুলি না উদ্ধার করিতে পারিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, আমার সঙ্গে এক রাজকুমার ও অপর এক সকল সাধু লোকান্বিত হইয়া বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছেন"

তখন রাজা কুণ্ঠাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"আমার মত নরাধম আর নাই, আপনারা যে গ্রন্থরাজিকে খুঁজিতেছেন, আমিই সেই গ্রন্থ—আমার মত অপরাধী এত বড় রাজ্যে দ্বিতীয় নাই আপনার সেই গ্রন্থগুলি যেমন ছিল তেমনই আছে, আপনি আসুন, আমার রাজ্যের নবরত্নাকারের যে সাজ্য তাহাই আমাকে দিন" এই বলিয়া নতজানু হইয়া রাজা সাশ্রুনেত্রে শ্রীনিবাসের পায়ে পড়িলেন, তাঁহার রাজবেশ ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। সমসাময়িক প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভক্তিরত্নাকর ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরের লেখা তাহার কাহিনীও প্রায় এইরূপ, দুই একটি জায়গায় সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয় ভক্তিরত্নাকরের সময়ে শ্রীনিবাস দেবতাস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি যেদিন প্রথম বীরহাম্বিরের রাজসভায় প্রবেশ করেন—সেই দিন তাঁহার উচ্ছলচ্ছটাসমন্বিত স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত ভাগবত-পাঠ শেষ না হইবে, তাবৎ বসিয়া শোনা আমার রীতি নহে" ইহা ছাড়া প্রেমবিলাসের মতে রাজসভায় রাস-পঞ্চাধ্যায় প্রথম দিন পঠিত হইতেছিল, কিন্তু ভক্তি-রত্নাকরের

রাজার অনুরোধ

বর্ণনায় "ভ্রমরকীড়া"র কথা লিখিত হইয়াছে। মোটামুটি কাহিনীটি একরূপ, তবে পরবর্তী ভক্তি-রত্নাকরের অতিরঞ্জিত ভক্তির বর্ণনা হইতে প্রেমবিলাসের সরল স্বাভাবিক বর্ণনা আমাদের কাছে অধিকতর প্রামাণিক মনে হয়।

এই ঘটনার পর রাজা স্বয়ং, সভাপণ্ডিত বাসুদেবাচার্য, রাণী সুরক্ষিণা প্রভৃতি সকলেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার রাজ্যশাসনের ভার শ্রীনিবাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মসম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার মতামত গ্রহণ করা এই সময় হইতে রাজার চরম কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাজা শ্রীনিবাসকে যে এইরূপ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেকথা তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পত্রে শ্রীনিবাস নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে হিজলীর ঈশান মালিক তাঁহার গুরুদেব বিশ্বম্ভরদাসের হস্তে গুপ্তবৃন্দাবনস্থিত হিজলাতলার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরের ও চন্দ্রকোণার পর বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ ও সঙ্গীতশিল্পীরা বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান অঞ্চলের লোক। গোবিন্দ দাসের বাড়ী ছিল শ্রীখণ্ড বর্ধমান। ইনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের একান্ত অনুরক্ত, বলরাম কবিরাজের সহোদর, জ্ঞানদাসের বাড়ী কাঁদরা কাটোয়ার, আর আর প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব কবিই বর্ধমান ও বীরভূমবাসী।

বীরহাম্বিরের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের ফলে মল্লে ধর্মসম্পর্কিত বিপ্লবকরণ শ্রীমন্দির হইয়াছিল। বনবিষ্ণুপুরে যত বৈষ্ণবমন্দির গঠিত হইয়াছিল তাহাদের গঠনশৈলী ও কারুকার্য মল্লভূমে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে পুঁথির মলাটে, প্রাচীরের গায়, কাঠফলকে কাগজে ও কাপড়ে এই সময়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক সরল সহজ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীনিবাস ধর্মপ্রচারকার্য খুব বিস্তৃত ভাবে চালাইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজ্যের সীমানা শুধু বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল নয়, ঝিলুদা, ধলভূম, ময়নাগড়ী পাহাড় এবং ঝুকী প্রভৃতি উনত পার্বত্য জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইয়াছিল। পার্বত্য ঝিলুদাদের পাহাড়িয়া লোকদিগকে আমি কুমিল্লার নিম্ন সমতলভূমে প্রায়ই দেখিয়াছি। তাহারা তুলাকার কাঠ বিক্রয় করিবার জন্য কুমিল্লার অবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ফিরিবার মুখে দোকান হইতে বৈষ্ণব চরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা ঠিক্ আমাদের কথা বলে—সে ভাষা আমাদের নিকট দুর্বোধ, কিন্তু কিছু কিছু ভাষা বাঙ্গলা বলিতে পারে, অথচ বৈষ্ণব-চরিতামৃতের মত কঠিন পুস্তক তাহারা লইয়া যায়। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রচারকগণ ও তাঁহাদের বংশধরেরা যে, মোটের বৈষ্ণবধর্মপ্রচারের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহায় ছিল—বনবিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুর রাজভাণ্ডার। এদিকে গোবিন্দ সমস্ত উড়িষ্যাবাসীকে রাজকর্মচারীকে এই ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান শিষ্য রাজা রসিকানন্দের রাজভাণ্ডার এই প্রচারকার্যের সহায় ছিল। চৈতন্য দীর্ঘকাল উড়িষ্যায় ছিলেন। তথাকার বহু পল্লীতে গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে,

খাস বাঙ্গলা দেশে যত গোস্বামিগ্রন্থের ভাষালেখা আমরা বেশ বিশুদ্ধ ঈড়িষ্যার পল্লীতে পল্লীতে পূজা পাইয়া থাকেন। এই পড়ায়ের গুরুস্থানীয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি করিয়াছেন। উহারা বৃন্দাবনের ভক্তের কীর্তন, সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশে প্রচলন করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী এবং অন্যান্য ভক্তির গ্রন্থের যথাযথরূপে ও বাঙ্গ-পুত্তলায় প্রচার চলিয়াছিল, পরোক্ষ স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট বৈষ্ণবগুরু স্বীকার করিয়াছেন। যদ্যা ভারতের কুরুক্ষেত্রের রাজা ৫০ বৎসর পূর্ব্ব মহাপ্রভুরোহের সহিত গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি শান্তিপুরবাসী অদ্বৈত প্রভুর এক বংশধরের শিষ্য। লক্ষ্মিলাহোর স্থানে স্থানে চৈতন্য প্রভুর ধর্ম্মে দীক্ষিত দল আছেন। ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্নিহিত কোন স্থানে ঠৈতন্য একটী দল থাকার কথা আমরা শুনিয়াছিলাম। এমন কি একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুখে আমি শুনিয়াছি, আফগানিস্থানবাসীদের মধ্যে চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত লোক আছেন। প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র কবি ও সাধু তুকারামের চৈতন্যসম্বন্ধে একটী 'অভঙ্গ' আছে। তাহাতে তুকারাম তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তিনি গোরাঙ্গকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার আর্থার ভি ভাণ্ডারকরের নিকট এই অভঙ্গটী আছে। আকবর বাদশাহ যে গোস্বামি সম্বন্ধে একটী গান রচনা করিয়াছিলেন সেই তিনি গানটি ৮ কাশীধাম ভক্ত মহাশয়ের গোসাঁই গুরুমিশনে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

স্বতরাং দেখা যায়—অনুসন্ধান করিলে সমস্ত ভারতবর্ষে গোস্বামী বৈষ্ণবগণের বিকাশ এবং বিস্তারসম্বন্ধে একখানি ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। যাঁহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন তাঁহারা এক হইতে পারেন। গোস্বামিগণ তো সে চেষ্টা করিলেনই না। সাহেবেরা যখন অযাচি হইয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কোন্ সাহসে সেরূপ মৌলিক ব্যাপারে হাত দিবেন? অথচ ব্যাপারটি গুরুতর হইলেও খুব কঠিন নহে। খড়দহ ও শান্তিপুরের গোস্বামিগণের শিষ্য-তালিকা এবং শ্রীনিবাসের বংশধরগণের শিষ্যতালিকা খুঁজিলে বিস্তর উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। মণিপুর, ত্রিপুরা, দক্ষ ভারতের কুরুক্ষেত্র এবং উড়িষ্যার মহারাজ প্রভৃতি রাজগণের পুঁথিশালায় এবং বংশতালিকায় এসম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কোন শিক্ষিত ও কর্ম্মী যুবক যদি এসম্বন্ধে উদ্যোগী হইয়া কার্য্যে হইতে পারেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত একটা উপকার হয়। বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ দেখাইবার জন্য নবদ্বীপের ধূলটে একবৎসর একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এমন শুনিয়াছি। কিন্তু এই ইতিহাস লেখার কার্য্যে উৎসাহ কে দিবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি বাহিরের কোন উৎসাহের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় প্রাণের অনুরাগে কাজ করিবেন, বিফলশ্রম হইলেও ভগবান্ তাঁহার শ্রম পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তিনিই সফলাকাঙ্ক্ষা বেশী কৃতকার্য্য হইবেন। হিন্দুরা নবব্রাহ্মণের যুগে তাঁহাদের ধর্ম্ম অন্তর অন্তর্নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন—বৈষ্ণবেরা এই যুগে সর্ব্বপ্রথম সেই অচলায়তনের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

ধর্ম্মের বিষয়ে দ্বার উদ্ঘাটন।

শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর হইতে খেতুরীতে (রাজসাহী জেলা) নরোত্তমের নিকট গ্রন্থগুলির উদ্ধার ও রাজার দীক্ষাগ্রহণের সমস্ত কথা জানাইয়া চিঠি পাঠাইলেন। নরোত্তম ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ বড় দুঃখে সুখী পাইলেন, কিন্তু নরোত্তম রাজপ্রাসাদে গেলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণমণিকে ডাকিয়া গোপনে এবং পিতামাতাকে জানাইলেন, তিনি যে সন্ন্যাসী সেই সন্ন্যাসী থাকিবেন, একেবারে ছাড়িবেন না এবং কৃষ্ণানন্দের যে নিশ্চিন্ত ভোগ আছে, তাহা হইতে প্রসন্ন পাইবেন। খাওয়া-দাওয়া কিংবা অন্য কোন সম্বন্ধে অনুরোধের বাড়াবাড়ি করিলে তিনি খেতুরী ছাড়িয়া পলাইবেন। তাঁহার স্থানে তাঁহার পুত্রস্নেহ-লোলুপ সন্তোষ দত্ত রাজা হইয়াছিলেন। নূতন রাজা ও বৃদ্ধ কৃষ্ণানন্দ দত্ত ভয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ ভিন্ন অপর সকলে নরোত্তমের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার রাজপরিচ্ছদ নাই বিলাসভূষণ নাই রাজদণ্ড নাই শুধু একটা মুণ্ডিত মস্তক ও দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া সেই একখানি প্রসন্নমুখী মূরতি। সেই মূরতে এমন একটা গৌরবের ছটা ছিল যে স্বয়ং পিতা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গন্ধোদ্ভাসের সময়ে খেতুরী রাজধানীর একক্রোশ দূরে অবস্থিত পদ্মাতীরের উচ্চস্থানে এবং রাজনীতি শত শত দর্শকের আনন্দবর্দ্ধন হইয়াছিল। নরোত্তম মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, খেতুরীতে মহোৎসবের বিরাট আয়োজন করিবেন, সেই ইচ্ছার কথা অন্তরে জানিয়া পাইয়া সন্তোষ দত্ত তাঁহার সমস্ত রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিলেন, যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া এই উৎসব সম্পন্ন করিবেন—ইহাই সঙ্কল্প করিলেন। সুতরাং ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে এই অভূতপূর্ব উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। এত বড় বৈষ্ণব-সমাজ আর হয় নাই, পাণিহাটির মহোৎসবের (১৪০৬ খৃ.) পর এই উৎসব বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। সমস্ত সকল বৈষ্ণব বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে আসিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ-পত্রিকা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"আমরা সকলের নাম জানি না জানা সম্ভবপরও নহে। তিনি এই উৎসব যাগ নিজ আমাদের উৎসব সফল করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই দয়া করিয়া আমাদের এখানে আসিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। বয়স্থ ও আঢ়্যের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা রাখিব না।" এরূপ সার্ব্বজনীন নিমন্ত্রণ আর কোথাও কখনও হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। এই উৎসব বৈষ্ণবদিগের "মহোৎসবের" মতই উদার এবং সর্ব্বব্যাপী। সন্তোষ দত্ত উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পায়ের দিয়াছিলেন, সেই শত সহস্র অভ্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়াছিল, শতবর্ষবয়স্কা, অতি জীর্ণা, উপবাসক্লান্তা তপঃপ্রভায় উজ্জ্বলকান্তি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার স্বামীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য খেতুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন মন্দিরে স্বামীর বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি করে চাহিতে চাহিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিয়া পড়িতেছিল তখন শত শত লোকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। ভৃত্য ঈশানের মুখে সন্তোষ দত্ত জানিতে পারিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা পোষণ করেন, জানিয়া তৎক্ষণে গোপনে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার পায়ের এবং ১৫০৲ টাকা

প্রধান কবেন শ্রীনিবাস, বীরহাম্বির, রামচাঁদা প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং শ্রীনিবাসকে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা এবং বহুমূল্য গহনের এক জোড়, ব্যাসাচার্য্যকে একখানি রেশমী বস্ত্র এবং ৫ টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন সকলেরই পদের এবং গুণগৌরব অনুসারে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল এই বিরাট উৎসবে গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিরা উপস্থিত ছিলেন, পুরুষোত্তমের প্রসিদ্ধ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিত, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেকের নামই এই উপলক্ষে প্রেমবিলাসে কথিত আছে। এই সকল ঘটনা প্রেমবিলাস প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের চক্ষুর বিষয়, সুতরাং তাহাতে বর্ণনার সমস্ত খুঁটিনাটির পাওয়া যায় শ্যামানন্দ স্বয়ং যে গায়কত্ব-নিবন্ধক গানটি রচনা করিয়াছিলেন সেই "শুনলো পরাণ সই, মরম কথা তোরে কই"—আজ গানটি উৎসবে যখন গাওয়া হয়, তখন লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল নরোত্তমের উপর, তাহার কথা ভুলিয়া তাঁহারা তখন ইঁহাদের সম্রাসী বন্ধুকুমারের কথাই ভাবিতেছিলেন। "আমার নৈশকালে হেমাগার, শুক গোরে সিংহদ্বার, আমার সকলই ত ছিল সই—মাঝের বজ্রাঘাত পড়ে গেল অকস্মাৎ" ইত্যাদি কথায় যিনি কক্ষের আচ্ছাদনে রাজকুলের গৌরব চৈত্র প্রাসাদ ছাড়িয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার ছাড়িয়া নিরহঙ্কার ভিক্ষাব্রতধারণ করিয়াছেন—তাঁহারই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই উৎসবে দেবীদাস ও গোকুলদাস দুই প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার সুমধুর পদকীর্ত্তনে - বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি মহাজনের পদসম্মোহনে উপস্থিত জনমণ্ডলী যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে খেতুরী কয়েক দিনের জন্য বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। উৎসবের পূর্ণবৃত্তান্ত, নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর, নিত্যানন্দের প্রেমবিলাস, গিরিশকুমার ঘোষের নরোত্তম চরিত প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। এই স্থানটিকে কি একটা প্রস্তর-লিপিদ্বারা স্থায়ীয় করিয়া রাখা যায় না?

নরোত্তম বঙ্গীয় সমাজে আর একটি বিষয় উপস্থিত করিলেন, ইহাঁর কায়স্থ শিষ্য তাঁহার অনেকগুলি ব্রাহ্মণ শিষ্য হইয়াছিল এই সকল ব্রাহ্মণ আবার পণ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন

কায়স্থ গুরুর ব্রাহ্মণ শিষ্য।

ভগবান ইঁহার কলাটে সাধুত্বের তিলক অঁকিয়াছেন তাঁহার প্রস্তাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই নরোত্তমের সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন বলরাম মিশ্র একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নরোত্তমের শিষ্য হইয়াছেন, এ সংবাদে সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এই উত্তেজিত দলের নেতা হইলেন পদ্মাবতী তীরে গান্ধিলা-গ্রাম নিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ইনি সকলদিকে সুপণ্ডিত ও ধনশালী লোক ছিলেন ইহার বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহাতে পাঁচ শত ছাত্রের ব্যয়ভার ইনি বহন করিতেন। "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তেঁহো পণ্ডিত প্রধান পাঁচ শত পড়ুয়ার নিত্য অন্নদান" প্রেমবিলাস, বিংশ তরঙ্গ। এই সময়ে বলরাম মিশ্র ছাড়া আরও দুইটি ব্রাহ্মণ নরোত্তমের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন— ইঁহাদের নাম রামকৃষ্ণ ও হরিনারায়ণ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও উত্তেজিত হইয়া ইঁহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। তবে তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি ও শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ভাবিয়াছিলেন, নিছক জাতিকর্তৃক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করার প্রমাণ কোন শাস্ত্রে

পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে তাঁহার নরোত্তমের চাঁদ না লইলেন। বহু তর্ক ও আলোচনার পর তিনি দেখিলেন, ইঁহারা দেবতার স্থায় দেশে যে নূতন সংবাদ আনিয়াছেন তাহা গ্রহণ না করিলে বাঙ্গালার উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা নাই। পরাজিত এবং সন্ত্রাসগ্রস্ত নূতন ভাবে প্রণোদিত হইয়া শক্তিত ও দুর্জয় গজনিবাসীদের স্বপ্ন নরোত্তমের বিজয় গঠন করিলেন।

কিন্তু নরোত্তমের প্রধান সংঘর্ষকার গৌড়দ্বারে হইয়াছিল। গৌড়দ্বার রাজমহলের নিকটবর্তী। তখনকার দিল্লী রাজবংশের অতি প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ভৃত্য যাঁহারা ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায়। ইঁহারা অতি প্রবলপরাক্রান্ত ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠান বাদশাহ মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, সুতরাং এই রাজার রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন বাদশাহ ইঁহাদিগকে ঘাঁটাইতে ইচ্ছা করেন নাই। মোগলদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য দাউদ খাঁ সকলের পর রাজধানী রাজমহলে আসিলেন। তিনি সমস্ত মুলুকটাকে বিদ্রোহী অবস্থায় রাখিয়া বলক্ষয় করা সময়োচিত মনে করেন নাই। কয়েকবার বাদশাহের কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করিতে গৌড়দ্বারে আসিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদ রায় সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

চাঁদ রায়ের পীড়া।

একটি নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে হত্যা করার পর চাঁদ রায় বড় অনুতপ্ত হইলেন, তাঁহার মন মন পুড়িতে লাগিল, এবং তিনি প্রলাপ বকিতেন। এতবড় দুর্দান্ত রাজা একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চাঁদ রায় এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, কেহ যেন বলিতেছে "পঞ্চমীর সন্ধ্যাকালে রাজকুমারের শরণ লইলে তাঁহার রোগ আরোগ্য হইবে।" কিন্তু অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ রাজা—একটা কায়স্থের শরণ লওয়া কথা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মুখে কল্পনাজাত স্বপ্ন বলে করিয়া তিনি কথাটা উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—সেই নিষ্ঠুর হত ব্রাহ্মণের দ্রুত চাঁদ রায়ের কাঁধে চাপিয়াছে। চিকিৎসকের সব প্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল, চাঁদ রায়ের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইল।

এ অবস্থায় সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া বৃদ্ধ রাজা রাজবৈদ্য নরোত্তমকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নরোত্তম আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন তিনি যাদুবিদ্যা জানেন না, তাঁহার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই। তিনি চাঁদ রায়ের দুরারোগ্য রোগ সারাইবেন কিরূপে? কিন্তু এবার অনুতপ্ত চাঁদ রায় তাঁহার পায়ে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া স্বয়ং চিঠি লিখিলেন—রোগ যদি না সারে, তবে তাঁহার মুখে মৃত্যুকালে হরিনাম শুনিলেও একটা গতি হইবে। এবার নরোত্তম থাকিতে পারিলেন না, করুণ প্রাণী আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু বুধুরির সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ভিষক্ এবং কবিকুলচূড়ামণি গোবিন্দলালের সহোদর রামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া গৌড়দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রাজধানীতে বিপুলভাবে সংরক্ষিত হইলেন। চাঁদ রায়ের বর্ণনা ছিল মানসিক। কতকটা নরোত্তমের প্রাণ জুড়ানো উপদেশে কতকটা বা রামচন্দ্র কবিরাজের চিকিৎসার ফলে তাঁহার মনের উপর বৈষ্ণব-প্রভাব খুব হিতকর হইল। চাঁদ রায় অল্পদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন। তখন নরোত্তমের উপর তাঁহার অচলা

ভক্তি হইল। তাঁহারা স্থির করেন যে শাক্ত, শাক্তকালে বা তাহার পূর্বে যত আড়ম্বরপূর্ণ যে দুর্গাপূজা হইত তাহাতে নরবলি মেষ ও মহিষ বলি দেওয়া হইত। কিন্তু এই সম্রাট ব্রাহ্মণ পরিবারের মনে যে পরিবর্তন হইল, তাহার ফলে বৃদ্ধ রাজবৈদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া রাজবাড়ীর সকলেই কানুর নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই ঘটনা এরূপ বিস্ময়কর হইয়াছিল যে, লোকে সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে চায় নাই।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই চাঁদ রায় পূর্বকৃত দুষ্কৃতির জন্য বড় অনুতাপ করিয়া গৌড়ের বাদশাহকে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন, এবার বাদশাহের কর্মচারী আসিলেই তিনি বাকী রাজস্ব সমস্ত পাঠাইয়া দিবেন। পাঠান বাদশাহ এই চিঠি লইয়া অনেক আলোচনা করিল, অধিকাংশ রাজমন্ত্রী এই চিঠির উপর নির্ভর করা অবিবেচনার কাজ মনে করিলেন। মহা ধূর্ত চাঁদ রায় কি গুপ্ত মতলব করিয়া হঠাৎ বাদশাহটি সরিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া এই সঙ্কট জালে না পড়িতে কোন রাজকর্মচারী স্বীকৃত হইলেন না।

চাঁদ রায় গোকর্ণা পরগণার সংলগ্ন নরোত্তম নিজে ছই সেনা কর্তৃপক্ষ করেন। শুক নরোত্তম দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁদ রায় গোস্বামীর সমক্ষে অনেক মণি মাণিক্য ও বস্ত্রালঙ্কার উপঢৌকন পাঠাইলেন। নরোত্তম তাহা এক কপর্দকও গ্রহণ করিলেন না। নরোত্তমের আগমনের পর একদা চাঁদ রায় ৫০ অশ্বারোহী ও ৫০০ পদাতিক সঙ্গে লইয়া শিলাইদহে গৌঁছবার হইতে সন্তোষদত্তকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গুপ্তচরেরা গৌড়ের বাদশাহকে জানাইল চাঁদ রায় অরক্ষিত অবস্থায় দূরে পড়ে রহিয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া গৌড়েশ্বর বহু সৈন্য পাঠাইয়া চাঁদ রায়কে বন্দী করিয়া লইয়া আসিলেন। লোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, অসামান্য দৈহিক বলসম্পন্ন চাঁদ রায়কে সম্বোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন "পাপিষ্ঠ তোমার এত বড় বুকের পাটা যে তুমি বহুকাল ধরিয়া আমার রাজস্ব চুরি করিয়া খাইতেছ?" চাঁদ রায় রাজোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়া বৈষ্ণব ভেকের সঙ্গে বলিলেন "আমি হুজুরে পূর্বেই জানাইয়াছিলাম—পূর্বকৃত দুষ্কৃতের জন্য আমি অনুতপ্ত, আমাকে উচিত শাস্তি প্রদান করুন" বাদশাহ তাঁহার ধার্ষ্ট্য ও সরলতা দর্শনে কতকটা মুগ্ধ হইলেন কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। "ইহার বিচার পরে হইবে" এই বলিয়া একটা অন্ধকার কারাগারে ইহাকে পাঠাইয়া দিলেন। মাটীর নীচে কারাগার আলোর প্রবেশপথ নাই, সাঁতসেঁতে ছাদ হইতে—দিনান্তে অতি ক্ষুদ্র খাদ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু সংসারের কোলাহল হইতে এই গুহায় ঢুকিয়া—ইনি ইহাকে আশ্রমের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি সেই নিভৃত নিকেতনে সারাদিন কৃষ্ণধ্যানে রত থাকিতেন। কোন সময় ভাবিতেন তিনি কৃষ্ণের জন্য চন্দন ঘসিতেছেন এবং অতি যত্নে তাঁহার টীপ বিগ্রহের মাথায় পরাইয়া দিতেছেন, কখনও ভাবিতেন, তিনি তাঁহার আরতি করিতেছেন, শঙ্খপ্রদীপের আলোতে বিগ্রহ ঝলমল করিতেছে, কখনও মনে করিতেছেন, তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, অথবা নৈবেদ্য সাজাইতেছেন। কখনও মনে

হইত, বনে বনে ঘুরিয়া তিনি কালের জন্য স্বয়ংপ্রস্ফুট ফুল চয়ন করিতেছেন, অথবা তাহার দ্বারা মালা রচনা করিতেছেন। এই ভাবে দিনযামিনী কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা তিনি জানিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ে যখন এই সহজ আনন্দ শতদলের মত ফুটিয়া উঠে, তখন বাসস্থান কক্ষমাত্র বা নিবিড় বন্ধনযুক্ত কারাগৃহ—তাহা ভাবিবার অবকাশ কোথায় থাকে?

চাঁদ রায়ের পিতা রাজদরবারে রায় কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ পাঠাইয়া তাঁহার আহারের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আর একজন লোক পাঠাইয়া এমন একটা সুযোগ করিয়াছিলেন, যাহাতে অনায়াসে চাঁদ রায় মুক্তি পাইতে পারিতেন। সেই লোক অতি গোপনে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন "আপনি কালবিগ্রহকে দুই বেলপাতা দিয়া পূজা করুন, তারপর আমি আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কালীবিগ্রহ উপস্থিত করিলেন। চাঁদ রায় বলিলেন "কৃষ্ণবিগ্রহ আমার উপাস্য আর কেহ নাই, এখানে যদি তাহাও ভাল—কিন্তু আমি অন্য কোন দেবতার পায়ে ফুল দিব না। আমার সকল ফুল, সকল নৈবেদ্য আমার দেবতার পায়ে বিলাইয়া দিয়াছি, অপর কাহাকেও দিবার মত আমার কিছুই নাই। আমার পিতাকে বলিও আমি ভাল আছি, কারাগারে যখন ছিলাম তখনকার অনেক ফুল আছি আমি মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়া যেমনে পরম পবিত্রতা ও অপূর্ব শান্তি অনুভব করিতেছি আমি চুরি করিয়া পলাইয়া যাইতে চাহি না।" পিতার নিকট দূত দেখিলেন কালীপূজা না করিলে এসম্বন্ধে কিছু করা তাহার পক্ষে নিরর্থক তিনি ফিরিয়া গেলেন।

যথা সময়ে দরবারে চাঁদ রায়ের ডাক পড়িল বাদশাহ বিচার করিয়া "হস্তিপদদলিত করিয়া হত্যা করা হউক"—এই আদেশ দিলেন চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত এশিয়াতে বন্দী ও অপরাধীকে হস্তিদ্বারা হত্যা করার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

চাঁদ রায়ের শক্তি ছিল অসীম। একটা বৃহৎ হস্তীকে তাঁহার দিকে ধাবমান করিয়া দেওয়া হইল তিনি তাঁহার হস্তদ্বারা হাতীর শুঁড় ধরিয়া এমনই জোরে মোচড় দিলেন যে, হাতীটা চীৎকার করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল এই অমানুষিক বল দেখিয়া বাদশাহ বিস্মিত হইয়া চাঁদ রায়কে বলিলেন, "তুমি এতদিন যাবৎ অতি সূক্ষ্ম খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ অনশনে আছ, এ অবস্থায় তোমার এরূপ অদ্ভুত বল হইল কি প্রকারে?"

চাঁদ রায় প্রথমে কারাধ্যক্ষের জন্য অন্তর চাহিয়া বলিলেন, "আমি কারাগারে উত্তম খাদ্য খাইয়াছি। কারাগারে আমি খুব ভাল ছিলাম—আমি সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে কৃষ্ণসেবা করিতে পারিয়াছি আমার পিতা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীপূজা করিবার কথা থাকাতে আমি তাহাতে রাজী হই নাই তজ্জন্য আমার মৃত্যুদণ্ড বা যে কোন দণ্ড দিলেন, আমার তাহাতে ক্ষোভ নাই আমি কৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়াছি" বলিতে বলিতে চাঁদ রায়ের চক্ষু সজল হইল বাদশাহ তাঁহার কথা শুনিয়া এত প্রীত হইলেন যে, তখনই তাঁহার মুক্তির আদেশ দিয়া যে সকল স্থান চাঁদ রায় বলপূর্বক দখল করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকারও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

চাঁদ রায় গৌড়দ্বারে প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং অতি প্রীতির সহিত বলিলেন, "সেবার আমি তোমাকে শুধু তোমার পৈত্রিক ও বাহুবলার্জিত সম্পত্তির অধিকার দিয়াছি আজ তোমাকে একটা পুরস্কার দিব।" বাদশাহের আদেশ অনুসারে চাঁদ রায়কে একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ দেওয়া হইল, তাহাতে তিনি আকেদি পরগনার অধিকার পাইলেন।

চাঁদ রায়ের দলে যে সকল ব্রাহ্মণ ভর্তা ছিলেন তাঁহারা অনেকেই নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পার্শ্বিক বাড়ুয়ে, কালিদাস চট্টে, নিরাকার চক্রবর্তী, রামজয় চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী এবং শিব চক্রবর্তীর নাম নরোত্তমবিলাস ও অপরাপর পুস্তকে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

মহাপণ্ডিত জীবনে তাঁহার যাহাই হোক না ছিল, তাহা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত। নিত্যানন্দ পণ্ডিত জাহ্নবার মতো বৈষ্ণব গোঁসাইদের গোঁড়ামিতা চালাইয়াছিলেন সমাজ তাঁহাকে প্রথম লক্ষ করিয়া রাখিয়াছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে কলহ শান্তির সম্পাদন করার জন্য বৃন্দাবনে সমবেত ব্রাহ্মণ সমাজের মুখ চেয়ে যে পাইয়াছিলেন। অবশ্য ইহাদের সকে এ প্রশ্ন মেটাবার জন্য শান্তিপুরে বিলক্ষণ আলোচনা হইয়াছিলেন। ইহারা বুঝিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ করিলে সমাজে অচল হইয়া পড়িবেন তাহা হইলে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা সফল হইতে পারিবে না। নিত্যানন্দের বংশের অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে "নিত্যানন্দ বংশাবলী ও সাধন" পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বংশধরেরা বহু চেষ্টায় এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলীন সমাজে আসন প্রদান সম্বন্ধে বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি বিনীত হইয়া সমস্ত দাবী দাওয়া মিটাইয়া কুলীন-সমাজকে হস্তগত না করিতেন, আজ খড়দহ ও শান্তিপুর একেবারে সমাজ বহির্ভূত হইয়া থাকিত।

কিন্তু নরোত্তম সমাজের কাছে একটুও অবনত স্বীকার করেন নাই বরঞ্চ বৈষ্ণবেরা জনসাধারণের এক বিশাল সভা আহ্বান করিয়া নরোত্তমকে খাঁটি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র দান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। এখন আর শুধু বলরাম মিশ্র কিংবা গঙ্গারাম চক্রবর্তী নহেন, চাঁদ রায়-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের ক্রোধ সকল সীমা অতিক্রম করিল, তাঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন।

কলিকাতার নিকট পকপল্লী আধুনিক পাইকপাড়া। তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তথাকার রাজা নৃসিংহ রায় একজন ব্রাহ্মণভক্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। এই রাজপরিবার কায়স্থ হইলেও সমাজে ইঁহাদের খুব প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া সমাজসংস্কারের একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা ছয়জন প্রতিনিধি নৃসিংহ রাজার নিকট পাঠাইলেন। এই ছয় জনের নাম যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কালীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, শিবচরণ বিদ্যাবাগীশ এবং দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন। ইঁহারা পকপল্লীর

রাজাকে বলিলেন "আপনি শাস্ত্রই পড়ুন, সংস্কৃত পড়ুন বা পার্সি পড়িতে বিলাতে যাইতেছেন। ব্রাহ্মণ পুরুষ উপস্থিত রহিয়াছে, ইহা হইতে কি ধর্ম্মতত্ত্ব বাহির হইতে পারে তাহা আপনি দেখে প্রত্যক্ষ করুন।" অনেক আলোচনার পর এই ঠিক হইল যে রাজা নিম্নে পণ্ডিতগণসঙ্গে লইয়া ঘরে বসিয়া পরীক্ষা করিবেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন, "যদি সেই কাজে গুরু এই সকল অন্ধকার বিদূরিত করিতে পারেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিকটে মাথা মুড়াইব, এবং তাঁহাকে যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে।"

পণ্ডিতেরা চারিদিক হইতে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পড়ুয়াদিগকেও আনিলেন, বহুকষ্টে রাজাই পুঁথি চালিয়া রাজা মুসলমান সম্রাটগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহাদের সহায়তা করিলেন। এই ভাবে রাজা একটা মস্ত বড় দল লইয়া মেছুয়ার অন্তর্গত বসিয়া গেলেন। এই সংবাদ ছড়াইতে বিলম্ব হইল না। এদেশের কিছু বিদ্যালাভে যে কতকটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে একটা মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিলেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন হানি হইবে না। কেহ কেহ বলিলেন, ইহাতে ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। এই উপায়ে কলিকাতা কিরূপ অসভ্য হইয়াছিল, তাহা কায়াপুর গ্রামে এখনো কোন কোন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এদেশের লোক যে কিরূপ ছোট একটা কারণ খুঁজিয়া বড় কার্য্য করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এখনো বিরল নহে। যাহা হউক, রাজার সভা পণ্ডিতদের পড়ুয়া দেখিয়া লোকে মনে করিল, ইহাদের মধ্যে একখানা পড়িলে লোকানের মালিক হইবেন। সেই কারণে সভা পণ্ডিতদের পড়ুয়া দেখিয়া কিনিতে যাহা পেয়ে ছেলে, মুদি ও পানওয়ালা, সকলেই সংস্কৃত কথোপকথন করে। আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা তাঁহাদের শিক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরদাতা বলিলেন, "আমরা মেছুয়ার লোক, সেখানে চাউল মহাজনের কাছে বড় পণ্ডিতের সভা হয়। মেছুয়ার লোকেরা সকলেই অল্প বিস্তর সংস্কৃত জানে।" কিন্তু এতো সহজে বিদায় লইতে পড়ুয়ারা রাজার যে কথা শুনিল তাহাতেই তাহারা অস্থির হইল। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া তাহারা গিয়া তাহাদের অধ্যাপকদিগকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিল। মেছুয়ার ক্ষুদ্র তিনটি লোকানের কাছে হাজারটা ঘরের অসম্ভব ভিড় হইল। ছয়জন পণ্ডিত তাহাদের বহু পড়ুয়া ও কতক সরঞ্জাম পুঁথি একদিকে অন্যদিকে তেলী, মুদি ও পানওয়ালা, রাজা স্বয়ং সভা ভাঙ্গিয়া বসিয়া গেলেন। মহারাজ স্বয়ং পণ্ডিতরাজ রূপনারায়ণ সরস্বতী। পণ্ডিতগণ আসিয়া দেখিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী পণ্ডিত উপস্থিত রহিয়াছে, যাহাতে তাঁহাদের প্রবেশমাত্র নাই, তাঁহারা সেই নব অযোধ অস্ত্রের নিপুণ সন্ধান। সনাতনধর্ম্ম হরিভক্তি বিলাসের "বধা কাঞ্চনতা যাতি কাংস্যং তথাবিধানেতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম" প্রভৃতি শ্লোক ও অন্যান্য যুক্তির বাহে পড়িয়া পণ্ডিতেরা একান্ত পরাজয় হইলেন। তাহাদের মনোহারী কথা, ভক্তির ও বেশ ও পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করিল। রাজা নৃসিংহ এবং সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী পরোক্ষভাবে

শরণ লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা নৃসিংহ ও রাজ্ঞী সুশীলা একত্র দীক্ষিত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে দ্রষ্টব্য।

নরোত্তম আরও অনেক লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী অন্যতম ছিলেন। সন্ন্যাস-কুলজাত শ্যামানন্দ পুনরায় ঘরে আসিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে উপস্থিত হন। পরমানন্দ মহাপাত্র, শ্রীকৃষ্ণ, এখানে তিনি অম্বিকাকালা দামোদরকে বহুদিন পরাস্ত করিয়া বিদ্যাধর্মে দীক্ষিত করেন। শেষ যা নায়ক এক মুসলমান দস্যু তাঁহার সাক্ষাৎ আসিয়া এতই প্রভাবান্বিত হন যে তিনি শ্যামানন্দের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদাস নামে পরিচিত হন। এই চৈতন্যদাস একজন পদকর্তা। ভক্তিরত্নাকরের শেষ তরঙ্গে ইহার সম্প্রদায়কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে ইনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। প্রেমবিলাস দ্রষ্টব্য।

রায়নি ধারার নিকটবর্তী ভূমিজ নগরে হরকালে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নাম অচ্যুত। ইহার অধিকার মল্লভূমির অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভূমিজ নগরের একদিকে দোলেশ্বর শিব। এই দেবতার প্রতি রাজার অত্যন্ত ভক্তি। তাই একটি সুন্দর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা অচ্যুত তাঁহার রাজ্য রক্ষার সহিত অনেক সময় এই মন্দিরের নিকটে বাস করিতেন। অচ্যুতের ভ্রাতুষ্পুত্র রসিকমুরারি পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও অনেক সময়ে দোলেশ্বরমন্দিরে বাস করিতেন। শালুকপুলা নামক স্থানে রসিকমুরারি শ্যামানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সেই সাক্ষাতের পর রসিকমুরারি ভক্তিরসে রসাপ্লুত হইলেন। তাঁহার মনের ভাব ও জীবনের গতি ফিরিল। তিনি মানুষ চিনিলেন, জীবের দোষগুণ তাঁহার নিকট অসার বোধ হইল। ক্ষত্রিয় রাজা রসিকমুরারি তাঁহার দুই রাজ্ঞী ঈশানী ও মালতীর সহিত সন্ন্যাস শ্যামানন্দের শিষ্য হইলেন। উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত রাজারাই এই রসিকমুরারির শিষ্য। সুতরাং মযূরভঞ্জ পড়িয়া উড়িষ্যার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরের অধীশ্বরদের গুরুর গুরু শ্যামানন্দ। ভক্তিরত্নাকরে শ্যামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে উদ্ধব, অক্রূর, মধুসূদন গোবিন্দ, জগন্নাথ, আনন্দানন্দ এবং রাধামোহনের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য রসিকমুরারি। সমস্ত উড়িষ্যাদেশে শ্যামানন্দ চৈতন্যধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। ইঁহারা জাতিভেদ একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সেই নিরিশেষে ধর্মমন্দিরের দ্বার সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একান্ত অস্পৃশ্য বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগকে বৈষ্ণব-পর্যায়ে স্থান দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা পণ্ডিতের উদারকারী ছিলেন, শাস্ত্রানুশাসিত জটিলতাগ্রস্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ হিন্দুসমাজকে একেবারে ইঁহারা জাগরণমন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। নব-জীবনের সৃষ্টিতে বৈষ্ণবধর্ম মণিপুর হইতে মহাবলিপুরম, উড়িষ্যা হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত সর্বত্র, পাহাড়িয়াদের মধ্যে কুকী, ত্রিপুরবাসী প্রভৃতি নানা জাতি ও দেশবাসীকে

চৈতন্যের প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতন্যের সঙ্কীর্তনই খোল ও মাদল বঙ্গদেশের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বর্ধিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনও থামে নাই। তাঁহারা ভিন্ন ধর্মের গ্রাস হইতে জনসাধারণকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে এই ধর্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার সমস্তই চৈতন্যের প্রেরণা-জাত। তিনি জ্ঞানের পাণ্ডিত্য ও প্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণে তাঁহার ইঙ্গিত ছিল সেই ইঙ্গিত ক্রমে বিচিত্রিনিন্দরের মত ক্রমে বিশালতোরণ শ্রেণীতিনীতে পরিণত হইয়াছিল। জাতিভেদসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সুস্পষ্ট, "মোর জাতি—মোর সেবকের জাতি নাই" চৈ ভা অন্ত্য ১০। "সন্ন্যাসী পণ্ডিতজনের কাঁহতে সঙ্কোচ নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্মের প্রকাশ" চৈ চ অন্ত্য ৭। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি কালিদাস কটু কদলীর পিণ্ডিছত্র খাইয়াছিলেন, চৈতন্য এজন্য তাঁহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন। যবন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈতন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে তাঁহার পাদোদক পান করাইয়াছিলেন, শ্রাদ্ধদি উপলক্ষে তিনি হরিদাসকে মহাসমারোহের চূড়া আদর ও পূজা দেখাইয়াছেন। জাতিনির্বিশেষে তাঁহার প্রেম ও দয়ার ধারণার গৌড়ীয় ব্রাহ্মসমাজে "নিমাই প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন" বলিয়া থাকে, "সব অবিধি এথের বিধি" অর্থাৎ যে আচারে—তাহাই নমস্কার্য। পাক্ত কবি চৈতন্যের এই উদারনীতিকে তীব্র কটাক্ষে লিখিয়াছিলেন, "যেবা বলে আমিও যেতে, একটে যোজন ছত্রিশ ক্রোশ যেতে, বাপ কোটাল খোপা কুলে একত্র সমস্ত"।

পরবর্তী কালে হিন্দুবিধি অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবেরা যে প্রাধান্য চালাইয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন, সেই প্রাধান্যের প্রথম চৈতন্য হইতে নির্গত হইয়াছিল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই বিপুল উদ্যম রুদ্ধ হইয়া পড়ে। বীরহাম্বীর মল্লবিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, অবশ্য তখনকার শিল্প ও স্থাপত্য বৈষ্ণব প্রভাবে অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব পুস্তক রাজার পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তিনি সাধারণ রাজধর্মের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্থল বলা যাইতে পারে তিনি প্রত্যহ একটা নির্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করার জন্য প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল লিখিত আছে, কোন কোন লোক রাত্রি জাগিয়া নাম জপ করিত, পাছে ঘুমাইয়া পড়িয়া নির্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করিতে অক্ষম হয়, সেই ভয়ে তাহারা নিজেদের টীকি ঘরের টুয়া বা আড়ার সঙ্গে সুতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। যখনি ঝিমাইতে থাকিত, তখনি টীকিতে টান পড়িত। তখন জাগ্রত হইয়া পুনরায় জপে মনোযোগী হইত। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব গোঁসাইগণ প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা লাভ করিয়া অভিজাততন্ত্রী ও কতকটা ধর্মের বিকৃত অর্থবাদক হইয়া পড়েন। আমরা বলিতে বাধ্য, চৈতন্য যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার গোস্বামিগণ প্রবর্তিত ধর্ম আর সেরূপ নাই। চৈতন্যের অশেষ দৈন্য ছিল, তাঁহাকে যদি কেহ ভগবানের অবতার বলিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর তাঁহার সম্বন্ধে বহু আজগুবী গল্পের

হইল, তখন তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিতে তিনি নরাকৃতি হইয়া গর্জন করিতে লাগিলেন, কখন এক সর্পের উপর হইয়া অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর অভিনয় করিলেন বহুলোকের খাদ্য একা খাইয়া লক্ষোদর হইলেন, চতুর্ভুজ ও ষড়্ভুজ মূর্তিতে ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিলেন, একদিনে আম্রবীজ বপন করিয়া সেইদণ্ডেই গাছে ফল উৎপন্ন করিলেন, জামীরের গাছে কদম্ব ফুটাইলেন, কখনও নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিলেন (চৈ ভা মধ্য ২য়, মধ্য ৩য়, চৈ চ মধ্য, ১৭ শ, ১২ ১৩ শ্লোক, চৈ চ মধ্য, ৩য় শ ৪র্থ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। লোচন দাস লিখিয়াছেন, তিনি পুরীতে আছেন শুনিয়া নদীয়া হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, এ সকল কথা পূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ চৈতন্য বিরহবিধুর নবদ্বীপবাসীদের মধ্যে যাহারা কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই আসিয়াছে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 'অলৌকিক গল্পে যে বিশ্বাস না করিবে—তাহার মস্তকে তিনি পদাঘাত করিবেন।' চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়—চৈতন্যের পূর্বলীলাতেই যত অলৌকিক ব্যাপার, রূপ গোস্বামীরা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাতে অলৌকিক অংশ খুব অল্প। এই পূর্বলীলার বর্ণনা নবদ্বীপবাসীরা করিয়াছিলেন যাহাকে তাঁহারা ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভাগবত লীলা আরোপ করা তাঁহারা দোষাবহ মনে করেন নাই, বরঞ্চ উহা অবিশ্বাস করা তাঁহারা পাপ মনে করিয়াছেন এজন্য মুরারি গুপ্তের মত প্রবীণ পণ্ডিতও অনেক অলৌকিক কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের করচা এই দোষ হইতে মুক্ত একথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে চৈতন্য নবদ্বীপে থাকিলে ভক্তির ক্ষেত্রে ঐ সকল আষাঢ়ে গল্প চালাইতে পারিতেন না। তিনি এরূপ অলৌকিক কথায় কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি পুরীতে এই সকল ভক্তির আতিশয্য নিরস্ত করিয়াছিলেন, এমন কি সার্বভৌমের মত পূজ্যপাদ প্রবীণ পণ্ডিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলাতে তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন, "প্রভু কহে সার্বভৌম আর কথা কহ। আমার সাক্ষাতে কভু কেন বা বলহ।" তাঁহার অনুপস্থিতিতে গৌড়দেশে ভক্তির বাড়ের পরিপাটি ঘরের আঙ্গিনা উপহাসের আগাছায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল

চৈতন্যদেবকে ভগবান রূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীরা নিজেরাও তাঁহার দেবত্বের অংশীদার হইতে দাবী করিলেন। চৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু নিত্যানন্দ বলরাম এবং অদ্বৈতকে সদাশিব করা হইয়াছে। কেশব ভারতী শ্রীকৃষ্ণ-গুরু সান্দীপনি মুনি, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বৃষভানু, নরহরি দাস মধুমতী, রামানন্দ বিশাখা, রূপ শ্রীরূপমঞ্জরী, গদাধর—রাধিকা রূপে চন্দ্রকলতা, সনাতন—লবঙ্গমঞ্জরী গদাধরভট্ট—সুদেবী, রঘুনাথ দাস রূপমঞ্জরী, মুকুন্দ—বৃন্দাদেবী, দেবানন্দ—গর্গমুনি, কাশীশ্বর—ইন্দুরেখা ভূগর্ভ—প্রেমমঞ্জরী, এইরূপ প্রত্যেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত যাদব যুগের কোন সঙ্গীর অবতার বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। গোস্বামিগণ এইভাবে মনুষ্যজগতের উর্ধ্বে সিংহাসন স্থাপন করিয়া দেবতুল্য হইলেন এবং জনসাধারণের নিকট পূজার দাবী দৃঢ়

করিলেন। চৈতন্যের না যাইয়া আত্মরক্ষা হইয়াছে সার" "নিরবধি কৃষ্ণপ্রেমে প্রভুর বিহ্বল, দুই কৃষ্ণদাস বই না করায় আদি। হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে তাহানে। ঈশ্বর করিয়া বলিবেক পাস দিনে" চৈ ভা. অন্ত্য ১০), "চিরাত্র চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায় অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায় বহিছে হৃদয়ে প্রবল অশ্রুধারা শত্রু ডাকে কানা নাই পাগলের পারা" "ছয় এক বহিবাস পাগলের বেশ" (কবচা। "ধুলায় পা ছটিটোপা অঙ্গ কথা নাই। পাশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই।" অনাহারে শরীরের চলিতে না পারে হয় পড়ে হাঁই নাম বেন ঘরে ঘরে " কবচা এই প্রসঙ্গে চৈতন্য মূর্তি আর লেখক সমক্ষে নাই কৃষ্ণনগরের কুমারেরা তাঁহার যে মূর্তি প্রস্তুত করে, তাহাতে চৈতন্যদেব গোসাইয়ের মত নধরকান্তি, দুটিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈলে ঘৃতে মাখান পুষ্ট দেহ। গোস্বামিগণ এই ভাবে নিজেরা আর অবতারূপে লোকসমাজে স্থান অধিকার করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান পুরুষ চৈতন্য ও আত্মা হইতে বিচ্যুত হইলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ফল না খাইলে তার ফল না পাইবে' স্বরূপের মত হইতে বলিয়াছিলেন। তবে তাঁহাই বেশ বিচার অন্ত লাভে শান্তিপুরে লয়— কিন্তু অনেক ছয়া দান করে। এ গ্রন্থের মধ্যে বহুতর করুণ কাহিনী আছে। স্বামী অন্নজলের ও সুগন্ধ পুষ্প প্রদান করে, কৃষ্ণ চৈতন্য ভিন্ন অন্য কোন কথা কহে কিছু শ্রবণ করে না নিজকে ভিক্ষু করিয়া সাজায় তুলসী কণ্ঠে পরিধান পুষ্পমাল্য ও ফল অন্যকে বিলাইয়া প্রদান করে। জগতে শুরুর মত সাধুসঙ্গের ও ফল চৈতন্যের সঙ্গের অনেক গুণের আদর আর কোথায় আছে? এজন্য চৈতন্য রঘুনাথ দাসকে শুকর মর্কট বৈরাগ্য ছাড় বলিয়া ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার শুকর এই কথা ব্যাখ্যা করিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন।

এই অবস্থায় নিত্য মহোৎসব চলিতেছে পদ্মটি ফুল ফুটিয়া কাদায় পড়িতেছে, কত অমর কত পাখী, কত ভক্ত ভক্তের মনে কত প্রতিদিন ভাব হইতেছে তুমাপি এই মহোৎসবের মধ্যে পরমানন্দ সেই আনন্দময়ের হাসির বিরাম নাই। "নিত্য সিদ্ধের আনন্দে গান নিত্য মনস্তুষ্ট সমুদ্র নিত্য পূর্ণ এর বুদ্বুদ্ ইহাতে সুখে" এই অস্থায়ী চিরচঞ্চল ভবসাগরের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের রূপ আছে সেই রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিলে মানুষ আনন্দনিকেতনে পরিত্রাণ পাবে। আনন্দ বস্তুতো বেদ্ধি ন বিভেতি কদাচন " চৈতন্য সেই আনন্দরূপের দেখা পাইয়াছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম আনন্দের ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম দুঃখের ধর্ম সেই আনন্দময় পুরুষবরকে দেখিতে দেখিতে দুঃখ আত্মা নিজস্বত্ত্ব ভুলিয়া আনন্দসাগরে ডুবিয়া যায়, যেমন নদী সমুদ্রে পড়িয়া নিজকে হারাইয়া ফেলে এই অবস্থার নাম "বিশিষ্ট চৈতন্যাদ্বৈতবাদ," এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া ভক্তদের বলিয়াছেন—"মুক্তবন্ধলোকৃত-মণ্ডনলীলা অনুভিপুরুষস্মিত লাবণ্যলীলা" ভাগবতও তাহার আভাস দিয়াছেন। চৈতন্যদেব ভগবানের সেই অপূর্ব হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশস্বরূপ তিনি শুধু তাঁহার ভগবদ্ভক্তিপ্রবন্ধ, অপাপবিদ্ধ, সুনির্মল মূর্তি দেখাইয়া সর্বলোককে পাগল করেন নাই তাঁহার প্রেমে

মহাপ্রভুর ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, ঈশ্বরপুরী, নরোত্তম বীরহাম্বির, চাঁদ রায় প্রভৃতি রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিরা তাঁহাদের অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকটি এক এক জন বুদ্ধের তুল্য। এই বঙ্গদেশে গোপীচন্দ্র, ভর্তৃহরি হইতে লালাবাবু ও চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত যত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকল্প ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন জগতের এত স্বল্প পরিসর কোন দেশে বোধ হয় বৈরাগ্য-সংস্থাপক ও ত্যাগীর আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু এই রাজর্ষিদের দেখে ও বৈরাগ্য সম্পূর্ণ করাতে চৈতন্যের প্রভাবে যতজন রাজকুলা ব্যক্তি ইত্যাদি বৈষ্ণব পরিধান করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত আর কোন যুগে হয় নাই। এই দেশ খুব বড় আদর্শ ও খুব বড় ত্যাগের দেশ। এ হাটে কুসুমকলা বিকায় না, এখানে জীবন মরণ পায়ের ভৃত্য কিন্তু ধনের জন্য নয় অনুরাগ ও প্রেমের জন্য। এদেশে অন্যত্র যে বল, ঐশ্বর্য্য গোলাগুলি ও বারুদের সে বল নাই। চৈতন্য আনন্দাশ্রুর উপর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জগৎ কতকাল পরে তাঁহার এই উচ্চ আদর্শকে বুঝিতে পারিবে, জানি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুরুবাদ ও পরকীয়া

আমরা দেখাইয়াছি যে পুরুষ ভগবান্ কল্পনা করিয়া সেই কল্পের পরিবর্তে যে সকল নরদেবতার মন্ত্রণা পাকস্থলীর হইয়াছিল তাহা কখনই চৈতন্যের অনুমোদিত হইত না। চৈতন্যের অবতারত্ব এই কল্পনার ভিত্তি। ইহা কখনই স্থান গ্রহণ করিতেন না যখন তিনি সর্ব্বদা ইহার বিরোধী ছিলেন।

রামরায় তাঁহার সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা বলেন, এবং যে সকল গান ও নাটক রচনা করেন, তাহা চৈতন্যের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। বস্তুতঃ যে কয়খানি পুস্তক তিনি নিত্য আবৃত্তি করিতেন, তন্মধ্যে "রায়ের নাটকগীত"-খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামানন্দের প্রসিদ্ধ "সো

গুরুবাদ।

এত রমণ হাম এত রমণী" গানটি চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে জীব ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ভগবানের অনুরাগমূলক। "পহিলহি প্রেম নবনবতরঙ্গ ভেল"—তাঁহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে আমার প্রেম প্রথম উদ্ভূত হইল, দিনে দিনে তাহা বাড়িয়া চলিল, তাহার অবধি হইল না। এই প্রেমের মধ্যে আর কেহ ছিল না, দূত বা অন্য তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। "না মিলল দুই, না মিলল আন, দুহুক মনে মনে পাঁচবান" এই কথায় গুরুবাদকে স্পষ্ট অস্বীকার করা হইয়াছে। চৈতন্যের নিজ উক্তি "ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়"

সেই বিশ্বাস অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না শুভ মুহূর্তে তিনি স্বয়ং তাঁহার অযাচিত করুণা কোন ভাগ্যবানকে দিয়া যান।

কিন্তু বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গুরুবাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে গোস্বামিগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"বৃন্দাবন লীলার সখীবাই মহাপ্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণের সহচর হইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং" বলরাম আস্থাপন করিবার অন্য উপায় নাই, গোপীগণের ভাবের সেই রসের চাবি গোস্বামিগণের বংশধরদিগের মধ্যে না রহিলে বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার কাহারও হইতে পারে না। গৌড়াভিনিবেশের শ্লোক মুখস্থ করাইয়া বৈষ্ণব শিশুদিগের মনে গোস্বামিগণের দেবত্ব বিশ্বাস সর্বাগ্রে দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছিল এই ভাবের বর্তমান বৈষ্ণব-ধর্মের চৈতন্যের ধর্ম সম্পূর্ণ করিয়া উদ্ভূত হয় নাই। তাহাতে কৃষ্ণ লীলার—রাধার কোন মর্যাদা নাই "কৃষ্ণে চণ্ডীদাস, রাধার পীরিতি—জাতিকুলশীল ছাড়া" এক এক গোস্বামির শিষ্যগণ হইলেন—তাঁহার পরিবার। ইঁহারা গ্রন্থাদি লিখিতে গিয়া নিজ শিক্ষাদাতা ভিন্ন পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা গুরু ও গুরুলাভের পারম্পর্য বর্ণনা করিয়া বন্দনাসূচক কবিতা লিখিয়া গ্রন্থমুখ করিয়াছেন নিজের জাতি বংশ গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্যান্যদের সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়া ফেলিয়া ইঁহারা গুরুবাদ মাথা পাতিয়াছেন ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। এরূপ গুরুবাদ বৈষ্ণবেরা পাইলেন কোথা হইতে? বৌদ্ধদিগের মধ্যে গুরুবাদ অত্যন্ত প্রবল ছিল—"গুরুর উপর মানুষ নাই, মানুষের উপর গুরু, তাঁহার উপর নাই"—চণ্ডীদাসের এই মানুষ কে তাহা জানি না কিন্তু বৌদ্ধগণের যে গুরুই সর্বশক্তিমান—অন্তর্যামী, একমাত্র পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই সেখানে হিন্দুদিগকে "দেবাদৃষ্ট" ও বৌদ্ধদিগকে "গুরাদৃষ্ট" বলা হয়। দেবাদৃষ্ট অর্থ "দেবতা অনুমোদিত" ও "গুরাদৃষ্ট" অর্থাৎ "গুরুকৃপা অনুমোদিত"। নাথধর্মেও গুরুর প্রতি অলৌকিক শক্তির বহু পরিচয় পাওয়া যায় গোরক্ষনাথ তাঁহার গুরুর জন্য কি অলৌকিক কার্য সাধন করিয়াছিলেন চৈতন্য দেবমন্দির ও কার্যকলাপগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন—সুতরাং তাঁহাকে "দেবাদৃষ্ট" বলা যাইতে পারে গুরুর প্রতি এই অলৌকিক ভক্তির লীলা তিনি কোথাও দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না আমার বিশ্বাস এই গুরুবাদ বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুতন্ত্র উভয় তন্ত্র হইতেই বৈষ্ণবগণ লইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে চৈতন্যের কোন প্রেরণা ছিল না। এই গুরুবাদের দ্বারা গোস্বামিগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থাগমের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পরবর্তী বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ মত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় অশোকের ধর্মমহামাত্রদের পদে গোস্বামিগণ নিজেরা অধিষ্ঠিত হইয়া পুরস্কার ও নিগ্রহ বিতরণ করিতেন অনেক বৈষ্ণবমঠের গৃহে কেল ছিল শিষ্যদের অপরাধের বিচার গোস্বামীরা স্বয়ং করিতেন, এবং তাঁহাদের কেলে অপরাধীরা দণ্ড পাইত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, খড়দহে তাঁহাদের কেল ছিল,—নিত্যানন্দের বংশধরগণ বিচার করিয়া তাঁহাদের শিষ্যদিগকে শাস্তি দিতেন। দুই হাজার তিন শত বছর পূর্বে মহারাজ প্রিয়দর্শী যে ধর্মমহামাত্রপদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এতকাল পরে সেই পদে

যে স্বামীদিগকে সহজিয়া দেখিয়া মনে হয়—ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও নষ্ট হয় নাই। নব ভারতের পত্র খুঁজিলে কর্ণধার অবস্থায় সেই সকল পত্র এখনও পাওয়া যায়। মহারাজ বিম্বিসার শুধু "ধর্ম্মমহামাত্র" পদের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ধর্ম্মের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষিতা চরিত্রবতী মহিলাদিগকে ও সেই ভাবে নিযুক্ত করিতেন। এই স্ত্রীধর্ম্মমহামাত্রগণের যাবতীয় গোপনীয়তা বজায় রাখিয়াছেন। ইহারা ভদ্রপরিবারে যাতায়াত করিয়া ধর্ম্মের অনুশাসন ও তত্ত্ব প্রচার করিতেন। চলিত ভাষায় ইহাদের নাম ছিল "মা গোঁসাই।"

বৌদ্ধধর্ম্ম শয়কালে দেহতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিল, অমরা পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে ১৪ অং, ৫৯ পৃঃ, ২৮৯ ৮৫ পৃষ্ঠা, তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। মহাপ্রভুর ভাবপ্রবণ ধর্ম্ম-ধর্ম্মে এই দেহতত্ত্ব একটা স্থান জুড়িয়া বসিল। গোরক্ষাবিজয়ে দেখিতে পাই, হাড়িবৈদ্য গোরক্ষ মৃদঙ্গের বোলে "কায় সাধ কায় সাধ" এই ধ্বনি তুলিয়া শুষ্ক যৌনসাধকে উদ্বোধন করিতেছেন। "গায় নাই ভাতে ভাবা নাই ইহাতে" এই উক্তির সঙ্গে বঙ্গের জনসাধারণ বিশেষভাবে পরিচিত। অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া নহে—আত্মসাৎ করিয়া পরবর্ত্তী ধর্ম্ম নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। মহাপ্রভুর নাম করিয়া অনেক কথা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র হইতে গৃহীত। চণ্ডীদাস স্বয়ং তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে "এড়িয়া টানিরে খাস" প্রভৃতি কয়েক খাসনিরোধক প্রাণায়ামের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সহজিয়া পুস্তকমাত্রেই ইড়াপিঙ্গলা ও চন্দ্রসূর্য্যসম্বন্ধে বিশেষ কোন উপদেশ নাই।

দেহতত্ত্ব

মহাপ্রভুর অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার অথবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মাধুর্য্য এই পঞ্চ অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ সহজিয়া-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে কেবলই দেহতত্ত্বের কথা। অমৃতরত্নাবলীর প্রথম ও শেষ কথা "সকলের সার হয় আপন পরীক্ষা। নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে স্থির।" ৩৭ পৃঃ চণ্ডীদাসের উক্তিতেও সেই একই কথা—"নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে, সহজ ভজন বলিব তারে।" সহজিয়া-সাহিত্যে ভক্তি বা প্রেমবাদ অত্যন্ত—সর্ব্বত্র দেহতত্ত্বের কথা। ইহা সেই সুপ্রাচীন তান্ত্রিক ধারা। সহজিয়ারা হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে যোগ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রই তাঁহাদের ভিত্তি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুসী বিশ্বাসী, রাম-রঞ্জনী, সাহেবধনী, দরবেশী, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, পাঁচ কড়িয়া প্রভৃতি যে সকল শ্রেণী আছে, তাঁহারা হিন্দুগণের প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, কোন কোন স্থানে মুসলমান গুরু এবং ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য, হিন্দুদের মধ্যেও গোঁসাই কোন কোন শ্রেণীর নিন্দিত নহে।

স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে এই সহজিয়াদের যে সকল মত আছে তাহা একেবারে সামাজিক আদর্শকে উলটপালট করিয়া দিয়াছে। ইঁহাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী নহেন, সহজিয়াদের মতে তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাঁহাদের সর্ব্বস্ব স্বামীর পদে বিকাইয়া দেন নাই। হিন্দুসমাজ পতিব্রতার স্থান যতটা উচ্চ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাতিব্রত্যের জন্য প্রচুর ত্যাগস্বীকার ব্যবস্থা

আছে—তাহাতে ইহকালে ইহাদের উচ্চতান-প্রশংসা এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ইহাদের কোনটির লোভ অলক্ষিতভাবে সাধু সন্ন্যাসিদিগের মনের উপর যেরূপ কার্য করিয়াছিল—ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। অন্তত মহাত্মাদের আদর্শ ইহারা হইতেই পারেন না। পরকীয়া-প্রেমে যে রমণী আত্মসমর্পণ করিল সেই মুহূর্তে সে লোকচক্ষুর বাহির হইল।

পরকীয়া।

নিজের পিতামাতা ভাইবোন স্বামী সন্তান শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ তাহার আর রহিল না। স্বামীগৃহে সে অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, অপাংক্তেয়। বন্ধু ও স্বজনেরা তাহাকে অস্বীকার করিল। নাট্যকারেরা তাহাকে নিষ্ঠুর নরক দেখাইলেন। সুতরাং পরকীয়ার প্রথম অবস্থা হইতে যে পার্শ্বে যাহা কিছু কামা তাহা সমস্ত বিসর্জন দিয়া—পরকালের সমস্ত ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া পথে দাঁড়াইল। সুতরাং ত্যাগ-সম্বন্ধে সে যে উচ্চতম আদর্শে পৌঁছিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গ্রালোক লইয়া ধর্মচর্চা বা প্রেমের আদর্শ প্রচলন করা এক সময়ে য়ুরোপের সকলে গ্রহণযোগ্য ছিল। যখন রাজার "মাইট ইজ রাইট" বলে দিনের কথা নহে। কিন্তু খৃষ্টান পুরুষের অনেক শ্রেণী এই রমণীদের লইয়া বাড়াবাড়ি করাকে ধর্মের অঙ্গীভূত মনে করিতেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত অতি সাধুকাম্য এবং প্রশংসনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। পূর্বকালে ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি স্বদেশের গরিমাস্থল লোকদিগে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি মুষ্টিকটিকে বসন্তসেনাই সেই নাটকের নায়িকা-অপেক্ষা প্রধান নায়িকা। পূর্বকালের নৃত্য, গীত এবং সমস্ত কলাবিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করিতে হইত উচ্চশ্রেণীর রমণীর পাদস্পর্শ। বিবাহপ্রথা আর্য সমাজে প্রচলিত হইবার পূর্বে আর্য গ্রীকোকদের বহুনায়কের সহিত সঙ্গত প্রশংসনীয় ছিল যে রমণী যতজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইত। যিনি পুরুষের নিষেধ অগ্রাহ্য করিতেন, যিনি সমাজে নিন্দিতা হইতেন, তাঁহাকে সমাজ "কঞ্চুকী" নাম দিয়া তাহাদের প্রতিকূলভাব দেখাইতেন। ডুগাচরণ সান্যালের সামাজিক ইতিহাস দ্রষ্টব্য। যদিও বৃদ্ধদের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার মিলনস্থলে বহু কবির নিবন্ধাবলী লিখিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি কালে সংঘের মধ্যে নরনারীর অবাধ মিলন হইতে লাগিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও যে একাধিপ্রথার দল বিদ্যমান ছিল তাহা পূর্বেই ৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই নব নব সংস্করণ এখনও পল্লীর পল্লীতে উৎসব হইয়া সেই অক্ষয় বটের অবিনাশী বংশধারা বজায় রাখিয়াছে। বোরপাড়ার মত শত শত গ্রামে রজনীর অন্ধকারে অর্গলবদ্ধ গৃহে নরনারীর অবাধ ধর্মানুশীলন এখনও চলিতেছে। আমরা পার্শ্বনাচরণ কবিশেখর প্রণীত চারুদর্শন নামক পুস্তক হইতে এই মিলনের একটা দৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

'কিশোরী ভজনের মেলায় যাইয়া রাত্রিকালে চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন প্রায় পাঁচশত লোক উপস্থিত। সেই লোকের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বার আনা। সেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই দশ আনা। সেই বিধবাদের মধ্যে যুবতীর সংখ্যা আট আনা। কোন স্ত্রীলোকের কোলেই শিশু নাই। বৃদ্ধের সংখ্যাও বড় কম, যুবতী ও যুবকদের সংখ্যাই গণনার

আনা। পরে পরে এই রীতি দেখিলেও তিনি একটী প্রধান বিষয়ে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন তাহাদের সন্তুষ্ট উন্নত ব্রাহ্মসমাজেও আশা করিতে পারে নাই ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইলেও সভায় বসিবার কালে একত্র মিলিয়া মিশিয়া বসেন না কিন্তু এখানে তাদৃশ সঙ্কীর্ণতা নাই পুরুষেরা যার যেখানে ইচ্ছা সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া বসিয়াছে। কাজেই তাদৃশ স্ত্রী-স্বাধীনতা দর্শনে হাকিমবাবু সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। হাকিমের এই চিন্তা শেষ হইতে না হইতেই গুরুগিরি আরম্ভ হইল সেই মোক্ষদাবাবু অভিযুক্ত বৈষ্ণবীটী ও তাহার কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী হাকিমবাবুর অতি নিকটে আসিয়া গান ধরিল—"এই পাগলের মনে—এই মনে কেউ এসনা রে ভাই কেউ এসনা, কেউ যেন না যায়। এই কলিতে এলে পরে—জাতের বিচার নাই। এক পাগল উড়িষ্যাতে জগন্নাথ গোসাই চণ্ডালেতে আনে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়। এক পাগল চিতলাইতে শম্ভু চাঁদ গোসাই। সে যে হিন্দুর গুরু যবনের শিব, মোসলমানের সাঁই।" উক্ত গান সমাপনের পর কমলদাস আসিয়া ঘোষণা করিল—"সেবানন্দে প্রেমানন্দ বাড়ে" অর্থাৎ ক্ষুধানিবৃত্তি না করিতে পারিলে ভগবানের প্রেমানন্দ লাভ ঘটে না

কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অন্নব্যঞ্জনের পাত্র সভার মধ্যস্থলে বিছানার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে পুরুষগণ সেই পাত্রের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল, এবং এক এক জনের মুখের অন্ন টানাটানি ও হাসাহাসি করিয়া অল্পে অল্পে খাইতে লাগিল এই দৃশ্যে হাকিমবাবু মহাসন্তুষ্ট হইলেন। এত বিভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলিত ভোজের মধ্যস্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্নব্যঞ্জন আসিতে পারে তাহা হাকিমবাবু স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তদুপরি আবার এক থালার অন্ন টানাটানি করিয়া সকলে খাইতে পারে, ইহা অসম্ভব হইতেও মহা অসম্ভব। সুতরাং উদৃশ জাতিভেদবিরোধী আচরণ হিন্দুজাতির মধ্যে পাইয়া হাকিমবাবু আহ্লাদে গলিয়া গেলেন তাঁহার 'জাতিভেদ' নামক পুস্তকখানিতে যে নূতন অধ্যায় লিখিত হইবে তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইতালিগকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আশাও জাগিয়া উঠিল। সেই আশা হঠাৎ বর্দ্ধিত হওয়াতে হাকিমবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন "হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ—আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে আমি দণ্ডায়মান হই নাই। এই বেলায় জাতিভেদ নাশক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা দেখিয়া এত আনন্দিত হইয়াছি যে তাহা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না এই জাতিভেদ বিনাশক ভোজনক্রিয়া-নির্ব্বাহকালে সকল দরজা খুলিয়া সকলকে দেখান উচিত। নতুবা এই মহাসত্য প্রচারের সুবিধা হইবে না ব্রাহ্ম সমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা প্রকাশ্য দিবালোকে নাই এই মহাসত্য প্রচারের মহাসুযোগ ঘটিতেছে। আপনাদের স্ত্রীস্বাধীনতা রাত্রিতে অতীব গোপনে পাপকার্য্যের মত সঙ্কটে সম্পন্ন হয় কেন? আপনারা যখন ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্, তখন আর ভয় করেন কাকে?

কিশোরী-ভজনের মেলা

"হিন্দুজাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ অবরোধপ্রথা। ঈদৃশ বর্বরতা কোন সুসভ্য জাতির মধ্যে নাই। দেশ জাগাইতে হইলে স্ত্রীস্বাধীনতার আবশ্যক। দেখুন বৃক্ষের অর্দ্ধাংশে সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া যদি বাকী অর্দ্ধাংশ উহা না পায় তবে সেই বৃক্ষ বলিষ্ঠমস্তক হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। এই জন্যই চিন্তাশীল কবি যথার্থনামে ঘোষণা করিয়াছেন, 'যা আঁধারে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' আপনাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সুশিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্মসমাজের বেশ মিল আছে। তাই আপনাদিগকে আগামী রবিবার সেই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে যাইতে অনুরোধ করি। তথায় আমি থাকিয়া যত উন্নতির পথ দেখাইয়া দিব। আমি স্বয়ং কয়েকখানি গাড়ীসহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার একটায় আসিবার প্রস্তুত আছি। আমার সঙ্গে আপনারা সেদিন ব্রাহ্মসমাজে যাত্রা করিবেন।"

হাকিমবাবুর এই বক্তৃতার মর্ম্ম কেহ বুঝিলেন না। তাঁহাদের পক্ষে যে তাহা বুঝিবার কোন আবশ্যকতা আছে তাহাও তাঁহারা মনে করেন না। শ্রীগুরুর শ্রীমুখের উপর যে হাকিমের বুধ বা অন্যের মুখ থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না। তাঁহারা নিজেরা এবং বাকী সমস্তই ভুল ইহাই তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সত্য ধারণা। তাঁহারা বিদ্যা ও বুদ্ধিকে কুপথের সহায় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বেদ বা শাস্ত্রকে ঐহিকের খেলা বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা পণ্ডিতকে বৃথা মস্তক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক নিয়মকে তুচ্ছ মনে করেন। গুরু, পুরোহিত, ধর্ম্ম ও ভগবানকে তত গ্রাহ্য করেন না। দেবপূজা উপবাস, স্নান, সন্ধ্যা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রভৃতিকে অসার মনে করেন, আনন্দময় মেলার আনন্দময় হরিনামের সারাংশ মনে করেন। তাই হাকিমের বক্তৃতার উত্তরে এই মেলার সাধু ও সাধুনীরা নিম্নোক্ত গান ধরিল "মন যাওরে সন্ধ্যার সময় উঠিস্ না,—কাল ক ক পেলে তোরে ছেড়ে দিবে না। শোন বলি মূর্খ যাদুমণি, দিনে থেকো ঘুন-কানার মত, রাত্রে হবে চতুর। তখন সিকে দিয়ে লেপুর, খুলনা পাবনা গেল না।" এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া আচমনের সময় আসিল। তাই দশ বারো জন স্ত্রীলোক—হাকিমবাবুর মুখ ধোওয়া জল খাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কাজেই এবার বিষম হুড়াহুড়ি বাধিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমবাবুকে রাত্রি দশটার সময়ে স্নান করিতে বাধ্য হইতে হইল। এমন সময়ে কমলদাস মনে মনে স্থির করিল, হাকিম-বাবু অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বক্তিমেতে যে বৈদমা ঘটে, তাহা সে জানিত না। যে স্থানে অশিক্ষিত পাঁচালীকের আনন্দ জন্মে, সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধর্ম্ম-পাপ লোকের তাহাতে আনন্দ না জন্মিবারই সম্ভাবনা বেশী। বরঞ্চ স্ত্রীলোকের এত নির্লজ্জতা ও অসভ্যতায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছিল। অতঃ তিনি স্নানের পর কাহাকেও পাত্র মোছাইবার অধিকার দিলেন না। কমলদাস এই আমোদকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রমাণের প্রয়াসপর হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন "শান্তরজো ভাবতমঃ পাপমুক্তঃ সদা শিবঃ" অর্থাৎ ভুলা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, নিন্দা ও আসক্তিকে অষ্টপাশ আট প্রকার বন্ধন বলে। সাধনবলে সেই

পাশমুক্ত হইতে হইবে। পাশমুক্ত না হইলে জীব কাহারও উদ্ধার সাধন করে না। সরল না হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না।" হর্ষিমবাবু শ্লোকদ্বয়ের নির্লজ্জতা ও কমলাকান্তের উক্তি মিলাইতে গিয়াও মিলাইতে পারিলেন না। এমন সময়ে কমলাকান্ত আবার ধর্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। বলা—ধর্মসাধনের দেহ চারি প্রকার—ক। চল, (খ। প্রবর্তক, গি সাধক, ঘ সিদ্ধ। প্রত্যেক দেহের জন্য দুইটি শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, যথা ১ দেশ, ২ কাল, ৩ আশ্রয়, ৪ পাত্র, ৫ আলম্বন ৬ উদ্দীপক দেহের অর্থ ও স্থানের অর্থ হাকিমবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি হাসাহাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না, বলিয়া অনেকের মুখে হাসি ছিল। তাই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। "যাহা বাহ্য কালে যাহা চক্ষে দেখিলেন বা অনুমান করিলেন তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে" (৪৮০-৪৮২ পৃষ্ঠা)।

ইহা একটি ব্যঙ্গচিত্র হইলেও এই বর্ণনার ভিতর যে কতকটা সত্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ছবির আর একটা দিক্ আছে। উন্নত সহজধর্মীর আদর্শ সংস্কারের ঊর্দ্ধে।

সহজিয়াদের আদর্শ-প্রেম।

নরনারীর প্রেমসম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা খুব উচ্চ তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে. চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "প্রেম করিয়া ছাড়য়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে" যাহাকে প্রেম দিয়াছ, তাহা হইতে সে প্রেম আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না—সে ব্যভিচারী হউক বা ব্যভিচারিণী হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না, সাংসারিক সুখ হয়ত হইল না হয়ত প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পুনরায় নির্ব্বাচন করিলে পরকালে সুখের হইত। কিন্তু সহজিয়া সে সুখ চায় না কুল যেমন তাহার সৌরভ বিতরণ করিয়া তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারে না, ভালবাসিয়া প্রকৃত প্রেমিক তাহা নষ্ট করিতে পারে না মান-মর্য্যাদা ইহা নহে, জ্ঞান করিয়া তুমি নিম্নে হইতে পার দ্বিতীয় চন্দ্রিদাসের মত, কিন্তু প্রেমকে যিনি সাধনার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দুঃখসুখের অতীত হইয়া গিয়াছেন দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া তাহাকে সাধনার পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে—প্রেম আদান-প্রদানের—কারবারের বা বিনিময়ের সামগ্রী নহে যিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না তিনি সাধন-অঙ্গ পাইবেন না সহজিয়া-প্রেমে "ভলাকনামা" অশ্রাব্য চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে "সহজ প্রেমের" নেশায় যুবক-যুবতীরা উন্মত্ত ছিল। কিন্তু এ সাধনা বড় শক্ত। কবি বলিয়াছেন, যোগ্য ব্যক্তি "কোটিকে গোটিক হয়", এক কোটী সাধনপন্থীর মধ্যে একজন হয় সে ব্যক্তি কেমন, তৎসম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—তিনি "সুমেরু পর্ব্বতকে সূতা-তন্তু দিয়া বাঁধিয়া আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, তিনি বিষধরের কবলে কেককে পাঠাইয়া তথায় তাহাকে নৃত্য করাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারেন তিনি যোগী অর্থাৎ তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই যোগী। "অকাবক্ক" পত্রিকায় পুরুষবন্ধ কীর্ত্তিকা ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ) এইরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম উপদেশ নিজদেহকে "কাঞ্চনলোষ্ট্রসম" করিতে হইবে অর্থাৎ উহাতে ইন্দ্রিয়াসক্তির লেশ মাত্র থাকিবে না দৈহিক উত্তেজনার লেশ থাকিলে

বৈষ্ণবেরা যে পুণ্যের স্বর্গ হইতে সাধকদের টানিয়া আনেন "মরে না জানে, ধরম রাখানে, এমন আছয়ে যারা কাজ নাই মোর তাদের কথায়, বাউরে বোল করা। আমার বাহির দুয়ারে, কপাট লেগেছে ভিতর হয়ার খোলা" গাহারা শাস্ত্র লইয়া বাস্ত করেন মর্ম্মী নহেন। তাঁহারা মনে করুন, বাউলদিগের মধ্যে তাহার অধিকার নাই।

চাঁদ ফকির বলিয়াছে যার—প্রভুর আছে যেই ফকির কারুরূপ চাঁদের মোহন ত্রিভঙ্গ দাঁড়াইয়া দিবে— যে ধর্ম্মের কথা শুনিলে, লাগিবে মরমে বাথ যে দেখের শুদ্ধতত্ত্ব এ দলের সুসংবাদ নহে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"পরেছা যাহার, তাহার তুমি, তাহার তুমি, তুমি সকল তাহার তুমি হও দিবসনি" ইহাদের কথায় কাজ নাই। স্বর্গলোকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে প্রেমের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার চণ্ডীদাস জীবনীতে বলিয়াছেন, তাহার মূল পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আছে এবং সেখানে সাহিত্য-পরিষৎ তাহা ছাপাইয়াছেন। ইহাতে আছে—পরী ও পরী নরনারীকে নিমন্ত্রণ করার পর পরস্পরের নিকট হইতে নরে পুরুষ সুরসা নারীর মনে ও নারী সুন্দর যুবকগণের মধ্যে,—যাহা জানিবেন নিমন্ত্রিত হইলে যাহা তাঁর আর প্রয়োজনসত্ত্বেও তাঁহাদের এমনিই সময়ের পাইবেন না হয় তবে তাঁহাদের পথম সম্পর্ক হই বলে। যিনি অবস্থায় তাঁহারা একত্রে বাস করিবেন, তখন যার চাহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বভাব লইয়া তাহারা কি কি ভাব আচরণ করিবেন তাহা তাঁহাদের নায়ক মুখে এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন— চারিমাস আগে তার চরণ সাধিবা সরতলে পড়ু করে স্বভাব লইয়া পুনঃ আর চারিমাস চরণ সবিধা বামেতাগে শুই রবে স্বভাব লইয়া পুনরপি চারিমাস মস্তাক দেখিয়া ছন-বক্ষে শুতি রবে স্বভাব লইয়া আর চারিমাস তার চরণ ধরিয়া—হৃদয়ে রাখিবে তাকে স্বভাব লইয়া" প্রত্যেক পদের পশ্চাতে "স্বভাব লইয়া" কথাটি আছে—তাহার স্থায়ী সংযমের ও নৈষ্ঠিক পবিত্রতার আদর্শটী বজায় রাখিয়া গুহ্যভাবে এইরূপে সহজ মানস প্রেমপাত্রের মানসী-পূজা করিতে হইবে এত বড় কঠিনাচরণ কে করে কল্পনা করিতে পারিয়াছে?

পুন, পুন, বেশকে ভাষায় রূপ হইয়াছে যত-বিরুদ্ধ বেশভূষার এই বাণী সুপরিচিত সাধকীয় ধর্ম্ম এই লাক বেশভূষা আর পুরু যে নাহি মানয় মন নিয়ে অন্ধ কামে কয় সাধন হয়ার এরূপ চার শত শ্লোকময় বসধর্ম, পালপুরের বেহুজান—এই সমস্ত পরিচয়ের এই তান্ত্রিক মতের ধ্বনি আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পর্য্যন্ত শুনিতে পাই "লোকাপেক্ষা করে যারে অনেক লাগে" তাহাই সহজিয়ার মূল বিধান স্বকীয়া অপেক্ষা, "পরকীয়ারূপ হয় ব্রজের উল্লাস তাহাতে সবের রতি মহাসুখের কয়" এই পরকীয়া ধর্ম্ম কিরূপ উচ্চ এবং তাহা যে শুধু একটা মতমাত্র নহে, তাহা অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্য এবং এখনও হইতেছে, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ তত্ত্বানন্দি-প্রণীত 'সাধুচরিতে'র আখ্যায়িকা এখানে অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে—

শ্রীহট্ট জেলার ইটা পরগনায় ক্ষেমস্তম্ভ গ্রামে দুর্গাপ্রসাদ কর পিতার নাম হরিবল্লভ কর

এবং যাহার নাম শান্তা দাসী। নামক একজন কায়স্থ ১৮৫১ খৃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি

মনোমোহিনী আখড়া।

শৈশব হইতে ধর্মানুরাগী এবং সাধুচরিত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইনি শৈশব হইতে মনোমোহিনী নাম্নী তাঁহার এক দূর আত্মীয়াকে ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা অতি মানসিক পূজা। ইহা দুর্গাপ্রসাদের মনের নিভৃতে থাকিয়া তাঁহাকে সমস্ত সাধুকার্য্যে প্রেরণা দিত। ইহা এত গুপ্ত ছিল যে বহুদিন পর্য্যন্ত মনোমোহিনী নিজেও ইহার অস্তিত্ব জানিতেন না। তাঁহার ২৮ বৎসর বয়সে তিনি মনোমোহিনীর নিকট পরপর তিনবার যাইতেন—প্রত্যহবার অতি অল্প সময় থাকিতেন, সকালে ও সন্ধ্যায় উঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেন। কিন্তু মধ্যাহ্নে একখানি থালা-হাতে তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইলে মনোমোহিনী তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জন দিতেন তাহার কিছু তিনি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে দুর্গাপ্রসাদ তাহা গৃহে আনিয়া খাইতেন। এই সময়ে দুর্গাপ্রসাদ মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহার সাধু নিরহঙ্কার জীবনদর্শনে প্রথম প্রথম লোকে কিছু বলিত না এবং মনোমোহিনীও এই অদ্ভুত খেয়ালী লোকটির আবদার প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণই ছিল না—কিন্তু তখনি লোকেরা বলাবলি করিত, "মনোমোহিনীই বা কিরকম?" সে উহাকে প্রশ্রয় দিতে দেয় কেন এবং আসায় উঁকিই বা যাইতে দেয় কেন?" হিন্দুসমাজের মর্ম্মে ঘা পড়িল। সন্ধ্যাহ্নে যেদিন দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত রূঢ় ভাষা করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সেদিন দাসীদের বহু অনুরোধ ও উপরোধসত্ত্বেও দুর্গাপ্রসাদ কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। দুর্গাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র ২৯ বৎসর। ক্রমাগত উপবাস চলিল আত্মীয়স্বজন নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইলেন দুর্গাপ্রসাদের উপবাসব্রত ভাঙ্গিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা মনো-মোহিনীকে তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া খাদ্য উঁহাকে গ্রহণ করাইতে অনুরোধ করিলেন। বিরক্তির সুরে মনোমোহিনী বলিলেন, "কেউ মেলা না মেলা তাহাতে আমার কি? আমাকে তোমরা আর ঐ লোকটার জন্য জ্বালাইয়া মারিও না।" অবশেষে দুই তিন দিন পরে তাঁহার ভ্রাতারা নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ী গেলেন। সেই আত্মীয়াকে দুর্গাপ্রসাদ অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ভ্রাতারা তাঁহাকে খাওয়াইতে

সাধু দুর্গাপ্রসাদ

চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যেদিন তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া সেই আত্মীয়ার বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন সেদিন হইতে পূরা একদিন দুর্গাপ্রসাদ উপবাস। কিন্তু সেই আত্মীয়া অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া কিছুতেই দুর্গাপ্রসাদের ধর্ম্মঘট পণ ভাঙ্গাইতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন চতুর্দ্দশ দিবস সাধুসঙ্গে নিরম্বু উপবাসে তিনি কঙ্কালসার ও শয্যাশায়ী। যাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও সাধুত্বের প্রতিষ্ঠা সকল পক্ষাবত এমন নিষ্কলঙ্কচরিত্র যুবক না খাইয়া মরিতে বসিয়াছেন—একথা শুনিয়া সকলের মন বিগলিত হইল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া মনোমোহিনীকে দয়া করিয়া উঁহাকে উচ্ছিষ্টান্ন দিতে অনুরোধ করিলেন।

মনোমোহিনীর মন গোপনে তাঁর আশা বোধ করিতেছিল—কেবল লোকলজ্জায় তিনি নির্দয়তা দেখাইতেছিলেন। এখন লোকান্তরালে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে দুর্গাপ্রসাদের বাড়ীতে যাইয়া উহাদের অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৫ দিন পরে তিনি আহার করিলেন। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন যাঁহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত। তাঁহাদের এক সময়ে দুর্গাপ্রসাদ প্রত্যক্ষ মনুষ্যের আদেশ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন। ইঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক একব্যক্তি তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে ডাকিয়া অনিয়া ইঁহার গোশালায় লইয়া গেলেন সেখানে গোবরের স্তূপ এত উচ্চ ছিল যে সেইখানের স্থান ছিল না, তাঁহার এক কে যে কোন রকমে দুর্গাপ্রসাদকে ঠেলিয়া দিয়া কালচন্দ্র আদেশ করিলেন, "এইখানে দাঁড়াইয়া থাক" সে রাত্রে ঘোর বিদ্যুৎ, ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। অনবরত বৃষ্টি পড়িয়া দুর্গাপ্রসাদের দেহ সিক্ত করিতেছে, শরীরে অসংখ্য মশক তাঁহার রক্ত চুষিয়া খাইতেছে। অপরদিকে পচা গোবরের অসহ্য দুর্গন্ধ। কিন্তু নির্ভিকতার মূর্ত্ত পুরুষ পর্ব্বতবিগ্রহের ন্যায় অনড় অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ১৫ ঘণ্টা পরে রাত্রি একটার সময়ে কালাচন্দ্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া মুক্তি দিয়া বলিলেন, "এখন ঘরে যাও"

এইরূপ গুরুভার কথা যুরোপ কি কখনও শুনিয়াছেন? তাঁহারা জানেন অন্ন তৈরী করার উপায়—পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপাদান হইতে আবশ্যক খাদ্য উৎপাদনের উপায়। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জগতের উপায় তাঁহার বহুবারেচ্ছ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অজ্ঞাত এবং ইহাই আমাদের সম্পদ। পৃথিবীকে যদি জয় করিতে হয় তবে প্রাচ্যের এই নির্ভিকতা, নির্ভিরতা ইচ্ছাশক্তি, দুঃখসহিষ্ণুতা অসীমসহিষ্ণু—অনন্ত বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমের উপায় দ্বারা করা করিতে হইবে, যাঁহারা পাশ্চাত্য বুদ্ধ অনেক জগৎ জয় করিয়াছিলেন—পাশ্চাত্য যন্ত্র প্রস্তুতিরা লয় করিয়াছিলেন এ সেই শ্রেণীর উপায়, পথ ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্ম জগৎ জয়ের এই উপায়ের মূল লক্ষ্য

প্রেমের জন্য অসংখ্যলোক সহজেই দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ঘৃণাই অনিষ্টের কারণ, ঘৃণা না হইলে তৃপ্তি হয় না—ইহাই সকলের এই মহাবাণী, প্রেম জগতে সাক্ষাৎভাবে যাহা দেখাইয়াছেন অন্যত্র তাহা সুলভ নহে চরাচর এই স্বর্গীয় ভাব হাটিতে আরম্ভ করিয়া কোন কথা না বলিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়া, সকল সংযমের শ্রেষ্ঠচেষ্টা—ত্যাগের শেষ দৃষ্টান্ত, ইহাই মহাজগতের বাহ্যিক ও বলসৌষ্ঠব এবং অধ্যাত্মজগতে সর্ব্বজিতা—ইহারা প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন এরূপ নির্ভীক বীরত্ব জগতে বিরল। ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতের জন্য তুলিয়া সক্রেটিসদিগের আদর্শ প্রেমের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিয়া—তাহা হইতে উচ্চতর আদর্শের পরিকল্পনা ইহারা করিয়াছেন, ইহাদের বুকের পাটা কত বড়

প্রাচ্য সমস্যা।

প্রসঙ্গ। "অন্ধকূপে" স্বামীকে বলিয়া করিয়া প্রণয়ীর সঙ্গে যাওয়ার অন্যান্য স্বাধীনতা বাঙ্গালী ভিন্ন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছে? কোথায় শক্তি, কোথায় পুরাকার—কতটা পেছনে ফেলিয়া ইহারা অগ্রসর হইয়াছেন

সহজিয়ারা বলেন কাচ-পাথরের বিচার সহজে দূর করা যায়—কয়েকটি ফুলবেলপাতা পায়ে ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট কিন্তু মানুষের মন কোথায় বড় উৎকট ভগবান্ কাহা, তিনি যাহা করিবেন আমি তাহাই দেখিবার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিব তাঁহার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা একেবারে ডুবাইয়া দিব, অপরাধ আমি, অপরাধ ব্যক্তি আমার হাত হইতে থালা ফেলিয়া দিয়া আমার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়া দিলেন, তখনও তখনও তিনি ভগবান্, দুর্গাপ্রসাদের এই ভক্তির তপস্যার মহিমা দুলোক হইতে ভূলোক স্পর্শ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "আমি নিজ সুখদুঃখ কিছু না জানি তোমার কুশলে কুশল মানি" অতি সরল সহজ সুষ্টি কথা—কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে হইলে বড় শক্ত। পরন্তু যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে শুধু ক্ষমা নহে—সর্বান্তঃকরণে ভালবাসা এবং তাহার হাতের শূল ফুল বলিয়া গ্রহণ করা

চণ্ডীদাস সহজিয়ার তাত্ত্বিক অংশের উপর জোর দেন নাই, তিনি অনুরাগের দিকটায় বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। আর একটি নূতনত্ব তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই —নরনারীর প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের পথ চিনাইয়া দেয়। বোধ হয় তাঁহার পূর্বে আর কোন সহজিয়া একথাটা বলেন নাই। "যদ্যপি আছয়ে যে জন, কেহ না জানয়ে তারে। প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে", এই পার্থিব প্রেমের সিঁড়ি বহিয়া স্বর্গলোকে যাইতে হয়, এবং এই নরনারীর প্রেমই সঙ্কীর্ণ স্থানে লইয়া যাইবার একমাত্র উপায়—তথায় পৌঁছিলে এই প্রেমের আর প্রয়োজন হয় না। কবি এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দিয়া বলিয়াছেন, যদি রঙ্গমঞ্চে কেহ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় কি আছে তাহা জানিতে চাহে, তবে সেই ভাবে সমস্ত জানিয়া লইলে তখন দীপের আর কোন প্রয়োজন হয় না" (বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, ১৩৬৩-১৩৬৪ পৃঃ)

৩০৯ পৃষ্ঠায় তিব্বতপ্রসঙ্গে আমরা যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় বজ্রের বাউল ও সহজিয়াদের সঙ্গে কোন কোন বৌদ্ধ শৈবের মতের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। একসময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের নরনারীর অবাধ মিলন ও ব্যভিচারে উত্যক্ত হইয়া তিব্বতের রাজা সজ্ঞদেব হইতে দীপঙ্করকে লইয়া যাইবার জন্য পাকাপাকি চেষ্টা করিয়াছিলেন মহাপ্রভু স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের অবাধ মিলনের বিরোধী ছিলেন তিনি ছোট হরিদাসকে শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর কাছে ভিক্ষা চাহিবার অপরাধে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।" হরিদাস প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও চৈতন্যের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে ত্রিবেণীতে যাইয়া জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে, সহচরদের সঙ্গে কোন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে চৈতন্য সমুদ্রতীরে যাইয়া আকাশে এক মধুর ও করুণ আর্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং চৈতন্য "কাহা কৃষ্ণদাস" বলিয়াছিলেন যিনি সহচরদিগকে বলিলেন, "হরিদাসের আত্মা আমার নিকট কৃপা চাহিতেছে" সে পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ কেহ জানিতেন না। সাধকগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন চূড়াধারী মাধব যখন মেয়েদের দলবল লইয়া পুরীতে আসিয়াছিল তখন চৈতন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার

পার্শ্বচরগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অদ্বৈতের সহিত চৈতন্য নিত্যানন্দের সম্বন্ধ অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। "আর পরই মাত্র নাহ উপাস স্থা দেখি পড়ু তন একপাশ।" সহজিয়াদের অবলম্বিত স্বীকাধনপদ্ধতি তাঁহার অনুমোদিত ছিল না, তিনি বলিয়াছিলেন "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেবা, প্রেম করা কি হয় রমণীরে সেবা? অষ্টেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে তখন প্রেমের তত্ত্ব জানিতে হইবে।

সুতরাং এই সহজিয়া ধর্ম চৈতন্যের ধর্ম নহে। চৈতন্য মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া বেড়াইতেন। সহজিয়াদের মধ্যে একদল বাউল বিগ্রহপূজা মানে না, কৃষ্ণের রূপ অগ্রাহ্য করে। একখানি সহজিয়া পুস্তক কৃষ্ণবিগ্রহপূজা, কৃষ্ণের বর্ণ এবং রূপ, এমন কি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সমস্ত মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে। (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগ, ভূমিকা।)

কৃষ্ণের রূপ কল্পনা করা পাপ। এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসও ইহাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ যে সহজিয়া নাম গ্রহণপূর্বক বাউলদের কৃপায় বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ লাভের বোধ চণ্ডীদাসের সঙ্গে হিন্দু ভয় ও তাঁহাদের কতকটা যোগস্থাপন-পূর্বক "রজক চণ্ডাল, নিতাই কলু" প্রভৃতি দিয়া বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সহজিয়াদের নৈশমিলন এখনও একশ্রেণীর বৈষ্ণবের মিলনের ধারা চালাইয়া রাখিয়াছে তাহাসম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ৩৭১ পৃঃ ছবি একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ মতের শূন্যতত্ত্বের মোহাই আছে। "লোকনাথ করে যারে আনক বারণ। তাহাতে পরম রতি মধ্যেতে হয়। মহামুনি নিব শাস্ত্রে এই মত কয়।" উদ্ধৃতচণ্ডিকা হইবা, মাতৃস্বসাদি বস্তু কত পোই চৈতন্য বৈষ্ণব সাহজিয়া দেখুন, এই 'মহামুনি' বুদ্ধ ছাড়া আর কে? চট্টগ্রামে এখনও 'মহামুনির মেলা হয়।

বাঙ্গালীর মত বর্তমান জগতে আর একটী জাতি আছে কিনা জানি না, যাহারা কোন বিষয়েই চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়েন না। যাঁহারা ক্ষুত্র সন্তই নহেন, বৈষ্ণবের গণ্ডী, লোকাচার, ধর্মের অনুশাসন, পারিবারিক বন্ধন যাঁহারা নিমেষের মধ্যে ছিন্ন করিয়া দূরার উদ্দেশে ছুটিয়া যান। দানের অতিশয্য দেখাইবার জন্য মাতাকর্ণের কল্পনা। অতিথি গৃহে আসিয়াছেন তাঁহার একমাত্র পুত্রকে কাটিয়া সেই মাংসে দিয়া অতিথির সৎকার করিতে হইবে। পিতা ও মাতা বালকুমারকে কলাগাছ দিয়া কাটিবেন। অতিথিই এই অদ্ভুত আবদার। পুত্রকে কাটিবার সময়ে মাতার এক ফোঁটা জল চক্ষু বাহির পড়িলে আতিথ্য নষ্ট হইবে, মাতা স্বয়ং পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন। জাতক-গ্রন্থে মাঝে মাঝে এইরূপ উপাখ্যান আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাঙ্গলার শত শত লোক বসিয়া এই দানের কথা লিখিয়াছে ও সহস্র সহস্র লোক ইহা শুনিয়াছে। কেহ বলে নাই—এই গল্পে বড় বেশী রকমের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, কেহ বলে নাই—অতিথির এই আবদার ছাড়ুক। বঙ্গবাসীর চক্ষু তখন এই গল্পের সাংঘাতিক দিকটার উপর পড়ে নাই। তাহারা এই গল্পে দূরার আনন্দ লাভ করিয়াছে, দানের অনুকরণীয় মাহাত্ম্যে তাহাদের মন ভরিয়া গিয়াছে। এই দানের আতিশয্য তাহাদের

চোখে পড়ে নাই, অতি-প্রাকৃতের কথা, এ ছাড়া নিরক্ষিতার কথা তাহারা ভাবে নাই। যদি ভাবিতে পারিত, তবে বঙ্গদেশের সুস্থ সবলদেহে মৃত স্বামীর পাশে পুড়িয়া ছাই নাম করিতে করিতে পরমানন্দে পুড়িয়া মরিতে পারিত না। কাঞ্চনমালা যে স্বামীর ভালবাসার জন্য সকলের পর কাঁদিয়াছিল সেই স্বামীর মৃত্যুতে সকলকে ছাড়িয়া গেল যে, সে তাঁহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইবে না। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, যদি তোমার একফোঁটা অশ্রু পড়ে তবে তোমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। অন্ধ স্বামী চক্ষু ফিরিয়া পাইবেন এই আনন্দে সে যে অশ্রু গোপন করিয়াছিল তাহার অপেক্ষাও তীব্র তর সপত্নীরা হইল - "অন্ধ বলিয়া" অন্য স্বামীকে ছাড়িয়া রাজকন্যা ভিক্ষারিণী হইল। স্বামীর কাছে সে নিজেকে ভিক্ষাপ্রার্থিনী চাহিয়া লইল। এই সমস্তই আশ্চর্য্য কল্পনা এই সকল স্থানে পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে—বাঙ্গালী সত্যসন্ধিতার সাধনা দুঃখ করিয়া উচ্চতর সাধনার ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছে। একদিকে কাঠুরিয়ার দৈন্য, অন্যদিকে কুলের কুল, আটবৎসর বয়স্কা রাজকন্যা দুইহস্ত পরিমিত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহার স্বামীর বাড়ীর দোরটিকে দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়াছে রাজপুত্রের আত্মচরিত্র দেখ। অপরদিকে অভিসারিকা বলিতেছে নগরে ঢাক পিটিয়া ঘোষণা কর যে, আমি কলঙ্কের প্রেমকলঙ্কসাগরে ডুবিয়াছি, ভালবাসা আমাকে জয়যুক্ত করিয়াছে, আমি তাঁহার নামের কুণ্ডল কানে পরিব, তাঁহার অনুরাগের রক্ত তিলক ভালে পরিব, তাঁহার কলঙ্ক হার কাঁথে গলায় পরিব "কাহু পরিবাদ মনে ছিল সাধ, সাধল করিল বিধি" জন্য জন্য আমি এই কলঙ্কের জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম আজ বিধাতা আমার মনের সাধ মিটাইয়াছেন। প্রেমের একদিকে স্বামীর নাম লইতে ফুলের কুঁড়ির মত লজ্জানম্রতায় মুখ মুদিত হইয়া পড়ে অপরদিকে কালা স্বামীর বুকের উপর নৃত্য করিতেছেন এবং রাধা শ্যাম অঙ্গে পা দিয়া মিশিয়া যাইতেছেন 'মিলন যায় চারবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা।' একদিকে ভক্তি ও প্রেমের যত রকম খেলা তাহার পাগলামীর লীলারোতে জগৎ ভাসাইয়া দিয়েছেন অপরদিকে রসুনাথ শিরোমণি সূক্ষ্ম ন্যায়ের যে জাল প্রস্তুত করিতেছেন—সেই কূটবুদ্ধির বাগুরায় পড়িয়া জগতের বুদ্ধিমানের শিরোমণিরা নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। সাধারণ উদ্ধারণারা এই স্বাধীনতা, এই কেন্দ্রবহির্মুখ এবং কেন্দ্রাভিমুখ গতি উভয়েরই ভূমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। উভয়ের গতি অবাধ, উভয়েই লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সাধনার পথে গিয়াছে। এ যেন ঘড়ির পেণ্ডুলম্ দুলিতেছে; ঘাত প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গালী যে ক্ষেত্রে যাহাকে দেখাইয়াছে—সেই ক্ষেত্রের কোন গণ্ডীর সীমা সে মানে নাই উচ্চ উঠিতে তাহার নবসৃষ্টি দেবসৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অবতরণ করিতে সে কূপ হইতে গভীরতম কূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার চক্রের পা বসিয়া বসিয়া তাহার ঈশ্বর মানবজন্ম করিয়েছেন। ধর্ম্মজগতে এরূপ দুঃসাহস কোন জাতি করে নাই তথাপি এই পরিকল্পনায় অসঙ্গতির লেশ নাই পুত্ররূপে, পতিরূপে, সখারূপে ভগবান্ তো সকলেই আমাদের পা ধরিয়া বসিয়া যান ভাঙ্গাইতেছেন এই জন্য চণ্ডীদাস বলিতেছেন -আমার স্বামী সোহাগাবই জগতে কে আছে—যিনি

স্পর্শমণিস্বরূপ, যাহা স্পর্শ করেন তাহাই সোনা হয়—তিনি—সেই পুরুষের মধ্যে স্পর্শমণিস্বরূপ—"নন্দের কুমার, কি ধন লাগিয়া করে চরণে আমার।" বাঙ্গালী মানুষ চিনিয়া ভগবানকে চিনিয়াছে—পৃথিবীর ফাঁক দিয়া সে স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছে, এজন্য সে ভগবানকে নিম্ন স্তরের পাশ ধরাইবার পরিকল্পনা করিতে সাহস করিয়াছে।

সহজিয়া সাহিত্য।

বাঙ্গলাদেশে সহজিয়াদের লিখিত পুস্তক অসংখ্য। তন্মধ্যে অমৃতরসাবলী, আগমসার, আনন্দভৈরব, অমৃতরত্নাবলী—এই চারিখানি পুস্তক বিশেষ অদ্ভুত। বিবর্তবিলাস' মুকুন্দ নামক এক লেখকের রচিত। ইনি নিজেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের (চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রণেতা) শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সহজিয়াদের "সদানন্দগ্রাম" নামক আনন্দসদন—কখনও "সহজপুর" বলিয়া পরিচিত। উহা হিন্দুর বৈকুণ্ঠ, বৌদ্ধের সুখাবতী এবং মুসলমানের বেহেস্তের ন্যায় পরিকল্পিত। এই সদানন্দগ্রাম কেবল সাধকদেরই গম্য, নরনারীর মিলনানন্দে উহাকে অধ্যাত্মরাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে সহজিয়ারা তাঁহাদের স্বর্গপরিকল্পনার আশ্চর্যরূপ মিল রাখিয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠান-বিদ্রোহ

মোগল-পাঠান—"যেন নূতন নকুল"

এইবার আমরা মোগল অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলাম। দাউদখাঁর পরেও পাঠানেরা তাহাদের দাবি ছাড়ে নাই, সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যায় বিদ্রোহী হইয়াছিল,—মোগল সৈন্যেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সম্যক বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি ১৫৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার নবাব সাহাবাজ খাঁ কতলু খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধিতে কতলু খাঁ বঙ্গদেশের উপর কোন হাত দিতে পারিবেন না, উড়িষ্যার অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, এই কথা ছিল। আকবর সাহাবাজ খাঁর কৃত সন্ধিতে সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস হইল, খাঁ সাহেব উৎকোচ-গ্রহণপূর্বক বিদ্রোহীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন,—সুতরাং সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গলার মসনদ হইতে বিচ্যুত করিয়া উজির খাঁ হোসেনকুলি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন। এই শাস্তিই প্রচুর হইল না, বহু অর্থ উৎকোচ গ্রহণের সন্দেহে সাহাবাজ তিন বৎসর কাল বন্দী হইয়াছিলেন।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বঙ্গের মসনদ পাইয়া কতলু খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে উড়িষ্যা ছাড়াইয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কতলু খাঁ নিজে উড়িষ্যায় থাকিয়া তাঁহার এক প্রবল দল ঘোড়াঘাট হইতে ৫০ মাইল দূরবর্তী নামক গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। মানসিংহের তরুণ পুত্র জগৎসিংহ তখন কতলু খাঁকে বশীভূত করিবার ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। পাঠানেরা ধূর্ততা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিল। তাহারা যুবরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে এই সন্ধির কথা লইয়া মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। কিন্তু ইহা একটি ষড়যন্ত্রমাত্র। কোন প্রকারে দেরী করিয়া বর্ষণের পুষ্টি ও শৃঙ্খলাসাধন ছিল উহাদের উদ্দেশ্য। যুবরাজ সন্ধির কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অবস্থায় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনায় পাঠানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং মানসিংহের পরিতাপ ও

মনঃকষ্টের সীমা-পরিসীমা রহিল না। কাবুল একধাও জনরব হইয়াছিল যে তাহারা জগৎসিংহকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু মোগলদের বরাত ভাল। কতলু খাঁ কিছু দিন হইতে অসুস্থ ছিলেন, হঠাৎ ১৫৯০ খৃঃ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্রেরা নাবালক ছিল, এবং সৈন্যদিগকে প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন নেতা ছিলেন না। পাঠানের ভয় পাইয়া ও সিংহকে তুষ্ট করিল, মানসিংহকে বহু অর্থ ও ৫০ টি হস্তী উপঢৌকন দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল। উদ্দেশ্য তাহাদের থাকিবে কিন্তু তাহারা সম্রাটের অধীন হইয়া থাকিবে। উড়িষ্যার আকবর বাদশাহের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইবে, এতদ্ব্যতীত তাহারা মানসিংহকে পুরস্কার অধিকার করিয়া দিল। সন্ধির শেষোক্ত ধারায় পরিষ্কারভাবে দুঃখ মানসিংহ বিরক্ত হইয়াছিলেন।

আকবর এই সন্ধিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেও তিনি ইহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতে পাঠানদের পরাস্ত করা থাকে ইসমাইল কুলী হওয়াতে তাহাদের স্বাভাবিক দুঃসাহসিকতা বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পবিত্র জগন্নাথ মন্দির অধিকার করিয়া লইল করিল। মানসিংহ পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মোগল সৈন্য একটা যুদ্ধের পরই পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিল। এবারও তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিল, সন্ধিতে ৫ লক্ষ টাকা পুনরায় মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। পাঠান-নেতৃগণ কতক জায়গীর পাইলেন, কর উড়িষ্যার রাজস্ব মোগল সম্রাটের প্রাপ্য হইল (১৫৯২ খৃঃ), কিন্তু পরবৎসরই পাঠান কতলুপুত্রগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে লুটপাট চালাইতে লাগিল। তাহারা রাজার খাজনা বন্ধ করিতে লাগিল। পুনরায় মানসিংহ তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিলেন। তাহারা অতিশয় বিনীত ভাবে সন্ধির প্রার্থনা করিল। রাজা তাহাদিগকে একেবারে বিনাশ করা অবিবেচনার কাজ মনে করিয়া জায়গীরগুলির অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন।

কতলুর পুত্রগণ।

কিন্তু মানসিংহ বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর কতলু খাঁর পুত্র ওসমান বিদ্রোহী হইলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন, মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ নামক মোগল পক্ষের সেনানায়কদ্বয় ঘোর যুদ্ধ করিয়া ওসমান খাঁর হস্তে মেদিনীপুর নামক স্থানে পরাস্ত হন। মোগলরাজ ভাণ্ডারের প্রধান কর্মচারীর হিসাবরক্ষক আব্দুল রজ্জাককে পাঠানেরা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনায় বঙ্গদেশে কিছুকালের জন্য ওসমান খাঁর অধিকারে আসে এবং সোনারগাঁও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৫৯৩ খৃঃ)।

সুতরাং রাজা মানসিংহকে সম্রাটের আদেশে পুনরায় বঙ্গদেশে পাঠান দলন কার্যের ভার লইয়া আসিতে হয়। ইসুপুর নামক স্থানে পাঠানেরা বিপুল ক্ষতির সহিত পরাজিত হয়। আব্দুল রজ্জাককে তাহারা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র লইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে হাতীর পিঠে ছিলেন, তথায় এক দুর্ধর্ষ ভীষণদর্শন পাঠান রক্তকৃপাণ সহ তাঁহার রক্ষকের কাজ

আব্দুল রজ্জাকের বন্দীত্ব

[illegible] তাহার [illegible] [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ

[illegible] শাহান ও মোগল রাজত্ব

[illegible] বঙ্গদেশে সাম্রাজ্যের একরূপ স্বাধীন ভূস্বামী হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা নিজের নামে মুদ্রা প্রচার করিতেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে বঙ্গদেশে বারজন ভূস্বামী ছিলেন, তাঁহারা বারভূঁইয়া নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহারা সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা সম্রাটের আদেশ অমান্য করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের অনেকেরই সৈন্যবল ও নৌবল ছিল। তাঁহারা সম্রাটের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। তাঁহাদের অনেকেরই নিজস্ব কামান

বাঙ্গলার প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ণধারস্বরূপ রাজাগণকে পরাজয় করিয়া হস্তগত করিয়াছিলেন। এই ভূমির আদি [illegible] ভূঞা ভূমিজ ও হয়ত কতিপয় পুরাতন সংস্কার নহে। বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করা নাই, সেবকদের লইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। তুরস্কের বাঙ্গলার তদানীন্তন [illegible] স্বাধীনভাবে হইয়া সুবর্ণগ্রামে তাঁহার রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার রাজকার্যে হস্তে [illegible] পাঠানদের সময়ে যে স্বাধীনতা তাঁহাদের লুপ্ত হয় নাই, এবার মোগলের সম্রাজ্য-সুকৌশলে তাহা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল।

এই বিদ্রোহীদের প্রথম নাম করেন—ইশা খাঁ মসনদ আলা

অবোধ্যাতে বাইসওয়ারে পরগনার [illegible] নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ইনি বিক্রমপুরের সামন্ত রাজা এবং অত্যন্ত ধনী ছিলেন। ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে তখনকার আসিয়া সুলতান ফিরোজশাহের সঙ্গে ইঁহার [illegible] এবং ইনি সুলতানের মহিষী গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে থাকিয়া যান। ইঁহাদের বংশে কালক্রমে সন্তানগ্রহণ করেন, ইনি অতি অভিজাত নিরভিমান ও সাহসিক পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে পুরাকালে ইনি একটি ছোট সোনার ইট নির্মাণ করিয়া তাহা ভাঙ্গ করিয়া সাঙ্গপাঙ্গদিগকে দান করিতেন। এজন্য ইঁহার "কালিদাস গজদানী" নাম হয়। কাহারও কাহারও মতে সুলতান আলাউদ্দিনের [illegible] কন্যা মাধবী খাতুন, কাহারও মতে তাঁহার এক কন্যা কালিদাসের গজদান সুন্দর দেহ বপু ও সুশোভন মুখচোখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। কিংবদন্তী যাহা কালিদাস সুলতানের কন্যার কাছে যে উত্তর দিয়েন, তাহাতে অনেক সত্যতা ছিল—এবং তাহার শেষ কথা ছিল—কুমারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হইয়া রাজকুমারী কোনরূপে তাহাদের [illegible] খাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করেন। অনন্যোপায় হইয়া কালিদাস গজদানী ইসলামধর্ম গ্রহণপূর্বক মাধবীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। ইহার মুসলমানী নাম হইল—সোলেমান। কয়েকজন মুসলমান পল্লীগীতকার এই ভালবাসার ব্যাপার বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন—কিন্তু অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে মুসলমান মহিলাদের জানিয়াই উনিই স্বয়ং প্রস্তুত হইয়া ইসলামধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। [illegible] ইতিহাসে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে। আইন-ই-আকবরীর মতে সোলেমানের দুই পুত্র ইসমাইল ও ইশা খাঁ, সোলেমান তাজ খাঁ এবং সালিম খাঁ কর্তৃক নিহত হওয়ার পর মসনদ পাদস্থলেশে প্রেরিত হন। তাঁহারা তাঁহাদের এক খুল্লতাতকর্তৃক পুনরায় বঙ্গদেশে আনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাটী অঞ্চলের অধিপতি হন। ইশা খাঁ তখন পৌরনে ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের সেনাপতিগণের তালিক ভুক্ত হইয়া শ্রীহট্টের তরপের) রাজ [illegible] খাঁর বিরুদ্ধে যুবরাজ রাজধরের সঙ্গে অভিযান করেন ত্রিপুরেশ্বরকে সহায়তা করিয়া ইনি মোগল সেনাপতি সাহবাজ খাঁকে পরাস্ত করেন। তখন ত্রিপুরার সমাইল পরগনার মালিক হইয়া ইনি অমর মাণিক্যের রাজ্ঞীকে মাতৃসম্বোধন

করিয়া রাজপাত্রগণের প্রতিজ্ঞা ও তাহার সাধন করেন। এই ঘটনা চেঙ্গমায়ে বিখ্যাত অমরকাব্যের [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] এই [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] পরাস্ত হইয়া [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible]

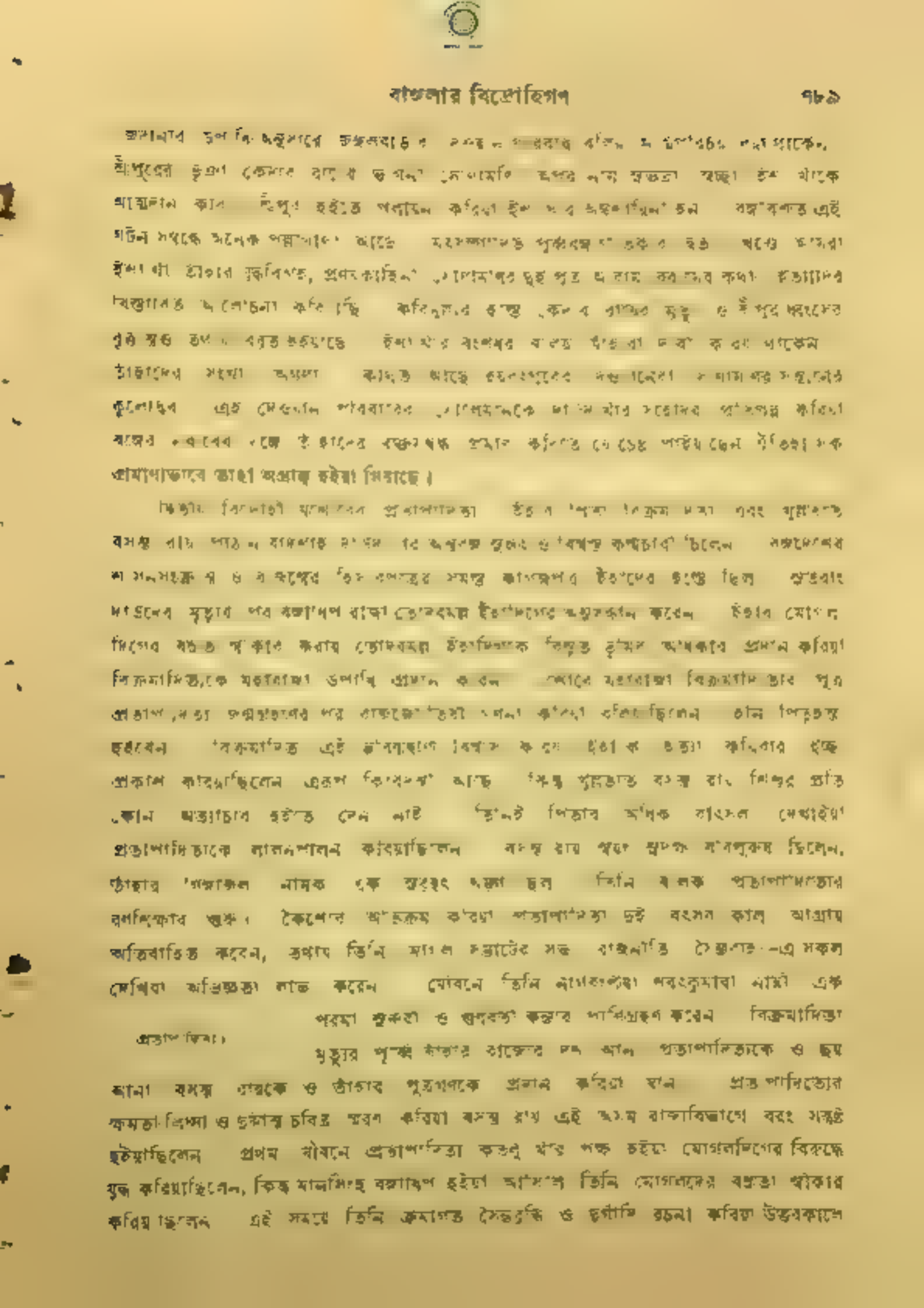

প্রতাপাদিত্য।

যোগেশশক্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া সমস্ত বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে কেহ বলেন মাতঙ্গ-দ্বীপ কেহ বলেন জয়দেবপুরের নিকটে, কেহ বা বলেন চাঁদপ্রতাপে কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনেক অকাট্য প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে যশোর জেলার রাজধানী ছিল পর্ত্তুগীজ লেখকেরা চাঁদপ্রতাপ বলিয়াছেন আমার মনে হয় ইহা মাগরদ্বীপের সন্নিহিত ফুল্লশ্রী পরগণার নাম চাঁদপ্রতাপ—হইতে পারে প্রতাপাদিত্যের বড় ভগ্নীর মধ্যে ১৮টি দুর্গ ছিল ১ বকের দুর্গ ২ ধুমঘাট দুর্গ ৩ রাজগড় দুর্গ, ৪ কমলপুর দুর্গ ৫ রেকাবে দুর্গ ৬ কেরবাই দুর্গ ৭ প্রতাপনগরের দুর্গ ৮, ৯ [illegible] দুর্গ, ১০ মাহলা দুর্গ ১১ [illegible], ১২ আড়িয়ল খাঁ দুর্গ ১৩ মাগরদুর্গ, ১৪, বাহাদুরপুর দুর্গ, ১৫) চকশ্রী ও চাকশ্রী দুর্গ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের ৭টি দুর্গ ছিল—যথা, মাতলা বালিয়াড়ি টাল, বেহালা বালিঘাটা, চিৎপুর, খিদিরপুর প্রতাপাদিত্য জাহাজনির্ম্মাণের প্রধান সহায়তা করিতেন তাঁহার নৌবহরের জন্য তখন বড় বড় কারখানায় অনেক জাহাজ ও রণতরী নির্ম্মিত হইত কোন কোন নৌকায় ৮টি বা তদধিক দাঁড় ছিল এবং অনেক জাহাজেই কামান থাকিত। তাঁহার নৌকা, রণতরী ও জাহাজের অনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কতক নাম বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে মুসলমান গ্রন্থকারদিগের লেখকে 'পরাণা, মহলবাড়ি', 'ঘুরাব', 'পাল', 'মাচোয়া', 'পলুয়া', 'ছিপ' 'গুরাব' 'পলবন্দর', 'কোচা' প্রভৃতি অনেক নৌকার উল্লেখ আছে, পর্ত্তুগীজদের সহিত একত্র কামানের জাহাজ-নির্ম্মাণে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহার জন্য [illegible] অনেক জাহাজ যশোর হইতে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন [illegible] প্রতাপের সকলই যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা [illegible] এর উপরে ছিল এবং অক্ষারোহী সৈন্যের সংখ্যাও ত্রিশহাজার কিংবা তদধিক ছিল জাহাজগুলি এখনও নামে মাত্র বর্ত্তমান। আবদুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়—"প্রতাপাদিত্যের [illegible] ঐক্য সৈন্যদল নানা স্থানে ছাউনী করিয়া থাকিত।" এই রণতরীগুলি প্রথম বঙ্গালা কন্দর্পের অধীন ছিল কিন্তু পরে পর্ত্তুগীজ, ফ্রেঞ্চ ও ডচদের হাতে পড়িয়া নষ্ট হয় প্রতাপের সৈন্য ১, চাল ২, অশ্বারোহী, ৩, চাবুকসওয়ার, ৪, গোলন্দাজ, ৫ সেনাপতি ৬ গুপ্তচর ৭ হাতীসওয়ার, ৮ হস্তিসেনা—এই আট বিভাগে বিভক্ত ছিল। তাঁর সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন কালিদাস রায় যখন যশ "যুদ্ধকালে সেনাপতি কাল"—ভারতচন্দ্র অশ্বারোহী সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতাপসিংহ বসু, হস্তিসেনার অধ্যক্ষ ফরিদউদ্দিন ও ফুরিল্লা চাবুকসওয়ার অধ্যক্ষ সুন্দর ও ধুলিয়ান সেন। সেনাপতির অধ্যক্ষ অষ্টাঙ্গ পেড়ো বিপক্ষদের [illegible] বন্দিত করিয়া লইবার জন্য যে গুপ্তচরদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ ছিল 'সুখা' নামক এক ফরাসডাঙ্গার বাসী। "গুপ্তচরোপাধ্যক্ষাণাং সুখাখ্যো ভীমবিক্রমঃ"—ঘটককারিকা, মুসলমানদের অধ্যক্ষের নাম রঘু। "ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতা, বাষান্ন হাজার যার জাল" প্রতাপাদিত্যের সৈন্যসংখ্যার এই নির্দ্দেশ ভারতচন্দ্র

করিয়াছেন। পূর্ব্ববিক্রমপুরের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎসেনের পুত্র। প্রতাপাদিত্যের বহু কামান ও গোলন্দাজ সৈন্যের বিবরণ এখনও ঘশোরের দৃষ্ট হয়। চব্বিশ পরগণার আবহাওয়া এবং মজুমদারবংশীয় সুন্দরবনের সন্ত্রান্তবংশীয় বহু লোক ও পল্লী এবং পূর্ব্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। তাহার সৈন্যদের মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিক পাঠান সৈন্য, পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মানি সিপাহীর বড় সেনা বিস্তর ছিল, বাঙ্গালী রায় বেশে ও ঢালী সৈন্যগণ অবশ্য দুর্দ্ধর্ষ ছিল। কাসুলি খাঁ পুত্র ওসমান খাঁ তাঁহার প্রধানতম সেনাপতি ছিলেন।

মানসিংহের সময়ে হিন্দু লোক ও অনেক মুসলমান কর্ম্মচারীর কার্য্যদক্ষতা বড়ই প্রশংসা ছিলেন কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্ম্মে শাসনকার্য্যে পুনঃ পুনঃ, হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন মূল কথা হইল তাহার অন্তরে বড় প্রবল চক্রান্ত এবং মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। মহারাজা গুরুকুলের কুলগুরু এই ছুতায় হিন্দুয়ানা পাঠানাধিকারের পরে দেশে হিন্দুরাজ ফিরাইয়া আনিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাহার সৈন্যবল এবং প্রতাপ ছিল—এবং তিনি নিজে বেশ বীরপুরুষ ছিলেন তাহাতে এইরূপ আশা করা অসম্ভব ছিল না। কমল সম্ভবতঃ কামাল নামক এক বিশ্বস্ত কাজি চন্দ্রদ্বীপ রাজধানী খোজা পুরে এই আশার এক পরম অবলম্বন ছিলেন কিন্তু ইহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং তৎসঙ্গে বাঙ্গালী চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে তিনি যাহা করিয়া গেলেন তাহা বুঝা যাইবে।

তিনি তান্ত্রিকভাবে অতিশয় ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, একজন মহাপুরুষ ছিলেন তাঁহার ক্রোধ হইলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিত না তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে যাহাকে হত্যা করেন সে ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, যাহাতে তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না যশস্ত্র রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি তীর বাণ করে এবং তাঁহা সংক্রান্ত অস্ত্রাঘাতে তাহাকে নিহত করেন ব্রাহ্মণকার্য্য ঈশ্বরিষ্ট যশস্ত্র রায় তাঁহার প্রশিষ্ট 'বাঙ্গালা' নামক খড়্গ আনিতে আদেশ করিলেন তখনই 'তরবা' হইতে অধিক প্রেষ্ঠ দিয়া তাঁহাকে লালপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করিলেন। (১৫৯৫ খৃঃ)। ক্রোধের সময়ে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না তাহার সদ্যোবিবাহিত জামাতা বাঙ্গালার অধিপতি তরুণবয়স্ক যশস্ত্রকে তিনি হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন যশস্ত্রের সঙ্গে 'সোনাই গঙ্গা' নামক এক ঈঁড় আসিয়াছিল বিবাহ উৎসবে সে তাহার তাড়াতাড়ি দেখাইয়া খুব বাহবা পাইয়াছিল। কিন্তু সে স্ত্রীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া হত্যাকারীদের সাহায্য করিতে থাকে। কিন্তু অবিলম্বে তাহার যবনীর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে এবং মহারাণী ও বংশমর্য্যাদা একদা প্রতাপাদিত্যকে জানান ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতাপাদিত্য সোনাই গঙ্গা এবং তৎসঙ্গে জামাইকে কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন হয়ত মুহূর্ত্ত পরে ক্রোধ থামিয়া যাইত এবং জামাইকে তিনি

যশস্ত্র রায়ের হত্যা।

নিকোল ক্লাসিয়া পাত্রক হইয়াছেন কিন্তু ভাঁত হইয়া বড়ই সকলের সমাদরে এই রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা এবং তাহাদের ভাগ্যে সুখোপভোগে লালসে করেন রাজকুমারী পরম সাধ্বী বিমল অবশ্য শেষে বারবার অস্ত্র দূরে তাঁহার স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু খসরু জ্যেষ্ঠই যেন বৃদ্ধক অকূল' হইয়া চিরকাল ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রের বিনোদ এবং স্ত্রী জামাতার প্রতি ভক্ত বাদশাহ তিনি অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন এই সকল কথা অসম্ভব' ইতিহাসবিরুদ্ধ, সুতরাং কখন হইতে পারে, কিন্তু যিনি যেভাবে সম্রাটের অভিপ্রায় কাহাদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন তাহা কখন কখনই ক্ষমা করা যাইতে পারে না আরাকানের রাজাকে তাঁহার চিরশত্রু বলিয়াই বুঝা যাইতে পারে যখন তিনি বন্দী হইয়া এবং মোগলের শিবিরে সহ যখন তাহার আত্মীয়গণ সেই ভয় পাইয়া আসিয়াছিল। আরাকানী দলের সঙ্গে সঙ্গে যখন কথা কহিয়া ছিলেন তখন বাহু সকল ব্যবহারে ও মুখের পাশ্চাত্যে সহ ই বাঁকে নাম করা হইয়াছিল তাহাকে চড়া করেন চুক্তাই বলে বাবরের এই ঘটনার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে আমি ইহাতে নিমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ আসিল যেখানে একবার কতকগুলি দলের বন্ধুকে পরিচয় করিয়াছিলেন তাহা এখন বাহিরে ইংরাজের পূর্বে প্রতিপত্তি। এই কলম্ব প্রকাশ করিলেন হত ছাড়া অনেক বলিয়াছেন ও ফরমাশমতে "ভবে শুটি" নামক কার এক বাদশাহকে তিনি নষ্টমনস্কে করা করেন, তাহার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারে বেশ ভাল হইয়াছিল যে তাহারা একজন কলম্বস হইয়া, বলিয়াছিল। তুলা হইতে চলুনিদার মেকলের কাছে এমনও লোকে ভবে শুটিকে দেখিয়া থাকে। এই ভবে শুটি বাবর-চরিত্রের নিকট একটি ভাঁত ছবি প্রস্তুত করিতে বসিয়াছিলেন এখনও ভবে শুটির বাস্তা"র অনেকটা বিদ্যমান আছে।

কবি ও ঘটে একদা মজলিসে উপস্থিত হইয়া তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন এমন কি ইহার সমস্তগুলাকারও নয় ছিল না কাহার উদাহরণ ব্যাপ্ত সমস্ত মনোযোগের মধ্যে এমনও হয় যে তিনি ভাল ভাল অর্থ প্রাপ্তিকে নিলেন এমন কি, কবিতা ঘটে এমন দুইটিকে যেন তিনি হাজারের উপস্থিত হইয়া কতক হইয়াছিলেন তখন একজন দাসকে বাদশা খসরুমীরকে চড়িয়া বসিয়াছিলেন ইহা শুধু পাওয়ার ইচ্ছা। কতক চতুরের পরা বসুবংশের রাজ্যে মেলার সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে কালিদাস তাহার বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু এই দুই বৌদ্ধযুগেই বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইত ছিল তাঁহারা হইয়াছেন এই কতক হওয়ার বাপোর সাবধানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কতকগুলার সঙ্গীত নাম করি তাঁহার ভগিনী রাজধানীর নিকট হইতে লক্ষ্য নিবারণের একখানি বস্ত্র চাহিয়া লইয়াছিলেন। ভিলাপ সম্বন্ধে ক্লাসিয়াসে কালিদাসের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, অন্ধ লক্ষ্য মহারাজ্ঞ নাটি রাখে ঘরে মৃত্তিকার ভাগ্য রাজা অনুপমে কার কেন হিন্দুস্তানকালে এ প্রথা ছিল কি না সন্দেহস্থল বর্তমানের

রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের কিছুপূর্ব্ব গঠন ও তাহার আদর্শে যে বৌদ্ধরাজগণ ইহার অনুসরণ করিতেন, তাহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা রাজ্যে সেদিন পর্য্যন্ত এ প্রথা নামে মাত্র অনুষ্ঠিত হইত। রাজা কণ্টকচ্যুত হওয়ার পর মহারাণী সর্ব্বপ্রথম তাহার রাজত্ব ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া কণ্টকচক্রের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি কোন শত্রুকে বাসায় লইয়া ছিনিমিনি খেলার পক্ষে ছিলেন না। ব্রাহ্মণ শঙ্করকুমারকে পাইলেন, শঙ্করকুমারও রাজার মর্ম্মকথা বাক্ত দিলেন না। এইস্থানে শঙ্করকুমার ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর সৃষ্টি করিলেন—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু গ্রহীতা শঙ্করের উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন "তিনি শুধু রাজার মনোরঞ্জন পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপে বাণীমাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন", তিনি তাহাকে বিনিময় প্রদর্শন করিলেন এবং বিনিময়ে রাজার যেরূপমত স্বর্ণ পাইলেন। প্রতাপাদিত্যের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত রাজা সাম্রাজ্যের এরূপ সুশৃঙ্খলা করিয়াছিলেন যে সকলে নির্ভয়ে বাস করিত। তাঁহার অপূর্ব্ব দানশক্তি ও উদারতাসম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, রামরাম বসু ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ছদ্মবেশে শত্রুদের অবস্থা সকলকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যের লোকেরা বহিঃশত্রুর আক্রমণসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। তাঁহার শিক্ষা বিক্রমাদিত্য; শিকারে বাহির হইতে ব্রাহ্মণ কাশীতে কুশল এবং পণ্ডিতগণ যশোরে আমন্ত্রিত হইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সাহিত্যের তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও সুসম্পন্ন ছিল—প্রাচীন কাহিনীর অনেক ভগ্নাবশেষ তথায় উপলব্ধ হয়। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পাইয়া তাহা অতি আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল এবং এই জন্যই ভারতচন্দ্র তাঁহাকে "যশোমন্ত ভবানীর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যখন যশস্বী রাজের আজ্ঞায় কুতবুদ্দি কপর্দ্দক বস্ত্র কচু বাটকে লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে তাঁহার হত্যার কথা জানাইল, সেই মুহূর্ত্তে হিন্দু রাজত্বের স্বাধীনতার শেষ আশা-রশ্মি অস্তমিত হইল। মানসিংহ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন, তিনি প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি ফরমান ও একটি বেড়ী (শৃঙ্খল) পাঠাইলেন। বেড়ী অধীনত্বের চিহ্ন—এবং ফরমানে যুদ্ধের আহ্বান। একবাক্তি নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "এই বেড়ী লও মানসিংহ তাঁহার প্রভু জাহাঙ্গীরের নামে পরাইয়া দেন"—"বেড়ি দিও আপনার মনিবের পায়ে" (ভারতচন্দ্র)। প্রতাপ স্থির ফরমান গ্রহণ করিয়া বেড়ী ফিরাইয়া দিলেন, তৎসঙ্গে রাজা মানসিংহ মোগলের আজ্ঞাবহতা করিয়া যে জাতিচ্যুত ও কুলচ্যুত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না।

মানসিংহ আকবরের নিকট যুদ্ধনীতি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, পথে পথে

[illegible] ছিলেন, [illegible] চেষ্টা করিলেন [illegible] করিতে [illegible] ছিলেন [illegible] ছিলেন, [illegible] করিতে [illegible] করিতে [illegible] করিতে

[illegible] [illegible] [illegible] [

করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁ নবাব হইয়া বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি একটু উগ্রপ্রকৃতির ছিলেন। রাজমহলে তাঁহার সঙ্গে প্রতাপের দেখাসাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বাধীনতার সেই চিরপোষিত ইচ্ছা তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। এ ছুতা সে ছুতা ধরিয়া তিনি সন্ধির নিয়ম ভাঙ্গিলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইবার প্রতাপাদিত্য ধুমঘাটের যুদ্ধে ইসলাম খাঁর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মীর্জা নাথনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। তাঁহার বন্দী হওয়ার সংবাদে তৎপুত্র উদয়াদিত্য দুইটির হৈস্ত লইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগলসৈন্যসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পরিখার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি নিহত হন, এবং পিতার চোখে পুত্রের পতিহা অঞ্জন করেন। এদিকে বন্দী প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকায় গিয়া ইসলাম খাঁ পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘকে আগ্রায় প্রেরণ করেন। পথে কালীধামে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে প্রতাপের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ভরতচন্দ্র এবং অপর দুই একজন লেখক লিখিয়াছেন—মানসিংহের খাঁচাই তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা ভুল। মানসিংহ নহে ইসলাম খাঁর হাতেই তাঁহার পতন।

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বহুস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। সমবায় যন্ত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একখানি নাতিক্ষুদ্র ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, একখানি পারসীতে লেখা 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' হইতে তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর অনুচর আবদুল লতিফ খাঁ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। তাঁহার সহজ-সরল ভাষা হইতে প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক মীর্জা সঙ্গল আলাউদ্দিন ইস্পাহিনী অপর নাম পাইয়া "সিয়ারুলমোতাখেরীন" নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কথা সবিস্তারে লিখিয়াছেন, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং খুঁটিনাটি তত্ত্বে পূর্ণ। পর্তুগীজ বিবরণ গ্রন্থসমূহেও প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিদ্যাবেত লিখিত কাফরগণের ইতিহাস, পর্তুগীজদের লিখিত অনেক বিবরণ, বিশেষতঃ দুআর্তিকের ইতিহাস—প্রভৃতি বহুগ্রন্থে যশোহরাজসম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সম্প্রতি বাঙ্গালায় প্রতাপাদিত্য ও যশস্থ রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যকুল কবি গোবিন্দ দাসের মতে প্রতাপের পূর্ব্বপুরুষ ও বংশধরেরা উত্তরেরই সখা ছিল—তিনি তাঁহার পদে ইহাদের নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

আর একটি কথা বলিয়া প্রতাপাদিত্যের কথা উপসংহার করিব। মোগলদের বিরুদ্ধে ঈশা খাঁ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল, অনেক ভূঞা সম্রাটের ও আগে অনেকে মোগলদিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। এদিকে পাঠানেরা মোগলের চিরশত্রু, বঙ্গদেশে এখনও তাঁহাদের প্রভাব একেবারে নষ্ট হয় নাই। সুতরাং মোগল সমস্ত দেশের শত্রু-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহারা কেন মিলিত হইলেন না—প্রতাপের শত্রুতাকাঙ্ক্ষী স্বয়ং ঈশা খাঁ, তিনি নানা উৎসবে ধুমঘাটে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের

শুভকার্য্যে যোগ দিয়াছিল কিন্তু বা পরস্পরে সাহায্য করিলেন না কেন? এক একটি করিয়া প্রতিপক্ষ রাজা ও মুসলমান নায়ক পতঙ্গের মত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন—সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেন না কেন? একথা মনে থাকুক প্রতাপের অশ্বারূঢ় সঙ্ঘ ও বিপন্ন কর্ণাটরাজগণ পর্য্যন্ত মোগলবিদ্বেষে তাঁহার সঙ্গীনাদের পথ দেখাইয়া দিল। তাঁহার নিজ জামাতা রাজপুতানার কি অল্পকালের জন্য পারিবারিক কলহ ভুলিয়া তাঁহার সাহায্যে দাঁড়াইতে পারিতেন না? আমেরিকা দেশ নাই হইল ঐক্য-লক্ষ্মী প্রবেশে থাকিলে বাঙ্গলক্ষ্মী এস্থান হইতে বিদায় লইতেন না। ইহার মিথ্যাসন পাকা ছিল। আমাদের নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাই সমস্ত বিষয়টিকে বুঝিতে পারিতেছি না। এই অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই আমরা সতীশ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

তথাকথিত "বারভূঞা"র অন্যতম ঈশা খাঁর কথায় বায়। চাঁদ রায় ও কেদার রায় সহোদর ছিলেন। ইঁহাদের রাজধানী পদুয়ার এক ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে কাঁশাইলঙ্গর গ্রামে শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল।

কেদার রায় ও চাঁদ রায়।

ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিজ রায় সম্ভবতঃ সেন রাজাদের সময়ে কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুর অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তি করায়ত্ত করেন, নিজ রায় তৎকালীন বঙ্গাধিপের নিকট 'ভূঞা' উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের একজন পরাক্রান্ত জমিদার বলিয়া গণ্য হন। আকবর ওয়াইভের মতে আকবরের সময়ে নিজ রায় কর্ণাট হইতে আসিয়াছিলেন (বারভূঞাসম্বন্ধে জেমস ওয়াইভ্ সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—এশিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণাল, ১৮৭৪)। চাঁদ রায় ও কেদার রায় সমস্ত বিক্রমপুর পরগণা ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে স্বাধীন নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী সন্দীপ মোগলদের দখলে ছিল—কিন্তু জনৈক পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো কেদার রায়ের নাম ঐ স্থান অধিকার করেন। কেদার রায় তাঁহার সেনাপতি কার্ভালোর দ্বারা ঐ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারস্বরূপ ঐস্থান সেই পর্ত্তুগীজ যোদ্ধাকেই প্রদান করেন। এই সন্দীপের অধিকার লইয়া আরাকানের রাজার সঙ্গেও কেদার রায়ের বন্ধুবিগ্রহ হইয়াছিল। তাহার তিনি আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্তু শেষে সন্দীপের অধিকার শেষোক্তের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল (১৬০২ খৃঃ)। কাস্তোস লিখিত "Portuguese in Bengal" পুস্তকে পড়ি যুদ্ধ আরাকানরাজ মানরাজগিরি কর্ত্তৃক সন্দীপ অধিকৃত হওয়ার পর কার্ভালো কেদার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কেদার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরের রাজকীয় সেনার অন্যতম অধিনায়ক হইয়াছিলেন। মোগলেরা বুঝিল তাঁহাদের অধিকৃত ইশখাঁ কেদার রায়ের সাহায্যে কার্ভালো জুটিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রীপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মহারাজ মানসিংহের সেনাপতি মজলিসও কেদার রায়ের সঙ্গে যে যোদ্ধৃত্ব যুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহা অনেকটাই জলযুদ্ধ। তাহাতে কালীগঙ্গার স্রোত সমিল উভয় পক্ষের শোণিতে লোহিত হইয়াছিল। যুদ্ধে কেদার রায় জয়ী হইলেন এবং মোগল-পক্ষীয় দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা মজলিস নিহত হইলেন (Purchas Pilgrims, Pt IV, Bk V, p 513)। কথিত আছে এই যুদ্ধে

বলিলেন, "আমরা ভাইয়ের মত ভাইদিগকে বিবাহ করিয়া পাঠাইয়া দিব না, বিবাহ করিলে একাসনেই করিব।" তখন কাণার কাছে তাঁহাদিগকে বলি দেওয়ার জন্য উপস্থিত করা হইল, তখন এই দুই রাজকুমারী খড়্গ হস্তে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে দাঁড়াইল, ভয়ে কেহ অগ্রসর হইল না। ইহাকে পতঙ্গের বাঁধ, অসাধারণ বলসম্পন্ন, ইহা যাঁর লক্ষিণহস্ত করিমুন্না—বধবা বেগমের শোকোন্মত্ততা দেখিয়া অবাক হইলেন। তিনি মোবারিজের নেতা সাদনের সাহায্য লইয়া ঈশপুরে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং যখন আরাম ও বিরাম কালীমন্দিরে রাজকুমারীদ্বয়ের আনুকূল্যে ভাবন-মরণের সন্ধিস্থলে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তখন অকস্মাৎ দূতকেতুর মত উপস্থিত হইয়া ইঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কেদার রায় নিকটবর্ত্তী বনে পলাইয়া গিয়া তাঁহার দুর্গমস্থ প্রাসাদ নিরাপদ মনে করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেন, রাজকুমারীরা ভাবিল, কেদার রায় বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের নিজেদের জীবন ও আরাম বিরামের জীবন সম্বন্ধেই শঙ্কিত থাকিবে। তাহারা সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিল, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী অরণ্যে এমন স্থান অনেকগুলি আছে, সেই জঙ্গলের মধ্যে কেদার রায়ের একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, উহা ঈশপুর হইতে মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরে সেই আত্মগোপন রাজপ্রাসাদে একটা গুপ্ত সুরঙ্গ ছিল তাহার দ্বারা নদীতে পৌঁছান যায়। করিমুন্না সেই স্থানে যাইয়া কেদার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন—তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন।

করিমুন্না

আরাম বিরাম যে দুইটি আর দুই পুত্র ও সোনামণির পালকপুত্র তাহার উল্লেখ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। পূর্ণানন্দ শর্ম্মা, দ্বিতীয় পুত্র, শ্যাম ও দ্বিতীয় সন্ধ্যা সইবা। এই সময়ে কেদার রায় মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা এই ঘটনাই ধরি, কিন্তু করিমুন্নার ভয়ে মসনদের কাছের দল তুল করিয়া মোগলেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা আরো দৃঢ়ভাবে বাড়াইবার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কিরূপ বিবরণ দিয়াছেন কথিত আছে, ইশা খাঁর মৃত্যুর পর মজনুর ও ছিদ্দিক দুর্গ আক্রমণ করিলে সোলেমানি উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। অপর এক প্রবাদ যে সোলেমানির স্বামীর মৃত্যুর পর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

যে কালে ডন কৌঁকে মোগল আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ একজন শাসন করিতেছিলেন, তাহাদের ভূষণা বা ফতেয়াবাদ। আধুনিক কালে অনেকটা ফরিদপুর জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। রাজ্যের অধিপতি মুকুন্দরাম রায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত জীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম অতি অল্প সময়ের জন্য মোগল রাজ-প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম খাঁর সঙ্গে সোহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কুচবিহার অভিযানের সময়ে কিছু সৈন্য দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন কিন্তু মূলতঃ ইনি মোগলদের চিরশত্রু ছিলেন। ক্ষণকালস্থায়ী সম্ভোষ ফলে কতকদিনের জন্য তিনি পাকুয়া ও সোহাটীর সুবেদার হইয়া মোগলদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি

এই কার্য্য একেবারেই পছন্দ করেন নাই। তাঁহার পুত্র সলিমকে ঐ মুলুকেই দিয়া তিনি

ঈশার মুসনদের বল। স্বীয় সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ ও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করেন। কথিত আছে, পুত্রাপেক্ষাও মৃত্যুর পরও তিনি মোগলদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন। তিনি মোগল সেনাপতি মোয়াজ্জমের পুত্রদ্বয়কে ভুলাইয়া আনিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (মাসির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, ৪৯৯ পৃঃ)। কথিত আছে, ফতেহপুর যাইয়া মোগলের রাজপ্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পুত্র সলিমও ইহার পৈতৃক বিদ্রোহভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে মুখে বশ্যতা স্বীকার করিলেও মোগলদিগের বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কাহনের সঙ্গে যখন মোগলের যুদ্ধ বাধে তখন তিনি নিরস্ত্র ছিলেন, তখন ফৌজদার বলদেবের সঙ্গে একটা গুপ্তসন্ধি করিয়া ইনি মোগলদিগের গতিবিধির সমস্ত সংবাদ শত্রুপক্ষকে দিতেছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, 'Satraji gave Jahangir's governors of Bengal no end of trouble, refused to send in the customary peshkash or do homage at the court of Dacca' (Blochmann, p. 332)। সম্রাজ্ঞি জাহাঙ্গীরের বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তাদের সংপরোনাস্তি অপমানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে প্রাপ্তির পেশকাশ প্রদান কিংবা বঙ্গেশ্বরকে স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হন এবং তথায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

যাঁর ভুজবলে মুঘল সম্রাটগণ অতি প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব অনেকস্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র ইহার সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধব পাশাকে হত্যা করেন।

মুকুন্দের লক্ষ্মণ সিকা।

মোগলদিগের বিরুদ্ধে বঙ্গবাসীর যে অভ্যুত্থান ছিল তাহা যে শক্তি দ্বারা বঙ্গভূমে আনীত শত্রুরা তাহাদের অস্ত্র মুহূর্ত্ত বৃষ্টিতে পড়ে যাহারা কসাইয়ের কাছে বিক্রীত গাভী বা বৃষ তাহার অস্ত্র বিপক্ষ বুঝিয়া ছটফট করে— সেই শক্তি দ্বারা বঙ্গীয় বীরেরা বুঝিয়াছিলেন, মোগলের অধীনস্থ থাকার অর্থ চিরকালের জন্য দাসত্বের যূপকাষ্ঠে নিজেদের আবদ্ধ করা। শাসনেরা তাঁহাদের নিকট সাহায্য কিছু প্রত্যাশা পাইলেই পুরোহিতের মত যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতেন এবং শুধু যুদ্ধক্ষেত্রকালে তাঁহাদের সহায়তা চাহিতেন কিন্তু সাম্রাজ্যালোচনা বহুকার্য, উহাকাঙ্ক্ষী মোগলদের হস্তে না দিলে আর রক্ষা নাই।

বঙ্গদেশ মোগলের বিরুদ্ধে কেন উঠিল

চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি কাহার কতটুকু জমি তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল সেজন্য শাসনকর্ত্তারা মোগলমুলুকে যাইতে পারিতেন বটে কিন্তু তাঁহাদের চলাফেরা কার্য্যকলাপ সমস্তই মোগল বাদশাহের সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণাধীন হইত। মোগলবাদ্যের লম্বের দাগ, সাম্রাজ্য গঠনের কঠোর নিয়মাবলী ও তাঁবুরই রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে পড়িয়াছিল। দেশের লোকগণ

স্বাধীনভাবে কার্যনির্বাহ করিবার অবকাশ পাইত না, অকবরের পৌরবার ভোজরাজ ও মানসিংহ যে রাজতন্ত্রী প্রথা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে তন্ত্রে পরিচালে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না। রাজস্ব প্রবলঃ বর্দ্ধিত হইবে, কৃষক অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া ক্রীতদাসের মধ্যে পরিণত হইবে, রাজপুরুষেরা নানারূপ উপায়ে ধনসঞ্চয় করিবেন, রাজপ্রাসাদে নানারূপ উৎসব সম্পন্ন করিবেন, মধ্যে মধ্যে অযোধ্যার 'বেগম সমরুর' ন্যায় অনুগত ইংরাজদিগকে অলঙ্কার প্রস্তুত করিবেন—এই বিপুল ব্যয় সম্পন্ন হইলে পরে কার্যকর্তাদের রক্ষা নাই, সুতরাং কর্তারা কেহ কাশী চলিয়া যাইতে অধিকারে পরিণত হইলেন, সে অধিকারে যাইই কেন উঁহারা হউক না রাজস্বসম্বন্ধের অবশ্যই একটা ভাগ নিজস্বরূপে ভোগ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্য দুর্বলকালে শিবকৃষ্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, রায়রায়ানদিগের সুকুমার রাজপ্রাসাদের জন্য বরাসতে 'চুরুটির ছইয়া' রক্তপ্রাবিত হইয়াছিল, যাহার এই পরিণাম সেই সকল মহাত্মাকে অস্ত্রশস্ত্র হইয়া ও অলঙ্কারাদি চূড়ান্ত ত্যাগ করিতে হইবে তাহা সম্ভবপর, অন্যান্য রাজপুরুষদের নিকট রাজস্ব আদায়ে টেক পাইয়া মরিয়া হইয়া মানুষের বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জমিদারের 'হজুরের' উপর রাগ অত্যাচার করিয়াছিলেন কিন্তু অনেকস্থলে তাঁহারা সাধারণের সহিত মিলিত হইয়া যে সুদৃঢ় প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্বদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। পরে যখন কোম্পানির কর্তৃত্ব অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইল, তখন তাহাদের পরিচালিত সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থানেই এই প্রকারের বিপ্লব উপস্থিত হইল, পাঠক অযোধ্যার পর প্রথম মহা মাস্ত্রাজ্যের কথা ও একটা সুদীর্ঘ তালিকা পড়িয়া দেখিবেন। হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও কৃষিজীবের সঙ্গে এই একটা বিষয়ে তাহাদের সহানুভূতি দেখিতে পাই। দুর্ভাগ্যের সময়ে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অপর কোনও জমিদারের যুদ্ধবিগ্রহের কথা ঐতিহাসিকেরা কোথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এগুলি 'সর্বজনবিদিত' অনুল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোগল-রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের নবাব যে পক্ষকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই পক্ষের বিজয়লাভে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নাই। এই সকল আসন্ন দুঃখ বিপদ দেখিয়া সাধুপুরুষগণ আক্ষেপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহারা বংশধরগণকে সেই অন্ধকারময় সাম্রাজ্যের ভয় বদন হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া ক্রন্দনপর করিয়াছিলেন। এই 'কৃষ্ণ রাজাদের' পর একমাত্র সীতারাম রায় বাঙ্গালার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন— কিন্তু তিনি একক কি করিবেন? মোগলের সর্বগ্রাসী বিজয়শক্তির বিরুদ্ধে দুর্বলের সংগঠনের কয়েকজনেরই দুর্বল হস্ত ছড়াইয়া গেল।

চুক্তাদের যখন যে অবস্থা হউক, তাহা ইশা খাঁর সময়ে ছিল না। সম্ভবতঃ পরেও ছিল না। ইশা খাঁ ছিলেন রাজপুত কালিদাসের পুত্র। ক্ষত্রিয় রক্ত তাঁহার ধমনীতে বহিত। তিনি মানসিংহের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোগলের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন

তথাপি তাঁহার মৃত্যুসময়ে অনেক ভৃত্য পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বহুটা একবার দেখিতে চাহিয়া লইয়া যান করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে যাঁ কলিকাতার অনেক লোকের এই ভ্রম আছে।

ফকির মজনু শাহ্ বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাসিমের সহিত যোগ দিয়া ইংরাজদিগকে তাঁহাদের সুবৃহৎ সাম্রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি বিদ্রোহীর গতি। বিদ্রোহের পূর্ব্বে পুরুষদের কথা স্মরণ করিয়া দেখ—তাঁহারা কেহ ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন আমার পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রপিতামহ মহাশয় ইংরাজ রাজ্য এত বড় হইবে ভাবিতে পারিতেন না, স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে ভয় করিতেন। আমি তাঁহারই বংশধর একথা একমুহূর্ত্তও ভুলিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন আমার সম্বন্ধের কথা শুনুন—ঈশ্বর আমাকে দুই কারণে এই জঙ্গলবাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের অধিবাসী আমি যখন বালক আমার সমস্ত প্রজার মনের অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া এই অসন্তোষসূচক মেজাজটীর আর কখনও হইতে দিব না। এবং আমি ইহা স্থির করিয়াছি, যখন আমি বিদ্রোহের কারণ দূর করিতে পারিব তখন আমি আর তরবারি ব্যবহার করিব না। সমাটের সৈন্য আমাকে যতদিন ইচ্ছা ধরুক আমার যদি মৃত্যু হয়—ঈশ্বর যদি তাহাকে বিধান করেন, তবে সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। ইহাই আমার দিব সকল আমি মৃত্যুকে আমার দ্বারে ডাকিয়া আনিতেছি।"

যখন বিদ্রোহী এই কথাগুলি শেষ করিয়াছিল সেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপুর হইতে এক দাসী আসিয়া জানাইল যে তাঁহার বাকসর্ব্বস্ব কারাগার করিয়াছিল। ফকির মজনু সেদিনের জন্য দরবার শেষ করিয়া অন্তঃপুরে মাতার সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

"অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিলেন। দাসীরা তাঁহাকে সুখাদ্য সহযোগে আহার দিল। তিনি তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া তোষকের উপর অঙ্গশোভিত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেন। তাঁহার মাতা ধীরে ধীরে চক্রিকার ন্যায় চরণ কাঁপিয়া মস্তকের নিকটে বসিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি মাতাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম সকরুণ ভাবে বলিলেন - "প্রথম, আমার প্রতি বিমুখ হইও না। তোমার মুখখানি কখনি দেখি তখনই আমি মনে করি তোমার বিবাহ না হইলে তুমি কখনই সেবাদাসী পাইবে না। বিবাহ করিতে সম্মতি দাও, তোমার চরণ যৌবন, কেন বল যে 'বিবাহ করিব না' আমার বারংবারের অনুরোধ কি তুমি এইভাবে অগ্রাহ্য করিবে? আমার বয়স হইয়াছে আমার বড় ইচ্ছা যে কবরে যাওয়ার পূর্ব্বেই আমি একটী সুন্দরী বধূ দেখিয়া মরি।

"ফকির তাঁহার মাতার কথা শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন—"আমার মনের কষ্ট মা তুমি বুঝিতে পারিবে না, আমার পূর্ব্বপুরুষ যাঁহা থাকে নিরীশ্বর স্বয়ং ভয় করিতেন, তাঁহার সেবা করা ও অন্ত্রশস্ত্রের পরিচয় পাইয়া তিনি যাচিয়া

[illegible] [illegible] [illegible] [

করিয়া আর নৈরাশ্য প্রকাশ করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল "আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে রাজকুমার, সেনাপতি পতাকাসহ সেনাদলের ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে আপনার পালঙ্কে শয়ার দিন ফুরাইয়াছে—এখন দরবার গ্রহণ করিতে হইবে, এখন হইতে বিশ্বার মসনদ আজ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কঙ্কণ ও চুড়ী খুলিয়া ফেলুন—তাহার তার আর কণ্ঠে শোভা পায় না, এখন মুখের হাসি ফুরাইবে, রাজকুমারি। আপনার যৌবনের আশা এখন প্রাতে ফোটাফুল যেমন সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে তেমনই অল্প সময়ের মধ্যে ফুরাইল, সংবাদ আসিয়াছে, তরুণ সেনাপতি এখন কেল্লা তেজপুরের দুর্গে বন্দী।"

ক্ষণকাল সখিনার মুখে বেপথী মেঘের সমস্ত আঁধার কেহ ঢালিয়া দিল তখন রাজমাতা ফিরোজা বিবি এবং অন্তঃপুরের নারীগণ ক্রন্দনশব্দে অঙ্গলবাড়ীর রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিতেছিলেন কিন্তু সখিনা কাঁদিলেন না তিনি দরিয়াকে বলিলেন "যোদ্ধার সাজ লইয়া আইস। তাঁহার একটা ঘোড়া আমাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে যাইব আমার সৈন্যদলকে বলিও আমি সেনাপতি সাহেবের সন্ধানে যাই।"

এই তরুণ বীরবেশধারী সেনার পশ্চাৎ অঙ্গলবাড়ীর অবশিষ্ট সৈন্য চলিল সেনাপতির প্রিয় ঘোড়া তুলালের পিঠে চড়িয়া সখিনা সকলের অগ্রগামিনী হইলেন এক দিনের পথ আধ ঘণ্টায় গেলেন, কারণ তিনি সমস্ত মনের আবেগ সহ সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন কেল্লা তেজপুরের ঘাটে মোগল সৈন্যের সঙ্গে তিন দিন ধরিয়া তাঁহার যুদ্ধ চলিয়াছিল এই তিন দিন তিনি লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে, অশ্বারূঢ়, তিন দিন "তুলালে"র পিঠে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, "পিতাই আমার গুরু" ইহা বলিয়া তিনি তৃতীয় দিবসে কেল্লা তাজপুরের রাজপ্রাসাদে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন দূরে দূরে অট্টালিকা সকলে পুড়িয়া যাইতে লাগিল সেই অগ্নির নিকট তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল তখনও তিনি অশ্বা উৎসাহে ঘোড়ার পিঠ হইতে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, আমি এই স্থানে পুনরায় মূলের গদ্যানুবাদ দিতেছি—

"সেই মুহূর্তে তাজপুরের দুর্গ হইতে একটি সৈন্য উপস্থিত হইল, সে তরুণ বীরবেশী সখিনাকে অভিবাদন করিয়া বলিল "আপনি মহাবীর হাসিম হইতেও বড় যোদ্ধা। আমি অঙ্গলবাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিয়াছি মোগলেরা অঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, এই দুর্ভাগা রাজধানীর পক্ষে আপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। ফিরোজ খাঁ এই চিঠি দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি মোগলদের সঙ্গে যে সর্তে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা এই কাগজে আছে। তিনি আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন—তিনি সখিনাকে তালাক দিয়াছেন—তাঁহারই জন্য সোনার অঙ্গলবাড়ী আজ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সর্তে আরও আরও যে প্রস্তাব আছে, তাহাতেও তিনি এই পত্রাঘাতেই সম্মত হইলেন, সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইয়াছে" এই বলিয়া সে ফিরোজ সাহার স্বাক্ষর যুক্ত তালাকনামা সখিনার হাতে দিল।

এক মুহূর্ত দ্বিধা সেই দলিলটির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন তারপর সর্বশক্তি যাদুর যেরূপ চলিয়া পড়ে সেরূপই ভাবে ঘোড়ার পিঠ হইতে ঢলিয়া পড়িলেন তাঁহার মাথার সোনার মুকুট ছাড়িয়া গেল—তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া "ছলাল" ঘোড়াটা অশ্রুপাত করিতে লাগিল চারিদিক্ হইতে সৈন্যেরা আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একমুহূর্ত পূর্বে যিনি সদর্পে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, এখন তিনি ভূলুণ্ঠিতা কদলীবাড়ীর সহর আজ প্রকৃতই ছিন্নিভিন্ন হইল তাঁহার সুদীর্ঘ কুন্তলরাশি এলাইয়া পড়িল। তাঁহার দেহ হইতে পুরুষের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। ঢাকাপুর কেল্লায় এই সংবাদ দ্রুতবেগে বায়ু হইল, সেনাপতি ও সৈন্যেরা রাজ্ঞীকে চিনিতে পারিল। ওমর খাঁ কিরোজ খাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখাইলেন—পুষ্পচন্দ্র মাটিতে পড়িয়া মান হইয়া গিয়াছে

তারপর ওমর খাঁ ও ফিরোজ খাঁর অনুচরগণ ও অন্য লোকের দ্বারা যাহা সমাধিস্তে পরের শেষকার্য-সম্পাদনের বিবরণী আছে।

যে রমণী স্বামীর ভালবাসার জন্য মোগলের শত শত গুলি সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন যিনি সাক্ষাৎ আত্মবলিদানী হইলেন একটা সাম্রাজ্যের গুলি সহ্য করিতে পারেন নাই,—তাঁহার অবশ্যম্ভাবী নিশ্চয় পরীর স্বর্গে হইয়াছিল। আজও কেল্লা ঢাকাপুরের মাঠ পড়িয়া আছে, সেখানে সন্ধ্যার ধূসর নিস্তব্ধতা ও উষার শিশির ধূলি হইতে এখন সেই দেশের আকাশে বাতাসে মিলিয়া গিয়াছে এই কাহিনীর ভিত্তি যে ইতিহাসমূলক তাহা বিশ্বাস করার বাধা নাই।

সব দিক দিয়া দেখিলে এই সকল পল্লীগানের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা অবশ্য বলা যায় না তবে বহু বাঙালী নারী যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শন আছে "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতির ভিত্তি ঐতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটি মুসলমান রমণীর অসাধারণ বলবীর্যের কথা বর্ণিত আছে "মাণিকতারা"-নামক গীতিকাথেও সেইরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে পাঠান-রাজত্বকালে যে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই দেহে বল এবং হৃদয়ে সাহস ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সেই সাহস ও বল লুপ্ত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে মোগলশক্তি বঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ণ আভাস হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দেশের লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল। মোগল রাজনৈতিকগণ ক্রমাগত ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া শেষে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধা বারভূঁয়া যদি একত্র হইতে পারিতেন, তবে মানসিংহ কিম্বা ইসলাম খাঁ এদেশে কিছুই করিতে পারিতেন না। যে একটি জিনিসের অভাবে তাঁহাদের সেনাবাহিনী বিফল হইয়া গেল, তাহা ঐক্য

মোগলেরা এদেশে আসিয়া যে শুধু পাঠান ও বুদ্ধা রাজগণের প্রতিপক্ষতা নিবারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের বহুলোক যা পাঠান সুলতানের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া তাহা মোগলদিগকে প্রদান করিলেন পাঠানেরা তো অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হইলই, পরন্তু মোগল ওমরাগণও প্রীত হইলেন না, কারণ তাঁহারা যে জায়গীর পাইলেন, তার

নির্বিবাদে ভোগ করিবার সুবিধা পাইলেন না। মোগলসম্রাট কাহাকেও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। বড় বড় রাজা হইতে ছোট ছোট ভূস্বামী সকলকেরই টীকি তিনি এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে সকলেই এক মহাশক্তির অধীন এবং তাঁহাদের কর্তৃত্ব যে নামমাত্র, তাহা সর্ব্বক্ষণ তাঁহারা বুঝিতেন। আকবরগণ রাজকীয় সৈন্যরক্ষার জন্য যে রাজস্বের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্গেশ্বরের মারফৎ দিল্লীতে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। শুধু ইহাই নহে—পাছে কেহ দীর্ঘকাল জায়গীর ভোগ করিয়া কোন প্রদেশে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, সেই আশঙ্কায় মোগলদরবারে কোন জায়গীদার বেশী দিন তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পাইতেন না। প্রায়ই জায়গীরগুলি হস্তান্তরিত হইত। এই সকল কারণে মোগল ওমরাগণও পাঠানদের জায়গীর পাইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। শাসনকর্ত্তার উপর এ সকল বিষয়ে কড়া হুকুম ছিল ("He was strictly forbidden to encourage the Jagirdars to increase the troops established by them in any one place"—Stewart)। মোগল আমীরেরাও এই সকল কারণে একত্র হইয়া আকবরের বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহী মোগলদের নেতা ছিলেন—মজনুন খাঁ কলেশ্বরবাসী) এবং বাজ খাঁ ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা। ইহারা শীঘ্রই ঘোড়াঘাট দখল করিয়া লইলেন। আকবর এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গেশ্বর মনাএম খাঁকে মোগল আমীরদের সঙ্গে বড় ব্যবহারের ফলে কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদের সাহস লক্ষ্য করিতে আদেশ করেন। আমীরদের ঐ আদেশের কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন আগে রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা ফিরুজ খাঁ ও সেই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শুক্রদেব আসিয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগ ভাল করিয়া জানিয়া যাউন তৎপরে বিবেচনা হইবে। তদনুসারে উক্ত দুই প্রধান রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের শিবিরে আগমন করিলেন। আমীরেরা তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের আসবাব ও দাসী আদি কাড়িয়া লয়। অবশেষে বিদ্রোহীরা রাজধানী তাণ্ডা অবরোধ করিয়া মনাএম খাঁকে হত্যা করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিয়া ঘোষণা করেন।

বিদ্রোহীদের দলে ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং বঙ্গেশ্বর মনাএম খাঁর হত্যার পর এই দল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আকবর দেখিলেন—এত ষড়যন্ত্র, এত কূটসাধন এবং চেষ্টার পর বঙ্গদেশের অধিকার—তাঁহারই স্বদেশীয় লোক, তাঁহারই পুরাতন ওমরাহগণ তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছে।

এই সময়ে আকবর রাজা টোডরমল্লকে সসৈন্যে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়া মোগল-বিদ্রোহ-দমনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন, আকবর তাঁহাকে ৫০০০০০ টাকা ডাকযোগে প্রেরণ করেন। এই টাকার অধিকাংশই উৎকোচরূপে দিয়া প্রতিপক্ষকে বশীভূত করার জন্য তিনি ভাগলপুরে আসিয়া বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন। কয়েক মাস যাবৎ উভয় পক্ষ পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া শত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিলেও কোন বড় সংগ্রামে লিপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে রাজা টোডরমল্ল হিন্দু জমিদারদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং

কখনও কখনও উৎকোচে বশীভূত করিয়া এমন হুকুমও করেন যে, বিদ্রোহীরা রসদ সংগ্রহে অসমর্থ হইলেন। দুর্লক্ষ্মীদের নানারূপ বিপদে শত্রুশিবির বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে তকোশলাদের সেনা যারা খুব মৃদু হয়, বিদ্রোহীদের অধিকাংশ লোক কাবুলী বিহারের দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বশীভূত করিবার নানা উপায় জানিতেন। যে সকল ওমরা একদিন তাঁহার সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, এই বিপদ কালে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও ও নানারূপ ছলে করিয়া স্বয়ং বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে বড় বড় কাজে নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে আকবর খাঁ ও সেরিফ খাঁকে তিনি বশীভূত করিয়া সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে আকবর খাঁ মৃত্যুকে বরণেচ্ছাস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া উৎকোচের বলে তকোশলাদিগের নূতন নেতা অবতঙ্কিকে বশীভূত করেন, এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের মধ্যে গৃহবিবাদের সৃষ্টি করেন। এইভাবে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ না হইতে হইতে বহুদেশের রাজা রাজধানী পুনরায় দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা মোগলাধিকৃত অঞ্চলে লুণ্ঠন করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহার সঙ্গলে দুর্ভাগ্য ছিলেন। কিন্তু যতদিন জগৎসিংহ তাঁহাদিগকে সেখানেও নিযুক্ত রাখেন নাই। তিনি তাঁহাদের বড় বড় সেনানায়কদল দখল করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের অধিকৃত এলাকা ছোট ছোট জমিদারীতে বিভক্ত করিয়া সরকারে ফেরত দিলেন। মোগলদের প্রবল বিদ্রোহ এইভাবে নিষ্ফল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর্তুগিজ দস্যু, চট্টগ্রামে যুদ্ধ প্রভৃতি

উৎকোচে বশতা, বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করা শত্রুশিবিরে ভেদ সৃষ্টি করা মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ করা ইত্যাদি নানা বিদ্যা আকবরের করায়ত্ত ছিল। যেখানে এইসকল বিদ্যা কার্যকরী হয় নাই, সেখানে ইন্দ্রজিৎ মেঘের মত তিনি শত্রুকে আক্রমণ করিতেন। যে কোন প্রকারে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও শাসনের ত্রুটি দূর করিয়া সকল সাধারণ উপর স্বীয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করা, এই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশাল সাম্রাজ্যের আয় দিয়া তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করা অসম্ভব বলিয়া কাহাকেও একস্থানে স্থির থাকিতে না দেওয়া—পাছে তিনি বড় হইয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়া বিদ্রোহী হন, শাসনকর্তাদিগকে ঘন ঘন একস্থান হইতে অন্যস্থানে নিয়োগ বড় ছোট

সকলের ভাণ্ডারের দিকে খরদৃষ্টি এবং চিরস্থায়ী ভাবে সেই ভাণ্ডার হইতে গ্রাসাচ্ছাদনগ্রহণ—এই ছিল তাঁহার রাজনীতি। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোন দেশ শাসন করা, কিংবা বলপূর্বক কাহারও সম্পত্তি গ্রাস করা—এসকল তিনি করেন নাই। পাঠানেরা যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন লুঠতরাজ ছিল তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক রাজকার্যের অঙ্গীভূত, এসকল বিগর্হিত কাজ তিনি করেন নাই। তিনি লুটন করিতেন না শোষণ করিতেন। নিতান্ত অবাধ্য না হইলে তিনি কাহারও নিকট পরাক্রম দেখাইতেন না। কিন্তু প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া তিনি কোন কৃষ্ণ পত্রপুষ্পসমন্বিত লতার ন্যায় এই প্রবল ভারত বিটপীকে আলিঙ্গনপাশে জড়াইয়া ধরিয়া নির্ভীক ও অধ্যবসায়যুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যনীতির ফলে সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—লোকে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিয়াও মনুষ্যত্ব হারাইয়া একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। এই বিরাট রাজধানীমুখী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে মোগলদের সুই রাজধানী ইংরেজ অধিকারভুক্ত কিংবা নিতান্ত বৈকুণ্ঠ তুল্য হইয়াছিল, কিন্তু মোগল শাসনের সময়ে বৃন্দাবনের কয়েকটী মন্দির ব্যতীত সমস্ত দেশে হিন্দুদের বিশেষ কোন কীর্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সম্রাটের মহাশক্তির আওতায় হিন্দুস্থানের আত্মার শক্তির অনুভব হারা বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। বিদেশীর অধিকারে বঙ্গদেশের যাহা কিছু গৌরব তাহা পাঠান আমলের। পাঠানগণ বিদেশী কারিগর আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না—তাঁহাদের যাহা কিছু শিল্প তাহা খাস বাঙ্গালী শিল্পী ও গুণীজনের কারুকার্য নিদর্শন। আকবর এই সব জাতিকে হিন্দুদের সহযোগে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাদ দিয়া মুসলমান হইতে পারিত, কিন্তু এতদ বিশাল সাম্রাজ্য কেহ শাসন করিতে পারিতেন না। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্থক্যের মধ্যে কোন প্রভেদ করেন নাই। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ শুধু মুখের অনুরাগ ছিল না উহা আন্তরিক ও যথার্থ ছিল। রাজা বীরবল একজন সামান্য ভাট কবি ছিলেন, তাঁহাকে আকবর রাজপদে উন্নীত করিয়া অসুরক্ত বন্ধু করিয়াছিলেন। বীরবলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি তিন দিন কাহারও সহিত কথা কহেন নাই—এবং মানসিংহের ভগিনীকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া রাজাকে সাম্রাজ্যের প্রধান কাণ্ডারী স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মানসিংহ ৭,০০০ সৈন্যের মনসবদার হইয়াছিলেন, কোন মুসলমান আমীরও এত বড় পদ পান নাই। তিনি হিন্দুদের ধর্মের অনুরাগী হইয়া 'এলাহীধর্ম' নামক এক নব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি গঙ্গাজল পরিতেন এবং অনেক সময়ে আমিষ ভক্ষণ করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণদিগের হাতে রাখি বাঁধিতেন এবং তাঁহার রাজপুত স্ত্রীদিগের মঙ্গলের জন্য হোম করিতেন। তিনি খৃষ্টান

* [illegible] Hindus and were crowded round me to see what I [illegible] the daughter of Rajas and the wives of their chiefs. From early youth [illegible] and to strive to meet before the sun.
Nizamuddin Tabakat Akbari

পাঠানদের মনেও বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাদের ধর্মের অনুরাগী এই সকল বিবিধগুণসম্পন্ন তিনি হিন্দুস্থানের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজের মাথা আকাশে ঠেকাইয়া অন্য সকলের মাথা হেঁট করাইয়াছিলেন—রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় তিনি ক্ষুদ্র বিদ্রোহীকেও তুচ্ছ করেন নাই। রাজকোষ সমস্ত রৈক্ত লইয়া তিনি তৃণ-দূর্ব্বাকেও নিষ্পেষিত করিয়াছেন। অগ্নিকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বিদ্রোহকেও তিনি মারাত্মক মনে করিতেন, তাহার প্রতাপে দেশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক শক্তি সূর্য্যের প্রভাবে নক্ষত্রের ন্যায় ম্লানপ্রভ হইয়া গিয়াছিল আকবরের সময় হইতে হিন্দুস্থানের প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয়। এই দাসত্বের বেড়ী হাতে লইয়া মানসিংহ ও ভোজরাজ দেশে দেশে ঘুরিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রতাপ ঘুণাক্ষরে সেই বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া চুতকে বলিয়াছিলেন, "বেড়ী দিও আপনার মনিবের পায় " প্রতাপ শুধু দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন—ইহা সহ্য করেন নাই — দিল্লী পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করিবেন—ইহা আনাইয়া বলিয়াছেন (তরবারিখানি রাখিয়া) "যমুনার জলে ধোও এই তরবারি " যে ঔদ্ধত্যের বীজ বাঙ্গলার জাতীয় চরিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল সেই বীজ সম্রাটের কূটনীতিতে অঙ্কুরিত হইয়া প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। হিন্দু রাজাদের কেহ ছিলেন এই ব্যক্তিরূপ সম্রাটের নখ, কেহ ছিলেন দন্ত সাম্রাজ্যনীতির প্রবৃদ্ধির উপলক্ষ হইয়াছিলেন ইহারা,—কিন্তু ইহার উদ্ভাবনী শক্তি সমস্তই আকবরের। অশোকের সাম্রাজ্যের ধারণাটি আকবরেরই মত, কিন্তু দুইটী সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মৌর্য্য-রাজার অনুশাসনে স্পষ্ট করিয়া লিখিত ছিল—"আমার পুত্র ও পৌত্রগণ যেন কোন বিজয় বাঞ্ছনীয় মনে না করেন, তাঁহারা যেন ধর্ম্ম বিজয়কেই যথার্থ বিজয় মনে করেন।"

আকবর ও আশোক।

আমরা দেখাইয়াছি, আকবর কিরূপে পাঠানশক্তি নির্ম্মূল করিয়া ঘর মোগল ওমরাহদের প্রবল বিদ্রোহ দমন করিয়া—ক্ষত্রিয়রাজগণের দুর্দ্দমনীয় শক্তি নিরস্ত করিয়া বল, বিচার ও উদ্ভাবনার মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি ছেলনীতি ও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করার কৌশল যথেষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন যেখানে দরকার হইয়াছে, সেখানে বুদ্ধির ধারাতে বিদ্ধ হইয়াছেন, অস্ত্রের শেষ ও শস্ত্রের শেষ রাখিতে তিনি দেন নাই জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার পথেই চলিয়াছিলেন, তবে আকবর তাঁহার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য নিষ্ঠুরতা পরিহার করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বে সে দয়াটুকু ছিল না। পরাজিত শত্রুকে তিনি ক্ষমা করেন নাই। আকবর ইলা বীর সহিত সখ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্য, মৃকুন্দ হার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়কে অব্যাহতি দেন নাই এই সার্ব্বভৌমত্বের চেষ্টা সাজাহান পর্য্যন্ত চলিয়াছিল আকবরের পর হইতে এই সাম্রাজ্যনীতির রথ অতি দুর্দ্দমভাবে চলিয়াছিল, আগ্রার দেওয়ানি-খাসের দ্বারের উপরিভাগে লেখা আছে "স্বর্গ যদি থাকে, তাহা এইখানে—এইখানে।" দিল্লীশ্বর লোকমতে জগদীশ্বরের স্থান লইয়াছিলেন—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—এই মোগল বাদসাহদের হিন্দু মুসলমান প্রভেদ জানিতেন না। শেষোক্ত দুই জনের সময়ে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু আকবর

অযথা নির্দয়তা করিতেন না। বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজস্বের প্রেরভাগ মোগল দরবারে পাঠাইলে তিনি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতেন না, শত্রুপক্ষকে বশীভূত করিবার জন্য ডাকযোগে অর্থ পাঠাইতেন। আমরা দেখিয়াছি রাজা ভোগরায়কে তিনি পাঁচলক্ষ টাকা এই জন্য পাঠাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের ন্যায়-অন্যায়বোধ অনেক সময়ে লুপ্ত হইত। নৌরোজা উৎসবে আকবর মাতাল হইয়া নানারূপ দুষ্কার্য করিতেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর যে ভাবে সের আফগানকে হত্যা করিয়াছিলেন এমন অন্যায় আকবর স্বপ্নেও প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না।

পাঠান শত্রুদলন, ভূঁইয়া রাজগণের শক্তিখর্ব এবং মোগল শিবিরের পরাক্রান্ত ওমরাদের বিদ্রোহদমনের কথা আমরা লিখিয়াছি, কিন্তু ইহা ছাড়া এক প্রবল শত্রু বঙ্গের পূর্বদক্ষিণ সীমান্তে মোগল সম্রাটের শত্রু হইয়া অত্যাচার করিয়া কেন ছারখার করিতেছিল। ইহারা পর্তুগীজ দস্যু, লৌকিক ভাষায় হার্মাদ। "আরমাডা" হইতে উদ্ভূত মগেরা শেষ সময়ে এই জল-দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়া পূর্ববঙ্গে লুণ্ঠন, অগহরণ, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অবাধে চালাইতেছিল—এই জন্য হার্মাদ শব্দ প্রথমতঃ পর্তুগীজ দস্যুদিগকে বুঝাইলেও শেষে মগদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। পল্লীগীতিকাসমূহে এই হার্মাদদিগের সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড, 'নসির মামুদ' দ্রষ্টব্য)। ইহাদের গায়ে লাল কুর্তা এবং মাথায় নানা রঙের পাগড়ী থাকিত, এই পাগড়ী সম্ভবতঃ মগদস্যুরা ব্যবহার করিত)। ইহাদের কাছে দূরবীণ থাকিত। জেলেদের ন্যায় ইহারা সেই দূরবীণযোগে বহুদূর হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ লক্ষ্য করিত, এবং অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে বাণিজ্যদ্রব্য-বোঝাই জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত। কবিকঙ্কণ ষোড়শ শতাব্দীতে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীমন্ত সদাগরের নাবিকেরা "রাত্রিদিন বাহি যায় হার্মাদের ডরে।" ইহারা সময়ে সময়ে সমুদ্রতীরবর্তী স্থান-সমূহে অবতরণ করিয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের উপকূলের বাণিজ্য-তরীগুলি ইহাদের উৎপাতে সমুদ্রে এক যাইতে সাহস করিত না। উক্তরূপ বহুসংখ্যক জাহাজ একত্র হইয়া মিছিল বাঁধিয়া যাইত। এই তরণীর মিছিলকে "বহর" বলিত, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নানা বিরাট অস্ত্রশস্ত্র থাকিত, এবং বহরের মধ্যে যিনি রণপণ্ডিত থাকিতেন তাঁহারই নির্দেশে জাহাজের গতি-বিধি এবং নঙ্গর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রধান ব্যক্তির উপাধি ছিল "বহরদার"। তৎকালে সমুদ্রতীরবর্তী লোকদের সাহস ও বীর্যবত্তা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। হার্মাদদের সঙ্গে মাঝে মাঝে অধিবাসীদের লড়াই চলিত। একটি পল্লীগীতিতে দেখিতে পাই—জেলেরা একত্র হইয়া তাহাদের বৃদ্ধ দলপতির পরামর্শ অনুসারে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া হার্মাদদের প্রত্যেকের চক্ষে মুঠি মুঠি লঙ্কার গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে। হার্মাদেরা ছোট ছোট ডিঙ্গিতে আসিয়া মধুর মাছি বা পঙ্গপালের ন্যায় বণিকদের জাহাজ ঘিরিয়া ধরিত। পল্লীগ্রামে ইহারা যে লুণ্ঠনকার্য্য চালাইত, তাহা দেশবাসীদের অসহ্য হইয়াছিল। সুন্দরী গৃহস্থ-বধূদের দুঃশাসনসম্বন্ধে আমরা অনেক পল্লীগাথা পাইয়াছি। কোন কোনটিতে বর্ণিত আছে—সতী রমণী তাঁহার স্বামীকে

পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদ।

স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন, "অভাগিনীকে মনে রাখিও ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া রহিল, আমার হাতের কঙ্কণ ফেলিয়া আসিয়াছি, আমাকে মনে করিয়া দুঃখ হইলে কঙ্কণ ও কলসী তোমার হাত দুখানি দিয়া ছুইও—তাহাতে আমি জুড়াইব। আর সুন্দরী দেখিয়া একটি মেয়ে বিবাহ করিও আমি যে আদর ও স্নেহের জন্য পাগল ছিলাম, তাহা তাহাকে দিও, হতভাগিনীর অদৃষ্টে তাহা নাই।" বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়—পর্তুগীজ দস্যুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজে শুধু সমুদ্রে বা উপকূলে নহে, কখনও পঞ্চাধিক মাইল দূর পর্য্যন্ত স্থলপথে যাইয়া লুটন করিত বিবাহ বাসরে এবং অন্যান্য উৎসবে ইহারা হঠাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া অকথ্য অত্যাচার করিত ইহাদের ভয়ে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অনেক দ্বীপ ও নগরী জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশ সরকার মহাশয় অক্সফোর্ড লাইব্রেরীর তালপত্রের গ্রন্থের পরিশিষ্টে (Bengal MSS., Indian Office, Private No. 211) হইতে এই দস্যুদের একটি বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—ইহারা বন্দীদিগের হাতের তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে বেত চালাইয়া দিয়া বহু বহু স্ত্রীপুরুষকে পশুর মত টানিয়া আনিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিত এবং লোকে যেরূপ পাখীদের জন্য পশু ছড়াইয়া দেয়—সেইরূপে তণ্ডুলসহ হতভাগাদের সম্মুখে ছড়াইয়া দিত অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত যাহারা বাঁচিত, তাহাদিগকে লাকিপাতের ওলন্দাজ ইংরেজ ও ফরাসী বণিকের নিকট বিক্রয় করিত। কোন কোন সময়ে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরেও তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইত পাদ্রী বার্নিয়ারের বর্ণনায় পাওয়া যায়, "প্রত্যেকেই জানেন এই পর্তুগীজ দস্যুরা কিরূপ প্রতিবৎসর বাকলা, নোয়াখালি, যশোর, হুগলী, জিজলী, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিয়া (মোগল) প্রজার শক্তি নাশ করিয়াছে। এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহারা এই রাজ্যের এগার হাজার পরিবারকে আনিয়া বিক্রয় করাইয়াছে" (Bernier, Travels in the Mogul Empire, 1656-1668, p. 438)। এই দস্যুরা এক সময়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৮,০০০ লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মগদস্যুরা এই পর্তুগীজদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অতি ভয়াবহ। তাহাদের অত্যাচারে অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও পতিত হইয়া আছেন। বিক্রমপুরে 'মগব্রাহ্মণ'দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মগ ও পর্তুগীজদের ঔরসজাত অনেক সন্তানে এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ খিরিস্তীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪ পরগনার উপকূলে, নোয়াখালীতে, হাতিয়া ও সন্দ্বীপে বরিশালে, ফরিদপুরে, চাঁদলি, নিশানবাড়ী মউদোষি, খাপড়াভাঙ্গা, মঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে অগণিত ঢাকার ফিরিঙ্গিবাজারে, তাহা ছাড়া কলিকাতার ও সুন্দরবনে চবিশপরগণার মোকামায় অনেক দুঃস্থ ফিরিঙ্গী বাস করিতেছে। বাঙ্গলাদেশে পর্তুগীজদের কীর্ত্তি এখানেই শেষ হয় নাই। অনেক পর্তুগীজ শব্দ বাঙ্গলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তদ্ভারা এই জাতির বাঙ্গলাদেশে ব্যাপক প্রভাব প্রতীয়মান হয় আনারস, পেঁপে, পেয়ারা জামরুল, কামরাঙ্গা, নোনা, আতা, বাঙ্গালু প্রভৃতি আমরা পর্তুগীজদের নিকট হইতে পাইয়াছি। এখনও এদেশে 'ফিরিঙ্গী খোলা' প্রচলিত,

পাউরুটির পূর্ব্ব নাম ছিল "ফিতিগ্রী রুটী"। কড়ি বরগা, চানেলা, পরাণিয়া, কামরা, বারেন্দা, আলমারি, কেরারা (Chair), মেজ, আলপিন্ ফিতা, চাবি, বোতাম, বন্দুক, বোতল, বালতি, বাসন, কারান পিস্তল, বন্দুক, বন্দুক, বরা মাতুল কুফান মিস্ত্রী, কামিজ, টেবিল, কাপড়, কুঠি, আয়া, চাবি, বোতাম, নীলাম প্রভৃতি শব্দের অনেকগুলিই বোধ হয় পর্তুগীজ ভাষা হইতে আমদানী। টাকেরেট সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময়ে ভদ্রলোকেরা এই সকল বিদেশী শব্দের বড় বেশী বিশুদ্ধতার বাঙ্গলাভাষার কথা কহিতেন তত্রই তাঁহাদের বাহাদুরী ছিল (Bengali Literature in Nineteenth Century, p. 2)। এবং সতীশ মিত্র মহাশয়ের যশোর ও খুলনার ইতিহাস হইতে এই শেষোক্ত পুস্তক হইতে আমি অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।) পর্তুগীজগণ তাহাদের নিষ্ঠুরতার ও অত্যাচারদ্বারা বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভাবপ্রকাশে "ফিরঙ্গী ব্যাধি" নামক রোগের উল্লেখ আছে এই ছাসাধ্য পীড়ার ফলে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে "ফিরঙ্গোগঃ ফিরঙ্গোদ্ভব আয়তে দেহিনাং সদম্" (শব্দকল্পদ্রুম -ফিরঙ্গ শব্দ, ২৮৮ পৃঃ)।

ষোড়শশতাব্দীর সময় হইতে পর্তুগীজগণ এদেশে আসিতে থাকে কালিকটের এক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাস্কো ডগামা এক ভদ্রকালী মন্দিরকে মেরীর মন্দির মনে করিয়া পাণ্ডাদের গঙ্গাজলকে অমৃতের জল ভাবিয়া পরম সন্তোষসহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুসেন সাহের সময়ে বাঙ্গলায় ইহাদের প্রথম আবির্ভাব। কোচবেহার, সিলহিটা প্রভৃতি পর্তুগীজ নেতৃগণ আসিয়া এদেশে বস্তুতন্ত্র আড্ডা স্থাপন করেন। ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে ইহাদের অধিনায়ক মেলো বাণিজ্যের ছলে অত্যাচার করায় অপরাধে অনেকদিন খোড়ে বন্দী হইয়া থাকেন। ক্রমে চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইহাদের বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায় শেষ খাঁর সময়ে ইহারা মামুদ সাহের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম ইহাদের সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়। ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গের নানা স্থানে আড্ডা স্থাপন করিয়া দেশবাসীদের উপর অত্যাচার চালাইত। কোন স্থায়ী অধিকার বা সঙ্ঘবদ্ধসমাজ নেতা বা শাসনপদ্ধতি ইহাদের ছিল না একসময়ে ইহারা আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল— ইহাদের নৌবল যথেষ্ট ছিল। মগদিগের সঙ্গে পেরে ইহাদের বেশ ভাব হইয়া যায় তখন মগ ও পর্তুগীজে একত্র হইয়া বঙ্গদেশ লুটপাট করিয়া খাইত ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ তাঁহার রাজ্যের সমস্ত পর্তুগীজকে নিহত করিতে আদেশ দেন তখন ইহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল ইহারা সন্দ্বীপের যোগল শাসনকর্ত্তা ও সেই স্থানবাসী পর্তুগীজদিগকে নিহত করে। তাহাদের অত্যাচারে ফতে খাঁ সন্দ্বীপের শাসনকর্ত্তা ইহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা মনে করিয়া পর্তুগীজ জলদস্যুদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধজাহাজ লইয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরে উপস্থিত হন। কিন্তু পর্তুগীজগণ জলযুদ্ধে বিশেষ ওস্তাদ ছিল। সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস নামক এক নেতার অধীনে জলদস্যুগণ ফতে খাঁর সহিত অতি বিক্রমসহ যুদ্ধ করিয়া যোগল সেনাপতি ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করে। গঞ্জালেসের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়, এবং তিনি সন্দ্বীপ দখল করিয়া তথাকার রাজা হন। সেখানকার মুসলমানদিগকে

তিনি একেবারে নির্মূল করেন। পার্শ্ববর্তী রাজারা তাঁহার আকস্মিক সফলতায় আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু গজালেস অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সেই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে আরাকান রাজের ভ্রাতা অনাপরম তাঁহার রাজভক্তির দ্বারা কোন অপরাধের জন্য লজ্জিত হন। তিনি গজালেসকে বহু অর্থ ও তাঁহার ভগিনীকে পত্নীস্বরূপ দিয়া আরাকান রাজ্য জয় করিতে বদ্ধপরিকর হন, কিন্তু গজালেস ও অনাপরমের অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়—আরাকান রাজের সঙ্গে ইহারা পারিয়া উঠেন না। তথাপি অনাপরমের নিকট বহু অর্থ পাইয়া পর্তুগিজ বন্দুক প্রীত হন এবং উক্ত যুবরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা আত্মসাৎ করেন। ১৬১০ খৃঃ অব্দে আরাকানের রাজা গজালেসের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে আসিয়া লক্ষীপুর পরগণা দখল করিয়া লন। মোগলেরা এক প্রকাণ্ড বাহিনী সঙ্গে আনিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, আরাকানরাজ ও গজালেস উভয়েই বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়া পলায়ন করেন। গজালেস অতি বড় দুর্বৃত্ত ছিলেন, ইনি এই সময়ে মগরাজের কয়েকজন অমাত্যকে লক্ষ টাকা একটা প্রস্তাব করিবার ছলে নিজ জাহাজে আনিয়া নিহত করেন এবং পরে সোরার শাসনকর্তার অধীনত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আরাকানরাজ অধিকারের লোভ দেখাইয়া তথা হইতে ডন ফ্রান্সিস নামক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য আনয়ন করেন। ইহারা আরাকানরাজ্যের প্রান্তভাগ লুণ্ঠন করিতে থাকেন। আরাকানের রাজা ওলন্দাজদের সহায়তায় পর্তুগিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ডন ফ্রান্সিস নিহত হন এবং গজালেস পালাইয়া যান। আরাকানরাজ অনায়াসে সন্দীপ দখল করিয়া লন ১৬১৮ খৃঃ অব্দে। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ আরাকানরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হুসেনবেগ সেনাপতির দ্বারা মোগলের নষ্ট ক্ষমতা উদ্ধার করেন। প্রায় ৭০ বৎসর কাল এই মগেরা এবং পর্তুগিজ দুর্বৃত্তেরা মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে তাহার কতক কতক বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে আরও অনেক ভয়াবহ কথা জানিতে পারা যায়। এই পর্তুগিজ দস্যুরা গর্ব্ব করিয়া বলিত, "পাদ্রীরা ৫০ বৎসরের চেষ্টায় যত লোককে খৃষ্টান করিয়াছে আমরা এক বৎসরে তদপেক্ষা বেশী করিয়াছি।" ১৬২৬ খৃঃ অব্দে সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি ওমেদ খাঁ ও হুসেনবেগ চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দখল করেন। মগেরা ১,২২৩টি কামান ফেলিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ ধনরত্ন ভূমিসাৎ করিয়া যাওয়াতে মোগলেরা আশানুরূপ অর্থ পাইতে পারেন নাই। আরাকানরাজের সঙ্গে একত্র হইয়া ইহারা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত। আরাকানরাজের সৈন্যগণের মধ্যে অনেক পর্তুগিজ সৈন্য ছিল, কিন্তু ইহারা কোন বেতন পাইত না। বাঙ্গলা দেশটা আরাকান-রাজের অনুমতিক্রমে ইহারা জায়গীর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সেখানে বারমাস ইহারা লুণ্ঠন, হরণ এবং অত্যাচার চালাইত (J. A. S. B., 1917, No. 6, p. 425)।

ইসলাম খাঁ তাঁহার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করিলেন। এই মগ ও পর্তুগিজদিগকে দমন করাই তাঁহার এই রাজধানী-পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ ছিল। তৎপূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য

মগ ও পর্তুগীজদের দৌরাত্ম্য অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছিলেন। এমন কি ছলনাপূর্বক সন্দ্বীপের শাসনকর্তা কানালোকে মৃত্যুঘাটে আনিয়া অবিচারে নিহত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় পর্তুগীজদের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেক পর্তুগীজ পাদ্রী এদেশ হইতে পালাইয়া যান। ইসলাম খাঁ পর্তুগীজদিগের অত্যাচার অনেকটা নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সায়েস্তা খাঁ ইহাদিগকে একেবারে সায়েস্তা করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ ও মগেরা সায়েস্তা খাঁর অধিকারে চট্টগ্রাম হইতে যেরূপে পালাইয়া যায়, তাহাতে পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গীগণ একেবারে শক্তিহীন হয়, এবং "মগের মুলুকের" বঙ্গবিখ্যাত অত্যাচার একেবারে গল্পের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। মগেরা যে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে পালাইয়া গিয়াছিল তাহার স্মৃতি এখনও উহাদের লোকের স্মৃতিতে জাগরূক আছে। মগদিগের পলায়ন জেনোফোনের "Retreat of the Ten Thousand" এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লৌকিক ভাষায় এই পলায়নের নাম "মগ-ধাওনি"। মগেরা পালাইবার সময়ে তাহাদের দেববিগ্রহ ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আরাকানে যাইয়া সেই লুক্কায়িত ধন ও দেবমূর্ত্তি প্রোথিত করিবার স্থানের একটা সাঙ্কেতিক মানচিত্র তাহারা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। বহুকাল পরে যখন দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন মগ পুরোহিতেরা সেই মানচিত্রহস্তে মৃতকের মত চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া সেই গুপ্ত দেববিগ্রহ ও মণিরত্নখচিতপূর্ণ কুম্ভ উঠাইয়া লইয়া যাইতেন। এখন শুনা যায় নাকি মগপুরোহিতেরা সে সকল স্থান আবিষ্কার করেন নাই তাঁহারা মানচিত্র লইয়া মাঝে মাঝে দেখা দেন সম্প্রতি চট্টগ্রামের কোন পাহাড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও অন্যান্য বিগ্রহ খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি অদ্ভুত ও উৎকৃষ্ট অবয়ব আছে—ইহারা যে সেই মগ-ধাওনির সময়কার পরিত্যক্ত বিগ্রহ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বহুকাল পূর্ব্বে আমি মগ-ধাওনির সময়কার কয়েকখানি বুদ্ধ ও পদচিহ্নমূর্ত্তি পাইয়াছিলাম তাহার একখানি আদি জয়নগর-মজিলপুর-বাসী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানী কালিদাস দত্ত মহাশয়কে দিয়াছি। 'নছর মালুম' নামক পল্লীগাথায় (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড) মগ পুরোহিতগণ কিরূপে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গুপ্তধন পুনরুদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌতুকাবহ কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ এই ভাবে মগদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে 'ইসলামাবাদ' নামে পরিচিত করেন। মগ ও পর্তুগীজ দস্যুর অত্যাচার বিশেষভাবে সেই সময় হইতে নিবারিত হইলেও, পর্তুগীজদের সাময়িকভাবে এখানে-সেখানে প্রাদুর্ভাবের কথা ইংরেজ আমলেও শুনা যাইত। লঙ্গ সাহেব লিখিয়াছেন ১৮২৬ খৃঃ অব্দেও মগ দস্যুকলিকাতাবাসীরা ভয় করিত। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট গঙ্গার একটা বাঁধ তৈরী দিগকে করিয়া মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন। বর্ত্তমান "উলুবেড়িয়ার" (Botar cul Garson) কাছে এই বাঁধ ছিল।

পাঠান ও মুঘলরাজগণের প্রতিপক্ষতা ও খাস মোগল শিবিরের বিদ্রোহদমন এবং পরিশেষে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার-নিবারণের পর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে

মোগল-সাম্রাজ্যের অধিকার মেঘনিমুক্ত আকাশের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গেল, তখন দিল্লীশ্বরের একাধিপত্য যে সকল বীর আগ্রা পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া যমুনার জল যোগলরক্তে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাদের জয়ী খড়্গ সেই জলে ধৌত করিবার এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল উচ্চাভিলাষী বীরের বংশধরেরা সম্রাটের প্রতিনিধির দরবারে কুর্নিশ করিতে করিতে যাঁহার রাজস্বলাভপূর্ব্বক কুর্নিশ করিতে করিতে দরবার ত্যাগ করিতেন। প্রবল দস্যু, প্রবল রাজা, প্রবল পাঠান, প্রবল মোগল—ইহারা সকলেই কেহ বা শির দিয়া, কেহ বা শির হেঁট করিয়া স্বীয় অধিকার-ই হইলেন আকবরের চার বাজিতে মোগল শক্তির এইরূপে জয় হইল ইহার পরে রাজ্যবৃদ্ধির কথা তাহাও আমরা সংক্ষেপে বলিয়া যাইব।

কুচবিহার রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে তিস্তা এবং উত্তরে আসাম ও ভিব্বতের পর্ব্বতমালা এই সীমারেখা প্রায় বরাবর হইতে স্বাধীন ছিল।

কুচবিহার রাজ্য।

১৪৮২ শকে (১৫৬০ খৃঃ) বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ বিশ্ব সিংহ বা বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন প্রবাদ ইনি শিবপুত্র। ইনি আহোম মোগলদিগের সঙ্গে ঘোড়াঘাটের যে সংঘর্ষের বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে কুচবিহারের রাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিত যেরূপ করিয়া মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন এই রাজার একলক্ষ পদাতিক সৈন্য, ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৭০০ হস্তী এবং ১০০০ রণতরী ছিল মোগলদিগের সঙ্গে এই অযাচিতকী প্রেম ও সাদরের নাগপাশ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়াতে তাঁহার আত্মীয়, স্বজন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা অত্যন্ত বিরক্ত হন, তাঁহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা স্বীয় দুর্গে আশ্রয় লইয়া বঙ্গাধিপের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখেন মোগলেরা এই সুবর্ণ সুযোগ কেনই বা ছাড়িবেন? জেহাঙ্গীর যার অধীন একদল মোগল সৈন্য পাইয়া রাজলক্ষ্মীনারায়ণকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করে—এই ভাবে কুচবিহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গে পরিণত হয়

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা দৈবোকীনারায়ণের মৃত্যু হয়, তৎকালে তাঁহার পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ শিশু ছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ইঁহার রাজত্ব প্রায় অন্তর্দ্বিপ্লবাবসানক ছিল ইঁহার প্রধান মুন্সী জয়নাথ ঘোষ (মুন্সী) রাজার রাজ্যভার গ্রহণের সময়ে কুচবিহারের একখানি ইতিহাস লিখিতে আদিষ্ট হন মোক্ষিনীমন্ত্র প্রভৃতি পুস্তকে উক্ত রাজার পূর্ব্বতন ইতিহাস লিখিত ছিল, একপ জানা যায়। জয়নাথ মুন্সীর চরিত সন ১১৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ ১৪২৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন এই ছয়শত পুস্তকখানির একখানি পাণ্ডুলিপি আমি পাইয়াছি, ইহা এপর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অনুমান ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই ইতিহাসের লেখা শুরু হইয়াছিল প্রাচীন কালের ধরনে ইহাতে আজগুবি গল্পের অভাব নাই, কিন্তু রাজবংশের রাজনৈতিক জীবন এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান

ঘটনা এই পুস্তকে যথাযথরূপে বিবৃত হইয়াছে। জয়নাথ মুন্সী রাজবাড়ীর সমস্ত কাগজপত্র, প্রাচীন দলিল দেখিয়া এবং বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির কাছারিত বিবরণগুলি শুনিয়া ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ দর্শী অথবা ঘটনাস্থলের ও ঘটনাকর্তা রাজার ইতিহাস তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চোখে দেখা। তাহাতে কোন ভুল আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

মোগলদিগের সঙ্গে কুচবিহারের যে সংঘর্ষের বিবরণ তুর্কী দিয়াছেন, তাহার অনেকটাই সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিকগণকর্তৃক প্রদত্ত কাহিনী হইতে সংগৃহীত। এই বিবরণের সঙ্গে জয়নাথ মুন্সীর কথিত বৃত্তান্তের অনেকাংশে মিল নাই। সম্ভবতঃ তাহার নাম লক্ষ্মণনারায়ণ নহে, লক্ষ্মীনারায়ণ। মোগল রাজবাড়ীর সুবাদারদের কর্মচারী প্রত্যক্ষদর্শী লেখক রাজাদেশে লিখিত পুস্তকে রাজার কালাকালসম্বন্ধে ভুল করিবেন এত কিছুতেই সম্ভবপর নহে। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৫৫ খৃঃ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ১৬১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অথচ মুসলমান "তারিখনবীসে" দুই বার মোগল সেনারা কুচবিহারে আসিয়া উৎপাত করে। তাহা যদি রাজার অধিকাংশ অর্দ্ধশতাব্দীই হেলা আরামপ্রদ মনে করিতেন এবং যদি যুদ্ধ না বাধিয়া সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিলেন,—তাঁহারা মোগল সৈন্যদের দ্বারা পরাস্ত হইলেন। মোগলেরা রাজ্যের অনেক ক্ষতি ও দুর্নাম করিয়াছিল। তাহার দুই পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভবনারায়ণ অসীম সৈনিক শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহারা বিজয়ী ও অপরাজিত ছিলেন। একবার মুকুন্দ সাঙ্কৃত্যায়ন নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে রাজা অপমানিত করেন। এই ব্যক্তি মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া আশ্রয় লয়েন। জাহাঙ্গীর বিদ্বান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আদর করিলেন। মুকুন্দ পণ্ডিত তাহার নিকটে রাজা উদয়নারায়ণের প্রবলতায় কুচবিহার জয় করিবার জন্য তিনি বার এক লক্ষ সৈন্যসহ কুচবিহার আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যহ যুদ্ধ হইতে থাকে। কোন কোন যুদ্ধে মোগলেরা পরাস্ত হইলেও মোটের মাথায় তাহারাই জয়ী হইয়া রাজ্য লুণ্ঠন করিতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখিয়া মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। দিল্লী থাকা কালীন জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয় বলনারায়ণ ও ভীমনারায়ণ-কর্তৃক কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়—তাহাতে দরবারে তাঁহাদের বীরত্বের কথা প্রচারিত হয়। এই সকল ঘটনা নিছক গল্প বলিয়া মনে হয়। একটা কুদ্র দলি দিয়া রাজা যাইতেছিলেন একটা হাতী বিদ্রোহী দিল হইতে আসিতেছিল। রাজাকে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই সুতরাং রাজা অগ্রসর হইতে থাকেন। পথ ছাড়াইয়া ফিরাইবার মোটা প্রশস্ত ছিল না, মাহুত কি করিবে? এমন সময়ে কুমার বলনারায়ণ "হস্তীর দুই দন্ত ধারণ করিয়া কিছু পাশে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিলেন যে হস্তী চীৎকার করিয়া পলায়নপরী হইল" আর একদিন রাজা যমুনাতে স্নান করিয়া তর্পণ ও বাচিক করিতেছেন এমন সময়ে একটি ১৪ দাঁড়ী নৌকা সেই ঘাটে বেগসহকারে উপস্থিত হইল, রাজা হস্তে পলাইবের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত

হইতেন কিন্তু ভীমনারায়ণ তাঁহার কবচটিকুলা বিলাস বক্ষ দ্বারা মোকাটা অতিবেগে ফিরাইয়া দিলেন। তৃতীয় পত্নী এই যে রাজা মহাশয়কে মাথা হেঁট করেন এমন্ত তাঁহার পথে আহারের একটা কুদ্র ভোজন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন শিবরাত্রির দিন তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিবেন না এই তাঁহাদের পণ। রত্নারায়ণ ঐ ধার মস্তকে ধারণ করিয়া আরো উচ্চ করিলেন। রাজা ও ভীমনারায়ণ মাথা নত না করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রবিষ্ট হইলেন।

জয়নাথ মুন্সী লক্ষ্মীনারায়ণের এই সকল কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার সময় হইতে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ভীমনারায়ণ ও রত্নারায়ণ অবশ্যই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু এই সকল গল্পগুলি এই দুই শত বৎসরের মধ্যে সৃষ্টি হইয়া কুচবিহারবাসীর প্রচলিত হইয়াছিল। রাজপুরুষের দেহে শত্রুর প্রহারের উপর খুব মোটা তুলিতে বা কলাম হইয়াছিল। আহারাদের সঙ্গে রাজার দেখা-শুনার কথাটা বোধ হয় সত্য। জয়নাথ মুন্সী-কল্পিত রাজা ও সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত ঠিক বলিয়াই মনে হয়। প্রবাদ সম্ভবতঃ উহা রাজকীয় দলিল-পত্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন। সেই অনুসারে মোগলেরা কুচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু তদবধি "রাজার নারায়ণী মুদ্রা পূর্ব্ব থাকিবে না, অনুসারে মোগল সম্রাটের নাম অঙ্কিত থাকিবে"। এইরূপে মহারাজ লক্ষ্মী নারায়ণ সিংহাসনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের এই বশ্যতা চিরস্থায়ী হয় নাই। মধ্যে মধ্যে মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সাময়িকভাবে পরাজিত হইলেও কুচবিহার ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। তাঁহাদের নারায়ণী মুদ্রা একই ভাবে সগৌরবে প্রচলিত হইত। কুচবিহারের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি ভীষণ আক্রমণ, দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম প্রভৃতির বিবরণে পূর্ণ।

মুক্তমালা ও কুরুকাটা।

পঞ্চবিংশবর্ষ মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের সময়ে অমাত্যগণ স্বপ্ন প্রমাণ হইল। তাকার এব্রাহিম খাঁ এবং কতিপয় অবলম্বন খাঁর সঙ্গে তাঁহারা মিলিত হইয়া কিছিৎ কর দিতে স্বীকৃত হইয়া তখন ঘোড়াঘাটে যে ফৌজদার থাকিত তাহারই অনুগত হইতে লাগিল। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে মহীন্দ্রনারায়ণের সেনাপতি মুসলমানদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। "মোগল-সৈন্য এক যুদ্ধ জয় করিয়া রাজসৈন্যের মস্তক কাটিয়া মালা গাঁথিয়া বাঁশের উপর লটকাইয়া রাখিয়াছিল, ইহাতেই সেই স্থানের নাম হইল 'মুক্তমালা'। রাজসৈন্য প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই তাহারাও একস্থানে অনেক যবনের শিরশ্ছেদ করিয়াছিল, সে স্থলের নাম হইল 'কুরুকাটা'। জয়নাথ মুন্সীর বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে হুইট সাহেবের উক্তির অনেক স্থলেই মিল নাই। কিন্তু এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস মুন্সী মহাশয় এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহার কথা আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা দেখিয়াছি যে হুইট সাহেব পুনঃ পুনঃ কুচবিহার-যুদ্ধের কথা লিখিয়াছেন (১৯১, ২১৪, ২৭৪, ৩২৪, ৩৫৫, ৩৬৯ ও ৪০৫ পৃঃ, বঙ্গবাসীর সংস্করণ) কিন্তু একবার জয় হইলে তাহার পরে যে রাজারা পুনরায় স্বাধীন কি ভাবে হইয়াছিলেন—সেই অবকাশ

পূরণ করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাঁহাদের পরাজয়ের কথা সাধ্যমত গোপন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে ঢাকার ফৌজদার মজলিস আলি মহারাজ রূপনারায়ণের (১৬৮৪-১৭০১ খৃ) সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রংপুরে পালাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা মুসলমানেরা কোন ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। ১৬৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গলার নবাব শায়েস্তা খাঁর সহিত মহারাজ রূপনারায়ণের এক সন্ধি হইয়াছিল। মহারাজ হারিয়া গিয়া এই সন্ধিতে দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ঢাকাতে ছিলেন নবাব জবরদস্ত খাঁ, তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন, চাকলে বোলা ও চাকলে পাটগ্রাম ও চাকলে পূর্বভাগ মহারাজের অধিকারে থাকিবেক সুবাকে কিছু কর দিবেন। ছত্রধারী গজসিংহের রাজা, অন্যকে কর দেওয়া কর্তব্য নহে এমতে নারায়ণ নাজির দেও বরাবে ইজারা লিখিয়া ঐ নামে কর দিতেছিলেন।[৩] কিন্তু সুবেদারের সেরেস্তাতে নারায়ণের মালকং চাকলে বোলা ও সরবর তরফ রূপনারায়ণ মহারাজা বেহার এই প্রকার লেখা হইত ১১১৮ সনে (১৭১০ খৃঃ এই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। তখনও মহারাজ নিজনামাঙ্কিত মুদ্রা চালাইতেন ও ছত্রধারী ছিলেন, অপরকে রাজকর দেওয়া অকর্তব্য মনে করিতেন। হুয়ার্ট সাহেব সম্ভবতঃ এই সন্ধির কথাই মুরসিম কুলি খাঁর কুচবিহারের স্বাধীনতা-লোপের নিদর্শন মনে করিয়াছেন। মিরজুমলা ১৬৬১ খৃঃ অব্দে কুচবিহার জয় করিয়া উহার নাম দিয়াছিলেন "আলমগীর নগর"—(হুয়ার্ট, ৩১৮ পৃঃ।) এই উক্তির কোন ভিত্তি নাই। এই নাম কেবল মুসলমান সমকার সরকারের দলিলপত্রেই ছিল। এই সময়ে কুচবিহারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, এই যুদ্ধে মিরজুমলা যে কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিলেন না তাহা হুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, যদিও মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করাতে তিনি সাময়িক সন্ধি বা কর, যাহা মুসলমানের পক্ষে গৌরবজনক, তাহারই উপর জোর দিয়াছেন। কৈলাশ ঘোষ এই সকল বিষয়ে অকপটে সত্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসখানি খুব মূল্যবান্ আমার নিকট যে পাণ্ডুলিপি আছে তাহা ৪৬৯ পৃষ্ঠা ব্যাপক (ফুলস্কেপ কোয়ার্টো সাইজ)। বস্তুতঃ মোগলেরা সময়ে সময়ে কুচবিহারের রাজস্ব ও বশ্যতার নিদর্শন পাইলেও এই রাজ্য সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারেন নাই। মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হন। পারলিপ (Mr Purnell) সাহেবের অধীনে কতকগুলি সিপাহী কুচবিহারের সৈন্যদল মিলিত হইয়া ভুটিয়াদিগকে পরাস্ত করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কুচবিহারের যে সর্ত হয়, তাহাতে রাজসরকার হইতে বৎসর বৎসর লক্ষ-টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন রাজস্ব দেওয়া এবং অন্যরাজ্য কখনও আক্রমণ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা ইংরেজদের দখলে আসে।

আসামের সৈন্য ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বঙ্গের অনেক পল্লী ও নগর লুণ্ঠন করে। তাহারা সুবৃহৎ ৫০০ রণতরী লইয়া আগমন করে। ইসলাম খাঁ ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পলায়নপর রাজসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক আসামে প্রবেশ করেন

এবং প্রজার ১৫টি গুণ অধিকার করেন। কিন্তু বলা আসিয়া পড়াতে বলের অভাবে দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়া পালাইয়া রক্ষা পান।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে মিরজুমলা আসামের স্বাধীনতা লুপ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু আসামের জঙ্গলে তাঁহার অশ্বের অভাবে ও শস্যের অধিকার প্রভৃতি তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। বর্ষার অবসানে রাজা পালাইয়া পাহাড়ে যাইতেন। তখন মিরজুমলা অনেক উৎসুল্ল হইতেন। কিন্তু শরৎ আবার বিড়ম্বনা আরম্ভ হইত। কিন্তু পরিশেষে মিরজুমলার জয় হইল। রাজা তাঁহাকে ৯০,০০০ তোলা সোনা, ১৩,৩৮,০০০ তোলা রৌপ্য, ৩০টি হস্তী এবং রাঙ্গামাটির দুইটি সুন্দরী কুমারী প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। তিনি বাৎসরিক একটা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন, এবং এই রাজস্ব যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হইবে বলিয়া তাঁহার জামিনস্বরূপ চারটি রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া আসেন। মোগলশিবিরে সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরেরও দূতগণ উপস্থিত হইয়াছিল। মোগলের যে কোন ছিদ্রলক্ষ পাইলেই তাঁহাদের সাম্রাজ্যের সুবিধা ঘটিতেছিল। পাঠানেরা যেরূপ অশ্বের অভাব হইলে বা পরিচ্ছদাদিবহনে নিকটবর্ত্তী গ্রামে উৎপাত করিয়া সেনাদিগকে ভারবহ করিয়া আনিতেন এবং যাইবার কালে এতদ্দেশে লাঙ্গল ভাঙ্গিয়া খোস যেতারে চলিয়া যাইতেন মোগলের রাজনীতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, তাঁহারা একদল পাইলেই তৎক্ষণাৎ প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্যটি চিরকালের জন্য আত্মসাৎ ও পদানত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন। কিন্তু কুচবিহার ত্রিপুরা ও আসাম বহুদিন এই দুর্দ্দম শত্রুর আক্রমণ ও তৎকর্ত্তৃক রাজ্যের অধিকার ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল, আমরা যথাস্থানে এই তিন রাজ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিব এজন্য এখানেই এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত রাজধরের নিকট আত্মায় এক মুসলমান যোদ্ধাকে কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন এরূপ কথা আমরা এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

ত্রিপুরা ও আসাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোগলাধিকারে বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃগণ

মফস্বলে মোগলেরা ধীরে ধীরে সমস্ত সত্রপক্ষ জয় করিয়া আত্মশিবিরের বিদ্রোহ দলনপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের প্রায় সকলগুলিকে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সার্ব্বভৌম অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত আকবর যাহা করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান সেই নীতিই মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন। আকবর

মিষ্ট ও মিষ্ট ব্যবহার দ্বারা জাহাঙ্গীরকে করতলগত করিয়া রাজচক্রবর্তী হইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তথাপি তিনি যুদ্ধ ভালবাসিতেন না যেখানে ক্ষমা ও মিষ্ট ব্যবহার ব্যর্থ হইত, সেখানে তিনি এক টুকরা জমির জন্যও তাঁহার বিপুল বাহিনীকে জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিতেন অধীন ব্যক্তিরা সদয় ব্যবহারের এক পরিমাণে তৃপ্ত হইতেন কিন্তু যিনি বাধা ঠেলা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন, তাঁহাকে তিনি উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না তাঁহার সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির কলাধার ক্ষুণ্ণ করিতে তিনি সম্মত হইতেন না শাসনকর্তাদের মধ্যে যাঁহার কেহ ফরাসডাঙ্গার একটু বেশী পরিচয় দিতেন তবে তিনি তাহা ক্ষমা করিতেন না শত্রুকে যে যতটা বেশী দলন করিতে পারিত, তাহার উপর তিনি ততটা সন্তুষ্ট হইতেন। শাসনের শিথিলতা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি শাহজাদা শাহ যোগলবিদ্রোহী ফতেপিলানের নেতা এবং পাঠান কতলু খাঁর প্রতি একটু বেশী সদয় হওয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃঃ, এজন্য আকবর তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ—এমন কি হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়া তিন বৎসর তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন অধীনস্থ কর্মীর প্রতি দয়ার আদর্শ অধীন যোদ্ধা কর্মীর স্বত্বরক্ষায় সমুচ্চ আকবর লেখনীটিতে জাহাঙ্গীরের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন যুদ্ধের প্রতি স্বভাবতঃ বিরাগসম্পন্ন অথচ এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অটল, অধ্যবসায়শীল যোদ্ধা জগতের ইতিহাসে বেশী দেখা যায় না প্রথম দুইবার মানসিংহ উড়িষ্যায় পাঠানদের সঙ্গে কতকটা তাহাদের অনুকূলে সন্ধি করাতে আকবর বিরক্ত হইয়াছিলেন। ("The Emperor was displeased at the want of energy evinced by the Raja on the occasion"—Stewart Bengal, p. 110), আকবর যথাসাধ্য রাজপদ হইতে চেষ্টা পাইতেন সের আফগানকে বলিয়াছিলেন, মেহেরুন্নেসাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবেন কিন্তু শেষে যখন করিলেন সেলিম তাঁহার জন্য পাগল—হয়ত তাঁহাকে না পাইলে তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইবে, তখনই তিনি যুবরাজের মনের দিকে না চাহিয়া যে কথা দিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন, মেহেরুন্নেসা সের আফগানের পত্নী হইলেন। তাঁহার মানের মর্যাদারক্ষা রাজোচিত অন্যকে সমূলে ধ্বংস করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেখানে ক্ষমা অথবা শিথিলতা-প্রদর্শন তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ—সে শত্রু যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, আকবর তাহার শেষের ভয় অন্যের থেকে আশঙ্কাজনক মনে করিতেন। এই সাম্রাজ্যনীতিতে তখনও ভারতবর্ষের বিশাল অধিকার তাঁহার অঙ্গুলী-সঙ্কালনে চলিত, তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজল তান সেন, মানসিংহ, ভোডরমল্ল প্রভৃতি বিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী লোককে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে চালাইতেন এতবড় রাষ্ট্র-প্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে খুব বেশী নাই কিন্তু তিনিই হিন্দুস্থানের কলঙ্ক করিয়াছেন, হিন্দুস্থানের রণদার্ঢ্য লক্ষিগকে নিধন করিয়া তিনি সমস্ত শক্তি স্ত্রীর কেন্দ্রগামী করিয়াছেন - যখন তাঁহারা দেশ বনিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিয়াছেন।

এইভাবে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি দিল্লী অভিমুখী হইয়াছিল, তখন'ও ভারতবর্ষ দিল্লীর আওতায় পড়িয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য নক্ষত্র এমন কি চন্দ্রসূর্য জ্যোতিষ্ক সূর্যোদয়ে বিলুপ্ত হওয়াতে একমাত্র প্রখর মোগলশাসন রৌদ্রের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা এখানে বঙ্গেশ্বরগণের সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দিব

১।	হুসেন কুলি খাঁ, খান জিহান			১৫৯৮-১৫৮০ খৃঃ
২।	রাজা তোডরমল্ল	...	...	১৫৮০-১৫৮৫ খৃঃ
৩।	খান আজিম মির্জা কোকা			১৫৮১-১৫৮৪ খৃঃ
৪	সাহাবাজ খান কম্বো			১৫৮৪ ১৫৮৭ খৃঃ
৫।	উজির খান জেবেরি	...	...	১৫৮৭ খৃঃ
				(অকালমৃত্যু)
৬	সৈয়দ খাঁন			১৫৮৭-১৫৮৯ খৃঃ
৭।	মানসিংহ			১৫৮৯ ১৬০৪ খৃঃ
৮	আবদুল ওয়াজিদ আসফ খাঁ			১৬০৪ ১৬০৬ খৃঃ
৯।	মানসিংহ	...	...	১৬০৬-১৬১০ খৃঃ

আকবর দীর্ঘজীবী হইয়া পড়াতে জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যাহাতে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, মানসিংহ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন কারণ খসরু মানসিংহের ভাগিনেয় ছিলেন এদিকে জাহাঙ্গীর সেলিম, আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে কতকটা স্বাধীনতাপ্রদর্শন এমন কি পিতার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে উদ্যত ছিলেন। মানসিংহ এই সুবিধা পাইয়া খড়দহটি কাশে পরিণত করিতে চেষ্টিত ছিলেন।

কুতুবুদ্দিন খাঁ কোকলটাস কোকা— ১৬০৩-১৬০৭ ইঁহার সময়ে বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলায় বিখ্যাত সের আফগানের হত্যা হয় এবং মেহেরুন্নেসা বর্দ্ধমান হইতে জাহাঙ্গীরের রাজধানীতে নীত হইয়া নুরজাহান (জগতের আলো) নাম গ্রহণ করিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী হন। এইখানে আমরা সংক্ষেপে নুরজাহানের কাহিনী বর্ণনা করিব।

পারস্য তাতারে রাজা আয়াস নামক সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি অবস্থার বিড়ম্বনায় ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার স্ত্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও নিতান্ত অস্থি নিঃস্ব ও দারিদ্র ছিল, এই দম্পতী ভারতবর্ষের পথে দুরবস্থার চরমে উপনীত হন। আয়াসের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তাঁহাকে একটি ঘোড়ায় চড়াইয়া স্বামী বল্গা ধরিয়া আস্তে আস্তে টানিয়া যাইতেছিলেন। দম্পতী তিন দিন উপবাসী ছিলেন, তাঁহাদের সমস্ত সম্বল ফুরাইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় রমণীর সন্তানপ্রসবের কাল উপস্থিত হইল, এবং যিনি কালে জগতের মহীয়সী মহিলাদের অন্যতম হইয়া ভারত সম্রাজ্ঞী হইবেন, সেই 'জগতের আলো' তথায় আবির্ভূত হইলেন। তখন রজনী আসন্ন, নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তি

নাই, তাঁহা আরাম ও তাঁহার পন্থা এত দুর্গম যে তাঁহারা আর চলিতে পারেন না। নবজাত শিশুসহ চলা অসম্ভব বোধ করিয়া তাঁহারা বিশেষ আদরে তাঁহার পন্থী পতিকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। সে স্থান হিংস্রজন্তুপূর্ণ রাত্রি হইলে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সুন্দরী কোন মহাপ্রাণ আগন্তুকের ভরসায় তাঁহাদের সুন্দরী নবজাত কন্যাকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিশুটিকে লতাপাতা দিয়া কতকটা ঢাকিয়া একটি বৃক্ষের নিম্নে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এক মাইল চলিয়া যাওয়ার পর সেই গাছটি যখন জননীর অদৃশ্য হইল, তিনি তখন কৃত্রিম হইয়া শিশুর জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহা আরাম পন্থীকে শান্ত করিবার জন্য এবং বাৎসল্যবশতঃ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এক রোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

সুন্দরীর মনস্কথা।

তিনি দেখিলেন এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণসর্প শিশুটিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে ও তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়াছে। সেইখানে তাড়াতাড়ি আসিয়া দোর গোল করাতে সাপটা হঠাৎ ভয় পাইয়া শিশুকে ছাড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিরাপদে স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তখন কতকগুলি লবণব্যবসায়ী বণিক্ সেই পথে চলিতেছিল, তাহারা এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেল। তখন আকবর লাহোরে ছিলেন। আসফ খাঁ নামে তাঁহার এক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহা আরামের সম্পর্ক ছিল, ইঁহার অনুগ্রহে এই দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশঃ রাজ-দরবারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি মোগল দরবারে রাজস্বসচিব হইলেন। সেই নবজাত কন্যার তখনকার কমনীয় বিষয় হইল। তাঁহার নাম হইল মেহেরুন্নেসা অর্থাৎ "রমণীকুলমহিমা", কারণ তাঁহার সৌন্দর্য্য সত্যই সূর্য্যের ন্যায় চক্ষে ধাঁধা দিত। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নানাগুণে গুণবতী হইয়া উঠিলেন। সঙ্গীতে, চিত্রবিদ্যায়, কবিতারচনায় ও নর্ত্তনে তিনি রাজসভাতে অদ্বিতীয়া হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দীর্ঘ ও সুগঠিত, কথা চাতুর্য্যপূর্ণ অথচ সত্যাত্মক, হাস্য মধুর ও স্নিগ্ধকরী ছিল। কোন নিমন্ত্রণসভায় সেলিম তাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার রূপ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল তাঁহার গানে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। মুসলীতের ঢেউ ছিল যুবরাজের হৃদয় জয় করা। হঠাৎ যেন অতর্কিতে তাঁহার অবগুণ্ঠন মুখ হইতে অপসারিত হইল, তখন তাঁহার সলজ্জ-রক্তিম গণ্ড, স্ফুরিতাধর ও ভূমলাকুল কপোল এবং চকিতহরিণীর দৃষ্টি সেলিমের বুকে যাইয়া শেলের মত বিঁধিল ("Then, as by accident, she dropt her veil and shone upon him at once with all her charms. The confusion which she could well feign on the occasion heightened the beauty of her face. Her timid eye by stealth fell upon the prince and kindled a fire in his soul into love"—Stewart, p 232) সেলিম সমস্তদিনটা তাহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহা আরাম ইহার পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ সের আফগানের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন, এইরূপ বাগ্দান করিয়া-

ছিলেন। নিরুপায় হইয়া সেলিম তাঁহার শিক্ষার নিকট প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু জ্ঞানের অবতার আকবর বাদশাহ তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি শত স্নেহসত্ত্বেও রাজ্য রক্ষার বিষয়ে বাধা জন্মাইতে সম্মত হইলেন না। আকবরের জীবদ্দশায় সেলিম সের আফগানের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেলিম ও নুরজাহানের প্রেম লইয়া এতটা নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত হইল যে, সের আফগান বিরক্ত হইয়া জায়গা পরিত্যাগপূর্বক বঙ্গদেশে আসিলেন এবং বর্দ্ধমানের আনুকূল্যে বর্দ্ধমান জেলার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পর যে কয়জন চালক ছিল, তাহা আবার আসিল। শুরুবয়সে যে কলঙ্ক ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, তাহা সহজে যায় না। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সের আফগানকে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইয়া আনিলেন, তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করিলেন। সের আফগানও নিতান্ত উপেক্ষণীয় লোক ছিলেন না। শুরুবয়সে তিনি পারস্যরাজ শাহ তহমাস্পের [illegible] হইয়া সে ইরমাইলের একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন এবং আকবরের সময়ে নানা যুদ্ধে অতিশয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ অপরাজিত সৈনিক বলের অহঙ্কার দেখাইয়া সম্রাট বিদ্যমানকালে সকলেরই আক্রোশ করিয়াছিলেন বলিয়া আকবর ইঁহাকে খাঁটি ভালবাসিতেন। ইঁহার নাম ছিল আসু তক্কা কিন্তু কেহই বাঁচিয়া থাকিতে সের আফগান নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার এবং সম্রাটের ঘোরায় সঙ্কট সঞ্চারিত ছিল। যুবরাজ সেই সময়ে সর্ব্বজনপ্রিয় ও রাজকুমারে সকলের সম্মানিত ছিলেন। উদ্দেশ্য কি করে সম্রাটের কি করিলে বল বা ছলনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন? তাহাতে বিদ্যা ও বিদ্বানের উপযুক্ত আদরই ছিল। কিরূপে মেহেরউন্নেসাকে পাইবেন, সম্রাট তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু দালালদের দালীকদায় সের আফগান কর্ণপাত করিতেন না, তাঁহার উদার হৃদয় তলে সকলের কালিমা থাকিতে পারিত না। সম্রাটের যাহা অভিপ্রায় তিনি সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একদিন একটা বাঘের উৎপাতে লোকজন বড়ই উৎপীড়িত হইতেছিল, সম্রাট উহা শিকার করিতে গেলেন, অন্যান্য ওমরাহের সহিত সের আফগানকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। বাঘ যেখানে ছিল সেই স্থানটা কেন্দ্র করিয়া একটা বৃহৎ পরিধি নির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্রাটের লোকজন পশুকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা বাঘের অতি নিকটবর্ত্তী হইলে বাঘ ভয়ে আস্ফালন-আস্ফোটন, গর্জ্জন ও লম্ফঝম্পের সহ পরিচয় দেখা যাইতে লাগিল। সম্রাট বলিলেন, "আমার ওমরাহের মধ্যে কে আছেন, যিনি একাকী যাইয়া বাঘটি নিধন করিয়া আসিবেন?" সম্রাট ভাবিয়াছিলেন সের আফগান অবশ্য প্রস্তুত হইবেন। এদিকে সের আফগান ভাবিলেন, "কিছুকাল দেখা যাক, ওমরাহের মধ্যে এরূপ সাহসী কেহ নাই, তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইলে তখন আমি প্রস্তুত হইব।" এই ভাবিয়া তিনি নীরব ছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে তিনজন ওমরাহ লম্ফঝম্পে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন সের আফগান

সের আফগানের বিরুদ্ধে

দেখিলেন, তাঁহার প্রাণপাখী যেন অন্তে লইয়া যায়, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "যাহারা যে বল ভগবান দিয়াছেন, আমাদেরও তাহাই দিয়াছেন নিরস্ত্র অবস্থায় কে যাইতে পারেন?" ওমরাগণ এ প্রস্তাবে বিমুখ হইলেন, তখন সের আফগান নিরস্ত্র হইয়া স্বয়ং ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি চাহিলেন। সম্রাট কয় মিনিট দেখাইয়া পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া শেষে মনে মনে আনন্দের সহিত অনুমতি দিলেন। রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত-দেহে সের আফগান বাঘটিকে হত্যা করিয়া সম্রাট শিবিরে ফিরিলেন। অসম্ভব সম্ভব হইল এবং সের আফগানের বীরত্ব-কীর্তি সমস্ত সহরে মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিন্তু জাহাঙ্গীর পুনরায় চক্রান্ত করিলেন। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড হাতীর মাহুতের উপর গোপনে আদেশ হইল যে, কোন কৃত্রিম অজিলাতির ছিলা দিয়া যখন সের আফগান যাইবেন, তখন 'হাতীটা পাগল হইয়াছে' এই ভাব দেখাইয়া সের আফগানকে উহার পদতলে ফেলিয়া মারিতে হইবে। কিন্তু সের আফগানের কি অপূর্ব বীরত্ব তিনি হাতীটার শুণ্ডের মূলে এমনই জোরে তরবারাঘাত করিলেন যে, শুণ্ড ছিন্ন হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল এবং হস্তী পলায়ন করিল। জাহাঙ্গীর রাজপ্রাসাদের এক জানালা দিয়া উৎসুক হইয়া দেখিতেছিলেন, তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন এই ঘটনায় বীরের প্রতি এরূপ নীচ ষড়যন্ত্র হইয়াছে সম্রাট তজ্জন্য নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। ইহার পরে সের আফগান বঙ্গদেশে কার্য্যে আসিলেন এবার কুতুবুদ্দিন যিনি নাকি জাহাঙ্গীরকে ক্রমাগত উৎসাহিত করিতেছিলেন, তিনিই বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার বঙ্গের মসনদ লাভের একটা সখ ছিল, সের আফগানকে বধ করা সের আফগান রাজে অস্ত্রধারী কোন দেহরক্ষক রাখিতেন না বলিয়া খুলিয়া রাখে ঝুলিয়া থাকিতেন, তাঁহার আবাসগৃহে একটি বৃদ্ধ চাকর থাকিত, অপরাহ্ণে দাসদাসীর সহায়ে পত্নী তাঁর স্নান বাটীতে চলিয়া যাইত। একজন অস্ত্রধারী লোক একরাত্রে ঘুমন্ত সেরের গৃহে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ সৈনিক বলিয়া উঠিল, "ঘুমের মানুষকে মারিতে নাই।" তখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, তিনি বৃদ্ধ সৈনিককে ধন্যবাদ দিয়া সিংহবিক্রমে এই দুইজন সশস্ত্র লোককে আক্রমণ করিলেন, অনেকে হত হইল, অনেকে আহত হইল, এবং কীটিতের মতো সকলেই পালাইয়া গেল কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্র বিফল হইল কিন্তু এই ঘটনায় সের আফগানের মানসিক অসন্তুষ্টরূপে বাড়িয়া গেল। তিনি যে পথ দিয়া যাইতেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় ভিড় হইত রাজধানী নিরাপদ মনে না করিয়া সের আফগান বর্দ্ধমানে চলিয়া আসিলেন ইচ্ছা মেহেরুন্নেসাকে লইয়া বাকী জীবন নিশ্চিন্তভাবে কাটাইয়া দিবেন। তাঁহার অপূর্ব সফলতার সম্ভাবনা ভাবী জীবনের উন্নতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এ সব বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত শান্তিময় জীবনের শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসিলেন কিন্তু নিষ্ঠুর, নীতিবিগর্হিত, ষড়যন্ত্রকারী কুতুব নিশ্চেষ্ট হইলেন না। আকবর হইলে এরূপ অসাধু ব্যক্তিকে একটা রাজ্যশাসনের ভার কখনই দিতেন না জাহাঙ্গীরকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিতেন, সের আফগানকে নিহত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সহজ

সৌভাগ্যের ছলনায় তিনি রাজমহল ঘুরিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সের আফগানের সঙ্গে মিত্রভাবে মিশিয়া পরে যাইতে লাগিলেন—কিন্তু একটা সৈনিকের উপর হঠাৎ সেরকে হত্যা করার আদেশ ছিল। অহেতুক ভাবে সের আফগানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে সের আফগান তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্র সেদিন এতটা প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়িয়াছিল যে, সের আফগানের উপর স্বয়ংও এই উদ্দেশ্য অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কুতুবুদ্দিনকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রীতির জন্য যে ব্যক্তি কিনা কুকুরের মত লোককে হনন করিতে পারিত, সেই হীনচরিত্র শাসনকর্ত্তা নিজের জালে নিজে পড়িয়া মারা গেল। কিন্তু সম্রাটের ওমরাহ সের আফগানকে ঘিরিয়া ফেলিল সের আফগান একক সেদিন চারিটী ওমরাহকে হত্যা করিয়াছিলেন, তখনো একজন পাঠানবীর মরণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু সমস্ত বহু যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিল কেহ তাঁর কেহ বুকে গুলি ছুড়িতে লাগিল। সের তাকিয়া বলিলেন, "তোরা এক একজন করিয়া আয়, দেখি বল কার কেমন কিন্তু সে কথা কেহ শুনিল না সমস্ত রণী ঘিরিয়া যেরূপ অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল,—এই বীরেন্দ্রকে সেরূপই ভাবে অসহায় ও অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলেন মৃত্যুকালে তিনি শত্রুমধ্যে হইয়া তলের অভাবে তূণীর খুলি মাথায় ছড়াইয়া তর্পণ করিলেন তাঁহার শরীরে ছয়টি গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। নুরজাহান স্বামীর নিধন সংবাদ পাইয়া বিচলিত হন নাই তিনি নাকি এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী, তাঁহার নিশ্চিতমৃত্যু পথ হইতে অপসারণ করিয়া, তাঁহাকে বিনা আপত্তিতে সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হইবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুসংবাদে জাহাঙ্গীর এরূপ বিশ্বস্ত ও প্রিয় কর্মচারী মারা পড়িলেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মেহেরুন্নেসার মুখ তিনি দর্শন করিবেন না কিন্তু তৎপর মেহেরুন্নেসা নুরজাহান হইলেন তাঁহার নাম সম্রাটের নামের সঙ্গে মুদ্রায় ও রাজকীয় দলিলপত্রে মুদ্রিত হইতে লাগিল তাঁহাদের যুগলনামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় এই কথাগুলি উৎকীর্ণ থাকিত —

"বজর শাহ জহাঙ্গীর বাদ্শহ সাহেব
বনামে নুরজহাঁ বাদশহে বেগম জর জ"

জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ কাবুলী ১৬০৭ খৃঃ।

কুলি খাঁ কাবুলী আগে মেহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার চরিত্র লীলাময়। ইনি সর্ব্বদা, একশত যৌতকী সঙ্গে রাখিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে কোরান আবৃত্তি করিতেন, প্রতি আবৃত্তির পর তাঁহাদিগকে বলিতে হইত—"এই আবৃত্তির পুণ্যফল বাদশাহ পাইবেন" তিনি পাঠশার নমাজ পড়িতেন, কিন্তু সেই সময়ে মুখের রঙ্গী ও কথনকালের ধারা কাহাকেও বেত্রাঘাত কাহাকেও ফাঁসি দেওয়া অথবা শিরশ্ছেদের হুকুম দিতেন, যখন বাহির হইতেন, তখন সঙ্গে একশত ঢাকী থাকিত কোন বিবাদ-বিসম্বাদের স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি সেই

এক পত্র ঢাকীকে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিতেন, সেই বিরাট শব্দে অন্যান্য বিবাদের গোলমাল চাপা পড়িয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গে এক শত অশ্বারোহী বন্দুকের সৈন্য থাকিত, ইহারা কাশ্মীরবাসী ছিল এবং আকাশে উড্ডীয়মান কুক্কুটকেও মারিয়া মাটীতে ফেলাইতে পারিত—কোন বিদ্রোহের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদা রাজাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। বঙ্গদেশ দখলই এই পাঠানদের হাত হইতে বাহির হইয়াছিল, তিনি একটি বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান		১৬০৮-১৬১৩ খৃঃ
কাশীম খাঁ	... ...	১৬১৩-১৬১৮ খৃঃ
ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ	... ...	১৬১৮-১৬২২ খৃঃ
শাজাহান	... ...	১৬২২-১৬২৬ খৃঃ

জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী হইয়া শাজাহান বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তিনি ঢাকায় আসিয়া বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্তার সম্পত্তি ও সরকারী রাজস্ব হস্তগত করেন। তৎপরে পাটনা বিজয় করিয়া রোটাস দুর্গ দখল করেন। ঐ দুর্গে নায়ক কোন ব্যক্তিকে এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহের পর সম্রাটের সহিত শাজাহানের প্রীতির ভাব পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল।

মহাবৎ খাঁ	...	অল্প সময়ের জন্য	... ১৬২৬ খৃঃ
খানজেমান খাঁ		ঐ	

মুকুরম খাঁ—ইনি ঢাকায় বাস করিতেন। সম্রাটের পুত্র আসিয়াছেন শুনিয়া রাজমহলে অতি শ্রদ্ধার সহিত সংবর্দ্ধনা করিয়া আনিতে যাইয়া ইনি বঙ্গেশ্বরীপদে কলমস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ফিদাই খাঁ	...	...	১৬২৭-১৬২৮ খৃঃ
কাশীম খাঁ চোবানি	...	...	১৬২৮-১৬৩২ খৃঃ

ইহার সময়ে পর্ত্তুগীজগণ হুগলী হইতে অধিকারচ্যুত এবং তাড়িত হয়।

আজিম খাঁ—১৬৩২ খৃঃ-১৬৩৫ খৃঃ—ইহার সময়ে ইংরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি পান এবং পিপলি বন্দরে (বালেশ্বরে) তাঁহাদের প্রথম কুঠি স্থাপিত করেন।

ইসলাম খাঁ মুসেহি	...	...	১৬৩৬-১৬৩৯ খৃঃ
সুজা বাদশাহ (সুলতান মহম্মদ সুজা)			১৬৩৯-১৬৫৯ খৃঃ

২৪ বৎসর বয়সে শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৬৩৯ খৃঃ)। কিন্তু পাছে ইহার শক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় শাজাহান শায়েস্তা খাঁকে (সুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র) বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে শাজাহানের এক কন্যার সর্ব্বাঙ্গ আগুনে পুড়িয়া যায়—সেক্রিয়েল বাউটন (Gabriel

Bo ... নামক এক ইংরেজ ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করাতে পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট তাঁহার প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ইংরেজদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। বাউটন রাজমহলে আসিয়া সুজার সঙ্গে দেখা করেন তখন রাজমহলে এক মহিলা গুরুতরক্রপে পীড়িত ছিলেন বাউটন তাঁহাকেও আরোগ্য করেন সুজা বাদশাহ ইংরেজ-জাতির উপর বিশেষ সদয় হন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে মিঃ ব্রিজম্যানকর্তৃক বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরেজদের কুঠী স্থাপিত হয় ১৬৫০ খৃঃ

সুজা রাজমহলে রাজধানী সংস্থাপিত করেন, তিনি বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন রাজমহলকে তিনি প্রায় দিল্লীর মত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন মানসিংহকর্তৃক নির্ম্মিত দুর্গগুলির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই নবনির্ম্মিত রাজধানীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন কিন্তু বছর ঘুরিয়া যাইতে না যাইতেই এক ভীষণ আঘাতে সকলই নষ্ট হইয়া যায় এমন কি অল্পকালে বাদশাহের পরিবারবর্গ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পান। পরবর্ত্তী আমীর রাজধানীর কতক অংশ পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু সুজা বাদশাহের প্রাসাদের কতকগুলি প্রকোষ্ঠ এখনও বিদ্যমান আছে।

সুজা মোগল উপর উদারমনা, ক্ষমাশীলতার রাজা ছিলেন তাঁহার মত উদার ও মুক্ত প্রাণ ছিলেন না তিনি ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রজারা তাঁহার শাসনকালে খুব সুখী ছিল ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বঙ্গশাসনকাল রাজত্বের যুগ ছিল। তাঁহার প্রভাব বঙ্গদেশে যেরূপ হইয়াছে আসকা কাহারও সাজাহান তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা ও করা পাঠান কিন্তু সুজা হইতে পীড়িত হন নাই। এক বৎসর পরে তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় শাসনকার্য্য আরম্ভ করেন এই সময়ে সাজাহানের শক্তভাবে রোগ হওয়াতে সুজা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া বাদশাহের সিংহাসনে তাঁহার দাবী পরিপক্ক করিবার জন্য বড় সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন তাঁহার সাহস তাঁহার চিরসঙ্গিনী ছিল, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইলে যে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত—ইহাই আশঙ্কা করিয়া তিনি এই বিদ্রোহ করিয়াছিলেন সাজাহান তাঁহাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি মরেন নাই, সুস্থ হইয়াছেন কিন্তু সুজা প্রচার করিলেন সেগুলি সমস্ত জালচিঠি, দারা তৈরী করিয়াছেন রাজকীয় সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার কাল্পীর নিকটে সাক্ষাৎ হয়। জয়সিংহ এবং দারার পুত্র সোলেমান সম্রাটের সৈন্যের নেতা ছিলেন। জয়সিংহ সুজার সঙ্গে সন্ধি করিলেন, কিন্তু তরুণবয়স্ক সোলেমান সেই সন্ধি অস্বীকার করিয়া অতর্কিতভাবে সুজার শিবির আক্রমণ করেন। বারাণসীর নিকটে যুদ্ধ হয়, সুজার বিশাল বাহিনী পরাস্ত হয়, সুজা পাটনা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরের দৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করেন এই সময়ে সংবাদ আসে, দারা পরাস্ত হইয়াছেন, সম্রাট বন্দী এবং আরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করিয়াছেন। সোলেমান বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন, এদিকে সুজা আরও শুনিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ সিংহাসনের দাবী করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সুজা পুনরায় এক মহতী বাহিনীর পুরোভাগে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদের

কুদগা নামক স্থানে এক মহাযুদ্ধ হইয়া গেল। সুজার দূরদর্শিতা এবং নিজের সৈন্যের কার্য্য তৎপরতার অভাব এবং আরঙ্গজেবের দূরদর্শিতা অতুল কর্ম্মপটুতা বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাকে নিরাশ্রয় করিয়াছিল। সুজার অনেক সৈন্য ছিল বঙ্গদেশের সৈন্যেরা তাঁহাকে ভালবাসিত এবং তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। তাঁহার হস্তী অশ্ব ও ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না, এদিকে আরঙ্গজেবের সেরূপ তাঁহার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত ছিল না। এক সময়ে এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার সৈন্যের কতক অংশ সুজার সঙ্গে যোগদান করিবে কিনা, এই বিষয় ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্যতম প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হওয়া বাহার ভাতার সূচনা করিয়াছিলেন। সুজা এসকল সংবাদ রাখিতেন কথা জানা যায় নাই কিন্তু তাঁহার এই গুরুতর বিষয়গুলির প্রতি অবহিত থাকার এরূপ প্রয়োজন ছিল কিসে অনায়াসে যশোবন্ত সিংহকে ও তৎসঙ্গে আরঙ্গজেবের সৈন্যের বহু অংশ স্বপক্ষে টানিয়া আনিতে পারিতেন—তাহা হইলে ফলও অন্যরূপ হইত। দিকে আরঙ্গজেবের বন্ধু সেনাপতি মীরজুমলা অনুকূলস্রোতে স্বেচ্ছাধীনে থাকিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিতেছিলেন, যশোবন্ত সিংহের বিদ্রোহে অধিকাংশ রাজপুত সৈন্য আরঙ্গজেবের বিপক্ষ হওয়া তাঁহার শিবির আক্রমণপূর্ব্বক লুটপাট করিতে লাগিল সমস্ত প্রহর গণিলেন, কিন্তু সুজা চোখ বুঁজিয়া এই সুবিধাগুলি হারাইলেন যুদ্ধ অতি ভীষণ হইল, সুজার জয় একরূপ নিশ্চিত, এই সময়ে যখন তাঁহার হস্তীর উপর হইতে আরঙ্গজেব না দেখা দিয়াছেন তখন সংবাদ তাঁহার কাণে পৌঁছিল "আরঙ্গজেব কি করিতেছে? তুমি তোমার সিংহাসন হইতে নামিতেছ।" চতুর সম্রাট তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই প্রলোভন করিয়া সেই হস্তীর উপরই চাপিয়া বসিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এদিকে সুজা বাদশাহের প্রকাণ্ড হস্তীটা অবাধ হইয়া উঠিল আরঙ্গজেবকে ধরিয়া শিবিকা মধ্যে লইয়া যাইতে যতই মাহুত তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল, ততই সেই পর্ব্বতাকার শরীর ও যুদ্ধের কলরবের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ঘামিতে লাগিল সে এক পা অগ্রসর হইল না, তাহলে আরঙ্গজেবের জীবন শেষ হইত এবং সুজা বাদশাহই ভারতেশ্বর হইতেন হস্তীর বল কে কাড়িয়া লইল, কে তাহার গতিরোধ করিল?—সৈন্য সেই অকর্ম্মণ্য হস্তীর উপর হইতে সুজা নামিয়া অশ্বারোহণ করিলেন, এই তাঁহার কাল হইল বহু পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধে পুরুরাজ পোরাস্ হস্তীর উপর হইতে নামিয়া আসায় তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া তিনি হত এই মনে করিয়া তাঁহার বিশাল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে মারা হস্তী হইতে নামিয়া যাওয়াতে তদীয় সৈন্যেরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছিল, এবারও তাহাই হইল,—সৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতে লাগিল কথিত আছে, মীরজুমলার দূতে বশীভূত হইয়া আমিরকী খাঁ নামক সুজার এক সেনাপতি তাঁহাকে হস্তী হইতে নামিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছিল। জনপ্রবাদ এই "সুজা হেরে বাজি, আপনা হাত ছাড়া" (সুজা বাজি হারিয়া আপনার হাতে

হারিলেন। সুজা মুঙ্গেরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন, মীরজুমলা এবং আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এখানে সুজা পুনরায় যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন করিতেছিলেন এবং দুইদিন পর্য্যন্ত মুঙ্গের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অবস্থা সুবিধাজনক না বুঝিয়া রাজমহলে চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে পরিবারবর্গ ও বিশ্বস্ত সৈন্যগণ ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার অনেক দেরী থাকিলেও বৃষ্টি পড়াতে সম্রাটের বাহিনী তাঁহাকে আর অনুসরণ করিতে পারে নাই। এই সময়ে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের সঙ্গে সুজার এক কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ বহুদিন পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল। কন্যা বালিকা ছিলেন। পিতার এই বিপদের সময়ে কন্যা রাজকুমার মহম্মদকে তাঁহার ভালবাসা এবং বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া যাহাকে তিনি মনে মনে স্বামিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কায় অনেক মর্ম্মান্তিক দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। এই পরমসুন্দরী কন্যার পত্র পাইয়া মহম্মদের শুচিস্নেহসিক্ত ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। তিনি আরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সুজার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহার অদৃষ্টে যাহা হউক, তিনি তাঁহার বাগ্দত্তা স্ত্রীকে ত্যাগ করিবেন না, এই পণ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সুজা বাদশাহ নিরাতঙ্কে সুখী হইয়া খুব ধুমধামের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। আরঙ্গজেব এই সময়ে এক অযোধ্যা চাকুরী মোগল এই প্রীতির সম্বন্ধ ভেদ করিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদকে একখানি চিঠি লিখিলেন—যেন উহা রাজকুমারের পত্রের উত্তর। তাহাতে লিখিত ছিল, "তুমি যে অনুতপ্ত হইয়া আমাদের ভরসায় আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছ এবং ঈশ্বরের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিতেছ—এজন্য ক্ষমা পাইবে। আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুজা বাদশাহের শিবিরে যুদ্ধ করিতে যাইয়া তাঁহাকে কেমনে বন্দী করিয়া আনিবে—কিন্তু দেখিতেছি তুমি রূপের জালে ধরা পড়িয়াছ এবং সুন্দর হাসিমুখ দেখিয়া কর্ত্তব্যের পথ ভুলিয়াছ।" পত্রখানি আরঙ্গজেব গোপনে পাঠাইলেন, কিন্তু যাহাতে সুজা বাদশাহের গুপ্তচরদের হাতে তাহা ধরা পড়ে এরূপ কৌশল ও ব্যবস্থা ছিল। যথাসময়ে পত্রখানি মুক্ত হইয়া সুজার হাতে পড়িল, তাহাতে আরঙ্গজেবের রাজকীয় সীলমোহর ছিল এবং পত্রের ভাষা এরূপ সরল ও নিপুণ ছিল যে উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যুবরাজ মহম্মদ ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন, তিনি কোন পত্র তাঁহার পিতাকে লিখেন নাই—এই তথাকথিত প্রত্যুত্তর পিতার চালবাজি মাত্র। কিন্তু কিছুতেই সুজার মনে আর জামাতার উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল না, তাঁহার অমাত্যগণও একবাক্যে বলিলেন এই পত্র জাল বলিয়া বোধ হয় না। সুজা জামাতাকে কোন শাস্তি দিলেন না। তাঁহাকে বহুমূল্য খেলাত দিয়া শিবির হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। কন্যা ও জামাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলে চতুরা পুত্রকে ক্রূর ও নির্দ্দয় লিপ্সা বন্দী করিয়া সেলিমগড়ের দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে ইহার মানিক বাব ৩০০০৲

ধার্য্য হয়। কিন্তু পরে ইঁহাকে ২০,০০০ সেনার অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে ইনি কিশুবারের রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সুজা মুঙ্গের নামক স্থানে পুনরায় ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বহু বাঙ্গালী সৈন্য নিহত হয় এবং সুজা তাঁহার অবশিষ্ট ১,৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে বিদায় করিয়া চট্টগ্রামে পলাইয়া যান। এইখান হইতে তিনি আরাকেরাজের সাহায্য লইয়া রাজ্য উদ্ধার করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সে বৎসর অতি দুর্যোগ হওয়াতে আরাকানরাজ একখানি জাহাজও পাঠাইয়া দেন নাই। অগত্যা তিনি তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গ বিদায় দিয়া শুধু পরিবারবর্গ ও দাসদাসী সমেত আরাকানের দিকে যাত্রা করেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে মার্চ মাসে তিনি সুলপাখে আরাকানের সীমান্তে উপস্থিত হন। তাঁহার এক দূত পূর্ব্বেই তথাকার রাজাকে তাঁহার আগমনের কথা জানাইয়াছিল। রাজা তাঁহার এক প্রধান কর্ম্মচারী পাঠাইয়া সেই সীমান্তপ্রদেশ হইতে তাঁহাকে সসম্মানে রাজধানীতে লইয়া আসেন। সুজা আরাকানের রাজার আতিথ্যে কিছু কাল সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন। কিন্তু সহসা রাজার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তখন নগরের রাজ প্রাসাদের উৎকোচে বশীভূত হইয়া অনুচর কতকগুলি গুপ্তভাবে বিশ্বাস করিয়া সুজার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং নানারূপে তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া এক কথায় চতুর্থ বার বিদায় করিলেন যে, অবিলম্বে তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইবেন। সুজা বলিলেন যে, সে সময়ে ঘোর বর্ষা, জাহাজ পাওয়া যাইবে না, যদি তিনি এই বর্ষা কয়টি মাস সেখানে থাকার অনুমতি পান, তবে আরাকানিরাজের সৌজন্যের পরিবর্ত্তন ও মূল তিনি দিবেন। তাঁহার হাতে তখন অনেক মণিমুক্তা ও ধনরত্ন ছিল। আরাকানরাজ তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। তাইমুরের বংশধর শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে কন্যা বিক্রয়ী ধন রাজের হাতে দেওয়া—এত বড় একটা অপমানজনক প্রস্তাব সুজা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা তখন, সুজা আরাকান অধিকার করিবেন এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন এই একটা অভিযোগ দিয়া সুজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। আমরা কবি আলোয়ালের লিখিত আত্মচরিত হইতে জানিতে পারি যে কবি সুজার এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন মর্ম্মে নামক সাক্ষীর এই মিথ্যা অভিযোগে আরাকানরাজ তাঁহাকে সাতবৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। সুজা তাঁহার পরিবারবর্গ ও পরিকরগণকে বলিলেন, "তোমরা ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ হও। আমি এখানে নিহত হইলে ঔরঙ্গজেব খুব সম্ভব তোমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন।" কিন্তু তাঁহারা কেহই সুজাকে এই বিপৎকালে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টীয়ের মোগল অধিপতি আরাকানরাজের বিরুদ্ধে কি করিবে? অনেকেই নিহত হইলেন, সুজা বাদশাহ ও তাঁহার পরিবারবর্গ আহত হইয়া ধৃত হইলেন। সুজার পরমসুন্দরী কন্যা পত্নীদ্বয়, যিনি সঙ্গীতবিদ্যা, নর্ত্তন, চিত্রাঙ্কন ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মোগল অন্তঃপুরের সেরা রমণী ছিলেন, তাঁহাকে জোর করিয়া আরাকানরাজ বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইলেন

রাজকুমারী সঙ্গোপিত ছুরিকা দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া নিজে আত্ম হত্যা করিলেন। সাহ সুজাকে অবশেষে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইল। সুজার জ্যেষ্ঠ-পুত্র বন্দী হইয়া হত হইলেন। তাঁহার অপর দুই কন্যা রাজার পুরে বন্দী হইয়া আরাকান রাজের জ্যেষ্ঠ-মহিষীর ভগ্নি নিযুক্ত হইলেন। কন্যা তাঁহারা অল্প কালের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন—কেহ কেহ এই অপযশে মগ্ন করেন। নাই। অনেক গ্রন্থকার সুজা-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলেন। আরাকানের অনেকে এ বেগম মমতাজ সম্বন্ধে শত শত গান আছে। আমরা তাহাদের মধ্যে দুইটি তুলিয়া দিয়াছি। এই কাহিনীর পার্শ্বাক্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে অনেকটা ঐক্য হইলেও কিছু কিছু ভিন্নতর। আমরা তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

[illegible]

ধর্ষিত হন। মন্থর খাঁ উহাদের পলায়নের কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া নদীর বক্ষ শাখা নদীর মধ্য কুদ্র বোধ হয়। সহিত ছুটিতে থাকেন ৩২ খানি এক নৌকায় তিনি ঢাকার নিকট ভেরিয়া নামক স্থানে উপনীত হন। তথা হইতে বিশালতোয়া শীতলক্ষ্যার বক্ষে পদার্পিত হন এশখাঁ সোনাইকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন কিন্তু এখানে তাঁহাকে লইয়া চলা নিরাপদ নহে বুঝিয়া তাঁহাকে জঙ্গলবাড়ী পাঠাইয়া দেন। শীতলক্ষ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কেওয়ান ক্যাটের নামক স্থানে উপস্থিত হন কিন্তু সুজার অনুচরগণের গতি লক্ষ্য করিয়া তিনি এখানে বিশ্রাম করেন। এই সংবাদ পাইয়া চল্লিশটি রণতরীর সহিত সুজা নারায়ণগঞ্জের দিকে ধাবিত হন। এশ খাঁ বন্দিশালে পলায়ন করেন। সুজা বন্দিশালের দিকে আসিতেছেন শুনিয়া তিনি কালক্ষেপ না করিয়া উপস্থিত হন। কালেকাটী হইতে খুলনা এবং তথা হইতে কেশবপুর—এই ভাবে অনুসৃত এবং অনুসরণকারীর সঙ্গে নৌকাদৌড়ের প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। কেশবপুর হইতে মন্থর খাঁ আরও কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করেন। এই অনুসরণ ব্যাপারে সুজা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, কারণ প্রায় এক বৎসর কাল তিনি এইরূপ ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তাঁহার নৌবাহিনীর রসদ সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়িল, যেহেতু নিতান্ত দূর ও অতি ক্ষুদ্র পল্লীর নিকট দিয়া তাহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইয়াছিল এবার তিনি একটি মাত্র প্রেরণার পুকুর ব ছুরা লইয়া সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করেন এবং অপর সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের অদূরে তিনি এরূপ নিরস্ত্র অবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, কিছুতেই তিনি মন্থর খাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারিলেন না এইবার কেওয়ান সম্মুখে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। কোন ক্রমে এই সংবাদ লাভ হইবা মাত্র সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তিনি তথায় মন্থর খাঁকে আক্রমণ করেন। এককালে সকলকার হইয়া মন্থর খাঁ তথাকার এক মসজিদে আশ্রয় লইলেন। সুজা মসজিদের অবস্থান না তিনি ভাবিলেন, হয়তো অন্ধকারে মারা যাইবে নতের পক্ষ হইতে আক্রমণ করিবে অনেক দিন গত হইল, মসজিদে যে কেহ আছে এখন কোন চিহ্ন পাইলেন না তিনি ভাবিলেন মন্থর খাঁ না যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে এই বিশ্বাসে মসজিদের ভিতর বলপূর্বক ঢোকা হইল, কিন্তু একি দৃশ্য! উপবাসক্লিষ্ট অথচ এক ব্যক্তি মূর্তি ধরিয়া পাশ হইতে আসিয়া যুদ্ধ করিতে দাঁড়াইল। মন্থর খাঁর প্রিয়তম সেবককে দেখিয়া সুজা মুগ্ধ হইলেন অথচ তাঁহার সিংহবিক্রমে কোন যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, পঞ্চাশজন সহচরের অনেকেই আহত হইয়াছে। তিনি সোনাইর স্বামিনক্ষাচনের কথা জানিতেই উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষের দ্বারা মন্থর খাঁকে আলিঙ্গন করিয়া সহচরের প্রতিকৃতি গ্রহণ করিলেন। উভয়ে মিলিত হইয়া চট্টগ্রামের রাজা রত্নমাণিক্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন মন্থর খাঁর বিক্রম ও কৌশলে উক্ত রাজা নিহত হইলেন, তখন সুজা রাজধানী আরাকানের নব রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন পাইলেন। নানাদিক হইতে বহু মুসলমান আনাইয়া তথায় বাসস্থানে নিরূপিত করিয়া তাঁহাদিগকে লাখেরাজ দিলেন লুণ্ঠিত ধনরত্নের এক

ভাগ মনুর খাঁ পাইলেন ; ধনরত্ন বোঝাই দুই নৌকা জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরিত হইল ইহার পর সাহ সুজা রাজমহলে এবং মনুর খাঁ জঙ্গলবাড়ীতে চলিয়া গেলেন গীতিকারক লিখিয়াছেন, "এইবার সুজা বাদশাহের জীবনের এক নূতন অধ্যায় দুঃখের মধ্য দিয়া আরম্ভ হইল", ইতিহাস-লেখকেরা তাহা সকলেই জানেন।

ত্রিপুরার রাজমালায় পাওয়া যায়, এই সময়ে ছত্র মাণিক্যের হাত বিতাড়িত হইয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য আরাকান-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকান রাজ সুধর্মা এবং গোবিন্দ মাণিক্য দুই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে সুজা উপস্থিত হইলেন তাঁহাকে দেখিয়া গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসন ছাড়িয়া তাঁহাকে সেই সিংহাসনে বসাইলেন রাজা সুধর্মা গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই বিদেশীকে এতটা সম্মান দেখাইলেন কেন ? উত্তরে গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, "আমার ও আপনার মত ইহার অনেক সম্পত্তি রাজ্য আছে।"

পরে গোবিন্দ মাণিক্যকে সুজা বলিলেন—"আপনি এই দেশী রাজার সভায় আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন আমার এখন আর কি আছে, যাহা এই বন্ধুত্বের প্রতিদানস্বরূপ দিতে পারি ?" এই বলিয়া তাঁহার কোষ হইতে মহামূল্য হীরকখচিত একটি ছুরিকা ও একটি মূল্যবান্ হারকণ্ঠমালা তাঁহাকে বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ প্রদান করিলেন গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা পুনর্ব্বার লাভ করিয়া কুমিল্লাতে সেই অঙ্গুরীটির বিক্রয়-লব্ধ টাকাতে সুজার নামে এক মসজিদ স্থাপন করিয়া তাহার উপরস্থ ঐ মসজিদে প্রদান করেন কুমিল্লায় এখনও সেই মসজিদ বিদ্যমান এবং সুজানগরের উপরস্থ এখনও মসজিদের প্রাচীরবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া থাকে

এই পাল্টাপাল্টির একটিতে সুজা বাদশাহের সহিত আরাকান-রাজের। সুধর্মার যে সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া আছে—তাহা ঐ ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত কোথায় কোথায় মিলিয়া যায় না পাল্টাপাল্টির দুই ছত্র—সুজা আরাকান-রাজ সুধর্মার এক কন্যাকে বিবাহ করেন, সুজা আরাকান রাজা দখল করিবার উদ্দেশ্যে রাজকন্যাকে শিকারের আড়াইশায় অছিলায় ৪-খানি পাল্কী রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেন এই পাল্কীগুলির প্রত্যেকখানিতে ছইজন করিয়া সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। রাজাকে অন্তঃপুরে নিহত করা ইহাদের অভিপ্রায় ছিল। ছয় দেউড়ী পার হইয়া যখন পাল্কীগুলি সপ্তম দেউড়ীতে পৌঁছিল, তখন তথাকার প্রধান দ্বাররক্ষকের মনে সন্দেহ হইল, এত পাল্কী অন্তঃপুরের ভিতর যায় কেন ? ফলে সন্ধান আরম্ভ হওয়াতে যোদ্ধৃবর্গ বাহির হইল। তাহাদের সঙ্গে দ্বাররক্ষক ও রাজার সৈন্যের ছোটখাট যুদ্ধ হইল সুজার লোকেরা নিহত হইল এবং সুজা স্বয়ং ধৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিহত হইলেন এই বিবরণটি বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুজা বিপদে পড়িয়া যাঁহার আশ্রিতা লাভ করিয়া প্রাণ পাইয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে ঈদৃশ ষড়যন্ত্র করিবেন এরূপ মনে হয় না বরং ট্যাভার্নিয়ের উক্তির সহিত সুজা-জনিত পরীবানুর যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে—তাহার সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হয়। আরাকানের নিকটে সমুদ্রতটে চট্টগ্রামের পূর্ব্বে সুজা ও পরীবানুসম্বন্ধে

অনেক গাথা প্রচলিত আছে। কৈলাস সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় এই গাথাগুলির অস্তিত্বের কথা লিখিয়াছেন, আমরা ইহার দুইটী প্রকাশিত করিয়াছি। সুধর্ম্মার কন্যাকে যে সুজা বাদশাহ বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথা ইহাতে নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। এই গাথা দুইটিতে দৃষ্ট হয় (১) সুজা ও তাঁহার পত্নী সমুদ্রে পড়িয়া মারা যান, (২) তাঁহাদের সঙ্গে বহুমূল্য ধন ও মণিমুক্তা ছিল, তাহা আরাকান রাজ লুণ্ঠন করেন, (৩) পরীবানু সুধর্ম্মার অন্তঃপুরে নীত হন, "নল" খাইতে যাইয়া তাঁহার স্তনাগ্র সর্ব্পদেহ কণ্টকিত হইয়া যায়, সোনার "নাইং" কালে পরাইতে যাইয়া দশজন সহচরী তাঁহাকে জ্বালাতন করে, (৪) ব্রহ্মদেশের লোকের তাঁহার অসহ্য হয়, তিনি তাঁহাদের পাচিকার রান্না খাইতে স্বীকৃত হন না। এই গীতিকায় ব্রহ্মদেশবাসীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। কিন্তু মূলতঃ এগুলি সত্য হউক, পরীবানুর দুঃখে আর্দ্র হইয়া গ্রাম্য কবিরা উহা রচনা করিয়াছিলেন। হ্যুয়াটের বিবরণ অনুসারে পরীবানু সুধর্ম্মাকে হত্যা করিতে অসম্মত হইয়া নিজে আত্মঘাতী হন। এই গাথা দুইটিতে তাঁহার মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐরূপ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। হ্যুয়াট মুসলমানদিগের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন—সুজা চট্টগ্রাম হইতে স্থলপথে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু বার্ণিয়ার বলেন, তিনি একখানি জাহাজে অল্প কাল মধ্যেই সপরিবারে আরাকানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হ্যুয়াটের কথাই সত্য। চট্টগ্রামের তৎকালীন কমিশনার মিঃ লুইন, যে স্থানটিতে আরাকান রাজের প্রতিনিধি সুজাকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন। উহা নাফ নদীর তীরে। সুজার মৃত্যুর বহু পরেও আরাকানের তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া অনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। কেহ কেহ বলিত, সুজা কনষ্টান্টিনোপলে গিয়াছেন, তথা হইতে বহু সৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিবেন। সম্রাট কখনও শুনিতেন, সুজা পারস্যদেশ পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আর একটা জনরব রটিয়াছিল যে, সুজা শেত এবং শ্যাম-দেশের রাজাদের সঙ্গ দুইটি সশস্ত্র সৈনিকপূর্ণ বৃহৎ রণতরী লইয়া রওনা হইয়াছেন, তাঁহার জাহাজের নিশান রক্তবর্ণ।

কিন্তু কয়েক দিন পরে তাঁহার পুত্রকন্যাসহ সমূলে নিধনের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বন্দী সাজাহান রাজা এই সংবাদ শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিয়াছিলেন, "হতভাগ্যের একটি বংশধরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না যে, সেই বর্ব্বর রাজাটার প্রতিশোধ লইতে পারিত।"

মীরজুমলা—১৬৬১-১৬৬৩ খৃঃ

ইনি পারস্যবাসী ছিলেন। ইনি তেলিঙ্গনার (দাক্ষিণাত্যে) রাজার অধীনে সেনানায়ক হইয়া গোলকুণ্ডার খনিসমূহ বহু অর্থের মালিক হন। কিন্তু ইহার পুত্র মীর মহম্মদ আসীম অহঙ্কৃত ও মদ্যপায়ী হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। কথিত আছে মদ খাইয়া একদিন তিনি রাজার শয্যায় শুইয়াছিলেন। নানারূপ দুর্ঘটনার পর মীরজুমলা আরঙ্গজেবের আশ্রয় লাভ করেন। সুজা বাদশাহের পর ইনিই বাঙ্গলার পরি অধিকার করেন। ইহার সময়কার

প্রধান ঘটনা—কুচবিহার রাজ বিক্রমনারায়ণের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদ, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ইনি আরঙ্গজেবের অতি বিশ্বস্ত ওমরা ছিলেন

সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ ও ১৬৭৭ খৃঃ (প্রথম বার)

আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ এবং জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য নিবারণ ইঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। ইঁহার সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাণিজ্যের জন্য ইঁহাদের কোন কর দিতে হইত না। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ মাঝে মাঝে ইংরেজদিগকে বিব্রত করিতেন। ১৬৬৯ খৃ. অব্দের ৭ই মে তারিখের এক পত্রে মাদ্রাজের গভর্নর সায়েস্তা খাঁর নিকট কয়েকটি অভিযোগ করেন: ১। ইংরেজদের নিকট হইতে হিন্দু প্রজাদের মত বাণিজ্যকর লওয়া হইতেছে। ২। আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বঙ্গপুরুষ ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ৩। রাজ কর্মচারীরা কলেরজন নিযাতন করিয়া ইংরেজ বণিকদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেছে। গভর্নর সাহেব উপসংহারে ভয় প্রদর্শনপূর্বক লিখিলেন, "যদি এই সকল অত্যাচার নিবারিত না হয় তবে তাঁহারা বাঙ্গলা হইতে সমস্ত ব্যবসায় তুলিয়া চলিয়া যাইবেন" (If these things in the English are not better treated, they will entirely withdraw from Bengal—Stewart, p 342)

ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ—১৬৭২-৭৭ খৃঃ

রাজকুমার সুলতান মহম্মদ আজিম—১৬৭৮ ১৬৭৯ খৃঃ

রাজা যশোবন্ত সিংহের শিশুসন্তানদিগকে নানা ছলে যোধপুরের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, হিন্দুদের অস্ত্রধারণ করাইয়া, হিন্দুবিদ্বেষ ও মন্দির ভঙ্গ করা প্রভৃতি কারণে সমস্ত রাজপুতনা আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে; তখন সম্রাট দিবারাত্রি লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এই সময়ে রাজকুমার আজিম বঙ্গের শাসনকর্তৃত্বের ভার অপর লোকের হাতে ন্যস্ত করিয়া ঢাকা হইতে এক বিপুল সৈন্যদল লইয়া রাজপুতনার দিকে অভিযান করেন, সঙ্গে তাঁহার নবযৌবনবয়স্ক পুত্র বেদার বক্ত ছিলেন। প্রায় ৫০ দিনে তিনি যোধপুরের নিকটবর্তী হন। শেষের একদিন তিনি ৭০ ক্রোশ পর্যটন করিয়াছিলেন। এই অভিযান ও শিশুকুমারের সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। আরঙ্গজেব রাজকুমারকে রাজপুতনার বিরুদ্ধে যে বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তাহার সেনাপতিত্ব প্রদান করেন।

সায়েস্তা খাঁ—১৬৭৯-১৬৮৯ খৃঃ (দ্বিতীয় বার)

ইংরেজ বাণিজ্যের এই সময়ে অনেকটা অবস্থান্তর হয়। ইংরেজেরা নবাবের কর্মচারীদের দ্বারা নানারূপে উত্যক্ত হইয়া বিলাতে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখেন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী হইতে মিঃ ওয়াইল্ডে সায়েস্তা খাঁকে সমস্ত অভিযোগ নিবেদন করিয়া কতকগুলি প্রার্থনা করেন, তন্মধ্যে সত্বর উলুবেড়ে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতির প্রার্থনা ছিল।

সায়েস্তা খাঁ উহা মঞ্জুর করেন নাই। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চেম্বার্স—গ্রাণ্ড মিরান নিকলসনের অধীনে এক রণতরী পাঠাইবার আজ্ঞা দেন। উদ্দেশ্য ছিল,—আরাকানের রাজা ও অসন্তুষ্ট হিন্দুপ্রজাদের সহিত যোগ দিয়া যে বঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আরঙ্গজেবের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর প্রচলন করেন এবং তাঁহাদের অনেক দেবমন্দির ভগ্ন করেন, এজন্য হিন্দুরা একান্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে চাইল্ড সাহেবের নেতৃত্বে কিছু কিছু যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ইংরেজেরা প্রথমতঃ হুগলীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু মোগলসৈন্যকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া উলুবেড়িয়া ও তৎপরে ইঙ্গলি নামক গঙ্গার এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি আব্দুল সমাদ খাঁ মিঃ চাইল্ডকে এই দ্বীপ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি জানিতেন সেখানকার জলবায়ু এত খারাপ যে আপনাহইতেই তাঁহার শত্রুপক্ষের ধ্বংসসাধন করিবে। ফলে তাহাই হইল। অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজ সৈন্য ২৩০জনের মধ্যে কালক্রমে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে আরাকানের রাজার সঙ্গে প্রস্তাবিত সন্ধি বার্থ হইল। ক্রমাগত ইংরেজের তাঁহার আদেশ অমান্য করায় আরঙ্গজেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ তিনি যখন জানিতে পারিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার বন্ধ শত্রু অসুরিদ সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছেন তখন তিনি বিষম উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগের মুর্শিদাবাদের বিশুদ্ধ কারখানাগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তথাকার সমস্ত ইংরেজকে ধৃত করিলেন। ইহা ছাড়া বিলাত পটুয়ের তাঁহাদের দোকান-পাট এবং কারখানাগৃহ লুণ্ঠিত হইল। সায়েস্তা খাঁ সম্রাটের আদেশে ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে শৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। আরঙ্গজেব আদেশ করিয়াছিলেন—ইংরেজদিগকে তাঁহার রাজ্য সর্ব্বত্র সমূলে ধ্বংস করিতে।

সায়েস্তা খাঁর সময়ে বিদেশের অধিবাসী সন্তানেরা বিতাড়িত হইয়া পাটনা অঞ্চলে অনেক লুটপাট করেন। সায়েস্তা খাঁর নিন্দিত অনেকগুলি কার্য্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও ঢাকায় দৃষ্ট হয়।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ—১৬৮৯ ১৬৯৭ খৃঃ

ইব্রাহিম খাঁর সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেব ইংরেজদের প্রতি কিছুকালের জন্য প্রসন্ন হইয়াছিলেন, যেহেতু ইংরেজদের বাণিজ্য দ্বারা রাজকোষে একটা আয় হইত, তাহা ছাড়া ইংরেজদের রণতরীর মহামাত্রদের উপর উৎপাত করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রসন্নতার ফলে ইব্রাহিম খাঁ মাদ্রাজ হইতে চাইল্ড সাহেবকে বঙ্গদেশে আসিয়া পুনরায় বাণিজ্যাদি করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা মাত্র বৎসর ৩৭,০০০ টাকা নিয়মিত উপঢৌকন দিতে স্বীকৃত হইলে আর কোন শুল্ক দিতে হইবে না এই প্রস্তাব হইল। কিন্তু ইংরেজেরা এসম্বন্ধে অতান্ত দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন। যেহেতু একটা দুর্গ না হইলে তাঁহারা কিছুতেই নিজদিগকে নিরাপদ্ মনে করেন নাই। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা এই অনুমতি পান নাই এমন আকস্মিকভাবে একটা সুযোগ ঘটিল। শোভাসিংহ নামক বর্দ্ধমানের এক জমিদার

বর্তমান-রাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই নিরাশ্রিত পাঠানবাহিনী যাহা একেবারে নিরস্ত্র হইয়া গিয়াছিল তাহার একটী ক্ষুদ্র দল তখনও দেশের এক কোণায় ছিল। পাঠান-শক্তির এই শেষ দলটি হঠাৎ জুটিয়া গেল। রহিম শেখ পুনরায় বঙ্গে মোগলশক্তি বিলোপ করিয়া পাঠান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়া শোভাসিংহের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইহারা বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। কৃষ্ণরামের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন, শোভা সিংহ তাঁহার বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাওয়ায় রাজকুমারের ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ পাঠানদের সহায়তায় দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। সৈন্যসামন্তেরা একবাক্যে রহিমকে তাহাদের নেতৃত্বে বরণ করিল। রহিম অপ্রতিহত গতিতে মালদহ হইতে রাজমহল এবং মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান দখল করিয়া লইলেন। সেনাপতি নিয়ামৎ খাঁ নামক এক মোগল তাঁহাকে প্রবল বাধা দিতে ছুটলেন। কিন্তু রহিম তাঁহাকে নিহত করিয়া শিলাদেবী পেকের বনিতা হইয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন অধিকন্তু মুকুটটী, চুড়িটা এবং চন্দনের পিঁড়িটী লুটিয়া লইলেন। সম্রাটেরা উহাকে বিশেষরূপে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবার এই সুযোগে উহাদের কারাগারের দুর্গাকৃতি দেওয়াল সকল খাড়া হইয়া খুব সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। এদিকে কৃষ্ণরামের পুত্র ঘনশ্যাম মরে বড় হয় থাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন, অমনপ্রকৃতি নবাব বাদশাহের কৌজদার ফৌজদারকে একটা চকুম দিতে কাস্ত রহিলেন। ফৌজদারী অর্থলোভে যেরূপ পটু, সামরিক ব্যাপারে তদ্রূপ ছিলেন না। তিনি তিন হাজার সৈন্য লইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহের আশঙ্কা বাড়িয়া গেল। ইব্রাহিম খাঁর কর্ণে চতুর্দিক্ হইতে সংবাদ পৌঁছিতে লাগিল, তিনি উপেক্ষার ভাবে তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁ এবং মহাবিয়াকে বলিলেন, "এরূপ ছোট খাট যুদ্ধ ভাল নহে, ইহাতে বলক্ষয় হয় মাত্র। করুক না কেন—পাঠানেরা কিই বা করিবে? এর পরে আপনা হইতেই নিরস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু রাজত্বের ক্ষতি হইতেছে এই মাত্র।" এদিকে তখন সমস্ত বাঙ্গলা দেশটা পুনরায় পাঠানদের প্রায় দখলে আসিয়াছে। আরঙ্গজেব এই বৃত্তান্ত প্রথম শুনিয়া বিষম বিচলিত হইলেন এবং তখনই তাঁহার পৌত্র কুমার আজিম ওস্মানকে বাঙ্গলা-বিহার উড়িষ্যার গভর্ণর অতিরিক্ত করিয়া এবং নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতির প্রধান করিয়া বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিলেন।

সুলতান আজিম ওস্মান—১৬৯৭-১৭০৭ খৃঃ

জবরদস্ত খাঁ ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন। রাজমহলের যুদ্ধে রহিম খাঁর সেনাপতি খিজের খাঁ নিহত হন। জবরদস্ত খাঁ ইংরেজ ও ডাচদিগের কারবার-গৃহগুলি উদ্ধার করেন, কিন্তু পাঠানদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করেন। এই সময়ে মুরশিদকুলি খাঁ নামক এক প্রতিভাপন্ন ব্যক্তিকে আরঙ্গজেব রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা 'দেওয়ান' করিয়া পাঠান। মুরশিদকুলি খাঁ যৌবনে মুসলমানদের হাতে পড়িয়া হাজি মুস্তফা নামে

ইসপাহানে নীত হন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু বলপূর্বক তাঁহাকে মুসলমান করা হইয়াছিল। তখন ইহার নাম হইয়াছিল মহম্মদ তাকি। ইনি প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদে কাজ করেন, তখন নাম হয় জাফর খাঁ। হায়দ্রাবাদে ইনি আরঙ্গজেবের সুনজরে পড়িয়া দেওয়ান হন, তখনকার নাম কায়েদ খাঁ। বঙ্গের দেওয়ান হইয়া ইহার নাম মুরশিদকুলি খাঁ হইল। ইনি বাঙ্গলার তৎকালীন রাজস্ব বিভাগের বেবন্দোবস্ত মিটাইয়া সেরেস্তা পর্যন্ত দুরস্ত করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রিয়, এজন্য সুলতান ইহাকে ঈর্ষা করিতেন। কিন্তু যতবার ইহার সহিত আজিম ওশানের সংঘর্ষ হইয়াছে, ততবার সম্রাট্ রাজকুমারকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিয়াছেন। সুতরাং সুলতান ইহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। জবরদস্ত খাঁ পাঠানদিগকে পরাস্ত করার পর সুলতানের সহিত দেখা করিতে যান কিন্তু আজিম ওশান তাঁহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া উপেক্ষার ভাব দেখান। জবরদস্ত খাঁ পলায়ন করেন। পাঠানেরা আবার মাথা জাগাইয়া লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। সুলতানের সহিত শেষ যুদ্ধে পাঠানেরা জয়ী হওয়ার মধ্যে আসিয়াছিল, এবং আজিম ওশানেরও মৃত্যু প্রায় অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু হামিদ খাঁ নামক মোগল পক্ষের এক আমীর হঠাৎ বিদ্রোহি-নেতা রহিম খাঁকে নিহত করায় পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

ইংরেজরা নিজ প্রয়োজনের জন্য সুলতানের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন করিয়া পাঠান, তাঁহারা কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই তিনটী স্থানসম্বন্ধে নানারূপ সুবিধা প্রার্থনা করেন এবং বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিতে থাকেন। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবার পূর্বে একটা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়াম আরঙ্গজেবের নিকট উইলিয়াম নরিস নামক এক রাজদূত প্রেরণ করেন—ইনি বহু কষ্টে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিয়া ইংরেজদের পক্ষে অনেকটা সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে সংবাদ আসিল যে তিনখানি মোগল জাহাজ মক্কা যাত্রীদিগকে লইয়া ফিরিয়া দেশে লইয়া আসিতেছিল ইংরেজ দস্যুরা তাহা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছে। সম্রাটের ক্রোধ দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল, তিনি রাজদূতকে ("He must know that war will be made to England" Norris, p. 484) ইংলণ্ডের পথ চিনিয়া যাইবার হুকুম দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ দস্যু আর জলপথে হজযাত্রীদের উপর দৌরাত্ম্য করিবে না—তবে তিনি তাঁহার বিষয়টি সুবিবেচনা করিবেন এবং এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াও তিনি অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন, কিন্তু রাজদূত এরূপ দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না। ইংরেজ দস্যুদের উৎপাত জলপথে ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সম্রাট্ হুকুম দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যত য়ুরোপবাসী আছে তাহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

মুরশিদকুলি খাঁকে সুলতান যড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করিবার জন্য আবদুল বাহিদ নামক এক গুণ্ডাকে নিযুক্ত করেন। মুরশিদকুলি দেওয়ান হইয়া সমস্ত রাজস্ব-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। সম্রাট্‌প্রদত্ত ক্ষমতার বলে জমিদারগণ তাঁহার

আদেশ অমান্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাদের দেয় রাজস্ব অনেকগুণে বাড়াইয়া সম্রাটের অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন, রাজকুমার সুলতান আজিম এশানের আদেশ মান্য না করিয়া দেওয়ানকে তাঁহারা ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিতেন। এই কারণে এবং ঈর্ষার বশীভূত হইয়া তিনি ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, মুর্শিদকুলি উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের জন্য সেই অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল, বরং মুর্শিদকুলি সর্ব্বসমক্ষে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া তাঁহার সহিত সম্মুখযুদ্ধযুদ্ধের আহ্বান করিলেন। দুর্মার ভয় পাইয়া অনেকক্ষণে নিজদোষ গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন। আজিমের এই ঘটনা জানিতে পারিয়া শোহরৎকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভৎর্সনা করিয়া এবং নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন, বাঙ্গলা ছাড়িয়া তাঁহাকে বিহারে থাকিতে আদেশ দিলেন। মুর্শিদকুলি দেওয়ানীর সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সুলতানের বিনা অনুমতিতে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন।

সম্রাটের আদেশ অনুসারে হাজিপুরে বন্দী হইলেন। ৪১ দিন তাঁহারা কারাবাস করিয়াছিলেন, মুরাদের মৃত্যু কথা অনুসারে হুগলীতে ফিরিয়া আসিলেন। সুজাকে মুর্শিদাবাদে তাঁহারা স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, সুতরাং ইংরেজেরা দেওয়ান সাহেবের সেক্রেটারীর নিকট অনেক অভিযোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এদেশের কারবার একেবারে উঠিয়া যাইত কিন্তু সুলতান আজিম এশান তাঁহাদের প্রতি সদয় ছিলেন, এবং মুর্শিদকুলি তাঁহার কার্য্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন। সুলতান হাজিপুরে বন্দী ইংরেজ বণিকদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আসিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহাদের আসিতে আরও ৩৬ দিন লাগিল। এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানির দুই দলের মধ্যে অনেক মনান্তর হইয়াছিল এবং সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হয়। কোম্পানির ডিরেক্টরেরা একত্র হইলেন এবং তাঁহাদের লিখিত বহু অর্থ দিয়া উইলিয়াম হুর্গে সঞ্চিত রহিল।

এই সময়ে (১৭০৬ খৃষ্টাব্দে) আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তিনি মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্য তিন ভাগ করিয়া তিন পুত্রকে দিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা কেহ মান্য করিতে লাগিলেন। আজিম সাহ পিতার বিরোধাচরণে বলিলেন, বঙ্গের অসন্তোষ তাঁহার আজিম এশান সিংহাসনের লাভ করিয়া অগ্রসর হইলেন, আগ্রার শাসনকর্ত্তা আজিম সাহের পক্ষ আজিম এশানের পরাজয় করিলেন এবং আজিম সাহ বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এককোটি টাকা রাজস্ব দখল করিয়া শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিলেন। তাঁহার নিজ সহবিলে এক কোটী টাকা ছিল। এই বিপুল অর্থে তিনি অযোধ্যা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আগ্রার নিকটে জাজু নামক স্থানে আজিম সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে আজিম সাহ ও তাঁহার দুই পুত্র নেলার বন্দুক এবং বাহুতে নিহত হইলেন (১৭০৭ খৃঃ)। আজিম এশানের পিতা মহম্মদ মাজিয়ার "শাহ আলম" উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। আজিম এশান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সহি আলমের মস্তিষ্ক খারাপ হওয়াতে সাম্রাজ্যের ভার অনেকটা আজিম এশানের

উপর পড়িল ১৭১২ খৃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল আজিম ওশানের পুত্রদের আমির উল ওমরা প্রভৃতি মন্ত্রণা চলিয়া [illegible], তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ মতলবমতো ফিরুখসিয়ার এবং রফী উদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দিলেন, আবার কিছুদিন লড়াই চলিল। ফারুখ আহমদ আজিম ওশানের আর একটি পুত্র বন্দী হইয়া বাদশাহের নিকট আনীত হইল এই সময় আজিম ওশানের জ্যেষ্ঠপুত্র বেঁচে ছিল, মতান্তরে [illegible] মারা" উপাধি লইয়া আগ্রার তক্তে বসিলেন

মুরসিদকুলি খাঁ—১৭০৭-১৭২৫ খৃঃ

১৭০৭ খৃ অব্দের অনেক পূর্ব হইতেই মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গদেশে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজিম তাঁহার পুত্রকে [illegible] বাদশাহ কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার [illegible] হইয়া এদিকে বেশী মনোযোগ দিতে পারেন নাই মুর্শিদকুলিই প্রকৃত [illegible] ছিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আজিম ওশানের মৃত্যু হইলে মুর্শিদকুলিই [illegible] হইলেন [illegible] তাঁর স্থায়ী বন্দোবস্ত আরম্ভ করেন। [illegible] এবং [illegible] হইয়া [illegible] সকলকে সম্ভবতঃ তাঁহার অধীনে [illegible] করেন তিনি হিন্দু-জমিদারদের প্রতি [illegible] করেন ক্রমশঃ তাহার [illegible] করিয়া তিনি [illegible] হিন্দু ও মুসলমানদিগকে [illegible] করিতে লাগিলেন এমন কথিত হইয়া [illegible] একরূপ কাড়িয়া লইলেন সমস্ত জমির মাপ হইল পরের সময় কোন সম্পত্তি [illegible] রহিল না, নবাব সরকারের [illegible] [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible] যাহা কিছু সম্পত্তি জমি ও [illegible] [illegible] ক্রমশঃ রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার [illegible] [illegible] করার অধিকার লাভ করিল রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য জমাদারোপরি লাভন ও কয়েকজন চরম [illegible] ব্যবস্থা করিতেন এই [illegible] কর্মচারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন [illegible] [illegible] [illegible] খাঁ [illegible] আবদুল [illegible] [illegible] [illegible] কখনও [illegible] [illegible] [illegible]

চুনাখালির কাছারির বৃন্দাবনের নিকট এক মুসলমান ফকির সওয়াল চাহিতে আসে ইহার শরীরে অত্যন্ত শক্তি থাকায় ও বিরক্তিকর দেখায় বৃন্দাবন তাহাকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দেয় ফকির কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিয়া একটা ছোট মসজিদের মত ঘর তৈয়ার করে মুন্সেফের বাড়ির কাছে এই কাণ্ডটা করে ইহাতে দাঁড়াইয়া ফকির নিকট চীৎকার করিয়া মোকদ্দমার সওয়াল পাঁচবার আহ্বান করিত বৃন্দাবন ঐ পথে যাইবার সময়ই ফকির ঐরূপ চীৎকার করিত বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবন খানকতক রুটি ফেলিয়া দিয়া ঐ ফকিরকে তাড়াইয়া দেয় ফকির মুন্সেফকে খাঁর সকট সম্পর্ক করে কাজি মহম্মদ করাফ্ এবং অপর একজন আইনজ্ঞ মুসলমান বিচারক এই মকদ্দমার বিচারের ভার গ্রহণ করেন কাজি মহম্মদ করাফ পাদরেত্রা অপেক্ষা ২।১ বৎসরের পুরোবর্তী বা কনিষ্ঠ ছিলেন সকলেই মরিচঝুঁকি নামক নূতন মহকুমার পাকা দেখা করিয়াছিলেন কিন্তু কাজি করাফের মৃত্যি এত বড় পণ্ডিত ও ধর্মাত্মার সাক্ষাৎ কখনও হয় নাই কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত যত বড় বড় ধর্ম্মগুরুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে নামধেয় হইতে-ছেন এরূপ আর ২।১ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অথচ আশ্চর্য্য এমন যখন এই সংবাদটি, আরব দেশের কোন ধর্ম্মগুরু শুনিলেন তখন আরবদেশে লিখিলেন "কাজি যাহা করিয়াছেন তাহা ঈশ্বরানুমোদিত" তখন এই কাজি করাফ বাঙ্গালার জন্য একজন প্রতিনিধি করিলেন তখন এই প্রতিনিধিকে দেখিবার জন্য সরকার হইতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজা সীতারাম রায়

মরিচঝুঁকি নামক নূতন মহকুমার প্রধান ঘটনা—সীতারামের অভ্যুদয় ও পতন সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ রামদাস রায় নামক কোন ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্র রামদাস রায় এত বড় লোক ছিলেন যে ইঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে স্বয়ং রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশী মহকুমার কুলিয়া গ্রাম ইঁহার বাস ছিল তথায় ইঁহার নির্ম্মিত দীঘি ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে অনন্তরাম এই রামদাসের পুত্র অনন্তরামের দুই পুত্রের মধ্যে সীতারাম ধনাঢ্যের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন অনন্তরাম হইতে সপ্তস্থানীয় হিমকর রায়ের পুত্র সীতারাম মুসলমান সরকার হইতে "রায় বিদ্যান" উপাধি প্রাপ্ত হন

সীতারাম "গাঁ বিশ্বাস" মহাশয়ের প্রতিপাল্য ও [illegible] পুত্র ইঁহারা উভয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই বাহুবলে গজদন্তের পর হইতে ইঁহাদের অবস্থা কতকটা অবনত হইয়াছিল সীতারামের পিতামহ [illegible] কার্য করিয়া "[illegible]" উপাধি লাভ করেন, তখন হইতে আবার এই পরিবারের অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়

বার ভূঁইয়ার অন্যতম ভূষণার রাজা মনুজ রায় ও তৎপুত্র সত্যজিতের মোগলদিগের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সত্যজিতের মৃত্যুর পর উক্ত পরগণা ইসলামাবাদ ফৌজদারের হস্তে পড়ে উহা মোগল সাম্রাজ্যের এক বিশৃঙ্খল অরাজক সীমান্তে সংস্থাপিত হওয়ায় ভূষণার উপস্বত্ব ভোগ করা [illegible] হইয়া উঠিল। এজন্য ফৌজদারগণ পূর্ববঙ্গের বিশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টি কক্ষা হওয়ায় ভূষণার প্রজারা প্রকৃত করেন ইঁহারা "রাম বেহা" নামক এক পুরুষ ধরিয়া ভূষণার কানুনগো হইয়া আসিতেছিলেন। মোগল সরকারে উঁহাদের বেশ মান প্রতিপত্তি ছিল। ভূষণার কর্তৃপক্ষের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না [illegible] ভূষণার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ভূষণা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে অনুমান ১৬৫৮ খৃঃ [illegible] সময়ে [illegible] গর্ভে সীতারামের জন্ম হয়

ইঁহার [illegible] ভূস্বামিবংশের কার্য করিতেন, সীতারাম বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় অনুরাগী ছিলেন কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া খেলা দিয়া করাই তাঁহার প্রধান কার্য ছিল প্রাণভয় তাঁহার থাকে না তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের কথা ক্রমে পড়াইতে হইল। তখন ভূষণা পরগণায় একদিকে অরাজকতা, অপরদিকে পাঠানবিদ্রোহ। সীতারামের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। সাহসী ও ক্রীড়া হইয়া সীতারামকে ভূষণার কতকগুলি পরগণা জায়গীর দিলেন

এই পরগণা খুব বড় ছিল, কিন্তু দস্যুতস্করদের অত্যাচারে ইহা একরূপ জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল সীতারাম ইহার শ্রী ফিরাইয়া দিলেন অরাজকতা ও সন্ত্রাসিকের পর ভূষণা পাঠান কীর্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল সীতারাম দস্যু তস্করের যমস্বরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দস্যু ছিল—তাঁহার নাম বক্কার খাঁ এই দস্যুপতিকে পরাস্ত করিয়া সীতারাম বন্দী করিলেন বক্কার খাঁ সীতারামের সাহস ও অমিতবিক্রম দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় দলবল লইয়া সীতারামের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন অন্যান্য দস্যুরা সীতারামের নাম শুনিয়া দূরান্তরে চলিয়া গেল। নলদি পরগণায় শত শত লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল সীতারাম বহু দীঘি খনন

* কথিত আছে বক্কার খাঁ যখন প্রথমে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন "এখানে প্রভুর ঘরে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ?" উত্তরে বক্কার বলেন "পাঠানজাতি" তখন সীতারাম হাসিয়া বলিলেন "তবে আমি পাঠান।"

করাইয়াছিলেন। অবশ্য এই ব্যবস্থা যখন ব্যাপারের অন্যতম উদ্দেশ্য সৈন্য সংগ্রহ করা। প্রকাশ্যভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিলে উহা নবাবের নজরে পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি নাম মাত্র কয়েক সহস্র লোককে মাত্র সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেন একজন লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া নূতন দল নিযুক্ত করিতেন এই ভাবে বহু লোক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল প্রয়োজন হইলে তাহারা সীতারামের আহ্বানে একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত উড়িষ্যার পরগনায় মগ, পাঠান ও দক্ষিণের অন্যান্য সিপাহীরা নিযুক্ত হইয়া বহুদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাহম্মদা বা সীতারামের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রাগারের কার্য্য তাঁহারা করিতেন তিনি আবদুল্লাহের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি সনন্দ আনাইয়া লইয়াছিলেন অনুমান ১৬৮৭-৮৮ খৃঃ অব্দে সীতারাম এই 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

নরাশ পরগনা, মহম্মদশাহীবাসে আসিয়া হওয়াতে হওয়ার আয় খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, ইহা ছাড়া সাহেব পরগনার অনেকটা ইজারা লইয়াছিলেন তাঁহার প্রতাপ এখন প্রবাদবাক্যের ন্যায় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হইল তিনি বিপুল উদ্যমে সৈন্যসংগ্রহ করিলেন সরকার হুগলীর আয় ছিল ৩৮,৯৭১, টাকা মাত্র, তাহা সীতারাম বলেন "হুগলীকার দিলে তাহা অন্যূন দুই লক্ষ টাকার সমান।" (৫৩৯ পৃঃ)। রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক যেরূপ বহু ঘটার সহিত অভিষেকাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বহুদিন কোন হিন্দু রাজা বাঙ্গলায় সেরূপ করেন নাই। লোকে মুখে মুখে বলিত, যেহেতুক সীতারাম বাঙ্গল বাহুড় তাঁর ঘরে ছাকোড় ছয়ে খেলে ঘর যার হাড়ুয়ে একটি দাঁত খুয়ে ঘর যায় রমা শ্যামা পুটলী বাঁধি গঙ্গাধামে যায়।"

যৌবন হইতে বিদ্যাজির মত সীতারাম সমস্তদিন হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে ক্রমে কয়েকজন অসমসাহসী যোদ্ধা তাঁহার সহায় হইয়া জুটিল, ইঁহাদের একজনের নাম "মেনা হাজী" বস্তুতঃ তাঁহার বিরাট দেহপুষ্ট দেহ ও বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিলে তাহাকে ছোটখাট একটি হাতী বলিয়াই মনে হইত সম্ভবতঃ ইঁহার নাম শুনিলেই অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলাইত ইঁহার প্রকৃত নাম রামরূপ ঘোষ। আকনার দক্ষিণ-বাড়ীর ঘোষবংশীয়। অপর একজন নাম মুসলমান ঘোষ, খুলনা জেলার বজরজ পরগণা মুসলমানের ও সাহায্যক মহম্মদ ও মেনা হাজীর সৈন্যের বল ও অদম্য উৎসাহ—সীতারামকে সহজেই পরাজিত করিত তাহা ছাড়া পাঠান বন্দুকধারী, মোগল আমল বেগ, রণপাঁয়ে ঢালী ও ফাঁকরা। মাছুয়াটী। প্রভৃতি সেনাপতিও যুদ্ধকালে তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিল এই নবগঠিত সৈন্যদলের মধ্যে অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সীতারামের জীবনলেখক অতি যত্নবান্ রমা, শ্যামা, শুন্তো শ্যামা, বিশে, ভবে, কালা নিমে ঘোষ, ভুলো, ভগা ও মেঘো—এই কয়জন প্রধান সর্দ্দারগণের উল্লেখ করিয়াছেন, সকলেই বাঙ্গালী ছিল এবং ক্রমে সীতারামের সঙ্গীভূক্ত হইয়াছিল রাজা সীতারাম পাঠান

[illegible] লইয়া [illegible] ছিন্দু-মসলমানে [illegible] [illegible] [illegible]

পাগলা অধিকার করিয়া লইলেন।

উপরে হইত।

হইল

পূর্ব্ব হইতেই কিছু আপত্তি ছিল। সেনাপতি কিছুতে সহজে তাহা ছাড়িলেন না। তখনও আলিবর্দ্দী খাঁ ও তাঁর ভ্রাতা হাজি আহম্মদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন নাই। সেনাপতি ভাবিলেন, এই সময় যদি তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অধিকার সম্বন্ধে কোনও গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ভাবিয়া তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেনাপতি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, নবাব সরফরাজ খাঁ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সেনাপতি নবাবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, তাঁহার সৈন্যগণকে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী গ্রামে স্থান দিতে আদেশ করিলেন। সেনাপতির সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী গ্রামে স্থান লইল। সেনাপতি নবাবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, তাঁহার সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইলেন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করিয়াছেন। অপর মহারাষ্ট্রেরা কেবল মুলুকগিরি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সীতারাম তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের গঠন-কার্য্যে একনিষ্ঠ সুপ্রযত্ন করিয়াছিলেন। যখন মুরশিদকুলি খাঁ রাজস্ব দেওয়ায় দেরি হইলে রাজস্ব জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া 'কৈকুটে' নিক্ষেপ করিতেন, সেখানে পূর্ণমাত্রায় জল উঠানামাকে অনাহারে মরিতে হইত, তখন সীতারাম অটলভাবে দাঁড়াইয়া জমিদারদিগকে বলিতেন, "রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কর।" তিনি জানিতেন—এই সংগ্রাম শুধু মুর্শিদাবাদের সঙ্গে নহে, সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্যের মালিকের হিমাদ্রিপ্রমাণ গুরুতর রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম, সেই বিশাল বপুর নিষ্পেষণে তাঁহার মহম্মদপুর বুদ্বুদের মত বিলীন হইবে। শত্রু যেমন আগ্নেয়াস্ত্রে বোঝাই কামানের পর কামান দাগিয়া চলে—সেইরূপ তিনি এই বিপদকে বরণ করিয়া লইলেন। এ যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ নহে—বাদশা জাঁহাঙ্গীরের সময়েও শক্তির সহিত মানসিংহের যুদ্ধ নহে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ছিল, এই যুদ্ধ লইয়া মহম্মদপুরের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের। এ সকল জানিয়া ও তিনি মুরশিদকুলি খাঁ-কৃত হিন্দু জমিদারদের অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, জোরজার করিয়া থাকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি রাজস্ব দিবেন না। যখন তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি অগ্রসর হইলেন যে সকল হিন্দু জমিদার তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা বলিয়াছিলেন মুরশিদকুলি খাঁর পক্ষাশ্রয়পূর্ব্বক সীতারামকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। স্বয়ং জগদ্রাম রায় বঙ্গদেশ তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়া মোগল সৈন্যের দলভুক্ত হইয়া মহম্মদপুরে অভিযান করিলেন, শুধু যুদ্ধ লাগাইয়া মেনা তাঁহাকে অকর্মণ্যভাবে বন্ধ করিলেন। মুরশিদকুলি শত্রু হইলেও ভীরু ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নরমুণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কি করিয়াছ? এরূপ বিশালকায় বীরকে না মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা উচিত ছিল।" ("The Nawab seeing the huge head said, 'A man like that you should have brought alive and not killed!' He directed the head to be taken back to Mahammadpur and it was there buried and a great tomb raised over it." Westland's Report, p. 27.) সীতারামের সহিত বারম্বিয়ায় মোগলদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ৬০০ মুসলমান সৈন্য নিহত হয়।

দয়াবাদের দ্বারাই সীতারামের পতন ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত মহম্মদপুরের দুর্গ সমাশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বন্দী হইয়া তিনি মুরশিদাবাদে নীত হন। তাঁহার বহু পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার তিন বিবাহিতা পত্নীর মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গী লেখক আপনাকে সীতারামের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া অনুসন্ধিৎসু ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্দরমহলের বহু রমণীর মধ্যে দুই একজন খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তাঁহার দেশীয় লোকের শত্রুতার ফলে তাঁহার পতন হইয়াছিল, তাঁহার রাষ্ট্রনীতি আদর্শ নরপতির যোগ্য ছিল। তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা সম্রাটের যোগ্য ছিল। অদম্য বীরত্ব, সাহস, ন্যায়বোধ প্রভৃতি গুণে তিনি জগদ্বরেণ্য মহাবীরদের পর্য্যায়ভুক্ত হইবার উপযুক্ত।

তিনি নিজের দোষে সিংহাসন হারান নাই। "ক্লান্তি যার অভিশাপে, গতিহীনের পথ্য যারা"—নিষ্ফল লোক যদি পর হয় স্বজনের বাস হোই হয়—তবে বিলাস অভিলাষ ভবিতব্য ইতিহাস—বিশ্বের বিক্ষুব্ধতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে। যেমন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মুরাদবক্স, মুক্তাকাক্ষার অভিনয়, রাজ্যের প্রধান ছাড়ি পদের হাত্যার মৃত্যু হইল—যাঁহার সহিত্যের ইন্দ্র কত বস্তুর অভ্যুচ্চ হইতে সহজেকে বাঁচাইয়াছেন বিশ্ব ভ্রাতার রাজ্যের সুখনের জন্য বন্দিত্ব টেম্পলের নাইটের ন্যায় আপনাকুলা বলার আগে বাঁচাইয়াছিলেন, কুটিল কৌশলে ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া, অবশেষে হত্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুকের মতো ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ যখন পৌঁছিল তখন সাজাহান হত্যা করিয়া যে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাহার চতুর্দিকে আজও আমরা আমাদের জন্যের অনুশ্রুত করিতেছি। ১৬১২ খৃ অব্দে যে শাহজাদার মৃত্যু হইয়াছিল ভক্ত ১৬৫৮।৫৯ মৃত্যু ১৭১২ সুতরাং মৃত্যুকে যে কতবার বহু ক্রম ৫৯ বৎসর এই সংসার হইয়াছিল

আট পরিচ্ছেদ

পরবর্তী বাদসাহগণ

মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ইংরেজদের বাণিজ্যসম্বন্ধে অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইংরেজেরা বৎসরে শুধু ১,০০০ টাকা শুল্ক দিয়াই মুক্ত চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা বাদশাহ ও অন্যান্য প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার, তাহা হইতে সেই সুবন্দোবস্ত চাহিয়াছিলেন। মোগল বেগ আরব বাণিজ্যেরা যেরূপ সামান্য শুল্ক হইতে মুক্ত, ইংরেজেরা সেইরূপ মুক্তি পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সকলে এই আবদারের প্রকৃত মর্ম বুঝে নাই। তাঁহার শুল্ক বন্দরাদির মহাশয় পত্র অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি জানিতেন সমুদ্রকূল দিয়া ইংরেজ বণিক্‌ বাঙ্গালার বাণিজ্য বর্ধিত করিয়া অনেক সুবিধা করিয়া লইতেছিলেন। সুজাবর্দ্দী যখন নবাব একখণ্ড ছিন্ন কাগজের মত উড়াইয়া দিলেন, তখন তাঁহারা স্বভাবতঃ বৃদ্ধ বাদশাহ ফেরোকশেয়রের নিকট আবেদন করিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা সম্রাটকে যে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইলেন, তাহার মূল্য ৩৫,০০০ পাউণ্ডের কম নহে। ইংরেজদের পক্ষে খোজা সরহদ সম্রাটের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া ৫০,০০০ পাউণ্ড দিতে স্বীকার করিলেন, সম্রাট সন্ধি যাহাতে নির্বিঘ্নে পৌঁছিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু এত খরচ করিয়াও ইংরেজেরা খুব সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নবাব মুর্শিদ, ইংরেজেরা তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া খুব অন্যায়রূপ সাধা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং বাদশাহকে বিস্তর উৎকোচ দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে উদ্যোগী। তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হুসেন আলি খাঁর দ্বারা আবেদনের বিরুদ্ধতা করিতে উহিয়া পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু

এই সময়ে তৈমুর ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত [illegible] ফেরোজ্‌শেহার বংশপুত্তরাজগণের অন্যতম [illegible] সুলতান ফরুখ্‌শিয়র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, সব ঠিকঠাক, এমন কি কক্ষা রাজধানীতে [illegible] হইয়াছিলেন,—এই সময়ে সম্রাট হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইলেন, বোধ চিকিৎসকেরা তাঁর [illegible] ইংরেজদের ডাক্তার ক্রকটন অনুসন্ধিৎসু করায় সম্রাট ফেরোক্‌শেয়রকে নীরোগ [illegible] করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রাণরক্ষা হইলেন ডাক্তার যাহা চাহিলেন তাহাই [illegible]। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ না মুক্তিলাভ তাহাদের আবেদন-মঞ্জুরের প্রার্থনা করিলেন। [illegible] ১৭১৫ সালের ফাল্গুনে ডাক্তার কাটার মোগল ফেরোক্‌শেয়রের ফার্মিলটনকে অনেক [illegible] উপঢৌকন ও তাহার সুপারিশে কয়েক দফা মঞ্জুর করিয়া দিলেন, কিন্তু বাণিজ্যসংক্রান্ত [illegible] সম্বন্ধে বাদশাহকে বিশেষ কিছু বলিতে বলিলেন, আবেদন যাহারা পড়িল হলেন [illegible] যাঁর কাছে সুবিধা আদায় সিধাই, অন্তঃপুরের এক খোজাকে উৎকোচ [illegible] বশীভূত করা হইল মত স্থিরকের পর ঐরূপের মত এই উৎকোচের ক্রিয়া হইলেই [illegible] কিন্তু নবাব বাদশাহের ডাকে কাগো পাঠাইতে হুকুমের পরে প্রকাশ্যভাবে না পাঠাইয়া, নানারূপ বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। একটা ছলা এইরূপ ছিল যে, ইংরেজগণ [illegible] সঙ্গে ১৫ খানি পত্রী লইয়া যাইতে পারিবেন। সকলেরা ইহা হইলে [illegible] হইয়া উঠিলেন যে যদি উইলসনের কোরে পরে আর তাহারা নবাবের প্রতিপক্ষতা করিতে [illegible] করিবেন। নবাব তখনিকে ডাকাইয়া বলিলেন, হক মুলাই দিক না কেন [illegible] যত বিদেশীদিগের নিকট তুমি বিক্রয় না করিবে। মুর্শিদকুলি খাঁ [illegible] যে সকল কর্মচারীর মহল্লা চালানের বলে যে সকল সুবিধা দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল।

এই সময়ে ফরোক্‌শেয়রের নিকটস্থানে নিহত হন (১৭১৯ খৃ)। মহম্মদাবাদের [illegible] পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল কিন্তু হুসেন কোকলাস আসান আলি খাঁ তাহাদিগকে [illegible] দমন করেন। তাহারা মুর্শিদকুলির নিকট সর্বসাকুল্যে ৬০,০০০ টাকা লুট করিয়াছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ সেই টাকা পাঠানদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। তাঁহারা একে পাঠানদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এই অপরাধে পাঠানদের সমস্ত জমিদারি তিনি তাঁহার প্রিয় রামজীবন নামক এক হিন্দুকে প্রদান করেন। রামজীবন রাজমহলের [illegible] জমিদার ছিলেন। নবাব ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবেহারের রাজাদের সঙ্গে ঈর্ষিতসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই সকল রাজারা একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। নবাবের অত্যাচারে বঙ্গের হিন্দুজমিদারদের কাহার একেবারে হইয়াছিল; কেবল বীরভূম ও বর্দ্ধমানের রাজারা [illegible] অর্থলোভে রাজধানীতে কতকটা নিরাপদ হইতে পারিয়াছিলেন।

[illegible] হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে [illegible] করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্য ধর্মাবলম্বীরাই সম্ভবপর বোধহইতে পারেন। তিনি মোগল-সম্রাট আরঙ্গজেবের প্রিয় ওমরাহ ছিলেন এবং মোগলগণ সেই সূত্রেই তাঁহার আদর্শ ছিলেন। তিনি ১০,০০০ সৈন্য ও গায়ক বাদকদের নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সদাসর্বদা তাঁহার কাছে

ফৌজদারি আদালত করিতেন। মুসলমান বিচারকগণ কিন্তু বহু উৎকোচগ্রহণের সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। কথিত আছে যিনি একবার কিছু উৎকোচ গ্রহণ করিতেন, বিচারে ও পারিতোষিকে সন্তুষ্ট থাকিতেন। কখনো কাহারও নিকট হইতে কোনো উপঢৌকন গ্রহণ করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাঁহার খুবই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক একমাত্র গৌড়বাসীই তাঁহার দোষ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তিনি প্রজাদের উপর অত্যধিক কর ধার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে কোনো নবাব এত অধিক কর ধার্য করেন নাই। কাফেরের দুঃখ দুঃখ নয়, কাজেই তাহারা নবাবের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে নাই। তাঁহার পুত্রগণ সিংহাসনের জন্য কলহ করিতে লাগিলে তিনি তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা জামাতা সিংহাসনে বসিবেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মরিল। সুজা উদ্দীন নবাব হইলেন।

সুজা উদ্দীন নবাব হইয়া রাজা হিন্দুকর্মচারিদিগকে মুক্ত দিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্বস্ত ও কর্মদক্ষ বিবেচনা করিয়া নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগে নবাব সৈন্য অকর্মণ্যতার অজুহাত পাইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। আর্মেনিয়ান ও ফরাসি মোগলসম্রাটের বহুমূল্য স্বীকার করিয়া বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হন। ইংরাজ এই কথা লিখিয়াছেন। এই সময়ে ফরাসিরা নবাবের সনদ পাইয়া হুগলীতে কোম্পানির নামে ইংরাজদের কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে তাঁহাদের এক বিস্তৃত কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ডাচ ও ইংরেজগণ তাঁহাদের বিপক্ষতা করিয়া নবাবের কর্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করাইয়া ফরাসীদের নামে মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত করেন। ফলে নবাব সৈন্যদল পাঠাইয়া ফরাসডাঙ্গার কারখানাটি ধ্বংস করিয়া সমুদয়ে ফরাসি বণিকের ফরাসডাঙ্গা ছিনিয়া দখল করেন। এই নবাব বঙ্গের রাজস্ব এক সংস্রবের মধ্যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ টাকায় পরিণত করেন। জমিদারদের প্রতি তাঁহার পূর্বে নবাবের কড়া শাসনে রাখা হয় নাই—সুজা উদ্দীনের উদারনীতির ফলে তাহা হইল। ইনি মারহাট্টাদের অত্যাচারের সময় বাঙ্গলার অধিবাসীদের ও মোগল এই দুইয়ের মধ্যে দেখা সংঘর্ষ করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করেন। ইহার ৫০০ রাজকর্মচারীর

যাহা হউক তিনি হিন্দুর কিন্তু খুব ভালবাসিতেন। তাঁহাদের একজন রায় আলমচাঁদ ইঁহাকে সকলে "রায় রায়া" বলিয়া ডাকিতেন। অনেক জনশ্রুতি আছে, ইঁহাদের পরামর্শে কত কতিয়াই ইনি সরকারী আয় হইতে বাদ দিতে অগ্রসর হইতেন। ইঁহারা নবাবের এত প্রিয় ছিলেন যে মৃত্যুর পূর্বে যে সকল চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া গুপ্ত সম্পত্তি খাঁকে রক্ষা করিতে আদেশ করেন। তাহার পরেও এক সময়ে যে তিন লক্ষ টাকা বাদ দিতে হইয়াছিল। ঐ অর্থ লইয়া কাজ করিবেন। মারজুমলা যেরূপ কার্যদক্ষ পরিশ্রমী ছিলেন। সুজা ঠিক সেইরূপই অপরিমিত বিলাসী ছিলেন, তিনি কাহার সহিতই বাহ্যতঃ বিরোধ সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৭৩৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারি আলিবর্দী খাঁ যখন উমিচাঁদ সম্প্রদায়ের অত্যাচার নিবারণ করেন। এই সময়ে যখন তাঁহার নায়ক জানকে অন্য এক সেনাপতি বিষ্ণুরাম রাজবল্লভের পুত্রকে কারাগারে হত্যা করিবার জন্য অর্থ দেন। কথিত আছে, সুজা উদ্ধারের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের একজন নাম করিয়াছিলেন।

সরফরাজ খাঁ—১৭৩৯-৪০ খৃঃ

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজা উদ্ধারের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯ সাল ৩০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সোয়া বৎসরের অধিক সময়ে ১,৫০০ বেগমী ছিলেন, ইঁহাদের লইয়া তিনি প্রমোদোদ্যানে দিন যাপন করিতেন কিন্তু তিনি সুলেখক ছিলেন না। কোন সুকবি রচনার কথা শুনিলে তিনি অত্যন্ত হইয়া যান অন্যায় দোষ চাপাইতেন। সম্রাটের আত্মীয়গণ তাঁহাকে ঐ সময়ে সাহস আক্রমণে নিহত করিবার জন্য গুপ্তভাবে কল পাতিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচর ইনি বাঙ্গলার ১৩০ সনের বাকী খাজনা আদায় করিতে পারিতেন। শুধু তাহাই নহে—আলম সাহেব সাহায্য করিয়া তিনি মুদ্রায় প্রচলন করিলেন। এই ঘটনা অবিলম্বে তাঁহার একদা গঙ্গাস্নান বাহকার করিয়া উত্তরকালে নিজাধিপ সম্রাট মহম্মদ সাহের মন এদেশের পক্ষে বিমুখ করিয়া দিয়াছিল। যে তিন ব্যক্তিকে নিজাম কাহার নিজের করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হাজি আহম্মদ একজন বাকী দুইজন আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠের কথা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। প্রথম প্রথম নবাব ইঁহাদের কথামত চলিলেন কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী হওয়া ইঁহাদের দুইজনকে বিষম চটাইয়াছিলেন। হাজি আহম্মদের নাতি ও নাতিনীর মধ্যে একটি বিবাহ স্থির হইয়াছিল ইঁহা ভাঙ্গাইয়া দিয়া কন্যাটিকে তাঁহার নিজের ছেলের সঙ্গে জোর করিয়া বিবাহ দেন। জগৎ শেঠের পুত্রের সঙ্গে একটি অপূর্ব-রূপসী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। জগৎ শেঠ তাঁহার পুত্রবধূকে নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যদিও নবাব কোন অত্যাচার করিতে সুবিধা পান নাই। এই ঘটনায় জগৎ শেঠের পরিবারে যে কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের উচ্চ কুলমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল। নবাবের অত্যাচার সম্বন্ধে এই সকল কথা এবং হাজি আহম্মদ সাহেব প্রভৃতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও সম্রাটকে অবজ্ঞা করার কথা অধিকাংশ লেখকই বর্ণনা করিয়াছিলেন

বং হাজি আহম্মদের মাতা আলিবর্দী খাঁকে নবাব করিলে সম্রাট্‌কে যে তিনি অপরিমিত অর্থ দিবেন তাহার এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সম্রাট্ ফাউকার শাসনকর্ত্তা আলিবর্দী খাঁকে গোপনে বঙ্গদেশের নবাব করার জন্য নিয়োগপত্র দিলেন। এদিকে হাজি মহম্মদ ও জগৎ শেঠ নবাবকে কুপরামর্শ দিয়া বাদ্‌শাহের উপরক্ত উত্তরে বহু সৈন্য বিদায় করিয়া দিলেন। নবাবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কিন্তু আলিবর্দী না নানারূপ বাক্‌-রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজে ও হাজি মহম্মদ এবং জগৎ শেঠ মিষ্ট কথা বলিয়া নবাবকে ভুলাইয়া রাখিতেন। তাঁহাদের লোকজনেরা বিদ্রোহীদলের জন করিয়া আলিবর্দী খাঁ তাঁহার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পাটনা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন মৌলভীর হাতে কোরান ও একজন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাজলের ঘটি ও তুলসীপত্র দিয়া সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণকে আহ্বান করিলেন। মুসলমান কোরান ও হিন্দু গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আলিবর্দী যাহা বলিবেন, প্রাণ হইলে অন্যায় হইলে তাহারা তাহা করিবে। এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, আলিবর্দী যে নবাবের বিরুদ্ধে যাইতেছেন তাহা তাহাদিগকে জানাইলেন। হাজি মহম্মদ, আলিবর্দী ও জগৎ শেঠ মহাশয়েরা এই চাতুরীর সাহায্য করিয়াছিলেন যে, যখন আলিবর্দী সৈন্য লইয়া একেবারে রাজমহলের নিকটবর্ত্তী, তখনও নবাব সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সত্যসত্যই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। শেষ দূতটি যখন শত্রুপক্ষের শিবির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে আলিবর্দী খাঁ সত্য সত্য, তখন নবাব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার মাতুল বলিল, এ অসময় যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া মধ্যে প্রাণ হারানোর কোন সার্থকতা নাই, বরঞ্চ তাহা ভ্রান্তবেগে ছুটে চলা মিষ্ট, রাজমহলের রাজার প্রবল সাহায্যে হয়ত বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইবেন। নবাব এ কথা শুনিলেন না, বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দীর বিরুদ্ধে মহাবীরের ন্যায় রণ করিতে রণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন (১৭৪০)।

আলিবর্দী খাঁ—১৭৪০-১৭৫৬ খৃঃ

নবাব সরফরাজ খাঁকে হত্যার পর মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই আলিবর্দী মৃত নবাবের মাতা জেনতুন্নেসা বেগমের শরণাপন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার গৃহদ্বারে যাইয়া সংবাদ পাঠাইলেন—"আমি নবাবকে হত্যা করিয়া অকৃতজ্ঞতার অনুতাপে পুড়িয়া মরিতেছি, আমি ক্ষমার যোগ্য নই, তথাপি ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি এই ঘোর পাপকার্য্যের পর আপনার মনে আর কোন কষ্ট দিব না, সর্ব্ববিষয়ে আপনার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব।" অনেকক্ষণ আলিবর্দী দ্বারে অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু শোকসন্তপ্তা মাতা কোন জবাবই দিলেন না। সুতরাং পুত্রহন্তা নবাবকে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইল। পাপটি কম গুরুতর নহে—নবাব সরফরাজ খাঁ স্বয়ং তাঁহার অন্যতম সুহৃৎ আলিবর্দীকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাকে হত্যা করা

কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য এই সকল গুরুতর অপরাধ, ভ্রাতৃহত্যা করিয়া আসিয়া বন্ধুত্বের ভান করিয়া অতর্কিতভাবে হত্যা করা—এই সকল ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কার্য মোগল ইতিহাসে শতবার দৃষ্ট হইয়াছে। মাংসাশীর লোভ অতি প্রবল, এজন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "মৃগমাংসিকঃ সে তাত, নিদয়ান বিশ্বয়ং হাস্ত"।

আলিবর্দী নবাব হইয়া সম্রাটের দরবারে অভিনব সংঘটিত এই সকল ক্রুর ব্যবহারের একটিও বাদ দেন নাই। কিন্তু শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে তিনি মুক্ত করিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে "দাবি অতি, দাবি যে কোনমতে" নীতি চালাইবার তিনি অপর সকলের সঙ্গে অবাধ ও মুক্ত প্রাণের উদারতা সুষ্ঠু রূপে অনুষ্ঠানের ও প্রকৃষ্টরূপে করা প্রভৃতি মহৎ গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল বাদশাহদের অনেকেই বংশের দুই ধারা দেখাইয়াছেন কিন্তু আলিবর্দী ছিলেন বংশের। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, একবার হেরে না করিয়া তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু কোন যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নাই। বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি একদণ্ড ভীত হন নাই, এবং প্রাণপ্রিয় অনুচর সুতরাং আত্মীয়দিগকে তিনি প্রতিভা, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের উচ্চশিখরে লইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা যখন অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছেন তখন সেই অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহারে তিনি তিলমাত্র ধৈর্য ছাড়া হন নাই। বাঙ্গলার বাদশাহদের মধ্যে আলিবর্দী সামরিক ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আসনগ্রহণের উপযুক্ত। শেষবয়সে যখন তাঁহার দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা বিদ্রোহী হইয়া পাটনা দখল করিতে অভিযান করিলেন—তখন সেই চিরস্নেহলালিত বালক তাঁহার ঐ অপকার করিলেন, তাহা মুহূর্তমাত্রও ভাবিলেন না, পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, গায়ে কি টের আঁচড়ের দাগ লাগে সেই ভাবনায় নিদ্রিত রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

তিনি রাজত্বের প্রথমেই মহাবদ্ধ বীর পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের জন্য প্রচুর টাকার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পূর্ববর্তী নবাবগণের সঞ্চিত বহু অর্থ লাভ করিয়া অকাতরে ও মুক্তহস্তে তাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন। সম্রাট মহম্মদকে এককোটি টাকা নগদ ও সত্তর লক্ষ টাকার উপযোগী উপঢৌকন সামগ্রী পাঠাইলেন। নবাব বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করিলেন। এইভাবে যখন স্থির হইয়া কেবল সিংহাসনে বসিয়াছেন তখন শুনিতে পাইলেন সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া যাহা পাঠাইয়াছেন তাহাতে খুশী না হইয়া অবশিষ্ট মসনদ দিয়া নবাবকে আনিবার জন্য এক প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছেন। আলিবর্দী এই লোকটিকে প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করিয়া, একটা হিসাব দাখিল করিয়া এবং সম্রাটের জন্য আর একটি মূল্যবান্ উপঢৌকনের ব্যবস্থা করিয়া মুরাদকে রাজমহল হইতে বিদায়পূর্বক পুনরায় সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিলেন। (১৭৪১ খৃঃ।)

ইহার পরে সুজা একদিন বাদশাহের জামাতা মুরশিদ খাঁকে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব হইতে বিদায় করিয়া নবাব সংকল্পে তাঁহার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের পুত্র সৈয়দ মহম্মদকে নিযুক্ত করিতে

সঙ্কল্প করিলেন। তিনি হুসেন খাঁর নিকট লিখিলেন—তিনি যদি স্বেচ্ছায় ঢাকা ত্যাগ করেন এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য ও পরিবারবর্গ লইয়া যে স্থানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অধিকারভুক্ত ও সিমলা হইতে প্রাণ নিরাপদ হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই প্রস্তাব সঙ্গত বা হইলে বুঝি কিছু গত্যন্তর নাই। মুরাদ খাঁ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে উহা হইলে তাঁহারা স্ব স্ব উপযুক্ত পরিবারের মধ্যে কিছু কিছু ধনরত্ন লইয়া ঢাকা ত্যাগ করিবেন। তাঁহার অধিকাংশ ধনরত্ন ঢাকাতেই রাখিয়া যাইবেন। সুতরাং যখন হইল আলি মর্দান খাঁ, তখন মুরাদ খাঁ ঢাকা হইতে বাহির হইয়া যে পথে তাঁহার আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন। আলি মর্দান খাঁ ও মুরাদ খাঁ, উভয়ে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু আলি মর্দান খাঁ যখন মুরাদ খাঁকে পুনরায় আসিয়া নৌকায় আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন মুরাদ খাঁ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি তাঁহার সঙ্গে যে কয়েকজন লোক ছিল, তাহাদিগকে বলিয়া গেলেন, তাহারা যেন আলি মর্দান খাঁর নৌকায় আরোহণ করে। তিনি

এককোটি টাকার প্রস্তাবের উত্তরে তাঁহা কিছু না বলিয়া—কপাল চুলকাইয়া বাদশাহ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবুক চতুর মধ্যে পাছে মুর্শিদকুলীর কাছারি হইতে পলাশীর মাঠপর্যন্ত প্রভুত্ব প্রসার করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার পূর্ণিয়া, দীনাজপুর ও রাজমহল প্রভৃতি স্থল অধিকার করিয়া বসেন, সুতরাং মুর্শিদাবাদ ও তাহার সন্নিহিত কয়েকটি পরগণার উপর আর কিছুই রহিল না। এই সময়ের পূর্বে বাঙ্গালার যে সকল বাদশাহী ফরমান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার সুবাদার ও দেওয়ানের নাম পাশাপাশি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখন হইতে দেওয়ানের নাম উঠিয়া গেল। সুবাদার নামে মাত্র বাঙ্গালার শাসনকর্তা রহিলেন, কিন্তু দেওয়ানের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হইল। সুবাদার নামে মাত্র বাঙ্গালার শাসনকর্তা রহিলেন, কিন্তু দেওয়ানের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হইল।

এই সময়ে নবাব আলিবর্দীর অনুমতিক্রমে হাজী আহমদ কলিকাতা অঞ্চলের চুঙ্গীঘরকে একটা পরিখা খনন করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই পরিখা মারহাট্টা ডিচ্‌ নামে অভিহিত হইত। ছয় মাসে তিন মাইল পর্যন্ত খনন করা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার দক্ষিণে এই পরিখা আসিতে তাহার পর আর খননকার্য্য চলে নাই।

নবাব এবার যুদ্ধের কথা প্রায়ই উত্থাপন করিতেন। সেইজন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সিরাজউদ্দৌলা মহসা মারহাট্টা শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি সুযোগ পাইলেই পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার সহিত যোগ দিবার আশায় রহিলেন। এদিকে নাড়োলরাজ ও আলিবর্দী খাঁ উভয়েরই পরামর্শদাতা ছিলেন, উভয়ের নিকটেই তাঁহার সম্মান ছিল। ভাস্কর পণ্ডিত ছয় মাস কাল কোনক্রমে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরের লোকেরা যখন শুনিল, মরাঠা ইঁহাদের রাজধানী লুট করিয়াছে, তখন রাজাকে তাহারা সমস্ত অবস্থা জানাইল, রাজা বলিলেন, "আমি কাল কিছু রামায়ণের কথা মদনমোহনকে শুনাব," এই বলিয়া তিনি সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত অনেক বসিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরদিন রাত্রে লোকেরা এক লম্বা কাঠি ক্ষণপ্রভাকে ভাষমতি পুকুরের মরাঠিদিগের নিকটস্থ আস্তানায় রাখিয়া আসিল। প্রাতে সকলে দেখিল মরাঠীরা অনেক গোলাগুলি নিকটবর্ত্তী স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরদিন মন্দিরের খুলিয়া দেখিল, মদনমোহন-বিগ্রহের সম্মুখে রাবণ, কুম্ভকর্ণ রাক্ষসের কাটা মাথা রাজলার ছড়াটির মর্ম্ম এই যে, মরাঠীরা পলাশীর পরে বিষ্ণুপুরে চড়াও হইয়াছিল। প্রজারা জানিল স্বয়ং ভগবান্ তাহাদিগের পক্ষ হইয়া মরাঠিগণকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। অকস্মাৎ অত্যাচারের বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা ইহা ভগবানের কৃপা এবং তাঁহারই বাহুবলের আশ্চর্য্য ফল মনে করিয়া সেই সুন্দর উক্তি ও রূপকবর্ণনাপূর্ণ ছড়াটি রচনা করিয়াছিল (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ)। মেদিনীপুরে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে নবাবের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মরাঠীরা হারিয়া যায়।

কিন্তু মরাঠীর হাঙ্গামা এখানেই শেষ হইল না। রঘুজী ভোঁসলা তাঁহার সেনাপতির পরাজয়-সংবাদে চটিয়া নিজে বহু সৈন্য স্বয়ং লইয়া বঙ্গদেশে আক্রমণ করিলেন। সকলেই

তানের মারহাট্টাদের ইতার মধ্যেই আজকাল উল্লিখিত হইয়াছিল বেরার অঞ্চলের নেতা ছিলেন রঘুজী ভোঁসলা এবং পুনার নিকটবর্তী স্থানগুলি বালাজীর অধিকৃত ছিল। যখন রঘুজী ভোঁসলা আলিবর্দীর বিরুদ্ধে আগমন করেন, সেই সময়ে বালাজী নবাবের নিকট হইতে সম্রাট্‌প্রদত্ত সনন্দের বলে এককোটি লক্ষ টাকা চৌথের দাবী করিয়া বৃহৎ সৈন্যের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই দুই দলের মুখলসরাইয়ে যোগাত্ত বাজেনা ছাউনীর হইবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল এবং আলিবর্দী দুই দলকে সম্মিলিত হইতে না দিয়া বালাজীকে তাঁহার প্রাপ্যের অর্ধেক মিটাইয়া দিয়া তাহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই সন্ধিসূত্রে বালাজী নবাবকে রঘুজীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং শত্রুশিবিরের লুণ্ঠনলব্ধ ধনরত্নের অর্ধেকটা তাঁহার হইবে আলিবর্দী এই প্রস্তাবও পাইলেন। রঘুজী এই ভয় প্রদর্শন দ্বারা হইতে নিরাপদ হইবার মানসে ইহার পন্থা অর্থাৎ পলায়নবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যাহাও যুদ্ধে নবাবের জয় হইল, তথাপি যুদ্ধজনিত লুণ্ঠনের ফলে ইহার রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হইল।

এই মহারাষ্ট্র হাঙ্গামার সময় মুস্তাফা খাঁ আলিবর্দীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রথমতঃ তিনিই বীরত্ব ও সাহসের সহিত আলিবর্দী হইতে হইয়াছিলেন, এজন্য নবাব কৃতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু মুস্তাফা ক্রমে আলিবর্দীর অসহ্য হইয়া উঠিল। বিহার প্রদেশের যুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তিনি সেই সময়ে তাঁহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু মুস্তাফা খাঁ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় দুর্মতি বলিয়া স্বীকৃত হইবার দাবী করিলেন। ইহার পর এই বীরকে পরাজয়ের কলঙ্ক কখনও মুছিতে পারে এই আশঙ্কায় নবাব তাঁহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। ইহাকে দূর করিবার জন্য নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন যে সকল সময়ের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন মুস্তাফা খাঁ তাহাদের নিকট হইতে উৎকোচ পাইয়া নবাবকে তাঁহার আদেশ পরিবর্তন করিতে অনুরোধ করিতেন। নবাব সমস্ত জানিয়া শুনিয়া শুধু খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নিজের হুকুম বদলাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু শেষে উভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি কারণে তিনি মনে করিলেন নবাব তাঁহাকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তিনি নবাবকে প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করিয়া বেতারের শাসনকর্তৃত্বের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং নানারূপ হিসাব দেখাইয়া নবাবের নিকট সতের লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে ইহা পাইলেই তিনি নবাবের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইবেন। এই প্রস্তাবে নবাব মনে মনে খুশী হইয়া তখনই হিসাব না দেখিয়া তাঁহাকে সেই দাবীর টাকা মিটাইয়া দিলেন। কিন্তু মুস্তাফা খাঁ নবাবের পায়ের তলার মাটি সরিয়া গিয়াছে দেখাইলেন যে, আলিবর্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুনরায় বাঙ্গালাদেশ পাঠানদিগকে দেওয়াইবেন, তাঁহারা যদি যোগ দিয়া মুস্তাফার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মুস্তাফা বাঙ্গালার সঙ্গে একযোগে আলিবর্দীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, এই ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

মুস্তাফা খাঁ বাঁধা।

১৭৪৫ খৃঃ অব্দে মুস্তফা খাঁ বাকরগঞ্জ লুণ্ঠন করিয়া মুঙ্গের হইয়া পাটনার দিকে রাজধানী আক্রমণ করেন। যদিও ভিনসেন্টের সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তথাপি তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। একটা তীর লাগিয়া মুস্তফার মান চক্ষুটা নষ্ট হইয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে কাপ্তু আনা হয়—ইহার পর তিনি বেশী দিন বাঁচেন নাই।

কিন্তু সমসের পাঠানের বেশীদিন বিশ্রাম করিবার না। তিনি গোপনে রঘুজীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। একসময়ে নবাবসৈন্য রঘুজীকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারিত কিন্তু সমসের তাঁহাকে আলাইতে সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবর্দী সমস্তই জানিতে পারিলেন। সমসের হরাৎ পাটনার হইয়া ভিনসেন্টের সঙ্গে যোগে প্রস্তুত হইলেন এবং নিশ্চয়ভাবে ভিনসেন্টকে লিখিত করিলেন, তাহার ৫ প্রদেশের সমস্তলক্ষ টাকা ও বহু মণি মাণিক্য সমসেরের হাতে পড়িল। সমসের এইজন্যই ভিনসেন্টের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, ইহাদের মধ্যে বেগম আমলাও আলিবর্দীর কন্যা ছিলেন।

এদিকে রঘুজীর পুত্র জানোজী কটকের নিকট লুটতরাজ চালাইতে লাগিলেন। আলিবর্দী ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ সেনাপতি মীরহাবিবকে মেদিনীপুর অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মীরহাবিব ওরে মেদিনীপুর হইতে বর্ধমানে পালাইয়া গেলেন এবং তাঁহার ধনরত্ন ও হস্তীগুলি বর্গীরা সহজেই লুণ্ঠন করিয়া লইল। মীরহাবিবকে একেবারে অকর্মণ্য দেখিয়া আলিবর্দী আতাউল্লা নামক এক কর্মঠ সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি প্রথম জানোজীর একদল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কাটোয়াপর্যন্ত বেদখল করিলেন, কিন্তু এক পাগলা হুমরাহ মনিয়া বসিল যে তিনি নিজে সাম্রাজ্য হইবেন। এই অভিসন্ধি জানিতে আতাউল্লার মুণ্ড খুলিয়া গেল এবং তিনি নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মীরহাবিবকে তিনি নবাব হইবার লোভ দেখাইয়া নিজের দলে টানিয়া লইলেন।

আলিবর্দীর গুপ্তচরেরা এ সমস্ত সংবাদই তাঁহাকে দিয়াছিল। তিনি সময় নষ্ট না করিয়া এই দুই সেনাপতিকে অবমানিত করিলেন, তিনি মীরহাবিবকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি তাঁহাকে হিসাব নিকাশ দিতে অসম্মত হওয়াতে তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিলেন। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নবাব জয়ী হন, সমসের নিহত হন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হয়। নবাব তাঁহার কন্যাকে আশাতীতরূপে ফিরিয়া পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে ভিনসেন্টের মৃত্যুর পর নবাব জানকীরামকে দেহারের শাসনকর্তায় নিযুক্ত করেন।

বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি

তখন আলিবর্দীর বয়ঃক্রম ৭৩ বৎসর, জানোজীর আক্রমণ তখনও থামে নাই। অবশেষে উড়িষ্যার শঙ্কর পণ্ডিতকুলের দুষ্কৃতিগণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া নবাব এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন, সন্ধির সর্তানুসারে বর্গীদিগকে কটক প্রদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন এবং

বঙ্গদেশ হইতে কলিকাতা যাইবার জন্য [illegible] ১৭৫১ খৃ [illegible] হইবার পর মারাঠা আর কোন উপদ্রব করে নাই।

আলিবর্দী এত সহজে সৈন্য লইয়া [illegible] হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনে [illegible] এবং এই দুষ্ট রাজপুত্রের জন্য অপরাধ মার্জনা করিলেন। [illegible] যেরূপ [illegible] বাঙ্গালাদেশের সর্বত্র আলোড়িত হইত।

যখন আলিবর্দী [illegible] এইরূপে শত্রু [illegible] উপযুক্ত হইলেন, তখন তিনি [illegible] মনোযোগ করিলেন। [illegible] ঘসেটী বেগম [illegible] উহারা দুইজন, আলিবর্দী উহাদের কোন দোষ দেখিলেন না। [illegible] হইতে [illegible] ঘসেটী বেগম উহাদের প্রিয় মনে করিতেন। [illegible] এই সময়ে [illegible] তাঁহার [illegible] করিলেন। [illegible] মতামত দিলেন না। প্রকাশ্য [illegible] [illegible] মুরাদবক্সকে [illegible] সৈন্য লইয়া [illegible] করিলেন। [illegible] লিখিলেন "আপনি আমাকে পুত্রের মত [illegible] করিতেন, এখন [illegible] দিলেন না, সুতরাং আমি [illegible] করিয়া [illegible] করিতে" [illegible] পূর্ণিয়ার দিকে [illegible] [illegible] আলিবর্দীর [illegible] তাঁহাকে ডাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] এমন সময়ে [illegible] এইরূপ অপ্রত্যাশিত সংবাদ আসিল, — [illegible] [illegible] [illegible] হইল। তিনি অতি [illegible] [illegible] [illegible] "চতুর এক সিরাজ [illegible], ফরিয়া এম" ইত্যাদি। সিরাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সিরাজের সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অধিকারী হন, তাহার বহুবত্ন কর্তৃক লর্ডমেকলে পূর্ণিয়াস্থ হাজি মহম্মদের পৌত্র মৈরাজ আহম্মদের পুত্র পক্ষে অসম্ভব প্রমাণের চেষ্টা করিলেন। ঘাটশতাধী ৮৮ বৎসর বয়সে পোপনোগে দেহত্যাগ করিলেন মৃত্যুর পূর্বে তিন সিরাজউদ্দৌলাকেই তাহার উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে অনেক মহলের বেগমের তাঁহাদের পক্ষে নবাব যাহাতে সিরাজকে কিছু বলিয়া যান এই অনুরোধ করায় আমিনা বলিলেন, "আমার যদি তিনটি জিনিস সিরাজ ভাল হইয়া থাকিত ও তাহার মাসীমাতার সহিত ভাল ব্যবহার করিবে তবে এই অনুরোধের রক্ষা প্রয়োজন করা যাইত।" ১৭৪০ খৃঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার মসনদে মহাবৎ জঙ্গের সর্বজনপ্রিয় নবাব ১৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাদের তাঁহার সেবা একটা বিশ্বাস করিতেন যে যখনি তাঁহার মার সময় উপস্থিত হইবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একটি টাকা তুলিয়া দিতেন।

সিরাজউদ্দৌলা ১৭৪০-৫৭ খৃঃ

যখন শৈশবে আমরা নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা শুনিয়াছি, তখন মনে হইত তাঁহার শত্রুরূপে, শত্রুপক্ষ এক মত অত্যাচারী অসংযমী লম্পটের লোক তখনকার দিনের ইতিহাস ও জনশ্রুতি তাঁহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা হইতে অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল সিরাজউদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর মাত্র তিনি চার মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন তিনি অতি পরদর্শন এবং বৃদ্ধ নবাবের চক্ষের মণির ন্যায় ছিলেন ব্লাকহোলের মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক। মহাশয় পুরাকাল "সরকার ইতিহাস কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" নামক যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন সিরাজ সিংহাসনে বসিয়া প্রজাদের মনোরঞ্জন পেই চিন্তায় সর্বদা থাকে তাহা লিখিতেন গঙ্গাতীরে নৌকা করিয়া লোকে কি ভাবে মরে তাহা দেখিয়া তৃপ্ত হইতেন আমাদের দেশের একটা রীতি আছে, যদি তাঁহারা কোন সাধুর জীবন বর্ণনা করেন তবে পূর্ববর্তী সাধুরা যে সকল অলৌকিক কাণ্ড ও লীলাখেলা করিয়াছেন সেগুলির সমস্ত খুঁটিনাটি জানিতে আবশ্যক করেন, সেইরূপ কেন তাঁহারা চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া পূর্ববর্তী নবাবদের তাহা কিছু করিয়াছে তাহার বর্তমান চরিত্রে আরোপ করিয়া থাকেন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবেই সিরাজচরিত্রে এই সকল কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন ইহা কোন মুসলমানের ইতিহাসে নাই, কোন সাহেবের বর্ণনায় নাই মুতাক্ষরিন ও রিয়াজের ইতিহাস যাহা অপরাপর লেখকেরা যাঁহারা সিরাজের জীবনের খুঁটিনাটি সকল কথা লিখিয়াছেন তাঁহারা কেহই ঐরূপ অদ্ভুত কথা লিখেন নাই কৃষ্ণচন্দ্র চরিত-লেখক যত পাড়াগাঁয়ে আজগুবি কথা শুনিয়াছেন, সবই নির্বিচারে লিখিয়া গিয়াছেন।

সিরাজ, তরুণ বয়সে যখন তাঁহার ঈষৎ গোঁফের রেখা উদ্গত হইয়াছিল তখন তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া চারিবৎসর কিছু উর্দ্ধকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন,

এই চারিমাস বিদেশীবিদ্বেষের সঙ্গে মনোমালিন্য এবং স্বীয় ধনবাহুল্যের ঘড়যন্ত্রের ফলে তিনি একটি দিনও শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। এই অল্প সময়ে তিনি এত কি অত্যাচার করিতে পারিতেন যে তজ্জন্য ইংরাজদের তাঁহাকে 'নিরোর পার্শ্বে স্থান দিতে হইবে? ডাক্তার কেলের অনুরোধ রক্ষার জন্য প্রবেশ করিয়া কিরূপ সন্তর্পণে মহিলাদিগকে অপমান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে এবং অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে "রক্তমেঘে রেঙ্গে পাখী শশি অস্তাচলে" ইত্যাদি সরোষ উক্তি কোন্ ইতিহাস মূল হইতে বাহির করিয়াছেন কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ইংরাজ একটা ঘটনার অতিরঞ্জন করিয়াছিলেন গোলাম হোসেন নবাবের আচরণ সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন সিরাজের সম্বন্ধে এই অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। অন্ধকূপ হত্যাটা অমূলক নহে, কিন্তু তাহা নিশ্চিতই অনাবশ্যক ভাবে করা হইয়াছে। ঘটনার সময়ে অন্ধকূপের বন্দীদিগকে কেহই রাজপ্রাসাদে স্বপক্ষসমর্থনে ডাকিয়া লয় নাই। তখন সেখানে কর্মচারীরা কিছু অত্যাচার করিয়াছিল, কিম্বা বন্দীদিগের অভাব অভিযোগের দিকে কর্মচারীরা মনোযোগী হয় নাই ঠিক ঘটনার সময়ে এই বিষয়টা এত আকাঙ্ক্ষিত ছিল যে তাহা সাহেবরা প্রথম শ্রেণীর রিপোর্টে উল্লেখ করেন নাই, পরকালে উহার একটি আতঙ্কজনক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল মুসলমান ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, নবাব ইহার কিছুমাত্র খবর রাখিতেন না। এখনই কি ঘড়ীটা ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে কোন্ প্রকার প্রজার কি অত্যাচার হইতেছে, কাহার কি অসুবিধা হইতেছে ইহার সকল সংবাদ রাখেন? জেলের কর্মচারীরা কি বন্দীদিগের, আসন্ন দায়রার প্রত্যেক বিষয়ে ঘড়ীটার মতন হইয়া কাজ করেন? আমাদের বিশ্বাস অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপারটা একেবারে অমূলক নহে, কিন্তু সেকালে তাহাকে ফলাও করিয়া লেখা হইয়াছে, রাজা রাজেন্দ্রলাল বলেন, তিনি ইংরেজদের পক্ষ হইয়া কেরি সাহেবের প্রেরণায় তাঁহার পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তিনিও এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা চন্দ্রিকা প্রভৃতি সংবাদে ছাপা হয়, ইহাতে সিরাজ সম্বন্ধে অতি বীভৎস বহু মিথ্যাকথা যাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—লিখিত হইয়াছিল। ঘটনার মাত্র ৫০ বৎসর পরের লিখিত এই বিবরণটিতেও সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ থাকা সত্ত্বেও অন্ধকূপের কথা একবারও উল্লিখিত হয় নাই যুদ্ধবিগ্রহের সময় এইরূপ সকল ঘটনা এত সচরাচর ঘটে যে তাহা কেহ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। এই ঘটনা অত্যাচারমূলক স্বীকার করিলেও নবাবকে এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা সঙ্গত হইবে না

তবে নবাব যে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত কথা। তিনি তাঁহার মাসী-মহাশয়ের আদরে অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ করিলেও বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে শাসন করেন নাই, এজন্য তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেন প্রজাদিগকে অযথা পীড়ন করিতেন, লোকে জানিত সিরাজ যাহা করিবেন, তাহার উপরে নালিশ চলিবে না সুতরাং জনসাধারণ এই অতিরিক্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত খামখেয়ালী তরুণ যুবকের প্রতি বীতরাগ

হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তিনি সুন্দরী স্ত্রীলোক খুঁজিয়া বেড়াইতেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব ওস্তার ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি এইভাবে বহু অপরাধ করিয়াছেন, কিন্তু সিরাজ ৪ মাস কালের মধ্যে এরূপ অপরাধ কতটাই বা করিতে পারিয়াছিলেন? নাটোরের মহারাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী রাজসাহী রাজবাগানবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর পত্নী ছিলেন, তিনি নিরুপমা সুন্দরী ছিলেন, তাঁর রূপবিষয় তাঁহার দিকে সিরাজের লোভ ছিল এসম্বন্ধে দেশব্যাপী এত প্রবাদ আছে যে ইহা অবিশ্বাস করা চলে না

তারাসুন্দরী

তারাসুন্দরীকে লইয়া রাণী ভবানী একটি বিচিত্র ছলনা পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার একটা মূর্ত্তি গড়িয়া তাহা শ্মশানে পোড়াইয়া তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্তরে ছিলে তাঁহার অভিভাবক গুরুজনের মত আদর পাওয়া সেই অপরূপা লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া থাকে এই হিসাবে সিরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই লোকের বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। অবশ্যই ঘসেটিবেগম ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া বিনা শাস্তিতে ক্ষমা লাভ করাতে এবং পূজনীয় মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে অত্যধিক আদরে নষ্ট এই বালককে দেখিতে না পারার অন্য আমরা জনসাধারণকে দোষ দিতে পারি না তিনি লোকেদের একটা ধারণা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিষ্ঠুর মৃত্যু এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র—লোকে জানিলেও তাঁহার স্মৃতি কোন কারণেই সৃষ্টি করে নাই, এমন কি যে ফকির তিনদিনের উপবাসী নবাবকে খাবার দেওয়ার লোভে ডাকিয়া আনিয়া মীরজাফরের লোকের হাতে ধরাইয়া দিল, তাহার বিরুদ্ধে লোকে একটা কথাও বলিল না। কয়েক দিনের নিষ্ফল উপবাসের পর ক্ষুৎকৃক্ষাতুর হতভাগ্য নবাব যখন আহারে বসিলেন, তখন মৃত হইয়া তাঁহার জন্য মীরজাফরের গৃহে নীত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শব হস্তিপৃষ্ঠে রাজপথে নীত হইল সেই সময় আর্ত্তনাদ করিয়া সেই হস্তীর পদতলে পতিত হইলেন যে ক্লাইভের ভিলোর তাঁর ও দরবারীদের আদরের দুলাল ছিলেন তাঁহার অনাবৃত অনিন্দ্যকান্তি দেহের উপর নিষ্ঠুর খড়্গাঘাত ও বাকনিন্দিনীর পাশবতায় বোধ হয় পাষাণও বিগলিত হইত, কিন্তু তাঁহার এই করুণ শোচনীয় পরিণামে উপলক্ষে পল্লীকবিরা একটা ছড়া বা পাঁচালিকা রচনা করিল না পলাশীর বিপ্লব প্রসঙ্গে চারণেরা যেরূপভাবে গুণগান করিত, সেইভাবেই রাজ-কথা চলিল কোন পল্লী কবি এরূপ শোকাবহ ব্যাপার লইয়া একটি গান বাঁধিল না, ইহার কারণ কি? অথচ ইংরেজদের গুণগানে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিকে জয়জয়কার পড়িল—এই বিসদৃশ কাণ্ডের অর্থ কি? নবাব অনবরত অশ্রুপাত করিয়া চলিয়াছেন—অত্যাচার করিয়াছেন এবং প্রজারা এমন কি রাণী ভবানীর ন্যায় পূজনীয়া সম্ভ্রান্ত মহিলাও তাঁহার জন্যে অনিদ্র নিশা যাপন করিয়াছেন সেনরাজের রাজত্বকালের পরেও তৎসম্বন্ধে পল্লীকবির নীরব ছিলেন, নিম্ন সম্প্রদায়ের লক্ষলক্ষ লোকের প্রীতি তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, শুধু ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে ইতরের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, বাঙ্গলা ভাষায় শাস্ত্রপ্রচার ও ইতরশ্রেণীর সম্বন্ধে

ছোঁয়াচে রোগের চূড়ান্ত লক্ষণ দেখাইয়া জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সেনানায়কের কাঁড়িগুলি তাহাদের পল্লীগৃহের অন্তর্কার্তা করেন নাই। কিন্তু সহজ দোষগুণের হতভাগা সিরাজউদ্দৌলা ও রাজনীতিক্ষেত্রে কোনরূপ দোষ দেওয়া চলে না।

সিরাজউদ্দৌলার মাতা ঘসেটি বেগম বড় ঐশ্বর্য্য লইয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর তিনি কয়েকটি গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া সিংহাসন লাভ করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন। ইংরাজ মুর্শিদাবাদের লেখক লিখিয়াছেন—এই ভদ্র মহিলা এবং তাঁহার ভগিনীরা যখন সিরাজকে নিতান্ত ছেলের মত দেখিতেন, তবে কত ভাল হইত। তাঁহাকে যখন তাঁহারা ঈর্ষার বিষয় করিয়াছিল, সেই সকল ওমরাহ—যাঁহারা নগদ আসিল, দোস্তি মহম্মদ এবং কীর্ত্তি বাবু—সেই অর্থ লইয়া প্রলোভন নিষ্পাপপূর্ণক সুখে যাপন করিতে লাগিলেন, এবং নিজের তাহার বিপক্ষে অর্থ দান করিয়া আনিয়া তাঁহাকে মসিবিলে হইতে বন্দীগারে প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ সিংহাসনে কয়েকজন বিশ্বাসী লোক বিদায় দিয়া তাহার কয়েকজনের মাথা ছিল এবং তাহা ব্যতীত তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইহাদের অহঙ্কার সর্ব্ব কর্ম্মচারী ও ওমরাহগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ আলোচনা করিলে তাহারা যে অনিষ্টসাধন করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যাঁহাদিগকে তিনি বিদায় করিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মাতামহ। তিনি আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা অনেকবার করিয়াছেন। যুদ্ধ নয়ন তখাপি তাঁহাকে তিনি একবার কর্ম্মচ্যুত করিয়াও শেষে ক্ষমা করিয়াছিলেন। সিরাজ কুসঙ্গীদিগের সঙ্গে মিশিয়া অত্যাচার করিতেন—এই অভিযোগ তাঁহার কার্য্যকলাপে সমর্থিত হয় না, বরঞ্চ তিনি যাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া দিয়াছিলেন—তাহাদের একটির অধিকাংশ ও অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার উদারচরিত্র লাভমোহাগণ যখন যাঁহাদিগকে বিশ্বাস ও করিতেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই বিশ্বাস ভাঙাইয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন, কিন্তু সিরাজ এবিষয়ে চতুর ছিলেন। যে চরিত্রকে তিনি প্রথম হইতেই অবিশ্বাস করিয়াছিলেন; যে দুই ব্যক্তিকে তখন পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মোহনলাল। ইনি সিরাজের সাহিত্যিক বিভাগের দেওয়ান বা প্রধান সচিব ছিলেন। সিরাজ ইহাকে "মহারাজা" উপাধি দিয়া সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ (Prime Minister-ship) দিয়াছিলেন। রাজার সহকারে বন্ধুত্বের কথা হইলেন, তারপর তিনি কাফের প্রবীণ ওমরাহদের দল তাঁহার নামে যেসকল কথা রাষ্ট্র করিল, তাহা সত্য কি না কে বলিবে? হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের উত্তেজনায় মানুষ অনেক মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কথিত আছে মোহনলালের একটি ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রাচ্য আদর্শ-অনুসারে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন—সে আদর্শের কথা আমরা সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পারসী প্রভৃতি অনেক ভাষায় লিখিত দেখিতে পাই, "দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী"—পদ্মপলাশাশ্রিত নারীর বর্ণনায় পাওয়া

যায়, "কুশোদরী," "কদলধ্যা," "কদলকটি"—ইত্যাদি বিশেষণ বাঙ্গালি সীতার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, কালিদাসের "মধ্যে ক্ষামা" ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রাজকবি কৃত্তিবাস "মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঙ্কলী" লিখিয়া এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আরও জটিল করিয়াছেন। পার্শীতে মেয়েদের রূপ বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন, "কেশরের কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম বরং তাহারও অধিক।"—আমরা বুঝিতে পারি এই সকল বর্ণনায় কবিরা কোন সুন্দরী রমণীর দিকে চাহিয়া রূপবর্ণনা করেন নাই—তাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্রের কোমল ও সূক্ষ্মির কসরৎ দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, তথাপি একথা নিশ্চয় যে উনা রমণীর কুচযুগলের মত ভারতীয় কিংবা পারস্যের রমণীদের স্তন কটি ও দেহ প্রশংসিত।

কথিত আছে মোহনলালের ভগিনীটি ওজনে শুধু ২২সের ছিলেন এবং পান খাইলে মাত্র তাঁহার ঠোঁট দুইটি লাল হইত না, তাঁহার কণ্ঠের খানিকটা অংশ পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠিত। ইনি নর্ত্তকী ছিলেন—ইঁহাকে নাকি মোহনলাল সিরাজউদ্দৌলাকে দিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি সিরাজউদ্দৌলার এক ফ্রালকের সঙ্গে বাঁচিবারে মৃত হন। নবাব তাঁহাকে বলিলেন, 'কুমারি! আমি দেখিতেছি, আপনি একটি বর্ষিকা মাত্র।" সুন্দরী জানিতেন, এবার তাঁহার রক্ষা নাই, সুতরাং ভবিতব্যতার স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া তিনি হাসির সহিত উত্তর করিলেন, "হাঁ নবাব সাহেব, আমি বর্ষিকাই বটে, আমি নর্ত্তকী—বর্ষিকাবৃত্তি আমার ব্যবসায়," তৎপরে সিরাজের মাতা আমনা বেগমের সম্বন্ধে একটা ক্রুর ব্যঙ্গ করেন। (অবশ্য সিরাজের মাতা আমনা বেগম সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা প্রচলিত ছিল।) সিরাজ এই কুমারীকে জীবিত অবস্থাতেই চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া বন্ধ করিয়া মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না মুতক্ষরিনে যেরূপ বর্ণিত আছে, আমি অবিকল তাহাই লিখিলাম (সিয়ার মুতক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ৮৮৭ পৃঃ)। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, এই রমণী আদৌই মোহনলালের ভগিনী ছিলেন না।

মোহনলালের ভগিনীসম্বন্ধে এই সকল কথার মূলে যাহাই থাকুক না কেন, একথা কখনই অস্বীকার্য্য নহে যে মোহনলাল সেই চরিত্রাগিনী রূপসীর খাতিরে নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি নবাবের বাল্যসখা ছিলেন, দক্ষতা, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততায় যে তাঁহার দ্বিতীয় ছিল না—তাহা ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ওমরাহ যাঁহার উপর সিরাজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, তিনি ছিলেন ঢাকানিবাসী মীরমদন। ইঁহারও অনেক মহা গুণের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। সুতরাং সিরাজ যে তাঁহার দুই কুসন্তানিগকে বড় বড় পদ দিয়াছিলেন, একথা গ্রাহ্য নহে। পরে যখন প্রবীণ মন্ত্রী ও ওমরাহের দল চিরকাল তাঁহার নুন খাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তখন এই দুই চিরবিশ্বস্ত, রণনিপুণ ও স্বীয় আপদ্ বিপদে সম্পূর্ণ নির্ভীক ব্যক্তি সিরাজকে রক্ষা করিবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

সিরাজ তাঁহার মামাত ভাই পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সকতজঙ্গ হাজি মহম্মদের পৌত্র এবং সৈয়দ মহম্মদের পুত্র। এই যুবকের বুদ্ধির প্রাখর্য্য

সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গগণও প্রশংসাপত্র দিতে পারিবে না। সিয়ার মুতক্ষরিনের লেখক গোলাম হুসেন স্বয়ং ইংরেজ এক ওমলাই ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে সকৎজঙ্গের ব্যবহারের অনেক রহস্যজনক ঘটনা উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পূর্ণিয়ার এই স্বজন নবাবের নাম গন্ধগন্ধের মত বিস্তার ছিল না। সুতরাং গোলাম হুসেন একবার আদেশমত যে সকল পত্রের মুসাবিদা করিলেন, তাহা ইঁহাকে বুঝাইতে যাইয়া অনেক বিরক্তি উৎপাদন করিত। কোন্ অক্ষর কেমন করিয়া লিখিতে হইবে, কি ভাষা লিখিয়া কোথায় বক্ররেখা বা সরল রেখা দিতে হইবে, প্রতি পদে নবাবকে তাহা বলিয়া দিতে হইত। এইরূপ করিতে যাইয়া গোলাম হুসেন একদিন দেখিলেন, নবাব কলম ফেলিয়া দিয়া মুখে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার পূর্বে আর কি করেন, এক ঘণ্টা ছিলেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কি অপরাধে নবাব বিরক্ত হইয়াছেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আর একদিন নবাব বলিলেন, "তোমার দ্বারা আমার কোনো কাজ হইল না। তুমি আমার মস্তক ব্যথা করিলে। আমার লেখাপড়া লইয়া এত মাথা ঘামাও কেন?" গোলাম হুসেন সতর্ক হইয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে সকৎজঙ্গ আবার ইঁহাকে সযত্নে অনুরোধ করিলেন, "তোমার আমার কিছু লেখাপড়া শিখাইতে হইবে বোধ হয়। অমন চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন?" যুদ্ধকালে ওমর খাঁ নামক এক ব্যক্তি ইঁহাকে গুপ্তচর রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি বলিয়াছেন, যখন তিনি সকৎজঙ্গের অধীনে কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন এবং নবাব যে ভাবে সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিসঙ্গত নহে। তখন নবাব তিরস্কারপূর্বক তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন "আমি কাহার উপদেশ শুনিতে চাহি না, আমি নিজেই যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইব।" সিরাজ ফৌজা বেগ, রুকনিবেগকে পূর্ণিয়ায় পাঠাইয়া দুইটি পরগনাসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাদের পরামর্শে মীরজাফর এবং অপর কয়েকজনের পরামর্শে সকৎজঙ্গ পাটনার অধীনস্থ জমীদারদিগের অনেক রকম কাগু করিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। সিরাজের পত্রখানি খুব তাড়াতাড়ি লিখিত হইলেও তাহার উত্তরে একটার পর একটা কৌশলের চাল ছিল। এই পত্রের উত্তর যাহা দিতে হইবে, গোলাম হুসেন সকৎজঙ্গের আদেশমত তাহার একটা খসড়া করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিলেন। এই খসড়াটার খুব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় ছিল, স্পষ্ট জবাব বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু নানা অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া সময় লইবার অভিসন্ধি ছিল। সিরাজউদ্দৌলা সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য যাহাতে না বুঝিতে পারেন সেজন্য লিপিকোশলের সঙ্গে নমনীয়তা করা হইয়াছিল, সকৎজঙ্গ উহা শুনিয়া খুবই খুসী হইলেন। কিন্তু যখন সভাসদেরা গোলাম হুসেনের চিঠির অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন "বুদ্ধিমুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্,"—নবাব নিতান্ত চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "ইহার গোলাম হুসেনের) অবশ্যই বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমার বুদ্ধির সঙ্গে ইহার তুলনা হয়? ইহার ঘটে যদি দশ হাজার লোকের বুদ্ধি থাকে, তবে আমার ঘটে লাখ লোকের বুদ্ধি আছে, আমি ইহার লেখাটা অনুমোদন করিব না।" সুতরাং তিনি অন্য এক ব্যক্তির বুদ্ধিতে সিরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি দিল্লী

হইতে তিন প্রদেশের সনদ পাইয়াছি, তদনুসারে আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের মালিক কিন্তু যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তজ্জন্য আপনার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই আপনি এই পত্র পাওয়া মাত্র ঢাকা কি অন্য প্রদেশে প্রস্থানের উপযুক্ত আয়োজন করিয়া চলিয়া যাইবেন, কিন্তু খবরদার, আপনি মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে একটি কপর্দক বা কোন দ্রব্যসামগ্রী লইতে পারিবেন না এই পত্রের উত্তরের জন্য আমি মোটা পাদাপিছে পা দিয়া অপেক্ষা করিতেছি।" সত্যসত্যই কতকগুলি নির্বুদ্ধি আমীরের মন্ত্রণায় সকতজঙ্গ যত টাকা খরচ করিয়া সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মালিকানার সনদ আনাইয়াছিলেন, উক্ত সম্রাটকে এক কোটী টাকা বৎসরে রাজস্ব দেওয়ার সর্ত্তে তাহাতে ছিল। মুতক্ষরিনে লিখিত আছে—এই সনদ পাওয়া "তিনি ছিলেন চক্ষুলোকে লক্ষ দিয়া একেবারে উঠিলেন সূর্য্যলোকে," বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়া তিনি কি কি করিবেন তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের সহিত তাহা আলোচনা করিতে বসিলেন, "আমি তাহার পর সুজা উদ্দিন খাঁ ও সরফরাজ খাঁকে দমন করিব তারপর ইচ্ছামত একজন সম্রাটকে আমার ক্রীতদাস পুতুলের মত আগ্রার সিংহাসনে বসাইব অতঃপর আমি লক্ষ্ণৌর ও ফরাসডাঙ্গা হইয়া কান্দাহার ও পেশোয়ারে যাইয়া বাস করিব, যেহেতু বাঙ্গলার জলবায়ু আমার একেবারেই সহ্য হয় না।" আলীনাস্কারের মত এই ক্রমোন্নতির পরিকল্পনা করিতে করিতে তাঁহার পুলিয়া রাজাটি একটা খেলানার মত ভাঙ্গিয়া গেল মহঃ আলি খাঁ নামক এক জোহুরার একদা তাঁহাকে "জগতের একমাত্র আশ্রয়" বিশেষণ দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। সকতজঙ্গের এই উপাধিটি এত ভাল লাগিয়াছিল যে সরকারী সমস্ত দলিলপত্রে ও সনদে তিনি ঐ উপাধি ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ উপাধি ছাড়া চিঠিপত্র লিখিত, তাঁহার পত্র তিনি না পড়িয়াই টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন সেরূপ কোন পত্র নবাবের সেরেস্তায় গৃহীত হইত না তিনি সমস্ত প্রজা ও তাঁহার নিজের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া চটাইয়া দিলেন এমন কি দরবারেও তিনি তাঁহার বড় বড় ওমরাহদিগকে এইরূপ ভাষায় তাড়া করিতেন, "ভাঁড়ামোর লক্ষ্য হইয়া থামের মত দাঁড়াইয়া আছ কেন? দেখছ না হিন্দু কর্ম্মচারীর কতটা এগিয়ে গেল?" বাস্তু ভোজগণ এইরূপ সম্বোধনে এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে যখন সিরাজের সঙ্গে প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল—তখন খুব অল্পলোককেই তিনি স্বপক্ষ অনুচরস্বরূপ পাইলেন মীরজাফর লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও কার্য্যকালে তাঁহার কোন সহায়তা করিলেন না। সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহ তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল, তিনি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী লালকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার দুই দিন বয়স্ক পুত্রকে হাতীর পিঠে চড়াইয়া তাহাকেই সেনাপতি করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। লালাকে তিনি বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিয়াছিলেন, সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহগণ একত্র হইয়া নিবেদন করিলেন—একপ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে এভাবে দণ্ডিত করা নীতিবিরুদ্ধ,

তাই ধরা দেওয়াই পাইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি এত বড় খাইয়াছিলেন যে, অতিকষ্টে উঠিতে উঠিতে মানুষের কাঁধে ভর করিয়া কোনরূপে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াছিলেন এবং শত্রুপক্ষের গুলিতে যখন তাঁহার মাথাটা উড়িয়া যায়, তখন সে মাথায় মগজের মেশা ছাড়া কোন বুদ্ধি এমন কি বোধশক্তিটুকুও ছিল কিনা সন্দেহ।

অনেক ঐতিহাসিক সকলঙ্কের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার তুলনা করিয়াছেন; মাসতুতো ভাইয়ের প্রকৃতি কতকটা একরূপ হইবেই তাঁহারা বলিয়া থাকেন, একথা সর্বৈব ভুল। একটা বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল, উভয়েই জনমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পদ-মর্যাদানুসারে তাঁহাদের সম্মান ব্যবহার করিতেন না কিন্তু সিরাজ অবিশ্বাসীদিগের প্রতিই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন—সকলঙ্ক নির্বিচারে সকলকে অপদস্থ করিয়া গালাগালি করিতেন। সিরাজের সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না।

ঢাকার সরকারী খাস-কর্তা রাজবল্লভ নানা উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষদলের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, সিরাজের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, সুতরাং কোন্ মুহূর্তে ঘামখেয়ালী নবাব তাহার শ্রাদ্ধশোধ লইবেন, তাহার ঠিকানা নাই,—এই ভয়ে তিনি তৎপুত্র রাজা কৃষ্ণবল্লভকে বহু অর্থসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ড্রেক সাহেবের তখন কলিকাতায় অসীম প্রাধান্য। ফোর্ট উইলিয়মে দুর্গে কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারসহ নিরাপদ হইলেন। নবাবের এই সংবাদ গুপ্তচরের নিকট পাইয়া ড্রেক সাহেবের নিকট ওমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার অর্থাদির সহিত মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া চিঠি লিখিলেন। ড্রেক অস্বীকার করিলেন। নবাব ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি বঙ্গদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য একেবারে উন্মূলিত করিতে সংকল্প করিয়া পূর্ণিয়া হইতে অবিলম্বে বাঙ্গলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী জগৎশেঠ এবং অপরাপর প্রধান অমাত্যগণ ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহাকেও অনুরোধ করিলেন না, ইংরেজের কারখানা আক্রমণ করিয়া মিঃ ওয়াটসকে বন্দী করিলেন। ড্রেক সাহেবের স্পর্দ্ধিত উত্তরে তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত সাহেব দুঃখের পাখীর মত প্রথমতঃ চুঁচুড়ায় ডাচ্ ও তৎপরে চন্দননগরে ফরাসীদের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন সাহায্য দিলেন না। সুতরাং সাহেব পলায়নপর হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সিরাজ তাঁহাকে হত্যা করিবেন—তিনি প্রথমতঃ ১,৫০০ বন্দুকধারী বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার বাক্স ভিঁড়িয়া যাওয়াতে বন্দুকগুলি অকর্মণ্য হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কতকগুলি সাহেববিবি লইয়া কলিকাতা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী গোবিন্দপুরের কুঠীতে উঠিয়া বাস্তুকে প্রবাদ করিলেন। এদিকে ফ্রাউড সাহেব পূর্ব বাঙ্গলের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়া যখন ১৯০ জন মাত্র ইংরেজ অবশিষ্ট—তখন নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইখানে বন্দীদের জন্য ভাল বন্দোবস্তই হইয়াছিল, তাঁহারা বারান্দায় থাকিবেন এই কথা ছিল। কিন্তু ভাগ্যপ্রাপ্ত-

ইংরেজ সংখ্যা

কর্মচারী বলিলেন, খোলা জায়গায় বন্দীদিগকে রাখা নিরাপদ নহে, আর কোন স্থান আছে কিনা খুঁজিয়া দেখ, অপর কর্মচারীরা বলিল, "ছয়জন কয়েদীদের জন্য একটা কামরা আছে।" প্রধান কর্মচারী না দেখিয়াই বলিলেন, "বেশ, সেইখানেই রাখা হউক।" এই ঘটনাই ইতিহাসবিকৃতির অঙ্কুর। ইহার সংবাদ নিরক্ষকৌলা দূরে থাকুক, তাঁহার ওমরাহদের কেহও জানিতেন না। এখানে যে গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণা ও গরমে আর্ত হইয়া সাহেবেরা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজদের প্রাথমিক রিপোর্টে লিখিত হয় নাই। সুতরাং এই ঘটনা যুদ্ধের আনুষঙ্গিক একটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া ধরা হইয়াছিল, যুদ্ধাবসান তো মৃত্যুর শঙ্কা থাকিয়াই রাখিয়াছে—রণক্ষেত্রে, কি যুদ্ধের পরক্ষণেই অবরোধগৃহে মৃত্যুটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন যে অন্ধকূপগৃহে, যতগুলি লোক মরিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা প্রথমতঃ বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীবিহারীলাল এবং পরে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঘটনাটি নিশ্চয়ই খুব অতিরঞ্জিত করিয়া পেশ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখন একেশ লোকের অপরাধে শতাধিক এক বিন্দু ইংরেজরক্তের যতটা মূল্য—যুদ্ধসম্পর্কিত ব্যাপারে তখন সেই রক্ত তত মহামূল্য ছিল না। এখনকার পাশ্চাত্য মানবনীতির দ্বারা এই বিষয়ের তখন বিচার করা ঠিক হইবে না। এ বিষয়ে কাহারও কোন ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতা হয় নাই। নিম্ন কর্মচারীদের অনবধানতার ফলেই এই অনর্থটি ঘটিয়াছিল। ("The prisoners were at first ordered to draw up in the Verandah, but the officer commanding the guard, thinking that they would not be sufficiently secure there—inquired where was the prison of the fort" (Stewart, p. 311) সেটা ইংরেজদিগেরই দুর্গ এবং সেই বন্দীখানার একটি গৃহে তাহাদের স্থান করা হইয়াছিল। অবাক মহাশয় "without examining the extent of the apartment"—সেই গৃহের আয়তন পরীক্ষা না করিয়াই সেখানে তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজদিগের প্রাথমিক ঘটনার বিবরণীতে ইহার উল্লেখ নাই। রাজবল্লভের মত ইংরেজের ভক্ত এবং সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষপক্ষীয় লেখকও ইহার উল্লেখ করেন নাই, এমন কি গোলাম হুসেন, যিনি সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার পরিবারবর্গকে নির্যাতিত করিয়াছিলেন—এই অভিযোগ দিয়া যেখানে-সেখানে উক্ত নবাবের নিন্দাবাদ ও সাহেবদের সুখ্যাতি করিতেন, তিনি তাঁহার মুতক্ষরিনের মত সিরাজের রাজত্বের সুবিস্তৃত ইতিহাসে এই অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখমাত্র করেন নাই। সুতরাং এবিষয়ের জন্য নবাবকে দায়ী করা কতটা ন্যায়-সঙ্গত তাহা বিবেচনা করা উচিত।

মন্ত্রীরা সকলেই সিরাজউদ্দৌলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফর আলিবর্দীর সময় হইতে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু নবাব সাগর বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াও তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা মীরবক্সীকে ও প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরামকে ডিঙাইয়া মীরমদন ও মোহনলালকে সৈন্যসজ্জা করিয়া শাসন-বিভাগের

কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন এজন্য এই দুইজনের ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রোধ ছিল। ঘুষা-প্রদত্তাভিলাষিণী ঘেসেটি বেগমের মাধ্যমে হাত বুলাইয়া মীরজাফর যে বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিবার জন্য তিনি সৈন্যসংগ্রহ এবং সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যয় করিয়াছিলেন পলাশীর সংগ্রামকে সিরাজের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিয়া তাঁহার সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। নবাবকর্তৃক তাহার অপরাধ ক্ষমা এবং আশ্বাস, এজন্য সিরাজ তাঁহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিলেও তাঁহাকে বন্দী করিতে পারেন নাই এমন কি পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্বে মীরজাফর ও ওয়াটস্ গুপ্তভাবে ইংরেজদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহার সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা পাইতেছেন একথা জানিতে পারিয়াও তিনি তাঁহাদিগকে বন্দী করিতে সাহস পান নাই সেই সময়ে মুর্শিদাবাদের ফরাসী সওদাগর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "নবাব সাহেব, আপনার আমলা ও ওমরাহ সকলে আপনার শত্রু ইহাদের হাতে আপনি ফরাসীদের ত্যাগ করিয়া ইংরেজদের হাতে পড়িয়াছেন তখন আপনার সর্বনাশ ইহারা সকলেই করিতে পারিবেন আমাকে যদি আপনার অধীনে কাজ দেন, তবে আমি ও আমার সৈন্যদল প্রাণপণে আপনার জন্য যুদ্ধ করিব" (ওমের্স, ২২৭ পৃঃ)। ফরাসী সাহেব ফরাসী এবং ইংরেজের শত্রু, এ'কথা নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন তাই একটি লোক ছাড়া সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিল, এমন কি মীরজাফরের ভয়ে কতক ইংরেজেরা চটিয়া গেলেন এই অবস্থায় তিনি বিশ্বাসী ফরাসী সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না ক্লাস সাহেব ঠিক বুঝিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নবাব অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, এজন্য যখন নবাব অন্তরঙ্গ ভাবে তাঁহাকে বলিলেন "সময় হইলে আপনাকে আহ্বান করিব," তখন সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার সহিত আমার আর দেখা হইবে না," বেতনভুক্তে যখন সিপাহী আসে, তখন তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া লাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য বিপদ অপসৃত করিয়া লাসের কাসিতে গোল হইল, যখন আসিলেন, তখন সিরাজ আর মসনদে ছিলেন না। লাসকে ইংরেজেরা ভাঙা কাদায় ঘোড়া ছুটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন কাজেই তিনি ভাগ্যবলে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইংরেজেরা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ক্লাইভ আসিয়া সুযোগ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন সন্ধি অনুসারে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, নবাব তাহা দিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন, এরূপ অজুহাতের অভাব হইল না। মোট কথা মীরজাফর ওমিচাঁদ কৃষ্ণচন্দ্র জগৎ শেঠ প্রভৃতি দেশের প্রধান ব্যক্তিরা ইংরেজদিগকে উস্কাইতে ছিলেন এদিকে কলিকাতার দুর্গসংস্কার ব্যাপারে তাহারাও মনে মনে প্রতিশোধ লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন চতুর ক্লাইভ বুঝিতে পারিলেন,—মুর্শিদাবাদে নবাবের মিত্র নাই, সকলেই শত্রু। মীরজাফরাদির পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এদিকে মীরজাফরের প্রবর্তনায় ঘেসেটি বেগম আসিয়া সিরাজ তাঁহার প্রতি

কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিয়া সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন। সিরাজের ধনভাণ্ডার কুবেরের ভাণ্ডারের মত, সড়যন্ত্র সফল হইলে তাঁহারা একদিনে এত দীর্ঘকালের তপস্যা সফল করিতে পারিবেন—ষড়যন্ত্র বিফলই বা কেন হইবে? নবাবের বিশালকায় কামানগুলি অসংখ্য সৈন্যবল ইহারা তো মীরজাফরের করতলগত। যাহা অসম্ভব—অজ্ঞানায়, তাহা সহজেই সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।

নবাব পূর্ণিয়ার যুদ্ধ জয় করিয়া যখনই দেশের সর্বত্র নূতন করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে ব্যস্ত ছিলেন—তাঁহার ভয়ের কারণ নাই, কলিকাতার দুর্গ ধ্বংস করিয়া তাড়াইয়াছিলেন তাঁহার একমাত্র শত্রু ইংরেজের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, সুতরাং যখন তিনি হুগলী, কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদের সকলকে তোষামোদ করিয়া তাঁহার নিকটে টানিয়া আনিতেছিলেন, তখন প্রথমতঃ সকলে মনে করিয়া তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে নাই, বরং বহুদিনের যে স্থান ছিল কিছু ভয়প্রদর্শনাদির পর তাহারই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচালক ও নেতা মিরজাফর কোন কোন সময় তাঁহার এমনও মনে হইত যে, ইঁহারা নিশ্চয়, কিন্তু তথাপি নিশ্চয় করিয়া ও ব্যবহারে সব ইহাদের কাছে সে ব্যবহার পাইতেন না। তিনি মুর্শিদাবাদের বাড়ীর দিকে দৃষ্টি করিয়া একটা বৃহৎ কামান রাখিয়া দিয়াছিলেন, উহা নবাবের অনুচরের মত মীরজাফরের গৃহের দিক সর্বক্ষণ রক্ষা করিত। অথচ সেইকে তিনি সুস্থির করিয়া মুসলমান করিবেন সকলে এই কথা বলাবলি করিত। তুলিরাম অন্যতম প্রধান ইহার কোন কথাই তিনি শুনিতেন না—ইহারা মনে মনে ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এরূপ নবাবের এই সকল ব্যবহার অসন্তুষ্ট মনে করিতে পারা যায় না। তাঁহার ভয় ছিল বেশী, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে কাহাকে তাঁর ভাষায় ইহাদিগকে অপমান করিতেন এবং বড় বড় মহাজনদিগকে মীরমদন ও মোহনলালের হাতে তুলিয়া দিয়া অপদস্থ করিতেন। অথচ ইহাদিগকে দণ্ড দিয়া নিরস্ত্র করা, কিংবা কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখার মত তাঁহার মনের সাহস বা দৃঢ়তা ছিল না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইল যে তাঁহাদের বাহিরের মুখ বজায় রাখিতে তাঁহারা দরবারে বসিয়াই সড়যন্ত্রটি পাকাইবার যথেষ্ট সুবিধা পাইলেন। তিনি মীরজাফর জগৎ শেঠ ও তুলারামসম্বন্ধে পূর্ণ হইতে যে সকল সংবাদ পাইতেছিলেন, বিদেশের দূতিয়ার মাস তাঁহার নিকট যে সকল গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ইহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শিবিরে মারিলে আজ আর বেশী দূর অগ্রসর হইত না। কিন্তু নষ্টা বুদ্ধিকে যেরূপ যার শাসন করিবার সে কোন স্বার্থ ছাড়িতে পারেন না—সেইরূপ ইনি এই সকল স্বার্থান্ধ ব্যক্তির সঙ্গ নষ্ট করিয়াও ইহাদিগকে ছাড়িতে পারেন নাই। নষ্টবুদ্ধি স্বার্থই ইহারা এই দুর্বলতার সুযোগ লাভ করিয়া স্বীয় প্রভুর সর্বনাশ করিতে লাগিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের নানাদোষ সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তাঁহাকে সকলের নিন্দিত ও সকল লোকের অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঘরের শত্রু যাহা পারে, বাহিরের শত্রু অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাহা করিতে পারে না। রাণী ভবানীর কন্যার প্রতি নবাবের লোভের ব্যাপার সমস্ত বাঙ্গা ও ওমরাহমহলে মনে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল।

এইরূপ নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র ও আসিয়া এই দলে ভিড়িয়া গেলেন। তিনি তাঁহার বংশের পূর্বসংস্কার ও ব্রাহ্মণসমাজের গুরু স্থান অধিকার করার দরুন বহু ব্যয় করিতেন,—পূজার্চনা, দানধ্যান, বার মাসে তের পার্বণ খুব ঘটা করিয়া করিতেন, এইজন্য তিনি একজন চির দেউলিয়া জমিদার ছিলেন। অথচ ও অর্থশালী বাঙ্গালের কাছে, ঋণগ্রহণের ব্যপদেশে তাঁহাকে সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত—ইংরেজদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে যখন মীরজাফর, ঢুলটরাম ও জগৎ শেঠ এই ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্রের ডাক পড়িল। মীরজাফরের রাজাকে হস্তগত করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন রাজবল্লভ বিস্তারিত ভাবে এই চক্রান্তের বিবরণ দিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র সহসা এরূপ একটা ব্যাপারে মাথা দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন, তাঁহার প্রধান অমাত্যকে প্রথমতঃ পাঠাইয়া দিলেন। ঢুলটরামের সঙ্গে যে অমাত্য নবাবের দেখা পাইয়া বলিলেন, "আমাদের রাজা হুজুরের সঙ্গে বিশেষ কথা পাইবার পর দেখা করেন নাই একবার দর্শনপ্রয়াসী,—হুজুরের অনুমতির জন্য আসিয়াছি।" তাঁহার হয়ত মুর্শিদাবাদে আসা যদি কোন সন্দেহের সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় নবাবদরবারের অছিলা দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিলেন। এদিকে কিরূপে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা যাইতে পারে, ষড়যন্ত্রে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা সেই কথা আলোচনা করিতেছিলেন। কেহ বলিলেন ইহাতে ভগবানের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। কেহ বলিলেন আমরা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করি, কেহ বলিলেন, সরাসরি অস্ত্রধারণ আর কোনরূপে সহ্য করা যায় না। অপর একজন মীরজাফরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "মশাই কি বলিতেছেন? এখানে যে মীরজাফর উপস্থিত, ইহা কি ভুলিয়া গেলেন?" তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। অবশেষ স্থির হইল কৃষ্ণচন্দ্র আসিলে ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া পরামর্শ করা হউক, তাঁহার যে বুদ্ধি, এ সমস্যার তিনি যে সমাধান করিবেন তাহাই যুক্তিযুক্ত হইবে। এই অবসরে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া যুক্তি দিলেন ইংরেজদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা হউক, আমি কলিকাতায় মায়ের দর্শনকামনায় যাইব ছলও হয় তখন পাওয়ার চেষ্টাও বটে; প্রায়ই কলিকাতায় যাইয়া থাকি। তাঁহারা মস্ত, বলবান, বুদ্ধিমান, রণনিপুণ, তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইয়া আমরাই তাহার চাল চালিব, শেষ পর্যন্ত নবাব আমাদের হাতে কলের পুতুলের মত আসিবেন, আমরাই কল চালাইব, 'ধরি মাছ না ছুই পানি' নীতি অবলম্বন করিলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না, অথচ অভীষ্টসিদ্ধি অতি সহজেই হইবে, মীরজাফরকে আমরা নবাব করিব।" এই যুক্তি শুনিয়া সকলে "বাহবা" পড়িয়া গেল। তখন মীরজাফরের সঙ্গে ক্লাইভের গোপনে চিঠি পত্র চলিতে লাগিল। এদিকে নবাবকে জব্দ করিবার জন্য ক্লাইভ ও ইংরেজেরা নানা উপায় চিন্তা করিতেছিলেন তাহার মধ্যে এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে মীরজাফর অর্থের যে লোভ দেখাইলেন, তাঁহাদের অবাধ আকাঙ্ক্ষা ও নবাবের অপরিমিত ধনভাণ্ডারের যথেচ্ছ যে আশা দিলেন, তাহাতে নিতান্ত উদাসীন ব্যক্তিরও মাথা ঘুরিয়া যাইতে পারিত। ইংরেজ সৈন্য দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল।

সিরাজের তেজ বিক্রম বুদ্ধি সকলই ছিল, কিন্তু অল্পবয়সে এরূপ বুদ্ধির চঞ্চলতা ও লোকচরিত্র বুঝিবার শক্তি বোধ হয় আলিবর্দ্দীরও ছিল না। তাঁহার দোষ ছিল—তিনি

সিরাজের দোষ।

যাহাদিগের আদরে একেবারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, চারিদিকের লোকজনকে কীটের মত গণ্য করিতেন, কাহাকেও তুচ্ছ করিয়া কথা বলিবার কারণের প্রতি তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। আলিবর্দ্দী তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দ্বারে সকলকেই মিত্র করিতে পারিতেন। এক রাত্রির কথা মনে পড়ে আলিবর্দ্দীর প্রধান সেনানায়ক মুস্তাফা খাঁ ও অপরাপর পাঠান সামন্তগণ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ইহারা সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত, গুপ্তচরের মুখে নবাব সমস্ত কথা শুনিয়া বিনা অস্ত্র শস্ত্র-রক্ষী ছাড়া একা কি সিরাজের হাত ধরিয়া বিপক্ষের মুস্তাফা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে এই অসহায় নবাবকে পাইয়া পাঠান সেনা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ

মুস্তাফা খাঁ ও আলিবর্দ্দী।

বলিলেন, "আপনাকে আমি আমার প্রধান সহায় বলিয়া জানিতাম, আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন জানিতে পারিলাম আপনি আপনার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। অতি নিঃসহায়, নিরস্ত্র ও অসমর্থ অবস্থায় বৃদ্ধ নবাব আপনার দ্বারে। আপনি অনায়াসে এখানে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষয় করিবার প্রয়োজন হয় না। আমার প্রাণ আপনার হাতে দিতে আমি আসিয়াছি। আর যদি আমাকে দেখাইয়া যায় আমার প্রাণ অপেক্ষা বেশী প্রিয় কিছু থাকে, তবে তাই নিন, যদি ইচ্ছা করেন তবে ইহাকেও হত্যা করিতে পারেন, আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবন, জীবনাধিক প্রিয়বস্তু ও সর্ব্বস্ব আপনার হাতে দিয়া আপনার বন্ধুত্বপ্রার্থী হইয়া এই অসময়ে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম।"

এই কথার পরে পাঠানদের সমস্ত বিদ্রোহভাব চূণের মত ভাসিয়া গেল। মুস্তাফা খাঁ প্রতিশপ্ত হইলেন, "যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, সে পর্য্যন্ত নবাব সাহেবের নিরস্ত্র সৈনিকের মেরুদণ্ডের মত আমার মাথা নীচু রহিল। যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আলিবর্দ্দী, তাঁহার সন্তান ও পরিবারবর্গের চিরদিন আমার জীবন অর্পণ করিলাম।" (সিয়ার মুতাক্ষরিন, ১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃঃ)।

আলিবর্দ্দীর এই রাজনৈতিক কূটনীতি ও চাল সিরাজ একেবারেই জানিতেন না। যখন শেষ বয়সে বিপদ্ আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল, তখন তিনি ঈশ্বরপ্রসাদের পায়ে পাগড়ী ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু সে অসময়ের কান্না। যদি সময়ে মিষ্ট ব্যবহার করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, তবে তাঁহার কেশ স্পর্শ করা সহজ হইত না। একদিকে জগৎশেঠ—যাঁহার বিপুল অর্থ বহুলোকের টাকি তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—তিনি জনমত সিরাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছিলেন। চিরশত্রু, ক্রূর ও কূটচক্রী মীরজাফর সমস্ত সৈন্যগণকে দেশের যোগদের অর্থে করতলগত করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া জুটিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশ এই

অনতিক্রান্ত কৈশোর বালকের নিকাবাদে নুবাবের হুকুমে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি একদিন দেখিলেন, চারিদিকে কেহই তাঁহার মিত্র নহেন, সেনেটি বেগম হইতে ক্ষুদ্র সৈনিকেরা পর্যন্ত সকলেই তাঁহার সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে—এমন কি ইংরাজ অক্ষর পর্যন্ত বিপদের দিনে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। মাত্র মাসকয়েক পূর্বে যিনি মুর্শিদাবাদে তাঁহাকে শুনাইয়া গেলেন যিনি চক্ষু দিয়া কলকাতা পুড়িয়াছিলেন, মাত্র মোহনলাল রণক্ষেত্রে ঘোর কৃতান্তের বেশে মীরজাফরের সড়কি আঘাতে কাতর অসমর্থ হইয়া প্রাণ দিলেন—মাত্র ফরাসী সেনাপতি লাস ইহাদের বালক নবাবের দুঃখে পরম দুঃখ পাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার বৃথা চেষ্টা করিলেন।

আর পলাশীর যুদ্ধ উহা যুদ্ধ নহে, সৈন্যের খেলা। সিরাজ বিলাসী, অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী এবং অলস—তাহাদের হাতে তাহার ন্যায় ঐশ্বর্যশালীর পক্ষে সেরূপ, স্বার্থ বিস্তৃত, ষড়যন্ত্রজালবিস্তৃত [illegible] অসহায় অবস্থায় নবযৌবনে, নব রাজ্যলুব্ধ একটি ব্রাহ্মণের হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিলেন, মনসব উপলক্ষমাত্র তাহা রাজলক্ষ্মীর কৌটা—একটা যাদুমন্ত্রে কবিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিয়া ইহা ইহার যোগ্য সম্মানদিগকে দিলেন মীরজাফর আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কর্নেল কুট, মীরজাফর প্রভৃতি ব্যক্তির মুখে যে অনুতাপ হইয়াছে ও হইতেছে যে ইহাদের স্বার্থের সঙ্গে দেশের স্বার্থ এক হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে আমাদের মনে হয় মীরজাফর ও অন্যান্য বলিয়াছেন—উহা বহুদিনের ব্যাধি।

[illegible] সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কোন বিলম্ব করিয়াছেন একথা ইতিহাসের কোথাও নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপরের প্রমাণ আছে তিনি তখন বুলবুলী ও তাঁহার ভাইকে হত্যা করিয়াছিলেন, তবে সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তখন তিনি বালক, এবং এই অপরাধে সেনেটি বেগম ও অপরাপর বয়োবৃদ্ধ লোকের বিশেষরূপ হাত ছিল, তথাপি উহা অতি গর্হিত কর্ম এবং এজন্য যে তিনি কম অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুকালীন কার্যকলাপ হইতে জানা যায় রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভের সহিত ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল সম্ভবত, অন্যায় উপায়ে বহু অর্থসম্পত্তি ঐশ্বর্য লইয়া রাজবল্লভ ঢাকায় ছিলেন এবং সেনেটি বেগমের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তথাপি সিরাজ রাজবল্লভকে কিছু বলেন নাই কিন্তু মনে পাপ থাকিলে ভিতরে সোয়াস্তি থাকে না। রাজবল্লভ তাঁহার অর্থের এক বিপুল অংশ রাজা কৃষ্ণবল্লভের হাতে দিয়া কলিকাতায় ইংরেজদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাইয়াছিলেন এ অবস্থায় নবাবের অর্থলিপ্সার এই দাবী ন্যায়সঙ্গত,

সমর ব্যবহার।

তিনি কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে ড্রেক সাহেবকে চিঠি লিখিলেন ড্রেক স্বীকৃত হইলেন না। নবাব কলিকাতা দুর্গ দখল করিবার তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলেন। নবাবের আর একজন বিদ্রোহী প্রজা ছিলেন উমিচাঁদ। তিনিও ইংরেজের আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়াছিলেন, নবাব

উভয়কেই আনিতে আদেশ করিলেন। Stewart সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "He (Nawab) immediately ordered Omichand and Krishnaballabh to be brought before him and received them with civility" (p 538) (তিনি তখনই উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত ভদ্রব্যবহার করিলেন।), তিনি এ অবস্থায় কৃষ্ণবল্লভের টাকাকড়িগুলি অন্ততঃ আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, অন্য কথা হইতে শুধু টাকাকড়ি গ্রহণ নহে, যাহার অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া তদ্বিপরীতপক্ষ আশ্রয় করিয়া তিনি একটা ভয়ানক দণ্ডও দিতে পারিতেন কিন্তু নবাব তাঁহাকে আদরে অভ্যর্থিত করিয়া গ্রহণ করিলেন। ওয়াট্‌স সাহেব তাঁহার বাড়ীতে বাস করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছেন—ইহাতো একটা গুরুতর অপরাধ—তাঁহার সহিত ব্যবহারসম্বন্ধে Stewart সাহেব লিখিয়াছেন "He dismissed him with assurance of safety" (p 538)। তাঁহার ভয় নাই, তিনি নিরাপদে থাকিবেন, এই আশ্বাস দিয়া নবাব তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কলিকাতার ইংরেজেরা তালিকা করিয়া অনেক টাকা সমর্পণ করিয়াছিলেন অথচ তাঁহাদের দুর্গ অধিকার কালে তিনি মাত্র ৫০,০০০ টাকা পাইলেন। তাঁহার সন্দেহ করিবার কারণ যথেষ্ট ছিল যে ওয়াট্‌স সাহেব টাকাপয়সা গুপ্ত স্থানে রাখিয়াছেন এজন্য। তিনি ইংরাজকে একটা ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন "However much property could be recovered could be obtained concerning the treasures which he supposed to be buried in Calcutta he released Mr Holwell and other English prisoners" (p 541)। কিন্তু যখন সেইরূপ কোন গুপ্তসম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তিনি মি. হলওয়েল এবং অপরাপর ইংরেজ বন্দীদিগকে মুক্ত দিলেন। ক্লাইভ মাদ্রাজ হইতে সাহায্য করার প্রস্তাবটিতে প্রথমতঃ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই তখন এই সকল বন্ধুত্বসূচক চিঠির বলে তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন—তখন ব্রেক তিনি চন্দননগর হইতে গোপনে চিঠি পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু একখানির মাত্র জবাব পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল—মীরজাফর নবাবের সঙ্গেই সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইবেন, কিন্তু ঠিক সময়ে তিনি ক্লাইভকে সাহায্য করিবেন। চিঠিটা যেমন তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তেমন নহে, তাহাতে আগ্রহ বেশী দেখা গেল না, তখন ক্লাইভ মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন—হয়ত নবাবের মন্ত্রী তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিয়া শেষে প্রভুর শত্রুর প্রতিশোধ লইবেন। ইহার পরে ক্লাইভ মন্ত্রীর নিকট হইতে আরও দুইখানি চিঠি পাইলেন, কিন্তু কতকটা আশ্বস্ত হইলেও মীরজাফরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করার মতন মনের ভাব তখন ইংরাজদের মধ্যে কাহারও ছিল না।

সবংজঙ্গ।

ভারতবর্ষে ক্লাইভ "সবংজঙ্গ" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন, ক্লাইভ বলিলে তাঁহাকে অল্প লোকেই চিনিত। তাঁহার অধীনে ৮০০ ইংরেজ পদাতিক সৈন্য, ১০০ কামান-চালক, ৫০ জন কামান লইয়া যাইবার নৌসেনা। এই কামানের মধ্যে মাত্র ছয় পাউণ্ড বারুদ ধরে এমন আটটি কামান ছিল।

তাহা ছাড়া পর্ত্তুগীজ ও ২,১০০ সিপাহী ছিল। নবাবের পক্ষে ১,৮০০ ফরাসী অশ্বারোহী সেন্য, ৫০,০০০ পদাতিক, তাহাদের হাতে বন্দুক বর্শা, ধনু, বোমা ইত্যাদি অস্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া ৪০টি কামান ছিল তাহার মধ্যে অধিকাংশের ২৪ হইতে ৩২ পাউণ্ড ওজনের গোলা ছুঁড়িত। এই সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের সম্পূর্ণ আশ্বাস না পাইলে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। মরজাদে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন আগ্রহাতিশয্য দেখান নাই। তারপর নবাবের সৈন্যের নেতা হইয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন, তবে ত সর্ব্বনাশ। ক্লাইভ সংকটজনক, তাঁহার ২০ জন প্রধান কর্ম্মচারীকে লইয়া একটা সভা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ফরাসীদের কথার উপর নির্ভর করিয়া নবাবকে আক্রমণ করা এই পথ খোলা আছে। দ্বিতীয় পথ—আমরা কাটোয়া হইতে অনেক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—এখানে অনায়াসে কয়েক মাস প্রতীক্ষা করা চলে, ইহার পর বর্ষাকালে যাতায়াতের অসুবিধা হইবে, তখন তাহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া নবাবকে আক্রমণ করা যাইতে পারে।"

২০ জনের মধ্যে ১৩ জন অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হইলেন। ৭ জন তখনই নবাব শিবির আক্রমণ করার পরামর্শ দিলেন। ক্লাইভ কিছু না বলিয়া নিকটস্থ তরুকুঞ্জে যাইয়া গভীর চিন্তায় এক ঘণ্টাকাল নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। অবশেষে তাহা স্থির করিলেন তাহা কাহার মত, এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন আর ফিরিয়া যাওয়া ভাল নহে, যে করিয়া হউক যুদ্ধ করিতে হইবে। এই পাঁর হইয়া তখনই তিনি সসৈন্য ৮০০ গজ দূরে এবং ৩০০ গজ প্রস্থ আমবাগানে শিবির স্থাপন করিলেন। এই আমবাগানই সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র। তিনি তথায় যাইয়া দেখেন নবাবের মানচরে যাইবার যে কথা ছিল তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও সৈন্যদল লইয়া অতি নিকটেই আছেন।

নবাবের অবস্থা তখন শোচনীয়, তিনি দেখিলেন যেন তাঁহার লোকেরা আর কেহ তাঁহার নহে। তাঁহার পরিচ্ছদবর্দ্ধ নবাবকে পরিত্যাগ করে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। এমন কি সেই শিবির এরূপ অরক্ষিত যে একটা চোর তথায় ঢুকিয়াছিল। একটি পরিচারককে তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোরা কি ভাবিয়াছিস যে আমি এখনই মরিয়াছি?"

পরিচ্ছদ-বর্জ্জিত নবাব।

এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মীরমদন ও মোহনলাল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, মোহনলাল ৫৫,০০০ সৈন্য লইয়া তুমুল বেগেতে যাইয়া পড়িলেন। একটা গোলা লাগায় মীরমদন অবসন্ন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় সিরাজের শিবিরে আনীত হইলেন, তিনি মরিতে মরিতে বলিয়া গেলেন "নবাব সাহেব, আপনার নিজের লোকই আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছে সকলেই আপনার শত্রু আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।" এই বিপদে সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন. দূতের পর দূত গেল, 'আসছি,' 'যাচ্ছি' করিয়া মীরজাফর অনেক বিলম্বে নবাবের নিকট আসিলেন। নবাব তাঁহার পায়ের নীচে নিজের পাগড়ী ফেলিয়া বড় অনুনয় বিনয় করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা

করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মীরজাফর পাথরের মত নিশ্চল থাকিয়া নবাবের সাগ্রহ অনুরোধের উত্তরে বলিলেন, "আজ রাত্রি হইয়াছে কাল সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।" উত্তরে নবাব বলিলেন, "আজ যুদ্ধ বন্ধ করিলে যে সর্বনাশ হইবে—রাত্রে শত্রুরা শিবির আক্রমণ করিবে।" মীরজাফর বলিলেন, "সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।" মুতক্ষরীনের পাদটীকায় লিখিত আছে, "কিন্তু এই অবস্থায় মীরজাফরের সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন তাহা বুদ্ধিমান বা অভিজ্ঞ রাজার মত আদৌ নহে। সকৎজঙ্গের পরিজনবর্গ ও সন্তানগণের প্রতি তিনি যেরূপ সময় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং গোলাম হুসেনের স্বগণদিগকে তিনি যেরূপ দয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাব কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না তিনি অত্যাচারী ছিলেন—একথা তো একেবারেই বলা চলে না। ইনি বাল্যকালে অত্যধিক স্নেহে লালিতপালিত হইয়া সৎশিক্ষা পান নাই, এবং যখন তাঁহার কিছু কাল স্থলে থাকা উচিত ছিল,—তখন হঠাৎ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।"

মোহনলাল পুনরায় বেগে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। গোলাম হুসেন এবং রাজবল্লভ উভয়েই লিখিয়াছেন—ইংরেজেরা বিপন্নপ্রায় হইলেন। জয়লক্ষ্মী নবাবের দিকে সবে মাত্র প্রসন্নবদন ফিরাইয়াছেন তখনই মীরজাফর আদেশ দিলেন "আজ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দাও।" মোহনলাল উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন, "এই কি যুদ্ধ থামাইবার সময়? আমি কিছুতেই এই অসময় আদেশ পালন করিব না, তাহা হইলে আমার সৈন্যেরা নিরুৎসাহ হইবে, এবং ইংরেজের সোৎসাহে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।" নবাবের এই কথাগুলি খুব মনে লাগিল কিন্তু মীরজাফর বলিলেন, "তাহা হইলে হুজুরের যাহা মর্জি, তাহাই করুন—আমি আর কি করিব?" যে ব্যক্তি তাঁহার কাঁধে চাপিয়া তাঁহাকে অতলে ডুবাইল, অন্তিম মুহূর্তে শেষ চেষ্টায় নবাব সেই মীরজাফরকেই আশ্রয় করিলেন। তাঁহাকে চট হইতে ডাক করিয়া মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে বারংবার নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। নিতান্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া মোহনলাল কুপাল ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিলেন। তখন শত্রুরা সোৎসাহে তাঁহার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। মোহনলাল চলিয়া গিয়াছিলেন—তখন ইংরেজদের বিজয় সম্পূর্ণ হইল। গোলাম হুসেনের বিবরণানুসারে মোহনলাল বন্দী ও আহত হইয়া তকিখানের হাতে সমর্পিত হন, তথায় অল্প পরেই তিনি নিহত হন। কিন্তু রাজবল্লভ লিখিয়াছেন যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মীরজাফরের আদেশ বারংবার লঙ্ঘন করিয়াও তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজাফরের এক চর পশ্চাৎ ভাগ হইতে খাল করিয়া তাঁহাকে নিহত করে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই মীরজাফর সৈন্যদল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

হতভাগ্য নবাব এখন আর রাজপ্রাসাদের লোকজন কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কে তাঁহার গলায় ছুরি দিবে, ঠিকানা নাই। তিনি তাঁহার বেগম লুৎফুন্নেসা এবং বহুমূল্য কতকগুলি মণিমুক্তা লইয়া মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া চলিলেন। তিনি তাঁহার

সেনাপতিগণকে আদেশ করিলেন যে পর্যন্ত তিনি কিরিয়া না যাইবেন সে পর্যন্ত যেন কেহ তাঁহার অনুসরণ করেন। তাঁহারা মাতামহের কণ্ঠস্বরে, কেহ তাঁহার আদেশে কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি তাঁহার বন্ধুবর্গ কেহও তাঁহাকে কোন সহায়তা না করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। একটা দিন তিনি রাজপ্রাসাদে ছিলেন তখন অনপূর্ণা তাঁহার খোঁজ লইতে আসে নাই। মতাবিলম্ব অপেক্ষা করিয়া তিনি রাজমহলের দিকে চলিলেন, পথে ফরাসী সেনাপতি মুঁসিয়ে লাসকে আসিতে চিঠি পাঠাইলেন। গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন "রাজমহলে যাদ স্থলপথে যাইতেন তাহার অনেক সুবিধা হইত, কিন্তু পূর্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তিনি জলপথে চলিলেন। কিছু খিচুড়ির ব্যবস্থার জন্য তিনি নৌকা লাগাইলেন। এমন সময়ে একটি ফকির আসিয়া আতিথ্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সাহেবা, সম্ভ্রান্তবর্গ ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা এক ফোটা জল পর্যন্ত খাইতে পান নাই, এই সম্পূর্ণ অভুক্ত রাজ পরিবারকে ছাড়া সে ফকির খাইবে কিরূপে করিয়া ডাকিতে লাগিল। এদিকে সে মাতামহের চরিত্রকে পুরুষ বলিয়া ও মনে করিত তাহার মনে কি বিরাট উপেক্ষার প্রতি অবজ্ঞার কি এক আক্ষেপ ছিল। যখন অভুক্ত রাজকুল খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে মাতামহের লাকেরা তাহার নানাকে ধরিয়া লইয়া গেল। নানা অভুক্তই রহিয়া গেলেন, এ জীবনে তাঁহার আর খাওয়া হইল না।

মীরন যখন সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া আসে, তখন তাহার অভুক্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা দেখিয়া সৈন্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অল্পক্ষণ পূর্বে যিনি তরুণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেন, আজ তাঁহার এই দুরবস্থা। সেই বিচলিত সৈন্যগণ কোন উৎসাহই পাইল না, কারণ সেনাপতিগণ সকলেই মতদ্বৈধে লিপ্ত। মীরজাফরের পুত্র মীরন একটা হিংস্র পশু, মুর্শিদা ও নিজামতের অবস্থার সিরাজকে আবদ্ধ করিয়া সে বহু অর্থের লোভ দেখাইয়া একজন ফকিরকে হত্যা করিতে প্রেরণ করে। কিন্তু এই দুষ্কর্মে কেহই স্বীকার পাইল না, অবশেষে মহম্মদী বেগ নামক অপর এক পশু প্রকৃতির লোক ছুটিল সে আলিবর্দী ও সিরাজের মনে চির কলঙ্কালিত এক আঘাতে সে হত্যা করিতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া বারংবার আঘাত করিয়া হতভাগ্য নবাবকে নিহত করিল। মরিবার পূর্বে সিরাজ বলিলেন, "আমি সকলই আমার যোগ্য শাস্তি পাইলাম, হুসেন কুলি, তোমার আত্মার এখন শান্তি হইবে।" * যখন সিরাজ এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন, তখন

* গোলাম হুসেন সিরাজকে, "তাঁহার দেশী কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ তাঁহারই উপর ক্রমাগত অত্যাচার করিয়াছিল। এই আপাতদৃষ্টির কারণটি তাঁহার মুখের উপর পড়িল যে মুখের ভাষা ও অনুপম সৌন্দর্য সমস্ত বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল, সেই মুখটি আজ আঘাতে আঘাতে রক্ত হইল। মুখখানি ছেলিয়া পড়িল," গোলাম হুসেন এই সামান্য বাক্যটির অনেক কথা লিখিয়াছেন, এই নরপিশাচের একটা নীতি ছিল যাহাকে সন্দেহ করিবে, তাহাকেই শেষ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে এই দুই ব্যক্তি সতত রক্ষা

মীরকাফর সেই নবাবের শয্যায় আরামে (প্রকৃতই হউক কিংবা ভান করিয়াই হউক) দিবা-নিদ্রা যাইতেছিলেন, চক্ষু মেলিয়া দেখেন পুত্র মীরনকে দেখিয়া বলিলেন "দেখ যেন নবাব পলাইয়া না যায়।" একথা ঠিক সত্যকার কথা কি ছলনা তাহা বলা যায় না। মীরন উত্তর করিল, "তজ্জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সিরাজউদ্দৌলার ছিন্ন-ভিন্ন দেহ হস্তীর পৃষ্ঠে বহন করিয়া সেই হস্তীকে মুর্শিদাবাদের সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কাহার জনসাধারণকে বুঝিতে দেওয়ার দরকার যে পুরাতন নবাব আর নাই, নূতন নবাব হইয়াছেন। যেখানে হসেন কুলি খাঁ কয়েক বৎসর পূর্বে নিহত হইয়াছিলেন ঠিক এক প্রয়োজনে মহম্মদী সেইস্থানে হাতীকে থামাইল এবং ঠিক সেই জায়গা হইতে সিরাজের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে লাগিল। হস্তী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই স্থান দিয়া চলিল এবং যে গৃহে সিরাজের মাতা ছিলেন, সেইখানে আসিয়া থামিল। হতভাগিনী জননী পুত্রের এই লাঞ্ছনার কিছুই জানিতেন না অকস্মাৎ এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি বুঝিয়া ফেলিলেন যে তিনি মুসলমান অন্তঃপুরের সম্ভ্রান্ত মহিলা, ভুলিয়া গেলেন যে তিনি আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিয়া আমিনা বেগম। দিখারিণীর মত চীৎকার করিয়া নগরের মধ্যে ছুটিয়া পড়িলেন এবং হাতীর পুচ্ছের ছিন্ন ভিন্ন দেহের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া চারিদিকের লোকেরা

হত্যা করিত। ইহার সংক্ষেপ দুইটা—সেনাপতি বেগ ও বিহারবাসী আমিনা বেগমকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা। আমিনাকে যাঁরা এই দুই ব্যক্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ওয়াট্‌স লিখিয়াছিলেন—"আমিনার তত্ত্বাবধানে এই দুই বাদশাহী আমলের আমির ও নবাবের ইজ্জতকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু ঢাকার রাজস্ব সচিব এই দুই বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করিয়া বীরত্ব বা মহত্ত্ব উহার লিখিয়াছিলেন, "আমি ঢাকার জন্য অন্য এক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হাতে এই কাজ সম্পাদন করব আমি ইহা পারিব।" যাঁহার একজন লোককে ঢাকায় পাঠাইয়া দিল এবং তাহার শাসনকর্তাকে লিখিল, "তুমি বেগমদ্বয়কে মুর্শিদাবাদে আসিতে যাইতেছেন, ইহার সঙ্গে তাঁহাদিগকে সাবাড় করিবে।" লোকটীর উপর এই আদেশ ছিল। ইংরাজদিগকে পথে জলে ডুবাইয়া মারিতে হইবে। আমিনা বেগম কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কমিঃ বেগ ('সওদা-মাত্রা' আমিনা বেগম) বলিলেন "কিসের, কাঁদিয়া কি হইবে? আমরা উহাদের অপরাধের কাছে অতি অপরাধী। এইমাত্র তিনি যে প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন, তাহা তাঁহার নিজ জীবনের উপর তাঁহার রোষাগ্নি বর্ষিত হইবে।" এই অভিসম্পাতের পর দুই তুর্কিনী পলাগলি করিয়া অতলজলে প্রাণত্যাগ করিলেন। মেজর এই সেনাপতির হত্যাকাণ্ড ঘটিল, ঠিক তাহার আটদিন পরে (১৭৬০ খৃঃ) ও সিরাজের মৃত্যুর দুইবৎসর পর মীরন আজিমাবাদের তখনে খুব একটি শিবির সন্নিবেশে প্রাণত্যাগ করে। আজিমাবাদের প্রধান সাধু সাহেবের আজি হাকিম এই সংবাদ পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "খোদার রোষাগ্নি কেমন সুস্পষ্টভাবে সকলের এক দৃষ্টি শিবির হইতে তাহার লক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।" দুইবৎসর পূর্বে সিরাজের শব যে পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদের সেই পথেই মীরনের মৃতদেহ শিবিকায় আনীত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর মীরনের পকেটে পুস্তিকায় ৩০০ শত সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের নাম পাওয়া গিয়াছিল। ইংরাজদিগের একজনকে সে হত্যা করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। সেজেট ও আমিনা বেগমের অনুগ্রহেই সে প্রথমজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। উহাদের সর্বনাশ-সাধন তাহার সহিতে পারে নাই (মুতাক্ষরিন, ২৪ খণ্ড, ৩৬৩-৩৭২ পৃঃ)

আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে ঘোলাম হুসেন খাঁ বারাকপুর হইতে তাঁহার আশ্রয়-দাতার পুত্রের এই দুরভিসন্ধি দেখিয়া দৃঢ় মত অবলম্বন করিতেছিলেন। তিনি কয়েকগুলি গুণ্ডা লাগাইয়া রাত্রির গুপ্ত মন্ত্রণা মারফৎ মেরমন সাহেবকে জোর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার সংবর্দ্ধনার্থ সৈন্যদল অসি নিষ্কাসন করিল। মীরজাফর ইংরেজের কায়দা জানিতেন না, সুতরাং তাহারা বুঝি তাঁহাকে হত্যা করিবে, এই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, এই সময়ে স্বয়ং ক্লাইভ আসিয়া তাঁহাকে 'নবাব' সম্বোধন করিয়া সাঁজোয়ার কবলমুক্তপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিলেন।

সিরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন, "কর্ণেল ক্লাইভকে সমর্থনার্থ আমরা এই বলিতে পারি যে, তাঁহার কোন ইংরাজ লেখকই সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুতে তাঁহার কোন হাত ছিল একথা বলেন নাই। অনেক বিশ্বাস করেন যে, সিরাজ যে বন্দী হইয়াছেন, একথাই তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার কোচিনে মৃত্যুর পর তাঁহাকে এসকল কথা জানান হইয়াছিল" (৩৬৯ পৃঃ)।

বাস্তবিক ক্লাইভের মত রাজপুরুষ এরূপ হেয় কার্য্য কখনই অনুমোদন করিতেন না, এমন কি মীরজাফরের প্রতিবাদে কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও তৎসম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত করার মোটা কোন প্রমাণ নাই। তবে মীরজাফরকে কেহই দেখিতে পারিত না। নবাব হইবার পর তিনি নিজে বড় বড় কাজালো একটা নাম ধারণ করিয়াছিলেন, "সুতরাং এই সুযোগে হিন্দুস্থানের মোগল মীরজাফর খাঁ বাহাদুর মেহাবৎজঙ্গ" ("Thus he was very much smitten with the charms of the title of Mehabut djung, which had been borne by Alyhardy Khan, he ordered a new seal to be engraven for himself, where he assumed the title of Nejah-el-Mulk Hyssam-ed doulat Mirdjafar Ally Khan Bahadur, Mehabut djung—that is, the high and valiant Lord Mirjafar khan, who is the valorous of the State, the sword of the Empire and the formidable in War and the Majestic in Battles." Metcalfe, Vol II, p 205), কিন্তু তাঁহার এক রহস্যপ্রিয় সভাসদ্ তাঁহার মসনদে বসিবার অল্প কয়েক মাস পরে আর একটি সহস্র নাম দিয়াছিল, "কর্ণেল ক্লাইভের গর্দ্দভ"—এই উপাধি দ্বারা তিনি আজীবন পরিচিত হইয়াছিলেন। (A very few months after Mirzafar's accession, he was nicknamed by some of the wits of the Court, "Colonel Clive's Ass" and retained the title till his death (Stewart, p 369) মীরজাফর মৃত্যুকালে নন্দকুমারের উপদেশানুসারে কিরীটেশ্বরীদেবীর পাদোদক পান করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন, "ইহাই তাঁহার শেষ খাওয়া—খোদা আমাদিগকে এই ভাবের পীড়া ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন"।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-দীক্ষার কথা

পাঠানদের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুর যে স্থান ছিল, তাহা মোগলদের সময়ে অনেকটা নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল পাঠানেরা এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে যতটা মিশিয়াছিলেন

পাঠানাধিকারে বাঙ্গালী।

মোগলেরা তাহা করেন নাই, ফলে মান প্রভৃতি প্রধান রাজারা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদিগের পুত্রকন্যা খুঁজিয়া তাঁহাদিগের সহিত স্বীয় সন্ততিবর্গের বিবাহ দিতেন আমরা একটীকিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বংশের ব্রাহ্মণগণের অনেক সুন্দরী কন্যা এবং গুণশালী যুবকের সহিত মুসলমান বাদশাহের পুত্রকন্যার বিবাহ হইয়াছে অবশ্য এই সকল কন্যা ও পুত্রদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত এইরূপে অযোধ্যা প্রদেশের বাইশোয়ারা পরগনার আদিপাল ক্ষত্রিয় ধনপৎ সিংহের বংশধর ভগীরথের পুত্র কালিদাস গজদানীর গুণে মুগ্ধ হইয়া নবাব ঘরের মেয়ের কন্যা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এই কালিদাসের কবিত্বের বলে ফলাইয়া মুসলমান কবি যে পদ্মাবতীর কথা রচনা করিয়াছেন, তাহা "ইশা খাঁ" নামক কাব্যে আছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন কালিদাস স্বয়ংসিদ্ধ। অবশ্য ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া গজদানী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গৌড়া হিন্দু ছিলেন। নবাবকন্যার প্রেমে পড়িয়া তিনি ধর্ম্মান্তরগ্রহণপূর্ব্বক সোলেমান নাম গ্রহণ করেন এই জন্যই কালিদাস গজদানীর পুত্রই কলঙ্কধারী সুপ্রসিদ্ধ রোজা ইশা খাঁ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বঙ্গদেশের ইতিহাসে যিনি একটা কলঙ্কের দাগের মত হইয়া রহিয়াছেন, সেই 'কালাপাহাড়'ও হিন্দু ছিলেন, তিনি মুসলমান বাদশাহের কন্যা বিবাহ করিয়া ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করেন; তাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে পাঠানেরা হিন্দুর রাজ্য জয় করিলেও তাঁহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের সকলকে স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন মোগলদের বিরুদ্ধে যেমন মাসুম খাঁ, কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানেরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন তেমনই চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, ঈশান দক্ষিণরায় ও মনোহর রায় প্রভৃতি হিন্দু জমিদারগণও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কারণ পাঠানেরা শুধু মাথা হেঁট করাইতে চাহিতেন, কিন্তু রাজস্ব চাহিতেন, সুবিধা পাইলেই চলিয়া যাইতেন; হিন্দু রাজারা প্রায় স্বাধীনই ছিলেন কেবলমাত্র রাজস্ব দেওয়ার পর নিজ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন করিতেন, এমন কি পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা অপর শত্রুদের সহিত যুদ্ধকালেও করিতেন ভুলুয়ার রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায় এইভাবে কতলু খাঁকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন সময়ে সময়ে ইঁহারা এত প্রবল হইতেন যে, বঙ্গাধিপের রাজ্য আক্রমণ করিবার কথাও মনে মনে পোষণ করিতেন এইভাবে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর একবার নবাবের রাজধানী আক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত হুসেন সাহের সেনাপতি মযারক খাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি

দিয়াছিলেন। পাঠানদের সময়ে হিন্দুর প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয় নাই। পূর্ব্বকালে জরাসন্ধ ও পৌণ্ড্র বাসুদেব যেরূপ মথুরা ও দ্বারকার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গের নরপতি জগন্নাথদেবের সেইরূপ সিংহাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিয়াছিলেন। এমন কি প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রিসহকে পরাস্ত করিয়া আচার্য্য যাজপুর পর্য্যন্ত যাইবেন, জগন্নাথচন্দ্র কর তাঁহার এই ইচ্ছা অবগত হইয়াছেন। "যমুনার জলে ধোব এই তরবার", লিখা মথুরা প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই বিদ্বেষ বাঙ্গালার চিরসংস্কারাগত মতবাদের পূর্ব্বকাল হইতে পুরুষপরম্পরা ভক্ত কবিদের চলিতেছে। জগন্নাথ আলেকজাণ্ডার পূর্ব্বকালের নায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বত্ব দিতেছেন। স্বয়ং মহাপ্রভু বঙ্গীয় ভক্তদের প্রতি এই বিদ্বেষ বাঙ্গালার চিরসংস্কারাগত মতবাদের পূর্ব্বকাল হইতে পুরুষপরম্পরা ভক্ত কবিদের চলিতেছে। জগন্নাথ আলেকজাণ্ডার পূর্ব্বকালের নায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বত্ব দিতেছেন। স্বয়ং মহাপ্রভু ইহাদের শাক্তত্ব যায় হরণ করিতে আরো পূর্ব্বে আক্রমণ করিবার চেষ্টা নানারূপে লক্ষিত হইয়া থাকে ছিলেন। এদেশ ইতিহাসের পূর্ব্বযুগ হইতে হরপার্ব্বতীর আত্মগতভেদ বিরোধ। পুরাণের

বাঙ্গালীর খাদ্য ও ইহার বাহন।

যত ছাঁচে ঢালিয়া ইহাদিগকে কালে প্রভাসাদিত্য হৃৎপুত্র উদয়াদিত্য, মধুকবায় হরপুত্র কার্ত্তিকের এবং কেদার রায়, ইশা খাঁ বিদ্রোহী বা সই হরপুত্র বিনোদ সন্তানে বহন করিয়া প্রাণ দিয়াছেন, কিন্তু পণ ছাড়েন নাই।

পাঠান রাজত্বে পরাস্ত হিন্দুদের এই স্বাধীনতার চেষ্টা সমধিক চলিয়াছিল। পাঠানেরা চমাধিকারী ছিলেন না, যাহারা ছিলেন সাম্রাজ্যের মূল সংগ্রামবিজয়ী। কৃষি ব্যবসায়, বাণিজ্য, সেবকের উপজীবিকা ইহাতে ইহার অধিকাংশ এসকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সভ্যতাকুপাণ-পাণি, রণজয়ী বীরদের কল্পনাকে অধিকার করিতে পারে নাই। তাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য জানিতেন না, কি কর্ম্মের কত আয় হইতে পারে, রাজস্ব কত হওয়া উচিত এসকল লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইতেন না। অর্থের প্রয়োজন হলে নিকটবর্ত্তী কোন রাজভাণ্ডার বা দেবমন্দির লুণ্ঠন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের ঐহিক পারত্রিক উভয় প্রকারের সুফল লাভ হইত। তবু দেখা যায় ও চলেন মন্ত্রী কর্ম্মচারী অর্থসম্বন্ধে খবর রাখিতেন, অপরাপর পাঠান নবাবেরা নিরন্তর সন্ধান উপায় ও সেই চিন্তাই করিতেন। তাঁহারা অর্থের চিন্তা হইতে মুক্ত থাকেন, তাঁহাদের মন স্বভাবতই উদার হয়, পাঠান নবাবদের কতকটা সেরূপ উদারতা ছিল এই সুযোগে এদেশে হিন্দুরা নানারূপ দ্বারা বিপুল অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন সেই ধনকুবেরদের দেহ সম্পদসহ পরবর্ত্তী কালে জগৎশেঠের গৃহ হইতে জন্মিয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, জগৎ শেঠের মত ধনী তখন পৃথিবীতে ছিল না।

পাঠানাধিকারে হিন্দু শিল্পেরই হিন্দু মুসলমান সকল নৃপতিরই ও গণ্যমান্য লোকের উৎসাহ পাইত। বিদেশ হইতে পাঠান নবাবেরা শিল্পী বেশী আনাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, যাহারা প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যের বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিত, পাঠানদের অত্যাচারে তাহারা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছিল।

হিন্দু শিল্প।

হাভেল সাহেব পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মোগল ও পাঠান-শিল্প বলিয়া যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পেরই মূলতঃ রূপান্তর।

তাহাতে ইরানী প্রভাব কতকটা আছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় শিল্পই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ফতেপুর সিক্রি এবং অন্যান্য স্থানের আকবর-কৃত মসজিদসমূহের সিংহদ্বারের কারুকার্যের মত উৎকৃষ্ট চারুকলা—কি এদেশে কি কারুকার্যে পারস্যদেশীয় কোন মসজিদে দৃষ্ট হয় না। (A Handbook of Indian Art, E B Havel, p. 143) তিনি বলেন হিন্দু কারিগরদিগকে আকবর ঐ সকল ইরানী মসজিদের আদর্শে মসজিদ গাঁথিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অপূর্ব কল্পনায় তাহারা বিদেশী আদর্শ অনেকদূর ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। হিন্দুদিগের মূর্তি ও চিত্রাঙ্কনশক্তির কথা উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল বলিয়াছেন, 'ইহাদের চিত্রাঙ্কনশক্তি আমাদিগের ধারণার অতীত। সমস্ত জগতে ইহাদের সমকক্ষ শিল্পী অতি অল্পই আছে।" (আইন-ই আকবরী—ব্লকম্যানের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ) ("Their pictures surpass our conception. Few in the whole world we find equal to them") ভাঙ্কেল বলেন, "হিন্দু শিল্পীদের দ্বারা গড়া এই সকল মুসলমানী মসজিদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আরব, তুরস্ক, ইজিপ্ট এবং স্পেনের মুসলমানী শিল্পের নিদর্শনগুলি ইহাদের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। হিন্দুর আনাড়িক ধারণা এবং তাঁহাদের সূক্ষ্ম-কারুকার্যে মণ্ডিত হইয়া বিজাপুর শিল্প, ফতেপুর সিক্রি, আহমদাবাদের মসজিদগুলি কেইরো এবং কনষ্টান্টিনোপলের মসজিদগুলি হইতে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে সেগুলি উহাদের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।" (The Ideals of Indian Art, Havel, p 116) "Inlay workers who were all Hindus from Kanoj and a Hindu garden designer from Kashmire" (A Handbook of Indian Art, Havel, p 117) ভাঙ্কেল সাহেব নানা প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৌদ্ধশিল্প-প্রভাব সমস্ত এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। চীন ও জাপানে, সিংহল জাভা, শ্যাম এবং সমস্ত ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এই কারুকার্য শিল্পের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পারস্য ও আরবও এই শিল্প (মূর্তি বা বিবাহ-নির্মাণপ্রথা অবশ্য বাদ দিয়া) হিন্দুস্থানের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিল। আহমদাবাদ ও বিজাপুরের আশ্চর্য মসজিদগুলি কিছু সামান্য পরিবর্তনের পর বৌদ্ধ বিহারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এরূপ অপূর্ব সুন্দর হইয়াছিল। আহমদাবাদের বিশাল ও সুন্দর দুর্গ ও মসজিদগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে গঠিত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যপ্রভু আহমদাবাদ গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচর গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, "আশ্চর্য্য আহমদাবাদ তাঁকের সহর।"

বারদুয়ারী মসজিদ।

মোগলদের সময়ে শাসনকর্তারা বঙ্গের শিল্পীদিগকে কোন বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু পাঠানেরা যে হিন্দু শিল্পী দিয়া তাঁহাদের সমস্ত মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধিক্ষেত্র গড়িয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত উদাহরণ বাঙ্গলার সর্বত্র এখনও আছে। গৌড়ের "বড় সোনা মসজিদ" বা "বারদুয়ারী" মসজিদে মাত্র বারটি গম্বুজ লাগাইয়া উহাতে মুসলমানী প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে,

এই "বারদুয়ারী" গৃহ হিন্দু আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন পুরাকীর্তিকার বঙ্গদেশের এই "বারদুয়ারী ঘরের" পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখনও মৈমনসিংহ জেলার ধনাঢ্যেরা "বারদুয়ারী ঘর" নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কাস্ত সেন সাহেব লিখিয়াছেন, "প্রাচীন গৌড়ের গৌরবলোপ মালদহ, মুর্শিদাবাদ মালদহ, রঙ্গপুর, রাজমহল প্রভৃতি নগরী সমগ্রভাবে গঠিত হইয়াছে, এমন কি কলিকাতা ও তাহার অনেক স্থানে সেই উপকরণ গৃহীত হইয়াছে।"

বাঙ্গলাদেশে ইট দিয়া বাড়ী ঘর নির্ম্মিত হইত, পাথর এখানে কতকটা দুর্লভ, পোড়া মাটিতে, সুন্দরভাবে নানারূপ কারুকার্য্য করা হইত। ইটের গাঁথা বজায় কোঠাবাড়ীতে খিলান প্রস্তুত করা সহজ। পাথর দিয়া গোলাকৃতি কি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চাপচিকা। খিলান তৈরী করা কঠিন। দিল্লী অঞ্চল অপেক্ষাও এদেশে মুসলমানের মসজিদ প্রভৃতিতে পোড়া ইটের উপর হিন্দু কারিগরদের হস্ত নৈপুণ্যের চরম বেশ। গৌড়ের মসজিদ ও সমাধিমন্দিরগুলিতে এইরূপ ইটের উপর যেরূপ অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দৃষ্ট হয় তাহা এদেশের হিন্দুকারিগরের হাতের কাজ। আমার মনে হয়, ইট কাঁচা থাকিতেই, এখন যেরূপ মার্শেলের নামের ছাঁচ তাহার উপর ছাপ দিয়া পোড়ানো হয় সেইরূপ প্রাচীন কালে নানারূপ পৌরাণিক এবং সামাজিক ঘটনা, নানারূপ মূর্ত্তি ও বিল্ল-সৌন্দর্য্যের ছাঁচ তৈরী থাকিত, তাহারই ছাপ দিয়া ইট পোড়ানো হইত। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের খিলানের কাজ বিশেষত জাফর খাঁর মসজিদের কারুকার্য্য, এগুলি সমস্তই হিন্দুশিল্পের উপকরণে নির্ম্মিত, এমন কি শেষোক্ত মসজিদের প্রাচীন নির্ম্মাণের একাংশে মসজিদের কলঙ্ক স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে। গৌড়ে হুসেন সাহের সমাধি এবং কয়েকটি মসজিদে যে নানা রঙ্গের এনেমেল করা টালির উপর কাজ দেখা যায়, তাহাও এই দেশের লোকের মৌলিক কাজ—আঙ্গলার নিজস্ব জিনিষ। "The Pathan mosques and tombs of Gour, Pandua and Malda on this account are even closer imitation of Hindu and Buddhist buildings than they were in the neighbourhood of Delhi, where stones of large dimensions were procurable and consequently the arch was not used by Hindu masons to secure a structural purpose. The terracotta and fine moulded brick-decorations used both in mosques and temples in Bengal were certainly not imported by Muhammedans. The cognate art of enamelled tiles and bricks so much used in Muhammedan buildings in India was probably a local one in Gour"—(A Handbook of Indian Art, Havell, p 123)

হুসেন সাহের সময়ে অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বঙ্গের নানাস্থানে তিনি মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৫০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পাটনা জেলায় বিহার মহকুমার বোনহারা গ্রামে, ঢাকা জেলার বল্লীপুর পরগনায় মাছাইন গ্রামে ১৫০১ খৃষ্টাব্দে, মালদহ জেলায় ১৫০২ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ্চ, ১৫০৩ খৃঃ অব্দে গৌড়ে কদম রসুলের নিকট সাগর জেলায় চোরাসি গ্রামে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায়—

এইরূপ বহুস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হুসেন সাহ মসজিদ, তোরণ ও কূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার ওমরাহ ও অধীন লোক ও আত্মীয়বর্গও অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বঙ্গের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ২৫২ হইতে ২৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই দেশব্যাপী স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহাতেই প্রায় দশটি পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছে। গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মালদহই এই স্থাপত্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। সারণ ও বিহার হইতে কামরূপ পর্যন্ত হুসেন সাহের এই উদ্যম সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। হুসেন সাহ ছাড়া পাঠানদের মধ্যে শের সাহের মসজিদ, সমাধি ও রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ অন্বেষণযোগ্য। শের সাহের সমাধি মন্দিরে স্থাপত্যের যেরূপ সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়। তিনি মুসলমান ছিলেন, এজন্য তাঁহার মৃত্যু চিহ্নে পার্শ্ববর্তী মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধির আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকালো ভাবটি নাই। একটি কৃত্রিম সুন্দর মধ্যবর্তী এই সমাধি স্বীয় মহিমান্বিত আকার প্রকটিত করিয়া দেখাইতেছে। উহা অনেকটা তাঁহার স্বীয় মহান্ চরিত্রের ন্যায়। চারিদিকের সমতলভূমি ও জঙ্গলরাশির মধ্যে থাকিয়া উহা সেই

শের সাহের সমাধি।

উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রের মহিমায় ঐতিহাসিক প্রভাব প্রকটিত করিতেছে। ইহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য বেশি নাই, কারণ সুন্নিরা সহজ নিরাভরণ, সাদাসিধা ভাবটা বেশী পছন্দ করিতেন। কিন্তু উহাতে ইরানী প্রভাব কিছুই নাই, উহা ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্তূপগুলির অমল-ধবল শান্ত জ্যোৎস্নার মত প্রভাবোদ্ভাসক। হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, "ইনি সুন্নিদের নিষেধাত্মক বিধি মানিয়া হিন্দু কারিগরদিগকে এই মন্দিরটি নির্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই সকল শিল্পী ইহা কারুকার্যে অলঙ্কৃত করে নাই, এই সমাধিমন্দিরও সর্বাংশে ভারতীয়, এই সমাধিতে প্রাচীন আর্যাবর্তের সমাধি-মন্দির ও বৌদ্ধস্তূপেরই পঞ্চদশ শতাব্দীর বিকাশ দৃষ্ট হয়" (He set Hindu craftsmen to work in carrying out his building projects in conformity with the Sunni prescriptions, just as the Indian mosque is always Indian so is the tomb of the great Pathan it is the fifteenth century development of the Indo-Aryan heroes' tomb—the Buddhist *stupa*"—(A Handbook of Indian Art, Havell, p. 115). অজন্তার গুহা-মন্দিরাদি হইতে দৃষ্ট হয় বৌদ্ধস্তূপগুলি গোলাকৃতি সূচ্যগ্র আকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় শিল্প-কলার সুচিরাগত আদর্শে পদ্মাকৃতি হইয়া আসিতেছিল। মসজিদের গম্বুজগুলি এই পরিবর্তিত ভাবের ঘোতনা করিতেছে। কি ইরানে, কি আরবে, কি ভারতবর্ষে, মসজিদের গম্বুজগুলি ভারতীয় বৌদ্ধস্তূপের অনুকৃতি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বোধহয় ও বৌদ্ধশিল্প অদ্ভুতরূপ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সুন্নিরা মূর্তি বাদ দিয়াও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পাঠানের সময়ে এদেশের হিন্দু ও মুসলমান-কীর্তি সমস্তই বাস্তবিক হিন্দু কারিগরের হাতের। হিন্দুরক্তের জটিল নিষেধবিধি কতকপরিমাণে এড়াইয়া এবং ইসলামের সহজ ও সরল আদর্শের অনুবর্তী

হইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দু কারিগরদের হাত একটু বেশী স্বচ্ছন্দ হইয়াছিল।

[illegible] হিন্দু কারিগরদের [illegible] বিশেষরূপে আদিষ্ট হইতেন। [illegible] পাথর [illegible] ও লোহ [illegible] পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে [illegible] কারুকার্য [illegible] করিতেন, [illegible] মন্দির [illegible] এবং স্থাপত্যের পরে কাজ [illegible] সুন্দর [illegible] নির্মাণ করিতে সঙ্গে পরে [illegible] হিন্দু [illegible] হিন্দু কারিগরদের একটি হাট বসাইতেন। সমস্ত মুসলমান [illegible] হইত [illegible] দাসী এবং নিপুণ কারিগর ক্রয় করা হইত।

এই [illegible] 'হাত বদল' হয়ে মাথায় শিল্পীত [illegible] পাথরের [illegible] হিন্দু কারিগরের এই খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই। [illegible] হিন্দুস্থান হইতে কারিগরেরা [illegible] তাহারা বিদেশে [illegible] তাহাদের [illegible] নামি [illegible] এই [illegible] বোধ হয় [illegible] ছিল। [illegible] Thousands of [illegible], each [illegible], were freed into the service [illegible] Europe was set to work [illegible] (I. 124) হিন্দু কারিগরেরা 'বিদেশে' নির্যাতন করিতে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া সহজে সঙ্কুচিত করিতে পারিল। তাহারা মূর্তি তৈরী করিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহা [illegible] করিল, যাহা আলঙ্কারিক সমৃদ্ধিকারের উদ্দেশ্যে মসজিদে অঙ্কিত হইত সেই [illegible] ও ফুলের অবলালাক্রম উদ্ভাবনা তাহারা কোরানের 'শ্লোক'গুলিকে মসজিদের ঘারদেশে অতি সুন্দর করিয়া চারুশিল্পকার্যে পরিণত করিল। তাহারা হাত মানুষের মূর্তি 'কাঠ' নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু কমল টালির উপর এবং পাথরের গায়ে নানারূপ বিচিত্র ফুলের ছবি তাহাদের শিল্পপ্রতিভা প্রদর্শন করিল।

যে যুগে [illegible] এবং মজবুত পাথরের [illegible] ইসলামের মসজিদ ও সৌধমালায় হিন্দু কারিগরের এই হস্তচিহ্ন বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা ফার্গুসন সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন, ইতিহাসের সাক্ষ্যও ইহার সমর্থন করে। বস্তুতঃ বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য ও চারুশিল্পের প্রভাব অতি আশ্চর্যরূপে সমস্ত এশিয়াতে এবং য়ুরোপের স্থানে স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার আভাস খুঁজিতে গেলে হয়ত আমরা অতীত ঐতিহাসিক কূলের থৈ পাইব না। খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বের মহেঞ্জোদারোতে যে সকল

শিল্প-নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তাহা আর্যাগমনেরও পূর্ববর্তী, তাহারই ক্রমবিকাশ আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম-যুগে দেখিতে পাই এবং তাহার কেন্দ্রভূমি ছিল ভারতবর্ষ।

মোগল-সম্রাট আকবর ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মিলন ঘটাইতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁর এই উদারতার ফলে মোগল দরবারে স্থাপত্য ও সুকুমারশিল্পের যেরূপ অভূতপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল তাহারই ঔজ্জ্বল্যে ফলে তাঁহার সময়ে ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী এই স্বল্পস্থায়ী রাজত্বের যাহারা কালে হিন্দু ও মুসলমান এই অভূতপূর্ব সমন্বয়ের সমুজ্জ্বল নিদর্শন আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি নগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেরূপ মনোহর প্রস্তর খোদাই করিয়াছিল, সেইরূপ মনোহর ইষ্টক-নির্মিত প্রাসাদও নির্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু আকবরের স্বল্প ও স্থায়ী কেন্দ্রভূমি ছিল আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রি।

আকবরের কুল স্বল্প ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ।

আকবর ধর্ম ও শিল্পকে যেরূপ উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সঙ্গীতের সম্বন্ধে সেরূপ পারেন নাই। তিনি চিত্রকর ও ভাস্কর্যশিল্পীদিগকে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ যাহারা ছিল তাহারা আসিয়া সভাসদ হইয়া গায়ক ও বাদকরূপে মুসলমান সমাজে স্থান পাইল। তিনি ইহাদের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন বটে, কিন্তু নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। ফলে এ যেন জটায়ুর পক্ষচ্ছেদন করা হইল। সঙ্গীত বিদ্যাটিকে তিনি আর কোন মনে করিয়া তাহা নিয়ন্ত্রিত করিলেন। যমুনার পারে বাঁধা ও বেসুরো থামিয়া গেল, কোরানের আবৃত্তি চলিল। এই কার্যের দ্বারা দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়—প্রথমতঃ ইসলাম ধর্মের সুস্থিমতের গোঁড়ামি, কিন্তু মূলতঃ বোধ হয় শিক্ষিতেরা পুত্র তাঁহার বাপের কার্যগুলি কিছুই নহে বলিয়া উহার অসারতা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন, তাই নিজে একটা নূতন সহজ সরল ভাবনের মৌলিক আদর্শ খাড়া করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার শিল্প ও কলা-চর্চার বিষয়ে ধর্মের গোঁড়ামি না শিক্ষবিদ্বেষের ফল তাহা বলা কঠিন।

সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে টাকা আসিত, যাহা আগে বাহ্য হইত আকবরের সে অর্থ ব্যয় করিতেন গৃহনির্মাণে, কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী সম্রাটগণ তাহা শিল্পচর্চায় ব্যয় করিতেন। এই মোগল যুগের শিল্প বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। শিল্পের কারুকার্য ও পরিচ্ছন্নতার এই ইঙ্গিত যদিও অন্যান্যদেশের অনেক পরিবর্তে দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহাকে ভারতীয় শিল্প নাম দিতে বাধে না। যদিও মোগল-শিল্প এদেশের জন-সাধারণের অনায়ত্ত বাঙ্গলাদেশ সকলে প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিল, মোগলের সাম্রাজ্যবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসন তাহাদের প্রকৃতির অনুকূল নহে, এইজন্য তাহারা মোগলাধিকারের পথে এত বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। যে প্রকৃত অর্থে মোগল স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ বাঙ্গলা হইয়াছিল, তাহা সার্বভৌম শক্তি ভিন্ন অন্যের আয়ত্ত নহে বিশেষ হইতেছে নিত্য নূতন-চঞ্চল এবং নদীপূর্ণ বাঙ্গলা দেশে স্থাপত্যের সেরূপ অবকাশ নাই কিন্তু মোগলশিল্পও বাঙ্গালীচিত্তকে ততটা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এদেশ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য। হ্যাভেল সাহেব বলেন,

বাঙ্গালী মোগল কলার পক্ষপাতী কেন হয় নাই।

তাহা তাজমহলেও নাই। শিল্প পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—তাজমহলাদি উচ্চাঙ্গের স্থাপত্যের সঙ্গে অজন্তার শিল্পের এই স্থানে প্রভেদ। বৌদ্ধ ও হিন্দুজগতের আধ্যাত্মিক মহিমা মোগলশিল্পে নাই এইজন্য সৌন্দর্য্যের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও মোগল-শিল্প বাঙ্গালীদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ মোগল শিল্পের অনেক কারুকার্য্য বাঙ্গালার মোটেই ভাল লাগে নাই। শিল্পশ্বর জগদীশ্বরের আসন স্থল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে দণ্ডটা সম্ভ্রম ও সম্ভ্রম দুইই দরকার। ভক্ত সেবাশ্রমে প্রবেশ করিতেও ততটা দেখাইতে পারেন না। দেওয়ানখাস সাজাহানের সভা, আকবরের জন্ম প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রত্যেক সভাসদ ও ঘাস চাঁচর পর্য্যন্ত আদব কায়দার চূড়ান্ত দেখাইতেছে, তাহাদের বসিবার ভঙ্গীতে একটুও ত্রুটি নাই, পরিচ্ছদে সজ্জায় বেশা। এমন কি ফকির ও সন্ন্যাসী যাঁহাদিগকে মাহাত্ম্যে ইঁহাদের ভক্তী বা বেশভূষার মুহূর্ত্তের জন্যও মোগল শিল্পী—তাঁহার অতি সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত আদব-কায়দার জ্ঞান খুঁজিতে পারেন নাই। সাহেবের এই কায়দাকানুন, অযাচিত সুকুমারতা ও ভীরুত্ব পর্য্যন্ত সকল চিত্রের মধ্যে উঁকি মারিতেছে সর্ব্বত্রই যেন রাজদরবার—বসিবার বা চলিবার ভঙ্গী পর্য্যন্ত বেকায়দা হইয়া যায় মোগল শিল্পী সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন, বাল্মীকি রামসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, "নিয়তপ্রাতরুত্থায়ী সমুখস্য পিতুঃ সদা"—"আমি যখনে থাকি বা চলাফেরা করি সেখানে তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দ ও নম্রভাবে দণ্ডায়মান হই (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৩৮ সর্গ, ৯ শ্লোক) তরুণ দিগীশ্বরের পশ্চাৎ প্রাসাদ যেন মোগল শিল্পে অতি সাবধানে তুলিয়া রাখিয়াছে, সকল মূর্ত্তিই যেন রোমের কলোসিয়মের মত স্বল্পোন্নত, এত বড় যেন হাসা, কাঁদা ও অঙ্গসঞ্চালন নিষিদ্ধ। এই ভাবে বাঙ্গালার কে কি করিবে কি করিতে পারে? তাহাদের আদর্শ—চালনা, সেবা তাহারা মোটেই পছন্দ করে না বৌদ্ধযুগের বুদ্ধবিগ্রহে অবিচলিত স্থৈর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহার আত্মাভিব্যক্তি মোগল শিল্পে নাই। মোগল শিল্পে সমস্ত মূর্ত্তিই যেন বাহা হইতে বুদ্ধ করার মোগল যুগে বাঙ্গালায় তরি সংকীর্ত্তনের তুমুল ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সাক্ষ্য ইন-ক্ষেত্রে মৃত্যুকারীদের দলগুলি, খোলবাদক লাফাইয়া আড়াই হাত উঁচু উঠিয়াছে—এক পা ধরণীতলে আর এক পা বায়ুর উপর। তাহার ছয় হাতের উদ্ধত গতিতে খোলের আওয়াজের উচ্চতার কল্পনা করা যায় সেখানে বাঙ্গালা ছবি আঁকিতে বসিয়াছে, সেইখানেই ক্ষিপ্রগতি ও প্রাণের দ্রুত স্পন্দন দেখাইয়াছে, হয়ত কোন সময়ে তাহারা মাতা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছে—এই নর্ত্তন, কুর্দ্দন, টীকি নাড়া ও কাঁসাঘণ্টার দেশে, সারি সারি বুদ্ধদেবের মত প্রশান্ত ছবি, তাহা যতই নিপুণ-হস্ত ও সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক হউক না কেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? বাঙ্গালী হয়ত একদিন বোধিমূর্ত্তির প্রশান্ত ভাব পছন্দ করিত, কারণ তাহাতে আধ্যাত্মিক ভাব ছিল, সে যুগ চলিয়া গিয়াছিল। মোগল-শিল্পের অন্ধ এক সম্পদ্ সৃষ্টি রেখাঙ্কন; মানুষের মুখ ও শরীর-অঙ্কনে তাহা এত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দেখাইয়াছে যে, ছবি দেখিলে মনে হয়—ছবি মানুষ হইতে সুন্দর। মোগলশিল্পের প্রাণ তাহা নাহে না

বাদশাগারের অন্দর মহলে ছবি থাকবে, বলেন, বাদশা নবাব ও রাজপুরুষদের ছবি আঁকিতে হইবে, চিত্রকর তুলি ধরিয়া রং ফলিতে পটিতে রঙের ভিতর এরূপ পরিমাজনা, এরূপ অলৌকিক লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, তাহার সমকক্ষতা করা সহজ নহে। চিত্রকর জানে, ছবিখানি ভাল হইলে তাহার অন্নবস্ত্রের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, বিক্রি হইলে হয়ত তাহার মৃত্যু যাইবে—এইজন্য নূরজাহান, মমতাজ, আরাঙ্গীব, সাজাহান প্রভৃতির ছবি তাহারা নিজের চোখে আঁকিতে যাইয়া তাহারা যত্নের কোন ত্রুটি করে নাই এক কথায় বলিতে গেলে তাহারা প্রাণপণ করিয়াছে কিন্তু এত যত্নের আঁকা ছবি কি সেই আধ্যাত্মিক সত্তা নিজে পারিতে সমর্থ হিন্দু বা বৌদ্ধ শিল্পী কোন দেবতা বা দেবপ্রতিম ব্যক্তির মূর্তিতে যেই দেবত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বুদ্ধের সেই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির কথা বলা যাইতে পারে, যাহাতে করুণাঘন উজ্জ্বল হইয়া আছে—যেখানে কুলবধূ ভিক্ষা দিতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড় করে আছেন। তাঁহার শিশুপুত্রের হাতে ভিক্ষাভাণ্ড, সেই অলৌকিক পুরুষসিংহ ব্যক্তিকে দেখিয়া নিজে ভুলিয়া গিয়াছে, ভিক্ষা দেওয়ার কথা মনে মনে নাই, কিংবা ত্রৈলোক্যদেবের প্রেমে কূলে সেই অপূর্ব নৃত্যের ছবিখানি, যাহাতে তাঁহার মণি রেখিয়া যাও লীলা হাতে দাঁড়াইয়া আছে নৌকা বাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে নৌকার স্বামীর হাতের হুঁকা হইতে কল্কে পড়িয়া গিয়াছে তাহার হুঁস নাই, অথবা কাঠের উপর সেই অপূর্ব মানুষটি তাহার মাথার চুলটি যে চুলোরমার আঁচড়না করিতেছে, অমন্থিত শিশুর গুন্তনানের সময়ে তাহার ভাবাস্তর মুখে স্নেহের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে মোগল আর্ট অত সুচিন্তিত, অত শুদ্ধক কবিদের ও সাধকদের পরিচায়ক হইয়াও কি ভক্তের বা সাধকের একটানে অনায়াসক্রমে আঁকা ছবির সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছে? গুরুনানক মানুষের ছবি আঁকিতে নিষেধ করেন শুধু দেবতার ছবি আঁকিতে উপদেশ দিয়াছে; কেন এই নিষেধ-বিধি তাহা পূর্বোক্ত বিষয়টি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। সকলেই অবগত আছেন আরঙ্গজেবের অত্যাচারে আর্যাবর্ত শিল্পীরা রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিল। হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন তাহারা রাজপুতনায় যাইয়া রাজাদের আশ্রয় লইল। এইখানে তাহারা যে সকল ছবি আঁকিয়াছে তাহা কতকটা মোগল শিল্পের পরিচ্ছন্ন ভাব ও কতকটা হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিয়াছে। মানসিংহের পর হইতে রাজপুতনার সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটু বেশ মেলামিশি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সংগ্রামসিংহ একেবারে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং মানসিংহ কুচবেহারের রাজকন্যা এবং কেদার রায়ের কন্যা বিবাহ করেন, ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গদেশ হইতে আরও অনেক রমণী লইয়া গিয়া অন্দরমহলে পুরিয়াছিলেন। মোগল বাদশাগণ প্রায়ই বহু বিবাহিত পত্নী ও বহু উপপত্নী অন্দরমহলে রাখিতেন, মানসিংহ এ বিষয়ে তাঁহার গুরুদের অনুকরণ করিয়াছিলেন সনাতন ও রূপগোস্বামীর কৃপায় রাজপুতনায় অনেক রাজা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলাদেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন, এইভাবে

রাজপুত-শিল্প।

রাজপুতনিবাসে বাঙ্গালাদেশকে পরের করিয়াছিল। এই বিষয়ে অন্য বাঙ্গালার চক্ষে পড়ে, তাহা একের উপর অন্যের প্রভাব বিস্তার করার পরিচয় ছাড়া সেনবংশের আদর্শ কিভাবে খুব উচ্চ মূল্যের বোধ বলিয়া মনে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তভাগে অন্নপূর্ণার কিছু বাঙ্গালা চিত্রশৈলীর উপর বিদেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অন্যত্র ইহা অত্যন্ত মহিমা-সহকারে উপস্থিত দেখাইয়া থাকিলেও 'চুরক' চিত্রকর 'হস্তস্থ' তাহাদের ছবিগুলি কালোপযোগী মনোরম, লবণপুর অনন্যসাধারণ বেশ চমৎকার কিন্তু বাড়ি বাঙ্গালা চিত্রের লীলাচঞ্চল প্রাণের খেলা তাহাতে নয়।

কাঙ্গড়া কলমের ছবি এখানে চমৎকার। আমরা উহার কারিগর পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বসীমান্ত হিমালয়ের উপত্যকা-অধিত্যকা-সমূহে এখন অনেক আপনাদিগকে দেখিতে পাইয়া থাকি। কাঙ্গড়া কলম।

স্ক্রাকত, মন্ত্র এবং মুক্তার বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে গৌড়ের লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব সুরসেন ১২০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদ-বখতিয়ার মুসলমানকর্তৃক গৌড়দেশ হইতে তাড়িত হইয়া প্রয়াগে আসিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত বেণীসংহার অনুসারে সুরসেনের পুত্র রূপসেনের সংখ্যা • যখন রাজতরঙ্গিণীর বংশতালিকাকে একটা সত্যের কাছে, তখন আমাদের তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অন্যত্র প্রকৃতির পক্ষে রাজতরঙ্গিণী যে বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা পাওয়া যায় এবং পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কবির স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পত্র চেম্বুর্থী মহাশয়ের 'রূ' বঙ্গের বিষয়ে কথা সকলে দেখা তথা হইতে এই সংবাদটা সঠিক আনিয়া আসিয়াছেন। ১২০৯ খ্রি. অব্দ, ইহার ৫২ খৃ. অব্দ, এই সময়েই লক্ষ্মণসেন মুসলমানের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়েন। তিনি তখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গৌড়ের শাসনভার জ্যেষ্ঠপুত্র কেশবসেনের উপর ন্যস্ত ছিল। কেশবসেনের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোনস্থলে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে পিতা নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলে কেশব শত্রুদলকে সহজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে দেন নাই। সেই জন্যবাদ্য বাঙ্গালার ইতিহাস কোন লেখক লোক লিখিয়া যান নাই। ১২০২ খৃ. অব্দে সুরসেন মুসলমানকর্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, ইনি কেশবসেনের পুত্র হওয়াই সম্ভব। যদি তাহাও না হয়, তবে তিনি যে লক্ষ্মণসেনের পুত্র ছিলেন—তাহা সহজেই অনুমিত হয়। লক্ষ্মণসেন উত্তর ভারতে "হিন্দুসুরের খলিফা" বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। মুসলমানকর্তৃক উত্তর ভারত-বিজয়কালে যে বঙ্গদেশের রাজা একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এমন মনে হয় না। তাহা হইলে এতগুলি পার্শ্বতা প্রদেশে লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা কখনই রাজত্বপদ পাইতেন না। খুব সম্ভব সুরসেন হিন্দু-মুসলিম সময়ে উত্তর ভারতে কোন না কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কিংবা নির্পীড়িত হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন—নতুবা

• রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড (২০-২১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

কোনরূপ ভ্রান্তধারণা বা কুচিত্রের পরিচয় প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত না পাইলে সহজে স্বধর্মত্যাগী রাজকুমারকে পার্শ্বচরদের ঠিকুল লাঞ্ছনার বহর করিয়া লইবে কেন? যঃ ইবন বক্তিয়ার খিলজী শুনিয়া আসিয়াছিলেন আসোয়ারে লক্ষ্মণসেন অপর সকল রাজার ধর্মগুরু ছিলেন, সম্ভবতঃ এই জন্য প্রজাদের ঘরে ঘরে সুরসেনের বর্গীলিপুণ্য কিংবা অপর কোন মহৎ ফলের পরিচয় পাইয়া স্বর্গীয় কাঙ্গড়ার ও অপরাপর দেশের লোকেরা মুসলমানকর্তৃক নিহত পূর্বরাজগণের বংশধরদের অভাবে ইহার পুত্রগণকে স্বীয় স্বীয় রাজ্যের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাজা ভগবান্ চাঁদরা অবশ্যই বৈষ্ণব দেশে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা চিত্রকর লইয়া গিয়াছিলেন। কিংবদন্তী যাহাকে "কাঙ্গড়া কলম" নাম দিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব "বাঙ্গলা কলম," বাঙ্গালী চিত্রকরেরাই এই চিত্রগুলির প্রাণদাতা। তাহা না হইলে কালঘাটের পটচিত্রগুলির সঙ্গে কাঙ্গড়া চিত্রপটের এরূপ আশ্চর্য সাদৃশ্য কেন হইবে? আমরা একখানা মহাদেবের চিত্রে ও পার্বতীর চিত্রে এবং অপরাপর কালীঘাটের চিত্রে যে অদ্ভুত লাল রঙ্গের দেখিতে পাই, কাঙ্গড়ার অনেক চিত্রে ঠিক তাহাই আছে। বাঙ্গালী চিত্রকরের কালির রেখাগুলি সুস্পষ্ট ও তাহাদের বাদ্যযন্ত্র কাঙ্গড়ার ঐরূপ দেখিতে হইতে পাইবে। কাঙ্গড়ার সমসাময়িক দেশগুলির রাজপুত কি মোগল-শিল্পে "কৃষ্ণ-রেখার এই লীলায়িত ভাব আদৌ নাই।

কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির গঠনভঙ্গীতে বাঙ্গালা চিত্রের অনুকূল মোগলচিত্রের বাদশাহী ভাব এবং রাজপুত চিত্রের দেবতাদের প্রাধান্য কাঙ্গড়ার চিত্রে নাই। রাজপুত চিত্রের দেবতারা আসন জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারা খুব সুন্দর হইলেও নড়াচড়াটা তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। কাঙ্গড়া ও বাঙ্গলার চিত্রে যে গঠনভঙ্গীর সাদৃশ্য আছে—তাহা অনেকটা একরূপ। মোগলদের কতকগুলি চিত্রে বিদেশ একটা বিকার চিত্রের ধর্ম সূচিত হইয়াছে—কিন্তু সে গতিও যেন একটু সংযমাত্মক। তাঁহারা ছুটিয়াছে—কিন্তু প্রাণপণে, কিন্তু যে চাহনি তাহারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতেও যেন বিকার। রাজকুমারের প্রতি একটা বিস্ময়বিমূঢ় আবেশ আছে। কাঙ্গড়ার বৈষ্ণব চিত্রগুলি বাঙ্গালার হাতের ছবির ছায়া। এই চিত্রকরের পূর্বপুরুষেরা বাঙ্গালার লোক—এই ধারণার অনেক কারণ আছে। ১৯১০ সনের 'রূপম' পত্রিকায় প্রকাশিত কাঙ্গড়ার একখানি রাধাকৃষ্ণের ছবি লাহোর মিউজিয়মে আছে। ভূতপূর্ব স্কুল ইন্সপেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, এম এ মহাশয় তাঁহার "ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস" নামক পুস্তকের ভূমিকায় পৃষ্ঠায় সেই ছবিখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —"এই ছবিতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের রীতের ভাব এত সুস্পষ্ট যে লিখিত না হইয়া পারা যায় না।" বাঙ্গালার সঙ্গে আর্যাবর্তের অপরাপর দেশের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা সমাবেশ ছিল ইতিহাসে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীরা বৈষ্ণব-ধর্ম নানা ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহার পদ বহুনা করিয়া জীব গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইতেন। ঐ পদগুলি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বড়ই উপাদেয় মনে হইত। ব্রজবুলিতে লিখিত হওয়াতে

তাহা বৃন্দাবনে গাওয়া হইত। বঙ্গীয় কবি ও চিত্রকরেরা বাঙ্গালাকে নবভাবে সৃষ্ট বৃন্দাবন তীর্থে নিশ্চয়ই যাতায়াত করিতেন। কাজেই এই তীর্থগুলির উপর বাঙ্গালার এরূপ বেশী প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়।

বৌদ্ধযুগে শিক্ষা সার্বজনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন বৌদ্ধ হিন্দু সঙ্ঘবন্ধের মধ্যে লুপ্ত হইত। বাহ্য সংস্কারও এক অল্প পরিমাণে এখনও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যে কোন জাতি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন। মুসলমানদের জন্যও বাহুবা অর্গল বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্য-যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী যুগেও এই উদারতা অনেক পরিমাণে বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাম মৈত্র নামক কুলীন ব্রাহ্মণ এক মুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা আবদুলকে বৈষ্ণব করিয়া ভূষণা ও রূপলাল নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া বৈষ্ণব সমাজে কোন বিশেষ গোলমাল হয় নাই। (সাময়িক ইতিহাস, ১৯৫ পৃ.)। মুসলমান হরিদাস, মুসলমান-জগাপাল এবং সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যুত রূপ সনাতন বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। মুসলমান সনাতন এবং অবধৌ পারসী গ্রন্থ ও নামের সুপণ্ডিত বিজলী খাঁ, শ্রীবাসের বাড়ীর মুসলমান নরহরি প্রভৃতির বৈষ্ণবধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ চৈতন্য প্রভুর সময়েই তাঁহার প্রভাবে ঘটিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শাম নন্দ ধাবেলা-বাহাদুরপুর নামক স্থানে শের খাঁ নামক নাকুকাল মুসলমান সন্তানকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিম্নজাতি বৈষ্ণবদলে এত ঢুকিয়াছিল যে, তাহারাই এখন 'ভাক্ত বৈষ্ণব' দলের প্রধান শক্তি। সহজিয়া বৈষ্ণবদলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সকলজাতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরে সহজিয়ারা বৌদ্ধ-সংস্কার এখনও রক্ষা করিয়াছে। সহজিয়াদের গুরু অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাকা জেলায় এক দল সাধুর নিকট খাদের বাসী পক্ষফকির মুসলমান—আর শত শত হিন্দু তাঁহার শিষ্য। সহজিয়াদের সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন মুসলমান। তাঁহারই নামে সম্প্রদায়টির নাম হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিকট শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইঁহাদের প্রধান আড্ডা। ইঁহারা জাতিভেদ একেবারেই মানেন না। হিন্দু ও মুসলমান এক থালায় বসিয়া খান। ইঁহারা নিরাকার পূজা করেন না এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ গভীরভাবে অনুরক্ত যে পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে পারেন। নবদ্বীপী সম্প্রদায় সনাতনকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। রামকেলির নিকট চৈতন্যের সঙ্গ লেখা হওয়ার পর হুসেন সাহের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন-পর সনাতন কিয়ৎকালের জন্য দরবেশের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এই হেতুতে প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। নবদ্বীপী সম্প্রদায়ের মূল শিক্ষা—"কেহ হিন্দু কেহ মুসলমান। মিলে-জুলে কর সাঁইজীকো নাম।" (হিন্দুই কি মুসলমানই বা কি, একত্র মিলিত হইয়া সাঁইজীর নাম কর)। একদেশী শব্দ দ্বারা সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। (সাঁইজি গোঁসাইজি শব্দের অপভ্রংশ। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের নেড়া বলরামের বাড়ী ছিল

সর্বধর্মের সমন্বয়-চেষ্টা ও সহিষ্ণুতা।

বাঁশবেড়িয়া। পাগল নাথ ও গোবরা সম্প্রদায়ের উক্ত নামধেয় নেতৃস্থানীয় মুসলমান ছিলেন। প্রথমোক্তের বাড়ী মুরাদপুর এবং দ্বিতীয়টির নিবাস ছিল নবাবগঞ্জ গ্রামে। রামবাবাজী-সম্প্রদায় জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তা ছাড়া প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাঁহারা সর্বধর্মসমন্বয়ের কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি গান, যেমন "কালা কৃষ্ণ গড়-খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাবার বিবাদ ছিল তাহে ঘুচে গেল। মন কালা কৃষ্ণ-গড় খোদা বল রে।" ইহারও পূর্বে বঙ্গের ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন, "হরে রাম হরে কৃষ্ণ তারা, 'গড' বলে ফিরঙ্গী যারা খোদা বলে ডাকে তোমায় মোরা পায়ন ইসাই কাফি"। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ঐক্যের এবং সম্পূর্ণরূপে সংস্কারশূন্যতার পরিচয় অল্পস্বল্পই হইতে হয়।

একদিকে সমাজের ভ্রূকুটি হইতে মুক্ত থাকিয়া যে সকল সম্প্রদায়ের সাধক অতি উৎকট ভাবে কড়া করিয়া গড়িতেছিলেন অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া দলের পর দল গঠন করিয়াছেন। ইহারাই সনাতন হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধনীতির সারোদ্ধার করিয়া বাঙ্গলার সমস্ত ধর্মস্রোত সুধাকরে স্বসম্প্রদায় অনাবিল ভাবপ্রবেশের জন্য মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃ: অব্দে মালদহের ঘোষে বলরাম ভাটী কুল অবতংস করেন। তিনি প্রথম জীবনে চৌকিদারী করিতেন কিন্তু একসময়ে তিনি চোঁয়া অপরাধে অভিযুক্ত হন, মেহেরপুরের। নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেটের সরকারে তিনি কাজ করিতেন। অভিযোগ টিঁকিল না,—কারণ বলরাম নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের পর তিনি গুলায় চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। বহুবৎসর তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া যখন দেশে আসিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিতে লাগিল। তিনি পাগলের মত থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সকল কথা বলিতেন যাহা লোকের মর্মে তীরের মতন যাইয়া প্রবেশ করিত, ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত তাঁহার ধর্মসম্বন্ধে মতামত শুনিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদা কয়েকজন ব্রাহ্মণ নদীতীরে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জল নদীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

বলরাম ভাটী।

ঐ সময়ে বলরাম গঙ্গার জল লইয়া নদীর পাটের দিকে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। এরূপ করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "তোমাদের তর্পণের জল যদি তোমাদের পূর্বপুরুষেরা পাইতে পারেন তবে আমার নিক্ষিপ্ত জলই বা আমার পূর্বপুরুষের বাগদে যাইবে না কেন, তাঁহারা ত আর কয়েক ক্রোশ দূরে রহি নয়।" খুষ্টী বিশ্বাসী দলের নেতা মুসলমানে ছিলেন তিনি বলিতেন "তোমরা কষ্টে পড়িলে আমাকে প্রার্থনা জানাইও, আমার যদি কেহ থাকে তবে আমি তাহাকে জানাইব"। এই সহজিয়া

বাবা আউল।

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান দলের স্থাপয়িতা বাবা আউল ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে লীলাসম্বরণ করেন। ইঁহার ১২ জন শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে রামশরণ পাল, নিতাই গোর প্রভৃতি প্রধান। ইঁহার সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ে একটি চলিত গান আছে, তাহা এই "এভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো। এর নাহিক বোধ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল। এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একমন, জয়কর্তা বলি,

যাচ্ছ টুপি, কাঁধে [illegible] এই হাসো দেওয়ায়, মরা মাটায় এর চড়কে গাজ শুকালো॥" বস্তুত সহজিয়া দলের মধ্যে সমস্ত যে ওই তাহাদের গুরুদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন আমরা ভিন্নদেশের যে-কয়েকটি প্রচলিত ঐতিহ্যের সমবায়ে নানা শেষের মত সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে—বৌদ্ধ ধর্মের ভাঙ্গা কল বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া এই সহজিয়া মত গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারা সামাজিক বা ধর্মের চিরাগত সংস্কারের কোনটিই মানে না। ইহাদের চিত্তবৃত্তিতে কোন অবাধ। ইহারা সামাজিক অনুশাসনের ধার ধারে না এবং সময়ে সময়ে একপ উদাসীনের ভঙ্গিতে এত সংক্ষেপে কথা বলে যে, সাধারণ লোকে সেই সকল কথা শুনিলে ভড়কাইয়া যাইতে পারেন। স্ত্রীলোকের সঙ্গ সাধনের ইহারা সামাজিক আদর্শ মানে নাই, আমাদের সমাজে পবিত্রতার জন্য যে স্বতন্ত্রলোক পালকের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং জনসাধারণ পাতিব্রত্যের যে উচ্চ মূল্য দিয়া থাকে, সহজিয়ারা তাহা বিন্দুমাত্র মানে না। তাহাদের মতে সাধনার ক্ষেত্রে একান্ত গোপনের মধ্যে কতকটা পরকীয়ার সুখ-কামনা ও ইহকালের লোক-ধর্মের ভাব হইতে সহজ, তত জানিবার দরকার নাই, কিন্তু সংস্কার-মুক্ত সতীত্ব একটা মিশ্র ভাবের মধ্যে, যুক্ত হইয়াছে এবং তাহাতেই সহজ বা দাম্পত্য ভাব-প্রেমের শেষতম আদর্শ যাহা কিছু করিবার তাহা নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। "বসন্তরাজা পরিচ্ছেদে"র শেষে [illegible] যে অংশ [illegible] তাহাতে দেখা যায় ইহাদের ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা একেবারেই ভুল সাধারণ নহে—উহাতে চিত্রিত যে স্বপ্ন বাসরের শুরু দেখা যায় তাহা সাধারণ পরিচ্ছদের মত। সমাজে জাতিভেদ প্রভৃতির সংস্কারের ইহার কোন ধার ধারে না। ইহারা প্রকাশ্যভাবে কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে নিজের দলে টানিয়া আনে না ছাড়ও কপালে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ছাপ মারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না। অথচ ইহাদের দলের লোক, পুরুষ হউক, স্ত্রীলোক হউক, বালক হউক, দলের নেতার প্রতি এমনই অনুরক্ত যে জগতে তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও মানে না। ইহার এক কথায় অবলীলাক্রমে প্রাণ দিতে পারে। কর্তাভজাদের নেতা বাবা আউল বা আউল চাঁদ পরবর্তী নামক গ্রামে জন্ম, খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন। রামকান্ত এবং তাহার আর সাত শিষ্য তাঁহার দেহ পরবর্তী গ্রামে চক্রদহ হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে সুবর্ণচুলিতে সমাধিস্থ করেন। যাহা আউলের পরলোক-গমনের পরে, রামকান্ত খাস্ত [illegible] আসরকারী হইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দলে মুসলমান ও হিন্দু আছে এবং মসজিদ মন্দিরের কোনও বাধা নাই তথাপি ইহাদের শ্রীতি অতি উচ্চ। ইহাদের একটি অনুশাসন এইরূপ "দয়া হিংসড়ে, পুরুষ খোসা, ছয়ে ছয়ে কর্তা ভজা"। কতাভজা দলের [illegible] গানগুলি 'সকালভাষায়' লিখিত, তাহা দুর্বোধ, কিন্তু কতকগুলি [illegible]। সহজিয়াদের একটি গান—"তুফান আসছে কত্তে জলে কল যাবে মিলে মাঝি হাল ধর কসে। আবার ধীরা নৌকা তাঁরা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ। ধরে মাঝি দাঁড়িয়ে থোন। মাঝি হত্তা বাদাম লও, ধরে থাকে বাও, তুফানে পানে কেন চও, হাল ধরেছে নিরঞ্জন।" মানুষ এখানে মাঝি,—সাড় হরিবার তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন

ভগবান্, কিন্তু কোন্‌দিকে নৌকা চলিবে তাহার নির্ণয় ভগবান স্বয়ং হাল ধরিয়া হাটেন অর্থাৎ পুরুষকারের কিছু ক্ষমতা আছে। ভাগ্য সাত পাঁচ ভাবিয়া, কিন্তু দেখিয়া নিয়মে, যে ক্ষমতাটুকু আছে, তাহা ব্যবহার ও করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে আর মানব জীবনরূপ তরণী, তাহা তো তুফানের মধ্যে চলিবার জন্য। কোন নৌকা এমন নাই, যাহা তুফানের হাতে পড়ে নাই। তুফানের দিকে লক্ষ্য করিতে নাই আর হইলে হয় পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে তুফানে নৌকা চালাইবে। যিনি বলেন যে কর্মফলে ভাল ছাড়া আছেন, উঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি নাচ সাহস ভাবে আত্মরক্ষা ও বন্ধুজনহিতায় সে এবং বিধাতা" পদের ভাব গানের মর্ম ছাড়িবে নহে।

সহজিয়াদের অনেক কথাই সন্ধ্যাভাষায় লেখা এই ভাষা কিন্তু কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই শব্দের সাধারণ অর্থ অনেক সময়ে ভাবার্থ ভিন্নার্থ বোধক। সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে ইহার সে সকল কূট অর্থ কাহারও বলিবে না। সমস্ত বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল মত অত্যন্ত যৌক্তিকতা দেখিয়া ইহারা সহজিয়ার সহিত কথিত হইয়াছে তাহা সাধারণ লোক জানিলে বলিবে হইবে এজন্য সহজিয়া সন্ধ্যাভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। "সে দেশের কথা, এ দেশে কহিলে, লাগে যে মরমে ব্যথা" চণ্ডীদাস।

সন্ধ্যাভাষা।

বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য পরিচয় যতই আলোচনা হইবে ততই বিদেশীর প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া যাইবে। আমরা বারংবার বলিয়াছি ইহারা আমাদের জাতির নিজস্ব ভাব বজায় রাখিয়াছে।

বাঙ্গলার তথাকথিত নিরক্ষরেরা।

উচ্চতন পর্যায়ে বিদেশের প্রভাবের ফল, পাণ্ডিত্যের কপ সংস্কারের বোঝা, এবং নানারূপ আবর্জনা জুটিয়া সমস্ত প্রশ্ন জটিল ও দুরূহ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু নিম্নে স্তরে অমলধবলপূর্ণ নিত্য সত্যের তরুণ-প্রাণময় সমুজ্জ্বল পল্লী—এখানের বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার ধন-ভাণ্ডার রাখিয়াছেন। এখানেই বঙ্গের চারুশিল্প—অঙ্গসজ্জার শেষ চিহ্ন, এখানেই নিরক্ষর কবির অপূর্ব পল্লী-গীত, বায়স্কোপে, বাউল ও বৈষ্ণব নৃত্য, এখানেই সহজিয়ার সুনির্মল অদ্বিতীয় প্রেমের আদর্শ—কিছুদিন পূর্বেও ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ সেই রত্নভাণ্ডার চলিয়া যাইবার পথে যদি বাঙ্গলার পল্লী পুঁথিগুলি, মনোহর সাই কীর্তন, সহজিয়ার আদর্শ প্রেম, বায়স্কোপে নাচ, পল্লীর শিল্পকলা চলিয়া যায় তবে বাঙ্গলার ভৌগোলিক সত্ত্ব জানিয়া আমরা কি করিব? বাঙ্গলাদেশ তো তাহা হইলে লুপ্ত হইল। কতকগুলি বিদেশী কলা বিদেশী শিক্ষার ফলে এদেশের কি গৌরব থাকিবে? যাহা বিদেশের নকল, তাহা তো নকল ছাড়া কিছুই নয়। জগতের শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালীর যে সকল অসাধারণ দান ছিল—তাহা লুপ্ত হইলে বাঙ্গলাদেশকে অন্য যে নাম দাও, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু "বাঙ্গলা—সোনার বাঙ্গলা" নাম দিয়া সেই পবিত্র নামের অবমাননা করিও না

বিদেশী শিক্ষা-সভ্যতে উপেক্ষা ও ঘৃণায় এই কিঞ্চিৎ অধিক অভিজাতদের মধ্যে বাঙ্গলার

পোঁতা থাকে, কিন্তু চিহ্নগুলো পড়ে সমস্ত পুঁথি তখনই মুখস্থ হয়ে আসে। সংবিধানের বিপুল সাহিত্য যাহা এখনও ইহার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট কিছু কিছু পাওয়া যায়,—তাহা পাঠ করলে বুঝা যায় তাহারা ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে মৌলিক কথা কিছুই বলেন নাই।

বাঙ্গালার পরিবারগুলির মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের শিক্ষার অভাব কোন কালেই ঘটে নাই। অক্ষরের লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। আমাদের দেশে আষাঢ় শ্রাবণকালে ঘুমে মুহূর্তে যেন চেতনা আসিতে চাহিত না। পুস্তক লেখা ও পড়ার পাঠ বৈষ্ণব গানে কমই ছিল। ঘরে ও বাহিরে কীর্তন ও কথকতা সকল স্তর গাঁথিয়া রাখিতেন। মনোরঞ্জন ও অর্থাগম এই—সমস্ত জ্ঞান আহরণ করা, চরিত্রের অঙ্গীভূত করা, জ্ঞান শুধু নিজে পরিচয় লাভের জন্য বলিয়া অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না। আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যখন মুখে মুখে এখনও বড় বড় গণিতের সমস্যা পূরণ করিতে পারে তাহাদের কতকগুলি এমনকি ধাঁধা নিয়ম ছিল যাহাতে অতি সহজে তাহারা গণিতের কোন জ্ঞান অর্জন করিতে পারিত, যাহা অক্ষরজ্ঞান এম এ উপাধিধারীর পক্ষেও কষ্টসাধ্য। এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। তাহার লেখা একখানি **শুভঙ্করী** আমার নিকট আছে তাহাতে লিখিত কতকগুলি সূত্র এখানে আছে। আমি সকল স্থানে তাহা খুঁজিয়া একত্র করিতে পারি নাই সুতরাং ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া কর্তব্য নহে, যেমন পাইয়াছি, নিম্নে তাহা তেমন ভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

সাঙ্কাকলী (গাণিতসূত্র)—

১। বিষা পাত্ত কর খড়া আড়ার ঘর সোলকড়া
কুঁড়ির গণ্ডা লেখা জান মনে করা সমাধান
সেহে করে যুক্ত তিন করেন শুভঙ্কর সাঙ্কাকলি

২ গুনহ করিয়া পাই কড়ি নিরেখন কত গণ্ডা কিম্বা সের সেই কিছু ধন।
কার কার গণ্ডা করে ভাড় কড়ি সত্ত গণ্ডা কিনে সের তার কোড়ি ?

আনার	গণ্ডা	দর	সের
বড় গণ্ডা	৫	৵৹	৵৹৭৫
মাঝারি	২৫	১	৵৫
ছোট গণ্ডা	৭০	৷৹	৵১৭৫
	১০০		১৲

(৩) এক এক এগার মাসে। একলও পাকিস্তান শিক্ষা তাদের কি কাজে লাগে নাই। পনের বাইসাম স্মৃতি পাত।

পাতন ১ ১ ১ ১
ভাগ ১১১
১ ৫ ২ ২ ০ ৭

(৪) দুই দুই বাইসে মাসে। কিবা ভাগ দিব তাহে।
মত কহে ওহে ভাত। পনের বাইসাম স্মৃতি সাত॥

পাতন ২ ২ ২ ২
ভাগ ১১১০
১ ৫ ২ ২ ০ ৭

(৫) রাজা বলে অশ্ববানে চলবে কোটাল
শয় তরাস শত পক্ষ আনহ তাতকাল॥
কিনিবে সাহস পক্ষ দুই টাকা দরে
অশ্বতরা সমা পক্ষ কিনিও সত্বরে॥
শিক্ষা শিক্ষা পাখরা, মকনা তিন শিক্ষা
কিনে আন শত পক্ষ দিয়া শত টাকা॥

আসামী	৫৫	৩৫	নেট
সাহস	৪১	২১	৮৪১
তরু	৪	৪০	২১
পাখরা	৫১	০	১১০
মকনা	১	৪০	৪০
	১০০		১০০১

(৬) টাকায় ছাগ শিকায় যাই পাঁচ টাকাতে মোহিশ পাই শত টাকায় শত জিব বলে গেল সমাধান॥

আসামী		৫৫	৩৫		নেট
ছাগ		২৪	১১		২৪১
মোহিশ	...	১২	৫১	...	৬০১
গাই	...	৬৪	০	...	১৬১
		১০০			১০০১

(৭) তিন টাকায় ছাগ কিনিবে পাই আট আনাতে ষোড়শ পাই কুড়ি টাকায় কুড়ি জিব। বলে গেল সদাশিব ॥

আসামী	...	জি	...	বয়	...	নেট
ছাগ	...	৫	...	৩৲	...	১৫৲
গাই	...	১০	...	।৹	...	২॥৹
ষোড়শ	...	৫	...	৷৹	...	২॥৹
		২০				২০৲

ষোটকে আউট

(৮) ষটেক ছয়ট ষটেক সাত। ছয় পাঁচ ছয় দিয়া ছাড়। এবার হারার ছয় আমী। ভাগ জানিলে যুক্তে বসী।

পাতন	।৹	৷৹	১৸৹	১৷৹	১।৹	১৷৹
ভাগ	১১ ১৮৹					
	১১	১১	১১	৹	৹	

(৯) শুনি অন্ধ পাখা পাখা পাখা রাজহংস দিয়া সখা। ঘোড়ার পৃষ্ঠে দিয়া পায়। অষ্ট কোটার এই নাম।

পাতন	১	৫	২	২	৹	৭
ভাগ	৫৮৪					
	১১	১১	১১	১১		

(১০) পান পল্টী পঞ্চম—পরগন্ধ যাব নবহ নবহ রস ষোল পল। অষ্টাদশ পল যুক্ত দিলো। আদি দ্বিতীয় ষোড়ি দ্বিতীয়ে দিলো ॥

পাতন	।৹	৷৹	।৷৹	১৹	।৹	৷৷৹	৷৷৹	৷৷৹	৷৷৹
ভাগ	১৮/৪								

(১১) নব কোঠার আরজা

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়। সাত আট ছাড়া নয়। গিহ ভাগ দিয়া জান নবকোঠার জন্মস্থান ॥

পাতন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯
ভাগ	৯							
	১১	১১	১১	১১				

(১২) আট কোঠার আবজা

চার চার চোদ্দলিস মাপে সন্ধা চোদ্দস শিক্ষা তাপে
কি কড়ি পাকুড় নাপ পনের বাইশার পুরি সাত।

পাতন		৪	৪	৪	৪
ভাগ	৩৪।০				
	১ ৪	২	২	৪	৭

(১৩) বাপ বাপ বোস্থ পুত সোল গণ্ডা সিক্কা জান॥ বাপের ভাগে পুরি আন। মুনি মুনি অন্নস্থান॥

পাতন	৪		৪	১১৬
ভাগ	৪			
	২	৭	৭	৮০

(১৪) মুনি মুনি বাবে পাখা। ভাতিনা তার পুত সিক্কা সন্ধা ষোলে সিক্কা পুরি আন। চার চার অন্নস্থান।

পাতন	২	৭	৭	৮০
ভাগ	১৬			
	৪৪		৪৪	

(১৫) বাস বাহিনা

বাস বাহিনা আর জত দিন তার পড়ে কত।
টাকা প্রতি ১৷৷০ = দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয়।
আনা প্রতি ।৵ = দুই কড়া দুই ক্রান্তি শিবরাম কয়॥

(১৬) বৎসর বাহিনা

বৎসর বাহিনা আর জত। দিন তার পড়ে কত।
টাকা প্রতি ৵৫ তিন কড়া পাঁচ ধরি হয়
আনা প্রতি দুই ধরি শিবরাম কয়॥

(১৭) বৎসর বাহিনা আর জত। বাস তার পড়ে কত টাকা প্রতি ৵৯ = ছাব্বিশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয়। আনা প্রতি ৷ = আট ক্রান্তি শিবরাম কয়।

(১৮) সনা (সোনা) কেনা

সনা (সোনা) কিনিতে যখন যাবে। ছিয়ানই (ছিয়ানব্বই) রতিতে মোহর লবে। টাকা প্রতি ৩৷৵ তের কড়া এক ক্রান্তি হয় আনা প্রতি ৷৵ আড়াই ক্রান্তি শিবরাম কয়।

(১৯) সনা / সোনা কিনিতে তখন জাবে। সস্ত বস্তিতে মোহর লবে টাকা প্রতি ৩৫৪ তিন গণ্ডা তিন কাক চাব তিল হয়। আনা পতি ৫৪ তিন কাক চাব তিল শিবরাম কয়।

২০। চাবি ধানে রাত হয়, দশ বস্তিতে মাসা, দশ মাসায় তলা। তোল হয়, স্বন সত্তাভাষা চৌষট্টী তোলায় সের ব ইস প্রমাণি। ষোলিশ সেরে মন হয় সর্বলোকে জানি পাচ সেরে পোয়দি হয় চাবি সেরে কিশা। ইহাতে জানিলে ঘুচে অবোধের দিশা

মাথতের আরজ্যা

(২১) জতেক চহার গ্রামে বাধত করিবে। তত গণ্ডা মাথতের তলে ভাগ দিবে আসলে হাবলে অস্ত হত টাকা হয়। টাকা প্রতি তত গণ্ডা শিবরাম কয়

আসল নফার আরজ্যা

২২। লাভে মূলে যত পাই বিকি-বরে কিন ভাই। কিনন দরে হবে লবে। আসলের ঠিকানা পাবে।

বগড়া ধান কেনা

(২৩) ধান্ত কিনিতে জাবে লিখে পড় করে। আনা পিতি কুড়িতে বেড়পাই লবে ধরে। মনে লবে বেড় কনা পেদ্যাদো ঠিকনা আমঠি এক শিবরাম দাশ কহে হিসাব করে দেখ।

(২৪) মনের করার জার সের পড়ে কত টাকা প্রিতি আটাশ্যা হয় লেখার মত আনা প্রিতি দুই কড়া তুল শিশুগণ এই মত মনকরা শিবরাম কয়

(২৫) সেরের করার জার ছটাক পড়ে কত টাকা প্রিতি এক আনা হয় লেখার মত আনা প্রিতি পাচ কড়া পণ্ডাশ কাক হয় এই মত সেরকরা শিবরাম কয়।

২৬ সেরের করার জার তলা তোলা পড়ে কত টাকা প্রিতি এক পাই হয় লেখার মত আনা প্রতি পাচ কাক তুল শিশুগণ এই মত সেরকরা শিবরাম কয়॥

ধান কেনার আরজ্যা

২৭) তঙ্কা দিয়া তত আড়া কিনিবে সে ধান। আড়া পিতি কুড়ি হয় আনার প্রমাণ কুড়ির পিতি সের হয় পুন ধর মানে। সেতেতে ছটাক ধান্ত শিবরাম ভনে॥

মন করার আরজ্যা

(২৮) তঙ্কায় লবে তত মন আশবার। মনেতে আড়াই সের আনার হিসাব। তত সের থাকয় ছটাক তত হয়। ছটাকেতে আড়াই সের শিবরাম কয়॥

(২৯) মনের করার জার পুথ পড়ে কত। তথা প্রিতি তুই গণ্ডা হয় লেখার মত আনা পিতি তুই কর শুন শিশুগণ। এই মত মনকরা ভিন্ন দৃশ্য রায় কন

আনা মসার (মাসার ?) আরজা

(৩০ কাহনে লইবে পন চেকে লবে বুড়ি গণ্ডায় লইবে কাক পোনে পাচ কোড়ি॥ কড়ায় লইবে পক তিলেক লিখন। আনা মসা কর লিপ্ত আনন্দিত মন॥

গণ্ডা কোড়ির আরজা

৩১ কাহনে লইবে গণ্ডা কবিরা জতন পনেতে লইবে কাক শুন শিশুগণ। গণ্ডায় লইবে তিন কড়ায় ধুল হয় এই মত গণ্ডার কোড়ি লিখবায় কয়

জমাবন্দির আরজা

(৩২ ভূমি বিদা যত হয় কবিবে বর্ণন তথা প্রি ৎ সাল গণ্ডা কাহাকে ধরন। জত আনা তত গণ্ডা পাই প্রিতি বট। গণ্ডা প্রিতি তোল তিন জানি একপট কড়া প্রিতি চারি তিল শুভঙ্কর ভনে লখালিখ কর লিপ্ত আনন্দিত মনে। *

(৩৩ হেঁয়ালির আরজা " তবিক ধারে কথা শুন শিশুগণ দক্ষিণে কড়ার গুনে কবিবে গণন কড়া পুরে চারিকড়ায় গণ্ডা লবে তাতে হাতগুছ গণ্ডা দোবে সমক পশ্চাতে সমাকে সমকে পন কমি হৈতে থাকে। পরে পরে এক কড়ি চৌথ ধরে লবে। চারি চৌকে টাকা হয় তবিক লেখা কর নরসিংহ বহুতে ক্রমে এই অংশ কয়।

(৩৪) জমা ওয়াশিলের আরজা "জম ওয়াশিল বাকী শুন লিপ্ত ভাই জমা ছোট খরচ বড় ফাজিল বলি তাই জমা বড় খরচ ছোট বাকীসার হয় জমা ওয়াশিল সমান হৈলে সাধু খালাস হয়।

(৩৫) হেঁয়ালির মাল অর্দ্ধেক হেউল এক পঞ্চাত প্রমাণ হোম করি ফেলে দিল বীর হনুমান। অষ্টেক পরেতে তার তিন ভাগ জলে সপ্তম ভাগের ভাগ সেকলার তলে। উপরে ৫২ এক দেখি বিদ্যমান। সকলে কতেক লিপ্ত কর পরমাণ

(৩৬) আরেজা—বাগবাট ঘুতসের, আটা এক বটে। কড়ায় তিন সের চালু আইসের হাটে॥ দশ কড়া কড়ি দিয়া গেল সদাগর। পাঁচ সের দহি কেন ইহার উত্তর॥

(৩৭) রামচন্দ্র জাগরেতে কৃষ্ণরূপ ধরি চলদলে নিলেন মোহন মুরলী ভুজে ধরি অষ্ট সখী বিহারয়ে বনে যাহে বিধি হয়াস্থর স্থিতি বৃন্দাবনে ভুবন মোহিত হৈল যার লীলা রবে আচম্বে প্রকাশ চক্ষু দেখিবারে পাবে পাঁচালী মজুমদার হাব বসি দিবা

* দিবিস্তি কাগজ বোর পাঁচালী ঐকোকি ৪ ঐল নিবেদকার পরগনা ভাগলাবাদ সাকিন বলরামপুর। সন ১২৬৩ সাল তারিক ২৩ চৈত্র। (১) হইতে (৩২) পর্যন্ত একখানি পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।

গণনে কতত ইইবে স্থত অপন বুজ বাল তুইপক্ষে ৬ত হবে মাপা কাবাগন তবে সে হইবে হার গুন সর্ব্বজন।

পাত্তন ১৬২৮৫৭১৪৩
৭৯৮ ১৭৮
২১৫৩৪৭২২
৫৫৫৫৫৫৫৫

মাত্ত দিয়া পুরিবে ৭

(৩৮) উক্তা প্রতি মোন যার তইবেক দর উক্তা প্রতি অষ্টগণ্ডা সের প্রতি ধর আনা প্রতি ছয় কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল।

(৩৯) উক্তা প্রতি মোন যার তইবেক দর উক্তা প্রতি তুই কড়া ছটাক প্রতি ধর। আনা প্রতি হয় তিল গণ্ডায় অষ্টেক কড় শুভঙ্কর দাস কহে এই মত হয়

৪০) তৈল লবণ ঘৃত ছিন বাঙ্গা কিনিতে যাই মোন দরে চারি টাকায় অষ্ট গণ্ডা পাই পোয়া প্রতি তুই মত সের ছয় ক জানি কহেন শুভঙ্কর তুমি বালক বুঝান।

৪১) ইহের অমরাপুরে পাইকার আছে কিনে কত লক্ষ মূল মোটে সেই গণে এক এক কালের মূল্য সোয়া মন সোনা। চারি যুগে কত পুণ্য কত মোন সোনা [ইহা একটা খুব দীর্ঘ পুরণের ব্যাপার—কিন্তু কিরূপে ইহা মনে মনে কষিতে পারিবে, (১২ বৎসর = ১ যুগ)]

৪২) মুনি গেলা তপস্যায় শুক্ল ধর করে তুই পাখা গরুড় নিল সাপ কক্ষপের ঘরে পুথি পাতে চক্র নাই উদয় আকাশে। কোথা গেল পোনর সইল অঙ্ক হবে কিসে শুক্ল অগ্নি বসু রাম রন্ধ্রাকের তাড় একাদশে পূরে দিল অষ্ট কোঠা হয় "

পাত্তন ১৩৮০৭
ভাগ পুরণ ১১
১৫২০৯৭

এইরূপ আর্য্যা ও প্রশ্ন শত শত এখনও পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের জানা আছে—কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিদ্যা যাহা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে এখনও অপরিহার্য্য, তাহা একবারে লুপ্ত হইবে। আর একটা কথা, অঙ্কের অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ ছিল, তাহা অত্যন্ত ধরিয়া দেশময় প্রচলিত ছিল সেগুলি উপেক্ষা করিয়া আমরা মনগড়া শব্দ নির্ম্মাণ করিতেছি। পরন্তু তাহে বসিয়া কূপ খনন করার বৃথা শ্রম করিয়া মরিতেছি। আমরা যাহাকে "পাটীগণিত" বলি, হিন্দুস্থানীরা তাহা তাহাদের পারিভাষিক ঠিক রাখিয়া "অঙ্কগণিত" বলেন আমাদের মনগড়া "ক্ষেত্রতত্ত্ব" অঙ্ক তাহাদের পারিভাষিক "রেখাগণিত"

শুভঙ্করী আর্য্যায় অনেক পরিভাষিক শব্দ আছে, তাহা বুঝা করিয়া না লইলে অধ্যাপকগণ চক্ষু খুলিয়া একবার দেখিলে ভাল হয়। [illegible] 'ছাত্রা', 'ছাত্রক', 'কন্ত', 'ঈন' 'হ্রস্বত্রয়', 'দীর্ঘত্রয়', 'পাতন ছাত্র', 'অর্য্যাস্থাঙ্ক' শুভঙ্করের আর্য্যার পাটীন পাতড়া হইতে এই বচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি —"তাহার বিবরণ এই, যে অঙ্কের অক্ষরের দ্বারা বিভাগ করা যায় তাহার নাম হাটা, এবং যে অঙ্ক দ্বারা তাহা হরণ করি তাহার নাম ছাত্রক, আর হরণ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহার নাম লব্ধ। এবং হরণ করিলে অবশিষ্ট যে থাকে তাহার নাম ভগ্নাংশেষ" এই পাতড়া-সাঙ্কেতিক অঙ্কসম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা আমরা শিশু মাত্রেই জানিতাম। এখন তাহার কতক কতক জানা থাকিলেও অনেক শব্দ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। পাতড়া হইতে আর একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি

১ = চন্দ্র, ষষ্ঠ শব্দ শুক্ল ২ = পক্ষ, কর, পাখা, ভুজ। ৩ = নেত্র, বায়, লোচন, অগ্নি ৪ = বেদ, যুগ ৫ = বাণ শর ৬ = ঋতু, রুচু। ৭ = সমুদ্র, অশ্ব, মুনি। ৮ = বসু, গজ ৯ = গ্রহ, রন্ধ্র। ১০ = দিক্ ১১ = রুদ্র

জমির মাপ —৮ যবে এক অঙ্গুলী, ৪ অঙ্গুলীতে এক মুষ্টি, ৩ মুষ্টে এক বিতস্তি, ২ বিতস্তে এক হাত, ৫ হাত দণ্ড ৪ হাত পরে এক ডাঁক, ১২ ডাঁকে এক কাহন, ২০ কাহনে বিঘা, ১২ বিঘায় এক পরা সমস্ত নিষ্কণ্টক ১৮ বিঘাতে। কাহা ৬৪ কাহনে এক পরা, ৩০ পরায় এক অনুপরা। কর্ম, ১০ অনুপরায় এক পরা, ৬০ পরায় এক রজ্জু, ৭ রজ্জুতে এক প্রহর ৮ প্রহরে এক দিবারাত্র, ৭ দিবসে এক সপ্তাহ ১৫ দিবসে এক পক্ষ দুই পক্ষে এক মাস, ছয় মাসে এক ঋতু, ছয় ঋতুতে এক বৎসর, ১০ বৎসরে এক যুগ, ৭১ যুগে এক মন্বন্তর

গণিতের অনেক সূত্র নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে মুখে জানা ছিল এজন্য তাহাদের কাগজ কলম লইয়া অঙ্কপাতি করিয়া অঙ্ক ক'ষতে হইত না তাহারা অতি জটিল হরণ পূরণ, ও ব্যাজাদি ধনের সূক্ষ্মতম হিসাব মুখে মুখে কষিতে পারিত। স্যার সোমেশ বসু আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে গিয়া বড় বড় জটিল হরণ-পূরণ অতি অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে মুখে মুখে বলিয়া তথাকার মনীষী অধ্যাপকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি সোপকরণস্থত? ভারতবর্ষে সোপকরণ অবিশ্বাস করা উচিত নহে। সেই বিশ্বাস আমাদের অস্থি-মজ্জাগত, কিন্তু তাহাতে এত ভেল চলিয়াছে যে, তাহা অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচারসহ হয় না। হয়ত সে বিদ্যা জনসমাজে অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং ভণ্ডদের প্রচারণা এই বিদ্যার উপর একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনিয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহাশয়ের এই গণিতের অপূর্ব্ব সফলতা হয়ত বা প্রাচীনকালের অধুনাবিলুপ্ত সূত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। মুখে মুখে সাধারণ লোকেরা এদেশে যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে গণিতের জটিল অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিল—তাহা এখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমরা যন্ত্রাদি বিস্তর করিয়াছি, কিন্তু গুলকর, শিবরাম ও কৃষ্ণরামকে বিচারের সুবিধা না দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি। নিত্যকার প্রয়োজনে এখনও গণিতের

অনেকখানি প্রয়োজন আছে, জমিজমার হিসাব, বাজার দর, কাঁসা, তামা, পিতল প্রভৃতির দর ও ওজন, অন্যান্য দরের হিসাব প্রভৃতি বিষয়ে চাষারা মুখে মুখে যাহা এখনও করিতে পারে, আমাদের এম এ উপাধিধারী কলেজের অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে তাহা অনেক বেশী সময়ে কষ্টেসৃষ্টে করিতে পারেন। চাষারা কাগজে কলমে অভ্যস্ত নহে, নিতান্ত জটিল অঙ্ক হইলে তাহাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানবর্জিত মাতব্বর গুটি একজন লোক তাহা 'কাল' করিতে বসে। নিতান্ত জটিল অঙ্ক না হইলে তাহারা মসি, মষ্যাধার বা কাগজের সাহায্য লয় না। এই জন্য যাহারা "কাল" করিতে জানে, চাষাসমাজে তাহাদের প্রভূত মান। এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের আশু শুভ হিসাব, যাহা তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করে, তাহা ভুল হয় না। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত লোক সেইরূপ করিতে গেলে বিস্তর চেষ্টায় সময় তো লইবেনই —তাহাতে অনেক সময়ই ভুল হইয়া থাকে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার সাহায্যে সমস্ত অভিজ্ঞতা বিষয়ের জ্ঞান বিস্তার করিবেন। ১৮৩৪ খৃ অব্দের পূর্ব্বে যে বিষয়টা বড় সহজ ছিল, —জগতের সমস্ত জাতি যে সকল কথা নিজের ভাষায় লিখে, ১০৪০ বৎসরের মধ্যে জাপান যেভাবে সভ্যজগতের জ্ঞান তাহাদের নিজের ভাষায় লিখাইবার প্রণালীর ভূমিপত্তনে আয়োজন করিয়াছেন। এখনও যে সাধারণ নিয়মে বাঙ্গলা শিখিয়াছে। পড়িয়াছেন, তাহা এদেশে অজ্ঞাত হইয়া আছে। স্বদেশের জ্ঞান প্রচার করার বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছেন ইঁহাদের মধ্যে অনেকটা ইংরেজী শিক্ষায় বিপর্য্যস্তবুদ্ধি গিয়াছে। যিনি এখন অঙ্ক শিখেন, তিনি বিদেশী ভাষায় তাহা লিখিতে অনেকের বেশী সময় সেই বিষয়ের উপযোগী ভাষা শিখিতে ব্যয় করেন। আসল বিষয় শিখিতে আর কতটুকু সময় থাকে?

যাহা হউক এখন যখন বাঙ্গলা ভাষায় অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, তখন আমাদের অঙ্কশাস্ত্রে যে সকল সূত্র বিলাতী পুস্তকে পাওয়া যায় না, অথচ নিত্যকার জীবনযাত্রার পক্ষে যাহা অপরিহার্য, সেগুলি কি শুভঙ্করের আর্য্যা হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত নহে? এই আর্য্যাগুলিতে কড়া, কাঠা, ক্রান্তি প্রভৃতি যে সকল শব্দ আছে তার প্রথম তিন হইলে পাঁচশত টাকা, সওয়া সের প্রভৃতি এখনকার প্রচলিত গণিতাঙ্কে পরিণত করিয়া প্রাচীন আর্য্যাগুলির অনুসরণপূর্ব্বক সূত্র রচনা করিতে বোধ হয় এখনকার অধ্যাপকেরা অসমর্থ হইবেন না। অনেক সময়ে সের, দর এবং মূল্যাদি বাঙ্গলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিবর্ত্তন করাতে বিশেষ দোষ নাই, তবে যখন বিলাতের সঙ্গে কারবারের প্রয়োজন হইবেই, তখন দুইটি গণিতাঙ্কে মূল্য ও ওজনের সম্বন্ধে দ্বিবিধ শব্দজ্ঞানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে সকল সূত্র লিখিয়া এতদ্দেশের লোকেরা এত সহজে গণনাকার্য্য নিষ্পন্ন করিত, সেই অসামান্য বিদ্যা অধিকাংশস্থলে—আমরা বিবেচনাপূর্ব্বক হইয়া হারাইতে বসিয়াছি। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায় হিন্দুদিগের গণিতবিদ্যা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্লে ফেয়ার সাহেব শুভঙ্করকে "The Cocker of Bengal" (বাঙ্গালাদেশের ককার) উপাধি দিয়াছেন। এই নামে শুভঙ্করের কোন গৌরব বৃদ্ধি হয়

নাই। গণিতের যে সকল অতি শুষ্ক বিষয়ের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তত্ত্বজ্ঞ সমস্ত কূট প্রশ্নের সহজ সমাধান করিয়াছেন এখন তাহার পড়াইতে সুলভ নহে। লর্ড মেকলের উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিয়াছিলেন "১৮৩ বৎসর ধরিয়া শুভঙ্করের অঙ্কের আবৃত্তিতে অনুমান ৪০,০০০ বঙ্গবিদ্যালয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের ইংরেজী শিক্ষা বিদ্যালয়সমূহে যে ভাবের শিক্ষা প্রবর্ত্তন সময় পড়িতে চলিতে তাহার পূর্ব্বপুরুষের ইংরেজদেরই পাপা " হিন্দুর মানসিক নিষ্ক্রিয় ভস্ত্র ছিলেন ইহার এই প্রচিরাবলম্বিত পথা এখন medical মেডিকেল অন্ধ পাইয়া শিক্ষকদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। শুধু গণিতের নহে, যে, ইংরাজীর শুভঙ্করী ফাঁকি ও অনার্য প্রমাদ বাঙ্গ বা নিম্নশ্রেণীর লোকের একপ আক্ষরিকভাবে সমাধান করিতে পারিত, তাহা জানিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন দিন উদ্ধারক হইবে তাহা আজ সহজে নিম্নশ্রেণীর লোক গণনা করিতে পারে। "যে যে গুরুর যে যে শিষ্য, তার সমুখে থাকে গণ্ড, সেখান " য় হয় সৌখাদাসী, অবশ্য বাহু নামে গণ্ড তাহা ঠিক হয় একে গণ্ডে যোগ হয় " ১৮৭৯ পাঠার উদ্ধৃত করিলে আর কাহ্ লেখের ইহার অর্থসাধারণ প্রকারে প্রশ্নটির সমাধান করিতে পারে তাহা আমি জানি না। আশ্চর্য্যের বিষয় লেখা ও ইহা সমাধান লোকের মধ্যে একপ বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে যে আমরা মনে করিতে পারি না অশিক্ষিত আর অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকেরা কিরূপে এই উদ্ভট সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিল। সত্যবাদের বিষয়ক সাহিত্যের অনেকাংশ সত্য তাহার লিখিত, যাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এই সম্পর্কিতের পাঠক, শ্রোতা ও লেখকদলের অধিকাংশই মধ্য পাঠশালার ও লোক—কিন্তু তাহাদের সাহিত্যে কেপ ভাবে নিখাস প্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া মস্তিষ্কচালনা ও সত্যসন্ধের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের আছে, তাহা তাহার বিশ্বকর "যোগক্রিয়া" নামক বাঙ্গলা পুস্তকখানা এতদিন অবজ্ঞাত হইয়া নিম্নশ্রেণীর লুটিয়ে পড়িয়াছিল। ইহার লেখক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান, এবং পাঠকও সেই শ্রেণীর। অথচ এই কাব্যের কোথাও যোগক্ষেমনাথ যে ৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু মীমাংসার ন্যায় মোহ ভঙ্গ করিলেন, তাহা যোগাসনের পর্য্যন্ত কৃত সাধক ভিন্ন কেহই উত্তর দিতে পারিবেন না আমরা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি, অনেক বিশ্বপণ্ডিতেরা যখন এম এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকা হইতে যোগক্ষ বিজয়ের সেই অংশ বাদ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমি বলিয়া কহিয়া এ বৎসরের জন্য তাহার কতকাংশ রাখিয়া দিয়াছি। এই ৩টি প্রশ্নের মধ্যে একটি "অরূপা কাহাকে বলে, রূপে কোন জন?" এখন জানিতে পারিয়াছি, "অরূপা" কথাটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও যোগের অতি প্রাথমিক কথা তাহা পূর্ব্বকালে এদেশের আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিত প্রশ্নগুলির আর দুইটি প্রকাশ পরিমাণ হইলে জ্যোতিষ্টা কোথায় যায় ও এবং ধ্বনি ফুরাইয়া গেলে শব্দ কোথায় বিলীন হয়?" ইত্যাদি এদেশে মহোৎসবে যেমন ছোট বড় সকলে নির্ব্বিচারে একত্র বসিয়া যায়, জ্ঞানবিস্তারের পরিবেশনেও এদেশের লোকের অপর সকলকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা শুধু তাহা ভোগ করিতেন না অন্ততঃ বৌদ্ধাধিকারের সময়ে এইরূপই নিয়ম ছিল, মাঝে কয়েক শতাব্দীর জন্য পোড়া ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের দ্বার

আলোইয়া পাহারা দিয়া উহার ভাণ্ডার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু এই গণতান্ত্রিক দেশে সেরূপ প্রভুত্ব টিকিল না—বৈষ্ণবেরা আসিয়া ঠেলা দিয়া সেই পাচীন দরজা ভাঙিয়া দিলেন, সমস্ত শাস্ত্রের আদেশ ও ব্রাহ্মণের নিষেধ বিধি উলট-পালট করিয়া দিয়া সহজিয়ারা সত্যের আদেশ ভাঙিয়া চুরমার করিয়াছিল, বৈষ্ণব গোস্বামী নিম্নতম শ্রেণীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন, অশেষ গালাগালির ভাজন হইয়াও অনুষ্ঠানকর্গণ সংস্কৃত পুরাণ কাব্য প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে বসিয়া গেলেন। নরোত্তম কায়স্থ ও শ্যামানন্দ সদ্গোপ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন—তাহার দল বোধ করায়িত চোখে তাহাদিগকে বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

পাচীনকালে বিদ্যার কিরূপ সম্মান ছিল তাহা পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে (১৯১-৩০০ পৃঃ) আমরা দেখাইয়াছি, "অকালমৃত্যুর্মেধাবী মৃত্যুস্তাসৌ সুতো বরম্ যতস্তে স্বল্পধীর্যাবদ্ভীবং জড়ো দহেৎ" পঞ্চতন্ত্র)। বাঙ্গলা প্রাচীন সরস্বতীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যে আমরা দেখিতে পাই, রাজা শ্রবেশ্বর তাঁহার মূর্খ পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অবশ্য একটা বাড়াবাড়ি কবিকল্পনার অবাধ স্বাধীনতা প্রমাণ করে, কিন্তু দরারাম কত সাধারণজনের সমস্ত অভিজনের মধ্যে এইটুকু সত্য যে, বঙ্গীয় সমাজে এক সময়ে মূর্খ পুত্র অভিশপ্ত ভূমার পাত্র ছিল। বাঙ্গলা যুগে শিক্ষার ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল

আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে চাঁহলে ইতরসাধারণের মধ্যে তাহার যতটা উপকরণ এখনও পাওয়া যাইবে—লিখিত পুস্তকে কি অনুশাসনাদিতে তাহা ততটা পাওয়া যাইবে না। অধুনা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রদেশের কোন ঐতিহাসিক পুস্তক বা সন্দর্ভ (...illegible) লিখিতে যাইয়া কেবলই সাহেবদের সাহায্য গ্রহণ করেন। যে সকল উপকরণ তাঁহাদের চারিদিকে পাওয়া যাইতেছে তাহা দেখিবার শক্তি তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা কোন সাহেব দেখেন নাই বা বলেন নাই, যেন কোন সত্য একান্ত সুস্পষ্টভাবে চক্ষের সম্মুখে থাকা বলিবার মত তাঁহাদের সাহস নাই। টলেমি যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, (দ্বাদশ দ্বিতীয় শতাব্দী) তাহা ভাল করিয়া পড়িলে আমি বুঝিতে পারি, তাহার "সলসোস," "সাবোরা," "দসেরা," এবং "মোনিয়াক্রুম" এই কয়টি নাম বাঙ্গলার যে সকল সাহেব সেই ভৌগোলিক বৃত্তান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা খুব সম্ভব বাঙ্গলাদেশের অধুনা নগণ্যগ্রাম ঐ কয়টি সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের স্থাননির্ণয় করিতে যাইয়া নানারূপ উৎকট কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন। সোলস্নো টলেমির বিবরণে খুব বড় অক্ষরে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া লেখা হইয়াছে, যে জায়গায় উহার সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমার মনে হয় তাহা কালীঘাটের নিকট। "সলসোস" গ্রাম এখনও বেহালার দক্ষিণে বিদ্যমান। উহা যে অতি প্রাচীন তাহাতে সংশয় নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের খুব প্রাচীন বলিয়া রায়ের বাড়ীর তথাবশেষ এখনও তথায় দৃষ্ট হয়। তাঁহার দুই কন্যার নামে যে পাশাপাশি দুইটি বৃহৎ দীঘি আছে—তাহাও ঐ গ্রামের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, কারণ সম্ভবতঃ এই দুই দীঘি বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল—উহাদের

পুনঃসংস্কার করিয়া শেষে বসন্তরায়ের কন্যাদের নামে উহাদের পরিচয় হইয়াছে পঞ্চাশোর্ধে সুপ্রসিদ্ধ রাজবাড়ীর মত তাহা সেদিনমাত্র উচ্চ নদীর কবলিত হইয়াছে তাহার ভিতর হইতে সমস্তই খোয়াইয়া গিয়াছে, অথচ উহা কেদার রায়ের নামের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে সম্ভবতঃ কেদার রায় তাহা সংস্কার করিয়া তাহাতে কোন দেবতা স্থাপনা করিয়া থাকিবেন সেজন্যেই এইভাবে নাম পরিচয় করিয়া থাকিবে। পাচুনেরা বলিয়া থাকেন ঐ রাজবাড়ীর সঙ্গে সুরঙ্গ যোগে কেদার রায়ের প্রাসাদ ছিল। কিন্তু ঐ তাহার বংসর পূর্বের লুপ্ত বৈভবের অনেকত্বই মৃত্তিকার উপরে থাকে না তাহা খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয় বসন্তরায় যে গ্রামে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সে গ্রাম পূর্ব হইতেই সমৃদ্ধ ও জনবিরল ছিল কাহারা ছিলেন তাহা করিতে পারিবেন কেহ তিনি ঐ গ্রাম স্থাপন করেন নাই গ্রামটী দেখিলেই খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় বোধ হয় এক কালে বাগদেবপুর, বেড়াল, মাড়খা প্রভৃতি অনেক গ্রাম লইয়া মজুমদার একটা পরগনার মত ছিল এজন্য টলেমি উহার আয়তন এত বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। "সাবার" যে ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ "সাভার" তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই, ঐ অঞ্চলটা ভীমসেনের পুত্র ধীমন সেন পিতার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে, হরিশ্চন্দ্র এবং ইহার পুত্রপৌত্রাদি কালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা ১৭১৮ পৃষ্ঠায় এই বৌদ্ধ নৃপতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি "সাবার" সম্ভার হইতে অনুমিতদের টলেমির সংস্থাননামুসারেও তাহাই হইয়া হয় দাসরা গ্রাম এক কালে বৃহৎ বৈদ্যদের ২৭টি সমাজের মধ্যে অন্যতম ছিল। ছয় সাত শত বৎসর পূর্বে এই সকল সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল তিন চারি শত বৎসর পূর্বেও কুলজি গ্রন্থসমূহে এই গ্রামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গ্রামের দক্ষিণস্থিত 'শিবরাড়ী' বড় প্রাচীন, তথায় শিব একটি বৃহৎ অশ্বত্থ পাদপরূপে পরিখা কূপের মধ্যে বিরাজিত। শিবরাড়ীতে যে সকল পাচীন প্রস্তর মূর্তি রক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাগল' অতি পাচীন, নবম-দশম শতাব্দীর বাসুদেব মূর্তিও তথায় দৃষ্ট হয়। দাসরার খালের ধারে একটি প্রাচীন কালীবাড়ী ছিল। ১৩১১ বংসর পূর্বে সেই স্থানটির একাংশে পুষ্করিণী করিতে উদ্যত হইয়া মালিক খুঁড়িয়াছিলেন। প্রায় একুশ হাত নিম্নে একটি প্রস্তরস্তম্ভ তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছে উহাতে স্তম্ভের উপরে সিংহমূর্তি ও অপরাপর কারুকৌশলের চিহ্ন আছে। উহা গুপ্তযুগের শেষের দিকের বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ঐ স্তম্ভটি কোন দেবমন্দিরের ছিল। আমাদের দেশে যেখানে কোন মন্দির থাকে, যুগ যুগ ধরিয়া সেই খানটায় নব নব মন্দির নির্মিত হইয়া থাকে সেই যে নবম শতাব্দীতে তথায় মন্দির ছিল, সেদিনকার কালীবাড়ী এতকাল পরেও সেই স্থানটির সূচনা করিতেছে। স্তম্ভটি দাসরার প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল, উহা শিবলিঙ্গ বলিয়া পুরোহিত পূজা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন পূর্ণবাবু আমার শিক্ষক ও আত্মীয়, তিনি উহা আমাকে দিয়াছেন অধুনা উহা আমাদের বাড়ীর

রূপেশ্বর মন্দিরে আছে উল্লেখের নির্দেশ অনুসারে "বনিয়াহুড়ম" নামের নিকটবর্ত্তী এই "বোনয়াহুড়ম" এখনও কিন্তু ঠিক ইহার বর্ত্তমান নাম "বানিয়াহুর"। গ্রামটীতে কিছু কিছু প্রাচীন চিহ্ন আছে সাহেবেরা অজ্ঞতাবশতঃ এই তিন গ্রামের ঠিকানা না জানিয়া সেখানে সধরণে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমার মতই যে সত্য— একথা আমি বলিতেছি না অন্ততঃ এ বিষয়টা বাঙ্গালার পক্ষে এত গুরুতর, যে এসম্বন্ধে কতকটা আলোচনা চলে। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ইতিহাস, এমন কি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ পরীক্ষা দিতে হইলে আমাদিগকে বিলাতে যাইয়া পড়িতে হয় সাহেবদের লিখিত পুস্তকগুলি তো আমরা বাড়ীতে বসিয়াই পড়িতে পারি, কিন্তু একবার অজন্তা, অমরাবতী, সাঁচি, পুরী, ভুবনেশ্বর, চন্দ্রিগুফা, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেখিবার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহাতে অল্পসময়ে অনেক কারিগর এবং ভারতীয় ইতিহাস-লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখী পরিচয় হইতে পারে আজও কম পড়ে আমা পাথর, ইট ও কাষ্ঠোজ প্রভৃতি স্থানও পাহাড় বা লণ্ডন হইতে অনেক কাছে।

সম্রাট যখন সাজাহান জগদীশ্বর মিলিবার আকবর জ্ঞানেন্দ্রমুখ সভাসদ্যগণের দ্বারা বা প্রতিমার বৈজ্ঞানিকভাবে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন বাঙ্গলা পর্য্যন্তে এসব পৌঁছায় নাই কিন্তু তদপূর্ব্বে এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঙ্গীতের চর্চ্চা বিশেষ-রূপেই হইয়াছিল লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রাগ রাগিণী রাজসভায় মূর্ত্ত হইয়া বসিয়া থাকিত আছে যে সময়ে অনুদস্তুল বাঁধা বাজাইতেন, তাঁহার সেই সুরলহরী নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীত সমাটগণকেও লজ্জা দিত বল্লাল সেনের উপাধিও আছে এই সকলেই তিনি এতদূর সুরজ্ঞ ছিলেন যে, সীতার তুলায়ও তাঁহার মাত্র বাণাবাদকরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গীত গুরুদেবের জয়দেবহারা পদাবলী গাহিয়া রাগ সাধিয়া কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ঝঙ্কার করিয়াছিলেন, স্বয়ং ভরতের তাঁহার চরণের মহিমা ক্ষয় লক্ষ্য করিয়া আসন ত্যাগ করিতেন এবং নিজকে "লক্ষ্মণাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার নর্ত্তকী লক্ষ্মণসেন এবং বিদ্যা প্রভাব গানে এত পারদর্শী হইয়াছিল যে, লোকে তাহা শুনিয়া বেহুঁস হইয়া যাইত একবার সেইরূপ অবস্থায় বিদ্যার প্রভাব দেখা 'স্বপ্নে' রাজার গান শুনিয়া নিজের শিশুকে কন্যা মনে করিয়া বুকে বাঁধিয়া কৃষ্ণেশ্বরকে নমস্কার দিয়াছিল। সেক শুভোদয়াতে এই ঘটনাটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় সেক শুভোদয়া, [illegible] ১৮৮৯ খৃ । জয়দেবের গীতগোবিন্দ সমস্ত ভারতবর্ষে গীত হইত, কিন্তু এত সকল স্থানে মন্দির গুর্জ্জর, রাধাক্ষ, বাঙ্গার পদ্ধতি রাগে গীত হওয়ার নির্দ্দেশ আছে। সম্ভবতঃ গুজরাট, কাম্বোজ, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে উপরোক্ত রাগের নামকরণ হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদেশ চিরকালই সঙ্গীতপ্রিয় এখানকার জনসাধারণ কোন কালেই একটা নির্দ্দিষ্ট কায়দা বা বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে রাজী নহে জনসাধারণ সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারা শিরোধার্য্য করিয়া

লয় নাই, তাহাদের নিজস্ব একটা সুর ছিল এই সুর হিন্দী মনসামঙ্গলে (বেহুলাকাব্যে 'বাঙ্গাল রাগ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ এই সুর কোন পরিচিত রাগরাগিণীর ধার ধারে না, উহা খাঁটি পল্লীজীবনের সমস্ত করুণ রস নিংড়াইয়া লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত এই সুর পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর গর্ভে মাঝিদের মুখে যিনি শুনিয়াছেন তিনি বুঝিবেন এই নদীমাতৃক দেশের উহা নিজস্ব সুর

ভাটিয়াল ও মাঝির মাই।

আকাশ ও নদী যেখানে তুলা রূপই বিশাল, বাতাসের গতি যেখানে অবাধ সেই অসীম রাজ্যের অসীম বেদনা বা ভক্তির সমস্ত বাধা নিষ্মুক্ত এই সুর যেন নৈসর্গিক রহস্যলোকের নিজস্ব যাত্রি যখন উহা গায় তখন তাহার সেই সুরতরঙ্গ পদ্মার তরঙ্গের মতই আকাশ বাতাসকে উদ্বেলিত করিয়া চলিয়া যায়। সে সুরে মনসা দেবীর কীর্তন গাহিয়া দ্বিজ বংশীদাস কলাবাগের মত হিংস্র পশুকে বিমুগ্ধ করিয়া তাহার পঙ্কিল জীবনস্রোত মনসাকিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ভেলুয়া কাব্যের নায়ক সাবের বাঙ্গাইয়া পশুপক্ষী বশীভূত করিতেন বলিয়া বাঙ্গলা পল্লীগীতিকায় বর্ণিত আছে,—ইহা হৃদয়ের সেই তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া অসীম বেদনার সৃষ্টি করে "আমার গুরু বড় দয়াল সভা আমি হলাম অপরাধ, আমি যে ভক্তিই না—ভক্তিহীন" কথাগুলি কত সরল সহজ কিন্তু ভাটিয়াল রাগে যখন নদীর উপর এই গানের সুর বাহিয়া যায়—তখন ভগবানের অসীম দয়ায় মানুষের নিজ অস্তিত্ব ডুবিয়া যায়।

এতকাল ভাটিয়াল রাগ একক দেবতার প্রস্তরলক্ষ্মরূপ পল্লীর হৃদয় উজাড় করিয়া চলিয়াছিল—হঠাৎ এক সোনার মানুষ আসার যাদুকাঠি দিয়া এই রাগটি স্পর্শ করিলেন অমনই তাহা সোনা হইয়া গেল যেন গুড়কে চিনি কিংবা চিনিকে মিছরিতে পরিণত করা হইল যে করুণা এটি দেখানি বাঁচিতে পারে যে বেদনা, গভীরতা এবং মনোহর সাই কীর্তনের সুর—এই ভাটিয়ালের উপাদানেই সৃষ্ট। আমি জানি না—মনোহর সাই কীর্তনের মত এরূপ প্রেমের উদ্বোধনা জগতের আর কোন সুরে আছে কিনা কারণ উহা প্রেমের উন্মাদেরই সুর সে সুর বিজ্ঞানসঙ্গত কিনা জানি না, যদি না হয়, তবে এই সুরকে বুঝিবার জন্য নববিজ্ঞান সৃষ্টি করা উচিত আজ প্রায় পঞ্চশত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী এই সুরের মাহে পাগল হইয়া আছে যেদিন চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল, সেইদিন হইতে পল্লীগীতিকার প্রাচীন সুর এদেশ হইতে উঠিয়া গেল এবং বাঙ্গলা ঐ জাতের সুরে তান গাহিতে লাগিল,

বহু রূপকথা ও পল্লীকথায় দুষ্ট হয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ এক গুরুর নিকট এক পাঠশালায় বসিয়া পড়িতেন সর্দারসোনার গল্পে রাজকন্যা ও কোটালের পুত্র একত্র এক পাঠশালায় পড়িতেন সেই সূত্রে একটা প্রতিপত্তির ফলে উভয়ে পলায়ন করিয়া স্বামি স্ত্রীর মত কাল যাপন করিয়াছিলেন। পল্লীগীতিকায়ও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই বাঙ্গলা পল্লীতে এই প্রথা রহিত হইয়া গেল সেদিন শ্রীযুক্ত ফকির-রাম কবিভূষণ মহাশয় জেলায় ঘুরিয়া সর্দারসোনার গল্পের একটা নূতন কবিত্বপূর্ণ সংস্করণ সঙ্কলন করেন। গল্পটি কিন্তু বহু পাচীন, ফকির-রামের সময়ে বিষয়টা একটু সংস্কারে

কৌলিক।

দীনাহীন ছিল, তখন হইতে এ পথে পরিচালিত ছিলেন। এতগুলি দৃষ্টান্ত আমরা রমণী ও পুরুষের একত্র পাঠশালার কথা লিখিতেছি যাহাতে মনে হয় ইহা দেশপ্রচলিত একটা প্রাচীন রীতির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছি। কিন্তু পাঠশালায় একত্র না পড়িলেও স্ত্রীলোকের পড়াশুনা যে পূর্ব্বদেশে মুসলমানদের সময়েও প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুরমণী, যাঁহারা অষ্টপ্রহর পূজা, অর্চ্চনা, অরন্ধনী প্রভৃতি বিশ্বব্যাপিকা ইতিহাসের পূর্ব্ব সময়ের পুণ্যানুষ্ঠানকে লইয়া টানাটানি করেন না, কালিদাস তাহার যে জ্যোতিষীর কন্যার নিকট স্বয় মুখতার জন্য বেচারিকে হইয়াছিলেন, কিংবা বিদ্যার প্রায় রাজকুমারীরা পণ করিতেন যে, যে তাঁহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন এই সকল গল্পকেও ইতিহাসের সুস্থায় স্থান দিব না। কিন্তু সত্যসত্যই আমরা চন্দ্রাবতীর প্রণয়িনী রামা, শিখা মাহাতার শিক্ষা মাধবী এবং চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবিদিগের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছি। চন্দ্রাবতীর দেখা যাইতেছে যে বাপকের মতন লিখিতে পড়িতে জানিতেন পরাশর-সংহিতা অবলে কৈবর্ত্তের কন্যা মনুষ্য ও খুল্লনা পত্রাদি লিখিতে পারিতেন—এরূপ উল্লিখিত আছে। ইহার সকলগুলিই গল্প কিনা, কিংবা ইহাদের কোন কোন কাহিনী সত্যমূলক, তাহা নির্ণয় করিবার অবসর আমাদের নাই। যাহারা লিখিবিদ্যায় সঙ্গীতে এবং অপরাপর কলাবিদ্যায় এতটা পারদর্শী ছিলেন তাঁহারা যে লেখাপড়া জানিতেন না, এমন মনে হয় না। আমরা গত একশত দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের অনেক শিক্ষিতা মহিলার কথা জানি—তাঁহারা শুধু লেখাপড়া জানিতেন না কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতী আনন্দময়ী, রমণী।

ফরিদপুর জেলার গ্রামনিবাসী রাজা রামপতি সেনের কন্যা বিদুষী আনন্দময়ী দেবীর নাম সুপরিচিত। ইনি পলাশী যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন। ইনি অল্পবয়সে হইতে যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিতে আঁকিয়া রাজা রাজবল্লভকে তাঁহার যজ্ঞের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেদিনকার সেই যজ্ঞকুণ্ডের ঘটনা পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রবধূ অন্নদাসুন্দরী সেন যে 'চরিতলীলা' নামক কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ইঁহার অনেক পরিচয় আছে, তাহাতে সংস্কৃতে তাঁহার অসামান্য অধিকার প্রমাণ করে। যে ছয় শতাব্দীর অন্তর্গত সেই কবি চন্দ্রাবতীর নাম এখন সুপরিচিত। ইনি মনসার গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং পিতার আদেশে রামায়ণের পদ্যানুবাদও করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার ১ম ও ৪র্থ খণ্ডে এই কবির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার রচিত কাব্যগুলিও সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পল্লীসাহিত্য খুঁজিলে আমরা বহু রমণী কবির রচনা পাইতে পারি কিন্তু সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ১০০ বৎসর পূর্ব্বেও কোন কোন বঙ্গীয় মহিলার আয়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। শুধু চন্দ্রাবতী এবং আনন্দময়ী নহেন, বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও এমন সকল পণ্ডিতা রমণী ছিলেন, যাঁহারা বিদ্বৎসমাজে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখের 'সমাচার ভাস্কর' নামক পত্রিকায় প্রবন্ধমালা লেখার সবিস্তার উল্লেখ আছে। ইহার কাহিনী আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত সতীশ্র-

মোহন ভট্টাচার্য, এম এ সম্বাদ ভাস্করের পাঠীন ভুল হইতে আবিষ্কার করেন এবং তাহার সহায়তায় শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে (১৩৩৮ সন, ফাল্গুন) প্রকাশিত করিয়াছেন। দ্রুবময়ী দেবী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মাত্র চতুর্দশ বৎসর-বয়স্কা ছিলেন। সম্বাদ ভাস্করে তাঁহার সেই সম্বন্ধের কথাই লিখিত হইয়াছিল এই অসুস্থ প্রতিভাসম্পন্না বালিকা কৈবর্তের বাহন চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা ইনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অতঃপর আমরা সম্বাদ ভাস্কর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"দ্রুবময়ী বালিকাকালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও মল্ল সাতখানি টীকা এবং অভিধান-পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকন্যার বুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রও কিয়দংশ শিক্ষা দিলেন, পরে দ্রুবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভারতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সকলশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণ দ্রুবময়ীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবৎসর পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রুবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে তদপেক্ষাধিক শিক্ষা করিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রুবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিষয় শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন দ্রুবময়ী কর্ণাটরাজের সভিতের ন্যায় দেশিকাপরিবৃতা হইয়া বিচার করেন না আপনি এক আসনে যেমন, সম্মুখে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক ও মুখ নিরাবরণ থাকে, তিনি চারুকান্তি যুবতী হইয়াছেন পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, মাতৃভাষায় বিচারের পরামর্শ দেন। দ্রুবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয়। বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রুবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন, আমরা দ্রুবময়ীর বিদ্যা-শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয়, তবে আমাদিগকে মিথ্যাবাদক বলিবেন এরূপ অদ্ভুত বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

১২৯১ বাং সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক" নামক পুস্তক হইতে হটী বিদ্যালঙ্কার নাম্নী অপর এক মহিলার বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি

হটী বিদ্যালঙ্কার।

"হাটের ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি বালকালে আপন আপন গৃহকার্য্যের অবকাশে পড়াশুনা করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে

বাস করিয়া গৌড় দেশের ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার সুখ্যাতি কীর্তনখা বাড়িলে সেখানকার সকল লোকে তাঁহাকে অধ্যাপকের কার্য নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি সভায় আসিলে সকল লোকের সম্মান দেখাইতে কাঁহাকেন।" ৬৭৮ পৃষ্ঠা

এই পুস্তকে আরও লেখক আছে "ফরিদপুর কোর্টালী পাড়া গ্রামের শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহ বাকলাদি আর সমস্ত পুস্তক করা হয় তাহাদিগের ক্রম সমাপ্ত পুস্তকাদি হইয়াছিল। ইহা অনেকেই পড়িয়াছেন। আর ঐ গ্রামের অবশ্য ভিন্নাধু ভট্টাচার্যের ওই কন্যা বাল্যকাল হইতে বিদ্যা শিখিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানেন।" ৬৭ পৃ

আমরা অনন্তময়ী দেবীর কথা উল্লেখ করেছি ইহার আত্মীয়া বিজয়িনী দেবীর গৃহে অনেক দামি বিক্রমপুর অঞ্চলের পুরাতন আছে। ইনি হালিশহর কাব্য সকল করিয়াছিলেন, ইহারা হস্তাক্ষর বড় সুন্দর ছিল। পরলোকগতা নাম্নী অন্য এক জন মহিলার হস্তাক্ষরের নমুনাও আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। ইনি একখানি বৈষ্ণব পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, হস্তাক্ষর মুক্তার মত সুন্দর।

ফরিদপুর জেলায় সুন্দরী দেবী নাম্নী এক মাতৃস্থানীয়া এক শতাব্দী পূর্বে জীবিতা ছিলেন, তাঁহার কথা লোকে আজও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া থাকে। তাঁহার হস্তাক্ষরের কতকগুলি নমুনা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বৃদ্ধাবস্থায় অনেক মহিলা পুঁথি নকল করিতে বসিতেন, কিন্তু পাঠশালায় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় বালিকা অধিক করিতে বসে পড়ি ছিলেন। তাঁহাদের খাতি যতদূর ব্যাপী হইত এবং তাঁহাদের গৃহস্থালির পরিচয় যত বেশি পাওয়া যাইত, বিবাহ সম্বন্ধে তত সুবিধা হইত।

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এক চাকার রথ চলে না। সংসারে মহিলা ও পুরুষদের তুল্যাংশই কাজ ছিল। গৃহলক্ষ্মী না হইলে একজনের জন্য গৃহ চলিত না। গৃহখানি তাঁহারা অতি যত্নে সুশোভিত করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদের হাতের সূচ সূতার উপর নানা রঙ্গ রসের বহির্বিকাশের কত বিচিত্র কারুকার্য। কথা বলিয়া বুঝিবার জন্য নানারূপ কিংশুক কারুখচিত পাতলতা, কারুকার্য ও চিত্রযুক্ত সাজি ও কুলা, পান ও পানের বাটা রাখিবার জন্য সূচ কার্যের সম্পাদিত বটুয়া ও বস্ত্রাবরণ, বালিশের খোল, বসিবার আসন, পাঠি, বরণ-ডালা, নানা রঙের বিচিত্র পুঁতির কাজের শিরকলা চিত্রিত পাঁচ, দরজার চিত্র, ছেলেদের খেলিবার সোলা ও মাটির পুতুল—এমন কি কাহার উপর বিচিত্র মূর্তি পাশা ও দাবা খেলিবার ছক ইত্যাদি কত বিভিন্ন যে কারুকার্য অঙ্কিত করিতে, তাহার অবধি নাই। খ্রীষ্টের মোরগা কাঠের ঘোড়া ও কাঠের হাতা এখনও নির্মাণ করিয়া থাকেন, সে সকল কারুকার্য এখনও লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার নমুনা আমরা দিয়াছি। চৌধুরীর লড়াই নামক পুঁথি কথায় যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা সত্য ঘটনামূলক। আমাদের দেশে যে কালী, ছিন্নমস্তা ভৈরবী ধূমাবতী প্রভৃতি শক্তিমূর্তির পূজা হয়, তাহার সব উপকরণ এইবেলের অস্তঃপুরে বিদ্যমান। এই মহিলারা প্রেমের জন্য না করিতে

পারেন, এমন কিছুই নাই. গীতি কবিতাগুলির পত্রে পত্রে দেখিতে পাইবেন ; বীরত্ব, ত্যাগ, আত্মসমর্পণ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্বার্থের বলিদান এবং তপস্যা—এ সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা পুরুষকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আমরা সতযা, মদালসা, চন্দ্রাবতী, কাজল-রেখা, সখিনা প্রভৃতি নারী-চরিত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এই চিত্রগুলি আমি যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে দশমহাবিদ্যার রূপ আমার চাক্ষুষ হইল। এক একটি দেবী-চরিত্র পড়িয়া আমি ২।৩ দিন আবিষ্টের মত থাকিতাম হিন্দু মেয়েরা যে কিরূপ নির্ভীকভাবে সহমরণে যাইতেন, তাহা বিদেশী লোকেরা বিস্ময়ের সহিত লিখিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি, কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিক হইতে সেদিনকার হ্যালিডে সাহেব পর্য্যন্ত যে সকল চাক্ষুষ বৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রভৃতি সাহেবেরা তাহা চাপা দিয়া এই ব্যাপারের একটা বীভৎস দিক্ দেখাইয়াছেন। খুব উচ্চ পরিবারে ও খুব নিম্নস্তরে মাঝে মাঝে যে অত্যাচার না হইত তাহা নহে কিন্তু বঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে, এই সহমরণ যে কত পবিত্র ও উজ্জ্বল ছিল, তাহার স্মৃতি বঙ্গের বহু পরিবারে প্রধাদবাক্যের মত হইয়া আছে। আমরা শৈশবে বহু পরিবারে সংরক্ষিত সহমরণের ইতিহাস শুনিয়াছি, সর্ব্বত্রই তাহা প্রেমের উজ্জ্বলতা বহন করে—সহমৃতাদের স্মৃতি বঙ্গের ইতিহাসের অতি পবিত্র ও গৌরবজনক। সে কাল গিয়াছে, সে আদর্শ ভাঙ্গিয়াছে, আমরা তাহা আর ফিরিয়া চাহি না —তাহা আর হইবার নহে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রাজা রামমোহন সেই জগৎ বন্দিতাদের স্মৃতির পূজা দিতে ভুলিয়াছেন, কেবলই অত্যাচারের পৈশাচিক লীলা দেখিয়াছেন। সহমরণের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন, এই চেষ্টা যুগোপযোগী। কিন্তু তিনি দেশের ছেলে হইয়া সেই দেবীদিগের অলৌকিক তপের জন্য একটি মাত্র প্রশংসার কথা বলেন নাই। কিন্তু বর্বরুলাসের শুকশ্রাদ্ধী উদার চিত্ত সেই স্বর্গীয়া রমণীদের পায়ে পূজার অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন "বাংলার প্রাণ-বিসর্জ্জন-পরায়ণা শিক্ষয়ত্রীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন্য দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে! তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া যাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জান নাই যে তোমার আত্ম-বিস্মৃত বীরত্বদ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরগুরুদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, সাম্রাজ্য লীলার অবসান-দিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূ-বেশে সীমন্তে সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, —চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দ-ময় করিয়াছ। বাংলা দেশের পাষক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি দ্বারা পূত হইয়াছে, আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে তোমার অক্ষয়—অমর স্মরণ-নিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে

—তোমার সেই অন্তিম বিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্ট-বসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উন্নত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি! অদ্য আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।" অবশ্য অল্পসংখ্যক স্থানে যে জোর জবরদস্তি না চলিত তাহা নহে, কিন্তু এই ব্যাপক পদ্ধতির মূলকথা ছিল প্রেমার্থে আত্মবিসর্জ্জন। যাঁহারা বাঙ্গলার পল্লীগীতিগুলি পড়িবেন, তাঁহারা ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। বঙ্গের মহিলাদের সর্ব্বস্ব দেওয়া প্রেমের প্রকৃত সূত্রের যাব উদ্ঘাটন করিয়াছেন—বঙ্গের মর্ম্মকথা বলিতে সুদক্ষ পল্লী-কবিরা। একদিকে স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন, অপরদিকে জীবনে প্রেমের জন্য সমস্ত দুঃখ ও মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়া এই নায়িকারা যে ভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—তাহাতে এই উভয় ব্যাপারেরই মর্ম্মকথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ আভিধানিক জি সি. হটন তাঁহার বাঙ্গলা ও ইংরাজী শব্দের নির্ঘণ্টে (A Glossary of Bengali and English—1825 A D) লিখিয়াছিলেন, "To crown all, the matchless constancy and fearless indifference of death in the Indian widow, who voluntarily mounts the funeral pile in the expectation of accompanying her husband to a region of bliss" [সকলের সেরা দৃষ্টান্ত, হিন্দু বিধবার অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি অকুণ্ঠিত উপেক্ষার ভাব, যাহাতে তাঁহারা স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন]

এক সময়ে বঙ্গের মহিলাদিগের চিকিৎসার ভার পল্লীর মেয়েদের হাতেই ছিল বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণলীলার অভিনয় দেখিতে দেখিতে যখন রাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন তখন রাজধানীর এক প্রাচীনা আহিরিণীকেই চিকিৎসার জন্য আনা হইল, তিনি মন্ত্রতন্ত্র দুকূলাঞ্চল এবং গাছগাছড়া প্রভৃতি ঔষধের উপাদান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। যখন রাজকন্যার চিকিৎসার জন্য এইরূপ মহিলা-চিকিৎসকের আহ্বান হইল, তখন মনে করিতে পারা যায়, মেয়েদের চিকিৎসার জন্য মেয়ে চিকিৎসকই ডাকা হইত। অবশ্য চণ্ডীদাসের রচনা কাব্য-কথা, কিন্তু তথাপি রূপ-কথা ও কবি-কল্পনার ফাঁক দিয়া আমরা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার আভাস পাইতে পারি—এই হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও তাহাদের স্থান আছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে বাঙ্গলাদেশের তাৎকালীন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির-গুলির উল্লেখ আছে। অজ্ঞ পুঁথিলেখকগণের দোষে সেই স্থানগুলির নাম অনেক পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, দেববিগ্রহগুলির নাম ও তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। ইহার পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার যে সকল তীর্থস্থান ছিল, তাহার কতকগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। সেই দেবতাগুলির কোন কোনটির পূজা হয়ত বৌদ্ধযুগ কিংবা তৎপূর্ব্ব হইতেও চলিয়া আসিয়াছে। দেবতত্ত্ব জানিতে হইলে স্বয়ং

যাইয়া তদ্বংশজ পরিবর্ত্তন করা দরকার—এই দেববিগ্রহের সহিত অনেক সময় প্রাচীন ইতিহাসের কথা জড়িত আছে। যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাসের গবেষণা করেন, আমি তাঁহাদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গলার চাষাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। ইহাদের একখানি নিজস্ব শাস্ত্র আছে,—তাহা ইহাদের কাছে বেদের ন্যায়, নিত্য নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের অনুশাসন তাহারা সর্ব্ববিষয়ে মানিয়া চলে। এই শাস্ত্র তাহারা লিখিত আকারে শিখে না—ইহা তাহাদের মুখে মুখে কত যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ভাষা অবশ্যই রূপান্তরিত হইয়াছে এবং যুগে যুগে নূতন কথার সংযোজনা হইয়াছে—তথাপি ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন বাঙ্গলার সমস্ত লোকই কৃষি-কার্য্য করিত ও বাণিজ্যের অবসর অথবা শুভকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য গ্রহ উপগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—এই শাস্ত্র তখন হইতে বিরচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অনেক সময়েই একান্ত নিষ্ফল এবং চাষাদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বাঙ্গলার ঋতুভেদে উৎপাদিকা শক্তির বৈষম্য এবং আবহাওয়া প্রভৃতির গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এই প্রবচনগুলি ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে বিলাত হইতে যে সকল বাঙ্গালী কৃষিতত্ত্বের উপাধি লইয়া এদেশে আসেন, কিংবা যাঁহারা বোম্বাই সহরে যাইয়া কৃষিবিজ্ঞানে পারদর্শী হন—তাঁহারা এতদ্দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং বাঙ্গলার অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচিত "ডাক ও খনার" এই অভ্রান্ত শাস্ত্রকে নিতান্ত উপেক্ষা করেন। গণিতের পণ্ডিতেরা যেরূপ শুভঙ্করী আর্য্যার কোন খবরই রাখেন না, কৃষি-বিষয়ক বিজ্ঞানবিদ্ এদেশের পণ্ডিতেরাও ডাক-খনার কোন তত্ত্বই অবগত নহেন যাহা লইয়া উক্ত বিষয়গুলির ঘাঁটাঘাঁটি হওয়া উচিত, সেই উপকরণ অগ্রাহ্য করাতে এই পণ্ডিতগণের শিক্ষার ভিত্তি চিরকালই কাঁচা থাকিয়া যায়। ডাক ও খনার সহস্র সহস্র প্রবচন এখনও পল্লীগ্রাম খুঁজিলে উদ্ধার করা যাইতে পারে, কয়েকটি প্রবচন নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। (১) চৈত্রে কুয়া (=সা। ভাদ্রে বান। নবের মুণ্ড গড়াগড়ি যান। (চৈত্রে কোয়াশা ও ভাদ্রে বান হইলে মড়ক লাগে।) (২) পূর্ব্ব আষাঢ়ে দখিনা বয়। সেই বছর বন্যা হয়। (দখিনা=দক্ষিণা হাওয়া।) (৩) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে পাড়া। (পৌষ মাসে যদি গরম হয় এবং বৈশাখ মাসেও যদি শীত থাকে, তবে সে বৎসর আষাঢ়ের প্রথম দিকেই ভয়ানক বর্ষা হইবে।) (৪) কোদালে কুদুলে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। বলদে চাষারে বাঁধতে আল। আজ না হয় জল হবে কাল। (কোদাল ও কুদুল কিম্বা কোপাইলে যেরূপ হয়, তখন মেঘগুলি সেইরূপ ছিন্ন হয় এবং তখন যদি মাঝে মাঝে হাওয়া দেয়, তবে বৃষ্টি আসন্ন বুঝিতে হইবে, সুতরাং তখনই চাষাদের বৃষ্টি ধরিবার জন্য ক্ষেতে আইল বাঁধিয়া রাখা উচিত।) (৫) যদি বরে আগনে, রাজা মানেন মাগনে। যদি বরে পৌষে, কড়ি হয় তুষে। যদি বরে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

যদি বরে ফাগুনে, চিনা কাঙ্গন হয় দিগুণে। জৈষ্ঠ তাকে আষাঢ়ে ধাবা, শস্যের ভার না সহে ধরা। মাঘ মাসে বর্ষে দেবা, রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা। (যদি অগ্রহায়ণে বৃষ্টি হয়, তবে এরূপ দুর্ভিক্ষ হইবে যে, রাজাকেও ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া বাহির হইতে হইবে। পৌষে বৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষ আরও ভয়ানক হয়, তখন তুষ বিক্রয় করিয়াও অর্থলাভ হয়। যদি জৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি না হইয়া আষাঢ়ে খুব বৃষ্টি হয় তবে অপর্য্যাপ্ত শস্য হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রজারা এত ধনী হইবে যে, রাজা ছাড়িয়া প্রজার কাছে গেলেও অর্থলাভ হইবে।) ৬) বেশ করে যাবে আর দিনে হয় জল ভবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল। (৭) আষাঢ়ে নবমী শুক্লা পক্ষা, কি কর শ্বশুর দেখা দেখা যদি বসে ঝিমিকঝিমি। শস্যের ভার না সহে মেদিনী। যদি বর্ষে মুষলধারে, অধাসনুত্রে বলা চরে যদি বসে ছিটে ফোঁটা, পর্ব্বতে হয় ঘাসের ঘটা। (শুক্লপক্ষীয় আষাঢ়ের নবমীতে যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খনা তাহার শ্বশুরকে বলিতেছেন, কেন আর চিন্তাকুলিত হইতেছেন—আমার কথা মানিয়া লউন, ঐ তিথিতে ঐরূপ বৃষ্টি হইলে সেবার এরূপ অনাবৃষ্টি হইবে যে মধ্যেসমুদ্রও শুকাইয়া যাইবে সেখানে চড়া পড়িবে ও তথায় গরু চরিয়া বেড়াইবে যদি খুব প্রবল বৃষ্টি না হইয়া ঐ তারিখে ছিটেফোঁটা অর্থাৎ অল্প বৃষ্টি হয়, তবে সেবারে ঘাস এরূপ জন্মে যে, পর্ব্বতের উপরও মৎস্য দেখা দিবে যদি ঝিমিঝিমি বৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ছোট ছোট বিন্দুতে অবিশ্রান্ত বর্ষা হয়, তবে সেবার অপর্য্যাপ্ত শস্য হইবে।) (৮ খনা ডেকে ব'লে যান বোনে ধান ছায়ায় পান। (যত রৌদ্র বেশী পাইবে ততই ধান ভাল হইবে এবং যত বেশী ছায়া পড়িবে তত ই পান বেশী হইবে। (৯) আশ্বিনে ঈশান কাত্তিকের ঈশান, বাদ দিয়া যত পারিস মটর কলাই বুনিস। (১০ খনা বলে চাষার পো। অগ্রহায়ণ পেরে সরিষা বো (১১) সাত চাষ তিন বিদার কলা লাঙ্গলি মাগে পুতে কলা লাঙ্গলে না কাটে পাছ। তাতেই কাপড় তাতেই ছাতু ১২ যদি থাকে টাকা কড়ির বো, তবে চৈত্র মাসে তুলা বো। (১৩) দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে বাদের বল (১৪ শুনরে বাপু চাষার বেটা। মাটির মধ্যে বেলে বেটা। তাতে বাদ বুনিস পটোল তাতেই তোর আশা সফল। (১৫) বৈশাখ জৈষ্ঠে তুলা বোও ঢালা পাশা খেলা ফেলিয়া থোও। (১৬) ফাল্গুনে আগুন চৈত্রে মাটী বাঁশ বলে শুন্য উঠি। শুন বাপু চাষার বেটা। বাঁশের আড়ে দিও ধানের চিটা। দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে তুই কুড়া তুঁই বেড়বে আড়ে (১৭) খনা বলে শুন শুন লবণের শেষে মূলো বুন (১৮) তামাক বুনে তুড়িয়া মাটী, বীজ পুত শুটি শুটি। ঘন ঘন পুত না। পৌষের অধিক বেশো না। (১৯) ব'লে গেছে বরাহের পো। নয়টি মাস বেগুন বো। চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ। (২০) অগ্রহায়ণে যদি না হয় বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি। (২১) ডাকছেড়ে বলে রামা। কলা রোবে আষাঢ় শ্রাবণ। তিন শত কাঁড় কলা হয়ে। থাক পুতী ঘরে শুয়ে।

এইরূপ অসংখ্য প্রবচন আছে। কতকগুলি রন্ধন সম্বন্ধে—যথা, যত আগে ব্যঞ্জন দিবে। তত আগে ভাত নাই। (ব্যঞ্জন রাঁধিতে যত বেশী জল দিবে ততই ভাল, কিন্তু ভাত রাঁধিতে

মৃত্ত আল ভাল । ভাঁড়ের ঘর সম্বন্ধে, আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে, সর্বপ্রকার কৃষি সম্বন্ধে—এই সকল প্রবচন বাঙ্গলার পক্ষে খাঁটি সত্য। যখন বাঙ্গালীর চাকুরী মিলিতেছে না, তখন আমাদের কৃষির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কিন্তু এই প্রবচনগুলি কি এখন আমাদের উদ্ধার করা উচিত নহে?

আমার নিকট খনার বচনের একটা সংগ্রহ আছে। বাঙ্গলা পত্রিকাগুলিতে কিছু কিছু সংগ্রহ আছে, কিন্তু চাষার পল্লীতে না গেলে এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালা বাবুর যে সেইটিই মহাভয়ের কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলি ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বদুয়া মিশ্র জ্যোতিরাচার্য্য মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের দেশের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় অনেক মৈথিলী পুঁথিতে ৫০০ ৪০০ বৎসরের পূর্ব্বের, অর্থ "খনাবচন" বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত খনার বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সকল প্রবচনের বটতলার অনুবাদগুলি সংগ্রহে আছে তাহাতে বেশী বচন সংগৃহীত হয় নাই। ইহাদের কাল নির্দ্দেশ করা সহজ নহে বৃহৎসংহিতা (৫ম শতাব্দী), এমন কি পতঞ্জলির মহাভাষ্য (খৃঃ পূ ২০০ শতাব্দী) প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে এই সকল প্রবচনের মত কতকগুলি বচন সূত্রাকারে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এতদ্দেশ-প্রচলিত খনার বচন নামধেয় প্রবচনগুলিতে ঠিক বঙ্গদেশের কথাই বেশী করিয়া পাওয়া যায়। নারী চরিত্র, জ্যোতিষিক প্রসঙ্গ এবং সামাজিক বিষয়ের প্রবচনই ডাকের কথায় বেশী।

এই সকল প্রবচনে স্থানে স্থানে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। ভগীরথ যে গঙ্গার গতি ফিরাইয়া দিয়া একটা বিরাট পুরুকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক উপাখ্যানের আড়ালে তাহা ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু খনার বচনে "ভগীরথ যদি মরণে ভগায় খাদে"—ছত্রটি পাওয়া যায়। "খাদ" অর্থ "খাল"—সুতরাং ভগীরথ যে খাল কাটিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাইতেছে। আর একটি প্রবচন এইরূপ —"উঠতে শুতে পাশমোড়া, তার অর্দ্ধেক ভুঁয়ে ছোঁড়া, জলের চৌদ্দ ডুবুর আট এই সব ক'রে জল কাট। এ যদি না করতে পারিস, ভগীর খালে দিয়ে ডুবে মরিস।" এখনও গৌড়া ব্রাহ্মণদের রীতি আছে যে গঙ্গার স্নান করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা এক মুঠ মাটী নদী হইতে তুলিয়া তীরে ক্ষেপণ করিয়া শেষে স্নান করেন। এই বিরাট পুরুকার্য্যে যে কিছুমাত্রই সহযোগিতা করিয়াছিল এবং কোন কালে এই ধারা লুপ্ত না হয়, এজন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই নিত্য-সাহায্য বাধ্যতামূলক ছিল, এই রীতিটার যেন সেই কথার আভাস পাওয়া যায়।

আবার শুভদিন ও অশুভদিন সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী জনসাধারণ প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া সিংহবিক্রমে কখন মুক্ত হইতে পারে খনার এই বচনটির প্রতি লক্ষ্য করুন—

"রজক দেখবে যখন, কাপড় ছাড়বে তখন। নাপিত দেখবে যখন খেউরি হবে তখন। কিসের তিথি কিসের বার। যাক দিবা হও গতিন পার। জল ভাল সন্ধ্যার জল, বল বল যাহ বল। আর যত সব ভাসা দিসা। খনার বিচারে বুদ্ধিনাশা।"

ইহার পূর্ব্বেই একটি বচনে পাই সোম ও শুক্র বার বাদ দিয়া নূতন কাপড় পরিবে, রবিবারে ও মঙ্গলবারে ক্ষৌরি হইবে না, জলপথে বিদেশে যাইতে হইলে অনেক অশুভ দিন বর্জ্জন করিতে হইবে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট দিনে তৎকালের কাপড় দিতে নাই কিন্তু এইবার শৃঙ্খলিত পুরুষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া বলিতেছেন যখন রজক আসিবে, তখনই কাপড় দিবে—তাহাতে দিন-ক্ষণ নাই। নাপিত পাইলেই ক্ষৌরি হইবে এবং স্নাফাইয়া সমুদ্র পার হইয়া, তাহাতে দিন-ক্ষণ দেখিতে হইবে না। জলের মধ্যে গঙ্গা-জল শ্রেষ্ঠ, এবং বলের মধ্যে বাহু বলই শ্রেষ্ঠ, প্রচলিত বল কিছুই নহে। খনা বলিতেছেন ওসকল শাস্ত্রের বচনে কেবল বুদ্ধি নাশ করে এবং উহারা নিরর্থ

আশ্চর্য্যের বিষয় অন্যান্য প্রাকৃতিক উপদ্রবের মত, ভূমিকম্প সম্বন্ধেও কতকগুলি পূর্ব্ব লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—"ঘন ঘন কাঁপে ইট্ বলা। এক চাপড়ে শতেক মরে সে দিন মেদিনী নড়ে ৷" মনের যদি এরূপ সাহসও হয় যে, এক চাপড়ে একশটি বিনষ্ট হয়—সেই দিন ভূমিকম্প হইবে, জানিবে। এইভাবে বন্যা ও ঝড়ের সূচনা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারির সূচনা প্রভৃতি বহুতর প্রবচন আছে। ধান, চাল হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় কলাই প্রভৃতি শস্য, ফল, পান, বেগুন, কলা, আম, কাঁটাল প্রভৃতি বিবিধ ফল উৎপাদন করিবার উপযোগী আবহাওয়া এবং শস্য ও ফলের ব্যাধি নষ্ট করিবার উপায়—বাঙ্গলার কৃষিতত্ত্বের সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে খনা দিয়াছেন। ডাকের বচনেও এ সকল কথা আছে, কিন্তু তাহাতে নরনারীর চরিত্রের অনুদৃষ্টি সম্বন্ধে প্রবচনই বেশী। সংকলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বিদেশীর অভিমত।

আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে বিদেশী লোকেরা অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজদের মন আমাদের উপর অনেকটা সদয় ছিল, তখন তাঁহারা আমাদের দোষগুণ উভয়ই সরলভাবে ব্যক্ত করিতেন। কেরি, ওয়ার্ড ও মাসম্যান এদেশের রীতিনীতি অনেক সময়ে অতিরিক্ত ভাবে নিন্দা করিয়াছেন—তাঁহাদের পৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার জন্য। কিন্তু এদেশের ভাল দিকটাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কূটরাষ্ট্রনীতি ইংরেজ কি দেশীয় সমাজে প্রবেশ করে নাই। মিস মেওর মত লোক তখন একটিও ছিল না, বরঞ্চ এদেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে কত এলফিনষ্টন, ফাণ্ড সন, উইলসন, কোলব্রুক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এখনও মহামনা গ্রীয়ারসন জীবিত আছেন—তুলসীদাসের প্রতি শ্রদ্ধায় যাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব বৃহৎকায় কবিকঙ্কণের চণ্ডী পড়িয়া বিস্মিত। তিনি এই কবিকে কখনও চসার এবং কখনও স্পেকের সঙ্গে তুলনা করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন এবং স্বয়ং চণ্ডীকাব্যের অনেকাংশ ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। ষ্টীল তাঁহার বাঙ্গলার অভিধানের (বাঙ্গলা হইতে ইংরেজী, ইহা একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)

নির্ঘণ্টের ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তাপ ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিতে যেরূপ দেরী হয়, সমাজের নিম্নস্তরে জ্ঞানের প্রসারও তেমনই সময়- ও কষ্ট-সাপেক্ষ এই জ্ঞানের পরিধি যুগযুগান্তরের চেষ্টায় ভারতীয় কুটীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল তিনি এই তথ্য সহজ ও সরল স্বাভাবিক জীবনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তিনি এই দেশের পাণ্ডিত্য ও পারিভাষিক মুন্সিয়ানায় জটিলতা বাদ দিলেও সেই জ্ঞান যে কতটা বিস্ময়কর প্রসারতা এবং গভীরতা লাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন। সেই জ্ঞান যে সকল লোকের আছে, তাহারা যে উহা কত তুচ্ছ ও মূল্যবান তাহা আদৌ অবগত নহে। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি প্রায়-নগ্নদেহ কোন কুটীরবাসীর মুখে নর-চরিত্র এবং মানুষের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে এরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞানের কথা শুনিবেন, যাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া যাইবেন তিনি তাঁহার এতদ্দেশের নিরক্ষর চাষক-বাকরের মুখে চারিদিকের লোকের স্বভাব সম্বন্ধে এরূপ অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক আলোচনা শুনিবেন, যাহা অন্য দেশের মাত্র মহাজ্ঞানীদের মধ্যে আশা করা যায়। তিনি পল্লীগুলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে খোলা হাওয়ার মধ্যে এরূপ সূক্ষ্ম শিল্প ও কারুকার্য্যের নমুনা দেখিবেন, যাহা যুগযুগান্তরের চেষ্টালব্ধ।

এই প্রদেশগুলির পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণকালে বর্ত্তমান শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। তিনি অনেক মন্দির, মসজিদ এবং obelisk দেখিবেন, যাহা সদ্যঃফোটা ফুলের ন্যায় শিল্পীর কোমল হস্তের গন্ধ এখনও হারায় নাই। এইসকল মন্দিরের যে কোনটি য়ুরোপে কোন স্থানে থাকিলে তাহা সেই দেশের, সেই শিল্পীর ও সেই যুগের গৌরব বলিয়া স্বীকৃত হইত সেইরূপ মন্দিরের খ্যাতিতে সমস্ত খৃষ্টীয় দেশগুলির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত এই শিল্পের অসাধারণ শ্রম, গঠন-নৈপুণ্য, নির্ম্মাণের কষ্ট ও অর্থব্যয় সম্বন্ধে কতই না সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়া ইহাদিগকে সম্মানিত করা হইত। প্রাদেশিক এই সমস্ত শিল্পকার্য্যের নিদর্শন আমাদের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু যিনি একবার ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলি দেখিবেন, পরিকল্পনা—সুরুচি ও আয়তন সম্বন্ধে এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দিরগুলির সমকক্ষতা করিতে পারে, তিনি জগৎ খুঁজিয়া এরূপ স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা কোথাও পাইবেন না। যখন পর্য্যটক এই মন্দিরময় নগরটি দেখিবেন, তখন যে অসাধারণ প্রতিভাশালী ইহাদের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং যেসকল কর্ম্মনিপুণ অধ্যবসায়শীল হস্ত ইহাদের আকার দিয়া গ্রানাইট্ পাথরে তাঁহাদের অমরকীর্ত্তি চিরকালের জন্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পরিচয় পাইয়া তিনি সহজেই বুঝিবেন যে তিনি জগতের এমন এক অত্যাশ্চর্য্য জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, যাহাদের তুলনা নাই তিনি উহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহাদের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ধ্বংসস্তূপ ও অস্থায়ী উপকরণগুলি উপেক্ষা করিয়া তিনি

যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারিত, তাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী পর্ব্বতের শিলা কাটিয়া তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

এমন সকল লোকও আছেন যাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের মস্তিষ্কবল আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। যাঁহারা এরূপ অসার মত পোষণ করেন, তাঁহারা একবার এদেশের সৈনিকদের অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা ভাবিয়া দেখুন। এদেশের লোকের সখের আইন কত বড়, তাহা একবার ভাবুন, বন্ধুর জন্য যন্ত্রণা—সুখে দুঃখের চূড়ান্ত পরীক্ষাস্থলে কিরূপভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। এদেশের দুর্ভোগা সামান্য কিছু উৎকর্ষ পাইলে প্রকৃতিকে কি আশ্চর্য্য উপহার প্রদর্শন করে—এই সকল তাঁহারা একবার চিন্তা করুন। এই দেশের অধিবাসীরা ভগবানের শ্রীচরণের অকৃত্রিম বিশ্বাসে নিজের অন্তরাত্মাকে কি ভাবেই না নিবেদন করেন তাহা ভাবুন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমি মন্দিরের কথা বলি। অনুকম্পা ভিক্ষা এবং মৃত্যুর প্রতি একান্ত উপেক্ষার প্রতীক হিন্দু বিধবা স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবার আশায় যেভাবে চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সেই দৃশ্যের কথা আপনারা একবার স্মরণ করুন। যে জাতির মধ্যে এই সকল মহাভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারা সভ্যতার মধ্যগগনে অধিরূঢ় নহেন যাঁর বিধি-প্রবর্ত্তক শাসনকর্ত্তারা এই সকল প্রবৃত্তির নৈতিক গুণ লক্ষ্য করিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন, তাঁরা এই জাতির ধর্ম্মের প্রেরণাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনায়াসে ইহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।"

["Knowledge, which like heat, pervades with difficulty the mass beneath, has in the progress of ages penetrated into the cottage, and the man who knows how to discover it in the simple language of nature, even though it be unaccompanied by pedantic common-place or technical obscurity, will be astonished at its universality and profundity without its possessor being conscious either of its rarity or its value. He will hear the most profound dissertations on human life and actions from the mouth of the utmost naked peasant. He will discover a knowledge of character in the lowest of his menial servants, that would not dishonour the most acute penetration and accurate observation. He will behold in his progress through the country, the most delicate arts pursued in the open air and each affected by a simplicity of process that could only result from the felicitous contrivances of centuries upon centuries.

In his travels through the provinces it may be his fortune to see many splendid specimens of modern art. He may observe temples, mosques and obelisks that have scarcely lost the bloom of the artificer's hand. Works that in Europe would each have been the glory of its age, its country and its projector, the fame of which would have resounded

from one end of christendom to the other, and be consecrated in elaborate descriptions, commemorative of its proportions and its extension, its difficulties and its expense These he may view with amazement

he will be convinced that he is amongst the most surprising race of men that ever existed, among the descendants of those who wishing to proclaim to posterity the mighty things of which they were capable, and feeling the frail and perishable nature of the common records, conceived the bold design of cutting a memento of their skill and power in the living rock for ever

There are those who would deny the possession of moral principles to the natives Let such prejudiced and superficial observers bear in mind the moral dignity, the generous sense of honour and the heroic fortitude of the native soldier, the singular fidelity and affection of the people in their plighted friendship for each other, through every extreme of good or evil; the devoted attachment of servants who are treated with any degree of kindness and consideration by their masters, the self-inflicted torments of the ascetic in the blind hope of making himself acceptable to his God, and to crown all, the matchless constancy and fearless indifference of death in the Indian widows, who voluntarily mount the funeral pyre in the expectation of accompanying her husband to a region of bliss A people capable of these things are of no common character and nothing but the skill of the legislator is required to direct such steadfastness of principle to whatever can advance and perpetuate their happiness." (Pages viii, ix.)]

এদেশের চাষাদের তখন বর্ণজ্ঞান অনেকেরই ছিল না বা নাই, কিন্তু পূর্বকালে গ্রামে গ্রামে এত পাঠশালা ছিল যে লঙ সাহেব উহার ক্যাটালগে বিষয়ের সহিত প্রাচীন বঙ্গে লেখাপড়ার বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু অনেক সময় বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও বিষয়জ্ঞান তাহাদের এতটা ছিল এবং হয়ত এখনও আছে যাহাতে তাহারা শিক্ষিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এ সম্বন্ধে হটন সাহেব ও তৎসম্বন্ধে অপরাপর অনেক ইংরেজও ইঙ্গিত করিয়াছেন পাঠক বর্ণজ্ঞানশূন্য বাঙ্গলার চাষাকে ছিন্ন, সাওতাল বা কুকী মনে করিবেন না। বাঙ্গলার চাষা সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীর অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতগুলির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ ঋষির আশ্রম হইতে উপনিষদের উপদেশ শুনিয়াছে, পরে বৌদ্ধ যুগের ইন্দ্রিয়সংযম, নীতিসূত্র ও ত্যাগসম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। নব ব্রাহ্মণ্য তাহাদিগকে ভক্তির বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনগণ, কবক ও বাউল-দরবেশের প্রসাদে, তাহারা ভক্তি, ধর্ম ও জ্ঞানের নানা সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়াছে। অন্য দেশে জনসাধারণ ভাগবত জ্ঞান-সম্বন্ধে অজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ মনীষারা যে চিন্তা করেন, জনসাধারণকে তাহা তাঁহারা বিলাইতে জানেন

না। ইলিয়াড কাব্য হইতে টেনিসনের গীতি পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষিতের পাঠাগারের সমস্ত দ্রব্যই জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিলাতের কয়জন চাষা সেক্সপীয়রের নাটক বা চসারের কাব্যের কথা জানে? কিন্তু এদেশের কোন্ চাষা—মুসলমান চাষাকে বাদ দিয়া বলিতেছি না,—রামায়ণ, মহাভারতের কথা জানে না? ৫০০ বৎসরের কৃত্তিবাস, সব প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল, এমন কি শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয় মহীপালের গান, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলের গান—এই চাষাটাই জিয়াইয়া রাখিয়াছে। বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও পরাবলম্বী অপূর্ব্ব সম্পদ ও পালা-গানের আশ্চর্য্য কবিত্বের ভাণ্ডারের চাবি ইহাদেরই কাছে। ডাক ও খনার বচন ইহাদেরই কণ্ঠে, কবিকঙ্কণের চরিত্র বিশ্লেষণের এবং মহাজনের পদ কীর্ত্তনের আসর ইহারাই জমাইয়া রাখিয়াছে। বঙ্গের যাহা কিছু প্রেম ও জ্ঞানের গরিমা—নিরক্ষর চাষীরাই তাহার মালিক। ইংরেজী বিদ্যার প্রচলন অবধি যে জ্ঞানের ধারাবাহিকত্ব এতকাল আপামর সাধারণের মধ্যে (বর্ণজ্ঞান থাকুক বা না থাকুক) চলিয়া আসিতেছিল, তাহার গতি থামিয়া গিয়াছে।

এই জন্যই বাঙ্গলার চাষা যাহা জানে বা বলে তাহা শুনিয়া বিদেশীরা মুগ্ধ হইয়া যায়, হটন সাহেবের উক্তি কিছুমাত্র অতিবাদ নহে। বাঙ্গলার চাষা কত বিপ্লবের মধ্যে বাস করিয়াছে,—দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচার, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী এ সকল তো তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তবু ক্ষেতে দাঁড়াইয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবের কথাই তাহার বেশী মনে পড়ে। ইংরেজ কবির আর্ত্তনাদ—I am acquainted with sad misery as the galley-slave is with his oar [শৃঙ্খলিত আহাজের ক্রীতদাস যেরূপ জাহাজের দাঁড়কে চিনে, তাহা হইতে তাহার মুক্তি নাই, সারাদিন সেই দাঁড় টানিতেই হইবে দুঃখের সঙ্গত আমি তেমনই পরিচিত (John Webster,) কিন্তু আমাদের চাষা দুঃখকে সহজভাবে বরণ করিয়া অবাস্তবের স্বপ্ন দেখে। বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুর প্রেমশাস্ত্রের তত্ত্ব তাহাকে যে উচ্চলোকে স্থাপিত করিয়াছে সে আসন টলায় কে? তাহাদের জন্য রামপ্রসাদাদি কবি তাহাদের মনের কথাগুলি ছন্দে গাঁথিয়া দিয়াছেন। ঘাস নিড়াইতে নিড়াইতে, লাঙ্গল চলাইতে চালাইতে সে তাহাই গাহিয়া শান্তি লাভ করে—"মনরে কৃষিকাজ জান না এমন মানব জনম রইল পড়ে, আবাদ কর্লে ফলতো সোনা।" কলু ঘানি চালাইতে চালাইতে গাহে "মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের মত, ভবের গাছে বেঁধে দিয়া মা, পাক দিতেছে অবিরত—কি দোষ করিলে আমার ছটা রিপুর অনুগত।" ছুতোর, কাঠ চুরানে পড়িয়া যখন তাহার তরীখানি ডুবু ডুবু—তখনও সে বাহিরের বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার জীবনতরীর কথা স্মরণ করে "কাল সমুদ্র দেখে আমার একা যেতে ভয় করে পাছে আমায় ফেলে যেও নারে।" কিংবা তাহার জীবনতরীর একমাত্র কর্ণধারের কাছে কাঁদিয়া বলে, "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে—আমি আর বাইতে পারি না জীবন ভরে বাইলাম বৈঠারে, তরী—ভাটার সময় আর উজান না।" দিন-মজুর কুলো বুঁড়িতে বুঁড়িতে গায়—"তোর কাজ নয়রে মা—আমি খাখাত সলিলে

চুমে মরি শ্যামা। ষড়্রিপু হল কুরুক্ষেত্ররূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কণ্টকময় কূপ" ঘরে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে চাষা গায়—"ভবের আশা খেলব পাশা বড় আশা মনে ছিল।"

এরূপ শত শত উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে বাঙ্গলার চাষা মাটিতে বাস করিয়াও প্রকৃত পক্ষে অবাস্তব রাজ্যের অধিবাসী সে কবিয়ালের কি যজমান বা অদৃষ্টের কৃপা বলে সে বুদ্ধ ও জৈন গুরুদের শিষ্য একটুখানি বর্ণজ্ঞান দিয়া ইহাকে উদ্ভ্রান্ত করা এবং আকবরকে নাম সই করিতে শিখাইয়া শ্রেষ্ঠতর করিবার বাহাদুরী লওয়া—উভয়ই তুল্যরূপ। বাঙ্গালী চাষা প্রশ্ন করে—"দীপ নিবিলে, আলো কোথা যায়? সুর থামিলে শব্দ কোথায় রয়?" (গোবিন্দবিজয়।) এইরূপ দার্শনিক প্রশ্ন কোন্ দেশের চাষা করিতে পারে? অন্য দেশের গ্রাম্য কবিতায়—বেদনার সজীবতা, জীবনের উপভোগ, স্বাভাবিক রসিক্ত আছে, কিন্তু বাঙ্গলা পল্লীগাথায় প্রেমের যে রূপটা আছে,—জগতের আর কোথাও সেরূপ সাধনা আছে কিনা তাহা জানি না পল্লীগাথাগুলিতে সেই অপূর্ব্ব রূপলোকের কথা পড়িয়া নিতান্ত বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠকও বাঙ্গলার চাষার প্রতি সম্ভ্রম হইবেন এদেশের কবি অবাস্তব-রাজ্যের নিত্য জন বাঙ্গলার গ্রাম্য কবির গাথা পড়িয়া এজন্য তাহাদের সহজ নায়িকাদিগকে চিত্রবিদ্যাবিশারদের মিসেস ছেগ, সেক্সপীয়র ও বেটনীর নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। রোমা রোলা পল্লীগাথার অপূর্ব্ব কাব্যরসের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং উইলিয়াম রথেনষ্টাইন তাহাদের মধ্যে অলঙ্কার বিবর্জ্জিত রমণীমূর্ত্তিগুলিকে ভাবস্থ পাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের, শেষতক যদি চাষারা বৌদ্ধ প্রভাবের নিকট ঋণী থাকে,—হিন্দু ব্রাহ্মণের নিকট তাহারা ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছে। সংসারের দুঃখ যে মায়ের হাতের 'মার খা'র' মনে করিয়া সেই মাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—'কারে কারে কত দুখ দিয়াছ, দিতেছ তারা, সে কেমন ধারা, তবু জেনেছি মা দুখহরা' ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে সে যে গান গায়, তাহার মর্ম্ম ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন্ দেশের চাষা বুঝিবে? বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্ধ্যাভাষায় বিরচিত লাল কবির যে গানগুলি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের সকলগুলির মর্ম্মার্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটি যে খুব উচ্চ অঙ্গের ভাবরাজ্যের কথা ও অবাস্তব তত্ত্বের সম্পদ্ তাহা সেগুলি পড়িলে পাঠকমাত্রেই ইঙ্গিতে বুঝিবেন।

বণিকদের কথা।

বাঙ্গলার বণিকেরা যে ক্রমশঃ অর্থগৃধ্নু ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমরা ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যগুলিতেই দেখিতে পাই পল্লী-গীতিকায় দেখিতে পাওয়া যায় মগ ও মুসলমানদিগের মত হিন্দু ললনাদিগকে নদীর ঘাট হইতে বণিকেরাও হঠাৎ তুলিয়া লইয়া চম্পট দিতেছে। রূপকথার শৈশবে আমরা শুনিয়াছি—সদাগরেরা রানাধিকা সুন্দরী রমণী পাইলে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইত। চট্টগ্রামের মঘাই বণিকের চিত্র 'অতিমান বন্ধু' নামক গীতিকায়, জেলুয়া গীতির ভোলা বণিকের চিত্রে, এবং মহুয়া-গীতির বিলাসী বণিকের চরিত্রে ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা কাব্য-কথায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এই বণিকেরা পরস্বাপহারী এবং অর্থলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। পল্লী-গীতিকায় দুই হস্ত সাধারণ কাচ কি প্রস্তরখণ্ড ইহারা সময়ে সময়ে

বহামণিকা বলিয়া সরলপ্রকৃতি গ্রাম্য লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে (Folk Literature of Bengal দ্রষ্টব্য)। কবিকঙ্কণ মুরারি শীলের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা একান্ত খুঁটি, সমসাময়িকবর্জ্জিত ঠক বণিকের সম্বন্ধে বহু কুৎসার রটনা না থাকিলে হয়ত কবি কাল্পনিক মুরারি শীলের এরূপ জীবন্ত চিত্র আঁকিতে পারিতেন না। বঙ্গ দেশের বিপুল বাণিজ্য যে নষ্ট হইয়া গেল তাহা দুর্নীতির ফল বলিয়াই মনে হয়। যে পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীর লোক সুনীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক থাকে, ততদিন তাহাদের পতন হয় না। এক সময়ে বাঙ্গালী বণিকের নাম ছিল "সাধু"। এই 'সাধু'শব্দের অপভ্রংশ 'সাউ' (পাহা, সাহু)। নৈতিক জগতেও এই সাধুদের চরিত্র ভ্রংশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়

জাহাজ-নির্ম্মাণ।

বঙ্গদেশের বিপুল বাণিজ্য-সম্বন্ধে উল্লেখ অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি ও গীতিকায় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে জাহাজগুলির আকার ও জাহাজ-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে অনেক সূত্রকে উল্লেখ পাই হয়। বংশীদাসের ১২৭৫ খৃঃ মনসামঙ্গলে জাহাজ নির্ম্মাণের একটা উৎসাহিত বিবরণ আছে। কালকেতুর স্বর্গারোহণ অত্যধিক অতিরঞ্জন প্রবণ করিয়াছে। জাহাজগুলি এক যুগে খুব বৃহৎ হইত সেই সংস্কার অতিরঞ্জিত করিয়া কবিরা যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অসম্ভব। "কোষ" নামক ডিঙ্গির উল্লেখ প্রায় সকল পালার অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ইশা খাঁর গীতিতে এই কোষার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে। এখনও ঢাকা অঞ্চলে "কোষ" নৌকার ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাহাজগুলির মধ্যে যেটিতে স্বয়ং সদাগর থাকিতেন এবং যাহা বিশেষ সুসজ্জিত হইত, তাহা 'মধুকর' নামে অভিহিত হইত। আমরা কাব্যগুলিতে জাহাজের বহু নাম পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, যথা—"রাজবল্লভ," "রাজহংস," "সমুদ্রগোলা," "শঙ্খচূড়," "উষাতারা," "গঙ্গা প্রসাদ" "দুর্গাবর" কোন কোন নাম প্রাকৃত যুগের, যথা—"ঘুঘারেখী" "উরাচুটি," "ডাহুক-পটুয়া" "ঝিঙ্গু শঙ্খ" বিজয় গুপ্ত)। ইহারা পুরাকালে যে খুব দৃঢ়নির্ম্মিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের অতিরঞ্জনের মূলে কিছু না কিছু সত্য আছে। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় যুগযুগান্ত পরে যে সকল সংস্কার ছিল, তাহা ক্রমশঃ পাড়াগেঁয়ে কবিরা বাড়াইয়া অসম্ভব করিয়া ফেলিয়াছেন। চাঁদ সদাগরের একটি জাহাজের মাস্তুল এত উঁচু ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার উপর উঠিলে বাঙ্গলা দেশ হইতে রাবণের লঙ্কা দেখা যাইত। কোন কোন বৃহৎ জাহাজে চাঁদ সদাগর হাট বসাইতেন, তাম্বূলবেচীরা নর্ত্তকীরা কোন কোনটিতে বৃত্য করিত। এই জাহাজের বহর এত বড়—অর্থ ছিল যে, একদিকের নৌকায় যখন রৌদ্র খেলিত, সেই সময়েই অপরদিকের নৌকার উপর বৃষ্টি হইত। "তার পিছু বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উপরতারা অনেক নাম ঝড় বৃষ্টি অনেক নাম ধরা"—বিজয় গুপ্ত। কোন কোন জাহাজে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ থাকিত। চাঁদ সদাগরের কোন ডিঙ্গা এত বড় ছিল যে তাহা ৮০ গজ জল ভাঙ্গিয়া যাইত। কোন জাহাজ এত বড় ছিল যে তাহা একদিকে হেলিলে নদীর পাড় ধসিয়া পড়িত ও নিম্ন ভূমিতে আটকাইয়া যাইত, তখন তাহাকে চালাইবার

জন্তু ছাগ মহিষ বলি দিয়া কালী মায়ের তুষ্টি সাধন করিতে হইত। এই সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার কতকগুলি অতিরঞ্জিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা তাঁর সমাগমের অনুকূলতায় বাণিজ্য, তরণী, নৌবল এবং বিপুল বৈভবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তখন রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্রের মর্যাদা প্রায় তুল্য ছিল। তাঁর সদাগর রাজদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাজা এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বণিকেরা রাজার মতনই সম্মানিত রূপকথা শুনিতে পাই রাজপুত্র ও সওদাগরের পুত্রের মর্যাদা প্রায় তুল্য। সেই সকল বণিক-রাজের দেশে আজকাল ছেলেরাও চাদনী ভাত খায় না। সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর ছিল এখানে তাহার নির্দেশ হইত, সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে সরস্বতী নদী হইতে বণিকেরা "মঙ্গল ঘাটে" তুলিয়া লইত। ঐ নদী শুকাইয়া যাওয়ার পর সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য লুপ্ত হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয় পল্লীগাথায় যে সকল বাণিজ্য তরণীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে অধিকাংশ অভিযান চট্টগ্রামে নির্দিষ্ট জাহাজে চড়িয়া বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্কা, লঙ্কাদ্বীপ, মাটাবান প্রভৃতি দেশে যাইতেন, "নিলঙ্কা" শব্দ বোধ হয় লঙ্কাদ্বীপকে "প্রলয়" প্রবলমকে ও "আবর্তনা" মাটাবানকে বুঝাইতেছে। "নাকুটা," "অঙ্গলঙ্কা" "চক্রসালা" প্রভৃতি যে সকল দেশের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহারা খুব সম্ভব আরব-সাগরের কোন কোন দ্বীপ। চট্টগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের এই দুই বন্দর বিখ্যাতিলাভ চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীরবাসী "বালামী" নামক এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নির্মাণ করিত এখনও বালামীদের বংশধরেরা ছোট ছোট জাহাজ নির্মাণ করিয়া থাকে "বালামী বোকা" ইহাদের নামানুসারে পরিচিত। চীন পরিব্রাজক মাহুয়ানের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় একদা হুসেনের সুলতান আলেকজাণ্ডার শাহ জাহাজ নির্মাণপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি জাহাজ নির্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন। আরবী লেখক ইদ্রিস ষোড়শ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি সে দেশের নাম করিয়াছেন "কলবল"- এইশব্দ 'কর্ণফুলি' শব্দের অপভ্রংশ। ১৪০৫ খৃঃ অব্দে চীন দেশের মন্ত্রী চেং হো বাণিজ্য-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের সমাধানার্থ স্বয়ং চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পর্যটক ইবনবতুতা চট্টগ্রামের জাহাজে চড়িয়া আরব এবং চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে পর্তুগিজ নাবুডি চোলা। পোয়ার শাসনকর্তা, তাঁহার সেনাপতি দি মারাকে চট্টগ্রামে তাঁহাদের একটা বাণিজ্য-কেন্দ্রস্থাপনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় নব-উদ্ভাবিত যন্ত্রচালিত জাহাজের প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামের এই বিপুল জাহাজ-নির্মাণ কারখানাটি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হতশ্রী হইয়া পড়িল। চট্টগ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক জাহাজের মালিকদের নাম লোকে বলিয়া থাকে—তাঁহারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেন. মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে তাঁহারা জীবিত ছিলেন—রঙ্গ, বসির, গুমানি হাসুম, বদন কেরানি, দাতারাম চৌধুরী প্রভৃতি জাহাজাধ্যক্ষদের কোন কোন জনের শতাধিক জাহাজ ছিল। ইহারা হার্মাদদিগের অত্যাচারের সময়ে বৃহৎ নৌবল লইয়া অগ্রসর হইতেন। এই শ্রেণীবদ্ধ জাহাজ-

গুলিকে "পুষ্পবতী" বলা হইত। যিনি হাজী দলিলকে দমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে "বহরবন্দ" বলা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ জীবিত ছিলেন, শিরু সর্দার, নসরুল্লা, রামমোহন দারোগা প্রভৃতির নাম এখনও শোনা যায়। রামমোহন দারোগার জাহাজ বাণিজ্যার্থ লইয়া স্কটলণ্ডের টুইড বন্দরে গিয়াছিল। চট্টগ্রামে নির্ম্মিত কতকগুলি জাহাজের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিব।

১। বালাম নৌকা—ইহা পূর্ব্বে যত বড় হইত, এখন আর তত বড় হয় না। সাধারণতঃ ইহারা ১৫ পালে, পাল উড়াইয়া চলে। ইহাদের মধ্যে বড় গুলি ২০০ এমন কি ২৫০ টন ধান্য বোঝাই লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫০ টনের অধিক মাল লইয়া ইহাদিগকে সমুদ্র-পথে যাইতে দেওয়া হয় না। ইহা কিপ্রগামী বালাম নৌকা বন্দরের সাহায্য বিনাও অনায়াসে ভাঙ্গত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কাটিয়া চলিয়া যায়। এক সময়ে ইহারা অতি প্রকাণ্ড হইত।

২। গোদা নৌকা—ইহাও অতি পুরাতন। এই নৌকাগুলি সচরাচর অতি দীর্ঘ হয়। ইহারা সাধারণতঃ মুটি ক মাছের কারবারের জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে ইহারা সমুদ্র-পথে নোনাদিয়া, লালদিয়া, বাক্সবাদা প্রভৃতি হইতে পসারদের ঈশপুজে মৎস্যের কারবার উপলক্ষে যাতায়াত করে। এই নৌকাগুলি কাঠের পেরেক দিয়া আটকান হয় না। "গরক" নামক বেত দিয়া নৌকার বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়, এবং সেই বেতের অবকাশে "ক্রাথো" তুলা ছিদ্র দাড়, তুলা, ধুনা প্রভৃতির দ্বারা এমন শক্ত করিয়া আটকান হয় যে, তাহাতে জলপ্রবেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গোদা নৌকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ খুলিয়া রাখা হয়। বর্ষাকালে সেগুলি জোড়া দিয়া নৌকা সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়, ইহাদের গলুই চাঙ্গদুয়া করা হয়। যখন বর্ষাকালে সমুদ্রপথ পর্য্যটন করিয়া বিপুল মৎস্যের পসার লইয়া শত শত গোদা নৌকা বন্দরকুলী নদীতে আসিয়া নঙ্গর করে, তখন সেই মৎস্যব্যবসায়ীদের আত্মীয়স্বজন দামামা, দগড় ও ঢোল পিটিয়া ও শাঁখ বাজাইয়া তাহাদিগকে যেরূপ অভিনন্দন করে, তাহা একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

৩। গুরা নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, পর্ত্তুগীজ প্রভাবে কতকটা রূপান্তরিত হইয়া ঐ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে।

৪। সারেঙ্গা নৌকা—কতকটা ছোট্টা বা মালটির মত। এগুলি সমুদ্রে যাইতে সাহসী হয় না; একটি বড় গাছ কুঁদিয়া নির্ম্মিত হয়।

৫। সাম্পান—অনেকটা হাঁসের মত আকৃতি, ইহা চীনা নৌকার ধরণে প্রস্তুত।

৬। কোন্দা—চট্টগ্রামের অরণ্যসমূহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কুঁদিয়া এই শ্রেণীর নৌকা তৈরী হয়। ইহা বড় মাল লইয়া যাতায়াত করে, মাঝিরা ইহা লগি দিয়া ঠেলিয়া চালাইয়া থাকে।

এখন চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা বাষ্পচালিত জাহাজনির্ম্মাণ শিক্ষা করিতেছে। মিঃ উইলিয়ামস্ এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট উইলসনের উৎসাহে ইহারা এই বিষয় শিখিতেছে। উইলসন বাঙ্গালীদের হাতের কাজ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা জাহাজ-নির্ম্মাণে সুদক্ষ কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

অধুনা মাদব, কালীকৃষ্ণ ও হারকানাথ জাহাজ নির্ম্মাণে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমাদের স্বদেশী মেকাদের ঐতিহাসিক সংবাদ এবং উচিত গৌরবের বিষয় ইতিহাসের নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানেন না।

পল্লী-গীতিকা-সাহিত্যে "নসব মাঝির" নামক গাথায় (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ) জাহাজ ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মাল্লারা সমুদ্রপথের সমস্ত বিষয় অবগত হইতেন, তাঁহারা দীর্ঘ পর্য্যটনের পরাতনে মানচিত্র আঁকিয়া লইতেন এবং নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেন। সাহেবরা যাঁর চট্টগ্রামে অভিযান-প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের ডিঙ্গিগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা দ্রষ্টব্য)।

জাহাজের অংশগুলির যে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে তাহার কয়েকটি এখানে দিতেছি —বাক (Bil), কাছন (floor), ইবারক (keel), সুকানকিলা (keelson), গুরপুরা (stern post), বাদ (stern), বাস্তল (mast) বাস্তলের চাসুতা (rake of the mast), ইস্কা (batten)। "গুরুরেহা ও কবর" নামক গাথায় (পূঃ পীঃ, ৪র্থ খণ্ড, ৯৩-১০০ পৃঃ) নৌ-সৈন্য লইয়া জাহাজের বহর কি ভাবে যুদ্ধ করিতে যাইত, তাহার একটা উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমানেরা কোরাণধারী জাহাজকে অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধের অভিযান করিতেন। কোরাণের পশ্চাতে ধর্ম্ম প্রচারের অন্যবিধ উপকরণ যথা আলা, গুলি, কামান প্রভৃতি জাহাজে মোতায়েন থাকিত। প্রাচীন হিন্দু বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা ৪৯০-৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

গৃহ-নির্ম্মাণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে পাওয়া যায়, কোন কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের ডাক ও খনা এ বিষয়ে

গৃহ নির্ম্মাণ

নীরব নহেন, তাঁহাদের সূত্র বাঙ্গলার কৃষকগণের মুখে মুখে —"পূবে চাল। পুষ্করিণীর জলাশয় তথায় হংস বিচরণ করিবে, উত্তরে বাঁশ, পশ্চিম ঘিরে, দক্ষিণ ছেড়ে, বাড়ী করলে ভেড়ের ভেড়ে।"

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে ছাবালপতি নামক কর্ম্মকারবাজের যে লৌহ গৃহ-নির্ম্মাণের বর্ণনা আছে, তাহা পড়িলে কিরূপ সমারোহের সহিত পুরাকালে আমাদের হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইত তাহার একটা আভাস চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই স্থপতিরা হয়ত ভিন্ন দেশাগত ছিল, নতুবা সুতধর ও লৌহকর্ম্মকারদের জল অনাচরণীয় রহিয়া গেল কেন? ইহারা কোনরূপ নোংরা কাজ করে না তথাপি ইহাদের জন্য পতিতের ব্যবস্থা কেন? বংশীদাসের বর্ণনায় ছাবালপতির রূপবর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে এইকালীন লোক যে ভিন্ন দেশবাসী, তাহার একটা সংস্কার কবির মনে ছিল। ছাবালপতি অবশ্য কল্পিত চরিত্র, কিন্তু এই চরিত্র যে শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা ঐতিহাসিক

"ছাবালপতি কর্ম্মকার সকলের প্রধান।
অধিক গুণ তার জানে সর্ব্বকাম॥
দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা, মাথার খাটো চুল।
ডান হাতে হাতুর বাম হাতেতে ভুল॥

শিঙ্গল মাথার চুল বেকা কাকলী।
আকে মুখে চক্ষুতে লাগিয়াছে কালী॥"

ইহার পর হাজার হাজার কারিগর একত্র হইয়া "আড়ে সাত গজ," "নয় গজ দীর্ঘে" এবং "উর্দ্ধে নয় গজ" লোহের ঘরখানি কি ভাবে গড়িয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

বঙ্গে যে সকল কুটিরশিল্পের চর্চ্চা হইত, তাহার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বাণিজ্যের জন্য বঙ্গের বস্ত্রশিল্প ভারতের সর্ব্বত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার মসলিনের কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বঙ্গদেশের বাণিজ্যশিল্পের মধ্যে "শঙ্খশিল্প" একটি প্রধান, ঢাকা নগরী তাহারও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

শঙ্খের কারবারটা প্রথমতঃ বাঙ্গলাতেই ছিল। শঙ্খশিল্পিগণ তথায় 'শাবরথা' নামে অভিহিত হইত। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের অনেক শাখার কাজ তামিল দেশের প্রাচীন রাজধানী কোরকাই এবং কায়ালের ধ্বংসস্তূপ মধ্যেও পাওয়া গিয়াছে। যে ভাবে তথায় শঙ্খ কাটা এবং কারুকার্য্যযুক্ত হইত তাহাতে বুঝা যায় এই শিল্পের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক ঢাকার শাঁখারিদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের মতই ছিল। মুসলিম কর্তৃক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে টিনভেলি জেলার হিন্দু রাজ্যধ্বংসের পর এই শিল্পিরা বঙ্গদেশে ঢাকায় আগমন করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত রে কোথাও বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু ঢাকার এই শিল্প যে এত আধুনিক তাহা মনে হয় না। ইহার শাঁখা বাঙ্গলা গৃহস্থ রমণী বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহার করিতেন এবং সেই শাখা যে দূরদেশবাসী শিল্পিরা প্রস্তুত করিয়া দিত, এমন মনে হয় না। শিবের প্রাচীন ছড়ায় বাঙ্গালী কবিরা দেবাদিদেবকে শাঁখারী সাজাইয়া গৌরীর সঙ্গে তাঁহার ঠাট্টা-তামাসার পরিকল্পনা করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকেরাই শঙ্খকে অতি পবিত্র সামগ্রী বলিয়া মনে করিতেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ে এতদ্দেশীয় মেয়েরা যে শাঁখা পরিতেন, তাহা দাক্ষিণাত্য হইতে আমদানী হইত বলিয়া মনে হয় না, "শঙ্খ কর চূর, বসন করহ দূর—সোঙরহ গরুড়ারি চারে"—বিদ্যাপতির এই কবিতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর। পুরাকালে অবশ্য মহীশূর, বেলেরি, হায়দরাবাদ, অনন্তপুর, কর্ণাল, কাথিওয়ার, কচ্ছ, গুজরাট প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে শাঁখার কাজ হইত। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ঢাকাও এই শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। টাভার্নিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিয়াছেন ঢাকা ও পাবনা। (অনুবাদক ভুল করিয়া পাবনাকে পাটনা করিয়াছেন,—এ সো মেময়ার, ৪২৫ পৃঃ) এই দুই নগরীতে অন্যূন ২০০০ শাঁখারী ছিল। বাঙ্গলায় ঢাকা, নবদ্বীপ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে শাঁখার কারবার চলিতেছে। এই ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বে সকলেই হিন্দু ছিল, কিন্তু এখন দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানেরা এই ব্যবসায়টা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। তথাপি মোটামুটি ধরিলে হিন্দু শিল্পীর সংখ্যাই সমধিক। ঢাকার শাঁখারীবাজারে যে সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাস করেন, তাঁহাদের

পূর্বপুরুষেরা কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলা যায় না। তাঁহাদের মেয়েদের বর্ণ এত ফরসা ও মুখের গড়ন এরূপ যে, তাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলাদেশের লোক বলিয়া মনে হইত না। তাঁহারা যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকটা বিদেশী ভাষার মত, কলহের সময়ে তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা কিছুতেই বাঙ্গলা বলিয়া মনে হইত না। আমি অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহারা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছেন, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বেও শাঁখ শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। ইঁহারা তখন অতি ক্ষুদ্র গুহার ন্যায় ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেই সকল বাড়ী দ্বিতল-চৌতল হইত,—এক একখানি দুর্গের মত দেখাইত। ঢাকার শাখারীবাজার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের নিজস্ব ছিল—অতি সঙ্কীর্ণ ৩০০ গজ পরিমিত রাস্তার দুই ধারে দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতল ছোট ছোট ঘরগুলি, শাখারীদের, বিশেষ তাঁহাদের মেয়েদের অতিশয় ধবধবে শ্বেতবর্ণ; শাঁখ কাটিবার একরূপ অদ্ভুত লৌহের করাত এবং অপরাপর যন্ত্র, শাঁখ কাটার সেই একঘেয়ে শব্দ, যাহা লইয়া তামিল কবি তাঁহার সমালোচককে দু' পৃঃ কোন এক শতাব্দীতে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, এই সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ঢাকার শাঁখারী সম্প্রদায়—বহুযুগ যাবৎ ঢাকা কোতয়ালীর নিকটে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তখন একটি করিয়া কূপ ছিল; সেই কূপে স্নান এবং সেই গৃহে আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক দিনরাত তাঁহারা শাঁখা তৈরী করিতেন—তাঁহারা কদাচিৎ বাহিরে যাইতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে বহিঃ বুড়ীগঙ্গার ঘাট তাঁহাদের গৃহ হইতে অর্দ্ধ মাইল মাত্র দূরে, তথাপি অনেক অশীতিপর বৃদ্ধ বুড়ীগঙ্গার ঘাট কোথায় তাহা জানিতেন না। এ সকল প্রবাদ অবশ্যই অতিরঞ্জিত, কিন্তু ইহার মূলে এই সত্যটুকু নিহিত যে এই শিল্প-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্টচিত্ত সম্প্রদায় বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঢাকা জেলার শাসরা গ্রামে ইঁহাদের এক কেন্দ্র ছিল। ইঁহারা পূর্ব্বে অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিতে পারিতেন, রেখাগুলি এরূপ সূক্ষ্মভাবে টানিয়া যাইতেন ও তাহা গালা দিয়া এরূপ সুন্দরভাবে রঞ্জিত করিতেন যে, তখন শাখাগুলি অনাড়ম্বর হইয়াও একান্ত সুরুচি ও সংযত কলার নিদর্শন হইত। এখন নানারূপ কারুকার্য্য তাহাতে ঢুকিয়াছে সত্য, কিন্তু কাজগুলি আর সেরূপ যত্নের সহিত হয় বলিয়া মনে হয় না এখনকার শাঁখা যা, চুড়ি পূর্ব্বের মত সুচারুরূপে কর্ত্তিত হয় না, এখন বাহিরে নানারূপ চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত থাকে, কিন্তু ভিতরটা উঁচুনীচু ও খুব ভাল ভাবে কাটা হয় না কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ভাল শাঁখার পশ্চাদ্ভাগ নিখুঁতভাবে মসৃণ হইত।

হরনেস সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময় ঢাকার শাঁখার ব্যবসায়টির অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল বিলাতী বেলোয়ারী চুড়ি ও বিদেশী পাটার্নের গহনার প্রতি অনুরাগের জন্য বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরা আর শাঁখার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতেন না, কিন্তু স্বদেশী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মেয়েরা আবার বিলাতী চুড়ি পরেন না, আবার শাঁখার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়াছে, এজন্য আবার এই শিল্প জাগিয়া উঠিয়াছে

১৯০৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কলিকাতার পথের আমদানীর নিম্নলিখিত মর্ম্ম হরনেল সাহেবের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে —

	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯	১৯০৯-১০
সিংহল হইতে	১৪৪৭৭২৲	১৮২২৮০৲	৮৬৫১৫৲	১৮১২২৩৲	১৬৬০৬০৲
মাদ্রাজ হইতে	৩৩৭৫৫৲	৩৬০৫৭	৫৫৮৯৲	৫৫২৪১৲	৬৮০১৯৲
ত্রিবাঙ্কুর হইতে	১১৪৲	শূন্য	৫৯৫৲	শূন্য	৫০০৲
বোম্বাই হইতে	৬৭৪৪৲	১৩৭৫০৲	৩৮২৩৲	২৩০৫৲	৪২৯৮৲
মোট	১৮৫৩৮৫৲	২৩৯০১৬৭৲	৯৬৫১৯৲	২৩৮৭৬৯৲	২৩৮৮৭৭৲

এই তালিকায় দুই হয় শাঁখার চাহিদা এদেশে বাড়িতেছে। ইহা একটু শুভ লক্ষণ। দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী এই বিশ বৎসরে ব্যবসাটি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার হিসাব আমাদের কাছে নাই।

বর্ত্তমানকালে শাঁখার যে সকল কারুকার্য্য চলিতেছে তাহার নমুনা দিয়ে দিতেছি।

শ্রীহট্টে দেবালয়ে ব্যবহৃত শাঁখের উপর অতি সূক্ষ্ম হস্তে অনেক চিত্রাদি কোদিত হইত। তাহাতে কোন পৌরাণিক দেবলীলার চিত্র আঁকা হইত,—এখনও সেই দেবতাদের লীলার কোদিত সূক্ষ্মরেখার সুন্দরভাবে অঙ্কিত চিত্রযুক্ত শাঁখ কোন কোন দেবালয়ে পাওয়া যায়। একটি চিত্র দেওয়া হইল। এখনকার দেবতারা নৈবেদ্য হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন, কে আর তাঁহাদের জন্য মন্দির ও পূজার উপকরণ সাজাইবে?

কবি হুসেন উদ্দীনের মারফৎ ঢাকা ৩৩নং শাঁখারীটোলাবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ধর শাঁখারী এবং তাঁহার পুত্র এবং আত্মীয়গণের নিকট হইতে অতীত ও বর্ত্তমানকালের ঢাকার শাঁখার কারবারের নিম্নলিখিত বিবরণ পাইয়াছি।

(১) যে যে স্থান হইতে শঙ্খ আমদানী হয় —তিন্নেভেলী (মাদ্রাজ), কাপনা (কলম্বো) ইত্যাদি।

(২) শঙ্খের জাত —তিহুপুটী, রামেশ্বরী, কাঁসারী, দোহানী, মতি-ছাপ্পামত, পাটী, গারবেণী, কাচ্চাঘর, ধলা, ভেজাল, কেলাকর, জামাই পাটী, এস্‌পাকার পাটী, নায়াখাদ, খগা, সুকীচোনা।

(৩) শঙ্খের দ্বারা কি কি তৈরী হয় —পাঁখা, আতরদানী, মালা, এসট্রে, সেফটীপিন্, ঘড়ির চেন, আংটি, বোতাম, ক্রশ, বাংগেল, ব্রেসলেট, পো, কমালদানী, জলশঙ্খ, বাদ্যশঙ্খ।

(৪) পাঁখার নাম :—

প্রথম যুগ—গাড়া। ২ পাছা হইতে ৪০ পাছা পর্য্যন্ত।

মধ্য যুগ—সাতকাণা, পাঁচলানা, তিনলানা, বাঙ্কাঘর, সাদাখালা, আউলাকেশী।

বর্ত্তমান যুগ —সোণা বাঁধানো, টালী, লাইনমোড, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, মোড়ানো, মতীলক্ষ্মী, আলফাঁস, ঢাইসাদর, বানাদার, সাদাপাঁখা, শঙ্খবালা, আইপেটেরন, ইংলিশপ্যাচ, ভেড়াশঙ্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা।

লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুক্কি, রাসিখুসী, লাভিলিং, তারপেঁচ, জয়শঙ্খ, পাথরকাটা, গোলাপ ফুল, মোটালতা, মাছ, মুড়িদার, আঙ্গুরপাতা, বেণী, উলবেণী, বাঁশপীর, গোলাপবালা, নাগরী বয়লা।

শঙ্খবয়ন-শিল্প।

বঙ্গদেশ বস্ত্রবয়ন-শিল্পের জন্মভূমি। বঙ্গোপসাগর যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন দেবদারু, বস্ত্রবয়নশিল্প তেমনই বঙ্গের নিজস্ব। এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

এদেশে একসময়ে চরকা মেয়েদের হাতের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল, যেমন বিষ্ণুর হাতের সুদর্শন চক্র এখন উহা মহাত্মা গান্ধীর হাতে উঠিয়াছে। চরকা কথাটা 'চক্র' কথারই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয় উহার আকারটা কতকটা সুদর্শন চক্রেরই মত।

চরকাকাটা

পূর্ব্বকালে রাজার রাণী হইতে দীনতম কুটিরবাসিনী সকলেই চরকায় সূতা কাটিতেন। রাজপার ব্রত-কথার অনেকগুলিতেই চরকা দিয়া সূতা কাটার কথা আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সুবর্ণচুর্ণাপুরের রাণী একবারাজাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে কেমন ভালবাস?" রাজা জানকীনাথ তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। রাণী কমলা মাথা হেলাইয়া বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পরে তুমি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিবে, চিতায় মঠ দিবে, আমি তো আর তাহা দেখিতে আসিব না। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তুমি কি করিতে পার, আমি দেখিতে চাই।" রাজা বলিলেন, "তুমি যা বলিবে তাই করিব।" রাণী বলিলেন, "বেশ, আমি সাত দিন সাত রাত ধরিয়া চরকায় 'এক টাকিয়া' সূতা কাটিব, সেই সূতা যতটা দীর্ঘ হইবে, সেই মাপে তুমি আমার জন্য একটা দীঘি কাটাইয়া দিবে—তাহার নাম রাখিবে 'কমলা-সায়র'।" কমলা সায়রের কতকাংশ এখন সোনেশ্বর নদের গর্ভে, বাকী অংশ এখনও বিদ্যমান। সেই দীঘিসংক্রান্ত দুর্ঘটনা এবং রাজ্ঞী কমলা দেবীর

শোভনার মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক গল্পগুজব এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত, তাহাদের দুইটি আমি প্রকাশ করিয়াছি (পূঃ পীঃ, ৩য় ও ৫ম খণ্ড)।

"চরকা আমার ভাতার পুত চরকার সৌলতে আমার দুয়ারে হাতী বান্ধা," প্রভৃতি অর্থ বাচক প্রবচন এখনও পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মুখে মুখে শোনা যায়। মেয়েরা চরকার ভাবে এতটা অভিভূত ছিলেন যে চাঁদের কলঙ্কটাকে "চাঁদের মা বুড়ী চরকা কাটিতেছে" এই ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদের বুঝাইতেন। চরকার সুতা এত সরু হইত যে এখনও তাহার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ চরকার ব্যবহার মোগল যুগে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখনও বিক্রমপুরের বাদুরের মেয়েরা চরকার সুতায় এরূপ সূক্ষ্ম সৈতা তৈরী করেন যে, চারি গণ্ডা সৈতার চারি গাঁটরী একটা বড় এলাচের খোসার মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া রাখা যায়। আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়িতাম, তখন আমার এক বিক্রমপুর নিবাসী সহপাঠী বড় এলাচের খোসার মধ্যে পুরিয়া তাঁহার মাতার হাতের কাটা চারিটি সৈতা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন, সেই চারিটি সৈতার মধ্যে চারি সুতা ছিল। সেই সুতা মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম হইলেও বেশ শক্ত ছিল। আমি উহা বহুদিন ব্যবহার করিয়াছিলাম।

একটি বড়-এলাচের খোসে চারিটি সৈতা।

বাঙ্গলার চরকা ও বাঙ্গলার সুতা বাঙ্গলার গৃহগুলির এরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল যে লোকে কথাবার্ত্তা, চলন দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই চরকা ও সুতার উপমা দিত। এমন সকল ব্যাপারে সুতার উল্লেখ ও উপমা দেওয়া হইত, যাহা এখন অদ্ভুত ঠেকে, কিন্তু সেইভাবের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়, বাঙ্গলার সুতার কারবারটা কত প্রিয় ও সরল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। একটি প্রাচীন বৈষ্ণবগান এইরূপ —

বাঙ্গালার সুতার ব্যবসায়।

"(সে হাটে) বিকায় নাকো অন্য সুতো।
বিনা তাঁতি নকের সুত॥
সে হাটের প্রধান তাঁতি প্রেমপতি পশুপতি,
আর যত আছে তাঁতি—তাদের শুধু খাতায়াত॥"

কিন্তু পুরুষেরা চরকা কাটিতেন না—তাহা তাঁহাদের অপমানের বিষয় ছিল। গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে দেখাইয়াছি, যদি কোন সেনাপতি যুদ্ধে অক্ষমতা দেখাইতেন, তবে রাজা প্রায়ই তাঁহাকে অপমান করিয়া বলিতেন, "তোমার আর যুদ্ধে যাইবার কাজ নাই, তোমাকে একখানি চরকা পাঠাইয়া দিব।" বঙ্গদেশে চরকার পাট উঠিয়া গেলেও আসামের মেয়েরা এখনও চরকা ছাড়েন নাই। তাঁহারা রেশমের উপর এখনও যেরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করেন, তাহা অতি সুন্দর। চাদরের উপর কত যে সোজন হয়। বড় ঘরের মেয়েদের হাতের কাজ দেখাইয়া বরপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তবেই ভাল বিবাহ হয়। বাঙ্গলার মেয়েরা এখন বিলাতীর নকল করিয়া 'রেশ' তৈরী করেন এবং যারা কচিৎ ব্যবহারে লাগে তাহাই

রচনা করিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত হন কিন্তু আমাদের মেয়েরা ভাল বেশমে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া থাকেন।

কার্পাস দ্বারা বস্ত্রবয়ন ভারতবর্ষে যে কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন. ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে তাঁতিদের সূতের উল্লেখ আছে ("হে শতক্রতু, তুমি যেরূপ তাঁতিদের সূতা খাইয়া ফেল তুমিও আমাকে তেমনই খাইয়া ফেলিতেছ—১০৫ ৪৮)। এই শ্লোকের ইঙ্গিতার্থ—তাঁতিরা সেই প্রাচীন কালেও সূতার মাত্র শত খৃ. পূঃ ২০০ বৎসর পূর্বে গ্রীকেরা ভারতীয় কার্পাসের কথা জানিতেন। ষ্ট্রাবো (Strabo) কার্পাসকে "কার্পাসস" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। জে ফর্বেস রয়েল (J Forbes Royle, M D, F R S, তাঁহার "Early History of Cotton" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "গ্রীকেরা ঢাকার মসলিনের কথা বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা বস্ত্রশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ইহাকে নির্দেশ করিয়াছেন এবং 'গ্যাঙ্গেটিকা' নাম দিয়াছেন, যেহেতু ইহা গঙ্গার উপকূল প্রস্তুত হইত ১০০ পৃঃ।" বাঙ্গালী শিল্পী যে এ বিষয়ে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন প্লিনি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাক্তার উরে Dr Ure) এবং টেইলর পর্যন্ত বহু লেখক ঢাকার মসলিনের অশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

প্লিনির সময় বাঙ্গলার মসলিনের নাম ছিল "কার্পাসিয়াম" এই শব্দটি সংস্কৃত 'কার্পাস' শব্দের অপভ্রংশ। অতীতকালের মসলিনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র, ঢাকার অদূরবর্তী ডাকাতিয়া পরগনার অন্তর্গত "কাপসিয়া" এখনও ঐ নামে পরিচিত

বাইবেলে এই মসলিনের উল্লেখ পাই হয় (ইস্তফিল, ১৬শ অধ্যায় ১০ ১৩ এবং ইসিয়া, ৩য় অধ্যায়, ২৩)।

প্লিনি লিখিয়াছেন, "রোমের মেয়েরা মসলিনের জাল করিয়া যাঁর নগ্ন অবয়ব সাধারণের চক্ষের নিকট উপস্থিত করেন।" -"A dress under whose slight veil our women continue to show their shapes to the public."

বিদেশী মত।

ডাক্তার উরে বলিয়াছেন, "রোমের পূর্বতন ঐশ্বর্যের যুগে ঢাকার মসলিন তথাকার মহিলাদের সর্বপ্রধান ও প্রিয় বিলাসের সামগ্রী ছিল (Cotton Manufacture of Great Britain by Dr Ure)। ইয়েটস লিখিয়াছেন, ভারতীয় কার্পাস খৃষ্ট জন্মিবার দুইশত বৎসর পূর্বে গ্রীসদেশের বাজারে প্রচলিত ছিল। (Textrium Antiquorum)

হুভিলেলের পুস্তকেও মসলিনের প্রশংসাসূচক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্লিনির লেখাতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশের ঢাকানগরীই এই বস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রভূমি ছিল। সমস্ত জগতে সুপ্রাচীন কাল হইতে ইহার ব্যবহার ও আদর হইত। "একদিকে চীন, অপর দিকে তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এবং পারস্যদেশের সহিত এই বাণিজ্য চলিত; ইহার কিছুদিন পরে গ্রীসদেশ, ইটালী, স্যাংওই কক এবং স্পেন দেশেও ঢাকার মসলিন প্রেরিত হইত (১৩২০,

৬০ হাত কাপড় হাতে যাবিলে টের পাওয়া যায় না

বঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ম সংখ্যা, ঢাকার মসলিন লেখক শ্রদ্ধেয় আবদুল করিম।

ইংলিশের সুবিখ্যাত রাজা এডোয়ার্ডও তাঁহার সৈন্য দলকে "কারোসমা" বস্ত্র উপহার দিতেন। টেভারনিয়ার লিখিয়াছেন মহম্মদ আলিবেগ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যদেশে ফিরিয়া রাজা সাফেফিকে একটি বুলবান পক্ষীর বাচ্চা বৃহৎ নৈশ্বর মত ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দেন, ইহার মধ্যে ৬০ হাত লম্বা একখানি মসলিন কাপড় ছিল, ইহা এত পাৎলা যে হাতে রাখিলে আলো কোন দিকের হাত আছে বলিয়াই মনে হইত না।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীকজাতি গ্রন্থকার ডাকার মসলিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, (Periplus of the Erythrean Sea) নবম শতাব্দীতে দুইজন চীন পর্যটক ভারতবর্ষের বিবরণ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন Account of India and China by Two Mahommedan Travellers এই পুস্তকের অনুবাদে কাপাসের আদিম জন্মভূমি ইহারাই। টেলার সাহেব তাঁহার 'ঢাকা রিভিউ' নামক ১৯১০ খৃঃ লিখিয়াছেন "উক্ত দুই মুসলমান লেখকের মতে ঢাকার লোকেরা এমন চমৎকার কাপড় বয়ন করে যে জগতের অন্যত্র তাহার তুলনা হইতে পারে না। পোষ আষাঢ়ে এই বস্ত্রগুলি পরীক্ষা হয় বলে ইহার একখানি এত সূক্ষ্ম যে একটি অঙ্গুরীয়কের ভিতরে সমস্ত কাপড়খানি টানিয়া আনা যায়।" প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন "১০০০ বৎসর পূর্বে হিন্দুরা বস্ত্রবয়নে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন" (Introduction to Bhagavat Gamitta) ভগবদ্গীতা নামক একখানি ভিন্নভাষায় পুস্তকে লিখিত আছে Glauy Dyalmo নাম্নী একজন ধর্ম্ম-যাজিকা মসলিন পরিধান করিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি উচ্চ ভণ্ডামীর অপরাধে অভিযুক্তা হইয়া অপদস্থিতা হইয়াছিলেন এদেশের লেখকগণ প্রাচীনকালে তথাকার উচ্চ ও নীচশ্রেণীর এইরূপ বস্ত্র ব্যবহারের নির্লজ্জতার জন্য তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। উলন্দ ঘুরোপীয় প্রাচীন লেখকদের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহাদের মতে "ঢাকার মসলিন মানুষের হাতের তৈরী নহে—উহা পরীদের হাতের কাজ" (১৬৩ পৃঃ)। একদা মসলিন পরিহিতা রাজকুমারী জেবউন্নিসাকে দেখিয়া তাঁহার পিতা আরঙ্গজেব উলঙ্গ মনে করিয়া সংশোধন করতে কুমারী বলিয়াছিলেন, "আমি কাপড়খানি সাতবার ঘুরাইয়া পরিয়াছি" এই সাড়ীখানি ২০ গজ লম্বা ছিল, ইহার ওজন প্রায় ১০ আউন্স (Bernier's Consideration on the Affairs of India, p. 206)। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এইরূপ বস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার সতেরটী মসলিন পরিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। মোগল সম্রাটগণ এই মসলিন বস্ত্রের প্রচার সম্বন্ধে এতটা ঈর্ষান্বিত ছিলেন যে কোন কোন সম্রাট এই বস্ত্র বিদেশে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া আইন প্রচার করিয়াছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে নূরজাহানের রুচি ও ফ্যাশনের প্রতি অত্যধিক অনুরাগের ফলে ভারতবর্ষীয় সমস্ত প্রধান নগরে সসম্ভ্রমে মসলিন বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

১০০০ বৎসর পূর্বে হিন্দু অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নূরজাহানের উৎসাহ।

যখন মসলিনের সৌভাগ্য প্রায় অস্তমিত, তখনও বাঙ্গলার কয়েকজন রাজা বিশেষ

ত্রিপুরেশ্বরগণ এই বস্ত্রের উৎসাহ দিয়া ইহাকে কথঞ্চিত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। "India of Ancient and Middle Ages" নামক পুস্তকে বিলেম ব্যানিং লিখিয়াছেন—ঘাসের উপর বিছানো একখানি সুদীর্ঘ মসলিন এক গাভী ঘাসের সঙ্গে খাইয়া ফেলিয়াছিল; এই জন্য সেই গাভীর বালিক নির্য্যাসন হতে গঠিত হইয়াছিল। ইতিহাস লেখক কাফি খাঁ মোগল রাজ-অন্তঃপুরে মসলিনের আদর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, এই বস্ত্রশিল্প রাজাবাদসাহের কতটা মনোযোগ এবং অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইণ্ডিয়াস সেক্রেটারীর হইতে (১৯০৫ খৃঃ) নিম্নলিখিত বিবরণ শ্রীযুক্ত আবুল আলি সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃঃ)। —১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ঢাকার মসলিন জগতের যত বস্ত্রশিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। অধ্যাপক কুপার এই প্রদর্শনীর বিবরণে এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ভাল মসলিন একটু দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক আয়াসে কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে উৎকৃষ্ট মসলিন "শিশির অশ্রুচিহ্ন" নাম অর্জ্জন করিয়াছিল, তখন উহা এতটা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল যে ঢাকার মাত্র একঘর তাঁতি উহা বয়ন করিতে পারিত। লণ্ডনের শিল্পশালায় একখানি মসলিন রক্ষিত ছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে বিশ গজ ও প্রস্থে এক গজ এবং তাহার ওজন ১½ আউন্স ছিল। Textile Manufactures নামক গ্রন্থে ডা এন্ ওয়াটসন জগতের সমস্ত বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, শুধু গুণে নয় এরূপ সূক্ষ্ম কাপড় যে এতটা টেঁকসই হইতে পারে তাহা ধারণার অতীত। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে একখানি মসলিনের ৬০ পাউণ্ড মূল্য ছিল, আক্‌বরীতেও সময়ে একখানি উৎকৃষ্ট মসলিন (আবরোয়ান) ৫০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মসলিন য়ুরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৮১৭ অব্দে কেবল ঢাকা হইতেই এককোটি আশিলক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানি হইয়াছিল। ভারত-নির্ম্মিত সাধারণ বস্ত্রেও য়ুরোপে যথেষ্ট কাটতি হইত।

১৫ হাত মসলিনের ওজন ৯ তোলা।

"টপোগ্রাফি অব ঢাকা" পুস্তকে লিখিত আছে, ১৬০ হাত লম্বা একখানি মসলিনের ওজন ছিল মাত্র ৯ তোলা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অবনতির সময়ও সোনারগাঁয়ে নির্ম্মিত একখানি ১৫ হাত দীর্ঘ মসলিনের ৯ তোলা মাত্র ওজন ছিল। পূর্ব্বে ঢাকায় ইহা হইতেও অনেক সূক্ষ্ম মসলিন নির্ম্মিত হইত।

ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এই নদনদীর সঙ্গমস্থলে ১২৬০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ডে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত হইত, ইহাদের কেন্দ্রস্থান কাপাশিয়া এখন তাওয়াদের জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। ঢাকা, মুড়াপাড়া, সোনারগাঁ, ডেমরা, বিক্রমপুর, বালিয়াপাড়া, নপাড়া, মৈকুলী, বহরক, চরপাড়া, বাশটেকি, নবিসঙ্গ, সাহাপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে মসলিনের সূতি এখনও তাঁতিরা বয়ন করেন। তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এককালে তাঁহাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা জগৎ জয় করিয়াছিলেন এবং শিরজগতে তাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তীর আসনে সমাসীন ছিলেন।

যেখানে পদ্মা, মেঘনা ও যমেশ্বরী বিরাট্ জলরাশি লইয়া বহিয়া যাইতেছে,—যেখানে নির্ম্মল সৌরকরোজ্জ্বল আকাশ ঐ নদনদীর মতই দিগন্ত প্রসারিত,—যেখানে ডিঙ্গা বাহিয়া যেসেরা তাহাদের অবাধ স্ফূর্ত্তির ছোতক ভাটিয়াল গান গাইয়া আকাশ বাতাস ও জলরাশির সুরে সুর মিশাইয়া থাকে—সেই রাজ্যের তন্তুবায়গণ আকাশ, রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার বর্ণ ধরিয়া রাখিয়া, জলরাশি ও মনের স্বচ্ছতা লইয়া স্রোতের প্রবহমান গতি আয়ত্ত করিয়া বস্ত্রশিল্পের যে বর্ণ, স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা যে "বয়ের স্বপ্ন", "বিজয়চিহ্ন", "পরীগণের লীলা", "সাঝ শিশির", "প্রবহমান নীর", "পদ্মাবলী", "মেঘডুম্বর", "বাতাসের জাল" প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

মসলিন নামের উৎপত্তি ও প্রকারভেদ।

মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতী মহালপত্তন বন্দর হইতে বিদেশীয় বণিকেরা এই বস্ত্র যুরোপে চালান দিতেন। এই মহলিপত্তন হইতে 'মসলিন' নাম বাঙ্গলার কার্পাস বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তুরস্কের সম্রাটেরা বাঙ্গলার এই কার্পাস বস্ত্রের পাগড়ী পরিতেন, এজন্য তথায় ইহার চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে বঙ্গোপসাগরে যাতায়াত কঠিন ও অনিশ্চিত জনক হইয়া উঠে, তখন তুরস্কের রাজধানী কোস্তুল নগরের বস্ত্র শিল্পীরা বঙ্গের বস্ত্র শিল্পের অনুকরণে একরূপ সূক্ষ্মবস্ত্র তৈরী করিতে আরম্ভ করেন। সেই নাম হইতে 'মসলিন' নামের উদ্ভব হয়। আমাদের মনে হয় মহলিপত্তন নাম হইতেই মসলিন নামের উদ্ভব বেশী সম্ভবপর।

মসলিনের নিম্নলিখিত প্রকার ভেদ পরিদৃষ্ট হয়—(১) বুনো—ইহা ঠিক আকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম—ইহা পরিলে কোন কাপড় শরীরে আছে বলিয়াই মনে হইত না। (২) ঝুনা—ইহাও খুব সূক্ষ্ম। (৩) সরকার আলি—নবাব বাদশাহেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন, ইহা যেমনই সূক্ষ্ম তেমনই শক্ত হইত,—শিল্পিদের উৎসাহের জন্য এই বস্ত্রের বয়নকারীদিগকে সরকার হইতে আরশির দেওয়া হইত। (৪) খাসা—ইহাও সূক্ষ্ম ঘন-সন্নিবিষ্ট সূত্রে প্রস্তুত হইত। আইন আকবরিতে ইহা 'কসাক' নামে অভিহিত হইয়াছে। সোনারগাঁয়ে উৎকৃষ্ট খাসা নির্ম্মিত হইত। (৫) সবনম্ (শাব্দ) শিশির নামেই ইহার পরিচয়—শিশিরের মতই ইহা স্বচ্ছ এবং সন্ধ্যার মতই ইহার বর্ণ। (৬) আবরোয়ান (প্রবাহিত জল-স্রোত), ইহা পরিধান করিয়া জেবউন্নিসা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আরঙ্গজেব তাঁহার কন্যাকে উলঙ্গ প্রায় করিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ কুমারী সাত পেঁচ দিয়া কাপড় পরিয়াছিলেন। আবদুল আলি ৭০ পেঁচ দিয়াছেন—ইহা পরিয়াই আততায়ী।

ইহা ছাড়া তাঞ্জেব, সরবন্দ, বদনখাস, আলাবালে, সরবতী, তনজাব, কুমীস, ডুরিয়া, নয়নসুখ, চারখানা, বলবল-খাস ও জামদানি প্রভৃতি বহু প্রকারের মসলিন প্রস্তুত হইত। টেলরের ইণ্ডোএাঙ্গী গ্রন্থে এই সকল বস্ত্রের সূত্র সংখ্যা, ব্যবহার, ওজন, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে

অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে। ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে সঙ্কলন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন (১৫৪—২২৪ পৃঃ)। ঢাকাই মস্‌লিনের যে সকল শ্রেণীর বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার অনেকগুলির আবার সূক্ষ্মভেদ আছে, যথা—জামদানী বস্ত্রের মধ্যে, তোড়াদার, কারেলা, বুটিদার, ডেরহা, জলধার, পাম্রাহাজার, মেল, ডুরিদার, ছালিদার, ছাওয়াল, বাল আর, ডুরিয়া, মেঘা, সাবুরঙ্গা প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঢাকার মোটা কাপড়ের এক সময়ে খুব আদর ছিল, যথা—বাফ্‌তা, খুরি, এক পাট্টা ও জোর, ডামাম, সুতি, কসিদা। মস্‌লিনের ছিটও পূর্ব্বে নানারকমের ছিল যথা—নয়ন সাহী, আনার দানা, কলতুর খোপী, সাকুতা, পাহাদার, কুন্তিদার প্রভৃতি। এই যুগে সেই বস্ত্র আজিকা গিয়াছে, এ দেশের কৌতুক, পারিজাত, চিন্তামণির মতই সেগুলি নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। অবনতির দিনেও ১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকায় ৪৫০০০০৲, সোনার গাঁয়ে ৩৫০০০০৲, ডেমরাতে ২৫০০০০, ভিক্রমপুরে ১৫০০০০৲ টাকার মস্‌লিন প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দেও ঢাকায় ১৪০০, সোনার গাঁ ও ডেমরাতে ৯০০, ভিক্রমপুরে ১০৬০ এবং মুড়াপাড়া, আবহুল্লা পুর প্রভৃতি স্থানে ৭০০—সকল সমেত ৩১৬০ খানি তাঁত ঢাকা জেলায় চলিত। যতীন্দ্রবাবু নবাবী আমলের বস্ত্রের চাহিদা ও বিক্রয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন, ইহার অনেক কথাই টেলরের পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ১৮০০ খৃঃ অব্দের তালিকা এইরূপ —

ঢাকা মস্‌লিনের চাহিদা

"দিল্লীর বাদশাহের জন্য সাদা ও বুটীদার মস্‌লিন ও রেশম খচিত বস্ত্র ১০০০০০৲ (আকবরী মুক্তা), মুর্শিদাবাদ নবাবের জন্য ৫০০০০০, জমরেশের জন্য ১৫০০০০৲, ভূরানীদের জন্য ১০০০০০, পারস্য ব্যবসায়ীদের জন্য ১৫০০০০০৲, রোগল ব্যবসায়ীদের জন্য ১৫০০০০০৲, ইংরেজ কোম্পানী ৩৫০০০০৲, হিন্দু ব্যবসায়ী ২০০০০০৲, ফরাসী ব্যবসায়ী ৫০০০০৲, ওলন্দাজ কোম্পানী ১০০০০০৲ টাকা (১৮৯ পৃঃ)।"

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে ২৮৫০০০০ টাকার বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ৫০০০০০০৲ টাকার বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ১৩৬২১৫৪৲ মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ১৩৮২৬০১৮ ৸/৫ মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

ইংরেজরা অনেক কল-কব্জা করিয়াও ঢাকার এই অপূর্ব্ব বস্ত্র-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন নাই। ওয়াট্‌সন লিখিয়াছেন, "With all our machines and wonderful inventions we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the 'woven air' of Dacca." আমাদের সমস্ত যন্ত্র এবং নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য উপায়গুলি দ্বারাও আমরা এপর্য্যন্ত কি ব্যবহারের পক্ষে উপযোগিতায় কি চারুশিল্প হিসাবে ঢাকার এই "হাওয়ার ইন্দ্রজালে"র সমকক্ষতা করিতে পারি নাই।

যাঁহারা অসাধ্য সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের অসাধারণ কঠোর পরীক্ষা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এই বুঝি বিধাতার নিয়ম। ঢাকার এই বিরাট ও স্নেহ শিল্পটি কিভাবে বিলোপ প্রাপ্ত হইল সেই করুণ ইতিহাস না বলাই ভাল। মুসলমান রাজত্বের শেষদিক্ হইতে এই তন্তুবায়গণ যত বিড়ম্বনা সহিয়াছে, তাহা সাধনার শাস্তি, প্রতিভার প্রায়শ্চিত্ত। দালাল-দিগের হাতে তন্তুবায়গণ লাঞ্ছনার একশেষ সহ্য করিয়াছে, হস্তভাঙ্গাগণ বন্দীশালায় আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপর যে সকল জুলুম হইয়াছে, তাহাতে তাহারা প্রাণপণ করিয়াও পারিশ্রমিকের ভাগ নামাজনকে দিয়া তাহাদের হাতে একরূপ কিছুই রাখিতে পারিত না। যত দুঃখে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যবসাটি কাঁদিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল—সে সকল দুঃখের কথা William Bolts (১৭৭২ খৃঃ) তাঁহার Considerations of Indian Affairs নামক গ্রন্থে, Mill তাঁহার History of British India Sir George Birdwood তদীয় Report on the Old Records of the India Office-এ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় এই কারবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড তদ্দেশজাত বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে ঢাকার মসলিন ইংলণ্ডে বিক্রয় নিষেধ করিয়া আইন পাস করেন।

কারবারীদের কষ্ট ও কারবার ধ্বংস।

মলমল, আবরোয়া, ঝুনা, তারেন্দাম, ডোরিয়া, জামদানি, ডুরিয়া ও খাসা এই আট প্রকার মসলিনের উপর নিষেধবিধি জারি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই ১৭৮৭ খৃঃ। ব্যক্কেটারের সময়ে-ঢাকা শিল্পের রক্ষার জন্য মসলিনের উপর শতকরা ৭৫ টাকা শুল্ক ধার্য্য হয়, বেড়াজালে পড়িয়া এই শিল্প নষ্ট হইয়াছে।

কিরূপে মসলিন তৈরী হইত টেলর সাহেব তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৭, শ্রাবণ প্রবাসী পত্রিকায় কোন স্থানক ব্যক্তির সাহায্য লইয়া মসলিন কল সম্বন্ধে যে উনাটী অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন ইয়োরোপের প্রস্তুত নকল মসলিনের সূতায় প্রত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে ৬৮০৮ এবং ৫৬০৩ পাক দেওয়া হয়, তৎস্থলে ঐ পরিমিত ঢাকা মসলিনের সূতায় গড়ে ১১০০১ এবং ৮০০৭টি পাক দেওয়া হইত। হাতে কাটা সূতা ও কলের সূতার পার্থক্য অনেক। কলে কাটা সূতা তাদৃশ মজবুত হয় না, কাপড় পরিষার অযোগ্য হয়, অত সূক্ষ্ম কাপড় ধোপে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু হাতে কাটা সূতার মসলিন ধোয়াইলে তাহার চাকচক্য বাড়ে, আরও বেশী টেঁকসই হয় এবং ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ।

মসলিনের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য।

সাধারণতঃ যে সকল উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরী হইত, তাহার সূতা ১০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক মেয়েরা প্রস্তুত করিত বস্ত্রবয়নকারীরা যে যন্ত্রের সাহায্যে মসলিন তৈরী করে তাহাতে জটিলতা কিছুই নাই। তাহা অতি আদিম প্রণালীতে কয়েকখানি কাঠ, দড়ি ও কয়েকটি আংটি দ্বারা প্রস্তুত। এই উপায়ে মসলিনের মত উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাহারা কিরূপে নির্ম্মাণ করিত,

তাহা য়ুরোপীয় শিল্প-সমালোচকদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। কেদারবাবু লিখিয়াছেন, "ঢাকার তাঁতিদের দেহের গড়ন ছিপ ছিপে ও কোমল তাহাদের দৈহিক শক্তি ও উদ্যমের কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহারা সূক্ষ্মস্পর্শজ্ঞান ও ওজন সম্পর্কে সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন, শুধু তাহাই নহে, দেহপেশীর পরিচালনে তাহাদের যে অসামান্য ক্ষমতা আছে, তাহার ফলে হাতের আঙুলের সঙ্গে পায়ের আঙুল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক অর্থে ইতালের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলিয়াছেন যে ইতালি যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, ঐ সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা ইয়ুরোপীয় তাঁতিরা তাহাদের পক্ষ ও মূল অঙ্গুলির সাহায্যে মোটা চট্ট তৈরী করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয়। ঢাকার তাঁতিরা সূতা দেখিবামাত্র তাহার সূক্ষ্মতা ঠিক করিতে পারে, নলের মধ্যে কতটা সূতা থাকানো আছে তাহা ঠিক করিবার তাহাদের কোন চৌম্বকও নাই। সূতার শেষ চোখ চাহিয়াই ঠিক করে এবং তৈরী ঠিক করিতে হইলে খানিকটা খোলাজমিতে কিছু দূরে দূরে কাঠি পুঁতিয়া তাহাতে সূতা মেলিয়া দিয়া স্থির করে। সূতা মাপিতে এক হাত দুই হাত করিয়া গণনা করে এবং রতি দিয়া ওজন করে। এক রতির ওজন প্রায় দুই গ্রেন। পূর্বকালে যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে মসলিন পাঠান হইত, তখন সেই মসলিনের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ছিল ১৫০ হাত, ওজন এক রতি কিন্তু সময় সময় কম বেশী হইয়া ১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্য্যন্ত হইত। টানায় ১৪০ হাত এবং পড়েনে ১১০ হাত সূতা আবশ্যক হইত" (প্রবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবণ)

বিদেশে শিল্পীদের সমাধিস্থান

সূতা প্রস্তুত করিবার প্রণালীও অতি সূক্ষ্ম শিল্পকলার পরিচায়ক। বেশী গরমে সূক্ষ্ম সূতা হইতে পারিত না কাটুনীরা প্রাতঃ হইতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে সূতা কাটিত। কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট সূতা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে কাটা হয় যদি গরম বেশী হয়, তবে একটা আধারে জল রাখিয়া তাহার উপর সূতা কাটা হইত জলের স্বাভাবিক বাষ্প গরমের সময় সূতা কাটার অনুকূল।

সূক্ষ্ম মসলিন ধোওয়াও নানারূপ উপায়ে সম্পাদিত হয়—পাটে আছড়াইলে ইহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রথমে কাপড়খানি ঈষৎ উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পরে সাজিমাটি ও সাবানের জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয় তারপর এক নবদূর্বাদল যুক্ত খোলা-স্থানে উত্তপ্ত রৌদ্রে করে শুকাইতে হয়। আধা শুকনো হইলে মসলিন পুনরায় জলে সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বশেষ নেবুর রসযুক্ত খুব পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিতে হয়। যে সকল কাপড়ের সূতা ব্যবহারের ফলে এদিক সেদিক সরিয়া গিয়াছে তাহা সোজা করিবার প্রথাকে ঢাকার লোক 'কাঁটা করা' বলে। উহা ঢাকায় নদিয়া নামক এক শ্রেণীর লোকেরাই জানে ঢাকা ছাড়া অন্যত্র ঢাকার মসলিন তেমন সুন্দর করিয়া কেহ বোনিতে পারে না, কারণ অন্য কোন স্থানে এই 'কাঁটা করা'র রীতি পরিচিত নহে।

ঢাকার বিণুকরেরা বস্‌লিনের যে কারুকার্য্যগুলি এমন সুন্দরভাবে বেকাবদ্ধ করিতে পারে যে তাহাতে বিণুর চিহ্নমাত্র থাকে না। টেলর সাহেব লিখিয়াছেন ঢাকার বিণুকরীরা অধিকেন খাইয়া বিণু করিতে বসে, তাহাতে নাকি তাহাদের কাজের নেশা বাড়িয়া যায় এবং বিণু উৎকৃষ্ট হয়। (Topography of Dacca, p. 176)।

আফিঙ্গের কারণে বিণুকর বধ

সূতা কাটার দুই প্রধান যন্ত্র চরকা ও তলন কাঠি। খুব ভাল বস্‌লিনের সূতা তলন কাঠি দিয়া তৈরী করিতে হয়। দেখিতে লৈখা একটি হাতের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র গোলাকৃতি মৃত্তিকা রাখিয়া দেওয়া হয়, উহাকে "তলন কাঠি" বলে। টেকো চালাইবার সময় হাত ঘামে পিছিলে বাঁশের গুড়া দিয়া হাত শুকাইয়া লইতে হয়। তলন কাঠির সাহায্যে দুই আঙ্গুলে টেকো ঘুরাইতে বেশ ভার বোধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু সূতা ও কাপড়ের প্রস্তুত-প্রণালী স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার একটা পরিষ্কার ধারণা করা অসম্ভব।

তলন কাঠি ও টেকো।

ঢাকার বস্‌লিন বহু প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই ইহার খ্যাতি জগন্ময় প্রচারিত হইয়াছিল। মুসলমান যুগের পরেও ইংরেজের উদয় সময়ে দিল্লীর উজীরেরা উক্ত কার্য্যটীর বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরগণ ময়ূরসিংহাসনে বসিতেন, তাজমহলের কারু করিতেন, বস্‌লিন পরিতেন এবং যমুনার নীলসলিলে ভেসমানী খানের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেন, এই যুগে ইহাদের কোনটীর মতই কিছু হয় নাই।

ঢাকার বস্‌লিন সম্বন্ধে ১৮৭০ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'শিল্পিক দর্শন' নামক পুস্তকে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ঢাকাই বস্ত্র সকলেরই প্রিয়; অথচ হিন্দুদিগের শিল্পকৌশলপূর্ণ বিষয়ে এই অনুপম বস্ত্র এক মহতী ঘটনা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল দেশীয় তন্তুবায়েরা ইহার তুল্য বস্ত্রবয়নে যত্নশালী হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি কেহই সফল হয় নাই। ঢাকাই বস্ত্র হংসরোমাদি সাধারণ বস্ত্রে প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সাধারণ বস্ত্র ও তন্তুবায়কুলের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে বিলাতের অধিষ্ঠাতৃ শিল্পকুশল ব্যক্তিরা বহুমূল্য বাষ্পীয় যন্ত্রসহকারেও তাদৃশ সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করণে পরাস্ত হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অনুপম বস্ত্র প্রাচীন রোম রাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগের শিল্প-সাফল্যের অনির্ব্বচনীয় প্রমাণ স্বরূপ গণ্য ছিল, এবং অদ্যুনা ইংলণ্ডদেশের তন্তুবায়দিগের ভিতরায় স্বরূপ জনসমাজে বিখ্যাত আছে। জনৈক য়ুরোপীয় শিল্পজ্ঞ ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন যে 'বোধহয় ইহা বিদ্যাধরী ও অপ্সরারা বয়ন করিয়াছে; এতাদৃশ সূক্ষ্মবস্ত্র মনুষ্যের মূল হতে সম্ভবে না।' বস্তুতঃ এই প্রশংসা অপ্রযোজ্য নহে।

"ঢাকা প্রদেশের সর্ব্বত্র এই উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয়, পরন্তু পশ্চাৎ লিখিত নগর সকল ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থল; তন্মধ্যে ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, ডুমরা, ভিক্রমপুরী, জঙ্গলবাড়ী ও মেঘনাপুর। এই সকল নগরী মধ্যে ঢাকা সর্ব্বোতোভাবে সুপ্রসিদ্ধ। এতদ্দেশীয় বস্ত্রার্থে

পূর্বকালে পৃথিবীর সকল সুসভ্যদেশ হইতে বণিকবর্গ ঐ স্থানে আগমন করিত। অধুনা অল্পমূল্যের বিলাতি বস্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহুমূল্য ঢাকাই বস্ত্রের প্রতি জনগণের তাদৃশ অনুরাগ না থাকা নাই, তথাপি ঐ নগর নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই। অদ্যাপি তথায় নানাবিধ ব্যবসায়ীদিগের সমাগম হইয়া থাকে।

"বস্ত্রবয়নের প্রথম ক্রিয়া সূত্র প্রস্তুত করণ। এই কর্ম এদেশীয় পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকদিগকে সাধারণ লোক কাটনী বা 'সূতা কাটনী' বলিয়া থাকে। এই কাটনীদিগের অঙ্গুলির অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তদ্দ্বারা উহারা সূত্রের সম্বন্ধে—তারতম্য যে প্রকার উত্তমরূপে করিতে পারে পৃথিবী মধ্যে এরূপ আর কুত্রাপি কোন জাতীয়েরা পারে না। অল্পবয়স্কা স্ত্রীরা সর্বোৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। বয়ঃক্রম ত্রিশৎ বৎসর অতীত হইলে তাহাদিগের নয়ন ও অঙ্গুলির তৎকর্মে অপটু হয়, সুতরাং তাহারা আর তত উত্তম সূত্র প্রস্তুত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্বাহ্নে বেলা ১০ ঘটিকা পর্যন্ত ও অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার পর সূত্র কাটিবার সময় এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে বিশেষতঃ রৌদ্র প্রখর থাকিলে, উত্তম সূত্র প্রস্তুত হয় না। 'মলমলখাস' নামক সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র বুনিবার সূত্র অতি প্রত্যূষে কাটিতে হয়, এবং যদপি সেই সময় কাটনীর চতুর্দ্দিগ্‌স্থ স্থানে নিশির না থাকে, তবে এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তদুপরি সূত্র কাটিবার প্রয়োজন হয়, নচেৎ সূত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে যে সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা উর্ণনাভের সূত্র হইতেও সূক্ষ্ম। ইহার ১৭৫ হস্ত সূত্রের পরিমাণ এক রতি মাত্র। কলতঃ ইহার একসের পরিমাণ সূত্র বিস্তার করিলে প্রায় ৪০০ ক্রোশিমীল ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হয়!!! অপিচ এই অদৃষ্ট সূত্র যাদৃশ সূক্ষ্ম ইহা প্রস্তুত করণের শ্রমও তৎপরিমাণে বহুল। দুইমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক তোলক পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত হয়, সুতরাং ইহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক। একসের সর্বোৎকৃষ্ট সূত্র ৬৪০ টাকার ন্যূনে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সূত্র প্রস্তুত হইলে 'কেটী' বা 'নুটীর' আকারে রাখিতে হয়। পরে তন্তুবায়েরা ঐ কেটী বা নুটী জলে ভিজাইয়া উহা বংশনির্ম্মিত এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া ঐ সূত্রকে দুই অংশে পৃথক্ করে, যাহা উত্তম তাহা 'টানার' (বস্ত্রের লম্বসূত্র) নিমিত্তে ব্যবহার হয়, এবং অবশিষ্ট 'পড়েনের' (বস্ত্রের প্রস্থসূত্র) উপযোগ্য। সূত্র ঐ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ হইলে টানার সূত্র তিন দিবস নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। চতুর্থ দিবসে উহা হইতে নির্গলিত করত ঐসূত্র এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। অনন্তর তাহা অঙ্গারচূর্ণ মিশ্রিত জলে পুনরায় ভিজাইতে হয়। অঙ্গারচূর্ণের পরিবর্ত্তে ভূষা অর্থাৎ পাক-পাত্রের তলস্থিত অঙ্গারবৎ পদার্থও ব্যবহৃত হয়। দুই দিবস এই জলে রাখিয়া ঐ সূত্রকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করা হয়। অতঃপর ঐ সূত্র পুনরায় এক রাত্রিকাল পরিষ্কার জলে ভিজান থাকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। ঢাকা অঞ্চলে চৈনের ঘড়ের ব্যবহার আছে এবং উহা সূত্রোপরি লিপ্ত করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ধুনা মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে টানার সূত্র প্রস্তুত হইলে তাহাকে

'উত্তম' 'মধ্যম' ও 'অধম' সূত্র যথাভাগে ব্যবহার করিয়া থাকে, সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়ন কালেও এই নিয়মের অন্যথা করে না 'পড়েন' প্রস্তুত করণে পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম নাই। তাহাকে একরাত্রি কাল জলে ভিজাইয়া তৎপর দিবস প্রাতে মণ্ডে লিপ্ত করিতে হয়, পরন্তু টানার সূত্র এককালে প্রস্তুত করিতে হয় পড়েনের সূত্র প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হয় এককালে এক খানের ব্যবহারোপযোগী সূত্র প্রস্তুত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

"পূর্ব্ব প্রকারে সূত্র প্রস্তুত হইলে বোনিয়ে বয়নকর্ম্ম আরম্ভ হয়, কিন্তু তান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহার বিস্তারিত বিবরণে অধুনা নিরস্ত থাকিতে হইল, 'মলমলখাস' বস্ত্রবপনের উত্তম সময় আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে তৎকর্ম্ম করিতে হইলে তাঁইকের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্রম করত তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়। ঢাকা প্রদেশে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে মলমলখাস, সরকার আলি, নয়না, রঙ্গ, আবরওয়া, খাসা, অবলম্ব, আলাবালী তন্জেব, তরঙ্গম, সরবন্দ, সরবতী, কোমিস, ডোরিয়া, চারখানা এবং জামদানী—এই কয়েক প্রকার বস্ত্র সর্ব্বপ্রসিদ্ধ

"মলমলখাস মুসলমান রাজাদিগের অতিশয় সমাদর রাজপরিবারেরা ব্যবহার করিত। তৎপ্রযুক্ত ইহা 'খাস' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে ইহার টানায় ১৮০০ সূত্র থাকে এবং এক অঙ্গ আবি, খানের পরিমাণ ৮ তোলা ০ আনা মাত্র।। ঐ খান অনায়াসে এক অঙ্গুরীয় মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে ইহা বপনে ছয়মাস কাল ব্যয় হয় এবং ইহার মূল্য ১০০,১৫০৲ টাকা।

"সরকার আলি পূর্ব্বাপেক্ষায় মধ্যম। রাজপ্রতিনিধিরা ইহা ব্যবহার করিত এবং ইহার টানায় ১২০০ সূত্র থাকে। 'নয়না' বস্ত্র এমত অস্বচ্ছ সূক্ষ্ম যে ইহা পরিধান করিলে শরীরোপরি বস্ত্র আছে এমন বোধ হয় না। ইহার তুলনায় 'শাল' নামে প্রসিদ্ধ বস্ত্রও অতি স্থূল জ্ঞান হয়। ইহার দুই হস্ত প্রশস্ত বস্ত্রে ২০০০ টানার সূত্র থাকে মুসলমান রাজমহিষীরা ও নর্ত্তকীরা এই বস্ত্র ব্যবহার করে। অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে এই বস্ত্রের ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষেধ আছে। তারণিহাত সাহেব লেখেন যে মুসলমান রাজাদিগের আজ্ঞাক্রমে কোন বণিক্ এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্থানান্তর করিতে পারিত না। 'রঙ্গ' বস্ত্র পূর্ব্ববৎ, কেবল বপনের প্রণালী স্বতন্ত্র ইহার টানায় ১২০০ সূত্র মাত্র থাকে। 'আবরওয়া' অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র ইহার তুল্য স্বচ্ছ বস্ত্র আর কৃত্রাপি হয় নাই। ইহার টানায় ৭০০ সূত্র মাত্র থাকে যবনেরা ইহার স্বচ্ছতা প্রযুক্ত প্রবাহজলের তুল্য জ্ঞান করিয়া ইহাকে 'আব' (বারি), 'রওয়া' গতিবিশিষ্ট। উপাধি দিয়াছেন। এই বস্ত্রোদ্দেশে কথিত আছে যে কোন সময় আরঙ্গজেব বাদশাহ স্বতনয়ার বর্ণ তাহার বস্ত্র ভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করাতে সে কহিয়াছিল, "পিতঃ, সপ্তস্তর বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, তথাপি কেন তিরস্কার করেন?" 'খাসা' বা 'জঙ্গল খাসা' পূর্ব্বে সোনারগাঁয়ে প্রস্তুত হইত। ইহা অন্যান্য মলমল অপেক্ষা ঘন এবং অধিক প্রশস্ত। ৩ হস্ত প্রশস্ত খাসা অপ্রাপ্য নহে। 'শবনম,' এই মলমল অতি মনোহর। ইহা রজনীযোগে

তুঁতের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে শিশির দ্বারা সিক্ত হইয়া পর প্রাতে অনুক্ত হয়; ক্রমাগত যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির শুষ্ক হইলে তাহা পুনরায় দূরীভূত হয়। সর্ব্বোত্তম শয়নের টানায় ৭০০ সূত্র থাকে।"

রেশম

বঙ্গদেশে রেশমের কীট-উৎপাদকদিগের নাম তুঁতচাষী। তুঁতপত্রের জন্য সাধারণতঃ ১০ বিঘা জমির প্রয়োজন। তুঁত চারি প্রকার, ১ম নারু,—পত্রবৃহৎ ও ফল কালো বর্ণ হয়, ২য় ডোরা—পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট—হুগলী ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ইহা বেশী জন্মে, ৩য় দেশী; ৪র্থ চীনি।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চারি প্রকারের কীট দ্বারা রেশম প্রস্তুত হইত ১ম বড়—ইহাতে বৎসরে একবার মাত্র রেশম জন্মে ২য় দেশী বৎসরে ইহা হইতে পাঁচবার রেশম হয়। ৩য় চীনি (অপর নাম মাদ্রাজী) বৎসরে ছয় সাতবার রেশম হয়, ৪র্থ বর্ণসঙ্কর দেশী ও চীনি কীটের মিশ্রণে জন্ম ইহাতে উত্তম রেশম হয় না।

রেশমের কীটকে তুঁতচাষীরা সাধারণতঃ "পুলো," "পোকা" বা "পোক" বলে। দেশী কীটের ডিম বসন্তকালে ১০ দিনে, বৈশাখে ৮ দিনে আষাঢ় মাসে ৭ দিনে ও শরৎকালে প্রায় ছই মাস পরে ফুটিয়া থাকে। বড় কীটের ডিম ফাল্গুনের শেষে জন্মে এবং একমাস পরে অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথমে কীটাবস্থার পরিণত হয় ফাল্গুনের শেষে ৪০টি পুংকীট ও ৪০টি স্ত্রীকীট জন্ম হইলে ২৫ ঘণ্টার মধ্যে ১২৮০০ (১০ কাহন) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি প্রথম শীতাঙ্গ তারপর মেটে পাথরের বর্ণ হয়। নব জাত কীটদিগকে চাষীরা প্রত্যহ চারবার নূতন তুঁতের পাতা খাইতে দেয়। চারিদিন তুঁতের পাতা খাইয়া কীটগুলি ঘুমাইয়া পড়ে। এই ঘুমকে চাষারা "আলাতে ঘুম" বলে। এই ঘুম দুইদিন পর্য্যন্ত থাকে, ঘুম ভাঙ্গিলে কীটের চর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ চর্ম্ম হয় এবং এই অবস্থায় তাহারা পুনরায় তুঁত খাইতে থাকে। এই খাওয়া ও তৎপরবর্ত্তী অপরিহার্য্য ঘুম—এই প্রক্রিয়া ৪ বার হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে ২বার পরিবর্ত্তন করিয়া কীট ৩½ অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ হয়, এইবার পুনরায় ইহাদিগকে ১০ দিন তুঁত খাইতে দেওয়া হয়—তারপর তাহারা আর কিছু খাইতে চাহে না। এই সময় একটা ডালা হইতে তাহাদিগকে ধরিয়া দিয়া প্রস্তুত ২৸০ হাত প্রস্থ এবং ৩৸০ হাত দীর্ঘ অপর একটা আধারে রাখা হয়। এই আধারের নাম ফিংএ। ফিংএর উপরে ছই অঙ্গুলী গভীর তিন অঙ্গুলী প্রস্থ সরু বাঁশের খোপ সকল নির্ম্মিত থাকে, চাষীরা ঐ খোপে এক একটি কীট রাখিয়া দেয়। তখন কীটগুলি তাহাদের মুখ হইতে এক প্রকার সূত্র বাহির করিয়া স্বীয় দেহ আবৃত করে ক্রমাগত ৫৬ ঘণ্টা সূত্র প্রস্তুত করার পর কীটেরা নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। এই গুটি প্রস্তুত হওয়ার ৪।৫ দিন পরে চাষীরা

ঘটি রঙের কীট গোত্রের উদ্ভাপে অথবা "তুঁতুর" নামে পৃথে রাখিয়া নিহত করে, তৎপরে গুটিগুলি তপ্ত জলে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে সূত্র প্রস্তুত হয়।

এখনও বহরমপুর রাঙ্গলার রেশমী বস্ত্রের গৌরব কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, "রেশম" ফার্সি শব্দ। আমাদের দেশে এইরূপ বস্ত্রের নাম ছিল 'কৌষেয়' 'ক্ষৌম,' 'পট্ট'। রামায়ণে সীতার পীত কৌষেয় বাসের উল্লেখ আছে। মহাভারতে সভা পর্বে দৃষ্ট হয়, হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বস্থ শক জাতীয় রাজারা যুধিষ্ঠিরকে "কীটজ বস্ত্র" উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে চীন দেশের রেশমী বস্ত্রের অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রঘের পতাকা পর্য্যন্ত চীনা বস্ত্রে প্রস্তুত হইত। এ সম্বন্ধে কালিদাসের সুপরিচিত "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানম্" সহজেই মনে পড়িবে।

চীন সম্রাট হোয়াঙ্গ টি (Hoang Ti) কংশোহের রাজা চীনসং (Chin Nong) ২৮০০ খৃঃ পূর্ব্বে রেশমী বস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ২৬৬২ খৃঃ পূর্ব্বে চীন সম্রাট হোয়াঙ্গটি (Hoang Ti), তাঁহার পাটরাণী সিলিং চিকে (Si Ling Chi) রেশমী সূতার উৎকর্ষ সাধনের ভার প্রদান করেন। এ বিষয়ে রাজ্ঞীর কৃতিত্ব এত বেশী হইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে রেশমের দেবতা বলিয়া জানিত।

Economics of Silk Industry নামক পুস্তকের লেখক আর সি রওয়ালি (R. C. Rawaley) প্রমুখ রেশমতত্ত্ব পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের রেশম—এই রেশম, উহাকে অন্য কোন স্থান হইতে আনিতে হয় নাই। শুধু রামায়ণ মহাভারতে নহে, পৃথিবীর আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে। মনু বহু স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, (পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক, নবম অধ্যায় ১৬৮ শ্লোক, দ্বাদশ অধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)। বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতে এই বস্ত্রের যে যে নাম পাওয়া যায়, ঊর্ণ, কৌষেয়, কীটজ, ক্ষৌম, তাহাদের কোনটিরই চীন দেশের রেশমী বস্ত্রের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য নাই। সে সকল নাম ভারতবর্ষের নিজস্ব, এবং এই বস্ত্রের উল্লেখ যখন হইতে অন্তিত্বের বহু পূর্ব্ব হইতে। চীনদেশীয় বস্ত্রের আদিকাল হইতে প্রাচীনতর সময়ের, ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে—তখন এই দেশের বস্ত্র এদেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, R. C. Rawaley's Economics (Silk Industry, p. 3);

ইয়ুরোপে এই বস্ত্র দুর্লভ ছিল। রোমের রাজারা এই বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন, কিন্তু ইহা এত দুষ্প্রাপ্য ছিল যে রাজারাও ইহা পরিতে পাইতেন না। সম্রাট্ আরিলিয়ানের পত্নী একটা অঙ্গরক্ষা এই বস্ত্রে বানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট্ বহুমূল্য বলিয়া তাহা রাজ্ঞীকে দিতে সম্মত হন নাই। ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে রোম সম্রাট্ হেলিওগেবলস রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া অকেন্দ্রের রাজপুত্রা তাঁহাকে অপবিত্রিত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। খৃঃ অব্দের অব্দ সময় পরেই ইয়ুরোপে ভারতীয় রেশমেরই পরিচয় হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন লেখকদিগকে কল্পনাপ্রিয় ও ইতিহাস-জ্ঞান-শূন্য বলিয়া নিন্দা করিতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে বাস্তবক্ষেত্রেও কোন অংশে হীন নহেন, য়ুরোপীয় প্রাচীন লেখকগণই তাঁহাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর ডমনাস লিখিয়াছেন, শুদ্ধ তুঁত খাওয়াইয়া একটা গুটীপোকাকে যতদিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহার পর তাহার বাচ্চা হইলেও তাহাদেরও তুঁত খাওয়াইয়া শেষে মারিয়া ফেলা হয়। ঐ বাচ্চাদের মধ্যে একটা পাত্রে রাখিয়া দিলে তাহা পচিয়া যায় এবং তন্মধ্যে রেশমী কীট দেখা দেয়,—সেই কীটের গর্ভে ভারতীয় কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে গৃহে এইভাবে কীটের ক্রমবিকাশ হয় তাহার নাম "খানক", ইহার পরিমাণ ১০ হাত দীর্ঘ, ১০ হাত প্রস্থ, ৯ হাত উচ্চ। এই গৃহে পর পর পাঁচটি মাচান থাকে, প্রত্যেক মাচানে ১৬টি ডালা—উহার পরিমাণ ১৯ হাত দীর্ঘ, ও ২৯ হাত প্রস্থ, এক একটি ডালায় ৩২০০ কীট রক্ষিত হয়। সুতরাং সকলগুলি ডালাতে ২,৫৬,০০০ কীট পালিত হইতে পারে। এই গৃহে একবারে তিন বার, তিন সের রেশম প্রস্তুত হয়—তাহা ছাড়া আরও কিছু অল্পমূল্যের রেশম পাওয়া যায়—তাহাকে "ওড়া রেশম" বলে।

রেশম সৌত করিয়া মাতা খসা করিতে হয়। তাহাতে প্রতি সেরে এক পাঁচ পরিমাণে রেশম নষ্ট হয়। চীনি গুটীতে এক রতি পরিমাণ রেশম কমে এবং ঐ রেশম প্রায় ৮০০ হাত দীর্ঘ হয়। ঐ রেশমের যদি তোলায় এক কোড়া উত্তম গরদ প্রস্তুত হইয়া থাকে এই পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পাঁচ হাজার সাতশো ষাট (৫৭৬০) গুটীর সূত্র দরকার।

এ সম্বন্ধে ৯০ বৎসর পূর্বে এক বিখ্যাতনামা বাঙ্গালী পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, "৫৭৬০ জীবের প্রাণ নষ্ট না করিলে এক কোড়া গরদের বস্ত্র পরিধান করা অসাধ্য। অধুনা যাঁহারা অবিরত বৈধ হিংসার নিন্দা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য যে তসর, গরদ, চেলি, সাটিন ও মকমল ইত্যাদি কীটজ বস্ত্র তাঁহারা কি বিবেচনায় ব্যবহার করেন? তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে বিংশতি বৎসর প্রত্যহ ছাগমাংস ভক্ষণে যত সংখ্যক জীবহত্যা ঘটে, এক কোড়া গরদের বস্ত্রার্থ তদপেক্ষা অধিক নহে? সম্ভাবনা, কারণ উক্ত বস্ত্রের প্রত্যেক গজ-পরিমিত পদার্থ প্রস্তুতকরণে সহস্রাধিক জীবের প্রাণহানি হয়। ১২৪১ বঙ্গাব্দে ১৮৪১ খৃঃ ১৬,১১৮।০ মণ রেশম ও ১৯, ৮৪১ খান কোড় আর ১,৫৮,৭৮৩ খান রেশম মিশ্রিত কাপাস বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশে যে রেশমের বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল তৎসমুদয় প্রস্তুতকরণার্থে ১,০০,০০০ মণ রেশমের আবশ্যক, এবং এই রেশম উৎপন্ন করণার্থ প্রতিবর্ষে অন্যূনতঃ ৮,৯৯ ৫২,০৩,০৫২ জীবহত্যা হইয়া থাকে। বৈধহিংসাদ্বেষী মহাশয়েরা কৌষেয় বস্ত্র ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত সংখ্যক জীবের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে।" (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২য় পর্ব্ব, ২৫ পৃঃ।)

নৈতিক ও অন্যান্য অঙ্গের এই গূঢ় প্রশ্ন সমাধানের আমাদের অবকাশ নাই কিন্তু উপরে যে সংখ্যাদ্বয় অঙ্ক কষিয়া দেওয়া হইল তাহা দ্বারা ১২ বৎসর পূর্বে ইংরেজ রাজত্বের প্রাকালে

আমোদের বেশম, শালবাফীদের যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার কথা স্বতঃই মনে হইবে। আমরা মোগল রাজত্ব পর্যন্ত এই ইতিহাসের পাঁড়ি টানিয়াছি সুতরাং পরবর্তী সময়ের বঙ্গের বাণিজ্য-সম্পর্কে বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্র উদ্ঘাটন করা আমাদের বিষয়-বহির্ভূত। এখন সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে বেশম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, তাহার একটা তালিকা আমার টেবিলের উপর আছে এই তালিকা হইতে শুধু বঙ্গদেশের অংশটা কতক পরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বেশম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল ১৮৮৭-৮৮ অব্দে যে চালান যায় তাহার মূল্য শুধু ৮০ লক্ষ টাকা ১৮৯১-৯২ অব্দে রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছিল, উহার মূল্য ৬৭১২০০০ টাকা ইহা সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাব

বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, বঙ্গদেশে বহু পূর্বে আর্য-নিবাস হইয়াছিল এবং অধিবাসীরা বেদোক্ত যজ্ঞ পালন করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, আসামের পাহাড়ে এখনও বৈদিকধর্ম-পালনকারী এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ঠিক বৈদিক ঋষিদের যজ্ঞের অনুকরণ যজ্ঞ-কুণ্ড করিয়া বৈদিক অনুষ্ঠান করেন।

পরবর্তী বৈদিক এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার পরে এবং এদেশের জনসাধারণ স্বভাবতঃই সপ্ত বধ বিরোধী হওয়াতে বৈদিকধর্ম এদেশে ততটা প্রচলিত হইতে পারে নাই মহাকাব্যের উদাহরণ প্রসঙ্গে পঞ্চানন লিখিয়াছেন, "লোকেশ্বর আক্ষালবর্তি -- প্রাগঞ্জ গ্রামেজো ব্রাহ্মণা আনীয়তামিতি।" এই লোকেশ্বর গুরুকল্প ব্রাহ্মণ রাজা পুণ্ড্রমিত্র তিনি বৌদ্ধ প্রভাবে পূর্বদেশে বৈদিকাচার বিবর্জিত দেখিয়া তথায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, উহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা।

কিন্তু নিম্নস্তরে যদিও বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম বিশেষ করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি খৃষ্টীয় প্রথম দিকার কয়েক শতাব্দীতে এদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোন কালেই অভাব হয় নাই তাম্রলিপিতে ইহার বহুল প্রমাণ পাই ধামোইরপুরের দিনাজপুর পাঁচখানি তাম্রশাসনে পাই যে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে এদেশে ব্রাহ্মণগণ "অগ্নিহোত্র" ও "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" সম্পাদন করিতেন, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত কোটিবর্ষে এই সকল বৈদিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত ফরিদপুর জেলার তিনখানি তাম্রশাসনে জানা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশের "বাঙ্গক মণ্ডলে" যজুর্বেদের বাজসনেয় শাখাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। ত্রিপুরার তাম্রশাসনে পাই যে প্রদোষ শর্মা নামক জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ চারিবেদে অভিজ্ঞ পঞ্চাধিক ব্রাহ্মণকে তদ্দেশে উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন বেলাবের রাজকীয় পুথিশালায় চন্দ্রকুল-বিরচিত হরিচরিতের কাব্যের পুষ্পিকায় পাই যে, পালবংশীয় বর্ণপালের রাজত্বকালে

বরেন্দ্রভূমিতে শতাধিক ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে লিখিত দিনাজপুরের গুরবমিশ্রের প্রকড়গুস্তম্ভে দুই হয় উক্ত মিশ্রের পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে বেদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কেদার মিশ্র বাল্যকালেই "চতুর্ব্বেদপারোনিধি" পদ লাভ করিয়া বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যে প্রভূতব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ দেবপালের মন্ত্রী ভট্টপাণি "বেদচতুষ্টয়রূপ মুখপদ্মলক্ষণাক্রান্ত" ছিলেন দেবপাল দেবের সমসাময়িক "ছন্দোগসর্ব্বানুক্রমণিপ্রকাশ" গ্রন্থকর্ত্তা নারায়ণেরও অনেক বেদজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম শতকে মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা ভূতি বর্ম্মার সময়ে তাম্রশাসন কামরূপে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপের ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে বেদের বিভিন্ন শাখাবলম্বী ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম আছে। ইহা ছাড়া এদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন যুগের বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিষয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার লিখিত ষড়ঙ্গপাদ সাধনা-লেখমালার অন্তর্গত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সেই প্রবন্ধটি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। বৈদিক এর বেদযুগে এদেশে যাদৃশ আদৃত হয় নাই, এই জন্য যাহা কিছু ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তথাপি ভবদত্ত, হলায়ুধ, রামনাথ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েক জন বৈদিক গ্রন্থকর্ত্তার নাম ও তাঁহাদের গ্রন্থের বিষয় পণ্ডিত দুর্গানাথ উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ বেদ রাহ্মণের পূজা পশুবলি ও বৈদিক যজ্ঞাদির বিরোধী ছিল এই জন্য বঙ্গের বাহিরের লোকেরা এই দেশ বেদ-বহিষ্কৃত, ব্রাহ্মণহীন বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে কোন কালেই পণ্ডিতের অভাব হয় নাই। আমরা ২৯১-৯৮ এবং ৩৫১-৭৬ পৃষ্ঠায় বঙ্গীয় পণ্ডিতদের কথা আলোচনা করিয়াছি।

ইংরেজদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেও বাঙ্গলায় এইরূপ ভুবনজয়ী পণ্ডিত অনেক ছিলেন, যাঁহাদের পদতলে বসিয়া উইলকিন্স, কোলব্রুক, কেরি, এয়ার্ড, টমাস ও মার্সম্যান প্রভৃতি সুপণ্ডিত সাহেবগণ এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিতেন। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমরা মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মার্সম্যান সাহেব তাঁহার শ্রীরামপুরের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদিগের পুরোভাগে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়, ইনি উড়িষ্যাবাসী, এবং বিদ্যার জাহাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন" (আমি Colossus of learning এর ভাবার্থ "বিদ্যার জাহাজ" শব্দে বুঝাইলাম)। কিন্তু তিনি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন না, বঙ্গদেশবাসীই ছিলেন। যে হিসাবে মার্সম্যান তাঁহাকে 'উড়িষ্যাবাসী' বলিয়াছেন —সে হিসাবে আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও উড়িষ্যাবাসী বলা চলে। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৭৬২ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মার্সম্যান ইঁহার সম্বন্ধে আরো লিখিয়াছেন —"ইঁহার সঙ্গে আমাদের প্রসিদ্ধ অভিধান-রচয়িতার (জনসনের) খুব সাদৃশ্য ছিল। জনসনের মতই মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁহারই মত হিন্দু পণ্ডিতের বিরাট ও অগোছাল বপু ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার মত পাণ্ডিত্য আর কাহারও ছিল না, মিঃ কেরি প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা

ইহারই কাছে তারা শিক্ষা করিতেন " মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত প্রবোধচন্দ্রিকার ইংরেজী ভূমিকায় মার্সম্যান লিখিয়াছেন, "মৃত্যুঞ্জয় বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্যতম" "One of the most [illegible]" । এই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের শুধু পাণ্ডিত্য নহে, ইঁহাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্মবিশ্বাস দেখিয়া সেই সকল সুপণ্ডিত পাদ্রী সাহেবেরাও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন কেরি সাহেবের জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় ব্রাহ্মণ একদা একটি লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন , এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন হয়, এবং ব্রাহ্মণকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল কিন্তু সাক্ষ্যের আদালতে যাইয়া শপথ লইতে হয়। ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাত্মা ব্রাহ্মণকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান স্বরূপ আদালত তাঁহার উপর এই দণ্ডই ব্যবস্থা করিলেন জেলে ব্রাহ্মণ হাজতে তিন দিন তিন রাত্র উপবাস করিয়া রহিলেন, প্রাণত্যাগ করিবেন তবুও আদালতে শপথ গ্রহণ করিবেন না, এই তাঁহার পণ এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান দেখাইয়া কেরি সাহেব বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক তাঁহাকে মুক্তিদান করেন বঙ্গদেশে তখনও যেরূপ ধর্মবিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পাদ্রীরা অনেক সময় বিলাপ করিয়া বলিতেন, "কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্মের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের খৃষ্টানদিগের মধ্যে তাহার সিকি পরিমাণ অনুরাগও তো দেখিতে পাই না " বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫ম সংস্করণ, ৫৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।) উমাস সাহেব নবদ্বীপে যাইয়া তথাকার পণ্ডিতদের আন্তরিক চরিত্রবল নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালীদের উদারতা, বন্ধুর জন্য প্রাণপণের জন্য অকাতরে স্বীয় প্রাণদান প্রভৃতি মহাগুণের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এই পুস্তকে সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ নাই। বাঙ্গালীদের অসামান্য বিদ্যানুরাগে সাহেবেরাও বিস্মিত হইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য চরিত লেখক শ্যামসুন্দর বসু সম্বন্ধে ডাঃ কেরি লিখিয়াছেন, "ইঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত আমি দেখি নাই , ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল।" "I am re devoot scholar than him I never saw

Before he [illegible]th year he became a perfect master of Arabic and Persian His knowledge of Sanskrit was not less worthy of note " কেরির মত বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতের এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার কথা নহে। রামরাম বসু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং নিমতা গ্রামের এক পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আরও অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে গঙ্গাধর কবিরাজেন্দ্র নাম স্মরণীয়। ইঁহার সম্বন্ধে ১৩৩১ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠের "নায়ক" পত্রিকায় কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন লিখিয়াছেন,

"সর্ব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে বলিতে শুনিয়াছি 'আমি চিকিৎসার শেষ ঋষি গঙ্গাধর। শ্রীচৈতন্যদেবের যুগের পর এত বড় পণ্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই'।"

ইনি সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন এবং ৭৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত ১৩খানি, জ্যোতিষ ১খানি, ব্যাকরণ ৮খানি, স্মৃতি ৭খানি, নাটক, আখ্যায়িকা, মহাকাব্য ও চম্পূগ্রন্থ ১৩খানি এবং ১৪খানি বিবিধ বিষয়ক। তাঁহার রচিত আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত টীকা 'ভানুমতী'। এখন বরদেশ্বর সেই ভিষক্‌কুলের প্রধান অবলম্বন। গঙ্গাধর হুগলীর জেলার কাঁচরা গ্রামে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে (২৪শে আষাঢ়, শুক্রবার) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৯ সনের ১৯শে জুন মৃত্যুমুখে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল ভবানী রায় ও মাতার নাম অন্নপূর্ণা দেবী—এবং ইনি তাঁহাদের একমাত্র সন্তান ছিলেন।

এই পণ্ডিতকুলের শিরোমণি বহরম আমরা রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি; ইনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের সংগমস্থলে বিরাজমান। ইনি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। পরাধীন জাতির একটি লোক বদ-মাস ঈশ্বর বিদ্যালঙ্কার ইংরেজদিগের মধ্যে তখনকার দিনে যে উচ্চ প্রশংসা ও সম্মান অর্জন পাইয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যাইবে আধুনিকতার প্রধান পাদপীঠসমূহে তখনও জ্ঞান মনের পুণ্য-প্রদীপ জ্বলিতেছিল। জগতের সেই মনীষিগণ রাজার হৃদয়কে যে কতদূর শুদ্ধ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহাদের অকপট হৃদয়ের অভিনন্দন দ্বারা প্রতীত হয়। আমরা এখানে কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—রাজার মনিষের কোমলতা বিদেশে সহানুভূতি কতটা আকর্ষণ করিয়াছিল। লণ্ডনের ইউনিটারিয়ান সমিতি হইতে রামমোহন রায়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় সেই সমিতির মুখপাত্র হইয়া রাজাকে মানপত্র দেওয়ার সময় তাঁর জন বাউরিং (Sir John Bowring) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম এই —"কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন, যদি এখন আমাদের মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত অমর-কীর্তি ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের যশ যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি হঠাৎ সভাস্থলে উপস্থিত হন, তবে আমাদের মনে কি ভাব হইবে? যদি হঠাৎ প্লেটো সক্রেটিস, মিলটন কি মিউটন অকস্মাৎ আসিয়া দেখা দেন, তবে আমরা কি ভাবিব? আমাদের একজন কবি, যিনি স্বর্গের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তিনি দক্ষিণ মেরুর সেই সুন্দর জ্যোতিষ্মান্ আলোকপুঞ্জ যাহা 'স্বর্গ কুলদণ্ড' (Heaven's Mace) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারা সর্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিস্ময়াবিষ্ট মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি এই সমিতির পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায়কে আপ্যায়ন করিতে যাইয়া সেইরূপ ভাব-বিহ্বলতার সহিত হস্ত প্রসারিত করিতেছি।" আমেরিকার ডাঃ বুথ মিঃ হুইলিনের নিকট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২রা মে তারিখের যে চিঠি লিখিয়াছিলেন,

তাহাতে রামমোহন সম্বন্ধে এই কথাগুলি ছিল —"ইহার মৃত্যুর পরে আমি ইহার সমস্ত গ্রন্থাবলী লাভ করিয়া পাঠ করিলাম। তাহার ফলে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি জগতে বর্তমান কালে বা অতীতে কখনও জন্মেন নাই।" বেঙ্গালেতে যে ৪ঠা পৌষের প্রিন্সিপিটেরিয়ান সভায় বলেন, "যে কোন বিষয় আলোচনায় ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইত, সেরূপ পাণ্ডিত্য আমি আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা এবং মৌলিকত্ব কেমন ছিল, তাহা আমরা আর কাহারও হইতে পারে না। জগতের সভ্য লোক যে কোন যুগে জন্মিয়াছেন রামমোহন রায় তাঁহাদের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত হইতেন।" ১৮৩১ খৃঃ অব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে কিন্স্ বাড়ী শিক্ষায় লণ্ডন . বক্তৃতা কালে ব্রেকাবেন্দ্র যে কথা বলিয়াছিলেন "একটা কবিতাপূর্ণ স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি মৃত হইলেও এখনও যে সকল কথা কহিতেছেন তাহা গ দুশাসর ভরিয়া শুধু ভারতবাসী নহে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের কাণে বাজিবে।" মিঃ গার্ডনার সিটে ব্রেকাবেন্দ্র গ্রন্থাগারে রামমোহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "যে সভ্যতা জগতে সর্বত্র প্রচারিত হইবে, তখনকার রামমোহনের নাম কেহ ভুলিতে পারিবেন না।" কর্নেল ফিটজ্ লরেন্স (মানচেষ্টারের আগে তাঁহার ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে (১৮৩১ ১৮ খৃঃ) লিখিয়াছেন, "অতি শৈশব হইতে ইনি অসাধারণ আরবী, ফারসী, সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ভাষার সাহায্যে এবং ইঁহার কথায় কথায় লক [illegible] এবং কেবলের [illegible] গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন।" সাময়িক সাময়াদের তৎকালের প্রধান নেতা সুবিখ্যাত রবার্ট ওয়েল ইঁহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মিঃ ব্রেকাবের ছিল (it [illegible]) লিখিয়াছেন, "তাহা আমাদের ভাষায় তর্ক করিলেন, ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বিপক্ষের অধিকার আমাদিগকে অবিকৃত করিল। রবার্ট হারিয়া গিয়া একটু চটিয়া গেলেন। তাঁহার এরূপ বিচলিত ভাব ও অসহিষ্ণুতা আমি আর কখনই দেখি নাই। রাজার ভাব স্থির সংযত ও প্রশান্ত।" ডাঃ বুট হইলিন সাহেবকে ১৮৩১ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন, "আমার চক্ষে রাজা রামমোহন রায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, জগতের অতীত ইতিহাসে ও বর্তমানে জ্ঞান ও বিনয়ের এরূপ পূর্ণ প্রতিমা আর একটিও আমি কল্পনা করিতে পারি নাই।" আর একজন ইংরেজ লিখিয়াছিলেন, "তর্কযুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে এক্ষেত্রে রাজা ইংরেজ তাঁহার সমকক্ষ একজনও পান নাই।" মেরি কার্পেন্টার লিখিয়াছেন, "ব্রিষ্টলের মিঃ এডামস্ রাজাকে ব্যাপটিষ্ট্ মতে দীক্ষিত করিতে আসিয়া নিজে রাজার সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া চলেন, একথা সকলেই জানেন।" সেই সময়ের সর্ব প্রধান হেতুবাদী দার্শনিক হেরেস হেম্যান রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন তিনি রাজাকে একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আপনার পুস্তকে নাম না থাকিলে আমি কিছুতে ধরিতে পারিতাম না যে উহা হিন্দুর লেখা,—বরঞ্চ উহা কোন শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চশিক্ষিত

ইংরেজের দ্বারা লিখিত বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল।" জন ক্লার্ক মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুখ্যাতি করিয়া লেখার রাজাকে লিখিয়াছিলেন,—"মিলের ইংরেজী লেখাটা যদি আপনার মত সুন্দর ও নিখুঁত হইত, তবে আর কিছু বলিবার থাকিত না।" বিলাতের তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি কাম্বেল রামমোহনকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তিনি যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন সেই দেশের আভিজাত্য বা বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবে সমাজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া আতিথ্য দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের সভায় এবং ফরাসী রাজ দুই সিসিলের দরবারে সম্মানিত সম্মান পাইয়াছিলেন।

এই বাঙ্গলার এক নগণ্য পল্লীর কুলপুরোহিত তখনকার কালেক্টরের সেরেস্তাদার, যিনি তৎকালের বিধি অনুসারে কেরানিগিরি হইতে উচ্চতর কোন পদের দাবী করিতে পারিতেন না, তিনি এত বড় হইয়াছিলেন যে সমস্ত সভা জগৎ সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট মাথা নোয়াইয়াছিল। এতদেশীয় পণ্ডিতগণ বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া একরূপ সমস্ত জগতের উপর কাজ করিয়া আসিয়াছেন। কৃত্তিবাসী এক নগণ্য পল্লীর পণ্ডিতকে দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবরমণি কেরি সাহেব পাশ্চাত্য প্রতিভাবলে বাঙ্গালা ব্যাকরণকে সেই রচিত আকারে তৎকালীন জগতের সকলের পণ্ডিতগণের একজন করিয়া সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতের মস্তিষ্কের অপূর্ব শক্তি নব্যবাঙ্গালার দুইশতের মধ্যে এখনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মাথা প্রবেশ করাইতে পারিতেছেন না। যে ভারতবাসী চারিদিকে বিদ্যুৎবেগ ছিটিয়া বেড়াইতেছে, উহা মহাযোগের উদাহরণস্থল। এই দুরোগের গভীর নিশার ঘোর অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু যুগে যুগে নব নব প্রতিভার সংঘর্ষে নানক, কবির, চৈতন্য, রামমোহন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পুরুষবরদিগের অভ্যুদয়ে কি মনে হয় না যে, এই জনস্রোত ক্ষেত্রে—এই বঙ্গভূমে এখনও জোয়ার্গি জন্মিতেছে, এখনও আদিকারিকের চির জ্যোতিষ্মান্ বহ্নিশিখা কেবল নিষ্কাশিত হয় নাই? এই যুগের মুক্তিমন্ত্র শিখাইবার যোগ্য কোন পুরোহিত আসিবেন, কি আসিয়াছেন? তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীর প্রতীক্ষায় সমস্ত দেশ স্তম্ভিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিব।

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষার উপর এই বিদ্যালয় জোর দিয়াছিল, বস্তুতঃ ইহা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এ কথাটা ভাবিতে পারা যায় না যে, যাঁহারা কোটী কোটী লোকের ভাগ্যনিয়ন্তা শাসনকর্তা, তাঁহারা সেই দেশের ভাষা না জানিয়া কার্যক্ষেত্রে কাজ কি করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারেন। এই প্রাদেশিক ভাষা অভ্যাস করাতে শিক্ষাশালাগুলিতে নানারূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এদেশের লোকেরা যৌবনে চিন্তাশীলতার প্রতিষ্ঠা একরূপ তারাইতে বসিয়াছে। গণিত পড়িবে গণিতের ভাষা ইংরেজী, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, উদ্ভিদবিদ্যা, ভাষা, ভিষক্‌শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই ইংরেজীতে শিখিতে হয়। ফলে প্রত্যেক বিষয় শিখিতে সময়ের অর্ধেকটা বাদ হয়সঙ্কীর্ণ ভাষাটা শিখন করিতে। এমন কি

সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় এমন প্রশ্নপত্র আছে যাহাতে ঐ দুই ভাষার জ্ঞান না থাকিলেও শুধু ইংরেজী জানিলেই পরীক্ষার্থী কৃতকার্য্য হইতে পারে। তাহা লইয়া কমরুদ্দ করাতে বিদ্যাস্থান অতি অল্পই হয় এবং যেটুকু হয় তাহা সাময়িক হয়—স্থায়ী চিন্তাশীলতার কোন উপায় দেওয়া হয় না। বিদেশী ভাষার অনাবশ্যক কসরৎ দখল করিতে করিতেই জীবনের অর্দ্ধেক চলিয়া যায়। এতগুলি মেডিকাল কলেজে এত ভাল ভাল ছাত্র গত অর্দ্ধশতাব্দীকালে প্রবেশ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ওঁদের চক্রবর্ত্তী হইতে ডাঃ সরকার পর্য্যন্ত একজনও এখন দাঁড়ান নাই। তিনি যে সব গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন নূতন তত্ত্ব দান করিতে পারিয়াছেন। ইংরেজী সম্বন্ধে আমরা এত কৃতী যে আমরা একরূপ ইংরেজীতে হাসি ইংরেজীতে কাঁদি এবং ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ আমরা মেকলের সম্বন্ধে লিখিতে গেলে কেবলই টেইন ডাউন, জিকটর হিউগো কি বলিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকি। আমাদের যে কোন স্বাধীন মত বা স্বকীয় আদর্শ আছে তাহা ভাবি না, ভাবিতেও পারি না। এদিকে ২৫ বৎসরের ইংরেজ যুবক বেন, স্পেন্সার, বেকন, গ্রীমাল্ডি, মহাভারত প্রভৃতি যাহা কিছু পড়িবেন, বুদ্ধ বাল্মীকি বৈশাখে কিংবা ঋগ্বেদের ঋষি কেহই ইংরেজ অধ্যাপক সমালোচনা হইতে রেহাই পান না। ইহারাই বা চিন্তাজগতে এমন স্বাধীন ও আমরাই বা এরূপ পরাধীন ও শেকলে-বাঁধা গোলাম হইলাম কেন? ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব আমরা কেবলই পরের মত রোমন্থন করিতেছি। ইহার একমাত্র কারণ আমরা নিজেদের কথাও নিজের ভাষায় পড়িতে পাই না। এ সম্বন্ধে এফ. এচ. সাহেব আর ডি এল বলেন, "দুঃখের বিষয় মেকলে সাহেব বাঙ্গলার শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন বহুত বাঙ্গালীরা যে মেকলেরও বাড়া বলিয়া অভিমত হইয়া থাকেন সেই নিজের কর্ম্মচারীদের এক্সামের তাঁহারা আজও হয়তো না।"

প্রাদেশিক ভাষা অজ্ঞতার ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর দুই হয়। এই যে কোন্ কোন্ লোকের ভাষা না জানিয়া রাজপুরুষেরা এদেশ শাসন করিতেছেন তাহার ফলে কত শত মতভেদ (অনুবাদক) অফিসে অফিসে বসিয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ যদি আমাদের ভাষা শিক্ষা করেন, তবে শত শত উকীল মোক্তারের ভাষা, অন্তঃ এ অপরিপুষ্ট ইংরেজী দ্বারা বিচারককে সকল কথা বুঝাইতে হয় না। ইহাদের এই শতমুখে ব্যয়িত সময়ের কি কোন মূল্য নাই? সাক্ষীর মুখ নবলব্ধ ইংরেজী অনুবাদে যে কত মূল্য সময় ও শক্তির অপচয় হয় তাহা সকলেই জানেন। মাত্র জনকতক হাইকোর্টের জজ, ছোট আদালতের জজ ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা জজ এদেশের ভাষা শিখিবেন না আর তজ্জন্য সমস্ত জাতি এই ভাবে মোর প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিচারককে ইংরেজীতে কি সকল কথাই এই সকল উকীল ভাল বুঝাইতে পারেন, না নাম মাত্র দেশী ভাষার জ্ঞান লইয়া বিচারক সাক্ষীর জবানবন্দী বুঝিতে পারেন? শাসনকর্ত্তাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেশের অবস্থা বুঝিয়া লইতে হয়, দেশের ভাষা না জানিয়া তিনি এই কার্য্য কি ভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারেন? প্রাদেশিক ভাষায় তিনি যে পরীক্ষা দিয়া পাস করেন, তাহা খেলা মাত্র, ম্যাট্রিকুলেসনের বাঙ্গলা পরীক্ষার

উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। কি আশ্চর্য যে বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বাঙ্গালী উকীল ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইংরেজী শিক্ষা এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু তাই বলিয়া যে ইংরেজীর বর্ণজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবহারকালেও সেই ভাষার শরণ লইতে হইবে তাহার কথা নাই। সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্র, মুসলমানী আইন কানুন ও ইংরেজী ব্যবহার-শাস্ত্র শিক্ষা করা অপরিহার্য, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃত, ফারসী কি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে হইবে এবং সাক্ষীর জবানবন্দী তর্জমা করিতে হইবে এ কথাতো সমর্থন করা যায় না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরস্পরের সহানুভূতি ও প্রীতির অটুটতম বন্ধন পরস্পরের ভাষাজ্ঞান। আমাদের ভাষা জানিলে—সাহিত্যপাঠে ও কথোপকথনে বিদেশী শাসনকর্তা আমাদের মনোভাব বুঝিয়া যতটা শ্রদ্ধা ও প্রীতিপরায়ণ হইবেন—আমরা যদি চিরকালই কৃত্রিম বুলি বলিয়া তাঁহাদের কাছে পশুপক্ষীর ন্যায় দুর্বোধ্য হইয়া থাকি, তবে সে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আমরা তাঁহাদের কাছে কখনই পাইব না।

মহাত্মা লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অতি বড় মহদুদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই দেশস্থ সিভিলিয়ানগণকে তাঁহাদের পদ পাইবার পূর্বেই সেই পদে উন্নতি লাভ করিবার জন্য দেশী ভাষায় খুব শক্ত পরীক্ষাস্থলে স্বীয় স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিতে হইত। তাঁহাদিগকে চারটিবার বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া দেশী ভাষায় তর্কবিতর্ক দ্বারা তাঁহাদের শাসিত প্রদেশের ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ দিতে হইত। এই তর্কসভায় দেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, রাজগণ, বিদেশী রাজদূতেরা, মন্ত্রিগণ এবং বিশিষ্ট মুন্সী ও মৌলভিরা উপস্থিত থাকিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ানদের বাঙ্গলা ও ফারসীতে এই বিচার কলিকাতার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে হইত। এদেশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কর্মোন্নতি এই কলেজের অভিমতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। এখানে বিদ্যার পরিচয় না দিয়া সমস্ত ভারতে কোন সিভিলিয়ানের পদ বা বেতনের উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। (No promotion was to be given in the public service throughout India in any branch of the service held by civilians except through the channel of this College"—Memoirs of Dr Buchanan, Vol I, p 205.) এই কলেজে বড় বড় ইংরেজ অধ্যাপক ও দেশের পণ্ডিতগণের ভাব-বিনিময়, চিরস্থায়ী অন্তরঙ্গতা ও পরস্পরের প্রতি সোহার্দ্যের একটা বিশিষ্ট স্থান সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সিভিলিয়ানদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িতে হইত—(১) ইয়োরোপের বর্তমান কালের প্রধান প্রধান ভাষা, (২) লাটিন, গ্রীক ও ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্য, (৩) গণিত, (৪) ভূগোল, (৫) সাধারণ ইতিহাস, (৬) উদ্ভিদবিদ্যা, (৭) রসায়নশাস্ত্র, (৮) জ্যোতির্বিদ্যা, (৯) নীতিবিজ্ঞান, (১০) স্মৃতি, (১১) সমস্ত জগতের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারশাস্ত্র, (১২) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গলা, তেলেগু, মহারাষ্ট্রী, তামিল এবং কেনারিজ প্রভৃতি

সাহিত্য, ভারতবর্ষের ও পাশ্চিপাত্যের ইতিহাস। এই কলেজ হাইর কর্ম-ক্ষেত্রের একটা বড় বিভাগ ছিল এবং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা অধ্যাপকদিগের সহিত সহযোগ করিয়া ইহা পরিচালনা করিতেন। ওয়েলেসলীর ইচ্ছা ছিল যে গার্ডেন রিচে একটা বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া কলেজকে স্থপ্রোথিত করা—তাহাতে সমস্ত অধ্যাপকগণ থাকিবেন, ৫০০ ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়া একটি বৃহৎ পাঠাগার, বস্তুভাণ্ডার, ভোজনাগার এবং আনুষঙ্গিক গৃহাদি থাকিবে।

বহু উদারচেতা ইংরাজ এই বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটা কোম্পানী কর্তৃক এত বড় সাম্রাজ্যের পত্তন হওয়ার বাপদেশে এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা আর কোথায়ও হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ভারত সরকারের সঙ্গে এদেশের প্রধান প্রধান লোকের একটা মিলন যদি স্বাভাবিক ক্রমে এই ভাবে গড়িয়া উঠিতে বোধ হয় পরবর্তী নানা রাষ্ট্রনৈতিক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না, প্রারম্ভেই মিলনের পথ সুগম হইলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতদ্বৈধ এরূপ উৎকট হইয়া দাঁড়াইত না।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিপন্থী হইলেন মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রধানতঃ ইংরেজদের সহায়তায় যে অভূতপূর্ব সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইয়াছিল—যাহাতে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য একরূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা মূলতঃ এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে

মোগলাধিকারে বাঙ্গালী

মোগল রাজত্বেও দেখা যায় বাঙ্গলাদেশে প্রধান প্রধান যোদ্ধার অভাব হয় নাই। কিন্তু পাঠান আমলে হিন্দু রাজা ও অপরাপর ভূস্বামীগণ যেরূপ দিল্লীশ্বরের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, মোগল-যুগে আকবর-প্রতিষ্ঠিত বিপুল সাম্রাজ্যের আওতায় পড়িয়া বাঙ্গালার সে সাহস ও বীর্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্যতন্ত্রী মোগলের তীব্র লক্ষ্য মুসলমান বাদসাহগণের উপর যেরূপ ছিল, ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীবীরের উপরও সেইরূপ ছিল,—সেই শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া কেহ কিছু মতলব বা বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতে সাহস পাইত না। আকবর অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা ছিলেন, পাছে কেহ দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিয়া শক্তি সঞ্চয় করে, এজন্য তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দিতেন না। আকবর বলিয়া নয়, মোগল রাজত্বে এই সাম্রাজ্যের অল্প-বেশী সকল সম্রাটের রাজত্ব কালেই দেখা যাইত আরঙ্গজেবের সময়ে হিন্দুদিগের উপর অভূতপূর্ব অত্যাচার চলিয়াছিল—সুতরাং সেই যুগে বাঙ্গালীরা কতকটা অসাড় ও হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি মুসলমান নবাবদিগের অধীনে থাকিয়া ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন এবং অনেক সময়েই বিশ্বস্ততা-নিবন্ধন

বাদশাহগণের প্রিয়পাত্র হইতেন। সোলার হুসেন দেখাইয়াছেন যে, আওরঙ্গজেব তাঁহার নানা প্রকার অত্যাচারের অনুমোদনে গৌড়া মোল্লাদিগের নিকট উৎসাহ পাইতেন। তাঁহার কাফের দলনের সদিচ্ছার জন্য ইহারা তাঁহাকে নিরন্তর "বিশ্বাসী সম্রাট" (Faithful Emperor, "সনাতন ধর্মের আশ্রয়" (Upholder of religion) ইত্যাদি উপাধি দিয়া স্তোক-বাক্য বলিতেন, ফলতঃ ইহাদের দ্বারা দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল আওরঙ্গজেব শত্রুরাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি অতি দৃঢ়হস্তে শাসন করিতেন, সুতরাং তৎকৃত অন্যায়গুলিদ্বারাও দেশের শাসনযন্ত্র শিথিল হইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটগণের অর্বাচীনতা এবং শক্তিসামর্থ্যের অভাবে দেশ উচ্ছৃঙ্খলের অংসের মুখে চলিতে লাগিল, যাঁহারা আইনজ্ঞ ও সুবিচারক তাঁহারা ক্রমশঃ হটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত চরিত্র লোকেরা সিংহবিক্রমে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। ("At last the office of the Cazy or Judge and that of Sadar or great Amoter, with many other Magistratures came to be publicly put up to sale, so that the people skilled in law and in distributive justice, entirely disappeared from the land, nor was anything else thought of, but how to bring money to hand by any means whatever." (Matakharin, Vol III, p 160) বাঙ্গলাদেশে এই অর্বাচীনতার ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন্য 'বৈকুণ্ঠের' ব্যবস্থা হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমাণে বুঝা যাইবে—সামান্য হিন্দু প্রজারা যে কত নিষ্পিষ্ট হইয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল। মোগলের সাম্রাজ্যতন্ত্র অর্থকেই মূলমন্ত্র করিয়া সমস্ত প্রদেশে এই বিষের আগুন প্রজ্বলিত করিয়াছিল।

সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বেও হিন্দুরা সাময়িক ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা অবশ্যই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্য্যেবীর্য্যে তখনও বঙ্গেশ্বরগণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে —বিশেষতঃ রাজস্বসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যে—তাঁহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। গুণনা দেখিয়া নবাবেরা জাতি বা ধর্ম্ম গ্রাহ্য না করিয়া ইহাদিগকে উচ্চতম পদ দিয়াছিলেন। মোগল ও পাঠান উভয় জাতির মধ্যে যেরূপ অবিশ্বাস ও কৃতঘ্নতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতে দেখা যায়, হিন্দুদিগের মধ্যে সেইরূপ বিশ্বাসের অভাব কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু সিরাজের সর্ব্বনাশসাধনে কয়েকজন হিন্দু বড়লোক মুসলমান-চক্রীদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন মুসলমানের অধিকার-বিলোপের পর সেই সকল বিশ্বাস ঘাতকতা ও নবাব কোথায় গেলেন? বঙ্গদেশের জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁহারা মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িলেন। শত অত্যাচারেও হিন্দু স্বীয় চরিত্রবল বজায় রাখিয়াছেন, এজন্যই তাঁহারা এপর্য্যন্ত টিঁকিয়া আছেন. অন্য কোন জাতি হইলে ভীষণ অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে হয় তাঁহারা বিজেতাদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের নিম্নস্তরে কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিবার একটা অবকাশ করিয়া লইতেন, নতুবা নির্ম্মূল হইয়া যাইতেন। কতক পরিমাণে ধর্ম্মচ্যুত বা জনেপ্রাপ্ত হইয়াও আজও বঙ্গে হিন্দুরাই প্রবল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আমরা বহু হিন্দুকে শাসন-বিভাগের শেখরদেশে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই. ঢাকার দেওয়ান যশোবন্ত রাও নবাব সরফরাজ খাঁর শিক্ষা-গুরু ছিলেন. তিনি এই সময়ের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাদবাক্য হইয়া আছে। তাঁহার রাজধানী রাজনগরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিরাশি কোলমক, নবরত্ন, একচালা প্রভৃতি বহু হর্ম্ম্য কীর্ত্তিনাশার অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে—এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরামের ভ্রাতা রাজবিহারী পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মকুশলতা দ্বারা নবাবের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঐ নবাবের সৈন্যসঙ্ঘ, অন্যতম প্রিয়পাত্র কায়স্থ শ্যামসুন্দর তাঁহার কামান ও অস্ত্রশস্ত্র বিভাগের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন সিরাজউদ্দৌলার সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে সকৎসঙ্গ তাঁহার মুসলমান সেনাপতিদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা নামের জন্য দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? দেখ না হিন্দু শ্যামসুন্দর অগ্রগামী হইয়া কেমন যুদ্ধ করিতেছে।" একথা পূর্ব্বে একবার লেখা হইয়াছে। রাজা রামনারায়ণ ও সুকরসিংহ পূর্ণিয়া ও দরভিঙ্গাবাদের যুদ্ধবিগ্রহে প্রধান কর্ম্মিরূপে নবাবদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন মুতক্ষরিনে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত আছে আলমচাঁদ রাইরায়ার পুত্র দেওয়ান রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়-রায়া নবাবের রাজস্ব-বিভাগের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জগৎ শেঠ ও বর্দ্ধমান রাজার এককোটী কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব আলিবর্দ্দীর দপ্তরে বহুদিন যাবৎ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, উহার অস্তিত্বও নবাব সরকারে বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল, কীর্ত্তিচন্দ্র এই হিসাব বরাইয়া দিয়া উহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আলিবর্দ্দীর রাজভাণ্ডারে প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। দুর্লভরাম রাজস্ব-বিভাগে আলিবর্দ্দীর সরকারে অনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার অসামান্য যোগ্যতার জন্যই ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন. তৎপরবর্ত্তী মোহনলাল সিরাজের সর্ব্ববিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতেন, দুঃসহ অভিমানে দুর্লভরাম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন. মুতক্ষরিনে লিখিত আছে, মোহনলাল পলাশীর ক্ষেত্রে বন্দী হইয়া ইহারই করতলগত হইয়া নিহত হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা, আলিবর্দ্দীর জামাতা, ঘেসেটি বেগমের স্বামী নফিসমহম্মদ খাঁন দয়ালাক্ষিণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি মাসিক ৩৭ হাজার টাকা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে গরীব, দুঃস্থ ও দুঃস্থদিগের মধ্যে দান করিতেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন আজীব রায়, এই বিশ্বাসী দেওয়ানের সহযোগে পুণ্যবান্ নবাব সর্ব্বজন-প্রিয় আদর্শ-নৃপতি হইয়াছিলেন বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান মাণিকচাঁদকে নবাব ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ১০০০ পদাতিকের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই দুর্গরক্ষার ভার দিয়া চলিয়া যান। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যসময়ে আরও বিস্তর হিন্দুরাজকর্ম্মচারীর কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, ইহারা শাসনপ্রিয় হইলেও রণক্ষেত্রে সিংহবিক্রান্ত ছিলেন। আলিবর্দ্দী যখন মহারাষ্ট্রদের হাতে পড়িয়া দুর্গতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন এক বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু রাজা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া ভ্রম-

বশতঃ বিপথে লইয়া গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি এতদূর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন যে তিনি নিজের তরবারি দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সীতারাম রায় নামক এক হিন্দু কর্মবীর, অতি অল্পবেতনের কর্মচারীর পদ হইতে আজিমগঞ্জের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়াছিলেন। ইংরেজের পক্ষ হইয়া ইনি ফরাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তদীয় সেনানীদিগের সাহস ও রণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা গোলাম হুসেন করিয়াছেন (মুতক্ষরিন ১৭০ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড)। ইনি ক্লাইভকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া রাজনৈতিকক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের কথা মুতক্ষরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ইনি আজিমগঞ্জ ফলফুলের বাগানগুলির উন্নতিসাধন ও সাধারণকে বিনা বাধে তাহাদের উৎপন্ন ফলভোগ করিবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা নুলুকসিংহের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, ইনিও সেই যুগের একজন সর্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এক নর্তকীর পুত্র গোলাম খোটস ইঁহারই প্রাসাদে বড় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ইঁহাকে নিহত করেন। বিচারের প্রসেনকর্তা আলিবর্দীর অতি বিশ্বস্ত জানকীরামের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। এখানে বলা উচিত বঙ্গদেশের এই যুগে কায়স্থগণই অধিকাংশ সময়ে বড় বড় রাজ-পদবী ও সমরকুশলতার খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

কায়স্থ জাতি।

ক্লাইভ ও মীরজাফর যখন সিরাজের ভাণ্ডার লুটন করিয়া পরস্পরের বখরার টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন নবাবের অন্তঃপুরে যে বিরাট ধনাগার লুক্কায়িত ছিল তাহার সন্ধান ক্লাইভ পান নাই। কথিত আছে নগদ আটকোটী টাকা ও বহু মণিমুক্তা ও জহরৎ রাজ-অন্তঃপুরে ছিল। মীরজাফর ও লাভুক্ষ নামক ক্লাইভের এক দেওয়ান এই টাকা আত্মসাৎ করেন। লাভুক্ষ ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ৬০ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। ইহার দশবর্ষ পরে মৃত্যুর সময়ে তিনি নগদ ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিজমা ও ৪০০ শত প্রকাণ্ড ঘড়া প্রভৃতি রাখিয়া যান। এই ঘড়াগুলির ৮০টির মধ্যে ষাটি সোনার মুদ্রা ও বাকী ৩২০টিতে রৌপ্য-মুদ্রা ছিল।

ক্লাইভের প্রধান মন্ত্রী (দেওয়ান) ছিলেন রামচাঁদ। আমি শুধু নবাবের কর্মচারীদেরই কথা এখানে বলিলাম। রাজাদের কথা বলিবার অবকাশ এখানে নাই। এই কাহিনী পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে, স্বাধীনতা-হারা হইলেও হিন্দুগণ রাজসরকারে সম্মানিত সমস্ত পদই প্রাপ্ত হইতেন। ধর্মের বাধা থাকিলেও অধিকাংশ বড় কর্মচারীরাই হিন্দু ছিলেন, এবং ধনৈশ্বর্যে জগৎ শেঠ শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা হিন্দু সেনাপতিদের শৌর্যবীর্যের কথা পাইতেছি এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণই ইহা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর ইতিহাস হিন্দুরা লিখেন নাই, হিন্দুর কথা হিন্দু নিজে কহেন নাই। তথাপি অনেক বাদ দিয়া বিদেশীরেরা এদেশীয় লোকের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতেও চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এই সময়ে আহাম্মদাবাদের নবাব দাউদ খাঁর এক হিন্দু স্ত্রী ছিলেন। রাজমহিষী যখন পূর্ণগর্ভা তখন নবাব মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হিন্দু স্ত্রী সহমরণ যাওয়ার জন্য উতলা হইয়া পড়েন, কিন্তু এখনতো তিনি রাজকুমারী হইয়াও মুসলমান নবাবের পত্নী—বেগম স্বামীর্ত্ত একখানি ছোরা তাঁহার ছিল, তিনি চিতানলে উঠিতে পারিলেন না কিন্তু সেই ছোরা দিয়া স্বয়ং অতি কৌশলে স্বীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে ধাত্রীর হস্তে দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিনতি করিয়া পরে সমাহিতভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। স্থির মস্তিষ্কে এমন কাজ জগতে হিন্দুমহিলা ভিন্ন কে করিতে পারিত? মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা প্রণীত রাজাবলীতে পৌরাণিক এক রাজমহিষীর সম্বন্ধে এইরূপ একটি উপাখ্যান পড়িয়াছিলাম। যার রাজকন্যা স্বীয় স্বামী গন্ধর্ব্বসেনের মৃত্যুতে শোক কাতরা হইয়া শীঘ্রধার এক ছুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার প্রাণবিয়োগ হইল। বালক অক্ষত দেহে গর্ভ হইতে নির্গত হইল" মুতক্ষরিনে লিখিত আছে — "Dara Khan (of Ahamadabad) had left a consort by whom he was tenderly loved. She was the daughter of a zemindar or great landlord of that kingdom where it was a standing rule, that some of these gentoo (Hindu) Princes should give their daughters to the viceroy in being. This lady who had been initiated in the Mosalman religion on her entrance into the serraglio, was now pregnant and seven months gone with the child and she had entreated for the liberty of following her husband of whom at our last parture, she had obtained her pregnard, as a token of his love. The news of his death in the middle of a victory having now reached Ahamadabad she took the pregnard, and opening her own belly with a precaution and dexterity that amazed everyone, she carefully drew out the child and tenderly recommended it to the bystanders, after which few words, she expired" (Mutaqharin, Vol I, p 96) এই আহম্মদাবাদের হিন্দুরমণীর সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত সতীর নাম কবে হইতে পারে আমরা খাস বাঙ্গলাদেশের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব ইনি বর্দ্ধমানের সুন্দরী রাজকন্যা ইনি সোভা সিংহকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। সোভা সিংহ বর্দ্ধমান আক্রমণ করিয়া রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করেন, রাজ-কন্যা, মহাক্ষমতাশালী সোভা সিংহ রাজকুমারীর প্রেমপ্রার্থী হইয়া তাঁহার শয্যাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অনেক অনুনয়বিনয় করেন, তৎপরে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিতে গেলে—["she drew from under her garment a knife which she had concealed in case of finding an opportunity to gratify her revenge. With this weapon she ripped up his belly" ('Narrative of the Govt of Bengal" by Francis Gladwin, 1788 pp. 5-8] রাজকুমারী প্রতিহিংসা লইবার জন্য যে শাণিত ছুরিকাখানি বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সোভা সিংহের পেটে বসাইয়া দিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ—আদিযুগ

"নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি হয় আ"—মধুবাবু

বাঙ্গলা ভাষা বা পৃথিবীর যে কোন ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা আদিযুগের মানব প্রথম যে ভাষা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই যুগে যুগে রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। এই অচিন্তিত আদিস্থান খুঁজিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। বাঙ্গালী যতদিন, বাঙ্গলা ভাষা ততদিন —কারণ এমন কোন যুগ নাই, যখন এদেশের লোক কথা কহে নাই। পূর্ব্বে এই দেশের ভাষাকে পণ্ডিতেরা মূলা করিয়া 'প্রাকৃত' বা শুধুই 'ভাষা' নাম দিয়াছিলেন, তারপর সংস্কৃত ভাষার লোকেরা ইহাকে 'গৌড়ীয় ভাষা' নামে অভিহিত করিতেন, 'বাঙ্গলা ভাষা' নামটা খুবই আধুনিক।

তবে এই ভাষায় কবে পুস্তক, কবিতা, নীতিসূত্র ইত্যাদি নানাবিষয়ক রচনা হইতে সুরু হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকেরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা বুঝে না কিন্তু তাহাদের মনের আনন্দ, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাবের উচ্ছ্বাস বহিয়া যায়, আনন্দ ও দুঃখের আতিশয্যে কথার সুর আসে; সেই সুরই গান, সেই সুরই বেদ; সামবেদে তাহা রাগ-রাগিণীতে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষায়ই যেন তাহা লিপিবদ্ধ হয়। এই আদেশের ফল "ত্রিপিটক"। শুধু ত্রিপিটক নহে, হীন-যানাবলম্বী বৌদ্ধগণের সমস্ত সমৃদ্ধ পালী সাহিত্য। এই পল্লীভাষার নাম হইল পালি। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারও এই একসঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হয়। পণ্ডিতেরা যে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং যাহা পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণ বহু গবেষণা ও বিজ্ঞান-সঙ্গত অনুশাসন দ্বারা সুধীসমাজে গ্রাহ্য এবং একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর —সেই ভাষার নিয়ন্ত্রণে আর এক ভাষা লিখিত ভাষার পরিণত হইয়া গেল এবং তাহাও কালে এতটা বিশুদ্ধ ও উন্নত হইয়া গেল যে তদনন্তর পুনরায় ব্যাকরণ-সঙ্কলনের প্রয়োজন পড়িল। এই ভাষার সাধারণ নাম প্রাকৃত। সাহিত্য-দর্পণকার ইহার ১৮ প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির সংখ্যা আরও অনেক বেশী।

এক সময়ে এই ভাষাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রী ও মাগধী ভাষাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের ভিত্তি গড়িয়া উঠিলেও তৎসঙ্গে বহু দেশজ আর্য্য ভাষার শব্দ এই প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশে যে প্রাকৃত কথিত হইত, তাহার অনেকটাই অর্দ্ধমাগধী নামে পরিচিত ছিল। আমরা অনেকবার লিখিয়াছি, বাঙ্গালীরাই মগধের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং আধিকালে কথিত বাঙ্গলা ভাষার উপর মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, শুধু অর্দ্ধমাগধী নহে, পৈশাচিক প্রাকৃতেরও কতকগুলি লক্ষণ এই ভাষার গঠনগত দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, এই সকল ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার স্থান বা অবকাশ আমাদের নাই।

ভাষার তিন যুগ।

বৈদিক যুগের ভাষার ব্যাকরণ আছে, তাহার সাহায্যে বৈদিক-সাহিত্যে আমরা প্রবেশ লাভ করিতে পারি। দ্বিতীয় যুগে আর্য্যভাষা সংস্কৃত, পাণিনি ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন বৈয়াকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বোপদেব এবং ক্রমদীশ্বর পর্য্যন্ত শত শত পণ্ডিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় যুগে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এই দুই ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিত হয় এবং ইহাদের রীতি, নীতি, রচনাপ্রণালী ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্যও ব্যাকরণের অভাব হয় নাই।

ক্রমে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের অনধিগম্য হইয়া উঠিল। অলঙ্কার-শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিল, সুতরাং জনসাধারণের সুখদুঃখ ও মনের ভাব বুঝাইবার পক্ষে ইহারা আর উপযোগী রহিল না তখন জনসাধারণের কথিত ভাষায় পুনরায় সংগীত ও প্রবচনাদি রচিত হইতে লাগিল। সংস্কৃতের আধিপত্যে পণ্ডিতেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে "প্রাকৃত" নাম দিয়াছিলেন, এই নাম কতকটা ঘৃণাব্যঞ্জক, শিক্ষিতজনের গণ্ডীর বহির্ভূত লোকেরা "প্রাকৃত" সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ দিকে সন্দিগ্ধচিত্ত রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সীতা বলিয়াছিলেন, "রাম, তুমি প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ তাহার স্ত্রীকে গালি দেয়, সেইরূপ অপভাষা ব্যবহার করিতেছ কেন?" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, 'প্রাকৃত' শব্দের প্রতি আর্য্যগণ কি ভাব পোষণ করিতেন।

বাঙ্গলাদেশে যে সকল পুস্তক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা কি হইল—এই প্রশ্ন সহজেই মনে হয়। প্রাকৃত ভাষায় সাধারণতঃ বৌদ্ধগণই গ্রন্থাদি রচনা করিতেন, সুতরাং অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পরাকৃত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুথি, তথা ঐ ভাষার প্রভাব, এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। সেন-রাজাদের সময় হইতে সংস্কৃতের উপর লোকদের অত্যধিক ঝোঁক হইল, সুতরাং সংস্কৃত নাটকাদিতে স্ত্রীলোক ও ইতর ব্যক্তিদের কথোপকথনের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা ছাড়া এদেশ প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক খুব অল্পই দেখা যায়—কতকটা নিশ্চিহ্ন হইয়া প্রাকৃত ভাষা উত্তর-ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। "গৌড়বহ"

বহুপুথি এ সময়ে প্রাকৃতে লিখিত হইত।

প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক আমরা প্রাকৃত ভাষায় পাইতেছি নেপালের পার্ব্বত্য উপত্যকায় এই প্রাকৃতের নিদর্শন কিছু কিছু আছে, যেহেতু বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পুঁথি-পত্র লইয়া তথায় আশ্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় গোবিন্দদাস, ঘনশ্যাম, রায় শেখর প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব কবি যে ভাষায় পদ লিখিয়া গিয়াছেন যাহা সাধারণতঃ "ব্রজবুলি" বলিয়া পরিচিত, তাহার উপর মৈথিল কবির প্রভাব খুব বেশী হইলেও উহা হয়ত এদেশ প্রচলিত প্রাকৃতের প্রাচীন ধারাটি বজায় রাখিয়াছে। গোবিন্দ দাসাদি কবি যে একটা নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না কোন স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় একটা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। ব্রজবুলির সঙ্গে মৈথিলীর সাদৃশ্য থাকিলেও ব্রজবুলি মৈথিল নহে।

ব্রজবুলি।

দুই কারণে আমাদের এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রাকৃত ভাষা লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত, ইহা অনুমান করিবার কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃতের টোলে পঠিত হইত—তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে শুধু নাটকে প্রাকৃত আছে বলিয়াই যে উহা অধীত হইত, এরূপ অনুমান হয় না,—নিশ্চয়ই প্রাকৃত ভাষা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা না হইলে প্রাকৃত ও পালি উভয়বিধ ভাষা লিখিবার ব্যবস্থা এক সময়ে সংস্কৃত টোলে থাকিবে কেন. গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর একটি পদে দুই জন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতন্য দেব পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কাব্য-কথা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক না হইলেও অনেক সময়ে ইতিহাসের ইঙ্গিত উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দুই জন "খানিয়ার বালা" শ্রীমন্ত প্রাকৃত শিক্ষাদি পাঠ করিতেছেন, ভারতচন্দ্রও প্রাকৃত জানিতেন, স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন জয়-নারায়ণ প্রভৃতি কবির লেখায়ও ইহার ইঙ্গিত আছে। যদি শুধু নাটকাদি পাঠ করিবার জন্যই প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা হইত, তবে এখনকার টোলগুলিতেও পালি ও প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা থাকিত।

দ্বিতীয়তঃ রূপ গোস্বামিকৃত প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত কবিতা চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে, "অরিষ্ম পবিজ্জমং রূপং সুন্দরং" ইত্যাদি পদে বিদ্যাপতির প্রভাব আদৌ নাই। এই প্রাকৃতই কতকটা সহজ করিয়া এবং বিদ্যাপতির ভাষার কতকটা অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাসাদি কবিরা পদ লিখিয়াছিলেন এদেশ-কথিত প্রাচীন কালের লিখিত প্রাকৃতই উত্তর কালে "ব্রজবুলি" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বস্তুতঃ উহা হাওয়া হইতে আসে নাই। দুই কারণে এই প্রাকৃত মৈথিল ও বৃন্দাবনী (ব্রজ) ভাষার থেকে সন্নিহিত হইয়াছে (১) বিদ্যাপতির অনুকরণ, (২) বাঙ্গলা দেশের বাহিরে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-প্রচার। গোবিন্দদাসাদি কবি এই ব্রজবুলি আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বত্রগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। একদিকে উড়িষ্যা অপর দিকে মথুরা, বৃন্দাবন এমন কি রাজস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদের গানের শ্রোতা ছুটিয়াছিল—ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি পুস্তক পড়িলে ইহা বুঝা যাইবে। ব্রজবুলি প্রাকৃত কবিতারই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে।

চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগে যেখানে বৌদ্ধ প্রভাব (হীনযানী বৌদ্ধ) যতদিন পর্য্যন্ত বজায় ছিল, সেখানে "কীর্ত্তি-কথা"র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিকে "পালি" বলে। ইহাতে মনে হয়, পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ গদ্যভাগ কথিত প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্তি করিয়া গানের অংশগুলিকে বিশিষ্টতাদান করিবার জন্য উহা পালি ভাষায় রচনা করিতেন।

উড়িয়া, কিন্তী বাঙ্গলা, মৈথিলী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অনেকটা একরূপ ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য খুব বেশী ছিল। এই কারণে শাস্ত্রী মহাশয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সঙ্কলিত দোহাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা-ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু "বৌদ্ধ দোহা ও গান" এবং "ডাকার্ণব" কখনই বাঙ্গলা ভাষার আকিঞ্চন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাদের সঙ্গে কিন্তীর সাদৃশ্যই বেশী। যে সকল শব্দ 'বাঙ্গলা শব্দ' বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অপরাপর লক্ষণ অনুধাবন করিলে ঐ সকল দোহা ও গানের ভাষা কিন্তী প্রভৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়। স্যার গ্রীয়ার্সন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের এই মত, এবং যতদূর জানিয়াছি তাহাতে ডাঃ সিলভ্যান লেভি, ডাঃ ব্লক ও ডাঃ চ্যাটার্জ্জিরও কতকটা এই মত। যদি এ কথাও প্রমাণিত হয় যে এই সকল লেখকদের মধ্যে কোন কোন জনের বাড়ী বঙ্গদেশে ছিল, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সেই সেই লেখক বঙ্গ ভাষার দোহা লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ইহা মনে করাই বেশী সঙ্গত যে তাঁহারা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদের লেখার টীকা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইবে কেন? সেই সকল কবিতার ভাষার লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয় না, পার্শ্ববর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলির কোন কোনটির সঙ্গেই তাহাদের বেশী সাদৃশ্য। এই দোহা লেখকদিগের কেহ কেহ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন। সেই যুগের খাঁটি বাঙ্গলার দৃষ্টান্ত দুর্লভ হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি, গোরক্ষবিজয়—ডাক ও খনার বচন প্রভৃতির ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মধ্যে কতক কতক অংশে সেই আদিম ভাষা বজায় রাখিয়াছে, দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে শূন্যপুরাণের গদ্যাংশ, যেখানে পূজা-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, ডাকের অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত প্রবচনগুলি যথা—আকুড়-বিধি, স্ত্রী-চরিত্র এবং শিতাপুত্র কলহ সংক্রান্ত সূত্রগুলি, গোরক্ষ-বিজয়ের সাধনা-সম্বন্ধীয় একত্রিশটি প্রশ্ন—এই সকল অংশে কতকটা অবিকৃতভাবে প্রাচীন বাঙ্গলার প্রকৃতি রক্ষা করিয়াছে। এবং দুই শতাব্দী পরে লিখিত চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা খাঁটি আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ জানাইয়াছেন। সুতরাং একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভাষার দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে একেবারে বিরল নহে। এই সকল দৃষ্টান্তের সঙ্গে বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা মিলাইয়া পড়িলে একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। এমন কি কারকপ্রত্যয়ের বহ্নি বিভক্তির চিহ্ন 'র' বা 'এর' যাহা

বৌদ্ধ দোহা ও গান।

বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয় তাহার উদাহরণও অপরাপর ভাষায় দুর্লভ নহে। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, অপরাপর দোহাকারেরা যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ বাঙ্গলা নহে, কিন্তু কাহ্নপাদের ভাষায় মাঝে মাঝে বাঙ্গলার লক্ষণ একটু একটু দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা এত প্রচুর নহে যে তদ্দ্বারা উহা বাঙ্গলা ভাষারই আদিরূপ বলিয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত হইতে পারে। "ডাকার্ণব" নামের পুস্তক একেবারে দুর্লভ। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় নিজেই লিখিয়াছেন যে উহার এক বর্ণও তিনি বোঝেন নাই, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তথাকথিত নবম কি দশম শতাব্দীতে লিখিত রচনার মধ্যে তিনি কথা, সেবিকোলন প্রভৃতি ঠিক দিয়া এবং মাঝে মাঝে পাঁড়ি টানিয়া তাঁহার সংস্করণটি বাহির করিয়াছেন। এই সকল ঠিক তিনি নিশ্চয়ই মূল পুঁথিতে পান নাই

সৌজ দোহা ও গান ছাড়িয়া দিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে খাঁটি বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা করিব।

সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার যে রূপটি ছিল, তাহা প্রাকৃত শব্দবহুল। বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষাকে বহু প্রাচীন বাঙ্গলা লেখক "প্রাকৃত" সংজ্ঞাই অভিহিত করিতেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলার যাব প্রাকৃত

সংস্কৃতের প্রভাব চণ্ডীদাসের সময় হইতে আমরা পাইতেছি। সেই প্রভাবের লক্ষণগুলি এই—(১) বহু আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, যাহা সেকেলে পাঁড়াগেঁয়ে লোকেরা ব্যবহার করিতেন না। (২ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত উপমার ছড়াছড়ি যথা উরুর সহিত কদলী-স্তম্ভ-কাণ্ডের, বাহুর সহিত নাগের এবং উহা আজানুলম্বিত বলিয়া বর্ণনা, কর্ণের সঙ্গে পৃথিবীর কাণের, হস্ত মুখের ভাব, মুখের সহিত পদ্মের, কণ্ঠের সঙ্গে কম্বুর, অধরের সঙ্গে পক্ক বিম্বের, স্তনের সঙ্গে শ্রীফলের, গমনভঙ্গীর সঙ্গে গজগতির কিংবা রাজহংসের গতির, চক্ষুর চাঞ্চল্যের সঙ্গে খঞ্জনের গতির, বেণীর সঙ্গে ভুজঙ্গের ইত্যাদি। (৩) বিষয়গুলির বিস্তারিত বর্ণনা ও একই কথার পুনরাবৃত্তি। (৪) ব্রাহ্মণের প্রতি অসীম ভক্তি। (৫ প্রতিবিষয়ে দেবতার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা (৬ দেবতার ও দৈবের উপর অচলাভক্তি ও বিশ্বাস।

মোটামুটি এইগুলি চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত পাঁচ শতাব্দীর ভদ্র-সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত, এইরূপে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া সব সময়ে আমাদিগের কালের সৌষ্ঠবাপণ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত হইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এক ভাগ সংস্কৃত-প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপর ভাগ সংস্কৃত-প্রভাবের অনুবর্ত্তী প্রথম ভাগের আদিকাল নবম কি দশম শতাব্দী কিন্তু তাহা এখনও শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগের উৎপত্তি চতুর্দ্দশ শতাব্দী এবং ইহারও শেষ হয় নাই। প্রথম যুগের ভাষা ও ভঙ্গীতে এখনও হয়ত বাঙ্গলার কোন নিভৃত পল্লীতে বসিয়া নিরক্ষর কবি গান বাঁধিতেছেন বা গল্প রচনা করিতেছেন, তাহা একান্তরূপে সংস্কৃত

প্রভাব-বর্জিত এবং সেই আদি যুগের লক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রভাবান্বিত সাহিত্যেরও প্রচেষ্টা এখনও অস্ত হয় নাই, হয়ত এখনও কোন কবি কবিকঙ্কণ বা ভারত-চন্দ্রের অনুকরণে গণেশ ও সরস্বতী-বন্দনা লিখিতেছেন। ইতিমধ্যে নব আগরণের দিনে 'বঙ্গোক্তি' 'ইঙ্গবঙ্গ' প্রভৃতি সমযোগে মধুসূদন গ্রীকরীতির অনুবর্তী হইয়া ইলিয়ড্ বা প্যারাডাইস লষ্টের অনুকরণে যে মহাকাব্য রচনা করিয়া গেলেন, কিংবা রবীন্দ্রের শব্দবেদুগীণ-সুরঝঙ্কারিণীনিন্দিত গীতিধ্বনি বঙ্গীয় কুঞ্জে ঝঙ্কিত হইয়া গেল—তাহাদের রচনায়ও সেই সংস্কৃত প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুতরাং লক্ষণ দেখিয়া (কালের হিসাবটা কতক পরিমাণে আড়াল রাখিয়া) সাহিত্যকে আমরা পূর্বকথিত দুইশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লইব। প্রথম শ্রেণীতে ৯ম-১০ম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ও তদন্তর্ভাপন্ন সমস্ত সাহিত্যকে অন্তর্গত করিয়া লইব। দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণগুলি কতক কতক নির্দেশ করিয়াছি, এখানে প্রথম শ্রেণীর লক্ষণগুলি বিবৃত করিব—

(১) খাঁটি প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য। ২ উপমাগুলি কোন পুস্তক বা সাহিত্য হইতে ধার করা নহে পাড়াগাঁয়ে যাহা সচরাচর চোখে পড়ে, তাহাই উপমা-রূপে ব্যবহার করা, যথা মুখের সঙ্গে 'মহুয়া' ফুলের, চোখের সঙ্গে 'অপরাজিতা' ফুলের, ওষ্ঠ অধরের সঙ্গে 'সোলা'র। উপমার বাহুল্য একেবারেই নাই সংস্কৃত প্রভাবান্বিত সাহিত্যে যেরূপ বিস্তৃত রূপকল্পনা, সংস্কৃতের কৃত্রিম উপমা জোগাইয়া দীর্ঘ করা হয়, অথচ উহাতে কোন রূপবান্ বা রূপবতীর রূপ একেবারেই চিত্রিত হয় না, বৃথা পাণ্ডিত্যের কোয়াসার মধ্যে রূপ অদৃশ্য হইয়া যায়,—প্রাক্ সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা হয় না। অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে সুন্দর বা সুন্দরীর ছবি যথাযথরূপে স্পষ্ট হয়—যথা "সোণার ডালা বঁধু একবার দেখ, আমার নয়ন দিয়া একবার দেখ" (মহুয়া)—"শয়ায় পড়িয়া কন্যা, এলোথেলো বেশ। সারাটি পালঙ্ক জুড়ি আছে কন্যার দীঘল মাথার কেশ"—সেই মেঘ-আন্ধার-হেন গুথিনী-লম্বমান-নাগ প্রভৃতি উপমানের বাহুল্য-বিড়ম্বিত রূপ-বর্ণনা অপেক্ষা পূর্বোক্তকালের দুটি ছত্রে অনাড়ম্বরে বাক্ত বর্ণনা চিত্রটিকে কত বেশী উজ্জ্বল শ্রী দান করিয়াছে! দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যগুলির প্রকৃতি বর্ণনায় এক দেয়ে কৃত্রিম সংস্কৃতের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কতকগুলি বাঁধা গৎ সর্বত্র দৃষ্ট হয়। বসন্ত কাল হইলেই কোকিল ডাকিবে, ভ্রমর গুঞ্জন করিবে, বর্ষা হইলেই ভেক ডাকিবে, কেয়াফুল ফুটিবে—এই ভাবে কয়েকটা নির্দিষ্ট কথা সমস্ত কাব্যেই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কাব্যে, কবি নিজের চক্ষে প্রকৃতি দেখেন ও নিজের কাণে প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি শুনেন, তাই তাঁহার কথায় ছবি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মনুয়া গীতিকার পাড়াগেঁয়ে এখো পুকুর ও কদম-মন্দার ও কদলীসমন্বিত পুকুর-পাড়টি কবি যেন কয়েকটি ছত্রে একেবারে চোখের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন—"শাওনিয়া মেঘ গিরে, বহু বরি যায়ে। ঘউ কথা কও বলি কাঁদে পথে পথে।" মাথার উপরে মেঘ, ঝড় বৃষ্টি তুফানে সিক্ত শরীরটা উঠাইয়া লইয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহা

দেশী ধারা।

অগ্রাহ্যের মধ্যে—পাখীটা তাহার প্রণয়িনীর মান ভাঙ্গিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, "হাতেতে সোণার খাড়ি বধা নেখে এসে" (কঙ্ক ও লীলা)। এখানে সোণার খাড়ি অর্থ বিদ্রূপ।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের আর এক লক্ষণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা এমন কি আধুনিক ঔপন্যাসিক ও কবিরা যাহা একশত পৃষ্ঠায় বলা করিতেন তাহা প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যের লেখকগণ দশ পৃষ্ঠায় শেষ করিবেন। ইহারা যাহা স্বচক্ষে দেখেন এবং নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তাহাই লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণ তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও সংস্কৃত কাব্যগুলির কথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না যেখানে সেখানে উপলক্ষ পাইলেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, স্বর্গ-নরকের পুণ্য ও সংস্কৃত পুরাণের গল্পগুলি ভুড়িয়া দিয়া স্বীয় কাব্য অযথা ভারাক্রান্ত করেন। পল্লীসাহিত্যে দেবলীলা একেবারেই দৃষ্ট হয় না। কর্ম্ম গৌরবই নায়ক-নায়িকাদের প্রধান অবলম্বন। তাঁহারা বিপদের চূড়ায় ওঠেন কিন্তু দেবতার নাম জপ করিতে বসিয়া যাইবেন না, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। সংস্কৃতের প্রভাবাধিত সাহিত্যের পথ একেবারে উল্টা—সেখানে নায়ক নায়িকা বিপদে পড়িলেই স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া দিবেন এবং উপিষ্ট দেবতা যে তখনই আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে ত্রাণ করিবেন, সে সম্বন্ধে পাঠকের পূর্ব্ব হইতেই কোন সংশয় দৃষ্ট হয় না—এবং এইজন্য চরিত্রগুলির অণুমাত্র স্বকীয় গৌরব লক্ষিত হয় না।

ব্রাহ্মণ প্রভাবের পূর্ব্বে বৌদ্ধনীতিই সমাজে কার্য্যকরী হইয়াছিল। বৌদ্ধনীতি কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই সূত্র অনুসারে কর্ম্মফল কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যেমন কর্ম্ম করিবে, তেমনি ফল ভোগ করিবে। এই জন্য প্রাক্ সংস্কৃত সাহিত্যে নায়ক নায়িকারা অধিকতর কর্ম্মশীল। ব্রাহ্মণ্য নীতি ভক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া শেষকালে এদেশে বিকাশ পাইয়াছিল। বাঙ্গলা মহাভারতেও বৈষ্ণবপ্রভাবের শিক্ষা—একবার মাত্র হরিনাম করিলে যত পাপ নষ্ট হয় মানুষ একজন্মে তত পাপ করিতে পারে না। "সর্ব্বশাস্ত্রে যত হরি-নাম দি-অক্ষর। আমি অন্য নাহি জানি বেদে অগোচর" (মহাভারত, আদি)। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রধান স্থান পায় নাই। ভক্তিই মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পন্থা সুতরাং ব্রাহ্মণপ্রভাবাধিত সাহিত্যে ভক্তির অবতারণা, পুরুষকার আড়ালে পড়িয়া গেল। যখন প্রণয়কে যখন কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাইল না, তখন আত্মত্যাগ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল, কিন্তু তখনই ভাবিল আমার খোঁজা তো শেষ হয় নাই, সন্ধান করার কাজ বাকী আছে, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি নিরাশ হইব না, সুতরাং আবার খুঁজিতে আরম্ভ করিল। নিজের চেষ্টার চূড়ায় না উঠিয়া এই সকল নায়ক-নায়িকারা হাল ছাড়িয়া দেন নাই। নব ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে দেশে যে হিন্দুধর্ম্ম ছিল তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মবাদ আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবাধিত সাহিত্যে বশানে যাইয়া শিবও চণ্ডীর "চৌত্রিশা" আবৃত্তি করিতেছেন, ধনপতি সদাগর চণ্ডীর পূজা বশানে বসিয়া ককারাদি করিয়া বর্ণমালার সমস্তগুলি অক্ষর দিয়া কালীর একএকটি নাম গ্রথিত করিতেছেন। কালকেতুর ন্যায় মহাবীরও স্বীয় 'লোহার সাবলে'র

তার ছই বাহু ও অস্ত্রশস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া চণ্ডীমাতার নাম স্মরণ করাই একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যে মানুষই বড়—দেবতার কোন হাত নাই। "সবার উপরে মানুষ বড় তাহার উপরে নাই।" এই জন্য সিদ্ধ ব্যক্তি ও তাপসগণ দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাঙ্কিলিছা "যমের মুহে বাবে যাতে চাঁদের পুতে খায়" এবং দেবরাজের পুত্র স্বয়ং তাঁহার অঙ্গে "চামর ঢুলায়।" ময়নাবুড়ি যমরাজকে তাড়া করিয়া তাঁহাকে আদি মধুসূদন ডাক ছাড়াইতেছেন ও গোরক্ষনাথ চণ্ডীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে কতকটা এইভাবে ব্রাহ্মণকে বাড়ানো হইয়াছে।

প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১। পালরাজাদের গান, এই গান এপর্য্যন্ত খুব অল্পই সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু রাজ্যপাল, বপ্পপাল, মহীপাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে যে বাঙ্গলা গান ছিল তাহা অনুশাসনাদিতে উল্লিখিত আছে। মহীপালের গানের সামান্য অংশ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহার যে একটা দীর্ঘ পালা গান এখনও আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাক্-সংস্কৃত যুগের বঙ্গ-সাহিত্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত চৈতন্য ভাগবতে গোপীচাঁদ, ভোগীপাল ও মহীপাল সম্বন্ধে যে ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গীতিকাগুলির বহুল প্রচলন ছিল।

২। নাথগীতিকা, নাথধর্ম্মের গুরুদিগের অলৌকিক বর্ণনা উপলক্ষে এই সকল গান বিরচিত হইয়াছিল। কাঙ্কিলিছা ও ময়নামতীর অদ্ভুত শক্তি ও লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া ময়নামতী সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। ময়নামতী ছিলেন মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। বিক্রমপুরের "চন্দ্র"রাজাদের একজন ইঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহার নাম মাণিকচন্দ্র। ইনি উত্তরাধিকার-সূত্রে বিক্রমপুরের অনেকাংশের অধিকারী হইয়া শ্বশুরের পুত্র না থাকাতে মেহেরকুলও লাভ করেন, তাহা ছাড়া সোণ্ড অকলে রংপুর প্রভৃতি স্থানের একটা শ্বশুরালয়ের ইনি উত্তরাধিকারী লইয়াছিলেন। রংপুর গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র যাতার আজার অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বার বর্ষ পরে রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর। গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) সাতারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের অদুনা ও পদুনা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ এই গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের ১০২৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ হইয়াছিল। নাথসম্প্রদায়ের আনুকূল্যে এই ময়নামতীর গান (অথবা মাণিকচন্দ্র-রাজার কিংবা গোবিন্দচন্দ্রের গীতি—প্রভৃতি নামবিশিষ্ট পল্লী-গীতিকা) একদিকে উড়িষ্যা অপর দিকে বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের বহুস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল।

গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ-চন্দ্র।

নাথগীতিকার মধ্যে গোরক্ষবিজয় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে যোগী গোরক্ষ-

নাথে কিভাবে তাঁহার গুরু মীননাথকে কদলীপত্তনে অষ্টনায়িকার প্রতি অনুচিত আসক্তি ও তজ্জনিত অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। এই কাব্যে ফল্গুরা, ভবনেশ্বরী প্রভৃতি কবির কল্পনা পাওয়া যায়।

৩। ধর্মপূজার পুঁথি ইহার রচয়িতা রামাইপণ্ডিত, বৌদ্ধধর্ম শেষকালে ধর্মপূজায় পরিণত হইয়াছিল। এই পূজার 'বাদ্যকরস্থান' 'শূন্যপুরাণ' ও "ধর্মপূজা-পদ্ধতি" প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়। এই পুস্তকগুলিতে অনেক ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে।

৪। বীরকথা, রূপকথা ও পল্লী-গাথা—প্রাক সংস্কৃত সাহিত্যের ইহারাই মূলসূত্র—সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালীর চিত্তের গৌরব। কয়জন পুরুষও ইহাদের অস্তিত্ব জানা ছিল না। রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজাদিগের সভায় রূপকথা শুনাইবার লোক ছিল। রাজা যখন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মর্মপীড়িত হইতেন তখন তাঁহার মাতুলের সভার "কথা বলিয়ে"রা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নানারূপ গল্প বলিয়াছিল। শুধু রাজসভায় নহে, রাজাদুঃপুরেও কথা বলিবার জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল—ইহাদের নাম ছিল "অ লাপনী"। রাজাদুঃপুরে এই "আলাপনী"দের মুখের কথা শুনিবার জন্য হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান অধিকারে এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ সর্বদা পাওয়া যায়। বোধ হয় পালরাজগণের সময়ে তাঁহাদের কাঁথিকথা ইহারা গান করিয়া শুনাইত, তাম্রশাসনে উক্ত আছে যে ধর্মপাল (?) নিজের প্রশংসাসূচক এই সকল গান ও গল্প শুনিয়া সভার মুখরোচক করিতেন। মুসলমানরাজত্বের সময়েও এই 'কথা' বলিয়েদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আলিবর্দী খাঁর সম্বন্ধে মুতক্ষরিনে লিখিত আছে যে, তিনি সন্ধ্যার একটা নির্দিষ্ট সময়েই এই গল্পকারীদের মুখে গল্প শুনিতেন। মীরকাসেমের পুত্র যখন যেদিন ঘোর অন্ধকার ও ঝড়বৃষ্টি-পূর্ণ নিশীথে আশ্রয়দাতার নিকট হইতে অল্পে অল্পে পলে পলে ক্ষুদ্র শিবিরে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, তখনও তাঁহার সঙ্গে ছুটি গায়িকা ও গল্প বলিবার জন্য একজন 'আলাপনী' ছিল। এই গল্পকারিকাও সেই বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, গোলাম হুসেন এই উপলক্ষে একটা ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মুখটীয়াছেন, যে ব্যক্তি দুষ্টের সঙ্গে থাকে সেও সেই দুষ্টের গতি প্রাপ্ত হয়। অবশ্যেষে বাঙ্গলার গল্পকারক ও আলাপিনীদের পদ বজায় রাখিয়াছিলেন।

এই সকল "আলাপিনী" ও গল্পকারক রাজা ও রাজকুলের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাসাদে নিযুক্ত হইত, সুতরাং সুকৌশলে গল্প করার নীতি তাহাদের শিক্ষা করিতে হইত। রাজাদের আশ্রয়ে এতদেশে যেরূপ অপূর্ব চাকচিক্য সৃষ্টি হইয়াছিল, এই গল্প বলিবার ভঙ্গী, বিষয়বর্ণন, চরিত্র, মূল ঘটনার বিবৃতি—গল্পকারেরা সেইরূপই আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে শিখিয়াছিল। এই গল্পের মধ্যে বৌদ্ধ জাতকের আশ্চর্য আত্মত্যাগ, হিন্দুর নিষ্ঠা, পাতিব্রত্য এবং নরনারীর বিবিধ আকর্ষণ এরূপ মনোরম ভাবে ফুটিয়া উঠিত, যাহার তুলনা ভদ্র-সাহিত্যেও বিরল। অথচ এক একটি গল্প অদ্ভুত পরিহাস-রস এবং বালকের মনোরঞ্জনের উপযোগী উপাদানও থাকিত। কথাগুলির অধিকাংশই গদ্য, মাঝে মাঝে গান থাকিত—

ইহাদের যেমনই উচ্চশিক্ষা তেমনই কল্পনা, পাঠক কখনও হাসিবেন এবং কখনও কাঁদিবেন এবং এক সঙ্গে যে দুইটি খেলা—আলো ও ছায়া—ইহার মুখে চোখে দেখা যাইবে। মাঝে মাঝে অলৌকিক ঘটনা থাকাতে অনেকদের কল্পনা-শক্তি উদ্বোধিত হইবে। গীতি-কথাগুলির মধ্যে মলুয়ার কাজলরেখা, আরও বহু নামরাম, নছর মামুদ, লখমালা, কঙ্কাবতী, খেকসার পাট পড়ুক কাহারটি প্রথম শ্রেণীর। ইহাদের মত গল্প অন্য কোন ভাষায় আছে কিনা জানিনা। কারণ যে জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামগ্রী, যাঁহাদের নবদ্বীপ সূক্ষ্ম দুষ্টান্তের অতুলনীয় নিদর্শন, সেই জাতি ভিন্ন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের জাল বুনিয়া আর কে এরূপ গল্প রচনা করিবে? মনে হয়, ইলানমং, বৌদ্ধ জাতক হিন্দু পুরাণ, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি সকলের রস নিংড়াইয়া এই গীতিকথা-গুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালার পাঠেরা জনের মনঃকথা যেরূপভাবে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

কঙ্কাবতী শুধুই ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য রচিত ২য় খোকনের ও ২য় খোকনের কথা পড়িলে এই দেখিবে যে, ইহা সমস্তই গল্প বটে গীতিকথার শ্রেষ্ঠত্ব ইহাদের নাই সত্য, কিন্তু কঙ্কাবতীই সমস্ত লক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্যদেশ বিজয় করিয়াছে এণ্ড্রুজ তাহার Indian Literature নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছে।

পল্লীগীতিকথা এই দেশের খুব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটিই মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বের নহে। সম্ভবতঃ শাসন-রাজাদের প্রশংসা-সূচক যে সকল গাথা পূর্ব্বকালে ছিল পল্লীগীতিকথাগুলি সেই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে। গঙ্গার আদি খুঁজিতে যেরূপ হিমালয়ে যাইতে হয় এই পল্লীসাহিত্যের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে হইলেও আমাদিগকে সেইরূপ সুদূর অতীতের দিকে তাকাইতে হইবে ইহাদের ভাব ও চরিত্রাঙ্কন সমস্তই নবদ্বীপের বিদ্বান্। ইহাদের অনেকগুলিতে মেয়েরা সেখানে উপস্থিত হইয়া নিজেরা বর নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া আসিতেছেন নিজের মতের সঙ্গে কন্যাকর্ত্তার নির্ব্বাচনের গরমিল [illegible] হচ্ছিল হইতে স্বীকার হন নাই, স্বয়ম্বরীর মতেই বরমালা দিয়াছেন। [illegible] মতো সুন্দর তাহার বর্ণনা অতি চমৎকার। ব্রাহ্মণদিগকে এই সকল [illegible] কোন স্থান দেওয়া হয় নাই বরং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নববিধানগুলি ইহারা অগ্রাহ্য করিয়াছে সমস্ত পল্লীসাহিত্যে একটা আশ্চর্য্য সৃষ্টি ও স্বাধীনতার ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই সৃষ্টি ও স্বাধীনতা একদল গোঁড়া ব্রাহ্মণের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে ইহারা পাশ্চাত্য হিন্দুসমাজে এখন আর পাত্তা দিতেছেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান গায়কগণ ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিছুপূর্ব্ব ডিরেক্টার ওটেন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ধূমাচ্ছন্ন, কাজুয়ে সহরের ধূসর আকাশ ছাড়িয়া হঠাৎ পল্লীর অবাধ ভাবে ও আলোর মধ্যে আসিলে মন যেরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, কৃত্রিম সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়িয়া এই পল্লীসাহিত্যের স্বচ্ছ রাজ্যে আসিলে সেরূপই আনন্দ হয়,

পল্লীগাথিকাগুলির কতটা অংশ বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে রহিয়াছে, তাহারা কথা যাইবে বাঙ্গালী তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার কতটা শক্তি রাখে। এই পল্লীগাথাগুলির সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে (৩৮৪-৪০২ পৃ.) একবার আলোচনা করিয়াছি। মহুয়া, মত্ত, চন্দ্রাবতী, রাণী কমলা, বনিক্ চুঁইচা কমলা, ভেওয়ানা মালুয়া, হছন খাঁ, ভেলুয়া, নছর মালুম, সুরেছো ও করম, আঙ্কা বঙ্কু প্রভৃতির কাহিনী সকলেই জানেন। আমরা বহু বহু কাব্য ও পুরাণে দুই চারিটি প্রধান নায়িকা পাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গাথাগুলির প্রায় প্রত্যেকটি গাঁয়ে দশ বার পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এত একটি অমর আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিহাস-বিশ্রুত ভারতের নায়িকা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শ্রৌপদী পর্য্যন্ত সকল গাথাগুলির নায়িকারা এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান লইতে পারেন। হয়েরার ফলের গোলাপের মত এই গাথাসাহিত্যে আদর্শ নায়িকার অভাব। ইহারা একঘেয়ে ভালো নহেন। পরিবর্ত্তনই ইহাদের একমাত্র আদর্শ নহে। অনেক স্থলেই রক্ষণশীল নায়ক এবং গ্রাম্যতার, আঙ্কা বঙ্কু প্রভৃতি পালার নায়িকাকে আড়ালে ফেলিয়া একেবারে প্রেম প্রচার নিজে ক্ষমা প্রেরণা করিয়াছে। ইহারা সামাজিক নিন্দা প্রশংসা কখনো ভিলমাত্রও বিচলিত হন নাই। হিন্দু সমাজের সহিত অন্যান্য শ্রেষ্ঠক চমৎকৃত হইয়া দেখিবেন এই গাথাকথিত মহিলা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ছাঁচে ঢালা, অথচ ইহারা কোন স্থানেই স্বাভাবিকে অতিক্রম করেন নাই। এমন কি আঙ্কা বঙ্কুর পালায় যখন রাজকুমারী স্বামীকে বলিয়া কহিয়া রাজ প্রাসাদের আরাম ত্যাগ করিয়া একটা অন্ধ ভিক্ষুকের জন্য প্রেমের আকর্ষণে দীনভাবে চলিয়া যেতে তখনও তাহার প্রতি দোষারোপ করার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় যেন বিশ্বের একখানি স্বর্ণপ্রতিমার মত প্রেমের দেবতা বিশ্বে উৎপাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। মনুতত্ত্ব, সামাজিক বাধা এই নৈসর্গিক ঘটি মিলার কাছে যেন ফুৎকারে উড়িয়া যেত, মহাজনের যে পথকাব্য প্রেমের আদর্শ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলার হাওয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বাধীন ও একনিষ্ঠ প্রেমিকাদের এই সকল ছবি দেখিয়া। গাথা রচকেরা সংসার পাঠের সীমা-রেখা চিহ্নিত করিয়াছেন, সহজিয়ারা সেই চিহ্ন ডিঙ্গাইয়া যাইয়া ইহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বসিয়াছেন। ইহারা ঐতিহাসিক মাটীর মানুষ নহে, কিন্তু ইহারাই স্বর্গের অধিবাসী, ইহাদের সহজ-ভোলা সাহসিক প্রেমই ভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র পন্থা—"ব্রহ্মাণ্ড বাহিয়া আছয়ে যে জন কেহ না চিনয়ে তারে, প্রেমের আরতি যেজন জানয়ে—সেই সে চিনিতে পারে"—চণ্ডীদাস। ইহাদের হৃদয়ের নিষ্কল, মুখিকাগুল্ল সাধুত্ব এবং ছলনা ও কপটতার অভাব শক্তি দর্শনে স্বতঃই হৃদয়ের অর্ঘ্য ইহাদের পায় দিতে ইচ্ছা হয়,—ইহাদের সমাজনিন্দিত দুঃসাহসিক কর্ম্মের জন্য অভিযোগের ভাষা মুখে আসিয়া ফিরিয়া যায়। এই গাথাসাহিত্যে বাঙ্গলার সমাজ, রাজনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক তত্ত্ব, আচার ব্যবহার, বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি নানাবিষয়ের যে উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে অমূল্য।

প্রবচন—ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। (১৯১৫-১৮ পৃষ্ঠা)।

বাঙ্গলার কতকগুলি ধর্ম্মকথা প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত, যথা—মনসামঙ্গল, শিবায়ন ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য এবং কৃষ্ণযাত্রাগুলি। ইহাদের পত্তন হইয়াছিল প্রাক্-সংস্কৃত যুগে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে মহারাজ ধর্ম্মপালের পত্নিকা রঞ্জাবতীর পুত্র গোপীচাঁদের ময়না গড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন কর্ত্তৃক কামরূপ-কাঁইর ও 'অষ্টোত্তরশত' বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া লাউসেনের মাতুল মহামদের মাতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে। পাল রাজাদের সময়ের এদেশের লোকের আদর্শ ও রাজভক্তি যে কত বড় ছিল, তাহার বহু আভাস এই কাব্যে পাই হয়। হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ বজ্রাবতার চরিত্র উজ্জ্বল ভাবে আঁকা হইয়াছে। কাম ভাবের আক্রমণ হইতে ও পরিশুদ্ধি রক্ষা করিবার জন্য ত্যাগপূর্ণ ভাবে জীবন-ত্যাগ এবং বৌদ্ধ জগতের কতকগুলি গুহ্যকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। শঙ্খার চরিত্রে অন্ধ মাতৃ-ভক্তি, স্বামীপুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াও যে রাজভক্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, এদেশের অধস্তন স্তরের লোকেদের উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রতিপন্ন করিতেছে। রাজমাতার সাক্ষাৎ দেবতার নিকট সকল চরিত্রের দুর্ব্বলতার চরিত্রে এবং হিন্দুসন্তানের ধর্ম্মান্তরিত হইবার পূর্ব্ব চরিত্র দৃষ্ট হইতেছে। ধর্ম্মমঙ্গলের আদিলেখক ময়ূরভট্টের রচনা এখনও সমস্তটা পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী কবি ময়ূরভট্ট, রূপরাম, ঘনরাম ও সীতারাম প্রভৃতি কতক জনের কাব্য আমরা পাইয়াছি। এই সকল কবি ব্যতীত আরও বহুকবি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিরা ব্রাহ্মণের আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ আদর্শ মিলাইয়া কাব্যগুলির গৌরবের হানি করিয়াছেন। এত বড় যাঁর লাউসেনকে ডোমের পর্ণকুটীরে ফেলিয়া তাঁহাকে দিয়া এত প্রহসনের অভিনয় করাইতে যাইয়া—তাঁহার পোষাকটা সমস্তই মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি প্রত্যেক খানি ধর্ম্মমঙ্গলে হিন্দুরাজত্বের কিছু-না-কিছু উপকরণ আছে, তাহা অতীব মূল্যবান্, অনেক লোকাচার ও প্রাচীন সমাজের তত্ত্ব এই পুস্তকগুলিতে পাওয়া যায়, শৈলশিপি ও তাম্রশাসনগুলির সঙ্গে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি মিলাইয়া পড়িলে বঙ্গের ইতিহাস-সন্ধানী পাঠক অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। এখনও বহু কবির রচিত ধর্ম্ম মঙ্গল বঙ্গের পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদের খোঁজ করে? এখনও [illegible] করে ইছাই ঘোষের গ্রামবাসীরা মন্দির কর্ণগড়ে লাউসেনের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ সেই প্রাচীন [illegible] কাহিনী কথা ঘোষণা করিতেছে। যে হরিপাল রাজার কন্যা কালেড়ার সঙ্গে [illegible] যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামাঙ্কিত হরিপাল নগরী এখনও বিদ্যমান এবং তাঁহার বিশাল পুরীর ধ্বংসাবশেষের টিবটা এখনও 'রাজবাড়ী' বলিয়া পরিচিত। ইছাই ঘোষ রাজশাসনের ঈশ্বর ঘোষ কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্ক চলিতেছে এবং প্রাচীন রাজা পাইলে তাঁহাকে স্বশ্রেণীতে টানিয়া আনিয়া স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য কেহবা তাঁহাকে কায়স্থ, কেহবা সদ্গোপ, কেহবা গয়লা করিবার চেষ্টায় আছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা পত্রিকা-গুলিতে কলিঙ্গের রাজচক্রবর্ত্তিগণের মধ্যে লাউসেন, মহীপাল প্রভৃতির নাম ছিল। আধুনিক পত্রিকাগুলি অনাবশ্যক মনে করিয়া লাউসেনের নামটি তুলিয়া দিয়াছে। মাণিক গাঙ্গুলীর

ময়ূর ভট্ট।

ঐ ব্রাহ্মণ অতি বিদ্বান সহিত বৌদ্ধ রাজকুলের কীর্ত্তিকলাপ এই পুস্তকের যখন একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তখন জাতি যাওয়ার ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন. হিন্দুরা প্রথমতঃ বৌদ্ধ জগতের প্রাচীন কাব্যগুলি, যাহা জনসাধারণের হাতে ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে বিধা বোধ করিয়াও এই সকল কাব্যের প্রেরণার সংখ্যা ও প্রাপ্যের অর্থের লোভবশতঃ শেষে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একটা প্রত্যাদেশের লোভই দিয়া অবশেষে তাঁহারা এই বিষয় হাতে লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মমঙ্গলকে নূতন আদর্শের আমলে আনিতে চেষ্টা করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়াছেন।

শিবায়ন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পূর্ব্বে শিবঠাকুর ইতর লোকের মধ্যে কৃষাণ-দেবতারূপে পূজা পাইতেন তারপর ব্রাহ্মণ্য যুগে এই শিবঠাকুরকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণরামদাস সেন এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিরা একটু উন্নত করিতে চেষ্টা করেন মুকুন্দরাম শিবকে কতকটা কালিদাসের শিবের মর্য্যাদা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহাভারতকার কাশীদাস ইহাকে পরিপূর্ণ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার শিবের মধ্যে—জনসাধারণের ধারণার চিহ্নমাত্র নাই সে শিব বুড়ুনী পাড়ায় যান না, ক্ষেতে হল চালনা করেন না, ষাঁড়ের উপরে চড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হন না, এমন কি শিবানীর সঙ্গে কোন্দলও করেন না। কিন্তু ভারতচন্দ্র এতবড় সংস্কৃতের ভার লইয়াও সাধারণের আবদারটা ছাড়িতে পারেন নাই। সেই পুরাতন খড়ার উপর তুলি বুলাইয়া তিনি তাঁহাকে কতকটা সভ্যতর করিয়াছেন মাত্র একমাত্র রামেশ্বর "শিবের গীতের" প্রাচীন সুরটি বজায় রাখিয়াছেন, ইহাতে শিবঠাকুর কৃষাণ, তাঁহার চাষ ভীম,—শিব ক্ষেতের আগাছা তুলিয়া ফেলেন, আইল বাঁধেন, শঙ্খে ফোকা লাগিলে ঔষধ দেন এবং জৌকের উৎপাত হইলে তাহাদের মুখে চুণ লাগাইয়া হত্যা করেন। ইনি খেয়া পাড়ি দিয়া বুড়ুনী পাড়ায় যান এবং শিবানীর সঙ্গে কোন্দল করেন এবং তাঁহার মান ভাঙ্গাইবার জন্য শাঁখারীর বেশ ধরিয়া হিমালয়ে যান। বিপ্রদাস গুপ্তের মনসামঙ্গলের শিবও কতকটা এই ধরণের, শিবের গীত সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা ২৭২ ১৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয়াছি। বস্তুতঃ এই গীত যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার একটি প্রমাণ এই যে বাঙ্গলা ভাষায় হিন্দুর যতগুলি দেবমহিমা-জ্ঞাপক প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়, যথা—চণ্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর ভাসান, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি তাহার সকলগুলিতেই শিবের ছড়া দিয়া মুখবন্ধ করা হইয়াছে। এই প্রাচীন শিব সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-বিরহিত। আশঙ্কিত নিম্ন শ্রেণীর শিব বঙ্গদেশের শত সহস্র কৃষকের ঘরের লোক, এই দেবচরিত্রটি কৈলাসেরও নয়, কৃষ্ণে-মসানেরও নয়, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিষ্কিকল্প যোগ-সমাধি-প্রাপ্ত তাপসও নহেন, এমন কি কালিদাসোক্ত আভিজাত্য-রুচি, কতকটা সন্দিগ্ধচিত্ত প্রেমিকও নহেন, তিনি চাষার ঘরের খাঁটি মানুষ। পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত পুরাণের যে প্রভা দেবদেব সর্ব্বত্র পড়িয়া শিবকে উজ্জ্বলা দান করিয়াছিল—

শিবায়ন।

জনসাধারণও যে আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিল এই প্রাচীন শিবচরিত্রে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

শিবের গানে শিব যে রূপ, কৃষ্ণ-ধামালীতে কৃষ্ণও কতকটা সেই প্রকারের, ইনি চাষার ঘরের ছেলে, রাধা চাষার ঘরের মেয়ে, কৃষ্ণ রাধার দইয়ের ভাঁড় বহিবার ঝাঁক

কৃষ্ণ-ধামালী।

ঠিক করিবার জন্য বাঁশ চাহিতেছেন, কখনও তাহার মোট বহিতেছেন, সমস্তই রাধার একটি চুম্বন পাইবার প্রত্যাশায়। কৃষ্ণ ধামালীর দুখু অমায়িকতাপূর্ণ চাষার ঘরের, এই ধামালী দুই শ্রেণীর এক শ্রেণীর নাম গুরুল, অপর শ্রেণীর নাম আসল। এই আসল এত অশ্লীল যে তাহা চাষারা পর্য্যন্ত নিজের ঘরে গাহে না—স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে দূরে রাখিয়া তাহারা মাঠে বাহিয়া গায়। কিন্তু গুরুল ধামালীতেও যে রুচি পাওয়া যায়—তাহাতে মধ্যে মধ্যে কাণে হাত দিতে হয়—চট্টগ্রামের কৃষ্ণকীর্ত্তন এই কৃষ্ণ-ধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ। যৌবনের এই শিবচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে চাষাদের দেবতা তাহাদের মাথা গুঁড়াইয়া যান নাই, তাহাদের ঠাকুরকে চাষারা নিজের দলে ভিড়াইয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। এই সকল দেবচরিত্রে ক্ষাত্রবত্তা, সাজসজ্জা বা আড়ম্বর কিছুই নাই, কোন বিধা বা সঙ্কোচ চাষারা তাহাদের দেবতাকে দেখে নাই, তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মানুষ করিয়া লইবার ফলে আমরা উত্তরকালে বৈষ্ণবদের পরকীয়ত্বের অপূর্ব্ব ধার্শনিক মহিমা দর্শন করিতে পাই। গৃহস্থালীকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের গৌরবে মণ্ডিত করিয়া ইহার আদর্শ বৈষ্ণবেরা বাঙ্গালীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত গড়িয়া দিয়াছিল চাষারা।

চণ্ডীপূজা বহু প্রাচীন। শ্রীযুক্ত ডাঃ আর. এন. সাহা, এম. আর. এ. এস ১৯৩১ সনের ১৮ই অক্টোবর তারিখের A.১৩৩০ সংবাদপত্রে চণ্ডীপূজা সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই পূজার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ দিয়াছেন, তিনি বলেন, "বাঙ্গালী বণিকেরা অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডী

চণ্ডী-বন্দন।

দুর্গা শ্যাম, কম্বোজ, চীন কোরিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সেলিবেস্ এবং ফিলিপাইন দ্বীপসমূহে লইয়া যান। এই সকল স্থানে [illegible] বর্ণমালার আঠারটি অক্ষর ব্যঞ্জনবর্ণ) মাত্র প্রচলিত, ১৮ মহাপুরাণ, ১৮ উপপুরাণ ও মহাভারতের ১৮ পর্ব্ব, বাঙ্গলার ১৮টি ব্যঞ্জ অক্ষরের মহিমা-জ্ঞাপক।" দক্ষিণা পথের একটি গিরিগুহায় অঙ্কিত অষ্টাদশ হস্তবিশিষ্টা প্রাচীন মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি যেরূপ, সেইরূপ প্রাচীন শক্তিমূর্ত্তি সুদূরাতীত কাল হইতে জগতের নানাস্থানে দৃষ্ট হয়, আমরা "History of the Bengali Language and Literature নামক পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, জাভা দ্বীপ হইতে ডাঃ ইজারস ৩০০০ খৃঃ পূঃ অব্দের সিংহবাহিনী মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে প্রস্তুত এসিরিয়া রাজ্যের 'ইমাসিলি'

গিরিমল্লিকে। তোগাজ কিউ নামক স্থানে। 'মা' দেবতার মূর্তি এইরূপ,—৮০০ খৃ' পূ' অব্দের কার্থেজের ভগ্নাও বোধ হয় এক পরিকল্পনা

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই মাতৃপূজা বহুপ্রচলিত তাহার অসংখ্য নামক স্থানে অনান একশতম চণ্ডীমন্দির আছে এই সমস্ত মন্দির ৪২৫ খৃ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল প্রাচীন বঙ্গদেশে দেখা যায় মাতৃপূজা বাঙ্গলার আর্য্যগণ প্রথমতঃ স্বীকার করেন নাই। অধিকন্তু মধ্যে ইহা প্রাচীনকালেই প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু প্রথমতঃ মেয়েদের দ্বারাই উহার প্রচলন ঘটিয়াছিল পুরুষ-সমাজগুলিরা লুকাইয়া পূজা করিতেন এবং তাহাদের স্বামীরা চক্ষুকে "ঠাইন" দেবতা বলিয়া কেবল ঘটে লাথ মারিতেন কিন্তু যে কবিরাই হউক বলিকরা শেষে উহা প্রচলন করিয়াছিলেন। বঙ্গেলায় মুচি, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর রমণীরা একরকমে শুধু উপাসক ছিল বোধ হয় মাসের পূজায় পশুবলি এমন কি নরবলি দেওয়া হইত, শেষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা পশু উহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে শাক্তের এতাবৎ পূজা ক্রমশ, বিলুপ্ত হয় শেষে মূর্তির ভগ্নে পৌরোহিত্যের ভার পড়ে শূদ্রপুরোহিতের হাতে ইহাই অপ্রচলিত হয় 'ডোমাক' কখনও "হাড়ির মেয়ে" বলা হয়, তা হয় বাড়ীতে বাঙ্গলা বাঙ্গলার এমনপক কোন কোন স্থানে আবেষ্টই হইত না, এরূপ জনশ্রুতি আছে "হাড়িকাঠ" শব্দ দ্বারা শুধু "হাড়িদের সহিত এই পূজার সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই, পশুবলি বাঙ্গালাগুলি যে এই শ্রেণীর লোকেরাই করিতেন তাহা অনুমান করা যায় এখনও কোন স্থানের কালীর মন্দিরে হাড়িরাই পূজারী পাণ্ড। দিনাজপুরের কোন কোনও স্থানে এরূপ পৌরোহিত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়

বাঙ্গলাদেশে এই পূজা বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিদ্বেষের সহিত দেখিতেন। বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই পূজা এবং এতৎসংক্রান্ত গানগুলির প্রচলন খুব প্রসন্নচিত্তে দেখেন নাই। শ্রীবাসের বাড়ীর দরজায় বিল্বপত্র ও সিন্দুর মাখা চণ্ডীর আবির্ভাব সময়ই কোন ব্রাহ্মণ রাখিয়া গিয়াছিল, এজন্য বৈষ্ণব-সমাজের সে কি ক্রোধ! সেই ব্রাহ্মণের এই অপরাধে কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল কবিতা বর্ণিত আছে নরোত্তমবিলাসে শাক্তপূজকের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই ভয়াবহ। কোন কোন শাক্ত মদ খাইয়া খড়্গহস্তে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন যাহাকে পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত। "হলেও ব্রাহ্মণ তার হাত না এড়ায়" বৈষ্ণবগণ কালীর নাম করিতেন না, মেঘাতের কালীকে 'মেহাই' ও জবাকুসুমের সঙ্গে কালীর পাদপদ্মের সম্বন্ধ আছে, এজন্য তাহাকে 'ওড়' ফুল এবং বিল্বপত্রকে 'অকপাতা' সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় স্বয়ং চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে অষ্টভুজার মন্দির দর্শন ও সেবাকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের শাক্ত-বিদ্বেষ।

শাক্তধর্ম্ম মুসলমান আধিপত্যের পর এদেশে খুব প্রচলিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম জগতের যাবতীয় মনুষ্যের জন্য দয়া খুলিয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও বাদ দেয় নাই বোধ হয় জগতে এরূপ ঔদার্য্য আর কোন ধর্ম্ম দেখাইতে পারে নাই চোর, ডাকাত, সিঁদকাটা,

'গামছামোড়া' সকলেই মায়ের সন্তান। যে জন যে ব্যবসায় করিবে, সেই কাজটিকে মা বলিয়া পূজা দিয়া যায়। আমি একখানি খড়্গ দেখিয়াছিলাম, তাহার উপর কালীর ক্ষুদ্র একখানি ধাতব মূর্তি। সেই মূর্তির নাম "ডাকাইত কালী"। মাতা সন্তানের কলঙ্ক নিজে লইয়া কলঙ্কিতা হইয়াছেন, তথাপি সন্তানকে ছাড়েন নাই।

বঙ্গদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে যাহাকে বাঙ্গালার গার্হস্থ্য অঙ্গ হইল, সে কথা পরে বলা যাইবে। এখানে মাত্র এই বলা উচিত যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস, নারায়ণ দেব ও কেমানন্দ একদিকে, অপর দিকে কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য ও জনার্দন তাহাই কবিত্বমণ্ডিত করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা এমন কি তৎপূর্ববর্তী সময়ের খসড়ার উপর পরবর্তী বঙ্গীয় কবিরা কারবার চালাইয়াছেন, তজ্জন্য শেষের কাব্যগুলির ইহা সত্য হইলেও সকলের আকর্ষণের সেই আদি যুগের চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল যে প্রাচীন যুগের খসড়া, তাহার প্রমাণ প্রায় এই বঙ্গীয় কবিদের নিজস্বপূর্ণ শ্লোক এবং এই দুই পুস্তকের কোনটিতেই ব্রাহ্মণদের সমুচিত সম্মান করা হয় নাই। এই কাব্যগুলির নায়ক নায়িকারা আদৌ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের লক্ষ্যীভূত নহে। উক্ত শাস্ত্রানুসারে নায়ক যদিও ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব হইবেন "ধীর উদাত্ত ও ক্ষমাবান্ হইবেন, কিন্তু এই কাব্যগুলির মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক বাধ কালকেতু, সে তো পিতৃধনের আদৌ নহে বরং দুখী—"গামছাখানি কাঁধে বেন ভেকধারী ভাণ্ড। ভোজন কুবাসত বাঘের চামড়া পরিধান।" পণ্ডিত হওয়া দূরে থাকুক সে ত স্বাক্ষর, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তো সে নহেই—চণ্ডীর বাধ, ব্যাধার গৃহে প্রবেশ করিবে তাহার "উচিত হয় স্নান।" চণ্ডীমঙ্গলে ব্রাহ্মণদের অবস্থা এত শোচনীয় যে, একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যত্নবিরক্ত কথা বলিয়াছিল, এজন্য সেই "নফরে আনেন কবি মারে ভারে ধাক্কা" (মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য)।

কথা হইতে পারে, চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মুকুন্দরাম পুরাতন কাব্য প্রাচীন কবিদের খসড়াটা বদলাইয়া ফেলিলেন না কেন? কেন তাহা আলঙ্কারিকদের মতানুসারে নূতন ছাঁচে ঢালিলেন না? উত্তর, এই সকল কাব্য যুগ যুগ ধরিয়া উৎসব উপলক্ষে চণ্ডীমণ্ডপে গাওয়া হইত, আখ্যানবস্তু নূতন হইলে জনসাধারণ সেই অনভ্যস্ত কথা শুনিবে কেন? কিন্তু [illegible] একজন প্রধান পাণ্ডা মুকুন্দরাম একেবারে নীরস হইয়া প্রাচীন গল্পের [illegible] ঝুলাইয়া যান নাই। ফুল্লরার সঙ্গে ধনপতির হাস্যপরিহাস ও রসিকতা এবং তাহার বেশা সম্বন্ধে বিবাহ তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। সেগুলি শ্রোতারা চিরকাল উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কবি তাঁহার সমস্ত আক্রোশ জনার্দন ঘটকের মুখে ব্যক্ত করিয়া ফুল্লরার পিতা লক্ষপতি কেন অষ্টম বৎসর বয়সে মেয়েকে গৌরীদান না করিয়া 'ধাড়ি' করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে খুব তীব্র ভৎসনা করিয়া মনের কাল মিটাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃতের পৌত্র। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের অপলাপ করিতে কিছুতেই স্বীকার করেন নাই। এজন্য তিনি ব্যাধের ছেলে ও বেদের মেয়েকে কাব্য-নায়ক না করিয়া তদীয়

চণ্ডীমঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছেন। কাব্য-নায়ক গুণবন্ত রাজার পুত্র সুন্দর—ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র এবং সপ্তগুণান্বিত নায়িকাও সর্বাংশেই তাঁহার যোগ্যা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুমোদিতা।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এগুলির আদিম লেখার উপর নানারূপ চাকচিক্যের খেল দেখাইয়া পরবর্তী কবিরা "নূতন মঙ্গল" লিখিয়াছেন। আদিযুগ ও মধ্যযুগ ছাড়াইলেই প্রভাব ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

গাথা-সাহিত্যে ও নাথ সাহিত্যের কালসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। ইহার অনেক-গুলিতে চতুর্দশ, পঞ্চদশ এমন কি তৎপরবর্তী যুগের ভাষা-চিহ্ন দেখিলেও ইহাদের অনেকগুলি বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথের সময় ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময় আমরা জানি, তাঁহাদের সম্বন্ধে গাথাগুলি সেই সময়ে কিংবা তাঁহাদের মৃত্যুর অনতিপরে রচিত হইয়াছিল বলিলেই মনে হয়, তবে যুগে যুগে তাহাদের ভাষা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং নূতন নূতন কবিরা তাহাদের নূতন নূতন অঙ্গসজ্জা পরাইয়াছেন, তথাপি ইহাদের মধ্যেই সেই প্রাচীন ভাষা ও ভাবের অনেক চিহ্ন রক্ষিত রহিয়াছে। ডাক ও খনার বচন এবং ধাঁধিকলাগুলি সাধারণতঃ সময়ের নির্দেশ বলিয়া অনুমিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দী হইতে এই শ্রেণীর কবিতাগুলি আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য

যে বঙ্গদেশ এক সময়ে ঐশ্বর্য, শস্য-রক্ষিত, ভদ্রশীল প্রভৃতি বৌদ্ধদেশের রাজধানী ছিল—যাহার এক প্রান্তে সাতাশের রাজা হরিশ্চন্দ্র পরিণত বয়সে ভিক্ষু সংঘিয়া ধর্মেশ্বরীর সাথে বৌদ্ধ মঠগুলিতে জীবনের শেষ-বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, এবং নাড়ার ও সুবর্ণপুরের মধ্যবর্তী বিশাল বিহার জগদ্দল শির উত্তোলন করিয়া "বাক্যাসন" নামে পরিচিত হইয়াছিল, অন্যদিকে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী পল্লী বৌদ্ধ যোগী ও যোগিনীদিগের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, যেখানে তিব্বত সাত সপ্তম শতাব্দীতে অবস্থিতি বৌদ্ধ বিহার দেখিয়া গিয়াছেন সেই বঙ্গদেশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নব ব্রাহ্মণের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগণ সমাজে যে সকল পরিবর্তন আনয়ন করিলেন, তন্মধ্যে প্রধান এই কয়েকটি: (১) সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইল। (২) বেদীদানের ব্যবস্থা হইল। (৩) কল্পিত

ভাষান্তরিত হওয়া বলিয়া কেবল ভক্ত গঠনের উপযুক্ত স্থান পাইল না। (৫ দেবভাষা সংস্কৃতের প্রভাব অলৌকিকরূপে বৃদ্ধি পাইল। ৫ ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানে আরূঢ় ছিলেন বলিয়া কহিলেন—তাঁহারাই সমাজের একমাত্র ভরসা। অপর সব জাতি পতিত রহে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কোন প্রকার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল না। কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া অন্য কোন জাতি নাই, ইহাই তাঁহারা প্রচার করিলেন।

ব্রাহ্মণ-প্রভাবে আর্যের অপচয়।

ভক্তির একমাত্র লক্ষ্য, জ্ঞান ও কর্মের অধিকারে লোপ পাইল। কর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণকে ধন ও শূদ্রকে শস্য করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। একদিকে বৈপায়ন ব্যাস ব্রাহ্মণকে কোন্ স্থিতিতে কি দান করিলে কি ফল হয়, তাহাই লিখিয়াছিলেন ৪৮ পৃষ্ঠা দুইটা। সেই লেখাটাই বঙ্গীয় সমাজের অনুশাসনরূপে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণেরাই এখন সকল শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের ফলে বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। পঞ্চাব কোকিলের কণ্ঠ অবশ্য থামে নাই। বেদ ধর্মশাস্ত্র হইতে সুরু করিয়া, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকৃতি যে যে স্থান সেন-রাজাদের অধিকৃত হয় নাই, সেই সেই স্থানের ব্রাহ্মণেরা এমন বোদ্ধ কলেবরে পুষ্ট হইয়া পালযুগের শুদ্ধ যুগের যে কোনরূপের ও পুরুষকারের অনুশীলনে লাগিল, যাহাতে পরবর্তী সে সকল দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ যে স্থান হইতে সর্বোৎকৃষ্ট পালযাগধাগুলি পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা বহুকাল সেন-রাজত্বের হাত হইতে স্বীয় স্বাধীনতা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। এক সময় সমস্ত বঙ্গদেশ এই গাথা-সাহিত্য লইয়া বিভোর ছিল, কিন্তু এখন সেন-রাজগণের যুগে সেই গাথা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হইল। গাথার কবিগণ সেন-রাজগণের কীর্তি কেহই বর্ণনা করেন নাই। হাই হউক, বল্লাল, বল্লাল, বল্লালসেন, বিজয়সেন প্রভৃতি পাল-রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে যাঁহারা গান রচিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন, বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেন কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন বা সুর সেন সম্বন্ধে একটি গাথাও রচনা করিয়াছেন বলিয়া শুনেন নাই। অথচ তাঁহাদের পরে ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্য, ধনমাণিক্য ও ৪ স্তর কমল সেন সম্বন্ধীয় সহ গাথার উল্লেখ আছে—এদিকে ঈশা খাঁ, মসনদ খাঁ, বিক্রমাদিত্য সহ মুসলমান এবং রাজসাহ-সম্বন্ধীয় পালগাথা আমরা পাইয়াছি। ৫ ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম অবলম্বন করিয়া পালরাজত্বের কোন উৎসাহ দেন নাই। ৫ ধর্ম-কোলে অবস্থিত হওয়াতে মানুষের কবিত্ব, লৌকিক জ্ঞান, এ সমস্ত উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িল। ইহারা অলঙ্কার করিয়া বলিলেন, মানবের কার্তিকথা লইয়া কোন কাব্য রচনা পশুশ্রম মাত্র। বিশেষ ঘৃণা করিত তাহারা। এই সব নরপালদিগের দেবলীলার সঙ্গে কবি ও অপরাপর লোকগণের লক্ষ্য হইল। আমরা এইজন্যে মাণিকচন্দ্রের রাজা, কাঞ্চনমালা-সোনা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি আরও বহুবিধ কথা হারাইলাম,—পাইলাম ধর্মের উপাখ্যান, প্রহ্লাদের কৃষ্ণপ্রীতি ও দেবকার্যে উৎসর্গ পাণ্ডবদিগের কথা, ভগবানের অবতার রামের লীলা ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বহু গল্প কাহিনী। পালগাথার স্থানে পাইলাম কলকত্তা, শীতিকথার স্থলে পাইলাম কীর্তন। আমরা হারিয়াছি কি জিতিয়াছি—তাহার বিচারস্থল এখানে নহে।

পল্লীসাহিত্য একেবারে আড়ালে পড়িয়া গেল, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ও ব্রাহ্মণ কবিকেরা পুষ্পমালের ছায় মস্তক হেঁট করিয়া বেদীতে বসিয়া ব্যাখ্যা, বর্ণন ও কীর্ত্তনের ভার লইলেন। পল্লীভাষার বিরুদ্ধে ঘোষণা বন্ধ হইল। যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা কথিত ভাষায় লিখিবেন, অথবা শ্রবণ করিবেন তাঁহাদিগের জন্য ঘোরতর নরকের ব্যবস্থা হইল, ব্রাহ্মণগণ এই অভিসম্পাত করিলেন।

বঙ্গ ভারতী এই বিপদের সময় বিদেশ রাজপদের বাহু আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন। মুসলমান নবাবের, এ দেশের শত শত ধর্ম্ম উৎসব সম্বন্ধে তথ্য ও বিবরণ জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই দুরূহ ব্যাপার কতদূর অসম্ভব কার্য্য, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। মোটকথা তাঁহারা মুসলমান নবাবদিগকে শাস্ত্রকথা জানিতে দেন নাই, ভয় দেখাইলেন—শুধু ব্যাকরণ পড়িতেই এক জীবন কাটিয়া যাইতে পারে। তুর্কিরা এদেশে বাস করিয়া এদেশের একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলা কথা কহিতে ও লিখিতে জানিতেন। মুসলমান রাজারা সংস্কৃতের মহিমা শুনিয়া কতকটা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সংস্কৃত হইতে মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় অনূদিত করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতে আদেশ করিলেন। এই কার্য্য ব্রাহ্মণগণ অবশ্য ঘোর অনিচ্ছায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নসরত সাহের আদেশে একখানি মহাভারত রচিত হইয়া ছিল, তাহা এখন লুপ্ত কিন্তু তাহার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই মহাভারত হয়ত খুব উৎকৃষ্ট ভাবে সঙ্কলিত হয় নাই—এজন্য হুসেন সাহের সেনাপতি চট্টগ্রাম বিজয়ী পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক আর একজন কবি-দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। এই অনুবাদের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার পরে পরে পরাগল খাঁর অনেক স্তুতিবাদ আছে। জৈমিনী কৃত অশ্বমেধ পর্ব্বের একখানি অনুবাদ পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে বিরচিত হইয়াছিল, সাহিত্য পরিষৎ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুবাদ কারকের নাম শ্রীকরণ নন্দী। গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইউসফের আদেশে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ খৃঃ ১৪৭৩-৮০ অব্দে সঙ্কলন করেন, গৌড়েশ্বর তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি সসম্মানে "প্রভু গয়েসুদ্দিন সুরতানের" উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একটি পদে লিখিয়াছেন যে, নসিরা সাহ প্রেমের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছেন এবং "পদ্মিনীর ধর্ম্ম গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভনে" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মুসলমান বাদসাহগণের মধ্যে হুসেন সাহই "দেশী ভাষার" সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। পরাগলী মহাভারতে ইঁহাকে "কলিযুগের কৃষ্ণ অবতার" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। খৃঃ ১৬৯৪ অব্দে রচিত মনসামঙ্গলে বিজয়গুপ্ত ইঁহাকে "সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি-তিলক" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। আরও কয়েকখানি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ইঁহার সুখ্যাতি আছে।

তুর্কী সর্দারদের দ্বারা মহাভারত ও সাহ সমাদর।

মুসলমান নৃপতিগণের উৎসাহ।

হুসেন সাহ তাঁহার দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসরের রাজত্বকালে সমস্ত বঙ্গদেশের প্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, ইনি চৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং কথিত আছে ইঁহারই রাজ-প্রামাদে হিন্দু ও মুসলমানকে এক দেবতার উপাসক করিবার উদ্দেশ্যে 'সত্যপীর' নামক মিশ্র দেবতা পরিকল্পিত হন। এই সত্যপীর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মৈমনসিংহ-নিবাসী কবি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এক পাঁচালী লিখেন। এই কাব্যে সত্যপীরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর, পুস্তকখানি কবিত্ব-পূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত, ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আমার নিকট ইহার হস্ত লিখিত একখানি নকল আছে কাব্যখানি অনুমান ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সত্যপীরের ন্যায় 'মাণিকপীর' এবং 'কালুগাজি' হিন্দুমুসলমানের উপাস্য মিশ্র দেবতা এবং ইঁহাদের মহিমজ্ঞাপক অনেক পুস্তকও বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালাভাষার উৎসাহ দাতা আরও অনেক মুসলমান বাদসাহ-ওমরাহের নাম আমরা পাইয়াছি। এখানে তাঁহাদের উল্লেখের অবকাশ নাই। আমাদের ধারণা যে মুসলমান বাদসাহদের অনুগ্রহে বাঙ্গালাভাষা রাজদরবারে ও ভদ্র-সমাজে প্রবেশের প্রথম সুবিধা পাইয়াছিল, নতুবা সংস্কৃতের একটি সহজ কাব্যের ভাষা আমাদের দেশীয়ভাষা মাত্রেরই জন্মের ধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলে ব্রাহ্মণ-শাসিত ভদ্র-সমাজে স্থান লাভ করিতে পারিত না। বঙ্গীয় মুসলমানের অধিকাংশই বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধজন-সাধারণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল। সুতরাং স্বদেশের ভাষার উপর অনুরাগ বঙ্গের মুসলমানেরা পুরুষ-পরম্পরায় লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা এই সকল কাব্যে তত উৎসাহ দেখান নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বর কি জাতীয় ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহার অসংখ্য ভণিতার মধ্যে কোন না কোন স্থানে "দ্বিজ" শব্দের প্রয়োগ থাকিত বলিয়া মনে হয়। এক 'কবীন্দ্র' ছাড়া তাঁহার আর কোন উপাধির উল্লেখ নাই। এখনও চট্টগ্রাম বা নোয়াখালীর কোন পুঁথিতে তাঁহার আত্মবিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীকরণ নন্দী ব্রাহ্মণ ছিলেন না—বৈদ্য বা কায়স্থ ছিলেন। আলাসের বসু কায়স্থ ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণগণ সহজে গণিত ভাষায় কাব্য লিখিতে তাঁহারা নাই কিন্তু তৎপরে আসেন যা বাদসাহগণের আদেশ ও উৎসাহে তাঁহারা এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহা মহারাজদের রাজসভা ও বাদসাহের দরবারের দেখাদেখি বঙ্গভাষার জন্য তাঁহাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

মহাভারতের সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন সঞ্জয়। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বৈদ্য ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাঁহার বাড়ী বিক্রমপুর ছিল, তথায় ঐ গোত্রীয় বৈদ্য এখনও অনেক আছেন। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। পরবর্তী

সঞ্জয়।

অনুবাদকগণের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও ছুটি খাঁ পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী নিত্যানন্দ ঘোষ সমগ্র মহাভারতের যে অনুবাদ করেন, তাহা গ্রাম দেশে ও চব্বিশ পরগনায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গে

কবি ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন ইঁহারা বিক্রমপুর-ঝিনাদলিবাসী এবং সুবর্ণবণিক ছিলেন। ষষ্ঠীবরের পিতা কুলপতির কথা গঙ্গাদাস খুব গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ একই সময়ে এবং কাশীদাসের কিছু পূর্বে রামেশ্বর নন্দী নামক আর একজন কবি মহাভারতের একটি অনুবাদ সঙ্কলন করেন। মহাভারতের প্রায় সমস্ত অনুবাদই কৃষ্ণপ্রেমের কাহিনীর বাহুল্য লিখিত—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীতেও ইহাদের বঙ্গভারতীর পূর্ণ বিকশিতা হোচে নাই।

কবি কাশীদাস এবং অন্যান্য অনুবাদক।

এই অনুবাদকগণের মধ্যে অবিসংবাদিত ভাবে কাশীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে। এই সিংহাসন ইঁহাদের বিক্রম, 'সরলজন' বিরুদ্ধ সিংহের প্রতিষ্ঠাপিত "সিংহপুর"। কাশীদাসের সুকবিত্ব বাঙ্গালী স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অনেকগুলি ভাতা ছিলেন ইঁহারা সকলেই সুকবি ও গায়ক ছিলেন। ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের "কৃষ্ণমঙ্গল" ও গদাধর দাসের "জগন্নাথমঙ্গল" দুইখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। কাশীদাসের মহাভারতে সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি, সুললিত শব্দচয়ন এবং বর্ণনা-বৈচিত্র্য ও রসসঞ্চার করার ক্ষমতা তাঁহার বিশেষরূপ ছিল। তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাটের কতকদূর লিখিয়া স্বর্গগত হন এবং তাঁহার মৃত্যু কালে আদেশ করিয়া যান যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস বাকী কয়েক পর্ব্ব রচনা করিয়া দিবেন কিন্তু এই শেষ পর্ব্বগুলির অনুবাদ প্রথম পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের ন্যায় 'আদর্শের ঝোড়াভাঙ্গা' নন্দরাম দাস নিজাননিক প্রেমের নিকটেই এ বিষয়ে বেশী ঋণী তাঁহার মহাভারত হইতেই তিনি বেশী সঙ্কলন করিয়াছেন। এমন কি স্বর্গারোহণ পর্ব্বের "গন্ধর্ব্ব-বিলাপের" উৎকৃষ্ট অংশটি তিনি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত হইতে হুবহু নকল করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইয়াছেন। বাঙ্গলার কত কবি যে মহাভারত এবং ইহার অংশ বিশেষের অনুবাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। কাশীরামদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর, এবং গোপীনাথ দত্তের "দ্রৌপদীবস্ত্র" প্রভৃতি পালা সম্পূর্ণরূপ মৌলিক। কাশীদাসী মহাভারতে শ্রীবৎস ও চিন্তার মত কতকগুলি উপাখ্যান মূলবহির্ভূত। ঐ উপাখ্যানটি গ্রাম্য গাথা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং "তিলক বসন্ত" পালার (পূর্ব্ব খণ্ড, পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা) সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য সকলেরই চোখে পড়িবে। কাশীদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মহাভারত শেষ করেন।

রামায়ণ, কৃত্তিবাস।

সম্ভবতঃ রাজা গণেশের আজ্ঞায় ফুলিয়া গ্রামের মুরারি ওঝার পুত্র বনমালী মুখুটির ঔরসে এবং মালিনীর গর্ভজাত কবি কৃত্তিবাস সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা রামায়ণ রচনা করেন। রচনার প্রাঞ্জলতা, পুরাতনত্ব এবং গ্রহণ-রঞ্জন সম্বন্ধে উপযোগিতা-বোধ কৃত্তিবাসের প্রধান গুণ। মূল রামায়ণের কোন অংশ বাদ দিয়া কি রাখিলে কাব্যখানি বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে, ইহা তিনি বিশেষরূপ জানিতেন, এবং ঠিক এই বোধ না থাকাতে সুপণ্ডিত ও সুকবি রঘুনন্দনের 'রামরসায়ন' খানি কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের পরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ময়মনসিংহ নিবাসী

বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে পল্লীগাথার আকারে যে সংক্ষিপ্ত রামায়ণখানি রচনা করেন তাহা এখনও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে পল্লীবাসিনীগণ বিরহ বাসরে গাহিয়া থাকেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে কালোপকথনের অন্তর্গত চন্দ্রাবতীর রামায়ণের একটি স্থল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সরল সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মনের কথা করুণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিতে চন্দ্রাবতী সিদ্ধহস্তা। উঁহার অসম্পূর্ণ রামায়ণ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন। (পূর্ববঙ্গ গীতিকা চতুর্থ খণ্ড, ২য় ভাগ)।

কিন্তু এই রামায়ণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মৌলিকত্বের দাবী কবিচন্দ্রের। ইঁহার নাম শঙ্কর, উপাধি 'কবিচন্দ্র'। সকলের রামায়ণে অঙ্গদের রায়বার' 'তরণীসেন ও শাবাচর যুদ্ধের পালা পড়িয়া মনে কবিচন্দ্রের লেখা। কবির সম্মুখে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ অবতারের অব্যবহিত পরে লীলা করিয়া গিয়াছেন। ফকাই, মাধাই আদোক, ভালপন্থ প্রভৃতি দানব-প্রকৃতি লোকেরা ইঁহাদের কৃপাকটাক্ষে উদ্ধার পাইয়া গেল। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা কবির হৃদয়পটে গাঢ় রঙে অঙ্কিত হইয়াছিল। তৎকৃত রামায়ণে সেই সকল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। বাস্তবিকের যুদ্ধ কাণ্ডটাকে তিনি ভক্তির কৃষ্ণ বা সংকীর্তন-ভূমিতে পরিণত করিলেন। রাক্ষসেরা ফকাই-মাধাইএর ন্যায় রাম-লক্ষ্মণের প্রতি অস্ত্র ছুড়িয়া মেরে অন্তরীক্ষের উচ্চে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা রামনামের ছাপ যুক্ত অঙ্গ ও রথের চতুষ্পার্শ্বে অঙ্কিত করিয়া হরিনামে কীর্তনভূমির অভিনয় করিতে লাগিল। একটা জীবন্ত ঐতিহাসিক ঘটনার ছাঁচের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই সকল বিষয়ের বিসদৃশতা আমাদের চোখে ঠেকে না। যিনি যুদ্ধ করিবেন তাঁহার বৈকালোচিত অঙ্গ-বিন্যাস এবং যিনি শত্রু তিনি তাঁহাকে কোলে ধারণ করিয়া ভক্তি ও ক্ষমার লীলা-প্রদর্শনের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও বিরুদ্ধের উপলব্ধি হইতেছে—তাহা আমাদিগের এই সকল কাহিনীর যথার্থ রস উপভোগ করিতে কখনও বাধা জন্মায় না। মাতৃস্নেহ চিরদিনই সন্তানের সহিত যুদ্ধ করিতেছে—তাঁহার বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করিতেছে অথচ অন্তরস্থ হইয়া তাহারই পদে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কবিচন্দ্রের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে শুধু বৈষ্ণব ইতিহাসের আভাস নহে, পূর্বোক্ত সনাতন ধর্মের উপাদান থাকাতে উহা 'চিরকাল জনসমাজে ও সুখপাঠ্য হইয়া থাকিবে। 'অঙ্গদের রায়বারের' মধ্যে যে পরিহাস রসিকতা আছে, তাহা বিশেষ মার্জিত রুচির পরিচায়ক না হইলেও উহা তৎকালোপযোগী হইয়াছিল। এই মৌলিকত্বই কবিচন্দ্রের বাহাদুরী। দুঃখের বিষয়, তদপেক্ষা 'কৃত্তিবাসী' রামায়ণ কবিচন্দ্রের সমস্ত রচনাগুলি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া এবং নিজ দেহে কৃত্তিবাসের নামের লিলেমোহর লাগাইয়া তাঁহারই স্বত্ব সাব্যস্ত-পূর্বক আজ পর্যন্ত সমানে বাজারে চলিতেছে।

রামানন্দ ঘোষ নামক একব্যক্তি বহুমান হইতে 'রামলীলা' নামক একখানি রামায়ণ প্রণয়ন করেন। উহা ১৬৯৪ খৃ. অব্দে বা তৎসন্নিহিত কালে বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানির মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে—কালিদাসের রঘুবংশ হইতে তিনি কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ কথা এই যে ইনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং

নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি সেন্সকৃতে লিখিয়াছেন যে পূর্বে দারু-

বুদ্ধের অবতার রামানন্দ ঘোষ।

ব্রহ্মকে ইনি 'আপিছ' বৈষ্ণব ও মুসলমানগণের হাত হইতে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া পুনরায় বৌদ্ধধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। দারুব্রহ্মকে এইভাবে অভিনিক্ত করিয়া তিনি মহাসমারোহে তাঁহার রামলীলা (রামায়ণ) পাঠ করিলেন, এই উপলক্ষে তিনি কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কাব্যের যে প্রদত্ত তাঁহার আত্মবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় যে তাঁহার বহু শিষ্য ও অনুচর ছিল। তিনি নিজকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই কাব্যের মাত্র একখানি পাটনা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে — তাহা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট আছে। তিনি এতদ্বিষয়ক হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনার পুস্তকে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ইতঃপূর্বে আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই পুস্তকের কথা লিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়া উচিত। রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদকগণের মধ্যে মহাভারতের লেখক হটবর সেন ও গঙ্গারাম সেনের রামায়ণ উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বহু পাণ্ডিত্য ও

অপরাপর রামায়ণ।

কবিত্বপূর্ণ বৃহদ্ধর্মপুরাণের 'রামরসায়ন'খানি কবি রঘুনন্দন গোস্বামীর অপূর্ব কীর্তি। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। এই কাব্য হটবরা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামমোহনের রামায়ণ ভক্তির অফুরন্ত সুধাভাণ্ডের মত, তাহার একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় আছে। কমচন্দ্র রাজার আদেশে দ্বিজ ভবানী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে 'লঙ্কা-দিগ্বিজয়' নামক এক কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য রচনার জন্য তিনি উক্ত রাজার নিকট হইতে প্রায় ১০ টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরচিত। সেই সময়ে এই পারিশ্রমিকের মূল্য অনেক বেশী ছিল। শিবচন্দ্র সেনের "সারদা-মঙ্গল"—রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। শিবচন্দ্র সেন বৈদ্যসন্তান, বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন। পাঁচপুরুষ পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন। এই পুস্তক একবার ছাপা হইয়াছিল।

ভাগবতের অনুবাদের মধ্যে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

অনুবাদ-গ্রন্থ।

বিখ্যাত প্রাণানন্দ, শঙ্কর কবিচন্দ্র, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস ও মাধবাচার্য প্রভৃতি কবিরা ভাগবতের অংশবিশেষ রচনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য গ্রাহ্য করেন না, সুতরাং অধিকাংশ অনুবাদই ভাগবতের ১০ম ও ১১শ

ভাগবত ও অপরাপর পুরাণ।

স্কন্ধ সম্পর্কিত এবং ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভাগবতবহির্ভূত কথা আছে। রাধার প্রেমলীলা অনেকগুলির মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গটি অবশ্য ভাগবতে নাই। আমরা প্রায় সমস্ত পুরাণেরই প্রাচীন বঙ্গানুবাদ পাইয়াছি। তাহা ছাড়া রূপ-গোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গীয় প্রাচীন পদ্যানুবাদ আমরা পাইয়াছি। শেষোক্ত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন কবি রঘুনন্দন দাস। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন।

রসময় দাস ও অপর কয়েকজন কবি জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণানুরাগের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী ১৭৩৬ খৃঃ। অনুবাদক গিরিধর জয়দেবের ছন্দের মাধুর্য্য বজায় রাখিয়া অনুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহাতে জয়দেবের ঠিক সুরটি ধরা পড়িয়াছে

গীতগোবিন্দ

১৬৩৮ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আলোয়াল মলিক মহম্মদ জোসি রচিত হিন্দী পদ্মাবতের যে বঙ্গীয় পদ্যানুবাদ করেন তাহা শুধু অনুবাদ বলিলে অপ্রতিষ্ঠ অবিচার করা হয়। বাঙ্গলা 'পদ্মাবতে' আলোয়াল যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব-শক্তি, হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণের জ্ঞান এবং সংস্কৃতের উপর অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। ভারতচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে আলোয়াল বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের যে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদিগকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া তোলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সংস্কৃতজ্ঞ এই কবির অনেক প্রাচীন পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফারসী অক্ষরে লিখিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি কোন কোন ইংরেজের মনে বঙ্গাক্ষর রোমান অক্ষরে পরিবর্ত্তন করিবার কথা উদয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইবার নহে। পাল ভাষাটী দেবনাগর অক্ষর ছাড়িয়া রোমান অক্ষর গ্রহণ করিয়াছে সংস্কৃতের অতি সরিহিত পালি ভাষার এই বেশ পরিবর্ত্তন আমরা একেবারেই অনুমোদন করি না। তাই বলিয়া তাঁহারা সংস্কৃত, বাঙ্গলা এবং অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার উপর এই কৃপাদৃষ্টি চালাইতে সফল হইবেন, এমন বোধ হয় না।

প্রত্যেক বিষয়ের ভালমন্দের একটা দিক আছে। বাঙ্গলায় তিনটা 'ন,' তিনটা 'র,' প্রভৃতির কোন উপযোগিতাই নাই। সাহেবেরা এদেশে আসিয়া গরম বস্ত্র ছাড়িয়া এখানকার উপযোগী ধুতি চাদর পরেন না বলিয়া গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মে সিক্ত করিয়া নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেন, তবু গরম কাপড় ছাড়েন না। বাঙ্গলা অক্ষরে যত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে কথাগুলি লিখিত হয়, রোমান অক্ষরে লিখিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী স্থানের দরকার। আর ভারতবর্ষে যে শত শত প্রাচীন পুঁথি আছে, রোমান অক্ষর প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা পড়িবার লোক জুটিবে না। এই জাতীয়তা-বিরোধী প্রস্তাব কখনও সমর্থিত হইতে পারে না, মুসলমানেরা ফারসী অক্ষর চালাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে কিছু কিছু আছে। আশা করি কেহ বাঙ্গলা ভাষার বুকের উপর এই খেল দিখাইতে চেষ্টা করিবেন না।

বাঙ্গলার বিরাট্ অনুবাদ-সাহিত্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। হঠাৎ সংস্কৃতের মহাভাণ্ডার নিজের গৃহের দ্বারে উন্মুক্ত দেখিয়া বঙ্গীয় অনুবাদ কারেরা দুহাতে শব্দ লুণ্ঠন আরম্ভ করিতে লাগিয়া গেলেন। প্রথম প্রথম বঙ্গভাষায় সংস্কৃত

অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক অবস্থা।

যোজনা বিমুখ হইয়াছিল, কৃত্তিবাস কবিরাজের "একাদশাপবাস" ধাত্রাখণ্ড প্রভৃতি সন্ধি-প্রয়োগ উৎকট। এমন কি বহু পরে রামপ্রসাদের "জননী জগদ্ধি জগদম্বিকমধুনা তব কৃপি নহি নহি" ও ভাল কিন্তু আলোয়ালের "মলয়সমীর সুশোভন সুশীতল, বিকোলিত পতি কতি বসন্তাবে; প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল ভ্রমরক্রম, মুকুলিত চূত-লতা কোরকঞ্জালে।" প্রভৃতি পদে বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কৃতের রাজ-যোটক হইয়াছে এই ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী ভারতচন্দ্র, তিনি সংস্কৃত ছন্দের তোটক, ভুজঙ্গ প্রয়াত প্রভৃতি

ছন্দ নির্দ্দোষভাবে বাঙ্গলায় আনিয়াছেন। বাঙ্গলা বর্ণমালায় লঘু-গুরু ভেদ নাই, সুতরাং সংস্কৃতের ছন্দগুলি নির্দ্দুষ্ট করিয়া বাঙ্গলায় আনা যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ভারতচন্দ্র শুধু এই কার্য্যে আশ্চর্য্য সফলতা দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু সংস্কৃত কবিতায় যাহা নাই, সেই সুকঠিন মিল দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত ছন্দে রচিত বাঙ্গলা পদ্যে প্রথিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতার কোন কোনটি সংস্কৃতের এত অধিক অনুগামী হইয়াছে যে তাহা কাণে কি পুস্তকে পণ্ডিতেরা দেবনাগর অক্ষরে পাঠ করিলে তাহা সংস্কৃত বলিয়াই ভুল করিবেন, যথা —"ভব বিভেদ শঙ্কর, বৃষভধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর ত্রিপুর, জয় শ্মশান-নাটক, বিষাণ-বাদক, চতুরাস-ভালক মহেশ্বর।"

ক্রমে বাঙ্গলা ভাষা এত সংস্কৃত শব্দে বিভূষিতা হইল যে, এদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেখিয়া বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কালে বহু ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল, সেগুলি প্রাক্-সংস্কৃত যুগের তাহাই পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়াছে।

ষোল কি সতেরো শতাব্দীতে 'লখাই কালাচাঁদ' নামক রচিত মনসা-মঙ্গল সম্বন্ধে সংস্কৃত-বিৎ বিজয় গুপ্ত বলিয়াছিলেন—"ইহা বহু প্রাচীন কালের লেখা, অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, লেখকের ভাষা ও ছন্দের জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না"—ইত্যাদি। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কালাচাঁদ নামক প্রাক্-সংস্কৃত যুগের কবিও ভাষায় লিখিয়াছিলেন, শিক্ষিত বিজয় গুপ্তের তাহা ভাল লাগে নাই। প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যকে যাঁহারা সংস্কৃত অঙ্গের নববেশ পরাইয়া ভদ্র সমাজের কাছে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাখরগঞ্জের ফুলশ্রী গ্রাম নিবাসী বিজয়গুপ্ত (১৪৯৩ খৃঃ), সমকালিক কবি ময়মনসিংহ-নিবাসী নারায়ণদেব, ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত পাতুয়ারি নিবাসী বংশীদাস চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী (১৫৭৪ খৃঃ), বিক্রমপুর নিবাসী দ্বিজ মাধব ও গঙ্গাদাস সেন (ষোড়শ শতাব্দী), বর্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগণা নিবাসী কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবিরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এপর্য্যন্ত মনসামঙ্গল-রচক এক শতের উপর প্রাচীন কবি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশ—বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গ নদীমাতৃক ও শস্যক্ষেত্র, হাওরপূর্ণ জলা দেশ, এখানে সর্পভীতিহেতু মনসাদেবী অতি জাগ্রৎ দেবতা, ভাদ্রমাসে ইঁহার পূজার সময়ে গান করিবার জন্য বহু "নূতন মঙ্গল" রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কবিদলের মধ্যে বিজয়গুপ্তের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান-সংঘর্ষের যুগ, কবি সেই সংঘর্ষের কতকটি জীবন্ত চিত্র দিয়াছেন। নারায়ণ দেবের হাতে বেহুলার বিলাপ চিত্তদ্রাবী করুণরসপূর্ণ হইয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বংশীদাস তাঁহার সময়কার সামাজিক ছবিগুলি—দেশে শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা, জাহাজনির্ম্মাণ ও কৃষিবিষয়ক প্রসঙ্গগুলি খুব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কেমানন্দ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া

মনসাদেবীর গান।

মনসা-মঙ্গলের কবিগণ।

কাব্যখানিতে এত করুণ রস ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে সেহলার দীর্ঘ দুঃখকাহিনীতে যেরূপ পাঠকের দুঃখাশ্রু পড়িয়া থাকে, তেমন তাঁহার স্বামীর সঙ্গে মিলন এবং শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রসঙ্গে চক্ষে অবশ্য পুলকাশ্রু পতিত হয়

চণ্ডীমঙ্গল—এই শ্রেণীর কাব্যও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচিত কতক কতক পাওয়া গিয়াছে চৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে—চৈতন্যের

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ।

আবির্ভাবের পূর্ব্বে বহু ভক্ত চণ্ডীমঙ্গলের পালা গাহিয়া রাত্রি-জাগরণ করিতেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের সমকালবর্ত্তী বা অব্যবহিত পূর্ব্বে বিক্রমকেশরী নামক এক রাজা মঙ্গলকোটে রাজত্ব করিতেন, ইঁহার কাহিনী কোন কোন ফারসী পুস্তকে পাওয়া যায় এবং "সেক শুভোদয়া" নামক পুস্তকেও ইঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় ধনপতি সদাগর এই রাজার আশ্রিত ছিলেন বহু চেষ্টার পর মুসলমানগণ এই রাজ্য ধ্বংস করেন সুতরাং সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে বলরাম, কবিকঙ্কণ মাধবাচার্য্য প্রভৃতি কবিরা মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু মুকুন্দরামের কালই এক্ষেত্রে সন্ধিক্ষণ। মুকুন্দরাম সন্ধি-যুগের কবি, তাঁহার ভাষা ও ভাব উভয়তে প্রাক্-সংস্কৃত যুগ ও সংস্কৃত যুগের নিদর্শন আছে এই আখ্যানের সমস্ত উপাদানই মুকুন্দরাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের নিকট পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে পুঁটিনাটি বিষয়গুলির নানারূপ সৌন্দর্য্য ধরা পড়িয়াছে চরিত্রাঙ্কনে এবং সামাজিক কি গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনীবর্ণনায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি ব্যাধ-নায়ককে পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হন নাই, যেহেতু সুচিরাগত গল্প পূর্ব্বাকারে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে—মূলগল্পের পরিবর্ত্তন শ্রোতারা সহ্য করিবেন না, কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁহার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত মানুষ করিয়াছেন—এইখানে তাঁহার বাহাদুরী ব্যাধ-নায়কের দুই বাহু "লোহার সাবল", তাহার বক্ষে ব্যাঘ্রনখের শল্ক, সে শৈশব হইতে মল-বিষ্ঠায় পটু, "অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে।" সে যখন খাইতে বসে—তখন হাঁড়িতে হাঁড়িতে কুম, পুঁইশাক, হরিণের পায়ের গোড়ালির মাংস প্রভৃতি খাইয়া নিজের সাধ্বী ও অনুরাগিণী স্ত্রীর জন্য কিছু রহিল বা না রহিল—সে চিন্তা না করিয়াই বলিয়া উঠে,—"কেন করেছ ভাল আর কিছু আছে?"—তাহার গ্রাসগুলি "ভেঁতুলিয়া তালের মত" এবং ভোজনটি অতীব কুৎসিত। সে এত বড় মূর্খ যে যখন পার্ব্বতী তাহাকে সাতঘড়া ধন দিয়া তাহারই অনুরোধে একঘড়া নিজে কাঁখে করিয়া লইয়া চলিলেন, তখন "মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধনঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী", সে যখন কথা কহে তখন স্ত্রীকে প্রতি কথায় বজ্জরের মত ধমক দেয়—"স্বব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য-ভাষা। মিথ্যা হলে চোয়াবে কাটিব তোর নাসা"—সুতরাং সে যে মূর্খ ব্যাধ, তাহা বুঝিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব হয় না, অথচ নৈতিক জগতে সে রাজচক্রবর্ত্তী, তাহার বাক্ বজ্জরতার মধ্যে তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় চরিত্রের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। খুল্লনা সুমধুর শীলের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তাহার শিশুর ন্যায় সরলতা দৃষ্ট হয়। চণ্ডীর সঙ্গে ব্যবহারে তাহার

[illegible] জীবনের [illegible] সতর্কতা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাবধানতা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

রাজসভায় বহু ফারসী ও আরবী শব্দ ঢুকিয়াছে, আইন ও আদালতের ভাষা মুসলমানী ভাষার অধিকৃত হইয়াছে। 'খণ্ডপতি' মহাপাত্র, 'পাত্র,' 'মিত্র' 'মহাপাত্র' প্রভৃতি পদবী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। 'হস্তশুল' উজীর, 'সাকৃহ' আমীর, চাকলাদার, ফৌজদার, নায়েব কারকুন হইতে আরম্ভ করিয়া কুদ্র সহর ও কারকুন প্রভৃতি সমস্তই মুসলমানী শব্দে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অত্যধিক প্রচলন হেতু পাইক পদাতিক কোটাল প্রভৃতি কয়েকটি হিন্দুযুগের প্রাকৃত শব্দ কিছু আজও রক্ষা করিয়া আছে। এই বিদেশী প্রভাব যেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেখানে চন্দ্রসূর্য্য উঠিয়া আবহমান কাল হইতে একটি সহজ হিন্দু কৃষিজীবন সাধের বাঁশিটী বাজাইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের শান্তিময় উদ্যম ক্রীড়ার ক্ষুদ্র প্রবেশের প্রাচীন রীতি ভাঙ্গিয়াছে, যাইতেছে, কিন্তু পল্লীর কৃষিবাণিজ্য নিশ্চল সামাজিক ব্যবস্থার ছাঁচ একদিন যাহাতে সুন্দর হইয়াছিল—সমস্তটি আজও তাহা বিকশিত হইতেছে।

এই যে সংস্কৃতের আদর্শ হইল, তাহার প্রধান কথা আচার ও নিয়মের শাসন। মন্বাদিসংহিতার ব্রাহ্মণ্যবিধানের শেষ সময়ের দাঁড়াইয়াছে—যাহা চরম আদর্শ সমস্তের প্রতি যাবতীয় বিদেশী ধারা হইতে অপূর্ব্ব উৎকর্ষভাবে প্রবেশে তাড়ন করিতে ছিল—তাহার ফল হইতেছে সমস্ত দেশকে নীচে উঠিতে যাইয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সামাজিক নিয়মের পুঁথিটি পড়িয়া। বস্তু হইলেন, আচারের নিয়মগুলিকে খুব জাঁটা জাঁটি হইল। বাল্যবিবাহে বিবাহ-সম্বন্ধে অত্যন্ত বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল। দুইটি চরম পরাস্ত অবস্থার রাজারা যেমনি বিবাহ করিতেন সাঁওতালদের কোন কোন স্থানে বয়ঃপ্রাপ্তের মধ্যে মামাত ভগিনী থাকিলে অন্য বিবাহ করা মামাতকে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পুণ্যাহে এই রীতি এখনও বিদ্যমান। ইউরোপে দেবরের সঙ্গে বিবাহ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। নব বঙ্গদেশে এবিষয়ে এত জাঁটা জাঁটি নিয়ম বাঁধিয়া গিয়াছে, বঙ্গদেশে সপিণ্ড মধ্যে বিবাহ ব্যাপারটা একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কোন দিকে ইহা যাইবে হইবে—ইহা ভাবিয়া আজ রঘুনন্দন সম্বন্ধে কঠোর বাদ প্রতিবাদ করিলেন। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—যে ব্যক্তি মাগ মাসে মূলা ভোজন করে, সে রক্ষহত্যা কাহার পাপ করে।

কার্য্যসম্বন্ধে অভিজাতেরা ব্রাহ্মণকে উঁচুতে রাখিয়া অন্য সকলকাতকে ততটা নীচে নামাইয়া দিলেন, যে বাঙ্গালী জাতির কোন অংশই সমাজসংশ্লিষ্ট কুলক্রমাগত বৃত্তিগুলির মত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দক্ষিণাত্যে এই অসম্পূর্ণতা এতদূর উৎকট ভাবে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু বাঙ্গলা দেশ চিরকালই তুরস্ত স্বাধীনতাপ্রিয়। কিছুকে খাঁচায় পুরিলে সে যেরূপ শৃঙ্খলকে তুচ্ছ মনে করিয়া ছটফট করিতে থাকে, অত্যধিক ব্রাহ্মণশাসনে পীড়িত হইয়া বাঙ্গালী এই দীর্ঘায়োজন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ব্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রবলে আত্মসাৎ করিয়া দেবতাদিগকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সাধারণ ও তাহাদের দেবতার মধ্যে এক উপেক্ষা প্রাচীর উঠিতে লাগিল। অভিমানে প্রবেশের অনেকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল

এই সকল অনুকূল মনের নিকটে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎলাভ ও ধর্মামৃত প্রেমের আস্বাদন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সমস্ত বিরুদ্ধভাব তুলিয়া দিয়া তিনি জগৎ-প্রেমের নিত্য রাজত্বের ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনুচরেরা কীর্তনের মিলিনেসে সমস্ত লোকের গৃহে গৃহে ধর্ম্মের সুখদ ও স্বর্গের শ্রেষ্ঠ বার্ত্তাগণের দ্বারা তাহাদের পেরোহিত্যের ব্যবস্থা করিলেন। আবার প্রেমের দুই অনুকূল সম্বন্ধে এই গ্রন্থ খোলা হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্য-যুগ

এখানে যে সকল মহাত্মা নানার চরিত্রের যখনা পাওয়া যায় তাহাদের কাহারও সহিত [illegible] প্রেমের বৈজয়ন্তীর ঘোষণা করিয়াছেন সহিত [illegible] সমস্ত ভক্তকালের তপস্যা—এই সমস্ত চরিত্রের ও তাহার সকলের মিলন আমাদের [illegible] বৈষ্ণব পরাবলী রচিত হইল। ইহা বঙ্গদেশের সাধারণ ভক্তির কথা। আমাদের দেশের ঘটনাবলীর একটিই স্বর্গীয় শ্রীতি, সুকোমলতা মনে করিবে [illegible] তাহাদের ও তাহার স্বাধীনতাকালীন নিভৃতে সমাধান এই সমস্তই একটি [illegible]। চৈতন্য সবের নায়িকা নহেন, ইনি সাধনের ধন। ইনি কোন কালের চরিত্র নহেন, ইনি 'যুগভাব' চতুরাম প্রভৃতি কালের এই মহাভাব-

ওঠাধরের কবিত।

ময়ীকে স্মরণ করিয়াছেন। প্রথমে হরিনাম মহামন্ত্র—যে নামে সমস্তের জগতে একমাত্র সত্য বলিয়া দেখাইয়াছেন, মৃত্যুকালে যে নামই একমাত্র সম্বল—সেই নামের কথা দিয়া চতুরাম তাহার গান আরম্ভ করিয়াছেন। "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কত নদী এই নামে তপ করিতে করিতে এমন এক স্থলে পৌঁছিল, যেখানে ইন্দ্রিয়ের কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই নামরূপের কথা চতুরাম বলিয়াছেন, "কহিতে কহিতে নাম অবশ করিলে মো" — অবশ" অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগ বিলুপ্ত হওয়া। যিনি সঙ্কীর্তন আছেন, অথচ তাঁহার অস্তিত্ব অবিদিত, যদি তাহা তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তা অনুভূত হয়—সাধক যদি প্রকৃতই বুঝিতে পারেন, এই মুহূর্ত্তে এখানে তিনি আছেন, তবে সেই সত্তার মহিমায় অভিভূত হইয়া গৃহস্থ কি আর গৃহধর্ম্ম করিতে পারেন? তাই "যেখানে বসতি হয়, সেখানে থাকিয়া মো যদুনন্দন। ধরম কেছে রহি—নামের মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া চতুরাম রূপের কথা বলিয়াছেন, রূপের রূপ সে আবার কি প্রকার? সেতো "শুদ্ধপ্রেমের বিবর্ত্ত কলসী," জগৎ দেখিতেছি,

জগদীশকে কি দেখিতে পাইল না? এই জগতের চারিদিকে গ্রাম ও কৃষ্ণ বর্ণ বিরাজ করিতেছে; আকাশ,—প্রায় এক দণ্ড পূর্বে নয়, সমস্ত এ সময়ের সেই নীলাভ শ্যাম-স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ। অপরাহ্ণের রঙের খেলা যমুনাজলের ন্যায়, সেই কৃষ্ণ মধুরতাকে সাজাইতেছে। চণ্ডীদাসের রাধা সেই কৃষ্ণবরণের মাধুরীতে ডুবিয়া আছেন। তিনি চুল এলাইয়া মালতীর মালা খসাইয়া ফেলিয়া মুক্ত কুন্তলে কৃষ্ণের আশা দেখিয়া দুরদেশে চাহিয়া আছেন—"এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথুনি, দেখয়ে খসায়ে চুলে"—কবে কবে মেঘের মধ্যে অকলঙ্ক হরির আভা দেখিয়া "না চলে নয়নে তারা"—যমুনা-মাতার কণ্ঠের মণি দোদুল সেই কৃষ্ণবর্ণ মনে পড়িতেছে তাঁহার নাম শুনিয়াছেন, ইন্দ্রিয় নিরস্ত হইয়া গেলে ইন্দ্রিয়ের তাঁহার আহ্বান শুনিতে পায়, কারণ তিনি সকলকেই তাঁহার মধুরতরা ভাষায় ডাকিতেছেন সেই সঙ্গীত আমাদের কাছে ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ আমাদের কান সংসারের কোলাহলের দিকে একদা শেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "Such music is the eternal soul but for the vestiare of decay that enshrouds it, we cannot hear."

রাধা সেই ডাক শুনিয়াছেন, তবুও "পরতি আহারে, বাসা বাস গেহে পরে, যেমন যোগিনী পারা" এই প্রেমের বাইতিহার কুলাকুলা কোথায়? তিনি বৈষ্ণব পদে, "সদাই চঞ্চল, নয়ন অঞ্চল, গমন মন্থর করে। সঘন ধরিয়া পরে চমকি, দুকূল খসিয়া পড়ে।"

রাধিকা "ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়, মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম কাননে চায়।" এই ছবির সঙ্গে চৈতন্যদেবের ছবি মিলাইয়া দেখুন।

রাধিকা "যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়, পায় ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতুলী যেন ভূমে লুটায়" তিনি কৃষ্ণনাম শুনিলে আচণ্ডাল সকলের পায় গড়াগড়ি দিতেন, এই রাধার চিত্র কি তাঁহারই পূর্ণ প্রকাশ নহে? যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী সাধারণ নায়িকার প্রেম বলিয়া ভুল করিবেন, সেই সকল সংসার লোক এই পদাবলী রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী নহেন।

ভগবান্ পুরুষরূপে চিরদিন আমাদের সেবা করিতেছেন। এই আমাদের চিরন্তন প্রভু—চিরন্তনসেবকের সত্তা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, "একথা কহিবে সই একথা কহিবে যমুনা এমন তপ করিয়াছু কবে পুরুষ পরশমণি নয়নের কুমার। কি মন লাগিয়া ঘরে চরণে আমার?" যাহার অঙ্গ রাতুলাটি তাহাতে সীসা ও লোহা সোণায় সোণা হইয়া যায়, তিনি কেন—কোন গুণের জন্য—আমার পায়ে ধরেন? সেই বিরাট্ পুরুষ ক্ষুদ্র হইয়া ক্ষুদ্রাপেক্ষা ক্ষুদ্র আমার নিকট এক ভিক্ষার জন্য ভালবাসা আমার কুটীর-দ্বারে আসিয়া হাত পাতিয়া থাকেন। তাঁহাকে না চিনিয়া আমরা প্রত্যহ ফিরাইয়া দিতেছি। তাঁহার সেই অসীম প্রেম—পুত্রকলত্র ধনজনগিনীর মারফৎ আমরা প্রত্যহ পাইতেছি—"আমি যাই যাই বাই—বলে তিন বোল, কত না চুম্বন দেই—কত দেব কোল পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া। কবে কব ধরি পিয়া অধীন দেহ মোরে পুন দরশন লাগি কত চাটু বলে।" এই যে প্রেমের খেলা তাঁহারই বিশ্বে নিরন্তর চলিয়াছে—

এই নিখা লক্ষ্য করে ফেলেছিলেন। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ বৃহত্তের নিকট, কাট হইতে কাট কাটায় নিকট এই ভাবে প্রত্যেক ভাব ধরে ফেলেন। তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তিনি রাজচক্রবর্তীর মহাসম্পদের দিকে চান, তিনি ক্ষুদ্র দরিদ্রকার যষ্টিমধুকণা লইয়া ক্ষুদ্র গাছটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আহ্বান করিতেছেন।

এ ঘরে এখনকার কেহই যাইবেন না, কারণ ধর্মকক্ষের মালিককে পাইয়াছেন, "যাকে আর খুলাতে বলা করবে যান স্বতন্ত্রই নয়—"মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা, কত না ইহার হৈরজ করে, তাহারে বলিব কারা।"

"আমি কাহু তন্ময় এ দেহ সম্পর্কে তিনি তুলসী রহিয়া তিনি তুলসী দিয়া যে কান হয় তাহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না। ক এরূপ আছেন তিনি বলিতে পারেন—ভগবান্‌কে কত ভাবেই না পাওয়া যায় তিনি করিয়াছেন। তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—সমস্তই ভগবানের দানে ইহাদের প্রত্যেকে তাহারা চলিত, তাহাদের অন্য কোন কাজ নাই। যাহারা যাহা দিয়াছেন তাহা ছাড়া কখনও ফিরাইয়া আনিবার সাধ্য নাই। "কত নদী বহে নদ নদীতে সাগরে যাই, সব কাহু পথে যায়রে॥ এই নদী নদী দুই কত কলকল, সবুজে সবুজে নাচে তার জল।"

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা করিয়া তিনি তাহাদের দিয়াছেন অধিকার। তাঁহার উৎসুক্য করিয়াছে যাহা সাধক যা লাভের কল্পনা উদ্ভাবন করিবার অবকাশ আছে, তিনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন নাই। তিনি ইঙ্গিতে দিয়াছেন। যদিন জগতের প্রাণ চঞ্চলতা ভরা, সেদিন এই পুলকের তরঙ্গ সঞ্চারে বাঁচিয়া যায়—সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া মধুর আছেন তাহা যায়, "শুকতন কাঁপে ঈড়াতে নাহি, সমাধি ছল ছাঁদি পুলকে অকুল নাই কেহ এই—সব ফুরায় শেষ।" যমুনার ঘাটের সময়ে সে কি ছিল। তখন তিনি সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারেন না—সেখানে সংকোচ, ভয়ের যাহাতে সেকথা কাহারও নাই। "সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—তাহা বলিতে বাহিয়া মুখের কথা ফিরিয়া আসয়ে লাজ হেন অবস্থা তাহা কাহাদের কথা মনে হইতেই তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়েন। "যমুনার জল, কত কলকল তাহাকি পরাণ রয়।" কেন যমুনার জল কলকল করে—তাহা আর তিনি বলিতে পারেন নাই। "কেহ কাঁদবার নয়" কৃষ্ণ কদম্ব ডালে বসিয়া থাকেন, তাহারই মধুর পদচিহ্নযুক্ত ধূলির পুষ্পরেণু কলের উপর পড়িয়া কলমল করে। রাধা এত কথা বলিতে পারেন নাই, পরবর্তী এক কবি বলিতেছেন "ঢেউ দিও না কেউ জলে, বলে কিশোরী। ধরণীর ধারা ধরে ধুলে যাবেগো।"

রাধা লোকনিন্দা সহিতেছেন। তাঁহার কাছে কুল শুধু ছায়া প্রেম, জগতের নিন্দা, তিনি কলঙ্কী, কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—তাহা একবার বলিয়াছেন, "সেখানে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে—একজনার মুখ আর দেখিতে না হবে।" জগবাসী, লোকনিন্দা, গুরুজনের গঞ্জনা, এসমস্তই তিনি প্রফুল্লমুখে সহ্য করিয়াছেন "যথা তথা সেই আছে বঁধুর চাঁদ। চাঁদ মুখের মধুর হাসে ভুলেছে মুরাই।" এমন অন্ধ থাকিতে সংসারের বিষ আর তাঁহার কি করিবে?

কিন্তু এত ভালবাসিয়াও তিনি সমাজ সমক্ষে বুক্কিতে পারেন না তাহাকে তাঁহার ভালবাসেন তিনি কে? "পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি" সমাজ সমক্ষে ইহা কবিতার মেই অন্তর্লোকের ভাষা থাকে, যাহা তাঁহাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। সে কি তাঁহাকে ভালবাসে কি না এসম্বন্ধে তাঁহার মনে কখনও কখনও তর্কের ঝড় আসে। পূর্ব্বে ও পরে এক মুহূর্ত্তের উক্ত বিদ্যাপতির রাধা যেরূপ এক মুহূর্ত্তে বলিয়াছেন "মাধব হম কৈছে কহবি মোয়।"

চণ্ডীদাসের কবিতা বাঙ্গলার লোকের প্রাণের ধন। বহুকাল তাহার প্রেমের মন্ত্রোদ্গীতি যে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে তাহা চণ্ডীদাসের নাম করে করে ঐ তত্ত্ব পরিমাণ করে। এই কবি আমাদের কত আপনার। "তবে যদি আমি তাঁর দুটি চোখ" প্রভৃতি পদে মন্ত্রোদ্গীতা পরকীয়ার চুরি চোখের সম্মুখে কবির যে সকল কথা আছে তাহা বাস্তবিক এবং চিরমিলন সৃষ্ট প্রেমিকের হৃদয়ের যে সকল কথা আছে তাহা সকল দেশের সকল ভাষের এমন একটা ছাপ মারিয়া দিয়াছে, যাহা যতদিন বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে ততদিন রহিবে। একদিকে সংসার, অপরদিকে স্বর্গ চণ্ডীদাসের পক্ষ—উহাদের মিলনের সেতু, একের সহিত অপরের, প্রকৃত পক্ষে উহাদের ছাড়াছাড়ি নাই। চণ্ডীদাসের কবিতা সম্বন্ধে একটা ভাবস্থানে রাখিয়া ওকথাকে তাহা দূর হইতে দেখায় নাই, তাহাকে একেবারে হৃদয়ের ঘরের সংলগ্ন মানুষের দেবতার পাদপীঠে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, এই কবিতাকে অনেকে বলিয়া সাধনের ধূলি লাগিয়া দেবমূর্ত্তি মলিন হইয়াছেন,—ইহাতে অন্তরে তাঁহার গায়ে কলঙ্কের ছায়া স্পর্শ করিয়াছে, এমন কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যাঁহাকে লইয়া আমরা চিরদিন বাস করিতেছি—সেই অন্তরের দেবতাকে দূরত্ব সম্বন্ধে রাখিতে চাহেন না।

চণ্ডীদাস বীরভূম নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার বাশুলি মন্দিরের তিনি পুরোহিত ছিলেন। রামী রজকিনী নামক এক ধোপানীর প্রেমে পড়িয়া তিনি জাতিচ্যুত হন। তাঁহার ভ্রাতার নাম নকুল ছিল। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁহার অনেক বন্ধু—তাঁহাদের মধ্যে, একজন রাজা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন গৌড়েশ্বর (সম্ভবতঃ জালালুদ্দিন) স্বীয় বেগম সাহেবাকে কবির অনুরাগিণী মনে করিয়া চণ্ডীদাসের হত্যার আদেশ দেন। একটা কাহার উপর তাঁহাকে রাখিয়া তীব্র বিষাক্ত তাঁহার মাংস উঠাইয়া ফেলিয়া গৌড়ের রাজধানীতে তাঁহাকে বহন করা হয়। কথিত আছে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দর্শনে বেগম সাহেবা অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং কলঙ্কের স্পর্শন স্থগিত হওয়াতে তাঁহারও সেই সঙ্গে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে চণ্ডীদাসের বয়স চল্লিশের বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইনি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। পরস্পরের উভয় কবির দেখা হইয়াছিল এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, অনেক প্রাচীন কবি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয় চণ্ডীদাস ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন তাঁহার তরুণ বয়সের

লেখা রহিয়া গেল ইহা কালের দেহের দিকে চণ্ডীদাসের প্রাচীন অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের সুরটি আছে। অধুনা কয়েকজন পণ্ডিত রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমসম্বন্ধ সত্যের অস্বীকার করিয়াছেন। বৃক্ষপত্রের সঙ্গে বায়ুসঞ্চারী প্রেম, এরূপ অসম্ভব। এইসকল ভাঁয়াতে যে গবেষণাপূর্ণ পণ্ডিতকে চণ্ডীদাসের কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে "কাহুর পিরীতি জাতি কুলশীল ছাড়ে।" প্রকৃষ্ণ নামক মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য সবিস্তারে লিখিয়াছি। কিন্তু, চণ্ডীদাসের সুহৃদ্ বা ছিদ্রান্বেষী যাঁহারা দুধা পক্ষপাতদুষ্ট হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা চণ্ডীদাসের কথাতেই বলিব "কাহু না বুঝি সখি, তাঁহার কথায়, যাহিবে রহুন তাঁরা।" কেহ কেহ চণ্ডীদাসের গানে যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও অস্বীকার করেন।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এবং কর্ণাটের [illegible] ইঁহারা শিবসিংহ ও তাঁহার পরবর্তী অনেক রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। এমনকি গুপ্তস্থান বিদ্যাপতি। [illegible] ইঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতেও মনে হয় শুধু মিথিলার রাজসভা নহে, সাধারণের মধ্যেও কবিতার কবিত্বের রূপেই ইঁহার সমধিক প্রতিষ্ঠা ছিল। ইঁহার কবিত্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর উত্তরকাল ব্যাপিয়া থাকিলেও ইনি বোধ হয় রাজসভার ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছিলেন। ইনি সংস্কৃতে পুরুষপরীক্ষা প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন, যথাক্রমে ইঁহার পূর্বপুরুষেরা পণ্ডিতের কার্য করিয়াছিলেন। ইঁহার অনুগ্রাহক রাজা ও রাজপরিবারের মধ্যে কবিত্বের ও বীরত্বের সেরাই করিবার দিকে ঝোঁক ছিল। ইনি রাজার একটা অনুরক্ত ছিলেন যে শিবসিংহের মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পরেও তাঁহাকে ইনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, "স্বপনে দেখিনু কবিবর কুল।" তাহার বহুবর্ষ পরে শ্যামল কবি প্রায় সমস্ত চতুর্দশ শতাব্দী ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর অবধি ইনি জীবিত ছিলেন। ইঁহার বাল্যকবিত্বের পলাবলী পুঁথি বোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গোদের বসন্তরায় এবং অন্য কয়েকজন বাঙ্গালা পাঠকের হিন্দীমিশ্র বাঙ্গলা ভাষায় পরিবর্তিত করেন। সেই পরিবর্তিত আকারে মৈথিল কবির পদ বাঙ্গলাদের ঘরে ঘরে এমনভাবে গীত হইয়া থাকে মহাপ্রভু স্বয়ং দিনরাত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করিতেন, এইজন্য বাঙ্গলা দেশে ইঁহার পাঠকসংখ্যা খুব বেশী হইয়াছে। উপমা ও অলঙ্কারের ছটায় বিদ্যাপতির পদগুলি ঝলমল করিতেছে। ইঁহার শেষ বিকাশের পদাবলীর ভাবের প্রগাঢ়তাও কম নহে। প্রবাদ এই যে চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকী রামীর সাক্ষাৎকারের পরে অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিবর্তে ভাবপ্রবণতার দিকে ইঁহার ঝোঁক বেশী হইয়াছিল। বিদ্যাপতির ভাবসম্মেলনের পর ভাবসমৃদ্ধিতে অতুলনীয়। "সখিনা যব আওব এ মধু যেহে মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে, বেলি করব হাম আপন অঙ্গনে, কান্থ লেওব তাহে চিকুর বিছানে" আলিপনা দেওব মোতিম হার। মঙ্গল কলস করব কুচ ভার" প্রভৃতি পদে কবি অভিসারী মিলনের কথা গাহিয়াছেন, যেখানে নরনারীর দেহমনের এবং কৃষ্ণ স্বয়ং সেই মিলনের দেবতা। মাথুরের পর কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে আসেন নাই, কিন্তু গোপীরা তাঁহাকে ভাবিতে না

পাইয়া মনের ভিতর পাইয়াছিলেন। ভাব-সম্মিলন বৈষ্ণব কবির অপূর্ব সৃষ্টি,—চিরবিরহের মধ্যে চিরমিলন।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরে বাঙ্গলার শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, অনন্ত দাস, মাধব দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস চক্রশেখর বা শশিশেখর, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি শত শত কবি পদ রচনা করেন। **নরহরি সরকার** শ্রীখণ্ডের সর্বজনপরিচিত বৈষ্ণবগুরু ও চৈতন্যের অনুচর। ইহার রচিত "অঙ্গনে বহিল মোর কিবা হেন ছার, ইহা যেন গলায় পরয়ে একবার, রোপিনু মালিকা নিল করে, পাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইনু তারে। নরহরি কহে এই কথা সে সময়ে কর্ণে শুনা'ও হরিনাম"—প্রভৃতি পদ প্রেমের গভীরতাপূর্ণ, অনন্ত প্রেমের অভিসার অতি সুন্দর, বংশীবদনের "না সেও না সেও, বাই, বৈস ভরুতলে, আপিনে পেরেছ যাহা চরণকমলে।" প্রভৃতি পদ অতুলনীয়। ইহাদের অনেকেই চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, শশিশেখর, বলরাম প্রভৃতি কবি পরবর্তী যুগের। গোবিন্দ দাসের কথা ইতিপূর্বে ২৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ইনি ব্রজবুলিতেই অধিকাংশ পদ লিখিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পর ইনিই বৈষ্ণব কবিকুলের শ্রেষ্ঠ।—ইহার রচিত "কণ্ঠক নহন হরি চল্ল ভামিনী তিমির পথানক আশে।" "মণিকঙ্কণপণ ফণিমুখবন্ধন শিখরে কুচযুগ শুক পাশে" এবং "যো পদতল পদকমল পরশী-পরশে উপজল অব কণ্টকময় বাটহি আওত যাত নিশঙ্ক" প্রভৃতি পদ—প্রেম যে ইন্দ্রিয়বিকার নহে কঠোর সাধনা, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কাঁদড়া-বাসী **জ্ঞানদাস** ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি চণ্ডীদাসের পদের বিস্তৃতি করিয়া, কোথাও বা আশ্চর্য মৌলিকতা দেখাইয়া যে সকল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা এখন কীর্তন-গায়কদের প্রধান আশ্রয়। কতকগুলি পদের তুলনা নাই, যথা "রূপলাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥ হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥" —পদে মানুষ যে অপূর্ব তবু নর কি নারী একক যে স্বীয় স্বাভাবিক অপূর্ণতায় বাধিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্য বেদনাতুর ও চিরপিপাসিত—তাহাই বুঝাইতেছে। এই অপূর্ণতা লইয়া নারী স্বামী পুরুষকে ছাড়িয়া টিকিবেন কিরূপে? যদি ভগবানের প্রেম দ্বারা এই চিরতৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা না মিটে, তবে নরনারীর দেহ ও মনের অপূর্ণতা লইয়া টানাটানির আর স্থান নাই। "কবি নৃপজ-বংশজ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" **বলরাম দাস ও ঘনশ্যাম**—গোবিন্দ কবিরাজের বংশজাত। ঘনশ্যাম গোবিন্দ-পুত্র দিব্যসিংহের পুত্র। বলরাম দাসের পদ অতি সরল পল্লীভাষায় রচিত, ইহার "সখি হের দে আসিয়া যা। নিদ যায় চাঁদবদনী ছাম অঙ্গে দিয়া পা॥ নিশাসে দুলিছে, বসন বেশর, হাসিখানি তাহে মিশা।" এবং শশিশেখরের "তুয়া অলিমন্দিরে, বিজুলী ঘন সঙ্গরে—মেঘকটি বসন পরিধানা" কিংবা "অতি শীতল, মলয়ানিল মন্দমধুর বহনা" প্রভৃতি পদ সম্বন্ধসংযোগে সুপরিচিত। গোবিন্দ দাস-প্রমুখ ঐ সকল কবিগণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের

লেখায় চৈতন্য দেবের আবদান প্রভাব আছে সুস্পষ্ট, এইজন্য ইহারা এমন একটি পৃথক্ পর্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে ইহাদিগকে অন্যান্য প্রেম সঙ্গীত-রচকদের সঙ্গে একত্র একটা স্থান নির্দেশ করা সঙ্গত নহে। ইহারা মহাকবি সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গদেশ ইহাদিগকে আর একটি নাম দিয়াছেন—যাহা ইহাদিগের গুণের বিশেষত্বের পরিচায়ক—সে সংজ্ঞাটি "মহাজন"।

ইহাদের পদে কাব্যের শিল্পকলা অলক্ষিতে খেলিয়া গিয়াছে, একটি পদের উল্লেখ করিব। চন্দ্রা কৃষ্ণকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন, রাধার নিকট ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ কৃষ্ণ আত্মহত্যা করিয়াছেন এই আশঙ্কায় দূতীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার চক্ষে অবিরত অশ্রু ঝরিতেছে, তিনি আঁচলে মুছিয়া তাহা সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না হঠাৎ যমুনা-কূলে "নীলমণি" মূলে তিনি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন—"চূড়া এক ভিতে, বাঁশী এক ভিতে" ধূলিধূসর দেহে তিনি নদী-সৈকতে লুটিয়া পড়িয়াছেন চন্দ্রা কৃষ্ণকে দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু গোপীর চিরাভ্যস্ত কপটতার সহিত মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ফেলিলেন এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, দূতী নিশ্চয়ই তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছেন, রাধা নিশ্চয়ই অনুতপ্তা হইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। তখন এত দুঃখের মুখ সমাপ্তিতে পুলকিত হইয়া কৃষ্ণ দেহ হইতে ধূলি ঝাড়িয়া দূতীর জন্য অগ্রসর হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধূর্তা চন্দ্রা তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন, তখন শুষ্কমুখে কৃষ্ণ 'দূতী-দূতী' বলিয়া পিছন হইতে ডাকিতে লাগিলেন, রাধাকে না দেখিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল দূতী উপেক্ষার ভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'পেছন হইতে ও ভাবে ডাকা ডাকি করিয়া অকল্যাণ করিতেছে কেন?' "ক করবি রে, মাধব, দুখিতহি কহ কহ আমার দাঁড়াইতে সময় নাই। হাম যাওব আন কাজে" "তব সনে বাত নহে মঝু সমুচিত, আর দরশব সখী মাঝে" অন্তরে কৃষ্ণের সঙ্গ-লাভে সুতীব্র সুখ প্রাপ্ত, কিন্তু বাহিরে উদাসীনতা কবি নিলিখিত ছন্দে এই দুই ভাবের লীলা অতি নিপুণভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন প্রথম কৃষ্ণকে ধূলি ঝাড়িয়া দূতীর জন্য প্রতীক্ষা-সূচক পদটির বিন্যাস-ভঙ্গি এবং দ্বিতীয় পদটিতে দূতীর বাহ্য উদাসীনতা কিন্তু কৃষ্ণ-সঙ্গের জন্য নিতান্ত পিপাসা ছন্দের কৌশলে ধরা দিয়াছে দূতী যে কথা বলিতেছেন তাহাতে মনে হইবে যে তাঁহার কথা বলিবার এক মুহূর্তও অবকাশ নাই। এদিকে ছন্দটি এত বিলম্বিত যে তাহাতে তো ব্যস্ততা আসে নাই, বরং দূতীর যেন যতটা দেরী করিতে পারেন ততই ভাল এই ভাবটি প্রকাশিত হইতেছে। মুখে যাহা বলিতেছেন—ছন্দ তাহার প্রতিবাদ করিয়া মিথ্যাটা আত্মপ্রকাশ করিতেছে "ক করবি রে, মাধব,—দুখিতহি কহ কহ—হাম যাওব আন কাজে, আমার দাঁড়াইবার সময় নাই—দাঁড়াইবার সময় আছে বরং আরও কিছু বেশী, নতুবা এত টানা সুদীর্ঘ ছন্দে কি করিয়া কথা বলা হয়। কথায় যে ব্যস্ততা, সুরে তাহার উল্টা। পদটি **ব্রাহ্ম শেখরের** এরূপ কৌশল বৈষ্ণব পদের অনেকগুলিতেই দৃষ্ট হইবে। পদ্যিতে তাহা যেরূপ বোঝা যায় গানে তাহা আরও পরিষ্কার হয়।

আর একটি গানে রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন "শ্রবণে শুনে রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গ, আমি নিশি যাই মনের হরিষে। শিখরে শিখণ্ড বোলে, মত্ত দাদুরী বোল, কাকিলা ডাকিছে কুহুরলে। ঝিঁঝি ঝিনকা বাজে, ডাহুকী সে গরজে, আমি স্বপন দেখিলাম হেন কালে।" নিদ্রিতার চক্ষু এখানে মুদ্রিত, সুতরাং বর্ষাসুলভ মযূরের দৃশ্য নাই নীপ পুষ্পের ঘটা নাই, কুসুমোপম কৃষ্ণমেঘের খেলা নাই আছে শুধু শ্রুতির বিষয়। বর্ষার অন্য সোন্দর্য্য ও দৃশ্যাবলী ছাড়িয়া কবি শুধু শ্রবণের উপর ভার দিয়াছেন, যাহাতে ঘুমের গাঢ়তা আনয়ন করে—ঘন ঘন দেওয়া গরজন 'শাওন'-রজনীর ঝিমি ঝিমি বৃষ্টি 'ঝিল্লি-পতনের শব্দ ঝিঁঝির ঝাঁক, ডাহুকীর চীৎকার—এসকলই শব্দময়, ঘুমের প্রগাঢ়তা সংঘটনের ঐকতানিক উপায়, দৃশ্যপটের অবতারণা না করিয়া কবি স্বপ্নবিহ্বলের শ্রুতিকে সহায়ক শব্দ জগতে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন এই কবিতা অপূর্ব্ব সাঙ্গীতিকতার সহিত সংযুক্ত হইয়াও কবি-প্রসিদ্ধি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। একস্থ বর্ষাকালে কোকিলের ডাক শুনাইয়াছেন ও অনন্তদাস সাঙ্গীতিকতার মাত্রায় ছন্দ ও বর্ষাবের ধ্বনির পরিকল্পনা করিয়াছেন।

চৈতন্যের সহচর এবং অনুবর্ত্তীগণ যে বিরাট সাহিত্য রচনা করিয়াছেন—তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। **কৃষ্ণদাস** বর্দ্ধমান ঝামটপুরে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন অল্পবয়সে বিরক্ত হইয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চিরকুমার বিশ্বস্থরাগ্র কৃষ্ণদাস পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুরোধে ৮৭ বৎসর বয়সে চৈতন্য-চরিতামৃত মহাগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া ৯৩ বৎসর বয়সে ৭ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে সমাধা করেন। পাণ্ডিত্যে ভাক্তিতে ইহার সমকক্ষ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় নাই, এবং ইহার শেষ ভাগের আখ্যায়িকাগুলি যাহা তাঁর গুরু, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি সাধুগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন, তাহা নিছক গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপি অপহৃত হওয়ায় তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করেন। তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তথাপি যেন আরও বাড়াইয়া দীপ নিবিয়া গেল। কৃষ্ণদাস অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিখিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুদের কথা কহিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর আভাষি শুদ্ধি নিষেধ বিধি অনিয়ন্ত্রিত হইবার ভয়ে তাঁহার পিতার নাম পর্য্যন্ত লিখেন নাই। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্যামদাস।

চৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্ব্বে **মুরারি গুপ্ত** সংস্কৃতে "চৈতন্যচরিতম্" কাব্য রচনা করেন, ইহাতে অনেক অলৌকিক কথা লিপিবদ্ধ আছে ভাষা সহজ ও কবিত্বপূর্ণ। **কবিকর্ণপুর** (শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ) এই সময়ে তাঁহার চৈতন্যের জীবনী সংস্কৃতে রচনা করেন—কিন্তু তাঁহার চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকই সংস্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চৈতন্যের তিরোধানে মহারাজ প্রতাপরুদ্র কিরূপ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তাহার একটি করুণ রসাত্মক চিত্র মুখবন্ধ করিয়া কবি নাটকখানি আরম্ভ করিয়াছেন। কড়চা-লেখক **গোবিন্দদাস** দুই বৎসরের চৈতন্য-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পদ্যে ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। চৈতন্যের

জীবন-সম্বন্ধে এরূপ ঐতিহাসিক ও চিত্তাকর্ষক পুস্তক আর নাই। চৈতন্যভাগবত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র **বৃন্দাবনদাস** রচিত। ইহা একখানি সর্ব্বজন-সমাদৃত গ্রন্থ। চৈতন্যের জীবন-সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা ইহাতে থাকিলেও পারিপার্শ্বিক ও তাৎকালিক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা হেতু ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী **জয়ানন্দের** চৈতন্যমঙ্গলেও অলৌকিক কথা এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব উভয়ের সংমিশ্রণ আছে। কোগ্রাম-নিবাসী নরহরি-শিষ্য **লোচন দাসের** চৈতন্যমঙ্গল কবিত্বের নির্ঝর স্বরূপ, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অল্প।

রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। রূপ প্রথমতঃ একই পুস্তকে এই দুই নাটকের বিষয় লিখিতে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-প্রভুর উপদেশে মথুরার ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা ও বৃন্দাবনের মাধুর্য্যপূর্ণ কথা স্বতন্ত্র করিয়া কবি দুইটি নাটক লিখিয়াছেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে এই দুই নাটকের স্থান খুব উচ্চে। রূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি' বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রের চূড়ান্ত গ্রন্থ। **সনাতনের** 'হরিভক্তিবিলাস' চৈতন্যের উপদেশ-চিন্তার উপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজের পরিচালক একমাত্র স্মৃতিগ্রন্থ। রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র **জীব গোস্বামীর** 'ষট্‌সন্দর্ভ' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য দার্শনিক গ্রন্থ। এই সকল এবং ইহা ছাড়া সংস্কৃত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ—যাহা বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ **অক্ষয়কুমার** 'ভক্তিরত্নাকর' এবং আমার Mediaeval Vaishnava Literature of Bengal নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

এই সকল পুস্তক ছাড়া সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত নরহরি চক্রবর্ত্তিকৃত 'ভক্তি-রত্নাকর' ও **নিত্যানন্দ দাসের** 'প্রেমবিলাস' দুইখানি অমূল্য ঐতিহাসিক পুস্তক। উহাতে তাৎকালিক বৈষ্ণব-সমাজের যথাযথ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তি-রত্নাকরের সঙ্গীত-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি উক্ত শাস্ত্রের একটি মূল্যবান্ সম্পদ্। চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গলায় ইহার মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক আর নাই। **হরিচরণ দাসের** 'অদ্বৈত-চরিত', **ঈশান নাগরের** "অদ্বৈতপ্রকাশ", **অক্ষয়হরির** 'নরোত্তম-বিলাস', **লোকনাথের** 'সীতা-চরিত' প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ের মধ্যে লিখিত হয়। বৈষ্ণব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ অনেকগুলি আছে—তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত **বৈষ্ণবদাস** (গোকুলানন্দ সেন, মুর্শিদাবাদ টেঁয়া-নিবাসী) কৃত 'পদকল্পতরু' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তৎপূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পৌত্র **রাধামোহন ঠাকুর** পদামৃত-সমুদ্র নামক গ্রন্থে অনেক বাঙ্গলা পদ সংগ্রহ করিয়া সেগুলির টীকা সংস্কৃতে করিয়াছিলেন। বোদ্ধযুগ অবসানে "ভাষায়" লিখিত পুস্তকের এতাদৃশ সমাদর আর কেহ দেন নাই। নরহরি চক্রবর্ত্তী স্বয়ং সংস্কৃতে কৃতবিদ্য পণ্ডিত হইয়াও তাঁহার ভক্তি-রত্নাকরে সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে বাঙ্গলা গ্রন্থের শ্লোকও প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণবের

মাথুর গান, একদিকে নিমাই সন্ন্যাসের ঘরো কারুণ্য করুণ হইয়াছে, অপরদিকে বঙ্গের তাৎকালিক ইতিহাস সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের উপাদান জোগাইয়াছে

মুসলমানগণ আসিয়া দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন রাজসাহী জেলায় কন্দরুপের মহিষী যে দেবমন্দিরগুলি রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের কবি লিখিয়াছেন, তাহার কারুকার্য্যে জগতে অদ্বিতীয় ছিল, এইরূপ শত শত মন্দির শুধু কারুকার্য্য শিল্প হিসাবে নহে অন্য হিসাবেও বড় ছিল। ইহাদের আঙ্গিনায় যে কীর্ত্তন-গান হইত, প্রত্যহ যে রাজ-ভোগ হইত, রাজা ও প্রজা একত্র হইয়া ভক্তির যে লীলা প্রকটিত করিতেন, যে সকল পর্ব্বে পর্ব্বে কুলমন্ত্রবন্ধের স্তূপ প্রত্যহ দর্শন করিবার জন্য আকৃষ্ট হইত এবং বিগ্রহের অঙ্গরাগের জন্য যে বিপুল সম্ভার সমানীত হইত, শত শত ভক্তিপ্রেম ও ত্যাগের স্মৃতিজড়িত, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যে সকল মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য সমাহিত হইত, সেই সকল মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিগ্রহ প্রস্তর রেণুতে পরিণত হইয়া ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গেল - হিন্দুর প্রাণাধিক প্রিয় এই মন্দিরগুলির চিতাশয়ায় দাঁড়াইয়া কবি যখন গাহিলেন, "কুসুম তাজিয়া অলি, মধুকরে দূরত,—কোকিলা না করতহি গান,—সোহি যমুনা জল, অনল সমান ভেল—বাঁশীরবে না রহে উজান, সখাগণ, বেণুরব বিসরহ"—তখন ঐতিহাসিক দৃশ্য অধ্যায় সন্দেহের অতীত হইল এবং "মাথুর" শ্রোতার করুণ সুরে আঁটা হৃদয়কথাতে বারবার ঘা দিতে লাগিল। বৈষ্ণবদের এই "মাথুরে"র পালা—মর্ম্মান্তিক পরিদেবনার সুর।

মাথুর গান।

এই মাথুরের মত করুণ গান বোধহয় আর কিছু হয় নাই—ইহা ভাষার গৌরব কবির তীব্র ব্যথার সুরে একদিকে রুদ্ধ-গুঞ্জন বন্যা, অপরদিকে রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের বিলোপ-জনিত—মর্ম্মান্তিক বিলাপ।

কত বীর, কত বিক্রান্ত রাজাধিরাজের স্মশান এই বঙ্গভূমি, এখানে লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম যখন "খাসা মখমলী" লাড়কা পায়, শিবে বলটোপ সুচেল পায়। যন গোঁফে চাড়া, ঘুঘায় আঁখি" এই মূর্ত্তিতে সৈন্যগণের পুরোভাগে রণক্ষেত্রে অভিযান করিতেন,—তখন শ্যামরূপা দেবীর অভয়-দানে ভক্ত নিশ্চিন্ত হইয়াই ঘোষেরও বক্ষ কম্পিত হইত, এখানে "সেনার প্রধান চলে সীতারাম দুজা যার ডরে পবন বুজর পড়ে ঝুজা," প্রভৃতি দৃশ্য সচরাচর দেখা যাইত এবং যখন বায়বৈগেগণ তাণ্ডব করিতে করিতে সৈন্যগণের অগ্রভাগে যাইতে থাকিত, তখন বঙ্গের গৌড়, বাসুদেবের বিজয় অভিযান ও সমুদ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল প্রভৃতি সম্রাট্‌গণের দিগ্বিজয়-যাত্রার কথা মনে হইত। এখানে প্রতাপাদিত্যের নিকট যখন মানসিংহের দূত আসিয়া বেড়ী (শৃঙ্খল) ও তরবারি রাখিয়া জানাইল, "এক হয় বেড়ী (অধীনতাসূচক) রাখুন, তরবারি ফিরাইয়া দিন, নতুবা যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা থাকে—তবে শুধু তরবারিটি রাখুন" প্রতাপাদিত্য বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, এই বেড়ী লইয়া যাও, "বেড়ী ও আপনার যনিবের পায়ে" আর "আমি শুধু মানসিংহকে জয় করিয়া ক্ষান্ত হইব না, আগ্রায় দিল্লীশ্বরকে পরাস্ত ও নিধন

করিয়া শত্রুরক্ত-রঞ্জিত অস্ত্র যমুনার জলে ধৌত করিল।" "যমুনার জলে যাব এই সত্যবচনে" কোথায় গেল সেই সীতারাম রায় যিনি মগ ও মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন? কোথায় গেল "মনোরমা" ? ছলনাপূর্ব্বক যাহার মস্তক কর্ত্তন করিয়া শত্রুরা নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মাথুরের এতবড় মাথা আমি দেখি নাই, এই মাথাকে বধিয়া আনিতে পারিলে না? কি দুর্ভাগ্য যে এমন লোকটাকে ছলপূর্ব্বক বধ করিয়া মাথাটী লইয়া আসিয়াছ।" (৮৯৯ পৃঃ) ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশে এই যে বীরত্ব ও চরমপরাক্রমের লীলাখেলা হইয়াছে, তাহা সেই যুগের বাঙ্গালাসাহিত্যের স্থায় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। শুধু 'মাথুরে' নহে, বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও সেই জাতীয় ভাবের ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছিল।

কত বীর, কত রাজা যে এই দেশে যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তাহার অবধি নাই। কত স্বর্ণচূড়, ইন্দ্রনীলশোভিত রাজপ্রাসাদ, কত নগর-শোভা হর্ম্ম্য ও প্রমোদ-উদ্যান নৈশ স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। এদেশের যে মূলকথার পরিচয় দেওয়া যায়, তাহাই ভক্তির অশ্রু-মাখা বিনম্র গৌরবের সহিত কবি কৃত্তিবাস যখন লিখিলেন, "লঙ্কায় আসিয়া দেখে ছিন্নভিন্ন সব। নাহিক সে দুর্গাদ্বার নাহিক সৌরভ"—তখন শ্রোতার মনে কত শত ক্ষুদ্র বিপুল লঙ্কার স্মৃতি উদয় হওয়ায় তাঁহার অশ্রুমাখা সহানুভূতি কবির লেখা সার্থক ও বাস্তবিক করুণাপূর্ণ করিত। কালিদাস যখন লিখিলেন, "অট্টালক অরুদ্ধাহিণী যার সঙ্গে যায় কেন দুর্যোধন রাজা ধূলায় লুটায়" তখন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্যোধনের স্মৃতিমণ্ডিত করুণ কথা পাঠকের মনে হইত। বঙ্গীয় কবিগণ সংস্কৃতেরই অনুবাদ করুন, কি কোন নূতন বিষয়েরই অবতারণা করুন, তাঁহারা তাঁহাদের কাহিনী ঘরে আনিয়া বাঙ্গলার ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়াছেন, এইজন্য বঙ্গের প্রাচীন কাব্যগুলি বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী। মুকুন্দরাম-সম্বন্ধে Cowell সাহেব যাহা বলিয়াছেন, বঙ্গীয় সমস্ত কবি সম্বন্ধেই অল্প বেশী পরিমাণে তাহা খাটে "কবি স্বর্গের কথাই বলুন বা মর্ত্ত্যের কথাই বলুন, তিনি সর্ব্বত্রই নিজ গ্রাম ও সমাজের দৃশ্য আঁকিয়াছেন" এই গুণে আমরা নিজের প্রাণের রসের ছিটান দিয়া কথাগুলি সরস ও জীবন্ত করার রীতিটা বাঙ্গালা প্রাচীন কবিদের বৈশিষ্ট্য। এইজন্য মুকুন্দরাম পশু-জগৎ ও উদ্ভিদ্-জগৎ বর্ণনা করিবার সময়েও চমৎকার কৌশলের সঙ্গে বাঙ্গালাগৃহের সুখ-দুঃখের চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন—"বনে থাকি বনে খাই, আড়িতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি ভালুক।" হস্তী বলিতেছে, "বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই নাহিক গোচর" এই সকল কথার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট।

কত বিয়োগান্ত নাটকের সার নিংড়াইয়া যে 'মাথুর' গান রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কুমারস্বামী লিখিয়াছেন,—"যে কোন অভিনয় লোকের মর্ম্মের সংবাদ দেয়, তাহাই প্রকৃত কাব্য" এই সকল গানে বাঙ্গালার হৃদয় মর্ম্মন্তুদ সাড়া দিয়াছে, এজন্য মাথুরের করুণা, রামায়ণ-মহাভারতের বঙ্গীয় অনুবাদের সুর, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বুদ্ধ পুরুষগুলি দেশময় ভাবের

বস্তু আনয়ন করিয়াছিল। "গলার কবচ মোর, কিঙ্কিণীর ধর ধর শিঙ্গা মোর বেথানে জননী নিশান অম্বুরী লয়ে, মধুরার হাতে দিয়ে, ক'য়ো তুমি হ'লে অনাথিনী, শুকায় সুবর্ণ ছড়া, বাপেরও চাল খড়া, সব লিয়া সমাচার ব'লো রবে অক্ষতর হ'য়ে, শঙ্খলিপি সংহারিয়ে, সমুখসমরে শাকা মালা" (বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুকালে মহাবীর শাকার এই উক্তির সঙ্গে মাথুরের "ললিতা লহ কঙ্কণ, বিশাখা লহ অঙ্গদ, চিত্রা লহ নীলমণি চুড়ি" ইত্যাদি পদ মিলাইয়া পড়ুন, বাঙ্গালার রণক্ষেত্র ও কন্দরে একযুগে একই বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল—এই জন্য বঙ্গসাহিত্যের সর্বত্র একই সুরের সাড়া পাইতেছি জয়দেবের কবিতা যবে ঘরে অলঙ্করণের যে আনন্দ-লালসার বার্তা ঘোষণা করিয়াছিল, সেই বার্তার উপসংহার পরবর্তী মাথুর গীত। বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী প্রমোদ উদ্যানে অতর্কিত মেঘ দেখিয়া কবির নীলাম্বর ও মেঘডুম্বর পাড়ী আঁধার রাত্রির সঙ্গে মিলাইয়া নিয়া "হর্ষি তরল আঁচলে"—যে কালা করিয়াছিলেন, জয়দেবের চক্ষে ছিল সেই দৃশ্য কিন্তু পরবর্তী কবিদের সেই আকাশে নিরাভরণা যোগিনীর বেশ—তিনি উপবাস ক্লিষ্টা, গোরা-লতিকা—"শরীর আহারে—বাসা বাসে পরে যেমন যোগিনী পারা" কুসুমবিহীন স্নিগ্ধ সঙ্কেতহারিণী "শুষ্ক কবরী চুল, দূরল কবরী দূর ছোড়ছি গজমোতি হারে"—"সাধাক সিন্দুর মুছিয়া করহ দূর" এই সন্ন্যাসিনীর নিরাভরণ রূপ তখন বঙ্গের আকাশে সঞ্চারিত হইতেছিল তখন উহারই কষ্টিপ্রস্তর-নিষ্পিষ্ট চন্দন-চর্চিত নীলকলেবর অনুধ্যান করিতেন, 'সমস্তের হাতের নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ, তখন ভক্ত সশঙ্কচক্ষু উর্ধ্বে তুলিয়া দেখিতেন, দূরে বিপুল কৃষ্ণবর্ণতে এবং মধুর মধুরায় করুণ সেই কালো রূপ আবিষ্কার পূর্বক ধ্যানস্থ হইলেন—তখন "আকুল পরাণে চাহে মেঘ পানে কি কহে দুইটি তুজ, এলাইয়া বেণী দুলায়ে গাঁথুনি দেখয়ে খসায় চুলে" এবং "এক দিঠি করি, ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে"

শ্রীমণ্ডিত ও শ্রীবিগ্রহবন্দনের পর বৈষ্ণব কবি—মাথুরলীলার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকালীলার সম্পূর্ণ পালিকা ধারণা করিতে পারিলেন ভারতের অন্য কোন কবি কংস ও জরাসন্ধের পার্থক্য এতটা বুঝিতে পারেন নাই শ্রীমণ্ডিত ভাণ্ডীর ও মথুরার অতুল ঐশ্বর্যকে দূরে ফেলিয়া কালাল ভক্ত বৃন্দের একটু ধূলিকণার প্রার্থী হইলেন, মথুরার সমস্ত শক্তি অপেক্ষা যে প্রেমের শক্তি সত্যস্তরূপে বড় মাথুরে তাহাই প্রতিপন্ন হইল এভাবে বৃন্দাবন অন্ত-সম্পদের বিয়োগে অধাত্ম-রাজ্যের পক্ষা হইলেন ও তাঁহার দৃশ্য হয় ভগবান করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায়

বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে বাঙ্গলার গদ্য সম্পদ্ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই সম্পদ বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয় কিন্তু মুসলমান কবি আলোয়াল সংস্কৃতে যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্র ছাড়া এতটা পাণ্ডিত্য আর কেহ দেখান

নাই। ইনি ফতেয়াবাদ (আধুনিক ফরিদপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী অনেকটি স্থান লইয়া ফতেয়াবাদ পরগনা গঠিত হইয়াছিল) বুন্দুকের অধিবাসী। তাহাদিগের সময়ে ইহার জন্ম হয়। ইনি আরাকানে যাইবার পথে জাহাজে জলদস্যুগণ দ্বারা আক্রান্ত হন। কোনও ক্রমে ইহার জীবন রক্ষা হয়—কিন্তু ইহার সঙ্গী সমস্ত্রের কৃতুব দুষ্ট করিতে করিতে সন্ধানের দ্বারা নিহত হন। আরাকানে ইনি মাগন ঠাকুর নামক এক রাজপুরুষের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পদ্মাবৎ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন বঙ্গদেশের সঙ্গে এই সময়ে আরাকান-রাজের ঘনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং আলোয়াল সুবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন—মতা নামক এক ব্যক্তির মিথ্যা সাক্ষ্যে এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়াতে কাব সাতবৎসর কারাভোগ করেন। এই ঘটনা ১৬৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। কারাগার হইতে বাহির হইয়া বৃদ্ধ বয়সে ইনি ছয়ফুল মলিকবদিউজ্জমাল প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু পদ্মাবৎই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে শুধু তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রদর্শিত হয় নাই, প্রত্যেকটি হিন্দু পূজা-পার্ব্বণ, আনুষ্ঠানিক ও সামাজিক ব্যাপারে অসামান্য অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া পদ্মাবৎ কাব্যের কোন কোন অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহার অনেক কবিতায় গীত-গোবিন্দের ছন্দ ও শব্দ-ঝঙ্কার বাঙ্গলা ভাষায় অনুকৃত হইয়াছে। এই কাব্যের বিষয় চিতোরের ইতিহাস বিখ্যাত রাজার উপাখ্যানটি। ১৫১৩ খৃঃ অব্দে যাঁর মালিক মহম্মদ সর্ব্বপ্রথম পদ্মাবৎ হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন—আলোয়ালের কাব্য তাহারই পদ্যানুবাদ। কিন্তু বাঙ্গলার কবি এই পুস্তকে এত মৌলিক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন যে আসলটি ভাল হইয়াছে কিংবা নকলটি ভাল হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়া অসম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে মুসলমান কবিগণের সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বক্তব্য আছে। মুসলমান নৃপতিগণের অনুগ্রহে রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষার অনুকূলে সর্ব্বপ্রথম সুবাতাস বহিয়াছিল। বাঙ্গলায় অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানী বাঙ্গলা পুস্তকের সংখ্যা-সংখ্যা নাই, তাহারা এত বেশী যে তৎসম্বন্ধে একখানি বড় ইতিহাস লেখা চলে। এই সকল পুস্তকের কতকগুলিতে উর্দ্দু প্রভাব এত অধিক যে তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলে না, অপরগুলি খাঁটি বাঙ্গলা। নগর ও সহরের সংস্রব-বর্জ্জিত বহু দূর পল্লীতে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করার পরেও রূপকথা, গীতিকথা ও পল্লীগাথার প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এক সুবিস্তৃত সাহিত্য বাঙ্গলার পল্লীতে পড়িয়া আছে—তাহাতে দুই হইবে বাঙ্গলা দেশের রূপকথাগুলির অধিকাংশ মুসলমানেরাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নব ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে হিন্দুসমাজে তাহা অধিকাংশস্থলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল গীতিকথা ও রূপকথা প্রভৃতিতে এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। "মল্লিকার পুথি" নামক একখানি কাব্যে মুসলমানগণ কিরূপে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন, অতি সুন্দর বাঙ্গলায় তাহা বর্ণিত আছে, উহার আখ্যান-বস্তুর মধ্যে অনেক কথাই ঐতিহাসিকেরা অগ্রাহ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি হিন্দু

মুসলমান সংস্পর্শের যে কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র এই কাব্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে এই দুই সমাজের কতকটা খাঁটি কথা আমরা জানিতে পারি। এইরূপ অনেক কথা আমরা পাইতেছি 'আমার Folk Literature'। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে কতকটা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সহজিয়াদের পুঁথির সংখ্যা নাই। তাহা এক সময়-বিশেষে এই সহজিয়া পুঁথিগুলির কতক কতক সকলেরই লিখিত এবং অনেকগুলির মধ্যেই উক্ত সম্প্রদায়ের সাঙ্কেতিক শব্দ আছে, যাহাদের কাহার পক্ষে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্থলে আমার বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৯৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত শালবণের গানের উল্লেখ করিতে পারি, এই সকল গানের ভাষা অতি সহজ বাঙ্গলা, কিন্তু ইহাদের ভাব এত জটিল যে আমরা যথা খুঁজিয়া অনেকগুলির কোন অর্থ করিতে পারি নাই। সহজিয়া-সাহিত্য বাঙ্গলার জনসাধারণের নিজস্ব। এই সাহিত্যে হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের মত ও তাহাদের আনুষঙ্গিক সাধনা-সঙ্কেত ভাষার কিন্তু অতি জটিল ভাবের সমবেশের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। এই সুপ্রচুর সাহিত্যের বিস্তৃতি ও সংখ্যা বাঙ্গলাদেশে মনে হয়— বাঙ্গলার প্রত্যন্তদেশের পথে এই প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কারের অবশেষ এতদ্দেশে যাহারা নিয়াছিলেন, আউল, বাউল, ফকির প্রভৃতি বিভিন্ন নামধারী সম্প্রদায়-গুলির অনেকেই বৈষ্ণব সাজিয়া সেই বাহ্যরূপের কথাগুলি এখনও এদেশে চালাইতেছেন। এই অদ্ভুত মতের বাহ্য প্রকাশ হইবার নহে, সুযোগ বুঝিয়া ইহা এদেশের ভূমিতে শিকড় গাড়িয়াছে, বৈষ্ণবেরা ইহা ভূঁইফোড় বলিয়া নিজেদের ভাবরাজ্যে উহাদিগকে ফুল গাছ রোপণ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ ইহাদের সাধনপ্রণালী ওকসাধ, পরকীয়া, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় এই অবস্থার আশে পাশে আজ ১০৫২ বৎসর যাবৎ ঘুরিয়াও খেই পাইতেছেন না। চারুদর্শন নামক পুস্তকে লেখক স্বর্গীয় পাঞ্চকড়িচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয় খানিকটা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই সম্প্রদায়ের পক্ষে জোর দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আলোচনা কতকটা বিবর্ণ হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ১৩১৮-২১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি।

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে বর্তমান বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজের নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে গৃহীত, সুতরাং ইহাদের কতক শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধসাধনার প্রভাব খুব বেশী। বোদ্ধভাবাপন্নসুফী সম্প্রদায়ের মত ধীরে ধীরে বাঙ্গলার পল্লীভবনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুসলমান ফকিরেরা পল্লীসমিতির মধ্যে সুফীমিশনের মত চালাইতেছেন, হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া সেই ফকিরদের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং আমরা যে খুব একদল শিক্ষাভিমানী হইয়া বাঙ্গলা ভাষাটার উপর কর্তৃত্ব ও মুরব্বীয়ানার চাল চালাইতেছি তাহা শুধু ভাষার উপরকার খুরটি খসল করিয়াছে। বিদেশী প্রভাবের সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্য, ঠিক সেরূপ উপকরণে নির্মিত হয় নাই, কিন্তু অবজ্ঞাত কোটি কোটী নরনারীর মধ্যে যে শিক্ষা এখনও প্রচারিত হইতেছে—পাগলা কানাই প্রভৃতি খাঁটি জন নেতারা যাহা দেশময় চালাইয়াছেন—আমাদের অগোচরে যে সাহিত্য বাঙ্গলার

বুটিবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার বিবরণ আমরা কিছুই রাখি না কিন্তু এই মুসলমান ফকিরদের মুসলমানী এবং দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে যাহা বাঙ্গলার পল্লীগুলির হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে,—তাহা চুকিয়া যায়, আবার আকাশ-বাতাস ও পারস্য হইতে আসে নাই তাহা খাঁটি দেশজ সম্পদ ও সেই বাঙ্গলার নিজস্ব। উহা বোধ জগতের কথা, দেহতত্ত্বের কথা। সহজিয়া প্রভৃতি যত খাঁটি মুসলমান বঙ্গের নিজস্ব নহে বৌদ্ধগান ইসলাম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-সংস্কার ছাড়িতে পারেন নাই শত শত বাউল ও ফকিরের দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহাদের সংখ্যা নাই বাঙ্গলার চাঁচার জন বাদসাহ ও আমীরের নাম কলিকেই হয়ত না কিন্তু অসংখ্য মুর্শিদা, অসংখ্য প্রভৃতি কয়েকজন কবির নামই এদেশে যথেষ্ট নহে, এমন কি কয়েকজন সুবিখ্যাত পদাবলী-রচকদিগের ও হয়ত দুই চারিটি আমাদের কবিতা শেষ হইবে না শত শত বাউল-ফকিরের গান, শত শত কথা যাহা মুসলমান ও হিন্দুর ঘরে ঘরে এখনও পল্লীতে কথিত হইয়া থাকে, যাহা [illegible] সুর ও মুসলমান রাজাদের দ্বারা প্রকাশিত বহু বাঙ্গলা পুঁথি, তাহাদের সমস্তগুলি পড়িয়া সন্ধান লইতে হইবে, এমন কি তাহাদের মূল্য কি পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করা নিতান্ত আবশ্যক তাহাও স্থির করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস এই অনুসন্ধান যে পরিমাণেই করা হউক আমাদের প্রত্যাশাকে অতিক্রম করিবে এবং বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য্যগঠনে মুসলমানের দান হিন্দুর চেয়ে কম নহে, বরঞ্চ দুই পুরুষ কালের পরিপাকে সে প্রভাব আরও বেশী। মাত্র কয়েকজন মুসলমান উর্দ্দু ফার্সী বলিয়া বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষার দাবী কখনো ফেলিতে পারিতেন না। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যাহা শিখিয়াছেন, যাহা যুগ-যুগ ধরিয়া তাঁহাদের সমাজে বহমান, তাহার প্রভাব তাঁহারা এড়াইবেন কিরূপে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের কর্ত্তা ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া-সমাজ সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও রুচি পরিচালনা করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে প্রতিনিধি রাজবল্লভ মহাসহরে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। রাজবল্লভ তাঁহার সহকারী শাসনকর্ত্তা (Deputy Governor) ছিলেন, এবং মুর্শিদাবাদের ঘেসেটি বেগমের অন্তর্দ্ধানে আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে তাঁহার প্রভাব খুব বেশী ছিল। ন্যায়পূর্ব্বক হউক কিংবা অন্যায় করিয়া হউক, রাজবল্লভ স্বীয় প্রতিষ্ঠিত রাজধানী রাজনগরে কুবেরের ঐশ্বর্য্য

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে কতকটা ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, প্রথমতঃ নবাব সরকারে রাজবল্লভের প্রাধান্যের কথা তাঁহাকে রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান করিত, দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের হাতে 'রাখি' বাঁধিয়া দক্ষিণাস্বরূপ পূর্ব্বকৃত ঋণ কয়েক লক্ষ টাকা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। প্রকাশ্যভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহস করিতেন না। কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম যুগে যে সব রাজা রাজবল্লভ কাণ্ড, কানুনগো, ব্রাহ্মণ হইতে পণ্ডিতগণ আনাইয়া নিষ্কর জমির উপরে স্বত্বের বিষয়ে চেষ্টা করিলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভিতরে ভিতরে এই কার্য্য বন্ধ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। কোন বৈদ্যকে তিনি উপযুক্ত গণ্য দিয়া তাঁহার রাজসভায় লইতে দিতেন না। রাজবল্লভ বিধবা বিবাহ-প্রচলনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীতিচতুর কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। মহারাজ রাজবল্লভ প্রতিষ্ঠিত রাজনগরের রাজধানী যে অপূর্ব্ব গৌরব লাভ করিয়াছিলেন তাহার কার্য্যকারিতা দেখিবার জন্য বহু কৃষ্ণনগর রাজনগরে আসিয়া ছবি আঁকিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার দেখাদেখি নবাবপক্ষের 'মিরনিবাস' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজবল্লভের বৈভব তাঁহার ছিল না, সুতরাং সেই সমকক্ষতার চেষ্টা, ফিউঁরিয়া মেমোরিয়াল হল নির্ম্মাণ করিয়া তাজমহলের অনুকরণ করিবার চেষ্টার মত বিফল হইল। কিন্তু এক বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সমকক্ষতা রাজবল্লভ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র বহু পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাঁহার সভায় পাইয়াছিলেন, রাজবল্লভ যদিও পণ্ডিতকে অকৃপণ হস্তে অর্থ দিতেন, তথাপি কবিরায় ভরতমল্লিক রুদ্রানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায় পঞ্চানন এবং শিবরাম বাচস্পতি প্রভৃতির ন্যায় সার্ব্বভৌম পণ্ডিত তাঁহার সভায় ছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। এদিকে কৃষ্ণনগরের রাজকবি ভারতচন্দ্র ও রাজাজ্ঞায় প্রাপ্ত রামপ্রসাদ কবিত্বের প্রায় অধিকার করিয়াছিলেন। রাজনগরের রাজকবি জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ী প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেও অবশ্য পূর্ব্বোক্ত দুই কবির সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র রায়ের আদিনিবাস ছিল পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রাম বর্দ্ধমানের রাজার অত্যাচারে এই পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হন।

ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ ভূরসুট পরগনার রাজা ছিলেন এদিকে তিনি কেশরকুনী বংশের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে তাঁহাকে মণ্ডল হইতে ভ্রান্তিত হইতে হইয়াছিল। দারিদ্র্যের দশা দিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের উরহ পথে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলায় তাঁহার তুল্যাধিকার ছিল, একলা তিনি অন্নদামঙ্গলে আমাদিগকে জানাইয়াছেন বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্বান্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০ টাকা বেতনে তাঁহার রাজসভার কবির পদে নিযুক্ত করেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাঁহার গুণগ্রাহী পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের বিচার উপলক্ষে "শাস্ত্র-তর্কে পূর্ব্বপক্ষ সুন্দর কবিল" ইত্যাদি কবিতায় তিনি তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রমাণ করিয়াছেন। সেতুবন্ধ, মন্দাক্রান্তা, কুরঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ছন্দ তিনি বাঙ্গলায় যে ভাবে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়ের সফলতার

পরিচায়ক। বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণে হ্রস্বত্ব দেখা যায়, তথাপি তৎপ্রবর্তিত ছন্দগুলি অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুমত হইয়াছে, কোথাও বিলক্ষণ ভুল হয় নাই। এই কবির অসাধারণ, কিন্তু ইহা ছাড়া ইহার আরও বাহাদুরী আছে। সংস্কৃত অলঙ্কারিকগণ যে নিয়ম করেন নাই তাহা অর্থাৎ, পদের চরণ মিল দেওয়ার রীতি—ভারতচন্দ্র বাঙ্গলায় প্রবর্তিত করিয়াছেন, তিনি কবির পরাকাষ্ঠা হইতে ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলিকে মিল দান করিয়াছেন। আর একটি প্রধান পরিচয় দিবার এই যে এই সংস্কৃত ছন্দগুলির প্রবর্তন করিবার মধ্যে কবির কোনরূপ পরিশ্রমের চিহ্ন দেখা যায় না। সুগায়কের কণ্ঠের গানের ন্যায় এই ছন্দোবদ্ধ পদগুলি কি সুমধুর ও একান্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বহু কবি ইহার পূর্বে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বাঙ্গলা কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের চেষ্টাই কবিতা যে বলেছে হইয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলার অতি সহজ মিলন হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দগুলি যে ভিন্ন ভাষার, তাহা এই বাঙ্গলা কাব্য পড়িয়া মোটেই মনে হয় না। ইঁহার সম্বন্ধে সংস্কৃত পুরের সম্পূর্ণেই কবি কেহ ইহার কাব্যগুলিকে 'ভাষার তাজমহল' বলিয়া গিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ছন্দের অনুরোধে পাকের শব্দগুলিকে অনেক সময়ে সংস্কৃতরূপ করিয়াছেন—যথা "ছলছল কলকল উথলে তরঙ্গ" পদের নিকট "সর্ষপাকার—এই বিশ্লেষণের দ্বারা কবি একটি ছত্রে সংস্কার বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে সংস্কৃতানুরূপ করিবার জন্য তিনি বাঙ্গলা 'ছলছল', 'কলকল', 'উথলে' এই তিনটি শব্দকে বিশেষ কলাকৌশল করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের রচনা কখনও কখনও এইভাবে বাঙ্গলা শব্দগুলিতে সংস্কৃতের মোহর অঙ্কিত করিয়া নবীন প্রমাণ করিয়াছে। বিদ্যার রূপবর্ণনা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে সংস্কৃতের ছাঁচ ইহার মধ্যে চালানো হইয়াছে, অলঙ্কারের সাহায্যে রচনা উৎকট হইয়াছে। অতিরিক্ত ভাল করার চেষ্টা এইভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র কোন গোরব ভিত্তি চাহেন, কোন করুণ মর্মান্তিক ঘটনা কোন মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করিতে পারেন নাই কিন্তু ভাষা সম্পদে, শব্দের কোন আঘাত চকাবর্তে, শব্দবিন্যাস রসিকতায় তিনি প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার অনেক কবিতা সহজ কথার এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক যে তাহা বাঙ্গলার প্রবাদ বচনের ন্যায় হইয়া আছে।

ভারতচন্দ্রের সমকালবর্তী রামপ্রসাদ। বিদ্যাসুন্দর-রচনায় রামপ্রসাদ ভারতের গুরু। ভারতের এমন কোন উচ্চভাব নাই, এমন কোন অলঙ্কার নাই, যাহা রামপ্রসাদ পূর্বে লিখেন নাই, কিন্তু ভাষার লালিত্যের দ্বারা ভারতের কাব্য রামপ্রসাদের মৌলিকত্বকে একেবারে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রামপ্রসাদ বৈষ্ণবদের ভাব চুরি করিয়া কালীর শাক্তধর্মকে যে কোমলশ্রী প্রদান করিয়াছেন, বাঙ্গলার শাক্তধর্মের এমন ভাবাই বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী দশভুজা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পূজা অঙ্গন খড়্গ, অগ্নি, চক্র, শূল প্রভৃতি আয়ুধধারিণী হইয়াও বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি হইয়াছেন। তাঁহার পদতলে সিংহ ও অসুর, জটাজুটে নাগিনী—এই

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য ১৮৮৩-৯০ খৃঃ।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য ১৮৬২-৮৩ খৃঃ।

মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য ১৮৫৭-৬২ খৃঃ।

মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ১৮৯০-১৮৯৭, পুনঃ ১৮৯৯-১৯০৯ খৃঃ।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বগামী রামপ্রসাদ 'মা' হইয়া আসিলেন। এত সময়ে কবিচন্দ্র বাঙ্গালির মুক্তকাণ্ডটাকে সংকীর্ত্তনের ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত কবিগণ সেইরূপ 'শতদলদলবিমল মনোজ্ঞকে' মোহার মত গলায় করিতে চাহিয়াছেন। এই শক্তি প্রধানতঃ মায়ের। রামপ্রসাদের মধ্যে ঘরোয়া গানগুলির মধ্যে তাহা সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিতার ন্যায় যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, বাঙ্গলার আর কোন সাহিত্যের সেই শ্রেষ্ঠ কবিতা গুলির মধ্যে তাহা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রামপ্রসাদের সুরে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ বিপন্ন সন্তানের মা ডাক মুক্ত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বঙ্গদেশ এক হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ও দুর্দ্দিন যে কোন সময়ে পরিবর্ত্তন করুক না কেন, বাঙ্গালা তখন বাঙ্গালার মা'র কাছে পূজা করিতে চাহিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানে সেই শ্রেষ্ঠ সত্য বঙ্গসন্তানের কণ্ঠকে আকুল কণ্ঠের 'মা'-ডাক।

রামপ্রসাদ ভবিষ্যতের অপেক্ষা করেন, কিন্তু কাহে। তিনি কালীঘাট শ্যামাপূজার দেওয়ান-আদালতে মোকদ্দমা করিয়াছেন 'কৃষ্ণ'চরণের আশায়। "শুন মা আমার দুঃখিনীর্ব্বা আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী। পদতলে রাখ তুলসী বিল্বপত্র দিয়াছি। ভক্তিবারি দিয়া তাহার মাঝে ১০ টাকা সুদ দিয়ে দিয়ে কাঁদিয়া তাঁহাকে জানাইতে হইবে নিষ্কৃতি মন। সংসারে পাঠা কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে কতকটা জমি নিষ্কর দান করিয়া তাঁহার নামোল্লেখ করেন। ইহাও প্রমাণ যে নিমকহারামকালী রামপ্রসাদকে স্বীয় গোকায় ডাকিয়া আনিয়া তাহার মধ্যে মাতৃসম্বোধনে খুসী করিতে হইয়াছিলেন। সেবার পুষ্টাব্দে কালীবিসর্জ্জনের সময় রাজা নাকি রামপ্রসাদ প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেহত্যাগ করেন।

রাজা রাজবল্লভের প্রতি তদানীন্তন সমাজে চরিত্রহীন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বা অন্নদামঙ্গলের সমকক্ষ কাব্য না হইলেও আকারে সেই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অনেক আছে। সামাজিক চিত্রোদ্ধারে ভারতচন্দ্রে খুব দৃষ্টি আছে। কবি স্বয়ং রাজসংসারভুক্ত ও বিলাসী অবস্থাপন্ন। তিনি যে খুব সৌখিনতাপ্রিয় ছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যের মূল্যনির্ণয় বর্ণনায় যথেষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিলাম —

"রাজার প্রভাত মাঘমণ্ডলের প্রায়। তিন প্রহর রহে নিশি হুকা বিশ হাজার। বিশ বিশ মণ তাহে প্রতি মুক্তার ওজন। তাহে মণিকর বহু ঝলক নয়ন। পঞ্চদশ পঞ্চশির বহু প্রতি হাতে। তেমন ঢাল বহু লিখিতে ন্যূনতে। নব হাতে কুমকুম লয় মাখিয়া। নিশি দুই প্রহরের মুক্ত অন্ধকারে দীপ প্রায় প্রকাশিল জ্যোতি। মহোৎসব আসিছে ভক্তি ভোর হইয়া। নিশি ভরা আনন্দপূর্ণ পক্ষের সমান। তারা যার নিশি হাতার আর লয় যায়। আলোর তেজেতে নিশি দুটির দুয়ার। সব নিশি নিশি হইল তখনে। চলন না দেখি তাহে ধাঁধা হয় মনে। আঁধিয়ার হয় যেন হয় মনোহর। তখনো আসে নিশি ছয় হাজার।"

অনেকদিন রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল রচিত অনেকগুলি অংশে চরিত্রচিত্রণের স্থান পাইয়াছে। তাহা সাহিত্যিক অনেকগুলি হইলে চরিত্রচিত্রের বহু আলোচনার পরিচয় প্রদান করিতেছে

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৪০২-১৩ পৃ. দ্রষ্টব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু যন্ত্র-সংগীত রচিত হয়। এখানে তাহার উল্লেখের অবকাশ নাই। বাত্রাওয়ালাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস ও রাই উন্মাদিনী (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) এই দুইটি অমর কীর্ত্তি। কৃষ্ণকমলের জন্মস্থান নদীয়া জেলার ভাঁড়না গ্রামে এবং কর্ম্মস্থল ঢাকায়। তিনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চাশৎ বর্ষে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে প্রাণত্যাগ করেন। সমস্ত বৈষ্ণবগ্রন্থ মন্থন এবং অমাবস্যা-সাহিত্যের রস নিঙড়াইয়া কবি তাঁহার এই দুই গ্রন্থ রচনা করেন বিশেষ রাই উন্মাদিনী। এই পুস্তকে রাধার মাঝে চৈতন্যের প্রেমমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে, যিনি চৈতন্যের সম্বন্ধে আবদ্ধ—তাঁহার এই অপূর্ব্ব কাব্যের স্বাদগ্রহণের প্রয়াস পাইবেন না। কয়েক মাসের মধ্যে কৃষ্ণকমল রচিত বিচিত্র বিলাসের ২০,০০০ পুস্তক বিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার উপর দিয়া বড় বড় বন্যা ও টর্ণেডোর প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাই উন্মাদিনী যে অশ্রুর বন্যার সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহার তুলনা নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত পুরুষই এই অপূর্ব্ব উন্মাদনার বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। চৈতন্য যে কত সত্য, তাঁহার প্রেমের কথা যে কত মর্ম্মান্তিক এবং তিনি যে বাঙ্গালী হৃদয়ের কত আপনার জন, তাহা এই বিয়োগান যাত্রা শুনিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রোতা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এই লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত গীতনাট্যের প্রত্যেকটি গান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিল।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে কবিওয়ালাদের মধ্যে ভবানীচরণ ও রামবসু বাঙ্গের মহজন-সমাদৃত কবি ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যে কৃষ্ণধামালী নামক কবিতা বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত—সেই ধামালীর সমস্ত আবর্জ্জনা ঘুচিয়া গিয়াছিল এবং উহা চৈতন্য-প্রেমের পূত-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক শুদ্ধস্নাত অবস্থায় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রায় ১০০ বৎসর যাবৎ নিশ্চল ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে কবিওয়ালাদের গানগুলি শুধু শব্দমধুর নহে, সত্য সুন্দর শুভ-সম্পন্ন সম্পূর্ণ এবং নিষ্পাপতার দ্যোতক হইয়াছিল। বিরহসঙ্গীত ও কৃষ্ণ-ধামালীর দুই ধারা কবির গানে নবজন্ম ধারণ করিয়াছিল। ঐ দুই শ্রেণীর গানও খুব নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গীত হইত। কবিওয়ালারাও প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোক—ইহাদের মধ্যে মুচি, ডোম প্রভৃতি জাতীয় কবিও ছিল। রামবসুর এই গানটি সর্ব্বজনপরিচিত, "মনে রইল সই মনের বেদনা, প্রাণে বলি বলি বলা হ'ল না, সবারে মরমের কথা কওয়া গেল না। যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, তবে নিলজ্জা রমণী ব'লে হাসিত লোকে। সখি বারণ সে বিধাতাকে, নারীজনম যেন আর হয় না। যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে তার মুখ দেখি মুখ ঢাকি কাঁদিলাম সজনি।" অনায়াসে প্রকাশে যেন সে ঋণমুক্ত।" শেষের কয়েকটি ছত্রের করুণ সুর সর্ব্বত্র প্রাণে দাগা দিয়া যায়। বিদায়কালেও তার হাসি কি নিদয়, সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, যাইবার সময়ও তাহার চোখে মুখে একটু দুঃখের ছায়া পড়িল না, বরং হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। শেষ ছত্রের

রামবসু।

"অনায়াসে" শব্দটি বড় কঠিন। সে "অনায়াসে" চলিয়া গেল, একটুও কষ্ট হইল না। সলজ্জা বধূ তাঁর হাসিমুখ দেখিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়া সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন পাছে নিষ্ঠুর সে, তাঁহার সেই অশ্রু দেখে।

এই গানটি "বঙ্গের সেই সুকোমলা বধূ" পল্লীঘরে সলজ্জ মধুর মূর্ত্তির একখানি চমৎকার ছবি, এই ছবি কি আর দেখিতে পাইব? সেই যে "ধনি বলি বাল বলা হল না" সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না"—বৃষ্টিধারা মুখে কুঁড়িটির মত নূতন অনুরাগে ভরা হৃদয়টি—এখনও যাহার সুগন্ধ বাতাস বিলাইতে পারে নাই, কোমল দলগুলি তাহা জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, এখনও ছাড়িয়া দেয় নাই সেই স্বর্গীয় ফুল কি আর দেখিতে পাইব? নারী স্বাধীনতার এই যুগে কি পল্লীবাসিনীর লজ্জাময়ী মূর্ত্তির গৌরব আর থাকিবে?

বাঙ্গলার কবিগণের শ্রেষ্ঠ দান—আগমনী গানে তখন কোলীন্যের মর্য্যাদা অত্যধিক হইয়াছিল। পূর্ব্বকথার বিবাহে লোকে শুধু কুল খুঁজিত এখন যেরূপ বি এ, এম এ পাসকরা ছেলের চাহিদা খুব বেশী সেকালে কুলীনের ছেলেমেয়ের মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক ছিল, কুলীনের ঘরে ভঙ্গ হইলে কাণা, খোঁড়া—কুলীনের ঘরে বিকাইত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত নিজে খুব সুশ্রী ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত কুরূপা ও অশিক্ষিতা একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতা কুলকার্য্য করিয়া এইরূপ এক পত্নীসঙ্গিনীকে পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছিলেন। আমার কোন আত্মীয় অতিশয় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তিনি তাঁহার ছেলে পুরুষে তোতলা এবং কুরূপা মহিলার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, কুলের গৌরব তখনকার দিনে সর্ব্বগৌরবের উপর ছিল এই সকল বিবাহের ফলে অনেক সময়ে বিসদৃশ ঘটনা ঘটিত। অনেকেই জানেন ঈশ্বর গুপ্ত এই পরিণয়ের ফলে স্ত্রীজাতি-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন আমার সেই আত্মীয়ের পুত্র তরুণ যুবার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, বিবাহের অল্প পরেই তিনি পাগল হইয়া গেলেন। কুলীনেরা অর্থের গৌরব চাহিতেন না, তাঁহারা সাধারণতঃ চিরদরিদ্র থাকিতেন, কেবল কুলের বড়াই করিয়া অনেক সময়ে শিক্ষাদীক্ষায়ও বিরত হইতেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেকের সস্ত্রীক বিবাহ যোগাড় করা নিতান্তই কঠিন কথা ছিল এদিকে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজাইবার চেষ্টায় ধনী মানিনী মূর্খ একান্ত দরিদ্র ও নেশাখোর বৃদ্ধের হস্তে তাঁহাদের আপোগণ্ড বালিকাদিগকে সমর্পণ করিয়া সামাজিক প্রশংসা অর্জ্জন করিতেন। সমাজের যখন এই অবস্থা—তখন এই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের যাহা কিছু অশুভ ও কষ্ট তাহা ভোগ করিতে হইত—সেই বালিকা কন্যাকে ও তাহার মাতাকে আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে বাঙ্গলার লোকে হিন্দুধর্ম্মকে ব্যাবহারিক জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই—পোষাকী ধর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালী কখনই তৃপ্ত হন নাই ঘরের কথার মধ্যে তাঁহারা স্বর্গের কথা আবিষ্কার করিতেন, মন্দিরের ঠাকুর যতদিন তাঁহাদের অন্তরের ঠাকুর না হইতে পারিতেন, ততদিন তাঁহারা ঠাকুরের উপাসনা করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না।

ঈশ্বর গুপ্ত।

বাঙ্গলার আগমনী গানে বাঙ্গলার জননী ও কন্যার হৃদয়ের নিহিত বাৎসল্যের প্রবাহ

আগমনী গান।

যাইয়া তাহা চক্ষুকির কাঁয় বাকিয়াছে স্বয়ম্ব কাছে [illegible] কথা শুনিয়া মেনকা [illegible] যখন [illegible] তাঁহার [illegible] কহিতে পাস্থ পটুরূপে [illegible] করে, অথচ কন্যার [illegible] ছলেরা কুধার [illegible] পথে ঘুরিয়া বেড়ায়—এ কষ্ট মায়ের অসহনীয় তাঁহা গিরিরাজকে বলিতেছেন "তুমি এ কথের গিরিরাজ, আমায় কতদিন কত কথা বোঝাও আমার মনে [illegible] আমার লক্ষ্মের আকি [illegible] হ'য়ে আছি ক্ষণার্দ্ধক [illegible] কার্ত্তিক [illegible] সন্তান [illegible] কিন্তু এই পরে সন্তানের কথা [illegible] উমার কথন মনে পড়ে, এবং কত অনুরের সোনার কার্ত্তিকদের এই মর্ম্মান্তিক দুঃখের কল্পনাবিহ্বলা মাতৃহৃদয়ের মনে অপূর্ব্ব কারুণ্যের সৃষ্টি করে [illegible] কবিরা এরূপ সরল অন্তর্দৃষ্টি কথা কহিতেন যাহাতে সকলের অধিকার ও দাবী মহেশ্বরের গৃহবর্ণনা করিতে যাইয়া [illegible] ছলার ঘরে [illegible] হইয়া গিয়াছেন

এরূপ গানে শুধু একটী নাত্র [illegible] কোনটিতে মেনকা বলিতেছেন গিরি, [illegible] তোমার [illegible] যে [illegible] স্বপ্নে দেখা দিয়া চলিয়া গেলেন, মায়ের দুঃখের কথা শুনিতে কেহই প্রতীক্ষা করিলেন না মেনকা কন্যার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন কাহারই বা কি [illegible] পাষাণের মেয়ে পাষাণী হ'ল" গিরিরাজও পাষাণই বটেন, কিন্তু এখানে গিরিরাজের হৃদয়ও যে পাষাণেরই মত তাহারই ইঙ্গিত দিয়া স্বামীর নিষ্ঠুরতার প্রতি মৃদু কটাক্ষ করিতেছেন। অন্য একদিন নারদের মুখে বাণী শুনিলেন, "কা বোল বাকল ইহ [illegible]" অর্থাৎ কি অনুমান করিয়া থাকা যায়? স্বামীর না বলিয়া কহিয়া নারদকে বলিতেছেন, "হাড় মাস ছিল, আনিতে গেলাঁ, উমা কেমনে রয়েছে" তিনি এমন কত কথাই শুনাইয়াছেন, শঙ্কর জন্মেই নাকি ছাড় খাইয়া দিগম্বর সাজিয়াছেন এবং গৌরীকে কত গালাগালি করিতেছেন "উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ, ভাঙ খেয়ে ভোলা ফেলেছে," এমনই কথা তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক মায়েরই গানের কথা ছিল ইহাদের সেই চাপা কান্নার ভাষা দিয়াছিলেন কবিরা এবং এই কথাগুলি গৃহোৎসব ভরিয়া গাহিয়া বিজয়ার বিদায় বাজনার সুর বাজনার পল্লীতে পল্লীতে একটা মর্ম্মন্তুদ শোক বহাইয়া দিত।

মেনকা কখনও আর সহিতে পারিতেন না সেই বৎসর ভরিয়া নিরন্তর দুঃখে প্রায় আকুল হইয়া উঠিত তিনি একটি গানে বলিতেছেন "গিরি আমার মনের এই বাসনা, আমি জামাতা সহিতে, আনিব দুহিতে, গিয়ে পুরে করব কিছু স্থাপনা। ঘরজামাই করি রাখবো কৃত্তিবাস, গিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস—হরগৌরী রূপ হেরব বারমাস—বৎসরান্তে আসে যেতে হবে না" গিরিরাজ অচল,—একটি গানে কবি তাঁহাকে মেরোরোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে নড়ান খুব সহজ ব্যাপার নহে, সুতরাং স্থিরই যদি হিমালয়ে স্থাপন করা

যায়, তবে প্রতি বৎসর অনড় স্বামীকে নড়াইবার চেষ্টা করার কার্য হইতে মুক্তি পাওয়া যায়—এই যে মেনকারাণীর আর্ত-বাৎসল্য এবং স্নেহ, যাহা কবিরা মর্ম্মান্তিক করুণার সুরে বর্ণনা করিয়াছেন—আগমনীর অতুলনীয় পদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলার তদানীন্তন শরৎ কালের নিজের সুর। দুর্গোৎসবের সর্ব্বাপেক্ষা করুণ রসের উৎস—মিলনোৎসবের মধ্যে কন্যা-বিরহের জন্য ব্যাকুলা জননীর প্রাণের নিভৃত বিলাপ। এই কবিতাগুলি নাকি উৎকট, কবিওয়ালারা নাকি 'অতি বীভৎস—অনুপ্রাস দোষদুষ্ট শব্দের বিকৃত রুচির পরিচায়ক—কবি সম্রাটের এই মন্তব্যের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণ কখনই সাড়া দিবে না।

কবিওয়ালারা যে এই পবিত্র উৎস বহাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার শুধু পারিবারিক মর্ম্মকথার সন্ধান দেয় না—শুধু তাহা হইলে ইহার মূল্য ততটা বেশী হইত না, করুণ রসের উদাহরণস্বরূপ বাঙ্গলার আগমনী গান একটা দর পাইত এই পর্য্যন্ত। কিন্তু উপসংহারে কবিরা যে সকল ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মহেশ্বরের ধ্যানমগ্নিত মূর্ত্তি বাঙ্গালী হৃদয় কতটা উপলব্ধি করিয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। কবি শেষ গানটির সমাপ্তি-বাক্যে বলিতেছেন, "যারি তুমি বাতুল হইয়াছ, কুবেরের ভাণ্ডার দিয়া যাঁহাকে কিনু ভুলাইতে পারেন নাই, যিনি এক মুহূর্ত্তে পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর মুহূর্ত্তে যোগীশ্বরের মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ ঊর্দ্ধলোকে বিহার করেন, যাঁহার তপস্যায় যুগ যুগ চলিয়া যায়—দেবতারা যাঁহার যোগ নিমগ্ন সমাধিস্থ রূপের কাছে আসিতে ভীত হন, শ্মশানের চিতা ভস্মমালা যাঁহার কাছে কৌতুকের বস্তু ও পারিহাস্য হইতে প্রাচ্য—সেই চিতাভস্মারোহী, অমৃতহলাহলের বৈষম্য-বিকৃত, যোগীশ্বর মহেশ্বরকে তুমি "ঘরজামাই" করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাও—যিনি লীলাবশতঃ ক্ষণেকের জন্য ভক্তের কাছে ধরা দেন, তাঁহাকে তুমি 'চরকলা' করিতে চাও, তুমি বাতুল।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার অন্তঃপুরের মর্ম্মান্তিক ও বাঙ্গালী জীবনের নিগূঢ়-ভাবের প্রবাহ হইতে এই আগমনী গানের ধারা বহিয়া আসিয়া শিব সমাধির স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছে। যাঁহারা আগমনী গান বুঝেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে বাঙ্গলাদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস বুঝিতে বিলম্ব হইবে।

আমরা এইখানেই সাহিত্যের ইতিহাস শেষ করিলাম। এই যুগে শব্দ-যন্ত্রের গুরু কয়েক জন কবি জন্মিয়াছিলেন এবং ভাব-যন্ত্রের গুরু কয়েকজন কবি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে, সংক্ষেপে দুইটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। শব্দ-যন্ত্রে গোপাল উড়ে কত উৎসবের রাত্রিকে যে উজ্জ্বল করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই সেই তরল হাস্য, সে নৃত্য, সেই সকল মিষ্ট কথা, যে দেখিয়াছে শুনিয়াছে—সে জীবনে ভুলিবে না। সেই "কুল বোগাই কেমন করে যামিনীতে কামিনীকুল নিত্য নে যায় চোরে," কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের তাল ও নূপুরের ধ্বনি মনে পড়ে "কোদাকার হাবা ছেলে হাসি পায় শুনে, সদায় বসে কই মাগী দুই বিয়া ছিলিনে—কলস যেন কড়ি খোকা, রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা, মনে একটু হয়না ভাবনা—আসে, বাঁচলে

গোপাল উড়ে

কি বাবা আছে দিব সে এনে"—কলেজের বালিকার ওই গানের সঙ্গে দুইটি তালে মালিনী মালী নাচিয়া গাহিয়া অপূর্ব্ব রস করিয়া দিত—সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে কি তাহা কখনও ভুলিতে পারে? সখের কালের কিছুই একটি দুইটি পড়ে না—তাহা অবশ্য, এই গানগুলিও তাহাই "কে শিখাল তোরে এই সখ-কাটা বিদ্যে—থাক থাক থাক্, হবে মাড়কাক—ঠোকর দিল শিব নৈবেদ্যে—গোবরা পোকা হবে বলিল পদ্মে" জীবনে সকলকে বিকার-গ্রস্থত নির্ব্বাকনিষ্কল হইয়া দৃক্পাত করে যখন থাকা যায় না—একটু তরল আমোদ-প্রমোদের জন্য মনের মাঝে মাঝে একটা ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক, তাহা আমরা মনে করি না যদি সত্য সত্যই কেহ স্থানু কিংবা অচলায়তন তেমন ধারা থাকেন, তবে আমি সপক্ষ করিয়া বলিতে পারি যাত্রার ঢাঁয়ারা দলী সঙ্গে নাচিয়া গাহিয়া তাঁহার প্রতি ঐ সকল গানের ফুলশর হানেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য চূর্ণমার হইবে

এই সকল কবিদের কীর্ত্তির, গোপাল উড়ের বাঁধনদার বৈষ্ণব দালদারের কিন্তু এই গানগুলি গোপাল উড়ের নামেই চলিয়া আসিতেছে বলা আমরাও তাহারই নামের উল্লেখ করিলাম। চতুরান বাঁধনদারনিবাসী যাত্রাওয়ালার নামার্থের শব্দের উপর এত আশ্চর্য্য অধিকার ছিল, ইনি যমক অলঙ্কারের এরূপ অপূর্ব্ব খেলা করিতে শব্দের উপর করাইয়াছেন যে, স্বীকার করিতে হইবে, ইনি একজন প্রকৃত খেলোয়াড় বটেন, সে সকল খেলা দেখিয়া প্রীত হই এবং বোধ হয় বিস্মিতও হই, কিন্তু যখন এই চতুর লোকটি তাঁহার কিপ্র ও উজ্জ্বল প্রতিভা দ্বারা আসর জমাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া স্বগৃহে আসিয়া গৃহদেবতার কাছে "দোষ কারও নয়গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা" বলিয়া কাঁদিতে থাকেন, কিংবা সেই দেবতার রূপে মাধুর্য্য ও ভীষণতার সংমিশ্রণের আভাস পাইয়া "কালবরণী, কলঙ্কিনী রমণী" বলিয়া স্তোত্র পড়িতে থাকেন—কখনও "কাল নয়ন-তিমির বিনাশনী, নিরবধিকাম নিশানাথ নিতম্বিনী" আবার পর মুহূর্ত্তে "কোলরসনা করালবদনা" বলিয়া ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করেন, তখন তাঁহার সেই মর্ম্মস্পর্শী অনুভূতি—তাহার সেবার পরিপূর্ণ ভাব মূর্ত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে সংহার-মূর্ত্তির ধ্যান আমাদিগকে তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধের প্রার্থী করিয়া তোলে।

এই শক্তি মন্ত্রের গুরুত্বকে ছাড়িয়া আমরা কলিকাতার এক সময়ের বড় লোকের সংগীত কলার অবলম্বনস্বরূপ রামনিধি গুপ্ত সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শেষ করিব—

রামনিধিবাবু নিধুবাবু, ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৯১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন বাগবাজার অঞ্চলে এখনও তাঁহার অট্টালিকা গৃহখানি আছে তাঁহার ভক্তের একসময়ে সীমাসংখ্যা ছিল না, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বড়লোক ছিলেন, এখনও সংগীতবিজ্ঞানানুশীলন-কারীদের মধ্যে তাঁহার ভক্তের অভাব নাই, এতাদৃশ ব্যক্তির গৃহখানি সংস্কার করিয়া মূর্ত্তিরক্ষার কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না—বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। রামনিধি গুপ্তের গানগুলি অধিকাংশই সাবি মিশ্রের টপ্পার অনুকরণে রচিত; রাধাকৃষ্ণের কথা বাদ দিয়াও যে প্রেম-সংগীত বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইতে পারে—তাহা নিধুবাবু দেখাইয়াছেন। "কানু ছাড়া

গীত নাই" একথারও অলঙ্কার তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি প্রায়ই অতি সংক্ষিপ্ত, সেই স্বল্পকথা স্ত্রীলোকের একটি সমগ্র ভাব প্রকাশ করে। সেই ক্ষুদ্র গীতগুলি বিয়োগান্ত কথা ও স্বতঃসিদ্ধ কারুণ্যে সার্থক হইয়াছে। "ভালবাসবে বলি ভাল বাসিনে, আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে। মিথুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি, তাই দেখে যেতে সাধ—দেখা দিতে চাননে"* গানটি সর্বজন-বিদিত। [ইহাতে প্রেমের "স্বভাব" বর্ণিত হইয়াছে—সে স্বভাব এই, যে তাহা, দিতে চায়—নিতে চায় না।] "যার মন তারই কাছে, লোকে বলে 'মনে নিলে. দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে। দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন না হইতে প্রেম মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে" [ইহার অর্থ, সে আমাকে ভালবাসে নাই, বরং আমিই তাহাকে ভালবাসিয়াছি, সে আমাকে কখনই দেখা দেয় নাই বরং দেখা হইবার পূর্বেই, তাহার লোকে রটাইতেছে যে আমি তাহার মন নিয়াছি—একথা সত্য নহে, তাহার মন তাহারই আছে। আর একটি গান "প্রেমে কি সুখ হ'ত। আমি যারে ভাল বাসি, সে যদি ভালবাসিত। কণ্টক পোড়িত প্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে, ফুল হ'ত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত" কবির এই সিদ্ধান্ত কি ঠিক? সত্যই কি জগতে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যায় না, তাহা কি পলাশের সুগন্ধের মত, কাঁটাগাছে কেয়ার মত, চন্দন তরুর ফুল ও ইক্ষুর ফলের মত দুর্লভ ও অসম্ভব? সত্যই কি যাহাকে যে ভালবাসে—সমস্ত প্রাণমন দিয়া ভালবাসে,—সে সেই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখিয়াই সরিয়া পড়ে—একজনের অতিরিক্ত আগ্রহে কি অপরের আগ্রহ ফুরাইয়া যায়? হয়ত কবি যথার্থই ইঙ্গিত করিয়াছেন, জীবনে সত্যই তাহাই ঘটে। প্রেমিক বাড়াবাড়ি রকমের বঞ্চিত হন যে নৈবেদ্য একমাত্র ভগবানকে দেয়, তাহা যাহাকে তাহাকে দিলে এবংবিধ বিড়ম্বনাই ঘটে। নিধুবাবু আর একটি গানে বলিয়াছেন "সে এত নিঠুর, তোমার প্রতি করুণায় বিন্দু তাহার নাই—তবু তুমি তাহাকে এত ভালবাস কেন?" একটি ছত্রে প্রেমিক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—"তবু যে কেন ভালবাসি, তাহা নিজেই জানি না" কিন্তু কবি এই প্রশ্নের উত্তর অন্য এক গানে স্বয়ং দিয়াছেন, "আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে" ইহাই প্রেমের স্বভাব। নিধুবাবুর প্রধান ভক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble); তিনি বলিতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর তুল্য কবি আর নাই।

বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যতদূর দেখা যায়—পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা ও আসামের রাজারা প্রাচীনকাল হইতে রাজদরবারে বাঙ্গলা ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজাদের তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কোন কোন তাম্রশাসন আমরা বাঙ্গলায় লিখিত দেখিয়াছি। তদ্রূপ একখানি তাম্রশাসন আমার নিকটই ছিল, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাহা আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া আর ফিরাইয়া দেন নাই। বঙ্গভাষা

* এই গানটি কেহ কেহ শ্রীধর পাঁচকের রচিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ভুল।

ও সাহিত্যে তাহার কৃতকার্য্যের একটা তালিকা হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজাদের বাঙ্গালায় লিখিত অনেক তাম্রশাসন রাজমালায় দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁরা বহুপূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মকার্য্যসম্বন্ধে পুস্তকও বাঙ্গালা লিখাইতেন। স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ বাঙ্গালা পদ্যে এদেশে বহুই হইয়াছে। কাশীরাম দাস যে সময়ে মহাভারতের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অন্য কবিরা রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালা অনুবাদগুলি একেবারেই অটিল নহে। অনেকাংশে ইহা সরল ও প্রাঞ্জল। আমরা এই তিন খণ্ড বৃহৎ বঙ্গের পূর্ব্বের অনেক পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু সাহিত্যের প্রয়োজন ও ধর্ম্মব্যাখ্যার জন্য সাধারণ ভাবে ইহা হইলেও ইহার বিশেষ পূর্ব্বের পরিচয় কোন স্থান লাভ করে নাই। ৭০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা চণ্ডীমঙ্গলের ইতিবৃত্তমূলক বাঙ্গালা গদ্যে লিখিতে পারিতাম। কিন্তু এ সব পরিচয় দিবার কথা এখানে উঠিত হইত, সে বেশে যত্ন করিয়া আমরা কখনও যাই নাই। ইংরেজদের আগমনে দেশটি বহুলাংশে কলের সংস্পর্শে আসা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব লাভ করিয়াছে। এই সময়ে ১৮০০ খৃঃ কিছু পূর্ব্ব হইতেই কোন কোন ইংরেজ লেখকগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য বাঙ্গালা-গতপ্রাণ ইংরেজদিগের কথাই আমরা বলিয়াছি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস—ত্রিপুরারাজ্য

"গৌড় সৈন্য আসিয়াছে দেখ বন্ধ কাল। তোমার নৃপতি হবে কবের গৃহীত
বন্দিবাক্য শুনি সবে বীরদর্পে বলে প্রতিজ্ঞা করিল যুদ্ধ দিবে সকলে।" রাজমালা।
"রাণী সঙ্গে সৈন্য-গণ যুদ্ধে প্রবেশিল ত্রিপুরাসুন্দরী রাণী হস্তী সোরে চলে।
ছয় পর পলাশ দল ত্রিপুরা সবল। ত্রিপুরাসুন্দরী রাণী করে এই বল।
গৌড়েশ্বর ভয়-পাইয়া গেলেক ভাগিয়া। বঙ্গদেশ যুদ্ধ করি হইলা জয়ী রাজা।
যুদ্ধ জিনে মহারাজ করি বিবেচন। ত্রিপুরাসুন্দরী নাম রাখে রাণী হৈল।
এত বড় যুদ্ধ রাণী কভু নাহি করে। মহারাজ ক বলেন রাণী।"—ত্রিপুরা-বংশাবলী।

সিংহাসনের দরবারে এবং অন্যান্য রাজসভায় সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকিত। আরঙ্গজেব যখন বুঝিলেন, তাঁহার অত্যাচারে দেশশুদ্ধ লোক ক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং তাঁহার বিবেচনাহীন বুদ্ধির দোষে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি যুদ্ধে তিনি হারিয়া গেলেন, তখন তিনি দরবারের ইতিহাস লেখকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন তাঁহার রাজত্বের দশম বর্ষে তিনি ইতিহাস লিখিবার পথ এইভাবে বন্ধ করিলেন, এজন্য তাঁহার সুদীর্ঘ শেষ সময়কার ঘটনার বিবরণ এত অসম্পূর্ণ (And hence the reason why after those ten years we find no detail of many parts of his long reign Mutaqherin, Vol IV, p 159) হিন্দুরাজাদের কেহ কেহ শকাব্দ, বিক্রমাব্দ প্রভৃতি কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনকালের বড় বড় রাজারা প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজত্বের আরম্ভকাল হইতে রাজাঙ্ক চালাইতেন

প্রাদেশিক ইতিহাস।

এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত। সেইসকল প্রাদেশিক রাজ্যগুলি দেশে অরাজকতার সময়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া প্রবল হইত এবং সময়ে সময়ে কোন সার্ব্বভৌম নৃপতির আনুগত্য স্বীকার করিত। ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লব এবং এক বংশের উচ্ছেদ করিয়া অপর বংশের প্রতিষ্ঠার ফলদেশে পূর্ব্বতন রাজত্বের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া যাইত, যাঁহারা শত্রুকে জয় করিতেন, তাঁহারা শত্রুবংশের গৌরব-কাহিনী রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন না। এইভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রাজ্যের ইতিহাসই লুপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজমালাতে এইরূপ কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ আছে, যথা তারানাথ সেনবংশীয় ও পালবংশের রাজাদের কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ

করিয়াছেন এই পুস্তকের ২৮৮-৯১ পৃ.। এই সকল ইতিহাস এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, মেরু তুঙ্গাচার্য্যের প্রবন্ধচিন্তামণি, আনন্দ ভট্ট ও বল্লালচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া এদেশে হিন্দুরাজত্বের ইতিহাসের কিছুই নাই। আর্য্যাবর্ত্তে যেরূপ মুসলমানের অত্যাচারে গ্রন্থাগার ও কীর্ত্তিস্তম্ভ বিধ্বংস পাইয়াছে, তদ্রূপ বাঙ্গালার ইতিহাসও সেইরূপ ধ্বংস পাইয়াছে। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলে কিছু মসলাপত্রের সন্ধান হইতে পারে। রাষ্ট্রবিপ্লবই এই ইতিহাস বিলোপের প্রধান কারণ, বহির্শত্রু ও রাষ্ট্রবিপ্লব এদেশে কোনকালেই তাদৃশ গৌরবের বিষয় হয় নাই। উহা দাসত্বগৌরবের কারণ হইত, সুতরাং একবংশের রাজত্বের পর অন্য বংশের অভ্যুদয়ে সেই গৌরব ধ্বংস পাইত। ধর্ম্ম গৌরবই এই দেশের জাতীয় গৌরবের হেতু ছিল, এই জন্য সমস্ত কাল তাহা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু দুই প্রবল ধর্ম্মের সংঘর্ষ হইলে বিজিত ধর্ম্মের গৌরব জন্য প্রভৃতি হইবারই বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের গৌরবজনক ইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। অশোকের কয়েকটি গুহা মাত্র **প্রত্নতত্ত্ব** আবিষ্কার করিয়াছে, পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ এই ভাবে প্রাচীন রাজ্যের কিছু কিছু বিবরণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ ইতিহাসের পরিচয় এদেশে এত বেশী ছিল যে, অনেকের বাড়ীতে অনেকগুলি হস্তলিখিত এবং কাষ্ঠফলকের উপরের সমাজ বিধান স্থাপনা না করিয়া নিশ্চিন্তে ও নিরুপদ্রবে তাঁহাদের ধর্ম্মকথা রক্ষা করিয়া রাখিতেন। অশোকের ৮৪০০০ অনুশাসনের মধ্যে মাত্র ৪০-৫০টি পাওয়া গিয়াছে (বৌদ্ধধর্ম্ম, ১২০৫ পৃ. অশোক)। অশোকের এলাহাবাদ অনুশাসনের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাহার উপর স্বীয় গৌরবের চিহ্ন করিয়াছেন। মুসলমানেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন, হিন্দুরা তাহা জানিতেন না—একথা আমি বিশ্বাস করি না। হিন্দুরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী অনুরাগী ছিলেন বলিয়া পার্থিব কোন ব্যাপারেই তাঁহাদের অনুরাগের ত্রুটি দেখা যায় না। কি স্থাপত্য প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহারা জগদ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। এখনও জগতে হিন্দু ও বৌদ্ধের যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন সকল বৎসরের অত্যাচার সহিয়া জগতে টিকিয়া আছে, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের তাহা নাই। মুসলমানগণের ইতিহাস লেখার প্রবৃত্তি তাঁহারা বৌদ্ধগণের নিকট পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এতিহাসিক গ্রন্থাদি অনেকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন্য তাঁহাদের তাম্রপত্রগুলি লুপ্ত হয় নাই; এবং প্রাচ্য সভ্যতায় সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাসের জন্য জায়গা করা হইয়াছে, এজন্য হয়ত সেগুলি ভবিষ্যতে লুপ্ত নাও হইতে পারে। কিন্তু আজ যদি মারহাট্টারা বিজয়ী হইয়া ভারত অধিকার করিতেন, তবে বাঙ্গালা বিদ্যাপতি, নানা ফার্ণাবশ কিংবা অন্তর পাণ্ডুতের হাতে মুসলমানদের ইতিহাস রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। বর্গীরা হিন্দু, কিন্তু হিন্দুমন্দিরও তাঁহাদের অত্যাচার হইতে বাদ পড়ে নাই। বাঙ্গলার প্রান্তভাগে যে কয়েকটি হিন্দুবংশ শত শত বৎসর টিকিয়া আছে তাহাদের ইতিহাস দুই একখানি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের দুই একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ যেরূপ তথাকার কীর্ত্তির ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া থাকে, এই দুই একখানি পুস্তকও আমাদের ঐতিহ্যের

সেইরূপ সাক্ষী, ইহারা স্থানের বাহিরে ছিল বলিয়াই রক্ষা পাইয়াছে, ইহাদের একখানি রাজমালা—ত্রিপুরার ইতিহাস। আর একখানি কোচবিহারের ইতিহাস আসামের অহম রাজাদের বুরঞ্জি যত এরূপ খাঁটি ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস দুর্লভ। বুরঞ্জি-লেখকগণ মুসলমান ইতিবৃত্তকারগণ হইতেও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য।

ধর্ম্মের সংস্রব যাহার জন্য পুরাণগুলিতে রাজাদের কাহিনী কিছু কিছু রক্ষা আছে এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের সংস্রবহেতু সকল দেশের লোকের রামায়ণ-চরিত্র ঠিক রহিয়াছে।

রাষ্ট্রবিপ্লব আমাদের দেশের ইতিহাস বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে, তাহা এদেশে নব-রাজ্যের প্রভাব। এই নব-রাজ্যের জগতের সমস্ত বিষয় হইতে হিন্দুর মুখ ফিরাইয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহারা রাজত্ববর্গের কাহিনী অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করায় তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করেন নাই। পার্থিব সমস্ত কার্য্যের প্রতি ইহারা ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। এই ইতিহাস বিলোপের চেষ্টা ইহাদের এত বেশী হইয়াছিল যে প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে যত পারলৌকিকী ছিল—তাহা তাঁহারা হিন্দু সমাজের গলা হইতে বিতাড়িত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, অবশিষ্টের প্রেতসম্বন্ধে অতিরঞ্জনমূলক যত কবিত্বপূর্ণ কাহিনী প্রেতদের প্রচলিত ছিল—তাহা তাঁহাদের ভ্রূকুটীতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মহারা, শ্যামরায় ও আরও বহুর গ্রায় আমরা কীর্ত্তি ময়মনসিংহে এখন আর হিন্দুর বাড়ীতে গাইতে শুনিতে পাই না। বৃন্দাবন দাস (ব্রাহ্ম) বোধ করি চক্ষে এই সকল কীর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, "এই ভাবে জগতের মিথ্যা কাল যায়।" বৈষ্ণব সমাজ ইহা হইতে আরও কতদূর হটিয়াছেন, তাঁহাদের মতে পরমার্থই প্রকৃত তত্ত্ব, মাতৃপিতৃ কেহই নহেন! একটা উল্লেখযোগ্য—ইহা কাহার নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা জানিবার কোন দরকার নাই,—কাহার দ্বারা আমার পুষ্টিসাধন হইয়াছে তাহাই একমাত্র জানিবার বিষয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত প্রসিদ্ধ লেখক, যিনি বৈষ্ণবগুরুদের কথা প্রতি পত্রে পত্রে স্তব করিয়া তাঁহাদের বিবরণ সংবলিত এত বড় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি একটিবার তাঁহার মাতৃপিতৃর নাম বলেন নাই।

খাঁটি ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা

আমরা এখন রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাসসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে যত রাজা বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম। আদিকাল হইতে ১৮৮ পুরুষের নাম এই বংশে আমরা পাইতেছি। রাজমালার প্রথমাংশের অনেক কথাই খাঁটি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু পরবর্ত্তী অংশ অধিক পরিমাণেই খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য। কল্হণের রাজতরঙ্গিণী হইতেও আমরা এই পুস্তকখানিকে মোটের মাথায় বেশী প্রামাণিক মনে করি। প্রথমাংশ পৌরাণিক প্রবাদ ও গল্পমূলক। যযাতি পুত্র দ্রুহ্য ত্রিপুর রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত। দ্রুহ্য কপিলা নদীর তীরে ত্রিবেগ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজমালা

তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমানায় মেখলী, পশ্চিমে কোচরং, উত্তরে হৈরম্ব নদী এবং দক্ষিণে আচরং ছিল এবং লোকের বিশ্বাসে এই বংশ কিরাত বলিয়া আখ্যাত হইতেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অনাচার ও অন্যান্য দোষের বিবরণীর জন্য এই বংশে কিরাতত্ব ঢুকিয়াছিল। এই কল্পিত অপবাদ সমগ্র আসাম স্থানে অবস্থিত ছিল সমগ্র-প্রসারিত বিস্তৃত ভূখণ্ড পাঁচটি সমৃদ্ধ নগরী ও দুই লক্ষ লোকসহ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে জলপ্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছে।

রাজা ফাটেঙ্গ্রা প্রথমভাগে—দৈত্যখণ্ড, ত্রিপুরখণ্ড, ত্রিলোচনখণ্ড, দক্ষিণখণ্ড, বৈত্রক্ষিণখণ্ড প্রভৃতি সপ্তখণ্ড সংবলিত, ছেংথোলাখণ্ড, ডাঙ্গরফাখণ্ড, রত্নমাণিক্যখণ্ড—এই দশ খণ্ডে বিভক্ত।

পঞ্চমভাগের ইতিহাসভাগ সংস্কৃতে ছিল যে মৃত্যুঞ্জয় শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রাজপণ্ডিতদ্বয় তাহার অনুবাদ করিতে পারেন নাই। অগত্যা ধর্ম্মমাণিক্য চন্তাই চুর্লুঙ্গেশ্বর মহাশয়কে ডাকিলেন। ইনি ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির ইতিহাস হইতে সঙ্কলন করিয়া যে কাহিনী শুনাইলেন, তাহাই **ধন্যমাণিক্য** ও **রাজেশ্বর** সঙ্কলন পয়ারে অনুবাদ করিয়া লইলেন। (আদিকাল হইতে ১৪৪৮ খৃঃ)।

দ্বিতীয়ভাগে—অমরমাণিক্যখণ্ড, প্রতাপমাণিক্যখণ্ড, মহামাণিক্যখণ্ড, বিজয়মাণিক্যখণ্ড, অনন্তমাণিক্যখণ্ড, উদয়মাণিক্যখণ্ড, কল্যাণমাণিক্যখণ্ড, অমরমাণিক্য ২য় খণ্ড, রাজধরমাণিক্যখণ্ড, মহেশ্বরমাণিক্যখণ্ড ও কল্যাণমাণিক্যখণ্ড—এই একাদশ খণ্ড রাজার বিবরণ সংবলিত। এইভাগে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাজাতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত আছে। এই ভাগের সঙ্কলয়িতা **লিক্ষাগুরুলাঙ্গীশা** ইনি এই খণ্ড সঙ্কলনে সমাপ্তির পূর্ব্ব চতুর্থ নরপতির নিকট উপকরণ পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে প্রাচীন রাজমালার সংশোধন হয়—"পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত প্রসঙ্গতে অলঙ্কার ভাষা যে কুৎসিত" 'অলঙ্কার' অর্থ অসংলগ্ন এবং কুৎসিত ভাষা অর্থ খাঁটি প্রাকৃত। মনসামঙ্গল-প্রণেতা বিজয়গুপ্ত যেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি কালা হরিদত্তের ভাষার দোষ গাহিয়াছেন, এই অভিযোগ তদনুরূপ। তথাপি আমরা সেই প্রাচীন রাজমালাখানি পাইলে বেশী সুখী হইতাম।

তৃতীয়ভাগ—গোবিন্দমাণিক্য, ছত্রমাণিক্য, রামমাণিক্য, চন্দ্রমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য, ধর্ম্মমাণিক্য(২য়) মুকুন্দমাণিক্য, ইন্দ্রমাণিক্য, রত্নমাণিক্য, উদয়মাণিক্য এই দশজন নৃপতির ইতিহাস-সংবলিত। ইহাতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ উত্তরকাল পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। এই ভাগ **দুর্গামণি উজিরের** লিখিত। এই ভাগের উপক্রমণিকায় দুর্গামণি উজির লিখিয়াছেন তিনি পূর্ব্বলেখের শুধু ভাষা পরিবর্ত্তন করেন নাই, তত্ত্ব ও পুরাণাদি হইতে অনেক তত্ত্ব তথ্যও পরিষ্কার করাইয়াছেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের (১৪৫৮ খৃঃ) রাজত্বকালে রাজমালা বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত ছিল, আমরা এরূপ উল্লেখ পাইয়াছি, "পূর্ব্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুরা-ভাষাতে" কিন্তু এই রাজার আদেশে রাজমালা "সুভাষাতে" বিরচিত হইল। 'সুভাষা' অর্থ সংস্কৃতভাষা এবং রাজা ধর্ম্মমাণিক্যের কালের এই "সুভাষাকে" দুর্গামণি উজির

আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা "অলীক কুতর্কিত"। এইখানে আর একটি কথা বলার দরকার কোন কোন ত্রিপুররাজের নাম মঙ্গোলিয়ান ভাষার ঠিক শব্দটি বহন করে, যথা, "ছেং খোম্পা" "ডাক্তর ফা" "খিতুক" প্রভৃতি এক সময়ে চীনরাজ্যের প্রভাব যে আসামের উত্তর সীমানায়, বিশেষত, বঙ্গের উত্তরভাগে, খুব বেশী হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ আছে। উহার প্রভাব এদেশের শিল্পকলায়ও পরিলক্ষিত হয় মণিত বীহান, বৌদ্ধপাল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পাচার্যগণের প্রভাব সুদূর উত্তর ও পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং মণিত ভারতীয় বৌদ্ধগণের প্রভাব চীন-জাপানের সর্বত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি চীন সম্রাটের অধিকার মাঝে মাঝে বঙ্গদেশের উত্তর দিক্ পর্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগকে দুই হয় বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশে যাইয়া তাহার সাধনা শিখিয়া আসিয়াছিলেন ভারতীয় রাজগণ বিশেষ মহারাজাধিরাজগণ এমন কি গৌড়রাজগণের কেহ কেহ চীনরাজের নিকট দূত পাঠাইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বঙ্গদেশেরই অনেক দেবমূর্তির চক্ষু চীনদেশীয় লোকের চক্ষুর ন্যায় হয়ত প্রাচীন কোন যুগে উত্তর দেশের ভাস্করগণ কখনও কখনও এদেশে মূর্তি নির্মাণ করিতেন, তাঁহাদের তাহার শিল্পসম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় "দেবচক্ষুঃ" উক্ত সংস্কার চলিয়া আসিয়াছে। জ্ঞানবংশীয়দের উপাধি ত্রিপুরা ও নিকটবর্তী জনপদের রাজারা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানদিগের প্রাধান্যের সময়ে মজুমদার, কুমলাদার, খাসনবিস, মহালানবিস প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রাহ্মণগণও পরিচিত হইতেন ত্রিপুর রাজগণের ঐরূপ সৈনিক বা স্থানদিগের উপাধি গ্রহণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি পুরাকাল হইতে এই রাজবংশের ১৮৯ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ক্রু ইহাদের মধ্যে সপ্তদশস্থানীয়—সুতরাং ক্রু হইতে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য পর্যন্ত ১৭৭ জন ত্রিপুরার রাজার নাম রাজবংশাবলীতে আছে। ক্রু নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা এবং যযাতির পুত্র ক্রুহ্যু এই ত্রিপুর ও অঙ্গের আদিপুরুষ কিনা, এই সকল ক্রুহ্য প্রশ্ন সমাধানের স্থান এখানে নহে। যখন চন্দ্রসূর্যবংশীয় রাজগণের গোড়ারই ঐতিহাসিক গলদ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কোন জ্যোতিষ হইতে মানুষের আবির্ভাব-ব্যাপার ঐতিহাসিকগণের ধারণার অতীত), তখন শুধু ত্রিপুর রাজগণের কথা নহে, সেই চন্দ্রসূর্যবংশের অভিমানী সমস্ত রাজগণের বংশাবলীরই আদিকথা ঘোর অন্ধকারাবৃত এই-সকল জল্পনা-কল্পনা লইয়া কালক্ষয় করা বিফল।

ত্রিপুর।

যে মুষ্টিমেয় আর্যবীর ত্রিপুর রাজ্যে প্রথম আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কিরাত ও অপরাপর অনার্যসমাজে মিলিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দৈত্যের পুত্র ত্রিপুর "জন্মাবধি না দেখিল দ্বিজ সাধু ধর্ম সেই হেতু নৃপতি হইল ক্রূরকর্ম। জানধর্ম না দেখিল আগম পুরাণ। বেদশাস্ত্র না পঠিল নাহি কোন জ্ঞান। দীক্ষিত না হৈল, দেবদ্বিজ না চিনিল। সদ্ব্যবহার কিছু না দেখিল কিরাত-প্রকৃতি হৈল কিরাত-আচার।" শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে, ত্রিপুর নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

"আপনাকে আপনে দেবতা করে জ্ঞান
যানা করে অন্যে যদি করে বড় মান।" রাজমালা, ত্রিপুরখণ্ড।

কিন্তু তাঁহার অত্যাচার ও অনাচার-বাদ বন্ধুকরা বেশী দিন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিহত হইলেন এবং তৎপত্নী হীরাবতী গর্ভে শিবাংশে ত্রিলোচন রাজার জন্ম হইল। এই শিব হইতেছেন ভগবান কুচবিহারের রাজাদেরও আদি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বাণ রাজা শিবের পুত্রবৎ ছিলেন, পুরাণে লিখিত আছে শিব কার্তিক হইতেও তাঁহাকে বেশী ভালবাসিতেন কোচ, কিরাত প্রভৃতি আদিম লোকেরা শিবের অনুচর বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

ধ্বজ, চক্র ও ত্রিশূলাঙ্ক

হীরাবতী গর্ভে শিবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোচন রাজা পরম শৈব হইলেন তাঁহার পাকৃত্যা নাম ছিল "সুরঙাই।" ইনি ত্রিপুর-রাজের ক্ষেত্রজ পুত্র, সুতরাং চক্রবংশের চিহ্ন—নিশান ও চক্রধ্বজের উত্তরাধিকারী এদিকে শিবসম্ভূত —এজন্য ত্রিশূলচিহ্নাঙ্কও ধ্বজও ব্যবহার করিতেন। তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের ধ্বজে চক্র ও ত্রিশূল উভয়বিধ চিহ্নই দৃষ্ট হয়।

ত্রিলোচন রাজার সময়ে রাজ্যে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল কলিঙ্গমুনির আশ্রম — বিশেষ পরমতঃ এই বংশের রাজধানী ছিল ত্রিপুর খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার রাজ্যে নানা পার্বত্য জাতির বাস হেতু তাহাদের অনার্য্য প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ত্রিলোচন সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুর সমাজে আর্য্য আচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমুদ্রকূল হইতে চতুর্দ্দশ দেবতা আনিয়া রাজ্যে নূতন প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল 'দেওড়াই' পুরোহিত আসিলেন তাঁহারা লোকদিগকে আর্য্য আচার শিখাইলেন। ত্রিলোচন রাজার রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুতর ঘটনা,—কাছাড়ের রাজার (হেরম্বাধিপতির) কন্যার সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের বিবাহ। মণিপুরের হেরম্বাধিপতি তাঁহার এক দৌহিত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন এই সব রাজ্যের সঙ্গে এবংবিধ সম্বন্ধ হওয়ায় ত্রিলোচনের পুত্রদের রাজ্যের সীমা ও শক্তি খুব বাড়িয়া যায় কথিত আছে, ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমকালিক এবং নিমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ত্রিলোচনের বারটি পুত্র জন্মে তন্মধ্যে একটি হেরম্বরাজ্যের অধিকার লাভ করেন তিনিই ছিলেন সকাজোই আর একাদশ জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'দক্ষিণ' সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অপর দশজনের প্রত্যেককে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি করিয়া 'মণ্ডলাধিপতি' নিযুক্ত করেন। আদি-উপনিবেশের সময়ে যে আদিমেরা আসিয়াছিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেন জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড়ের অধিকার পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত রাজ্যের অধিকারী—এই দাবী দাঁড়াইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ করেন।

ত্রিলোচন রাজার সময়ে রাজ্যে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল কলিঙ্গমুনির আশ্রম — বিশেষ পরমতঃ এই বংশের রাজধানী ছিল ত্রিপুর খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার রাজ্যে নানা পার্বত্য জাতির বাস হেতু তাহাদের অনার্য্য প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ত্রিলোচন সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুর সমাজে আর্য্য আচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমুদ্রকূল হইতে চতুর্দ্দশ দেবতা আনিয়া রাজ্যে নূতন প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল 'দেওড়াই' পুরোহিত আসিলেন তাঁহারা লোকদিগকে আর্য্য আচার শিখাইলেন। ত্রিলোচন রাজার রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুতর ঘটনা,—কাছাড়ের রাজার (হেরম্বাধিপতির) কন্যার সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের বিবাহ। মণিপুরের হেরম্বাধিপতি তাঁহার এক দৌহিত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন এই সব রাজ্যের সঙ্গে এবংবিধ সম্বন্ধ হওয়ায় ত্রিলোচনের পুত্রদের রাজ্যের সীমা ও শক্তি খুব বাড়িয়া যায় কথিত আছে, ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমকালিক এবং নিমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ত্রিলোচনের বারটি পুত্র জন্মে তন্মধ্যে একটি হেরম্বরাজ্যের অধিকার লাভ করেন তিনিই ছিলেন সকাজোই আর একাদশ জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'দক্ষিণ' সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অপর দশজনের প্রত্যেককে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি করিয়া 'মণ্ডলাধিপতি' নিযুক্ত করেন। আদি-উপনিবেশের সময়ে যে আদিমেরা আসিয়াছিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেন জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড়ের অধিকার পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত রাজ্যের অধিকারী—এই দাবী দাঁড়াইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ করেন।

ত্রিলোচন

হেরম্বাধিপতির কন্যার সঙ্গে বিবাহ।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত ও মহাক্ষতিগ্রস্ত হইয়া একাদশ ভ্রাতা ত্রিবেগের রাজধানী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেরম্বাধিপতিকে দিয়া তাঁহারা আরও সরিয়া আসিয়া বরাক নদীর তীরবর্ত্তী

অলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ফলতঃ তাঁহার দক্ষিণ রাজার সৈন্যেরা আত্মকলহ করিয়া এবং মারামারি কাটাকাটি করিয়া অনেকে (৫০০০ জনের পাইল দক্ষিণের মৃত্যুর পর তৈদক্ষিণ রাজা হইয়া মণিপুরের (মথলা রাজার মণিপুরেশ্বরের) কন্যাকে বিবাহ করিলেন সুতরাং ত্রিপুর-রাজগণ কাছাড় ও মণিপুরের রাজগণের সঙ্গে আদান-প্রদান দ্বারা তাঁহাদের সামাজিক প্রকৃতি আরও একটু জটিল করিয়া তুলিলেন তৈদক্ষিণ হইতে একত্রিংশ স্থানীয় ত্রিপতি শিক্ষারাজ নরমাংস খাইতেন বলিয়া প্রবাদ আছে এই সময়ে ছাম্বুল নগর, কৈলাসহরের অন্তর্বর্তী শিবমন্দরাদি শোভিত হইয়া সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে ফক্ষু হইতে ১৫ স্থানীয় 'কুমার রাজা' অনেক সময়ে এই নগরীতে বাস করিতেন কাছাড়ের সঙ্গে ত্রিপুর রাজগণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইল ফক্ষু হইতে ১০৭ স্থানীয় প্রতাপ নামক ত্রিপুর-রাজের সহিত গৌড়রাজের একসময়ে খুব বেশী ভাব হইয়াছিল উভয় কুলই অল্পকালে একরাজি হইতে সম্ভব, এজন্য দুই রাজা একত্র হইয়া উভয়রাজ্য শাসন করিবেন, এই মনস্থ করিয়াছিলেন এদিকে কামাখ্যা, জয়ন্তী পাহাড় প্রভৃতি দেশের রাজারা সখিলেন, এই দুই পরাক্রান্ত রাজা সম্মিলিত হইলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি ইঁহাদের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না। সুতরাং তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া এক সুন্দরী রমণীকে ইঁহাদের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নানারূপ শিক্ষা দিয়া ভেটস্বরূপ রাজদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। শুক-উপসুন্দের মত, দুই রাজা এই রমণীকে উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধাবসরে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু শেষে হেরম্বরাজ অনুতপ্ত হইয়া ত্রিপুর রাজের বিরুদ্ধে সংকল্পিত অভিযান পরিত্যাগ করিলেন হাজা ছিমতি (প্রভাত হইতে ৪৯ স্থানীয়) রাজামাটি দখল করেন। রাজামাটিতে "লিকা" নামক এক জাতি বাস করিত, তাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইল। এই রাজা অধিকার করিয়া ত্রিপুর-রাজ নিরুদ্বিগ্নে অবতরণ করিয়া বঙ্গদেশের বিশাল-গড় প্রভৃতি পর্বত-সন্নিহিত পরগণাগুলি দখল করিয়া লইলেন। রাজামাটিতেই ছিমতি রাজার অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু ঘটে যে স্থানে তাঁহার দৈহিক দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ করা হয়, সেই স্থানের নাম 'বৈকুণ্ঠপুর' দিয়া ত্রিপুরবাসীরা এক মঠ নির্মাণ করেন।

ছিমতি রাজা।

বিশালগড় বৈকুণ্ঠপুর

ফক্ষু হইতে ১৩৩ স্থানীয় ছেংথোম্মা রাজার সময়ে গৌড়ের রাজার এক প্রবল-পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুর-রাজ্যের দক্ষিণাংশ লুণ্ঠনাদি করাতে উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেনাপতি ঈশাখাঁ বা গৌড়েশ্বরের দুই তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া ছেংথোম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন ত্রিপুর রাজ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ্ঞী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বীয় কাপুরুষ স্বামীকে বিস্তর ভৎসনা করিয়া স্বীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব করিতে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন তাঁহার উৎসাহবাক্যে ত্রিপুর সৈন্যেরা জীবন পণ করিয়া

কীর্ত্তিধর বা ছেংথোম্মা।

মহারাজ্ঞী ত্রিপুরাসুন্দরী

যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিল। তিনি ত্রিপুর-সৈন্যদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গৌড়সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল। যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে যেই জন যত চল আমা সনে।" (রাজমালা, ছেংথোম্পাখণ্ড)। তাঁহাদের অনুকূল প্রতিশ্রুতি পাইয়া মহাদেবী স্বয়ং রন্ধন কার্য্যের তত্ত্বাবধায়িকা হইয়া মহিষ, পশম, মেষ, হাঁস, হরিণ, নানারূপ পক্ষী, অসংখ্য শূকর প্রভৃতির মাংস রন্ধন করাইলেন, "সহস্র সহস্র মস্তের কলস ও দধি-দুগ্ধাদির ভাণ্ড" আনীত হইল এবং ত্রিপুরার কুকি ও রাঙ্গ-সৈন্য একত্র হইয়া মহারাজার এই খাদ্য-সম্ভার উপভোগ করিয়া চলু হইল। মহারাজের বেশ ও উন্নত মূর্ত্তি দেখিয়া অগত্যা রাজাকেও রণক্ষেত্রে যাইতে হইল।* হাঁবাবক্স খাঁর পক্ষের কোন স্থল নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং মাথায় সোনার পাগড়ী এবং অঙ্গে সোনার 'জিরা' বর্ম্ম ঝলমল করিতেছিল। ত্রিপুর সৈন্য মহারাজার নেতৃত্বে দুর্জ্জয়বেগে গৌড়সৈন্যকে আক্রমণ করিল এবং হাঁবাবক্স খাঁয়ের রাজবেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকেই জোরে আক্রমণ চালাইল গৌড়সৈন্য পরিণামে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল কথিত আছে এই মহাসমরে একলক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা উদ্ধিদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, একটি বৃত্তাকার কবন্ধ আকাশে নাচিতেছে, একটু নৃত্য করিয়া কবন্ধ ধরাশায়ী হইল। এক লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে নাকি রণক্ষেত্রে—একটি কবন্ধ দেখা দেয়। রাজা বুঝিলেন, এই যুদ্ধে একলক্ষ লোক মরিয়াছে। তাঁর রাজা চোখে মরিয়া মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, কিংবা কবন্ধ দেখিয়াছিলেন বলা যায় না যুদ্ধ জয় করিয়া ছেংথোম্পা সেই হতাহত সৈন্য-সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে এক তিল স্থান বসিবার উপযোগী পাইলেন না, তখন তাঁহার জামাতা বলে পরিপূর্ণ এক অতিকায় হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয় খড়্গাঘাতে কাটিয়া রাজাকে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। রাজা জামাতার বিক্রম দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং জামাতাকে সম্মানিত করিলেন তদবধি রাজপুত্রের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ জামাতারা একসঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার পাইলেন এবং জামাতারা সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য রাজ-সরকারের দৈনিক একসের মাত্র চাউল বরাদ্দ ছিল। ত্রিপুরা-সুন্দরী সোহাগ ডি আর্কের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে এই যুদ্ধ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল, তখন

* "রাণী সঙ্গে সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবেশিল।
ত্রিপুরা-সুন্দরী রাণী হস্তী সোহার হৈল॥
* * *
হস্ত পঞ্চ পলাশ বল ত্রিপুরা যখন (১২৪০ খৃঃ)
ত্রিপুরা-সুন্দরী রাণী করে এই জন।"—ত্রিপুর কালবেলী

† কোন কোন পুরাণে এবং তুলসীদাসের রামায়ণে এক লক্ষ লোক রণক্ষেত্রে নিহত হইলে ঐরূপ কবন্ধ দেখা যায়, এই প্রবাদ পাওয়া যায়। রাজমালা-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন তাই তাঁহার টীকা রাজমালীয় "মহাসমিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুবর্ণগ্রামের কোন রাজা।* পূর্ব্ববঙ্গে তখনও হিন্দু শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। কেশবসেন অথবা মনৌজ মাধব তখন এই সময়ে স্বর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন।

ছেংথোম্ফার পুত্র আচোঙ্গ ফার সময়ে আর একটি প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। রাজার নাম অনুসারে শুধু "মা রাণী" যোগ দিয়া মহারাজার নাম রচিত হইত, যথা আচোঙ্গের মহিষীর উপাধি হইল "আচোঙ্গ মা-রাণী", তৎপুত্র "খিচোঙ্গের" রাজ্ঞী "খিচোঙ্গ মা-রাণী" এই নামে অভিহিতা হইতেন। কিন্তু এই প্রথা খুব দীর্ঘকাল ছিল না। আচোঙ্গরাজ জয়দেব (জৈন্তাপাহাড়) রাজ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং ত্রিপুর রাজের সঙ্গে কাছাড়, মণিপুর ও জৈন্তাপাহাড় রাজের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হইয়াছিল। আচোঙ্গ রাজার পুত্র ফাজর ফার ১৮টি পুত্র জন্মে। ইহাদের কাহাকে রাজ্যদান করিবেন, এই সমস্যায় তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন। অবশেষে স্থির করিলেন, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান তিনিই রাজ্যের অধিকারী হইবেন। বুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিরূপণ করিবার জন্য তিনি ১৮টি পুত্রকেই একস্থানে খাওয়াইতে বসাইয়া কুকুর-শাবককে ত্রিপটি অন্তরে কুকুর ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। ক্ষুধার্ত্ত কুকুরগুলি ছুটিয়া আসিয়া কুমারগণের পাত্রে মুখ দিল, সুতরাং তাঁহারা খাদ্যত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, সকলকনিষ্ঠ পুত্র বহু দূর কিন্তু আসন ত্যাগ করিলেন না, কুকুর তদীয় অন্নব্যঞ্জনের সম্ভারও দেখিয়া তিনি দূর হইতে হাত ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, তাহাতে কুকুরগুলি দূরেই রহিয়া গেল, ইতিমধ্যে তিনি আহার সমাধা করিয়া ফেলিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ রাজা তাঁহাকে গৌড়েশ্বরের সভায় পাঠাইয়া দিলেন এবং বাকী ১৭ জনের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া তাঁহাদিগকে "রাঙ্গাফা" নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধীনে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। রাঙ্গাফা যৌবরাজ্য পাইয়া "রাঙ্গামগরে" স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত স্থানগুলির শাসনভার অপরাপর কুমারদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন—(১) কাইচগঙ্গ ২) আড়রঙ্গ ৩ ঞাকুক ৪ বিশালগড় (৫) খুটিখুড়া (৬) নাকি বাকী (৭) আগরতলা "আগরফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল" ডাঙ্গফাখণ্ড, রাঙ্গমালা, ৮ মধুগ্রাম (৯) ধর্ম্মনগর (১০) খানাংচি (১১) খোপাপাথর (১২) লাউগঙ্গা ১১ মোহিইগঙ্গা (১৪) রবাক নদীতীর অবধি (১৫) তেলাইকন্দ (১৬) মণিপুর। রাঙ্গাফা—সকলের উপরে, তিনি রাঙ্গামগরে বাস স্থাপন করিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই প্রদেশগুলি এক বহু বিস্তৃত রাজ্যের সীমা প্রদর্শন করে। এক দিকে পদ্মানদী—অপর দিকে নাগা-পাহাড়। উত্তরে খাসিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণে সমুদ্র—মোটামুটি এই ভাবে সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে

রঙ্গফা বহুসৈন্য ও ধনরত্ন লইয়া গৌড়ে গমন করেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ত্রিপুররাজের বিশেষ সৌহার্দ্য ও মৈত্রী ছিল এবং বহুকাল তথায় থাকিয়া রাজনীতি শিখিতে পারিবেন,—

* "যে সময়ে এই বৃদ্ধ ত্রিপুরায় গমন করেন। গৌড়েশ্বর সেনবংশীয় রাজগণ ছিল।"—ত্রিপুর-রাজমালা।

পিতা মহারাজের এই অভিপ্রায় ছিল। রত্নফার মাতা পুত্র বিরহে যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া অনেক পল্লীগাথা রচিত হইয়াছিল। "তখন মাতা মনঃ দুঃখে কাঁদিল বিস্তর সে কথা গাইতে গায় লোকে অতঃপর ত্রিপুরার কত বড় ছাগ আছে ঘরে সেই যজ্ঞে শীঘ্র গায় ত্রিপুর সমাজে" রাজমালা, ওঝারফা খণ্ড। গৌড়েশ্বর রত্নফাকে আশ্রয় দিলেন, তাঁহার সৈন্যের ধুমুর-কাঠি মাটী হইতে ধরিয়া খাইত, এইজন্য গৌড়ীয়েরা তাহাদিগকে উপহাস করিত। গৌড়েশ্বর তাহা শুনিয়া রাজকুমারকে এজন্য একটু ঠাট্টা করেন। রত্নফা বলিলেন, "ত্রিপুরার ক্ষত্রসমাজে রাজ্যরক্ষে এরূপ আচার নাই। আমাদের রাজ্যের কুকুর প্রহরী এইরূপ খাদ্য খাইয়া থাকে" গৌড়েশ্বর এই উত্তরে প্রীত হইলেন, এবং কুকী, কিরাত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজার বাসে বিশিষ্ট ত্রিপুর সাম্রাজ্যের বিশালতা অনুমান করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ হইলেন।

রত্নফার মাতার পুত্র-বিরহ, পল্লীগাথা।

গৌড়েশ্বর এবং রত্নফা।

একদা শুভ মোমবারে যথারীতি গৌড়েশ্বর বেহারা রাজমন্ত্রীনাথ রাজপ্রাসাদে সমাগত হইল। ইহারা সমারোহ করিয়া আসিতেছিল, কাহারও মস্তক চাকরেরা স্বর্ণখচিত নিশান লইয়া আগে আগে চলিয়াছে, কোন রমণী রত্নখচিত বস্ত্র ও মণিমাণিক্যের গহনা পরিয়া গোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে, কেহ পদব্রজে চলিয়াছে; তাহাদের "প্রধানিকা" বহুমূল্যবস্ত্রাবৃত চৌদোলায় যাইতেছে। বহুসংখ্যক দর্শকগণ চৌদোলার নিকট ঘেঁষিতে ছড়িদারেরা বেত্রাঘাত করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া রাখিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া কুমার রত্নফা প্রধানিকাকে গৌড়েশ্বর মনে করিয়া সম্ভ্রমে তাহার অগ্রে দাঁড়াইলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। চতুর্দ্দিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। সেই প্রধানা গণিকার চক্ষেও হাসি খেলিয়া গেল, কুমারের সুশ্রী মূর্ত্তি ও মুগ্ধতন্ময়তা দেখিয়া তাঁহার কৃপা হইল। এই ঘটনা গৌড়েশ্বরের কাণে গেল। তিনি কুমারকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। লজ্জায় রত্নফার মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল, তিনি আড়ষ্ট ভাবে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, তিনি উঁহাকে মহারাজ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। রাজসাহ কুমারের এই নিষ্পাপ হৃদয়ের সারল্যে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ ম্লান দেখিতেছি, তোমার পিতা কি তোমাকে ঈপ্সিতমত বস্তু পাঠান না?" রত্নফা বলিলেন, "আমি কনিষ্ঠপুত্র, পিতা আমাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠাইয়াছেন এবং অপরাপর ভ্রাতাদিগের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।"

গণিকাকে মাতাকে প্রণাম।

গৌড়েশ্বর এই কথায় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে পিতৃরাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য বহু সৈন্যসমেত ত্রিপুরায় পাঠাইয়া দিলেন। "ক্ষমির খাঁর গড়ে" যে যুদ্ধ হইল তাহাতে ডাক্তরফা পরাস্ত হইয়া পলাইতে পলাইলেন, তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই যুদ্ধ জয় করিয়া রত্নফা রাজামাটির অধিকার লাভ করিলেন, তৎপরে ক্রমে ক্রমে অপর সমস্ত রাজাকে জয় করিয়া সমস্ত ত্রিপুর রাজ্য দখল করিয়া ফেলিলেন। এই সকল যুদ্ধ সংক্রান্ত স্থানগুলি রাজমালায়

'ক্ষমির খাঁর গড়ে' যুদ্ধ।

উল্লিখিত আছে যথা, খানপুর, তেজানব, ছায়ের নলা (এইখানে তাঁহারা পুষ্টভঙ্গ দেওয়ার মন্ত্রণা করেন), তৈলাহর, কাবেক (এই স্থানে তাঁহারা বন্দী হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন), সমার (এই স্থানে এক রাজকুমারের শির কর্ত্তিত হইয়াছিল, আমরা এখানে কালীপ্রসন্নবাবুর সহিত একমত হইয়া মূল অর্থে পর্ব্বতের পুত্র মনে করিতে পারি না), তেলাইকক্ষ (এই স্থানে তাঁহারা খাদ্যাভাবে কদলীর খোসা খাইয়াছিলেন)।

সুলতান শামসুদ্দিন।

যুদ্ধ জয় করিয়া রত্নফা গৌড়েশ্বরকে বহু হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন প্রদান করেন। রত্নফা গৌড়েশ্বর হইতে "মাণিক্য" উপাধি প্রাপ্ত হন। রত্নফার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ ১৩৬৩ খৃঃ অব্দ। সুলতান শামসুদ্দিন ১৩৫৭ খৃঃ হইতে ১৩৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, ইঁহার রাজধানী (ত্রিপুরা) আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ ও হস্তী পাওয়ার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুতরাং খুব সম্ভব সুলতান শামসুদ্দিন হইতেই ত্রিপুরার রাজাদের 'মাণিক্য' উপাধি চলিয়া আসিয়াছে।

মাণিক্য উপাধি।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের এই সৌহার্দ্যের হেতুতে তিনি বাঙ্গলা হইতে ১০,০০০ সব বাঙ্গালী লইয়া গিয়া তথায় তাঁহাদিগকে উপনিবিষ্ট করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি বঙ্গে স্বর্ণগ্রাম হইতে ৪,০০০ সেনা ও বহু ভদ্রলোক লইয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। রাঙ্গামাটিতে দুই হাজার ঘর, রত্নপুরে এক হাজার, যশপুরে ৫০০ এবং হীরাপুরে ৫০০ ঘর বাঙ্গালী উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। রত্নমাণিক্যের সময় হইতে বাঙ্গালার সঙ্গে এই ভাবে ত্রিপুরার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় তথায় গ্রন্থের শিক্ষাদীক্ষা প্রবেশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

বাঙ্গালী উপনিবেশক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমাণিক্য

ধর্ম্মমাণিক্য ১৩৩১ খৃঃ-১৩৬২ খৃঃ।

১৪৯৯ হইতে ১৫১ খৃষ্টাব্দ মহামাণিক্যের পুত্র মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য প্রথম যৌবনে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। কাশীতে কৌতুক নামক এক ব্রাহ্মণ, ইনি রাজা হইবেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য অতঃপর দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজা হইলেন। তিনিই ত্রিপুরা হইতে রাজমালা বাঙ্গলা পয়ারে অনূদিত করাইয়াছেন। পূর্ব্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুরা ভাষাতে। পয়ারে লিখিত সব সকলে বুঝিতে। সুতরাং

ধর্মমাণিক্য রাজমালা রচেন। রাজমালা বলিয়া গ্রন্থকে নাম দেন।" এতদ্বারা বোঝা যায় ত্রিপুরার বৃহৎ সাহিত্যে তখন কমলা ভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। ধর্মমাণিক্যের সময়ে বহু ব্রাহ্মণ বসতি করা হইয়াছিল। কুসুমের বৃহৎ "ধর্মসাগর" এই রাজার প্রধান কীর্তি। ইনি বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। একখানি তাম্রপত্রের কতকাংশ রাজমালায় উদ্ধৃত হইয়াছে—উহা ১৬৮০ (১৫৫৮ খৃঃ) শকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ধর্মমাণিক্য (১৫৫৮ খৃঃ)

ত্রিলোচন রাজার সময় হইতে ১০জন সেনাপতির উপর সৈন্যবিভাগের কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ধর্মমাণিক্যের পুত্র প্রতাপমাণিক্য অত্যাচারী হওয়ায় সেনাপতিগণ ইহাকে হত্যা করে, ধাত্রী গুৎকনিষ্ঠ ধ্বজকে লুকাইয়া রাখেন। বালক তখন একাদশবর্ষীয় ছিলেন। পুরোহিত ইহাকে লইয়া আসেন এবং সেনাপতিরা ইহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। প্রথমে সেনাপতি ইহাকে স্বীয় কন্যা দান করেন। ইনিই ত্রিপুরার ইতিহাস-বিখ্যাত রাজ্ঞী কমলা দেবী। বঙ্গমাণিক্য সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অল্প বয়সেই প্রবীণের ন্যায় অভিজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন। ইনিই ত্রিপুর রাজ্যের অবিসংবাদিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। ইঁহার পুরোহিতই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, রাজমালায় ইঁহাকে বলি রাজার পুরোহিত শুক্রাচার্যের সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে। প্রথমে রাজার সর্বপ্রধান কার্য হইল, সেনাপতিদিগকে খর্ব করা। প্রত্যেক সেনাপতির অধীন ৫,০০০ সৈন্য ছিল, সুতরাং ১০ জন সেনাপতি ৫০ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এই দশ জন সেনাপতির অলক্ষ্যে রাজাকে উঠিতে বসিতে হইত, পুরোহিত রাজাকে উপদেশ দিলেন, "কোলাচল কি কারণে বাড়াইতে চাহ। নখে ছেদি বৃক্ষে, কেন কুঠারে লাগাহ। মহা ব্যাধি জন্মে যদি অধিকাঙ্গ হয়। বিকৃতি আকার দেখি লজ্জা যে জন্মায়। অগ্র ছিন্না ছেদ করি তারে যদি ফেলে। তবে তাকে উপহাস না করে সকলে। অস্থি শিরা না হইবে নাশিক্রোধমতি। এই মতে বুঝাইছে গুরু বৃহস্পতি। রাজ্যিক ভাব যদি রাজার না হয়। অস্থি শিরা হৈলে তাঁর জীবন সংশয়॥" (রাজমালা, বঙ্গমাণিক্যখণ্ড)। পুরোহিতের উপদেশে রাজা তিন মাস কাল অন্তঃপুরে থাকিয়া যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে লাগিলেন, তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ ও বিশাল হইল। পীড়ার ভান করিয়া ইনি কাহারও সহিত দেখা করিতেন না, এমন কি মহারাজ্ঞী কমলা দেবীও তথায় ঢুকিতে পারিতেন না। অতঃপর একবারে সেনাপতিদিগকে রাজদর্শনের অনুমতি দেওয়া হইল, রাজগৃহে ৩০ ৪০ জন গুপ্তঘাতক প্রস্তুত ছিল, সেনাপতিরা যখন রাজাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া যাইবেন, তখন গুপ্তঘাতক দল রাজার ইঙ্গিতে তাঁহাদের প্রত্যেককে বধ করিল। এই সেনাপতিগণের বল-গুপ্ত মণ্ডলী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রাজা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জলন্ত ভাস্করের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সেনাপতিদিগকে হত্যা।

সেনাপতিগণের গৃহ লুণ্ঠিত হইল, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণকে পর্যন্ত বধ করা হইল এবং তৎস্থলে স্বীয় আশ্রিত ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ সেনাপতি নিযুক্ত হইল। কথিত আছে,

ধন্যমাণিক্যের বার কোটি পদাতিক সৈন্য ছিল এই বর্ণনা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত। সেনাপতিগণের উপাধি হইল "বড়ুয়া", এই দুর্দম সৈন্যবল লইয়া ত্রিপুরেশ্বর মেহেরকুল, পাটীকারা, গঙ্গাসাগর, রাগমাটি প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশঃ বঙ্গদেশের নিম্নভূমির প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। খেজুর তালগাছ প্রভৃতি দেশের জঙ্গল কাটিয়া তিনি আবাদ করাইলেন অবশেষে গৌড়েশ্বরের রাজ্যান্তর্গত বরদাখাত পরগনা বলপূর্বক অধিকার করিলেন। বরদাখাতের রাজা প্রতাপ গৌড়েশ্বরকে অগ্রাহ্য করিয়া ধন্যমাণিক্যের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। কেবল বিদ্রোহী হইল খণ্ডল, এই রাজাও গৌড়েশ্বরের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং রাজা 'বলিক' বা খণ্ডলেশ্বরের দ্বারা শাসিত হইত ধন্যমাণিক্য তথায় এক সেনাপতি পাঠাইয়া তাঁহাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন. বলিকেরা ইহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গৌড়েশ্বরের দরবারে হাজির করাইলেন হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার হুকুম হইল কিন্তু এই দুর্দম সেনাপতি খড়্গাঘাতে বিপক্ষ সেনাকে হত্যা করিয়া হস্তীর শুণ্ডের উপর ক্রমাগত খড়্গাঘাত করিতে লাগিলেন হস্তী ছুটিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু সেনাপতির খড়্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—এই অবস্থায় তাঁহাকে অন্য হস্তীর পদতলে ফেলিয়া বধ করা হইল রাজমালায় লিখিত আছে, এই অদ্ভুত কর্মা সেনাপতির বীরত্বের কথা শুনিয়া কেন ইহাকে হত্যা করা হইল বলিয়া গৌড়েশ্বর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ধন্যমাণিক্যের ক্রোধ কালানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি মনের ভাব সংবরণ করিতে পারিলেন। পরে ক্রোধ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি খণ্ডলের বলিকদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজধানীতে ডাকিয়া আনিয়া কৌশলে প্রত্যেকটিকে হত্যা করিয়া খণ্ডল নির্বিবাদে অধিকার করিলেন। ধন্যমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন "চয়ঢ়াগ", ইনি খণ্ডলবাসীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থকে বৃক্ষপত্র পরাইয়া ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বরদাখাত দখল।

সেনাপতি চয়ঢ়াগ

ধন্যমাণিক্য তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে জাতিভেদের বৈষম্য ভালবাসেন নাই সমস্ত সৈন্যকে একত্র করিয়া একদা এক মহোৎসব করিয়াছিলেন। পংক্তি অনুসারে যখন তাহারা খাইতে বসিয়াছিল, তখন কতকটা খাওয়ার পর এক হীনকুল-জাত কুকী-সরদার তাহাদিগের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার ছলে একটা কাঠি দিয়া সকলের মস্তক স্পর্শ করিল স্বয়ং মহারাণী কমলাদেবী এই ভোজন-ব্যাপারের পরিদর্শিকা ছিলেন। রাজত্বরে কুকীরা স্পৃষ্ট হইয়াও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না এবং ভোজন ব্যাপারও ক্ষান্ত করিতে পারিল না। এই সকল সৈন্য "কাঠি ছোঁয়া" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ে একটি শ্বেত হস্তীর অধিকার লইয়া আসামের (হেরম্ব দেশ) রাজার সহিত ধন্যমাণিক্যের বিরোধ উপস্থিত হইল। ধন্যমাণিক্য কাছাড়ের প্রসিদ্ধ ধনাইছি দুর্গ অবরোধ করিলেন, এই গড় উচ্চ পাষাণ-নির্ম্মিত এবং দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। আট মাস কাল সেনাপতি চয়ঢ়াগ দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিলেন, তথাপি আসাম-সৈন্য

সৈন্যগণের মধ্যে জাতি ভেদ বিলোপ, কাঠি ছোঁয়া

পরাজয় স্বীকার করিল না। একদা ত্রিপুর-সৈন্য একটা গোলাপ ঘরিল, পার্শ্বত্য-প্রদেশের গোধিকা—মহাকায় ও প্রবল পরাক্রমশালী। কথিত আছে, এই অদ্ভুত জীব দৈর্ঘ্যে আট হাত ও প্রস্থে তিন হাত পরিমিত ছিল। চয়চাগ ইহাকে ধরিয়া ইহার পুচ্ছের সহিত সেতুর বন্ধু বাঁধিয়া দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠিতে সৈন্যদের তাড়না করিলেন, সেই বেত্র ধরিয়া একটি করিয়া সৈন্যেরা উপরে উঠিতে লাগিল। তখন গভীর রাত্রি, আসামসৈন্য এই কার্য্যের কিছুই জানিত না। ত্রিপুর-সৈন্য দুর্গ-প্রাকারের সর্ব্বোচ্চস্থানে বন্ধু আটকাইয়া ফেলিয়া বন্যার মত ধানাংছি গড়ে ঢুকিয়া পড়িল। দুর্গ অধিকৃত হইয়া গেল। ধানাংছির সৈন্যেরা এত কাল দুর্গের প্রাচীরের উপরদেশে বসিয়া নিরস্ত্রিত ত্রিপুর-সৈন্যের দিকে পা ঝুলাইয়া দিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিত, এইবার তাহারা শাস্তি পাইল। ধানাংছি গড় ত্রিপুরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে ইহার নাম হইল "ত্রিপুরা-পুরী"। এই দুর্গবিজয় সম্বন্ধে নানা কথা রাজমালায় আছে। আট মাস ধরিয়াও যখন সেনারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন চয়চাগ রাগিয়া সৈন্যদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা পুরুষ নও - মেয়ে মানুষ, চরকা হাতে লইয়া অন্তঃপুরে যাও।" তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া শিবিরে ঘুমাইত দেখিয়া তিনি চালে খুটো করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সারা রাত্রি ঢুঁইতে ঢুঁইতে ত্রিপুর-সৈন্য ঘুমাইতে পারিত না। যাহা হউক অবশেষে দুর্গ জয় করিয়া চয়চাগ ধানাংছি গড় নরশোণিত রঞ্জিত করিলেন, ত্রিপুর-সৈন্য নাড়াগড়কে লুণ্ঠন করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিল। চয়চাগ ইহার পরে পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পাহাড়-বাসী লোকদিগকে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন করিলেন। সামুল নায়ক স্থানে স্বীয় শিবির স্থাপন করিয়া 'ছাইমার', 'ছাইবেখ', 'ছাকাচেঙ্গ', 'খামাচেঙ', 'মাঙ্গ', 'মুঙ্গ', 'ছাকাঁ', 'রাঙ্খল', 'খামাঁ', 'গুগৈছা', 'খছুং', 'মাছিল', 'রাঙ্গাগ্রস্থ' প্রভৃতি আটটি টিপাগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, তাহারা সকলে আসিয়া রাজধানীতে স্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিদের ভেট পাঠাইল। ত্রিপুরার রাজধানীতে "সহস্র সহস্র কুকী আসিল দিগম্বরা"—ইহারা 'গজদন্ত', 'গরম', 'ছাগ', 'কাংস্য', 'মাদুর', 'ঘোড়', 'রক্ত-কৃষ্ণ-শ্বেত-বস্ত্র', 'কাংস্য থালি', 'শিকলানী', 'তামার কড়ঙ্গ,' 'দ্বিমাত্রিক জলপাত্র', 'কিরাচিয়া খড়্গ', 'পিত্তল ও কাঁসার কাবি' প্রভৃতি ভেট লইয়া আসিয়াছিল। বঙ্গমালিকা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যখন কোন কোন সভাসদ সেনাপতি চয়চাগের দুই বৎসরের অনুপস্থিতি এবং আসামের বড়ুয়া কন্যাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় কালাতিপাত সম্বন্ধে দুই একটি ইঙ্গিত করিল, তখন রাজা একটু হাসিলেন মাত্র। বস্তুতঃ চয়চাগকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

ধানাংছি দুর্গ অধিকার।

দিগম্বর কুকীদের বশ্যতা স্বীকার।

ইহার পর চট্টগ্রাম বিজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া বঙ্গমালিকা সৈন্য পাঠাইলেন। হুসেন সাহের একদল সৈন্য সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল, বঙ্গমালিকের সৈন্যেরা তাহাদিগকে জয় করিয়া ১৪৩৪ (১৪১৩ খৃঃ) অব্দে চট্টগ্রাম ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্গত করিল। হুসেন সাহ এই সংবাদ পাইয়া গৌড়মল্লিকের অধীন বহু সৈন্য দিয়া ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। এই সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে 'বার

হুসেন সাহের সঙ্গে বিরোধ।

ফৌজ'দের সৈন্যেরাও ছিল "(বার বাঙ্গলা সৈন্য গৌড়মল্লিক সঙ্গে)" গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের অবধি ছিল না। মেহেরকুলে প্রথম যুদ্ধ হইল। ত্রিপুরার সৈন্যেরা এই যুদ্ধে পরাস্ত হইল, মেহেরকুল পাঠানেরা দখল করিল। হটিয়া গিয়া ত্রিপুর সৈন্য চণ্ডীগড়ে আশ্রয় লইল, গৌড়মল্লিক কিছুতেই দুর্গ জয় করিতে পারিলেন না বজ্রমাণিক্য গোমতীর একটা দিক্ সোনা মুহুরী মাটি কাটিয়া ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন। এই নদী বহুবাহুক এবং অগভীর—কিন্তু খুব বেগশালী। পাঠানেরা নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিল—এদিকে এক রাত্রে বজ্রমাণিক্য সেই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পাঠান সৈন্য বহু সংখ্যক ডুবিয়া মরিল। তখন ত্রিপুরেশ্বর শত্রুক্ষয় কামনা করিয়া অভিচারের অনুষ্ঠান করিলেন একটা চণ্ডালের মুণ্ড কাটিয়া অন্ধরাত্রে এই অনুষ্ঠান করা হইল ত্রিপুর সৈন্য সেই অভিচার-দর্শন করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। পাঠানেরা ভাবিল বহু সৈন্য লইয়া বিজয়োল্লাসে ত্রিপুরগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল এবং গৌড়মল্লিক পরাস্ত হইয়া হুসেন সাহের দরবারে অধমর্ণিত হইলেন। এই যুদ্ধ জয় করিয়া বজ্রমাণিক্য চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় সেই দেশ অধিকার করেন,—সেইখানে সেনাপতি "রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ"কে শাসন কর্ত্তা নিয়োগ করিয়া বজ্রমাণিক্য রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এই রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ—আরাকান (রসাঙ্গ) স্বয়ং অধিকার করিতে অসমর্থ হন। রাজা রাজচাগ ও রায় কহুম এই দুই সেনাপতিকে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এইবার চট্টগ্রাম ও সমস্ত আরাকান প্রদেশ (১৬০৭ শক, ১৫২৫ খৃঃ অধিকৃত হইল। হুসেন সাহ একশত হস্তী আরোহী, পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ তাঁহার প্রিয় সেনাপতিদ্বয় হৈতেন খাঁ ও করা খাঁকে ত্রিপুরা বিজয় করিতে পাঠাইলেন। "বাদশ বাঙ্গলা (বার ভূঞার সৈন্য সামন্ত) চলে হৈতেন খাঁ সহিতে।" সরাইলের পথে ত্রিপুর সৈন্য হটিয়া গেল। পাঠানেরা অগ্রসর হইয়া জামির খাঁর গড়ে উপস্থিত হইল ত্রিপুর-সেনাপতি খঙ্গরায় বহু যুদ্ধ করিয়াও সেই দুর্গ রাখিতে পারিলেন না ইতঃপূর্ব্বে পাঠানেরা কৈলাগড় ও বিশালগড় দখল করিয়াছিলেন, সুতরাং বিজয়ী পাঠান সৈন্য আরো উত্তরে অগ্রসর হইয়া ছমরিয়াগড়ে যাইয়া রাজ-সেনাপতি গগন খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিল। তিন প্রহরব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের পর গগন খাঁ পরাস্ত হইলেন। বজ্রমাণিক্য রণপুর ছাড়িয়া রাঙ্গামাটির দিকে হটিয়া চলিলেন। সন্ধ্যাসময় পাড়ি দিয়া রাজা ডোমঘাটিতে শিবির স্থাপন করিলেন। হৈতেন খাঁ কর্ণফুলি ডাঙ্গিয়া সেই স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড় নির্ম্মাণ করাইলেন। এদিকে গোমতীর জল ত্রিপুরার লোকেরা বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়া হৈতেন খাঁ দুই প্রহরের মধ্যে সেই স্থানে এক দীঘি খনন করাইলেন। ডোমঘাটিতে ডোম-মেয়েরা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান জানিত—কথিত আছে, তাহারা মানুষ খাইত, লোকেরা তাহাদিগকে ডাইনি বলিত। প্রবাদ ডাইনি "রসাগমা-যুবতী" রাজার আজ্ঞায় সাত দিন

গৌড় মল্লিকের অপমান।

চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয়।

ত্রিপুর-সৈন্যের উপর্যুপরি পরাজয়।

গোমতীর জল বাঁধিয়া রাখিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল ও দুইটি কুলা বাহুমূলে বাঁধিয়া সূত্র-যোগে উহা উড়াইয়া দিল। সেই কুলা ২০০ হাত উচ্চে উঠিয়া নদীতে পড়িয়া গেল। বেহুলেই হউক, এই ভাইনীরা নদীর জলের নানা সন্ধান জানিত। হয়ত যেখানে জল খুব কম, সেখানে কৃত্রিম কোন উপায় করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে জল অন্যদিকে অগোচরে সরিয়া যাইত।* হঠাৎ গোমতীর একটা জায়গায় চড়া পড়িল। হৈতেন খাঁ উহা ভগবানের দান মনে করিয়া সেই চড়ার উপর শিবির স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে লাগিলেন। এদিকে ত্রিপুর সৈন্যেরা বহু কদলী তরু কাটিয়া শত শত ভেলা তৈরি করিল। প্রত্যেকটি ভেলার উপর তিন তিনটি কৃত্রিম মনুষ্যমূর্তি এক একটির হাতে দুইটি করিয়া কুলা মশাল)। হঠাৎ গোমতীর বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া সুখ শয়ান পাঠানদলের শিবিরে ইহারা জল প্রবেশ করাইয়া দিল। চড়া ভাসিয়া গেল, হস্তী অশ্ব সৈন্য সকলে জলে ডুবিল। এদিকে মশাল-হস্তে মনুষ্যমূর্তি ভেলার উপরে, শত সহস্র মশালের আলোকে পাঠানেরা দেখিল যেন শত্রুরা আসিতেছে, পশ্চাতে সহস্র সহস্র সংখ্যক সৈন্য—এদিকে বাঁধ ভাঙার দরুন পার্বত্য গোমতী নদীর প্রবল বেগ। সম্মুখের দিকে ভীষণ অরণ্যে ত্রিপুর সৈন্যেরা আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। চারিদিকে বৃহৎ বৃক্ষাদি পুড়িয়া যাইবার ভীষণ শব্দ, জলের উৎকট কল্লোল ও ত্রিপুর সৈন্যের গর্জন। হৈতেন খাঁ ও কদা খাঁ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেলেন, এবং হুসেন খাঁর দরবারে অবস্থানিত হইলেন। যে স্থানে পাঠানেরা ত্রিপুর সৈন্যের বুদ্ধি-কৌশলে এরূপ অভূতপূর্বভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন, সে স্থানের নাম বলগঙ্গা। মহারাজ ধন্যমাণিক্য যুদ্ধ জয় করিয়া সে স্থানে চতুর্দশ দেবতার ঘটা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরের সহস্র সহস্র বাঙ্গালীকে বলি দেওয়া হইত, ধন্যমাণিক্য এই বলি বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজার আদেশে বলির এইরূপ ব্যবস্থা হইল। ১৪ দেবতার তিন বৎসর পরে একটি নরবলি, কালীমন্দিরে এক নরবলি, "লোচা পাথর" নামক দেবতার স্থানে দুইটি নরবলি কিন্তু তাহাও শত্রুপক্ষীয় লোক পাইলে হইবে। "ইহার অধিক বলি মানা করে রাজা।" ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রামে দুই মন সোনা দিয়া ভুবনেশ্বরীর মূর্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কুকীদের এক আশ্চর্য শিবলিঙ্গ আছে জানিয়া তিনি তাঁহার জামাতা হেপাকলাউকে তাহা আনিতে পাঠান। কুকীরা ইহাকে হত্যা করাতে এই ষড়যন্ত্রের নেতৃবর্গ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

যন্ত্রের উপায়ে গোমতীর জল বাঁধা।

হৈতেন খাঁ ও কদা খাঁর পরাজয়।

মনুষ্য-বলি নিষেধ।

দুই মন সোনার ভুবনেশ্বরী মূর্তি।

* বঙ্গদেশের কোন একখানি ইতিহাসে আমি পড়িয়াছিলাম একটী নদীর বাঁধে কৌশলপূর্বক ছোট-বার নির্মিত হইয়াছিল। তাহা বন্ধ করিলে নদীর গতি থামিয়া যাইত, এতদপেক্ষা ছোটটি আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। গোমতী নদীর বাঁধ সেইরূপ কোন উপায়ে নির্মিত হইয়া থাকিবে।

ধন্যমাণিক্য যেমন বীর ছিলেন, তেমনই রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন; তিনি সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। "ধন্যমাণিক্য রাজা একত্তরে পাত্র। উৎকলখণ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি॥ কোন্ডিবে মাত্রা-চন্দ্রাকর নিধি আর। পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবারে॥ বিচিত্র দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি। রাজ্যেতে শিখায় গীত নিত্য নৃপমণি॥ ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়। ছাগ অন্নে ভাব যত ত্রিপুরে রাজায়॥" (ধন্যমাণিক্য খণ্ড।) রায় নামক এক কবির দ্বারা তিনি "গীত-চন্দ্রকলা" নামক পুস্তক রচনা করাইয়াছিলেন, এই কাব্যখানি তাঁহার প্রিয় ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইনি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলারই সেবা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাবের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, এইজন্য তিনি 'সুভাষা'—বাঙ্গলা ভাষাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী কমলা তাঁহার যোগ্যা ছিলেন, "মহারাণী কমলা নাম পৃথিবীতে ধন্যা" তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ ত্রিপুরার সর্ব্বত্র শ্রুত হইত। ধন্যমাণিক্য অনেক দীঘি, দেব-মন্দির ও মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে রাজারা মঠ-মন্দির ও বিহার নির্ম্মাণে যে কিরূপ মুক্তহস্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যের জন্য চেষ্টিত ছিলেন, তাহা ধন্য-মাণিক্যের একটি কার্য্যে প্রতীয়মান হইবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধন্যমাণিক্য কয়েকটি মঠ নির্ম্মাণ করান। তিনি স্থপতিকে বলিয়াছিলেন, তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যেন সেই মঠগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে। কার্য্য সমাধা হইলে রাজা কারিগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে যাহা করিয়াছে তাহা হইতে আরও ভাল করিতে পারে কি না। স্থপতি একটি বক্র হাসিরেখা অধর প্রান্তে টানিয়া বলিল, "অবশ্য পারি।" রাজা বলিলেন, "তোমাকে যথাসাধ্য করিতে বলিয়াছি, যত অর্থ হউ, দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তথাপি তোমার বিদ্যার কতকটা পেটে রাখিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়াছ।" রাজা তরবারি দ্বারা তখনই তাহার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলার পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ধন্যমাণিক্যের মত এত বড় রাজা হয় নাই। তাঁহাকে এই যুগের "অনুদগুপ্ত" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্থপতির মৃত্যুদণ্ড

ধন্যমাণিক্যের পর ধর্ম্মমাণিক্য ৩ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎকনিষ্ঠ দেবমাণিক্য ভূসুরা দখল করেন। দেবমাণিক্য তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। মিথিলাবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক ভণ্ড তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ছিন্নিয়া রাজার সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, সে তান্ত্রিককার্য্যে শ্মশানে মহারাজের সহযোগিতা করিত। দেবমাণিক্য ইহার হস্তে নিহত হন। প্রধানা রাজ্ঞী সহমৃতা হন এবং তৎপুত্র যুবরাজ বিজয়কুমারকে বন্দী করিয়া চাঁদপুরে রাখা হয়। ছিন্নিয়া রাজ্ঞীর পুত্র নামে মাত্র রাজা হন। সেই ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণই রাজত্ব করিতে থাকে। এক বৎসর কাল এই দুরাচার ব্রাহ্মণ রাজ্য করিতেছিল। প্রজারা ক্ষেপিয়া যায় এবং

দেবমাণিক্য ১৪৪২-১৪৫৭ খৃঃ।

প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ কৌশল ক্রমে রাজাকে বধ করেন। বিদ্রোহী প্রজারা শিশু রাজা ইন্দ্রমাণিক্যকে আছাড় দিয়া হত্যা করে, এবং সমস্ত প্রধানরা রাজ-অন্তঃপুরে গিয়া পাশিক্ষা রাজমাতাকে সংহারপূর্বক হীরাপুর বন্দীশালা হইতে বিজয়মাণিক্যকে আনিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করে।

ত্রিপুরার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়মাণিক্য সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দেখিলেন, সমস্ত ক্ষমতাই দৈত্যনারায়ণের হাতে, এমন কি রাজ্যভাগ যাচাইবার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতাও রাজার নাই। দৈত্য-নারায়ণের লোভী ভ্রাতৃ নারায়ণের অত্যাচারে দেশ কণ্টকিত হইল। শাক-বেচা এক রমণীকে সুন্দরী দেখিয়া তাহার বলপূর্বক লইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিল। সেই রমণীর স্বামী রাজার কাছে নালিশ করিল। রাজা দেখা করিবার চেষ্টের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। রাজা দৈত্যনারায়ণের কন্যা পুণ্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার ইঙ্গিতে তাঁহার জামাতা মাধব দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করিয়া সেই গৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন—এবং প্রচার করিলেন অগ্নিদাহে দৈত্যের মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজা পিতৃচন্তা মাধবকে ছলনাপূর্বক ডাকাইয়া হত্যা করিলেন। রাজা পুণ্যবতীকে এই অপরাধে নির্বাসন করিয়া দ্বিতীয় মহাদেবী গ্রহণ করিলেন। বিজয়মাণিক্যকে সার্বভৌম রাজা স্বীকার করিয়া খাসিয়া পাহাড়ের রাজা, শ্রীহট্টের রাজা জয়ন্তীর রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে আবার পাঠানদের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল। সোলেমান করবানী তাঁহার শ্যালক মবারক খাঁকে বহু সৈন্য দিয়া চট্টগ্রামে পাঠান। প্রথম কয়েকবার পাঠানদিগের জয় হইয়াছিল। রাজার সেনাপতি কালা নাজির যুদ্ধে নিহত হইলে, ত্রিপুরেশ্বর সেনাপতিদিগকে চরকা পাঠাইয়া দিলেন। অর্থাৎ তোমরা চরকা কাট গিয়া, যুদ্ধের যোগ্য নও। যাহা হউক প্রধান সেনাপতি গজপতি শেষে জয় লাভ করিয়া ঘোর অহংকৃত বাদসাহের শ্যালক মবারককে বন্দী করিয়া আনিলেন। ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে খুব আদর যত্ন দেখাইলেন, কিন্তু মবারক নৃপতিকে অভিবাদন বা নমস্কারাদি করিলেন না। রাজার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চন্তাই (পুরোহিত) মবারককে চতুর্দশ

বিজয়মাণিক্য—১৫২৯-১৫৭০ খৃঃ

খাসিয়া, শ্রীহট্ট ও জয়ন্তীর আনুগত্য স্বীকার।

সেনাপতি গজপতি কর্তৃক সোলেমান করবানীর শ্যালক মবারক খাঁকে বন্দী করা ও কালীমন্দিরে বলি দেওয়া।

বিভিন্ন ধাতুর ও অ-ধাতুর গলনাঙ্ক ১।

দেবতার নিকট বলি দিলেন। বলির সময় পাঠান অধিনায়ক পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজার লোকেরা তাহা দেয় নাই। তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহাকে বলিল, "খাঁ সাহেব পূর্ব্বই বা কি পশ্চিমই বা কি, ঈশ্বর সকলত্র আছেন", তখন পূর্ব্বদিকেই তিনি মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার কর্ত্তিত মুণ্ড দেখিয়া রাজা অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যে বাদসাহের চিঠি আসিল -মযারককে ছাড়িয়া দিলে তিনি পশ্চাদ্দেশ হইতে পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ত্রিপুরেশ্বরকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু যখন মযারকের হত্যা-সংবাদ পৌঁছিল, তখন রণদুন্দুভি আবার বাজিয়া উঠিল। কিন্তু এই সময় বাঙ্গলার বাদসাহ হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে আবদপশ যুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্য এই সকল অন্তর্বিরোধ স্থগিত হইল। চট্টগ্রাম বিজয়ের পর বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়ার্থ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হইলেন। কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইল না। সুবর্ণগ্রামে আসিয়া তিনি দেখিলেন, বিক্রমপুরের লোকেরা ত্রিপুর-সৈন্যদিগকে বিদ্রূপ করে। রাজা এক সহস্র টাকা ও এক এক খানি চতুর্দ্দোলা পাঠাইয়া কুলীন চৌধুরীদিগের সুন্দরী কন্যাদিগকে পদ্মাসঙ্গিনী করিতে লাগিলেন। এই অভিযানের সময় বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রের উপরে এক সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কৈলাগড়ে তিনি একটি সুবৃহৎ খাল কাটাইলেন উহা নদীর মতই হইল, এই নদীর নাম হইল "বিজয়-নন্দিনী" তারপর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করাইলেন—ইহা "ত্রিপুরার রাজপথ" নামে পরিচিত হইল। ফিনারপুরে তিনি আর একটি খাল কাটাইলেন, তাহার নাম হইল "ত্রিপুরার খাল"। বালিশিরা নামক এক স্থানে যাইয়া রাজা সেই স্থানের নাম 'বিজয়পুর' রাখিলেন। বিজয়ের দুই পুত্র—ছাত্রফা ও অনন্ত। গণকগণ গণিয়া বলিল ছাত্রফার 'দেব যোগ' আছে। রাজা তাঁহার বন্ধু উড়িষ্যার অধিপতি মুকুন্দদেবের নিকট জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহাকে বহু ধনরত্ন দিয়া বুঝাইলেন, জগন্নাথতীর্থে থাকিলে তাঁহার ইহকাল ও পরকালের সদ্গতি হইবে। মুকুন্দদেব রাজপুত্রকে আটখানি গ্রাম দিলেন। বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত সিংহাসনে আসীন হইলেন। বিজয়মাণিক্য মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রকে মিনতি করিতে লাগিলেন,"আমাকে বাঁচাইয়া দিন, আমি আপনার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দিব।" এই ভাবে রাজা ৪৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও অতি সুদর্শন ছিলেন। রাজমালায় বিজয়মাণিক্যের দিগ্বিজয় কৌতূহলপ্রদ ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহার বিখ্যাত অভিযানে ৫০,০০০ নৌকার এক বহর ছিল। প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া তথায় কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া "পঞ্চক্রোশ" নামক ব্রাহ্মণাধ্যুষিত গ্রাম স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি লক্ষ্য পার হইয়া ইচ্ছামতি অতিক্রমপূর্ব্বক পশ্চাতীরে উপস্থিত হন। তিনি পথে পথে ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে ভাস্রশাসনাদি দ্বারা বহু ভূমি ও স্বর্ণ দান করিয়া নিরুদ্যমভাবে শত্রু দলনপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং মনে হয় তিনি সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। আবুল ফজল বিজয়মাণিক্যের নাম আইন

বিজয়মাণিক্যের দিগ্বিজয়, ত্রিপুরার খাল, ত্রিপুরার রাজপথ, 'বিজয়-নন্দিনী' ও 'বিজয়পুর'।

আকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন, এই রাজার সমসাময়িক কাছাড়ের রাজা নিরঞ্জনারায়ণ এবং জয়ন্তিয়ার রাজা বিজয়মাণিক।

অনন্তমাণিক্যকে তাঁহার বন্ধু গোপীনাথ কৌশলক্রমে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন, তদুপলক্ষে গোপীনাথ-কন্যা মহারাজ্ঞী জয়া দেবীর যে তেজোগর্ভ উক্তি ও ব্যবহার রাজমালায় উক্ত আছে, তাহাতে এই মহীয়সী রমণীর পাতিব্রত্য, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গোপীনাথ ইঁহাকে জোর করিয়া সহমৃতা হইতে দেন নাই গোপীনাথ পূর্ব্বে বিজয়মাণিক্যের সমান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। একদা তিনি এক ব্রাহ্মণের কুলমাছে বসিয়া কুল খাওয়াতে সেই ব্রাহ্মণের হাতে বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়াছিলেন। বিজয়-মাণিক্য ইঁহাকে 'বড়ুয়া'র পদ দিয়াছিলেন শেষকালে ইনি মহারাজের রন্ধনশালার প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন অন্ত পরিবেশন কালে রাজা ইঁহার হাতে রাজচিহ্ন দেখিয়া ইঁহাকে 'গোপীপ্রসাদ নারায়ণ' উপাধি দিয়া প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন, শুধু তাহাই নহে ইঁহার নিষ্কলঙ্কচরিত্রের কথা অবগত হইয়া ইঁহার সঙ্গে স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। এখন এই বিশ্বাস-ঘাতক সেনাপতি স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিয়া "উদয়মাণিক্য" নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যার উৎসন্নতা অতিই হইয়াছে, ইনি চন্দ্রপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অতীব অত্যাচারী রাজা ছিলেন অবিজ্ঞ সেনাপতির পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পিতার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। রাজার কাছে অভিযোগ আসিলে তিনি অভিযোগকারীর কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া তাড়াইয়া দিতেন ইঁহার স্ত্রী মহলে ২৫০ জন রমণী ছিল। ইঁহাদিগকে ইচ্ছামত স্বীয় অন্তঃপুরে রাখিয়া তিনি শেষে যাকে তাকে বিলাইয়া দিতেন। ইঁহার পুত্রের অত্যাচার তদোধিক হইয়াছিল। রাজ্যের শাসন গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে শুনিয়া মোগলেরা চট্টগ্রাম দখল করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। রাজা স্বীয় ভগিনীপতি রণাগণকে প্রধান সেনাপতি করিয়া তৎসঙ্গে চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, আগুখান নারায়ণ, গজপতি নারায়ণ প্রভৃতি বীরদিগকে ৫২,০০০ সৈন্যসহ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কথিত আছে ইঁহাদের পরিচালক ৩,০০০ সেনাপতি ছিল, শিরোকণা আরি এবং জামালখা পনি এই দুই সেনাপতির হস্তে ত্রিপুর-সৈন্য সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে ৪০,০০০ ত্রিপুর-সৈন্য এবং ৫,০০০ মুসলমান সৈন্য নিহত হয়; এইভাবে চট্টগ্রাম ত্রিপুর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে এই যুদ্ধ ঘটিয়া ছিল।

অনন্তমাণিক্য ও উদয়-মাণিক্য—১৫৭০-১৫৮৩ খৃ.।

চট্টগ্রাম হইতে প্রেরণ।

উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্য রাজা হইয়া দেখিলেন—সমস্ত ক্ষমতাই সেনাপতি রণাগণের হস্তে। ইঁহাকে রণচতুর নারায়ণের পুত্র বধ করেন। জয়মাণিক্য সেনাপতির দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল।

উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ১২ বৎসরের কিছু উর্দ্ধকাল। ইহারা ত্রিপুর-

রাজবংশের বাহিরের লোক, কিন্তু দেবমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য এইবার সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক পূর্ব্ব রাজবংশের গৌরবরবি পুনরায় স্থাপন করেন। ইনি এক "হাজরা"র হৃৎ গর্ভে মহারাজ দেবমাণিক্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া হাজরার সন্ততিরূপে তাঁহারই গৃহে লালিত হন। এইবার সৈন্যসকল তাঁহাকে লইয়া আসিয়া রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। অমরমাণিক্যের প্রধান কীর্ত্তি "অমরসাগর।" এই দীঘি-খনন উপলক্ষে ত্রিপুর-রাজার পরমধার্ম্মিকতা ও মহিমা কতকটা অনুভব করা যায়। দীঘি-খননের জন্য স্থানাধ্যক্ষ শ্রীপুরপরগণার চাকরায় ৭০০, বাকলার বসু ৭০০, মলে গোয়ালপাড়ার গার্জি ৭০০ ডালুয়ালের রাজা ১০০০, অইগ্রামের জমিদার ৫০০, বানিয়াচঙ্গের অধিপতি ৫০০, রসুলগুয়ালের জমিদার ১০০০, সরাইলের ইসা খাঁ ১০০০ এবং কুশুরার রাজা ১০০০ জন লোক দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্টের (তাবাবের) পাঠান রাজা কোন সাহায্য করেন নাই এজন্য অমরমাণিক্য এক বিপুল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, এই সেনার অধিনায়কগণের নাম রাজমালায় আছে—রণগিরি নারায়ণ, রণজীৎ নারায়ণ, রণদুর্জ্জয় নারায়ণ, বীরদর্পা নারায়ণ, গরুড়ধ্বজ নারায়ণ, অর্জ্জুন নারায়ণ, গজসিংহ নারায়ণ, ত্রিবিক্রম নারায়ণ, শত্রুমর্দ্দন নারায়ণ, সুপ্রতাপ নারায়ণ, ছিন্নুল নারায়ণ, রণসিংহ নারায়ণ, সমরকীর্ত্ত নারায়ণ। ইহাদের সঙ্গে প্রখ্যাতযশা ইতিহাস-বিশ্রুত ইসা খাঁও ছিলেন। এই দর্পিত অভিযানের উপলক্ষে ধর্ম্মমঙ্গলের ঘাঁরধিগের কথা মনে পড়ে—"সেনার প্রধান চলে সিতারাম ভুইঞা, যার ভরে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে থুইঞা।" অমরমাণিক্যের পুত্র রত্নাধর এই সৈন্যদল পরিচালনা করিয়াছিলেন। সুযোগ পাইয়া ত্রিপুর-সৈন্য গোয়ালপাড়া গ্রামে লুট করিয়াছিল। শ্রীহট্টের রাজা ফতে খাঁ বন্দী হইয়া ত্রিপুরায় আনীত হইয়াছিলেন, রাজা তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইসা খাঁকে বহু সৈন্যদ্বারা সাহায্য করাতে এই সেনাপতি মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন, তাঁহার 'মছলন্দী' উপাধি আকবর দেন নাই, উহা ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্য দিয়াছিলেন।* ইসা খাঁ অমরমাণিক্যের রাজ্ঞীকে মাতৃসম্বোধন করাতে রাজা তাঁহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন, ইহার সবিস্তার বর্ণনা রাজমালায় আছে। সরাইল পরগনায় অনেক শিকারযোগ্য পশুপক্ষী আছে, এইজন্য যুবরাজ

অমরমাণিক্য—১৪৮৫ ১৫১৩ খৃঃ, অমরমাণিক্য—১৪৮৬-১৫২১ খৃঃ।

অমরমাণিক্য ১৪৯১ ১৫১১ খৃঃ

অমর দীঘি।

কুশুরার রাজা—১৪৭৭ খৃঃ।

ত্রিহট্টের রাজা ফতে খাঁ বন্দী ১৪৮২ খৃঃ, ইসা খাঁ মছলন্দী রাজকালে বিদ্রোহ।

* নানা প্রমাণে প্রতিপন্ন হইতেছে ইসা (ইশা) খাঁ ত্রিপুর-রাজার প্রসাদেই উন্নতির পথে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা অমরমাণিক্যের যে ঐতিহাসিক প্রাধান্যের কথা কহিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে চাপা দিয়া তাঁহাকে মসনদের রাজা খাড়া করাইবার চেষ্টা হইয়াছে—তিনি বরাবরপুত্র ছিলেন এবং আকবরের প্রদত্ত "মসনদআলি" উপাধি পাইয়া ছিলেন, সেই পুস্তকে এই সকল দাবী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ-গী ৪০৯ আমরা এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করিয়াছি

রাজধর উহার প্রতি লুব্ধ হওয়াতে ইনা থাকে ঐস্থান ত্যাগ করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। অমরমাণিক্য ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জয় করেন, তৎপূর্ব্বে ১৪৭৭ খৃঃ অব্দে কুলুয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কুলুয়াধিপতি ছত্রজয়ার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যশ্রেণীতে ৩০০ শত পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন মহারাজ স্বয়ং সিংহেশ্বর নারায়ণ নামক সেনাপতির সঙ্গে কুলুয়ায় ৩৬,০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া আসেন, তৎপরে বাকলাধিপতি কন্দর্প রায়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য গঠন করেন। সুপ্রসিদ্ধ অমর দীঘির কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এই দীঘি খনন করিতে তিনটি বৎসর লাগিয়াছিল, ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার খনন কার্য্য শেষ হয় সেইখানে জগন্নাথ মঠ নির্ম্মিত হয় এবং মহারাজ ১৪খানি গ্রাম এই মঠে উৎসর্গ করেন "তদবধি চৌদ্দগ্রামে নাম তার হৈল।" অমরমাণিক্য স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার সভায় দুইশত ভট্টাচার্য্য সকলে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। অমরমাণিক্য, 'ফুলকোয়াড়ি ছড়া'র নিকট দুইটী বটবৃক্ষে কুতে আড্ডা করিয়াছে শুনিয়া সেই দুইটি বৃক্ষ কাটিতে আদেশ করেন, এসম্বন্ধে বহুলোকের অনুরোধ ও নিষেধ তিনি শুনেন নাই বৃক্ষ দুইটি কাটা গেলে সকলে দেখিল, বৃক্ষের উৎপাটে দাঁড়িয়ে আছে,—বৃক্ষতল হইতে যে রাজধন বেশ্য তাহা লোকে বুঝিল, রাজার একবার উৎকট ব্যাধি হইয়াছিল এক দুই লোক প্রচার করিল, যদি তাঁহার আরোগ্য কামনায় নরবলি প্রদত্ত হইয়া ১২টি শিশু 'ফুলকোয়াড়ির ছড়া'য় ডুবাইয়া পূজা দেন ভয়ে সহস্র সহস্র লোক নিজ শিশুদিগকে লইয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল রাজা সেই দুই লোককে বধ দিবার জন্য ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন এবং প্রজাগণকে ধনরত্ন বিতরণপূর্ব্বক সেই 'মধ্য' কথার অসারতা প্রমাণ করিলেন আরোগ্যলাভ করিয়া অমরমাণিক্য আরাকান বিজয়ে বহির্গত হইলেন আরাকানরাজ ফিরিঙ্গিদের সহিত যোগ দিয়া প্রথমতঃ ত্রিপুর সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অমরমাণিক্যেরই জয় হইল, এই যুদ্ধে অমরমাণিক্যের পুত্র রাঘব ও তাঁহার ভ্রাতারা অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয় হইল বটে, কিন্তু কনিষ্ঠ রাজপুত্র অমর-দুলভকে পাওয়া গেল না সন্ধ্যা হইয়া গেল—রণক্ষেত্র খুঁজিয়া তাঁহার মৃতদেহ বা কর্ত্তিত-মুণ্ড না পাইয়া ত্রিপুর সৈন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল অবশেষে দুই অশ্বারোহীর সহিত রাজপুত্র ঘোড়ায় বিদ্যুৎ-বেগে আসিয়া নিজ শিবিরে দেখা দিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাক্ত, হস্তে অসি এরূপ ভাবে মুষ্টিবদ্ধ ছিল যে শিরগুলি টানিয়া ধরায় সেই অসি হস্তে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সহজে খোলা গেল না—"অশ্ব হ'তে রাজপুত্র যখন নামিল। রক্তমেখে হাতে খড়্গ তাতে না খসিল উচ্চরব দিয়া তারা হস্ত পাখালিল। তিন সোয়ারের হস্তের খড়্গ তখন খুলিল।" এই মহাযুদ্ধে কর্ণফুলির তীরে বহু মগ ও ফিরিঙ্গি সৈন্য নিহত হইয়াছিল মগ-বিজয়ের পর অমরমাণিক্য উড়িষ্যার রাজাকে আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন, উড়িষ্যারাজ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, উদ্যোগের জন্য কিছু সময় চাহিয়া লইলেন।

দুষ্ট বধ না রাজার বধ।

মগ-বিজয়।

ইতিমধ্যে সেকেন্দর সাহ নামক মগরাজ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

মগাধিপতি সেকেন্দরের বিদায়।

ত্রিপুরসৈন্য মগদিগকে কাটিতে কাটিতে তাহাদের দুর্গ পর্য্যন্ত ধাবমান হইল, কিন্তু দুর্গদ্বারের নিকট হইতে মগদিগের গোলাগুলি অজস্র ত্রিপুর সৈন্যের উপর পতিত হইতে লাগিল। পশ্চিম বয়স্ক মহাবীর রাজকুমার যুঝার সিংহের ওরসজাত নামক এক প্রচণ্ড গোলার আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া ঘোড়াকে পরস্থলে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন এবং স্বয়ং যুবরাজ রাজধর সিংহও উরু এবং উদরে গুলির আঘাতে সহ্য করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। এদিকে মহারাজ সেকেন্দর সাহ রাজপুতকে তাঁহার সৈন্যের নিধন করিবে, তাহা কখনও ভাবেন নাই। দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া তিনি অনুকূল সন্ধির প্রস্তাব করিয়া অমরমাণিক্যের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অমরমাণিক্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি সেকেন্দরের সহিত পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মগেরা উদয়পুর পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া আসিল। ফলতঃ তাহারা উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ ফিরিয়া ফেলিল। অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া রাজা বস্ত্র বোকাই করিয়া কতক মালপত্র সহিত উদয়পুরের পার্শ্বস্থ জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেকেন্দর তখন "দেওভাই"কে খুঁজিয়া পাইয়া তাহাকিগকে রাজা উপাধি দেওয়ার লোভ দেখাইয়া অমরমাণিক্যের স্বজনের সন্ধান পাইলেন এবং তাহা সূচন করিলেন। ত্রিপুরা-রাজ্যের এই বিপদ্ ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয়। কুডামর্দ্দ নামক এক ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদানপূর্ব্বক সেকেন্দর উদয়পুর ত্যাগ করিয়া যান। আরাকান রাজ চলিয়া গেলে অমরমাণিক্যের নিকট দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করেন যে, যদি ত্রিপুররাজ আরাকানের বিদ্রোহী সেনাপতি আলম সাহকে প্রত্যর্পণ করেন, তবে তিনি উদয়পুরে আর কোন উৎপাত করিবেন না। রাজা অমরমাণিক্য উত্তরে লিখিলেন, "শরণাগত আলম সাহ না দিব কখনি। ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার। তুমি যদ কি জানিবে আমা ব্যবহার। দৈব যোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে আর দুইপুত্র আমা গৃহে যে আছে। তাহা দুই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত তথাপি আলমে আমি না দিব নিশ্চিত।" পুত্র বিয়োগ-দুঃখ-কাতর রাজা বিদ্রোহী সৈন্যকে তাড়া করিয়া অনুতপ্ত হইয়া যমুনার তীরে আফিঙ্গ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহারাজ্ঞী স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন। পুত্র রাজধরমাণিক্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

অমরমাণিক্যের অকূত সাহস ও আত্মহত্যা—১৫১১ খৃঃ

রাজধরমাণিক্য ১৫১১-১৫২৪ খৃঃ।

তিনি সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি নারায়ণ নামক পরম বৈষ্ণব পুরোহিত ও ২০০ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সর্ব্বদা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। আটজন কীর্ত্তনীয়া নিশিরাত্র কীর্ত্তন গান করিত; তিনি অনেক দানধ্যান করেন ও যজ্ঞমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৌড়ের বাদসাহ "ছাদশ বাঙ্গলা" (বারভূঞা, সমুদ্রবাহাদুর) এক দল সৈন্য ত্রিপুরা বিজয় করিতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কৈলাগড় পর্য্যন্ত আসিয়া রাজার বিপুল সৈন্য-বল দেখিয়া যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না, ফিরিয়া গেল। রাজধরমাণিক্য ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তৎপুত্র যশোধরমাণিক্য ১৬২৩ খৃঃ অব্দে রাজা হইলেন।—ইহার সময়ে মুলুয়ার রাজা গন্ধর্ব-নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ত্রিপুর-সৈন্যের জয়লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও ইঁহার রাজ্যের সমস্ত হস্তী ও ঘোড়া চাহিয়া পাঠাইলে, ত্রিপুর রাজ উত্তর দিলেন, "হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কখন" ইস্পিন্দার ও ছুরুল্লা নামক সেনাপতিরয় ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইস্পিন্দার উদয়পুর রাজধানী অধিকার করিলেন, পলায়ক যশোধরমাণিক্যকে মোগলেরা ধরিয়া আনিয়া ঢাকায় বন্দী করিয়া রাখিল, তথা হইতে অনেকদিন পরে তাঁহাকে ফাতাজঙ্গের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, যশোধরমাণিক্য রাজা ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন এই বলিয়া মুক্তি পাইলেন নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যশোধরমাণিক্য বাহাত্তর বয় বয়সে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন।

• যশোধরমাণিক্য ১৬২৩

আড়াই বৎসর কাল বিজয়ী মোগলেরা উদয়পুর দখল করিয়া রাখিয়াছিল, "পাপিষ্ঠ যবন অতি দুষ্ট দুরাচার। পশুকর্ম নিরবধি নগর বাজার। যত কিছু রহে প্রজা উদয়পুরেতে। মোগলের সৈন্যে লুটে না পারে থাকিতে ছত্রিশ দেব পূজা নিষেধে যবন। কালিকা দেবীর পূজা করিল বারণ। অমরসাগর আদি যত সরোবর খাল কাটিয়া শুকায় যবন বর্ব্বর। যত দন আছিলেক উদয়পুর দেশ সরোবরে পুষ্করিণে জানিয়া বিশেষ।" (যশোধরমাণিক্য খণ্ড।) কিন্তু মোগল সেনার মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কিছুতে তাহারা তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া মেহেরকুলে আসিয়া আস্তানা স্থাপন করিল। তখন সেনাপতি ও প্রজারা কল্যাণমাণিক্যকে রাজা করিয়া উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করিল।

যশোধরমাণিক্যের পূর্ব্বে যেরূপ ত্রিপুরারাজ্যে অস্ত্রের ঝনঝনা ও বীরের গর্জ্জন শোনা যাইত—তার পর হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের বেদপাঠ, খোলবাদ্য ও সংকীর্ত্তনের রোলই বেশী শোনা যাইতে লাগিল কল্যাণমাণিক্য পক্কা ত্রিপুর রাজবংশীয় পরাধীনতাদের সঙ্গে যুদ্ধাদি করিয়া বিরাগ বোধ করিতে লাগিলেন তিনি শুরুর চরণে ধনুর্বাণ সমর্পণ করিয়া "আজি হৈতে অস্ত্র ত্যাগ করিলাম আমি" এই শপথ করিলেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দকে যৌবরাজ্য প্রদান করার উৎসবে তিনি তুলাদান করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন, মথুরা, সেতুবন্ধ ও উদ্দিষ্যা প্রভৃতি দেশ হইতে ১০,০০০ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। "চন্দ্র গোপীনাথ" মূর্ত্তি মগেরা লইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা আনাইয়া পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তৎকর্তৃক গঙ্গামঠ নামে এক মন্দির ও তৎ সংলগ্ন "জগমোহন" নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কল্যাণমাণিক্য ১৬২৩ খৃঃ।

গোবিন্দমাণিক্য—১৬৪৯-১৬৬০ খৃঃ।

অকৃত কৈলাগড়ের দেবীমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। কল্যাণ-সাগর তাঁহার অপর এক কীর্ত্তি। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বর্গগত হন। তাঁহার পূর্ব্ব গোবিন্দমাণিক্যের সময়ের বিশেষ কোন ঘটনা নাই, ইঁহার সঙ্গে আরাকান-রাজ সন্দসুধর্ম্মের খুব সৌহার্দ্দ্য ছিল, ইনি আরাকানরাজ-সভায় সাহসুজার সঙ্গে

• রাজমালার তারিখের সহিত এইস্থলে রোসাঙ্গ-রাজের ইতিহাসের তারিখের মিল নাই। নানা কারণে আমরা কৈলাসবাবুর তারিখই গ্রহণ করিয়াছি।

বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হন। উক্ত হতভাগ্য সম্রাট কুমার ত্রিপুরেশ্বরকে যে ইস্তক অনুরীয় দিয়াছিলেন তৎ বিক্রয়-লব্ধ টাকা দিয়া গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লায় "সুজা বাদসাহের মসজিদ" ও "সুজাগঞ্জ" নগর স্থাপন করিয়া তাঁহার স্মৃতি তর্পণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের সনদের বলে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্ব কতক দিনের জন্য তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র সিংহ দখল করিয়া নিজেকে "ছত্রমাণিক্য" বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক রাজশাসন করিয়াছিলেন ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজা হইয়াছিলেন। ইহার পরে ত্রিপুরা-রাজমালায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সার্ব্বভৌম মুসলিমের বাদশাহগণের লাঞ্ছনার কথাই বেশী মোগল সাম্রাজ্য তখনও দৃঢ়স্থ, মুর্শিদাবাদের শাসন কর্ত্তারা মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি—তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য অভিপুণ্যবান্ ও ধর্ম্মাল ছিলেন। সরাইল পরগনার জমিদার নহর-আলির পুত্র শিকার করিতে যাইয়া দৈবদুর্ঘটনায় ত্রিপুরেশ্বর কুমার চন্দ্র-সিংহের প্রাণ বধ করিয়াছিল, কুমারের তখনই মৃত্যু হইল নহর আলি নিজ পুত্রকে ধরাইয়া মহারাজ রামমাণিক্যের নিকট বিচারার্থ পাঠাইলেন রাম-মাণিক্য তাহাকে ক্ষমা করিলেন এখন হইতে কিছু হইলেই জাতিয়া যাইয়া মুর্শিদাবাদে নবাবের কাণে লাগাইত। ধাত্রিকা নামক এক ব্যক্তি নবাবকে জানাইল "রামমাণিক্য চক্ষেও দেখেন না কাণেও শোনেন না, বৃদ্ধ ও অথর্ব হইয়াছেন, আমাকে রাজা করুন।" কিন্তু এই অভিযোগ টিকিল না। রামমাণিক্যের পুত্র রত্নমাণিক্যকে পুনরায় সেই ধাত্রিকা নানা ছলে মুর্শিদাবাদ-নবাবের কাণভরানের বলে অধিকার চ্যুত করিয়া স্বয়ং 'নরেন্দ্র মাণিক্য' নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু নবাবের "ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট" স্বভাব, এই নরেন্দ্রমাণিক্য অল্পকাল পরেই নবাবের ক্রোধে পড়িয়া রাজ্য চ্যুত হইলেন পুনরায় রত্নমাণিক্য রাজা হইলেন। ইহার রাজত্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ '১৭ রত্নের' মন্দির নির্ম্মিত হয় অল্প পরেই রাজার ভ্রাতা ঘনশ্যাম ঠাকুর মুর্শিদাবাদ হইতে সৈন্য আনিয়া রত্নমাণিক্যের সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাকে হতাশ করিলেন ঘনশ্যাম ঠাকুরের উপাধি হইল "মহেন্দ্রমাণিক্য" ভ্রাতৃহত্যার অনুতাপে তাঁহার শরীর শুকাইতে লাগিল এবং তিনিও কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইলেন তৎপরে যুবরাজ দুর্জ্জয়দেব। কাহার কাহারো মতে দুর্জ্জয়দেব ধর্ম্মমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের প্রকৃতি প্রশান্ত ছিল তাঁহার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে ৫৩টি হস্তী মুর্শিদাবাদে দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি এই রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদ সত্ত্বেও চুপ করিয়া রহিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, ছত্রমাণিক্য মহারাজের জগৎরায় নামে এক প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি যথেষ্ট অর্থ ও

পুনরায় গোবিন্দমাণিক্য—১৬৬৯-১৬৭০ খৃঃ।

রামমাণিক্য—১৬৭০-১৬৮২ খৃঃ।

বিচারে মৃত্যু।

রত্নমাণিক্য (২য়)—১৬৮২ খৃঃ, নরেন্দ্রমাণিক্য—১৭১১ খৃঃ, পরে আবার রত্নমাণিক্য ১৭১২ খৃঃ।

মহেন্দ্রমাণিক্য—১৭১২-১৭১৪ খৃঃ।

ইন্দ্রা ভেড়ুয়ার পাঠকর্তৃত্ব দিয়া নবাব সুজাউদ্দিনের নিকট হইতে ফৌজ ও সনদ লইয়া আসিয়া ধর্মমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। যাঁর হাতিয়ের অধীনে যুদ্ধ চলিল, রাজা পলাইয়া পর্বতে আশ্রয় লইলেন "জগৎরায় জগৎমাণিক্য" নামে সিংহাসনারূঢ় হইলেন এবং নবাব সৈন্য পরাস্ত হইল। ইতিমধ্যে ধর্মমাণিক্য মুর্শিদাবাদে যাইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট তরবারিকে অত্যন্ত খারাপ কোষে রাখিয়া খারাপ তরবারিগুলি উৎকৃষ্ট কোষে রাখিলেন, কতকগুলি অমূল্য পাথর কাঁচের ভাঙ্গা বাক্সে এবং বহুমূল্য পাথর পালমাটিমাখা খারাপ বাক্সে রাখিলেন। উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলিকে খারাপ সাজে সজ্জিত করিয়া অল্প মূল্যের ঘোড়াগুলির গায়ে মূল্যবান্ সাজ পরাইয়া দিলেন। এদিকে নবাবের কাছে যাইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "নবাব সাহেব! আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই আপনাকে দিতে আনিয়াছি।" নবাব দেখিলেন, ধর্মমাণিক্য বেজায় ভালমানুষ। এদিকে জগৎ শেঠকে খুস খাওয়াইয়া ধর্মমাণিক্য হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন নবাবের নিযুক্ত কর্মচারে জিনিষের মধ্যে মূল্যবান্গুলি সাঁচিয়া নবাব নিজ হস্তে রাখিতে বলিলেন, তখন জগৎ শেঠ প্রস্তাবনা করিয়া সেই খারাপ জিনিষগুলিই খুব ভাল বলিয়া নবাবের হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং রাজা সন্তুষ্ট মনে মূল্যবান্ সম্পত্তি লইয়া নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার পূর্ব রাজা শাসন করিয়াছিলেন। ইনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া ছিলেন।* ধর্মমাণিক্যের পর তাঁহার কনিষ্ঠ লাতা চক্রমণি 'দুর্লভমাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজতক্তে অধিষ্ঠিত হন। এই রাজা বিনা অপরাধে হিন্দুর রাজ্যরক্ষার কর্মচারী নামক এক প্রধান কর্মচারীর চক্ষু-কাণ্ডে নিধন নবাবের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পড়িলেন, যে পাপিষ্ঠ ফৌজদার রাজা হনমন্তের। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নবাব সৈন্য লইয়া আসিয়া রাজ্যের ধ্বংস করিল। নিরীহ রাজা অপমানে কলঙ্কিত হইয়া কারাগারে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। মহারাণী প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজীর মৃত্যুকালের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতিরা কুমারকেই 'জয়মাণিক্য' উপাধি দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন (১৩৮ খৃঃ)। কিন্তু অল্পকাল পরেই দুর্লভমাণিক্যের পুত্র পাঁচকড়ি নবাব হইতে ফৌজ ও সনদ প্রাপ্ত হইয়া জয়মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া "ইন্দ্রমাণিক্য" নাম গ্রহণপূর্বক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু জয়মাণিক্য পরাস্ত হইবার পরও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, তিনি রাজ্যে যুদ্ধ অভিযান করিয়া পুনঃ

ধর্মমাণিক্য (২য়) ১৭১৪-১৭৩৯ খৃঃ

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ দুর্লভেন্দ্র পর ১৭৪২ ১৭৫৮ খৃঃ।

জয়মাণিক্য ১ম রাজ্য। ইন্দ্রমাণিক্য ১৭৫৮ খৃঃ পরে আবার জয়মাণিক্য অল্পকাল

* মহারাজ ধর্মমাণিক্যের ভ্রাতৃ "নন্দি উপাধ্যায় মেহারকুল" হইতে "কবীন্দ্র পরমেশ্বর" নামক কবিকে আনাইয়া মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। ইনি "ছুটিখাঁ" নামে পরিচিত ছিলেন। মহারাজ ধর্মমাণিক্যের ভ্রাতৃ "কালীকৃষ্ণ", কাশীচন্দ্র মাণিক্যের ভ্রাতৃ "শিবাজী" কিন্তু পরবর্তী সময়ে "রাজধর" নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পুনঃ বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন। অগত্যা ইন্দ্রমাণিক্য পুনরায় নবাবের শরণাপন্ন হইলেন এদিকে আলিবর্দ্দী খাঁর প্রিয়পাত্র হাজি হবেলকে হস্ত করিয়া জয়মাণিক্য ত্রিপুরার সনদ পাইবার চেষ্টায় ছিলেন, চন্দ্রমাণিক মুর্শিদাবাদে স্তম্ভিত করিতে যাইয়া আর ফিরিলেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন পুনশ্চ জয়মাণিক্য রাজা হইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। জয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ রাজা হরিমণি ঠাকুর "বিজয়মাণিক্য" উপাধি লইয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, ইনিও অতি অল্পকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ইন্দ্রমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য সিংহাসনের দাবীদার হইলেন কিন্তু এই সময়ে এক সামান্য প্রজা পরে পরাক্রান্ত হইয়া কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরা শাসন করিয়াছিল তাহার ইতিহাস আমরা এখানে কেবল সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রদান করিয়া উপসংহার করিব যেহেতু আমার এই ইতিহাস ইংরেজ শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই আপাততঃ লিখিত হইল এখন হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা ও চূড়ান্ত প্রতাপ লুপ্ত হইয়াছিল। যে সময়ের এক বর্ষে যে ঐশ্বর্য্যের সমস্তের সৈন্যের প্রতি অকাতরে অজস্র সহিত স্বয়ং বঙ্গ আক্রমণের নেতৃত্ব করিয়া স্বীয় রাজ্যকে পুনরায় গঠন করিয়াছিলেন—রণক্ষেত্রে হস্তীর উপর তাঁহার মহামল্ল বলভদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া এক লক্ষ সৈন্য বিনাশের পর—গৌড়েশ্বরের বিরাট বাহিনী ভঙ্গ দিয়াছিল, যে বঙ্গের ধন্যমাণিক্য তাঁহার মহাবীর সেনাপতি চন্দ্রাগের সাহায্যে হুসেন সাহের ক্রোধ পরাক্রান্ত বাদশাহকে পরাজয়পূর্ব্বক চট্টগ্রাম ও আরাকান কাড়িয়া লইয়াছিলেন, যে উজ্জ্বল মহিমান্বিত বংশের এক রাজা সোলেমান সাহের প্রবল সমরানলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চতুর্দ্দশ বেতার যাবনে বাস দিতে সাহসী হইয়াছিলেন, —অন্য এক রাজা হেরম্বাধিপতির অজেয় ধনাইছি দুর্গ আট মাসের চেষ্টায় বিধ্বস্ত করিয়া তদুপরি ত্রিপুরার বিজয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং যে মহাবংশের উজ্জ্বল রত্ন বিজয় মাণিক্য দিগ্বিজয়ে অভিযান করিয়া একদিকে নানারাজ্য জয়, অপরদিকে নানা দীঘি, সরোবর, মন্দির ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় নামে এক নদীর ন্যায় সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত খাল খনন করিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রবংশীয় সেই প্রাথিতযশা নৃপতিদের বংশধরদিগকে এইবার নবাবের সামান্য তালুকদারের মত নদি-পত্র লইয়া জমিদারের সঙ্গে বিরোধ ও অভিযোগ করিতে ঘন ঘন মুর্শিদাবাদে যাইতে দেখিলে মনে হয়—ত্রিপুরলক্ষ্মীর পদাঙ্ক কত নিষ্প্রভ ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল যে তাহার চিহ্নও ঐতিহাসিকগণের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হইত

বিজয়মাণিক্য ও ধন্যমাণিক্য ১৭৪৪ খৃ পর্য্যন্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণমাণিক্য—কৃষ্ণমাণিক্য

সমসের গাজি।

যে সমসের গাজির কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাঁহার নাম সমসের গাজি। ইহার পিতা পীর মহম্মদ ভরবস্থায় চট্টগ্রামের উপনীত হইয়া একটা কুমড়া চুরির অপরাধে দক্ষিণ-শিকের জমিদার নাসির মহাম্মদের নিকট আনীত হন। জমিদার ইহার প্রতি সদয় হইয়া আট কানী জমি দান করিয়া ইহার পরিবার প্রতিপালনের সমস্ত ব্যবস্থার গ্রহণ করেন, এই পীর মহাম্মদের এক লক্ষপতাকাস্থ পুত্র হয়; পীর আট বা নাইক এক সময়কার ইহার চিকুণ্ড দেখিয়া কৃষ্ণ রাশিতে জন্ম নির্ণয়পূর্বক সমসের গাজি নাম রাখেন। ছেলেটিকে অপুত্রক মেহেরা দেখিয়া জমিদার ইহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সমসের আরবী, পারশী, উর্দু ও বঙ্গভাষায় পারদর্শী এবং প্রভূত দৈহিক বলসম্পন্ন হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে ইঁহার সহিত ছাই ঠাকুর মুসলমানি, ছাবার ভাই ইহার অনুগামী হন। ছাদের দৈহিক বল অতুলনীয় ছিল, কথিত আছে ইঁহার একক ছয়টি বাঘ, একটি বুনো হাতী এবং একটি বিশালকায় কুমীর খড়হস্তে মারিয়াছিলেন। লক্ষপতিকে এই সময়ে খুব ডাকাতি হইত। ছাদের সহায়ে সমসের পার্শ্ব ডাকাতদিগকে নিরস্ত করেন, পরন্তু তাহারা প্রতিজ্ঞা করে যে তাহারা লক্ষপতিকে আর ডাকাতি করিবে না, এবং অন্যত্র যেখানে যেখানে ডাকাতি করিবে সেখানে সেখানে লব্ধ অর্থের একটা ভাগ সমসেরকে দিবে, ডাকাতদের সংখ্যা পাঁচ শতের উপরে ছিল। এই সময়ে গঙ্গা গোসেন বঙ্গকার নামক এক মহাবড় সাধু ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সমসের ত্রিপুরার রাজা হইবেন। তিনি তাঁহাকে একটি মন্ত্রপূত বিজয়ী ঘোড়া ও তরবারি প্রদান করেন। ডাকাতির অর্থে সমসের ধনবান্ হইয়া উঠিলেন, এবং জমিদার নাসির মহাম্মদের রূপসী কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। নাসির এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হন। এই ঘটনায় সমসের গাজি বাসস্থান কুরুজা হইতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি কৌশলক্রমে জমিদার ও তাঁহার দুই পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং জমিদার বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন। যে রূপসী কন্যার জন্য এই যুদ্ধবিগ্রহ—হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, সেই সৈয়া-বিবি পিতা ও ভ্রাতাদের শোকে আগুনে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। একটা ডাকাত জমিদারকে হত্যা করিয়া নিজে সেই স্থান লইয়াছে শুনিয়া, ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, উজির হইলেন সেনাপতি। কিন্তু সমসের ছাদের সাহায্যে অতি অতর্কিত ভাবে উজিরকে বন্দী করিলেন, কিন্তু অনেক টাকা নজরানা দিয়া বশ্যতা স্বীকার করায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সমসের বিস্তর অর্থ ও উপঢৌকন পাঠাইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বশীভূত করিলেন। ইহার পরে খাজানা বন্ধ করায়ও কৌশলক্রমে রাজক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাইয়া দক্ষিণ-শিক মেহেরকুলের জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিন বৎসর

কাল গোলযোগ, অরাজকতা ও বৈরকর্ম ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিল। হঠাৎ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন মহারাজ কৃষ্ণমণি যুদ্ধযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন, তদনুসারে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন সমসের উদয়পুর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাজা একবার জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে হারিয়া গিয়া মণিপুরে পলাইয়া গেলেন। সমসের রাজ্য-বিপ্লব করিয়া বহু অর্থ দ্বারা নবাবের কর্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া ত্রিপুর সিংহাসনের সনদ আনাইলেন ইনি ভাইদের ভূমিদানকে সিদ্ধ করিলেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ক্রমশঃ মনোমালিন্য বাড়িয়া চলিল ভাইদের অভিযোগ "আমি করি যুদ্ধ জয় নাম হয় তব আমি মারি রাজ্যভার তুমি ভোগ কর।" রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য ভাবে ভবে আমার ইহাদের করে, নাগিচ্ছাসে মোরে " একদিন প্রকাশ্যভাবে সে সমসের গাজিকে বলিল, "তোর লাগি জয়লাভ করিলাম যুদ্ধে। রাজ্যখণ্ড ছাড়াইয়া রাজ্যও কাড়ি। চতুর্দ্দশ বর্ষ তুমি ভোগে পরিহরি। আমি যুদ্ধ-অঙ্গ করি—তুমি অধিকার " এইভাবে মনোমালিন্য বাড়িয়া চলিল, শেষে সমসের গাজি গোপনে ও কৌশলক্রমে ছাদেকে নিহত করিলেন। ছাদেক জানিত—সমসের গাজির খেয়ায়—ভ্রাতৃস্নেহকে স্থান দিলেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বীকার করিয়াছিলেন, "তাহার কারণে তোমার এমন সম্পদ কে আর ধরিবে ভালে আসিলে বিপদ।"

এই সমসের গাজির জীবনী লিখিয়াছেন তাঁহার সিপাহসালার ও ভক্ত শেক মনুহর তিনি লিখিয়াছেন, রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময় ত্রিপুরেশ্বরী কালী সমসেরকে স্বপ্ন দেখাইয়া তাঁহার পূজা দিতে আদেশ দেন গাজি রাজন ডাকাইয়া দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা দিয়াছিলেন। রাজা বিজয় হইল বটে, কিন্তু পাহাড়ের কুকীরা ত্রিপুর-রাজবংশে রাজাই অন্য কাহারও আনুগত্য করিবে না—এইকথা জানাইলে, সমসের গাজি উদয়মাণিক্যের রাজপুত্র রত্নমাণিক্যকে "লক্ষ্মণমাণিক্য" উপাধি দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করান মহারাজ কৃষ্ণমণি সিংহাসন লইয়া গিয়াছিলেন, একটা বাঁশের সিংহাসন তৈরী করিয়া রাজাকে অভিষেক করা হইয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্মণমাণিক্য সাবালোপাল হইয়া ছিলেন, সমসের গাজিই প্রকৃত রাজা, অতঃপর গাজি ফুলঝা জয় করেন। নবাব সরকারে তিনি প্রতিবৎসর একলক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন, এবং তাঁহার রাজ্য—দক্ষিণে শ্রীহট্ট—কলিকালের উত্তর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পূর্ব্বে—নাবরি পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল রাজা হইয়া সমসের প্রজাদিগকে সুশাসনে রাখা করিয়াছিলেন তিনি অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন, বাজারে প্রত্যেক জিনিসের মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না (১৭৪৯ খৃঃ) মূল্য তালিকা এইরূপ —চাউল ১ সের = ৫ মহামরিচ—১ সের = ৫ । শুঠ—১ সের = ১০ । লবণ—১ সের = ১০ । রসুনপিঁয়াজ—১ সের = ১০ কার্পাস—১ সের = ৫ কলাই ১ সের = ৫ । ধুতুরি ১ সের = ১০ মটর ১ সের = ১০ আড়হর ১ সের = ৮ , মুগ ১ সের = ৮ । তৈল ১ সের ৫ । ঘৃত ১ সের = ৷০ আনা।

লক্ষ্মণমাণিক্য ১৭৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত

এসকলই বিরাশির ওজন ছিল। পরবর্তী যুদ্ধের প্রাক্কালে বাজার দর কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। "সমসের গাজির গানে" অনেক কৌতুকাবহ কথা আছে চন্দ্র ও উৎসব নামে দুই নাপিত তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় খেড়রি করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিল ক্ষৌর-কার্যের সময়ে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে নাই তিনি স্বীয় প্রাসাদে স্কুল খুলিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন তাহাদের মধ্যে এক অন্ধ হাফেজ আনাইয়া তিনি কোরান পড়াইতেন, হিন্দুস্থান হইতে মোল্লা আনাইয়া আরবি পড়াইবার ও ভূগলিয়া হইতে গুরু মহাশয় আনাইয়া বাঙ্গলা এবং ঢাকা হইতে মুনসী আনাইয়া পারশী পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পাতে ৬টা হইতে ১০টা এবং অপরাহ্নে ১২টা হইতে ৪টা, পড়িবার এই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন গাজি শাসন সম্বন্ধে এরূপ কড়াকড়ি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, চোর-ডাকুর উৎপাত ত্রিপুরা রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সমসের গাজির এক কন্যাকে ঢাকার নবাব বিবাহ করেন। ইহার পরে পুনঃ পুনঃ মুর্শিদাবাদে যাইয়া গাজিকে আলিবর্দ্দি খাঁ নবাবের সঙ্গে দেখা করিবার হুকুম আসিতে লাগিল। ঢাকার নবাবের নিম্নেষে গাজি প্রথমতঃ তথায় যাইতে ইতস্ততঃ বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে এক সওয়ারের পরোচনায় গাজি ১৭৪১ খৃ অব্দে মুর্শিদাবাদ গেলেন। এদিকে আবু বখর নবাবকে বুঝাইয়াছিলেন "ঘাটীর ধার বন্ধ করি ছাড়ি দিবা কেনে। আসিয়া মারিবে দেশ সমুখে সে রণে। কাড়ি নিল ধাক্কা দিয়া জমিদারে মারি। রাজবলে খেদাইল রোসনাবাদ ত্রিপুরা। কাড়ি। অতাপি ভাল আছে বন্ধ করি আনি নতুবা পশ্চাতে তব হবে লেওলো না।" ভীত হইয়া নবাব নিমরাজি হইলেন, বিনা অপরাধে গাজিকে ছোপের মুখে ফেলিয়া হত্যা করা হইল "ঢাকাবাসে চলে বলবান্ আত গাজীর সহিত তার আছুল পাঁচরতি পাঁচ শত লোক জন তার সঙ্গে ছিল। গাজির পরিবার সেই দেশে আন দিল।"

কৃষ্ণমালিকা ১৭৬০ খৃ. অব্দে রাজা কন। রামগঙ্গা বিদ্যারত্ন নামক এক পণ্ডিত 'কৃষ্ণমালা' নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত কাহিনী লিখিয়াছেন কিন্তু ইংরেজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি এই পুস্তকের বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, সুতরাং এই স্থানে ত্রিপুরার ইতিহাস শেষ করিলাম

কৃষ্ণমালিকা, ১৭৬০ খৃঃ "কৃষ্ণমালা"।

আমরা ত্রিপুর-রাজের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতির গৌরব করিবার অনেক বিষয় পাইয়াছি। এই বংশে শুধু ভারতের প্রাচীনতম রাজ বংশ নহে, ইহার কীর্ত্তিকথা চিরস্মরণীয় এবং বঙ্গের ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিতেছে ইহার কয়েকটি স্থানে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইলে তাহা বাঙ্গালী জাতির দর্শনীয় পুণ্যস্থানে পরিণত হইবে।

ত্রিপুরার গৌরব কথা।

(১) যেখানে প্রতীত হইতে এক স্থানীয় মহারাজ ছিলতির (রামচরণের) শ্মশান লোক-স্মৃতিতে অক্ষয় করিবার জন্য "বৈকুণ্ঠপুর" স্থাপিত হইয়াছিল, (২) মহারাজ

কীর্ত্তিগণের ছেঃ খোদ্দার। বৈজয়ন্তী বরুণা মহারাণী ত্রিপুরা-সুন্দরী যেখানে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গৌড়েশ্বরের সেনাপতি তাজখাঁ খাঁর সোণার পাগড়ীর উপর স্বীয় বিজয়-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, ৩ যেখানে এই বীর-রমণীর হুঙ্কার সমরে লক্ষ সৈন্য হত হইয়াছিল—এবং উক্ত কবন্ধ-দলনের পারিতোষিক স্বরূপ রাজা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, রাজ-জামাতা সেই শোণিতাক্ত রণ-সঙ্কুল রক্ত-ক্ষেত্রে বসিবার জন্য তিলমাত্র স্থান না দেখিয়া বিশালকায় হস্তীর রক্ত খড়্গাঘাতে কাটিয়া রাজার জন্য সাময়িক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন—ত্রিপুরার রাজা কর্ত্তৃক গৌড়ের এই পরাজয় কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সকল স্থানে কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করা কি উচিত নহে? যেখানে যেখানে ত্রিপুরা-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজধানী ছিল, যথা ত্রিবেগ, খলংমা চাকুলনগর, কাইচারঙ্গ, আচরঙ্গ, তারক, বিশাল গড়, পুটিয়া, নাকিবাড়ী, খানাংচি, সোণা-পাথর, লাউগঙ্গা, মোহরী গঙ্গা, চেলাইরঙ্গ, মণিপুর, উদয়পুর—সেই সকল স্থান এখন নিশ্চিহ্ন,—ইহাদের স্মৃতিচিহ্ন রাখার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে।

৪ যেখানে বসিয়া যাহার সৈন্যদিগকে উপঢৌকন মহারাজ বঙ্গমাণিক্যের সেনাপতি প্রতাপীর চমচাগ জয় করিয়াছিলেন, যেখানে ত্রিপুরা-সেনারা আট মাস ব্যাপী চেষ্টার পর আট হস্ত দীর্ঘ ও তিন হস্ত প্রশস্ত গোমিকার সাহায্যে অজেয় খানাংচি দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, তথায়ও একটি স্মৃতিস্তম্ভ উত্থিত হইতে পারে। (৫) মহারাজ অমর মাণিক্যের অমর কীর্ত্তি 'অমর দীঘি' এখনও বিদ্যমান, এই দীঘির খনন-কার্য্য ১৪৭৭ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়, এই খনন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সামন্ত রাজার লোক পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীপুরের চাঁদ রায় ৭০০, বাকলার বসু ৭০০, সোরাল পাড়ার গাজি ৭০০, ভাওয়ালের রাজা ১০০০, সরাইলের রাজা ইসা খাঁ ১০০০, সুপুয়ার রাজা ১০০০, একথা পূর্ব্বে অমরমাণিক্যের রাজত্বপ্রসঙ্গে একবার লিখিয়াছি, সেই অমর-দীঘির তীরে এক স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করিয়া তথায়ও এই কথাগুলি উৎকীর্ণ করিলে ত্রিপুরা-রাজবংশের গৌরবের বিষয় হইতে পারে। (৬) যেখানে যুবরাজ রাজধর ইসা খাঁ প্রভৃতি সামন্ত-রাজগণ সহ তোরাপের শ্রীহট্টের রাজা ফতে সিংহকে ভীষণ যুদ্ধের পর পরাজয়পূর্ব্বক বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন—সেই স্থানে সুরমা নদীর তীরে গোধারাণী পাহাড়ে বিজয়স্তম্ভ উত্থিত করিয়া সেই জয়বার্ত্তা চিরস্মরণীয় করিবার যোগ্য। (৭) এরূপ আরো অনেক স্থান আছে, বাহুল্য-ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। যেখানে যেখানে মহারাণীরা সহমৃতা হইয়াছিলেন,—তাহার উল্লেখ রাজমালায় আছে—সেখানে সেখানে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির ভক্তি অর্ঘ্য দ্বারা—সেই পুণ্যশ্লোকের স্মৃতি অভিনন্দিত হইতে পারে (৮) এই কার্য্যে ব্যয় খুব বেশী হইবার নহে শুধু প্রস্তরলেখ প্রস্তুত করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ রচনার খরচ কতই বা পড়িবে? আমার মনে হয় এক একটি স্তম্ভে ১৫০৲ টাকার বেশী খরচ হয় না.

ত্রিপুরার রাজারা অনেকেই বাঙ্গলাভাষার উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন—তাঁহারা যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গলায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন,—সেগুলি কোথায় গেল? তাহা কি

পাওয়া যায় না? মহারাজ রত্নমাণিক্য উৎকলখণ্ড পাঁচালী এবং জোতিষের যন্ত্রা-

বঙ্গভাষার উৎসাহদান।

দ্বারকের বঙ্গানুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন, অমর মাণিক্য ও রাণী কমলা সম্বন্ধে অনেক পুরাকীর্তিকথা ছিল, ত্রিহুত হইতে গায়ক ও নর্ত্তক আনাইয়া ধর্ম্মমাণিক্য তাঁহার লোকদিগকে সেই সকল গীত বিশুদ্ধ ভাবে গাইতে শিখাইয়াছিলেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ত্রিপুরেশ্বরগণের উদ্যোগে ও চেষ্টায় হইয়াছিল এই সকল পুস্তক ও গান কোথায় গেল? আমার বিশ্বাস সন্ধান করিলে উহা আংশিক ভাবেও উদ্ধার করা যাইতে পারিবে সেই সন্ধান করিবে কে? আমরা সম্প্রতি মিস্ত্রোহলাণ্ড নরেশ শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দেববিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের দুই একটিকে সযত্নভাবে আকর্ষণ করিয়াছি ত্রিপুরার অনেক তাম্রশাসন ও প্রাচীন দলিল আমরা সযত্নভাবে লিখিত পাইয়াছি

ত্রিপুরাধিপের অনেকেরই দান ও সনন্দপত্রের উদাহরণ রাজমালায় পাওয়া যায়—কিন্তু

উদারতা ও দানশীলতা।

কিন্তু পূর্ব্বেও ত্রিপুরেশ্বরগণ পূর্ণ বয়স্কে অক্ষরে। মহারাজ গত হইলে, কাহাকেও, এবং আত্মীয়ের পুত্রকে সিংহাসন দিয়াছেন, "আমার এ ছাড়া কোন পুত্র অভুক্ত আছে কি?" তাঁহাদের দানপত্রে লেখা থাকিত—"যদি কেহ আমার বংশের লোপ করিয়া এই সিংহাসন অধিকার করেন, তবে আমি তাঁহার দাসানুদাস হইয়া প্রার্থনা বোধ করিব, যদি তিনি আমার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরে হস্তক্ষেপ না করেন" যদিও এই সকল রীতি পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার—ভারতীয় অনেক রাজবংশের তাম্রশাসনে এরূপ কথা পাওয়া যায়—তথাপি মহারাজ ইহা পাঠ করি, তখনই সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত দানশীলতার উৎস যাহা হইতে ইহার প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া সেই মহানুভব রাজাদের আদর্শের উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকি এখন রাজপ্রাসাদ হইতে যে মহৎ সংস্কারগুলি লুপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা দুঃখের বিষয় হইবে পূর্ব্বে রাজারা যেখানে রমণীদের কোমল হস্তের নিপুণ নবনির্ম্মিত কারুকার্য্যশোভিত ফুলের মশারি ও ফুলের শয্যায় শয়ন করিতেন, আর মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শয়ন-গৃহে সেইরূপ শয্যা হইত, তাহা জানি—সেই শয্যার রূপ ও সুরভিতে মন মুগ্ধ হইয়া যাইবার কথা এখন সে সকল রীতি আছে কি না জানি না মহারাজ কৃষ্ণমণিমাণিক্য তাঁহার চির-শত্রু মুসলমান সমাজের সাজিত প্রস্তর ব্রহ্মোত্তর ও অন্যান্য দানের উপরও হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ত্রিপুর রাজ্যে প্রজা ও সেনাপতিদের যে কতটা ক্ষমতা ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ রাজমালায় দৃষ্ট হয়। ১৭১ সাধক মহারাজার অভিষেক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"সাধু-

শাসন, প্রজাদের ক্ষমতা।

রায় নামে তার ছোট ভাই ছিল। সর্ব্বলোকে রাজি হৈয়া তারে রাজা কৈল।" (দুর্লভ খণ্ড মহারাজ সাধুরায় ১২০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র মহারাজ প্রতাপমাণিক্যকে প্রজারা হত্যা করিয়াছিল। "প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে রাজা করে। অধার্ম্মিক দেখি তাকে লোকে মারে পরে"—রত্নমাণিক্য খণ্ড লিখিত

আছে রাজা ইন্দ্রমাণিক্যের মাতার পিতৃ এক ব্রাহ্মণ ঘাড়াই বংশের রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দুরাত্মাকে প্রজারা হত্যা করিয়াছিল। (১৫২৮ খৃ. ত্রিপুরেশ্বর ধর্মমাণিক্যকে উত্তেজিত সৈন্যেরা বধ করিয়া অমরমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিল (১৫৯৭ খৃঃ)। অরাজকতা দেখিয়া যেরূপ প্রজারা পালবংশের শেষ গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল, ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার প্রজারা সেইরূপ কল্যাণমাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। "রাজপুত্র পোত্র নাই, নাহি ব্রহ্ম-রাজা কাহাকে করিব রাজা ভাবিয়া সকলে সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিত তখন কাহাকে করিব রাজা না দেখি লক্ষণ মহামাণিক্যবংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি যশোধর কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান্। রাজযোগ্য হয় সেই দেখ বিদ্যমান এত চিন্তিয়া সেনা পাত্র দিব্যজ্ঞান। কল্যাণ নাম সেনাপতি বৈসে সিংহাসন" (কল্যাণমাণিক্য খণ্ড)। ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণ আরও আছে। আমরা এক গোপালকে লইয়া এদেশে গণতান্ত্রিকতার প্রমাণ খাড়া করিয়াছিলাম। কিন্তু ত্রিপুর রাজবংশে এরূপ কত গোপাল দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য একথা বলা উচিত, যে সকল রাজাকে প্রজারা নির্বাচিত করিয়াছিল তাহাদের ধমনীতে রাজরক্ত কম-বেশী প্রবাহিত থাকিত। ত্রিপুর-রাজ্যের একটা ইতিহাস আছে—এইজন্য এই সকল কথা জানিতে পারিলাম। অন্যান্য দেশের ও তাহার পূর্ণ হওয়াতে তাহার প্রমাণ নাই; কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দুস্থানের প্রাদেশিক রাজাগুলির সকলেরই এক আদর্শ ছিল।

সীমানা।

ত্রিপুরার পূর্ণ গৌরবের সময়ে এই রাজ্যের সীমানা নিম্নলিখিতরূপ ছিল—উত্তরে ভূটান—ব্রহ্মপুত্র বা তৈরব নদ, পশ্চিমে গারো পাহাড়—কোচবিহারের সীমান্ত পর্যন্ত এবং ময়মনসিংহের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ সমেত ঢাকানগরীর পূর্ব্বে মেঘনা নদী পর্যন্ত, পশ্চিম-দক্ষিণে মেহেরকুল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর পার্বত্য দক্ষিণ পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে চট্টগ্রামও অধিকৃত হইত দক্ষিণে রাঙ্গামাটী, সিকাপাহাড় প্রভৃতি এবং পূর্ব্ব সীমান্তে প্রায়ত্রিশটি পর্ব্বত লইয়া খলংমা, পানাছড়ি প্রভৃতি প্রাচীন ত্রিবেগ হইতে ত্রিপুররাজ্য আরো পূর্ব্বে সরিয়া আসিয়া উত্তর-দক্ষিণে অনেকটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বংশাবলী।

ত্রিপুর-রাজবংশ—রাজমালার নবসংস্করণের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় যেরূপ বংশলতা দিয়াছেন, তদনুসারে —১ চন্দ্র, ২ বুধ ৩ পুরূরবা, ৪ আয়ু ৫ নহুষ, ৬ যযাতি, ৭ দ্রুহ্য, ৮ বভ্রু, ৯ সেতু, ১০ অনর্ত্ত, ১১ গান্ধার, ১২ ধর্ম্ম, ১৩ ধৃত, ১৪ দুর্দ্দম, ১৫ প্রচেতা, ১৬ পরাচি (শতধর্ম্ম), ১৭ পরাবসু, ১৮ পারিপ্লব, ১৯ অরিক্ষিত্র, ২০ সুক্ষিৎ, ২১ পুরুরবা (২য়), ২২ বিদর্ণ, ২৩ পুরু সেন, ২৪ মেধাবর্ণ, ২৫ বিকর্ণ, ২৬ বসুমান, ২৭ কীর্ত্তি, ২৮ কনীয়ান, ২৯ প্রতিশ্রবা, ৩০ প্রতিষ্ঠ, ৩১ পরন্তিপ, ৩২ প্রতর্দ্দন, ৩৩ প্রমথ, ৩৪ কলিঙ্গ, ৩৫ ক্রম, ৩৬ মিত্রারি, ৩৭ বারিষেণ, ৩৮ কাঞ্চক, ৩৯ কলিঙ্গ, ৪০ ভীরুক, ৪১ আদুমিত্র, ৪২ চিত্রসেন, ৪৩ চিত্ররথ, ৪৪ চিত্রায়ুধ, ৪৫ দৈত্য, ৪৬ ত্রিপুর, ৪৭ ত্রিলোচন, ৪৮ বীরসেন, ৪৯ তনক্ষিণ,

[illegible] ১৮৮ মহারাজ বাহাদুরমল্লিকশোভা মাল্লিকা।

শুধু ভারতবর্ষে কেন ইউরোপ ছাড়া কোথাও এরূপ সুদীর্ঘকাল এক রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত নাই। প্রথমে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল মথুরা ও পরে কপিলাশ্রমের

মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য— রাজরত্নমালা ১৮৩১-১৮৬৭ খৃঃ

নিকট ১১ শতাব্দে বৃষ্টি প্রভঞ্জন সমরবংশের রাজধানী ছাড়িয়া কিরাতবিগকে পরাজয়-পূর্ব্বক কাছাড়ে যাইয়া বরাক নদের তীরে বর্ত্তমান ত্রিপুররাজ্য সংস্থাপিত করেন। এই কিরাত-জাতি হইতে হইয়া ইহারা অন্যান্য আচার ও উপাধি অবলম্বন করেন। ১১ শতাব্দ হইতে ত্রিপুর রাজগণ অনেকে "ফা" (পিতা বা প্রভু) উপাধি ধারণ করিয়াছেন। চীনদেশের পার্শ্ববর্ত্তিত 'হালাম' নামক পার্ব্বত্য জাতির এক সময়ে ত্রিপুরাতে বিশেষ প্রভুত্ব ছিল, সেই জাতির সংসর্গে আসিয়া ত্রিপুরায় পুনরায় আর্য্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিষ্ঠা আরও কয়েক শতাব্দ পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজগণ উক্ত চীন-পার্শ্ববর্ত্তিত হালাম জাতির ভাষা হইতে অনেক সময়ে উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে শক ও হুণ রাজারা শত্রুদের বিনাশের নামের সঙ্গে হিন্দু উপাধি গ্রহণ করিতেন (২৫০ পৃঃ)। এই 'হালাম' ভাষার প্রচলন এত বেশী হইয়াছিল যে সংস্কৃতজ্ঞ (১৪৬৩ পৃঃ ১৪১৩ পৃঃ) পণ্ডিত রাজত্বের প্রথম সময়ে রাজসভা ভাষা বুঝিতে পারিতেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পুনরুত্থানে, বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাস হইতে সম্পূর্ণ লোপ পাইবার পর, সংস্কৃত ও "বুড়াসার" বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন একচ্ছত্রে বেশী হইয়াছিল।

ত্রিপুরার শিল্প

পূর্ব্বপ্রান্তের কাল হইতে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে বয়নশিল্পের প্রচলন আছে। পাছুড়ি, ছবেড়া, পরা (আসন), প্রভৃতি বস্ত্র প্রায় সমস্ত পাহাড়িয়া রমণীরাই প্রস্তুত করিতে পারেন। যুধিষ্ঠিরের সব সাহায্যিক বলিয়া কথিত সুলোচন রাজ শিল্পের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনিই তদ্দেশে কার্পাস-বস্ত্রের বেশী প্রচলন করিয়াছিলেন, ১৯১ খৃষ্টীয় রাজা রাজ ফা (আচঙ্গ ফা) মহিষী অমর-রাজ-কুমারীই রাজ-পরিবারে বস্ত্র-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার পুত্রবধূও পরে এবিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অমর রাজ কুমারী আচঙ্গ ফার মহিষীই ত্রিপুরার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র শিল্পের উদ্ভাবন করেন। এই "পাছলা" প্রাচীন কালের সুপ্রসিদ্ধ "কাঁচুলী" ইহাতে নানারূপ ফুল লতা পশুপক্ষী, মনুষ্য ও দেব দেবীর মূর্ত্তি সুচারুরূপে প্রস্তুত হইত। এই "পাছলা" শুধু রাজপরিবার ও ঠাকুর সাহেবদের গৃহ-রমণীরাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ইহার ব্যবহারও তাঁহাদের মধ্যেই আবদ্ধ। মহিলাদের ন্যায় পুরুষও বস্ত্রে সূচীকর্ম্ম করিতেন। ত্রিপুরেশ্বরগণের অনেকেরই শিল্পের দিকে একটা ঝোঁক ছিল যে শিল্পের পটুত্ব দেখিয়া তাঁহারা রমণীকুল হইতে মহিষী নির্ব্বাচন করিতেন। কথিত আছে, উদয়মাণিক্য শিল্পকুশলা ২৫০টি রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রশিল্পে কৃতী ছিলেন (১৪৭২ শক পৃঃ)। ত্রিপুর-রমণীগণ এখনও তাতের চরকা ছাড়েন নাই, ১৯২০ সনের সেন্সাসে দেখা যায়, পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় মোট ৩৪,৮৫৩ ঘর গৃহস্থ, তন্মধ্যে ৩১,৪৮৫ খানি তাঁত চলিতেছে।

তাঁতশিল্প।

বয়ন-শিল্পের সঙ্গে স্বর্ণ-খচিত বস্ত্রাদির পটীর জন্যও ত্রিপুর-বাসীরা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য (১৪২৫-৭২ খৃঃ) ব্রহ্মদেশ হইতে অনেক কারু-শিল্পিক আনিয়া ত্রিপুরায় কারু-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা

মাহোর পার্বত্য প্রদেশে ও সমতল ক্ষেত্রের [illegible] সর্বাপেক্ষা ধারণ ও পুরাতনত্বের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরার কোন কোন স্থানের পুরাতন কাহিনী হইতে এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশ, উৎকীর্ণ মূর্তি ও শিলালিপি হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্বেই [illegible] 'কৈলাস' নামে [illegible] উৎকোটীশ্বর শিব [illegible] ঐ দুর্গম মধ্যে [illegible] মূর্তি [illegible] কারিগর [illegible] এই মূর্তি [illegible] পাথর [illegible] ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত [illegible] [illegible] [illegible] উৎকোটীশ্বর এখনও [illegible] [illegible] [illegible]

দুর্নীতি ও অরাজকতার স্থলে সেনাদের এ শান্তি স্থাপন করেন কিন্তু তাঁহার পৌত্র বিজয় মাণিক্যের সময়েও নিম্ন পার্বত্য প্রদেশে কিছু কিছু গণ্ডগোল দেখা যায়। উক্ত রাজা খণ্ডল বাসী বাঙ্গালীদের এরূপ উপায়ে কর দিয়াছিলেন যে বস্ত্রাভাবে তাহারা বৃক্ষপত্র পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বিক্রমপুরের ভদ্রসমাজে তাঁহার অকথ্য অত্যাচার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। এদিকে হাসনে আবার বাঙ্গালা সাম্রাজ্যকে মুক্তহস্তে স্বর্ণ ও ভূমি দান করিতেছিল। তাহার পূর্ব্ব বঙ্গে বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণের অকথ্য কষ্ট হইতেছিল অপর দিকে ক্রমশঃ বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে পার্ব্বত্য-ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে মণিক্য রাজার সময়ে টিপ্রা ভাষা যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছে তদ্রূপ সমগ্র ত্রিপুরা দেশ এখন বাঙ্গালা সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। ধন্যমাণিক্য পার্ব্বত্যদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অরণ্যকুল, পার্ব্বত্যকুল, গজদন্ত, বন্য মধু, বিষম ইঁড়ি, প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেন। ইহাতে অসংখ্য প্রজা দেশ ত্যাগ করে। দুর্ভিক্ষ অধ্যুষিত সমস্ত পার্ব্বত্যভূমি দেশ ত্যাগ করিলে পর ধন্য করিয়াছিলেন, চট্টগ্রাম জিতিয়া এবং পরে বিজয়মাণিক্য দখল করিয়া ছিলেন। বিজয়মাণিক্য ইহাই জন্য কাড়ে সুবর্ণ-গ্রাম পাঠান-দিগকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর হইতে পশ্চিমে ভুলুয়া, এবং সমস্ত উপকূলভূমি বিশাল জলধি তাঁহার সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল। এই রূপে ত্রিপুরেশ্বর বঙ্গের এক প্রকাণ্ড বিভাগ স্বাধিকারে আনিয়া সমুদ্রতীরে কিরীটেশ্বরী ও নিম্ন পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই কালে এই সমস্ত স্থান মহাভারতের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, রাজারা মহাভারত ও অন্যান্য সংস্কৃত-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন, উহার কালে মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গের বংশধরেরা ষোল কড়ায় লইয়া এই রাজ্যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। আমি দেখিয়াছি কুমিল্লায় পরিচিত কুকুরা কাপড় বিক্রয় করিতে যখন নিম্ন ভূমে অবতরণ করে, তখন তাহাদের কেহ কেহ হরিনাম প্রকাশিত চৈতন্য-চরিতামৃত ক্রয় করিয়া লইতে বলে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ সারদাদেবীকা বৈষ্ণব শাস্ত্র-প্রকাশের জন্য নবদ্বীপের একজন বিদ্বান্‌কে এক লক্ষ টাকা দিয়া বৈষ্ণব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

বসন্ত রোগ।

এই রাজাদের কাহিনী পাঠ করিলে দেখা যাইবে—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক রাজাই বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সে সময়ে কি বাঙ্গলা টীকা লওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল না? ত্রিপুরারাজ্যে যে এই ব্যাধি খুব সংক্রামক ভাবে কোন কালে দেখা দিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, মহারাজ মহামাণিক্য, ধন্যমাণিক্য, ধর্ম্মমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, ছত্রমাণিক্য ইঁহারা সকলেই বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া রাজমালায় লিখিত হইয়াছে; মহামাণিক্য ১৪৩১ খৃঃ অব্দে, ধন্যমাণিক্য ১৬৩২ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মমাণিক্য ১৪১৫ খৃঃ অব্দে, বিজয়মাণিক্য

১৫৭০ খৃঃ অব্দে, ভূদ্রমাণিক্য ১৬৯০ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯০ খৃঃ অব্দ—এই ২২৯ বৎসরের মধ্যে ৫ জন নৃপতি পর পর বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন, রাজমালার এই উক্তির মধ্যে কিছু ভুল আছে বলিয়াই মনে হয়।

আর একটি কথা, বহু পূর্ব্ব হইতে এই রাজকাহিনীতে বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকের কথা পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাইতেছে—ইঁহারাই বাঙ্গলার "বারভূঞা" ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও ইঁহাদের কথা আছে। গৌড়েশ্বরগণ কর্ত্তৃক দ্বাদশ সামন্ত রাজ নিযুক্ত করার প্রথা বহু প্রাচীন প্রাচীনকালে ত্রিপুরেন্দ্রের ৭,৫০০ বর্গ মাইল ব্যাপক ছিল।"

দ্বাদশমণ্ডল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর

প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরপ্রাচীনকালে অতি বিস্তৃত রাজ্যরাজ্য ছিল, এক এক সময়ে এই রাজ্য সিলেটের অনেকাংশ দখল করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থান নিজ করায়ত্ত করিয়াছিল। যতকাল পর্য্যন্ত কোচ বিহার এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং বঙ্গের ভাটিদেশ মৈমনসিংহের পূর্ব্বাংশ এমন কি ঢাকা পর্য্যন্ত এই রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ঢাকা জেলার উত্তরাংশে বিশেষ ভাওয়াল ও তৎপরিবর্ত্তিত অঞ্চলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বহু কথা আমরা দেখিয়াছি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্য নাম কামরূপ এখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে কামাখ্যা দেবী প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ এই স্থানেই বিশেষ রূপে হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নরক, ভগদত্ত, মুর প্রভৃতি রাজারা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি বহু পুরাণে ইঁহাদের বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। বাণ রাজাও সেই যুগের এক কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন রামায়ণে যে নরক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়—কৃষ্ণের সমকালিক নরক কখনও তিনি হইতে পারেন না। এই নরক কর্ত্তৃক দেবমাতা অদিতির কর্ণের কুণ্ডল হরণ করার অপরাধে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়, কৃষ্ণ ইঁহাকে ও ইঁহার প্রধান সেনাপতি মুরকে বধ করিয়া কুণ্ডল গ্রহণ করেন জয়দেব এই নরক ও মুরের কথা তাঁহার অমর-পংক্তিকার স্তোত্রে উল্লেখ করিয়াছেন "মধু মুর-নরক বিনাশন গরুড়াসন হে—স্মৃতুঃখভবচ্চকোর জয় জগদীশ হরে" বাণের কন্যা ঊষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গন্ধর্ব্ব রীতিতে বিবাহ করেন বাণ তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন,—এইসূত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে বাণের যুদ্ধ হয়। ইঁহার রাজধানী শ্রীহট্টের শাঙ্কিয়-নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন। বাণ শিবের ভক্ত ছিলেন,

কথিত আছে, শিব ইহাকে স্বীয় পুত্র কার্ত্তিকেয় হইতেও বেশী ভালবাসিতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাজগণের সম্বন্ধে এরূপ নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে ঐতিহাসিকগণ সেগুলির মধ্যে অবশ্য অনেক কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া রাজাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই।

হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিলে জানা যায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজারা অতি পরাক্রান্ত ছিলেন এবং ইহারা যুধিষ্ঠিরের সময়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের পুরোভাগে অবস্থিত ছিলেন। ইহাদের অনেকেই প্রাচ্য সম্রাট্ জরাসন্ধের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন রামায়ণের বর্ণনায় যে লোহিত-সাগর পাওয়া যায়, তাহা আরবের পশ্চিমে অবস্থিত "রেড সি" নহে, তাহা লোহিত্য নদ। এই নদ একসময়ে ব্রহ্ম সাগরোপম ছিল, বরমালের তাম্রশাসনে এই নদকে "লৌহিত্যসিন্ধু" বলা হইয়াছে বল্লালের তাম্রশাসনে ইহাকে "বারিধি" ও রত্নপালের শাসনে 'সিন্ধু' এবং ইন্দ্রপালের শাসনে "সরিৎপতি" নাম দেওয়া হইয়াছে ইহার বর্তমান নাম করতোয়া। সম্ভবতঃ এই সাগরোপম বাধা অতিক্রম করিতে না পারিয়া ভারত-বিজয়ী জাতিরা পৌণ্ড্র দেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এখানে থেকিয়া পড়িতেন নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিয়াছেন, এই স্থানে বৈদেহ শাণ্ডিল্য ও আর্য্যগণের নানা শাখা বেদের সময় হইতে বসবাস করিতেছেন, এখান হইতে পাল বণিক জাতি পূর্ব্বদেশ সকলে বাণিজ্য জাহাজ লইয়া যাতায়াত করিত, এখনও এখানে চট্টোপাধ্যায় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ঠিক বেদমন্ত্রের ন্যায় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমকার্য্য করিয়া থাকেন গেট সাহেব লিখিয়াছেন—আসাম বঙ্গদেশে যেরূপ সমস্ত জাতি মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, আসামে তাহা হয় নাই। আসামে বহু পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার লইয়া এক এক জাতি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আছে। এই দেশকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার একখানি সংক্ষিপ্ত ও অবিকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিকগণের তীক্ষ্ণ সন্ধানী উৎসুক দৃষ্টির আলোক এখনও এই পার্ব্বত্য প্রদেশের নিগূঢ় নিকেতনে প্রবেশ করে নাই এই খনি আবিষ্কৃত হইলে অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য এখান হইতে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে একসময়ে বশিষ্ঠের মত মহর্ষি নাকি কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই লৌহিত্য নদের তীরে যুগে যুগে যে রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম বিপ্লবের আন্দোলন হইয়াছে, তাহার সন্ধান করার স্থান এখানে নহে, সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয় লইয়া আমরা বিলম্ব করিব না কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আর্য্যাবর্ত্তে—বিশেষ গৌড়দেশে ইহাদের কি দান, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব

বাণলিঙ্গ।

১। বাণলিঙ্গ (মহাদেব বাণের দ্বারা পূজিত একরূপ শিবলিঙ্গ) আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র শৈবগণ কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত কথিত আছে অন্য প্রকার শত শত শিবলিঙ্গ পূজার যে ফল, একটীমাত্র বাণলিঙ্গ পূজার তাহাই ফল।

২। কামাখ্যাতীর্থ, সমগ্র হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থস্থান,—এই স্থানে তান্ত্রিক যাদু-বিদ্যার এতটা প্রচলন হইয়াছিল যে একসময় অন্ততঃ গৌড়দেশবাসী সকল তান্ত্রিকই সকলসময়ে কামাখ্যায় যেতাই দিতেন বাঙলা শত শত পল্লীগাথায় যাদুবিদ্যার কথা হইলেই কামাখ্যা তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এমন কি বহু উচ্চ শ্রেণীর কর্তৃক লিখিত "মুসলমানী বাঙলায়" লিখিত পুঁথিতেও আমরা যাদুবিদ্যা-প্রসঙ্গে কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি। পুরুষকে ভেড়া করিয়া রাখিবার যে সকল টোনা আছে, বাঙলা দেশ এই যাদুর কামরূপ বাসিনীদিগকেই সেই টোনার একমাত্র আবিষ্কর্ত্রী বলিয়া জানে। কলিকাতার পটুয়ারা সোনার পাতের কামরূপ বা কামরূপবাসিনীদিগের এইরূপ ভেড়া বানাইবার ছবি আঁকিয়া বিক্রয় করিত।

কামাখ্যাতীর্থ।

৩। কামরূপের চিত্রকরদের নাম ইতিহাসবিখ্যাত। চিত্রকর ও চিত্রকরীর বহু উল্লেখ আমরা ভারতীয় সাহিত্যে পাইয়াছি। অজন্তা প্রভৃতি অবিস্মরণীয় স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধদের চিত্র নিদর্শনের অভাব নাই কিন্তু চিত্রাঙ্কনই ভারতীয় সাহিত্যে চিত্রকর বাঙলা সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনি বাৎস্যায়নকন্যা ঊষার সখিনী ছিলেন এবং মনুষ্যের পরিকল্পিত এরূপ সুন্দরভাবে আঁকিতে পারিতেন যে তাঁহার ছবিগুলি মানুষ বিশ্বিত হইয়া জীবন্ত বলিয়া ভ্রম করিত। বহু চেষ্টার পর এই চিত্রকরী ছবি দেখিয়া ঊষা অনিরুদ্ধকে প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, হরিবংশ-পুরাণে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে চিত্রাঙ্কণের উল্লেখ আছে—উত্তরচরিতে রামের ঘরোয়াজীবনের চিত্রলেখমালা দর্শনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার পুরাতন স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, নাগানন্দ নাটকে রাজা চন্দ্রকেতু যে ছবি আঁকিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা চিত্র লিখনের অতি উচ্চ স্তরের পরিচায়ক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে দেবতা দেখা যায় আলো ও ছায়া ছাড়াইয়া, শিল্পী তাহা আঁকিতে পারিতেন না। অজন্তার চিত্রাবলীতে ত্রিমাত্রিক ও অন্ধকার-আলোর আকর্ষণ ও সংস্থান এরূপ যথাযথ ভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে যে তাহা কাহারও কোন সন্দেহ করিবার নাই—তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়,—উহা একেবারে নিখুঁত হইয়াছে। বিদগ্ধ রসিকজনের "সাহু নক্সসস মহবাবগাঢ়ং হংসমিথুনো ভাবানুপ্রবেসো খলু বিস্ম য লিট্ঠা সিদ্ধহত্থলেখেসু।" (বহুত, সাধু।—অবস্থানের নৈপুণ্যে ভাবের সমাবেশ সুন্দর হইয়াছে, নিম্ন ও উন্নত অংশগুলিতে যেন দৃষ্টি অঙ্কিত হইতেছে। এই নিখোলের স্থান-সমন্বয় আলো ও ছায়ার সম্যক জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। চিত্রস্থ শুকের চুনির অক্ষির যে পূর্ণ কল্পনা দিয়াছেন, তাহাতে শিল্প-কুশলতা ও অন্তর্দৃষ্টি বিশেষভাবে পরিচয় হইয়াছে—"আধারলম্বিতস্যচ্ছ চ তত্রোন্নিদ্রাচুনিচ্ছায়াঃ। শুকে কৃষ্ণমৃগাস্থ বামনয়নং কণ্ডূয়মানং দৃষ্টম" (শাখা হইতে যখন চুনিত, এইরূপ একটি বৃক্ষের নীচে দুটা কৃষ্ণ মৃগের শৃঙ্গে আপনার বাম নয়ন ঘষিতেছে তাহাই আঁকিতে ইচ্ছা করি)।" কবির দৃষ্টি ও চিত্রকরের দৃষ্টি এখানে "মিলিয়া যুগল তনুতে যেন ইহা" হইয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলার অক্ষয় কীর্তি স্থান প্রাগজ্যোতিষপুর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগের আদিকাল

আমি যুগের উপকথার কোয়াসা বিজড়িত অস্ফুট ভগদত্তলোকের রাস্তা ছাড়িয়া আমরা ঐতিহাসিক যুগে অবতরণ করিব। এ পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্যের দশখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১। ভাস্কর বর্ম্মার নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন। ২। হর্জ্জর বর্ম্মার হাতুংখলে প্রাপ্ত তাম্রফলক। ৩। তেজপুরে প্রাপ্ত মহারাজ বনমালার তাম্রলিপি। ৪ নোগাঁয় প্রাপ্ত বলবর্ম্মার তাম্রশাসন ৫ ঘড় গাঁয়ে প্রাপ্ত রত্নপালের ১ম তাম্রশাসন ৬। সোণালুচিতে প্রাপ্ত ঐ রাজার তাম্রশাসন। ৭। গৌহাটিতে প্রাপ্ত ইন্দ্রপালের প্রথম তাম্রশাসন ৮ গুণাকুচিতে প্রাপ্ত ঐ রাজার ২য় তাম্রশাসন। ৯ ধর্ম্মপালের শুভঙ্কর পাটক লিপি। ১০ ঐ রাজার পুষ্পভদ্রা লিপি ইহা ছাড়া হর্জ্জর বর্ম্মার প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ লিপিও এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর বর্ম্মা—৬৪৬ খৃঃ।

১। ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রলিপি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ এই ভাস্কর বর্ম্মার সময়ে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে হিউএনসাং তাঁহার সভায় অতিথি হইয়াছিলেন কনোজাধিপ হর্ষের সঙ্গে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের যুদ্ধের প্রাক্কালে ইঁনি কনোজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তাম্রশাসনখানি কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। হর্ষ তখন সাময়িক ভাবে উক্ত রাজধানী ভাস্কর বর্ম্মার অধিকৃত ছিল। ভাস্কর বর্ম্মার পরিচয়স্থলে তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, ইনি কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত নরক রাজের বংশোদ্ভব। নরকের পুত্র ভগদত্ত,—তৎপুত্র বজ্রদত্ত নরকবংশীয় রাজারা তিন হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর সেই বংশে ধুষ্যু চতুর্থ শতাব্দীতে পুষ্যবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। ১ পুষ্য বর্ম্মা, ২ সমুদ্র বর্ম্মা, ৩ বল বর্ম্মা (দত্তা দেবীর গর্ভজাত), ৪ কল্যাণ বর্ম্মা (বজ্রাবতীর গর্ভজ), ৫ মহেন্দ্র বর্ম্মা (বজ্রবতীর গর্ভজাত), ৬ নারায়ণ বর্ম্মা (রাজ্ঞী সুনন্দার গর্ভজাত , ৭ মহাভূত বর্ম্মা দেববতীর গর্ভজাত , ৮ চন্দ্রমুখ বর্ম্মা। দেববতীর গর্ভজাত), ৯ স্থিত বর্ম্মা, ১০ সুস্থিত বর্ম্মা। নয়ন দেবীর গর্ভজাত শ্রীমুখাক্ষ উপাধি), ১১ সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা (ভামা দেবীর গর্ভজাত)। ভাস্কর বর্ম্মা এই সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভামা দেবীর গর্ভজাত। কথিত আছে ইনি "স্বীয় বাহুবল দ্বারা সমস্ত সামন্তচক্রের বল খর্ব্ব করিয়া" সার্ব্বভৌম নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কানোজের সহিত মৈত্রী নিবন্ধন ইনি পশ্চিম হইতে বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার রাজ্যে আনয়ন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন।

২। হর্জ্জর বর্ম্মা।—এই অনুশাসনে গুপ্তাব্দ ৫১০ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং ৮২৯ খৃষ্টাব্দ। ইহা হারপেশ্বর স্কন্ধাবার হইতে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ এই স্থানটি তেজপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল।

হরির বর্ম্মার পিতার নাম প্রাংশু ও মাতার নাম জাহ্নবী, ইনি সালঙ্কায়ন বংশসম্ভূত। ইহার

হরির বর্ম্মা।

পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা বনমাল। "শ্রীমান্ হরির দেব সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দেবরাজ কর্তৃক ইক্ষুর ন্যায়, প্রণত রাজগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া সমুদ্র তীর্থবারিপূর্ণ মঙ্গল্য দ্রোণী কলসের জলের দ্বারা বণিক্ জন-পুরোগম সমক্ষে জাত রাজ্য পুত্রগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।"

৭। বনমাল, অনুমান নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইনি মহারাজ হরির বর্ম্মার পুত্র। এই অনুশাসনে দৃষ্ট হয়, ইঁহারা নরক ও ভগদত্তের বংশীয় বলিয়া দাবী স্থাপন করিয়াছেন। শাসনখানির সংস্কৃত নির্দ্দোষ ও অভিজাত্যপূর্ণ শ্লোকে লৌহিত্য নদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি।

বনমাল

৮। বল বর্ম্মা, ইনি বনমাল বর্ম্মার পুত্র, পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহার রাজত্ব কাল। এই অনুশাসনে অভিজ্ঞান মহারাজ বনমাল দেবের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,

বল বর্ম্মা।

"কেহ যা হাতে তাঁহার মুখ সম্পূর্ণ কেহ দেখেন নাই, কোন নাচ বা অভিনয় তথা তিনি আস্বাদন করেন নাই, সঙ্গীত চিত্রবাদ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহার বিলাস ও অন্যান্য প্রাসাদপ্রেণী নানা চিত্র সমন্বিত এবং বহু পাকেই নির্ম্মিত ছিল।" বোধ হয় সেই প্রাচীন আমলে এখনও আমাদের গ্রামপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সেই সকলের পুরাতন প্রথম শ্রেণীর প্রাসাদের ছবি মনে হয়।

এই অনুশাসন হইতে জানা যায়, বনমাল সম্বন্ধে পুত্রের নাম হরিমাল—ইহার উপাধি বীরবাহু, বল বর্ম্মা তাঁহার পুত্র।

৫। রত্নপাল সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত একাদশ শতাব্দীর পুরুষোত্তম। যদিও সালঙ্কায়নবংশীয় নৃপতিগণ আপনাদিগকে নরক ভগদত্তবংশীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তথাপি বোধ হয় তাঁহারা সেই প্রাচীন রাজবংশের কেহ ছিলেন না রত্নপালের অনুশাসনে ইহাদিগকে ক্ষেত্রবংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রত্নপালের অনুশাসনে আছে—"যাহাদ্বারা নরকবংশের রাজারা পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন কিন্তু দুষ্টবলশালী সালস্তম্ভ সেই শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের একবিংশতিতম রাজা ভগদত্তের নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় বর্ণাঢ্য হওয়াতে 'পুনশ্চ আমাদের নরকবংশের রাজারই প্রয়োজন' এই স্থির করিয়া প্রকাশ শ্রীমান্ পালকে রাজা মনোনীত করিয়াছিলেন" রত্নপাল ব্রহ্মপালের পুত্র। ইহার পরাক্রমের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে ইহার রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের চতুষ্টয়াত্মক নগরী—(১) শুকরাজরূপ ক্রীড়াপর্ব্বতের দৃঢ় পত্তন, (২) কুঞ্জরাধিপতির অরি স্বরূপ (৩) তুরঙ্গ গোমহিষাদিরূপ সম্পদের কূট পাকল (৪) একরূপ হস্তিযূথের, সমূহ, ও কেবলেশ্বররূপ শত্রুদের বন্ধস্বরূপ, (৫) বাহিক ও মানিক কাশীর রাজ্যের সন্নিহিত প্রদেশ, রাজ্যের আতঙ্কজনক ছিল। এই সকল রাজ্যের সঙ্গে রত্নপালের কোথায় কিভাবে সংঘর্ষ হইয়া ইহার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন

৬৫৭ রত্নপালের পুত্র পুরন্দর পালের অকালমৃত্যুতে তৎপুত্র (রত্নপালের পৌত্র) ইন্দ্রপাল রাজা হইয়াছিলেন, সময় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইঁহার তাম্রশাসনের শিরবন্ধনটি বড় সুন্দর, অনেকে বৈষ্ণবপদে পুনঃ পুনঃ পাইয়াছে, রাধা কৃষ্ণ বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন—"হারিলে তোমারে দিব বেশর কাঁচুলি। জিনিলে লইব তোমার মোহন মুরলী।" অনুশ সনের স্থলনায় পাওয়া যাইতেছে, হরগৌরী রাজা রাণীরা পাশা খেলিতেছেন ও শিব পরাস্ত। গৌরী বলিতেছেন, "তোমার সকাশে—ঘটস্থ, পরস্ত, দুর, শঙ্খকলা প্রভৃতি আমি জিতিয়াছি, কিন্তু সমস্তই আমি লিখাইয়া দিলাম, কেবল গঙ্গা আমার অলঙ্কারার্থ কিঙ্করী হইয়া থাকুক।"

ইন্দ্রপাল।

৮ ধর্মপাল—এই বংশের আট পুরুষ ব্রহ্মপাল, ২য় রত্নপাল, ৩য় ইন্দ্রপাল, ৪র্থ গোপাল, ৫ম হর্ষপাল, ৬ষ্ঠ ধর্মপাল। ধর্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

ধর্মপাল।

ভাস্কর বর্মার সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্য চতুর্দিকে বেড়িয়া ১৬৯৭ মাইল ব্যাপক ছিল। কামিংহামের মতে সমস্ত রঙ্গপুর জেলার দক্ষিণাংশ, কোচবিহার এবং ভূটান এই সুবিস্তৃত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীন দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে 'সু' জনপদ এবং খৃষ্টাব্দের কতকাংশও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধীন ছিল। গেট সাহেব বলেন, এই বংশের ইন্দ্রপাল রাজাকে বঙ্গদেশ পিতা 'যজয় গৌড় পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের কাল সম্বন্ধে বিস্তারিত নাই। কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা পাল সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করাতে গৌড়েশ্বর নামক ইঁহার (কুমারপালের) রাজপুত্র কর্তৃক পরাস্ত ও নিহত হন। গৌড়েশ্বর তখনকার রাজা হইয়াছিলেন। (২৭০ পৃঃ)

সীমা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাঠান-আক্রমণ ও ক্রমশঃ অধিকার সঙ্কোচ

এই বিপ্লবের পরে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে মহম্মদ ইবন্ বক্তিয়ার খিলিজির আসামের বিরুদ্ধে অভিযান করার সংবাদ পাইতেছি। বক্তিয়ার বড় বিড়ম্বিত হইয়া এই রাজ্যের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি পাইয়া বৃহৎ জঙ্গল ভেদে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ১২৫৭ খৃঃ অব্দে যুজবক তোগেরিল খাঁ কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কিয়ৎকালের জন্য বিজয়ী হইয়াছিলেন, একটি মসজিদ পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল,—কিন্তু কালক্রমে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি কামরূপেশ্বরের হস্তে নিহত হইলেন। ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে

মহম্মদ সাহার ১ ০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য কামরূপ রাজের হাড় বিস্তার প্রভাবে সমস্তই বিনষ্ট হইল। (আলমগির নামা, ৭৩১ পৃ.) কিন্তু এই সময় হইতে প্রাগজ্যোতিষপুর বহু খণ্ড-রাজ্যে পরিণত হইয়া পরোক্ষভাবে কোন কোন পার্বত্য রাজবংশের নেতার অধিকারে আসিল। চুটিয়া রাজারা সুবর্ণশ্রী ও দিগারু নদীর পূর্বভাগে, পশ্চিমে কাছাড় রাজগণ এবং পরবর্তী সময়ে অহম রাজগণ, স্ব স্ব স্থান অধিকার লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন। চুটিয়াদের উত্তরে এবং কাছাড়ীদের পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞা রাজারা স্বাধীন ভৌমিক, আধিপত্য করিতেন। দক্ষিণে, পূর্ব ময়মনসিংহে দুর্গাপুর, জঙ্গলবাড়ী, কাশ কাঁঠালিয়া, বোকাইনগর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজবংশীয় নেতারা এই সময়ে স্বাধীন হইয়াছিলেন। এদিকে কোচবিহার প্রবল হইয়া এক সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছিল। চুটিয়াদের আদি রাজা বীর পাল, —তৎপুত্র গোবিনারায়ণ, সোনা সিংহপাল) ভরসেন নামক এক রাজাকে হত্যা করিয়া বঙ্গপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশে গোবিনারায়ণের (রাজ উপাধি রত্নধর পাল) পর নয়টি রাজা হইয়াছিলেন। অহম রাজা স্বর্গনারায়ণের নাবালক পুত্রের অভিভাবক এবং মামাতো ভাইরূপ অহমদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বারভূঞাদের আদিপুরুষ সমুদ্র, তৎপুত্র মনোহর,—মনোহরের কন্যা লক্ষ্মীর গর্ভে শ্যামন্ত এবং শ্যামন্ত কন্যাগ্রহণ করেন শ্যামন্তের বংশধর রাজধর নোয়াগাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, রাজধরের পুত্র কন্দর্পনারায়ণের দেওয়ানজগন্নাথ মহাপাত্রকে হত্যা করিয়া পরে নিজেরা রাজা হইয়াছিলেন। বারভূঞাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অহমগণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। চুটিয়া রাজগণের সময়ে কামাখ্যাদেবীর মন্দির নিত্য নরবলির রক্তে প্লাবিত হইত। কামতার রাজগণের শেষ বংশধর নীলাম্বর ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে হুসেন সাহ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন, যেন রাজগণের আদি পুরুষ

কামতা রাজ

গরুড় রাজার ছিলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুধর্ম গ্রহণ পূর্বক নীলধ্বজ উপাধিতে পরিচিত হইলেন। হ্যামিল্টন কামতাপুরের রাজ্য ১৯ মাইল ব্যাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ এবং তৎপুত্র নীলাম্বর। এই নীলাম্বরের রাজ্য ব্রহ্মপুত্র মন্ত্রীর পুত্রের প্রেমে আবদ্ধ হন, রাজা উহা জানিতে পারিয়া সেই মন্ত্রিপুত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস রাঁধাইয়া অজ্ঞাতসারে মন্ত্রীকে খাওয়ান। শেষে স্বয়ং ঘটনাটি মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী প্রতিশোধ লইবার জন্য অভিসন্ধি করিয়া হুসেন সাহার পক্ষ গ্রহণ করেন, হুসেন সাহ ১২৯৮ খৃঃ অব্দে কামতাপুর অবরোধ করিয়া বহু কালের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারেন নাই অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে রাজার সঙ্গে হুসেন সাহের বেগম দেখা করিতে অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে ছদ্মবেশী কতকগুলি সৈন্যকে প্রেরণ করেন এই ভাবে কামতা মুসলমানের অধিকৃত হয়। রাজা পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন ১৪৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কামতা মুসলমান শাসনাধীন থাকে। ইহার পরে মুসলমানেরা অহম রাজাদের রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করায় ফলে, সমস্ত মুসলমান সৈন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পূর্বাধিকৃত কামতা রাজ্যও তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। ইহার পরে চন্দন এবং মদন নামক দুই ক্ষুদ্র রাজার নাম পাওয়া

যায়, ইহারা বিশ্বসিংহের ভ্রাতা ছিলেন এই বিশ্বসিংহ ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু প্রতাপে —প্রাগজ্যোতিষপুরের বড় নদী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করেন

অহমরাজবংশের যে বৃত্তান্ত আছে, গেট সাহেবের মতে তাহার পূর্ব্বভাগ—যেখানে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বংশের উৎপত্তির কথা আছে—তাহা ছাড়া বাকী সবই বিশ্বাস যোগ্য। অনেকগুলি মূলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, গেট সাহেব বলেন, এই জাতির মত ইতিহাস-লেখক পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে বিরল —এমন কি মুসলমানেরাও তাহাদের সমকক্ষ নহেন সৃষ্টিতত্ত্ব তাঁহারা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, গেট সাহেব বলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক হিন্দুদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই কিন্তু সেই সৃষ্টিতত্ত্বের সার সঙ্কলন তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে দুই চারি স্তম্ভ পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ইহার মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। ইহাদের মধ্যেও আদিকালে যে প্রবল বন্যা জগৎকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে উপাখ্যান আছে।

অহমরাজ টায়ো ও পুনকানের বংশে ১১০ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে রাজা খুনুর পৌত্র সুকাফা আসামে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ইঁহারা শান সংজ্ঞক এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নাগা হইতে আসামে আগমন করেন। খৃঃ। ১২১৫ খৃ: অব্দে সুকাফা আসামে অবতরণ করেন তাঁহার সঙ্গে দুইটি শ্বেত হস্তী, ৩০০ ঘোড়া ও ৩,০০০ লোক ছিল তিনি নাগাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মোরান, মোয়াড় পর্ব্বত প্রদেশ রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি ১২১৮ খৃ: হইতে খৃ: ছাড়া ১২১৮-১২৮১ ১২৫৮ খৃ: অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুকাফার পুত্র সুতিফা খৃ:। ১২৮১ খৃ: অব্দ পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন নর নামক এক জাতি (শান-বংশসম্ভূত) অপেক্ষাকৃত সভ্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, ইহাদের রাজা সুতিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, যাহাতে তাহাদিগকে দাসত্বমুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সুতিফা নরবাজার কন্যাকে বিবাহ করিতে চান,—তাহাতে সম্মতি পাইলে সাহায্য করিবেন, তৎবিনা—১২৮১ ১৩৩ বলিয়া পাঠান। কিন্তু নরবাজ তাহাতে সম্মত হন না। ইহার পরে খৃ:। যে যুদ্ধবিগ্রহ হয় তাহাতে সুতিফা বিজয়ী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজা সুবিনফা ১২৮১-১২৯৩ খৃ: অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি রাজ্য বৃদ্ধি করেন নাই, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, বরগোহাইন এবং বুঢ়া গোহাইন এই সুখাংফা—১৪০১ ১৩২ খৃ:। দুই সেনাপতির মধ্যে তুলারূপে প্রভুত্ব ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন সুবিনফার পুত্র সুখাংফা চুটিয়া, কাছাড়ি ও কামতার রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন, শেষোক্ত রাজার কন্যা 'রাজনী'কে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন ইঁহার ৩৯ বৎসর ব্যাপক রাজত্ব-কালে অহমরাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

তৎপর সুখাংফার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুতুংফা রাজা হন। তৎকনিষ্ঠ চাওলুংগাইএর ষড়যন্ত্রে ইঁহাকে বহুকাল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল বস্তুতঃ তাঁহার ৩৩ বৎসর-ব্যাপক দীর্ঘ

রাজত্বকাল একটা কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় রাত্রিযাপনের মত অতি কষ্টে উদ্‌যাপিত হয়। এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য সুধাংফা রাজা হন চুটিয়ার রাজার সঙ্গে কিছুকাল ইহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু এই রাজা শত্রুর ছলে নগরে লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সুচুংফাকে হত্যা করেন।

সুধাংফা—১৩ ২ ১৩৪৪ খৃ.। সুচুংফা ১৩৪৪ ১৩৫৪ খৃ.।

চার বৎসর কাল সিংহাসন রাজশূন্য থাকে এবং বরগোহাঁইন রাজ্য শাসন করেন এই অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় সুধাংফার তৃতীয় পুত্র টাঙাংখামটি রাজপদে অভিষিক্ত হন চুটিয়া রাজার প্রাণ প্রতিশোধ লইবার জন্য ইনি অভিযান করেন, এবং ইহার অনুপস্থিতি কালে বড়রাণী ছোটরাণীকে মদ্যা অভিযোগ দিয়া গড়াযন্ত্রায় ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে নিক্ষেপ করে জলাইয়া দেন চুটিয়ারাজা বিফল হইয়া রাজা ছোটরাণীর এই নিষ্ঠুর অপমৃত্যুর কথা শুনিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন কিন্তু বড়রাণীর ভয়ে কিছু করিতে সাহসী হন নাই দীর্ঘ শোকে এমন অভিভূত হন যে প্রজারা ক্ষেপ্ত হইয়া গড়িয়া নিয়াহ রাজাকে হত্যা করে

টাঙাংখামটি—১৩৮০-১৪০৩ খৃ.।

অরিরি কতক সময়ের জন্য রাজতন্ত্র লুপ্ত হইয়া থাকে সাময়া টাঙাংখামটির ছোটরাণীকে জলে ভাসাইয়া দিবার কথা লিখিয়াছে, তাহাতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ইহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি সন্তান প্রসব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন এই অনাথ বালক ব্রাহ্মণের যত্নে পালিত হন, এবং, ইঁহার শাসনের বিস্তৃতি হইলে ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে 'সুধাংফা' উপাধি লইয়া রাজা হন। পুনঃপুনঃ সাম্রাজ্যবিস্তারে ইনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ ইঁহার চিন্তা হইয়াছিল রাণী নানা স্থানে রাজ্য উপদ্রব খামখাং এবং এইটুন্ প্রভৃতি দলের নেতৃত্বের সংঘবদ্ধতার আকর্ষণ করেন। ইহার সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অবশ্য জাতির মধ্যে বৃদ্ধি পায় রাজার পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণরাজা ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই এই রাজ্য খুব বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, রাজা খুব ধর্মভীরু ছিলেন—বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পুরোহিতরূপে থাকিতেন পঞ্চমবর্ষে বসে রাজা হইয়া সুধাংফা দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুধাংফা—১৩৮৭-১৪০৭ খৃ.,

ইঁহার পরে সুচুংফা ১৪০৭ ১৪১২ সুফাকফা—১৪১২ ১৪৩৯, এবং সুহেনফা—১৪৩৯-১৪৮৮ খৃ. অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, ইঁহাদের রাজত্বকালে বিশেষ কোনে যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই এবং অহমদেশের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল রাজা সুহেনফা নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু কাছাড়-রাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া একটি রাজকন্যা, ১২টি দাসী এবং ১টি হস্তী যৌতুক দিয়া সন্ধি করেন সুহেনফাকে একজন আততায়ী ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করে। তৎপুত্র সুলিংফার রাজ্ঞী স্বামীর সাক্ষাতে এক নাগা রাজার রূপের প্রশংসা করাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক

সুচুংফা—১৪০৭-১৪১২ খৃ.,
সুফাকফা—১৪১২-১৪৩৯ খৃ.,
সুহেনফা—১৪৩৯-১৪৮৮ খৃ.,
পাইকোরের সমসাময়িক।

নাগপল্লীতে নির্ব্বাসিত করেন। পরবর্ত্তী রাজা সুরথমংএর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অহম রাজেরা এই সময় হইতে 'স্বর্গনারায়ণ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে রাজা স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করিয়া শোণিতপুর অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ছুটিয়া রাজ নারায়ণের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া বিদ্রোহ করাতে ছুটিয়া রাজ্যটি অহম রাজের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই সময়ে হুসেন সাহ অহমরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ২৪,০০০ পদাতিক, বহু অশ্বারোহী ও অনেক যুদ্ধজাহাজ ছিল। প্রথমবার হটিয়া যাইয়া রাজা বর্ষাকালে হুসেন সাহার পুত্রসহ সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেন (বিবৃতি দেখুন)। এই পরাজয়ের পর মুসলমানেরা আবার ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুরবক এবং হুসেন খাঁ বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারেন নাই, শেষে পরাজিত হইয়াছিলেন। পরোক্ষ সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন এবং অহমরাজ পঞ্চদশ শতকের শেষে ৫টি হাতী, ৮০টি ঘোড়া, অনেক কামান, বন্দুক ও সোনারূপা পাইয়া ছিলেন। সুরথমংকে কাছাড়ী খাসিয়া টাইপের এবং নাগসাংএর নাগাদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় সকলেই ইঁহার বিজয়ী হইয়াছিলেন, এবং কোচরাজ বিশ্বসিংহ এবং ঘাঘটপুরাধিপের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি বিশেষ পরাক্রম ও দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার পুত্র সুক্লেনফা ইহাকে এক ভৃত্য দ্বারা হত্যা করেন। ইহার পূর্ব্বে এই সুক্লেনফা স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। সুক্লেনফা রাজা হইয়া পিতৃহত্যার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য চতুরাকারে ভ্রাতাদিগকে বধ করেন। ইহার রাজত্বকালে কোচরাজ নরনারায়ণের সঙ্গে বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। নরনারায়ণের ভ্রাতা ছিলা রায় শুক্লধ্বজ অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও মহাবীর ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে অহমরাজ কতককালের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন। নরনারায়ণ ১৫৪৬ খৃঃ অব্দ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিক্করাবাসী পর্য্যন্ত দখল করিয়া ধারাঙ্গা, কলিয়াবার প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন।

সুক্লেনফার পুত্র সুখাম্ফা। ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ায় ইহার একটি পা খোঁড়া হইয়া যায় এবং ইনি 'খোঁড় রাজা' নামেই পরিচিত হন। নরনারায়ণের ভ্রাতা ছিলা রায় পুনরায় অহমরাজকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক নামরূপের চরাইখাড়া পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। অহম্ রাজ সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া কোচরাজের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক জামিনস্বরূপ তাঁহার প্রধান সামন্তগণের পুত্রগুলিকে প্রদান করেন এবং অনেক অর্থাদি দিয়া সন্ধি করেন, কিন্তু কোচ-সেনাপতি চলিয়া গেলে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে কোচরাজ মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে জামিন প্রত্যর্পণ করিয় অহম্-রাজের প্রস্তাবিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সুখাম্ফা নর এবং চুটিয়াদের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্দরে বহু মহিষী ছিলেন এবং ইঁহাদের কেলেঙ্কারিতে রাজা

সুরথমং—১৫৩৯-১৫৪২ খৃঃ।

সুখাম্ফা—১৫৮২-১৬০৩ খৃঃ।

বাস্তিবাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন সময়ে এক বাঙ্গালী রাজার সঙ্গে অভিযুক্ত হওয়ার ফলে তিনটি লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রথমোক্তার পুত্র সুলেমান বৃদ্ধ বয়সে রাজা হন, সুতরাং তাঁহাকে লোকে 'বুড়া রাজা' নাম দিয়াছিল। ইঁহার অপেক্ষাকৃত যুবকমান ভ্রাতার নাম ছিল এসফ খাঁ, ইহার আর এক নাম হইয়াছিল "বুড়া স্বর্গনারায়ণ", ইহার রাজধানী ছিল প্রতাপগিরি, এই নামেই ইঁহার পরিচয়। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার রাজত্বের প্রথম সময়ে কাছাড়ের রাজা ভীমবলের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ হয় এবং ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহা কোচরাজ পরীক্ষিতের কন্যা "মঙ্গলদৈ"কে বিবাহ করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কোচরাজ বাসুদেবনারায়ণ মুসলমানদের উৎপীড়নে ইঁহার আশ্রয়প্রার্থী হন। ইঁহা তাঁহাকে আশ্রয়দান করেন। এই সময়ে কোলাডিবার নামক স্থানে এক মুসলমান বণিক নিহত হয়, বঙ্গের শাসনকর্তা হইতে কোচহাজো এইসকল কারণে অহমরাজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আবুবকর এবং ঢাকার ফৌজদার সসৈন্যে বহু সৈন্য লইয়া অহমরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সৈয়দ আবুবকর এবং মুসলমান সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং বন্দীদের মধ্যে সমাটের এক পুত্র কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে বলিপ্রদত্ত হন। বাসুদেবনারায়ণকে সুবেদার ছাড়াএর সাহায্যার্থে পত্র প্রেরিত করেন। ইহার পর মুসলমানগণ সৈয়দ ইসমাইল আবদিনের অধীনে বহু বাঙ্গালী লইয়া অহমরাজ আক্রমণ করেন। তখন সম্রাটের ছিলেন ইসলাম খাঁ মসনদ আলি, মজলিস মহাজন এবং সমাদির অহমগণ কর্তৃক পরাস্ত হন, প্রথমোক্ত সেনাপতিদ্বয় নিহত হন এবং মুসলমানদের বহু রণতরী অহমরাজের করতলগত হয়। সম্রাটের ব্যবহার এই সকল যুদ্ধ আরম্ভে সন্দেহজনক ছিল। তিনি কোন সময়ে মুসলমানপক্ষীয় হইয়া আবার কোন সময়ে অহমরাজের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন করিতেন। যাঁর সৈন্যগণ কর্তৃক বৃত হইয়া তিনি ঢাকায় প্রেরিত হন এবং পথে নিহত হন সৈন্যগণ কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের সাহায্যে এবার জয়ী হন এবং সুবেদারী রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে সুবর্ণশ্রীর উত্তরে 'বড়নদী' এবং দক্ষিণে 'অম্বরাম আলি' মুসলমান ও অহমরাজ্যের এই সীমা নির্দিষ্ট হয়। প্রতাপের রাজত্বকালে কাছাড়ীরাজ ইন্দ্রবল্লভ তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন।

ভগারাজা—১৬৪১-১৬৬৬ খৃঃ।

রুদ্রিয়া রাজা—১৬৬৬-১৬৮৮ খৃঃ।

তৎপরে ভগারাজা সুরাপায়ী, অত্যন্ত বিলাসী, কামাচারী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাকে বিষ দিয়া হত্যা করেন। ইহার পরে রুদ্রিয়া রাজা সুতনিয়া রাজা হন। ইঁহা চিররোগী এবং অসমর্থ ছিলেন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের ইনি সিংহাসনচ্যুত হন।

পরবর্তী রাজা সুতাম্লা 'গরুরজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। মীরজুমলার সঙ্গে ইহার স্বল্পকালস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। পরিণামে ফলকাশ খাঁ প্রভৃতি সেনাপতির কৌশলে মুসলমানেরা বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং অহমরাজের সঙ্গে তাঁহাদের সন্ধি হইয়াছিল। এই সন্ধি অনুসারে করতোয়া তাঁহার

গরুরজ—১৬৪০-১৬৬৩ খৃঃ।

এক কন্যাকে সম্রাট প্রত্যর্পণে নিতে অস্বীকার করেন। ইহার সঙ্গে রাজকুমার মহম্মদ আজিমের বিবাহ হইয়াছিল। ফরিদি আলমগীর গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে এই বিবাহে অওরঙ্গজেব কন্যাকে ১,৮০,০০০ টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন।

এই সর্ত ছাড়া আরও কয়েকটি সর্ত হইয়াছিল। ২১ লক্ষ টাকা দেনা এবং ইহার ছয়গুণ রূপা বাজাকে দিতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার প্রধান অমাত্যদের ছয়টি পুত্রকে জামানতস্বরূপ প্রেরণ করা স্থির হইয়াছিল। এই সর্ত অনুসারে অওরঙ্গজেব তাহাদের ভিতরে ভাকলী নদী এবং কঙ্কির কল্লাস পর্যন্ত সমস্ত স্থানের অধিকার মোগল সম্রাটকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

জয়ধ্বজের পর চক্রধ্বজ রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহার সময় মুসলমানদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে। ফিরোজ খাঁ পরাজিত হন। যে ৯০০ মোগলসৈন্যকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সত্য হইল না। অওরঙ্গজেবের এই ঔদ্ধত্যের ফলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৬৬৭ খৃ. অব্দে আবদুস সামিদ নামক সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু মোগলেরা পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া অওরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধবিগ্রহের অনেক আগে হইতে মোগলদিগের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন জয়ন্তিয়া পর্বত দেবের বংশের চক্রধ্বজ একজন ছিলেন।

ইঁহার পরে সাময়িক ভাবে কয়েক জন রাজা হইয়াছিলেন। যথা—দেবরাজ ১৬৬৯-১৬৭৩ খৃঃ, রামসিংহ ১৬৭৩-১৬৭৮ খৃ., তাহার ১৬৭৮ খৃঃ। তাহার ১৬৭৮ খৃ., যু জনার্দন ১৬৭৮-১৬৭৯ খৃঃ, জেতোজয় হইতে ৫ জয় মুকুন্দ ১৬৭৯-১৬৭৯ খৃঃ। পেতোক্ত রাজা সামন্তদের সহায়তায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অবশেষে ইঁহাদের এক জনের দ্বারা উৎপাটিতরাজ্য হইয়া বিদায় হন। সুখনমুক্ত পরে পুলাইকা রাজা হইলেন। যুদ্ধবিগ্রহ এবং বড় ফুকনের মধ্যে অসদ্ভাবের ফলে, বড় ফুকনের ষড়যন্ত্রে রাজকুমার মহম্মদ আজিম আসাম আক্রমণ করিয়া গৌহাটি দখল করেন। বড় ফুকন প্রবল হইয়া রাজাকে নিহত করেন এবং রাজবংশের একটি বালককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার নাম সুলক্ষ্মী কিন্তু সাধারণতঃ ইনি 'লরা' রাজা নামে খ্যাত, 'লরা' অর্থ কিন্তু বড় ফুকনের অবিমৃষ্টকারিতা এবং রাজকীয় লরা রাজা—১৬৭৯-১৬৮১ খৃঃ। সর্ব্ববিধ প্রভাব আত্মসাৎ করার চেষ্টাতে ইনি লোকের অত্যন্ত বিদ্বেষভাজন হন। অবশেষে ধৃত হইয়া ইনি ইহার পুত্রদের সহিত নিহত হন। লরা রাজা এই সকল ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের ভয়ে অতিশয় নির্দ্দয় হইয়া পড়েন। ইনি ভূতপূর্ব্ব রাজার জ্ঞাতিগোষ্ঠী শত শত লোককে হত্যা করেন, কিন্তু বহির শেষের স্ত্রী গদাপাণি নামক একটি রাজকুমার কৃষকের বেশে কৃষকের কার্য্য করিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। একটি গরীব কৃষকের গৃহে তিনি পালিত হইয়াছিলেন, অবশেষে প্রজারা রাজার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত এবং শেষে নিহত করে। অতঃপর গদাধর গদাপাণি সিংহ রাজা হইয়া মুসলমানদের হস্ত হইতে গৌহাটি উদ্ধার করেন। গৌহাটির ফৌজদার উজবেগে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং মুসলমানদিগের

[illegible] ধনরত্নের লোভে রাজাকে হস্তগত করা [illegible] ভাবিয়া কতকগুলি মুসলমানকে আনিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন [illegible] ঐ সকল পুস্তক পুড়াইয়া ফেলিয়া তাঁহার মৎস্য ধরিবার [illegible] ঐ সকল পুস্তক 'লক্ষ্মণ সেনের' ছিল। মুসলমানদিগের এই শেষ চেষ্টা। ইহার পর যখন মোগলেরা পরাস্ত হইলে আসামের দিকে আর মুসলমানেরা অগ্রসর হন নাই এই যুদ্ধে যে সকল কামান আসামরাজ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল তাহার দুই তিনটি এখনও আছে, একটি গৌরীশ মন্দিরদ্বারে, এবং একটি, লক্ষ্মীপুরের ডেপুটি কমিশনারের বাটীর কাছে রক্ষিত আছে ইহাতে এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ আছে "শাহ জহানের [illegible] হইতে মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া এই অস্ত্র অধিকার করেন শকাব্দ ১৫০৪ ১৫৮২ খৃঃ" রাজা সিংহ এবং [illegible] সকলে মিলিত হইয়া [illegible] ১৬৬৯ খৃঃ। কিন্তু ইহার পর ইনি লক্ষ্মণসেনের [illegible] বৈষ্ণবদের নিকটে [illegible] পাঠাইয়া দেন। অপরাধ এই [illegible] যখন ছদ্মবেশে দিন যাপন করিতেছিলেন তখন [illegible] ইহাকে কোন সাহায্য করে নাই। ২য়,—শঙ্কর দিল্লীর [illegible] ভাইয়া [illegible] ছলে [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল এদিকে আহোমরাজ [illegible] করিতে পারিতেছিলেন না। [illegible] ধরিয়া [illegible] ছিলেন [illegible] দিতে পারেন নাই [illegible] যুদ্ধে [illegible] যুদ্ধারম্ভে যোগদান [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] রাজা [illegible] গোঁসাইয়ের চক্ষু [illegible] করিয়া [illegible] ইহাকে সমস্ত ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করিলেন, সোনা রূপার [illegible] ঐ [illegible] ফেলিয়া দিলেন [illegible] কেহই, কাচে ডোম এবং [illegible] ঐ [illegible] ছাগ এবং [illegible] মাংস আনাইয়া তাহাদের সম্মান [illegible] করিলেন। [illegible] ছেলে বয়সে রাজত্ব করিয়া ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের [illegible] মাসে [illegible] করেন। ইনি রাজা আতাজেবের সম-সাময়িক ও তাঁহারই মত [illegible] ও প্রতাপশালী ছিলেন, ইনি একজন [illegible] ছিলেন

[illegible] গদাধর সিংহের পুত্র কমলেশ্বর রাজা হইয়া বৈষ্ণবদের প্রতি অবিচার দূর করেন। নিষ্কলঙ্ক বৈষ্ণব গোস্বামীরা পুনরায় মন্দির অধিকার করিলেন, এমন কি রাজা স্বয়ং অনন্তরাটি গোসাইয়ের নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণার্থ ইনি সুবিখ্যাত রাজমিস্ত্রী সুলতান মলঙ্গমকে কোচবিহার হইতে আনাইয়া অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন কিন্তু ইহাতে পারত্রৌহিক বিদ্যা বিদায় করার পরে [illegible] ঐ। [illegible] ইনি আসামের প্রত্যেক দুর্গ ও নগর সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনাযুক্ত কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া যাইতেছেন। মুসলমান সৈন্যের সহিত কোন ষড়যন্ত্র আশঙ্কা করিয়া গুপ্তচর বলিয়া ইহাকে হত্যা করা হয়। ইনি অহম-রাজ রাম সিংহ ও কাছাড়-রাজ তাম্রধ্বজকে বহু যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনেন। কিছু কালের জন্য অবশ্য পাহাড় ও কাছাড়গুলি বাদ করিয়া আসামের অধিকারভুক্ত করা হয়—পরে ইনি

রাজাদিগকে মুক্তি দিয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেন। এই দুই রাজা লুপ্ত করিয়া ইনি অপরিমিত অর্থ পাইয়াছিলেন। কর্ণসিংহ গোড়া হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গার কতকটা অংশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের রাজ্য আক্রমণপূর্বক যুদ্ধবিগ্রহের উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে উপরওয়ালার ডাক পড়াতে তিনি এই সংসার ত্যাগ করিলেন। অষ্টমগড়ের পুরাতন 'মহারাজবাড়ী' ইহার দেহ সমাধিস্থ না করিয়া হিন্দুমতে শ্মশানে ভস্মীভূত করা হয়।

কর্ণসিংহের পুত্র শিবসিংহ গোড়া লোক ছিলেন। অনেকে ইহাকে অকালমৃত্যু ভবিষ্যদ্বাণী করাতে ইনি রাজা পরমেশ্বরকে রাজা প্রদান করিয়া "বড়রাজা" উপাধি লেন।

শিবসিংহ ১৭১৪-১৭১৬ খৃঃ।

এই রাজার ১৭১১ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয় তখন ইনি মৃত রাজার গর্ভিণী 'অম্বিকাকে বিবাহের সেইরূপ রাজপদ প্রদান করেন, ১৭১৮ খৃঃ অব্দে এই রাজারও মৃত্যু হয় তখন ইনি 'পরমেশ্বরী'কে বিবাহ করেন। রাণীরা গোড়া লোক ছিলেন, রাজা ইহাদের প্রভাবে আসামের সর্বপ্রধানের গুরু মোয়ামারিয়া এবং অপরাপর গুরুকে দুর্গাপূজা করিতে বাধ্য করেন, ইহার অন্যথা হইলে তিনি ইহাদিগকে দেশের সীমার বাহির করিয়া দিবার ভয় দেখাইতেন। ইহাতে ইহাদের কপালে অঙ্কিত করিয়া দেন। বৈষ্ণবেরা গুরু কুলের এই অপমান ভুলিতে পারেন নাই। শিবসিংহের রাজত্বকালে টাবরনিয়র, বার্নিয়র, ফ্রাঙ্কলিন বিস্টার এবং মিঃ—ব্রাহার সঙ্গে দেখা করেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন ইহারা রাজার সম্মুখে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। ("It is said, they [Hindu females] were obliged to prostrate at his feet." Gait's History, p. 155).

শিবসিংহের মৃত্যুর পর প্রমথসিংহ ১৭১৪-১৭৪১ এবং রাজেশ্বরসিংহ ১৭৪১-১৭৬৯ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজেশ্বরের দুই পুত্র নিহতিত হইয়াছিলেন, দুইটি পুত্র লক্ষ্মীসিংহ

লক্ষ্মীসিংহ ১৭৬৯-১৭৮১ খৃঃ।

সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ ছিল যে ইনি রাজার ঔরসজাত পুত্র নহেন—আকৃতি প্রকৃতিতে কোন সাদৃশ্যই ছিল না, এমন কি রাজা স্বয়ং বলিতেন—এই ছেলে আমার নহে। অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর ইনিই রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন ইহার বয়স ৫৩। লক্ষ্মীসিংহের সময় বিখ্যাত বৈষ্ণব-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সেই মোয়ামারিয়ার ও বৈষ্ণব গুরুর অপমানের স্মৃতি আসামের বৈষ্ণব-সমাজের বুকে জাগা দিয়া গিয়াছিল, এবার শিখ সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও রাজদ্রোহ ঘোষণা করিল, যাহার নায়ক মোগলদিগের দলপতির উপর রাজার কোন প্রধান সেনানীর অত্যাচার করে সে ব্যক্তি তাঁহার গুরু মোয়ামারিয়ার গোসাইয়ের পুত্র। ইহারা একটা ছল খুঁজিতেছিলেন সুতরাং অবিলম্বে গুরুর বলদৃপ্ত বাঁধিয়া উঠিল মোয়াল ও কাছাড়ী দলের লোকেরা দলে দলে যোগ দিল। লক্ষ্মীসিংহের ছোট ভ্রাতা কয়না গোসাইন রাজা হইবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া এই দলে ছিলেন। মোয়ামারিয়ার গোসাইয়ের পুত্র বানগান নিজেকে রামরূপের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লক্ষ্মীসিংহ ও তাঁহার প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীরা বন্দী

হইলেন বিদ্রোহীরা উঁহাদের কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে কার্য্য করে। এমন কি বৃদ্ধা প্রতিবাদকল্পে শুরুর বক্ষস্থল হইতে বিদারণ করিয়া কতক নিহত হইলেন। বাদশাহ রাজসিংহাসন অধিকার করিতে পরে তাঁহার পিতা ইহাকে নিষেধ করিয়া মোগল-দলনেতা নাহারের পত্র পাঠ এবং তাঁহার সেই পত্রকে সমস্ত আমেরের বিভিন্ন অংশ বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে এক একটি অংশ দিয়া দিলেন। রাজা হইলেন কিন্তু বাদশাহের সমস্ত প্রকৃত ক্ষমতা "মহা বড়ুয়া" পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বাদশাহ তাহার মন্ত্রণাকে স্ব স্ব অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। তাহাদের এক হাজারের উপর ছিলেন। এদিকে লক্ষ্য করা কর্তব্য হইতে কোলেজমে মুক্ত হইয়া অন্তরীণদের প্রত্যেক ব্যক্তির করিয়া দিয়া। অনেক এপ্রিল মাসে তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কথিত আছে, অন্তঃপুর হইতে মন্ত্রিপুরের বেগমেরা বাহির হইয়া বাদশাহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। ইহার পরে তাঁহার সহিত যুদ্ধের সন্ধি হয়। যোধপুরের রাজা কতকগুলি ধর্ম্মান্ধ নিরপরাধ অন্ধ পুরুষের মত এমন সকল যুদ্ধ প্রস্তাব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে তাঁহার বন্ধুত্ব করিলেন। যে সকল কারণে এই সকল বিদ্রোহের জন্ম স্থগিত ছিল, এখন তাহা দূরীভূত হইল। রাজপুতানা যোধ পাঠান ছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অনেক বড় ও পুরাতন কারণের অনুসন্ধান করেন। আমরা ইহার পরের আধুনিক কালে বিদ্রোহ। একজন রাজপুত ইতিহাসকার অতি সুন্দর পুরুষের পর অন্য বিষয়ে ইহাদের অনেক পরস্পর রাজপুতের বাসস্থানের বাসস্থানিকা দিয়া শেষ করিব।

যোধপুরের রাজা ১৭৯০-১৮৪৩ খৃঃ কমলেশ্বর সিংহ ১৮৪৩-১৮১০ খৃঃ, চন্দ্রকান্ত সিংহ ১৮১০-১৮১৮ খৃঃ, পুরন্দর সিংহ ১৮১৮-১৮১৯ খৃঃ।

আমরা এই রাজ্যের কথা বলিয়াছি কিন্তু ইহার রাজবংশের কথা বলা হয় নাই। যিনি প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মনে জন্মের উপর প্রাধান্য করিতেছেন এখন পর্য্যন্ত যাঁহার বংশ অদ্যাপি প্রভুত্ব করিতেছে যিনি কোহিনূরাদি সম্ভূত হইয়াও রাজপুত এবং সর্ব্বদেশের পূজ্য, যিনি ভোজ রাজবংশ এবং সপ্তপক্ষ অক্ষ রক্ত কলঙ্কিত বাহু রাজন্যগণের সম্বন্ধযুক্তপুষ্ট দেবীর অঙ্গের অবলম্বনস্বরূপ ব্রত ও ক্ষত উপ সকলিগের অত্যাচারের মূলে তুলসীপত্র কৃষ্ণত, ক্ষমাসুন্দর, দয়া ও ধর্ম্ম যাঁহার রাজকুমারীদের ছিলেন যিনি আমাদেরই চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী এবং যাঁহার মন্ত্র সকলেরই সম্মুখে সেই বৈষ্ণব চূড়ামণি আমাদিগের জন্মের অমর কবিতার অন্তরের ও ধর্ম্মের অধিক পরস্পর ছাড়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

শঙ্করদেবের পিতা কুসুমবর পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইহাদের আদিবাস বটদ্রুবি। নোয়াগাঁও। অল্পবয়সে শঙ্করের মাতার মৃত্যু হয়। শৈশবকালে তিনি অতি দুরন্ত ছিলেন, কিন্তু পিতার দুর্দ্দশায় তাঁহার চৈতন্য হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি সকলশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলেন, তাঁহার উপাধি হইল "দেবকণ্ঠি।" তিনি একটা আশ্চর্য্য ঘটনা করিয়াছিলেন যে, কথিত আছে,

তিন চার দিন শ্বাসরোধ করিয়া থাকিতে পারিতেন, দীর্ঘকাল তিনি একটিমাত্র পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন। আসামে এইরূপ যোগাভ্যাসের রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল। শাক্তগণ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যোগাভ্যাস করিয়া নানারূপ বিভূতি দেখাইতেন। এইখানে চৈতন্যদেবের সঙ্গে শঙ্করের বৈষ্ণবভক্তিবাদের মূল প্রভেদ। বাঙ্গালা বৈষ্ণবেরা এইসকল বিভূতি কিছু কিছু না দেখাইতেন, এমন নহে। অদ্বৈত ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে নানারূপ বিভূতি প্রদর্শনের কথা প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যদেব ঐসকল ব্যাপার বিরোধী ছিলেন। শঙ্করদেবকে তাঁহার পিতামহ সৌমাই খেরাজ ও লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি অল্পবয়সে তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গৃহী করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর গৃহে আবদ্ধ থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। নব যৌবনে স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন, শঙ্কর তাঁহার তিন শত দুগ্ধবতী গাভী, ধান্য কুড়া ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরণ করেন, এইভাবে তাঁহার ঘাট কোড়া বলদও সংবর্তিত হইল। অবশিষ্ট সম্পত্তি তাঁহার দুই ছোট ভাই ও মাধবকে দিয়া তিনি একদিন খেরুয়া পরিয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক গৃহ হইতে বাহির হন। বারবৎসর তিনি নানাস্থানে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং ধর্মপ্রচার করেন। তাঁহার ভ্রাতা বনমালা তাঁহার গৃহ নির্মাণপূর্বক যে সকল গাভী ও ধান্য বালকদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটিকে ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ করেন, তাহারা অস্বীকার করাতে বনমালা এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি একটি ব্রাহ্মণকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ঘটনায় শঙ্কর অত্যন্ত মর্মপীড়া পাইয়াছিলেন। শঙ্করের জ্ঞাতিভ্রাতা জগদানন্দ তাঁহার বাসস্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতা সুপণ্ডিত ছিলেন, শঙ্কর তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে সর্বদা ধর্মালোচনায় সময় কাটাইতেন। জীবনের এই অধ্যায়ে মাধবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। মাধবই তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য এবং তিনিই মহাপুরুষিয়া-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মাধব সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ঘোর শাক্ত ছিলেন,—ইহার বাড়ী তেজপুরিয়াবস্তে ছিল। ইঁহার ধাক্কায় গুরুতর পীড়া হওয়াতে ইনি তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া কামাখ্যাদেবীর নিকট দুইটি ছাগবলি মানত করিয়াছিলেন। শঙ্কর শিষ্য সমাপাদির সঙ্গে এই উপলক্ষে মাধবের তর্ক হয়, এবং মাধব তর্কে পরাজয় করিবার জন্য শঙ্করের নিকট উপনীত হন। মাধব সংস্কৃতশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে শঙ্কর ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন: "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।" (যেরূপ তরুমূলে জল নিষেক করিলে তাহার কাণ্ড শাখা-উপশাখা সমস্ত পুষ্ট হয়, যেরূপ প্রাণের তৃপ্তি হইলে সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ অচ্যুতের অর্চনায় সর্বদেবতা অর্চিত হইয়া থাকেন।)

মাধবের মত এত বড় পাণ্ডিত্যের পরাজয়ে সমস্ত শাক্ত নেতাদের টিকি নড়িয়া উঠিল,

শ্রীধর ভট্টাচার্য, কবিরাজ মিশ্র, বামনাচার্য এবং বহুতর কপটী পণ্ডিত শাক্ত দেওয়ান কি উপায়ে বৈষ্ণবদ্বেষের বাদ মিটাইবেন নাই করিবেন, তজ্জন্য চেষ্টিত হইলেন। শ্রীধর ভট্টাচার্য স্বয়ং নৈষ্ঠিক ছিলেন তিনি বলিলেন "তর্কযুদ্ধে শঙ্করকে পরাস্ত করা যাক।" ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য বলিলেন, "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ইহাতে শঙ্করকে অনায়াসেই পরাস্ত করা হইবে কেবল এই কামাখ্যাদেবীর দেশে আসিলেই বিপদ্ যাইবে, অপেক্ষা করুন।" বহুতর কপটী পণ্ডিত বলিলেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম এই ভাবে বিলুপ্ত করিবার কোন সম্ভাবনা দেখিলেন না। তিনি বলিলেন, "সকলে মিলিয়া এই ধর্মের নিন্দা ও অযথা করা যাক তাহা হইলে সাধারণের মনে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জন্মিবে।" শাক্তেরা তাহাই করিতে লাগিলেন, যেখানে সেখানে বৈষ্ণবনিন্দা ও শাক্তাদিগকে লইয়া সভায় চলিতে লাগিল। একদিন বহুতর নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাগত হইলেন, বৈষ্ণবেরা তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে স্বীকার করিলেন না, তাহা তাহার নিকট বিদায় লইয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন যে তাহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। বহুতর কপটী নিজের স্থানে বসিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। শাক্তেরা বিদ্বান্ হইলে কতকগুলি শুষ্ক শ্লোক-ঘটিত তর্ক করিতে পারেন, কিন্তু শঙ্করের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিলেন না। এদিকে বহুতর পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের মন যোগাইতে চেষ্টিত হইলেন, তিনি তাঁহার নিকটস্থ কতক টাকা তাঁহাদের হাতে আসিয়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁহার পক্ষ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ইহাতে ব্রাহ্মণ দলের ভাব অনেকটা অনুকূল হইল এবং ইহাদিগকে দেখে তর্ক করিতে লাগিল। এই সময়ে তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণের সহায়তায় শাস্ত্র অস্থি সরল সুন্দর আসামী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অহমরাজের শাক্ত পণ্ডিতেরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে তুমুল অত্যাচার করিতে লাগিলেন, এমন কি একজন শঙ্কর কোনরূপে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রিয় শিষ্য হরি নিহত হইলেন। অহমরাজদিগের অত্যাচারে শঙ্করদেব বুঝিলেন, কামাখ্যাদেবীর প্রতাপ আসামে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। তিনি বরপেটায় আসিয়া কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের আশ্রয়ে বাস করিয়া নিশ্চিন্তমনে ধর্মপ্রচারের খুব সুবিধা পাইলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার এক প্রধান শিষ্য জুটিল—নারায়ণ দাস। এখানেও প্রথম শঙ্কর বড়ই কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন, কারণ ব্রাহ্মণেরা রাজা নরনারায়ণকে জানাইলেন, শঙ্কর-শিষ্যেরা ভগবানের নিকট মাথা নত করে না কামাখ্যাদেবীকে মানে না ইত্যাদি। রাজা শঙ্করকে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন, শঙ্কর বিনা আপত্তি করিয়া পলাইয়া গেলেন। তাঁহার দুই শিষ্য নারায়ণ দাস ও হেরুক দাস ধৃত হইয়া রাজার নিকট আনীত হইলেন। ইহারা কিছুতেই দুর্গাপ্রতিমার নিকট মাথা নোয়াইবেন না—এজন্য রাজা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাদিগকে বধ্যভূমিতে শূলে চড়াইয়া শেষে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন,

ভীষণ আঘাতে নারায়ণ নামক শিষ্যের একখানি হাত ভাঙ্গিয়া গেল, সেবে অসহ্য পীড়ন সহ্য করিয়া ইহারা গুরুর নিকট মস্তক অবনত করিলেন, কিন্তু শঙ্করদেবের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। রাত্রে ইহাদের দেহ হইতে লোহশৃঙ্খল খসিয়া পড়িল, তখন ইহারা রক্ষীদিগকে পুনরায় তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিয়া প্রহরীরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শঙ্কর লুকাইয়া কোথায় থাকিবেন? তিনি নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। চিলা রায়ের চেষ্টায় শঙ্কর নরনারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। শঙ্করের সোম্য মূর্ত্তি, সরস্বতীর বরের মত সুস্বর এবং চরিত্রের মহত্ত্বপূর্ণ গাম্ভীর্য্য রাজাকে মোহিত করিল। তিনি রক্ষীদিগকে সভায় ডাকাইয়া আনিয়া বিচার করিতে আদেশ করিলেন। শঙ্করের নিকট রাজসেনা পরাজয় স্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহার এমনই বিনয় ছিল যে রাজসেনা ক্রোধপ্রকাশের কোন সুবিধা পাইলেন না। গোট সাহেব দুইটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। একটিতে কথিত আছে, রাজা নরনারায়ণ শঙ্করের গুণিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন এই দ্বিতীয়টির সত্য রাজা নরনারায়ণ নহেন, চিলা রায় তাঁহার ছদ্মবেশধারী হইয়া ছিলেন। রাজা স্বয়ং শঙ্করের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাহা হইতে পারে নাই। রাজা শঙ্করকে পাড়ুকের বসা এবং তৎসম্বন্ধিত গুণগুলির লক্ষণকথন শিখাইতেন, কিছুকাল এই কাজ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারকার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে, তিনি বৈদিক ধর্ম্ম পড়িতেছেন, তখন সেই কাজে ইস্তফা দিয়া তিনি কোচবিহারে আসিয়া বাস করেন, এই সময়ে তাঁহার বহু শিষ্য হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মথুরাদাস খাক (বরপেটা নিবাসী) মধুপুরের বিষ্ণু আতা, কমলাবাড়ীর বহুদা আতা, কেশব আতা (ভাটোকুচি নিবাসী), চামটাবাড়ীর বিষ্ণু আতা, বৈদ্যনাথ নারায়ণ দেব ঠাকুর, দালোগাঁয়ের রামচরণ ঠাকুর হরিদেবমিশ্রের পুত্র মাধব এবং তাহার কাশী লক্ষ্মীকান্ত আতা—এই কয়েকজনকে তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন। মাধব পুরুষোত্তম সম্প্রদায়ের এবং রামদেব আর এক সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছিলেন। রামদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ বহু ব্রাহ্মণ এই বলে লিখিয়াছিলেন। আসামী লেখকগণের মতে কন্দলীয় দৈত্য, বী এবং রামরায়ই শঙ্করদেবের জীবনচরিতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য, ইহারা এবং অপরাপর কয়েকজন কবিগণ লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। একখানি প্রাচীন আসামী হাতের লেখা পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্রে চৈতন্য ও শঙ্কর উভয়কেই উপবিষ্ট দৃষ্ট হয়, চৈতন্যদেব উপদেশ দিতেছেন এবং শঙ্কর তাহা সম্ভ্রমের সহিত শুনিতেছেন। শঙ্কর চৈতন্য হইতে বয়সে বড় ছিলেন এবং উভয়েই সমসাময়িক ও অতি নিকটবর্ত্তী দেশবাসী—উভয়েই বৈষ্ণব ধর্ম্মের নেতা। এরূপ অবস্থায় উভয়ের এই মিলন কথা যখন এতকাল আসামীয় পুঁথিতে বর্ণিত আছে, তখন দুইজনের সাক্ষাৎকারের কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না কিন্তু শঙ্কর বৈদ ভক্তি এবং জ্ঞানমার্গের দিকে বেশী জোর দিয়াছিলেন, চৈতন্যদেবের প্রেমের গতি 'রাগানুগা'—উভয়ের দুই স্বতন্ত্র পন্থা। শঙ্কর নৈতিক উপদেশের মুক্তাবলী ছড়াইয়া গিয়াছেন,

চৈতন্যদেব স্বীয় প্রেম রূপ দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইয়াছেন সেই ভাববিহ্বলতার বন্যার মধ্যে উপদেশ দেওয়ার অবকাশ খুব কমই ছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের কোন প্রভাব যে শঙ্করদেবের উপর পড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় না।

কথিত আছে শঙ্করদেব একদিনের মধ্যে ভাগবতের একখানি মধ্যানুবাদ আসামী ভাষায় রচনা করিয়া রাজা নরনারায়ণকে 'দক্ষিণা' দিয়াছিলেন কোন ব্রাহ্মণ তাহা এত অল্প সময়ের মধ্যে করিতে পারেন নাই। শঙ্করের এই ভাগবতের অনুবাদখানির নাম 'গুণমালা'। মৃত্যুকালে শঙ্করের পার্শ্বস্থিত বালক পুত্র রামানন্দ ঠাকুর বলিলেন, "বাবা, আমাকে কি দিয়া যাইতেছেন?" শঙ্কর বলিলেন "তোমার মাতার স্তন ও মণিমাণিক্যের বৈভব আছে, তাহা ছাড়া রাজা নরনারায়ণ এবং রাজকুমার লক্ষ্মীনারায়ণ যে অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন তাহা তোমারই রহিল।" রামানন্দ চক্ষের জল মুছিতে বলিলেন, "আমি এ সকল পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতেছি না বাবা, আমার পরকালের সম্বল হয় এমন ধন আমি আপনার নিকট চাই।" মৃমূর্ষুর মুখমণ্ডল আনন্দে ক্ষণেকের তরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "তুমি আমার যোগ্য পুত্র—আমার কর্ম্মজীবনের সঞ্চিত যাহা আমার ছিল শঙ্করকে দিয়াছি, তাহার সহিত আমার কোন প্রভেদ নাই। তুমি যাহা চাও, তাহার নিকট পাইবে।"

কিরূপে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্রমশঃ বড় হইয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল এবং পরিশেষে অহমরাজদের অকথ্য অত্যাচারে তাহারা চক্রের জপমালা ফেলিয়া অসি ধারণ পূর্ব্বক এক রাজাকে নিধন করিয়া কতকালের জন্য সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল—তাহার বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে দিয়াছি।

আসাম নানা রূপ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। আসামের মেখলা বস্ত্র মেয়েরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহাদের কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তদ্ভিন্ন কাষ্ঠের কারুশিল্প—অতুলনীয়। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসামে যে প্রাসাদ ছিল, তৎসম্বন্ধে একজন সাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে কাষ্ঠের যে অপূর্ব্ব কারু দেখা যায়, এবং অপরাপর শিল্পের যে নিদর্শন আছে—তাহা সুতরাং, তাহা আমার লেখনীর বর্ণনার অতীত। বোধ হয় জগতের আর কোন স্থানে কাষ্ঠের ঘরে এরূপ অদ্ভুত সৌন্দর্য্য এবং শিল্পকলা অন্য কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। প্রতি প্রকোষ্ঠে গবাক্ষগুলির শিল্পনিপুণ আদর্শ নানারূপ মনোজ্ঞ আকৃতিতে গঠিত হইয়া এরূপ মনোহরতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে যখন সূর্য্যের আলো তাহাদের উপর পড়ে, তখন প্রকোষ্ঠগুলি ঝলমল করিয়া চোখ ধাঁধিয়া দেয়। রাজার শয়ন-গৃহ ছাড়াও অন্যান্য কাষ্ঠের অট্টালিকা এত সুন্দর, তাহাদের সুগঠিত অবয়বে চারুশিল্পের এরূপ মনোহারী খেলা যে, তাহা দেখিবার সামগ্রী, ভাষা দিয়া এই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য বোঝান যায় না"। (গেট সাহেবের ইতিহাস, ১৫১ পৃঃ) এইরূপ কাষ্ঠ ও বেত শিল্প দ্বারা নির্ম্মিত ঘরের প্রাচুর্য্য এক সময়ে খাস বাঙ্গলা দেশেও ছিল। আমরা ৫৫৮-৬৩ পৃষ্ঠায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

শিল্প ও স্থাপত্য

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কোচবিহার

কোচবিহার বহুকাল যাবৎ নরক বংশীয় রাজাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সুতরাং আদি যুগে প্রাগজ্যোতিষপুরের ইতিহাস হইতে বর্তমান কোচ রাজ্যের ইতিবৃত্ত এক সময়ে অভিন্ন ছিল পালবংশের কয়েকজন রাজার নামও আমরা পূর্বে করিয়াছি। ইঁহারা সেনবংশের সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন রঙ্গপুর হইতে তেজপুর পর্যন্ত এক বৃহৎ জনপদ ইঁহাদের শাসনাধীন ছিল। পালদের রাজধানী ছিল, ত্রিমলা ব্রহ্মপাল হইতে ধর্মপাল পর্যন্ত পাঁচ পুরুষ। ধর্মপালের পুত্র ধর্মপাল, কথিত আছে পল্লীপতিকার বাণিকচন্দ্র রাজার সঙ্গে ইঁহার কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল, বাণিকচন্দ্র রাজার উপকথা সাহিত্যে দুই হয়, প্রসিদ্ধ রাজা ময়নামতীর সঙ্গে ধর্মপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। ধর্মপালের পরে গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) রাজা হন। ইঁহার সন্ন্যাসসম্বন্ধে অনেক কথা সমস্ত ভারতবর্ষে ঐতিহ্য আকারে প্রচলিত আছে। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র অজ্ঞাতবশে দেশময় খাড়ি অখাড়ি ? অঞ্জন করিয়াছিলেন। ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গরচন্দ্রের নিম্নশ্রেণিতাসম্বন্ধে বহু উপকথা আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি। গরবাজগণ এই রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীর অদ্ভুতবীর ইতিহাস যথাশক্তি কল্পনার সাহায্যে সাজাইয়া তাঁহাদিগকে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, সে সকল কথা শুধুই ভিত্তিহীন গল্প। ভবচন্দ্র ও গরচন্দ্র মন্ত্রী নাকি কর্ণ ও নাসিকা-রন্ধ্র তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাজসভায় বসিতেন—পাছে সেই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি রন্ধ্র পথে পলাইয়া যায় ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে ইঁহারা প্রজাদের আবেদন নিবেদনে কাণ দিতেন না। আর একটি গল্প এই যে একদা একটা কাক ঠোঁটে করিয়া চিঁড়াই দিয়া আনিয়া সেই রাজ্যে ফেলিয়াছিল। সে দেশে চিঁড়াই অজ্ঞাত ছিল, রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ জিনিসটা কি ? মন্ত্রী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন "ঘুণে পূর্ণিমার চাঁদটাকে খাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে" ভবচন্দ্রের রাজধানী রঙ্গপুর জেলার বাগডুর পরগনায় ছিল এখানে তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে এই শাখার পালদের শেষ রাজার নাম "পালা রাজা"—ইঁহারও রাজবাড়ীর চিহ্ন এখনও বাগডুবে দেখিতে পাওয়া যায় তথায় "পালাগড়" দুর্গের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

ধর্মপাল হইতে ভবচন্দ্র।

অনেক দিন পর্যন্ত এই দেশে অরাজকতা চলিয়াছিল, ইহার পরে কোচবিহার রাজ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ অহমরাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। যেন রাজাদের সঙ্গে মুসলমানদের এবং অহমরাজগণের যুদ্ধ বিগ্রহ পূর্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যেন রাজাদের পতনের পর কতকগুলি কোচ (রাজবংশী) নেতারা স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপন-পূর্বক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। এই খণ্ডরাজ্যের একজন দলপতির নাম ছিল হাজো জারা ও হীরা নামে ইঁহার দুই সুন্দরী কন্যা ছিল। ইঁহারা উভয়েই চিকনা পাহাড় নিবাসী

মেড সংশ্লিষ্ট হাড়িয়া মেচ নামাঙ্কর বেহারি বা হাবদাস নামক এক বালকের সহিত পরিচিতা হন তাঁহার গর্ভে চন্দন ও মদন নামক দুই পুত্র জন্মে। কিন্তু ইঁহারা যেমনই রূপবন্ত, তেমনই শিশুর সমস্ত কার্য্য ও ক্রীড়া বর্জ্জনী ছিলেন তাহাতে বয়ঃ প্রাপ্তের সহিত > ক্রমে লক্ষ করিয়া তিনি বড় ব্যস্ত হন এই বলে দেবী তাঁহার শিশু নামক এক অদ্ভুত প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র লাভ করে।

কিম্বদন্তী এরূপ, এই সব বিষয় সম্বন্ধে শক্তির কথা বলিয়া কান্ত হওয়া যায় না। দেবী জন্মগ্রহণ ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে ১৬০০ খৃঃ অব্দে মহারাজ সংক্রান্তির দিন তাঁহার গর্ভে শিশু ১৬০১ খৃঃ অব্দে একটি পুত্র হইয়াছিল। 'চিকনা পাহাড়ে ডুডকা কোচ নামক এক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু আটটি পল্লী সংগঠন একটি রাজ্য স্থাপনের কামনা করিতেছিলেন। দৈবক্রমে শিশু একদিন একটি বালককে হত্যা করিতে ডুডকা কোচদের সেনাপতি বিশু ও তাঁহার সহচরগণকে ধৃত করিবার জন্য আদিষ্ট হন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার ভক্ত হইয়া বলে ও দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির দ্বারা বড় থাকিতে পারিবেন না বলিয়া ভাবিলেন। ডুডকা কোচদের সহিত এই কিশু নামের সম্বন্ধে বিস্তর ভেদ আছে তাহার পরিচয় পূর্ব্ব মদন অবতার হন, কিন্তু বিশু ডুডকা কোচদিগকে চতুর করিয়া রাজ্যের ও পারিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন ডুডকার পরিবারবর্গ হিন্দুই ছিলেন মুসলমান হইয়াছিল ইহার প্রথমে কুচবিহার পুত্র [illegible] ৬৯০ বঙ্গাব্দ করিলেন। চন্দন ভোজ ভক্তা, সুতরাং তিনিই রাজা হইলেন [illegible] পরগণে আকৃষ্ট হইয়া, দশ গ্রামের নেতা, [illegible] নেতা ও [illegible] নেতারা চতুষ্পার্শ্ব হইতে আসিয়া [illegible] অধীনতা স্বীকার করিল চন্দন ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন।

কিন্তু 'বিশ্বসিংহ' তন্ত্রাদি গ্রন্থানুসারে ১১ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫৮২ খৃঃ অব্দে রাজপদে [illegible] হন। প্রথমে তুর্কিদের সন্ধি করিয়া ইহার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিল। ভোট রাজ [illegible] বঙ্গেশ্বরকে কর দিলেন, সঙ্কটসময়ে সাহায্য করিলেন, এবং রাজ্য [illegible] সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর বিষয়ে কোচবিহার রাজা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেন। মন্ত্রির এই সময় ইহার আদেশে মহারাজ চিকনা পর্ব্বত হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে পাট স্থাপন করেন ইনি ইহার বালা সহচরদিগকে খণ্ডরাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বাহু দুর্গাদি অনুচরগণকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। বিশ্বসিংহ ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি মোক্ষ সাধনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া চিকনা পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ বিশ্বসিংহের দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহার রাজত্ব শিবসংশায় ভূপতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ (তিনি এবং চিরকুমার মহাবীর ছিলেন, ইঁহার পরাক্রমে বহু রাজ্য কোচবিহারের প্রাধান্য স্বীকার করেন, নরনারায়ণ রাজা হইয়াই

গৌড়দেশ আক্রমণ করেন—নিরুপায় কোন মুসলমান সেনাপতিকে নিযুক্ত করিয়া চিলা রায় চিলা রায়। পাঠানদের রাজত্বের শেষকাল। আলেমান করবানীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র দাউদ পুনঃ পুনঃ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকেন। যখন বহু সৈন্য লইয়া পাঠান নৃপতি ব্যস্ত, সেই বিপত্তিকালে নরনারায়ণের কোন সেনাপতিকে হত্যা করিয়া উত্তরবঙ্গের খানিকটা কাড়িয়া লইয়াছিলেন চিলা রায় তাহাদের সুযোগ্য যোদ্ধা, রাজাকে পরাস্ত করেন। সুযোগ্য নরনারায়ণের অধীনে স্বীকার করিয়া রাজকুমার শুকর রহিলেন এবং আরো কতোকটি সম্ভ্রান্ত বংশের যুবককে সম্মানস্বরূপ বহু উপঢৌকনসহ পাঠাইয়া দিয়া করেন। অতঃপর চিলা রায় কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্যসহকে সঙ্গে করিয়া উক্ত রাজ্যকে নরনারায়ণের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। কথিত আছে কোন যুদ্ধে আলেমান করবানী চিলা রায়কে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন এবং চিলা রায়ের উপর তাঁহার বিশেষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সহিত স্বীয় এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কন্যাটি এই একদা চিলা রায় মনে মনে চিন্তা করিলেন—সমস্ত রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছি আর রাজার ভয় নাই করি, অপরাপর রাজাদিগকে এই রাজ্যের অংশ দিব, অথচ যাহা নরনারায়ণ রাজ্যভোগ করেন তাহা অসহ্য, আমি আর এ ভাবে থাকিব না। এই মনে করিয়া তিনি খড়্গহস্তে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরনারায়ণের মুখ প্রসন্ন বলিয়া সন্দেহ বা বিচার লেশ নাই, সকলকে যে ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল দেখে উজ্জ্বল হইয়াছে পরন্তু যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখিলেন, স্বয়ং ভগবতী তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। নরনারায়ণ ১৪৮৫ খৃঃ। তখন হাতের খড়্গ ফেলিয়া দিয়া তিনি রাজার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া "আমি ব্রাহ্মণের আমাকে ক্ষমা করুন—আমার পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার এই অভিপ্রায়ের কথা জানাইলেন যে তিনি রাজাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া নিজে কাঁদিয়া বলিলেন, "ভাই, দুঃখ করিবেন, তুমি আমাকে দেখিলে, আমাকে তিনি কোলে করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম না"

অনেকের ধারণা রাজার বিষ্ণু মন্ত্র কানে বলিয়া দিলে, মানুষ এক বৎসর বা তার সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন তবে বিষ্ণু কাটিতে পারে, তদনুসারে মহারাজ নরনারায়ণ একবৎসর সন্ন্যাস লইয়া গৃহাশ্রম ছাড়িয়াছিলেন এই সময়ের জন্য শুক্লধ্বজ (চিলা রায়) রাজত্ব করিয়াছিলেন. এই সময়ে শঙ্কর দেব (১৪৮৯-১৫৬৯) কোচবিহারে আসিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনকাহিনী হইতে জানা যায়, তখনও কোচবিহারে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব খুব বেশী ছিল রাজধানীতে বড় বড় পঞ্চচূড়াকমন্দির ছিল এবং প্রজারা শিবভক্ত কালাপাহাড় কামাখ্যামন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল—নরনারায়ণ তাহা সংস্কার করেন। মন্দির গাত্রে নরনারায়ণ ও চিলা রায়ের প্রতিমূর্তি ক্ষোদিত আছে নরনারায়ণ যে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারায়ণী মুদ্রা—বহুকাল উহা কোচবেহার রাজ্যে প্রচলিত ছিল.

নরনারায়ণ স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিদ্বান্‌দের আদর করিতেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃতে ব্যাকরণ রচনা করেন এবং অনন্ত কন্দলী ভারবি ও মাঘকাব্যের পদ্যানুবাদ সঙ্কলন করেন। ইহার রাজত্বকালে শঙ্কর ও মাধবের স্থূল নাটকগুলি রচিত হয়।

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও বিলাসপরায়ণ। তাঁহার সময়ে মুকুন্দ সার্বভৌম নামক এক পণ্ডিতকে উপাধি আদায়ীকরণের জন্য রাজা অবমাননা করেন। এই ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হইয়া ভাগীরথীকে স্মরণ করেন। মোগল-সৈন্যের সঙ্গে সমরে উদ্যত হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তাঁহার এক কন্যাকে তিনি মানসিংহের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবরনামায় কথিত আছে যে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ২০,০০০ পদাতিক ৭০০ হস্তী এবং ১,০০০ ভারক্ষম ছিল—তাঁহার রাজ্যের আয়তন ছিল ২০০ ক্রোশ এবং প্রস্থ ১০০ হইতে ৮০ ক্রোশ ছিল—উহা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে তিব্বত সীমান্তে মেচরাষ্ট্র এবং পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলদিগের সঙ্গে সন্ধি হইবার পরে নরনারায়ণ মুসলমান অনেক মোগলপ্রভাবের চিহ্ন থাকিলে, উভয় রাজ্যের সীমা যথাসম্ভব থাকিবে এবং কোন রাজাই অন্য রাজ্য উপদ্রব করিতে পারিবেন না, এই স্থির হইয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার রাজ্যের পূর্বাংশ ছিলা রাজ্যের সন্তানদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন। এই অংশের রাজার সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের অসদ্ভাব হইয়াছিল। ফলে মোগল সহায়তায় পূর্ব কোচরাজ্যের রাজা পরীক্ষিৎকে লক্ষ্মীনারায়ণ পরাস্ত করেন এবং পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর সেই অংশ মোগল সরকারের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু কোচেরা বেশদিন মোগল প্রভুতা স্বীকার করিল না। আকবরের সৈন্য সমস্তই তাড়াইয়া ধ্বংস করিল। পুনঃ পুনঃ অভিযানের পরে ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া রাজা বলিনারায়ণকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। পূর্বাংশের রাজারা অহম রাজাদিগের সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা অনায়াসে বড় নদীর পশ্চিমের অংশের অধিকার করিল। পরীক্ষিতের রাজা অহমরাজের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে অহমরাজ এবং ত্রিপুরা রাজ কোচবিহার সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তিনি মোট ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বীরনারায়ণ রাজা হইলেন, তখন কোচবিহারের সীমা অনেক সঙ্কুচিত হইয়াছিল। ধর্মোক্ত নেতারা স্বাধীন এবং মহারাজের অভিষেকোৎসবে ছত্রধরের কাজ করিতে অসম্মত ত্রিপুরারাজের আনুগত্য স্বীকার করিল না। মহারাজ বীরনারায়ণ আতাব-কোঠায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার রাজ-প্রাসাদের নাম দিলেন "মতল আবাস"। তাঁহার রাজত্বকালে নারায়ণ ত্রৈলোক্যবর্তী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোচবিহারে

বীরনারায়ণ ১৬২১-১৬৪৫ খৃঃ।

আসিলেন, রাজমহিষীরা তাঁহার বীরত্বের বেশ দেখিয়া অপহরণে করিয়াছিল রাজা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিলেন এবং শিক্ষার মানোন্নতিতে বৃদ্ধি পায় এজন্য পল্লীতে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র ও স্বগোত্রীয়দের জন্য উচ্চশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল রাজারা বহুপত্নীক ছিলেন এই রাজার কোন মহিষীর গর্ভে এক পরমসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, বহু হওয়ার পরে উঁহাকে রাজা আর দেখেন নাই হঠাৎ অন্তঃপুরের উদ্যানে পরমসুন্দর কোচেরা যুবা দেখিয়া ইনি কামাতুর হইয়া তাঁহাকে

রাজার অদ্ভুত কার্য ও তৎফলে মৃত্যু।

ধরিতে যান, রাজকুমারী বিশেষ লজ্জায় আর্ত্ত হইয়া রাজার হাত ছাড়াইয়া অশ্ব পুরে প্রবেশ করেন। রাজ উদ্যানে ঐ নাগ মুন্সী এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"রাজকুমারী, তাঁহার বিবাহের যে স্বর্ণ চাকুনি ও পাঁচটি স্বর্ণ সিন্দুক অর্থাৎ কৌশলস্থ ছিল, তাহা এবং স্বর্ণদাল ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমেত নর্দ্দমা তটে গমন করিয়া সিন্দুক প্রস্তুলিত করিয়া স্বনেত্র অস্ত্রদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক স্বর্ণ থালাতে রাখিয়া সহচরকে দিয়া কহিলেন, 'পিতামহ দিও, তিনি তাঁহার বাঞ্ছা বাঞ্ছিত জানিবেন। আমি গমন করিলাম।' ইহা বলিয়া চারুনিবর্ত্তি মস্তকে করিয়া নর্দ্দমাতে মগ্ন হইলেন ঐ নর্দ্দমার নাম হইল কুমারী নদ—ইহা অদ্যাপি আছে সহচরী থাল সমেত রাজার নিকট আসিয়া যথামাত্র মহারাজ তাহাকার শব্দ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতে লাগিল শোকে ও লজ্জাতে মৃতপ্রায় হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে মহাদেব, মৃত্যু সকাশাতে উপগত হওনের চেষ্টা করাতে তুমি ঈদৃশীর ছেদন করিয়াছিলে, আমাকে কেন শূলে আরূঢ় কর না।' মন্ত্রিবর্গ নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিল, ফলে মহারাজ পুনরায় রাজসভাতে আসিয়া বসিলেন না, লজ্জিত হইয়াই অল্পকাল ছিলেন পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১৭ শকে (কোচরাজ শক, যাহাতে ১০৩৩ সন বাঙ্গলা, ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ হয়, রাজা বীরনারায়ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসগামী হইলেন।"

বীরনারায়ণের পুত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণ ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন

প্রাণনারায়ণের সময় মুসলমানেরা পুনরায় কোচবিহার রাজ্যে হানা দিয়াছিল রাজা কিছুকাল পলাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতক জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ তাঁহার লুকাইবার স্থানের সন্ধান দিয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি ধৃত হইলেন, কিন্তু কোনক্রমে

প্রাণনারায়ণ—১৬২৪-১৬৬৪ খৃঃ

মুক্তি পাইয়া প্রবল সৈন্য লইয়া আসিয়া মুসলমানদিগকে স্বরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন মীরজুমলা সহ সৈন্য লইয়া কোচবিহার রাজ্য দখল করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু পথে তাঁহার মৃত্যু ঘটাতে মুসলমানেরা ফিরিয়া গেল, তজ্জন্যই মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজ্যে আর কোন উৎপাত হয় নাই জয়নাগ মুন্সী লিখিয়াছেন —"রাজা প্রাণনারায়ণ বাল্যকাল ও যুবা সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কবিকবি, প্রতিধর। মহারাজ বীরনারায়ণ যত বালককে পড়িতে দিয়াছিলেন, সকলেই পণ্ডিত হইল। রাজসভাতে অনেক পণ্ডিত —তন্মধ্যে বিশেষ পাঁচজন, তাঁহাদের দ্বারা পঞ্চরত্ন সভা হইল। রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমত পণ্ডিতের সভা আর

হয় নাই কবিরত্ন ও কবিভূষণ দুই মহা [illegible] পণ্ডিত। দৃশ্যবর্গ সমুদায় ও ধার্য পরব সকলেই আসিত, সংস্কৃতবাদিত অন্য ভাষাতে কথা ছিল না অন্য দেশের রাজাদিগের দূত ও প্রেরিত মহা রাজসভাতে আসিতে ইচ্ছুক: করিত। সর্ব্বদা সর্ব্বশাস্ত্রালাপ হইত " মহারাজ প্রাণনারায়ণ ভারতবর্ষের চৌষট্টি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ভবানন্দ মুন্সী লিখিয়া ছেন "আমার স্বীমানে এমত চাংসার ও অতবড় মন্দির কুত্রাপি দেখি নাই। বরং যাঁহারা বহু দেশ দেখিয়াছেন তাঁহারাও বলেন এমত মন্দির কেহ দেখেন নাই, যেন অমানুষী ক্রিয়া জ্ঞান হয়।" প্রাণনারায়ণ একজন অতুল প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন তাঁহার মন্দির ছাড়া স্থানে স্থানে শিবমন্দির, বাসুদেব ও রাধাবল্লভের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ১৬৬৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পরেই দুই কৈবর্তরা তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল, এই অপরাধে অনেক ব্রাহ্মণ ও কবিরত্নের শিরশ্ছেদ হয়। "মহারাজ প্রাণ-নারায়ণ বড় অদ্ভুত মনে পাঁচ অদ্ভুতে রাজকার্য্য করিতেন। বাল্য অবধি পূর্ব্বে সকল কার্য্য হইতে অবসর হইয়া তাঁহার সহস্রাধিক সমবয়স্ক রমণী সকল সমাজবাটীতে নানা রঙ্গ ও ক্রীড়া করিতেন। পুষ্পচয়ন পুষ্পমালা গ্রথন, পুষ্প অলঙ্কার ও পুষ্পশয্যা নির্ম্মাণ করিতেন এবং নানা খেলা হইত—সেস্থানে কখনও যাইতেন না। বয়স্থ অতি হইলে পুনরায় রাজকার্য্য করিতেন। সভা মধ্যে নানা বাদ্য ও সঙ্গীত শাস্ত্রে অধিকার ছিলেন। স্বকৃত এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহা আমি শুনিয়াছি, এমত গ্রন্থ ছিল তাহা পড়িলে বা শুনিলে সকল ব্যাকরণ অধিক এবং এমত পুথি অন্য কাহারো কৃত নাহা নাই অনেকে মনে করিলে পারিত পুথিখানি অগ্নিতে লোপ হইয়াছে, তাহার নকল যে কোন স্থানে আছে, এমত শুনি না " রাজ মালাখান।)

প্রাণনারায়ণের পুত্র মোদনারায়ণের সময় জাতি বন্ধের প্রবল হইয়া উঠে, এই সকল উপদ্রবে রাজা স্থির ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই তিনি ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার জাতি মহানারায়ণ ও তৎপুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহই মোদনারায়ণের রাজত্বের প্রধান ঘটনা।

মোদনারায়ণ — ১৬৬৯ ১৬৮৩ খৃঃ।

ইহার পরে কতক দিনের জন্য বাসুদেবনারায়ণ 'রায়কতদিগের চেষ্টায় রাজা হইয়াছিলেন ইনি মহারাজ প্রাণনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র ইনি দুইবৎসর মাত্র রাজত্ব করার পর মহানারায়ণের পুত্রদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন, রায়কত-নেতা জগদেব এবং জুজদেব মহারাজ প্রাণনারায়ণের পৌত্র মনোনারায়ণের পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন ইহার সময়ে মোগলেরা প্রথমত খাঁর নেতৃত্বে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভেতরপুর, কাজির হাট এবং কাকিনা চাকলা দখল করে, অবশেষে প্রদেশের কোন কোনটি গোপনে নরেন্দ্রকে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া কোচরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে মহেন্দ্রনারায়ণ ৫ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন,

বাসুদেবনারায়ণ ১৬৮৩ খৃঃ।

মহেন্দ্রনারায়ণ ১৬৮৩ ১৬৯৩ খৃঃ।

১৯ বৎসর বয়সে এই নামে মাত্র রাজা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং তিনি কোন সন্তানাদি রাখিয়া যান নাই।

মূল রাজবংশের ধারা এইখানে শেষ হয়। উহার মহানারায়ণের বংশধর রূপনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা আসিয়া পুনরায় চাকলা ঘোড়া, পটগ্রাম এবং পুন্ড্রাঞ্চল আক্রমণ করে। ১৭ বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ চলে, পরে সন্ধি হয়। এই সময় হইতে কোচবিহার রাজ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। পূর্বোক্ত চাকলাগুলি নামে মাত্র কোচবিহার কর্তৃক অধিকৃত থাকে, কারণ রাজা সেগুলি পুনরায় মোগল স্বরূপ বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে পট্টার পাট্টা প্রাপ্ত হন। ছত্রপতি রাজার পক্ষে ইহার জন্য প্রত্যহ ১৫০ টাকা করিয়া অথবা এককালীন রাজার পক্ষ হইতে তাঁহার জাতি পাত্রনারায়ণ ইহারা গ্রহণ করেন। এই সাল ১৭১১ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হয়।

রূপনারায়ণের ভোগ পূর্ব উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব স্বল্পকালব্যাপক ছিল। ইহার সময় মহম্মদ আলি খাঁ নামক এক পুরের ফৌজদার রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু ভুটিয়াদের সহায়তা গ্রহণ করিয়া মহারাজ রক্ষা পাইলেন। ৯৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮৯ বৎসর বয়সে উপেন্দ্রনারায়ণ পরলোকে গমন করেন। তাঁহার পাঁচখানি রাজ্য সমৃদ্ধ হইল।

উপেন্দ্রনারায়ণ ১৭১৬—১৭৯৫ খৃ.

ইহার পরে রাজপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চ বৎসর মাত্র। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে এক অচিন্তনীয় করুণ ঘটনায় রাজপুরী শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ মাতৃল জয়নারায়ণের ষড়যন্ত্রফলে গোসাই রামানন্দ একটী কুৎসিত কসাইএর কাজ করিলেন "অনেক কসাই ভাল গোসাইএর চেয়ে"—ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাটি এখানে সমালোচিত হইল। আমি ভবানাথ মুন্সীর বর্ণনা হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি। "রামানন্দ গোসাঞির সমভিব্যাহারে এক ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার নাম রাঢ় শর্মা। সে প্রায় সপ্তবৎসর বয়ঃক্রমপর্যন্ত থাকিত। মহারাজের তখন ষষ্ঠ বৎসর বয়স। একদিন অপরাহ্ণ বেলাতে কয়েকজন সমবয়স্কের সহকারে রাজবাটীর অগ্নিকোণে, পদ্মপুষ্করিণীর দক্ষিণ কোণে—যেখানে অদ্যাপিও একটা বৃক্ষ আছে—কুমারালোক কূপ খনন করিতেছে—ঐ স্থানে রাজা ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাকে সমক্ষ আনন্দে আছেন, এই সময় রাঢ় শর্মা অকস্মাৎ কোন্ দিক্ হইতে কি প্রকারে সঙ্গে এক ভরবারি হস্তে ধারণ করিয়া আসিয়া একাঘাতে মহারাজের শিরশ্ছেদ করিয়া বাম হস্তে কেশ ধরিয়া মুণ্ড লইয়া দ্রুতগতি ঐ পদ্মপুষ্করিণীর অগ্নিকোণে চণ্ডীর একটী ইষ্টকময় মন্দির ছিল, তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজের স্বর্ণ পুত্তলীর ন্যায় সরস ধূলাতে পতন হইয়া কবন্ধপ্রায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ধাত্রী ধরা পড়িত রাজার রক্ষক ও ভৃত্য সকল তাহাকার শব্দ করিয়া রক্তি শব্দের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ঐ মন্দির মধ্যেই কেহ শূল, কেহ তরবারি, কেহ বন্দুকের অগ্নি দ্বারা রাঢ় বর্মা ব্রাহ্মণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নষ্ট করিল। ইহা প্রকাশ

রূপনারায়ণ—১৭৯৫-১৮১৫ খৃঃ

হইতে পারিল না, রবি শর্মা ঠক করেন—কাজের কথাতেই এই দুরূহ কর্ম করিল রাজবাড়ী ফোটোগ্রাফ ক্রমশের অংশটি পূরিত হইল। কোন সূত্রে রাজার মৃত আনিয়া শরীরের নিকট রাখিল 'কেরোই' অর্থাৎ রাজমাতা নিমুপদের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া 'হা পুত্র হা পুত্র' বলিয়া কেন কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাজের কাঁটা যাওয়ার সংবাদ গোবিন্দজন মন্ত্রীর ও অন্যান্য কর্মচারীরা শুনিয়া হতবুদ্ধি পাগলের ন্যায় হইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হয়। আর আর মহিষীরা মহাত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন " যে বয়সে বয়স্ক বালক রাজার এবম্বিধ শোচনীয় মৃত্যুর কথা বলিয়া আমরা গুহবাসে কোচবিহারের ইতিহাস শেষ করিলাম। কারণ এখন হইতে রাজত্ব সত্ত্ব আলম সম্রাটের নিকট অন্তরে মুসলমানের হস্ত হইতে ছুট হইয়া কোম্পানির হাতে পড়িল ১৭৬৫। ইংরেজাধিকারের কথা আমাদের বিষয়বহির্ভূত। সংক্ষেপে নিম্নে পরবর্তী রাজগণের একটা তালিকা দিতেছি মাত্র —

মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ১৭৬৫-১৭৮৩ খৃ. (ইহার মধ্যে কতক সময়ের জন্য রাজ্যসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রাজা হইয়াছিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ।) মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ১৭৮৩-১৮১৩ খৃঃ মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ ১৮১৩-১৮৩৭ খৃঃ মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৭-১৮৬৩ খৃঃ মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৬৩ খৃঃ

নবম পরিচ্ছেদ

কাছাড় (হেরম্ব)

আমরা ত্রিপুরা, আসাম ও কোচবিহারের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া কাছাড় রাজ্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি, এই বংশের রাজারা একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইলেও এক সময়ে প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন।

বর্তমান কাছাড় রাজা ইংরেজ গভর্নমেণ্ট খাস করিয়া লইয়াছেন; ইহার আধুনিক আয়তন ৩,২০০ বর্গ মাইল। বর্তমান নওগাঙ্গ হইতে কাছাড় রাজ-বংশের দুইটি প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দুই হয় দিমাপুর ও মাইবাং। দিমাপুর রাজধানীর বিশাল অট্টালিকার স্তূপ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, ইহার রাজারা যে কিরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন,—তাহা ঐ সকল কীর্তি দেখিলে সহজেই অনুমিত হয়। এক সময়ে কাছাড় রাজ-বংশের গৌরব ও ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। কাছাড়ের বৃদ্ধ নৃপতি যখন ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচনের (বুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক) সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন ত্রিপুরেশ্বর নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন। এই বিবাহের

প্রস্তাবের কথা শুনিয়া "সর্ব্ব লোক পুলকিত কত কনে জন। ত্রিপুরকুলের বৃদ্ধি হবে হেন দেখি" ; রাজমালা ত্রিলোচনখণ্ড এদিকে ত্রিপুরার লোকেরা এই বিবাহ 'কুলক্রিয়া' বলিয়া মনে করিয়াছিল। কাছাড়ের রাজা এই সম্বন্ধ দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে চাহিয়াছিলেন,—ডেক্ক ও কোচদিগের আক্রমণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বৃদ্ধ ও অপুত্রক রাজা ত্রিপুরেশ্বরের মহায়তায় স্বীয় রাজ্যের বিলুপ্তপ্রায় ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং একদিকে ছিল 'কুলক্রিয়া' ও অপরদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা অনুমিত হয় কাছাড় রাজবংশের আভিজাত্যের গৌরব সেই সময়ে খুবই ছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই বিবাহটির কথা না বলিয়া লিখিয়াছেন—"রাজা-ই নরপতির জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড়ে রাজ্য স্থাপন করে, সেই নরপতির কনিষ্ঠপুত্র ত্রিপুরা রাজবংশের আদি পিতা।" অর্থাৎ ত্রিলোচনাদির আক্রমণ তিনি অস্বীকার করেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক রাজার দুই পুত্র, একজন ত্রিপুরা ও অপরটি কাছাড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এই অনুমানের ভিত্তি কোথায় তাহা জানি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৃদ্ধ কাছাড় রাজ আত্মিকাতা গঙ্গাতীরে, কিন্তু বর্ম্মার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ত্রিলোচনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার যখন সৌহৃদ্য হইয়াছিল, এই যখন সৌহৃদ্যের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুপতিকে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন। এই জ্যেষ্ঠপুত্রকে গ্রহণ করাতেও দৃষ্ট হয় যে তিনি মানসম্ভ্রমে ন্যূন ছিলেন না, তাহা না হইলে ত্রিপুর-রাজ কখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে শ্বশুরালয়ে চিরদিন থাকিতে দিতে সম্মত হইতেন না।

মহাভারতের বীরগণের সহিত সম্বন্ধ।

ত্রিপুর রাজবংশ যেরূপ যযাতি-পুত্র দ্রুহ্য হইতে তাঁহাদের বংশলতিকা টানিয়া দেখান,—কাছাড়-রাজারা সেইরূপ ভীম-পুত্র ঘটোৎকচকেই তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। মণিপুরের রাজারা অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজারা কৃষ্ণদ্বেষী নরকাসুরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাঞ্চলের রাজারা মহাভারতের রাজন্যগণের শাখা উপশাখার সঙ্গে সম্বন্ধের দাবী করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন। উত্তর বঙ্গের কোন কোন স্থানে বিরাটের গোগৃহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে আমরা দেখাইয়াছি, ঢাকা জেলার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গলে চেদিরাজ শিশুপালের পৃষ্ঠাসনের এখনও পরিচয়দিগণ দেখাইয়া থাকেন মহাভারত প্রদেশের কল্পনাকে এরূপ প্রবুদ্ধ করিয়াছিল যে সেই মহাপুরাণের উল্লিখিত বীরগণের সঙ্গে রক্তসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে এদেশের রাজারা কৃতার্থ হইতেন এ শুধু পূর্ব্বভারতের কথা নয়, কোন কালে আবু পাহাড়ে যজ্ঞ করিয়া শক ভাতারা কয়েকজন বীরকে যজ্ঞবেদী "অগ্নিকুল" নাম দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা এখন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। এই দুইটি জ্যোতিষ একটি উজ্জ্বল অপরটি ম্লান—আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরুষদের পূর্ব্ব পুরুষ,—এখনও পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উদয়াস্তের লীলা করিতেছেন ও মানুষের ধারণার স্পর্দ্ধা দেখিয়া হয়ত

হাসতেছেন। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়া অন্যান্য জাতিকে নগণ্য মনে করিতেছেন। আত্মশ্লাঘার মূলে এই সকল গল্প ও জনশ্রুতি। কাল কালে কেহ কি এগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? তবুও এরূপ সম্ভব যে রাজপুত ও আর্যাবর্তের পশ্চিমে অবস্থিত ভূখণ্ডের লোকের অপেক্ষা ত্রিপুরা ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের রাজাদের বংশ বলা সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ধ্বংসই হইয়াছে অহম রাজত্ব করিবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু ত্রিপুরের ক্ষেত্রে এমনটি অজ্ঞাত। কাছাড়ের রাজাদের ১। ঘটোৎকচ হইতে (২) মেঘবর্ণ, ৩ মেঘদল ৪ তাম্রধ্বজ ৫। কেতুধ্বজ হইতে অকম্পধ্বজ পর্য্যন্ত ৬ জন "ধ্বজ" উপাধিক এবং ৭ জন হইতে মহদনন্তের পর্য্যন্ত ৭ জন "নারায়ণান্ত" উপাধিক, তৎপরে ৮। 'চন্দ্রধ্বজ হইতে হেমধ্বজ পর্য্যন্ত পুনরায় ৭ জন ধ্বজ উপাধিক,—তৎ পিশাচচন্দ্র হইতে বীরচন্দ্র পর্য্যন্ত ১৫ জন "চন্দ্র" উপাধি ধারণ করেন। ৯। পুরন্দরপাল হইতে ১২। মেঘনারায়ণ পর্য্যন্ত ৪ জন 'পাল' ও নারায়ণ' এই দুই উপাধিই ব্যবহার করিয়াছেন নাম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারিতেছি। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার "রাজমালা" গ্রন্থে এই সকল নামের তালিকা দিয়াছেন (২৮৮-২৯১ পৃঃ)। শুধু কতকগুলি নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস এমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হাণ্টারের Annals of Rural Bengal নামক পুস্তকে কাছাড়ের একটি বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত (৩৩৩ পৃঃ)। এই সকল বংশাবলীতে কতকগুলি প্রবাদ ও পৌরাণিক উপাখ্যানের উপর উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, 'কাছাড়'—নেপালী শব্দ। কেহ কেহ বলেন, উহা সংস্কৃত একটি শব্দ হইতে উদ্ভূত তাহার অর্থ "প্রান্তদেশ"। পুরাকালে এই দেশ সম্ভবতঃ 'মেচ' বা ভেদ্ধ জাতির নিবাস ছিল। একটি সুবিস্তৃত অংশে বড়ো এবং তৎসম্পর্কিত ভাষা প্রচলিত, তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে এককালে হয়ত সমগ্র আসাম এবং বঙ্গ দেশের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল সমস্তই 'বড়ো' জাতির অন্তর্গত ছিল। কাছাড়ের কোন সংহত ইতিহাস পাওয়া যায় না,—তাহাদের সহিত অহম রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের কথা আসাম বুরুঞ্জীতে প্রাসঙ্গিক ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল, অর্থাৎ শিবসাগর হইতে কলাং পর্য্যন্ত এবং ধানশ্রী উপত্যকা এবং নওগাঁর অন্তর্গত কাছাড়ি বিলাস অধিকার করিয়াছিল। ১৪২৬ খৃঃ অব্দে ইহারা অহমদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৪২৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অহম রাজের সহিত অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল—উত্তর পক্ষের জয়পরাজয় ঘটিয়াছিল কিন্তু পরিশেষে কাছাড়ীদের জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধে কাছাড়ী রাজ পুনঃপুনঃ বন্দী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুচরদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিল।

কিন্তু দৈবের পুনরায় 'বজ্রাঘাত' হওয়াতে অহমগণ তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করিয়া ফেলে,—এইরূপ ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ীর হিমাপুর ছাড়িয়া মাইবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করে

কাছাড়ীদের পূর্ব্ব যেরূপ ইতিহাসে কিছুই পাওয়া যায় না, প্রবাদ এই যে আদি কালে কাছাড় ত্রিপুরেশ্বরের অধিকৃত ছিল। কিন্তু তাহারা রাজার সহিত ত্রিপুর রাজ স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া ঐ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার তাহাদিগকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন।

১৬০৩ খৃঃ অব্দে জয়ধ্বজরাজ ধনঞ্জয়কে পরাস্ত করিয়া কাছাড়রাজ একজন "খাঁর মর্দ্দন" উপাধি গ্রহণ করেন, ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর পর কাছাড়রাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অর্দ্ধেক অধিকার দান করেন। এক্সলমকে নাইক কবি বঙ্গভাষায় "হেড়ম্বচন্দ্র" নামক একখানি বড় পুথি লিখিয়াছিলেন। ইহার পর মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, প্রথম বার মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া চলে কিন্তু আহোমদের সঙ্গে যুদ্ধকালে বঙ্গেশ্বরের (কোঁয়র খাঁ, সময় কাছাড়ীদের ভূত প্রধানের তুল্য অনুমান করি) সাহায্যার্থ মুসলমানেরা সমৈন্যে কাছাড় আক্রমণ করে ও জয়ধ্বজকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। প্রতাপ সাহকে একলক্ষ টাকা মূল্যের ৫০০০ টাকা, বঙ্গেশ্বরকে এবং খানজাদে মুবারিজ খাঁকে ২০,০০০ টাকা দিয়া মুক্তি করেন। ইহা ছাড়া তিনি ৯৫টি হাতী ও ৫টি ঘোড়া বঙ্গেশ্বরকে (?) দিয়াছিলেন। প্রতাপসাহ ও মহেন্দ্র ছাড়িয়া কাঁঠীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে বীরদর্পনারায়ণের সঙ্গে অহম রাজ চক্রধ্বজের মনোমালিন্য ঘটে, কিন্তু চক্রধ্বজ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়াছেন শুনিয়া বীরদর্প তাড়াতাড়ি অহম শিবিরে অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়া লইলেন। একটি শব্দ পাওয়া যাইতেছে ও হাতে ক্রমের দল অবতার চিত্রিত হইয়াছে এবং ইহা ১৬৭১ খৃঃ অব্দে বীরদর্পনারায়ণের রাজত্ব কালে মোদিত হইয়াছিল—ইহা লক্ষ্মীর আছে। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে ভাগ্যধর রাজা অহম রাজ কন্যাদিগের পাণিগ্রহণ অস্বীকার করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অহম রাজদরবারে নীত হন, তথায় আনুগত্য স্বীকার করাতে কমলসিংহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু গৃহে ফিরিবার পথে খাসপুরে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মহারাজ কমলসিংহ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অন্য রাজ্যে ঘোষণার জন্য দূতকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল (১৭০৮ খৃঃ)। ভাগ্যধরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুরদর্পনারায়ণ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে বাণেশ্বর বাচস্পতি নামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্তৃক 'আদর্শ পুলস্ত' বিরচিত হয়। রাজমাতা চন্দ্রপ্রভার আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৭১৪ খৃঃ অব্দে কীর্ত্তিচন্দ্রনারায়ণ অহম রাজ রাজেশ্বরের অনুগত্য স্বীকার না করাতে পুনরায় যুদ্ধ হয় কিন্তু পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হইল। ১৭২১ খৃঃ অব্দে হরিশ্চন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অহম রাজের আনুকূল্য প্রাপ্ত হন। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র স্বর্ণগাঁও নিম্নাপূর্ব্বক তথাকার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মা দেশে দূত করিয়া বিপক্ষ পক্ষীয়রূপে ধরা হন। গাঙীর অধিবাসীরা ব্রহ্মদেশের অধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন—গোবিন্দচন্দ্র রাজা হন। এই রাজত্বকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কোঁয়রপাল নামক রাজপুত্র এক সৈন্যদল লইয়া রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করে। রাজা তাহাকে নিহত করেন, কিন্তু তৎপুত্র তুলারাম রাজ্যের উত্তরাংশ দখল করিয়া বসে। মণিপুরের রাজা মার্জিত সিংহ এই সময়ে কাছাড় আক্রমণ করেন

বিপদে পড়িয়া গোবিন্দচন্দ্র মণিপুরের নিকটবর্তী রাজা সুরাজিৎ সিংহের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সাহায্যে মণিপুর অধিকার করিলেন সত্য, কিন্তু সুরাজিৎ সিংহের পুত্র মারজিৎ এবং গম্ভীর সিংহ তাহার রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন না, সুতরাং যুদ্ধ-ব্যাপার হাতে উপনীত হইলেন। এক্ষণে কাছাড়ের সৈন্য কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাই ইংরেজ রাজের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষের সূত্রপাত, কিন্তু ইহার পরের কথা এই পুস্তকের বিষয়বহির্ভূত।

এই যুদ্ধান্তে উপসংহার করিবার পূর্বে শিমাপুরের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিব। রাজবাটীর দক্ষিণ দিকটা দুই মাইল পর্যন্ত ধনশ্রী নদীর উপকূল ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্মিত পাকা ঘাট দ্বারা বাঁধান ছিল। অহম্ রাজাদের অপেক্ষা কাছাড়ের রাজগণের বৈভব ও নির্মাণ-কৌশল অনেক বেশী ছিল, কারণ অহমেরা ইটের কাজ একবারে জানিতেন না। কাছাড়ের রাজারা বঙ্গদেশের কারিগর ও ভাস্কর্য্য আয়ত্তসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। ইটের উপর নানারূপ খোদাই, পুতুল ও ফুলের মূর্ত্তি অঙ্কিত, এবং ইহাদের কতকগুলির ইটের গাঁথুনি এরূপ শক্ত যে ১৩৭৩ সনের ভূমিকম্প হওয়ার পর এতকাল যাবৎ তাহারা একরূপ অটুট অবস্থায় আছে। কতকগুলি দেবদেবীর ১২ ফুট-উচ্চ নানা কারুকার্য্যখচিত শুদ্ধ দৃষ্ট হয়—তাহারা প্রায় দশ মাইল জায়গা জুড়িয়া আছে। সেই দেশের কারিগর যে এই সকল কারুকার্য্য বাঙ্গালীদের নিকট শিখিয়াছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভগুলি দূর হইতে অটুট অবস্থায় আনা সম্ভবপর নহে। শিমাপুরে কতকগুলি দীঘি দেখা যায়, উহারা বড়ই সুন্দর। ৩০০ হস্ত পরিমিত বেড়যুক্ত দুইটি দীঘি আছে—অপরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই সকল স্থানের কোনই সন্ধান হয় নাই, হয়ত অনেক নূতন তত্ত্ব জঙ্গলের অন্ধকারে লুপ্ত করিয়া বসিয়া আছে, ঐতিহাসিকদিগকে কিছু বলিবার সুবিধা তাহারা আজও পায় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

কাছাড়ী

বাঙ্গলার লোকসিলের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণব, পতিত জাতিদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব গোস্বামীদের শিষ্য। পূর্বে মণিপুর হইতে পশ্চিমে মেদিনীপুর এবং উত্তরে রঙ্গপুর হইতে দক্ষিণে সুন্দরবন—এই বিশাল জনপদ বাসীরা অধিকাংশই গোস্বামিগণের অধিকারভুক্ত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পাহাড়িয়া টিপ্রা এবং সাঁওতাল-গণের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে, এবং যে সকল পার্ব্বত্য জাতি ভাল

করিয়া বাঙ্গলা বলিতে বা লিখিতে পারে না, তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিম্ন-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়, বাঙ্গলার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম এই সময়ও সীমানার মধ্যে মহাপ্রভুর খোল-করতাল বাজে না, এমন স্থান ছিল না। মহাপ্রভুর পিতা-মাতা, শিক্ষাগুরু বাসুদেব, ও প্রেমদাতাগুরু, মাতুল এবং বাল্যসহচরের অনেকেই শ্রীহট্ট নিবাসী। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও আদি পুরুষ মধুকর মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ,—তাঁহার গুরু এবং অনুরাগী অদ্বৈতাচার্য্য

শ্রীহট্টের শাসন।

যাঁহার তপোবলে তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া চিরাগত প্রবাদ, তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত শ্রীবাস—যাঁহার অঙ্গিনার ধূলি তাঁহার গৌরব অঙ্গ হইতে পড়িবে বলিয়া নিত্য মুছিয়া ফেলিতেন, তাঁহার চির অনুরক্ত পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব, রত্নগর্ভ আচার্য্য এবং পদকর্ত্তা যদুনাথ দাস—প্রকৃতি বৈষ্ণববন্দিত আচার্য্যগণ। দেশের ঢাকা দক্ষিণ গ্রাহবাসীরা এবং শ্রীচৈতন্যমণ্ডলীর অনেকেই—শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্য এবং তাঁহার পার্ষদ-বর্গের মধ্যে যিনিই অনেক লোককে শ্রীহট্ট দান করিয়াছেন। এই হিসাবে সমস্ত বঙ্গদেশ এমন কি উৎকলেরও কতকাংশ, অর্থাৎ যে যে দেশবাসীরা চৈতন্যের দোহাই দিয়া থাকেন,—তাঁহারা সমস্তই শ্রীহট্ট সমাজের অধিকারভুক্ত। এই সমাজের যিনি চক্রবর্ত্তী চৈতন্যদেব এবং অন্যতম নেতা অদ্বৈতাচার্য্য আমরা সকলে ইহাদেরই বাক্যে বাস করিতেছি। শুধু বৈষ্ণবগণ নহেন, বাঙ্গেগণ শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে খড়কাটা চাষারাও আজ তাঁহারই করতাল বাজাইতেছে। বঙ্গদেশ আজ শ্রীহট্টের শাসন মানিয়া লইয়াছে, শ্রীহট্টের এক বাঙ্গালকুমার অনুরাগের রাজদণ্ড লইয়া এই বিশাল ভূভাগ শাসন করিতেছেন।

নবদ্বীপই এ যুগে হিন্দুর রাজধানী, হিন্দুরাজত্ব সেখান হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, যাঁহারা রাজস্ব আদায় করেন—প্রজাদিগকে অনুগ্রহ-নিগ্রহ করেন, তাঁহারা সাময়িক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা আমাদের উপর কর্তৃত্বের দাবী করিলেও সমস্ত জাতি যাঁহাদের নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাথা নোয়াত, যাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রভাব দূর হয় না, বংশানুক্রমে লোকমুখে যাঁহাদের প্রশংসা, সেই সকল বিধিদত্ত রাজদণ্ডধারীরাই প্রকৃত রাজা। এই হিসাবে নবদ্বীপের রাজা 'নবদ্বীপচন্দ্র' উপাধিতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ দখল করিয়াছেন এবং অপর এক রাজা রঘুনাথ শিরোমণি—তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র মিথিলা বিজয় করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে নবদ্বীপের প্রাধান্য—বঙ্গদেশের প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই রঘুনাথ শিরোমণিরও বাড়ী শ্রীহট্টে।* বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে শ্রীহট্টের উল্লেখ করা উচিত।

* কেহ কেহ বলেন তাঁহার বাড়ী নবদ্বীপে। কিন্তু নবদ্বীপ তাঁহার টোল ছাড়া তাঁহার বসত বাড়ী, জন্মভূমি প্রভৃতির কোন প্রবাদ নাই। শ্রীহট্ট তত্ত্বসন্ধানে নানারূপ প্রমাণ আছে এবং এই সমস্ত প্রমাণ 'বৈষ্ণব সঞ্জীবনী' নামক সংস্কৃত কুল-গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে (৩১০-৩২ পৃঃ) এবং সাহিত্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত

[illegible] [illegible] [illegible] [

হয়" (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড ১০৫ পৃ.)। এইরূপ কোন সূত্র দেখাইতে হইত নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে অবস্থিত ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের ও ব্রহ্মদেশের সহিত বঙ্গদেশের উক্ত সম্বন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "তাহার বিস্তৃতির পরিচয় দেওয়া বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইল।" তাহা প্রকরণের স্থায় শেষ প্রস্তর হয়। এই স্থানের অন্তর্গত নদীতে "এক অপূর্ব্ব শিবলিঙ্গ, তাহাতে অগণ্য স্বর্ণরেখা চিত্রিত করিয়াছে।" পার্শ্বে গ্রন্থকার লাঠি ধরিয়া। লোকে উহাদিগকে "পঞ্চপাণ্ডব" নাম দিয়াছে। স্থানীয় ঐ পাহাড়ের বেষ্টনে মত চারিটি প্রস্তর দাঁড়াইয়া আছে ইহাকে "চারি যুগের আস্তানা" বলে, তাহাতে "স্বর্গদ্বার" নাম একটি গুহাতে কয়েকটি পাথরের লিঙ্গ—কোন প্রস্তর-মূর্ত্তি সম্ভবে বহন করিয়া আনিতেছে, ঐ স্থানের নাম "যোগানিদ্রা", গুহার দ্বারে বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গা রাম-সিংহের নাম খোদিত, ইনি কোন রাজা বাদ হইলেন হয়ত তাঁহারই দ্বারা দুইটি প্রকাণ্ড প্রস্তরের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু অপর পর্ব্ব ভিন্ন অতি প্রাচীন, প্রস্তরগুলি বড় পুরু মূলের

৩ গাঁয়ের নাম "হরা মহুয়া স্থানিত নহে, সেবক কোনে চিরকাল বর্ত্তমান আছেন" (ইতিবৃত্ত, ১১৫ পৃ.)। শিব ৮ হাত দীর্ঘ পাথরটী দেবতা সমস্তই ভগ্ন ও কর্দ্দিত। পাণ্ডারা ইহাকে লুকাইয়া রাখিয়া পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া কালাপাহাড়ী দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইহা গোটা টিকর নামক স্থানে অবস্থিত

৪। দালিশিরা পরগণায় কাশবন্ধ ছিল। কথিত আছে নিশ্চই ও হস্তই নামক ত্রিপুরার দুই রাজকুমারী এই স্থানে ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে "নিশ্চইশ্বর" স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্থান সম্ভবতঃ বহু পূর্ব্ব হইতেই তীর্থরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

৫ উনকোটি তীর্থ কৈলাসহরের প্রায় হইতে ৮ ক্রোশের দক্ষিণদিকের পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই উনকোটি তীর্থের সীমানা। উনকোটি পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। "শিরোভাগের মূর্ত্তিগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত পার্শ্বের স্থান পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত।" উনকোটি মূর্ত্তিগুলি বড় পরিষ্কার, এমন ঠিক চিনিতে পারা যায় না। প্রত্যেক মূর্ত্তির কাণে "কানে-পাতার" ন্যায় বৃহৎ কুণ্ডল আছে। বহুসংখ্যক মূর্ত্তি খোদিত ছিল, তাহা কালক্রমে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিমে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, মূর্ত্তি বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু একটি মহাদেব-মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য, ইহার কর্ণ দুইটি কবচের ন্যায়, ইহার কুণ্ডল দুইখানি ঢালের ন্যায় গোপের একদিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অপর দিক এক হাত কি দেড় হাত রহিয়াছে হাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ ত্রিপুরারাজ বিজয়মাণিক্য দেখিয়াছিলেন। উনকোটি তীর্থ দেখিতে গিয়াছিলেন তখনও কালাপাহাড় এদেশে আসে নাই এইরূপ বিশাল দেবমূর্ত্তি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইত আমরা ত্রিপুরা-প্রসঙ্গে একবার এই মূর্ত্তিসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছি।

এইসকল দেবতা ছাড়া চাঙ্গাঘাট পরগণার পৌরাপল্লীর নিকটে "সিদ্ধেশ্বর শিব", শ্রীহট্টের "হাটকেশ্বর", সাদেক্ষাগড়ের নিকট খোয়াই নদীর তীরে "ভূতেশ্বর" নামক বৃহদাকৃতি

শিবলিঙ্গ, পঞ্চখণ্ডের "বাসুদেব" প্রভৃতি প্রাচীন দেবতা শ্রীহট্ট জেলায় বিদ্যমান থাকায় প্রমাণ হইতেছে কোন কোন দেবতার অস্তিত্ব অজ্ঞাতমূলক নহে, শুধুই কিম্বদন্তি কল্পনা নিছক কল্পনা বলিয়া মনে হয়, শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণের অধ্যুষিত ও পূর্ণজনপদের অতি নিকটস্থ স্থান ছিল, কারণ যেখানে শিব লিঙ্গও নহেন বিগ্রহও নহেন শুধু দীর্ঘাকৃতি শৈলখণ্ড—তাহা অতি পুরাতন যুগের। পূর্ণজনপদের নৈকট্য, শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য তাহা যেমন এ প্রমাণে, তেমনই প্রদেশের তীর্থগুলিতেও পরিচয় হয় শৈব ও শাক্ত তীর্থই এখানকার প্রাচীনতম

ত্রিপুরা ও কামরূপের রাজবংশই অনেক সময় এই দেশ শাসন করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন কালের আর একটি রাজবংশের পরিচয় আমরা পাইতেছি ইহাঁদের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই দুইখানিই শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী ভাটেরা গ্রামের "হোমের টিবা" নামক এক ক্ষুদ্র শৈল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে ইহাদের মধ্যে যে তাম্রশাসন দেওয়া আছে, তাহার কতকটা কালক্রমে নষ্ট ও রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে—ঐ দানপত্র হইতে সময় সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করিয়াছিলেন, প্রথমখানির তারিখ ২৮৩ বা ৩৮৩ এইদিকে পণ্ডিতবর বিদ্যাবিনোদ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

প্রাচীন ইতিহাস।

ইহার সময় বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন এমন কি অক্ষয়-বাবু ঐ তাম্রশাসনখানি খৃষ্ট অব্দারম্ভের পূর্ব্বের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন আমার মনে হয় উহা পড়িতে যাইয়াই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসন্ধানের আগ্রহ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "কলম দেখে বিদ্যে" এই কথাটা ঠেকিয়া ঠিক রাজাকে সাহেবদের কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত রাজা হোডগ্রোসনের সহিত তুলনা মনে করিয়াছেন,—"হোসিনের কাল" বলিলেই যেমন বুঝা যায় সেকেন্দর সাহের কালে জন্ম হওয়ায় পর ছিলুরাজা নিশ্চই হয় বেশ মুসলমান নামের করতলস্থ হয় ইহা হইলে কেশব সেনের পর ঈশান-সেন আবার সাহেবদের কাছে রাজা হইবেন কিরূপে? এইরূপ বহু অসঙ্গতি কথা মিত্র মহাশয়ের মস্তিষ্ক হইতে বাহির করা যায়, কিন্তু চরিত্রের প্রধান প্রমাণ এই যে তাম্রপটের লিপি কখনই প্রাচীনের সহিত সমান নহে, পরই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অপর দিকে অক্ষয়বাবু যে ঐ লিপি খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন, তাহা একবারে অসম্ভব যেখা, গুপ্ত, পাল প্রভৃতি যুগের সহিত লিপি অসঙ্গত হইয়াছে কামরূপের শাসনাবলী হইতে বনমাল ও তৎপরবর্ত্তী নৃপালদের লিপির পরিচয়গুলির সহিত অধিকাংশ এই সকল লিপির সঙ্গে তুলনা করিলে কেশব-তাম্র-শাসনের লিপি নবম কি দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয় এই লিপি অনেকটা ভঙ্গুরবর্ম্মা এবং বনমালের লিপির মত (মূল লিপি ১৮৮০ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে দ্রষ্টব্য)। কেশব সেনের সুদৃঢ় প্রস্তরনির্ম্মিত বিক্রমন্দির কোথায় গেল? সুতরাং তাহা বহু বহু প্রাচীন এবং কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অক্ষয়বাবুর এই যুক্তির উত্তর অতি সহজ, অস্মাবতের যত কিছু পাকার ও লেঠ নির্ম্মিত কীর্ত্তিস্তম্ভ ও মন্দির, তাহার প্রায় সমস্তই গত সকল বৎসরের বাস্তু বিপ্লবে অধিকাংশ স্থলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার উপর কালের হাত অবশ্য কিছু আছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের

অনুমানের অন্য একটি বিরুদ্ধ যুক্তি এই যে একজন, দুজন, এবং তিনজন রাজার তাম্রপট-গুলির লিখনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, তাহারা যত পুরাতন হউন না কেন, তাহাতে কম নবম শতাব্দীর পর হইতে ঐ সকল বর্ণনায় লেখার সঙ্গে সাদৃশ্যের অভাব দেখি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অর্থাৎ দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনে এই লীলা চলিয়া আসিয়াছে, সাধারণতঃ কায়রূপ-শাসনাবলীতে দেখা যায়, যে রাজার তাম্রফলকে লিপিতে গৌরী কিংবা অন্য দেবীর বরের কথার শেষ নাই সেই সময় রাজাকে হরপার্বতীর তাম্রশাসনও প্রায়রূপ বর্ণনা-বিবর্জিত কিন্তু পরবর্তী সময়ের তাম্রশাসনে বর্ণনা আসিয়া পড়িয়াছে। লোহিত্য নদের বন্দনায় বলা হইয়াছে, ঐ নদীর জল

কেশবের তাম্রশাসন।

ক্ষীরসিন্ধুর পুরাজলাহরের ফেন ও তন্তু হইতে এই স্তবটির সৃষ্টি হইয়াছে। একাদশ রাজবর্ষে হরপার্বতীর তাম্রশাসনে দুই হয় গৌরী পাশাপাশি লিখিয়াছেন এবং শিবকে বলিতেছেন "তুমি ত্রিলোচন, কিন্তু পরের সকল দ্বার আমি বন্ধ করিয়া দিতেছি, তোমার প্রবেশ আমার নিকট নিষিদ্ধ থাকিল।" দ্বাদশ রাজবর্ষে ধর্মপালের তাম্রপট অষ্টনারায়ণের বন্দনায় বলা হইয়াছে শিবের একটিমাত্র ভগ্ন ও অপর দিকে গৌরীর তুঙ্গ স্তনমণ্ডলের কুঙ্কুম যদি এই তাম্রপট ব্রহ্মের একাধার হইত, তবে অনেকটা লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তির ন্যায় তাহাতে "কলিঙ্গরণাদি"-এর মত কোনও যোদ্ধজয়-সূচক পদ থাকিত। কেশবের তাম্রপটের সঙ্গে বরং ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করার কথা আছে। ইহাতেও এরূপ দানের প্রশংসা ও ভূমি অপহারকদের উপর অভিসম্পাত আছে। কায়রূপের পরবর্তী সময়ের তাম্রপট্টগুলিতে তাহা নাই। কেশবের ও তৎপূর্ব্ব তিনজনের বংশাবলী এইরূপ — ১ নরনারায়ণ, ২ গোকুলদেব, ৩। নারায়ণদেব, ৪। কেশবদেব, ৫ তাঁর পুত্র, ইঁহাদের ইঁহারা সৈন্য হইলেও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন, তাহাতে মন্ত্রীর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের নামেও নিষ্কলঙ্কত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারা সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন,—ইঁহাদের অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ও রথ ছিল। ইঁহাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন "বৈদ্যকুল-প্রদীপ সনমালী কর" এবং সেনাপতি ছিলেন সমর-প্রবীণ দৈবদত্ত। কেশবের তাম্রপটে যে হট্টশাটকে বটেশ্বরের উল্লেখ আছে তাহা বোধ হয় কলিঙ্গরঙ্গের গুপ্তবংশীয় রাজত্বের জয়ন্তীপুরের হাটকেশ্বর হইতে অভিন্ন (আসাম জেলা গেজেটিয়ার, ৩ অধ্যায়, ৮৭ পৃঃ)। অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন, "গৌড়গোবিন্দ এই হাটকেশ্বর শিবপূজা করিতেন। মিনারের টিলা বা নিকটের অন্য কোন টিলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিলেন। হজরত সাহজালালের সময় যখন মাধবপীঠ সংগোপন করা হয়, তখন হাটপূজিত হাটকেশ্বর জলে নীত হন। বহুকাল ঐ লিঙ্গ সেইখানে ছিলেন, তথা হইতে চুড়াগোছড় পরগনার সেনগ্রামে নীত হন।" (হিন্দুরাজ, ১ম ভাগ, ৯ম অধ্যায়, ১৯৯ পৃষ্ঠা)। তাম্রপটে এই রাজাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিত আছে, ইঁহারা যে গৌড়গোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষ নহেন, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? আমরা তাম্রপটের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথার উপর এখনও আসা

স্থাপন করিতে পারি না। পরলোক হইতে যাঁহারা চতুরবাক্যে বক্তৃতা শ্রবণ করেন, ইঁহা অবশ্যই তাঁহাদের বহুবক্তৃতা [illegible] হইতে সকলে মিলিয়া [illegible] তাহা আমরা সাহিত্যের [illegible] হইতে জানিতে পারিয়াছি।

কথিত আছে, 'ইন্দ্রপ্রস্থের [illegible]। যথার্থ কথা। কিন্তু [illegible] একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইহা [illegible] একটি বিশিষ্ট পুরুষ ও চাঁদবরদাই ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই যজ্ঞোপলক্ষে ইন্দ্রদ্যুম্নের সহ বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন হয়। [illegible] ও ব্রাহ্মণগণের [illegible] একটি [illegible] দুই সাদাপাগড়ি ছেন। [illegible] [illegible] কন্ত ইহার অনেক পূর্বে হইতে পুরুষানুক্রমে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেছিলেন, [illegible] [illegible] হইতে আসিয়া তাঁহারা [illegible] করিতে পারিতেছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

নাকার ব্রাহ্ম কান্তুরা লইয়া কি ভীষণ অত্যাচার ও অনাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বঙ্গদেশের কোলীন্যের প্রতিষ্ঠাতা বল্লাল সেনের কৌলীন্যের আদর্শ ছিল এবং 'পাঞ্জী' সম্বন্ধে যাহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন বহু বংশধর বর্তমান থাকিতে বঙ্গদেশ হইতে পলাইয়া সাধারণ শ্রীহট্টে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট বহুদিন পর্যন্ত হিন্দু রাজাদের অধিকারে ছিল, এজন্য এই নিরাপদ আশ্রয়ে বহু সম্ভ্রান্ত বংশের হিন্দুরা বাস করিতেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহট্ট মুসলমানদের অধিকৃত হয়। তখন বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত, এজন্য আমরা দেখিতে পাই, দেশের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তখনও শ্রীহট্ট বাস করিবার জন্য চলিয়া যাইতেন। ইহার পর শ্রীহট্টে রাষ্ট্রবিপ্লব ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে আমরা তত্রত্যদের ইতিহাসে দেখিতে পাই। এদিকে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের টোল তখন খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ফলে ফলে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ দেশান্তরিত হইয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা হিন্দু-পুনরভ্যুদয়ের উৎসাহে সংস্কৃত শাস্ত্রে চর্চাপূর্বক বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সহজেই নবদ্বীপের টোলে অধ্যক্ষ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য রঘুনাথ শিরোমণি ও অদ্বৈত আচার্যের নাম নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর পুরোভাগে। শ্রীহট্ট প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যের পণ্ডিত দেশে সংস্কৃতের চর্চা এত বেশী হইয়াছিল যে বঙ্গদেশের তাৎকালিক আধুনিক সময়ের বহু সংস্কৃত শব্দের সন্নিবেশ ছিল। আকবরের শাসনকালে, বঙ্গের সুবেদার মানসিংহ খাঁর সময় এবং শ্রীহট্টের গৌরবের অবসান কালে ঈশা খাঁর সময়ে নিম্নলিখিত দলিলখানি সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহা ১৯৯ বৎসর পূর্বে লিখিত, সুতরাং সে সময়েও যে আদালতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। যথা—"শ্রীনরকপাটা আচকবার মহে ২৫ আষাঢ় সন ১০৯২ সাল খুসি 'ঘিনবন্ধুবরেষ্বরভক্তমাকে আষাঢ়ত্ব পক্ষবিংশতিতমদিবসে শ্রীশ্রীমতাং সুবেতান আরজ সহ পাবলপ্রতাপসমরকটীন বহো বঙ্গানমধীশ্বরের শ্রীযুক্ত সাহইশু খাঁন মহাশয়প্রতাপেষু শ্রীহট্টাধিকারিণা শ্রী ঈ আবদুল রহেম খান মহাশয় শ্রীযুক্ত হাসন সাহারাজকস্য পক্ষপাতাধিকারাদ্ব বিলম্বিত সাহায্য পক্ষত্ব চত্বরকার্যনি খানসাহইশু শ্রীসুদাম দাস শ্রীগোবিন্দ দাস শকাশাং সত্ত্ব মুদ্রা গৃহীতা শ্রীমধুসূদন পাল ইত্যক্ষরমিদং পালত্বাং দক্ষিণে শ্রীলক্ষিকারক্ষোটিক পাশ্চমে পূর্বে রামমার্গ চ উত্তরে পুষ্করণীপর্যন্তশাং পূর্বে ঈশান কোণোদ্ধিক পর্যন্তের পোলক আর ফলটির বাড়ীর খোলে চ ভূমিস্থাব দ্বিসীমা ইথং চতুঃ সমাবচ্ছিন্না শ্রীমধুসূদন বাটিকা নৌহে অসহা সর্বদিনী বিক্রয়ার্হেতি কহুলাং ৭ শত তঙ্কা দ্রব্য একবাড়ী চতুঃ সমান মন ভাবিষ্য—সনদ" শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ৪র্থ অং পৃঃ ২২। আমরা কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি

* শ্রীহট্ট জেলে অবস্থান কালে ভূমিক ভরিয়ে ভাকাতি অবাধেই সংঘটিত হইত। উহার ফলে জেলে অনিষ্ট দেখিতে। বাস জেলে একটি লোক বধ পর্যন্ত। "প্রবাসী-সমাজ, চরকথা।

কোচবিহার ও উক্ত রাজার নগর গাকরেরা পাণ্ডু সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিত। হিন্দুরাজের সম্বন্ধের চেষ্টা যে অস্বাভাবিক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ইংরেজাধিকারে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ইংরেজদিগের কথা ও ব্যবহার

মহারাজ গৌড়েশ্বরের এতদ্বিষয়ক হুকুম ছিলেন রাজা প্রাসাদে আসিলে রাজা তাহাকে ছিলেন বিনা "সেলামে" যাহাতে সম্মান করিতে জানিবেন। এই সম্বন্ধেই যাহা হউক এবং তাহাতে হিন্দুরা যে কিরূপ ঘৃণার ভাব করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত ১৬৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। এই রাজার সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। তাহা হরিবংশের বংশাবলী হইতে পাওয়া গিয়াছে। একদা রাজার নিকট সংবাদ আসিল যে—গৌড়ের ভিখারীরা তাঁহার কোন উপকার করিতে পারে। যাই হউক গৌড়েশ্বরের ভিক্ষক কুল-চূড়ামণি চক্রধর জীবিত ছিলেন, তাঁহার মন ভাবিলেন তাহা তাঁহার জন্য নয় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু চক্রধর তখন আতুর— তাঁর পাঠাইবার ভাবিয়া উঠিতে পারেন না। এই সংবাদে রাণী আসিয়া কাতরা হইয়া তাঁহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া সেই বহুমূল্য পেটিকাটি সহ পুরস্কার করিয়া ভিক্ষকদলের "নকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, "আমি আপনার কন্যা স্বরূপা আমার স্বামীর আপনি এ সকল গহনা দিয়া কি করিবেন? আপনিই রক্ষণ করিবেন, অন্যথা তাহা বিক্রয় দিবেন—আর দিবেন হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব, স্বচ্ছন্দে আপনি নগরীতে ভিক্ষা করিতে পারেন। কখন হইতে আপনার দ্বারা রাজার ও রাজ্যের দুঃখ কষ্টের কখন রক্ষা হইতে পারে।" দস্যুটীক চক্রপাণি এই সকলের কথায় উপেক্ষা করিতে পারিলেন না রাজা তাঁহার সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেন। রাজা তাঁহাকে বিস্তর ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিলেন কিন্তু তিনি গঙ্গাতীর ছাড়িয়া কিছুতেই হরিদ্বারে যাইতে সম্মত হইলেন না, তাঁহার রাজা জ্যেষ্ঠপুত্রকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া চলিয়া গেলেন

মুসলমান বঙ্গ।

বহু রাজ গৌড়েশ্বরের নিকটস্থ হইয়াও কখনে আর সুখী হইতে পারিলেন না গৌড়েশ্বরের অপরাধে তিনি ইতিপূর্বে চুলটিকর রাজা বহুদিন উজীর এবং কালি মুকুন্দকে উজীর আর দাসত্ব করিয়াছিলেন, এই মতের সঙ্গে অপরাপর স্থানের হিন্দু রাজাদের গৌড়েশ্বরের মুসলমান-নিগ্রহের সাদৃশ্য আছে কিন্তু হিন্দু মুসলমানের কথা এখন পর্য্যন্ত গোপনে লইয়া চলিতেছে, সুতরাং একরূপ বলার যে একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা প্রমাণাভাবে ঠিক করিয়া বলা যায় না এইরূপে দণ্ডিত ব্যক্তিরা বঙ্গেশ্বরের শরণাপন্ন হন। আলাউদ্দিন খিলজি সাহ স্বীয় ভাগিনেয় সেকেন্দারকে গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন দাক্ষিণাত্য-প্রভাবে সেকন্দর চইবারই হিন্দু-রাজার নিকট পরাভূত হন তোয়ারিখে আলালি নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। প্রথম যুদ্ধে হারিয়া গিয়া সেকন্দর দ্বিতীয়বার খুব সমারোহ করিয়া বিশাল সৈন্য সঙ্গে গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে

অভিযান করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকে সেই অভিযান সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, শেষ পঙ্‌ক্তি এইরূপ "চতুর সাদেকা চলা সিকন্দর সহার"। ইহার পরে তিনি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে বঙ্গেশ্বর শ্রীহট্টের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ গৌড়-গোবিন্দের সঙ্গে তাঁহার সন্ধি হইয়াছিল, অথবা মুসলমান এই সময়ে সন্ধির কথাই হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এই সময়ে আর একজন মুসলমান নেতা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন, ইনি বিখ্যাত সাধু সাহ জালাল। ইনি হজরতে মোহাম্মদের জ্ঞাতির বংশধর এবং ইহার মাতাও সৈয়দবংশোদ্ভবা ছিলেন এবং পিতা মাহমুদ কায়েসের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সাহ জালালের জন্মস্থান আরবের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ মেক্কায়। সাহ জালাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইনি অল্প বয়সেই সাধনার পথে এতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, একটা বাঘকে তাঁহার আশ্রম পর্যন্ত তাড়িত করিলে তিনি খড়্গ দ্বারা সেই ব্যাঘ্রের গণ্ডে এরূপ ভীষণ চপেটাঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহা দন্তরাজি বিকশিত করিয়া তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সাহ জালাল ভারতবর্ষে আসিবার পর তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, তিনি বিশ খাইয়া বিষ হজম করিয়াছিলেন এবং চর্ম্ম-পাদুকা পায়ে নদ-নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া জন-শ্রুতি আছে। তোয়াখে জালালিতে এরূপ অনেক উপাখ্যান বর্ণিত আছে। দিল্লীতে আসার পর তৎকালীন হিন্দু রাজার দ্বারা তিনি উৎপীড়িত হইলেন। গৌড়ের এক হিন্দু গোবিন্দ তাঁহাকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং কিছু দিনের জন্য তাঁহার অবরোধ হইল। সাহ জালাল ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারার্থ শ্রীহট্টের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক তাঁহার দলে ভিড়িয়া গেল। তিনি বার জন সঙ্গী লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু দূর যাইতে যাইতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বহু জন হইল। এ দিকে কাঁচি মুরকিদের অধিনেতৃত্বের বিপুল সৈন্য ছিল। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অলৌকিক সাধনা-বলের কথা শুনিতে শুনিতে হইয়া তাঁহার অনুচরের সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করিল। শ্রীহট্টের সীমার অবস্থিত চাক (দিনাজপুর পরগনায়) নামক স্থানে আসিলে গৌড়-গোবিন্দ এই অভিযানের সংবাদ পাইলেন। সাহ জালাল রঙ্গপুর উত্তীর্ণ না হইতে পারেন এজন্য হিন্দু রাজা সেই নদে সমস্ত তরণীর যাতায়াত নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমান সৈন্য কৌশলক্রমে সেই নদ অতিক্রম করিল, তারপর তাহারা করাক নদীর তীরবর্ত্তী বাহাদুরপুরে পৌঁছিল—সেখানেও গৌড় গোবিন্দ সমস্ত নৌকার যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু সেই চেষ্টায়ও তিনি ব্যর্থ হইলেন। সাধুর কেরামতের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজার মুসলমানের প্রতি অত্যাচারে এক শ্রেণীর লোক তাঁহার প্রতি বিমুখ ছিল, অপরদিকে হজরতের বংশোদ্ভব সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার উপর চারিদিকে এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গৌড় গোবিন্দ নিজকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করিয়া পেচাগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে, রাজার যে গগনস্পর্শী প্রস্তর-মন্দির ছিল, তাহা সাহ জালাল

ও তাঁহার অনুচর বর্গের আজানের শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িত। কেশব সেনের যে বিখ্যাত মন্দির কথা আমরা ফ্রন্টপটে উল্লিখিত দেখিতে পাই, সেই মন্দির কি তাহাই? যদি তাহাই হয়, তবে তাহা কোথায় গেল বলিয়া কাহারো খোঁজার হাতড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। গৌড় প্রাসাদ স্বয়ং অনেক কেরামতি করিয়াছেন কিন্তু সাহ জালালের নিকট কোনটিই টিঁকিল না।

ঐতিহ্যের সন্ধানে ভ্রমণ ১৩৮৮ খৃ.।

এইরূপে সুলতান সাহ জালাল যখন সিলেটে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর। তাঁহার সঙ্গে ১৩০ জন সাহসী সৈনিক ছিল। তাহারা সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১৮ জন ছিল সাহ জালালের আত্মীয়। তাঁহারা সকলেই সিলেটে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের বংশধরেরা জালালী পাগড়ী নামে পরিচিত, ইহারা অবধূত।

সাহ জালালের আগমনে সুলতান হুসেন শাহ খুব বিপদে পড়িয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি গুপ্তচরের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। তাই তাহারা মিথ্যা খবর দিতে পারিত না। তাঁহার সভাপণ্ডিত হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সাহ জালালের সভা।

ঐ সময়ের কয়েকটি শিলা-লেখ আছে, একটিতে লিখিত আছে হুসেনের সময়ে ১৪৭৯-১৫১৯। উহা ছাড়াও পরবর্তী বাদশাহেরা উহার সংস্কার ও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। একটিতে ১১১ হিজরী (১৭০০ খৃঃ), আর একটিতে ১১৮৮ হিজরীর ১৭৭৫ খৃঃ, অঙ্ক আছে। ঐ সময়ের সাহ জালাল একটি ঈদ্গাহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইহার "ফুল ফুকার" নামক তরবারি, মুগাঙ্গীর আসন। আসলা এবং কাঠ পাদুকা আছে। ইহা ছাড়া ৩টী কামার পেয়ালাও আছে। ইহাদের উপর অনেক শ্লোক উৎকীর্ণ। ঐ সময়ে আরাঙ্গজেব একটি বৃহৎ দিঘীও খনন করিয়াছিলেন—ইহা ৪ মাইল দীর্ঘ, ইহাতে ১০,০০ মণ চাউলের ভাত রান্না হইতে পারে। ইহার উপরে যে মিনি মসজিদ আছে তাহা ১০০৭ হিজরীর (১৭০৭ খৃঃ) অঙ্ক বহন করে। সাহ জালালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া আসিয়াছিলেন। খ্রীহট্টবাসীরা কখনও কখনও তাঁহাদের কবরকে "দক্ষিণের মক্কা আউলিয়ার মুলুক" বলিয়া থাকেন। "খ্রীহট্টে সাত আজন", "আউলিয়ার আখলাক" এবং "খ্রীহট্ট দর্পণ" প্রভৃতি পুস্তকে এই আউলিয়াদের নাম ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অক্ষয়বাবু তাঁহার ইতিবৃত্তে অনেকেরই নাম ধাম দিয়াছেন।

সাহ জালালের মৃত্যুর পর (অনুমান ১৯০৮ খৃঃ) নবাব ইসপেন্দিয়ার খ্রীহট্ট শাসন করেন। তৎপরে ফকর খাঁ, গজ খাঁ, মোহম্মদ খাঁ, সলেমান খাঁ, মঁর খাঁ, ইউসুফ খাঁ, খোয়াজ ওসমান, লোদী খাঁ ও ভাঙ্গান খাঁ ক্রমান্বয়ে খ্রীহট্ট শাসন করেন। ইহাদের উপাধি ছিল 'কানুনগো', কিন্তু সমস্ত রাজস্ব ও শাসনভার ইহাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। ইহাদের প্রত্যেকেরই শাসনকাল অল্পকাল ছিল। বাদশাহেরা কিছুকালের জন্য এক একজনকে কানুনগোর পদ দিয়া তাঁহাদের নব-বিজিত রাজ্যগুলিকে সেই পদের

খ্রীহট্টের নবাবগণ।

উত্তরাধিকারী করিয়া যমস্থই স্থাপন করিতেন। ১৪৯৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে শ্রীহট্টের শাসনকার্য্য চলিয়াছিল। সর্ব্বানন্দ নামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সরওয়ার খাঁ নাম গ্রহণ করেন, পূর্ব্বোক্ত তালিকায় সপ্ত হইবে তিনিও এই কানুনগোদের একজন। সরওয়ার খাঁর পুত্র মাহ খাঁ তৎপুত্র হাসন খাঁ (১৫২৬ খৃঃ + এক বংশের এই তিনজন কানুনগোপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাসন খাঁর সময়ে আনন্দনারায়ণ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের দেওয়ান ছিলেন। এই আনন্দ নারায়ণের সাহায্যে পরবর্ত্তী কানুনগো মোবারক ওসমান্ হইতে রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ও ইট্টা অধিকার করেন। তাঁহার খাঁ কানুনগো অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন, যদুদাস কবিদাস ও তৎপরে জামদার সুলিমানের প্রত্যেকেই ব্রহ্মত্তর দান করিয়াছেন।

আমিল

কিন্তু আকবর শাসন বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ পৃথক্ করিলেন, তদনুসারে কানুনগোগণ তাঁহাদের ক্ষমতা হারাইলেন। তাঁহারা দেওয়ান ও তহশীলদারের কার্য্য করিতেন, এবং শাসন কর্ত্তা হইলেন "আমিল" নামে মোগল কর্ম্মচারী। আকবরের সময়ে শ্রীহট্টের রাজস্ব ১১৭,১৭০ টাকা অবধারিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের আমিলগণের বিবরণ হইতে ৪০ জনের নাম সংগৃহীত হইয়াছে। মোট আমিল বোধ হয় ৬০ জন ছিলেন, তন্মধ্যে অচ্যুতবাবুর পুস্তকে ৪৩ জনের নাম ও কার্য্যের তালিকা আছে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ইঁহাকে হারা ছিলা রাজার সাহায্যে একজন আমিলকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধস্থলেই আমিল নিহত ও তাঁহার প্রভু বন্দী হন। নরনারায়ণ শ্রীহট্টের ২০০ ঘোটক, ১০০ উষ্ট্র, তিন লক্ষ টাকা, দশ হাজার মোহর কর স্বরূপ পাইবেন—এই সর্ত্তে উক্ত রাজা মুক্তি লাভ করেন।

ইহার পরবর্ত্তী শ্রীহট্ট শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁর সহিত ত্রিপুর রাজ অমরমাণিক্যের যুদ্ধের কথা 'ত্রিপুর রাজ্য' অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ফতে খাঁ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ফতে খাঁর পরে মোবারক আমিন তুরবদাস, সৈয়দ ইসমাইল (১৫৪৭ খৃঃ), নবাব লুৎফউল্লা খাঁ বাহাদুর (১৬০৩ খৃঃ), নবাব ফাজিল মোবারক (১৬১৭ খৃঃ), নবাব ফরহাদ খাঁ (১৬৭০ খৃঃ), নবাব মহাফতা খাঁ, নবাব নুরউল্লা খাঁ (১৬৭৮ খৃঃ), নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলি খাঁ, কাইমজঙ্গ (১৬৮০ খৃঃ), নবাব আবদুল্লেম খাঁ (১৬৮০ খৃঃ), নবাব সাদক বাহাদুর (১৬৮৬ খৃঃ), নবাব কবুতলাল খাঁ (১৬৯৮ খৃঃ), নবাব আহমদ মাজুম (১৬৯৯ খৃঃ), নবাব কারগুজার খাঁ (১৭০৩ খৃঃ)—এই কয়জন আমিলের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকলেরই ভূমি দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ইঁহারা নিজেচ্ছায় দোয়াতা অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। আরাঙ্গজেবের পরে নবাব তাসিম আলি খাঁ ও নবাব কবুতউল্লা খাঁ আমিল হইয়াছিলেন; কবুতউল্লা খাঁর পরে একজন হিন্দুকে এই উচ্চপদ দেওয়া হয়, ইঁহার নাম নবাব হরেকৃষ্ণ, উপাধি মনসুর উল-মুলুক বাহাদুর। যে বংশে সর্ব্বানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণের পর সরওয়ার খাঁ নামে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন, সেই বংশে

নবাব হরেকৃষ্ণ—১৭০৩-১৭১১ খৃঃ

করিলেও রায় মামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। কবিবল্লভের পুত্র শ্যামদাসের দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে হবেকৃষ্ণই নবাব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব শুকুরুল্লার উপর বিরক্ত হইয়া হবেকৃষ্ণকে ঐ পদ দিয়াছিলেন কিন্তু ঐ বৎসর না যাইতে যাইতেই শুকুরুল্লা চক্রান্ত করিয়া গুপ্তঘাতক দ্বারা পূজার সময়ে হবেকৃষ্ণকে দেবমন্দিরের মধ্যেই হত্যা করান। ইহাতে সেনাপতি বাদশাহি এই লোক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণার্থী হন। শুকুরুল্লা হবেকৃষ্ণের ছিন্নমুণ্ড একটা লম্বা বাঁশদণ্ডের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন শুনিলে এক পারস্য কবি বলিয়াছিলেন, "ওরে বাঃ! কী লালা হবেকৃষ্ণ! যাঁহার সম্বন্ধে মোগল সম্রাট এত সম্মান প্রদর্শন করিতেন।" হবেকৃষ্ণ দুইটী বৎসরের মধ্যে বহু ধন কাড়িয়া লিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "রাজস্ব কালেক্টরেতে নবাব জাফরের যে সকল মানসিক পাওনা যায়, তন্মধ্যে অনেকই "নবাব হবেকৃষ্ণের প্রদত্ত।" সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত হবেকৃষ্ণ ইহাই শাসন করিয়াছিলেন। নবাব হবেকৃষ্ণের পর শুকুরুল্লা পুনরায় মুর্শিদাবাদের শাসনকর্ত্তা হন তৎপরে নবাব সমসের খাঁ বাহাদুর ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ এই সময়ে চাকলে জলালপুরী ১৪টী পরগণা ছিল, এবং ইহার রাজস্ব ছিল ২,১০,৬৫৪ টাকা সমসের খাঁ মুর্শিদ কুলি খাঁর জামাতা ছিলেন, তৎপর নবাব বরকত খাঁ (১৭৩৯ খৃঃ), নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ (১৭৪১ খৃঃ) নবাব তাকি খাঁ, নবাব নজাব খাঁ (১৭৪১ খৃঃ) নবাব সরফরাজ খাঁ মোহাম্মদ খাঁ (১৭৪৭ খৃঃ), নবাব মোহাম্মদ আলি খাঁ ২য়), নবাব এক্রাম আলি খাঁ (১৭৬৯ খৃঃ) ও নবাব আজাদ খাঁ ক্রমান্বয়ে চাকলার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন মোগল সম্রাটগণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে স্থির হইয়া থাকিতে দিতেন না পাছে তাঁহারা প্রজাদিগকে সশঙ্কিত করিয়া বিদ্রোহ করেন এই ভয়ে। পাছে তাঁহারা এক নগরে কোষাগার স্থাপন করিয়া সৈন্য রক্ষা করা, তৎপরবর্ত্তীকে সেই সৈন্য ভাঙ্গিয়া দিয়া বিদ্রোহ করা—এই নিমিত্তে মোগলেরা বাধ্যবাধ্য হইয়া লিখিয়াছিলেন কিন্তু এইরূপ ঘন ঘন শাসনকর্ত্তার নিয়োগ ও পরিবর্ত্তনের অন্য এক কারণও ছিল যাঁহারা সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইতেন এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্রাটদের সন্তোষ জন্মিলে একদম উপায় ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের। গুপ্ত অভিসন্ধিতে কিন্তু প্রবল অমাত্যকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া দুর্ব্বল ভাবিয়া যেরূপে হউক তাঁহারা তাঁহাদিগকে দূরে শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইতেন।

ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়, —মহম্মদ ঐতিহাসের এই তিন অংশে একসময়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ইহার রাজা সুলিমনারায়ণের • সঙ্গে ওসমান খাঁর যুদ্ধের কথা ইহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তাহাঙ্গীরের সময়ে মোরাজ ওসমান তাঁহাদের আদেশে অবাধ্য ব্রাহ্মণ রাজা

ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়

• আমরা পরীক্ষিতিকাব পুনঃ পুনঃ ঐতিহের শাসনকর্ত্তাদের কথা বলিয়াছি। মোগল সম্রাটগণকে বিদ্রোহ-দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইবার কারণ দেখাইয়াছি। কবিবল্লভরায়ের পুত্র বুলন্দরায় নামে

সুবিদনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন শের খাঁর সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সুবিদনারায়ণের কন্যা রত্নমতী অতিশয় রূপসী ছিলেন। মোগল মুসলমানের উপর তাহাকে অর্পিত করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা ছিল। সুবিদ নারায়ণ সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী কমলা সহমৃতা হন এবং রত্নমতী পিতা খাইয়া আত্মহত্যা করেন। সুবিদনারায়ণের চার পুত্র কামাল খাঁ, কামাল খাঁ, ইসি খাঁ ও ঈশা খাঁ নাম গ্রহণপূর্বক মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইয়া বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি এই বংশের রাজারা সকলেই মুসলমান অভিহিত হইয়াছেন। অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন, "রাজা সুবিদনারায়ণের বংশধরগণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু রাজনীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলেন।"

প্রতাপগড় এক সময়ে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সুতরাং ইহার ইতিহাস সেই দেশের ইতিবৃত্তের অন্তর্গত। পরবর্তী সময়ে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশশতাব্দীর রাধারমণ অজমলাচার দেওয়ানদের

নবাব রাধারাম।

বাংলার মুসলমান শাসনকর্তার হস্ত হইতে কৌশলক্রমে অনেক সম্পত্তি অধিকার করিয়া 'নবাব' উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে, একটা মাতকে তাঁহার দুই একজন কর্মচারী খুইয়া ছিল, তাহাদের পা মাতক হইতে বর্জিত হইয়াছিল, এই জন্য তিনি সেই মাতক নিখাতাকে ছোট মাতক প্রস্তুত করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহার পা কাটিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একদিন নৌকাযোগে যাইতেছিলেন, নৌকার মাঝি একটা বড় মাছ ধরিয়া দিয়াছিল। তাঁহার বিনা অনুমতিতে সে ঐরূপ করিল এজন্য তিনি সেই মাঝিকে জলে চুবাইয়া মাছের মত গলায় বঁড়শি বাঁধাইয়া টানা করেন। কিন্তু এসকল নিতান্তই উপন্যাসের মত শোনায়।

রাধারাম তাঁহার সরল প্রাণ বন্ধু কমিলার কানুরামকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মিথ্যা সন্দেহে কালীর নিকট বলি দিতে চাহিয়াছিলেন। কানুরামের কন্যা এই আকস্মিক টের পাইয়া তাঁহার প্রাণকে যুবতীর প্রস্তুত একটা সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া গভীর রাত্রে কাঁধে করিয়া ভীষণ বন্যজন্তুসঙ্কুল দুর্গম পাহাড়ের জঙ্গল দিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার যোগ্য। নবাব রাধারাম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া ছদ্মবেশে পলায়নপর হইলেন। তিনি পথে আত্মহত্যা করেন এবং তৎপুত্র কুমার জয়মঙ্গল ডোমের ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ধৃত হইয়া বন্দী হন। এখনও কৃষকগণ লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে গাহিয়া থাকে—"কাঞ্চনের চরণোলার লোক দেশে দেশান্তর। জয়মঙ্গল আসিবে যবে চরণোলার নগর। ডোম চাঁড়াল মিলিয়াবে বান্ধাইয়া দিবু ঘর।"

পরিচিত কানাই খাঁ ও রাধারাম খাঁ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছি। সুবিদনারায়ণের কন্যার আত্মহত্যা-সম্বন্ধে সম্ভবতঃ পরীক্ষা লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সাহাবে উহার সিন্ধি মুসের খাঁর হাতে পড়িয়াছে 'পুরুষ-পরীক্ষা' হইয়া।

লাউড অতি প্রাচীন রাজ্য। কথিত আছে লাউড পর্ব্বতে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয় মল্লিক, নামে এক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একটি দোলাকুদর হইতে বিজয়মল্লিকা শ্রীশ্রীলেখা দেবী শক ১০০৮ লেখা পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা ১১৯১ খৃষ্টাব্দের, এই রাজা অনুমিত, ত্রিপুর রাজবংশের রাজা হইবেন। কিন্তু ইঁহার রাজত্ব কোথায় কি ভাবে বিলুপ্ত হইল জানা যায় নাই। তাহপরে আমরা একেবারে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া পড়ি। তখন দিব্যসিংহ নামক এক প্রবল রাজা লাউড রাজ্য করিতেছিলেন। ইহারই সভা কবির রচিত বিদ্যাত "সঙ্গীত চন্দ্রিকা" গ্রন্থপ্রণেতা কবির পঞ্চানন— অগ্নিহোত্রীর শিক্ষা। দিব্যসিংহ উত্তরকালে বৈরাগ্যবশে দীক্ষিত হইয়া "কৃষ্ণদাস" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং "সঙ্গীত চন্দ্রিকা" নামক ভাগবতের সারোদ্ধার সংকলিত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন "লাউড় রাজ কৃষ্ণদাসের ভাষাকাল শক, যে গ্রন্থ শুনিলে হয় কৃষ্ণ পাবত্র" ইহার পরে ত্রিপুরের মোগলবংশীয় নামক এক রাজার উল্লেখ পাইতেছি, ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, এবং তাঁহারই বংশীয় দিব্য নামক আর এক রাজার কথা জানিতে পারি। এই দুই নামেই এক মূল প্রাক্ষণ বংশের সন্ধান অনুমিত হয়। গোবিন্দ-মিশ্রের সঙ্গে কেবল মিশ্রের বংশের কোন্‌ পুরুষের কন্যার বিবাহ হয় সম্রাট আকবরের গোবিন্দ মিশ্রের অবাধ্যতা স্বরূপ তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন "কবির খাঁ" নাম দেন, তাঁহার নব ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কের ত্যাগ লইয়া বিবাদ করেন। ইতিমধ্যে কবির খাঁ একটী পুত্রের সহিত বিজয়ের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান ইহাতে বিজয় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু মৌখিক আত্মীয়তার ভাণ করিয়া কবির খাঁর পুত্র আলম খাঁকে স্বগৃহে আনিয়া সন্ধি করেন। আলম অতি রূপবান্ ছিলেন বিজয়ের কন্যা কৌশল ক্রমে তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। উহার রাজত্ব কালে, দিব্যসিংহ নিহত হন এবং তাঁহার বংশ লুপ্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে এই লাউড রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার সঙ্কুচিত পরিমাণ ২৮টী পরগণা এবং অনেক পর্ব্বত ভূমি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইহার মালিক ছিলেন আনোয়ার খাঁ, তিনিই সর্ব্বপ্রথম "চৌধুরাণ" উপাধি প্রাপ্ত হন, তদবধি তাঁহার বংশধরগণ ঐ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এখানে আর একটী কথা বক্তব্য আলম খাঁ ও বিজয় কন্যার ঘটনাটীকে রূপান্তরিত করিয়াই বোধ হয় একটি গীতিকা বিরচিত হইয়াছিল। (মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড)।

এই সকল ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার অনেক স্থানই মুসলমান, তথাপি ইহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ রাজকুল-ভাত। যে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ মুসলমানদের অধিকৃত হইয়াছিল, সে সময়েও শ্রীহট্ট বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাধিকারে ছিল, এজন্যই এই প্রদেশে বহু পণ্ডিত ও গুণী ব্রাহ্মণ জন্মিয়া অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহট্ট এক সময়ে নানারূপ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল শঙ্খপুরের 'উনি চাদর,'

হবিগঞ্জের উত্তরে হাতলিয়া গ্রামের [illegible] মহাশূদ্রেরা ইহা প্রস্তুত করে, গায়ে দিবার মুগীদের "বেলাপ", ৭৮ হাত দীর্ঘ ৬ হাত প্রস্থ বৃহৎ ধবিবার জাল, 'কাকিজাল', 'হরাজাল', 'খেতজাল', 'চৈতাজাল', 'উদাল জাল', 'মশারজাল', 'কাঁইজাল', 'হাউজাল', 'পেঙ্গুইনজাল', 'বাঘেরজাল' 'পাখীজাল' প্রভৃতি কত প্রকার জালই প্রস্তুত হইত। তাহাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজন কমে নাই, আমরা দুঃখের বিষয় এই দিনটি চাহিয়াছি, পূর্ব্ববঙ্গে বড় বড় এন্ট্রান্স লীগাডুমি বসাই এতদ্দেশীয় ছাত্রদের সঙ্গে তাল রাখিয়া এই বিচিত্র শিল্প শ্রীসম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইতেছিল [illegible] সেই সকল নমুনা এখনও আছে, যৎসামান্য শিল্প। তাহার পরিধি কিছুমাত্র কমে নাই ভদ্রলোকেরা এখন বহুমূল্য বিলাতী বীড়শি লইয়া পুকুরের ইট্রে বাঁকের মত বসিয়া থাকেন, কচিৎ দুই একটি মৎস্য দৈবযোগে উঠিয়া পড়িয়া কৃতার্থ হন এখন প্রয়োজনের কথা কেহ বলে না উহা সখে দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীহট্টের বেতমাদুর ও তাহাতে এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। মোগলাধিকারের সময়ে লাউড়াধিপতিকে সময় সময় যে রাজস্বস্বরূপ দিতে হইত। ভাটেরার তাম্রফলকে ঈশান দেবের 'সমতটজাত' বলেন আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কৈলাস সহরে এক দল মহন্ত মগ যাত্রী এক জাহাজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহা ছাড়া তিনি বিলখানি জাহাজের একটি নমুনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এখনও ইংরাজ মহলে ঐ 'পানডরার নৌকা' প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুনামগঞ্জের সুবর্ণজিত কাষ্ঠের খেলানা এবং কাষ্ঠপাদুকা খড়ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তরপের কচুয়াদি গ্রামে উৎকৃষ্ট বেহালা প্রস্তুত হয় নবিগঞ্জ ও আখাইলকুড়ার রথে কাষ্ঠশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

শ্রীহট্টের "পাটিয়াবা দাস" নামক এক শ্রেণীর লোক বেতের পাটী প্রস্তুত করিয়া থাকে ইহা উৎকৃষ্ট নৈপুণ্যের পরিচায়ক জলসুখা, কালাখসুর, জফরপড়, প্রতাপগড়, চাপঘাট প্রভৃতি স্থানে ঐ শিল্প বিশেষ শ্রীসম্পন্ন ছিল এক একখানি পাটীর মূল্য ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইত। ধুলিকুবার ইহার অধঃপতন। শিল্প মহলাম দাস ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কৃষি প্রদর্শনীতে ৯০ টাকা মূল্যের একখানি পাটী দেখাইয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

ইহাছাড়া মেয়েদের কাথা-সেলাই অতি উৎকৃষ্ট শিল্প ছিল। ঢাকা দক্ষিণের মেয়েদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। শ্রীহট্টের হাতীর দন্তের কাজ, শীতল পাটি, 'চাচ' বা বাঁশের নলমাদুর অতি সূক্ষ্ম নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত ভগবাংপুর ও জলসুখা হইতে ১৯০১ খৃঃ অব্দে ১৪,০০০ মণ নলমা বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের শিল্পীর হাতের বাঁশের টুকরি, ধামা, পাখীর পিঞ্জর পেটারা, বাক্স, মোড়া, চেয়ার উল্লেখযোগ্য। শ্রীহট্টের পাতার ছাতি প্রশংসনীয়। সেখঘাটস্থ কারিগরের হাতের বাঁশ ও বেত নির্ম্মিত একটি ছোট গৃহ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা ও পারিতোষিক পাইয়াছিল।

শ্রীহট্টের ঢাল একসময়ে ভারত প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীহট্ট এক সময়ে কামান নির্ম্মাণের জন্য

খাদিম নাম্ক করিয়াছিল। ইহারা পাঠানদের অধীনে কার্য করিত। ইহাদের পূর্বপুরুষ জনার্দন কর্মকার ১০৪৭ হিজরী সনে তরোয়াল নামক এক কাঁসার হাতিয়ার প্রস্তুত করিয়াছিল, ইহার লম্বা ৩২ হাত, পাতলি দিক ৪ হাত, মুখের বেড় ১৮ হাত ও অন্য সমস্তের ছিদ্র মেপে হয়।

কামার।

আমাদের পল্লীর কেহ কেহ বলেন, তাঁহার কোন্ কোন্ স্থানে এখনও এই মহাকায় ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন আছে। যদি কিছু কোথাও থাকে—তবে তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা করা এবং তাহার মূলে কুঠারের যাহাতে ঘা না পড়ে তাহার জন্য সেগুলির জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মণিপুর

মণিপুর' মহাকাব্যে মণিপুর কিরূপ, তাহাকে লইয়া ৩১ ৩২ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। বিশেষতঃ ইহার ৩ কি ৪ শতাব্দীর পূর্বে এই রাজ্যের সীমানা লগতাক্ হ্রদের পার্শ্ববর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। ইম্ফালতুবেল নদী নানা নদী এই হ্রদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে মনে হয় যেন নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া রাজরাজেশ্বরী বেশে রাজসিংহাসনে সেই সকল নদীর জলরাশিরূপে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন। প্রকৃতির এরূপ মনোরম ও অপূর্ব শোভাও সহজে দৃষ্ট হয় না। রাজারা পঞ্চপাণ্ডব হইতে নিজেদের বংশধরগণ বলিয়া গর্ব করিতেন। মিত্রাই রাজবংশাবলীতে ৮২টি রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। পঞ্চপাণ্ডব বা সকলই এই রাজগণের আদিপুরুষ হইয়া থাকেন, তবে বংশাবলীর পূর্ববর্তী বহু নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। এক রাজাকে এক শতাব্দী ধরিলে ৮৩টি রাজা ২৫ শত বৎসরের কিছু উর্ধ্ব সময় রাজত্ব করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত হয়। উহা খুবই অল্প শতাব্দী হইল। অতএব ইহাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া পরিকল্পনা করা যায়। এই রাজগণের প্রথমে পাখাবার নাম পাইতেছি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন এই রাজ্যের প্রকৃত নাম "মিত্রাই লোইপাক্" কিন্তু কোন "মণিপুর" নামটি যত আধুনিক মনে করেন, আমাদের নিকট উহা সেরূপ আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ ৬৫ শত বৎসর পূর্বে লিখিত কোন কোন পুস্তকে ঐ স্থানের নাম 'মণিপুর' বলিয়াই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

মণিপুর রাজবংশ

যাহা হউক এ বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন, কয়েকটি নামের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রাচীন প্রবাদকে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। পূর্বাঞ্চলের প্রায় সর্বত্র, যেখানে সেখানে সমুদ্র মন্থনের বসতির জন্য একটু স্থান দিয়া

সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গেই আর্যগণ কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের, নরক প্রভৃতি রাজাদের আসুরই সাব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। অবশ্য সুরমা নিকেতন মণিপুরে যে আর্যগণ পদার্পণ করেন নাই তাহার প্রমাণ কিছু অবশ্য একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে পাগ্‌লাক্‌ কিরণপুর ও ত্রিপুরার মত এই মণিপুরও কয়েক বিন্দু আর্য রক্ত বিপুলায়তন কিরাত-রক্ত-সমুদ্রে মিশিয়া ছিল।

পৌরাণিক জগতের স্বপ্ন-মায়ার ঘোর কাটাইয়া আমরা ঐতিহাসিক যুগের সংবাদ পাওয়ার জন্য চেষ্টিত হইব। মণিপুর লোকতঃ দুই প্রধান দলে সমুদ্রের কূলে সাত মৈয়াং, সোমান আদম, এবং সোমাং এই ৩টি উপনিবেশ সমেত, যাহারা মেতৈ জাতি) গণের উপাস্য "পাকঙ্গ সিদবা," "লাই এম সোবা," "সেন মহি" প্রভৃতি দেবতা এবং রাজা দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, ইহারা নামগুলির এক একটা বাংলা ধরণ দেখিলেই মনে হয়, ইতিহাসের পূর্ব দুয়ে পাহাড়িয়া কত অন্যান্য জাতির দেব-দেবী যে আর্য দেবতাগণের সঙ্গে এক পংক্তিতে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই বঙ্গদেশেও বহু অনার্য দেবদেবী সংস্কৃত মন্ত্র বলে দেবীরূপে হইয়া পূজা বিষ্ণু ও কল্কির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন, কলিতের মত পূর্বাঞ্চলে যাহারা বাস করিতেছেন তাহাদের মধ্যে এই প্রভাব বেশী দৃষ্ট হয় বিদেশ বৌদ্ধগণ জনসাধারণের "সঙ্কট" দূর করিবার জন্য আর্য অনার্য নির্বিচারে সকলকে লইয়া পর্যন্ত করিয়াছিলেন, কতকটা বাদ দেন নাই সেই মুক্ত পরিবেশে মণিপুর দেশও, ভারতের সমস্ত ঐতিহ্য সম্ভার লইতে পারিয়াছিল। শাহরা হইতে ৪৯ খানি নাম গোত্র পর্যন্ত মেতৈ সমাজের সকলগুলি নামই পাওয়া যায়। ৫০ নং নিংথৌখাম্বা—উপাধি 'ভরত' এই সময় হইতেই বোধ হয় সংস্কৃত-মূলক সংশোধন আরম্ভ হয়। ৫১ নং রাজার নাম মধবা, কিন্তু উপাধি 'গোবা শ্যাম'। ৫২ চিংথং খম্বার উপাধি জয়সিংহ', ৫৩ নং খাম সংস্কৃত—'মধুচন্দ্র' ৫৪ চৌরাজিৎ, ৫৫ মারজিৎ, ৫৬ কুলচন্দ্রসিংহ, ৫৭ নরসিংহ, ৫৮ গোবিন্দসিংহ, ৫৯ চন্দ্রকীর্তি ৬০ সুরচন্দ্র, ৬১ কুলচন্দ্র, ৬২ চূড়াচাঁদ শৈলেন্দ্র সিংহ অনুমান করিয়াছেন, বৈষ্ণবেরাই ইঁহাদিগকে আর্যীকরণের জন্য এই সকল উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজাদের নাম দৃষ্টে তাহা বোধ হয় না, যেহেতু কুলচন্দ্র, গোবিন্দসিংহ, মারজিৎ প্রভৃতি নাম বৈষ্ণব প্রভাবাক্রান্ত নহে ১৬২৮ শকে (১৭০৬ খৃঃ) ৬৭ নং রাজা চেরাউবা আয়ন্তুক-পতি মণিপুর আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন। রাজপুরুষ এই প্রসঙ্গে "আয়ন্তুকবা" (আয়ন্তুক বিজয়) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৩৩ শকে (১৭১৮ খৃঃ) ৬৮ নং রাজা পামহেইবা উপাধি 'কর্দিকর মনওয়ার'। ত্রিপুরেশ্বর বিজয় ধর্মমাণিক্যের সীমান্তরক্ষক সৈন্যদিগকে জয় করিয়া "কিয়ংলেংবা" (কিয়ং-বিজয়) উপাধি ধারণ করেন। মণিপুরীরা "কিয়ংলেংবা" নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পামহেইবার সময় বৈষ্ণব অধিকারীরা মণিপুরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে বৈষ্ণব দীক্ষা প্রদান করেন। ইহার পূর্ব হইতেই মণিপুরে সংস্কৃতের আদর হইয়াছিল, এইবার রাজপরিবারে বৈষ্ণব ধর্মের

রক্ষা পাইয়া বিষ্ণুভাগবত চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত ও অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। ১৭০১ শকের (১৮১৮ খৃ) পূর্ব্বে মণিপুররাজ মারজিৎ কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্র নরায়ণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এখন মহারাজ স্বীয় ভ্রাতা চন্দ্রকীর্ত্তি, মন্ত্রী নরসিংহ ও বখতাবসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া সসৈন্যে কাছাড় ও মণিপুর রাজ্য রক্ষার জন্য যাত্রা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মণিপুরের রাজা ব্রহ্ম-নৃপতির সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মের রাজা কাছাড় জয় করিলেন। গম্ভীরসিংহ প্রভৃতি মণিপুর ইংরেজদিগের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। ইংরেজ সরকার ইহাদিগকে আশ্রয় দানপূর্ব্বক "গাম্ভীর সিংগোঁই" নামক একদল সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এদিকে যে ব্রহ্মরাজের সঙ্গে সন্ধি হয়, তাহাতে ব্রহ্মরাজ গম্ভীরসিংহকে মণিপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। গম্ভীরসিংহ পুরুষসিংহ ছিলেন। ইংরেজেরা মুক্তকণ্ঠে ইঁহার বীরত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন (Wilcox's Narrative of War, p. 20)। ব্রহ্মযুদ্ধের পর বন্ধুত্বের খাতিরে কাছাড়ী সরকার গম্ভীরসিংহের রাজ্যে অধিকার করেন, যদিও ব্রহ্মরাজ দাবী অস্বীকার করিতে না পারিয়া ঐ পরগণা গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিতে হয় তথাপি গম্ভীরসিংহ কাছাড়পরগণা ইংরেজ সরকার হইতে বাৎসরিক ৬০০০ টাকা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে মণিপুর রাজের অধিকাংশ কাছাড় হইয়া ৭,০০০ বর্গ মাইলে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সনে রাজা গম্ভীরসিংহ পরলোকগমন করেন। ইঁহার এক বৎসর বয়স্ক পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তিকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সেনাপতি নরসিংহ রাজ্য করিতে থাকেন।

বহুকালের ইতিহাস কাছাড় নরসিংহের কথা ১০৯৯ পৃঃ

চন্দ্রকীর্ত্তির জনৈক নরসিংহ নামক এক ভাই মন্ত্রিত্বের প্রাধান্যে নরসিংহের প্রভুত্ব বিলোপ করিবার জন্য তাঁহাকে হত্যা করিবার মন্ত্রণা করেন। নরসিংহ যখন দেবমন্দিরে পূজায় নিরত ছিলেন, তখন নরসিংহ তাঁহার উপর অতর্কিতভাবে খড়্গাঘাত করে ১৮৪২ খৃঃ)। নরসিংহ চক্ষে আঘাত পান, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। নরসিংহ বলপূর্ব্বক ভাই প্রমথ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন এবং নরসিংহকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ৬ বৎসর কাল রাজা থাকিয়া নরসিংহ ১৭৬৪ শকে ১৮৫০ খৃঃ, পরলোক গমন করেন। নরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেরেকসিংহ সাত বা আট দিন মাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যম বর্ষীয় বালক চন্দ্রকীর্ত্তি একদল সৈন্য লইয়া বাহুবিক্রমে স্বীয় পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন, তৎপুত্র শুরচন্দ্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এই মণিপুর রাজ্য এখন সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী; মহাপ্রভুর রাজত্বে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে মণিপুরীদের মত ভক্তিমান আর কেহ আছেন কিনা জানি না। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণে শত শত নবদ্বীপবাসী পুরুষের সর্ব্ববিধ কষ্ট সহ্য করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া সোৎসাহে যোগদান করে, তাহা অপূর্ব্ব। নবদ্বীপ পর্য্যন্ত দূর হইতে দেখিয়া ইঁহারা চৈতন্যের নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন, কেহ কেহ বহুদূর হইতে বুকে

চাঁটিয়া মন্দির-পশ্চাদবর্তী হয় মণিপুরে মেয়েদের গ্রাম্যকথা—তন্তুকলার সঙ্গে তাঁতীদের হাতের পানাক্ষর শিল্প অতীব প্রশংসনীয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর

মাদলাপঞ্জী অনুসারে পূর্বকালে উড়িষ্যা রাজ্য ৬টি "মণ্ডলপাট" বা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর ৬টি 'মণ্ডলপাটে' লইয়া গঠিত বলে পরিগণিত হয় ১ টাঁদিয়া ২ নারায়ণপুর (৩ ছত্রিশ গড়বন্দর ৪ নইগা, ৫ তৌলাট, (৬) মালঝিটা।

(১ টাঁদিয়া বর্তমান কাঁসাই নারায়ণের কিয়দংশ ও পাঁচেত পরগণা। ২, নারায়ণপুর = নারায়ণগড়। (৩) ছত্রিশ গড়বন্দর মেদিনীপুর, কেশপুর, শালবনী, খড়্গপুর, বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম, পোলীবাহাদুরপুর দাসপুর এবং অন্যান্য বাজোদ অধিকাংশ (৪ নইগা ও তৌলাট = এগরা নন্দগ্রাম, পটাশপুর ও সবঙ্গ। ৬) মালঝিটা = রামনগর, কাঁথি, খাজুরী ও ভগবানপুর থানা

যখন মাদলাপঞ্জীর এই বিভাগ উল্লিখিত হয়, তখন তমলুক তাম্রলিপ্ত উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল না, এজন্য উহার নাম এই তালিকায় নাই।

আকবর মেদিনীপুর জেলার যে নূতন বিভাগ করেন, তাহাতে এই জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রাজা তোডরমল্ল কৃত বিভাগে জলেশ্বরের অন্তর্গত কুড়িটি মহাল মেদিনীপুরের মধ্যে পড়িয়াছে (১) ঘাটশীলা, (২) সাঙ্কণচুম (৩) খরকপুর, (৪) কুজুবপুর। মহাকাল ঘাট, ৫। মেদিনীপুর, ৬) কেশরকুণ্ড, (৭) সবঙ্গ, ৮ কাঁসাইগোড় (৯ তমলুক, ১০ নারায়ণপুর, ১১ তরকোল, ১২ মালঝিটা, (১৩) বালি কাহো, (১৪) তাঁদাহাই, ১৫ খাসলচুম ১৬ জলেশ্বর, (১৭) গগনপুর, ১৮) রাইন, (১৯, কাশোই, ২০) বাজার

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রাচীন বন্দর বিশ্ববিশ্রুত, এখনকার বর্গভীমার মন্দির একটি মহাতীর্থ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা জগন্মোহন দেবের "দেশাবলী বিবৃতি" নামক পুস্তকে লিখিত আছে তখনও আশিপঞ্চাশ পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে লোকে 'তমলুক' বলিত। তন্ত্রসারে বেহালা, বাঁড়িশা, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি সমস্ত দেশই তমলুকের অন্তর্গত ছিল ভক্তপ্রসাদ খাস্তগীর মহাশয় এই "দেশাবলী বিবৃতি" উদ্ধার করিয়াছেন। পাটনার সুবেদার বিষ্ণুদেব নামক এক ভোহান রাজার আদেশে জগন্মোহন দেব ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে

ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বিবরণ সংস্কৃতে প্রণয়ন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে মেদিনীপুর জেলার কতকটা তাম্র দেশ নামে পরিচিত ছিল।

মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা মজার উল্লেখ-যোগ্য। পূর্বে এই তাম্রলিপ্তের আর একটি নাম ছিল "দামলিপ্ত"। দামল জাতীয় লোকের নিবাসবশতঃ ঐ নাম হইয়াছে এবং এই "দামল" জাতিই ক্রমে দক্ষিণ-দেশে যাইয়া "তমিল" নামে পরিচিত হইয়াছে। তাহা হইলে মেদিনীপুর জেলার আদিম লোকেরাই তামিল দেশের পূর্বপুরুষ। তমলুকের সঙ্গে অনেক এ ধরণের কথা আছে। মহাভারতের অন্যান্য স্থানে যাহাকে, দামলিপ্তে এবং পদ্মপুরাণে তাম্রলিপ্তের যেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার অনুমান করা যায় যে একসময়ে তাম্রলিপ্ত একটি স্বতন্ত্র এবং বৃহৎ রাজ্য ছিল। রোমান্যাণ্ড ঐতিহাসিকেরা তাম্রলিপ্তরাজ। মহাভারতের পুত্র সঙ্গে অঙ্গদেশের যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহাতে মনে করা যায় যে তাম্রলিপ্ত রাজধানী ছিল।

মহাভারতের পরবর্তী সময়ে আমরা সিংহল ও পেগু প্রভৃতি স্থানে তাম্রলিপ্তের বহু উল্লেখ দেখিতে পাই। সিংহল গুহ ভদ্রবাহু (চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন) প্রমাণ দিয়া গোদাম জৈনদিগের চারটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে "তাম্রলিপ্তিকা" অন্যতম। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক লেখক টলেমি "তাম্রলিপ্তি" নামক পুস্তকে তাম্রলিপ্ত যে ভারতের প্রধান বন্দরগুলির একটি তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে ভারত মাগরের অপরাপর যাত্রাতে তাম্রলিপ্ত বন্দর দ্বারা সম্পর্কিত হইত। এই বন্দরের চারিদিকে বোধ সম্প্রদায়ের ও পুরের উচ্চ মন্দিরের দৃষ্ট হয়, এমনকি প্রমাণিত হইয়াছে যে বর্গভীমার মাথার একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের উপর নির্মিত। মেগেস্থেনিস সম্ভবতঃ এই তাম্রলিপ্তবাসীদিগকেই "মলুক" নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রীক লেখক প্লিনিও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেই কথার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। "মলুক" জাতি অতি পরাক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কলিঙ্গের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্ত কিংবা তৎপুত্র বিন্দুসার কেহই তাম্রলিপ্ত রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। অশোক যে যুদ্ধে অসংখ্য লোক নিহত করিয়া কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন—সেই কালিঙ্গের সৈন্যগণ বোধ হয় তাম্রলিপ্তবাসীরাই ছিলেন, ইহারাই তখন অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন। হিউনসাঙ্গ তাম্রলিপ্ত নগরে অশোকের অনুশাসনস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অশোকের অনুশোচনা দুর্দান্ত কলিঙ্গবাসীদিগকে কতকটা নিরস্ত করিয়াছিল। এই তাম্রলিপ্তের ভাস্কর্যে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। মহাবংশে পুত্র ও কন্যা। সিংহলে গিয়াছিলেন চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েন ৪১১-৪১২ খৃঃ। তিনি সমুদ্র তাম্রলিপ্তে বাস করিয়া তথা হইতে অর্ণবযানে সিংহলে যাত্রা করেন। তিনি এই স্থানে ২৪টি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ্গ তাম্রলিপ্তে ১০টি বৌদ্ধমঠ ও সহস্রাধিক শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। ৬৩৪ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্ত একবার সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল। হিউনসাঙ্গের পর ৬৭৩ খৃঃ অব্দে ইৎসিং নামক চৈনিক পরিব্রাজক কাংচাউ নগর হইতে সমুদ্রযানে তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করিয়াছিলেন।

ইহারা ছাড়া তাওলিন, কাং চেং তে হইতেন, ইহিং চেংকন্ চাংমিন প্রভৃতি বহু সংখ্যক চীন পর্যটক তাম্রলিপ্তের বন্দরে আসিয়া ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছিলেন এই সমস্ত পর্যটক তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে এই দেশের হর্ষবর্ধনের কালের স্বাধিকারের প্রসার এবং সমস্ত বিষয়ে যে বলের কথা পূর্বে লিপিবদ্ধ আছে

খ্রীষ্টীয় অশোকের পরে কলিঙ্গ ও তন্নিকটস্থ তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা হারাইয়া সাম্রাজ্যভোগে পরিণত হয়, তথাপি এই দেশের তখনও প্রবলপরাক্রান্ত ছিল ৩০৫ খ্রীঃ অব্দে বাকেশ্বর চোল সামন্তরাজ ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির অধিপতি ধর্মপালকে পরাজিত করেন, এই কথা বিক্রমদেবের খিলিমিলিতে ঘোষণা করিয়াছেন রামপাল একাদশ শতাব্দীতে যে সমাজচক্র রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোটিবর্ষের রাজপুত্র পরাজিত করসিংহ ও অপরমন্দারের অধিপতির উল্লেখ আছে, ইহাদের তিন জনই যে ধর্মপালের রাজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই পরাজিত মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি, অপরমন্দারের বর্তমান নাম মান্দারণ, খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে কর্ণসেনের রাজা কর্ণসেন-ধর্মপাল রাজ্যে স্বাধীনতা রক্ষা করত স্বাধীন ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র শূরসেন বা লবসেন ধর্মমঙ্গল-কাব্যের নায়ক লাউসেন, কাহার কামরূপের অধিপতি এবং হরিপাল প্রভৃতি রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া "অঙ্কের বেতুরের" অধিপতি সমঘোষের পুত্র ইহাই ঘোষকে নিহত করেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর আদি সময় পর্যন্ত প্রায় ৫০০ শত বৎসর কাল মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন ইঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইঁহাদের আদি পুরুষ অনন্তবর্ম্মা গাঙ্গেয়দেব, গঙ্গা সন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুরের রাজা ছিলেন তিনি সমস্ত উৎকলও বিজয় করিয়াছিলেন

খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহলে যাতায়াত করিতেন। সেকালে কলাণ গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে ইহা জানা যাইতেছে, এবং ১০০৫ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্তের জনৈক রাজা তাম্রলিপ্ত হইতে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা উল্লিখিত আছে (Hamilton's East India Gazetteer, Vol II, p. [illegible]),

সুতরাং এই মেদিনীপুর ও তন্নিকটস্থ তমলুক সমৃদ্ধ-কারণ প্রসিদ্ধ এবং বাঙ্গালার বিশেষ গৌরবের রাজা ১৮৮১ খৃঃ অব্দে রূপনারায়ণের কাছে ইডেন সাহেব, মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হন উহা সচ্ছিদ্র এবং কোন রাজার নাম বা অঙ্ক তাহাতে নাই, কোন কোনটিতে পদ্মপাণির মূর্তি অঙ্কিত। তমলুকের স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজাদের সময় খৃঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে ঐ মুদ্রাগুলি নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন সম্ভবতঃ এই রাজাদের কতকগুলি সঙ্গে অশোকের ইতিহাস বিখ্যাত সংঘা হইয়াছিল ঈশানচন্দ্র মিত্র ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে কতকগুলি "পুরাণ" নামক মুদ্রা তমলুকে পাইয়াছিলেন। এই পুরাণ মুদ্রা বড় প্রাচীন ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তমলুকে কণিষ্কের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ইহা ছাড়া কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্ত রাজবংশের মুদ্রা তমলুক ও মেদিনীপুরের অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সকল মুদ্রা দেখিলে তমলুকের

প্রচণ্ডই প্রবাহিত হয়। ... এবং এই সকল স্থানের বন্দোবস্ত সন্তোষজনক হইবার পক্ষে পর পর বাধা। এখনও এই সকল স্থানের বন্দোবস্ত সন্তোষজনক হয় নাই, ইহাও এক অনেক প্রয়োজনীয় অবস্থা বর্তমান—তবে কিছু কিছু নিদর্শন এই দেশের অনেক স্থানেই আছে।

এই দেশ কাহাকে কাহাকে বলে তাহা লইয়া 'চরমপন্থী'। আমাদের কালের মধ্যে কোন্ ভূখণ্ড সম্বন্ধে কতটা ভাষা বদল হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এখন আমরা যাহাকে বাংলা দেশ বলি তাহার সীমা ও নাম সুদূর অতীতে কি ছিল এবং সেই সীমার কোন্ কোন্ অংশ কখন কখন বাংলা নামে পরিচিত হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি। তাহা হইলে খুব সম্ভব কবিকঙ্কণ যখন লিখিলেন, হরিষালকুড়ি, সেই সময়ে হরিষালকুড়ি বলিয়া কোন দেশ ছিল না বা থাকিলেও সেই সময়ের পরবর্তী। এই হরিষালকুড়ির লোকেরা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও সাহস দেখাইয়া [illegible] হইয়া থাকিবে, তবে এই স্থান হইতে অনেকের মতে যে বিদেশ [illegible] সমস্ত অধিবাসী সেই মুসলমান পরাক্রমের সম্মুখীন হইয়া [illegible] ... ইহাদের ... ১১১১ খৃষ্টাব্দে সুস্থ দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিজয়-স্তম্ভ কিনা বলা যায় না।

[illegible] বঙ্গদেশের এই সমস্ত বন্দর হইতে সিংহল ও দক্ষিণ ভারত সহ পশ্চিম সাগরের [illegible] হইত। বিদেশের [illegible] হইতে যে সকল বিদেশী পর্যটকগণ এই স্থানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখানে আসিবার জন্য নানাবিধ সুবিধা পাইতেন। যে সকল [illegible] সুদূর হইতে এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সুলেমান, ইবন্ খোরদাদবে (৮৪৭ খৃঃ অব্দে) তাঁহাদের একজন। ইনি বহু সাধু ও বণিকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। যাহারা ছয়টি বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়া দেশ ও লোক বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং ছবি অঙ্কন করিতে শিখিয়াছিলেন—সুতরাং এই [illegible] যে সোনার গাঁয়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং সেখানে যে বিস্তৃত আড়ম্বর ও বহু সমারোহ ছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা অনুমান করিতে পারি, বঙ্গীয় ব্যবসায়ীরা সিংহল, মেই সময়ের ও মুসলিম সাম্রাজ্যের মঙ্গলকোট হইতে এই [illegible] বন্দর দিয়া সিংহলে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার কত শত অর্ণবপোত এই বন্দরে যাতায়াত করিত এবং বাণিজ্যলক্ষ্মী, কিংবদন্তী এবং বাঙ্গালার ধন লইয়া সমস্ত জগতে পরিভ্রমণ করিত। তাম্রলিপ্ত চৈনিকদের চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান কার্য কেন্দ্র ছিল।

চট্টগ্রাম এই ভূখণ্ডের কতটা অংশ ১০৭৮ ১,৪২ খৃঃ সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলের [illegible] পরিচয় সম্বন্ধে [illegible] কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালা গজবংশ উচ্ছেদে তাহাদের ছিলেন, ইহা মেদিনীপুরবাসী তথা সমস্ত বঙ্গবাসীর কম গৌরবের কথা নহে। এই মেদিনীপুর এক সময়ে জঙ্গলাবৃত ছিল, এখান হইতে [illegible] বিশেষ অধিক দূরবর্তী ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫১০ খৃঃ

চৈতন্যদেব পদব্রজে বন্য শ্বাপদ ও দস্যুসঙ্কুল যে সুবিস্তৃত জঙ্গল অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং প্রায় এক শতাব্দী পরেও যে জঙ্গল অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই জঙ্গল পার হইয়া বন বিষ্ণুপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। একালে এই জঙ্গল বন্য ভল্লুকের আবাসভূমি ছিল এবং ক্ষুদ্রতর দুর্গ আশ্রয় করিয়া অনেক রাজপুরুষ এই প্রদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এস্থানে সংক্ষেপে তাঁহাদের কয়েকটির উল্লেখ করিব।

কেহ কেহ অনুমান করেন ও ব্রাহ্মণদের বসতি বেশি হওয়ায় পুরুষোত্তমের কালে যে ক্ষেত্রে চাকলা বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে সেখানে কোন রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন পুরুষোত্তম মল্ল অতঃপর ও কর্ণগড়ের কর্তৃত্বকাল ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ, কতক কালের জন্য তাঁহার সংখ্যাধিক্যের মোকদ্দমা পুরুষোত্তম মল্লের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে অমরকবি নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, ইনি ঐ পুরাণে মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধকর্তা ছিলেন, আরও, তাঁর দেবোত্তর ঐ সময়ে বাকি ছিল। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই।

রঘুনাথ নাম্নী সম্ভবতঃ রামচন্দ্র নামক অনেক কায়স্থের একজন [illegible] পুরোহিত (ভট্টাচার্য) দেখা যায় ইনি কয়েকটি [illegible] ছিলেন, ইনি ভট্টাচার্য্য মাত্রের এক ব্রাহ্মণের [illegible] এবং পরে অনুতপ্ত হইয়া গঙ্গাসাগরে আত্মবিসর্জনপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করেন।

রঘুর মৃত্যুর পর কৈবর্ত্ত জাতীয় কালুর দেখের [illegible] মধুবংশ, কালুরাজা, রাজধানী কিল্লা দিয়া নিশ্চিন্তপুরে [illegible] রাজত্ব করিতেন।

এই বাজার বংশের তালিকায় ভূমিজদের বংশের সঙ্গে আদি গোপীচন্দ্র ও দেবরাজের সঙ্গে বংশলতা অঙ্কিত করার চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু মেদিনীপুরের ইতিহাস লেখক গোপেন চন্দ্র বসু মহাশয় নানা কারণে ঐরূপ বংশলতা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। (৩৫৮-৫৯ পৃ.)।

মধুবংশের, রামচন্দ্র (কৈবর্ত্ত) ভূমিজ [illegible] ভূমিজদের গুরু [illegible] ও ভূমিজদের নাম এই তালিকায় আছে, ইহাদের কাহারও নাম কিন্তু সময়ের অসামঞ্জস্যের দরুন উক্ত হইয়াছে। দেবরাজের গোপীচন্দ্র প্রভৃতি অনেক রাজার নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। রাজাদিগের নাম দেখিলেই আমাদের একটু ধিক্কার ভাব হওয়া স্বাভাবিক। বঙ্গের যেন কোন সময় অরাজকতার বহু সংখ্যক রাজবংশের আদিপুরুষ চক্রবর্তী বংশ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতিও অনেক বংশলতায় বিবৃত হইয়াছে, লাক্ষ বংশাবলী লেখকদের এই স্বভাব কিছু নূতন নহে। গোপীচন্দ্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কালুরাজা কৈবর্ত্ত মধুবংশ, ভূমিজ হইতে নিম্নে-নারায়ণ রায়—বংশলতায় উক্ত ৩৩টি রাজার প্রত্যেকের নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, তাহাতে বেশ একটা পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে—কিন্তু তাঁহাদের নামের অনুনা এইরূপ—কালুডুক্রা, ধাঙ্কড়ডুক্রা, মুচাড়ডুক্রা, ডমরাডুক্রা ও ভাঙ্গড়ডুক্রা। ভাঙ্গড়ডুক্রার মৃত্যু হয় ১৪০৩ খৃ. অব্দে। সুতরাং কালুর কাল সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

যখন সামন্তগণ গোড়রাজের ভূমি কৈবর্ত ও তাঁহার দলবলের উচ্ছেদ সাধন করেন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকে ঢেঁড়্যার দিকে অগ্রসর হইয়া পরবর্ত্তী ১।২ শতাব্দীর মধ্যে বলসঞ্চয়পূর্ব্বক সমধিক অধিকার করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ মেদিনীকোর' এককালে মেদিনীকর মেদনীপুর' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার স্থিত প্রাণকর নামক কোনক রাজা এই অঞ্চল হইতে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বভাগে শাসন করিতেন বলিয়া মহাশয়ের মতে মেদিনীকর ১২০০ হইতে ১৬০১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা গণেশের সভাসদ কৃষ্ণমিশ্র মতিলাল ১৪১০ খৃষ্টাব্দে অমর-কোষের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে মেদিনীকোরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যোগেশ বসু মহাশয় অনুমান করেন ১২৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মেদিনীকরের সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে। কর্ণ বংশের একখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা বুবনেশ্বর অঞ্চল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অনঙ্গভীমদেবের দ্বারাই ঐ কর রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়। "পণ্ডিত সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, কবেরা বৈদ্য" (যোগেশ-সমাজ ইতিহাস, ২২৮ পৃঃ)। আমি মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই বৈদ্য বলিয়া মনে করেন এবং যোগেশবাবু ইহা নিঃসন্দেহে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, যেহেতু সেই অঞ্চলে 'কর' পদবিধারী অনেক ভাষলী দৃষ্ট হয়। আমার অনুমান, এই তিন মতই সত্য। কয়েরা প্রথমতঃ সেন্য ছিলেন, সংপরে বৈদ্য হইয়া ভাষ্যচর্চ্চা করায় দরুন শেষে ভাষলীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। সাতাবের হরিশ্চন্দ্র রাজারও ঠিক এই গতি হইয়াছিল (২৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মেদিনীপুরের অন্যতম ইতিহাস-লেখক কৈলোক্যনাথ পাল নারায়ণগড়ের রাজাদের বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন। এই রাজবংশ ১২৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ২৬ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন।

ইহাদের প্রথম রাজা শঙ্কর ১২৭৩ খৃঃ অব্দে এতদঞ্চলের শাসনকর্ত্তৃস্বরূপ জগন্নাথ দেবের নাটমন্দির চন্দন দ্বার খুররার রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ইনি এবং ইঁহার বংশধরগণ "শ্রীচন্দন" উপাধি-ভূষিত।

রাজা শঙ্কর শ্রীচন্দন পালের পুত্র নারায়ণবল্লভ-শ্রীচন্দন পালের নামানুসারে এই স্থান নারায়ণগড় নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজা শঙ্কর ব্রহ্মাণী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাজা শঙ্কর-শ্রীচন্দন পাল—১২৭৩-১২৯৩ খৃঃ

কৈলোক্যবাবু লিখিয়াছেন, "যে দিন ভগবতী ব্রহ্মাণী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন, সেদিন মন্দিরাভ্যন্তরে যে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিয়াছিল ৬২০ বৎসর সেই দীপ সমভাবে জ্বলিয়া আলো দান করিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও নির্ব্বাপিত হয় নাই।" এই বংশের শেষ রাজা পৃথ্বী-বল্লভের জীবনদীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে নিভিত ১২৯০ সালে (১৮৮৩ খৃঃ) সেই সুচির-প্রজ্বলিত দীপ-শিখা অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। রাজা শঙ্কর ১২৯১ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন, তদীয় মহারাজ্ঞী পুণ্যশ্লোকা মধুমতী স্বামীর চিতানলে সহগামিনী হন।

রাজা নারায়ণবল্লভ-ইন্দ্রজন পাল ১২৯৬ খৃঃ অব্দে রাজা হন তাঁহার সময়ে এবং তৎপূর্ব্ব হইতে দস্যুদের ভয়ে পুরীর যাত্রীরা পথে যাতায়াত করিতে পারিত না। রাজার অনুচরদিগকে হত্যা করিয়া তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেও ইহারা দ্বিধা বোধ করিত না একবার এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র ও সহচরগণ পরিবৃত হইয়া পুরীর পথে যাইতেছিলেন, দস্যুরা সেই সম্ভ্রান্ত লোকটিকে হত্যা করিয়া তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। তাঁহার সাধ্বী পত্নী স্বামীর চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এই দুঃসংবাদ পাইয়া নারায়ণবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় তিনি দস্যুদল দমিত করিবেন, নতুবা রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন তিনি ৩০০ বিঘা জমি খরিদ করিয়া এক বৃহৎ পরিখা খনন করিয়া সত্বরই প্রস্তুত করিলেন এবং স্বীয় প্রাসাদ অত্যন্ত সুদৃঢ় করিলেন। তিনি দৃঢ় হস্তে দস্যুদল দমনে নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে এরূপ ভাবে নিরস্ত্র করিলেন যে দস্যুদলপতি স্বয়ং আসিয়া আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যদল-ভুক্ত হইল।

রাজা নারায়ণবল্লভ-ইন্দ্রজন পাল ১২৯৬-১৩০২ খৃঃ

নারায়ণবল্লভের পুত্র দেবীবল্লভ-ইন্দ্রজন পাল ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তৎপরে অল্প কয়েক জন নৃপতির পরে শ্যামবল্লভ-ইন্দ্রজন পাল ৬৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দীর্ঘ শাসনে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহার শুরু বিস্তারের নামে খাত বিস্তারত দীঘি ও পরমঙ্গা দীঘি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পরমঙ্গা দীঘি দৈর্ঘ্যে এক মাইলের অধিক, প্রস্থেও তদনুরূপ, কথিত আছে দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মহীপাল দীঘি অপেক্ষাও এই দীঘি বৃহত্তর সাজাহান বাদসাহ একদা সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে নারায়ণগড়ের পথে যাইতেছিলেন। শ্যামবল্লভ রাজপুরীর দ্বার বন্ধ করিয়া কৌশলে নদীর জলের পয়ঃপ্রণালী খুলিয়া দিয়া সাজাহানের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাজাহান বিশালকায় হস্তীদের দ্বারাও নারায়ণগড়ের সুরক্ষিত লৌহকবাট ভাঙ্গিতে পারেন নাই অবশেষে শ্যামবল্লভ জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া করযোড়ে সম্রাট্-কুমারের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন "মহারাষ্ট্রীয়া আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে এবং দস্যুরা পথে উৎপাত করিতে না পারে—আমি তাহার কিরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছি তাহা হুজুরকে দেখাইবার জন্য এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি, আপনি আমার মার্জ্জনা করিবেন।" সাজাহান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা, সৌজন্য, বল, বিক্রম ও রণকৌশলের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে "মাড়ি সুলতান" উপাধি দিলেন। এই উপাধির অর্থ "পথের প্রভু।" শ্যামবল্লভের বংশধর মধুসূদনবল্লভ-ইন্দ্রজন পাল মাড়ি সুলতান খাঁদের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্ব কাল ১৫ বৎসর।

রাজা দেবীবল্লভ-ইন্দ্রজন পাল ১৩১২-১৩২৮ খৃঃ
রাজা শ্যামবল্লভ ইন্দ্রজন পাল মাড়ি সুলতান—১৩২৮-১৩৯৬ খৃঃ

রাজা মধুসূদনবল্লভ-ইন্দ্রজন পাল মাড়ি সুলতান—১৭২৮-১৭৪৩ খৃঃ। রাজা পরীক্ষিৎ-ইন্দ্রজন পাল মাড়ি সুলতান—১৭৪৩-১৭৮২ খৃঃ

পরবর্ত্তী রাজা পরীক্ষিতের রাজত্বকালও নানা বিঘ্নসঙ্কুল. একদিকে বর্গীদের অত্যাচার,

নবাব ও ইংরেজ সৈন্যদের প্রথম সংঘর্ষ, বন্দুক বিদ্রোহের ক্রমাগত নিরীহ গৃহস্থদিগকে উৎপীড়ন, অন্যদিকে ১৮৫৭ খৃঃ প্রচণ্ড উপপ্লবে দেশবাসীরা নবাবত্বপদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল সুদীর্ঘ ২১টি বৎসর রাজ্যভোগ অথবা ভূতোগ করিয়া তাঁরা পরীক্ষিৎ পরলোকগমন করেন

এই দেশে মুসলমান অধিকারের প্রারম্ভকাল ১২০৬ খৃঃ বলা যাইতে পারে তৎপূর্বে কিঙ্কণীতে রাজা বা একটি ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন উত্তরকালে প্রতাপাদিত্য কিঙ্কণীর অধিকার সুলতানদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আমরা প্রথমভাগে দেখাইয়াছি উড়িষ্যা এক সময়ে মোগলদের বিরুদ্ধে পাঠানদের যড়যন্ত্রের অন্যতম কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল রাজা বা মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া উড়িষ্যার অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু তবুই তাঁহাকে কোন দিনই নিরাপদে স্বাধীনভাবে বসিতে দেয় নাই। প্রতাপাদিত্যের পর কঙ্কণের ঈশা খাঁ এক বা দুই কিঙ্কণীর অধিপতি হইয়াছিলেন মোগলাধিকৃত ঈশা খাঁ ও তাঁহার বংশধরের জীবনেতে উল্লিখিত আছে, বলভদ্র রাজারামের মত লোকদিগকে আশ্রয়দান করিতেন—"কিঙ্কণী মধ্যে নাই হেন ভাগ্যবান্" ইত্যাদি কথা ইহা দেখাইতে যে তাঁহারা স্বাধীন রাজা অর্থাৎ বাদশাহের সুবা বলিয়া স্বীকার করেন। রামকান্ত ভাদুড়ী নামক স্থানের রাজা অনাদিনাথের পুত্র রসিকানন্দ ঈশা খাঁর কন্যা বিবাহ করেন। রামকান্ত ভাদুড়ীর নিকট হইতে সমস্ত ভাদুড়ী মণ্ডলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন রামকান্ত ১৫৯০ খৃঃ হইতে ১৬৪২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন এই সময়ে কিঙ্কণীর শাসনকর্তা এবং সম্ভবতঃ বাঙ্গালার বহু কয়েক জনের নাম আমরা পাইয়াছি —বিক্রমাদিত্য দাস (পদ্মনাভ কায়স্থের পুত্র , ১৫৮৪ খৃঃ দ্বিতীয়ের পুত্র ভীমসেন বক্সীপাত্র, বলভদ্র দাস ও সদাশিব দাস, সালম খাঁ (১৫৮৯ খৃঃ পাঠানবিদ্রোহের সময়ে নানারূপ রাজনৈতিক বিপ্লবে কিঙ্কণী বিধ্বংসিত হইয়াছিল।

তোডরমল্ল কর্তৃক রাজ্য বিভাগের পর সাজাহান পুনরায় এই অঞ্চলের বিভাগ করিয়াছিলেন তদনুসারে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার মুজফ্ফরি, সরকার মাদারণ ও সরকার সোহালসাহার অন্তর্গত করা হইয়াছিল ঐ সময় কিঙ্কণী সুবা উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং উহা বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে মুরশিদ কুলী খাঁ সুবা বাঙ্গলাকে নূতনরূপ বিভাগ করেন, তিনি তোডর মালের কৃত বাঙ্গলার ১৯টি সরকারের সহিত কিঙ্কণী ও বাকলার দুইটি এবং নবসৃষ্ট নয়টি সরকার মিলাইয়া সুবা বাঙ্গলাকে ২৪ সরকারে ১৩১০ বঙ্গাব্দে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর পুনঃ পুনঃ রাজস্ব সম্বন্ধে বিভাগ হয়, তাহার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন কিছু দিন পূর্বে বর্তমান মেদিনীপুর দুই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল —বর্ধমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও কিঙ্কণী "১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জলেশ্বর জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় উত্তরকালে বর্ধমানের অন্তর্গত ঘাটশিলা পরগনা ও হিজলীর অন্তর্গত কতকগুলি পরগনা ও সমগ্র হিজলী জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়" (যোগেশবাবুর ইতিহাস, ২৫ পৃঃ)। মেদিনীপুরের প্রত্ন-বিদ্রহ ও ধর্মবিধি সম্বন্ধে যোগেশবাবু যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক দুঃখের বিষয় সেই সকল

প্রাচীন কীর্তিগুলির কোন ছায়া চিত্র দেওয়া হয় নাই, আমরা মূলতঃ তাঁহার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কয়েকটি কথার উল্লেখ করিব

(১) বর্গভীমার মন্দির—কথিত আছে এই মন্দির ও বিগ্রহ বৈদ্যনাথ ভারতোক্ত মহাদেবের বংশের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত করেন, কিন্তু উহা একটি ভগ্ন স্তূপ মাত্র মনে হয় মন্দিরটি পূর্ব্বকালে কোন বৌদ্ধ মঠ ছিল, পরবর্ত্তী কোন হিন্দু রাজা উহা হিন্দুদেবালয়ে পরিণত করিয়াছেন বর্গভীমার মূর্ত্তি উগ্রতারার মত মন্দিরটি ৬০ ফুট উচ্চ এবং অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ এই উচ্চতা ছাড়া ইহার অধিষ্ঠান ত্রিশ ফুট উচ্চ। (২) মহানগড় ভিতর গড়ের পরিমাণ ৫,৬২,৫০০ বর্গ ফুট, ইহার চতুষ্পার্শ্বের প্রত্যেক দিকে ৭০০ ফুট দীর্ঘ পরিখা। বাহির গড়ের পরিখা প্রত্যেক দিকে ১৪০০ শত ফুট। (৩) মহিষাদলের রাণী ভবানী দেবীর নবরত্ন মন্দির (১৭৮৮ খৃঃ) রামকিঙ্কর মন্দির, রাণী ইন্দ্রাণীদেবীর রাসমঞ্চ, সিংহবাহিনী দেবী প্রভৃতি। ৪ দোরো পরগণায় ঘাটশিলা, সাঙ্গমাধব ও নীলমাধব—নীল প্রস্তরের অতি প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের মূর্ত্তি—চমৎকার শিল্প-নিদর্শন (৫) আকড়ার দীঘি বড় দীঘিটি নাই ছোট দীঘিটি আছে—এই ছোট দীঘির এক পারে দাঁড়াইলে অপর পারের মানুষ লিলিপুটের মত ছোট দেখায়। ছোট দীঘি যদি এই হয়, বড়টি কিরূপ ছিল, তাহা অনুমান করা যায় সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগে এই দীঘিগুলি খাত হইয়াছিল (৬) গোপ-শিবিরে যে সকল কীর্ত্তি চিহ্ন আছে, তাহা মহাভারতের বিরাট রাজার সঙ্গে জড়িত করিয়া অনেক উপকথা তদ্দেশে প্রচলিত করা হইয়াছে। রামগড়ের সামন্ত রাজের অন্যতম বিরাট গুপ্ত একাদশ শতাব্দী) কর্ত্তৃক ঐ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন ৭) কণগড়—গড়টি একক্রোশ ব্যাপক ছিল। ইহা ছাড়া বৌদ্ধযুগের বহু ভগ্ন মূর্ত্তি ও মন্দিরাদির কথা মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখকেরা উল্লেখ করিয়াছেন এখানে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

এই কুদ্র সন্দর্ভের অনেক কথাই আমি যোগেশচন্দ্র বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয়দ্বয়ের ইতিহাস হইতে সঙ্কলন করিয়াছি মেদিনীপুর কাশীরাম দাস ও তাঁহার ভ্রাতাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী লিখিবার স্থান, মহাপ্রভুর পদাঙ্ক-পূত, অশোকের স্মৃতি-বিজড়িত, চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্থ, প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু সনামধন্য ব্যক্তির স্মৃতি-সংশ্লিষ্ট, ইদানীংকালে বিদ্যাসাগরী পণ্ডিতাগ্রগণ্য মৃত্যুঞ্জয় ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি—সুতরাং এই স্থান বাঙ্গালীর হৃদয়কে সহজেই আকর্ষণ করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বন-বিষ্ণুপুর *

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ও বঙ্গের সমাজে বন বিষ্ণুপুর রাজবংশ একটা নূতন জীবন ও প্রেরণা আনিয়াছিল—এই মাটীখানার প্রধান নায়ক রাজা বীর হাম্বির নূতন জীবন পাইয়া বঙ্গের সামাজিক জীবনে একটা নূতন জীবনের প্রেরণা দিতে ছিলেন। বন বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করিয়া ৫ই শতাব্দী কাল বঙ্গের শিল্প সাহিত্য ও সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং এদেশের শিক্ষা-দীক্ষার যে দিকের সমস্তই নিতু নিতু হইয়া আসিতেছিল, তাহা কিয়ৎকালের জন্য বিষ্ণুপুরের রাজবংশ একটু উস্কাইয়া দিয়া পোক্ষণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা এখন বন-বিষ্ণুপুরের ইতিহাসটী এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে তুলিয়া দিলাম।

মহাভারতের সময়ে মল্লভূমি বা মল্লরাজ্য সমুদ্রের কোলে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। ফরিদপুর জেলা, যশোহর, খুলনা, বরিশাল এবং ২৪ পরগণা যখন সমুদ্রগর্ভে ছিল, তখনও বোধ হয় মল্লভূমি মাথা জাগাইয়া ছিল। এই দেশের প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে পাথরে ও টেরাকোটার ফলকে যে রণতরীর ছবি উৎকীর্ণ দেখা যায় তাহাতেও মনে হয় সমুদ্র এক সময়ে এদেশের অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। জনশ্রুতিও এই সংস্কারের অনুকূল।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন—সম্ভবতঃ কলিঙ্গের একাংশ তখন মল্লভূমি ছিল। যবন দেশের রাজা ডেমেট্রিয়স খৃষ্টের পূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে মল্লভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন বুদ্ধগয়ার লিপি হইতে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক রাঢ় দেশের অধিপতি ছিলেন (৭ম শতাব্দী), তখন সম্ভবতঃ মল্লভূমি রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

মল্লরাজবংশের আদিপুরুষের নাম আদিমল্ল, আদিমল্ল আদিশূরের মত নাম। কলত যখন বংশাবলী রচিত হয়,—তখন বংশের আদিপুরুষের নাম হারাইয়া গিয়াছিল, সেই ঐরূপ একটা উপাধি দিয়া কুলজি শাস্ত্রে চালাইয়া দেওয়া হইয়া থাকিবে। আদিমল্ল আদিত্যের রাজা বৈদ্যদেবে পালিত হন কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন,—রাজপরিবারে এইরূপ কিংবদন্তী, এই আদিমল্লের নাম 'রঘুনাথ' বলিয়া রাজবংশের কুলজিতে উল্লিখিত আছে এবং তিনি ক্ষত্রিয়-বংশের চন্দ্রকুমারী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন, কুলজি-লেখক এ সংবাদ দিতেও ভুলেন নাই। কথিত আছে, আদিমল্ল ৬২৬ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ্য স্থাপন করেন। রাজ-পঞ্জীর লেখক একটা ঠাট বজায় রাখিয়াছেন যে, উহাতে কোন ভুল বাদ পড়ে নাই। ইহাতে সপ্তম শতাব্দী হইতে রাজাদের প্রত্যেকের নাম ও তারিখ ঠিক বজায় রেখা আছে। এত দীর্ঘ কালের এরূপ সন-তারিখ সংবলিত ইতিহাস বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন রাজবংশের

* বন-বিষ্ণুপুর প্রবন্ধ এই সংখ্যাটি আমরা অধ্যাপক মল্লিক মহাশয়ের বিষ্ণুপুরের উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক ইতিহাস, বিষ্ণুপুরের ই পত্র এবং সাহিত্য-সেবকগণের অভিজ্ঞতার মূলতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিলাম।

নাই তালিকাটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; রাজাদের নাম ও অভিষেকের সময় ইহাতে দেওয়া হইল।

আদি মল্ল (রঘুনাথ) ৩৯৪ খৃঃ, মল্লাব্দ ১। ৫৫ মল্ল ৭৩৮ খৃ, ৩৫ বীর মল্ল ৭৯৩। জিষ্ণু মল্ল ৮৩১। ঐক্য মল্ল ৮৬২। কানু মল্ল ৮৯৭। ধৈর্য মল্ল ৯৩১। শূর মল্ল ৯৬৪ অনন্ত মল্ল ৯৯৪ কর্ণ মল্ল ১০১১। মনোহর মল্ল ১০৪৮ রণদা মল্ল ১০৯১। দুর্জ্জন মল্ল ১১৩৫। বেণু মল্ল ১১৭৮। রঘুনাথ মল্ল ১২০৫। বিজয় মল্ল ১২৩১। মাধব মল্ল ১২৬৩ দুর্যোধন মল্ল ১২৯৮। কর্ণ মল্ল ১৩৪৪। অনন্ত মল্ল ১৩৭৯ কৃপ মল্ল ১৪১৪ প্রথম মল্ল ১৪২৯ দুর্জ্জন মল্ল ১৪৫৩। কৃষ্ণ মল্ল ১৪৭৯ জয় মল্ল ৪৫ বৎসর রাজত্ব মল্ল ১৫২৪ প্রতাপ মল্ল ১৫৭২ সিংহ মল্ল ১৬১১। গোবিন্দ মল্ল ১৬৪৯। ধবলাঙ্গী মল্ল ১৬৮৮। ২৫ মল্ল ৫৮। ভীমদেব মল্ল ১৭৩৭। রাঘব মল্ল ১৭৮৫ বাঘমল্ল মল্ল ১৮০৮ ভীম মল্ল ১৮১১। কল্যাণ মল্ল ১৮৫৮। পৃথ্বী মল্ল ১৮৯৪। রূপ মল্ল ১৯০৯। ভীমবন্ধু মল্ল ১৯৩৭ কাশু মল্ল (৭৫ বৎসর ৪ মাস মল্ল (৪৪) ১৯৮৮। সিংহ মল্ল ১৯৯৮ মদন মল্ল ১৯৯৯। দুর্জ্জন মল্ল (২য়) ১৯৯৯। উদয় মল্ল ১৯৯৯। চন্দ্র মল্ল ১৯৯৯। বীর মল্ল ১৯৯ । হাড়ি মল্ল ১৯৯৯। বীরহাম্বির ১৯৯৯। বাড়ি হাম্বির ১৯৯ রঘুনাথ সিংহ ১৯৯ বীর মল্ল ১৯৯৯। দুর্জ্জন সিংহ (৩য়) ১৯৯৯। রঘুনাথ সিংহ (২য়) ১৯৯৯। গোপাল সিংহ ১৯৯। চৈতন্য সিংহ ১৯৯৯-১৯৯৯।

চৈতন্য সিংহ পর্য্যন্ত মল্ল রাজারা ১১৯৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন চৈতন্য সিংহ এই তালিকার ৫৬ সংখ্যক নৃপতি। এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের কুলপঞ্জী অবশ্যই তাজপুরে সুরক্ষিত ছিল, সুতরাং নাম সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা অল্প—তারিখও প্রায় ঠিক-মোগা বলিয়াই মনে হয়,—কারণ আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই বংশের লোকেরাই শাসন করিয়াছিলেন অধিকাংশ যদি অপর কোন বংশের হাতে যাইয়া পড়িত, তবে ধারা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং গোজামিল দিয়া বংশাবলী প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইত। এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত কিন্তু তথাপি দুই হইবে যে, বীর হাম্বিরের পর হইতে রাজারা মল্ল উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাড়ি হাম্বিরের ভ্রাতা রঘুনাথের সময় হইতে সমস্ত রাজাই 'সিংহ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এত দীর্ঘকাল যে 'মল্ল'-উপাধি বংশগত ছিল তাহা সহসা তাঁহারা ছাড়িলেন কেন? নবাবেরা এই উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যয়যোগ্য নহে ইসা খাঁ যেভাবে বিক্রমপুর হইতে মসনদআলি উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া বীর গৌরব বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, মল্ল রাজারাও হয়ত সেইভাবে নবাবের দত্ত উপাধি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এইরূপ অনুমান করার কারণ আছে প্রকৃত পক্ষে উপাধিটি রাজাদের স্বকৃত উহা আত্মে উঠিবার উপায় মাত্র, এবং স্বকৃত-উপাধি, বস্তুতঃ 'সিংহ' পদ এত মহান যে উহা নবাব-দত্ত উপাধির মত শোনায় না "মাণিক্য" উপাধিটীর বরং একটা গৌরব আছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই মল্লরাজীয় রাজন্যদিগকে প্রকৃত শিক্ষিত ও সুসভ্য করিয়াছিল—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই বৈষ্ণবদের প্রভাবেই রাজারা এই 'মল্ল' উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—কেন ছাড়িয়া ছিলেন তৎসম্বন্ধে প্রত্যেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "ক্ষত্রিয় সিংহ উপাধি গ্রহণের পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজারা বহু শতাব্দী

করেন আপনাদিগকে মল্ল। অন্যান্য উপাধি। যাহারা পরিচয় দিতেন, এবং এখন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ইতিহাসকে 'বাজা রাজা' বলিয়া জানে তাহা ছাড়া স্থানীয় নানারূপ প্রবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিষ্ণুপুরের রাজারা বহুকাল স্বাধীন এবং ক্ষত্রিয়বংশ ছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা কায়স্থ কিম্বা ইতরা কদাপত্ত কায়স্থ ছিলেন না। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরের রাজাদের কায়স্থত্বের যে দাবী, উত্তরলাঢ়ে রাজপুত এবং গুপ্ত কায়স্থ মৌলিক ক্ষত্রিয়দেরও সেই দাবী অর্থাৎ ইহারা বহু পুরা রাজাদিগকে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বংশী হইয়াছিলেন।

এই রাজাদের প্রজারা এত ভক্ত হইয়াছিল যে, রাজপরিবার ইহাদের সঙ্গে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই পাহাড়পুরই বরাবর নিজেকে নিজে রক্ষা করিয়াছে। বিষ্ণুপুরে গড়ি বাঁধ বন্ধ ছিল এই বন্ধের এক একটি পুরুষই অসম্ভব হইয়াছেন। লোকে বলিয়া থাকিবার জন্যই ইহাদের স্বাধীনতা অন্তরাল অন্তরে আন্দোলিত হইয়া থাকে। বাঘের মত নিজে ও তার শিকারের উপযোগী করিয়া আছে—ঐ জন্যে কুকুরের, সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু এই বীরের মত পরাক্রমে ছাড়িয়া দিলে উপকূলবর্তী স্থানগুলি বন্ধাবস্থায় হইয়া যায় বিলক্ষ সৈন্যদিগকে এই বন্ধন খোলা হলে মত ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে ইহা বিষ্ণুপুরের অনেক অন্ত পুরুষ এই ইহা আক্রমণ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত এ রাজ্যের কিছুই করিতে পারে নাই বিষ্ণুপুরের পূর্ব্বে তিনটি বাঁধ আছে—রসকোষ, কৃষ্ণসাগর এবং দামোদর পশ্চিমে রঘুনাথবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ এবং রাজবাঁধ নামের যথাক্রমে সাতাশবাঁধ পাহাড়িয়া জল নীচের দিকে প্রবাহিত হইবার পথে পূর্ব উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীরের আকারে ছাড়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ইহাই বাঁধে পরিণত হইয়াছে। বাঁধগুলি পূর্ব পশ্চিম—ইহাদের একটি এক বর্গ মাইলের অধিকাংশ ব্যাপক পূর্ব্বে এই বাঁধগুলির পাড়ে রাস্তাদের মনোরম পুষ্পোদ্যানে ছিল রাজারা নবাবদের হইতে পুষ্পতরু আনাইয়া ইহাদের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ১৭৮২ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত কলিকাতার শাসনকর্ত্তা হলওয়েল সাহেবের বিবরণীতে লিখিত আছে "কিন্তু প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধায় বিষ্ণুপুর অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন রাজা, কারণ যে কোন সময় রাজা ইচ্ছা করিলে বাঁধের মধ্য খুলিয়া দিয়া বিপক্ষ পক্ষকে ধ্বংস করিতে পারেন সুজা বাঙ্গালার রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি বহু অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন কিন্তু বিষ্ণুপুরাধিপতি একটি বাঁধের মুখ খুলিয়া দেওয়াতে মোগল সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল—রাজ্যের একটিও ফৌজিত ছিল না তদবধি বিষ্ণুপুর অধিকার করিতে আর কেহ চেষ্টা বা সাহসী হয় নাই। সুতরাং এই রাজারা কখনই মোগলদিগের অধীন হন নাই।" যাহা হউক "বিলীয়তে বা গলীয়তে বা"—এই ভারতব্যাপী প্রবাদের প্রতি আস্থা দেখাইয়া বিষ্ণুপুরের রাজারা মোগল কোন বৎসর ১৫,০০০ কোন বৎসর ২০,০০০ টাকা মোগল সরকারে নজরানা পাঠাইতেন আবার কোন কোন বৎসর একটি পয়সাও দিতেন না সুতরাং বাদশাহটা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন দাঁড়াইয়াছিল।

বিদেশ পর্য্যটকেরা বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানের

অট্টালিকার মত শোভায় জঙ্গলের যেন একটা উজ্জ্বল মরুভূমি, বিষ্ণুপুর তাহাতে ওয়েসিসের মত। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, "In this district are the most vestiges of the beauty, purity, regularity, equity and strictness of ancient Innocent Government. Here the property as well as the liberty of the people are invaluable, here no robberies are heard of either private or public" (Interesting Historical Events, by Holwell, published in 1766)

ইহার মর্ম্মার্থ—"এই জেলায় প্রাচীন হিন্দু শাসনতন্ত্রের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, নিয়মশৃঙ্খলা এবং ন্যায়পরতার এখনও জীবন্ত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশের মত আর কোথাও তাহা নাই। প্রজাদের ধনসম্পত্তি ও সম্ভ্রম এখানে সুরক্ষিত, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য কাহারো নাই। এখানে সাধারণ অথবা প্রকাশ্যে লুঠতরাজ কোথাও সংঘটিত হয় না।"

ফরাসী পর্য্যটক গ্রাবিয়েল যেমন লিখিয়াছেন—"এই দেশকে প্রকৃতি এমন ভাবে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন যে অধিবাসীদের চাষবাসের মাধুর্য্য এবং জীবনের আনন্দ সেই আদিকাল হইতে একভাবে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের বস্ত্র কখনই নষ্ট হইতে দেখিত হয় না। ইহারা চারিদিকে জলের ধারা এমন সুরক্ষিত যে, চাষ খুলিয়া দিলেই সমস্ত ক্ষেত জলে ভরিয়া যায়। কৃষকের বাহুতেও বল এই ভাবে সঞ্চার পাইয়াছে। ফলে আর কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না।"

বাহিরের লোক এখানে আসিলে যেরূপ আতিথ্য পাইত, য়ুরোপীয় লেখকেরা একবাক্যে তাহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, "কোন বিদেশী—বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অথবা শুধু দেশ পরিদর্শন—যে মুহূর্তে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করেন, সেই মুহূর্তে তিনি রাজ অতিথি বলিয়া গণ্য হন। সরকারী বাহে তাঁহার পরীরক্ষী নিযুক্ত হয়,—তাঁহার চলাফেরা সুবিধাজনক যাহাতে সুবিধা হয়—প্রাক্-সঙ্গে এই সকল লোক তাহা সম্পাদন করিতে আসিয়া হয়। প্রথম রক্ষীর দল কতক দিন পরে তাঁহাকে তদ্রূপ দ্বিতীয় একটি দলের নিকট সমর্পণ করে—এই ভাবে এক দলের কর্ত্তব্য শেষ করার সময় পর্য্যটক মহাশয়কে ইহাদের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে সবিস্তার প্রশ্ন করা হয় এবং ইহাদের ব্যবহারে কোন ত্রুটি হয় নাই প্রমাণ করিবার নিকট হইতে একখানি লিখিত সার্টিফিকেট নিতে হয়। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে এক দলের পর অপর দলের রক্ষকদিগের সঙ্গে তিনি রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত গমন করেন। যে দিন বিষ্ণুপুরে তিনি পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতে তাঁহার আহারাদি ও থাকিবার ব্যবস্থা সমস্তই রাজব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তাঁহার সঙ্গে তুরঙ্গাদি বহন প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ রাজা দিয়া থাকেন। কোন পাল্কী বা বৈল বাহন উপস্থিত না হইলে একস্থানে তিন দিনের বেশী থাকিলে অবশ্য পর্য্যটকের নিজেই ব্যবস্থা নিজেই করিতে হয়। রাজ্যের মধ্যে যদি কেহ কোন জিনিষ হারায়, তবে যে তাহা কুড়াইয়া পায়—সে তৎক্ষণাৎ

নিকটবর্তী গাছের উপর তাহা ঝুলাইয়া রাখিয়া চৌকিদারকে খবর দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ সহকার হইতে সজোর ঢোল পিটাইয়া দিয়া ঐ সামগ্রীর স্বামীকে আমন্ত্রণ করা হয়।

য়ুরোপীয় পর্যটকেরা যে প্রশংসা করিয়াছেন,—তাহার অতি অল্প অংশ মাত্র উপরে উদ্ধৃত করিলাম সে ধারণা চুরি, ডাকাতি ছিল না,—সেখানকার সকল লোকই মুসলমান সে ভয় এবং সন্ত্রাসের বিষয় এই রাজধানী আরম্ভমান কাল হইতে এই ভাবে চলিয়া আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না বীর হাম্বির রাজা যখন সম্রাপতি ছিলেন এবং সেখান দুইটি পর্যন্ত যে জনসাধারণ রাজা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কষ্টে থাকিত, তাহা তখন নিরাসী কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের পরামর্শকরণে প্রতীয়মান হয় প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর দ্রষ্টব্য বৈষ্ণবগণের সভাবের এই দেশ হিন্দুর আদর্শ রাজ্য পরিণত হইয়াছিল সেই আদর্শ সনাতন কাল হইতে হিন্দু রাজার দেশে পালিত হইয়া আসিয়াছে; মাগেস্থেনিস, ফাহিয়েন প্রভৃতি সমস্ত বিদেশী পর্যটক এই বিষয়ে একই কথা বলিয়া গিয়াছেন অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মাত্র পোনের হিন্দু শাসিত এক দেশ দেখিয়া (১৮৯৮-৯৯) লিখিয়া গিয়াছেন — "অধিবাসীদের অনেকে ধনিক এবং সকলেই বিদ্যানী ও রাজভক্ত, ইহারা কোন কারণেই কখনও বিদ্যা করেন না, এবং জগতে ইহাদের মত সাধু বিশ্বাস কোন জাতি নাই। ইহারা মাংস আহার করেন না, মদ্যপান করেন না এবং পশুহত্যার প্রতি অনুরাগ হন না— ইহাদের জীবন সর্বতোভাবে পবিত্র।"

বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে ফরাসী গ্রাবে রেনল Abbe Raynal) লিখিয়াছেন—"যে সকল সমাজ পৃথিবীর শীর্ষস্থ, অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এই বিষ্ণুপুরের কত তফাৎ এই রাজ্যের ভিত্তি শৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিক অর্থনীতি, যাহা চিরকাল অক্ষয় অত্যাচারীদের রাজ্য বুদ্বুদের মত উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয়— কিন্তু এইরূপ রাজ্যের ধ্বংস নাই।" *

বিষ্ণুপুরের এই যুগ বৈষ্ণবদের পরাধীনতা হলওয়েলের সময় (১৭৬৫ খৃঃ) রাজধানী ও তৎসন্নিকটে ৩৯৩টি মন্দির ছিল। ইহাদের অনেকগুলিই বীর হাম্বির ও তাঁহাদের বংশধরগণের দ্বারা গত ৩৫০ বৎসরের মধ্যে নির্মিত। মল্লভূমির ধর্ম মাধুর্যের সেরা। এই প্রেম ও অনুরাগপূর্ণ ধর্ম জনসাধারণকে শিল্পকলায় দীক্ষিত করিয়াছিল—সেই প্রেরণায় যে কি সুফল ফলিয়াছিল, তাহা মন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে।

হিন্দু রাজাদের আদর্শ শান্তি বর্তমান প্রতীচ্য জগতের উদ্বেগ অশান্তি ও অবিরত কলহ। কে কাহার মাথা ভিঙ্গাইয়া বড় হইতে পারে ইহাই প্রতীচ্য জীবনের লক্ষ্য। যে অপরকে ভিঙ্গাইয়া উঠিবে, দাঁড়িয়া থাকিবার তাঁহারই দাবী—অপরের মৃত্যু অনিবার্য। Struggle of the fittest নীতির ইহাই মর্মকথা হিন্দু সকলকে লইয়া বিনা দ্বন্দ্বে,

* History of Bishnupur Raj, by A. P. Mallik, B.A. B.T. p. 132 (1921)

বিনা হিংসায়, বিনা প্রতিযোগিতায় এক সঙ্ঘায় থাকা মুসলমানের মত সর্ব্বজাতির সমাবেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকে তাঁহাদের সামাজিক পরম লক্ষ্য বলে ধরিয়া আসিয়াছেন কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বার্থ উদ্দেশ্যে অপরকে ধ্বংস করিবার জন্য সদাই অস্ত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অদৃষ্টের রহস্য এই যে, আমরা বিশ্বের সংহারিণী শক্তি কালী মূর্ত্তির পূজক এবং প্রতীচ্য জগৎ ক্ষমার অবতার যিশুর উপাসক

বৈষ্ণব ধর্ম্ম জগতকে কিরূপ শুভ্র করিতে পারে, বনবিষ্ণুপুর কয়েক শতাব্দীর জন্য সর্ব্বসমক্ষে সেই চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছে

এখানে বিষ্ণুপুর রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি।

আদিমল্ল সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে ইঁহার নাম 'রঘুনাথ' এবং ইনি বৃন্দাবন সন্নিহিত যদুনন্দনের ক্ষত্রিয় রাজবংশে, যাদবের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বর্দ্ধমানের অন্তর্গত জয়পুর নামক জঙ্গলপথের এক স্থানে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। রাজা সিংহাসনচ্যুত হইয়া সস্ত্রীক পুত্রসহ যাত্রা করেন, পথিমধ্যে লোধ্রগ্রামে পূর্ণগর্ভা পত্নীর জন্য মনোহর পঞ্চানন নামক এক ব্রাহ্মণকে দিয়া ও জগন্নাথ গুহ নামক এক কায়স্থের হস্তে দুই 'জয়ঢক' রক্ষা করিয়া স্বয়ং সপরিজনে চলিয়া যান রাজা তথায় বিসূচিকা রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন এদিকে একটি পুত্র জন্মিবার পরেই রাণী পরলোক গমন করেন নিঃসন্তান পুত্রটিকে পঞ্চানন শিক্ষাদান করেন, এবং জনৈক বাগ্দিজাতীয় মহাবীর ইঁহাকে মল্লক্রীড়ায় সুদক্ষ করে বাল্যকাল অতিবাহনে প্রচলিত গল্পের কথা ইঁহার কাহিনীতেও বাদ পড়ে নাই নিদ্রিত বালকের (রঘুনাথ) মস্তকে একটা বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ইঁহাকে রোদে ছায়া দান করিয়াছিল, সুতরাং ইনি যে রাজা হইবেন, তাহা সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিল ইঁহার মুখ সুদর্শন ছিল এবং সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে মল্লবিদ্যায় ইঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না প্রতাপপুরের রাজা নৃসিংহদেব ইঁহার গুণপনার পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে লোধ্রায় ও তৎসন্নিহিত ছয়টি গ্রামের অধিকার প্রদান করেন প্রতাপপুরের রাজার অধীন অট্টবঙ্গের রাজা বিদ্রোহী হওয়াতে আদিমল্ল রঘুনাথ, বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত হইয়া বিজয়ী হন – সুতরাং রাজা সন্তুষ্ট হওয়ায় সেই রাজ্যের অর্দ্ধাংশও আদিমল্লকে প্রদান করেন। পঞ্চানন ও দিগ্বিজয়ী সভাসদ ও মন্ত্রিরূপে রাজা শাসনে সহায়তা করিতেন

আদিমল্লের পর তৎপুত্র জয়মল্ল ৭০১ খৃঃ অব্দে রাজা হন, তাঁহার রাজ্যের পরবর্ত্তী ঘটনা প্রতাপপুরের রাজার সঙ্গে বিবাদ প্রতাপপুরের রাজা সেই অঞ্চলের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন এবং আদিমল্ল ইঁহারই অধীনস্থ ছিলেন কিন্তু মল্লরাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা দর্শনে ভীত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া নরসিংহ দেব (প্রতাপপুরের রাজা) তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বিবিধ ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। জয়মল্ল পত্তনপুর আক্রমণপূর্ব্বক ধ্বংস করেন রাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ কানাই সরোবরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পান। কানাই সরোবর এখনও বিদ্যমান জয়মল্ল প্রতাপপুরেই তাঁহার

এখিমল্লের অধিকৃত — অঞ্চলগুলি কি?

রাজধানী করেন, ক্রমেই এই গ্রামের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে বিষ্ণুপুর (৭৩০-৭৯৯ খৃঃ) একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৃদ্ধি করেন রত্নাকর (৮৫৫-৮৮৫ খৃঃ) কর্তৃক অধিকার করেন, মুরমল্ল (৯৭৫-৯৯৫ খৃঃ) তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগ কীর্ত্তির নানা বৃদ্ধি হইয়াছে। খৃষ্টীয় (৮৩৫-৮৫৫ খৃঃ) অম্বুলা রাজাপুর নামের আখ্যাত করিয়া স্বীয় নামানুসারে নগর স্থাপন করেন।

কথিত আছে [illegible] রাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থাপিত করিয়া মন্দির ও প্রাসাদে ভরপুর হইয়া উঠে এবং বিষ্ণুপুরকে 'মন্দের সমৃদ্ধ কারণ হোলেন' শব্দপুরাণের লেখক [illegible] তাঁহার সময়ে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

[illegible] বিষ্ণুপুরের [illegible] রাজাদের সময় বিষ্ণুপুরের [illegible] হইতে থাকে। তখন হইতে বৈষ্ণবের [illegible] হইতে নিষ্কাশ এবং সমবেতভাবে [illegible] বিষ্ণুপুর রাজসভা [illegible] করেন।

[illegible] রাজাদের [illegible] ছিলেন। [illegible] সঙ্গে [illegible] ছিল। [illegible] সর্ব্বপ্রথম [illegible] করেন। [illegible] ছিল [illegible] কথা ছিল কিন্তু [illegible] কোন কোন সময় কিছুই [illegible] রাজত্ব [illegible] করিয়াছিলেন, এমন কি এক সময় [illegible] করিবার [illegible]।

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] যে সকল [illegible] করিয়াছিলেন তাহা [illegible] মূল্যবান্ মণিমুক্তা [illegible] করিয়াছিল। [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত [illegible] বৈষ্ণব [illegible] প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ [illegible] ছিল। [illegible] শিল্প ও [illegible] বিষ্ণুপুর রাজগণের [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] সাহেব যে বিষ্ণুপুর ও তদুপরি [illegible] মন্দিরের কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই [illegible] অল্প যত্নে বৈষ্ণব [illegible] ফলে স্থাপিত হইয়াছিল। গোড়ীয় বৈষ্ণব [illegible] প্রধান কেন্দ্র [illegible]—নবদ্বীপ, চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপের আলোক নিবিয়া যায়। চৈতন্য অদ্বৈত, [illegible] পূর্ব্বে ত্যাগ ছিলেন, [illegible] তাঁহার [illegible] পরলোক [illegible] সেই আলোকরেখা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] পরে কতক বৎসর [illegible] অল্প [illegible] কিন্তু [illegible] অধিক [illegible] সেই আলোক [illegible] বলে [illegible] পারে, বড় লোক যাঁরা, এই আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। [illegible] পরে বিশেষ [illegible] অন্তর্ধানের সহিত এই আলোক বৃন্দাবনে [illegible] নিষ্কাশিত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্যের

প্রচারক বিষ্ণুপুরে এই শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, পূর্ব হইতে অষ্টাদশীকাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের রাজসভাই বৈষ্ণব শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর বীর হাম্বির গৌড়ীয় বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিয়া কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তি-রত্নাকরে তাহাদের কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার এইটা অভিপ্রায় হইয়াছিল যে সেই তীর্থ সংস্কার কতকগুলি নাম স্থায়ী অধিকারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের কয়েকটি দীঘি সেইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন যথা, কালিন্দী হ্রদ, রাধাকুণ্ড এবং কয়েকটি গ্রামের যথা, মথুরা প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য তাঁহার রাজ্যে চিরদিনের জন্য বাঁধিবার জন্য বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণদাস নামক একজন মুসলমান সাধুকে নিজ রাজ্যে বাস করিবার জন্য নিষ্কর জমি দিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব ভক্ত যাহা আইন মনোহর দাসের জন্য দীনমণি চট্টোপাধ্যায়ের লেখক) বঙ্গদেশ ও সে দেশবাসীদিগে দুইটি মহা প্রাচীরে কারিয়াছিলেন।

বীর হাম্বিরের পুত্র ধাড়ি হাম্বিরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভাতা রঘুনাথ সিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। (১৬১৬ খৃ.)।

বীরসিংহ দ্বিতীয় আকবরের মত স্বীয় রাজ্যের উন্নতির সাধনে তৎপর ছিলেন ১৬৫৮-৮৮ খৃ.। তিনি তাঁহার ভাতা রাজসিংহকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। অপর ভ্রাতা রঘুনাথ সিংহ পলাইয়া যাইয়া বাঘমুণ্ডিতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত করেন। বীরসিংহ তাঁহার নিজ তিন পুত্রকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র হত্যার পর তাঁহার দয়ার্দ্র মনে সে ঐ পুত্র নিষ্কৃতি পান। কিন্তু রাজাকে জানান হয় যে, তাঁহারা তিন কুমারকেই হত্যা করা হইয়াছে। তিনি অনেক ব্রহ্মোত্তর জমি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্যের প্রতিবাদ করাতেই মানভূম প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্দান্ত শাসনে কাহারও কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। প্রজাদিগকে তিনি প্রাচীরের মধ্যে গাঁথিয়া হত্যা করিতেন। মানভূমের ভূমিজ কর্দিগের বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি তাঁহাকে পরাভূত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কথিত আছে বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি রাজকুমারকে হত্যা করার বদল তাঁহার মনে ঘোর অনুতাপ হইয়াছিল তখন তাঁহার কর্মচারীরা মুক্তিস্নাত ক্ষেত্রে পুত্র দুর্জন সিংহকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাজা আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া ক্ষেত্র পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আকবরের সঙ্গে বীরসিংহের এই স্থানে একটু তফাৎ। আকবর তাঁহার দুষ্কৃতির জন্য একদিনের জন্যও অনুতপ্ত হন নাই।

দুর্জন সিংহ দ্বিতীয় মোকলের পক্ষ অবলম্বনকারক বিদ্রোহী রঘুনাথ সিংহ ও রহিম খাঁকে পরাস্ত করেন। শেষোক্ত সিংহের কন্যাকে তিনি পাটরাণী করেন এবং মৃত রহিম খাঁর পত্নী লালবাইকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসেন। এই রমণী আনন্দাশ্রুকরী, সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ও মধুকণ্ঠী ছিলেন। রাজা ইহার অনুরাগে মজিয়া আত্মবিস্মৃত

হইয়া পড়িলেন। এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাহার বাসস্থান নিকেপল্লীর নিকটবর্তী নায়াবুসারে লাল বাঁধ নামে এক প্রকাণ্ড দীঘিকা খনন করাইলেন। রাজা দিন-রাত লালবাইএর কাছে পড়িয়া থাকিতেন। মহারাজের রাগে অনুরোধ করিয়া তিনি লালবাইএর সঙ্গে মুসলমানী খানা খাইতেন—রাজ্যের সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের কোনও খোঁজ খবর লইতেন না। মহারাজ রাজা পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইহার পরে এক সঙ্কটজনক ঘটনার ঘটিল। লালবাই রাজাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন শুধু তাহাই নহে, রাজা শুদ্ধ একদিনে একসঙ্গে সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীদিগকে মুসলমান হইতে হইবে এই আব্দার করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার প্রণয়াসক্তি বশতঃ এবারের মুসলমানের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন এবং বিনয়ের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিলেন। মুসলমানী রাজাকে তাহের মুঠোর ভিতর পাইয়াছেন মে ভাবিয়া নিজ শক্তি সম্বন্ধে বুঝিয়া একটা অযোধ্য অস্ত্র সন্ধান করিল। রাজা যদি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হন তবে সে বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। রাজা অকূল চিন্তাসাগরে পড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং অবশেষে মুসলমানীর আব্দার রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষ্ণুপুরের শ্মশানঘাটের নিকট নূতন মহলের পাশাপাশি এখনও ভোজনহলা বলিয়া যে স্থানটি বিদ্যমান, তথায় রাজাজ্ঞা সকল নির্দিষ্ট ব্যক্তির আহারের বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল। ১১১২ সাল অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের শতকরা নব্বইজন অধিবাসী আকস্মিকভাবে জাতি চ্যুত হইতে বাধ্য হইল—সেই নিমন্ত্রণ যিনি উপেক্ষা করিবেন, সপরিবারে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এদিকে রাজপরিবারের অন্দরমহলে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। গোপালসিংহ ও মহারাজ্ঞী স্বয়ং রাজার সমান মহীয়সীকে হত্যা পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। লালবাইএর অন্নাবধানে মুসলমানী খানা পরিবেশনের আয়োজন হইতেছিল। হঠাৎ মহারাজ্ঞীর হস্ত নিক্ষিপ্ত এক বাণে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। লালবাইকে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া দীঘিতে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃ. অব্দে সেই দীঘি হইতে কঙ্কালগুলি মুসলমানী ভোজনশালা ও একটা নরকঙ্কাল উত্তোলিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের পুরাতত্ত্ববিদ্—লালবাই এর ইহার কি পরিচয় দিতে পারেন?

মহারাজ্ঞী স্বামীকে হত্যা করিয়া তাঁহারই চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর লালবাইএর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা হইল। রাজা ও মহারাজ্ঞী যে স্থানে একত্র বসিতেন, তাহা লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে। এই রাজ্ঞীকে লোকে "পতিঘাতিনী সতী" আখ্যা দিয়াছিল। প্রজার কল্যাণার্থে এবং ধর্মের জন্য তিনি প্রাণপ্রিয় পতিকে হত্যা করিয়া তাঁহারই চিতায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি তাই একাধারে সতী ও পতি-ঘাতিনী বটেন। পরবর্ত্তী রাজা গোপালসিংহ সকলবিষয়ে আদর্শ নৃপতি ছিলেন কিন্তু ধর্মবিষয়ে তিনি একটু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়া কতকটা উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রজাকে তিনি প্রতিদিন নিজেই সাধাক নাম জপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দীনতম

প্রজাগণ এই নিয়ম পালন না করিলে দণ্ডিত হইত। এই নিয়ম পালন করা হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি অনেকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই গুপ্তচরের ব্যাপারটা বিষ্ণুপুরে "গোপালসিংহের গোয়েন্দা" নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যসিংহের দীর্ঘ রাজত্ব। ১৪৮০-১৮০০ কাল পর্যন্ত তাঁহার ও তাঁহার পৌত্র মনোমল্লসিংহের বিদ্রোহ প্রবৃত্তিতে অতিবাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমরা এই রাজার সম্বন্ধে আর কিছু লিখিব না যেহেতু যোগলরাজত্ব পর্য্যন্ত এই ইতিহাসের সীমা। চৈতন্য সংহের সময়েই রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত ও ছাউনি দ্বারা পীড়িত হয়। এই ইতিহাস কোম্পানির কর্তৃত্বলাভ হয়

রঘুনাথসিংহের সময় বিষ্ণুপুরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। যে সাতটি মঠের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাঁচটির রাজা রঘুনাথ কর্তৃক নির্ম্মিত। তিনি ১০৮ মল্লাব্দে মদনেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেন "ঘড়ুকরনরপালে মহীপতে ইক্ষ্বাকুসংজ্ঞে অতিলালিত্য বেদকুল নিধিরে নিরপায়পালনে" এই শিলালিপিযুক্ত মন্দিরটি রাজা তাঁর ও নিজ বীরসিংহের নামে উৎসর্গ করেন বন বিষ্ণুপুরের ইতিহাস-লেখক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ১২৮ মল্লাব্দে রঘুনাথ রাজা হন নাই যদু কর ৯৪=১২৮ অঙ্কের বামাগতি ধরিয়া বীরসিংহ ৫৪৯ হইতে ৮০৭ মল্লাব্দ। আমার মনে হয়—বীরসিংহ বীরসিংহ বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন এবং মদনেশ্বরের মন্দির বীরসিংহ প্রতিষ্ঠিত অপর অপর যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের দেওয়ালে তারিখ দেওয়া আছে, তাহাদের সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বের তারিখ মিলাইয়া কোন্ রাজা কোন্ মন্দির স্থাপন করিয়াছেন তাহা জানা যাইতে পারে

শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির—"শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগে শকাব্দে লোকযুগেক নবরন্ধ্রম্ শ্রীবীরহাম্বীর নরেন্দ্রসুনুনে নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ" মল্লাব্দ ১৮৮ = ১৬৬৬ খৃঃ

শ্যামরায়।

জোড়-বাঙ্গলা মন্দির—"শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগে শুন্যাব্ধিরসসংখ্যে নৈঋতস্থ শকেক্ষে। শ্রীবীরহাম্বীরনরেন্দ্রসুনুনো নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ" ১৯১ মল্লাব্দ ১৬৬৫ খৃঃ। কালাচাঁদের মন্দির "শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগে শকে বিধুসাগরযুক্তে নবরন্ধ্রে নৈঋত শ্রীবীরহাম্বীরনরেন্দ্রসুনুনো নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।" ১৯১ মল্লাব্দ = ১৬৬৫ খৃঃ।

জোড়-বাঙ্গলা—১৬৬৫ খৃঃ

লালজীর মন্দির—"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণযুগে শকেন্দুবিধুসাগরযুক্তে নবরন্ধ্রনৈঋতে। মল্লাব্দিপঃ শ্রীরঘুনাথনৃপতে নৃপঃ শ্রীযুতবীরসিংহঃ।" ১৯৯ মল্লাব্দ— ১৬৭৪ খৃঃ।

লালজী - ১৬৭৪ খৃ

যুগলকিশোর মন্দির—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলী মল্লাব্দনীবন্ধনঃ। শ্রীল-শ্রীযুক্তবীরসিংহ-মহিনী শ্রীলশ্রীযুতদুর্জ্জনি মল্লাব্দে অব্ধিশরন্ধবিমিতে ঐশ্বাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ শ্রীশ্রীযুগ কেশবস্য কৃষ্ণকেলাস পুরোত্তোরণমন্দিরম্ "

যুগলকিশোর—১৬৮৪ খৃঃ

মল্লাব্দ ২১১ = ১৬৮৪ খৃঃ

মদনগোপাল মন্দির [illegible] রঘুনাথজীনাথ-
[illegible] ইহার সংলগ্নেই ভৈরবস্থানসমূহ। মাহাত্ম্যাদি
[illegible] ১৫৮২ খৃঃ
[illegible] মন্দির [illegible] অনন্তসংস্কৃত [illegible] মন্দিরে
[illegible] সোনা [illegible] নিশ্চলে। সোনা [illegible]
[illegible] খুদিত হইল। [illegible] বিস্তৃতাখ্যান।" ১৩০০ মল্লাব্দ = ১৬২৪ খৃঃ।

[illegible] "[illegible]
[illegible] অর্থাৎ [illegible] মল্লাব্দে বেদকালাম্বরবিধু
[illegible] [illegible] [illegible] খুদিত
[illegible] [illegible] [illegible] সনায়ম্।" শকাব্দা ১৬৮০ = ১৭৫৮ খৃঃ।

শ্যামরায় মন্দির—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ
[illegible] [illegible] [illegible] [

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভুলুয়া বা নোয়াখালী

পূর্ব্বে বিশাল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত যত গুলি জেলা ছিল, তন্মধ্যে নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের অনেকাংশ ত্রিপুরার রাজারা শাসন করিতেন। এখন যে স্বাধীন নোয়াখালী জেলা, তাহার সকল অংশের যে সমান ভাবে সমৃদ্ধিলাভ হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। বরাহীমুড়া এই জেলার কোন স্থানে পাওয়া 'মহাভারত' এখনও কোন স্থানে হরগৌরী ও বোকমুড়ি পাওয়া যাইতেছে। সেই সকল মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় না যে বিষয়টিপুর হইতেই এ দেশ জনসমাজে পরিচিত হইয়াছে। বিষয়পুর হইতে বর্ত্তমান কালের যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ১৭ পুরুষ,—মাত্র ৪০০ বৎসরের কিছু উর্দ্ধকালের কথা পাওয়া যায়। কত কালে এই দেশ প্রথম লোক বসতিযুক্ত হইয়াছিল—ইহা বিবাদ্য নহে। ঐ সকল মূর্ত্তি বড় প্রাচীন, এবং এই জেলায় কতকগুলি দীঘি পুষ্করিণী আছে, তাহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। হয়ত কোন সময়ে সুন্দরবনের মত এই স্থানের কতক অংশ জলমগ্ন থাকিত, এই কারণে লৌকিক প্রবাদ সমর্থিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই জেলায় প্রথম রাজা বিষয়পুর মূর বঙ্গাধিপ আদিশূরের বংশ। কয়েক কালে এ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফলে এই কথাটির উদ্ভব হইয়াছে। কারণ এই বাঙ্গালার লেখকেরা কেহই ঠিক পূর্ব্বে প্রবাদটি অবগত ছিলেন না। তাঁহারা নোয়াখালী ত্রিপুরা জেলাটির সম্বন্ধের সময় নির্দ্দেশের যে মতামত দিয়াছিলেন—তাহাতে লিখিত আছে যে যে সময় রাজা আদিশূর পুত্র বিষয়পুরের চট্টগ্রামে ইহাঁর বংশের আধিপত্য করিতেন, তাঁহারা বঙ্গদেশে নোয়াখালীতে রাজত্ব করেন এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং ইহারা মৈথিল রাজবংশ। শ্রীহট্টাধিপ আদিশূরের সমকালীন লোকদের মত হইতে ৫০ বর্ষ পরে বংশের রাজত্ব চলিতেছে,—কিন্তু এই নোয়াখালীর সূর বংশের শেষ রাজার সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর হইতে মাত্র ১৮শ পুরুষ। ইঁহারা যে মিথিলাধিপের বংশ তাহা যেরূপ নোয়াখালী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখিত হইয়াছে সেইরূপ অন্যান্য ঐ ইতিহাস সকলের মধ্যেও লিখিত হইয়াছে। বক্তীয়ারমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাসে এই বংশকে মৈথিল রাজবংশ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তাঁহার রাজমালায় এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন—"আদিশূরের বংশধর বিষয়র সূর মিথিলা প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন" রাজমালা, ৩৯৯ পৃঃ)। আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার 'বারভূঞা' নামক পুস্তকে (১৬৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "এই স্থলে যে আদিশূরের কথা বলা হইল, তিনি বঙ্গদেশের নৃপতি আদিশূর নহেন, ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত।"

মিথিলার রাজবংশের তালিকা এইরূপ :—

১। আদিশূর ২। বিষয়ভল্ল ৩। পালপতি ৪। সুরানন্দ বা ৫ বিশ্বানন্দ বা ৬ বিজয় ঠাকুরতা ৭। রামভদ্র কর্ণসূর ৮। হরিনাথ ৯ কবিকৌষ্টিভসূ

১০ কৃষ্ণরাম ১১, ইন্দ্রনারায়ণ ১২ মুকুন্দ ১৩ নরোত্তম — রামরতন ১৪। গোপাল কৃষ্ণ ১৫ নন্দকুমার ১৬ হরিশ্চন্দ্র বিদ্যমান। নবম সংখ্যক কবিকঙ্কণপুত্রের অন্য পুত্র রাজা প্রসাদনারায়ণ রায়ের পরে ৪ রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মুসলমান জমিদার ইছা খেঁয়ীর যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে "ইছা খেঁয়ীর লড়াই" নামক পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তিকাখানি স্থলে স্থলে অংশতঃ লেখকের দুই পুরুষান্তর পরবর্তিতে রচনাকাল হইতে তাহা নিখিত হওয়া যায়। অন্তত বহু সন্ধানে আমি ইহার পুঁথি আমি সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকাগারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি ছোট, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ১৫৫৮ পৃষ্ঠা হইবে। প্রাচীন রাজাদের অধঃপতনের সময় তাঁহাদের রাজ্য কিরূপ নৈতিক অবস্থায় পড়িতে হয়— এই পুস্তক তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন; তথাপি এই পুস্তকের সাহায্যে যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—তাহা গল্পলেখকের কল্পনাবিলাসে একখানি ঐতিহাসিক সত্য।

ইতিহাসলেখক পূর্ববর্তীরা কখনই রঘুনন্দনের কথা উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদের রাজত্বের প্রথমেই রাজপুরীর মিলের কথা অনুমানেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আনন্দনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "এই বংশের প্রথমপুরুষ সকলেই যেমিল রাজপুরী বলিয়া পরিচয় দিতেন" (বঙ্গের ১৫ পৃঃ)। কৃষ্ণরাম রায় কবিকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কবি যে রাজার রাজত্ব ছিলেন না। মেদিনীপুর ও কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে যাহা কবিকথা উক্ত হইয়াছে—

"গঙ্গাবাস পরগণায় চন্দ্রপুরের পশ্চিমে
ইছাখাঁ নামেতে বিশ্বাসঘাতী হইল।
কবিবর রামকৃষ্ণ ও রিপুসেনানিবারিনাম
চন্দ্রে তাঁহাদিগে যুদ্ধবিদ্যা প্রশস্তকে ॥"

আমরা পূর্ব বাংলার যে তালিকা দিয়াছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, উত্তরকালে রাজাদের ভাটগণেরা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে [illegible] বা রাজা ১৭টি অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। পুরোহিত ঠাকুরেরা সেই কুল কুল রাজার তালিকা পড়িয়াছিলেন। এক এক রাজার বহু রাজা হইয়াছে এই তালিকা একান্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যতীনবাবুর নিকট হইতে যে তালিকা পাইয়াছি তাহা তাঁহারই পূর্বপুরুষদের খাতা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা "রাজমালার" (ত্রিপুরার) প্রাচীন পুঁথি হইতে জানিতে পারিয়াছি যে মোগলেরা যে সময় ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় ত্রিপুরেশ্বরের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজবংশের এক রাজাকে হত্যা করিয়া যখন উদয়মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ত্রিপুরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে "ইন্দ্রনারায়ণ" নামে পুর জমিদার, বৃদ্ধবয়সে বলে সে যে ত্রিপুরা রাজার [illegible] পুরুষপুরুষ তাঁর ত্রিপুর সঙ্গে মিলে নাহি মিলে, উদয়মাণিক্য রাজা তাহে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে —ইন্দ্রনারায়ণ নামে পূর্ববঙ্গের এক ব্যক্তি

নৃপতির যোগ্য মর্য্যাদায় ভুলুয়াতে প্রকৃত করিতেছিলেন। ভুলুয়ার পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বাধীন ত্রিপুরাধিপের অভিষেককালে সেই রাজদরবারে সামন্তরাজরূপে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু দুর্জ্জনারায়ণ উপস্থিত হন নাই। পরন্তু তিনি বলিয়া পাঠান "রাজবল পাইয়া তুমি উদয় মাণিক্য। আমিও ভুলুয়া-রাজ তুমি সমকক্ষ।" রাজমালা, অমর খণ্ড।)

ত্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিক্য এই উত্তর পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন কিন্তু নানা কারণে তিনি সামরিক অভিযান করিয়া ভুলুয়া আক্রমণ করিতে পারিয়া উঠিলেন না। অমরমাণিক্য রাজা হইয়াই ভুলুয়ায় পুনরায় দূত পাঠান, কিন্তু দুর্জ্জনারায়ণের উত্তর এবার আরও প্রগল্ভ "ত্রিপুরেশ্বরেরা আমার অধীন, আপনার সেই সিংহাসনে দাবী নাই।" এবার অমরমাণিক্য আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি এবার স্বয়ং হাজার চারি পুরা সহ ৩০,০০০ সৈন্য লইয়া ভুলুয়ার রওনা হইলেন। সঙ্গে রাজার শালক ছত্র-মাণিক্য এবং উজির সিংহ-সরথ নারায়ণ সেনাপতি হইয়া চলিলেন। পথে রাজা মহালমারোহে কালীপূজা করিয়া ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সৈন্যেরা ভুলুয়া লুটপাট করিতে লাগিল। এদিকে ভুলুয়াপতি দুর্জ্জনারায়ণ স্বয়ং মাত্র তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অধিকাংশ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পাঠান বলায় ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে ইহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। এই যুদ্ধে অমরমাণিক্য দুর্জ্জনারায়ণ সমক্ষে এক বাঙ্গল সেনাপতিকে অসি দ্বারা হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চলেন, পরে জয় করিয়া অমর মাণিক্য রাজধানী ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ভুলুয়া ত্রিপুরেশ্বরের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল—ভুলুয়ায় বঙ্গীয় পূর্ব্ব কর্ত্তিত হইলেন। সেই বৎসরই অমরমাণিক্য যে বিশাল জলকীর্ত্তি খনন আরম্ভ করাইয়াছিলেন—সেই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত দেশ হইতেই রাজারা মজুর পাঠাইয়া ত্রিপুররাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভুলুয়াধিপ বঙ্গীয় পূর্ব্ব এই উপলক্ষে এক হাজার মজুর পাঠাইয়া ছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসরে এই দীঘির খননকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। দুর্জ্জনারায়ণকে পরাস্ত করিয়া অমরমাণিক্য বাকলা দখল করেন—সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে বাকলা কন্দর্পরায় শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ভুলুয়ার যুদ্ধের পর এই রাজ্য হইতে জুঁইলিয়া ও হীরড়া এই দুইটি পরগনা স্বতন্ত্র হইয়া যায়। তোবড় বলে এই তিন স্থানের রাজস্ব এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ভুলুয়ার রাজস্ব ১১,১১ ৮৮০ দাম। জুঁইলিয়া—৫,১২,০৮০ দাম। হীরড়া—৪,১১ ৩৮০ দাম।

বিষ্ণুপ্রসূত হইতে রত্নমাণিক্য ৭ পুরুষ। কবিত আছে বিষ্ণুপ্রসূত ১২০২ খৃষ্টাব্দে ভুলুয়ায় রাজপাট স্থাপন করেন। রত্নমাণিক্যের বংশাবলী কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় এইরূপ দিয়াছেন—১ বিষ্ণুপ্রসূত ২ গণপতি ৩ সুরেন্দ্র ৪ দেবানন্দ ৫। কবিচন্দ্র ৬ রাজবল্লভ ৭ রত্নমাণিক্য।

আমরা ত্রিপুরার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজমালা হইতে দেখাইয়াছি, ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে বাকলার রাজা কন্দর্পনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন, এবং তিনি ভুলুয়ার রাজা দুর্জ্জনারায়ণের

সমসাময়িক। কন্দর্পনারায়ণ যখন যুবক, তখন ছত্রনারায়ণ বৃদ্ধ—এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে, লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে কন্দর্প পুত্র রামচন্দ্রেরই সংঘর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং লক্ষ্মণমাণিক্য ১৩০০ খৃষ্টাব্দ বা তৎসন্নিহিত কোন সময় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদিগকে বিশেষভাবে দমন করিয়াছিলেন এবং ইহার বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি শোনা যায় কোন কারণে বাকলাধিপতি কন্দর্পরায়ের পুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণমাণিক্যের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল তাহার ফলে লক্ষ্মণমাণিক্যকে রামচন্দ্র (প্রতাপাদিত্যের জামাতা) অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন * রামচন্দ্র কুলুয়ার রাজাকে অতিশয় আদর ও সম্মান দেখাইয়া প্রীতির অভিনয় করেন সরল লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহার ঘরজামাই হইয়া রামচন্দ্রের রাজকার্য্যে (কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক বাকলা চন্দ্রদ্বীপ) হইতে তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া তাঁহার সেনাপতি রামাই মাল (রামমোহন মিত্র—ডক্তিরত্নবিলাসী কায়স্থ) ও অপরাপর লোক দ্বারা সেযমগণ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নৃশংসভাবে হত্যা করেন লক্ষ্মণমাণিক্য শুধু বীরাগ্রগণ্য ছিলেন না তিনি সুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার রচিত সংস্কৃত নাটক 'বিখ্যাত বিজয়' মগ যুগের বঙ্গের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ অজুন কর্ত্তৃক কর্ণ বধ—এই নাটকের বিষয় কথিত আছে রামচন্দ্র পর্তুগীজ অবস্থায় নিতান্তভাবে যে তালবৃক্ষের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীয় দুঃখের আবেগে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন (রজনীকান্ত-বাবুর চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস দ্রষ্টব্য) এবং তিনি বৃদ্ধ কালে যে বস্ত্র পরিতেন—তাহার ওজন এক মন ছিল।

লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র বলরামদেবের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি তিনি ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া অমর যুদ্ধের যখন কালে মক্তুর পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাজা ছত্রনারায়ণের পত্নী শশিমুখীর শাসনকালে কুলুয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়, ইহা ষোড়শ শতাব্দীর কথা, তৎপরে এই প্রদেশ ১৪টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই ভাবে রাজ্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণের শাসনাধীন থাকিয়া ক্ষীয়মাণ হয়। এখন এই বংশের যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যথার্থই গৌরব যোগ্য। সেই বীর প্রবর লক্ষ্মণমাণিক্য—যিনি মগদিগকে জয় করিয়া নানা যুদ্ধে স্বীয় বীরত্ব ও শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইয়াছিলেন, যে কৃতকীর্ত্তি রাজা ছত্রনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্যকে লক্ষ্মণীয় উত্তর দ্বারা অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন,—যে রাজা ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সোলেমানদিগের টেরাকিনিং নামক বৃহৎ জাহাজ জলমগ্ন হইলে তদারোহিগণকে অশেষ আদর আপ্যায়ন করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন,—এবং যাঁহাকে এলকাস্ত কাপ্তেন "বোলোয়ার" (কুলুয়ার) শ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন—সেই মনাধন্য মহামান্য রাজাদের কুলুয়া এখন আর নাই—

* আনন্দনাথ রায় মহাশয় এই ঘটনা বিশ্বাস করেন না কিন্তু এই ঘটনার প্রথা এত ব্যাপক এবং সাময়িক নানা গ্রন্থ উল্লিখিত যে রামচন্দ্রকে এই অভিশাপ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার চেষ্টা বিফল।

এখন উহা সন্দ্বীপ, সিন্ধি, হাতিয়া প্রভৃতি ৪৮টি দ্বীপের সমষ্টিভূত নোয়াখালী জেলায় পরিণত হইয়াছে। বাবুপুরে এই বংশের রাজাদের বিশাল কামানটি পড়িয়া থাকিয়া ইঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে এবং "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতিকার বর্ণনা রাজবংশের অধঃপাতে যাওয়ার চিত্র প্রাণ-করুণায় সঞ্জিত করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়া বুঝাইতেছে—কি কি দোষে রাজলক্ষ্মী বিচলিত হইয়া চলিয়া যান।

'ভুল হয়া' শব্দ হইতে ভুলুয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ গল্পগুজব পল্লীবৃদ্ধগণ শুনাইয়া থাকেন, এগুলি নিতান্তই বাজে বলিয়া বোধ হয়। কোন প্রমাণ না পাইয়া একটা শব্দ হাতে পাইলেই ইঁহারা উহা নিংড়াইয়া যথাসাধ্য ঐতিহাসিক রস দোহন করিতে থাকেন—এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুন্দরবন

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সুন্দরবন অঞ্চল সম্প্রতি সমুদ্র হইতে শির উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের এই "সম্প্রতির" অর্থ লক্ষ লক্ষ বৎসর,—সুতরাং ঐতিহাসিক আলোচনার সময় তাঁহাদের মতামত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

এ পর্য্যন্ত যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় সুন্দরবন অঞ্চলের পশ্চিম দিকটাই খুব প্রাচীন। এই খানেই সুপ্রাচীন কপিল তীর্থ, তাহারই কাছাকাছি মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন ২১ নং লাট কদম্বদীঘির পশ্চিমে বার দীঘির পশ্চিম তীরে ভাটার সময় প্রায় ১৮ ফুট মাটীর নীচে প্রাচীন গৃহাদির ভিত দৃষ্ট হয়—তাহার ইট খুব বড় বড়, মৌর্য্য যুগের ইটের ন্যায়। সেখানে বহু সুবৃহৎ দেব বিগ্রহও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে ঐ সকল স্থান ডুবিয়া যাওয়াতে তাহারা ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থান ছাড়া সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলেও ঐরূপ প্রাচীন ইটের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থান খাত হইলে বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের নূতন আরও অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে

রামায়ণের বালকাণ্ড ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে আমরা নিম্নবঙ্গের নাম "রসাতল" রূপে দেখিতে পাই। মহাভারতে (বনপর্ব্ব, ১১৪ অঃ) দেখা যায়, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে অবগাহন করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—এই সাগরসঙ্গম অঞ্চলে সুহোম নামক এক রাজা প্রাচীন কালে রাজত্ব করিতেন তাঁহার সন্ধানে আগত প্রদ্যুম্নপুত্র দীপান্বী নগরীর রাজা শুপাকরের কন্যা (তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র সাম্বের পত্নী) সুলোচনা পুরুষ-বেশে "বীরবর" নাম ধারণ

পুরাবৃত্ত।

পূর্ব্বক ভীমপাল নামক এক প্রবল শত্রুর বধ করিয়াছিলেন" পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ৭ম অধ্যায়। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে নিম্নবঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ঐ সময় এ দেশের সামন্তগণ নৌযুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন।

পাল রাজত্ব কালে, গোপাল দেবের রাজত্বের প্রথম ভাগেই এই নিম্নবঙ্গ তাঁহাদের দখলে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দেবপালের তাম্রলিপিতে দুই বার গোপাল-সাগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া তাহার পর আর কোন চেষ্টা নাই'—এই জন্যই তাঁহার রণকুঞ্জর-গণকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এই সময় পর্য্যন্ত পালেরা অবশ্যই নিম্নবঙ্গের শেষ সীমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে রাখিয়াছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল তাঁহার হস্তিগণকে পর্য্যন্ত সাগরতীরে অবগাহনের সুবিধা প্রদান করিত, তাহাদের পুণ্য জলের সহায়ক হইয়াছিলেন দেবপালের নালন্দা তাম্র-লিপি)।

২৪-পরগণা জেলার ১৮৮ নম্বর লটে ১৮৮ ই উচ্চ একটি ভাঙ্গা মেঝেল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা সরকার বাহাদুর মেরামত করিয়াছেন। মেরামতের পূর্ব্বের ও পরের দুইখানি ছবি দেওয়া হইল। এই মন্দিরের নাম "ভাটার দেউল," ইহার নিকটে কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি তাম্রপট পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে লিখিত আছে, ৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৮৩৭ শকে ভবচন্দ্র নামক কোন রাজা কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কেহ কেহ অনুমান করেন ভবচন্দ্র সেই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের পূর্ব্বজ। এই বংশের ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে এখনও অনেক আলোচনা চলিতেছে।

সুন্দরবন ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে আরও কতকগুলি ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে [illegible] সম্বন্ধে কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত শুপ্তমুদ্রা (Indian Museum Catalogue of Indian Coins—Allan, I xxi), খুলনা জেলার ভরতভায়নার স্তূপ (Annual Report, Archæological Survey of India for 1921-22 p 76), ২৪-পরগণার কাকুড়িয়ার ভগ্নস্তূপ ধারার অধীন কাশীপুর ও সরিহাটা গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্য ও নৃসিংহ-মূর্ত্তি এবং যশোহর নগরের অধীন ১৩৮ নম্বর লট গোবিন্দপুর গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ উল্লেখযোগ্য।

কতকগুলি পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কারের পরিচয় প্রদান করে ২৪-পরগণা জেলার বিভিন্নাংশে বেড়া চাঁপা ও ভাকা গ্রামের মৃ. পৃঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীর কয়েকটি Cylinder Seal এবং Punch-marked মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। উক্ত বেড়া চাঁপা গ্রামে চন্দ্রকেতুর গড় ও বরাহমিহিরের বাটী নামক দুইটি স্তূপ হইতে বহু প্রাচীন ইষ্টক ও পোড়া মাটির দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব্ব-চক্রের অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া ঐ স্থানটিকে "নিম্নবঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Annual Report, Archæological Survey of India for 1922-23, p. 109)

লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন ও দক্ষিণ গোবিন্দপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় সুন্দরবন ও তৎসন্নিকট প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত খাড়িমণ্ডলের অধীন ছিল তাম্রশাসনে উল্লিখিত "বেতড় চতুরকের" নাম চাকড়ার অন্তর্গত বেতড় গ্রামের নাম হইতে এবং খাড়িমণ্ডল ২৪-পরগনার খাড়ি থানের নাম হইতে হইয়াছিল (বঙ্গলার ইতিহাস রাখালবাবু প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৫)।

জয়নগর মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় সুন্দরবনের ইতিহাস উদ্ধার-কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন এবং প্রাচীন নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং একটি সুন্দর চিত্রশালা স্থাপন করিয়াছেন, এই প্রবন্ধটি মূলতঃ উঁহারই সাহায্যে লিখিত হইল।

সম্প্রতি সুন্দরবনের "খাড়ি মণ্ডলের" পূর্ব্বাংশে "পাথর প্রতিমা" নামক পল্লীর নিকটে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ১০৮৮ শকে সাম্বুদের নামক কার্ণাটবংশে এক রাজা বল্লুকে দেওয়া হইয়াছিল। তাম্রপট্টে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ হওয়াতে কালসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি যে, মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেন রাজারা আর খাড়িমণ্ডলের অখণ্ড অধিপতি ছিলেন না, যেহেতু এই শাসনে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে তৎসময়ের সার্ব্বভৌম মহারাজ সেন রাজার বিদ্রোহী অমাত্যবংশজাত শ্রীশ্রী। অবশ্য মহামাণ্ডলিক পারোপার্শ্বিক কোন হিন্দু রাজা এই স্থান শাসন করিতেছিলেন। "পাথর প্রতিমা" পল্লীর অন্তিদূরে এক বৃহৎ খনন ছিল, এবং তন্নিকটস্থ চতুষ্পার্শ্বে এত পাথর ও প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, যাহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে এক সময়ে এ স্থানটি একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। উক্ত পাথরফলার সাময়িক মহাশয় পাল এই ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনখানির প্রতিলিপি, ইংরেজী অনুবাদ ও তৎসম্বন্ধীয় অপরাপর বিবরণ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে (Indian Antiquary) ২য় খণ্ড, ১৯২৩ পৃঃ। অধ্যাপক ডাক্তার বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, পি এচ ডি (লণ্ডন) এবং শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত কোন সময়ে সুলতান কবুলখিন বয়াতের রাজত্বকালে দক্ষিণ দেশটা মুসলমানদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে সেনরাজগণের বংশধরগণ বহু চেষ্টায় হিন্দু অধিকার তথায় কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছিলেন। মুসলমানদের সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির উল্লেখ বহু প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়। কথিত আছে মহাপ্রভু কুলীন গ্রামটিকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি ঐ গ্রামের কুক্কুরটিকে নিজের অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই কুলীন গ্রামেই ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু, গুণরাজ খাঁ, রামানন্দ বসু ও অপরাপর বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, এক সময়ে এই অঞ্চলে রামানন্দ খাঁ অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

আকবরের সময়ে সুন্দরবন অরণ্যাবৃত হওয়াতে কর আদায়ের অযোগ্য ছিল Ayeen

Akbar, Gladwin, p. 427.) এই সময়ে ভিন্নদেশ আক্রমণে এই অঞ্চলের অনেকস্থান জনশূন্য হইয়াছিল।

এই পুস্তকার্থ ইযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের লিখিত সন্দর্ভ

সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ

বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পলিময় অসংখ্য বৃক্ষগুল্মসমাচ্ছাদিত নদীবহুল বিস্তীর্ণ ভূভাগ পূর্ব্বকালে নামে প্রসিদ্ধ এবং বর্ত্তমান সময়ে বাকরগঞ্জ, খুলনা ও ২৪ পরগণা এই তিনটী জিলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে ইহা সম্বন্ধে মুসলমান আমলের পরগণাকুলের শেষসীমা হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ও পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহানা হইতে পূর্ব্বদিকে মেঘনার মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের Chief এই প্রদেশের রাজস্বকার্য্য আরম্ভ হইয়া এখনও চলিয়াছে, এবং ইহার নামে ইহা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত হইতে অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এই অংশ খুব প্রাচীন স্থান নহে এবং অনুমান হইতে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যে লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন এবং তাঁহাদের নিকট যে দেশ খুব নূতন, ঐ তত্ত্বজ্ঞদের নিকট তাহা যে খুব পুরাতন সেকথা ইতিহাস ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে মনে রাখেন না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান হইতে ইহাও জানা যায় যে সুদূর অতীতকালে ভূমি নিম্নগামী হওয়ায় এই প্রদেশের পূর্ব্বতন ভূসংস্থানের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, (Revenue Survey Report on the districts of Jessore, Fandpur and Bakher gunge—Oldham Gastral Manual of Geology of India—R. D Oldham) ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিকের নিজস্থানে, অর্থাৎ ভাগিরথীর পূর্ব্ব, অবস্থাসম্বন্ধে হইতে ও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন খননকালে দৃষ্ট হইতে, যে সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, ইষ্টকস্তূপ, গড়, মজা পুষ্করিণী ইত্যাদিপ্রভৃতি ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও বুঝা যায় যে বঙ্গদেশে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজত্বের সময়কালে এখানে বহু সমৃদ্ধ জনপদ বিদ্যমান ছিল (যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ঈশানচন্দ্র মিত্র), The Antiquities of Khari, North-West Sundarbans, and the Sundarbans By Kanjilal Datta, Varendra Research Society's Monographs Nos. 3, 4 and 5 এবং পুরাতন প্রত্নবিদ ও ঐ সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন হইতে প্রতিপন্ন হয় যে সুন্দরবনের দক্ষিণাংশ প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান এবং তথায়ই সভ্যতালোক সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুণ্যতোয়া ভাগিরথী নদী সুদূর অতীত যুগ হইতে এখানে সপ্তমুখিনী অর্থাৎ বহুধাবিভক্ত ভাবে বহু প্রাচীনকাল হইতেই কপিল

মুনির আশ্রম ও গঙ্গোদ্ভেদ-প্রকাশ তীর্থরূপে এই প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে ইহা ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত। এখানে ভাগীরথী হাবড়া মহকুমার অন্তর্গত বসুলপুর থানার অধীন ১৩ নম্বর লট, কচুবেড়িয়া দিয়ার পশ্চিমে, রায়মঙ্গল নদীর পশ্চিমতীরে, ভাটার সময়ে প্রায় ১৮ ফুট মাটির নিম্নে মোহানার মুখের খুব কাছে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীন গৃহের ভিত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতে কচুবেড়িয়া কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐরূপ ভিত্তির অংশবিশেষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সুন্দরবনের অন্যান্য অংশেও এইরূপ প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমিকম্পের ফলেই যে ঐ সকল প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ঐরূপে ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কখনও এতদঞ্চলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন আরম্ভ হইলে তাহা ঐ সকল পুরাকীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়া সুন্দরবনের অতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিতে পারে।

পৌরাণিক যুগে সুন্দরবন

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণেই সর্বপ্রথম গঙ্গাসাগর সঙ্গমের উৎপত্তির কথা লিখিত আছে। কিন্তু উহাতে "গঙ্গাসাগর" নামে কোনও তীর্থের উল্লেখ থাকিলেও অন্য কোনরূপ পরিচয় নাই (রামায়ণ, বালকাণ্ড, বিশ্বামিত্রবংশ-কথা)। রামায়ণের পরে মহাভারতে গঙ্গার পরিচয় আমরা সর্বপ্রথম মহাভারতে প্রাপ্ত হই। তাহাতে দেখা যায় যে তৎকালে ভাগীরথী নদী বহুসংখ্যক শাখায় বিভক্ত ছিল। অর্জুন তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমে আসিয়া ঐ সকল নদীর মধ্যে অবগাহন করত কতিপয় দেশোদ্ভবগত বৈতরণী কাশীতীর্থে গিয়াছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব, ১১৪ অ.)।

মহাভারত ব্যতীত অনেকগুলি পুরাণেও গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে উক্ত তীর্থক্ষেত্রে এক বিস্তৃত জনপদ ছিল এবং প্রহেন নামক একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে আরও প্রসেনজিৎ চম্পাপুরী নগরীর রাজা শুভাকরের কন্যা ও তদঞ্চলস্থ নগরের রাজপুত্র মাধবের পত্নী সুলোচনা পুরুষবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া জীবনাদি নামে এক গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ৫ অ.)। ইহাতে বুঝা যায় যে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত গঙ্গাসাগর সঙ্গম সুন্দরবনেই ছিল এবং তথায় উক্ত পুরাণ রচনাকালে জঙ্গল ও জনপদ উভয়ই বর্তমান ছিল।

ঐতিহাসিক যুগে সুন্দরবন

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুগের যে সমস্ত কীর্তি নিদর্শন সুন্দরবনে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্ত, পাল ও সেন-রাজত্বকালের। তৎপূর্ববর্তী

সময়ের সভ্যতার কোন নিদর্শন এখনও এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইহার সন্নিকটে ২৪-পরগণা জিলার উত্তরাংশে কতকগুলি খুব প্রাচীন পুরকীর্তির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বেড়াচাঁপা ও ভদ্রকালীর খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীর কয়েকটী Steatite Seal & punch marked coins উল্লেখযোগ্য (Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad—R. D. Banerjee, p. 10) উক্ত বারুইপুর গ্রামে চতুর্দ্দশ হইতে ষষ্ঠ ও ষষ্ঠ-খ্রীষ্টাব্দের কাটা নামে দুইটী স্তূপ রহিয়াছে ও বহু প্রাচীন ইষ্টক ও পাড়া মাটির দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্ব ডিরেক্টর অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া এই স্থানটীকে "One of the earliest settlements in Lower Bengal" বলিয়া স্থির করিয়াছেন, (Annual Report, Archaeological Survey of India for 1922-23, p. 109)।

ঐ সকল নিদর্শন বারুইপুর, মজিলপুর ও আরুকান্দীর স্থানে যে সমস্ত বেশী পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্তযুগের। তদ্ভিন্ন কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্ত মুদ্রা-সমূহ (British Museum Catalogue of Indian Coins—Allan, p. xviii), খুলনা জিলার ভদ্রচন্দ্রাকোলে স্তূপ (Annual Report, Archaeological Survey of India for 1911-12, p. 70), ও ২৪-পরগণার অন্তর্গত ধলেশ্বর ও অধুনা কালেক্টর ও সদিমাহাট গ্রামে প্রাপ্ত ইষ্টক ও মৃৎপাত্র ও মহাস্থানের নিকট ৩৪ নম্বর লাট গোবিন্দভিটার গ্রামের কিরদংশের উৎখননের উল্লেখযোগ্য (The Antiquities of Khari and the Sundarbans, Kalika Datta, V. R. Society's Monographs, Nos. 4 and 5)। এই সকল নিদর্শন হইতে বুঝা যায় যে গুপ্তসাম্রাজ্যের বঙ্গোপসাগর-তীরবর্ত্তী বিস্তৃত সমৃদ্ধ ছিল। এই যুগেই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী তাম্রলিপ্তির বিখ্যাত বন্দরকে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব হয় (Early History of India—V. A. Smith) তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে বহুল সিংহধ্বজ উপলব্ধ হওয়ায়ও যে বিষয়ের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঐ সময় এদেশবাসিগণ নৌযুদ্ধে খুবই পারদর্শী ও শক্তিশালী ছিলেন।

পাল রাজত্বকাল

গুপ্তযুগের অবসানে বঙ্গদেশে মাৎস্যন্যায়ের ফলে পাল রাজত্বের সৃষ্টি হয়। গোপালদেব এই বংশের সংস্থাপক। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র ধর্মপাল ও দেবপালের—রাজত্বকালেই বাঙ্গলার ইতিহাসের সুবর্ণময় যুগ। দেবপালের মুঙ্গের ও নালন্দা তাম্রশাসনলিপির চতুর্থ শ্লোক পাঠে প্রতীয়মান হয় যে সম্ভবতঃ গোপালদেবের রাজত্বকালের প্রথমভাগেই এদেশ পাল রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। উক্ত থেকে জানিতে পারা যায় যে পাল-নরপতি গোপাল বঙ্গদেশের মাৎস্যন্যায় দূরীভূত করিয়া সমুদ্রপর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। সে কারণে আর যুদ্ধাভিযানের প্রয়োজন নাই বলিয়া তাঁহার সমস্ত রাজকর্ম্মচারীকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন (গৌড়লেখমালা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃঃ ৪১, Nalanda Copper-plate of Devapala,

V. R. Society's Monograph, No. 1, p. 24)। ঐ শাসন দুইখানির সপ্তম শ্লোকে দেখা যায় যে গোপালদেবের পুত্র প্রসিদ্ধ নরপতি ধর্মপালদেবের সমভিব্যাহারী ভৃত্যবর্গও নিম্নবঙ্গে আসিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ধর্মকণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

২৪-পরগনা জেলার অধীন সুন্দরবনান্তর্গত পলেমে ১১৬ নম্বর লাটে, প্রাচীন নগরের রীতিতে নির্ম্মিত প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ একটি ভগ্ন মন্দির অথবা মঠ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার বর্ত্তমান নাম জটার ভেরী। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ মন্দিরের সন্নিকটে একখানি তাম্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে পাল-রাজত্বকালের শেষভাগে, ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়শ্চন্দ্র নামক জনৈক নৃপতিকর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল (List of Ancient Monuments in Bengal, Presidency Division No. 1)। এই জয়শ্চন্দ্র কে তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভিটভদ্রদেবের যে কয়খানি তাম্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইগুলি হইতে বুঝা যায় যে ঐ সময়ে বঙ্গদেশে চন্দ্রবংশীয় রাজগণও কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন (Inscriptions of Bengal, Part III by N. G. Mazumdar, published by the Varendra Research Society)। জটার ভেরী প্রতিষ্ঠাতা জয়শ্চন্দ্র এই বংশীয় কেহ হইলেও হইতে পারেন। পুরাতন পুস্তকের মধ্যে গোবিন্দবিজয় ও ময়নামতীর পুঁথিতেও উক্ত চন্দ্রবংশের রাজগণের কথা আছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ডীনেশচন্দ্র সেন, ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৫০-৬১)। পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন মন্দির হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে ২৬ নম্বর লাট, কদম্বগাছিতে এক বিস্তৃত জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানে যে সকল ইষ্টকস্তূপ ও ভূমির চিহ্ন দেখা যায় সেই সব ইষ্টকের সহিত জটার ভেরীর ইষ্টকের গঠন-পারিপাট্য ও আকারের যেরূপ মিল আছে তাহা দেখিলে এই স্থানটি ঐ সময়ে সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়।"

সেন-রাজত্বকাল

পাল-রাজত্বকালের অবসানে বঙ্গদেশে সেন-রাজবংশের উদ্ভব হয়। বিজয় সেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পৌত্র বল্লাল সেনের সুন্দরবন ও দক্ষিণগোবিন্দপুরের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে সেন-রাজত্বকালে বর্ত্তমান ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, অর্থাৎ ভাগীরথী-প্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত আলিপুর, খিদিরপুর, বেহালা, ফলতা, ডায়মণ্ড হারবার, কুলপী প্রভৃতি অঞ্চলের অধীন ভূভাগ বর্ত্তমান ভূর্ভুক্তির অন্তর্গত বেতড় চতুষ্কের মণ্ডলবর্ত্তী এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ প্রদেশ, যাহা উক্ত ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনান্তর্গত খাড়ীমণ্ডলের অধীন ছিল (The Antiquities of Khari and North-West Sundarbans. By Kalidas Datta. Varendra Research Society's Monographs, Nos. 3 and 4)। উক্ত বেতড় চতুষ্কের মধ্যে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেতড় এবং খাড়ীমণ্ডল ২৪-পরগনা জিলার অধীন 'খড়ি'—এই দুই গ্রাম তাম্রলিপির

ইতিপূর্বে এতদঞ্চলে আবিষ্কৃত পঞ্চদশটি প্রত্নতাত্ত্বিক যে সকল পুরাকীর্তি নিদর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই পাল ও সেন রাজত্বকালের। ঐগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে এই পরগনা-সমূহের মধ্যে সাগরদত্ত বরেন্দ্রী-প্রদেশই এই পাল ও সেন-রাজত্বকালে বহু শাসনসম্পর্কিত সমৃদ্ধ ছিল এবং সে সময়ে তথায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বাঙ্গলাদেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় তৎকালে বৌদ্ধধর্ম এতৎ অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কোন্ সময়ে কি কারণে এই প্রদেশের ঐ সমস্ত লোকালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা আজও ঠিক জানা যায় নাই। তবে এখানে এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র মুসলমান রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সম্ভ্রান্তবংশ নিদর্শনসমূহের আবিষ্কার হওয়াতে বোধ হয় মুসলমান আমলের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ সেনরাজত্ব-কালের শেষ সময়ে, এতদঞ্চলের পাচীন অধিবাসিবৃন্দ, হয় কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে অথবা বৈদেশিক আক্রমণে, নষ্ট হইয়া বর্ত্তমান স্থানসমূহে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমান অধিকারকাল

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ইতিহাস যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে মুসলমানগণ গোড় বিজয়ের বহুদিন পরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কতিপয় বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশের অধিকার চারাইয়া অবশেষে বাধা হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দুর্গম প্রদেশে থাকিয়াই বহুদিন মুসলমানগণের সহিত সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। বখতিয়ার খিলিজির মৃত্যুকালে বরেন্দ্রভূমির কিয়দংশ মাত্র তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল (Tabkati Nasir, pp 484-456, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। তদবধি লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ সে সময়ে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অধিকর্তা ছিলেন (Ibid, p 538)। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় পর্য্যন্ত, বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান রুকনুদ্দীন কৈকাউসের রাজত্বের শেষভাগে, দেবকোটের শাসনকর্ত্তা বহরম উর্দ্দীন খাঁকর কর্ত্তৃক সংগ্রাম লিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ বঙ্গ মুসলমানগণের অধিকারে আসে নাই (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঐ সময়ের প্রায় ১৬৭ বৎসর পরে, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুলতান রুকনুদ্দীন বরবাকের রাজত্বকালে, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল (Epigraphia Indica, Moslemica, 1908-10, p. 114)। এই সময়ে বসিরহাটে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হয়। উহা এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে এবং সাঙ্গী মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। (বসিরহাটের সাঙ্গী মসজিদ, শ্রীযুক্ত কেদারনারায়ণ রায়চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ)।

চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, এই পাঠান রাজত্বকালের শেষভাগে, হুসেন সাহের শাসনসময়ে বর্ত্তমান ২৪ পরগনা জেলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন ছত্রভোগ পর্য্যন্ত স্থানে মনুষ্যবাস ছিল এবং উহার দক্ষিণ প্রদেশ অরণ্যাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে ছত্রভোগ একটি প্রধান বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং রামচন্দ্র খাঁ নামক হুসেন সাহের একজন কর্ম্মচারী উহার নিকটে সমগ্র দক্ষিণদেশ শাসন করিতেন (চৈতন্যভাগবত, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৩-৩৮৫)। এই রামচন্দ্র খাঁ কে ছিলেন, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। ঐ সময়ে ছত্রভোগের ১২।১৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মাহীনগর নামক স্থানে পুরন্দর খাঁ নামক হুসেন সাহের জনৈক হিন্দু অমাত্য বাস করিতেন। তাঁহার বংশে অনেকের খাঁ উপাধি ছিল। অতএব রামচন্দ্র খাঁ এই বংশের কেহ হওয়াই সম্ভব। ভাগবতের অনুবাদক প্রসিদ্ধ মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁও এই বংশীয়। ইঁহাদের বংশধরগণই অধুনা বঙ্গদেশে মাহীনগরের বসু নামে প্রসিদ্ধ। এই মহী (বা মাহী) নগর প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর উপর একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য ও বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান প্রভৃতি পুরাতন পুস্তকে এই স্থানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, উক্ত বসুবংশের কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ মহীপাত বসুর নাম হইতে এই স্থানের নাম মহীনগর হইয়াছিল। এখানে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের তিনঘর একঘরে হওয়ায় ইহা পূর্ব্বকালে সমাজিকগণের নিকটও খুব প্রসিদ্ধ ছিল (কায়স্থ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩৫, পুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর সমাজ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু)। এবং কুলীনগ্রামে নামেও অভিহিত হইত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কুলীনগ্রামের অবস্থানের যেরূপ পরিচয় লিখিত আছে তাহা হইতেও এই স্থানটি ঐ নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া বুঝা যায়। ঐ পুস্তক অনুসারে চৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে অম্বুয়া গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে গঙ্গার বামতীর অবলম্বনে কাঁচরাপাড়া বেতড় বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত এবং দক্ষিণে রাখিয়া উক্ত কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন (চৈতন্যমঙ্গল পরিষৎ সংস্করণ—৭, পৃষ্ঠা ৯৫)। মহী নগরের এই বসুবংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বসু রামানন্দের নামও বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে তাঁহাকে জগন্নাথের পট্টডোর যজমান করিয়াছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ১০ পরিচ্ছেদ)। গুণরাজ খাঁ কৃত ভাগবতের বঙ্গানুবাদের জন্যও এই কুলীনগ্রামকে মহাপীঠ বলিয়া সেবের চক্ষে দেখিতেন। কুলীনগ্রাম-বাসিগণের জগন্নাথের পট্টডোর লইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই —

" কুলীনগ্রামেরে কহে সম্মান করিঞা।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রার পট্টডুরী লঞা॥
গুণরাজ খাঁ কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
মূর্খের নমন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥

তোমার যা কথা কিবা তোমার গ্রামের কুকুর
সেও মোর প্রিয় অক্ষরন বহনে॥" চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।।

পাঠান রাজত্বের অবসানে বঙ্গদেশে মোগল রাজত্বের আরম্ভ হইলে ২৪ পরগনা জেলার উত্তরাংশে সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত বুড়াগাছা, খাবরা (খাড়ী), হাতীয়াগড়, সেদনমল, ও বাসোত্রা প্রভৃতি পরগনার অধীন হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশে সুন্দরবন প্রদেশ ঐ সকল পরগনার বহির্ভাগে অবস্থিত হইয়া কর আদায়ের অনুপযুক্ত অবস্থায় ছিল। Ayeen Akbari—Gladwin, p 427 Hunter's Statistical Account Vol. I, p. 381)। এই সময়ে ঐ দিকের ডাকাতী ও হরতোগ প্রভৃতি বহু জনপদ যবন ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে সুন্দরবনের সীমা আরও বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকালেও কলিকাতার সন্নিকটে অরণ্য দেখা যাইত।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য রাজা ও জমিদারগণ

মুরশিদাবাদের নবাবদের ইতিহাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী নবাবদের শুধু নামোল্লেখ করিয়া যাইব। মীর জাফর ইংরেজদিগকে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বিভাগের জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই ভূখণ্ডটিই বর্ত্তমান ২৪-পরগনা, (পরিমাণ ৮৮১ বর্গ মাইল), ইহার রাজস্ব দশ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে ইঁ ইঁ কোম্পানীকে বাৎসরিক ২,২২, ৯৮৫ টাকা নবাব-সরকারে খাজনা দিতে হইত। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে মীর জাফর এই ভূভাগের মালিকানী স্বত্ব কোম্পানীকে দিয়া খাজনার ২,২২, ৯৮৫ টাকা ক্লাইবকে প্রদান করেন। জীবনের মৃত্যু হওয়াতে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিম নবাব হন। ইনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে বেশব বারো কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বক্সারের যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধবিগ্রহকালে মীর কাশিম জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ইংরেজের পক্ষে লেখিয়া আল ভুবাইয়া নিহত করেন—সৈবক্রমে কৃষ্ণনগরের অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধার পান। মীর কাশিমের সঙ্গে সঙ্গে মুরশিদাবাদের নবাবদের প্রাসাদের শেষ দীপ নির্ব্বাপিত হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীর কাশিম রাজ্যচ্যুত হইলে মুরশিদাবাদের সিংহাসনে মীর জাফর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই (১৭৬৫ খৃঃ অব্দে) কুষ্ঠ রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার দৌহিত্র নিজামউদ্দৌলা ও সৈফউদ্দৌলা নবাব হন। প্রথমোক্ত নবাব ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সৈফউদ্দৌলা ১৭৭০ খৃঃ অব্দে সেই একই রোগে

মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপরে যথাক্রমে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭১০-২৭ খৃঃ), নবাব সরফরাজ (১৭২৭-১৭৩০ খৃঃ), নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ (১৭৪০-৫৬ খৃঃ), নবাব সিরাজদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খৃঃ) ও নবাব মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ খৃঃ) ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইঁহার সময়ে বর্ত্তমান লালবাগ দুর্গের প্রাসাদ ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়, (১৬৭৯-৮৮ খৃঃ)। জয়পুর জয়ের পরে নবাব মনসুর আলি খাঁ (১৬৬৫-৭০ খৃঃ), হন আলা মির্জ্জা খাঁ (১৬৮০-১৭০৮ খৃঃ), এবং পরবর্ত্তী কালে সঙ্গীতপ্রিয় ঐতিহাসিক আলি মির্জ্জা খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রগণের রাজত্বকাল—ইঁহারা এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণসমাজের সমাজপতি এবং ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত। ভট্টনারায়ণের সপ্তম স্থানীয় কাশীনাথ (১৪৯৭ খৃঃ) হইতে পরবর্ত্তী জমিদারী পরিচালনা করিতেন। কাশীনাথের পুত্র রামভদ্রকে আকবরের আমলের একজন সমাদার পোষ্য গ্রহণ করেন, তৎপরে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের দত্তক পুত্রত্ব গ্রহণ করিয়া, ভূরি ভোজের বিশাল সম্পত্তি অধিকারপূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ভবানন্দের পুত্র রামগোপাল, তাঁহার পুত্র রাঘবচন্দ্র রায়—এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণনারায়ণ দিল্লীশ্বর হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ এবং রঘুরাম রাজা হন। রঘুরামের মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) শুভাদৃষ্টক কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন পণ্ডিত, তেমনই বুদ্ধিমান্ ছিলেন, রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন, এবং ধর্ম্মবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং অগ্নিহোত্র, বাজপেয় প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজস্ব দেওয়ার ত্রুটি হওয়াতে মুর্শিদকুলী কর্ত্তৃক তাঁহার "বৈকুণ্ঠবাসের" আজ্ঞা হইয়াছিল কিন্তু দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব তাঁহাকে ১২টি কামান উপহার দিয়াছিলেন। তিনি 'শিবনিবাস', 'মঞ্চাবাস' প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্লাইবের অনুরোধে তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে 'মহারাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৭৮২ খৃঃ ২২শে আষাঢ় তিনি ৭০ বৎসর বয়সে স্বর্গীয় হন। তাঁহার সভায় বহু পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পরে যথাক্রমে শিবচন্দ্র রায় (১৭৮২-৮৮ খৃঃ), ঈশ্বরচন্দ্র রায় (১৭৮৮-১৮০২ খৃঃ), গিরীশচন্দ্র রায় (১৮০২-৫১ খৃঃ), শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮৫১-৫৭ খৃঃ), সতীশচন্দ্র রায় (১৮৫৭-৭৭ খৃঃ), ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (১৮৭৭-১৯১০ খৃঃ) এবং ক্ষোণীশচন্দ্র রায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

ভাওয়ালের রাজবংশ—কথিত আছে মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে, ঢাকার কোন কোন স্থান পাঠিরা অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ কেলার ধুলাপুর গ্রামের গ্রামবাহী "কানাই" নদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইঁহারা 'গাঙ্গিখালে' নাম দিয়াছিলেন। পাল ও চাঁদ গাজির পুত্র ভাওয়াল গাজির নামানুসারে ঢাকার উত্তরবর্ত্তী ভূভাগের "ভাওয়াল" নাম হইয়াছে। গাজি বংশের মকরম গাজির পুত্র জালাল গাজির এক ব্রাহ্মণ

দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার বিক্রমপুর বহুযোগিনী গ্রামবাসী এবং ইঁহার নাম ছিল কৃষ্ণবল্লভ, দেওয়ানজী বর্তমান জয়দেবপুরের পার্শ্বস্থে চান্দনা গ্রামে গৃহ নির্মাণ করান। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রঘুরাম ব্যবসাদারদের সর্দারের নয় আনা অংশ নিলামে ক্রয় করিয়া নবাব-সরকার হইতে 'রায় চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হন তারপর রাজা উপাধি হয়। রঘুরামের পরে শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, জয়দেব রায় চৌধুরী, গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরী এবং কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী যথাক্রমে রাজা হন। কালীনারায়ণ গবর্নমেণ্ট হইতে রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কালীনারায়ণের পুত্র রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, ইঁহারই দেওয়ান ছিলেন পূর্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘু রায় যাহাদের কালীপ্রসন্ন গোষ। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় হন। তাঁহার তিন পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ, কুমার রবেন্দ্রনারায়ণ এবং কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ—সকলেই খৃষ্টান হইয়াছিলেন এই কথাই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি রমেন্দ্রনারায়ণ চিকিৎসার্থে ইউরোপ যাইয়া স্বয়ং অস্বীকারের দাবী করিয়াছেন, অমৃতের কাগজে এই কথা পড়া যাইতেছে। সে বিচার এখনও শেষ হয় নাই।

অকূলাগাড়—এই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গাঁয়ের পূর্বপ্রান্তে বর্ষীয়ান মজলিস কাব্য প্রসঙ্গে গজলের 'মকটই' বলিত। ইহা একবারে কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র সেনের অনেক কীর্তিকথা প্রবাদবাক্যের ন্যায় হইয়া আছে, লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কিশ সেন।

কিন্তু প্রাচীন রাজবংশের কি হইল জানা যায় নাই। বর্তমানকালে মধনা রাজের সন্তানের আদিপুরুষ ১। গোবিন্দানন্দ ব্রাহ্মণরাজ, ২ পরমানন্দ ব্রাহ্মণরাজ, ৩ মাধবেন্দ্র ব্রাহ্মণরাজ, ৪ গোকুলানন্দ ব্রাহ্মণরাজ, ৫। কৃষ্ণানন্দ ব্রাহ্মণরাজ, ৬। জয়ানন্দ ব্রাহ্মণরাজ, ৭. বলরামেন্দ্র ব্রাহ্মণরাজ, ৮ অনন্তানন্দ ব্রাহ্মণরাজ, ৯। রাধারামানন্দ ব্রাহ্মণরাজ রাধারামানন্দ ১৮২৮ খৃঃ অব্দে রাজাসন প্রাপ্ত হন ১৮৮১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজা জ্ঞানানন্দ, ইঁহার ভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ ও রাজকুমার সাধনানন্দ সাধারণ গৃহস্থ হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহাদের রাজ বিভূতি আর নাই।

পুঁটিয়া বংশবাচ্য এই বংশের আদিপুরুষ, ইঁহার পুত্র পীতাম্বর রায় জমিদারী অর্জন করেন। তাঁহার পরে নীলাম্বর রায় ও পরে আনন্দচন্দ্র রায় জমীদার হন, আনন্দচন্দ্র নিঃসন্তান হইলে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। আনন্দচন্দ্রের পুত্র দর্পনারায়ণ, তারপর ক্রমান্বয়ে রামচন্দ্র রায় নরেন্দ্রনারায়ণ রায়, দর্পনারায়ণ রায়, জয়নারায়ণ রায় ও রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজেন্দ্রনারায়ণের বিদ্যা পত্নী পরমসুন্দরী দেবী এদেশের গৃহলক্ষ্মীদের মধ্যে শেষ গুণের অধিকারিণী, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর সঙ্গে কথোপকথোপে শুনিতেন, তৎপরে ও নানা বিধ কুশলাদন করিয়া তিনি প্রস্থান হইয়াছিলেন। একদা কোন ভদ্র ইংরেজ কলিকাতা তাঁহার ষ্টেট দেখিতে আসিয়া বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন, "রাজা তো এখনও বালক বয়স্ক, আর একবার বিবাহ করিতে পারেন" এই পাপ কথা শুনিয়াছিলেন পরক্ষণে তিনি সাধারণের কল্যাণে কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন

এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে দিনাজপুর পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৩ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ৬৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সুশাসন করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ চেমযুকুমারী এখন রাণী। তিনিও অনেক দান করিয়া বদান্যতা দেখাইয়াছেন।

আড়োয়ার—বারেন্দ্র কুলীন সমাজে এই রাজবংশের আদি পুরুষ ইঁহার এক সুদূর বংশধর কামদেব মৌলা পুণ্ড্রিয়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের জমিদারীতে কাজ করিতেন। এই কামদেবের সপ্ত বংশধরের একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর দীক্ষিতাজন হইয়া বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কাহনসরের আদ্য রাজা রামজীবন 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭২০ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার পুত্র মহারাজ রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী ভবানী রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার পবিত্র জীবন ও দানশীলতা বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের ন্যায় হইয়া আছে। ইনি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ইনি অযোধ্যা এবং মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানে বহু মঠ মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জমীদারীর আয় এত প্রচুর ছিল যে তাঁহাকে লোকে "অর্দ্ধবঙ্গের অধিকারিণী" বলিত। ১৭৭০ খৃঃ অব্দের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তিনি যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা গল্পের মত শুনায়। তাঁহার পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় অনর্থের মূল মনে করিয়া রাজ বৈভবের প্রতি যে ঔদাসিন্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সে বৈভব নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি উদ্বেলাধক লোকদিগকে লইয়া তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ভাবুক সাধুদের সংস্রবে গান গাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলি ভক্তি ও প্রেমে ভরপুর। "আমার মন যদি রে ভুলে তবে বাসির শয্যায় কালার নাম বেঁধ কর্ণমূলে—আমায় এনে দে জোনা কদমের মালা জামাই গঙ্গাজলে" প্রভৃতি গান ভক্তির অমৃত, বিষয়-ভোগ-নিষ্কামনের ভেরজ। রামকৃষ্ণের পর মহারাজ বিশ্বনাথ রায়, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র রায়, মহারাজ শ্রীবিশ্বনাথ রায়, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় রাজত্ব লাভ করেন। এখন জগদিন্দ্রনাথের পুত্র কুমারিন্দ্র, মহাসমারোহে মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ছোটতরফে শিবনাথ রায়, আনন্দনাথ রায়, চন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ রায় ক্রমান্বয়ে রাজা হন। রাজা যোগেন্দ্রনাথ ১৯০১ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন।

কাশিমবাজার—কালীপদ নন্দীর পুত্র রামকৃষ্ণ নন্দী—তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত নন্দীই (কান্তবাবু)। এই রাজবংশের গৌরব ভিত্তি। হেষ্টিংসের প্রসাদে ইনি অতুল বৈভবের অধিকারী হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পরলোকে গমন করেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথ নন্দী 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে হরিনাথ নন্দী (১৭৯৮-১৮৩৯ খৃঃ), এবং শেষে তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ নন্দী রাজা হন। কোন ভৃত্যকে খুন করার অপরাধে ইঁহার উপর ওয়ারেণ্ট জারি হয়, সেই অপমানে ইনি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানের যশ বঙ্গের সর্ব্বত্র বিঘোষিত। কথিত আছে, এই পুণ্যশীলা

রমণী ১০ লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীমবাজার গদির তৎপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের যশ যেন তাঁহাকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সকল বয়সে প্রাণীরা যেন একমাত্র লক্ষ্যহারা হইয়াছে। তদীয় পুত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী অল্প বয়সে গুরু পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদ্বজ্জন সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য চেষ্টিত আছেন।

দোয়াপাড়া কুণ্ডু—এখানে বাস এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ, ইনি পুটিয়ার রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি বিলক্ষণ কুশল ছিলেন, ইহার বুদ্ধি বলে নৃসিংহকুণ্ডু খাঁ বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহারই চেষ্টায় বিদ্রোহী সীতারাম রায় বন্দী হইয়া নিহত হন। দয়ারাম রায়ের পুত্র জগন্নাথ রায় এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে প্রাণনাথ রায়, প্রসন্ননাথ রায় এবং প্রমথনাথ রায় রাজা হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের দিল্লীর দরবারে প্রমথনাথ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। এখন তৎপুত্র প্রমথনাথ রায় রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজা প্রমথনাথের মাতারা সকলেই কৃতী, বিদ্বান এবং দাতা প্রকৃতি বসন্তকুমার পরলোক-গমন করিয়াছেন, শরৎকুমারের যত্ন চেষ্টাতেই কন্যা ও অনাথের দাতা বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হেমেন্দ্রকুমার সে অভাবের একটী আংশিক নিবারণ করিল।

দিনাজপুর—কথিত আছে শীলবাহু ঘোষ নামক এক কায়স্থ উত্তর বাঙ্গলায় ৭ জন সঙ্গের ১৪৬ কায়স্থের ঘর স্থাপন করেন, এসম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা আমি এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি না, স্বর্গীয় মনোমোহন বসু প্রণীত 'বঙ্গজ-গৌরবে'র ৪৯০ পৃষ্ঠায় ও তৎপরিচ্ছেদে সংকলিত প্রবন্ধে সমালোচক ইতিহাসে তাহা লিখিত আছে। শীলরাজ ঘোষের পুত্র শুকদেব রায়ের সময় এই বংশের ক্ষমতার বৃদ্ধি পায়। ইনি ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মে কক্ষে প্রাপ্ত হন। তাহাদের ক্রমান্বয়ে জয়দেব রায়, পরমানন্দ রায়, রমানাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায়, রামনাথ রায় গোবিন্দনাথ রায় তারকনাথ রায় ও গিরিজানাথ রায়। ইনি ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি দিনাজপুরে একটী খাল কাটিতে ১৪ ০০০ টাকা ব্যয় করেন এবং ইহাঁর ও বড় মেমোরিয়াল হলের জন্য ২৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

ঢাকার নবাব-বংশ—আকুল ঢাকার নামক এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী এই বংশের আদিপুরুষ তৎপরে যথাক্রমে হাফিজুল্লা, খোজা আলিমুল্লা এবং আবদুল গনি এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। আবদুল গনিই এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইনি সি. এস. আই উপাধি এবং সেই বংসরেই বংশানুক্রমে নবাব উপাধি পাইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর জীবনে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কে সি এস আই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া ছোট-বড় অনেক রাজা-মহারাজা ও জমিদার বাস বাঙ্গলায় আছেন, তাঁহাদের উল্লেখের স্থান আমাদের নাই। ইহাদের মধ্যে চাচড়া, নলডাঙ্গা, মহিষাদল, হেতমপুর,

অঞ্চল চকদঘি, নওহাটা, কর্ণকেনা, তাজহাট, চন্দ্রকোণ, নন্দীপুর নাড়াজোল, শিয়াখোলা, পাইকপাড়া, চুনিয়াসোল, পাথুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোয়াইল, মেহেরা প্রভৃতি কয়েকটির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর পরিবারে রাজা মহারাজার অভাব নাই, কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য ছায়াবৎ, উহাতে উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রতিভার বিশেষত্ব খ্যাতি

এই হতভাগ্য দেশের হতশ্রী রাজবৈভবের ক্রমবিলুপ্যমান শেষ রশ্মি আর দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। স্বর্গকিরীটিনী বঙ্গলক্ষ্মীর ললাটে আর সে মণিস্বাতি নাই। আমরা সে ঐশ্বর্য্যের চিতা-ভস্মের মৃদু আর ঘাটিতে চাহি না। সে দিন গিয়াছে, যখন কোন তরুণ রাজার গুপ্তোদ্বাহ উপলক্ষে রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া রাজমাতা কোটী কোটী টাকা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। স্বপ্নে সে সকল কথা অপূর্ব্ব মধুর মনে হয়, কিন্তু বেতড় শান্তাপাড়ের ও হাজিরপুরের রাজা কালেনারায়ণ ভূর্গোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের একজন জমিদার ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সে দিনও গিয়াছে।

কিন্তু আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যদেবের প্রেম কন্যার ও মাধুর্য্য বাহির হইয়াছে। তাহা কোকিল-কূজনের ন্যায় সমস্ত জগতে মোহ উৎপাদন দিতেছে, বসন্তসমীরের ন্যায় বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমস্ত জগৎ বৈষ্ণবদলের তরঙ্গভঙ্গের নৃত্য দেখিতেছে। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের লক্ষ্মীশ্রী বর্ণমাধুরীতে পৃথিবী ভরপুর হইতেছে, পরমহংস দেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের তত্ত্ব জগৎময় কাণ পাতিয়া শুনিতেছে। আমার ভয়ই হয় যেই জন কিনা হাসে বাঙ্গালীর ঘরে, তবে "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার ছাউনি" লইয়াও আমরা গর্ব্ব করিতে পারিব, প্রাতঃকালে নহবৎ বাদ্যের তরঙ্গে ও ললিত রাগিণীর সুরে না হয় আমাদের ঘুম আর নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে সন্ধ্যা পূরবী রাগিণীর সুর না হয় আমাদের শম-সমাপ্তির কথা আর নাই জানাইল। আমাদের কুটীরপার্শ্বে আম্র বাটিকায় কোকিল-কূজন থামিবে না, নীলাকাশে 'বউ-কথা-কও' ও 'চোখ-গেল রে' আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেনের অভাবের দুঃখ ভুলাইয়া দিবে। আমাদের শস্য-শ্যামলা সুবিস্তৃত মাতৃ-লক্ষ্মীর অঞ্চল আমাদের খাদ্য লইয়া নিরবধি প্রসারিত থাকিবে, এবং এদেশের নিম্নভূমিগুলি শত শত বাহু বিস্তার করিয়া সর্ব্বদাই উহা নিবারণের জন্য উদ্যত আছে। এ পারিবার প্রস্তাবমুখ না হইলে কাহারও আমাদিগকে মারিতে পারিবে না, আমাদের উপাস্য স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মহাদেব

বঙ্গদেশে যে সব প্রাচীন মন্দির, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও দীঘির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের অনেকগুলিতেই বাঙ্গলা স্থাপত্যের নিজস্ব রূপটি আছে, এই ঐশ্বর্য্যের শ্মশানভূমি পরিক্রমা করিতে আমার সাধ কুলাইল না। আশা করি, বঙ্গীয় নবীন যুগের যুবকেরা এই দেশের উপেক্ষিত পুরাকীর্ত্তিগুলির প্রতি মনোযোগী হইবেন,

তাহা দেখিবার ও তাহাদের ঐতিহ্য গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য সময় লক্ষণ করিতে হইবে না, বাড়ীর চতুষ্কোণে চোখ মেলিয়া চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত কীর্তি যে প্রাচীন কীর্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শত্রুর আক্রমণ নিরোধে অশক্ত হইয়া বহু রাজা তাঁহাদের ধনসম্পত্তি সহ দেবদেবতাসহ সেই দীঘির কোন কোনটির জলে বিসর্জন দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বহু মন্ত্রপূতের কত সুন্দর বিগ্রহকে সেই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বিপ্লবের মধ্যেও মানুষ। এইরূপ এক দীঘিতে ধনসম্পত্তি লুকাইয়া গিয়াছেন সন্দেহ করা, ষোলশের একটা খাল কাটিয়া সেই দীঘির জল নিঃসন্দেহে তাহা লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন ১৩১৬ প্রতাপপুরের রাজা যুদ্ধে বিক্রমপুরের অধিপতির ৭০৯ পৃঃ। ভগ্নে পরাজিত হইয়া স্বীয় প্রাসাদ সংলগ্ন কাননস্থ সরোবরে রাজা ও অপরাপর মহিলাগণ সহ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও আছে। রাজা জ্ঞানকীনাথের। সুনন্দ দুর্গাপুরের অধিপ। রাজ্ঞী কমলাদেবী কমলসাগরে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীর পুণ্যপুরুষাদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার হল হইতে পারে, কিন্তু সন্দেহ হয়না। হইতেও সেই দীঘি একটি কাহিনীবহুল প্রসিদ্ধিক। অমন দীঘি খনন করিয়া তাহাতে সহ বিসর্জন রাজাদের অনেকের কত লালসা ছিল, তাহার ইতিহাস আছে (১৩৩৩ প্ অনেক দিঘির বহু স্থান দীঘি বিস্তারিত ও নির্মল সলিলের অনাহতে স্থান সমাটিগণেরই ছোয়া। এই দীঘির পরিমাণ ৩৮০০ × ১১০০ ফুট ইহার তীরে যে মন্দির ছিল তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার ও কারুকার্য্যে তাহা যে এক দীঘিবহু শোভা ছিল তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। এই দীঘি দিনাজপুরে অবস্থিত এবং এই জেলারই চতুর্কোণে তপন দীঘি ৪৭০০ × ১৭৭০ ফুট, গোপাল দীঘি ৫০০০ × ১০০০ ফুট কালা দীঘি ৪০০০ × ৮০০ ফুট এবং পুরাতন মেলান দীঘি, পোর দীঘি ও আরও দীঘি কুটীর চিহ্নে এখনও বর্ত্তমান। আমরা আলোচনে দেখিতে পাই কখন ও কখনও রাজারা নিজ হাতে ঝুড়ি কাটিয়া রাজ্যের আরম্ভ করিতেন, সাতদিনে যতটা ঝুড়ি কাটিবেন, সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে। কমলা সাগর। মৈমনসিংহ। এই ভাবের এক সর্ত্তে কাটা হইয়াছিল, মৈমনসিংহের সুবাদারের দীঘিও এরূপ সর্ত্তে খাত হইয়াছিল পুরাতন কথা। পূর্ব্বোক্ত দীঘিগুলি ছাড়া এদেশে যে আরও কত অতিকায় দীঘি বিদ্যমান, যাহাদের খোঁজ কেহ রাখে। আমরা ভবিষ্যতে লক্ষ কাটিন এবং লক্ষ লেমন্ দীঘির কথা মন্তব্য করিব। মেদিনীপুরে কাকুরার বড় দীঘিটি নাই ছোট দীঘিটি আছে, এই দীঘির এক পারে দাঁড়াইলে অপর পারের মানুষ অতি ক্ষুদ্রাকার দেখা যায় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মেদিনীপুর শহরেটায় জলটুঙ্গী দীঘি, ইন্দ্র পুষ্করিণী, পাথুরিয়া ডুবা, মঙ্গলা, কবেল দীঘি, অমৃতপুষ্করিণী এবং চাড়ুয়া প্রভৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট অনেক স্তূপ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। বর্দ্ধমান জিলার প্রাচীন দীঘির পাড়ে একটি দেব-মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণায় সরস্থনা গ্রামের কমলা-কমলার দীঘি এখানে উল্লেখযোগ্য। এখন আমাদের পল্লীর ক্ষুদ্র পুকুরটি সংস্কার করিতে শক্তি নাই এই সকল

আব্দুল, চকদঘি, নড়াইল, কাঁকনা, কাগজাটি, চন্দ্রদ্বীপ নইপুর নাড়াজোল, শিয়ারশোল, পাইকপাড়া, চুঁচকলাস, পাথুরিয়াঘাটা জানজোল, বোয়াইল, চেতলা প্রভৃতি কয়েকটির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর পরিবার রাজা-মহারাজার অধীন নাই, কিন্তু জড় ঐশ্বর্য ছাপাইয়া উঠিতে উঁহাদের যশ কাহারও কাহারও প্রতিও বিদ্রোহজন খ্যাতি।

এই হতভাগ্য দেশের ঐশ্বর্য রাজ বৈভবের ক্রম বিলীয়মান শেষ দৃশ্য আর দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত বঙ্গভূমির কীর্তির কুণ্ডলে আর যে মণিরাজি নাই। আমরা জড় ঐশ্বর্যের চিতা-শয্যার দৃশ্য আর উদ্ঘাটিত করিব না। সে দিন গিয়াছে, যখন কোন রাজার শুভোদ্বাহ উপলক্ষে রাজলক্ষ্মী মুক্ত করিয়া হস্তস্থিত কোটী কোটী টাকা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। আজকে সে সকল কথা স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু সেদিন শতাব্দীরও আগেকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীরই বঙ্গের একজন জমিদার ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কোন এক দেবীর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন,—সে দিনও গিয়াছে।

কিন্তু আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যদেবের খোল করতাল ও মন্দিরা বাহির হইয়াছে। তাহা কোকিল কূজনের ন্যায় সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়া দিতেছে, এবং অনন্তদেব বীণা বিস্মৃত মাতৃভূমি সমগ্র জগৎ বিস্ময়ভরে উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিতেছে। সগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের নানা বর্ণ মাধুরীতে পৃথিবী রঙ্গীন হইতেছে, পরমহংস দেবের সরল বাণী সমস্বরের ন্যায় জগৎবাসী কাণ পাতিয়া শুনিতেছে আমাদের ভয়ই বা কি? যেই জন্য কেঁদে মরি, যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তার পাতার ছাউনি" লইয়াও আমরা গর্ব করিতে পারিব, প্রাণে তরু নহবৎ বাজের উৎসবে ও কালড় রাগিণীর সুরে না হয় আমাদের ঘুম আর নাই ভাঙ্গল, এবং নহবতে সাঝা-পূরবী রাগিণীর সুর না হয় আমাদের ভগ্ন-সমাপ্তির কথা আর নাই জানাইল। আমাদের কুটীরপার্শ্বে আম্র নাটিকায় কোকিল-কূজন থামিবে না, নীলাকাশে 'বউ-কথা কও' ও 'চোখ-গেল বে' আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিবে। মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেনের অভাবের দুঃখ ভুলাইয়া দিবে আমাদের শস্য শ্যামলা সুবিস্তৃত মাতৃ-অঙ্কের অফল আমাদের খাদ্য লইয়া নিরবধি প্রসারিত থাকিবে, এবং এদেশের বিশালতোয়া নদ-নদী শত শত বাহু বিস্তার করিয়া সর্বদাই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য উদ্যত আছে ও থাকিবে,—আমরা শ্রমবিমুখ না হইলে দারিদ্র্য আমাদিগকে মারিতে পারিবে না, আমাদের উপায় স্বয়ং বিশ্বম্ভর মহাদেব।

বঙ্গদেশে যে কত প্রাচীন মন্দির, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও কীর্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের অনেকগুলিরই বাঙ্গলা স্থাপত্যের নিজস্ব রূপটি আছে, এই ঐশ্বর্যের শ্মশানভূমি পরিক্রমা করিতে আমার সাধ ফুরাইল না। আশা করি, বঙ্গীয় নবীন যুগের যুবকেরা এই দেশের উপেক্ষিত পুরা-কীর্তিগুলির প্রতি মনোযোগী হইবেন,

তাহা দেখিবার ও তাহাদের ঐতিহ্য গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য সমস্ত গভীর করিতে হইবে না, বাড়ীর চতুর্দিকে চোখ মেলিয়া চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীঘি যে প্রাচীন কীর্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শত্রুর আক্রমণ নিরোধে অশক্ত হইয়া বহু রাজা তাঁহাদের ধনসম্পত্তি-সহ কোন-বিশ্বস্তজনকে সেই দীঘির কোন কোনটির তলে বিসর্জন দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, রাজ অন্তঃপুরের কত সুন্দরী বিপৎকালে সেই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন বিপদের মনোমোহনকে। এইরূপ এক দীঘিতে ধনসম্পত্তি লুকাইয়া গিয়াছেন সন্দেহ করিয়া, মোগলেরা একটা খাল কাটিয়া সেই দীঘির জল নিঃসরণপূর্বক তাহা শুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন ১০৭৬ পৃ. পরবর্তীকালের রাজা যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের অন্তর্ভুক্তের ৭০৯ পৃঃ হস্তে পরাজিত হইয়া স্বীয় প্রাসাদ সংলগ্ন কানাই সরোবরে রাজ্ঞী ও অন্যান্য মহিলাগণ সহ পাল বিসর্জন করিয়া ছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও আছে রাজা জানকীনাথের সুযশস্ক দুর্গাপুরের অধিপ রাজা কমলাদেবী কমলাসাগরে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীর পূর্বপুরুষগণকে নরক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এ কথার সংস্কার ভুল হইতে পারে, কিন্তু পুরোহিত যখন, এইরূপ সেই দীঘি একটি তীর্থস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ অমর দীঘি খনন করার ইতিহাসের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের রাজবংশের অধিকার কত ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহার ইতিহাস জড়িত (১০৩৩ পৃঃ ভাগীরথীর মহানাল দীঘি বিশালত্বে ও নির্মল সলিলের প্রাচুর্যে পাল সম্রাটগণেরই যোগ্য। এই দীঘির পরিমাণ ৩৮০০ × ১,০০০ ফুট, ইহার তীরে যে মন্দির ছিল তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উচ্চতায় ও কারুকার্যে তাহা যে এই দীঘিরই যোগ্য ছিল, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। এই দীঘি দিনাজপুরে অবস্থিত এবং এই জেলারই দেবীকোটে তখন দীঘি ৪৭০০ × ১৭৫০ ফুট, দোয়াল দীঘি ৪০০০ × ১,০০০ ফুট কালা দীঘি ৩০০০ × ৮০০ ফুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীঘি ও আমুরা দীঘি কুটীর তীরে এখনও বিদ্যমান। আমরা পালাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও রাজারা নিজ হাতে সুতা কাটিয়া তাহাকে আদেশ করিতেন সাতদিনে যতটা সুতা কাটিবেন, সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে। কমলা সাগর। মৈমনসিংহ, এই ভাবের এক সর্তে কাটা হইয়াছিল মৈমনসিংহের সুলতানের দীঘিও এইরূপ সর্তে খাত হইয়াছিল (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, বাদশা ঈশার কথা। পূর্বোক্ত দীঘিগুলি ছাড়া এদেশে যে আরও কত অতিকায় দীঘি বিদ্যমান, তাহাদের খোঁজ কে করে? আমরা উত্তরবঙ্গের লক্ষ্মীকুল এবং লক্ষ লেমন্ দীঘির কথা মুখস্থ করিয়াছি মেদিনীপুরে কাঁকড়ার বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীঘিটি আছে, এই দীঘির এক পারে দাঁড়াইলে অন্য পারের মানুষ অতি ক্ষুদ্রাকৃতি দেখা যায় তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে মেদিনীপুর গভর্নমেন্ট কলেজের দীঘি, ইন্দ্র পুষ্করিণী, শাঁখারিয়া চয়া, মঙ্গলা, কবেশ দীঘি, অমরপুষ্করিণী এবং হাজরা প্রভৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট অনেক স্কুল ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে বগুড়ার সিকোলার প্রাচীন দীঘির মাঝে একটি দেব-মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণার সরস্থনা গ্রামের কমলা-বিমলার দীঘি এখানে উল্লেখযোগ্য। এখন আমাদের পল্লীর ক্ষুদ্র পুকুরটি সংস্কার করিতে শক্তি নাই, এই সকল

দীঘির কথা জানিবার মত মনোবৃত্তিই বা কয়। সহরে নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিও জল কিনিয়া খাইতেছে। মণিপুরের নিকট ত্রিশাপুরে ৩০০ হস্ত বেড় যুক্ত দুইটি দীঘি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি দীঘির সংবাদ পাইয়াছি, ইহা নাকি মহীপাল দীঘি হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে মুসলমান বিজয়ের কিছু পূর্ব্বে কোন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। সুলতান সামসুদ্দিনের পিতার নাম কতকগুলি মুদ্রায় তথায় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহা ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের। এই মাধবপুরে প্রাচীন অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩-টি বৃহৎ দীঘির চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে ২-টিতে এখনও গ্রীষ্মকালে জল থাকে। বাঙ্গলা দেশের রাজারা যে ধনরত্ন এমন কি তাম্র-কাঁসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া রাখিয়া আপৎকালে চলিয়া যাইতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, বহু দীঘি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে-কোন উৎসব উপলক্ষে কেহ বাসনপত্র চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবান্তে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত। মাধবপুরের কোন কোন দীঘি সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে "সোণার-পুকুর" প্রসিদ্ধ,—দীঘির আয়তন ১৯ বিঘা। ইহা ছাড়া "ফুলবাড়ী পুকুর," "কালা পুকুর," "বড় বাড়ী," "মোচা পুকুর," "গোপাল বাড়ী," "চিক্কা বাড়ী," "গোয়াল বাড়ী," "সোনা বাড়ী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা একটা সমস্যা। হয়ত কোন রাজা বা রাণী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দেবতার কাছে সঙ্কল্প করিয়া থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্থানে "ভিমের পুকুর" নামধেয় কতকগুলি দীঘি আছে। প্রবাদ, এক সময়ে উহার জলস্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবন পাইত, এতগুলি বড় দীঘি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানযুক্ত ছিল। মাধবপুরের বিস্তৃত বিবরণ আমি ঢাকা জেলার বাকলি হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

জে. সি. ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিয়াছেন, মহাস্থান খুঁড়িলে বহুমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যাইবে, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উদাসীন (৪০৮ পৃঃ)। এই স্থান হইতে মিঃ ব্লকম্যান ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ তাম্রলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। ২৪ পরগণায় জটার দেউল নামক খৃষ্টাব্দে রাজা জয়ন্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল (১১২৯ পৃঃ)। যশোরে মহম্মদপুরে রাজা সীতারামের মন্দবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রাজারই দুর্গ ছিল, এই দুর্গগুলিকে 'কোট বাড়ী' বলা হইত দিনাজপুরে বিরাটগড় বিরাট রাজার রাজধানী প্রবাদ), চাকেরাতে দুর্গ, বাগড়ে বাণ রাজার দুর্গ, বর্দ্ধমানে রাণীগঞ্জের অধীন চুকলিয়া পল্লীতে রাজা নরোত্তমের দুর্গ, বাঁকুড়ায় নূতন গ্রামে ধনেশ্বর গড়, কাঁসাই গড়, কুরুম গড়, অম্বর গড়, শ্যামসুন্দর গড় প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মেদিনীপুরে ময়নাগড়ের দুর্গ (লাউসেন নির্ম্মিত, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী), ২৪-পরগণার কাউগাছির দুর্গ আয়তনে চার মাইল, চতুর্দ্দিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় জরিপা দিলীপ সিংহের গড় (১৪৮৫ খৃঃ অব্দে ইশা খাঁ কর্ত্তৃক অধিকৃত), হুগলী জেলায় ভান্ডারহাটের গড়, দিনাজপুরে সাতপাড়া গড় ও ঘোষীয়োলা গড়,—এই সকল প্রাচীন দুর্গের

অন্ত নাই। যশোরে প্রতাপাদিত্য হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ কংসনারায়ণের যশোরেশ্বরী মন্দির হইতে ৯ হইবে। মৈমনসিংহ গড়ের পাড়ার দুর্গা ৪০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল।

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতু বিজয়সুদ্ধ যে কত ছিল তাহার গণনা কে করিবে? ঢাকাতে ধামরাই ভাওয়াল, সাভার, রসোরা প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বিক্রমপুর সুবর্ণগ্রাম ও সাভার প্রভৃতি স্থানে বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন সাভারে হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজা ভাওয়ালে কিশুপালের রাজধানী ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। সুবাপুর ও নারায়ণের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাট বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন এখনও বিদ্যমান, ঐস্থান রাজাসন নামে পরিচিত বিক্রমপুরে সন্নালবাড়ী প্রভৃতি সুপ্রাচীন স্থান হইতে অনেক প্রাচীন বিগ্রহাদি পাওয়া গিয়াছে। বহুযোজনী চণ্ডীর নাম বহুর যোগিনী। কাপাসিয়ার জঙ্গল... রাজবাড়ীর পার্শ্বে মৃত্তিকা পঞ্চাশহস্তে সমাধিত হইয়াছে মীরকাদিম ও রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি স্থানে বিরাট দেবকীর্তি এখনও বিদ্যমান। ফরিদপুরে নগরা গ্রামের নিকটবর্তী মধুরাপুরের মন্দির হইতে পঞ্চমুখ শুকসনক প্রভৃতি অনেক মূর্তির চরি লইয়া গিয়াছেন। বাগেরহাট বিজয় রায় ১৩০২ খৃঃ নির্মিত, তদাকার ষষ্ঠেশ্বরীর মন্দির আর কোথাও কিন্তু তদপেক্ষাকৃত আধুনিক দিনাজপুর কান্তনগরের কাকেশ্বর গত দুইশত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়া কারুকার্য্যে অতি সুন্দর। ঐ জেলার কাশিমপুর, বীরব বিরাটপুর, কচক প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় রংপুর কাকেশ নামে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। তাহা ৩২ ফুট উচ্চ প্রস্তর, ইষ্টকের নির্মিত কোন আসাম-রাজ কর্তৃক ইহা নির্মিত হইয়াছে। বাকুড়ার হাড়মাসরা গ্রামে পঞ্চদশ বাংলার বাড়ীর নিকটবর্তী মন্দিরটি মুসলমান আগমনের পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় আমার নিকট বহু গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা মজুদ আছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সুন্দরবন, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখ্যা নাই, কিন্তু আমার স্থানাভাব। কালীঘাট, খড়দহ, কাশিমপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির এক শত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কীর্তি সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাঁহারা মন্দির ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু মসজিদ গড়িয়াছেন, যথা—ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ, পাণ্ডুয়ার হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া অনুমান ১৩০০ খৃঃ অব্দে উহা নির্মিত হইয়াছিল অনেক মসজিদের আদ্যন্ত পাঠ করিলেই হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিকল্পিত প্রস্তর দৃষ্ট হইবে, প্রাচীন এই কীর্তিগুলির ধ্বংস করার বিশেষ প্রয়োজন, পাণ্ডুয়া ও মহাস্থানের বিরাট ধ্বংসস্তূপগুলির মধ্যে সাঙাইলে বাঙ্গালাদেশকে মহাস্থান ভূমি বলিয়াই মনে হয় দেশ ভক্ত ঐতিহাসিককে মহাদেবের মতই এই মহাশ্মশানের চিতাভস্ম লইয়া তত্ত্বোবতন সাধনা করিতে হইবে

দিঘির কথা তাবিবার মত মনোবৃত্তি বা কাহার নাই। তবে নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিও জল কিনিয়া খাইতেছে। ঘণ্টিপুরের নিকট ঝিনপুরে ৩০০ হস্ত বেড় বৃক্ষ দুইটি দীঘি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি দীঘির সন্ধান পাইয়াছি, তাহা নাকি মহাপাল দীঘি হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে মুসলমান বিজয়ের কিছু পূর্ব্বে কোন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। সুলতান সামসুদ্দিনের লিপির নাম কতকগুলি গ্রন্থে তথায় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহা ১২৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের। এই মাধবপুরে প্রাচীন অনেক কীর্ত্তি চিহ্ন আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩০টি বৃহৎ দীঘির চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে ২০টিতে এখনও প্রীষ্মকালে জল থাকে। বাঙ্গলা দেশের রাজারা যে কতদূর এমন কি আমাকাঁসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া রাখিয়া আসিতে চলিয়া যাইতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, বহু দীঘি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে কোন উৎসব উপলক্ষে কোন পাত্রাদির চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবান্তে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত। মাধবপুরের কোন কোন দীঘি সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে "গোবিন্দ-পুকুর" প্রসিদ্ধ,—ইহার আয়তন ১৮ বিঘা, ইহা ছাড়া "ফুলবাড়ী পুকুর" "কালা পুকুর," "বড় বাড়ী" "মোচা পুকুর," "গোপাল বাড়ী," "চিড়া বাড়ী," "গোয়াল বাড়ী," "সোনা বাড়ী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা একটা সমস্যা। হয়ত কোন রাজা বা রাণী নিদিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দেবতার কাছে মানত করিয়া থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্থানে "জিয়ল পুকুর" নামধেয় কতকগুলি দীঘি আছে প্রবাদ, এক সময়ে উহার জলস্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবন পাইত, এরূপ বহু দীঘি তান্ত্রিক কার্য্যানুষ্ঠানযুক্ত ছিল। মাধবপুরের বিস্তৃত বিবরণ আমি ঢাকা জরীপ কার্য্যালয়ের ভেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

ব্রে সি ক্রেফ সাহেব লিখিয়াছেন, যে স্থান খুঁড়িলে বহুমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যাইবে, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উহা স্পর্শ করেন না। এই স্থান হইতে তিনি কতকগুলি ব্রাহ্ম তাম্রশাসন উৎকীর্ণ তাম্রফলক আবিষ্কার করিয়াছেন। ২৪ পরগণায় প্রাপ্ত দেউল গ্রাম খুদাইলে রাজা জয়ন্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল (১২২৯ খৃ.)। যশোরে মহম্মদপুরে রাজা সীতারামের অধিকারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক স্থানেই দুর্গ ছিল এই দুর্গগুলিকে কোট বাড়ী বলা হইত, দিনাজপুরে নিহাটগড়। বিরাট রাজার বসতি প্রবাদ), চাঁদেবার দুর্গ বাঘগড়ে বাণ রাজার দুর্গ, বর্দ্ধমানে রায়গড়ের অর্দ্ধেক চুকলিয়া পল্লীতে রাজা ধনে তমের দুর্গ, বাকুড়ায় নূতন গ্রামে (ধানা ভাঙ্গা করার গড়, কৃষ্ণ গড়, অসুর গড়, শ্যামসুন্দর গড় প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মেদিনীপুরে মানাগড়ের দুর্গ (লাউসেন নির্ম্মিত, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী), ২৪ পরগণার কাঁড়গাছির দুর্গ (আয়তনে চার মাইল, চতুর্দ্দিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় জরিপা সিরাজ সিদ্দিকের গড় (১৪৮৫ খৃ. অব্দে ইশা খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত), হুগলী জেলায় ভান্ডাড়ার গড়, মিদনাপুরে সাতপাড়া গড় ও ঘোলঘোলা গড়,—এই সকল প্রাচীন দুর্গের

অন্ত নাই। মন্দিরের প্রস্তাপাদিকা বহু ছলে অশ্লীল কার্য্যে পরিপূর্ণ। মন্দিরগুলির চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর পাড়ার ন্যায় ৫০৩ বৎসর পূর্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রাচীন দেবমন্দির রাজপ্রাসাদ, সেতু, বিজয়স্তম্ভ যে কয় ছলে তাহার গণনা কে করিবে? টাকাতে গ্রামেই, তদ্ব্যতীত সাতার সাতেরা প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বিক্রমপুর সুবর্ণগ্রাম ও সোণার গাঁ প্রভৃতি স্থানে বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। সাতারে হরিশ্চন্দ্র রাজার বাটী। রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর উত্তরপারে ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সুবর্ণগ্রাম এক সময়ে বঙ্গের মধ্যে একটী বড় নগর ছিল। ঈশানদেব নামে পরিচিত। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী প্রভৃতি সুপ্রাচীন স্থান হইতে অনেক প্রাচীন 'ধাতুময় দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বজ্রযোগিনী গ্রামের নাম বদর যোগিনী। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মহাকালিকা ও কালভৈরব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিরাজমান। ফরিদপুরে নগিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী মধুমতীর মন্দির হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ১০০১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত, তদানীন্তন ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। বিক্রমপুর কাঙ্গলবাড়ের কাছে মন্দির গত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। এখন কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষ। ঐ জেলার ভাগলপুর, বাঘর, সিমাইলপুর, পঞ্চসার প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তদ্ব্যতীত ভোলেশ্বর নামে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উহা ২১ ফুট উচ্চ প্রস্তরময়, ভোলেশ্বর নামক কোন রাজা কর্ত্তৃক এই শিব স্থাপিত। বাকুড়ার ছাতনাগড় গ্রামে বর্ত্তমান রাজার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মাকড়ীশ্বর মহাদেবের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট বহু গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা সংগৃহীত আছে। বর্ত্তমান, বাঁকুড়া জেলার ২৪-পরগণা প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সংখ্যা নাই। কিন্তু আমার স্থানাভাব। কালীঘাট মন্দির, কাশিপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির ৩৪ শত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কীর্ত্তি সমস্ত বঙ্গদেশ ময় ছড়াইয়া আছে। তাঁহারা মন্দির ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু মসজিদ গড়িয়াছেন, যথা—হিজলীর ছাতর খাঁর মসজিদ, প্রাচীন হিন্দু-মন্দির ভাঙ্গিয়া অনুমান ১৩০০ খৃঃ অব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক মসজিদের আস্তর খুঁড়িলেই হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিসম্বলিত প্রস্তর দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন এই কীর্ত্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ বিশেষ গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মহাস্থানের বিরাট ধ্বংসস্তূপগুলির মধ্যে দাঁড়াইলে বাঙ্গালাদেশকে মহাশ্মশানভূমি বলিয়াই মনে হয়। কেন এক ঐতিহাসিককে মহাদেবের মতই এই মহাশ্মশানের ছাইভস্ম লইয়া তত্ত্বোত্তম সাধনা করিতে হইবে।

ভূমিকার পরিশিষ্ট

আমরা ২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজ-বংশের আদিপুরুষ ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছি, এই নাম সাভারের কোন মঠের শিলা-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে।

বল্লাল-চরিতে "রাজবল্লভ" বলিয়া যে ভীম সেনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও সম্ভবতঃ এই ভীম সেনকেই নির্দেশ করিতেছে। বল্লাল এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং বল্লাল চরিতোক্ত বল্লাল সেনের প্রিয় ভীম সেন শিলা-লিপির ভীম সেন হওয়ার বিপক্ষে কাল হিসাবে কোনও গুরুতর প্রমাণ বা যুক্তি নাই। "বল্লাল-চরিতে" দৃষ্ট হয় পিতৃ-পিতৃব্য বঙ্গের তত্ত্বাবধানের ভার যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন ও এই ভীম সেনের উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ভীম সেনকে রাজা বল্লালের একান্ত অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই, (৪৮৬ পৃঃ) বৈদ্য কুলজী-কার অযসেন বিশ্বাস বল্লাল-প্রপৌত্র ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছেন, (২৮১ পৃঃ) তাঁহার মতে 'নৃপেন্দ্র' ভীম সেন বিশ্বরূপ সেনের পুত্র এবং পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গভাগে রাজত্ব করেন। জয়-সেন বিশ্বাস ভীম সেনের পুত্র কার্ত্তিক সেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন (২৭৭-৭৮ পৃঃ)।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রাজাবলী নামক একখানি ইতিহাস প্রকাশিত করেন, এই বহিখানির অল্পসময়ের মধ্যে বহু সংস্করণ হইয়াছিল। ইহাতে সেন-বংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপ —১। বল্লাল সেন, ২। লক্ষ্মণ সেন, ৩। মাধব সেন, ৪। পুরু সেন ৫ ভীম সেন, ৬। কার্ত্তিক সেন, ৭। হরি সেন ৮ পদ্মস্ব সেন, ৯। নারায়ণ সেন, ১০। লক্ষ্মণ সেন, ১১। দামোদর সেন। নানা কারণে এই বংশাবলী সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না, সম্ভবতঃ হরি সেন নামটি বাদ পড়িবে।

সাভারের শিলালিপি ছাড়া অন্য কোন প্রস্তর-লিপি বা তাম্র-শাসনে ভীম সেনের নাম পাওয়া যায় নাই। কুলজী গ্রন্থের প্রমাণও অনেক সময় সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে,—তাহাতে নাম বাদ পড়া কিংবা উলট পালট হওয়া সচরাচর দৃষ্ট হয়।

কিন্তু তথাপি যখন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত নানারূপ প্রমাণে একটি বিষয় সম্বন্ধে ঐক্য দৃষ্ট হয়, তখন তাহা উপেক্ষিত হইবার কারণ নাই। এই সকল প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় যে বল্লালের অব্যবহিতপরবর্ত্তী কালে ভীম সেন রাজা এইদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি বল্লালেরই বংশধর।

বল্লাল সেন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারীদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু তখনও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল সাভারের শিলা-লিপিতে দৃষ্ট হয়, ভীম সেনের পুত্র ধীমন্ত সেন বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতারা (সম্ভবতঃ কার্ত্তিক সেন ও অপরাপর ভ্রাতারা) তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন (২৭৭ পৃঃ)।

বল্লাল-চরিত, সাভারের শিলালিপি, অযসেন বিশ্বাসের কুলজী এবং রাজাবলী—এই পৃথক্ পৃথক্ চারিটি স্থানের উল্লিখিত ভীম সেন এক সময়ের এবং বল্লালের বংশধর।

আমাদের সুচিন্তিত ধারণা এই যে ইহারা অভিন্ন এবং এই রাজা ও তাঁহার বংশধরেরা পরবর্ত্তী কালে কিছু কালের জন্য সেন রাজ-প্রাসাদের শেষ প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া ছিলেন

১১৩৬ পৃষ্ঠায় দমদমপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামকে পুঁটিয়ার রাজ কর্ম্মচারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি নাটোরের রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন।

ভূমিকার ৩/০ পৃষ্ঠায় স্কীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার নিকট হইতে আমি আমার শিলালেখের কতক কতক উপকরণ পাইয়াছি, তাঁহার নাম প্রসন্নচন্দ্র কাব্যতীর্থ, নামটি ভুলিয়া যাওয়াতে যথা স্থানে তাহা উল্লেখ করিতে পারি নাই।

এরূপ বৃহৎ পুস্তকে নানারূপ ত্রুটি ও ভুল থাকা বিচিত্র নহে, বিশেষ আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত, ইতিহাস রচনায় ইহাই আমার হাতে-খড়ি। সজ্জন ব্যক্তিদের সহানুভূতিই আমার পুরস্কার। এই পুস্তক দ্বারা আমার অর্থাগমের কোন সম্ভাবনা নাই, অথচ ইহার জন্য শুধু প্রাণান্ত পরিশ্রম নহে, আমাকে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, ছবি সংগ্রহ ও ব্লক করার ব্যয় বাবদ আমি ত্রিপুরেশ্বরের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা ছাড়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও বিদ্বৎ-সমাজে বরেণ্য ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা মহাশয় আমাকে আর্থিক আনুকূল্য করিয়াছেন। আমার সুহৃদ্বর দমদমপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া ব্লকের দরুন ঋণভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘু করিয়া দিয়াছেন।

আমি একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার প্রতিভাশালী পরিবারবর্গ আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ ও উৎসাহ-দ্বারা এই দুরূহ কার্য্যক্ষেত্রের পথ দীর্ঘকাল সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধনীয়। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, মহাশয় এই বহির শেষাংশ-প্রকাশে প্রেসের কাজ শীঘ্র সমাধা করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা লিখিয়া উপসংহার করিতেছি।

নানারূপ বিঘ্ন ও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হওয়াতে কোন কোন স্থলে ছবিগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত হয় নাই। অনেক স্থলেই ছবির নীচে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা ছবির বৃত্তান্ত পুস্তকের কোন্ পৃষ্ঠায় আছে তাহা বলা পড়িবে। সেখানে তাহাও স্পষ্টরূপে সূচিত হয় নাই, সেখানে পাঠক ছবির সূচীপত্র দেখিবেন—তদ্দ্বারা ছবির বৃত্তান্ত কোন্ স্থানে তাহা নির্ণীত হইবে। ৬১১ পৃষ্ঠার ১৮ ছত্রে ১২২৮ স্থলে ১৪২৮ এবং ৬৪৯ পৃষ্ঠার ৮ ও ১০ ছত্রে ১৩০৮ ও ১৩১০ স্থলে ১২০৮ ও ১২১০ হইবে

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শব্দ-সূচী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ২৪২, ৩৬৯, ১১৫৮

অক্ষোভ্য ৮

অগ্নিকুণ্ড ১৮৩

অগ্নিপুরাণ ৯১

অগ্নিহোত্র ৯৮৩

অচ্যুত ১০৯১

অজগবিত ৯১৯

অজা ৫, ৬, ২১, ৫৩, ৭৬, ৩১, ৬৪, ২৬১, ৯৮৫

অজয় ৬৭১, ৯৮৪

অজ্ঞাত ৪১২

অজ্ঞাতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ৩৮, ১১৩, ১১৮, ১০৮৪

অজ্ঞ ৫০৯

অঞ্জনা ১১ ২২১, ২৪৩-২৪৭, ৩০২, ৩৪০ ৫১৩ ৫১৭ ৫৩৩ ৬৩৫, ৫১৯, ৫১৪ ৮৮৯ ৯০৮, ১০৪২

অঞ্জলি ৮৮৪ ৯০৪

অঞ্জনাচেতুর ২৫৯, ৯৭০ ১১০১

অঞ্জাতশত্রু (অজাতশত্রু) ১০৪, ১১৭ ১২৯, ১৪৩ ১৯৮

অঞ্জিত ভাষ্যরত্ন ৬৯৮

অঞ্জিতযান ৯৮৫

অঞ্জন ৯০

অঞ্জনা ১১৩

অণিমা ৪৮০, ৪৮৬

অতীশ ৩১৫, ৩১৯, ৩১৩, ৩১৫

অতুলকৃষ্ণ ঘোষাল ১১৩১

অত্রি ১৩৮

অত্রিসংহিতা ১৪১

অথর্ব ২১৪, ২৭৫, ২৮৩, ২৮৬, ৪৪৯, ৫৪০, ৯৪৩

অদৈত ২০, ৫২, ৪৯৭, ৬৮১, ৬৯৯, ৭১০, ৭১১, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৭, ৭৫৫, ১০৮১, ১০৮৭

অদ্বৈতপ্রকাশ ৩১৪, ৭৪১, ৭৪৩

অদ্ভুত-সাগর ৪৮০

অনঙ্গপাল ৫২৪ ৫২৫

অনঙ্গবিজয় ১১০৪

অনন্তকন্দলীপ্রণেতা ১ ১২

অনন্তদাস ৫১১

অনন্তপুরী ১১১

অনন্তপুর ১১৮

অনন্তবর্মা ৪১ ৪ ৭ ৫ ১১ ১ ১১১৭

অনন্তহট্ট ৫ ২

অনন্তবাণীকর ১০৪১ ১০৪২

অনন্তবাণীকোষগ্রন্থ ১০১৩

অনন্তবাহ ৮৪১

অনন্তবাহ ৯৮১

অনন্তবীর্য ৪৩১

অনিরুদ্ধ ৯৮ ৭৩ ১১৩ ১১৫৮ ১১৫২

অনিরুদ্ধ ভট্ট ৪৮১

অনুপম ৭১৩

অনুবিজ্ঞপ্তি ৯১

অনুরা ৭৩, ৭৩

অনুরুদ্ধ ৪৩৩

অনুশাসন ৪১ ৪৮ ৪১ ২৫৫, ৪৩৭ ৯৮৮ ১০১৪, ১০৪৩, ১০৪৪ ১০৪৫

অন্ধকুপ-হত্যা ৭৩৫

অন্ধ্রভৃত্য ১০৪২

অন্ধ্রাবতু (অন্ধ্রাবতু) ৪৪৭ ৭১৫ ৭৭৮, ৭৮১, ৭৯৮, ৮৪৯, ১০১৫

অন্ধ্রবংশ ১১৮ ১১১ ১০৫, ২৬১ ২৯৯

অন্ধ্রবাহ্মণ ৯১১ ৯১৪ ১০৮৩

অন্নদাচরণ ৪৮৩

অপারমন্দার ৫৭, ৬০১, ১১০১
অমরকাব্য ৫২১, ৫৭৮
অমরমণি ৩০৬
অমরেন্দ্রনাথ ১১৩৭
অমলোদ্ভিদ ৩২১
অমলোদ্ভিদোদ্যান ২৫১ ৩২৪
অমিক্ষা ১০০
অমৃত ১৫৭
অমৃতি ৯১
অমৃত রস ১৪৯
অমৃতলাল বসু ১১৭৮, ১১৭৯
অমৃতা দেবী ৪৪৯
অমৃতাপুরী ৬০১
অমৃতিয়া ১ ৩৭ ১০৩ ৫১ ১ ৩৮
অমৃতমুকুর ১০৫৩
অমৃতবাজার ১০ ১০০ ৭৮১, ৭৯৮, ৯৭৩, ১০৪৩, ১০৫৩ ১০৫৪ ১০৮৩, ১০৪৪ ১০৪৫ ১০৪৩, ১১২১, ১১২২
অমৃতবাজারপত্রিকা ১০১৩, ১ ২১
অমৃতবাজারী ৮০৬ ৪৪১ ৫১৯ ৫৫৭ ৫৭০ ১ ৮
অমৃতী ৫
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৭০
অমৃতরত্নাবলী ৭৮২
অমৃতরসাবলী ৭৮২
অমৃতানন্দ অধিকারী ২৮০ ২৮৩
অমোঘবর্ষ ২৫৭
অম্বষ্ঠ ব্রত ৪৯, ১২৫ ১৯৭
অম্বিকা ১০৪৩
অম্বিকাচরণ চৌধুরী ২৮২
অম্বুরাশি ১১০১
অযোধ্যা ৩১ ৪৪, ৭৮৭
অযোধ্যাপ্রসাদ ৮৭
অরবিন্দীয় ১১৩২
অরন্ধতী ৪২৭, ৯১০
অরণ্যদেব ১০৭৮
অর্জুন ২৮, ৩১, ৪০ ৪২, ২৪ ১৪৮, ১৪৯, ৭২৫ ১১২৭
অর্জুননারায়ণ ১০৪৩
অর্ণ ১২১
অর্জুনেশ্বর ৫৮২
অর্জুনেশ্বরী ৫৭৭ ৯৫১
অর্ঘ্য ১০
অর্ঘ্যদিক ২২৩
অর্দ্ধনারীশ্বর ১৭১ ১৯১ ১৯৮
অর্ধেক ৫ ৮ ১৫ ১৯, ২৭, ২৮, ৪৩, ৪১, ৭৩, ৭৫, ৮৭, ৮৯, ১৪১, ১৫৩-১৭৩, ২০৫ ২৩১, ৪১১, ৮১২, ১০২৪, ১১০৭, ১১০১, ১১০২, ১১০৫, ১১০৮
অর্ধোক্রুত ৫০২
অর্ধোপপত্তি ১১১
অর্বাচীন ৫ ১৯ ১৪ ১৯, ২৭, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ১৪১, ১৫৩-১৭৩, ২০৫ ২৩১, ৪১১, ৮১২, ১০২৪, ১১০৭, ১১০১, ১১০২, ১১০৫, ১১০৮
অর্বুদ ৫০
অর্ব্বুদ ৫০
অর্ব্বুদ ৫০
অর্ব

৮২৫, ৮২৩, ৮২৯, ৮৮৭, ৮৮৮, ৯৪৫, ১০৩১, ১০৭১, ১০৭৫, ১০৯৯, ১১২৫
আপগুরু ৬০৮
আপস্তম্বধর্মসূত্র ৭২৭, ৮৪৮
আপ্তমীমাংসা ৬৮৩, ৭৩৭
আপ্তমীমাংসা টীকা ১০৫৮
আপ্তমীমাংসাভাষ্য ৭৮২
আপ্তমীমাংসালঙ্কৃতি ৩৩৫
আপ্তরামায়ণ ৯০২
আপ্তশতক ৯৪২
আপ্তসংহিতা ৮৪২
আপ্তস্তোত্র নারায়ণ ১০৩২
আফজলখাঁ ৯৪১
আবুল ১৪১, ১৮৯, ১৯৩, ৮১০, ৮১৯, ৮২৩, ৮৩৫, ৮৪১
আবেরী ১০১৬
আবেরী মঠ ১০১৩
আবেরী মঠাধীশ ১০১৩
আবেরী মঠাধীশ ১০১৩
আবেরী মঠাধীশ

আবজ্যা, আসল নকড় ৯০৩
„ কন্যা বাস ফেলা ৯০৩
„ আসমসার ৯০১
„ পীঠাকড়িয় ৯০১
„ জমাবন্দির ৯০১
„ ডেভিসের ৯০১
আরব ৫১৯, ৮৩৬, ৯০৬, ১০০২
আরবী ৯১০, ১৮৭, ১০৪০, ১০৫২
আরাকান ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ৫২৩, ৭৯২, ৭৯৭, ১০০০, ১০২৭ ১০৩৪ ১০৩৫, ১০৩৯
আরাকানরাজ ৮১৬, ৮১৪, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৪, ৮৩৬, ৮৩৭
আরাকীব (আরকীব) ১৩৩, ৫৩৮, ৮০২, ৮৩৮, ৮৫৯, ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২, ৮৬৯, ৮৬৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১, ৮৮৩ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৯২, ৯৪৪, ৯৫৩, ৯৬৭, ১০১১ ১০৯১ ১০৯৭, ১০৯৯, ১১১৫
আরাম ৮০০
আরব ৮৭
আর্য ও অনার্য সংস্কৃতি ১১৯-১২৫
আলমগীরনামা ৫৯৭, ৫৯৯
আলাওয়াল ৯, ১
আলাওয়ী ১, ৩, ৫১, ৬০, ৪৩, ৫৫, ৮৭, ৯২, ৫১৩, ৫৫৫, ৭৭৯, ৭৪৪, ৭৫৫, ৯৫১, ১০৭৭
আলীনগর খাঁ ৬১৫
আলীবর্দী (মির্জা) ৮৩৭
আলমগীর সানি ৮১৯
আলমগীরনামা ১০৫৩
আলম খাঁ ১০৪৩
আলমচাঁদ ৮৫৩
আলমচাঁদ প্রাণরাজ ৯৫৩
আলবেরুনী ৭১১
আলাউদ্দিন ৩১৭, ৩১৩, ৩১৯ ৩৬৭, ৭৯৩, ১০৮৮
আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ ৮২৭
আলাপিনী ৩৮৩, ৯৬৭
আলাবাজ ৯৩৯
আলিপুর ১১২৯
আলিবর্দিন খিলজি ৬১২, ৯৪১
আলিমেদ ৯১৫
আলিবর্দি খাঁ ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৩ ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬৪, ৮৬৯, ৮৭৩, ৮৭৫, ৮৭৭, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ১০০২, ১০০৯, ১০৪২
আলিমুল্লা (মোল্লা) ১১০৬
আলেকজান্ডার ১০৯, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ৫২৪,৮২৯
আলেকজান্ডার III ১২৪
আল্লাবক্সুল ৬৫৩
আশরাই ৬০৮
আশরেফ ৬৫১
আশরেফ চৌধুরী ১৩
আসমানতারা ৬২৫, ৬১২
আসমান খাঁ ৬৫৯
আসাম ১৮, ২১, ৫৯২ ৮০৯, ৮২৯, ৮৫১ ৮৫১ ৯৩২, ৯৩৩, ১০১৫, ১০৫৫ ১০৫৮ ১০৫৮ ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৪ ১০৬৫, ১০৬৮ ১০৭৯ ১০৮৩, ১০৮৮ ১০৮৯ ১০৯৫ ১০৯৮ ১০৯৮ ১০৯৯ ১১০৫ ১১০৮
আসামী ভাষা ১৮, ১৯, ১০৫৩
আসমানী হাতের লেখা ১০৬৭
আহমদ ৭০
আহমদ শাহ ৬৫৯
আহমদ সাহ ৬২৭
আহিরিণী ৯১৩

ই

ইউনিটারিয়ান সমিতি ১৪১
ইউরোপ ১৫০, ১৬৫, ১৯৪
ইউলিসিস্ ১৬২
ইউসফ সাহ ৬২৯
ইউসুফ খাঁ ১১৯০, ১১৯১
ইংরাজ ৮১২, ৮৩৬, ৮৬৭, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭২, ৮৭২ ৮৭৪, ৮৭৭, ৮৭৮
ইংরেজী ১৫৩
ইংরেজী বাঙ্গালাপাঠ ১৫৩
ইংলণ্ড ১৬৮, ১৭০, ১৫০
ইন্দ্রজিৎ ১৯১, ২০৯
ইন্দ্রজিতের উক্তি ৬১৬
ইন্দ্রজিতের উক্তি পাঞ্জিপাঠ ৬৫০

ইচিং ১১০২
ইডাই দোষ ২৫৯, ৯৭০ ১১০১
ইন্দু চৌধুরী ১১২০
ইন্দি খী ১০৮৩
ইন্ডিপেন্ট ২৩০, ৯৩৪, ৯৪০
ইন্ডেকিস ৯৩৩
ইন্টা ১০৮১ ১০৯১ ১০৯২
ইন্টালী ২২৮ ৯৩১
ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী ১২০
ইন্ডিয়ান ৯৪৩
ইন্দিরা ২৪১, ৭৭২, ৩০২
ইন্দিলুন্দিয়া ৯৩১
ইন্দ্রিস খী ৩৪৪, ৯২৫
ইমামবেদ খী ৭৯৪
ইমাম ১১১৩
ইমিরা বাই ৭৩১
ইন্দুভূষণ সেন ৯৪৮
ইন্দুমতী ২২৭, ১০৩১
ইন্দ্র ১০ ২৯, ৯৮, ১৮১, ৯০২
ইন্দ্রপত ২৮৮
ইন্দ্রধনু ৪৮২
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১১২০
ইন্দ্রপাল ১০৪১, ১০৪৫
ইন্দ্রপুকরিণী ১১৩৮
ইন্দ্রপ্রস্থ ৩২, ৩৯ ৪১, ১০৬ ২১৮ ২৪০ ৯৫২ ৭৮৯, ৭৮৭
ইন্দ্রবরম ১০৪০
ইন্দ্রভূতি ৩৪৪
ইন্দ্রমাণিক্য ১০১১ ১০৩০, ১০৩৮ ১০৫৯, ১০৯৫
ইন্দ্রমেন ২৫
ইন্দ্রাদেবীর রামমন্ত্র ১১০৭
ইন্দ্রবতাড়ু ৯২৫
ইন্দ্রাজন খী ১০৭৪
ইব্রাহিম খী ৮১৮, ৮৩৭
ইব্রাহিম খী কতেজঙ্গ ৯২৭ ৮৩৮
ইব্রাহিম খাঁ ৬১৯, ৬২৯, ৬২৮, ৬৩৩
ইরেডিন ১৩৩
ইরাক ৯২৭
ইরাণ ৭১২, ৭১৯, ৭৩৮
ইরাবতী খী ৬৫৫
ইরিবেড় ১২২, ১৬৪
ইরিয়ান খারে ৬১৮
ইরোয়া ৬০৫, ৬৪০, ৯১৯
ইর্শা খী ১৩, ১৪, ১৫, ২১৮, ৩৮৫ ৪৪৪ ৭৮৯, ৭৮৭, ৭৮৮ ৭৯৯ ৭৯৯, ৭৯৯, ৮০০, ৮০৫, ৮০৫, ৮০৭, ৮০১, ৯২৪, ৯৭৯, ৯০৩, ১০০৪, ১০৪৩, ১০৪৩, ১০৪৪, ১১০৯, ১১৩৮
ইশা ইসলাম খোন্দকারী ৮১৯, ৮৪০, ১০৭৬, ১১১৭
ইষ্টদিন ২৪৯, ২৫০
ইসকা ২৪৭
ইসবার্ড ২৪৫
ইসলাম খী ৭৮৫ ৭৯৯ ৮০০, ৮০৬, ৮১৪, ৮১৫, ৮২০, ৮২৯
ইসলাম ধর্ম ৭৮৭
ইসিস ২৩১
ইস্পাহান ৯৩৭
ইস্পিকার ১০৩৬

ঈ

ঈশান কোণ ১০৭৯ ১০৮৫, ১০৮৯, ১০৯৪
ঈশান নাগর ৬২৫, ৭৪১ ৭৪৮ ৯২৬
ঈশান বর্মা ২১৮
ঈশান মাণিক্য ৭৫৬
ঈশ্বরগুপ্ত ১০০৭
ঈশ্বর ঘোষ ৫৫৬
ঈশ্বরচন্দ্র রায় ১১৩৩
ঈশ্বরপুরী ৭০২, ৭০৩, ৭০৫

উ

উইলসন ২৮, ৯৮৮, ১০৯, ৯২৬,১১০১
উইলিয়াম জোন্স ৬০৩
উইলিয়ামস ৯২৩
উগ্রা ৮
উজ্জয়ন ২৩৭
উজবেগী ৯০৫
উড়িষ্যা ১০৪৩

উজির খাঁ ৮১২
উজিরপুর ১১২২
উজির সিংহ সরবনারায়ণ ১১২১
উজ্জয়ি ৭৯
উজ্জয়িনী ২৭৮, ২৫৩, ৫১৫
উজ্জ্বলচন্দ্রিকা ৭৭৩, ৭৮৩
উজ্জ্বল নীলমণি ৭৪২, ৭৫২, ৯৮১
উড়িয়া ৯৫১, ৯৬২
উড়িয়া সাহিত্য ১৭
উড়িষ্যা ১৪, ১৭, ১৮, ২১, ৩১, ৫৭ ৪৭৭ ৭০৮ ৭১৪
৭২৬, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৪০ ৭৪৫ ৭৫১ ৭৮৪ ৮ ৫ ৮৫১
৮৩৮, ৮৪০ ৮৪১, ৮৫৫ ৮৫৯ ৮৬৭ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯৭,
৯১৯, ১০৩৪ ১০৩১ ১০৮৯ ১১ ১ ৫২ ১১১৪
১১৫৬
উৎকল ১৪, ২১, ২৩৭, ১০৮১
উৎকল-খণ্ড ১০২৯, ১০৪৪
উৎকল-ভাষা ১৮
উৎসর্গ ৫ ১
উৎসব ১০৪১
উৎসবলতা ১২৪
উৎসর্গ ৩৫১
উদয় নারায়ণ ১ ২১, ৮৪৮
উদয়পুর ৮৩৪ ১ ৪, ১১৩৩
উদয়াদিত্য ৩ ১০১৯ ১০৩২ ১০৪৪ ১০৪৭ ১ ১৭,
১১২ ১১৭৪
উদয়াস্তিক-খণ্ড ১১ ৮
উদয়ন ২৮৫
উদয়শঙ্কর ১ ১৭
উদয়াদিত্য ৭৮৭, ৭৯১
উদয়াস্তিক ১০৩
উদীচ্য ৭১
উদ্ধবপুর ৫৫৭
উদ্যালক ৭৭২
উদ্যোৎকর ন্যায়বার্তিক ৩৫৩
উদ্ভরণ দত্ত ৭৬২
উদ্ভিদ বিদ্যা ১৫৩
উদ্ভিদ্যবীথিকা ৮১৫
উনুর ৬৮
উপকণ্ঠ ১৮, ১৫৭
উপনিষদ ৭০ ৮২
উপনিষদ ৭৭৮ ৮১৫
উপনিবেশ ৪
উপপুত্র ২৩৮
উপাধি ১ ৩
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১ ৩৯
উপেন্দ্র নারায়ণ ১ ৭৫
উমাপতি ২১৬ ৪৮২,৪৯৩
উমেশ ঘটকরাজ ৫১৬
উয়ার্ড ১ ৩ ৪৫১
উরঙ্গাবাদ ৭৯
উরগ (ফণিপুর) ১৩৪
উর্দ্দি ১ ৪৫
উল ওয়ার ৮৫১
উলা ১ ২
উলুবেড়িয়া ৮৩৭
উষ্ণি ১ ৩

ঊ

ঊনকোটিতীর্থ ১০৩৮, ১০৮৫, ১০৮৩
ঊনাকোটিশ্বর শিব ১ ৩৮
ঊর্ণনাভী ৭৭১
ঊষা ৩৮, ৪৮, ১১৫১
ঊষাকুটী ২৫১

ঋ

ঋক্ষমালী ২৩৮
ঋগ্বেদ ১, ৭, ২৫৩, ২৩৩ ৪৪১, ৪৫১
ঋতুসংহার ২৬১
ঋষভদত্ত ১১০
ঋষভদেব ৩৭
ঋষি ১, ২৫১
ঋষিসত্তম ১৪

এ

এইটন ১১৫৮
একমাটা ৮

এফটাক্কিয়া ৬২৩, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪৪ ৮০২, ৮৮১ ৯০১
একডালা দুর্গ ৬০৫
একবটম ১৭৬
একাত্তিয়াহী ৩২১, ৩২৮ ৭৭২
একুশরত্ন ২৪৬
এছাক আলি খাঁ (নবাব) ১০০২
এণারসিন্দুর ৭৪৫
এণ্ডারসন ২২৮
এরেশের প্রবৃত্তি ৯০৪
এরেলবাস ৩৪০
এলগাকার পার্টি ১৩১
এলাহাবাদ ১০১৩
এলাহিবর্ষী ৮০৯
এসিয়া ১১, ৮৩, ৪১, ১০১৪
এশিয়াটিক সোসাইটি ৩৩৩, ৯৯৮
এসিরিয়েটেল ১১৬
এসেন্সিয়ল ৯৩৩
এসেন্সিওকাস ২০৩
এসেটিলোসাস ১৩০, ১৩৩
এসেরেরেল ১১১২
এসেরাকোসিয়া ১৪৩
এসিরিয়ম ১৪৫
এসোল ৪০১

ঐ

ঐরাবেল ৪
ঐরাবত ১৯৬

ও

ওকা রেশম ৯৪৪
ওটেম ৪০১, ২৬৮
ওডুবেশ ৪৯৪
ওথেলো ৪১
ওলন্দপুর ৮, ১১, ১৬, ১৯, ২৯৪, ২১৯, ৪০০, ৭০৬, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৪, ৪৫৩
ওমর খাঁ ৮০৩, ৮০৬, ৮৪৬
ওয়াইজ ৬৪৭, ৭৯৭
ওয়াটসন ৯৩৫, ৯৪৭

ঔ

ঔষধালয় ৭১
ঔপনিবেশিক আমি মির্জা খাঁ ১১৩৩
ঔরংজীব ৬০ ১৭৯
ঔষেধার ১৫৮
ঔষধালয়ি (ডাং) ৩৪৩, ৯৮৩, ১০৪

ক

কংস ২৬, ৪১, ৭১৬
কংসে মাঁরাজ ১১৩৭
কংসোই ৩৩১
কংকড়া ১১১৪
কংসুর মারাজ ১০৩, ১০৮, ১১৩
কংকরাই ২০৫, ২৫১
কংসরাজার ৮১২
কড ১৩২, ১৪৩, ৪০৪, ৯৭৮
কড়ন ২৯৯
কড়ঘরীদি ১১২৩, ১১৫৭, ১১৫৯
কড়ী ৮৮
কড়ুবাদি ১০৯৫
কড়ু রায় ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫
কড়ুশক্তি ৩০
কড়ুকল ৬৮২
কড়ক ৯৫৯
কড়া খাঁ ১০২৭, ১০৫৮
কণিষ্ক ১৮৯ ২০৩ ২০৪ ৩৪৭, ১১০৯
কতলু খাঁ ৭৫২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৯, ৭৯১ ৮৭১, ৮৮১
কথাসেত ৩২৮
কথা-আর্ত্তিকা ৩০১, ৪০৮
কথাইস্টীরাজার ৮৩৫
কনাক সূর্যমন্দির ৩৪৯
কানাজ ১২, ৫২, ৪৯২, ৫২৫, ৭০৭, ১০৫৩
কনৌজ ৫৫৯
কনৌজ রাজবংশ ১১২১ ১১২২
কনৌজ রায় ১০৩৪, ১১৫১

কপিল ৯, ২১২, ৩০৮, ১১২৩
কপিলা নদী ১০১৫
কপিলাবস্তু ১৯, ৪২ [illegible] ২৩৯, ৭৩৮
কপিলাশ্রম ৫, ৪৪
কপিলেশ্বর মেলা ৬৪৭
কবর ৯৬৯
কবরেজ (বৈদ্য) ১১৩৩
কবিকঙ্কণ ২৯০, ৩৭৯, ৪৫৩, ৫১৩, ৫২২, ৬২৪, ৮৩৩, ৯৬৩
[illegible] ৯৭৯, ১১০৭
কবিকঙ্কণ চণ্ডী [illegible]
কবিকর্ণপুর [illegible]
কবিকঙ্কণ [illegible]
কবিচন্দ্র [illegible]
কবিরঞ্জন বাঘ ১০৮২
কবিরঞ্জন [illegible]
কবিরাজ [illegible] ৫১৪, ৯৪২
কবিরত্ন ১০৭৪
কবিরাজ মিশ্র ১১৩৩
কবিরাজ শীহি ১১৩৮
কমঠ [illegible]
কমলা [illegible]
কমলাকান্ত ৭৭৫,৭৭৪
কমলা [illegible]
কমলা ৭৭৯
কমলা নদী [illegible]
কমলা কমলার কীর্তি [illegible]
কমলা [illegible]
কমলাবতী [illegible]
কমলাবিলাস ১৭৪
[illegible]
কমলেশ্বর (কর্মেশ্বর) ২, ১, [illegible]
কমলাহাটা [illegible]
কমারহাট ৮৫
কমলাসাগর ১৮৫
কমিকরমনগুড়াম [illegible]
কবিরমন্দ [illegible]
কবিরুহ [illegible]
কবিরাজ [illegible]
কবিরাজ [illegible]
কবিরাজ

কার্ডএল (কার্ডমেল) ৩৪৭, ৯১৮, ১৮৩
কার্ডগাড়ির দুর্গ ১১৩১
কার্ডাড়ি নগর ১১০৩
কার্টাবেলিয়া ১৩৫
কার্পা ৪৩২, ১০৯৫
কার্ষি ৫৯
কাফা ২১২
কাফিলা ১১০৭
কাফিলা চাকলা ১০৭৪
কাবুরী ৩০৮
কাবিড়াকলম ৮৯০, ৮৯১, ৮৯৪
কাম্বাবাদ ৯৪১
কাম্বার ১৯, ১০১৮, ১০১৯, ১০২১, ১০২৫, ১০৪৭, ১০৪৮ ১০৪৯, ১০৭৮-৮০ ১০৯৯
কাম্বাড়ী ১০৪৬ ৫৫৭ ১০৪৯
কারক রেখা ৩০৫ ৪২৪ ৯ ১ ১৯৮ ২১৯
কারী ১০ ৮৯১
কারীদের আচারবিধি ৯৭১
কারীর হাটে ১০৭৪
কারুমন্দার ৭৩৫
কারুশুক্ল ২৪৮
কারুলমালা ১৭৫, ৩৯৩, ৪০৪, ৭৮১, ৯৬৮, ৯৭৩
কারুশিল্পী ৬০২
কারুস্তরম ৭৩৪
কারু ৪৯
কার্তুনী ৯৩৯, ৯৪১
কার্তিকৈয়া ১০২৫
কার্ন সিরোমণি ৩৫০
কার্পাসহরিদ্রু ৯৮৩
কার্পেড়া ৯৭০
কার্ষাপণ ১১৩
কাত্যায়ন ১১৯
কাথিওয়াড় ৬২, ৬৩, ৭১ ১২০, ১৪১, ৯৭৮
কাদম্বরী ২৯৫, ৪০১, ৪৯৫
কানাই মঠ ১১৩১
কানাই মহোৎসব ১১১৩ ১১২৮
কানাড়া ৮৮, ২৮৪ ২৯১
কানিংহাম ৩৩, ৯৮, ১০৫৭
কানুবংশ ১০৯০ ১০৯১
কানুসন্ধ ২৯২ ২৯১
কানুসম্প্রদায় ১০১৪
কানুরায় ১২১
কান্যাকুব্জ ২৫১ ৯৮৮ ৯৮৮
কাঞ্চনজঙ্ঘা ৫১, ২১৩, ২৫৩, ২৬৬, ৪৯১, ৫৯৬
কাঞ্চনপুর ১১৪০
কাঞ্চনমিত্র ১১৪০
কাঞ্চনশিরা ৫৫৮
কাঞ্চন ৮৫২
কাঞ্চন ৫৭৮
কাবেরী ৫৯
কাম্বুজ ১ ৮ ১ ১৫১ ১৫১ ৫৭
কাম্বুজাম্বুজ ১০৫১
কাম্বুজের খাঁ ৬২৬
কাম্বুজ ১
কামদেব বুদ্ধভট্টারী ১০৯
কামরূপ অঞ্চল ১,১৪
কামন্দিকী ১২১
কামরূপ ৩৪ ৯৩ ২১৯ ২২০ ২৯৪ ৩১১ ৪০০ ৭৪১ ১১ ৮৮০ ১ ৫৫ ১ ৪১ ১০৪৪ ১০৮৪ ১১৮৫
কামরূপী ১৫ ১৪ ১০১৯ ১০৪১ ১০৭৯ ১ ৭১
কামরূপ খাঁ ১০৯৩
কামোকাবাক ৬১৭ ৬১৮
কম্বোজরাজ ১ ৯১
কায়স্থ ৯৯৮
কারবেন ১৮৩
কারেন ১ ৫
কার্ডবোর্ডোছন ২১, ৪৯, ১৮৫
কার্ত্তিক ১০, ৪০, ২৭৯
কার্ত্তিকপুর ২,১
কার্ত্তিকায়ন ৪৮০ ৯৮৪
কার্ত্তিকেয় ১০৭১
কার্ত্তেয় ৯১৩
কার্লেস্টার ৯৫০
কার্ত্তাবেল্লা ৭১১ ৭১৭ ৭৯৮, ৮০১
কালকেতু ৭০, ৯৬৫, ৯৮৫

কালকের ৪৪
কালকেতন ২৩
কালকেতু খাসা ৭৯৯
কালাচাঁদ ১৮
কালাচাঁদ রায় ৬৪১
কালাজ্বর ৫৩১
কালাত্রোর ৩৩
কালাদুদি ১১০৩
কালাপাহাড় ১৩৮৮
কালাপাহাড়ি ১১০৩
কালাপাহাড় ৫০৩, ৮৩৫ ৫২৩, ৬৪০ ৯৪১ ৮৯৮ ১০৭১ ১০৮৩
কালাপুকুর ১১৩৯
কালিকট ৮১৩
কালিকট ৪২৫, ৬৩৯
কালিদাস ৪৫ ১১৮, ২৮০, ২৮৮, ৪৭ ২৩৪, ৫৪১ ৫৯৫ ৬৯৭, ৪০১, ৯১০, ১৭১, ১৮০
কালিদাস গজদানী ৭৮১, ৭৮৮, ৮৮১
কালিদাস রস ৪৫, ১৩৫, ১১৫৫ ১১৫৯
কালিদাস রায় ৪৯৩
কালিন্দী ১১১৫
কালিন্দী ১১
কালী ৮, ৩৯৭, ৮০০, ৮৯৩, ৯০৪, ৯৪২
কালীকুমার ৯৫৭
কালীগঙ্গা ৭৯১
কালীঘাট ৪, ১৫, ৪৩, ৮৫, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৪৮, ৮৭৫, ৮৯৩, ৯০৯, ১১২৩, ১১২৪, ১১৪০
কালীচরণ ২৮৯
কালীচরণ ভরদ্বাজ ৭৭৮
কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী ১১১৪
কালীপদ নন্দী ১১৩৫
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১১৩৪
কালীপ্রসন্ন সেন ১০৪০, ১০৫৩
কালীপ্রসন্ন সিংহ ২৩
কালু খাঁ ৮৪৭
কালু গাজি ৯১৮
কালু ডোম ১০২, ৬৪১, ৯১০, ৯৯৪
কালু ভুঞা ১১০৩
কালোহাঁড়ি ২৩৪
কাশিম খাঁ ৮২৭
কাশিম খাঁ-ঘোলাবি ৮৫৭
কাশিপুর ১১২৪, ১১৪৮
কাশিমবাজার ১০৫, ১১০১
কাশী ৫৩, ৪০৮, ৫৪৫, ৭২০, ৭৩৩, ৯৮৩
কাশীনাথ ৯৭১, ৯৭৯, ৯৯৮, ১১০৭
কাশীনাথ ১১৩৩
কাশ্মীর ৫৩, ১৪৭, ২১৪, ২২৫, ২২৬
কাহ্না ১১৫, ১১৬
কাহ্নাচ্ছন্দ ১৮
কিন্নর ১১১৪
কিরাত ৪, ২১, ৩৮, ৪৩, ৯৩, ২৮৩, ৯০৭, ১০১৭, ১০২২, ১০৯৭
কিরাতরূপ ১০২৩
কিরীটেশ্বরী ৮৮৩
কিরণবালী ৬১৭
কিশোরগঞ্জ ৯৮৩, ১০৪৫
কিশোরীবল্লভ ৭৭২
কিষ্কিন্ধ্যা ১১৩
কীচক ৩৮, ১১৪৩
কীর্তন রস ৯৫৪
কীর্তি ২৩৩
কীর্তিচন্দ্র মাহাতো ১০৭৮
কীর্তিচন্দ্র রায়বাহা ৯৫৯
কীর্তিধর ১০৪৩
কীর্তিবর্মা ২৯৫
কুইকিম ৫৫
কুকি ৪, ৫৮, ১০৫৪, ১০৪৩
কুকুরী ৭৩
কুক্ষ ৫৯২
কুক্ষয় ৭৯৪
কুক্ষবাটি ২৬৫
কুঞ্জিকা তন্ত্র ৪৮৮
কুটিয়াড়ী ১১৩৮
কুতুমখী ১০৩৪, ১০৩৬
কুতবউল ৯০২
কুতুবউদ্দিন ৬৫২, ৬১১, ৬১২

কুম্ভের বী ৬১৯
কুনাল ১৭২
কুন্তী ২৫
কুন্দনাচার্য্য ৪৮৪
কুপথ্য ৭৬, ৮১
কুফলতা ৩৬৯
কুবের ৪৮৩
কুবের পঞ্চানন ১০২৪
কুবেরাহার ২৯২
কুমারগুপ্ত ২০৪, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ১১১১
কুমারখণ্ড ৩১৩, ৪৯২, ৫ ৩, ৫০৭
কুমারপাল ২৩, ৮৪
কুমাররাজা ১০১৯
কুমারসম্ভব ২৪২
কুমারিকা ৮৪২
কুমারী নদী ১০৭৩
কুমিল্লা ৭, ৭৫৩, ৮৩৪, ১০৩৭, ১০৪১
কুমীর ১৩১, ৪৪২
কুয় ৫০০
কুরুক্ষেত্র ৮
কুরুকার ৪০৮
কুরু ২৫৩
কুরুক্ষেত্র ১৩ ২৮
কুরুপাণ্ডব ১৩৯১৪০
কুলচন্দ্র ১০৯৭
কুলতুঙ্গ ৫৯
কুলদ ২৫
কুলপী ১১২৯
কুলকর্ণ ৫৫, ৮৩, ৮৮
কুলার্ণবতন্ত্র ৪৮২
কুলীনগ্রাম ১১৫৫, ১১৬১
কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব ৩০৫
কুলুকভট্ট ৩৭১
কুলেশ্বর ১১৩৪
কুলজী ৩০৬
কুহুরগড় ১০৪৪
কুহুমেলে ২২২
কৃত্তিকা ৪৮

কৃত্তিবাস ৩৭৭, ৯৭১
কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র ১১৩৫, ১১৩৯
কৃষ্ণ ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩২ ৪০ ৪১, ৪২, ৭৫, ১৬৬, ১৯৮, ৫০৪, ২১৯, ২৩৫, ২৮৯, ৪০২, ৪২৩, ৭৮১, ৬৮৮, ৭৮৭, ৮২৪ ৯১৪ ৯৭২, ১ ৪
কৃষ্ণকমল গোস্বামী ৭৬৮, ১ ১৯
কৃষ্ণকায় ৩৪৮
কৃষ্ণকান্ত বর্ম্মী ১১৩৫
কৃষ্ণকলী মূর্ত্তি ৬৩৯, ৭৩৩
কৃষ্ণগড় ১১৩৯
কৃষ্ণচিত্তি ৩১৪
কৃষ্ণচন্দ্র ৮৭৪, ১০০৪, ১০৩৩ ১০৩৪, ১০৭৮, ১১০৪, ১১৩৭
কৃষ্ণচৈতন্যচরিত ৮৩১
কৃষ্ণদাস ১১৯, ১৮১, ১০৫ ১০১৪
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৩৫৮, ৩৭৫, ৭১৯, ৭৪১, ৭৪৩, ৭৮৪, ১০১৫
কৃষ্ণ ধারালী ৯৭১, ৯৭৪, ১০০৬
কৃষ্ণনগর ৭১৩, ৮৩৫, ১১৩১, ১১৩৩
কৃষ্ণনাথ ৭১৩, ৮৩৮, ৮৭৫, ৮৭৫
কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী ১১১২
কৃষ্ণবিজয় ১ ৪৩
কৃষ্ণমঙ্গল ৫৭৯
কৃষ্ণমণি খাণ্ডিকা ১ ৩৯, ১০৫ , ১০৪১, ১০৪২
কৃষ্ণমালা ১০৪২
কৃষ্ণরায় ৮৩৮ ৯৪৮, ১১২০
কৃষ্ণলীলা ৪৮২
কৃষ্ণসাগর ৮৪৮
কৃষ্ণা ৯২৮
কৈবর্ত্তি ৪১৩, ৪২৪, ৪৯৯
কেতকাদাস ৭৪৮, ৮৮৩
কেতুগ্রহ ১০৭৮
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০৮, ১৩১
কেদারমিশ্র ২৪৭
কেবার রায় ১৩, ১৪, ৭৮৩, ৭৮৯, ৭৯৩, ৭৯৫, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮১০, ৮৩১, ৮৩৯, ৯০৭
কেনারাম ৭৬৪
কেনারিজ ৯৪৩

কেন্দ্রবিন্দুখি ৭৮১
কেন্দ্রাভিমুখ ৭৮১
কেরল ৭৮২
কেরি ৩৪৭, ৪৪৮, ৯৫১
কেলাকর ৯৩১
কোচবিহারপুর ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬
কেশব ৫০
কেশব আচার্য ১০৫১
কেশব ভারতি ৩১৩, ৪০১
কেশবচন্দ্র ৭০৫
কেশব সেন ১০০৪ ,০০৫ ১০৩৩, ১০৩৩
কেশবপুর ৮০৩
কেশব ভট্ট ৭০১
কেশব ভারতী ১১০ ১১৪ ১৪১
কেশব মিশ্র ১০২৩
কেশব সেন ৮৯০ ৮৯৪ ৮৯৬
কেশরী রাজ ৮৩১
কেশি ৪৩১
কৈবর্তরাজ ১০২৭, ১০৩১, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৭৯
কৈবর্তরাজা ভূর্ণ ৭৯৩
কৈবর্তরাজ সিংহ ৩৩৪, ১০১১, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৭৮,
১০৮৯ ১০৯১ ১১০৫ ১১১৫ ১ ১২
কৈবর্তরাজ্য ১০৩৮,১১৩৩
কোকোরায় ৪৭৯
কোকুলটাস কোভা ৮৭২
কোট ১০৩৯, ১০৭৭
কোচবিহার ৭৮, ৫৮৩, ৭১৫, ৮১৬ ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯,
৮৭৩, ৮৭৬, ৮৭১, ৮৭৯, ১০১৫, ১০৪৫, ১০৪৮, ১০৪৯,
১০৫৫, ১০৫৯, ১০৬২, ১০৬৯-১০৭৪, ১০৭৭, ১০৭৮
,০৮১
কোচবিহারের ইতিহাস ৫৮৪
কোচরা ১০৫৪
কোচিনকোল ১১১৮
কোটিবাড়ী ১১৩৪
কোটিবর্ষ ৪৭, ২৩৩, ১১০১
কোটিশিলাড়া ৮১৭
কোণারকী ২২০
কোনারক ৫১৮
কোল ৯২৯
কোরকাই ৯২৮
কোরান ৭৭৯, ১০৫২
কোরিয়া ৩৩৫, ৯৭৫
কোলঙ্গ ১১০ ১৪৭
কোলাচলগ্রাম ২১৪
কোলে ২৫
কোষা ১২৩
কৌণিন্য ১০৭৯
কৌটিল্য ১৩৮, ১৬৪, ১৬৬, ২৩১, ৩৪০, ১১০৩
কৌণ্ডিন্য ১১৫
কৌণ্ডিন্যী ২১ ৩৩
কৌশিকী ৪৭০ ৫০৪ ৫২১ ৫৩৮
কৌশিকী ১০
কৌশিনী ৭৩১
কৌশিকী ১৩৪, ৫১৭
কৌশিক ৪৪৪
কৌস্তুভ ১১৫
ক্যাপুটি ৫১৫
ক্রমণ্ডলম ৩৫০
ক্রমদীশ্বর ৪৪০
ক্রীট ২১০
ক্রুসের ৩৪০
ক্ষত্রিয় ৮৭০ ৮৭১, ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৮ ৯৪৭ ১১৩৭,
১১৩৮
ক্ষত্রপদত্ত ৩৩১
ক্ষত্রিয় ৪১
ক্ষপণক ৩১৫
ক্ষারস্বামি ১৮৫-১৮৭
ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ১১৩৫
ক্ষেত্রপাল ৯০২
ক্ষেমানন্দ ২১০, ৪৭৪ ৪৭৫
ক্ষেমীশ্বরচন্দ্র রায় ১১৩৩
ক্ষৌম ৮৪৪

খ

খড়্গধর ১১৪৩
খড়্গপুর ১১১৫

খড়দহ ১১১৪
খড়্গবংশ ১৬, ২২১, ৩০১
খড়্গরায় ১০৫১
খড়্গোদ্যম ২২১, ২২২
খড়্গল ১০৫৩
খড়্গলবাসী ১০৬৮
খনা ৯০৪ ৯১০, ৯১৪ ৯১৭ ৯ ৮, ৯২২, ৯৪৭ ৯৫৯ ৯৬৯
খরস্রা ১০৮৭
খর্জুর ৫৩৫
খলাসী ১০৯৯, ১০৯৩, ১০৯৪
খলিফা ৫৯১ ৫৯৫
খালেদি খাঁ ৮০৭
খস্ ৪০
খসরু ৮২২
খসরুই ৮১৩
খাণ্ডিলাল খোঁয়া ১০৮৭
খাণ্ডিমস্তাল ১১২৫ ১১২৮
খাণ্ডিড় ১১২৯
খারজাহাম ৬২৩
খাসাকুল ৯১১
খাসাচিরাজা ১০৪৯
খাসজা ১০৫৮, ১০৫৯
খাসটি ১০৫৮
খাসাজা ১০৫৯
খাসায় (খাড়ী) ১১৩৭
খালিয়পুর ২৫৫
খালিল মাইথ ৫৩৯
খাসা ৯৩১ ৯৫২
খাসিয়া পাহাড় ১০২১ ১০৩০
খিচরাজ ১০২১
খিজির খাঁ ৯৩৮, ৬৩৯
খিজিরপুর ৭০৮
খিড়ুক ১০১৭
খিদিরপুর ১১২৯
খিরেট খাঁ ৮৩৮
খুষ্টী ১০৯, ২৪০
খৃষ্টাব্দ ৮০৯, ৮৯২
খেজুর ১০৫৭
খেড়োবন্ধ ৫৫৮
খুটিমুল্লা ১০৫৭
খুনখার ১০৭৮
খুনজাবের বংশ ১০৫৭
খুল্লনা ৮১২, ৮১৩ ৮৩১ ৮৪৪, ৮৫৬, ১১০৮, ১১১৩ ১১২৮ ১১৩৭
খুল্লনা ৯৩৪ ৯১৮ ৯৭৩
খুল্লিবিলাস ৮৯৩
খুল্লিবিলাসী ৬২৭ ৭১১
খড়্গবংশ ১৯৭, ২৪১ ২৯৭, ৪০১, ৪৭৫ ৪৭৭, ৯৭৮
খড়্গ ৫৯০
খেদ ১ ১১
খেদেস্তাস ৫৬৬ ৫৫৭
খোসারীয়া ৫৯১
খোটিস ৯৫৮
খাজ ৮৯৪
খোসম হুসেন খাঁ ৮৮০
খোসাল ১০৯৭
খোয়াজ কুতবাল ১০৯১ ১০৯১

গ

গঙ্গা ১, ২ ৩ ৪ ৬ ১৫, ১৯ ২৭, ১৭৭, ২৯৪, ৫৬০, ৯৯৯ ১১৯ ১১৮ ৭ ১ ৭৪০, ৯০৭ ৯০৭, ৯৪৮ ১০৮৮
গঙ্গাকুল ১ ৭৮৯ ৭৯,
গঙ্গাকুলী ১০৯
গঙ্গাকাস ৭১৩
গঙ্গাকাস পণ্ডিত ৯৬১
গঙ্গাকাস সেন ৩৭৩, ৩৮১, ৩৮৩
গঙ্গাধর কবিরাজ ১৭৭ ১৯৮ ১৯৯
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৭৯৯, ৭৯৮
গঙ্গাপ্রসাদ ৯২৯
গঙ্গাবংশ ১৮ ৫৭, ৬১
গঙ্গাবাস ...১১
গঙ্গাস্তোত্র ১০২৫
গঙ্গাস্তোত্র ১০৪১
গঙ্গারাম ৮৩৭
গঙ্গারাম মিত্র ৮১২

১১৫৬ নির্দেশিকা

গঙ্গারিডি ১৪৪, ভূমিকা ১৮/০
গঙ্গাসাগর ১০২৭
গঙ্গাসাগর সঙ্গম ১১২৭, ১১২৯
গঙ্গেশ শিরোমণি ৩৫৫, ৩৫৯
গজবল্লভ নারায়ণ ১০৩১
গজপতি ১০৩০
গজপতি নারায়ণ ১০৩১
গজসিংহ নারায়ণ ১০৩৩
গণ্ডারেস ৮২৩, ৮১৪
গড়খাই ১১০৫
গড়মহারি ৬৯১, ৭৩৭, ৪০৯
গড়মান্দারণ ২৩৪
গণদেব ৫২
গণপতি ১১১৯, ১১২১
গণিত ৪৫৩
গণেশনারায়ণ ১১৩৭
গণেশ ১৯, ২৩৪, ২৩৮
গণেশ (রাজা) ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৭, ৮৪২, ৮৩৩, ৮১৯, ১১০৪, ১১৩৬
গণেশ নারায়ণ ৬২৫
গণ্ডক ৩৫
গণ্ডকী ৩৪, ১১৪
গণ্ডকীদেবী ২০৪
গদাধর ৩৪৯, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪
গদাধর হাস ৯১৯
গদাধর গঙ্গোপাধি সিংহ ১০৮০, ১০৮১
গদাধরেশের খঙ্গকার ১০৫০
গন্ধমাদন ৯
গন্ধার ১১০৪
গন্ধর্ব নারায়ণ ১০৩৯
গন্ধর্ব ঐতিহ্য পাল ১১০৩
গন্ধর্ব সেন ৯৪৮
গন্ধচন্দ্র ১০৬৯
গন্ধন খাঁ ১০২৭
গন্ধীর সিংহ ১০৮০, ১০৯৭, ১০৯৮
গয়া ৫২, ১১৬, ৩৮৩, ৭০৩
গয়াপাণি ১০৬৩
গয়ারাম ৮৭

গয়েস উদ্দিন ৬২০, ৬২১, ৬২২
গয়াবেগ্নি ১১৩৮
গরুড়ধ্বজ ১০৩২, ১১০৩, ১১০৭
গরুড়স্তম্ভ ৩১৭
গর্গ ৩১৮
গর্গ ৪০৪
গর্গুর ১২৬
গর্গেক ৯৫৯
গর্গেশ খাঁ ১০৯০
গর্গেশ্বর ৮৩৯
গর্গী ৯১০
গর্গি ১০
গর্গি খাসি ১১৩৩
গাঙ্গুড় জল ৯১৪, ১০৪৫
গাঙ্গুড় ভূমিকা ১৮০
গাঙ্গুড়ী ভূমিকা ১৮/০
গাঙীব ১০৪
গান্ধার ১৮, ২১, ২৯, ২৩৩
গান্ধার রাষ্ট্র ৪০৮
গান্ধী (মহাত্মা) ৫৩, ১৩১, ১৩১
গান্ধারেশ্বরী ৯৩১
গান্ধোয়ান ৩১৮
গান্ধোয়ান ৩১৮
গান্ধর্বসিদ্ধ ১৪১
গিরজী ১২৮
গিরিসৌধিন ৬১২, ৬১৩, ৬১৯, ৬৪০, ৭০১, ৯১৭
গিরিসৌধিন বলভদ্র ১১৩০
গিরিজানাথ রায় ১১৩৯
গিরিবজপুর ৪১, ১৫০
গিরিশচন্দ্র রায় ১১৩৯
গিরিধর ১৪৪
গৌড়পাদাচার্য ২৯৬ ৩১২, ৩২৯, ৩৯১, ৪১৫, ৯৪৮
গৌড়ব্রাহ্মণ ২৮১
গৌড়ীকথা ৩৮৭
গুইবিবাহ ৫৮১
গুজরাট ২, ৬২, ৭০, ৭১, ৮৯, ১৩১, ৯১৮, ৯২৮
গুণিত চট্টোপাধ্যায় ৯৪২
গুণাঢ্য ৭০

গুপ্তবিদ্যু ১৪৭
গুপ্তমতি ৬০১
গুপ্তমালা ১০৪৮
গুপ্তরাজ ৬৭৮
গুপ্তরাজ বাঁ ৬৩৬, ৩৭৭, ১১২৪, ১১৩১
গুপ্তসাধারি ৮১২
গুপ্তাক্ষর ১১২৩, ১১২৭
গুপ্তবন্ধ ৯২৭
গুপ্ত ২০ ২১ ২ ৮ ২৯৯ ৫২১ ২৪১ ২৮৯ ৯৭৪ ১০৭
গুপ্তমুদ্রা ১১২৪, ১১২৮
গুপ্তমুদ্রা ২০
গুপ্তরাজবংশ ১১২৭
গুপ্তসাম্রাজ্য ২ ২৯৯৩
গুমানি ১২৫
গুয়াবেরী ৯২৪
গুরুদাস মিশ্র ৯৪৭
গুরুবার ১৬৮ ১১০
গুরুলক্ষ্য ঘর ৯৪০ ৫২৫ ১১৫
গুরুসিবর ১০৯৭
গুর্খা ৮৫৫
গুর্জর ২৫৭
গুলাবি ১৫
গুহ্য ১৫৯
গুহ্যসমাজতন্ত্র ১০৬
গৃহ দেব ৯৮
গৃহসূত্র ৯০৬
গৌড় সাহেব ২৮৯, ১০৫১ ১০৫৯, ১০৪৯, ১১৫৯, ১ ৬৩
গৌড়িয়ভাষা বাউটিম ৮২৭ ৮২৮
গৌকর্ণ ২৪৫
গৌকর্ণ তীর্থ ৫৫৫
গৌকুল দাস ১০৬৯
গৌকুল দেব ১০৮৫
গৌকুলদেব রাজেবলীদেব ১১১৫
গৌগরা ৬১৭
গৌড় ৮৮
গৌড়াশ্বরী ২
গৌড়ান ১১০৭
গৌরালোকা ৯২৬
গোবর্ধনী পাটী ১১৪৯
গোল ১৬ ১০
গোপগিরি ১১০৭
গোপাল ২৯০, ২৫১, ২৫৩, ২৬৩, ৩০২, ১০৫৫, ১০৫৫
গোপাল উট্টে ১০০৯, ১০১০
গোপাল ১৬ ১১২
গোপাল কলা ১১৯৯
গোপাল দেব ১১২৯, ১১২৮, ১১২৯
গোপাল ভট্ট ৪৬১ ৫৫৭ ৭৫১
গোপাল সিংহ ১১১৩, ১১১৭
গোপাল গ্রন্থ (গোপাল গ্রন্থ) ১১ ২৭৭ ২৭৯, ২৮১, ৪৯১ ৬৬৯, ৫২৯, ৫৮৯ ৬৬৩, ৯৭৫, ১০৫৯, ১০৭৯, ১০৮৮ ১০৯৩, ১১ ৩, ১১২৫
গোপীচাঁদের গান ৬৬৮
গোপীনাথ ৭০৯, ৭৫১
গোপীনাথ (গোপীকৃষ্ণ নারায়ণ) ১০৩৫
গোপীনাথ ঘর ১১৯
গোপীনাথ মিশ্র ৭৬৩
গোপীবল্লভের গান ১১৯৬
গোপীবাসীগ্রাম ১০৭৯
গাবর ১০৬১
গোপেরা ৮৬১
গোবর ৫ ১২১ ১১১
গোবর্ধন ২৫১ ২৫৮ ৪৫৩ ৯ ১ ১২১ ৭২২, ৭৮৮
গোবর্ধনাচার্য ৬৭৩ ১৭৭, ৪২১
গোবর্ধনাসন মাহেশ্বরীস্ত্র ১০৫৫
গোবিন্দ ঘোষ ২১১
গোবিন্দচন্দ্র (গোপী চন্দ্র দ্রষ্টব্য)
গোবিন্দচন্দ্র গীত ১১১৫
গোবিন্দ দাস ৪৭৮, ৫৫৩, ৫৫৫, ৬২৬, ৬৮১, ৬৮৫, ৭৫১, ৭৫৩, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭৩, ৭৮১, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৭, ৭৯০, ৮১১ ৮১৩, ৮৯৫ ৯৯১
গোবিন্দদাস রায় ১১৫ ১১৬০
গোবিন্দনারায়ণ ১১৯৮
গোবিন্দপুকুর ১১৫৯
গোবিন্দপুর ৮২১, ১১২৮
গোবিন্দ মাণিক্য ৮৩৯ ১০১৬, ১০৩৯ ১০৪৭
গোবিন্দমিশ্র ১০৯২

গোবরী ১০২ ১০২৮
গোরা ৮১১ ৮৫৪
গোয়াল পাড়া ১১১
গোয়ালপাড়া ১১০৬
গোয়ালপাড়ার ধর্মী ১১০৪, ১১৩৯
গোয়ালিয়র ৪২৫
গোরক্ষনাথ ২১৪, ৪১৮, ৭৭০, ৯০৪, ৯৩৬, ৯৭৫
গোরক্ষপুর ১৯ ১০ ৭৮৯
গোরক্ষবিজয় ২১৩, ৪২৫, ৪৮৪, ৭৭১, ৯২২, ৯৩২, ১২১
গোরক্ষবিজয় ১১৩৮
গোরক্ষা ১৩৫
গোরক্ষা ক্রান্তি ৭৭১ ৭৭৯
গোরক্ষ ৮১৫
গোরক্ষ গোরক্ষনাথ ৯৪৭
গোরক্ষ চরিত্র ৯১১ ৯৭৯ ১৩৮ ৮৮৫ ৯৫৫ ৯৭৭ ৯৯৭
গোরক্ষ ভারতী ৯৫৫
গোরক্ষনাথ সম্প্রদায় ৯৫
গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ভুক্ত ৯৫
গোরক্ষা ৭৭৫
গোরক্ষা ক্রান্তি ১৫
গোরক্ষা ১ ১৪
গৌড় ৭, ১৫, ১৬, ২১, ২৮, ৩৪, ৭১, ৫০৩, ৫১৩, ৫২৪, ৯০৩, ৯১৭, ৭১৮, ৭৩৩, ৭৮৩, ৯১২, ১০২১, ১১৩৩, ১১৫৮
গৌড়গোবিন্দ ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০
গৌড়বঙ্গ ৩৩১
গৌড়মহ ৯১
গৌড়লেখমালা ১২৮
গৌড়ীয় আলঙ্কারিক ৭
গৌড়ীয় ঢঙ ৯৪৩
গৌড়ীয় রীতি ১
গৌতম ২৪, ৪৫ ৯৭ ৯৮ ১৩ ১৪৩
গৌতমী ২৭
গৌরগণোদ্দেশ ৬৮ ৭৭৭
গৌরগণোদ্দেশিকা ২১
গৌরপ্রসাদ ঘোষমজুমদার ১০৭৬
গৌর মল্লিক ১০২৬, ১০২৭
গৌরাঙ্গ ৬৯৮, ৬৯৯, ৬৯৭, ৭৩৯, ৭৪৮, ৭৪৭
গৌরী ১০৮, ৫৭৫, ৯৫৮, ১০৭৮
গৌরীদাস ৫৭২-৫৭৩, ৫৯৮
গৌরীদাস ১৭২, ৯৯১
গৌরীমঙ্গল মৃগয়া ১০৭৩
গৌরীমাধব শিং ১০৬১
গৌরীমায়াবতার ১০৫৯
গৌরীমায় ১ ১৭
গৌরী ১০৫৩, ১০৫১
গ্রামমঙ্গল প্রবেশবলি ৬০৭, ৬১৮, ৬১৩
গ্রামবিচিত্রা ৭২১
গ্রামাণ ৭২
গ্রীক ১৭৭, ১৭৮, ২০৩, ২০৩, ২০৫, ৩০৩, ৩৬৩, ৩৫৩, ১১৩৩
গ্রীক প্রভাব ১৭৮
গ্রীকাগ্নি ১০৮৩
গ্রীমায়ন ৯১৮, ৯৬২
গ্রীস ১১৩-১৬৩ ১৩১

ঘ

ঘটোৎকচ ৪৬৫, ১০৭৭, ১০৭৮
ঘটোৎকচ গুপ্ত ২০১ ২০৮ ২১৩
ঘনরাম ২৩৩, ৫৫৫
ঘনরাম ৯১ ৯৮৯
ঘনশ্যাম ৯৬১, ৯৬২, ১০৬২
ঘনশ্যাম চক্রবর্তী ১০৩৭
ঘরের দেয়ালে চিত্র ৭৬৫
ঘেরেণ্ডসংহিতা ৮৬৮ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৯, ৮৭৫, ৮৭৯, ৯৫৯, ১০৭২
ঘোড়াঘাট ৮ ৮ ৮১
ঘোষপাড়া ১৭২
ঘোষালী ৬৫২

ঙ

ঙকৌষিক ১১৩৭
ঙকৌষিক ১৯

চক্রবর্ত ১০৮৮
চক্রবহ ৮২৪
চক্রবাক ১০৫৩, ১০৬১
চক্রপাণি ১০৬১ ১০৮৮
চক্রপাণি দত্ত ৩৭২
চক্রাযুধ ২৫৫
চট্টগ্রাম ১১, ১৮, ৮৪, ৫৩৩, ৭৮০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮৩৫, ৯৫৩, ৯৫৫, ৯৫৭, ৯৬১, ৯৬৫, ৯৬৭, ১০২৩, ১০৫৭, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০২, ১১০৮ ১১৪৪, ১১৪৯ ১১৫৯
চতুর্ভিত্তি ১৫৩
চতুর্ভাল ১০
চতুর্ভী ২৩৮, ৪৭২, ৯৬১, ৯৬৫, ৯৬৩, ৯৮৫, ১০৭৪
চতুর্ভীকাব্য ৯১০, ৯৭৪ ১১০৭, ১১৩১
চতুর্ভীগড় ১০৪৭
চতুর্ভীচরণ তর্কালঙ্কার ৯১১
চতুর্ভীদাস ৪৯৭ ৫৫৩ ৬৭২ ৮০১ ৮৩৩ ৮৮৫, ৯১১ ৭৩৮ ৭৫৩, ৭৫৯, ৭৭০, ৭৭১ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৮, ৭৮১, ৮০৩, ৮৩৮, ৯১১ ৯২৮ ৯৩৩ ৯৩৯, ৯৭২ ৯৮৮, ৯৮৯ ৯৯০, ৯৯২, ৯৯১
চতুর্মঙ্গল ৬৬, ২২২, ২৭১ ২৭৯, ২৭৫ ২৮৩ ৩০৪ ৩৩৩
চতুর্থ আশীর্বাদী ২৭১
চতুরালী ৪৪৯
চতুরেশ্বর ৩৭
চতুর্বিংশোপাখ্যানোপনিষদ ২৪৭
চন্দ্রাই ৩, ৩৭, ১০৩৮ ১০৪৮
চন্দন ১০৭০
চন্দন দাস ১৪০
চন্দননগর ৮৩৮, ৮৩৮, ৮৭৩
চন্দ্রপ্রভা ২৭
চন্দ্রের ২৭১
চন্দ্র ১০, ৩২, ১০৪২
চন্দ্রকান্ত সিংহ ১০৪৪
চন্দ্রকীর্তি ১০৮৭, ১০৮৮
চন্দ্রকেতুর গড় ১১২৩, ১১২৮
চন্দ্রগর্ভ ৩০৩
চন্দ্রগুপ্ত ১৭১, ১৪৩, ১৪৮, ১৭৩, ১৭২, ২০৭, ২০৮, ২০৯ ২১৩, ২৩৫, ২৪০, ৫৫৪, ৭৫৩, ১১৭০
চন্দ্রগোমিন ৩৩৮, ৩৪৪
চন্দ্রশেখরবাস ১০৮৯
চন্দ্রহাস ১০৩
চন্দ্রদেব ৮০১
চন্দ্রদ্বীপ ১১২২, ১১৩৭
চন্দ্রনাথ ৪, ১৫
চন্দ্রনাথ রায় ১১৩৫
চন্দ্রনারায়ণ ৩৪৮
চন্দ্রপাল ৩০১
চন্দ্রপুর ১০৩৫
চন্দ্রপুরা ১ ৭২
চন্দ্রবংশ ২৭৩, ২৮৪
চন্দ্রবর্মা ২১২, ১১৩৮
চন্দ্রমুখবর্মা ১০৫১
চন্দ্রশালা ৯২৪
চন্দ্রশেখর ২৩৮, ৭১৩
চন্দ্রশেখর সেন ১০৮১
চন্দ্রসিংহ ১ ৩৭
চন্দ্রসি ও নারায়ণ ১ ৩১
চন্দ্রসূর্য ১৮ ১৭
চন্দ্রাবতী ১১ ৩১৭ ৪৪৮ ৭১৩, ৭১৩ ৭৭৯ ৮৮৮ ৯৮৩
চর্যাগীতিপদাবলী ৮১২, ১১৩৮ ১১৭৩ ১১৯৮ ১১৯১ ১১৩২ ১১৩৪
চলন্ত ২৩, ৭৩৮
চলন্তিকা ৩৯১
চলোগ ১০২৪ ১০২৩, ১০৩৭ ১০৪৩
চরক ৩৫৩
চরকা ৯৯০
চরণদাস ৮০৩, ৮৪২
চরণাড়া ৮৩৫
চরাই ধান ১০৫৯
চরিতবিদ ৯২৮
চলাই ৯১৮
চলিতভাষা ১০৫৭
চাংখিন ১১০১
চাটগা ৭৯৫, ৮৪৩, ১১৭৩
চাঁদকবি ৪৩০
চাঁদখালি ১১৩৯
চাঁদ বণিক ৪৯১

চাঁদ বিনোদ ৯১২
চাঁদরায় ৩ ৬, ৭৯৮, ৯৯, ৭৫২, ৭৬১ ৭৬৯ ৭৯৭ ৭৯৮ ৮৮৯, ৯০৩, ৯০৪৩, ৯০৪৮
চাঁদসদাগর ১৪, ৪৩৮, ৬২৪, ৯২৫
চাঁদেরি ৬৬
চাকমা ১৪
চাকমা ৬, ৪০
চাঁপাই ১৪২, ১৪৩ ১৪৮, ১৫২, ১৬৩, ১৬৪, ৩৪৩, ৩৭৯, ৭৪৯
চাঁপাচা ১১৩৬
চাঁপাচোরার দুর্গ ১১৩৯
চাঁপা ১৪৭
চাঁপাহাটি ১০৮৫
চাঁপানি ৯১৫
চাঁপাবিণা ১০৬৭
চাঁপাল ৪৪
[illegible] ৭৫৪
চাঁপানগর ৯১৯, ৭৭৭
চাঁপানাচ ৬৬৯, ৬৫৪
চাঁপানাটি ১০৮১
চাঁপানি ৩১৫
চাঁপাবতী ১০
চাঁপাবাণী ১৮
[illegible] ৯৭
চিকণী ১০৬৯, ১০৭৯
চিত্র ১১০
চিত্রকর ১ ৭৮
চিত্রবহা ১০৫২
চিত্রমালিকা ২৭১
চিত্রলেখা ২৩৮
চিত্রশিল্প ৪৪৬-৪৫২
চিত্রসেনা ৩০
চিতা ৭৮
চিত্রাঙ্গদা ১৩৭, ৪৩৫, ১ ৫২
চিনি ২৪৩, ২৫৪
চিন্তা ৯৭৯
চিন্তাপোড়া ১১৩৯
চিরঞ্জীব সেন ৭৮২
চীন ২২, ২৯ ৩৮ ৩৮, ৭১ ৮৯ ২৩২, ২৯৫, ৩১৭, ৩৩৭ ৩৯৮ ৪০ ৫২২, ৫২৫, ৯৩৫, ৯৩৪, ৯৩৪, ৯৭২, ৯৯১ ১ ১৭, ১০৫৭, ১০৫৫, ১১০৩
চীনরাজ ১০৫৯, ১০৮৭, ১০৭৯, ১০৮৩
চুচুঁড়া ২৪৮
চুনাখড়ি ৩১
চুনারঘাট ১ ৮৫
চুনারুঘাটের ৯৮
চেংকুল ১১১৩
চেংমো ৯২৫
চেঙ্গিজ খাঁ ৩৩৯
চেঙ্গুর ১৩৫
চেটি ১৪৭
চেটি ৪, ১২, ২৫, ২৬, ৩৫, ৩৫, ২৩১, ৭৭৫, ১০৭৭
চেরাই হ্রদ (সাগরকূলপট্টি) ১০৯৭
[illegible] ৫ ৫৮ ৫৫ ৫৩ ৫৫ ৩৪১ ৩৬ ২৩১ ৫১৫ ৫৫৫ ৫৬৩ ৯৫ ৭৩৭ ৯১৮ ৭৮১ ৮৮২ ৮৮৩, ৮৮৪ ৮৮৫, ৮৯০, ৯৩১, ৯৩৭, ৭০৬, ৭৩৩, ৭৩৭, ৭৪০, ৭৫১, ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৬ ৭৬৭ ৭৭৮ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৭০ ৭৭৯ ৭৭৯ ৭৯৫ ৭৯৭ ৮৩৫ ৮৫৫ ৮৭৩ ৮৭৮, ৮৮১ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৮ ৮৯৭ ৮৯৮ ৯০৩ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০ ১০০১ ১০০২ ১০০৩ ১০০৪ ১০০৫ ১০০৬ ১০০৭ ১০০৮ ১০০৯ ১০১০ ১০১১ ১০১২ ১০১৩ ১০১৪ ১০১৫ ১০১৬ ১০১৭ ১০১৮ ১০১৯ ১০২০ ১০২১ ১০২২ ১০২৩ ১০২৪ ১০২৫ ১০২৬ ১০২৭ ১০২৮ ১০২৯ ১০৩০ ১০৩১ ১০৩২ ১০৩৩ ১০৩৪ ১০৩৫ ১০৩৬ ১০৩৭ ১০৩৮ ১০৩৯ ১০৪০ ১০৪১ ১০৪২ ১০৪৩ ১০৪৪ ১০৪৫ ১০৪৬ ১০৪৭ ১০৪৮ ১০৪৯ ১০৫০ ১০৫১ ১০৫২ ১০৫৩ ১০৫৪ ১০৫৫ ১০৫৬ ১০৫৭ ১০৫৮ ১০৫৯ ১০৬০ ১০৬১ ১০৬২ ১০৬৩ ১০৬৪ ১০৬৫ ১০৬৬ ১০৬৭ ১০৬৮ ১০৬৯ ১০৭০ ১০৭১ ১০৭২ ১০৭৩ ১০৭৪ ১০৭৫ ১০৭৬ ১০৭৭ ১০৭৮ ১০৭৯ ১০৮০ ১০৮১ ১০৮২ ১০৮৩ ১০৮৪ ১০৮৫ ১০৮৬ ১০৮৭ ১০৮৮ ১০৮৯ ১০৯০ ১০৯১ ১০৯২ ১০৯৩ ১০৯৪ ১০৯৫ ১০৯৬ ১০৯৭ ১০৯৮ ১০৯৯ ১১০০ ১১০১ ১১০২ ১১০৩ ১১০৪ ১১০৫ ১১০৬ ১১০৭ ১১০৮ ১১০৯ ১১১০ ১১১১ ১১১২ ১১১৩ ১১১৪ ১১১৫ ১১১৬ ১১১৭ ১১১৮ ১১১৯ ১১২০ ১১২১ ১১২২ ১১২৩ ১১২৪ ১১২৫ ১১২৬ ১১২৭ ১১২৮ ১১২৯ ১১৩০ ১১৩১ ১১৩২ ১১৩৩ ১১৩৪ ১১৩৫ ১১৩৬ ১১৩৭ ১১৩৮ ১১৩৯ ১১৪০ ১১৪১ ১১৪২ ১১৪৩ ১১৪৪ ১১৪৫ ১১৪৬ ১১৪৭ ১১৪৮ ১১৪৯ ১১৫০ ১১৫১ ১১৫২ ১১৫৩ ১১৫৪ ১১৫৫ ১১৫৬ ১১৫৭ ১১৫৮ ১১৫৯ ১১৬০ ১১৬১ ১১৬২ ১১৬৩ ১১৬৪ ১১৬৫ ১১৬৬ ১১৬৭ ১১৬৮ ১১৬৯ ১১৭০ ১১৭১ ১১৭২ ১১৭৩ ১১৭৪ ১১৭৫ ১১৭৬ ১১৭৭ ১১৭৮ ১১৭৯ ১১৮০ ১১৮১ ১১৮২ ১১৮৩ ১১৮৪ ১১৮৫ ১১৮৬ ১১৮৭ ১১৮৮ ১১৮৯ ১১৯০ ১১৯১ ১১৯২ ১১৯৩ ১১৯৪ ১১৯৫ ১১৯৬ ১১৯৭ ১১৯৮ ১১৯৯ ১২০০ ১২০১ ১২০২ ১২০৩ ১২০৪ ১২০৫ ১২০৬ ১২০৭ ১২০৮ ১২০৯ ১২১০ ১২১১ ১২১২ ১২১৩ ১২১৪ ১২১৫ ১২১৬ ১২১৭ ১২১৮ ১২১৯ ১২২০ ১২২১ ১২২২ ১২২৩ ১২২৪ ১২২৫ ১২২৬ ১২২৭ ১২২৮ ১২২৯ ১২৩০ ১২৩১ ১২৩২ ১২৩৩ ১২৩৪ ১২৩৫ ১২৩৬ ১২৩৭ ১২৩৮ ১২৩৯ ১২৪০ ১২৪১ ১২৪২ ১২৪৩ ১২৪৪ ১২৪৫ ১২৪৬ ১২৪৭ ১২৪৮ ১২৪৯ ১২৫০ ১২৫১ ১২৫২ ১২৫৩ ১২৫৪ ১২৫৫ ১২৫৬ ১২৫৭ ১২৫৮ ১২৫৯ ১২৬০ ১২৬১ ১২৬২ ১২৬৩ ১২৬৪ ১২৬৫ ১২৬৬ ১২৬৭ ১২৬৮ ১২৬৯ ১২৭০ ১২৭১ ১২৭২ ১২৭৩ ১২৭৪ ১২৭৫ ১২৭৬ ১২৭৭ ১২৭৮ ১২৭৯ ১২৮০ ১২৮১ ১২৮২ ১২৮৩ ১২৮৪ ১২৮৫ ১২৮৬ ১২৮৭ ১২৮৮ ১২৮৯ ১২৯০ ১২৯১ ১২৯২ ১২৯৩ ১২৯৪ ১২৯৫ ১২৯৬ ১২৯৭ ১২৯৮ ১২৯৯ ১৩০০ ১৩০১ ১৩০২ ১৩০৩ ১৩০৪ ১৩০৫ ১৩০৬ ১৩০৭ ১৩০৮ ১৩০৯ ১৩১০ ১৩১১ ১৩১২ ১৩১৩ ১৩১৪ ১৩১৫ ১৩১৬ ১৩১৭ ১৩১৮ ১৩১৯ ১৩২০ ১৩২১ ১৩২২ ১৩২৩ ১৩২৪ ১৩২৫ ১৩২৬ ১৩২৭ ১৩২৮ ১৩২৯ ১৩৩০ ১৩৩১ ১৩৩২ ১৩৩৩ ১৩৩৪ ১৩৩৫ ১৩৩৬ ১৩৩৭ ১৩৩৮ ১৩৩৯ ১৩৪০ ১৩৪১ ১৩৪২ ১৩৪৩ ১৩৪৪ ১৩৪৫ ১৩৪৬ ১৩৪৭ ১৩৪৮ ১৩৪৯ ১৩৫০ ১৩৫১ ১৩৫২ ১৩৫৩ ১৩৫৪ ১৩৫৫ ১৩৫৬ ১৩৫৭ ১৩৫৮ ১৩৫৯ ১৩৬০ ১৩৬১ ১৩৬২ ১৩৬৩ ১৩৬৪ ১৩৬৫ ১৩৬৬ ১৩৬৭ ১৩৬৮ ১৩৬৯ ১৩৭০ ১৩৭১ ১৩৭২ ১৩৭৩ ১৩৭৪ ১৩৭৫ ১৩৭৬ ১৩৭৭ ১৩৭৮ ১৩৭৯ ১৩৮০ ১৩৮১ ১৩৮২ ১৩৮৩ ১৩৮৪ ১৩৮৫ ১৩৮৬ ১৩৮৭ ১৩৮৮ ১৩৮৯ ১৩৯০ ১৩৯১ ১৩৯২ ১৩৯৩ ১৩৯৪ ১৩৯৫ ১৩৯৬ ১৩৯৭ ১৩৯৮ ১৩৯৯ ১৪০০ ১৪০১ ১৪০২ ১৪০৩ ১৪০৪ ১৪০৫ ১৪০৬ ১৪০৭ ১৪০৮ ১৪০৯ ১৪১০ ১৪১১ ১৪১২ ১৪১৩ ১৪১৪ ১৪১৫ ১৪১৬ ১৪১৭ ১৪১৮ ১৪১৯ ১৪২০ ১৪২১ ১৪২২ ১৪২৩ ১৪২৪ ১৪২৫ ১৪২৬ ১৪২৭ ১৪২৮ ১৪২৯ ১৪৩০ ১৪৩১ ১৪৩২ ১৪৩৩ ১৪৩৪ ১৪৩৫ ১৪৩৬ ১৪৩৭ ১৪৩৮ ১৪৩৯ ১৪৪০ ১৪৪১ ১৪৪২ ১৪৪৩ ১৪৪৪ ১৪৪৫ ১৪৪৬ ১৪৪৭ ১৪৪৮ ১৪৪৯ ১৪৫০ ১৪৫১ ১৪৫২ ১৪৫৩ ১৪৫৪ ১৪৫৫ ১৪৫৬ ১৪৫৭ ১৪৫৮ ১৪৫৯ ১৪৬০ ১৪৬১ ১৪৬২ ১৪৬৩ ১৪৬৪ ১৪৬৫ ১৪৬৬ ১৪৬৭ ১৪৬৮ ১৪৬৯ ১৪৭০ ১৪৭১ ১৪৭২ ১৪৭৩ ১৪৭৪ ১৪৭৫ ১৪৭৬ ১৪৭৭ ১৪৭৮ ১৪৭৯ ১৪৮০ ১৪৮১ ১৪৮২ ১৪৮৩ ১৪৮৪ ১৪৮৫ ১৪৮৬ ১৪৮৭ ১৪৮৮ ১৪৮৯ ১৪৯০ ১৪৯১ ১৪৯২ ১৪৯৩ ১৪৯৪ ১৪৯৫ ১৪৯৬ ১৪৯৭ ১৪৯৮ ১৪৯৯ ১৫০০ ১৫০১ ১৫০২ ১৫০৩ ১৫০৪ ১৫০৫ ১৫০৬ ১৫০৭ ১৫০৮ ১৫০৯ ১৫১০ ১৫১১ ১৫১২ ১৫১৩ ১৫১৪ ১৫১৫ ১৫১৬ ১৫১৭ ১৫১৮ ১৫১৯ ১৫২০ ১৫২১ ১৫২২ ১৫২৩ ১৫২৪ ১৫২৫ ১৫২৬ ১৫২৭ ১৫২৮ ১৫২৯ ১৫৩০ ১৫৩১ ১৫৩২ ১৫৩৩ ১৫৩৪ ১৫৩৫ ১৫৩৬ ১৫৩৭ ১৫৩৮ ১৫৩৯ ১৫৪০ ১৫৪১ ১৫৪২ ১৫৪৩ ১৫৪৪ ১৫৪৫ ১৫৪৬ ১৫৪৭ ১৫৪৮ ১৫৪৯ ১৫৫০ ১৫৫১ ১৫৫২ ১৫৫৩ ১৫৫৪ ১৫৫৫ ১৫৫৬ ১৫৫৭ ১৫৫৮ ১৫৫৯ ১৫৬০ ১৫৬১ ১৫৬২ ১৫৬৩ ১৫৬৪ ১৫৬৫ ১৫৬৬ ১৫৬৭ ১৫৬৮ ১৫৬৯ ১৫৭০ ১৫৭১ ১৫৭২ ১৫৭৩ ১৫৭৪ ১৫৭৫ ১৫৭৬ ১৫৭৭ ১৫৭৮ ১৫৭৯ ১৫৮০ ১৫৮১ ১৫৮২ ১৫৮৩ ১৫৮৪ ১৫৮৫ ১৫৮৬ ১৫৮৭ ১৫৮৮ ১৫৮৯ ১৫৯০ ১৫৯১ ১৫৯২ ১৫৯৩ ১৫৯৪ ১৫৯৫ ১৫৯৬ ১৫৯৭ ১৫৯৮ ১৫৯৯ ১৬০০ ১৬০১ ১৬০২ ১৬০৩ ১৬০৪ ১৬০৫ ১৬০৬ ১৬০৭ ১৬০৮ ১৬০৯ ১৬১০ ১৬১১ ১৬১২ ১৬১৩ ১৬১৪ ১৬১৫ ১৬১৬ ১৬১৭ ১৬১৮ ১৬১৯ ১৬২০ ১৬২১ ১৬২২ ১৬২৩ ১৬২৪ ১৬২৫ ১৬২৬ ১৬২৭ ১৬২৮ ১৬২৯ ১৬৩০ ১৬৩১ ১৬৩২ ১৬৩৩ ১৬৩৪ ১৬৩৫ ১৬৩৬ ১৬৩৭ ১৬৩৮ ১৬৩৯ ১৬৪০ ১৬৪১ ১৬৪২ ১৬৪৩ ১৬৪৪ ১৬৪৫ ১৬৪৬ ১৬৪৭ ১৬৪৮ ১৬৪৯ ১৬৫০ ১৬৫১ ১৬৫২ ১৬৫৩ ১৬৫৪ ১৬৫৫ ১৬৫৬ ১৬৫৭ ১৬৫৮ ১৬৫৯ ১৬৬০ ১৬৬১ ১৬৬২ ১৬৬৩ ১৬৬৪ ১৬৬৫ ১৬৬৬ ১৬৬৭ ১৬৬৮ ১৬৬৯ ১৬৭০ ১৬৭১ ১৬৭২ ১৬৭৩ ১৬৭৪ ১৬৭৫ ১৬৭৬ ১৬৭৭ ১৬৭৮ ১৬৭৯ ১৬৮০ ১৬৮১ ১৬৮২ ১৬৮৩ ১৬৮৪ ১৬৮৫ ১৬৮৬ ১৬৮৭ ১৬৮৮ ১৬৮৯ ১৬৯০ ১৬৯১ ১৬৯২ ১৬৯৩ ১৬৯৪ ১৬৯৫ ১৬৯৬ ১৬৯৭ ১৬৯৮ ১৬৯৯ ১৭০০ ১৭০১ ১৭০২ ১৭০৩ ১৭০৪ ১৭০৫ ১৭০৬ ১৭০৭ ১৭০৮ ১৭০৯ ১৭১০ ১৭১১ ১৭১২ ১৭১৩ ১৭১৪ ১৭১৫ ১৭১৬ ১৭১৭ ১৭১৮ ১৭১৯ ১৭২০ ১৭২১ ১৭২২ ১৭২৩ ১৭২৪ ১৭২৫ ১৭২৬ ১৭২৭ ১৭২৮ ১৭২৯ ১৭৩০ ১৭৩১ ১৭৩২ ১৭৩৩ ১৭৩৪ ১৭৩৫ ১৭৩৬ ১৭৩৭ ১৭৩৮ ১৭৩৯ ১৭৪০ ১৭৪১ ১৭৪২ ১৭৪৩ ১৭৪৪ ১৭৪৫ ১৭৪৬ ১৭৪৭ ১৭৪৮ ১৭৪৯ ১৭৫০ ১৭৫১ ১৭৫২ ১৭৫৩ ১৭৫৪ ১৭৫৫ ১৭৫৬ ১৭৫৭ ১৭৫৮ ১৭৫৯ ১৭৬০ ১৭৬১ ১৭৬২ ১৭৬৩ ১৭৬৪ ১৭৬৫ ১৭৬৬ ১৭৬৭ ১৭৬৮ ১৭৬৯ ১৭৭০ ১৭৭১ ১৭৭২ ১৭৭৩ ১৭৭৪ ১৭৭৫ ১৭৭৬ ১৭৭৭ ১৭৭৮ ১৭৭৯ ১৭৮০ ১৭৮১ ১৭৮২ ১৭৮৩ ১৭৮৪ ১৭৮৫ ১৭৮৬ ১৭৮৭ ১৭৮৮ ১৭৮৯ ১৭৯০ ১৭৯১ ১৭৯২ ১৭৯৩ ১৭৯৪ ১৭৯৫ ১৭৯৬ ১৭৯৭ ১৭৯৮ ১৭৯৯ ১৮০০ ১৮০১ ১৮০২ ১৮০৩ ১৮০৪ ১৮০৫ ১৮০৬ ১৮০৭ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০ ১৮১১ ১৮১২ ১৮১৩ ১৮১৪ ১৮১৫ ১৮১৬ ১৮১৭ ১৮১৮ ১৮১৯ ১৮২০ ১৮২১ ১৮২২ ১৮২৩ ১৮২৪ ১৮২৫ ১৮২৬ ১৮২৭ ১৮২৮ ১৮২৯ ১৮৩০ ১৮৩১ ১৮৩২ ১৮৩৩ ১৮৩৪ ১৮৩৫ ১৮৩৬ ১৮৩৭ ১৮৩৮ ১৮৩৯ ১৮৪০ ১৮৪১ ১৮৪২ ১৮৪৩ ১৮৪৪ ১৮৪৫ ১৮৪৬ ১৮৪৭ ১৮৪৮ ১৮৪৯ ১৮৫০ ১৮৫১ ১৮৫২ ১৮৫৩ ১৮৫৪ ১৮৫৫ ১৮৫৬ ১৮৫৭ ১৮৫৮ ১৮৫৯ ১৮৬০ ১৮৬১ ১৮৬২ ১৮৬৩ ১৮৬৪ ১৮৬৫ ১৮৬৬ ১৮৬৭ ১৮৬৮ ১৮৬৯ ১৮৭০ ১৮৭১ ১৮৭২ ১৮৭৩ ১৮৭৪ ১৮৭৫ ১৮৭৬ ১৮৭৭ ১৮৭৮ ১৮৭৯ ১৮৮০ ১৮৮১ ১৮৮২ ১৮৮৩ ১৮৮৪ ১৮৮৫ ১৮৮৬ ১৮৮৭ ১৮৮৮ ১৮৮৯ ১৮৯০ ১৮৯১ ১৮৯২ ১৮৯৩ ১৮৯৪ ১৮৯৫ ১৮৯৬ ১৮৯৭ ১৮৯৮ ১৮৯৯ ১৯০০ ১৯০১ ১৯০২ ১৯০৩ ১৯০৪ ১৯০৫ ১৯০৬ ১৯০৭ ১৯০৮ ১৯০৯ ১৯১০ ১৯১১ ১৯১২ ১৯১৩ ১৯১৪ ১৯১৫ ১৯১৬ ১৯১৭ ১৯১৮ ১৯১৯ ১৯২০ ১৯২১ ১৯২২ ১৯২৩ ১৯২৪ ১৯২৫ ১৯২৬ ১৯২৭ ১৯২৮ ১৯২৯ ১৯৩০ ১৯৩১ ১৯৩২ ১৯৩৩ ১৯৩৪ ১৯৩৫ ১৯৩৬ ১৯৩৭ ১৯৩৮ ১৯৩৯ ১৯৪০ ১৯৪১ ১৯৪২ ১৯৪৩ ১৯৪৪ ১৯৪৫ ১৯৪৬ ১৯৪৭ ১৯৪৮ ১৯৪৯ ১৯৫০ ১৯৫১ ১৯৫২ ১৯৫৩ ১৯৫৪ ১৯৫৫ ১৯৫৬ ১৯৫৭ ১৯৫৮ ১৯৫৯ ১৯৬০ ১৯৬১ ১৯৬২ ১৯৬৩ ১৯৬৪ ১৯৬৫ ১৯৬৬ ১৯৬৭ ১৯৬৮ ১৯৬৯ ১৯৭০ ১৯৭১ ১৯৭২ ১৯৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ ১৯৭৭ ১৯৭৮ ১৯৭৯ ১৯৮০ ১৯৮১ ১৯৮২ ১৯৮৩ ১৯৮৪ ১৯৮৫ ১৯৮৬ ১৯৮৭ ১৯৮৮ ১৯৮৯ ১৯৯০ ১৯৯১ ১৯৯২ ১৯৯৩ ১৯৯৪ ১৯৯৫ ১৯৯৬ ১৯৯৭ ১৯৯৮ ১৯৯৯ ২০০০ ২০০১ ২০০২ ২০০৩ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ২০২২ ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ ২০২৮ ২০২৯ ২০৩০ ২০৩১ ২০৩২ ২০৩৩ ২০৩৪ ২০৩৫ ২০৩৬ ২০৩৭ ২০৩৮ ২০৩৯ ২০৪০ ২০৪১ ২০৪২ ২০৪৩ ২০৪৪ ২০৪৫ ২০৪৬ ২০৪৭ ২০৪৮ ২০৪৯ ২০৫০ ২০৫১ ২০৫২ ২০৫৩ ২০৫৪ ২০৫৫ ২০৫৬ ২০৫৭ ২০৫৮ ২০৫৯ ২০৬০ ২০৬১ ২০৬২ ২০৬৩ ২০৬৪ ২০৬৫ ২০৬৬ ২০৬৭ ২০৬৮ ২০৬৯ ২০৭০ ২০৭১ ২০৭২ ২০৭৩ ২০৭৪ ২০৭৫ ২০৭৬ ২০৭৭ ২০৭৮ ২০৭৯ ২০৮০ ২০৮১ ২০৮২ ২০৮৩ ২০৮৪ ২০৮৫ ২০৮৬ ২০৮৭ ২০৮৮ ২০৮৯ ২০৯০ ২০৯১ ২০৯২ ২০৯৩ ২০৯৪ ২০৯৫ ২০৯৬ ২০৯৭ ২০৯৮ ২০৯৯ ২১০০ ২১০১ ২১০২ ২১০৩ ২১০৪ ২১০৫ ২১০৬ ২১০৭ ২১০৮ ২১০৯ ২১১০ ২১১১ ২১১২ ২১১৩ ২১১৪ ২১১৫ ২১১৬ ২১১৭ ২১১৮ ২১১৯ ২১২০ ২১২১ ২১২২ ২১২৩ ২১২৪ ২১২৫ ২১২৬ ২১২৭ ২১২৮ ২১২৯ ২১৩০ ২১৩১ ২১৩২ ২১৩৩ ২১৩৪ ২১৩৫ ২১৩৬ ২১৩৭ ২১৩৮ ২১৩৯ ২১৪০ ২১৪১ ২১৪২ ২১৪৩ ২১৪৪ ২১৪৫ ২১৪৬ ২১৪৭ ২১৪৮ ২১৪৯ ২১৫০ ২১৫১ ২১৫২ ২১৫৩ ২১৫৪ ২১৫৫ ২১৫৬ ২১৫৭ ২১৫৮ ২১৫৯ ২১৬০ ২১৬১ ২১৬২ ২১৬৩ ২১৬৪ ২১৬৫ ২১৬৬ ২১৬৭ ২১৬৮ ২১৬৯ ২১৭০ ২১৭১ ২১৭২ ২১৭৩ ২১৭৪ ২১৭৫ ২১৭৬ ২১৭৭ ২১৭৮ ২১৭৯ ২১৮০ ২১৮১ ২১৮২ ২১৮৩ ২১৮৪ ২১৮৫ ২১৮৬ ২১৮৭ ২১৮৮ ২১৮৯ ২১৯০ ২১৯১ ২১৯২ ২১৯৩ ২১৯৪ ২১৯৫ ২১৯৬ ২১৯৭ ২১৯৮ ২১৯৯ ২২০০ ২২০১ ২২০২ ২২০৩ ২২০৪ ২২০৫ ২২০৬ ২২০৭ ২২০৮ ২২০৯ ২২১০ ২২১১ ২২১২ ২২১৩ ২২১৪ ২২১৫ ২২১৬ ২২১৭ ২২১৮ ২২১৯ ২২২০ ২২২১ ২২২২ ২২২৩ ২২২৪ ২২২৫ ২২২৬ ২২২৭ ২২২৮ ২২২৯ ২২৩০ ২২৩১ ২২৩২ ২২৩৩ ২২৩৪ ২২৩৫ ২২৩৬ ২২৩৭ ২২৩৮ ২২৩৯ ২২৪০ ২২৪১ ২২৪২ ২২৪৩ ২২৪৪ ২২৪৫ ২২৪৬ ২২৪৭ ২২৪৮ ২২৪৯ ২২৫০ ২২৫১ ২২৫২ ২২৫৩ ২২৫৪ ২২৫৫ ২২৫৬ ২২৫৭ ২২৫৮ ২২৫৯ ২২৬০ ২২৬১ ২২৬২ ২২৬৩ ২২৬৪ ২২৬৫ ২২৬৬ ২২৬৭ ২২৬৮ ২২৬৯ ২২৭০ ২২৭১ ২২৭২ ২২৭৩ ২২৭৪ ২২৭৫ ২২৭৬ ২২৭৭ ২২৭৮ ২২৭৯ ২২৮০ ২২৮১ ২২৮২ ২২৮৩ ২২৮৪ ২২৮৫ ২২৮৬ ২২৮৭ ২২৮৮ ২২৮৯ ২২৯০ ২২৯১ ২২৯২ ২২৯৩ ২২৯৪ ২২৯৫ ২২৯৬ ২২৯৭ ২২৯৮ ২২৯৯ ২৩০০ ২৩০১ ২৩০২ ২৩০৩ ২৩০৪ ২৩০৫ ২৩০৬ ২৩০৭ ২৩০৮ ২৩০৯ ২৩১০ ২৩১১ ২৩১২ ২৩১৩ ২৩১৪ ২৩১৫ ২৩১৬ ২৩১৭ ২৩১৮ ২৩১৯ ২৩২০ ২৩২১ ২৩২২ ২৩২৩ ২৩২৪ ২৩২৫ ২৩২৬ ২৩২৭ ২৩২৮ ২৩২৯ ২৩৩০ ২৩৩১ ২৩৩২ ২৩৩৩ ২৩৩৪ ২৩৩৫ ২৩৩৬ ২৩৩৭ ২৩৩৮ ২৩৩৯ ২৩৪০ ২৩৪১ ২৩৪২ ২৩৪৩ ২৩৪৪ ২৩৪৫ ২৩৪৬ ২৩৪৭ ২৩৪৮ ২৩৪৯ ২৩৫০ ২৩৫১ ২৩৫২ ২৩৫৩ ২৩৫৪ ২৩৫৫ ২৩৫৬ ২৩৫৭ ২৩৫৮ ২৩৫৯ ২৩৬০ ২৩৬১ ২৩৬২ ২৩৬৩ ২৩৬৪ ২৩৬৫ ২৩৬৬ ২৩৬৭ ২৩৬৮ ২৩৬৯ ২৩৭০ ২৩৭১ ২৩৭২ ২৩৭৩ ২৩৭৪ ২৩৭৫ ২৩৭৬ ২৩৭৭ ২৩৭৮ ২৩৭৯ ২৩৮০ ২৩৮১ ২৩৮২ ২৩৮৩ ২৩৮৪ ২৩৮৫ ২৩৮৬ ২৩৮৭ ২৩৮৮ ২৩৮৯ ২৩৯০ ২৩৯১ ২৩৯২ ২৩৯৩ ২৩৯৪ ২৩৯৫ ২৩৯৬ ২৩৯৭ ২৩৯৮ ২৩৯৯ ২৪০০ ২৪০১ ২৪০২ ২৪০৩ ২৪০৪ ২৪০৫ ২৪০৬ ২৪০৭ ২৪০৮ ২৪০৯ ২৪১০ ২৪১১ ২৪১২ ২৪১৩ ২৪১৪ ২৪১৫ ২৪১৬ ২৪১৭ ২৪১৮ ২৪১৯ ২৪২০ ২৪২১ ২৪২২ ২৪২৩ ২৪২৪ ২৪২৫ ২৪২৬ ২৪২৭ ২৪২৮ ২৪২৯ ২৪৩০ ২৪৩১ ২৪৩২ ২৪৩৩ ২৪৩৪ ২৪৩৫ ২৪৩৬ ২৪৩৭ ২৪৩৮ ২৪৩৯ ২৪৪০ ২৪৪১ ২৪৪২ ২৪৪৩ ২৪৪৪ ২৪৪৫ ২৪৪৬ ২৪৪৭ ২৪৪৮ ২৪৪৯ ২৪৫০ ২৪৫১ ২৪৫২ ২৪৫৩ ২৪৫৪ ২৪৫৫ ২৪৫৬ ২৪৫৭ ২৪৫৮ ২৪৫৯ ২৪৬০ ২৪৬১ ২৪৬২ ২৪৬৩ ২৪৬৪ ২৪৬৫ ২৪৬৬ ২৪৬৭ ২৪৬৮ ২৪৬৯ ২৪৭০ ২৪৭১ ২৪৭২ ২৪৭৩ ২৪৭৪ ২৪৭৫ ২৪৭৬ ২৪৭৭ ২৪৭৮ ২৪৭৯ ২৪৮০ ২৪৮১ ২৪৮২ ২৪৮৩ ২৪৮৪ ২৪৮৫ ২৪৮৬ ২৪৮৭ ২৪৮৮ ২৪৮৯ ২৪৯০ ২৪৯১ ২৪৯২ ২৪৯৩ ২৪৯৪ ২৪৯৫ ২৪৯৬ ২৪৯৭ ২৪৯৮ ২৪৯৯ ২৫০০ ২৫০১ ২৫০২ ২৫০৩ ২৫০৪ ২৫০৫ ২৫০৬ ২৫০৭ ২৫০৮ ২৫০৯ ২৫১০ ২৫১১ ২৫১২ ২৫১৩ ২৫১৪ ২৫১৫ ২৫১৬ ২৫১৭ ২৫১৮ ২৫১৯ ২৫২০ ২৫২১ ২৫২২ ২৫২৩ ২৫২৪ ২৫২৫ ২৫২৬ ২৫২৭ ২৫২৮ ২৫২৯ ২৫৩০ ২৫৩১ ২৫৩২ ২৫৩৩ ২৫৩৪ ২৫৩৫ ২৫৩৬ ২৫৩৭ ২৫৩৮ ২৫৩৯ ২৫৪০ ২৫৪১ ২৫৪২ ২৫৪৩ ২৫৪৪ ২৫৪৫ ২৫৪৬ ২৫৪৭ ২৫৪৮ ২৫৪৯ ২৫৫০ ২৫৫১ ২৫৫২ ২৫৫৩ ২৫৫৪ ২৫৫৫ ২৫৫৬ ২৫৫৭ ২৫৫৮ ২৫৫৯ ২৫৬০ ২৫৬১ ২৫৬২ ২৫৬৩ ২৫৬৪ ২৫৬৫ ২৫৬৬ ২৫৬৭ ২৫৬৮ ২৫৬৯ ২৫৭০ ২৫৭১ ২৫৭২ ২৫৭৩ ২৫৭৪ ২৫৭৫ ২৫৭৬ ২৫৭৭ ২৫৭৮ ২৫৭৯ ২৫৮০ ২৫৮১ ২৫৮২ ২৫৮৩ ২৫৮৪ ২৫৮৫ ২৫৮৬ ২৫৮৭ ২৫৮৮ ২৫৮৯ ২৫৯০ ২৫৯১ ২৫৯২ ২৫৯৩ ২৫৯৪ ২৫৯৫ ২৫৯৬ ২৫৯৭ ২৫৯৮ ২৫৯৯ ২৬০০ ২৬০১ ২৬০২ ২৬০৩ ২৬০৪ ২৬০৫ ২৬০৬ ২৬০৭ ২৬০৮ ২৬০৯ ২৬১০ ২৬১১ ২৬১২ ২৬১৩ ২৬১৪ ২৬১৫ ২৬১৬ ২৬১৭ ২৬১৮ ২৬১৯ ২৬২০ ২৬২১ ২৬২২ ২৬২৩ ২৬২৪ ২৬২৫ ২৬২৬ ২৬২৭ ২৬২৮ ২৬২৯ ২৬৩০ ২৬৩১ ২৬৩২ ২৬৩৩ ২৬৩৪ ২৬৩৫ ২৬৩৬ ২৬৩৭ ২৬৩৮ ২৬৩৯ ২৬৪০ ২৬৪১ ২৬৪২ ২৬৪৩ ২৬৪৪ ২৬৪৫ ২৬৪৬ ২৬৪৭ ২৬৪৮ ২৬৪৯ ২৬৫০ ২৬৫১ ২৬৫২ ২৬৫৩ ২৬৫৪ ২৬৫৫ ২৬৫৬ ২৬৫৭ ২৬৫৮ ২৬৫৯ ২৬৬০ ২৬৬১ ২৬৬২ ২৬৬৩ ২৬৬৪ ২৬৬৫ ২৬৬৬ ২৬৬৭ ২৬৬৮ ২৬৬৯ ২৬৭০ ২৬৭১ ২৬৭২ ২৬৭৩ ২৬৭৪ ২৬৭৫ ২৬৭৬ ২৬৭৭ ২৬৭৮ ২৬৭৯ ২৬৮০ ২৬৮১ ২৬৮২ ২৬৮৩ ২৬৮৪ ২৬৮৫ ২৬৮৬ ২৬৮৭ ২৬৮৮ ২৬৮৯ ২৬৯০ ২৬৯১ ২৬৯২ ২৬৯৩ ২৬৯৪ ২৬৯৫ ২৬৯৬ ২৬৯৭ ২৬৯৮ ২৬৯৯ ২৭০০ ২৭০১

চৌড়গঞ্জ ৪৩৬
চৌদ ৮৪৯
চৌধুরীর লড়াই ১৪, ৮৮৩, ১১২৮, ১১২৩
চৌরঙ্গী ২৭৯
চৌরাচিত ১০৯৭, ১০৯৮
চৌরীশার ৪৫৯
চৌহান রাজা ১০৯৯
চাঁচুর ৩৬৮ ৩১৯, ৩২২

ছ

ছগলিয়া খড় ১ ২১
ছত্রনাচিত ১১২৯
ছত্রপতি ১০৭৫
ছাঁদাপাল ১১৩১
ছত্রমাপাল ৮৭৩, ১০১৩, ১০৩৩, ১০৩৭, ১০৪৯, ১০৫০
ছত্রেশ্বরী-মন্দির ১১৩৩
ছন্দক ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৪৮৯
ছয়গাঁর জাম মিজার খাঁ ৪৫৯
ছায় ঠাকুর ১০৫০
ছাপুর নগর ১০১৯, ১০৪৩
ছিন্নমস্তা ৯১২
ছুটি খাঁ ৪৫৩, ৯৭৭, ৯৭৮
ছেংখোলা ১০৪৩, ১১১৭, ১১১৯, ১১২৫, ১১২৯, ১০১১
ছেংফাছোগা ১০৮৯
ছোটমোগলপুর ১২, ১৪

জ

জগৎমল্ল ১১১৩
জগৎমাণিক্য ১০৩৮
জগৎরাম ৮৩৮, ১০৩৭, ১০৩৮
জগৎশেঠ ৮৪৩, ৮৫৪, ৮৬২, ৮৭১, ৯১৩, ৯৫৭, ১০৩৮, ১১৩২
জগৎসিংহ ৭৮৩, ৭৮৯, ৮০৮
জগদানন্দ ৭৩৪, ৭৩৫, ১০৬৫
জগদানন্দ বাহবলীন্দ্র ১১৩৩
জগদীন্দ্র রায় ১১৩৫
জগদীশ ৩৫৫, ৩৫৯
জগদীশ তর্কালঙ্কার ৫৫৯
জগদীশ্বরী ৯১ ৯৯
জগন্নাথ ১০৭৯
জগন্নাথ তর্কবাগীশ ৮৪৩
জগন্নাথদেব ৩৫৯
জগন্নাথ'মঙ্গল ৯১৯
জগন্নাথ মুখী ১০৩৪
জগন্নাথ মিশ্র ৬৯১ ৬৯৮, ৪৯৯ ৭৬২ ৯৮৫, ১০৮১
জগন্নাথপুর ১০৯৫
জগন্নাথ রায় ১০৭১
জগবন্ধু ভদ্র ৬৯১ ৭৯৯, ৭৯৭
জগমোহন ১০৩৩
জগমোহন পণ্ডিত ১০৯৯
জগাই ৭৯৯, ৭৬৭, ১১০
জগন্নাথী ১৩, ২৩৩, ৪১০, ৩৩৫, ৪৫৪ ৭৮৪, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০ ৮০৫ ৮৩৯, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৮, ৯৪৭, ১০৯৪ ১ ৪৩, ১০৯৩
জাজিনগর ১০২৩
জটাঁহারা ১১১৩
জটার মেউল ১১২৪, ১১২৯
জটাধর ৯, ২৯১
জতুগৃহ ১৪০
জবামেরু ৪৩৩
জন হুইলার মিল ৯৪১
জনার্দন কবিকার (কাশার) ৮৫৭, ১০৩৪
জনার খাঁ ৪৩০
জনরঞ্জ ১০৯৫
জনরঞ্জ খাঁ ৯১৯, ৯৩৮, ৯৩৯
জমির খাঁ গাজ ১০৫৫, ১০৯১
জয়কৃষ্ণ (মহাশ) ১১৩৩
জয়গীশ ৫৫৫
জয়দেবপুর ১
জয়েন্দ্র ৮৭৪
জয়দেব ৯, ৫০ ৯১ ২৯৬, ৩৩১, ৩৩৯, ৪১৫, ৪১৯, ৪৯১, ৫০২ ৭৪০ ৮৫৯ ৮৫৮, ৯০৮, ৯৮১, ১০৫০
জয়দেব রায় ১১৩৯

অযোধ্যা ২২৩
অরণ্যদেব ১০৬৮, ১০৮১
অরবিন্দ ১১১৩, ১১২৪, ১১২৮
অরবিন্দ ঘোষ ৪৮৯, ৮১৩, ৮১৩
অরবিন্দ মুখী ৪৮৪, ৮১৩, ৮১৭, ৮৩৮, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫
অরবিন্দবাজার ৯৪১, ৯৭১, ৯৭৪, ৯৮৩
অরবিন্দবাজার রোড ১১৪৪
অরবিন্দবাবু সেন ৯১০
অরুণ ২২৫, ১০৫১, ১০৯৮, ১০৯২
অরুণচন্দ্র ১১২৯
অরুণিমা ১০৮৩
অরুণী পাহাড় ১০১৯ ১০৮২
অরুণীবাজ ১০৮২, ১০৭৯
অরুণাচল ৩০৫
অরুণাভ ৩৪৪, ৫২৫, ৫৪১
অরুণুবর্ণিনী ৮৯১
অরুণী কলম ৯২১
অরুণেন্দু ১০১৩
অরুণী ১১১৩
অরুণাধিকা ১০১৩, ১০৪৫, ১০৪৮, ১০৪৪
অরুণাধিকা বন্ধ ১০১৩
অরুণাম ৬৩
অরুণাম্বর বর্মণ ১১১৩
অরুণেশ্বর ৫৫১
অরুণিমা ৮৭৮, ১০৮৭, ১১০১
অরুসেন ৪৮৯, ৪৯১, ২৮৪
অরুসেন বিশ্বাস ৫৪৭
অরুসোয়ান ২০৬
অরুন্ধতীপাড় ৪১৯
অরোবেদী ১০৭২
অরুণ ৮৩
অরাবন্দ ৬৬৫ ৬৯৭, ৭৪০, ৭৪৫, ১০৮৭, ১০৮৭ ১১৩৭
অরাবন্দ রায় চৌধুরী ১১৬৫
অরাপীড় ২২৫ ২২৫
অরাবত ৬, ৭, ১২, ২২, ২৪, ২৫ ২৯, ২৭ ৩২, ৪০, ৪১, ৪৩, ৫৬০, ২০৬, ২২৭, ৬৫২, ৭৮৬, ১০৫১
অরিশা (দেশ) ১১৬৬
অলটুজি ৫৩৫, ৬৫৮
অলটুজি বীথি ১১৩৮
অলপাইগুড়ি ২৮, ৫২
অলপুরী ১০১৫
অলেকার সরকার ১১০৬
অল্লেল ১১৫০
অল্লেবর ১০৭৬
অল্লেবর ১১৫
অলীক উৎসব ৯৩০
অলোরাবাদ ১১২৩, ১১২৮
অলোবাট ৫১৬
অলোরন ১১৮০
অলোক ৯১ ১৯৫ ১৯৭
অলোকরঞ্জন ২২১
অলোকবাণী ৭৩৬
অলোকবালা ২৯৫
অলোকিক ৪২২
অলোকদেবী ১১০৭
অলোকীনাথ ১৬১
অলোকীনাথ (রাজা) ১১৩২
অলোকী বিদ্যার ৮৪৫
অলোকীনাথ ৮৫২, ৮৬০, ৯১৭
অলোকনাথ মিত্রা ৯৫০
অলোকরঞ্জন (নবাব) ১০৯১
অলোবিন্দ ৪৫৬
অলোম ১১ ৭১ ৮৩, ২৩২, ৩৩৭, ৯৮৭
অলোর বী ৮৩৯
অলোর বীর অলোবিন্দ ১১৫০
অলোক ৫২, ৬১
অলো ৭১, ৮২ ২২১, ২৩২, ২২৫
অলোবন্দি ২০৬, ২৩৭, ৮৪২
অলোয়ান বী ১০৩৫
অলোয়ান বী সৈনি ১০৩২
অলোবি ১৫১
অলোবান ৮৫২
অলোয়ার উত্তর অলোবিন্দ ৪৫৯, ৭৮১, ৫১৬-৫২৬
অলোয়ার নাহ ৬৯০
অলোয়ারী পাহাড় ১০৯০

কালানুক্রমিক ৪১৪ ৪১৫, ৫০৪ ৫০৮ ৫১০ ৬১৫ ৬২৭ ৯২১
কালানুক্রমিক উপেক্ষাহ ৬৫৯
কাহারবা ৬৭২ ৭৪৩, ৮০১, ৮০৪, ৮১০ ৮১১, ৮১৭ ৮১৮ ৮২০, ৮২১, ৮২৫, ৮২৫, ৮২৯, ৮৩৯, ৯০৫, ১০০০, ১০৩৬, ১০৭৯, ১০৯৪
কাহারবেরা (কাশার) ৮৪৭, ১০৯৯
কাহান খাঁ ১০৯০, ১০৯১
কাহালার পাড় ৮৪১
কাহ্নবী ১০৪৯
কাহ্নবী দেবী ৪২৮
কিস্তারি ৫০৪ ৬৩০, ৬৩৯
কিসমিস ৬১১, ৬১৮
কিনপাহ ৮৪১
কিসাবপুর ১০৩১
কিসমপুকুর ১১৩৯
কীরক ৫৯৩
কীরগোপায়ী ৩১১, ৩১৩, ৩১৫, ৭১৭, ৭২১, ৭৫৪, ৭৫৫ ৭৫৯, ৭৫৮, ৭৫১, ৭৫৩, [৭৫৫], ৮৫৪, ৮৯১, ৯৫৬, ১১১৪
কীরদা ১০৫৪
কীরপন্থা ৯২
কীর্তি ১০৪৯, ১০৭০
কুলবিদ্যা ১০৪২
কুলীবিদ্যা ১১২১
কুশা খাঁ ৬৫৩
কুসুমনদী ৩৬৯
কেকবি ১২৯
কেনোফোন ৮১৪
কেলটিস্মা ৯৩৪ ৯৩৬
কেমন্ ৮৩৭
কেরেমি কেল্লাম ৯৫০
কেলাসুচিন ৭৫১
কেহাজ খাঁ ৮১৪
কৈন ৬, ৭ ৯ ১০, ২০, ৪৫, ৪৭-৪৯, ৯২, ১২৫, ১২৮ ১৩৪, ২৯৯ ৩১৯ ৪৭৮, ৯৪৬, ১০৭১, ১১০৫, ১১৫২
কৈশুদ্দিন ১০৬০
কৈলাসাহাড় ১০৭১
কৈমিনী ১৭৭
কোড়ারাজল মন্দির ১১১৭
কোহান ডি আর্ক ১০২০
কাহানপুর ৬৯২
কোপারিকিয়া ৮৫৩
কোপিয়লাস্থ ১০০০
কোবপুর ৬৩২
কাবস্ত্র ৩০১
কাবলাস ৬৭১, ৭৫১ ৯৯৩
ক্রমবী ১১৯
ক্রমবী মিত্র ১১
ক্রামাবন্ধ ১১৩৩
ক্রান্তবৃত্তী ১৫৩

খ

খাদি ২১৯
খাসনা ১১০
খাদিখণ্ড ৪, ৭২০, ৭৪৪, ১১০৪
খালকড়ার দীঘি ১১০৭
খালকাটি ৮৩৩
খালসা ৮৫০
খিজারি ৯৭৯, ৯৮৩
খুনো ৯০৩, ৯৪২
খুরকুম খাঁ ৮৪৭

ট

টঙ্কিন ৭৪
টঙ্ক ৩৩
টেশোগ্রাফি ৯৭৪, ৯৯৫
টিয়ান ১৪৮
টেলেফি ১০৫, ১০৭ ১০৮
টিপা ১৩৯, ১৪১
টাবলা ১০৪১
টীকা ১০৪৭, ১০৪৮
টীকা ১০৪৯
টপ্পা ১০৮০
টিপ্রাতারা (ত্রিপ্রাকাশ) ৩৭, ১০৪১
টিবেটো-বর্মন ১২৩
টিমাটি ৯২৪

ট্রেইন, হেনরী ৯১১

টুর্ণে ১৩২

[illegible] ১৩৩

[illegible] ৫৮

[illegible] ৯২

[illegible] ৭৮

[illegible] ৯

[illegible] ৩১

[illegible] ১৩১

[illegible] ৯৮

[illegible] ১৩৯

ড

[illegible] ৬৪৩

ডাইয়ার ১৪২

ঢাকা ১, ৯৯, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২৫, ১৩১, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২,

তানিব আলি খাঁ (নবাব) ১০২১
তান্ত্রিক ১২৫
আন্দিকতা ৩৬৮
তারাদেবী ৪৪৯
তামিল ৫৩, ৮৬, ১২৩, ২৪৪, ২৪৮, ৩২৯, ৩৪০, ১১০৪
তাম্বুলি ১১০৪
তাম্রফলক ১০৫৫, ১০৬৮, ১০৭৯, ১১০০ ১১০২
তাম্রলিপি ৩৭৩
তাম্রলিপি ৩৭৩
তাম্রলিপ্ত (তাম্রলিপ্তি) ৯, ১৯, ২০ ৩০ ৪৪, ৪৭, ২২৪ ১১০০, ১১০১, ১১০৫, ১১০৩
তাম্রশাসন ৪৫৯, ৪১৫, ৯৬১ ১০১১, ১০১৫, ১০৪১, ১১৪৪, ১০৪১ ১০৪১, ৭৪৪, ৯০১৫, ১০৩৪, ১১০১, ১১০৪, ১১২৫
তামিক ১০৪৩
তারকচন্দ্র রায় ৫৬৯
তারকনাথ রায় ১১৩৬
তারপাশা ২৮৯
তারী ৮, ৯
তারাপাথ ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৭১, ২৮৮, ২৯৯
তারাপতি ২২৭
তারাসুন্দরী ৮৬৬
তারু ২০৬
তালতলা ১১৪০
তালপট্টি ১১২৯, ১১২৭
তালিব আলি খাঁ (নবাব) ১০৯২
তালিম ৮১৫
তালুক ১১১০
তাহিরপুর ১১০৭
তিথিবিদ্যা ২২৩
তিলবহুলী ১০৫, ১৩৭
তিলবাড়ি ৯৪০
তিলপুর ৯৩০
তিলক ১১, ৩৫, ২৪১, ২৭৫, ২৮৯, ৩০৭, ৩১৩, ৩৯২, ৭৭২
তিলকদাস ৫৪, ১১০১
তিলকবন্দর ১৭১
তিলকচন্দ্র ১৭২
তিলকাচন্দর ২১১, ৫৪৭
তিলোত্তমা ২২২
তীর্থঙ্কর ১৮
তিমির ৮৮
তীর্থযাত্রা ৩, ৯, ৪০, ৫১, ৩৪৫, ৭১৫
তীর্থযাত্রা ৩৩৩
তুঙ্গবন্দ ১০৮২, ১০৮৩
তুঙ্গভদ্রা ১০১১
তুলসী ৯৩৯
তুলসীদাস ৯,৮
তুলাদান ২০৭৩
তুলাপুরুষ ১৫, ১৯০, ৪৪৪
তেজপুর ১১৩৭
তেজাদিত্য ৬১৯
তেজাদিত্যবর্মন ৬১৯
তেজপুর ১০৫১, ১০৬৪
তেজাদিত্য ১ ৪৩
তেলেঙ্গানা ৮৪১, ৮৪৩, ১১৫৩
তেলেঙ্গু ৫৪, ১৪১
তৈতন ৫৮৫
তৈত্তিরীয় ১০৯৪
তৈত্তিরীয়ক ১০১৩
তৈমুর লঙ্গ ১০১৩
তৈলকল্প ২৯৭
ত্রৈলোক্যমল্ল ৬৪৩, ৭৩৩, ৭৮৯, ৮০৫, ৮১৩, ৮২১, ৮২২, ১১০৯, ১১৪৮
ত্রৈলোক্য চন্দ্র ৬১৯, ৬১৯, ৮৪৭
ত্রৈলোক্যনাথ ৯০৯
ত্রৈম ১২০
ত্রিপাঠা ২২৪
ত্রিপিটক ৩৩৩
ত্রিপুর ৬, ৫২
ত্রিপুরবন্ধ ১০১৩
ত্রিপুর-রাজবংশ ১০৪৪

ত্রিপুরা ৩, ৯, ১২, ১৩ ১৫ ১৯, ১৭, ১৮, ৩১, ৫৩, ২১৪, ৩১৩, ৪১২, ৭৪১, ৭৮৩, ৮৫৩, ৮৫৪, ১০১১, ১০১২, ১০৪০ ১০৭৩ ১০৭৮, ১০৮৫, ১০৮৪, ১০৮৮, ১১০৭ ১১৩৮ ১১৭৮, ১১৮১, ১১৯১, ১১৯৩, ১১৩৮

ত্রিপুরার খাল ১০৭১

ত্রিপুরার জঙ্গল ৯ ৩১

ত্রিপুরাসুন্দরী ৫৮১ ১০১৯ ১০৪৩

ত্রিপুরেশ্বরী ছাপা ১০৪৯, ১০৪৮

ত্রিফাঙ্গুড় ৭৩১

ত্রিবিক্রম নারায়ণ ১০৩১

ত্রিবেণী ১০১৪, ১০১৮, ১০৪৩, ১০৫৩

ত্রিবেদী ৩৪, ১১৪০

ত্রিভুবনপাল ২৪৪

ত্রিলোচন ৪০, ১০১৮, ১০৭৩, ১০৭৭

ত্রিলোচনবঙ্গ ১০১৯, ১০৭৭

ত্রিশঙ্কু ১৫৩

ত্রিস্রোত ১৮, ২৯৪ ৭১৫ ৮১৯

ত্রৈলোক্যচন্দ্র ১১২৩

ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত ৯৩৮

ত্রৈলোক্য নাথ পাল ১১০৩ ১১০৭

ত্রৈলোক্য সুন্দরী ২৮৪

থ

থাকুর ৫৩

থানবিহার ৩১৩

থানাদার ১০২৩, ১০৪৩, ১০৪৫

থানাদার ১০২৫ ১০৫৩, ১০৪৮

থিতুক ৫৩

থিরস্থক হিউয়ান ৩১৭

থেড়ি ১১

থেরাপুটিক ২৪৩

থোসিন বিহার ৩১৭

দ

দক্ষ ৪১, ২৪১

দক্ষিণখণ্ড ১০১৩

দক্ষিণাপথবিজয়পুর ১১২৪, ১১২৯

দক্ষিণেশ্বর ১১৭১

দক্ষমহোৎসব ৭২৩, ৭৪৮

দক্ষযজ্ঞ ২৯৪, ২৯৮

দক্ষযজ্ঞবিধ্বংস, ১০২৩

দক্ষাবেশী ১০৫৩

দক্ষেশ্বর ৩৫৩

দক্ষোৎসব ১০২১

দক্ষ রায় ৩১৩

দক্ষৌহ ৩৫৩

দক্ষৌহযাগ ৩১৪

দক্ষিণ ১৫, ৪৭

দক্ষিণ ১৮৫ ১৯ ৫১২

দক্ষিণী ১০২, ১৩৮

দক্ষিণায় ১০৬

দক্ষিণায় রায় ১১৩৪

দক্ষিণেশ্বর ২৪৯, ২৫১, ২৫২

দক্ষেশ্বরী ৭৭১ ৮০৫

দক্ষাক্ষ খাঁ ৩

দণ্ডেশ ৮০৪, ৮০৫

দণ্ডীবাহেশ্বর রাজা ১১৩৩

দত্তপাণি ২৫৭, ২৫৮, ৭৫৩

দত্তাত্রেয় ৩৫

দত্তাহাল (হলদিঘর) জমিদার ১১১৮

দত্তাহালিয়া ৩৮৩, ১০৫৩

দত্তকুমারচরিত ২৯৩

দত্তকুলা ১১২

দত্তবাহিনিকা ১১৩

দত্তবন্ধ ২৩৯

দত্তাত্রেয় ২০৮

দত্তবন্ধ ২০১

দাইলাম ৫৫১

দাউদ খাঁ ৫২, ৪০৯, ৫২৫, ৫৪৩, ৬৪৯, ৬৫১, ৭৮০, ৭৮৩ ৭৮৯, ৮০১, ৮৪৭, ১০৩১, ১০৭৮, ১১০৬

দাউদ ১১০১

দাক্ষিণাত্য ৭২৯

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস ১৫৩

দাক্ষাকর্ণ ৭৮০

ধাত্রীগ্রাম ৯২৪
ধাম পী ৬৪৪
ধামরা ১১২১
ধারাকরী কৌমুদী ১৫২
ধারব ৪০, ৫২
ধারশী ৩১৮
ধার সাগর ৪৮০, ৪৯০
ধানাশ ফকির ৮৭৮
ধামোদর ১২৩, ১২৫
ধামোদরপুর ৯৪৬
ধামোদর সিংহ ১১১৭
ধায়তাশ ৪৫০
ধারা ৮২৮
ধার্জিলিং ১৯, ২৮
ধার্মরণী ১০১০
ধামরা ৯০৩, ৯০৭, ৯৫৮, ১২১, ১১৪০
ধাস্ত ৯৩৪, ৯৩৯, ৯৮৭, ৯৭২
ধিওগাম ৯৫২
ধিকারের দুর্গ ১০৫৯
ধিগম্বর ৯, ১৯১, ৩৬৯, ৫৫৭
ধিগ্বর্ণী ৬৮২
ধিরমাগ ৬৫৪
ধিরাজপুর ২৮, ৯২৮, ৯৩৬, ৯৪৭, ১১৩৬, ১১৩৮, ১১৩৯, ১১৪০
ধিরায় ২৪৩, ৫৭৯
ধিরারপুর ১০৮৯
ধিরোক ৬৯, ২৩৪, ২৮৪, ৪৩৮
ধিরাসিংহ ১০৩৪
ধিরাপুর ১০৭৯, ১০৭৮, ১০৮০
ধিলীপ ৭৮২
ধিলীপ রায় ১৯, ৪২৭
ধিল্লী ৪২৩, ৭৮৯, ৭৮৭
ধিশা ১০৫৬
ধিশাপুর ১১৩৯
ধীক্ষিত ২৮
ধীমাপাতিয়া ১১৩৬
ধীষিত্তি ৬৫৫
ধীমধন্ধু মিত্র ১১০১
ধীমন্দিংহদেব ১১১৫
ধীমন্ত ঠোর ১১৩১
ধীশচন্দ্র ৮, ১১ ১৫ ১৯ ২৩৪, ৩৫৫-৩১৭, ৩৪৪, ৪৫৭, ৪ ৫, ৪৮৮ ১০৫ ১১৯ ১৩৪ ১১৪০
ধীশুখ্রীষ্ট ৮০১
ধীলিপ সিংহের গড় ১১৩৯
দুর্গা ৬৭৩, ৮১১
দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৬৫৫
দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ১৩৭, ২৬১, ৮০৫, ১১৩৬
দুর্গাপুর ১০৫৩, ১১৩৮
দুর্গাপ্রসাদ বসু ১১৯, ১১৭ ১১৮
দুর্গামণি উজির ১০১৬
দুর্গামোহন দত্ত ১৪১
দুর্গেশনন্দিনী ৪৩৬
দুর্জন সিংহ ১১১৫
দুর্জয় ১০৫৪
দুর্জয় খান ৪৮১, ৮৮১
দুর্জয় দেব ১০৩১
দুর্যোধন ২৩, ২৪, ৭৩, ১৪৮, ৬৩৪, ৪৩৫, ১০৬৭
দুর্লভনারায়ণ ১০৩০, ১১৫০, ১১৫১
দুর্লভনারায়ণ সূর ১৩
দুর্লভ মল্লিক ২১৩
দুর্লভরায় ৮৬৩, ৮৭১, ৮৭২, ৯৫৬
দুর্লভ রায় ১০৩৬
দুর্বাসেত্র ৩১, ১০১৬
দুলারী দিঘি ৬৪০, ৬৪২
দুলাল ৮০৪ ৮০৬
দুষ্মন্ত ১০৫২
দৃঢ়মতি ১০১১
দেবকীর্তি ৬১৩
দেবগড়াই ১০১৮, ১০৩৪
দেবগ্রামণী ১১৩৪
দেবদেব মন্দির ৯৪৯
দেবধানী ধাস ৯১০, ৯৪০
দেবনাগ ১০৭৮
দেবপালী ২৫২
দেবকোট ১১৩০
দেবরাজ ২২১, ২২২

দেবগিরি ১০৫৪
দেবগুপ্ত ৪১৯
দেবদত্ত ৯৪
দেবপাল ২৫১, ২৫৩-২৫৮, ২৫৯, ২৪৭, ১১১৪, ১১১৮
দেবভবী ১০৫৩
দেবভোগ ৫৪৪, ৫৪৭
দেবমার্গিক ১০২৯, ১০৩৩
দেবরাজ ১১০৪
দেবলগিরি ৩৫
দেবানন্দ ১১২১
দেবী ৮৪
দেবীকোট ১১৩৮
দেবীপুরাণ ৯৩
দেবীবর ৯০৭
দেবীবরের গীতিকথন পালা ১১০৫
দেবেন্দ্র ৩১৩ ৩১৫
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৬৩
দেবেন্দ্রনারায়ণ ১০৭৫, ১০৭৬
দেবেন্দ্র সিংহ ১০৩৭, ১০৪৮
দেয়াং ৮৩
দেহারা ৬৩৩
দৈত্যারণ্য ১০১৬
দৈত্যারায়ণ ১০৩০
দৈবপুত্রী ৪১৩
দৈশা সিংহ ১০৪০
দোরোপরগণার যাদব ১১০৭
দোলমঞ্চ ৯৫৬
দোহাল দীপি ১১৩৮
দৌড়া পাথর ১০২৮
দৌলত কাজি ১৬, ১৭
দৌলতপুর ৫৫৪
দৌলতাবাদ ৬৬২
দৌলৎ গাজি ১১০৩
দ্যুমৎসেন ৪০১
দ্রাঘনি ২৩৮
দ্রবময়ী ৯১০, ৯১১
দ্রাবিড় ১৫৮, ২৫৭
দ্রুপদ ২৩

ধ

ধনদেব ১৩১
ধরণং সিংহ ৮৮১
ধরণীধর ১৫, ৩২৮, ৯৭৩, ৯৮৫, ১১০৫
ধর সিংহ ৫৩
ধর্মমঙ্গল ১৩, ৩৯০, ৯৭৩, ১০৫৩, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬৪, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৬৯
ধর্মরাজিকাস্তূপ ১০১৩, ১০২৯
ধর্মস্তূপী ৫১৮
ধর্মেন্দ্রনারায়ণ ৮১৯
ধর্ম ১০
ধর্মদত্ত ৩০৩
ধর্মদাস রায় ১১৮০
ধর্মপদ ১৫৩
ধর্মপাল ১৫, ২৩, ৬০, ৬১, ২৪৭, ২৫৩-২৫৫, ২৫৬, ২৭০, ৩০১, ৩১৭, ১৬৪, ১৯৭, ৯৭০, ১০৫৩, ১০৫৫, ১০৬৯, ১০৮৪, ১১০১, ১১২৭
ধর্মপালদেব ১১২৯
ধর্মপ্রজাস্থিতি ৪৭৪, ৫০৭
ধর্মমঙ্গল ১৩ ৫১৭, ৯২৪, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭৫, ৯৮৩, ৯৮৯, ১০৬৩, ১০৫০

ধর্মমঙ্গল কাব্য ১১০১, ১১০৫
ধর্মযাত্রা ১১০, ১১১
ধর্মযাত্রিকা ১০১৬, ১০২০, ১০৩১, ১০৩৮ ১০৪৪, ১০৪৯, ১০৭৯, ১০৯১
ধর্মরক্ষিত ৩০৬
ধর্মশাস্ত্র ৩৩৪-৩৪০
ধর্মসাগর ১০৪০
ধলভী ১০৮০
ধরেশ্বরী ৪১৭, ২৮৩, ২০২, ৯৩৬
ধাত্রার ভুরো ১১০৩
ধাড়িমল ১১১৬, ১১১৮
ধাতুপাল ২৩৮
ধাতুসেন ৮৩
ধামরাই ধামরাল ৯৮, ৪১৯, ২৩৪, ১১৪০
ধারাধারকল্পা ২৪৮
ধীবর ১১৪০
ধীমতসেন ৩৪, ২১৮, ২৮৩, ৯০৭
ধীমান ১১, ১৫, ১৯, ৪০৭, ৪৪৯, ৬০৪, ১০১
ধীরনারায়ণ ১০৫৬, ১০৬৯
ধুলিজুরার ১০৯৪
ধুবঘাট ৭৯৩
ধুরন্ধাট ১৯৩, ৫৫২
ধেরপুর ৭৮৩
ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ৮১৬, ১০৭৬
ধোপার পাট ৯৯৮
ধোপার পাথর ১০৪৩, ১০৪৪
ধোয়ী ৩৬৯, ৪৯১, ৪৯২, ৫০৬, ৫৫১
ধৌম্য ২৫
ধ্রুব ৮, ৯১০
ধ্রুবসাধিনী দেবী ২১৩
ধ্রুবাদশ ৬০৭
ধ্রুবের উপাখ্যান ৯৭৩
ধ্বজঘাট ১০৪৭
ধ্বজমালিকা ১০২৯

নকুল ১৭৮
নক্ষত্রসিংহ ১০৩৭
নগেন্দ্রনাথ বসু ৪৭, ৭৮, ১২২, ২৩৩, ৫৩৩, ৬০৮, ৯০৩, ৯৩১, ১০৩১ ১১৩১
নগ্নজীৎ ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৯ ৭২, ৬৮১
নচিকেতা ৯৯
নচর আলি ১০৩৭
নটবর ২২৩
নড়াইল ১১৩৭
নন্দকুমার ৮৮৫ ১,২০
নন্দন সাহী ৯৩৭
নন্দবংশ ৪৪, ১৩৬-১৪০, ১৪১-১৪৭, ৭৮৩
নন্দরায় খাঁন ১৭৯
নন্দলাল দে ২৩, ৩৩, ৬৫, ৫৭
নন্দিন্ ৫১৪
নন্দকিশোরী ৬২৫
নন্দীকেশ্বর ১০৮৪
নবদ্বীপ নবীন ১৯, ৮৭, ৩১৫, ৩৪৫ ৩৪৬, ৪৭৮, ৫৪১, ৯৭৭, ৭০৩, ৭৬১, ৭৬২ ৭৫৮, ১০৮১, ১০৮৭, ১০৯০, ১১০৮
নব ব্রাহ্মণ ৪৭, ৫৪, ৯০১
নবরত্ন ১৫১
নবরত্ন মন্দির ১১০৭
নবিপত্র ১০৫
নবীন মহম্মদ খাঁ ১৫৩
নবীনচন্দ্র ভদ্র ৩১
নবীনচন্দ্র সেন ৫৯৪
নবীন সিংহ ১০১৮
নবাবগঞ্জ ১৪ ৩৫৩ ৩৫৪, ৩৫৯
নমুচি ১৫১
নরক বেদী ১০৫৩
নরনারায়ণ রায় ৭৬৮
নরক ৪, ৭, ১২, ২২, ২৯, ৩৮, ৪১, ৫৩, ১৫৪, ২-৩, ২২৭
নরকভূম ৮০৭
নরকদর্পহা ১০৫৪, ১০৬৯
নরক রাজা ১০৫০, ১০৬৭
নরনারায়ণ ১০৫১, ১০৭০, ১০৭৩, ১০৭৫, ১০৯১
নরোত্তম রায় ১১০৪, ১১০৫
নরেন্দ্রনাথ ও কবর ৯২৭

মহলানবিশ ১৭
মহাপাত্র ৪ ১ ১১০ ৩১
মহাপাত্র ২৩১, ৩০২ ৩০৪
মহাবংশ ১০৫৭
মহাসিংহ ৬২৪, ১০৯৭, ১০৯৮
মহাস্থবির ৭৪১, ৭৪৩, ৭৪৭
মহাস্থবির চন্দ্রমণীর ভক্তিরত্নাকর ১১০৮, ১১১৪
মহাস্থবির সরকার ৭১১, ৭১২, ৯৯৩, ৯৯৪
মহিষেরগুল্পী ৩১৩
মহিষাবাথান ১০৬০
মহেন্দ্রনারায়ণ ২৮৯, ১০৭৩
মাণেক্যধাপিকা ১০৩৭
মাইসুম ২৭, ৮০৪ ৭৪২ ৭৪৭ ৭৬৮ ১১২০
মাকোয়া ইস্কুল ১১০৩
মাকোয়াপুরিলয়া ২১৩
মাকো কাথব ছুর্গ ১ ৬৮
মল ২৪৪
মলঙ্গা ৭৪ ৭৭৪, ১ ৩৯
মলাক্কা সভাগা ৮৮৩, ৮৪৬ ৮৪৪ ৮৪৬
মল্লিকাবাস ভট্টশালী ৭ ৯ ১৬, ৩৪ ২২২ ২২৩ ২২৭
মল্লিকাবাস মাস্তাল ৮৯১
মল্লিকীরঞ্জন সেন ২৮০
মশুরকালন ২৬১, ৯০১
মশিপুর ১১৪৭
মসজিদ পীর ৬৩৪, ৬৪০, ৯১৭
মসজিদ মাসুদ ৬১১, ৬১৩, ৬২৭, ৬৬৮, ৬৬৯
মসিয়ে ৬৫৮, ৬৫৯
মসিয়েঁ অন ৬৪৯
মসিয়া দাহ ৯৭৭
মহু মাসুদ ২২৯
মাইটি এরাণ্ড, ১১২
মাকাবাঙ্গ ২৫৪
মাঁকেদাড়ী ১০৪৩
মাকুই ৯২৫
মাগ ২১২
মাগকেশর ৩৪, ৩৫
মাগ-চো ৩১০, ৩১৩
মাগবন্ধু ২১২
মাগবাট্টি ২৫৫
মাগাধিপ ৩৩৭
মাগাধিপ ১০৮২
মাগা সঙ্কেত ১০৭৩
মাগা পাহাড় ১০২১
মাগাপ্রদেশ ৩০১
মাঙ্কিমুখিয় ৬১৭
মাঙ্কির আরাকান ৬৪১, ৮৪২
মাটোর ১১৩৫
মাড়ুয়াধাম ১১৩৭
মাথা-দৈত্যিকা ১১৯
মাথবাই ১৮১
মাদিরপাম ৮৫৩
মাদ্রক ৪২, ১৫১
মাদ্রাজ ১৭৫ ১১৪০
মাদ্রাজ ৯৯১
মাদ্রাজপত্তি ১১৯
মাধবাচার্য ১০৫৯
মাধব ৫৪, ২৫, ১৬১, ২১৪, ২৩৮ ৭৩৩, ৯৫৭, ১০৮
মাধব-পঞ্চকুড়া-মাধব ৪১
মাধবীলতাকুঞ্জ ১০৭১
মাধবেন্দ্রপুরাণ ১১২১, ১ ৭১, ১১৯৮
মাধবীলতা ৩৫, ৮৩৩,
মাধবেন্দ্রপুর ১১০৪ ১১০৫, ১১০৬
মাধাল ইসলামকর্মী ১০৭২
মাধাবেশ ১০৬৩
মাধাল বেব ১৭৪, ১৮৩, ১৮৮৫
মাধবেন্দ্র ১০৬৭
মাধাব পাল ২৫৮, ২৫৯
মাধাব বঙ্গ ১০৪৩
মাধবেন্দ্রপুর ঐতিহ্য পাল ১১০৪, ১১০৫
মাধবেন্দ্র মন্ত্র ৮১৮ ১০৭১
মাধবেন্দ্র ১৪৭, ১৮৮

মারোক্কি যন্ত্র ৭৩৩
মালঞ্চা ৮, ১১, ১২, ৮৭, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৩৪, ২৯৯, ৩০০, ৩২৯, ৪৪৭, ৪৮০, ৯৮৬, ১১২৮
মল্লিকা ২৪১, ৮৫০, ৮৬৭, ৮৯৮, ১১৪০
মাংসোগ্রাম ৩০০
মাসিক (মাসীক) ৫৪৩, ৫৫৫
মাসিক উদ্ভিদ ৬১৩, ৬১৯, ৬৪৩
মাসিক মতমত ১০৪০
মাহাত্ম ১০৬৩
মাহাত্মপল্লী ৫২৮
মিউটেন ৯৫৯
মিত্রেশীখণ্ড ১০৯৭
মিত্রক ৫৯৯
মিত্রবোধ ঘাট ১৩৬
মিত্রাবউদ্যৌলা ১১৩৫
মিত্রাম বাহাদুর ৯০৪ -
মিত্রাযুলদুলক ৮৬৬
মিঠাই মোর ৯৯৩
মিত্রাবেশ ২০, ৪৪, ৬৫৩, ৬৮১, ৭০৭, ৭১০, ৭৯১, ৭৯৯, ৭৯০, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৪১, ৭৪২, ৭৫৭, ৭৬৫
মিত্রাবেশ সোম ১৭৮ ১৭৯, ১৮০
মিত্রানন্দ ঘাট ১৯৯
মিথিলাপতি ৬০৩
মিদুদায়ু ৯৪৩, ১০১৩
মিথেষিতা কবিতা ১০১১
মিশ্রতা ৯৪৮
মিশ্রবাস ৭৯৭
মিশ্রাই ৬১৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৪
মিশ্রাচারা ৬৭৮
মিশ্রাহর বী ৬৩৮
মিহরুল ৯৩
মিহরুলনাবক্ষ ১১৩৪
মিহরুলেশ উষা ১০, ৩৬২
মিশ্র ব্রজাতিপুত্র ১০৩, ১০৮, ১২৯, ১৩০
মির্জাপুর ২০১
মির্জর নারায়ণ ১০৩৭
মির্শ্রাই ১০৬৩
মির্শ্রাই শিব ১০৮৩
মিশ্রমঠ ৪১, ৪৫, ৭০
মিশ্রবাড়ী ৮১২
মিশ্রক ২১
মীনিবিজ্ঞান ২৫৩
মীনিলাই ১৯০
মীনাক্ষ ৩১, ১০৪৩
মীনাক্ষি চক্রবর্তী ৫৫২
মীনাক্ষীদেব ১১০৭
মীনাক্ষর ৬০৫, ৮৬২, ১০৪৩
মীনাক্ষর চক্রবর্তী ১০৮১
মীনাক্ষর রায় ১১৩৪
মুইটা ৮৩৮, ৮৬৫
মুকবেহা ৯৬১
মুকবিধি (ণ্যাস) ১০৭৮, ১০৮৯
মুকলা ১০৩৬
মুকলা বী (মবাহ) ১০৯১
মুকলাবাদ ৮৭২, ৮৭৩, ৮৮৯, ৯৬৪
মুকাকলা ৪৯৫-৪৯৭
মুকেশমাবাদ ১০৭৩
মুলিয়ে রেখ ১১১৩
মুলিয়ে মূর্তি ১১২৪, ১১৪৮
মুসিংহ রায় ৭৩৩, ৭৩৪
মেখাপত্রু ৪৯, ৯০
মেড়াবেড়ী ৭২৫, ৭৩৬, ৭৯৫
মেরাবত ৬৬৩
মেরাপুরিব (পীঠ) ১০৯৯
মেরুকোনা ১০৪৫
মেপাল ১১, ১৯, ৭১৫, ৭৯৮, ৮১৫, ৮৪৫, ৯৬১
মেপালী শক ১৪৮
মেথিলাথ ৯
মৈত্রক মহাপদ্ম ৫০৫-৫১২
মৈত্রিবাহন ৯০১
মোটর মর্সডিজ ৬৫০
মোরাবালি ১৪, ৮১২, ১১১৯
মোরাবালি পোস্টঅফিস ১১১৯
মৌপাল ১০৪৪
ম্যাগনোলিয়া ৩৭২

প

পঞ্চপাণ্ডব ৭৩৩
পঞ্চপুরিয়া ৩৬৩
পঞ্চবটি ১০৮৪
পঞ্চমৌড়েশ্বর ৭, ১৯, ২১, ৩৩, ৩৬৭
পঞ্চচূড়া ১৪৭
পঞ্চতত্ত্ব ৯৭২
পঞ্চতন্ত্র ১০৩
পঞ্চরোলা ১০৩১
পঞ্চরত্নমেলা ১০৩
পঞ্চাধ্যায় ১১১৩
পঞ্চাল ৭৭
পাঁচু ঠাকুর ৮০২
পটাঙ্গ ২৪
পটুয়া ৩২২
পঠান ১০৮, ১৩১, ১৪২
পাঠান ৪৩ ১৭১ ১০৭১
পতঞ্জলি ৯১৭
পতিব্রতাধর্ম্মী নারী ১১১৩
পত্রলেখা ২৮০, ২৮১ ৩১৯ ৪১ ১৬৬
পত্রকোল ২৩৮
পত্রভঙ্গ ১৩৪
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ১ ৮৬
পদ্মপাত ৩১৮
পদ্মনাভ রাজা ১১০৬
পদ্মপুরী ২৩৮
পদ্মপুরাণ ৩৩৪, ৯৫৭, ১১৩৩, ১১২৪, ১১২৭
পদ্মপ্রভ ৩১৩
পদ্মবজ্র ৩১৮, ৩৩৮
পদ্মা ১৩, ৫৮, ২৪৪, ৯৯৭, ৯০৫, ৯০৭, ১০৯, ৯৩৪ ৯৩৭ ১০৫১
পদ্মাকী ৪৪১
পদ্মাবৎ ৭৮২
পদ্মাবতী ৪৭৩, ৪০৪, ৪০৯, ৪২৩, ৯০৮
পদ্মিনী ৪৭৪, ৪৮৮, ৭৩১, ৭৩৩, ৭৩৪
পদ্মাতীর্থ ১০৮২
পদ্মপথ ১০

পদ্মাক্ষ ১০৩
পরমৌড় ৭৫১, ৭৬৮, ৭৭২, ৭৭৩, ১৩৪, ১০০১
পরমৈশ্বর ৮০৪
পরম ভট্টারক ২৮৫
পরমহংস ধর্ম্ম ৭১৪, ১১০৭
পরমানন্দ ব্রাহ্মণেন্দ্র ১১৩৪
পরমানন্দ সেন ৭২৬
পরাশর ২৮৫
পরমেশ্বর কবীন্দ্র ১১১ ১৭৬
পরমেশ্বরী ১০৩৩
পরগনাত ২৩ ৪৪, ৪৫ ১২৩, ১৪১, ১৪২, ১৯৮
পরাজিত রাজ ৭১৮
পরাশরী ৬৫৩, ১৭৭
পরাশরাধারে ১০৪৭
পরিষাদ কেশব ২১৫, ২২৩, ৭১৬
পরীক্ষিৎ ১০৪০, ১০৭৪, ১১০৫, ১১০৬
পরী বানু ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৪, ৮৩৫
পর্ণাঢ্য রেখা ৪১
পর্ত্তুগীজ ৭৩৩, ৭৩৬, ৭৮৭, ৮১১, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২৩, ৮৩৩, ৮৩৪, ৯২৬
পলতার মৌজা ১০৩৫
পলাশী ৮৫৭, ৮৬৩, ১০৫২
পরিত্যক্তিকা ১০৭ ৮৩৩ ৮৪১, ৮৭৮, ১০৬৯
পর্ণকর্ণি ৫১৩, ৫৫১
পাইকপাড়া ১১৩৭
পাঁচকড়ি ১০৩৮
পাঁচু ঠাকুরী ৩২৭ ৭৭১
পাঞ্চালী ১০৪৩, ১০৭১
পাঞ্চজন্যধ্বনী ৩২৭ ৭৭১, ৮৮৩
পাণ্ডুয়া কাব্যবীথি ৩৭৭
পাণ্ডুরঙ্গ ৭১
পাণ্ডাল ২৫, ১০৩
পাণ্ডার ৮৯১
পাণিনি ১০৪২
পাণ্ডিপুত্র ১৪১, ১৪২, ১৭৭, ২১৩, ২৪৮, ৪৮৭
পাণ্ডিকারা ১৩, ২২৩, ১০২৫, ১০৪৯
পাণ্ডিবর্দ্ধিত ৯০২

পাঠান ১৪, ১৫, ২৩১ ৪৮১ ৫১৮ ৫৪৪ ৫৭৪, ৫৮৩, ৫৮৬, ৬৭৩, ৬৮৭ ৬৯১, ৭৮৬, ৭৯৭, ৮১১, ৮১৪ ৮২১ ৮৩৮, ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৫৬, ৮৫৯ ৮৬১, ৮৬৩ ৮৬৫ ৮৬৮ ৮৭৫ ৮৭৭ ৮৭৯ ৮৮৫ ৮৮৭, ৮৮৮ ৮৯৫ ৯০৫, ৯০৮ ৯৩১ ৯৩৩ ৯৩৭, ৯৩৮ ৯৩৯ ৯ ৪৪ ৯৭১ ৯৯৬
পাঠানাধিপতি ১ ৬৭
পাণিনি ৩৩৭, ৪৪৯ ৪৬১
পাণ্ডব ৮ ৪২
পাণ্ডিত্য ১৪৪ ৩৬৮ ৪৫—৪৭৯
পাণ্ডু ৮ ৮১ ৮২
পাণ্ডুকাশ্মীর ৮৯
পাণ্ডুয়া ১৬, ২৮, ৬৫৭, ৮৮৮ ১১৬৮
পাতঞ্জল-ভাষ্য ৬৯৮
পাতঞ্জলসূত্র ৬৯৩
পাত্রকেশরী স্বামী ৩৯৬
পাত্রদাসের ৫৬৬
পাথুরিয়াঘাটা ১১৬৭
পাথুরিয়া দুর্গা ১১৯৮
পাদুকাস ৭১৩ ৮১৫
পাবনা ২৮ ৬৬৫ ৭২৮
পামারইটা ১১৫৭
পারসিক ৬১৮
পারসী ১৬৩, ১৬৫৮ ১৮৪২
পারস্য ২৩১, ৭৮৭, ৮৮৩, ১১১, ১১৮২
পার্থপ্রস্থ ১৯৫
পার্থিবাস্ত্র ২৩৮
পার্থিবাধিক ১১
পার্শ্বনাথ ১৫৮
পার্শ্বিটার ১৩৯, ২৮৭
পার্শ্বি ২৬১, ২৬৫
পার্শ্বনাথ কবিরাজ ৩৭৩
পার্শ্বনাথ কবিশেখর ৭৭২
পার্শ্বনাথ রায় ২
পার্শ্বনাথ ৯, ১৫ ২১, ৪৫, ১২৮ ১৩১, ১৩২
পাল ২১ ২৭২, ২৯৩, ২৯৮, ৩৭১, ৩৮৪, ৫১৫ ৭৮৩ ১০৫৯
পালকব্য ৪৭৮
পালপাল্লি ১১৬৩
পালরাজত্ব ৩৩৪, ১১২৭
পালরাজা ১০৯৮
পালসাম্রাজ্য ২৯৮-৩৯৯
পুলি ৩১, ৪৪ ১৫, ১৪৭ ৪৭৮, ৪৪৯, ৮৯৯, ৯৩৪ ৯৩৫
পিঙ্গল ৪৮৫
পিঙ্গলী ১২৫
পিঙ্গলা ৯৭৭
পিতৃদত্ত বী আর্য্য ১০৫২
পিতৃপিতৃ যজ্ঞ ৮৮৫
পীতাম্বর ৬৭৫, ১১৩৪
পীতাম্বরদত্ত ১০৮৮
পীর সদাগর ৯২৬
পুটিয়া ১১৩৪
পুণ্ড্র ৮৫৮
পুণ্ড্রবীক ৬৭৫
পুণ্ড্রবীক বিদ্যানিধি ৭২৬
পুণ্ড্রবীকাক্ষ ১০৭৮
পুত্র ৫ ৯, ২১, ২২
পুষ্পদন্ত পুষ্প) ৬২৭
পুষ্প রবি ১০৯৮
পুষ্য ৬৮
পুস্তকাস ৮৭৭
পুস্তকেশ ৯৮, ১৯৯
পুস্তকেশ ২১৭
পুস্তকিক ২৩
পুস্তকের বী ১১৭১
পুস্তকের পাল ১০৪৫
পুস্তকের সিংহ ১০৪৪
পুস্তাব ৯১১, ৯৬৮, ৯৬৯, ১০১৪, ১০১৫
পুরাণ পরিচয়পাল ১৮৫ ৭২৩, ৭৬১, ৭৬৪, ৭৮২, ৭৮৭ ১১ ৫ ১১৮৩, ১১৭১
পুরু ৫ ৩৭, ১৪৫, ১৪৫
পুরুরাজ ৮২৯
পুরুষপত্তন ১৩৬, ১০৭২
পুর্ণিয়া ৮৪৭, ৮৬৮, ৮৭১, ৮৭৪, ৮৮৩, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯৫৩
পুলকেশী ৪৩৩, ১১৩৩

পুলিন ৩৫, ৮১
পুলো ৪৪৩
পুষবর্মা ১০৫৩
পুষ্টা ৪৮, ১৩৬
পুষ্টামিত্র ৬৯, ১৪৭, ১৮৪, ২১৪ ২৪৮ ৭৪১
পুষ্পপুর ১৪৮
পুষ্পহার ২৩৮
পূর্ব ১১৩
পূর্বচন্দ্র সেন ৯ ৭
পূর্ববর্গা ৫৫১
পূরবী ১১৩৭
পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ৪১৩, ৪৫৩, ৭৩০, ১০৩৪
পূরণচাঁদ ৩২৭
পৃথিবী সেন ২১৩
পৃথু ২১৪, ২৫৫
পৃথ্বীমল্ল ১১১৮
পৃথ্বীরাজ ৫১১ ৫২৪ ৭১৪
পেগু ৪১ ২২১ ৫ ৬ ১ ২
পেটিয়া ৮৩১
পেশিমুলাদন ৬১
পোকামান ৫ ৯
পাঁচ ৪৮১
পৈশাচী ২৯৭
পাকা ৯৪৩
পাঁচ: প্রাচীর বাণী ৫৫৩
পোপোপুরী ১০২
পৌণ্ড্র ৪, ৯ ৭ ১২ ২২ ২৬ ২৩. ২৮ ২৯ ৩১ ৪৫, ৩৪, ২২৭, ২৮৮, ৭৮৯
পৌণ্ড্রবর্ধন ২৮ ১৪১ ২১৭, ২২৩ ৩০২ ১১২৫ ১১২৯
প্যারাসাইস লাট ৯৩৪
প্রকাশানন্দ সরস্বতী ৭২৯
প্রকাকর ৩৩৩ ৪৭১ ৪১৪
প্রজাকরমর্দি ৩১০
প্রজাপারমিতা ২২৪
প্রতাপগড় ১ ৮৯, ১০৭২, ১০২৫
প্রতাপাদিত্য ৯ ৯
প্রতাপ নারায়ণ ১০৭৮
প্রতাপমার্তণ্ড ১০২৩ ১২৫ ১০৪৩
প্রতাপরুদ্র ১১০ ১৬৩ ৭৩৭, ৭৩৯ ৭৪০, ৭৪২, ৯২৫
প্রবোধ সিংহ ১০৯
প্রয়াগ ৮, ১৫, ১৫ ৫৩৩, ৫৭৫, ৭৮৩, ৮৮৯, ৯৯১, ৯১৩, ৯৪৮ ৯৫৩ ৯৮১ ৯৯৪, ৯৮১ ৯০৯ ৯৯৭ ১০০৮ ১৪
পরিহার ৭
পর্তগীজ ১০৫৩
পর্তুগিজ ৯১৯ ১০৪৪
পর্বতিকা ৯৯
পর্বতেশ্বর ১ ৯
পর্বতেশ্বর ১ ৩
পর্বতেশ্বর ৫৫৫
পর্যটন ৯৬৩
পর্বত সেন ২০৯ ২০৯
পর্বতাকার স্তূপ ১৯৯
পর্বতারোহণ ২১৮, ১ ৩
পর্বতেশ্বর কুমার ৭
পর্যুষিত ২৯৯
পর্যন্তর ৫৯৯, ৫ ৩
পর্যবেক্ষণ ১৫৫ ৩৩১
পর্যবেক্ষণী ৫৭৯ ৫৫ ৩০৩ ১ ১৮
পর্যবেক্ষণ গৃহ ১১৩৩
পর্যবেক্ষণ ১ ৩
পর্যবেক্ষণ হাট ১,১৩
পর্যবেক্ষণাগার ৭১৯
পর্যবেক্ষণ ৮৯ ৯ ৩, ৫৫৪, ৯০৮, ৯২৫, ৯৭৩
প্রসন্ন ৯২৪
প্রসন্নমহাবাসন্ত ৯৭৫
প্রসন্ন ও ঠাকুরদাস ৩৪৮
প্রসন্নদাস রায় ১১০৩
প্রসেনজিৎ হাট ১১২০
প্রস্তাব ৮ ১১৩
প্রস্তর ৪৯৫, ৯৫৩ ৯৯১
প্রাক্‌ ও ইতিহাস ৪ ৩, ১২, ১৮, ১৭ ১৯, ২২ ২৬ ২৯, ৩১ ১৬৮, ১৮৩ ১৭৩, ২৫৭, ২৮৩, ৩২৫, ১০১৮, ১০৪৫, ১০৫৩ ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮১, ১০৮৭
প্রাচী ১৬০
প্রাচীকর ১১৩৪

প্রাণনাথ রায় ১১৩৩
প্রাণনারায়ণ ১০৩৮, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৮৭
প্রাপ্তি ২৬, ২৭, ৪০
প্রাসন্ত ১০৫৬
প্রিয়ঙ্কর ৬০৫
প্রিয়ম্বদা ৮, ৫১, ৭৭০ ৭৭১
প্রেতচতুর্দশী ১০২৯
প্রেমবিলাস ৭০৭, ৭১১ ৯৯৯ ১০৭৫, ১১১২
প্রেমভূষণ ১১২৩, ১১২৭
প্রাটিনাম ৩৮
প্রিন্সি ২৩৩
প্লেটো ৯৪১

ফ

ফকিরচাঁদ ৬১৯
ফজিল ১০
ফজিলতুন্নেছা ৮ ৫
ফজিলাতুন কুবিয়তন ৯৭৯
ফজলুল করিম ৬১৮
ফতেহ খাঁ ৭৮৭ ১০৩৩, ১০৩১
ফতেহ জঙ্গ ১০৩৮
ফতেহপুর ১০৭৪
ফতেহ সাহ ৬৩০
ফাতি মিঃ ১৩
ফরেস্টিন্ড ১০৪৩ ১১১৫
ফরহাদ খাঁ (নবাব) ১০৪ ১০২১
ফরিদাব ৩৩৪
ফরাসী ২২৮, ৮১২, ৮৫৮, ৮৭ ৮৭৮ ৯৪৩, ৯৪৭, ১১০২
ফরিদপুর ৯১০, ৯১২, ১০৭৮, ১১১
ফলনা ১১২৯
ফাগার ১৭
ফাল্গুনী ৯৪৩, ৯৮৭, ৯৮২, ৯৮৭
ফারা ৮৯৩
ফার্ডিনেন্ড ২৮
ফাহাতেন ৯৭ ২৩৫, ২৪২, ৩০১ ৫৫৯, ১১০২ ১১১২
ফিরোজ ৯৪৩

ফিরোজ খাঁ ৮০৭
ফিরোজ খাঁ ৮২৭ ৮৩১
ফিরিঙ্গিবাজার ১২১
ফিরিঙ্গি ৮৪৫, ৮৪৯, ৮৯৫, ১০৫৪
ফিরিঙ্গিবাজার ৮১২
ফিরোজ খাঁ ১৩, ৫৩৯, ৪২৫, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬ ১ ৯১
ফিরোজ সাহ ৩৮৩, ৫১৮ ৫২৮ ৬৫১, ৬৫৫ ১০৮৮
ফিলিপ (প্রভু ৯৫১
ফিলিপাইন ৯১২
ফুর্সি ২৯১
ফুলতলা ৯৯১
ফুলন ৯৩
ফুলকাপারি ৫১১ ৭ ৩৪
ফুলবাড়ী পরগণা ১১১০
ফুলেশ্বরী ৭৯৭
ফেনসিডি ৯৫১
ফেরারাজেদের লড় ১৯
ফর্সিয়া ৩ ৮
ফুলবী ১০৫
ফেরেকাবাদের ৮৫১
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৯৩ ৯৪৯
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ৮৪০ ৮৯৮
ফোর্টি ৯৪১
ফৌজদার ১৩
ফ্রেঞ্চ সাহেব ১১৩৯
ফ্রিট ২১৭

ব

বাঙ্গালিস ২২৪ ২২৭ ২৭৪ ৯৮০ ১১৩
বক ৯৮
বকচৌল ৪০০
বক্তার খাঁ ৮৪৩ ৮৪৪
বক্তপুর ৭৯৯
বক্তবন্ধ ৭৪২
বখতিয়ার (বক্তিয়ার) খিলজি ২০৩, ৩৩১ ৪৭৭, ২২৬, ৫২৭ ৫৩৫, ৫৪—৫৫৫, ৪১০, ৬৪৯, ৮৭১, ১০৫৫, ১১৪০

বর্ধাড়ি ৬৮, ৫৭
বরড়া পরগনা ১১১৪
বরড়া ৯, ৬৮, ১১৩৮
বরদাক্স ৪৪৪
বরিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪০
বঙ্গ ৪, ৪, ৪, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২২, ২৯, ৩১, ৪৯, ২০৯, ৫২৮
বঙ্গবীরাঙ্গনা ১৪
বঙ্গভাষা ৪৫৬, ১১২৯
বঙ্গভাষিতা পত্রিকা ৭৮০
বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ১১৩৩
বঙ্গোপসাগর ১১২৬
বঙ্গরাবন ৬০
বঙ্গা ৩০১
বঙ্গতারা ৩২৪
বঙ্গবারাণ ৮১৭, ৮১৮
বঙ্গবর্মন্ ২৮৪
বঙ্গযোগিনী (বরবযোগিনী) ৩০৪, ৩৪৩, ১১৩৪, ১১৩৫
বঙ্গ ৮
বঙ্গাসন বিচার ৩০৫
বটকে আটনী ৮৯৮
বটকবি ১০৩৪
বটুকভৈরব ৫২
বটুয়া ৯১৫
বটেবর ১০৮৫
বড়গা ১০৫৩
বড়গোহাটেব ১০৪৭, ১০৫৮
বড়চুকন ১০৪১
বড়বড়্যা ১০৪৯
বড়বাজা ১০৪৩
বড়িশা ৪৭
বণিকদুহিতা (কবল,) ২৪৯
বৎসরাজাবী ১১৩৬
বত্রিস সিংহাসন ২০৯, ২১০
বদনগঞ্জ ১১১৫
বদরিকাশ্রম ৩৮১
বদুল আলা ১০৪৭
বনবর্ধ ৩১৮
বর্ধমানপুর ১৪, ১৪৭, ৭৫৬, ৭৬৩, ৮৮১, ১১০৩,১১০৮
বনমাল ১০৮৪
বনমালা ১০৪৫
বনমালী ১০৪১
বনমালী কর ১০৮৫
বনমালী ঘটক ৭০৫, ৭০১
বনমালী মুন্সী ৯১২
বনগাঁ ২৪৯, ২৫২
বঙ্গবধি ৬১, ৬২, ১৭১
বক্তবাহন ৪৫৫, ১০৭৭, ১০৮৬
বরদাপাড় ১০২৫, ১০৪১
বরদোলা ১০৫৪
বরাহক পাহ ৬২৯, ৬৪০, ৬৪২, ৬৪৩
বরাহ নদী ১০১৮ ১০১৯, ১০৪৭
বরাহমিহির ১১০৩
বরাহপুরাণ ৮২
বরাহমূর্তি ১১০৩
বরাহসংহিতা ২৪৩, ২৪৪, ১১২৩, ১১২৮
বরাহীমূর্তি ১১১৯
বরিশাল ৮১২, ৮৩০, ৮৩৬, ১১০৮
বর্ণচৌরার বল্লিপ্ত ১১০৭
বর্গী ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৬১, ৮৬০, ১১০৪, ১১১৭
বর্জনা ফোর্টস্টেস ১০৩৩, ১০৩৪
বর্ধন ৫৩৩
বর্ধনকোট ৬১০
বর্ধমান ১০, ১৪, ৪৭, ৭০, ৩৩২, ৫১৩, ৭৫৩, ৮৪৪, ৮৪৭, ১২৩, ৪৪০, ৮৭২, ১০১০, ১১০৩, ১১২৯, ১১৩৯, ১১৪০,
বর্ধমান পৌ ৬৪, ২৮৫
বর্ধাগাড়া ১১৩৯
বলরাম ৪৮৫ ৮০১
বলরাম চট্টোপাধ্যা ৫১৫
বলবর্ণী ২১২, ৪৫৪, ১০৪১, ১০৫৩, ১০৫৪
বলভদ্র ৫০৪
বলভদ্র খান ১১০৩
বলাকি ৩০০
বলাল্লাব ২৭, ১১৩৪

বলরাম হাঁস ৯৯৩
বলরাম সূর ১১২১, ১১২২
বলরাম সূর ১৩
বলরাবী ৩২৭, ৭৭১
বলশেভিক ৭১৮
বল্লভী ৪৪৯, ৫০৯, ৫১১
বল্লভাচার্য ৪৭৮
বিজয়ানন্দ ৪৮৫, ৪৮৭ ৪৮৮, ৫৯০
বিদেশী সম্প্রদায় ৪৭৯
বিদ্যাপতি ২৮৪ ৪৬০, ৪৬৩, ৪৮৩, ৪৮৪, ৫৩১
বিদ্যাবাড়ী ১১৪০
বিদ্যাসাগর ৫৯, ২৮১, ২৮৪, ৪৪১, ৪৫৪ ৪৪৭, ৫১৪, ৫১৮
৪৮৭ ৪৮৮ ৫২৪, ৫২৮ ৫৩২, ৫৫২ ৬০২, ৭২৫, ৮১৪
১০৫৫, ১০৮৭, ১১৪০
বিদ্যালী দারিদ্র্য ৪৮৫, ৫৩১
বিদুষক ৩৩০, ৩৩২
বিশিষ্ট ভূমি ১১৯, ১০১৪, ১০৫১
বিশিষ্ট-সংহিতা ১৩১
বিশ্বকুমার ১১৩৭
বিশ্বনাথ পাল ১৫
বিশ্বনাথ রায় ৭৮৯, ৭৯১, ৭৯৫, ৭৯৫, ৭৯৫, ৭৯৯, ৮০৫,
৮০৭
বিশ্বস্ত সেবা ৭৭২
বিশ্বাসের ছুরকী ১০২৭
বিশ্বিক ১০৫৫
বিশিরহাট ১১৩০
বিশ্ববন্ধু ২৫৩
বিশ্বভূতি ৩৩৫
বিশ্বেশ্বর ৫০, ৯৩১, ৯৯৯
বিষ্টি ৯০
বিহর ৮১১
বিহরণাড় ৮১১, ৯২৯
বিহরম উপনিষদ আকবর শাহ ১১৩০
বিহরম খাঁ ৬১৯
বিহরম খাঁ (নবাব) ১০৩৫
বিহরমপুর ৯৪৪, ১০৪৯
বিহারক ৯৩৫
বিহিবিবাহ ৫৯৯
বাইবেল ১১৭, ৯৩৫
বাইরাম খান ৬১৯
বাউল ১১৫, ৩২৯, ৩৪৭, ৭১২, ৭৮০
বাঁকুড়া ১১৯৯, ১১৪০
বাঁশবেড়িয়া ৭১৫, ৮৯৩, ১১৪০
বাকলা ৮১২, ১০৩০, ১০৪৪, ১০৪৯, ১১২১
বাকীতকী ২০৭, ২৫৮, ৫০৯
বাগবাজার ১১২৯
বাগমুড়ি ১০৩৯
বাগমুড়ি ১০২৪
বাঘনাপাড়া ৩৫০
বাঘের কীর্তি ৬৩০
বাঘাই মজলিস ৭০০
বাঙ্গলা কলম ৯২১
বাঙ্গলা ঘর ৪১৮
বাঙ্গলা ঘরে জাবের খৌরব ৩৮১-৩৯৪
বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ৪১৯
বাঙ্গলা সহর ৪৫৮
বাজার রাম ৪৩৮, ৯১৯
বাঙ্গালা ১১, ১২ ১৫, ১৮ ১২৯, ৮১৫, ৮৩৮, ৮৫ ৮৪১,
৮৫৮, ৮৬১, ৮৬৭, ৯১৬, ৯৬২, ১০৪৮, ১০৪২
বাঙ্গালীর পাঁচুর ৫১৮
বাচস্পতি মিশ্র ৩৫৯, ৩৬৮
বাজারিদ ৩২৫ ৯৪১, ৯৭৫, ১১৪০
বাজীরাও ৫২৫
বাণ ২১৫, ২৬১
বাণগড় ৫২৮, ১১৬৯
বাণরাম ১০৭৪
বাণেশ্বর ১৬৯, ৩৭৮, ৪৩৫, ৫৯৯
বাণেরাজা ১০১৮, ১০৫৮
বাণেরাজার দুর্গ ১১৩৯
বাণলিঙ্গ ৪৮, ১০৫১
বাণিজ্য ৮১২, ৮১৪
বাণেশ্বর ৩৭, ১০১৬, ১০৭৪
বাণেশ্বর বাচস্পতি ১০৭৯
বাণেশ্বর শিব ১০৮৩
বাত (আত) ৮৫
বাতাসের বাল ৯৩৬
বাৎস্যায়ন ৬৮৫, ৬৮৭, ৯৭

১১৭৮

বাংলাদেশ ২৩১

বামাল ৪৩

বাল্মিকি ২,৩ ২১৯, ১ ১৯, ১ ২৯

বাহিনী ৩.৭ ১৩৯ ৪৩৬

বাবা আইটম ৮৩৪, ৮৩৪

বাবা বা ৮৩৭ ৮৩৮

বাবুল মিয়া ৮,৭

বামরাজা মহাপাত্র ১০৮২

বামনদাস ১ ১১

বাঁধন বাবুন ৯৮

বায়ুমণ্ডল ৩৭৮

বারোভাজা ভাষণটি ১ ১১ ৯৭ ৮৮ ১০৯

বারিদবরণ ১৫৭ ৭১১

বারোদাকোড-নির্দেশ ৩৫, ৯৮৯

বার্তেজিস ২৯, ৪৩২

বাসিন্দা ২১ ৫

বাহিনী ৬৮

বাংলাদেশ ২৩৮

বালাজি ১৩২

বালাদিত্য ৩৫১ ১০২ ১৯৫

বালামী ২২৫ ৯২৩

বালামী মৌকী ৯২৩, ৯২৩

বালি ৩৯, ৪৩৪, ৪৭৫, ১১০২

বালি বারাণসী ১০৬৮

বালিশিল্পী পরমপদ ১০৮৯

বাণী ৭১, ৮৩

বাজেশ্বর ৮১২, ৮২৮, ৮৪৩, ৮৫৭

বাণীকি ৫, ২০৯, ৩৮৩, ৪৮৫, ৭২২, ৮৩৮, ৪৪২, ৪৮৮

বাল্মীকিবাহ ৪১২-৪৭৩

বাল্মীকী ১০৭

বাসন্তী মন্দির ১৯১

বাসুদেব ৬, ৭, ১২, ২২, ২৩ ২৯, ৩২ ৫২ ২০১ ৫৭৮ ৫৭৮, ৪৭১, ৬৩৪ ৭১২ ৭৮৩, ৯০৭ ১০৫৩

বাসুদেব ঘোষ ৯৯১

বাসুদেব বারোজা ১০৭৪

বাসুদেব সার্বভৌম ৯৩০, ৯৯১, ৭১১ ৭২৫

বাহাদুরপুর ৮২৮, ১০৮১

বৃহৎ বঙ্গ

ভারতের রাষ্ট্র ৮৮১

ভাষিকরণ ১৭০

ভাষাবিজ্ঞান সাময়িকপত্র ২৪১-২৪৭

ভিত্তিফলকলী ৫০ ৭১৩

ভিন্নধর্মী মতো ২৫৯

ভিন্নমতো ৮, ১ ১১ ১৯ ২৮, ১০৭, ৬১১, ৯৩৪, ৯১৮ ৯৭১ ৯৮৭, ১ ১৫ ১০৪৯, ১০৫৪ ১১ ৪, ১১৪৮

ভিত্তিফলক ২৫৫

ভিন্নমতো ৮ ১১ ২৯৪, ২৯৯ ১০৪, ১০৫, ৫১ ৯৮১

ভূমিকম্পন ২০৮, ২০৯, ২৪৫, ৪৯১ ৬৪৮, ৭২১

ভিন্নমতো ৫৭৮

ভিন্ন ১৮ ৭১, ৪৮ ৫৯ ৬৩ ৭২ ৭৪ ৭৯ ৭৭, ৭৯ ৮১, ৮৩, ৮৮, ২৫৮, ৫৮৩, ৫৭৯, ১০৯৪

ভিন্নভূমিকা ১০৫৯

ভিন্নমত ২২৮

ভিন্ন ভাষা ৫৮৯, ৫৯০, ৬৩৩, ৬৭৪, ৬৭৯, ৬৭৭, ৬৭৯, ৯৮১

ভিন্নমতের মতামত ৯৩২

ভিন্ন ঠাকুরমা ১১১৯

ভিন্নমতপথ ১১

ভিন্নমতাবলী ১০১১

ভিন্নমতপুর ১০৩

ভিন্নমতের ৯০৪

ভিন্নমতাবিক ১১ ১০১ ১০৩১ ১ ৩২, ১০৩৯, ১০৮৯ ১০৮৭ ১ ৪১ ১০৮৩, ১০৯৮

ভিন্নমতাবিকা ৭৩ ১০১৩

ভিন্ন মত ৪৭৩, ৬১১, ৭৩৪, ৭৪৫, ৭৭৫ ৭৭১, ৯৭৩, ১০৫৫ ১১১১

ভিন্নমতী ৯১৫

ভিন্নমুখ ৯১

ভিন্নমুক্ত ৯৫৪

ভিন্নমতাবলি ৯১ ১৫ ১১ ৪০৭ ৫৭১ ৬৭৩ ১০১৭

ভিন্নমুখ ৯১ ১০১

ভিন্নমতাবাদ ৭৫৫ ৯৮১

ভিন্নিলা ৯১

ভিন্নমতাবাদ ৪

বিদ্যা ৪৭৭ ৯১০ ১৭৮ ১০ ৯
বিদ্যাধর ১১০৫
বিদ্যানন্দস্বামি ১১০৭
বিদ্যাধর দাস ১১ ১
বিদ্যানগর ৭২৫
বিদ্যানন্দ স্বা ১১১৮
বিদ্যাপতি ৩৫৪ ১৯১ ৩২১ ৫ ৭১ ৭১৭ ৭৫৪
৯২৮, ১১১ ১৭৭ ৯৪১, ১১২, ১৩৫
বিদ্যাবাগীশ ১ ৭১
বিদ্যুৎবিভিন্নি ১১৪
বিদ্যাবন ৬৬৪
বিদ্যাবিনু ১০৪৯
বিদ্যাসাগর ব ১ ৭১২ ১৪৭ ১১ ৭
বিদ্যুৎপর্ণা ৪০৫ ৫ ৪ ৫২৩ ১ ৮
বিনু চেষ্টা ৫১০
বিনু ও বিনয় ১৩ ২১৫
বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯ ৫
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪
বিনু শঙ্কর সাহা ৩২১
বিনয় বাবু ফুটানো ৭ ৮
বিনয় ৮৪ ১০৯
বনফুল ৯৮২
বিনোদক ৯৭৫ ৫৯৭
বনমালা ৫ ১৫৩ ১৫৪ ১৪৪
বিপ্র ১২
বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী ১ ৭১
বিমার বাসর ৮২৬
বিবেকানন্দ ১১৫, ৭৯৪ ৯৫১
বিরজ ৩২১
বিরোচন ১২৯, ১২৭ ৬৮
বিরোচন রাম ১১ ৩
বিরূপিকুমার হাজ ৭১ ২৯৯
বিমল মিত্র ৩১৮
বিমানে স্নান ৩৫৩
বিশ্বিসার ১৮ ১১৪, ১২৯, ১৬৩, ৩
বিরাট ৩৮, ১০৭৭
বিরাট পর্ব ১১৩৩
বিরাটপুর ১১৮০
বিরূপ ৭১৪, ৯১০
বিরিঞ্চিবাবাজন ১০৮৫
বিরূপাক্ষ ৪১৮
বিরোচন ৩১৮
বিলাসবৌ ৪৬৬, ৪৭৮
বিলাসপুর ৩০২
বিশ্বেশ্বর ১৬৮, ১৪৩
বিশ্বাস ৬৮১
বিশ্বগড় ১০১৩, ১০২৭, ১০৪৩
বিশ্ব ১০৭০
বিশ্বরূপা ৫৩০, ৯৩১
বিশ্বকোষ ১১০৮
বিশ্বনাথ কবিরাজ ৩৬১
বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন ৩৭২
বিশ্বনাথ রায় (মহারাজ) ১১০৪
বিশ্বনাথ সিংহ ৯১৪, ১০৯১
বিশ্বপতি চৌধুরী ৪৩,
বিশ্বরূপ মিশ্র ৭৯২
বিশ্বভারতী ১১১৯, ১১২১
বিশ্বরূপ ৪১ ১১৯ ৭ ৫
বিশ্বকর্ম দেবী ১১১
বিশ্বাস ১ ৭৭, ৭৯১ ৭৭৯
বিশ্বামিত্র ৯৭
বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ২৭৪
বিষ্ণু ঘোষ ১৮
বিষ্ণু ১০ ১১ ১১৯, ২৩৮ ৯৭৪, ১০৪৭
বিষ্ণু মায়া ১০৮৭
বিষ্ণুগুপ্ত ২ ৭
বিষ্ণু সাহায্য ৮৩৮, ১০৭৩
বিষ্ণুপুর ৮৪৭
বিষ্ণুপুরাণ ৩৯ ৯২ ১৪০, ১৪২, ৭২৪ ১১১৩
বিষ্ণুশর্মা ৭০২ ৭০৩, ৭ ১ ১৭৮
বিষ্ণুক্রান্তা-ক্রান্তা ১১৯৯
বিষ্ণুগোবিন্দ ১০৯৮
বিষ্ণুমায়া ৬৭৮
বিহার ১৫ ৫৮১, ৮১৫, ৮৭৪ ৮৪৭, ৮৪১, ৮৫৫, ৮৬০,
৮৬১ ৮৮৭
বিহ্নমণ্ডল ৭

বিহারীলাল ৮১১
বীরভদ্র ১১০১
বীরচন্দ্র ১০৭৮
বীরচন্দ্র মাণিক্য ১০৪৪
বীরেন্দ্রশ্রেণীব্রাহ্মণ ১০৫০
বীর হাম্বীর ১০৮৫
বীর হাম্বীর ১০৭২, ১০৭৩
বীর পাল ১০৫৩
বীরবল ১১২০, ১১৪৭
বীরভান ৮০৯
বীরভাণ ৪৬৩
(শ্রী) বীরমিত্রবভিদোষ মাণিক্য বাহাদুর ৩৩, ১০১৭, ১০৪৪, ১০৫৩
বীরমিত্র ১০৪৫
বীরভূম ৮৪১, ৮৫৭
বীরভূমি ২৮৫
বীরসিংহ ৭০, ১১১৪
বীরহাম্বির ৭৪৫, ৭৫৩, ৭৫৫, ৭৫৫, ৭৬৩, ৭৬৯, ৮০১, ১০৪৮, ১১০৮, ১১০৯, ১১১২, ১১১৪, ১১১৫
বীরাচন্দ্র ৩১০, ৩১৯
বৃন্দাবতর ১০১৭
বৃদ্ধ জেঠাইমি ১ ৫১, ১০৫৮
বুড়ো মুকর্ম ১০৬১
বুড়িগঙ্গা ৯৫৩, ১০৪৯
বুদ্ধ মিশ্র ৪১৫, ৪১৫
বুধগুপ্ত ৭১৭
বুদ্ধ ৯, ১১, ১৫, ১৯, ৪১ ৫১, ১০-১১৮, ১২৫ ১৯৫, ২০৯, ২৪১, ৪০৯, ৪৭৫, ৫৮৫, ৭১৮, ৭৮০ ৭৮৯, ৮১৫, ৮৪৯, ৯৮১, ১০৪৮
বুদ্ধ বী ১০৬৯
বুদ্ধগুপ্ত ৬০১
বুদ্ধভিক্ষু ৪৭০
বুদ্ধরক্ষিতা ৩২১
বুদ্ধিমন্ত ৫৫২, ৫৫৩
বুনাবিম ৫৩৯
বুদ্ধেশ্বর (বুদ্ধেশ্বর) ৩৩, ৬৩৯
বুরহান উদ্দিন ১০৮৮, ১০৮৯
বুরুচি ১০১৫, ১০৪৭

বৃন্দাবন ৭১
বৃন্দাবন ৬১৫
বৃন্দাবনের ৫৩৯
বৃন্দাচি ৩৪
বৃন্দাই ৩৯
বৃন্দাবন ৫৩৯
বৃন্দাবন ৩৩
বৃন্দাবন ৮৭, ১৪৫, ৬৮১, ৭১০, ৭৮৯ ৭১৬, ৭৩৫, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫৯, ৭৬০, ৮০৫, ৮৫২, ৮৯১, ৮৯২ ৯৪১, ১০৭৯, ১১১৩, ১১১৪, ১১১৫
বৃন্দাবন দাস ৭১০, ৬৮১, ৬৯৮, ৭১৫, ৭৪৩, ৯৭৩, ৯৯৫
বৃহৎ দীঘি ১১৩৮
বৃহৎসংহিতা ৩১৭
বৃহদ্রথ ২৫, ১৮৮
বৃহন্নল ৫১৪
বৃক ৪৮, ২৪১
বৃহস্পতি (স্মৃতিকার) ১১০৪
বেতকাঠী ৩১০
বেত্রবতী ৪১৫
বেদাচাপা ১১২৪, ১১২৮
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ (বেদজ্ঞব্রাহ্মণ) ১১২৪, ১১৫৯
বেধেলাম ৯০
বেনী ৭৭০, ৭৭৪
বেলাঙ্গ ৬৮৯
বেলাবরক ৮৪০
বেনিবাহাদুর ১০৬ ১০৮
বেলাটুর ১১৪
বেলিন্দ ৬১৪
বেলেসর জোপি ৬৩২, ৬৩২, ৬৪৩
বেতাল ৫১, ১১২১
বেহুলা ৪২৭ ৪৪৮
বেহুলাকাক ১০৯
বৈদ্য ৮৪১, ৮৪৯, ৮৫২, ৯৪৫
বৈদ্যনাথ ঘোষ ২, ৯
বৈদ্যনাথপুর ১০১৯, ১০৪২, ১০৭০
বৈদ্যবাস ১১৩০
বৈদ্যুর ১১৩১
বৈদিক ৫১, ১৯০, ৩৩৫, ৯৯০, ১০৮১

পঞ্চানন্দ ঘাস ৪৪৩
পঞ্চানন্দ ঘাস ১০৮১
পঞ্চবাণ ২৮৪
পঞ্চবাণ ঘাস ১০৮৫
পলাশা গ্রাম ৯১০
পবনদীপ ৮৩, ৮৪ ৯১৭
পদ্মনা ২ ৮৭
পরাশি ৩১, ৪৩৩, ১০১৫, ১০১৭, ১০৭৭
পর্ণপুর ১০২৩, ১০৫৭
পলোপা ৪০৩
পাখাবতী ৪৫৩
পশোধরবাসিকা ১০৩৩, ১০৩৮
পশোধরবাসিকা-গুপ্ত ১০৩৯, ১০৩৬
পশোধন্ত রাও ৯০৬
পশোধন্ত সিংহ ৮৭৯
পশোবন্তা ২৭১, ২৭১
পশোরাজ খী ৫৫৩
পশোরেশ্বরী ৭০৩
পশোহর ৭১৫, ৭৮৩, ৮১২, ৮১৩, ৮৩৮, ৮৪১, ৮৮৬, ১১০৩ ১১৭৩, ১১৩৯, ১১৪০
পাঞ্জবক্ষ ১৪৩, ৪৭২
পাঞ্জবক্ষ-সাহিত্য ১৪১
পাঞ্চালীবৃক্ষ ১০৪৪
পাণ্ডবানন্দ ৫৮৪
পাণ্ডুরাম ১০৪১
পাথরি পাহাড় ১০৪১
পাদ্মা ৪৪, ১০৯, ৯২৭, ১১০২
পীত ৩৮৫, ৭৭৮
পুইচি ২০৩
পুথারসিংহ ১০৩৫
পুরন্দিহ সিংহ ১০৮০
পুষ্পিত্র ৮, ২৫, ১৪৮, ২০৩, ২২৭, ৯৪৪, ১০১৮, ১০৪১
পুলোপীর ১১১০, ১১১২
পেগুই ৪৯
পোলিনীতন্ত্র ২৮১, ৮১৩
পোলিনী মালিক ৩৭, ২৮১
পোলীখোপাপাড় ১১০১
পোলীন্দ্রনাথ রায় ১১০৫
পোলীপাল ৭৪৮, ২০৫, ২৭৭, ২৯০, ৫২৯, ৯৭৩
পোলীমারা ২৫৮
পোপালচন্দ্রনাথ রায় ১১০৫
পোপালচন্দ্র সি হ ১১১৮
পোপালচন্দ্রমাণিক্য রায় ১১০৯
পোবিন্দচন্দ্র বসু ৫৭, ১১০৩, ১১০৪ ১১০৭
পোবিন্দচন্দ্র রায় ১১০
পোবিন্দপুর ৮০৩
পোবিন্দপাল ৪৪৩

র

রঙ্গু ২২৭
রঘুজী-ভোঁসলা ৮৫৭ ৮৫৮, ৮৫৯
রঘুনন্দন ৪৭০, ৭২৭, ৯৭৩, ৯৮১, ১১৩৪
রঘুনাথ ৯০৪, ৭৫১-৭৫৪, ৭৪১ ৭৪৩ ৯০৫, ১১০৮ ১১০৯, ১১১৩
রঘুনাথ চক্রবর্তী ১১১৫
রঘুনাথ ভিট্টাচার্য ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪৩, ৭৫১ ৭৮১, ১ ৮১, ১০৮৭
রঘুনাথ সিংহ ১১১৫, ১১১৭
রঘুবংশ ১৮১, ২৪২
রঘুরাম ১১৩৩
রঙ্গপুর ১৯, ২৮ ৮১৯, ৮২৮ ১০৪ ১৭৪ ৯৫১, ৯৮৯, ১০৪১, ১০৮০
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫
রজক ৫৩১
রণাবন ১০৩৩
রণাবতী ৯৭০
রতা ৭১৫
রণবিষ্টি মাদারণ ১০৩৪
রণভূর মাদারণ ১ ৩২
রণবীর সেন ৩৪
রণবীর ১৪, ২০৪
রণবীর খী ৭২৪
রণাওরাবী ১০৩৩
রণবীর মাদারণ ১০৩৪
রণধুরার মাদারণ ১০৩৩
রণসিংহ মাদারণ ১০৩৪

রণাগণ ১০২
রণেন্দ্রনারায়ণ (কুমার) ১১০৩
রত্নাবলী ২৪৫, ২৪৬
রত্নিকাক্ষ ৬৪৪
রত্নিকাক্ষ রায় ১১০৪
রত্নিলক্ষ্মী ১০৭৬
রত্নগর্ভ আচার্য ১০৮১
রত্নপাল ১০৭৩, ১০৭৪
রত্নপাল (হয়) ১০৭৪
রত্নপুর ৩২, ১০৫৩, ১০৭৩
রত্নপ্রভা ৩১২
রত্নবতী ১০৭১, ১০৯৩
রত্নবজ্র ৩৩০
রত্নবতী ১০৭৩
রত্নমালিকা ১০১৩, ১০৭৩, ১০৭৭
রত্নমালিকাখণ্ড ১০১৩, ১০৭৩
রত্নসার ২৩৮
রত্নাকর ১৭৭, ৩০১, ৩৩
রত্নাকরশান্তি ১০৮৮
রত্নাকরশান্তি ৩১১
রত্নাবলী ৮৪১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৪, ১২৭, ১৭৪ ২০০ ৩২৪, ৫৩০, ৬০৪, ৭০৪, ৯১৩, ৯৪৩, ১০৪
রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী ১১০৭
রবীন্দ্রনারায়ণ (কুমার) ১১০৪
রমতী ১৯
রমানাথ রায় ১১০৬
রমেন্দ্রনারায়ণ (কুমার ১১০৮
রমেশচন্দ্র দত্ত ১১ ৯
রমুলাস ৮৪
রমোটি ২১০
রয়চান ৩১৮
রসময় দাস ৯০২
রসায়ন-মর্দন ১ ২৭
রসায়ন-শাস্ত্র ৯৫০
রহিম খাঁ ৮৪৮, ১১১৪
রহিম সেখ ৮৭৮, ৮৩২
রাউল ৩৫
রাকস ৫২
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯, ৭০, ৪১৭, ৭১৮, ৭৯৩, ২৭ , ২৭৫, ১১৩০
রাগদ্রুম ৩১৫
রাগদ্রুম ৯৯৯, ৩৩৮, ১০৪১
রাঘ ১০৩৪
রাঘবেন্দ্র রায় ১১৩০
রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ৭৯৫
রাঢ়াবাটি (রাজবাটী) ১৬, ২২৭, ১০১৯, ১০২২, ১০২৩, ১০২৭ ১০৯৫
রাঢ় ৮৪১
রাজপুর ১৯
রাজতরঙ্গিণী ২২৩, ২২৫, ২৩০, ২৪৯, ৪৩৭, ৪০০, ১০১৫
রাজমল্ল ১০৩৪, ১০৪৩, ১০৭৩
রাজমল্ল মল্লিক ১০৪৫
রাজমল্ল সিংহ ১০৭৫
রাজমহল ৪৫৩, ১০০২
রাজলী ১০৪৭
রাজপুতানা ৩৯, ১৩১, ৫০০, ৭৪১, ৭৪২, ৮৩৯
রাজপুত শিল্প ৮৯০
রাজমিহির ২৩১, ৮৬৮ ৮৭৪, ৯২৪ ৯৫৩, ১০০২ ১১০৩, ১১২১, ১১৩২
রাজমাটী ৪০৭, ১১৯০
রাজমহল ১৯, ৮৫৫ ৮৫৭, ৮৫৯
রাজমালা ১৩, ২৮৯ ১০১৪, ১০১৯, ১০২০, ১০২২, ১০২৮ ১০২৯, ১০৩১, ১ ৩৩, ১ ৩৯, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৮, ১০৭৭, ১০৭৮ ১১১৯, ১১২০ ১১২১
রাজমালিকা ২৮৯
রাজমুকুটের ৩৭
রাজশ্রী ২৫৭
রাজসাহী ১৪, ৮৪৩
রাজিসিংহ ৮৫১
রাজপুর ২৩, ৩২ ২০২, ২৩৪, ২৩৫ ২৪০
রাজস্থান ৯৩১
রাজাকা ১০২১
রাজাবলোচন ৮৩১ ৮৬২, ৮৬৮, ৮৭৭
রাজু ৩৯০

রাজেন্দ্র চোল ৫৩ ৫২, ১৫, ২১৩ ২১৫ ২৮৩, ৪০২, ৬০৯, ৯৫৯, ১১০১
রাজেন্দ্র দাস ৯১২
রাজেন্দ্রনাথ সেন ২৮০
রাজেন্দ্রনারায়ণ ১০১৯, ১১২০, ১১৩৪
রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ১১৩৪
রাজেন্দ্রবন্ধু দাস ১০২১
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৫৩, ১২৪, ২৪০, ১০৮৪
রাজেশ্বর সিংহ ১০৬৩
রাজোপাখ্যান ১০৭৪
রাস বর্ষ ১৩, ৭৮৭, ৭৮৮
রাজাধিরাজবিজয়পত্ত ১০১৬
রাজিয়া ২৫৮, ২৬০, ৯৬৬, ৯৭৮
রাজ্যবর্দ্ধন ২১৯, ২২০, ৭৮৭
রাঢ়ী ২২০, ৭৯২
রাঢ় ৬, ১৮, ২০, ৩০, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৫, ২০৩, ২৮৩ ২৯৯
রাঢ়ু (রাঢ়া) ৬৮
রাতুল রায় ৬৬২
রাধাকৃষ্ণ ১১১৫
রাধাকৃষ্ণ দাসী ১১৩৪
রাধাগুপ্ত ১৭২
রাধানাথ ১০৪২
রাধানাথ রায় ১১৩৩
রাধানাথ-মন্দির ১১১৮
রাধাবল্লভ ১০২৩
রাধাবল্লভ ১০৯৩
রাধাবল্লভ-মন্দির ১১১৮
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু ১১৩৪
রাধিকা ৬৮১, ৬৮৪, ৭৩৭, ৯১৫
রাধা ৮৪১
রাধা ২৩, ৮৮৮
রামকান্ত ১১৩৫
রামকৃষ্ণ ১৫, ১১৪, ৩৭৩, ৯৪৭, ৯৫১, ১১৩৩, ১১৩৫
রামকেলী ৩২৪, ৮৯২
রামগয়া বিদ্যারত্ন ১০৪২
রামগোপাল ১১৩৩
রামচন্দ্র ২০, ১৯৮, ২৯৪, ৩৮০, ৪১৮, ৮০৪, ১০৭৬, ১১০৩, ১১২২, ১১৩৩
রামচন্দ্র কবিরাজ ৭৬০
রামচন্দ্র খাঁ ১১৩১
রামচন্দ্র রায় ১১৩৪
রামচরণ ঠাকুর ১০৩৭
রামচরণ তর্কবাগীশ ৩৩৯
রামচরিত ২৮৮
রামচাঁই ৯৫৭
রামজীবন মল্লিক ১১০৭
রামজীবন ১১৩৩, ১১৩৫
রামদাস কাপুরি ৭৪০
রামদাস খাঁ ০৪২
রামনাথ সেন ৫৮৯
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ১০৪০
রামনারায়ণ মল্লিক ৯৫৬
রামপাল-ভিটা ১০১৫
রামপাল ১২, ১৫, ৫৭ ৮৪, ২৫ , ২৬৮, ২৭৮, ২৯১, ৩১২, ৫ ৮, ৫১৫, ৬০৪, ৮৪৫, ৯৭৬ ১১০১ ১১০৪, ১১০৭
রামপাল-ভিটা ১০১৫
রামেশ্বর ৭০, ৪৪০, ৫৪১, ৬৯১, ১ ৭৪, ১০০৪
রামভদ্র ২৫৭
রামভদ্র কর্ণপুর ১১১৯
রামভদ্র ভট্টচৌধুরী ৮২০
রামমণি ৭৭১
রামমণি ১১১৪
রাম মাণিক্য ১০১৬, ১০৩৭
রামমোহন রায় ৫৩, ৩১৫, ৩০৬, ৬১১, ৭৯৯, ৮২৬, ৯১০, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৪৪ ৯৪৬, ৯৮১
রামমোহন সিংহ ১১২২
রামরতন ১১২০
রামরাইদেব ৯৭৯, ৯৮১
রামরাম বসু ৭৮৩, ৯৪৮
রাম রায় ৬৮৪, ৭৪২, ৭৬৯
রামরূপ ঘোষ ৮৪৪, ৮৪৮
রামলীলা ৯৮০
রামশঙ্কর পাল ৮৯০, ৮৯৪

রামমোহন রায় ৮৫৭
রাম সিংহ ১০৫১, ১০৬২
রামেশ্বরী ২২৮
রায়গুণাকর ৩৩১, ৩৪৩, ২৯৭, ১১১৪
রামানন্দ যতি ১১২৪
রামানন্দ যোগাদ্যা ১০৭৫
রামানন্দ সেন ১০ ২৮৫, ৯৮৫
রামানন্দ ঠাকুর ১০৬৮
রামানন্দ বসু ১১২৫
রামানন্দ রায় ৭৭৫
রামাবতী ৬৭৭, ৬৭৮
রামায়ণ ১, ২, ৫ ৩৯, ১২৫ ১৯৩, ১৯৮, ১৯৯, ২১ ,
৫৩৪, ৭০৩, ৭৭১, ৮৪৭ ৮৫৮, ৯৭৯ ৯৮৫ ৯৯৮
১০৪০, ১০৫১, ১০৭২, ১১২৩, ১১৫১
রাবী ৭৭৬, ৮৮১
রাহেবন্ত ১৮
রাঘবেন্দ্র চক্রবর্তী ৯৭১
রাঘবেন্দ্র স্বামী ৯৭৮
রাঘবেন্দ্র ১০৫৭
রাঘবেন্দ্র ২৫৮
রাজগড় ১০২৭
রাজগিরি ১১২৩
রাজবাড়ী ১৪
রাজবেশে বাচ ৩৯৫
রাজশেখর ৯৬১, ৯৯৪
রাজ ৫৩
রাজেন্দ্র চিত্র ১০৭১
রাঢ়ীমুটি ২৫৫, ২৪৭, ২৬৫
রাঢ়ীশ্রেণী ৯৫৩
রামেশ্বর ৭০১
রাহু ১০৫
রাহুল ৯৩, ১১৫, ১১৬
রাধাকান্ত ৪০৩
রিচ, চেম্বার্স ৮৩
রিয়াজ ৬১৩
রিপন ডেন জান পো ৩০৭
রিয়াসুদ্দ ৮৩
রুকন খাঁ ১০৯০
রুদ্রদামন ৯১৯
রুদ্রপুর ডিন ১১৯০
রুদ্রপুরের কৈলাস ১১৯০
রুদ্রপুরের বর্ষাক ১১২৫
রুদ্রপুরের রহাবক ১ ৩৭
রুদ্রিষ্ট ২০৯
রুদ্রিয়ন ৩৪৯
রুদ্রাক্ষ ২৯৪
রুদ্রযমন ১২৩
রুদ্রযাম ৫৫৪
রুদ্র-বাস ১০২১
রুদ্র সেন ২০৭, ৪১২
রুদ্র বারাহল ১১ ৫, ১১৩৩
রুদ্র ভারবাসুদ্রি ৩৪১
রুদ্রসিংহ ৭৩৩
রুদ্রমনি ১০৩৮
রুদ্রদাম ২৩৪
রুদ্রেশ্বর ২৯৭
রুদ্রসেনাম ৩১৮
রুদ্রসিংহ ১০৬২, ১০৬৩
রুপ ৫৩, ২৩৯, ৩২৫, ৩৬৯, ৭১৬-৭২১, ৭৩৭, ৭৩৫, ৭৪৪,
৭৫৩, ৭৮৮, ৩৩৭, ৭৯৯, ৮০১, ৯৩৩, ৯৭৫, ৯৮১, ৯৯৪,
৯৯৬
রূপকথা ৯২৫
রূপচাঁদ চাঁদী ৮৪৪
রূপনারায়ণ-ছড়া ১০৮২
রূপসজ্জা ৩৭৯-৩৮৫
রূপনারায়ণ ৩৭৩, ৩৭৫, ৭৪৫, ৭৪৩, ৭৪৯ ৭৫৪, ৮১৯
১০৭৫ ১১০১
রূপরাম ৯৭০, ৯৮৪
রূপরাম বসু ৭৮৩, ৭৯৩
রূপ সেন ৮৯৯
রূপাভিসার ৬৯১
রূপেশ্বর ৯০৮
রূপম পত্রিকা ৯৯১
রেখা-লিপি ৯০২
রেজুন ১২, ২০৯
রেবা খাঁ ৩৪১
রেড ইন্ডিয়ান ২৩১

রোনাল্ড ৪২১, ৭৩৭
রেমুনা ১০৯
রেশম ৯৪৩, ৯৪৫
রৈবতক ২৬, ৬৫২ ১০১
রৌদ্র ৪০০
রোডম্যান ৩৪
রোজগার ৪০৪
রোটারি ক্লাব ৬৩৭, ৬৩৮
রোটারি বাস্কেট ২৭৩
রোডেনস্টাইন ৪৩১
রোষ ৬৬৮, ৯৬৩, ৯৪৩
রোমধা ৫৯২
রোমান অক্ষর ৯৮২
রোমাইল ৬৯৫, ১১৩৭
রোহিণী ৬৮
রাত্রিদিন ২৮৩, ৫৮৩

ল

লক ক্যাটিন ১১৩৮
লক হোমস ১১৩৮
লক্ষ্মণশ্রী ৯৭৪
লক্ষ্মণসেন ৯৫৪
লক্ষ্মী ১০৩১
লক্ষ্মণ ৮, ১১৬
লক্ষ্মণসিংহাসন ৯৮১
লক্ষ্মণমাণিক্য ৮০১, ১০৪০, ১০৪১, ১১২১, ১১২২
লক্ষ্মণমাণিক্য ২৮৯
লক্ষ্মণ সেন ২৬৭, ৩৬৭, ৩৭৭, ৪৪৮, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৮৪, ৪৮৩, ৫২৪, ৫৫৫, ৫৮৯, ৬০৪, ৮২১, ৮৪৩, ৯৭৩, ১০৮৮, ১১২৫, ১১৫৯
লক্ষ্মণ হাজরা ১৮৮
লক্ষ্মণাবতী ১৩, ৪৩১
লক্ষ্মী ২০৬, ২৩০, ১০১, ৭০২, ৯১১, ৯৭০, ১০৫৪
লক্ষ্মীকান্ত আচার্য ১০৬৭
লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার ১৯৪, ১৯৫
লক্ষ্মীনারায়ণ ৪০৯, ৮১৭, ৮১৮, ১০২৯, ১০৭৬, ১০৭২
লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য ৭৪৫

লক্ষ্মীপুর ২৩৩
লক্ষ্মী সিংহ ১০৯১
লঙ্কা ত্যাগ চুল ১০২৯, ১০৯১
লঙ্কিয়া ৪৮০
লড সাহেব (লাট্টা) ৮১৫, ৮৭৪, ৯০৫, ৯১২
লঙ্কা ৯ ৭৫, ১৩ ৭২, ৮১ ২৩০ ৯৮ ৯২৪
লজ্জাবতিকা ৪৭৭ ৫৩৯, ৫৪৫
লব সেন ২৮৩
লম্ব ১০৫
লম্বা ছাতা ১০৯১
লম্বা ২৫৮, ২৫৯
লম্বোদর ১০৮, ১৩৫
লম্বিত ১১৩৭
লম্বিতপুত্র ৩৩
লম্বিতবিপ্লাব ৯১, ৯৩, ১৯৫
লম্বিতসাধব ১৮১
লম্বিকা ৩৮১
লম্বিতাক্ষিরা ২২৩, ৪২৪
লক্ষরপুর ১০৯৪
লা'ইই ফ্রাংচাস ৩১৫
লা'ইই ফ্রাংসো ৩১৩
লহড়ন ২২২
লাইব্রেরি সেস'স ১০২৭
লাউ পক্ষা ১০৪৩
লাউর ৩৮ ৭১১, ১০৫
লাউ সেন ২৮৫, ৪৭১, ৬৭৫, ৯১০, ৯৯৭, ১১৭১, ১১৩৯ ১১৩৯
লাক্ষাসাধ ৬৮
লাঙ ৫৩, ৭১, ৭২
লাঙ্গ ৫৯, ৭০
লাঙ্গুক ৯৫৭
লাজা ইয়েসি হোড ৩০৭
লাজা হাউসন ছুপ ৩১৬
লাবণকরা ২৩১
লাবিকা ৩১
লাল ৭৩, ৭৫, ৭৪
লালমোহন ১১৪৭
লালমোহন বাঁড়ুজ্জ ১১১৭

লালবাই ১১১৪, ১১১৬
লালবাঈ ১১১৬
লাল রাঢ়ী ৭০
লালশশী ৩২৭, ৮৯৯
লাল সাহেব ৮৭০, ৮৭৮
লালা বাবু ৯০০
লালা ৩২৬
লাহোর ৮২৬
লিকা পাহাড় ১০৪৪
লিঙ্গরাজ ১২৮, ১৩৮, ২০৭, ২১৬, ৫১৭
লীলাবতী ৯১১
লুইস ৮৩৪
লুতফ উল্লা খাঁ বাহাদুর (মৌলবী) ১০৫১
লুৎফুন্নেসা ৮৭৭
লুৎফুল খবির ৫১৯
লুসাই ৫২১
লুসিবী বন ১৯, ৯৪
লুসেন পাহি লিঙ্গাই ৬০৭
লোধাই ৩১৬
লো ৫৫ ৩৮
লোকনাথ ৯১৬
লোকনাথ মোহান্তী ৭১৬, ৭৪১
[illegible] ১১৪
[illegible] ৫৮৯, ১১৯
[illegible] ৩১৭
[illegible] ৩৪৯
[illegible] ১০
[illegible] ৮৩৭
[illegible] ১০৯৭
[illegible] ১০৫১
[illegible] ৯৫৩
[illegible] ৯৫৩
[illegible] ৯৫৩

শাস্ত্র ৬৮৪, ৬৮৬, ৯৭২
শান্তনারায়ণ ৮১৯, ১০৭৫
শাশ্বত ১০৫৬
শাস্ত্ররক্ষিত ২০, ৩১৭, ৩১৮, ৩৫৫, ১১৪
শাস্ত্রী বাসী ৭৭৭
শান্তি ৩০৬, ৩৫৯
শান্তিপুর ২২১, ১০৮৭, ১১১১ ১১৪০
শারদা ৬১৭
শার্ঙ্গ ২৯, ৪৩
শার্ঙ্গমকর্ণ ১২৩
শার্ঙ্গলবিক্রীড়িত ২৯৪
শালবান ২৭৩
শালবন ২৩
শাল ২৫
শালারাম ৬৩৭
শিকার-মৃগ ২২৯
শিকারাঘ্ন ১০১৯
শিখ ৮৩৪
শিখণ্ডিচিত্র ১০৭৮
শিব ৯, ১০, ৪১, ৪৩, ১৩৬, ১৯৩, ১৯৬, ২০১, ৪৩৩, ৪৭২, ৬৭৬, ৯২৮, ৯৭১, ৯৭২, ১০১৮, ১০৪৭, ১০৪১, ১০৭৭, ১০৮৩, ১০৯১
শিবচন্দ্র ৩৮০
শিবচন্দ্র রায় ১১৪৯
শিবচন্দ্র সেন ৯৮১
শিবদাস সেন ৯৮০
শিবনাথ রায় ১১৩৫
শিবনাথ শাস্ত্রী ৩২০
শিবনিবাস ১০৫৩, ১১৩১
শিবপুরাণ ৯২
শিবমন্দির ১১২৮
শিবমন্দির ১১১৪
শিবরাজ সেন ২৭৪
শিবরাম ১০৩
শিবলিঙ্গ ১০৭
শিবসংগীত ১০৮৮
শিবসিংহ ১০৪৭

শিবনিবেদন ১১১৪
শিবাজী ৮৩৩, ৮৪৪
শিবানন্দ সেন ২২৯, ৭৬২
শিবাবেশ ২১০, ২৭১
শিবারোল ১১৩৭
শিরোধেরী ৪৪৩, ৭৩৮
শিলাশিল্প ১১০১
শিলাবৃষ্টি ৫২
শিল্প-নি ২২ ১২১-২৪০, ৩৪৩-৩৮০
শিল্প ও ভাস্কর্য ৪৪৭ ৫৩৮, ৩৪৯-৩৮০
শিল্প ১০৭
শিল্পবাগ ১৩৬, ১৪০, ১৪২, ১৯১
শিল্পশাস্ত্র ১২, ২৩, ২৫, ৫৯, ৬২, ৩৩, ১৩৮ ২৭৬, ১০৭৭, ১১৪০
শিল্পশাস্ত্র ১০৭০
শীকর ২৩৮
শুভচন্দ্র চক্রবর্তী ২৭৬
শৈবলাক্ষা ৮৩৩
শৈলরাজ ৫১, ৩৪০, ৩৭১ ৩৭২, ৪২৮ ৩৭৪
শৈলরক্ষিত ৩৭৬
শৈলাবন্ধ ৩৭, ৩১
শুকুর উল্লা খাঁ (নবাব) ১০৯১, ১০৯২
শুকদেব রায় ১১৩৩
শুকসারিকা ১০৭০
শুক্রনীতি ১৩১, ২৭৫, ২৩৭, ৩৩৮
শুক্লাম্বিকা ৩০১
শুক্লাম্বর ২৩৯, ১০১৬
শুক্লাম্বর ১ ৪৮
শুক্লেশ্বরী ১০৪৬
শুটুকি মাছ ২১৯
শুম্ভনিশুম্ভ ১৩, ২১, ২৯
শুম্ভস্তম্ভ ধাম ২০২, ২০৩ ২০৪, ২০৫
শুম্ভকরী ২০১, ২১৪
শুম্ভনিশুম্ভ ১
শুম্ভার ৫১
শুম্ভপুরাণ ৯, ১৮ ৩৩১ ৩৭৫, ৯৩২, ৯৩৭, ৯৭৩, ১০৫৭, ১১১৪
শুকরাজ ৩০৪

১১৯৬

পুরুষম ১১১৩
পরিষদ সিংহাসন ১১০ ৩১০
পুষ্পাদি ৫০৪
পুরুষাস ২১১
পুলিন ৫১৯
পেয়ী ৮ ৩, ৮১২
পৌরাণ ৬৩১, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৭, ৬৫৪, ১০৯৩
[illegible] ৯১, ১১৩-১১৫, ২১৩ ২২০ [illegible], ৭৯৮ ৭৯৯ ১০০৬
প্রেমাভাস ৪০ ৪১
প্রভাতি ৩৪
[illegible] ৮৫৮ [illegible]
প্রেমী ১০৮
[illegible] ১০১ ১০৫
[illegible]
পাণি ১১ ৮৩, ১৪ ১৩২ ২০৯ ৩ ৮ ৩১৯, ৪৩৪ ৯ ৮ ৯ ২, ১১ ২
প্রাণকৃষ্ণ ১১১৪
প্রাক্ষণা ১০৯৫
[illegible]
প্রাথনায় ১০৮, ৮৪৪, ১০১৭
প্রাণরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির ১১১৩
প্রাণরায়ের মন্দির ৯১০
প্রাণন মন্ত্র ২৮৩, ২৮৪, ৪০২, ৬৫৮
প্রাচীন পাঠ ১৮৮
প্রাণপ্রতিষ্ঠা ৯৫৩
প্রাণপ্রতিষ্ঠা পদ্ধতি ১১১৯
প্রাণায়াম ১০৪
প্রাণায়ামী ১ ৫৯
প্রাণোপাঞ্চ ২ ৭৪২, ৭৯১ ৭৯৯ ৮৩২, ৯০৯, ১০০১
প্রাণায়ামী ৮ ২
প্রবল ১১, ৫৯
[illegible] ৭০৯, ৭৮
[illegible] ৯১১ ৯১৮
[illegible] ৭০২
[illegible] ৯০১
[illegible] ১১০৩

বৃহৎ বঙ্গ

[illegible] ২০৭, ২০৮, ২১৯
[illegible] ১১২৪, ১১২৯
[illegible] ৩০৫, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৬, ৮১৪
[illegible] ৩০৮
[illegible] ৩৩৩, ৩৫৩
[illegible] ১ ৪১
[illegible] ২৮৫
[illegible] ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১৩৭-১৩৯, ৯৮১, ১০৮১, ১১১৪, ১১১৯
[illegible] ১১ ২
[illegible] ১৮৩ ১৮৯, ১৯১, ১৯৮, ২০০, ১০৪০, ১০৪১
[illegible] ২১১ ৯৭৯
[illegible] ৯৮৪
[illegible] ১০৪, ১০৫ ১১১ ১১২ ১১৯ ১৩১ ১৩১, ১৪১ ১৪৩ ১৮২ ৯৬১ ৯৬৬
[illegible] ৫ ১৩ ১১১ ৯৩১ ৯৩৪
[illegible] ১৮৮
[illegible] ১১৯ ১৩০ ৭২৫
[illegible] ১০৩, ১১২ ১১৩
[illegible] ১০৫০
[illegible] ১০৮১
[illegible] ১১৯
[illegible] ১১৯১
[illegible] ১ ১১, ৯১, ৩৮ ২১৩, ৫১২ ৬২৯, ৬৯৭ ৭১৫ ১০ ১১৯ ১৮৭, ৯১২, ৯৩৯, ৯৭৩, ৯৮৫, ৯৮৯, ১ ৯০ ১০৯১ ১০৩৪ ১০৪১ ১০৪৯, ১০৫৮, ১০৮০, ১১৮১ ১ ৯৬, ১২১৯
[illegible] ১৯১
[illegible] ৪১৫
[illegible] ১২৫

ম

[illegible] ৯১৫
[illegible] ৭৪৯
[illegible] ১২৫
[illegible] ৯১৩
[illegible] ৯১৯, ৯৮১

ষ্টুয়ার্ট ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৯, ৮৪২, ৮৬১, ৮৬৯, ৮৭৫, ৮৮০
ষ্টেট্‌সম্যান ৪৫৪
ষ্টেশলটন ৪৭৮, ৪৮০, ২৮১, ৪৫৯
ষ্টেলা ক্রামরিশ ৪০০

স

সংগ্রাম সিংহ ৮৪০, ৮৮৯
সংঘোষিনী ১০৮১
সংস্কৃত ৩৫৩-৩৭৬, ২৪৩, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৫ ২৬৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮২, ২৮৩, ২৯৪, ২৯৫, ১০৫৩, ১০৮১, ১০৮৭
সংস্কৃত সাহিত্য ১০৭২
সংস্কৃতজ্ঞ ২৪৬
সংস্কৃতে ১৮২
সকুষ্ঠ ২৪
সখিবা ৫৩৯, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৯১৩
সখিসোপা ৪০৯
সগা ৬৩৫, ৬৬৯, ৬৮৭, ৯৭২
সগর ৪
সঙ্গেশ্বর-মন্দির ১১১৮
সঙ্ঘমিত্রা ৮৯, ১৪৮, ১১০৫
সজ্ঞারাম ১১০৫
সত্তর ৯৭৮
সত্রয়বেলট্টিপুত্ত ১১৫, ১১৮
সত্তীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১১২, ৩১৮
সত্যেন মিত্র ১১৩, ১১৭, ৮১৩, ৮৪৬, ৮৪৮, ১১২৩
সত্যেশচন্দ্র রায় ১১৩৫
সত্যপীর ৮৬, ৯১৮
সত্যবাদ্ ৪০১
সত্রাজিৎ ১৩, ৭১৯, ৮০১, ৮১০ ৮৪৩ ৮৮১, ১০৬০
সদানন্দ গ্রাম ৭৮২
সদাশিব খাঁ
সদাশিব রায় ১১০৬
সদ্গতিকর্পামৃত ৫৩০, ৫৩১, ৫৩৩
সদ্ধর্ম ৪৪, ৩৩১
সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্রিকা ২৮১ ৫৫৭
সনক ৩২৯
সনক সম্প্রদায় ৬১৮
সনাতন ১১, ৩২৪, ৩২৮ ৬০৪, ৭১৩-৭২১, ৭৫৭, ৭৬৪, ৭৯৭, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০১, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৬
সনাতনগোস্বামীর আশ্রম ৪৪৪
সন্ধ্যাকর নন্দিন ১০৭১
সন্ধ্যার রাগ ৮৮১
সন্ধ্যোপাসি ৬৮১
সন্ধ্যা ৭৯৭, ৮১৫, ৮১৬, ৮৬৬, ১০৪৪, ১১৫৩
সন্ত্রাবলি ৩১
সন্ধ্যাকরনন্দী ২৮৮, ৫৮৮, ১০১৪
সন্ধ্যাসবর্ত ১২৫-১২৮
সপ্তগ্রামের ৬৮৮
সপ্তগ্রাম ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৬, ৭৮৮, ৯১৩, ৯২৪
সপ্তর্ষিবাদ ৮২৪
সপ্তশিখ ৫২৩, ৫২৪, ৫৩৮
সপ্তশতক ৬১৫, ৮৭৬
সপ্তস্বরা ১, ১২ ৬১, ২২৫
সপ্তস্বরীর আরোহণ ১০৬৬
সপ্তসাগরদিগন্ত ৪৭৭
সপ্তসেতুর যুদ্ধ ১০৫৩
সপ্তসেতুর স্ত্রী ৮৪৮, ৮৫৯, ১০২৫,
সপ্তসেতুর বাহিনী ৯৯১, ১০৪৩, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৪
সমুদ্র ৪ ৬৮
সমুদ্র ১০৪৯
সমুদ্রগুপ্ত ১৫, ৪০৮, ৫০৯, ৫১৩, ৫৪৩, ৬১৯, ৪৪৭, ১০৮, ১০২৮
সমুদ্রতেজস ৯২৪
সমুদ্রবর্মা ১০৫৩
সমুদ্রযাত্রা ৪৭৩
সমুদ্র সেন ৬৩
সমেতশৈখর ১৯, ১৬১
সমলপুর ২২৯
সমাহর্তাগর ৯১৩, ৯১১
সমোপবন্ধ ৬১৮
সমুদ্রগুপ্ত ৮৮৭

সত্যব্রত দত্ত ১০৯০, ১০৯১
সরকার ইতিহাস ৬৮
সরকার দীনেশচন্দ্র ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬
সরযূ ৩০, ৯১১
সরস্বতীদেবী ৮৯০
সরোজিনী দেবী ৭, ৪০২, ৪৪৭
সরোজিনী নগর ৪, ২০৩, ২০৪, ৯১১, ১০৪৯, ১০৫৭
সরোজবিকাশ ৯০৫
সরোজনা ১১৩৮
সরোবর ৭৮৭, ১০৩৩, ১০৩৭, ১০৩৯
সরিৎসাগর ১১২৪, ১১২৮
সরিষাফুল ২৮৩
সরোদবাদ্য ১০৪১
সরোদী ১০৪৩
সরিৎ দেবী ১১০৩
সরিৎ পুর ১৩৭
সরিষাবাড়ি ১০৪৭
সরিষাবাড়ি ৪৭, ৪৮, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৭৭২, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮২, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৯০, ৭৯৬, ৮০৬, ৮৩৬, ১০১২
সরোবর ৫২, ১৪৮
সরোবর ৯১৩
সরোজিনী ২৮, ৪, ৫
সরিৎসুন্দরী ৫৭, ৬৮, ৬৫, ৬৯
সরিৎসাগর ৬৮,
সরিৎসাগর ৮২৪
সরোজা ৮৯২
সরোজাল ১০৮০
সরিষাবাড়ি ৪৫১, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬
সরোজবালা ৪৮
সরোজ ১৩
সরোজবাসিনী ১১০৭
সরোজিনী ৮, ১
সরোজিনী ৪৫৫, ৮১, ৮২৩, ৮২৭, ৮৩৯, ৮৩৫, ৮৩৮, ৮৮৯, ১১০৪, ১১, ২
সরোজা ১৩, ১১৩২
সরোজাক্ষপাড়ি ১১৩৯
সরোজপল্লী ৯০২
সাধনাবন্ধ ১১০৩
সাধুবাদ ১০০৪
সাবরমতী ১০৫১
সাবিত্রী ১২৭, ৯০১, ৯৩৩, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৮, ৭৮১, ৮৩৫, ৯৬৯
সাবিত্রীদেবী ৪৮৭
সাবর্ণ ১, ১১, ৩৫, ২৮৮, ২৮৪, ২৮৭, ৯০৪, ৯০৭, ১১০৪, ১১৪০
সাময়ুক্তকরা ১০৯৭
সাম্য ১০৫৩
সাময়ে সেন ৪৬৪, ৪৬৬, ৫২৩
সারস্বতকল পুর ১০৪, ১১২, ১১৪, ১১৭, ১১৮
সারণাম ৯২৩
সারসুচিমা ৬২৩, ৬২৮, ৬৭২, ১১০৯
সারসুচিমা (তুলাচার) ১০৫৩
সারসুচিমা ইতিহাস ৯৭৭, ১০৯০
সা মহম্মদ আলি রাজিব ৮৭৯
সাহেবা খী ৮১৪, ৮১৫, ৮২১, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৬, ৯২৭
সারস্বতাচারাম বিদ্যা ১৪৮
সারস্বত ১২৭
সারদেশ ১১৫
সারক দেবী ২২৩
সারোদবাদ্য ১০৩ ১০১
সারদাশ ১১৪
সারিপুর ১১৬, ৩০১
সার্দি ছিপার টিকা ১০১০
সারদা রৌকা ১২৩
সারদাদেবী ৬০২
সারিমদাহ ৩১২
সায় আলম ১০৭৯
সায়ুজাল ৬২১
সায় ছেলার ১৪৯, ১০৮৪ ১০৮৯ ১০৯০
সায়ুদ্দিন ৫০০ ৬২৪, ৯২৪
সায়েদকেন্দ্র রোকাজম মহাশয় খী (নবাব) ১০৩২
সায়ক্ত ৬২৭
সায় মুজা ১০৩৩
সাহাবাজ খী ৭৮৩, ৭৮৭, ৭৮৮, ৮২১, ৮৪২

সাহাবুদ্দিন ঘোরি ৩৫৪
সাহিত্য ১১২৯
সাহিত্যপরিষৎ ৯৭৭
সাহি বসন্তিক ১১৩০
সাহেব সা ৯৭৮
সাহেব গনী ১৭১
সাহেব খাঁ ৩৪৮
সিংহপুর ১৯, ২১, ৪৯, ৪৭, ৬৫, ৬৫, ৬৮, ৯৮৩
সিংহবর নারায়ণ ১০৩৪
সি ওধারিনী ৮৬, ১১০১
সিংহলদ্বীপ ৫৪ ৫৫, ৫৬, ৫৭ ৫৮ ৬১ ৭৩, ৭৪ ৭৫ ৭৯ ৮৬
সিংহল ১১, ৫৪ ৬১, ৭১, ৭২, ৮৭, ২৫৭, ২৬২, ৩০৬, ৩১৮, ৪৩৬, ৫৪৮ ৫৯০, ১১০৩, ১১০২
সিংহল-বিজয় ৫৫
সিংহলী ৬৭, ৬৮, ৮৮, ৮৯
সিংহসিংহলী ৭৩
সিকোলা ১১০৮
সিকান্দরপুর ২৫৮, ২৬৯, ৩৩০, ২৪১
সিক্রিগ্রাম ৯৭৯
সিন্ধুরগড় ৫৭
সিন্ধুপুর ১৮৩
সিন্ধুসেন দিবাকর ৩৩৫, ৩৪৪
সিন্ধাই ৭১৩
সিন্ধান্তবাগীশ ১০১৩
সিন্ধার্থ ৬০
সিন্ধি ১১৭৩
সিন্ধিবন্ধর ৩৩১, ৪৫০
সিন্ধেশ্বর ১০৮২, ১১৮৩
সিন্ধু ১, ২, ৩, ৮৭, ৮২৫, ১০৫১
সিন্ধুকী ৫৭০, ৫৫৩, ৬১৭
সিন্ধলী ৫৩
সিন্ধসন ৫৪
সিন্ধাবিবাহ ৫৩৯
সিরাজউদ্দৌলা ৮৫৫, ৮৭০, ৮৯১ ৮৯৪, ৮৯৬, ৮৯৮, ৮৯৯, ৮৯০, ৮৯৩, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫,

১২০০

সুধাময়ন্ত ১০১৪
সুধীন্দ্রকুমার ৫১৩
সুন-উপন্যাস ১০১৯
সুন্দর ১০, ৪২৭, ৯৫৫ ১০০৩
সুন্দর গোয়াইন ১০১১
সুন্দরবন ১১ ১৫, ৭৮১, ৮১৫, ৮৪৪, ৮৭৩, ১০৮০, ১১২৩
১১৩৭, ১১৪০
সুন্দর সিং ৯৩৩, ৯৪৭
সুন্দরী ৭৮৭
সুপারিকা রাজা ১০৩১
সুপিয়া ১০৫৮
সুপ্রভাবন্দর ৫৮
সুবন্ধি ৩১, ৩১, ৩২, ৭৫ ৩১০
সুবাহু ৩১
সুব্রহ্মণ্য ভারতীয় ১০৮০
সুমাকল্প ১০৫৮
সুমি ভাষি ৭৪১
সুমেরু ১০১৮
সুরসেন ৫৮, ১০৩১, ১০৫০, ১১১০
সুরসেন ৩০৩
সুরসরিৎ ৩৩৩-৩৩৮, ৯৭৩
সুরসিংহ ৮, ১৯, ৩০৩, ৩৩১
সুর্যসী ১০৩৩
সুলা ৩৩৮
সুবিন্যাসাল ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৩
সুবিন্যাস ১০৩১
সুবিনয়া ১০৫৭
সুবুদ্ধি রায় ৩৩২, ৩৩৩
সুরক্ষা ১০৫৩
সুরমা ৫৫১
সুরক্ষোষি ১৪৫
সুরাপসেনা ২০৩
সুরেন্দ্র ১৯, ১০১৩, ১০৪৭
সুরেন ১৪৩
সুবর্ণভূমি ৮১
সুবেন ৯৫
সুবেশ ১৪১, ১৪২
সুবেলা ৭০, ৯৭২

সুবিত্র (সুবিত্র) ৭৫, ৮৩
সুমিত্রা ৮৩, ১১০২
সুমেরুপ্রিয়াস ১৩০
সুরাপুর ৩০৫, ৪৭৫, ১১৩৩, ১১৪০
সুরেন্দ্র ১০৯৭, ১০৯৮
সুর্যদেব সিংহ ১০৮০
সুরসুন্দরিনী ৪
সুবর্ণ নারায়ণ ১০৭১
সুবর্ণন ৩৩২, ৪০৫, ৪৩৩
সুবাসন ৮৯০, ৯৭৩
সুবাবন্ধ পী ১১১৩, ১১৪১
সুবেন্দ্রযোহন বসু ১১৩৩
সুবেশ ৪০৩
সুর্পাক্ষী ৮৭
সুর্যা ১০৩৩, ১০৫৩, ১০৮৫
সুলতানগঞ্জ ৫৩৩
সুলিকল্প ১০৩১
সুলেমান পী ১০৪৮
সুলেমান সাহ ১০৩৩
সুলোচন রাজা ১০৩৭
সুলোচনা ১১৫৩, ১১৫৭
সুবুদ্ধা ৩০৫
সুবেন ১১৫৩, ১১৫৭, ১১৩৩
সুবা সুর্যাপুত্র ৩৩৩
সুর্যিমা ৫৫, ৫৩
সুরেশবা ১০৫০
সুবেন ৫৩
সুবিত্র বর্মা ১০৫৩
সুবা মা ১০৫৮
সুবাং ১০৬১
সুরেশবা ১০৫৮
সুবৈ ৫০৪
সুবা ৩, ৩০, ৫৪
সুরসেন ১৩
সুবা ১০, ৩৯ ৫১৩, ৫১৭
সুবাকল্প ১১৫
সুবৈতাস সরকেল ৭০৩, ৭৩৩
সুবাসুবি ১১৫৪, ১১৫৮

হরিণর ৩৬৮
হেক মহুয়ের ১০৪১
হেক উদ্যোগ ২৩৯, ৪৪২, ৪৬৪, ৪৮৩, ৫০৩, ৫১৪, ৫১৩-৫২৩, ৯৬৪
হেকেশ্বর সাহ ৩৫০, ৩৬৩, ৩৬৬, ১০৬৪, ১০৬৮, ১০৬৯
হেকেশ্বর বাবা ১৯
হেমন্তীয়র ৩১, ১৪২
হেমুখণ্ড ২০৯, ৫৫৪, ১০৩৬
হেমন্তমন্ত ১১৩২
হেম ২০, ৩৭, ৬৩৩, ১০৬৯
হেম-রাজির ৪৪৮-৪৭১, ১১২১, ১১২৯
হেমহাটি ৫৪৩, ৫৪৮
হেমাসিহি ১০২৭
হেম আলোপাস ৮১১, ৮২১, ৮২৪, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬
হেরিক খী ৮০৮
হেলিটকস ১৪০, ১৮১
হেলিডিস ৮৭২
হেলিস ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪
হেলিহরড় ৮৩০
হৈত উদ্দিস ৩২২
হৈত আলোপাস ৯৮২, ৯৯৯, ১০০৭, ১০০২
হৈত ইত্রাহিম ১০০১
হৈত খাস্ ৮৫৫
হৈত মর্তুজা ১০০২
হৈত মহম্মদ ৮৩৪, ৮৫৩, ৮৬১, ৮৬৪
হৈত মহম্মদ আলি খী (বরাব) ১০৯১
হৈত হুসেন ৬৩১, ৬৩২
হৈত উমৌলা ১১৩৫
হোগাই ৮৩২
হোগাপাড়া ১১৩৯
হোগাবণি ৭১৮, ৭১৯, ৮০৫
হোগাপুরী ১১১৩
হোগাহোড়া ১০২৭
হোগার খী ১৩, ১৩০, ১৩৩, ১৩৭
হোগার বাঙলা ৮১৫
হোসেনহোসাহ ৬০১
হোম খোর ১১০১
হোমহোর্ড ৭১
হোমর ১৪৫
হোমরী ৫৯৯
হোমনাথ ২, ৫১০, ৫২৩, ৫২৭, ৫৪৭
হোমনাথ মুখোপাধ্যায় ১১০৩
হোমেশ গুপ্ত ১০৩
হোমেসাস খী ৬৪৩, ৬৫২, ৭৮৭, ৭৮৯, ৮২৮, ৮৩৯
হোমেসাস ভরদ্বাজ ৬৪৫, ১০৩ , ১০৭১
হৌরীন ৬২
হৌরবর্ণ ৫৭৩-৫৭৯
হৌরাষ্ট্র ৯
ষট ৫১৯
ষড়িপু ১৮
ষড়ভুজ ২১৪, ২১৩, ২১৭, ২১৮, ২২১, ১১০৯
ষিমে ৫৪
ষ্টোলোকের উচ্চশিক্ষা ৫২৭
ষষ্ঠিরপুত্র ১৭৯
ষাগড়া ও শিঙ ৩০৯, ৪০৯-৪১২
ষ্ঠিরবর্ণা ১০৫৩
ষ্ঠিরমতি ৩০১
স্পেন ২২৮
স্পেনিশিজেস্ ১২১
স্পেসোগ্রাফাস্ ১২৩
হকীম ১৪১
হজ্ ৪০
হজ্জাজ ৩৮
হর্ণ বাহাদুর ১০৪৯, ১০৬৩
হর্ণগ্রাম ১০২৩
হর্ণবতী ১১০৭
হর্ণ সিংহ ৪৪৫
হার ২৬৯
হারেমবন্দুকা ৮২১
হার্ডিক ২৬৮
হিন্দ (হার্গার্ট) ৮০৩
হিন্দ (হিন্দেস্ট) ১১৩, ১৩৯, ১৯৮, ১৪১, ১৪৩, ১১৭, ৫৪০, ৫৬৩, ৫৮৩
হুরি ৮৩৩, ১০৩৩

হ

হ ম ২৫
হ শ্রেয়ম ১১০৬
হ সেবাইত মন্দির ১১৪০
হংস ৭০৭ ৭০৮ ৭১১ ৭১২
হজরত ১২৭ ১৭১ ৮২২
হজ্ব কথা ১০৫৩, ১০৫৪
হজ্বে যেতে ১০৮৫
হজ্বযাত্রা ১০৮৫
হঠাৎ ৪৭০
হনুমান্ ২৩ ১২৬, ১৪৩, ৪১৯, ৬৮০, ৬৮১
হরকিরণ্ ১০৩৪, ১৩১, ১৩৩
হরিণশ্রী ১০৪৪
হরিণ খাঁ ১০৪৪
হরিণ ২০৩
হরিণাক্ষী ৫৯
হরিপদী ১১১১
হরিপদী সংবাদ ৯১
হরিয়া ২২৯, ২৩০, ২৪১, ৪১৩
হরিসাধন পাত্রী ৭, ১১, ৩৭, ১৮৩, ২৩৪, ২৮৮, ৩৩১, ৩৯১, ৩৮৩ ১০৪১, ১১০৩
হরিসাধন-সম্পর্কিত-লেখমালা ৮
হরিহর ১০২৬
হরিষে পুজা ১১ ২
হরিহরক্ষেত্র ১০৭১
হর্ষবেগ ১১
হর্ষিতরণ হাস ১২৬
হর্ষোৎফুল্ল ৯৪৬
হর্ষিত পত্রিকা ১২৪
হবিষ্যান্ন ৪৬১, ৪৬৮
হবিষ্যান্ন সাধু ৪৫১, ৪৮১, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭৮১, ৮৯৪, ১১১৮
হরিষ্যান্ন নিরাকরণীয় ১৪৭, ১৪৮
হরিষাল ১৯, ৭০৪, ৯৬৮
হরিষ্যে হৈকুর ১০৩৬
হরিনাথ নদী ১১০৪
হরিপাল ৪৮৬, ৯৭০, ১১০১
হরিপুর ২৪১
হরিবংশ ৭, ২৪, ২৬, ২৭, ৩৩, ২৩৮, ৪২৪, ১০৫, ১০৫১
হরিবর্ষী ১০৬
হরিভক্তিবিলাস ৭২০, ৭২৮, ৭৪২, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৬৪
হরিভক্তিবিলাসামৃতসিন্ধু ৭৫২
হরিলীলা ১১০
হরিশচন্দ্র ৯, ৩৩, ২৭৫, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৭, ৭৭৫, ৮৪৩, ৯০৭, ৯৩৩, ১১০৩, ১১০৭
হরিশ্চন্দ্র মাহাত্ম্য ১০৭৯
হরিষে বাইচি ৩৬০
হরিহর ভট্টাচার্য ৩৯৭
হরিদাস ৫৪৩
হরিদাস খাঁ ৪২৩
হরিধ্বনি ১০৯২
হরেকৃষ্ণ সমাধান ১১৩৩
হরেন্দ্র ৬৩৩, ৮৩৭, ১০৭৩
হর্ষাই ১০৮৭
হর্ষিত ১২০
হর্ষপাল ১০৪৫, ১০৬৯
হর্ষদেব ২০৩, ২০৯, ২৯১ ৭০২
হলকর্ষণ ৮৭৫ ১১ ১ ১১১৯
হলায়ুধ ১৫৮ ৪৫১ ৫০৩, ৫০৪, ৪৬০, ৫০৩, ৫০৯ ৫৭৮, ৯১৭
হলায়ুধকোষ ৪১২
হস্তিকর্ণা ৮১৮
হস্তিকর্ণা ৫০৫
হস্তিনাগ ২৫৮
হস্তিনাপুর ১৫৮
হাওড়াসাস ৪, ৩০৮
হাকন্দ ৩৫০
হাজেরি ৩৮
হাটার ৩, ৪০
হাজারদুয়ারি প্রসাদ ১১০৬
হাজি আহম্মদ ৮৫০, ৮৫৪
হাজি মহম্মদ ৮১৪ ৮৫৩, ৮৬১, ৮৬৪
হাজি মুনসুর ১১০৮
হাজি হুসেন ১০৩৯

হাজো ১০৬১
হাটকেশ্বর ১০৮৩, ১০৮৫
হাড়মালসা ১১৪০
হাড়ি সিদ্ধা ৩৩৩
হাতিয়া ৮১৫, ১১২৩
হাতিয়াগড় ১১৩২
হাদুরা ১১৩৮
হানিফ ৮০৫
হাবেরা ৩২৯, ৭৪১
হাবিবুল্লা ১১৩৬
হাবিলী ৬৩২, ৬৫০
হামজবলীর প্রপাত ১০৪২
হামির খাঁ ৮৩৯
হায়দরাবাদ ৯০৪, ৯২৮
হারক ৯০৩
হারিয়া মেছ ১০৭০
হারীত সংহিতা ১৬১
হাল্লেমেরবেগাবার ১০৫৩
হাসান (হারমাদ) ৪১৩, ৮১১, ৮২৯
হাসা ৯ ৩
হালহেড সাহেব ৬১৩
হালাম ১০৬৭
হালি (পালিবাস) ৬৮
হাসাই ৪০৭
হাসানুজ্জিমা বিলাসি ৪১৩
হিউগো, ভিক্টর ৯০৫
হিউস সাঙ ৭, ৮৯, ৯০, ২১, ১৩৩, ১৩৭, ২০৯, ৩১১, ৪১২, ৭১০, ৫৫৪, ৫৫৯, ৭২২, ১১০০ ১১০২
হিজু ৫৯৫, ৬০৭
হিজুল নারায়ণ ১০৩৩
হিজরি ১০৯০
হিজলি ৪৭, ৮৫১, ১১০৪
হিড়িম্বা ৬৫৫
হিন্দী ১০৯, ৯৬২
হিন্দু ২৩৮, ১১০২
হিন্দুস্থানী ৯৫৩
হিন্দুস্থানী লিপি ৩৫
হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ৮২০
হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ৬৫৫
হিরু ১১৭
হিমকর দাস ৮৪২
হিমগিরি ১০১৮
হিরণ্যের প্রপাত ১০৪২
হিরাবতী ৩০৮, ৯৩১, ৯৪৯
হিরু ৬৩৯
হিজল বি ই ৮৩৮
হিরণ্য ৭১১ ৭২২
হুসায়ন উদ্দিন ৪১৪
হুদ ১০৩
হৈমবত ২০৮, ৩০৪ ৯৫৯
হৈহয় ১০৬৮ ১০৬৯ ১০৭০
হীরাপুর ১০৫৩, ১০৫৮, ১০৬০
হীরাবতী খাঁ ১০৫০, ১০৫৩
হুলুদ ১১০১
হুগলি ৩০, ৩৮, ৫৭, ৮১৫, ৮১৩, ৮৬৮, ৮৭১, ১১৩৮
হুন ২৩১, ২৪৭, ৩০২, ১০৪১
হুমায়ুন ৮৩৩, ৮৩৫, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৫২
হুমায়ুনের প্রবাস ১১৩৩
হুদি উদ্দি ৩১৮
হুসেন আলি ১১৩৩
হুসেন আলি খাঁ ৮৫১, ৮৫৯
হুসেন কুলি খাঁ ৪১৮, ৮২২, ৮২৩, ৮৩১, ৮৩৩, ৮৭৪, ৮৭৮, ৮৭৯
হুসেন খাঁ ১০৫১, ১০৫৯
হুসেন সাহ ২১, ৪৩৩, ৪৪৫, ৪৪৯, ৪৫৭, ৭১১, ৭১৭, ৭৩৩, ৭৫৭, ৭৮১ ৮৩৯, ৯১৭, ৯৫৮, ১০২৩, ১০২৭, ১০৩৯, ১০৪৩ ১০৪৮, ১০৫৬, ১০৫৯, ১১৩১
হেরোদোত ৭২
হেকিম ৪১৫
হেতমপুর ১১৩৬
হেমাকলাট ১০৯১
হেমচন্দ্র চৌধুরী ১৩১
হেমন্তক ১০৭৮
হেমন্তকুমারী ১১৩৫
হেমন্ত সেন ১০৯, ৫২৪, ৯৭৩

হেমপ্রভা দেবী ১৮১
হেমমালিকা ৪৪৯
হেমেন্দ্রকুমার ১১৩৩
হেরম্ব ১০১৮, ১০২৫, ১০৭৯-১০৮০
হেলিওট্রোপিয়ম ২০৪
হেস্টিংস ১১৩৫
হৈতেন পী ১০৪৭, ১০৪৮
হোগলাডাঙা ৮৬৯

হোত (হোতৃ) ৬৮
হোমের টিবা ১০৮৪
হোরস পী ৬০১
হ্যাদিস্টস ১৭৭, ৮৫১
হ্যাডসন সাহেব ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮১
হ্যাপ্রিয়ানাস ৭২
হ্যালিডে ১১৩
হ্যুয়েন ১০৩

চিত্র-সূচি

আমরা কতকগুলি ধাতব বহুমূর্তি চট্টগ্রামের মেসার্স পাগাডের নিকটে পাইয়াছি। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেও সেইরূপ অনেকগুলি রক্ষিত আছে। অন্যত্রও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে রাজা-রাণীদের কতকগুলি মূর্তির এরূপ আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য, যে মনে হয় যেন তাহারা একই কারিগরের হাতের নির্ম্মিত। বাঙ্গলা হইতে যে এই চিত্র ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্প সুদূর ভারতাদি সমস্ত পৃথিবীতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ক্রমশঃ বহু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা এই পুস্তকের ভূমিকায় ৯৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সম্প্রতি গাইকোওয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে ডাঃ সিলভ্যান্ লেভি কর্ত্তৃক নেপাল হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথির তালিকার ভূমিকায় ঐ দেশের একখানি চিত্র সম্বন্ধে প্রাচীন পুস্তকের উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখক বলিতেছেন যে তিনি "বোধ হয় গুরুদের চিত্রানুক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উহার সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চিত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৪৩৯ (খ) সংখ্যক পৃষ্ঠায় বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধে বাঙ্গালার চিত্রশিল্প সম্বন্ধে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ গুলির উচ্চ ধারণার প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাম্রমন্ত্রের মত কোন ধাতুর জানিয়া গেলে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যেরূপ বহু স্থান ব্যাপিয়া পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলার সেই অমৃত শিল্প নিদর্শনগুলির নিদর্শন সেইরূপ এখনও দেশময় পড়িয়া আছে; এখনও তাহার প্রচুর অনুসন্ধান হয় নাই।

(১) চিহ্নিত চিত্রগুলি সমস্তই আমার চিত্রশালার, উহাদের অধিকাংশই এখন ত্রিপুরেশ্বরের আগরতলার রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। কেবল যাত্র যে সকল মূর্ত্তি ও চিত্র আমার রণেশ্বর দেবমন্দিরে পূজার ঘরে ছিল, তাহা সেইখানেই আছে।

		পৃষ্ঠা
১	মকরের উপর গঙ্গাদেবী (দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ) ..	১
২।	বিজয়ের বঙ্গপরাজয় (অজন্তা)	৭৮
৩।	যুদ্ধান্তে প্রমোদোৎসব অজন্তা	৭৯
৪।	বিজয়ের অভিষেক	৮০
৫	সিংহের সহিত মল্লযুদ্ধের দৃশ্য কাল' ঘাটের পটুয়া)	৮৫
৬।	সিংহলী ধর্ম্ম-গুরু ধর্ম্মপাল	৮৬(ক)

		পৃষ্ঠা
৭।	ধর্মপাল (বৃহৎ বঙ্গে)	৮৬(ক)
৮।	বিমলানন্দ	৮৬(ক)
৯।	দেবপ্রিয় বলীসিংহ	৮৬(ক)
১০।	রেডারেণ্ড শীলানন্দ	৮৬(খ)
১১।	রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ	৮৬(খ)
১২।	পালোওয়ার নৌকা	৮৬(খ)
১৩।	বুদ্ধ-পুত্র রাহুল (প্রাচীন চিত্র হইতে)	৯৬
১৪।	সারিপুত্র (প্রাচীন চিত্র হইতে)	১০৩
১৫।	মৌদ্গল্যায়ন (প্রাচীন চিত্র হইতে)	১১৬
১৬।	পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি	১৩৫
১৭।	আলেকজেণ্ডার (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	১৪৪
১৮	পুরু ও আলেকজেণ্ডার (প্রাচীন মুদ্রা হইতে	১৪৫
১৯।	বহিঃপক্ষযুক্ত আলেকজেণ্ডারের মুখ	১৪৭
২০।	আলেকজেণ্ডারের বহিঃ-লাঞ্ছন শিরস্ত্রাণ (ত্রিবর্ণ)	১৪৭(ক)
২১।	অশোক	১৫৪
২২।	কনিষ্ক (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	২০৩
২৩।	হুবিষ্ক (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	২০৩
২৪।	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার দেবী (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	২০৭
২৫।	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	২০৭
২৬।	সিংহ-শিকারী চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (প্রাচীন মুদ্রা)	২১০
২৭।	শিকারোদ্যত চন্দ্রগুপ্ত ২য়) (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	২১১
২৮।	অশ্বারোহী চন্দ্রগুপ্ত ২য়) (প্রাচীন মুদ্রা	২১১
২৯।	বীণাবাদক চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (প্রাচীন মুদ্রা	২১৪
৩০।	কুমারগুপ্ত (১ম) (প্রাচীন মুদ্রা)	২১৫
৩১।	কুমার গুপ্ত (২য়) ঐ	২১৫
৩২।	স্কন্দগুপ্ত ও তাঁহার রাজ্ঞী, ধরুড় গুপ্ত	২১৫
৩৩।	দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত (প্রাচীন মুদ্রা)	২১৮
৩৪।	শশাঙ্ক গুপ্ত (প্রাচীন মুদ্রা)	২১৯
৩৫।	মহেন্দ্রোদারোর বাঁড়	২২৮(ক)
৩৬।	পাহাড়পুরের পুরুষ	২২৮(ক)
৩৭।	যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন	২২৮(ক)
৩৮।	মহেন্দ্রোদারোর ক্ষুদ্র মনুষ্য-মূর্ত্তি	২২৮(ক)

		পৃষ্ঠা
৩৯।	দশম-একাদশ শতাব্দীর অনুরূপ মূর্তি	২২৮(ক)
৪০।	মহীপালদেবের সময়ের ছবি **	২২৮(খ)
৪১।	নরপতি কবিচন্দ্রের ব্রহ্মযামল **	২২৮(খ)
৪২।	ব্রাহ্মযামলের ছবি **	২২৯(ক)
৪৩।	ঐ **	২২৯(ক)
৪৪।	পটুয়ার অঙ্কিত সিংহ **	২২৯(খ)
৪৫।	ঐ সংকীর্তন **,	২২৯(খ)
৪৬।	রমণীমূর্তি ত্রিবর্ণ (২৫০ বৎসরের প্রাচীন) **	২৩০ ক)
৪৭।	ব্রহ্মযামলের ছবি (ত্রিবর্ণ) ** ...	২৩১ ক)
৪৮।	১০৪৭ সনের গোপীদের ছবি (ত্রিবর্ণ)	২৩৯(ক)
৪৯।	ঐ ঐ	২৩৯(ক)
৫০।	রাসচক্র ঐক্যান	৩০৫
৫১।	নাগদেন	৩১১
৫২।	মিনাণ্ডার	৩৩৭
৫৩।	কার্তিকেয় (দশম একাদশ শতাব্দী)	৪০১(ক)
৫৪।	হরগৌরী (দ্বাদশ শতাব্দী)	৪০৬ ক,
৫৫।	ঐ (নবম শতাব্দী) ..	৪০৬ ক)
৫৬।	সূর্যমূর্তি (দশম শতাব্দী)	৪০৬(ক)
৫৭।	বিষ্ণুমূর্তি (একাদশ শতাব্দী)	৪০৬(খ)
৫৮	ঐ (দ্বাদশ শতাব্দী)	৪০৬(খ)
৫৯।	নবগ্রহ (দশম শতাব্দী)	৪০৬(খ)
৬০।	সাদা কুকুরমুখো ছবি	৪১৭ ক)
৬১।	উল্কামুখো ছবি	৪১৭(ক)
৬২।	বিশাখা কর্তৃক চিত্র প্রদর্শন	৪১৭(ক)
৬৩।	বৈষ্ণব **	৪১৭(খ)
৬৪।	বৈষ্ণবী ** ..	৪১৭(খ)
৬৫।	ঘোড়া ** ...	৪১৭,খ)
৬৬।	অশোক-স্তম্ভের সিংহের মত সিংহ .	৪১৮(ক)
৬৭।	অশোক-স্তম্ভের সিংহ . ..	৪১৮(ক)
৬৮।	সিঙ্গানপুরের চিত্র (২২৮-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) .	৪১৮(ক,
৬৯।	সিঙ্গানপুরের চিত্র	৪২৮(খ)
৭০।	ঘোড়া হইতে হরিণ **	৪২৮(খ)

		পৃষ্ঠা
৭১।	অজন্তার হরিণ	৪১৮(খ)
৭২।	সিঙ্গানপুরের হাঁড়ি	৪১৮(খ)
৭৩	ঐ টিকটিকি	৪১৮(খ)
৭৪।	সিঙ্গানপুরের মাদুর। ২২৮ ২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।	৪১৮(খ)
৭৫।	দ্বাদশ শতাব্দীর কেরে ত্রিপুরার হরের মূর্তি	৪১৯ ক,
৭৬।	জৈন সন্ন্যাসী	৪১৯(ক)
৭৭	খুলনার চতুর্দশ শতাব্দীর কাষ্ঠশিল্প	৪১৯(ক,
৭৮।	ঐ	৪১৯(ক)
৭৯।	ঐ	৪১৯(ক)
৮০।	বাউলীর রথের মূর্ত্তি	৪১৯ খ,
৮১।	ঐ	৪১৯(খ,
৮২	ঐ	৪১৯(খ)
৮৩	বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী কাষ্ঠ-সিংহাসন সপ্তদশ শতাব্দী	৪১৯(গ)
৮৪।	আন্দুলের রথের মূর্তি। বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ সংগৃহীত	৪১৯(গ)
৮৫	নবাব হবেকেদের কাষ্ঠ-সিংহাসন ১৭০৯ খৃঃ	৪১৯(গ)
৮৬।	আন্দুলের রথের চিত্র সপ্তদশ শতাব্দী। বিপিনকৃষ্ণবাবুর সংগৃহীত	৪১৯(গ)
৮৭।	ঐ	৪১৯(গ)
৮৮।	খঞ্জন-বাহিকা—কাষ্ঠ-শিল্প। সপ্তদশ শতাব্দী	৪১৯(ঘ)
৮৯।	খুলনার কাষ্ঠগৃহের পুত্তলিকা। সপ্তদশ শতাব্দী	৪১৯(ঘ)
৯০	ঐ পুরুষ মূর্ত্তি	৪১৯(ঘ)
৯১।	ঢাকার কাষ্ঠ সিংহাসনের উৎকীর্ণ মূর্ত্তি, (সপ্তদশ শতাব্দী)	৪১৯(ঙ)
৯২।	ঐ	৪১৯(ঙ)
৯৩।	ঐ	৪১৯(ঙ)
৯৪।	ফরিদপুর নাটমন্দির (কাষ্ঠের)	৪১৯(চ)
৯৫।	ঢাকা কাষ্ঠ সিংহাসনের মূর্ত্তি	৪১৯(চ)
৯৬।	হংসাবতার (সপ্তদশ শতাব্দী)	৪১৯(চ)
৯৭।	রাজা সীতারাম রায়ের স্বহস্তনির্ম্মিত কাষ্ঠের লক্ষ্মী	৪১৯(চ)
৯৮।	নাটোকুঞ্জর। ত্রিবর্ণ, মৎস্যগৃহীত।	৪২১
৯৯।	রাধাকৃষ্ণ ত্রিবর্ণ, মৎস্যগৃহীত।	৪২১(ক)
১০০	রায় সীতা, অষ্টপুষ্টী কলস	৪২১(খ)
১০১	স্ত্রীলোকের অঙ্কিত নারী-পুরুষের চিত্র, উইট্ (ত্রিবর্ণ)	৪২১ক
১০২।	দুর্গামূর্ত্তি (ত্রিবর্ণ, মৎস্যগৃহীত)	৪২২(ক)

		পৃষ্ঠা
১০৩।	গণেশ জননী (ত্রিবর্ণ, বৎসগৃহীত) ...	৪২২(খ)
১০৪।	বলরাম ঐ	৪২২(খ)
১০৫।	কাঁথা-শিল্প ত্রিবর্ণ) ..	৪৩০(ক)
১০৬।	ঐ (ত্রিবর্ণ	৪৩০(খ)
১০৭।	নৌ-সৈন্য (বিষ্ণুপুর, পোড়া ইটে, সপ্তদশ শতাব্দী)	৪৩৩(ক)
১০৮।	পদ্ম (পোড়া ইটে) ..	৪৩৩(ক)
১০৯।	ঐ ..	৪৩৩(ক)
১১০।	ঐ বরিষা, (সপ্তদশ শতাব্দী) ..	৪৩৩(ক)
১১১।	যুদ্ধের অংশ (পোড়া ইটে, চতুর্দশ শতাব্দী, ফরিদপুর) ..	৪৩৩(ক)
১১২।	বানর যুদ্ধ (পোড়া ইটে, সপ্তদশ শতাব্দী, মেদিনীপুর ..	৪৩৩(খ)
১১৩।	মেষপালক (২৪প পরগণা) ..	৪৩৩(খ)
১১৪।	যদুই ও গোপীদের দধি-বিক্রয়ার্থ মথুরাযাত্রা . .	৪৩৩(খ)
১১৫।	শিকার-চিত্র (ফরিদপুর, চতুর্দশ শতাব্দী) ..	৪৩৩(খ)
১১৬।	মাটীর গহনা (ফরিদপুর)	৪৩৩(খ)
১১৭।	ঐ ..	৪৩৩(গ)
১১৮	মাটীর মাতৃমূর্তি (ফরিদপুর) ..	৪৩৩(গ)
১১৯।	আমসত্ত্বের ছাঁচ (বরিশাল) . ..	৪৩৩(গ)
১২০।	আলপনা	৪৩৩(ঘ)
১২১।	ঐ . ..	৪৩৩(ঘ)
১২২	ঐ . .	৪৩৩(ঙ)
১২৩।	ঐ	৪৩৩(ঙ)
১২৪।	ঐ	৪৩৩(ঙ)
১২৫।	ঢাকার মসলিন	৪৩৩(চ)
১২৬।	ঐ .	৪৩৩(চ)
১২৭।	মাদুর (মেদিনীপুর) ভাল উৎরায় নাই ভিতরের হল্দ ঢালগুলি ছবিতে অঙ্কিত (ভূমিকা ৬৮০ পৃঃ) ..	৪৩৩(চ)
১২৮।	শঙ্খের উপর দশ অবতার (সপ্তদশ শতাব্দী, শীতল)	৪৩৩(চ)
১২৯।	অনুরাগরঞ্জিত দাম্পত্য (হরপার্ব্বতী, ১ম শতাব্দী) .	৪৩৫(ক)
১৩০	সম্পূর্ণ দাম্পত্য (হরপার্ব্বতী, ১১শ শতাব্দী)	৪৩৫(খ)
১৩১।	সম্পূর্ণ দাম্পত্য (হরপার্ব্বতী, ১১শ শতাব্দী) .	৪৩৫ খ)
১৩২।	ঐ (৯ম-১০ম শতাব্দী)	৪৩৫(গ)
১৩৩।	কালীঘাটের পটুয়ার অঙ্কিত হরপার্ব্বতী, বাৎসল্য ভাব .. .	৪৩৫(ঘ)

		পৃষ্ঠা
১৩৪।	কালীঘাটের পটুয়াগণ অঙ্কিত হর-পার্ব্বতী ...	৪৩৫(ঘ)
১৩৫।	মহাদেব (পটুয়া অঙ্কিত) ...	৪৩৫ ঙ)
১৩৬।	দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে শিব-চিত্র ...	৪৩৫(চ)
১৩৭	পটুয়া-অঙ্কিত শিবের সঙ্গে ভঙ্গীর সাদৃশ্য ...	৪৩৫(চ)
১৩৮।	অজন্তার স্তম্ভ ...	৪৩৫(চ)
১৩৯	অনুরূপ কাঠের স্তম্ভ, পুলনা (১১শ শতাব্দী) ...	৪৩৫(চ)
১৪০	সুলতানগঞ্জের বুদ্ধ	৪৩৬(ক)
১৪১।	সারনাথের বুদ্ধ	৪৩৬(ক)
১৪২।	চট্টগ্রামের ধাতব বুদ্ধ (৯ম শতাব্দী) ...	৪৩৬(ক)
১৪৩।	ঐ (১৩শ শতাব্দী)	৪৩৬(ক)
১৪৪।	বরোবদোরের বুদ্ধ	৪৩৬(খ)
১৪৫।	ঐ	৪৩৬(খ)
১৪৬।	মথুরার বুদ্ধ	৪৩৬(খ)
১৪৭।	বরোবদোরের বুদ্ধ	৪৩৬(খ)
৪৮	বরোবদোরের বুদ্ধের অনুকরণ, এন, সি, পাল ...	৪৩৬(গ)
১৪৯।	ঐ	৪৩৬(গ)
১৫০।	প্রবনমের বুদ্ধ	৪৩৬(গ)
১৫১।	খেড়রাহের বুদ্ধ (১০ম-১১শ শতাব্দী) ...	৪৩৬(ঘ)
১৫২	বৌদ্ধ গণেশ ১০ম শতাব্দী, চট্টগ্রাম ...	৪৩৬(ঘ)
১৫৩।	বৌদ্ধ জাঙ্গুলের চিত্র (কাষ্ঠ ফলক) ...	৪৩৬(ঘ)
১৫৪।	প্রসন্ন বুদ্ধ	৪৩৬(ঙ)
১৫৫।	ভূটিয়া বুদ্ধ ...	৪৩৬(ঙ)
১৫৬।	ভূপের শিব	৪৩৬(ঙ)
১৫৭	ভূঙ্গক ও বুদ্ধশিষ্য আনন্দ (প্রাচীন চিত্র হইতে)	৪৩৬(ঙ)
১৫৮।	ভগ্নস্তূপ দেবতা	৪৩৬ চ)
১৫৯।	অশোক রেলিংএর মূর্ত্তি	৪৩৬ চ)
১৬০।	ঐ	৪৩৬(চ)
১৬১	কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা (মৎসংগৃহীত—ত্রিবর্ণ)	৪৩৮ ক)
১৬২।	পুথির ললাটে ভূল-লক্ষ্মীর চিত্র ...	৪৩৮(ক)
১৬৩।	মথুরায় কৃষ্ণ (মৎসংগৃহীত—ত্রিবর্ণ) ...	৪৩৮(খ)
১৬৪।	স্তম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ ...	৪৩৮,খ)
১৬৫	মকরীদের (পটীদারদের) চিত্র	৪৩৯(ক)

		পৃষ্ঠা
১৬৬।	বরদাদেব (পটীবারদেব) চিত্র	৪৩৯।ক)
১৬৭।	ঐ ...	৪৪০(ক)
১৬৮।	ঐ	৪৪০(ক)
১৬৯।	বাল গোপাল (ত্রিবর্ণ)	৪৪১(ক)
১৭০।	কুঞ্জবন (ত্রিবর্ণ)	৪৪১(ক)
১৭১।	মিস বেলনসের অঙ্কিত বাঙ্গালীর ছবি—বন্ধন শালা	৪৪৭(ক,
১৭২।	ঐ—চরক	৪৪৭(ক
১৭৩।	শিশুর শব	৪৪৭(ক)
১৭৪।	গঙ্গায় অর্ণাসান	৪৪৭(খ)
১৭৫।	বাঙ্গালী হিন্দু বাই	৪৪৭ খ)
১৭৬।	গৃহাভিমুখে	৪৪৭।খ)
১৭৭।	হিন্দু অন্তঃপুর ...	৪৪৭(গ
১৭৮।	প্রশাসন ...	৪৪৭।গ)
১৭৯।	নিক্রিকা	৪৪৮(ক)
১৮০।	নর্ত্তকী ...	৪৪৮।খ)
১৮১।	স্বামী স্ত্রী ...	৪৪৮।খ
১৮২	বৈষ্ণব ...	৪৪৮।গ
১৮৩।	নায়িকা	৪৪৮।গ
১৮৪।	ঐ	৪৪৮(ঘ
১৮৫।	ভেড়া বানানো	৪৪৮।ঙ)
১৮৬।	বীণাবাদিকা ...	৪৪৮।চ)
১৮৭।	নায়িকা	৪৪৮।ছ)
১৮৮।	নায়ক-নায়িকা	৪৪৯(ক)
১৮৯।	পত্নী	৪৪৯।খ)
১৯০।	নায়ক-নায়িকা	৪৪৮(ঝ)
১৯১।	পত্নী	৪৪৮(ঞ)
১৯২।	চুল আঁচড়ানো	৪৪৮(ঞ)
১৯৩।	বেহালা-বাদিকা	৪৪৮।ট)
১৯৪।	ভ্রূকুটি-সেবিনী	৪৪৮(ট)
১৯৫।	ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা	৪৪৮(ঠ)
১৯৬।	পটল তোলা	৪৪৮(ঠ)
১৯৭।	যুদ্ধ-পত্নী	৪৪৮(ড)

		পৃষ্ঠা
১৯৮।	ভবলা-বাদিকা **	৫৪৮(ঙ)
১৯৯।	গো-দোহনকারিণী	৫৪১(ক)
২০০।	ফরিদপুরের মাতৃমূর্ত্তি	৫৪১(ক)
২০১।	আলেকজেন্দ্রিয়ার আইসিস মূর্ত্তি	৫৪১(ক)
২০২।	চীনদেশীয় মাতৃমূর্ত্তি	৫৪১(ক)
২০৩।	কালীঘাটের মাতৃমূর্ত্তি	৫৪১(ক)
২০৪।	লক্ষ্মণ সেন	৫৪২(ক)
২০৫।	বাবর	৫৪২(ক)
২০৬।	আকবর	৫৪২(ক)
২০৭।	মানসিংহ	৫৪২(খ)
২০৮।	হুমায়ুন	৫৪২(খ)
২০৯।	শেরসাহ	৫৪২(খ)
২১০।	সুরজাহান **	৫৪২(খ)
২১১।	জাহাঙ্গীর	৫৪২(খ)
২১২।	সাজাহান	৫৪২(খ)
২১৩।	আরঙ্গজেব	৫৪২(গ)
২১৪।	মুর্শিদকুলি খাঁ	৫৪২(গ)
২১৫।	সরফরাজ খাঁ	৫৪২(গ)
২১৬।	আলিবর্দ্দী খাঁ	৫৪২(গ)
২১৭।	সুজাউদ্দিন	৫৪২(গ)
২১৮।	সিরাজুদ্দৌলা	৫৪২(ঘ)
২১৯।	মীরজাফর ও মীরণ	৫৪২(ঘ)
২২০।	গোবিন্দনাথ	৫৪২(ঘ)
২২১।	মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র	৫৪২(ঘ)
২২২।	ক্লাইভ	৫৪২(ঘ)
২২৩।	মোহনলাল	৫৪২(ঙ)
২২৪।	কল্পদমন	৫৪২(ঙ)
২২৫।	রাজা নরসিংহ দেব	৫৪২(ঙ)
২২৬।	রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল	৫৪২(ঙ)
২২৭।	রামপ্রসাদ সেন * *	৫৪২(ঙ)
২২৮।	রামপ্রসাদের স্ত্রী যশোদা দেবী * *	৫৪২(ঙ)
২২৯।	রমণী-দেহের উত্তরার্দ্ধ নগ্ন, যদুবংশ	৫৫৯(ক)

		পৃষ্ঠা
২৩০	রমণী-দেহের উত্তরার্দ্ধ নগ্ন, শরোবলদ	৫৫৯(ক)
২৩১।	সারওয়ারজান মিঞার ঘর	৫৫৯(খ)
২৩২।	ঐ (ত্রিবর্ণ)	৫৫৯(গ)
২৩৩।	কাঙ্গনগ্রামের মন্দির	৬৬০(ক)
২৩৪।	বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী-মন্দির ...	৬৬০(খ)
২৩৫।	বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির	৬৬০(খ)
২৩৬।	মহানাদের, রাধাকৃষ্ণ-মন্দির	৬৬০(ঘ)
২৩৭।	মহানাদের সোতালা ঘরের পঙ্ক মন্দির ...	৬৬০(ঘ)
২৩৮।	বাহিপলের, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির	৬৬০ গ)
২৩৯।	জটার দেউল	৬৬০(ঘ)
২৪০।	সের সাহের সমাধি	৬৬০(ঘ)
২৪১।	চৈতন্য-সংকীর্তন (সপ্তদশ-শতাব্দী—ত্রিবর্ণ) মৎসংগৃহীত ...	৬৭৪(ক)
২৪২।	গোবর্দ্ধন-ধারণ (ত্রিবর্ণ) মৎসংগৃহীত	৬৯১(ক)
২৪৩।	পদ্মাকর্তৃক নায়িকাহরণ (ত্রিবর্ণ) **	৬৯৫(ক)
২৪৪।	রাই কামিনী (ত্রিবর্ণ) **	৬৯৪(ক)
২৪৫।	কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা (ত্রিবর্ণ) **	৬৯৫(ক)
২৪৬।	রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণ (ত্রিবর্ণ)	৬৯৫(খ)
২৪৭।	কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা (ত্রিবর্ণ)	৬৯৪(খ)
২৪৮।	চারিটি গোপী (ত্রিবর্ণ)	৬৯৫(খ)
২৪৯।	চৈতন্য (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬৯৭(ক)
২৫০।	চৈতন্য (২০০ বৎসর পূর্ব্বের) **	৬৯৭(খ)
২৫১।	চৈতন্য (সমসাময়িক) **	৬৯৭(খ)
২৫২।	চৈতন্য (নবদ্বীপের প্রাচীন মূর্ত্তি)	৬৯৭(গ)
২৫৩।	চৈতন্য সংকীর্তন (১৮১৫ খৃঃ)	৬৯৭(খ)
২৫৪।	কৃষ্ণের দধি-হরণ-লীলা (মন্দিরগাত্রের চিত্র, ত্রিবর্ণ) ** ...	৬৯৭(গ)
২৫৫।	শ্রীনিবাস মূর্চ্ছাপন্ন, রামচন্দ্র কবিরাজ এবং একজন বৈদ্য চিকিৎসক (সপ্তদশ শতাব্দী ত্রিবর্ণ) **	৬৯৭(গ)
২৫৬।	বীরহাম্বীর (বৈষ্ণব ভিক্ষুবেশে) রাজী দুর্জ্জনিকা এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য (ত্রিবর্ণ) **	৬৯৭(গ)
২৫৭।	প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যের প্রথম মিলন সপ্তদশ শতাব্দী (ত্রিবর্ণ) ...	৬৯৭(ঘ)
২৫৮।	হরিদাস ও অদ্বৈত (১২৫ বৎসর পূর্ব্বের ত্রিবর্ণ, মৎসংগৃহীত) ...	৬৯৭(ঘ)
২৫৯।	হরিদাস, (সপ্তদশ শতাব্দী ত্রিবর্ণ, মৎসংগৃহীত)	৬৯৭(ঘ)

		পৃষ্ঠা
২৬০।	ষড়ভুজ চৈতন্য (১৮১৫ খৃঃ)	৬৯৭(ঙ)
২৬১।	নিত্যানন্দ (২৫০ বৎসর পূর্ব্বের) **	৬৯৭(ঙ)
২৬২।	অদ্বৈত (প্রৌঢ় বয়সের, সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬৯৭(ঙ)
২৬৩।	অদ্বৈত (বার্দ্ধক্যে) **	৬৯৭(ঙ)
২৬৪।	হরিদাস (২৫০ বৎসর পূর্ব্বের) **	৬৯৭(ঙ)
২৬৫।	রূপ গোস্বামী ঐ **	৬৯৭(চ)
২৬৬।	গদাধর ঐ **	৬৯৭(চ)
২৬৭।	রায় রামানন্দ ঐ **	৬৯৭(চ)
২৬৮।	শ্রীগোবিন্দ ঐ **	৬৯৭(চ)
২৬৯।	সনাতন ঐ **	৬৯৭(চ)
২৭০।	রাজা প্রতাপরুদ্র ঐ **	৬৯৭(চ)
২৭১।	জীব গোস্বামী ঐ **	৬৯৭(ছ)
২৭২।	গোপাল ভট্ট ঐ **	৬৯৭(ছ)
২৭৩।	রঘুনাথ ভট্ট ঐ **	৬৯৭(ছ)
২৭৪।	রঘুনাথ দাস ঐ **	৬৯৭(ছ)
২৭৫।	স্বরূপ দামোদর ঐ **	৬৯৭(ছ)
২৭৬।	শ্রীরূপসনাতন ঐ **	৬৯৭(জ)
২৭৭।	শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬৯৭(জ)
২৭৮।	উদ্ধরণ দত্ত (২৷৩ শত বৎসর পূর্ব্বের) **	৬৯৭(জ)
২৭৯।	গদাধর পণ্ডিত (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬৯৭(জ)
২৮০।	শ্রীবাস (২৫০ বৎসর পূর্ব্বের) **	৬৯৭(ঝ)
২৮১।	রামচন্দ্র কবিরাজ (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬৯৭(ঝ)
২৮২।	মূর্দ্ধাপন্ন শ্রীনিবাস আচার্য্য (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬৯৭(ঝ)
২৮৩	হেবন্ত (ভূমিকা ৩৯-এ/০ দ্রষ্টব্য)	৬৯৭(ঝ)
২৮৪।	বীরহাম্বীর (২৫০ বৎসর পূর্ব্বের) **	৬৯৭(ঝ)
২৮৫।	হরিদাস-আশ্রমের বকুলতরু (মৎসংগৃহীত)	৬৯৭(ঞ)
২৮৬।	চৈতন্য-সংকীর্ত্তন (সপ্তদশ শতাব্দী)	৬৯৭(ঞ)
২৮৭।	বাসুদেব সার্ব্বভৌম **	৬৯৭(ট)
২৮৮।	মহারাজা প্রতাপরুদ্র (১৩৪ পৃঃ) **	৬৯৭(ট)
২৮৯।	খঞ্জন আচার্য্য (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬৯৭(ট)
২৯০।	দক্ষিণে শ্রীনিবাস, মধ্যে নরোত্তম, বামে শ্যামানন্দ (১৭৫৮ খৃঃ) মৎসংগৃহীত	৬৯৭(ট)
২৯১	রথের মিছিল	৬৯৭(ঠ)

		পৃষ্ঠা
১৯২।	পঙ্ক-শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য কে, সি, এস, আই (ত্রিবর্ণ)	১০১৩
১৯৩।	মহারাজা বিজ[illegible]ক্যের নৌবাতান	১০৩১(ক)
১৯৪।	ঐ	১০৩১(খ)
১৯৫।	মহারাজা দুর্গামাণিক্য	১০৪৫(ক)
১৯৬।	মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য	১০৪৫(ক)
১৯৭।	মহারাজা ঈশানমাণিক্য	১০৪৫(ক)
১৯৮।	মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্য	১০৪৫(ক)
১৯৯।	মহারাজা ধন্যমাণিক্যের মন্দিরসমূহ	১০৪৪(খ)
২০০।	মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য (ত্রিবর্ণ)	১০৪৬(ক)
২০১।	মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য (ত্রিবর্ণ)	১০৪৬(খ)
২০২।	মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য (ত্রিবর্ণ)	১০৪৬(গ)
২০৩।	"রিয়া" প্রস্তুতকারিনী রমণীগণ (ত্রিবর্ণ)	১০৪৭(ক)
২০৪।	বয়ননিরতা রমণী (ত্রিবর্ণ)	১০৪৭(খ)